২০শ বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩৪৮ [১ম সংখ্যা

উপনিষদের ব্রহ্মবাদ

সংহিতা ও ব্রাহ্মণের বন্ধুর পথে অদ্বৈত বেদান্তের যে চিন্তাধারা ফল্গুধারার মত স্থূলদর্শীর অলক্ষিতে মৃদুগতিতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছিল, তাহাই আরণ্যক ও উপনিষদে নানাভাব-তরঙ্গময়ী জ্ঞান-গঙ্গায় পরিণত হইয়াছে। পণ্ডিত ম্যাক্সমূলর সত্যই বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে উপনিষৎ বা ...বিদ্যার আবির্ভাব আকস্মিক নহে। বহু পার্ব্বত্য ...সের ধারা ও পার্ব্বত্য সরিৎপ্রবাহ একত্র মিলিত হইয়া ...ন সুবিশাল নদীরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ উপনিষদের ...ীর আধ্যাত্মিক ভাবসমূহ, বেদরূপ দূরবর্ত্তী উৎস হইতে ...দ্ভূত হইয়াছে। ১

বৈদিক সংহিতার অনুরূপ প্রশ্ন ও উত্তর আমরা উপনিষদেও দেখিতে পাই। উপনিষদের ঋষি প্রশ্ন

১। These Upanishads did not spring into ...stence on a sudden : like a stream which has ...ived many a mountain torrent, and is fed by ...ny a rivulet, the literature of the Upanishads ...ves, better than anything else, that the elements ...their philosophical poetry came from a more ...stant fountain.

—Maxmuller's History of Ancient Sanskrit ...erature. P. 566.

উপনিষদের সংখ্যা অনেক। মুক্তিকোপনিষদে নিম্নলিখিত ১০৮ খানি উপনিষদের নাম উল্লেখ আছে:—১ ঈশ, ২ কেন, ৩ কঠ, ৪ প্রশ্ন, ৫ মুণ্ডক, ৬ মাণ্ডুক্য, ৭ তৈত্তিরীয়, ৮ ঐতরেয়, ৯ ছান্দোগ্য, ১০ বৃহদারণ্যক, ১১ ব্রহ্ম, ১২ কৈবল্য, ১৩ জাবাল, ১৪ শ্বেতাশ্বতর, ১৫ হংস, ১৬ আরুণি, ১৭ গর্ভ, ১৮ নারায়ণ, ১৯ পরমহংস, ২০ অমৃতবিন্দু, ২১ অমৃতনাদ, ২২ অথর্ব্বশিরঃ, ২৩ অথর্ব্বশিখা, ২৪ মৈত্রায়ণী, ২৫ কৌষীতকী, ২৬ বৃহজ্জাবাল, ২৭ নৃসিংহতাপনীয়, ২৮ কালাগ্নিরুদ্র, ২৯ মৈত্রেয়ী, ৩০ সুবাল, ৩১ ক্ষুরিকা, ৩২ মন্ত্রিকা, ৩৩ সর্ব্বসার, ৩৪ নিরালম্ব, ৩৫ শুকরহস্য, ৩৬ বজ্রসূচিকা, ৩৭ তেজোবিন্দু, ৩৮ নাদবিন্দু, ৩৯ ধ্যানবিন্দু, ৪০ ব্রহ্মবিদ্যা, ৪১ যোগতত্ত্ব, ৪২ আত্মবোধ, ৪৩ পরিব্রাট্, ৪৪ ত্রিশিখী, ৪৫ সীতা, ৪৬ যোগচূড়া, ৪৭ নির্ব্বাণ, ৪৮ মণ্ডল, ৪৯ দক্ষিণামূর্ত্তি, ৫০ শরভ, ৫১ স্কন্দ, ৫২ মহানারায়ণ, ৫৩ অদ্বয়, ৫৪ রাম-রহস্য, ৫৫ রামতাপনীয়, ৫৬ বাসুদেব, ৫৭ মুদ্গল, ৫৮ শাণ্ডিল্য, ৫৯ পৈঙ্গল, ৬০ ভিক্ষু, ৬১ মহা, ৬২ শারীরক, ৬৩ যোগশিখা, ৬৪ তুরীয়াতীত, ৬৫ সন্ন্যাস, ৬৬ পরিব্রাজক, ৬৭ অক্ষ-মালিকা, ৬৮ অব্যক্ত, ৬৯ একাক্ষর, ৭০ অন্নপূর্ণা, ৭১ সূর্য্য, ৭২ অক্ষি, ৭৩ অধ্যাত্ম, ৭৪ কুণ্ডিকা, ৭৫ সাবিত্রী, ৭৬ আত্মা, ৭৭ পাশুপত, ৭৮ পরব্রহ্ম, ৭৯ অবধূত, ৮০ ত্রিপুরা-তাপনী, ৮১ দেবী, ৮২ ত্রিপুরা, ৮৩ কঠরুদ্র, ৮৪ ভাবনা, ৮৫ রুদ্রহৃদয়, ৮৬ যোগ-কুণ্ডলী, ৮৭ ভস্মজাবাল, ৮৮ রুদ্রজাবাল, ৮৯ গণপতি, ৯০ জাবালদর্শন, ৯১ তারাসার, ৯২ মহাবাক্য, ৯৩ পঞ্চব্রহ্ম, ৯৪ প্রাণাগ্নিহোত্র, ৯৫ গোপালতাপনীয়, ৯৬ কৃষ্ণ, ৯৭ যাজ্ঞবল্ক্য, ৯৮ বরাহ, ৯৯ শাট্যায়নীয়, ১০০ হয়গ্রীব, ১০১ দত্তাত্রেয়, ১০২ গরুড়, ১০৩ কলিসন্তরণ, ১০৪ জাবালি, ১০৫ সৌভাগ্য, ১০৬ সরস্বতীরহস্য, ১০৭ বহ্বৃচ, ও ১০৮ মুক্তিক : উল্লিখিত একশত আটখানির সঙ্গে নৃসিংহোত্তরতাপনীয়

করিয়াছেন,—কাহার ইচ্ছায় প্রেরিত হইয়া আমাদের মন ক্রিয়াশীল হয়? কাহার ইচ্ছায় আমাদের বাক্যস্ফূর্ত্তি হয়? কোন্ দেবতা আমাদের চক্ষু ও কর্ণকে তাঁহাদের স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকেন? উত্তর হইল,—তিনি আমাদের শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, চক্ষুর চক্ষু। চক্ষু যেখানে যায় না, বাক্য যাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, মন যেখানে প্রবেশ করে না, তাহাকে আমরা স্থূল-বস্তুর মত দেখিতে পারি না, জানিতে পারি না। তাঁহার কথা আমরা কেমন করিয়া বলিব? তিনি জানা ও অজানার বাহিরে। ১

ব্রহ্মের স্বরূপ

তিনি বিরাট্, পৃথিবী অপেক্ষাও মহান্, অন্তরিক্ষ অপেক্ষাও মহান্, দ্যুলোক অপেক্ষাও মহান্, এমন কি, সমস্ত লোকসমষ্টি হইতেও তিনি মহান্। এই জন্যই তাঁহাকে ব্রহ্ম বা বৃহত্তম (বৃহত্ত্বাৎ ব্রহ্ম) বলা হইয়া থাকে। ঋগ্‌বেদের পুরুষসূক্তে আমরা তাঁহার এই বিরাট্ রূপেরই পরিচয় পাইয়াছি। সেই বিরাট্ পুরুষকে লক্ষ্য করিয়াই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ঋষি বলিয়াছেন:—তাঁহার কর ও চরণ সর্ব্বত্র বিসারিত, সর্ব্বত্র তাঁহার চক্ষু, সর্ব্বত্র তাঁহার মুখ, সর্ব্বত্র তাঁহার শিরঃ। সকলের মুখই তাঁহার মুখ, সকলের শিরই তাঁহার শিরঃ, সকলের গ্রীবাই তাঁহার গ্রীবা। তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত, তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বান্তর্য্যামী। নিখিল বিশ্বই তাঁহার রূপ। মুণ্ডক উপনিষদে ব্রহ্মের বিরাট্ রূপের বর্ণনায় লিখিত হইয়াছে যে, দ্যুলোক তাঁহার মস্তক, চন্দ্র-সূর্য্য তাঁহার চক্ষুঃ, দিক্ তাঁহার কর্ণ, বেদ তাঁহার বাণী, বায়ু তাঁহার প্রাণ, পৃথিবী তাঁহার চরণ, সর্ব্বভূতের হৃদয় তাঁহার আবাসগৃহ। ১

নির্গুণ ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম

তিনি অনাদি অনন্ত, ধ্রুব এবং ক্ষয়ব্যয়রহিত। এই অক্ষর-ব্রহ্ম স্থূলও নহেন, অণুও নহেন, হ্রস্বও নহেন, দীর্ঘও নহেন, ছায়াও নহেন, তমঃও নহেন, বায়ুও নহেন, আকাশও নহেন, রসও নহেন, শব্দও নহেন, গন্ধও নহেন, চক্ষুও নহেন, শ্রোত্রও নহেন, বাক্যও নহেন, মনও নহেন, তেজও নহেন, প্রাণও নহেন, অন্তরও নহেন, বাহিরও নহেন। তিনি প্রজ্ঞানঘনও নহেন, প্রজ্ঞও নহেন, অপ্রজ্ঞও নহেন। তিনি দর্শনের অতীত, জ্ঞানের অতীত, ব্যবহারের অতীত, লক্ষণের অতীত, চিন্তার অতীত, নির্দ্দেশের অতীত, একমাত্র আত্মরূপেই প্রসিদ্ধ, প্রপঞ্চাতীত শান্ত শিব অদ্বৈত। তিনিই আত্মা, তিনিই ব্রহ্ম। ২ শ্রুতিতে এইরূপে নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের

গোপালোত্তরতাপনীয়, রমোত্তরতাপনীয় ও অপর একখানি নারায়ণোপনিষৎ যোগ করিয়া ১১২ খানি উপনিষৎ বোম্বে নির্ণয়-সাগর-কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৫০ খানি উপনিষৎ ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ সাহাজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারার উদ্‌যোগে পারস্য ভাষায় অনূদিত হয়। ঐ পারস্য অনুবাদ ১৮০১-২ খৃষ্টাব্দে লাটিন ভাষায় পুনরায় অনুবাদিত হয়। ইহা হইতেই পাশ্চাত্ত্য দেশে উপনিষদুক্ত তত্ত্ব আলোচনার সূত্রপাত হয়।

১। কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি।
শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্ বাচো হ বাচং স উ
প্রাণস্য প্রাণঃ······
ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনো ন বিদ্মো
ন বিজানীমো
যথৈতদনুশিষ্যাৎ অন্যদেব তদ্ বিদিতাদথো অবিদিতাদধি······
কেনোপনিষৎ—প্রারম্ভ,

১। জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষাৎ জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ। ছাঃ ৩।১৪।৩
সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি। শ্বেতাশ্বতর ৩।১৬
বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
শ্বেতাশ্ব ৩।৩
সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ।
সর্ব্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ
শ্বেতাশ্বতর ৩।১১
অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্‌বিবৃতাশ্চ বেদাঃ
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্‌ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ
সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।—মুণ্ডক ২।১।৪

২। অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ
প্রমুচ্যতে। কঠ ৩।১৫
এতদ্ বৈ তদক্ষরং ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি অস্থূলমনণু, অহ্রস্বমদীর্ঘম্···অচ্ছায়মতমোঽবায়ু অনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাক্ অমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রমনন্তরমবাহ্যম্। বৃহদাঃ ৩।৮।৮
নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং
ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞমদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যম্, একাত্মপ্রত্যয়সারং

বর্ণনা পাওয়া যায়। এইরূপ বর্ণনার তাৎপর্য্য এই যে, যে ভাবেই ব্রহ্মকে জানিতে যাও না কেন, তাঁহার যে নামই দেও না কেন, তাঁহার কোনটিই ব্রহ্ম নহেন। ব্রহ্ম-বস্তু সর্ব্ববিধ জ্ঞাত ও পরিচিত পদার্থ হইতে বিভিন্ন। তিনি অবাঙ্মনসগোচর। তিনি জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়ের বাহিরে। এই জন্যই ব্রহ্মকে বিধিমুখে অর্থাৎ "তিনি এইরূপ" এই ভাবে (Positively) প্রকাশ করা যায় না, নিষেধ-মুখে (Negatively) অর্থাৎ নেতি নেতি, তিনি ইহা নহেন, তিনি তাহা নহেন, এই ভাবেই তাঁহাকে জানিতে পারা যায়। তাঁহার উর্দ্ধে আর কিছুই তত্ত্ব নাই, ব্রহ্মতত্ত্বই চরম ও পরমতত্ত্ব। ১ ব্রহ্ম জ্ঞাতা নহেন, জ্ঞান নহেন, জ্ঞেয়ও নহেন, দ্রষ্টা নহেন, দৃশ্য নহেন, দর্শনও নহেন, তিনি সৎও নহেন, অসৎও নহেন; তিনি চিৎ নহেন, জড়ও নহেন, তিনি সুখও নহেন, দুঃখও নহেন; অথচ তিনি সবই বটেন, তিনি সমস্ত দ্বন্দ্বের চির-সমন্বয়। দেশ, কাল ও নিমিত্ত যখন তাঁহার বাহিরে নহে, তখন দ্বৈতই বা কি? আর অদ্বৈতই বা কি? ফলতঃ তিনি দ্বৈতও নহেন, অদ্বৈতও নহেন। ব্রহ্ম সকল দ্বৈতাদ্বৈতের একান্ত অবসান। (Supreme Unity of all contradictions) ইহাই শ্রুতির ব্রহ্ম-উপদেশের তাৎপর্য্য। এইজন্য উপনিষদে পরব্রহ্মে সমস্ত বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমন্বয়ের ইঙ্গিত করিয়া বলা হইয়াছে যে, তিনি দূরে অথচ নিকটে, তিনি অণু হইতেও অণু, আবার মহৎ হইতেও মহত্তম। তিনি অমূর্ত্ত অথচ জগন্মূর্ত্তি। তিনি নিগুর্ণ অথচ সগুণ। তিনি অসীমও বটেন, সসীমও বটেন, অখণ্ডও বটেন, সখণ্ডও বটেন। তিনি স্থির অথচ গতিশীল। এইরূপ বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশ উপদেশ করিয়া শ্রুতি ব্রহ্মে চিরদ্বন্দ্বের সমন্বয়েরই নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ব্রহ্ম সৎ, অসৎ, চিৎ, জড়, সুখ, দুঃখ এই সকলেরই চির অবসানভূমি। ব্রহ্মবস্তু বেদান্তের ভাষায় অনির্ব্বাচ্য।

প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্,—স আত্মা বিজ্ঞেয়ঃ। মাণ্ডুক্য।৭
এতদমৃতমভয়মেতদ্ব্রহ্ম। ছাঃ ৪।১৫।১, অক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরম্, কঠ ৩।২
শুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্। ঈশ ৮।
১। স এষ নেতি নেতি আত্মা বৃহদাঃ ৪।৫।১৫; অথাত আদেশো নেতি নেতি নহ্যেতস্মাদিতি। বৃহদাঃ ২।৩।৬।

নিগুর্ণ, নিরুপাধি ব্রহ্ম দেশ, কাল ও নিমিত্তের অতীত

ব্রহ্ম নিগুর্ণ, নির্ব্বিশেষ ও নিরুপাধি। নিরুপাধি শব্দের অর্থ কি? সমস্ত ব্যাবহারিক জগৎই দেশ, কাল, নিমিত্ত বা কার্য্য-করণসম্বন্ধ এই ত্রিবিধ উপাধির অধীন। ব্রহ্ম দেশ, কাল ও নিমিত্তের অতীত। এই দৃষ্টিতেই ব্রহ্মকে উপনিষদে নির্ব্বিশেষ ও নিরুপাধি বলা হইয়াছে।

ব্রহ্ম দেশের অতীত

ব্রহ্মের দেশাতীত অবস্থা বুঝাইবার জন্য বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে, হে গার্গি! যাহা দ্যুলোকের উর্দ্ধে এবং পৃথিবীর অধোদেশে বর্ত্তমান, দ্যুলোক এবং ভূলোক যাহার মধ্যে অবস্থিত, সেই আকাশ-ব্রহ্মে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই কালত্রয় ওতপ্রোত-ভাবে বিরাজ করিতেছে। ছান্দোগ্য বলিয়াছেন, ব্রহ্মই উর্দ্ধে, ব্রহ্মই অধোদেশে, ব্রহ্মই পশ্চাতে, ব্রহ্মই সম্মুখে, ব্রহ্মই দক্ষিণে, ব্রহ্মই উত্তরে, সমস্তই ব্রহ্মময়। ব্রহ্ম এক এবং অনন্ত, তিনি পূর্ব্বেও অনন্ত, পশ্চিমেও অনন্ত, দক্ষিণেও অনন্ত, উত্তরেও অনন্ত, সব দিকেই অনন্ত। ১

ব্রহ্ম কালের অতীত

দেশের অতীত ব্রহ্ম কালাতীতও বটেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ স্পষ্টতঃ ব্রহ্মকে কালত্রয়ের অতীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—পরঃ ত্রিকালাৎ, (শ্বেতঃ ৬।৫) বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম চির সত্য, সনাতন, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান তাঁহার পরিমাপ করিতে পারে না; তিনি ভূত এবং ভব্যের (ভবিষ্যতের) অধীশ্বর,—ঈশানং ভূতভব্যস্য, বৃহদাঃ ৪।৪।১৫। তিনি কালাধীশ, কাল তাঁহার অন্তরে অবস্থিত।

ব্রহ্ম নিমিত্তের অতীত

যিনি দেশের অতীত ও কালের অতীত, শাশ্বত, ধ্রুব, অক্ষর, অব্যয় ও কূটস্থ, তিনি যে নিমিত্তের

১। সহোবাচ যদূর্দ্ধং গার্গি দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্ভূতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষত আকাশ এব তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চেতি বৃহদাঃ ৩।৮।৭
স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ
স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্ব্বম্। ছাঃ ৭।২৫।১
ব্রহ্ম হ বা ইদমগ্র আসীদেকোঽনন্তঃ প্রাগনন্তো দক্ষিণতোঽনন্তঃ প্রতীচ্যনন্ত উদীচ্যনন্ত ঊর্দ্ধং চ অবাক্ চ সর্ব্বতোঽনন্তঃ।
মৈত্র্যুপনিষৎ ৬।১৭

(কার্য্য-করণের) অতীত এবং স্বয়ং সর্ব্বকারণ-কারণ তাহাতে সন্দেহ কি ? ১

ব্রহ্ম অজ্ঞেয়

দেশ, কাল, নিমিত্তের অতীত ব্রহ্ম অজ্ঞেয়, অমেয় এবং অনির্দ্দেশ্য। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, দ্রষ্টা, দৃশ্য প্রভৃতি বিশেষ বোধের উদয় হইতে পারে না। জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ব্রহ্মে একীভূত, দ্রষ্টা দৃশ্য একাকার, সুতরাং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম "জ্ঞেয়" হইবেন কিরূপে ? দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্ম বেদান্তের ভাষায় বিষয়ী (Subject), আর, জ্ঞেয় জড়বস্তু বিষয় (Object)। জ্ঞাতা বিষয়ী (Subject) ও জ্ঞেয় বিষয়ের (Object) ভেদ সুপ্রসিদ্ধ। বিষয়ী (Subject) বিষয় (Object) হইতে পারে না, কারণ, বিষয় (Object) হইলে উহা আর বিষয়ী (Subject) থাকিতে পারে না, জ্ঞেয় জড়বস্তুর মত জড়-বস্তুই হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ পক্ষে তিনি বিষয় এবং বিষয়ী এই উভয়ের ঊর্দ্ধে, বিষয় ও বিষয়ীর, জড় ও জীবের অন্তরে বিরাজ করেন। তিনি নিখিল বিশ্বের দ্রষ্টা ও সাক্ষী, তাঁহাকে কিরূপে জানিবে ? ২—বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ—বৃহদাঃ ২।৪।১৪। তিনি অবিজ্ঞাত (অজ্ঞেয়) হইয়াও বিজ্ঞাতা—অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ, বৃহদাঃ ৩।৮।১১, অদৃষ্ট হইয়াও দ্রষ্টা, তিনি ভিন্ন অন্য কোন দ্রষ্টা নাই, অন্য কোন জ্ঞাতা নাই, তিনিই সর্ব্বান্তর সর্ব্বান্তর্য্যামী অমৃত আত্মা। এই আত্মাই সূত্র। আত্মসূত্রেই নিখিল বিশ্ব গ্রথিত আছে। আত্মাই সর্ব্বত্র সম্মুখে, পশ্চাতে, উত্তরে, দক্ষিণে সদা বিরাজমান এবং যাহা কিছু চতুর্দ্দিকে বিদ্যমান, সমস্তই সেই আত্মা। ৩ আত্মাই ব্রহ্ম। আত্মাই ভূমা। ভূমা কাহাকে বলে ? যেখানে অন্য বস্তুর দর্শন হয় না। অন্য বস্তুর শ্রবণ হয় না, অন্য বস্তুর মনন হয় না, তিনিই ভূমা, আর যেখানে অন্য বস্তুর দর্শন হয়, অন্য বস্তুর শ্রবণ হয়, অন্য বস্তুর মনন হয়, তাহা অল্প বা পরিচ্ছিন্ন ; যিনি ভূমা তিনিই অমৃত। যাহা অল্প, তাহাই মর্ত্ত্য ও বিনাশী। ১ এই ভূমা ব্রহ্মে দ্বৈতের বা ভেদের কোনও স্থান নাই। ভেদ থাকিলেই, দ্বৈত থাকিলেই জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ভাবের উদয় হয় ; ভূমার সকল প্রকার ভেদ তিরোহিত হয়, সুতরাং ভূমা ব্রহ্ম জ্ঞেয় হইবেন কিরূপে ?

ব্রহ্ম অজ্ঞেয়, অমেয়, অনির্দ্দেশ্য হইলেও নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে উপনিষদে সচ্চিদানন্দস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ব্রহ্মের এই সদ্‌ভাব, চিদ্‌ভাব ও আনন্দভাবের বিশ্লেষণ আমরা ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি প্রাচীন এবং প্রামাণিক উপনিষদে দেখিতে পাই। ছান্দোগ্য উপনিষদের মতে সত্যই ব্রহ্মের নাম—তস্য বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যম্—ছাঃ ৮।৪।৪, বৃহদারণ্যক উপনিষদে আবার ব্রহ্মকে "সত্যস্য সত্যম্" বলা হইয়াছে—তস্যোপনিষৎ সত্যস্য সত্যমিতি বৃহদাঃ ২।১।২০, এবং সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের উপাসনারও উপদেশ করা হইয়াছে। ২ ব্রহ্মই পরমার্থতঃ সত্য-বস্তু, তাহার তুলনায় বিশ্বের অন্য সমস্ত বস্তুই মিথ্যা, ব্রহ্মের এই পরমার্থ সত্যতা (Absolute Reality) বুঝাইবার জন্যই ব্রহ্মকে "সত্যস্য সত্যম্" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সত্যস্বরূপ ব্রহ্মই চিন্ময় বা জ্ঞানস্বরূপ। ব্রহ্ম স্বয়ং জ্যোতিঃ।

বিশ্বের অন্য সমস্ত বস্তুই ব্রহ্ম-জ্যোতির্দ্বারা প্রকাশিত হয়, কিন্তু ব্রহ্মের প্রকাশের জন্য অন্য কোন প্রকাশকের অপেক্ষা নাই ; এই জন্যই উপনিষদে ব্রহ্মকে স্বপ্রকাশ বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যকে জনক-যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদে জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, পুরুষ বা আত্মাকে প্রকাশ করে কে ? জনকের এই প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন

১। In Indian language Brahman, in contrast with the empirical system of the universe, is not like it in space but is spaceless, not in time but timeless, not subject to but independent of the law of causality.

—Deussen's Philosophy of the Upanishads. P. 150.

২। The supreme Atman is unknowable, because he is allcomprehending unity, whereas all knowledge presupposes a duality of subject and object.

—Deussen's Philo. Upa. P. 79.

The Atman as the knowing subject is itself always unknowable. —Ibid. P. 236

৩। আত্মৈবাধস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি।—ছাঃ ৭।২৫।১

১। যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যদ্‌ বিজানাতি স ভূমা। অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি, অন্যৎ শৃণোতি, অন্যদ্‌ বিজানাতি তদল্পং যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যম্।—ছাঃ ৭।২৪।১

২। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, তৈত্তিঃ ২।১, সচ্চিদানন্দময়ং পরং ব্রহ্ম—নৃসিংহতাপনীয় ১।৬, বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম, বৃহদাঃ ৩।৯।২৮

প্রজ্ঞা ইত্যেনদুপাসীত, সত্যমিত্যেনদুপাসীত, আনন্দ-ইত্যেনদুপাসীত।

যে, আত্মাই আত্মার জ্যোতিঃ ও প্রকাশক। আত্মার জ্যোতিদ্বারাই সমস্ত জীব ও জগৎ জ্যোতির্ম্ময় হইয়া থাকে। পুরুষ, আত্মা বা ব্রহ্মই জ্যোতির জ্যোতিঃ পরম জ্যোতিঃ। ১ এই জ্যোতিঃ নিত্য ভাস্বর, এই জ্যোতির কখনও বিলোপ হয় না। যেখানে সূর্য্যের ভাতি নাই, চন্দ্র-তারার প্রকাশ নাই, বিদ্যুতের বিকাশ নাই, অগ্নির আলোক নাই, সেখানেও এই নিত্য ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ বিদ্যমান। চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যুৎ, অগ্নি প্রভৃতি সমস্ত জ্যোতিষ্মান্ পদার্থই এই ব্রহ্মজ্যোতিঃ-প্রভায়ই প্রভাবান্, ব্রহ্মের আলোকেই দ্যুতিমান্, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি জড়-জ্যোতিঃ ব্রহ্মজ্যোতির ছায়া মাত্র। ২

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।—কঠ ৫।১৫, শ্বেত, ৬।১৪

উক্ত কঠশ্রুতির প্রতিধ্বনি করিয়া গীতায় শ্রীভগবান্‌ও বলিয়াছেন যে, সূর্য্যের যে তেজঃ নিখিল জগৎকে উদ্‌ভাসিত করে, চন্দ্র ও অগ্নিতে যে তেজঃ বিদ্যমান, তাহা আমারই তেজঃ বলিয়া জানিবে। ৩ আত্মার চিন্ময় রূপ বুঝাইবার জন্য বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন যে, লবণখণ্ডের যেমন ভিতর ও বাহির সমস্তই লবণ ব্যতীত আর কিছুই নহে, সেইরূপ বিজ্ঞানময় আত্মার অন্তর ও বাহির বিজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে। ৪ এই বিজ্ঞান বিষয় ও ইন্দ্রিয়-সংযোগের ফলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা নহে, উহা জন্য জ্ঞান, ঐ জন্য জ্ঞানের উৎপত্তিও হয়, বিনাশও হয়। আত্মবিজ্ঞান নিত্য, সুতরাং আত্মবিজ্ঞানের উৎপত্তিও হয় না, বিনাশও হয় না; কারণ, বিজ্ঞানই আত্মার স্বরূপ। যতক্ষণ বিজ্ঞানময় আত্মা আছে, ততক্ষণ বিজ্ঞানও থাকিবে, বিজ্ঞানের বিলোপ হয় না, হইতে পারে না। সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ, ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপও বটেন—বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম- বৃহদাঃ ৩।৯।২৮, ব্রহ্ম আনন্দের সমুদ্র, ব্রহ্মই প্রাণ, ব্রহ্মই প্রজ্ঞা, ব্রহ্মই আনন্দ। এই ব্রহ্মানন্দ অপরিমিত আনন্দ, ইহার কোন সীমা নাই, ইহা অসীম, অখণ্ড ভূমানন্দ। এই আনন্দ সাংসারিক বিষয়ানন্দ নহে, ইহা প্রকৃতপক্ষে সুখ-দুঃখের অতীতাবস্থা। ১ মানুষ যখন এই আনন্দের সন্ধান পায়, তখন সাংসারিক বিষয়ানন্দকে দুঃখেরই রূপান্তর বলিয়া বিষের মত পরিত্যাগ করে। জাগতিক ভোগবিলাসের মধ্যে মানুষের যে আনন্দবোধ রহিয়াছে, তাহা অনন্ত ব্রহ্মানন্দেরই অতি ক্ষুদ্রতম কণিকা মাত্র। সুখ-স্বরূপ, রস-স্বরূপ, পূর্ণব্রহ্মই জীব ও জগতের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন আছেন এবং জীবের বিষয়ভোগের মধ্যে আনন্দরূপে ও রসরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। এই রসস্বরূপ ব্রহ্মকে বিষয়ের মধ্য দিয়া আস্বাদন করে বলিয়াই জীব বিষয়ভোগেও আনন্দ লাভ করে। ২ তবে এই বিষয়ানন্দ ব্রহ্মানন্দের তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। বিষয়ানন্দ অকিঞ্চিৎকর হইলেও তাহার সম্বন্ধে মানুষের একটা স্পষ্ট ধারণা আছে, এই জন্যই তৈত্তিরীয় বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদে বিষয়ানন্দকে দৃষ্টান্তরূপে উপন্যাস করিয়া ব্রহ্মানন্দের স্বরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন—মানুষের মধ্যে যে ব্যক্তি সমৃদ্ধিশালী এবং সমস্ত জাগতিক ভোগ যাহার করায়ত্ত, যিনি সকলের অধিপতি তাঁহার যে আনন্দ, সেই আনন্দই মানুষের পরম আনন্দ বা আনন্দের পরাকাষ্ঠা, পিতৃলোকের আনন্দ ঐ মানুষলোকের আনন্দের শতগুণ; গন্ধর্ব্বলোকের আনন্দ

১। কিং জ্যোতিরেবায়ং পুরুষঃ ইতি, আত্মৈবাস্য জ্যোতির্ভবতি আত্মনা এবায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কর্ম্মকুরুতে বিপল্যতীতি।
—বৃহদাঃ ৪।৩।৬,
তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতম্।
—বৃহদাঃ ৪।৪।১৬

২। ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।
—কঠ ৫।১৫,
শ্বেত ৬।১৪ ও মুণ্ডক ২।২।১০

৩। যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্।
—গীতা ১৫।১২,

৪। স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এব এবং বা অরে অয়মাত্মা অনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব।
—বৃহদাঃ ৪।৫।১৩,

১। এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা আনন্দোঽজরোঽমৃতঃ। কৌষীঃ ৩।৮
আনন্দো নাম সুখচৈতন্যস্বরূপোঽপরিমিতানন্দসমুদ্রোঽবিশিষ্টসুখরূপশ্চ
আনন্দ ইত্যুচ্যতে—সর্ব্বোপনিষৎ। ৩৫২ পৃঃ হরিপদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

২। এতস্যৈব আনন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি। বৃহদাঃ ৪।৩।৩২ রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি তৈঃ ৭।২

আবার পিতৃলোকের আনন্দের শতগুণ। যাঁহারা স্বীয় কর্ম্মফলে দেবত্বলাভ করিয়াছেন, ঐ কর্ম্ম-দেবগণের আনন্দ গন্ধর্ব্বলোকের আনন্দের শতগুণ, যাঁহারা স্বভাবতঃই দেবতা (অর্থাৎ কর্ম্মদ্বারা দেবত্ব লাভ করেন নাই) তাঁহাদের আনন্দ কর্ম্ম-দেবতাগণের আনন্দের শতগুণ। নিষ্পাপ, নিষ্কাম শ্রোত্রিয়ের আনন্দও স্বভাবদেবতার আনন্দেরই তুল্য। প্রজাপতিলোকের আনন্দ আবার এই দেবতাগণের আনন্দের শতগুণ। ব্রহ্মলোকের আনন্দ প্রজাপতিলোকের আনন্দের শতগুণ। ইহাই পরম আনন্দ, আনন্দের পরাকাষ্ঠা বা ব্রহ্মানন্দ, ইহাই ব্রহ্মলোক।১ তৈত্তিরীয় উপনিষদেও ঐরূপ দৃষ্টান্তের সাহায্যেই ব্রহ্মানন্দের স্বরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ঐ সকল দৃষ্টান্তের অর্থ এই যে, ব্রহ্মানন্দ অপরিমেয় ও অসীম, ব্রহ্মানন্দের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। শ্রুতি বলিয়াছেন, বাক্য ও মনঃ যাহাকে ধরিতে না পারিয়া নিবৃত্ত হয়, সেই ব্রহ্মানন্দকে জানিলে কোন কিছুতে ভয় থাকে না।২

এইরূপে উপনিষদে ব্রহ্মের সদ্ভাব, চিদ্ভাব, আনন্দভাবের বর্ণনা করিলেও প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ হইবেন কিরূপে? আর, ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ হইলে তিনি নির্গুণ ও নির্ব্বিশেষ রহিবেন কিরূপে? ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ বলিয়াই তো শ্রুতি—কেবল "নেতি—নেতি" দ্বারা অর্থাৎ "ইহা ব্রহ্ম নহে", "উহা ব্রহ্ম নহে" এইরূপে নিষেধ-মুখে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য নিষেধসূচক "ন"এর অসংখ্য প্রয়োগ করিয়াছেন। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ হইলে বিধি-মুখে (positive process)ই তো শ্রুতি ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাইতে পারিতেন? শ্রুতি তাহা করেন নাই কেন? ইহার উত্তরে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদী অদ্বৈতবেদান্তী বলেন যে, ব্রহ্মের সদ্ভাব, চিদ্ভাব ও আনন্দভাব ব্যাখ্যা করায় আপাতদৃষ্টিতে ব্রহ্মকে সগুণ, সবিশেষ বলিয়া মনে হইলেও ব্রহ্ম সেরূপ নহেন। সৎ, চিৎ, আনন্দ এই পদত্রয় বস্তুতঃ 'নেতি'রই প্রতিরূপ, অভাবের সূচক মাত্র; সৎ শব্দের অর্থ মিথ্যা নহে। চিৎ শব্দের অর্থ জড় নহে, আনন্দ শব্দের অর্থ দুঃখস্বরূপ নহে। পর-ব্রহ্মকে সৎ বলিলে বুঝায় যে, জগৎ যেমন ভঙ্গুর ও মিথ্যা, ব্রহ্ম সেরূপ মিথ্যা নহেন। চিদ্ বলিলে বুঝায়, জড়বস্তু যেমন অপ্রকাশ এবং তমঃস্বভাব, ব্রহ্মবস্তু সেরূপ নহেন, ব্রহ্ম স্বয়ং-জ্যোতিঃ এবং স্বপ্রকাশ; আনন্দ বলিলে বুঝায় যে, ব্রহ্ম সুখস্বরূপ, দুঃখস্বরূপ নহেন। এইরূপে সৎ, চিৎ, আনন্দ এই তিনটি পদ অভাব পরিচয়েই ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদন করে; এবং ব্রহ্ম যে অন্য সকল জাগতিক পদার্থ হইতে বিলক্ষণ, তাহা বুঝাইয়া দেয়।১ এই অভাবও এখানে একটি অতিরিক্ত পদার্থ বা কোন বিশেষ ধর্ম্ম নহে, ইহা সচ্চিদানন্দেরই স্বরূপ ব্যাখ্যা মাত্র। যেমন সাদা বলিলে স্বভাবতঃই বুঝায় যে, কালো নহে, এই কৃষ্ণতার অভাব যেমন শুক্লতারই স্বরূপ, কোন অতিরিক্ত বস্তু নহে, সেইরূপ ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ বলিলে স্বভাবতঃ ব্রহ্ম মিথ্যা, জড় ও দুঃখস্বভাব নহেন, ইহাই বুঝা যায়। সৎ, চিৎ, আনন্দ এই পদত্রয় যথাক্রমে ব্রহ্মে মিথ্যাত্ব, জড়তা ও দুঃখস্বরূপের অভাব সাধন করে বলিয়া সার্থকও বটে। বাস্তবিক পক্ষে ব্রহ্ম সৎও নহেন, অসৎও নহেন, জড়ও নহেন, অজড়ও নহেন, আনন্দও নহেন, নিরানন্দও নহেন। ইহা সদসতের অতীত, জ্ঞান ও অজ্ঞানের

১। সযো মনুষ্যাণাং রাদ্ধঃ সমৃদ্ধো ভবত্যন্যেষামধিপতিঃ সর্ব্বৈর্মানুষ্যকৈর্ভোগৈঃ সম্পন্নতমঃ স মনুষ্যাণাং পরম আনন্দোঽথ শতং মনুষ্যাণামানন্দাঃ স একঃ পিতৃণাং জিতলোকানামানন্দোঽথ যে শতং পিতৃণাং জিতলোকানামানন্দাঃ স একো গন্ধর্ব্বলোক আনন্দোঽথ যে শতং গন্ধলোকআনন্দাঃ স একঃ কর্ম্মদেবানামানন্দো যে কর্ম্মণা দেবত্বমভি—সম্পদ্যন্তেঽথ যে শতং কর্ম্মদেবানামানন্দাঃ স এক আজানদেবানামানন্দো যশ্চঃ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামতোঽথ যে শতমাজানদেবানামানন্দাঃ স একঃ প্রজাপতিলোক আনন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতোঽথ যে শতং প্রজাপতিলোক আনন্দাঃ স একো ব্রহ্মলোক আনন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামতোঽথ এষ পরমআনন্দ এষ ব্রহ্মলোকঃ।

বৃহদারণ্যক ৪।৩।৩৩, তৈত্তিরীয়, ব্রহ্মবল্লী ৮।২ দ্রষ্টব্য।

২। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চ ন। তৈত্তিরীয় ২।৯।১

১। All three definitions of Brahmin as being, thought or bliss are in essence only negative. Being is the negation of all empirical being, thought the negation of all objective being, bliss the negation of all being that arises in the mutual relation of knowing subject and known object. —Deussen's Philosophy of the Upanishands.P. 147.

অতীত ব্রহ্মবিজ্ঞান। ব্রহ্ম অজ্ঞেয় হইলেও অজ্ঞাত তত্ত্ব নহেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপরিতনবর্ত্তী "প্রজ্ঞানের" সাহায্যে ব্রহ্মকে জানা যায়; সাধারণ জ্ঞানের তিনি অগম্য হইলেও যোগদৃষ্টির সাহায্যে তাঁহাকে দেখা যায়। যোগদৃষ্টিকে লক্ষ্য করিয়াই উপনিষদ্ বলেন যে, অধ্যাত্ম-যোগ অধিগত হইলে সেই দেবকে জানিয়া ধীর ব্যক্তি সাংসারিক সুখ-দুঃখ অতিক্রম করেন। জীব যখন জ্যোতির্ম্ময় কর্ত্তা ঈশ্বর বা ব্রহ্মযোনি পুরুষকে দর্শন করে, তখন সে পাপ-পুণ্যের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া নির্ম্মল হইয়া ব্রহ্মের সমতা লাভ করে। জ্ঞানপ্রসাদে বিশুদ্ধচিত্ত সাধক ধ্যানযোগে অখণ্ড পরব্রহ্ম বা পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন।১ তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি প্রভৃতি বেদান্ত মহাবাক্যে এইরূপ ব্রহ্মদর্শনের কথাই বলা হইয়াছে। নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের পরিচয় দেওয়া গেল। এতদ্ব্যতীত সগুণ ভাবের বর্ণনাও উপনিষদে প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। উপনিষদের মতে সগুণও নির্গুণ ভিন্ন তত্ত্ব নহে। নির্গুণ ও সগুণ একই তত্ত্ব। যিনি স্বতঃ নির্গুণ, তিনিই মায়াবশে সগুণ হন। গুটিপোকা যেমন জাল রচনা করিয়া নিজেকে সেই জালে আবৃত করে, সেইরূপ নির্গুণ ব্রহ্মও অনাদি মায়াজালে আপনাকে আবৃত করিয়া সগুণ ও সবিশেষ হন। মায়াই ব্রহ্মের যবনিকা, এই মায়াই জগজ্জননী প্রকৃতি। মায়াময় ব্রহ্মই ঈশ্বর বা মহেশ্বর।১ এইরূপেই তিনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-নিদান। ছান্দোগ্য উপনিষৎ সগুণ ব্রহ্মের একটি রহস্য নাম দিয়াছেন—"তজ্জলান্" (ছাঃ ৩।১৪।১) তজ্জ, তল্ল ও তদন; অর্থাৎ (তজ্জ) তাহা হইতেই জগৎ জাত, (তল্ল) তাহাতেই লীন এবং (তদন) তাহাতেই অবস্থিত। ছান্দোগ্যের এই রহস্য-উপদেশটি তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আরও স্পষ্ট বাক্যে বলা হইয়াছে। যাহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হইতেছে এবং উৎপন্ন হইয়া যাহা দ্বারা জীবিত রহিয়াছে এবং পরিণামে যাহাতে বিলীন হইবে, তাহাই ব্রহ্ম।২ এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়াই ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মের লক্ষণ করা হইয়াছে—"জন্মাদ্যস্য যতঃ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।২)।৩

শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী।

(অধ্যাপক, এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি)।

১। অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি
—কঠ ২।১২,

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষমাত্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্য-পাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥
মুণ্ডক ৩।১।৩

জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।
—মুণ্ডক ৩।১।৮

১। মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্, শ্বেতাশ্বঃ ৪।১০

২। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভি সংবিশন্তি তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্মেতি, তৈত্তিঃ ৩।১

৩। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদী আচার্য্য শঙ্করের মতে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।২

ইহা ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম (তৈঃ ২।১) ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ, ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ, সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ এই দ্বিবিধ ভাবই যে উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আচার্য্য শঙ্কর তৎকৃত শারীরক মীমাংসা-ভাষ্যে স্বীকার করিয়াছেন —ব্রহ্মসূত্র শংভাষ্য ১।১।১১, ও ৩।২।১১ দ্রষ্টব্য। কিন্তু তাঁহার মতে সগুণ ভাব মায়িক, নির্গুণ ভাবই সত্য। সগুণ ব্রহ্মবাদী আচার্য্য রামানুজের মত শঙ্কর-মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। আচার্য্য রামানুজের মতে সগুণ ব্রহ্মই সত্য, নির্গুণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম অসত্য। তিনি তাঁহার শ্রীভাষ্যে শঙ্করমত পূর্ব্বপক্ষরূপে উপন্যাস করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন।
—শ্রীভাষ্য ৩।২।১১, ৩।২।১৪, ও ৩।২।১৭ সূত্র দ্রষ্টব্য।

প্রকাশ

গভীর প্রাণের নীরব আকুলতা কইবে না কি মোরে?
তোমার মনের গোপন ব্যাকুলতা তুলবে না কি ধ'রে?
মনের কথা মনের কাছে
লুকিয়ে রাখায় কি ফল আছে?
তুলবে তুফান হৃদয়-মাঝে উঠবে শিহরে।

বুকের কথা মুখের ভাষায় উঠবে যখন ফুটে
আঁখি-কোণের স্বপ্ন-মাখা তন্দ্রা যাবে ছুটে।
বর্ষা-রাতের শেষ ধারাতে
দেখ্‌বে তখন আপনা-হ'তে
ভাসছে বেহাগ গভীর চিতে সকল বাধা টুটে।

শ্রীউমানাথ সিংহ।
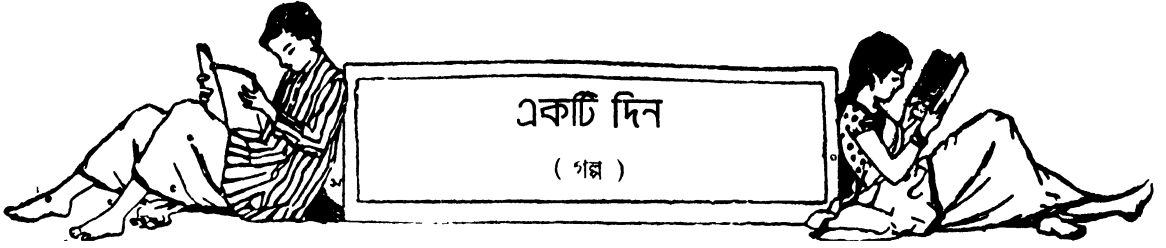
একটি দিন

(গল্প)

"চাই অমৃতবাজার, বসুমতী, আনন্দবাজার, চাই—হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড, যুগান্তর,—টাটকা খবর—রুশ-জার্ম্মাণে ভীষণ যুদ্ধ—থাইল্যাণ্ডে জাপান,—অহিংসার জয়যাত্রা!"

ষ্টেশনে আসিয়া ট্রেণ থামিল। একটি যুবক অনেকগুলি খবরের কাগজ লইয়া গাড়ীগুলির দুয়ারে দুয়ারে ঐ সকল কথা হাঁকিতে লাগিল। গ্রামাঞ্চল হইলেও রেল-ষ্টেশনটি সুপরিচিত। ছোট একটা রেল-লাইন দূরস্থ কোনও সহর পর্য্যন্ত প্রসারিত। নিকটবর্ত্তী নদী দিয়াও ষ্টীমারের যাতায়াত ছিল। অনেক যাত্রী, এবং অনেক মালপত্র উঠিত নামিত। নিকটে একটা হোটেল ছিল; ভিতরে ভাল একটা রেস্তরাঁ ছিল। বহু মালগুদামে ও দোকান-পাটে স্থানটি এখন বড়-রকম বন্দরে পরিণত হইয়াছে। এই যুদ্ধের মরসুমে, ষ্টেশনে, বন্দরে, এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলিতে দৈনিক কাগজ যথেষ্ট বিক্রয় হইত। উক্ত যুবক ষ্টেশনে ট্রেণের সময় কাগজ ফিরি করিত, অন্য সময় সাইকেল চড়িয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসী বাঁধা খরিদদারদের কাগজ দিয়া আসিত।

উচ্চশ্রেণীর একখানি গাড়ী হইতে বহু মালপত্রসহ শার্টশর্ট-পরা একটি যুবা নামিলেন, তাঁহার সঙ্গে মিহি মোলায়েম রেশমী সাড়ীপরা রূপবতী একটি মহিলা; দেখিলেই মনে হয়, এই যুবকটি পদস্থ কোনও রাজকর্ম্মচারী এবং মহিলাটি তাঁহারই পত্নী। কাগজ-ওয়ালা যুবক তাঁহাদের কাছে গিয়াই হঠাৎ ফিরিয়া আসিল।

"আরে রণু, রণু! শোন শোন! এই যে এদিকে?"

কাগজওয়ালা যুবক—তাহার নাম রণধীর—একটু ইতস্ততঃ করিয়া ফিরিল; কেমন যেন সঙ্কুচিত ভাবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া তাঁহার নিকট আসিল।

"এই যে, এস রণু, এস! ভাল ত?"

বলিতে বলিতে শার্টশর্ট-পরা যুবকটি কয়েক পা সম্মুখে গিয়া রণুর খালি হাতখানি হাতে চাপিয়া ধরিলেন।

"হ্যাঁ, এই চ'লে যাচ্ছে একরকম শরীরগতিক। তা তোমার সব খবর ভাল ত সতু!"

সতু (সতীন্দ্রনাথ বা মিষ্টার এস্. এন্. চৌধুরী) উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, সে মন্দ আর কি? তা, তুমি কাগজ ফিরি ক'রছ দেখছি! হ্যাঁ, এস, চল ওই ওয়েটিংরুমে, শুনব সব কথা!"

"ভাল আছেন ত রণু বাবু? চিনতে পাচ্ছেন?"

হাসিমুখে সঙ্গিনী মহিলাটি—মিসেস্ চৌধুরীও অগ্রসর হইয়া এই কথা বলিলেন।

"কে—ও! মিস্—মিসেস চৌধুরী! নমস্কার। তা আপনারা চিনতে পারলেন আর আমি পারব না? তা—"

বলিতে বলিতে হঠাৎ সে থামিয়া গেল। মনে হইল, সহসা এই অবস্থায় ইঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে রণু যেন লজ্জায় ও কুণ্ঠায় একেবারে এতটুকু হইয়া গিয়াছে। একটু হাসি ফুটিতে ফুটিতে ম্লান নিষ্প্রভ মুখে মিলাইয়া গেল।

তিন জনে অগ্রসর হইয়া ওয়েটিংরুমে প্রবেশ করিলেন। সেখানে বসিয়া চৌধুরী কহিলেন, "তার পর! বলছি কি—ব্যাপার-খানা কি? কাগজ ফিরি করছ! তোমার মত এক জন ব্রিলিয়াণ্ট গ্রাজুয়েট—"

একটু হাসিয়া রণু উত্তর করিল, "ও-সব এখন ভুলে যাও সতু! উল্কা আকাশে যতই আলোক ছড়িয়ে ছুটুক, মাটিতে পড়লেই ঠাণ্ডা, কালো একখানা পাথর! যার তার পায়ের ধাক্কায় কাদা-মাটিতে গড়াগড়ি যায়!"

"তবু—"

"তবু-টবু আর কিছু নেই,—একদম চাক্ষুষ সত্য এই। তোমাদের সেই নিত্যকার সঙ্গীদলের মোড়লই যাকে ব'লতে পারতে—সেই রণু—আমি আজ এই গ্রামে রেলের ষ্টেশনে কাগজ ফিরি করে খাই! আর সত্যি, লজ্জা আমার এতে কিছু নাই! লজ্জা হ'চ্ছে তোমাদের দেখে! লজ্জা বেশ একটু পেয়েছিলাম তখন।"—বলিয়া রণু বাহিরের দিকে মুখখানি একটু ফিরাইল।

"হুঁ। তা—"

রণু একটু হাসিল। হাসিয়া মুখখানি ঘুরাইয়া চাহিল, বলিল—"হাঁ, বুঝতে পারছি—বড় একটা কৌতূহল তোমার মনে হচ্ছে জানতে—কি ক'রে এটা ঘটল? তা মোট কথা, এ সব-ঘরেই ঘটছে, এমন নতুনও কিছু নয়! বাবা হঠাৎ মারা গেলেন. রেখে কিছু যেতে পারেননি। উকিল ছিলেন, রোজগারও ভালই করতেন; তবে দু'হাতে সবই খরচ করতেন। এটা বোধ হয় কখনও ভাবেননি—আকস্মিক ব্যাধিতে কি মৃত্যুতে এ রোজগার হঠাৎ একদম বন্ধ হয়ে যেতে পারে। খুব কম লোকই এটা বোধ হয় ভাবে! তখন একেবারেই নিঃসম্বল হ'য়ে পড়লাম। মা ছিলেন, দু'টি ভাই-বোন. আর এক বিধবা পিসী—সংসার পড়ল এসে নিঃসম্বল মাথায়! এম-এটা আর পড়া হ'ল না। পড়তে পারলেও কি হ'ত শেষে—জানি না। কত ভাল ভাল এম-এ বছরের পর বছর বৃথা উমেদারী করে ফিরছে। দৈবাৎ যদি কারও কিছু-একটা সুযোগ মেলে! নইলে সবাই সমান উমেদার বা বেকার। আর আমি যত-বড়ই অনারওয়ালা হই, বি-এ মাত্র। গ্রাম্য কোনও স্কুলে স্কুলমাষ্টারী একটা জুটেছিল, —মাইনের কথা আর কি শুনবে—তাও মাস-ছয় পরে রিডাক্সান (reduction)এ নাম বাদ গেল। কি করব? সুবিধে আর কোথাও কিছু হ'ল না। অগত্যা শেষে এই কাগজ ফিরিই ধরলাম এখানে এসে। যায়গাটা আগে থেকেই জানা ছিল।"

"হুঁ। তা কিছু মনে করো না ভাই—কত করে হয় মাসে?"

"যুদ্ধের মরশুম—কুড়ি-পঁচিশটা টাকা মাসে জুটে যায়। আর বিকেলে সন্ধ্যেয় দু'-তিনটে ছেলে পড়াই; তাতেও গোটাদশেক করে টাকা পাই।"

"কোথায় থাক? খাওয়া-দাওয়া—"

"তাও শুনবে? ভাল, শোনই তবে। খাই ঐ হোটেলে, হাঁ, সুবিধেও একটু করে নিয়েছি; চার ধারে সব গাঁয়ে ঘুরি— কিছু সুবিধে দরে ওদের চালটা সাপ্লাই (supply) করবার একটা বন্দোবস্ত করে নিয়েছি, কমিশন কিছু পাই; খোরাকী-খরচটা আর গাঁট থেকে দিতে হ'ল না, বরং গাঁটেই কখনও কখনও কিছু আসে। হাটবারে তরিতরকারীও কিছু পাইকারী দরেই কিনে আনি, সেগুলো বাজার দরে ওরা কিনে নেয়।"

"থাকও তবে ওই হোটেলেই?"

"না,—স্থায়ী বোর্ডার হবার মত জায়গা এ সব হোটেলে থাকে-টাকে না, যাত্রীর ভিড়ই ওরা অনেক সময় সামলাতে পারে না। আর যায়গা পেলেও ভাড়া ত যা হক কিছু নেবে? তাই বা কেন দেব, না দিয়ে যদি চালাতে পারি।"

"তবু একটা আস্তানা ত চাই?"

একটু হাসিয়া রণু কহিল, 'সারা দিন ত ঘুরেই বেড়াই, রাতে শুয়ে থাকি ঐ রেস্তর্াঁয়; যায়গা হলে টেবিলটার ওপরে, নইলে অগত্যা কোনও একটা বেঞ্চিতে। কাপড়-চোপড় ঐখানেই একটা দড়ীতে ঝোলে। অবসরমত কাজে সাহায্য করি, তাই একটু খাতির করে। একটা সুটকেশ আছে, তা ঐ হোটেলের বামুন-ঠাকুরুণটি দয়া করে তাঁর বাড়ীতে রাখতে দিয়েছেন। মূল্যবান্ যা কিছু সম্পত্তি—এই বেশী দু-'চারখানা কাপড়-চোপড়, আর টাকা-পয়সাটা তাতেই রক্ষা পাচ্ছে। অসুখ-বিসুখ এখনও কিছু হয়নি। বিছানা নিতে হ'লে তাঁর বাড়ীতেই বোধ হয় পড়ে থাকতে হবে। মানুষটি ভাল—পিসী বলে ডাকি, বেশ একটু দরদও করেন বলে মনে হয়। ব্যস্! ফুরিয়ে গেল আমার ইতিবৃত্ত। হাঁ, তুমি ত এখন পোষ্টাল-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হয়েছ?"

"হাঁ।"

"টুরে বেরিয়েছ বুঝি?"

"হাঁ।—তা, ক'দিন আর এ-কাজ তোমাকে করতে হবে?"

"যদ্দিন দরকার হয়, এর চাইতে ভাল আর কিছু যদ্দিন জুটোতে না পারি।"

"তার প্ল্যান (plan) কিছু ঠাউরেছ?"

"প্ল্যান আর কি এমন ঠাউরাব? ভাবছি, পরে যদি একটা দোকান-টোকান কিছু খুলে ফেলতে পারি, কিছু কিছু জমাচ্ছি, দেখি কি হয়!"

"হুঁ! মূলধন যদি তেমন কিছু—"

হাসিয়া রণু কহিল, "আমাদের মত আনাড়ীদের ছোট সম্বল নিয়ে ছোট কারবার গোড়ায় সুরু করাই ঠিক। তার পর যদি বুঝে চ'লতে পারি, আর ভাগ্য ফেরে, কাজ বড় হয়ে ওঠে ভালই। না ওঠে, দিন এক-রকম করে চ'লে যাবেই। বেশী মূলধন— সে ত পরের টাকা, হাতে তুলে কেউ দিলেও নেব না। শেষে হয় ত সব নষ্ট ক'রে ফেলব—মুখ থাকবে না। সে লজ্জা—সে দুর্ভাগ্যের দায়িত্ব নিতে চাইনে। দুঃখ? ভাল। সত্যি বলতে কি, তেমন কোন দুঃখ এখন অনুভব করছি না। তবে—তবে হঠাৎ তোমাকে দেখে লজ্জা বেশ একটু পেয়েছিলাম। লজ্জা কেন পেয়েছিলাম, তাই ভাবতেই এখন লজ্জা হচ্ছে!"

বলিতে বলিতে একটু হাসিয়া রণু চাহিল। বেশ সপ্রতিভ হাসি—ম্লানতা কি দীনতা তাহাতে ছিল না।

বেয়ারা আসিয়া জানাইল—সঙ্গে মালপত্র সব তোলা হইয়াছে।

"আচ্ছা, তা'হলে এখন উঠি, ভাই! তোমাদের যাত্রার সময় হ'ল।"

বলিয়া রণবীর উঠিল।

"আচ্ছা, তা'হলে এস। ফিরবার পথে আবার দেখা হবে।"

"সম্ভব, যদি তখন ষ্টেশনে আসি।"

"চিঠি লিখব।"

"বেশ, তাহ'লে সময়মত হাজির থাকব। নমস্কার মিসেস্ চৌধুরী!"

"নমস্কার। হাঁ, আজকার কাগজ এখনও দেখা হয়নি।"

"ও:! কাগজ চান? তা কোনটা দেব?"

"যে ক'টা আছে এক-একটা দিন।"

হা'সিয়া রণবীর পাঁচখানা কাগজ বা'হির করিয়া টেবিলের উপরে রাখিল। মিসেস্ চৌধুরী স্বামীর দিকে চাহিলেন। চৌধুরী পকেট হইতে পার্স (purse) বাহির করিয়া কহিলেন, "হাঁ, দাম কত হ'ল?

"দাম আর দিতে হবে না। ক'টা কাগজ ত! মিসেস্ চৌধুরী প'ড়বেন—"

মিসেস্ চৌধুরী বলিয়া উঠিলেন, "দাম নেবেন না, সে কি রণু বাবু? কাগজ ত আপনার নয়।"

"এখন আমারই বটে। নগদ দাম দিয়ে কিনে নিতে হয়। বিক্রী যদি কিছু না হয়, ফেরত আর নেয় না। তবে থাকে না বড়, টানই, বরং পড়ে—আজ-কাল। চাহিদা বুঝেই কিনে নিই কি না!"

"তা—তা—"

হাসিয়া রণু কহিল, "তা—তা আর কিছু নেই। জুলুম করেন ত কাগজ ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে যাব। আচ্ছা, নমস্কার! —আসি তবে ভাই! ফিরবার পথে আবার দেখা হলে খুসী হব।"

বলিয়াই রণু বাহির হইয়া গেল।

২

স্নানের তখন সময় হইয়াছিল। আহারাদি সারিয়া দুপুরে আবার কাগজ লইয়া গ্রাম-কয়টা ঘুরিয়া আসিতে হইবে। বৈকাল চারিটায় একটা ট্রেণ আসে, তখন আবার ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিতে হইবে। হাতের কাগজগুলি রেস্তর্াঁর টেবিলটির এক পাশে রাখিয়া তেল মাখিয়া কাপড় ও গামছাখানি লইয়া রণবীর নদীতে গেল। সামনেই নদীর খুব একটা বাঁক, দূরে লঞ্চখানি তখনও দেখা যাইতেছিল। সেই দিকে চাহিয়া রণবীর দাঁড়াইয়া রহিল। দূর—দূর—আরও দূরে ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া বাঁকের মোড় ঘুরিয়া লঞ্চখানি দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রণবীর নদীর পাড়ে বসিয়া পড়িল। কলিকাতার কলেজ-জীবনের কত কথাই তখন তার মনে হইতেছিল। পরিচিত ছাত্রদল তার প্রতিভার খ্যাতিতে মুখর ছিল; কেবল বিদ্যার্জ্জনের কৃতিত্বে নয়, ছাত্রজীবনে প্রচলিত আরও বহু কর্ম্মে তার উদ্যমশীলতায় সকলে মুগ্ধ হইত; তাহার নেতৃত্বও সহজ ভাবে বহু ছাত্র মানিয়া চলিত, অধ্যাপকরা তাহাকে কত আদর করিতেন। বন্ধুদের

কতক বিস্তার গুণে, এবং কতক তাহার সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহের সুদর্শন সৌষ্ঠবে, কতক বা সরল সপ্রতিভ বাক্‌পটুতায় সকলেই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইত। কন্যার পক্ষে একটি অতি সুপাত্র বলিয়াও অনেকে তাহাকে আকৃষ্ট করিতে চাহিত। আজকার এই মিসেস্ চৌধুরী তখনকার মিস্ ললিতা ব্যানার্জ্জি ছিল—তাহারই একটি বন্ধুর ভগিনী। কত সন্ধ্যায় বন্ধু তাহাকে গৃহে লইয়া গিয়াছে; ললিতার ললিত কণ্ঠের কত গান শুনাইয়াছে; কত দিন ললিতাকে লইয়া সে সিনেমায় গিয়াছে। ললিতার পিতামাতাও তাহাকে কত আপ্যায়ন করিয়াছেন। বন্ধুরা রঙ্গ করিয়া কত কথাই না বলিত। তাহারও মনে হইত, ললিতা তাহার প্রতি বেশ একটু আকৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে; আর সে-ও—হ্যাঁ, মনে হইত, ললিতাকে ভালই বাসিয়াছে। অন্ততঃ তাকে বড়ই ভাল লাগিত। ইচ্ছা হইত, প্রত্যহ সন্ধ্যায় ললিতাদের বাড়ী যায়, তার গান শোনে, হাসি-গল্প করে। সতুও সঙ্গে সঙ্গে যাইত; কিন্তু মনে হইত, ললিতা তাহাকে তাচ্ছিল্যই করে। কেনই বা না করিবে? প্রতিভায়, বাক্‌পটুতায়, পুরুষোচিত বলিষ্ঠ দেহের শ্রীসৌষ্ঠবে সে ছিল সতুর তুলনায় শ্রেষ্ঠ। সতু নিজেও সেটা বেশ অনুভব করিত; এই সব সান্ধ্য-মজলিসে সে উপস্থিত থাকিলে তাই কেমন যেন একটু মুস্‌ড়াইয়া পড়িত। তবে সতু তাহাকে বড় ভালও বাসিত, ঈর্ষা কখনও করিত না, ছাত্রদের আমোদ-প্রমোদে, কি সমবেত যত কিছু কাজকর্ম্মে আনন্দে তাহার প্রাধান্য স্বীকার করিত; বুঝিত, অন্যান্য সকলকেও বুঝিতে দিত, এই প্রাধান্যের যোগ্যই সে, প্রাধান্য তাহাকেই শোভা পায়।

আজ কোথায় সতু, আর কোথায় তার সেই ললিতা! আজ সতুর স্ত্রী সে, তার উচ্চ ভাগ্যে ভাগ্যবতী, তার পদ-গৌরবে গৌরবিনী, তার বৈভববিলাসললিত গৃহের আদরিণী গৃহিণী। আর আজ তার এই ভাগ্য! এই হীন-দীনতা, মনঃশক্তিবিহীন সাধারণ দিনমজুরের ন্যায় কঠোর শ্রমে এই যৎসামান্য জীবিকা অর্জ্জনের প্রয়াস! সবই সেই ললিতার চক্ষে পড়িল—যে এক দিন তাহারই পত্নীত্ব অতি বরণীয় বলিয়া হয় ত মনে মনে কামনা করিয়াছিল। সতু আজ তার স্বামী, আর সে সেই সতুর কাছে কে? দয়া করিয়া একটি কেরাণীগিরি দিলেই কৃতার্থ হইয়া যায়। দশ-পাঁচটি টাকা দিলেও সে হয় ত মাথায় তুলিয়া লয়। তাহার এই দীনতা লক্ষ্য করিয়াই ললিতা আজ খবরের কাগজ কয়খানি কিনিয়া কয়েকটা পয়সা অর্জ্জনের সুযোগটুকু তাহাকে দিতে চাহিয়াছিল। কথাটা কেবলই তাহার মনে হইতেছিল, আর জ্বলন্ত একটা লৌহশলাকা যেন তাহার বুকে বিঁধিতেছিল। ধিক্! পথের ভিখারীর ন্যায় এই কৃপাবিন্দু সেই ললিতা তাহাকে দিতে চাহিয়াছে? কেন, সত্যই কি সে এত দীন,—এত হীন! সতু আজ বড় সরকারী চাকরী পাইয়াছে, তার তুলনায় বড় যোগ্যতায় নহে, বড় ভাগ্যে। কাজটা যদি রুটিনমত চালাইয়া যাইতে পারে, সে আরও উচ্চপদে উঠিবে, অধিক আরও অনেক বেশী হইবে। মহা গৌরবেই জীবনটা তার কাটিয়া যাইবে। কিন্তু লোক-সমাজের মাথায় চূড়া হইয়া তাহারা যত আড়ম্বরেই পূজিত হউক, আর সে যতই কণ্টকপূর্ণ বন্ধুর পথে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া চলুক, প্রকৃত মনুষ্যত্বের তুলনায় সে হীন কিসে! যোগ্যতা সত্ত্বেও ভাগ্য-বিড়ম্বনায় সে উচ্চপদ লাভ করিতে পারে আপ্যায়নলাভ তাহার জীবনে ঘটিবে না কিন্তু তাই বলিয়া তার প্রতিভা সে হারায় নাই, যোগ্যতাও হারায় নাই; দেহের ও মনের শক্তি ও স্ফূর্ত্তি, তাহারও কিছু এখনও হারায় নাই। যতই কঠোর শ্রম হউক, স্বাধীন ভাবে নিজের জীবিকা সে অর্জ্জন করিতেছে। এই কাজ করিয়া তেমন কোনও দুঃখ ত সে অনুভব করে নাই—যে অবস্থাতেই থাক্, ভালই আছে, নিজের গৃহ নাই—তা বুদ্ধি আছে, শক্তি আছে, কাজ তেমন একটা কিছু দেখিয়া লইতে পারিবে—যাহাতে আয় কিছু বেশী হয়, ক্রমে আরও বাড়ে। তখন নিজের গৃহ হইবে, আর গৃহে একটি গৃহিণী আনিয়াও বসাইতে পারিবে—অত সুন্দরী আর পরিপাটি আবেষ্টনের মধ্যে পরিবর্দ্ধিত না হইলেও ললিতার চাইতেও তাকে তার ভাল লাগিবে। তার দীন-গৃহেও আদরে-স্নেহে সে রাণীর মত থাকিবে, রাণীর মতই সে আপনাকে সুখিনী ও ভাগ্যবতী মনে করিবে। যদি কখনও ঘটে—আর তখন সতু আর ললিতা যদি এদিকে আসে, সমান বন্ধুর ন্যায় নিমন্ত্রণ করিয়া সে তাহাদের সেই গৃহে লইয়া যাইবে, স্ত্রীকে তাদের সম্মুখে আনিবে,—বুঝিতে দিবে, ললিতা অপেক্ষা সে হীনা নহে, আর মনুষ্যত্বের মর্য্যাদায়—পৌরুষের মহিমায় সতু অপেক্ষা সে নিজেও হীন নহে। যদি পারে, আজকার এই ব্যথা সে ভুলিতে পারিবে।

৩

"এই যে রণুদা! বাঃ!"

চমকিয়া রণু ফিরিয়া চাহিল। চাহিয়া বলিল, "কি রে বিনি, কি? কি হয়েছে!"

ষোল-সতের বৎসরের একটি মেয়ে—নাম বিনি (অর্থাৎ বিনোদিনী) হোটেলের বামুন ঠাকুরুণের কন্যা—বড় একটা কলসী-কক্ষে জল লইতে আসিয়াছিল। সে উত্তর করিল, "সেই কখন্ নাইতে এসেছ, চুপচাপ একলাটি ব'সেই রয়েছ! মা যে ভারী ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন; বললেন, "জল আন্‌তে যাচ্ছিস্, দেখে আসিস্, রণু কি করছে। সেই কখন্ তেল মেখে গেল, এখনও ফিরছে না, কুমীরে-টুমীরেই টেনে নিয়ে গেল না কি? হি-হি-হি!"

"হাঃ হাঃ হাঃ!"—রণুও হাসিয়া উঠিল, কহিল, "কুমীর কোথায়? এত নৌকোর ভিড়, ষ্টীমার আনাগোনা করছে—নদীতেই বা জল কত! কুমীর এর ভেতর কোথাও থাকতে পারে? তাদেরও প্রাণের ভয় আছে। যদি থাকে ত দেখে নিতাম—আমার এই দেহটাকে গিলতে পারে, এত বড় হাঁ কোন্ কুমীরের আছে!"

"ইস্! শুনেছি, কত গরু মুখে ক'রে নিয়ে যায়, আর তুমি ত বলে একটা মানুষ।"

"মানুষই,—গরু নই। গরুগুলোই ত—কি আর বলব—একেবারেই গরু! একটা কুকুর তাদের তাড়া ক'রলে লেজ তুলে ছুটে পালায়, যেন বাঘ এল। তা গরুকে কুমীরগুলো যত সহজে কায়দা করতে পারে, মানুষকে তা পারে না। মানুষেরও কায়দা আছে। শুনেছি, মাথা ঠিক রেখে কুমীরের চোখে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিতে পারলে বাপ্ বাপ্ ব'লে ছেড়ে দিয়ে পালায়।"

"সে যাক্‌গে, তুমি এখন শীগ্‌গির করে নেয়ে নাও। ওদিককার সব কাজ চুকে গেছে, এখন তোমার খাওয়া হ'লেই

"ওহো! তাই ত, মনেই হয়নি কথাটা আমার—বড্ড ভুল হ'য়ে গেছে! এই যাচ্ছি এখুনি নেয়ে। তা তুই ত জল নিয়ে যাচ্ছিস্—গিয়ে বল্‌গিস্, তাঁর ব'সে থাকবার দরকার নেই। আমার ভাতটা যেন চাপা দিয়ে রেখে যান।"

কথাটা বলিয়া রণু উঠিয়া দাঁড়াইল।

"তা তিনি যেতে চাইবেন না। কতক্ষণ আর তোমার দেরী হবে? তাড়াতাড়ি ক'রে নেয়ে নিয়ে চলে এস না।"

ব'লিয়া বিনি জলে গিয়া নামিল। ভাটার জল তখন অনেক দূর সরিয়া গিয়াছিল, চড়া জাগিয়াছিল, বড় পিছল; পা টিপিয়া টিপিয়া বিনি নামিতে লাগিল। রণু কহিল, "অত-বড় একটা ভরা কলসী নিয়ে উঠবি—পা পিছলে আছাড় খাবি না ত? কলসীটাও ভেঙ্গে গুঁড়ো হবে। তা তুই থাক্, আমিই একটা ডুব দিয়ে ভরা-কলসী উপরে তুলে দিচ্ছি।"

বলিতে বলিতে রণু তাড়াতাড়ি কয়েক পা নামিল। হি-হি করিয়া বিনি হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "ভাটির নদীতেও এমন ভরা-কলসী রোজই তুলে নিচ্ছি; কই, আছাড়-টাছাড় ত খাইনি কখন। থাক্, থাক্. তোমাকে আর কিছু করতে হবে না। তুমি এখন তাড়াতাড়ি নেয়ে নাও! আর ক'টা কলসীই বা তুমি আমাকে তুলে দেবে? এই একটাই ত নয়, এমন বিশ-পঁচিশ কলসী জল যে রোজই তুলছি। জোয়ার-ভাটা আছে, জল-ঝড় কত হচ্ছে; কি করব? জল ত আমাকে তুলতেই হবে।"

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া রণু কহিল, "সত্যি, বড় জুলুমই তোর ওপর চলছে। এই অতটুকু মেয়ে তুই—কলসী-কলসী এত জল—"

"কি করব রণুদা! জান ত সব। বাবা রয়েছেন রোগে ঘরে পড়ে—ওষুধ-পথ্যিটাও ত চালাতে হবে। কোনও উপায় আর ছিল না। মা তাই এলেন হোটেলে রাঁধতে। আমি বাড়ীতে থেকে বাবার সব করি, আর ফাঁকে ফাঁকে এসে জল তুলে দিই। যখন আসি, বাবাকে একেবারে একলাটি থাকতে হয়। বাত-ব্যাধির রোগী—জলের গেলাসটি মুখের কাছে তুলে ধরে, এমন মানুষ আর একটি নেই। মশা-মাছি গায়ে বসলেও হাত তুলে তাড়াতে পারেন না। আসবার সময় তাই একটা মশারি খাটিয়ে তাকে ঢেকে রেখে আসি।"

"হুঁ, ভারী অসুবিধেতেই পড়েছিস বটে তোরা। তা—" হঠাৎ কি মনে হইল, রণু বলিয়া ফেলিল, "তা—বড়-সড় হয়ে উঠেছিস, তোর যখন বিয়ে হবে, শ্বশুর-বাড়ী যাবি—"

"যা-ও!" বলিয়া লজ্জায় মুখখানি ফিরাইয়া অন্য দিকে বিনি তাড়াতাড়ি নামিতে গেল, আর পা পিছলাইয়া কাদায় পড়িয়া গেল।

"এই দেখ্! ব'লতে না ব'লতে—" রণু গিয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া বিনিকে ধরিয়া তুলিল। কলসীটি কাদার উপর প'ড়িয়াছিল তাই ভাঙ্গে নাই। বিনিকে ধরিয়া পাড়ে তুলিয়া দিয়া, রণু কলসী ধুইয়া একটা ডুব দিয়া তাহাতে জল ভরিয়া আনিল। কহিল, "তোর বড্ড লেগেছে, কলসীটা আমিই কাঁধে করে নিয়ে যাব'খন।"

"না, না, ছি! তাও কি হয়? কাদা-মাটিতে পড়েছি—লাগেনি। আমিই নিয়ে যাচ্ছি।"

বলিয়া কলসীটি কাঁকালে তুলিয়া লইল। কাঁকালে বেশ একটু লাগিয়াছিল, প্রকাশ না করিলেও পদক্ষেপের ভঙ্গীতে রণু তাহা বুঝিল; কিন্তু আর কিছু বলিল না। তাকে লজ্জা দিয়া নিজেই সে তখন বড় লজ্জা অনুভব করিতেছিল। ছি! বিনির ঐ সব কথার উপরে কি করিয়া এই কথাটা তার মুখে বাহির হইল!

বিনি আসিয়া যখন ডাকিল, তাহার চিন্তাস্রোতে হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা লাগিল; সে চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল, দেখিল, কলসী-কক্ষে হাসিমুখে বিনি সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। এ কি সেই বিনি—নিত্য সে যাহাকে দেখে, নিত্য চলার সঙ্গে যে এটা-ওটা কথা বলে? না—এ যে তার কল্পনার ছবিটিই ঠিক মূর্ত্তি ধরিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! কল্পনায় যে স্ত্রীর চিত্র তাহার মনে ভাসিয়া উঠিতেছিল, সে কি বিনির চিত্র? হাঁ, তাই বটে,—তাই বটে! কিন্তু সে ত ভাবে নাই—ঠিক বুঝিতেও পারে নাই, কল্পিত স্ত্রীরূপে বিনিকেই সে ধরিয়া লইয়াছিল, বাস্তব এই বিনি আর কল্পিত চিত্র—মূর্ত্তি একই বটে, কিন্তু এক বলিয়া সে অনুভব করে নাই, বিনির অস্তিত্ব তার মনে হয় নাই। কিন্তু চিত্রের সেই মূর্ত্তির রূপ তার বড় মিষ্ট লাগিতেছিল। সে রূপ ত এই বিনিরই রূপ। কিন্তু বিনিতে ঐ রূপ ত সে আর কখনও দেখে নাই! যৌবনপুষ্ট সুস্থ দেহের সুগোল সুডৌল গড়ন, নিখুঁৎ না হইলেও বড় সুন্দর মিষ্টি মুখখানি, আর চোখের ঐ চঞ্চল চটুল হাসি, কোনও রূপ-প্রসাধন-রঞ্জনাদি নাই, তবু সমস্ত দেহে কি স্নিগ্ধ সজ্জিত নয়নাভিরাম শ্যামল-শ্রী ঢল-ঢল করিতেছে! পল্লীভূমির উপরে উজ্জ্বল নীল আকাশ, চা'র ধারে সজীব বনরাজির স্নিগ্ধোজ্জ্বল শ্যাম-শোভা যেমন মিষ্ট লাগে, বিনির স্নিগ্ধোজ্জ্বল শ্যামল-শ্রী ঠিক তেমনই এই তার চোখে মিষ্ট লাগিল। আহা, এই বিনিকে যদি সে বিবাহ করিয়া গৃহে আনিতে পারে! কিন্তু হায়, গৃহ তার নাই—গৃহস্থ হইয়া বাস করিবে, এমন সম্বলও কিছু নাই। বিনির মা যতই দুঃখী হউন, তার মত নিঃসম্বল নিরাশ্রয় একটা অভাগার হাতে কেন তিনি মেয়েকে সঁপিয়া দিবেন? সেই বা কোন্ সাহসে হাতে ধরিয়া তাহাকে লইবে? তবে নিঃসম্বল সে চিরদিন থাকিবে না; এমন নিরাশ্রয় হইয়াও রহিবে না। সম্বল হইবে, গৃহও হইবে, অবশ্য হইবে—সবই তাহাকে করিয়া লইতে হইবে; পথ খুঁজিলেই পথ পাওয়া যাইবে—দৈব অনুকূল হইলেও হইতে পারে। তখন—কিন্তু তত দিন যদি বিনির আর কোথাও বিবাহ হইয়া যায়? বিনি যদি এ-গাঁ ছাড়িয়া দূরস্থ কোনও গাঁয়ে তার শ্বশুরগৃহে চলিয়া যায়? হায়! চোখেও যে আর সে তাহাকে দেখিতে পাইবে না!

মুখে অন্য কথা বিনির সঙ্গে যা-ই বলুক না, মনের তলে এই কথাগুলিরই তোলা-পাড়া হইতেছিল, তাহা সে একেবারে চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না।

কাঁকালে জলপূর্ণ কলসীটি লইয়া ধীরে ধীরে বেশ একটু চাপা ক্লেশেই যেন পা ফেলিয়া বিনি চলিয়া গেল। একাগ্র-দৃষ্টিতে রণু চাহিয়া রহিল। তার পর স্নানার্থে নদীতে নামিয়া পড়িল।

৪

আহারের পর রণু ষ্টেশনের সাধারণ ওয়েটিং-রুমে গেল; রেস্তর াঁটি তাহারই একধারে ছিল। একটি বিড়ি ধরাইয়া কোমরের কাপড়ের ফাঁস একটু ঢিলা করিয়া দিয়া লম্বা একখানি বেঞ্চির উপরে কাত হইয়া পড়িল। আধঘণ্টাটাক একটু বিশ্রাম করিয়া কাগজ লইয়া আবার দৈনিক ফিরি করিতে বাহির হইবে।

"এই রণু বাবু,—খাওয়া-দাওয়া হ'ল?"

"কে ? ও—এই যে, আসুন দত্ত মশায়, বসুন !" উঠিয়া বসিয়া আগন্তুক এই দত্ত মশায়কে রণু পাশেই যায়গা করিয়া দিল। দত্ত মহাশয় বসিলেন। রণু বুঝিল, অন্য কোথাও যাইবার পথে দৈবাৎ তাহাকে দেখিয়া শিষ্ট আলাপোচিত এই সম্ভাষণমাত্র করেন নাই,—তাহার কাছেই কোনও প্রয়োজনে তিনি আসিয়াছেন।

"তা, কি মনে করে দত্ত মশায়—অসময়ে এই দুপুর বেলায় ?"

হাসিয়া দত্ত মশায় বলিলেন, "সময়-অসময় আর কি রণু বাবু, এই সময় আপনাকে এ স্থানে ঠিক পাব; নিরেলায় দুটো কথা ব'লবারও সুবিধে হবে, তাই রোদটা বেজায় বেড়ে উঠলেও ঠিক সময় ভেবেই এসেছি। তা আপনার বিশ্রামের বোধ হয় কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত ক'রলাম।"

"কিছু না—কিছু না। আমার আবার বিশ্রাম! এই ত এখুনি বেরোব একরাশ কাগজ নিয়ে।"

বলিয়া রণু গামোড়া দিয়া একটা হাঁই তুলিল। ভদ্রতার খাতিরে যাই বলুক, দুর্লভ এই বিশ্রামটুকুতে যে সত্যই একটা ব্যাঘাত উপস্থিত হইল, সেটা রণু বেশ অনুভব করিতেছিল, সেটা তাহার পক্ষে বিশেষ অপ্রীতিকরও হইয়া উঠিল। দু'টি চক্ষু ভাঙ্গিয়া ঘুম আসিতেছিল, মনে হইতেছিল, দত্ত এখনই উঠিয়া গেলে সে বাঁচে, আবার লম্বা হইয়া শুইয়া পড়ে। কাগজ লইয়া না হয় কিছু পরেই বাহির হইবে; চারিটার ট্রেণের সময় ফিরি না-হয় এক দিন বন্ধই থাকিল।

"হাঁ, তার পর কি কথা বলুন ত; এখুনি আবার বেরোতে হবে কি না।"

"বলছি। তা কি জানো রণুবাবু, আমাদের কর্ত্তা বাবু আজ এখানে এসেছেন।"

"কর্ত্তা বাবু কে? আপনাদের আড়তের খোদ মালিক? কি নামটা ভাল তাঁর ?"

"ঐ ত বিপিনবিহারী রায়।"

"হাঁ, হাঁ, তিনি ত বেলেঘাটায় তাঁদের মূল আড়তেই থাকেন ? তা এখানে কবে এলেন ?"

"এই ত কাল এসেছেন। থাকেন বেলেঘাটাতেই, তবে মাঝে মাঝে বেরোন এখানে-ওখানে; আর যে সব আড়ত আছে, তাঁর শাখা সেখানে গিয়ে হিসেবপত্র, কাজ-কর্ম্ম দেখেন। আর কাজ ক্রমেই বাড়ছে কি না, কাজেই ভাল লোক-টোক কোথাও পান কি না তাও খোঁজেন।"

"হুঁ, তার পর—"

"এদিককার বড় এক জন দালাল আমাদের অনেক টাকা মেরে-নিয়ে স'রে প'ড়েছে। নূতন এক জন ভাল বিশ্বাসী লোক তিনি খুঁজছেন। তা আমাকে পাঠালেন আপনার কাছে, যদি ও-বলা—এই ধরুন, সন্ধ্যেবেলা নাগাৎ—আপনি একটিবার যদি যেতে পারেন ওখানে—"

"যেতে কেন পারব না? তবে আমি—কি হবে গিয়ে? দালালীর কি জানি আমি ?"

"জানেন বই কি—জানেন বই কি! এই কাগজের দালালীটাও দালালী, আবার ঐ হোটেলে ওদের বছরের চাল আর তরকারী-টরকারীও আপনিই সরবরাহ ক'রে থাকেন। কর্ত্তা বাবু বলেন, ছোট হক্, বড় হক্, কাজ যে যা করে, করবার ধরণটা দেখলেই বোঝা যায়। লোকটা কাজের লোক কেমন হবে ? আর বিশ্বাস তাকে করা যায় কি না ?"

"হুঁ। আচ্ছা, সন্ধ্যেবেলায় তবে দেখা করব। খুব বড় ব্যবসা তাঁর, কোনও কাজে যদি ঢুকে পড়তে পারি—"

"হাঁ, বেশ একটা হিল্লে হয় ত আপনার হয়ে যাবে। এই যে গাড়ীতে গাড়ীতে আর গাঁয়ে গাঁয়ে কাগজ ফিরি করে বেড়াচ্ছেন, সারাটি দিনে সোয়াস্তি একটু নেই।"

হাসিয়া রণু কহিল, "কাজ করেই পয়সা কুড়োতে হবে দত্ত মশায়! সোয়াস্তি বেশী চাইলে সস্তায় বিকিয়ে পরে ভেবে মরতে হয়। আপনাদের কর্ত্তা বাবু যদি কোনও কাজে আমাকে লাগিয়ে দেন, সেই কাজের ওজনেই পয়সা দেবেন। মোটা পেন্সনে বিনি-কাজে সোয়াস্তিতে বসিয়ে খাওয়াবেন না। আর সেই দয়া করবেন বলেও আমাকে ডেকে পাঠাননি—এই দুপুরে রোদে লোক পাঠিয়ে। আচ্ছা, বলবেন গিয়ে তাঁকে, সন্ধ্যেবেলায় আমি যাব।"

কথা শেষ করিয়া রণু উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘুমের ঘোরটা তখন কাটিয়া গিয়াছিল। ভাবিল, কাগজ লইয়া এখনই বাহির হইবে।

"আচ্ছা, আসুন তা'হলে আপনি। আমি এইখানেই একটু গড়িয়ে নিই। খেয়ে উঠেই অমনি ছুটে এসেছি কি না।"

দত্ত মহাশয় রণুর পরিত্যক্ত বেঞ্চির উপরেই লম্বা হইলেন। বেশ মিষ্ট হাওয়া বহিতেছিল। ক্ষণকাল পরেই দত্ত মহাশয়ের গুরু গম্ভীর নাসিকাধ্বনি আরম্ভ হইল। রণু কাগজগুলি লইয়া তাহার বাইকে চড়িয়া সেই রোদেই ছুটিয়া চলিল।

চারিটার ট্রেণে ফিরি শেষ করিয়া রণু রেস্তরাঁয় গিয়া এক কাপ চা খাইল। কাপড়-চোপড় বিলক্ষণ ময়লা হইয়াছিল। বড়লোকের সঙ্গে দেখা করিতে যাইবে, ধোপদস্ত পরিচ্ছদে ফিট্‌ফাট্ হইয়াই যাওয়া উচিত। হোটেলের বামুনপিসী মোক্ষদা ঠাকুরাণীর ঘরে তাহার সুটকেসটি আছে। পরিষ্কার কিছু-কাপড় জামাও তাহাতে আছে। বাড়ী খুব দূরে নয়। রণু বাহির হইল। বাড়ীর কাছাকাছি আসিতেই দেখিল, অর্দ্ধ-পক্বকেশ দু'টি লোক—ভদ্রলোকই বটে—বাহির হইয়া আসিলেন। ঠিক বৃদ্ধ না হইলেও প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমা তাঁহারা প্রায় পার হইয়া আসিয়াছেন। একটু কাছে আসিতেই রণু দেখিল, এক জন তাহার সুপরিচিত বিলাস মুখুয্যে; এই মুখুয্যে তাহার পিতারই মুহুরী ছিলেন।

"আরে বিলাস দা' যে, আপনি এখানে ?"

"কে, রণু ভায়া! আরে এস, এস; ভাল আছ ত? তুমি এখানে—"

"কাজ করি এখানে, ঐ ষ্টেশনে। যাচ্ছিলাম ঐ বাড়ীতে একটু কাজে। চেনা লোক ওরা। তা আপনারাও ত ঐ বাড়ী থেকেই বেরোলেন মনে হচ্ছে।"

"হাঁ, তাই বেরোলাম বটে; তা কি জান দাদা, এই ইনি আমার বন্ধু লোক—জীবন চক্রবর্ত্তী,—ওঁর ভাগ্নে তারক ভট্‌চাজের বাড়ী ঐ, তাঁর একটি কন্যা আছে—বয়স্থা বিবাহযোগ্যা। তা ইনি মাঝে পড়ে কথাবার্ত্তা চালাচ্ছিলেন। আজ ঠিকঠাক্ সব হয়ে গেল, এই ২৭শে তারিখে বিবাহের একটা দিন আছে।"

"ঠিকঠাক্ হয়ে গেল—দিন ২৭শে—কি বিয়ের? কার? ঐ বিনির ?"

"হাঁ, হাঁ, মেয়েটির নাম বিনোদিনীই বটে। খাসা নামটি—যেমনি ঢল-ঢল কান্তি, তেমনি মুখভরা মিঠে নামটি—বিনোদিনী; যেন শ্যামসোহাগিনী 'রাই বিনোদিনী!'"

রণুর ইচ্ছা হইল, পায়ের জুতা খুলিয়া বিলাসের মুখে মারে। অতি আয়াসে আপনাকে একটু সামলাইয়া লইয়া রণু কহিল, "কার সঙ্গে বিয়ে? পাত্রটি কে?"

"পাত্রটি—হাঃ হাঃ—তা কি জান দাদা, তোমার বৌঠাকরুণ এই ক'বছর ধরে ব্যামোতে ভুগে ভুগে একেবারে শেষ হয়ে গেলেন, বিছানা ছেড়েই এদানী আর বড় উঠতে পারেন না। অনেকগুলি পুষ্যি ঘরে—সংসারটা আর চলে না। আমিও দেখ—তা বয়েস ত নেহাৎ কম হ'ল না, যদিও এখনও বেশ আছি, তা শরীর ত ভেঙ্গে আসছে, দেখবার-শুনবার একটি লোক না হলে দুর্গতির একশেষ তখন হবে। তাই এই জীবন ভায়াও বলছেন—আমিও দেখলাম—"

"ও! তা হলে আপনি নিজেই পাত্র?"

"হাঃ হাঃ! তাই ত ঠিকঠাক হয়ে গেল দাদা! এই ২৯শে দিন। তা এইখানে ত আছ, এঁদের সঙ্গে দেখছি বেশ জানা-শুনাও আছে। তা 'বরের মাসী কনের পিসী' হয়ে আমোদ-আহ্লাদ করবে এসে। ভারী খুসী হব দাদা! হাঃ হাঃ। কি বল, জীবন ভায়া! সম্পর্কে ত তুমিও হবে দাদামশায়, হাঃ হাঃ!"

"অচ্ছা, সে দেখা যাবে তখন। এখন আসি"—বলিয়া পাশ কাটাইয়া রণু দ্রুতপদক্ষেপে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

মোক্ষদা ঠাকুরাণী দাওয়ায় বসিয়া রহিয়াছেন; মুখ ভার, চক্ষু দু'টিও ছল-ছল, ঈষৎ রক্তাভ।

"এস বাবা, এস! কিছু কাজ আছে?"

"এই এলাম জামা-কাপড় কিছু বের করে নেব। সুটকেসটা—"

"ঐ ঘরের ভিতরেই আছে। যাও বাবা, যা যা দরকার, বের করে নিয়ে এস।"

রণু ঘরের ভিতরে গেল; দেখিল, বিনি এক কোণে বসিয়া মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছে। রণু একবার চাহিয়া দেখিল, মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু সে কিছু বলিল না। নিঃশব্দে জামা-কাপড় যাহা দরকার বাহির করিয়া লইয়া সুটকেসটি বন্ধ করিল। বারান্দায় আসিয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া কি ভাবিল, তার পর মোক্ষদা ঠাকুরাণীর দিকে চাহিয়া ডাকিল, "পিসী!"

"কি বাবা?"

"একটা কথা আপনাকে বলব? বাইরে একটু আসবেন?"

"চল, যাচ্ছি।"

নামিয়া দুই জনে বাড়ীর বহির্ভাগে পথের কাছে দাঁড়াইলেন।

"কি বাবা, বল।"

"বিনির বিয়ের সম্বন্ধ কি ঠিক হয়ে গেল।"

"হাঁ বাবা, তা গেল বই কি। ঐ উনি আমার দাদাশ্বশুর—"

"জানি। পাত্রটি কি বিলাস মুখুয্যে?

"হাঁ, তা তুমি কি করে জানলে বাবা? আমি ত জানাজানি একেবারেই কিছু করতে দিই নি।—বিনিকেও এদ্দিন কিছু খুলে বলিনি।"

"এই ত পথে ওঁদের সঙ্গে আমার দেখা হ'ল। বিলেস মুখুয্যে আমার খুব চেনা লোক; আমার ছেলেবেলা থেকেই চেনা। সে আমার বাবার মুহুরী ছিল কি না।"

"হাঁ, শুনেছি. উনি কোন্ উকিলের মুহুরীগিরি না কি করত।"

"সেই উকিল ছিলেন আমারই বাবা।"

"ওঃ।"

"তা, ওর হাতে বিনিকে দিচ্ছেন! জানেন কিছু ওর কথা?"

"জানি বই কি, সবই জানি। আগের এক বউ ঘরে আছে—রোগা, ঘর-ভরা ছেলে-পিলে।

"তবে?"

"কি ক'রব বাবা! আমার যে অবস্থা, সবই ত জান। সোয়ামী রোগে ঘরে পড়ে; ভাল বামুনের ঘরের মেয়ে ছিলাম, উনিও ভাল ঘরেরই ছেলে, লেখাপড়াও শিখেছিলেন, ইস্কুলে পণ্ডিতী ক'রতেন। কপালগুণে আজ আমি হোটেলে গিয়ে ভাত রেঁধে সংসার চালাচ্ছি। ঐ যে বিনি—ওকেও সেখানে নদীর জল এনে দিয়ে কিছু রোজগার ক'রতে হচ্ছে। ব'লতে কি, টাকাকড়ি কিছুই নেই, গায়ে একখানি রূপোর গয়না ওর নেই। দিতেও পারবো না। এর চাইতে ভাল ঘর-বর কোথায় আমি পাবো বাবা?"

"না হয় বিয়ে নাই হবে।"

"কিন্তু কোথায় ও দাঁড়াবে। মেয়ে-ছেলে সোমত্ত হ'য়ে উঠেছে। দেখবার-শুনবার কেউ নেই; ভাত-কাপড় দিয়ে পুষবে এমন কোথাও কেউ নেই। উনি রোগে ঘরে প'ড়ে, আমি মেয়ে-মানুষ, হোটেলে রাঁধি; দিন দুপুর, রাত দুপুর হোটেলেই কাটাতে হয়! বড় ভয় হয় বাবা! মেয়ে-ছেলে, কত লোকে কত কুদৃষ্টি দেয়। একটা সংসারের আশ্রয়ে নিজের ঘরে তার একটা তবু স্থিতি ত হবে।"—আঁচলখানি তুলিয়া মোক্ষদা ঠাকুরাণী অশ্রুমার্জ্জনা করিলেন।

সাশ্রু মুখখানি এক দিকে একটু ফিরাইয়া রণু কহিল, "বিনি দেখলাম কাঁদছে!"

"কাঁদবেই ত। কাঁদবার কপাল—ও কাঁদবে না ত কোন্ আবাগী আর এ পৃথিবীতে কাঁদবে বাবা। তবে কি না, নিজের অবস্থা বুঝেই সবাইকে চ'লতে হয়। যে আশ্রয় দিতে চাচ্ছে, তার সঙ্গে মিলে-জুলেই চ'লতে হবে। আশীর্ব্বাদ কর বাবা, তাই যেন সে পারে। আশ্রয় তবু যা পাচ্ছে, মনটা শান্ত ক'রে তাই যেন সে আঁকড়ে ধ'রে থাকতে পারে।"

"না, এ আশীর্ব্বাদ—আশীর্ব্বাদ নয়, এ অভিশাপ আমি বিনিকে ক'রতে পারব না। আশ্রয়ে নয়—সে যাচ্ছে জলন্ত একটা নরকে। আপনি বিলাসকে জানেন না। আমি জানি। জানি, তাই ব'লছি, বিলাসের ঐ ঘরে—তার নোংরা হাতে বিনিকে দেবেন না।"

"দিতে কোথাও হবে ত! কিন্তু আর কোথায় কার হাতে দেব? কে এ দয়া অভাগীকে ক'রবে?"

"এ সম্বন্ধ আপনি ভেঙ্গে দিন। আমি ব'লছি, ভাত-কাপড়ে, মানে-আদরে ওকে পালন ক'রবে, এমন একটি ছেলে আমি দেখে দেব!"

"তুমি! তুমি দেখে দেবে বাবা?"—বলিয়া মোক্ষদা কাঁদিয়া উঠিলেন। অশ্রু মুছিতে মুছিতে কহিলেন, "তাহ'লে বলি বাবা, মনের কথাটা খুলেই তোমাকে বলি। তোমাকে আমার পেটের

ছেলের মতই দেখি। আর সত্যিই বড় ভাল ছেলে তুমি। এমনটি আর কোথাও দেখিনি। দিনের পর দিন—কত দিন ভেবেছি, খেতে বসেছ, চেয়ে চেয়ে তোমাকে দেখেছি আর ভেবেছি, তোমার হাতে যদি বিনিকে দিতে পারতাম। হোটেলে তোমাকে ভাত বেড়ে দিয়েছি আর ভেবেছি, নিজের ঘরে বসিয়ে জামাই বলে সোহাগে ভাতের থালা যদি তোমাকে দিতে পারতাম! তুমি গরীব, তা বিনিও ত বড় গরীব। গরীব বলে কুলি-মজুরও ত সোয়ামী-স্ত্রীতে কাজকর্ম্ম করে খায়। দিন-কাল যা এসেছে, বামুন-সুদ্দুর, হাড়ি-ডোম সবাই সমান অবস্থায় এসে পড়েছে। সবাইকেই সমান ভাবে গতর খাটিয়ে পেটের ভাত করে খেতে হচ্ছে। তা আজকাল ভদ্দর-ঘরের ছেলেরা বেশি রোজগার করতে না পারলে বিয়ে করতে চায় না; তাই বাবা, মুখ খুলে মনের কথা কখনও তোমাকে বলতে পারিনি।"

অশ্রু মুছিয়া মুখ তুলিয়া রণু এবার চাহিল, বলিল, "বিনিকে তবে আমার হাতে দেবেন?"

"দয়া করে নেও যদি বাবা, দিয়ে হাতে স্বর্গ পাব।"

"ভাল, নেব তবে। বিনিকে ভাত-কাপড় দিয়ে পুষতে আমি পারব, আপনাকে আর হোটেলে কাজ করতে হবে না। বিনি আর আমি দু'জনেই কাজ ক'রব। আপনি ঘরে থাকবেন ওঁকে নিয়ে। আমার মাকে খবর দিচ্ছি। এই ২১শে তারিখেই দিনস্থির করুন।"

ভূমিষ্ঠ হইয়া রণু মোক্ষদা ঠাকুরাণীর চরণে প্রণিপাত করিল। সস্নেহে টানিয়া তুলিয়া তিনি রণুর শিরশ্চুম্বন করিলেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ (এম-এ, অধ্যাপক)।

কবিতা লেখা

কবিতা একটি দিব বলেছিনু; এসেছে তাহারি দাবী,
কলম লইয়া শূন্যে চাহিয়া, কি লিখিব তাই ভাবি।
ভেবে ভেবে মন হ'ল দিশাহারা,
কাব্য-দেবীর নাহি পাই সাড়া!
ভাবিলাম—এই নিদারুণ ফাঁড়া
কেটে গেলে যেন বাঁচি!
একমনে তাই কাব্য-দেবীর
করুণা কাতরে যাচি।

দুপুর কাটিয়া গড়া'ল বিকাল,
তথাপি লেখার না পাই নাগাল!
এমন সময় প্রকৃত কবিতা
চক্ষে উঠিল ফুটি'।
দেখি—মহাজন বি, এন, সাহার,
সেই মোটা, বেঁটে, টেকো সরকার—
ছ' মাসের 'বিল্' করিতে আদায়
আসিতেছে গুটি-গুটি।

তাড়াতাড়ি গিয়া দোতালার ঘরে
শুইয়া-পড়িনু বিছানার 'পরে।
কহিনু ডাকিয়া ভৃত্য ভূধরে—"কেহ যদি এসে খোঁজে,
বল্‌বি যে—'বাবু নাই আজ বাড়ী,
খেয়ে-দেয়ে চেপে স'দুটোর গাড়ী,
গিয়েছেন তিনি বৈষ্ণবাটীতে একটা বিয়ের ভোজে'।"

সন্ধ্যায় পুনঃ লিখিবারে যেই বসিনু ঘড়িটা দেখে,
অমনি শ্রীমতী গৃহিণী আসিয়া বসিলেন বেশ জেঁকে।
কহিলেন—"ভয়ে মরি যে'গো! ওঁ মা!
জার্ম্মেণী না কি ফেলবে গো বোমা?
লিখচো কি চিঠি বহরমপুরে? পড় না একটু হেঁকে।"
হাজার প্রশ্নে, হাজার কথায়,
কবিতা লেখা সে উঠিল মাথায়!
খাতা-পত্তর বাঁধি পুনরায় স্থির করিলাম,—তবে
আহারের পর লিখিলেই হবে—সকলে ঘুমা'বে যবে।

কিন্তু—কিন্তু—বলিব কি আর!
ভোজনটা কিছু হো'ল গুরুভার।
সুতরাং আর কবিতা লিখিতে হ'লাম শক্তিহীন।
পড়িনু ঢলিয়া শয্যার 'পর,
ঢুলু-ঢুলু আঁখি ঘুমেতে কাতর,
ভাবিনু এতেই হবে না কি শোধ মোর সে-দিনের ঋণ!

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

জলের বুকে যুদ্ধ

জলের বুকে মেঘনাদী-রীতিতে যুদ্ধের যে-সমারোহ, তাহা আজ অব্যর্থ হইতেছে। জলে-ডোবা গুপ্ত-শত্রুকে পরাস্ত করিবার জন্য আমেরিকায় এখন নানা সরঞ্জামাদির সৃষ্টি হইয়াছে। বড় বড় রণতরীকে গুপ্ত-আক্রমণ হইতে রক্ষা; জলবক্ষবিহারী সাবমেরিণাদির ধ্বংস-সাধন—এসব কাজে নব-রচিত মার্কিন 'ডেষ্ট্রয়ার' আজ অপরূপ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছে। এই নব ডেষ্ট্রয়ারের কাজ ছয় দিক্ দিয়া সার্থক হইতেছে। প্রথম কাজ, বড় বড় রণতরীকে পক্ষপুটতলে ঢাকিয়া তাদের যাত্রা নিরাপদ করা; টর্পেডো-শরে বিপক্ষ তরী ধ্বংস করা; বিপক্ষ জাহাজকে খুঁজিয়া বাহির করা; ধোঁয়ার আবরণ তুলিয়া নিরাপদ পথ-রচনা; সদাগরী জাহাজগুলির জলযাত্রা নিঃশঙ্ক নিরাপদ করা; এবং বিপক্ষের ডেষ্ট্রয়ারকে চূর্ণ ও ধ্বংস করা। উপরের কখানি ছবিতে মার্কিন ডেষ্ট্রয়ারের বিজয়-অভিযানের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

সদাগরী জাহাজের পাহারাদারী

ধোঁয়ার আবরণে

ডেষ্ট্রয়ার-ধ্বংসী

—

পক্ষাঘাতের প্রতিকার

পক্ষাঘাত-রোগীর চিকিৎসা এত দিন প্রায় দুরারোগ্য বলিয়া চিকিৎসকরা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। সম্প্রতি মার্কিন-চিকিৎসক

পক্ষাঘাতের প্রতিকার

শ্রীযুত চার্লস হেনরি উড পক্ষাঘাত সারাইবার উদ্দেশ্যে এক অভিনব বৈদ্যুতিক যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যে-অঙ্গে পক্ষাঘাত, সেই অঙ্গে এই যন্ত্র-সাহায্যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চালিত করিয়া ডাক্তার উড বহু পক্ষাঘাতগ্রস্তকে সর্ব্বতোভাবে সচল সক্রিয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এ-যন্ত্রটি এমন কৌশলে নির্ম্মিত যে, ইহার সাহায্যে সঞ্চালিত বৈদ্যুতিক প্রবাহ শিরা-উপশিরাদিতে এবং নার্ভ সিষ্টেমে জীবনী সঞ্চার করিতে পারে।

অনড় ক্যামেরা-ষ্ট্যাণ্ড

ফটো তুলিবার সময় অনেক ক্ষেত্রে ষ্ট্যাণ্ড নড়িয়া যায়—ছবি তোলায় সে জন্য গলদ ঘটে। এ গলদ-নিবারণের উপায় হইবে ষ্ট্যাণ্ডের সঙ্গে তিন-চার সের ভারী কোনো সামগ্রী যদি এই ছবির ভঙ্গীতে সংলগ্ন করেন। দড়ি দিয়া ভার না ঝুলাইয়া ষ্ট্র্যাপে বাঁধিয়া ঝুলাইবেন। হাল্কা ষ্ট্যাণ্ডও এ ভার-সহযোগে অচল অটল থাকিয়া ফটোগ্রাফারকে বিব্রত করিবে না।

ষ্ট্যাণ্ডে ভার বাঁধা

পথ-চারী ছাপাখানা

নিউ-ইয়র্কের এক প্রসিদ্ধ ছাপাখানা-ওয়ালা গাড়ী-ছাপাখানা তৈয়ারী করিয়াছেন। বড় মোটর ট্রাকে কামরা গড়িয়া সেই কামরায় ছাপিবার মেশিন, কয় কেশ্ টাইপ এবং সেই সঙ্গে ছ'জন কম্পোজিটর ও প্রিণ্টার লইয়া এ-গাড়ী দেশে দেশে ছাপার কাজ সম্পাদন করিয়া বেড়াইতেছে। ছাপিবার জন্য লিনো-টাইপ মেশিন, ষ্টিরিওটাইপিংএর সাজ-সরঞ্জাম, রোটারি প্রেস এবং বই বাঁধিবার ব্যবস্থাও সুকৌশলে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

গাড়ী-ছাপাখানা

এরোপ্লেনের রসদ

যুদ্ধের সময় যে প্লেন অভিযান-সাধনে আকাশে উঠিয়াছে—পেট্রোল ফুরাইলে সে-প্লেনকে যদি মাটিতে নামিয়া পেট্রোলের জোগান লইতে হয়, তাহা হইলে জায়গা বুঝিয়া ওঠা-নামায় অনেকখানি সময় নষ্ট হয়। যুদ্ধের সময় এ ভাবে সময় নষ্ট হইলে জয়-পরাজয়ে নানা পরিবর্ত্তন ঘটিবার আশঙ্কা—তাই পথের মাঝে মাঝে সুবিধানুযায়ী পেট্রোল-ভরা ট্রাক রাখা হয়। উড়ন্ত প্লেনের প্রয়োজন হইলে ছোঁ মারিয়া সেই ট্রাক হইতে পেট্রোল-গ্রহণের কেমন চমৎকার ব্যবস্থা হইয়াছে, পাশের ছবি দেখিলে তাহা সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইবে।

পেট্রোল ভরা

অতি-ক্ষুদ্র টাইপ-রাইটার

সুইজার্লাণ্ডের কুশলী শিল্পীর হাতে নূতন টাইপ-রাইটারের সৃষ্টি হইয়াছে। যেখানে যান, সঙ্গে এ টাইপ-রাইটার অনায়াসে রাখা চলে। এ টাইপ-রাইটারের আকার লম্বে প্রস্থে এগারো ইঞ্চি—উচ্চতায় মাত্র আড়াই ইঞ্চি। ওজন ঢাকনি-সমেত চার সের। বহিবার জন্য হ্যাণ্ডেল আছে। এ টাইপ-রাইটারে অক্ষরাদি আছে বড় টাইপ-রাইটারের মতো। ইংরেজী, ফরাসী, জার্ম্মাণ প্রভৃতি সকল ভাষার হরফ-যুক্ত টাইপ-রাইটার পাওয়া যায়—যায় না শুধু বাঙলা হরফের টাইপ-রাইটার। শিল্পীর ইচ্ছা আছে, বাঙলা হরফে এই ক্ষুদ্র আকারের টাইপ-রাইটার তৈয়ার করিবেন।
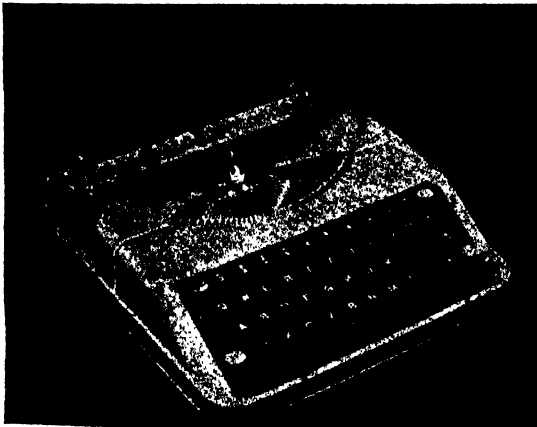
অতি-ক্ষুদ্র টাইপ-রাইটার

জুতা কাচাইতে চান ?

আমেরিকার আর এক অভিনব কীর্ত্তি! মেয়েদের স্পোর্টস-জুতায় কাদা লাগে—কাদা লাগিলে জুতার জুতাত্ব ঘুচিয়া যায় ম্লেয়মতো। আমেরিকায় এ

কাচাইয়া জুতা পায়ে দিন

দুর্ভোগ-নিবারণের জন্য স্পোর্টস জুতা কাচাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। জুতার শোল্ হইতে জুতাটি বিচ্ছিন্ন করিয়া ধোপার কাছে পাঠাইয়া তাহা কাচানো চলে। কাচা হইলে মোজা ও দস্তানার মতো

এ জুতা কাচানো চলে

রৌদ্রে শুকান; তার পর বন্ধনী-বোতাম আঁটিয়া আবার শোলের সঙ্গে সংলগ্ন করুন। এই বন্ধনী-বোতাম এমন কৌশলে বসানো আছে যে. তাহা চোখে পড়ে না।

বাক্-যন্ত্র

নিউ-ইয়র্কে এক ভদ্রলোকের বাস। তাঁর নাম জন স্মিথ। বুড়া বয়সে তাঁর স্বর-নালীর কি রোগ হয়—ডাক্তার তাঁর স্বর-নালী কাটিয়া দেন!

গলার নলীতে যন্ত্র লাগাইয়া বাক্-প্রয়াস

ভদ্রলোকের কথা কহিবার সামর্থ্য সঙ্গে সঙ্গে ঘুচিয়া যায়! তিনি ধনী ব্যবসায়ী। কথা কহিতে না পারিয়া আত্মঘাতী হইবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু লশ এঞ্জেলের এক বৈজ্ঞানিক জর্জ রাইট তাঁকে বাক-যন্ত্র সাহায্যে কথা কহিবার শক্তি দান করিয়াছেন। এ যন্ত্রটি গলার বাহিরে লাগাইয়া যে-কথা কহিবার প্রয়াস পাইবেন, সে বাক্-প্রয়াসের সঙ্গে যন্ত্রে ধ্বনি জাগিবে, এবং সে ধ্বনি সুস্পষ্ট স্বর-গ্রামে প্রকাশিত হইবে। এ যন্ত্র-সাহায্যে বোবার মুখেও কথা ফুটিতেছে!

অয়েল-ক্লথের পরিচর্য্যা

ঘরের মেঝেয় অনেকে অয়েল-ক্লথ বা লিনোলিয়াম বিছাইয়া রাখেন। তা ছাড়া অয়েল-ক্লথের ব্যবহার আছে নানা ঘরে নানা কাজে।

মোম লাগাইয়া পরিচর্য্যা

কিছু দিন ব্যবহারের পর অয়েল-ক্লথ বা লিনোলিয়াম ফাটিয়া যায়—নোংরা কদর্য্য হয়। মাঝে মাঝে যদি অয়েল-ক্লথ ও লিনোলিয়ামের গায়ে মোম মাখাইয়া তার উপর গরম ইস্ত্রী চালান, তাহা হইলে অয়েল-ক্লথ বা লিনোলিয়াম পরিষ্কার থাকিবে এবং ফাটিয়া চটিয়া তাহা অব্যবহার্য্য হইবে না।

১১

পরের দিন। অনাদি অফিসে গিয়াছে; আহার সারিয়া কল্লোল আসিয়া নদীর তীরে বসিল। অদূরে বড় একখানা নৌকায় কাঠ বোঝাই হইতেছে—তারি পানে দৃষ্টি।

মন কিন্তু কোন্ অদৃশ্য লোকে বিচরণ করিতেছিল! মনে হইতেছিল, ভাবিয়াছিল, স্রোতে ভাসিয়া কোনো রকমে জীবনটাকে কাটাইয়া দিবে। কোনো ঘাটে ধরা-ছোঁয়া দিবে না! কিন্তু তা হইল কৈ? এ-ঘাটে মাল তুলিয়া পরের ঘাটে মাল নামাইয়া ঐ নৌকার মতোই চলিয়াছে! সেখানে মা-শী···এখানে এই গঙ্গা···

শিপ্রার কথা মনে পড়িল। শিপ্রার সঙ্গে শুধু অলস খেলা খেলিয়াই ক'টা দিন অতিবাহিত করিয়াছে! কোনো লক্ষ্য ছিল না···কিছু না! এক-একবার মনে হইত, এই শিপ্রাকে চিরদিনের মতো···অমনি কেমন আতঙ্ক হইত!

তার পর ওদিক্‌কার বাঁধন কাটিয়া পলাইয়া আসিয়াছে! ভাবিয়াছিল, সামনের পথেই চলিবে চিরদিন। যে-বাঁধন কাটিয়া চলিয়া আসিয়াছে—পিছন-পানে সে-বাঁধনের পানে কখনো ফিরিয়া চাহিবে না!

কিন্তু স্মৃতি যায় না! শিপ্রার নাম শুনিয়া, শিপ্রা এখানে আসিতেছে শুনিয়া মন আবার সেই পিছনের দিনগুলার পানে তাকাইতেছে! কিসের আশায়?

শিপ্রা আসে, আসুক!···সে তার সঙ্গে দেখা করিবে না! জ্ঞানীরা বলিয়া গিয়াছেন, মানুষ যে-গ্রন্থি বাঁধে, সে-গ্রন্থির বাঁধন খোলা যায় না···সারা জীবনে যায় না! ভাবিত, এ কি আবার একটা কথা!

মনের মধ্যে দুটো দৈত্য যেন যুদ্ধ সুরু করিয়া দিয়াছে! এক জন বলিতেছে—শিপ্রার নামে তুমি নাচিয়া ওঠো কেন? সে যেখানে খুশী আসুক, যা খুশী করুক, তাহা লইয়া তোমার মাথা ঘামাইবার কি প্রয়োজন? আর-একটা দৈত্য বলিতেছে,—আহা, একটিবার গ্যাখোই না শিপ্রাকে··· সে কেমন আছে, অত-বড় শরৎ চৌধুরীর গৃহিণী হইয়া··· তোমাকে মানে কি না, চিনিতে পারে কি না···

দু'টো দৈত্যের বিরোধের মাঝখানে পড়িয়া কল্লোল যেন বিমূঢ়ের মতো হইয়া গিয়াছে···

মনে মনে যতবার ভাবিতেছে সেই শিপ্রা···শিপ্রা আসিয়া যদি দেখে, কি করিয়া সে দিন কাটাইতেছে··· কি লইয়া···কাহাকে লইয়া···ঘৃণায় মুখ ফিরাইবে! ফশ্ করিয়া হয়তো কি বলিয়া বসিবে···

কাজ নাই! শিপ্রা আসিতেছে এই রেঙ্গুনে··· রেঙ্গুন ছাড়িয়া সরিয়া যাই! তাহা হইলে শিপ্রার সঙ্গে দেখা হইবে না তো!

পরক্ষণে আবার মনে হইতেছে, সব ত্যাগ করিলেও শিপ্রাকে কাছে পাইয়া একটিবার তাকে দেখার বাসনা ত্যাগ করা যায় না তো!

· · ·

এমনি দু'-মুখী চিন্তা লইয়া কল্লোলের মন যখন নিরুপায়, তখন ইরাবতী নদীর বুকের উপর দিয়া রেঙ্গুন

মেল্ আসিতেছে···রেঙ্গুনের দিকে। সূর্য্য মধ্য-গগনে উঠিয়া বসিয়াছে। প্রখর সূর্য্য-তাপে চারি দিক্ তপ্ত। এই গরমে ফার্ষ্ট ক্লাশ কামরার বাহিরে ডেকে ইজি-চেয়ারে পড়িয়া আছে শরৎ চৌধুরী···পাশে টিপয়ের উপর হুইস্কির খালি বোতল; এবং তাকে ঘিরিয়া দু'-চার জন পার্শ্বচর।

পার্শ্বচরের দল বার-বার বলিতেছে—এই গরমে না বসে কামরার মধ্যে চলুন, স্যর···জানলায় খশ্‌খশের পর্দ্দা···ঠাণ্ডা বোধ করবেন।

শরৎ চৌধুরী তাদের কথা অগ্রাহ্য করিয়া বার-বার বলিতেছে, বয়স আটচল্লিশ পার হইতে চলিলেও যৌবন এখনো তাকে ত্যাগ করিয়া যায় নাই! কলিকাতা হইতে এতখানি পথ আসিতে এক-মিনিটের জন্য মাথা ধরে নাই ইত্যাদি···

বোতল প্রায় খালি,—শরৎ ডাকিল,—বিষ্ণু···

পার্শ্বচর নিতাই বলিল—বিষ্ণু ঘুমোচ্ছে। তার শরীরটা তেমন ভালো নেই!

শরৎ কহিল—হুঁ···আচ্ছা, শম্ভুকে ডাকো। আর একটা বোতল নিয়ে আসুক। আর সোডা···

নিতাই গেল শম্ভুকে ডাকিতে।

শরৎ বলিল—বুঝলে হে কার্ত্তিক, শীকার কাকে বলে একবার দেখো। পেগুর ও-পারে পাঁচ-মাইল গেলেই ভীষণ জঙ্গল। সে জঙ্গলে কি না পাওয়া যায়! হুঁঃ··· ক্যাম্প করতে হবে। পারবে ক্যাম্পে থাকতে? সেখানে আরাম মিলবে না!

এ-অনুগ্রহে বিগলিত হইয়া কার্ত্তিক বলিল—বলেন কি-স্যর! আপনি পারবেন, আর আমি পারবো না!

শরৎ বলিল—তার মানে?

কার্ত্তিক বলিল—মানে, আপনার হলো সুখী শরীর···

শরৎ বলিল—কিন্তু তোমরা হলে বৌয়ের অঞ্চল-নিধি ···বাড়ী আর বৌ ছেড়ে কোথাও যেতে পারো না!

কার্ত্তিক বলিল—পয়সার অভাব···কাজেই বৌয়ের মেজাজ খেঁচে আছে সর্ব্বক্ষণ। সে-মেজাজকে ঠাণ্ডা রাখবার জন্য কাছে ঘেঁষে আদর-সোহাগ-ভালোবাসার অভিনয় করতে হয় কি না···

শরৎ বলিল—বর্ম্মায় আসতে দিলে যে!

কার্ত্তিক বলিল—রৌপ্যচক্র দিয়ে পাশপোর্ট আদায় করেছি! সাধে আপনার কাছে কাকুতি জানিয়ে ছিলুম, স্যর! আপনি একশোটি টাকা দিলেন, তাই থেকে গোটা পঁয়ষট্টি টাকা দিয়ে এসেছি···তিনি সংসার চালাবেন। ঐ টাকা পেয়ে তবে ছেড়ে দেছে।

শরৎ বলিল—হুঁ···

শম্ভু আসিল। তার হাতে হুইস্কি এবং সোডার বোতল। সঙ্গে নিতাই···নিতাইয়ের হাতে বরফ।

পাশের ফার্ষ্ট ক্লাশ কামরায় গদিমোড়া আসনে কোমল-শয্যা। সে শয্যায় শিপ্রা শুইয়া আছে। জানলায় খশ্‌খশের পর্দ্দা টাঙ্গানো। কামরায় ইলেকট্রিক ফ্যান্ চলিয়াছে···শিপ্রা শুইয়া নভেল পড়িতেছে।

বই ভালো লাগিল না। বুকের উপর বই রাখিয়া শিপ্রা চাহিল দাসী মুক্তির পানে। মুক্তি তার কাছে অনেক দিন আছে···তারি বয়সী। মেঝেয় বসিয়া মুক্তি চাহিয়া আছে খোলা জানলা দিয়া বাহিরে ঐ নদীর পানে···

শিপ্রা ভাবিল, মুক্তি কি ভাবিতেছে?—নিজের ঘর-সংসারের কথা?

মনে হইল, দাসী বলিয়া নয়···মুক্তিও নারী···তার মতো নারী। কলিকাতায় থাকিতে মুক্তিকে দাসী জানিয়া শুধু হুকুম-ফরমাশ করিয়াছে···মুক্তি যে নারী, সে-কথা কোনো দিন মনে জাগে নাই! আজ হঠাৎ মনে হইল, নারী বলিয়া মুক্তির সঙ্গে যদি একটু আলাপ-পরিচয় করে! শিপ্রার মনে যেমন কত সাধ-আশা, বাসনা-কামনা ···মুক্তিও নারী, তার মনেও কি তেমনি সাধ, আশা, বাসনা, কামনা? জীবনকে মুক্তি কি বুঝিয়াছে? শুধু দাসীত্ব করিয়া পয়সা-রোজগার?—না, মুক্তিও একদিন মনের মধ্যে হাজার-বাতির ঝাড় জ্বালিয়া অনেক-কিছু প্রত্যাশা করিয়াছিল···সে-প্রত্যাশা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেছে?

মনের উপর নিজের জীবনের অতীত ক'টা বৎসর মেঘের মতো উদয় হইয়া চকিতে সরিয়া গেল।

একটা নিশ্বাস। শিপ্রা ভাবিল, আমার পৃথিবী··· তার রূপ-রস গন্ধ-স্পর্শ কোথায় মিলাইয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! এ পৃথিবী যেন আজ পাষাণের আবরণে ঢাকিয়া

গেছে!…সামনে এখনো জীবনের কত…কত দিন পড়িয়া আছে! সেগুলা…

যেন মরুভূমি! তরু-হীন ঝরি-হীন শ্যামলতা-বর্জ্জিত ধূ-ধূ বালির স্তূপ!

মুক্তির জীবন? আমি ঐশ্বর্য্য পাইয়াছি…সম্পদ-সম্ভোগের পরিপূর্ণ আয়োজন! আমি যা পাইয়াছি… মুক্তি তার কণার কণাও পায় নাই! তবু…

শিপ্রা ডাকিল—মুক্তি…

মুক্তি সাড়া দিল—বৌদি…

উঠিয়া কাছে আসিল, বলিল—কিছু বলবে বৌদি? কিছু চাই?

শিপ্রা বলিল—না…কিছু চাই না। বোস্…তোর সঙ্গে গল্প করবো।

মুক্তি বিস্ময়ে কাঠ! এত কাল বৌদির দাসীত্ব করিতেছে, বৌদির মুখে এমন কথা কখনো শোনে নাই!

শিপ্রা কহিল—তোর বিয়ে হয়েছে মুক্তি?

—হ্যাঁ…

—স্বামী কলকাতাতেই থাকে?

—হ্যাঁ…

—তোকে যে ছেড়ে দিলে আমার সঙ্গে রেঙ্গুনে আসতে?

—পেটের দায়ে, বৌদি।

—স্বামী কাজ করে না?

—কাছারিতে পেয়াদার কাজ করে।

শিপ্রা কহিল—রোজকার করছে…বৌকে খাওয়াতে পারে না?

দু'চোখে বিস্ময় ও প্রশ্ন ভরিয়া মুক্তি চাহিল শিপ্রার পানে।

শিপ্রা কহিল—নিজে রোজকার করে, আবার বৌকে পরের বাড়ী চাকরি করতে দ্যায়…কেমন মানুষ সে?

মুক্তির মুখ নিমেষে পাংশু! শিপ্রা তাহা লক্ষ্য করিল।

মুক্তি বলিল—আমার দুই ননদের বিয়েতে কিছু দেনা হয় বৌদি…তাই। তাও তোমাদের বাড়ীতে বলেই আমাকে চাকরি করতে দেছে। নাহলে আর-কারো বাড়ী হলে দিত না কি? কখ্খনো না!…এখন বলে, ছেড়ে দে চাকরি, মুক্তি। আমি বলি, না…,

শিপ্রা বলিল—তোর কথা আমায় বল্ মুক্তি…সব কথা…

মুক্তি হাসিল। মলিন হাসি! হাসিয়া মুক্তি বলিল—আমরা গরীব মানুষ বৌদি…আমাদের আর কথা কি আছে, বলো? খাওয়া-পরার, দুঃখ-কষ্ট নিয়েই আমাদের দিন কাটে।

শিপ্রা বলিল—তোর বর তোকে ভালোবাসে?

লজ্জায় মুক্তি একেবারে জড়োসড়ো! দু'চোখের দৃষ্টিতে সলজ্জ হাসি…মুক্তি বলিল—বাসে।

শিপ্রা কহিল—ছাই ভালোবাসে! কখ্খনো বাসে না। তা যদি বাসতো, তাহলে তোকে ছেড়ে দিত না আমার সঙ্গে…এত দূরে এই রেঙ্গুনে।…আমি যদি তোর বর হতুম, আর তোকে ভালোবাসতুম,—তাহলে কখ্খনো তোকে আসতে দিতুম না…আমায় সেখানে এমন একা-একা রেখে! স্বামীরা ভালোবাসে না, মুক্তি…কখনো না। ওরা…

নিশ্বাসের বাষ্পে মুখের কথা সংরুদ্ধ হইল।

মুক্তি বলিল—তোমরা বড়মানুষ, বৌদি…আমরা গরীব—মনে কষ্ট হবে, ব্যথা পাবো… এ-সব ভাবলে আমাদের চলে কি? মনের সুখ-দুঃখের আগে পেট-চালাবার উপায় দেখতে হবে তো…ও বলে, দুঃখ ব্যথা…ও-সব সাজে, যারা পয়সাওলা, যারা সৌখীন…তাদের!…এই যে বাবু এলেন রেঙ্গুন…তুমি বললে, তুমিও আসবে। পয়সা আছে বলেই তো আসতে পারলে! আমাদের কি তা হয়? আমি এলুম তোমার পয়সায়। ও বলেছিল, যদি পয়সা থাকতো, তাহলে কাছারিতে ছুটী নিয়ে আমিও তোর সঙ্গে যেতুম, মুক্তি! পয়সা তো নেই, বৌদি!

কথার শেষে মুক্তি নিশ্বাস ফেলিল।

সে-নিশ্বাস শিপ্রার মনের কোণে বাজিল। শিপ্রা বলিল—আমাকে বলিস্ নে কেন মুক্তি? আমি তাহলে তার আসবার ভাড়া দিতুম। দু'জনে বেশ একসঙ্গে থাকতিস্…নতুন দেশ…কত কি দেখতিস্-শুনতিস্…

—তুমিও যেমন বৌদি!…আচ্ছা, একটা কথা, জিজ্ঞাসা করবো?

—কি কথা?

—রাগ করবে না?

—না।

—বাবু যদি তোমায় একা রেখে কোথাও যান, তোমার খুব বিশ্রী লাগে? বাবুর জন্য মন-কেমন করে?

এ কথার জবাব শিপ্রা দিতে পারিল না…কথাটা যেন তীরের মতো বুকে বিঁধিল! মনে মনে শিপ্রা নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করিল—তাই কি? মুক্তি যা জিজ্ঞাসা করিতেছে…

মন সাড়া দিল না।

মুক্তি বলিল—তোমরা দু'জনে দু'জনকে ছেড়ে কখনো থাকোনি, না? থাকতে পারো না?

অন্যমনস্ক ভাবে শিপ্রা বলিল—কেন বল্ তো, এ কথা বলছিস্?

মুক্তি বলিল—আমি তো বুঝতে পারি…আমাদের মতো নও তো যে মন-কেমন করলেও পয়সার অভাবে নিরুপায়! তোমাদের পয়সা আছে…দু'জনে দু'জনকে ছেড়ে কেন আলাদা থাকবে, বলো, বৌদি!

শিপ্রা এবারো কোনো জবাব দিল না…জানলার অন্তরালে বাহিরের পানে তাকাইল…নদীর বুকে সূর্য্য-কিরণ পড়িয়াছে…জলে রূপালি ঢেউয়ের মালা…

তীব্র তীক্ষ্ণ বাঁশী বাজিল। ষ্টীমারের বাঁশী।

মুক্তি বলিল—কোনো ষ্টেশনে এলো, বুঝি! যাই, দেখি গিয়ে…

মুক্তি বাহিরে গেল। শিপ্রা তেমনি শুইয়া রহিল… মন শূন্য উদাস!

১২

রেঙ্গুনে পৌছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল।

অফিসের লোক-জন আসিয়াছিল মনিবকে সাদর-অভ্যর্থনা করিতে। তারা বলিল—মেল বড্ড লেট্ করেছে, স্যর। পেগুতে তাহলে…

শরৎ চৌধুরী বলিল—এখন নয়। দু'দিন পরে পেগু যাবো। বাড়ী ঠিক করেছো তো?

—হ্যাঁ, স্যর…অফিসের অনাদি বাবু গেছে। পাকা লোক।

শরৎ চৌধুরী বলিল—আমি টেলিগ্রাম করে দিয়েছি এখানকার মিস্ বার্কার্স হোটেলে…ঘরের জন্য।

—ও…সে-হোটেল তো ঐ আরুণ্ডেল ষ্ট্রীটে।

দু' ঘণ্টা পরে। রাত্রি সাড়ে আটটা।

পাশাপাশি তিনখানা বড় কামরা।

মুখ-হাত ধুইয়া সাজিয়া-গুজিয়া শিপ্রা বসিয়াছিল তার নিজের কামরায়…বেশভূষা দেখিয়া মুক্তি বলিয়াছে—রাজ-রাণীর মতো তোমায় দেখাচ্ছে বৌদি…সত্যি।

শিপ্রা বলিল—তুই যা, গা ধুয়ে নে শীগগির। গল্প করবো।

মুক্তি গেল গা ধুইতে। শিপ্রা উঠিয়া আয়নার সামনে দাঁড়াইল। আয়নার বুকে নিজের যে ছবি দেখিল…এ-মূর্ত্তি লইয়া বিশ্ব-জয় করা যায়! সে যদি পুরুষ-মানুষ হইত…

বুকের মধ্যে নিশ্বাসের বাষ্প ঘন হইয়া উঠিল।

আয়নার বুকে ছায়া…শরৎ চৌধুরীর মুখ!

শরৎ চৌধুরী আসিল; কহিল—তোমার হয়েছে তা হলে!…হুঁ…ত্যাখো, হোটেলটার ব্যবস্থা ভালো… জায়গাটিও ভালো। ফার্নিচার-টার্নিচার সৌখীন… খাওয়া-দাওয়াও স্প্লেনডিড্!

শিপ্রা বলিল—হ্যাঁ…তাছাড়া বয় বলে গেল, আমাদের ঘরেই আমাদের খাবার দিয়ে যাবে।…এই খোলা খড়খড়ি দিয়ে বাইরে ঐ নদীর বাঁকটুকু কি চমৎকার দেখাচ্ছে! এমন হোটেল এখানে পাবো, ভাবিনি!

শরৎ চৌধুরী বলিল—ভাবছি, পেগুতে না হয় আসছে হপ্তায় যাওয়া যাবে। এখানে এক-হপ্তা বরং…

শিপ্রা বলিল—আমার খুব ভালো লাগছে! পেগুতে যেতে হয়, তুমি যেয়ো। আমি ক'দিন এখানেই থাকবো।

—হুঁ…

শরৎ চাহিল শিপ্রার দিকে। শিপ্রা লক্ষ্য করিল, শরৎ চৌধুরীর চোখের দৃষ্টিতে সুনিবিড় আবেশ!…মুখের স্তুতি-বচনে মন ভুলাইতে যখনি আসিয়াছে, তখনি শরতের দু'চোখে এমনি দৃষ্টি! এ দৃষ্টি…

শিপ্রা কাঁপিয়া উঠিল। ও দৃষ্টির কুহকে শিপ্রা বহুবার নিজের পণ ভুলিয়াছে, নিজেকে ভুলিয়াছে! ভুলিয়া…

কিন্তু না, আর নয়…ও-দৃষ্টিতে এখন কেমন অস্বস্তি!

শিপ্রা বলিল—দাঁড়িয়ে রইলে যে! কিছু বলবে?

শরৎ চৌধুরী বলিল—হ্যাঁ, এ ঘর তোমার পছন্দ হয়েছে তাহলে?

—খুব।

শরৎ চৌধুরী কহিল—আমার ঘর…

শিপ্রা বলিল—ওদিকে। সে-ঘরে তোমার বিছানা করেছে।

শরৎ চৌধুরী বলিল—হুঁ…সামনের ঘরখানা…

শিপ্রা বলিল—ভাবছি, ও-ঘরটায় আমি বসবো… আমার ট্রাঙ্ক থাকবে…মুক্তি শোবে…

শরৎ চৌধুরী বলিল—নিতাই কার্ত্তিক ওরা…

শিপ্রা বলিল—ওদের জন্য ওদিকে ঘর নেওয়া হয়েছে তো…শম্ভু বলে গেল।

শরৎ চৌধুরী বলিল—কাল সকালে এইখানেই এই রেঙ্গুন-নদীর ও-পারে যাবো শীকার করতে। বড় লেক্ আছে…সে-লেকে রকমারি পাখী…

শিপ্রা একান্ত মনোযোগে শুনিল···জবাব দিল না।

শরৎ চৌধুরী বলিল—তুমি যাবে ?

—না···

—বেশ···

শিপ্রা বলিল—তোমার খাওয়া হয়েছে ?

শরৎ চৌধুরী বলিল—না। এখানকার অপিসের বড়-বাবু কিশোরী আর লাপুং এসেছিল, তাদের সঙ্গে কথা কচ্ছিলুম।

শিপ্রা কহিল—শোওগে। বেশী রাত নাই জাগলে আজ! বিশ্রামের দরকার। কাল আবার শীকারে যাচ্ছ!

শরৎ চৌধুরী অনিমেষ-দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল শিপ্রার পানে! বেশভূষায় শিপ্রা কি কুহক জাগাইয়া রাখিয়াছে···

শরৎ চৌধুরী দু'হাতে শিপ্রাকে ধরিয়া বক্ষ-লগ্ন করিল।

সবলে নিজেকে মুক্ত করিয়া শিপ্রা বলিল—আঃ, কি জ্বালাতন করো!

জ্বালাতন! শরৎ চৌধুরী সরিয়া আসিল···আহতের মতো! তার পর নিজেকে সম্বৃত করিয়া সহজ কণ্ঠেই শরৎ চৌধুরী কহিল—তুমি খেয়েছো ?

শিপ্রা বলিল—না। সামান্য কিছু খাবো। মুক্তি গা ধুতে গেছে···সে এলে শম্ভুকে বলবে। তখন শম্ভু আমার খাবার ব্যবস্থা করবে। তুমি এখন যাও···আমি একটু গড়িয়ে নেবো।

শরৎ চৌধুরী আবার সেই একাগ্র-দৃষ্টিতে চাহিল শিপ্রার পানে, বলিল—আমি যদি একটু বসি এখানে ? মানে, ইউ আর রিয়্যালি চার্ম্মিং···

পাশের ঘরে পায়ের শব্দ···

শিপ্রা কহিল—মুক্তির হয়েছে, ঐ মুক্তি আসছে। আমার চার্ম্ম এক-দিনে মুছে যাবে না! আজ আর এ-চার্ম্ম নাই দেখলে! তুমি টায়ার্ড, আমি আবার তোমার চেয়েও টায়ার্ড ফীল্ করছি···

মুক্তি আসিল, ডাকিল—বৌদি···

ডাকিবার সঙ্গে সঙ্গে মনিবকে দেখিয়া জিভ কাটিয়া সপ্রতিভ ভাবে দু'পা পিছনে সরিয়া গেল।

শিপ্রা ডাকিল—মুক্তি···

মুক্তি দাঁড়াইল···

শিপ্রা বলিল,—বাবু এখনি চলে যাচ্ছেন। বাবু চলে গেলে তুই গিয়ে শম্ভুকে বল্—আমার জন্য একটু স্যুপ, খানিকটা কারি আর ভাত আনবে···আর এক পেয়ালা কফি। ব্যস্! আর কিছু না। খেয়ে শুয়ে পড়বো। মাথাটা যেন ধরেছে একটু···বুঝলি ?

মাথা নাড়িয়া মুক্তি জানাইয়া দিল, বুঝিয়াছে।

সে চলিয়া গেল। শরৎ চৌধুরী বলিল—কাল সকালে আমি সকলকে নিয়েই বেরুবো। শুধু শম্ভু আর মুক্তি থাকবে। তোমার চলবে তো ?

—চলবে।

শরৎ চৌধুরী বলিল—ফিরতে হয়তো সন্ধ্যা হয়ে যাবে···দু'-এক দিন হয়তো নাও আসতে পারি। সেজন্য তুমি ভেবো না···

শিপ্রা বলিল—ভাববো না।

শরৎ চৌধুরী বলিল—শম্ভু থাকলে ভয়ের কোনো কারণ নেই! আমার জিনিষ-পত্তর রক্ষা করতে যদি প্রাণ দিতে হয়, তা সে দেবে। তা সে জিনিষ-পত্তর আমার আংটি-ঘড়ি টাকা-কড়ি হোক আর রূপসী স্ত্রীই হোক··· হাঃ হাঃ, কি বলো ?

কথাটা বলিয়া শরৎ চৌধুরী প্রস্থান করিল।

শিপ্রার সর্ব্বাঙ্গে যেন প্রহারের যাতনা! এ···স্বামীর মুখের কথা ? না, চাবুক ? আংটি-ঘড়ি টাকা-কড়ির যে দাম শরৎ চৌধুরীর কাছে, স্ত্রীর দামও ঠিক ততখানি! স্ত্রী তৈজস-পত্রের সামিল! তাই শম্ভু করিবে শিপ্রার পাহারাদারী!

মনের মধ্যে আগুন জ্বলিল! বিবাহ হইয়াছে···আজ ক'বৎসর না! মোটর-গাড়ী, আংটি-ঘড়ি, লেপ-তোষক, জামা—ওদের মতোই স্ত্রী তোমার সম্ভোগের সামগ্রী! স্বার্থপর মূঢ় কাপুরুষ! টাকার জোরে পৃথিবীকে পদানত করিতে পারো···শিপ্রাকে নয়! পৃথিবী মাটীর—তার প্রাণ নাই! শিপ্রা মাটীর পৃথিবী নয়, জানিয়ো! আগ্নেয়-গিরির বুকে তিলে-তিলে যে-আগুন প্রধূমিত হয়···এক দিন তার ভার বহিতে না পারিয়া আগ্নেয়-গিরি ফাটিয়া চৌচির হয়। এবং তার সে বিদীর্ণ বুক হইতে যে গলিত লাভা, যে ধূম্রানল-জ্যোতি উৎকীর্ণ হয়, তার তেজে গ্রাম-নগর পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়! তোমার এই লাঞ্ছনা, অপমান, অবহেলা আমার বুকে যে-আক্রোশ প্রধূমিত করিতেছে···

সমাজ-সংসার···আত্মজনের মন···কত কিসের আবরণ দিয়া সে-আক্রোশ শিপ্রা চাপিয়া রাখিয়াছে···

পরের দিন। বেলা প্রায় আটটা।

মুক্তিকে লইয়া শিপ্রা আসিল রেঙ্গুন-নদীর তীরে। তীর-পথে বহু দূর হাঁটিয়া চলিল।

তার পর খেয়াল হইল···ডাকিল—মুক্তি···

শিপ্রার পানে মুক্তি ফিরিয়া চাহিল।

শিপ্রা কহিল—ঐ ছোট নৌকো একখানা ভাড়া করে চ, খুব-খানিকটা বেড়িয়ে আসি।

মুক্তি কহিল—বলো কি, বৌদি ? দু'-জন মেয়ে-মানুষ আমরা···এই মগের মুল্লুক···শম্ভুকে তাহলে আনলে না কেন ?

—শত্তু নেই, তাতে বেড়ানো যাবে না কেন, শুনি ?

—ভয় করে, বৌদি! বর্ম্মার মাঝি। শুনেছি, এখানকার লোক ভারী বদ্...

মৃদু হাস্যে শিপ্রা বলিল—বদ্ লোক শুধু বর্ম্মাতেই বুঝি ? ঘরেও তো বদ্ লোক আছে !

মুক্তি বলিল—শেষে মাঝ-নদীতে নৌকো নিয়ে গিয়ে যদি কিছু করে ? তোমার গায়ে এই গহনা ?

শিপ্রা বলিল—গহনার ভয় করি না, মুক্তি। যারা খেটে খায়, তারা চোর হয় না।

মুক্তি কহিল—বাবু যদি রাগ করেন ?

শিপ্রা কহিল—সে-রাগের জবাব তো তোকে দিতে হবে না...সে-রাগের জবাব আমি দেবো। আয়, কোনো ভয় নেই।

নৌকা ঠিক করিয়া সে-নৌকায় দু'জনে উঠিয়া বসিল। শিপ্রা বলিল—আমাদের খুব-খানিকটা ঘুরিয়ে আনো। বেশ অনেক-দূর পর্য্যন্ত।

মাঝি বলিল—আনবো।

মাঝি হিন্দী জানে। ভাঙ্গা বাঙলা হিন্দী আর ইংরেজী মিশাইয়া কথা যা কয়, বুঝিতে অসুবিধা হয় না।

শিপ্রা বলিল—তুমি কখনো কলকাতায় গেছ, মাঝি ?

মাঝি বলিল—কভি কভি যায়, মেম-সাব! ভালো লাগে না। বর্ম্মার মতো কলকাতা না আছে...

নৌকায় বসিয়া রেঙ্গুনের বাহিরের দিকটা যতখানি দেখা যায়—শিপ্রার চমৎকার লাগিল।

মুক্তি বলিল—আমাদের দেশের মতোই বৌদি, না ? আমাদের দেশে যেমন মন্দির, এদের দেশেও তেমনি। গয়ার মন্দিরের মতো ঐ মন্দিরটা দ্যাখো...

শিপ্রা কহিল—বুদ্ধদেবের নাম শুনেছিস্, মুক্তি ?

—ও মা, তা আর শুনিনি! পড়েছি বুদ্ধদেবের গল্প...থিয়েটারে বুদ্ধদেব দেখেছি। রাজার ছেলে...সব ছেড়ে চলে গেলেন...সন্ন্যাসী হলেন...সেই তো ?

শিপ্রা বলিল—হ্যাঁ। আমাদের দেশের দেবতা বুদ্ধদেব। তাহলে আমাদের দেশের মন্দিরের সঙ্গে এখানকার মন্দিরের মিল থাকবে না কেন, বল্ ?

মুক্তি বলিল—ঠাকুর-দেবতায় মিল আছে...কিন্তু এরা যে কি কথা কয়! কথা সব এমন কেন, বলো তো বৌদি ? কি বলে, তার কিছু যদি বোঝা যায় !

হাসিয়া শিপ্রা বলিল—তা বুঝোতে হলে তোকে নিয়ে প্রাচীন-সভ্যতার স্কুল খুলতে হবে, মুক্তি। সে সময় আমার নেই...আর সে-বিদ্যাও আমার জানা নেই।

নৌকা চলিয়াছে...কখনো এ-পার ঘেঁষিয়া, কখনো ও-পার ঘেঁষিয়া। ঘাটে জন-তরঙ্গ...সে-তরঙ্গে কত বৈচিত্র্য...

চড়ায় বাধা পাইয়া এক দিকে নদীর একটা শাখা বাঁকিয়া সহরের কোলে গিয়া ঠেকিয়াছে। সে-দিককার চড়ায় বাঁশের ঝোপ...

মুক্তি বলিল—ওখানটা দ্যাখো বৌদি...যেন কুঞ্জবন !

শিপ্রা বলিল—সত্যি, চমৎকার তো !

মাঝিকে বলিল—ও-দিকটায় চলো...

মাঝি বলিল—ও-দিকটায় বস্তী মেম-সাব। যত গরীব লোক থাকে...যারা খেটে খায়। নোংরা বস্তী।

শিপ্রা বলিল—তাহলেও ঐ বাঁশের ঝোপটা বেশ লাগছে। চলো...একেই বলে বেতস-কুঞ্জ...

মাঝি নৌকা চালাইল সেই বেতস-কুঞ্জের দিকে। বাঁশ-ঝাড়ের ফাঁকে-ফাঁকে ক'খানা কুটীর...কে যেন ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছে !

নৌকা চলিল সেই বস্তীর দিকে...

বিশ-পঁচিশ হাত দূরে তীর। নৌকা চরে বাধিয়া গেল ; আর চলে না।

শিপ্রা বলিল—কি হলো ?

মাঝি বলিল—চর...নৌকো আটকেছে।

—উপায় ?

মাঝি বলিল—টেনে নিয়ে যেতে হবে...যতক্ষণ না অনেক-জল পাই...

তীরে কে গান গাহিতেছিল...বাঙলা গান...কণ্ঠ যেন পরিচিত !

গান গাহিতেছিল—আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা...।

রবীন্দ্রনাথের গান !

অজ্ঞাত এই বর্ম্মীজ বস্তীর বুকে বসিয়া রবীন্দ্রনাথের গান গায়...কে ?...ও কে ?

শিপ্রা বলিল—মাঝি, ওখানে নামিয়ে দিতে পারো আমাদের ?

—পারি।

—দাও...

নৌকা ঠেলিয়া মাঝি তীরে লাগাইল।

তীরে তখনো সে-গান চলিয়াছে। গায়ককে শিপ্রা দেখিল...দেখিয়া চমকিয়া উঠিল !

মানুষের সঙ্গে মানুষের এত মিল!...ও যেন...হাঁ, ওকে দেখিতে ঠিক...

যেন কল্লোল রায় ! [ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

[উপন্যাস]

দশম তরঙ্গ

ওয়াইল্ডের অন্তর্দ্ধান

ওয়াইল্ড কোন সুযোগে জঙ্গলে প্রবেশ করিল, এবং গর্ত্ত হইতে গোল্ডবার্গের এটাচি-কেস তুলিয়া লইয়া খুলিয়া দেখিল, তাহার ভিতর হীরা-জহরত একখানিও নাই! সে এটাচি-কেসের ভিতর পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "বুঝিতে পারিয়াছি—এ ব্লেকেরই কাজ! কিন্তু ব্লেক ইহার সন্ধান পাইল কিরূপে? লোকে বলে, আমি অদ্ভুতকর্ম্মা; কিন্তু ব্লেক কি? যাদুকর!"

ওয়াইল্ড এটাচি-কেসটি ফেলিয়া-রাখিয়া বলিল, "হীরাগুলা এখানে লুকাইয়া রাখিয়া অত্যন্ত নির্ব্বোধের কাজ করিয়াছিলাম; কিন্তু ব্লেক কখন এখানে আসিয়া এই ভাবে বাটপাড়ি করিয়া গেল? প্রায় দশ মিনিট পূর্ব্বে জানিতে পারি—ব্লেক আমার অনুসরণ করিয়াছে। অদ্ভুত লোক বটে; অসাধারণ শক্তি! কিন্তু হীরাগুলা আবিষ্কার করিল কি উপায়ে?"

কিন্তু ব্লেকের এই কার্য্যে ওয়াইল্ড বিন্দুমাত্র বিস্মিত বা বিরক্ত হইল না। সার রড্‌নে ড্রুমণ্ডের সহিত তাহার চুক্তি হইবার পর সে সেই কথাই চিন্তা করিতেছিল; অপহৃত হীরা-জহরৎগুলির প্রতি তাহার আর তেমন অধিক আকর্ষণ ছিল না। পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিতেছে শুনিয়া সে সার রড্‌নের নিকট কয়েক মিনিটের জন্য বিদায় লইয়া ভূবিবরস্থিত হীরাগুলি অপসারিত করিতে আসিয়াছিল।

ওয়াইল্ড মনে মনে বলিল, "কিন্তু এক দিন ব্লেককে এই কাজের জন্য জবাবদিহি করিতে হইবে; তাহার কৈফিয়ৎ আদায় না করিয়া ছাড়িব না। তাহাকে ঘাড় ধরিয়া এখানে টানিয়া আনিব!"

আরও পাঁচ মিনিট পরে পুলিশ সার রড্‌নের আরণ্য-ভবনে উপস্থিত হইল। ব্লেক স্মিথকে লইয়া একটু দূরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কেহ তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল না।

স্মিথ ব্লেককে জিজ্ঞাসা করিল, "পুলিশ কি ওয়াইল্ডকে ধরিয়া আটক করিতে পারিবে কর্ত্তা! আপনার কি মনে হয়?"

ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, উহা তাহাদের অসাধ্য;—অর্থাৎ দুই-পাঁচ জনের কর্ম্ম নয়!"

স্মিথ বলিল, "এই কার্য্যে পুলিশ অসমর্থ হইলে আমাদের কি কিছুই করিবার নাই কর্ত্তা!"

ব্লেক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "আমরা কি করিব বল? আমি পূর্ব্বেই ইন্‌স্পেক্টরকে সতর্ক করিয়াছি; কিন্তু লোকটা এতই দাম্ভিক যে, আমার উপদেশ হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়াই সঙ্গত মনে করিল। নিজের শক্তিতে তাহার অগাধ বিশ্বাস! এ অবস্থায় যদি তাহাকে অপদস্থ হইতে হয়, তবে সে দায়িত্ব তাহার নিজের।

বাজি রাখিয়া বলিতে পারি—ওয়াইল্ড
...থ বলিল, "কর্ত্তা কিন্তু
রাখিতে পারিবে না। টেলি
করিয়াছিলেন; আপনাকে
সংবাদ পাঠাইবার পর অ
...ষণ ধূর্ত্ত, আর তাহার দেহেও
আত্মরক্ষার জন্য সার ?
...আপনি তখন সে কথা শুনিয়া—
করিয়াছে। পুলিশের
...ব হইবার পূর্ব্বেই এক জন কনষ্টেবল
স্মিথ বলিল, "
...খে আসিয়া বলিল, "মিঃ গোল্ডবার্গ
ব্লেক বলিলেন,
করিতে চাহেন। তিনি এখানেই
ওয়াইল্ড সার রড্‌নের

তাহা অনুমান করা আমার অসাধ্য ; কিন্তু আমার ধারণা, আমি তাহার সন্ধান পাইয়াছি—ইহা বুঝিতে পারিয়া সে পুলিশের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে সম্মত হইয়াছে, এবং তাহার সম্মতিক্রমেই সার রড্‌নে পুলিশকে আসিতে বলিয়াছেন। তাহার সহিত সার রড্‌নের কোন রকম গুপ্ত-পরামর্শ হইয়াছে, এরূপ সন্দেহ পুলিশের মনে স্থান না পায়—ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। ওয়াইল্ড এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ; কারণ, সে জানে—পুলিশ তাহাকে থানা পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারিবে না। কিন্তু এ কথা বলিতে আমার আপত্তি নাই যে, ওয়াইল্ড আত্মরক্ষা করিতে পারিলেই আমি খুসী হইব। ওয়াইল্ড সাধারণ দস্যু নহে, এবং সে আমার শ্রেষ্ঠতাও অস্বীকার করে না ; এ অবস্থায় তাহাকে জব্দ করিবার জন্য কেন আমরা পুলিশকে সাহায্য করিব ?"

স্মিথ বলিল, "আপনি এ কথা বলিতে পারেন বটে, কিন্তু শেষে কি দাঁড়াইবে—তাহা এখন বলা যায় না।"

কয়েক মিনিট পরে পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টর ওয়াইল্ডকে দেউড়ির ভিতর দিয়া প্রাচীরের বাহিরে লইয়া আসিলেন। ওয়াইল্ডকে অত্যন্ত নিরুৎসাহ ও হতাশ দেখাইতেছিল ; দুই জন বলবান প্রহরী তাহার দুই পাশে থাকিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছিল ; আর দুই জন প্রহরী সতর্ক ভাবে তাহার অনুসরণ করিতেছিল। সুতরাং ওয়াইল্ড ইহাদের কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য পলায়ন করিবে, ইন্‌স্পেক্টর ইহা মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্বাস করিতে পারেন নাই।

ওয়াইল্ডকে ঐ ভাবে যাইতে দেখিয়া ব্লেক স্মিথকে বলিলেন, "আমি তোমাকে যে কথা বলিয়াছি, তাহা সম্পূর্ণ সত্য স্মিথ ! ওয়াইল্ডের যে দুরভিসন্ধি আছে—এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ওয়াইল্ড স্বেচ্ছাক্রমেই বুদ্ধদেব। ৩। করিয়াছে। সে কোনরূপ বিদ্রোহিতা না এখানকার মন্দিরের।. সার রড্‌নে তাহাকে পুলিশের মুক্তি বলিল—ঠাকুর-দেব ছন ; কিন্তু পুলিশ শেষ- এরা যে কি কথা কয় ! কথা পারিবে না—এ বিষয়ে বৌদি ? কি বলে, তার কিছু যদি

হাসিয়া শিপ্রা বলিল—তা

নিয়ে প্রাচীন-সভ্যতার স্কুল খুলতে হবে রড্‌নে কোন আমার নেই···আর সে-বিদ্যাও আমার । হয় কর্ত্তা !"

।ন্ত কিছুই বুঝিতে

মনে হয়—ওয়াইল্ড

কি উদ্দেশ্যে পুলিশের হস্তে আত্মসমর্পণ করিল, তাহা শীঘ্রই আমরা জানিতে পারিব। আমাদের এখানে আপাততঃ আর কোন কাজ নাই, সুতরাং আমরাও এই স্থান ত্যাগ করিতে পারি ; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে ইন্‌স্পেক্টরকে দুই-একটি কথা বলিতে চাই। সে যে পরে আমার উপর দোষারোপ করিবে, তাহাকে তাহার কোন সুযোগ দিব না মনে করিতেছি।"

সার রড্‌নে পুলিশ ইন্‌স্পেক্টরকে বিদায় দান করিলে ইন্‌স্পেক্টর ওয়াইল্ডকে সঙ্গে লইয়া সদলে তাঁহার গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। ইন্‌স্পেক্টরের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত ; সাফল্য-গর্ব্বে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ। ব্লেক আড়াল হইতে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহাকে দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর সোৎসাহে বলিলেন, "আসামী পাকড়াইয়াছি, মিঃ ব্লেক !"

ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ কি ? কিন্তু উহাকে শেষ পর্য্যন্ত আটক রাখিতে পারেন —সে বিষয়ে সতর্কতার ত্রুটি করিবেন না ইন্‌স্পেক্টর ! আমি এই কথাই আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিতে আসিয়াছি। ওয়াইল্ড ভয়ঙ্কর ফন্দিবাজ, ধূর্ত্ত লোক ; আপনি মুহূর্ত্তের জন্য অসতর্ক হইলেই—"

ইন্‌স্পেক্টর তাঁহার কথায় বাধা দিয়া সদম্ভে বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, আপনি উপযাচক হইয়া আমাকে আমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিবেন—ইহা আমি আপনার পক্ষে অনধিকার-চর্চ্চা বলিয়াই মনে করি। আমার কর্ত্তব্য কি, তাহা আমি ভালই জানি। আপনি কেন পুনঃ পুনঃ এই একই কথা বলিয়া আমাকে সতর্ক করিতেছেন ? আপনারা সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভ, এ জন্য কখন কখন আমাদের কিছু কিছু উপকার করিতে পারেন—ইহাও স্বীকার করি ; কিন্তু পুলিশ কি ভাবে কয়েদিগণকে কায়দায় রাখিবে—সে সম্বন্ধে আমাদিগকে উপদেশ দিবেন—সে শক্তি আপনাদের নাই মহাশয় !"

স্মিথ অস্ফুট স্বরে বলিল, "কলা খাও !"

ইন্‌স্পেক্টর স্মিথের কথা কানে না তুলিয়া ব্লেককে বলিলেন, "আরও একটা কাজের কথা এই যে, আমি হীরাগুলিও পাইয়াছি। আমি আসামীর পকেট খানাতল্লাস করিয়া ডাকাতির মাল তাহার পকেটেই পাইয়াছি।"

ব্লেক ঈষৎ শ্লেষের সহিত বলিলেন, "বলেন কি ? সত্যই সেগুলি পাইয়াছেন ? সেগুলি আপনার জন্যই কি সে পকেটে রাখিয়াছিল ?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "সত্য নয় ত, আপনাকে কি মিথ্যা কথা বলিতেছি ? আর পকেটে না রাখিয়া কোথায় রাখিবে ?"

ব্লেক বলিলেন, "আপনি জ্ঞাতসারে মিথ্যা বলিবেন না, তাহা জানি। কিন্তু আপনি বহুদর্শী ইন্‌স্পেক্টর হইলেও জহুরী নহেন ; ঝুটা হীরাকে আসল বলিয়া আপনার ভ্রম হইতেও পারে। আমি ঐ সকল হীরা পাইলে আপনার ন্যায় তাহা আসল বলিয়া বিশ্বাস করিতাম না। আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ওয়াইল্ড অসাধারণ চতুর দস্যু !"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "হইতে পারে ; কিন্তু তাহার এরূপ সামর্থ্য নাই যে, আমার চক্ষুতে ধূলা নিক্ষেপ করিবে। আমার দৃষ্টিশক্তি আপনার দৃষ্টিশক্তি অপেক্ষা ক্ষীণ, আপনার এরূপ ধারণা অমার্জ্জনীয় দম্ভ বলিয়াই আমার মনে হয়। আমার সাফল্যে অনেকের মনেই ঈর্ষ্যার সঞ্চার হইতে পারে। যাহা হউক, ভবিষ্যতে আপনি আমাকে উপদেশ দিতে না আসিলেই আমার ধন্যবাদভাজন হইবেন।"

এই কথা বলিয়া ইন্‌স্পেক্টর তাঁহার গন্তব্য-পথে গাড়ী চালাইলেন।

স্মিথ ব্লেককে বলিল, "কর্ত্তা, ওয়াইল্ডকে গ্রেপ্তার করিয়া বেচারার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে; এজন্য মানুষকে মানুষ বলিয়া গণ্য করিতেছে না ! কিন্তু উহাকে শীঘ্রই অনুতাপ করিতে হইবে। ইন্‌স্পেক্টর যখন জানিতে পারিবে, আসল হীরাগুলি আপনার হাতে আসিয়া পড়িয়াছে—তখন ও-বেচারা ক্ষেপিয়া না যায় !"

ব্লেক কিছু বিলম্ব করিয়াই গ্রে-প্যান্থারে আরোহণ করিলেন, এবং প্রায় আধ ঘণ্টা পরে স্মিথ সহ থানায় উপস্থিত হইলেন। ইন্‌স্পেক্টর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই থানায় প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।

স্মিথ গাড়ী হইতে নামিয়া একাকী থানায় প্রবেশ করিল। সে ইন্‌স্পেক্টরকে তাঁহার আফিস-কক্ষে উপবিষ্ট দেখিল ; কিন্তু তাঁহার সেই আনন্দ, উৎসাহ, স্ফূর্ত্তি কিছুই দেখিতে পাইল না ! তাঁহার মুখ ম্লান, চক্ষুতে ভয়ের চিহ্ন সুপরিস্ফুট ; তাঁহার ললাট হইতে ঘর্ম্মধারা ঝরিতেছিল। বায়ুপূর্ণ ফুটবলের 'ব্লাডারে' গঁজাল বিঁধিলে চুপ্‌সাইয়া তাহার যে অবস্থা হয়, ইন্‌স্পেক্টর সেইরূপ চুপ্‌সাইয়া গিয়াছিলেন।

কয়েক মিনিট পরে ব্লেকও গ্রে-প্যান্থার হইতে নামিয়া ইন্‌স্পেক্টরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ইন্‌স্পেক্টর, আশা করি, আপনার আসামীকে গারদে পুরিয়াছেন। পথে কোন রকম অসুবিধা হয় নাই ত ?"

ইন্‌স্পেক্টর মুখের অদ্ভুত ভঙ্গি করিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিলেন, "আসামী ভাগিয়াছে মিঃ ব্লেক ! পলায়ন করিয়াছে।"

ব্লেক বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "পলায়ন করিয়াছে ? এ আপনি বড়ই অসম্ভব কথা বলিতেছেন ! আপনি বলিয়াছিলেন, আপনার হাত হইতে কোনও আসামী পলায়ন করিতে পারে না ; এ বিষয়ে আপনি অসাধারণ সতর্ক !"

ইন্‌স্পেক্টর ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "এ রকম অদ্ভুত কাণ্ড আমি জীবনে কখনও দেখি নাই মহাশয় ! আসামীর হাতে হাতকড়ি ছিল, এবং গাড়ীর ভিতর দুই জন কনষ্টেবল তাহার দুই পাশে বসিয়া পাহারা দিতেছিল। মোটর-কার ঘণ্টায় তখন ত্রিশ মাইল বেগে ছুটিতেছিল ! এই ভাবে চলিতে চলিতে গাড়ী যখন একটা বেড়ার পাশে আসিয়া পড়িল, সেই সময় আসামী হঠাৎ উঠিয়া এমন একটা লাফ দিল যে, সে তৎক্ষণাৎ সেই বেড়া ডিঙ্গাইয়া অন্য পাশে পড়িয়া অদৃশ্য হইল ! তাহার হাতের হাতকড়ি দুই টুক্‌রা হইয়া ভাঙ্গিয়া গাড়ীর পা-দানের উপর পড়িয়া ছিল ! মানুষ নয়, মশায়, ওটা মানুষ নয় !"—ইন্‌স্পেক্টরের মস্তক আন্দোলিত হইতে লাগিল।

ইন্‌স্পেক্টর নীরব হইলে স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা কিন্তু পূর্ব্বেই আপনাকে সতর্ক করিয়াছিলেন ; আপনাকে বলিয়াছিলেন—ওয়াইল্ড ভীষণ ধূর্ত্ত, আর তাহার দেহেও অসাধারণ বল। কিন্তু আপনি তখন সে কথা শুনিয়া—"

স্মিথের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই এক জন কনষ্টেবল ইন্‌স্পেক্টরের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "মিঃ গোল্ডবার্গ আপনার সঙ্গে দেখা করিতে চাহেন। তিনি এখানেই আসিবেন কি ?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "তাঁহাকে এখানে রাখিয়া যাও।"

কিন্তু জুলিয়াস, গোল্ডবার্গকে আর ডাকিয়া আনিতে হইল না; তিনি হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া ইন্‌স্পেক্টরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার হীরাগুলি পাইয়াছেন ইন্‌স্পেক্টর?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "হাঁ পাওয়া গিয়াছে; সমস্তই!"

তিনি হীরাগুলি বাহির করিয়া ডেস্কের উপর রাখিলেন। সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই মিঃ গোল্ডবার্গ চীৎকার করিয়া বলিলেন, "এই আমার হীরা? এই ঝুটা—একরাশ তুচ্ছ কাচ আমার হীরা? কি নির্ব্বোধ! সেই ডাকাতটা কোথায়? তাহাকে গারদ হইতে এখানে শীঘ্র হাজির করুন। আমার আসল হীরার পরিবর্ত্তে এই সকল ঝুটা মাল কেন সে আপনাকে দিয়াছে—তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব। তাহার ঘাড় ধরিয়া আমার পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডের জহরত আদায় করিব। আমার সঙ্গে চালাকি?"

ইন্‌স্পেক্টর মিঃ গোল্ডবার্গের অভিযোগ শুনিয়া নির্ব্বাক্! সেই উজ্জ্বল দিবালোকে তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে তামসী রজনীর নিবিড় অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল! লোকটা বলে কি? ঝুটা হীরা! পলাতক আসামী ওয়াইল্ডের নিকট এইগুলিই ত পাওয়া গিয়াছে! সে কি আসল হীরা-জহরৎ লুকাইয়া রাখিয়া এই সব ঝুটা হীরা—কতকগুলি অসার কাচ আনিয়া দিয়াছে? অসম্ভব! এ কি রহস্য, ইন্‌স্পেক্টর তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

তাঁহাকে নীরব দেখিয়া গোল্ডবার্গ পুনর্ব্বার হুঙ্কার দিলেন, "কোথায় আপনাদের সেই আসামী—সেই ডাকাত? তাহাকে হাজির করুন আমার সম্মুখে।"

ইন্‌স্পেক্টর ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, "সে চলন্ত মোটর-কার হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পলায়ন করিয়াছে। ঐ দেখুন, তাহার হাতের হাতকড়ি—পাকাটির মত উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া-রাখিয়া চম্পটদান করিয়াছে!"

এ কথা শুনিয়া গোল্ডবার্গ আহত সিংহের মত গর্জ্জন করিয়া ইন্‌স্পেক্টরের সম্মুখে লাফাইয়া-পড়িতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সুপরিস্ফুট; পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড মূল্যের জহরতের শোক-সংবরণ করা সহজ নহে।

গোল্ডবার্গের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ব্লেক মুহূর্ত্তে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পথরোধ করিলেন; সংযত স্বরে বলিলেন, "মিঃ গোল্ডবার্গ, এত উত্তেজিত হইবেন না; আমার কথা শুনুন। আপনার হীরাগুলি অপহৃত হইবার পর সেগুলি উদ্ধারের ভার আপনি কি আমার হস্তে অর্পণ করেন নাই?"

গোল্ডবার্গ তীব্র-দৃষ্টিতে ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া কর্কশ স্বরে বলিলেন, "আপনি কি এই অসার কাচগুলি দেখাইয়া আমাকে বলিতে চাহেন—আপনি আমার হীরাগুলি উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন?"

ব্লেক বলিলেন, "এই ইন্‌স্পেক্টরটি কোথা হইতে কি উপায়ে কোন্ দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন, তাহা আমার জানা নাই; উনি আমার উপদেশেও কোন কাজ করেন নাই। আমার উপর আপনি যে ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই ভার আমি বহন করিতে সমর্থ হইয়াছি কি না—তাহা এই দ্রব্যগুলি পরীক্ষা করিলেই আপনি বুঝিতে পারিবেন। আশা করি, আপনার অপহৃত হীরাগুলি সমস্তই এবার মিলাইয়া পাইবেন।"

ব্লেক পকেট হইতে আসল হীরাগুলি বাহির করিয়া গোল্ডবার্গের হস্তে প্রদান করিলেন।

হীরাগুলি দেখিয়াই গোল্ডবার্গ আনন্দে উৎসাহে হর্ষধ্বনি করিলেন; তাহার পর ব্লেককে বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, আপনি সত্যই অসাধারণ ব্যক্তি; অদ্ভুত আপনার ক্ষমতা! আমি আমার হীরাগুলি সমস্তই পাইলাম; একখানিও হারায় নাই। আমি আপনার নিকট চির-কৃতজ্ঞ। আপনার পারিশ্রমিকের জন্য বিল পাঠাইবেন; যাহা আপনি সঙ্গত মনে করিবেন—আমি আপনাকে সেই টাকারই চেক পাঠাইয়া দিব।"

এবার ইন্‌স্পেক্টর কম্পিত-পদে উঠিয়া-দাঁড়াইয়া বিচলিত স্বরে বলিলেন, "ঐ হীরাগুলি কি পূর্ব্বেই আপনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন? কিন্তু এ কথা পূর্ব্বে আমাকে বলেন নাই কেন? আপনি ঐগুলি কোথায় সংগ্রহ করিলেন, কিরূপেই বা উহা আপনার হস্তগত হইল?"

ব্লেক বলিলেন, "মিঃ গোল্ডবার্গ তাঁহার হীরকগুলি উদ্ধার করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন; আমি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছি। কিন্তু এই

ব্যাপারে আমার গৌরব বর্দ্ধিত হইবে—তাহার সম্ভাবনা নাই; অথচ আপনার অক্ষমতার সংবাদ প্রকাশিত হইলে আপনার সুনামের হানি হইতে পারে ইন্‌স্পেক্টর! —মিঃ গোল্ডবার্গ, আমার অনুরোধ, আপনি স্মরণ রাখিবেন—আপনার হীরাগুলি আপনি এই ইন্‌স্পেক্টরটির নিকট পাইয়াছেন, ইহাই যেন সকলে জানিতে পারে। আর ঐ ঝুটা হীরাগুলির কথা বিস্মৃত হইলে কাহারও কোন ক্ষতি হইবে না।"

গোল্ডবার্গ বলিলেন, "আপনার অনুরোধের মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছি; আপনার এ অনুরোধ আমার স্মরণ থাকিবে। আপনার উদারতার তুলনা নাই!"

ইন্‌স্পেক্টর অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "আপনাকে ধন্যবাদ মিঃ ব্লেক! আপনি সত্যই মহৎ ব্যক্তি। মানব-সমাজে এরূপ মহত্ত্ব দুর্লভ!"

ওয়াইল্ড ইন্‌স্পেক্টরের কবল হইতে মুক্তিলাভ করায় ইন্‌স্পেক্টর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন; মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া তাঁহার ক্ষোভ দূর হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন—হীরকগুলি উদ্ধারের জন্য তিনি কর্ত্তৃপক্ষের প্রশংসা লাভ করিবেন, এবং ওয়াইল্ডকে পলায়ন করিতে দেওয়ার ত্রুটি চাপা পড়িবে।

কিন্তু ওয়াইল্ড তখন কোথায়? পুলিশ যে আর তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবে, তাহার সম্ভাবনা ছিল না। এই ভাবে পলায়ন তাহার পক্ষে নূতন নহে।

ইন্‌স্পেক্টরের নিকট বিদায় লইয়া ব্লেক পথে আসিলে স্মিথ তাঁহাকে বলিল, "কর্ত্তা, আমরা কি পুনর্ব্বার রোপার ওয়াইল্ডের সন্ধান পাইব?"

ব্লেক বলিলেন, "শীঘ্রই সে পুনর্ব্বার তাহার শক্তির পরিচয় দিবে—এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহার আরব্ধ কার্য্য শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না, স্মিথ!"

ব্লেকের এই ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা নহে, পাঠক শীঘ্রই তাহার পরিচয় পাইবেন। কারণ, কয়েক দিন পরেই ওয়াইল্ড সম্পূর্ণ ভিন্ন-মূর্ত্তিতে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিল। এবার তাহার লক্ষ্য—সার রডনে ড্রুমণ্ডের অন্যতম শত্রু অস্‌কার মেট্‌ল্যাণ্ড। মেট্‌ল্যাণ্ডই তাহার প্রথম শিকার।

—

একাদশ তরঙ্গ

প্রথম ধাক্কা!

কয়েক দিন পরের কথা।

রোপার ওয়াইল্ড একখানি বেগবান মোটর-সাইকেলের আরোহী। সে মোটর-সাইকেলে আরোহণ করিয়া নাইটব্রীজের যে পথে ধাবিত হইয়াছিল—সেই পথ লণ্ডনের দক্ষিণাংশে হাইড-পার্ক পর্য্যন্ত প্রসারিত।

রোপার ওয়াইল্ড কিছুকাল পূর্ব্বে লক্ষ্য করিয়াছিল, সেই পথের ধারে পুরাতন ও দুর্লভ পণ্য-বিক্রেতা প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী মিঃ অস্‌কার মেট্‌ল্যাণ্ডের যে দোকান ছিল, সেই দোকানের সম্মুখে পথিকগণের ভীড় ছিল না; এবং সেই পথে তখন যান-বাহনের সমাগমও অল্প ছিল।

ওয়াইল্ড তাহার মোটর-সাইকেল চালাইতে চালাইতে ভাবিল, "কাহাকেও সাইকেল চাপা দিয়া হত্যা না করি, সে-জন্য আমাকে যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।"

ওয়াইল্ড একখানি মোটর-বাসের ঘাড়ে পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেল, একখানি ট্যাক্সির সহিত ধাক্কা লাগিতে লাগিতে অতি কষ্টে আত্মরক্ষা করিল; এবং এরূপ বেগে চলিতে লাগিল যে, দর্শকগণের মনে হইল—সাইকেলের গতিরোধ করা তাহার অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে; তাহার মোটর-সাইকেল হঠাৎ বুঝি বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছে!

এক জন পথিক তাহার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "কি সর্ব্বনাশ! লোকটার মতলব কি? কাহাকেও চাপা দিবে না কি?"

আর এক জন পথিক বলিল, "লোকটা পাগল না কি! এত বেগে কি এ পথে কেহ গাড়ী চালায়?"

পথের অন্য ধারে দাঁড়াইয়া অনেক পথিক তাহার এই অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য করিতে লাগিল। সকলেরই ধারণা হইল—এই মোটর-সাইক্লিষ্ট কাণ্ডজ্ঞান-বর্জ্জিত হইয়া সাইকেল চালাইতেছে! তাহার সাইকেলের এঞ্জিন গর্জ্জন করিতেছিল, এবং সাইকেলখানা পথ ছাড়িয়া পাশের ফুটপাথের উপর উঠিয়া-পড়িয়াছিল। কিন্তু তখনও তাহার গতিবেগ প্রশমিত হয় নাই; সাইকেলখানা ফুটপাথের উপর দিয়াই প্রচণ্ড বেগে ছুটিতেছিল!

ওয়াইল্ড বিকট মুখভঙ্গি করিয়া মস্তক অবনত করিল। সে সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িল বটে, কিন্তু তখনও গাড়ীর বেগ হ্রাস করিল না। তাহার সম্মুখেই প্রকাণ্ড দোকান—বহু পণ্যদ্রব্য সুসজ্জিত!

কিন্তু সে কি করিতেছিল—তাহা তাহার অজ্ঞাত ছিল না; এবং তাহার সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য সে দিবাবসান কালে যখন পথে লোকজনের ভীড় কম—সেই সময় স্বেচ্ছায় এই দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সে কিছুকাল পূর্ব্বেও দুইবার মিঃ মেট্ল্যাণ্ডের দোকানের সম্মুখে আসিয়াছিল, কিন্তু দুইবারই সেখানে লোকের ভীড় দেখিয়া ঐ প্রকার প্রচণ্ড বেগে গাড়ী চালাইয়া সেখানে আসে নাই; এই তৃতীয়বার সে সঙ্কল্পসিদ্ধির সুযোগ লাভ করিয়াছিল। দোকানের সম্মুখস্থ খোলা যায়গায় এক জনও লোক না থাকায় ওয়াইল্ড দোকানের সম্মুখস্থ প্রকাণ্ড কাচের জানালা লক্ষ্য করিয়া সেইরূপ বেগে তাহাতে সাইকেলের ধাক্কা দিল।

মোটর-সাইকেলের সেই ধাক্কায় কাচের জানালার সুবৃহৎ কাচখান খন্-খন্ ঝন্-ঝন্ শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল! যেন রেলের এঞ্জিনের সংঘর্ষণে তাহা শতখণ্ডে চূর্ণ হইল।

সেই জানালার অন্তরালে অনেক বহুমূল্য, প্রাচীন কালের অতি দুর্লভ পণ্যরাজি থরে থরে সজ্জিত ছিল। ওয়াইল্ড তাহার মোটর-সাইকেলসহ সেই সকল দ্রব্যের মধ্যে আসিয়া তাহার গাড়ী হইতে এক পাশে ছিট্‌কাইয়া পড়িল। সাইকেলখানি অনেক দ্রব্য চূর্ণ করিয়া, চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া-দিয়া, এঞ্জিনের ভর-র ভর-র শব্দ করিতে করিতে রাশিকৃত জিনিসের উপর কাত হইয়া পড়িয়া গেল। মুহূর্ত্ত মধ্যেই সেই দোকানের ভিতর লণ্ডভণ্ড কাণ্ড ঘটিয়া গেল—যেন প্রচণ্ড ভূমিকম্পে এই বিভ্রাট ঘটিল!

এই ভীষণ ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া বহু লোক সেই ভাঙ্গা জানালার ভিতর দিয়া দোকান-ঘরে প্রবেশ করিল; তাহাদের চিৎকারে সমগ্র দোকান প্রতিধ্বনিত হইল। উত্তেজনা ও কোলাহল ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

সকলেই ওয়াইল্ডের দিকে আতঙ্ক-বিহ্বল নেত্রে চাহিয়া রহিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ অসাড়; চেতনা ছিল বলিয়া মনে হইল না।

কিন্তু সত্যই তাহার চেতনা বিলুপ্ত হয় নাই। সে বুঝিতে পারিয়াছিল, তাহার দেহের কোন কোন অংশে আঘাত লাগিয়াছিল; কিন্তু সেই আঘাত সাংঘাতিক নহে। তাহার বাম জানু কাচে কাটিয়া গিয়াছিল; কিন্তু সে বেদনা অনুভব করে নাই! তাহার দেহে আঘাত লাগিলে সে যন্ত্রণা অনুভব করিত না; তাহার দেহের এই বৈচিত্র্য অসাধারণ। কেহ তাহার দেহে ছুরিকাবিদ্ধ করিলে যদি রক্তপাত হইত, তাহা হইলেও তাহার মুখভাবের কোন পরিবর্ত্তন হইত না; সে সেই স্থানে দৃষ্টিপাত করিয়া একটু হাসিত মাত্র!

সে কিরূপ সঙ্কল্পের বশবর্ত্তী হইয়া এই কার্য্য করিল, তাহা অন্য লোকের বুঝিবার উপায় ছিল না; কাজেই ইহা উন্মাদের কাজ বলিয়া অনেকেরই ধারণা হইল। কিন্তু সত্যই ওয়াইল্ড খেয়ালের বশে এই কার্য্য করে নাই; দুই দিন পূর্ব্ব হইতেই সে এই মতলব স্থির করিয়াছিল। তাহার ধারণা ছিল, এই কার্য্যে তাহাকে আহত হইতে হইলেও তাহার কোন অসুবিধা হইবে না; কিন্তু অন্য কেহ আহত না হয়—সে দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল। মেট্ল্যাণ্ডকে চূর্ণ করিবার জন্যই সে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। সার রড্‌নে ড্রুমণ্ডকে সে ভবিষ্যতে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে না পারে—এই উদ্দেশ্যে ওয়াইল্ড যাহা করিবে স্থির করিয়াছিল—এই কার্য্য তাহার সূচনা মাত্র।

ওয়াইল্ড জানিত, মেট্ল্যাণ্ডের দোকানের জানালার কাচ ভাঙ্গিয়া সে দোকানে প্রবেশ করিবে; কিন্তু তাহার পর তাহার ভাগ্যে কি ঘটিবে—তাহা তাহার অজ্ঞাত ছিল। পরে যাহাই ঘটুক, সে জন্য সে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল। সে ইহাও জানিত যে, তাহার যতই অসুবিধা ও বিপদ ঘটুক, সে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে। বিপদের ভয়ে সে সঙ্কল্পচ্যুত হইত না। সে বুঝিতে পারিল, যে কার্য্য সে করিল, তাহা তাহার গুপ্ত-সঙ্কল্পের অনুকূল।

সে জানিত, এই চেষ্টায় তাহাকে আহত হইতে হইবে। সে যখন দোকানের ভিতর তাহার সাইকেল হইতে সবেগে ছিট্‌কাইয়া পড়িল, তখন তাহার ললাট হইতে শোণিতের স্রোত বহিতেছিল; তাহার ললাট ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল। সে মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিল। তাহার এই অসাড়তা তাহার ইচ্ছাকৃত, তাহা সত্য নহে, এবং এ জন্য

সে বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ হয় নাই; বরং সে বিলক্ষণ আনন্দ অনুভব করিতেছিল।

একটি যুবক দোকানের ভিতর দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিল—"মিঃ মেট্‌ল্যাণ্ড! মিঃ মেট্‌ল্যাণ্ড! আপনি কোথায়?"—যুবকটি গভীর উত্তেজনায় উভয় করতল পরস্পর ঘর্ষণ করিতে লাগিল।

এই যুবকটি মেট্‌ল্যাণ্ডের দোকানেরই কর্ম্মচারী। কিন্তু মেট্‌ল্যাণ্ডকে আহ্বান করিবার প্রয়োজন ছিল না; কারণ তাহার আহ্বানের পূর্ব্বেই মেট্‌ল্যাণ্ড সিঁড়ি দিয়া দোতলা হইতে নামিয়া আসিতেছিল। সে কিছু দূর নামিয়াই দোকানের জিনিস-পত্রের অবস্থা দেখিয়া, কাঠের সিঁড়ির রেলিং ধরিয়া স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছিল! লোকটি ক্ষীণকায় এবং কিঞ্চিৎ কুব্জ। তাহার মুখে দাড়ি-গোঁফের চিহ্নমাত্র ছিল না। তাহার নাসিকা দীর্ঘ, এবং চক্ষু অক্ষিকোটরে প্রবিষ্ট; তাহার ভ্রু-যুগলের কেশরাশি ঘন এবং এরূপ দীর্ঘ যে, তাহাতে চক্ষু ঢাকিয়া গিয়াছিল।

মেট্‌ল্যাণ্ড দোতলায় বিভিন্ন জিনিসপত্র গুছাইতে-ছিল, সেই সময় দোকানের ভিতর হুড়মুড় শব্দ শুনিয়াই সে চমকিয়া উঠিয়াছিল, এবং দোকানে কি বিভ্রাট ঘটিল—তাহা দেখিবার জন্য হাতের কাজ বন্ধ করিয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিতেছিল। দোকানের অবস্থা দেখিয়া তাহার চলৎ-শক্তি রহিত হইয়াছিল, এবং কিরূপ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা দেখিয়া সে যেন বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছিল। অতঃপর সে কি করিবে, তাহা স্থির করিতে পারিল না।

কিন্তু তাহার সেই কর্ম্মচারীটি তাহার শোচনীয় অবস্থা লক্ষ্য না করিয়া পুনর্ব্বার চিৎকার করিয়া বলিল, "মিঃ মেট্‌ল্যাণ্ড! দোকানে অতি ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। এক জন লোক মোটর-সাইকেলের ধাক্কায় আমাদের কাচের জানালা ভাঙ্গিয়া তাহার গাড়ীসহ দোকানের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, জিনিস-পত্রগুলি ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া ফেলিয়াছে; সাইকেল হইতে ছিট্‌কাইয়া-পড়িয়া যে নিজেও মরিয়াছে। উহার দেহে প্রাণ নাই; আপনি শীঘ্র নীচে আসুন কর্ত্তা!"

কর্ম্মচারীর এই চিৎকারে মেট্‌ল্যাণ্ডের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল; সে বিহ্বল স্বরে বলিল, "আমি সব দেখিয়াছি। আমার কি চক্ষু নাই যে, এই ভয়ঙ্কর কাণ্ড দেখিতে পাইব না?"—তাহার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ, কিন্তু আবেগচঞ্চল।

মেট্‌ল্যাণ্ড সিঁড়ির রেলিং ছাড়িয়া-দিয়া উভয় হস্তে বক্ষস্থল চাপিয়া ধরিল,—যেন তাহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইয়াছিল; আতঙ্কে, উৎকণ্ঠায় সে চতুর্দ্দিক ঝাপ্‌সা দেখিতেছিল; কিন্তু দুই-তিন মিনিটের মধ্যেই সে আত্ম-সংবরণ করিয়া নীচে নামিবার চেষ্টা করিল। সেই সময় দুই জন পুলিশ-প্রহরী তাহার দোকানের ভাঙ্গা জানালার সম্মুখে আসিয়া সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইল, এবং সেই স্থান দিয়া বাহিরের কোনও লোক দোকানে প্রবেশ করিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে সতর্ক ভাবে পাহারা দিতে লাগিল।

আর এক জন কন্‌ষ্টেবল দোকানের দ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। সেই সময় মেট্‌ল্যাণ্ড কম্পিত পদবিক্ষেপে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া আসিল, এবং আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল, "কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড! আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে; আমার সব জিনিস ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়াছে। কিন্তু এ রকম অসম্ভব কাণ্ড ঘটিল কিরূপে? হতভাগাটা ঐখানে পড়িয়া আছে; মরিয়াছে না কি? যদি মরিয়া থাকে, তাহাতে আমার দুঃখ নাই। পাগল, উন্মাদ ভিন্ন কেহ কি এমন কাণ্ড করে? হতভাগাটা নিজেও মরিল, আমাকেও মারিয়া গেল। হায়, হায়, কি হইল! ইচ্ছা হইতেছে, লাঠি মারিয়া উহার মাথা গুঁড়া করিয়া দিই, আমার কি সর্ব্বনাশ করিল!"

মেট্‌ল্যাণ্ড ওয়াইল্ডের অসাড় দেহের দিকে চাহিয়া যেন ক্ষেপিয়া উঠিল, তাহার আত্মসংযম বিলুপ্ত হইল; তাহার কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষু হইতে যেন অগ্নি-বৃষ্টি হইতে লাগিল। কন্‌ষ্টেবলটি একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু কোন কথাই বলিল না। সে চতু-র্দ্দিকের বিক্ষিপ্ত এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ জিনিস-পত্রগুলির ভিতর দিয়া পথ করিয়া-লইয়া ওয়াইল্ডের প্রসারিত দেহের নিকট উপস্থিত হইল।

কন্‌ষ্টেবলটিকে সেই ভাবে চলিতে দেখিয়া মেট্‌ল্যাণ্ড উত্তেজিত স্বরে বলিল, "খবরদার, হুঁসিয়ার হইয়া পা বাড়াইও; ঐ সকল পাত্র পদাঘাতে ভাঙ্গিও না নির্ব্বোধ! আমার কথা শুনিতে পাইয়াছ ইডিয়ট!"

মেট্‌ল্যাণ্ডের দুর্ব্বাক্যে কন্‌ষ্টেবল ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "চুপ করিয়া থাক বেআক্কেল বুড়ো! লোকটা মরিয়া না থাকিলেও এখনই বোধ হয় মারা যাইবে। উহার জীবন আগে, না, তোমার এই সব তৈজসপত্র আগে? আমি এখানে সাবধানে চলিব—সে অবসর আমার নাই।"

অতঃপর কন্‌ষ্টেবল দোকানের সেই কর্ম্মচারীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তুমি শীঘ্র এখানে আসিয়া লোকটার মাথাটা দুই হাতে তুলিয়া ধর।—আমার কথা শুনিতে পাইয়াছ?"

কন্‌ষ্টেবলের কথা শুনিয়া কর্ম্মচারী বলিল, "তোমার বচন শুনিয়া আমার কি আর দু'খানা হাত গজাইবে, হাঁদারাম ধাড়ী? তার চেয়ে বল, এই দুর্ঘটনা কিরূপে ঘটিল।"

কন্‌ষ্টেবল তাহার কথা শুনিয়া কর্কশ স্বরে বলিল, "দুর্ঘটনা কিরূপে ঘটিল, তাহা শুনিলেই কি তোমার আর দু'খানা হাত গজাইবে? ও-সব কথা এখন রাখিয়া দাও। এই আহত লোকটিকে শীঘ্র হাসপাতালে পাঠাইতে হইবে, নতুবা বেচারা বাঁচিবে না। কে এখানে ইহার পরিচর্য্যা করিবে? পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এখানে এ্যাম্বুলেন্স আনিয়া-ফেলিতে হইবে। কিন্তু ততক্ষণ লোকটার দেহে প্রাণ থাকিবে কি না সন্দেহ; উহার প্রাণ বাহির হইতে আর বেশী বিলম্ব নাই, তাহা কি বুঝিতে পারিতেছ না?"

কন্‌ষ্টেবল অতঃপর ওয়াইল্ডের মাথাটা দুই হাতে উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিল। ওয়াইল্ড প্রহরীর সদয় ব্যবহারে খুসী হইল।

কন্‌ষ্টেবল বলিল, "অবস্থা যত খারাপ বলিয়া মনে হইতেছিল—তত খারাপ নয় দেখিতেছি! এখনও নিশ্বাস বহিতেছে; বুকও ধুক্‌-ধুক্‌ করিতেছে। বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। ইহার দেহের ভিতরেই বেশী রকম জখম হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে; কিন্তু নিজের উপর নির্ভর করিবার শক্তি আর নাই দেখিতেছি!"

এই সময় অস্কার মেট্‌ল্যাণ্ড কন্‌ষ্টেবলটির পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। সে ওয়াইল্ডের মুখের দিকে না চাহিয়াই কন্‌ষ্টেবলকে উত্তেজিত স্বরে বলিল, "শীঘ্র উহাকে লইয়া যাও। আমার দোকান হইতে শীঘ্র বাহির কর এই আপদটাকে! দেখ দেখ, উহার রক্তে দামী রাগখানা ভিজিয়া সপ্‌-সপ্‌ করিতেছে! এত মূল্যবান্ রাগখানা একেবারে নষ্ট হইয়া গেল! কি বিপদ! আমার যে সর্ব্বনাশ হইল। কোথা হইতে আসিল এই হতচ্ছাড়া রাস্কেল? আর ঐ চেয়ারখানার অবস্থা কি রকম হইয়াছে দেখিয়াছ? শীঘ্র—এই মুহূর্ত্তেই উহাকে দোকান হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাও। আর এক মুহূর্ত্তও উহাকে এখানে রাখা চলিবে না বাবা পুলিশ!"

কন্‌ষ্টেবল মাথা নাড়িয়া বলিল, "এম্বুলেন্স আগে আসুক, তবে ত ইহাকে হাসপাতালে পাঠাইব। গাড়ী না আসিলে ইহাকে বাহিরে লইয়া গিয়া কোথায় ফেলিব? আপাততঃ তুমি খানিক জল আনাইয়া দাও, তাহাতে ইহার কিছু উপকার হইতে পারে।"

মেট্‌ল্যাণ্ড ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "কিন্তু আমার এই সকল মূল্যবান্ দ্রব্যসামগ্রী—"

কন্‌ষ্টেবল রুক্ষ স্বরে বলিল, "চুলোয় যাক্ তোমার দ্রব্যসামগ্রী! এ জীবন-মরণের ব্যাপার! মানুষের জীবন আগে, না তোমার এই সব জিনিস আগে? আর তোমার এত আক্ষেপ করিবার কোন কারণ আছে বলিয়াও ত মনে হয় না। দোকানের সকল জিনিসই ত তুমি 'বীমা' করিয়া রাখিয়াছ। কেমন, আমার এ কথা কি সত্য নয়?"

মেট্‌ল্যাণ্ড এ প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া দুই হাতে বুক চাপিয়া-ধরিয়া নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখ মলিন, সর্ব্বাঙ্গ থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল। তাহার ন্যায় ধনবান, দাম্ভিক লোক এই আঘাতেই ভাঙ্গিয়া পড়িল; কারণ, তাহার সন্দেহ হইয়াছিল—এই আঘাত আকস্মিক নহে, ইহা তাহার শোচনীয় অধঃপতনেরই সূচনা! সে আত্মসংবরণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না।

তাহার দোকানের বাহিরে বহু লোকের কোলাহল ও উত্তেজনার সীমা ছিল না। প্রতি মুহূর্ত্তেই জনতা বর্দ্ধিত হইতেছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেই ভীড় ঠেলিয়া একখানি এম্বুলেন্স মেট্‌ল্যাণ্ডের দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। হাসপাতালের কয়েক জন শুভ্র পরিচ্ছদ-ধারী পরিচারক একখানি দোলনা (ষ্ট্রেচার) লইয়া

এম্বুলেন্স হইতে নিঃশব্দে নামিয়া দোকানে প্রবেশ করিল। তাহারা কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া ওয়াইল্ডের অসাড় দেহ সেই দোলনায় তুলিয়া-লইয়া অতি সন্তর্পণে বাহিরে আসিল। তাহারা যেন মন্ত্রবলে পরিচালিত হইতেছিল!

ওয়াইল্ডকে সংজ্ঞাহীন মনে হইলেও তাহার চেতনা ছিল, এবং সে চক্ষু বুজিয়া কৌতুক উপভোগ করিতেছিল! সে এম্বুলেন্সের আরোহী হইয়া হাসপাতালে যাইতে যাইতে ভাবিল, "মেট্‌ল্যাণ্ডকে পরীক্ষা করিয়া ভালই করিয়াছি; বুঝিলাম, লোকটা অল্প আঘাতেই ভাঙ্গিয়া পড়ে। এখন তাহাকে কোন ফ্যাসাদে ফেলিয়া যদি বছর সাতের জন্য জেলে পুরিতে পারি, তাহা হইলে সে জেল হইতে ফিরিয়া আসিয়া সার রড্‌নেকে যে আর বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে পারিবে, এরূপ মনে হয় না। এবার সেই চেষ্টাই করিতে হইবে।"

এম্বুলেন্স সবেগে হাসপাতাল অভিমুখে ধাবিত হইল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

সভ্যতার প্রতি

আজিকে প্রভাতে জাগি হেরি মোর অন্তরের
শ্রবণ-কুহর
সহসা হয়েছে মুক্ত। পশিতেছে তায় দূর
আহ্বানের স্বর।
বনের পাখীর গান তটিনীর কলতান
গিরি-নির্ঝরিণী,
ছায়াচ্ছন্ন বনভূমি উদার প্রান্তর-ভরা
চাঁদিনী যামিনী,
সবাই ডাকিছে মোরে, 'আয় ফিরে আয় ওরে
আসিছে দুর্য্যোগ,
পথ চেয়ে আছে মাতা সুখের সংসার পাতা
কর উপভোগ।'
চঞ্চল হয়েছে মোর তৃষিত এ মূঢ়প্রাণ,
উঠেছে শিহরি,
যদি বা বিদায় চাই রাগ করোনাক তবে
সভ্যতা-সুন্দরি!
সত্য ভেবে দেখ মনে কি সুখের প্রলোভনে
কি দিলে আশ্বাস,
কি দিয়াছ এ জীবনে হোক তার বিধিমত
হিসাব-নিকাশ।
যা দিয়েছ শুল্ক তার নিয়েছ হাজার বার
পূরেনি কি আশা?
সহস্র বাঁধনে বাঁধা সকলি করেছে আধা
মিটেনি পিপাসা।
শ্রমখেদ বিনিময়ে যা লভেছি ভুঞ্জিবারে
কোথা অবসর?
তার কতটুকু খাঁটি? মুখে তুলিয়াছি বাটি
কেড়েছ সত্বর।
হৃদয়-শোণিত শুষি কভু বা করিতে খুশী
ফুটায়েছ ফুল।
আয়ু তার কতটুকু দু'দিনে হয়েছে ম্লান,
ভুল—সবি ভুল।
কি হরেছ বিনিময়ে ভেবে দেখ একবার,
স্বাস্থ্য, পরমায়ু।
জীবনের অবসর, বিরাম, বিশ্রাম, স্বস্তি,
মুক্ত প্রাণ-বায়ু।
সম্ভোগের শক্তি আর, হাসিবার অধিকার,
সারল্য-মাধুরী,
দেহবল, মনোবল, সকলি লইলে হরি
করিয়া চাতুরী।
ছুটাইয়া স্বর্ণমৃগ হেরিতেছ কি কৌতুক?
মৃগ-পিছে ধাই
হেম-মৃগ হ'য়ে হত হয় বটে অধিগত,
প্রেমেরে হারাই।
তব মরীচিকা পিছে ছুটে ছুটে হায় মিছে
তৃষ্ণা শুধু বাড়ে।
বনানীর শ্যামসুধা আমারে ডেকেছে, বাধা
দিও না আমারে।
সহসা প্রভাতে আজ মনে হয় সব ফাঁকি
পড়িয়াছে ধরা,
ফিরে যেতে চাই আমি, ফিরে পেতে চাই বিশ্ব
মধুপর্কে ভরা।
তোমার এ মর্ত্ত্য ছেড়ে সেই স্বর্গে যদি ফিরি
নিজ ভুল বুঝি,
বলিবার আছে কিছু? তুমি ত নিজেই জানো
তোমার যা পুঁজি।
তোমার এ বন্দিশালে সবল জীবন মম
ক্লিষ্ট শ্রমাতুর,
শেষের দিবসগুলি সন্ধ্যা-মালতীর বাসে
হউক মধুর।

শ্রীকালিদাস রায়।

মৃত্যুঞ্জয়ের কবি রবীন্দ্রনাথ

ঊষাকাশকে অরুণরাগে অনুরঞ্জিত করিয়া তরুণ সূর্য্য যখনই তাঁর ছটা-বিচ্ছুরিত উদয়রথে দেখা দেন, তখনই আমাদের জানা থাকে, যতই উগ্র কিরণের ধারায় এ ধরণীকে তিনি অভিষিক্ত করুন, সন্ধ্যাকালিমা ঘনীভূত হইবেই।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ও বিশিষ্ট পরিবারে যে দিন বাংলার তরুণ রবির উদয় হইয়াছিল, সে দিন এই কলিকাতা নগরীর উপর শুভ-গ্রহগণের যত বড় শুভদৃষ্টিই পড়িয়া থাকুক, সেই সঙ্গে অশুভ-গ্রহদের অমঙ্গল-দৃষ্টিও ছিল, তাহা অনিবার্য্য। চন্দ্রের উপর রাহুচ্ছায়ার মতই ইহা প্রতিজীবনের পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়ায়। রবীন্দ্রনাথের অসুস্থতার সংবাদ ইদানীং প্রায়ই পাওয়া যাইতেছিল। রোগের ধাক্কা ঝঞ্ঝার মতই তাঁহাকে আঘাত করিয়া যাইতেছিল, তিনি মহামহীরুহের মতই অটল ভাবে সেই আঘাতকে অবলীলাক্রমে সহিয়া লইয়া, দেশবাসীর বিস্ময়ানন্দের উদ্রেক করিতেছিলেন। তাঁর অনন্যদুর্লভ জীবনীশক্তির যে সতেজ উৎস তাঁহাকে এই অদম্য শক্তির আধার করিয়াছে, সেই তেজ, সেই শক্তিই তাঁর দেহকে এখনও কিছুকাল রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে—এই বিশ্বাস আমাদের দৃঢ় ছিল। 'তাই এবারও অস্ত্রোপচারের পর', একটু সুস্থ হইয়াছেন জানিয়াই একান্ত-ভাবেই নিশ্চিন্ত ছিলাম। এই সে দিন মাত্র তাঁর জয়ন্তী-উৎসবে শত কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিয়াছিল, "দাতা শতং জীবতু"। সহস্রের সেই মঙ্গল কামনা কি ব্যর্থ হইবে? রবীন্দ্রনাথ যে কত বড় দাতা, পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, সারা ভূমণ্ডলেই তাহা সুপ্রচারিত। রবীন্দ্রনাথের তিরোভাবে চিত্ত কে যেন বিস্ময়াভিভূত করিয়া ফেলিল,—মনে হইল, রবীন্দ্র-নাথের মত অত বড় একটা সৃষ্টি, তেমন বস্তুকেও ধ্বংস করিতে করাল কালের হস্ত কম্পিত হইল না তো?

"দারুণ রাহু, এমন চাঁদেরেও হানে?"—এক দিন তিনি নিজেই, 'কোশলরাজের' উদ্দেশ্যে, কোশলবাসীর মুখ দিয়া এই যে কথাটা বলাইয়াছিলেন, আজ তাঁর স্বদেশবাসীর চিত্তেও এই প্রশ্নটাই ধ্বনিয়া উঠিল! কিন্তু জরা-জন্ম-দুঃখহত, ক্ষুদ্রচিত্ত মানুষ আমরা, আমাদের দৃষ্টি ক্ষুদ্রসীমায় আবদ্ধ।—আমরা যাহাকে হারানো মনে করি, সে যে প্রকৃত হারানো নয়, এই নীতিই যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে প্রচার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ এ তত্ত্ব খুব ভালরূপে বুঝিয়াছিলেন, তাই এই মহাতত্ত্বকে অতি সহজ সত্যরূপে শ্লোকচ্ছন্দে গাঁথিয়া বিশ্ববাসীর মধ্যে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁর সাহিত্যের মধ্য হইতেই আমরা আমাদের বিস্ময়াপনোদনের এই অমীমাংসিত প্রশ্নের মীমাংসা খুঁজিয়া পাই। মৃত্যুকে আমরা যে চক্ষে দেখিয়া থাকি, দেখিয়া তাহার স্পর্শভয়ে ভীত হই, অস্পৃশ্যের মত তাহাকে সযত্নে পরিহার করিতে চাহিয়া শিহরিয়া সরিয়া যাই; জ্ঞানী তাহা করেন না। উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন,—

"দেবানামায়ুঃ ন দেবানাং নিধনমনিধনম্॥"

আবার বলিয়াছেন, "অবিদ্যয়ামৃত্যুংতীর্ত্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে" —অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যুলোক উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাদ্বারা অমৃতত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যা এবং অবিদ্যা এই উভয়কেই লাভ করিয়াছিলেন। তাঁর জাগতীক বিদ্যা বা অবিদ্যাসমূহ তাঁহাকে ইহলৌকিক সমস্ত সম্পদ পূর্ণরূপে প্রদান করিয়া, মৃত্যুলোকের অন্ধকার আবরণ তাঁহার দৃষ্টি হইতে অপসারিত করিয়াছিল। তাঁর নির্ভীক বীরচিত্তকে মৃত্যুভয়হীন করিয়াছিল, তাঁর বিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা বা আত্মজ্ঞানের পরিপূর্ণতা তাঁকে অমৃত-লোকের বার্ত্তা প্রদানে, সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্কর মৃত্যুকে তাঁর অন্তরঙ্গতম করিয়া তুলিয়াছিল। এই মৃত্যু-রহস্য না জানাতেই দুর্ব্বল-চিত্ত আমরা তাকে অপরাজেয় শত্রুভাবেই গ্রহণ করিয়া থাকি। তাই তার আবির্ভাবে আর্ত্ত হইয়া পড়ি—শোকে বিহ্বল হই। এই মৃত্যুরহস্য রবীন্দ্রনাথ আজ বলিয়া নয়, বহু—বহুকাল পূর্ব্বে, তাঁর তরুণ বয়সে, অতুল ভোগৈশ্বর্য্যের মধ্যবর্ত্তী হইয়াই উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন।

"মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান।"

* * * মৃত্যু অমৃত করে দান।

এই মিষ্ট-মধুর সখ্যভাব কবেকার? কতটুকু বয়সের রবীন্দ্রনাথ পিতামহের বয়সী বয়স্যের কণ্ঠ জড়াইয়া তাঁহার প্রতি এই সোহাগ-বাণী বর্ষণ করিতেছেন!

"মোর পরাণের সাথে খেলিব আজিকে
মরণখেলা রাত্রিবেলা।"

আবার বলেন,

"তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা,
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণসজ্জা,
ব্যাঘাত আসুক নব নব, আঘাত খেয়ে অচল রব,
বক্ষে আমার দুঃখে বাজে তোমার জয়ডঙ্ক,
দে'ব সকল শক্তি লব অভয় তব শঙ্খ।"

তার পর কালে কালে মহাকালের সঙ্গে কি অটুট মিতালী, কি দুর্ভেদ্য নিবিড় বন্ধনের অচ্ছেদ্য মৈত্রীতে তিনি নিজেকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁর সমস্ত সাহিত্য তার নির্ভুল সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

"ভেঙ্গেছো দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ম্ময়!
* * অরুণ বহ্নি জ্বালাও চিত্ত মাঝে,
মৃত্যুর হোক লয়,
তোমারি হউক জয়।"

মাঝে মাঝে মৃত্যুকে বিলয় করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে তিনি অন্তরের অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়কে লাভ করিতে হইলে যে, মৃত্যুর সহিত সন্ধি না করিলেই নয়; এই গূঢ়তত্ত্ব তিনি যথার্থরূপেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। প্রবলতম শক্রকে বাহুবলে জয় না করিয়া আর একপ্রকারে জয় করা যায়; এবং সেই জয়েই প্রকৃত বিজয় লব্ধ হয়। এই ছিল তাঁর আন্তরিক বিশ্বাস। তাই যে চোর তাঁকে প্রায় সর্ব্বহারা করিয়াছিল, তিনি তাহাকেই সখা-রূপে দৃঢ় বাহু-পাশে আবদ্ধ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নাই।

"নিঠুর হে, এই করেছ ভাল,
এম্‌নি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো,
আমার এ ধূপ না জ্বালালে, গন্ধ সেত' নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে, দেয় না সেত' আলো।"

নিঠুরের নিদারুণ নির্ম্মমতাকে এমন করিয়া কয় জনে তাঁর পরম পরীক্ষার দান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে?

"জানি তুমি মঙ্গলময়!
সুখে রাখো দুঃখে রাখো যে বিধান হয়,
কিছুতেই নাহি ভয়।"

এই ভক্তিই পরম বৈষ্ণবের পরাভক্তি। উপাস্যের প্রতি একনিষ্ঠা! তাঁকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করা। তাঁর কবিতায়, গানে এই আত্মনির্ভরতা ও একনিষ্ঠা পরিপূর্ণ রূপেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

"তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা
এ সমুদ্রে আর কভু হবো না ক পথহারা,"

এ'কি আজকের লেখা?

"আমায় দু'জনায় মিলে পথ দেখায় বলে
পদে পদে পথ ভুলি হে,
নানান্ কথার ছলে, নানান্ মুনি বলে,
সংশয়ে তাই দুলি হে।"

এ কোন্ ভক্ত বালকের মুখ দিয়া তরুণ কিশোরের আত্মপ্রকাশ!

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে অদ্বৈতবাদ এবং তাঁর কবিতা গানে দ্বৈতবাদ সমান ভাবেই প্রকটিত দেখা যায়। জীবন-দেবতাকে জীবনের স্বর্ণ সিংহাসনে বসাইয়া তাঁর পায়ে ভক্তি-পুষ্পের অজস্র পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করাতেই তিনি সমধিক আনন্দ লাভ করিয়াছেন। সোঽহমস্মির চাইতে দাসোঽহমস্মিই তাঁর জীবনবীণার তন্ত্রী হইতে সুস্পষ্টরূপে ধ্বনিত ও রণিত হইয়া উঠিয়াছে। "সাধন দুর্লভ, জীবন-বল্লভ"কে তিনি, "মর্ম্মের কথা অন্তর্ব্যথাও" শুনাতে কুণ্ঠিত হন। তাঁর "প্রেমমূর্ত্তি বক্ষে" ধারণ করাতেই তিনি কৃতকৃতার্থ। তাঁর "হৃদয়পুরাধিষ্ঠিত" "মহারাজের" "কোটী-সূর্য্য-শশি-লাঞ্ছিত চরণের" প্রতিই তাঁর সাধকচিত্তের দৃষ্টি দৃঢ় নিবদ্ধ। তাঁকে তিনি "তারায় তারায়" "বিশ্বের অণুতে অণুতে" সকল সময়েই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

"অগ্নিবীণায়" তাঁর অন্তরের যে সুর ধ্বনিয়া উঠে, সেই "আগুনের পরশমণির" ছোঁয়া পাইয়া, তাঁর সেই অগ্নিস্নাত প্রাণ "ধন্য হইয়া যায়, পূর্ণ হয়—" রবীন্দ্রনাথ আনন্দময়ের, শিবসুন্দরের আরাধনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি মৃত্যুঞ্জয়ের কবি, নির্ভয়ের তান্ত্রিক সাধক! ক্ষুদ্রতাকে তিনি সহ্য করিতে পারেন না। বন্ধ-মুক্ত জীবনের নির্ভীকতা তাঁর জীবনের প্রতি কাজে ও রচনার মধ্যে, সমানভাবেই বিদ্যমান দেখিতে পাই। তিনি ভীরু দুর্ব্বলকে মন্ত্রদান করেন, তার বাণী এই;—

"বাঁধন খেলার সাধন হবে,
মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ রবে।"

তিনি তাঁর অন্তর্দেবতাকে অনুনয় জানান ;

"বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না মানি যেন ভয়!"

আবার এ'ও বলেন;—

"নম্র শিরে সুখের দিনে, তোমার মুখ লইব চিনে,
দুঃখের রাতে নিখিল ধরা—যখন করে বঞ্চনা,
তোমারে যেন না করি সংশয়।"

রবীন্দ্রনাথকে চিনিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম তাঁর এই মৃত্যুজয়ী নির্ভীকতা, তাঁর শিব-শক্তির সম্মিলিত রূপসাধনা ; আবার সত্যমঙ্গল প্রেমময়ের সহিত তদাত্মতাকে চিনিয়া লইতে হইবে। নতুবা রবীন্দ্রনাথের খণ্ডিত রূপ দেখা হইবে, রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ রূপ দেখা সম্ভব হইবে না। অন্ধের হস্তি-দর্শনের অবস্থা ঘটিবে।

শক্তি তাঁকে স্বদেশের বিদেশের সমুদয় ক্ষুদ্রতা, অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে দৃপ্ত তেজে দাঁড়াইতে ভরসা দিয়াছিল। "তিনি তাহাকে শুধু বিদেশীর বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করেন নাই।" দেশবাসীকেও ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে সমর্থ হইয়াছেন,—

"শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মানভার
মানুষের নারায়ণে তবুও করোনি নমস্কার।"

বৈদেশিক অবিচারের বিরুদ্ধে সমান ক্ষোভে বলিয়া উঠিয়াছেন, "একদিন ইংরাজকে বিধাতার বিধানেই ভারতবর্ষকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। সেদিন কোন্ ভারতবর্ষকে সে তার পশ্চাতে ছাড়িয়া যাইবে? কী-পঙ্কিল আবর্জ্জনায় ভরা ভারতবর্ষ?···"

রাথবেনের মুখ দিয়া ইংরেজ জাতির যে তীব্র তিরস্কারপূর্ণ অপমানের কশাঘাত ভারতবাসীর পৃষ্ঠে আসিয়া পড়িল, তাহাতে মুমূর্ষু রবীন্দ্রনাথ সুপ্ত সিংহের মতই গর্জ্জিয়া উঠিয়াছিলেন। সেই সময়কার ঘটনায় এই শ্লোকটি স্পষ্ট হইয়া মনে জাগে ;—

"অপি নির্ব্বাণমায়াতি নানলো-যাতি শীততাম্।"

মানুষ চলিয়া যায় ; পশ্চাতে রাখিয়া যায়, তার কৃতকর্ম্মের ফলাফল। এমন কোন মানুষ জন্মায় না, যার জীবনের প্রতিকার্য্য এবং প্রত্যেক মতামত বিশাল মানবসমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিটির সহিতই মিলিতে পারে। শাস্ত্র বলিয়াছেন —

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজু কুটিলনানাপথজুষাং"

রুচি বিভিন্নতা, সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের অবিচ্ছিন্ন অংশ। কিন্তু তাঁহাকেই আমরা মহামনীষী বলি, বিশ্বমানব বলি, মহাপুরুষ বলি, যাঁর জীবনের উদ্দেশ্য এবং কার্য্যফলে জগতের অধিকাংশ মানুষ লাভবান হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের মধ্য দিয়া সুপ্রচুর দানে স্বদেশী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া, বিদেশে তার সম্মাননা এবং চাহিদা জন্মাইয়া দিয়াছেন। প্রাচীনকালের আদর্শে তাঁর বিশ্বভারতীতে সর্ব্ব পৃথিবীর অধিবাসীদের অধিকার স্বীকৃত। তাই তিনি, "স্বদেশেষু ধন্য, বিদেশেষু মান্য!" মৃত্যু মানুষের পরিচয় রাখে, তার ব্যক্তিত্ব দিয়া নহে, তার কৃত কর্ম্ম দিয়া। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশবাসীকে, মৃত্যুকে অমৃত করিবার যে মন্ত্র পূরাকালে বৈদিক ঋষি, উপনিষদের ঋষি দান করিয়া গিয়াছিলেন, সেই গুহা-নিহিত সর্বোচ্চ ভাবধারাকে সার্ব্বজনীন্ করিয়াছেন। দুষ্প্রবেশ্য জটিল তত্ত্বকে সকলের মধ্যে অতি সহজভাবে ছড়াইয়া দিয়া, সমস্ত দেশ ও জগতের পক্ষে যে মহৎ উপকার তিনি করিয়াছেন ; তাঁর স্বদেশবাসী যদি শুধু সেইটুকুই বুঝিতে পারে, পারিয়া অংশতঃ নিজ নিজ জীবনে গ্রহণ করে ; তবেই তাঁর স্মৃতি সুরক্ষিত হইবে। সেই মন্ত্র মৃত্যুঞ্জয়ের উপাসনামন্ত্র! মৃত্যু-জয়ের মন্ত্র। মানুষের পক্ষে এর চেয়ে কোন মন্ত্রই বড় নয়! তাঁর সাহিত্যের সমুদ্র মন্থন করিয়া হলাহল যাঁদের প্রাপ্য, তাঁরা পান ; আমরা যেন অমৃত-ভাণ্ডটিকেই গ্রহণ করিতে পারি। আর সেই অমৃতাস্বাদ লাভ করিয়া আমাদের অ-মর চিত্ত যেন তেমনই আগ্রহে বলিতে পারে ;—

"দূর হতে ভেবেছিনু মনে,
দুর্জ্জয় নির্দ্দয় তুমি কাঁপে পৃথ্বী তোমার শাসনে।
তুমি বিভীষিকা।
শেষবজ্র পাত? নামিল আঘাত,
এইমাত্র?—আরো কিছু নয়?
ভেঙে গেল ভয়!

"যখন উদ্যত ছিল তোমার অশনি
তোমারে আমার চেয়ে বড় বলে নিয়েছিনু গণি'
তোমার আঘাত সাথে নেমে এলে তুমি,
যেথা মোর আপনার ভূমি।
যত বড় হও, তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড় নও?
আমি মৃত্যু চেয়ে বড়!
এই শেষ কথা বলে যাব আমি চলে।"

এই শেষ কথাই বিশ্বভুবনের সব চেয়ে বড় কথা! তাই "সবার উপরে মানুষ সত্য।" সে মৃত্যুর দাস নয়, মৃত্যুঞ্জয়! তাকে লক্ষ্য করিয়াই উপনিষদের ঋষি একদা বলিয়াছিলেন ;—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা।
আযেধামাণি দিব্যানি তস্থুঃ।"

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

রবীন্দ্রনাথ

তুমি কি মরেছ কবি? বৃথা এই কোলাহল ;
জাগ্রতে এ বৃথা স্বপ্ন ;—চিন্তার বিকার ফল।
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ কি মোহ-মদিরাবশে
আত্মবিস্মৃতিতে হায়! প্রমত্তের মত ভাষে।

শারদ-প্রভাতে দেখি দাঁড়াইয়া আছ তুমি :
ভাসিছে তোমার রূপে পরিণত শস্যভূমি ;
নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে, তটিনীর প্রবহনে
বিলসিত ভাষা তব শুনিতেছি প্রতিখণে।

সুরভি দখিণ বায় তোমার নিশাস শুনি ;
চূতমুকুলের বাসে অঙ্গের সৌরভ মানি ;
মল্লিকার শুভ্রহাসে প্রেমের বারতা ভাসে ;
বজ্রের ঘর্ঘরে ঘোর তব ক্রোধ পরকাশে।

গর্ভতরে জননীর আত্মভোলা নিবেদন,
বাঁচিবার তপ্তসাধ, কর্ম্মে তীব্র উদ্দীপন,
মুক্তির জলদ বাণী, বন্ধের দারুণ ক্লেশ,—
সকলের মাঝে তুমি বহুরূপে বহুবেশ।

ব্যথিত ও উপেক্ষিতে তুমি তীব্র অনুভূতি ;
রঙ্গরসে পরিহাসে ধরেছ তরল মতি ;
মানবের মনোরাজ্যে নাহি হেন কোন ঠাঁই
যথায় তোমার রবি, মুক্ত কর পড়ে নাই।

লইয়া ঋষির দৃষ্টি দেখিয়াছ এ জগতে
যত জাতি মিলিতেছে মহাতীর্থ এ ভারতে।
দেখিলে সাধকরূপে মহাভাবে নির্ব্বিকার
জন্মমৃত্যু দ্বন্দ্ব নহে—মূল এক সবাকার।

নতশির হয়ে কভু প্রভুর চরণতলে
শুনাইলে কত গীতি ভাসি প্রেম-অশ্রুজলে।
কভু বা বিরহে তাঁর,—বুকেতে বেদনা-ভার—
পলকে সে যুগ গণি মাগিলে হে অভিসার।

সুপ্ত গৃহ, এ ভুবন ; সুপ্ত দেহ সুপ্ত মন,
জাগিয়া উঠিল প্রাণ ; হ'ল কার আগমন?
নূপুরের রুণুতালে বাজিল হৃদয়-তার ;
মধু হিয়া, মধু দৃষ্টি,—মধুসৃষ্টি কবিতার।

সত্যের আলোক ধরি মৃত্যুরে করিয়া জয়
দেখালে ভাবি যে মৃত্যু—মৃত্যু নহে, মৃত্যুভয় :—
দেখালে ভাবি যে কায়া, তাহা সে মৃত্যুর ছায়া,
তাহার স্বরূপে নয়, অভিনয়ে কাঁপে হিয়া।

ত্যজি এবে অবরোধ মরদেহ করি লয়,
অসীমে মিশায়ে দেছ আপনার পরিচয় ;—
আকাশে মিশেছে পাখী ভাঙ্গি তার কারাগার ;
দীপের দীপত্ব নাশে—আলো সনে একাকার।

কেবা তুমি? নাহি জানি। কে তুমি আপন জন
ব্যাপিয়া ঢাকিয়া মোরে রহিয়াছ অনুখণ?
তোমারে যে ভালবাসি এ নহে মুখের ভাষা ;
যত দিন যাবে র'বে—বাড়িবে এ ভালবাসা।

ভুলিবে বাঙ্গালী কভু ছিল এই অভিমান ;
অভিমানে ব'লে দিল সরল বাঙ্গালী প্রাণ।
প্রাণের ভূমিতে ধরা বাঙ্গালীরে দেছ কবি!
মনের মন্দিরে তার চির দীপ্ত র'বে রবি!

শ্রীললিতমোহন মিত্র।

অবশেষে 'জয়দুর্গা' হোটেলেই উঠিলাম।

সারা পথ ধরিয়া গৃহিণী অত্যন্ত মোলায়েম সুরে হোটেলে আশ্রয় গ্রহণের অনুকূলে যে সব যুক্তির অবতারণা করিতেছিলেন, বিচার করিয়া তাহার সারবত্তা যাচাই করিতে সাহস হয় নাই।

তবে হোটেলে উঠিয়া গৃহিণী খুশীই হইলেন, এবং তাহার বিধি-ব্যবস্থারও প্রশংসা করিলেন মুক্তকণ্ঠে। সুতরাং সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল, এই প্রবাদ-বাক্যই আমি সার জ্ঞান করিলাম।

মোটের উপর দিনগুলি ভালই কাটিতে লাগিল। মায়াপুরী কলিকাতা—ইহার সহস্র আকর্ষণের গুণে দিনের বিস্মৃতি বিশেষ অনুধাবন করা যায় না। বিশেষতঃ, এখানে আসিয়া গৃহিণী আমার সম্বন্ধে সহসা যেরূপ মনোযোগী হইয়া উঠিলেন, তাহাতে এত দিন তাঁহার সম্বন্ধে কতখানি অন্যায় ধারণা পোষণ করিয়া আসিয়াছি, তাহা স্মরণ হওয়ায় অনুতাপও অল্প হইল না। তাঁহার নিরন্ধ্র সতর্ক দৃষ্টির পাহারায় ও স্নেহের অনুশাসনে নিজের পৃথক্ অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইতে হইল।

সকালে গঙ্গাস্নান, তৎপর কালীঘাট বা দক্ষিণেশ্বর, মধ্যাহ্নে চিড়িয়াখানা কিম্বা মিউজিয়ম, মাঝে মাঝে কলেজ ষ্ট্রীট ও হগ্‌মার্কেটের কাপড়, জামা বা অলঙ্কারের দোকান,—অপরাহ্নে কলিকাতার কোন থিয়েটার কিম্বা সিনেমা, এমন ভাবে গৃহিণী দৈনিক কার্য্যের রুটীন করিয়া ফেলিলেন যে, ইহার প্রতিবাদে কোন কথা বলিবার সুযোগ রহিল না। নিজের শরীরের অবস্থা ভালো নয়, এই দৌড়ধাপে কাহিল হইয়া উঠিবারই কথা; কিন্তু গৃহিণীর উৎসাহ দেখিয়া মনে পুলকেরও অভাব হইল না। ভাবিলাম—হয় তো বা 'ওবেসিটি পিলে'র খরচটা এইবার কমিয়া যাইবে।

যাহা হউক, দিনগুলি সুখেই কাটিয়া যাইতেছিল, কিন্তু ভাগ্যদোষে গোল বাধিল আমাদের পায়রার খোপগুলি লইয়া। চার-তলার বারান্দার দিকের দুইটি ঘর আমরা ভাড়া লইয়াছিলাম। সে দিকে আরও যে চারটি ঘর ছিল, তাহার ভাড়াটেদের সহিত আমার আলাপ-পরিচয় করিবার প্রয়োজন না থাকিলেও গৃহিণী ইতিমধ্যেই সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইবার সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন।

সুতরাং বাহির হইতে ফিরিলে প্রায়ই দেখিতাম, কোন না কোন ঘরে তিনি একটি ক্ষুদ্র সভা আহ্বান করিয়া সভানেত্রীর আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন! তাঁহার এই আলাপ আপ্যায়ন যথানিয়মে ক্রমশঃ যে বিষম ঘনিষ্ঠতাতেই পরিণত হইল, এরূপ নহে; কাহারও সহিত তাঁহার পরিচয় না থাকিলেও ইহারই মধ্যে গৃহিণী কাহারো দিদি, কাহারো মাসী—এমনি নানা সম্বন্ধ পাতাইয়া আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় করিয়া তুলিলেন। ইহার ফলে থিয়েটার-বায়োস্কোপের পয়সাটা কিছু বাঁচিলেও এই নূতন আত্মীয়তার সম্বন্ধের মাধুর্য্যটুকু বজায় রাখিতে মাঝে মাঝে আমাকে 'দ্বারিকে'র দোকান হইতে বাগবাজারের স্পঞ্জ রসগোল্লার আড্ডায় হাজিরা দিতে হইল। কিন্তু প্রতিবাদ করা কঠিন; সুতরাং তাঁহার উপরেই বিচারভার অর্পণ করিয়া মনাগুণে নিজেই দগ্ধ হইতে লাগিলাম!

সে দিন শরীর বড় ভাল ছিল না, তবুও কোন কাজে বাহির হইতে হইয়াছিল। কিন্তু অসুস্থ শরীরের জন্য একটু পরেই বাসায় ফিরিতে হইল। বাসায় ফিরিয়া

ঘরে গৃহিণীর সাক্ষাৎ মিলিবে না, ইহা বুঝিয়াছিলাম কিন্তু বাসায় ফিরিয়া আমাকে হতবুদ্ধি হইতে হইল। এ পর্য্যন্ত গৃহিণী অপরের ঘরেই সভা করিতেন, তাঁহার নিজের ঘরে কোন দিন সভা বসে নাই। আজ বাসায় ফিরিয়া দেখিলাম, সেই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে! চার-তলার অধিবাসিনী মহিলাগুলির সকলেই আমার ঘরে সম্মিলিত হইয়াছেন। সভার কার্য্য বোধ হয় খুব জোরেই চলিতেছিল—কিন্তু আমার সাড়া পাইয়া সকলেই তাড়াতাড়ি স্ব স্ব কক্ষে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাদের রসালাপে অকস্মাৎ ব্যাঘাত ঘটাইলাম ভাবিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলাম। তাই গৃহিণীর অন্ধকারাচ্ছন্ন মুখের দিকে চাহিয়া কতকটা দুঃখিত ভাবেই কহিলাম,—বড্ড শরীরটা কেমন করছে তাই। কিন্তু তোমাদের···

গৃহিণী বাধা দিয়া কহিলেন, থাক্—কিন্তু তোমার অসুখটা কি হোলো শুনি?

বড়ই মুস্কিল আর কি! অসুখটা যে কি, তাহা আমি নিজেও যে ঠিক জানি, তা বলা যায় না; তবে শরীরটা সত্যই আজ ভাল বোধ হইতেছিল না। ডাক্তারী-শাস্ত্রে উহার হয় তো কোন নাম আছে; কিন্তু তাহা আমার সম্পূর্ণই অবিদিত। তাই বলিলাম, এমন কিছু নয়—গা'টা কেমন যেন করছে!

– তা' জানি!

শুধু ছোট্ট মন্তব্যটুকু! তাহার পর এমন নীরবতা যে, নিজেরই কেমন অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। অনুশোচনাও কম হইল না—না আসিলেই বরং ভাল ছিল।

—সুলতা!

গৃহিণী নির্ব্বাক্।

বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছিলাম; আড়-চোখে তাঁহার গম্ভীর মুখ দেখিয়া-লইয়া বলিলাম,—সত্যিই বলছি···

গৃহিণী গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—আমি কি মিথ্যে মনে করছি?

—তা নয়, তবুও—মনে হচ্ছে, তুমি রেগেচো।

রেগেচি—আমি কথা কইলেই রাগ মনে হয়। তা' যখন এতই···

বড়ই বেগতিক! এখনই যে একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধিবে, তাহাতে ভুল নাই। সুতরাং বিষয়টাকে লঘু করিবার জন্য মৃদু হাসিয়া পরিহাসের ভঙ্গীতে কহিলাম,—রামচন্দ্র! তুমি যে কি ভাবো, সুলু, ও শরীর-টরীর কিছু নয়···পথে গিয়ে তোমার কথা মনে পড়ায় কি রকম যেন হ'য়ে পড়লাম! সত্যি বলছি, কি মন্তরই জান সু! এক মিনিট না দেখলেই দশ দিক্ অন্ধকার! তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ···

গৃহিণী ফোঁস করিয়া উঠিলেন,—লজ্জা হচ্ছে না ছ্যাবলামি করতে?

ভয়ানক গম্ভীর হইয়া সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলাম,—আমাদের সবই ছ্যাবলামি সু! কি ভুলই করেছিলাম, তা' আর কি বলবো···এবার ভগবানকে বলবো, পরজন্মে যেন মেয়ে ক'রে পাঠান—সে-ও ভালো, তবুও এমন অবিশ্বাসী হওয়া ভালো নয়!

সুলতার ওষ্ঠপ্রান্ত বহিয়া হাসির বিজলী খেলিয়া গেল। তবুও বোধ করি, মান বাড়াইবার জন্য কতকটা ঝাঁঝের সঙ্গে তিনি কহিলেন,—কেবল কথার ধাপ্পা! কিন্তু অসুখ···

—আবার! অসুখ করলে তো বলবো? সত্যি বলছি··

থাক্!—বলিয়া গৃহিণী মানভরে উঠিয়া বাহিরে চলিলেন। কিন্তু কি ভাবিয়া দরজার পাশ হইতে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—মনের দুঃখে আবার বাইরে ছুটো না যেন, এখুনি আসছি!

মনে হইল, এ-যাত্রা বাঁচা গেল।

অল্পকাল পরেই তিনি ফিরিলেন। কিন্তু এবার এক-খানা রেকাবি ভরিয়া মেঠাই-মণ্ডা সহ।

বলিলাম,—এ আবার কি?

—অলকা দিদি দিয়েছেন যে!—অলকা ২৫ নং 'রুমে'র অধিবাসিনী। এই তরুণী তাঁর দিদি। বয়স ক্রমে কমিতেছে!

কিন্তু কেন, কি বৃত্তান্ত—এ সব প্রশ্ন যখন নিরর্থক, তখন ভোজনে প্রবৃত্ত হওয়াই সঙ্গত। তাহাতে কিছুমাত্র ত্রুটি হইল না।

গৃহিণী হাসিয়া কহিলেন,—আশ্চর্য্য! মেঠাই-মণ্ডা পেয়ে আমাকে ভুলেই গেলে?

মুখের তখন অবসর ছিল না,—কথা বলিবার উপায় নাই। তবুও অদ্ভুত একটা শব্দের মতো মুখ দিয়া বাহির হইল,—সে গুণের কথা তো তুমি জানো!

গৃহিণী মধুর হাসিয়া কহিলেন,—থাক্, থাক্, ওটা আগে শেষ কর, নৈলে গলায় বাধবে।

—হুঁ!

মিনিট দুই-তিন পরে গৃহিণী সহসা গা ঘেঁসিয়া বসিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিলেন,—তেইশ নম্বর রুমের ব্যাপারটা ভেবেছো?

এ সব ব্যাপার ভাবা কোন দিন আমার অভ্যাস নাই; তা ছাড়া, বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা একেবারেই অসম্ভব। তাই শুধু মাথা নাড়িয়া বলিলাম,—না।

গৃহিণী গভীর বিস্ময়ে দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিলেন,—বলো কি! এতো বড় একটা ব্যাপার!

তাঁহার বলার ধরণে নিজের কৌতূহলও যেন সহসা দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। উদগ্র আগ্রহে কহিলাম,—ব্যাপার? কি ব্যাপার বলই না শুনি!

সুলতা গালে হাত দিয়া মাথা ঝাঁকাইয়া অধিকতর বিস্ময়ে যেন কথা খুঁজিয়া পাইলেন না; কয়েক মুহূর্ত্ত কিছুই বলিতে পারিলেন না। তাহার পর শুধু বলিলেন,—একেই বলে পুরুষ মানুষ!

মেঠাইগুলোর অধিকাংই তখন গলাধঃকরণ হইয়াছে; হাসিয়া কহিলাম,—এ অতি সহজ সরল সত্যকথা সুলতা! কিন্তু তোমার ব্যাপারটা কি বলো।

সুলতা তবুও ভণিতা ছাড়িলেন না। তেমনি বিস্ময়-ভরা সুরে কহিলেন,—তাই তো বলি, পুরুষগুলো সত্যই অন্ধ! এতো-বড়ো একটা ব্যাপার···

প্রশ্ন করিলে সুবিধা হইবে না বুঝিয়া রেকাবের অবশিষ্ট মেঠাই কয়টার প্রতি আবার মনঃসংযোগ করিলাম। ইহার ফলও ফলিল। গৃহিণী খানিক থামিয়া আপন কথার বেগে আবার বলিয়া চলিলেন,—আচ্ছা, সে যেন হোলো—এসে পর্য্যন্ত তেইশ নম্বর ঘরটা কোন দিন লক্ষ্য করেছো?

—অনেক বার।

—কিছু চোখে পড়েছে?

—কৈ, মনে পড়ে না।

গৃহিণী মাথা দোলাইয়া সগর্ব্বে কহিলেন,—নইলে আর পুরুষ কিসে! এসে পর্য্যন্ত ঘরটা খোলা দেখেছো কোন দিন?

—মনে পড়ে না।

—ও-ঘরে ভাড়াটে আছে জানো?

—পরিচয়-তালিকায় দেখেছি বটে।

—ছাখো না ছাখো—এ অতি সত্যি কথা! আর শুধু থাকা নয়, ও-ঘরে যে পরমাসুন্দরী মেয়েটি আছে, তার মতো রূপসী তুমি ভূ-ভারতে আর কখনো দেখেছো কি না সন্দেহ!

মৃদু হাসিয়া কহিলাম,—তা হ'লে না দেখাই ভালো সু,—শেষটায়···

গৃহিণীও ঠকিবার পাত্রী নহেন; মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিলেন,—মজে যাবে? তা তুমি যেতে পারো। সে ভয় যে না করি, এমন নয়—কিন্তু মেয়েটার কথাই শোনো। এসে পর্য্যন্ত বাইরে আসে শুধু স্নানের সময়—আর একবারো নয়। কি যে ব্যাপার···

রহস্যের গন্ধ পাইয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিলাম। নিরতিশয় কৌতূহলভরা স্বরে কহিলাম,—বলো কি! কিন্তু ও কি একাই থাকে, না আর কেউ আছে?

—একটি পুরুষও থাকে—বোধ করি, ওর স্বামী···কি আর কেউ! কে জানে? ঠিক দশটায় সে বেরিয়ে যায়—সাতটায় ফেরে।

—ফিরেই বুঝি দরজা বন্ধ?

—তা আবার বল্‌তে?

—কিছু বুঝতে পেরেছো?

—কিছু না। অথচ······

—ভীষণ আশ্চর্য্য!

—আশ্চর্য্য, বলো কি! 'অলকাদি' তো এরই মধ্যে সন্দেহ কচ্ছে···হঠাৎ গৃহিণী চাপিয়া গেলেন।

তাঁহার অকস্মাৎ ভাব পরিবর্ত্তনে আরও বিস্মিত হইলাম। তাঁহাকে সোহাগভরে কাছে টানিয়া আদর করিয়া কহিলাম,—কি সন্দেহ কচ্ছে, বলোই না।

গৃহিণী আমার দিকে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে ক্ষণকাল চাহিয়া-থাকিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—না থাক, সে আর এক দিন বলবো।—তিনি আমাকে আর কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়াই দ্রুতপদে সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

তাঁহার এইরূপ রহস্য-হাসিভরা মুখে দ্রুতবেগে পলায়ন,

আর তেইশ নম্বর ঘরের সেই অদেখা পরমাসুন্দরী তরুণীর অজ্ঞাত রহস্য আমার মাথার ভিতর উগ্র নেশার মতো উত্তেজনার সৃষ্টি করিল।

কিন্তু গৃহিণীর সেই 'আর একদিন' আর আসিল না! যে-দিন বলি, প্রত্যুত্তরে তিনি হাসিয়া রহস্যভরা কণ্ঠে আর একদিনের কথাই বলেন; কিন্তু সেই আর একদিন আর কখন আসিবে কি না, কে জানে!

তবুও সেই তেইশ নম্বর ঘরের অদেখা সুন্দরী তরুণী সত্যই আমাকে যেন যাদু করিল! ভিতরের নিগূঢ় রহস্যের স্বরূপ বুঝিবার আগ্রহ তত বেশী না হোক, বেশী হইল তাহাকে একবার দেখিবার লোভ! এজন্য আমার বাহিরে যাইবার আগ্রহ একবারেই কমিয়া গেল।

কিন্তু গৃহিণীকে ফাঁকি দিতে পারিলাম না; তিনি মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিলেন,—কি, তেইশ নম্বরের ফাঁদে পড়লে না কি?

উত্তর দিতে গিয়া মুখের অবস্থা কেমন হইয়াছিল, এবং কি উত্তরই বা দিয়াছিলাম, তাহা এত দিন পরে ঠিক বলিতে পারিব না; কিন্তু তাঁহার সাবধান-বাণীটা আজিও বেশ মনে আছে। তিনি হাসিয়া সকৌতুকে সে-দিন বলিয়াছিলেন,—দেখো, সাধ করে যেন আগুনে ঝাঁপ দিও না!

কিন্তু সতর্ক করিলে কি হইবে?—অদৃষ্ট, বিধিলিপি, নিয়তি—এ সব খণ্ডন করিবার শক্তি কোথায়?

দিন কয়েক পরের কথা।

গৃহিণীরা একটু স্বাধীনতার আস্বাদ উপভোগ করিতে গিয়াছেন। পরিষ্কার করিয়া বলি,—উপরের সব ক'টি মহিলার কেহই আজ কোন বডিগার্ড লইবার প্রয়োজন মনে করেন নাই। পুরুষগুলিকে অকারণ বোঝা মনে করিয়া আজ তাঁহারা নিজেরাই সিনেমায় না কোথায় উধাও হইয়াছেন।

কেহ এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন কি না জানি না; কিন্তু স্বাধীনতার যুগে—সাম্য ও মৈত্রীর যুগে—নারী-প্রগতির যুগে, এ সব চিন্তা একান্তই অনাবশ্যক মনে করিয়া আমি বাক্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হই নাই।

সুতরাং চার তলাটা সে দিন খালি পড়িয়াছিল। মেয়ে-পুরুষ সকলেই প্রত্যেক কামরা-দ্বারে তালা লাগাইয়া বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন;—কিন্তু আমি তাহা করিতে পারি নাই। ঠিক এমনি অবস্থায় নীচের তলায় সে-দিন তালা ভাঙ্গিয়া চুরি হইয়াছিল,—তাই আমাকে একটু সতর্ক থাকিতে হইয়াছে।

তা'ছাড়া···আমার অপর উদ্দেশ্যটাও তেমন জটিল নয়। যদি কিছু···

ঘরে একাকী পড়িয়া থাকিতে থাকিতে চোখ মুদিয়া আসিয়াছে; হঠাৎ কি একটা শব্দ শুনিয়া চোখ মেলিয়া চাহিয়াই গভীর বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম।···এক ঝলক বিদ্যুতের আভায় যেন সারা ঘরটি উদ্ভাসিত হইল।

কয়েক মিনিট মুখে কোন কথা ফুটিল না। স্বপ্নের মতো আলস্য-জড়িত রঙীন মোহ যেন আমার সর্ব্বেন্দ্রিয়কে অবশ—আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। কিছু কাল পরে যেন স্বপ্নভঙ্গে মোহাচ্ছন্ন অস্ফুট কণ্ঠে কহিলাম—আপনি!

—হাঁ, আপনারই প্রতিবেশী!—হাসির ফুলঝুরির মতো তাহার সুমিষ্ট কথাগুলি যেন বাতাসে ঝরিয়া পড়িল। বায়ু-হিল্লোলের সাথে তাহার সর্ব্ব অঙ্গের সৌরভ সারা ঘরখানিকে পলকে মাতাইয়া তুলিল।

অপরিসীম বিস্ময়ের সহিত কণ্ঠ হইতে নিঃসারিত হইল—প্রতিবেশী?

সবিনয় অভিবাদনের সঙ্গে সে মৃদুহাস্যে কহিল,—তেইশ নম্বর কামরায় থাকি কি না।

পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া পুলকের একটা বিদ্যুৎ-হিল্লোল বহিয়া গেল। এ স্বপ্ন, না সত্য?

একটা অনির্ব্বচনীয় উত্তেজনার আবেগে হঠাৎ উঠিয়া বসিলাম। শিষ্টাচারের কথা মনে পড়িল না। সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলীর ক্ষণিক উত্তেজনায় নির্লজ্জের মতো নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

তাহার সমস্ত অঙ্গ বহিয়া যেন রহিয়া রহিয়া কি একটা রহস্যের বিজলি-প্রভা বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল।

এ সেই!

এ সেই—যাহাকে লইয়া এত জল্পনা-কল্পনা! যাহারা ইহাকে দেখে নাই—তাহাদের কল্পনার রঙীন আঙিনায় ইহার যে ছায়া পড়িয়াছিল, তা হয় তো সত্যই কল্পনা।

কিন্তু কাহার সহিত ইহার তুলনা দিব? প্রস্ফুটিত শতদল? কিন্তু সে তো ফুল—তাহা সুন্দর; তাহার রূপ, রস, গন্ধ আছে, লাবণ্যভরা সজীবতাও আছে,—কিন্তু জীবন বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা নাই; এমন প্রাণমাতানো হাসি নাই, এমন ভাসা ভাসা চোখের মাদকতা-পূর্ণ দৃষ্টি নাই! এ রূপের তুলনা মিলাইতে পারি—সে শক্তি আমার নাই! ইহার তুলনা শুধু এই ললনা—স্বয়ং!

নির্ব্বাক্ হইয়া নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিলাম।

রূপসী তরুণী একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া অনুমতির জন্য প্রতীক্ষা না করিয়াই বসিয়া পড়িল; এবং রহস্য-ভরা হাসির তরঙ্গ তুলিয়া সোৎসাহে কহিল,—একটা গল্প শুনবেন?

গল্প! অপরিসীম বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বোধ করি বাক্‌শক্তি হারাইয়া ফেলিলাম।

সে সেই ভাবেই হাসিতে লাগিল। শরৎ-পূর্ণিমার শুভ্র মেঘমণ্ডিত চাঁদের হাসির মতো সে-হাসিতে আছে শুধু গভীর উন্মাদনা—মানুষকে মুহূর্ত্তে যা পাগল করিয়া তোলে! তেমনি হাসিতে ঘর আলো করিয়া আবার বলিল,—হ্যাঁ, গল্প! শুনবেন? শুনুন!···এক যে ছিলো বেঙ্গমা, আর তার যে ছিলো বেঙ্গমী···কিন্তু এ গল্প তো আপনার ভাল লাগবে না!

ইহার চেয়ে রোমাঞ্চকর আর কিছু উপন্যাসে পাইয়াছেন কি? তবুও এ আমার বাস্তব জীবনের সত্য ঘটনা। এক অচেনা তরুণী অনাহূত ভাবে আসিয়া তাহার রূপ-যৌবনের অফুরন্ত সম্ভারে পরিপূর্ণ ডালাখানি নিরালায় আমার মুগ্ধ চোখের সামনে খুলিয়া ধরিয়া বলিতেছে,—গল্প শুনবেন—গল্প!

কিন্তু ইহার অপেক্ষাও অধিক বিস্ময়কর আরও কিছু পরমুহূর্ত্তেই যখন আমার সামনে আসিয়া পড়িল, তখন অদেখা ভগবানের মনের কথা ভাবিয়া আমারও অন্তর বোধ করি চঞ্চল হইয়া উঠিল।

কিন্তু সেই হাসির ঝরণা সহসা বন্ধ হইয়া গেল, এবং দু'টি পদ্ম-আঁখি বহিয়া মুক্তাধারার মতো ঝরিয়া পড়িতে লাগিল অজস্র অশ্রু-কণা! যে মুখে মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বে চাঁদিমার মতো মন-মাতানো শুভ্র হাসি অজস্র ধারায় ফুটিয়া ছিল, তাহা যেন একখণ্ড সজল জলদজালে আবৃত হইয়া কোথায় লুপ্ত হইয়া গেল!

এ কি স্বপ্ন—না দৃষ্টি-বিভ্রম?—অথবা আরও কিছু!

সেই সজল কণ্ঠ সহসা অব্যক্ত আর্ত্তনাদে যেন ফাটিয়া পড়িল,—আমাকে বাঁচান, সজনী বাবু!

গল্প-উপন্যাস পড়িয়াছি, থিয়েটার-বায়োস্কোপও দেখিয়াছি—কিন্তু চোখের সামনে এমন রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটিতে পারে, তাহা কখন কল্পনা করিতে পারি নাই! রূপ, যৌবন, হাসি, অশ্রু—নর-শিকারের যে কয়টি অমোঘ অস্ত্র আছে, সব কয়টির প্রয়োগে আমারই মোহ-বিমুগ্ধ চক্ষুর সম্মুখে ছায়াবাজীর মতো রোমাঞ্চকর, অদৃষ্টপূর্ব্ব নাটকের হয় তো বা একটি অঙ্কের মনোরম অভিনয় হইয়া গেল। তখন জ্ঞান ছিল, কি ছিল না, এ কথা আজ আর ঠিক স্মরণ নাই,—তবে এটুকু মনে পড়ে, চেতনা একেবারে লুপ্ত হয় নাই। এমনি করিয়াই কলিকাতার পথে-ঘাটে পুরুষ-মৃগয়া চলে, এই সহজ-সত্য জ্ঞানটুকু যেন এই অভাবনীয় বিপর্য্যয়ের মধ্যেও তীরের মতো তীক্ষ্ণ সজাগ হইয়া আমাকে মুহুর্ম্মুহু সতর্ক করিয়া দিতেছিল।

তাই পরক্ষণে অতি সুস্পষ্ট কণ্ঠে কহিলাম,—আপনার বিপদের কথাও আমার জানা নেই—আমার দ্বারা আপনার কতটুকুই বা সুবিধে হবে, তাও আমার অজ্ঞাত; তবুও আপনি এরই মধ্যে কি করে আমার নাম থেকে আরম্ভ করে মনে মনে স্থিরনিশ্চয় হ'য়ে এসেছেন যে, আমাকে দিয়েই আপনার বিপদ কেটে যাবে?—এর চেয়েও ধাঁধার ব্যাপার আর কিছু আছে কি?

রূপসী তরুণী অদ্ভুত তৎপরতার সহিত চোখের জল মুছিয়া ফেলিল। তাহার অশ্রুমুক্ত বিষাদ-ম্লান নলিন নেত্রের নীরব ভাষা গভীর বেদনাপ্লুত! সত্যই সে ছলনাময়ী কি না জানি না, তবুও পরক্ষণেই তাহার সুগঠিত নাসিকা হইতে যে দীর্ঘশ্বাস নিঃসারিত হইল, তাহা আমার ত্বগিন্দ্রিয় বিদীর্ণ করিয়া মর্ম্মস্থলে বিদ্ধ হইল। হয় তো ভুল করিয়াছি—হয় তো অবিশ্বাস করিতে গিয়া তাহার একান্ত বেদনার স্থানটিতেই নিষ্ঠুরের মত আঘাত হানিয়াছি! মুহূর্ত্তে লজ্জায়, বেদনায়, অনুতাপে বিচলিত হইয়া উঠিলাম।

কিন্তু তরুণী অতি সহজ ভাবেই বলিল,—সত্যিই এ

অতি অদ্ভুত, সজনী বাবু! আপনার নাম জানবার তো কোন অসুবিধে নেই—কার্ডবোর্ডেই তা দেখা গেছে। হয় তো তা' থেকে আমাদেরও কিছু পরিচয় আপনি পেয়ে থাকবেন। কিন্তু সে কথা থাক। বিপদের কথা যা বললেম, তা সত্য। আর যখন সেটা এসে পড়লো, তখন বাসায় আপনি ছাড়া আর কেউ নেই! উদ্ধার পাবো কি না জানিনে—তবু আপনি ছাড়া এ সময় আমায় ভরসা দিতে পারে, এমন লোক আর কেউ নেই।

এ সকল কথার পর আর তাহাকে অবিশ্বাস করিতে পারি নাই—তাহার ভয়ব্যাকুল কাতর মুখের দিকে চাহিয়া মুহূর্ত্তে চঞ্চল হইয়া উঠিলাম। মিথ্যা সন্দেহের জন্য মনে অনুতাপের সঞ্চার হইল। পরক্ষণেই সহানুভূতিভরে কহিলাম,—আমায় মাফ করবেন, কিন্তু আপনার কিরূপ বিপদের কথা বলছিলেন?

তরুণী আর একটি ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বিষাদাপ্লুত কণ্ঠে কহিল,—সে অত্যন্ত অদ্ভুত কাহিনী! আমার সঙ্গে আছেন আমার স্বামী। এককালে তিনি প্রফেসর ছিলেন; কিন্তু এখন প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে এমন উন্মত্ত হয়েছেন যে, প্রফেসরিতে আর তাঁর পোষাল না। সুতরাং দেশের বন-জঙ্গল থেকে আরম্ভ ক'রে তিব্বতের পর্ব্বতচূড়ার শত শত মঠে তাঁর গবেষণা চল্‌তে লাগলো। আনন্দে, উৎসাহে তিনি আহার-নিদ্রা পর্য্যন্ত ভুলে যেতেন! এই সব গবেষণা নিয়ে তিনি তিব্বতের এক মঠে তিনটি বৎসর একাদিক্রমে কাটিয়ে দিয়েছেন। সেই সময় তিনি সেখানে ভগবান্ বুদ্ধের একটি রজত-মূর্ত্তি দেখে মুগ্ধ হন। অতীত ভারতের ভাস্কর্য্যের এমন নিখুঁত নিদর্শন অতি অল্পই দেখা যায়। বুদ্ধ-মূর্ত্তিটি ভারতে আনবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। এজন্য মঠ থেকে তাঁকে বিতাড়িত হ'তে হয়; কিন্তু শুধু-হাতে তিনি দেশে ফিরে আসেননি। জীবন বিপন্ন ক'রেও তিনি তিব্বতীয় লামাদের শতচক্ষুর সতর্ক-দৃষ্টি অতিক্রম ক'রে বুদ্ধ-মূর্ত্তিটিকে নিয়ে পালিয়ে আসেন। সেই মূর্ত্তিটিই এখন আমাদের কাল হয়েছে! এই মূর্ত্তি ফিরে পাওয়ার কত দূর চেষ্টা, আর কি ভীষণ উৎপীড়ন যে আমাদের উপর চলছে, তা একমাত্র ভগবানই জানেন। সত্যই আমাদের জীবন অভিশপ্ত হ'য়ে উঠেছে। ভয়, উৎপীড়ন প্রতিদিন এমন বেশী হয়েছে যে, প্রাণভয়ে আমাদের নাম ভাঁড়িয়ে ছদ্মবেশে আত্মগোপন ক'রে থাক্‌তে হচ্ছে। আমাদের চিন্‌তে পার্‌লে যে কোন মুহূর্ত্তে তারা আমাদের হত্যা করতে পারে। তাই কোন স্থানে এক দিনও স্থির থাকতে পারিনে। সহরের পর সহর, গ্রামের পর গ্রাম থেকে প্রাণের ভয়ে সর্ব্বদা পালিয়ে বেড়াচ্ছি। এখানে এসে—অনেক চেষ্টার পর আত্মগোপন করতে পেরেছি ভেবে কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে আমরা উভয়েই আত্মপ্রসাদ অনুভব করছিলেম। কিন্তু সে যে কত বড় ভুল—তার প্রমাণ দেখুন! তরুণী তাহার কথা শেষ করিয়া কম্পিত হস্তে একখানা ক্ষুদ্র চিঠি আমার টেবিলের উপর রাখিয়া দিল।

তরুণীর রোমাঞ্চকর অদ্ভুত কথা শুনিতে শুনিতে অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এইবার তাহার কথায় নিজের সহজ জ্ঞানটুকু যেন কতকটা ফিরিয়া আসিল। চিঠিখানা হাতে লইয়া এক নিশ্বাসে পড়িয়া ফেলিলাম,—

"কল্যাণীয়া কমলপ্রভা ঘোষ—জয়দুর্গা হোটেল, কলিকাতা।

আপনার স্বামী মিঃ টি, সি, ঘোষকে বহু চেষ্টায় আজ হাতে পাওয়া গিয়াছে। তিনি নির্ব্বোধের ন্যায় যে কার্য্য করিয়াছেন, তদ্দারা সমগ্র বৌদ্ধসম্প্রদায়ের ধর্ম্মে আঘাত করা হইয়াছে—মৃত্যুদণ্ডও বোধ করি তাঁহার অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি নহে। কিন্তু তাঁহার প্রতি আমাদের কোন ব্যক্তিগত আক্রোশ নাই—অহেতুক কাহাকেও পীড়ন করাও আমাদের ধর্ম্মের বিধান নহে। আপনাকে জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, বুদ্ধমূর্ত্তিটিই আমাদের কাম্য। এ কারণ অদ্য সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে যদি আপনি উক্ত বুদ্ধমূর্ত্তি সহ লালদীঘির দক্ষিণ কোণে উপস্থিত না হন, তাহা হইলে আপনার স্বামীর প্রতি মৃত্যুদণ্ডের বিধানে আমাদের বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা হইবে না। ভগবান্ তথাগতের সেই মূর্ত্তি আমাদের পক্ষে অপরিহার্য্য—এ কথা স্মরণ রাখিবেন। নির্ব্বোধের ন্যায় আপনার স্বামীর ও নিজের নিশ্চিত মৃত্যুকে বরণ করিবেন না।—ইতি

ভিক্ষু।"

পত্রখানি হইতে আমাকে মুখ তুলিতে দেখিয়া তরুণী হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কি আকুল ক্রন্দন! তাহার পর সে অশ্রুসজল নেত্রে বলিল,—এখন কি করিব, বলুন। আপনার উপদেশ প্রধান সম্বল মনে করিতেছি।

আমি বিস্ময়ে, ভয়ে এবং দারুণ উৎকণ্ঠায় যেন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িলাম। বুদ্ধদেবের যে ক্ষুদ্র মূর্ত্তিটি লইয়া এই

ভয়-মিশ্রিত কৌতূহলে ক্রমশঃই আমার হৃদয় পূর্ণ হইতেছিল, তাহা আর চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না; তাই কতকটা তাচ্ছিল্যের সহিত পান-সিগারেটের প্লেটটা টেবিলের এক পাশে সরাইয়া রাখিয়া কহিলাম,—আমায় মাফ করবেন। আমি আপনাদের ভদ্রতার পরিচয় নিতে আসিনি। আমি কি জন্য এসেছি, তা নিশ্চয়ই আপনাদের জানা আছে; কিন্তু আমি বিস্মিত হচ্ছি—আমার সঙ্গে যে তিব্বতী ভদ্রলোক দু'টি ছিলেন, তাঁরা কোথায় অদৃশ্য হ'লেন, তা বুঝতে না পেরে!

যে লোকটি আমাকে বসিতে বলিয়াছিল, সে মৃদু হাসিয়া কহিল,—তাঁরা এখানেই আছেন। কিন্তু কাজ তো আপনার তাঁদের কাছে নয়; যে জিনিস আপনি এনেছেন, তা এখন দিতে পারেন।

আমি কহিলাম,—তা' পারি। কিন্তু এর বিনিময়ে আমরা যাঁর মুক্তিপ্রার্থী, তাঁকে না পেলে আমি কি করে আপনার অনুরোধ রক্ষা করি?

—তা বটে; কিন্তু জেনে রাখুন, বিশ্বাস করলে আপনি ঠক্‌বেন না।

ইহার পর আমার আর কিছুই বলিবার ছিল না। আমি মূর্ত্তিটি বাহির করিয়া তাহাকেই দিলাম। সে তাহার সঙ্গীকে উহা আলমারীতে তুলিয়া রাখিতে আদেশ করিল।

আমি কহিলাম,—তা হ'লে এইবার তাঁকে আনতে বলুন। রাত্তির বেশী হ'য়ে যাচ্ছে। বিশেষতঃ বাসায় তাঁর স্ত্রী এমন ব্যাকুলা হ'য়ে পড়েছেন যে…

লোকটি বাধা দিয়া রসিকতা করিয়া কহিল,—শুধু তাঁর নয়, বোধ করি, এতক্ষণ আপনার স্ত্রীও কম ব্যাকুল হননি।

আমি বলিলাম,—তার আর আশ্চর্য্য কি? যা হোক—

লোকটি হাসিয়া কহিল,—ব্যবস্থাটা আপনার হাতেই—মূর্ত্তি দিয়েছেন, কিন্তু মুক্তিপণ তো দেননি!

—মুক্তিপণ! আমি বিস্ময়ে অস্ফুট চিৎকার করিয়া উঠিলাম।

সে স্বাভাবিক ভাবেই কহিল,—নইলে আর কি জন্য আপনাকে কষ্ট দিয়ে এখানে আনা হ'য়েছে?

চঞ্চল হইয়া উঠিলাম; কহিলাম,—আপনারা কি শুধু মূর্ত্তিটিই চাননি?

—মিথ্যে নয়—সে তাঁর জন্যে। কিন্তু আপনার?

—আমার?

—হ্যাঁ; মুক্তি পেতে হ'লে আপনাকেও কিছু ক্ষতি স্বীকার করতে হবে বৈ কি?—লোকটি মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

আর তাহার দিকে চাহিয়া আমার চোখের বিস্ময়, বুকের বল ধীরে ধীরে যেন সুগভীর অজ্ঞাত আতঙ্কে পরিণত হইল। দুইটি চোখের দৃষ্টিতে রাজ্যের দুশ্চিন্তার ছায়া ঘনাইয়া আসিল। সেইখানে নির্ব্বাক্ ভাবে বসিয়া নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার শোচনীয় পরিণাম চিন্তা করিয়া ভয়ে—উৎকণ্ঠায় ঘামিয়া উঠিলাম।

এমনি নীরবতায় কিছুকাল কাটিয়া গেল। লোকটিও সেই ভাবে নির্ব্বাক্ বসিয়া রহিল। আমি যে কি করিব, কি বলিব, কি করিয়া এই অপ্রত্যাশিত আকস্মিক বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিব, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না!

লোকটি কিছুকাল পরে কহিল,—সজনী বাবু, আপনার অবস্থা দেখে দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু কি করবো, আমরা নিরুপায়! এই আমাদের উপজীবিকা,—আপনাদের মতো ভদ্রলোকদের কৌশলে শোষণ ক'রেই আমরা সংসার প্রতিপালন করি।

তাহার কথা শুনিয়া ক্রোধে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না।

লোকটি বলিল,—বসে বসে মিছে ভেবে কোন ফল নেই, পাঁচটি হাজার টাকা মুক্তিপণ দিয়ে আপনাকে মুক্তিলাভ করতে হবে।

আমি চমকিয়া উঠিলাম। কম্পিত কণ্ঠে কহিলাম, পাঁ—চ হা—জা—র টাকা?

—হাঁ, তার এক পয়সাও কম নয়।

—কিন্তু এ টাকা আমি কোথায় পাবো?

লোকটি হো হো করিয়া হাসিয়া কহিল,—আমরা কি আপনার মতো বোকা মনে করেছেন? ভাল ক'রে খবর না নিয়ে যাকে-তাকে কি আমরা ধরে আনি মশায়! মূর্ত্তিটি এখানে আনবার আগে এ সব কথা আপনি চিন্তা করেননি—কে তা বিশ্বাস করবে?

কি বলিব? চক্ষুর উপর আশঙ্কার নিবিড় কুজ্ঝটিকা

ঘনাইয়া আসিল। তবে কি সেই তেইশ নম্বরের তরুণীই ইহার মূল ?—মূর্ত্তির কাহিনীটি তবে কি ইহাদের কল্পনা-প্রসূত ?—সমস্তই শঠতাপূর্ণ ষড়যন্ত্র ? সেই রূপসী তরুণীই কৌশলে আমাকে ফাঁদে ফেলিয়াছে! কিন্তু এ কথা মনে করিতেই অপরিসীম ক্রোধ ও ঘৃণায় হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিল।

অনেকটা পরে মৃদু স্বরে কহিলাম,—তা হ'লে এই মূর্ত্তির কাহিনীটা আপনাদের একটা চাল মাত্র ?

লোকটি অদ্ভুত রকম হাসির সঙ্গে মাথা নাড়িয়া কহিল—আপনার অনুমান মিথ্যা নয়।

—আর সেই মেয়েটি ?

লোকটি হো হো করিয়া হাসিয়া কহিল,—সে ওখানে না থাকলে কে আর আপনাকে ফাঁদে ফেল্‌তো বলুন ?

নিজের অবিমৃষ্যকারিতায় নিজের উপর ক্রোধ সংবরণ করা অসাধ্য হইল; কিন্তু নিরুপায়! তাই অবশেষে প্রশান্ত ভাবেই কহিলাম,—তা' হ'লে সেই মেয়েটির দ্বারাও আপনারা কম প্রতারিত হননি। আমাকে না জেনেই সে এখানে পাঠিয়েছে। আমার বাড়ী এখানে নয়, কলকাতায় এসেছি বেড়াতে,—তথাপি যদি এতগুলো টাকার আশাতেই আমাকে ধরে এনে থাকেন, তবে শেষ পর্য্যন্ত খালি হাতে অনুতাপ করা ছাড়া আপনাদের আর কোন উপায় থাক্‌বে না দেখছি।

লোকটি সেই ভাবেই হাসিয়া কহিল,—অনুতাপ আমরা কখনো করিনে। ভুল আপনি করতে পারেন—সে পারে না; করলে তার শাস্তি তাকেই পেতে হবে। অযথা কোন ভদ্রলোককে আমরা হয়রাণ করিনে। তার সাক্ষী আপনার চোখের সামনেই।—বলিয়া সে ডাকিল, বিদ্যুৎ!

ক্ষণকাল পরেই পাশের দরজা দিয়া যে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, সে বিদ্যুৎই বটে! নইলে সে আমার চাখ দু'টিতে এমন করিয়া ধাঁধা লাগাইয়াছিল কি রিয়া? ক্রোধ ও ঘৃণায় অন্য দিকে মুখ ফিরাইলাম।

বিদ্যুৎ বোধ করি, কতকটা ব্যঙ্গের সহিতই হাসিয়া হিল,—বাঃ, আপনি কি রাগ করলেন? আমি কিন্তু াপনাকে পাঠিয়ে দিয়ে স্থির থাক্‌তে পারিনি! কি ানি, যদি কোন বিপদ ঘটে!

মনে হইল, উহার গালে এক চড় মারিয়া উহাকে শায়েস্তা করি। কিন্তু নিজেই নিজের পায়ে কুড়ুল মারিয়াছি, এখন আর আক্ষেপ করিয়া কি ফল? নিরতিশয় ক্রোধে ও ঘৃণায় জ্বলিয়া উঠিয়া কহিলাম,—তোমার ব্যবসাই বুঝি এই ?

বিদ্যুৎ অবনত মুখে বলিল,—আমাকে লজ্জা দিতে পারবেন, এ আশা ত্যাগ করুন মশায়!

এত বিপদেও হাসি পাইল। কহিলাম,—লজ্জা দেব তোমাকে? আমারই সত্যি লজ্জা হচ্ছে যে, মা-বোন বলে তোমাদের পরিচয় দিয়ে আমরা গৌরব বোধ করি।

—কিন্তু সে গৌরব আমি বাড়িয়েছি সজনী বাবু! এ দেশের মেয়েগুলিকে আপনারা অবলা বলেন; কিন্তু এর পর···

—চুপ কর বিদ্যুৎ!—বলিয়া দলপতি আমার দিকে চাহিয়া কঠোর স্বরে কহিল,—সজনী বাবু, আপনি মুক্তিপণ দিতে রাজি কি না বলুন ?

আমি দৃঢ়স্বরে কহিলাম,—অক্ষম আমি।

দলপতি কয়েক মিনিট চুপ করিয়া রহিল; তার পর কহিল,—কিন্তু এর কি ফল হবে জানেন ?

আমি বলিলাম,—ভয় দেখিয়ে কোন ফল হবে না—জান্‌বেন।

কিন্তু আমার এই উক্তি কত অসার, তাহা পরমুহূর্ত্তেই বুঝিতে পারিলাম। দলপতি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে সে পকেটে হাত পুরিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে ছোট একটা পিস্তল বাহির করিয়া আমার কপালে উদ্যত করিয়া কহিল,—এর পর আপনার অবস্থা কিরূপ হবে, মনে করেন ?

চোখে অন্ধকার দেখিলাম। ভয়ে জিহ্বা—তালু পর্য্যন্ত শুকাইয়া গেল! বুকের ভিতরে দুরু-দুরু করিতে লাগিল! এতক্ষণ যে পদদ্বয় এত সাহস—ভরসা দিতেছিল—এইবার তাহা এভাবে কাঁপিতে লাগিল যে, দাঁড়াইয়া থাকিলে হয় তো ধরাশায়ী হইতাম। উপায় নাই—উপায় নাই!···কিন্তু কি-ই বা করিব? সঙ্গে টাকা তো কিছুই আনি নাই; বাসায় থাকিলে হয় তো কোন একটা ব্যবস্থা করা সম্ভব হইত। অবশেষে বলিলাম,—বিশ্বাস করুন, আমার সঙ্গে কিছুই নেই।

—তা' আমরাও জানি। কিন্তু আপনি ইচ্ছে করলেই ব্যাঙ্ক বরাবর চেক দিতে পারেন! ব্যাঙ্কে আপনার সুঞ্চিত টাকার কথা আমাদের অজ্ঞাত নয়, মহাশয়!

বুঝিলাম, আর রক্ষা নাই। ইহারা আমার হাঁড়ির খবর লইতেও বিন্দুমাত্র ক্রটি করে নাই; এবং জানিয়া-শুনিয়া আট-ঘাট বাঁধিয়াই আমাকে এখানে লইয়া আসিয়াছে! তবুও শেষ চেষ্টা করিলাম, শুষ্ক-স্বরে কহিলাম,—কিন্তু ব্যাঙ্কের চেক্-বই তো আমার সঙ্গে নেই।

বিদ্যুৎ হাসিয়া কহিল,—সেই জন্যেই তো আমার আস্তে কিছু দেরী হলো সজনী বাবু! খুঁজে তা হাতাতে হবে তো? এই দেখুন, আপনার চেক্-বই! নিন্, টাকার অঙ্কটা ফেলে সই করুন।

অগ্নিগর্ভ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলাম। সে শুধু একটু হাসিল। দলপতি পিস্তলটি আর একবার সেই ভাবে উদ্যত করিয়া কহিল,—শীঘ্র কাজ শেষ করুন।

সুবোধ বালকের মতো পাঁচটি হাজার টাকা চেকে তুলিয়া সহি করিয়া দিলাম।

দলপতি পিস্তল নামাইয়া মৃদু হাসিয়া কহিল,—ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন; কিন্তু এত রাত্রিতে কি ক'রে বাসায় যাবেন? অতিথি আপনি—তা ছাড়া, চেক্খানা ভাঙ্গাবার আগে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া যে কি রকম নির্ব্বোধের কাজ, তা কি আমরা জানিনে? বিদ্যুৎ, এই ভদ্রলোকের ভার তোমার উপরেই রইলো—এঁর যেন কোন রকম অযত্ন না হয়।

দলপতি কক্ষান্তরে প্রস্থান করিল।

তার পর বিদ্যুৎকে আমি গম্ভীর স্বরে কহিলাম,—তুমি নারীজাতির কলঙ্ক, বিদ্যুৎ! রাগ আর ঘৃণার চাইতেও তোমার ওপর আমার অনুকম্পা হচ্ছে অনেক বেশী। অর্থোপার্জ্জনের এমন ঘৃণিত পথও তোমরা বেছে নিয়েছ!

স্পষ্ট দেখিলাম, বিদ্যুতের উজ্জ্বল মুখখানি মুহূর্ত্তের জন্য ম্লান হইয়া গেল; সে এই প্রসঙ্গ এড়াইবার জন্যই যেন হঠাৎ উঠিয়া চলিয়া গেল।

* * * * * *

পরদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে যখন হোটেলে পৌছিলাম, তখন দেখি, সেখানে এক ভীষণ হুলুস্থূল কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে! সারা বাসায় সে এক ভয়ানক হৈ-রৈ ব্যাপার! লোক-জন, দারোগা-পুলিসে হোটেল সরগরম।

আমাকে দেখিয়া ম্যানেজার লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন,—এই যে সজনী বাবু! তিনি যেন স্বর্গ হাতে পাইলেন। তাহার পর সকলকে থামাইতে, দারোগা-পুলিস প্রভৃতি বিদায় করিতে যে বেগ পাইতে ও যে আজগবি গল্প ফাঁদিতে হইল, সে কাহিনী সবিস্তারে লিখিয়া পাঠকের ধৈর্য্য নষ্ট করিবার আগ্রহ নাই।

একটু ফাঁক পাইতেই নিজের ঘরে প্রবেশ করিলাম। গৃহিণীর অবস্থা দেখিয়া হাসিব কি কাঁদিব, ভাবিয়া পাইলাম না! ঘরে প্রবেশ করিতেই তিনি একবারে পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন,—ওগো···

—চুপ্! চুপ্! পাঁচ জনে কি বলবে, ছিঃ!—গৃহিণীকে বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করিতে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইল। সর্ব্বদাই আশঙ্কা করিতেছিলাম, বিদ্যুৎ ও আমার একই সময় অন্তর্দ্ধানে না জানি গৃহিণী কি বিভ্রাট বাধাইয়া বসেন; তাই এক সময় জিজ্ঞাসা করিলাম,—তেইশ নম্বরের ঘরটা যে আজ খোলা দেখ্লাম?

গৃহিণী এইবার সহজ-গলায় কহিলেন, ও মা! তা বুঝি শোনোনি! মেয়েটির কি দুর্ভাগ্য!—ওর স্বামী কাল সকালে বর্দ্ধমান পৌছলেন; সেখানে গিয়েই তাঁর কলেরা···তার পেয়ে রাত্রির গাড়ীতেই সে চলে গেছে। যাবার সময় তার যা কান্না!—বলিয়া গৃহিণী তরুণীর বিপদের কথা মনে করিয়া, বোধ করি, সমবেদনায় অঞ্চলে চক্ষু মার্জ্জন করিলেন।

ঘাম দিয়া যেন আমার জ্বর ছাড়িল! এতগুলি টাকা নষ্ট হইবার কষ্টও কষ্ট বলিয়া আর মনে হইল না—গৃহিণী যে সন্দেহ করেন নাই, ইহাতেই বিলক্ষণ পুলকিত হইলাম, এবং আর কোন কথা না বলিয়া নির্ব্বাক্ রহিলাম।

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সাহা।

বৈষ্ণবমত-বিবেক

পঞ্চদশ অধ্যায়

শ্রীজীব ও বৈষ্ণববন্দনা

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিমলবিহারী মজুমদার-লিখিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত "শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান" নামক একখানি গ্রন্থে শ্রীজীবের নামে প্রকাশিত একখানি বৈষ্ণববন্দনার সংস্কৃত পুস্তিকা প্রদত্ত হইয়াছে। বৈষ্ণববন্দনার পুস্তকগুলি বৈষ্ণব-ইতিহাসের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই জন্য এই বৈষ্ণব-বন্দনাটি শ্রীজীবের রচিত হইলে সমসাময়িক বৈষ্ণবেতিহাসের ইহা একটি সমৃদ্ধ উপাদানরূপে পরিগণিত হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সর্ব্ব-প্রথমে বিচার্য্য—এই পুঁথিখানি শ্রীজীবের রচিত কি না। এই বৈষ্ণব-বন্দনাখানির ভাষা সংস্কৃত; ইহার রচনা কোথাও উৎকৃষ্ট আবার কোথাও অপকৃষ্ট,—ভাষার সামঞ্জস্য নাই। কোন কোন স্থানে বর্ণিত শ্লোকের অর্থগ্রহণই দুঃসাধ্য; যথা—

"দ্বিজকুলতিলকং কৃতাবতারং গঙ্গাং গৃহীতকামাবতীর্ণাম্।
মাধবং মাধবরূপং রসময়তনুং প্রেমাখ্যম্।
ঈশ্বরপুরীশিষ্যঃ সর্ব্বদর্শনপারকঃ।
বিষ্ণুভক্তিপ্রধানশ্চ সদ্‌গুণাবলীভূষিতঃ।"

এই শ্লোক দুইটিতে "গৃহীতকামাবতীর্ণাম্" এই কথাটির অর্থ-বোধ হওয়া দুষ্কর। "গৃহীতকামা" কথাটি স্ত্রীলিঙ্গ, কিন্তু প্রথমা বিভক্তিযুক্তা হওয়ায় দ্বিতীয়া বিভক্তিযুক্তা "গঙ্গাং" শব্দটির বিশেষণ হইতে পারে না। তবে যদি এই কথাটি—"দ্বিজকুলতিলকং" কথার বিশেষণ হয়, তবে কথাটি "গৃহীতকামং" হইবে। কথাটি "গৃহীতকামং" হইলে "গঙ্গাং" কথাটিকে ইহার কর্ম্মরূপে ধরা যাইতে পারে, এবং তাহা হইলে একটা অর্থবোধও হয়। কিন্তু তাহা হইলে দ্বিতীয়ান্ত "মাধবং" শব্দের সহিত কাহার অন্বয় হইবে? ইহা কোন্ ক্রিয়ার কর্ম্ম? পরের শ্লোকে প্রথমান্ত "ঈশ্বরপুরীশিষ্যঃ" ইত্যাদি শব্দগুলিরই বা কাহার সহিত অন্বয় হইবে? এইরূপ অন্যত্রও আছে। এতদ্ব্যতীত এই শ্লোকের গুরুতর ছন্দোভঙ্গের কথাও আলোচনা করিলে, এই সকল রচনা শ্রীজীবের বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে অসাধারণ দুঃসাহসের প্রয়োজন; সুতরাং স্থানে স্থানে এই পুঁথির কবিত্ব শ্রেষ্ঠ হইলেও স্থানে স্থানে এতই অপকৃষ্ট যে, অচল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না!

দ্বিতীয়তঃ, এই বৈষ্ণববন্দনায় এমন কয়েকটি সংবাদ পাওয়া াইতেছে, যাহা প্রচলিত বৈষ্ণব-ইতিহাসের বিরোধী। যথা—ল নিত্যানন্দকে সঙ্কর্ষণপুরীর শিষ্য বলা হইয়াছে। সঙ্কর্ষণ-ীর নাম ইহার পূর্ব্বে অন্য কোনও বৈষ্ণব-গ্রন্থে পাওয়া যায় নাই। াতে গদাধর দাসকে শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন-তনুরূপা শ্রীরাধিকা বলা য়াছে—তাহাও অন্যান্য বৈষ্ণবগ্রন্থবিরোধী। শ্রীল সনাতনের বা রূপের গ্রন্থে ভক্তদিগকে ব্রজলীলার পরিকররূপে পরিণত করিবার শেষ প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায় না। বৈষ্ণববন্দনার এই পুঁথিখানিতে সে চেষ্টা বিশেষ ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই জন্যও এই পুঁথিখানি শ্রীজীবের কি না—তৎসম্বন্ধে সন্দেহ হয়।

তৃতীয় সন্দেহের কারণ—এই পুঁথিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায়কে মাধ্বসম্প্রদায়ের মধ্যে আনয়ন করিবার চেষ্টা। শ্রীজীব সর্ব্বসম্বাদিনী-প্রমুখ গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবকে স্বসম্প্রদায়ের অধিদেবতারূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত তিনি ভাগবতের লঘুতোষণী টীকার দশম স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে শ্রীসম্প্রদায়কে ও তত্ত্ববাদী-সম্প্রদায়কে (মধ্ব-সম্প্রদায়কে) নিজ সম্প্রদায় হইতে স্বতন্ত্ররূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। (মাসিক বসুমতী, আষাঢ়, ১৩৪৮) শ্রীজীবের অন্যান্য প্রামাণিক গ্রন্থের বিরোধী বলিয়া এই স্থানটি বিশেষ সন্দেহজনক।

চতুর্থতঃ, এই বৈষ্ণববন্দনায় জাহ্নবা দেবীকে ঈশ্বরপুরীর "শিষ্যিকা" বলা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করার কিছু কাল পরেই শ্রীমদীশ্বরপুরীর তিরোভাব ঘটে। যখন শ্রীচৈতন্যদেব দক্ষিণদেশ ভ্রমণের পর পুরীধামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন,তখন শ্রীমদীশ্বর-পুরীর তিরোভাবের পর তাঁহার শিষ্য ও সেবক গোবিন্দ ও কাশীশ্বর তাঁহার আজ্ঞাতেই শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট আসিয়াছেন। ইহারও অন্ততঃ ৫।৭ বৎসর পরে শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু বিবাহ করিয়াছেন। বিবাহকালে শ্রীল জাহ্নবা ঠাকুরাণী নিশ্চয়ই বালিকা ছিলেন। তাহারও অন্ততঃ পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমদীশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ সম্ভবপর কি না, তাহা বিশেষ সন্দেহের বিষয়।

পঞ্চমতঃ—নিত্যানন্দ-কন্যা গঙ্গাদেবীকে "প্রেমমঞ্জরীমুখ্যা" বলা হইয়াছে। ইহা অন্য কোনও গ্রন্থে, এমন কি, গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকাতেও পাওয়া যায় না। গঙ্গাদেবীর স্বামী মাধবকেও ঈশ্বর-পুরীর শিষ্য বলা হইয়াছে—তাহাও বিশেষ সন্দেহজনক। শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুকে "পুরুষঃ প্রকৃতিঃ সোঽসৌ বাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ"—অর্থাৎ বাহ্য ও অভ্যন্তরভেদে পুরুষ ও প্রকৃতি; সঙ্কর্ষণের অবতার আদিশেষ শরীর ভেদের দ্বারা ভগবানের আসন-শয্যাদি আকার ধারণ করিয়া বা তাহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া ভগবৎসেবা করেন, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত—কিন্তু তিনি যে অভ্যন্তরে প্রকৃতি, এ কথা অন্য কোনও গ্রন্থে বলা হয় নাই। এই বন্দনাতেই শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণীকে "অনঙ্গমঞ্জরী" বলা হইয়াছে। ইহাতে শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্যের পুত্র অচ্যুতানন্দকে শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের সেবক বলা হইয়াছে। জগদানন্দ পণ্ডিতকে গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় সত্যভামা বলা হইয়াছে—কিন্তু বৈষ্ণববন্দনায় তাঁহাকে "বাণীমূর্ত্তিভেদং" বলা হইয়াছে। তিনি যে সরস্বতীর প্রকাশ, ইহা বৈষ্ণববন্দনায় ভিন্ন অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।

পূর্ব্বোক্ত কারণগুলির জন্য, এবং ভাব, ভাষাও শ্রীজীবের অন্যান্য গ্রন্থের সহিত সামঞ্জস্য না থাকায় এই বৈষ্ণববন্দনা-পুঁথিখানা শ্রীজীবের রচিত কি না, তদ্বিষয়ে বিশেষ সন্দেহের অবকাশ আছে। তথাপি এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আরও আলোচনা হওয়া উচিত। আমরা

অন্যত্র শ্রীজীবের গ্রন্থাবলীর পরিচয় প্রদান করিবার সময়ে এ সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

শ্রীজীবের পত্রাবলী

পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, শ্রীজীবের সময় গৌড়, বঙ্গ ও উৎকলের সহিত শ্রীবৃন্দাবনের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ, গৌড় ও বঙ্গদেশ হইতে বহু লোক প্রতিবৎসর তীর্থ-দর্শনের উদ্দেশ্যে ও কোনও কোনও ভাগ্যবান্ শ্রীবৃন্দাবনের গোস্বামিগণের শ্রীচরণদর্শনের উদ্দেশ্যে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিতেন। ইঁহারা শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলেই, শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীজীব-প্রমুখ ভক্তবৃন্দ—যাহাতে তাঁহারা উপযুক্ত স্থানে আশ্রয়-প্রাপ্ত হইয়া তীর্থ-দর্শনাদি করিয়া যথাসময়ে দেশে প্রত্যাগমন করিতে পারেন, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। যে সকল ভক্ত বৈষ্ণব শ্রীবৃন্দাবন যাইতেন, শ্রীজীবাদি তাঁহাদের নিকট বঙ্গদেশে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর, শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দ কবিরাজাদি; গৌড়ে শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি ও উৎকলে শ্রীল শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দাদি যে ভাবে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের আচার ও প্রচার করিতেছেন, তাহার সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করিতেন, এবং সম্ভব হইলে ইঁহাদের অনেকের নিকট পত্র প্রেরণের দ্বারা শ্রীনিবাসাচার্য্যাদি ভক্তগণকে স্বীয় কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করিতেন। কখনও বিশেষ পরিচিত ব্যক্তিকে পাইলে তাহার দ্বারা শ্রীবৃন্দাবন হইতে গোস্বামিগণের লিখিত গ্রন্থাদিও প্রেরণ করিতেন। গৌড়, বঙ্গ ও উৎকল হইতে ভক্তগণের মনে ভজনাদি সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের উদ্রেক হইলে পত্র দ্বারা তাঁহারা শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট উহা জ্ঞাপন করিয়া উহার মীমাংসা-ভিক্ষা করিয়াছেন। শ্রীল ভক্তিরত্নাকরে শ্রীজীবের নিকট হইতে শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি যে পত্র পাইয়াছিলেন তাহা রক্ষিত হইয়াছে। প্রেম-বিলাসে শ্রীনিবাস শ্রীজীবকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার একখানি পত্রও রক্ষিত হইয়াছে। এই পত্র কয়েকখানি সংস্কৃতে লিখিত। তবে সংস্কৃত গদ্যেই—সাধারণ ভাবে লিখিত হইয়াছে। তাৎকালীন পত্রাদি লিখিবার রীতি অনুসারেই এই পত্র কয়েকখানি লিখিত হইয়াছে। এই জন্য এই পত্র কয়েকখানির ঐতিহাসিক মূল্য নিতান্ত অল্প নহে। এতদ্ব্যতীত তাৎকালীন বৈষ্ণবেতিহাসের কয়েকটি সংবাদও এই সকল পত্র হইতে সংগ্রহ করা যায়।

প্রথম পত্র

ভক্তিরত্নাকরে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখন বিষ্ণুপুরে শ্রীবৃন্দাবন হইতে আনীত গ্রন্থরাজি অপহৃত হইল, তখন শ্রীনিবাস আচার্য্য শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীকে গ্রন্থ-অপহরণের সংবাদ প্রেরণ করেন। ইহা প্রেমবিলাসের ত্রয়োদশ বিলাসে লিখিত আছে। এ কথা সত্য হইলে ইহাই শ্রীনিবাস আচার্য্যের শ্রীবৃন্দাবনে প্রথম পত্র। কিন্তু প্রেমবিলাসের এ বৃত্তান্ত ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনার দ্বারা সমর্থিত নহে। অতঃপর গ্রন্থ যখন পাওয়া গেল, তখন যে সকল গোশকটে গ্রন্থরাজি আনীত হইয়াছিল, তাহা নানাবিধ উপায়নে পরিপূর্ণ করিয়া রাজা বীর হাম্বির বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন, এবং শ্রীনিবাস আচার্য্য শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজীবের নিকট গ্রন্থপ্রাপ্তির সংবাদ সহকারে একখানি পত্রও প্রেরণ করেন। এই পত্রখানি পাওয়া যায় নাই। এই পত্রখানি পাওয়া গেলে হয় ত অনেক সমস্যারই মীমাংসা হইতে পারিত। যাহা হউক, ইহার বহু দিন পরে শ্রীনিবাস আচার্য্য শ্রীবৃন্দাবনে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। বহু দিন পরে বলিতেছি এই জন্য যে, তখন শ্রীনিবাস আচার্য্য দেশে আসিয়া বিবাহ করিয়াছেন, এবং তখন তাঁহার শ্রীবৃন্দাবনদাস নামক পুত্রও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই পত্রখানি ভক্তিরত্নাকরে প্রদত্ত হয় নাই, কিন্তু প্রেমবিলাসে ধৃত রহিয়াছে। আমরা সমস্ত পত্রখানিই এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম।

শ্রীকৃষ্ণো জয়তি।

স্বস্তি মদীয় সমস্তকুশলপ্রদ চরণ-যুগল-পূজ্যপাদ

শ্রীজীবগোস্বামিপাদেষু—

সোঽহং সেবকশ্রীনিবাসনামামুহুর্ম্মহুর্নত্য বিজ্ঞাপয়ামি। ভবতাং সংজ্ঞাতুমিচ্ছামি, ন তত্তু বহুকালং যাবৎ প্রাপ্তমিতি, যেন বয়ং সুখিনো ভবামঃ। অহন্তু নীরোগশরীরতয়া তিষ্ঠামি, তিষ্ঠন্তি চ তথান্যে বৃন্দাবনদাসাদয়ঃ। শ্রীগোপালভট্টাদিগোস্বামিচরণানাং কুশলং লেখ্যং ভবতা। পরঞ্চ শ্রীরসামৃতসিন্ধু মাধবমহোৎসবোত্তরচম্পু হরিনামামৃত-ব্যাকরণানাং শোধনানি সন্তি কিম্বা, সন্তি চেৎ প্রস্থাপ্যানি। কিঞ্চ, ভবৎসু সর্ব্বেষামস্মদাদীনাং নমস্কারা জ্ঞাতব্যাঃ। তত্রস্থেষু তত্রভবৎসু সর্ব্বেষু মম নমস্কারা বাচ্যা ইতি।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের জয়।

স্বস্তি, যাঁহার চরণযুগল আমার সমস্ত মঙ্গলপ্রদানকারী সেই পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামীর পাদপদ্মে—আমি শ্রীনিবাস নামক সেবক বারংবার প্রণাম করিয়া জানাইতেছি যে, আপনাদিগের মঙ্গল জানিবার ইচ্ছা করিয়াও বহুকাল যাবৎ তাহা জানিতে পারি নাই, কিন্তু তাহা জানিতে পারিলে আমরা অতিশয় সুখী হই। আমি নীরোগ শরীরে বর্ত্তমান—বৃন্দাবনদাসাদি অন্য সকলেও সেইরূপ আছে। আপনি শ্রীগোপালভট্টাদি গোস্বামিপাদগণের কুশল লিখিবেন। পরন্তু শ্রীরসামৃতসিন্ধু, মাধবমহোৎসব, উত্তরচম্পূ, হরিনামামৃত ব্যাকরণ গ্রন্থাদির সংশোধন হইয়া গিয়াছে কি না, হইয়া থাকিলে গ্রন্থগুলি প্রেরণ করিবেন। অধিক কি লিখিব, আপনারা সকলেই আমাদিগের নমস্কার জানিবেন এবং শ্রীবৃন্দাবনস্থ পূজনীয় ব্যক্তিদিগকে আমার নমস্কার জানাইবেন। ইতি।

মন্তব্য

পত্রখানিতে কোনও তারিখ দেওয়া নাই, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপাদ তখন জীবিত আছেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য বোধ হয় পূর্ব্বের কোনও পত্রে বা লোক দ্বারা তাঁহার বৃন্দাবনদাস নামে এক পুত্র জন্মিয়াছে—একথা জানাইয়াছিলেন; কারণ, এ পত্রে বৃন্দাবনদাসের কোনও পরিচয় প্রদান করা হয় নাই। অতএব অনুমান হয়, ঐ পরিচয় জানা থাকাতেই আর নূতন করিয়া পরিচয় দানের আবশ্যক হয় নাই। এই পত্র লিখিবার সময় পর্য্যন্ত রসামৃতসিন্ধু, মাধবমহোৎসব, উত্তরচম্পূ, হরিনামামৃত ব্যাকরণাদি গ্রন্থের সংশোধন চলিতেছে। তবে কি এই সকল গ্রন্থ শ্রীনিবাসাচার্য্যাদির শ্রীবৃন্দাবন হইতে আগমনের সময় আনীত হয় নাই? অথবা আনীত হইলেও অসংশোধিত

অবস্থায় আনীত হইয়াছে—পরে সংশোধন করিয়া পুনরায় পাঠাইবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছেন।

দ্বিতীয় পত্র

শ্রীবৃন্দাবননাথো জয়তি।

স্বস্তি মদীয়সমস্তসুখপ্রদ পদদ্বন্দ্ব শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যচরণেষু—

জীবনামা সোঽয়ং নমস্কৃত্য বিজ্ঞাপয়তি। ভবতাং কুশলং সদা সমীহে, তত্তু বহুদিনং যাবন্নপ্রাপ্তমিতি তেন বয়মানন্দনীয়াঃ, তত্রাহং সম্প্রতি দেহনৈরুজ্যেন বর্ত্তে—অন্যে চ তথা বর্ত্তন্তে, কিন্তু শ্রীভূগর্ভ গোস্বামিচরণা দেহং সমর্পিতবন্ত আত্মানন্ত শ্রীবৃন্দাবননাথায় জ্ঞানপূর্ব্বকমিতি বিশেষঃ। স্বপরিকরাণাং বিশেষতঃ শ্রীবৃন্দাবনদাসস্য কুশলং লেখ্যং কিঞ্চিদসৌ পঠন্ নবেত্যপি। পরঞ্চ, শ্রীব্যাসশর্ম্মাণং প্রতিকথং কুত্র বর্ত্ততে শ্রীবাসুদেব কবিরাজো বা তদপি লেখ্যং।

অপরঞ্চ, শ্রীরসামৃতসিন্ধু, শ্রীমাধবমহোৎসবোত্তরচম্পূ হরিনামামৃতানাং শোধনানি কিঞ্চিদবশিষ্টানি বর্ত্তন্ত ইতি বর্ষাস্বেতি সংপ্রতি ন প্রস্থাপিতানি। পশ্চাত্তু দৈবানুকূল্যেন প্রস্থাপ্যানি। কিঞ্চাত্রকীয় সর্ব্বেষাং যথাযথং নমস্কারাদয়ো বাচ্যাঃ। শ্রীরাজমহাশয়েষু শুভাশিষ ইতি। ভাদ্র সুদী

অনুবাদ

শ্রীবৃন্দাবননাথ জয়যুক্ত হউন।

স্বস্তি, যাঁহার পদদ্বয় আমার সমস্ত সুখপ্রদানকারী, সেই শ্রীনিবাসাচার্য্যের চরণযুগলে—জীবনামক ব্যক্তি নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছে। সর্ব্বদা আপনার কুশল আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, কিন্তু তাহা বহু দিন যাবৎ পাইতেছি না, অতএব সেই সংবাদের দ্বারা আমাদিগের আনন্দবিধান করিবেন। আমরা সম্প্রতি নীরোগদেহে বর্ত্তমান আছি, অন্য সকলেও সেইরূপে আছেন। কিন্তু শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামিপাদ শ্রীবৃন্দাবননাথকে দেহ সমর্পণ করিয়াছেন—কিন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন ইহাই বৈশিষ্ট্য। স্বীয় পরিকরগণের, বিশেষতঃ বৃন্দাবনদাসের কুশল লিখিবেন এবং তিনি কিছু অধ্যয়ন করিতেছেন কি না তাহাও জানাইবেন। পরে, ব্যাসশর্ম্মা ও বাসুদেব কবিরাজ কোথায় কি করিতেছেন তাহা লিখিবেন।

শ্রীরসামৃতসিন্ধু, শ্রীমাধবমহোৎসব, উত্তরচম্পূ ও হরিনামামৃত ব্যাকরণাদির সংশোধন কিয়ৎ পরিমাণে বাকি আছে, এখন বর্ষাকাল এই জন্য তাহা প্রেরণ করা হইল না, পরে দৈবানুকূল্যে প্রেরণ করা যাইবে। আর এ স্থানের সকলের যথাযথ নমস্কার ও আশীর্ব্বাদাদি জানিবেন এবং ঐ স্থানের সকলকে যথাযোগ্য নমস্কার ও আশীর্ব্বাদাদি জানাইবেন। শ্রীযুক্ত রাজা মহাশয়কে আমার মঙ্গলাশীর্ব্বাদ জানাইবেন। ইতি—ভাদ্র মাস সুদী।

মন্তব্য

শ্রীনিবাস আচার্য্য শ্রীজীবের ছাত্র হইলেও শ্রীজীব তাঁহাকে পূজনীয় ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার চরণে নমস্কার জানাইয়া এই পত্রে অসাধারণ বিনয়ের আদর্শ দেখাইতেছেন। এই পত্র শ্রীবৃন্দাবন হইতে নরোত্তম দাস ঠাকুরের শিষ্য বসন্ত রায়ের মারফৎ প্রেরিত হইয়াছিল। এই পত্র বর্ষাকালে ভাদ্রমাসে লিখিত হইয়াছিল, সম্ভবতঃ ঐ সময়েই শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামীর তিরোভাব ঘটে। তখনও শ্রীরসামৃতসিন্ধুর, শ্রীমাধবমহোৎসবের, উত্তরচম্পুর ও হরিনামামৃত ব্যাকরণের সংশোধন শেষ হয় নাই। এই পত্রে বিষ্ণুপুরের রাজ-পুরোহিত ব্যাসাচার্য্যের ও বাসুদেব কবিরাজের সংবাদ জানাইবার অনুরোধ জানান হইয়াছে। শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রথম পুত্র বৃন্দাবনদাস অধ্যয়নাদি করিতেছেন কি না, তাহাও জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। এই পত্রে রাজা বীর হাম্বিরকেও আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

তৃতীয় পত্র

শ্রীবৃন্দাবননাথো জয়তি।

স্বস্তি সমস্তগুণপ্রশস্ত বন্ধুবর শ্রীনিবাসাচার্য্যমহত্তমেষু—

ইতঃ শ্রীবৃন্দাবনাজ্জীবনাম্নস্তস্য সপ্রণামালিঙ্গন শুভাশংসনকং স্বস্তিমুখমিদং। শমিহসমীহিতং শ্রীবৃন্দাবনবাসরূপং বসত্যেব। ভবতাং তত্তদনুভাবায় সমুৎসুকোঽপি মধ্যে মধ্যে তদশ্রবণ তদ্বিরুদ্ধ শ্রবণাভ্যাং দুনিতচিত্তোঽস্মি তস্মাদ্ যথাযথং সাম্প্রতেনাপি তচ্ছ্রাবণেন সান্ত্বয়িতব্যোঽস্মি।

পরঞ্চ, পূর্ব্ব ভবৎপত্রিকা প্রতিবচনং পূর্ব্বমেব লিখিতবন্তঃ স্ম। সম্প্রতি চ নিবেদয়ামঃ, "বিরোধী ভগবদ্বক্তৈঃ বিদাগৌন্দ্রিয়দেহয়োঃ। শোকস্তথাপি কর্ত্তব্যো যদি শুচো নিবর্ত্ততে।" ইতি। অন্যচ্চ, এতে শ্রীশ্যামাদাসাচার্য্যাঃ পারমার্থিকা ভবতাং সবাসনা ভবন্তি, ব্যুৎপন্নাশ্চ তস্মাদেতৈঃ সমং ব্যতিমিশ্র শ্রীভগবদ্ভক্তিবিচারাদিকং কর্ত্তুমুচিতং। ঈদৃশেন সহায়েন পাষণ্ডিনশ্চ খণ্ডিতাঃ স্যুঃ। সম্প্রতি শোধয়িত্বা খিচার্য্য চ বৈষ্ণবতোষণী দুর্গমসঙ্গমনী শ্রীগোপালচম্পূ পুস্তকানি তত্রামীভির্নীয়মানানি সন্তি। ততঃ পুস্তকবিচারয়োঃ শোধনায় চ ব্যতিষক্তব্যমেভিরাত্মীয় পাল্যবৃদ্ধিশ্চ কর্ত্তব্যাত্রেতি।

অপরঞ্চ, পূর্ব্বং যৎ হরিনামামৃতব্যাকরণ; ভবৎসু প্রস্থাপিতমাসীৎ, তদ্ যদি পাঠ্যতে তদা তত্র ভাষ্যবৃত্ত্যাদি দৃষ্ট্বা ভ্রমাদিকং শোধ্যং অন্যপারিশেষপুস্তকঞ্চাত্র বর্ত্ততে, তদ্ যদি মৃগ্যতে তদাজ্ঞাপিতব্যং। সম্প্রতি শ্রীমদুত্তরগোপালচম্পূ লিখিতাস্তি কিন্তু বিচারয়িতব্যাস্তীতি নিবেদিতং। পুনস্তাদৃশং ভাগ্য কদা স্যাৎ, যদা ভবৎপ্রসঙ্গ ইতি দূরাদপি শ্রুত্বা অনুধ্যানং কার্য্যং। শ্রীবৃন্দাবনদাসাদিষু শ্রীগোপালদাস প্রভৃতিষু ভবৎসু শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য চরণেষু শুভানুধ্যানমিতি।

অনুবাদ

শ্রীবৃন্দাবননাথ জয়যুক্ত হউন।

স্বস্তি, সর্ব্বসদ্গুণে বিভূষিত বন্ধুবর শ্রীনিবাসাচার্য্য মহত্তমেষু—

এই শ্রীবৃন্দাবন হইতে জীব নামক ব্যক্তির প্রণামসহকৃত আলিঙ্গন শুভাশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক মঙ্গলসূচক এই পত্র। বিশেষ বাঞ্ছিত শ্রীবৃন্দাবন-বাসরূপ মঙ্গল এখানে বিরাজমান। তবে আপনাদের মঙ্গল জানিবার জন্য সর্ব্বদা সমুৎকণ্ঠিত থাকিয়া কখনও তাহার অশ্রবণে এবং কখনও বা তাহার বিপরীত সংবাদ শ্রবণে দুঃখিত হইয়া থাকি, অতএব সম্প্রতি যথার্থরূপে সেই সংবাদ শ্রবণ করাইয়া আমাকে নিশ্চিন্ত করিবেন।

পূর্ব্বে আপনার প্রেরিত পত্রের যথাযথ উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। সম্প্রতি নিবেদন করিতেছি—"ইন্দ্রিয় ও দেহের দাহনকারী ভগবদ্ভক্তির বিরোধী বলিয়া শোক করা কখনও উচিত নহে—তথাপি শোক করিলেই যদি শোক যাইত, তাহা হইলেও না হয় শোক করা উচিত হইত।" ইতি। অন্য কথা হইতেছে এই যে, শ্রীশ্যামাদাস আচার্য্য মহাশয়, ইনি আপনার পরমার্থপথের সঙ্গী ও সমভাবাপন্ন (সতীর্থ) ইনি শাস্ত্রাদিতেও ব্যুৎপন্ন; অতএব ইঁহার সহিত বিশেষ স্নেহপুরঃসর ভগবদ্ভক্তির বিচারাদি করা উচিত। এই প্রকার সহায়ের দ্বারাই অপমতগ্রস্ত পাষণ্ডিগণের মত খণ্ডিত হইয়া থাকে। বৈষ্ণবতোষণী, দুর্গমসঙ্গমনী ও শ্রীগোপাল-চম্পূ এই তিনখানি গ্রন্থও বিশেষরূপে বিচার পূর্ব্বক সংশোধন করিয়া ইনি লইয়া যাইতেছেন। ইঁহার সহিতই এই গ্রন্থের বিচার ও শোধন সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন ও ইঁহাকে আত্মীয় বুদ্ধিতে প্রতিপালন করিবেন।

আর এক কথা এই যে—পূর্ব্বেতে হরিনামামৃত ব্যাকরণ আপনাকে পাঠাইয়াছি, তাহা যদি অধ্যাপনা করাইতে থাকেন তবে ভাষ্য ও বৃত্তি দেখিয়া ভ্রমাদি সংশোধন করিয়া লইবেন। অন্য পরিশেষ পুস্তকও এখানে আছে, তাহারও যদি প্রয়োজন হয় তবে জানাইবেন। সম্প্রতি শ্রীমদুত্তরগোপালচম্পূ গ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে লিখিত হইয়া গিয়াছে—কিন্তু তাহার এখনও বিচার করিতে হইবে। পুনরায় আমাদের এমন ভাগ্য কবে হইবে যে, আপনার প্রসঙ্গ দূর হইতেও শ্রবণ করিয়া আপনার বিষয়ে চিন্তা করিব? শ্রীবৃন্দাবন-দাস প্রভৃতির, গোপালদাস প্রভৃতির ও আপনাদিগের অনবরত মঙ্গল চিন্তা করিতেছি।

মন্তব্য

'প্রেমবিলাস' গ্রন্থে এই যে শোকের কথা আছে—ঐ শোক শ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোস্বামিপাদের তিরোভাব সম্বন্ধেই ঘটিয়াছিল। 'প্রেমবিলাসের' কথা যদি সত্য হয়, তবে এই পত্র লিখিবার কিয়ৎ-কাল পূর্ব্বেই গোপালভট্ট গোস্বামীর তিরোভাব ঘটিয়াছিল, ইহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। এই পত্রের দ্বারা জানা যাইতেছে যে, এই পত্রেরও পূর্ব্বে শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট শ্রীজীব গোস্বামী আর একখানি পত্র দিয়াছিলেন, কিন্তু সেই পত্রখানি পাওয়া যাইতেছে না। এই পত্রে যে শ্যামাদাস আচার্য্যের কথা দেখা যায়—প্রেমবিলাসকারের মতে তিনি বিষ্ণুপুররাজ বীর হাম্বিরের পুরোহিত শ্রীল ব্যাসাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র। ভক্তিরত্নাকরও বলিতেছেন—"পত্রীমধ্যে শ্যামাদাসাচার্য্য যাঁর নাম। তেঁহো ব্যাসাচার্য্যের নন্দন বিদ্যমান। বৃন্দাবনদাস শ্রীনিবাসের নন্দন। আদি শব্দে জানো তাঁর ভ্রাতা ভগ্নাগণ। বীর হাম্বিরের পুত্র শ্রীগোপাল দাস। শ্রীজীব-গোস্বামি-দত্ত এ নাম প্রকাশ।"—"দুর্গমসঙ্গমনী"—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকা। শ্রীজীব গোস্বামী এক একখানি পুস্তক লিখিয়া বহু দিন ধরিয়া তাহার সংশোধনাদি করিতেন। সুতরাং পত্রের মধ্যে গ্রন্থলেখার, বিচারের ও সংশোধনের কথা থাকিলেও গ্রন্থ যে কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল, তাহার সময়-নির্ণয় দুঃসাধ্য। শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর পরিবারে "সেবাপ্রাকট্য ও ইষ্টলাভ" পুঁথিমতে ১৫৮৫ খৃঃ অব্দে বা ১৫০৭ শকাব্দে শ্রাবণী শুক্লা পঞ্চমীতে গোপালভট্ট গোস্বামীর তিরোভাব হয়। অতএব এই পত্রখানি সম্ভবতঃ ঐ বৎসর উহার ২।১ মাস পরেই লিখিত বলিয়া ধরিতে হইবে। ঐ সময়ে বৃন্দাবনদাস ও গোপালদাস অন্ততঃ ৬।৭ বৎসর বয়স্ক—এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

চতুর্থ পত্র

এই পত্রখানি শ্রীল গোবিন্দদাস, শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীল নরোত্তমদাস শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট কতকগুলি বৈষ্ণবসাধনা বিষয়ক ব্যাপার জানিবার জন্য লিখিয়াছিলেন। এই পত্রখানি প্রেমবিলাস।

শ্রীকৃষ্ণো জয়তি।

পরমারাধনীয় সমস্তমঙ্গলপ্রদ পদদ্বন্দ্ব পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামি মহাশয় শ্রীচরণসরোজেষু—সেবকাধমানাং শ্রীরামচন্দ্র-নরোত্তমগোবিন্দদাসানাং সংখ্যাতীত প্রণামপূর্ব্বকং নিবেদনমেতৎ—

অত্রস্থানাং কুশলং সর্ব্বেষাং। তত্রস্থানাং তত্রভবতাং পূজ্যপাদ শ্রীললোকনাথাদি গোস্বামিপাদানাং ভবতা যত কুশলং সমীহামহে। পরঞ্চ যন্নিত্যস্মরণ-প্রক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তব্যং তল্লেখ্যং। যদ্যপি, "সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি" ইত্যাদিনা কিঞ্চিৎ ভবত উপদেশাজ্ জ্ঞাতং তথাপ্যস্মাকং কুতর্কত্বেন সন্দিগ্ধচিত্ততয়া সেবা-সাধকরূপেণেত্যাদি বচনস্য বিশদাং ব্যাখ্যাং জ্ঞাতুং বাঞ্ছামঃ। অতঃ সহাশিষা সা প্রস্থাপ্যা।

কতিচিদস্মাভি রচিতানি শ্রীগীতামৃতানি প্রস্থাপিতানি দয়া-পরবশতয়া দ্রষ্টব্যামীতি। তত্রস্থেষু তত্রভবৎসু সর্ব্বেষ্বস্মাকং সংখ্যাতীতঃ প্রণামঃ জ্ঞাপিতব্যমিতি।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক।

যাঁহার পাদপদ্মযুগল সমস্ত মঙ্গলের প্রদানকারী ও পরমারা-ধনীয় শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী মহাশয়ের শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু—

সেবকাধম শ্রীরামচন্দ্র, নরোত্তম ও গোবিন্দদাসের সংখ্যাতীত প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন এই যে—

এই স্থানের সকলেরই মঙ্গল। শ্রীবৃন্দাবনবাসী পূজ্যপাদ শ্রীল লোকনাথ গোস্বামিপাদগণের এবং আপনার কুশল জানিবার ইচ্ছা করিতেছি, পরে নিত্য স্মরণ প্রক্রিয়ার যাহা কর্ত্তব্য, অনুগ্রহ করিয়া তাহা জানাইবেন। যদিও শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে "সেবা সাধক-রূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি" এই শ্লোকের দ্বারা আপনি স্মরণ ব্যাপারের কর্ত্তব্য উপদেশ করিয়াছেন, তথাপি আমাদের হৃদয় কুতর্কপরায়ণ হওয়ায় উহার অর্থ জ্ঞানে সংশয়ের সৃষ্টি হইয়াছে, অতএব ঐ শ্লোকের বিশদ ব্যাখ্যা আমাদিগকে জানাইয়া অনুগৃহীত করিবেন। এই পত্রের উত্তরে সেই ব্যাখ্যা প্রেরণ করিবেন।

আমাদের (অর্থাৎ শ্রীল গোবিন্দদাস কবিরাজের) রচিত কতিপয় শ্রীগীতামৃত এই সঙ্গে প্রেরণ করিতেছি, আপনি দয়া করিয়া এই পদাবলী দর্শন করিবেন। শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণকে আমার সংখ্যাতীত প্রণাম জ্ঞাপন করিবেন। ইতি—

[ক্রমশঃ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম্-এ, বি-এল)।

সজ্জী-সংরক্ষণ

(উদ্ভিদ্-তত্ত্ব)

মানবের উদ্ভিজ্জ-আহার্য্যকে প্রকৃতি ও গুণ অনুসারে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যায় ; তন্মধ্যে তিনটি প্রধান,—শস্য—ডাইল ; ফল এবং সজ্জী। ধান্য, গোধূম প্রভৃতি শস্য, ও মসুর কলাই ইত্যাদি ডাইল অল্প দিনে নষ্ট হয় না। অনেক ফলও শুষ্ক হইয়া অবিকৃত অবস্থায় অনেক দিন ব্যবহারোপযোগী থাকে। কিন্তু সজ্জীশ্রেণীয় উদ্ভিদ্ সহজ-পচনশীল (perishable); সেই জন্য সেগুলি সাধারণতঃ তাজা থাকিতেই ব্যবহৃত হয়। ফল, মূল, কন্দ, কাণ্ড, পত্র প্রভৃতি উদ্ভিদাংশ সজ্জীরই অন্তর্গত, কিন্তু ইহাদের সকলের অবিকৃত থাকিবার ক্ষমতা (keeping quality) সমান নহে। কতকগুলি সজ্জী—যেমন শাকবর্গের ন্যায় পত্রময় সজ্জী টাটকা অবস্থাতেই ব্যবহারযোগ্য ; শুষ্ক হইলে উহাদের উপকারিতার হ্রাস হয়। কিন্তু অন্য কতকগুলি শুষ্ক হইলেও তাহাদের খাদ্য-মূল্যের বিশেষ তারতম্য হয় না, এবং এইরূপ ক্ষেত্রে সজ্জী-সংরক্ষণের সুযোগ গ্রহণ করা যাইতে পারে। অবশ্য, যে সকল দেশে স্বভাবতঃই সজ্জীর প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়, সে সকল দেশে সজ্জী-সংরক্ষণের তেমন অধিক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয় না। সুজলা সুফলা বঙ্গদেশে পূর্ব্বে এইরূপই ছিল। পক্ষান্তরে, অনেক শুষ্ক ও পার্ব্বত্য প্রদেশের মৃত্তিকা ও জল-বায়ু সজ্জী-উৎপাদনের প্রাচুর্য্যের অনুকূল নহে। সেই সকল প্রদেশের লোক বাধ্য হইয়া মরসুমের সজ্জী-সংরক্ষণ দ্বারা বৎসরের অন্যান্য সময় তাহার অভাব পরিপূরণের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে। সেই জন্যই কাশ্মীর, নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি অঞ্চলে শুষ্ক সজ্জীর সমধিক প্রচলন লক্ষিত হয়।

অনেক গ্রন্থেই ৫০ বৎসর পূর্ব্বেও বঙ্গের পল্লীসমূহে সজ্জীর প্রাচুর্য্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এবং অনেক স্থলে, বিশেষতঃ, পশ্চিম-বঙ্গে কৃষিকার্য্যের অবনতি-নিবন্ধন তাহার অভাব হইয়াছে। কলিকাতার বাজারে বিবিধ সজ্জীর, এমন কি, 'শাক-পাতার'ও ক্রমবর্দ্ধমান মহার্ঘ্যতা দ্বারা সেই অভাব প্রতিপন্ন হইতেছে। কোন কোন স্থানের পক্ষে এ কথাও সত্য যে, রপ্তানী-কার্য্যের সুযোগের অভাবে উদ্‌বৃত্ত সজ্জী পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকিলে এগুলির দ্বারা অন্য স্থানের লোকের অভাব মোচন হইতে পারিত। বৎসরের সকল সময় সজ্জী সরবরাহের সমতা-রক্ষাকল্পে সজ্জী-সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যতীত আরও একটি কারণে সজ্জী-সংরক্ষণ এক্ষণে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। বর্ত্তমান মহাসমরে লিপ্ত ফৌজ সমূহের জন্য সরকার শুষ্ক সজ্জী সংগ্রহ ও সরবরাহের জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা আমরা লক্ষ্য করিতেছি। গোল আলুর বৃহৎ উৎপাদন-কেন্দ্র সমূহে সরকার ইতিমধ্যেই হাজার হাজার মণ শুষ্ক টুক্‌রা আলুর জন্য অর্ডার দিয়াছেন। বিগত মহাযুদ্ধের সময় মেসোপোটেমিয়ায় পাঠাইবার ন্যায় এবারেও মধ্যপ্রাচী ও আফ্রিকায় ভারতীয় সৈন্য-সমূহের জন্য ভারত হইতে কয়েক প্রকার শুষ্ক সজ্জী পাঠাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে ; এবং তদুদ্দেশ্যে সিন্ধু, পঞ্চনদ, ও যুক্তপ্রদেশের নানা স্থানে উক্তরূপ সজ্জী সংগৃহীত হইতেছে। সুতরাং সজ্জী-সংরক্ষণের আপাততঃ একটা ব্যবসায়িক গুরুত্ব বুঝিতে পারা যাইতেছে। এ প্রদেশের জনসাধারণ যদি এই গুরুত্ব সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করে, তাহা হইলে যুদ্ধকালে লাভবান্ হওয়া ভিন্ন যুদ্ধোত্তর কালেও সজ্জী-সংরক্ষণ ধনাগমের একটি পন্থায় পরিণত হইতে পারে। অবশ্য, এই প্রদেশের জনসাধারণ চিরকালই টাট্‌কা সজ্জী ব্যবহারে অভ্যস্ত ; এখানে শুষ্ক

সব্জীর ব্যবহার প্রচলন করিতে কিছু বিলম্ব হইবে। কিন্তু ভারতে ও ভারতের বাহিরে বহু স্থানেই শুষ্ক মাছ, মাংস ও সব্জী আহারের প্রথা পূর্ব্ব হইতেই প্রবর্ত্তিত আছে। সেই সকল স্থানে সংরক্ষিত সব্জীর কাটতি হওয়া আদৌ কঠিন নহে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বঙ্গদেশে সংরক্ষণযোগ্য সব্জী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

সব্জীর গঠন

আমরা সচরাচর যে সকল কাঁচা তরকারি ব্যবহার করি, সেগুলি উদ্ভিদেরই অংশবিশেষ। আমাদিগের আহার্য্যের দিক্ হইতে বিবেচনা করিলে উদ্ভিদের গঠনোপাদানের মধ্যে প্রতীদ, বসা, শ্বেতসার, শর্করা, খনিজ লবণ ইত্যাদিই প্রধান। কিন্তু উদ্ভিদ্-দেহে এই সমুদয় ব্যতীত আরও অনেক উপাদান আছে, তাহার মধ্যে জলই প্রধান। বস্তুতঃ, বিভিন্ন উপাদানের আপেক্ষিক মাত্রা হিসাব করিলে দেখা যায়, জলের পরিমাণ তুলনায় অনেক অধিক। জল পচনক্রিয়ার সহায়তা করে। সেই জন্য সব্জীকে অধিক কাল অবিকৃত রাখিতে হইলে উহার জলীয়াংশ যথাসম্ভব অপসারিত করা চাই। যে সব সব্জী সাধারণতঃ শুষ্ক প্রথায় সংরক্ষিত হয়, বা হইতে পারে, তাহাদের কতকগুলির জলীয়াংশের শতকরা মাত্রা নিম্নে লিখিত হইল,—

ফুলকপি	...	...	৮৯
বাঁধাকপি	...	...	৯০
আলু	...	...	৭৪
রাঙ্গাআলু	...	...	৬৬
কুমড়া	...	...	৯২
বেগুন	...	...	৯০
কাঁচকলা	...	...	৮৩
কচু	...	...	৭৩
ওল	...	...	৭৮
কাঁটালবীচি	...	...	৫১
পাণিফল	...	...	৭০
কাঁচা আম্	...	...	৯০

যে সকল সব্জী উদ্ভিদের পত্র ও পুষ্প—সেগুলি শুষ্ক করা অপেক্ষাকৃত সহজ। ফল ও মূলের জলীয়াংশ যথেষ্ট মাত্রায় হ্রাস করা অধিকতর আয়াসসাধ্য। এতদ্ভিন্ন, গুণ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে সংরক্ষণ করিবার সময় কোন নির্দ্দিষ্ট সব্জীর গঠনের বিশিষ্টতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তদুপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বনীয়।

সংরক্ষণ-প্রণালী

সব্জী ও অন্যান্য প্রকার উদ্ভিজ্জ দ্রব্য আর্দ্র ও শুষ্ক, উভয় প্রথাতেই সংরক্ষিত হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত প্রথায় নানাবিধ প্রক্রিয়া অবলম্বিত হয়। canning অর্থাৎ বায়ুরুদ্ধ টিনে 'প্যাক' করিয়া সংরক্ষণ এই প্রথার অন্তর্গত। অনেক সভ্য দেশে টিনে আবদ্ধ ফল, মূল ও সব্জী প্রস্তুত একটি লাভজনক শিল্প। আমরা কিন্তু এ স্থলে কেবলমাত্র রৌদ্রোত্তাপ কিম্বা কৃত্রিম তাপে শুষ্কীকৃত সব্জীরই আলোচনা করিতেছি। সভ্যতার আদি কাল হইতেই মানব খাদ্যদ্রব্যাদি সূর্য্যকিরণে শুষ্ক করিয়া সংরক্ষণ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। এ প্রথা যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এবং বিচক্ষণতার সহিত প্রয়োগ করিতে পারিলে ইহা দ্বারা খাদ্যের পোষণোপযোগী উপাদান ও খাদ্যপ্রাণ যে অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু খাদ্যদ্রব্যাদি সংরক্ষণ করিবার উপযোগী প্রখর সূর্য্যরশ্মি সকল সময়ে পাওয়া যায় না। এই উপায়ে উদ্ভিজ্জ দ্রব্যকে জল-বিরহিত করিতেও অপেক্ষাকৃত অধিক সময়ের প্রয়োজন। সেই জন্য বর্ত্তমান যুগের কর্ম্মব্যস্ত মানবকে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। 'আমরা যাহাকে 'কাঠফাটা রোদ' বলি, এ দেশে তাহার অভাব নাই এবং জনসাধারণ তাহার সুযোগ গ্রহণ করিতেও পরাঙ্মুখ নহে। গ্রীষ্মকালে প্রস্তুত আমচুর, আমসত্ত, শুষ্ক কুল, মহুয়া ফুল প্রভৃতি তাহার উদাহরণ; কিন্তু আপাততঃ এইরূপ দেশীয় প্রথায় যে সকল আহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত হয়, সে সমুদয়কে নির্দ্দোষ বলা যায় না। তাহাদের অপকর্ষতার প্রধান কারণ দুইটি—অপরিচ্ছন্নতা এবং গুণের সমতার (uniformity) অভাব। পাশ্চাত্য দেশে সূর্য্যকিরণে শুষ্কীকৃত ফল ও সব্জীর প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ফল ও সব্জী উৎপাদন ও সংরক্ষণের অন্যতম কেন্দ্র কালিফর্ণিয়ার কথা বলা যাইতে পারে। কলিকাতায় হগ্-সাহেবের বাজারে আমদানী-করা কালিফর্ণিয়াজাত কয়েক

প্রকার শুষ্ক ফল কাহারও কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকিতে পারে। এ সমুদয় শুষ্ক ফল প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য যথেষ্ট যত্ন লওয়া হয়। বিশেষ-রূপে প্রস্তুত আঙ্গিনায় (yard) পূর্ব্ব হইতে সুপরিষ্কৃত সব্জী বা ফলগুলি বিছাইয়া দেওয়া হয়। উহাদিগকে নাড়িবার বা উল্টাইয়া দিবার উপযুক্ত বন্দোবস্ত আছে। দর্পণ সাহায্যে কেন্দ্রীভূত সূর্য্যকিরণ প্রয়োগ এই বিষয়ে আধুনিকতম উন্নতি। আঙ্গিনায় নির্দ্দিষ্ট স্থানে কয়েকটি দর্পণ এ ভাবে সজ্জিত থাকে যে, তদ্দ্বারা শুষ্ক করিবার উপযোগী দ্রব্যের উপর সর্ব্বোচ্চ রবিতাপ নিক্ষেপের ব্যবস্থা থাকে। এইরূপ রৌদ্রপক্ক ফল-মূল ইত্যাদি দেখিতে যেমন সুন্দর, গুণেও তেমনি উৎকৃষ্ট।

কৃত্রিম প্রথায় শুষ্ক করাকে সাধারণতঃ Desiccation বলা হয়। এতদ্দ্বারা এরূপ ক্ষিপ্রগতিতে সব্জী প্রভৃতিকে শৈত্যবিরহিত করিয়া তোলা হয় যে, বীজাণু সমূহ উহাতে পচনক্রিয়া সংঘটন করিবার সময় পায় না। ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য এইরূপ শুষ্কীকৃত সব্জী বায়ুরুদ্ধ টিনে বন্ধ করিয়া রাখাই শ্রেয়ঃ। সব্জী ও ফল শুষ্ক করার উদ্দেশ্যে যে শ্রেণীর কল সচরাচর ব্যবহৃত হয়, সেগুলির নাম Evaporator। ছোট বড় নানা রকমের Evaporator আছে, এবং বিভিন্নরূপ কলে শুকাইবার প্রণালীর পার্থক্যও লক্ষিত হয়। কিন্তু স্থূলতঃ বলিতে পারা যায় যে, এই শ্রেণীর কলে উপরি-উপরি সজ্জিত কতকগুলি আধার (tray) থাকে। আধারগুলির নীচে ষ্টোভ্ (stove) রাখিবার স্থান; উহার সাহায্যেই উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহ আধারগুলির মধ্য দিয়া পরিচালিত হয়। নিম্নের আধারগুলির দ্রব্য অবশ্য আগে শুষ্ক হয়; তখন সেগুলিকে উপরে তুলিয়া দিয়া উপরের আধার নীচে নামাইয়া দেওয়ারও ব্যবস্থা কলে রহিয়াছে। দ্রব্য হিসাবে তাপের পরিমাণ ১২০ হইতে ১৮০ ডিগ্রি ফারেন্-হিট্ পর্য্যন্ত আবশ্যক হইতে পারে। বলা বাহুল্য যে, কলে দেওয়ার পূর্ব্বে সব্জীগুলিকে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করিয়া, খোসা ছাড়াইয়া, মাইজ ফেলিয়া দিয়া, অথবা যে ক্ষেত্রে যেরূপ আবশ্যক, সেইরূপ করিয়া তৈয়ারী করিয়া লইতে হয়। জলীয়াংশের মাত্রা হিসাবে ১০০ ভাগ টাট্কা সব্জী শুষ্ক হইয়া ১০ হইতে ৩০ ভাগে পরিণত হয়। শুষ্ক সব্জী ও ফলের কারবার করিতে হইলে রৌদ্রো-ত্তাপে শুষ্ক করিবার ব্যবস্থা ব্যতীত রৌদ্রাভাবের সময় কার্য্য অব্যাহত রাখিবার জন্য একটি মাঝারি রকমের কলও দরকার হয়। পঞ্চনদের কুলু পাহাড়ে এ৺ও, ন্যাসপাতি প্রভৃতি ফল শুষ্ক করিবার দু'-একটি কারখানা আছে। সে স্থানেও সূর্য্যোত্তাপ ভিন্ন এইরূপ কলের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

সংরক্ষণযোগ্য সব্জী

কোন কোন প্রকার সব্জী শুষ্ক প্রথায় সংরক্ষণ করা সহজ অথবা লাভজনক নহে। সেগুলির কথা বাদ দিয়া বঙ্গদেশে সব্জী-সংরক্ষণ শিল্পে যেগুলিকে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তন্মধ্যে কয়েকটির এস্থলে উল্লেখ করা হইল,—

আলুঃ—ইহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ সব্জী বলিতে পারা যায়। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের এ দেশে আলু অতি অল্পই জন্মিত। তখন ইহা সখের ফসল ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এখন ইহার চাষ অনেক জেলাতেই প্রসার লাভ করিয়াছে; তথাপি আসাম ও বিহার প্রদেশের কোন কোন স্থান হইতে কলিকাতায় যথেষ্ট আলু আমদানী হওয়ায় বুঝিতে পারা যায় যে, চাহিদার উপযোগী আলু বাঙ্গালায় এখনও উৎপাদিত হয় না। শুষ্ক আলুর চাহিদা বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য দেখা দিয়াছে। প্রস্তুতের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারিলে এই ব্যবসায় যুদ্ধের পরও স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে। খণ্ডীকৃত করিয়া (chips) কিম্বা গোটা, উভয় প্রকারেই আলু শুষ্ক করা যায়। প্রথমোক্ত প্রথায় অপেক্ষাকৃত কম সময় লাগে। নৈনিতাল অপেক্ষা দেশী ও পাটনাই আলু স্বভাবতঃ অধিকতর পচনসহ। সূর্য্যালোকে শুকাইবার জন্য আলু নির্ব্বাচন করিবার সময় সমস্ত দাগী ও ক্ষতযুক্ত আলু বাদ দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য। সামান্য তুঁতে-মিশ্রিত জলে ধুইয়া লইলে আলুর রোগাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা কম হয়। আলু সঞ্চয়ের ঘর উচ্চ-ভূমিতে অবস্থিত হওয়া এবং তথায় অবারিত ভাবে বায়ু-সঞ্চালনের ব্যবস্থা থাকা দরকার। আলু রাখিবার ঘরে মাচান বাঁধিয়া এবং মাচানের তাকে

তাকে শুষ্ক বালি ছড়াইয়া তাহার উপর আলু রাখিতে পারা যায়। আলুর স্তর একটি আলু মাত্র গভীর হইবে। উপরি-উপরি ২।৩ স্তর রাখিলে পচনের আশঙ্কা থাকে। শুষ্ক আলু এই ভাবে সতর্কতার সহিত উপযুক্ত স্থানে সঞ্চিত হইলে ৩।৪ মাস অবিকৃত অবস্থায় থাকিতে পারে। কিন্তু উচ্চ ও শুষ্ক অঞ্চলের পক্ষে এই প্রথা প্রশস্ত। নিম্ন-বঙ্গে Evaporator শ্রেণীর কলে আলু শুষ্ক করিয়া টিনে বন্ধ করাই শ্রেয়ঃ।

রাঙ্গা আলুঃ—ইহা লাল আলু ও শকরকন্দ নামেও পরিচিত। আমেরিকার গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের আদিম অধিবাসী হইলেও ভারতের অনেক প্রদেশে ইহার চাষ সাধারণ। ইহা প্রায় গোল আলুর ন্যায়ই পুষ্টিকর সব্জী; অধিকন্তু ইহাতে কিয়ৎ পরিমাণ শর্করা বর্ত্তমান। মার্কিণে রাঙ্গা আলুর আটার প্রচলন আছে এবং তথায় ইহা একটি প্রধান ফসল বলিয়া গণ্য। সাদা ও লাল উভয় প্রকার শকরকন্দের লম্বা লম্বা ফালি করিয়া শুকাইয়া লইলে এবং শৈত্যবিরহিত স্থানে মজুদ করিলে অনেক দিন উহা ভাল থাকে। খাদ্যরূপে রাঙ্গা আলুর ব্যবহার বিহার ও যুক্তপ্রদেশেই অধিক।

বাঁধাকপি, ফুলকপিঃ—কাশ্মীরে এক জাতীয় বাঁধাকপি (ফড়ম) শীতকালে ব্যবহারের জন্য সাধারণ লোকরা শরৎ কালে শুষ্ক করিয়া রাখে। অন্যান্য পার্ব্বত্য অঞ্চলেও কপি শুষ্ক করিবার প্রথা আছে। কলিকাতায় বাস করিলেও নেপালীরা যে কপি শুষ্ক করিবার অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারে নাই, তাহা বোধ হয় অনেকেই দেখিয়াছেন। শুষ্ক করিবার পূর্ব্বে কপি পরিষ্কার করিয়া পাতলা ফালি করিয়া কাটিয়া লইতে হয়। বায়ুরুদ্ধ টিনে বন্ধ করিয়া রাখিলে অনেক দিন পর্য্যন্ত শুষ্ক কপির স্বাভাবিক স্বাদ ও গন্ধ অবিকৃত থাকে।

কদলীঃ—পক্ব ও অপক্ব উভয় অবস্থাতেই ইহা উৎকৃষ্ট খাদ্য। কাঁচকলা সব্জীরূপে ব্যবহৃত হয়, যদিও আধুনিকেরা ইহার বিশেষ পক্ষপাতী নহেন। অপক্ব শুষ্ক কদলী কিন্তু আফ্রিকার অনেক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রধান খাদ্য ও ব্যবসায়ের দ্রব্য। পোষণকারী গুণে ইহা ধান, গম, বা গোল আলু অপেক্ষা আদৌ অপকৃষ্ট নহে। খণ্ডীকৃত শুষ্ক কদলী, কাঁচকলার আটা, শুষ্ক পক্ব-কদলী প্রভৃতি কদলীজাত দ্রব্যের অনেক বিদেশীয় বাজারে কাট্তি আছে। এ দেশে কদলী-শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারবৃদ্ধির যে যথেষ্ট অবসর আছে, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে একাধিক প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। পাকা অথবা কাঁচা উভয় প্রকার রম্ভাই শুষ্ক করিতে হইলে উহার খোসা ছাড়াইয়া দুই-তিন খণ্ড করিয়া লইতে হয়। কাঁচকলা শুকাইয়া কাঠের উদূখলে কুটিয়া ঘরে ব্যবহারের জন্য সহজে আটা প্রস্তুত করিতে পারা যায়; কিন্তু ব্যবসায়িক হিসাবে আটা উৎপাদন করিতে হইলে কল আবশ্যক। পূর্ণ পরিপুষ্ট অথচ পাকিতে আরম্ভ করে নাই, এরূপ কাঁচকলাই আটা প্রস্তুতের উপযোগী। গড়পড়তা হিসাবে ত্বক্‌বিরহিত কাঁচকলার ওজনের এক-পঞ্চমাংশ আটা পাওয়া যায়।

কচু, ওল, মানকচুঃ—ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সাধারণ কচু সব্জীরূপে ব্যবহৃত হয়। জমিকন্দ নামে নানা জাতীয় অর্দ্ধ বন্য ও কর্ষিত ওলেরও কাট্তি নিতান্ত কম নয়। মানকচু, বিশেষতঃ ছোট আকারের মানকচু বঙ্গদেশে অধিক প্রচলিত। এই-গুলি সমবর্গীয় উদ্ভিদ্ এবং ইহাদের গঠনও প্রায় সম-প্রকার। সাধারণতঃ এগুলি খোসাসমেত শুষ্ক করিয়া উত্তর-ভারতের বাজারে বিক্রয় হয়। কিন্তু খোসা ছাড়াইয়া পাতলা খণ্ড করিয়া শুষ্ক করিয়া লইলে সেগুলি দেখিতে যেমন চিত্তাকর্ষক হয়, তাহাদিগের গুণও তেমনি অক্ষুণ্ণ থাকে; সঙ্গে সঙ্গে রন্ধনের পক্ষেও অনেক সুবিধা হয়। মানকচু ও ওলচূর্ণ আয়ুর্ব্বেদীয় প্রণালীতে কোন কোন রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কুমড়া বা বিলাতী কুমড়াঃ—অধিক দিন সংরক্ষণের জন্য গৃহস্থেরা সুপক্ব কুমড়া শিকায় ঝুলাইয়া রাখে। পূর্ণ পরিপক্ব কুমড়া সহজে পচে না। উহার ফালি হইতে আঁতি সম্পূর্ণরূপে অপসারণ করিয়া শুষ্ক করিলে সেরূপ ফালিও কিছু কাল ভাল থাকে। সুলভ ও সহজপ্রাপ্য সব্জী বলিয়া বিদেশে ভারতীয় ফৌজগণের খাদ্যার্থে কুমড়া প্রচুর পরিমাণে চালান দেওয়া হয়। শুষ্ক বেগুন ও মূলাও সৈন্য-বাহিনীর রসদের অন্তর্গত। বেগুন ও ছাল-ছাড়ান মূলাকে লম্বালম্বি দুই ফালি করিয়া শুকাইয়া লওয়াই নিয়ম।

কাঁটাল-বীজ ও পাণিফলঃ—কাঁটালের সময়েই কাঁটাল-বীচি ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। সংরক্ষণ করা হয় না বলিয়া অন্য সময়ে ইহা দুর্লভ। পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে ইহার অধিক প্রচলন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সেই উদ্দেশ্য একমাত্র শুষ্কীকরণ-প্রথা দ্বারা সংসাধিত হইতে পারে। শুষ্ক করার পূর্ব্বে বীজের অন্তঃ ও বহিঃত্বক্ অপসারিত করা দরকার। উত্তর-ভারতে পাণিফল বা সিঙ্গারার প্রচলন অধিক। খোসা-ছাড়ান শুষ্ক পাণিফল এবং পাণিফলের পালো বাজারে পাওয়া যায়। কাশ্মীরে অনেক গরীব লোককে শীতকালের খাদ্যের জন্য পাণিফলের আটার উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু এগুলির প্রস্তুত-প্রণালী সেকেলে ধরণের ও অনুন্নত। আধুনিক প্রথা অবলম্বন করিলে পাণিফলজাত আহার্য্যের প্রসার যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইতে পারে।

সাধারণ ফলের মধ্যে **আম ও কুলকে** সব্জীর মধ্যে গণ্য করিতে পারা যায়। আমচুর বা আম্‌সি দেশীয় শুষ্কীকরণ-প্রথায় প্রস্তুত হয়; কিন্তু সেগুলি দেখিতে কিম্বা গুণে তেমন ভাল হয় না। সুপুষ্ট কাঁচা আম উপযুক্তরূপে খণ্ড করিয়া সযত্নে শুষ্ক করিলে দেশ ব্যতীত বিদেশেও উহার কাট্‌তি হওয়া সম্ভবপর। বাজারে শুষ্কীকৃত টোপা কুলেরও কিয়ৎ পরিমাণে কাট্‌তি আছে। বিহার ও যুক্তপ্রদেশে শুষ্ক কুল বা বেরী চূর্ণ করিয়াও বাজারে বিক্রয় হয়। উত্তমরূপে শুষ্কীকৃত চূর্ণ অনেক দিন ভাল থাকে। বিদেশীয় খাদ্য ও চাটনি প্রস্তুত-কারকগণ এইরূপ উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে পাইলে তাঁহাদিগের কার্য্যে প্রয়োগ করিতে পারেন।

কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠের বাজারের প্রতি যাঁহারা লক্ষ্য করিতেছেন, তাঁহারা অবশ্য বুঝিতে পারিতেছেন যে, সব্জী ক্রমশঃ দুর্মূল্য হইয়া উঠিতেছে। ইহার প্রতিকারের উপায় প্রধানতঃ দুইটি,—উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি, এবং এক ঋতুর অতিরিক্ত ফসলকে সংরক্ষণ করিয়া অন্য ঋতুতে সরবরাহের ব্যবস্থা। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে সব্জী-চাষের জমি ও উৎপাদনের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়াছে বলিয়াই অনুমান হয়; কিন্তু তৎসত্ত্বেও দ্বিতীয় উপায় উপেক্ষণীয় নহে। সংরক্ষিত সব্জীর ব্যবহারে এ দেশের লোকের আপাততঃ আগ্রহ না থাকিলেও অভাবের তাড়নায় অদূর ভবিষ্যতে সেরূপ হওয়া অসম্ভব নহে। তদ্ভিন্ন, শুষ্ক সব্জী-প্রস্তুত শিল্প অন্য প্রকারে লাভজনক হইতে পারে। ভারতের যে সকল প্রদেশে শুষ্ক সব্জীর প্রচলন আছে, এবং ভারতের প্রতিবেশী ব্রহ্ম, মালয় প্রভৃতি যে সকল দেশের লোক শুষ্ক মাছ, মাংস ও সব্জী ইত্যাদির ব্যবহারে অভ্যস্ত, সে সকল দেশেও শুষ্ক সব্জী কাট্‌তির সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প নহে, এবং অল্প চেষ্টাতেই তাহা সুসাধ্য হইতে পারে; কিন্তু জনসাধারণ এ বিষয়ে মনোযোগী না হইলে আমাদের অরণ্যে রোদনমাত্র সার হইবে।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

রবীন্দ্র-প্রয়াণে

হতভাগ্য বাঙালীর ঘরে এত বড় ভাগ্যবান্ কবি
লভেনি জনম কোন দিন; তোমার মনের নানা ছবি
গল্পে, গাথায়, চিত্রে, কথায়, নাটকে, নৃত্যে, প্রবন্ধে, গানে
আঁকিয়াছ আমরণ বিচিত্র ছন্দে সুরে স্বাধীন প্রাণে।

জীবিতকালে লভেছ তুমি দেশ-বিদেশে ভুবনময়
কবি-কাম্য শ্রেষ্ঠ খ্যাতি, শ্রদ্ধা ও পূজা, এ কথা মিথ্যা নয়;
যা কিছু দিবার ছিল দিয়ে গেছ অকাতরে প্রতিদিন,
সব শেষ করি, বিশ্ব-কবি, হ'লে আজ অসীমেতে লীন।

যত দিন যাবে পূর্ণভাবে তত পাবে তোমা দেশবাসী,
জাতির অন্তরে নিভৃত কুঞ্জে স্ব-রূপে দাঁড়াবে আসি;
তোমার প্রাণের বেদিকার 'পরে সবে মিলিবে যখন
আজিকার বিরহ-বেদন মেঘল করিবে কি স্মরণ?

আজ কিন্তু চোখে জল, বুক ফেটে যায় মহা বেদনায়!
শ্মশানের স্মৃতি, অতি অকরুণ ব্যথা দেয় চেতনায়!

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী।

২১

বৎসর খানেক পরের কথা।

সুধীশ কি একটা কাজে কলিকাতায় আসিয়াছিল। পাঁচ বার অগ্র-পশ্চাৎ করিয়া অবশেষে মাসিমার নিকট হইতে ঠিকানা লইয়া সে নেলীর সহিত দেখা করিতে গেল।

একটি লেপচা যুবতী একটি অত্যন্ত শীর্ণ ক্ষীণ শিশুকে লইয়া সুধীশের সহিত কথা বলিতে লাগিল,—নেলী বাড়ী নাই, সকলেই বাহিরে গিয়াছে।

সুধীশ না বসিয়া কার্ডখানা দিয়া বলিল, "তাঁকে বলবে, আমি সন্ধ্যের দিকে আসব। এইটি কি তাঁর ছোট ছেলে?" বলিয়া সে তুড়ি দিয়া শিশুটির দিকে হাত বাড়াইল। রুগ্ন শিশু কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহার দিকে হেলিয়া পড়িল।

সুধীশ সন্তর্পণে তাহাকে বুকে লইয়া শিহরিয়া মনে মনেই বলিল,—এও ত নেলীকে ফাঁকি দেবে দেখছি! হায় হতভাগিনী!

অস্থিসার শিশুটি সুধীশের কাঁধে মাথা রাখিয়া অল্প অল্প সুর করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছে দেখিয়া লেপচা যুবতী বলিল, "বাবু, ছেলেটা বিশ্রী কাঁদুনে, চেনা লোকের কাছেই যেতে চায় না, কিন্তু আপনার কাছে বেশ গেছে ত!"

সুধীশ একটু হাসিল, ভাবিল, মাতৃশোণিতের কি কোন মূল্য নাই? এক সময় ত নেলী তাহাকে সর্ব্বান্তঃ-করণে ভাল বসিয়াছিল!

ঠিক এই সময় গাড়ীর শব্দ পাইয়া সুধীশ ফিরিয়া চাহিল,—একটা ব্যাগ হাতে লইয়া নেলী অবতরণ করিতেছিল।

সুধীশ নিস্পন্দ হইয়া চাহিয়া রহিল।

নেলী শীর্ণ বিবর্ণ, তাহার চোয়ালের ও কণ্ঠার হাড় উঠিয়া পড়িয়াছে, কপালের সামনের চুল উঠিয়া গিয়াছে, চোখের কোল বসিয়া কালিমায় আচ্ছন্ন, এবং চশমায় আবদ্ধ। পরিপুষ্ট শোভন বক্ষ শুধু চর্ম্মাবৃত, বুঝি বা বক্ষ পঞ্জরের সহিত মিশিয়াই গিয়াছে। সুছাঁদ অঙ্গুলিগুলি কাঠির মত সরু এবং শ্রীহীন; কোন অঙ্গে কমনীয়তার চিহ্ন মাত্র নাই, বরং সর্ব্বাঙ্গেই কঠিন রুক্ষতা বিদ্যমান। একখানা কালাপাড় সাড়ী এবং সাদাসিধা জামা, আর পায়ে ফাটা দাগযুক্ত চামড়ার জুতা! ইহাই তাহার বেশ। সুধীশের মনশ্চক্ষে ভাসিতে লাগিল—কুমারী নেলীর অপরূপ লাবণ্যময়ী মূর্ত্তিখানি!

নেলী তাহাকে হঠাৎ দেখিয়া ভূত-দেখার মত চমকিয়া উঠিল; এক মুহূর্ত্ত তাহার চোখের তারা বড় হইয়া উঠিল। সে-ও কথা বলিতে পারিল না। আট বৎসর পরে দেখা,—সেই ষ্টেশনে দেখা হইয়াছিল,—আর আজ! দু'দিনের দৃশ্যে কত প্রভেদ!………

প্রথমে নেলীই কথা বলিল, হাত বাড়াইয়া ছেলেটার দিকে আগাইতে আগাইতে বলিল, "এঃ, কেন নিয়েছ এটাকে, এই নোংরা দুষ্টুটাকে? তার পর, কতক্ষণ এসেছ? কত দিন পরে দেখা! বোস তুমি। আমি পাঁচ মিনিট পরেই আসছি। এটাকে দেখছ ত? সকাল থেকে ছেড়ে গেছি, এখন একটু না খেয়ে ছাড়বে কি? কি রে?"—বলিয়া সে ছেলের পানে চাহিয়া হাসিল।

সুধীশ ততক্ষণে আত্মসংবরণ করিয়াছে। বলিল, "হাঁ, যাও, তুমি কাপড় ছাড়ো, একটু জিরোও। আমি বসে থাকছি, তুমি ব্যস্ত হয়ো না। তোমার আর সব ছেলে-মেয়ে কোথায়?"

"আনছি।"—বলিয়া নেলী ছেলে লইয়া চলিয়া গেল।

মিনিট পনের পরে বড় ছেলেটিকে লইয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া নেলী আসিয়া ঘরে ঢুকিল, প্রথমেই সুধীশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল তাহার কেশের অল্পতা। হিমানী ও গায়ত্রীর মত সুকেশিনী না হইলেও নেলীর চুল আনিতম্ব ছিল, কিন্তু এখন তাহা ঘাড়ের একটু নীচে পড়িয়াছে মাত্র।

নেলী তাহার দৃষ্টির অর্থ বুঝিয়া হাসিয়া বলিল, "চুলগুলো একেবারে গেছে। পাঁচটা ছেলেপুলে হ'লে আর কি কিছু থাকে?—সুবোধ, ওঁকে প্রণাম করো।"

ছেলেটি সুধীশকে প্রণাম করিতে আসিলে, সে তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইল। নেলীর ছেলেটি ছবির মত সুন্দর নয়, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা তাহাকে ব্যথিত করিল—ওর ছেলেদের শীর্ণ আকৃতি।

ছেলে দু'টিকে আদর করিতে গিয়া সুধীশ নিজের অন্তরের একটা আশ্চর্য্য ভাব দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল! হিমানীর ছেলে-মেয়েরা তাহার পক্ষে যাহা,—ইহারাও তাহাই। উভয়ের জননীকেই তাহাদের কুমারীবেলায় সমস্ত প্রাণ দিয়া সে ভালবাসিয়াছিল। কিন্তু হিমানীর সন্তানদের সে যে-দিন প্রথম দেখে,—সে-দিন সে তাহাদের পিতার অস্তিত্বকে মনের মধ্যে তিলমাত্র ঠাঁই দিতে পারে নাই! হিমানীর সন্তান—সুধীশেরই সন্তান, তৃতীয় ব্যক্তিকে সে মাঝে দাঁড়াইতে দেয় নাই। তাহার মনে এ প্রশ্ন মুহূর্ত্তের জন্যও উদয় হয় নাই। কিন্তু আজ নেলীর সন্তানকে বুকের ভিতর লইয়াও তাহার বুকটা তেমন করিয়া জুড়াইয়া গেল না! অথবা ইহাদের মুখে পিতৃ-সম্বোধন শুনিবার জন্য তাহার মনে বিন্দুমাত্র লোভ হইতেছে না! ইহাদের নিজস্ব ভাবিতেও তাহার বাধিতেছে; অটল সেনের মুখটা যেন সে প্রতি-ফাঁকে দেখিতে পাইতেছে।

লেপচা মেয়েটি ছোট ছেলেটিকে লইয়া আসিল, বলিল, "বড় কান্না আরম্ভ করেছে, আপনার কাছে না গেলে ঠাণ্ডা হবে না।"

নেলী তাহাকে কোলে লইয়া বড়টিকে কহিল—"যাও, তুমি খেলা করো গে।"

নেলীর ক্রোড়স্থিত শিশুটির দিকে চাহিয়া সুধীশ বলিল, "এ ছেলেটির শরীর ত দেখছি বড়ই খারাপ। এত রিকেটি—"

নেলী ম্লানমুখে বলিল, "দু'টো আমায় ফাঁকি দিয়ে গেছে—এটাও যাবে। আমার জীবনটা মরুভূমি হয়ে গেছে সুধীশ!"

সুধীশ সমবেদনার সহিত বলিল, "তোমার দু'টি ছেলের স্বাস্থ্যই বড় খারাপ দেখছি। নিজে তুমি এমন যশস্বিনী চিকিৎসক—"

তাহাকে মুখের কথা শেষ করিতে না দিয়াই নেলী প্রচ্ছন্ন বেদনার সহিত বলিল, "সব জানি সুধীশ, ঘরে ঘরে আমি ছেলেদের পথ্য সম্বন্ধে তাদের মায়েদের উপদেশ দিয়ে বেড়াই, কিন্তু আমার ছেলেকে স্বাস্থ্যবান্ করতে পারি না। শুধু জানলেই ত আর ছেলেদের স্বাস্থ্য ফিরবে না, খোরাক যোগাতে হবে ত!"—নেলী একটু থামিল, বুঝি বা পরের কাছে নিজের দৈন্য ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইল। কিন্তু সে চেষ্টা নেলীর ব্যর্থ হইয়া গেল। এতখানি দুঃখ ও বেদনা সে একাই নিঃশব্দে সহ্য করিয়া চলিয়াছিল,—কোন দিন কেহ সহানুভূতি প্রকাশ করে নাই, নেলীও কোন দিন কাহারও কাছে মনের কবাট উন্মুক্ত করে নাই। কিন্তু আজ যখন তাহার বিগত ঐশ্বর্য্যের দিনের একান্ত অন্তরঙ্গ সুহৃদ,—তাহার এক সময়ের জীবন-যৌবনের একমাত্র কাম্য সুধীশ, তাহার এই দুঃখ-দুর্দ্দশার দিনে একান্ত আত্মীয়ের মত তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন নেলী আর তাহার গুপ্ত-বেদনা ঢাকিয়া রাখিতে পারিল না।

সে বলিল, "ছেলেপুলে নিয়ে সংসার চালান যে কত শক্ত, তা ত বুঝতেই পাচ্ছ সুধীশ, বাছারা আমার আধ সের দুধ খেতে পায় না।"—বলিতে বলিতে তাহার দুই চোখ দিয়া দর-দর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে একেবারে ছোট মেয়ের মত আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

সমবেদনায় সুধীশের চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিল, সে কোন-কিছু ভাবিয়া দেখিবার পূর্ব্বেই দুর্ভাগিনীর মাথায় হাত রাখিয়া বাষ্প-গদগদ কণ্ঠে ডাকিল, "নেলী!"—নেলী অধিক উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল;—নিরুপায়া জননীর বুক-ভাঙ্গা রোদন! সুধীশ কাতর হৃদয়ে নিঃশব্দে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিল। কোলের ভিতর ছেলেটি কাঁদিয়া উঠিতে নেলী আত্মসম্বরণ করিয়া চোখ মুছিয়া মুখ তুলিল।

এই পূর্ণ-যৌবনার অপগত যৌবনশ্রীর প্রতি চাহিয়া

সুধীশ ব্যথিত দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরাইয়া লইল। মানুষের দুরদৃষ্ট কি তাহাকে এমন করিয়া ভাঙ্গিয়া গড়ে?…

নেলী ছেলেটিকে একটু শান্ত করিলে সুধীশ কাসিয়া রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিল, "এক সময় আমরা দু'জনে একত্র লেখাপড়া করেছি,—আমাদের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। সে-দিনের কথা মনে করে, আজ তোমার বিপদের দিনে, আমাদের পাশাপাশি দাঁড়াতে দাও। তোমার দুর্দ্দিনে আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতায় যা হয়ে ওঠে, তা আমি করতে চাই,—তুমি তাতে বাধা দিও না।"

নেলীর মুখ ছাইয়ের অপেক্ষাও বিবর্ণ হইয়া গেল। মিনিট দুয়েক মৌন থাকিয়া সে সংবৃত কণ্ঠে বলিল, "তা হয় না সুধী! তোমার সাহায্য নিলে, আমার বিবেক আমায় ধিক্কার দেবে।"

সুধীশ ব্যথিত ভাবে বলিল, "কেন সে পুরোন কথা তুলছ? আমি সে ভেবে বলিনি। সে কথা ভাববার আজ আর আমাদের অধিকারও নেই। তুমিও ছেলে-পুলের মা হয়েছ, আমিও বিয়ে করেছি। ঘরে আমার সুশীলা স্ত্রী আছে।"

নেলী চোখ মুছিয়া বলিল, "বিয়ে করেছ? কবে? কেমন বউ হয়েছে?"

সুধীশের মনশ্চক্ষের সম্মুখে তন্বী গায়ত্রীর চারু অবয়ব ও হাসিমাখা মুখখানি ভাসিয়া উঠিল। সমস্ত অন্তর যেন তাহার স্নিগ্ধতায় ভরিয়া গেল; সে আবেগভরা কণ্ঠে বলিল, "আমি ভাগ্যবান্ নেলী! যাকে পেয়েছি, তার অন্তর-বাহির সমান সুন্দর, সে দেবী!"

নেলীর মুখে একটু সলজ্জ বেদনার ছায়া পড়িল, তবু কৌতূহল দমন করিতে পারিল না; গায়ত্রীর সম্বন্ধে ঔৎসুক্যের সহিত খোঁজ লইতে মনে বোধ হয় অজানিত প্রচ্ছন্ন গর্ব্বে আঘাত লাগিয়াছিল,—এক দিন যে তাহাকে ভাল বাসিয়াছিল, কামনা করিয়াছিল,—আজ তার রুচি কোন্ কোঠায় পৌছিয়াছে!

সুধীশ তা বুঝিল কি না, জানি না; কিন্তু গায়ত্রীর প্রেমে মুগ্ধ সুধীশ তাহার যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিল, তাহাতে নেলী শ্রেষ্ঠত্ব বোধ করিবার কিছু সুবিধা পাইল না।

তাহার পর সেই প্রসঙ্গ চাপা দিয়া সুধীশ পুনরায় পূর্ব্বের প্রস্তাব তুলিল। নেলী দৃঢ়ভাবে বলিল, "তা হয় না ভাই, আমার কর্ম্মফল আমি একাই ভোগ করব, তুমি ঝক্কি নেবে কেন?"

দু'জনেই ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিবার পর সুধীশ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "মাষ্টারমশায় কি কোনই খোঁজ রাখেন না?"

নেলীর মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল; কণ্ঠস্বরে তিক্ততা সে ঢাকিতে পারিল না, বলিল, "না……"

তাহার পর অকস্মাৎ সুধীশের চোখের উপর চোখ রাখিয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "সুধী, আজও কি আমার দুঃখ শুনলে তুমি ব্যথা পাবে? আমার জন্য আজও কি তোমার মনে মায়া আছে?"—বলিতে বলিতে তাহার গালের উপর দর-দর ধারে জল গড়াইয়া আসিল।

সুধীশ মুখে কিছু বলিল না, শুধু নেলীর শীর্ণ হাতখানি হাতে তুলিয়া লইল।

নেলী চোখ মুছিল না, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "পৃথিবীতে যা কিছু লাঞ্ছনা, যা কিছু দুর্ভাগ্য হতে পারে, আমার তা সবই হয়েছে। এই বয়সের মধ্যে আমি পৃথিবীর সব কটু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি।"—একটু থামিয়া পুনরপি ভিজা-গলায় বলিতে লাগিল, "চারি দিকে এমন কেলেঙ্কারী আরম্ভ করে দিলে যে, আমি আর বাইরে মুখ দেখাতে পারতুম না। টাকাই তার কাছে সব। প্রথমে আরম্ভ করলে যেখানে যত নোংরা ব্যাপার, সব হাতে নিতে লাগল—মোটা টাকা পাবে বলে। ওই সব নোংরা কাণ্ডের মধ্যে ঘুরতে-ঘুরতে তার এমন অধঃপতন হ'ল, যা তুমি ধারণাও করতে পারবে না! যেমন মাতাল, তেমনি উচ্ছৃঙ্খল।"—একটুখানি নীরব থাকিয়া নেলী আবার বলিল, "সবটাই বলি,—কেন পৃথক হয়েছি।…… এক দিন ঐ রকম একটা বিশ্রী কেসে গেছে। রাত্রি যখন আড়াইটা, তখন আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। অত রাত্রেও ফেরেনি দেখে অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। হঠাৎ চোখ পড়ল—নীচেকার ঘরে; আয়ার ঘরে আলো জ্বলছে। আর তার চৌকির ওপর একটা পুরুষ-মানুষের পা দেখা যাচ্ছে!………

"আয়ার বয়স বোধ হয় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হবে। অবাক্ হয়ে গেলুম। বিরক্ত হয়ে নেমে গিয়ে যা দেখলুম, তাতে আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হ'ল!…আয়ার

সঙ্গে একত্রে শুয়ে সে ঘুমুচ্ছে!···অনেক সহ্য করেছিলুম, কিন্তু এটা আর পারলুম না। তার পরদিনই আমি পৃথক্ হয়েছি।

সুধীশ দাঁতে দাঁত পিষিয়া বলিল, "ব্রুট!"—একটু পরে বলিল, "হয় ত জিজ্ঞেস না করাই উচিত, তবুও না জিজ্ঞেস করে পারছি না।"—নেলী দৃষ্টি উন্নত করিয়া চাহিল। সুধীশ বোধ হয় যাহা জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহা দমন করিয়া লইল, বলিল, "তার পর কি সে পাপিষ্ঠ কোন দিনও অনুতপ্ত হয়ে এসে ক্ষমা চাইলে না?"

নেলী বিষণ্ণ হাসিল, তাহার চোখের ভিতর জল চক্‌-চক্ করিয়া উঠিল; ম্লান হাসিয়া বলিল, "কেন আস্‌বে? বাড়ীতেও শুনি এখন রাসলীলা বসেছে। কে এক পিস-শাশুড়ীর বউ, কে এক মামী-শাশুড়ী—বাড়ীতে জাঁকিয়ে বসে রাধা-চন্দ্রাবলীর পালা গাইছে!···আমি না কি ভ্রষ্টা, তাই স্বামী ত্যাগ করে স্বৈরিণীর মত জীবন যাপন কচ্চি!"—বলিয়া অসীম লজ্জা ও বেদনার মধ্যেও নেলী একটু হাসিল।

দু'জনেই অনেকক্ষণ নির্ব্বাক্ থাকিবার পর সুধীশ ডাকিল—"নেলী!"

নেলী মুখ তুলিয়া চাহিয়া রহিল, যৌবন নাই, রূপ নাই—তবু চোখের দৃষ্টি আজও আছে তেমনই গভীর অতল-স্পর্শী! সুধীশ তাহার হাতখানির উপর আস্তে আস্তে আঙ্গুল বুলাইতে বুলাইতে সঙ্কোচ-কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলিল, "একটা সংশয় আমার মনে সর্ব্বদাই জাগে!"—বলিয়াই সে একটু চুপ করিল; তাহার পর দ্বিধাজড়িত স্বরে আবার বলিল, "কি করে তুমি আমায় ভুলে গেলে?—আমি কি তোমার প্রাণের চেয়েও বেশী আদরের ছিলুম না। মাষ্টার মশায়, ক'মাসে কি করে সে ভালবাসা উড়িয়ে দিলেন?"

নেলীর সমস্ত দেহের রক্ত যেন মাথায় উঠিল; সে প্রাণপণে আত্মসংবরণ করিয়া মিনতিভরা সুরে বলিল, "এত দিন পরে সত্যি কথা বললে তুমি বিশ্বাস কি করতে পারবে"—উত্তেজনায় তাহার সমস্ত দেহ থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

সুধীশ তাহার হাতখানি সস্নেহে কোলের উপর রাখিয়া বলিল, "কেন অবিশ্বাস করব?"

নেলী পিঠের দিকে এলাইয়া পড়িয়া হাঁপাইতে লাগিল; তাহার পর মাথা তুলিয়া বলিল,—"আগুন নিয়ে খেলতে গিছলুম, ভাবতে পারিনি—যতই যা শিখে থাকি, আমি মেয়ে মানুষ, ভগবান্ আমাদের বেশী উড়তে দেখলে ডানা পুড়িয়ে দেবেন। আগুনের গোলকধাঁধায় ঢুকে খেলতে গিয়ে কাপড়ে আগুন ধ'রে গেল, বেরুবার পথ আর খুঁজে পেলুম না!—তোমার কাছে ফিরে আসবার অধিকার হারিয়ে ফেললুম সুধী,—আমার দুর্ব্বুদ্ধির ফল আমায় মাথা পেতে নিতে হ'ল। এখানে আসবার ছ'মাস পরেই সুবোধ হয়েছে!"

মুখের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই নেলী সামনের দিকে ঝুঁকিয়া সংজ্ঞা হারাইয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িল। হতবুদ্ধি সুধীশ ক্ষিপ্রহস্তে তাহাকে ধরিয়া-ফেলিয়া সাংঘাতিক আঘাতের হাত হইতে রক্ষা করিল। তাহার পর তাহাকে কাঁধের উপর তুলিয়া লইয়া লেপচা মেয়েটাকে ডাকিয়া শয়ন-কক্ষটি দেখাইয়া দিতে বলিল।

মেয়েটা হ্যাবাচ্যাকা খাইয়া কাঁদিয়া উঠিল; তাহার পর জানাইল শয়ন-কক্ষ দ্বিতলে। সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি বাহিয়া, নেলীর অচেতন লঘু দেহখানি বুকে লইয়া সুধীশ উপরে উঠিতে লাগিল। নেলীকে শয্যায় শোয়াইয়া প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে সে ভালো করিয়া চারি দিক চাহিয়া দেখিতে লাগিল; তাহার পর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ওপরে আন্‌লে কি করে সুধী?"

সুধীশ তাহার কপালে ধীরে-ধীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল,—"কেন, এ দেহে কি তোমায় বয়ে আনবার মত শক্তিও নেই? তোমার ও দেহে আছে কি?"

নেলী আগ্রহের সহিত বলিল, "তবু অত সরু সিঁড়ি দিয়ে কি করে আন্‌লে বলো ত শুনি!"

সুধীশ বলিল, "কেন? তুলে কাঁধে ফেলে আনলুম। তোমার হাড়গুলোও বুঝি হাল্কা হয়ে গেছে!"

নেলী সুধীশের হাতখানা বুকের উপর রাখিল। তাহার দু'টি আঁখি-প্রান্ত হইতে নিঃশব্দে বিন্দু-বিন্দু জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সুধীশের চক্ষু দু'টিও আর্দ্র হইয়া উঠিল। দু'জনেই কিছু কাল নিস্তব্ধ,—আজ বহু দিনের জমাট একখানা কালো মেঘ বুঝি বা দক্ষিণা বায়ুহিল্লোলে উড়িয়া গিয়াছে!

দুই জনেরই মন একটু লঘু হইলে সুধীশ তাহার চুলের ভিতর আঙ্গুল চালাইতে চালাইতে বলিল, "শরীরের অবস্থা যা হয়েছে, তুমি বাঁচবে কি করে?"

নেলী বলিল, "বাঁচবার ইচ্ছেও আর নেই সুধী, শুধু ছেলে দুটোর জন্যেই যা বলো। আমি ত মরে বেঁচে আছি। জীবনে না আছে শান্তি, না আছে সুখ, না আছে আশা।"

সুধীশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তুমি দিন-কতক চেঞ্জে যাও। বিশ্রামও হবে, আর জল-হাওয়া পরিবর্ত্তনে কিছু উপকারও হবে।"

নেলী ক্ষীণ হাসিল, বলিল, "সুধী, ভুলে যাচ্ছ কেন, এ সংসারের আমিই কর্ণধার। বিশ্রাম করলে আমার সংসার চলবে কি করে?"

সুধীশ তাহার হাতখানি কাঁধের উপর লইয়া ঈষৎ নত হইয়া বলিল, "মাস-দুইয়ের মত না হয় সংসারের কর্ণধার আমাকেই হতে দাও না নলু, ও-ভাবনাটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। তোমায় যেতেই হবে—"

নেলী ঘাড় নাড়িল, গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "স্বভাবটি এখনও ঠিক সেই আগের মতই আছে,—অল্পেই ব্যথা পাও! কিন্তু তা কি হয় সুধী, তুমি বিয়ে করেছ, আমাকে চেঞ্জে পাঠানর কি কৈফিয়ৎ স্ত্রীর কাছে তুমি দেবে? আমি আগুনে হাত দিয়েছি, হাত পুড়বেই,—কিন্তু নিরপরাধ এক জন কেন তার জ্বালাটা সইবে?"

কথাটা সঙ্গত। সুধীশ আর জেদ করিতে পারিল না, বরং মনে হইল, সে গায়ত্রীর কাছে বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছে। তবু বলিল, "বেশ, যেয়ো না। কিন্তু আমি যা পারি, তোমার ছেলেদের জন্যে পাঠাব, ফেরৎ দিতে পারবে না।"

নেলী একটু থামিয়া বলিল, "এখন থাক্ সুধী, তবে তোমায় কথা দিচ্ছি, অভাব হ'লে জানাব।"

২২

গায়ত্রীর প্রেম সুধীশকে সম্ভবতঃ বিশ্বজগৎ বিস্মৃত করিয়া দিতে পারিত, হয় ত সে আপনাকে চরম সুখী মনে করিতে পারিত, কিন্তু তাহা হইতে দিল না—তাহার জীবনের এক সময়ের একান্ত বাঞ্ছিতা এবং অধুনা অনুকম্পার পাত্রী,—হিমানী ও নেলী! দু'জনেরই অভাব অতিরিক্ত, দু'জনের স্কন্ধেই ভিক্ষার ঝুলি, দু'জনেরই ম্লান মুখ, এবং সংসারের সহিত কঠোর সংগ্রাম করিতে গিয়া উভয়েই রক্তাক্তহৃদয়। উভয়ের জন্যই সুধীশ ব্যথাতুর; কাজেই গায়ত্রীর প্রেমে সে আত্মহারা হইতে পারিল না।

নেলীর জন্য তার বেদনা যতই থাক, তার ব্যবহারে তাহার প্রতি ঘৃণা ও বিরক্তি যে ছিল না, তা নয়; কিন্তু এবার কলিকাতা হইতে সে ভিন্ন ধারণা লইয়া আসিয়াছিল, এবং হৃতস্বাস্থ্য নেলীর মুখ অহর্নিশি তাহাকে কাঁটার মত বিঁধিতে আরম্ভ করিল। তবু সে দূরে, তাহার জন্য কিঞ্চিৎ উদ্বেগ হইলেও হিমানীর মত তাহাকে লইয়া অনুক্ষণ অন্তর্যুদ্ধ চলিল না। কিন্তু হিমানী তাহার মনে সর্ব্বদাই অনুতাপের আগুন জ্বালিয়া রাখিয়াছে। সুধীশ কিছুতেই তাহার দাহন হইতে নিষ্কৃতি পায় না।

দূরদর্শী অতীশ যাহা বলিয়াছিল, তাহা যদি সুধীশ স্বীকার করিত, তবে এক দিক্ দিয়া সে শান্তি পাইত নিশ্চিতই। বিবাহের পর হইতে কুটুম্ব-সম্পর্কিতা হিমানীর সহিত তাহার মেলামেশা যথেষ্ট বাড়িয়াছে। গায়ত্রীকে যদি হিমানীর সত্য পরিচয় সে জানাইয়া রাখিত, তবে গায়ত্রীর ভয়ে, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, হিমানীর ত্রিসীমায় ঘেঁষিতে পারিত না; কিন্তু তাহা সে করে নাই। কাজেই হিমানীর সম্বন্ধে তাহার সতর্কতার কোন প্রয়োজন ছিল না। হিমানী যখন সুধীশের সহিত গল্প করে, তখন ক্ষণেকের জন্য যে সে তাহার গভীর দুর্ভাগ্যের কথা বিস্মৃত হইয়া থাকে, তাহা সুধীশ বোঝে। সে ত অগ্নিগর্ভ গিরির মত অনুক্ষণ জ্বলিতেছে, তাহার অন্তর্দ্দাহ তিলেকের জন্য কমিবার নয়, তবু এক লহমার জন্যও যে তাহার মুখের গাঢ় অন্ধকার কতকাংশে অপসারিত হয়, তাহাতেই সুধীশ পুলকিত হইয়া উঠে। হিমানীর প্রতি সে যে আচরণ করিয়াছে, তাহা সে কোনও দিন ক্ষমা করিতে পারিবে না;—তা কি ক্ষমা করা যায়? উপেক্ষিত হইয়া কে কবে সেই হীনতা বিস্মৃত হইতে পারে? আবার ভাগ্যচক্র তাহাকে আনিয়া ফেলিয়াছে তাহারই কাছে,— সেই নিষ্ঠুর, অকরুণ, চপলচিত্ত সুধীশের কাছে!

হিমানীর মনের অবস্থা সুধীশ জলের মত স্পষ্ট বোঝে। যেখানে তার সাম্রাজ্ঞীর আসন ছিল, সেখানে সে

কৃপাভিখারিণী হইয়া দিনাতিপাত করিতেছে। তাহার সংসার, তাহার গৃহস্থালী, সর্ব্বোপরি তাহাকে,—গায়ত্রী একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে, সুধীশকে কোন দিক্ দিয়া এতটুকু ছোঁয়াচ দিবার অধিকারও হিমানীর নাই; সুধীশের পাশে থাকিয়াও যে সর্ব্বপ্রকারে তাহাকে বর্জ্জন করিয়া হিমানীকে কুটুম্বিনীর মুখোস পরিয়া থাকিতে হয়, ইহাতে কি গায়ত্রীর প্রতি তাহার সপত্নীবৎ বিদ্বেষ জাগে না? তার অন্তরাত্মা কি নিদারুণ যন্ত্রণায় মরণার্ত্তের ন্যায় আর্ত্তনাদ করে না?

সুধীশ যেন কণ্টকিত হইয়া ওঠে। দিনের পর দিন তাহার অনুভূতি যেন অধিক সতর্কতা অবলম্বন করে, তাহার আতঙ্ক হয়; আজ যদি হিমানী তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, কোথায় তোমার সে প্রেয়সী,—যাহার জন্য আমায় ত্যাগ করিয়াছিলে? আজ কোন্ মনোমন্দিরে গায়ত্রীকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছ?

সুধীশকে শশব্যস্ত থাকিতে হয়। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে হিমানীকে সদা সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করে, অসম্ভব যত্ন করে। তার অতিযত্ন এক-এক সময় যেন মাত্রা ছাড়াইয়া যায়। হিমানীর মুখের একটি কথার প্রতীক্ষায় সে যেন উন্মুখ হইয়া থাকে, এবং তার কোন-কিছুর প্রয়োজন হইবার পূর্ব্বেই তাহা হিমানীর হাতের কাছে একান্ত আগ্রহের সহিত আনিয়া দেয়। হিমানীর বুকে সে যে শেলাঘাত করিয়াছিল, তাহা ফিরাইবার কোন উপায় নাই,—তবু সে প্রাণপণে তাহাতে শীতল প্রলেপ দিতে থাকে,—যাতনা যদি একটু কমে!

তাহার এই অতি-যত্ন এক জনের কিন্তু একটু অসহ্য ঠেকে,—সে গায়ত্রী। হিমানী তার আত্মীয়া, তাহাকে যা-কিছু যত্ন করিতে হয়, গায়ত্রীই করিবে,—কিন্তু তার স্বামীর সুতীক্ষ্ণ চক্ষু যে হিমানীর প্রত্যেক প্রয়োজন সম্বন্ধে সতত সজাগ থাকিবে, এবং গায়ত্রীকে জানাইবার অপেক্ষা না রাখিয়া সোজা আসিয়া হিমানীর হাতেই পড়িবে, এটা গায়ত্রীর মনে খোঁচা দেয়। তাহাদের প্রসাধন দ্রব্য, বস্ত্রাদি, যা কিছু সুধীশ আনে—সমান ভাগ করা, এবং হিমানীকে ডাকিয়া সুধীশ তাহার অংশ তাহার হাতেই তুলিয়া দেয়,—গায়ত্রীর হাতে দিবার অপেক্ষায় থাকে না।

গায়ত্রী নিজে যা কিছু করে, হিমানীকে সমান ভাগ করিয়া দেয়, তাহাতে সে আনন্দ পায়, কিন্তু তাহার স্বামীর কাছেও যে হিমানীর সহিত তাহার কোন পার্থক্য থাকিবে না; ইহাতে গায়ত্রীর মর্ম্মে আঘাত লাগে। সে হিমানীর হিংসা করে না,—তাহাকে ভালবাসে,—হিমানী তাহার আশ্রিতা, দুঃখিনী ভ্রাতৃজায়া, তাহার প্রিয় সখী, এবং নিকটতমা আত্মীয়া। গায়ত্রীর জন্যই সুধীশের সহিত হিমানীর সম্পর্ক, অথচ সে হিমানীর তত্ত্ব লয় গায়ত্রীকে অতিক্রম করিয়া। যেন এ বিষয়ে গায়ত্রীর বলিবার কিছুই নাই; যেন সুধীশের স্নেহে, সুধীশের অর্থে, সুধীশের প্রতি অধিকারে হিমানী গায়ত্রীর অপেক্ষা একবিন্দু ন্যূন নয়।

ছোট একটা ঘটনা,—কিন্তু তাহাই গায়ত্রীকে সময়-বিশেষে ব্যথিত করিল। গায়ত্রী শেলাই করিতেছিল, দেখিয়া সুধীশ উহার পরদিনই তাহার জন্য সেলাইয়ের কল আনিয়া দিল,—কিন্তু উহা তার জন্য আসিলেও, হিমানীর জন্য আসিল—দামী গ্রামোফোন; রেকর্ডও আসিল এক রাশি, যেগুলি পছন্দ হয় নির্ব্বাচন করিয়া লইবে। শেলাইয়ের কল গৃহস্থালীর পক্ষে প্রয়োজনীয়; উহার প্রয়োজন কেহই অস্বীকার করে না, কিন্তু তাহার সহিত আনন্দ বা বিলাসের সংস্রব নাই। শেলাইয়ের কলটা যেমন সোজা আসিল গায়ত্রীর ঘরে, বাজনাটাও তেমনই গেল সরাসরি হিমানীর ঘরে। শেলাইয়ের কল একা নিভৃতেই পড়িয়া রহিল; কিন্তু হিমানীর বাজনা লইয়া সারা দিন চলিল আনন্দস্রোতের কলগুঞ্জন। গায়ত্রী শান্ত, সহিষ্ণু, বুদ্ধিমতী; কিন্তু সুধীশের প্রতি অবিচল অনুরাগই তাহাকে আজ ঈর্ষান্বিতা করিয়া তুলিল। স্বামী ও ভ্রাতৃজায়ার আনন্দসমারোহের ভিতর হইতে এক সময় সে নিঃশব্দে উঠিয়া গেল। মনটা যেন কি-একটা অজ্ঞাত বেদনায় ক্লিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল; গায়ত্রী খানিকটা এ-ধার ও-ধার করিয়া নূতন কল লইয়া আনমনে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

গান শুনিবার আগ্রহের মাঝেই এক সময় অকস্মাৎ সুধীশ আবিষ্কার করিল গায়ত্রী চলিয়া গিয়াছে! তার মনটা অশান্ত হইয়া উঠিল, আর সেখানে বসিতে ইচ্ছা হইল না। হয় ত বা অন্তরের নিগূঢ়তম প্রদেশের শাসন কানে বাজিলে সে-ও উঠিয়া আসিল। গায়ত্রীর চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া ধীরে-ধীরে তাহার মুখখানি নিজের

দিকে ঘুরাইয়া ক্ষণকাল অনিমেষে চাহিয়া থাকিবার পর আস্তে আস্তে বলিল, "তুমি রাগ করেছ রাণু!"

রাগ? ঠিক রাগ নয়, তবে গায়ত্রীর চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল বৈ কি! কিন্তু সুধীশের স্নেহস্রাবী চক্ষুর দিকে চাহিয়া গায়ত্রীর মনের ভার লঘু হইয়া গেল। সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "কেন?"

সুধীশ তাহার এলো-চুলগুলি নাড়িতে নাড়িতে নত নেত্রে চাহিয়া বলিল, "হিমানীকে বাজনাটা দিলুম বলে!"

গায়ত্রী লজ্জা পাইল। সুধীশ এমন করিয়া তাহাকে হাতে-হাতে ধরিয়া ফেলিবে, এ আশঙ্কা ছিল না; সে একটু মৌন থাকিয়া সুধীশের কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া কুণ্ঠিত স্বরে বলিল,—"মনে একটু ছায়া পড়েছিল, সেটা কেটে গেছে।···আমার তুমি আছ,—ওর ত কিছু নেই!"

সুধীশ মৃদুকণ্ঠে বলিল, "হাঁ, ওর কিছু নেই। ও দুঃখী বলেই ওকে ভালবাসি!"

সে-দিনের মেঘ কাটিয়া গেল বটে, কিন্তু গায়ত্রী তেমন শান্তি পায় না। সে ঈর্ষাপরায়ণা নয়, আর সন্দিগ্ধ-চিত্তও নয়, তবু হিমানীর আচরণ দেখিয়া সে বিস্মিত হয়। পরগৃহে পরাশ্রিতার যতখানি কুণ্ঠিত থাকা সঙ্গত, হিমানীতে তাহার বাষ্পও নাই, সে স্বাধীনা গৃহিণীর মত থাকে। বেশভূষায় সে গায়ত্রীর সমানই থাকে, প্রসাধনেও তার বিরাগ নাই। গায়ত্রী বিস্মিত হইয়া ভাবে, প্রসাধন-মার্জ্জিত মুখের পানে যদি স্বামীর স্নেহ-বিমুগ্ধ দৃষ্টি না পড়ে, তবে তেমন প্রসাধনে রুচি আসে কি করিয়া!

তার প্রফুল্ল মুখের পানে চাহিয়া গায়ত্রী তার হতভাগ্য অগ্রজকে স্মরণ করিয়া গোপনে চোখ মোছে। হিমানী কি সেই হতভাগ্যকে ভুলিয়া গেল?···

হিমানী ও সুধীশের আর একটা ব্যবহার তাহার বিসদৃশ লাগে,—উহাঁরা পরস্পরের নাম ধরিয়া ডাকে। হিমানী সম্পর্ক-কনিষ্ঠকে ডাকিলেও ডাকিতে পারে,—কিন্তু সুধীশ ডাকে কি হিসাবে, তাহা সে ভাবিয়াই পায় না।··· তাছাড়া, উহারা যে পরস্পরের সঙ্গটা বেশ ভালবাসে, তাহা গায়ত্রী অন্তরে অন্তরে অনুভব করে। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কোন কিছু বলা তাহার স্বভাবের বাহিরে।

শ্রমক্লান্ত সুধীশ গৃহে ফিরিলে হিমানী আসিয়া বসে, গল্প করিতে থাকে, সহজে আর ওঠে না! গায়ত্রী ছটফট করিতে থাকে স্বামীকে একান্তে পাইবার জন্য, কিন্তু সুধীশ যে কোনরূপ অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতেছে, তাহা মনে হয় না। শেষে হিমানী উঠিয়া গেলে, গায়ত্রী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলে, "বৌদি'র গল্প আর শেষ হয় না!"—সুধীশ বলে, "ছি, ওর হিংসে করো? ওর দুর্ভাগ্য ভাব দেখি একবার!"

গায়ত্রী লজ্জা পায়। মনে পড়ে, সত্যই তাহার জন্য হিমানী কতখানি ত্যাগস্বীকার করিয়াছিল। প্রাপ্ত-যৌবনা গায়ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ করিবার দায়িত্বে সে স্বামীর শয্যার অংশ লইতে পায় নাই। তাহাদের মুকুলিত প্রেমের মুখে গায়ত্রী গুরুভার পাষাণের মতই চাপিয়া বসিয়া ছিল,—তাহারা কোন দিন প্রাণ খুলিয়া হাসিতেও পায় নাই।

এ কথা মনে হওয়ার সঙ্গেই গায়ত্রীর স্নেহশ্রদ্ধা-বিমুগ্ধ অন্তর হিমানীর নিকট অবনত হইয়া পড়ে। গায়ত্রী সমস্ত অপ্রিয় চিন্তাকে মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে চায়,—হয় ত কতকটা কৃতকার্য্যও হয়; কিন্তু আবার কখন কি কতকগুলা চোখে পড়ে, আর তাহার অন্তর ভারাক্রান্ত হইয়া ওঠে।

২৩

বৎসর ঘুরিয়া যাইবার পর সুধীশ জানিতে পারিল, গায়ত্রী গর্ভবতী হইয়াছে।

প্রথম সন্তানের শুভাগমন-সংবাদে সুধীশ আশাতীত আনন্দলাভ করিলেও, সেই ক্ষণেই তার মনে পড়িল, হিমানীর সহিত অপ্রত্যক্ষ ভাবে গায়ত্রীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে, এবার আরম্ভ হইবে তাহাদের সন্তানদের মধ্যে।

তাহাকে বিমনা দেখিয়া গায়ত্রী সলজ্জ দৃষ্টি তুলিয়া, স্বামীর প্রতি নম্র নেত্রপাত করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, "কি ভাবছ?"

সুধীশ অন্তরে লজ্জা পাইলেও হাসিমুখে গায়ত্রীকে কাছে টানিয়া লইল, তাহার পদ্মপত্রাক্ষে সপ্রেমচুম্বন করিয়া মৃদু হাসির সহিত বলিল, "ভাবছি, এত দিনে সত্যই আমাদের ঘাড়ে দায়িত্ব এসে পড়বে! আমাদের সন্তান হবে!···কানে কেমন আশ্চর্য্য ঠেকে, না?"

গায়ত্রী লজ্জারক্ত মুখখানি তাহার বুকে লুকাইল।

সুধীশ তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কানে কানে বলিল, "কি হবে বল ত, রাণু, খোকা না খুকুমণি?"

গায়ত্রী মুখ না তুলিয়াই সলজ্জ ভাবে বলিল, "জানি না, যাও!......"

সুধীশ পুলকিত কণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা, কি হ'লে বেশি আহ্লাদ হবে শুনি? খোকন, না খুকু!"

গায়ত্রী মুখখানি অধিক লুকাইয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "খোকন!"

সুধীশ বলিল, "না, একটি খুকুমণি। প্রথমবারে মেয়েই ভাল। তোমার মত সুন্দর"—

গায়ত্রী মুখ তুলিয়া ফোঁস করিয়া উঠিল—"আহা, হা, আমার মত হ'লে ত ভারীই সুন্দর হবে! বলো, তোমার মত—"

মুগ্ধা পত্নীর চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া সুধীশ বলিল, "আমি কি একবারে রূপের খনি? ওটা তোমার নিছক পাগলামী!"

গায়ত্রী বলিল, "বটেই ত। ভগবান্ তোমায় যেমন গড়েছেন, আমি তাই বলেছি মাত্র।"—একটু হাসিয়া বলিল, "পুরুষের মধ্যে তুমি, আর মেয়েদের মধ্যে বৌদি, সত্যিই, তোমাদের মত নিখুঁত রূপ আর কখন দেখিনি। বৌদি যখন তোমার কাছে বসে থাকে, দেখে আমার মনে হয়, তোমাদের দু'জনকে বিধাতা নির্জ্জনে গড়েছিলেন। তোমাদের যদি বিয়ে হ'ত, তাহ'লে, মানাত বটে, যেন হরগৌরী! তোমার পাশে আমায় কি মানায়?"

সুধীশ মন্তব্য শুনিয়া আতঙ্কে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল,— এ পাগলী বলে কি!

গায়ত্রী সুধীশের হাতের ভিতর আবদ্ধ নিজের হাত-খানার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "দেখ না, কত তফাৎ! আমি কি তোমার যোগ্য? যেন রাজার পাশে বাঁদী—"

সুধীশ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "কিন্তু এই বাঁদীই রাজার বুকের রক্তের চেয়েও আদরের। এই বাঁদীই আমার ঘর আলো করে থাকুক, ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা।"

গায়ত্রী হাসিয়া বলিল, "রাজার রুচির কিন্তু একান্ত অভাব। যতই ঢাকা দাও, তোমার পাশে আমি ছাই। তোমার পাশে বৌদিকেই ঠিক মানায়। যদি তোমাদের দু'টিতে বিয়ে হ'ত, বেশ মানানসই দেখাতো!"

সুধীশ পাংশুমুখে বলিল, "ছি, কি সব আবোল-তাবোল বকছ বল ত। এই সবই কি দিন-রাত্রি তোমার মনে জাগে? তুমি ঈশ্বর বিশ্বাস করো না? তিনি যাকে যার জন্যে গড়েছেন, সে তাকে পাবেই। তাদের পরস্পরকে উভয়ের উপযুক্ত করেই সৃষ্টি করেছেন। রূপ! তুচ্ছ জিনিস, ও-ত শুধু চোখের নেশা—মনে যখন নেশা ধরে যায়, তখন রূপের কথা আর মনেও থাকে না। কোন একটা রোগে আজ যদি আমি কদাকার হয়ে যাই, তোমার ভালবাসা কি তা হ'লে কমে যাবে?"

গায়ত্রী অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "আহঃ, ও-সব কথা কেন বলছ!" একটু পরে বলিল, "আচ্ছা, সত্যি করে বলো ত, তোমার মনে হচ্ছে কি না যে, সবিতার সঙ্গে বিয়ে হ'লে প্রায় বিয়ের যোগ্য মেয়ে থাকত!"—সে হাসিতে লাগিল।

সুধীশ কষ্টে হাসিয়া বলিল, "মোটেই না। এর মধ্যে শ্বশুর হবার ইচ্ছে আমার আদৌ হয়নি। আর এত বড় মেয়ে হ'তও না, সবিতাই হয় ত ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের হ'ত। কিন্তু তোমার তার প্রতি ভারী হিংসে, না?"

গায়ত্রী হাসিয়া বলিল, "নাঃ, তা কি আর থাকবে! তুমি যে আজও তাকে ভালবাস। সেই পোড়ামুখীকে আমার একবার দেখতে ইচ্ছে করে,—"

সুধীশের চোখে একটা ভয়ার্ত্ত ভাব ফুটিয়া উঠিল; তবু সে সহজ ভাবে বলিল, "তুমি তাকে ত দেখতে পাবে না, সুতরাং তার প্রতি তোমার বিদ্বেষের কোন কারণ নেই। তা ছাড়া, যাতে তোমার মন চঞ্চল হয়, এমন চিন্তা এখন করো না।"

গায়ত্রী কনুয়ের গুঁতা মারিয়া বলিল, "কেবল কথা চাপা দেওয়া! সবিতার নামটাও কি ছাই আমার করবার যো নেই?"—সে হাসিতে লাগিল।

সুধীশ অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "আমি কি বারণ করেছি? তোমার ইচ্ছে হয়, তুমি তার নাম জপ করো না।"

গায়ত্রী হাসিমুখে বলিল, "আমার সঙ্গে ত তার মিষ্টি

সম্পর্ক নয় যে, আমি জপ করবো ; বরং তুমিই জপ করো, তোমারই সে আদরের—"

সুধীশও হাসিল, বলিল, "বটে! তার নাম জপ করবো? তুমি সহ্য করতে পারবে? তবে করি,—সবিতা—সবিতা—সবিতা।"

গায়ত্রী স্বামীর মুখ চাপিয়া ধরিল, হাসিয়া বলিল, "থাম পঞ্চানন্, থাম। হয়েছে, হয়েছে!"

সুধীশ মুখ ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, "এই দেখ, তিন বার নাম করেছি, তাই সহ্য করতে পাচ্ছ না!"

গায়ত্রীর মুখে মৃদু হাসি।

সুধীশ ক্ষণকাল অন্যমনে থাকিবার পর বলিল, "ধর, যদি হঠাৎ কোন প্রয়োজনে সবিতা আমার কাছে সাহায্যপ্রার্থিনী হয়ে আসে, তুমি কি করো?"

গায়ত্রী হাসিয়াই বলিল, "যে জন্যে আসে, সেটা যত শীগ্‌গির পারি দিয়ে বিদেয় করি। তা বলে তিন দিন তাকে তোমার চোখের ওপর থাকতে দিইনে। তাকে আমি ভয় করি!"

সুধীশ বলিল, "এত দিনে সে-ও কত ছেলেপুলের মা হয়েছে, আমিও ছেলের বাপ হ'তে যাচ্ছি; এখনও কি মনে করো, আমাদের পা পিছলে যাবে?"

গায়ত্রী বলিল, "তোমরা কেউই বুড়ো হওনি, কাজেই পা পিছলোবে কি না, তা শুধু ভগবান্‌ই বলতে পারেন, জোর করে কিছুই বলা যায় না। তবে যে রকম তোমার মুখে শুনি, তাতে কি হবে, সেটা বলা কঠিন; কারণ, তুমি এখনও তার স্মৃতি একটুও ভোলোনি।"

সুধীশ একটু মৌন থাকিয়া বলিল, "তুমি আমায় একটুও বিশ্বাস করো না, না? আমার ওপর তোমার একটুও আস্থা নেই, কি বলো!"

গায়ত্রী বলিল, "এটা তোমার নিছক ঝগড়ার কথা। তোমায় আমি সন্দেহ করি না, তবে সবিতার কথা যদি বলো, ওখানে তোমায় বিশ্বাস করে ছাড়তে পারি না। ওখানে তোমার আজও ব্যথা আছে।"

সুধীশের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, বলিল, "মেয়েরা বড় কল্পনাপ্রিয়। আমি তোমায় যা বলেছি, তুমি অবশ্য তার চেয়ে অনেক বেশি ধরেছ; তাই তোমার মনে হচ্ছে, আমি বুঝি তাকে দেখলেই তার পায়ে লুটিয়ে পড়ব!… বলেছি তাই, না বললে তুমি কি করতে পারতে? ভালমানুষীর কাল নেই, খালি সন্দেহ আর সন্দেহ!"—বলিয়া রুষ্ট সুধীশ ক্রোড়ের উপর হইতে গায়ত্রীর এলাইত তনু সরাইয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

গায়ত্রী বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, তুচ্ছ আলাপ যে অবশেষে এমন কলহে পরিণত হইবে, তাহা সে একবার কল্পনাও করিতে পারে নাই। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুধীশের দুই স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া বলিল, "ও কি! সামান্য কথাটা তুমি এত বড় করে তুললে? এতে ত রাগের কোন কথা হয়নি; তুমি যেমন সাধারণ ভাবে কথা বলেছ, আমিও তেমনই বলেছি। ও কি—যাচ্ছ কোথা?"

সুধীশ গায়ত্রীর হাত সরাইয়া দিয়া বলিল, "সরো, আমার কাজ আছে।"—গায়ত্রীর শুষ্ক বিবর্ণ মুখের পানে দৃষ্টিপাত না করিয়াই সে চলিয়া গেল।

গায়ত্রী হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল; কেন যে সুধীশ এমন ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

২৪

বাহিরে যাইতে যাইতে সুধীশের উষ্মা ক্রমশঃ শীতল হইতে লাগিল।

বড় মিথ্যা কথা বলিয়াছে গায়ত্রী!…হিমানীর বিষয় সে জানে না, তাই না সুধীশ তাহাকে অতখানি লজ্জা দিতে পারিল। সত্যই কি সে হিমানীকে দেখিবামাত্র পূর্ব্বস্মৃতির অনলে দগ্ধ হয় নাই? না, এখনও কি হয় না? পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িতে বাকীই বা কি আছে? কেবল মাত্র হিমানীর কল্যাণার্থই ত সে গায়ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিল। নিজের কাছে সে কি অস্বীকার করিতে পারে যে, গায়ত্রীকে সে কোন দিক্ দিয়া বেশি কর্ত্রীত্ব দেয় নাই? হিমানীর প্রতি সে যে সহানুভূতি দেখায়, লোকে যাহাই ভাবুক, নিজের মনে সে জানে, তাহা তাহার অন্তরপ্লাবী প্রেম। গায়ত্রী ইহার কিছুই জানে না বলিয়াই সে অপরাধী হইয়াও এতখানি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া আসিয়াছে। হিমানীর প্রতি তাহার ব্যবহার অত্যন্তই স্নেহমধুর, ইহাতে গায়ত্রীর যদি ঈর্ষাসঞ্চার হয়, তবে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় কি? হিমানীর

কথা কহিয়া আলাপের পিপাসা মিটে না, তাহাকে বস্ত্রে, অলঙ্কারে সাজাইয়া মন তৃপ্ত হয় না।···তবু সে মুখের উপর হইতে তাহার মুগ্ধদৃষ্টি সরিতে চায় না, সগর্ব্বে পত্নীর কাছে বলিয়া আসিয়াছে, সবিতাকে দেখিলে সে একটুও বিচলিত হইবে না! এ কি কপটতা নহে?

আবার তাহার চিন্তার ধারা পরিবর্ত্তিত হয়। সুধীশ যে-চোখেই হিমানীকে দেখুক, গায়ত্রী ত পূর্ব্ব-কথা জানে না; তবে তাহার এ সন্দেহ কেন? এ হিংসাবৃত্তি কেন? ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, গায়ত্রী স্বভাবতঃই হিংসুক ও সন্দিগ্ধচেতা।

সুধীশের মুখভাব কঠোর হইল। গায়ত্রীর এত ক্ষমতা? আজ যদি সে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ওঠে,—যদি হিমানীর সত্য পরিচয় জানাইয়া তাহার সহিত প্রেম-চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হয়—কি করিতে পারে গায়ত্রী? তাহা প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা তাহার আছে? ইস্! অপরাজেয় পুরুষ সে—সে নারীর হাতের ক্রীড়নক নয়! সে গায়ত্রীকে আর সব দিতে পারে, কেবল স্বাধীনতাটুকু ছাড়া।

সবিতাকে তিন দিনের বেশি থাকিতে দিবে না! অহঙ্কৃতা নারী, তোমার সাধ্য কি যে, তুমি পুরুষের স্বাধীন ইচ্ছা পরিচালিত করো? তোমার জন্য স্নেহ আছে, যত্ন আছে, সুখ আছে, সান্ত্বনা আছে—কিন্তু সে সমস্তই আমার ইচ্ছাধীন। তুমি দাবী করিয়া বা জোর করিয়া, মিষ্ট কথায় বা চোখের জলে তাহার উপর কোন কিছুই আদায় করিতে পার না। আমার দয়ার দানই তোমার জীবনে একমাত্র বর,—উহাকেই তুমি শ্রেয়ঃ এবং প্রিয়রূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য। নিজস্ব বলিয়া কোন কিছুর দাবী তোমার নাই। আমার ইচ্ছামত আমি চলিব, তোমার কাছে সে জন্য কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য থাকিব না। মনে রাখিবে, আমার দয়ার মুষ্টিভিক্ষাই তোমার জীবনের সার্থকতা ও আনন্দ; অনাবশ্যক অধিকার খাটাইতে গিয়া তাহাতে বঞ্চিত হইও না।

মনে মনে এই সকল আলোচনা করিতে করিতে হঠাৎ চিঠির বাক্সের দিকে দৃষ্টি পড়িল; একখানি পত্র আসিয়াছে। তাহার এই সময়ের মানসিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই নেলীর পত্র যেন তাহার হাতে আসিয়া পড়িল। কলিকাতায় সেই সাক্ষাতের পর হইতেই নেলীর সহিত সুধীশের নিয়মিত পত্র-ব্যবহার চলিতেছে। সুধীশ প্রতি মাসে নিয়মিত ভাবে নেলীকে সাহায্য করে; অবশ্য, গায়ত্রীকে এ সম্বন্ধে কোন কথাই সে জানায় নাই।

নেলীর পত্রখানি সুধীশ প্রথমে মুড়িয়া রাখিল; কিন্তু কি ভাবিয়া পড়িল। তাহার মুখভাব কঠোর হইয়া উঠিল; ললাট কুঞ্চিত করিয়া ক্ষণকাল কি ভাবিবার পর সে প্যাডটা টানিয়া লইয়া ক্ষিপ্রহস্তে পত্র লিখিতে লাগিল। নেলীকে কলিকাতার বাস তুলিয়া এখানে আসিয়া প্রাকটিস করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিল; এবং এখানে আসিলে যে তাহার সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহের যোগ্য আয় হইবে, এ বিষয়ে তাহাকে নিঃসন্দেহ হইতে লিখিল। নাম স্বাক্ষর করিয়া পুনশ্চে লিখিল, গায়ত্রী অন্তঃসত্ত্বা, এখানে তেমন ভাল লেডী ডাক্তার না থাকায় সে নেলীর সাহায্যপ্রার্থী।

পত্রখানি তখনই সে ডাকে পাঠাইয়া দিল।

বৈকালে অন্তঃপুরে গিয়া সে গায়ত্রীর কাছে গেল না, হিমানীর ঘরেই বসিল। হিমানী তখন সবেমাত্র ছেলে-মেয়েকে পড়াইতে বসিয়াছে; গৃহশিক্ষক সন্ধ্যায় আসেন। সুধীশকে দেখিয়া আনন্দে তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; হাসিমুখে বলিল, "কি গো, আজ এ সময়ে এ ঘরে যে? ঠাকুরঝি কোথায়?"

সুধীশ উত্তর দিল, "জানি না। আমি নীচে ছিলুম, ও-দিকে এখনও যাইনি।"

হিমানী সকৌতুক হাসির সহিত বলিল, "ঠাকুরঝির বাহুডোর ছাড়িয়ে নীচে ছিলে যে? তাও আবার ওপরে এসেই এ ঘরে? আর ও-দিকে যে 'ফাটি যাতি হায় ছাতিয়া'—"

সুধীশ বলিল, "এইটুকুতে ফাটি গেলে নিরুপায়! আমি তোমার কাছে এলুম,—তোমার কি দরকার না-দরকার জানতে। আমি আজ-কাল তোমার সম্বন্ধে বড় কম খোঁজ রাখি দেখছি।"

হিমানী বলিল, "আর ত দরকার হয় না। ঠাকুর-ঝির যত্নের কি শেষ আছে? সে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখে।"

সুধীশ অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলিল, "তার লক্ষ্য রাখা আমি যথেষ্ট মনে করিনে। আমি কি কচ্ছি না কচ্ছি, তার হিসেব আমিই রাখব।"

হিমানী ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া তিরস্কারের সহিত বলিল, সুধীশ!…"

সুধীশ উদ্ধত স্বরেই বলিল, "কেন? আমি কি সর্ব্বদা ওকে ভয় করে চলব না কি? চরণমঞ্জীর আমি হব না।"

হিমানী দাঁত দিয়া ঠোঁট কামড়াইয়া এক মিনিট নীরব থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা, যথেষ্ট হয়েছে! সে তোমায় চরণমঞ্জীর করবার আকাঙ্ক্ষা রাখে না, শিরোভূষণ বলেই মনে করে।"—ছবি ও মৃণা তাহাদের পিসেমশায়ের রুষ্ট মুখের পানে চাহিয়া আছে, ইহা ইঙ্গিতে জানাইয়া সে বলিল,—"আর বাড়িয়ো না।"

সুধীশ তাহাদের বিস্মিত মুখের পানে চাহিয়া মাথা হেঁট করিল।

হিমানী বলিল, "ঘর করতে গেলে এক সময় খুঁটিনাটা হয়ই। ঠাকুরঝি কিছু বলেছে বুঝি?"

সুধীশ ক্রুদ্ধস্বরে ইংরেজীতে বলিল, "আজ বুঝলুম, আমায় সর্ব্বদা সন্দেহ করে।"

হিমানী ইংরেজী বলিতে পারিত না—বুঝিত। সে বলিল, "বড় অন্যায় করে, না? সন্দেহ করবার ষোল আনা কারণ থাকা সত্ত্বেও সে যদি তোমায় সন্দেহ করে, তোমার তাকে দোষ দেবার মুখ আছে? তুমি বুকে হাত দিয়ে বলতে পার, তুমি অক্ষত?"

সুধীশ নতবদনে রহিল।

হিমানী বলিল, "তুমি করতে পারো, আর সে বলতে পারে না?"

সুধীশ এবার হিমানীর দিকে চাহিল, বলিল, "করতে পারি কি? সে ত গত কথা,—"

হিমানী স্থিরচক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "গত কথা? সুধীশ!…"

সুধীশ আবিষ্ট নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল, বলিল, "নয়? তবে কি?"

হিমানী হয় ত এমন কথা স্বীকার করিবার কল্পনাও করে নাই, কিন্তু উত্তেজনায় সে যেন পাগল হইয়া উঠিয়াছিল। ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিল, "কি? সেটা আমার অজ্ঞাত নেই সুধীশ! ওর আস্বাদ তুমি একবার আমায় জানিয়ে-ছিলে, আর আজ তুমি ক্ষতিপূরণের চেষ্টায় আছ! কিন্তু আর ত তা হয় না!"—এতখানি বলিয়া ফেলিয়াই হিমানী তার হারান সম্বিত ফিরিয়া পাইল। জিহ্বা দংশন করিয়া ভাবিল, কি করিলাম, এ কি করিলাম! এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে উচ্ছ্বসিত অশ্রুস্রোত নিরুদ্ধ করিতে করিতে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

ঘটনাটার বিসদৃশটা লক্ষ্য করিয়া সুধীশ চঞ্চল হইয়া উঠিল, এবং হিমানীর হতবুদ্ধি সন্তান দু'টির পানে চাহিয়া বলিল, "তোমাদের মা পাগল হয়ে গেছে, না ছবি?" —শিশু হইলেও তাহারাও কেমন একটা গরমিল বোধ করিতেছিল, কথা কহিল না।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী মায়াদেবী বসু।

পূজারিণী

আরতি-দীপ জ্বেলেছি আমি হৃদয়-দেউল মাঝে
কানন আমার মুখর আজি নানান ফুলের সাজে।

একটি হাতে ধূপের কাঠি, অপর হাতে মালা
দুই হাতেতে ধ'রে আছি সোনার বরণ-ডালা।
এ-পথ দিয়ে যাবে তুমি এই তো আমি জানি
আকাশ-তলে মেঘে মেঘে হ'চ্ছে কাণাকাণি।
দিনের পরে দিনটি আসে আবার যায় সে চলে
তোমার আসার সঠিক খবর কেহ নাহি বলে।

তবু আমি রইবো সেজে পূজারিণীর বেশে
জানি আমি আসবে তুমি একটি দিনের শেষে।
যখন আমি দেখবো তোমায় আমার নয়ন-পথে—
ছুটে গিয়ে আনব ডেকে শাঁখের ধ্বনির সাথে।
নানান সাজে সাজিয়ে দিয়ে নিখুঁত আলিপনায়
মনের মত করবো পূজা প্রাণের আঙিনায়।

শ্রীউমানাথ সিংহ

ব্যষ্টিবাদ ও বিশ্বশান্তি

য়ুরোপীয় বুধমণ্ডলী মানবীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের উৎপত্তি ও বিকাশধারা লক্ষ্য করিয়া তাহাদের স্বরূপ-নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। ইহা মানবীয় প্রতিষ্ঠানের স্বরূপ-নির্ণয়ের শ্রেষ্ঠ উপায় হইলেও ইহাতে একটি অপরিহার্য্য অসুবিধা জন্মে। মানবীয় প্রতিষ্ঠানের সকল বিষয়ই ঠিক তাঁহাদের চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হয় না। তাঁহারা দুরস্থ ব্যাপারের স্বরূপ বুঝিতে পারেন না। কাজেই প্রত্যেক বিষয় তাঁহাদের পর্য্যবেক্ষণ (observation) এবং বিশ্লেষণের (experiment) ভিতর না আসায় যেখানে প্রত্যক্ষ দর্শনের অভাব, সেখানে অনুমানের আশ্রয় গ্রহণের প্রয়োজন হয়। অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইলেই তাহার অলক্ষিত ছিদ্র-পথে ভ্রম প্রবেশ করে; বস্তুতঃ, কখন কখন সমস্ত সিদ্ধান্তই ভ্রান্তিমূলক হইয়া থাকে। য়ুরোপীয়দিগের প্রয়োজনে মানুষের আদি-কথা সম্বন্ধে এইরূপ অনেক ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত চলিয়া গিয়াছে। পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে সে সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও সাধারণ লোক তাহার প্রভাব সহজে অতিক্রম করিতে পারে নাই। কাজেই য়ুরোপ হইতে আমদানী অনেক ভ্রান্ত সিদ্ধান্তকে য়ুরোপীয় মনীষীরা ভ্রান্ত জ্ঞানে বর্জ্জন করিলেও আমরা ঠিক তাহাই অবলম্বন করিয়া বসিয়া আছি!

মানুষের উৎপত্তি এবং অভিব্যক্তি লইয়া এইরূপ আনুমানিক সিদ্ধান্ত অনেক হইয়াছে। এই শ্রেণীর কোন কোন সিদ্ধান্তকে আধুনিক তত্ত্বান্বেষীরা মিথ্যা বা কাল্পনিক বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকদিগের মত ছিল—মানুষ তির্য্যক্ প্রাণী হইতে ক্রমবিকাশ দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়াছে; সেই জন্য আদিম কালীন মানুষের মধ্যে পাশবিক প্রবৃত্তিরই প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যাইত। সুতরাং তাহারা মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা পাইবার যোগ্যই ছিল না। তাহারা স্বার্থ লইয়া পশুর মত পরস্পরকে নখর-দ্রংষ্টাঘাত করিত। পশুত্ব ব্যতীত আদৌ তাহাদের মনুষ্যত্ব ছিল না; কিন্তু পশুমাত্রেই পরস্পর একত্র হইলেই মারামারি করে না। কেহ কেহ বলেন, পশুত্বের এবং দেবত্বের মিশ্রণেই মনুষ্যত্বের স্ফুরণ হইয়াছে। গোড়ায় মানুষের ভিতর পশু-ভাবই ছিল; পরে সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে মনুষ্যহৃদয়ে দেবত্বের বিকাশ হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত এই ধারণা বিজ্ঞানসম্মত বলিয়াই সমাদৃত হইয়াছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নৃতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে এই সিদ্ধান্তই স্থায়িভাবে গৃহীত হইয়াছে যে, আদিম মানুষরা নিতান্ত স্বার্থপর ছিল না। তাহাদের মধ্যে দেবভাবই প্রবল ছিল। এই সকল বৈজ্ঞানিক বলেন, আদিম কালের মানুষ কেবল সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা চালিত হইত। তাহারা কেহ কাহারও সান্নিধ্য সহ্য করিতে পারিত না। ইঁহাদের এই মত যে ভ্রান্ত, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। নিঃসঙ্গ মানুষ কেহ কখনও দেখে নাই। সকল অবস্থায় মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বাস করিতে দেখা যায়। সন্ন্যাসীরাও জনসমাজ ছাড়িয়া বিজন বনে তপস্যা করিতে যান, কিন্তু তাঁহারা সেই বনেও ঠিক নিঃসঙ্গ থাকিতে পারেন না। এক বনে কতকগুলি সন্ন্যাসী থাকেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে একটা দল থাকে,—সেই দলের কতকগুলি নিয়ম থাকে। সে নিয়ম সকলকে মানিয়া চলিতে হয়। ক্বচিৎ দুই-এক জন সন্ন্যাসী সাধনার অতি উচ্চ স্তরে উঠিলে অপেক্ষাকৃত বিজনতর বনে প্রয়াণ করেন; কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহারা এত দূরে যান না যে, অন্য সন্ন্যাসীরা তাঁহাদের সংবাদ লইতে পারে না। বিজন বনমধ্যে এই সন্ন্যাসীর উপনিবেশই আশ্রম বা তপোবন। মানুষের পক্ষে তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ সাধন করিতে হইলে একেবারে একাকী থাকা উচিত নহে—সম্ভবও নহে। সংহতি হইতেই সমাজ, সমাজ হইতেই সভ্যতার প্রকাশ ও বিকাশ। পাশ্চাত্য মতে সভ্যতা হইতে সমাজের আবির্ভাব, এই সিদ্ধান্ত এখন অচল। বস্তুতঃ, সমাজ হইতেই সভ্যতা দেখা দিয়াছে।

য়ুরোপখণ্ডে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে দুইটি বিভিন্ন মতবাদীর মধ্যে বিশেষ বিতর্ক চলিতেছে। এক দলের নাম প্রকৃতিবাদী (Naturalist), অন্য দলের নাম আদর্শ-বাদী (Idealist)। মানবজাতির প্রাথমিক অবস্থায় তাহাদের সমাজের প্রকৃত অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার সম্বন্ধে প্রকৃতিবাদীদের কোন প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ জ্ঞান না থাকিলেও তাঁহারা কল্পনা-বলে একটা অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া তাহাকে তাঁহাদের মত-রচনার ভিত্তি করিয়াছিলেন। কারণ, যখন পৃথিবীতে আদিম মানুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, তখন তাহাদের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা দেখিবার এবং লিখিয়া রাখিবার মত লোক কেহই ছিল না। যদি মানিয়াই লইতে হয় যে, সর্ব্বপ্রথমে মানুষ এক জাতীয় বানরীর গর্ভে জন্মিয়াছিল, তাহা হইলে সেই বানরী গর্ভজাত মানুষ—তখনকার সমাজের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা বুঝিবার মত বুদ্ধি ধরিত না। আর এক প্রশ্ন এই যে, একটি মাত্র বানরী কোন মতে প্রকৃতির বিকৃতি-রূপে একটি আদি-মানুষ প্রসব করিয়াছিল কি? না, সেই সময়ে প্রত্যেক বানরীই আদি-মানুষ প্রসব করিতে আরম্ভ করিয়াছিল? ইহা সংক্রামক ব্যাপার, না, একটা ব্যতিক্রম মাত্র? বিজ্ঞান এই সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করিতে পারে নাই। আর এক কথা—ক্রমবিকাশবাদ অনুসারে বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণের ফলে লক্ষিত হয় যে, সৃষ্টিপ্ররোহের বিকাশের একটা অবস্থান্তর প্রাপ্তি যখন দেখা যায়, তখনই প্রতীত হয়, এই প্ররোহের মুখে যেন একটা ধাপ বা সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; তাহা আর নাই। এতদিন আমরা শুনিয়া আসিয়াছিলাম যে, বানর হইতে মানুষের পথে পরস্পর-সংযুক্ত শিকলের কড়ায় একটি কড়ার সন্ধানই পাওয়া যাইতেছে না। ইংরেজীতে উহাকে missing link বলে। এখন দেখা যাইতেছে যে, অবস্থান্তর-প্রাপ্তির সঙ্কট-মুখেই একটা কড়ার সর্ব্বত্রই অভাব; অর্থাৎ জলচর হইতে জীব যখন উভচর হয়, উভচর হইতে যখন নভোচর হয়, নভোচর হইতে যখন স্থলচর হয়, তখনই মাঝের একটা করিয়া কড়া (link) লোপ পাইয়াছে। এ রহস্যের কোন উদ্ভেদ হয় নাই। ফলে এই 'প্রাথমিক ব্যাপারমাত্রই মানুষের তথা বিজ্ঞানের চক্ষুর অগোচর। কেবল কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া উহা বুঝিতে হয়। সেই কল্পনাকে উদ্দাম ভাবে ছাড়িয়া দেওয়া কোন মতে সঙ্গত নহে। তাহা হইলে আসলে সব নষ্ট হইবে।

যাহা হউক, প্রকৃতিবাদীরা বলেন যে, আদিম মানুষ বন্য পশুর ন্যায় অত্যন্ত স্বার্থপর ছিল,- স্বার্থের জন্যই তাহারা সকলের সহিত বিবাদে রত হইত। সপ্তদশ শতাব্দীতে টমাস হবস্ (Thomas Hobbes) নামক ইংরেজ দার্শনিক সিদ্ধান্ত করেন যে, প্রাথমিক মানুষ মাত্রই অত্যন্ত স্বার্থপর ছিল, আর সেই স্বার্থরক্ষার জন্য তাহারা ক্রমাগত বিবাদেই রত হইত। তখন প্রত্যেক মানুষই নিজের বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য অতিশয় ব্যস্ত থাকিত। এজন্য অন্য মানুষকে তাহারা শত্রু মনে করিত। দুই জন মানুষে দেখা হইলেই তাহারা পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ করিত। তখন নীতিজ্ঞান ছিল না। তবে এই নীতিজ্ঞান আসিল কোথা হইতে? প্রকৃতিবাদীরা কল্পনাবলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, মানুষ যখন দেখিল, ক্রমাগত বিবাদে লিপ্ত থাকিলে তাহার সকল স্বার্থ সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব, তখন তাহারা পরস্পর একটা চুক্তিসূত্রে আবদ্ধ হইল। কারণ, তাহারা দেখিয়াছিল যে, পরস্পর সম্মিলিত হইতে হইলে তাহাদিগকে কতকগুলি স্বার্থ অন্যের সুবিধার জন্য ছাড়িয়া দিতে হইবে সত্য, কিন্তু তাহাতে তাহাদের অবশিষ্ট সকল স্বার্থই ভোগ করিবার সুযোগ হইবে। এই ভাবিয়াই মানুষ সমাজবদ্ধ হইবার জন্য স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছে। আসল কথা, মানুষ অন্যের মঙ্গলসাধনের জন্য নীতিজ্ঞান এবং সামাজিক নিয়ম-নিষ্ঠাকে গ্রহণ করে নাই, পরন্তু সে পূর্ণমাত্রায় স্বার্থরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই স্বার্থত্যাগী এবং নিয়মানুগ হইতে বাধ্য হইয়াছে। এক কথায় প্রকৃতিবাদীদিগের গোড়ার কথা, স্বার্থপরতাই মানুষের নীতিজ্ঞানের এবং নিয়মানুবর্ত্তিতার মূল কারণ। স্বার্থপরতাই মনুষ্যের মূলধর্ম্ম।

পক্ষান্তরে, আদর্শবাদীদিগের কথা অন্যরূপ। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিশপ বাটলার নীতিজ্ঞানের নিন্দাকারী প্রকৃতিবাদীদিগের এই স্বার্থসর্ব্বস্ব মতবাদের খণ্ডনে প্রবৃত্ত হন। তিনি ইহাই সপ্রমাণ করিতে আরম্ভ করেন যে, প্রকৃতিবাদীদিগের মানবচরিত্র সম্বন্ধে ঐ ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা। মানব-প্রকৃতিতে যেমন এক দিকে আত্মম্ভরিতা বা আত্মপ্রত্যয় বিদ্যমান, সেইরূপ অন্য দিকে

তাহার পরহিতৈষণা-বৃত্তিও সম্পূর্ণ স্বভাবগত। পরোপচিকীর্ষা মানুষের একটা স্বাভাবিক বৃত্তি। বিশপ বাট্লার এবং তাঁহার ন্যায় আদর্শবাদীরা সভ্য মানুষ সম্বন্ধে এই মতের যাথার্থ্য সম্পূর্ণ সপ্রমাণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু আদিম মানুষ সম্বন্ধে সে কথা সম্পূর্ণ সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই। কারণ, আদিম মানুষ কেহই প্রত্যক্ষ করেন নাই। সাধারণ লোক আদিম মানুষের প্রকৃতি হিংস্রভাব-প্রধান বলিয়াই ধারণা করিতেন। আদর্শবাদীরা সে ধারণা খণ্ডন করিতে পারিতেন না। কিন্তু প্রকৃতিবাদীদিগের এই মত যে মনস্তত্ত্বজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল, তাহা গভীর নহে; মানব-চরিত্র সম্বন্ধে নিতান্তই পল্লবগ্রাহিতার পরিচায়ক। ইহাতে এই কথাই বেদবাক্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় যে, মানুষের সমস্ত কার্য্যের প্রকৃতিসাধক বৃত্তি কেবল স্বীয় আনন্দ লাভের বাসনা এবং কষ্টভোগের উপর বিতৃষ্ণা। উহা ভিন্ন মানুষের যেন অন্য কোন প্রবৃত্তিই নাই। মানুষের স্বভাবই এই যে, মানুষ অনেক সময় একটা অসমগ্র সত্যকে পূর্ণ সত্য বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরে, এবং তাহারই গোলকধাঁধায় ঘূরপাক খাইতে খাইতে অনেক অলীক দার্শনিক মত রচনা করে। দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। প্রকৃতপক্ষে মানুষ ঐ দুইটি মাত্র মনোবৃত্তির দ্বারা কস্মিন্‌কালেও চালিত হয় না। মানুষের পরস্পর মিলিয়া-মিশিয়া থাকিবার একটা প্রবৃত্তি সর্ব্বাবস্থাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। সেই জন্য এরিষ্টটল বলিয়াছেন যে, মানুষ গোড়া হইতেই রাজনীতিক জীব (Political animal)। মানুষ যে দিন ধরাতলে আবির্ভূত হইয়াছে, সেই দিন হইতেই তাহার সহজাত সামাজিক বুদ্ধি নিজ ব্যক্তিগত মঙ্গল-সাধনের বুদ্ধি অপেক্ষা সাধারণের মঙ্গল-সাধনের চেষ্টা তাহার প্রকৃতিতে প্রবল ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। এক জন বিশিষ্ট য়ুরোপীয় লেখক বলিয়াছেন, অতি প্রাচীন আত্ম-বাদী লোকের যে কল্পনা করা হয়, তাহাকে রাজার, ধর্ম্মযাজকের এবং ভূতের ভয় দেখাইয়া ধর্ম্মনীতির অনু-বর্ত্তী করিতে হইত, উহা নিছক কল্পনা। আর মানুষ মাথা-ঘামাইয়া যে সকল নিবন্ধ-পুস্তকে এই কথা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে যে, আত্মম্ভরিতা হইতে পর-হিতৈষণার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার সমস্তই ভুয়া। মানুষের প্রকৃতিতে যেমন স্বার্থপরতা নিহিত আছে, তেমনই পরার্থপরতাও নিহিত আছে (১)। সেই পরার্থ-পরতা অধুনা সুপ্ত হইলেও সম্যক্ লুপ্ত হয় নাই।

সমাজের উদ্ভব সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকরা এ পর্য্যন্ত যাহা অনুমান করিয়া আসিয়াছেন—আধুনিক বৈজ্ঞানিকরা তাহার সমস্তটাই ভ্রান্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহারা এখন যে সিদ্ধান্ত করিতেছেন, তাহা পূর্ব্বতন বৈজ্ঞানিকদিগের সিদ্ধান্তের ঠিক বিপরীত। পূর্ব্বতন সমাজবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতরা বলিতেন যে, আদিতে কতক-গুলি পরস্পর ঘোর বিবদমান ও বৈরী ভাবাপন্ন মানুষ গরজে-পড়িয়া সমাজ-বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু আধুনিক সমাজবিজ্ঞানবাদীরা সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, মানুষ প্রথম হইতে পরার্থপরতার প্রভাবে সমাজবদ্ধই ছিল। তাঁহারা প্রশ্ন করিতেছেন যে, মানুষ প্রথমে সমাজবন্ধন হইতে কতকটা মুক্ত হইতে অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল কি করিয়া? অর্থাৎ মানুষ প্রথমে স্বতন্ত্র ছিল না। মানুষ ছিল সমাজের ভিতর। মানুষ গোড়ায় ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন ছিল না,—সে ছিল পাকা সামাজিক জীব; সে হিংস্র ছিল না,—পরহিতৈষী ছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার কুটিলা গতি তাহাকে স্বার্থ-পর করিয়া তুলিয়াছে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পাশ্চাত্য-খণ্ডে বহু রক্তপাত হইয়াছে, এবং বহু নয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়াছে। সময়ে সময়ে ইহার গতি রুদ্ধ হইয়াছে সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয় নাই। তাহার পর বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য-চিন্তার ধারা এবং সভ্যতার প্রবাহ বিপরীত দিকে গতি আরম্ভ করিয়াছে। এখন পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের সিদ্ধান্ত সবই উল্টাইয়া যাইতেছে। যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ এত দিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল, তাহা য়ুরোপে লোপ

(১) The social instinct, which leads him to prefer a common to a private good has been present and powerful in his nature from his first appearance in this planet...and all the laborious treaties which have been written to show how egoism developed into altruism are so much waste papers. Unselfishness is a primitive and fundamental charateristic of human nature as selfishness.—Richards.

পাইতে বসিয়াছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া মানবের ব্যষ্টি-জীবনকে (Individuality) বড় করিবার জন্য যে চেষ্টা চলিয়া আসিতেছিল, তাহা সবই ঘুরিয়া গেল। তাহার জন্য যাহা গড়া হইয়াছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইতে থাকিল। মানুষ বুঝিতে আরম্ভ করিল, সে কোন কালে একলা থাকে নাই, একলা থাকা তাহার উন্নতির পরিপন্থী। নিঃসঙ্গ জীবন সভ্যতার শত্রু। য়ুরোপে যে উন্নতি হইয়াছে, তাহা নিঃসঙ্গ জীবনের Individualityর জন্য নয়। প্রাচীন গ্রীসে এবং রোমে মানুষকে রাষ্ট্রের দশ জনের মধ্যে এক জন হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। মানুষ মানুষকে দশ জনের এক জন বলিয়া মনে করিত। তাহাতে রাষ্ট্র ছিল সমষ্টি—ব্যক্তি ছিল ব্যষ্টি। প্লেটো বল, এরিষ্টটল বল, সকলেই সেই দশ জনের এক জন হইয়াই নিজ নিজ প্রতিভা বিকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন। ইহার পরই ষ্টোইসিজম্ (Stoicism) এবং এপিকিউরিয়ানিজম (Epicureanism) মত পাশ্চাত্য-খণ্ডে মানুষের বুদ্ধিকে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্রের দিকে প্রেরণা দেয়। ইহার ফলে মানুষ তাহার প্রতিবেশী মানুষকে তাহার স্বাভাবিক শত্রু মনে করিতে থাকে। এই সময়ে মানুষকে দলভ্রষ্ট বা সমাজভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা দেখা দেয়। 'Every man for himself' এই নীতি প্রবর্ত্তিত হয়। এই মতবাদ পরোক্ষ ভাবে মানুষের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, য়ুরোপে ধনিক-শ্রমিকে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রতিবেশীর অনিষ্ট করিয়া লোক নিজ স্বার্থ-রক্ষা করিতে কুণ্ঠাবোধ করিত না। ধনী নিজ উদর পূর্ণ করিবার জন্য শ্রমিককে পশুর ন্যায় খাটাইয়া লইতে লজ্জা বোধ করিত না, এবং এখনও করে না। এই ব্যক্তিত্বের ব্যভিচারই য়ুরোপে যান্ত্রিক-শিল্পের প্রশ্রয় দিয়াছে,—শত জনের বৃত্তি মারিয়া এক-জনের বিত্ত বৃদ্ধি করিয়াছে। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে যুগকে সভ্যতার পুনর্জ্জন্মের যুগ বলা হয়, সে যুগে ব্যক্তিত্বের প্রভাববিস্তারের জন্য লোক বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিয়াছিল। ফলে, সমাজের উপর ব্যক্তিত্বের প্রভাব-প্রতিষ্ঠার অনুকূলে লোকমত প্রবল হইলেও উহা যে হৃদয়হীনতার পরিচায়ক, তাহা এখন স্বীকৃত হইতেছে (২)। উহার প্রভাবে সহস্র নয়নে অশ্রুধারা বহিয়া গিয়াছে। সংসারে কত রক্তপাত ও নরহত্যা যে ভ্রান্ত ষ্টোইক (বা উদাসীন) এবং ঔদরিক বা আত্ম-বিলাসী (Epicurean)দিগের মতের প্রভাব য়ুরোপীয় সমাজে প্রবাহিত, তাহার ইয়ত্তা নাই। এখানে সে ইতিহাস বলা অনাবশ্যক।

এই ব্যক্তিবাদ মানুষের মানসক্ষেত্রে যে বিষ ঢালিয়া দিয়াছে, মানুষের মন আজিও তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। স্বার্থপরতার ন্যায় পরার্থপরতা মানুষের যে একটা সহজাত গুণ, প্রকৃতিবাদীরা এই ধ্রুব সত্য কথা ভুলিয়াই সেই মানব-মানস-সমুদ্র-মন্থনোদ্ভূত বিষে প্রায় সমস্ত পৃথিবীকে প্লাবিত করিয়া গিয়াছেন। এখন মানুষ বুঝিতেছে যে, স্বার্থপরতাই মানুষের আদিম প্রকৃতি নহে,—পরার্থপরতাই তাহার আদিম প্রকৃতি; কিন্তু তাহা হইলেও মানুষ আত্মস্বার্থে অবহিত হইয়া যত গোল ঘটাইতেছে। সেই জন্য পাশ্চাত্য-খণ্ডে সমাজতন্ত্রবাদ, সর্ব্বস্বত্ববাদ প্রভৃতি দেখা দিয়াছে। উহাতে জনসমাজকে ব্যক্তিগত বাসনা চরিতার্থ করিবার অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা দেওয়া হয় না। উহাতে মানুষকে দশ জনের এক জন হইয়া থাকিবার, দশের নিকট নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থ বলি দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু একবার একটা দৈত্যকে জাগাইয়া দিলে, তাহাকে আর ঘুম পাড়ান সহজে সম্ভব নহে। এপিকিউরাস যে মত এথেন্সে প্রথমে প্রচার করিয়াছিলেন, রোমে আসিয়া তাহার কতকটা বিকৃতি ঘটিয়াছিল। স্বার্থপরায়ণ রোমান এপিকিউরিয়ানগণ নিরীশ্বরবাদী ও ভোগপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা আত্মতৃপ্তিকেই জীবনের সার সাধনা মনে করিতেন। সাম্রাজ্যবাদী রোমে এই মত বিকৃত হইয়া এমন অবস্থায় দাঁড়াইয়াছিল যে, উহাই পরিণামে রোমক সাম্রাজ্যের এবং রোমক জাতির পতনের কারণ হইয়াছিল। রোমক সাম্রাজ্য লোপ পাইলেও পাশ্চাত্য চার্ব্বাক্-মত বিকৃত হইয়া যে ঘোর দৈত্যের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা লুপ্ত হয় নাই;

(২) Moreover it was really during the first quarter of the nineteenth Century that effects of Industrial Revolution began to make itself felt. The evergrowing use of machinery spread ruin in the homes of domestic workers; etc,

—The Period of Industrial Revolution.

তাহা মানুষকে নাস্তিক এবং ভোগবিলাসী করিয়া বিশেষ ভাবে স্বজাতিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছে। রোমক সাম্রাজ্যের পতনের পর এই পাশ্চাত্য চার্ব্বাক-মত ষোড়শ শতাব্দীতে য়ুরোপের প্রথম সাম্রাজ্যেশ্বর স্পেনের স্কন্ধে ভর করিয়া তাহার পতন ঘটাইয়াছিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের কিছু পূর্ব্বে স্পেনের অসমসাহসী বিশ্বাসঘাতক ফ্রান্সিস্‌কো বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আটাহুলপার রাজ্য হরণের পর স্প্যানিয়ার্ড জাতি নিরীশ্বর এবং নৃশংস হইয়া পেরুরাজ্যে যে অত্যাচার করিয়াছিল, তাহাও এই বিকৃত চার্ব্বাক-মতের ফল। তিন শত বৎসর কাল ঘোর অত্যাচার-পূর্ণ শাসনে স্পেনীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়াছিল। ফলে ব্যক্তিত্ববাদ মানুষের ভিতর যে স্বার্থপরতাকে জাগাইয়া তুলিয়াছে,—তাহা আর সুপ্ত হইতেছে না। বর্ত্তমান সময়ে মানুষ যতই পরার্থপরতার ভান করুক, অধিকাংশ লোকের মনে স্বার্থপরতার আকর্ষণই অধিক। এখন উহা সমাজ-বিশেষের মধ্যে নিবদ্ধ নহে। তাই পাশ্চাত্য-খণ্ডে ধনিকরা শ্রমিকদিগকে সুবিধা পাইলেই শোষণের চেষ্টায় বিরত হইতেছেন। বিজেতা জাতি বিজিত জাতির সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া আত্মধনবৃদ্ধি করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেছেন না। তাই ফ্যাসিবাদী ইটালী হাব্‌সী জাতিকে দুর্ব্বল পাইয়া তাহার দেশ কাড়িয়া লইয়াছিল, জাপান রুক্ষ মূর্ত্তিতে চীন আক্রমণ করিতে কুণ্ঠাবোধ করে নাই। কারণ, ইহারা জানে যে, নীতি-জ্ঞানকে উপেক্ষা করিলে এই ব্যক্তিবাদের যুগে তাহা দোষের হয় না; কারণ, অধিকাংশ লোকই ব্যক্তিবাদী।

নাজীবাদ এই আত্মম্ভরিতা-বাদের চরম পরিণতি বলিয়া শুনা যায়। জার্ম্মাণী হইতে ইহুদী-বিতাড়ন ব্যাপারেই নাজীবাদের প্রকট মূর্ত্তি পরিলক্ষিত হইয়াছে। ফ্যাসিবাদ নাজীবাদেরই রকমফের। আজ এই নাজীবাদ পৃথিবীতে ঘোর অশান্তি উপস্থিত করিয়াছে। সমস্ত য়ুরোপ মহাশ্মশানে পরিণত হইতে বসিয়াছে। এখনও কোন সিদ্ধান্তই নিশ্চিত ভাবে করা চলে না; তবে আমাদের বিশ্বাস এই যে, উগ্র উৎপীড়নকারী, স্বজাতির প্রতি সহানুভূতিশূন্য নাজীবাদ এই যুদ্ধের ফলে দমিত হইবে। কিন্তু তাহাতেই যে পৃথিবীতে শান্তি সংস্থাপিত হইবে, এরূপ মনে হয় না। এক আকারের নাজীবাদ বিলুপ্ত হইতে পারে, কিন্তু আর এক আকারের নাজীবাদ বা ফ্যাসিবাদ দেখা দিবে। যত দিন মানুষ আত্মস্বার্থকে বড় করিয়া বুঝিবে—ভিন্নজাতীয় মানবের স্বার্থকে নষ্ট করিতে কুণ্ঠিত না হইবে, তত দিন পৃথিবী হইতে নাজী-বাদের উৎপীড়ন বিলুপ্ত হইবে না। যত দিন ব্যক্তিত্ববাদ প্রবল থাকিবে, তত দিন সংসারে শান্তি আসিবে না।

বর্ত্তমান সময়ে ব্যক্তিত্ববাদের একটু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ব্যক্তিত্ববাদ এখন পূর্ণ অব্যক্তিগত না হইয়া কতকটা দলগত বা রাষ্ট্রগত হইয়াছে। এখন এক-একটা রাষ্ট্রের লোক এক-একটা নেশন্ বা জাতি বলিয়া পরিচিত। ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির স্বার্থ লইয়া যে কাড়া-কাড়ি চলিতেছিল, তাহা রহিত না হইলেও জাতির সহিত জাতির বিরোধ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই বিরোধের ফল ব্যক্তি-গত দ্বন্দ্ব-কলহ অপেক্ষা অধিকতর মারাত্মক হইতেছে। সমগ্র দেশ শ্মশানে পরিণত হইতেছে। মানুষে মানুষে যেমন রাজনীতিক কারণে সংগ্রাম হয়, আর্থিক কারণে বিবাদ ঘটে, নেশনে নেশনে তেমনই এখন রাজনীতিক কারণে এবং আর্থিক কারণে সংগ্রাম চলিতেছে। বর্ত্তমান যুগের ব্যষ্টিটা সে-কালের ব্যক্তিগত ব্যষ্টি অপেক্ষা কিছু ব্যাপক হইয়াছে। কিন্তু উহার ভিতরে রহিয়াছে একই কারণ, নিরীশ্বরতা এবং স্বার্থগত সঙ্কীর্ণতা। যাহারা পররাজ্য অকারণ স্বার্থের অনুরোধে কাড়িয়া লইতে চায়, তাহাদিগকে, আর যাঁহারা পররাজ্য অপহারীকে শাস্তি দিতে অগ্রসর হইয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই উভয়কেই আমরা এক পর্য্যায়ে ফেলিতে চাহি না। দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত দুর্ব্বল ব্যক্তিকে যে কাপুরুষের ন্যায় আক্রমণ করে তাহাকে, আর যে দস্যুহস্ত হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিতে চাহে তাহাকে—এক পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। উভয়ের মধ্যে বিশাল প্রভেদ বর্ত্তমান।

আসল কথা, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যবাদ যে দানবকে উপস্থিত করিয়াছিল, এখন তাহা জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের অঙ্কে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ব্যক্তিত্ববাদ যে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন (Natural selection) এবং যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন (Survival of the fittest), তাহাও এই জাতি-স্বাতন্ত্র্যবাদের ভিতর দেখা দিয়াছে। কাজেই ইহাতে ব্যক্তির স্থানে দল হইয়াছে এবং ইহার মারাত্মকতা অতি

মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা অতি ভয়ঙ্কর। আজ সেই ভীষণতার পীড়নে ধরিত্রী টলমল। ইহা পশুর সহিত পশুর যুদ্ধের ন্যায় নহে, পশুযূথের সহিত পশু-যূথের যুদ্ধ। এ যুদ্ধ মাঝে মাঝে হইবে, মাঝে মাঝে থামিবে। ইহার ফলে কেবল জাতির বলক্ষয় হইবে। ইহার নিবৃত্তি করিবার একটিমাত্র উপায় আছে। সে উপায়—সমস্ত মানবজাতির মধ্যে স্বার্থপরতাকে খর্ব্ব করিয়া পরার্থপরতার প্রতিষ্ঠা। বিদ্বেষের আখড়া ভাঙ্গিয়া বিশ্বপ্রেমের স্বর্ণ-সিংহাসনের প্রতিষ্ঠা। তাহা কি সম্ভব হইবে? এখনও উদয়াকাশে তাহার কোন জ্যোতিরীক্ষণ লক্ষিত হইতেছে না। লোক ব্যক্তিত্ববাদ ছাড়িয়া বিজ্ঞানবিদের পরামর্শে সমষ্টিবাদী হইতেছে বটে, জাতির স্বার্থ লইয়া বিবাদ করিতেছে বটে,—কিন্তু আসল ব্যাপার, ধর্ম্মকে বাদ দিয়া বিষম গোল ঘটাইয়াছে। তাহাদের সমাজের ভিতর পরস্পরের মধ্যে আসঙ্গ নাই। হীন স্বার্থপরতাই তাহাদের আকর্ষণ। তাহাদের সামাজিক বন্ধনে বিশেষ দৃঢ়তা নাই,—উহা যেন কতকটা শিথিল। তাই জাতির মধ্যে মাঝে মাঝে নানা বিক্ষোভের সঞ্চার হয়; তাই যে বিবাদ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে জাগাইয়া তোলা হইয়াছিল, সেই বিবাদ জাতিতে জাতিতে দেখা দিয়াছে। এরূপ অবস্থায় প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও চার্চ্চিল বারিধিবক্ষে সুরক্ষিত তরণী-কক্ষে যতই গুপ্ত-পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করুন, মানব-সমাজে শান্তির প্রতিষ্ঠা করা তাঁহাদের সাধ্যাতীত। তাঁহারা সম্মিলিত শক্তির সাহায্যে হয় ত জার্ম্মাণীকে চূর্ণ করিতে পারিবেন, ইটালীকে নির্জ্জীব করিতে সমর্থ হইবেন; কিন্তু বিশ্বে শান্তি-প্রতিষ্ঠা করিবেন, তাঁহার সম্ভাবনা নাই। মানুষের ভিতর যে আধ্যাত্মিকতা প্রবল আছে,—তাহা মানস-শক্তির ভিতর দিয়া তিনটি আকারে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে,—যথা ধর্ম্ম-তত্ত্ব, দর্শন ও বিজ্ঞান। ইহার কোনটাই তুচ্ছ নহে। প্রথমটি বাদ দিয়া যাহাই করিতে যাইবে,—তাহাই পণ্ড হইবে। সেই জন্য শঙ্কা হয় যে, বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বড় বড় পণ্ডিতরা যে চেষ্টা করিতেছেন,—তাহা সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইবে। আসল কথা, মানুষ যত দিন মানুষকে তাহার যোগ্য মর্য্যাদা দিতে না শিখিতেছে,—তত দিন পৃথিবী হইতে বিবাদ-বিসম্বাদ তিরোহিত হইবে না। তত দিন মানুষকে প্রকৃতির এই কশাঘাত সহ্য করিতেই হইবে। বিশ্বে শান্তির প্রতিষ্ঠা হইবে না।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

যে ছিল অসীম নভে—সে আজ এসেছে দ্বারে

বরষার ম্লান দিন ছিনু বসি আনমনে নিরালায় গৃহকোণে একা
বিজন জীবনে মম চুপিসারে এলে তুমি দিলে আজ
সুগোপন দেখা।

তোমার পরশেতে চাহি বিস্ময়ে ভরে মন তুমি মোর মানস-কমল
তোমার বক্ষে আজি সপ্ত-সাগর সুধা কামনায় করে টলমল,
একটি তারকা বুঝি খসিয়া পড়েছে আজ—
আসিয়াছে পাশেতে আমার—

এত দিন পরে বুঝি ভাঙিয়াছে ঘুম প্রিয়া তব ফুল-প্রেম-দেবতার!
যে-ছিল অসীম নভে যে-ছিল সুদূর হয়ে সে যে আজ
আসিয়াছে দ্বারে

আমার বিজন ঘরে বুকের আসন পাতি নিরালায় বসাইব তারে।

শরতের নীল-নভ—শুভ্র মেঘের ছায়া লাগিয়াছে নারিকেল-শাখে
দূরের কানন হতে ভেসে আসে মিঠে সুর—বিরহিণী
ঘুঘু কোথা ডাকে।

তুমি এলে সেইখণে পিছু হতে চুপি চুপি ফাগুনের ফুলপরী সম
একটি স্বপন যেন নামিল নয়নে মম—রূপ তার মধু-মনোরম।

যে-সাধ আছিল মোর মরমেতে লুকাইয়া—তুমি দিলে
খুলে সেই দ্বার—

পরশ করিনু তব একটি বেপথু হিয়া—পুলকিত তনু-সম্ভার।
হেরিনু নয়নে তব প্রথম আবেশমাখা পুলকের ঘন শিহরণ;
কাঁপে দূরে নীপশাখা—তারি সাথে কাঁপে প্রিয়া রসঘন তব তনু-মন।

শরতের ম্লান নভ—আঁধার গহন রাতি—ঝর ঝর বারিধারা ঝরে
বাহিরে বাতাস কাঁদে শাখা-পাতা ভেঙে পড়ে—দীপ নেবে
প্রতি ঘরে ঘরে;

একা ঘরে মুখোমুখি তুমি আর আমি শুধু বসে আছি—শুধু দুই জন
বাঁধ-ভাঙা ঢেউ যেন উথলায় বুকে তব—সাড়া তার জাগে অনুখণ।
বাহিরের ঝড় যেন লাগিয়াছে মনে আজ মুখে তবু ভাষা নাহি হায়,
দুই পারে থাকি মোরা কামনার তট হতে দু'জনারে চাহি দু'জনায়।
বাদল ভাঙিয়া পড়ে—জল আসে জানালায়—ডাকে দেয়া—
দূর নভ-পারে,

এত কাছে রহি মোরা তবুও মিলন লাগি একা ঘরে তিতি
আঁখি-ধারে।

বন্দে আলী মিয়া।

বাবাজী !

(গল্প)
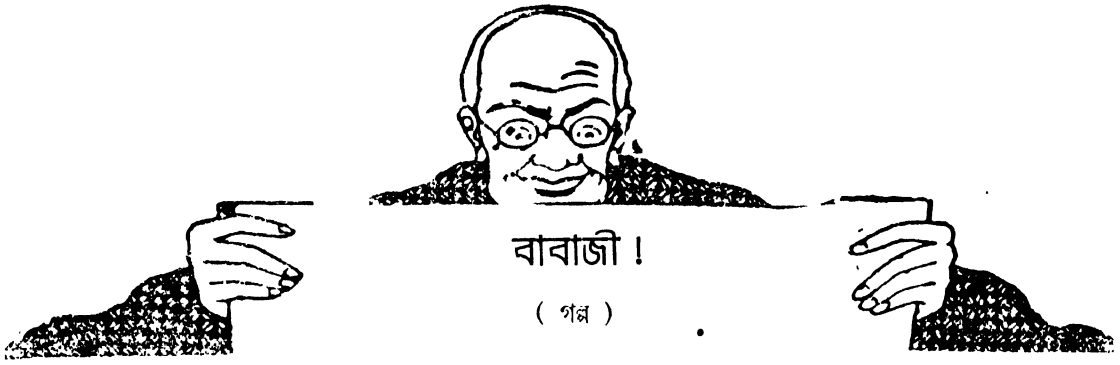
১

দুর্গোৎসব উপলক্ষে পঁয়তাল্লিশ দিনের মেয়াদে স্থলভে যাতায়াতের টিকিট লইয়া পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ঘুরিতে ঘুরিতে কোজাগরী পূর্ণিমার পূর্ব্ব-দিন সন্ধ্যার সময় বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া সুরযমলের ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইলাম। বৃন্দাবনে যাইবার সময় ট্রেণে এক মাড়োয়ারী সহযাত্রীর সহিত কথাবার্ত্তায় জানিতে পারি, তিনিও বৃন্দাবনের যাত্রী। তিনি কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বৃন্দাবনে কোথায় থাকিবেন ?"

আমি তাঁহাকে জানাইলাম—যে কোন-একটা ধর্ম্মশালায় উঠিয়া রাত্রিটা কাটাইয়া দিব।—আমার কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "সুরযমলের ধর্ম্মশালায় যাইবেন : খুব বড় ধর্ম্মশালা, দেড় হাজার লোক থাকিতে পারে। বন্দোবস্তও বেশ ভাল ; কোন অসুবিধা হইবে না। ধর্ম্মশালায় প্রত্যহ ত্রিশ সের হইতে এক মণ আটার রুটি সাধুদিগকে বিতরণ করা হয়।"—ইত্যাদি।

আমি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম—রুটির আশায় নহে, রাত্রিযাপনের আশায়। ভাবিলাম, সুরযমলেরই হউক, আর চন্দরমলেরই হউক, রাত্রি-যাপনের জন্য কাহারও আস্তানায় একটু আশ্রয় পাইলেই নিশ্চিন্ত হইতে পারি।

ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইয়া দেখি, প্রকাণ্ড চক-মিলান দ্বিতল অট্টালিকা। এক এক দিকে সারি সারি দশ-বারটি করিয়া কক্ষ ; কক্ষগুলির সম্মুখে সুদীর্ঘ বারান্দা। সুবৃহৎ প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটি অনতিউচ্চ পাথরের বেদী ; ত্রিশ-চল্লিশ জন লোক তাহাতে একসঙ্গে বসিতে পারে। আমি সেই বেদীর উপর আমার বাক্স, বিছানা রাখিলে এক জন কর্ম্মচারী বলিল, "বাবু, উপরে ঘর খালি নাই, নীচে দুই-চারিটা খালি আছে।" আমি তাহাকে নীচেরই যে কোন ঘর খুলিয়া দিতে বলিলে সে একটা ঘর খুলিয়া দিল। আমি সে-রাত্রির মত সেই ঘরেই আশ্রয় লইলাম। খাবার সঙ্গেই ছিল, আহারান্তে শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

পরদিন প্রভাতে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় শিখা-মালাধারী এক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিলেন,—আপনি আহারের কোন ব্যবস্থা করিয়াছেন কি ? যদি বলেন, তবে আমি দেবতার প্রসাদ আনিয়া দিব। আমি বলিলাম,—প্রসাদে কি কি থাকে, কখন্ পাওয়া যায় ? প্রসাদের জন্য আমাকে কি দিতে হইবে ? ব্রাহ্মণ বলিলেন,—বেলা বারটার সময় আমি লইয়া আসিব। প্রসাদে অন্ন, ডাল, ভাজা, চার-পাঁচ প্রকার ব্যঞ্জন, অন্ন এবং পায়স থাকে। প্রসাদের জন্য সাড়ে তিন আনা দিতে হইবে। আমি ভাবিলাম, চোদ্দ পয়সায় এ যে রাজভোগ ! কাল রাত্তিরটা ত জলযোগেই কাটিয়া গিয়াছে, আজ মধ্যাহ্নে যদি দেবতার অন্নপ্রসাদ পাই ত ভালই হয়। সুতরাং তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া প্রসাদ আনিতে বলিলাম। ব্রাহ্মণও আমার কাছে কার্য্য শেষ করিয়া ধর্ম্মশালায় আর কেহ "প্রসাদ" গ্রহণেচ্ছু থাকেন, তাহার অন্বেষণে বাহির হইলেন। আমিও আমার কক্ষদ্বারে তালা লাগাইয়া পথে বাহির হইলাম।

প্রথমেই গেলাম যমুনায়। বৃন্দাবনের নিম্নে সুদূর-বিস্তৃত বালুকাকীর্ণ চরভূমি ; সেই চর পার হইয়া জলের নিকটে যাইবার সময় প্রথমেই দৃষ্টিগোচর হইল—জলের নিকটে, পাথুরে কয়লার চাপের মত কি সব পড়িয়া রহিয়াছে ! উহা যে কি, তাহা প্রথমে বুঝিতে পারি নাই, পরে নিকটে গিয়া দেখি, অসংখ্য কচ্ছপ জলের মধ্যে এবং জলের সন্নিহিত স্থানে বিরাজ করিতেছে ! স্নানার্থীরা

প্রাতঃস্নানে আসিয়া ঐ সকল কচ্ছপকে ছোলা-ভাজা খাওয়ায়। ছোলা-ভাজার লোভে কচ্ছপগুলি জল হইতে নদীসৈকতে উঠিয়া আসে। স্নানের ঘাটের পার্শ্বেই তিন-চারি জন লোক ছোলা-ভাজা বিক্রয় করিতেছিল; আমি এক পয়সার ছোলা-ভাজা কিনিয়া জলে ও জলের কিনারায় ছুড়িয়া দিতে লাগিলাম; কচ্ছপগুলি কাড়াকাড়ি করিয়া সেগুলি খাইতে লাগিল।

দিল্লীতে দেখিয়া আসিয়াছি, পদব্রজে যমুনা পার হইতে পারা যায়; এখানে বোধ হয় জল কিছু গভীর, সেই জন্য নৌকার সেতুতে পারাপারের ব্যবস্থা আছে। যমুনার এক পারে বৃন্দাবন, মথুরা; অন্য পারে গোকুল, নন্দালয়;—যেখানে শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম শৈশবে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। বালক কৃষ্ণ গোকুল হইতে সখাগণ সহ গাভীদল লইয়া এপারে বৃন্দাবনে গো-চারণে আসিতেন। এই বৃন্দাবনেই তাঁহার হস্তে অঘাসুর, বকাসুর, বৎসাসুর নিহত হইয়াছিল। এইখানেই তিনি ভীষণ বিষধর কালীয় নাগকে দমন করিয়াছিলেন। যমুনার কূলে দাঁড়াইয়া কত কথাই মনে হইল! অদূরে ঐ সেই কালীয়-দমন ঘাট—যেখানে শ্রীকৃষ্ণ কালীয়-দমন করিয়া মৃত সখাগণকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন। মনে হইল, সে কত দিনের কথা, যখন এই যমুনার—

"বিশাল তটে রূপের হাটে
বিকাত নীল কান্তমণি!"

লালাবাবুর দেবালয়, শেঠেদের দেবালয় প্রভৃতিতে দেবদর্শন করিয়া পথিমধ্যে একটি দেবালয় দর্শন করিলাম—শুনিলাম, সেটি বর্ম্মার রাজার ঠাকুর-বাড়ী। বর্ম্মার রাজারা ত বৌদ্ধ, বৈষ্ণবের প্রধান তীর্থ শ্রীবৃন্দাবনে বৌদ্ধ রাজার দেবালয় কিরূপ, দেখিবার জন্য কৌতূহল হইল। দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, মন্দিরটি ঠিক ব্রহ্মদেশীয় প্যাগোডা বা বৌদ্ধ-মন্দিরের অনুকরণে নির্ম্মিত। কলিকাতায় ইডেন গার্ডেনে যে প্যাগোডা আছে, তাহার প্রবেশ-পথের দুই পার্শ্বে যেরূপ দুইটা সিংহমুখ সর্পাকৃতি কল্পিত জীবের মূর্ত্তি আছে, এই মন্দিরের সিঁড়ির দুই পার্শ্বে সেইরূপ দুইটি মূর্ত্তি দেখিলাম। মন্দিরমধ্যে কৃষ্ণ, রাধিকা এবং বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি। মন্দিরে এক জন শ্যামবর্ণ প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ আমাকে দেবতার চরণামৃত ও প্রসাদী বাতাসা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনার নিবাস? আমি বলিলাম,—চন্দননগর। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—কোন্ জিলা? আমি বলিলাম,—হুগলী জেলা। চন্দননগর ইংরেজদের রাজ্য নহে, ফরাসীর রাজ্য, সেই জন্য চন্দননগরের অপর নাম ফরাসডাঙ্গা। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—বুঝেছি, সেই ফরাসডাঙ্গা, যেখানে বর্ম্মার রাজকুমার মেইনগুন পালিয়ে গিয়ে কিছু দিন বাস ক'রেছিলেন।

ইতিহাসজ্ঞ পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড় লাট লর্ড ডফরিণের শাসনকালে ব্রহ্মদেশ স্বাধীনতা হারাইয়া ইংরেজের অধীন ও ভারতবর্ষের অন্যতম প্রদেশে পরিণত হইলে, ব্রহ্মদেশের শেষ স্বাধীন রাজা থিবর ভ্রাতুষ্পুত্র মেইনগুন বন্দী হইয়া কাশীধামে প্রেরিত হইলে কিছু দিন পরে তিনি ছদ্মবেশে কাশী হইতে পলায়ন করিয়া চন্দননগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি চন্দননগরে প্রায় এক বৎসর অবস্থানের পর চন্দননগর হইতে গোপনে পণ্ডিচেরীতে গমন করেন।

আমি ব্রাহ্মণকে তাঁহার নিবাস কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন,—বর্ম্মার পুরাতন রাজধানী ম্যাণ্ডেলে। ছয় পুরুষ ধরিয়া আমাদের ম্যাণ্ডেলেতে বাস। তাহার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় বাস ছিল; কিন্তু কোথায়, তাহা জানি না। আমরা ব্রহ্মরাজের গুরু।

বৌদ্ধরাজার হিন্দুগুরু কিরূপ, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন,—আমরা বর্ম্মার রাজবংশের ধর্ম্মগুরু নই, শিক্ষাগুরু। রাজকুমারগণ আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের নিকটে বিদ্যা-শিক্ষা করিতেন। রাজা সভাস্থ হইয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলে, তাঁহাকে সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করাও আমাদের অন্যতম কর্ত্তব্য ছিল। এই মন্দির আমার পূর্ব্ব-পুরুষ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। ইহার নির্ম্মাণ-ব্যয় বর্ম্মার রাজাই দিয়াছিলেন।

মন্দিরে তিন-চারিটি স্ত্রীলোককে দেখিলাম, তাঁহাদের মুখশ্রী বঙ্গরমণীর মত; কিন্তু বেশ-ভূষা, কেশবিন্যাস বর্ম্মিজ মহিলাদের মত। দেব-দর্শনের পর বেলা এগারটার সময় ধর্ম্মশালায় ফিরিলাম।

২

ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণার উদ্রেক হইয়াছিল, বাসায় ফিরিবার সময় কিছু খাবার কিনিয়া লইয়াছিলাম;

জলযোগান্তে বাহিরের বারান্দায় বসিয়া দেবতার প্রসাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ধর্ম্মশালায় কত নূতন যাত্রী বাক্স-বিছানা লইয়া আগমন করিল; আবার কত যাত্রী মোট-ঘাট বাঁধিয়া সদলে প্রস্থান করিল। বেলা প্রায় ১২টার সময় দুই-চারি জন করিয়া মলিন-বেশী ভিক্ষুক ধর্ম্মশালায় প্রবেশপূর্ব্বক প্রাঙ্গনের পার্শ্ববর্ত্তী বারান্দায় বসিতে আরম্ভ করিল। এমন সময় প্রাতঃ-কালের সেই মালা-তিলকধারী ব্রাহ্মণ আমার জন্য "প্রসাদ" লইয়া আসিলেন। আমি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলে তিনিও আমার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে আসিয়া কক্ষতলে প্রসাদ-পাত্র রক্ষা করিলেন। একটা পিতলের গামলায় অন্ন, এবং পলাশ-পত্রের ছোট ছোট ঠোঙ্গায় নানাপ্রকার ব্যঞ্জন, ডাল, পায়স প্রভৃতি আনিয়াছিলেন; গামলার উপরে একখানা পাতা চাপা। তিনি সেই পাতায় অন্ন রাখিয়া, এবং ব্যঞ্জনের ঠোঙ্গাগুলি তাহার পার্শ্বে সাজাইয়া রাখিয়া বলিলেন, "প্রসাদ গ্রহণ করুন।" আমি তাঁহাকে প্রসাদের মূল্য সাড়ে তিন আনা দিলে তিনি প্রস্থান করিলেন, আমিও ভোজনে প্রবৃত্ত হইলাম।

অন্নগুলি বেশ সুগন্ধী এবং শুভ্র; কিন্তু হাত দিয়া দেখিলাম—তুষার-শীতল! হউক শীতল, কিন্তু ডাল মাখিতে গিয়া দেখিলাম, ভোগের অন্ন তখনও তণ্ডুলত্ব পরিহার করিয়া অন্নত্বে উপনীত হয় নাই! অঙ্গুলি দ্বারা তাহা টিপিয়া কোমল করা অসাধ্য! দুই-চারি গ্রাস মুখে দিয়া দেখিলাম, সেগুলিকে উদরস্থ করা কঠিন। ভাবিলাম, অন্ন-ভোজনে আর কাজ নাই; ব্যঞ্জন ও পায়স দ্বারাই উদর পূর্ণ করি। কিন্তু—

"অভাগা যদ্যপি চায়
সাগর শুকায়ে যায়"

ব্যঞ্জনগুলিও অন্নের উপযুক্ত উপচার! ব্যঞ্জনগুলি অপক্ক অবস্থা অতিক্রম করিয়াছে বটে, কিন্তু সিদ্ধ হইয়া কিসে পরিণত হইয়াছে, অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহা আবিষ্কার করিতে পারিলাম না। কোন ব্যঞ্জনই মুখে দিয়া বুঝিতে পারিলাম না, তাহা সুক্ত কি অম্ল, ডাল্‌না কি ঘণ্ট, ঝোল কি চচ্চড়ি! সবগুলির আস্বাদ একই প্রকার, অর্থাৎ কোন আস্বাদই পাইলাম না। এই পর্য্যন্ত বুঝিলাম যে, কতকগুলি ফল ও মূল কিঞ্চিৎ লবণ সহযোগে সিদ্ধ করা হইয়াছে। মূলগুলি আলু কি কচু, অথবা ফলগুলি অলাবু কি বার্ত্তাকু—মুখে দিয়া তাহা বুঝিবার উপায় নাই! প্রসাদে অম্লও ছিল,—তেঁতুল-গোলা; শেষে পায়স্।—মনে করিয়াছিলাম যে, ব্যঞ্জনগুলি অখাদ্য হইলেও পায়সটা সুখাদ্য না হউক, অন্ততঃ অখাদ্য হইবে না। কিন্তু সে আশাতেও নিরাশ হইলাম। মুখে দিয়া বুঝিলাম—পায়স্ বটে, তবে পয়স্-বর্জ্জিত। বিনা-দুগ্ধেও যে পায়স্ হইতে পারে, সে অভিজ্ঞতা এবার বৃন্দাবনে লাভ করিলাম। যে বৃন্দাবনে যশোদা-দুলাল শ্রীকৃষ্ণ আশৈশব ক্ষীর, সর, নবনী খাইয়া লালিত-পালিত হইয়াছিলেন, সেই বৃন্দাবনে এখন তিনি ও-রসে বঞ্চিত হইলেন কেন?—কালমাহাত্ম্য?

প্রসাদগ্রহণের পর বাহিরে আসিয়া দেখি, প্রাঙ্গণের তিন দিকের বারান্দায় শ্রেণীবদ্ধ ভাবে প্রায় সত্তর-আশী জন ভিখারী বসিয়া আছে; তন্মধ্যে কুড়ি-পঁচিশ জন স্ত্রীলোক। বালক-বালিকাও আছে। ভিখারীদের মধ্যে দশ-বার জনকে বাঙ্গালী বলিয়া মনে হইল। আমার কক্ষের সম্মুখস্থ বারান্দায় এক জন বৃদ্ধকে দেখিয়া বাঙ্গালী বলিয়া মনে হইল। বয়স বোধ হয় সত্তর বৎসর হইবে। দীর্ঘ শ্মশ্রু, মাথার দীর্ঘ কেশ পাকাইয়া ঝুঁটি বাঁধা, তাহাতে একখানা ছিন্ন বিবর্ণ নামাবলী জড়ানো; পরিধানে এক-খানি অর্দ্ধমলিন বস্ত্র এবং একটি গেঞ্জি। নাসিকায় তিলক, গলদেশে তুলসীর মালা, নিকটে একটি একতারা দেখিয়া বুঝিলাম, এই ভিখারী বাউল-সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব। বেশভূষা যেরূপই হউক, আকৃতি দেখিয়া তাহাকে ভদ্র এবং সম্ভ্রান্ত-বংশোদ্ভব বলিয়া মনে হইল। তাহার সহিত একটু আলাপ করিবার ইচ্ছা হইল; কিন্তু সেই সময় সাধুদিগের ভোজ্য আনীত হওয়ায় তখন কথা-বার্ত্তার সুযোগ হইল না।

ধর্ম্মশালার এক জন কর্ম্মচারী—বোধ হয় পাচক, ব্রাহ্মণ, একগোছা রুটি আনিয়া প্রত্যেককে দুইখানি করিয়া রুটি পরিবেশন করিতে করিতে অগ্রসর হইল; তাহার পশ্চাতে আর এক জন লোক একটা বড় পিতলের বাল্‌তিপূর্ণ ডাল লইয়া প্রত্যেককে এক-হাতা করিয়া ডাল দিতে লাগিল। ভোজনার্থিগণ প্রাপ্ত রুটি পাতিয়া তাহার উপর ডাল

লইল। কেহ কেহ একটা পুরাতন কলাই-করা, বা এলুমিনিয়ামের বাটি আনিয়াছিল, তাহাতেই ডাল লইয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইল। যাহাদিগের রুটি ফুরাইয়া গেল, তাঁহাদিগকে আবার রুটি ও ডাল দেওয়া হইল। রুটিগুলি বেশ বড়, এবং প্রত্যেকখানি আধ ইঞ্চি পুরু। ডালটা কলায়ের ডাল কি অন্য কোন ডাল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। পরিবেশনকালে দেখিলাম, তাহা হরিদ্রা বর্ণ এবং জলবৎ তরল। যাহা হউক, এইটুকু বুঝিলাম যে, ধর্ম্মশালার প্রতিষ্ঠাতার দয়ায় প্রত্যহ মধ্যাহ্নকালে সত্তর-আশী জন বুভুক্ষু অনাথ-অনাথা, বালক-বৃদ্ধ উদর পূর্ণ করিয়া খাইতে পায়। ইহা অল্প দয়ার কার্য্য নহে।

আমার কক্ষের সম্মুখে যে বৃদ্ধ বাবাজী বসিয়াছিলেন, তিনি উঠিয়া হাত-মুখ ধুইতে গেলেন। তাঁহার ধীর, শান্ত পদক্ষেপ দেখিয়া তিনি যে অন্য ভিক্ষুকদের মত এক জন সাধারণ ভিক্ষুক নহেন, ভদ্রসন্তান, আমার সেই পূর্ব্বেকার ধারণা আরও বদ্ধমূল হইল। ভোক্তারা হাত-মুখ ধুইয়া প্রস্থান করিলে তিনি সকলের পরে হাত-মুখ ধুইয়া আসিলেন। তাঁহার সেই একতারাটি আমার কক্ষের দ্বারের পার্শ্বে রাখিয়া গিয়াছিলেন, আচমনান্তে তাহা লইতে আসিলেন। তিনি আমার নিকটস্থ হইলে আমি বলিলাম—"বাবাজী, নমস্কার!"

বাবাজী প্রতি-নমস্কার করিয়া বলিলেন, "নমো নারায়ণায়!"

"আপনি ব্রাহ্মণ?"

"ব্রাহ্মণবংশে জন্ম বটে, তবে আমি 'ব্রাহ্মণ', এ কথা কি করে বলি? শাস্ত্রে আছে, 'ব্রহ্মং জানাতি ব্রাহ্মণঃ—"ব্রহ্মকে জানা ত দূরের কথা, ব্রাহ্মণের অবশ্যকর্ত্তব্য কোন কর্ম্মই ত করি নাই; সুতরাং কি করে বলি যে, আমি ব্রাহ্মণ?"

আমি বলিলাম, "আপনার কথা শুনে আমি বড় আনন্দিত হয়েছি। যদি আপনার আপত্তি না থাকে, তা'হলে এই ঘরের মধ্যে এসে একটু বিশ্রাম করুন, আপনার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করবার জন্য বড়ই আগ্রহ হচ্ছে।"

তিনি বলিলেন, "আমার আপত্তি কি? আপনার মত এক জন সদাশয় লোক এই অপরিচিত দীন-দরিদ্রের সঙ্গে ডেকে কথা কইতে চাইছেন, এ ত আমি পরম সৌভাগ্য বলে মনে করি। দরিদ্র ভিক্ষুককে ডেকে কে কথা কয়?"

কক্ষের এক পার্শ্বে আমার শয্যা পাতা ছিল, তিনি সেই শয্যাতে না বসিয়া শয্যার অদূরে ঘরের মেঝেতে বসিবার উপক্রম করিলে আমি তাঁহার হাত ধরিয়া শয্যায় আমার পার্শ্বেই তাঁহাকে বসাইলাম। তিনি উপবেশন করিলে আমি বলিলাম, "আপনি কত দিন বৃন্দাবনে বাস করিতেছেন?"

"ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর হবে?"

"আপনার আর কে আছে?"

"শ্রীবৃন্দাবন-বিহারী রাধানাথ আছেন। তিনি ছাড়া আর আমার আপনার বলতে কেউ নেই।"

"এখানে আপনার আশ্রম কোথায়?"

বাবাজী হাসিয়া বলিলেন, "আমার আবার আশ্রম! ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে। গ্রীষ্মকালে গাছতলায়, আর শীতকালে যে কোন মন্দিরে বা কোন ধর্ম্মশালার বারান্দায় রাত্রিযাপন করি।"

"আপনি প্রত্যহ কি এইখানে আহার করেন?"

"প্রত্যহ নয়, মধ্যে মধ্যে। মাধুকরী-বৃত্তি, যে দিন নারায়ণ যেখানে যা দেন।"

আমি বলিলাম, "আপনি বাঙ্গালী, বঙ্গদেশের কোথায় আপনার পূর্ব্বাশ্রম ছিল, সে আশ্রমে আপনি কি করতেন প্রভৃতি জানবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল হচ্ছে। আমি জানি, সাধু-সন্ন্যাসীরা পূর্ব্বাশ্রম সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেন না, সে সম্বন্ধে কোন কথা তাঁদের জিজ্ঞাসা করাও অনুচিত। তবু কেন জানিনে, আপনার সম্বন্ধে আমি কৌতূহল দমন করতে পারচিনে, সে জন্য ক্ষমা চাইচি।"

বাবাজী হাসিয়া বলিলেন "আপনি ঠিকই বলেছেন—সাধু-সন্ন্যাসীদের পূর্ব্বাশ্রমের কথা জিজ্ঞাসা করতে নেই। কিন্তু আমি সাধুও নই, সন্ন্যাসীও নই; সুতরাং আমার অতীত জীবনের কোন কথা জিজ্ঞাসা করায় বিন্দুমাত্র দোষ হয়নি। আমার জীবন-কথা এমন কিছু বিচিত্র নয় যে, শুনলে আপনি বিস্মিত হবেন। আমাদের দেশের শত শত হতভাগার অদৃষ্টে যা ঘটে থাকে, আমার অদৃষ্টেও তাই ঘটেছে। আপনার কাছে আমার জীবনের

কথাগুলি শুনে যদি কেহ আগে থেকে সাবধান হয়, তা'হলে আমি আমার এই অবস্থাবিপর্য্যয়কেও সার্থক মনে করব ; তবে আমার একটা অনুরোধ, সেটা আপনাকে রাখতে হবে। যদি কখন কারও কাছে আমার সম্বন্ধে গল্প করেন, তা'হলে আমার নাম, বাসস্থান ও বংশ-পরিচয় প্রকাশ করবেন না।"

আমি তাঁহার অনুরোধ-রক্ষায় প্রতিশ্রুত হইলে তিনি আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। তাঁহার পরিচয় শুনিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না ! সে-কালে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদে স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে নিখিল বঙ্গব্যাপী আন্দোলন হইয়াছিল, তাহাতে সুরেন্দ্রনাথের আহ্বানে যাঁহারা জন্মভূমির জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আন্দোলনের অগ্নিরাশিতে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, ইনি —এই দীন-হীন ভিক্ষুক তাঁহাদেরই অন্যতম ! সে সময় এই স্বদেশপ্রেমিক ব্যক্তির নাম কাহার অজ্ঞাত ছিল ?

আমি তাঁহার মুখে তাহার অতীত জীবনকাহিনী যাহা শুনিলাম, আজ তাহা পাঠকবর্গকে শুনাইতেছি, কিন্তু তাঁহার নাম-ধাম প্রকাশ করিব না। তিনি হাসিমুখে তাঁহার যে কাহিনী বর্ণনা করিলেন, তাহা আমি তাঁহার কথাতেই পাঠকগণকে সংক্ষেপে শুনাইতেছি।

৩

বাবাজী বলিলেন :—

আমি ফরিদপুর জিলার লোক। শুনিয়াছি, আমার কোন পূর্ব্বপুরুষ, নবাব সায়েস্তা খাঁর অধীনে উচ্চ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া পশ্চিম-বঙ্গ অর্থাৎ বর্দ্ধমান জিলা হইতে ঢাকায় গিয়া বাস করেন। তিনি এক সময় একটা যুদ্ধে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া নবাবের জীবন-রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই জন্য নবাব তাঁহাকে ফরিদপুর জিলায় বিস্তীর্ণ জায়গীর এবং বংশানুক্রমে "রায়" উপাধি প্রদান করেন। শুনিয়াছি, তাহার পূর্ব্বে আমাদের পদবী ছিল চক্রবর্ত্তী। আমরা তদবধি "রায়" উপাধিই ব্যবহার করিয়া আসিতেছি। বংশ-পরিচয়ে আমরা শুদ্ধ শ্রোত্রীয়।

আমরা নবাবের নিকট যে জায়গীর উপহার পাইয়াছিলাম, শুনিয়াছি, তাহার বাৎসরিক আয় প্রায় তিন লক্ষ টাকা ছিল! আমাদের আদিপুরুষ ত্রিলোচন রায় ঢাকাতেই বাস করিতেন। পরে বাঙ্গালার রাজধানী পশ্চিম-বঙ্গে স্থানান্তরিত হইলে ত্রিলোচনের পুত্র ঢাকার বাস ত্যাগ করিয়া ফরিদপুরে নিজের জমিদারীতে গিয়া বাস করেন। সেখানে তিনি প্রকাণ্ড প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে প্রায় এক শত বিঘা জমি গড় দ্বারা বেষ্টিত ছিল বলিয়া আমার পিতৃপিতামহগণ "গড়ের বাবু" নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

কালসহকারে আমাদের বিস্তীর্ণ জমিদারী জ্ঞাতিদের মধ্যে বিভক্ত হইয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া গেল। আমার পিতামহের অংশের জমিদারীর আয় বাৎসরিক বাইশ হাজার টাকা ছিল। আমার পিতা তাঁহার জননীর একমাত্র সন্তান ছিলেন, আমিও আমার পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। যদি আমি আমাদের প্রবীন দেওয়ান বাবুর পরামর্শ গ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে আজ আমাকে বৃন্দাবনে মাধুকরী-বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইত না।

আমার বয়স যখন সাত বৎসর, তখন আমার মাতার মৃত্যু হয়। আমাদের গড়বন্দী বাড়ীর যে অংশে আমরা থাকিতাম, সেই অংশটা আমার পিতামহের আমলে পদ্মাগর্ভে ভাঙ্গিয়া পড়ে। সেই জন্য আমার পিতামহ সেই গ্রাম ত্যাগ করিয়া পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী অন্য এক গ্রামে গিয়া বাস করেন। নূতন বাড়ী আমাদের প্রাচীন প্রাসাদের মত সুবৃহৎ বা গড়বন্দী না হইলেও নিতান্ত ছোট ছিল না। নূতন বাড়ীতেও প্রতিবৎসর বিশেষ সমারোহে দোল-দুর্গোৎসব হইত, অতিথিশালাও ছিল। বলা বাহুল্য, আমি এই নূতন বাড়ীতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। আমার জননীর মৃত্যুর পর আমার পিতা আর বিবাহ করেন নাই ; তিনি জনক ও জননী উভয়ের স্নেহ দিয়াই আমায় লালন-পালন করিয়াছিলেন। আঠার বৎসর বয়সে আমার বিবাহ হয়। ফরিদপুর জিলার কোন পল্লীগ্রামের এক গৃহস্থ ভদ্রলোকের সুন্দরী কন্যাকে বাবা পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি তখন ঢাকা জগন্নাথ কলেজে এফ-এ পড়ি।

যথাসময়ে এফ-এ পাশ করিয়া বি-এ পড়িতে লাগিলাম। আমি শুনিয়াছিলাম যে, আমার কোষ্ঠীতে সমুদ্রযাত্রা লেখা আছে। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ

করিবার পর হইতেই আমার বিলাত যাইবার ইচ্ছা প্রবল হইল। অনেক দিন আমি বসিয়া বসিয়া জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিতাম, ষ্টীমারে চড়িয়া ভূমধ্যসাগর দিয়া ইংলণ্ডে যাইতেছি! কখনও কল্পনা করিতাম—ব্যারিষ্টার হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে আইন-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক দিন বাবার কাছে আমার বিলাত-গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি বলিলেন, "তুমি আগে বি-এ পাশ কর, তার পর দেখা যাবে।" আমি বুঝিলাম যে, আমার বিলাত-গমনে তাঁহার আপত্তি হইবে না।

বি-এ পরীক্ষার প্রায় চারি মাস পূর্ব্বে, এক দিন ঢাকার বাসাতে আমাদের দেওয়ান নবীন বাবুর লিখিত এক পত্র পাইয়া স্তম্ভিত হইলাম। তিনি আমাকে অবিলম্বে বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য তাগিদ দিয়া পত্র লিখিয়াছেন। দেওয়ান বাবুকে আমি জ্যাঠা মহাশয় বলিতাম; আমার বাবাও তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। বাড়ী হইতে আমি আসার পর পিতার এবং ইদানীং আমার স্ত্রীর নিকট হইতেই পত্র পাইতাম, জ্যাঠা মহাশয় আমাকে কোন পত্র লিখিতেন না, বা আমিও তাঁহাকে কোন পত্র দিতাম না; আজ হঠাৎ তিনি আমাকে বাড়ী যাইবার জন্য পত্র দিলেন কেন? আমি অমঙ্গল আশঙ্কায় কাতর হইয়া তৎক্ষণাৎ গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, বিনা-মেঘে আমার মাথায় বজ্রাঘাত হইয়াছে; আমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে! তখনও তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয় নাই। জ্যাঠা মহাশয়ের মুখে শুনিলাম, দুই দিন পূর্ব্বে সন্ধ্যার সময় বাবার অকস্মাৎ মূর্চ্ছা হয়। গ্রামে ভাল চিকিৎসক না থাকায় ফরিদপুর হইতে ভাল চিকিৎসক আনিবার জন্য লোক পাঠানো হইয়াছিল। ফরিদপুরের ডাক্তার সেই লোক-মুখে বাবার পীড়ার সংবাদ শুনিয়া, পরদিন প্রাতঃকালে আমাদের বাড়ীতে উপস্থিত হয়েন। তিনি আসিবার সময় এক মণ বরফ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। ডাক্তার বাবু রোগীকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, সহসা রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় মস্তিষ্কের একটা শিরা ছিঁড়িয়া গিয়াছে, রোগ সাংঘাতিক; জীবনের আশা অতি অল্প। তাহা শুনিয়াই জ্যেঠা মহাশয় আমাকে পত্র দিয়াছিলেন। বৈকালে অবস্থা আরও খারাপ হওয়ায় তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবার জন্য এক জন লোককে ঢাকায় প্রেরণ করেন। সেই লোক ঢাকায় আমার বাসায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই আমি ঢাকা ত্যাগ করিয়াছিলাম, তাই তাহার সঙ্গে আমার দেখা হয় নাই। আমি বাড়ী পৌঁছিবার প্রায় তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে বাবার শেষ-নিশ্বাস বাহির হয়। আমি নিশ্চয়ই আসিব জানিয়া জ্যাঠা মহাশয় আমার দ্বারা পিতার শেষকৃত্য সম্পন্ন করাইবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

বাবার শ্রাদ্ধ-কার্য্যাদি শেষ হইবার পর এক দিন জ্যাঠা মহাশয় আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার মতে তোমার আর বাড়ী ছাড়িয়া বিদেশে থাকা উচিত হইবে না। তুমি পাশের পড়া নিয়েই এত দিন ব্যস্ত ছিলে, জমিদারীর কাজ-কর্ম্ম কিছুই জান না। কর্ত্তা স্বর্গে গিয়াছেন, এখন তুমি নিজে এ-সব না দেখিলে বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিবে না।"

আমি বলিলাম—"আপনি ত আছেন।"

"আমি আছি সত্য, কিন্তু কয় দিনের জন্য? কর্ত্তা বাবু আমা অপেক্ষা চার-পাচ বছরের ছোট ছিলেন। কে জানিত যে, অমন স্বাস্থ্যবান্ লোক তিন দিনের রোগেই আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন? আমারই যে কাল মৃত্যু হইবে না, কে বলিতে পারে? তোমার বি-এ পরীক্ষা এ বৎসর না দিয়া পর-বৎসর দিলেও ক্ষতি নাই। যদি ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি এক বৎসর, এমন কি ছয় মাসও জীবিত থাকি, তাহা হইলে তোমাকে জমিদারীর অনেক কাজ শিখাইয়া যাইতে পারিব কিন্তু যদি ইতিমধ্যেই আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে কি হইবে?"

তাঁহার এই প্রস্তাব সঙ্গত মনে করিয়া আমি তাহাতেই সম্মত হইলাম। বি-এ পরীক্ষার আশা আপাততঃ ত্যাগ করিয়া জ্যাঠা মহাশয়ের কাছে জমিদারীর কাজ-কর্ম্ম শিখিতে লাগিলাম। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন যে, জমিদারী রাখিতে হইলে মামলা-মোকর্দ্দমা করিতেই হয়, কিন্তু মামলা যত কম করা হয়, ততই ভাল। অনেক পুরাতন বনিয়াদি-বংশ মামলায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথের ভিখারী হইয়াছে। যদি জ্যাঠা মহাশয়ের এই অমূল্য উপদেশ

অনুসারে কার্য্য করিতাম, তাহা হইলে আমাকে আজ পথের ভিখারী হইতে হইত না।

তখন বুঝিতে পারি নাই যে, জ্যাঠা মহাশয় ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা ছিলেন। তিনি নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে আর অধিক দিন জীবিত থাকিতে হইবে না। বাবার মৃত্যুর ঠিক চার মাস পরে, দারুণ কলেরায় আক্রান্ত হইয়া জ্যাঠা মহাশয়ও আমাকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন। আমি জগৎ অন্ধকার দেখিলাম। চেষ্টা করিলে এই চারি মাসেই জমিদারীর কাজ-কর্ম্ম অনেকটা শিখিতে পারিতাম, কিন্তু সেরূপ চেষ্টা করি নাই। কি করিয়া সম্পত্তি-রক্ষা করিব, এখন ইহাই প্রধান ভাবনা হইল। আমার চিন্তার বিষয় অবগত হইয়া এক দিন আমার স্ত্রী বলিলেন, "আমার এক মেসোমশাই আছেন, তিনি অনেক বড় বড় জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করেছেন। তাঁকে একটু বিশেষ করে ধরলে তিনি 'না' বলতে পারবেন না। তাঁকে আনিয়ে তাঁর উপর সব ভার দাও, কোনও ভাবনা থাকবে না।" অনেক আলোচনার পর আমার স্ত্রীর পরামর্শই সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল। আমার পত্র পাইয়া এক দিন মেসোমশায় আমাদের বাড়ীতে পদার্পণ করিলেন। হায়! তখন যদি বুঝিতাম, 'স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী!'

দেখিলাম, মেসোমশায় জমিদারী সেরেস্তার কাজে একেবারে পাকা ঘুণ। দেওয়ানী ফৌজদারী মামলা-মোকদ্দমার তদ্বিরে, অবাধ্য প্রজার শাসনে, পুলিশ ও হাকিমের মনোরঞ্জনে একেবারে সিদ্ধহস্ত। এক বৎসরের পর দেখিলাম, আমার বাৎসরিক আয় বাইশ হইতে তেইশ হাজার টাকা হইল। মেসোমশায় বলিলেন, "দেখ্‌ছ কি বাবাজী, আগামী বৎসরে তোমার পঁচিশ হাজার টাকা আয় দেখাব।" আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম।

চার-পাঁচ বৎসর নিরুদ্বেগে কাটিয়া গেল। এই কয় বৎসরের মধ্যে মেসোমশায়ের স্ত্রী, তিনটি পুত্র, তিনটি পুত্রবধূ, দুইটি কন্যা, একটি ভাগিনেয়ী প্রভৃতি আসিয়া আমাদের বাড়ীতে বেশ আসর জাঁকাইয়া বসিয়াছিল। আমার নিজের বাড়ীতে বাস করিয়া মনে হইল যেন, শ্বশুরবাড়ীতে বাস করিতেছি! যে দিকে চাই, শালা, শালাজ, শালীই নজরে পড়ে। বলা বাহুল্য, আমার বি-এ পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই, বিলাত যাওয়াও হয় নাই।

ইহার কিছু দিন পরেই বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ উপলক্ষে সারা বঙ্গদেশ অভূতপূর্ব্ব ভাবে আন্দোলিত হইয়া উঠিল। কলিকাতায় সুরেন্দ্র বাবু, বরিশালে অশ্বিনী বাবু, ফরিদপুরে অম্বিকা বাবু প্রভৃতির নেতৃত্বে দেশে দেশে প্রতিবাদ-সভা হইতে লাগিল। আমি তখন পঁচিশ বৎসর বয়স্ক যুবক। আমি সেই আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। ফরিদপুরের জননায়ক বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার আমার পিতার বন্ধু ছিলেন, আমি তাঁহার নিকটে স্বদেশী-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তাঁহার অনুচররূপে গ্রামে গ্রামে সভায় বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম; মাসের মধ্যে দুই-তিন দিনও বাড়ীতে থাকিতাম কি না সন্দেহ।

বাবাজীর কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, "আমি তাহা জানি। বরিশালে প্রাদেশিক সম্মেলনে আপনার মাথায় পুলিশের লাঠী পড়িয়াছিল,—খবরের কাগজে পড়িয়াছিলাম। আপনার নাম শুনিয়াই আমি আপনাকে চিনিয়াছি। কিন্তু আপনার এ ভাগ্য-বিপর্য্যয় হইল কেন?"

বাবাজী বলিলেন, "এবার সেই কথাই বলিব।"

৪

বাবাজী আবার আরম্ভ করিলেন :—

আমাদের জমিদারীর ঠিক পার্শ্বেই এক মুসলমানের জমিদারী ছিল। সেই জমিদারও খুব সম্ভ্রান্ত এবং প্রাচীন-বংশ। এক দিন মেসোমশায়ের মুখে শুনিলাম যে, একটা গ্রামের দখলি-স্বত্বাধিকার লইয়া তাঁহাদের সহিত আমাদের মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছে। যে গ্রামটা লইয়া বিবাদ, সেই গ্রাম তাঁহাদের জমিদারীর একেবারে শেষ সীমায় ছিল। গ্রামের পূর্ব্ব পার্শ্বে একটা নদী আছে; সেই নদীর পূর্ব্ব দিকে আমাদের তালুক। এক বৎসর সেই নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, বর্ষার শেষে দেখা গেল, নদী সেই গ্রামের পশ্চিম দিকে নিম্ন-ভূমি দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। দুই-তিন বৎসরের মধ্যে নদীর পুরাতন খাদ ভরাট হইয়া নূতন খাদটাই প্রবল হইয়া উঠিল। আমাদের বাঙ্গালা দেশে অনেক নদীরই খাদ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। মেসোমশায় বলিলেন, ঐ নদীই যখন আমাদের জমিদারীর পশ্চিম সীমানা, তখন ঐ

গ্রামটাও আমাদের তালুকভুক্ত। মুসলমান জমিদার তাহাতে আপত্তি করিলেন। মেসোমশায় সালিশ মানিতে অসম্মত হইয়া আদালতের আশ্রয় লইলেন। সব্-জজের আদালতে মোকর্দ্দমা চলিতে লাগিল।

ইংরেজের দেওয়ানী আদালত, মামলার আর নিষ্পত্তি হয় না। অবশেষে দুই বৎসরের পর মামলার বিচার-ফল প্রকাশিত হইল,—আমাদের হার হইয়াছে। মেসো-মশায় বলিলেন, "সব্-জজকে ঘুস খাইয়েছে, দেখা যাক্, হাইকোর্টে কাকে ঘুস দিয়ে হাত করতে পারে।" হাইকোর্টে আপিল করা হইল।

আমি তখন 'স্বদেশী' লইয়াই উন্মত্ত। জন্মভূমির জন্য আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। বিশেষতঃ, যে মেসো-মশায়ের চেষ্টায় ও পরিশ্রমে জমিদারীর আয় বাড়িয়াছে, তাঁহার পরামর্শ অগ্রাহ্য করি কিরূপে? মেসোমশায় কলিকাতায় গিয়া মিঃ (তখনও 'সার' হন নাই) এস, পি, সিংকে আমাদের পক্ষ-সমর্থনে নিযুক্ত করিলেন। আমি মফঃস্বলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিদেশী-বর্জ্জনের বক্তৃতা করিয়া বেড়াই, দশ-পনের দিন অন্তর দুই-এক দিনের জন্য বাড়ীতে আসি, আবার বক্তৃতা করিতে যাই। অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় আমার স্বদেশানুরাগ দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, সর্ব্বদা আমাকে ডাকিয়া পাঠাইতেন, সকল কার্য্যে—অবশ্য দেশের কার্য্যে—আমার জমিদারীর কার্য্যে নহে—আমাকে উৎসাহ দান করিতেন।

এক দিন মেসোমশায় আমাকে বলিলেন, "বাবা, তুমি ত সভা-সমিতি, কংগ্রেস-কন্‌ফারেন্স নিয়ে পাগল, এ দিকে তোমার অনুপস্থিতিতে সময় সময় আমি যে বড় মুস্কিলে পড়ি।"

—"কেন? মুস্কিল কিসের?"

—"যে সব কাজে তোমার নাম-সই দরকার, সে সব কাজ তোমার জন্য ফেলে রাখ্‌তে হয়। তোমার বদলে আমি সই করলে ত আদালতে গ্রাহ্য হবে না,—"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "আপনাকে যদি Power of Attorney দিই?"

—"তাহা হইলে চলিতে পারে বটে, কিন্তু আমি দায়িত্ব লইব না।"

আমি তাঁহার আপত্তি শুনিলাম না, সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়া অবশেষে তাঁহাকে সম্মত করাইলাম। এ বিষয়ে আমার স্ত্রীও তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। মেসোমশায়ের সম্মতি পাইবামাত্র আমি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সদরে গেলাম, এবং তাঁহার নামে Power of Attorney দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

আমার জমিদারীর মধ্যে আমি বিলাতী লবণ, বিলাতী বস্ত্র প্রভৃতি বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম, সেজন্য মহকুমা-হাকিম এবং পুলিশের নজরে পড়িয়াছিলাম; কিন্তু আমি তাহা গ্রাহ্য করিতাম না। এক দিন আমার এক জন আমলার মুখে শুনিলাম যে, মুন্সেফি আদালতে, সব্-জজের এবং জজের আদালতে আমাদের আট-দশটা মামলা চলিতেছে। মেসোমশায়কে সে কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "বাবাজী, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। মামলা আছে—আমি আছি, তোমার ভাবনা কি? সে ভার আমার।"

এক দিন আমাদেরই জমিদারীর একটা গ্রামে সভা করিতে গিয়াছিলাম। সভার পর গ্রামের কতকগুলি মুরুব্বি আসিয়া বলিল যে, গ্রামের একটা পুষ্করিণীর জল-সেচন লইয়া উত্তর-পাড়ার সহিত দক্ষিণ-পাড়ার লোকের বিবাদ চলিতেছে, আমাকে তাহার একটা মীমাংসা করিয়া দিতে হইবে। আমি উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া যাহা ন্যায়সঙ্গত মনে করিলাম, তাহাই সিদ্ধান্ত করিলাম। আমার সিদ্ধান্ত শুনিয়া উত্তর-পাড়ার লোকে খুব আনন্দিত হইল, কিন্তু দক্ষিণ-পাড়ার লোকে অসন্তুষ্ট হইল। আমি গ্রামে গ্রামে সভা করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, দশ-বার দিন পরে আমি সংবাদ পাইলাম যে, সেই গ্রামে একটা ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে, ডাকাতের গুলীতে এক জন গ্রামবাসী মারা পড়িয়াছে। শুনিয়া মনটা খারাপ হইয়া গেল। ভাবিলাম, পুলিশ নিশ্চয়ই ইহার একটা কিনারা করিবে। আমি তখনও বাড়ীতে ফিরি নাই, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে স্বদেশীর বীজ বপন করিয়া বেড়াইতেছিলাম। পাঁচ-ছয় মাস কাটিয়া গেল। আমি সুরেন্দ্র বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কলিকাতায় গিয়া আমার এক উকীল-বন্ধুর বাড়ীতে চার-পাঁচ দিন ছিলাম। সেই সময় এক দিন তিনি আমাকে সংবাদ দিলেন যে, আমার হাইকোর্টের

মামলার রায় বাহির হইয়াছে, আপিলে আমাদের জিত হইয়াছে। দুই-তিন দিন পরে মেসোমশায়ের নিকট হইতেও সংবাদ পাইলাম যে, হাইকোর্টে আমরা জিতিয়াছি, তবে সেই মুসলমান জমিদার বোধ হয় বিলাতে আপিল করিবেন।

বরিশালে অশ্বিনী বাবুর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য কলিকাতা হইতে খুলনা গেলাম। খুলনাতে ষ্টীমারে আরোহণ করিবার সময় এক জন পুলিশ-কর্ম্মচারী আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলে আমি নাম বলিবামাত্র তিনি আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, "আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে। আপনি বন্দী।"—বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার হাতে হাতকড়া লাগাইয়া দিলেন।

আমি বন্দী হইলাম, কিন্তু কেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। হাজতে যাইবার পর জানিতে পারিলাম যে, আমাদের জমিদারীর সেই গ্রামে যে ডাকাতি ও খুন হইয়াছিল, পুলিশ আবিষ্কার করিয়াছে, সেটা সাধারণ ডাকাতি নয়, রাজনীতিক ডাকাতি, আমি সেই ডাকাতির সহিত সংশ্লিষ্ট। খুলনা হইতে ফরিদপুর জেল-হাজতে প্রেরিত হইলাম। সেখানে আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত সাত-আটটি ভদ্র যুবককে দেখিলাম, তাহারা না কি আমারই দলভুক্ত ডাকাত! আপনার স্মরণ থাকিতে পারে, সেই সময় হইতে চার-পাঁচ বৎসর ধরিয়া বঙ্গদেশে সাধারণ ডাকাতি আর হয় নাই, যত ডাকাতি হইত, সবই না কি রাজনীতিক ডাকাতি!

আমি সদলবলে দায়রা সোপর্দ্দ হইলাম। অম্বিকা বাবু আমার মুক্তির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না। পুলিশ আমার বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া লুণ্ঠিত পিতল-কাঁসার বাসন পাইয়াছে। যে গ্রামে ডাকাতি হইয়াছিল, সেই গ্রামের দক্ষিণ-পাড়ার পাঁচ-সাত জন লোক—আমারই প্রজা—আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল—তাহারা আমাকে বন্দুক-হস্তে ডাকাতি করিতে দেখিয়াছিল!

দায়রার বিচারে আমার সাত বৎসরের জন্য দ্বীপান্তর-বাসের আদেশ হইল; আর আমার দলভুক্ত বলিয়া কথিত সেই সকল যুবকের তিন বৎসর হইতে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইল। অম্বিকা বাবু হাইকোর্টে আপিল করিলেন, আপিলে দায়রা আদালতের আদেশ বজায় রহিল।

আমার কোষ্ঠীতে সমুদ্র-যাত্রা লেখা ছিল, তাহা সফল হইল। ষ্টীমারে চড়িয়া ভূমধ্যসাগর দিয়া য়ুরোপে নহে, বঙ্গোপসাগর দিয়া আণ্ডামানে প্রেরিত হইলাম। তাহার পর আর বিস্তারিত করিয়া বলিবার কিছুই নাই। সাত বৎসর পরে আণ্ডামান হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আমাদের উকীলের সঙ্গে দেখা করিলাম। তাঁহার নিকট শুনিলাম, বিলাতে প্রিভি-কাউন্সিলে আমার হার হইয়াছে। হাইকোর্টে ও বিলাতে মামলা চলিবার সময়, মামলার ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য মেসোমশায় আমার অধিকাংশ মহল বাঁধা রাখিয়াছিলেন। অবশেষে আমার হার হওয়াতে, উভয় পক্ষের ব্যয়ের জন্য আমি দায়ী হই। ফলে আমার সমস্ত জমিদারী এবং বাসত বাড়ী পর্য্যন্ত নীলামে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। সে সব আমার দ্বীপান্তর-বাসের চতুর্থ বৎসরে হইয়া গিয়াছে।

কারামুক্তির সময় প্রত্যেকেই স্ব স্ব বাড়ীতে যাইবার জন্য পাথেয় পাইয়া থাকে, আমিও পাইয়াছিলাম। তাহাই সম্বল করিয়া কলিকাতা ত্যাগ করিলাম। আমাদের গ্রামে যাইতে হইলে মেসোমশায়ের গ্রামের কাছ দিয়া যাইতে হয়। আমি সেই গ্রামে গিয়া একটা মুদীর দোকানে বসিয়া বিশ্রাম করিলাম, এবং মুদীর নিকট মেসোমশায়ের সংবাদ লইলাম। মুদী বলিল, মেসো-মশায়, মাসীমা, এবং তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে; কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণধন বাড়ীতে আছে। তাহার অবস্থা খুব ভাল, তাহার পিতা তাঁহার এক জমিদার জামাতার ম্যানেজার হইয়া প্রায় লক্ষ টাকা হস্তগত করিয়া আসিয়াছিলেন। সেই জমিদার জামাতার অনেকগুলা মহল তিনি নীলামে কিনিয়াছিলেন; কিন্তু অধিক দিন ভোগ করিতে পান নাই। আমি কৃষ্ণধনের সঙ্গে দেখা করিয়া আমার স্ত্রীর কথা জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "আমি ঠিক জানি না, দিদি বোধ হয় মামার বাড়ীতে আছেন।"

মামা-শ্বশুরের বাড়ীতে গিয়া সংবাদ লইলাম; তাঁহারা বলিলেন, "শোভা ত এখানে আসে নাই, সে তার এক পিস্তুত ননদের বাড়ীতে আছে শুনিয়াছি।"

গোপনে, ছদ্মবেশে আমার দূর ও নিকট যত আত্মীয় আছেন, প্রত্যেকের বাড়ীতে অনুসন্ধান করিলাম, কোথাও

তাহার সংবাদ পাইলাম না। আটাশ বৎসর বয়সে দ্বীপান্তরে গিয়াছিলাম, পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে দেশে ফিরিয়া পাঁচ বৎসর আগের স্ত্রীর অনুসন্ধানে দেশে দেশে ঘুরিলাম। যখন কোন সন্ধানই পাইলাম না, তখন ঘুরিতে ঘুরিতে বৃন্দাবনচন্দ্রের লীলা-নিকেতন এই শ্রীবৃন্দাবনে আসিলাম"; এখানে পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি ফলে এক মহাত্মার কৃপালাভ করিলাম। তাঁহার নাম শ্রীল সন্তদাস বাবাজী। আপনি বোধ হয় জানেন, পূর্ব্বাশ্রমে তাঁহার নাম ছিল তারাকিশোর রায়; কলিকাতা হাইকোর্টের সুবিখ্যাত উকীল। ওকালতীতে যখন তিনি বৎসরে লক্ষাধিক টাকা উপার্জ্জন করিতেছিলেন, সেই সময় সহসা তাঁহার সংসারে বৈরাগ্য হইল, তিনি সমস্ত ত্যাগ করিয়া ভিখারী হইয়া বৃন্দাবনে আসিলেন। আমি এক দিন তাঁহাকে আমার জীবনের কাহিনী বলিলে তিনি হাসিয়া বলিলেন, "বাবা, আনন্দ কর। আনন্দময় তোমাকে বন্ধন-মুক্ত করিয়া তোমার প্রতি তাঁহার অশেষ করুণা—অশেষ কৃপা প্রকাশ করিয়াছেন। আনন্দ কর, বাবা—আনন্দ কর, আনন্দময়ের রাজ্যে সর্ব্বদা আনন্দে থাক।"

এই কথা বলিয়াই বাবাজী হাসিমুখে দণ্ডায়মান হইলেন এবং "নমো নারায়ণায়" বলিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আমি একটা বিষয় লক্ষ্য করিলাম, বাবাজী নিজের জীবন-কাহিনী আদ্যোপান্ত হাসিমুখে বলিয়া গেলেন, এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিষাদ বা নিরানন্দের ছায়া দেখি নাই! তিনি প্রস্থান করিলে আমি আপন মনে বলিলাম,—

সব নাশি' তুমি হয়েছ সন্ন্যাসী তবু হাসি হাসি মুখ,
না জানি তোমার ত্যাগের আড়ালে আছে কোন্ মহাসুখ!

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

তোমার কবিতা

তোমার কবিতা লিখিতে আমার ছন্দ খুঁজে না পাই!
এলোমেলো ভাষা জুটে যায় খাসা, কি ক'রে আরো গুছাই!
পুঁথি পড়া যত বিদ্যা সতত পদ্যে আসিয়া পড়ে
তোমার কবিতা লিখিতে বসিলে তাহারা পলায় ডরে!
অলঙ্কারের অহঙ্কারের বুক করে ঢিব্ ঢিব্,
অনুপ্রাসের মহাত্রাসেই তালুতে শুকায় জিব!
পণ্ডিতী কথা গণ্ডী ডিঙ্গায়ে সটান্ সরিয়া পড়ে
সাদা-মাটা ভাষা সেথা বাঁধে বাসা, ভাবের রসেতে ভরে!
বুকের ভিতর কি যে ক'রে ওঠে বুকই সে কথা জানে
কলমের আগে গাঢ় অনুরাগে প্রাণের ভাষাটি টানে।
তোমার প্রণয় বাহিরের নয় বাহিরিতে নাহি চায়
পোষাকী ছন্দ প্রেম-নিবন্ধ তার না নাগাল পায়!
কবির গর্ব্ব লইয়া "তোমার কবিতা" যায় না লেখা
সে যেন সহজ কোকিলের কুহু, শিখির কণ্ঠে কেকা!
চণ্ডীদাসের প্রাণ-নিঙ্গড়ানো সে যেন সুধা প্রচুর
বিদ্যাপতির প্রেম-আরতির মধু-মৈথিলী সুর!
ভক্ত সাধক যেমন করিয়া একটি ঈশ্বর জপে,
একটি মূরতি ধেয়ান করিয়া তপস্বী রত তপে,
সরল চাষা সে একই সিধে সুরে বধূরে যেমন ডাকে
সারি, জারি আর ভাটিয়ালী গানে একটানা মধু থাকে
তেমনি তোমার কবিতার সুর একই ছন্দে বহে
ঘুরিয়া ফিরিয়া জীবন ভরিয়া তোমারি [ ]রতা কহে!
তোমার কথা ত এতটুকু নয়, এক ভাবে হবে শেষ
নানা ভাবে এসে তার সাথে মেশে অনন্ত পরিবেষ!
এক মহানদী বহি' চলে যেন,—শত শতদ্রু-ধারা
শত সহস্র সম্পদ সহ তাহে মিশে হয় হারা!
তা হোক্ তবু সে নিজস্ব রূপে যমুনা-সলিল প্রায়
আপনার নীল রাখে অনাবিল যত সঙ্গম পায়!
"তোমার কবিতা" কোনো কবিতার সাথে তার মিল নাই
যত সুমধুর হোক্ না কো সুর, তোমার নিকটে ছাই!
এতবার ভাবি তোমার কবিতা লুকায়ে লিখিয়া যাবো
হীরকের দ্যুতি লুকাবো, তেমন আঁধার কোথায় পাবো?
তোমার কবিতা লুকায়ে লিখিলে লুকায়ে যাবে না রাখা
আকাশে বাতাসে ফুলে মধুমাসে তাহার ছবিটি আঁকা!
তোমার কবিতা মেঘের রাজ্যে বিজলী হইয়া আছে
তোমার কবিতা কুমারীর চোখে আঁখিতারা হয়ে নাচে!
তোমার কবিতা বনের নিবিড় ছায়ায় মিলায়ে রয়
তোমার কবিতা মনের গভীর মায়ায় লভেছে লয়!
তোমার কবিতা অগ্নিহোত্রী, কবির জীবন ভরি'
হোমের অগ্নি রাখে জ্বালাইয়া জন্ম জন্ম ধরি'!
তোমার কবিতা মর্ত্ত্য হইতে স্বর্গ অবধি রহে
মর-মানবের ক্ষণিক অর্ঘ্য অমর করিয়া বহে!
ছবি এঁকে হায় কবি ম'রে যায়, সবই নশ্বর বটে—
তোমার কবিতা অবিনশ্বর, তা'র না মৃত্যু ঘটে।

শ্রীরামেন্দু দত্ত।

বাঙালী-বৌ

গলির মোড়ে সংরক্ষিত স্তিমিত গ্যাসের আলোকটিতে গলির অন্ধকার যেন আরও নিবিড় ও ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যার অন্ধকার যেন পুঞ্জীভূত হইয়া এই গলির বদ্ধ-বাতাসে স্থির মেঘের মত সঞ্চিত হইতেছে।

বাড়ী খুঁজিতে খুঁজিতে সুধীর এই গলির ভিতরেই প্রবেশ করিল। যে বাড়ীওয়ালার বাড়ীতে সে এখন বাস করিতেছে, তাহার অভদ্র আচরণ এতই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে যে, যেমন করিয়া হউক, মাসের শেষ পর্য্যন্ত বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। কুড়ি-পঁচিশ টাকা ভাড়ায় ভদ্র-পরিবারের বাসযোগ্য বাড়ী ত সহসা মিলে না, বর্ত্তমানে তাহা দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

একটি পুরাতন জীর্ণ একতলা বাড়ী। বহু কাল পূর্ব্বেই চূণ-বালি খসিয়া পড়িয়াছে, ইটগুলি অত্যন্ত নগ্ন—বীভৎস ভাবে দন্ত বাহির করিয়া আছে। বিজলী-বাতি নাই, রাস্তার পাশে একটি ঘরে লণ্ঠন জ্বলিতেছে,—না জলারই অনুরূপ। জানালার পাশে বসিয়া একটি উন্মাদ বিড়-বিড় করিয়া কি বকিতেছিল, সহসা উচ্চ-কণ্ঠে গান ধরিয়া দিল, —হাতের হাতকড়া জানালার গরাদে লাগিয়া ঝুণ্-ঝুণ্ করিতেছে!

বাড়ীটির সর্ব্বাঙ্গে যেন দারিদ্র্যের প্রলেপ। বাহিরে লেখা একখানি ঘর-ভাড়ার বিজ্ঞাপন। নির্দ্দেশ দেওয়া আছে—ভিতরে অনুসন্ধান করুন।

এই উন্মাদ, জীর্ণ বাড়ীখানি, আর এই গভীর অন্ধকার একসঙ্গে মিলিয়া রহস্যময় বলিয়া সুধীরের মনে হইল। বাড়ী পছন্দ হইবে না জানিয়াও সে কড়া নাড়িতে আরম্ভ করিল।

দরজা খুলিয়া গেল।

ভিতর হইতে নারী-কণ্ঠে কে শুধাইল—কি চাই?

—ঘরভাড়া দেবেন, তাই ঘর ক'টা দেখতে চাই।

—ভিতরে আসুন।

দরজা পার হইয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন সঙ্কীর্ণ গলি। সুধীর এই অজ্ঞাত অন্ধকারে পা বাড়াইতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। মহিলাটি একটি লণ্ঠন আনিয়া ঘোমটার আড়াল হইতে বলিলেন—আসুন। এই দিকেই ঘর।

সুধীর লণ্ঠনের স্বল্পালোকিত পথে মহিলার আল্‌তা-পরা পা দু'খানির অনুসরণ করিয়া চলিল। তিনটি ঘর, রান্নাঘর—বাথরুম প্রভৃতি দেখাইয়া মহিলাটি অকস্মাৎ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন।

সুধীর প্রশ্ন করিল,—এ বাড়ীতে আর কেউ থাকে না?

—না।

—আপনি একা?

—আমরা দু'জন।

সুধীর হিসাব করিয়া বুঝিল, সেই উন্মাদ ও এই মহিলাটি—এই দুই জন। ঘর সম্বন্ধে একটা কিছু অভিমত দেওয়া প্রয়োজন; তাই বলিল,—ঘরগুলি ত বেশ বড়ই দেখলাম।

মহিলাটি ঘোমটা একটু উন্মুক্ত করিয়া কহিলেন,—আলো আর হাওয়াও যথেষ্ট আছে, দিনের বেলা এলে দেখবেন।

সুধীর অনিচ্ছাতেই তাঁহার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, —দিনের বেলা এক দিন দেখে যাবো। ভাড়া কত ক'রে?

—এর আগে যাঁরা থাকতেন, তাঁরা পঁচিশ টাকা দিতেন।

সুধীর বিস্মিত হইয়াছিল তাঁহার মুখখানি দেখিয়া।

হউক দারিদ্র্যের লাঞ্ছনায় মলিন, তথাপি এই গৌরবর্ণ, এই অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি, এই ক্ষীণ তন্বীদেহ বিস্ময়কর সুন্দর! সে একটু বিলম্ব করিয়া জবাব দিল,—পরশু রবিবারে সকালের দিকে এসে সমস্ত ঠিক ক'রে যাবো—

মহিলাটি ক্ষুদ্র একটু নমস্কার করিয়া বলিলেন,—তাই আসবেন।

সুধীর চিন্তিত, বিস্মিত চিত্তে রাস্তায় নামিয়া আসিল। এই মহিলাটিকে রহস্যময়ী বলিয়াই তাহার মনে হইল।

এই জীর্ণ বাড়ীতে, এই উন্মাদকে লইয়া একাকী দিনের পর দিন, মাসের পর মাস তিনি কেমন করিয়া কাটাইতেছেন! অন্ধকার রাত্রিতে নিশ্চিন্ত মনে তিনি একাকী এই বাড়ীতে কেমন করিয়া থাকেন? যৌবন অতিক্রান্ত হইয়াছে এমন নয়, অথচ, কোন্ আকর্ষণে এমন করিয়া এখানে আছেন? মহিলাটিকে শ্রদ্ধা করিবে, কি ভয় করিবে তাহা সে বুঝিয়া পায় না,—সুধীর চিন্তান্বিত চিত্তে বাড়ী ফিরিল!

এই কয়টি দিনের প্রায় প্রত্যহই মাঝে মাঝে সেই রহস্যময়ী বধূটির কথা মনে করিয়া সুধীর অস্থিরতা বোধ করিয়াছে। রবিবার সকালে সমস্ত ঠিক করিবে মনে করিয়া আবার সেই বাড়ী দেখিতেই রওনা হইল। মহিলাটি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য—আলো ও বাতাসের প্রাচুর্য্য সত্যই লোভনীয়। ঘরগুলি যে এত ভাল, তাহা বাহির হইতে দেখিয়া অনুমান করা সম্ভব নয়। অন্য বাড়ীও সে যাহা দেখিয়াছে, তাহার ভাড়া অতিরিক্ত। সুধীর সদরের দরজার সামনে দাঁড়াইয়া বলিল,—তা হ'লে তাই ঠিক রইল, মাসের ৩০শে না হয়, পয়লা আস্‌বো।

মহিলাটির আকর্ণ আঁখি দুইটি সহসা যেন আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি স্মিতহাস্যে বলিলেন—তাই আসবেন, আমার ত কোন কাজই নেই। ঘর গুছিয়ে দিতে কিছু কিছু সাহায্যও ক'রতে পারবো।

—আপনারা

—আমরা ব্রাহ্মণ;—আপনারা?

—ব্রাহ্মণ।

মহিলাটি আবার একটু হাসিয়া বলিলেন,—ভালই হ'ল, স্বজাতির কাছে সহানুভূতিরই আশা করা যায়।

—অবশ্যই।

পাগলটি দরজার ফাঁকে চাহিয়া চাহিয়া তাহাদিগকে দেখিতেছিল। সহসা উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—উজীর, উজীর, —এদিকে এস।

সুধীর একটু বিহ্বল ভাবে মহিলাটির দিকে চাহিতেই তিনি বলিলেন,—আপনাকেই ডাক্‌ছেন।

সুধীর ঘরে প্রবেশ করিতেই পাগলটি বলিল,—মহারাণীকে কুর্ণিশ কর, কর বলছি—

মহিলাটি প্রগল্‌ভার মত হাসিয়া বলিলেন,—আমিই মহারাণী!

উন্মাদকে বলিলেন,—এঁরা এ-বাড়ী ভাড়া নিলেন; আমাদের নতুন ভাড়াটে—

উন্মাদটি আবার আদেশ দিল,—কুর্ণিশ কর, কুর্ণিশ কর—

সুধীর পকেট হইতে নোট বাহির করিয়া মহিলাটির হাতে দিয়া বলিল,—এটা আগাম দিয়ে গেলাম—কথাটা যাতে পাকা হ'য়ে থাকে।

—মুখের কথা কি পাকা নয়?

—তার চেয়েও পাকা এইটি।

সুধীর রাস্তায় আসিয়া ভাবিল,—উন্মাদটি কে, তাহা ত জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

সুধীর বাড়ী ফিরিয়া আসিল সত্য, কিন্তু মহিলাটির স্বচ্ছন্দ জড়তাহীন সাবলীল ব্যবহার, তাহার সৌন্দর্য্য, তাহার এই রহস্যময় জীবন-যাত্রা—সব একসঙ্গে তাহাকে অত্যন্ত কৌতূহলী করিয়া তুলিল। এই উন্মাদটিই বা কে? কেমন করিয়াই বা তাহাদের উদরান্নের সংস্থান হয়?

পাগলটির আর যাই হোক্, সৌন্দর্য্য-বোধ আছে—মহারাণী নামটা সত্যই খুব মানানসই; মহারাণীর সৌষ্ঠব, গৌরব, সৌন্দর্য্যের সমারোহ সবই তাহার আছে, নাই কেবল অর্থ।

সুধীর বাড়ীতে সমস্তই বলিয়াছিল, বলে নাই কেবল একটি কথা—এই মহিলাটির বিস্ময়কর সৌন্দর্য্যের কথা।

মাসের শেষ তারিখে সুধীর তাহাদের অনতিবৃহৎ পরিবার ও তক্তপোষ প্রভৃতি লইয়া নূতন বাটীতে হাজির

হইল। সংসারে লোক পাঁচটি। সুধীর, বৌদি, বিধবা বোন ও দুইটি ছেলে-মেয়ে। তাহার দাদা শনি-রবিবারে আসেন,—কাজ করেন বর্দ্ধমানে। সুধীর পড়ে,—নানাবিধ ব্যবহারিক বিষয়, আর চাকুরীর সন্ধান করে।

মালপত্রাদি ঘরে তুলিতে বেলা তিনটা বাজিয়া গেল। জিনিসপত্রে ঘরে পা বাড়াইবার স্থান নাই। মহিলাটি আসিয়া বলিলেন,—ওঃ, ঘর কি হয়েছে! রাত্রে খেতে হবে ত! আসুন, হাতে হাতে কতকটা গুছিয়ে ফেলি।

মহিলাটির নাম জানা গেল—মনোরমা।

সুধীর হাসিয়া বলিল,—প্রতিবেশী যখন হলাম, তখন একটা সম্পর্ক পাতিয়ে নেওয়া দরকার; বৌদি' বলেই ডাক্‌বো—কেমন?

মনোরমা বলিলেন,—বেশ ত, শ্বশুর-ঘর ক'রতে এসে আমি একটি দেওর পাইনি বলে আমার বড্ডো দুঃখ ছিল। এত দিন গেল, কত বছর কেটেছে, কেউ খুনসুড়ি করেনি। কোন দিন হাস্‌তে পাইনি।

মনোরমার চোখ-দু'টি সহসা জলে টলটল করিতে লাগিল। সুধীর তাহা লক্ষ্য না করিয়াই কহিল,—একটি ছিল—দু'টি বৌদি' হ'ল। আমার আর ভাবনা কি? এত জ্বালাতন ক'রব যে, শেষে ব'লতে হবে—

মনোরমা হাসিয়া বলিলেন,—আমাকে চেনেননি, আমাকে জ্বালাতন ক'রতে পারবেন না। আমার মনটা সুখ-দুঃখের বাইরে।

টেবিলের উপর বই কয়খানা গুছাইতে গুছাইতে মনোরমা উৎকর্ণ হইয়া কি যেন শুনিলেন। তাহার পর তাড়াতাড়ি বলিলেন,—আমি আস্‌ছি এক্ষুণি—

সুধীর লুব্ধ-দৃষ্টিতে তাঁহার গমন-পথের দিকে চাহিয়া মনোরমার ছন্দ-বদ্ধ গতিটার তারিপ করিতেছিল। মনোরমা সোজা উন্মাদটির ঘরে গিয়া কি যেন বলিলেন। উন্মাদটি চিৎকার করিতে করিতে সহসা মন্ত্রমুগ্ধের মত নিরস্ত হইয়া গেল।

ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পরিচয়ই জানা গেল।

মনোরমার বাপের বাড়ী মফস্বলে; পিতা অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। দশ বৎসর পূর্ব্বে ভাল ঘর, বর দেখিয়া তাঁহার পিতা বিবাহ দিয়াছিলেন। কলিকাতায় তাঁহাদের এই বাড়ী। ছেলেটি এম-এ পাশ করিয়া কোন আফিসে ভাল চাকুরী করিত। নূতন ঘরে সুন্দরী নূতন বধূকে যথেষ্ট সমারোহেই অভিনন্দিত করা হইয়াছিল।...

...আজ এই তাঁহার গৃহ, আর ঐ উন্মাদটি তাঁহার স্বামীর ভগ্নাবশেষ, এবং মনোরমাও তাঁহার পূর্ব্বদিনের এক ভগ্নাংশ মাত্র! আজ আর কেহই নাই। বাপের বাড়ী হইতে ভাই দুই-এক বার মনোরমাকে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল; কিন্তু মনোরমা ঐ নিরুপায় উন্মাদটিকে ত্যাগ করিয়া যাইতে রাজী হন নাই।

এই ক্লান্তিকর দীর্ঘ কাহিনী বলিতে বলিতে মনোরমা সে দিন উৎসারিত অশ্রু দমন করিতে অকস্মাৎ চুপ করিয়া গেলেন। সুধীরের বৌদি বলিলেন,—তা, তুমি গেলে না কেন?

—ওঁর কি হবে?—বলিয়া মনোরমা ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। এই বেদনাদায়ক অব্যক্ত কাহিনীর অগ্রগতিকে প্রতিহত করিবার জন্য তাঁহারা প্রসঙ্গান্তরে প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু মনোরমা কিছু না বলিয়া নিজের ঘরে গিয়া নীরবে অশ্রু-মোচন করিয়া হৃদয়ের ভার লঘু করিয়াছিলেন। শ্রোতৃমণ্ডলী নীরবেই সহানুভূতি জানাইয়াছিলেন এইমাত্র!

এমনি করিয়া মনোরমা আজ সাত বৎসর এই বাড়ীখানিতে একাকী অসহায় অবস্থায় কাটাইয়া দিয়াছেন। ইহার ভাড়াটিয়া-প্রদত্ত ভাড়াই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন। যখন ভাড়াটিয়া থাকে, তখন গ্রাসাচ্ছাদন চলে, যখন থাকে না, তখন চলে না বা না-চলার মতই কোন মতে চলে। উন্মাদের অত্যাচারে ভাড়াটিয়া একবার উঠিয়া গেলে আর সহসা এই জীর্ণ বাড়ীর ভাড়াটিয়া জোটে না। মনোরমার সংক্ষিপ্ত জীবনেতিহাস ইহাই।

মনোরমার কাজ নাই বলিলেই হয়। একবেলা দু'টি যা-হয় কিছু রাঁধিয়া খাওয়া ও উন্মাদটিকে খাওয়ানো; তাই অবসর সময় তিনি সুধীরদের পরিবারের সাহায্য করিয়া, গল্প করিয়া কাটাইয়া দেন। তাঁহার বন্দী-জীবনে এই প্রতিবেশী শুধু যে আনন্দদায়ক, তাহাই নয়, অপরিহার্য্যও বটে! মনোরমা তাই সকলের স্নেহই

গল্প করেন, বাহিরের জগত সম্বন্ধে অনাবশ্যক ও অশোভন প্রশ্নে সকলকে বিব্রত করিয়া তুলেন।

সুধীর সে-দিন মনোরমাকে বলিল,—এই বাড়ী আমি পছন্দ করেছিলাম কেন জানেন, বৌদি!

—জানি, ভগবান আছেন তাই। দুঃখের সীমা নির্দ্দেশ ক'রে দিয়েছেন তাই—

—তার মানে?

মনোরমা হাসিয়া বলিলেন,—ভগবানের দূতের মত আপনি এসেছিলেন। এর আগে চার মাস ভাড়াটে জোটেনি। যা কিছু সঞ্চয় করেছিলাম, সবই নিঃশেষ হয়েছিল। ঠিকে ঝিও জবাব দিয়ে গেছে। কে বাজার করে, কে দু'টো পয়সা সংগ্রহ করে! ওঁর ত খাওয়ার গরজ নেই।

একটু থামিয়া, ক্ষুদ্র একটু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনোরমা বলিলেন—যে-দিন পাঁচটা টাকা আগাম দিয়ে গেলেন, তার আগে দু'টো দিন অমনি চ'লে গেছে—ওঁর মুখে কিছুই দিতে পারিনি?

—আপনি?

মনোরমা হাসিয়া বলিলেন—বিয়ে করুন, নইলে জানবেন কি ক'রে? স্বামীকে না খাইয়ে কোন্ বাঙালী-মেয়ে খায়?

সুধীর তীব্র দৃষ্টি হানিয়া বলিল,—এত বাড়ী ক'লকাতা সহরে থাক্‌তে, আপনাদের এই জীর্ণ বাড়ীটাই আমার পছন্দ হ'ল কেন জানেন?

—সেটা একটু আশ্চর্য্যই বটে! কিন্তু আপনার পছন্দ না হ'লেই বা আমি কি ক'রতুম?

—সে-দিনের সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে, এই জীর্ণ বাড়ীখানাকে রহস্যময় বলেই মনে হ'ল! সে রহস্য বেড়ে উঠ্‌ল—যখন লণ্ঠনের স্বল্পালোকে আপনার দেবীনিন্দিত মুখখানা দেখ্‌লাম। মনে হ'য়েছিল—আপনি যেন বহু দিনের পুরাতন—বহু দিনের পরিচিত।

মনোরমা আবার একটু হাসিয়া বলিলেন—আপনি কবি না কি ঠাকুরপো!

—কবি আমি, সে কথা মিথ্যা নয়, কিন্তু অন্তরে, কালি-কলমে নয়।

আরও অনেক অবান্তর গল্পের পর মনোরমা প্রশ্ন করিলেন,—আমি এমন ভাবে আপনাদের কাছেই পড়ে থাকি কেন জানেন?

সুধীর বলিল,—জানি, সময় কাটানো, সম্ভবতঃ এই-মাত্র। আর আমাদের এই পরিচয়ের আকর্ষণকে যদি উপেক্ষা না করেন, তবে—বলবো আকর্ষণেই।

—ওর দু'টোই সত্যি। মানুষকে আমি হয় ত গত-জন্মে অবহেলা ক'রেছিলাম, তাই এ-জন্মে মানুষের অভাবই সব চেয়ে আমার বেশী।

সুধীরের বৌদি সে-দিন মনোরমার সুখ্যাতি করিয়া বলিলেন,—ঠাকুরপো, মেয়েটির অসাধারণ শক্তি। এই যে স্বেচ্ছায় দাসীর মত সর্ব্বদা সাহায্য ক'রছে, কোন দিন কিছু বলিনি, এতে ওর যেন আনন্দ; এতটুকু অভিমান, কি অহঙ্কার নেই।

সুধীর বলিল,—অভিমান বা অহঙ্কার ক'রবার মত কি-ই বা আছে?

সুধীরের বৌদি বলিলেন,—তোমার বৌএর যদি ওর এক নখের রূপও থাক্‌তো, তবে সে মাটিতে পা-ও দিত না। আর কি সাহস—এই বাড়ীখানার ভিতর সে একাকী বাস ক'রেছে।

সুধীর মনে মনে বলে,—তার একাকীত্ব দূর ক'রবে বলেই ত সে এসেছে এই জীর্ণ বাড়ীতে।

অকস্মাৎ কক্ষান্তরে উন্মাদটি খুব উত্তেজিত হইয়া চিৎকার করিতে সুরু করিয়াছে; কয়েকটা দুপ্-দাপ্, ঝন্-ঝন্ শব্দ! কে যেন 'উঃ' শব্দে আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেল।

সকলে ছুটিয়া গিয়া দেখেন, উন্মাদটি গেলাস ছুড়িয়া মনোরমাকে মারিয়াছে। মনোরমার কপাল কাটিয়া রক্তস্রোত সমস্ত গণ্ড ও বুক প্লাবিত করিয়া দিয়াছে। মনোরমা ক্লান্ত-জড়িত কণ্ঠে ভিখারীর দৈন্যভরা সুরে বলিতেছেন,—ওগো, আমাকে আর মের না, আমি ত আর পারিনে।

উন্মাদের আস্ফালন তখনও শেষ হয় নাই। সে আরও কিছু খুঁজিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছে। মেঝেতে এক গ্লাস দুধ ঢালিয়া দেওয়ায় তাহা ঘরময় থৈ-থৈ করিতেছে। সকলে মনোরমার হাত ধরিয়া বার-বার অনুরোধ করিতে

লাগিলেন,—চল বৌ, এমনি ক'রে পাগলের সঙ্গে কি যুঝতে পারো ?

মনোরমা শুধু বলিলেন —ওর যে খাওয়া হয়নি।

—একটু পরে হবে, তাতে কি? নিজে বেঁচে না থাক্‌লে ত ওকেও বাঁচাতে পারবে না।

গালের উপর রক্ত আর অশ্রুধারার সংমিশ্রণ লক্ষিত হইল। সুধীরের বৌদি তাহা মুছাইয়া দিতে দিতে বলিলেন,—যদি একটা এমন কিছু হয়! এ তোমার কি রকম পাগলামী বৌ! অমন ক'রে কি তুমি পারবে? নিজের দুঃখকে আর বাড়িয়ে তুলো না।

মনোরমা চোখ দুইটি তুলিয়া স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন,—আপনারা জানেন না, দিদি, তাই! ও যখন ভাল ছিল, তখন আমার একটু-কিছু হ'লে এত ব্যস্ত হ'ত! একবার বঁটিতে আমার হাত কেটে গিয়েছিল, ও তাই দেখে ডাক্তার ডেকে এনে কত যে কাণ্ড-কারখানা ক'রে বসলো—

—সে-দিন, সে ভালবাসা, সে অন্তর, সবই এখন চলে গিয়েছে! তার এতটুকু যদি এখন বজায় থাক্‌তো, তবে আজ কি তোমার এই দশা হয়?

মনোরমা অদূরস্থ শীর্ণ নারিকেল গাছের বায়ু-বিকম্পিত পাতার দিকে ক্ষণিক চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন,—একবার এমনি আমাকে মেরেছিল, আমি অজ্ঞান হ'য়ে গিয়েছিলাম, তাই সাত দিনের জন্যে ওর জ্ঞান ফিরে এসেছিল।

সকলে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন।

মনোরমা আবার বলিলেন,—আমাকে মারলে তাই আমার দুঃখ ক'রবার কিছু নেই; যদি তেমনি করে আবার ক্ষণিকের জন্যেও ওর জ্ঞান ফিরে আসে!

মনোরমার চোখ দুইটি ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে!

সকলের চোখই জলে ভরিয়া উঠিল। ওই ক্ষীণ একটু আশাকে মাত্র অবলম্বন করিয়া এই সহিষ্ণু নারী, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর এই নির্দয় লাঞ্ছনা ও নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের সঙ্গে অক্লান্ত ভাবে সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছেন! কিন্তু এই আশা, এই সহিষ্ণুতা, এই লাঞ্ছনা যে কত বড় মিথ্যা, তাহা কি তিনি জানেন? জানিলেও এই অনিবার্য্য ভবিষ্যৎকে তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন না।

রাত্রে মনোরমার একটু জ্বর হইয়াছিল।

সুধীরের বৌদি তাঁহাকে দেখিতে যাইয়া লণ্ঠনের আলোটা বাড়াইয়া দিলেন। মনোরমা কি যেন একটা খাতা তাড়াতাড়ি বালিশের নীচে লুকাইয়া ফেলিলেন।

—ও কি?

মনোরমা মৃদু হাসিয়া বলিলেন—খাতা।

—কিসের, দেখি!

—কাউকে ব'ল্‌বেন না প্রতিজ্ঞা করুন, তা হ'লে দেখাতে পারি।

সুধীরের বৌদির অন্তর সন্দেহের আতিশয্যে অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া উঠিল; তিনি কেবলমাত্র ছোট একটা 'হুঁ' বলিয়া নিজেই খাতাখানা বালিশের তলা হইতে টানিয়া বাহির করিয়া খুলিয়া ফেলিলেন। এদিক-ওদিক দেখিয়া বলিলেন,—এ যে কবিতার খাতা! তুমি লেখ না কি?

মনোরমা লজ্জিত ভাবে বলিলেন,—না।

—তবে, কিসের?

—কাউকে ব'ল্‌বেন না?

—না।

—বিয়ের পরে প্রথম প্রথম ও আমার নামে এই-সব কবিতা লিখ্‌তো। যে সব চিঠি লিখ্‌তো সবই কবিতায়।—আমি ভাল ক'রে উত্তর দিতে পারতুম না বলে কতই অভিমান ছিল ওর!

—ও, তাই? এটা নিয়ে কি ক'রছিলে?

মনোরমা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—দেখ্‌ছিলাম, মাঝে মাঝে দেখি,—সুন্দর লিখ্‌তে পারতো, আর কি ফুক্কুড়িই ক'রতো!

সুধীরের বৌদির চোখ দু'টি সহানুভূতির অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। এই অত্যন্ত জীর্ণ ময়লা খাতার ভিতরের ছন্দহীন এই কবিতা কয়েকটিই অভাগীর নিরালা জীবনের সান্ত্বনা!

সে দিন শুক্রবার।

সকালে স্নান করিয়া, একরাশ ভিজা চুল সারা পিঠে ছড়াইয়া দিয়া, শুভ্র ললাটে বড় একটা সিন্দুরের ফোঁট

দিয়া মনোরমা আসিয়া কহিলেন,—ঠাকুরপো, দেখুন ত, —পাঁজি আছে ?

সুধীর বলিল,—আছে, কি দেখ্‌ব ?

—দেখুন ত, শনিবারে কি পূর্ণিমা ?

সুধীর পাঁজি দেখিয়া বলিল,—হ্যাঁ, শনিবারেই পূর্ণিমা, রবিবার সকালে একুশ দণ্ড পর্য্যন্ত আছে। কিন্তু আপনার অকস্মাৎ পূর্ণিমার দরকারটা কি ?

মনোরমা ম্লান একটু হাসিয়া বলিলেন,—এমনি ; পূর্ণিমায় উপোস করি কি না, তাই।

—পূর্ণিমায় উপোস আপনি করেন কেন ?

মনোরমা একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—এমনই, আমার শাশুড়ীর আদেশ ছিল, তাই।

শনিবার ও রবিবার চলিয়া গেল।

মনোরমা দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া কি যেন করেন, সন্ধ্যায় বাহির হইয়া স্বামীকে খাবার দিয়া যান—এই পর্য্যন্ত ! সুধীরের কৌতূহল হইয়াছিল, কিন্তু নিজে খোঁজ লইতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল। তাহার বৌদিকে সে প্রশ্ন করিল,—ও বৌদির কি হ'য়েছে ? আজ তিন দিন ওঁকে দেখি নে।

বৌদি বলিলেন,—সে আর শুনে কি হবে ?

—কেন ?

বৌদি অনিচ্ছার সহিত বলিলেন,—ও স্বপ্ন দেখেছিল একবার, শনিবার পূর্ণিমা পড়লে, সেই সময় যদি তিন দিন উপবাস ক'রে লক্ষ বীজমন্ত্র জপ ক'রতে পারে, তবে ওর স্বামীর পাগলামি সেরে যাবে। সম্ভবতঃ এবার তাই ক'রছে।

সুধীর শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছিল,—সমগ্র জীবন ধরিয়া ওই বধূটি সীতার সহিষ্ণুতা লইয়া নিষ্ফল সাধনা করিয়া চলিয়াছেন, অথচ তিনি জানেন না যে, এ সাধনা তাঁহার জীবনকে কত কঠোর করিয়া তুলিয়াছে !

বৌদি বলিলেন,—ওর ঐ কষ্ট, আর চোখের জল সহ্য করা যায় না ঠাকুরপো, তুমি অন্য বাড়ী দেখ—আমরা উঠে যাই।

সুধীর 'হুঁ' বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সোমবার অতি প্রত্যূষে উঠিয়া সুধীর কি কারণে নীচে আসিয়াছিল। তখনও গলির ভিতর অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া ছিল, কিন্তু মনোরমার উন্মাদ স্বামী যে ঘরে থাকে, কোন ছিদ্র-পথে প্রভাতের সুবর্ণরশ্মি আসিয়া সেই ঘরখানাকে স্বল্পালোকিত করিয়াছে। স্পষ্ট দেখা যায় না, তবুও স্থানে স্থানে বেশ আলো। একটা চাপা কান্নার সুর তাহার কানে যাইতেই সে আগাইয়া গেল।

মনোরমা মেঝেয় বসিয়া আছেন, কয়েক দিনের কৃচ্ছ্র-সাধনায় মুখখানি তাঁহার পাংশু-মলিন, বিবর্ণ। রুক্ষ চুলগুলি সমস্ত পিঠে ও মুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শুভ্র ললাটে তেমনি একটা বড় সিন্দূরের ফোঁটা। চোখ দুইটি ভরিয়া অশ্রু সঞ্চিত হইয়া দৃষ্টি ঝাপ্‌সা করিয়া রাখিয়াছে—গণ্ডের উপর দু'ফোঁটা অশ্রু মুক্তার মত টল্‌-টল্‌ করিতেছে।

শৃঙ্খলাবদ্ধ উন্মাদ, একাকী বিড়্‌-বিড়্‌ করিয়া কি বকিয়া যাইতেছে !

মনোরমা বুকফাটা আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—ঠাকুর, এবারও আমার কথা শুন্‌লে না !

সুধীরের বুকের ভিতর হৃদ্‌পিণ্ডটা দ্রুত স্পন্দিত হইয়া চক্ষু অশ্রুরাশিতে আপ্লুত করিয়া তুলিল ; অতি সন্তর্পণে উপরে উঠিতে উঠিতে সে ভাবিল, তিন দিনব্যাপী এই সাধনা, এই উপাসনা, এই ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরে হয় ত উনি আশা করিয়া আসিয়াছিলেন—ভগবান্ উঁহার প্রার্থনা শুনিয়াছেন ; কিন্তু নিষ্ঠুর বিধাতা স্বামীর প্রলাপোক্তির ভিতর দিয়া উঁহার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা, ব্যাকুল প্রতীক্ষা মুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছেন।

নিজের ঘরে জানালার পাশে দাঁড়াইয়া, সুধীর চোখ দুইটির দৃষ্টিকে স্বচ্ছ করিয়া তুলিতেছিল—বৌদি ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন,—আর ত পারিনে এ দেখ্‌তে ঠাকুরপো ! তুমি আজই বাড়ী দ্যাখো।

সুধীর বাহিরের দিকে চাহিয়া-থাকিয়াই কহিল,—তা হয় না বৌদি ! আমরা বাড়ী ছেড়ে গেলে, এর উপর উপবাসটাও যোগ ক'রে দেওয়া হবে।

বৌদি চোখে আঁচল চাপিয়া বলিলেন,—কিন্তু ওর দুঃখ আমি রোজ রোজ সহ্য ক'রবো কেমন ক'রে ? এই জন্যেই ত আবাগীর বাড়ীতে কোন ভাড়াটেই থাক্‌তে চায় না।

শ্রীপৃথ্বীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য (এম-এ, বি-টি)।

কানাই-নাটশালা

(আলোচনা)

কানাই-নাটশালা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের পরম পবিত্র তীর্থস্থান হইলেও এ-কালে অবজ্ঞাত। শ্রীগৌরাঙ্গের পাদ-স্পর্শ-পূত এই পুণ্যক্ষেত্রে বৈষ্ণব-সমাজের দৃষ্টি যথোচিত ভাবে আকৃষ্ট হয় নাই।

শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপ-প্রকাশের পূর্ব্বে গয়াধামে গমন করিয়া ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। প্রত্যাবর্ত্তন-কালে পথে 'ভক্ত-গোরা'র শ্রীকৃষ্ণদর্শন ঘটে, এবং কৃষ্ণ-প্রেমে ও কৃষ্ণ-বিরহে তাঁহার হৃদয় এত দূর বিহ্বল হয় যে, নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিয়া স্বজনের নিকট তাঁহার তীর্থদর্শন-কাহিনী বর্ণন-প্রয়াস পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ হয়। 'হা কৃষ্ণ! হা মুরলীবদন!' পাইয়াও হারাইলুঁ জীবন-কানাঞি' বলিয়া দিবারাত্রি রোদন করিতে লাগিলেন। অবশেষে বহু প্রচেষ্টার পর এক দিন তিনি 'আপ্তগণে' পরিবৃত হইয়া তাঁহার জীবনের পরিবর্ত্তন-রহস্য এই ভাবে বিবৃত করিলেন,—

"কানাঞি নাটশালা নামে এক গ্রাম।
গয়া হইতে আসিতে দেখিল সেই স্থান॥
তমাল-শ্যামল এক বালক সুন্দর।
নবগুঞ্জা-সহিত কুণ্ডল মনোহর॥
বিচিত্র-ময়ূরপুচ্ছ শোভে তদুপরি।
ঝলমল মণিগণ—লিখিতে না পারি॥
হাথেতে মোহন বংশী পরমসুন্দর।
চরণে নূপুর শোভে অতি মনোহর॥
নীলস্তম্ভ জিনি ভুজে রত্ন-অলঙ্কার।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ-বক্ষে শোভে মণিহার॥
কি কহিব সে পীত-ধটীর পরিধান।
মকর-কুণ্ডল শোভে কমল-নয়ান॥
আমার সমীপে আইলা হাসিতে হাসিতে।
আমা আলিঙ্গিয়া পলাইলা কোন্ ভিতে॥"

—শ্রীচৈঃ ভাঃ, মধ্যখণ্ড, ২য় অঃ (বসুমতী-সংস্করণ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

মন্ত্রদীক্ষার পর এইরূপে কানাই-নাটশালায় ভক্ত-নট গৌরাঙ্গসুন্দরের জীবনে পরম শুভমুহূর্ত্ত সমাগত হয়, এবং শ্রীকৃষ্ণে তিনি আত্মসমর্পণ করেন। এই কারণে কানাই-নাটশালা গৌরাঙ্গ-লীলায় একটি বিশিষ্ট স্থান লাভের অধিকারী। গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে কানাই-নাটশালায় গোরাচাঁদের ঐরূপ দর্শনের বিবরণ "ভক্তিরত্নাকর" গ্রন্থেও বর্ণিত আছে। বৃদ্ধ ঈশান শ্রীনিবাসাদিকে নবদ্বীপ দেখাইতে দেখাইতে প্রসঙ্গক্রমে এক স্থানে বলেন,—

"ওহে বন্ধু সব সবে আজি গৃহে যাহ।
কালি শুক্লাম্বর ঘরে আসিবারে চাহ॥"

—(৮২০ পৃষ্ঠা)

আবার অন্যত্র বলিতেছেন,—

তেথা প্রেমাবেশে প্রভু বৈষ্ণবে কহিল
কানাইর নাটশালা গ্রামে যে দেখিল।—(৮৬৭ পৃষ্ঠা)

—রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত "ভক্তিরত্নাকর"।

গৌরাঙ্গদেব দ্বিতীয়বার এই পরম পবিত্র তীর্থে আগমন করেন। গৌড় হইয়া বৃন্দাবন-গমনের পথে তিনি কানাই-নাটশালায় উপস্থিত হইয়া, বৃন্দাবনের পথে আর অগ্রসর না হইয়া পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দ্বিতীয়বার এই স্থানে তাঁহার পদার্পণের কথা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে। যথা,—

"প্রাতে চলি এলা কানাঞির নাটশালা।
দেখিল সকল তাহা কৃষ্ণচরিত্র লীলা॥"

—মধ্যলীলা, প্রথম পরিচ্ছেদ।

অন্যত্র চৈতন্যচরিতামৃতকার লিখিতেছেন,—

"তবে রামকেলি গ্রাম প্রভু যৈছে গেলা।
নাটশালা হৈতে প্রভু পুনঃ ফিরি এলা॥"

—মধ্যলীলা, ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সনাতন চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে একটি 'প্রহেলী কহিল।' তাহা এই,—

"যার সঙ্গে হয় এই লক্ষ লোক কোটি।
বৃন্দাবন যাবার এই নহে পরিপাটী॥
তবে আমি শুনিল মাত্র না কৈল অবধান।
প্রাতে চলি আইনু কানাইর নাটশালা গ্রাম॥"

—মধ্যলীলা, ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কথিত আছে, যখন শ্রীচৈতন্য গৌড়ের পথে বৃন্দাবন অভিমুখে গমন করিতেছিলেন, তখন ভক্ত নৃসিংহানন্দ মানস-সেবাকল্পে মহানন্দে মনে মনে পথ সাজাইতেছিলেন। মানস-পটে তিনি শ্রীচৈতন্যকে কানাই-নাটশালা পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া আর কোনমতে

অগ্রসর করাইতে পারিলেন না। তখন তিনি সকলকে বলিলেন,—'প্রভু আমার'

"কানাইর নাটশালা হৈতে আসিব ফিরিয়া।
জানিবে পশ্চাৎ কহিল নিশ্চয় করিয়া॥"
—চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, প্রথম পরিচ্ছেদ।

লোচনদাসও এই ঘটনার বর্ণনাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"ক্রমে ক্রমে চলি যাইতে কানাইর নাটশালা হৈতে
পুনঃ নেউটিলা গোরা রায়॥"
—শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, অন্ত্যখণ্ড।

পরেই তিনি লিখিতেছেন,—

মন কথা নৃসিংহানন্দ, সিদ্ধি কৈল গৌরচন্দ্র,
গুণ গায় এ লোচনদাস॥
—শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, অন্ত্যখণ্ড।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ও শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে আমরা পাইতেছি যে, তিনি এই বৃন্দাবনযাত্রায় কানাই-নাটশালা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন; কিন্তু ভাগবৎকার শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের বর্ণনা-পাঠে স্বতঃই ধারণা হয় যে, তিনি রামকেলী গ্রাম হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করেন। যথা,—

"এই মত প্রভু কথোদিন সেই গ্রামে।*
নির্ভয়ে আছয়ে নিজ-কীর্ত্তন-বিধানে॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিবারে শক্তি কার।
না গেলেন মথুরা ফিরিলা আরবার॥"

শুধু তাহাই নহে, তিনি মহাপ্রভুর সহিত রূপসনাতনের মিলনের কথার উল্লেখ করেন নাই, এবং কেন যে হঠাৎ মহাপ্রভু মত-পরিবর্ত্তন করিয়া মধ্যপথ হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন—তাহারও কারণ প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহার বর্ণনা-মতে প্রত্যাবর্ত্তন-করা খেয়ালমাত্র, এবং এতখানি পথ অতিক্রম যেন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত; কিন্তু মহাপ্রভু তাঁহার সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য রূপসনাতনকে আকর্ষণ করিতেই যে রামকেলী আসিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং কার্য্যতঃ হইয়াছিলও তাহাই। রূপসনাতন মহাপ্রভুর লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও ভক্তিগ্রন্থ-প্রকাশরূপ লীলা-প্রকাশের পরম সহায়ক, এবং যদিও তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই মহাপ্রভুর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন, তথাপি তখন সন্ন্যাস-গ্রহণের লক্ষণ ছিল না। এই মিলনের ফলেই তাঁহারা সংসারত্যাগী হওয়ায় এই দিক্ দিয়া মহাপ্রভুর এত দূর আগমনের সার্থকতা লক্ষিত হয়; কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই,—

"তবে রামকেলী গ্রাম প্রভু যৈছে গেলা।
নাটশালা হৈতে প্রভু পুনঃ ফিরি এলা॥
শান্তিপুরে পুনঃ কৈল দশ দিন বাস।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস॥
অতএব ইহাঁ তার না কৈল বিস্তার।
পুনরুক্তি হয় গ্রন্থ বাড়য়ে অপার॥"
—মধ্যলীলা, ১৬শ পরিচ্ছেদ।

এই অংশটি পাঠে মনে হয় যে, চৈতন্যচরিতামৃতকার এইরূপে নাটশালা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া ইঙ্গিতক্রমে বিবরণের পূর্ণতা সম্পাদন করিলেন। এইরূপ করিতে গিয়া তিনি তাঁহার এই উক্তির সহিত বৃন্দাবনদাস মহাশয়ের বিবৃতির কোন অসঙ্গতি বুঝিতে পারেন নাই।

আরও এক কথা;—ভাগবতে লিখিত আছে, শ্রীচৈতন্যদেব রামকেলী গ্রাম হইতে ফিরিয়া শান্তিপুরে আসিলে এক কুষ্ঠরোগী মহাপ্রভুর পদতলে পড়িলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের নিন্দা করায় তিনি কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত হইলে পরে আবার তাঁহারই কৃপায় রোগমুক্ত হন। ভাগবতের অন্ত্যখণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে এই বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। এখন ব্যাপার এই যে, বিখ্যাত "শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা"র রচয়িতা শ্রীদেবকীনন্দন ছিলেন এই কুষ্ঠরোগী। 'বৈষ্ণব-নিন্দনে' তাঁহার 'এতেক দুর্গতি' হওয়ায় তিনি শ্রীবাসের আজ্ঞাক্রমে "শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা" রচনা করিয়াছেন ও বলিয়াছেন,—

বৈষ্ণব-গোসাঞির নাম উদ্দেশ কারণ।
নানা ক্ষেত্র তীর্থ মুঞি করিনু গমন॥"

দেবকীনন্দন নানা দেশ ঘুরিয়া ও বহু গ্রন্থ পড়িয়া বৈষ্ণব-বন্দনা রচনা করেন। তাহাতে লিখিত আছে,—

"নাটশালা হৈতে যবে আইসেন ফিরিয়া।
শান্তিপুর যান যবে ভক্তগোষ্ঠী লৈয়া॥
সেই কালে দন্তে তৃণ ধরি দূর হৈতে।
নিবেদিনু গৌরাঙ্গের চরণ-পদ্মেতে॥"

সদ্যপ্রত্যাগত শ্রীগৌরাঙ্গের ও গৌরাঙ্গ-সঙ্গীদের সহিত তিনি আশু মিলিত হইয়াছিলেন। সুতরাং সঠিক সংবাদ তাঁহার জানিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। অতএব দেবকীনন্দনের এই বিবৃতির পর শ্রীগৌরাঙ্গের নাটশালা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের লীলা-গ্রন্থ মধ্যে শ্রীপাদ মুরারি গুপ্তের "শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত" বা "শ্রীমুরারি গুপ্তের করচা" আদিগ্রন্থ। গৌড়পথে শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রাকালে রামকেলীতে মুরারি গুপ্তও সঙ্গে ছিলেন। সুতরাং তাঁহার উক্তি কোনক্রমে উপেক্ষার যোগ্য নহে। তিনি স্ব-রচিত গ্রন্থে কি লিখিয়াছেন দেখা যাউক। শ্রীযুত মৃণালকান্তি ঘোষ-সম্পাদিত 'করচায়' এই সম্পর্কে এক স্থানে দেখি,—

"এবং তং পরিসন্তোষ্য কৃষ্ণো নান্যস্থলং গতঃ"
—১৮ সর্গ, ১২ শ্লোক, ১৬৫ পৃষ্ঠা।

ইহার অর্থ, 'তাঁহাকে (সনাতনকে) এইরূপ পরিতুষ্ট করিয়া কৃষ্ণ (গৌরসুন্দর) অন্য স্থলে গমন করেন নাই'—স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, ইহাতে অর্থ-সঙ্গতি লক্ষিত হয় না। "পরিসন্তোষ্য" লেখার পর "নান্যস্থলং গতঃ" খাটে না,—আমাদের মনে হয় "কৃষ্ণো নান্যস্থলং গতঃ" পাঠটি মুদ্রাকরপ্রমাদ। "কৃষ্ণো নান্যস্থলং গতঃ" স্থলে সঠিক পাঠ হওয়া উচিত "কৃষ্ণ নাট্যস্থলং গতঃ"; অর্থাৎ তাঁহাকে এইরূপে পরিতুষ্ট করিয়া তিনি কৃষ্ণনাট্যস্থলে গমন করিয়াছিলেন। এরূপ অনুমান করিবার কারণ এই যে, এই গ্রন্থেরই অন্য অংশে লিখিত আছে,—

"এবং ক্রমেণ সংপ্রাপ্য নাট্যস্থলমপি দ্বিজঃ।
...হ বনলীলাং যঃ স্মরণ্ কৃষ্ণস্য বিক্রমম্॥"
—তৃতীয় প্রক্রমে, সপ্তদশ সর্গ।৯।

---

* গৌড়ের নিকটে গঙ্গাতীরে এক গ্রাম।
ব্রাহ্মণ-সমাজ তার—'রামকেলী' নাম॥
—চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়

লক্ষ্মী লাভ

[শিল্পী—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

এবং,—
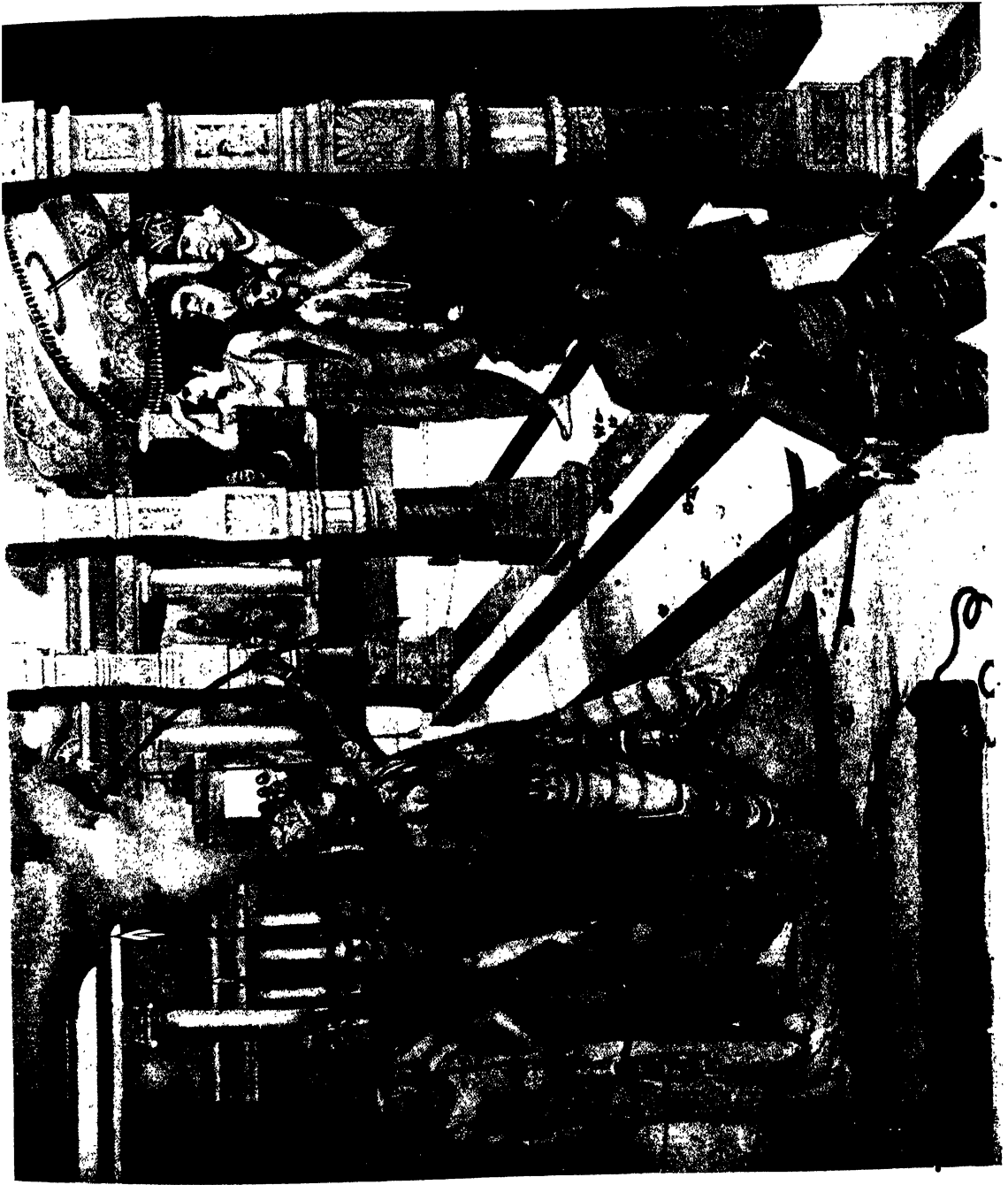
"অধুনা ন গমিষ্যতি মথুরাং ভগবান্ প্রতি।
আয়াস্যতীতি জানন্ত কৃষ্ণনাট্যস্থলাদপি॥
—সপ্তদশ সর্গ, ১১ শ্লোক।

অন্যত্র,—

শ্রীনৃসিংহানন্দেন যৎ কৃতঃ জঙ্গালমুত্তমম্।
তেন যথা রাম-কেলি-কৃষ্ণনাট্যস্থলাবধি॥
—পঞ্চ-বিংশতিতম সর্গ, ৩০ শ্লোক।

এই সকল অংশ দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, "কৃষ্ণনাট্যস্থলং গত" পাঠই সুসঙ্গত। অতঃপর শ্রীচৈতন্য যে এ-যাত্রায় কানাই-নাটশাল পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশমাত্র থাকিতেছে না।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বৃন্দাবন যাইবার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া মধ্যপথ হইতেই ফিরিলেন। এইরূপ কেন করিলেন?—সমগ্র চৈতন্য-চরিত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহার কোন কার্য্যই নিরর্থক নহে, বরং প্রত্যেক কার্য্যই বিশেষ কোন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এক্ষেত্রে তাঁহার কি উদ্দেশ্য সাধিত হইল? চৈতন্যচরিতামৃতকার বলিতেছেন—

বৃন্দাবন যাব আমি গোড়দেশ দিয়া।
নিজমাতার গঙ্গার চরণ দেখিয়া।
—মধ্যলীলা, ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

মাতৃদর্শন ও গঙ্গাদর্শন, এই দুই উদ্দেশ্য তিনি নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার লীলার অন্যতম প্রধান সহায়ক রূপ ও সনাতনকে আকর্ষণ করাও এই যাত্রার আর এক প্রধান উদ্দেশ্য। চরিতামৃতে দেখি, তিনি রূপসনাতনকে বলিতেছেন—

গৌড় নিকট আসিতে নাহি মোর প্রয়োজন।
তোমা দোহা দেখিতে মোর ইহাঁ আগমন॥
এই মোর মন-কথা কেহ নাহি জানে,
সবে বলে কেন এলে রামকেলি গ্রামে।
—মধ্যলীলা, প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমাদের মনে হয়, তাঁহার আর এক "মন-কথা" ছিল; তাহা নাটশালা-দর্শন। এই স্থানে তাঁহার প্রথম কৃষ্ণদর্শন ঘটে; তাই ভক্ত-গৌর আর একবার এই বৃন্দাবনতুল্য তীর্থে আসিলেন—যদিও 'যাহা গৌর তাঁহা বৃন্দাবন,' "যত্রত্বং তত্র তীর্থঞ্চাখিলং বৃন্দাবনং মধু" (করচা)! পুরী হইতে কষ্টে-সৃষ্টে তিনি রামকেলি গ্রামে আসিলেন। সনাতন তাঁহাকে টুকিলেন ও বলিলেন, "তীর্থযাত্রায় এরূপ লোকের সঙ্ঘট ভাল রীতি নয়।" তিনি তখন শুনিলেন মাত্র, ফিরিলেন না। আরও একটু অগ্রসর হইয়া আসিলেন 'কানাই-নাটশালায়' ও ফিরিলেন সেই গ্রাম হইতে। 'শ্রীবৃন্দাবন যাই' বলিয়া বাহির হইয়া কানাই-নাটশালায় যাত্রা-সমাপ্তি করিতে দেখিয়া আমাদের চক্ষে এই স্থানের মাহাত্ম্য বিশেষরূপ বর্দ্ধিত হওয়াই স্বাভাবিক।

এইবার দেখা যাউক, কানাই-নাটশালা কোথায় অবস্থিত। এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কাহারও কাহারও বিশ্বাস, কানাই-নাটশাল রামকেলিরই অংশ-বিশেষ। আবার কেহ এই স্থানটি রাজমহলের নিকটেই অবস্থিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তবে এ কথাও সত্য যে, বহু বিশিষ্ট বৈষ্ণব সুধী আদৌ জানেন না—এই স্থানটি কোথায় আত্মগোপন করিয়া অবস্থিতি করিতেছে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি—শ্রীমুরারী গুপ্তের করচায় এক স্থলে রামকেলি ও কৃষ্ণনাট্যস্থল একত্র উল্লিখিত আছে; যথা,—'রামকেলি কৃষ্ণনাট্যস্থলাদপি' (২২৭ পৃষ্ঠা)। কিন্তু অন্যত্র কয়েক স্থলে 'কৃষ্ণ নাট্যস্থলে'র কথা পৃথক ভাবেই লিখিত আছে। করচা এবং চরিতামৃত পাঠে স্পষ্টই বুঝা যায়—রামকেলি ও কানাই-নাটশাল পরস্পরের অদূরবর্ত্তী পৃথক্ স্থান। রামকেলি ও কানাই-নাটশাল এক স্থানে অবস্থিত হইলে সর্ব্বগ্রন্থে রামকেলিরই উল্লেখ থাকিত, কারণ, গৌরাঙ্গের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই রামকেলি সুপ্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া পরিচিত ছিল। তবে যে করচায় এক স্থলে এই দুই স্থানের একত্র উল্লেখ দেখা যায়, তাহার কারণ কি? এই শ্লোকের বিষয়বস্তু এই যে, নৃসিংহানন্দ সুদূর পুরীতে বসিয়া মানস-সেবানুক্রমে "জঙ্গাল" রচনা করেন ও সেটি "রামকেলি-কৃষ্ণনাটস্থল অবধি"। কত দূর পর্য্যন্ত জঙ্গাল করেন, তাহা যাহাতে সহজে বুঝা যায়, সেই জন্য এই শ্লোকে রামকেলি কানাই-নাটশাল একত্র উল্লিখিত হইয়াছে। কারণ, গ্রন্থ-রচনাকালে রামকেলি বৈষ্ণব-সমাজে অতি সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল, ও পূর্ব্ব হইতেই "ব্রাহ্মণ সমাজ" বলিয়া এই গ্রামের প্রসিদ্ধি ছিল। (চৈঃ ভাঃ, অন্ত্যখণ্ড ৪র্থ অধ্যায়)

কানাই-নাটশাল একটি গ্রামবিশেষ। যথা,—"কানাঞি নাটশালা নামে এক গ্রাম"। ভাগবতে আছে—

"গয়া হইতে আসিতে দেখিল সেই স্থান।"
—মধ্যখণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।

চৈতন্যচরিতামৃতকারের বর্ণনা পড়িলে বুঝা যায়—কানাই-নাটশাল রামকেলি গ্রামের পর বৃন্দাবনের পথে পড়ে। পূর্ব্বে গয়া যাইতে গৌরাঙ্গ-সুন্দর মন্দারে গিয়াছিলেন। গয়া হইতে আসিতে তিনি কানাই-নাটশালায় কৃষ্ণদর্শন করেন। এ ক্ষেত্রেও বুঝা যায়, শ্রীগৌরাঙ্গ রাজমহলের নিকট বাদশাহী-সড়ক ধরিয়াছিলেন। ইহাই তখন গৌড় হইতে মন্দার দিয়া গয়া যাইবার একমাত্র পথ ছিল। কুশী এবং অন্যান্য পার্ব্বত্য নদী থাকায় রামকেলির পার দিয়া বৃন্দাবন-পথে অগ্রসর হওয়া সহজসাধ্য ছিল না। এই কারণেই সে-কালে গঙ্গা পার হইয়া রাজমহল হইতে বিখ্যাত বাদশাহী-সড়ক ধরিয়া যাইতে হইত। বিহার হইতে বাঙ্গালায় প্রবেশ করিতে হইলে এই পথই ছিল সম্বল, এবং রাজমহলের নিকটস্থ বাদশাহী-সড়কে অবস্থিত "গড়ি" এই কারণেই "A key of Bengal"—'বাঙ্গালার দরজার চাবি' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সনাতনও গৌড় হইতে বৃন্দাবনে পলায়নকালে গঙ্গা পার হইয়া এই পথই অবলম্বন করিয়াছিলেন।

—(চৈঃ চঃ, মধ্যলীলা, বিংশ পরিচ্ছেদ)।

যে পথে মহাপ্রভু গয়াগামী হইয়াছিলেন, সেই পথের বর্ণনা কবি কর্ণপুর-রচিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের ৪র্থ সর্গে বিবৃত হইয়াছে; যথা—

কৃ চ বিলোক্য মনোজ্ঞতমাং স্থলীং
স্থলপয়োরুহপাদপয়োরুহাং।
উপতরঙ্গিণি তেণ বিশবিভ্রমে
ন মধুপা মধুপাতুমনুৎসুকাঃ॥ ২৪॥

অনন্তর মহাপ্রভু ভাগিরথী-তীরে উপস্থিত হইয়া একটি মনোরম প্রদেশ অবলোকনান্তর তথায় উপবেশন করিলে অলিকুল ব্যাকুল হইয়া স্থলপদ্মে মধুপানের জন্য সমুৎসুক হইল।

• • • •

স হৃদয়ে হৃদয়েপ্সিতমীক্ষণা-
দকৃতকোঽকৃতকো ন হি বিভ্রমঃ।
স্মরণতো রণতোঽপি মুদং প্রভো-
র্দিরিবতা বিরতা বিততির্দধে॥ ৪৩॥
চিরমিব প্রতিবোধমুপাগতা
গিরিভুবো বিভুলোচনবর্ত্মগাঃ।
বিবিধ পত্রিরবেণ জয়ধ্বনিং
সপদি সম্পদি সন্ততমাদধুঃ॥ ৪৪॥
সুহরিতা হরিতালরুচাঞ্চয়ৈঃ
ক্বচন কাঞ্চন কান্তরুচিঃ ক্বচিৎ।
ঘনসমান সমা স্বরুচাঽসিতা
ক চ সিতা চ সিতাচ্ছ শিলাচয়ৈঃ॥ ৪৫॥
বিকসিতৈঃ কসিতৈঃ কুসুমোচ্চয়ৈ-
রিব দরী বদরী বিধুরাম্বিতা।
বিহসতী হসতীক্ষণগে প্রভা
বধর ভূধর ভূরতি সুন্দরী॥ ৪৬॥

• • •

পথি স চীর নদে প্রভুরাতনোৎ
প্লবন তর্পণ পূজনমুৎসুকঃ।
জ্বরিতমস্য বপুঃ সমভূত্ততো
ন চরিতং চরিতং ভবতি প্রভোঃ॥ ৫০॥

এই বর্ণনা হইতে জানা যায়, মহাপ্রভু গঙ্গাতীরে এক মনোজ্ঞ বনস্থলী পাইলেন। সেই অরণ্যাঞ্চলে গিরিস্থলীও আছে। পরে যাইতে যাইতে চীর নদীতে স্নান করিলেন ও জ্বরে পড়িলেন। মন্দারে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই চীর নদী পাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ, মন্দার হইতে ৩।৪ মাইলের মধ্যে আজও চীর নদী প্রবাহমানা। গঙ্গা ও চীর নদীর মধ্যে রাজমহলের মনোজ্ঞা বনভূমি ও গিরিভূব বিরাজমান। সুতরাং এই সকল বর্ণনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, রাজমহল হইতে তেলিয়াগড়ী পর্য্যন্ত যে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পর্ব্বতময় অরণ্যভূমি ছিল, মহাপ্রভু সেই পথেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। রামকেলি হইতে গঙ্গাপার হইলেই সুপ্রসিদ্ধ বাদশাহী-সড়ক পাওয়া যায়, উহা এই অরণ্যসঙ্কুল পার্ব্বত্য অঞ্চলের ভিতর দিয়াই গিয়াছে। পথের বর্ণনায় পদ্মের বিশেষ উল্লেখ আছে। রাজমহলের সন্নিহিত স্থানসমূহ এখনও পদ্মের জন্য এ অঞ্চলে সুপরিচিত। বর্ণনায় পার্ব্বতীয় নিম্নভূমির বিচিত্র বর্ণের উল্লেখ রহিয়াছে; তন্মধ্যে শ্বেতবর্ণের উল্লেখই বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। বলা বাহুল্য, আজ পর্য্যন্ত রাজমহলের নিকট বাদশাহী-সড়কের পার্শ্বেই শ্বেতবর্ণ Caolin প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, এবং তাহার ফ্যাক্টরীও বর্ত্তমান।

এখানে মহাপ্রভুর গয়া-গমন-পথ পাওয়া গেল। রামকেলি হইতে অগ্রসর হওয়া যাউক। চৈঃ-চঃ মতে রামকেলিতে সনাতন শ্রীগৌরকে বলিয়াছিলেন, এত লোক সঙ্গে লইয়া হৈ-চৈ করিয়া বৃন্দাবন-যাত্রা প্রশস্ত নহে। এই সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য বলিতেছেন,—

তবে আমি শুনিল মাত্র না কৈল' অবধান।
প্রাতে চলি আইনু কানাইর নাটশালা গ্রাম॥
রাত্রিকালে মনে আমি বিচার করিল।
সনাতন মোরে কিবা প্রহেলী কহিল।
—মধ্যলীলা, ১৬ পরিচ্ছেদ।

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, তিনি 'প্রাতে' রামকেলি হইতে 'চলি' কানাইর নাটশালা গ্রামে আসিলেন, ও 'রাত্রিকালে' তিনি কানাই-নাটশালে ছিলেন। সুতরাং কানাই-নাটশালা রামকেলি হইতে এক দিনের পথ,—এবং সকালেই অথবা সারা-দিনের মধ্যেই তিনি তথায় উপস্থিত হন। অতএব রামকেলির অনতিদূরে এক দিনের পথে এই কানাই-নাটশালা অবস্থিত। রামকেলি গঙ্গাতীরবর্ত্তী ও অপর পারেই সুপ্রসিদ্ধ বাদশাহী-সড়ক।

রাত্রিকালে নাটশালায় 'গোরা রায়' ভাবিয়াছিলেন,— সনাতন ঠিকই বলিয়াছেন,—

"বৃন্দাবনে যাব কাঁহা একাকী হইয়া
সৈন্য সঙ্গে চলিয়াছি ঢাক বাজাইয়া॥"

এইরূপ চিন্তা করিয়া

"ধিক্ ধিক্ আপনারে বলি হইলাম অস্থির
নিবৃত্ত হইয়া পুনঃ আইলাম গঙ্গাতীর।"

তিনি কানাই-নাটশালায় স্থির করিলেন, পুরী ফিরিয়া যাইবেন ও 'নিবৃত্ত হইয়া পুনঃ গঙ্গাতীর' আসিলেন। এরূপ 'ক্ষেত্রে নিবৃত্ত হইয়া পুনঃ আইলাম গঙ্গাতীর' পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, কানাই-নাটশালা যাইতে গৌর রায়কে গঙ্গাতীর * ছাড়িয়া যাইতে হইয়াছিল, এবং পুরী ফিরিতে গিয়া তাঁহাকে গঙ্গাতীরে পুনরায় আসিতে হইয়াছিল। এখন বর্ণনার সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, বৃন্দাবন যাইবার উদ্দেশ্যে রামকেলি † হইতে তিনি গঙ্গাপার হন, এবং বাদশাহী-সড়ক ধরিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইবার পর কানাই-নাটশালে উপনীত হন। সেখানে রাত্রিবাসকালে স্থির করেন, আর বৃন্দাবন যাইবেন না, পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। সেই কারণে তাঁহাকে 'নিবৃত্ত হইয়া পুনঃ গঙ্গাতীরে' আসিতে হইয়াছিল। কবি কর্ণপূর-রচিত "শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মহাকাব্যং" গ্রন্থেও দেখি,—

কালিন্দীয়ে তীর এব প্রযাতুং
গাঢ়োৎকণ্ঠঃ পশ্চিমে ক্বাপি গত্বা।
প্রত্যাবৃত্তো ভূয় এব স্বচিত্তে
কিম্বালোক্য স্বর্ধুনীতীরমায়াৎ॥—২০ সর্গ, ৩২ শ্লোক।

---

* রামকেলি গঙ্গাতীরবর্ত্তী ছিল।

† আজও সাধারণের ধারণা, শ্রীচৈতন্য "হাবাসখানা"র ঘাটে গঙ্গাপার হন। ভক্তগণ অদ্যাপি রামকেলিতে জ্যৈষ্ঠ-সংক্রান্তিতে ও তৎপর-দিন প্রভুর আগমন উপলক্ষে উৎসব করিয়া থাকেন। এই উৎসব "রামকেলির মেলা" বলিয়া প্রসিদ্ধ। উৎসবকালে সকলে 'হাবাসখানা'র ঘাটে স্নান করেন। সনাতনও এই ঘাটে গঙ্গাপার হইয়াছিলেন।

কালিন্দীতীরে মথুরায় যাইতে গাঢ়োৎকণ্ঠ হইয়া 'পশ্চিমের' কোন অংশে গিয়া আবার ফিরিয়া গঙ্গাতীরে আসিলেন। এই অংশ চৈতন্য-চরিতামৃতের বর্ণনারই সমর্থন করিতেছে। রাজমহল সাহেবগঞ্জকে বাঙ্গালীরা আজও "পশ্চিম" নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

এখন বিবেচ্য, রামকেলির অনতিদূরে এক দিনের পথে গঙ্গাপারে অথচ পারঘাটের অদূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত এই কানাই-নাটশালা কোথায়?

রামকেলি হইতে রাজমহলের নিকট গঙ্গাপার হইলে অতি নিকটেই "কানাইয়া থান" নামক একটি স্থান এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এই "কানাইয়ের থান" বা কানাইস্থান একটি দেবস্থান। রামকেলি হইতে রাজমহল এখন এক দিনের পথ। আবার এই 'কানাইস্থান' প্রাচীন বাদশাহী-সড়কের উপর অবস্থিত, এবং স্থানটি দেবস্থান বলিয়া উক্ত অঞ্চলে এখনও প্রসিদ্ধ।

নিম্নোক্ত অংশটি পাঠে মনে হয়—'কানাঞির নাটশালা' গঙ্গা-তীরবর্ত্তী ;—

এত চিন্তি প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করি
নীলাচলে যাব বলি চলিল গৌরহরি।
—মধ্যলীলা, ২য় পরিচ্ছেদ।

আবার—

ধিক্ ধিক্ আপনারে বলি হইলাম অস্থির,
নিবৃত্ত হইয়া পুনঃ আইলাম গঙ্গাতীর।

এই অংশ পাঠে ধারণা হয় যে, কানাঞির নাটশালা যেন গঙ্গা-তীরবর্ত্তী নহে। এই পার্থক্যের সামঞ্জস্য হয় কিরূপে? আমাদের বর্ণিত 'কানাইয়া থান' এক পার্ব্বত্য উচ্চ-ভূমিতে অবস্থিত। তাহার নীচেই গঙ্গা প্রবহমানা, ও সেখানে পার হওয়া সম্ভব নহে। এই বৈষম্যের সামঞ্জস্য করিতে হইলে এইরূপ দাঁড়ায় যে, গৌর রায় প্রাতঃকালে কানাই-স্থানেই স্নান সমাপন করেন ও পরে ফিরিবার কথা প্রকাশ্যে জ্ঞাপন করিয়া সড়ক ধরিয়া গঙ্গাতীরে অর্থাৎ পার-ঘাটে আসিলেন।

এই কানাইয়া থান কর্ণপূর-বর্ণিত বনময় অরণ্যসঙ্কুল প্রদেশের অন্তর্গত। মুরারি গুপ্তের করচায় লিখিত আছে—

এবং ক্রমেণ সংনীতো নাট্যস্থলমপি দ্বিজঃ
উবাহ বনলীলাং যঃ স্মরণ্ কৃষ্ণস্য বিক্রমম্।
—সপ্তদশ সর্গ, ৯ম শ্লোকঃ।

এই অংশটিতে দেখা যাইতেছে, নৃসিংহানন্দ গোরা রায়কে কৃষ্ণ-নাট্যস্থলে আনিয়া "কৃষ্ণ-বিক্রম" স্মরণ করিয়া 'বনলীলা' করাইলেন। সুতরাং কৃষ্ণনাট্যস্থল 'বনস্থলি' অনুমান করাই সঙ্গত। বস্তুতঃ, আমাদের এই কানাইয়া থান' পূর্ব্বখ্যাত বনস্থলির অন্তর্গত, —যে বনস্থলির বর্ণনা আমরা কর্ণপূর হইতে পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি।

নিকটবর্ত্তী জনসাধারণের মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ বিশ্বাস চলিয়া আসিতেছে যে, এই 'কানাইয়া থান' প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের পাদস্পর্শে পরিপূত!

শ্রীসরিৎশেখর মজুমদার (এম-এ)।

চেনা পথিক

চেনা পথে তোমায় দেখে অনেক দিন পরে,
পথের তরু-গুল্ম-লতা চায় আবেগ-ভরে।
বস্‌লে যে সব তরুর তলে
আবার তা'রা বস্‌তে বলে,
আনন্দেতে কুসুম ফোটে ডালগুলি নড়ে।

তুমি ভালবাস্‌তে যে সব কোকিল পাপিয়া,
চাহে তোমার পথ যে কত বরষ ব্যাপিয়া।
গান শুনিয়া থাম্‌তে তুমি,
উল্লসিত কানন ভূমি,
তোমার 'আউচ' আকন্দকে কে আদর করে?

সাম্‌নে শুভ সংশী তোমার শঙ্খচিল ডাকে,
ভরা-কলস কক্ষে বালা বন্দে তোমাকে।
পথের ধারে সারি সারি
প্রণাম করে নর-নারী
মুখে হাসি—উল্লাসেতে দুই নয়ন ঝরে।

আস্‌তে যেতে বসন্ত শীত শরৎ বাদরে,
ভরা এ পথ তোমার হাসি তোমার আদরে।
এ পথেতে আমরা জুড়াই,
বুক ভরিয়া সোনা কুড়াই,
তোমার পরশ ভরেছে পথ পরশ-পাথরে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

তখন ও এখন

(গল্প)
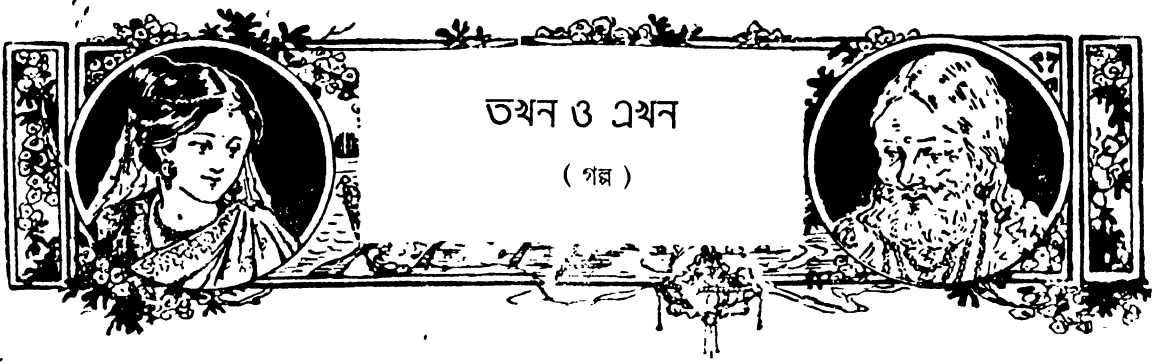
আমি এখন আলমডাঙ্গায় থাকি। কিন্তু দোহাই আপনাদের, যেন ভূগোল খুলিয়া বসিবেন না। সে-কালে আমাদের সময় ভালই ছিল, আমরা ভূগোল কিছুমাত্র না শিখিয়া বিনা-গোলযোগে বিশ্ব-বিদ্যার অর্ণব পাড়ি দিয়াছি। তাহার ফল এক-হিসাবে ভাল হইয়াছে। প্রতিদিনের সংবাদ আমরা অবলীলাক্রমে পড়িয়া যাই। বেসারভিয়া পেরুতে কিংবা সাইবেরিয়ায়, তাহা লইয়া আমাদের কোনও দুশ্চিন্তা হয় না। আমরা সাহিত্যিক, কল্পনা-প্রবণতা লইয়া মানসিক অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা মনে মনে হয় ত আঁকি, হয় ত বা আঁকি না। আপনাদের মত অকারণ চাঞ্চল্য আমাদের নাই।

আলমডাঙ্গা বাঙ্গালা দেশের ভূগোলে নাই—এটা গল্পের জগতের; অথচ এর বাস্তব সত্তা আছে। কুমার নদ আষাঢ়ের জলধারা বক্ষে লইয়া তর-তর বেগে বহিয়া যায়; নানা দেশ-দেশান্তরের নৌকা ঘাটে ভিড়ে। খুলনা হইতে আসে বড় বড় ধানের নৌকা,—সুন্দরবন হইতে সুঁদরী-কাঠের সুবৃহৎ নৌকা। তাহা ছাড়া রকমারি পান্সি, ঘাসি, ডিঙ্গী ইত্যাদি। বিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্রের মাঝে—হঠাৎ মাথা তুলিয়া আদালতের লাল দালান দাড়াইয়াছে আর তার গোল গম্বুজ—আর আদালতের পাশে সনাতন বটবৃক্ষ তার অসংখ্য ঝুরি নামাইয়া নৌকা-ঘাটের দৃশ্যকে গম্ভীর করিয়া তুলিয়াছে।

আলমডাঙ্গার আর পূর্ব্ব-গৌরব নাই। সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। ভাঙ্গা আসরে এক জন মুন্সেফ আদালত করেন; তিন হাজার বাকী-খাজনার মামলা তাঁর পুঁজি। কিছু কিছু দেওয়ানি মামলাও চলে—তাই আমাদের সাইত্রিশ জন উকিলের রুজি বজায় রাখিয়াছে।

আ[illegible] বাবু খুব নিরহঙ্কার, বিদ্যার গৌরব অগ্রসর হওয়া তিনি শ্রীগৌরকে বলিয়াছিই। যখন কাজ না থাকে, বসিয়া বসিয়া চেম্বারে খবরের কাগজ পড়েন,—এজলাসে আমরা বসিয়া পাখার বাতাস খাই। পাখা টানে বুড়া তোজাম্মেল —সে পাখা টানে যত, ঘুমায় তার দ্বিগুণ;—অথচ নিরুপদ্রবে তার জীবন চলে—কারণ, দয়ালু নীরদ বাবু গরীবের অন্ন মারিতে সম্মত নন। সে-দিন আমার কতকগুলি একতরফা খাজনার মামলা ছিল। আদালতে বসিয়া নাম দেখিতেছিলাম। মুহুরী আসিয়া জানাইল— একটি পাপর-মোকদ্দমার আর্জ্জি ও দরখাস্ত লিখাইতে একটি মেয়ে আসিয়াছে। সেরেস্তায় ফিরিলাম,—ক্লাবের পাশেই আমার টিনের ঘর।

বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা—মেয়েটির বয়স ত্রিশ-বত্রিশ; তাহার সঙ্গে আর কেহ ছিল না। ফি পাইব না ভাবিয়া বিমর্ষ হইলাম। মেয়েটি তাহার অবগুণ্ঠন খুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল,—"বাবু, আমায় চিনতে পারেন না?"

আমি অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলাম। ইহাকে কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না।

মেয়েটি তখন হাসিতে হাসিতে বলিল,—"আমি তাজা বিবি"—নাম শুনিতেই প্রথম জীবনের আশা ও আনন্দের ছবি চিত্ত-মুকুরে ভাসিয়া উঠিল। স্মরণ হইল— তাজা বিবিকে।

তখন আইন পাশ করিয়া সদরে আসিয়া বসিয়াছি। নূতন জজ বীচক্রফ্‌ট সাহেব আমাকে স্নেহ করিতেন। আমায় একটি খুনী মোকদ্দমায় অপরাধীদের পক্ষ সমর্থন করিতে বলিয়াছিলেন—তাজা বিবি ছিল সেই মোকদ্দমার আসামী। তাজা বিবি তখন ষোড়শী সুন্দরী—তাহার মুখে ছিল ফুটন্ত গোলাপের লাবণ্য,—আর দীর্ঘ ষোল বৎসর পরে—আজ সেখানে জীর্ণতার ম্লানিমা। তাহাকে চিনিতে পারি নাই—ইহাতে আশ্চর্য্যের কারণ নাই।

সেই খুনী মোকদ্দমার ঘটনা সংক্ষেপে বলি ;—আলি আজগর বেগমপুরের এক জন বৰ্দ্ধিষ্ণু প্রজা—সম্বৎসরে পাটে সে হাজার-বারশ' টাকা পাইত, ধান বিক্রয় করিয়া তাহার আরও পাঁচ-ছয় শত টাকা আয় হইত—তাহা ছাড়া, তাহার নগদ টাকা ও লগ্নী-কারবারও ছিল। পঁচিশে বৈশাখ আলি আজগর খুন হয়। হত্যাকারী রহমান হাতে-হাতেই ধরা পড়ে ;—সন্ধ্যারাত্রে সে যখন একনালা বন্দুক হাতে বাহির হইতেছিল, তখনই ধরা পড়ে।—বন্দুকে সদ্য গুলী করিলে যে ধূমগন্ধ থাকে, তাহা অনুভূত হইয়াছিল। রহমানকে প্রধান আসামী বলিয়া পুলিশে চালান দিয়াছিল, সঙ্গে-সঙ্গে তাজা বিবি ও নুর মহম্মদ সহকারী বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছিল। সেসন কোর্টে আমিই তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলাম।

আমি যে ফৌজদারি আদালত ত্যাগ করিয়া দেওয়ানীতে কাজ করিতেছি—তাহার কারণই এই তাজা বিবি।

আমার বিশ্বাস ছিল—তাজা বিবি নিরপরাধ, কিন্তু তাহাকে মুক্ত করিতে পারি নাই ; জুরির নিকট তাহার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিতে পারি নাই। ইহা আমারই অপরাধ মনে করিয়া আমি ফৌজদারি মোকদ্দমায় জীবন-মরণের খেলা ত্যাগ করিয়াছি।

আলি আজগরের বয়স হইয়াছিল। প্রবীণ বয়সে তাজা বিবির মত সুন্দরীকে বিবাহ করা তাহার উচিত হয় নাই। ধন দিয়াই যুবতীর মনোহরণ করা যায় নাই। আলি আজগরের বাড়ীর সম্মুখে এক মক্তব ছিল।—সেই পাঠশালায় তরুণ শিক্ষক নুর মহম্মদের সহিত তাজা বিবির আশ্‌নাই বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল।

কেমন করিয়া পর্দ্দার আড়ালে এই প্রেম সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা আমার অজ্ঞাত ; তবে পুলিস দুইখানি প্রেমপত্র প্রমাণ-স্বরূপ উপস্থিত করিয়াছিল। তাজা বিবি তাহা তাহার নিজের লেখা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল। চিঠি দুইখানি এই মোকদ্দমায় তাহার অপরাধের সাক্ষী। প্রথম চিঠিখানি এইরূপ,—

"বুকের কলিজা আমার, সুধা পাইলেও তোমাকে আমি ভুলিতে পারব না। খাদিজা তোমার কথা প্রায়ই বলে ; কিন্তু নিষ্ঠুর আমি আজগরের ভয়ে কিছু করতে পারি না। যে-দিন তোমায় আমায় নিকা হবে, সে-দিন কি সুখের হবে !—খোদার এয়াস্তে সে-দিনের দেরী নাই—আমি টাকার যোগাড় করেছি, তুমি এখন যদি মানুষ ঠিক করতে পার, তাহ'লে আর দেরী হবে না—তোমার জন্য আমার বুক ফাটছে, তোমার কথাই আমি হামেসা ভাবি।"

দ্বিতীয় পত্র এইরূপ,—"প্রাণনাথ, তুমি আমার দুঃখের বোঝা বইছ—তোমায় সব না লিখে কাকে আর লিখব বল—তুমিই আমার কাণ্ডারী ; তুমি যা বল, আমায় তাই শুনতে হবে—তুমি যে-দিন চাও, খাদিজা সেই দিন তোমায় টাকা দিয়ে আসবে—তুমি আর দ্বিধা করো না—আমার মনে এক তিল সুখ নেই—কবে তুমি আসবে—বিজয়ী বীরের মত আমার দুঃখ হরণ করবে। আমি আর সবুর করতে পারছি না।"

পুলিসের অভিযোগ—নুর মহম্মদ ও তাজা বিবি উভয়ে রহমানকে নিযুক্ত করায় সে অর্থলোভে এই হত্যা করিয়াছিল। তাজা বিবি এই লেখা তাহার বলিয়া আমার নিকট স্বীকার করে ; কিন্তু সে বলে—তাহারা নির্দ্দোষ। রহমানকে তাহারা টাকা দিয়া বশ করে নাই। সে নিজের শত্রুতা সাধনের জন্য আজগরকে হত্যা করিয়াছে।

কিন্তু জুরিকে আমি তাহা কিছুতেই বুঝাইতে পারি নাই—তাজা বিবি ও নুর মহম্মদের সাত বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছিল।—সেই তাজা বিবি এত কাল পরে আজ আমার সম্মুখে !

প্রথম যে-দিন তাহাকে দেখি, সে-দিন সে ছিল বসন্তের নবোদ্গত মুকুল, আজ সে ঝরা-পাতা—কিন্তু ঝরা-পাতার বেদনাও বেদনা,—সংসারে তাহাকে অবজ্ঞা করা চলে না ; তাই প্রশ্ন করিলাম—"কি দরকারে এসেছ ?"

সে আমার দিকে মিনতিভরা দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"আমি তালাক চাই। ফাটক থেকে বেরিয়ে নুর মহম্মদকে আমি বিয়ে করেছিলাম ; কিন্তু সে আমার জীবন অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে—"

দোয়াত কলম লইয়া বসিলাম। তাজা বিবি বলিয়া গেল—আমি শুনিয়া পাপরের দরখাস্ত ও আরজি লিখিয়া যখন শেষ করিলাম, তখন প্রায় চারিটা বাজে। আদালতে গিয়া দেখি, নীরদ বাবু খাস-কামরায়। খাস-কামরায় তিনি তখন মনের আনন্দে ধূমপান করিতেছিলেন।

আমাকে দেখিয়া তাঁহার রূপার সিগারেট-দানি আগাইয়া দিয়া বলিলেন—"নিন একটা ভবেশ বাবু!"

আমি আপ্যায়িত হইয়া বলিলাম—"না সার, ওটা চলে না।"

"কেন? পিউরিটানিজিম্—?—তার পর কি, বলুন?

"একটা পাপরের দরখাস্ত—"

"আবার জ্বালালেন দেখছি—চলুন—কিসের মোকদ্দমা?"

তিনি গাউন পরিতে লাগিলেন,—আমি বলিলাম—"বিবাহ-বিচ্ছেদ—"

"আপনারা দেখছি, গৃহের মাধুর্য্য আর পবিত্রতা রাখবেন না—"

নীরদ বাবু একটু পত্নীব্রত—মুন্সেফদের ঘর-কুনো জীবনে বাহিরের কোনও আকর্ষণই থাকে না—কাজেই তাঁহারা একটু স্ত্রৈণই হইয়া থাকেন। তাই তিনি যাহাতে বিরক্ত না হন—সেই জন্য বলিলাম, "অন্যায় বটেই, কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় যে—"

তাজা বিবির জবানবন্দী করিলাম,—

"তোমার নাম কি?"

"তাজা বিবি।"

"এই দরখাস্ত তুমি দাখিল করছ?"

"করছি।"

"তুমি দুই মাসের মধ্যে কোনও সম্পত্তি বেচনি ত?"

"না।"

"তুমি এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে কারও সঙ্গে কোনও যুক্তি করেছ?"

"না।"

"তোমার এক শত টাকা মূল্যের সম্পত্তি আছে?"

"না।"

"তোমার কি আছে?"

"পরণের দু'খান কাপড়, একখানি থালা, একটা গেলাস, একটা বাটি—"

নীরদ বাবু খুব দ্রুতগতি কাজ করেন। জবানবন্দী ও অর্ডার লিখিয়া হাসিতে হাসিতে আমায় বলিলেন—"কিন্তু আপনার মক্কেলের গহনা আছে—ওর হাতে বালার দাগ দেখছি।"

নীরদ বাবু ডিটেক্‌টিভ-উপন্যাসের ভক্ত। আমি চুপ করিয়া গেলাম। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"ভয় নেই, একতরফা আপনি জিতলেন, কারণ, আদালতের চোখ হ'ল সাক্ষ্য।"

মাস-দুই পরে মোকদ্দমা উঠিল।

অপর পক্ষের জেরায় তাজা বিবি নাজেহাল হইল। তাহাতে যে ঘটনা জানিলাম, তাহা এই;—নূর মহম্মদের এক বোবা মেয়ে ছিল—তার বিবাহ হইয়াছিল সামসুল আলমের সঙ্গে। এক দিন নিশীথ রাত্রে তাজা তাহার সঙ্গে গহনাপত্র টাকাকড়ি সহ পলাইয়া আসিয়াছে। সামসুলকে বিবাহ করিবে, তাই এই বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা।

তাজা বিবির জীবনে প্রেমের এই দুই ইতিহাস। প্রথম ইতিহাসে শোণিতসিক্ত মাদকতা; কিন্তু তথাপি সেই প্রেমের মধ্যে যেন মধু ছিল। বৃদ্ধ আলি আজগরের প্রেমে সে পরিতৃপ্ত হইতে পারে নাই, তজ্জন্য তাহার প্রতি কৃপা হইত; তাহার প্রতি ঘৃণা আসিত না।

কিন্তু এই পলায়নের ইতিহাস যেন সৌরভহীন বীভৎসতা। জামাতৃতুল্য সামসুলের সঙ্গে পরিণত বয়সের এই পলায়ন যেন ফেনিল কামনায় বিষবাষ্প। ইহার মধ্যে না আছে রোমাঞ্চ, না আছে যাদু, না আছে সুষমা!

পাপর মোকদ্দমা হারিলাম। প্রথম যৌবনে তাহার মোকদ্দমায় হারিয়াছিলাম—তখন সে অন্যায় ভাবে পাইয়াছিল শাস্তি—তাই সে বেদনা নিঃশেষ।

পাপর মোকদ্দমার রায়ও নীরদ বাবুর ডিটেকটিভ-বুদ্ধিজাত পক্ষপাতের জন্য আমাদের বিরুদ্ধে গেল। এবার হারিয়া কিন্তু দুঃখ হইল না। যেন স্বস্তির আনন্দ পাইলাম। ইহা কি বয়সের দোষ? তখন ছিলাম আশাতুর যুবা—আর আজ আমি তিক্ত প্রৌঢ়তায় সর্ব্ব-আশাহীন।

শ্রীমতিলাল দাশ।

চিবুক

চিবুকের উপর মেয়েদের মুখের শ্রী-সৌন্দর্য্য নির্ভর করে অনেকখানি। চিবুকের পরিচর্য্যা না করিলে যৌবনেই

১। সামনে পিছনে মাথা নাড়া

চিবুক দু'-ভাঁজে ভরিয়া মুখের শ্রী হরণ করিয়া বসে। দু'-ভাঁজ চিবুককে ইংরেজীতে বলে, ডবল-চিন্ (double-chin)। গলায় দাড়ির নীচে যাহাতে মেদ না জমে, সে-দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা চাই। দাড়ির নীচে মেদ জমিলে সারা দেহের বাঁধনে বিকৃতি সুরু হয়। চিবুককে সুস্থ সুন্দর রাখিতে হইলে তার ব্যায়াম-পরিচর্য্যা সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে।

অনেকের বিশ্বাস, খুব বেশী পাণ চিবাইলে চিবুক-ভাগের ব্যায়াম হয়; এবং সে-ব্যায়ামে চিবুকের শ্রী অক্ষুণ্ণ থাকে। কথাটা সত্য নয়।

চিবুককে সুন্দর সুগঠিত রাখিতে না পারিলে মুখশ্রী রক্ষা করা যাইবে না, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সুডোল সুঠাম করিবার জন্য যেমন বিশেষ ব্যায়াম-বিধি আছে, চিবুকের শ্রী-সৌন্দর্য্য রক্ষার জন্যও তেমনি বিশেষ বিধি মানিয়া চিবুকের ব্যায়াম-সাধন প্রয়োজন।

চিবুকের ব্যায়াম-সাধনে প্রথম বিধি—ঘাড় তুলিয়া ১নং ছবির ভঙ্গীতে ধীর ভাবে সামনে-পিছনে মাথা নাড়া। মাথা নাড়িবার সময় দেখিবেন, ঘাড়ের গোড়ায় বেশ একটু টান পড়িবে। এই টানেই ব্যায়ামের উপকারিতা। প্রথমে দশ বার মাথা নাড়িবেন; তার উপর ক্রমে মাত্রা বাড়াইয়া মাথা নাড়িবেন বিশ বার। এবং এই মাথা-নাড়ার মাত্রা বাড়াইয়া ক্রমে পঞ্চাশ বার করিতে হইবে।

দ্বিতীয় পর্ব্বে—খাটে চিৎ হইয়া শুইয়া ঘাড়ের নীচে হইতে মাথা হেলাইয়া ঝুলাইয়া দিন। ঝুলাইয়া দিবার পর ধীরে ধীরে মাথা তুলিবেন। এমন ভাবে মাথা তুলিবেন, যেন চিবুক আসিয়া বুকে ঠেকে! তার পর আবার আগেকার মতো মাথা ঝুলাইয়া দিন! এ

ব্যায়ামে দোভাঁজ চিবুকের মেদ ঝরিয়া চিবুক একহারা ও সুশ্রী সুগঠিত হইবে। এই মাথা ঝুলানো এবং পরক্ষণে মাথা তুলিয়া চিবুক দিয়া বুক স্পর্শ করা—এ ব্যায়াম প্রত্যহ করা চাই অন্ততঃ দশ বার।

তৃতীয় পর্ব্বে—ঘাড় হইতে মাথা তুলিয়া ৩নং ছবির ভঙ্গিতে ট্যার্চা ভাবে যতখানি পারেন উপর-দিকে চান। তার পর ঘাড়-মাথা এমনি সিধা খাড়া করিয়া বাঁয়ে ফিরান ধীরে ধীরে। এমনি ভাবে একবার ডাহিনে, পরক্ষণে বাঁয়ে ঘাড়-মাথা হেলাইবেন—প্রত্যহ অন্তত পক্ষে দশ-বারো বার। এ ব্যায়ামে চিবুক কখনো দোভাঁজ হইবে না—চিবুকের নীচে বা গলায় মেদ জমিবে না। চিবুক দোভাঁজ হইলে সে-বিকৃতি সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ সারিয়া যাইবে। চিবুক ও গ্রীবাদেশ সুশ্রী সুগঠিত হইবে।

২। খাটের বাহিরে মাথা হেলানো

৩। মাথা তুলিয়া

৪। ডান হাতের উল্টা পিট দিয়া চপেটাঘাত

চতুর্থ পর্ব্বে—ঘাড় তুলিয়া চিবুকের নীচে ৪নং ছবির ভঙ্গীতে হাতের উল্টা দিক দিয়া ধীরে ধীরে চপেটাঘাত করিবেন। ষোল বার চপেটাঘাত করা চাই।

পঞ্চম পর্ব্বে—৫নং ছবির ভঙ্গীতে ঘাড় তুলিয়া উপর-দিকে চাহিবেন। চাহিয়া হাঁ করিবেন। যতখানি সম্ভব, হাঁ করিতে হইবে। দু'সেকণ্ড হাঁ করিয়া মুখ বুজিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নামাইবেন। ধীরে ধীরে মুখ বুজিবেন এবং ধীরে ধীরে ঘাড় নামাইবেন। দু'সেকণ্ড পরে আবার হাঁ করিতে এবং ঘাড় তুলিতে হইবে। হাঁ করিয়া ঘাড় তোলা এবং দু'সেকণ্ড পরে মুখ বুজিয়া ঘাড় নামানো—এ ব্যায়াম করিবেন পাঁচ মিনিট।

৫। হাঁ করিয়া

৬। হাত দিয়া মর্দ্দন

এবার ষষ্ঠ পর্ব্বে—৬নং ছবির ভঙ্গীতে ঘাড় তুলিয়া

এক বার ডান হাত ঘষিয়া পরক্ষণে বাঁ হাত ঘষিয়া চিবুক ও গলা ধীরে ধীরে মর্দ্দন করিবেন।

৪নং এবং ৬নং ব্যায়াম করিবার পূর্ব্বে চিবুকে ও গলায় ক্রীম মাখিবেন। নহিলে চপেটাঘাতে ও মর্দ্দনে বেদনা বোধ করিবেন। নিয়মিত ভাবে এ কয়টি ব্যায়াম করিলে গ্রীবা ও চিবুকের গড়ন হইবে কমনীয় এবং দোভাঁজ চিবুক সারিয়া মুখের কদর্য্যতার বিলোপ ঘটিবে।

ছেলেমেয়েদের বিপত্তি

স্পষ্ট একটা কথা বলতে চাই—পাঠিকারা রাগ করবেন না। এ যুগে লেখাপড়া, গান-বাজনা, সজ্জা-প্রসাধনের কলা-কৌশল শিখতে মেয়েদের আজ যতখানি মনোযোগী দেখি, ঠিক ততখানি তাঁদের ঔদাস্য দেখি ছেলে-মেয়ের লালন-পালনের কাজে। যাঁদের অবস্থা ভালো, ছেলে-মেয়েদের পরিচর্য্যা—তাঁদের মধ্যে অনেকে ভাবেন, দাসীত্ব! ভাবেন, নিজের হাতে ছেলেমেয়ে লালন করছি যদি কেউ দেখে, তাহ'লে ফ্যাশনেব্‌ল্ সমাজ থেকে তখনি নাম-কাটা যাবে! দাসী-চাকর রাখবার মতো সামর্থ্য যাঁদের নেই, তাঁদের মধ্যেও অনেককে দেখি, ছেলেমেয়েদের লালন-রীতি সম্বন্ধে হয় তাঁরা অজ্ঞ, না হয় জেনে-শুনে উদাসীন!

প্রথমতঃ ছেলেমেয়েদের এ্যাক্সিডেণ্ট—সব ঘরেই ঘটতে পারে। ধরুন, বাপের সিগারেট ধরাবার দেশলাইয়ের বাক্স—যেখানে-সেখানে এ-বাক্স পড়ে থাকে। কাজেই অবোধ ছেলেমেয়েরা সে-বাক্স নিয়ে যদি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাতে যায় এবং কাঠি জ্বালার ফলে যদি অগ্নি-কাণ্ডে বিপর্য্যয় ব্যাপার ঘটে, তাহ'লে মা-বাপের লজ্জা নয়, পরিতাপের সীমা থাকে না! এ-কথা জেনেও কত মা-বাপকে দেশলাই রাখার সম্বন্ধে উদাসীন দেখি।

তার পর দাসী-চাকরের জিম্মায় ছেলেমেয়েদের পার্কে পাঠাই হাওয়া খাওয়াতে! পাঠিয়ে আমরা কর্ত্তব্য করলুম বলে যেমন আনন্দ অনুভব করি, তেমনি ছেলে-মেয়েদের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত অনাসক্তির ভাব মনে পোষণ করে হয়তো রেডিয়ো খুলে বসি, নয় সিনেমায় যাই, না হয় খুব যদি কর্ম্মিষ্ঠ হই তো ভাঁড়ার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি! দাসী-চাকর নোংরা হাতে ছেলেমেয়েদের ঘাঁটাঘাঁটি করে—বাজারের কত ভেজাল খাবার খেতে খেতে ছেলেমেয়ের বায়না শুনে তাদেরো সে ভেজাল খাবার প্রসাদ দেয়; কিম্বা পার্কের নোংরা আবর্জ্জনার মধ্যে ছেলেমেয়েকে ছেড়ে গল্পগুজবে মত্ত হয়ে দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য ভোলে—এ-কথা কেউ কখনো চিন্তা করে দেখেছেন কি? দৈবাৎ এক দিন কাছের পার্কে আচমকা গিয়ে যদি উদয় হন, দেখবেন, কোথায় আপনার

দেশলাইয়ের বাক্স

প্রাণ দিয়ে গড়া ছেলে-মেয়ে নোংরা, আবর্জ্জনা ঘেঁটে ভূত সাজছে, আর পার্কের বেঞ্চে বসে আপনার বিশ্বাসী দাসী-চাকর আর-পাঁচ-বাড়ীর দাসী-চাকরের সঙ্গে প্রাণ খুলে মনের কথা কইতে ব্যস্ত! তাছাড়া দাসী-চাকর ময়লা কাপড়ের খুঁট দিয়ে ছেলে-মেয়ের মুখ মুছিয়ে দিচ্ছে—এতে যে কতখানি রোগের বিষ দেয়, সে-কথা কেউ ভেবে দেখেছেন কখনো?

হাত না ধুয়ে ছেলে-মেয়েরা খাবার খেতে বসলো কিম্বা ঘরের কানাচে অপরের পাতে-পড়া উচ্ছিষ্ট খাদ্যকণা

দেখে হয়তো সেই খাবার খেতে বসলো ! মা, বাপ, ভাই-বোনের উচ্ছিষ্ট খাওয়াও উচিত নয়—এ হলো স্বাস্থ্য-বিভাগের গোড়ার কথা ; এ-কথা সংসারে আমরা ক'জন মেনে চলি !

ছেলে-মেয়েদের সর্দ্দি-জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, কাশি,—এগুলো প্রায় আমাদের ঔদাস্যবশে ঘটে। এ রোগগুলি খুব সংক্রামক এবং ছেলে-মেয়েদের পক্ষে এ সংক্রামকতা এত উগ্র যে, বাড়ীতে কারো সর্দ্দি হলে, সে যত বড় গুরু বা প্রিয়জন হোক, তার ত্রিসীমা থেকে ছেলে-মেয়েকে দূরে সরিয়ে রাখা উচিত। বাড়ীর একটি ছেলের অসুখ হলে অন্য ছেলে-মেয়েদের তার ছোঁয়াচ লাগতে দিতে নেই, এ-কথা ভুলে অনেক সময় সংসারের ছেলে-মহলে কত রোগকে রীতিমত সংক্রামক করে তুলি !

বড় বালতিতে জল ভরা আছে—ছোট ছেলে-মেয়ে যাতে সে বালতির ত্রিসীমায় না যেতে পারে, সে বিষয়ে খুব সতর্ক থাকা উচিত। বড় বালতির জলে ডুবেও বহু সংসারে শিশু-হত্যা ঘটেছে। বালতি দেখে ছোট শিশু সে-বালতি ধরে উঠে জলের নাগাল পেতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে বালতির জলে ডুবে প্রাণ হারাতে পারে—এ-কথা ভুলে যাবেন না।

তার পর পোড়া, ছ্যাঁকা লাগা—তপ্ত কড়া, কেট্‌লি, দুধের বাটি—এগুলো খুব সাবধানে রাখা উচিত।

অনেকের স্বভাব, বালিশের নীচে দেশলাই রাখেন। ঘরে ছোট ছেলেমেয়ে দেশলাই জ্বেলে বিছানায় আগুন ধরিয়ে সে আগুনে পুড়ে দগ্ধ হচ্ছে,—খপরের কাগজে এমন বহু শোচনীয় কাহিনী ছাপা আছে।

জ্বলন্ত ষ্টোভের সামনে ছেলে-মেয়েদের কদাচ ঘেঁষতে দেবেন না। তার পর এ-যুগের এই টেলিফোন ! টেলিফোনেও বিপত্তির আশঙ্কা বড় অল্প নেই ! ঐ যে যন্ত্র কথা কয়—ও যন্ত্রের সঙ্গে আলাপ করবার বাসনা শিশু-মনে প্রবল। এবং টেবিলের উপর কিম্বা উঁচুতে-রাখা ঐ টেলিফোন-যন্ত্র ধরতে গিয়ে বহু ঘরে ছোট ছেলেমেয়েরা পড়ে হাত-পা ভেঙ্গেছে, মাথায় চোট পেয়েছে !

সিঁড়িতে বা কলতলায় পিছল—এগুলোও ছেলে-মেয়ের পক্ষে সাংঘাতিক। পায়খানার কাছে বা বারান্দার কাছে ছেলেমেয়েরা কদাচ একা না যেতে পারে, সে সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে।

বিলাতের সেফটী কৌন্সিল এ-সম্বন্ধে একটি পুস্তক প্রকাশ করেছেন। গৃহে ছেলেমেয়েদের নিরাপদে রাখার সম্বন্ধে এ-পুস্তিকায় লেখা হয়েছে—

টিনের বা কাচের খেলনা ছোট ছেলেমেয়েদের হাতে কদাচ দেবেন না। কাচের খেলনা-পুতুল ভাঙ্গলে তার ভাঙ্গা খোঁচায় এবং টিনের খোঁচায় ছেলেমেয়েদের হাত-পা কেটে যেতে পারে এবং এ কাটা-ঘা সেপ্‌টিক্ হয়ে ছেলেমেয়ের বিপত্তি ঘটাতে পারে !

সিঁড়িতে খেলনা রেখে সেই খেলনায় পা লেগে ছেলেমেয়ে পড়ে হাতে-পায়ে মাথায় চোট পেয়ে ইহজন্মের সঙ্গে সব সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে পারে।

দাড়ি কামাবার ক্ষুর, ব্লেড ; ছুরি ; মাথার কাঁটা—এ-সবও খুব সাবধানে রাখবেন—ছেলেমেয়েরা যেন এ-সবের নাগাল কদাচ না পায়। ওষুধ বা কালি-ভরা দোয়াত—এ-সবও রাখবেন এমন জায়গায়, ছেলেমেয়ে যেন তার নাগাল না পায়। ভাঁড়ার-ঘরের বঁটি, কাটারি ছেলেমেয়েদের প্রাণ-ঘাতী, এ-কথা মনে রাখবেন। কোনো রকম যন্ত্রপাতি কিম্বা ইলেকট্রিক সুইচ প্রভৃতিও ছেলে-মেয়েদের কাছে ক্ষেত্র-বিশেষে প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে—এ-কথা মনে রেখে এ-সব সামগ্রী তাদের সামনে থেকে সরিয়ে রাখবেন।

তার পর তাদের বেশভূষা পরিষ্কার রাখবেন। ভোজ্য-পানীয়ের পাত্র পরিষ্কার রাখা চাই। এ-সব দিকে বিশেষ লক্ষ্য না রাখলে ছেলেমেয়েদের পক্ষে সুস্থ সবল থাকা কখনো সম্ভব হবে না। নোংরামির ফলেও ছেলেমেয়েদের প্রাণে বাঁচানো অনেক সময় শক্ত হয়।

নির্ব্বাসিতা রাজকন্যা

(রূপকথা)

১১

পাহাড়ের পথে বিজলী ছুটেছে পাহাড়ে ঝড়ের মতন প্রচণ্ড বেগে, পিঠে তার লীনা। চাঁদের আলোয় সমস্ত অঞ্চলটাই যেন হাসছে। কালো কালো পাহাড়গুলোর মাথার উপরে বন-বাদাড়-গুলো পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কিন্তু উঁচু পাহাড়ের পাশ দিয়ে সঙ্কীর্ণ রাস্তাটি এমনি এঁকে-বেঁকে ঘুরতে ঘুরতে চলেছে যে, সামনে বা পিছনের পথে কিছুই নজরে পড়ে না। ঘোড়ার পিঠে বসে পিছনের পানে লীনা বার বার চেয়ে চেয়ে দেখছিল—সেই পাঁচটা পাহাড়ে দস্যু তাকে ধরবার জন্তে ছুটে আসছে কি না! কিন্তু পাহাড়ের আড়াল পড়ায় পিছনের কিছুই সে দেখতে পেল না। অগত্যা সে পিছনের ভাবনা ছেড়ে সামনের দিকেই নজর দিল। এই ঘূর্ণী পথটা পেরিয়ে কোন জঙ্গল বা সমতল রাস্তা না পাওয়া পর্য্যন্ত সে যেন স্থির হতে পারছিল না।

অনেকক্ষণ পরে পাহাড়ের এই অঞ্চলটা পার হয়ে সে একটা নতুন জায়গায় এসে পৌঁছলো। সেখান থেকে পিছনে তাকাতেই তার মনে হ'লো পাহাড়গুলো যেন গায়ে গায়ে মিশে সেই কদর্য্য মানুষগুলোর মূর্ত্তি ধরে তার পানে চেয়ে আছে। সামনের দিকে ফিরে চাইবামাত্র সে দেখলো, বড় বড় গাছের সারি হাত-ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে তাকে যেন কাছে ডাকছে! লীনা বুঝলো, সামনের ঐ গাছের সারির পিছনেই জয়ন্তীয়ার ভীষণ জঙ্গল, এই জঙ্গলটা মেয়ে-রাজ্যের এলাকার ভিতর ব'লে লালুংরা এর ত্রিসীমাতেও ঘেঁসতে চায় না। পাহাড়ে জাতের লোকেরা নিছক বন-জঙ্গলের চেয়ে পাহাড়কেই বেশি পছন্দ করে, পাহাড়ের গায়ে যে সব বন-জঙ্গল থাকে, এরা সেই দিকেই ঘোরাঘুরি করে। এই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে জয়ন্তী দেবীর মন্দিরে যাবার সোজা একটি রাস্তা আছে, সাধু-দাদুর কাছেই এ সব কথা সে জেনে ছিল। এখন তার মনে সন্দেহ জাগলো, তাহ'লে সামনের জঙ্গল ছাড়া আরও একটা রাস্তা নিশ্চয়ই আছে—লালুংরা যেখান দিয়ে যাতায়াত করে। হঠাৎ জঙ্গলের ভিতরে না ঢুকে লীনা সেই রাস্তাটির সন্ধান করতে লাগলো।

খানিকটা খোঁজাখুঁজির পর জঙ্গল ছাড়া আর একটা পথ লীনার চোখের উপরে সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। পাহাড়ের গায়ের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটি ধরে এই জঙ্গলের মুখে সে আসতে পেরেছে, সেই রাস্তাটিই বাঁ দিকের পাহাড়, আর ডান দিকের জঙ্গলের মাঝ দিয়ে সুড়ঙ্গের মত এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। আনন্দে অমনি লীনার চোখ দুটো চকচক্ করে উঠলো। বুঝতে তার বিলম্ব হ'ল না যে, সুড়ঙ্গের মতন এই সরু পথটাই হচ্ছে লালুংদের এলাকা, তারা এই রাস্তাটাই ব্যবহার করে। পাশের জঙ্গলটা জয়ন্তী রাজ্যের সামিল বলে ওরা ওদিকে ঘেঁসে না।

লীনার মনে এখন প্রশ্ন উঠলো, সে কি করবে, কোন্ রাস্তায় বিজলীকে চালাবে? সুড়ঙ্গের মত রাস্তাটা সঙ্কীর্ণ হ'লেও সে-পথে স্বচ্ছন্দে ঘোড়ায় চ'ড়ে যাওয়া চলে, আর এই রাস্তাটা ধরে গেলে হয় ত সে জয়ন্তী দেবীর পীঠেও খুব সহজেই পৌঁছতে পারবে। কিন্তু একটা আশঙ্কার কথাও আছে। রাস্তাটা যখন লালুংদের এলাকায়, তখন বিপদ ঘটাও ত আশ্চর্য্য নয়! সেই পাঁচটা লোকের নজরে যখন সে পড়েছে, তারা যে তার পিছু পিছু আসছে না—তাই বা কে বলতে পারে? সরু পথে ঢুকলে আত্মরক্ষা করাও তার পক্ষে কঠিন হ'তে পারে। এই জন্তই এতক্ষণ সে কোন প্রশস্ত জায়গা কিম্বা জঙ্গল খুঁজছিল! কিন্তু সামনেই যখন সেই জঙ্গল পাওয়া গেল, নির্ব্বিচারে তার ভিতরেই প্রবেশ করা ভালো। লালুংদের রাজার সড়ক আর জয়ন্তীর রাণীর জঙ্গল যখন পাশাপাশি চলেছে, জঙ্গলের পথেই দেবীর পীঠে যাবার রাস্তা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। আর দেবীদর্শনের সাধ যখন তার মনে জেগেছে, দেবীই সে সাধ অবশ্যই পূর্ণ করবেন। মনের মধ্যে এই সঙ্কল্প দৃঢ় করেই লীনা বিজলীকে চালিয়ে দিলে সামনের দুর্গম জঙ্গলের দিকে।

এমন বিপদে পড়েও লীনার মন থেকে দেবী-দর্শনের সাধটুকু মুছে যায়নি। ঝরণার কাছে পাঁচ-পাঁচটা লালুংকে দেখেই তার মনে সন্দেহ জাগে—একটা অজ্ঞাত বিপদ আসছে। এ পর্য্যন্ত পথে জন্ত-জানোয়ারদের সঙ্গেই তার ছোটখাটো দু'-চারটে সংঘর্ষ বেধেছে, কিন্তু এবার মানুষ-জানোয়ারদের সঙ্গে তাকে বুঝাপড়া করতে হবে। এই জাতের রাজা রাজ্যের মেয়েদের জোর করে ধরে আনে—সাধুদাদুর মুখে এ কথা শুনে অবধি লীনার বুকের ভেতরে সেই যে রোষের আগুন জ্বলেছিল, এ পর্য্যন্ত তা নেবেনি। এই অত্যাচারী জাতটার পরিচয় ঝরণার কাছে পাঁচটা লোকের ব্যবহারেই স্পষ্ট ভাবেই সে পেয়েছে। তাকে অতর্কিত ভাবে ধরবার জন্তে পাষণ্ডগুলোর কি সতর্ক প্রয়াস! বিজলী যদি না জানিয়ে দিত, তাহ'লে হাতখানি তোলবার অবসরও হয় ত সে পেত না! উপস্থিত বুদ্ধির জোরে কোন রকমে সে রক্ষা পেয়েছে, কিন্তু পাষণ্ডগুলোকে রীতিমত শাস্তি না দেওয়া পর্য্যন্ত সে ত নিশ্চিন্ত হতে পারছে না! এর জন্তে তাকে দেবীর কাছে ধর্ণা দিতেই হবে। দেবীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবে—মেয়েদের প্রতি পাষণ্ডদের এই পীড়ন তিনি কি করে দেখে আসছেন? এর কি কোনই প্রতীকার নেই?

হঠাৎ তার মনে হ'ল—সে যেন একটা ভীষণ অন্ধকারময় গহ্বরের

মধ্যে ঘোড়াশুদ্ধ গিয়ে পড়েছে! কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারলো—সেটা গহ্বর নয়, ভীষণ জঙ্গল; তারা জঙ্গলের পথে চলেছে। এমন দুর্ভেদ্য ঘন জঙ্গলের মধ্যে এই বুঝি তাদের যাত্রা প্রথম সুরু হ'ল। বড় বড় গাছগুলো ডালে ডালে পাতায় পাতায় মিশে উপরে এমনি একটা ঘন আবরণ তৈয়েরী করেছে যে তার ভিতর দিয়ে এতটুকু আলো আসবার যো নেই! বাইরে অমন জ্যোৎস্না, দিক্-দিগন্ত তার আলোয় যেন হাসছে; কিন্তু এই জঙ্গলের ভিতরে তার একটু কণাও ঠিকরে পড়ছে না! এমনি অন্ধকারের ভিতর দিয়ে লীনাকে পিঠে করে অতি সন্তর্পণে বিজলী আস্তে আস্তে এগুতে লাগলো। তার পায়ের শব্দে ত্রস্ত হয়ে নানা রকমের আওয়াজ তুলে ছোট বড় কত রকমের জন্তু জানোয়ার যে তীরের বেগে পাশ কাটিয়ে গেল, তার আর সংখ্যা হয় না। কিন্তু এইটুকু আশ্চর্য্য যে, কেউ রুখে দাঁড়ালো না। বড় বড় সাপগুলো শুকনো পাতার ওপর দিয়ে সর্ সর্ শব্দে সরে গিয়ে পথ ছেড়ে দিল, কিন্তু কেউ ফণা তুলে ফোঁস্ করে উঠলো না। এমন দুর্গম পথে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে চললো এই দুঃসাহসী মেয়েটির দুর্ব্বার অভিযান!

অনেকক্ষণ পরে লীনার মনে হ'ল, সামনের দিকে খানিকটা জায়গা যেন ফাঁকা! গাছে গাছে ঘন ভাবে মিশে উপরে যে ডালপালার ছাউনি এ পর্য্যন্ত সমান ভাবে সাজানো ছিল, হঠাৎ মনে হ'ল, এই জায়গাটায় তার খানিকটা যেন ছিঁড়ে গেছে; কতকগুলো গাছের মোটা মোটা ডাল এমন ভাবে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে যে, দেখলেই অবাক্ হ'তে হয়। গাছের গুঁড়িগুলো দিব্যি খাড়া রয়েছে, কিন্তু তাদের শাখা-প্রশাখাগুলো পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মতই অসাড় হয়ে ঝুলে প'ড়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে; অথচ, কোথাও ভাঙ্গবার চিহ্নটিও নেই। গুচ্ছ গুচ্ছ পাতাগুলো এতটুকুও বিবর্ণ হয়নি, কোনটি মুষ্ড়েও পড়েনি, বরং সাপের জিহ্বার মত সেগুলো লক্-লক্ করছে, আর একটা আভা ঠিকরে আসছে পাতা-পল্লবগুলোর ডগা থেকে। দিব্যি ফাঁক পেয়ে এই সুযোগে মুক্ত আকাশের জ্যোৎস্না এই জায়গাটাকে ভরিয়ে দিয়েছে। বহুক্ষণ পরে নির্ম্মল আকাশ আর চাঁদের জ্যোৎস্না দেখে লীনার মনের ভিতরটাও যেন আলোকিত হয়ে উঠলো। বিজলীকে লক্ষ্য করে সে বললো—'এগিয়ে চল বিজলী, দিব্যি আলো পড়েছে ওখানে, আর কি সুন্দর পাতাগুলি লক্-লক্ করছে; পেট ভোরে খেয়ে নে তুই, আমিও ঐ ডালটির উপরে বসে কিছু মুখে দিই।' বলেই সে বিজলীর পিঠ থেকে টুক্ করে নেমে তার বল্গাটি ধরে সামনের দিকে এগিয়ে চললো।

সহসা বিজলী চীৎকার করে লাফিয়ে উঠলো। লীনা ভাবলো, কোন হিংস্র জন্তুর সন্ধান সে পেয়েছে, নতুবা এ ভাবে চঞ্চল হবে কেন? জিজ্ঞাসা করলে তার দিকে চেয়ে—'কি হয়েছে রে? লাফিয়ে উঠলি যে!' চাঁদের আলোয় বনের অনেকটা অংশই দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু লীনার চোখে কোনও হিংস্র জন্তুর ছায়াও পড়লো না। সামনের দিকে যাবার জন্যে পুনরায় সে বল্গা আকর্ষণ করলে। কিন্তু এবারও বিজলী অবাধ্য হ'ল, কিছুতেই সে সামনের দিকে একটি পা'ও বাড়াতে প্রস্তুত নয়—তার আচরণে এইটুকুই লীনা বুঝলো। সে তখন নিজেকে শক্ত ক'রে স্থিরদৃষ্টিতে বিজলীর চোখের দিকে তাকালো।

জীবজন্তুর অনুভবশক্তি যে অত্যন্ত প্রখর, লীনার তা খুব ভালই জানা ছিল। বিজলীর এই চাঞ্চল্য তার মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুললো। কারণটুকু জানবার জন্য সে বিজলীর ভয়ার্ত্ত চোখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো।

চোখের দৃষ্টি থেকে অনেক কিছুই আবিষ্কার করা যায়, লীনার মত মেয়ের পক্ষেও বিজলীর ভয়ের কারণটুকু আবিষ্কার করতে বিলম্ব হ'ল না। বিজলীর চোখ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে সে সামনের গাছগুলোর এলোমেলো ডালপালার উপর ফেলতেই ঝাঁ করে একটা কথা তার মনে পড়ে গেলো! কি আশ্চর্য্য, এই ভীষণ দুর্গম বনে এসেও এত-বড় কথাটা তার অন্তরে মোটেই দোলা দেয়নি! মনের ভুলের জন্যে নিজেকেই দায়ী করে গভীর বিস্ময়ে সে এই ফন্দীবাজ গাছগুলোর পানে তাকিয়ে রইলো!

তোমরা বোধ হয় ভাবছো, গাছ-গুলোর পানে লীনা অমন ক'রে তাকিয়ে রইলই বা কেন, আর জংলের গাছপালাই বা ফন্দিবাজ হয় কি ক'রে? এর মীমাংসা করতে হ'লে আগের কথা মনে করতে হবে। বনের কথা উঠতেই বলা হয়েছে, এই বনে এক রকম মাংসাশী গাছ আছে, তারা রাক্ষসের মতই ভীষণপ্রকৃতি। জীবজন্তুর রক্ত-মাংসই তাদের প্রধান খাদ্য। কিন্তু বনের জানোয়ারদের অনুভব-শক্তি এমনি প্রখর যে, এই রাক্ষুসে গাছের গন্ধ পেলেই তারা সভয়ে দূরে পালায়, প্রাণান্তেও কাছে ঘেঁসে না। আবার গাছ-গুলোরও এমনি অদ্ভুত ঘ্রাণশক্তি যে, এদের কাছে আসবার অনেক আগেই এরা গন্ধের সাহায্যে জানতে পারে—নতুন শিকার বনে এসেছে। অমনি এরা ফাঁদ পাততে সুরু করে। বড় বড় ডাল-পালা সব লতার মতন নুইয়ে মাটিতে এলিয়ে পড়ে, আর নিবিড় অরণ্যের এইখানে একটু ফাঁকা দেখে আগন্তুকরা সহজেই এগিয়ে আসে—একটু বিশ্রাম করবার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে অমনি গাছগুলোর চেহারা বদলে যায়, তলায় বা ডালে যারা বসে, ডাল-গুলো তখন সাঁড়াশীর মতন তাদের দেহগুলো ধরে নিংড়িয়ে রক্তমাংস নিঃশেষ করে শুষে নেয়—তলায় পড়ে থাকে শুধু হাড়গুলো। বিস্ময়ে চোখ দুটো কপালে তুলে লীনা তার বহু নিদর্শন দেখতে পেল। কত রকমের কঙ্কাল, কণ্ঠা, মাথার খুলি এই বিস্তীর্ণ স্থানটা জুড়ে ছড়িয়ে আছে। আশে-পাশে কোন জন্তু-জানোয়ার, এমন কি, কীট পতঙ্গেরও চিহ্নমাত্র নাই। শুধু সারি সারি একই আকারের দশ-বারোটি এই জাতের মাংসাশী গাছ একটা গোষ্ঠীর মতন জঙ্গলের এই অংশটাকে যেন আলাদা করে রেখেছে।

দেখতে দেখতে লীনার মনে হ'তে লাগলো, এই অঞ্চলে বিজলীর পিঠে চড়ে সে প্রবেশ করবামাত্রই, গায়ের গন্ধ পেয়ে এরা এই ভাবে ফাঁদ পেতে তৈয়েরী হয়ে শিকারের প্রতীক্ষা করছিল। কিন্তু বিজলী এদের সব আশাই বিফল করেছে। নতুবা এতক্ষণ তারাও সাঁড়াশীতে আটক হ'য়ে ইহলীলা সম্বরণ করতো, তাদের হাড়গুলো তার সাক্ষী থাকত।

স্তব্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে বিজলীর বল্গাটি ধরে লীনা এই রাক্ষুসে গাছগুলোর কথা ভাবছে, চারি দিক্ নিস্তব্ধ, ঝিঁঝির ঝঙ্কার পর্য্যন্ত শোনা যাচ্ছে না, বাতাসও যেন ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছে,—এমন সময় অসংখ্য শীষের মত একটা মিশ্র তীক্ষ্ণ সুর লীনার কান দুটোকে যেন বধির করে তুলল,—সেই সঙ্গে বিজলীও অস্থির হয়ে উঠলো। লীনা বুঝলো, যে পথ এইমাত্র সে পার হয়ে এসেছে, সেই পথ বেয়ে আসছে আর একটা নতুন বিপদ অথবা তাদের কোন শত্রু।

পিছনের দিকটা ভালো করে দেখবার জন্যে লীনা তাড়াতাড়ি বিজলীর পিঠে উঠে পড়লো, ইঙ্গিতে তার বাধ্য বাহনটিকে স্থির থাকতে বলে সে খাড়া হয়ে দাঁড়ালো তার পিঠে,—চাঁদের আলোর যে রেখাটুকু সামনের দিকে পড়েছে, তাকেই অবলম্বন করে প্রখর দৃষ্টি তার নিবদ্ধ করলো—পিছনের প্রাঙ্গণে! কিন্তু তার দৃষ্টিপথে যে দৃশ্যটি ফুটে উঠলো, সেটা আরও ভয়ঙ্কর! সে দেখলো—লাল রঙের এক পাল হিংস্র জানোয়ার তাদের ল্যাজগুলো সাপের ফণার মতন মাথার উপর তুলে হিস্-হিস্ স্বরে গর্জ্জন করতে করতে ছুটে আসছে তাদেরই দিকে!

এরাই যে ভীষণপ্রকৃতির শিকারী নামক হিংস্র জীব, এদের গায়ের রঙ ও সাপের ফণার মত উদ্যত পুচ্ছ দেখেই লীনা তা বুঝতে পেরেছিল। পলকের মধ্যেই সে বিজলীর পিঠ থেকে এক লাফে নীচে নেমে দাঁড়ালো, সুন্দর ঠোঁটটি দাঁতে চেপে, সুবঙ্কিম কালো ভুরু দু'টি কুঞ্চিত করে সে ভাবতে লাগলো—কি উপায়ে এখন নিস্তার পাওয়া যায়! সামনে নৃশংস গাছ, পিছনে হিংস্র জানোয়ার, দুই-ই সমান বিপজ্জনক! হঠাৎ একটা উপায় সে স্থির করে ফেললো—তার অদ্ভুত উপস্থিত-বুদ্ধির প্রভাবে। তার পরণের ছাড়া কাপড়গুলো পাট করা অবস্থায় ঘোড়ার পিঠেই ছিল। লাল রঙের একখানা ছাড়া-রেশমী কাপড় তাড়াতাড়ি টেনে-নিয়ে সে খুলে ফেলে বেশ লম্বা করে সুকৌশলে তফাৎ থেকে ফেলে দিলে—রাক্ষুসে গাছের যে ডালপালাগুলো ফাঁদের মতন এলিয়ে পড়েছিল শিকার ধরবার জন্যে—ঠিক তাদের ওপরে। এমনি কায়দা করে কাপড়খানি সে বিছিয়ে দিলে যে, শিকারীগুলো এলে প্রথমেই তাতে তাদের নজরে পড়বে। পরক্ষণেই সে বিজলীকে নিয়ে এমন সন্তর্পণে রাক্ষস-গাছগুলোর পাশ কাটিয়ে চললো যে, কোন রকমে ডালপালাগুলো তাদের নাগাল পেলে না।

রাক্ষুসে গাছের এলাকা পার হয়ে একটু তফাতে গিয়ে যেমন লীনা বিজলীর পিঠে উঠেছে, ঠিক সেই সময়ে উদ্দাম ঝড়ের মত বেগে হুলু রাজার সেই বারোটি শিকারী এসে উপস্থিত হ'ল মাংসাশী গাছগুলোর ঠিক সামনে! পালের যে গোদা, তার মুখে লীনার পরিত্যক্ত সেই রঙিন গামছাখানা। সে এখানে এসেই সবার আগে হঠাৎ স্থির হয়ে দাঁড়ালো। তার এগারোটি সাথীও অমনি তাকে ঘিরে তার মুখের গামছাখানি একে একে শুঁকতে লাগলো। বোধ হয়, গামছার গন্ধের সঙ্গে—যার গায়ের গন্ধ মিশে ছিল, এখানে আসতেই সেই গন্ধটি সুস্পষ্ট হয়ে এদের উত্তেজনা বাড়িয়ে দিল। এমন সময় গাছের এলায়িত ডালগুলির উপর বিছানো লাল রঙের রেশমী কাপড়খানার দিকে এদের দৃষ্টি প'ড়লো। চাঁদের আলো প'ড়ে তার লাল রঙের আভা যেন জ্বল্-জ্বল্ করছে, এলো-মেলো বাতাসে তার গন্ধ যাচ্ছে এদের নাকের দিকে ছড়িয়ে। বারোটি শিকারী এবার যেন মাতাল হয়ে একসঙ্গে গর্জ্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়লো—মাটিতে এলিয়ে-পড়া—মোটা মোটা শাখা-প্রশাখাগুলোর ওপরে বিছানো লাল রঙের সেই কাপড়খানা লক্ষ্য করে!

ওদিকে একসঙ্গে এতগুলো শিকারকে ফাঁদে পড়তে দেখে শিকারী গাছের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো রক্তপানের আগ্রহে যেন নেচে উঠলো। লীনার কাপড়খানার উপর হুলু রাজার দুঃসাহসী শিকারীদের দাঁতগুলি পড়বার আগেই মোটা মোটা ডাল-পালাগুলি ভীষণ একটা শব্দ ক'রে নড়ে উঠেই তাদের দেহগুলো সাঁড়াশীর মত চেপে ধরে এমনি জোরে পিশে ফেললো যে, কারুর মুখ দিয়ে টুঁ-শব্দটিও বেরুবার ফুরসদ হ'ল না!

—গল্পদাদু।

—

ডাক-টিকিটের জন্ম

পাঁচ-পয়সা দামের একখানি ডাক-টিকিট,—চিঠি যে লিখিতে চায়, তারই চাই পাঁচ-পয়সা দামের ডাক-টিকিট! পাঁচ-পয়সা দামের খাম কিনিয়া সেই খামে ভরিয়াও ডাকে চিঠি পাঠানো চলে। কিন্তু আমরা আজ বিশেষ করিয়া এই ডাক-টিকিটের কথা বলিতেছি।

খামে পাঁচ-পয়সার ডাক-টিকিট আঁটিয়া সেই খামে আমরা চিঠি পাঠাইয়া যে কোনো জায়গায় আত্মীয়-বন্ধুর সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করিতে পারি। কলিকাতা হইতে পাঁচ-পয়সার টিকিট-আঁটা খামে-ভরা চিঠি চলিল ও-দিকে সেই কাশ্মীর, আর সে-দিকে সেই ত্রিচনোপলি। সুতরাং পাঁচ-পয়সার এ টিকিটের দাম সামান্য নয়!

তার উপর তোমাদের মধ্যে যারা ডাক-টিকিট জমাও, তারা জানো, ডাক-টিকিটের বিচিত্র সংগ্রহের দাম হাজার দশ-হাজার টাকা হইতে পারে।

অথচ এই একখানি ডাক-টিকিট তৈরী করিতে কতখানি আয়োজন, সে কথা জানো কি? পৃথিবীর সব দেশেই ডাক-টিকিট আজ ভাত-কাপড়ের মতো প্রয়োজনীয় সামগ্রী। সারা পৃথিবীতে আজ যত ডাক-টিকিট ছাপা হইতেছে, সেগুলি একটির উপর আর-একটি রাখিয়া যদি ডাক-টিকিটের পিরামিড গড়িয়া তুলি তো সে-পিরামিড গিয়া চাঁদের গায়ে ঠেকিবে!

আমেরিকায় এই টিকিট ছাপিবার জন্য কাগজ আসে কেরোলাইনা হইতে; কালি আসে মিশৌরী নদীর বুকের খনিজ উপাদান হইতে; ডাক-টিকিটের পিঠে যে আঠা আছে, সে আঠা যবদ্বীপের ক্ষেতের কাশাডা গাছের আঠা। যা-তা আঠায় ডাক-টিকিটের কাজ চলে না—এ আঠার একটু বৈশিষ্ট্য আছে।

যে ছাপাখানায় এ সব ডাক-টিকিট ছাপা হয়, সে ছাপাখানায় ছাপার কাজে এক-নিমেষ বিরাম থাকে না।

কলে কাগজ ভিজানো হয়—সঙ্গে সঙ্গে ভিজা কাগজে ছাপার কাজ এবং তখনি তখনি ছাপা কালি শুকানো, আঠা লাগানো, এবং সে আঠা শুকাইয়া একেবারে পাঁচ-হাজার দশ-হাজার টিকিট 'রোল' করিয়া প্যাক করা—চক্ষের পলক পড়িতে যে সময় লাগে, সেইটুকু সময়ের মধ্যে ডাক-টিকিটের সৃষ্টিকার্য্য আগাগোড়া সুসম্পন্ন হইয়া ওঠে! এখন রাজার মুখ আর টিকিটের দাম ধরিয়া নানা হরফ মারিয়া টিকিটের রঙ করিয়া রাখা হইল—তার পর দু'ঘণ্টা পরে আঠা লাগানো—তা হইবার জো নাই! রোল পাকানো হইবামাত্র সেই সুদীর্ঘ রোল তখনি কাটিয়া ছোট ছোট রোলে ভাগ করিয়া ডাক-টিকিটের পকেট-কেতাবে সেগুলি আঁটা হইয়া যায়।

এক-একখানি কেতাবে ৪০০ করিয়া টিকিট থাকে। প্রত্যেক বইয়ে স্বতন্ত্র নম্বর ছাপা—এবং প্রত্যহ রাত্রে এই সব টিকিটের বই দেখিয়া টিকিট গণিয়া তবে তাহা ডাক-বিভাগের ভাণ্ডারে তোলা হয়। কোনো বইয়ে যদি একখানি টিকিট কম থাকে বা বেশী থাকে, তাহা হইলে যে বিভাগের হাতে বই বাঁধিবার ভার, সে-বিভাগকে এ ত্রুটির জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হয়।

সবচেয়ে আশ্চর্য্য কথা এই যে, এত কালেও কোনো টিকিটের বইয়ে টিকিটের সংখ্যায় ভুল হয় নাই! টিকিটের গায়ে ঐ যে পার্ফোরেশন (সারবদ্ধ ছিদ্র), তাও যন্ত্র-সাহায্যে সম্পাদিত হয়। এ-কাজ কলে হয়। ছবিতে কলের ক্রিয়াকৌশল বুঝিবে।

যে কালিতে এবং যে রঙে টিকিট ছাপানো এবং রঙানো হয়, সে কালি এবং রঙের কথা আরো খুলিয়া বলি। মিশৌরী নদীর বুকে সালফেট্ অফ বেরিয়ামের পলি পড়ে; সেই পলি ছাঁকিয়া রাসায়নিক কৌশলে ডাক-টিকিট ছাপার কালি তৈয়ারী হয়। এ কালি ছাড়া অন্য কালিতে ডাক-টিকিট ছাপা চলে না। রঙ হয় আনিলিন দিয়া। আমেরিকায় সাতাশ মণ কালিতে এক বছরের মতো টিকিট-ছাপার কাজ চলে।

ডাক-টিকিটের কাগজেও একটু বৈচিত্র্য আছে। উত্তর কেরোলাইনায় এক-রকম পাইন গাছ আছে, সে গাছের ছাল হইতে ডাক-টিকিট ছাপিবার কাগজ তৈয়ারী হয়। এ কাগজে জল লাগিলেও সহজে তাহা ছেঁড়ে না, বিকৃত হয় না।
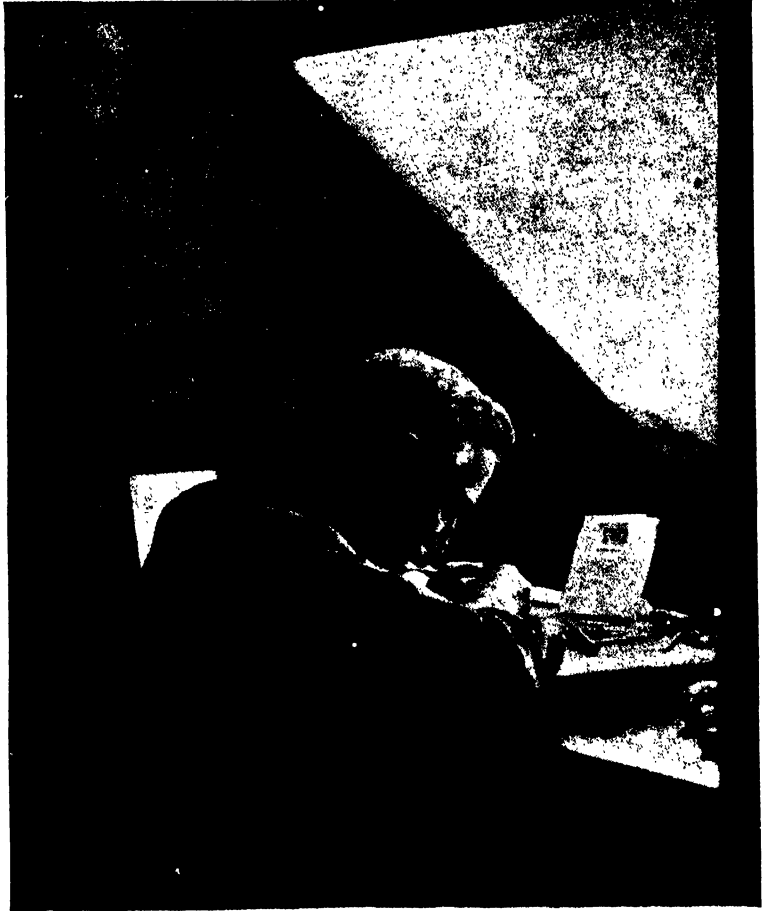
টিকিটের নক্সা আঁকা

ডাক-টিকিটের আকার তো ঐ অতটুকু! অতটুকু টিকিটের গায়ে এত রকমের নক্সা, ছবি ও কথা ছাপানো রীতিমত জটিল ব্যাপার। কি করিয়া ছাপা হয়, ছবি দেখিলে বুঝিতে পারিবে।

ডাক-টিকিটের ছবি বা নক্সা আঁকিয়া প্রথমে কার্ডবোর্ডে আঁটা হয়। এ ছবিখানি আকারে তিন-চার ইঞ্চি। তার পর এই আঁকা ছবির ফটো লওয়া হয়। ডাক-টিকিট যে আকারের হইবে, ফটো হয় ঠিক সেই আকারের।

টিকিটের কোলে পার্ফোরেশন্ করা

এইখানে ডাক-টিকিট মজুত রাখা হয়

তার পর এই ছোট ফটোখানি আর-একটা বড় কার্ডবোর্ডে আঁটিয়া ষ্টীল-এনগ্রেভারের হাতে দেওয়া হয়। অতি-সন্তর্পণে ম্যাগনিফাইং গ্লাসের সাহায্যে ষ্টীল-এনগ্রেভার ধারালো যন্ত্র দিয়া নরম ইস্পাতের উপর এই ফটোখানি ছকিয়া (trace) তোলেন।

আগের পৃষ্ঠায় ১নং ছবি ছাখো। একখানি বড় কার্ডবোর্ডের মাথায় দেখিতেছ একটা ডিজাইন আঁটা আছে। পাশে ইস্পাতের গায়ে ওটি ডাক-টিকিটের আঁকা ডিজাইন। ঐ ডিজাইনটির গায়ে খুব সতর্ক এবং কুশল হাতে ম্যাগনিফাইং গ্লাসের সাহায্যে যন্ত্র লইয়া এনগ্রেভার রেখা কাটিয়া অক্ষর ও ছবি ছাঁদিয়া ব্লক তৈয়ারী করিতেছেন। দু'-তিন জন শিল্পী মিলিয়াও অনেক সময় একখানি ব্লক বা ডাক-টিকিটের ছাঁচ গড়িয়া তোলেন। ছবি ও অক্ষর ছাঁদা হইলে এই ইস্পাতের প্লেটখানিকে গরম করিয়া, তার পর আবার ঠাণ্ডা করিয়া এটিকে রীতিমত কঠিন করা হয়। তার পর আগুনের আঁচে ইস্পাতের গায়ে চাপ দিলে তোলা হরফ ও ছবি কায়েমী ভাবে ফুটিয়া বাহির হয়। তখন এই ছাঁচ হইতে টিকিট-ছাপার কাজ চলে।

পূর্ব্বে অনেক সময় শিল্পীর ভুলে ছাঁচে গলদ ঘটিয়া উল্টানো হরফ বাহির হইয়াছে। সে-ভুল যেমন চোখে পড়া, তখনি অবশ্য সে-ছাঁচ বাতিল করিয়া নূতন ছাঁচ

তৈয়ারী হইয়াছে। হইলেও আগেকার ভুল-ছাপা যে সব ডাক-টিকিট বাজারে বাহির হইয়া গিয়াছে, সেগুলিকে ফেরত পাইবার উপায় থাকে না। এজন্য যাঁরা ডাক-টিকিট সংগ্রহ করেন, তাঁদের কাছে এই ভুল-ছাপা ডাক-টিকিটের দামের আর সীমা-পরিসীমা নাই! ভুল-ছাপা টিকিটের সংখ্যা যত অল্প হয়, দাম তত বেশী হয়। আমাদের এ দেশে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমোলে দু' পয়সায় অনেক টিকিট ছাপিতে কালির ভুলে গলদ ঘটিয়াছিল। নীল কালিতে না ছাপিয়া অনেক টিকিট ছাপা হইয়াছিল কালো কালিতে। কালো কালিতে ছাপা দু' পয়সার সে-টিকিটের এক-একখানির দাম—অবশ্য ডাক-টিকিট-সংগ্রহকারীদের কাছে—পাঁচ-সাতশো টাকা। সে টিকিট আমরা ছেলেবেলায় দেখিয়াছি।

ডাক-টিকিট জমানোর সখ—পৃথিবীর সব দেশেই অনেকের আছে। এজন্য দেশে দেশে সমিতি খোলা হইয়াছে—সে সব সমিতির নাম ফাইলাটেলিক সোসাইটি।

মার্কিন যুক্তরাজ্যে প্রথম বছরে নানা দামের ৩৫০ রকমের ডাক-টিকিট তৈয়ারী হইয়াছিল। এই ৩৫০ খানি টিকিট পাইয়া যদি কেহ আজ বেচিতে চায়, তাহা হইলে সেখানকার ফাইলাটেলিক সোসাইটি তখনি তাকে দাম দিবে দু' লক্ষ টাকা!

যাঁরা ডাক-টিকিট জমান, তাঁদের কাছে শুধু বিদেশী টিকিটেরই যে আদর, তা নয়। সব টিকিটের দাম আছে। বিলিতী দু'পেনি ছ'পেনির টিকিট আর আমাদের দেশের পাঁচ-পয়সার টিকিটের দামে ইতর-বিশেষ নাই!

তবে পুরানো টিকিটের দাম আছে।

সে-কালের দু' পয়সা দামের টিকিটেরও বেশ দাম আছে—ডাক-টিকিট-সংগ্রাহকদের কাছে। কুইন ভিক্টোরিয়ার আমলে টিকিটের দাম আবার সপ্তম এডওয়ার্ডের আমলের টিকিটের চেয়ে বেশী। ছেলেবেলায় আমাদের ডাক টিকিট জমানোর খুব সখ ছিল। এ-কালে তোমাদের মধ্যে এ সখের পরিচয় তেমন পাই না তো! এ-সখে খরচ আছে—কিন্তু আমোদও খুব! আজ হইতেই তোমরা টিকিট জমাইতে সুরু করো। ডাক-ঘরের ছাপ-মারা টিকিট জমাইতে হয়—নানা দেশের টিকিট জমাও। দশ বৎসর পরে দেখিবে, সে সংগ্রহ হইবে রীতিমত দামী।

এই প্রেসে লক্ষ-লক্ষ টিকিট ছাপা হইতেছে

বিদেশী খেলা

বৃষ্টি-বাদলার দিনে বা আজ এই ব্ল্যাক-আউটের দিনে সন্ধ্যার পর ঘরে বসে খেলতে পারো, এমন কতকগুলি মজার বিদেশী খেলার কথা বলছি।

১। ভূগোল-খেলা

এটি বেশ মজার খেলা। এতে খেলার সঙ্গে ভূগোলের সম্বন্ধে অনেক কথা জানা হয়। পাঁচ-সাত-দশ জনে মিলে এ-খেলা খেলা চলে। খেলাটা কি রকম, জানো?

ধরো, দশ জনে মিলে বসেছো। তুমি বলবে,—আমি বিদেশে যাচ্ছি। আর সকলে বলবে—কোথায় চলেছো? তুমি বললে—গ্রীনল্যাণ্ডে যাচ্ছি! আর সকলে বললে—কিসে করে কোন্ পথ দিয়ে যাবে? তোমাকে

তইন রেল ষ্টীমার জাহাজ—যাতে করে' এখান থেকে গ্রীনল্যাণ্ডে যাওয়া যায়, সেই সব যান-বাহনের নাম বলতে হবে। তার পর খানিকক্ষণ পরে তুমি বললে—গ্রীনল্যাণ্ড ঘুরে এলুম। সকলে বললে—সেখানকার খপর বলো।

তোমাকে তখন গ্রীনল্যাণ্ডের কথা বলতে হবে। সেখানকার লোক-জন কেমন, পথ-ঘাট, বাড়ী-ঘর কেমন, কি খাবার মেলে—এমনি সব কথা। এ সব কথায় কিন্তু যা-তা বললে চলবে না। গ্রীনল্যাণ্ডের সঙ্গে এ-সব কথা সত্যি করে মেলা চাই!

এ-খেলায় ভূগোল-ইতিহাসের বৃত্তান্ত যে সঠিক বলতে পারবে, তারই জিত! ভুল হলে জরিমানার ব্যবস্থা থাকলে এ-খেলা আরো বেশী জমবে। যারা ছোট, এ-খেলায় তাদেরো দেশ-বিদেশ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ হবে। ভূগোল পড়ে যে জ্ঞানলাভ হয়, এ-খেলায় তার চেয়ে বেশী ও শীঘ্র অনেক-কিছু শিখতে পারবে।

২। বিশেষণে গল্প

দশ জন বারো জন মিলে এ-খেলা চলে। দলে যত বেশী ছেলে-মেয়ে হবে, এ-খেলা তত বেশী জমবে। এক জন হবে এ-খেলায় সর্দ্দার। বাকীরা হবে খেলুড়ি। খেলার গোড়ায় সর্দ্দার-খেলুড়ি আর-সকলকে দেবে এক-টুকরো করে কাগজ। কাগজ দিয়ে বলবে, একটা করে বিশেষণ-জ্ঞাপক (adjective) কথা শুধু লিখে দাও! কেউ কারো লেখা দেখবে না! সকলের লেখা হলে সেই কাগজগুলি নেবে সর্দ্দার। নিয়ে সর্দ্দার এই বিশেষণগুলি ধরে একটি গল্প বলবে।

একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ধরো, দশ জনে মিলে খেলছো! তুমি হলে সর্দ্দার, বাকীরা তোমার খেলুড়ি। ন' জনকে তুমি দিলে কাগজ—তারা এ-কাগজে ন'টা বিশেষণ লিখে লেখা-কাগজগুলি দিলে তোমার হাতে। ধরো, ন' জনে মিলে এই ক'টি কথা লিখে দেছে—মিষ্ট, টক, লাল, ঠাণ্ডা, সাদা, নরম, হাস্যকর, বীর, অহঙ্কারী! সবগুলোই বিশেষণ। তুমি সর্দ্দার—তোমাকে এই ন'টি বিশেষণ জুড়ে একটি গল্প বলতে হবে। অবশ্য সে-গল্পে আরো দুশো-পাঁচশো বিশেষণ যদি জোড়ো, তাতে বাধা নেই। ন'টি বিশেষণ নিয়ে তুমি বলতে পারো—মেরু প্রদেশ খুব ঠাণ্ডা; সেখানে বেড়াতে গেছলেন ও পাড়ার বীর বালক শ্যামলধন। তার মত অহঙ্কারী ছেলে দেখা যায় না। শ্যামলধন সেখানে গিয়ে দেখে, সাদা বরফের ওপর লাল রঙের কতকগুলো ফল পড়ে আছে। ফলগুলি বেশ নরম। পাকা ভেবে শ্যামল তাতে দিলে কামড়, কামড় দিয়ে দেখে, মোটেই মিষ্টি নয়—কাঁচা তেঁতুলের মত টক! বেচারার মুখে তখন যে-ভাব হলো, তা রীতিমত হাস্যকর!

এ খেলার নিয়ম, লেখা বিশেষণগুলি এক বারের বেশী দু' বার ব্যবহার করা চলবে না।

৩। পদ্য লেখা

আট জন, দশ জন, বারো জন মিলে এ-খেলা খেলতে পারো। আরো বেশী সঙ্গী পাও, আরো ভালো। এ-খেলায় কি করতে হবে, জানো?

এক জন পদ্যর একটি লাইন লিখে দ্বিতীয় সঙ্গীর হাতে সে-কাগজখানি দেবে। দ্বিতীয় সঙ্গী প্রথম সঙ্গীর লেখা লাইনটি মিলিয়ে এক-লাইন লিখবে। এ লাইন লিখতে হবে পদ্যে। যা তা লিখলে চলবে না—প্রথম লাইনের সঙ্গে মানে আর ভাবের সঙ্গতি রেখে লাইন লেখা চাই! এমনি করে পর-পর সবাই এক-এক লাইন লিখে যাবে। সকলের লেখা লাইন মিলিয়ে পদ্য হবে। সে-পদ্যর মানে থাকা চাই এবং ভাবে যেন অসামঞ্জস্য না ঘটে, সাবধান!

অর্থাৎ আমি লিখলুম প্রথম লাইন—

আমি ভালোবাসি ভাই রবিবারটাকে।

লিখে এই লাইন-লেখা কাগজ দিলুম তোমার হাতে। তুমি লিখলে—

মন বাঁধা থাকে না কো রুটিনের পাকে!

তার পর এ দু'লাইন গেল তৃতীয় সঙ্গীর হাতে। সে লিখলে—

অন্য দিন নাওয়া-খাওয়া যেন ছুটোছুটি।

চতুর্থ সঙ্গী লিখলে,—

দশটা না বাজতে বাজতে ইস্কুলে জুটি।

এমনি করে ক'জনে মিলে পদ্য তৈরী হবে। মজার খেলা নয়?
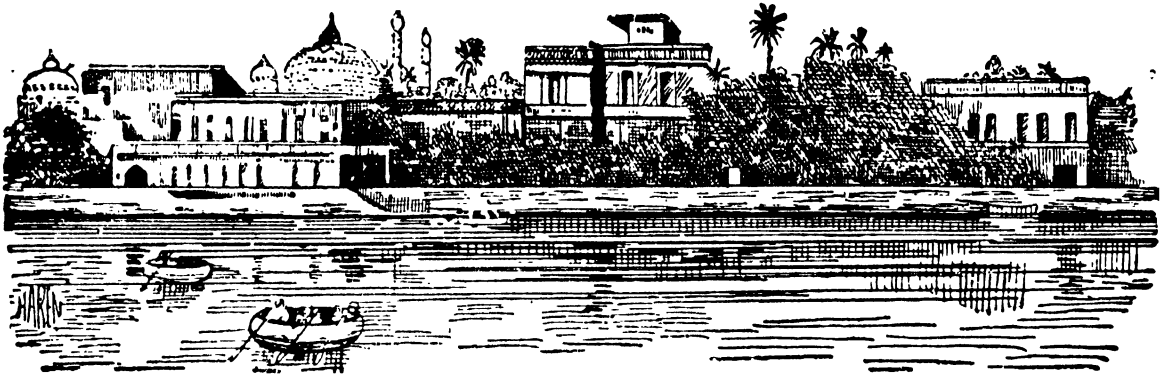
বিমান-পোতের ভবিষ্যৎ

বিমান-পোত বা এরোপ্লেন,—ক'বৎসরে মানুষের জীবনে যেন যুগান্তর বহিয়া আনিয়াছে! আকাশে পাখী ওড়ে,—সেই পাখীকে দেখিয়া মানুষ ঘুড়ি তৈয়ারী করিয়া সে ঘুড়ি আকাশে উড়াইল! তার পর ফানুশ-উড়ানোয় মানুষের সাফল্য! সেই ফানুশ হইতে মানুষ তৈয়ারী করিল বেলুন! বেলুনে চড়িয়া আকাশ-পথে বিচরণ করিতে গিয়া মানুষের কল্পনা আরো প্রসারিত হইল; তার বৈজ্ঞানিক মন নব তথ্য-আবিষ্কারের সাধনায় নিজেকে একান্ত ভাবে নিয়োজিত করিল; এবং এই সাধনার ফলে মানুষ তৈয়ারী করিল এরোপ্লেন বা বিমান-পোত!

এরোপ্লেনের আদিপুরুষ (১৯০৩)

এ বিমান-পোত তৈয়ারী করিয়াই মানুষ নিশ্চিন্ত রহিল না। মজা বা খেলার জন্য বিমান-পোতের সৃষ্টি নয়। এই বিমান-পোতকে সর্ব্ববিধ কাজে সহায়-স্বরূপ করিবার জন্য মানুষের সাধনার অন্ত রহিল না!

আজ এই বিমান-পোত বিশ হাজার মাইল ঊর্দ্ধে উড়িতেছে,—এ বিমান-পোত সসাগরা পৃথিবীর উপর দিয়া দেশে-বিদেশে যাত্রী বহিতেছে, ডাক ও মালপত্র বহিতেছে! এবং তার পরিচালনা-ব্যাপার এমন নিরাপদ নিখুঁত হইয়াছে যে, স্থলপথের রেলওয়ে-ট্রেনের মতো এই যাত্রীবাহী বিমান-পোতের যাতায়াতের সময় একেবারে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সুনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—ঝড়ে-জলে দুর্য্যোগে বিমান-পোতের আজ আর মার নাই!
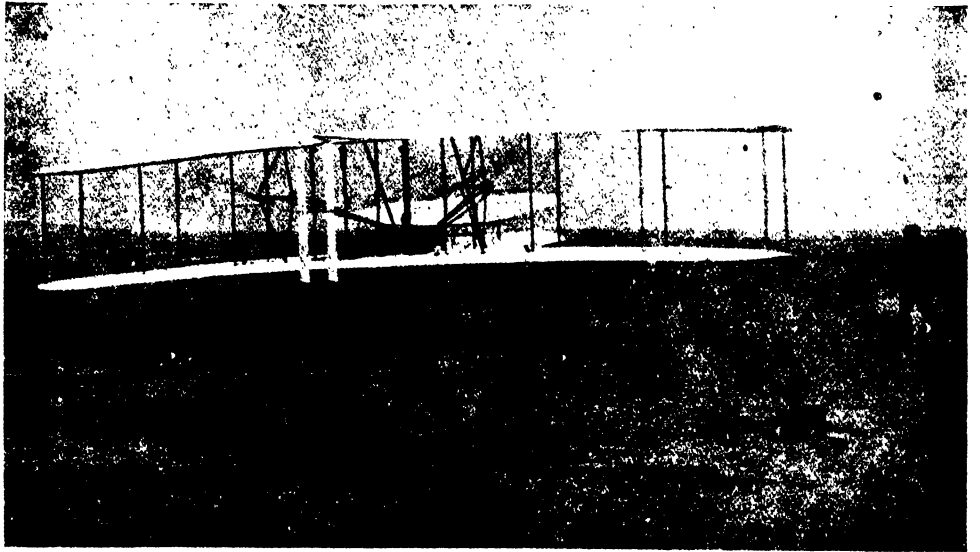
তাছাড়া প্লেনে বসিয়া সকল স্বাচ্ছন্দ্য, সকল আরাম মিলিতেছে। গরম 'খানা', 'লাঞ্চ'—তার উপর কেশ-বেশ-প্রসাধনের যে ব্যবস্থা হইয়াছে, রেলওয়ে ট্রেনের কামরাতেও তেমন স্বাচ্ছন্দ্য, তেমন আরাম নাই!

আমেরিকা এবং ইংলণ্ড—এই দু'টি প্রদেশে এরোপ্লেন আজ রেলওয়ে-ট্রেনের মতো মানুষের সকল কাজে সহায় হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড—এরোপ্লেনে

চড়িয়া নিত্য আজ ডাক আসিতেছে ;—প্লেনে চড়িয়া যাত্রীদল ছ'ঘণ্টায় ছ'মাসের পথ নিরাপদে অতিক্রম করিতেছেন !

আমেরিকার প্লেনে বসিয়া নিউ ইয়র্ক হইতে লশ্ এঞ্জেলেশে পৌঁছিতে সময় লাগে পনেরো ঘণ্টা। আমেরিকার পূর্ব্ব-প্রান্ত হইতে পশ্চিম-প্রান্তে যাইতে সময় লাগে সাড়ে তেরো ঘণ্টা মাত্র! উনিশ হাজার বিশ হাজার ফুট উর্দ্ধে আকাশ-পথে প্লেন চলিয়াছে—মহাসাগরের উপর দিয়া প্লেন চলিয়াছে—আরামের এমন ব্যবস্থা হইয়াছে যে, হিম-শীতল জমাট বায়ুর চাপে যাত্রীদের নিশ্বাস লইতে অশান্তি বা অস্বাচ্ছন্দ্য নাই! প্লেনের কামরায় এখন বিশেষ ভাবে অক্সিজেন-বাষ্প পুঞ্জিত ও সঞ্চারিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে; এ জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসে এতটুকু অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটে না। ইহার উপর আরো খোদ্‌কারি চলিয়াছে। প্লেনের কামরা এমন বৈজ্ঞানিক কৌশলে তৈয়ারী হইয়াছে যে, পৃথিবীর মাটী বা সাগর-বক্ষের উপরে ৪।৫ মাইল উর্দ্ধ দিয়া প্লেনে বিচরণ করিতে যেমন এতটুকু অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটিবে না, তেমনি নব পদ্ধতিতে নির্ম্মিত pressurised কামরায় বসিয়া বিশ হাজার মাইল উর্দ্ধ-পথেও কোনো অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটিবে না ; বা কামরায় বিশেষ ভাবে অক্সিজেন-বাষ্প সঞ্চালনেরও প্রয়োজন থাকিবে না !
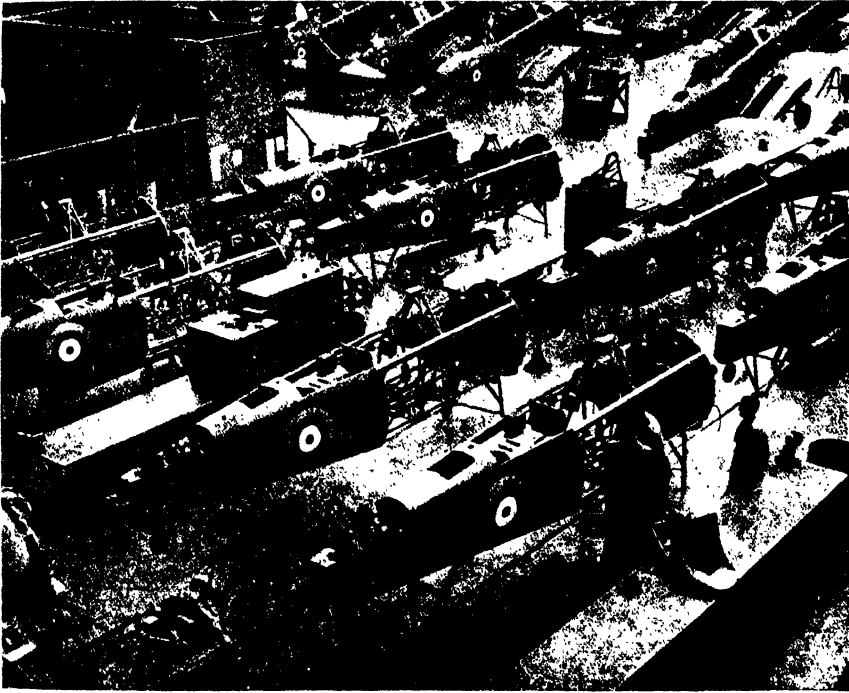
বিজ্ঞানের বলে বিমান-পথে বিচরণ আজ এমন নিরাপদ হইয়াছে যে, নির্দ্ধারিত টাইম ধরিয়া নিত্য প্লেন চলিয়াছে আজ দূর-দূরান্তবর্ত্তী পথে। পৃথিবী হইতে চন্দ্রলোকের পথ যত দূর, মার্কিণ প্লেন নিত্য আজ সেই পথের সিকি-পথ বিচরণ করিতেছে।

প্লেনের কাঠামো

তাছাড়া আমেরিকার প্লেনের দামও আজ মাঝারি দামের মোটর-গাড়ীর সমান! মোটর-গাড়ী কিনিবার সামর্থ্য যাঁর আছে, তিনি আজ অনায়াসে প্লেনও কিনিতে পারেন। প্লেন কিনিলে বিনামূল্যে প্লেন-চালনা শিখাইবার সুব্যবস্থা হইয়াছে সেই সঙ্গে। যিনি মোটর গাড়ী চালাইতে পারেন, আকাশ-পথে প্লেন চালানো-শিক্ষা তাঁর পক্ষে মোটে কঠিন নয়। তেরো বৎসর পূর্ব্বে প্লেনে চড়িয়া লিণ্ডবার্গ কোথাও না থামিয়া না নামিয়া এক-পাড়িতে আটলাণ্টিক মহাসাগর উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। প্লেনে তিনি একা ছিলেন; আজ মার্কিনে যে নূতন বমার-প্লেন তৈয়ারী হইতেছে, সে প্লেন ঘণ্টায় দুশো মাইল রেটে চলে এবং এ বমার প্লেনে দশ জন যাত্রী স্বচ্ছন্দ আরামে বসিয়া আকাশ-পথে যাত্রা সম্পাদন করিতে পারে। এ প্লেনের এক একখানি টায়ার আট ফুট উঁচু। এক একখানি টায়ারের ওজন ছোট প্লেনের ওজনের সমান।

সামরিক বিভাগে বিপক্ষ-প্লেনকে তাড়া দিয়া আক্রমণের উদ্দেশ্যে যে সব pursuit (অনুসারী)

উইক্-এণ্ডে প্রমোদ-পিয়াসীর আকাশ-বিচরণ—নিউ ইয়র্ক
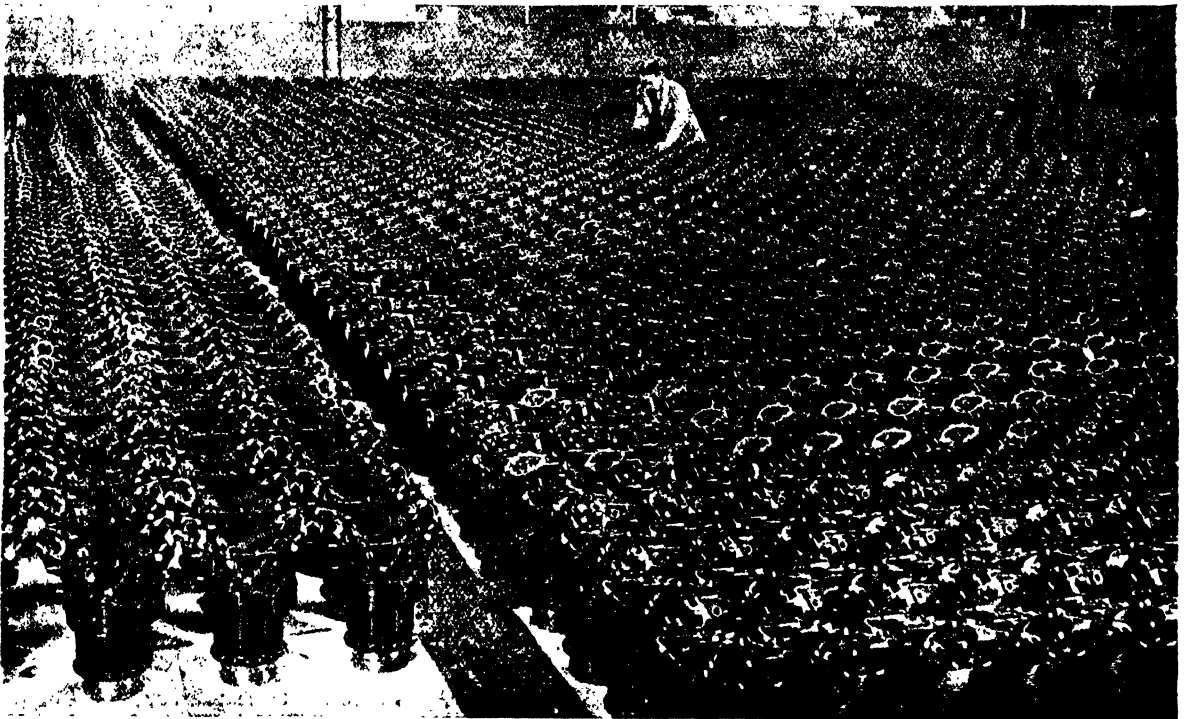
কারখানায় সিলিণ্ডারের ভাণ্ডার

প্লেনে ভোজ্য-ভাণ্ডার

প্লেনে প্রসাধন-কক্ষ

বিমান-পথের ষ্টেশন্

বিমানপোত নির্ম্মিত হইতেছে, সেগুলির গতিবেগ ঘণ্টায় ৫০০ মাইল। অর্থাৎ এক-মিনিটে আট মাইল পথ চলে। সেগুলিতে আছে একটি করিয়া কামান এবং চারটি করিয়া মেশিন-গান্। এ প্লেন তীব্র ধূম্র-জ্যোতি উদ্গীরণ করিয়া চকিতে বিপক্ষ-প্লেনকে বিচূর্ণ করিতে সমর্থ।

যাত্রী বহিবার জন্য আজ সাধারণ দোতলা যাত্রী-পোত নির্ম্মিত হইয়াছে। এ প্লেনে এক্-তলা হইতে দো-তলায় উঠিবার জন্য সিঁড়ি আছে। প্লেন উড়িয়া চলিয়াছে—সে সময় যাত্রীরা নিরাপদে প্লেনের মধ্যে একতলা-দোতলায় উঠা-নামা করিতেছেন! নব-বিবাহিত দম্পতী সেই সঙ্গে বর ও বরযাত্রী চলিয়াছে। এ সব প্লেনে পরিপাটী ছাঁদের কামরা আছে। বিমান-পোতে আরামের আর অন্ত নাই।

একশো দু'শো যাত্রী বহিবার উপযোগী প্লেন এখনো নির্ম্মিত হয় নাই সত্য, কিন্তু প্রয়োজন বুঝিলে দু'-চারি শত জন যাত্রী-বহনের যোগ্য বিমানপোত যে অচিরে আকাশ-পথে দেখা যাইতে পারে, সে সম্ভাবনা আজ আর কবি-কল্পনা নয়! এবং এখন যে-সব যাত্রীবাহী বড় প্লেন আকাশ-পথে যাতায়াত করিতেছে, সেগুলিতে জাহাজের মতো ডেক আছে, বারান্দা আছে। বাতাসের বেগে কোনো বিপত্তি না হয়, সে-দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এই বারান্দা ও ডেক রচিত হইয়াছে।

তার উপর বিমানপোতে যাত্রা আজ এতখানি নিরাপদ, নিঃশুল্ক ও স্বচ্ছন্দ হওয়ার ফলে পৃথিবী-পরিভ্রমণের ম্যাপেও যেমন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তেমনি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে আমাদের চিরদিনের জীবন-যাপনের পদ্ধতিতে। তাছাড়া বেতারের মারফৎ উড়ো প্লেনে বসিয়া যাত্রীরা যেখানে খুশী যে-কোনো সংবাদ পাঠাইতে পারেন।

বিমানপোতের কল্যাণে গাছের টাট্কা বোঁটা-কাটা ফল-ফুল, গোরুর বাঁট হইতে সদ্য-দোহা দুধ—হাওয়াই দ্বীপ হইতে আমেরিকার ওয়াশিংটন সহরে চকিতে আসিয়া পৌঁছিতেছে; ঔষধপত্র চলিয়াছে ওয়াশিংটন হইতে হাওয়াই দ্বীপে। তাছাড়া দেশ-দেশান্তরের তরু-শস্যের বীজ পূর্ব্বে টাট্কা তাজা অবস্থায় পাওয়া অসম্ভব ছিল; এখন বিমানপোতের কল্যাণে সর্ব্বপ্রকার ফুল-ফলের টাট্কা বীজ বা চারা আনিয়া যেখানে খুশী তাদের আবাদ ও ফলনের কাজ স্বচ্ছন্দ সফল হইতেছে।
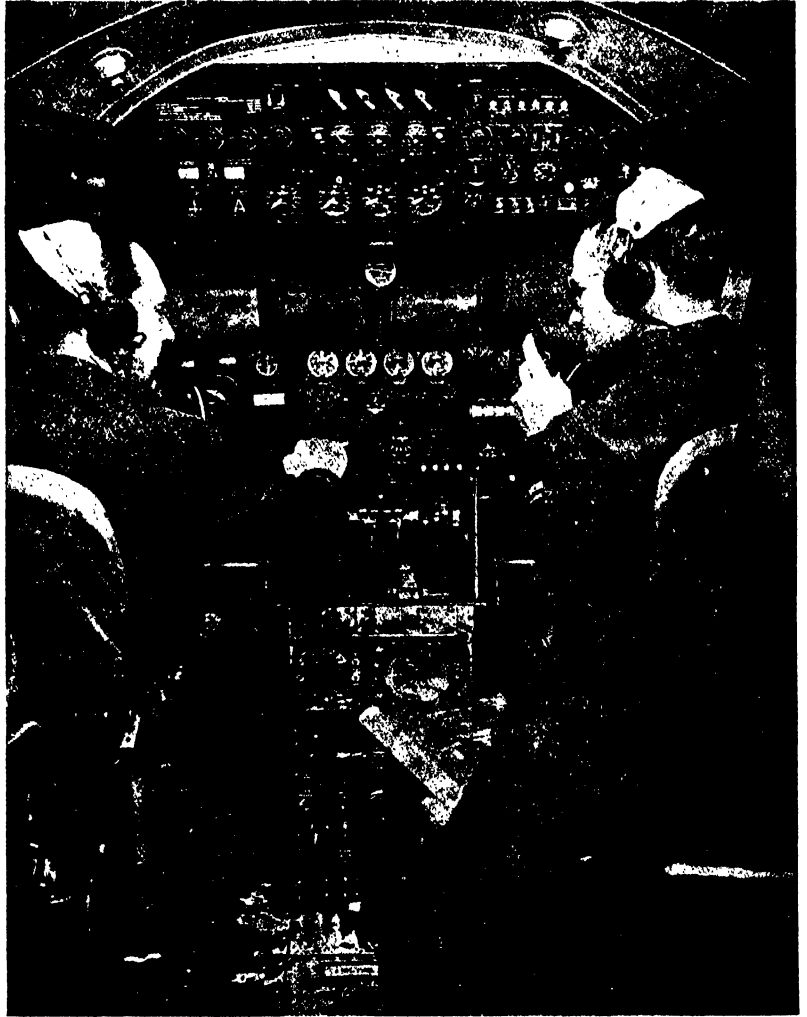
প্লেনে অসংখ্য যন্ত্র—এ সব যন্ত্র নিয়ন্ত্রিত করেন তিন জন এঞ্জিনীয়ার

এ-সব সুখ-সুবিধার স্বচ্ছন্দ সমাবেশ যেমন সহজ ও অনায়াসলভ্য হইয়াছে, তেমনি আবার দূর-দেশের রোগ-বীজাণুরাও এই প্লেনে চড়িয়া পৃথিবীর সর্ব্ব দেশকে আক্রমণের সুযোগ পাইতেছে। দক্ষিণ আমেরিকা হইতে মার্কিন-রাজ্যে ম্যালেরিয়ার মশা আসিয়া সেখানে ম্যালেরিয়ার পত্তন করিয়াছিল, এ জন্য সেখানকার স্বাস্থ্য-বিভাগ

বেতার-সঙ্কেত-লক্ষ্য

এখন প্লেন পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্লেনে উঠিবার পূর্ব্বে যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। কাহারো দেহে সংক্রামক ব্যাধির লক্ষণ ধরা পড়িলে তাঁকে প্লেন হইতে নামাইয়া জাহাজে তুলিয়া তাঁর যাত্রা সম্পাদিত হইতেছে।

দিনের আলো ছাড়া রাত্রে প্লেন চালানো পূর্ব্বে ছিল কঠিন। রাত্রে বিপত্তি-পাতের আশঙ্কা ছিল। এখন দিনে-রাতে সব সময়ে প্লেন চলিতেছে, রেল-পথে যেমন ট্রেণ চলে, তেমনি! যাত্রীরা নিশ্চিন্ত মনে প্লেনের নিরাপদ-কামরায় ঘুমাইয়া রাত্রি যাপন করেন—প্লেনে বসিয়া তাঁরা প্রাতরাশ খান, লাঞ্চ খান, ডিনার খান। প্লেনে রন্ধনশালা নাই; তবে রান্না-করা খাদ্যের ভাণ্ডার আছে। প্লেনে যে খাদ্য দেওয়া হয়, তাহাতে বেশ একটু বৈশিষ্ট্য আছে। যে সব খাদ্য আমাদের দেহের মধ্যে গ্যাসের সৃষ্টি করে, তেমন খাদ্য প্লেনে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। তার কারণ, আকাশ-পথে এমনিতেই উদরে বায়ু সঞ্চারিত হয়, সে জন্য প্লেনে এমন খাদ্য দেওয়া হয়, যাহা গ্রহণে উদরে বায়ু-সঞ্চারের বিন্দুমাত্র আশঙ্কা থাকে না।

বিমানপোতের সাহায্যে দূর-দেশ হইতে কৃতী চিকিৎসক এবং ঔষধ-পত্র আনাইয়া কত রোগীর প্রাণরক্ষা—য়ুরোপে প্রায় নিত্যকার ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে চিলির ভূমিকম্পে কয়েক জন আহতের জন্য অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হইলে আর্জেন্টাইন্ হইতে অস্ত্রশস্ত্র-সমেত কৃতী অস্ত্র-চিকিৎসককে চিলিতে লইয়া যাওয়া হয় এবং চিকিৎসকের অস্ত্রোপচারে বহু আহত সে-যাত্রা প্রাণ পাইয়া বাঁচিয়াছেন।

অপার সাগরের বুকে জাহাজ চলিয়াছে—সে-জাহাজে দারুণ জটিল রোগে কোন যাত্রীর প্রাণ-সংশয়, এমতাবস্থায় প্লেনে তুলিয়া রোগীকে তীরে কোনো ভালো হাসপাতালে রাখিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা—তাছাড়া দুর্গম প্রদেশে যন্ত্র-পাতি সরবরাহ করা—ঔষধি-বর্ষণে তৃণশস্যাদির রক্ষা ও পুষ্টি—এ সব কাজ সহজ হইয়াছে আজ শুধু এই

বিমান-পোতের স্বচ্ছন্দ-বিহার-শক্তির গুণে।

তাছাড়া দুর্গম বনে মৃগয়ার পশুদের খাদ্যদানে রক্ষা করা,—কিম্বা দুরধিগম্য হ্রদ-বক্ষে ট্রাউট্ মাছের লালন-কার্য্য—ফেরারী আসামীদের সন্ধান—রুক্ষ গিরি-বক্ষে তরু-রাজি-বপনাদির কাজেও প্লেন্ হইয়াছে মানুষের আজ মস্ত সহায়! তাছাড়া গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীত-বসন্ত—কোনো ঋতুর প্রকোপ আজ আকাশ-পথে প্লেনকে একটুও বাধা দিতে পারে না।-কুয়াশা ও মেঘস্তর ভেদ করিয়া প্লেন আজ আকাশ-পথে নিজের গতিকে সম্পূর্ণ নিঃশঙ্ক নিরুপদ্রব স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল করিতে পারিয়াছে। তাছাড়া প্রয়োজন বুঝিলে পাইলট যাহাতে যত্র-তত্র

ছেলেমেয়েদের লইয়া দাসী চলিয়াছে বায়ু-সেবনে

প্লেনে প্রাতরাশ
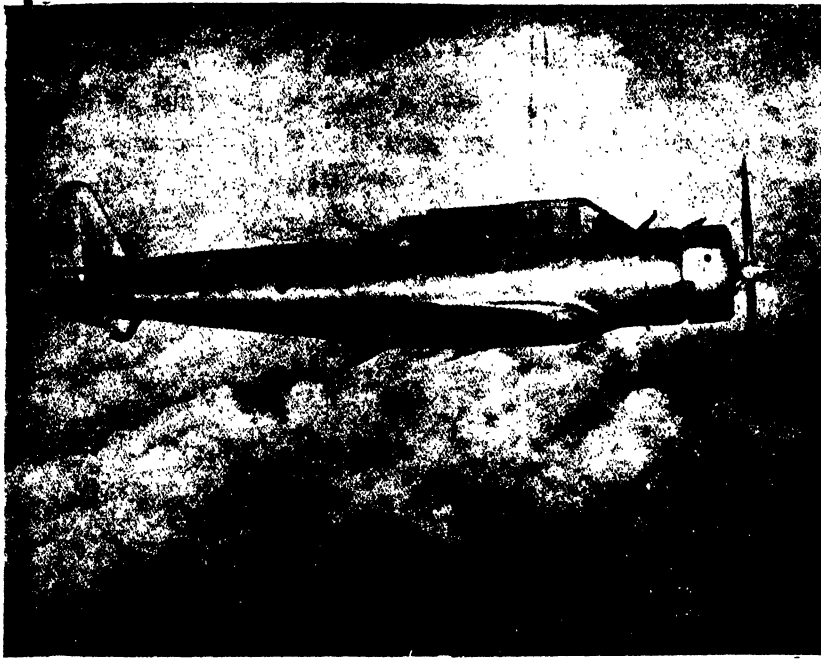
বমার-প্লেন

বমার-প্লেনের একখানা টায়ার

প্লেন নামাইতে পারেন, সে সম্বন্ধেও ব্যবস্থা হইতেছে। প্লেনের বুকে আঁটা যন্ত্র দেখিয়া পাইলট প্লেন নামাইতেছেন। এ সব কাজ আজ সহজ হইয়াছে বলিয়াই বিমান-পোত অনেকের জীবিকার্জ্জনের পক্ষে বিপুল পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

এ কাজে দক্ষতা লাভ করিতে হইলে দু'টি জিনিষ বর্জ্জন করা চাই—ধূম এবং সুরা। পেশাদার পাইলটের কাজে যে সব লোককে লওয়া হয়, তাঁদের ধূম্র ও সুরা বর্জ্জন করিতেই হইবে।

আমেরিকার তরুণ সমাজে বিমানপোত চালনা শিখিবার উৎসাহ আজ অপরিসীম। গত বৎসরে তরুণ ও তরুণী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল পঁচিশ হাজারের উপর। ইঁহাদের মধ্যে কোনো ছাত্র-ছাত্রী সামরিক বিভাগে যোগ দেন নাই। ইঁহাদের মধ্যে তিন হাজার ছাত্র-ছাত্রী হালকা প্লেন কিনিয়াছেন—সখের জন্য—প্রমোদ-বিহারের বাসনায়।

প্লেন-শিল্পীরা বলিতেছেন, এখন মাল-বাহী প্লেনের সংখ্যা ৩২২; কিন্তু দশ বৎসরের মধ্যে তাঁরা দশ হাজার মাল-বাহী প্লেন গড়িয়া দিবেন। এখন যাত্রী ও মাল লইয়া ষোলটি লাইনে

প্লেন চলিতেছে। প্লেনে ডাক যাইতেছে আমেরিকা হইতে অষ্ট্রেলিয়ায়; হাওয়াই-দ্বীপে এবং প্রাচ্য জগতে। দূরদেশের চিঠিপত্র এবং পার্শেল এখন বিমান-যোগে আমেরিকায় পাঠাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। যে সব ছোট-খাট জায়গায় ল্যাণ্ডিং-ষ্টেশন নাই, সেখানে উঁচু বাঁশের খুঁটীতে ডাকের থলি-ঝোলানোর যে আয়োজন, তাহা রীতিমত পাকা। তাছাড়া ট্রেণে যেমন থার্ড-ক্লাশ কামরা আছে—যাত্রীরা কম-ভাড়ায় ট্রেণে যাতায়াত করিতে পারে; ওদিকেও তেমনি ডেলি-প্যাশেঞ্জারদের জন্য কম-ভাড়ার প্লেন আছে। এ প্লেনে কামরার শীট্ গদি-দার নয় বা তাহাতে ভোজন বা শয়নের আয়োজন নাই—তাহা না থাকিলেও যাত্রীদের নিরাপদ বা স্বচ্ছন্দ বিচরণে অসুবিধা হয় না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, যাত্রী ও এরোপ্লেন রেলওয়ে ট্রেণের মতো ঘড়ির কাঁটা দেখিয়া যাতায়াত করিতেছে। এ সম্বন্ধে দীর্ঘতম পাড়ি—নিউ-ইয়র্ক হইতে হংকং হইয়া রেঙ্গুনের লাইন। আর একটি লাইন আছে লিশবন-নিউ-ইয়র্ক-শিকাগো-লশ্ এঞ্জেলেশ্-সান-ফ্রান্সিশ্কো-হংকং হইয়া রেঙ্গুন। সারা পথে মাইক-যন্ত্র-সাহায্যে এক জন কর্ম্মচারী কোথা দিয়া প্লেন চলিয়াছে, তাহা বলেন।

বহু উর্দ্ধে আকাশ-পথে তুষার-ধারায় যন্ত্রাদির বৈকল্য অনিবার্য্য; সে বৈকল্য-নিরাকরণের কৌশল-কীর্ত্তি

গতি, আরাম এবং নিরাপদ নিশ্চিন্ত যাত্রার দিক্ দিয়া বিমান-পোতের ভবিষ্যৎ আজ অপূর্ব্ব অপরূপ হইয়াছে। পাইলটেরা কাজে যেমন পটু, সাহসও তাঁদের তেমনি অসাধারণ। যাত্রীবাহী বড় বড় প্লেনে দু'জন করিয়া পাইলট থাকে। পাইলটরা আকাশ-বিজ্ঞানে রীতিমত কুশল; কলকব্জার জ্ঞানেও তাঁদের পটুতা অনির্ব্বচনীয়!

আমাদের মনে হয়, কামরায় যত স্বাচ্ছন্দ্যই থাকুক, চলন্ত প্লেনের ঐ ভীষণ শব্দ—ও-শব্দে কাণের পর্দ্দা ছিঁড়িবে না? এ প্রশ্নের উত্তর,—না! যাত্রীদের একরকম চর্ব্বণী (chewing gum) দেওয়া হয়। লজেঞ্জেশের মতো এই গাম মুখে দিয়া প্লেনে বসুন—প্লেন যত উর্দ্ধে উঠুক—কর্ণপটে এতটুকু উৎপাতের সম্ভাবনা থাকে না। এ গাম্ মুখে দিলে উর্দ্ধে আকাশ-পথের বায়ু-চাপে কোনো অসুবিধা ভোগ

করিতে হইবে না। যাঁরা এ প্লেনে যাতায়াত করেন, তাঁরা বলেন, রেলের কামরায় বসিয়া যেমন অনায়াসে গান-বাজনা করা যায়, কথা বলা চলে—প্লেনের কামরায় বসিয়াও তেমনি কথা বলা যায়; গান গাওয়া চলে। প্লেনের কামরার ভিতরে রক্-উলের আবরণ সংলগ্ন আছে—সেজন্য নার্শের পরিচর্য্যায় এ অস্বাচ্ছন্দ্যের অবসান ঘটে। পৃথিবীর মাটীর উপর সাত-হাজার ফুট ঊর্দ্ধে উঠিলেই মেঘ-লোক—সেই মেঘলোক ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে—আরো বহু ঊর্দ্ধে শূন্যপথ ধরিয়া প্লেন চলে। ঘনঘোর মেঘের মধ্য দিয়া যাইবার সময় অন্য প্লেনের সঙ্গে ধাক্কা লাগিবার আশঙ্কা নাই—মেঘের মধ্যে অন্য প্লেন থাকিলে যন্ত্র-সাহায্যে তাহা জানিতে পারা যায়।

বমার-প্লেনের লক্ষ্যভেদ-শিক্ষা

প্লেন চলিবার সময় পাইলটের কাণে 'হেডফোন্' আঁটা থাকে। এঞ্জিনে ছোট টাইমপীশ্-ঘড়ির মতো অসংখ্য নির্দ্দেশ-যন্ত্র সংলগ্ন আছে। এ যন্ত্রের প্রত্যেকটি বিভিন্ন রকম সঙ্কেতিকার কাজ করে। কাণে হেডফোন্ লাগাইয়া দু' চোখের দৃষ্টি এই সব নির্দ্দেশ-যন্ত্রগুলির উপর নিবদ্ধ রাখিয়া পাইলট তাঁর প্লেন পরিচালনা করেন। পাইলট কোনো ভুল করিলে নির্দ্দেশ-যন্ত্রে তখনি সে ভুল ধরা পড়ে এবং ধরা পড়িবা-মাত্র সে ভুল চকিতে সংশোধন করা আদৌ কঠিন হয় না! হেড-ফোনের সঙ্গে যে বেতার-বার্ত্তার তার সংলগ্ন আছে, সেই তারের সাহায্যে পৃথিবীর বুকে কোথায় গরম, কোথায় ঠাণ্ডা, কোথায় ঝড়, কোথায় বৃষ্টি, সে-সংবাদ প্রতিনিয়ত মেলে।

চলন্ত প্লেনের ভিতরে বসিয়া মেশিনের শব্দ এতটুকু শুনা যায় না।

প্রতি প্লেনে অসংখ্য পরিচারক ও পরিচারিকা আছে যাত্রীদের পরিচর্য্যার জন্য। তাদের তৎপরতার সীমা নাই। তাছাড়া নার্শ আছে। জাহাজে যাত্রীদের যেমন সমুদ্র পীড়া হয়, বিমান-পথের যাত্রীদের তেমনি কাহারো কাহারো বায়ুপীড়া (air-sickness) দেখা দেয়—

এ যন্ত্রগুলি এমন নিখুঁত যে, পাইলট ভুল করিলেও যন্ত্র কখনো ভুল করে না! এবং এই নিখুঁত যন্ত্রের জন্য সুদীর্ঘ পথ ব্যাপিয়া প্লেন চালাইতে পাইলট আদৌ ক্লান্তি অনুভব করেন না। পাইলটের বসিবার জায়গাকে বলে কক্-পিট্ (cockpit)। এই কক্-পিটে যন্ত্রের হিজিবিজি দেখিলে আমরা শিহরিয়া উঠিব! অথচ এই যন্ত্রগুলিই যেন প্লেনের নাড়ী এবং এই নাড়ীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞান

প্লেন-পরিচারিকার দল

এ প্লেন চলে মেঘ-লোকের উপর দিয়া

আবিষ্কৃত করিয়া প্লেনের এই নাড়ী-নক্ষত্র দেখিয়াই পাইলট প্লেনের পাড়িকে আজ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও শঙ্কাহীন করিয়া তুলিয়াছেন।

বড় বড় যাত্রী-প্লেনে সঙ্কেত-বাতি আছে। এ বাতি জ্বালিয়া যাত্রীদের কখন্ কি করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে প্রতিনিয়ত সতর্ক সচেতন রাখা হয়।

প্লেনে ব্যবহার করিবার জন্য আমাদের নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও ঊর্দ্ধলোকোপযোগী করিয়া বিশেষ কৌশলে নির্ম্মিত হইতেছে। আমাদের এই নিত্যদিনের ফাউণ্টেন-পেন—প্লেনে বসিয়া দীর্ঘ-পাড়ি দিতে গেলে এ পেনে লেখা যাইবে না। তার কারণ, ঊর্দ্ধে শূন্যপথে এ ফাউণ্টেন-পেন 'লীক্' করিবে। এ জন্য প্লেনে ব্যবহারোপ-যোগী স্বতন্ত্র ধরণের ফাউণ্টেন পেন তৈয়ারী হইয়াছে। যে সব খাদ্য বা পানীয় মাটীর পৃথিবীর বুকে বসিয়া গ্রহণ করি, যে তাম্রকূট সিগার, সিগারেট বা তামাক পাইপে ভরিয়া সেবন করি—সে খাদ্য, পানীয় বা তাম্রকূট প্লেনে বসিয়া সেবা করা চলিবে না। যে সব খাদ্যে কার্ব্বন আছে, সে খাদ্যাদি দশ-বারো হাজার ফুট ঊর্দ্ধে আকাশ-পথে বোমার মতো ফাটিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইবে। প্লেনের উপ-যোগী খাদ্যাদি প্লেনে গ্রহণ করা হয়। মাছ-মাংস মিলিবে; কেকও মিলিবে। তবে চপ-কাটলেট বা কেক—এগুলির আকার করিতে হইবে খুব ছোট—নচেৎ পাউডারের মতো চূর্ণ হইয়া যাইবে। সাধারণ সিগারেট সাত-আট হাজার ফুট ঊর্দ্ধে আকাশ-পথে সহজে জ্বলিতে চায় না। জ্বলিলেও যে-সিগারেট পৃথিবীর মাটীর বুকে আট ঘণ্টায় পুড়িয়া নিঃশেষ হয়, সে সিগারেট আকাশ-পথে পুড়িয়া নিঃশেষিত হইতে সময় লাগিবে চার-পাচ ঘণ্টা! বাড়ী হইতে চা কফি স্যুপ বা খাদ্য তৈয়ারী করিয়া যদি প্লেনে উঠিতে চান,—তাহা হইলে সে চা কফি বা খাদ্য থার্ম্মোশে ভরিয়া রাখিতে হইবে। বেশী গরম না হয়! নহিলে ৮০০০ ফুট ঊর্দ্ধে উঠিলে এ চা কফি প্রভৃতি এমন গরম হইবে, যে সে আর জুড়াইতে চাহিবে না! কাজেই তাহা গ্রহণ করা মানুষের পক্ষে সাধ্যাতীত ব্যাপার!

প্রাইভেট প্লেন্

প্লেনে যে প্লেট-ডিশ-গ্লাস ব্যবহার করা হয়, সেগুলি এলুমিনিয়ামের তৈরী। ছুরি ব্যবহার করা হয় তার ভিতর ফাঁপা। আবার কাঁচের প্লেট গ্লাস বা এই সাধারণ কাঁটা ভারী বলিয়া প্লেনে ব্যবহার করা চলিবে না।

প্লেনে রন্ধনশালা নাই। কারণ, আগুন জ্বালিয়া রান্না করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। প্লেনে সুরা-পানের ব্যবস্থাও অসম্ভব।

আকাশ-পথে বিদ্যুতের ভয় পূর্ব্বে প্রচুর ছিল। মেঘলোকে বিদ্যুৎ চমকিয়া যদি উড়ন্ত প্লেনকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে সে-আক্রমণ রোধ করিয়া প্লেনের

প্রাণরক্ষার উপায় বৈজ্ঞানিকেরা এখন এমন পাকা করিয়া তুলিয়াছেন যে, বিদ্যুত-বহ্নিকে প্লেন আজ অনায়াসে তুচ্ছ করিয়া চলে!

এ সব প্লেন তৈয়ারী করিতে এত সময় লাগে যে, শুনিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইবেন! একটি কোম্পানী তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে একখানি ছোট সামরিক প্লেন তৈয়ারী করিতে সক্ষম হইয়াছেন। বড় প্লেন তৈয়ারী করিতে অবশ্য বেশী সময় লাগে। এলুমিনিয়াম-পাতে প্লেন তৈয়ারী হয়; এলুমিনিয়ামের মতো হাল্‌কা উপাদান আর নাই। প্লেনের বিভিন্ন অংশ তৈয়ারী করিয়া বেশ জোর করিয়া আঁটিয়া সম্পূর্ণ গোটা প্লেন তৈয়ারী হইলে সে-সব প্লেনকে রীতিমত জোরে সিমেণ্টের মেঝেয় আছাড় দেওয়া হয়; এ-আছাড়ে প্লেন যদি না মচকায়, না ভাঙ্গে, তবেই মজবুত এবং সক্ষম বলিয়া সে-প্লেন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। মজবুতী সার্টিফিকেট পাইলে তখন কল-কজাদির সমাবেশ।
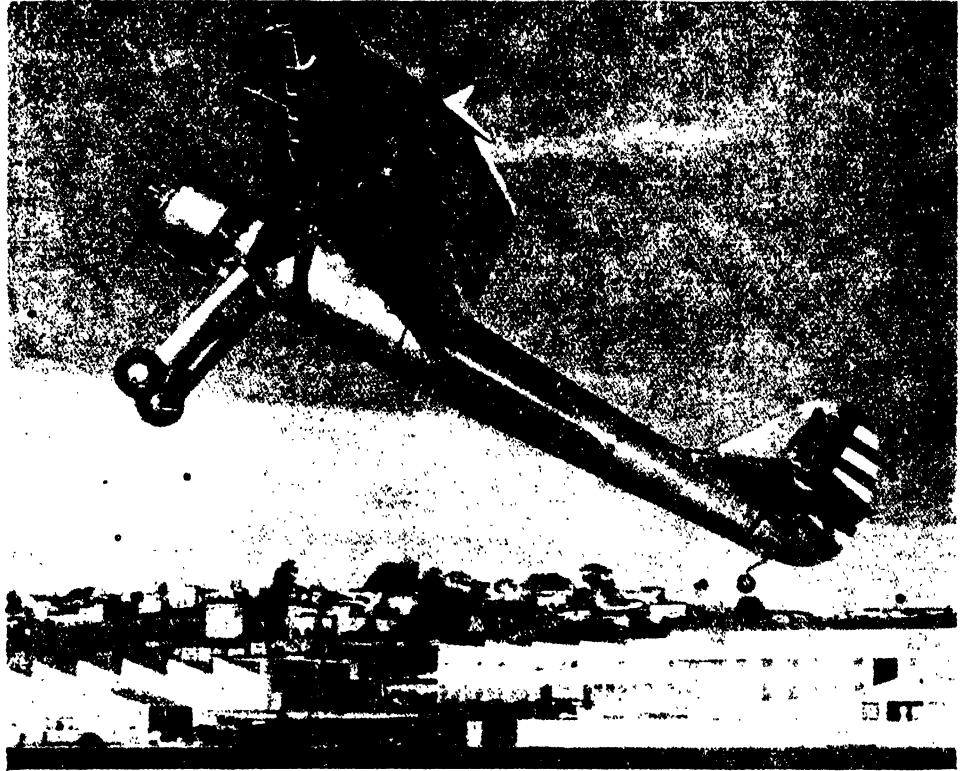
নূতন যুদ্ধ-প্লেন্—অনায়াসে সর্ব্বত্র উঠিতে-নামিতে পারে

ওড়া-পথে নানা আব-হাওয়ার কথা বলিয়া আমাদের কথা শেষ করিব। অক্সিজেনের বিশেষ ব্যবস্থা যদি না থাকিত, তাহা হইলে কি ঘটিত, জানেন? ১২০০০ ফুট উর্দ্ধে আকাশ-পথে উঠিলে দারুণ ক্লান্তিবশতঃ যাত্রীর নিদ্রালুতা ঘটে! ক্লান্তিতে নিদ্রালুতা যাঁর ঘটে না, তিনি মনে দারুণ স্ফূর্ত্তি বোধ করেন এবং সে-স্ফূর্ত্তি-বশে তাঁর হাসি ফোটে! সে-হাসি থামিতে চায় না; থামে না; এবং এ হাসির দমকে প্রাণ-পক্ষী দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া পলাইবে! ২৫০০০ ফুট উর্দ্ধে উঠিলে সর্ব্বাঙ্গ অবশ মূর্চ্ছাতুর হইবে,—যাকে আমরা 'কোমা' বলি, সেই 'কোমা'-অবস্থা ঘটা অনিবার্য্য! ১৬০০০ হইতে ১৮০০০ ফুট উচ্চ আকাশ-পথে শ্রুতি ও দৃষ্টিবোধ বিলুপ্ত হয়। ব্যথা-বেদনার অনুভূতি লোপ পায়! অক্সিজেনের বিশেষ ব্যবস্থার ফলে এ সব অস্বাচ্ছন্দ্যের কোনোটা ঘটিতে পারে না। দশ হাজার ফুট উর্দ্ধে উঠিলেই যাত্রীকে এই অক্সিজেন গ্রহণ করিতে হয়। এ ব্যবস্থা না থাকিলে বিশ হাজার ফুট উর্দ্ধে উঠিলে বায়ু-লেশহীন বদ্ধ কামরায় বসিয়া থাকিলেও রক্তে নাইট্রোজেন-কণা জমিতে থাকে এবং তার ফলে মৃত্যু অনিবার্য্য হয়।

সমর-প্লেনে ফটোগ্রাফ লওয়া এবং সে ফটো সদ্য-সদ্য তোলা ও প্রিণ্ট করার ব্যবস্থা আছে। প্লেনে চড়িয়া বহু বহু মাইল দূর হইতে শত্রুব্যূহের অবস্থানাদির সুন্দর ফটো গ্রহণ করা যায়। সামরিক বিভাগে যে সব প্লেন তৈয়ারী হইতেছে, সে প্লেনে দশ হাজার সৈন্য শূন্য-পথে

...সে যাত্রা করিতে সমর্থ এবং যেখানে খুশী এ-সব সেনা প্যারাশুট-যোগে ভূতলবর্ত্তী হইতে পারে। তাদের প্যারাশুট-বিদ্যায় এমনি পারদর্শিতা লাভ হইয়াছে।

বিমানপোতের সাহায্যে ইতিমধ্যে দূরত্বের ব্যবধান অন্তর্হিত হইয়াছে। যে-সব প্রদেশে যাওয়া-আসা এত কাল আকাশ-কুসুমের মতো অসম্ভব ছিল, সে-সব প্রদেশ এখন অচিরলভ্য হইয়াছে; দুর্গম গিরি-বনের রহস্য আজ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম-ভাবে মানব-সমাজের সুপরিচিত হইয়াছে। মরু-প্রান্তর ও মেরুপ্রান্ত আজ কল্পনায় পর্য্যবসিত না থাকিয়া লোকলোচনের অন্তর্বর্ত্তী হইয়া মানুষের কৌতূহল চরিতার্থ করিতেছে। এবং এই বিমানপোতের সাহায্যে মানুষ এক দিন দ্যুলোক-ভূলোকের সকল রহস্য আয়ত্ত করিয়া বৃহত্তর জগতের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণে সফল হইবেন, সে-আশা দুরাশা বলিয়া মনে হইতেছে না।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে

কবিগুরু, প্রয়াণের পথে অর্ঘ্য লহ
বেদনায় সজল নয়ানে
চেয়ে থাকি দূর পথপানে—
নীলাকাশে অনন্তের তুমি বার্ত্তাবহ।
মরণ অমৃত হল প্রয়াণের পথে তব
করে তার জয়মালা দোলে,
গগনে গগনে ওঠে তোমার বন্দনা-গান
জ্যোতিঃ পারাবারের কল্লোলে
তূর্য্য তব বেজেছিল
তারুণ্যেরে দিলে তুমি ডাক,
গাহিলে মাভৈঃ জয়গান—
'ওরে তোরা ওঠ আজি'
ঘুমাবার নাহি দিন আর
জাগ্রত আজিকে ভগবান্।
তব কণ্ঠে নানা সুরে
দিক্ হতে দিগন্তর ভরি
মহান্ সাধনা-ব্রতে
প্রভাতের দীক্ষা দিলে
দূর করি মোহ-বিভাবরী—
শারদার বোধন-উৎসবে
বাজাইলে শরতের বাঁশী
তোমারে ঘেরিয়া সারা বেলা
আলো-ছায়া করে কত খেলা
ছবি আঁক আপনা উদাসী।
প্রকৃতির রূপের পূজারী
অপরূপ করিলে সৃজন
অসীমের দূরাগত বাণী
সীমার প্রকাশে দিলে টানি,
দুয়ে আজি করে আলিঙ্গন।
অর্ঘ্য লহ কবি-গুরু!
অর্ঘ্য লহ পুষ্পিত লতার
অর্ঘ্য লহ অশ্রুজলে
অর্ঘ্য লহ ছন্দিত কথার—
অর্ঘ্য লহ মুকুলের
একান্ত মিনতি-ভরা প্রাণে:
অর্ঘ্য লহ রূপে রসে
অর্ঘ্য লহ প্রকৃতির দানে।
কূজন গুঞ্জনে ভরা
অর্ঘ্য লহ প্রভাত-সন্ধ্যার,
অর্ঘ্য লহ দুঃখ-সুখে
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারকার।
নীলিমার লহ প্রেম
লহ স্নেহ নীল জলধির:
হে চিরবাঞ্ছিত দেব
লহ পূজা লহ নমস্কার,
আরাধনা লহ ধরণীর।
লহ অর্ঘ্য হে দেশকালাতীত!
শতাব্দীর রূপে নব নব
স্মরণের অটুট বন্ধনে
নিখিলের প্রীতির চন্দনে
অমর মূরতি গড়ি তব।

শ্রীমতী শোভা দেবী।
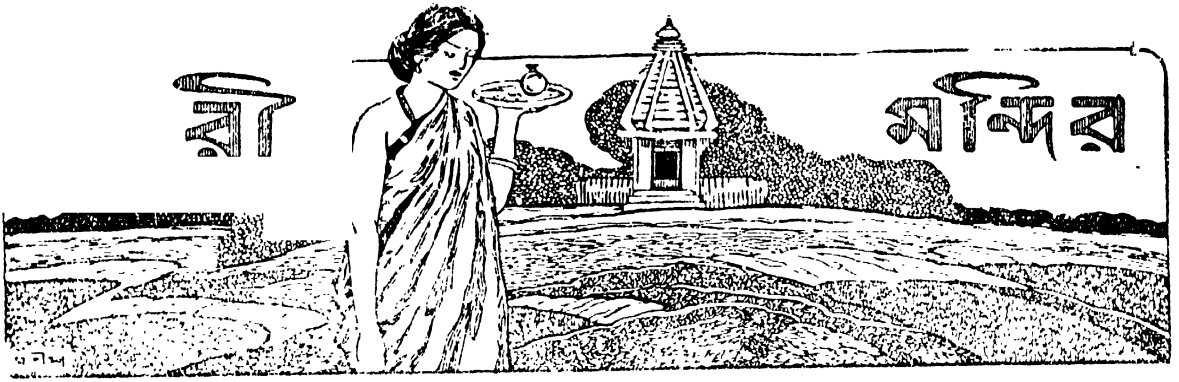
ছাপা কাপড়

সাদা-ধুতিতে নক্সাদার পাড় ছাপানো ; কিম্বা সাদা ধুতি বা চাদরের গায়ে নানা নক্সার ছাপ তুলে তাকে নক্সাদার

সিল্কের টেবল্‌-ক্লথে ছাপার কাজ

শাড়ীতে রূপান্তরিত করার কাজ খুব সহজ। অথচ হাতে-তোলা এ-নক্সার কাজে আমোদও প্রচুর।

অনেক সময় বাজারে সাদা ধুতি বা পাড়ওয়ালা ধুতি-শাড়ী পাঠিয়ে তাতে ছাপ তুলিয়ে আমরা নক্সাদার শাড়ী করি। দোকানদারের কাজ হয়তো ভালো হয়, কিন্তু দি এবং নিজেদের হাতে নক্সা করি, তাহলে দোকানের ছাপা শাড়ীর চেয়ে আমাদের হাতের নক্সাদার শাড়ী কোনো অংশে খারাপ হবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস। ঘরে নক্সার কাজ করলে সুবিধা হবে এই যে, নিজের পছন্দমতো নক্সা এঁকে সে-নক্সার ছাপে শাড়ী, টেবল্‌-ক্লথ, বিছানা-ঢাকা

ছাপা পর্দ্দা

প্রভৃতি বেশ রকমারি সজ্জায় গড়ে তুলে ঘরের শ্রীসম্পাদন করতে পারবো।

এ কাজের জন্য প্রথমে আমাদের নক্সার ছাঁচ বা ব্লক তৈয়ারী করে নিতে হবে। দোলের সময় অনেকে নোনা বা আলু কেটে সেই নোনায় বা আলুতে মাথার কাঁটা বা

লেখা তুলে সেই হরফ-লেখা নোনা-আলুর গায়ে রঙ বা আবীর মাখিয়ে অনেকের কাপড়ে ছাপ মেরে আমোদ উপভোগ করি—তেমনি ভাবে আলু বা নোনার গায়ে ফুল-পাতার নক্সা কুঁদে তা দিয়েও শাড়ী-চাদরে নক্সার ছাপ তুলে তাদের রকমারি-সাজে সাজাতে পারি। কিন্তু সে-নক্সা স্পষ্ট হবে না। তার কারণ, নোনা বা আলু নরম জিনিষ। দু'-একবার রঙ লাগলে তাদের গায়ে কোঁদা ফুল-পাতার ডিজাইন চুপ্‌সে সে-নক্সাত্বের অবসান হবে। এজন্য মজবুত নক্সার
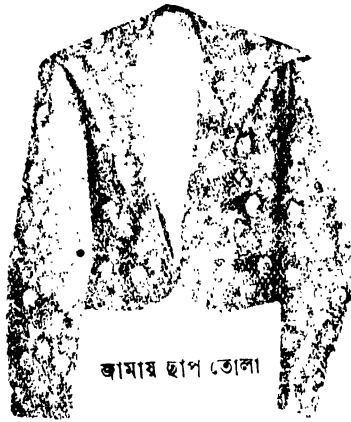
জামায় ছাপ তোলা

জন্য চাই শক্ত জমিতে ছাপ এঁকে ব্লক তৈরী করা।

মাটীর গায়ে নানা নক্সার কাজ করে সেই মাটী পুড়িয়ে যে-ছাঁচ তৈরী হয় (বাজারে এ ছাঁচ কিন্‌তে পাওয়া যায়) সে-ছাঁচ দিয়ে বাড়ীতে অনেকেই চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের ছাঁচ প্রভৃতি মিষ্টান্ন তৈরী করেন। এ রকম পোড়া-মাটীর গায়ে নক্সা কুঁদে তা দিয়েও কাপড়-চাদরকে নক্সাদার করা যায়। তবে তার চেয়েও মজবুত ব্লক হবে কাঠের গায়ে নক্সার ছবি কুঁদে তুলতে পারলে।

এ কাঠের ব্লক বাড়ীতে তৈরী করা শক্ত নয়। হালকা দেবদারু-কাঠ কিম্বা প্লাই-উড ব্লকের জন্য সবচেয়ে উপযোগী হবে।

কি করে নক্সা তুলবেন, বলি।

কাগজে ছবি আঁকুন—যে-রকম ছাপ তুলতে চান, তারি ছবি বা ডিজাইন। তার পর যে-কাঠে নক্সার ছাঁচ তৈয়ারী করবেন, সেই কাঠের উপর একখানা কার্ব্বন-কাগজ

বাটালি ও কুঁদিবার যন্ত্র
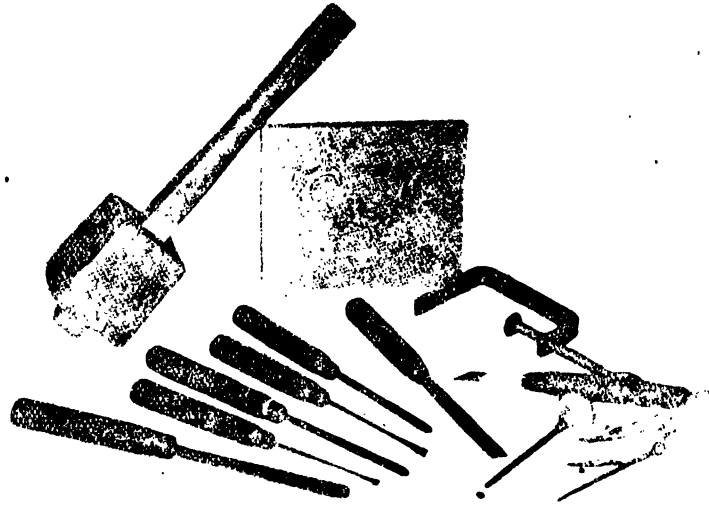
নক্সার ছাঁচ

ফেলে তার উপর ছবি-আঁকা কাগজ রেখে শক্ত পেন্সিল দিয়ে কিম্বা সরু চা-খড়ি দিয়ে ছবির গায়ে গায়ে দাগ বুলিয়ে যান। দেখবেন, কাঠের গায়ে রেখায়-রেখায় ছবি উঠেছে। এখন ঐ ছবির মতো যন্ত্র অথবা বাটালি দিয়ে কিম্বা ধারালো ছুরির সাহায্যে কিম্বা ভোঁতা নরুণ

দিয়ে রেখায়-রেখায় কুঁদে ও-ছবি কাঠের গায়ে ফুটিয়ে তুলুন। এ কাজটুকু করতে হবে বেশ মনোযোগী হয়ে এবং শান্ত ভাবে।

"নক্সার ছাঁচ" ছবি দেখুন। এমনি ভাবে কাঠের গায়ে

এ ছবি ট্রেশ করা হবে

নক্সার ছাঁচ তুলতে হবে। তার পর যে কাপড়ে বা চাদরে ছাপ তুলতে চান, সেই কাপড় বা চাদরকে টেবিলের উপর বা মেঝের উপর বেশ টাইট ভাবে আঁটতে হবে। কাপড়-চাদর সরে না যায়, সে সম্বন্ধে খুব সাবধান! কাপড়-চাদর টাইট ভাবে রেখে এবার ঐ ব্লকে কালি মাখিয়ে চেপে চেপে তার গায়ে ছাপ তুলুন। ধীর ভাবে কাজ করবেন—ছাপা যেন গায়ে গায়ে হয়। কিম্বা যদি কাপড়ের মাঝে মাঝে শুধু ফুলের ছাপ তুলতে চান —জ্যাবড়া না হয় এমনি ভাবে ফুলের ব্লকে কালি মাখিয়ে কাপড়ের গায়ে নির্দ্ধারিত বা নির্দ্দিষ্ট ফাঁক রেখে ছাপ মেরে যাবেন। তাহলেই ছাপা শাড়ী, চাদর বা পর্দ্দা তৈয়ারী হবে।

কালির কথা বিশেষ করে বলি। যা-তা কালিতে ছাপার কাজ চলবে না। কারণ, সুতির কাপড়-চাদর ময়লা হলে ধোপার বাড়ী কাচতে যাবে। তখন ধোপার হাতে ছাপা নক্সা কালির স্রোতে শুধু ভেসে যাবে তা নয়—কাপড় চাদরের মূর্ত্তি হবে কিম্ভূতকিমাকার।

এ জন্য কালির কথা বলা প্রয়োজন। এ-সব কাপড় ছাপাবার জন্য কালি তৈয়ারী করবেন এই রকমে—রঙ নেবেন এক ভাগ, গ্লিসিরিণ এক ভাগ, গাম-ট্রাগ (Gumtrug) ১৮ ভাগ; এসেটিক এসিড (৪০ পার-সেণ্ট percent) ৪ ভাগ; জল ৯ ভাগ।

কাপড়ে ব্লক ছাপা হচ্ছে

এই ক'টিকে একসঙ্গে মিশিয়ে আগুনের আঁচে বসাবেন। তার পর নামিয়ে ঠাণ্ডা হলে তাতে মেশাবেন, এক ভাগ টার্টারিক এসিড; জল দু' ভাগ; এসেটিক ট্যানিক চার ভাগ।

এই মেশানো হলেই কালি তৈয়ারী হলো।

ছাপা স্কার্ফ

সুতির কাপড়ের জন্যও এই কালি তৈরী করতে হবে। এ-কালির ছাপ ধোপে নষ্ট হবে না।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

রুশ-জার্ম্মাণ সঙ্ঘর্ষ—

চারি মাস পূর্ব্বে এক অশুভ প্রভাতে রুশ নর-নারী শয্যা ত্যাগ করিয়া শ্রবণ করিয়াছিল—জার্ম্মাণী অতর্কিত ভাবে তাহাদিগের দেশ আক্রমণ করিয়াছে। তদবধি দুর্দ্ধর্ষ জার্ম্মাণ বাহিনী ও তাহাদিগের সহযোগিগণ অভূত-পূর্ব্ব জীঘাংসার সহিত কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রকে আঘাত করিতেছে। এই "তড়িৎ গতি" যুদ্ধের যুগে চারি মাস অল্প সময় নহে। বিশেষতঃ, জার্ম্মাণী একাকী এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই; সমগ্র য়ুরোপের শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠান, খনিজ ও কৃষিজ সম্পদ,
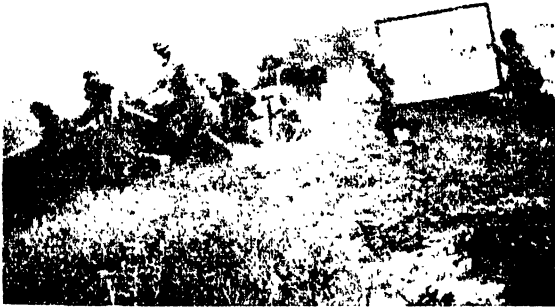
জার্ম্মাণরা রুশ-রণক্ষেত্রে একটি নদী অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিতেছে

এবং অধিকাংশ বিজিত রাজ্যের সেনাদল জার্ম্মাণীর নেতৃত্বে ও জার্ম্মাণ প্রণালীতে সংহত হইয়া কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আরব্ধ "ধর্ম্মযুদ্ধে" চারি মাস প্রযুক্ত রহিয়াছে। তবুও এত দিনে জার্ম্মাণীর তিনটি প্রধান লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি মাত্র তাহার কুক্ষিগত হইয়াছে। গুরুত্বপূর্ণ সোভিয়েট অঞ্চলের কিয়দংশ জার্ম্মাণীর আয়ত্তে আসিলেও এই যুদ্ধের অবসানের আশা এখনও সুদূরবর্ত্তী; সোভিয়েট বাহিনীর প্রতিরোধ-শক্তি হ্রাসের বিন্দুমাত্র লক্ষণ এখনও প্রকাশ পায় নাই।

গত চারি মাসে জার্ম্মাণ বাহিনী প্রায় সমগ্র ইউক্রেণ প্রদেশ মথিত করিয়াছে; ঐ প্রদেশের রাজধানী কিয়েভ তাহাদিগের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। ওডেসায় একটি সোভিয়েট-বাহিনী সুদীর্ঘ আড়াই মাস অসীম বিক্রমে শত্রু-সৈন্যের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেছিল; গত ১৫ই অক্টোবর তাহারা সমুদ্রপথে ঐ নগর ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। জার্ম্মাণ বাহিনী এখন পোল্‌টাভা অধিকার করিয়া ইউক্রেণ প্রদেশের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজধানী খারকভ বিপন্ন করিয়াছে; আর একটি বাহিনী আজভ সাগরের তীর ধরিয়া ট্যাগান্‌রগ্ পর্য্যন্ত পৌছিয়া ইউক্রেণ ও ককেসাসের সংযোগস্থলে অবস্থিত রস্টভে হানা দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে। জার্ম্মাণরা দাবী করিতেছে না, তাহারা ষ্ট্যালিনো অধিকার করিয়াছে। অবশ্য ক্রিমিয়া এবং উহার প্রধান নৌঘাঁটী সেবাস্তেপোলে এখনও সোভিয়েট-প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত; জলপথের সংযোগ ব্যতীতও ককেসাস্ হইতে কার্চ্চের পথে ক্রিমিয়ার সহিত সংযোগ রক্ষিত হইতেছে।

ইউক্রেণ অঞ্চলে জার্ম্মাণ বাহিনীর এই ব্যাপক সাফল্যের প্রধান কারণ—এই অঞ্চলের রুশ সেনাপতি মার্শাল বুদেনী, অঞ্চল-বিশেষের রক্ষা অপেক্ষা স্বীয় সেনাবাহিনী ও তাহাদিগের সংগ্রাম-শক্তির সংরক্ষণেই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ ভাগে জার্ম্মাণ বাহিনী যখন দক্ষিণে খারসনের নিকট-বর্ত্তী স্থানে এবং উত্তরে ক্রেমেনচাগে নীপার নদী অতি-ক্রম করে, তখন মার্শাল বুদেনীর বাহিনী পরিবেষ্টিত হইবার উপক্রম হয়। রুশ-সেনাপতি তখন তাঁহার সেনাবাহিনীর রক্ষার উদ্দেশ্যে একরূপ বিনাযুদ্ধেই নীপার নদীর বাঁক ত্যাগ করিয়া ডোনেজ অঞ্চলে গমন করে, এবং সেখানে নূতন করিয়া রক্ষাব্যূহ রচনায় প্রবৃত্ত হন। কোন অপ্রত্যা-শিত কারণে মার্শাল বুদেনী যদি তাঁহার সেনাবাহিনী লইয়া এই স্থান হইতে পুনরায় পশ্চাদপসরণে বাধ্য না হন, তাহা হইলে এই অঞ্চলে সত্বর প্রচণ্ড যুদ্ধ হইতে পারে। অবশ্য, সম্প্রতি মধ্য-রণাঙ্গণে জার্ম্মাণ বাহিনীর

আক্রমণের বেগ বৃদ্ধি পাওয়ায় এই অঞ্চলে তাহাদিগের চাপ কিঞ্চিৎ শিথিল হইয়াছে।

ইউক্রেণ অঞ্চল হস্তচ্যুত হওয়ায় সোভিয়েট রাশিয়ার যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা দুষ্পূরণীয়। ইউক্রেণ প্রদেশ কৃষিজ সম্পদে এবং শ্রমশিল্পে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। সোভিয়েট বাহিনী প্রত্যাবর্ত্তনের সময় শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংস করিয়া আসিয়াছে। কাজেই, জার্ম্মাণী এই অঞ্চল পাইয়া লাভবান্ হয় নাই। তবে, সোভিয়েট রুশিয়া বিশেষ ভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। জার্ম্মাণ বাহিনী যদি ইউক্রেণ হইতে ককেসাসে পৌছিতে সমর্থ হয়, এবং ককেসাস পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম করিয়া বাকুর তৈলকূপ অধিকার করিতে পারে, তাহা হইলে জার্ম্মাণী অমিত-

নীপার নদীর বিখ্যাত বাঁধ ; পশ্চাদ্বর্ত্তনের সময় সোভিয়েট বাহিনী এই বাঁধ ধ্বংস করিয়া দিয়াছে

পরাক্রমশালী হইয়া উঠিবে। তখন বৃটেনের পশ্চিম এশিয়ার স্বার্থ বিশেষ ভাবে বিপন্ন হইবে ; পশ্চিম দিক হইতে ভারতবর্ষেরও ঘোর বিপদ ঘটিতে পারে। পক্ষান্তরে, ককেসাসের সীমান্তে যদি জার্ম্মাণ বাহিনীর অগ্রগতি প্রতিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে বিশাল ইউক্রেণ প্রদেশের দ্বারাও জার্ম্মাণী বিশেষ উপকৃত হইবে না ; এমন কি, ইউক্রেণে আধুনিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্য পরিচালনের উপযোগী তৈল যোগানও তাহার পক্ষে দুষ্কর হইবে।

য়ুরোপীয় রুশিয়ায় ইউক্রেণের পর লেনিনগ্রাড্ অঞ্চলের গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। গত আগষ্ট মাসের প্রথমে যখন জার্ম্মাণ আক্রমণের তৃতীয় অধ্যায় আরম্ভ হয়, তখন ইউক্রেণ ও লেনিনগ্রাড্ অঞ্চলেই তাহার আক্রণের বেগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সেপ্টেম্বর মাসে লেনিনগ্রাড্ অভিমুখী অভিযানের তীব্রতা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয় ; বস্তুতঃ, সেপ্টেম্বর মাসের শেষ ভাগে লেনিনগ্রাড্ পতনের আশঙ্কা ঘনাইয়া আসে। কিন্তু সোভিয়েট-বাহিনীর প্রাণপণ-শক্তিতে প্রতিরোধে জার্ম্মাণীর অভিসন্ধি সিদ্ধ হয় নাই ; কম্যুনিষ্ট নেতার নামে খ্যাত এই নগরের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে পৌছিয়াই জার্ম্মাণ বাহিনী আক্রমণের গতি ফিরাইতে বাধ্য হয়। জার্ম্মাণরা দাবী করিয়াছে যে, মার্শাল ভরোশিলভের বাহিনী পঙ্গু হইয়াছে ; লেলিনগ্রাড্ এখন অবরুদ্ধ। জার্ম্মাণদিগের এই দাবী সত্য হউক আর নাই হউক, সোভিয়েট রুশিয়া যে লেনিনগ্রাডের নিকটবর্ত্তী শ্রমশিল্পকেন্দ্রে বঞ্চিত
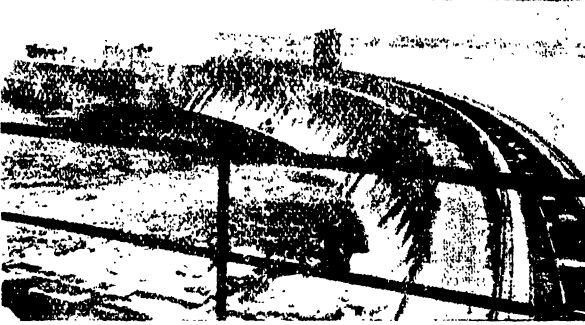
রুশিয়ার একটি কংক্রীটের দুর্গ ধ্বংস করিবার পর জার্ম্মাণ-সৈন্য সন্তর্পণে উহার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে

হইয়াছে, ইহা মিথ্যা নহে। ইউক্রেণ অঞ্চলের শ্রমশিল্প হারাইবার পর লেনিনগ্রাডের নিকটবর্ত্তী শ্রমশিল্পকেন্দ্র শত্রুর হস্তে পতিত হওয়ায় সোভিয়েট রুশিয়ার সংগ্রাম-শক্তিতে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হওয়াই সম্ভব।

লেনিনগ্রাড্ অধিকার অসাধ্য বিবেচিত হওয়াতেই হউক, অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, গত ৩রা অক্টোবর জার্ম্মাণী অকস্মাৎ উত্তর-রণক্ষেত্রে মনোযোগ হ্রাস করিয়া মস্কৌর উদ্দেশে প্রচণ্ড অভিযান আরম্ভ করিয়াছে। দক্ষিণে ব্রিয়ানস্ক, উত্তরে রেজভ্ এবং মধ্যবর্ত্তী স্থানে ভিয়াজমা হইতে মস্কৌর উদ্দেশে প্রবল আক্রমণ চালিত হইতেছে ; আরও উত্তরে ক্যালিনিনের নিকটবর্ত্তী স্থানে একটি জার্ম্মাণ বাহিনী লেনিনগ্রাড্-মস্কৌ রেল-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া রাজধানী মস্কৌ পরিবেষ্টনে উদ্যোগী

হইয়াছে। মস্কো অভিমুখে জার্ম্মাণদিগের এই আক্রমণের প্রচণ্ডতা অত্যন্ত তীব্র। হিট্‌লার শীত-সমাগমের পূর্ব্বে সোভিয়েট রুশিয়ার রাজধানী অধিকারের জন্য তাঁহার সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। এই আক্রমণের প্রচণ্ডতা বর্দ্ধিত হওয়ায় দক্ষিণ ও উত্তর-অঞ্চলের রণক্ষেত্রে জার্ম্মাণদিগের "চাপ" সাময়িক ভাবে হ্রাস পাইয়াছে।

বর্ত্তমানে এই অঞ্চলেই পূর্ব্ব-য়ুরোপের যুদ্ধের গুরুত্ব কেন্দ্রীভূত; রুশ নর-নারীর প্রিয় রাজধানী মস্কো শত্রু-হস্তে পতিত হইবার আশঙ্কা এখন অত্যন্ত প্রবল। এই আশঙ্কায় রুশিয়ার শাসনকেন্দ্র মস্কো হইতে ৫৫০ মাইল পূর্ব্বে ভল্‌গা নদীর তীরে কুইবিশেভে স্থানান্তরিত হইয়াছে। সাধারণতঃ, রাজধানী স্থানান্তরের নৈতিক প্রতিক্রিয়া

হস্তচ্যুতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য, ইতিমধ্যে মস্কো ও লেনিনগ্রাড্ অঞ্চলের কারখানার বহু যন্ত্র স্থানান্তরিত হইয়াছে; কিন্তু এই সকল যন্ত্রের সাহায্যে পণ্যোৎপাদন সময়সাপেক্ষ।

সোভিয়েট-জার্ম্মাণ যুদ্ধ বর্ত্তমানে যে অবস্থায় পৌঁছিয়াছে, ইহা আশঙ্কাজনক। অবশ্য, সোভিয়েট রুশিয়ার নর-নারী কখনও ফ্যাসিস্ত শত্রুর নিকট আত্ম-সমর্পণ করিবে না; কেবল ইউক্রেণ, মস্কো, লেনিনগ্রাড্ কেন, সমগ্র য়ুরোপীয় রুশিয়া যদি শত্রুর কুক্ষিগত হয়, তাহা হইলেও উরল অঞ্চলে তাহারা প্রতিরোধ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখিবে। জার্ম্মাণী কখন তাহার অধিকৃত রুশ অঞ্চল নিশ্চিন্তে সম্ভোগ করিতে পারিবে না; অধিকৃত অঞ্চলের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে স্বাধীনতাকামী রুশদিগের
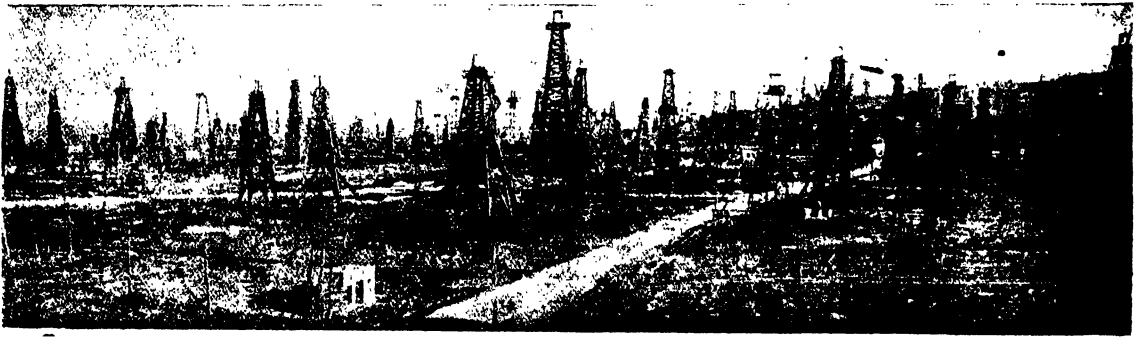
জার্ম্মাণী ককেসাসের এই তৈল-উৎপাদন কেন্দ্রে অধিকার-প্রতিষ্ঠার জন্য আকাঙ্ক্ষী

অত্যন্ত প্রবল। তবে, মস্কো হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ায় যুদ্ধপরিচালন-সম্পর্কে সোভিয়েট রুশিয়ার দৃঢ়তার পরিচয় আরও সুস্পষ্ট; শত্রু নিকটবর্ত্তী হইলে রাজধানী "উন্মুক্ত সহর" ঘোষণা করিয়া ইট-কাঠের স্তূপগুলি রক্ষার ফরাসীসুলভ মনোভাব যে রুশ-রাষ্ট্রনায়কগণ পোষণ করেন না, ইহা তাহারই দ্যোতক। বস্তুতঃ, মস্কোর প্রতি গৃহে, প্রতি রাজপথে শত্রুকে প্রতিরোধ করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প ঘোষিত হইয়াছে। এই প্রতিরোধ ভেদ করিয়া শীতের পূর্ব্বে মস্কো অধিকার জার্ম্মাণদিগের পক্ষে সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। তবে, সোভিয়েট রুশিয়া মস্কো অঞ্চলের শ্রমশিল্পে বঞ্চিত হইবে, তাহার সম্ভাবনা আছে। মস্কো অঞ্চলে সোভিয়েট রুশিয়ার শতকরা ১০ ভাগ শিল্পজাত পণ্য উৎপন্ন হইত। কাজেই এই অঞ্চলের

প্রবল প্রতিরোধ চলিবে। মস্কোর যদি পতন হয়, তাহা হইলে হিট্‌লার হয় ত চীনের নান্‌কিং সরকারের অনুকরণে সেখানে একটি তাঁবেদার সরকার স্থাপন করিবেন; সেখানে প্রতিষ্ঠিত করাইবার জন্য কোন রুশ "ওয়াঙ্গ" হয় ত তাঁহার ভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে। তবে, ইহা নিশ্চিত যে, চীনা ওয়াঙ্গ অপেক্ষা রুশ "ওয়াঙ্গ" অধিকতর স্বল্পায়ু হইবেন, তাঁহার আসনও অধিকতর বিঘ্নসঙ্কুল হইবে।

বস্তুতঃ, রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধের আশঙ্কা এ দিক্ হইতে নহে। বর্ত্তমানে স্বাধীনতাকামী রুশদিগের "মরেল" সমগ্র জগৎকে বিস্মিত করিতেছে, ভবিষ্যতেও তাহা করিবে। এই যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থায় আশঙ্কার কারণ এই যে, সোভিয়েট রুশিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রমশিল্পকেন্দ্র শত্রুহস্তে

পতিত হওয়ায় তাহাকে ক্রমেই অধিকতর পরনির্ভরশীল হইতে হইতেছে। জার্ম্মাণী সোভিয়েট রুশিয়াকে শ্রমশিল্পের দিকে পঙ্গু করিয়া বহির্জ্জগতের সহিত তাহার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে চাহে। উত্তরাঞ্চলে জার্ম্মাণীর সাফল্যে মুরমানস্কের পথ অবরুদ্ধ হইবার আশঙ্কা আছে; দক্ষিণে জার্ম্মাণ বাহিনী যদি ককেসাসে পৌঁছিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে ইরাণের পথ আর নিরাপদ থাকিবে না; এ দিকে জাপান ব্লাডিভোষ্টকের পথ বিঘ্নাকীর্ণ করিতে পারে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রমশিল্পকেন্দ্রে বঞ্চিত হইবার পর সোভিয়েট রুশিয়া যদি এই ভাবে বহির্জ্জগতের সহিত বিচ্ছিন্ন হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতিরোধ-প্রয়াস ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইবে। উরল্ মহানুভবতার নিদর্শন নহে; ইহা বৃটেনের নিজের প্রয়োজন। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের পক্ষে সোভিয়েট রুশিয়াকে সাহায্য-প্রদানের সামর্থ্য কতটুকু, তাহাই বিবেচনার বিষয়। গত সেপ্টেম্বর মাসে কভেন্‌ট্রীতে এক বক্তৃতায় মিঃ ইডেন্ বলিয়াছিলেন—"The output of war material of Allied and associated Powers, including the contribution of the United States still fall far short of needs." ইহাই যদি বৃটেনের অবস্থা হয়, তাহা হইলে সোভিয়েট রুশিয়া তাহার সাহায্যে কতটুকু উপকৃত হইবে? অবশ্য, বৃটিশ সাম্রাজ্য হইতে কাঁচা মাল প্রদানের ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রধান প্রধান

ইউক্রেণের গম

অঞ্চলে সোভিয়েট রুশিয়ার যে সকল শ্রমশিল্পপ্রতিষ্ঠান আছে, উহার সাহায্যে ব্যাপক ভাবে আধুনিক যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকা কখনও সম্ভব নহে।

সোভিয়েট রুশিয়াকে ইঙ্গ-মার্কিণ সাহায্য-দান সম্পর্কে প্রস্তাবিত কমিশন গত সেপ্টেম্বর মাসে মস্কো গমন করিয়া প্রয়োজনীয় আলোচনা সম্পন্ন করিয়াছেন। সোভিয়েট রুশিয়াকে প্রয়োজনীয় সাহায্য-দান করিয়া তাহার সংগ্রাম-শক্তি অটুট রাখা বৃটেনের একান্ত প্রয়োজন। কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের প্রতিরোধ-শক্তি যদি বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে বৃটেন ও বৃটিশ সাম্রাজ্য বিপন্ন হইবে। বস্তুতঃ, এই রাষ্ট্রটি বৃটেন্ ও বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের শেষ প্রাকার; ইহার প্রতিরোধ-ব্যূহ ভেদ করিতে পারিলে শত্রু বৃটেন্‌কে প্রত্যক্ষ ভাবে আঘাত করিতে পারিবে। কাজেই, সোভিয়েট রুশিয়াকে সাহায্য-প্রদানের আয়োজন শ্রমশিল্পকেন্দ্রে বঞ্চিত সোভিয়েট রুশিয়া এখন ট্যাঙ্ক, বিমান ও কামান চাহে। বৃটেনের ইহা প্রদানের সামর্থ্য কতটুকু? তাহার পর, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। রুজভেল্ট-সরকার ফ্যাসিষ্ট-ঔদ্ধত্য চূর্ণ করিবার জন্য যুদ্ধরত ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী শক্তিগুলিকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতে আগ্রহান্বিত। কিন্তু মার্কিণী স্বতন্ত্রবাদীদিগের (isolationist) চক্রান্তে এই সাধু প্রচেষ্টা বিশেষ ভাবেই ব্যাহত হইতেছে। অল্পকাল পূর্ব্বে লণ্ডনের 'ডেলী মেল' মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমরোপকরণ উৎপাদন-ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছিলেন—"undergoing a miserable phase of muddle and internecine war." এই মন্তব্যে অতিরঞ্জন থাকিতে পারে; কিন্তু ইহা যে সম্পূর্ণ অসত্য নহে, তাহার আভাস আমরা মধ্যে মধ্যে পাইয়া থাকি। এই সকল বিষয় ব্য

সোভিয়েট রুশিয়ায় ইঙ্গ-মার্কিণ সাহায্য প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ হইবার আশঙ্কা ত আছেই।

সোভিয়েট-জার্ম্মাণ যুদ্ধের আলোচনা-প্রসঙ্গে একটি কথা দুঃখের সহিত বলিতে হয়—শত্রু চারি মাস কাল পূর্ব্ব-য়ুরোপে বিশেষ ভাবে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও এখনও পশ্চিম অথবা দক্ষিণ-য়ুরোপে বৃটেন্ তাহার বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণ পরিচালনে সমর্থ হয় নাই। শত্রু যদি এই সময় অন্যত্র মনোযোগ প্রদানে বাধ্য হইত, তাহা হইলে স্বভাবতঃই পূর্ব্ব-য়ুরোপে তাহার আক্রমণের বেগ হ্রাস পাইত। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কেবল কম্যুনিষ্টদিগের রক্তেই শত্রুর শক্তিক্ষয়ের প্রচেষ্টা দেখা যাইতেছে; তাহাদিগের

দুইটি রুশ-বীরাঙ্গনা; জাতির এই দুর্দ্দিনে রুশ-নারী হাসিমুখে পুরুষের সমান দুঃখ ও ত্যাগ স্বীকার করিতেছে

প্রতি শত্রুর "চাপ" হ্রাস করাইবার কোন প্রয়াস হয় নাই। বস্তুতঃ, এইরূপ প্রয়াস যে অত্যন্ত অবিমৃষ্যকারিতার পরিচায়ক, তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা হইতেছে। আমরা সমর-বিশেষজ্ঞ নহি—এই বিষয়ে দৃঢ় অভিমত প্রকাশের অধিকার আমাদিগের নাই। বিশেষতঃ, পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব-য়ুরোপে জার্ম্মাণীর আয়োজনের প্রকৃত বিবরণ আমরা জানি না; বৃটিশের আক্রমণ-শক্তি সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্যও আমাদিগের অজ্ঞাত। তবে, এই প্রশ্ন মনে স্বতঃই উদিত হয়—আজ জার্ম্মাণী যখন পূর্ব্ব-য়ুরোপে বিশেষ ভাবে বিব্রত, তাহার ক্ষতির পরিমাণ যখন অভূতপূর্ব্ব, তখনও যদি তাহাকে আঘাত করা অসম্ভব বিবেচিত হয়, তাহা হইলে এই দুর্দ্ধর্ষ শত্রু কবে এবং কি ভাবে পরাভূত হইবে?

সুদূর প্রাচী—(জাপান)

অক্টোবর মাসের মধ্যভাগে জাপানে মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন হইয়াছে; গত জুলাই মাসে প্রিন্স কনোয়ী "নরম" ও "গরম" দলে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যে মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করিয়াছিলেন, তাহার সদস্যগণ জেনারল টোজো ও তাঁহার সমরকামী সহযোগীদিগের জন্য আসন শূন্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন। জেনারল টোজোর অধিক পরিচয়ের আবশ্যক নাই; যে সকল জাপানী-ধুরন্ধর অস্ত্রবলে সাম্রাজ্য প্রসারের জন্য অধীর, জেনারল টোজো তাহাদিগের সর্ব্বপ্রধান পাণ্ডা। ইঁহার শিক্ষা ও সংস্কৃতির নিদর্শন—গত ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে তিয়ান্‌সীনে দুই জন জাপানী কর্ম্মচারীর হত্যাকাণ্ড উপলক্ষ করিয়া যখন ঐ নগর জাপান কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হয়, তখন বীরপুঙ্গব টোজোর আদেশেই ইংরেজ নরনারীকে বিবস্ত্র করিয়া তাহাদিগের অঙ্গ তল্লাস করা হইয়াছিল।

জাপানের নব নির্ব্বাচিত প্রধান-মন্ত্রী জেনারল্ টোজো

জাপানের রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চে জেনারল টোজো প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ায় সর্ব্বত্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। সকলেরই মনে "কি হয়, কি হয়!" জেনারল টোজো প্রধান-মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন—তিনি কোন মধ্যবর্ত্তী পন্থা অবলম্বন করিবেন না; শান্তি অথবা যুদ্ধ! বস্তুতঃ, জাপানের অভ্যন্তরীণ অবস্থা যেরূপ, তাহাতে সে আর প্রতীক্ষা করিতে পারে না: চারি বৎসরব্যাপী চীনা-যুদ্ধের ফলে জাপানী জনসাধারণ এখন অশেষ দুঃখভোগ করিতেছে। জাপানীরা এখন নির্দ্দিষ্ট

পরিমাণের অধিক চাউল পায় না—Rice is rationed. চিনি ও মাংস ভক্ষণ জাপানীরা একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছে; তাহারা পরিচ্ছদে বাহুল্য হ্রাস করিতে বাধ্য হইয়াছে; রাজপথে 'বাস'গুলি কাঠ-কয়লার সাহায্যে চালিত হয়—পেট্রোলের অভাব; ইচ্ছা অনুযায়ী অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার উপায় নাই—কাঠ-কয়লাও প্রচুর পাওয়া যায় না। আহত ও মৃতের সংখ্যা জনসাধারণের মনে ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছে। এই দুঃখ ও আতঙ্কের লাঘবের জন্য জাপানের পক্ষে চরমপন্থা অবলম্বন একান্ত প্রয়োজন।

জেনারল টোজো যে শান্তির কথা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ হয় ত এই—আমেরিকার সহিত জাপানের এখন যে আলোচনা চলিতেছে, তাহাতে তিনি এক শেষ প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন। সেই প্রস্তাব যদি গৃহীত না হয়, তাহা হইলে অস্ত্রবলের শরণাপন্ন হইবেন।

শান্তির এই প্রয়াস যদি বিফল হয়, তাহা হইলে টোজো-মন্ত্রিসভা কোন্ দিকে অস্ত্রবল প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইবেন, বিবেচ্য। এ জন্য অনেকেরই অনুমান—সাইবেরিয়া অভিমুখে জাপান মনোযোগী হইবে। জাপান যদি সত্যই সোভিয়েট রুশিয়ার পৃষ্ঠে অস্ত্রাঘাত করে, তাহা হইলে দক্ষিণ-প্রশান্ত মহাসাগরে এবং মালয় উপদ্বীপে বৃটিশ ও মার্কিণ স্বার্থ আপাততঃ রক্ষা পাইবে। বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যদি জাপানের সহিত অর্থনীতিক সহযোগিতার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দেয়, এবং এই ভাবে আপনাদিগের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে জাপানকে উত্তরাভিমুখে "লেলাইয়া" দেওয়ার প্রয়াসী হয়, তাহা হইলে জাপানের পক্ষে সাইবেরিয়া আক্রমণে প্রলুব্ধ হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু তবুও জাপান এইরূপ দুঃসাহস করিবার পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিবে। ইহার প্রথম কারণ—স্থলযুদ্ধে সে এখন চীনে বিশেষ ভাবে ব্যাপৃত; এখন নূতন করিয়া স্থলযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া তাহার পক্ষে দুষ্কর। বিশেষতঃ, সোভিয়েট রুশিয়ার পশ্চিম-অঞ্চলে যুদ্ধের অবস্থা যেরূপই হউক না কেন, পূর্ব্ব-দিকে একটি প্রথম শ্রেণীর শক্তির সহিত যুঝিবার ক্ষমতা কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের আছে; বস্তুতঃ, এই অঞ্চলে জাপান অপেক্ষা রুশিয়ারই শত্রুকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার সামর্থ্য অধিক। দ্বিতীয় কারণ—সাইবেরিয়ার কতকাংশে অধিকার বিস্তার যদি জাপানের পক্ষে সম্ভবও হয়, তাহা হইলেও অর্থনীতিক বিষয়ে সে তত উপকৃত হইবে না। তাহার সর্ব্বাধিক প্রয়োজনীয় বস্তু—লৌহ, তৈল, রবার প্রভৃতি সাইবেরিয়ায় পাইবার আশা নাই।

জাপানের প্রয়োজন এবং তাহার নৌবহরের অক্ষুণ্ণ শক্তির কথা স্মরণ করিলে ওলন্দাজ-পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেই তাহার শ্যেনদৃষ্টি পতিত হইবার সম্ভাবনা অধিক বলিয়া মনে হয়। এই দ্বীপপুঞ্জ প্রাকৃতিক সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ; জাপানের প্রয়োজনীয় সকল বস্তুই সেখানে প্রচুর পরিমাণে পাইবার সম্ভাবনা আছে। এই দ্বীপপুঞ্জে

চীনের যুদ্ধে নিহত জাপানীদিগের চিতাভস্ম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আধারে নীত হইতেছে

মনোযোগী হইবার জন্য প্রধানতঃ জাপানের নৌবাহিনীই প্রযুক্ত হইবে। জাপানের নৌবাহিনী বিশেষ শক্তিশালী, এবং এখন পর্য্যন্ত ইহার শক্তি বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নাই। অধিকন্তু, জাপান হয় ত আশা করে, জার্ম্মাণী বর্ত্তমানে আট্‌লান্টিকে যে ভাবে মার্কিণী নৌবহরকে ব্যাপৃত রাখিয়াছে, তাহাতে উহার পক্ষে প্রশান্ত মহাসাগরে বিশেষ মনোযোগী হওয়া সম্ভব নহে। বৃটিশ নৌবহরও অনন্যমনা হইয়া প্রশান্ত মহাসাগরে অবহিত হইতে পারিবে না।

ত্রিশক্তির চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী হিসাবে জার্ম্মাণীর সহিত সহযোগিতায়ও দক্ষিণ-প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের তৎপরতা অল্প কার্য্যকরী হইবে না। আর ভ্লাডিভোষ্টকের পথ অবরুদ্ধ করিবার জন্য সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত তাহার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন নাই; আমেরিকার সহিত আলোচনা বিফল হইবামাত্র নৌবাহিনীর সাহায্যেই জাপান এই পথ রোধ করিবে।

চীন-যুদ্ধ—

পঞ্চম বৎসরেও চীনাদিগের সংগ্রাম-শক্তি যে অক্ষুণ্ণ আছে, তাহার পরিচয় সম্প্রতি হুনান প্রদেশে পাওয়া গিয়াছে। চীনারা প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়া সম্প্রতি ঐ প্রদেশের রাজধানী চ্যাংশা অধিকার করিয়াছে। হুপে প্রদেশের অন্যতম প্রধান বন্দর ইয়াংসী নদীর তীরবর্ত্তী ইচাংও চীনারা অধিকার করিয়াছিল; কিন্তু উহা তাহারা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। জাপানীরা না কি ইচাংএ বিষবাষ্প ব্যবহার করিয়াছিল।

চীনের যুদ্ধকে এখন আর বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখা যায় না; ইহা এখন বিরাট্ বিশ্ব-সংগ্রামের অংশ-বিশেষ। এই

চীনের বর্ত্তমান রাজধানী চুংকিং

যুদ্ধে স্থানীয় জয়-পরাজয়ের গুরুত্ব যাহাই হউক না কেন, বিশ্ব-সংগ্রামে এই যুদ্ধের প্রতিক্রিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক অবস্থায় চীনের ভাগ্য সমস্ত ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী শক্তির ভাগ্যের সহিত অচ্ছেদ্য ভাবে গ্রথিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বিশ্ব-সংগ্রামে ফ্যাসিষ্ট-শক্তি যদি জয়ী হয়, তাহা হইলে চীনাদিগের এই চারি বৎসরব্যাপী আত্মাহুতির সম্পূর্ণ ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী। আর এই সংগ্রামে যদি ফ্যাসিষ্ট-ঔদ্ধত্যের অবসান ঘটে, তাহা হইলে আজ চীনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশ জাপানের কুক্ষি-গত থাকা সত্ত্বেও চীন যে পুনরায় পূর্ণাঙ্গ এবং স্বাধীন হইবে, ইহা নিশ্চিত। চীনের বর্দ্ধিত সংগ্রাম-শক্তির পরিচয় পাইয়া মনে হয়—বিশ্ব-সংগ্রামে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির দায়িত্ব চীনারা উত্তমরূপেই পালন করিতেছে; ভবিষ্যতেও করিবে।

আমেরিকার মনোভাব—

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। তিনি জানান—সমুদ্রপথে স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য তাঁহারা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ; জার্ম্মাণী পুনঃ পুনঃ মার্কিনী জাহাজ আক্রমণ করিয়া এই স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতেছে। তাই তিনি দৃঢ়তা সহকারে ঘোষণা করেন—"American vessels and American planes will no longer wait until Axis submarines or raiders on the surface strike their deadly blow first." প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের এই বক্তৃতায় ব্যক্ত হয়—আইস্‌ল্যাণ্ড পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে জাহাজ-চলাচলের দায়িত্ব মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করিবে। ইহার পর, মার্কিনী জাহাজগুলিকে জার্ম্মাণীর আক্রমণকারী জাহাজ ও সাবমেরিণকে দেখিবামাত্র আক্রমণ করিতে আদেশ দেওয়া হয়। এই আদেশের ফলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সমুদ্রবক্ষে অঘোষিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু তবুও জার্ম্মাণ সাবমেরিণের আক্রমণ বন্ধ হয় নাই। জার্ম্মাণ জল-দস্যুদিগের হস্ত হইতে মার্কিনী পোত-রক্ষার উদ্দেশ্যে এখন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যপোতগুলি অস্ত্রসজ্জিত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। হয় ত অদূর ভবিষ্যতে নিরপেক্ষতা বিধানের পরেও সংস্কার করিয়া মার্কিনী বাণিজ্যপোতগুলিকে যুদ্ধাঞ্চলে প্রবেশের অনুমতিও দেওয়া হইবে।

মার্কিনী জাহাজের প্রতি জার্ম্মাণীর আক্রমণ সম্পর্কে মনে হয়—জার্ম্মাণী ইচ্ছা করিয়াই মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রকে বিব্রত করিতেছে। আইস্‌ল্যাণ্ডে মার্কিনী ঘাঁটী স্থাপিত হইবার পর হইতে বৃটেনে প্রেরিত পণ্য ঐ দ্বীপ পর্য্যন্ত মার্কিনী নৌবহরের রক্ষণাধীনে আসিতেছিল। কাজেই, মার্কিনী রক্ষি-জাহাজ আক্রমণ না করিয়া বৃটেনে এই পণ্য-প্রবেশ বন্ধ করা জার্ম্মাণীর পক্ষে কার্য্যতঃ অসম্ভব হইয়া উঠিতেছিল। এই জন্য জার্ম্মাণী মার্কিনী জাহাজ আক্রমণ করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধ-ঘোষণায় বাধ্য করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। ইহা ব্যতীত, প্রশান্ত মহা-সাগরে জাপানকে পরোক্ষে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যেও জার্ম্মাণী আট্‌লাণ্টিকে মার্কিনী নৌবহরকে বিব্রত রাখিতে চাহে।

শ্রীঅতুল দত্ত।

প্রেম

'প্রেম' শব্দে সাধারণতঃ লোকের ধারণায় ভালবাসা বুঝায়। জাগতিক ব্যাপারে স্ত্রী-পুরুষের প্রণয় 'প্রেম' নামে অভিহিত হইয়া থাকে ; সেই জন্য আজ-কাল সাহিত্যে ইহার এতই ছড়াছড়ি যে, ইহার অপপ্রয়োগ বশতঃ প্রেম বলিতে স্ত্রী-পুরুষের দৈহিক একটা সম্বন্ধমাত্র বলিয়া লোকের ধারণা হইয়াছে। সে যাহাই হউক, প্রেমের অর্থ ভালবাসা। এ ভালবাসা কেমন? প্রতিদান-বিরহিত, আত্মসুখ-বিবর্জ্জিত কেবলমাত্র প্রেমাস্পদের আনন্দ-বর্দ্ধন জনিত যে ভালবাসা—তাহাই প্রেম। বহু ভাগ্যে, বহু সাধনায়, মানুষ এই প্রেম অর্জ্জন করিতে পারে। মানুষের সহিত মানুষের যে ভালবাসা, যে সম্বন্ধ, তাহা কেবলমাত্র স্বার্থজনিত। নিঃস্বার্থ সম্বন্ধ তাহাদের মধ্যে হইতে পারে না। অতএব তাহাদের যে ভালবাসা, তাহাও স্বার্থ-বিজড়িত। এই জন্যই তাহার প্রেম আখ্যা দেওয়া সঙ্গত নহে। কামনাবিহীন সম্বন্ধ যেখানে, সেখানেই প্রেম বর্ত্তমান। সে সম্বন্ধ একমাত্র শ্রীভগবানের সহিত হওয়াই সম্ভব। সুতরাং শ্রীভগবানের প্রতি এই নিঃস্বার্থ ভালবাসার নামই 'প্রেম'। জাগতিক সম্বন্ধজড়িত যে কোনও জীবের প্রতি ভালবাসা থাকুক না কেন, তাহাতে নিজ ইন্দ্রিয়গণের প্রীতির ইচ্ছাই বলবতী। প্রতিদান না চাহিলেও হয় ত প্রেমাস্পদকে দেখিতে ভাল লাগে। আর প্রতিদান-ইচ্ছাই স্বাভাবিক। সে ইচ্ছার ব্যতিক্রম মর-জগতের জীবের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয় না। সুতরাং সে স্থানেও ইন্দ্রিয়-প্রীতিই বলবতী। ইহাকে প্রেম আখ্যা দেওয়া চলে না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

তাই বলি, যেখানে স্বসুখবাঞ্ছা রহিয়াছে, সেখানে প্রেমের স্থান নাই। তাহা কাম মাত্রে পর্য্যবসিত। শ্রীভগবানের প্রতি যে ভালবাসা, তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত ইন্দ্রিয়গণের, মনের, প্রাণের যে ব্যাকুলতা—তাহাই প্রেম। এই প্রেম ব্রজের গোপীগণের ছিল। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিয়াই সুখী, কোনও দিন কোনও প্রতিদান-প্রত্যাশা করেন নাই, বা সুখবাঞ্ছা করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ ভালবাসেন, তাই তাঁহারা বেশভূষা করেন। তাঁহাদের যাহা-কিছু—সে সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত। স্বসুখবাসনা তাঁহাদের আদৌ ছিল না। তথাপি তাঁহারা যে সুখ স্বতঃই প্রাপ্ত হইতেন, সুখবাঞ্ছা থাকিলে তাহার কোটি-ভাগের এক ভাগও পাইতেন না।

সুখবাঞ্ছা নাহি সুখ হয় কোটিগুণ। (চৈঃ-চঃ)

প্রেমের পর্য্যবসান এই গোপীপ্রেমে, এবং তাহার চরম পরিণতি শ্রীমতী রাধিকায়। শ্রীভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়াও এই প্রেমের প্রতিদান করিতে সমর্থ হয়েন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মা ভজন্ দুর্জ্জর-গেহ-শৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥
—শ্রীমদ্ভাগবতম্।

শ্রীরাধার প্রেমের প্রতিদান করা দূরের কথা, তাহা আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীভগবান্ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন; অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন, শ্রীরাধার ভাবে প্রভাবিত না হইলে এ প্রেমাস্বাদনের উপায়ান্তর নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তাই গায়িয়াছেন,—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্য সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

তাই আমাদের কালো ঠাকুর শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গরূপে সেই প্রেমাস্বাদন করিলেন। শ্রীচৈতন্য অবতারে তাই আমাদের কালো ঠাকুরের স্বার্থ নিহিত। অবশ্য, কেবলমাত্র স্বার্থই ইহার হেতু নহে; কারণ, প্রেমদানও উদ্দেশ্য ছিল। যথা—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসং স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিত
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥ (চৈঃ-চঃ)

শ্রীচরিতামৃতের এই শ্লোক হইতেই অবতার-প্রয়োজন আলোচনায় দেখা যায় যে, প্রেমদানও অবতারে প্রয়োজন ছিল। অন্য অবতারে, এমন কি, স্বয়ং অবতার শ্রীকৃষ্ণরূপে তিনি জগতের ভার-হরণের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে স্বার্থসম্বন্ধ ছিল। শ্রীভগবানের স্বার্থ বলিয়া কিছুই নাই; কারণ, তিনি আত্মারাম, সর্ব্বকারণ-কারণ। তাঁহার নিজ প্রয়োজনও কিছুই নাই। যে তাঁহাকে যেমন ভাবে ভজনা করে, তিনি সেই ভাবেই তাহার ভজনের প্রতিদান করেন। যেহেতু গীতায় তিনি বলিয়াছেন,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

কিন্তু ব্রজসুন্দরীদের এই ভজনের, তাঁহাদের এই প্রেমের প্রতিদানে সমর্থ হইলেন না। সর্ব্বশক্তিমান্ হইলেও এ স্থলে তাঁহার শক্তি বিলুপ্ত হইল। তিনি বলিলেন—"ন পারয়েঽহং" ইত্যাদি। তিনি শ্রীরাধার প্রেমাস্বাদনের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। সে প্রেমের প্রতিদান করা দূরে থাকুক, তাহার অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের আস্বাদনলোভে ব্যাকুল হইয়া, শ্রীমতীর ভাব ও অঙ্গকান্তি ধারণ করিয়া তিনি শ্রীগৌরসুন্দররূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হইলেন, এবং সেই মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া কেবল স্বয়ং আনন্দ লাভ করিলেন না, অখিল ব্রহ্মাণ্ডকেও ধন্য করিলেন।

আত্মারাম, স্বয়ং ভগবান্, সর্ব্বকারণ শ্রীকৃষ্ণ যে-প্রেমের প্রতিদান করিতে অসমর্থ, সে-প্রেমের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা ক্ষুদ্র মানবের সাধ্যাতীত। তাহার আস্বাদনে সমর্থ ছিলেন—ব্রজের গোপীগণ, ও তাঁহাদেরই কৃপাপ্রাপ্ত বৈষ্ণবগণ। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব, মীরাবাঈ—এ প্রেমের আস্বাদন-লাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। বিল্বমঙ্গলও এই প্রেম আস্বাদন করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। এ প্রেমের অধিকারী হইতে হইলে বহু জন্মান্তরীন সাধনার এবং ভগবৎকৃপার একান্ত প্রয়োজন। সুখের বাসনা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবা লাভ করিতে পারিলেই এই প্রেমের উদয় হয়, তৎপূর্ব্বে তাহা হইবার নহে। সমস্ত বাসনা ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলেই তাঁহার কৃপাধিকারী হওয়া যায়, এবং তৎপরে সাধনা-দ্বারা ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে আরোহণ করিলে এই প্রেম লাভ হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এই স্তরের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর। ভগবদ্-কৃপায় যাঁহার অনাদি বহির্মুখ-বৃত্তি অন্তর্মুখী হয়, তিনিই সাধুসঙ্গ করেন। সাধুসঙ্গে ক্রমে শ্রদ্ধা, রতি, ভক্তি, ভাব, প্রেম,—তৎপরে মহাভাব লাভ হইতে পারে। এই মহাভাবই প্রেমের চরমোৎকর্ষ। শ্রীচরিতামৃতের ২৩শ পরিচ্ছেদে ইহা বিশদ ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রেম বলিতে একমাত্র ভগবৎ-প্রেমই বুঝায়। জাগতিক কোনও ভালবাসা, ভগবদতিরিক্ত কোনও বস্তু বা জীবের প্রতি আকর্ষণ—প্রেম নামে অভিহিত হইতে পারে না।

প্রেম হ্লাদিন্যাংশপ্রধান শুদ্ধ সত্ত্বের বৃত্তি-বিশেষ। সুতরাং প্রেম চিদ্বস্তু। এজন্য জাগতিক জীবের প্রাকৃত মনে ইহার আবির্ভাব হইতে পারে না। সাধনপ্রভাবে শ্রীভগবানের কৃপায় যখন জীবের মন হইতে সমস্ত কামনা বাসনা তিরোহিত হয়, যখন ভুক্তি-মুক্তিবাঞ্ছারূপ পিশাচী জীবের হৃদয় হইতে বিদূরিত হয়, তখনই জীবের চিত্তে প্রেমোদয় হইতে পারে, তৎপূর্ব্বে নহে।

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদিবর্ত্ততে।
তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

অর্থাৎ যে-পর্য্যন্ত ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহা থাকিবে, সে-পর্য্যন্ত ভক্তিরাণীরই আবির্ভাব হইতে পারে না, প্রেম ত দূরের কথা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বাঞ্ছা আদি সব॥
তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণ-ভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥

মোক্ষবাঞ্ছা থাকিলে ভক্তিরাণীর আবির্ভাব হওয়া দূরের কথা, তিনি সাধকের হৃদয়ে পূর্ব্বে উদিত হইয়া থাকিলে মোক্ষবাঞ্ছার আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গেই অন্তর্হিত হইয়া

থাকেন। জীবের প্রধান ইচ্ছা—মোক্ষপ্রাপ্তি। কিন্তু মোক্ষ অন্যের চরম লক্ষ্য হইলেও, বৈষ্ণবের অর্থাৎ ভক্তের নিকট তাহা অতি তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর সামগ্রী। ভক্ত চিরদিনই দাস। কৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তিই তাঁহার চরম উদ্দেশ্য। শ্রীচরিতামৃত বলেন,—

কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দ-সিন্ধু।
কোটি ব্রহ্মানন্দ নহে তার এক বিন্দু॥

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

সালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্য সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

তথাহি— মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি চতুষ্টয়ং।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্॥

শ্রীচরিতামৃত আরও বলেন,—

আর শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণপ্রেম সেবা বিনে।
স্ব-সুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে॥

পঞ্চ বা চতুর্ব্বিধ মুক্তিই মাত্র স্ব-সুখবাসনাময়ী; সুতরাং ভক্ত তাহা গ্রহণে অনিচ্ছুক। তাঁহার একমাত্র কাম্য শ্রীকৃষ্ণ-চরণকমলের সেবা। তিনি তাহাই চাহেন। সেই জন্য তাঁহার আনন্দ ব্রহ্মানন্দ হইতেও অশেষ গুণ অধিক। 'রসং হেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি'—আনন্দপ্রাপ্তিই জীবের জন্ম-জন্মান্তরীণ সাধনা। আনন্দই জীবের একমাত্র লক্ষ্য। সুতরাং আনন্দের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ না করিয়া মাত্র তাহার সানুদেশে উপস্থিত হইয়া লাভ কি? ব্রহ্মানন্দ এই আনন্দগিরির সানুদেশে অবস্থিত। সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং ব্রহ্মা পর্য্যন্ত মুক্তিলাভ আশায় শ্রীভগবানের আরাধনা করিয়া যখন তাঁহার কৃপায় শ্রীভগবদ্‌ধর্ম্মলাভ করিলেন, তখন তাঁহার ভক্তিলাভ হইল, মুক্তি-বাসনা দূরে চলিয়া গেল; তিনি কৃষ্ণদাস হইলেন। অনন্ত কোটি ব্রহ্মানন্দের অধীশ্বর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের সেবাধিকার না চায়, এমন জীব কে আছে?

ব্রহ্মজ্ঞান জীবের চরম জ্ঞান হইলেও তাহাতে মাত্র আনন্দস্বরূপ হওয়া যায়; কিন্তু আনন্দস্বরূপ হইয়াও লাভ নাই—'লব্ধানন্দী'—অর্থাৎ আনন্দাস্বাদনে সক্ষম হওয়া চাই। আনন্দস্বরূপ হইলে এই আনন্দ আস্বাদন করা যাইবে কিরূপে? সুতরাং ভক্ত এই আনন্দ চাহেন না। তিনি চাহেন আনন্দ-আস্বাদন। আস্বাদন করিতে হইলে দ্বিতীয় বস্তুর প্রয়োজন। স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইয়া আনন্দ-আস্বাদন করা যায় না—আর ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মের তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া জীব আনন্দ-নিমগ্নতার স্ফূর্ত্তিতেই বিভোর হইয়া থাকে। ভগবল্লক্ষণানন্দ স্ফূর্ত্তিরেব প্রধানম্—(প্রীতিসন্দর্ভঃ) অন্য কোনও ভাব তাহার চিত্তে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না; সুতরাং তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের জ্ঞান বা স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য ভগবৎসেবার অনুসন্ধানও তাহার চিত্তে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না, সাধারণতঃ উদিতও হয় না। কিন্তু যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারা চাহেন ভগবানের সেবা; সেবা করিতে হইলে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব জ্ঞান প্রয়োজনীয়। এই স্বতন্ত্র অস্তিত্বের স্ফূর্ত্তি এবং সেবানুসন্ধানই ভক্তের কাম্যবস্তু। তাই কোন ভক্তই সাযুজ্য মুক্তি ইচ্ছা করেন না। ভগবান্ দিতে চাহিলেও তাহা গ্রহণ করেন না (দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি—ভাগবত); কারণ, তাহাতে সেবানুসন্ধানের জ্ঞান বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। সাযুজ্য দুই প্রকার—ব্রহ্মসাযুজ্য ও ঈশ্বরসাযুজ্য। যাঁহারা ব্রহ্মসাযুজ্য গ্রহণ করিবেন না তাঁহারা যে ঈশ্বরসাযুজ্য চাহিবেন না, তাহা বলাই বাহুল্য।—"ব্রহ্মসাযুজ্য হইতে ঈশ্বরসাযুজ্যে ধিক্কার।"—(চৈঃ-চঃ, মধ্য, ৬।৪২)

স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইয়া আনন্দ-আস্বাদন করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ হইলেন আনন্দঘন বিগ্রহ। ভক্ত তাঁহার সেবানন্দ চাহেন। তিনি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া আনন্দস্বরূপ হইতে চাহেন না। ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের জ্যোতিঃ।

সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গকান্তি। (চৈঃ-চঃ)

জ্যোতিঃ যখন আছে; তখন জ্যোতিষ্মান্ এক জন আছেনই। যাঁহার জ্যোতিলাভে আনন্দস্বরূপ হওয়া যায়, তাঁহাকে লাভ করিলে যে কি আনন্দ পাওয়া যাইবে, তাহা বর্ণনা করিবার সাধ্য কাহারও নাই। প্রেম ব্যতীত অন্য কাহারও মধ্য দিয়া এই আস্বাদন সম্ভব নহে, এবং প্রেমের অধিকারী একমাত্র ভক্ত ভিন্ন অন্য কেহই নহেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকায় প্রেমতত্ত্বের ব্যাখ্যায় শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় বলিয়াছেন,—প্রেমের আবির্ভাবের সহিত শ্রীকৃষ্ণে মমত্ববুদ্ধির আধিক্য এবং ভগবত্তাজ্ঞান লুপ্ত হইয়া তাঁহার সহিত মধুর সম্বন্ধ স্থাপিত

হয়। তাই তখন ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা লালায়িত; শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টাশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া পড়েন। শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় বিষয় ব্যতীত অন্য কোনও ব্যাপারেই তাঁহার আর অনুসন্ধান থাকে না। ধ্বংসের কারণ উপস্থিত হইলেও এই প্রেমবন্ধন ছিন্ন হয় না। এই প্রেম যতই গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়, ততই শ্রীকৃষ্ণে মমত্ব-বুদ্ধি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণকে প্রীত করিবার চেষ্টায়ও অন্যাপেক্ষা ক্রমশঃ দূরীভূত হইতে থাকে। প্রেমের গাঢ়তম অবস্থায় বেদধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম, স্বজন, আর্য্যপথাদির, এবং সর্ব্ববিধ সম্বন্ধের অপেক্ষা তিরোহিত হইয়া যায়। ভক্ত তখন নিজাঙ্গ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া তাঁহার প্রীতি-বিধানের চেষ্টা করিয়া থাকেন। প্রেমের উদয়ে সাধকের অষ্ট সাত্ত্বিক-বিকার উপস্থিত হয়। স্তম্ভ, স্বেদ, পুলক, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, মূর্চ্ছা—এই কয়টি ক্রমান্বয়ে, কখনও কখনও বা যুগপৎ সাধকের দেহে উপস্থিত হয়। প্রেমের উদয়ে যে কি অবস্থা হয়, তাহা শ্রীগৌরসুন্দর জগতকে দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি যখন নৃত্য করিতে করিতে প্রেমে অশ্রুপাত করিতেন, তখন তাঁহার চতুর্দ্দিকস্থ লোক তাঁহার নয়ন-সলিলে অভিষিক্ত হইত। তাঁহার যখন রোমাঞ্চ হইত, তখন তাঁহার লোমকূপসমূহ পনসের ত্বকের ন্যায় কণ্টকিত হইত। যখন বৈবর্ণ্য উপস্থিত হইত, তখন গৌরবর্ণ কালি হইয়া যাইত। প্রেমোদয়ে আরও অনেক অদ্ভুত অবস্থার উৎপত্তি হয়। তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিতে অনেক স্থানের প্রয়োজন। শুধু এইটুকু বক্তব্য যে, প্রেমে মহাপ্রভুর হস্তপদাদির গ্রন্থি শিথিল হইয়া ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডল তনু (চারি হস্ত পরিমিত দেহ) দৈর্ঘ্যে ছয় হস্ত পরিমিত হইত। কখনও কখনও কূর্ম্ম বা কুকর আকৃতিবৎ সঙ্কুচিত হইয়া যাইত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আলোচনায় ইহার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। এই প্রসারণ ও সঙ্কোচন সম্বন্ধে একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। দ্বারকায় এক দিন শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীগণের অনুরোধে শ্রীরোহিণীমাতা তাঁহাদিগকে বৃন্দাবন-লীলা বর্ণনা করিয়া শুনাইতেছিলেন। দ্বারে শ্রীমতী সুভদ্রা দ্বারী ছিলেন—পাছে শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন, ও মাতাকে লজ্জিত হইতে হয়। কারণ, শ্রীকৃষ্ণলীলা-কথার এতই আকর্ষণী শক্তি যে, যে স্থানে লীলা-কীর্ত্তন হয়, শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম তথায় উপস্থিত না হইয়া থাকিতে পারেন না। শ্রীরোহিণীমাতার বর্ণনা আরম্ভ হইবার সময় শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম রাজসভায় ছিলেন। বর্ণনা আরম্ভ হইলে তাঁহারা অস্থির হইয়া রাজসভা হইতে অন্তঃপুরাভিমুখে ধাবিত হইলেন; কিন্তু দ্বারে আসিয়া দেখিলেন—সুভদ্রা দেবী দ্বারী হইয়া দ্বার-রক্ষা করিতেছেন! তাঁহার নিকটে তাঁহারা শুনিতে পাইলেন—মাতার নিষেধ, তাঁহাদের ভিতরে প্রবেশ করিবার অনুমতি নাই। সুতরাং উভয়েই দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন। দুই ভ্রাতা দুই দিকে, মধ্যস্থলে সুভদ্রা দেবী। এই অবস্থায় তিন জনেই লীলা-বর্ণনা শুনিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ প্রেমাতিশয্যে তিন জনেরই হস্তপদাদি সঙ্কুচিত হইয়া দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করায় চক্ষু গোলাকৃতি, এবং আকৃতি খর্ব্ব হইল। সুদর্শন গলিয়া লম্বমান হইলেন। এমন সময় স্বচ্ছন্দগতি নারদ স্বেচ্ছাক্রমে তথায় উপনীত হইলেন, ও এই মূর্ত্তি-দর্শনে বিস্ময়াপ্লুত হইয়া স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তৎপরে বর্ণনা শেষ হইলে ক্রমশঃ তিন জনেরই পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া আসিল। নারদকে সম্মুখে দেখিয়া শ্রীভগবান্ আনন্দে তাঁহাকে বরদান করিতে চাহিলে নারদ বলিলেন,—"প্রভো! আপনার এই প্রেমঘন মূর্ত্তি জগতে প্রচার করুন।"—শ্রীভগবান্ও 'তথাস্তু' বলিয়া নীলাচলে দারুব্রহ্মরূপে প্রেমের এই ঘনীভূত মূর্ত্তি প্রচার করিতে স্বীকৃত হইলেন। ইহাই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মূর্ত্তির ইতিহাস। সে মূর্ত্তি প্রেমের ঘনীভূত মূর্ত্তি, প্রেমের জাজ্বল্যমান নিদর্শন।

প্রেম ক্রমশঃ স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, ভাব ও মহাভাবে পরিণত হয়। তন্মধ্যে মাদন নামক মহাভাবেই সমস্তগুলি স্তরের একত্র সমাবেশ হয়। এই মাদনাখ্য মহাভাব শ্রীমতী রাধিকারই নিজস্ব সম্পত্তি। লীলার আধার স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেও এই ভাব নাই। জীব সাধনমার্গে যতই উন্নতি লাভ করুক না কেন, প্রেম পর্য্যন্ত লাভে সমর্থ হয়। স্নেহ, মান, প্রণয়াদি জীবদেহে সম্ভব নহে; তবে দেহান্তে শ্রীভগবানের নিত্যলীলার আবির্ভাব, জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া এই ভাবের অধিকারী হওয়া যায়।

শ্রীঅচ্যুতানন্দ রায় (বি-কম)।

মাধ্যমিক শিক্ষা-বিল

কোয়ালিশন দলের অধিক সংখ্যক বাঁধা-ভোটের দৌলতে মাধ্যমিক শিক্ষা-বিলখানি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে সিলেক্ট কমিটীর হস্তে প্রদানের প্রস্তাব ফাঁসিয়া গিয়াছে। এইরূপ হইবে, ইহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যেখানে যুক্তির কোন মূল্য নাই,—সার্ব্বজনীন কল্যাণ সম্বন্ধে কোন চিন্তা নাই,—কেবল এক সম্প্রদায়ের বাঁধা-ভোটের আধিক্যে অন্য সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির এবং শিক্ষার বনিয়াদ বিধ্বস্ত করা অনায়াসসাধ্য—সেখানে এইরূপই হইয়া থাকে। সাম্প্রদায়িকতা এমন একটা জঘন্য বস্তু যে, উহা জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ, মানুষের সার্ব্বজনীন কল্যাণ চিন্তার পথ পর্য্যন্ত অর্গলরুদ্ধ করে। সেই জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এই বিলখানির বিক্ষিপ্ত ভাবে সংশোধনের ফলে উহার অনিষ্টকারিতার গতিরোধ হইবে না। শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল, এই বিলখানি সম্বন্ধে সচিব-দলের সহিত বিরোধী-দলের একটা রফার চেষ্টা হইতেছিল। কখন শুনি, রফা হইল না,—হইবার সম্ভাবনাও নাই,—আবার কখনও শুনি, রফার জন্য আর এক দফা চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু রফা হইয়াছে, এরূপ কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই; সুতরাং রফা হয় নাই বলিয়াই মনে হইতেছে। এই বিলখানির বিরুদ্ধে বাঙ্গালার সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুরাই আন্দোলন করিতেছেন। বিলখানি যদি আইনে পরিণত করিয়া তদনুসারে কাজ হয়, তাহা হইলে হিন্দুর সংস্কৃতি ও কল্যাণ বিলুপ্ত হইবে, এবং সাম্প্রদায়িক বিভেদ চিরদিনের জন্য জাগাইয়া রাখা হইবে। অনেকে মনে করিতেছেন, বিলখানি সাম্রাজ্যবাদীদিগের একটা ফন্দী মাত্র। বিলখানি লইয়া ব্যবস্থা পরিষদে অনেক তর্ক-বিতর্ক হইয়া গেল; যদি সত্য সত্যই রফার চেষ্টা হইত, তাহা হইলে ঐ সম্বন্ধে তর্ক বন্ধ থাকিত। রফার আশায় বিরোধী পক্ষ তর্ক-বিতর্ক কালে কোনরূপ শৈথিল্য প্রকাশ করিতেছেন কি না, তাহা বুঝা যাইতেছে না—কিন্তু সচিবদল বিলখানি পাশ করিবার জন্য আদা জল খাইয়া লাগিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা জিদ-প্রকাশে বিন্দুমাত্র শিথিলতা প্রদর্শন করেন নাই। সুতরাং রফার আশায় জলাঞ্জলি দিতে হয়। তবে ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন বন্ধ হইয়া গিয়াছে; এবং বিলখানি এখন ত্রিশঙ্কুর ন্যায় মধ্য-আকাশে ঝুলিতেছে। বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন এখনও বন্ধ হয় নাই। সম্প্রতি এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি বিলখানি সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতির অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে; বিলখানিতে তাহার সংশোধনের চেষ্টা করা হয় নাই। কেবল উহার বাহিরের কাঠামোখানি বজায় রাখিয়া তাহার ভিতর সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি গজাইয়া তুলিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ফলে বঙ্গদেশে সাম্প্রদায়িক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার আশা বিলুপ্ত-প্রায়। বাঙ্গালায় অতঃপর অশান্তির কালানল আরও প্রচণ্ড বেগে জ্বলিয়া উঠিবে। ইহাতে লাভ হইবে কাহার? বিবদমান কোন পক্ষেরই ত লাভ হইবেই না, আর যে কয় জন শকুনি আত্মগোপন করিয়া এই কার্য্যে প্রেরণা দিতেছে, তাহাদেরও কোন ইষ্ট-সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। অবশেষে সকলকেই পস্তাইতে হইবে।

মিঃ ফজলুল হকের পদত্যাগ?

মৌলভী ফজলুল হক ভাগ্যবান্ পুরুষ। তিনি বড় লাটের অনুরোধে জাতীয় দেশ-রক্ষা পরিষদের সদস্য হইয়াছিলেন। সেই জন্য মোস্লেম লীগের সভাপতি মিষ্টার মহম্মদ আলি জিন্না তাঁহাকে প্রাদেশিক মোস্লেম লীগের সভাপতিত্ব ত্যাগ করিতে বলেন। মিঃ হক বিবেচনার জন্য দশ দিনের সময় লইয়াছিলেন। শেষে এক গুজব রটিল বা রটান হইল যে, তিনি প্রধান-সচিবের পদ ত্যাগ করিবেন এবং সেই জন্য তিনি লাট সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। সংবাদটি শুনিয়াই মনে হইয়াছিল,—'শিলা জলে ভেসে যায়, বানরে সঙ্গীত গায়, দেখিলেও না হয় প্রত্যয়।'—এই কবিবাক্য নিষ্ফল হইবে না; অর্থাৎ যাহা অসম্ভব, তাহা সম্ভব হইবে না—

মিঃ হক হকাই সচিবসঙ্ঘের প্রধান-সচিবের পদে কদাচ ইস্তফা দিবেন না। ফলে ঠিক তাহাই হইয়াছে; তিনি দেশরক্ষা কাউন্সিলের সদস্য-পদ ছাড়িয়া দিয়াছেন, আরও ছাড়িয়া দিয়াছেন মোস্লেম লীগের কার্য্যকরী সমিতির সদস্য-পদ, এবং 'বোঝার উপর শাকের আটির' মত উহার কাউন্সিলের সদস্য-পদ। ধরিয়া রাখিয়াছেন—প্রধান-সচিবের পদ, আর মোস্লেম লীগের সাধারণ সদস্য-পদ। এ সম্বন্ধে তিনি বাঙ্গালার লাটের সহিত কোন পরামর্শ করিয়াছেন কি না, তাহা সাধারণের অজ্ঞাত; তবে তিনি দুই-এক জন বে-সরকারী ইংরেজ সদস্যের সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। এই পরামর্শদাতা যাঁহারাই হউন, তাঁহারা যে পাকা পরামর্শদাতা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এখন জিজ্ঞাস্য, সকল প্রধান-সচিবই কি মোস্লেম লীগের সদস্য হিসাবে তাঁহাদের ভোটদাতাদিগের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন? সকলেই জানেন, মৌলভী ফজলুল হক নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে মোস্লেম লীগের তরফের সদস্য পদপ্রার্থীকে পরাজিত করিয়া ব্যবস্থা পরিষদে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তবে তিনি যে পরে মোস্লেম লীগের এক জন মাতব্বর সদস্য হইয়াছেন, সে কি প্রধান-সচিবত্বেরই মোহে নহে? এ অবস্থায় তিনি ন্যায়তঃ মোস্লেম লীগের বিধাতা-পুরুষ জিন্না ছায়েবের বেজাবেদা আদেশ পালনে বাধ্য বলিয়া মনে হয় না। আবার ভারত-সচিব এবং বড় লাট উভয়েই ঘোষণা করিয়াছেন যে, প্রধান-সচিব তিন জনকে প্রধান-সচিব বলিয়াই দেশরক্ষা পরামর্শ-সমিতির সদস্য করিয়া লওয়া হইয়াছে; অর্থাৎ তাঁহারা মুসলমান বলিয়া তাঁহাদিগকে ঐ পদে বরণ করা হয় নাই। তাঁহারা যদি প্রধান-সচিবের পদ ত্যাগ করেন, তাহা হইলেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের দেশরক্ষা কাউন্সিলের সদস্য-গিরিও ঘুচিয়া যাইবে। যাঁহারা তাঁহাদের স্থানে প্রধান-সচিব হইবেন, তাঁহারা হিন্দুই হউন, মুসলমানই হউন, আর খৃষ্টানই হউন, তাঁহারাই ঐ কাউন্সিলের সদস্য হইবেন। অর্থাৎ ঐ দুইটি পদ একই সূত্রে গ্রথিত। সুতরাং দেশরক্ষা কাউন্সিলের সদস্য-পদ ছাড়িয়া দিলে তাঁহাদের ত প্রধান-সচিব থাকা চলে না। অথচ কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে, তাহাই হইতেছে।

আবার কংগ্রেসের মন্ত্রীরা যখন কংগ্রেসের আদেশে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন দৃপ্ত বৃটিশ-কেশরীর হুঙ্কারে চরাচর কম্পিত হইয়াছিল; অথচ যখন মোস্লেম লীগ কংগ্রেসের মত সচিবত্ব ছাড়িতে বলিলেন, তখন কেশরীর একটি কেশরও কম্পিত হইল না,—সবটাই বেমালুম হজম হইয়া গেল; তাহার পর গত ২৫শে ভাদ্র ভারত-সচিব বৃটিশ কমন্স সভায় যাহা বলিয়াছেন—তাহা পাঠ করিলে কাহারও সন্দেহ নিরস্ত হয় না। আমরা এস্থলে তাহার আলোচনা করিব না। যখন যোতের বন্ধন মুক্ত করা হইল, দেশরক্ষা কাউন্সিলের সদস্য-পদ পরিহার করিলেও যখন প্রধান-সচিবত্ব অক্ষুণ্ণ রহিল, তখন হক ছাহেব যাহা করিয়াছেন, তাহা অবশ্য ভালই করিয়াছেন। সচিবের মোটা বেতনটাও ঘরে আসিবে,—লোকের সেলাম ও সম্মানও আদায় হইতে থাকিবে,—তাহার উপর বেসরকারী সদস্য য়ুরোপীয়দিগকে খুসী রাখাও চলিবে। এক ঢিলে তিন পক্ষীই মরিবে। দেশরক্ষা কাউন্সিলে থাকিলে এ সকল কোন লাভের সম্ভাবনাই নাই। অতএব ব্যবস্থা ঠিকই হইয়াছে। কিন্তু সরকারের সম্ভ্রম (prestige) ইহাতে কোথায় গিয়া পৌছিল, তাহা সরকারের অজ্ঞাত থাকিবার সম্ভাবনা আছে কি?

সত্যনিষ্ঠা বটে!

কথিত আছে, রাজনীতি-ক্ষেত্রে কোন কাজ অন্যায় বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। প্রতারণা দ্বারা কার্য্যোদ্ধার রাজনীতিকের পক্ষে নিন্দনীয় নহে। বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সভায় সেই জন্য বাঙ্গালার সচিবসঙ্ঘ ফাঁকতালে পাকিস্থান-প্রস্তাব পাশ করিয়া লইয়াছেন। এক দিন রাষ্ট্রীয় সভায় সভাপতি অনুপস্থিত ছিলেন,—সেই জন্য এক জন মুসলমান মহিলা সভাপতির কার্য্য সম্পাদন করেন। সদস্যগণেরও অনেকে সভায় অনুপস্থিত ছিলেন! সেই শুভক্ষণে রাষ্ট্রীয় সভা এক প্রস্তাবের সংশোধনচ্ছলে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব পাশ করিয়া লইয়াছেন যে, লাহোরে গত বৎসর মোস্লেম লীগের যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল, সেই প্রস্তাব অনুসারে ভবিষ্যতে যেন ভারতবর্ষের শাসন-যন্ত্র গঠিত হয়। লাহোরের সেই প্রস্তাবটি ছিল—পাকিস্থান সম্পর্কে। সুতরাং বঙ্গীয় কাউন্সিল

অব ষ্টেটে ফাঁকতালে পাকিস্থান প্রস্তাব গৃহীত হইল। সাম্প্রদায়িক ভাবে ভোরপুর কতকগুলি মুসলমান ভিন্ন আর সকলেই এই আচরণের নিন্দা করিতেছেন। কৃষক-প্রজাদলের মুখপত্র মুসলমান-সম্পাদিত 'কৃষক' পত্রিকা এইরূপ ফন্দির নিন্দা করিতেছেন। কেবল সচিব-দলের সমর্থক য়ুরোপীয়রা বিশেষ কোন কথা বলিতেছেন না। সমাজ-নীতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ কোন বিশিষ্ট ইংরেজ লেখক লিখিয়াছেন,—লোকের বিশ্বাস, প্রতারণাই কূট-রাজনীতির সার ভাগ (deceit is the essence of deplomacy)। এই সার ভাগ, নীর ত্যাগ করিয়া ক্ষীরের ন্যায় গ্রহণযোগ্য; এবং তাহা গ্রহণেই কূট-রাজনীতিতে অভিজ্ঞতা প্রকাশ পায়। এ বিদ্যায় বাঙ্গালার মুসলমান সচিবসঙ্ঘ দড় হইতেছেন কি না, তাহাই দ্রষ্টব্য।

বাঙ্গালার সময় প্রবর্ত্তন

কলিকাতায় দীপনির্ব্বাণ কার্য্য চলিতেছে বলিয়া সন্ধ্যার পর রাস্তায় যাহাতে ভীড় অল্প হয়, সে জন্য বাঙ্গালা সরকার গত ১৪ই আশ্বিন হইতে সরকারী আফিসের কার্য্য করিবার সময় 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইমের' এক ঘণ্টা আগাইয়া দেওয়ার আদেশ করিয়াছেন; অর্থাৎ 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড' ৯টার সময় ঘড়িতে ১০টা বাজাইতে হইতেছে; আর সেই সঙ্গে আফিসে ছুটিবার জন্য 'সাজ সাজ' রব পড়িয়া গিয়াছে। লোকের যাহাতে অসুবিধা হয়, বাঙ্গালা সরকারের সচিব-দল তাহাই করিবার জন্য অদ্ভুত তৎপরতা দেখাইতেছেন! দীপ-নির্ব্বাণ ব্যবস্থা ত কিছু দিন ধরিয়াই চলিতেছে; কিন্তু সে জন্য কেহ কি খানিক সকালে আফিস বন্ধ করিবার জন্য দরখাস্ত পেশ করিয়াছে? আমাদের মনে হয়, দীপ-নির্ব্বাণের সময়টা ঘণ্টা-খানেক পিছাইয়া দিলেই চলিত, কিংবা আফিসের খাটুনির সময় কিছু কমাইয়া দিলেও চলিত। চারিটার সময় আফিস বন্ধ করিলে কিছুই বলিবার থাকিত না। আসিবার সময় আগাইয়া দেওয়ায়, যাঁহাদিগকে মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় আফিস করিতে আসিতে হয়, তাঁহাদের দারুণ অসুবিধা হইতেছে। অনেককে প্রত্যূষে উঠিয়াই তাড়াতাড়ি দু'মুঠো ভাত নাকে-মুখে গুঁজিয়া ট্রেণ ধরিবার জন্য দৌড়াইতে হইতেছে। এ অবস্থায় আফিসের খাটুনির সময় কিছু কমাইয়া দিলেই সঙ্গত হইত না কি? ট্রেণগুলির সময়ও এই সঙ্গে বদলাইতে হইয়াছে; কিন্তু এখনও দেখা যাইতেছে—সওদাগরী আফিসগুলি সেই সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্তই খোলা রাখা হইয়াছে; ফলতঃ কেবল গরিব কেরাণীদিগের খাটুনির সময়টাই এক ঘণ্টা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। সচিব-দলের প্রাণ কাহাদের জন্য কাঁদে, ইহাতে তাহা কি বুঝিতে পারা যাইতেছে না?

নূতন আইন

যুদ্ধের মধ্যে ভারত-শাসন সম্বন্ধে নূতন আইন রচিয়া বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধের সময় ভারতীয় প্রদেশগুলির নির্ব্বাচন বন্ধ রাখা হইবে। ইহা একটা মস্ত অসুবিধার কথা। কিন্তু কংগ্রেস এ-সম্বন্ধে একটিও বাক্যব্যয় করিতেছেন না,—ইহার একটা কৈফিয়ৎ কংগ্রেস দিয়াছেন। নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীর সাধারণ সেক্রেটারী আচার্য্য কৃপালনী বলিয়াছেন,—"কংগ্রেস যখন সরাসরি সরকারের উপর চাপ দিতেছেন, তখন তাঁহারা সরকারের এই সকল ছোট-খাট কাজ লইয়া মাথা ঘামাইতে চাহেন না।" কংগ্রেস নামেমাত্র সরকারের উপর সরাসরি চাপ (direct action) দিতেছেন সত্য,—কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা অন্য বিষয়ে কথা বলিতেছেন না,—তাহা নহে। আমেরীর বক্তৃতা সম্বন্ধে ত তাঁহারা অনেক কথা বলিয়াছেন,—তবে এই সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশেই তাঁহাদের বাক্‌রোধ হইল! সরাসরি কাজ করিলে কি আর কথা বলা চলে না?

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গান্ধীজী

'সর্ব্বোদয়' নামক একখানি হিন্দী পত্রিকায় গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি সন্দর্ভ লিখিয়াছেন। সেই সন্দর্ভে তিনি বলিয়াছেন যে, "গুরুদেব ভারতের ভিতর দিয়া পৃথিবীর মানব জাতির উপকার করিবার বাসনা করিয়াছিলেন, আর সেই কার্য্য করিতে করিতেই তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার নশ্বর দেহ আর নাই,—কিন্তু তাঁহার অবিনশ্বর আত্মা রহিয়াছে। সকলেরই তাহা থাকে। সুতরাং কেহ মরেও না, জন্মেও না। গুরুদেব যে ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন

তাহাতে তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য স্পষ্টই প্রকাশ পায়। তাঁহার ভাব সার্ব্বজনীন, কিন্তু বেশীর ভাগ পারমার্থিক। সেই জন্য তিনি অবিনশ্বর হইয়া থাকিবেন। শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন এবং বিশ্বভারতী তাঁহার কার্য্যের বহিঃ-প্রকাশ। ঐগুলিই তাঁহার জীবনের সারাৎসার; উহার জন্যই দেশবন্ধু এণ্ডরুজ এই পৃথিবী হইতে প্রয়াণ করিয়াছেন এবং তিনিও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। তাঁহার ঐ তিনটি প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করিলেই তাঁহার প্রতি আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন করা হইবে। তিনি যেখানেই থাকুন, তথা হইতেই তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানত্রয়কে লক্ষ্য করিতেছেন।” কথা যথার্থ। ইহার উপর মন্তব্য প্রকাশ অনাবশ্যক। গুরুদেবের প্রতি গান্ধীজীর ভক্তি-শ্রদ্ধা তাঁহার এই সকল মন্তব্যেই সুপ্রকাশ।

আমদানী-নিয়ন্ত্রণ

যুদ্ধের সময় সরকার বিদেশ হইতে ভারতে পণ্য আমদানী-নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহারা আবার এই নিয়ন্ত্রণের ব্যাপকতা বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইণ্ডিয়া গেজেটের অতিরিক্ত সংস্করণে তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে। উদ্দেশ্য সেই একই। মার্কিণ হইতে অধিক পণ্য আমদানী করিলে ডলারের মূল্য বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইবে। নূতন ইস্তাহারে নিয়ন্ত্রিত বস্তুজাতের ব্যাপকতা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ভারত সরকার নিয়ন্ত্রিত বস্তুগুলিকে ক এবং খ এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। 'ক' নামক তালিকার দ্রব্যগুলি পূর্ব্বে নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছিল, 'খ' তালিকায় কতকগুলি নূতন জিনিসের নাম যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে শ্রমশিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কলকব্জা ও অন্যান্য জিনিসের উপর উহা নূতন করিয়া নিয়ন্ত্রণ করা হইতেছে। ভারতবাসীর পক্ষে এখন মার্কিণ ভিন্ন অন্য কোন দেশে এই সকল দ্রব্যের বায়না দিবার আর স্থান নাই; অথচ মার্কিণ হইতে অধিক পণ্য ভারতে আমদানী করিতে গেলেই ডলারের মূল্য-বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইবে। সমস্যাটি বড়ই জটিল। কিন্তু আমাদের কথা এই যে, মার্কিণ হইতে কলকব্জা আমদানী সঙ্কুচিত বা বন্ধ করিয়া দিলে ভারতে শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠার পথে প্রবল বাধা উপস্থিত হইবে; বিশেষতঃ, ভারতে মার্কিণ হইতে এত অধিক কলকব্জা প্রভৃতি আমদানী হইবে না যে, তাহার ফলে মার্কিণী ডলারের বিনিময়-মূল্য বিশেষ ওলট্-পালট্ হইবে। এখন ত মুদ্রা ধাতুগত নহে, উহা কাগজের। সেই জন্য উহার বিনিময়-মূল্য ব্যবস্থা পূর্ব্বক কিছু নিয়ন্ত্রিত করা যায়। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আর এখানে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে ইদানীং সরকারের কতকগুলি কার্য্যফলে ভারতে শ্রমশিল্প রক্ষার এবং বিস্তৃতি-সাধনে বিশেষ বাধা ঘটিবে বলিয়া আশঙ্কা অকারণ নহে।

বর্ত্তমান যুদ্ধে পোপের অভিমত

গত ১লা আশ্বিন মার্কিণের নিউ ইয়র্ক হইতে প্রেরিত সংবাদে এ দেশে প্রকাশ, পোপ নাজী-বিরোধী সংগ্রামকে ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম বলিয়া ঘোষণা করিতে অসম্মত হইয়াছেন। উক্ত সংবাদে প্রকাশ, মার্কিণের প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট তাঁহার খাসের দূত মাইরন্ টেলরের মারফতে পোপকে একখানি পত্র লিখিয়া নাজীবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম বলিয়া ঘোষণা করিতে অনুরোধ করেন। প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট পোপকে যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, তাহা সুদীর্ঘ এবং তাহাতে লেখকের হৃদয়ানুরাগ সুপরিস্ফুট। উহাতে তিনি বলিয়াছেন, যুদ্ধের পর মার্কিণ রুশিয়ায় ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। পোপ তাহার উত্তরে নাজীবাদের সমর্থনে একটি কথাও বলেন নাই। তবে পোপ তাহার উত্তরে যে দীর্ঘতর পত্রখানি লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্টকে অনেক প্রীতি-পূর্ণ কথা বলিয়াছেন। পোপ একটা মহা সমস্যায় পড়িয়াছেন। তিনি “কোন পক্ষই অবলম্বন করিতে পারেন না। ইহা ভিন্ন তিনি তাঁহার বিশ্বাসগত মতের হিসাবে কোন যুদ্ধকেই ন্যায়সঙ্গত বলিতে পারেন না।” সংবাদটি মার্কিণের 'নিউ ইয়র্ক টাইম্‌সে' প্রকাশিত হইয়াছে। সংবাদটি সত্য বলিয়াই মনে হয়। পোপের জবাবটি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইলে তাঁহার মনোভাব সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যাইত। তিনি যদি ধর্ম্মবিশ্বাস অনুসারে সংগ্রামমাত্রকেই অন্যায় এবং দুর্নীতিদ্যোতক মনে করেন, তাহা হইলে তাহা অনেকটা গান্ধীজীর মতানুযায়ী

বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে। হিংসা কখনই ধর্ম্ম-নীতিসঙ্গত হইতে পারে না ; উহা পশুত্বেরই অভিব্যক্তি। তবে যেখানে পশুপ্রকৃতির লোক পশুবলে অন্যের উপর অত্যাচার করে, আর যেখানে তাহাকে অন্য উপায়ে নিবৃত্ত করা যায় না,—সেখানে যদি বাধ্য হইয়া যুদ্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে কি তাহাকে ধর্ম্মযুদ্ধ বলা সঙ্গত নহে ?

নূতন জাতিসঙ্ঘ

পুরাতন জাতিসঙ্ঘ লোকের বিশ্বাস হারাইয়াছে। কাজেই এবার মিত্রশক্তিবর্গের আর একটি নূতন জাতিসঙ্ঘ গঠিত হইতেছে। গত ৩১শে ভাদ্র ইংলণ্ড হইতে ভারতে এই সংবাদ প্রেরিত হইয়াছে যে, সেখানে মিত্রশক্তিবর্গের একটি জাতিসঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে। এই জাতিসঙ্ঘ বর্ত্তমান য়ুরোপকে নব ভাবে গঠিত করিবে। এই প্রতিষ্ঠানের সরকারী নাম হইল—"লণ্ডনের আন্তর্জ্জাতিক পরিষদ।" ইহার উদ্দেশ্য বিশেষ আড়ম্বর সহকারে বিবৃত হইয়াছে। যে সকল জাতি নাজী-ফ্যাসিষ্টদিগের সহিত বিরোধিতা করিয়া বৃটিশ জাতির সহায়তা করিতেছেন, তাঁহাদিগের ইতিহাস, আর্থিক অবস্থা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, জীবনোপায়, এবং জাতীয় জীবনের আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথা ইহাতে বিশেষ ভাবে পর্য্যালোচনা করা হইবে, এবং যুদ্ধের পর কিরূপ নীতি অবলম্বনেই বা পুনর্গঠন করিতে হইবে, তাহাও ধার্য্য করা হইবে। ভাইকাউণ্ট সিসিল ইহার সভাপতি হইয়াছেন। সহ-সভাপতি অধুনা জার্ম্মাণী-নির্জ্জিত কয়েকটি রাজ্যের প্রতিনিধি। এই সমিতির সভ্য হইবার জন্য অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, ভারত, নিউজিল্যাণ্ড, গ্রেট্ বৃটেন, বেলজিয়ম, চীন, জেকোশ্লোভাকিয়া, স্বাধীন ফ্রান্স, গ্রীস্, হল্যাণ্ড, নরওয়ে, পোল্যাণ্ড, দক্ষিণ-আফ্রিকা, মার্কিণ যুক্তসাম্রাজ্য, রুশিয়া, এবং জুগোশ্লোভিয়াকে আমন্ত্রণ করা হইবে।—রয়টারের সংবাদে এইটুকুই প্রকাশ। তবে ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ভারতের পক্ষ হইতে যাঁহাকে বা যাঁহাদিগকে ইহার সদস্য মনোনীত করা হইবে,—তাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী জাতিসঙ্ঘের সদস্যদিগের ন্যায় ভারতীয় বৃটিশ-সরকার কর্ত্তৃকই মনোনীত হইবেন ; অর্থাৎ তাঁহারা সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রদায়ের ইংরেজ দলেরই মনের মত লোক হইবেন,—এবং কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহারা বৃটিশ জাতিরই মনরাখা কথা বলিবেন,—জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত ভারতবাসীর অনুকূলে কথা বলিবেন না। অন্যান্য রাজ্যের সদস্যরা সেই সকল দেশের অধিবাসী দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন, আর ভারতের 'লম্বসাটপটাবৃতম্' প্রতিনিধিরা বৃটিশ সরকারেরই প্রতিনিধিত্ব করিবেন। এই ব্যবস্থার ফল কিরূপ হয়, তাহা আমরা পুরাতন জাতিসঙ্ঘেই দেখিয়াছি। ইহাকেই পুরাতনের পুনরাবর্ত্তন বলা যায়। তবে ভারতবাসীকে চাঁদা অবশ্যই দিতে হইবে, এবং ভারতবাসীরা অন্যান্য বৃটিশ উপনিবেশের ন্যায় রাজনীতিক্ষেত্রে সমান অধিকার ভোগ করিতেছে,—এই ধারণা বিশ্বময় ছড়াইবার বিলক্ষণ সুবিধা। সুতরাং এই সংবাদে ভারতবাসীর উৎফুল্ল হইবার কারণ ষোল আনাই বর্ত্তমান !

বোম্বাইয়ের বস্ত্র-সমিতি

পূজার কিছু দিন পূর্ব্বে বোম্বাই সহরে সরকারের চেষ্টায় এক সমিতি আহূত হইয়াছিল। এই সমিতিতে সরকারের পক্ষ হইতে বাণিজ্য-সচিব, নূতন নিযুক্ত সংগ্রাম বিভাগের সরবরাহ-সচিব, আর এক দল সরকারী কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন। পক্ষান্তরে বেসরকারী পক্ষে কার্পাস-বয়নশিল্পের সমিতিগুলির কয়েক জন প্রতিনিধি ইহাতে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যুদ্ধের জন্য কার্পাস বস্ত্র এবং সূত্রের টান ধরিয়াছে,—য়ুরোপ হইতেও আর কার্পাস পণ্য তেমন আমদানী হইতেছে না,—জাপান হইতেও ভারতে কাপড় আসিতেছে না। ইহার ফলে যেন কার্পাস পণ্যের মূল্য অযথা ভাবে বর্দ্ধিত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কি উপায়ে এই কার্পাস পণ্যের মূল্য-বৃদ্ধি না হয়, তাহাও এই সমিতির বিবেচনার বিষয় ছিল। অথচ সিদ্ধান্ত কি হইয়াছে, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। কাজে কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, কার্পাস পণ্যের মূল্য দিন-দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে ; ফলে দরিদ্র ভারতবাসীর দারিদ্র্যের ঘটা ইহাতে বেশ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। তাহার উপর বাঙ্গালার সচিবমণ্ডলীর ধার্য্য বিক্রয়কর প্রভৃতির চাপে জনসাধারণের দুর্দ্দশা পর্দ্দায় পর্দ্দায় চড়িয়া উঠিয়াছে।

নিরঞ্জনে বাধা

দুর্গাপূজার পর বাদ্যভাণ্ড সহ প্রতিমা নিরঞ্জন করিতে হয়,—ইহা শক্তিপূজার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। বাঙ্গালার ইতিহাসে ১৯২২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইহাতে কোন পক্ষই কোন কালে বা কোন কারণে আপত্তি করেন নাই। এমন কি, ঔরঙ্গজেবের আমলেও এরূপ ব্যবস্থা বাঙ্গালায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এমন কোন প্রমাণ আমরা এ পর্য্যন্ত পাই নাই। সম্প্রতি মোস্লেম লীগের এই সচিবমণ্ডলীর আমলে রাজপথ দিয়া বাদ্যভাণ্ড সহকারে প্রতিমা নিরঞ্জন করিতে লইয়া যাওয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে—ইহাই বাঙ্গালার রাজনীতি-ক্ষেত্রে একটা অভিনব ব্যাপার! রাজপথে সকল সম্প্রদায়েরই তুল্যাধিকার আছে,—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে হিন্দুরা রাজপথ দিয়া বাদ্যভাণ্ড সহকারে প্রতিমা বিসর্জ্জন করিতে লইয়া যাইতে পারিবেন না,—এ ব্যবস্থা কোন্ নিরপেক্ষনীতিসঙ্গত, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। প্রজার যে অধিকার ন্যায়-সঙ্গত, শাসকদিগের আদেশে তাহা সঙ্কুচিত করিলে তাহাতে শাসকদিগের যথেচ্ছাচারই প্রকাশ পায়। মসজেদের সম্মুখে বাদ্যভাণ্ড সহ শোভাযাত্রা করিলে মুসলমানদিগের কোন অসুবিধা ঘটে, এ কথা সত্য নহে—ইহা অনেক মুসলমানই স্বীকার করিয়াছেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের প্রথমে নাগপুরের মুসলমানগণ স্বীকার করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা মসজেদের সম্মুখে বাদ্যভাণ্ড সহ শোভাযাত্রায় আপত্তি করিবেন না। মিশরে মসজেদের সম্মুখে বাদ্যভাণ্ড করিলে কোন আপত্তিই হয় না; কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বাঙ্গালায় মোস্লেম লীগের দলভুক্ত সচিববর্গ মন্ত্রীর মসনদে আরোহণ করিয়া অবধি হিন্দুদিগের পক্ষে দেব-দেবী-পূজা এক-প্রকার অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন। এবার ময়মনসিংহে, দিনাজপুর জিলায়, এবং ২৪ পরগণার বজবজে সরকার যেরূপ আদেশ প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে এবার ঐ সকল স্থানে দুর্গাপ্রতিমা নিরঞ্জন করা বন্ধ হইয়াছে। ইহাতে হিন্দুর ধর্ম্মাচরণে অতি প্রবল আঘাত করা হইয়াছে। এই ব্যাপারে হিন্দুরা বিক্ষুব্ধ হইয়া কলিকাতায়, ময়মনসিংহে, দিনাজপুরে, ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় ও বহু স্থানে হরতাল করিয়াছেন, এবং কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে হিন্দু জনসাধারণ সভা করিয়া এই অসঙ্গত, অন্যায়, এবং হিন্দুর ধর্ম্মঘাতক কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে ত কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে না! যে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা সাম্প্রদায়িক অনাচার বা পক্ষপাত দমনের জন্য স্বপদে অধিষ্ঠিত আছেন, তিনি এই সকল কাণ্ড দেখিয়াও কি দেখিতেছেন না? তাঁহার ক্ষমতা আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ—এই অজুহাতে তিনি যে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে-ছেন না, ইহা দেখিয়া কেহ কেহ বিস্মিত বা ক্ষুব্ধ হইতে-ছেন। যেখানে Constitution নাই,—সেখানে শাসক Constitutional হইবেন কিরূপে? সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে যে শাসন-পদ্ধতি (Constitution) গঠিত, তাহাকে কিরূপে Constitution বলা যাইতে পারে? Constitution মাত্রেরই কতকগুলি মূল-নীতি (fundamental principles) থাকে। কিন্তু সম্প্রদায়-বিশেষ ব্যক্তিগত বুদ্ধির অভাবে, অথবা অন্যের স্বার্থের প্রভাবে—বাঁধা ভোটের আধিক্যে যেখানে শাসনব্যাপারে স্বৈরাচার প্রবর্ত্তিত করিতে পারে, সেখানে সেই শাশ্বত-নীতি (fundamental principles) রক্ষিত হয় কি? ইহাতে কেবল বিক্ষোভেরই সৃষ্টি হইতেছে। স্থায়ী মিলন-প্রতিষ্ঠাকামী শাসকদিগের উদ্দেশ্যের তাহা অনুকূল নহে, এবং ইহা বুঝিতে গভীর রাজনীতি-জ্ঞানেরও প্রয়োজন হয় না।

দেশের এ কি দুর্দ্দিন!

বাঙ্গালার বড়ই দুর্দ্দিন উপস্থিত! চারি দিকেই হাহাকার! জীবন-ধারণের জন্য অত্যাবশ্যক দ্রব্য সমস্তই দুর্ম্মূল্য। চাউল, তরিতরকারী, ঘৃত, বস্ত্র, কেরসিন তেল, দেশলাই, কয়লা—সবই যেন অগ্নিমূল্য! সর্ব্বত্র লোকের চূড়ান্ত দুর্দ্দশা। নূতন আউস চাউলই মফঃস্বলে ৬ টাকা মণ বিকাইতেছে! নূতন আউসের ভাত পরিপাক করিবার শক্তি সকলের নাই; সুতরাং যাহারা বেকার, তাহারা কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। আমাদের এই বাঙ্গালা প্রদেশে ১ লক্ষ ৯৪ হাজার লোক বস্ত্র-শিল্পে জীবিকার্জ্জন করে।

যুদ্ধ উপস্থিত হওয়া অবধি তাহারা বেকার। এই এক লক্ষ ৯৪ হাজার তন্তুবায় কর্ম্মীর পরিবার-সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ। প্রত্যেক পরিবারে গড়ে ৬ জন লোক আছে; সুতরাং এই সম্প্রদায়ের প্রায় ৯ লক্ষ লোক বেকার অবস্থায় কালযাপন করিতেছে। ইহাদের মধ্যে হিন্দু অধিক, কিন্তু মুসলমানও অল্প নহে। ইহাদের অধিকাংশেরই চাষের জমি নাই—অন্য কোন বৃত্তিও নাই। বাজার হইতে সূতা কিনিয়া ইহারা হস্তচালিত তাঁত চালায়। প্রতি বৎসর ইহারা আনুমানিক ৫ কোটি ১১ লক্ষ টাকার কাপড় বুনিত; কিন্তু যুদ্ধ উপস্থিত হইবার পর হইতে সূতার মূল্য দ্বিগুণ হইয়াছে। অথচ তাঁতে বোনা কাপড়ের মূল্য শতকরা ৩৩ টাকা হারের অধিক বর্দ্ধিত হয় নাই। ইহার উপর রঙের বাজারও আগুন! কাজেই ইহাদের দুঃখ-কষ্টের সীমা নাই। এখন আর ইহাদের তাঁতের কাপড় বেচিয়া খরচা পোষাইতেছে না। তন্তুশিল্প বাঙ্গালার অতি প্রাচীন শিল্প, এবং বিশেষ গৌরবের জিনিস। দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙ্গালার সচিবমণ্ডলী বিশেষ ভাবে ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছেন না। এই শিল্পীরা সঙ্ঘবদ্ধ নহে। ইহাদের মাল বিক্রয় করিবার সুব্যবস্থাও নাই। সরকার যে ভাবে ইহার প্রতিকার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না। ইহাদিগকে সুলভ মূল্যে সূতা এবং রং প্রদানের ব্যবস্থা করা উচিত। যুদ্ধের পূর্ব্বে ইহারা ১ কোটি ৪৩ লক্ষ পাউণ্ড সূতা লইত। এখন কার্পাস কলগুলি আপন আপন প্রয়োজন মিটাইয়া এত সূতা ইহাদিগকে যোগাইতে পারে না। সে জন্য অধিক সূতা কাটিবার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। চরকা এবং তকলীতে তাহা করা যায় না কি? চরকার কতকটা উন্নতিসাধন কর্ত্তব্য। ইহাদের জন্য সরকার এই সকল সুবিধা করিতে পারিবেন কি?

—

ঢাকায় আবার দাঙ্গা

ঢাকায় আবার নূতন করিয়া দাঙ্গা আরম্ভ হইয়াছে। কতকগুলি লোক আচম্বিতে আহত ও নিহতও হইয়াছে, এবং স্থানীয় নিরীহ লোক মাত্রকেই ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিতে হইয়াছে। কিন্তু এই তৃতীয় বার দাঙ্গা আরম্ভ হইবার কারণ কি, তাহা ঠিক জানিতে পারা যায় নাই। তবে ইহাকে ঠিক দাঙ্গাও বলা যায় না। সাধারণতঃ দাঙ্গা হয়,—একটা বিষয় লইয়া। এতদ্ভিন্ন, দাঙ্গায় দুই পক্ষের লোক দলবদ্ধ হয়, এবং পরস্পর লাঠালাঠি করে; তাহাতে মাথা ফাটে, হাত-পা ভাঙ্গে, উভয় পক্ষই শেষে বেগতিক দেখিলে সরিয়া পড়ে। এই দাঙ্গায় সেরূপ হয় নাই। এখানে একটা গুপ্তঘাতক আচম্বিতে, নিতান্ত অতর্কিত ভাবে এক জন পথচারী লোককে অকারণে ছোরা মারিয়া পলায়ন করে,—আর সেই নিরীহ পথিকটি মর্ম্মান্তিক জখম হইয়া পথে পড়িয়া থাকে। সেখানে সে মরে, না হয় হাসপাতালে গিয়া মরে, বা সারিয়া উঠে। ইহা এই ধরণের দাঙ্গা। এখানে বিবাদ নাই, বিবাদের বিষয়ও নাই। তাই মনে হয়, ইহা ভাড়াটিয়া গুণ্ডামির মত ব্যাপার। কেহ কেহ বলিতেছেন, এবার দুর্গাপ্রতিমা নিরঞ্জনে বাধা দেওয়ায় হিন্দুরা নানা স্থানে প্রতিবাদ সভা এবং হরতাল করিতেছেন, তাহার প্রতিবাদেই এই দাঙ্গার উৎপত্তি। কিন্তু এই অনুমান সত্য বলিয়া মনে হয় না। হিন্দুরা দুর্গাপ্রতিমা নিরঞ্জনে বাধাজনক ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিতেছেন বলিয়া ঢাকা সহরের গুণ্ডারা ক্ষেপিয়া উঠিয়া এই কাজ করিতেছে, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। তবে কেহ যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া গুণ্ডাগুলাকে এই কার্য্যে প্ররোচিত করিতেছে, এরূপ অনুমান সত্য হইলে বরং ব্যাপারটার কারণ কতকটা বুঝিতে পারা যায়। এই দাঙ্গার পুনরাবির্ভাবে বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘের এই প্রদেশের শাসন-কার্য্যে এবং শান্তি-স্থাপনে যে অযোগ্যতা প্রতিপন্ন হইতেছে, তাহা কেবল তাঁহাদেরই পক্ষে লজ্জাজনক নহে, যাঁহারা অযোগ্য ব্যক্তির হস্তে এইরূপ দায়িত্বভার অর্পণ করিয়া তাহার ফল 'দাঁড়িয়ে দেখেন তফাতে', তাঁহাদের পক্ষেও ইহা গৌরবের বিষয় নহে।

—

নূনের টাটকা সন্দেশ

মালিক সার ফিরোজ খাঁ নূন পাঁচ বৎসর কাল ইংলণ্ডে ভারতীয় হাই-কমিশনারের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া শ্রান্তদেহে দেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। দেশে ফিরিয়া দেশের লোককে তিনি অত্যন্ত মুখরোচক সন্দেশ

মুক্তহস্তে পরিবেশন করিয়াছেন। তিনি খবর দিয়াছেন, বিলাতের অধিকাংশ অধিবাসীই ভারতবাসীকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের অনুরূপ অধিকার প্রদান করিবার জন্য ব্যস্ত (ব্যাকুল নহে কি?); কিন্তু তৎপূর্ব্বে সকল ভারতবাসীকে একমতাবলম্বী হইতে হইবে। এই 'কিন্তু'র কথা কি আমরা তাঁহার মুরুব্বিদের মুখে বহু দিন হইতেই শুনিয়া আসিতেছি না? ভারতে এই মতভেদের মূল কোথায়, তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, এবং তাহা কাহারও অজ্ঞাত থাকিবারও কথা নয়। বিশেষতঃ, সেই মতভেদের প্রেরণাই বা কোথা হইতে আসিতেছে, তাহাও ক্রমশঃ সকলেই বুঝিতেছেন, এবং পরেও বুঝিবেন। সকল বিষয়ে মতভেদ তিরোহিত হইবে, তাহারই বা সম্ভাবনা কোথায়? কাজেই একটা অসম্ভব সর্ত্তের উপর এ দেশের লোকের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে। সুতরাং ইহার নির্গলিত অর্থ,—ভারতবাসী যে কস্মিন্ কালেও ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার পাইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় কি, তাহা তিনিই জানেন।

জাতীয় দেশরক্ষা-পরিষদ

গত ১৯শে আশ্বিন বড় লাটের প্রাসাদে জাতীয় দেশরক্ষা পরিষদের প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল। প্রথম দিন সকালে ও বিকালে সভার বৈঠক বসিয়াছিল। সরকার-পক্ষের সকল সদস্যই হাজির ছিলেন। বড় লাট সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি ভারতীয়দিগের দানের এবং ভারতীয় সৈনিকদিগের শৌর্য্যের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন;—কিন্তু ভারতবাসীর রাজনীতিক অবস্থার প্রগতিসাধন সম্পর্কে কোন কথাই তাঁহার মুখে শুনিতে পাওয়া যায় নাই। দেশীয় নৃপতিগণের পক্ষ হইতে জামনগরের শাসনকর্ত্তা এক বক্তৃতা করেন; কিন্তু আসলে আমাদের ভাগ্যফল কি, তাহা কাহারও বোধগম্য হয় নাই। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে দিল্লীতে লাট-ভবনে পুনর্ব্বার এই পরিষদের অধিবেশন হইবে। আমরা বক্তৃতা শুনিতে পাইব, তাহা সুশ্রাব্য হওয়াই সম্ভব। এ-কালে রাজারা ইংরেজী শিখিয়া খাসা বক্তৃতা করেন, সে-কালের ফিদারধারীদের মত তাঁহারা এক পক্ষের বাক্যোচ্ছ্বাসের নীরব শ্রোতা নহেন। সেই 'ইয়েস, নো, ভেরীগুডের' আমোল আর নাই।

অতি-বর্ষণ

গত ২০শে আশ্বিন হইতে ২৩শে আশ্বিন পর্য্যন্ত চারি দিন বাঙ্গালা প্রদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই বৃষ্টি হইয়াছে। স্থানে স্থানে অতি-বর্ষণ এবং ঘূর্ণিবায়ুও প্রবাহিত হইয়াছে। এই বর্ষণের ফলে কোন কোন স্থানে ফসলনাশের সংবাদও পাওয়া গিয়াছে। পঞ্জাব মেল এবং বরিশাল এক্সপ্রেস গত ২২শে আশ্বিন যথাসময়ে পৌছিতে পারে নাই। কোন কোন স্থানে ধান্যের কিছু ক্ষতি হইয়াছে। তরিতরকারীর ক্ষতিই অধিক হইয়াছে। এ জন্য এই দুর্ম্মূল্যতার দিনে লোকের বিশেষ কষ্ট হইয়াছে। ২৪শে আশ্বিন শনিবার বারিপাত বন্ধ হয়। সাগর-বক্ষে প্রবল ঝটিকা হইয়াছিল এবং তাহার তোড় বিক্ষিপ্ত ভাবে স্থানে স্থানে আসিয়া পড়িয়াছিল। এই ঝড়-বৃষ্টিতে অট্টালিকার তেমন অধিক ক্ষতি হয় নাই বটে, কিন্তু অনেক স্থানেই মেটে বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে; স্থানে স্থানে নিরাশ্রয় নরনারীগণকে রেলের উচ্চ বাঁধে আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

পাকা রাজনীতিক

সাধারণ লোকের বিশ্বাস, কূট-রাজনীতির মূল এবং সর্ব্বপ্রধান উপাদানই চাতুরীর সহিত প্রতারণা। মিথ্যার সহিত যতটুকু সত্যের ভেজাল না দিলে লোক উহা বিশ্বাস না করে, ততটুকুমাত্র সত্য ইহার সহিত বেশ দক্ষতার সহিত ভেজাল দিতে হয় (The popular belief is that, as an art, it (diplomacy) consists entirely in skilful deception, and can be no further truthful than may seem necessary to make falsehood credible)। ইহা সত্য হইলে আমাদের বর্ত্তমান ভারত-সচিব মিষ্টার আমেরী সুপক্ক কূট-রাজনীতিক (diplomat)। তিনি সম্প্রতি মার্কিণবাসীদিগের এক প্রশ্নের জবাবে বলিয়াছেন, 'ভারতবর্ষ বিলাতবাসীদিগকে টাকা দেয় না—ভারতে যে রাজস্ব আদায় হয়, তাহাতে ভারত-শাসন ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়।'

এ কথাটা না-সত্য না-মিথ্যা; উভয়েরই সংমিশ্রণ। তবে উহাতে মিথ্যার খাদই অধিক। সত্যের সুবর্ণ অতি অল্প। করদ রাজ্য হিসাবে ভারতবর্ষ বিলাতকে বার্ষিক কর দেয় না সত্য, কিন্তু ভারত বিলাতি শাসনের ব্যয়-বাবদ পশ্চাদ্দ্বার দিয়া বাৎসরিক ৭৫ কোটি টাকা বিলাতবাসীকে দিয়া থাকে। এই টাকা অবসর-প্রাপ্ত রাজপুরুষদিগের পেন্সন এবং টাকার সুদ হিসাবে লওয়া হইয়া থাকে—কর হিসাবে লওয়া হয় না। ইহা ভিন্ন শাসন-বিভাগের এবং সমর-বিভাগের যে সমস্ত কর্ম্মচারী এ দেশে কাজ করেন, তাঁহারা তাঁহাদের বেতন বাবদ যাহা পাইয়া থাকেন বা লইয়া থাকেন (এই গ্রহণ-কার্য্য তাঁহাদের ধার্য্য পরিমাণের উপর নির্ভর করে), তাহার পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। পৃথিবীর আর কোন দেশে এত অধিক বেতনের চাকুরীয়া নাই! এই অতিরিক্ত অর্থ-গ্রহণ নামে কর না হইলে কাজে ইহাকে কর ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? কিন্তু এ সব কথার-আলোচনা করিয়া কোন লাভ নাই। ভারত গৌরীসেন আছে কি জন্য?

সংবাদপত্র ও বাঙ্গালা সরকার

বাঙ্গালা সরকার সম্প্রতি তিনখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্রকে অভিযুক্ত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একখানি (দৈনিক বসুমতী) বেবসুর খালাস পাইয়াছে, আর দুইখানি অর্থ-দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। সংবাদপত্রগুলির বিরুদ্ধে এরূপ ব্যাপক ভাবে মামলা রুজু করা সরকারের পক্ষে কর্ত্তব্য কি না, তাহাও এস্থলে বিবেচ্য। ভারত সরকার এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন যে, পরামর্শ-সমিতির সহিত পরামর্শ না করিয়া সরকার কোন সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করিতে পারিবেন না, এবং কোন সংবাদপত্র অথবা সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান যদি পূর্ব্বে সতর্ক করিয়া দিবার পরও সেই সংবাদপত্র ক্রমাগত নির্দ্দেশ ভঙ্গ না করে, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে নালিশ করা হইবে না। অথচ এই মামলা তিনটি রুজু হইবার পর ভারত সরকার সংবাদপত্র সম্মেলনে এইরূপ প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় ন্যায়তঃ কার্য্য করিতে হইলে বাঙ্গালা সরকারকে ঐ মামলা উঠাইয়া লওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু মামলা-প্রসঙ্গে প্রকাশ পাইয়াছে যে, বাঙ্গালা সরকার প্রাদেশিক পরামর্শ-সমিতির সহিত পরামর্শ না করিয়াই বা অভিযুক্ত সংবাদপত্র তিনখানিকে পূর্ব্বে কোনরূপ সংবাদ না দিয়াই মামলা রুজু করিয়াছিলেন। ইহা কি সঙ্গত হইয়াছিল? পরামর্শ-সমিতি যখন আছে, তখন তাহার সহিত পরামর্শ করাই সঙ্গত ছিল। যাঁহারা দেশের শাসন-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন,—তাঁহাদের ব্যক্তিগত মনোভাব লইয়া কার্য্য করা উচিত নহে। তাঁহাদের নিরপেক্ষ ভাবেই কাজ করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে কয়েক বার সাবধান করিয়া দিয়া তবে মামলা উপস্থিত করা উচিত ছিল। তাহা তাঁহারা করেন নাই। তাঁহাদের এই কার্য্য দেখিয়া বাস্তবিক বিস্মিত হইতে হয়। 'দৈনিক বসুমতীর' বিরুদ্ধে তাঁহাদের অভিযোগ ব্যর্থ হইয়াছে। 'দৈনিক বসুমতী' কোন অপরাধ করে নাই বলিয়া আদালতে স্থির হইয়াছে; তবে এই পত্রিকাখানিকে অকারণ হয়রাণ করা হইল কি জন্য? ইহার জন্য সচিববর্গ কি ন্যায়তঃ খেসারত দিতে বাধ্য নহেন? এই দৈনিক পত্রিকাখানির বিরুদ্ধে সচিবদলের এইরূপ ব্যর্থ অভিযোগ নূতন নহে; কিন্তু এ-কালে কি যে অসম্ভব—তাহা কি কেহ বলিতে পারেন?

মিটিল কই?

বাঙ্গালায় মুসলমান সচিবদিগের মধ্যে মতের বা মনের অনৈক্য ঘটিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে মিষ্টার সুরাবর্দ্দীর বিরুদ্ধে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব ব্যবস্থা পরিষদে পেশ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু প্রস্তাবগুলি আলোচিত হইবার পূর্ব্বেই পরিষদের অধিবেশন বন্ধ হইয়া যায়; সেই জন্য প্রস্তাবগুলি বাতিল হইয়া পড়ে—যদিও মাধ্যমিক শিক্ষা-বিলখানি সেরূপ হয় নাই। তাহার পর শুনিতে পাইতেছি, মৌলবী ফজলুল হকের 'সুখী পরিবারে'র মধ্যে যে ভাঙ্গন ধরিয়াছিল, তাহা জোড়া লাগিয়া গিয়াছে। আবার দেখিতেছি, তাহাতে অসুখের অবসান হয় নাই। মৌলবী হক ছাহেবের প্রগতিশীল দলের সহকারী নেতা খাঁ বাহাদুর হাসেম আলি খাঁ দার্জ্জিলিঙ্গে গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রায় এক ঘণ্টা কাল কি সব কথোপকথন করিয়াছিলেন। ইহাতে মনে হইয়াছিল, এইবার এই ব্যাপারের বোধ হয় কিছু কালের জন্য অবসান ঘটিল।

বস্তুতঃ সকলেই বুঝিতেছেন যে, এই সচিবমণ্ডলী যাহাতে বাহাল থাকেন, মুরুব্বি-মহলের কাহারও কাহারও তাহাই ইচ্ছা। কারণ, ইঁহারা তাঁহাদের ঠিক মনের মত! মিষ্টার হাসেম আলির সহিত সার জন হার্ব্বাটের নিভৃত কক্ষে কি কথা হইয়াছিল, তাহা অবশ্য প্রকাশ নাই, বোধ হয়, তাহা প্রকাশের সম্ভাবনাও নাই। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক মিটিয়াছে কি? হক ছাহেবের নব-প্রকাশিত 'নবযুগ' পত্রে যে ভাবের লেখা বাহির হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, এই মতভেদের বা মনোভেদের রেখা নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া যায় নাই। এই পত্রে হক ছাহেবের প্রতিদ্বন্দ্বী দলের প্রতি তীব্র কটাক্ষ আছে। মনে হয়, ব্যাপারটা চাপা দেওয়া হইয়াছে, একেবারে স্থায়ী মীমাংসা হয় নাই। রঙ্গমঞ্চে যে সকল অভিনেতা অন্তরালে প্রচ্ছন্ন প্রমটারের উপর নির্ভর করিয়া অভিনয় করে, তাহাদের অভিনয় ঠিক স্বাভাবিক হয় না। এ ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম হইবে কি করিয়া? খাঁ বাহাদুর হাসেম আলি কি একটা ছত্রিশ হাজারী সচিবত্ব লাভ করিবেন?

ভারত-সিংহল চুক্তি

সিংহল-প্রবাসী ভারতবাসীদিগের সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করা হইবে, তাহা লইয়া অনেক দিন ধরিয়া আলোচনা চলিতেছে। ইহার একটা ব্যবস্থা করিবার জন্য গত বৎসর নবেম্বর মাসে দিল্লীতে এক বৈঠক বসান হইয়াছিল। সে বৈঠকে উভয় পক্ষীয় সদস্যগণ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। সম্প্রতি আবার সিংহলের কলম্বো সহরে সিংহল-সরকারের এবং ভারত-সরকারের সদস্য লইয়া এক বৈঠক বসান হইয়াছিল, সেই বৈঠকে উভয় পক্ষীয় সদস্যগণ একটা রিপোর্ট দিয়াছেন। ব্রহ্ম-প্রবাসী ভারতবাসীদিগের সম্বন্ধে যেরূপ অসঙ্গত ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে এই ভারত-সিংহল বৈঠকের ফল ভাল হইবে বলিয়া কেহ আশা করেন নাই। ভারতবাসীদিগকে পদে পদেই সর্ব্বত্র বিড়ম্বিত হইতে হইতেছে। কলম্বো-বৈঠকে উভয় সরকারের মনোনীত সদস্যগণ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই। এ স্থানে তাহার বিশদ আলোচনা সম্ভব নহে। মোটের উপর ইহাই বলা যায় যে, এই মীমাংসা-সমিতি সিংহল-প্রবাসী ভারতবাসীদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, এই বিষয়ের বিবেচনা করিবার আসল বিষয় এই যে, যে সকল ভারতবাসী সিংহলে বহু দিন বসবাস করিতেছেন, এবং যাঁহাদের তথায় কায়েম স্বার্থ আছে, তাঁহাদিগকে সিংহলবাসীর নাগরিক সমস্ত অধিকার দেওয়া হইবে কি না? বিষয়টির ভিতর বিন্দুমাত্র জটিলতা নাই। কিন্তু মীমাংসা-বৈঠকের সদস্যরা সিংহল-প্রবাসী ভারতবাসীদিগকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, এবং তাঁহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন অধিকার দিয়া এই সরল বিষয়টিতে জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, যাঁহারা জন্ম হইতে স্থায়ী প্রবাসী-ভারতবাসীদিগের বংশধর এবং যাঁহারা বংশ-পরম্পরা ধরিয়া সিংহলে বাস করিতেছেন, এবং করিবেন, সেই সকল ভারতবাসীই সিংহলে সর্ব্ববিধ নাগরিক অধিকার লাভ করিবেন। আর সকলকে সে অধিকার সর্ব্বতোভাবে দান করা হইবে না। দ্বিতীয় শ্রেণী স্বেচ্ছায় সিংহলের স্থায়ী বাসীন্দা হইবেন, ইহা আদালতে সপ্রমাণ করিতে হইবে। যাঁহারা সিংহলে স্থায়িভাবে বাস করিবার অনুমতি পাইয়াছেন, এবং যাঁহাদের জীবিকা-অর্জ্জনের উপায় আছে, তাঁহারাই তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত। ইঁহারা তথায় সরকারী ও আধা-সরকারী আফিসে কার্য্য করিতে পারিবেন না। দিল্লীতে যে বৈঠক বসিয়াছিল, তাহাতে সকল প্রবাসী ভারতবাসীকে পূর্ণ নাগরিক অধিকার-দানের কথা হইয়াছিল। সিংহলীরা সে প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। সেই জন্য সেই বৈঠক ভাঙ্গিয়া যায়। এবার রিপোর্টে যে ব্যবস্থা করা হইবে বলা হইয়াছে, তাহা কোন মতেই ভারতবাসীর অনুকূল নহে। ভারতবাসীরা ইহাতে কোন ক্রমেই সম্মত হইতে পারে না।

সত্যপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী পরলোকে

স্বর্গীয় রায় বাহাদুর সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং পরলোকগত সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রায় বাহাদুর ডক্টর সত্যপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী গত ২৯শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৯০ বৎসর হইয়াছিল; একালে বাঙ্গালীর পরমায়ু-হিসাবে তিনি দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন। শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে তাঁহার ন্যায় দীর্ঘজীবীর সংখ্যা একালে অত্যন্ত অল্প।

রায় বাহাদুর ডক্টর সত্যপ্রসাদের পত্নীও দীর্ঘকাল জীবিতা ছিলেন; স্বামীর মৃত্যুর দ্বাদশ দিন মাত্র পূর্ব্বে তিনি বৃদ্ধ স্বামীকে রাখিয়া হিন্দুনারীর চির-আকাঙ্ক্ষিত সতীলোকে প্রস্থান করিয়াছেন, তাঁহাকে আর বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল না।

পরলোকগত রায় বাহাদুর পাঁচ বৎসর যাবৎ কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সুবিচারক ছিলেন বলিয়া কলিকাতার পুলিশ-কোর্টের বিচারক ও উকিলগণ তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা

করিতেন। কলিকাতার অনেক দেশহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার সংস্রব ছিল। তিনি জনপ্রিয় এবং সমাজ-হিতৈষী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি একমাত্র পুত্র এবং দুইটি কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

স্বর্গীয় প্রভাসচন্দ্র কুমার

গত ১লা কার্ত্তিক শনিবার অপরাহ্ণে প্রসিদ্ধ লৌহ-ব্যবসায়ী প্রভাসচন্দ্র কুমার তাঁহার ভবানীপুরের বাড়ীতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু অত্যন্ত আকস্মিক; সেই দিন বেলা সাড়ে দশটার সময় তিনি সুস্থ দেহে

প্রভাসচন্দ্র কুমার

আফিসে যাইতেছিলেন, সেই সময় হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়া কয়েক ঘণ্টা পরেই ৪-৪৫ মিনিটের সময় ইহলোক ত্যাগ করেন।

স্বর্গীয় প্রভাসচন্দ্র বর্দ্ধমান জিলার সুলতানপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি টি, ডি, কুমার এণ্ড ব্রাদার্স লিঃ নামক প্রসিদ্ধ লৌহ ব্যবসায়ের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন, এতদ্ভিন্ন, আরও কয়েকটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হইতেছিল।

তিনি স্বয়ং সুদক্ষ ব্যবসায়ী ছিলেন, এবং বাঙ্গালী-পরিচালিত বিভিন্ন ব্যবসায় ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান তাঁহার সহায়তা লাভ করিয়াছিল। যে সকল শিক্ষিত বাঙ্গালী ব্যবসায়ে অনুরাগ প্রকাশ করিতেন, তাঁহারা তাঁহার সহায়তায় বঞ্চিত হইতেন না; বাঙ্গালীর ব্যবসায়ানুরাগে তিনি সর্ব্বদাই উৎসাহ প্রদান করিতেন। অনেকেই তাঁহার সাহায্যে শিল্প ও ব্যবসায়-পরিচালনে উন্নতি লাভ করিয়াছেন। তিনি সুলতানপুর য়ুনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। জন্মস্থানের উন্নতির প্রতি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তিনি অনেক অনাথ ও দুঃস্থ পরিবারকে অর্থ-সাহায্য করিতেন। তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে বাঙ্গালীর ব্যবসায়-কার্য্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

স্বর্গীয় যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

উত্তর-বঙ্গের প্রবীণ জননায়ক, কংগ্রেসকর্ম্মী যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গত ২৫শে আশ্বিন রবিবার অপরাহ্ণে তাঁহার দিনাজপুরস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু আকস্মিক; হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া রহিত হওয়াই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে তিনি পিত্তশূল বেদনায় কষ্ট পাইতেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছিল।

যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় দিনাজপুরের প্রতিষ্ঠাপন্ন উকিল ছিলেন। উত্তর-বঙ্গের সামাজিক ও রাজনীতিক আন্দোলন সমূহের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, এবং স্বদেশ-সেবায় তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল। তিনি সর্ব্বদাই পরোপকারে রত থাকিতেন। তিনি অসহযোগ-আন্দোলনে যোগদান করিয়া ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে দীর্ঘকালের জন্য কারাবরণ করিয়াছিলেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির দিনাজপুর-অধিবেশনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি কিছু দিন দিনাজপুর জিলা-বোর্ড ও মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যানও ছিলেন।

যোগীন্দ্রচন্দ্র বাবুর অমায়িকতা ও দানশীলতা প্রশংসনীয় ছিল। জিলার শ্রেষ্ঠ উকিল বলিয়া দিনাজপুরে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল, এবং উত্তর-বঙ্গের শিক্ষিত সমাজ তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে উত্তর-বঙ্গের এক জন সর্ব্বজনসম্মানিত নেতার অভাব হইল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিহারের অবসরপ্রাপ্ত সুপারিণ্টেণ্ডিং-এঞ্জিনীয়ার রায় বাহাদুর শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এখনও জীবিত আছেন। এই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভিন্ন তিনি দুই পুত্র এবং এক কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

২০শ বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮ [২য় সংখ্যা

পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে ঈশ্বর

৯

ন্যান্য সেশ্বর আস্তিক দর্শন-সম্প্রদায়ের ন্যায় পূর্ব্বমীমাংসা-র্শনেরও স্বারসিক সিদ্ধান্ত এই যে—ঈশ্বরই উপাস্য। াধুশব্দাধিকরণে' (১) ভট্টপাদ শ্রীকুমারিল অতি সুস্পষ্ট ভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সগুণ আত্মতত্ত্বের জ্ঞান বা াসনা দ্বারা পারলৌকিক অভ্যুদয় ও নির্গুণাত্মজ্ঞানে য়স (মোক্ষ) প্রাপ্তির যোগ্যতা আছে (২)।

'সাধুশব্দাধিকরণ' নামটি 'ন্যায়সুধাকারে'র প্রদত্ত। উহাকে প্রযুক্ত্যধিকরণ' 'সাধুপদপ্রয়োগনিয়মাধিকরণ', বা 'ব্যাকরণা- বলা হয়। উহা পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের প্রথমাধ্যায়ের ের নবমাধিকরণ (১।৩।২৪-২৯)।

) 'তথা ; য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুবিশোকো জিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞা-তব্যঃ' তথা 'মন্তব্যো বোদ্ধব্যঃ' তথা 'আত্মানমুপাসীত' ति কামবাদলোকবাদবচনর্বিশেষৈর্জিজ্ঞাসামননসহিতাত্মজ্ঞানকেবলাব-াধপর্য্যন্তস্পষ্টাত্মতত্ত্বজ্ঞানবিধানাপেক্ষিতবাক্যান্তরোপাত্তিদ্বিবিধাভ্যুদয় িঃশ্রেয়সরূপফলসম্বন্ধঃ 'স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামানা-প্নোতি', 'তরতি শোকমাত্মবিৎ' তথা 'স যদি পিতৃলোককামো ভবতি াদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন পিতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে যোগজন্যাণিমাদ্যষ্টৈশ্বর্য্যফলানি বর্ণিতানি। তথা 'স বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে ন স পুনরাবর্ত্ততে' পুনরাবৃত্ত্যাত্মকপরমাত্মপ্রাপ্ত্যবস্থাফলবচনম্। অপ্রকরণগতত্বে-নৈকান্তিকক্রতুসম্বন্ধাসম্বন্ধাচ্চ নাঞ্জনখাদিরস্রুববাক্যাদিফলশ্রুতি-র্থবাদত্বম্" —তন্ত্রবার্ত্তিক, ১।৩।২৭, আনন্দাশ্রম সং, পৃঃ ২৮৮।

এক্ষণে অবশ্য প্রশ্ন উঠিবে—এই সগুণ আত্মা যে ঈশ্বর—তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি? নিরুপপদ 'আত্ম'-শব্দের প্রয়োগ রূঢ়ার্থবোধের প্রক্রিয়ানুসারে প্রত্যগাত্মা বা জীবাত্মাকেই বুঝাইয়া থাকে—ইহাই আস্তিকদর্শন-সম্প্রদায়গুলির সর্ব্ব-বাদিসম্মত অভিপ্রায়। তবে এ স্থলে 'আত্মা' বলিতে 'ঈশ্বর' বুঝিতে হইবে কেন?

ইহার উত্তর দিতে হইলে ন্যায়সুধাকারের উক্তি উদ্ধৃত করিতে হয়। তিনি বলিয়াছেন যে—কুমারিল সাধুশব্দাধি-করণে প্রতিপাদন করিবেন যে, অসংসারি-রূপ সগুণ ও নির্গুণ আত্মার জ্ঞান যথাক্রমে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের হেতু। একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, সগুণ আত্মা বলিলে ঈশ্বরকেই বুঝিতে হয়। কারণ, জীবাত্মা বা প্রত্যগাত্মা যে সগুণ, সে বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ। সংসারী বলিয়া জীব জীবদশায় সর্ব্বদাই

এই উক্তির দ্বারা ভট্টপাদ উপনিষদের সগুণোপাসনা ও নির্গুণোপা-সনা এতদুভয়ের প্রামাণ্যই স্বীকার করিয়াছেন। উপনিষদুক্ত অভ্যুদয়ফলক সগুণাত্মতত্ত্বোপাসনা আর ঈশ্বরোপাসনা যে একই কথা —ইহা ত বেদান্তসম্প্রদায়-সম্মত। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের সপ্তম প্রকরণে (মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮) করা হইয়াছে।

সগুণ; তাহার উপর অধিকন্তু 'সগুণ' এই বিশেষণের প্রয়োগ পুনরুক্তি-দোষদুষ্ট—নিষ্প্রয়োজন। অতএব, 'সগুণ আত্মা,' 'নির্গুণ আত্মা' প্রভৃতি পদ প্রয়োগে সগুণ-নির্গুণ জীবকে বুঝায় না—বুঝায় অসংসারী জীবের সগুণ ও নির্গুণ অবস্থাকে অর্থাৎ সংসারের কারণভূত ঈশ্বর ও সর্ব্ব-সংসার-ধর্ম্মবর্জ্জিত ব্রহ্মকে। ভট্ট সোমেশ্বর তাঁহার ন্যায়সুধায় এই বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন (৩)।

এখন এ অবান্তর প্রসঙ্গ ছাড়িয়া প্রধান বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক। ন্যায়সুধাকার ভট্ট কুমারিলের সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ উক্তির বিশদ বিশ্লেষণপূর্ব্বক ভট্টপাদের মতেরই সমর্থন করিয়া দেখাইয়াছেন যে—সগুণাত্মজ্ঞানের ফল অভ্যুদয় (৪) (স্বর্গাদিলোকপ্রাপ্তি—হিরণ্যগর্ভলোক-প্রাপ্তি উহার চরম অবস্থা); আর নির্গুণাত্মজ্ঞানের ফল নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষ (৫)।

এখন যদি বলিতে চাহেন যে—কুমারিল সগুণ-নির্গুণ আত্মজ্ঞানের ফলবিবৃতিযুক্ত যে সকল উপনিষদ্বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেগুলিকে অর্থবাদ বলিয়া অপ্রমাণ বলা চলিতে পারে। কুমারিল তাঁহার শেষ পঙ্‌ক্তিটির দ্বারা এই আশঙ্কারও নিরসন করিয়াছেন (৬)।

অর্থবাদ বলা যায় কিরূপ বাক্যকে? যে সকল বাক্যের স্বতঃ স্বার্থে প্রামাণ্য নাই—কোন না কোন বিধিবাক্যের সহিত একবাক্যতাপন্ন হইয়া যাহাদিগের প্রামাণ্য নিরূপিত হয়, সেই সকল স্তুতিনিন্দা-ফলক বাক্যের নাম অর্থবাদ-বাক্য। অর্থবাদ-বাক্যের যথাশ্রুত অর্থ মীমাংসকগণ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত নহেন। তাঁহাদিগের মতে উহা স্বসম্বন্ধ বিধির স্তুতি অথবা নিন্দা প্রকাশ করে মাত্র; যথা—"যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি ন স পাপং শ্লোকং শৃণোতি" (অর্থাৎ—যিনি পলাশকাষ্ঠের জুহূ দ্বারা আহুতি প্রদান করেন, তাঁহাকে অকীর্ত্তিভাগী হইতে হয় না)। এই বাক্যটির যথাশ্রুত অর্থের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় না। পলাশকাষ্ঠের জুহূ ব্যবহার করিলেই যে লোক-নিন্দার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, তাহা সত্য নহে। এই বাক্যটির তাৎপর্য্য কেবল পলাশকাষ্ঠময় জুহূর প্রশংসায় (৭)। সেইরূপ বর্ত্তমান প্রসঙ্গেও বলা যাইতে পারে যে, কুমারিল সগুণ-নির্গুণ আত্মজ্ঞানের ফলশ্রুতিযুক্ত যে সকল উপনিষদ্বাক্য তন্ত্রবার্ত্তিকে উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেগুলির যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণীয় নহে। ঐগুলি সগুণ-নির্গুণ আত্মজ্ঞানের নিছক প্রশংসাপর বাক্যমাত্র।

---

(৩) "এতচ্চ সংসারিরূপাত্মপ্রতিপাদনাভিপ্রায়ম্। অসংসারিরূপ-সগুণ-নির্গুণাত্মজ্ঞানস্য অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সার্থতয়া সাধুশব্দাধিকরণে বক্ষ্যমাণত্বাদ্" ইত্যাদি—ন্যায়সুধা, বারাণসী সং, পৃঃ ২৫।

(৪) "...সগুণাত্মজ্ঞানবিধ্যপেক্ষিতাভ্যুদয়ফলং সম্বন্ধজ্ঞাপকং কামবাদং তাবদুদাহরতি—স সর্ব্বাংশ্চেতি"—ন্যায়সুধা, পৃঃ ৩২৭।

(৫) "সগুণাত্মজ্ঞানফলপ্রতিপাদকং কামবাদং লোকবাদং চোদাহৃত্য নির্গুণাত্মজ্ঞানবিধ্যপেক্ষিতনিঃশ্রেয়সরূপফলপ্রতিপাদকং বচনবিশেষমুদাহরতি—তথেতি"—ন্যায়সুধা, পৃঃ ৩২৮।

কুমারিল যে ব্রহ্মকে মানিতেন—ইহার সম্বন্ধে আর কোন সংশয়ই কাহারও থাকিতে পারে না—তিনি নিজ মুখে অপুনরাবৃত্তিরূপ পরমাত্মপ্রাপ্তির কথা স্বীকার করিয়াছেন। ন্যায়সুধাকার ইহার আরও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"স্থানবিশেষাত্মকলোকপ্রাপ্তেঃ ক্ষয়েনাক্ষয়ত্বানুপপত্তিমাশঙ্ক্য পরমাত্মৈব ব্রহ্মশব্দবাচ্যঃ পরমানন্দোপভোগে হেতুত্বাৎ কর্ম্মধারয়সমাসাশ্রয়ণেন লোকে বিবক্ষিতঃ তৎপ্রাপ্তেশ্চ শরীরসম্বন্ধোপাধিককর্ত্তৃভোক্তৃত্বাত্মকসংসারিরূপাবস্থাপরিত্যাগেন অকর্ত্তৃভোক্তৃত্বাত্মকাসংসারিরূপনেজাবস্থাত্মকত্বেন অজন্যত্বাৎ যুক্তমক্ষয়ত্বমিতি স্পষ্টয়িতুং পরমাত্মেত্যুক্তম্"—ন্যায়সুধা, পৃঃ ৩২৮। পাঠকগণ সাবধানে লক্ষ্য করিবেন—ইহা খাঁটি অদ্বৈত-বেদান্তসিদ্ধান্ত। তাহা হইলে আর এই সকল মীমাংসককে নিরীশ্বর বলা চলে কি?

(৬) অপ্রকরণগতত্বেন ইত্যাদি পঙ্‌ক্তি (২ নং ফুটনোট দ্রষ্টব্য)।

(৭) মীমাংসকগণ নানা প্রকার অর্থবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ত্রিবিধ মুখ্য অর্থবাদের স্বরূপ নিম্নে সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল:—(ক) 'গুণবাদ' বা গৌণোক্তিমূলক অর্থবাদ; যথা—"আদিত্যো যূপঃ"। আদিত্য কখনই যূপ হইতে পারেন না। অতএব এস্থলে 'আদিত্য'-পদের অভিধা বা যথাশ্রুত অর্থ বাধিত হওয়ায় উহার লাক্ষণিক বা গৌণ অর্থ স্বীকার্য্য। অন্যথা বাক্যটি অসমঞ্জস হইয়া পড়ে। এই কারণে বাক্যটির অর্থ করা হইল 'আদিত্যতুল্য উজ্জ্বল যূপ'। (খ) 'অনুবাদ' বা সমর্থনকর পুনরুক্তি; যথা—"সুবর্গায় হি লোকায় দর্শপূর্ণমাসাবিজ্যেতে" দর্শপূর্ণমাস যে স্বর্গজনক, তাহা প্রমাণান্তর হইতেই জানা যায়; তথাপি 'স্বর্গলোকার্থ' এই অংশের পুনরায় উক্তি উক্তফলের দৃঢ়তা সম্পাদনপূর্ব্বক উহার সমর্থন করে মাত্র। (গ) 'ভূতার্থবাদ' বা যথাভূত অতীত অথবা বর্ত্তমান ঘটনাদির সমুল্লেখ; যথা—"স আত্মনো বপামুদখিদৎ"—প্রজাপতি নিজের বপা (হৃদয় ও নাভির মধ্যবর্ত্তী মেদ) উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। ইহা একটি অতীত ঘটনা। মীমাংসকমতে এই ত্রিবিধ অর্থবাদই বিধির সহিত একবাক্যতাপন্ন হইয়া প্রামাণ্যলাভ করে; উহাদিগের স্বতঃ স্বার্থে প্রামাণ্য নাই। বেদান্তীরা বলেন, প্রথম দুই প্রকার অর্থবাদের স্বার্থে প্রামাণ্য না থাকিলেও ভূতার্থবাদের স্বার্থে প্রামাণ্য নিশ্চয়ই আছে। ইহা ছাড়া নিন্দা-প্রশংসা-পরকৃতি-পুরাকল্প-ভেদেও অর্থবাদ চতুর্ব্বিধ। ইহাঁরা সকলেই স্বার্থে অপ্রমাণ—কেবল বিধির স্তুতি বা নিন্দা করে মাত্র।

ইহার উত্তরে ভট্টপাদ অতি সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছেন, তাহার গূঢ়াশয় এইরূপ :—ফলশ্রুতি-বাক্যমাত্রেই যে অর্থবাদ, তাহা নহে। যদি ঐগুলির পরার্থতা নির্ণীত হয়, তাহা হইলেই উহাদিগকে অর্থবাদ বলা চলিতে পারে। এই পরার্থতা নির্জ্ঞাত হয় দুই প্রকারে—(১) প্রকরণ-বলে, ও (২) নিয়ত ক্রতুসম্বন্ধ বশে। অর্থাৎ প্রায়ই অর্থবাদগুলি কোন না কোন বিধির সহিত একই প্রকরণে পঠিত হইয়া থাকে। ইহারা সেই সকল বিধির স্তুতি-নিন্দাপর বলিয়া সেই সেই বিধির সহিত একবাক্যতাপন্ন হইয়া প্রমাণরূপে গণ্য হয়। স্বতন্ত্র ভাবে ইহারা প্রমাণ নহে। এই কারণে এই সকল অর্থবাদের আক্ষরিক অর্থের সত্যতা মীমাংসকগণ স্বীকার করেন না। অঞ্জন-বাক্যগত ফলশ্রুতি এই জাতীয় অর্থবাদ। আর এক শ্রেণীর অর্থবাদ আছে, যাহারা কোন বিশিষ্ট ক্রতুবিধি-প্রকরণে পঠিত না হইলেও উহাদিগের সহিত ক্রতুর অব্যভিচারী স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে। উহারা যজ্ঞে ব্যবহৃত কোন না কোন বস্তুর স্তুতি-নিন্দাপর মাত্র। ঐ সকল দ্রব্য (যথা, স্রুব ইত্যাদি) যজ্ঞাঙ্গ হওয়ায় ঐ সকল দ্রব্যঘটিত অর্থবাদ-বাক্য যে কোন যোগ্য বিধি-বাক্যের সহিত একবাক্যতাপন্ন হইতে পারে। খাদিরস্রুব-বাক্যগত ফলশ্রুতি এই-জাতীয় অর্থবাদ। এখন উপনিষদুক্ত সগুণ-নির্গুণাত্মজ্ঞানের ফলশ্রুতিরূপ অভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স-প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যগুলিকে এই দ্বিবিধ অর্থবাদের কোন এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় কি না, ভট্টপাদ তাহারই বিচারপ্রসঙ্গে উক্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন যে—না, উপনিষদের কোন অংশকেই অর্থবাদ বলা যায় না। কারণ, (১) আত্মজ্ঞান-বাক্য কোন ক্রতুবিধিপ্রকরণেই পঠিত হয় নাই; অতএব উহা প্রথম শ্রেণীর অর্থবাদ নহে; আবার (২) আত্মাকে দ্বার করিয়া যে আত্মজ্ঞানের প্রকাশ, সেই আত্মার সহিত কোনরূপ ক্রতুরই অব্যভিচারী স্বাভাবিক কোন সম্বন্ধ নাই বা থাকিতেও পারে না (যেহেতু, ক্রতু সাধ্যবস্তু ও আত্মা সিদ্ধ বস্তু—উভয়ের সম্বন্ধ অসম্ভব); এ নিমিত্ত উক্ত উপনিষদ্-বাক্যগুলি অর্থবাদের দ্বিতীয় কোটিতেও পড়ে না (৮)।

অতএব, ভট্টপাদ-কর্ত্তৃক উদ্ধৃত অসংসারিরূপ সগুণ-নির্গুণাত্ম-ঘটিত উপনিষদ্-বাক্যাবলী অর্থবাদ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না; অর্থাৎ উহাদিগের স্বার্থে প্রামাণ্য আছে—ইহা তিনি নিজেই স্বীকার করিতেছেন। আর উপনিষদের স্বার্থে প্রামাণ্য যিনি অস্বীকার করেন না, অভ্যুদয়ের হেতু সগুণ ব্রহ্ম ও নিঃশ্রেয়সস্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্মও যে তাঁহার স্বীকৃত—তদ্বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কি আর থাকিতে পারে?

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার আছে। কুমারিল বলিলেন যে, উপনিষদ্ অঞ্জন-খাদিরস্রুব-বাক্যগত ফলশ্রুতির মত অর্থবাদ নহে। তিনি সমগ্র উপনিষদের (সগুণ-নির্গুণ উভয় অংশেরই) অর্থবাদত্ব নিরাকরণ করিলেন। কৈ, তিনি ত একথা বলিলেন না যে, উপনিষদ্‌কে অর্থবাদ বলিতে পার, কিন্তু উহার ফলশ্রুতি অংশকে নিরর্থক বলিও না। কারণ, অবিদ্যমান ফলের দ্বারা বিধিপ্রশংসা করিয়া মানবকে যেমন বিধির অনুষ্ঠানে প্ররোচিত করা যায়, বিদ্যমান ফলের দ্বারাও সেইরূপ বিধির প্রশংসা করা চলে। অতএব, অর্থবাদ হইলেই যে তাহার যথাশ্রুত অর্থ থাকিতে নাই—এমন কোন নিয়ম দেখা যায় না। দর্শ-পূর্ণমাস যাগের ফল যে স্বর্গ—ইহা অতি সত্য কথা। অতএব, স্বর্গফলের যে উক্তি পূর্ব্বোল্লিখিত অর্থ-বাদবাক্যে আছে—উহাকে নিরর্থক বলা চলে না। অর্থাৎ—এ স্থলে এই অনুবাদাত্মক অর্থবাদটি স্বার্থে প্রমাণ। পর্ণময়ী-জুহূ-সম্বন্ধীয় অর্থবাদটি হইতে এই অর্থবাদের কিছু পার্থক্য আছে; যথা—পর্ণময়ী-জুহূ-সম্পর্কিত বাক্যের অক্ষরার্থ সত্য বলিয়া ধর্ত্তব্য নহে—উহা পর্ণময়ী জুহূর কেবল প্রশংসা-দ্যোতক মাত্র; পক্ষান্তরে, এই অর্থবাদটির আক্ষরিক অর্থও সত্য—উহা দর্শ-পূর্ণমাসের নিছক প্রশংসাসূচক নহে (৯)।

---

(৮) "পারার্থ্যে নির্জ্ঞাতে ফলশ্রুতেরর্থবাদত্বং ভবতি প্রকরণাচ্চ, 'যদঙ্‌ক্তে বজ্র এব ভ্রাতৃব্যস্যাঙ্‌ক্তে' ইত্যঞ্জনস্য পারার্থ্যং নির্জ্ঞাতং; 'যস্য খাদিরঃ স্রুবো ভবতি ছন্দসামেব রসেনাবত্ততী'তি চ ক্রত্বর্থাব্যভিচারিস্রুবাদিদ্বারা খাদিরত্বাদেঃ। ন চাত্মজ্ঞানং প্রকরণগতং, ন চাত্মনো দ্বারভূতস্যৈকান্তিকঃ স্বাভাবিকঃ ক্রতু-সম্বন্ধোঽস্তি শরীরসম্বন্ধোপাধিকত্বাৎ কর্ত্তৃত্বস্য অশরীরিরূপাত্মজ্ঞানে তদভাবাদিতি"—ন্যায়সুধা, পৃঃ ৩২৮-২৯।

(৯) "নন্‌ 'বিদ্যাপ্রশংসে'তি (জৈঃ সূঃ ১।২।১৫) সূত্রে বেদনফলানাং প্রশংসারূপত্বং জৈমিনিনা সূত্রিতমিতি চেৎ? অস্তু নাম। বিদ্যমানেনাপি ফলেন প্রশংসিতুং শক্যত্বাৎ। এতচ্চাচার্য্যৈ-র্ব্রহ্মজ্ঞানফলবাক্যস্য স্বার্থেঽপি তাৎপর্য্যং দর্শয়িতুমুদাহৃতম্—

'ইচ্ছাম্যেবার্থবাদত্বং বচসোঽস্যপরত্বতঃ।
যথাবস্থিতধায়িত্বান্ন ত্বভূতার্থবাদতা॥

পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর (পর্ণময়ী জুহূ) অর্থবাদকে 'অভূতার্থবাদ' ও এই শ্রেণীর অর্থবাদকে 'ভূতার্থবাদ' বলে (১০)। যদি উপনিষদ্গুলিকে ভূতার্থবাদ বলা যায়, তাহা হইলে উহারা অর্থবাদ হইলেও কোন ক্ষতি হয় না—উহাদিগের আক্ষরিক অর্থ সত্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কিন্তু ভট্টপাদ এরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে উপনিষদ্গুলির স্বার্থে প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠাপিত করিবার চেষ্টাই করেন নাই। তিনি সোজাসুজি উপনিষদ্গুলির অর্থবাদত্বই খণ্ডন করিয়াছেন ; আর উহার পক্ষে যুক্তি দেখাইয়াছেন যে, উপনিষদের বাক্যাবলী কোন যাগপ্রকরণে উক্ত হয় নাই, অথবা উহাদিগের সহিত এমন কোন বস্তুর সম্বন্ধ নাই—যে বস্তুর সহিত যাগক্রিয়ার নিয়ত সম্বন্ধ আছে। উপনিষদের সহিত সম্বন্ধ অসংসারি আত্মজ্ঞানের—তা তাহা সগুণই হউক আর নির্গুণই হউক। এই অসংসারি সগুণ-নির্গুণ আত্মার সহিত যাগের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। যদি বলা যায় যে, নির্গুণ আত্মার ক্রতুসম্বন্ধ না থাকিলে সগুণ আত্মার উহা থাকা স্বাভাবিক—কারণ, অসংসারি সগুণ আত্মাই সংসারীকে কর্ম্মফল প্রদান করে, এ-কারণে ভোগ্য ফলকে দ্বার করিয়া সগুণ আত্মারও কর্ম্মসম্বন্ধ ঘটিতে পারে। তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে,—আত্মা স্বরূপতঃ এক, উহার সগুণ ও নির্গুণ এই দুইটি রূপ নাই। স্বরূপে আত্মা নির্গুণ—উহার সগুণত্ব কল্পিত। কল্পিত সগুণত্ব লইয়া যদি সগুণ আত্মার ক্রতুসম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে উক্ত সম্বন্ধও কল্পিত (অর্থাৎ মিথ্যা) হইয়া দাঁড়ায়। এরূপ স্থলে সিদ্ধবস্তু আত্মার সাধ্য যাগের সহিত অব্যভিচারী সম্বন্ধ হইতেই পারে না।

মোটের উপর দাঁড়াইল এই যে, ভট্টপাদের সিদ্ধান্তে উপনিষদের সগুণ বা নির্গুণ আত্মতত্ত্ব-প্রতিপাদক কোন অংশই অর্থবাদ বলিয়া গণ্য হয় নাই। এক কথায়, তাঁহার মতে সমগ্র উপনিষদংশেরই স্বার্থে প্রামাণ্য আছে। আর তাহা হইলেই সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা তাঁহার অভিমত—ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এ বিষয়ে তিনি যে অদ্বৈত-বেদান্ত-সম্প্রদায়ের প্রায় অনুরূপ মত পোষণ করিতেন—ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

আচার্য্যপাদের এই সিদ্ধান্ত শাস্ত্রদীপিকাকার-কর্ত্তৃকও সমর্থিত হইয়াছে। পার্থসারথি বলিয়াছেন যে,—ইতিকর্ত্তব্যতাযুক্ত উপাসনাসমূহের যে বিধান উপনিষদে আছে, কোন যাগে তাহাদিগের উপযোগ দৃষ্ট হয় না বলিয়া উহাদিগের ফল অদৃষ্ট—ইহা স্বীকার্য্য। অদৃষ্ট ফল দ্বিবিধ—অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স (১১)। অর্থাৎ—মোটের উপর সগুণ উপাসনা পার্থসারথিমিশ্রেরও মতবিরোধী নহে।

রামকৃষ্ণ 'যুক্তিস্নেহপ্রপূরণী সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা'তে এই মতেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন (১২)।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, উপনিষদুক্ত সগুণোপাসনা ভাট্টসম্প্রদায়ের কেবল যে অনভিপ্রেত ছিল না, তাহা নহে—তাঁহারা উহার অল্পাধিক অনুরাগী ছিলেন, ইহা বলাও বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

এইরূপ অনুমানের পক্ষে একটি প্রবল যুক্তি—'শ্লোকবার্ত্তিকের' প্রথম মঙ্গলাচরণ শ্লোক। এই শ্লোকে শ্রীল কুমারিল ভট্টপাদ দেবাধিদেব মহাদেবের নমস্কারপ্রসঙ্গে বলিতেছেন—

"বিশুদ্ধজ্ঞানদেহায় ত্রিবেদীদিব্যচক্ষুষে।
শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিনিমিত্তায় নমঃ সোমার্দ্ধধারিণে॥"

এই শ্লোকটি নানা কারণে অপূর্ব্ব ও অমূল্য। ৺শ্রীশ্রীসপ্তশতী চণ্ডী গ্রন্থের পূর্ব্বে পাঠ্য 'কীলক'স্তবের আদিতেও এই শ্লোকটি পঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা 'দেবীকীলক' হইতেই গৃহীত কি না—তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন (১৩)।

ইজ্যেতে স্বর্গলোকায় দর্শাদর্শৌ যথা তথা।
ন স্বভূতার্থবাদত্বং পাপশ্লোকা শ্রুতির্যথা॥'
—সায়ণাচার্য্যকৃত ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকা, সংস্কৃত-
সাহিত্যপরিষৎ সংস্করণ, পৃঃ ৬১।

(১০) এস্থলের 'ভূতার্থবাদ' পারিভাষিক 'ভূতার্থবাদ' হইতে ভিন্ন। এ ভূতার্থবাদ—ভূতার্থস্য (যথাশ্রুত অর্থের) বাদঃ (উক্তি) —statement of facts. অভূতার্থবাদ—যাহাতে যথাশ্রুত অর্থের উক্তি নাই—অর্থাৎ যাহার যথাশ্রুত অর্থ সত্য নহে।

(১১) "যানি পুনরিতিকর্ত্তব্যতাবিশেষযুক্তানি উপাসনাত্মকানি বিধীয়ন্তে তেষাং ক্রতৌ দৃষ্টোপযোগাভাবাদদৃষ্টফলত্বম্। অদৃষ্টং চ ফলং বাক্যশেষাদ্ দ্বিবিধম্—অভ্যুদয়রূপং নিঃশ্রেয়সরূপঞ্চ"—শাস্ত্রদীপিকা (১।১।৫), নির্ণয়সাগর সং, পৃঃ ১৩১।

(১২) "উপাসনাত্মকস্য তু জ্ঞানস্য কর্ম্মণি পুরুষে বা দৃষ্টপ্রয়োজনাভাবাদ্ অদৃষ্টাপেক্ষায়াং শ্রুত্যাত্তভাবেন চ ক্রত্বর্থত্বাসম্ভবাদ্ বাক্যশেষোপনীতাভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সফলতয়া পুরুষার্থত্বমেব"—যুক্তিস্নেহপ্রপূরণী, ঐ সং, ঐ পৃঃ।

(১৩) ত্রিপুরা-তন্ত্রসম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিকাচার্য্য মহামনীষী ভাস্কর রায় তাঁহার 'গুপ্তবতী' নামক সপ্তশতীর টীকাগ্রন্থে উক্ত শ্লোকটির ব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"অয়ঞ্চ শ্লোকস্তর্কচরণমীমাংসাবার্ত্তিকে প্রথমঃ। অত্রাপি বহুভিঃ পঠ্যতে। শিবস্য সোমযাগস্য চেহ শ্লেষঃ। বিশুদ্ধং নির্ব্বিষয়কমধ্যয়নসিদ্ধং চ। জ্ঞানং চৈতন্যং বেদার্থস্য চ। ত্রিবেদী বেদত্রয়মৈষ্টিকপাশুকসৌমিকবেদিকাত্রয়ং চ। শ্রেয়ো মোক্ষঃ স্বর্গশ্চ। সোমার্দ্ধঃ চন্দ্রোঽভিষুতসোমরসশ্চ।" তাৎপর্য্য এই যে, ভাস্করের মতে—এই শ্লোকটি জৈমিনিসূত্রের তর্কপাদের মীমাংসাবার্ত্তিকের (অর্থাৎ শ্লোকবার্ত্তিকের) প্রথম শ্লোক। এই স্থলেও (কীলকের প্রারম্ভে) অনেকে ইহা পাঠ করিয়া থাকেন। ইহাতে শিব ও সোমযাগের শ্লেষ আছে। যথা বিশুদ্ধ (শিবপক্ষে) নির্বিষয়, (সোমযাগপক্ষে) অধ্যয়নসিদ্ধ। জ্ঞান (শিবপক্ষে) চৈতন্য, (সোমযাগপক্ষে) বেদার্থের জ্ঞান। ত্রিবেদী (শিবপক্ষে) ঋগ্-যজুঃ-সাম—এই বেদত্রয়,

শ্লোকটির অন্বয়মুখে অর্থ করিলে দাঁড়ায় এইরূপ—যাঁহার দেহ বিশুদ্ধ (অর্থাৎ নির্বিষয়) জ্ঞানময় (অর্থাৎ শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ), বেদত্রয় (ঋগ্-যজুঃ-সাম-মন্ত্রাত্মক সমগ্র বৈদিক বাঙ্ময়) যাঁহার দিব্য (অর্থাৎ জ্ঞানময়) চক্ষুঃস্বরূপ, সোমার্দ্ধধারী (চন্দ্রকলাশেখর) সেই দেবকে মোক্ষ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে নমস্কার করি (অথবা—নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্তির নিমিত্তভূত সেই চন্দ্রকলাধারীকে নমস্কার করি)।

এ অর্থ বেশ সরল। কিন্তু একটু গোলমাল আছে। শ্লোকটির মধ্যে দ্ব্যর্থ বা শ্লেষ বিদ্যমান। শিবপক্ষে ইহার যেরূপ ব্যাখ্যা করা চলে, যাগপক্ষেও ইহার সেইরূপ অর্থ করা সম্ভব। 'ন্যায়রত্নাকরে' পার্থসারথিমিশ্র ইহার যজ্ঞপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—বিশুদ্ধ অর্থাৎ মীমাংসাদ্বারা পরিশোধিত সুনিশ্চিত জ্ঞান যাহার দেহস্বরূপ, ত্রিবেদী (ইহার অর্থ বেদত্রয় কিংবা বেদীত্রয়—পার্থসারথি তাহা স্পষ্ট না বলিলেও মনে হয়, বেদত্রয়ই তাঁহার অভিপ্রেত অর্থ; কারণ তাহা না হইলে 'প্রকাশক' কথাটির সঙ্গতি হয় না), যাহার চক্ষুঃস্বরূপ (অর্থাৎ প্রকাশক), সোমের আধারস্বরূপ গ্রহ-চমসাদি পাত্র যাহার দ্বারা ধৃত হইয়া থাকে, কল্যাণপ্রাপ্তির নিমিত্তভূত সেই যজ্ঞকে প্রণাম করি (১৪)।

যজ্ঞপক্ষে এই ব্যাখ্যা করিলেও পার্থসারথির নিজ-মুখের উক্তি হইতে বেশ মনে হয়—ইহা তাঁহার স্বারসিক অভিপ্রায় নহে। কারণ, তিনি বলিয়াছেন—"ইতি যজ্ঞপক্ষেঽপি সঙ্গচ্ছতে"। ইহার আক্ষরিক অর্থ এই যে—'এইরূপে যজ্ঞপক্ষেও ব্যাখ্যার সঙ্গতি হইতে পারে'। তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এই যজ্ঞপক্ষে ব্যাখ্যাটি তাঁহার নিকট দ্বিতীয় বা গৌণ কল্প বলিয়া মনে হইয়াছে। প্রথম অর্থাৎ মুখ্যকল্পে যে ব্যাখ্যা, তাহা তিনি পূর্ব্বেই দিয়াছেন। অবশ্য মুখ্যকল্পে তিনি কোন বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন নাই। কিন্তু ইহাই যে তাঁহার নিজের যথার্থ নিগূঢ় অভিপ্রায়, ইহা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে শিবপক্ষে ব্যাখ্যাটির সারাংশ সংক্ষেপে শ্লোকাকার ন্যায়-রত্নাকর গ্রন্থের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণরূপে করিয়া নিবেশিত করিয়াছেন। তাঁহার শ্লোকটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

> "শ্লোকবার্ত্তিকমারিপ্সুস্তস্যাবিঘ্নসমাপ্তয়ে।
> বিশ্বেশ্বরং মহাদেবং স্তুতিপূর্ব্বং নমস্যতি" ॥
> (ন্যায়রত্নাকর, প্রথম উপোদ্‌ঘাত-শ্লোক)

ইহার তাৎপর্য্য এই—

(ভট্টপাদ শ্রীল কুমারিল) 'শ্লোকবার্ত্তিক'-রচনা আরম্ভ করিবার ইচ্ছায় উহার নির্ব্বিঘ্ন পরিসমাপ্তির উদ্দেশ্যে বিশ্বেশ্বর মহাদেবকে স্তুতিপূর্ব্বক নমস্কার করিতেছেন।

পার্থসারথির এই উক্তির পর কি আর সন্দেহ থাকিতে পারে যে, ভাট্টসম্প্রদায়ের মীমাংসকগণ নিরীশ্বরবাদী? শিবপক্ষে ব্যাখ্যাই যে পার্থসারথির ন্যায় মীমাংসক-শিরোমণির নিকট মুখ্য পক্ষ বলিয়া স্বীকৃত—ইহাতে আমরা নিঃসন্দেহ। যদি যজ্ঞপক্ষে ব্যাখ্যা তাঁহার মুখ্য কল্প বলিয়া বোধ হইত, তাহা হইলে তিনি কখনই উহাকে দ্বিতীয় স্থান প্রদান করিতেন না—উহা দ্বারাই ন্যায়রত্না-করের আরম্ভ করিতেন। বিশেষতঃ, "যজ্ঞপক্ষেঽপি"—এই 'অপি'-শব্দের প্রয়োগে তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, শিবপক্ষে ব্যাখ্যা ব্যতীত যজ্ঞপক্ষেও এইরূপ একটা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাকে প্রথম স্থান প্রদান করা চলিতে পারে না। কারণ, ঐ ব্যাখ্যা স্বাভাবিক সরল বুদ্ধিসঞ্জাত নহে—ব্যাখ্যাতৃগণের নিপুণ-বুদ্ধি-কৌশল-প্রসূত। এ সম্বন্ধে বারান্তরে আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।　　শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী।

(সোমযাগপক্ষে) ইষ্টি পশু সোম এই তিনটি আহুতির নিমিত্ত তিনটি বেদী। শ্রেয়ঃ (শিবপক্ষে) নিঃশ্রেয়সরূপ পরম কল্যাণ, (সোমযাগপক্ষে) স্বর্গরূপ সুখ। সোমার্দ্ধ (শিবপক্ষে) চন্দ্র অর্থাৎ চন্দ্রকলা, (সোমযাগপক্ষে) অভিষুত সোমরস। সোমার্দ্ধঃ—ষষ্ঠী সমাস। 'অর্দ্ধঃ' পুংলিঙ্গ; ইহার অর্থ একাংশ, ঠিক আধা-আধি নহে। ঠিক আধা-আধি হইলে 'অর্দ্ধ' ক্লীবলিঙ্গ হইত ও ষষ্ঠী-সমাসের পরিবর্ত্তে একদেশী সমাস হইয়া 'অর্দ্ধসোম' পদ হইত। এই কারণে 'সোমার্দ্ধ'পদের দ্বারা চন্দ্রের অংশ বা কলা এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। অতএব, সোমযাগপক্ষে ব্যাখ্যা এইরূপ দাঁড়াইল—বৈদিক কর্ম্ম-কাণ্ডের অধ্যয়নে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানই যাহার শরীরস্বরূপ, ইষ্টি-পশু-সোম এই আহুতিত্রয়ের উপযোগী ঐষ্টিক-পাশুক-সৌমিক বেদীত্রয় যাহার চক্ষুঃস্বরূপ, স্বর্গপ্রাপ্তির নিমিত্তভূত সেই সোমরস-ধারী যজ্ঞকে নমস্কার করি। ভাস্কর রায় সুস্পষ্ট বলিলেন না যে, ইহা কীলকস্তবেরই অংশ অথবা কুমারিলের রচিত। বোধ হয়, এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজেরও বিশেষ সন্দেহ ছিল। 'দুর্গাপ্রদীপ' নামে অতি আধুনিক একখানি সপ্তশতী-টীকায় এই প্রসঙ্গে ভাস্করের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, ইহা শ্লোকবার্ত্তিকের প্রথম শ্লোক, এ স্থলেও বহু লোক পাঠ করেন, পরন্তু ইহা আর্ষ নহে। কিন্তু আমাদিগের মতে উহা কীলকেরই অংশ; বার্ত্তিককার মঙ্গলার্থে ঋণস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বলিলে কিছু অসঙ্গত হয় না। কোন স্থানের কোন প্রাচীন শ্লোক অন্য কোন আধুনিক গ্রন্থে মঙ্গলার্থে গ্রহণ করা যায় না—এমন ত কোন রাজাদেশ নাই। অতএব ইহা আর্ষ শ্লোকই বটে। "অত্র কেচিদয়ং শ্লোকস্তর্কচরণমীমাংসাবার্ত্তিকে প্রথমোহত্রাপি বহুভিঃ পঠ্যতে, পরন্ত অনার্ষ ইত্যাহুঃ। বয়ন্তু ত্রমোহত্রত্য এব স শ্লোকো মঙ্গলার্থং বার্ত্তিককারৈর্গৃহীত ইতি কুতো ন স্যাৎ। ন হি কুত্রচিৎ স্থিতঃ শ্লোকো মঙ্গলার্থমন্যত্র ন গৃহীতব্য ইতি রাজাজ্ঞাস্তি। তস্মাৎ সর্ব্ব-পুস্তকেষূপলম্ভাদার্ষ এব শ্লোক ইতি।" ইহাও অনুমান মাত্র। মীমাংসা কিছুই হইল না। 'কীলক'কে কেহ কেহ 'দেবীকীলক' 'লক্ষ্মীকীলক' প্রভৃতি নামও দিয়া থাকেন।

(১৪) "বিশুদ্ধং মীমাংসয়া সংশোধিতং জ্ঞানমেব দেহো যস্য। ত্রিবেদ্যেব দিব্যং চক্ষুঃ প্রকাশকং যস্য। সোমস্য অর্দ্ধং স্থানং গ্রহচমসাদি তদ্ধারিণে ইতি যজ্ঞপক্ষেঽপি সঙ্গচ্ছতে।"
—ন্যায়রত্নাকর, পৃঃ ১

সিংহ ডেপুটি

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ

অগ্রহায়ণ মাস। সন্ধ্যা হইয়াছে। লেকের দিকে চার-তলা বাড়ী। দোতলায় বসিবার ঘরে রিটায়ার্ড সব-জজ্ রায়-বাহাদুর লালবেহারী গাঙ্গুলি ইজি-চেয়ারে পা ছড়াইয়া বসিয়া আছেন। সবুজ বালবের উপর ব্ল্যাক-আউটের কালো ঘেরা-টোপ্ পড়িয়া ঘরে যে-আলো হইয়াছে, নামেই তাকে আলো বলা চলে! সে আলোয় না যায় লেখাপড়া করা, না হয় গল্প! এ-আলোয় চোখ আপনা হইতে ঘুমে ঝিমাইয়া আসে!

ভৃত্য মধু আসিয়া সংবাদ দিল,—গুরুপদ বাবু এসেছেন।

রায়-বাহাদুর বলিলেন,—ও···তা নিয়ে আয়।

মধুকে লইয়া আসিতে হইল না। রায়-বাহাদুরের স্বর শুনিয়া গুরুপদ বাবু তখনি আসিয়া উদয় হইলেন। তিনি ছিলেন দ্বারের বাহিরে মধুর ঠিক পিছনে···মেয়েরা যদি ঘরে থাকেন, ঢুকিবার পূর্ব্বে মধুকে পাঠাইয়া তাই সাড়া দিলেন।

মধু চলিয়া গেল। রায়-বাহাদুর বলিলেন—বসো গুরুপদ···

গুরুপদ বাবু বসিলেন; বসিয়া চারি দিকে চাহিলেন। বলিলেন—অন্ধকার করে বসে আছেন!

রায়-বাহাদুর বলিলেন—এ-আর-পি নাহলে এখনি এসে চেঁচাবে! এ-বাড়ীর নীচেই তারা দল বেঁধে এসে দাঁড়ায় কি না···

রায়-বাহাদুরের কণ্ঠ গাঢ়। একটু কাশিলেন। লক্ষ্য করিয়া গুরুপদ বাবু বলিলেন—সর্দ্দি হয়েছে?

—বড্ড। নতুন হিম্ পড়ছে···আমার বড় মেয়ে শৈল এসেছে শ্বশুর-বাড়ী থেকে। তার বাচ্চা-ছেলেটার জ্বালায় ভোর হলে তো আর বিছানায় পড়ে থাকবার জো নেই। শৈল বললে, চলো বাবা, সকলে লেকের দিক্ ঘুরে বেড়িয়ে আসি। গেলুম। অভ্যাস নেই···তায় বয়স হয়েছে···লেগে গেল ঠাণ্ডা···ব্যস্!

রায়-বাহাদুরের গৃহিণী ঘরে প্রবেশ করিলেন, কহিলেন,—কার সঙ্গে কথা কইছো?

রায়-বাহাদুর বলিলেন—গুরুপদ এসেছে···

—ও···বলিয়া গৃহিণী সুইচ্ টিপিয়া একটা সাদা বালব্ জ্বালিলেন; সবুজ বালবের সুইচ্ সঙ্গে সঙ্গে অফ্ করিয়া দিলেন। ঘরে আলো হইল। তার পর গুরুপদর পানে চাহিয়া তিনি বলিলেন—ভর-সন্ধ্যায় বেরিয়েছেন!

গুরুপদ বলিলেন—হ্যাঁ। মানে, আজ গেছলুম একবার ডেপুটী-কমিশনার টমাশ সাহেবের কাছে।

রায়-বাহাদুর বলিলেন—হঠাৎ?

গুরুপদ বলিলেন—হঠাৎ নয়। পেন্সন নিয়ে কি করে সময় কাটাবো—দারুণ সমস্যা হয়েছে! তাই ফরিদপুরে থাকতে আলাপ হয়েছিল···সেখানে ছিলেন তখন শশী দত্ত, এস-পি···তিনি বললেন, ডেপুটী টমাশ সাহেবের সঙ্গে তাঁর খাতির, তাঁর কাছে নিয়ে যাই; তাঁকে ধরে যদি অনারারী-ম্যাজিষ্ট্রেটী একটা পেয়ে যান···দুপুর-বেলাটা দিব্যি কাটবে। তাই টমাশের কাছে গেছলুম। দেরী হলো···তার পর ট্রাম থেকে নেমে সটান এখানে আসছি।

রায়-বাহাদুরের গৃহিণী বলিলেন—মাইনে নিয়ে লোকজনকে জেল দেছেন, জরিমানা করেছেন,···সে যা করবার, করেছেন। এখন মাইনে না নিয়ে ও-কাজ করে লোকের শাপ-মন্যি আর নাই-বা কুড়োলেন!

বাহির হইতে দাসী ডাকিল,—মা···

গৃহিণী বলিলেন—ও···জল গরম হয়েছে? দাঁড়া, আমি যাচ্ছি···

গৃহিণী চলিয়া গেলেন।

রায়-বাহাদুর বলিলেন—এঁরা দেখেন শুধু লোককে জেল দেওয়া আর জরিমানা করা! বোঝেন না তো, এর নাম বিচার! ভালো লোককে ধরে কি আর জেল-জরিমানা করা হয়? হুঁঃ! এমন না হলে আর মেয়ে-মানুষ বলবে কেন? কিন্তু এ-সব কথা এঁদের মুখের উপর বলা চলে না তো!

গুরুপদ সিঙ্গী পঁচিশ বছর ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেটি করিয়া বাহিরে-বাহিরে কাটাইয়া সবে এই দু'-তিন মাস পেন্সন লইয়া কলিকাতায় সাবেক পৈতৃক বাড়ীতে আসিয়া বসিয়াছেন। বাড়ী ঢাকুরিয়ার কাছে। পূর্ব্বে এখানটা ছিল জলা-বিল নালা-জঙ্গলের আড়ালে; এখন ইমপ্রুভ-মেণ্ট ট্রাষ্ট দশ-হাতে সে জলা-বিল বুজাইয়া, জঙ্গল কাটিয়া সাফ করিয়া জায়গাটিকে যেন ইন্দ্রপুরী বানাইয়া তুলিয়াছে! এবং পাড়ার অন্য বাড়ীর সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া ডেপুটির মর্য্যাদা রাখিয়া গুরুপদর গৃহিণী রাজলক্ষ্মী এবং তাঁর দুই কন্যা ব্রজ ও রেবা স্ক্রীন-ম্যাগাজিনে টকি-ছবির বাড়ীর শেট্ দেখিয়া তারি ছাঁদে ভাঙ্গিয়া জুড়িয়া সাবেক বাড়ীকে যে-মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত করিয়াছেন, দেখিয়া গুরুপদর তাক লাগে! বাড়ীকে এখনো ঠিক নিজের বাড়ী বলিয়া মনে-প্রাণে কায়েমি ভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই! বাড়ীতে ঢুকিতে তাঁর গা ছম্‌ছম্ করে! ভাবেন, কমিশনার-সাহেবের বাড়ী! না, জজ-সাহেবের বাড়ী!

কিন্তু সে কথা থাক···রায়-বাহাদুরের গৃহিণী ফিরিয়া আসিয়াছেন, অতএব আমরা ও-ঘরে চলি।

গৃহিণী আসিলেন। তাঁর হাতে চায়ের পেয়ালা। পেয়ালা হইতে ধোঁয়া উঠিতেছে।

গৃহিণী আসিয়া টেবিলের উপর পেয়ালা রাখিলেন; ডাকিলেন,—মঞ্জু···

সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে মঞ্জুর প্রবেশ। তার হাতে প্লেটে আদা-বাটা।

গৃহিণী বলিলেন—আদা আমায় দে···

মঞ্জু প্লেট্ ধরিল মায়ের সামনে। প্লেট হইতে আদা-বাটা লইয়া রস নিংড়াইয়া মা চায়ে আদার রস মিশাইলেন।

গৃহিণী মেয়েকে বলিলেন—তোর কাকাবাবুর জন্যে ভালো করে চা তৈরী করে নিয়ে আয়···আর সেই সঙ্গে দুখানা বিস্কুট···

মেয়ে গেল মায়ের আদেশ পালন করিতে।

চামচ দিয়া পেয়ালা নাড়িয়া রায়-বাহাদুরের সামনে গৃহিণী পেয়ালা ধরিলেন। বলিলেন,—খাও···

রায়-বাহাদুর বলিলেন—ধোঁয়া উড়ছে। বড্ড গরম।

গৃহিণী বলিলেন—সইয়ে-সইয়ে এই গরমই তোমায় খেতে হবে···নাহলে উপকার হবে কেন?

রায়-বাহাদুর নড়িয়া খাড়া হইয়া বসিলেন। গায়ের উপরে পাৎলা সুজনি ঢাকা ছিল···নড়িতে সে-সুজনি সরিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে-মঞ্জু শিহরিয়া উঠিল। কহিল—এঁ্যা, বাবা! পায়ে মোজা নেই!··· দেখেছো মা?

মা দেখিলেন। মেয়ে ছুটিল মোজার সন্ধানে।

গৃহিণী বলিলেন—কেন এমন অসাবধান হও বলো দিকিনি? পুরুষ-সিংহের পৌরুষ? এই নতুন হিম্···বয়স হয়েছে···এ কথা কি বলে ভোলো?

রায়-বাহাদুর কোনো কথা বলিলেন না। বলিবার উপায় ছিল না। তিনি তখন ধীরে ধীরে আদার রস-মিশানো গরম-চা সিপ্ করিতেছেন!

মেয়ে মঞ্জু ফিরিয়া আসিল। তার হাতে গরম-মোজা এবং কম্‌ফর্টার। আসিয়া নিঃশব্দে সে রায়-বাহাদুর বাপের পায়ে মোজা এবং গলায় কম্ফর্টার পরাইয়া দিল।

গুরুপদ একাগ্র দৃষ্টিতে এ-দৃশ্য দেখিতেছিলেন। বুকের মধ্যে পুরোনো শৈশবের কথা যেন ঘূর্ণী-তরঙ্গের মতো চক্র তুলিয়া ফুঁশিয়া উঠিল! স্কুলে পড়িতেন—মাঠে খেলিতে বা পরের বাগানে গাছে উঠিতে গিয়া অসাবধানে হাত-পা কাটিয়া বাড়ী ফিরিলে মা ছুটিয়া আসিয়া কাটা ঘা ধুইয়া গাঁদা-পাতা বাটিয়া দিতেন; রাত্রে কাহারো বাড়ী নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিলে শুইতে যাইবার পূর্ব্বে জোয়ানের আরক খাওয়ানো; এগ্‌জামিন দিতে যাইবার সময় কপালে দইয়ের ফোঁটা এবং পকেটে ঠাকুরের প্রসাদী-ফুল গুঁজিয়া দেবতার কাছে সাফল্য-কামনা; তার পর অসুখে-বিসুখে মাথার শিয়রে বসিয়া মাথায় হাত বুলানো; মাথায় পয়সা ছোঁয়াইয়া সে-পয়সা

লইয়া ভক্তি-ভরে গিয়া তুলসী-তলায় পোঁতা,—জীবনকে মনে হইত কত দামী! সে-জীবনকে মা কি ভাবেই না রক্ষা করিতেন! মায়ের সে-যত্ন পাইয়াছিলেন বলিয়াই না পরে···

এই সঙ্গে আরো মনে পড়িল, চাকরি-জীবনের কথা। চাকরি পাইয়া প্রোবেশনারিতে প্রথম সেই জঙ্গীপুর-যাত্রা! মায়ের দু' পায়ে বাত···তবু যাত্রা-কালে মা নিজে কোনো মতে ঠাকুর-ঘরে গিয়া ছেলের কল্যাণ-কামনায় দেবতাদের তৃপ্তি-সাধনের কি বিচিত্র আয়োজন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন···

সেই মা চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোথায় গেল সে কল্যাণ-কামনা···সে দেবতা-ঠাকুর···সে প্রসাদী-ফুল!

স্ত্রী রাজলক্ষ্মী। স্ত্রীর হাতে সংসার···সে-সংসারে গুরুপদ শুধু খাটিয়া টাকা আনিয়াছেন! অসুখ-বিসুখ করে নাই কি? করিয়াছে। সে অসুখ-বিসুখে মুন্সেফ, সাব-ডেপুটি, কোর্ট-বাবু, প্রসাদপ্রার্থী দু'-চার জন উকিল···ইঁহারা আসিয়া গল্প করিয়াছেন! সরকারী এ্যাসিষ্টাণ্ট-সার্জ্জন আসিয়া প্রেসক্রপশন্ দিয়াছেন! ঔষধ আসিয়াছে সরকারী হাসপাতাল হইতে! স্ত্রী কোনো দিন পাশে বসিয়া রাত্রি জাগিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না! তার পর দুই মেয়ের আবির্ভাব! বড়র বেলায় রাজলক্ষ্মীর কি-দুঃখ! ছেলে না হইয়া মেয়ে হইল কেন? দীনু-চাপরাশি···তারো ছেলে হইয়াছে! আর তিনি হাকিমের স্ত্রী···নিরুপায়ে মেয়েকে ছেলে সাজাইলেন! মেয়ের নাম রাখিলেন ব্রজেন্দ্রনন্দিনী ···এই মেয়েকে তার দশ বছর বয়স পর্য্যন্ত পেন্টুলেন-কোট পরাইয়াছেন! লোকে হাসিত, তবু! তার পর ছোট মেয়ে রেবা। মেয়েদের লইয়া রাজলক্ষ্মী সেই যে পাশের ঘরে আলাদা শয্যা পাতিয়া পাশ হইতে সরিয়া গিয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত দু'জনে আর পাশাপাশি মিলিতে পারিলেন না! পেন্সন লইবার আগেও সে-বার খুব অসুখ করিয়াছিল। কিশোরগঞ্জ-মহকুমায় গিয়া দারুণ ম্যালেরিয়া! সে-জ্বরে একা পড়িয়া কাতরাইয়াছেন···· হাসপাতাল হইতে দেশী নার্শ আনিয়া স্ত্রী তাঁর কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। তার পর গুরুপদর জ্বর ছাড়িবা-মাত্র তাঁকে সেই কিশোরগঞ্জে ফেলিয়া মেয়েদের ইন্‌জেক্শন্ দিয়া গৃহিণী কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন··· কিশোরগঞ্জের মশা পাছে তাঁর দুই মেয়েকে কামড়ায়! পাছে তাঁর দুই মেয়ের দেহে বিষ ঢোকে!

এখানে আজ এই সামান্য-সর্দ্দিকাশিতে রায়-বাহাদুরের গৃহিণী আর কন্যারা রায়-বাহাদুরের কি অসামান্য সেবাই না করিতেছেন!

নিজেকে অতি-অসহায় নিঃসঙ্গ বলিয়া মনে হইল। বেদনার বাষ্প জমিয়া নিমেষে বুকের মধ্যে যেন হিমালয় পাহাড় গড়িয়া তুলিল!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ফরিদপুরের এস্-পি শশী দত্ত ছিলেন কলিকাতায়··· ছুটীতে। তিনি সে-দিন বৈকালে চায়ের নিমন্ত্রণ করিয়া-ছিলেন। গুরুপদ আসিয়া শুনিলেন, দত্ত-গৃহিণীর অসুখ। সেই অসুস্থ শরীর লইয়াই বেচারী দত্ত-গৃহিণী বিবর্ণ পাণ্ডু-মুখে স্বামীর অতিথির পরিচর্য্যায় আরাম-বিরাম ত্যাগ করিয়া আসরে আসিয়া বসিয়াছেন!

ঠিক করিয়া আসিয়াছিলেন, দত্তকে আজ চাপিয়া ধরিবেন। শশী দত্তকে বলিবেন, টমাশ সাহেবকে বলিয়া অনারারীর গতি করিয়া না দিলে তাঁর পক্ষে প্রাণ রক্ষা করা কঠিন হইবে! সকালে-সন্ধ্যায় পাঁচ জনের বাড়ীতে ঘুরিয়া সময়-কাটানো চলে। কিন্তু দুপুর-বেলায় পুরানো বন্ধুদের মধ্যে কেহ আমল দিতে চান্ না!

সে-দিন গিয়াছিলেন বংশীধর বাবুর কাছে। জজীয়তী করিয়া পেন্সন লইয়া বংশীধর বাড়ীতে আসিয়া বসিয়া-ছেন। বলিলেন,—দুপুর-বেলাটায় গিন্নী দখল ছাড়েন না হে। বলেন, সকালে-বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে যেখানে খুশী যাও, যা খুশী করো···দুপুর-বেলায় কোথাও তোমার যাওয়া হবে না। সে-সময় আরাম আর বিশ্রাম!··· আমাদের চোখের ওপরে থাকবে।

সুরেশ সেন···ডাক্তারী-চাকরি করিয়া মেদিনীপুরের সিভিল্ সার্জ্জেনের পোষ্ট হইতে পেন্সন লইয়া বাড়ী আসিয়া বসিয়াছেন। সন্ধ্যার পর ও-পারে হাওড়ায় গিয়া তাস খেলিয়া রাত্রি বারোটা বাজাইয়া বাড়ী ফেরেন, সেনের স্ত্রী তাহাতে কথাটি ক'ন না! কিন্তু দুপুর বেলায়? হাসিয়া সেন বলেন,—অন্তঃপুর ছাড়বার হুকুম নেই হে গুরুপদ···

সরকারী-উকিল বাল্যবন্ধু সুরেশ পালিত ব্লাড্-প্রেসারের দমকে কোর্টে দু'-দু'বার অজ্ঞান হইয়া গিয়াও আদালতের মায়া ছাড়িতেছিলেন না! স্ত্রী শেষে কোমর বাঁধিয়া সুরেশ পালিতকে রিটায়ার করাইয়া ছাড়িয়াছেন! পালিত বলেন,—উনি বলেন, পয়সা ঢের রোজগার করেছো, কে তোমার পয়সা চায়? এখন বাড়ীতে চোখে-চোখে আমাদের সঙ্গে বসে থাকতে হবে।

মনের মধ্যে বায়োস্কোপের ছবির মতো দৃশ্যের পর যেন দৃশ্য-পরিবর্ত্তন হইতেছিল। এ সব দৃশ্য গুরুপদকে বিচলিত করিয়া তুলিল! এমন বিচলিত যে, দত্ত-দম্পতীর সৌজন্যের তারিফ করিয়া দু'টা কথা বলিবেন ভাবিয়াছিলেন, সে-কথা ভুলিয়া কেমন গম্ভীর হইয়া রহিলেন!

স্মেলিং-সল্টের শিশি খুলিয়া এ্যামোনিয়ার ঘ্রাণ লইতে-লইতে দত্তর স্ত্রী তাঁর গম্ভীর মূর্ত্তি লক্ষ্য করিলেন। করিয়া বলিলেন,—সিঙ্গী-মশায়ের শরীর খারাপ না কি?

গুরুপদ বলিলেন—না। কেন বলুন তো?

দত্ত-গৃহিণী বলিলেন—কেমন যেন অন্যমনস্ক দেখছি··· চুপচাপ!

শশী দত্ত বলিলেন—হ্যাঁ···আমিও লক্ষ্য করছি।

গুরুপদ বলিলেন—হ্যাঁ···মানে, ক'দিন ধরে কেমন যেন একটু বেজুৎ···মানে, অর্থাৎ···

এই অর্থাৎ এবং মানে আর বলা হইল না। এস্-পি শশী দত্ত বলিলেন—বলছি, লেগে যান্ অনারারী কাজে। তার পর গবর্ণমেণ্ট হয়তো re-appoint করতে পারে। ক'জনকে করেছে···ডার্থ অফ্ অফিসার্শ। মানে, যাঁরা দিব্যি কাজ করছেন, শুধু বয়সের ওজুহাতে তাঁদের পেন্সন দেওয়া···আমার ভালো বলে মনে হয় না। যারা রুগ্ন, খিট্‌খিটে-মেজাজ···এজলাসে বসে ঝিমুচ্ছে আর ঘুমুচ্ছে··· তাদের ধরে দাও পেন্সন! কিন্তু যারা শক্ত-সমর্থ··· তাদেরো ঐ সঙ্গে?···হুঁঃ!

কথাগুলা কাণে গেলেও মনের মধ্যে পৌঁছিতে পারিল না। মনের সামনে তখন পুরানো-বন্ধুদের দুপুর-বেলাকার আরাম-সুখের বিচিত্র ছবি-আঁকা ড্রপ-শীন পড়িয়া আছে!

চায়ের পেয়ালা শেষ হইলেই আসর ভাঙ্গিল। শশী দত্ত বলিলেন—ইনি অসুখ করে বসলেন! না হলে ভেবে-ছিলুম, এখান থেকে আপনাকে নিয়ে সিনেমায় যাবো।

দত্ত-গৃহিণী বলিলেন—আমার এমন অসুখ নয় যে, চৌকিদারীর দরকার! সিঙ্গী মশায়কে নিয়ে যাও না তুমি সিনেমায়···সত্যি!

মুখে কুণ্ঠিত হাসি···শশী দত্ত বলিলেন—যাওয়া উচিত হবে গুরুপদ বাবু? আমায় না নিয়ে উনি কখ্‌খনো সিনেমায় যান না। সে-দিন ওঁর দিদি এসেছিলেন, আর আমার সম্বন্ধীর স্ত্রী—তাঁরা কত সাধলেন, সিনেমায় চলো। উনি গেলেন না!

দত্ত-গৃহিণী বলিলেন—আহা, কি করে যাবো? বুঝলেন সিঙ্গী মশায়, সে-দিন সকাল থেকে ওঁর ডায়েরিয়া চলেছে ···বেলা পাঁচটার সময় একটু বার্লি মাত্র দিয়েছি··· আমার কি তখন আমোদ করবার সময়? না, আমোদ ভালো লাগবার কথা?

গুরুপদ জবাব দিলেন না। তাঁর মুখে কথা নাই! তিনি নীরব শ্রোতা। মনে হইতেছিল, এ যেন কোন্ অমৃতলোকের কাহিনী শুনিতেছেন! রোমান্স···কাব্য··· কলেজে এ সব পড়িতেন। এনক্-আর্ডেন, রোমিও-জুলিয়েট···এমনি ভালোবাসার কথা, মায়া-মমতার কথা! সে-সব কথা পেনাল-কোড আর ক্রিমিনাল প্রোসিডিয়োর কোডের তলায় চাপা পড়িয়া পিষিয়া মরিয়াছে!

মনে হইতেছিল, তাঁর স্ত্রী রাজলক্ষ্মীও সিনেমায় যান··· প্রায় যান···মেয়েদের লইয়া যান···বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গে যান! কিন্তু কৈ, কোনো দিন গুরুপদকে ডাকিয়া স্ত্রী বলেন নাই, ওগো, চলো না সিনেমা দেখতে···

বেশী দিনের কথা নয়···এই সে-দিন। কোথায় এক-খানা ছবি দেখাইতেছিল···তাও বাঙলা ছবি নয়; হিন্দী ছবি। সেই হিন্দী ছবি দেখিতেই দুই মেয়েকে লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। গুরুপদর সে-দিন···না, ডায়েরিয়া নয়···ডিসেণ্টি···তবু গেলেন! আর এই শশী দত্তর স্ত্রী···

গুরুপদর মনে হইল, না, সত্যই তাঁর কেহ নাই! যে-বাড়ীতে যান, দেখেন, স্বামি-স্ত্রী ছেলে-মেয়ে···সকলে মিলিয়া-মিশিয়া আরাম-নীড় রচনা করিয়া বাস করি-তেছে! ইহাকেই বলে সংসার! আর তাঁর গৃহ···

যেন মহাজনী-কারবার। খোঁজ পড়ে শুধু ব্যাঙ্কে চেক কাটিবার সময়…

মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলিয়া গুরুপদ মনে মনে বলিলেন, উপায় কি!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সে-দিন ঘুরিতে ঘুরিতে বেলা দেড়টার সময় ধর্ম্মতলায় কার্জন্‌-গার্ডন্‌সে আসিয়া বসিলেন। বসিয়া থাকিতে-থাকিতে বেলা পড়িয়া গেল। গুরুপদ ভাবিলেন, সন্ধ্যা হইয়াছে, এবার গিয়া কাহারো আরাম নীড়ে ঢুকি! রাত্রি বারোটার আগে চোখে ঘুম আসে না…চির-দিনের অভ্যাস…বারোটা পর্য্যন্ত বসিয়া রায় লিখিতেন!

উঠিতেছিলেন। হঠাৎ দেখা ব্যারিষ্টার আর, মিত্তিরের সঙ্গে। গুরুপদ আর এই আর, মিত্তির ওরফে রবীন মিত্তির…ছেলেবেলায় দু'জনে এক স্কুলে এক ক্লাশে পড়িয়াছেন…বরাবর।

মিত্তির বলিলেন—শুনেছিলুম বটে, তুমি পেন্সন নিয়ে বাড়ী এসে বসেছো। যাবো-যাবো মনে করি, যাওয়া আর হয় না। তা আছো কেমন?

গুরুপদ বলিলেন—কেমন দেখছো?

মিত্তির বলিলেন—ভালো।…চলেছো কোথায়?

—কোথাও না…

মিত্তির বলিলেন—আমার ওখানে চলো…কত যুগ পরে দেখা হলো। আমার গাড়ী আছে লেডলর দোকানের সামনে সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী রোডে। হাইকোর্ট থেকে এ-পথটুকু রোজ হেঁটে আসি…একটু এক্সারসাইজ হয়। গিন্নীর হুকুম।. তিনি গাড়ীতে বসে আছেন। তোমায় দেখে ভারী আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন।

আবার সেই দাম্পত্য প্রেমের দৃশ্য!…এ-দৃশ্যে গুরুপদর মনে যা হয়…

নিরুপায় চিত্তে গুরুপদ বাল্যবন্ধুর সঙ্গে চৌরঙ্গীর মোড় পার হইলেন।

মিত্তির বলিলেন—ঐ আমার গাড়ী…

লেডলর দোকানের সামনে সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী রোডে মস্ত মোটর।

মিত্তির আসিয়া ডাকিলেন—বাসু…

মিসেস বাসন্তী মিত্তির চাহিলেন স্বামীর পানে।…স্বামীর পিছনে…কে ও ভদ্রলোক?

বিরক্ত হইলেন। এ সময়টা দু'জনে গাড়ীতে চড়িয়া ময়দান ঘুরিয়া সেই গঙ্গার ধার হইয়া বাড়ী ফেরেন। দু'জনের এ-বিচরণের মাঝখানে বাসন্তী মিত্তির ছেলে-মেয়েকে ঘেঁষিতে দেন না…আর স্বামী আজ ও কাহাকে লইয়া…

মিত্তির বলিলেন—আমাদের গুরুপদ গো…ডেপুটি গুরুপদ। পঁচিশ বছর পরে দেখা। পেন্সন নিয়ে কেমন আরাম্‌সে আছে! কোনো দায় নেই! আর আমি আজো ঘাড়ে জোয়াল নিয়ে গাড়ী টানছি। বরাত!

বাসন্তী মিত্তিরের বিরক্তি ছুটিল। হাসিয়া তিনি বলিলেন—আসুন গুরুপদ বাবু…

নেপালী ড্রাইভার গাড়ীর দ্বার খুলিয়া দিল। গুরুপদকে ঠেলিয়া গাড়ীর মধ্যে তুলিয়া মিত্তির উঠিলেন। ড্রাইভার দ্বার বন্ধ করিল…

তার পর গাড়ী চলিল।

গাড়ীতে বসিয়া কত কথা…সে কথার শেষ নাই! গুরুপদর ক'টি ছেলেমেয়ে? ছেলে নাই? শুধু দু'টি মেয়ে!…বড় মেয়ের নাম ব্রজেন্দ্রনন্দিনী? বাসন্তী মিত্তির বলিলেন,—আর নাম খুঁজে পেলেন না?…ব্রজেন্দ্রনন্দিনী আই-এ পড়িতেছে…ছোট রেবা পড়িতেছে ম্যাট্রিক! বটে! বিবাহের কথা মনে জাগে না? মিত্তিরের দুই মেয়ে…এক ছেলে। বড় মেয়ের বিবাহ হইয়াছে পশুপতি ঘোষের ছেলে নীহাররঞ্জনের সঙ্গে। নীহার আই-সি-এস্…মেয়ে-জামাই এখন আছে বাঁকুড়ায়! ছোট মেয়ে বিভা আই-এ পাশ করিয়াছে…বিবাহের কথা পাকা…নবেন্দু দত্ত এটর্ণি…তাঁর বড় ছেলে কমলেন্দু…বিলাত গিয়াছে ব্যারিষ্টার হইতে…তার সঙ্গে। সামনের এপ্রিলে কমলেন্দু ফিরিবে। তখন বিবাহ। ছেলেটি সেণ্টজেভিয়ার্সে পড়িতেছে। এবার জুনিয়র-কেমব্রিজ দিবে ইত্যাদি…

বাসন্তী বলিলেন—মেয়েদের বিয়ে দিন। চাকরিতে থাকতে থাকতে দেওয়া উচিত ছিল। ডেপুটির মেয়ে! এখন পেন্সন নেছেন…আয় কমে গেল তো…

রবীন মিত্তির বলিলেন—মফঃস্বলে কাটিয়েছে চিরদিন

…খরচ কম…জমিয়েছে বিস্তর। তুমি বোঝো না বান্ধু… ছেলে নেই…শুধু মেয়ে…বাপের পয়সা আছে…সে-পয়সার লোভে কত ভ্যাগাবণ্ড ছুটে আসবে'খন…

কথায় কথায় গাড়ী আসিয়া লাউডন-ষ্ট্রীটে মিত্তিরের বাড়ীর ফটকে ঢুকিল।

আদর…অভ্যর্থনা…

মিত্তির বলিলেন—তোমরা কথা কও…আমি একবার অফিস-কামরায় যাই। দুটো নতুন ব্রীফ্ এসেছে…এটর্নি রাধিকা সেন বসে আছেন। নাহলে আজ গুরুপদর 'অনারে' যেতুম না…বসে গল্প করতুম।

বাসন্তী মিত্তির বলিলেন—কিন্তু রাত ন'টা…ন'টায় ডিনার…তার পর অফিস-কামরায় তোমায় আর যেতে দেবো না…মনে রেখো। মক্কেল যত টাকাই দিক্! এর নড়চড় নয়। আমায় জানো তো?

সিগার ধরাইয়া হাসিয়া মিত্তির বলিলেন—গুরুপদ এলো আজ পঁচিশ বছর পরে…ওর সামনে প্রথম দিন শক্তির পরিচয় দিচ্ছ! ও ভাববে, এত বড় hen-pecked husband! আমি মক্কেলের কাজে যাচ্ছি, পয়সা-রোজগার…তাছাড়া আমার সুস্থ শরীর…না ব্লাডপ্রেশার! না ডায়েবেটিস্!

বাসন্তী বলিলেন—কি দুঃখে ও-সব রোগ হবে? হাতের তেলোয় রেখেছি না?

তিনি চাহিলেন গুরুপদর দিকে। বলিলেন,—জানেন, আপনার বন্ধুর বড় দুঃখ, কোর্টের সব সিনিয়ারদের একটা-না-একটা অসুখ আছে; ওঁর কোনো রোগ নেই। মানে, আজীবন আমি চৌকিদারী করে মরছি, তাই। রাত দশটার পরে কাজ বন্ধ…অফিস-কামরায় চাবি পড়বে। ন'টার পর খেয়ে একবার শুধু অফিস-কামরা…দশটা বাজলে ও-কামরার দিকে নয়। তার পর দশটা থেকে সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত ড্রয়িংরুমে সকলে বসে গল্প-সল্প। মেয়েরা কেউ গান গাইলে, কি মাসিক পত্র খুলে গল্প-কবিতা পড়ে শোনালে। উনি ঠাট্টা করেন। বলেন, জানো, কোর্টে কেউ রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েনি—পড়েছেন শুধু উনি…

বাধা দিয়া মিত্তির বলিলেন—শুধু পড়া? মুখস্থ! সেই "প্রেমের অভিষেক"… charming! লাইব্রেরীতে মাঝে মাঝে ঐ কবিতা আমি recite করি…সকলে শোনে। বুঝেছো গুরুপদ, রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতা…

…শত-সহস্রের পরিচয়হীন
প্রবাহ হইতে, এই তুচ্ছ কর্ম্মাধীন
মোরে তুমি লয়েছ তুলিয়া—নাহি জানি
কি কারণে! অয়ি মহীয়সী মহারাণী
তুমি মোরে করিয়াছ মহীয়ান…

বাসন্তী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন,—পাশের ঘরে মেয়ে রয়েছে…তার উপর অফিস-কামরায় এটর্নি রমণী বাবু বসে আছেন মক্কেল নিয়ে! কি ভাববে সকলে? যাও… আজ কিন্তু ন'টা…খাওয়া-দাওয়ার পর হেনা আজ নতুন গান গাইবে…রবি বাবুর সেই 'জনগণ-মন-অধিনায়ক' গান…

মিত্তির চাহিলেন গুরুপদর পানে। বলিলেন— তুমি পালিয়ো না গুরুপদ…

গুরুপদ কিন্তু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন,—আজ আসি ভাই। আজকের জন্য দু'জনে আমায় মাপ করো। আর একদিন আসবো। এসে মেয়ের গান শুনবো, তোমাদের ঘরকর্ণার কথা শুনবো। আজকের মতো… লক্ষ্মীটি…

বাসন্তী অনুরোধ করিলেন।

কৃতাঞ্জলি-পুটে গুরুপদ বলিলেন—আজকের মতো ক্ষমা চাইছি, মিসেস মিত্তির…দু'-এক দিনের মধ্যেই আসবো।

বাসন্তী বলিলেন—পরশু শনিবার। হোয়াই নট স্যাট ডে?

গুরুপদ বলিলেন—বেশ। তাই হবে।

মিত্তির বলিলেন—সপরিবারে…

কথাটা গুরুপদর মুখে পড়িল চাবুকের মতো!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চুপচাপ করিয়া যদি বা দিন কাটিতে পারিত, এখন পাঁচ বাড়ীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিতে গিয়া দিন-কাটানোর ব্যাপার আরো সঙ্গীন হইয়া উঠিল। যেখানে যান, দেখেন…

বাড়ী ফিরিয়া আসেন, সারা পথ মনে যেন ফুল ফুটিতে থাকে! ভাবেন, আজ বাড়ী গিয়া···কিন্তু···

সে-দিন শনিবার। মিত্তিরের বাড়ী আজ নিমন্ত্রণ··· একা নয়···সপরিবারে।

দুপুরবেলায় আহার সারিয়া নীচেকার ঘরে শুইয়া ছিলেন···হাতে খপরের কাগজ···এডিটোরিয়ালে সেই এক-কথার মামুলি-কচ্‌কচি পড়িতে-পড়িতে মাথা গরম হইয়া উঠিল! বিজ্ঞাপনগুলায় চোখ বুলাইতে লাগিলেন। এ-গুলাই একমাত্র পাঠ্য···মজা আছে! ঘড়িতে ঢং করিয়া একটা বাজিল। খেয়াল হইল, মিত্তিরের বাড়ীতে যাইবার কথা···রাজলক্ষ্মীকে এই বেলা বলা উচিত।

অন্দরে আসিলেন। দোতলার সিঁড়িতে পা দিবামাত্র উপরে উচ্চ হাস্যধ্বনি শুনিলেন। এ হাসি···

দোতলার দালানে রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা। তিনি একখানা শাড়ী লইয়া দক্ষিণের ঘরের দিকে চলিয়াছেন।

গুরুপদ ডাকিলেন—শুনচো? ওগো···

ওগো দাঁড়াইলেন। গুরুপদ বলিলেন—আজ সন্ধ্যার সময় নেমন্তন্ন আছে।

রাজলক্ষ্মী বলিলেন—যেয়ো।

—শুধু আমার একার নয়···সক্কলের। তোমার, আমার, বজুর, রেবার···

রাজলক্ষ্মী ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন, বলিলেন—কার বাড়ী?

—আমার বাল্য-বন্ধু রবীন মিত্তির ব্যারিষ্টার। তার ওখানে। তাঁর স্ত্রী বিশেষ করে বলে দেছেন···

রাজলক্ষ্মী বলিলেন—চিনি না, জানি না, আমরা কোথায় যাবো?

গুরুপদ বলিলেন—তার মানে?

—তার মানে, তুমি যেয়ো···আমরা যাবো না।

বিস্ময়ে গুরুপদ নির্ব্বাক্! রাজলক্ষ্মী বলিলেন—তা ছাড়া কেষ্টনগর থেকে পারুলরা এসেছে···পারুলের সঙ্গে বজুর খুব ভাব। পারুল ধরেছে থিয়েটার দেখতে যেতে হবে···

রাজলক্ষ্মী আর দাঁড়াইলেন না···ঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

গুরুপদ হতভম্বের মতো ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিলেন, তার পর ধীরে ধীরে নামিয়া আসিলেন···বসিবার ঘরে।

মনের মধ্যে দু'-দল গোরা-ক্লাব যেন শীল্ডের ফাইনাল-ম্যাচ খেলিতে সুরু করিয়াছে! তেমনি দাপাদাপি, হাঁকা-হাঁকি, মারামারি, চীৎকার! তেমনি মাতন! মনের গ্রাউণ্ড যেন সে-মাতনে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া যাইবে!

বাড়ীতে থাকিতে পারিলেন না। মনের মধ্যে সেই ম্যাচ-খেলার মাতন লইয়া পথে বাহির হইলেন।

কোথায় যাইবেন? দুপুরবেলায় কোনো পেন্সনী-বন্ধুর দেখা মিলিবে না! ক্ষিতীশকে মনে পড়িল। এম-এ পাশ করিয়া ইস্কুল-মাষ্টারী করিতেছে···বাল্য-বন্ধু। তার উপর ক্ষিতীশ বিবাহ করিয়াছে গুরুপদর মাসতুতো-বোন জগদ্ধাত্রীকে।

দোতলায় উঠিয়া গুরুপদ ডাকিলেন—জগো···

ওদিক্‌কার ছাদ হইতে উত্তর আসিল—কে?

স্বর শুনিয়া গুরুপদ একেবারে ছাদের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ছাদে মোড়ায় বসিয়া ক্ষিতীশ; আর ক্ষিতীশের পায়ের কাছে বসিয়া জগদ্ধাত্রী···নরুণ দিয়া ক্ষিতীশের পায়ের নখ কাটিয়া দিতেছে।

দাদাকে দেখিয়া জগদ্ধাত্রী নরুণ রাখিয়া দাদার পানে চাহিল, কহিল—মেজদা!

গুরুপদ বলিলেন—সব দেখ্‌তে-শুন্‌তে এলুম। ক্ষিতীশের ইস্কুল নেই?

হাসিয়া ক্ষিতীশ বলিল—আজ শনিবার।

—ও! তা বটে!···পেন্সন নিয়ে বারের হিসেব ভুলে গেছি।

ক্ষিতীশ চাহিল জগদ্ধাত্রীর পানে। বলিল,—দাও গো, তিনটে আঙুল আর বাকী থাকে কেন? এ-নখগুলোও কেটে দাও···

হাসিয়া গুরুপদ বলিলেন—এ-কাজও জগোকে দিয়ে না করালে নয়?

ক্ষিতীশ কহিল—ফার্ষ্ট ক্লাশ হাত হে, তোমার বোনের! এ্যায়সা নখ কাটে···কখনো বাধে না! নাপিতও এমন পারে না। চাও যদি, তোমার নখ ট্রাই করতে পারো।

স্বামীর মুখে এমন স্তুতি-গান! খুশী-মনে জগদ্ধাত্রী বলিল,—ত্মাখো তো মেজদা···কখনো যদি নিজের হাতে

কিছু করবেন ! এ তো নখ-কাটা দেখছো…বাবুর দাড়ি …কে কামিয়ে দ্যায় ? গিলেট-ব্লেড দিয়ে আমাকেই নাপতেগিরি করতে হয়। শুধু ইস্কুলে যাওয়াটাই যা করি না ! না হলে কী নয় ? ছেলেদের এগজামিনের খাতা পর্য্যন্ত এই আমি দেখে নম্বর দি !…বলি, ওগো, কেউ যদি সেক্রেটারিকে বলে দ্যায়, তাহলে তোমার চাকরি যাবে।

ক্ষিতীশ হাসিল, হাসিয়া বলিল,—তা বলে বাইরে কারো কাছে ওঁর গুণগান করি না, তা নয়। বুঝলে গুরুপদ, বন্ধু-মহলে আমার খ্যাতি রটে গেছে দারুণ স্ত্রৈণ বলে…

জগদ্ধাত্রী বলিল—তোমার লজ্জা করে না, আমার করে। সত্যি মেজদা…এই সে-দিন…ওঁদের স্কুলের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট রমেশ বাবু…তাঁর মেয়ের বিয়ে হলো…গায়ে-হলুদের তত্ত্বে নেমন্তন্ন গেছি…বরের বাড়ী থেকে রাশীকৃত ফুলের মালা এসেছিল…দেখলে অবাক্ হতে হয় ! তাদের বুঝি নার্শারি আছে…ফুলের ব্যবসা করে…নিউ-মার্কেটে মস্ত দোকান। তা সেখানে সবার সামনে বড় একছড়া মালা নিয়ে উনি বললেন—এক-ছড়া ওঁর চাই…সে-দিন না কি ওঁর বিয়ের এ্যানিভার্সারি। নিলেন মালা ! লজ্জায় এতটুকু হয়ে আমি ঘরের মধ্যে গিয়ে লুকোই…

হাসিয়া ক্ষিতীশ বলিল—আচ্ছা, তুমি হাকিম-মানুষ, তুমি বিচার করো ভাই। উনি আমায় কি তোয়াজে রেখেছেন ! চেহারা দেখছো তো ! ভাত খেতে বসলে উনি দেন মাছের কাঁটা বেছে। চাকর রয়েছে…এমন নয় যে, তোমার বোনকে দাসীবৃত্তি করাবার জন্য ঘরে এনেছি ! উনি চুপ করে পায়ে পা দিয়ে বসে থাকুন না ! তা নয় ! নিজের হাতে আমার জুতো ব্রাশ করবেন ; চাকরকে ব্রাশ করতে দেবেন না। লোকে দেখলে কি বলবে ভ্যাবো-গঙ্গারাম বলবে না, স্কুল-মাষ্টার কি না, মুখ্যু…বই মুখস্থ করে পাশই করেছে ; আক্কেল নেই ! তাই স্ত্রীকে দিয়ে জুতো বুরুশ করাচ্ছে !

জগদ্ধাত্রী বলিল—তা হলে আমি বলি, শোনো মেজদা…চাকর জুতো ব্রাশ করে, ওঁর পছন্দ হয় না…বলেন, এখানটা চক্‌চক্ করছে, ওখানটা ম্যাড়মেড়ে ! দে ব্রাশ। বলে নিজের হাতে বুরুশ করতে বসবেন ! কাজেই আমি চাকরকে ও-কাজ করতে দিই না। আমি করি ওঁর জুতো বুরুশ…

ক্ষিতীশ বলিল—আমিও মাঝে মাঝে ওঁর লুচি ভেজে দি…সে কথা বলো। না হলে তোমার দাদা ভাববে, এক-তরফা **contract** ! তা নয়, গুরুপদ। আমাদের এ হলো **mutual co-operation**…গিভ্-এ্যাণ্ড-টেক্ পলিশি !

জগদ্ধাত্রী বলিল…

অর্থাৎ দু'জনের মুখে যেন কথার বাণ ডাকিল ! সে-বাণে গুরুপদ বুঝি ভাসিয়া যাইবেন !

বোনের বাড়ী হইতে বাহির হইলেন সন্ধ্যার পর। মিত্তিরকে ফোন্ করিয়া দিলেন—মাপ করো ভাই…আগে থেকেই বাড়ীর সকলের অন্যত্র এন্‌গেজমেণ্ট ছিল। তাই যাওয়া হলো না। আসছে শনিবারে নিশ্চয়…আজ খপর দিতে দেরী হলো। মানে, আমার এক বোনের বাড়ীতে আটকে পড়েছিলুম। বোনের সঙ্গে দেখা হলো প্রায় দশ বছর পরে…মিসেস মিত্তিরকে বুঝিয়ে বলো, তিনি যেন ক্ষমা করেন !

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাড়ী আসিলেন। রাত প্রায় ন'টা…

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, মনের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ ! দেহ-মন যেন দুই যমজ-ভাই ! একের আঘাত অপরকে বাজে ! গুরুপদর মনের উপর উপর্য্যুপরি আঘাত চলিয়াছে, সমবেদনায় দেহ যেন তাই নিজেকে আর খাড়া রাখিতে পারে না ! ক্লান্ত-মনের পাশে দেহও শ্রান্তি-ভরে লুটাইয়া পড়িতে চায় !

এমনি দেহ-মন লইয়া বাড়ী আসিয়া দেখেন, বাড়ী অন্ধকার। ভৃত্যকে ডাকিলেন,—হারু…

সাড়া মিলিল না। দু'-পা আগাইয়া আসিয়া ডাকিলেন,—ঠাকুর…

সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া বাহিরের ঘরে বসিলেন। ঠাকুর আসিল। বলিলেন—হারু…?

ঠাকুর বলিল—মামাবাবুরা কলকাতায় এসেছেন।

শ্যামবাজারে উঠেছেন। সকলে শ্যামবাজারে গেছেন··· হারু সঙ্গে গেছে।

চমৎকার! গুরুপদ জুতা-জামা ছাড়িলেন।

ঠাকুর বলিল,—আপনাকে সেখানে যেতে বলে গেছেন···রাত্রে সেইখানে খাবেন। তার পর এক-সঙ্গে সকলে আসবেন।

রাগে মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল! বলিলেন—বয়ে গেছে আমার যেতে! আমায় কুলি পেয়েছে? ···রাত ন'টার সময় হুকুম হয়েছে শ্যামবাজারে গিয়ে খেতে হবে!···না, আমি যাবো না।

এত-দিনকার গভীর হতাশা মনকে বিশুষ্ক করিয়া রাখিয়াছিল···যেন খড়! সে-খড়ে এ-কথা লাগিল যেন দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠি! মন একেবারে দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল! ঠাকুরকে বলিলেন—আমার খাবার তৈরী করেছো?

ঠাকুর বলিল—কুট্‌নো-টুট্‌নো নেই। ঘী-তেল··· সব চাবি বন্ধ করে গেছেন।

গুরুপদ বলিলেন—তুমি খাবে না? না, তোমারো নেমন্তন্ন?

ভীত কণ্ঠে ঠাকুর বলিল—আজ্ঞে, আমাকে এ-বেলার জন্য জলপানির পয়সা দিয়ে গেছেন।

গুরুপদ চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—ব্যস্···ব্যস্··· ব্যস্···

সে-স্বরে ভয় পাইয়া ঠাকুর সরিয়া গেল! আর গুরুপদ বাবু···

ভাবিলেন, বৈরাগ্য লইয়া চলিয়া যাই···কাশী, না হয় মক্কা···যেখানে খুশী! তার পর দেখি, মামাবাবুর শ্যামবাজারের বাড়ীতে উৎসব চলে ক'দিন!

মাথার মধ্যে স্কুলের সেই বড় গ্লোবটা যেন ঘুরিতে লাগিল! চোখের সামনে গুরুপদ দেখিতে লাগিলেন—ইণ্ডিয়া, চায়না, মোঙ্গোলিয়া, সাইবেরিয়া, জাপান···ও-দিকে নর্থ এ্যাণ্ড সাউথ-আমেরিকা···সব ঘুরিতেছে!

এত বড় পৃথিবী···কোথায় গেলে নিশ্চিন্ত হইবেন?

গ্লোবের সঙ্গে সঙ্গে মাথাটাও ঘুরিয়া উঠিল! গুরুপদ আলো নিবাইয়া ইজি-চেয়ারে শুইয়া পড়িলেন।

আলোর ঝলকে চোখ খুলিয়া দেখেন, ঘরে আলো জ্বলিতেছে···সাম্‌নে দাঁড়াইয়া ঠাকুর।

ঠাকুর বলিল—খাবার দেবো?

—খাবার!

ঠাকুর বলিল—বাজার থেকে ঘী-ময়দা এনে লুচি ভেজেছি। আলুভাজা-বেগুনভাজা···

গুরুপদ বলিলেন—না, আমি খাবো না।

ঠাকুর দাঁড়াইয়া রহিল। মুখে কথা নাই।

গুরুপদ বলিলেন—আলোটা নিবিয়ে দিয়ে তুমি সরে পড়ো···যাও···

ধমক খাইয়া ঠাকুর আর এক-মিনিট দাঁড়াইল না··· সুইচ্-অফ্ করিয়া সরিয়া পড়িল।

ঘড়িতে ঢং-ঢং করিয়া বারোটা বাজিল।

গুরুপদ চোখ বুজিলেন। মাথার মধ্যে সোঁ-সোঁ শব্দে যেন তুবড়ি ফুটিতেছে···কি ঝাঁঝ!

প্রায় বিশ-মিনিট পরে একখানা ট্যাক্সি আসিয়া বাড়ীর সামনে দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার—ঠাকুর··· ঠাকুর···

ঠাকুর ছুটিয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

রাজলক্ষ্মী বলিলেন—বাবু ফিরেছেন?

ঠাকুর বলিল—হ্যাঁ।

—শ্যামবাজারে যাবার কথা বলেছিলে?

—বলেছিলুম। বাবু রাগ করলেন। বললেন, যেতে বয়ে গেছে!

—কি খেলেন?

—ঘী-ময়দা চাবির মধ্যে রেখে গেছেন···মুদির দোকান থেকে আমি ঘী-ময়দা নিয়ে এলুম। লুচি ভাজলুম। বাবু বললেন, খাবেন না···

মেয়ে ব্রজেন্দ্রনন্দিনী বলিল—বাবা রাগ করেছে।

রাজলক্ষ্মী বলিলেন—রাগ কিসের? আমাদের অপরাধ?

কাণ খাড়া করিয়া গুরুপদ শুনিলেন এ সব কথা··· মনে-মনে বলিলেন, সত্যই তো···তোমাদের অপরাধ কি? অপরাধ আমার, কোনো দিন কর্ত্তা বলিয়া কর্ত্তৃত্ব করি নাই!

ছোট মেয়ে রেবা বলিল—বাবা সারা রাত উপোস করে থাকবে, মা?

মা বলিলেন—খাবার নিয়ে গিয়ে সাধলে যদি না খান, উপোস করে থাকবেন! কি করবো তার?

স্ত্রীর মুখে এই কথা…বাঃ!

ওদিককার কথা শেষ হইল। তার পর জুতার শব্দ…সে-শব্দ সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছে…

বাহিরে ট্যাক্সিওলার সঙ্গে হারুর তর্ক…ড্রাইভার বলিল—মীটারমে হুয়া ঢাই রূপেয়া…তোম্ দেতা দো রূপেয়া! হারু জবাব দিল—টাকায় চার-আনা কাট্‌ লিয়া …কমিশন। এক টাকা চৌদ্দ আনা হোগা…দো-আনা জাস্তি দিচ্ছি! ড্রাইভার কহিল—নেহি, নেহি, ও নেহি হোগা। পেট্রোলকা দাম চঢ় গিয়া। ওর রেশনিং চলতা। ঢাই রূপেয়া দেনে পড়েগা…

ঘরে আলো জ্বলিল। রাজলক্ষ্মী আসিয়া কহিলেন—গেলে না যে?

গুরুপদ জবাব দিলেন না।

রাজলক্ষ্মী বলিলেন—হাকিমী-চাল বাইরে চালো, মানায়! দাদা বললে, অমুক এলো না রে!

বোবার শত্রু নাই! গুরুপদ এবারো জবাব দিলেন না।

রাজলক্ষ্মী বলিলেন—দশটার মধ্যে খাবার-দাবার তৈরী…কেউ খেতে বসে না! মানুষ এই আসে, আসে—ভেবে সব বসে আছে! ও মা! রাত এগারোটা বেজে গেল, দেখা নেই! দাদা বললে, সত্যি, তাহলে এলো না? কি হবে, রাজু? কাকেও পাঠাবো? আমি বললুম, না। তাঁর জন্য কেন বসে থাকা? এ তাঁর স্বভাব…কাকেও কি গেরাহ্যির মধ্যে আনেন! ভাবেন, সবাই ওঁর কাছারির আমলা-চাপরাশি! স'-এগারোটায় সব খেতে বসলুম। তার পর যে করে এসেছি…

রাজলক্ষ্মী চলিয়া গেলেন। জুতার শব্দে গুরুপদ বুঝিলেন, উপরে চলিয়াছেন। সে-শব্দ ক্রমে মিলাইয়া গেল। তার পর দোতলায় ঘরের মেঝেয় পায়ে-চলা শব্দ…

মেয়েরা ডাকিল—হারু…

গুরুপদর মাথার মধ্যে ঝিম্-ঝিম্-ঝিম্…

ঘুম ভাঙ্গিল মেয়ে রেবার ডাকে। রেবা ডাকিল, —বাবা…বাবা…

বাবা বলিলেন,—কেন?

মেয়ে বলিল—না খাও, ওপরে এসো…শোবে।

—যাবো'খন…

—অখন নয়। এখন এসো। একটা বাজে…

মাথার সেই ঝিমি-ঝিমি হইতে যেন নদী বহিল…

সে-নদী বাপের মনকে দু'ভাগ করিয়া বহিয়া চলিল! নদীর ও-পারে রায়-বাহাদুর সাব-জজের বাড়ীতে সেবা-পরিচর্য্যা…মোড়ায় বসিয়া ক্ষিতীশ, ক্ষিতীশের পায়ের কাছে বসিয়া জগদ্ধাত্রী ক্ষিতীশের নখ কাটিয়া দিতেছে; আর এ-পারে গুরুপদ দোরে-দোরে ঘুরিতেছেন—আর দুই মেয়েকে লইয়া ট্যাক্সিতে চড়িয়া রাজলক্ষ্মী চলিয়াছেন শ্যামবাজারে তাঁর দাদার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ!

একটা নিশ্বাস…

রেবা বলিল—ওঠো। এসো। শোবে এসো, বাবা…

ক্ষোভে-অভিমানে বাবার মন ভরিয়া আছে। সে-ভাবে বাবা যেন বিমূঢ়…কি করিবেন, বুঝিতে পারেন না! মুখে বলিলেন—যাবো না…

রেবা বলিল—রাগ করতে হয়, বিছানায় শুয়ে রাগ করো। ওঠো…না উঠলে আমি ছাড়বো না।

রেবা বাবার হাত ধরিয়া টানিল। বিরক্ত হইয়া বাবা বলিলেন—আঃ…

তার পর রেবার হাত হইতে মুক্তি-লাভের জন্য তেতলায় উঠিয়া বিছানায় গিয়া শুইলেন…যেন কাঠ!

পাশের ঘরে রেবা শুইতে গেল।

রাজলক্ষ্মী বলিলেন—ওপরে এলেন?

রেবা কহিল—হ্যাঁ…

—কিছু খাওয়াতে পারলি?

রেবা কহিল—বাব্বাঃ! কী রাগ! যে করে দোতলায় শুতে এনেছি…তার উপর খেতে বললে আমাকে দ্বীপান্তরে পাঠাতেন!

রাজলক্ষ্মী বলিলেন,—ওঁর ঘরে কিছু রেখে আয়। রাত্তিরে যদি খিদে পায়…দু'খানা বিস্কুট অন্ততঃ। ঘরে আলো জ্বালিস্‌নে যেন! যদি ঘুম ভেঙ্গে যায়, রেগে আবার চেঁচামেচি করবেন।

গুরুপদ শুনিলেন। মনে মনে বলিলেন,—রাগ? চেঁচামেচি? ধেঁচুটি!

অন্ধকার ঘর। পায়ের শব্দ শুনিলেন। সন্তর্পণে কে আসিল টেবিলের কাছে···টেবিলের উপরে কি রাখিল··· খুট্ করিয়া শব্দ! বুঝিলেন, মায়ের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া রেবা আসিয়াছে বিস্কুট রাখিতে! মনে-মনে বলিলেন, ও বিস্কুট যদি আমি মুখে দি তো আমি শূয়ার! ক্ষুধা পায়, সকালে সটান্ গিয়া উঠিব জগদ্ধাত্রীর বাড়ী!

সকালে উঠিয়া রাজলক্ষ্মী আসিলেন গুরুপদর ঘরে। বিছানা খালি। হারুকে বলিলেন,—বাবু কোথায় রে?

হারু বলিল—সকালে উঠে বেড়াতে বেরিয়েছেন।

—হুঁ···

বড় মেয়ে ব্রজেন্দ্রনন্দিনী বলিল—বাবার চা?

রাজলক্ষ্মী বলিলেন—বেরিয়েছেন। ওঁর জন্য চা এখন করতে হবে না।

রেবা কহিল—চা না খেয়ে বেরুলেন?

রাজলক্ষ্মী বলিলেন—রাগ হয়েছে! কাল রাত্তিরের সেই রাগ! একে বলে হাকিমের গোঁ···

বিস্ময়ে দু'চোখ বিস্ফারিত···মেয়েরা চাহিয়া রহিল মায়ের মুখের পানে।

মা বলিলেন—একে দেইজীপনা বলে! করুন রাগ··· কি আমাদের অপরাধ হয়েছে, শুনি···

সংসার তার বাঁধা-লাইন ধরিয়া চলিল···

গুরুপদ ওদিকে লেক ঘুরিয়া ট্রাম-লাইনের ধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভাবিতেছেন, ট্রামে চড়িয়া জগদ্ধাত্রীর ওখানে···আজ রবিবার···সারাদিনটা তার ওখানেই না হয়···

ট্রাম আসিল। ট্রামে চড়িয়া বসিলেন। চড়িবা-মাত্র অভ্যর্থনা—গুরুপদ!

চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখেন, তারাচরণ বাবু··· রিটায়ার্ড ডেপুটী। বহু দিন দু'জনে একসঙ্গে ছিলেন সাতক্ষীরায়।

তারাচরণ বলিলেন—মর্ণিং-ড্রাইভ?

শুষ্ক-হাসি-মুখে গুরুপদ বলিলেন—হ্যাঁ···

তারাচরণ বলিলেন—আমারো তাই। ইংরেজীতে সেই পড়েছিলুম Time hangs heavy···তাই হয়েছে। সময় আর কাটে না!

সখেদে গুরুপদ কহিলেন—আমারো তাই।

তারাচরণ কহিলেন—অনারারী চাকরি মিলেছিল··· নিলুম না। কাঁধ থেকে জোয়াল নেমেছে···বলে, সে জোয়াল আবার? বাপ্ রে!

গুরুপদ বলিলেন—দুপুরবেলায় কি করো হে তারাচরণ?

—ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরী আছে···শিবপুরের বাগান আছে···ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বসে তাসখেলা আছে। চলো না আজ আমার ওখানে···

—গেলে হয়।

—বেড়িয়ে যদি আমার ওখানেই ফেরো?

—মন্দ কি!

তাই হইল। টালিগঞ্জের টার্ফ রোডে তারাচরণ বাসা বাঁধিয়াছেন। ট্রাম হইতে নামিয়া তারাচরণের সঙ্গে গুরুপদ গিয়া উঠিলেন তাঁর গৃহে।

বাহিরের ঘরে গুরুপদকে বসাইয়া তারাচরণ গেলেন অন্দরে খপর দিতে।

গুরুপদ খপরের কাগজ খুলিলেন···

একটু-পরে পাশের ঘরে মৃদু কণ্ঠে শুনিলেন···কথার ক'টা টুক্রা!

—গুরুপদ বাবু রে···ডেপুটী গুরুপদ সিঙ্গী। সকলে বল্‌তো, কাছারিতে সিঙ্গী···বাড়ীতে কিন্তু পোষা বেরাল!

—বেরাল···তার মানে?

—গিন্নী যা করেন···দুই মেয়ে যা করে। কোনো দিন দেখিনি বাড়ীতে স্ত্রীর সঙ্গে কি মেয়েদের সঙ্গে বসে দুটো কথা কইছেন! কাছারি ছিল সর্ব্বস্ব!···আমলা-পেয়াদা আর মকর্দ্দমার কাগজ ছাড়া আর-কিছু জানতেন না। সকলে ঠাট্টা করতো। বলতো, নিষ্ঠাবান্ হাকিম··· চাকরি জ্ঞান, চাকরি ধ্যান···

কথাগুলা গুরুপদ শুনিলেন। দুই কাণ আগুনের মতো তপ্ত···মাথার মধ্যে আবার সেই ফোটা তুবড়ির সোঁ-সোঁ গর্জ্জন···

তারাচরণ ফিরিলেন। গুরুপদর মনের মধ্যে তখনো

সদ্য-শোনা কথাগুলা লাট্যুর মতো ঘুরিতেছে! এবং সে ঘূরণ-বেগের দমকে গুরুপদ তারাচরণকে কথাটা খুলিয়া বলিলেন। বলিলেন, সংসারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নাই··· অর্থাৎ ব্যাপার যা হইয়াছে···

তারাচরণ বুঝিলেন। বলিলেন—পঁচিশ বছর চাকরি নিয়ে এমন মত্ত ছিলে যে, স্ত্রী-পুত্রকন্যাকে দূরে সরিয়ে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক কেটে দেছ, ভাই! চাকরি করতে বসে আমরা অনেকে ভুলে যাই যে, চাকরি ছাড়া পৃথিবীতে ঘর-সংসার আছে, স্ত্রী-পুত্রকন্যা আছে, বন্ধু-বান্ধব আছে। তোমার তাই হয়েছে···অর্থাৎ পঁচিশ বছরে স্ত্রী আর মেয়েদের কাছে তুমি stranger হয়ে গেছ! তোমার সঙ্গে তাঁদের মনের যোগ ফেটে গেছে···সংসার চলেছে তার বাঁধা রুটিনে।

কথায় কথায় তারাচরণ বুঝাইলেন—স্নেহ-ভালোবাসা বলো, বন্ধুত্ব বলো, ব্যবহারে-চর্চ্চায় ঝালিয়ে রাখা চাই।

গুরুপদ বলিলেন—নিজের স্ত্রী···নিজের মেয়ে··· তাদের সঙ্গে স্নেহ-ভালোবাসা ঝালিয়ে রাখতে হবে··· মানে?

তারাচরণ কহিলেন—নিশ্চয়। পঁচিশ বছর তাঁদের ছেড়ে তুমি অন্য পথে চলেছো···তাঁদের সঙ্গে তোমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। তুমি তাঁদের সঙ্গ হারিয়েছো, তাঁরাও তোমার সঙ্গ হারিয়েছেন।···স্কুল-কলেজে যাদের সঙ্গে পড়েছিলুম···তখন তাদের সঙ্গে খুব মেলামেশা ছিল, বন্ধুত্ব ছিল···তাদের নাড়ী-নক্ষত্র ছিল আমাদের নখ-দর্পণে। তার পর বিশ বছর ছাড়াছাড়ি! এখন তাদের সঙ্গে দেখা হলে ঠিক সেই আগেকার মতো মেলামেশা করতে পারো? স্ত্রীর সঙ্গে, মেয়েদের সঙ্গেও তোমার তাই হয়েছে। তুমি জানো, তাঁরা আছেন তোমার সংসার-যন্ত্র চালিয়ে তোমার স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান করতে··কাছারির সময়টিতে তুমি খাবার পাবে—ঠিক-সময়ে তোমার টিফিন গিয়ে পৌঁছুবে। আর তাঁরা জানেন, তুমি আছো মাস-কাবারে টাকা দেবে, তোমার সংসার-যন্ত্রটি তাঁদের হাতে সুশৃঙ্খলে যাতে চলে···ব্যস! এতে প্রাণের সম্পর্ক নেই! তোমার সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা ওঁদের নিয়ে নয়—ম্যাজিষ্ট্রেট-কমিশনার, ফাইল আর উকিল-মোক্তার-আমলা-চাপরাশি নিয়ে! ওঁরাও তোমায় ছেঁটে ওঁদের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা নিজেদের মধ্যে নিবদ্ধ রেখেছেন! Separation হয়ে গেছে!

গুরুপদর চোখের সামনে হইতে পৃথিবী যেন তার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ লইয়া বাতাসে বিলীন হইয়া যাইতেছে···

অনেকক্ষণ পরে তিনি বলিলেন—উপায়?

তারাচরণ বলিলেন—Assert করে সংসারে ওঁদের মধ্যে নিজেকে আবার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। হাঁকডাক করে বোঝাতে হবে, তুমি আছো! ওঁদের সংসারেরই এক জন তুমি···তোমার সত্তা আছে···অস্তিত্ব আছে··· অর্থাৎ উপনিষদের ভাষায় জানাতে হবে···সোঽহং!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কথাগুলার মর্ম্ম মনে সঠিক দানা বাঁধিল কি না বুঝা গেল না! গুরুপদ শুধু বুঝিলেন, assert করিতে হইবে! হাঁকে-ডাকে আত্ম-প্রতিষ্ঠা!

মনকে সুদৃঢ় করিয়া বাড়ী ফিরিলেন।

স্নান করিতে বাথ-রুমে ঢুকিলেন। দেখেন, গরম জল নাই। হারুকে ডাকিলেন। হারু আসিলে বলিলেন,—গরম জল?

—হয়নি।

—কেন হয়নি? ষ্টুপিড ফুল···আমি চান করবো··· গ্রাহ্য নেই!

তীব্র ভৎসনা···সেই সঙ্গে হারুর মাথাটা ছিল হাতের কাছে···মাথার সামনের দিকে চুলের লম্বা ঝুঁটি! সেই ঝুঁটি ধরিয়া সবলে এক ধাক্কা! ছিটকাইয়া দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া পড়িয়া হারু মাথা কাটিল।

চীৎকার শুনিয়া রাজলক্ষ্মী ছুটিয়া আসিলেন। স্বামীর পানে চাহিলেন, স্বামীর মুখ দিয়া চোখ দিয়া আগুন বাহির হইতেছে! হারুর পানে চাহিলেন, হারুর দু'চোখ যেন ঠেলিয়া বাহির হইবে!

রাজলক্ষ্মী বলিলেন,—কিসের চেঁচামেচি?

গুরুপদ কোনো জবাব দিলেন না। হারুর কাঁদ-কাঁদ মুখ।

রাজলক্ষ্মী বলিলেন—গরম জল···আমিই বলেছিলুম,

বাবু কোথায় বেরিয়েছেন, কখন আসবেন, ঠিক নেই···এলে জল গরম করে দিয়ো। ঠাকুরকে জলের কথা বললেই তো হতো। এর জন্য হাকিমী-মেজাজ না ফলালে নয়?

গুরুপদ বলিলেন—আমার বাড়ী···আমার মাইনে খায় বামুন-চাকর···আমার কাজে তাদের চাড় থাকবে না? বলিয়া তখনি গম্ভীর মুখে তিনি গেলেন কল-তলায়; এবং ছোট বালতি লইয়া মাথায় হুড়-হুড় করিয়া জল ঢালিতে লাগিলেন।

ঠাকুর ছুটিয়া আসিল। উপরের ঘরে হার্‌মোনিয়ম বাজাইয়া মেয়ে ব্রজেন্দ্রনন্দিনী রবীন্দ্র-সঙ্গীত রপ্ত করিতে-ছিল···তার গান গেল থামিয়া। সে আসিয়া দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইল। দেখিল, বাবা মাথায় জল ঢালিতেছেন!

মেয়ে বলিল,—চৌবাচ্ছার জলে চান করছো বাবা?

—হ্যাঁ। চাকর-বাকররা এ-জলে চান করতে পারে, আর আমি পারবো না? তাছাড়া আমার বাড়ী, আমার চৌবাচ্ছা, আমার যা খুশী, আমি তাই করবো।

নিমেষে যেন বজ্রাঘাত হইয়া গেছে···সারা বাড়ী স্তম্ভিত!

খাইতে বসিয়া আর-এক পর্ব্ব···

গুরুপদ ভাতে ঘী খান নিত্য···বরাবরের অভ্যাস। আজ ঘী নাই! পাতে ঝোল ঢালিলেন, ঠাকুর আসিয়া ঘীয়ের বাটি ধরিয়া দিল।

রাগে গুরুপদ ঘীয়ের বাটি সজোরে ছুড়িয়া দিলেন। ঘীয়ের বাটি লাগিল গিয়া ঠাকুরের পায়ে। গরম ঘীয়ে পা পুড়িয়া গেল। ঠাকুর লাফাইয়া উঠিল।

মেয়ে রেবা আসিতেছিল। তার হাতে বাটি···বাটিতে ঘন দুধ···দুধে পাকা মর্ত্তমান-কলা।

রেবা কহিল—বাবুর পাতে ঘী দাওনি, ঠাকুর?

ঠাকুর বলিল—জমে গেছলো···তাই গরম করতে নিয়ে গিয়েছিলুম ছোটদি!

রেবা বলিল—বাবুর খাওয়া অর্দ্ধেক হয়ে গেল··· এখন ঘী আনছো!

রাজলক্ষ্মী আসিলেন। গম্ভীর মুখ। ঠাকুরের দিক লইয়া তিনি বলিলেন—ঠাকুর কি করে জানবে যে, তোমার-ওঁর জন্য পথে এরোপ্লেন দাঁড়িয়ে আছে? এই তো আসনে এসে বসলেন! খাওয়া তো নয়···যেন মেল-ট্রেণ চলেছে! বললেই তো হতো, ঘী কোথায়? পাতের কাছ থেকে ঠাকুর ঘীয়ের বাটি নিয়ে গিয়ে উনুনে ধরলো—আমি ছিলুম রান্নাঘরে···দেখেছি তো। উনি মেজাজ দেখাচ্ছেন! ও-মেজাজকে আমি ভয় করি না।

গুরুপদর মনে হইল, মনের মধ্যে একদল রেজিমেণ্ট সবলে হাঁকিতেছে,—গুরুপদ, Assert yourself!

তীরের বেগে তখনি তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তার পর আচমন···

রেবা অবাক্! ঠাকুর যেন কেঁচো! ব্রজেন্দ্রনন্দিনী নামিয়া আসিল। রাজলক্ষ্মী বলিলেন—আমাদের খেতে দাও ঠাকুর···বেলা হয়েছে।

রেবা বলিল,—কিন্তু···

রাজলক্ষ্মী বলিলেন—পঁচিশ-বছর আগে ও-রাগ আমি ঢের দেখেছি। তোরা দেখিস্‌নি, ত্যাখ্! পুরুষ-সিংহ! চাকরির গুঁতোয় এ-গর্জ্জন গিয়েছিল। আবার দেখা দেছে···

পাশের ঘরে গুরুপদ গায়ে জামা চড়াইতেছিলেন, কথাগুলা কাণে গেল! রাগ আরো বাড়িল। ভাবিলেন, দূর ছাই, কিসের জন্য সংসার! কার সংসার? আজই কাশী যাইব···সেখানে আছেন প্রবোধ বাবু···দিল-দরিয়া মেজাজ ··দু'দিন তাঁর ওখানে···

গায়ে জামা চড়াইয়া বাসে উঠিয়া হাওড়া-ষ্টেশন।

কাশীর ট্রেণ নাই! আপার-ইণ্ডিয়াখানা বিশ মিনিট আগে চলিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার আগে আর ট্রেণ নাই। মক্কার পথ জানা নাই···কোন্ ট্রেণে মক্কায় যাওয়া যায়, তাও জানেন না···অগত্যা নিরাশ-চিত্তে ফিরিলেন।

হাওড়ার নূতন পুল তৈয়ারী হইতেছে···বোটের উপর হইতে লোহার কি কতকগুলা উপরে তুলিতেছে···চির-কালের-চেনা পুরানো পুলে দাঁড়াইয়া তাই দেখিতে লাগিলেন।

কিন্তু পথে পথে ঘুরিয়া মানুষ কতক্ষণ থাকিতে পারে

…বিশেষ যাঁর বিদ্যাবুদ্ধি আছে! সন্ধ্যার আগে নিরুপায় চিত্তে গুরুপদ বাড়ী ফিরিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বাড়ী আসিয়া দেখেন, রাজলক্ষ্মী লগেজ বাঁধিতেছেন; দুই মেয়ে ও ভৃত্য হারু সে-কাজে সাহায্য করিতেছে।

কোথায় চলিয়াছেন? মুখের কথা খসাইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন…লজ্জা করে! তাছাড়া কাকে জিজ্ঞাসা করিবেন? বাড়ীর লোকের কাছে তিনি আজ ষ্ট্রেঞ্জার! এত-বড় ট্রাজেডি কেহ কখনো কল্পনা করিয়াছে!

গুম্ হইয়া নিজের ঘরে আসিয়া তিনি বসিয়া রহিলেন।

রাত্রি আটটা বাজিল।

রাজলক্ষ্মী আসিয়া বলিলেন—তোমার সংসারে আমরা হয়েছি আপদ! আর ভয় নেই। মেয়েদের নিয়ে আমি যাচ্ছি বর্দ্ধমানে—দিদির কাছে। দু'-চার মাস কি ছ'-মাস সেখানে থাকবো। তোমার সংসার তুমি দেখো। হ্যাঁ, তোমার সংসারের চাবিগুলো…

বলিয়া গোটা-পঞ্চাশেক চাবি-সমেত প্রকাণ্ড রিং আঁচল হইতে খুলিয়া ঝনাৎ করিয়া রাজলক্ষ্মী ফেলিলেন গুরুপদর সামনে টেবিলে। বলিলেন—চাবিতে এক-দুই করে সব নম্বর দেওয়া আছে; আর আমার টানায় ছোট খাতা আছে, তাতে লেখা আছে কোন্ নম্বরের চাবি কিসে লাগে!…খরচের জন্ত আমার কাছে দেড়শো টাকা ছিল …তাই থেকে একশো-পঁচিশ আমি নিয়ে যাচ্ছি। বিয়ে করে এনেছো…স্ত্রী! আর ওরা হলো মেয়ে। তোমার আইনেও বলে, আমাদের মেন্‌টেনান্স দিতে তুমি বাধ্য! এ-টাকাটা তাই নিয়ে যাচ্ছি। খুশী-মনে তুমি নিজের ঘর-সংসার করো। সত্যি চাকর-বাকরকে মাইনে দাও তুমি, আর তারা তোমায় না মেনে আমাদের মানবে? তোমার শত্রুর কথায় চলবে-ফিরবে? উচিত হবে না।

গুরুপদ নিঃশব্দে সব কথা শুনিলেন। তিনি যেন কাঠ! মনে হইতেছিল, পৃথিবীখানা আগাগোড়া যেন বদ্‌লাইয়া যাইতেছে!

রাজলক্ষ্মী চলিয়া গেলেন।

বাহিরে ট্যাক্সি। কলরব করিতে করিতে লগেজ তোলা…

গুরুপদ আসিলেন খোলা খড়খড়ির সামনে।

বাহিরে রাজলক্ষ্মীর কণ্ঠস্বর,—না, আদিখ্যেতা করে ওঁকে আর বলতে যেতে হবে না! তোরা জানিস্ না, আমি তো জানি ওঁর আচরণ। ক'বচ্ছর আমাদের পানে কখনো ফিরে তাকিয়েছেন? রোগে-শোকে সুখে-দুঃখে আশায়-আকাঙ্ক্ষায় কোনো দিন খোঁজ নেছেন যে, ওগো কি করছো তোমরা? হাকিম! উনি একা হাকিম নন… আরো অনেক হাকিম আছে। তারা হাসি-মস্করা করে না? স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে মেলামেশা করে না? কিন্তু ওঁর মতো? আমি…তাই সয়ে আছি!

ওদিকে কণ্ঠ নীরব হইল। তার পর সকলে ট্যাক্সিতে উঠিলেন।

ট্যাক্সি চলিয়া গেল।

খোলা খড়খড়ির সামনে দাঁড়াইয়া গুরুপদ। তাঁর পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত যেন সেই অহল্যার মতো ধীরে ধীরে পাষাণে মণ্ডিত-বিজড়িত হইয়া উঠিতেছে!

এ-পাষাণ ভাঙ্গিল গানের সুরে…

রেডিয়োয় গান হইতেছিল,

পথ-চারী একা তুই পান্থ…

নিশ্বাস ফেলিয়া গুরুপদ বিছানায় শুইয়া পড়িলেন।

দু'-দিন তিন-দিন সাত-দিন কাটিয়া গেল…বুকের উপরে পাথর যেন আরো ভারী হইয়া চাপিয়া বসিতেছে! সে-পাথরের ভার শেষে এত বেশী যে, নিশ্বাস বুঝি বন্ধ হইয়া যাইবে! বর্দ্ধমান হইতে ক'দিনে একখানাও চিঠি আসিল না…ব্যাপার কি?

তারা জন্মের মতো চলিয়া গেল? রাজলক্ষ্মী? ব্রজেন্দ্রনন্দিনী? রেবা?

সে-দিন সকালে উঠিয়া গুরুপদ স্নান করিলেন। স্নান করিয়া জামা-জুতা আঁটিয়া সজ্জিত হইলেন। ভাবিলেন, পর্ব্বত যদি না আসে, মহম্মদ অগত্যা…

বর্দ্ধমান।

ভায়রা-ভাই নীলমাধব মল্লিক বর্দ্ধমানের কোর্টে ওকালতি করেন। তিনি তখন কোর্টে···গুরুপদ গিয়া কোর্টে নীলমাধবের সঙ্গে দেখা করিলেন।

নীলমাধব তখনি মুহুরিকে কাজ-কর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন—আমি বাড়ী চললুম, তিনকড়ি। এগুলোর তুমি যা হয় ব্যবস্থা করো। আজ আর আমি কোর্টে ফিরবো না···

মুহুরি তিনকড়ি বলিল,—আচ্ছা, স্যর···

গুরুপদকে লইয়া নীলমাধব বাড়ী আসিলেন। পথে নীলমাধবের কাছে গুরুপদ বলিলেন তাঁর জীবনের ট্রাজেডির কথা···

দিদি কুসুমকুমারী বলিলেন—হাকিমী করতে বসে কাকেও দ্বীপান্তরে পাঠাতে পারোনি বলে পেন্সন নিয়ে এদের তাড়িয়ে দ্বীপান্তরের সে-সাধ মিটিয়েছো!

গুরুপদ কোনো কথা বলিলেন না।

নীলমাধব বলিলেন—আমরাও পয়সা রোজগার করি, কিন্তু সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক কেটে দিইনি, ভায়া! ঘর আর বাহির···দু'টোর কোনোটাকে বাদ দেওয়া চলে না! হাকিমী দু'দিনের। কিন্তু স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, ঘর-সংসার ···চিরদিনের। তাছাড়া চাকরি বলো, ব্যবসা বলো, এ কি শুধু নিজের জন্য করা? স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে···ওদের জন্যও তো বটে! এদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেঁটে শুধু চাকরিকে যারা সর্ব্বস্ব করে, তাদের ঘর আর ঘর থাকে না; সংসারও সংসার থাকে না! স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে—সব পর হয়ে যায়। তোমার তাই হয়েছে। এখন ফিরে-ফিরতি এদের সঙ্গে মিলে-মিশে এদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আশা-আকাঙ্ক্ষা মিলিয়ে নতুন করে আলাপ-পরিচয় করতে হবে। বুঝলে! আর ঐ তারাচরণ বাবু যা বলেছেন, assert করা, তার মানে সিংহ-বিক্রমে তর্জ্জন-গর্জ্জন নয়!···এটা ডিমোক্রেশির যুগ···এদের সঙ্গে মিলতে হবে, মিশতে হবে। মিলে-মিশে নিজের পরিচয় আবার ঝালিয়ে নিতে হবে, মানিয়ে নিতে হবে।

গুরুপদ বলিলেন—হুঁ···

রাজলক্ষ্মী বলিলেন—চব্বিশটা বছর···বুঝলেন মল্লিক-মশাই, মুখ জুবড়ে উনি শুধু চাকরি করেছেন। আমাদের অসুখ-বিসুখ গেছে···শক্ত অসুখ···তাতে নির্ভর ঐ জেলার ডাক্তার! কাছারির এ্যাটেণ্ডান্সে কখনো নিজে সময়ের এতটুকু ব্যতিক্রম করেননি!

নীলমাধব বলিলেন—কিন্তু তোমরাও তো ওকে ওর অসুখে তেমন করে ছাখোনি, ভাই!

রাজলক্ষ্মী বলিলেন—দেখিনি? ও মা! অসুখের সময় কাছে গেলে উনি জ্বলে উঠতেন! বলতেন, বিরক্ত করো না—এ-ঘরে কেউ এসো না! চট্‌পট্ সারতে হবে···বহু ফাইল! আমাদের বেলা জ্বালাতন হতেন! কিন্তু কাছারির আমলা-টামলা কেউ এলে বলতেন, পেস্কার-বাবু বাইরের ঘরে বসে আছেন···দেখতে এসেছেন··· ফাইলগুলোর কি হবে, পরামর্শ আছে···নিয়ে এসো।··· চিনেছিলেন শুধু ওঁর উপরিওলা, ফাইল আর ডেমি-অফিসিয়াল চিঠি। স্ত্রী হলেও সত্যি দাসী-বাঁদী নই··· কাজেই তাড়া খেয়ে-খেয়ে ক্রমে সরে এসেছি।

হাসিয়া নীলমাধব বলিলেন—অনারারি-ম্যাজিষ্ট্রেটি নয়, গুরুপদ। কাছারির ধারে আর নয়। এখন স্ত্রী, দুই মেয়ে,—এদের সঙ্গে মেলা-মেশা করো। চাকরির বিষে জর্জ্জরিত থেকে ঘরের যে-ভালোবাসার কথা মনে হয়নি, যে-ভালোবাসার মর্ম্ম বোঝোনি, এখন সেই ভালোবাসা প্রাণ ভরে নাও। তোমরা চাকুরের দল··· আমাদের উকিল-মোক্তারের মতো হতভাগা নও···যে ছুটি মেলে না! তোমাদের ছুটি মেলে। সে-ছুটির সদ্ব্যবহার করো। স্ত্রী-ছেলেমেয়ে,—তাদের কাছে ষ্ট্রেঞ্জার হয়ে থাকা—পর হয়ে থাকা—এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর মানুষের হতে পারে না! মাথা ঠিক করে এদের সঙ্গে মেলামেশা করো—ফ্যামিলি-লাইফ···বুঝলে··· তার চেয়ে কামনার আর কিছু নেই! এই লাইফের কথা মনে করেই বোধ হয় বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন,—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

প্রসাধনী-কৌটা

মার্কিণ-শিল্পীর যত্নে মেয়েদের ব্যবহারোপযোগী নূতন যে প্রসাধনী-কৌটা তৈয়ারী হইয়াছে, আকারে সে কৌটা যেমন ছোট, তেমনি এ-কৌটায় আছে আয়না, পাউডার, পাফ, লিপষ্টিক প্রভৃতি সর্ব্ব-রকমের সজ্জা-প্রসাধনী। ছোট হাত-ব্যাগে এ কৌটা বহন করা চলে; এবং যেখানে খুশী কৌটা খুলিয়া মনের মতো সজ্জা-প্রসাধন সুনির্ব্বাহিত হয়।

প্রসাধন

বন্ধ কৌটা

রূপার জিনিষ সাফ করা

রূপার ফুলদানী, কাঁচি, চামচ ময়লা হইয়া গেলে এবং সে সব সামগ্রীতে যদি নক্সার কাজ থাকে, তাহা হইলে তাহা সাফ করা সহজ নয়। নক্সাদার রৌপ্যপাত্রাদি সাফ করিতে হইলে ছোট ব্রাশ ব্যবহার করিবেন। ব্রাশে পালিশ-পেষ্ট মাখাইয়া ধীরে ধীরে পাত্রাদির গায়ে বুলাইলে ময়লা অচিরে পরিষ্কার হইবে। তার পর ব্রাশো বা অন্য দ্রাবক মাখান্—রূপার গা ঝক্‌ঝক্‌ করিবে।

ছোট ব্রাশ দিয়া

কাঠের তৈরী বেবি-বোট

বেবি-বোট

প্লাই-উডে রেজিনের (রঞ্জন) কোট লাগাইয়া আমেরিকায় খুব হাল্‌কা মোটর-বোট তৈয়ারী হইতেছে। এ-বোটের দাম অপেক্ষাকৃত অল্প। এ-বোটে ছ'-জন লোক ধরে। বোটে বসিয়া মাছ ধরুন, গান-গল্প করুন, চড়িভাতি করুন—কোনো অসুবিধা হইবে না। কাঠের তৈয়ারী বলিয়া এ-বোট বেশ দ্রুত চলে—এবং জল-তরঙ্গের তীব্র উচ্ছ্বাসে কোনো আশঙ্কা নাই। এক ঘণ্টা চলিতে এ-বোটে পেট্রোল খরচ হয় আধ গ্যালন মাত্র। গৃহস্থের পক্ষে ইহা বড় কম লাভ নয়!
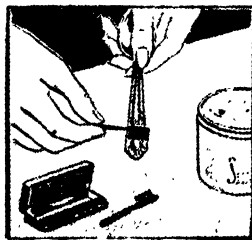
সূর্য্য-কিরণে গরম জল

ফ্লোরিডা এবং হাওয়াই প্রদেশের মত সরকারী গৃহে-অফিসে সূর্য্যতেজে জল গরম করার ব্যবস্থা হইয়াছে। সূর্য্যতেজে দু'-তিন ঘণ্টার মধ্যে জল তাতিয়া ১৮০ ডিগ্রী গরম হয়। জল গরম করিবার জন্য ফ্লোরিডায় এবং হাওয়াই দ্বীপে সরকারী গৃহ ও অফিসের ছাদে

কাচের আবরণে বড় বড় বাক্স ও ট্যাঙ্ক রক্ষিত হইতেছে ; এ-বাক্সে ও ট্যাঙ্কে তামার পাইপ লাগানো আছে। এক-একটি জলাধারে এক হাজার হইতে দশ হাজার গ্যালন জল ধরে। সূর্য্যতেজে জল
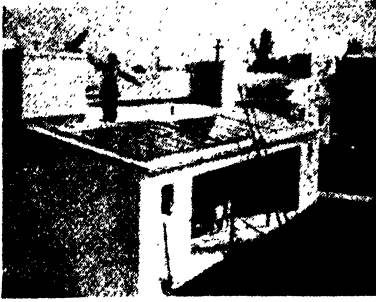
ছাদে কাচের আবরণ

গরম হইলে সেই জল তামার পাইপ-যোগে প্রয়োজনীয় কাজে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা চলে। এ-ব্যবস্থায় জল গরম করিবার বহু ব্যয় সম্পূর্ণ নিবারিত হইয়াছে।

জলের মধ্যে

জলের মধ্যে সাঁতার কাটিয়া, ডুব-সাঁতার দিয়াও মার্কিণ-সন্তরণ-কারীদের তৃপ্তি নাই! তাঁরা এখন চান ডুব দিয়া জলের মধ্যে গিয়া বসিয়া থাকিবেন—বসিয়া জলের মধ্যে মাছ ও জল-জীবদের ঘর-কর্ণা দেখিবেন! এবং ইহাদের এ-বাসনা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে

জলের মধ্যে আসন

সেখানে সম্প্রতি ওয়াকুলা-প্রপাতে একটি ষ্টেশন খোলা হইয়াছে। এই ষ্টেশনে যে স্বচ্ছন্দ-আসন রচা হইয়াছে, জলমধ্যে সে-আসনে যে-কোনো ব্যক্তি স্বচ্ছন্দে শ্বাস-প্রশ্বাস লইয়া নিরাপদে বসিয়া থাকিতে পারেন—যতক্ষণ খুশী! এ আসনখানি কাচের আবরণে মণ্ডিত। যেখানে বসিবার আসন, সেখানে পাম্প করিয়া উপর হইতে বায়ু-চলাচলের সুব্যবস্থা আছে।

কাঠের বাড়ী

এ-যুদ্ধে বিপক্ষ-আক্রমণের জন্য ফ্রান্সে গ্রাম-নগরের যত অধিবাসীকে
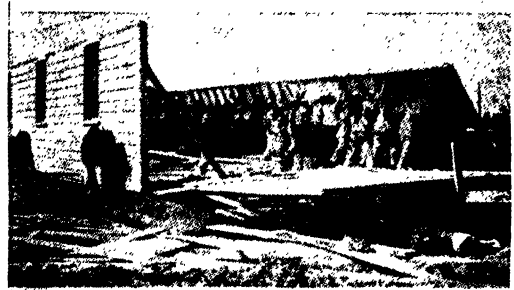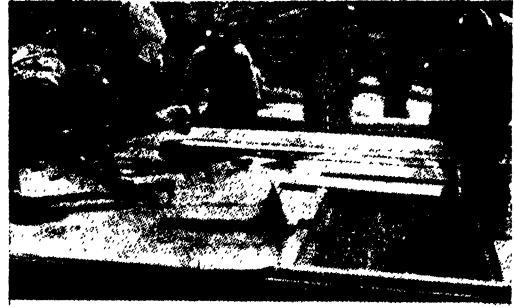
বাড়ীর জীবনে পাঁচ অধ্যায়

কাঠ কাটা

গ্রাম-নগর, বাড়ী-ঘর ছাড়িয়া নিরুপায় ভাবে পথে-ঘাটে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল বলিয়া আমেরিকা সেই সম্ভাবিত বিপক্ষ আক্রমণ কল্পনা করিয়া পথে-প্রান্তরে মাথা গুঁজিবার জন্য নিরাপদ নীড় রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে কাঠ দিয়া যে-সব গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে, সে-গুলিতে স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম মিলিবে প্রচুর—তা ছাড়া এ-সব গৃহ-নির্ম্মাণে ব্যয় অল্প; এবং নির্ম্মাণকার্য্য এত দ্রুত সম্পাদিত হয় যে, চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশে যে-কোন প্রান্তর-পথে পাঁচশো-সাতশো নিরাপদ আশ্রয় রচিয়া তোলা সহজ। আক্রমণ-প্রতিরোধী ফৌজের জন্যও প্রান্তর-পথে এমনি আশ্রয়-নীড় হাজার-হাজার সংখ্যায় নির্ম্মিত হইতেছে।

তৈয়েরী বাড়ী

বাড়ীর ভিৎ

সেনা-বারিক

কচুরি-পানার যম

কচুরি-পানার উৎপাতে আমাদের দেশে কত খাল-বিল, দীঘি-পুকুর মজিয়া হাজিয়া মরিয়া যাইতেছে, সে জন্য লোকসানেরও সীমা থাকিতেছে না। অথচ কচুরি-পানা উচ্ছেদের তেমন উপায়ও নির্দ্ধারিত হইতেছে না। আমেরিকার ফ্লোরিডা-প্রদেশেও ঠিক এমনি
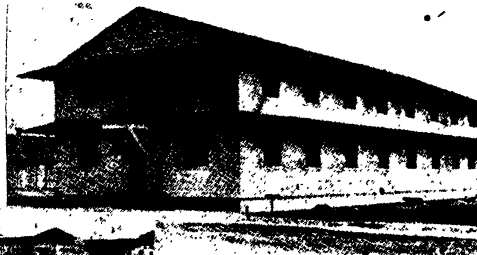
কচুরিপানা ভরতি

কচুরিপানা কাটা

দুর্দ্দশা। এই কচুরি-পানার উচ্ছেদ-কল্পে সেখানকার পূর্ত্ত-শিল্পী শ্রীযুক্ত লিঙ্গল্ এবং নিপসন্ সম্প্রতি ১৬ ফুট লম্বা এক রকম নৌকা তৈয়ারী করিয়াছেন। এ নৌকার সামনে ১৫ ইঞ্চি ধারালো ব্লেড সংযুক্ত করা হইয়াছে। কচুরিপানা-ভরা খালে-বিলে এ নৌকা চালাইয়া দিলে সামনের ঐ ধারালো ব্লেড দিয়া কচুরি-পানা কাটিয়া উপড়াইয়া তার বিলোপ-সাধন ঘটিবে। কাটিয়া নির্ম্মূল হইলে এ কচুরি-পানা বোটে তুলিয়া তীরে আনিয়া তাহাতে অগ্নি-সংস্কার! পোড়া পানা মাটীতে পুঁতিয়া রাখিলে তাহাতে জমির সার হইবে। এ নৌকা অবশ্য বৈদ্যুতিক-মোটর-যোগে চালানো হইতেছে। বৈদ্যুতিক মোটর না লাগাইয়া দাঁড়েও এ-নৌকা চালানো যায়; তবে বৈদ্যুতিক মোটরে কাজ হইবে খুব ক্ষিপ্র।

প্লেন-চারী বৈদ্য

এ-যুদ্ধে মেঘনাদী-রীতি অবলম্বিত হইয়াছে; তাই জয়-কামনায় প্লেন যেমন অপরিহার্য্য সহায়, আক্রমণ-প্রতিরোধে এবং হতাহতের

সেবা-পরিচর্য্যাতেও তেমনি ইহার মতো সহায় আর নাই! কোথায় কাহারা শত্রুর অস্ত্রে আহত বা নিপীড়িত হইল, দেখিবার জন্ত প্লেনে চড়িয়া আম্বুলান্স-বিভাগ আকাশ-পথ পরিক্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। যেমন দেখা আহত-সেনা প্রান্তর-বক্ষে পড়িয়া আছে,—অমনি প্লেন-আম্বুলান্স পক্ষ মুড়িয়া সেখানে আসিয়া নামিল; নামিয়া আহতের

প্রান্তরে আহতের সেবা

পরিচর্য্যায় মনোযোগী হইল; এবং প্রাথমিক সেবায় স্বাচ্ছন্দ্য দিয়া তাকে সেই প্লেন আম্বুলান্সে তুলিয়া স্বপক্ষীয় নিরাপদ হাসপাতালে পৌঁছাইয়া দেয়। প্লেন-আম্বুলান্সের কল্যাণে বোমারু-মৃত্যুর হাত হইতে এবারকারের এ-মহাযুদ্ধে বহু আহত ক্ষিপ্র সেবার গুণে প্রাণ পাইয়া পুনর্জ্জন্ম লাভ করিতেছে।

ট্যাঙ্কের অবাধ গতি

মার্কিণ সামরিক বিভাগ এই কুরুক্ষেত্রের সমারোহ-পর্ব্বে যে ট্যাঙ্ক নির্ম্মাণ করিতেছে, সে সব ট্যাঙ্ক যেন এক-একটি দুরতিক্রম্য দুর্দ্ধর্ষ

এ ট্যাঙ্ক যেন কেল্লা!

দুর্গ। পাহাড়-পর্ব্বত, খানা খোন্দলের সকল বাধা অতিক্রম করিয়া এ-ট্যাঙ্ক চলে ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে। চলার পথে যে বাধা-বিঘ্নই উত্তোলিত থাকুক, এ-ট্যাঙ্ক সে-বাধার উপর দিয়া চলিবে অনায়াসে স্বচ্ছন্দ-গতিতে। ভূগর্ভে নামিবার প্রয়োজন হইলে এ-ট্যাঙ্ক
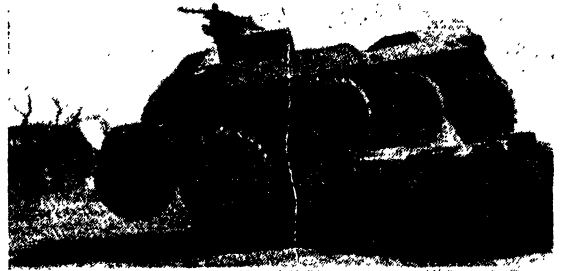
উপরে ওঠা

ভূগর্ভে নামা

অপ্রতিহত স্বচ্ছন্দ-ভঙ্গীতে তাহাও করিতে পারে। এক-একটি ট্যাঙ্কের ওজন দশ হইতে আটাশ টন। ট্যাঙ্কগুলিতে উৎকৃষ্ট ডিশেল-এঞ্জিন সংলগ্ন আছে। মোড় বাঁকিতে, পিছু হঠিতেও এ-ট্যাঙ্কের কৃতিত্ব অসাধারণ।

এ যুদ্ধে নারীর সহযোগিতা

ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় রণ-সমারোহ-ব্যাপারে সেখানকার নারী-সমাজ হাতে-কলমে সহযোগিতায় নামিয়াছেন। অন্ত-বিভাগের কথা ছাড়িয়া দিলেও বারুদখানায়, অস্ত্রাদি-নির্ম্মাণের কাজে

কার্টরিজ সাজানো

সেখানকার নারী-সমাজের কর্ম্ম-সাধনা অপরিসীম। নব-কৌশলে যে-সব মেশিন-গান নির্ম্মিত হইতেছে, সেগুলি হইতে এক ঘণ্টা কাল ধরিয়া অবিরাম গুলি-বর্ষণ করা চলে। এই মেশিন্-গানে থাকে-থাকে কার্টরিজ সাজাইবার কাজ করিতেছেন সেখানকার মেয়েরা।

২৫

সন্ধ্যাকালে বাহিরে যাইবার পূর্ব্বে সুধীশ গায়ত্রীর নিকট হইতে চাবি লইয়া আলমারি খুলিল, এবং পোষাক বাহির করিয়া পরিধান করিল। বিবাহের পরদিন হইতে ইহা গায়ত্রীরই দৈনিক কার্য্য। কিন্তু স্বামীর মুখ গম্ভীর দেখিয়া গায়ত্রী কোন কথা বলিতে সাহস করিল না; একটা আলমারিতে পিঠ রাখিয়া পাথরের পুতুলের মত স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। শুধু তাহার বেদনাম্লান চক্ষু দু'টি ঘুরিয়া-ফিরিয়া সুধীশের অঙ্গ-সঞ্চালন লক্ষ্য করিতে লাগিল।

সুধীশ তাহার দিকে একবারও না চাহিয়া এটা-সেটা দরকারী জিনিস পকেটে পূরিল, রুমালে সুগন্ধ ঢালিয়া তাহা পকেটে রাখিল। অন্য দিন নিয়মিত ভাবে সে ঐ সুরভিত রুমালখানা সাদরে গায়ত্রীর গালে-মুখে ঘসিয়া দেয়, এবং এই পরিশ্রমের বিনিময়ে ন্যায্য পারিশ্রমিক সংগ্রহেও ঔদাসীন্য প্রকাশ করে না। গায়ত্রী তার বলিষ্ঠ বাহু-বন্ধনে আত্মসমর্পণ করিয়া আর্শীর ভিতর সেই ছায়া দেখে, এবং সুখাবেশে তার চক্ষু মুদিয়া আসে। আজ এই প্রথম দিন এই ব্যবহারে ব্যতিক্রম ঘটিল।

গায়ত্রী তাহাকে জুতা পরাইয়া-দিতে উদ্যত হইলে সুধীশ হাত তুলিয়া বাধা দিয়া বলিল, "থাক, থাক। আমি নিজেই জুতো পরতে জানি। যাকে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতে পারো না, তাকে বাহ্যিক যত্ন দেখাবার দরকার নেই। আমি তোমার ভক্তিরও প্রত্যাশী নই।"

গায়ত্রী মুখ তুলিয়া কি বলিতে গেল, কিন্তু বলিতে পারিল না। কি নিদারুণ মর্ম্মান্তিক বেদনায় যে তাহার বাক্শক্তি রুদ্ধ হইয়া গেল, তাহা যদি সুধীশ বুঝিত!

সুধীশ জুতা পরিয়া হ্যাটটা হাতে লইয়া গট্-গট্ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। আর গায়ত্রী কাঠ হইয়া সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল।

রাত্রে ফিরিয়া সুধীশ নিজেই পোষাক ছাড়িল। সে প্রত্যহ স্নান করে, স্নানান্তে খাইতে গেল। গায়ত্রী ও হিমানী দু'জনেই সেখানে থাকে, আজ যে হিমানীর পক্ষে সেখানে থাকা একান্ত অসম্ভব, সুধীশ তাহা জানে। গায়ত্রী থাকিলেও সুধীশ নীরবেই আহার শেষ করিল। অন্য দিন গায়ত্রী হাতে জল ঢালিয়া দেয়, তোয়ালে আগাইয়া দেয়;—আজ সে-সব সুধীশ নিজেই করিল। আহারান্তে সুধীশ ঘরে আসিলে গায়ত্রী তাহাকে পানীয় জল ঢালিয়া দেয়, সুপারীর ডিবাটি হাতে তুলিয়া দেয়,—আজ সে তাহা দেওয়ার পূর্ব্বেই সুধীশ ক্ষিপ্রহস্তে এক গ্লাস জল ঢালিয়া-লইয়া পান করিল, দুই-কুচি সুপারী মুখে দিল, এবং স্বয়ং খাটের মশারি খাটাইতে লাগিল।

এ সব কাজই গায়ত্রীর—সে একান্ত মনে স্বামী-সেবা করে। ঘুম ভাঙ্গিলে যদি সুধীশ নিজে জল ঢালিয়া-লইয়া খায়, তাহা হইলে গায়ত্রীর অভিমানের সীমা থাকে না;—কেন সুধীশ তাহাকে জাগাইয়া জল চাহে নাই? সুধীশকে সে কোন দিন পায়ের তলা হইতে আচ্ছাদনখানা টানিয়া-লইয়া গায়ে দিতে দেয় না, নিজেই তাহার সর্ব্বাঙ্গ পরিপাটী করিয়া ঢাকিয়া দেয়। অধিক কি, কোন দিন সুধীশকে কলমে কালিটুকুও পূরিতে হয় না;—এমনই সকল দিকেই তাহার সতর্ক দৃষ্টি।

আজ শুধু তাহাকে উপেক্ষা দেখাইবার জন্যই সুধীশ স্বহস্তেই সব কাজ করিয়া লইল।

গায়ত্রীর আহারের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা না থাকিলেও, লোক হাসাইবার ভয়ে তাহাকে খাইতে বসিতে হইল। হিমানীরও সেই অবস্থা; দু'জনেই নিঃশব্দে যৎসামান্য গলাধঃকরণ করিয়া উঠিয়া গেল।

শয়ন করিতে আসিয়া গায়ত্রী দেখিল, সুধীশ চিৎ হইয়া চোখে হাত চাপা দিয়া শুইয়া আছে। গায়ত্রী

নিজের বালিশে মাথা রাখিয়া শুইল ; উভয়ের মাঝে রহিল দাম্পত্য-কলহের ব্যবধান ! সুধীশ কথা কহিল না ; খানিকটা পরে তাহার দিকে পিঠ ফিরাইয়া শুইয়া রহিল ।

আজ পনের মাস তাহাদের বিবাহ হইয়াছে ; ইহার মধ্যে কোন দিন কোন কারণে তাহাদের কথান্তর হয় নাই। সুধীশ কখনও তাহার কথার প্রতিবাদ-পর্য্যন্ত করে নাই ; সে যাহা বলিয়াছে, যাহা করিয়াছে, তাহাই আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়াছে, আদরে সোহাগে অহর্নিশি তাহাকে সপ্তম-স্বর্গে তুলিয়া রাখিয়াছে। আজ এমন ভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া বালিশে মাথা রাখিয়া শুইতে গায়ত্রীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। যে পনের মাস তাহাদের বিবাহ হইয়াছে, তাহার প্রতিদিন সে সুধীশের বাহু-উপাধানে মাথা রাখিয়া শুইয়াছে। প্রথম প্রথম গায়ত্রী হাতে ব্যথা লাগিবার অজুহাত তুলিলে সুধীশ তাহার বলিষ্ঠ বাহুর পেশী-সঞ্চালন করিয়া দেখাইয়া হাসিত, বলিত, "ফুলের মত হাল্কা তুমি, তোমার ভারে লোহার মত শক্ত হাতে লাগে না, হতে যদি বস্তার মত মুট্‌কী, তাহ'লে লাগত,—আর তাহ'লে এ সখও থাকত না।"

গায়ত্রী হাসিত, বলিত, "আমিই যদি তেমন মোটা হই ?"

সুধীশও হাসিত, বলিত, "তুমি বেড়া ডিঙ্গিয়ে গেছ। এখন যদি তুমি মোটাও হও, আমার চোখে তা আর মোটা ঠেকবে না। তখন তাতেই তোমায় বেশি সুন্দর দেখব্ হয় ত !"

এ সব কথা স্মরণ করিয়া গায়ত্রী আর অশ্রু-সংবরণ করিতে পারিল না।

প্রথমে যেন তাহার কান্না শুনিতেই পায় নাই, এমনই ভাবে একটুখানি বিমুখ হইয়া থাকিয়াই সুধীশ বিরক্তি-ভরে বলিল, "আমি বলেছি কি ? এত কান্না কিসের ? কথার আগেই কান্না ! ঝক্‌মারি হয়েছে আমার ! কাঁদতেই হয় যদি—তবে একা শুয়ে প্রাণভরে কাঁদ ; আমি সোফায় গিয়ে শুচ্ছি। কাঁদতে হয় না কি না, তাই কাঁদতে এত সাধ !"

গায়ত্রী বুঝিল, কথায় কথা বাড়াইয়া সুধীশ একটা তুমুল কলহ করিতে উদ্যত হইয়াছে ! ভয়ে সে চোখ মুছিয়া ফেলিল ; পিছন হইতে একটা হাতে সুধীশকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার পিঠে মুখ-গুঁজিয়া চুপ করিয়া রহিল।

অগত্যা সুধীশ তাহার দিকে ফিরিল, তাহার অবলুণ্ঠিত মাথাটি নিত্যকার মত বাহুর উপর তুলিয়া লইল ; সিক্ত আঁখি মুছাইয়া চুমা খাইয়া পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "কেন কাঁদছ ? তোমায় কাঁদাবার মত কি করেছি আমি ?"

কোমল কথা, কিন্তু কণ্ঠে রৌদ্ররস বিদ্যমান। ভয়ে গায়ত্রী কথা কহিল না, কি জানি, কিসে কি হইবে ! শুধু সন্তর্পণে নিশ্বাস ফেলিল।

সুধীশ তাহা অনুভব করিয়া ব্যথিত ও লজ্জিত হইল ; স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, "কি হ'ল, বল ত। অত বড় লম্বা নিশ্বাস পড়ছে, রাগারাগি কান্নাকাটি পাগলের মত কেন কচ্ছ রাণু !"

এতক্ষণে সুধীশ তাহাকে স্নেহ-সম্বোধন করিল ! কান্নায় গায়ত্রীর গলা বুজিয়া আসিল, তবু প্রাণপণে আত্মসম্বরণ করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "তুমিই ত আমাকে কাঁদালে ! আমি কি এমন বলেছিলুম, যাতে তুমি আমায় এত শাস্তি দিলে ? আর রাগ—আমি করেছি, না তুমি ? আমার ওপর তুমি এত রাগও করতে পার ?"

সুধীশ অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিল, "আমায় মাপ কর রাণু ! রাগ চণ্ডাল জান ত ? আর তা ছাড়া, চোরকে চোর বললে তার রাগ হয়, জান ত···কিন্তু তুমি যেন রাগ করে থেক না ;—এবার যে তুমি মা হয়েছ, তোমার মানসিক অবস্থা থেকেই তার ভবিষ্যৎ-চরিত্র গঠিত হবে। তার কল্যাণ-চিন্তা এখন থেকেই তোমায় করতে হবে।"

গায়ত্রী ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল, "ও মরুক গে। আমি চাইনে মা হতে। যার জন্যে তোমার ভালবাসা হারাতে হয়, তেমন ছেলে আমি চাইনে। সেই থেকেই ত তুমি আমার ওপর রাগ করছ !"

সুধীশ চমকিয়া উঠিল, গায়ত্রী এ কি বলিতেছে ! সত্যই কি সুধীশ তাহার ভবিষ্যৎ বংশধরের আগমন-সম্ভাবনায় আতঙ্কিত হইয়াছে ?···না, না, সত্যই সে প্রীত হইয়াছে। নিজের সত্তা গায়ত্রীর সহিত মিশাইয়া এই যে তাহার কোলে শিশু আসিতেছে, ইহাকে সে স্বাগত অভিনন্দন করিতেছে।

সে গায়ত্রীর কৃশ তনুখানি বুকে জড়াইয়া বলিল, "ছি, ছি! মা হয়ে কি ও-কথা বলতে আছে? ভয় নেই গো, ভয় নেই! ছেলে-মেয়ে যাই হোক, তাদের মায়ের জায়গা ঠিক থাকবে। তোমার আদর কমবে না, অভিমানও করতে হবে না।"

২৬

হিমানী সে রাত্রে ঘুমাইল না। ইহার পর কেমন করিয়া সে সুধীশকে মুখ দেখাইবে? সুধীশই বা ভাবিল কি? সে এখন বিবাহিত, গায়ত্রীর একান্ত অনুরক্ত স্বামী; হয় ত কি একটু মান-অভিমানের পালা চলিয়া থাকিবে, যে জন্য সে গায়ত্রীকে উপেক্ষা দেখাইতেই হিমানীর ঘরে আসিয়াছিল, অতীত দিনের প্রেমের স্মৃতি স্মরণ করিয়া নয়! হয় ত হিমানীর দুর্ব্বলতা লইয়া তাহারা এতক্ষণে কৌতুক উপভোগ করিতেছে। ছি ছি, যা দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়া ফেলিল হিমানী, সুধীশের সন্দেহের—সংশয়ের আর অবকাশ রাখিল না। অতীতেও যেমন সে সুধীশের অনুরক্তা ছিল, এত ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পরেও তেমনই আছে,—ইহা ভাবিয়া সুধীশ নিশ্চয়ই অনুকম্পার হাসি হাসিতেছে। আজ হিমানী ত মাত্র অতীত, বর্ত্তমান ত গায়ত্রী—যাহাকে সুধীশ বক্ষ শোণিতের তুল্য ভালবাসে।

কিন্তু এক দিন?...... ...

এই গায়ত্রীর মতই প্রাণাধিকা প্রিয়তমা ছিল সে!

সেই সব পুরাতন স্মৃতি উদ্বেল হইয়া তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল,—মনে জাগিতে লাগিল, সুধীশের প্রেম-মাদকতাভরা দিনগুলি! আবার মনে পড়িল, তাহার নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানের বেদনা;—সেই নিরানন্দময় মৃত্যুতুল্য অব্যক্ত যন্ত্রণাময় জীবন।.........

তাহার পর বিবাহ হইল। হয় ত গায়ত্রীর মত অহোরাত্র স্বামীর সোহাগ-ধারায় আপ্লুত হইতে পারিলে সুধীশকে কতকটা ভুলিতে পারিত;—কিন্তু সে তাহা পায় নাই। প্রৌঢ় দম্পতি যেমন প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের সম্মুখে সর্ব্বদা সমীহ করিয়া চলে, গায়ত্রীর জন্য তাহারা সেই ভাবে চলিত। কিশোরী গায়ত্রীকে লুকাইয়া অনুপ স্ত্রীর সান্নিধ্য কামনা করিত। তখন সে ছিল নিষ্কলুষ পূতঃচরিত্র। কিন্তু হিমানীর মনের কালি কি তাহাকেও তাহার মনের অজ্ঞাতে স্পর্শ করিল? যাহার ত্রিশটা বৎসর কাটিয়াছিল—অনাবিল পবিত্রতার মাঝে, তার অকস্মাৎ পদস্খলন হইল কেন? আর শুধুই কি পদস্খলন! গেল ত গেলই—একেবারে অতলে ডুবিয়া গেল। সদ্বংশে জন্মিয়া, সুশিক্ষা পাইয়া অবশেষে সে নারী-হত্যা করিল!—হিমানী শিহরিয়া চোখ বুজিল!

ঘুমন্ত মৃণা এই সময় তাহার বুকে হাত দিল; সন্তানের স্পর্শ তাহার লুপ্ত চেতনা ফিরাইয়া আনিল। মৃণা তার স্বামীর দান, অনুপের মহৎ দান,—তাহার স্নেহের উৎস! সুধীশের উপর আজ তাহার কোন দাবী-দাওয়া নাই; কিন্তু অনুপ হত্যাকারী হোক্, ঘৃণিত হোক্, তবু তার দানেই হিমানী গরীয়সী—পৃথিবীতে তাহাই হিমানীর নিজস্ব বস্তু!...অথচ এই দাতার প্রতি সে কৃতজ্ঞ নয়, যথোচিত স্নেহও তার কি আছে?

হিমানী মলিন হাসিল, সে শুধু ছিদ্রান্বেষী মন লইয়া কেবলই অনুপের বিচার করে, কিন্তু একবারও নিজের দিকে চাহে না;—একবারও মনে করে না যে, পুরুষের শতবারের ব্যভিচারের ক্ষমা আছে,—তাহা সহনীয়; কিন্তু দ্বিচারিণীর স্থান নরক।......দ্বিচারিণী? হাঁ, সে দ্বিচারিণী ভিন্ন আর কি? স্বামী ব্যতীত অন্য পুরুষের চিন্তন, মনন, স্মরণ—সবই ঘোর অপরাধ। কিন্তু হিমানী তাহার এই সুদীর্ঘ বিবাহিত জীবনের মাঝে—কবে, কোন্ দিন সুধীশকে ভুলিতে পারিয়াছে? শুধুই কি চিন্তন, মনন, স্মরণ? হিমানীর সারা দেহে আজও সুধীশের সপ্রেম আলিঙ্গনের নিবিড় স্পর্শ লাগিয়া আছে, এ পোড়া ওষ্ঠাধরে আজও সহস্র উত্তপ্ত অধরস্পর্শের স্মৃতি জাগিয়া আছে; তাহার প্রতি শিরায় সুধীশের স্পর্শের বিদ্যুৎ সঞ্চালিত হইতেছে! ...এখনও কি তাহাকে দেখিলে হিমানীর বক্ষশোণিত উদ্দাম হইয়া উঠে না? বাহ্যিক ব্যবহার সে সংযত রাখিলেও অন্তরে তার প্রচণ্ড আসক্তি জাগে। সে তাহার বাল্য ও কৈশোরের একান্ত বাঞ্ছিতকে কিছুতেই ভুলিতে পারে না। তার চরিত্রহীন স্বামী অনুপস্থিত, আর সুধীশ উপস্থিত;—তাহার বিক্ষিপ্ত চিত্ত কিছুতেই নীতির পথ মানিয়া চলিতে চাহে না।

গরম রক্তে হিমানীর মাথা যেন ভারী হইয়া উঠিল।

সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল, বুকের ভিতর যেন প্রচণ্ড ঝড় বহিতেছে। পরক্ষণেই দৃষ্টি পড়িল নিদ্রিত শিশু দু'টির উপর। হিমানী শান্তি পাইল। ইহারাই তাহার শান্তির আকর, পবিত্র নিষ্পাপ শিশু দু'টি! অনুপ?—না সে তাহার জীবন মোটেই নষ্ট করে নাই;—সেই তাহাকে এই স্বর্গের প্রসূন দু'টি উপহার দিয়াছে; তাহাকে মাতৃত্বের সুখ দিয়াছে। প্রেম? হাঁ, তাহাতেও সে হিমানীকে বঞ্চিত করে নাই। হিমানীর নিজের দোষে সে সুখী হয় নাই, অনুপের অপরাধে নয়। সে কেবল আলেয়ার পিছনেই ছুটিয়া মরিল, তুলসী-মূলের নির্ব্বাত পবিত্র দীপটির দিকে চাহিয়া দেখিল না; অথচ তাহাতেই হিমানীর গৃহ আলোকিত রহিল।

স্বামীকে স্মরণ করিয়া হিমানীর দুই চোখে অবিরল জল ঝরিতে লাগিল।

* * * *

প্রভাতে গায়ত্রী স্নানাগারের পাশে আসিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, ঝি রামুর মা, ও রামুর কথার এক-টুকরা তাহার কাণে গেল।

রামু বলিতেছে, "বাবু দেবতা, তুই বল্‌ছিস্ কি রেমোর মা! আমার অনেক কিছুই চোখে পড়ে, ছবিতে যেমন পয়সা খরচ করে দেখে আসি, তেমনি ধারা,—বাবুর মাঠাকরুণ অন্ত-প্রাণ।"

রামুর মা বলিল, "তুই থাম্ রেমো,—মাঠাকরুণ-অন্তপ্রাণ! তাই চব্বিশ ঘণ্টা হিমানী, হিমানী, হিমানী! শালাজের জন্যে আবার অত কি রে?"

রামু বলিল, "ও-সব বড় ঘরের বড়-কথা! তুই-আমি খেটে খেতে এসেছি, আমাদের ও-সব দিকে চোখ-কাণ দিয়ে লাভ কি? তবে তুই যাই বল, আমি এ কথা বলব, বাবু দেবতা! আজ চার বৎসর আমি আছি, দেখছি ত; হাতে অযচ্ছল পয়সা, তবু একটি দিনের তরেও কোন বদ্-খেয়ালী দেখিনি বাবুর। টাকা-কড়ি সবই ত আমার হাতে থাকত, কেবল দানে দানেই সব যেত। আমি ত দিনে-রাতে দেখছি। মাঠাকরুণকে ত বাবু চক্ষে হারান, তুই কি-ই বা জানিস?"

রামুর মা কি বলিল, গায়ত্রী শুনিতে পাইল না।

রামু বলিল, "পরে কি দাঁড়াবে, তা অবিশ্যি জোর করে বলা যায় না। বাবুর দোষ কি, পুরুষ মানুষ, কাঁচা বয়েস। মেয়েছেলে নাই দেয় যদি, তবে শিবেরও ধ্যান ভাঙ্গে! আর রূপ ত নয়? যেন জগদ্ধাত্রী! তা মাঠাকরুণ কি আর এতই বোকা?"

কথাগুলা যে হিমানীকে লক্ষ্য করিয়াই উচ্চারিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে গায়ত্রীর বিলম্ব হইল না। তাহার মনে হইল, তাহার দুই কানের ভিতর দিয়া তপ্ত লৌহ-শলাকা চালাইয়া দিয়া কে যেন একই সঙ্গে তাহার মস্তিষ্ক ও হৃৎপিণ্ড দুইই বিঁধিয়া দিল। সুধীশ তাহার একান্ত প্রিয়তম এবং হিমানী তাহার প্রিয়সঙ্গিনী,—অথচ তাহারা না কি উভয়েই গায়ত্রীকে প্রতারণা করিতেছে! অতীতে সুধীশ যাহাই করুক, এখন সে গায়ত্রীর একান্ত অনুরক্ত বিশ্বস্ত স্বামী,—গায়ত্রী তাহাই জানে; কিন্তু লোকে তাহার আড়ালে গায়ত্রীকে অনুকম্পার পাত্রী বলিয়া ভাবে! গায়ত্রী নিজের দুর্ব্বলচিত্ততার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিল। ছি ছি, ঝি-চাকরে তাহার স্বামীর চরিত্র লইয়া আলোচনা করিতেছে—শুনিয়া তাহার মনে বিকার আসিল! এত সন্দিগ্ধ মন তাহার?

মন হইতে কালি মুছিয়া ফেলিয়া সে স্নান সমাপন করিয়া ঘরে গেল। যাহা এত দিন সে সহজ ভাবে লইয়াছে, আজ তাহাই বিকৃত মনে হইল। সুধীশ শয্যাত্যাগ করিয়াছে, তাহার ব্যায়ামের অভ্যাস আছে, ছাদের ঘরে সে ব্যায়াম করে, তাহার পর খোলা গায়ে খানিকটা ছাদে বেড়ায়। আজও সে নিয়মমত তাহাই করিতে গিয়াছিল; কিন্তু সহসা জানালা হইতে গায়ত্রীর চোখে পড়িল, সে আলিসায় কনুইয়ের ভর দিয়া নীচের দিকে চাহিয়া আছে। হিমানী বোধ হয় এইমাত্র শয্যাত্যাগ করিয়াছে; সে বারান্দার মোটা থাম জড়াইয়া তাহাতে মাথা হেলাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। শিথিল কবরী ঘাড়ের কাছে লুটাইতেছে। নিদ্রালীন চক্ষু দু'টি অর্দ্ধ-নিমীলিত। অঞ্চল কাঁধে ওঠে নাই—তাহা বারান্দার আধখানা অবধি লুটাইতেছে, ষোড়শীর মত সুগঠিত বক্ষ দীর্ঘশ্বাসে মৃদু মৃদু কম্পিত হইতেছে। গায়ত্রী দেখিয়া স্বীকার করিল, নিদ্রালসার এমন রূপ বোধ হয় কদাচিৎ চোখে পড়ে, সত্যই ইহা মুনি-মনোহর। কিন্তু সুধীশ ছাদে দাঁড়াইয়া যে মুগ্ধনেত্রে ইহা দর্শন করিতেছে,—ইহা ভাবিতেই

গায়ত্রীর বুকের ভিতরটা মুচড়াইয়া উঠিল। চোখে জল ভরিয়া আসিতেছিল, প্রাণপণে তাহা রুদ্ধ করিয়া সে সে দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া চুল আঁচড়াইতে লাগিল। —না, মনকে সে ছোট হইতে দিবে না।

আর্সীতে সুধীশের ছায়া পড়িল; গায়ত্রী যাহা কোন দিন করে নাই, আজ তাহা করিল। মুখ ফিরাইয়া হাসি-মুখে তাহার সম্বর্দ্ধনা করিল না; যেমন চুল আঁচড়াইতেছিল, তেমনই রহিল। সুধীশ আসিয়া পাশে দাঁড়াইল; গায়ত্রীর হাত হইতে চিরুণীখানা টানিয়া-লইয়া তাহাকে নিজের দিকে ফিরাইয়া চুল আঁচড়াইয়া দিতে লাগিল, তাহার পর হাসিমুখে বলিল, "আজ এর মধ্যেই সব সারা হয়ে গেছে? বেশ, ভালই। এবার থেকে ভোরে উঠো, ছাতে খানিকটা বেড়িও। ভোরের হাওয়া গায়ে লাগলে শরীর ভাল থাকে।"

গায়ত্রী তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "আমি ছাতে গেলে তোমার অসুবিধে হবে না?"

সুধীশ হাসিয়া বলিল, "ওঃ, ব্যায়াম করি বলে বলছ? তখন মেয়েছেলের মুখ দেখতে নেই? ও-সব পালোয়ানেরা বলে। পাশ্চাত্য-মতে এমন অনেক ব্যায়াম আছে, যা স্বামি-স্ত্রী একসঙ্গে করে।"

তাহার সরল উক্তি শুনিয়া গায়ত্রী মনে মনে লজ্জায় মরিয়া গেল, ছি ছি!—এমন স্বামীকে সে সন্দেহ করিতে-ছিল! সে হাসিমুখ ঘুরাইয়া বলিল, "থাক, আমার ব্যায়ামে কাজ নেই, তুমিই করো।"

সুধীশ কাজে বাহির হইয়া গেলে গায়ত্রী নীচে নামিল। গায়ত্রী ও হিমানী—দু'জনে যখন দেখা হইল, তখন বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ চিত্তে উভয়েই অসহিষ্ণু; কেহই যেন কাহাকেও সহিতে পারিতেছে না, অথচ মুখ ফুটিয়া বলিবার মত অভিযোগও কাহারও কিছু নাই! ভাঁড়ারের কাজ করিতে করিতে অকস্মাৎ কি কথা লইয়া দু'জনে তর্ক হইতে লাগিল। তর্ক হইতে কটু ভাষা, এবং কটু ভাষা হইতে তুমুল কলহ হইয়া গেল,—যাহা এই বারো বৎসর একত্র বাসের মধ্যে কোন দিন হয় নাই।

হিমানী কাঁদিয়া উঠিয়া গেল।

গায়ত্রী অনুতপ্ত হইল বটে, কিন্তু তাহার মনের মধ্যে অনুক্ষণ এমন একটা সন্দেহ বিঁধিতেছিল, যে জন্য সে ক্রমেই হিমানীর প্রতি স্নেহ হারাইতেছিল। সে-ও গিয়া হিমানীকে মিষ্টবাক্যে শান্ত করিল না, বা ক্ষমা চাহিল না।

সুধীশ বাড়ী ফিরিয়া গায়ত্রীকে একা এবং তাহার রুষ্ট মুখ দেখিয়া বিস্মিত হইল। প্রশ্ন করিল, "হিমানী কৈ? তাকে দেখছি না যে?"

ঠিক এই কথাই বলিয়াছিল রামুর মা। গায়ত্রীর গায়ে যেন সূচ ফুটিল; ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "বিশ্ব-সংসার অন্ধকার দেখছ, নয়? হিমানীর জন্য হেদিয়ে পড়েছ!"

পূর্ব্বদিনের অপ্রিয়-স্মৃতি মুছিবার সময় পাইল না,—আবার সেই কথা। সুধীশের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, রোষদীপ্ত কণ্ঠে কহিল, "হিংসেয় যে ফেটে মরচ দেখ্‌ছি! কি এমন বলেছি, যাতে ও-কথাটা বললে? মুখের বাড় বড্ডই বেড়েছে যে? কার সঙ্গে কথা বলছ, তা মনে আছে?"

গায়ত্রী দমিল না, রুক্ষ কণ্ঠেই বলিল, "মনে বেশ আছে। তোমার দরকার থাকে, তোমার হিমানীকে খুঁজে নাওগে। আমি তার দাসী নই যে, সর্ব্বদা তার সন্ধান তোমায় জানাব।"—বলিয়াই সে হন্‌-হন্‌ করিয়া চলিয়া গেল।

সুধীশ তখনই হিমানীর সন্ধানে গেল না, স্নানাহার সারিল; রামুর নিকট সংবাদ পাইল হিমানীর সঙ্গে গায়ত্রীর প্রবল কলহ হইয়াছে, এবং হিমানী নিজের ঘরে শুইয়া আছে। উভয়ের কেহই জলস্পর্শ করে নাই।

আহারান্তে সুধীশ হিমানীর ঘরে গেল। ছবি মৃণা খাটে অঘোরে ঘুমাইতেছে; মেঝেয় হিমানী শুইয়া আছে, —বোধ হয় তন্দ্রাচ্ছন্ন।

সুধীশ সন্তর্পণে দুয়ার ভেজাইয়া দিয়া তাহার মাথার কাছে বসিয়া আস্তে আস্তে ডাকিল, "হিমন্‌, হিমু!"

হিমানী চমকিয়া চাহিল, তাহার পর অবরুদ্ধ ক্রন্দনের ভারে গুমরিয়া উঠিল, "সুধীশ!"—তাহার দুই চক্ষুর জলে দুই গাল ভাসিয়া গেল।

বহু পুরাতন দিনের একটা কথা সুধীশের কাণে হঠাৎ ভৈরব রবে বাজিয়া উঠিল!—রাজকুমারী বলিয়া-ছিলেন, "আমার বড় আদরের হিমু, দেখো, যেন কখন ওর চোখের জল না পড়ে!" সেই হিমানী কাঁদিতেছে,

এবং তাহার চোখের জলে সুধীশের হর্ম্ম্যতল ভিজিয়া যাইতেছে!

সুধীশ অতি কষ্টে আপনাকে সংযত করিল; ধীরে ধীরে তাহার ভিজা রেশমের মত চুলগুলি নাড়িয়া দিতে দিতে কোমল কণ্ঠে বলিল, "কি হ'ল হিমু? এত কাঁদছ কেন?" হিমানী কথা কহিতে পারিল না, শুধু শয্যাতলে মুখ লুকাইয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। সুধীশ তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "চুপ করো, আর কেঁদ না। কি হয়েছে?"

হিমানী এবার মুখ তুলিল, ব্যাকুল ক্রন্দনের সুরে বলিল, "আমায় আমার বাড়ী পাঠিয়ে দাও, সুধীশ!"

সুধীশ কোঁচার কাপড়ে তাহার প্রবহমান অশ্রুধারা মুছাইয়া দিতে দিতে সস্নেহ কণ্ঠে বলিল, "বাড়ী যাবার জন্যে এত উতলা হয়েছ কেন? যাবেই ত এক দিন। হ'ল কি হঠাৎ?"

হিমানী ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "কিছুই হয়নি! দুনিয়ার নিয়মই এই; লোক ডাঙ্গায় উঠে নৌকোয় লাথি মারে! আজ বাহাদুরী-কাঠ পেয়েছে বলেই ঠাকুর-ঝি আমায় এমন করে অপমান করতে ভরসা পায়; কিন্তু এ ভেলা ধরে তাকে ভাসতে শেখালে কে?"

কথাটা সত্য, কিন্তু সুধীশের কাণে যেন তাহা বেসুরো লাগিল। গায়ত্রী তাহার প্রেমের মন্দাকিনী, তাহার শান্তির উৎস, সে এত অবহেলার পাত্রী নয়। আর অতীতে যাহাই তাহার ধারণা থাক, আজ গায়ত্রীর বিনিময়ে সুধীশ তাহার পঞ্জরাস্থিও সহজেই দিতে পারে। গায়ত্রীর গুণে সে আজ একান্ত মুগ্ধ,—বশীভূত। কিন্তু সে কথা হিমানীর সম্মুখে উচ্চারণ করিবার মত সাহস সুধীশের নাই। তাই ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "সে কথা ত গায়ত্রী জানে না,—মনে করে বুঝি,—যাক্‌গে তোমাদের হ'ল কি? পাগলামী কোর না হিমু! লোক-জন কি ভাবছে? ওঠ!" সে হিমানীর হাত ধরিয়া টানিল।

হিমানী কাঁদিয়াই বলিল, "কারুরই কিছু ভাববার দরকার নেই। তোমার ঋণ শোধবার নয়, বাড়ী ত তুমি দায়মুক্ত করে রেখেছ, আমি শুধু সেখানেই যেতে চাইছি। আমি ঠাকুরঝির বাড়ী বসে তার অশ্রদ্ধার ভাত খেতে চাইনে!" সে বুক-ভাঙ্গা বেদনায় আকুল হইয়া সুধীশের পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল।

হিমানীর এই কাতর অশ্রু-প্লাবিত দীন মূর্ত্তি সুধীশের উপর কঠোর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল; দ্রুত সে আত্মবিস্মৃত হইতে লাগিল, কাণের কাছে মায়ের অন্তিম আদেশ কামানের গর্জ্জনের মত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সে সযত্নে হিমানীর একখানি হাত হাতের মধ্যে লইয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "তোমার হিসেবের ভুল হচ্ছে, হিমু, তুমি অনুপ গুপ্তর ভগিনীপতির কাছেও নেই, বা তার ভাতও খাও না,—আছ তুমি তোমার সুধীশের কাছে, খাও তুমি তোমার সুধীশের অন্ন; তার ওপর পূর্ব্বে তোমার চেয়ে কারুর বেশি দাবী ছিল না।"

মর্ম্মপীড়িতা হিমানী কাতর স্বরে বলিল, "সে কথা আর তুলছ কেন? সে জলের দাগ নিজের হাতেই ত মুছে ফেলেছ! তাই না আজ আমি তোমার ঘরে তোমার গলগ্রহ!"—সে কঠিন ভূমিতলে লুটাইতে লাগিল।

সুধীশ ক্রমশঃ শক্তি হারাইতে ছিল; সে হিমানীর অবলুণ্ঠিত মস্তকটি জানুর উপর তুলিয়া লইয়া অনুতপ্ত স্বরে বলিল, "না, তা নয়। জলের দাগ ত ছিল না যে, হাত দিয়ে মুছে ফেলব! এ যে পাথরে দাগ পড়েছিল, যতক্ষণ না ভেঙ্গে শেষ হবে, এ দাগ ত মোছবার নয়। কিছু কি তুমি বোঝ না?"—সে লুণ্ঠিতা বিবশা হিমানীকে বুকে তুলিয়া লইতেই বোধ হয় উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার অঙ্গে হস্তার্পণ করিবামাত্র তাহার বিবেক যেন তাহাকে কশাঘাত করিল। হিমানী পরস্ত্রী, এবং সে-ও বিবাহিত; কবে কোন্ সুদূর অতীতে তাহারা পরস্পরকে ভবিষ্যৎ স্বামি-স্ত্রী বলিয়া কল্পনা করিত, সেই মোহের ছলনায় আজি-কার সুদৃঢ় বর্ত্তমানকে সে ঠেলিয়া ফেলিতে পারে কি?

হিমানী এক সময় তাহার বাগ্দত্তা ছিল বলিয়া যদি তাহার অন্য স্বামী বর্ত্তমানেও তাহার উপর সুধীশের দাবী থাকে, তবে সত্যই যাহাকে পবিত্র বিবাহ-বন্ধনে বাঁধিয়াছে, তাহার দাবীর পরিমাণ কতখানি?—সুধীশের হাত কাঁপিতে লাগিল।

হিমানীও "ছিঃ!" বলিয়া আপনাকে মুক্ত করিয়া উঠিয়া বসিল। বিদ্যুতের মত তাহার চোখের সামনে ঝিলিক্

মারিয়া উঠিল—স্বামীর মুখখানি! তার ছবি-মৃণার জন্মদাতা ঘৃণিত হইলেও তাহার আরাধ্য, তাহার বন্দনীয়, পবিত্র ধর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ স্বামী! সে পরিচয় যতই কলঙ্কযুক্ত হউক না, তাহাই হিমানীর মুখোজ্জ্বল করিবে,—সুধীশের প্রণয়িনীরূপে নয়। তাহার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল।

উভয়েই অনেকক্ষণ মৌন হইয়া রহিল—বিবেকের দংশনে। তাহার পর মৃদু নিশ্বাস ফেলিয়া সুধীশ বলিল, "গায়ত্রীর হয়ে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। সে তোমার ছোট, তুমি তাকে মাপ করো। বেলা এতখানি হয়েছে, সে কিছুই খায়নি। লজ্জায় তোমার কাছে আসতেও পাচ্ছে না, কেবল কাঁদছে। তুমি ওঠো, আমি তাকে দেখি।"—বলিয়া সুধীশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

নিজের মনেই সে হাসিল; শৈশবে ঠাকুরমার কাছে সে সুয়োরাণী দুয়োরাণীর গল্প শুনিত; তার নিজের জীবনেও প্রায় তাই হইয়াছে। সে-ও সেই দুর্ভাগ্য দোটানায় ভাসা রাজার মত অহর্নিশ সুয়োরাণী ও দুয়োরাণী লইয়া বিব্রত!···বড় রাণীর মান ত ভাঙ্গিয়াছে, এবার কনিষ্ঠার পালা, যাহার নিকট পদে পদে সে অবিশ্বাসী হইতেছে!

২৭

ঘরে ঢুকিয়া সুধীশ দেখিল, গায়ত্রী মেঝেয় মাদুর পাতিয়া তাহার উপর পড়িয়া আছে; স্বামীর সহিত চোখো-চোখীতেই সে বালিশে মুখ গুঁজিল।

সুধীশ সরিয়া গিয়া তাহার কাছে বসিল; সস্নেহে তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া গাঢ় স্বরে ডাকিল, "গায়ত্রী!"

গায়ত্রী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

এবার আর সুধীশ বিরক্ত হইল না, তাহার হৃদয় তখন লজ্জা ও অনুশোচনায় অত্যন্ত বিচলিত, সে গায়ত্রীর অশ্রু-সিক্ত মুখখানি গালের নীচে চাপিয়া-ধরিয়া নির্ব্বাক্ ভাবে বসিয়া রহিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল যে, সরল ভাবে সব কথা গায়ত্রীকে বলিয়া মনটা সুস্থ ও লঘু করে; কিন্তু তখনই সে সেই ইচ্ছা দমন করিল। হিমানীর সম্বন্ধে গায়ত্রীর মনে সংশয় জন্মিলেও সত্য কথা সে জানে না;—জানিলে তিন জনেরই জীবন বিষময় হইয়া উঠিবে। ভাগ্যে সে অতীশের পরামর্শ লয় নাই!

সুধীশ ক্ষুব্ধ চিত্তে নিশ্বাস ফেলিল; ভাবিল, তাহার জীবনের সূত্র এমনই জটিল ভাবে জড়াইয়া গিয়াছে যে, সত্য প্রকাশ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই, কেবল মিথ্যার উপর মিথ্যার বোঝা চাপাইয়া অভিনয় করিতে করিতেই বুঝি তাহাকে সারা জীবন কাটাইতে হইবে! তাই যদি হয়, তবে মিথ্যার মুখোস পরিয়া যত দিন চলে চলুক।·········

গায়ত্রীর অভিমানাশ্রু সুধীশের বক্ষচ্ছায়াতলে ক্রমশঃ শীতল হইয়া আসিল, তখন সুধীশ বিষণ্ণ মুখে বলিল, "হিমানী বিপন্ন বলেই তোমার বাড়ী এসে রয়েছে, তার ওপর তোমার কি রাগ করা উচিত?"

গায়ত্রী ক্রুদ্ধ অভিমানভরে বলিল, "আমার বাড়ী? আমি কে? আমি ভেসে এসে লেগেছি বৈ ত নয়!"

সুধীশ তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া ম্লান হাসিয়া বলিল, "এ ত তোমার ভুল! মোটরে আমার পাশে বসে এসেছ, তা মনে নেই? বাড়ী তোমার নয়? দলিলখানা খুলে দেখ দেখি, কার নাম আছে? এখনও ছ'মাস হয়নি, মণি কয়ালের কাছে নগদ সাড়ে ন'টি হাজার টাকা গুণে দিয়ে কিনেছ; আর এখন পরিষ্কার বলে ফেললে—এ বাড়ী তোমার নয়! কি শোচনীয় স্মরণশক্তি!"

গায়ত্রী অভিমানপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "হাঁ, যেমন তোমার ওপর না-দাবীদার তোমার স্ত্রী, তেমনি না-দাবীদার সে বাড়ীর মালিক!"

সুধীশের ওষ্ঠে ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। গায়ত্রীর ললাটে হাত বুলাইয়া মৃদু স্বরে বলিল, "ছি ছি, ও কথা মনেও ঠাঁই দিও না রাণু! সর্ব্বস্বেরই মালিক তুমি; আমাকেই যে তুমি কিনে রেখেছ! হিমানী তোমারই বাড়ীর অতিথি, তোমার ভাজ সে, আমার ত কেউ নয়। হাঁ, স্বীকার কচ্ছি, ওর ছেলেপুলের ওপর, ওর ওপর আমার একটু মায়া আছে; আমি তাদের একটু অতিরিক্ত যত্নই করি। কিন্তু সেটা যে তোমার অসহ্য হয়ে উঠেছে, তা ত আমি জানতুম না! আমার মনে হয়, ওদের ওটুকু যত্ন আমি যদি না করতুম, তা হ'লে তুমি হয় ত বিরক্ত হতে, মনে বড্ড দুঃখ পেতে। তোমার দাদার সঙ্গে আমার ত আলাপ-পরিচয় নেই,—শুধু শুধু তাঁর বাড়ীর জন্যে অতগুলো টাকা খরচ করবার আমার কোনই দরকার

ছিল না; তা করেছি—শুধু তুমি তৃপ্তি পাবে ভেবে। আজ মনে হচ্ছে, হয় ত ওটাও আমার হীনতার একটা নজীর বলে তোমার ধারণা হ'য়ে থাকবে।"—সে গভীর ক্ষোভের নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

ক্ষোভে লজ্জায় গায়ত্রী আড়ষ্ট হইয়া পড়িল। ছি ছি, কত দূর নীচ মন তার! সত্যই সে মহাদেবের মত স্বামী পাইয়াছে, অথচ সে ঈর্ষার আগুনে জ্বলিয়া মরিতেছে! এমন প্রেমময় স্বামী কোন্ ভাগ্যবতীর ভাগ্যে মেলে?—সে আর মুখ তুলিতে পারিল না, সুধীশের প্রশস্ত বুকে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

সুধীশ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "হিমানী এখানে থাকলে তুমি যদি অশান্তি ভোগ কর, তাহ'লে ওর নিজের বাড়ী যাওয়াই ভাল নয়? খেয়ে উঠে আমি তার কাছে গেছলুম, শুনলাম, তারও আর এখানে থাকবার ইচ্ছা নেই।—আমি বলি, ও নিজের বাড়ীতেই চ'লে যাক্। ঠাকুর ত বুড়ো মানুষ, সে রাত্তিরে গিয়ে ওখানে শোবে; আর মাসে মাসে তাকে কিছু কিছু দিও, তাতেই যা-হোক করে চালিয়ে নেবে।"

গায়ত্রী এ কথা শুনিয়া শিহরিয়া ধড়-মড় করিয়া উঠিয়া বসিল; সুধীশের একখানা হাত সভয়ে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "সে কি? না, না, আমি তা কখনই হ'তে দেব না। ওগো, আমার মাথা খাও, বৌদিকে তুমি চলে যেতে দিও না।"

সুধীশ এবার আন্তরিক ভাবেই বলিল, "না। কেন তাকে আট্‌কাচ্ছো? যেতে চাইছে সে, তাকে যেতে দাও। আমাদের সুখের সংসারে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে লাভ কি? যখন তোমার মনে বিরক্তি জন্মাবে, তুমি মিছামিছি কষ্ট পাবে, আমিও পাব; আর হিমানী ত পাবেই। যে কথার ভিত্তি মনে নেই, তা মুখ থেকে বেরোয় না; কোন্ দিন হয় ত হিমানীর মুখের ওপরেই বলে ফেল্‌বে,—তার চেয়ে ও নিজের বাড়ী যাক্, মানে মানে এখনই ওকে যেতে দাও। আমি তোমায় নিয়ে যে সুখের নীড় বাঁধতে চাই, তাতে আর বাধা দিও না।"

গায়ত্রী ব্যাকুল ভাবে বলিল, "না, না, ও-কথা বোল না? দাদা এলে আমি তাঁকে কি বলব? কি করে তাঁকে মুখ দেখাব? তিনি আমার সম্বন্ধে কি ভাববেন বল দেখি?"

সুধীশ নিস্পৃহ স্বরে বলিল, "সে তোমরা ভাই-বোনে বোঝাপড়া কোর, এ বিষয়ে আমার কিছুই বলবার নেই। কিন্তু তোমার দাদা এসে কি ভাববেন বা কি বলবেন, সেই চিন্তায় আমি নিজেদের জীবন বিষাক্ত করে তুলতে চাইনে। আমার কথা শোন গায়ত্রী! হিমানীকে যেতে দাও। তোমার স্বামী দুর্ব্বলচিত্ত, তা ত তুমি জান; হিমানীকে নিয়ে মনে তোমার কালি পড়েছে,—তবে কেন ওকে আট্‌কে রেখে নিজের জীবন অশান্তিপূর্ণ ক'রছো?"

গায়ত্রী বুঝিল, সুধীশ সঙ্কল্প স্থির করিয়াছে। সে সুধীশের পায়ের উপর লুটাইয়া-পড়িয়া অনুতাপভরা কাতর কণ্ঠে কহিল, "আমার মাথায় ভূত চেপেছিল। পথের ধূলো থেকে আমায় কুড়িয়ে তুলে এনে তোমার বুকে ঠাঁই দিয়েছ; আমার দোষ যদি তুমি ক্ষমা না করো, তবে আমি কোথায় দাঁড়াব? আমার আর আশ্রয় কোথায়? আমি যা বলেছি, তার জন্যে আমি লক্ষবার তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।"

সুধীশ তাহাকে পায়ের উপর হইতে টানিয়া-তুলিয়া সস্নেহে তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "এতে ক্ষমা চাইবার কিছুই নেই গায়ত্রী! তোমার মনে যদি সন্দেহ হয়ে থাকে, তাহ'লে তা প্রকাশ করে বলবার সম্পূর্ণ অধিকার তোমার আছে। তুমি রাগ-অভিমান আমার ওপর করবে না ত কার ওপর করবে? কিন্তু হিমানীকে যেতে দিলেই ভাল করতে। নিজেও সে আর এখানে থাকতে রাজী নয়, তা ত শুন্‌লে।"

গায়ত্রী কাতর ভাবে বলিল, "আমি বৌদির কাছে মাপ চাইব, সে কখন আমার ওপর রাগ ক'রে থাক্‌তে পারবে না!"

দু'জনেই একটুখানি মৌন থাকিবার পর সুধীশ বলিল, "যাও, আর দেরী কোর না, হিমানীকে সঙ্গে নিয়ে খেতে যাও। আর কোন দিনও যেন এমন করে রাগারাগি করে উপোস পেড়ো না; এ অবস্থায় মোটেই উপোস করতে নেই; মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখতে হয়। রাগ-হিংসাকে আদৌ মনে স্থান দিতে নেই। নিজের ভবিষ্যতের অশান্তির কারণ করে রেখ না।"

কৃতকর্ম্মের অনুশোচনায় ব্যাকুলা গায়ত্রী নতমুখে নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল।

সুধীশ বুঝিতে পারিল, শান্তপ্রকৃতি গায়ত্রী আজ অকস্মাৎ একটা বিপর্য্যয় ঘটাইয়া ফেলিয়া অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হইতেছে। সুধীশের সহিত চোখ তুলিয়া কথা কহিবারও সাহস আজ তাহার নাই! মমতায় সুধীশের কোমল চিত্ত আর্দ্র হইয়া গেল; সে গায়ত্রীর শিশিরসিক্ত স্থলকমলের মত অশ্রু-প্লাবিত মুখখানি বুকের উপর লইয়া স্নেহ-কোমল স্বরে কহিল, "হাঙ্গামাটা মিটে গেল ত রাণু! আর আমার ওপর রাগ নেই ত ...যদি হিমানীকে আমি ভালবাসি বলেই মনে করো, তবু তোমার চেয়ে তাকে যে বেশি ভালবাসি না, এটা ত বিশ্বাস করো?"

গায়ত্রী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না। তুমি বৌদিকে স্নেহ করো, তার প্রতি তোমার সহানুভূতি আছে; কিন্তু তাকে তুমি ভালবাসতে পার না। তোমার ভালবাসার শেষ-কণাটুকু পর্য্যন্ত আমার প্রাপ্য, তা আমি পেয়েছি; কিন্তু তা থেকে এক তিল আমি কারুকে দিতে পারি না, কখন পারব না।"

সুধীশ তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল; তাহার মুখ হাস্যোৎফুল্ল। [ক্রমশঃ।

শ্রীমতী মায়াদেবী বসু।

নন্দপুর-চন্দ্র

বন্দি নন্দপুরচন্দ্র, এক দিন এ হৃদয়-
কুটীরে আমার
জীর্ণচ্ছদ-রন্ধ্রপথে পশেছিল রশ্মিরেখা
তব চন্দ্রিকার।
আঁকি দিয়া আলিম্পন করেছিল স্বর্ণোজ্জ্বল
দীর্ণ গৃহতল,
ক্ষণেকের পরসাদ, অযাচিত আশীর্ব্বাদ,
আজিও সম্বল।
প্রথম যৌবনে কবে গাহিনু তোমার গীতি
ক্ষীণকণ্ঠে মম,
শিবচতুর্দ্দশী রাত্রে কিরাতের বিল্বপত্র-
বর্ষণের সম।
অন্তরে ছিল না ভক্তি, ছিল না রচনা-শক্তি,
অকপট মন,
ছন্দোবদ্ধ অনুপ্রাসে করেছিনু পরিতৃপ্ত
সুলভে শ্রবণ।
অখ্যাত অক্ষমে তবু অনেকেই আজো প্রভু
তাই দিয়ে চিনে,
লজ্জা পাই, তবু তাই দেয়নি হারাতে মোরে
জনতা-বিপিনে,
তার পর হ'তে আমি কত গাথা লিখিয়াছি,
গাহিয়াছি গান,
অকপট হৃদয়ের আকৃতিরে বাণীরূপ
করিয়াছি দান,
কত স্বপ্ন, কত সত্য, কত চিন্তা, কত তথ্য,
কত অনুভবে
কত না বিচিত্র ছন্দে দিয়াছি বাঙ্ময় রূপ,
শুনায়েছি সবে।
কোথায় হারায়ে গেছে, যাহারা শুনেছে তারা
পায়নিক রস,
অযত্নে ফুটন্ত গীতি যৌবনের বনে আজো
ছড়ায় সুযশ।
ভাষা তার নয় মোর, ভাব তার ধার-করা
বৈষ্ণব কবির,
পেয়েছি গুরুর কাছে ছন্দ তার, রস তার
নয়ক গভীর,
তবু তাহা তুচ্ছ নয়, করেছে সে অনেকেরই
মানস রঞ্জন,
সে শুধু তোমারি গুণে, আমার কৃতিত্ব নাই,
হে নন্দনন্দন।
আজি তাই মনে হয় চরণ পরশ তব
নাই যেই ফুলে,
যত গন্ধ শোভা থাক ব্যর্থ তা জীবনকুঞ্জে
এ যমুনা-কূলে।
যাহারা তোমার গীতি ছাড়া কিছু গায়নিক,
শ্যাম-সুধাকর,
তোমার অমৃত দিয়া তাঁদেরে এ-মরবিশ্বে
করেছ অমর।
অমরত্বে স্পর্দ্ধা নাই, তাঁদের চরণ-ধূলি
আমার বৈভব।
এক দিনও তব গীতি গাহিয়াছি লালাচ্ছলে,
ইহাই গৌরব।

শ্রীকালিদাস রায়।

বৈষ্ণবমত-বিবেক

অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদ

অপ্রাকৃত তত্ত্বমাত্রই মানবের প্রাকৃত বুদ্ধির দ্বারা চিন্তনীয় নহে। অসীম, অনন্ত ও অপ্রাকৃত তত্ত্বের অনুভূতি প্রাকৃত, সসীম ও সান্ত মনোবুদ্ধির দ্বারা কিছুতেই সম্ভবপর নহে; এই জন্যই শ্রীধরস্বামী বিষ্ণুপুরাণের (৬, ৩, ২,) "শক্তয়: সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ"। শ্লোকের অচিন্ত্য শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"অচিন্ত্যং তর্কাসহং" অর্থাৎ যাহা তর্কযুক্তি সহ্য করিতে পারে না; অথবা "অচিন্ত্যা ভিন্নাভিন্নত্বাদিবিকল্পৈশ্চিন্তয়িতুমশক্যাঃ" অর্থাৎ অচিন্ত্য যাহা ভিন্ন বা অভিন্নত্ব বিচারের দ্বারা কেহ চিন্তা করিতে সমর্থ নহে। শ্রীজীব গোস্বামী ঐ কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—'দুর্ঘটঘটকত্বং হ্যচিন্ত্যম্'—অর্থাৎ চিন্তার দ্বারা যাহার ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, তেমন ঘটনা ঘটিলেই তাহাকে অচিন্ত্য বলা যাইতে পারে।

দার্শনিক চূড়ামণি আচার্য্য শঙ্করও এই জন্য বরাহপুরাণের প্রমাণ গ্রহণ করিয়া স্বীকার করিয়াছেন, (মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বে এই শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়)।

> "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
> প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥"

অর্থাৎ "যে সকল ভাব অচিন্তনীয়, তর্কের দ্বারা তাহাদের যোজনা করিবে না; যাহা প্রকৃতির অতীত, তাহাই অচিন্ত্যের লক্ষণ বলিয়া জানিবে।" ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের মূল-প্রবর্ত্তক শ্রুতিও (বৃহঃ ৫,১,১, মুক্তিঃ ১) এই জন্য বলিয়াছেন,—

> পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
> পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

অর্থাৎ "ইন্দ্রিয়ের অগোচর তত্ত্বও পূর্ণ বিশ্বাদি ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষগোচর তত্ত্বও পূর্ণ, পূর্ণ হইতেই পূর্ণ প্রকাশ পাইতেছে, এবং পূর্ণ হইতে পূর্ণ গ্রহণ করিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে।

শক্তিবাদ

আর্যদর্শন সমূহ ঈশ্বরশক্তি বা প্রকৃতি, জগৎ ও জীব লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধনিরূপণে ঐকান্তিক ভেদও স্বীকার করা যায় না, আবার ঐকান্তিক অভেদও স্বীকার করা যায় না—অথচ প্রতীয়মান ভেদ ও অভেদের মূলে যে তত্ত্ব, তাহা অচিন্ত্য অর্থাৎ প্রাকৃত মনোবুদ্ধির গোচর নহে। এই জন্যই সমস্ত স্মৃতির সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইলে এই অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদ ব্যতীত কিছুতেই তাহার সমন্বয়-বিধান হইতে পারে না এবং এই অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব স্বীকার করিলে লক্ষণার দ্বারা বা কষ্ট-কল্পনার দ্বারা শ্রুতির ব্যাখ্যা করিয়া 'অবাঙ্‌মনসগোচর' তত্ত্বকে প্রাকৃত বুদ্ধির বা তর্কের ক্ষেত্রে আনিয়া ফেলিয়া তাহাকে বাদ-বিবাদের বিষয়ীভূত করিবার কোনও প্রয়োজন হয় না। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব দার্শনিক শ্রীজীবই সর্ব্বপ্রথমে তাহাকে তাঁহার "সর্ব্বসংবাদিনী" গ্রন্থে এই 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' নামকরণ করিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শনের অভিপ্রায়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি তাঁহার 'পরমাত্মসন্দর্ভের' অনুব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—

"অতো ভেদাভেদবাদো বিশিষ্টবস্ত্বপেক্ষয়ৈব প্রবর্ত্ততাম্। অভেদবাদস্তু বিশেষানুসন্ধানরাহিত্যেনৈবেতি। অপরে তু 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' (ব্রঃ সূঃ ২,১,১১) ভেদেঽপ্যভেদেঽপি নির্ম্মর্যাদদোষসন্ততি দর্শনেন ভিন্নতয়া চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদং সাধয়ন্তঃ তদ্বদভিন্নতয়াপি চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ভেদমপি সাধয়ন্তোঽচিন্ত্যভেদাভেদবাদং স্বী-কুর্ব্বন্তি। তত্রাপ্যয়ঃ পৌরাণিকশৈবানাং মতে ভেদাভেদৌ ভাস্করমতে চ। মায়াবাদিনাং তত্র ভেদাংশো ব্যাবহারিক এব প্রাতীতিকো বা। গৌতম-কণাদ-জৈমিনি-কপিল-পতঞ্জলি মতে তু ভেদ এব। শ্রীরামানুজমধ্বাচার্য্যমতে চেত্যপি সার্ব্বত্রিকী-প্রসিদ্ধিঃ। স্বমতে ত্বচিন্ত্যভেদাভেদেব অচিন্ত্যশক্তিময়ত্বাদিতি।"

—সর্ব্বসংবাদিনী, ১৪৯ পৃঃ, সাহিত্যপরিষদ্ সংস্করণ।

অনুবাদ—"অতএব বিশিষ্ট বস্তু অঙ্গীকারে ভেদাভেদবাদ এবং বিশেষ পদার্থের অনুসন্ধান-রাহিত্য বশতঃ অভেদবাদ প্রবর্ত্তিত হউক। অপর এক সম্প্রদায়ের বেদান্তীরা বলেন, তর্কের অপ্রতিষ্ঠা হেতু (ব্রহ্মসূত্র ২,১,১১) ভেদে এবং অভেদেও নিখিল দোষসমূহ দর্শনে ভিন্নতারূপ চিন্তা করা অসম্ভব। এই জন্য যেমন ভেদ সাধন করা দুষ্কর, তেমনি অভিন্ন ভাবে চিন্তা করিয়া অভেদ সাধন করাও দুষ্কর। এইরূপে ভেদাভেদ উভয়ই সাধন করিতে গিয়া ইহারা ভেদাভেদ সাধনে চিন্তার অসমর্থতা উপলব্ধিতে অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদ স্বীকার করেন। পৌরাণিক ও শৈবগণের মতে ভেদাভেদবাদ; মায়াবাদিগণের মতে ভেদাংশ ব্যাবহারিক বা প্রাতীতিকমাত্র। গৌতম, কণাদ, জৈমিনি, কপিল ও পতঞ্জলির মতে ভেদাভেদবাদ শ্রীরামানুজ মতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও শ্রীমধ্বাচার্য্যমতে ভেদাভেদবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। পরমতত্ত্ব অচিন্ত্যশক্তিময় বলিয়া স্বীয় মতে অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।"—শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণকৃত অনুবাদ। ঐ ৩৪১ পৃঃ।

ফলতঃ, শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে গেলেই শ্রীভগবানকে সর্ব্বশক্তির আধার বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে ভারতীয় সকল দর্শনেই—কেহ বা স্পষ্টভাবে, কেহ বা অস্পষ্টভাবে এই শক্তিবাদ স্বীকার করিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি এই জন্যই বলিয়াছেন—'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে' (শ্বেতাশ্বতর ৬-৮), অর্থাৎ এই পরমপুরুষের বিবিধা শক্তির কথা শ্রুতিতে বলা হইয়াছে। 'শ্বেতাশ্বতর' (১-৩) আরও বলিয়াছেন—

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ।
শ্বেতাশ্বতর (৪-৫) অন্যত্র এই শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, যথা—
অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ।

ইহাতে শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—এই শক্তি বা প্রকৃতি অজা অর্থাৎ উৎপাদনবিনাশরহিতা, সুতরাং নিত্যা। তিনি একা অর্থাৎ সজাতীয় দ্বিতীয়রহিতা। ইনি লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণা অর্থাৎ রজঃসত্ত্বতমোগুণ-স্বরূপা। লোহিত শব্দটি রজোগুণের প্রকাশক, শুক্ল শব্দটি সত্ত্বগুণের এবং কৃষ্ণ শব্দটি তমোগুণের ব্যঞ্জক। ইনি মহত্তত্ত্ব হইতে স্থূল পর্য্যন্ত বহু প্রকার বৈচিত্র্যময় এই জগতের সৃষ্টিকারিণী।

অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদ বুঝিতে হইলে শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধই যে অচিন্ত্যভেদাভেদের মূল ভিত্তি, ইহা সর্ব্বপ্রথমে বুঝিতে হয়। এই জন্যই আমরা শক্তি সম্বন্ধে আলোচনাই সর্ব্বাগ্রে সমীচীন মনে করি। বেদের বহু স্থলে কোথাও স্পষ্টভাবে, কোথাও বা অস্পষ্ট-ভাবে এই শক্তিবাদের অনেক প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে; কেবল শ্বেতাশ্বতরে নহে, ঋগ্বেদসংহিতাতেও দেখা যায়,—

'স্তোমেন হি দিবি দেবাসো অগ্নিমজীজনন্ শক্তিভী রোদসি প্রাম্।
তমু অকৃণ্বন্ত্রেধা ভুবে কং স ওষধীঃ পচতি বিশ্বরূপাঃ।' শাকপূণি।

ইহার ভাষ্য করিয়াছেন—'স্তোমেন হি যং দিবি দেবা অগ্নিমজীজনন্ শক্তিভিঃ কর্ম্মভির্দ্যাবাপৃথিব্যোঃ পূরণং তমকুর্বন্ ত্রেধা ভাবায় পৃথিব্যামন্তরীক্ষে দিবি।'—ঋ ১০. ৮৮, ১০।

অর্থাৎ দেবতাগণ স্তুতি ও কর্ম্মদ্বারা ত্রিভুবনব্যাপক অগ্নিকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। এই কর্ম্ম শব্দের অর্থ অত্যন্ত গভীর। সমগ্র জগৎ ও জগদতীত ক্রিয়ামূলক শক্তি এই কর্ম্মশব্দের অন্তর্ভুক্ত। আমরা ঋগ্বেদ-সংহিতার এই স্থলে শক্তি শব্দের স্পষ্ট প্রয়োগ দেখিতে পাইলাম। অন্য কতকগুলি মন্ত্রে শক্তি শব্দের প্রয়োগ না করিয়াও শক্তিতত্ত্বের পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। যথা—

'অগ্নে যত্তে দিবি বর্চ্চঃ পৃথিব্যাং যদোষধীষপ্স্বা যজত্র।
যেনান্তরিক্ষমুর্ব্বাততন্থ ত্বেষঃ স ভানুরর্ণবো নৃচক্ষাঃ।'—৩, ২২, ২।

"হে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর! অগ্নি তোমারই জ্যোতি অর্থাৎ তোমারই শক্তি, পৃথিবীতে দাহ-পাকাদি ক্রিয়া নিষ্পাদকরূপে যে তেজ বিদ্যমান, তাহা তোমারই তেজ, ওষধি সমূহে যে সোমাখ্যতেজ, জলে 'ঊর্ব' নামে যে তেজ, তাহাও তোমারই তেজ, বায়ুরূপে তেজোদ্বারা তুমিই অনন্ত আকাশ ব্যাপিয়া রহিয়াছ।"

ইহাতে অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, জল ইত্যাদি বিবিধরূপে যে পরমেশ্বরের শক্তিই প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বলা হইয়াছে। 'অগ্নিশ্রিয়ো-মরুতো বিশ্বকৃষ্টয়ঃ' ঋ ৩, ৪৬, ১৫; অর্থাৎ মরুতেই বৈদ্যুতাগ্নির আশ্রয় এবং এই মরুৎই বিশ্বের আকর্ষণীয় শক্তি। পুনশ্চ 'অপ্‌স্বগ্নে সাধিষ্টব মৌষধীরনু রুধ্যসে। গর্ভে সঞ্জায়সে পুনঃ' ঋ ৮ ৪৩, ৯; অর্থাৎ হে অগ্নে! তুমি জলে প্রবেশ কর, সেই তুমি ওষধি সকলের উৎপাদন পূর্ব্বক উহাদের গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া থাক, সেই তুমিই আবার উহাদের অপত্যরূপে প্রাদুর্ভূত হও।

চারি বেদ হইতে শক্তিবাদের প্রমাণ সংগ্রহ করিলে একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া পড়ে! চারি বেদই শক্তিবাদের সমর্থক, আমরা তাহার দিগ্‌দর্শন মাত্র করিয়া ক্ষান্ত রহিলাম।

এই শক্তিবাদ এবং শক্তির সহিত শক্তিমানের অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। শক্তিবাদকে পুরাণাদিতে যে ভাবে সুবিস্তৃত করিয়া, উপাসনা-তত্ত্বকে সরল ও সহজ করা হইয়াছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন তাহাকেও অতি সূক্ষ্ম বিচারের দ্বারা সুপ্রণালীবদ্ধ করিয়া যে তত্ত্বানুসন্ধিৎসার ও সম্যগ্‌দর্শনের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়; আমাদের সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে শক্তিবাদ যে সমস্ত আর্যদর্শনে স্বীকৃত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি।

অন্যান্য দর্শনে শক্তিবাদ

প্রাভাকরগণের মতে যে অষ্টবিধ পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে, শক্তিও তাহার একতম। এই অষ্টবিধ পদার্থ যথা—দ্রব্য গুণ, কর্ম্ম সামান্য, সমবায়, শক্তি, নিয়োগ ও সংখ্যা। নব্য প্রাভাকরগণও যে অষ্টবিধ পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন—শক্তি তাহার অন্যতম। সুতরাং মীমাংসাদর্শনে শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে।

নব্য নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ শক্তিকে ভিন্ন পদার্থ বলিয়া স্বীকার না করিলেও নব্য নৈয়ায়িকগণের মধ্যে 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি'কার শ্রীমদ্ উদয়নাচার্য্য কারণত্বকেই শক্তি বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি বা শক্তি তো সর্ব্বজনবিদিত। অতএব যোগদর্শনেও শক্তিবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। আধুনিক বেদান্তপদবাচ্য 'যোগবাশিষ্ঠে'ও শক্তিবাদ স্বীকৃত হইয়াছে।

নির্ব্বিশেষ বেদান্তমত শ্রীমদাচার্য্য শঙ্কর কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইবার পূর্ব্বে যাদব, টঙ্ক বৌধায়নও শাস্ত্রযুক্তির দ্বারা ভগবৎশক্তির প্রামাণিকতা দেখাইয়া গিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামী দেখাইয়াছেন যে, অন্যের কথা দূরে থাকুক, শ্রীমদাচার্য্য শঙ্করও তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে সুস্পষ্টরূপে শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। শ্রী শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম পাদের অষ্টাদশ সূত্রে অসৎকার্য্যবাদ খণ্ডন ও সৎকার্য্যবাদ স্থাপনের জন্য বলিয়াছেন,—

"শক্তিশ্চ কারণকার্য্যনিয়মার্থা কল্প্যমানা অন্যাসতী কার্য্যং নিয়চ্ছেৎ অসত্ত্বাবিশেষাৎ অন্যত্বাবিশেষাচ্চ, তস্মাৎ কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্য্যম্।"

—সর্ব্বসংবাদিনী, পৃঃ ৩০।

অর্থাৎ "শক্তিকারণের কার্য্য নিয়মনের জন্য প্রকল্পিত। শক্তি কার্য্য-কারণ হইতে ভিন্ন হইলে, অথবা কার্য্যের ন্যায় সত্তারহিতা হইলে উহার দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। কেন না, তাহা হইলে শক্তি ও কার্য্যেরই মত সত্তার হত ও কার্য্য হইতে অনন্য হয়। এই নিমিত্ত সিদ্ধান্ত এই যে, শক্তি কারণস্বরূপা এবং কার্য্যও শক্তিস্বরূপা।" বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অনুবাদ। শ্রীমদাচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের (১।১।৫) ভাষ্যের অন্যত্রও "অসত্যপি কর্ম্মণি 'সবিতা-প্রকাশতে' ইতি কর্ত্তৃত্ব ব্যপদেশ দর্শনাদেবাসত্যপি জ্ঞানকর্ম্মণি ব্রহ্মণঃ—'তদৈক্ষত'—ইতি কর্ত্তৃত্ব ব্যপদেশোপপত্তের্ণ দৃষ্টান্ত-বৈষম্যম্ ইতি"

অনুবাদ—"সূর্য্য প্রকাশ পাইতেছেন, এইরূপ দৃষ্টান্তে সূর্য্যের যেমন কর্ত্তৃত্ব ভাব দৃষ্ট হয়, "তদৈক্ষত' (তিনি দর্শন করিয়াছিলেন,) ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মের জ্ঞান-ক্রিয়া বুঝাইলেও তাহার কর্ত্তৃত্ব ভাব উপলব্ধ হয়। ইহাতে দৃষ্টান্ত-বৈষম্যের আশঙ্কা নাই।"

ব্রহ্ম সূঃ ১।১।৫॰। অনুবাদ। শ্রীমদাচার্য্য শঙ্কর "বিষ্ণুসহস্র নামের" ভাষ্যেও অচ্যুত শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"স্বরূপ সামর্থ্যেন ন চ্যুতো ন চ্যবতে ন চ্যবিষ্যতে, ইত্যচ্যুতঃ 'শাশ্বতং শিবমচ্যুতমিতি শ্রুতেরিতি"। অর্থাৎ "স্বরূপ সামর্থ্যে তিনি কখনও চ্যুত হন নাই ও এখনও চ্যুত নহেন বা ভবিষ্যতেও হইবেন না, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম অচ্যুত বলা হইয়াছে।" এই সামর্থ্য কি শক্তি নহে?

শক্তি ও শক্তিমানের অচিন্ত্যভেদাভেদ

শ্রীজীব শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদ অচিন্ত্য, এই সিদ্ধান্ত করিয়া বলিতেছেন—"স্বরূপাদভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ভেদঃ ভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদশ্চ প্রতীয়ত ইতি শক্তিশক্তিমতোর্ভেদাভেদাবেবাঙ্গীকৃতৌ তৌ চ অচিন্ত্যৌ ইতি" সর্ব্বসংবাদিনী ৩৭ পৃঃ।

অনুবাদ—"এই হেতু স্বরূপ হইতে অভিন্নরূপে চিন্তা করা যায় না বলিয়া উহার ভেদ প্রতীত হয়, আবার ভিন্নরূপেও চিন্তা করা যায় না বলিয়া অভেদ প্রতীত হয়। ফলতঃ, শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদ অচিন্ত্য।"

—বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অনুবাদ ২২৯ পৃঃ।

অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদে ব্রহ্মতত্ত্ব বা ভগবত্তত্ত্ব

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবানের ও তাঁহার শক্তির অবিচিন্ত্য ভেদাভেদ স্বীকার করিয়া শ্রীভগবানে নানাবিধ স্বরূপ শক্তির লীলা-বিলাস স্বীকার করিয়াছেন। যে স্থানে নিখিল শক্তি অপ্রকাশিত (শ্রীজীবের ভাষায় অবিবিক্ত), সেই তত্ত্বই ব্রহ্ম। উপনিষদে বা বেদে যে ব্রহ্মশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা নিখিল শক্তিমান্ তত্ত্ব। বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে সেই পরতত্ত্বকেই 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' অর্থাৎ এই বিশ্বের জন্ম, স্থিতি লয়ের কারণাত্মক বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার ব্রহ্মসূত্র রচনা করিলেন।* কিন্তু পরবর্ত্তীকালে নির্ব্বিশেষবাদীরা এই ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক করিয়া ব্যাখ্যা করায় শ্রীজীব গোস্বামীর 'ব্রহ্ম' শব্দের নূতন পরিভাষার প্রয়োজন হইল। এ স্থলে একটি বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে; শ্রীশঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মে যে দ্বিরূপতা কল্পনা করিলেন, শ্রীরামানুজাদি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তাহা অস্বীকার করিলেন। তাঁহারা নানাবিধ যুক্তিতর্ক ও শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত প্রমাণের দ্বারা ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব নিরাকারত্ব খণ্ডন করিলেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই নির্বিশেষ ব্রহ্মকে একান্ত ভাবে অস্বীকার করিলেন না—ইহা পরতত্ত্বের একটি নিঃশক্তিক সামান্য (homogenous) অবস্থা-বিশেষ বলিয়া তাঁহারা মানিয়া লইলেন। শ্রীজীব 'ক্রমসন্দর্ভে' এই ব্রহ্মের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা এই 'শক্তিবর্গলক্ষণতদ্ধর্ম্মাতিরিক্তং কেবলং জ্ঞানং ব্রহ্মেতি শব্দ্যতে' অর্থাৎ যে স্থলে শক্তিবর্গের লক্ষণের ও ধর্ম্মের অতিরিক্ত কেবল জ্ঞান মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাকে ব্রহ্ম-সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের প্রতিপাদিত এই নিরাকার ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' (মধ্য ২০) বলা হইয়াছে—"ব্রহ্ম অঙ্গকান্তি তাঁর নির্বিশেষ প্রকাশে। সূর্য্য যেন চর্ম্ম-চক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে।"

কিন্তু মূলতঃ ব্রহ্ম ও ভগবান্ এই শব্দ দুইটি স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহে। শ্রীজীব 'ভগবৎসন্দর্ভে' বলিয়াছেন—"তদেতং ব্রহ্মস্বরূপং ভগবচ্ছব্দেন বাচ্যং নতু লক্ষ্যম্। তদেব নির্দ্ধারয়তি, ভগবচ্ছব্দোঽয়ং তস্য নদীবিশেষস্য গঙ্গা শব্দবাচক এব নতু তটশব্দবল্লক্ষকঃ।" —ভগবৎসন্দর্ভ, ৩।

অর্থাৎ ভগবৎ শব্দের দ্বারা ব্রহ্ম-স্বরূপেরই প্রকাশ করা হয়; অর্থাৎ, ভগবচ্ছব্দের অভিধা বৃত্তির দ্বারা ব্রহ্মকেই বুঝায়, লক্ষণার দ্বারা ব্রহ্মকে বুঝায় না। দৃষ্টান্ত, যথা—গঙ্গায় ঘোষ বাস করে, এ কথা বলিলে গঙ্গার মধ্যে ঘোষের বাস করা অসম্ভব; এই জন্য গঙ্গা শব্দে গঙ্গা নদীকে না বুঝাইয়া তাহার তটদেশকে বুঝাইলেও এ স্থলে সেরূপ নহে; এখানে ভগবৎ শব্দের দ্বারাও ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে। তবে ব্রহ্মকে ভগবত্তত্ত্বের অসম্যক্ আবির্ভাব বলা হইয়াছে কেন? জ্ঞানাদিমার্গে সাধনকারীর নিকট নিঃশক্তিক নির্ব্বিশেষ ভাব মাত্র প্রকাশ হইয়া থাকে, কারণ, সেরূপ অধিকারী সাধনার দ্বারা পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তিমত্ত্বের উপলব্ধির যোগ্যতা লাভ করেন নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঔপনিষদ ব্রহ্মে এ সমস্ত গোলমালের কোন কারণ ছিল না, শ্রীমৎ শঙ্করের শারীরক ভাষ্যই গোলমালের উৎপত্তির কারণ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে এইরূপ ব্রহ্ম ও ভগবান্ ব্যতীত 'অন্তর্যামিত্বময় মায়াশক্তি প্রচুর-চিচ্ছক্ত্যংশ বিশিষ্টঃ' পরমাত্মতত্ত্ব নামে আর একটি তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, যাঁহারা যোগী, তাঁহাদের নিকট এই অন্তর্য্যামিরূপী তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে, কারণ, তাঁহারা যোগ-সাধনার দ্বারা এই তত্ত্বেরই উপাসনা করিয়া থাকেন।

সর্ব্বশক্তিময় পরিপূর্ণ পরম বিশেষ পরতত্ত্ব ভগবান্ই সাধনা-বিশেষে সাধকের নিকট এইরূপে প্রকাশিত হন। সুতরাং ব্রহ্মতত্ত্ব ও পরমাত্মতত্ত্ব এইরূপ একটি দিকের আংশিক প্রকাশ মাত্র। ভগবত্তত্ত্বই পরিপূর্ণতম প্রকাশ। ইহাকে সগুণও বলা যায় না, যদিও ইহা সবিশেষের বা সগুণের মত প্রতিভাত হয়। আর ইহাকে নির্বিশেষ বা নির্গুণও বলা যায় না—যদিও নির্ব্বিশেষ ও নির্গুণত্বরূপে ইহা তত্ভাবাপন্ন উপাসকগণের নিকট প্রতিভাত হয়। সূক্ষ্মরূপে শ্রীজীব-প্রমুখ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের হৃদয়ের ভাব বুঝিয়া বলিতে হইলে ইহাকে সগুণের ও নির্গুণের অতিগ এক অচিন্ত্য পরম বিশেষ তত্ত্বরূপে অভিহিত করিতে হয়। এই অচিন্ত্য প্রাকৃত অপ্রাকৃত বৈভবশালী সর্ব্বপ্রকার বিরোধী শক্তির একমাত্র আশ্রয় পরতত্ত্বই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীভগবত্তত্ত্ব-কথনপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, ভগবান্ সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির সমাশ্রয়, যথা,—

"যস্মিন্ বিরুদ্ধ গতয়ো হ্যনিশং পতন্তি বিদ্যাদয়ো বিবিধশক্তয় আনুপূর্ব্ব্যা। তদ্ ব্রহ্ম বিশ্বভবমেকমনন্তমাদ্যমানন্দমাত্র বিকারমহং প্রপদ্যে।" (ভাঃ ৪, ৯, ১৬)। অর্থাৎ—"স্ব স্ব বর্গে আনুপূর্ব্বিক পর্য্যায়ক্রমে উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভাবে বিরুদ্ধগতি বিদ্যাদি শক্তিসকল যে ভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়া নিজ নিজ কার্য্য করিতেছে, আমি সেই বিশ্বস্রষ্টা এক অনন্ত, আদ্য, আনন্দমাত্র নির্ব্বিকারস্বরূপ ব্রহ্মের শরণাপন্ন হইলাম।"

পুনশ্চ—

সর্গাদি যোঽস্যানুরুণদ্ধি
শক্তিভির্দ্রব্যক্রিয়াকারকচেতনাত্মভিঃ।

---

* এই উপনিষদ্ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীচরিতামৃতে বলা হইয়াছে "ব্রহ্ম শব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্। চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধসমান। চৈঃ চঃ, আদি, ৭ম পঃ।

তস্মৈ সমুন্নত বিরুদ্ধশক্তয়ে
নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় বেধসে ।—(ভাঃ, ৪।১৭।১৮)

অর্থাৎ—

"যে ভগবান্ স্বীয় দ্রব্যক্রিয়াদিকারক চেতনা-শক্তি দ্বারা এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতিলয়াদি বিধান করিতেছেন, সেই সমুন্নত বিরুদ্ধ শক্তিশালী নিগ্রহানুগ্রহের বিধাতা পরমপুরুষকে প্রণাম করি।"

এই সমস্ত বিচার করিয়াই তত্ত্বদর্শী সুপণ্ডিত শ্রীজীব বলিতেছেন, —"তে চ স্বরূপশক্তি মায়াশক্ত্যী পরস্পরবিরুদ্ধে তথা তয়োর্বৃত্তয়ঃ স্বস্বগণ এব পরস্পরবিরুদ্ধা অপি বহ্ব্যঃ, তথাপি তাসামেকং নিধানং তদেবেত্যাহ— "যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ
বিবাদসংবাদ ভুবো ভবন্তি।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং
তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে।"— ভাঃ, ৬।৪।২৬

'স্পষ্টম্—' ভগবৎসন্দর্ভ, ১২।

অর্থাৎ—"স্বরূপশক্তি ও মায়াশক্তি যেরূপ পরস্পরবিরুদ্ধা, সেইরূপ উঁহাদের বৃত্তিসকলও পরস্পরবিরুদ্ধা হইয়াও তাহাদিগের নিজ নিজ গণে বহু; কিন্তু তথাপি একমাত্র সর্ব্বশক্তির আধার ভগবানেই তাহারা পর্য্যবসিত। যথা, শ্রীভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের ষড়্‌বিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে ভগবানের মায়া ও বিদ্যাদি নিখিল শক্তি পরস্পর বিবাদকারী—ষোড়শ পদার্থবাদী নৈয়ায়িকগণের, অনীদৃগ্‌বাদী মীমাংসকগণের, সপ্তপদার্থবাদী বৈশেষিকগণের, শূন্যবাদী বৌদ্ধগণের ও স্বভাববাদী নাস্তিক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মত ও পন্থাবলম্বীদিগের বিবাদের ও কখনও কখনও সম্পদের বা ঐকমত্যের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে এবং যে শক্তিসকল বিবাদকারিগণের মুহুর্মুহু আত্মবিস্মৃতি উৎপাদন করিয়া থাকে, সেই অনন্তগুণের আধারভূত পুরুষ ভগবান্‌কে প্রণাম করি।"

—ভগবৎসন্দর্ভ, ১২।

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরমপুরুষ ভগবানে সর্ব্বশক্তির প্রবৃত্তি ও উপরতি অচিন্ত্যভাবেই হইয়া থাকে। শক্তির ভেদ না থাকিলে জ্ঞানের প্রবৃত্তি হয় না, এবং অভেদ না থাকিলে ভগবানে সর্ব্বার্থের সম্যক্ উপরতি হয় না। এই জন্য শক্তির সহিত যুগপৎ ভেদাভেদ স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু সেই ভেদাভেদ অপ্রাকৃত, অতএব প্রাকৃত মনোবুদ্ধির দুরধিগম্য ও অচিন্তনীয়। সেই জন্যই শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামী হইতে আরম্ভ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শক্তি ও শক্তিমানের এই সম্বন্ধেই যে সর্ব্বশ্রুতির সামঞ্জস্য ও সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষবাদের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য সাধিত হয়, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীজীবের আচার্য্য শ্রীরূপও তাঁহার, লঘুভাগবতামৃতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপকে পরিপূর্ণতমস্বরূপ এবং ব্রহ্মাদি তত্ত্বকে তাঁহার অন্তর্ভুক্ত বলিয়াছেন। যথা—শ্রীলঘুভাগবতামৃতে শ্রীরূপ গোস্বামিপাদের কারিকায়—

"নমু শ্রৈষ্ঠং মুকুন্দস্য ব্রহ্মতো যুজ্যতে কথম্।
যদ্ ব্রহ্ম শ্রীভগবতোরৈক্যমেব প্রসিধ্যতে।"

অর্থাৎ—শাস্ত্রে যখন ব্রহ্ম ও ভগবানের অভেদই প্রসিদ্ধ, তখন কি প্রকারে ব্রহ্ম হইতে ভগবানের শ্রেষ্ঠতা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? এতদুত্তরে বলিতেছেন,—

"তত্তৎ শ্রীভগবত্যেব স্বরূপং ভূরি বিদ্যতে।
উপাসনানুসারেণ ভাতি তত্তদুপাসকে।
যথা রূপরসাদীনাং গুণানামাশ্রয়ঃ সদা।
ক্ষীরাদিরেক এবার্থো জায়তে বহুধেন্দ্রিয়ে।
দৃশা শুক্লো রসনয়া মধুরো ভগবাংস্তথা
উপাসনাভির্বহুধা স একোঽপি প্রতীয়তে।
জিহ্বয়ৈব যথা গ্রাহ্যং মাধুর্য্যং তস্য নাপরৈঃ।
যথা চ চক্ষুরাদীনি গৃহ্ণন্ত্যর্থং নিজং নিজং।
তথাঙ্গা বাহ্যকরণাস্থানীয়োপাসনাখিলা।
ভক্তিস্তু চেতঃস্থানীয়া তত্তৎ সর্ব্বার্থলাভতঃ।
ইতি প্রবরশাস্ত্রেষু তস্য ব্রহ্মস্বরূপতঃ।
মাধুর্য্যাদি গুণাধিক্যাৎ কৃষ্ণস্য শ্রেষ্ঠতোচ্যতে।

• • • • •

নমু প্রাকৃতরূপত্বান্ম গতৃ ক্ষোপমাজুষাম্।
গুণানাং গণনা ন স্যাদিতি কাত্র বিচিত্রতা।
দৈবং গুণানামেতস্য প্রাকৃতত্বং ন বিদ্যতে।
তেষাং স্বরূপভূতত্বাৎ সুখরূপত্বমেবহি।

• • • • •

অতঃ কৃষ্ণোঽপ্রাকৃতানাং গুণানাং নিযুতাযুতৈঃ।
বিশিষ্টোঽয়ং মহাশক্তিঃ পূর্ণানন্দঘনাকৃতিঃ। ২০৮।
ব্রহ্মনির্ধর্ম্মকং বস্তু নির্ব্বিশেষমমূর্ত্তিকম্।
ইতি সূর্য্যোপমস্যাস্য কথ্যতে তৎ প্রভোপমম্। ২০৯।

—শ্রীলঘুভাগবতামৃতং, পূর্ব্বখণ্ডম।

অর্থাৎ- "একই ভগবৎস্বরূপে ব্রহ্ম পরমাত্মাদি বহুস্বরূপ অন্তঃপাতিরূপে নিত্য বিদ্যমান থাকিলেও উপাসনার তারতম্যানুসারে (জ্ঞান, যোগ ও ভক্তিরূপ সাধনের পার্থক্যবশতঃ) সেই সেই উপাসকে তদুপযোগী স্বরূপের প্রকাশ হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত—যেমন রূপরসাদি বিবিধ গুণের আশ্রয়ীভূত এক দুগ্ধাদি দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়দ্বারা বহুবিধ আকারে প্রতীয়মান হয়, অর্থাৎ চক্ষু দ্বারা শুক্ল, জিহ্বা দ্বারা মধুর ইত্যাদি রূপে প্রতীত হয়, তদ্রূপ ভগবান্ এক হইয়াও উপাসকের উপাসনাভেদে বহু প্রকার প্রতীয়মান হন। তন্মধ্যে যেমন দুগ্ধাদির মাধুর্য্য একমাত্র জিহ্বা দ্বারাই পরিগৃহীত হয়, অন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা নহে, আর যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ রূপরসাদি গুণের মধ্যে কেবলমাত্র স্ব স্ব বিষয়ই গ্রহণ করিতে সমর্থ, কিন্তু চিত্ত সর্ব্বেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়ই গ্রহণ করিতে সমর্থ; তদ্রূপ অন্যান্য উপাসনাসমূহ (জ্ঞান ও যোগ প্রভৃতি) বাহ্যেন্দ্রিয়স্থানীয় (চক্ষু ও জিহ্বাদিস্থানীয়) অর্থাৎ উহারা কেবল নিজ নিজ উপযোগী প্রসিদ্ধ বিষয়ই গ্রহণ করিতে সমর্থ, অন্য কাহাকেও নহে। ভক্তি কিন্তু চিত্তস্থানীয় বলিয়া বিভিন্ন উপাসকের বিভিন্ন উপাসনার বিষয় সমস্তই লাভ করিতে সমর্থ। এই প্রকারে শ্রীমদ্ভাগবতাদি প্রধান প্রধান শাস্ত্রে ব্রহ্ম হইতে মাধুর্য্যাদি গুণের আধিক্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ (শ্রেষ্ঠত্ব) অভিহিত হইয়াছে।

অতএব সেই মহাশক্তি শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য প্রাকৃত গুণবিশিষ্ট ও পূর্ণানন্দঘন বিগ্রহ।" ২০৮।

"নির্গুণ নির্ব্বিশেষ এবং অমূর্ত্ত ব্রহ্ম সূর্য্যস্থানীয় শ্রীকৃষ্ণের প্রভাস্থানীয়রূপে উপমিত হইয়া থাকেন।" ২০৯—শ্রীগৌরসুন্দর ভাগবত-দর্শনাচার্য্যের অনুবাদ।

বস্তুতঃ 'ব্রহ্মতত্ত্বানুভাবিত শ্রীভগবৎস্বরূপের এই পরিচয় ভাগবতে ভগবদ্গীতা-প্রমুখ বহু গ্রন্থেই বিদ্যমান রহিয়াছে। ভক্তিপথানুসারী টীকাকার আচার্য্যগণ তাহা সুপ্রণালীবদ্ধ ও সুসংবদ্ধভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। ভগবত্তত্ত্বের এইরূপ মহিমা শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের পরমগুরু শ্রীযামুনাচার্য্যও তাঁহার স্তোত্ররত্নে বিশেষভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

যদণ্ডমণ্ডান্তরগোচরং চ যৎ
দশোত্তরাণ্যাবরণানি যানি চ।
গুণাঃ প্রধানং পুরুষঃ পরং পদং
পরাৎপরং ব্রহ্ম চ তে বিভূতয়ঃ ॥ ১৭।

অর্থাৎ—"ব্রহ্মাণ্ড, যাহা ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত, ব্রহ্মাণ্ডের যে দশোত্তর আবরণ, গুণসকল, প্রধান, পুরুষ, পরপদ এবং পরাৎপর যে ব্রহ্ম, ইহা তোমারই বিভূতি।

ফলতঃ প্রাচীন পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের ও ভাগবতসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের মূল অভিপ্রায় শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় পার্ষদ সবিশেষ প্রতিভাবান্ শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীজীবাদি গোস্বামিবৃন্দ এই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। অনন্তাচিন্ত্য-শক্তিমান্ ভগবান্ ও তাঁহার শক্তিমালার এই সম্বন্ধ বিচারে তাঁহারা আরও সূক্ষ্ম বিচারশক্তি ও দার্শনিক বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

তাঁহারা সমস্ত শ্রীভাগবতী শক্তিকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা, ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিপ্রাধান্যে চিৎশক্তি, তটস্থা শক্তি বা জীবশক্তি, বহিরঙ্গা শক্তি বা মায়াশক্তি। জীবশক্তি নামে ভগবৎ শক্তি ভগবানের অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তির মধ্যস্থ। জীবশক্তি যখন বহিরঙ্গা মায়াশক্তির অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন ঐ শক্তি সংসার প্রপঞ্চাদি দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে; আবার যখন ঐ শক্তি অন্তরঙ্গা চিৎশক্তির অধিকারের আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন ভগবৎশক্তির বৃত্তি দ্বারা অন্তর্ভাবিত হইয়া এই শক্তির লীলার দর্শনকারিণী ও পুষ্টিকারিণী হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিকে আবার ত্রিবিধ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা—সদংশে সন্ধিনী, চিদংশে সম্বিৎ এবং আনন্দাংশে হ্লাদিনী। যেহেতু, ব্রহ্মসূত্রে আনন্দকেই ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া অভিব্যক্ত করা হইয়াছে, এই জন্যই হ্লাদিনীরূপা শ্রীরাধিকাই আনন্দময় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যা শক্তি। শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে মাধুর্য্যেরই পরিপূর্ণতম প্রকাশ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই জন্যই শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়া থাকেন। প্রেমভক্তি অবলম্বনেই রসময় বিগ্রহ রসিক-শেখরের উপাসনার জন্য শ্রীরূপ-সনাতনপ্রমুখ রসতত্ত্ব-বিদ্গণ যে উপাসনাপদ্ধতির প্রচার করিয়াছিলেন, বৃহদ্ভাগবতামৃত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। দেবগুরু বৃহস্পতির প্রিয়শিষ্য শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম পার্ষদ উদ্ধব বৃন্দাবনে গোপীগণের ভজন-মাধুর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন,—

"আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্"।"
—ভাঃ ১০, ৪৭, ৬১

অর্থাৎ যে ব্রজসুন্দরীগণ দুস্ত্যজ্য স্বজন এবং আর্য্যপথ (পাতিব্রত্যাদি) পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রুতিগণেরও অন্বেষণীয়া মুকুন্দপদবী ভজনা করিয়াছেন, অহো! আমি যেন বৃন্দাবনে তাঁহাদিগের চরণরেণুসেবী গুল্মলতা ও ওষধি সমূহের মধ্যে কোনও কিছু হইয়া জন্মলাভ করি। মাধুর্য্যরস-তত্ত্বভূপতি শ্রীরূপ শাস্ত্রপ্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বলিতেছেন,—

তত্রাপি সর্ব্বগোপীনাং রাধিকাতিবরীয়সী।
সর্ব্বাধিক্যেন কথিতা যৎ পুরাণাগমাদিষু॥
— লঘুভাগবতামৃত, উত্তরখণ্ড।

অর্থাৎ মধুরভাবের উপাসনাপদ্ধতির চরমোৎকর্ষ ব্রজগোপীগণে, সেই গোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধিকা অতীব বরীয়সী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতমা, যেহেতু, পুরাণ ও আগমাদি শাস্ত্রে তিনিই সর্ব্বোত্তমারূপে কথিতা হইয়াছেন।

সমস্ত বাদ-বিবাদের মর্ম্ম কথা, শ্রীভগবদুপাসনা। ভারতীয় দর্শনসমূহের উদ্দেশ্যই তত্ত্বজ্ঞান বা নিঃশ্রেয়সলাভ। আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি, কেহ বা পরমানন্দময় ভগবৎপ্রাপ্তিকেই এই নিঃশ্রেয়স লাভের স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীবেদব্যাস নিখিল বেদার্থ সংগ্রহ করিয়া ব্রহ্মসূত্র রচনা করেন, নিজেই তিনি শ্রীমদ্ভাগবতরূপ তাঁহার অনুপম ভাষ্য রচনা করেন। সেই অনুপম ভাষ্যের মর্ম্মকথা শ্রীভাগবৎমূর্ত্তি শ্রীচৈতন্যদেবরূপে আবির্ভূত হইয়া জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। শ্রীরূপ-সনাতন তাঁহারই কৃপায় সেই ভাগবতরসনির্য্যাসের তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া বঙ্গদেশে যে অনুপম রস-প্রবাহের সঞ্চার করিয়াছেন—দার্শনিকপ্রবর শ্রীজীব তত্ত্বসন্দর্ভ, ভাগবতসন্দর্ভ, কৃষ্ণসন্দর্ভ, পরমাত্মসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ, ও প্রীতি-সন্দর্ভরূপ ছয়খানি সন্দর্ভ গ্রন্থে, ক্রমসন্দর্ভরূপ শ্রীভাগবতের টীকায় ও সর্ব্বসংবাদিনীতে তাহারই সিদ্ধান্তনিচয় সুরক্ষিত করিয়া 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদরূপ' দার্শনিক মত খ্যাপন করিয়াছেন। দার্শনিক-চূড়ামণি শ্রীজীব দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বা শুদ্ধাদ্বৈতবাদের প্রতিযোগিরূপে এই মত প্রকাশ করেন নাই বলিয়া তিনি এই মত খ্যাপনের জন্য ব্রহ্মসূত্র, গীতা ও উপনিষদ্ এই প্রস্থানত্রয়ের স্বতন্ত্র ভাষ্য রচনা করেন নাই, পরন্তু ভাগবতের উপর সে ভার অর্পণ করিয়া তিনি রস-স্বরূপের সুগম উপাসনাবর্ত্ম যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহারই চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে অচিন্ত্যভেদাভেদ স্থাপিত হইলেই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের সকল কথাই প্রধানতঃ বলা হইয়া যায়; কারণ, জীব ব্রহ্মেরই শক্তি, এবং জগৎ শক্তিরই কার্য্য, কিন্তু তথাপি দার্শনিক মতরূপে আলোচনার সময়ে জীব ও জগৎ সম্বন্ধে অচিন্ত্য-ভেদাভেদসিদ্ধান্ত স্বতন্ত্র বলিয়া বিবৃত হওয়া উচিত মনে হয়।

[ক্রমশঃ

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল)।
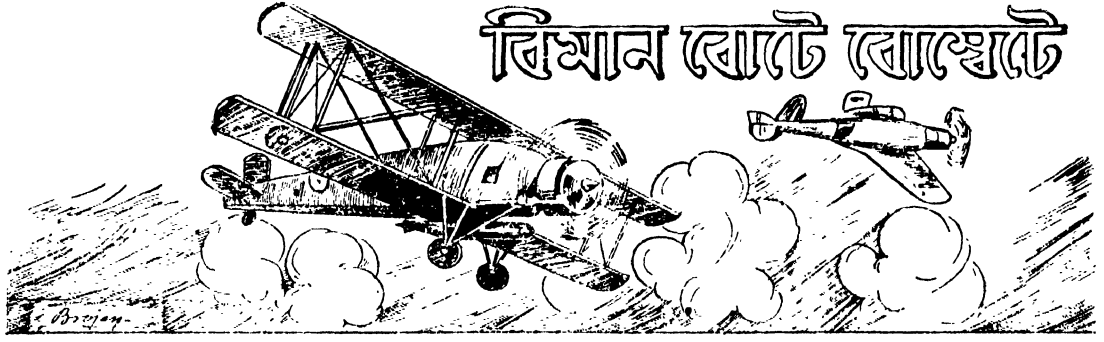
দ্বাদশ তরঙ্গ

ব্লেকের ধারণা

অস্কার মেট্‌ল্যাণ্ডের দোকানে যখন ঐ দুর্ঘটনা ঘটিল, তাহার কয়েক ঘণ্টা পরে—সন্ধ্যা অতীত হইলে পর স্মিথ মিঃ ব্লেকের উপবেশনকক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। স্মিথ বুঝিল, তিনি তাঁহার লেবরেটারীতে বসিয়া সম্ভবতঃ কোন বৈজ্ঞানিক-পরীক্ষায় রত আছেন। এ জন্য সে অবিলম্বে তাঁহার বৈজ্ঞানিক-পরীক্ষাগারে উপস্থিত হইল। ব্লেক তখন সেই কক্ষে বসিয়া টেষ্ট-টিউব লইয়া কি পরীক্ষা করিতেছিলেন।

ব্লেক মুখ তুলিয়া স্মিথের মুখের দিকে চাহিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "খবর কি স্মিথ?"

স্মিথ বলিল, "সান্ধ্য সংস্করণের কাগজ দেখিয়াছেন কর্ত্তা! একটা খুব টাট্‌কা খবর আছে।"

ব্লেক বলিলেন, "না, দেখি নাই; দেখিতেছ ত, এখন আমার কাগজের দিকে চাহিবার সময় নাই। টাট্‌কা খবরের কথা বলিতেছ? কি খবর বল, শুনিতে আপত্তি নাই।"

স্মিথ বেঞ্চির এক কোণে বসিয়া-পড়িয়া বলিল, "মেট্‌ল্যাণ্ড সম্বন্ধে একটা প্যারা বাহির হইয়াছে; খবরটা একটু অদ্ভুত বটে!"

ব্লেক বলিলেন, "কোন্ মেট্‌ল্যাণ্ড? অস্কার মেট্‌ল্যাণ্ড কি?"

স্মিথ হাসিয়া বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, সেই গুণবান্ মহাপুরুষই বটে! তাহার একটা শোচনীয় বিভ্রাটের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে!"

ব্লেক হাতের কাজ ফেলিয়া-রাখিয়া বলিলেন, "কি রকম বিভ্রাট, বল ত শুনি। সে কি পথে চলিতে চলিতে বাস-চাপা পড়িয়াছে, না, দোতালার সিঁড়ি হইতে হঠাৎ পদস্খলন হইয়া ঘাড় ভাঙ্গিয়াছে? মেট্‌ল্যাণ্ডের মত হতচ্ছাড়া লোকগুলা প্রায়ই ও-ভাবে মরে না স্মিথ! দেশের লোকের হাড় জ্বালাইবার জন্য উহারা বুড়া বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে।"

স্মিথ বলিল, "সে কথা সত্য কর্ত্তা! যাহারা ভাল লোক, তাহারা অল্প বয়সেই মারা যায়। বদলোকগুলাই বহু দিন বাঁচিয়া থাকিয়া লোকের সর্ব্বনাশ করে।"

ব্লেক বলিলেন, "ঠিকই বলিয়াছ, কিন্তু ঐ সকল শয়তান এক দিন না এক দিন তাহাদের কুকর্ম্মের প্রতিফল ভোগ করে। পাপের পথ কখন সুখকর হয় না। যাহা হউক, মেট্‌ল্যাণ্ডের কাণ্ডখানা কি বল, শুনি।"

স্মিথ বলিল, "এই ঘটনার সহিত তাহার অতীত জীবনের কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না কর্ত্তা! আজ বৈকালে একটা নির্ব্বোধ লোক মোটর-সাইকেল চালাইয়া মেট্‌ল্যাণ্ডের দোকানের কাচের জানালা ভাঙ্গিয়া সেই সাইকেল সহ দোকানে প্রবেশ করিয়াছিল; ইহাতে মেট্‌ল্যাণ্ডের দোকানের বিস্তর মূল্যবান্ জিনিস-পত্র ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে। বেচারার ভয়ানক ক্ষতি হইয়াছে। সাইকেলের আরোহীটাও সাইকেল হইতে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া আহত হওয়ায়, তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইয়াছিল; দেহের নানা স্থান কাটিয়া রক্তপাত হইয়াছিল। তাহার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া এম্বুলেন্সে তাহাকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। কেহ কেহ ভাবিয়াছিল, হাসপাতালে পৌছিয়াই লোকটা মারা পড়িবে; কেহ কেহ মনে করিয়াছিল, দীর্ঘকাল ভুগিয়া সারিয়া উঠিতেও পারে। কিন্তু এম্বুলেন্স হাসপাতালে পৌছিলে আহত ব্যক্তিকে

নামাইয়া লইতে গিয়া দেখা গেল, সে সেই এম্বুলেন্সে নাই! সে কোথায় কখন কিরূপে অন্তর্দ্ধান করিল, তাহা কেহই জানিতে পারে নাই—যেন বাতাসে মিশিয়া গিয়াছে! অদ্ভুত ব্যাপার কর্ত্তা!"

ব্লেক বলিলেন, "অন্তর্দ্ধান করিয়াছে? সেই আহত মোটর-সাইক্লিষ্ট চলন্ত এম্বুলেন্স হইতে অদৃশ্য হইয়াছে! একদম ফেরার?"

স্মিথ বলিল, "হাঁ কর্ত্তা! এ কাজ ওয়াইল্ডের কীর্ত্তির মতই অদ্ভুত বলিয়া মনে হইতেছে!"

ব্লেক স্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "অদ্ভুত বলিয়া মনে ত হইবেই; কারণ, সে ওয়াইল্ড ভিন্ন অন্য কেহ নহে।"

স্মিথ বলিল, "আপনার কি ধারণা—সে ওয়াইল্ড?"

ব্লেক বলিলেন, "এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই স্মিথ!"

স্মিথ বলিল, "নিঃসন্দেহ হইবার কারণ?"

ব্লেক বলিলেন, "কারণ, এরূপ কার্য্য ওয়াইল্ড ভিন্ন আর কাহারও সাধ্য নহে; এই প্রকার কৌশল-প্রদর্শনে সে অভ্যস্ত—ইহার পরিচয় কি পূর্ব্বে কখন পাও নাই? বিশেষতঃ, অল্প দিন পূর্ব্বে সে যখন সার রড্নের আরণ্য-ভবন হইতে ইন্‌স্পেক্টর কর্ত্তৃক থানায় নীত হইবার সময় চলন্ত মোটর-কার হইতে অদৃশ্য হইয়াছিল, সেই সময় আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, কার্য্যক্ষেত্রে শীঘ্রই আমরা তাহার সাক্ষাৎ পাইব; কিন্তু এত শীঘ্র সে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিবে, এরূপ আশা করিতে পারি নাই।"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, আপনার সে কথা আমার স্মরণ আছে কর্ত্তা! তবে এ কাজ ওয়াইল্ডেরই?"

ব্লেক বলিলেন, "ওয়াইল্ড প্যারাস্থুটের সাহায্যে উড়িতে উড়িতে সার রড্নে ড্রুমণ্ডের যে আরণ্য-ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত, এবং দুর্দ্দান্ত শৃগাল-প্রহরী দ্বারা সুরক্ষিত। সার রড্নে কি কারণে এই আরণ্য-ভবনে দীর্ঘকাল হইতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও আমরা জানিতে পারিয়াছি; এই জন্য আমরা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, ওয়াইল্ড সার রড্নের সহিত কোনরূপ গোপনীয় চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু সার রড্নের সহিত তাহার ঘনিষ্টতার সংবাদ পুলিশের অজ্ঞাত থাকে, এই উদ্দেশ্যে সে নিরীহ ব্যক্তির ন্যায় অতি সহজে পুলিশের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। সুতরাং সার রড্নের সহিত তাহার পরিচয় আছে, এরূপ সন্দেহ পুলিশের মনে স্থান পায় নাই। কিন্তু ওয়াইল্ড থানায় নীত হইবার সময় পুলিশের গাড়ী হইতে পলায়ন করায় আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম, ইহা সার রড্নের সহিত তাহার ষড়যন্ত্রেরই ফল।"

স্মিথ বলিল, "আপনার এইরূপ সন্দেহ হওয়াতেই ত আমরা সার রড্নে ড্রুমণ্ডের অতীত জীবনের ইতিহাস সংগ্রহে প্রবৃত্ত হই। সন্ধান লইয়া আমরা জানিতে পারি—পারস্য দেশে তৈলের ব্যবসায়ে তিনি বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি প্রভূত সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু ক্রমাগত দশ বৎসর কাল তাঁহাকে তিন জন নরপিশাচের কবলে পড়িয়া উৎপীড়িত হইতে হয়। তাহারা তাঁহাকে ভয়প্রদর্শন করিয়া তাঁহার বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করে। সেই তিন জন নর-প্রেতের নাম সাইমন কার্ণ, হুবার্ট রোরকি, এবং অস্‌কার মেট্‌ল্যাণ্ড। ইহারা বিচারালয়ে অভিযুক্ত হইলে প্রত্যেকে তিন বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। কিন্তু উহারা যেরূপ ভীষণপ্রকৃতির অপরাধী, তাহাতে মনে হয়, উহাদের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-বাসের আদেশ হইলেই সঙ্গত হইত।—আপনি কি বলেন কর্ত্তা!"

ব্লেক বলিলেন, "তোমার কথা অসঙ্গত নহে স্মিথ! চিরনির্ব্বাসন দণ্ডই উহাদের অপরাধের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত। উহাদের ন্যায় নরাধম পাপিষ্ঠ পৃথিবীতে অধিক আছে বলিয়া আমার মনে হয় না! এই তিন জন নরপিশাচ কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সার রড্নে ড্রুমণ্ডকে হত্যা করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, এ কথাও তোমার স্মরণ থাকিতে পারে।"

স্মিথ বলিল, "হাঁ কর্ত্তা, উহাদের সেই প্রতিজ্ঞা আমার স্মরণ আছে। ঐ কথা শুনিয়াই ত সার রড্নে প্রাণ-ভয়ে ঐ দুর্গম আরণ্য-ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ওয়াইল্ডের সহিত তাঁহার কিরূপ চুক্তি হইয়াছিল—তাহা আমি জানিতে পারি নাই।"

ব্লেক বলিলেন, "ওয়াইল্ড হঠাৎ সার রড্নের সেই

আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিলে সার রড্‌নে তাহার সঙ্গে একটা চুক্তি করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। কিন্তু সেই চুক্তির মর্ম্ম কি, তাহা বুঝিতে পারা কঠিন নহে। ওয়াইল্ড সার রড্‌নেকে এই তিন জন শত্রুর কবল হইতে উদ্ধার করিবে—এই মর্ম্মে একটা চুক্তি হইয়াছিল—ইহা বুঝিতে পারা যায়। আমার বিশ্বাস, ওয়াইল্ড মোটর-সাইক্লে আরোহণ করিয়া যে ভাবে অস্কার মেট্‌ল্যাণ্ডের দোকান আক্রমণ করিয়াছিল, তাহা তাহার সেই চুক্তিরই সূচনা মাত্র।"

স্মিথ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "আপনার কি ধারণা, ওয়াইল্ড এই ভাবে অস্কার মেট্‌ল্যাণ্ডের দোকান আক্রমণ করিয়া তাহার চুক্তি অনুসারে কার্য্য আরম্ভ করিল? অর্থাৎ অস্কার মেট্‌ল্যাণ্ডই কি তাহার প্রথম শিকার? তাহার সর্ব্বনাশ করিবার পর ওয়াইল্ড সার রড্‌নের অন্য শত্রুদ্বয়কে চূর্ণ করিবে?"

ব্লেক বলিলেন, "তুমি ঠিকই বুঝিয়াছ স্মিথ!"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু ওয়াইল্ড যে নমুনা দেখাইল, তাহা সুবিবেচনার কাজ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় কি? মোটর-সাইক্লে চাপিয়া ও-ভাবে সে মেট্‌ল্যাণ্ডের দোকানের সম্মুখস্থ জানালা ভাঙ্গিয়া তাহার দোকানে প্রবেশ করিল, কতকগুলা জিনিস-পত্র ভাঙ্গিয়া তস্রূপ করিল; তাহাতে মেট্‌ল্যাণ্ডের মত টাকার কুমীরের এমন কি ক্ষতি হইয়াছে? ঐ রকম গোঁয়ার্তুমি করিতে গিয়া সে নিজেই ত মরিতে পারিত।"

ব্লেক বলিলেন, "কে মরিতে পারিত? ওয়াইল্ড? নিজের শক্তি সম্বন্ধে তাহার কি নিশ্চিত ধারণা নাই? তবে এ কথা সত্য যে, ওয়াইল্ডের ন্যায় অদ্ভুতপ্রকৃতি, অসাধারণ দস্যু আমি আর কখন দেখি নাই, এবং সে কি মতলবে কোন্ কাজ করে, তাহাও আমি ধারণা করিতে পারি না। তবে ইহা যে অস্কার মেট্‌ল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তাহার যুদ্ধারম্ভের সূচনা, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।"

স্মিথ বলিল, "ওয়াইল্ড বিমান-বোট হইতে পলায়ন করিবার পর আমরা তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। তাহার বোম্বেটেগিরি আমরাই ব্যর্থ করিয়াছি; তাহার গতিবিধির প্রতিও আমরা সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছি। এখন আমাদের কি কর্ত্তব্য?"

ব্লেক বলিলেন, "আমি গোল্ডবার্গের যে কার্য্যের ভার লইয়াছিলাম, তাহা শেষ হইয়াছে; সুতরাং ওয়াইল্ড সম্বন্ধে আমাদের আর কোন কর্ত্তব্য নাই। বরং লণ্ডনের অভি-শাপস্বরূপ ঐ তিনটা বিষধর সর্পের বিষদন্ত চূর্ণ হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে, এজন্য আমি আনন্দিত।"

স্মিথ বলিল, "ওয়াইল্ড যে অবশেষে ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহার পক্ষে ইহা নূতন বটে!"

ব্লেক বলিলেন, "উল্টা বুঝিয়াছ স্মিথ! কে বলিল, ওয়াইল্ড ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে? সে যাহা করিতেছে, তাহাতে তাহার যথেষ্ট বাহাদুরী প্রকাশের সম্ভাবনা আছে বটে; এই লোভ সে কখন ছাড়িতে পারে না। দস্যুবৃত্তিই তাহার অবলম্বন, তবে তাহার গুণও যথেষ্ট আছে। তাহার সরলতা প্রশংসনীয়। সে কখন কথার খেলাপ করে না। আমি তাহার অঙ্গীকারে সম্পূর্ণ নির্ভর করি। অনেক বিষয়ে আমি তাহাকে সম্মানের পাত্র বলিয়াই মনে করি। সে যে দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে—ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় বলিয়াই আমার মনে হয়। তাহার দেহের শক্তি যেরূপ অসাধারণ, সে যদি কোন সার্কাসের দলে প্রবেশ করিয়া সাধুভাবে জীবিকানির্ব্বাহ করিত, তাহা হইলে এত দিন সে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিত, এবং দেশ-বিদেশে তাহার খ্যাতিপ্রতিষ্ঠারও সীমা থাকিত না। ভুল পথে চলিয়াই সে জীবনটা ব্যর্থ করিয়া ফেলিল! আহা বেচারা!"

স্মিথ সহানুভূতিভরে বলিল, "আপনার কথা সত্য কর্ত্তা! ওয়াইল্ডের জন্য সত্যই দুঃখ হয়, কিন্তু পুলিশ যে তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে দিতেছে না। পুলিশ সর্ব্বদা তাহাকে উড়ো-তাড়া না করিলে সে সৎপথে থাকিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারিত, সম্ভবতঃ, কুকর্ম্মেও লিপ্ত হইত না; কিন্তু তাহার সম্ভাবনা কোথায়? তাহার বিরুদ্ধে এখনও বিস্তর পরোয়ানা চারি দিকে ঘুরিতেছে! নানা স্থানের পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিতেছে। তদ্ভিন্ন, আমার মনে হয়, ওয়াইল্ড এই ভাবে জীবন-যাপনেরই পক্ষপাতী; তবে তাহার চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, কোন নোংরা কাজে

তাহার অনুরাগ নাই, এবং যে ব্যক্তি উৎপীড়িত বা নানা ভাবে নির্য্যাতিত হইতেছে, সে কখন তাহার কোন অনিষ্ট করে না, বরং তাহারই পক্ষ সমর্থন করে। এই জন্যই তাহাকে শ্রদ্ধা করিতে ইচ্ছা হয়। তাহার অপরাধকে অপরাধ বলিয়া স্বীকার করিতেও প্রবৃত্তি হয় না।—আমি আমার ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ করিতেছি। সকলেই আমার মতের সমর্থন করিবেন, এরূপ আশা করিতে পারি না।"

ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু সে যে অপরাধী, এ বিষয়ে ত সন্দেহ নাই স্মিথ! সে সর্ব্বদাই আইন লঙ্ঘন করিতেছে। বে-আইনী কার্য্যেই তাহার অনুরাগ; তাহাতেই তাহার আনন্দ। তাহার এই সকল কার্য্য সমর্থনের অযোগ্য। যাহা হউক, এবার সে যে কার্য্য আরম্ভ করিল, তাহার উপর আমি দৃষ্টি রাখিব। আমি সতর্ক ভাবে তাহার অনুষ্ঠিত প্রত্যেক কার্য্যের অনুসরণ করিব; কিন্তু সার রড্নের জন্য আমার কিঞ্চিৎ দুশ্চিন্তা হইয়াছে—ইহা আমি অস্বীকার করিতে পারিতেছি না।"

স্মিথ বলিল, "তিনি ওয়াইল্ডের সঙ্গে মিশিতেছেন বলিয়াই কি আপনার এই দুশ্চিন্তা কর্ত্তা?"

ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, তাই বটে! আমি জানি, সার রড্নে ড্রুমণ্ড খাঁটি লোক; তাঁহার সাধুতায় আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ওয়াইল্ডের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যে, তাহার অসাধারণ দৈহিক বলে, এবং তাহার সরলতায় তিনি মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন, ইহা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। তিনি ইহাও বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তাহার চরিত্রে ইতরতার লেশমাত্র নাই। আমার বিশ্বাস, ওয়াইল্ডের কথাবার্ত্তা শুনিয়া এবং তাহার ব্যবহারে তিনি তাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু তিনি যদি ওয়াইল্ডের সাহায্যে তাঁহার শত্রুগুলাকে জব্দ করিয়া তাহাদের কবল হইতে উদ্ধার লাভের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা তাহাতে বাধা-দানের চেষ্টা করিলে তাহা সঙ্গত হইবে বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। শেষে হয় ত এক দিন দেখিব, ওয়াইল্ড ফৌজদারী তদন্ত-বিভাগের (সি, আই, ডি) কার্য্যে যোগদান করিয়াছে।"

স্মিথের কথা শুনিয়া ব্লেক একটু হাসিলেন, কিন্তু কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না। তিনি এই ব্যাপারে কোন পক্ষ হইতে কোন কার্য্যের ভার প্রাপ্ত না হওয়ায় কিরূপে অস্কার মেট্ল্যাণ্ডের ব্যাপারের অনুসরণ করিবেন—তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

কিন্তু তিনি স্থির করিলেন, এ বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন না। ওয়াইল্ড কি কারণে মেট্ল্যাণ্ডের দোকানের জানালা ভাঙ্গিয়া তাহার পণ্যদ্রব্যগুলি চূর্ণ ও লণ্ডভণ্ড করিল, তাহা তিনি বুঝিবার চেষ্টা করিবেন বলিয়াই স্থির করিলেন। ওয়াইল্ডের কার্য্যটি প্রথম দৃষ্টিতে পাগলামি বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইয়াছিল।

কিন্তু রোপার ওয়াইল্ড যে কোন একটা মতলব করিয়াই এই কার্য্য করিয়াছিল, এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ হইল না। সে মেট্ল্যাণ্ডকে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়াছিল—ইহা ব্লেক অস্বীকার করিলেন না। এই ভাবে পুনঃ পুনঃ কঠোর ধাক্কা সহ্য করিতে হইলে দৃঢ়চিত্ত ও দুর্দ্দান্ত মেট্ল্যাণ্ড যে ভাঙ্গিয়া পড়িবে—ইহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন। ওয়াইল্ড সার রড্নের তিন জন মহা-শত্রুকে হত্যা না করিয়াও যদি চূর্ণ করিতে পারে—তাহা হইলে সে কোন্ পথে অগ্রসর হইবে—তাহা দেখিবার যোগ্য বলিয়াই ব্লেকের মনে হইল।

ব্লেক ভাবিলেন, অস্কার মেট্ল্যাণ্ডকে যদি ওয়াইল্ড কোন কৌশলে সাত-আট বৎসরের জন্য কারাগারে প্রেরণ করিতে পারে,—তাহা হইলে সে মুক্তিলাভের পর আর সার রড্নেকে আক্রমণ করিতে সাহস করিবে না। কিন্তু ওয়াইল্ড কি কৌশলে মেট্ল্যাণ্ডকে দীর্ঘকালের জন্য কারাগারে প্রেরণ করিবে, এবং তাহার কৌশল নিখুঁত ও কার্য্যোপযোগী হইবে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য ব্লেকের প্রবল আগ্রহ হইল।

ত্রয়োদশ তরঙ্গ

বর্জ্জিয়ার স্বর্ণ-মঞ্জুষা

নর্থবির বিখ্যাত নিলাম-ঘরে নানাপ্রকার দুর্লভ মূল্যবান্ প্রাচীন দ্রব্যরাজি নিলাম হইতেছিল। অনেক ধনাঢ্য ক্রেতা নিলাম ডাকিতে আসিয়াছিলেন। সেই সকল ক্রেতার মধ্যে অস্কার মেট্ল্যাণ্ডের ন্যায় ঐ সকল

পণ্যের ঝুনো ব্যবসায়ীরাও উপস্থিত ছিল; আবার লণ্ডনের অভিজাত সম্প্রদায়ের অনেক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিও সখের খাতিরে নিলাম ডাকিতে গিয়াছিলেন।

অনেকগুলি প্রাচীন দ্রব্য নিলামের পর নিলামকারী গোমস্তা মণিমুক্তা-খচিত একটি স্বর্ণ-মঞ্জুষা নিলামে তুলিল। মেট্‌ল্যাণ্ডের কোন ধনাঢ্য মক্কেল উহা ক্রয় করিবার জন্য তাহাকে আদেশ করিয়াছিলেন।

মেট্‌ল্যাণ্ড দর হাঁকিল—"দুই হাজার গিনি।"

লণ্ডনের সুবিখ্যাত লক্ষপতি লর্ড ব্ল্যাকউড ঐ সৌখিন সামগ্রীটি ক্রয় করিবার সঙ্কল্পেই স্বয়ং নিলাম ডাকিতে আসিয়াছিলেন। মেট্‌ল্যাণ্ড দুই হাজার গিনি ডাকিলে নিলামকারী গোমস্তা হাঁকিল, "দু' হাজার গিনি—দু' হাজার গিনি এক!"—সে অদূরে উপবিষ্ট লর্ড ব্ল্যাকউডের মুখের দিকে চাহিয়া হাতুড়ি উদ্যত করিয়া আবার হাঁকিল, "দু' হাজার গিনি এক—দু' হাজার গিনি দুই—"

লর্ড ব্ল্যাকউড্ হাঁকিলেন, "তিন হাজার গিনি!"

আবার গোমস্তার হাতুড়ির সহিত কণ্ঠস্বর উঠিল—"তিন হাজার গিনি, তিন হাজার গিনি—এক—"

মেট্‌ল্যাণ্ড হাঁকিল, "সাড়ে তিন হাজার গিনি।"

গোমস্তা হাঁকিল, "সাড়ে তিন হাজার গিনি এক, সাড়ে তিন হাজার দো;—জলের দামে যায় এই অমূল্য সম্পদ!"—সে হাতুড়ি তুলিয়া লর্ড ব্ল্যাকউডের মুখের দিকে চাহিল। প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইলে অনেকেই প্রথমে ডাকাডাকি করিয়াছিল; কিন্তু এখন সিংহে ব্যাঘ্রে যুদ্ধ দেখিয়া অন্য কেহ ডাকিতে সাহস করিল না, সকলেই সরিয়া দাঁড়াইল। কেবল লর্ড ব্ল্যাকউড এবং অসুকার মেট্‌ল্যাণ্ডের মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা চলিতে লাগিল।

লর্ড ব্ল্যাকউড হাঁকিলেন, "চার হাজার গিনি।"

গোমস্তা হাঁকিল, "চার হাজার গিনি! চার হাজার গিনি এক,—চার হাজার গিনি দো—"

মেট্‌ল্যাণ্ড ডাকিল, "সাড়ে চার হাজার গিনি।"

গোমস্তা প্রফুল্ল-মুখে হাঁকিল, "সাড়ে চার হাজার গিনি! সাড়ে চার হাজার গিনি এক, সাড়ে চার হাজার গিনি দো—" সে হাতুড়ি মাথার উপর উচু করিয়া লর্ড ব্ল্যাকউডের মুখের দিকে চাহিয়া আবার হাঁকিল, "সাড়ে চার হাজার গিনি—এক, দো—"

তাহার হাতের হাতুড়ি আন্দোলিত হইতে লাগিল।

লর্ড ব্ল্যাকউড ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিরক্তিভরে বলিলেন, "নাঃ, দোকানদারটা জ্বালালে দেখ্‌ছি!—পাঁচ হাজার গিনি।" —ক্রোধে তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল।

গোমস্তা হাতের হাতুড়ি আবার মাথার উপর তুলিয়া উৎসাহভরে বলিল, "পাঁচ হাজার গিনি! পাঁচ হাজার গিনি এক, দো—আপনি আর ডাকিবেন মিঃ মেট্‌ল্যাণ্ড?"

মেট্‌ল্যাণ্ড উত্তেজিত স্বরে বলিল, "না, আমি উহার উপর আর এক ফার্দিংও ডাকিব না। চুলোয় যাক্ সখের জিনিস!"

গোমস্তা হাঁকিল, "পাঁচ হাজার গিনি—এক, পাঁচ হাজার গিনি দো, পাঁচ হাজার গিনি তিন।"—সঙ্গে সঙ্গে টেবিলে সশব্দে হাতুড়ির আঘাত।

বর্জ্জিয়া-মঞ্জুষা পাঁচ হাজার গিনি মূল্যে লর্ড ব্ল্যাকউডের হস্তগত হইল।

গোমস্তা হাতুড়ি দ্বারা টেবিলে আঘাত করিবার প্রায় দুই মিনিট পরে একটি ভদ্রলোক অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে নিলাম-কক্ষে প্রবেশ করিয়া যখন শুনিলেন, মঞ্জুষাটি নিলামে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, তখন তাঁহর যেন মূর্চ্ছার উপক্রম হইল! কিন্তু তিনি আত্মসংবরণ করিয়া মেট্‌ল্যাণ্ডকে একটু দূরে ডাকিয়া লইয়া-গিয়া তাহার কানে কানে কি বলিলেন, তাহার পর সেই স্থান ত্যাগ করিলেন।

মঞ্জুষাটি-ক্রয়ের পর লড ব্ল্যাকউডের সেখানে থাকিবার প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু যে সকল দ্রব্য নিলাম হইতেছিল, তাহাদের মধ্যে কারুখচিত একটি ইটালিয়ান ডাবর ছিল। উহাও সৌখীন দ্রব্য। এই ডাবরটিও ডাকিয়া-লইবার জন্য লর্ড ব্ল্যাকউডের অত্যন্ত আগ্রহ ছিল; কিন্তু উহার নাম তালিকার অনেক নীচে থাকায় তাহা নিলামে চড়িতে বিলম্ব ছিল। সেই জন্য লর্ড ব্ল্যাকউডকে আরও কিছুকাল সেখানে অপেক্ষা করিতে হইল। তিনি মঞ্জুষাটি ক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

লর্ড ব্ল্যাকউড পার্শ্বস্থ একটি কক্ষে বিশ্রাম করিতেছিলেন; মেট্‌ল্যাণ্ড ধীরে ধীরে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া লর্ড ব্ল্যাকউডের অদূরে স্থাপিত একখানি চেয়ারে বসিয়া

পড়িল। ওয়াইল্ড যে দিন তাহার দোকানের জানালা ভাঙ্গিয়া দোকানে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার পর তিন দিন অতীত হইয়াছিল ; এই তিন দিনে মেট্‌ল্যাণ্ড তাহার ক্ষতির শোক সংবরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

মেট্‌ল্যাণ্ড কাসিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া লর্ড ব্ল্যাক-উডের মুখের দিকে চাহিল ; তাহার পর বিনীত স্বরে বলিল, "মাই লর্ড, আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন—আপনাকে দুই-একটি কথা বলিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি।"

লর্ড ব্ল্যাকউড স্থিরদৃষ্টিতে মেট্‌ল্যাণ্ডের মুখের দিকে চাহিয়া ধীর-গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আমাকে কথা বলিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছ ; তাহাতে আমার আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে? কিন্তু যদি তুমি আমাকে আমার ক্রীত বজ্জিয়া-মঞ্জুষা সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার ইচ্ছা করিয়া থাক, তাহা হইলে আমি তোমাকে বলিয়া রাখিতেছি, তুমি সময়টা অনর্থক নষ্ট করিবে। যাহা হউক, তুমি কি বলিবে বল, আমি তাহা শুনিবার জন্য প্রস্তুত আছি।"

মেট্‌ল্যাণ্ড পুনর্ব্বার কাসিয়া লইল ; তাহার পর ঢোক গিলিয়া বলিল, "মাই লর্ড, আপনার অনুমান সত্য ; আমি ঐ বজ্জিয়া-মঞ্জুষা সম্বন্ধেই আপনার নিকট একটি প্রস্তাব করিতে সাহসী হইতেছি। আমার একটি সম্ভ্রান্ত মক্কেল উহা ক্রয়ের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া অল্পকাল পূর্ব্বে তাঁহার একটি পদস্থ কর্ম্মচারীকে আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বেই আমাকে মঞ্জুষাটি ডাকিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু টাকার পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট না থাকায় আমি শেষ পর্য্যন্ত আপনার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সঙ্গত মনে করি নাই ; তবে আপনি যে টাকায় নিলামে উহা কিনিয়াছেন, তিনি তাহা অপেক্ষা অধিক টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন। তিনি আরও এক হাজার—"

লর্ড ব্ল্যাকউড তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই প্রসঙ্গে কোন কথা বলিলে তোমার সময় অনর্থক নষ্ট হইবে।"

মেট্‌ল্যাণ্ড সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিল, "আমার মক্কেল উহার জন্য ছয় হাজার গিনি প্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন মাই লর্ড!"

লর্ড ব্ল্যাকউড উগ্রস্বরে বলিলেন, "তোমার মনিব টাকার মানুষ হইলে ষাট হাজার গিনি মূল্য দিয়াও উহা হস্তগত করিবার জন্য উৎসুক হইতে পারেন ; কিন্তু আমি দোকানদার নহি। আমি বিক্রয় করিবার জন্য উহা নিলামে ক্রয় করি নাই। তোমার ভদ্রতা-জ্ঞান থাকিলে তুমি আমার সখের জিনিস কিনিয়া লইবার প্রস্তাব করিতে লজ্জা অনুভব করিতে। লাভের লোভ দেখাইয়া তুমি বণিক-বৃত্তিরই পরিচয় দিয়াছ। সেই বদমায়েস বোনাটা (নেপোলিয়ঁ বোনাপার্ট) ইংরেজকে 'দোকানদারের জাত' বলিয়া রসিকতা করিয়াছিল ; কিন্তু ইংরেজ মাত্রই দোকানদার নহে।"

মেট্‌ল্যাণ্ড দুই হাত রগড়াইতে রগড়াইতে বলিল, "কিন্তু মাই লর্ড, আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াই - "

লর্ড ব্ল্যাক্‌উড এবার অত্যন্ত নীরস স্বরে বলিলেন, "তোমার ব্যাকুলতা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। আমি পাঁচ হাজার গিনি ডাকিবার পর তুমি যে ছয় হাজার গিনি ডাকিয়া আমার আরও কিছু খসাইবার দুরভিসন্ধি ত্যাগ করিয়াছিলে, এজন্য আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞ ; কারণ, তুমি ছয় হাজার গিনি ডাকিলে আমাকে সাত হাজার গিনিতে উঠিতে হইত। আমার মনের মত জিনিস, তুচ্ছ টাকার জন্য আমি উহা ছাড়িতাম না। হয় ত বাধ্য হইয়া আমাকে দশ-বার হাজার গিনি পর্য্যন্ত হাঁকিতে হইত।"

মেট্‌ল্যাণ্ড মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিল। সে আশা করিয়াছিল, এই স্বর্ণ-মঞ্জুষা লর্ড ব্ল্যাকউডের নিকট হইতে কিনিয়া লইয়া তাহার মক্কেলের নিকট দুই-চারি শত গিনি লাভ করিবে ; কিন্তু তাহার সেই আশা পূর্ণ হইল না। এতদ্ভিন্ন, তাহার মক্কেল উহা না পাওয়ায় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাহাকে তিরস্কার করিবেন, এরূপও আশঙ্কা ছিল।

যে সময় তাঁহাদের বাদানুবাদ চলিতেছিল—সেই সময় সুপরিচ্ছদধারী একটি যুবক সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের অদূরে একখানি চেয়ারে বসিয়া ছিল, এবং একখানি সচিত্র মাসিকপত্রে মনোনিবেশ করিয়াছিল,—লর্ড ব্ল্যাকউড বা মেট্‌ল্যাণ্ড উভয়ের কেহই তাহা লক্ষ্য করেন নাই ; কিন্তু যুবকটি তাঁহাদের প্রত্যেক কথাই আগ্রহভরে শুনিতেছিল।

মেট্‌ল্যাণ্ড কয়েক মিনিট নিস্তব্ধ থাকিয়া লর্ড ব্ল্যাকউডকে বলিল, "আপনি তাহা হইলে আমার কোন প্রস্তাবেই কর্ণপাত করিবেন না স্থির করিয়াছেন ?"

লর্ড ব্ল্যাকউড বলিলেন, "সে কথা বুঝিতে অধিক বুদ্ধি ব্যয় করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া ত মনে হয় না।"

মেট্‌ল্যাণ্ড তথাপি বলিল, "আপনি উহার মূল্য বাবদ সাত হাজার গিনি পাইলেও কি—"

লর্ড ব্ল্যাকউড তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "না, না। তুমি যে ভয়ঙ্কর বেহায়া লোক হে! কেন তুমি আমার সঙ্গে এ-রকম ফড়েমো করিতেছ ? আমি তোমাকে বলিয়াছি—ঐ মঞ্জুষা আমি কিনিয়াছি। এ দেশে ঐ প্রকার প্রাচীন শিল্প-সম্পদ অতি অল্পই আছে। উহা আমার সংগৃহীত প্রাচীন শিল্প-সম্ভারের শোভা বর্দ্ধন করিবে।"

মেট্‌ল্যাণ্ড বলিল, "উহা নিতান্ত সাধারণ সামগ্রী ; প্রাচীন শিল্প-সম্পদ সম্বন্ধে আপনার কোন ধারণা থাকিলে আপনি ইহা ঐরূপ গৌরবের বস্তু বলিয়া মনে করিতেন না।"

লর্ড ব্ল্যাকউড সরোষে বলিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে বাজে তর্ক করিও না। আমি তোমাকে বলিতেছি—কোন জমিদারির বিনিময়েও ঐ মঞ্জুষা আমি হস্তান্তর করিব না। আমার শেষ কথা আমি তোমাকে বলিয়া দিয়াছি ; বুঝিয়াছ ? আমার আর কিছুই বলিবার নাই।"

মেট্‌ল্যাণ্ড তথাপি নিশ্চেষ্ট হইল না ; সে পুনর্ব্বার বলিল, "আপনি অকারণ মেজাজ গরম করিতেছেন মাই লর্ড! আমার প্রস্তাবে রাগ করিবার কিছুই নাই ; ইহা সাধারণ বৈষয়িক প্রস্তাব মাত্র।"

লর্ড ব্ল্যাকউড মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, তাহা নয়। আমি তোমাকে এ সম্বন্ধে আর কোন কথা বলিতে নিষেধ করিয়াছি। আমার সঙ্কল্প স্থির ; তবে তুমি কেন আমাকে পুনঃ পুনঃ বিরক্ত করিতেছ ?"

"এ জন্য আমি দুঃখিত মাই লর্ড!"—বলিয়া মেট্‌ল্যাণ্ড উঠিয়া পড়িল, এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

অতঃপর লর্ড ব্ল্যাকউডও উঠিয়া নিলামের কক্ষে গমন করিলেন। ইটালিয়ান ডাবরটি নিলামে তুলিতে তখন আর বিলম্ব ছিল না।

যে যুবকটি সেই কক্ষের এক কোণে বসিয়া সচিত্র মাসিক পত্রিকাখানি লইয়া নাড়া-চাড়া করিতেছিল, এবার সে-ও কাগজখানি টেবিলের উপর ফেলিয়া-রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "বড় মজার ব্যাপার বটে!"

এই যুবক রোপার ওয়াইল্ড ভিন্ন অন্য কেহ নহে। নর্থবির আফিসে নিলাম হইবে—এ সংবাদ ওয়াইল্ডের অজ্ঞাত ছিল না ; সে জানিত, যেখানে ঐরূপ দুর্লভ প্রাচীন দ্রব্যরাজি নিলামে বিক্রয় হইবে, সেখানে অস্কার মেট্‌ল্যাণ্ড নিশ্চিতই নিলাম ডাকিতে আসিবে। এই জন্যই ওয়াইল্ড তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল। মেট্‌ল্যাণ্ড তাহাকে লক্ষ্য করে নাই বটে, কিন্তু সে মেট্‌ল্যাণ্ডের অনুসরণ করিয়া এবং লর্ড ব্ল্যাকউডের সহিত তাহার তর্ক-বিতর্ক শুনিয়া যেরূপ খুসী হইল, তাহা তাহার আশার অতিরিক্ত! উভয়ের প্রত্যেক কথাই সে শুনিতে পাইয়াছিল।

ওয়াইল্ড উৎসাহভরে বলিল, "ভারী চমৎকার! এ রকমটা আমি আশা করিতে পারি নাই। মেট্‌ল্যাণ্ড ঐ মঞ্জুষাটা লইবার জন্য ভয়ঙ্কর জিদ্ করিতে লাগিল, কিন্তু লর্ড ব্ল্যাকউড উহা তাহাকে দিবেন না স্থির করিয়াছেন ; বুঝিতে পারিলাম, কোন মূল্যেই উহা তিনি মেট্‌ল্যাণ্ডের নিকট বিক্রয় করিবেন না। আমার পক্ষে বড়ই আনন্দের সংবাদ! কি মজা! এইবার আমি আমার ভবিষ্যৎ কার্য্য-পদ্ধতি স্থির করিয়া লইতে পারিব ; সেই পথে চলিলেই কার্য্যসিদ্ধি!"

ওয়াইল্ডের উর্ব্বর মস্তিষ্ক মেট্‌ল্যাণ্ডকে চূর্ণ করিবার উপায় চিন্তায় রত হইল।

* * * * * *

লণ্ডনের নাইট্‌ব্রীজ পল্লীতে অস্কার মেট্‌ল্যাণ্ডের যে দোকান পুরাতন দুর্লভ শিল্প-সম্ভারে পূর্ণ ছিল, সেই দোকানের পশ্চাদ্বর্ত্তী কক্ষে সে একাকী বাস করিত। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার দিন সন্ধ্যার পর মেট্‌ল্যাণ্ড সেই নিভৃত কক্ষে বসিয়া একটি চুরুট মুখে গুঁজিয়া সান্ধ্য দৈনিকখানি

পাঠ করিতেছিল। কক্ষটি ক্ষুদ্র হইলেও সুসজ্জিত; তাহা একাধারে তাহার আফিস, এবং শয়ন-কক্ষ। মেট্‌ল্যাণ্ড ভয়ানক কৃপণ ছিল, আহারাদি ব্যাপারে তাহার কোন আড়ম্বর ছিল না। সে তাহার ক্লাবেই প্রত্যহ ভোজন শেষ করিয়া আসিত। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহার দোকান বন্ধ হইলে কর্ম্মচারীরা চলিয়া যাইত, এবং মেট্‌ল্যাণ্ড তাহার এই ঘরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিত।

নর্থবির আফিসে সে দিন মধ্যাহ্নে নিলাম ডাকিতে গিয়া তাহাকে হতাশ হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল, এ জন্য সায়ংকালেও সে মন স্থির করিতে পারে নাই; পুনঃ পুনঃ সেই পরাজয়ের কথাই তাহার মনে পড়িতেছিল। তাহার মক্কেলের সঙ্গে দেখা হইলে সে কি কৈফিয়ৎ দিবে, কিরূপে তাঁহার ক্ষোভ দূর করিবে, তাহা সে স্থির করিতে পারে নাই। লর্ড ব্ল্যাকউডকে টাকার লোভ দেখাইয়া সে বশীভূত করিতে পারিল না—এ কথা কি তাহার মক্কেল বিশ্বাস করিবেন?

ধূমপান করিতে করিতে মেট্‌ল্যাণ্ড এই সকল কথা চিন্তা করিতেছিল, সেই সময় টেলিফোনে ঝন্‌-ঝন্‌ করিয়া শব্দ হইল।

মেট্‌ল্যাণ্ড মুখের চুরুট নামাইয়া-রাখিয়া টেলিফোনের নিকট উপস্থিত হইল; অস্ফুট স্বরে বলিল, "কার্ণ বোধ হয় আমাকে ডাকিতেছে। সে ভিন্ন এই অসময়ে আর কে আমাকে ডাকিবে? কিন্তু আজ আমার মন খারাপ; আজ রাত্রিতে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে চাহি না।"

মেট্‌ল্যাণ্ড রিসিভার তুলিয়া-লইয়া কানে ধরিল। সে সাড়া দিলে অন্য দিক্ হইতে শুনিতে পাইল, "আপনি মিঃ অস্‌কার মেট্‌ল্যাণ্ডকে ডাকিয়া দিলে বাধিত হইব।"

মেট্‌ল্যাণ্ড বলিল, "আমিই মেট্‌ল্যাণ্ড, আপনি কে?"

ভারী-গলায় উত্তর হইল, "চমৎকার! খুব ভাল কথা! মিঃ মেট্‌ল্যাণ্ড, আমার কথা শুনুন। পুরাতন দুষ্প্রাপ্য পণ্যদ্রব্য-বিক্রেতা সমূহের মধ্যে আপনিই কি প্রধান ব্যক্তি?"

মেট্‌ল্যাণ্ড বক্তার কণ্ঠস্বরের টান শুনিয়া বুঝিতে পারিল—বক্তা আমেরিকান। তাহার মন কৌতূহলে পূর্ণ হইল। সে বলিল, "হাঁ, সকলে উহাই বলিয়া থাকে বটে; কিন্তু আপনার কণ্ঠস্বর শুনিয়া আপনি কে, তাহা ত ঠাহর করিতে পারিতেছি না মহাশয়!"

বক্তা হাসিয়া বলিলেন, "আমার দুর্ভাগ্য,—আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় নাই, আমার কণ্ঠস্বর কিরূপে চিনিতে পারিবেন? কিন্তু এ দেশে আমি নিতান্ত অপরিচিত নহি। আপনি কখন আমেরিকান ওটিস্ হারকোর্টের নাম শুনিয়াছেন? আমি ওটিস্ হারকোর্ট।"

মেট্‌ল্যাণ্ড অস্ফুট স্বরে বলিল, "কি সৌভাগ্য!"

বক্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি বলিলেন?"

মেট্‌ল্যাণ্ড ব্যাকুল স্বরে বলিল, "না, আমি কিছুই বলি নাই, মিঃ হারকোর্ট! আপনাকে কোন কথা বলি নাই।"

কিন্তু সত্যই মেট্‌ল্যাণ্ডের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। সে জানিত, মিঃ ওটিস্ হারকোর্ট কেবল কোটিপতি নহেন, তিনি বহু-কোটিপতি (মাল্‌টি-মিলিয়নিয়ার)। তিনি পুরাতন দুর্লভ পণ্যের এরূপ অনুরাগী যে, পছন্দ হইলে তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য অনায়াসে লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয় করিতেন। হারকোর্টের ন্যায় মুরুব্বি পাওয়া মহা সৌভাগ্যের বিষয়,—সোনার খনি আবিষ্কারের ন্যায় লাভজনক!

মিঃ হারকোর্ট বলিলেন, "আমি কস্‌-মস্ হোটেলে আছি। আপনার সো-রুমে কয়েকটি দুর্লভ পুরাতন পণ্যদ্রব্য প্রদর্শিত হইতেছে; তাহাদের মধ্যে কয়েকটি আমার বড়ই পছন্দ হইয়াছে। এই জন্য আমি আপনার দর্শনপ্রার্থী মিঃ মেট্‌ল্যাণ্ড! তদ্ভিন্ন, আমার আরও কতকগুলি প্রাচীন দ্রব্যের প্রয়োজন আছে। এই জন্য যদি সম্ভব হয়, আজ রাত্রিকালে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করিতে চাই।"

মেট্‌ল্যাণ্ড ব্যগ্র ভাবে বলিল, "হাঁ, নিশ্চয়ই সম্ভব হইবে।"

মিঃ হারকোর্ট বলিলেন, "আজ রাত্রি এগারটার সময় কি আপনার সুবিধা হইবে?"

মেট্‌ল্যাণ্ড কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "তখন একটু অসময় হইবে না? তবে আমার তাহাতে আপত্তির কোন কারণ নাই।"

মিঃ হারকোর্ট বলিলেন, "হাঁ, একটু অসময়ই বটে;

কিন্তু কথা কি জানেন? তাহার আগে আমার একটা জরুরি 'এন্‌গেজমেণ্ট' আছে। রাত্রি এগারটার আগে তাহা শেষ করিবার আশা নাই; অথচ তাহা এড়াইতেও পারিতেছি না। আপনি ঐ সময় আমার সঙ্গে দেখা করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে বড়ই অনুগৃহীত হইব মিঃ মেট্‌ল্যাণ্ড!"

মেট্‌ল্যাণ্ড বলিল, "আমি কি কস্‌-মসে গিয়া আপনার সঙ্গে দেখা করিব?"

মিঃ হারকোর্ট দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "না, নিশ্চয়ই আপনাকে ঐ ভাবে কষ্ট দিব না। অসময়ে আপনার সঙ্গে দেখা করিতে চাহিতেছি,—আপনি যদি আপনার ঘরে থাকেন, তাহা হইলে আমিই রাত্রি এগারটার সময় সেখানে গিয়া আপনার সঙ্গে দেখা করিব। আপনার ঘরেই আমাদের পরামর্শ হইবে। এ প্রস্তাবে আপনার আপত্তি আছে?"

মেট্‌ল্যাণ্ড বলিল, "না, কোন আপত্তি নাই মিঃ হারকোর্ট! আপনি ঐ সময় এখানে আসিলে আমার কোন অসুবিধা হইবে না। ঐ সময় আমার দোকান বন্ধ থাকিলেও উহার পশ্চাদ্বর্ত্তী বাসকক্ষের দ্বারের 'ইলেক্‌ট্রিক পুস্‌' টিপিলেই আমি স্বয়ং আপনাকে দ্বার খুলিয়া দিব, এবং আপনাকে সঙ্গে লইয়া আমার ঘরে আসিব।"

হারকোর্ট বলিলেন, "চমৎকার ব্যবস্থা! আপনি যে আমার জন্য এতখানি কষ্ট স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন, এ জন্য আপনাকে শত ধন্যবাদ। রাত্রি ঠিক এগারটার সময় আমার প্রতীক্ষা করিবেন।"

মেট্‌ল্যাণ্ড 'রিসিভার' যথাস্থানে ঝুলাইয়া রাখিল। তাহার মুখ প্রফুল্ল হইল, চক্ষুও আনন্দে উজ্জ্বল। নানা আশায় তাহার হৃদয় আন্দোলিত হইতে লাগিল।

মেট্‌ল্যাণ্ড অস্ফুট স্বরে বলিল, "হারকোর্টকে অবশেষে হাতে পাইলাম! কত দিন ভাবিয়াছি—এই রকম রুই-কাতলাকে কোন্ সুযোগে বঁড়শীতে গাঁথিয়া খেলিয়া তুলিব?"

সে জানিত, হারকোর্ট কোন জিনিস পছন্দ করিলে তাহার দাম লইয়া দোকানদারী করিবেন না, অনায়াসে দশ গুণ অধিক মূল্য আদায় হইবে। তদ্ভিন্ন, বাজে জিনিসও তাঁহাকে গতাইয়া-দেওয়া চলিবে, একবার তাঁহার মনে ধরিলেই হইল!—মেট্‌ল্যাণ্ড জাগিয়াই সুখস্বপ্নে বিভোর হইল।

মিঃ ওটিস্ হারকোর্টের সহিত দেখা হইবার পূর্ব্বেই মেট্‌ল্যাণ্ড তাঁহাকে শোষণ করিবার ফন্দি স্থির করিয়া ফেলিল!

লাইনের অপর দিকে মিঃ ওটিস্ হারকোর্ট অদ্ভুত মুখ-ভঙ্গি করিয়া হাসিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া কেহই বলিতে পারিত না—তিনিই মার্কিণ কোটিপতি মিঃ ওটিস্ হারকোর্ট। যাহারা রোপার ওয়াইল্ডকে চিনিত, তাহারা বলিত—এ যে ওয়াইল্ড! কিন্তু তাহার কথাগুলির 'টান' শুনিয়া তাহাকে আমেরিকান বলিয়াই মনে হয় বটে!

ওয়াইল্ড মৃদু স্বরে বলিল, "রাত্রি এগারটার সময় মেট্‌-ল্যাণ্ডের সঙ্গে দেখা করিবার ব্যবস্থাটা ত পাকা হইয়া গেল; এখন অন্য দিকের অভিনয় বাকি। সেটি এখন শেষ করিয়া ফেলি। এবার আমি অস্কার মেট্‌ল্যাণ্ড।"

এবার সে টেলিফোনে লর্ড ব্ল্যাকউডকে আহ্বান করিল। সে তাঁহার সাড়া পাইয়া বলিল, "আপনাকে পুনর্ব্বার একটু বিরক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছি মাই লর্ড! আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন। আমার কথা আপনার স্মরণ থাকিতে পারে,—আমি নাইট্‌ব্রীজের মেট্‌ল্যাণ্ড, হাঁ, অস্কার মেট্‌ল্যাণ্ড।

লর্ড ব্ল্যাকউড বিরক্তিভরে বলিলেন, "তুমি বর্জ্জিয়া-মঞ্জুষাটি কিনিবার জন্য আবার কি কিছু দাম বাড়াইবার প্রস্তাব করিবে? যদি তুমি সেইরূপ মতলব করিয়া থাক—তাহা হইলে—"

তাঁহার কথায় বাধা দিয়া ওয়াইল্ড বলিল, "আপনি ক্ষণকাল ধৈর্য্য-ধারণ করুন, মাই লর্ড! আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা এক মিনিটের মধ্যেই শেষ করিতে পারিব!—এক মিনিট!"

কণ্ঠস্বর শুনিয়া লর্ড ব্ল্যাকউড মুহূর্ত্তের জন্য সন্দেহ করিতে পারিলেন না যে, বক্তা মেট্‌ল্যাণ্ড নহে, অন্য লোক!

লর্ড ব্ল্যাকউড গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তুমি বলিতে চাও কি?—বিরক্ত করিয়া মারিলে যে!"

ওয়াইল্ড বলিল, "আমার মক্কেলের সঙ্গে ও-সম্বন্ধে

আমার আলোচনা হইয়াছিল; তিনি বলিয়াছেন, আপনি মঞ্জুষাটি বিক্রয় করিলে তিনি উহার মূল্য দশ হাজার গিনি প্রদান করিতে সম্মত আছেন মাই লর্ড! আপনি এই প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশের পূর্ব্বে আমার শেষ কথা শ্রবণ করুন। আপনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলে বুদ্ধিমানের মত কাজ করিবেন, নতুবা পরে আপনাকে আক্ষেপ করিতে হইবে—এ কথা স্মরণ রাখিবেন।"

লর্ড ব্ল্যাকউড সক্রোধ গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "কি? আমাকে আক্ষেপ করিতে হইবে? কিন্তু তোমার কি বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে? আমি তোমাকে ত স্পষ্ট ভাবেই বলিয়াছি—উহা আমার জিনিস, আমি বিক্রয় করিব না; তবে কেন অধিক মূল্যের লোভ দেখাইতেছ?"

ওয়াইল্ড মুখভঙ্গি করিয়া বলিল, "কিন্তু দশ হাজার গিনিও কি—"

লর্ড ব্ল্যাকউড বিকৃত স্বরে বলিলেন, "চুলোয় যাক্ তোমার দশ হাজার গিনি! আমি তোমাকে বলিয়াছি, প্রাচীন স্বর্ণমঞ্জুষাটি বিক্রয় করিবার জন্য ক্রয় করি নাই, কোন মূল্যেই উহা বিক্রয় করিব না। আমার কথা বুঝিতে পারিতেছ না কেন?"

ওয়াইল্ড যেরূপ আশা করিয়াছিল, লর্ড ব্ল্যাকউড সেই পথই অবলম্বন করিয়াছেন বুঝিয়া সে অত্যন্ত উৎসাহিত হইল। লর্ড ব্ল্যাকউডের ধারণা হইল, মেট্ল্যাণ্ডের স্থায় ঝুনা ব্যবসায়ী যখন তাঁহার মঞ্জুষাটি দশ হাজার গিনিতে ক্রয় করিবার জন্য এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে, তখন উহার প্রকৃত মূল্য অনেক অধিক; কোন কারণেই উহা হস্তান্তরিত করিবেন না। এজন্য তিনি সঙ্কল্প করিলেন—

কিন্তু তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া ওয়াইল্ডেরও জিদ বাড়িয়া গেল! সে এবার বলিল, "আমি আমার মক্কেলের পক্ষ হইতে উহার মূল্য বার হাজার গিনি প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি মাই লর্ড! হাঁ, বার হাজার গিনি। আমার প্রস্তাবটি আপনি ধীর ভাবে বিবেচনা করুন, ইহাই আমার উপদেশ। যদি আপনি আমার এই উপদেশ অগ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে আপনাকে সতর্ক করিবার জন্য জানাইতেছি যে—"

ওয়াইল্ডের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ক্রুদ্ধ লর্ড ব্ল্যাকউড কঠোর স্বরে বলিলেন, "কি? কি বলিলে তুমি? রাস্কেল্! তোমার এত সাহস যে, তুমি আমাকে উপদেশ দিতে চাও? আমাকে তুমি সতর্ক করিতেছ? তুমি আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ও-কথা বলিলে এক ঘুসিতে তোমার দাঁতগুলা ভাঙ্গিয়া দিতাম; তোমার পিঠের চামড়াও অক্ষত থাকিত না শূয়ার!"

ওয়াইল্ড বলিল,"আপনি বৃথা তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতেছেন! আমি যে কথা বলিয়াছি, তাহা এক বার কেন, সহস্র বার বলিব। আমি আরও বলিতেছি—লর্ড ব্ল্যাকউড, আপনি জানিয়া রাখুন, আপনি আমার প্রস্তাবে যখন সম্মত হইলেন না, তখন আমি ছলে বলে কৌশলে—যেরূপে পারি, আপনার ঐ স্বর্ণ-মঞ্জুষা হস্তগত করিবই করিব। উহা যতক্ষণ আমার অধিকারে না আসিতেছে, ততক্ষণ আমি এই চেষ্টায় বিরত হইব না। কোন কারণেই নিশ্চেষ্ট হইব না। আমার কথা আপনি বুঝিতে পারিলেন?"

ওয়াইল্ডের এই কথা শুনিয়া লর্ড ব্ল্যাকউড ক্ষেপিয়া উঠিলেন; তিনি কম্পিত স্বরে বলিলেন, "ওরে রাস্কেল্, ওরে স্কাউণ্ড্রেল! আমাকে এই ভাবে ভয়-প্রদর্শন করিতে তোর সাহস হইল? বেশ, তোর যাহা সাধ্য হয় করিস্, আমি সে-জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।"

তিনি উত্তেজনাভরে টেলিফোনের রিসিভার সশব্দে রাখিয়া দিলেন। ওয়াইল্ড বুঝিতে পারিল, তাঁহাকে আর কোন কথা বলিবার উপায় নাই; কিন্তু তাঁহাকে আর কোন কথা বলিবার প্রয়োজনও ছিল না। ওয়াইল্ড মনের আনন্দে হী-হী শব্দে হাসিয়া টেলিফোন-বক্স ত্যাগ করিল।

চতুর্দ্দশ তরঙ্গ

ওয়াইল্ডের অদ্ভুত কার্য্য

রাত্রি ঠিক এগারটার সময় অসকার মেট্ল্যাণ্ড তাহার বাসভবনের পশ্চাৎদ্বারে উপস্থিত হইয়া রোপার ওয়াইল্ডকে সেই স্থানে দণ্ডায়মান দেখিল। সে বুঝিতে পারিল, মিঃ হারকোর্ট তখনই তাঁহার মোটর-কার হইতে নামিয়া আসিয়াছেন; কারণ, একখানি সুবৃহৎ মোটর-কার সেই মুহূর্ত্তেই সেই স্থান হইতে দূরে প্রস্থান করিল। ওয়াইল্ডের বেশ-ভূষা দেখিলে তাহাকে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি

বলিয়াই মনে হইত; সুতরাং অস্‌কার মেট্‌ল্যাণ্ডের গৃহে আসিবার সময় তাহার বাহ্যাড়ম্বরের প্রয়োজন হয় নাই। তাহার ছদ্মবেশেরও বৈশিষ্ট্য ছিল না। সে জানিত, মেট্‌ল্যাণ্ড তাহাকে চিনিতে পারিবে না।

তাহাকে দেখিয়া মেট্‌ল্যাণ্ড বলিল, "আসুন মিঃ হারকোর্ট, ভিতরে আসুন; আমি আপনারই প্রতীক্ষা করিতেছি।"

ওয়াইল্ডের পরিধানে তখন একটি সুদৃশ্য ডিনার-সুট, এবং তাহার উপর চেকের ওভার-কোট ছিল; মাথায় নরম হ্যাট, এবং চক্ষুতে শিং-বাঁধানো এক জোড়া রঙ্গীন চশমা। মেট্‌ল্যাণ্ড তাহাকে একবার মাত্র দেখিয়াছিল—যে দিন সে তাহার দোকানের কাচের জানালা ভাঙ্গিয়া দোকানে প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু সে সময় তাহার মুখের প্রতি মেট্‌ল্যাণ্ডের তেমন লক্ষ্য ছিল না; নিজের ক্ষতির চিন্তাতেই সে তখন বিভোর। বিশেষতঃ, ওয়াইল্ডের চেহারায় এরূপ মার্কিণী ভাব ছিল যে, তাহাকে দেখিবামাত্র প্রকৃত ওটিস্ হারকোর্ট বলিয়াই মেট্‌ল্যাণ্ডের ধারণা হইল। মেট্‌ল্যাণ্ড তাহাকে সঙ্গে লইয়া নির্জ্জন খাস-কামরায় প্রবেশ করিল। ওয়াইল্ড ইহা তাহার সঙ্কল্পসিদ্ধির অনুকূল বলিয়াই মনে করিল।

ওয়াইল্ড সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া ক্ষুব্ধভাবে বলিল, "দেখুন মিঃ মেট্‌ল্যাণ্ড, এইরূপ অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিতে হইল, এ জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত। নিয়মনিষ্ঠা এবং আদব-কায়দা সম্বন্ধে আমাদের—আমেরিকানদের কিঞ্চিৎ শৈথিল্যই লক্ষিত হয়। আমাদের ঘাড়ে যখন কাজ আসিয়া পড়ে, তখন সেটি সময় কি অসময়—সে দিকে আমাদের দৃষ্টি থাকে না। আমার আশঙ্কা—আপনারা বৃটিশাররা আমাদের মনের ভাব সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না।"

মেট্‌ল্যাণ্ড তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল, "না মিঃ হারকোর্ট, ও-একটা কথাই নয়। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি—আমাদের মধ্যেও অনেক লোককে আপনি ঠিক আপনার মতাবলম্বীই দেখিতে পাইবেন। কাজ সকল সময়েই কাজ। কাজের জন্য আপনি যদি শেষ-রাত্রিতে আমার ঘুম ভাঙ্গাইতেন, তাহা হইলেও আমি বিনা-আপত্তিতে আপনার আদেশ পালন করিতে বসিতাম। কাজের খাতিরে চোখে জল দিয়া ঢুলুনী বন্ধ করিতাম। কাজ কি কখন বন্ধ থাকিতে পারে? আপনারা কোন কারণে তাহা বন্ধ রাখেন না বলিয়াই আজ আপনারা সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে—হী—হী!"

মেট্‌ল্যাণ্ডের তৈলদানের ঘটা দেখিয়া ওয়াইল্ডের মুখেও হাসি আসিল। সে মুখ টিপিয়া হাসিল; তাহার পর বলিল, "এই রকম কথাই আমি শুনিতে ভালবাসি মিঃ মেট্‌ল্যাণ্ড! কিন্তু আমাদের আসল কথা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে আপনি কি আমার সঙ্গে কিঞ্চিৎ পানানন্দে যোগদানে আপত্তি—"

কথাটা শেষ করিবার পূর্ব্বেই ওয়াইল্ড তাহার পকেট হইতে একটি ফ্লাস্ক টানিয়া অর্দ্ধেক বাহির করিল। তাহা দেখিয়া মেট্‌ল্যাণ্ড তাড়াতাড়ি বলিল, "ও-কি করিতেছেন? না, না, আপনি উহা বাহির করিতে পারিবেন না। আপনি আমার অতিথি, অতিথি সেবার গৌরবটুকুতে আপনি আমাকে বঞ্চিত করিবেন না। আপনার ঐ ফ্লাস্কটা সরাইয়া রাখুন।"

অতঃপর মেট্‌ল্যাণ্ড তাহার কাবোর্ডের নিকট উঠিয়া-গিয়া হুইস্কি, ব্র্যাণ্ডি, লিকারস্, সোডা ও গ্লাস বাহির করিয়া আনিল।

তাহা দেখিয়া ওয়াইল্ড বলিল, "আমি কিন্তু হুইস্কিরই ভক্ত; আপনি কোন্ পানীয়ের পক্ষপাতী, তাহা আমার অজ্ঞাত।—আর এক কথা, আপনার ঘরের ঐ কোণে দৃষ্টিপাত করিয়া যে টেবিলখানি দেখিলাম—ওখানি অতি অদ্ভুত জিনিস নয়? ঐ রকম একটি মনের মত জিনিস আমি বহু দিন হইতে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি!"

মেট্‌ল্যাণ্ড ওয়াইল্ডের কথা শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া মুহূর্ত্তের জন্য সেই টেবিলখানার দিকে চাহিল। সেই এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই ওয়াইল্ড এক অদ্ভুত কার্য্য করিল! সে দুই অঙ্গুলীর ফাঁক হইতে একটি অতি ক্ষুদ্র বড়ি ট্রের উপরে সংরক্ষিত গ্লাস-দুইটির একটির ভিতর নিক্ষেপ করিল।

মেট্‌ল্যাণ্ড ধীরে ধীরে বলিল, "ঐ টেবিলের কথা বলিতেছেন? হ্যাঁ, এ-কালে ও-জিনিস দুর্লভই বটে, বহু দিন পূর্ব্বে আমি উহা অনেক চেষ্টায় সংগ্রহ করিয়াছিলাম। ঐ টেবিলখানি গ্রহণের যোগ্য বলিয়া আপনার মনে ধরিয়াছে মিঃ হারকোর্ট?"

ওয়াইল্ড মাথা ঝাঁকাইয়া বলিল, "হাঁ, বলিলাম ত বহু দিন হইতে ঐরূপ সামগ্রী সংগ্রহের চেষ্টা করিয়া আসিতেছি, কিন্তু জুটাইতে পারি নাই। কে জানিত, আপনার ঘরে আসিয়াই উহা দেখিতে পাইব ?"

ওয়াইল্ডের কথা শুনিয়া মেট্‌ল্যাণ্ডের মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। টেবিলখানি সুদৃশ্য হইলেও উহার শিল্প-নৈপুণ্যে কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না, এবং তাহা প্রাচীনও নহে; আধুনিক ও নিতান্ত সাধারণ আসবাব। মেট্‌ল্যাণ্ড ভাবিল—মার্কিণ কোটিপতি যখন এই টেবিল পছন্দ করিতেছেন, তখন সে উহা তাঁহাকে বিক্রয় করিয়া ভাল রকম দাঁও মারিতে পারিবে; উহার কুড়িগুণ মূল্য সে আদায় করিতে পারিবে—সন্দেহ নাই। আমেরিকানরা মনে করে, তাহারা অত্যন্ত চতুর, কিন্তু কত সহজে তাহাদিগকে ঠকাইতে পারা যায় !

ওয়াইল্ড একটি গ্লাস ট্রের উপর হইতে তুলিয়া-লইয়া বলিল, "আমাদের এই মিলন যেন সার্থক হয়।"—সে গ্লাসের হুইস্কিটুকু নিঃশেষ করিয়া বলিল, "কি চমৎকার চিজই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন! এ খাঁটি মালই বটে।"

ওয়াইল্ড যে গ্লাসের ভিতর বড়িটি নিক্ষেপ করিয়াছিল, মেট্‌ল্যাণ্ড এবার সেই গ্লাসটি তুলিয়া-লইয়া হুইস্কিটুকু পান করিল; তাহার পর গ্লাস নামাইয়া-রাখিয়া চেয়ারে সোজা হইয়া বসিয়া ওয়াইল্ডকে বলিল, "মিঃ হারকোর্ট, আমার বিশ্বাস যে,—আমি—আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি,—হঠাৎ আমি কেমন অসুস্থ বোধ করিতেছি ! সম্ভবতঃ অস্বাভাবিক উত্তেজনায় আমার—আমার—"

তাহার মুখ হইতে আর কোন কথা বাহির হইল না। সে হঠাৎ চেয়ারের উপর কাত হইয়া পড়িল; তাহার দেহ অসাড়, নিস্পন্দ !

ওয়াইল্ড তাহার মুখের দিকে চাহিয়া এক মিনিট স্থির ভাবে বসিয়া রহিল। মেট্‌ল্যাণ্ডের চেতনা বিলুপ্ত হইলেও সে আরও এক মিনিট প্রতীক্ষা করাই সঙ্গত মনে করিল। তাহার পর সে মেট্‌ল্যাণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "আমি ত ইহাই চাই; তোর অবস্থা দেখিয়া আমার এক বিন্দু দয়া হইতেছে না। বেটা বদমায়েস !"

ওয়াইল্ড যাহা আশা করিয়াছিল, তাহাই হইল। মেট্‌ল্যাণ্ড যে হুইস্কি পান করিল, ওয়াইল্ড তাহার ভিতর চেতনানাশক বড়ি ফেলিয়াছিল; মেট্‌ল্যাণ্ড তাহা বুঝিতে পারে নাই। সেই বড়িটি বিষাক্ত না হইলেও ওয়াইল্ড জানিত, তাহার প্রভাবে অন্যূন চল্লিশ মিনিট মেট্‌ল্যাণ্ডের বাহ্যজ্ঞান-রহিত হইবে; ইহা ভিন্ন তাহার অন্য কোন অনিষ্ট ঘটিবার আশঙ্কা ছিল না। যদি মেট্‌ল্যাণ্ড ঐ সময়টুকু অচেতন থাকে, তাহা হইলেই ওয়াইল্ড তাহার গুপ্ত-সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবে—এ বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল না।

ওয়াইল্ড বলিল, "এইবার কাজ আরম্ভ করি।"—সে জানিত, মেট্‌ল্যাণ্ড সে সময় সেই কক্ষে একাকী ছিল, অন্য কেহ তাহার কাজ লক্ষ্য করিবে না; তথাপি সে একবার সতর্ক ভাবে সেই কক্ষ পরীক্ষা করিল; তাহার পর সে মেট্‌ল্যাণ্ডের পদপ্রান্তে বসিয়া তাহার পা হইতে জুতা-জোড়াটা খুলিয়া লইল, এবং জুতার ভিতর বাহির পরীক্ষা করিয়া দেখিল। অনন্তর সে সেই জুতা জোড়াটা নিজে পরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং দুই-এক পা চলিয়া দেখিল।

ওয়াইল্ড অস্ফুট স্বরে বলিল, "পায়ে একটু আঁট হইয়াছে; তা হউক, কোন রকমে কাজ উদ্ধার করিতে পারিব।"

অতঃপর ওয়াইল্ড পকেট হইতে নোট-বহি বাহির করিয়া তাহার একখানা পাতা ছিঁড়িয়া লইল। এই সময় ওয়াইল্ডের উভয় করতল ও অঙ্গুলিগুলি সুকোমল সাময়-চর্ম্মের দস্তানা দ্বারা আবৃত ছিল। সে মেট্‌ল্যাণ্ডের একখানি হাত টানিয়া লইয়া টেবিলের উপর সংরক্ষিত সেই কাগজখানির উপর রাখিল, এবং সেই কাগজের উপর তাহার আঙ্গুলগুলি সজোরে চাপিয়া ধরিল।

ওয়াইল্ড খুসী হইয়া বলিল, "দেখা না যাক, কিন্তু এই চাপে কাগজখানার উপর ঐ আঙ্গুলগুলার যে ছাপ পড়িয়াছে, তাহাতেই আমার কাজ চলিবে।"

সে কাগজখানি মুড়িয়া একখান লেফাপায় পুরিল; তাহার পর সেই লেফাপা সতর্ক ভাবে পকেটে রাখিল।

এবার ওয়াইল্ড আর একটা অদ্ভুত কাজ করিল। সে মেট্‌ল্যাণ্ডের সার্টের ডান হাতের আস্তিন হইতে কনুই

পর্য্যন্ত প্রসারিত অংশের কাপড় টানিয়া ছিঁড়িয়া লইল। আস্তিন দেখিলে মনে হইত, কোন গঁজালে বাধিয়া টান পড়ায় তাহা ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

ওয়াইল্ড মাথা নাড়িয়া বলিল, "চমৎকার! ইহাতেই কাজ চলিবে।"

ওয়াইল্ড এবার মেট্ল্যাণ্ডের পকেট হইতে তাহার চাবির গোছা বাহির করিয়া লইল। সে মেট্ল্যাণ্ডকে তাহার চেয়ারে বসাইয়া রাখিয়াই, যে ভাবে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই ভাবেই সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল। সে মেট্ল্যাণ্ডের গৃহত্যাগের পূর্ব্বেই তাহার চাবিগুলি পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিল, একটি চাবি তাহার সঙ্কল্পসিদ্ধির সহায় হইবে।

ওয়াইল্ড অতঃপর নাইট্‌স ব্রীজে গমন করিয়া শ্লোন ষ্ট্রীটে প্রবেশ করিল। সে তাড়াতাড়ি চলিতেছিল; কিন্তু অন্য লোক দৌড়াইলেও তাহার সঙ্গে সমান তালে চলিতে পারিত না; সুতরাং তাহার দৌড়াইবার প্রয়োজন হয় নাই। এক মিনিটও অপব্যয় হয়, এরূপ তাহার ইচ্ছা ছিল না।

শ্লোন ষ্ট্রীটে প্রবেশ করিবার অব্যবহিত পরেই ওয়াইল্ড শ্লোন-স্কোয়ারের সন্নিহিত একটি নিভৃত অট্টালিকার নিকট উপস্থিত হইল। সে দিবাভাগে এই স্থানটি পরীক্ষা করিয়াছিল; এ জন্য কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে তাহার কোন অসুবিধা হইল না।

সে যখন লর্ড ব্ল্যাকউডের বাসভবনের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন রাত্রি এগারটা কুড়ি মিনিট। সেই অট্টালিকার বিভিন্ন বাতায়ন হইতে কক্ষস্থিত দীপালোক লক্ষিত হইতেছিল, কিন্তু ওয়াইল্ড সে জন্য চিন্তিত হইল না।

সেই অট্টালিকার পাশে একটি সঙ্কীর্ণ পথ ছিল; পথের ধারে পাঁচ ফুট উচ্চ প্রাচীর। ওয়াইল্ড এক লম্ফে সেই প্রাচীরের মাথায় উঠিয়া তৎক্ষণাৎ ভিতরে নামিয়া পড়িল। তাহার পর সে আঙ্গিনা অতিক্রম করিয়া যে সকল বাতায়ন-পথে দীপালোক দেখিতে পাইল, সেই সকল বাতায়নের মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা দুরারোহ, সেই বাতায়নটিতে প্রবেশ করিবার জন্য তাহার আগ্রহ হইল। সেই বাতায়নটি বৃহৎ, এবং তাহা স্থূল গরাদে দ্বারা সুরক্ষিত। ওয়াইল্ড সেই বাতায়নের নীচে আসিয়া যে পথ দেখিতে পাইল, তাহা ভিজা লাল সুরকী দ্বারা আবৃত ছিল।

ওয়াইল্ড সেই সুরকীর উপর দিয়া এ ভাবে চলিতে লাগিল যে, সুরকীগুলির উপর জুতার দাগ সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিল। সে অতঃপর এক লম্ফে জানালাটির ধারীর উপর উঠিয়া তাহার গরাদগুলি দুই হাতে চাপিয়া ধরিল। সে মনে মনে বলিল, "লোকে জানালায় এই সকল গরাদে লাগাইয়া কিরূপে নির্ভয়ে বাস করে? এই গরাদেগুলা আঙ্গুলের চাপে পাকাটির মত সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়!"

ওয়াইল্ডের দেহে অসাধারণ শক্তি ছিল। সে এক জোড়া গরাদে ধরিয়া হ্যাঁচকা টান দিতেই তাহা বাঁকা হইয়া চৌকাট হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তখন সে তাহা উর্দ্ধে ঠেলিয়া-তুলিয়া যে ফাঁক পাইল, তাহার ভিতর দিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। সে বুঝিতে পারিল লর্ড ব্ল্যাকউড তখনও জাগিয়া ছিলেন, এবং তাঁহার লাইব্রেরী বা ড্রয়িং-রুমে বসিয়া অতিথি-সৎকার করিতেছিলেন; কিন্তু ওয়াইল্ড সে জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তিত হইল না। সে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বৈদ্যুতিক টর্চ্চের আলোকে চারি দিক্ দেখিতে লাগিল।

ওয়াইল্ড যে কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাই লর্ড ব্ল্যাকউডের ধনাগার। সেই কক্ষে যে সকল মূল্যবান্ বহু-প্রাচীন দ্রব্য-সামগ্রী ছিল, তাহা কোন সাধারণ তস্করের লুব্ধদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিত না; কারণ, সেই সকল ভারী দ্রব্যের কোনটি স্থানান্তরিত করা সহজসাধ্য ছিল না। এতদ্ভিন্ন, কতকগুলি দ্রব্য এরূপ যে, কোন তস্কর সেগুলি চুরি করিতে পারিলেও তাহা বিক্রয়ের জন্য ক্রেতা সংগ্রহ করিতে পারিত না।

লর্ড ব্ল্যাকউডের ধারণা ছিল—কোন দস্যু-তস্কর বাহির হইতে সেই সুরক্ষিত-কক্ষে প্রবেশ করিতে পারিবে না; কিন্তু ওয়াইল্ড তাঁহার এই ধারণা অসার প্রতিপন্ন করিল। সে সেই কক্ষস্থ দ্রব্যরাজি পরীক্ষা করিতে লাগিল। সে কাচের আলমারিগুলির ভিতর প্রাচীন কালের বিবিধ দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা, বাসন ও তৈজসপত্র, এবং অদ্ভুত আকারের অস্ত্র-শস্ত্র দেখিতে পাইল। সে সেই কক্ষের চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। অবশেষে সেই কক্ষের এক

প্রান্তে তাহার অভিলষিত দ্রব্যটি দেখিতে পাইল। একটি বৃহৎ আলমারির ভিতর বৰ্জ্জিয়া স্বর্ণ-মঞ্জুষা সংরক্ষিত ছিল।

কাচের আলমারির ডালা বন্ধ ছিল। ওয়াইল্ড সেই কাচের ডালা অনায়াসেই ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিত; কিন্তু সে তাহা না করিয়া পকেট হইতে ইস্পাত-নির্ম্মিত একটি সূক্ষ্মাগ্র যন্ত্র বাহির করিয়া তাহার সাহায্যে আলমারি খুলিয়া ফেলিল, এবং তাহার ভিতর হইতে স্বর্ণ-মঞ্জুষাটি বাহির করিয়া অদূরবর্ত্তী টেবিলের উপর রাখিয়া দিল।

অতঃপর সে আলমারি বন্ধ করিয়া ঠিক কুড়ি মিনিটের মধ্যেই অস্কার মেট্‌ল্যাণ্ডের গৃহে প্রত্যাগমন করিল। স্বর্ণ-মঞ্জুষাটি লর্ড ব্ল্যাক্‌উডের গৃহ হইতে সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিতে তাহার কুড়ি মিনিট সময়ের প্রয়োজন হইত না; কিন্তু লর্ড ব্ল্যাকউডের গৃহ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে সেখানে তাহাকে দুই একটি কাজ শেষ করিয়া আসিতে হইয়াছিল। সে জানিত, সেই সকল কার্য্য তাহার সঙ্কল্পসিদ্ধির অনুকূল; এই জন্যই সে তাহা উপেক্ষা করিতে পারে নাই।

ওয়াইল্ড মেট্‌ল্যাণ্ডের কক্ষে ফিরিয়া-আসিয়া দেখিল, মেট্‌ল্যাণ্ড সেই একই ভাবে চেয়ারে বসিয়া জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলিতেছিল। ওয়াইল্ড চারি দিকে চাহিয়া পা হইতে জুতা খুলিয়া-লইয়া মেট্‌ল্যাণ্ডের পায়ে পূর্ব্ববৎ পরাইয়া দিল, এবং নিজের জুতা পায়ে দিয়া দুই-একটি কাজ করিতে আরও পাঁচ মিনিট কাটিয়া গেল।

এইবার ওয়াইল্ড মেট্‌ল্যাণ্ডের সম্মুখে বসিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "আরও এক মিনিট, বুড়া, আর এক মিনিট মাত্র; তাহা হইলেই তুমি চেতনা লাভ করিবে।" সে ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল, "হুম্, বারটা বাজিতে আর পাঁচ মিনিট বাকি! বন্ধু মেট্‌ল্যাণ্ড জাগিয়া-উঠিয়া ঘড়ির দিকে চাহিলেই বুঝিতে পারিবে, অনেক সময় কাটিয়া গিয়াছে! তাহা উহাকে বুঝিতে দেওয়া হইবে না। আমি এখনই ইহার প্রতিকার করিতেছি। উহার মনে কোন রকম সন্দেহ না হয়—তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইতেছে।"

ওয়াইল্ড মেট্‌ল্যাণ্ডের হাতের ঘড়ির কাঁটা ঘুরাইয়া সময়টা এগারটা দশ মিনিট করিয়া রাখিল, এবং মেট্‌ল্যাণ্ডের ম্যাণ্টলপিসের উপর যে ক্লকটা ছিল, তাহারও কাঁটা সরাইয়া এগারটা দশ মিনিট করিল।

ওয়াইল্ড মনে মনে বলিল, "ঘড়ির কাঁটা এই ভাবে পিছাইয়া দেওয়া হইল, ইহা পরে ধরা পড়িবে, কিন্তু উপায় নাই; যথানিয়মে কাঁটা ঘুরাইয়া সময় পরিবর্ত্তন করি সে সুযোগ এখন নাই, তাহা সময়-সাপেক্ষ। আমি যাহা করিলাম, তাহাতেই আপাততঃ সন্দেহের কোন কারণ থাকিবে না।"

ওয়াইল্ড তাহার চেয়ারে বসিয়া মেট্‌ল্যাণ্ডের মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিল—তাহার চেতনা-সঞ্চারের আর অধিক বিলম্ব নাই। তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হইয়া আসিয়াছে। সে মেট্‌ল্যাণ্ডের হাঁটুতে হাতের গুঁতা দিয়া সশব্দে কাসিয়া উঠিল। সে জানিত, সে যে মাদক দ্রব্য প্রয়োগে মেট্‌ল্যাণ্ডের সংজ্ঞা বিলুপ্ত করিয়াছিল, চেতনা-সঞ্চারের পর সে তাহার কোন প্রভাব অনুভব করিতে পারিবে না;—তাহার মস্তিষ্কে কোনরূপ যন্ত্রণা বোধ করিবে না, বা মাথা ভার হইবে না।

এই চেতনা-নাশক মাদক দ্রব্যটিতে কোকেনের বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান ছিল। নেশা ছাড়িলেও মন উৎসাহে পূর্ণ হইত, এবং দেহে বিন্দুমাত্র অবসাদের লক্ষণ বুঝিতে পারা যাইত না।

মেট্‌ল্যাণ্ড নয়ন উন্মিলন করিয়া চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিল। তাহার দৃষ্টিতে গভীর বিস্ময় পরিস্ফুট! সে সেই মুহূর্ত্তে সম্মুখে চাহিতেই ওয়াইল্ডকে তাহার হাতের গ্ল্যাসটি টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিতে দেখিল।

ওয়াইল্ড পূর্ব্ব-মন্তব্যের অনুসরণ করিয়া বলিল, "হাঁ মিঃ মেট্‌ল্যাণ্ড, এ খাঁটি স্কচই বটে! এ জিনিস আপনি কোথায় সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা আমাকে বলিবেন কি? আমি বাজী রাখিয়া বলিতে পারি,—এ দেশের জনসাধারণ যে সকল মার্কার হুইস্কির বোতল সংগ্রহ করে, সেগুলিতে এ জিনিস থাকে না।"

তাহার কথা শুনিয়া মেট্‌ল্যাণ্ড স্খলিত স্বরে বলিল, "মিঃ হারকোর্ট, আমি—আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমি বুঝিতে পারিতেছি, মুহূর্ত্তের জন্য যেন আমার বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়াছিল! কেমন, আমার এ কথা কি সত্য নহে?"

ওয়াইল্ড তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "মিঃ মেট্‌ল্যাণ্ড, আমার মনে হইতেছে, আপনি

হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন ; এ অবস্থায় আপনার সঙ্গে কোন কথার আলোচনা করা এখন সঙ্গত হইবে না। আমি স্বীকার করি, এ জন্য আমিই দায়ী ! এ রকম অসময়ে আপনার সঙ্গে আলাপ করিতে আসা আমার উচিত হয় নাই। এ অবস্থায় যদি আমি কাল সকালে আসিয়া আপনার সঙ্গে সকল কথার আলোচনা করি, আশা করি, তাহাই আপনি সঙ্গত বলিয়া মনে করিবেন।"

মেট্‌ল্যাণ্ড ব্যগ্রভাবে বলিল, "না, না, আমি স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছি ; আমার এ কথায় আপনি নির্ভর করিতে পারেন। আমি কি কারণে সহসা এ ভাবে বাহ্যজ্ঞানরহিত হইয়াছিলাম—তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না মিঃ হারকোর্ট! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন ; আপনি যখন আসিয়াছেন, তখন আজ রাত্রেই আমরা সকল কথা শেষ করি—ইহাই সঙ্গত বলিয়া—"

ওয়াইল্ড তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "না, আজ থাক। আমি এখন আমার ভ্রম বুঝিতে পারিতেছি। আমি সকালেই আসিয়া আপনার সঙ্গে দেখা করিব। সকালে কোন্ সময় আপনার সুবিধা হইবে? সাড়ে দশটার সময় আপনার সুবিধা হইবে কি?—সেই ভাল। এই কথাই ঠিক থাকিল।"

মেট্‌ল্যাণ্ড এই প্রস্তাবে আপত্তি উত্থাপনের চেষ্টা করিল ; কিন্তু ওয়াইল্ড এরূপ দৃঢ়তা প্রদর্শন করিল যে, অস্কার মেট্‌ল্যাণ্ডের সকল আপত্তিই ভাসিয়া গেল। ওয়াইল্ড তাহার নিকট বিদায়-গ্রহণের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল, মেট্‌ল্যাণ্ড তাহাকে আর বাধা দিতে পারিল না।

পাঁচ মিনিট পরে মেট্‌ল্যাণ্ড ওয়াইল্ডকে বিদায় দান করিয়া অত্যন্ত বিরক্তিভরে তাহার খাস-কামরায় ফিরিয়া আসিল। তাহার মন তখন নিদারুণ অশান্তিপূর্ণ ; কিন্তু সে হতাশ হইল না। তাহার ধারণা হইল, মিঃ হারকোর্ট পরদিন প্রভাতে নিশ্চিতই তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবেন ; তখন সে তাঁহাকে তাঁহার অভিলষিত দ্রব্যগুলি গছাইয়া দিয়া দাঁও মারিতে পারিবে। এক রাত্রি বিলম্বে আর কি ক্ষতি হইবে ?

এবার মেট্‌ল্যাণ্ড তাহার হাতের ঘড়ির দিকে চাহিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "এগারটা বাজিয়া আঠার মিনিট! কিন্তু পথের দিকে চাহিয়া মনে হইতেছে, রাত্রি আরও বেশী হইয়াছে। পথ সম্পূর্ণ নির্জ্জন দেখিলাম ; রাত্রি স-এগারটা বা সাড়ে-এগারটার সময় পথ ত এমন নির্জ্জন হয় না!

অতঃপর সে ম্যাণ্টল্‌পিসে সংস্থাপিত ক্লক ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিল। তাহার হাতের ঘড়ির সঙ্গে ক্লকের সময়ের কোন পার্থক্য লক্ষিত হইল না। ওয়াইল্ড কর্ত্তৃক সে যে প্রতারিত হইয়াছে, এ সন্দেহ তাহার মনে স্থান পাইল না। সন্দেহেরই বা কি কারণ ছিল ?

[ক্রমশঃ

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

ভুল্‌তে চাওয়া

চোখের জলে বিদায় ক'রে দিয়েছি আমি যারে
ভুলেছি যার স্মৃতি,
কেন সে তার পাগল-করা কোমল বাহুলতা
বাড়ায় নিতি নিতি!
ধর্‌তে যারে চেয়েছিলাম—সকল প্রাণ দিয়ে
বুকের শিহরণে ;
হৃদয় যে তার দেয়নি ধরা—চপল-মৃগ সম
পলায় অকারণে।

আজ কেন গো হারিয়ে-যাওয়া গোপন দিনের গীতি
নিত্য সকাল-সাঁঝে ;
দেয়নি ধরা যে জন ওগো, তারি ব্যথার স্মৃতি
নিঠুর হ'য়ে বাজে!
ভুল্‌তে যারে চেয়েছিলাম সারা জীবন ধ'রে
তারি আঁখির জল,
বুঝিয়ে দিল ভুল্‌তে-চাওয়া সে যে বিষম ভুল—
এ যে ভোলার ছল্!

শ্রীনকুলেশ্বর পাল (বি-এল্)।

আদর্শ শিল্পে মূলধন-যোগান প্রতিষ্ঠান

বর্ত্তমান মহাবিপ্লবের অবসানে যখন শান্তির শাসন ফিরিয়া আসিবে, তখন বিপ্লবের বিপুল ধ্বংস ও ক্ষতিপূরণ এবং ভাবী সম্ভাব্য অভাব-অনাটন নিবারণ ও নিরাকরণ নিমিত্ত বিপুল, বিরাট্ ও ব্যাপক শিল্প-প্রচেষ্টা প্রবর্ত্তিত হইবে। এই শিল্প-প্রচেষ্টাকে সাফল্য-মণ্ডিত করিবার নিমিত্ত প্রয়োজন হইবে—শিল্প-প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের প্রথম ও প্রধান উপকরণ মূলধন।

আমরা পূর্ব্বে একটি প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, কিরূপে বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে যে বিপুল শিল্প-প্রচেষ্টা ভারতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা ব্যর্থ হইয়াছিল। উপযুক্ত পরিমাণ কার্য্যকরী মূলধনের অভাব ও অনাটনই ছিল ঐ বিফলতার প্রধান কারণ। শিল্পোদ্যমের মোহে উৎসাহিত ও আকৃষ্ট হইয়া বহু লোক স্বল্প অথবা অপ্রচুর মূলধন লইয়া যৌথ-কারবার আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ-রক্ষা করিতে পারেন নাই।

অংশবিক্রয়-লব্ধ অর্থে প্রারম্ভের সকল অনুষ্ঠান নির্ব্বাহ করিয়া, কার্য্যারম্ভ হইতে উৎপন্ন-দ্রব্যের বিক্রয়-লব্ধ অর্থাগম পর্য্যন্ত যে কার্য্যকরী মূলধনের অভাব অথবা অনাটন ঘটে, তাহার ফলে অনেক আশাপ্রদ ও কল্যাণকর শিল্প উন্নতির সূচনা-মুখেই নষ্ট হইয়াছিল।

শিল্প-প্রচেষ্টার এই সন্ধিস্থলে প্রয়োজন,—দীর্ঘ অথবা মধ্যম-মেয়াদী ঋণ। ভারতবাসী-পরিচালিত স্বদেশী শিল্পের পক্ষে এই অতি-প্রয়োজনীয় ঋণ সংগ্রহ করা দুর্ঘট। বণিজ-ধন-প্রতিষ্ঠানগুলি (Commercial Joint Stock Banks) স্বল্প-মেয়াদী ঋণ দিতে পারে, কিন্তু তাহাতে দায় উদ্ধার দূরের কথা, সম্যক্ অভাব পূরণও ঘটে না। লব্ধপ্রতিষ্ঠ, বিত্তশালী, অথবা সহায়সম্পন্ন বৈদেশিক প্রবর্ত্তক বা তত্ত্বাবধায়কমণ্ডলীর অর্থের অভাব ঘটে না; কিন্তু ভারতবাসী-পরিচালিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষকে বিষম সঙ্কটে পড়িতে হয়। সরকারী সাহায্য সংগ্রহ দুষ্কর। ভারতীয় মূলধন কূর্ম্ম-স্বভাবসম্পন্ন। নিরাপত্তার নিমিত্ত স্বল্প সুদে এই অর্থ এমন দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে যে, কোম্পানীর কাগজ, সরকারী ঋণ, আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের খৎ কিংবা স্থাবর সম্পত্তির কবল হইতে ইহাকে মুক্ত করা দুঃসাধ্য।

এ যাবৎ ভারতে যে সকল বৃহৎ শিল্পানুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহার মূলে আছে—বিদেশীয় মূলধন। বিদেশীয় মূলধন প্রয়োজন; কিন্তু বিদেশীয় মূলধনের একাধিপত্য হইলে শিল্প-শাসনের সমস্ত কর্ত্তৃত্ব বিদেশীরই হস্তগত হয়। সুতরাং, স্বদেশী মূলধন যথেষ্ট পরিমাণে প্রযুক্ত করিতে না পারিলে, কেবল মাত্র অথবা মুখ্যতঃ স্বদেশের কল্যাণ-কল্পে স্বদেশী শিল্প পরিচালন করা সম্ভব নহে।

ভারতবর্ষের শিল্প-সম্পদ অসীম; লোকসংখ্যাও বিপুল। সুতরাং শ্রমিকের ও ক্রেতার অভাব নাই। কিন্তু ভারতবাসী অতি দরিদ্র; এ দেশে ধনাঢ্যের সংখ্যা যেমন অল্প, ধনহীনের সংখ্যা তেমনি অধিক। যাহাদিগকে আমরা মধ্যবিত্ত বলি, তাহারাও নিঃস্ব। তথাপি সকলেরই কিছু না কিছু অর্থ-সামর্থ্য আছে। সমবায়-নীতিকে ভিত্তি করিয়া এই অর্থ-সামর্থ্যকে একত্র সংযুক্ত করিতে পারিলে আশাতীত মূলধনের সমাবেশ হইতে পারে।

নির্ভয়ে এবং নির্ভাবনায় যাহাতে ধনী-নির্ধন সকলেই যাহার যতটুকু উদ্বৃত্ত, এই শিল্প-প্রচেষ্টায় নিয়োজিত করিতে পারে, তাহারই উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। সে উপায়—বিশিষ্ট ধন-প্রতিষ্ঠান। সাধারণ বণিজ-ধন-প্রতিষ্ঠান (Commercial Banks) নহে; বিশিষ্ট শিল্প-ধন-প্রতিষ্ঠান (Industrial Banks)।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বিগত মহাযুদ্ধের অবসানের পূর্ব্বে, ভারতীয় শিল্প-তদন্তসমিতি, তদানীন্তন প্রগতিশীল টাটা-শিল্প-ধন-প্রতিষ্ঠানের ন্যায় প্রতিষ্ঠানের প্রশংসা করিয়া, কেবল মাত্র শিল্প-সমুন্নয়নের নিমিত্ত প্রাদেশিক

শিল্প-ধন-প্রতিষ্ঠান-প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করিয়াছিলেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের বৈদেশিক মূলধন-তদন্ত-সমিতি এবং ১৯৩০-৩১ খৃষ্টাব্দের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ধন-বিনিয়োজন সমিতি-গুলিও ঐ সুপারিশের সমর্থন করিয়াছিলেন।

বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে, জাপানের শিল্প-ধন-প্রতিষ্ঠানই ছিল একমাত্র ঐ শ্রেণীর অভ্যুদয়শীল প্রতিষ্ঠান। কয়েক বৎসরের মধ্যে জাপান যে শিল্প-বাণিজ্য-জগতে অতুল আত্ম-মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহা এই শিল্প-ধন-প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে। কিন্তু এ কথাও স্মরণ করিতে হইবে যে, এই শিল্প-ধন-প্রতিষ্ঠানের পশ্চাতে জাপানের রাষ্ট্র-শক্তির সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। রাষ্ট্রতন্ত্রের সক্রিয় সাহায্য, জাপানী ধনকুবেরগণের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা এবং জাপানী বীমা-প্রতিষ্ঠানগুলির শিল্প-প্রতিষ্ঠানে অর্থ-বিনিয়োজন ব্যতীত, ক্ষুদ্র জাপান ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এরূপ বিস্ময়াবহ শিল্পোন্নতি-সাধনে কখনই সমর্থ হইত না।

এই শিল্পে ধন-বিনিয়োজন প্রক্রিয়া-প্রবর্ত্তনে জাপানের শিল্প-ধন-প্রতিষ্ঠানেরও দুইটি পূর্ব্ববর্ত্তী প্রতিষ্ঠান ছিল। ক্ষুদ্র বেলজিয়ামে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে এইরূপ প্রথম প্রতিষ্ঠানের অভ্যুদয় হয়। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে তাহার অনুসরণ করে ফরাসী, কিন্তু বর্ত্তমানে সে প্রসঙ্গের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

শিল্প-সমুন্নয়নকল্পে জার্ম্মাণীর ধন-প্রতিষ্ঠানগুলির যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা আছে, এবং তাহারা যথার্থ কল্যাণকর কর্ম্মের দ্বারা সেই প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছে। প্রাচীন কালে জার্ম্মাণী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড-রাজ্যের সমষ্টী ছিল। কৃষি-মূলধনের নিমিত্ত বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা-বাণিজ্যের সাহায্যকল্পে সমবায়-সমিতি ছিল। সুতরাং বলিতে হয়, জার্ম্মাণীর ধন-প্রতিষ্ঠানগুলির আবির্ভাব হইয়াছিল —শিল্প-প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের জন্য।

জার্ম্মাণ ধনপ্রতিষ্ঠানগুলি যে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ দ্বারা শিল্প-প্রচেষ্টার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিত, তাহা নহে। অন্যান্য দেশের ধন-বণিকের (Bankers) ন্যায় জার্ম্মাণীর ধন-বণিকেরাও দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণদানের পক্ষপাতী ছিল না; কিন্তু যেখানে তাহারা উত্তম শিল্প-সম্ভাবনার সন্ধান পাইত, সেখানে তাহারা অকুতোভয়ে অর্থ-দাদন করিত। যখন কোন সম্ভাব্য-শিল্প দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইত, তখন তাহারা অংশ ক্রয় করিত; কিংবা প্রয়োজন হইলে নিজেরাই দুঃস্থ শিল্পের তত্ত্বাবধান করিতে কুণ্ঠিত অথবা পশ্চাৎপদ হইত না। তাহারা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া কোন নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠা অথবা তাহার পরিচালনভার লইত না। কিন্তু ঘটনাচক্রে এরূপ কোন দুর্দ্দশাপন্ন শিল্পে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িলে তাহারা হা'ল ছাড়িয়া দিত না।

অধুনা জার্ম্মাণ ধন-প্রতিষ্ঠানগুলি বৃটীশ ধন-প্রতিষ্ঠান-গুলির পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছে। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শিল্প-ঋণদানই ইহাদের প্রধান কর্ম্ম ছিল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ, অর্থাৎ বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহারা সাধারণ আমানতী ও তেজারতী কার্য্যে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আমানতের পরিমাণ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহারা নিজেদের স্বার্থ-বিজড়িত শিল্প এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানা ও কারবারে অধিক পরিমাণে অর্থ-সাহায্য দানে সমর্থ হইয়াছিল। পূর্ব্বের টাকা-খাটান কাজের সহিত এখন তাহারা টাকা জমা লইতে আরম্ভ করিয়াছিল। ক্রমে তাহারা মিশ্র-ধন-প্রতিষ্ঠান (Mixed Banks) নামে অভিহিত হয়। বৃটেনে যে কার্য্য যৌথ প্রতিষ্ঠান প্রবর্ত্তকের (Company Promoters), মূলধনের অংশ প্রচারকের (Issue-Houses), দায়িত্বশীল মূলধন বণ্টকের (Under Writers) বণিক্-শ্রেষ্ঠীর (Morchant Bankers) ধরাট বৃদ্ধিজীবীর (Discount-Houses) এবং এমন কি, কোম্পানীর কাগজের দালালের,—তাহারা সে সকল কার্য্যও করিত। ১৯১৩ হইতে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাহারা শাসন-কর্ত্তৃগণকে ঋণ দেওয়ার কার্য্যে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিল; ঋণ-সংগ্রহ করিয়া রাষ্ট্রের 'ব্যয়-সৌকর্য্য সাধনে সহায়তা করিত। ক্রমে ক্রমে তাহারা আমানতী-কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিল, এবং বৃটীশ যৌথ ধন-প্রতিষ্ঠানের সহিত তাহাদের পার্থক্য ঘুচিয়া গিয়াছিল। সুতরাং জার্ম্মাণ ধন-প্রতিষ্ঠানগুলি যে দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণদান দ্বারা শিল্প-পুষ্টি কার্য্যে একনিষ্ঠ ভাবে লিপ্ত ছিল, তাহা সত্য নহে। অতএব জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কগুলিও আমাদের আদর্শ হইতে পারে না।

দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণদান দ্বারা শিল্প-সমুন্নয়নার্থ শিল্প-বন্ধকী ধন-প্রতিষ্ঠানের (Industrial Mortgage Banks)

সৃষ্টি হইয়াছে বিগত মহাযুদ্ধের পর। ফিন্‌ল্যাণ্ড এ বিষয়ে অগ্রণী। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ইহার প্রতিষ্ঠা। চারি বৎসর পরে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে হাঙ্গেরীতে এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ফিন্‌ল্যাণ্ডের শিল্প-বন্ধকী-ধন-গোলা ছিল স্বল্পজনীন যৌথ প্রতিষ্ঠান (Private Joint Stock Company)। রাষ্ট্র ইহার মূলধনের অংশ গ্রহণ করে নাই। হাঙ্গেরীর শিল্প-বন্ধকী-ধন-গোলার মূলধনের অধিকাংশ রাষ্ট্র কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে স্যাকসনীতে একটি প্রাদেশিক বন্ধকী-ধন-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়—ইহা সম্পূর্ণরূপে একটি রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান। এটি স্যাক্‌সনীর রাষ্ট্রধন-প্রতিষ্ঠানের লেঙ্গুড় ছিল। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে পোল্যাণ্ডে তিনটি রাষ্ট্র-ধন-প্রতিষ্ঠানের সমবায়ে একটি জাতীয় অর্থোন্নতিকারী ধন-প্রতিষ্ঠান (National Economic Bank) প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহারা প্রত্যেকেই বন্ধকী-খৎ ও তমস্থক-খৎ (Mortgage bonds and debentures) দ্বারা শিল্প-সমূহকে দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণদানে পুষ্ট ও উন্নত করিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে। এইরূপ দীর্ঘস্থায়ী সাহায্য ব্যতীত য়ুরোপের শিল্প সকল ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের দারুণ সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিত না।

ভারতের শিল্পসমস্যাও দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণের অভাব এবং অপ্রতুলতা। এইরূপ ঋণ-অপ্রাপ্তি হেতু যে সঙ্কটের উদ্ভব, তাহার ব্যাপ্তি, কল-কারখানার কার্য্যারম্ভের সূত্রপাত হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ ধনাগমের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতবাসী-পরিচালিত স্বদেশী শিল্প মাত্রেরই এই মধ্য-বর্ত্তী কালই অতি বিষম সঙ্কট-সময়। বহু শিল্প প্রচেষ্টা এই সন্ধিক্ষণে অকালে বিলয়প্রাপ্ত হয়। এই অকাল-বিয়োগের প্রতীকারই স্বদেশী শিল্প-সমুন্নয়নের একমাত্র মুখ্য উপায়, এবং সে উপায়—দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণদাতাবিশিষ্ট শিল্প-ধন-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় শিল্প-তদন্ত-সমিতি এবং ১৯৩০-৩১ খৃষ্টাব্দে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় ধন-বিনিয়োজন-তদন্ত সমিতিগুলি এইরূপ শিল্প-ধন-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করিয়াছিলেন। জাপানের শিল্পধন-প্রতিষ্ঠানই তখন আদর্শ ছিল; কিন্তু জাপানী এবং জার্ম্মাণ এই উভয় প্রতিষ্ঠানই যে আমাদের দেশের শিল্প-সমস্যা সমাধানের ঠিক উপযুক্ত নয়, তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছিল। বিগত মহাযুদ্ধের পরে য়ুরোপে শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের নিমিত্ত যে শিল্প-বন্ধকী-ধন-বিনিয়োজন প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তাহাই আমাদের দেশের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। এই পদ্ধতির অনুসরণ দ্বারা য়ুরোপে গত পঁচিশ বৎসর মধ্যে শিল্পের প্রভূত উন্নতি ও পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে।

এই নব-আদর্শের অনুকরণে ভারতীয় শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা ও ব্যবস্থার অনুকূল শিল্প-বন্ধকী-ধন-প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। এইরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্ত্তব্য হইবে—য়ুরোপীয় শিল্প-বন্ধকী, ধন-প্রতিষ্ঠানের ন্যায় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের স্থাবর সম্পত্তির, অর্থাৎ বাড়ী-ঘর জমা-জমির, এবং কল-কব্জা ও যন্ত্রপাতি বন্ধক রাখিয়া দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণদান। শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির অংশ-বিক্রীত মূলধনের অতিরিক্ত হইবে এই ঋণ-লব্ধ অর্থ; এবং ইহা সংগৃহীত হইবে শিল্প-বন্ধকী-খৎ দ্বারা।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই প্রতিষ্ঠান প্রাদেশিক হইবে, অথবা প্রাদেশিক-শাখা-সম্পন্ন কেন্দ্রীয় সংগঠন হইবে? ভারতীয় কেন্দ্রীয় ধন-বিনিয়োজন-তদন্ত-সমিতি প্রাদেশিক শিল্প-ধন-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পক্ষে মত দিয়াছিলেন। প্রাদেশিক ধন-বিনিয়োজন সমিতিগুলির অনেক সভ্য দ্বারাও এই মত সমর্থিত হইয়াছিল। তাঁহাদের ধারণা ছিল, প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় হইলে প্রাদেশিক স্বার্থের অপহ্নব ঘটিবে। প্রাদেশিক পরিস্থিতি সর্ব্বত্র সমতুল নহে—এবং কেন্দ্রের পক্ষে প্রত্যেক প্রদেশের বিশিষ্ট অবস্থা কিংবা স্বতন্ত্র ব্যবস্থা অনুধাবন, অথবা তদনুযায়ী অনুকূল বিধান দেওয়া সহজ ও সম্ভব নহে।

এই তর্কের মূলে যে কিছু সত্য আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু প্রাদেশিক-শাখা-সম্পন্ন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে আমাদের যুক্তি অধিকতর প্রবল। প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের মুখ্য কার্য্য হইবে শিল্প-বন্ধকী-খৎ প্রচলন। বন্ধকী-খতের তিনটি বিশিষ্ট গুণ থাকা চাই, —নিরাপত্তা, বাজার-চলন, এবং উপসত্ত্ব। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান-বিনির্ম্মুক্ত খতের বাজার-মর্য্যাদা এবং নিরাপত্তা প্রাদেশিক-প্রতিষ্ঠান-বিনির্গত খৎ অপেক্ষা স্বতঃই দৃঢ়তর হইবে। আমাদের দেশের অর্থ-সঙ্গতি অধিক নহে;

সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রচুর পরিমাণে ধন-সরবরাহ করা সম্ভবপর নহে; বরং একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান ঐ প্রাপণীয় সমগ্র অর্থ সংগ্রহ করিয়া প্রাদেশিক শাখাগুলির মধ্যে তাহা প্রয়োজনানুরূপ বণ্টন করিয়া দিতে পারে। প্রদেশ অপেক্ষা কেন্দ্রের প্রতি সঙ্গতপন্ন ব্যক্তিবর্গের শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসও অধিক। কোন ধনাঢ্য প্রদেশের প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ থাকিলেও অন্য নিঃস্ব প্রদেশের পক্ষে তাহা পাওয়া সহজ ও সুলভ নহে; কিন্তু কেন্দ্রে আধিপত্য থাকিলে সমগ্র ধনের ন্যায় ও প্রয়োজনসঙ্গত বণ্টন অতি সহজ। বিভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সম্পত্তি বন্ধকপ্রযুক্ত কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সংগৃহীত অর্থের নিরাপত্তা-রক্ষা করাও সহজসাধ্য।

কার্য্য-ব্যপদেশে আবশ্যকানুযায়ী এই খৎ যেমন দেশে, তেমনি বিদেশেও বিক্রীত হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রাদেশিক অপেক্ষা কেন্দ্রীয় খতের মর্য্যাদা ও সৌকর্য্য অধিক। আমাদের দেশে এমন প্রচুর ধন নাই, যাহা দ্বারা ভারতের বিপুল শিল্পৈশ্বর্য্যের সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি ও পরিণতি সাধিত হইতে পারে। বিদেশীয় মূলধনেরও আমাদের প্রয়োজন যথেষ্ট। এ ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের মর্য্যাদা ও উপযোগিতা অত্যন্ত অধিক। বিদেশীয় ধনিক কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানকেই সহজে বিশ্বাস করিবে। এতদ্ব্যতীত, দেশের মধ্যেও বাঙ্গালার খৎ মাদ্রাজে, কিম্বা মাদ্রাজের খৎ বোম্বাইয়ে, অথবা পঞ্জাবের খৎ আসামে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠা লাভ না-ও করিতে পারে; কিন্তু কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান-প্রচলিত খৎ সর্ব্বপ্রদেশে সর্ব্বসময়ে অবাধে অখণ্ড প্রভাব ও প্রচলন লাভ করিবে। যদি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের পশ্চাতে কেন্দ্রীয় শাসন-শক্তির সমর্থন থাকে, তাহা হইলে খতের প্রভাব ও প্রচার অপ্রতিহত হইবে। উপযুক্ত অর্থেরও অপ্রতুলতা ঘটিবে না; কারণ, কেন্দ্রীয় শাসন-শক্তির সমর্থন-প্রাপ্ত খৎ দেশে-বিদেশে সর্ব্বত্র নিঃসঙ্কোচে গৃহীত হইবে।

বন্ধকী-খৎগুলির নিরাপত্তা সম্বন্ধে দুইটি বিষয় বিবেচ্য। বন্ধকী ধন-গোলার সহিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিকদের এবং ধন-প্রতিষ্ঠানের সহিত খৎধারীদিগের সম্পর্ক। ধন-প্রতিষ্ঠানগুলির নিরাপত্তার নিমিত্ত প্রদত্ত ঋণ বিঘ্ন-বিমুক্ত হওয়া আবশ্যক। দীর্ঘ মেয়াদে টাকা খাটাইতে সমর্থ ও ইচ্ছুক ব্যক্তিকে যত অধিক পরিমাণে এই খৎ লইতে প্রবৃত্ত করা যাইবে, ইহার নির্ব্বিঘ্নতাও তত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। ঝুঁকি অথবা দায়ের উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক বণ্টনের উপর এই খৎগুলির নিঃশঙ্কতা নির্ভর করিবে। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই এই ঝুঁকিকে বহুধা বিভক্ত করিয়া ক্ষতির পরিমাণ লঘুতম করা সম্ভব। ঝুঁকির দায়কে বহুতে নিবদ্ধ করিয়া যথাসম্ভব ক্ষতির সম্ভাবনাকে লঘুতম করা সুস্থির ভাবে টাকা খাটাইবার মূলমন্ত্র। দুই ভাবে ইহা করা সম্ভব। বিভিন্ন প্রদেশে এবং বিভিন্ন বিভাগে।

কোন একটি বিশেষ প্রদেশে, এবং কোন বিশেষ কারণে দুর্গতি ঘটিলে অন্যান্য প্রদেশের প্রগতি সে টাল সহজেই সামলাইয়া লইতে পারিবে। আবার কোন বিশেষ শিল্পে মন্দা ঘটিলে অন্যান্য শিল্পের তেজস্বিতায় তাহার ঘাটতি পূরণ হইতে পারিবে। এই উভয় ব্যাপারে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের প্রভাব ও প্রতিপত্তি যেরূপ সামঞ্জস্য-বিধান করিতে পারিবে, প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানের কোনটিও তাহা পারিবে না। পৃথিবীব্যাপী মন্দা ব্যতীত কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি সম্ভবপর নহে। বহু শিল্পের একই যোগে একই সময়ে দুর্গতি অথবা বন্ধকী সম্পত্তির বহুল পরিমাণে মূল্য-হ্রাস ব্যতীত কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

যেখানেই শিল্প-বন্ধকী ধন-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, সেইখানেই সম্ভাব্য ক্ষতির ঝুঁকিকে যথাসম্ভব বিস্তৃত ভূখণ্ডে বহু প্রকারের এবং বহু আয়তনের শিল্পের উপরে চারিয়ে দেওয়ার নীতি অবলম্বিত হইয়াছে। বৃটিশ ধন-নিয়োজকমণ্ডলী-(Investment Trusts)গুলি এই নীতির অনুসরণ করিয়া থাকে।

কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের আর একটি সুবিধা এই যে, ইহা সর্ব্বদা প্রাদেশিক স্বার্থ এবং সঙ্কীর্ণতা হইতে বিমুক্ত থাকিবে। অর্থনৈতিক ব্যাপারে প্রাদেশিকতা অনিষ্ট-জনক। সুবিজ্ঞ অর্থনীতিবিদের মতে শিল্পসমুন্নয়ন বিষয়ে প্রাদেশিক উন্নতি অপেক্ষা সর্ব্বাঙ্গীন জাতীয় অগ্রগতি বাঞ্ছনীয়। সুতরাং প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা প্রাদেশিক শাখা-সম্পন্ন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানই শ্রেয়স্কর!

এখন এই কেন্দ্রীয় শিল্প-বন্ধকী ধন-গোলার

কার্য্যপ্রণালী কিরূপ হইবে, তাহাই বিবেচ্য। ভারতের অনন্যসাধারণ অবস্থা—ইহার বিপুল আয়তন—প্রাদেশিক ঈর্ষা-দ্বেষ এবং স্থানীয় ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহের স্বার্থ-সংরক্ষণ সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তব্য মূলসুদ-খৎ বিনির্গমন-মাত্রে নিবদ্ধ থাকা বিধেয়। কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে সরাসরি দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ দেওয়া ইহার কর্ম্ম-পরিধির বহির্ভূত থাকিবে। প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য্য হইবে বন্ধকী-ঋণ প্রদান। পক্ষান্তরে, প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলির মূলসুদখৎ বিনির্গমনের কোন ক্ষমতা থাকিবে না। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান মূলসুদ-খৎ দ্বারা মূলধন সংগ্রহ করিয়া, তাহা অবস্থা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী—প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বণ্টন করিবেন। প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের বিবিধ উৎপন্ন দ্রব্য, বাড়ী-ঘর, জমা-জমি, কল-কব্জা, যন্ত্র-পাতি, সাজ-সরঞ্জাম এবং ভাণ্ডাররক্ষিত বস্তুজাত বন্ধক রাখিয়া, তাহাদিগকে দীর্ঘ অথবা মধ্যম-মেয়াদী ঋণ দান করিবেন। প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হইতে লব্ধ-ঋণের সমপরিমাণ বন্ধকী-খৎ ঐ প্রতিষ্ঠানের নিকট গচ্ছিত রাখিতে হইবে।

নিখিল ভারতের বিভিন্ন শিল্পের পরিস্থিতি, তাহাদের প্রয়োজন, প্রবৃদ্ধি-সম্ভাবনা, ঋণের পরিমাণ এবং ঋণাবদ্ধ বন্ধকী সম্পত্তির সমগ্র অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান প্রচুর দৃঢ়তা এবং স্থায়িত্বসম্পন্ন, নির্দ্দিষ্ট মুনাফা-প্রদ নিরিখ-নির্দ্ধারিত-খৎ প্রচলিত করিতে সমর্থ হইবে। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের আর একটি সুবিধা এই হইবে যে, ইহা প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা স্বল্প সুদে শিল্পানুগনে ঋণ প্রদানে সমর্থ হইবে।

কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের মূলধন যথোপযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। অংশ-বিক্রয়-লব্ধ এবং সুদ-খৎ দ্বারা প্রাপ্ত অর্থের সমষ্টিই মূলধন হইবে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র এইরূপ প্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্রের একটি বৃহৎ অংশ থাকে। সুতরাং এই মূলধনের কিয়দংশ রাষ্ট্রপ্রদত্ত এবং বক্রী অংশ প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান-প্রদত্ত হইবে। প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানের মূলধনের অধিকাংশ আসিবে—প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র, সাধারণ অংশ-ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিগণ, বণিক্ ধন-প্রতিষ্ঠান, এবং যৌথ-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি হইতে; এবং বক্রী-অংশ আসিবে ভাবী ঋণ-গ্রহিতাদের নিকট হইতে। এই শেষোক্ত সম্প্রদায় তাঁহাদের আবশ্যক ঋণের শতাংশের অন্ততঃ পাঁচ অংশ লইতে বাধ্য থাকিবেন।

কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে মূলধনাংশ গ্রহণ ব্যতীত, তৎ-প্রচলিত সুদ-খতের কিছু দায়িত্বও রাষ্ট্রকে স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে, স্বদেশী ও বিদেশী সর্ব্বশ্রেণীর ধনিক, মহাজন ও কৃষিজীবীর নিকট হইতে প্রচুর অর্থ প্রাপণীয় হইবে।

সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশের শাসন-তন্ত্র শিল্প-ঋণ-ধন-গোলা স্থাপন করিয়াছেন। বাঙ্গালায় শাসন-তন্ত্রের পৃষ্ঠ-পোষকতায় শিল্প-ঋণ-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার কোনটিই যে বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছে, এরূপ মনে হয় না।

বর্ত্তমানে শিল্প-জগতের মতিগতি কেন্দ্রীয় বন্ধকী-ঋণ-প্রতিষ্ঠানের দিকে। য়ুরোপে এই ঝোঁক এত প্রবল যে, সমগ্র বৃটীশ সাম্রাজ্যের জন্য একটি রাজকীয় বন্ধকী-ধন-ভাণ্ডার (Imperial Mortgage Bank) স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবিকর-জাল ও লূতা-জাল

আমাদের এই গানের খেলা লূতার সূতার জাল-বোনা।
তোমার কিরণ পড়েই তাতে নীহার-কণা হয় সোনা।
থাকবে তুমি শাশ্বত কাল,
করবে আলো ঐ কর-জাল,
মোদের এ জাল পড়বে ধরা, আমরা কেহই থাক্‌বো না॥

শ্রীকালিদাস রায়

ঋণ

এক

সংসারে আপন বলিতে যাহাদের বুঝায়, সোমনাথের তেমন কেহ নাই। সংসারে সে একলা। পিতৃদত্ত কয়েক হাজার টাকা ও কলিকাতায় খান-দুই বাড়ী লইয়া সে নিশ্চিন্ত ভাবে নিরুপদ্রবে দিন কাটায়। একমাত্র ভৃত্য নাথুয়া তাহার সঙ্গী,—রসুই হইতে আরম্ভ করিয়া জুতা-সেলাই পর্য্যন্ত করিতে পারে। কারণ, সে জানে, এমন মনিব আর-একটি খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। যতই অন্যায় করুক, কৈফিয়ৎ চাহিবার লোক নাই, তাহার উপর মাহিনা মোটা, আবার বাবু দিল্‌দরিয়া মানুষ,—মাঝে মাঝে টাকাটা-আধুলিটা, কখন বা গায়ের জামাটা, কখন বা জুতা-জোড়াটা বকশিস করিয়া ফেলেন।

নাথুয়া দেশ-ভাইদের কাছে গর্ব্ব করে, তাহার মনিব এক জন বড়লোক বাঙ্গালী বাবু, এবং সে খুব ভাল বাঙ্গালা বুঝে। শেষের গর্ব্বটা দুপুরে দেশ-ভাইদের বৈঠকে যেমন খাটে, বাবুর কাছে কিন্তু তেমন নয়; কারণ, বাবুর বিচিত্র হিন্দীর অর্থ বুঝিতে এবং বাবুকে বুঝাইবার মত ভাষা আবিষ্কার করিতে গিয়া তাহাকে প্রায়ই ঘামিয়া উঠিতে হয়।

সোমনাথ নিরহঙ্কার দেশহিতৈষী যুবক,—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ স্বাস্থ্যবান্ বলিষ্ঠ দেহ—জল্‌জলে হাস্যময় চক্ষু—মাথার চুল ছোট করিয়া ছাঁটা, অনাড়ম্বর বিলাসহীন সাজ-সজ্জা। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সমাজের সংস্কারে বা উপকারে লাগা, অথবা দেশের কাজে আইন অমান্য দ্বারা কারা-বরণ করিয়া নাম-কেনা,—এ সব ব্যাপারে সে উদাসীন থাকিলেও অবস্থা-বিপর্য্যয়ে পড়িয়া কেহ তাহার সাহায্য-প্রার্থী হইলে তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্য-দানে, বা সামাজিক কোনও সদনুষ্ঠানের জন্য কেহ চাঁদা চাহিতে আসিলে যথাসাধ্য অর্থদানে কখনও কুণ্ঠিত হইত না। কোন বিষয়ে তাহার গোঁড়ামি নাই, অথচ যাহার আছে, তাহাকে উপহাস করে না। ব্যায়াম-চর্চ্চা তাহার নিত্য নিয়মিত কাজ। কলেজ ছাড়িয়া কোনো ভাল চাকরির চেষ্টা সে করে নাই বা করিতেছে না, এমন নহে; তবে ঐ চেষ্টাতেই অফিসে অফিসে নিত্য ঘুরিয়া বেড়ানো তেমন পছন্দ করে না। সাহিত্য, বিজ্ঞান ও জ্যোতিষ-শাস্ত্রের চর্চ্চাতেই তাহার দিনগুলা হাল্‌কা বাতাসের মত কাটিয়া যায়।

রাত তখন দশটা হইবে। সোমনাথ নিজের লাইব্রেরীতে বসিয়া জ্যোতিষ-শাস্ত্রে ডুব দিয়াছে, এমন সময়ে নাথুয়ার দোদুল্যমান মূর্ত্তি দেখা দিল। সে অতি নম্রকণ্ঠে নিবেদন করিল, "বাবু, একঠো জেনানা বাহার খাড়া হায়, আপ্‌কো সাথ ভেট করনে মাঙ্‌তা।"

এইবার সোমনাথ দস্তরমত সচকিত হইয়া উঠিল। তাহার প্রত্যেক স্নায়ুতে একটা যেন উত্তেজনার সাড়া! সে অন্যমনস্ক ভাবে ভাবিতেছে, তাহার পরিচিতা এমন কে থাকিতে পারে? কিন্তু ভৃত্য তাহার চিন্তায় বাধা দিয়া কহিল,—উন্‌কি হিঁয়া লে আয়ে গা?

—আচ্ছা, লে আও।

মিনিট-খানেকের মধ্যেই এক তরুণী গৃহে প্রবেশ করিল। সোমনাথ বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার পানে তাকাইতেই সে যুক্তকরে নমস্কার করিল। সোমনাথ ব্যস্ত ভাবে উঠিয়া প্রতি-নমস্কারের পর হাস্যরঞ্জিত মুখে চেয়ার দেখাইয়া কহিল,—বসুন।

তরুণী শ্রান্তভাবে বসিয়া পড়িল; কিন্তু সোমনাথের এ কি স্বপ্ন, না আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপ লাভ? সে যেন কিছুই ঠিক করিতে পারে না। কি [illegible]

সূত্রপাত করিবে, সে-ও এক মহা সমস্যা! যাহা হউক, সুবিধামত ভাষা খুঁজিয়া না পাওয়ায় বেচারা অপ্রতিভ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

তরুণী সুন্দরী। নিটোল দেহের ভাঁজে ভাঁজে যৌবন যেন লীলায়িত। গৌরবর্ণ গাল দু'টিতে বিস্রস্ত কেশগুচ্ছ মাঝে মাঝে একটু যেন ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। মাথার পিছনে আলুগ্ন খোঁপাটা প্রায় পিঠের উপর লুণ্ঠিত। একখানা সাধারণ শাড়ি ও একটা সাধারণ ব্লাউজ ব্যতীত আর কোন সাজসজ্জা নাই, কিন্তু তাহাতেই তাহাকে যথেষ্ট সুন্দরী দেখাইতেছে। নারীর রূপ ও কমনীয়তা সম্বন্ধে সোমনাথের যেন একটা মধুর অনুভূতি জাগিতে লাগিল। নারীদের সংস্পর্শ এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করা সত্ত্বেও সে যাহাদের সহিত একটু-আধটু মিশিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কাহাকেও এত ভাল লাগে নাই।

সহসা তরুণীর কণ্ঠস্বরে সোমনাথ আকৃষ্ট হইল।

—আপনাকে একটু কষ্ট-স্বীকার করতে হবে, আমরা বড় বিপদে পড়েছি।

সোমনাথ অতি বিনীত ভাবে কহিল, বলুন, আমার যত দূর সাধ্য, আমি করব।

—আজ তিন দিন হোল, আপনার পাশের বাড়ীটায় আমরা উঠে এসেছি। আমার বাবা নেই, আছেন শুধু মা আর দাদু। ক'দিন থেকে দাদুর শরীরটা খারাপ ছিল, তার ওপর বাসা বদল করতে একটু-না-একটু অতিরিক্ত খাটুনি হয়েই পড়ে। আজ সন্ধ্যা থেকে তিনি হঠাৎ অজ্ঞান হোয়ে গেছেন।

তরুণীর চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল। অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বলিতে লাগিল, সহায়-সম্পদ সবই আমাদের দাদু, তার ওপর নতুন এখানে এসেছি, কারো সঙ্গে চেনা নেই, বড়ই বিপদে পড়ে গেছি।

এইবার তাহার গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সে আবার কহিল,—আমি জানালা হোতে ক'দিনই আপনাকে দেখছি, দেখে আপনার সম্বন্ধে কি জানি কেন, আমার একটা খুবই উঁচু ধারণা হয়েছে। তাই সব দ্বিধা-সঙ্কোচ ঠেলে-ফেলে ছুটে এলুম আপনারই কাছে।

সোমনাথ একটু বিব্রত ভাবে কহিল,—তাই তো, আমারও যে উপস্থিত একটা মুস্‌কিল রয়েছে, কাল পুরী রওনা হব ঠিক কোরে ফেলেছি।

তরুণী বাধা দিয়া কহিল,—কিচ্ছু মুস্‌কিল নেই, আপনার কাজের অন্তরায় হোতে চাই-নে। শুধু জানতে এসেছি, কাছে কোনো ভাল ডাক্তার আপনার পরিচিত আছে কি না।

—হ্যাঁ, তা আছে। আমারই এক বন্ধু, বছর-দুই হোল, বিলেত থেকে পাশ কোরে এসে নিকটেই বেশ প্রাক্‌টিস্ জমিয়েছে। আচ্ছা, কোনো চিন্তা নাই, আমি এখনি তাকে আস্‌তে অনুরোধ করছি।

ইহার পর সে কুণ্ঠিত ভাবে যুক্তকরে কহিল,—যদি কিছু মনে না করেন, দুটো-একটা প্রশ্ন করি।

—স্বচ্ছন্দে করুন, কোনো আপত্তি নেই।

—আচ্ছা, আপনার আর কোন ভাই বা ভগিনী আছেন?

তরুণী মাথা নাড়িয়া কহিল,—না।

—আপনাদের সংসার চলে কিসে?

—শুধু দাদুর শ-খানেক টাকার পেন্‌শনে।

—এই মাত্র?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

আর কোনো প্রশ্ন না করিয়া সোমনাথ ব্যস্ত ভাবে চিঠির কাগজ লইয়া একখানা চিঠি লিখিয়া ফেলিল। সেখানা খামে পূরিয়া নাম-ঠিকানা লিখিতে লিখিতে হাঁক দিল,—নাথুয়া!

ডাক শুনিয়া নাথুয়া ছুটিয়া আসিল। সোমনাথ আদেশ-জারি করিল,—এই চিঠিখানা লেকে তুমি জল্‌দি নৃপেন বাবুর পাস্ যাও।

—ডাগ্‌দার সাহেব-কা পাস্?

—হাঁ। খুব জল্‌দি ছুটকে ছুটকে যায়ে গা।

—বহুৎ আচ্ছা।

তরুণীর পানে তাকাইয়া সোমনাথ কহিল,—আপনি নাথুয়াকে আপনার বাড়ীটা দেখিয়ে দিয়ে যান। তা হোলে নাথুয়াই ডাক্তারকে সঙ্গে কোরে এনে একবারে আপনার বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারবে।

তরুণী একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—সন্ধ্যা থেকে

পাখার বাতাস, জলের ঝাপটা, আইস্-ব্যাগ—এ সব না কোরে আগেই আপনার কাছে ছুটে এলে কত ভাল হোত!

সোমনাথ যেন মনে মনে একটু গর্ব্ব অনুভব করিল। তরুণী উঠিয়া কহিল,—আচ্ছা, আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন, নমস্কার! আপনার এ উপকার ভোলবার নয়।

দুই

তরুণী চলিয়া গেলে সোমনাথ তাহার কথাই চিন্তা করিতে লাগিল। কি অদ্ভুত বিস্ময়কর ব্যাপার! এক ঘণ্টা পূর্ব্বে যে তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিতা ছিল, সহরে এত লোক থাকিতে সে তাহাকেই ঠিক করিল—বিপদের ত্রাণ-কর্ত্তা! 'আপনার সম্বন্ধে কি-জানি-কেন, আমার একটা খুবই উঁচু ধারণা হয়েছে'—তরুণীর মুখের এই প্রশংসাবাদে সোমনাথের হৃদয় পুলকের তুফানে উদ্বেল! পুরুষের স্বভাবই সুন্দরীর প্রশংসায় খুসী হওয়া, সুতরাং সোমনাথের অপরাধ নাই। সে ঠিক করিল, এই বিপদে তাহার উচিত, তরুণীর বাড়ীতে গিয়া খোঁজ-খবর লওয়া। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তরুণীর নামটা জানিয়া লওয়া হয় নাই। কি প্রকাণ্ড ভুল! সে নিজের ত্রুটিতে নিজের প্রতি বিরক্ত হইল।

যাহা হউক, সে উঠিয়া চটি পায়ে রাস্তায় বাহির হইল। তরুণী বলিয়াছে, পাশের বাড়ী। কিন্তু কোন্ পাশের? মনে মনে বিচার করিয়া সে বাম পাশেরই বাড়ীর সম্মুখে অগ্রসর হইল। ঘরের আলো জানালার ভিতর দিয়া দেখা যায়, কিন্তু ভিতরের মানুষ কাহাকেও দেখা গেল না। কলিকাতার পথ তখনও নির্জ্জন না হইলেও সে অঞ্চলটা তখন নির্জ্জন হইয়া পড়িয়াছে। অপরিচিতদের বাড়ীর দুয়ারে রাত এগারটার সময় উঁকি-ঝুঁকি দেওয়া শঙ্কাজনক সন্দেহ নাই। সোমনাথ দরজা ঠেলিয়া প্রবেশ করিতে সাহস করিল না, ধীরে ধীরে ফিরিয়া গিয়া নিজের রোয়াকে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরেই দুয়ারের সম্মুখে একখানা সুদৃশ্য কার আসিয়া দাঁড়াইতেই দরজা খুলিয়া ডাক্তার নৃপেন নামিয়া পড়িল; সোমনাথকে দেখিয়াই কহিল, হাল্লো, ব্যাপার কি?

সোমনাথ প্রীতিভরে তাহার করমর্দ্দন করিয়া কহিল,—ব্যাপার তো সবই চিঠিতে লিখেছি, ভাই! তবে একটা কথা তোমায় জানিয়ে রাখি; যত দিন যতবার দেখা দরকার, তুমি অনাহূত হোলেও দেখে যাবে, এবং তোমার ডিস্‌পেন্‌সারি থেকে সব প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন্ সার্ভ করাবে। বিল্ আমার নামে কোরো।

নৃপেন ঈষৎ রহস্যভরে হাসিয়া কহিল,—কে হে? লিখেছ এঁরা অপরিচিত, অথচ হঠাৎ এতটা আপন জন হয়ে গেলেন কি কোরে? লভ্-টভের ব্যাপার না কি? খুলেই বল না।

—ছোঃ! আমায় এতই হাল্কা পেলি? নিছক পরোপকার, শরণাগতকে আশ্রয় দান।

নৃপেন কহিল,—তবে আমার বিল্ তুই কেন শোধ করবি? যে পরোপকারটা তোর এত অবশ্যকর্ত্তব্য মনে হয়েছে, আমারও তাতে সহযোগিতা থাকবে না? তোর কাছ থেকে পয়সা নিয়ে আমার পকেট ভরাতে হবে?

সোমনাথ বাধা দিয়া কহিল,—আহা, ঐটেই যে তোর পেশা। আচ্ছা ফী না-হয় নাই নিলি, কিন্তু ওষুধগুলো তো গাঁটের পয়সা দিয়ে কিনে রাখতে হয়েছে। সেগুলো খয়রাৎ করতে গেলে যে পার্সে হাত পড়ে।

—তুই যে মনে পড়িয়ে দিলি—নামটা না হয় না-ই করলাম—এক নামজাদা ডাক্তারের কথা। তিনি শ্বশুরের নামে বিল্ পাঠিয়েছিলেন নিজেরই পীড়িতা স্ত্রীকে দেখে এসে। যাক্, এখন কোথায় তোর পেশেণ্ট? আগে দেখে আসা যাক্, তার পর বিলের কথা ভাবা যাবে।"

সোমনাথ হাসিয়া ডাক্তারের পিঠে চপেটাঘাত করিয়া কহিল,—বড় ফাজিল তুই!

—ফাজিল হলুম আমি? রাত দুপুরে ঘুম ভাঙিয়ে ডাক্তারকে ডেকে আনা হয়েছে, মনে থাকে যেন।

সোমনাথ নৃপেনকে লইয়া নাথুয়ার অনুসরণ করিতে করিতে কহিল, ডাক্তাররা রাত দুপুরের আগে যে ঘুমোয় না, তা আমার ভাল রকম জানা আছে।

তিন

তখন বেলা পাঁচটা হইবে। দিগন্তব্যাপী ফেনিল জলধি-তরঙ্গ গর্জ্জন তুলিয়া আপন মহিমা ঘোষণা করিতেছে। অস্তোন্মুখ শ্রান্ত তপন সেই বিরাট্ সিন্ধুবক্ষ কোটি স্বর্ণ-পদকে ভূষিত করিয়া মৃদু হাস্যে বিদায় মাগিতেছে। যে আপন মহিমায় ভরপুর থাকে, সে অপরের মহিমায়

মহিমান্বিত হইবার জন্য লালায়িত নহে। সে ভ্রুক্ষেপ করে না চন্দ্র-সূর্য্যকে, ভ্রুক্ষেপ করে না বিশাল পৃথিবীটাকে। সে আপন গরবেই সর্ব্বদা উন্মত্ত। অট্টহাস্যে আছড়াইয়া পড়িতেছে বিস্তৃত বেলাভূমে।

সোমনাথ একটা বালির স্তূপের উপর বসিয়া উদ্দেশ্য-হীন ভাবে চাহিয়াছিল। দলে দলে নরনারী উপকূলে বেড়াইতে আসিয়াছে। কোথাও বা কেহ গান ধরিয়াছে। সোমনাথের চোখে সমস্ত দৃশ্যটা যেন কোন চলচ্চিত্রের অভিনয়। সে যেন একটা রোমাঞ্চকর অভিনয়-দর্শকের আসনে স্থির ভাবে উপবিষ্ট, অভিনয়টা শেষ হইলেই আসন ত্যাগ করিবে।

সূর্য্যাস্তের বহুক্ষণ পরে সোমনাথ উঠিয়া সীমাহীন অম্বুরাশির পানে চাহিতে চাহিতে ভিক্টোরিয়া ক্লাবের পানে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। তথায় পৌঁছিতেই ভৃত্য আসিয়া জানাইল,—হুজুর, আপ্‌কো এক চিট্ঠি আয়া, টিব্বিল্‌কা উপর রাখ-দিয়া।

সোমনাথ তাহার কামরায় প্রবেশ করিয়া খামে-মোড়া চিঠিখানা টেবিলের উপর দেখিতে পাইল। শিরোনামার লেখা দেখিয়া বুঝিল, নৃপেনের হস্তাক্ষর। নৃপেন লিখি-তেছে—'সোমু, তোমার সেই বৃদ্ধ রোগীটি কাল মারা গিয়াছেন। তোমার আশ্রিতাকে অর্থাৎ সেই তরুণীটিকে —অন্ততঃ, সপ্তাহ কাল তোমার জন্য অপেক্ষা করিতে উপদেশ দিয়াছি; কারণ, এই নূতন বিপদে তুমি তাঁদের জন্য কি ব্যবস্থা করিবে জানি না। আশা করি, পত্র পাঠ অকূলের কাণ্ডারীস্বরূপ উপস্থিত হইবার জন্য উদ্যোগী হইবে। তোমার মনের সুস্থতা সম্বন্ধে একটু সন্দিহান থাকিলেও আশা করি, বায়ু-পরিবর্ত্তনের ফলে শারীরিক সুস্থতার মাত্রা অনেকটা বাড়িয়াছে। ইতি—তোমার নৃপেন।'

চিঠি পড়িয়া সোমনাথের মুখখানা একটু লাল হইয়া উঠিল। কি আশ্চর্য্য, বিপন্নাকে পুরুষ সাহায্যদান করিবে না? হ'লই বা সে তরুণী, হ'লই বা সুন্দরী। চিঠিতে কি অভব্য ইঙ্গিত! আমার মত অকৃতদার যুবকের পক্ষে সমাজে বাস করাও বিপদ! সোমনাথ মনের গর্ব্বে টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতে লাগিল। কাগজ-কলম লইয়া রাগের মাথায় লিখিয়া ফেলিল—'গোল্লায় যাও, রাস্কেল্! রূপসীটির প্রতি তোমার নিজের কতটা আকর্ষণ, তোমার চিঠিখানা তারই প্রমাণ। আমার ফিরিয়া যাইবার বিলম্ব আছে। ওঁদের দুঃসময় শুনিয়া আমি দুঃখিত হইলেও আর কোনও প্রতীকারের ব্যাপারে আমি নাই। তুমি পার তো তরুণীটির অন্ন-সমস্যা দূর কোরো।—তোমার সোমু।'

সে চিঠিখানা খামে মুড়িয়া নিজেই পোষ্ট করিয়া আসিল।

চার

—মা, আমি না হয় আজ দুপুরে একবার সব বালিকা বিদ্যালয়গুলো ঘুরে আসি।

—তা'তে লাভ কি?

- কোথাও যদি একটা চাকরি মেলে। এ ভাবে আর কত দিন চল্‌বে?

—বুঝতে পারছি তা। সমস্যা ক্রমশঃই গুরুতর হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। দাদা তো স্পষ্টই বোলে গেলেন, তাঁর জায়গারও অভাব, টাকারও অভাব। ভবিষ্যতের কথা ভাবতে গেলে আর জ্ঞান থাকে না।

মঞ্জুষা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—তোমার গহনাগুলোর সবই তো প্রায় গেছে, এইবার আসবাব-পত্র একটা একটা কোরে বিক্রি না করলে আর উপায় নেই। কি করা যায়, মা? খবরের কাগজে এত বিজ্ঞাপন দিলুম, কিন্তু ফল তো কিছুই পেলুম না, শুধু টাকাগুলোই গেল!

সে অত্যন্ত অসহায় ভাবে বাহিরের পানে তাকাইল। সরমা কন্যার নিকট আগাইয়া আসিয়া কহিলেন,—বিনা-সুপারিশে কি চাকরি মেলে, মা? যত চেষ্টাই কর্, আর সে-দিন নেই, মঞ্জুষা! এখন অন্ন-সমস্যা পুরুষের যেমন, মেয়েদেরও তার কম নয়। বরং এক কাজ কর্, তোর দাদুর অসুখের সময় যে ছেলেটির কাছে গিয়েছিলি, তারই কাছে আর একবার যা। তার অন্তঃকরণ খুব ভাল। অসুখের সময় নিজে না থাকলেও সে ডাক্তার ডেকে দিলে, ডাক্তারকে একটি পয়সা ফী নিতে দেয়-নি; আবার নিজের চাকরটাকেও দিয়ে গেল আমাদের অসময়ে দরকারে আস্‌বে বোলে।

'নিজে না থাকলেও' এই কথাটায় মঞ্জুষার অভি-মানের সমুদ্র যেন স্ফীত হইয়া উঠিল। কহিল,—নাঃ,

একবার গেছলুম বোলে বার বার যাব? তখন ছিলুম বিপন্না, কিন্তু এখন যে ভিক্ষুক!

ঈষৎ বিরক্ত কণ্ঠে সরমা কহিলেন,—ও কথা বলিস্ নে, মঞ্জু! তোর মত লেখাপড়া-জানা মেয়ের মুখে অমন্ কথা সাজে না। ছেলেটি যে বিপদে আমাদের সাহায্য করেছে, জীবনে তা ভোলবার নয়।

মঞ্জুষা চুপ করিয়া রহিল। কি-জানি কেন, মন তাহার এ কথাগুলা সরল ভাবে মানিয়া লইতে চাহে না। বুকের ভিতর কোথায় যেন একটা কাঁটা, ভাবিতে গেলেই খচ্-খচ্ করে। এ অভিমানের যে কোনই ভিত্তি নাই, তাহা সে উত্তমরূপেই বুঝে। সোমনাথ যেটুকু করিয়াছে, তাহার জন্য তাহাদের ঋণ কোন-রূপে পরিশোধ করিবার নহে; কিন্তু তবু মঞ্জুষার মনে একটা খোঁচা—কেন, তিনি কি মনে করিলে আর দুইটা দিন থাকিতে পারিতেন না? আচ্ছা, না হউক, দুই-চারি দিন পরেই কি ফিরিয়া আসিতে পারিতেন না? ডাক্তার বাবু তো বলিলেন, তিনি তাঁকে পত্রপাঠ আসিবার জন্য পত্র দিয়াছেন। মঞ্জুষা তো তাহার প্রত্যাগমনের জন্য পনর দিন অপেক্ষা করিয়াছে। হাঁ, স্বীকার করিতেই হইবে, সোমনাথ তাহাদের বড় উপকার করিয়াছে। কিন্তু তাহার মধ্যে এমন বিশেষত্ব কি আছে? এক জন ভদ্রমহিলা ওরূপ অবস্থায় পড়িলে সব ভদ্রলোকই সাধ্যমত উপকার করিয়া থাকেন। এ ক্ষেত্রে তরুণী নিজে উপযাচিকা হইয়া তাহার দুয়ারে দাঁড়াইয়াছিল, তবে তো সে ঐ উপকারটুকু করিয়াছে?

মঞ্জুষার মনের আর একধারে প্রতিবাদ উঠিল, সব ভদ্রলোক সমান নয়, সকলেরই মন সোমনাথের মত নয়। কিন্তু তথাপি তাহার অভিমান চীৎকার করিয়া উঠিল—না না, সবাই অমনি। এ সব উপকারের ঐ একই ঢং, এতে ওঁর বিশেষত্ব কিছু নেই।

পাঁচ

মাসখানেক পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া সোমনাথ নাথুয়াকে জিজ্ঞাসা করিল, পাশের বাড়ীর খবর। নাথুয়া বিস্মিত ভাবে কহিল,—কৌন্ মোকামকা বাত পুছ্তেঁ, হুজুর?

সোমনাথ অত্যন্ত চটিয়া গিয়া কহিল,—পাশের বাড়ী রে হতভাগা! যাঁহা একটা বড় বাবুর বেমার ছিল।

নাথুয়া এইবার বুঝিতে পারিয়া তৎপরতার সহিত জবাব দিল,—বুড্ঢা বাবু তো মর্ গিয়া।

সোমনাথ আরও চটিয়া কহিল,—আরে মর্ গিয়া কি বাঁচ গিয়া, সে কথা তোকে কে জিজ্ঞেস্ কর্ছে রে রাস্কেল্? মায়ী লোক ও-বাড়িতে হ্যায়, না চলা গিয়া?

এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা যেন হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে, এইরূপ মুখের ভঙ্গীতে নাথুয়া বিনীত কণ্ঠে কহিল,—হুজুর, মায়ী লোক তো মুলুক চলা গিয়া।

—মুলুক চলা গিয়া? তা মুলুক কাঁহা, তুমকো বলেননি?

—ডাগ্দার সাহেবকো বোলা, হাম্ভি শুনা, লেকেন কানপুর বোলা কি জামালপুর, আভি হাম্কো তো খেয়াল নেহি।

—কানপুর কি জামালপুর?

—ঐসাই হোগা, ঠিক খেয়াল নেহি হুজুর।

সোমনাথ চিন্তিত ভাবে ইজিচেয়ারে হেলান দিল। একটু পরে আকাশের পানে চাহিয়া কহিল,—যাও, জল্দি কোরে চা লে আও।

—বহুৎ আচ্ছা—বলিয়া নাথুয়া ছুটিল।

চা-পানের পর সোমনাথ ঠিক করিল, নৃপেনের কাছে গিয়া কথাপ্রসঙ্গে ওঁদের সংবাদ লইবে। কিন্তু তাহার উঠিবার তাড়া দেখা গেল না।

আজ কয় দিন হইতে তাহার মানসিক অবস্থা ভাল নয়! সে এখনও ঠিক বুঝিতে পারে না, নৃপেনের পত্রে অতটা গরম হইয়া পড়িয়াছিল কেন? তাহাকে চটাইবার মত নৃপেন এমন কি লিখিয়াছিল? লেখার মধ্যে তাহার একটু রসিকতা এবং স্বভাবসিদ্ধ তরলতারই পরিচয় পাওয়া যায়। অকৃত্রিম বন্ধুকে কটু লিখিবে বলিয়া তো লেখে নাই। মানুষটা বড় রসিক, এবং সব ব্যাপারেই রহস্য করিয়া আমোদ পায়।

নৃপেনের বিষয় মনে মনে আলোচনা করিয়া সোমনাথ আজ প্রথম লজ্জানুভব করিল। চিঠিতে কি এমন অভব্য ইঙ্গিত ছিল, যাহার জন্য সে অত কড়া প্রত্যুত্তর দিয়াছে? অবিবাহিত তরুণ-তরুণীর মধ্যে একটা যৌন আকর্ষণ না

ঘটিলেও, ভাবায় রহস্যচ্ছলে তাহার ইঙ্গিতটা কি এতই মারাত্মক অপমান? কথাটা ভাবিতে ভাবিতে কি জানি কেন, সোমনাথের কানের ডগা পর্য্যন্ত একবার লাল হইয়া উঠিল। নিঃশ্বাসটাও যেন গরম বোধ হইতে লাগিল। কি জ্বালা! সে বিরক্ত ভাবে দুয়ারের পানে তাকাইল—তাহার এই বিচলিত ভাবটা নাথুয়া লক্ষ্য করিতেছে কি না দেখিবার জন্য।

ডিস্‌পেনসারির দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইতেই নৃপেন তাহাকে দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—হ্যাল্লো! ও কে, সোমনাথ না কি?

কেন, সন্দেহ হচ্ছে?

—হবারই কথা যে। চামড়া তিন পোঁচ ময়লা হয়েছে সমুদ্রে চান কোরে কোরে, তার ওপর গতরখানা যেন খোদার খাসি।

সোমনাথ চেয়ারে বসিয়া কহিল,—তার পর, খবর কি বল্।

নৃপেন একটু দুষ্টামির হাসি হাসিয়া কহিল,—খবর বড় সুবিধের নয়। হিট্‌লার দেখছি নেপোলিয়ানেরই নব-সংস্করণ। পোল্যাণ্ড হল্যাণ্ড নরওয়ে বেলজিয়ম এ সব নিয়েও ক্ষান্ত নয়। এখন তো দেখছি, ফ্রান্সেও ঢুকে পড়েছে।

সোমনাথ বিরক্তির সহিত বাধা কহিল,—ও-সব খবর তোর কাছে কে চাইছে?

নৃপেন হাসিয়া কহিল,—তবে কি? মিত্র-শক্তির পক্ষে কে কে আছে?

সোমনাথ চটিয়া লাল! পুনরায় বাধা দিয়া কহিল,—তোর পলিটিক্‌স্ রাখ্, এখন বাচালতা বন্ধ করবি কি না?

কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত নৃপেন কহিল,—তা হোলে জেনে রাখ্, আমি বাচালতা বন্ধ করলুম।

সোমনাথ চেয়ারে হেলান দিয়া টেবিলের উপর হইতে একখানা ডাক্তারি বই তুলিয়া লইয়া পাতা উল্টাইতে লাগিল। একটু পরে বইখানা মুড়িয়া রাখিয়া শান্ত কণ্ঠে কহিল,—তুই চুপ করলি কেন? কথার উত্তর দে।

নৃপেনের দুই চোখে রহস্যের ধারাল ছুরি ঝক্-ঝক্ করিয়া উঠিল। কহিল,—আমি তো সব সংবাদই দিচ্ছিলুম, তুই যে থামতে বললি।

—যত সব যুদ্ধের সংবাদ বলতে লাগলি! আমি কি তাই চেয়েছি?

—তবে কি সংবাদ চাস? বর্ত্তমানে আর তেমন জবর সংবাদ কি আছে?

সোমনাথ ভিতরে বেশ গরম হইয়া উঠিলেও বাহিরে শান্ত ভাবে কহিল,—আমি চাইছি, তোর পেশেণ্টদের খবর।

—ও, ধন্যবাদ। উপস্থিত একটা খুব সিরিয়াস্ কেস্ হাতে এসেছে। কেস্‌টার বিবরণ খুব ইন্‌টারেষ্টিং, সব ডিটেল্‌স্ বলছি।

সোমনাথ সোজা হইয়া বসিয়া অসহ্য বিরক্তির সহিত কহিল,—দুত্তোর সিরিয়াস্ কেস্,; তুমি গোল্লায় যাও রাস্‌কেল্! আমি যে কেস্‌টা দিয়েছিলুম, তাদের কি হোল?

—হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ, তাই বল্। কোথায় ড্রাইভ করছিস্, এতক্ষণ বুঝতেই পারিনি। শুধু শুধু কতকগুলো বাজে বকালি। প্লেন্‌লি বললেই পার্‌তিস্।

সোমনাথ কষ্টে হাসি টানিয়া কহিল,—ঢের হয়েছে; এখন বল।

—সে রোগী মারা গেল ভাই, কিছুতেই বাঁচল না, এপোপ্লেক্সি কি না।

সোমনাথ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল,—তার পর, ওঁরা সব কোথায় চলে গেলেন?

—কারা? মঞ্জুষা আর তাঁর মা? সে বিষয়ে তোরই ব্যবস্থা আমায় ঘাড় পেতে নিতে হোল।

সোমনাথ বিবর্ণ মুখে কহিল,—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ, তার ফলে মঞ্জুষা এখন আমার গৃহলক্ষ্মী।

মনের দুর্দ্দমনীয় চাঞ্চল্য যথাসম্ভব চাপিয়া সোমনাথ কহিল,—বেশ বেশ, শুনে খুব খুশি হলুম। তোর সুমতি হয়েছে দেখছি।

—কি করি ভাই? তুই এলি-নে, তাঁরা অত্যন্ত অসহায়, কাজেই তাড়াতাড়ি ঐ ব্যবস্থাই করতে হোল। চল্, তোর সঙ্গে দেখা করিয়ে আনি।

নৃপেন কথা শেষ করিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল। সোমনাথ উদাসীন ভাবে কহিল,—এখন থাক্, আমার অনেক কাজ আছে। সময়মত আস্‌ব। তা ছাড়া, একটু প্রস্তুত হয়ে আসতে হবে, বুঝতে পাচ্ছিস্ ত!

সোমনাথ উঠিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু একবার পিছন ফিরিলেই সে দেখিত, নৃপেন অকারণ খুব খানিকটা হাসিয়া লইতেছে।

ছয়

মঞ্জুষার কথা মনে হইলেই সোমনাথের চিত্ত উত্তেজিত হইয়া উঠে। ইতিমধ্যে সে অনেক বার প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, জীবনে আর কখনও স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে আসিবে না। কিন্তু স্ত্রীজাতির প্রতি তাহার কেন এ ক্রোধ, কিসের অভিমান, কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। একটা কথা বার বারই তাহাকে আঘাত করে—নৃপেন বিবাহের পূর্ব্বে এক বারও তো তাহাকে জানাইল না, একটা নিমন্ত্রণ-পত্রও দিল না। হয় তো মঞ্জুষা দরিদ্র-কন্যা বলিয়া বিবাহটা অতি সংক্ষেপেই সারিয়া লইয়াছে। কিন্তু নৃপেনের পিতা তো দরিদ্র নহেন, যথেষ্ট ধন-সম্পত্তির মালিক, এবং আপন গুণপনায় যথেষ্ট উপার্জ্জনও করেন। তবু এত চুপি চুপি বিবাহ সারিবার কি কারণ ঘটিতে পারে?

কিন্তু সোমনাথ মনে মনে এত বড় সমস্যাটারও একটা সন্তোষজনক সমাধান করিয়া লইল। ভাবিল, সে তখন বিদেশে, কোন্ ঠিকানায় আছে না জানায় হয় তো পত্র পাঠাইতে পারে নাই। কিন্তু মঞ্জুষাও কি জানাইতে পারিত না? তা, সে-ই বা কেমন করিয়া জানায়? সোমনাথের মনের একটা ক্ষোভ কিছুতেই মিটে না,—মঞ্জুষা কি আরও কিছু দিন অপেক্ষা করিতে পারিত না?

সকালে চা-পানের পর বৈঠকখানায় বসিয়া সে কাগজ পড়িতেছে, এমন সময়ে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক সেখানে প্রবেশ করিলেন। সোমনাথ চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কাকে চান?

ভদ্রলোক বিনীত ভাবে কহিলেন,—আজ্ঞে, সোমনাথ বাবুকে।

—আমিই সোমনাথ। বসুন ঐ চেয়ারে।

ভদ্রলোক বসিলে সোমনাথ জিজ্ঞাসা করিল, আমার কাছে আপনার কি প্রয়োজন?

ভদ্রলোক কহিলেন,—আমার নাম শ্রীহরিনাথ ঘোষাল, নিবাস কাঁকুড়গাছি।

বাধা দিয়া সোমনাথ কহিল,—ও-সব থাক, আপনার প্রয়োজনটা কি, তাই এখন বলুন।

ভদ্রলোক অপ্রতিভ হাস্যে কহিলেন,—নৃপেন বাবুর কাছে গিয়েছিলুম। একটি বেশ ভাল পাত্রী আছে। জোড়াসাঁকোর ঘোষেদের চেনেন তো? বিখ্যাত বংশ।

সোমনাথ আবার বাধা দিয়া বিরক্তিভরে কহিল,—তা জেনে আমার লাভ নেই! এখন ঘটনা কি বলুন।

হরিনাথ বাবু ব্যস্ত ভাবে কহিলেন,—হ্যাঁ, তার পর নৃপেন বাবু বল্লেন—তাঁর বিয়ে হয়ে গেছে। তিনি আপনার নাম করলেন আর ঠিকানা দিলেন।

ইহার পর একটু কুণ্ঠিত হাসির সহিত ভদ্রলোক কহিলেন,—আপনি যদি মেয়েটি দেখে আসেন, তা হোলে—

তাঁর কথা শেষ করিতে না দিয়াই সোমনাথ বলিয়া উঠিল,—ও, আপনি বুঝি ঘটক? এ বিয়েটা লাগাতে পারলে অনেক টাকা পাবেন বোধ হয়?

হরিনাথ বাবু একটু হাসিলেন। সোমনাথ সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কহিল,—আপনি নৃপেনের কাছেই যান। আমার কাছে কোনো আশা নেই, অর্থাৎ আমি বিয়ে কোরব না স্থির কোরে ফেলেছি।

হরিনাথ বাবু হতাশ কণ্ঠে কহিলেন,—তাঁর তো বিয়ে হয়ে গেছে।

সোমনাথ উচ্চ কণ্ঠে কহিল,—তা হোক্, তাকে ধরলে আরও দু'-চারটে বিয়ে করতে পারে। আচ্ছা, নমস্কার! আপনি এসে আমার অনেকখানি সময় নষ্ট কোরলেন।

হরিনাথ বাবু ক্ষুণ্ণ মনে উঠিয়া গেলেন। সোমনাথ ক্রুদ্ধ ভাবে টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিল,—আঃ, জ্বালিয়ে মারলে!—নাথুয়া!

'হুজুর' বলিয়াই নাথুয়া ছুটিয়া আসিবামাত্র সোমনাথ কহিল,—সব জিনিস-উনিস গুছায়ে লেও, এ-বাসা ছোড়কে ছোটা বাসামে যায়েগা। এ-বাসাটা ভাড়া দেগা।

নাথুয়া বিস্মিত ভাবে সরিয়া গেল। সোমনাথ পেপার-ওয়েট্-চাপা একখানা খামে-মোড়া পত্র টানিয়া লইল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পত্রখানা পড়িয়া দেখে, ঐ একই কথা! দেশ হইতে খুড়ো মহাশয় লিখিতেছেন, সুন্দরী পাত্রী আছে, খুব গুণবতী; তুমি বিবাহ কর।

কেন করিবে না? বিষয়-সম্পত্তি কি গোল্লায় যাবে? —ইত্যাদি।

সোমনাথ চার-টুক্‌রা করিয়া চিঠিখানা ছিঁড়িয়া, ফাউণ্টেন্ পেন্ খুলিয়া ফস্ ফস্ করিয়া লিখিল—

'কাকা, প্রণাম নেবেন। পত্র পেয়েছি। আনন্দিত হোলুম—এইটুকু ভেবে যে, আমার জন্যে আপনি এতটা চিন্তা করেন। দুঃখের বিষয়, আমি আপনাদের অভাগা এবং অবাধ্য ভ্রাতুষ্পুত্র। আমি বিবাহ কোরব না, একবারে কৃতসঙ্কল্প। বিষয়ের কথা ভেবে মন খারাপ কোরবেন না, কারণ, আমি হাবু-রবিকেই সব দিয়ে যাব ইতি—'

এই ভাবে উত্তর লিখিয়া সে মুঠার উপর গণ্ডস্থাপন করিয়া বসিয়া রহিল।

সাত

—এত ভোরে কোথায় বেরুচ্ছিস, মঞ্জু?

মঞ্জুষা দ্রুতহস্তে চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে কহিল,—আজ ক'দিন হোল, একটা নতুন কাজ পেয়েছি, মা, বাড়ী-বাড়ী টয়লেটের জিনিস বিক্রি করা। দুটো মেয়ে পড়িয়ে যা পাই, তাতে তো ভদ্র-আনা বজায় রেখে চালানো যায় না, মা! এই কাজটায় পরিশ্রম আছে বটে, কিন্তু পরিশ্রমের অনুপাতে রোজগার হবে। মাসে অন্ততঃ টাকা-ত্রিশেক কোরে তোমার হাতে এনে দিতে পারব।

সরমা কহিলেন,—কিন্তু এত ঘুরুনি তুই পেরে উঠ্‌বি, মঞ্জু?

মঞ্জুষা মায়ের মুখের পানে প্রফুল্ল মুখে চাহিয়া কহিল, —এই তো খাটবার বয়েস। একটু কষ্ট না করলে ঘরে কি পয়সা আসে? দাদু আজ দু-বছর মারা গেছেন, এর মধ্যেই তোমার গহনাগুলো তো প্রায় সবই গেল। তুমি যথাসর্ব্বস্ব বেচে আমায় খাওয়াবে, আর আমি দিব্যি বোসে বোসে খাব? এ কথা যে ভাবলেও কষ্ট হয়।

সরমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—আমায় সেলাইয়ের কাজ যোগাড় কোরে দে না, তা হোলেও তো কতকটা সুবিধে হয়।

মঞ্জুষা কাপড় পরিতে পরিতে কহিল,—হ্যাঁ, আমি চেষ্টায় আছি।

—না খেয়ে বেরুবি না কি? দাঁড়া, আমি একটু চা তৈয়েরি কোরে দিই।

মঞ্জুষা আপত্তির সুরে কহিল,—না, না, দেরি হয়ে যাবে, মা! তুমি ব্যস্ত হয়ো না, আমি দোকান থেকে কিছু কিনে খাব।

সে জুতা পরিয়া স্যুট-কেস্ হাতে লইতেই মা কহিলেন, --কখন্ ফিরবি?

—বারটার মধ্যেই।

বেলা চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। মঞ্জুষা ট্রাম-কার্ হইতে নামিয়া দ্রুত-চরণে রাস্তা পার হইল। সমস্ত দিন অনাহারে পরিশ্রমে দেহের মধ্যে ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে। সে মাথা নীচু করিয়া আপন দুরবস্থার কথা ভাবিতে ভাবিতে চলিল। তখন স্কুল-কলেজের ছুটী হইয়াছে। রাস্তায় ছাত্র-ছাত্রীদের জনতা বড় কম নয়। মঞ্জুষা ভাবিতে লাগিল, ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ এমন আছেই—যাহার গৃহে অন্ন নাই, হয় তো তাহারই মত অনাহারে স্কুলে অথবা কলেজে আসিয়াছে শুধু এই আশায় যে, কোন-রূপে পাশ করিতে পারিলেই অন্ন-সমস্যার কিনারা হইবে। কিন্তু হায়, সে-ও তো এই আশা লইয়াই তিনটে পাশ করিয়াছে। তাহার মুখে কান্না ও হাসি যেন একসঙ্গে ফুটিয়া উঠিল। এ জগতে বাণীর উপাসনা করিলে লক্ষ্মীও যে প্রসন্না হইবেন, এমন কোন নিশ্চয়তা নাই।

একটা চৌমাথায় আসিয়া দাঁড়াইতেই একখানা ছোট্ ঝক্‌ঝকে দোতলা বাড়ী মঞ্জুষার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। মুক্ত জানালাগুলার ভিতর দিয়া ঘরের আসবাব-পত্র যতটুকু দেখা যায়, তাহাতে অনুমান হইতে পারে, গৃহস্বামী অতিশয় ধনী না হইলেও সৌখীন বটে। সে বাড়ীতে দু'-চার টাকার জিনিস বিক্রয় হইতে পারে, এই আশায় সে ধীরে ধীরে সদর দরজায় প্রবেশ করিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। একটি ছেলে কি মেয়ের দেখা পাইলেই তাহার সুবিধা হয়, তাহা হইলে তাহার সাহায্যে সে অন্দরে যাইতে পারিবে।

তাহার ডান দিকে ও বাম দিকে সামনা-সামনি দুই-খানা ঘর। বাম দিকের ঘরখানা বন্ধ। দু'-চার পা আগাইয়া দক্ষিণ দিকের ঘরের দরজায় উপস্থিত হইয়া ভিতরে চাহিতেই মঞ্জুষা দেখিল, একটা প্রকাণ্ড টেবিলের উপর কতকগুলা পুস্তক ছড়ানো, এবং তাহার পাশে

গদি-আঁটা চেয়ারে একটি যুবক মাথা নীচু করিয়া বই পড়িতেছে।

মঞ্জুষা ভাবিল, এখানে না দাঁড়াইয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া যাইবে, কিন্তু আবার কি ভাবিয়া ডাকিল,—শুনচেন? সঙ্গে সঙ্গে দুই-এক পদ অগ্রসর হইল।

যুবক মুখ তুলিয়া ঈষৎ বিস্মিতের ভঙ্গীতে কহিল,—কাকে চান?

মঞ্জুষা তাহার স্বভাব-সুলভ ভীরুতা দমন করিয়া কহিল,—আমার কাছে ভাল ভাল টয়লেটের জিনিস আছে, আপনি কিছু কিনবেন?

যুবক পুস্তকের পানে পুনরায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল,—না।

যুবকের 'না' উত্তরটিতে মঞ্জুষার যেন কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল। ভোর হইতেই সারা দিন ঘুরিতেছে, এখনও কিছু আহার করিবার অবসর পায় নাই। মানস-নয়নে দেখিল, অভুক্তা জননী তাহার প্রতীক্ষায় জানালায় বসিয়া আছেন। তাহার চক্ষু সজল হইয়া আসিল। একবার শেষ চেষ্টা করিবার জন্য মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল,—বাড়ীর মেয়েরাও কেউ কিছু নেবেন না? একবার দয়া কোরে দেখুন না, এ সব জিনিস সকলেরই তো দরকার হয়।

তাহার করুণ কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়া যুবক মুখ তুলিয়া চাহিল। ঈষৎ হাস্যে কহিল, আচ্ছা,—ঐ চেয়ারটায় বসুন।

—আমায় কারো সঙ্গে একবার বাড়ীর মধ্যে পাঠিয়ে দিন না।

যুবক হাসিমুখেই কহিল,—সেখানে গিয়ে কি করবেন? মাথাই নেই, তার মাথা ব্যথা!—মেয়েরাই নেই, তা বিক্রি করবেন কাকে?

মঞ্জুষা ভাবিল, ভদ্রলোক কৃপণ, তাই অন্দরে পাঠাইতে ইচ্ছা নাই, পাছে মেয়েরা কতকগুলা বাজে জিনিসে পয়সা খরচ করে।

যুবক আবার কহিল,—আপনি বসুন। কি কি জিনিস এনেছেন আমাকে দেখান, আমিই কিনব।

মঞ্জুষা চেয়ারে বসিয়া কহিল,—মেয়েরা নেই মানে—আপনার স্ত্রী বুঝি পিত্রালয়ে?

যুবক হাসিয়া কহিল,—পিত্রালয়েও নয়, শ্বশুরালয়েও নয়। আমার স্ত্রীই নেই।

মঞ্জুষা অপ্রতিভ ভাবে সুট-কেসটা টেবিলের উর্দ্ধ হইতে তুলিয়া লইল। যুবক তাহার মুখের পানে ক্ষণকাল তাকাইয়া কহিল,—দাঁড়ান এক মিনিট। আমার প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিন—একটুও সঙ্কোচবোধ না কোরে।

—বলুন।

—আপনি কি আজ এখন পর্য্যন্ত কিছু খাননি?

মঞ্জুষার ললাট কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে বিরক্ত কণ্ঠে কহিল,—মাপ করবেন, আপনার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি অক্ষম।

—কি আশ্চর্য্য! আমি কি আপনাকে খাটো করবার জন্যে এ প্রশ্ন তুলেছি, না আপনার ঘরে পয়সা নেই বোলে খেতে পাননি, মনে করেছি? কার্য্যগতিকে সময় কোরে উঠতে পারেন-নি, এমন তো হোতে পারে। আমি সেই হিসেবেই বলেছি।

—হ্যাঁ, আপনার অনুমান ঠিক। আজ কার্য্যগতিকে খাবার সময় কোরে উঠতে পারিনি।

যুবক চীৎকার করিয়া ডাকিল,—নাথুয়া!

মঞ্জুষা চমকাইয়া উঠিল। এ-বাড়ীরও ভৃত্যটির নাম নাথুয়া? কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিল,—নাথুয়াকে কেন?

যুবক কহিল,—আপনার জন্যে চা আর কিছু খাবার আনবে।

মঞ্জুষা ঘোর আপত্তির সুরে কহিল,—না, না, আমি এখনি বাড়ী ফিরব। আমার অপেক্ষায় মা হয় তো এখনো অভুক্ত আছেন। আপনি ও-সব করবেন না।

নাথুয়া ঘরে প্রবেশ করিল, মঞ্জুষা তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল,—এ কি! নাথুয়াও কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া একটা সেলাম ঠুকিয়া সহর্ষে কহিল,—আরে মঞ্জুষা দিদি-বাবু! আপ কব্ মুলুকসে আ গেয়ী?

মঞ্জুষা কহিল,—আপনিই যে সোমনাথ বাবু, তা চিনতে পারিনি, আপনার নাথুয়া সন্দেহভঞ্জন কোরে দিলে।

সোমনাথ মাথা নাড়িয়া কহিল,—হ্যাঁ, চিনতে না পারবারই কথা। সকলকে কি সব সময়ে মনে থাকে?

মঞ্জুষা হাসিয়া উত্তর দিল,—আচ্ছা, এটা না হয় আমার ত্রুটি, কিন্তু আপনিই কি চিনেছিলেন?

—আমার পক্ষে সেটা অন্যায় বোলে মনে করি না;

কারণ দু'-বছর আগে এক দিন রাত্তিরে দু'-চার মিনিটের জন্যে আপনাকে দেখেছিলুম। তা ছাড়া—

হঠাৎ সোমনাথ থামিয়া গেল। মঞ্জুষা কহিল,—তা ছাড়া কি বলুন।

—তা ছাড়া, দু'টো কারণে আরও চিনতে না পারবার কথা। প্রথমতঃ, পুরুষের পক্ষে মেয়েদের মুখের পানে বেশীক্ষণ চেয়ে দেখাটা অশিষ্টতার মধ্যে গণ্য, তাই আপনাকে তেমন ভাল কোরে লক্ষ্য করিনি।

এ কথায় মঞ্জুষা একটু জোরেই হাসিয়া উঠিল।

সোমনাথ কহিতে লাগিল,—দ্বিতীয়তঃ, আপনি এখন পরস্ত্রী বোলেই জানা আছে; সুতরাং আপনি এমন ভাবে আসতে পারেন, স্বপ্নেও তা ভাবতে পারিনি!

—আমি পরস্ত্রী! তার মানে? মঞ্জুষার স্বরে একরাশ বিস্ময়—চোখের দৃষ্টিতে হাজার প্রশ্ন!

—মানে, পুরী থেকে ফিরে আপনাদের খবর নিতে আমি নৃপেনের কাছে গিয়েছিলাম। সে বললে, আপনাকে সে পত্নীত্বে বরণ কোরেছে—আপনাদের দুঃখ ঘোচাবার মহৎ উদ্দেশ্যে!

মঞ্জুষার মুখে কে যেন আবীর মাখাইয়া দিল! সে তীব্র কণ্ঠে কহিল,—এ কথা তিনি বলেছেন, আশ্চর্য্য! তাঁর কি মাথা খারাপ?

এবার সোমনাথ হাসিয়া সহজ ভাবে কহিল,—নৃপেন বরাবর আমাকে চটিয়ে আমোদ পায়। এখন বুঝছি, আমায় চটাবার জন্যেই এ তার নূতন ফন্দী!

—ফন্দী! কিন্তু আমাকে পত্নীত্বে বরণ কোরলে আপনি চটবেন, এ ধারণা তাঁর—

মঞ্জুষার কথা শেষ হইল না—কণ্ঠে বাষ্পভার আসিয়া জমিল।

সোমনাথের কাণের ডগা পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল!

সেটুকু মঞ্জুষার দৃষ্টি এড়াইল না। ক্ষিপ্রহস্তে সুটকেস্‌টা টানিয়া উঠিয়া-দাঁড়াইয়া সে কহিল,—তা হোলে আসি, নমস্কার!

সে পা বাড়াইতেই সোমনাথ কহিল,—দাঁড়ান, জিনিস বিক্রি না কোরেই চোলে যাচ্ছেন যে?

—বিক্রি করবো না। এর মধ্যে যা কিছু আছে, সব আপনি রেখে দিন। আপনার কাছ থেকে আমার দাম নেওয়া উচিত নয়।

সোমনাথ বিস্ময়াবিষ্ট কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—কেন?

—আপনি যা করেছেন, সে ঋণ শোধ দেবার নয়!

এ কথায় সোমনাথের মুখ আর একবার রক্তিম হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সে কহিল,—তা হোলে আপনি স্বীকার করেন, আপনি ঋণী?

—অস্বীকার করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

—আপনার মা-ও এ ঋণ স্বীকার কোরবেন?

মঞ্জুষার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। নতমুখে সে নীরব! একটু পরে সোমনাথ প্রীতিমধুর কণ্ঠে কহিল,—তা হোলে সুটকেস্ এখানে রেখে চলুন, আপনার মায়ের কাছে যাই। তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে জেনে আসি, আমার মা হোতেও তিনি রাজি আছেন কি না।...তার পর দেখবো ঐ নৃপেনকে,—রাস্‌কেলের সঙ্গে বোঝাপড়া যা করবো, দেখে বলবেন,—হ্যাঁ ঠিক!

শ্রীইলারাণী মুখোপাধ্যায়।

পাহাড়ী নদী

পাহাড়ের কোলে ছোট্ট পাহাড়ী নদী।
কলকল স্বরে বহিতেছে নিরবধি।

ঝর্ণার মত উচ্ছল গতি তার
শত শত বাধা ভাঙ্গিতেছে বারে বার।
কখনও শান্ত কখনও ক্রুদ্ধ অতি
কখনও চপল, কভু হাসিছে স্রোতস্বতী।
সূর্য্যকিরণে ঝিক্‌মিক্ করে জল
(যেন) মুক্তা-মাণিক করিতেছে ঝলমল।

পাহাড় হইতে উপলখণ্ড পড়ে
দু'-হাত বাড়ায়ে নদী তারে বুকে ধরে।
আশ্রয় দেয় আপন বক্ষতলে
মা যেন শিশুরে লইল বক্ষে তুলে।
সাগরের পানে ছুটে চলে নিরবধি
চঞ্চল সেই ছোট্ট পাহাড়ী নদী।

শ্রীসুনীতি দেবী।

"রংমহালের মিনার ঘিরে
ব্যর্থ প্রেমের অশ্রু ঝরে।"

[শিল্পী—জে, চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথ *

রবীন্দ্রনাথকে দেশের সাধারণ লোক কতটুকু জানে? অধিকাংশ লোক রবীন্দ্রনাথকে এক জন দেশপূজ্য কবি বলিয়া জানে—অনুমানের দ্বারা। যাঁহাকে দেশ-বিদেশের বড় বড় লোকে সম্মান করে—যিনি Nobel prize পাইয়াছেন, যাঁহাকে দেশের রাজ-সরকারও সম্মানিত করিয়াছেন, যাঁহাকে সকলেই দেশগুরু, বিশ্বকবি ইত্যাদি আখ্যা দিয়াছে, তিনি নিশ্চয়ই খুব মস্ত-বড় কবি। ইহাই সাধারণ লোকের অনুমান-লব্ধ ধারণা।

অনেকে তাঁহার রচিত গান দুই-চারিটি শুনিয়াছে, পাঠ্যপুস্তকে বাল্যে কৈশোরে তাঁহার রচনাও কিছু কিছু পড়িয়াছে; ২।১ খানা উপন্যাসও পড়িয়াছে। তাহারা রবীন্দ্রনাথ-সাহিত্যের সামান্য পরিচয় পাইয়াছে সাক্ষাৎ ভাবে, বাকিটুকু তাহাদেরও অনুমান।

মুষ্টিমেয় লোক,—তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সাহিত্যিক, কিংবা শিক্ষাব্রতী, তাঁহারাই রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর অনেকাংশ পাঠ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সাধ্যমত রবীন্দ্র-সাহিত্য বুঝিয়াছেন। 'সাধ্যমত' কথাটা বলিতেছি এই জন্য—

ভাগ্যে যদি মিলে যায় মহারণ্যে সোনার ভাণ্ডার
কতটা আমরা পাই? যতটুকু শক্তি বহিবার
ততটাই পাই মোরা। দাতা যিনি ক'রে যান দান
যতটুকু অভাবের সেই দানে হয় অবসান,
জীবনের প্রয়োজন যতটুকু সেই দানে পূরে,
ততটুকু কৃতজ্ঞতা বিম্বিত সে মর্ম্মের মুকুরে।
গুরু বিতরেন জ্ঞান, সকলের নহেত সমান
গ্রহণ করার শক্তি। মহানদে বারি অফুরান
ঘট যতটুকু পায় সেটুকুরই গাহে সেই জয়,
তৃষিত তটের সাথে সে ঘটের তুলনা না হয়।

মহানদে অফুরন্ত জল, কিন্তু ঘট কতটুকু পায়? তৃষিত তটের সঙ্গে শূন্য ঘটের এ বিষয়ে তুলনা হয় না। অতি অল্প লোকই সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠ করিয়াছে এবং বরাবর রবীন্দ্র-প্রতিভার উন্মেষ-ধারার অনুসরণ করিতে পারিয়াছে। কবি যাহা দিতে চাহিয়াছেন, তাহার সমস্তটুকু অধিগত করিতে কেহই পারে নাই, রবীন্দ্র-সাহিত্যের পূর্ণ পরিচয় লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। রবীন্দ্রনাথ যে রবিকরোজ্জ্বল তুষারশুভ্র সারস্বত শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন—মানস-চক্ষু দিয়া তাঁহার পরিপূর্ণ ভাবমূর্ত্তি অধিগত করিতে হইলে অনেক উচ্চে আরোহণ করিতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের বহু শত বৎসরের তপস্যার ফল। বৈদিক সভ্যতার ধারা হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সংস্কৃতির ধারা পর্য্যন্ত সমস্ত ধারাই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় সম্মিলিত হইয়াছে। শত শত আলোক-রশ্মি অধিশ্রয়ণ (Focus) লাভ করিয়াছে তাঁহার মনীষায়। বৈদিক সভ্যতা, উপনিষদের রসব্রহ্মবাদ, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, বৌদ্ধ সংস্কৃতি, বৈষ্ণব লীলানন্দবাদ, উত্তর ভারতের নানক, দাদু, কবীর, রজব ইত্যাদি মরমী সাধকদের বাণী, সুফীদের রসধর্ম্ম, বাউলদের সর্ব্বসংস্কার-মুক্তির ধর্ম্ম, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য ও লোক-সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন ভাবধারা তাঁহার কবিধর্ম্মে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। তাহার সঙ্গে পাশ্চাত্য জগতের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা ও সাধারণ সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন ধারাও মিলিত হইয়াছে। এই সকল বিচিত্র ধারার মিলনে কবির জীবনে একটি বিরাট্ মানসক্ষেত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার সঙ্গে আছে—কবিগুরুর নিজস্ব দৈবী প্রতিভা ও অপরিমিত অফুরন্ত সৃজন-শক্তি, একনিষ্ঠ সারস্বত সাধনা, যোগিজনোচিত ধ্যান-ধারণা, শান্তিময় নিরুদ্বেগ পরিবেষ, আদর্শ পারিবারিক পরিবেষ্টনী, এবং নিরবচ্ছিন্ন অবসরের দীর্ঘ জীবন। এই অবসর রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার উন্মেষের পক্ষে অত্যন্ত অধিক মূল্যবান্। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—"অসীম সৃষ্টিকার্য্য অসীম অবসরের মধ্যেই নিমগ্ন। উন্নত সাহিত্যোদ্যম—স্বাস্থ্যময়, সৌন্দর্য্যময়, আনন্দময় অবসর।"

এই সুদীর্ঘ জীবনের নিরবচ্ছিন্ন স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্যময়, আনন্দময় অবসরে তিনি যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন,

* কলিকাতা মহানগরীর শিক্ষকমণ্ডলী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধবাসরীয় স্মৃতিতর্পণ সভায় সভাপতির অভিভাষণ।

তাহার পরিমাণ, বৈচিত্র্য, গভীরতা, গহনতা, জটিলতা এতই অধিক যে, যে কোন পাঠকের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ অধিগত করা ব্রহ্মবিদ্যালাভের ন্যায় দুরূহ। কেবল রবীন্দ্র-সাহিত্যই যে কোন জাতির বা দেশের একমাত্র সাহিত্য হইলেই সাহিত্যের দিক হইতে সে জাতি বা দেশের গৌরবের চূড়ান্ত হইতে পারে। রবীন্দ্রসাহিত্যকেই 'সাহিত্যের একটি বিরাট্ বিশ্ববিদ্যালয়' বলা যাইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, গান, প্রবন্ধ, পত্রসাহিত্য, ধর্ম্মসাহিত্য, কথিকা, সমাজতত্ত্ব এবং বহু তত্ত্ব ও নীতি অবলম্বনে রাশি রাশি প্রবন্ধ। সাহিত্য-প্রতিভার এইরূপ বহুশাখ বিকাশ, বহুমুখী অভিব্যক্তি জগতের কোন সাহিত্যিকের জীবনে সম্ভব হয় নাই। কবি নিজেই বলিয়াছেন—"কবিতাতেই আমার সকলের চেয়ে বেশী অধিকার। কিন্তু আমার ক্ষুধানল বিশ্বরাজ্য ও মনোরাজ্যের সর্ব্বত্রই আপনার জলন্ত শিখা প্রসারিত করতে চায়।" (ছিন্নপত্র)

উৎকর্ষের ও বৈচিত্র্যের কথা বাদ দিলে সৃষ্টির আয়তনে ও পরিমাণেও রবীন্দ্র-সাহিত্যের সহিত জগতের অন্য কোন সাহিত্যিকের রচনার তুলনা হয় না। রবীন্দ্রনাথ যে কোন একটি শাখার সাহিত্য রচনা করিয়াই যদি নিবৃত্ত হইতেন—তাহা হইলেও তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক-গণের অন্যতম বলিয়া গণ্য হইতে পারিতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—কেবল যদি গানই রচনা করিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও গীতরচনায় তিনি জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য হইতেন। এত বিচিত্র শ্রেণীর, ভঙ্গীর ও প্রকৃতির কবিতা তিনি লিখিয়াছেন যে, যে কোন ভঙ্গীর—যে কোন একটি শ্রেণীর কবিতা লিখিলেই জগতের শ্রেষ্ঠ কবিদের এক জন হইতে পারিতেন।

সাহিত্যক্ষেত্রে একটি কোন নূতন ভঙ্গী বা আদর্শের প্রবর্ত্তন করিলেই এক জন সাহিত্যিককে যুগপ্রবর্ত্তক বলা হয়। রবীন্দ্র-প্রতিভা কত যে নূতন নূতন বিচিত্র ভঙ্গী, রসসৃষ্টির কত যে নূতন নূতন আদর্শের মধ্য দিয়া উন্মেষিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। রবীন্দ্রনাথ মূর্ত্তিমান্ গতি-প্রবাহ। কোনখানে থামিয়া থাকা তাঁহার কবিচরিত্রের ধর্ম্ম নয়।—"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে"—এই বাণীই তাঁহার কবিজীবনের মূলসূত্র।

আমাদের প্রাচীন কাব্য-সাহিত্যের ছন্দগুলিকে তিনি যেমন অভিনব রূপ দিয়াছেন, আমাদের দেশে প্রচলিত রাগ-রাগিণীগুলিকেও তেমনি তিনি নব নব মূর্ত্তি দান করিয়াছেন। বাঙ্গালার উষর মানসক্ষেত্রে তিনি 'সুরের সুরধুনীর' ভগীরথ।

কেহ কেহ Shelley, Keats, Browning, কালিদাস ইত্যাদি কবিদের সহিত রবীন্দ্রনাথের তুলনা করিয়া থাকেন। Keats ছিলেন ইন্দ্রিয়াত্মক সৌন্দর্য্যের (Sensuous beautyর) উপাসক—রবীন্দ্রনাথ যৌবনেই সে স্তর অতিক্রম করিয়াছেন। Shelley ছিলেন অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য্যের (Transcendental beautyর) উপাসক, প্রৌঢ়ত্বের আগেই তিনি সে স্তর পার হইয়াছেন, Browning-এর জ্ঞানমিশ্রভক্তিবাদ, বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ববোধ ও বিশ্বাত্মকতা তাঁহার খেয়া-রচনার পূর্ব্বেই তাঁহার কাব্যে অসামান্য বাণীরূপ লাভ করিয়াছে। কালিদাসের সৌন্দর্য্যাদর্শ ও রচনার অলঙ্কারাঢ্য পারিপাট্য তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টির একটা অঙ্গ মাত্র। রবীন্দ্রনাথের প্রৌঢ়কালের প্রথম যুগ পর্য্যন্ত যে সকল রচনা, সেই সকল রচনার সহিত এই সকল কবির রচনার তুলনা চলে। তার পর তিনি যখন মহা রহস্যময় mystic height-এ উত্তীর্ণ হইলেন—তখন তাঁহার প্রতিভার অভ্রভেদী গৌরীশঙ্করের সঙ্গে আর কাহার তুলনা হইবে?

কবিত্বের কথা বাদ দিয়া কেবল mystic চিন্তারাজ্যের কথা ধরিলে, রবীন্দ্রনাথের সহিত Plato, Plotinus. Eckpart, Bruno, Spinoza ও Hegel-এর তুলনা হইতে পারে। ইংরেজি-সাহিত্যে শেক্‌সপীয়ার, ফরাসী-সাহিত্যে ভিক্তর হ্যুগো, জার্ম্মাণ-সাহিত্যে গেটে, এবং রুশ-সাহিত্যে টলষ্টয়ের যে স্থান, ভারতীয় সাহিত্যে—এমন কি, এসিয়ার সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের সেই স্থান। কিন্তু সমগ্র জগতে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় তাঁহারাও কবিমর্য্যাদা লাভ করিয়া যান নাই। অবশ্য, সর্ব্বযুগের ও সর্ব্বদেশের সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতাব্দীর কবি বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছে।

এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে, জগতে কোন

সম্রাট্, কোন দিগ্‌বিজয়ী বীর, কোন রাষ্ট্রনেতা, কোন দিগ্‌গজ পণ্ডিত, কোন কবি—জীবদ্দশাতেই তাঁহার মত মর্য্যাদা লাভ করেন নাই। অবশ্য ইহার একটা কারণ, তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া জীবদ্দশাতেই তাঁহার সাহিত্যের সমাদর দেখিয়া যাইবার সুযোগ পাইয়াছেন—আর একটি কারণ, তিনি ভারতের আধ্যাত্মিক বাণী বহন করিয়া দেশ-বিদেশের চিত্তজগৎ জয় করিয়া আসিয়াছিলেন এবং জগতের সকল বিদ্বৎসমাজের মধ্যে নিজের বাণী প্রচার করিতে পারিয়াছিলেন।

যে কোন সভ্য দেশে পাঁচ শত বৎসরে সাহিত্যের যতটা সর্বাঙ্গীণ সমুন্নতির সম্ভব—একা রবীন্দ্রনাথ বঙ্গ-সাহিত্যের ও ভাষার তদপেক্ষাও অধিক উন্নতিসাধন করিয়াছেন। বঙ্গদেশে আর একটা বিপুল সৃষ্টির যুগ আসিয়াছিল। সে যুগ বড়ু চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া রাধামোহন ঠাকুর পর্য্যন্ত প্রায় তিন শত বৎসরব্যাপী। এই তিন শত বৎসরে শতাধিক কবি যাহা দান করিয়াছিলেন, একা রবীন্দ্রনাথ তাহার চেয়ে অনেক বেশী দান করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের দান সে দানের চেয়ে যেমন পরিমাণে আয়ততর, ভাববৈচিত্র্যেও তেমনি আঢ্যতর। রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তটি রসগর্ভ, চিন্তাঘন ও সৃজন-ধর্ম্মে তদ্‌গত বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃতের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত করিয়া বঙ্গভাষাকে সাহিত্য-সৃষ্টির উপযোগিতা দান করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি সাহিত্য-রাজ্যের দায়িত্বভার রঘুর হস্তে দিলীপের ন্যায় রবীন্দ্রনাথের হস্তে সমর্পণ করিয়া পঞ্চাশোর্দ্ধেই বিদায় লইয়াছিলেন। তার পর দিগ্‌বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ এই কাঙালিনী ভাষাকে রাজরাজেশ্বরী করিয়া তুলিয়াছেন। এ যেন কঙ্কালের নবকলেবর লাভ! রবীন্দ্রনাথ এত দ্রুত বঙ্গ-সাহিত্যকে বহু স্তর অতিক্রম করাইয়া লইয়া গিয়াছেন যে, দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, রসবোধের আদর্শ, ভাবানুভূতির শক্তি তাহার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারে নাই। দেশের পাঠক-সম্প্রদায়, এমন কি, দেশের বিদ্বৎসমাজও বহু পিছনে পড়িয়া গিয়াছে। **Matthew Arnold** বলেন—একটি সৃষ্টির যুগের পর একটি আলোচনার যুগ আসে। তার পর আবার সৃষ্টির যুগ আসে—এই ভাবে **Spiral movement**. এ সৃষ্টি ও বলসঞ্চয়ের ধারা চলিতে থাকে—অক্ষিপটলের উন্মীলন ও নিমীলনের মত। কবির কথায় নটরাজের পা-তোলা পা-ফেলার মত। এই হিসাবে বাঙ্গালা-সাহিত্যের সৃষ্টির ঋদ্ধতম যুগের অবসান হইল—জাতির মহাশক্তির **Dynamic** সক্রিয়তার পর **Static** অবস্থা ফিরিয়া আসিল। এখন অন্ততঃ অর্দ্ধশতাব্দীকাল চক্ষু মুদিয়া এই বিরাট্ সৃষ্টিকে উপলব্ধি করিতে হইবে—ইহাকে অনুশীলনের দ্বারা অধিগত করিতে হইবে।

যাহারা গোগ্রাসে রবীন্দ্র-সাহিত্য নির্বিচারে গিলিয়া গিয়াছে, এখনও পরিপাক করিতে পারে নাই—বহু দিন ধরিয়া এখন তাহাদের রোমন্থনের প্রয়োজন।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনেকাংশ শুধু পাঠ করিলেই চলিবে না—বিশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া একনিষ্ঠ পাঠককে ধৈর্য্য ও শ্রদ্ধার সহিত অধ্যয়ন করিতে হইবে; অনেক ক্ষেত্রে 'তপ্ত ইক্ষু-চর্ব্বণের' দুর্লভ আনন্দকেই পুরস্কার মনে করিতে হইবে।

বিশ্বসাহিত্যের সহিত যাঁহার পরিচয় আছে, দেশীয় ও বিদেশীয় সাহিত্য পাঠ করিয়া যিনি সাহিত্যরস-বোধের একটি ধ্রুব আদর্শের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন—ভারতীয় ভাবধারা ও সংস্কৃতির প্রতি যাঁহার শ্রদ্ধা আছে—তিনিই রবীন্দ্র-সাহিত্যের রসবোধের সম্যক্ অধিকারী। কবি বলিয়াছেন, "যে মানুষ বহুশ্রুত সে রস-সৌন্দর্য্যের একটা আদর্শ বাইরে থেকে সংগ্রহ কোরে অনেক পরিমাণে আত্মসাৎ করতে পারে। এর জন্য চাই সাহিত্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ তার সঙ্গে নিরন্তর পরিচয় থাকা।"

হেম-নবীনের রচনা ও রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের রচনার মধ্যেও ব্যবধান অনেকটা—বাস্তব-জগতের সহিত স্বপ্নজগতের যতটা ব্যবধান ততটাই। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের সহিত কিছু পরিচয় থাকিলেই এই সকল রচনার রস উপভোগ করা কঠিন হয় না। তার পর রবীন্দ্র-সাহিত্যের সাহায্যেই রবীন্দ্র-সাহিত্যের রস উপভোগ করিবার অধিকার লাভ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের এক কবিতার মধ্যে অন্য কবিতার রস-উপভোগের সূত্র নিহিত আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-সাহিত্যের সাহায্যে তাঁহার কাব্য-সাহিত্যের ভিতরে প্রবেশ করা যাইতে পারে। কবি বলিয়াছেন,—"সাহিত্য অনুশীলনের সাহায্যেই

সাহিত্যরুচির বিস্তার সাধন করা যায়। এ জিনিসটা সাধুতার মতই স্বাভাবিক, সাধুতা যদি দুর্ব্বল হয়, তবে সাধুসঙ্গ হচ্ছে পথ।” রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের রচনার সাহায্যেই আমাদের মন কতকটা পরবর্ত্তী রচনার রসগ্রহণের উপযোগী হইয়া উঠিয়াছিল—আমরা সেই মন লইয়া তাঁহার রচনাধারার অনুসরণ করিতেছিলাম; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এত দ্রুত চলেন, এত ঘন ঘন তিনি ভঙ্গী ও আদর্শের পরিবর্ত্তন করেন, তাঁহার সোনার তরী এক ঘাট হইতে অন্য ঘাটে এত দ্রুত চলিয়া যায়, এত তাড়াতাড়ি তাঁহার সৃষ্টির বর্ণ ও রূপ পরিবর্ত্তিত হয়,—তাঁহার রসচিত্র-মালা এত দ্রুত চক্ষুর উপর দিয়া চলিয়া যায়—ভাবলোকে তিনি সহসা এত ঊর্দ্ধে উঠিয়া পড়েন যে, আমরা তাঁহার সৃষ্টিধারার অনুসরণ করিতে পারি নাই। পঙ্গুর পক্ষে এক জন বিরাট্ পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে চলা বড়ই কঠিন। সৃষ্টিধারার এখন অবসান হইয়াছে—এখন আমাদিগকে ধীরে ধীরে সেই ধারাকে আয়ত্ত করিতে হইবে।

“ঘষিতে ঘষিতে যৈছে চন্দনের গন্ধের বিস্তার।”

কবি বাঙ্গালা ভাষার কি অপূর্ব্ব রূপ দিয়াছেন, তাহার পরিচয় আজ অল্প কথায় দেওয়া যায় না। সকল দেশের সাহিত্যের ভাষাই সাধারণ সর্ব্বজনোচ্ছিষ্ট ভাষা হইতে স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ “অন্তর হতে আহরি বচন” এ ভাষাকে সরস, সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও অলঙ্কৃত করিয়াছেন,—এক কথায় রবীন্দ্রনাথ পুষ্পিত ভূষায় বঙ্গভাষাকে শৃঙ্গারবেশে সজ্জিত করিয়াছেন। সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ভাব-প্রকাশের প্রয়োজন না হইলে ভাষা কখনও তদুপযোগী হয় না। রবীন্দ্রনাথের অতি বিচিত্র সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ও জটিল ভাব-পরম্পরা প্রকাশের জন্য বঙ্গভাষাকে সাধারণ নিরাভরণ হৈমন্ত বেশ বর্জ্জন করিয়া বৈচিত্র্যময় বাসন্ত বেশ ধারণ করিতে হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ কেবল তাঁহার বিচিত্র লোকোত্তর চিন্তাগুলিকে ব্যক্ত করিবার জন্য নয়, তাঁহার অতীত জীবন-পরম্পরার ভাব-স্থির স্মৃতি ও কল্পজীবনের স্বপ্ননীহারিকাগুচ্ছকে রূপদানের জন্যও আমাদের এই জীর্ণ ভাষাকে তদুপযোগী করিয়া গড়িয়াছেন। শুধু তাহাই নয়। অতীন্দ্রিয় ভাব-সঞ্চারের ভাষাও তিনি দিয়াছেন। এই ভাষা অর্থের নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীতে পরিচ্ছিন্ন লৌকিক ভাষা নয়। কবি বাল্মীকির মুখে যাহা বলিয়াছেন—তাহা তাঁহার ভাষা সম্বন্ধেও সত্য।

মানবের জীর্ণ বাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর
অর্থের বন্ধন হ'তে নিয়ে তারে যাবে কিছু দূর,
ভাবের স্বাধীন লোকে। * *
সূর্য্যেরে বহিয়া যথা ধায় বেগে দিব্য অগ্নিতরী,
মহাব্যোম নীলসিন্ধু প্রতিদিন পারাপার করি,
ছন্দ সেই অগ্নিসম বাক্যেরে করিব সমর্পণ
যাবে চলি মর্ত্ত্যসীমা অবাধে করিয়া সন্তরণ
গুরুভার পৃথিবীরে টানিয়া লইবে ঊর্দ্ধ পানে
কথারে ভাবের স্বর্গে, মানবেরে দেবপীঠ স্থানে।

এই ভাবের স্বর্গে আমাদের বুদ্ধি ও কল্পনা উঠিতে না পারিলেই আমরা বলি—রবীন্দ্রকাব্য হেঁয়ালী।

সাধারণ ভাষাকেও তিনি একটা অভিনব আভিজাত্য দান করিয়াছেন। ভাব-বৈচিত্র্য প্রকাশের জন্য ও অলঙ্কারণের জন্য তিনি নূতন নূতন শব্দের প্রবর্ত্তন এবং নূতন নূতন শব্দ-সঙ্কেত রচনা করিয়াছেন। এই সকল শব্দ ভাবজগতেরই সমৃদ্ধি বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়াছে। চির-প্রচলিত শব্দগুলিও প্রয়োগের গুণে অভিনব সার্থকতায়, নব নব ব্যঞ্জনায়, নব নব রস-পরিবেষে মণ্ডিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন বলিলেই যথেষ্ট হয় না; তিনি বঙ্গভাষার প্রত্যেক শব্দকে অর্থাঢ্য ও রসাঢ্য করিয়াছেন। রস-পরিবেষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রত্যেক শব্দটি মধুকোষে মধুমক্ষীর রূপ ধরিয়াছে। বহু শব্দে কবি তাঁহার মন হইতে অভিনব অর্থগৌরব ও অভিনব মাধুর্য্য সংযোগ করিয়াছেন—অভিধানের দেওয়া অর্থ তাহাদের কাছে স্তম্ভিত। অভিধানসর্ব্বস্ব পাঠকের অভিমান এখানে আঘাত পাইবেই। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের অনুসরণে বঙ্গভাষার নূতন করিয়া অভিধান-সৃষ্টির প্রয়োজন হইয়াছে।

কোন ভাষাতত্ত্ববিদ্, কোন অভিধানকার, কোন দিগ্‌গজ পণ্ডিত চেষ্টা করিয়া একটা নূতন শব্দ ভাষায় চালাইতে পারেন না—কোন শব্দের অর্থশক্তিও বাড়াইতে পারেন না, রবীন্দ্রনাথের মতন ভাষা-সম্রাটের দ্বারাই তাহা সম্ভব হইয়াছে। তিনি বহু শব্দের লক্ষ্যার্থক ও ব্যঙ্গার্থক অর্থশক্তি বাড়াইয়াছেন। আমরা কবিকঙ্কণের

কালকেতুর মত কবির প্রতিভাদেবীর অনুগ্রহে বঙ্গভাষার মাটির তলে সাত ঘড়া সোনা পাইয়াছি।

রবীন্দ্রনাথের আগে বাঙ্গালা ভাষায় অলঙ্কার-প্রয়োগ ছিল নিতান্ত মামুলী ধরণের—মৌলিকতা একেবারেই ছিল না। আগেকার লেখকরা পুরাতন জরাজীর্ণ অলঙ্কার-গুলিকেই মাজিয়া-ঘষিয়া ভাষার ভূষার দাবি মিটাইতেন। এগুলি ছিল—কবিদের এজমালী সম্পত্তি। পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের ব্যবহৃত একই অলঙ্কার বার বার প্রয়োগ করিতে পরবর্ত্তী কবিরা কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। রবীন্দ্রনাথের অলঙ্কার সমস্তই মৌলিক, এবং তাঁহার বিশাল সাহিত্যের বিরাট্ অঙ্গতটে এক অলঙ্কারের দুই বার প্রয়োগ নাই।

বাঙ্গালা ভাষার আর একটি ঐশ্বর্য্য বাঙ্গালার চলতিগৎ (Idiom)। এইগুলি গত শতাব্দীতে অবজ্ঞাত হইয়াই ছিল, অর্থাৎ সংস্কৃতানুগ ভাষার পক্ষে অপাংক্তেয় হইয়া পড়িয়াছিল। এইগুলিকে পাংক্তেয় করিয়া রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালার লুপ্ত-সম্পদের আবিষ্কর্ত্তা এবং পতিতপাবন। কবি এইগুলির নিজস্ব শক্তি উপলব্ধি করিয়া চলতি বাঙ্গালায় লেখা সুরু করেন, এবং প্রচুর পরিমাণে বাঙ্গালা 'ইডিয়ম' প্রয়োগ করিয়া সেই ভাষাকে এমনি জোরালো করিয়াছেন যে, আজ তাহার সাহায্যে উচ্চশ্রেণীর ভাব-প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে।

কবিগুরু এত বিচিত্র বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছেন, এবং সেই চিন্তাকে পরিচ্ছন্ন ভাষায় এমনি শোভন সুন্দর বাণীরূপ দিয়াছেন যে, আমাদের যে কোন ভাবকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রকাশ দান করিতে হইলে রবীন্দ্র-সাহিত্য হইতে অংশ উৎকলন করিয়াই আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি। শোভনতর রূপ দেওয়ার প্রয়াস বাতুলতা মাত্র। রবীন্দ্রনাথের মনোভূমিতে ভূমিষ্ঠ হইয়া, তাঁহার সৃষ্ট পরিবেষমণ্ডলে লালিত হইয়া আজ আমরা যাহা কিছু লিখিতে যাই, তাহাতে অজ্ঞাতসারে তাঁহারই বাণী ফুটিয়া উঠে। আমাদের মুখের কথাতেও কবিগুরুর বাগ্‌ভঙ্গী স্বতঃই আসিয়া পড়ে। এক কথায়, রবীন্দ্রনাথ আমাদের ভাষাকে দিয়াছেন ভূষা, এবং সমগ্র জাতির মুখে দিয়াছেন সেই ভূষায় মণ্ডিত ভাষা। কেবল ভাষা কেন, আমাদের চিন্তার ধারা ও ক্রম, রসবোধের সূত্র, বাদানুবাদের ভঙ্গী, অনুভূতির প্রকৃতি, ভাবপ্রকাশের ছন্দ ও ছাঁদ সমস্তই রবীন্দ্রনাথের দ্বারাই সঞ্চারিত।

বিধাতার এই সৃষ্টির রূপই রবীন্দ্রনাথ আমাদের চোখে বদ্‌লাইয়া দিয়াছেন। প্রকৃতির প্রত্যেক বৈচিত্র্য, প্রত্যেক লীলারঙ্গ, প্রত্যেক দৃশ্যটি আমরা এখন রবীন্দ্রনাথের জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার দ্বারা উন্মীলিত নয়নে দেখিতে শিখিয়াছি। এই চিরপরিচিত নিত্যদৃষ্ট সৃষ্টির অন্তরালে যে এত সৌন্দর্য্য, এত ঐশ্বর্য্য ছিল, তাহা ত আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই!

"যাহা ছিল চির পুরাতন তারে পাই যেন হারাধন।"

তিনি আমাদের দিব্যদৃষ্টি দিয়াছেন, তিনি আমাদের এ দেহপিণ্ডে অভিনব ইন্দ্রিয়ের উদ্বোধন করিয়াছেন, মনের অঙ্গে নব নব দ্বার-বাতায়ন খুলিয়া দিয়াছেন—কবিকে উদ্দেশ করিয়া তাই বলি—

নব শ্রীরূপ সঞ্চারিলে জীবলোকের জীবন ভরি'
নূতন ক'রে গড়লে ভুবন পুন মনোলোভন করি।
কুব্জা হলো অজ্ঞ বিভা, অহল্যা তার তুল্‌ল গ্রীবা
উর্ব্বশীরে মুক্তি দিলে বল্লী-জীবন মোচন করি।

কলির প্রাণে নবীন গন্ধ অলির গানে ছন্দ নব,
মেঘের মুখে মন্দ্র নবীন অর্পিল আ-নন্দ তব।
অনীরিত অনেক বাণী অঝঙ্কৃত অনেক গানই
শুনালে মুক জড়ের মুখে, সম্ভাবিল অসম্ভবও।

নূতন নূতন দ্বারবাতায়ন খুল্‌লে তুমি গগন-গায়ে।
সনাতনী ব্রাহ্মী বাণী আবার শুনি গহন-ছায়ে।
মর্ম্মে পেলাম কল্পশ্রুতি অতীন্দ্রিয় অনুভূতি
নূতন নূতন ইন্দ্রিয়দের ফুটালে এই মনের কায়ে।

অনাদৃত হীন হেয় যা নয়নে তাও লাগ্‌লো ভালো।
জীর্ণ কুঁড়ের ছিদ্রগুলো ঝর্ণা হ'য়ে ঢাল্‌ল আলো।
ইন্দ্রধনুর কান্তরাগে তোমার তুলীর টানটি জাগে,
তোমার চরণাঙ্ক লভি তৃণাঙ্কুরও মন ভুলালো।

নিরানন্দ 'দুঃখালয়মশাশ্বত'ম্ এই সৃষ্টির মধ্যে আনন্দময় প্রেম-লোকের সাক্ষাৎ লাভ যে কত বড় লাভ, তাহা রসজ্ঞ ভাগ্যবান্ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেহ বুঝিবে না!

সৃষ্টির বৈচিত্র্য তাঁহাকে যে গভীর আনন্দ দান করিয়াছে—আমাদের ভাগ্যে তাহার পরিপূর্ণ উপভোগ

ঘটে নাই বটে, কিন্তু সে আনন্দের যজ্ঞভাগ হইতে আমরাও একেবারে বঞ্চিত হই নাই। তাই রবীন্দ্র-যুগে জন্মগ্রহণ পরম সৌভাগ্য মনে করি। কবি তাঁহার আনন্দলোকের স্বপ্নজাল দিয়া সমস্ত সৃষ্টিকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। Wordsworthএর ভাষায়—

He gave me eyes and gave me ears
Humble cares and delicate fears,
A heart—a fountain of sweet tears
Love and faith and joy.

[এখানে She-এর স্থলে কেবল He বসাইয়াছি।]

কবি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন—

শুধু বাঁশিখানি হাতে দাও তুলি
বাজাই বসিয়া প্রাণ মন খুলি
পুষ্পের মত সঙ্গীতগুলি ফুটাই আকাশ-ভালে।
অন্তর হ'তে আহরি বচন আনন্দলোক করি বিরচন
গীত-রসধারা করি সিঞ্চন সংসার-ধূলিজালে।
ধরণীর শ্যাম করপুটখানি ভরি দিব আমি সেই গীত আনি
বাতাসে মিশায়ে দিব এক বাণী মধুর অর্থভরা,
নবীন আষাঢ়ে রচি নব মায়া
এঁকে দিয়ে যাব ঘনতর ছায়া,
ক'রে দিয়ে যাব বসন্তকায়া বাসন্তী বাসপরা।
ধরণীর তলে গগনের গায় সাগরের জলে অরণ্য ছায়
আরেকটুখানি নবীন আভায় রঙীন করিয়া দিব,
সংসার মাঝে দু'একটি সুর রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর
দুয়েকটি কাঁটা করি দিয়া দূর তার পরে ছুটি নিব।
সুখহাসি আরো হবে উজ্জ্বল সুন্দর হবে নয়নের জল
স্নেহ-সুধা মাখা বাসগৃহতল আরো আপনার হবে।
প্রেয়সী-নারীর নয়নে অধরে আরেকটু মধু দিয়ে যাব ভ'রে
আরেকটু মধু শিশুমুখ 'পরে শিশিরের মত রবে,
না পারে বুঝাতে আপনি না বুঝে
মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে
কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে মাগিছে তেমনি সুর,
কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা
বিদায়ের আগে দু'চারিটি কথা রেখে যাব সুমধুর।

আমাদের প্রকাশের ভাষা কবিই দিয়া গিয়াছেন। "কথা খুঁজে খুঁজে না ফিরে" আমার বক্তব্য কবির ভাষাতেই তাই ব্যক্ত করিলাম। কবিতার 'অঙ্গীকার' কবি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া গিয়াছেন।

অন্ধকারে আমরা যাহা স্পর্শের দ্বারা অনুভব করি, অস্পষ্ট আলোকে যাহার রূপের আভাস মাত্র পাই—রবির আলোকে আমরা তাহা সুস্পষ্ট ভাবে দেখিয়াছি। আমাদের দৃষ্টিকে মুক্তি দিয়া রবি শুধু এই সৃষ্টিকে আমাদের চোখে প্রকাশিত করেন নাই—তাঁহার কিরণ-সম্পাতে সৃষ্টির মধ্যে যাহা 'গুহাহিত গহ্বরেষ্ঠ,' তাহাও আমাদের চোখে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তৃণাগ্রের অশ্রুশিশির-কণাটিও হসিতচ্ছবি মুক্তার রূপ ধরিয়াছে।

শুধু বিধাতার সৃষ্টি নয়, অন্য কবির সৃষ্টির কুহরে কুহরে যে রস সঞ্চিত আছে—তাহার সন্ধানও তিনি আমাদের দিয়াছেন। রবির আলোকে যেমন অন্য গ্রহও উজ্জ্বল হইয়া উঠে—রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত রসাদর্শে তেমনি অন্য কবিদের রচনাও আমাদের অধিকতর উপভোগ্য হইয়াছে। এইভাবে জগতের সকল কবির, সকল শিল্পীর—সকল গুণীর সৃষ্টির মধ্যে কেমন করিয়া রসের সন্ধান পাইতে হয়—তাহা তিনিই আমাদের শিখাইয়াছেন।

শুধু বাহিরের সৃষ্টির কথা নয়, আমাদের অন্তরের সুখদুঃখের বর্ণ পর্য্যন্ত রবির আলোকে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। রবীন্দ্র-সাহিত্য আমাদের মনের সুকুমার বৃত্তিগুলির সৌকুমার্য্য আরও বাড়াইয়া দিয়াছে—আমাদের মধ্যকার দুর্দ্দান্ত পশুটাকে একেবারে বধ করিতে পারে নাই সত্য—কিন্তু তাহাকে নখশৃঙ্গদংষ্ট্রায় বঞ্চিত করিয়াছে।

কেবল আমাদের বাস্তব জীবনের পরিবর্ত্তন ঘটে নাই—আমাদের স্বপ্নজীবনটা যেন সম্পূর্ণ কবিরই সৃষ্টি। আমাদের কল্পনা কবিরই নির্দ্দিষ্ট পথে এখন ধাবিত হয়—সে আর স্বৈরাচারী নয়।

কেবল সুখ দুঃখ নয়, পাপ, তাপ, লোকলোকান্তর, জীবাত্মা, পরমাত্মা, মৃত্যু, সংসার, বৈরাগ্য, কর্ম্ম, জ্ঞান, প্রেম, কল্যাণ ইত্যাদি সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা ও মতবাদ কবিই নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিয়াছেন। তাই বলি, আমরা যে রবীন্দ্রনাথকে দেশগুরু বলি, তাহা মর্য্যাদা প্রকাশের একটা অভিধা মাত্র নয়—ইহা বর্ণে বর্ণে সত্য।

রবীন্দ্রনাথ কেবল বঙ্গ-সাহিত্যকে জগতের সভ্যজাতি

সমূহের সাহিত্যের সমকক্ষ করিয়া যান নাই, তিনি সমগ্র ভারতবর্ষকেই জগতের সমক্ষে সুসভ্যদেশের পর্য্যায়ে উন্নীত করিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের আগে কোন কোন ভারতীয় মহাপুরুষ ও প্রাচ্যবিদ্যায় প্রাজ্ঞ য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ ভারতীয় সভ্যতার গৌরব জগতে প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ছিল বিদ্বৎসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এবং সে গৌরব কেবল প্রাচীন ভারতেরই প্রাপ্য।

রবীন্দ্রনাথ জগতের আপামর সাধারণের কাছে ভারতের সভ্যতাকে পরিচিত করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান ভারত-ও যে সমগ্র জগতের শ্রদ্ধার পাত্র, তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন। সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ অঙ্গ রাষ্ট্রাধিকার, যুদ্ধ-বিগ্রহ, ব্যবসায়-বাণিজ্য নয়। সাহিত্য ও ধর্ম্মই সর্ব্বোচ্চ অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান ভারতের ধর্ম্ম ও সাহিত্যের বিশ্বদূত, বর্ত্তমান ভারতের সাহিত্য ও ধর্ম্ম-সাধনার চরমোৎকর্ষই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের মধ্য দিয়া জগতে প্রচারিত হইয়াছে।

২৫ বৎসর বয়সে কবি তাঁহার কড়িকোমলে লিখিয়াছিলেন—

উঠ বঙ্গকবি মায়ের ভাষায়　মুমুর্ষুরে দাও প্রাণ,
জগতের লোক সুধার আশায়　সে ভাষা করিবে পান।
চাহিবে মোদের মায়ের বদনে　ভাসিবে নয়ন-জলে
বাঁধিবে জগৎ গানের বাঁধনে　মায়ের চরণতলে।
বিশ্বের মাঝারে ঠাঁই নাই বলে　কাঁদিতেছ বঙ্গভূমি
গান গেয়ে কবি জগতের তলে　স্থান কিনে দাও তুমি।
একবার কবি মায়ের ভাষায়　গাও জগতের গান
সকল জগৎ ভাই হয়ে যায়　ঘুচে যায় অপমান।

তাঁহার আহ্বান শুনিবার সামর্থ্য আর কাহারও ছিল না। কবি নিজেই নিজের আমন্ত্রণীর সার্থকতা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীকালিদাস রায়।

চাকুরীর টান

সেই ধরা-বাঁধা নিয়মে আফিসে যাওয়া,
　কোথাও কর্ত্তা, কোথাও বা তাঁবেদার,
কভু প্রশংসা কখনো নিন্দা পাওয়া।
　দাস কি মনিব বুঝাই হ'ত যে ভার!

কত কাজ, কত কথা, কত খুঁটি-নাটি,
　কত আনন্দ কতই ভাবনা ভয়,
কতই সফর, সমারোহ পরিপাটী,
　কত দর্শক-আশা উদ্বেগময়!

কত রকমের আদেশ পালন করা,
　কতই আদেশ দেওয়া দৈনন্দিন,
কত আলোচনা সুদূর দৃষ্টিভরা
　নিতি নব নব পরিচয় প্রীতিহীন।

জীবন-বীমার চাঁদা পাঠাবার কথা,
　ছেলের পড়ার টাকার তাগিদ আসা,
চিঠি না পাওয়ার লাগি কত ব্যাকুলতা—
　মোটের উপর গেছে দিনগুলি খাসা।

দীর্ঘ দিনের পরে এলো অবকাশ—
　পোষ মেনে গেছে এমনি খাঁচার পাখী,
মুক্ত পবন, সুন্দর নীলাকাশ
　টানিতে পারে না—দাঁড়ে আবদ্ধ আঁখি।

ভুলিতে পারে না নিয়মিত জল দানা,
　ছোট পিঞ্জরই গোটা ধরিত্রী তার,
জড়িমায় তার জড়িত দুইটি ডানা
　শেখা বুলি ছাড়া কিছুই বলে না আর।

সুলগনে কভু বিহগের মনে পড়ে
　সবল পক্ষ গিরি-শিখরের বাসা,
গরুড়ের জ্ঞাতি অমৃতের কথা স্মরে,
　ভাবে এবারেও বৃথা হ'ল ভবে আসা।

কি হতে পারিত—সে সব কাহিনী থাক্
　আলোয় আলোয় গেছে ত দিবস ভাল,
বুঝিতে পারে না শিকলের শত দাগ,
　দেহ-মন দুই বিকৃত হয়ে গেল।

পক্ষ শিথিল বক্ষেতে নাহি বল
　দেখে আকাশেতে নব জলধর-মেলা,
ক্ষুদ্র চাতক ডাকিছে ফটিকজল
　কত রমণীয় তার ও বিকালবেলা।

পিঞ্জরার শিক্ স্মরিয়া দিবস কাটে,
　কথা ডোবে তার নবীনের কলরবে;
পথিক ভাবিছে দাঁড়ায়ে পথের ঘাটে
　কত সহজে সে ত্যজেছে সুদুর্লভে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

উপনিষদের ব্রহ্মবাদ

২

ব্রহ্মই বিশ্বযোনি, সকলের প্রভু, সকলের অধিপতি। ইনিই সর্ব্বেশ্বর, ইনিই ভূতাধিপতি, ইনিই ভূতপালক, সর্ব্বলোকের বিভাজক, ধারক এবং পোষক। ইনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, সত্যকাম এবং সত্যসঙ্কল্প। ইনি ঈশ্বরের ঈশ্বর, মহেশ্বর, দেবতাগণেরও পরম দেবতা, প্রজাপতিরও ইনি পতি, ইনি বিশ্বপতি, এই নিখিল বিশ্বের ইনি কর্ত্তা ও শাসক।[১] জীব ও জগৎ ব্রহ্মেরই বিভাব বা মায়িক বিকাশ। প্রলয়ের অন্ধকারে যখন নিখিল বিশ্ব আবৃত ছিল, তখন এক ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই ছিল না, চরাচর জগৎ ব্রহ্মেই বিলীন ছিল। সৃষ্টির উষায় সেই প্রলয়ের অন্ধকার ভেদ করিয়া স্বয়ংজ্যোতিঃ ব্রহ্মই জীব ও জগৎরূপে প্রকাশিত হইলেন, আপনার মধ্যে বিলীন জগৎকে আবির্ভূত করাইলেন। সৃষ্টির প্রারম্ভে তাঁহার কাম, কামনা বা সৃজনী বৃত্তির উদয় হইল। তিনি মনে করিলেন, "এক আমি বহু হইব," "আমি জন্ম গ্রহণ করিব," তাঁহার এই বহু হইবার প্রবৃত্তি, জগৎ-সৃষ্টির ইচ্ছা, মায়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই মায়া বা কাম প্রলয়ের অবস্থায় ব্রহ্মের মধ্যেই লুপ্ত ছিল। সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত্তে ঐ লুপ্ত কামনা বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মকে জগৎ-সৃষ্টির প্রেরণা দিল। মায়ার উদরে বিলীন বিশ্বকে তিনি ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ দিয়া প্রকাশ করিলেন। এই প্রকাশই বিশ্বের জন্ম। তার পর, তিনি সৃষ্ট জগতের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিজকে সৃষ্টির জালে আবৃত করিলেন, জড়-জগতে জীবনী-শক্তি সঞ্চার করিলেন, কিন্তু তিনি ইহাতেই নিঃশেষ হইয়া গেলেন না; তিনি যেমন জগৎকে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য জগতের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন, সেইরূপ জগতের বাহিরেও তিনি বিদ্যমান রহিলেন; জগতের অন্তরেও তিনি, বাহিরেও তিনি; যাহা কিছু ব্যক্ত, যাহা কিছু অব্যক্ত, সমস্তই তিনি; সমস্তই ব্রহ্মময়, সমস্তই আত্মবাসিত—ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্—নৃঃ তাঃ ৭, আত্মৈবেদং সর্ব্বম্—ছাঃ ৭।২৫।১, "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্—ঈশ ১। বাস্তবিক ব্রহ্ম ব্যতীত জগৎ বলিয়া কিছুই নাই, ব্রহ্মই মায়াবশে জগৎ-রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মই জীবরূপে জগতে প্রবেশ করিয়া নাম ও রূপের ভেদ সাধন করিলেন, দ্বৈত জগতের সৃষ্টি করিলেন। এই নাম, রূপ ও দ্বৈত জগৎ সমস্তই মিথ্যা, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। যেমন একখণ্ড মাটিকে জানিলে সমস্ত মৃন্ময় বস্তুই জানা হয়, কেন না, সমস্ত মৃন্ময় বস্তু এক মাটিরই বিভিন্ন বিকার। ঐ বিভিন্ন মৃন্ময় পদার্থের রূপ ও নাম ভিন্ন হইলেও উহা যেমন মাটি ব্যতীত আর কিছুই নহে, সেইরূপ সাগর, ভূধর, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, পশু, পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গম জগৎ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। জাগতিক পদার্থের মধ্যে নাম ও রূপের পার্থক্য থাকিলেও ইহার মূলে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই বিরাজমান। জগৎকে ব্রহ্মরূপে দেখিলেই যথার্থ দেখা হইল, ব্রহ্ম ভিন্ন জগৎরূপে দেখিলেই সেই জগৎ-দর্শন মিথ্যা হইবে। ব্রহ্মই মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তরূপে, ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে, মর্ত্ত্য ও অমৃতরূপে প্রকাশিত হন; মূর্ত্ত ব্যক্তরূপ ব্রহ্মের মায়িক রূপ, সুতরাং মিথ্যা; অমূর্ত্ত, অব্যক্ত, অমৃতরূপই সত্য। এক ব্রহ্মই বহু নামে, বহু রূপে প্রতিভাত হন। এই তত্ত্বই বৈদিক ঋষি উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন—একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি, ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৪৬।

জগৎ যে ব্রহ্মের মায়িক বিকাশ এবং তত্ত্বতঃ মিথ্যা, তাহা আলোচনা করা গেল। এখন আমরা জীবের স্বরূপ বিচার করিব।

জীব ব্রহ্মাগ্নির স্ফুলিঙ্গ, ব্রহ্মসিন্ধুর বিন্দুমাত্র। উপনিষদ্ বলিয়াছেন—যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি হইতে সহস্র সহস্র

১। সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ...... এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্ব্বিধরণ এষাং লোকানাম-সম্ভেদায়।

—বৃহদাঃ ৪।৪।২২

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যামী এষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্,—মাণ্ডূক্য ৬।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্ তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পুরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্।

—শ্বেতাশ্বতর ৬.৭

বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ অক্ষর পুরুষ হইতে বিবিধ জীব উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং পরিণামে তাহাতেই বিলীন হয়। অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ পরমাত্মা পরব্রহ্ম হইতে সমস্ত প্রাণ, সমস্ত লোক, সমস্ত দেবতা ও ভূতসমূহ নির্গত হয়।১ জীব ব্রহ্মেরই অংশ। জীব যে ব্রহ্মাংশ, এ কথা শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় আরও স্পষ্ট বাক্যেই বলা হইয়াছে—মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ, গীঃ ১৫।৭, ব্রহ্মসূত্রের মতও গীতার অনুরূপ (অংশো নানাব্যপদেশাৎ ইত্যাদি, ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪৩)। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, ব্রহ্ম তো নিরবয়ব ও নিরংশ, নিরংশ ব্রহ্মের জীব-অংশ হয় কিরূপে? জীবকে যে ব্রহ্মাংশ বলা হইয়াছে, ইহার অর্থ কি? ইহার উত্তরে অদ্বৈত বেদান্তী বলেন—নিরংশ ব্রহ্মের অংশ অসম্ভব বলিয়া জীব বস্তুতঃ ব্রহ্মের অংশ নহে, তবে অংশের মত (অংশ ইব), অর্থাৎ জীব অখণ্ড চৈতন্যের সখণ্ড অভিব্যক্তি। জীব ঘটাকাশ, ব্রহ্ম মহাকাশ। অনন্ত মহাব্যোম যেমন ঘটাদি বিষয়ের আবরণে আবৃত হইয়া ঘটাকাশ, মঠাকাশ প্রভৃতি বিভিন্ন নাম ধারণ করে, বস্তুতঃ ঘটাকাশ, মঠাকাশ সেই মহাকাশ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, সেইরূপ জীবও ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে—জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ। অনন্ত মহাকাশের উপাধি ঘট, আর অনন্ত চিদাকাশের উপাধি জীবের অন্তঃকরণ বা হৃদয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—সকলের হৃদয়েই আমি অবস্থিত—সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ। গীতা ১৫।১৫। হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থান করেন - ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। গীতা ১৮।৬১। সর্ব্বভূতের হৃদয়ই আত্মার আবাস-গৃহ। এই জন্যই উপনিষদে হৃদয়কে ব্রহ্মের 'গুহা' এবং জীব-দেহকে "ব্রহ্মপুর" বলা হইয়াছে। এই হৃদয়-গুহা বা ব্রহ্মপুরের বর্ণনায় ছান্দোগ্য বলিয়াছেন যে, এই দেহে (ব্রহ্মপুরে) একটি ক্ষুদ্র পদ্ম (পুণ্ডরীক) আছে, এই পদ্মটি একটি গৃহ। ঐ গৃহের মধ্যে ক্ষুদ্রতর অন্তরাকাশ বিরাজ করে; ঐ আকাশের অভ্যন্তরে যিনি অবস্থান করেন, তাঁহার অন্বেষণ করিবে—তাঁহাকে জানিতে চেষ্টা করিবে।১ ব্রহ্মই ঐ দহরাকাশে বিরাজ করেন। এই জন্যই ঐ দহরাকাশকে শাস্ত্রে ব্রহ্মকোষ বলা হইয়াছে। এই কোষই ব্রহ্মের উপাধি এবং জীবভাবের মূল,—কোষোপাধি, বিবক্ষায়াং যাতি ব্রহ্মৈব জীবতাম্। পঞ্চদশী ৩।৪১। এই ব্রহ্মকোষের বর্ণনায় উপনিষৎ বলিয়াছেন যে, নীল মেঘের মধ্যে অবস্থিত বিদ্যুতের মত ভাস্বর নবীন ধান্যের শীষের (অগ্রভাগের) ন্যায় ক্ষুদ্রতম, জ্যোতির্ম্ময় এই কোষ অণুর সহিত উপমেয়।২ সূক্ষ্ম দহরাকাশকে লক্ষ্য করিয়াই জীবকে অণু বলা হইয়াছে। কেশের শত ভাগের এক ভাগকে পুনরায় যদি শত শত খণ্ড করা যায়, তবে সেই কেশাংশ যেমন ক্ষুদ্রতম হয়, ব্রহ্মাংশ জীবকে সেইরূপই ব্রহ্মের অতি ক্ষুদ্রতম অংশ বলিয়া জানিবে। জীবের প্রকৃত ব্রহ্মরূপ জানিলেই অমর হওয়া যায়।৩ জীবকে এইরূপে অণুপরিমাণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও জীব বাস্তবিক অণু নহে। জীবের উপাধি অণু, সেই জন্যই জীবকে অণু বলিয়া মনে হইয়া থাকে।৪ জীব স্বভাবতঃ অণু হইলে কোন কোন শ্রুতিতে জীবকে যে আকাশের ন্যায় বিভু এবং মহত্তম বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।৫ আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ, এই সকল বর্ণনার সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। বিভিন্ন উপনিষৎ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, জীবকে কোথায়ও অণু হইতে অণু, আবার

১। যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্ বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি। – মুণ্ডক ২।১।১

যথা অগ্নেঃ ক্ষুদ্রাঃ বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি—বৃহদাঃ ২।১।২০

১। অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্, ছাঃ ৮।১।১

২। নীলতোয়দমধ্যস্থা বিদ্যুল্লেখেব ভাস্বরা।
নীবারশূকবৎ তন্বী পীতা ভাস্বত্যণূপমা।
—মহানারায়ণ উপনিষৎ ১১।১২, তৈঃ আঃ ১০।১১

৩। বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে।
—শ্বেতাশ্বঃ ৫।৯

৪। বুদ্ধের্গুণেনাত্মগুণেন চৈব
আরাগ্রমাত্রো হ্যবরোঽপি দৃষ্টঃ। —শ্বেতাশ্বঃ ৫।৮
এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ। —মুণ্ডক ৩।১।৯,

৫। স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু
—বৃহদাঃ ৪।৪।২২,

কোথায়ও বা মহৎ হইতেও মহত্তম বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।১ জীব সম্বন্ধে এইরূপ পরস্পরবিরোধী বর্ণনার তাৎপর্য্য এই যে, জীবের নিজের কোন পরিমাণ নাই, জীব বস্তুতঃ অজ্ঞেয়, অমেয়, উপাধির পরিমাণ জীবে আরোপিত হইয়া জীবকে অণু বা বিভু বলা হইয়া থাকে। জীবের উপাধি যেখানে অণু, জীবও সেখানে অণু, উপাধি যেখানে মহান্, জীবও সেখানে মহান্। নিরুপাধি জীব সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ, সুতরাং সে যে মহত্তম ও বৃহত্তম হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? জীব ঘটাকাশ, ব্রহ্ম মহাকাশ—এইরূপে যে উপনিষদে জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, বেদান্তের পরিভাষায় ইহা "অবচ্ছেদবাদ" বলিয়া প্রসিদ্ধ। এতদ্‌ব্যতীত উপনিষদে জীবকে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বলিয়াও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের বুদ্ধিতে যে প্রতিবিম্ব পড়ে, সেই প্রতিবিম্বই জীব। ব্রহ্ম বিম্ব, জীব প্রতিবিম্ব, বুদ্ধি সেই প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিবার উপযুক্ত দর্পণ। এই প্রতিবিম্ববাদের বিশ্লেষণে উপনিষদ্ বলিয়াছেন যে, এক অদ্বিতীয় আত্মাই ভূতে-ভূতে বিরাজ করিতেছেন, জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্বের ন্যায় একই বহুরূপে দৃষ্ট হইতেছেন। একই সূর্য্য যেমন বিভিন্ন জলাধারে প্রতিবিম্বিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হন, সেইরূপ একই চিৎসূর্য্য বিভিন্ন জীব-হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রতিজীবশরীরে বিভিন্ন বলিয়া প্রকাশিত হন।২

এই প্রতিবিম্ববাদ বেদান্তচিন্তায় বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছে। সূর্য্যের এই উপমাটি বাদরায়ণ তাঁহার ব্রহ্ম-সূত্রেও গ্রহণ করিয়াছেন—(অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ। ব্রঃ সূঃ ৩।২।১৮), এবং জীব যে ব্রহ্মেরই আভাস বা প্রতিবিম্ব, তাহাও সূত্রে স্পষ্টতঃ স্বীকার করা হইয়াছে—(আভাস এব চ। ব্রঃ সূঃ ২।৩।৫০), বুদ্ধি-প্রতিবিম্ব জীব স্বীয় অজ্ঞান বশতঃ বুদ্ধির ধর্ম্ম সুখ, দুঃখ প্রভৃতি নিজের ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে, মোহগ্রস্ত হইয়া শোক ও দৈন্যের অধীন হয়, স্বীয় নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব বিস্মৃত হয়—অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ—মুণ্ডক ৩।২, জীবের এই বিভ্রান্তিই মোহনিদ্রা। মায়াই ইহার মূল। মায়া অনাদি এবং সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী। এই মায়াই ব্রহ্মের তিরস্করণী, আবার এই মায়াই জগজ্জননী প্রকৃতি এবং মায়াধীশই জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বর বা মহেশ্বর।১ এই মহেশ্বরই সকল প্রকার শক্তি-সামর্থ্যের প্রস্রবণ। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন—তাঁহার শক্তি বিবিধ বলিয়া শুনা যায়—জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ। তিনি তাঁহার বিবিধ শক্তিদ্বারা সমস্ত জীব-জগৎ শাসন করেন। তিনি এক অদ্বিতীয় রুদ্র, তিনি ঈশান, সকলের অধিপতি, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বান্তর্য্যামী। স্থাবর-জঙ্গম জগৎ, দ্বিপদ, চতুষ্পদ প্রভৃতি প্রাণিবর্গের তিনি প্রভু।২ তিনি মায়ার অধীশ হইলেও মায়ার বশ নহেন, মায়াই তাঁহার বশ; পক্ষান্তরে জীব অনীশ, সুতরাং মায়ার বশ। জীব অজ্ঞ, ঈশ্বর প্রাজ্ঞ। অজ্ঞ জীব তাঁহার অজ্ঞতা বুঝিতে পারে না, এই জন্যই শোক-মোহে অভিভূত হইয়া সংসারের জ্বালায় জ্বলিয়া মরে; যদি ভাগ্যবশে কখনও সদ্‌গুরুর সঙ্গ লাভ করে এবং গুরু তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন যে, হে ভ্রান্ত জীব! তুমি জরা-মরণশীল বা শোক-মোহের অধীন নহ, তুমি ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, তোমার এই আত্মাই ব্রহ্ম—"অয়মাত্মা ব্রহ্ম," "তত্ত্বমসি"। এইরূপ সদ্‌গুরুর উপদেশে যখন তাহার প্রজ্ঞা-নেত্র উন্মীলিত হয়, সে তখন বুঝিতে পারে, আমিই সেই ব্রহ্ম, নিত্যমুক্ত এবং সদা পূর্ণ—"অহং ব্রহ্মাস্মি" "সোঽহম্," সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্। এইরূপ আত্মবোধ উদিত হইলে জ্ঞানের আলোকে

১। অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্ কঠ—২।২০
—শ্বেতাশ্বঃ ৩।২০, তৈঃ আঃ ১০।১০
২। এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ।—ব্রহ্মবিন্দু ১২

১। অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।—শ্বেতাশ্বতর ৪।৫
মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।—শ্বেতাশ্বঃ ৪।১০
২। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ।—শ্বেতাশ্বঃ ৬।৮
একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ।
য ইমান্ লোকান্ ঈশত ঈশনীভিঃ।—শ্বেতাশ্বঃ ৩।২
এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্য্যামী,—মাণ্ডুক্য ৬
সর্ব্বস্য প্রভুরীশানং সর্ব্বস্য শরণং বৃহৎ।—শ্বেতাশ্বঃ ৩।১৭
বশী সর্ব্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ—শ্বেতাশ্বঃ ৩।১৮
য ঈশেঽস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ।—শ্বেতাশ্বঃ ৪।১৩

অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হয়, জীব ও ব্রহ্মের ভেদ সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়। ঘটাকাশ মহাকাশে বিলীন হয়। প্রতিবিম্ব বিম্বে মিলিত হয়, জীববিন্দু ব্রহ্মসিন্ধুতে পড়িয়া নিজকে হারাইয়া ফেলে। নদী যেমন একদিন না একদিন মহাসাগরে মিশিবেই, জীবের জীবন-প্রবাহও সেইরূপ একদিন না একদিন ব্রহ্ম-সমুদ্রে মিশিবেই মিশিবে। ইহাই জীবের পরিণতি, জীব-জীবনের চরম ও পরম সার্থকতা। এই অবস্থার বর্ণনায় উপনিষদ্ বলিয়াছেন—নদী সকল যেমন সমুদ্র অভিমুখে ধাবিত হয় এবং সমুদ্রে পতিত হইয়া নিজকে হারাইয়া ফেলে, তখন তাহাদের কোন নামও থাকে না, রূপও থাকে না, একমাত্র সমুদ্রই বর্ত্তমান থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মদর্শী জীব ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্ম-সমুদ্রে অন্তর্হিত হয়, তখন তাঁহার কোন নামও থাকে না, রূপও থাকে না, কেবলমাত্র ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকে।১

নাম-রূপ-বন্ধন-বিমুক্ত জীবের ও ব্রহ্মের তখন কোনই ভেদ থাকে না; সর্ব্বপ্রকার বিভেদ তিরোহিত হয়। চিদাভাস চিদাকাশে সম্প্রসারিত হয়। জীবসম্বিৎ ব্রহ্ম সম্বিতে পরিণত হয়। সঃ ও অহম্, তৎ ও ত্বম্, জীব ও ব্রহ্ম একীভূত হইয়া যায়। জীবের ইহা আত্ম-বিনাশ নহে, ইহা জীব-জীবনের পূর্ণতা। এই পূর্ণতায় পৌছিতে হইলে জ্ঞান-তরবারের সাহায্যে জীবের সর্ব্ববিধ বন্ধন ছেদন করিতে হয়, অবিদ্যা কামকর্ম্মের উচ্ছেদ করিতে হয়। তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত অজ্ঞানের বিনাশ অসম্ভব। যে পর্য্যন্ত জীবের তত্ত্বজ্ঞানের উদয় না হইবে, সেই পর্য্যন্ত জীবকে অবিদ্যা, কামকর্ম্মের ফলে সংসার-চক্রে জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত্তে পড়িয়া অনন্তকাল ঘুরিয়া মরিতে হইবে। দেহ-ধারী জীবের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। মৃত্যুতে জীব-দেহের ধারক ও পোষক জীবাত্মার সহিত জড়দেহের নিবিড় সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়, ফলে শীর্ণ দেহ বিধ্বস্ত হয়। জীবাত্মা শীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া কোন নূতন দেহ আশ্রয় করে। এইরূপে জীবশরীরকে কেন্দ্র করিয়া জীবনমৃত্যুর আবর্ত্ত চলিতেছে। জীবাত্মার কিন্তু বস্তুতঃ জন্মমৃত্যু নাই। জীবাত্মা অজর, অমৃত ও ধ্রুব।১

মৃত্যুকালে মুমূর্ষু জীবের বাক্‌শক্তি তেজঃশক্তিতে অন্তর্হিত হয়। প্রাণ বায়ুতে মিশিয়া যায়। চক্ষু সূর্য্যে, মনঃ চন্দ্রে, শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশে, শরীর পৃথিবীতে, আত্মা মহাব্যোমে, লোমসমূহ তৃণ-লতা প্রভৃতিতে, কেশপাশ বৃক্ষে, রক্ত ও শুক্র জলমধ্যে বিলীন হইয়া থাকে।২ এইরূপে শরীরাবয়ব বিনষ্ট হইলেও ঐ জীব-পুরুষ বিনষ্ট হয় না। জীবাত্মা তখন কোথায়, কাহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে? বৃহদারণ্যক উপনিষদে ঋষি আর্ত্তভাগের এই প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে, স্বীয় কর্ম্মসূত্রকে অবলম্বন করিয়াই জীবপুরুষ তখন বিরাজ করে। কর্ম্ম ও অবিদ্যাই জীবের জীবভাবের মূল। জীবের মৃত্যুর পরেও কর্ম্ম-শেষ বিদ্যমান থাকে, ঐ কর্ম্মমূলেই জীব দেহান্তে পরলোকে গমন করে, এবং পুনরায় নবীন দেহ পরিগ্রহ করিয়া সংসার-পথে বিচরণ করে। কর্ম্ম তাহাকে পরিত্যাগ করে না, কর্ম্মানুষ্ঠান জীবকে করিতেই হয়। জীব স্বীয় স্বভাব-বশেই কর্ম্মানুষ্ঠান করে। তাঁহার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম যদি শুভ হয়, জীব শুভ ফল ভোগ করে। পুণ্যাত্মা জীব ব্রাহ্মণাদি উচ্চ কুলে জন্মগ্রহণ করে; অশুভ কর্ম্মের ফলে শূকর-যোনি, কুক্কুরযোনি, চণ্ডালযোনি প্রভৃতি নিকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হয়।৩ এইরূপ হীনকর্ম্মা জীবের দুর্গতি অবর্ণনীয়। তাঁহাদের উর্দ্ধগতি নাই। জন্ম এবং মৃত্যুই তাঁহাদের নিয়তি। তাহারা কেবল একবার জন্মে, আবার মরে, আবার জন্মে, আবার মরে। এইরূপেই জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত্তে ঘুরিতে থাকে। শ্রুতি এই পথকে "জায়স্ব ম্রিয়স্ব" নাম দিয়া তৃতীয় পথ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—জায়স্ব ম্রিয়স্বেত্যেতত্তৃতীয়ং স্থানম্—ছান্দোগ্য ৫।১০।৮। এতদ্-ব্যতীত পরলোকে পৌছিবার আরও দুইটি পথ আছে—

১। যথেমা নদ্যঃ স্পন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্য অস্তং গচ্ছন্তি, ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে, সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে। এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শকলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্য অস্তং গচ্ছন্তি, ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে, স এষোহকলোহমৃতো ভবতি। —প্রশ্ন ৬।৫

যথা নদ্যঃ স্পন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।

১। জীবাপেতং বাব কিল ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়তে,
—ছাঃ ৬।১১।৩

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।
—কঠ ২।১৮, গীতা ২।২০

২। বৃহদাঃ ৩।২।১৩

৩ ছান্দোগ্য ৫।১০।৭

একটি দেবযান, অপরটি পিতৃযান বলিয়া প্রসিদ্ধ। যাঁহারা যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কল্যাণকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, পর-হিতার্থে পুষ্করিণী খনন, জনসেবার জন্য গৃহাদি নির্ম্মাণ এবং উদ্যানাদি রচনা করেন। উপযুক্ত পাত্রে যথাশক্তি দান করেন, দুঃখীর দুঃখ মোচন করেন, এইরূপ বিশ্বপ্রেমিক কর্ম্মী গৃহস্থ মৃত্যুর পর পিতৃযান মার্গে পরলোকে গমন করেন। এই পিতৃযান মার্গটি কিরূপ? এই পথটি ধূমাচ্ছন্ন। ঐ ধূমের অন্তরালে এক দেবতা আছেন, তিনি পিতৃযান-পন্থীকে ধূমের মধ্যে পথ দেখাইয়া লইয়া যান এবং রাত্রি-দেবতার কাছে তাহাকে পৌছাইয়া দেন,—অর্থাৎ এই পথের প্রথমে ধূম, পরে রাত্রি, তার পর আসে অন্ধকারাচ্ছন্ন কৃষ্ণপক্ষ; কৃষ্ণপক্ষের পরে আসে সূর্য্যদেব যে ছয় মাস দক্ষিণায়নে অবস্থান করেন, সেই দক্ষিণায়ন কাল। দক্ষিণায়নে পৌছিয়া পরে ঐ কর্ম্মী পিতৃলোকে গমন করে, পিতৃলোক হইতে আকাশে, আকাশ হইতে চন্দ্রমণ্ডলে গিয়া পৌছায়। ইহাই পিতৃযান-পন্থা। চন্দ্রলোকে কর্ম্মী তাঁহার অনুষ্ঠিত শুভকর্ম্মের ফল ভোগ করে এবং ভোগ শেষ হইলে চন্দ্রকিরণকে অবলম্বন করিয়া, অথবা আকাশ, বায়ু, মেঘ, বৃষ্টি প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া পৃথিবীর বুকে শস্যের মধ্যে পতিত হয়, সেই শস্য স্ত্রী এবং পুরুষে ভোজন করে। স্ত্রী-শরীরে উহা রক্তরূপে পরিণত হয় এবং পুরুষ-শরীরে উহা শুক্ররূপে বর্দ্ধিত হয়; এবং যথাকালে স্ত্রী-ও পুরুষের সহবাসের ফলে চন্দ্রলোক-ভ্রষ্ট জীব পুনরায় পৃথিবীতে জন্মলাভ করিয়া থাকে। এই পিতৃযান পথেও দেখা গেল যে, জীবের যাহা চরমগতি, সেই মুক্তি মিলিল না, কর্ম্মক্ষয়ে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হইল। তবে তৃতীয় পথ হইতে এই দ্বিতীয় পথের উৎকর্ষ এই যে, এই পথে চন্দ্রমণ্ডলে গমন করিয়া জীব অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্যও নিরাবিল স্বর্গ-সুখ আস্বাদন করিতে পারে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, চন্দ্রমণ্ডল-প্রত্যাগত জীব যে সকল ধান্য যবাদি শস্যে পতিত হয়, ঐ শস্যাদি যখন কৃষক কাটিয়া আনে এবং শস্য বাহির করিবার জন্য মুগুরাদি দ্বারা আঘাত করে, সেই অবস্থায় সেই জীবের অনন্ত পীড়নাদি ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না কি? তখন ঐ পুণ্যকর্ম্মা জীবের এবং যাহারা দুষ্কৃত কর্ম্মের ফলে ধান্যাদি জড়দেহ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহাদের কোন পার্থক্য থাকে কি? ইহার উত্তরে আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে, পাপাত্মা দুষ্কৃতকারীদিগের ধান্যাদি দেহ ভোগদেহ, সুতরাং তাঁহাদের ঐ দেহবিনাশে দুঃখভোগ অবশ্যম্ভাবী। চন্দ্রমণ্ডল-প্রত্যাগত জীবের উহা ভোগদেহ নহে, আশ্রয়মাত্র; কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ জীব সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ধান্যাদি শস্যে পতিত হয়, তখন তাঁহার কিছুমাত্র অনুভূতি থাকে না, সুতরাং তাঁহার তখন পীড়নাদি দুঃখভোগের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। চন্দ্রমণ্ডলে নির্দ্দিষ্ট সুখভোগের শেষ হইলে সুখী জীবের হৃদয়ে অসহ্য যাতনার সঞ্চার হয়, ক্লেশাধিক্য-বশতঃ তখন তাঁহার শরীর এতই উত্তপ্ত হয় যে, উহার ফলে তাঁহার চন্দ্রমণ্ডলস্থিত জলীয় দেহ বিগলিত হইয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞাও বিলুপ্ত হয়। সংজ্ঞাহীন মূর্চ্ছিত দেহ যেমন এক স্থান হইতে স্থানান্তরে হইয়া গেলেও ঐ দেহের কোন অনুভূতি থাকে না, সেইরূপ চন্দ্রমণ্ডল-প্রত্যাগত কর্ম্মীর কোন সুখ-দুঃখের অনুভূতির উদয় হয় না।১ ঐরূপ মূর্চ্ছিত সংজ্ঞাহীন জীবের সর্ব্বপ্রকার সংস্কারই তখন বিলুপ্ত হইয়া যায়। সংজ্ঞাহীন মূর্চ্ছিত জীব দেহ ধারণ করিবে কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রাণিমাত্রেরই দুই দেহ আছে, একটি তাহার স্থূলদেহ, অপরটি তাঁহার সূক্ষ্ম-দেহ; স্থূল-দেহটি পঞ্চভূতের সমবায়ে গঠিত, সূক্ষ্ম-দেহটি পঞ্চপ্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় ও এই সপ্তদশকের সূক্ষ্ম অংশ দ্বারা গঠিত।২ স্থূল-দেহই বার বার জন্মে ও মরে, সূক্ষ্ম-দেহটি জন্মেও না, মরেও না, জীবের চরম মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত স্থির থাকে। এই সূক্ষ্ম-দেহ লইয়াই জীব ইহলোক ও পরলোকে কর্ম্ম শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতে থাকে।

জীবের পুনর্জ্জন্ম

জোঁক যেমন অপর একটি তৃণ গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত পূর্ব্বে গৃহীত তৃণটি পরিত্যাগ করিতে পারে না, সেইরূপ

১। ছান্দোগ্য শংভাষ্য ৫।১০।৬ দ্রষ্টব্য।

২। বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয়প্রাণপঞ্চকৈর্ম্মনসা ধিয়া।
শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে। —পঞ্চদশী ১।২৩

জীব অপর একটি স্থূল দেহ গ্রহণ না করিয়া বর্ত্তমান স্থূল দেহটি পরিত্যাগ করিতে পারে না। সেইজন্য মৃত্যু-সময়ে জীব তাঁহার কর্ম্মানুযায়ী ভাবী অভিনব দেহটি মনে মনে চিন্তা করিয়া জোঁকের ন্যায় আশ্রয় করে এবং তাহার পর তাঁহার বর্ত্তমান জীর্ণ দেহটি পরিত্যাগ করে। স্বর্ণকার যেমন সুবর্ণের কতক অংশ গ্রহণ করিয়া ভাঙ্গিয়া পিটিয়া একটি অভিনব এবং মনোরম অলঙ্কার নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ পরলোকগমনেচ্ছু আত্মা স্থূল স্বীয় কর্ম্ম ও অবিদ্যার সাহায্যে দেহের উপাদান সুবর্ণস্থানীয় পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতকে বার বার ভাঙ্গিয়া পিটিয়া কল্যাণময় অভিনব আকৃতির সৃষ্টি করে।১ মৃত্যুসময়ে মুমুর্ষু জীবের চিত্তে তাহার জীবনে কৃতকর্ম্মের ফলে যেরূপ সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হয়, যেরূপ কর্ম্মবীজ ফলোন্মুখ হয়, তদনুরূপ দেহের সৃষ্টি হইয়া থাকে। অবিদ্যা, ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার, জীবের জীবন-যাত্রা-পথে অপরিহার্য্য পাথেয়। তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে পূর্ব্বপ্রজ্ঞা চ। বৃহদাঃ ৪।৪।২, এই পাথেয় যত দিন আছে, জীবের এই মহাযাত্রাও ততদিন আছে। যাহারা জ্ঞানী তাঁহাদের অজ্ঞান বিলুপ্ত, কর্ম্মবীজ দগ্ধ, সংস্কার বিধ্বস্ত হইয়া যায়, সেইজন্য তাঁহারাই শুধু জন্ম-মরণ-প্রবাহ অতিক্রম করিতে পারেন। যাঁহাদের জ্ঞান পরিপক্ব না হইলেও প্রস্ফুটোন্মুখ, তাঁহারাও ক্রমশঃ জ্ঞানবিকাশের ফলে জন্ম-মৃত্যুর কবল হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া মুক্তির আনন্দ আস্বাদ করিতে পারেন। ইঁহারাই দেব-যান-পন্থী। যাঁহারা স্থূল দ্রব্যময় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সেই সকল যাজ্ঞিকেরা পিতৃযান-মার্গে গমন করিয়া থাকেন, ইহা আমরা দেখাইয়াছি। ঐ স্থূল যজ্ঞ যখন ভাবনাময় সূক্ষ্ম যজ্ঞে রূপান্তরিত হয়, তখন আরণ্যকের ঐ ভাবনা-যজ্ঞ ক্রমে জ্ঞান-যজ্ঞে পরিণতি লাভ করে এবং ঐ আরণ্যক যাজ্ঞিক জ্ঞানীর পর্য্যায়ে উন্নীত হন।

[ক্রমশঃ

শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী।

(অধ্যাপক, এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি)।

১। তদ্ যথা তৃণজলায়ুকা তৃণস্যান্তং গত্বা অন্যমাক্রমমাক্রম্য আত্মানমুপসংহরতি এবমেব অয়মাত্মা ইদং শরীরং নিহত্য অবিদ্যাং গময়িত্বা অন্যমাক্রমমাক্রম্য আত্মানমুপসংহরতি। —বৃহদাঃ ৪।৪।৩
তদ্ যথা পেশস্কারী পেশসো মাত্রামুপাদায় অন্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং তনুতে এবমেব অয়মাত্মা ইদং শরীরং নিহত্য অবিদ্যাং গময়িত্বা অন্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে। —বৃহদাঃ ৪।৪।৪
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥
—গীতা ২।২২

ক্ষণিকের মোহ

মৃত্তিকার মধুরিমা ভুলিতে পারি না
বহু রূপে আমি তাই আসি।
নিতান্ত অপরিচিত—চিনেও চিনি না—
একান্ত আপন-জ্ঞানে তারে ভালোবাসি।

ক্ষণিকের লীলাভূমি মাটীর মন্দিরে
কত বন্ধু কত শত্রু সৃষ্টি করে যাই,
আড়ালে ঢাকিয়া রাখি আমার আমিরে
কামনার কূপে আমি বন্দী হতে চাই।
আমার পরম-বন্ধু বিবেক আমার
ক্ষীণ স্মৃতি এঁকে দিয়ে যায়,
বিস্মৃতির বালুচরে গাঢ় অন্ধকার
আলেয়ার আলো সম নয়ন ধাঁধায়।

প্রেমের সমাধি রচি আপনার হাতে
প্রিয় হয় পার্থিব প্রণয়।
কামনার কল্লোলিনী স্রোতস্বিনী সাথে
যুগে যুগে হয় পরিচয়।
কেঁদে মরে লক্ষাঘাতে বিক্ষত চেতনা
অতি ক্ষীণ সকরুণ স্বরে
আত্মার আহুতি-অর্ঘ্য করিয়া রচনা
দৃঢ় ভিত্তি রেখে যাই ধরণীর 'পরে

শ্রীআভা দেবী।
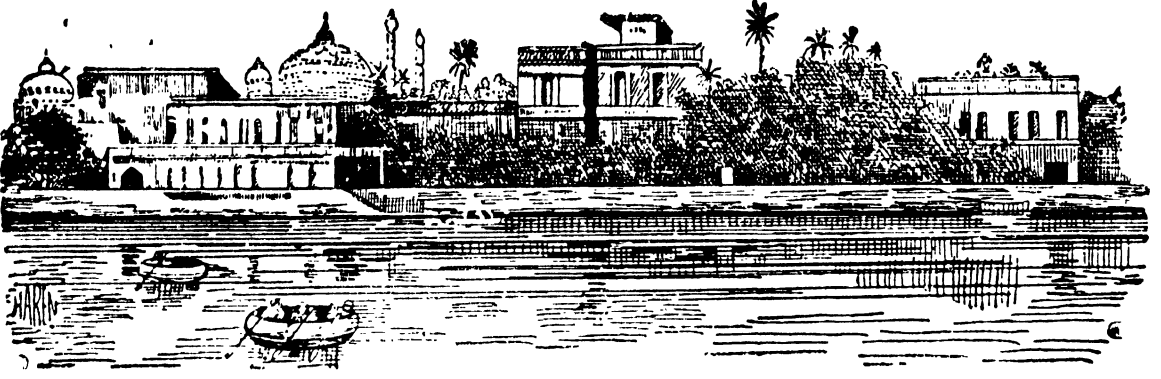
ইংলণ্ডের খাল-বিল

আমাদের এ-দেশকে আমরা বলি নদী-মাতৃক। তার কারণ, দেশের বুক চিরিয়া ছোট-বড় অসংখ্য নদী-নালা বহিয়া চলিয়াছে! একদা এই সব নদী-নালার বুকের উপর দিয়া এক দেশ হইতে অন্য দেশে নানা বাণিজ্য-সম্ভার বহন করা হইত। শুধু বাণিজ্য-সম্ভার কেন, ট্রেণ ও ষ্টীমারের যখন বাহুল্য ছিল না, তখন বড় বড় নৌকায় চড়িয়া নানা খাল-বিল-নদী-পথ ধরিয়া এক দেশের লোক-জন অন্য দেশে যাতায়াত করিতেন। তখন নদী-নালায় জল ছিল প্রচুর—কাজেই নৌকার গতি ছিল অবাধ ও অব্যাহত। এবং এই নদীর কল্যাণেই একদিন ফল্‌তা, বাগ-বাজার, চন্দননগর, হুগলি, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জায়গা বাণিজ্য-সমৃদ্ধির কেন্দ্রস্বরূপ হইয়াছিল। এখন ট্রেণ-ষ্টীমারের প্রচলন হওয়া সত্ত্বেও বাঙলার বহু নদী, খাল, বিল বহিয়া পণ্য-সম্ভার চালান হইতেছে। ওদিকে ভাঙ্গড়ের খাল, এদিকে আদি-গঙ্গার (টলিস্-নালা) বুক বহিয়া এখনো চাল, ডাল, মাছ, তরি-তরকারী প্রভৃতি কলিকাতা-সহরে নিত্য আমদানি হইতেছে। তাছাড়া বহু স্থান এখনো ট্রেণের সংস্পর্শ লাভ করে নাই বলিয়া সে-সব জায়গায় যাতায়াত করিতে নদী ও খাল-বিলই একমাত্র পথ হইয়া আছে।

আমরা ভাবি, ইংলণ্ডে আজ এই ট্রেণ-ষ্টীমার-লরি-প্লেনের ঘনঘটায় সেখানে বুঝি খাল-বিল নাই, এবং সে খাল-বিল বহিয়া এ-যুগে সেখানে পণ্য-সামগ্রী বা যাত্রী-চলাচলের কোনো ব্যবস্থাই নাই! আমাদের এ ধারণা কিন্তু ভুল!

এই মহাযুদ্ধের কিছুকাল পূর্ব্বে আমশ বার্জ নামে এক জন মার্কিণ ভদ্রলোক ইংলণ্ডে আসিয়া সেখানকার এই খাল-বিল, নদী-নালা-পথে ভ্রমণ করিয়া তার যে ছবি আঁকিয়াছেন, সে-ছবি দেখিলে বুঝিব, আমাদের দেশের মতো ইংলণ্ডে ছোটখাট নদী-নালা বহিয়া এখনো মাল ও যাত্রী-চলাচল হইতেছে! তবে ইংলণ্ড আমাদের দেশের মতো দরিদ্র দেশ নয়; তার উপর ইংরেজ

মরাল-দূত

বণিক-জাতি, স্বাধীন-জাতি—এ জন্য তাদের অধ্যবসায়ও অসাধারণ। এবং এই অধ্যবসায়ের ফলে ইংলণ্ডে মরা-হাজা নদী-খালের অস্তিত্ব নাই। মাটী কাটিয়া লক্ষ্য রাখিয়াই এ-সব খাল-বিলকে সর্ব্বদা তারা ব্যবহারযোগ্য রাখিয়াই নিশ্চিন্ত রহে নাই,—বৈজ্ঞানিক কৌশলে এই সব নদী-নালাকে মিলাইয়া-মিশাইয়া যে বিপুল জল-পথ রচনা করিয়াছে, সে জল-পথে আভ্যন্তরীণ নানা দেশের সহিত সহরের কর্ম্মকেন্দ্রগুলির সংযোগ সুগঠিত রহিয়াছে।

মার্কিণ ভদ্রলোকের বর্ণিত সে-কাহিনীর মর্ম্মানুসরণ করিয়া ইংলণ্ডের এই সব নদী-নালার রহস্য জানিবার প্রয়াস পাইব। এ-কাহিনী বুঝিতে হইলে প্রথমে এই উপরের মানচিত্রখানি দেখা প্রয়োজন।

খাল-বিলের লেখা-জোখা

মার্কিণ বার্জ-সাহেব লিখিতেছেন,—নানা নদী-খালকে মিলাইয়া-মিশাইয়া যে বিরাট জল-পথ রচিত হইয়াছে, সে পথের নাম গ্রাণ্ড ইউনিয়ন। এই গ্রাণ্ড ইউনিয়নের কর্ত্তৃপক্ষের পরামর্শে ও সাহায্যে আমরা নৌকায় চড়িয়া লণ্ডন হইতে বার্মিংহাম, লিভারপুল, ম্যাঞ্চেষ্টার পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়াছি। এ পথ দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত গিয়াছে। এ পথ ছাড়া আরো বহু পথ আছে—কার্ডিফ হইতে বোষ্টন, লিনকন পর্য্যন্ত; কশগ্রোভ হইতে কেমব্রিজ হইয়া নর্থ-শীর মোহনায় কিংস-লিন; তাছাড়া উস্টার, উলভারহাম্পটন ক্রুশবেরি, ষ্টোক-অপন্-ট্রেন্ট, লিষ্টার, ওয়ারউইক, ষ্ট্রাটফোর্ড-অন-আভন, অক্সফোর্ড, রেডিং—অর্থাৎ এমন কোনো গ্রাম বা নগর নাই, যেখানে এই সব নদী-নালা ধরিয়া যাওয়া যায় না!

এই জল-পথগুলি প্রায় দেড়শো বৎসর পূর্ব্বে সুশৃঙ্খল-ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে। এ পথে নৌকায় করিয়া কয়লা, যন্ত্রপাতি এবং সর্ব্বপ্রকার ভারী মাল চালান হইত; এবং এই সব জল-পথ বহিয়া সর্ব্ব-প্রকার কাঁচা-মালের জোগান পাইয়া ইংলণ্ড আজ বিপুল বাণিজ্য-কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। আজ রেল-পথে এ সব মাল চালান হইতেছে—তাহাতে বহু সুবিধা হইয়াছে, সত্য! কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এখনো বহু সুদূর গ্রাম হইতে কাঁচা-মাল ভারে-ভারে নৌকায় চড়িয়া এই সব জল-পথ বহিয়াই সহরের কর্ম্মশালাগুলিতে আসিয়া পৌঁছিতেছে।

আমাদের বাঙলা দেশে বড় বড় ভড় বা মাল-বোঝাই নৌকাকে 'গুণ' টানিয়া স্রোতের বা বাতাসের বিপ-রীত-মুখে চালাইতে হয়; ইংলণ্ডেও গুণ টানিবার প্রথা আছে। কিন্তু সে প্রথায় রকম-ফের আছে। সেখানে বোঝাই-নৌকা টানা হয় ঘোড়ার সাহায্যে। খালের দুই তীরে ঘোড়ায় চড়িয়া দড়ি ধরিয়া মাঝি চলে। ঘোড়ায় গুণ টানিবার সুবিধা হইবে বলিয়া বহু খালের তীর-দেশগুলিকে যথাসম্ভব পরিষ্কার ও সুগম রাখা হইয়াছে।

মাটী কাটিয়া এই সব খাল-বিলকে ব্যবহার-যোগ্য রাখিবার জন্য বহু-ব্যয়ে সুব্যবস্থা করা হইয়াছে।

শ্রীযুত বার্জ লিখিতেছেন,—পরিক্রমণ-পর্ব্বের জন্য আমেরিকা হইতে আমরা বোট আনিয়াছিলাম। বোটের নাম দিয়াছিলাম Song of the Winds 'হাওয়ার গান'। এ নৌকায় লণ্ডন হইতে যাত্রা সুরু করিলাম। খালের মধ্য দিয়া পাড়ি—মাঝে মাঝে লক্-গেট। খালে দেখি, সরু সরু বোট। সে সব বোটে ভাঙ্গা লোহা, ইস্পাত এবং তামা বোঝাই। এগুলা চলিয়াছে যত মিলে আর ফ্যাক্টরিতে। তখনো মহাযুদ্ধ সুরু হয় নাই—চারিদিকে সাজ-সাজ রব উঠিয়াছে। শুনিলাম, এ সব ভাঙ্গা লোহা ও ইস্পাত প্রভৃতি যুদ্ধের নানা উপকরণ-রচনার কাজে লাগিবে। জল-পথে মাল-বোঝাই ছোট-বড় অসংখ্য নৌকা দেখিয়াছি। এ সব নৌকার সমারোহে আমাদের নৌকা বরাবরই প্রায় মন্থর গতিতে চলিয়াছে। মাল-বোঝাই নৌকাগুলি ঘোড়ার গুণে টানা হইতেছে। খালের তীর ধরিয়া ঘোড়া চলিয়াছে—ঘোড়ার পিঠে দড়ি ধরিয়া মাঝি বসিয়াছে—তীর-পথে ঘোড়া চলিয়াছে আর ঐ দড়ির টানে নৌকা চলিয়াছে খালের বুক বহিয়া। দিনে দশ ঘণ্টা করিয়া ঘোড়া দিয়া এমনি গুণ টানা হয়। মাঝে একবার ঘোড়া বদল করার ব্যবস্থা আছে। এমনি ভাবে এ সব নৌকা ঘণ্টায় দু' মাইল করিয়া চলে।

লণ্ডনের এবং বড় বড় অন্য সহরের খালেই শুধু ঘোড়া দিয়া গুণ-টানার ব্যবস্থা দেখিলাম। বড় বড় সহরের বাহিরে কেনাল-কর্ত্তৃপক্ষের অধীনে আছে ডিশেল-এঞ্জিন-সংযুক্ত 'কুইক বোট' ও "ফ্লাইবোট"। মালের নৌকা টানিবার জন্য এ বোট ভাড়া পাওয়া যায়। ভাড়া বেশী নয়। ভাড়া করিলে মাল-নৌকা বাঁধিয়া এই সব কুইক বোট ও ফ্লাইবোট তাদের টানিয়া লইয়া যায়। এ বোটের সাহায্যে লণ্ডন হইতে বার্মিংহাম পৌছিতে জল-পথে সময় লাগে ষাট ঘণ্টা। এ বোট না লইয়া দাঁড় টানিয়া বা লগির সাহায্যে গেলে মাল-নৌকার লণ্ডন হইতে বার্মিংহাম পৌছিতে সময় লাগে সাত দিন।

তীরে বন্ধু-সম্মেলন

মালের এই সব নৌকাগুলিকে পারিবারিক বোট (family boat) বলা চলে। তার কারণ, এ বোটের মাঝি-মাল্লারা সপরিবারে বোটেই বাস করে। বোটগুলি লম্বে ৭২ ফুট, চওড়ায় ৭ ফুট। চওড়া কম বলিয়া সরু খালে চলিতে বাধা ঘটে না। মাঝি-মাল্লার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার

থাকিবার জন্য ছোটখাট কেবিন আছে। কেবিনগুলি সজ্জিত। ছেলেমেয়েরাও বোটে নানা কাজ করে।

খাল-বিলের এ সব নৌকায় যত মাঝি-মাল্লা আছে, তাদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। ইহারা যেন জলের পোকা! দেহ যেমন মজবুত, সাহসও তেমনি অপরিসীম। খাটিতে এতটুকু দ্বিধা নাই, নারাজী নাই! বিদেশীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা করিতে কিন্তু ইহাদের সঙ্কোচ প্রচুর।

বোটগুলির গায়ে গোলাপ-গুচ্ছ না হয় প্রাসাদের ছবি আঁকা দেখিলাম। কোনো বোটে ইহার ব্যতিক্রম দেখি নাই। কারণ শুনিলাম, গোলাপ-গুচ্ছ বা প্রাসাদের ছবি আঁকা নিয়ম—না আঁকিলে বিঘ্ন-বিপত্তি ঘটিবে! এ সংস্কার সেই মান্ধাতার আমল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বোটে যে সব মাঝি-মাল্লার বাস, তাদের চিত্ত-বিনোদনের জন্য বোটে রেডিয়ো-শেট আছে। তাছাড়া তীর-পথে স্থানে-স্থানে সিনেমা হাউস আছে। এ সব সিনেমা-হাউস আছে শুধু এই সব মাঝি-মাল্লাদের জন্য। লেখক বলেন—বহু বোটেই মাঝিরা সহর্ষে আমায় বলিল—রেডিয়োয় রাজ্যাভিষেকের সব ব্যাপার কাণে শুনিয়াছে! মেয়েরা বলিল—'মিউটিনি অন্ দী বাউন্টি' ছবি দেখিয়াছি। আমাদের সে ছায়া-ছবির কাহিনী বলিয়া শুনাইল।

খাল-বিলের তীরে অসংখ্য কারখানা আছে, মিল আছে। তীরে তৃণ-শ্যামল বড় বড় পার্ক।

লেখক লিখিতেছেন—এক জায়গায় একটা সেতুর নীচে দিয়া আমাদের নৌকা চলিয়াছে, সেতুর উপর হইতে এক জন লোক চীৎকার করিয়া বলিল—আমার কুকুর —কুকুর—তোলো, তোলো। তার আকুল-মিনতি-ভরা কণ্ঠে জলের দিকে চাহিয়া দেখি, একটা কুকুর জলে পড়িয়াছে। কুকুরটাকে নৌকায় তুলিলাম। শুনিলাম, বোট হইতে জলে পড়িয়া গিয়াছে; তীর খাড়া বলিয়া উপরে উঠিতে পারিতেছিল না!

গ্রপশায়ার কেনালে লক্-গেট্

সন্ধ্যার সময় আমরা প্যাডিংটনে আসিয়া পৌঁছিলাম। লণ্ডন হইতে প্যাডিংটন আট মাইল। তীরে দুরন্ত ছেলের দল খেলা করিতেছিল। আমাদের নৌকা দেখিয়া মহা-উৎসাহে আমাদের লক্ষ্য করিয়া ঢিল ছুড়িতে লাগিল। প্রাণ যায়! যত নিষেধ করি, শোনে না! শেষে পুলিশ ডাকিয়া কোনো মতে সে-যাত্রা পরিত্রাণ পাইলাম।

প্যাডিংটনে খাদ্যাদি মিলিল। তার পর সকালে আবার পাড়ি সুরু করিলাম। কত গ্রাম উত্তীর্ণ হইলাম। গ্রামগুলি শান্ত স্নিগ্ধ—কাননান্তরালে কুটীরগুলি মনোরম। দেখিয়া চোখ জুড়াইয়া গেল!

পথে এঞ্জিনীয়ারিং কৌশলের বৈশিষ্ট্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। নেপোলিয়নের ওয়াটারলু-যুদ্ধের সময় পাথরের যে সব প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল, সে সব প্রাচীর অক্ষত দেহে আজো বিদ্যমান রহিয়াছে।

লণ্ডনের এলাকা পার হইবার পর কোনো লকে 'কীপার' দেখি নাই। এ সব লকের নির্ম্মাণ-পদ্ধতি এমন

ওয়াণ্টাজে পাণিফলের ক্ষেত

যে, নৌকারোহী নিজেই লকের আংটা ধরিয়া লক খুলিয়া খালের মধ্য দিয়া নৌকা লইয়া যাইতে পারে।

সমতল প্রান্তরদেশ ছাড়িয়া ক্রমে আমরা পর্ব্বতসঙ্কুল প্রদেশে আসিলাম। ৪৫টি লক্ পার হইয়া প্রায় ৪০০ ফুট উর্দ্ধে অবস্থিত টিং-শিখরের জল-পথে পৌছিলাম। এমন নিঃশব্দে এত উর্দ্ধে নৌকা উঠিল যে, আমরা ঘুণাক্ষরে এ উর্দ্ধ-গতি উপলব্ধি করিতে পারিলাম না।

এখানে খালের তীরে বসিয়া কত লোক মাছ ধরিতেছিল। প্রশ্ন করিলাম, মাছ মিলিল? উত্তর শুনিলাম, না। এত লোক রৌদ্রে বসিয়া মাছ ধরিতেছে, কাহাকেও দেখিলাম না, মাছ ধরিয়াছে। হাসিয়া এক-জনকে বলিলাম,—মাছ ধরার কথা কেন বলেন? বলুন, রৌদ্র পোহাইতেছেন!

লেখক লিখিতেছেন,—বার্ক-শায়ারের 'ওয়াণ্টাজ্' গ্রামে দেখি, তীরে জলা-ভূমি। এবং এ জলাভূমি সবুজ পাণিফলে ভরিয়া আছে। বরাবর ক্যামেরা লইয়া আমি ফটো তুলিতেছিলাম। পাণিফল ক্ষেতের ছবি তুলিবার জন্য মালিক আমায় মিনতি জানাইলেন। বলিলেন—এখানকার এ পাণিফলের প্রাচুর্য্য সম্বন্ধে এক জন মার্কিণ ভদ্রলোক সম্প্রতি এক বিবরণ লিখিয়া কাগজে ছাপাইয়াছেন। সে বিবরণে তিনি লিখিয়াছেন, আমাদের এ পাণিফল-ক্ষেতের জন্য আমরা ঐ সব খাল-বিল হইতে জল লই—কথাটা সত্য নয়! এ ক্ষেতের জল ক্ষেতের মাটী হইতে ওঠে। জলের জন্য আমাদের নদী বা খালের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না! এ-কথাটা সকলকে ছাপার অক্ষরে জানানো কর্ত্তব্য।

রিকম্যানস্-ওয়ার্থ গ্রামে জাহাজের মস্ত কারখানা আছে। এখানে জাহাজ তৈয়ারী হয়। বড় বড় বোট

তৈয়ারী হয়। বোট তৈয়ারী হয় মজবুৎ ওক-কাঠ দিয়া। ইংলণ্ডের ওক-কাঠের মত মজবুৎ কাঠ না কি আর কুত্রাপি নাই! বৃটেনের রণ-তরী, বড় মাল-জাহাজ—এ সব ঐ ওক-কাঠে তৈয়ারী হয়। এবং এই ওকের কাঠই না কি ইংলণ্ডকে বাণিজ্য-সম্পদে এমন সম্পদশালী করিয়াছে!

এখন প্রাচীন ওকের অসদ্ভাব ঘটিতেছে বলিয়া এ কারখানার জন্য নানা জায়গা হইতে কাঠ আনা হইতেছে। কারখানার কর্ম্মনিষ্ঠা অসাধারণ। অধ্যক্ষ হইতে অতি তুচ্ছ নগণ্য মিস্ত্রী-মজুর পর্য্যন্ত কাজে এতটুকু ফাঁকি বা গোঁজামিল দিতে জানে না। আমেরিকা, জার্ম্মাণি হইতে এ কারখানায় জাহাজের অর্ডার আসে। এখানকার অধ্যক্ষ শ্রীযুত ওয়াকার বলিলেন—খুব মজবুৎ করিয়া জাহাজ গড়িতে হয়। কোথাও না এতটুকু গলদ থাকে। গলদ ঘটিলে আমাদের কাছে মেরামতীর জন্য আসিবে। আসিলে আমাদের নাম খারাপ হইবে। দেড়শো বৎসরে যে-সুনাম গড়িয়া তুলিয়াছি, একটু ঔদাস্য-বশে সে-সুনাম নষ্ট হইতে দিতে পারি না!

এখানকার এক জন সামান্য মুচিকেও দেখিলাম—অসাধারণ তার সাধুতা এবং কর্ম্মনিষ্ঠা। আমরা অনেকে জুতা সারাইতে দিয়াছিলাম। কোথায় কি করিতে হইবে, তার এমন খুঁটিনাটি ফর্দ্দ করিয়া দিল যেন রণ-তরী নির্ম্মাণ করিবার অর্ডার লইতেছে! জুতা যা মেরামত করিয়া দিল, এমন নিখুঁৎ কাজ দেখা দূরের কথা, মানুষ কল্পনা করিতে পারে না! ভাবিলাম, সহরে শাঠ্য কাপট্য থাকিলেও ইংলণ্ডের এই সব সুদূর গ্রামে মানুষের মনে অসাধুতার এতটুকু বিষ-বাষ্প আজো প্রবেশ করে নাই!

ছুটিছাটার দিনে এই সব স্থানে সহুরে লোকজনের ভিড় জমে। তাঁরা আসেন অবকাশ-যাপনের আনন্দ উপভোগ করিতে! শনিবারে-শনিবারে অবসর-যাপনের জন্য বহু লোকের সমাবেশ ঘটে। মাঠে-বাটে ছাউনি ফেলিয়া সেই ছাউনিতে তারা আনন্দ-সায়র রচিয়া তোলে। সে সময় রেল ও বাস কোম্পানিরা বেশ মোটা টাকা রোজগার করে।

খালের চৌ-মাথা

ব্যাচওয়ার্থে এমনি এক দল অবসরযাপীর দলের মাঝে পড়িয়াছিলাম। সে-দিন শনিবার। বোট ছাড়িয়া তীরে ছাউনি ফেলিয়াছিলাম। আমার এক ইংরেজ বন্ধু সস্ত্রীক আসিয়া আমার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। রবিবার সকালে দেখি, পথ একেবারে জনারণ্যে পরিণত। হাঁটিয়া, সাইকেলে চড়িয়া, বাসে চড়িয়া, মোটর-কোচে

চড়িয়া যেন জনসিন্ধু উত্তাল তরঙ্গে ফুলিয়া আসিয়া উপস্থিত। লণ্ডন হইতে পাঁচ মিনিট অন্তর ট্রেণ ছাড়িয়াছে—প্রায় এক হাজার মোটর-কোচে যাত্রী আসিতেছে। একটি দিনের জন্য নিমেষে যে জন-সমুদ্র রচিয়া উঠিল—অনুমানে বুঝিলাম, প্রায় পাঁচ-ছ'শো লোক আসিয়া জমিয়াছে।

বিপন্ত্রৌ কেনাল-কর্ম্মচারীরা

ভাবিলাম, যে ইংলণ্ড টাকা-পয়সায় সূক্ষ্ম হিসাব কষিয়া চলে, একটি-মিনিট বাজে কাজে নষ্ট করে না—সে জাত ছুটির দিনে প্রমোদ-উপভোগের জন্য এমন ভাবে মাতিয়া ওঠে! দেখিলে কে বলিবে, রবিবারের পর সোমবার হইতে এরাই আবার কাজের দমকে নাকে-চোখে দেখিবার ও শুনিবার সময় পাইবে না!
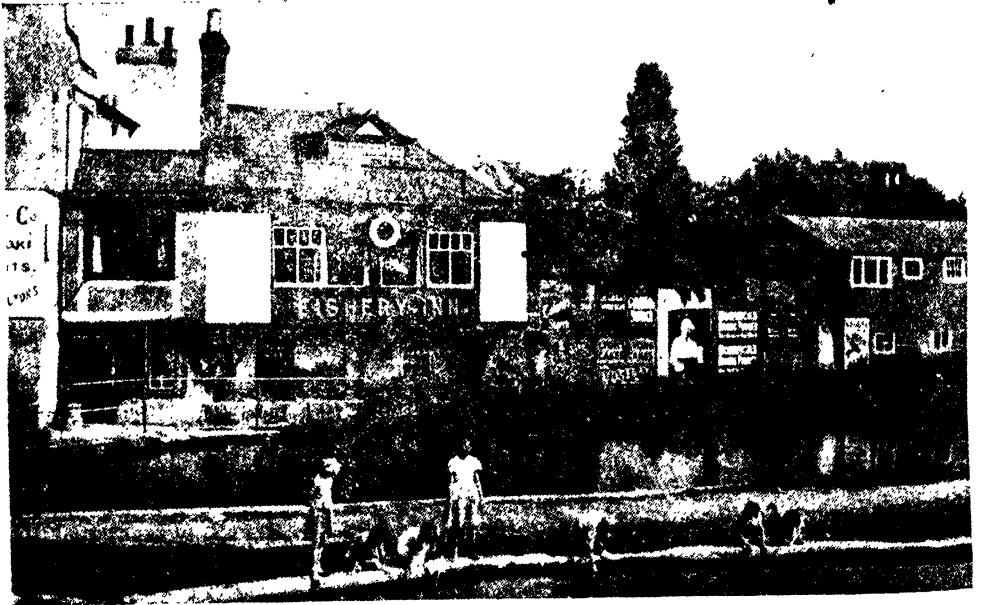
খালের ধারে ছেলেমেয়েদের খেলা

ব্যাচওয়ার্থের লক্-কীপার টমাস কাটলার বলিল—১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে এ লক তৈয়ারী হইয়াছে। আমার প্রপিতামহ ছিল এ লকের কীপার! তার পর হইতে পুরুষানুক্রমে আমরা এ লকের কীপারী করিতেছি। আমাদের মধ্যে কেহ কাজ না করিয়া বসিয়া বসিয়া সরকারী একটি পয়সা গ্রহণ করি নাই! অর্থাৎ বংশে পেন্সন-লাভ কাহারো ভাগ্যে ঘটে নাই।

ট্রিং-শিখর হইতে ব্লিশওয়ার্থ টানেল পার হইয়া উইভন
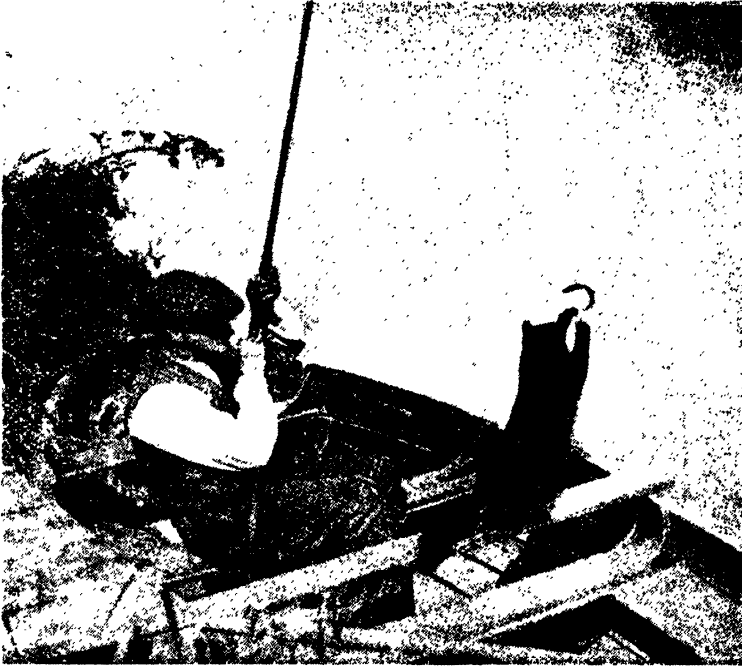
মাছ উঠিলে সাবধান !

গ্রাণ্ড ইউনিয়নের খাল-খোলার উৎসবে ডিউক অফ কেণ্ট

টানেলের মাথা হইতে ঝর্ণার ধারায় জল চোঁয়াইয়া পড়িতেছে। টানেলের মধ্যে মিশ-কালো অন্ধকার। সে অন্ধকারের বুকে মাঝে-মাঝে বৈদ্যুতিক আলো। যেন কালো আকাশের গায়ে কয়েকটি নক্ষত্র চিক্‌চিক্ করিয়া জ্বলিতেছে! এখানে 'ডিসেল' এঞ্জিনযুক্ত কুইকবোট আমার নৌকা টানিয়া ছিল।

পনেরো মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ব্রনষ্টন শিখরের আগে বাক্‌বী-লকে আসিয়া পৌছিলাম। এখানে আমার এক বন্ধু ছিলেন। তাঁর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। পরের দিন ব্রনষ্টন টানেলে আসিলাম। পর-পর ২৯টি লক পার হইয়া ১৭৬ ফুট নীচে লীমিংটনে পৌছিলাম। এখানে ফল-ফুলের বিপুল সমৃদ্ধি! এখানকার টোমাটো বিশেষ-ভাবে বিশ্ব-প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

লীমিংটন ছাড়িয়া আভন-নদী বহিয়া ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ওয়ারউইক ও ষ্ট্রাটফোর্ড উত্তীর্ণ হইয়া হাটন লকের সম্মুখে আসিলাম। এখানে তেইশটি লক পার হইয়া ১৬২ ফুট উর্দ্ধে উঠিলাম। হাটনে খালের তীর ক্ষয়িয়া যাইতেছে। তীরভূমি আগাগোড়া সিমেণ্টে বাঁধানো হইয়াছিল; কিন্তু জলস্রোতে সে সিমেণ্ট ক্ষয় পাইতেছে বলিয়া এখন চাপ-মাটী দিয়া তীরভূমি নূতন করিয়া বাঁধানো হইতেছে।

দুপুরবেলায় স্রুলি টানেল পার হইয়া ৩৮০ ফুট উর্দ্ধে নৌলের শিখরদেশে উঠিলাম। দারুণ বৃষ্টি পড়িতেছিল। সেই বৃষ্টি মাথায় করিয়া বার্মিংহামের সহর-তলীতে আসিয়া পৌছিলাম। জলে-

চেকে আসিলাম। টানেলটি পার হইতে সময় লাগিয়াছিল পাকা তিন ঘণ্টা। পাহাড় কাটিয়া খালের বুকে এ-টানেল নির্ম্মিত হইয়াছে। নির্ম্মাণ করিয়াছে গ্রাণ্ড ইউনিয়ন।

কাদায় চারি দিক এমন ভরিয়া ছিল যে, নামিবার উপায় না পাইয়া খালের তীরে একটা বড় গাছের নীচে নৌকা বাঁধিয়া সেই নৌকায় পড়িয়া রাত্রি-যাপন করিলাম।

পরের দিন নৌকা ঠেলিয়া তীরে নামিলাম। এখানে বড় বড় নৌকা হইতে কয়লার মোট নামিতেছিল। ঘাটে অসংখ্য গাদাবোট। সে সব বোট হইতে কাগজের বস্তা নামানো হইতেছে; ইস্পাতের বোঝা নামিতেছে! কোনো বোটে পাকা-মাল বোঝাই হইতেছিল।

এবারে নিঃশব্দ-তীরদেশ অতিক্রম করিয়া বার্ম্মিং-হামে আসিয়া এখানকার কল-কারখানার জীমূতমন্দ্রে লোক-জনের কলকোলাহলে মনের উপর হইতে স্বপ্ন-বৈচিত্র্যের সব সুষমা-মাধুরী চমকিয়া ছিঁড়িয়া ফাঁশিয়া চূর্ণ হইয়া গেল! যে-দিকে তাকাই, কয়লা, ইস্পাত এবং তন্তুশিল্পের পাহাড় জমিয়া আছে! ভারী কাঠের উপর কাঠ সাজানো। বার্ম্মিংহাম ইংলণ্ডের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। লণ্ডন ছাড়া এত লোক-জন, এত বাড়ী-ঘর, এত অফিস, কল-কারখানা—ইংলণ্ডের আর অন্য কোনো সহরে নাই।

নৌকায় চড়িয়া তেরোটি লক উত্তীর্ণ হইয়া আবার নীচে নামিলাম। নীচে নামিয়াই পাইলাম বার্ম্মিংহাম সহর।

তীরে বড় বড় ফ্ল্যাট-বাড়ী ও কারখানা। জানলায় দাঁড়াইয়া কার-খানার কিশোরী কর্ম্মচারিণীরা রুমাল নাড়িয়া অভ্যর্থনা করিল। কাগজের টুকরায় অভিনন্দন লিখিয়া সে কাগ-জের টুকরাগুলা বৃষ্টিধারার মতো বাতাসে নিক্ষেপ করিল। নৌকায় চড়িয়া আমরা এদিককার খাল-বিল পরিভ্রমণ করিতেছি—খপরের কাগজে এ-সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। ফ্যাক্টরির অনেক মেয়ে আসিয়া তীরে দাঁড়াইয়া অভ্যর্থনা করিল। এক জন বলিল—আমাদের ফটো তোলো।

ফটো তুলিলাম। তার পর একবেলা বার্ম্মিংহামে কাটাইয়া নৌকায় চড়িয়া উল্‌ভারহাম্পটনের অভিমুখে পাড়ি দিলাম।

পাঁচশো বৎসর পূর্ব্বে এই উল্‌ভারহাম্পটন ছিল পশম-ব্যবসায়ের প্রধানতম কেন্দ্র। এখানকার কয়লা এবং লোহার ব্যবসাও এককালে খুব সমৃদ্ধ ছিল। তার পর আসিল আজিকার এই যন্ত্র-যুগ। এ-যুগে পশমের ব্যবসায়ে সে শ্রী এখানে নাই—কয়লা ও লোহার ব্যবসাও নির্জীবপ্রায় হইয়াছে! তবু মাঠে-বাটে পুরাতন সমৃদ্ধির স্মৃতি আজো মিশিয়া আছে। উল্‌ভারহাম্পটনে দু'দিন অতিবাহিত করিয়া চেষ্টারের দিকে চলিলাম। অদার্লি-জংশনে সিধা পথ ছাড়িয়া স্রপশায়ার ইউনিয়ন কেনালে ঢুকিলাম। এ কেনালের একটি শাখা মার্শি নদী হইয়া পূর্ব্বদিকে নটিংহাম, রদারহাম, শেফীল্ডের দিকে গিয়াছে। আর একটি শাখা গিয়াছে ব্রেউড হইয়া চেষ্টার; আর একটি শাখা ষ্টোক অতিক্রম করিয়া লিভারপুলে গিয়াছে।

জল-পথ উর্দ্ধমুখে ওয়ারউইকে চলিয়াছে

কেনালের দু'ধারে সবুজ-শ্যামল তৃণ-কানন-খচিত

তীরভূমি। এ কেনালেও ঘোড়া-গুণ দিয়া মাল-নৌকা টানা হয়।

এক দিন বৈকালে ব্রেউডে পৌছিলাম। এদিকটায় যত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের বাস। সকলেই বেশ ভদ্র ও অমায়িক। স্থানীয় গ্রামার-স্কুলে নিমন্ত্রিত হইলাম। শিক্ষক ও ছাত্রদের সে-আদর কোনো দিন ভুলিব না। এখানে ইংরেজের আভিজাত্য-গর্ব্বের ছায়াও দেখি নাই।

তৃতীয় দিনে ব্রেউড ত্যাগ করিলাম। এদিকে হার্লিষ্টন জংশন হইতে একটি পথ গিয়াছে দক্ষিণে ওয়েলশের পার্ব্বত্য-ভূমির দিকে। লাঙ্গোলেনের কাছে পাথরের প্রাচীরের গণ্ডীর মধ্য দিয়া ডী-নদী পার হইয়া কেনাল আসিয়াছে চেষ্টারে। প্রাচীন রোমান-আমলে চেষ্টারের পত্তন হয়। পাথরের দুর্গ-প্রাসাদ ও অট্টালিকাদির বহু চিহ্ন চেষ্টারের বুকে রোমান-যুগের সমৃদ্ধি ও বিরোধদ্বন্দ্বের চিহ্ন-স্বরূপ আজও বিদ্যমান আছে।

চেষ্টারের আগে ন' মাইল উত্তরে এলেশমীয়ার বন্দর। এই বন্দরের গায়ে চার-লক দেওয়া ম্যাঞ্চেষ্টার-শীপ কেনাল সুরু হইয়াছে। এলেশমীয়ার হইতে সাড়ে তিন মাইল দূরে ইষ্টহামের শীপ-ইয়ার্ড। এই শীপ-ইয়ার্ডটি একেবারে মার্শী নদীর মোহনায় অবস্থিত। এ পথটুকু বাকী রাখিলাম না। 'হাওয়া-গান' নৌকায় চড়িয়া এ পথটুকু শেষ করিয়া ম্যাঞ্চেষ্টারে আসিলাম।

ম্যাঞ্চেষ্টারে দু'দিন থাকিয়া মালপত্র —সায় নৌকা-খানিকে প্যাক করিয়া ট্রেণে তুলিয়া লণ্ডনে পাঠাইলাম।

ব্রনষ্টন টানেলের বাহিরে
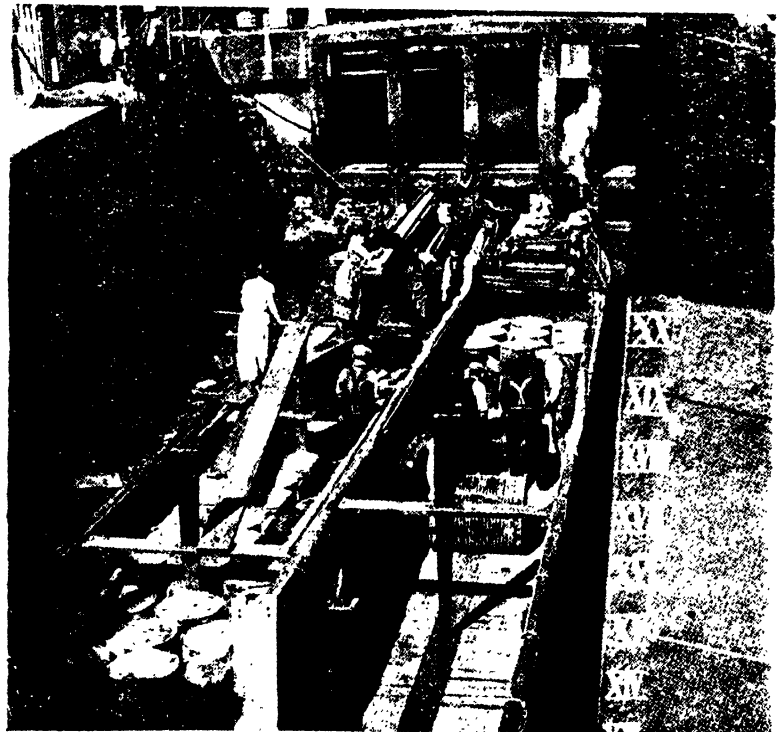
খালে মালবোঝাই বোট
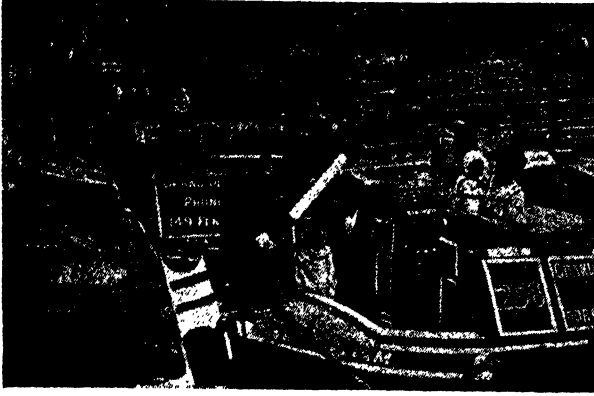
মাঝিরা সপরিবারে বোটে বাস করে

এবং নৌকায় চড়িয়া কেনাল বহিয়া যে-লণ্ডন হইতে ম্যাঞ্চেষ্টারের পাড়ি পঁচিশ দিনে শেষ করিয়াছি, ট্রেণযোগে সে-পাড়ির অবসান করিলাম মাত্র ৪ ঘণ্টায়! অর্থাৎ ট্রেণে লণ্ডন-ম্যাঞ্চেষ্টারের পাড়িতে চার ঘণ্টা সময় লাগে।

ফিরিয়াছি চকিতে! কিন্তু জল-পথে ২৫ দিনের এ পাড়িতে যে দৃশ্যবৈচিত্র্য উপভোগ করিয়াছি, এ্যাডভেঞ্চারের যে-আনন্দে মন ভরিয়াছিল, সে আনন্দ-উপভোগের স্মৃতি হীরার মতো আমার বুকে চিরদিন প্রোজ্জ্বল থাকিবে। সে-পাড়িতে ইংরেজের নাড়ীর যে-পরিচয় পাইয়াছি, ইংলণ্ডের ইতিহাসে ইংরেজের সে-পরিচয় মেলে না; সহর দেখিয়া সহরের বিলাস-ঐশ্বর্য্যের জৌলুশ দেখিয়াও ইংরেজের সে-পরিচয় পাই না!

ভারতের হিমাচল

—ভারতের হিমাচল
যুগ যুগ ধরি মাটীর বুকেতে দাঁড়ায়ে অচঞ্চল।
দেখেছি তোমারে জোছনার মাঝে
সুন্দর তুমি গোধূলির সাঁঝে
তোমার বুকেতে দুকূল-ভাসানো গঙ্গার গলা জল
দূর হতে আমি প্রণমি তোমারে হিমগিরি হিমাচল।

—শুনেছি তোমার গান
মুগ্ধ হইয়া অন্ধের মত দূরেতে পাতিয়া কান!
মাঝে মাঝে আলো ঝিকি-মিকি করে
কালো কালো-মেঘ থাকে-থাকে ভরে
সবুজের বুকে সুরের জন্ম তুমিই করিলে দান—
ভাবের ছন্দে গিরিরাজ তুমি তুলিয়া ধরেছ তান।

—খসে পড়ে হিম-কণা
মুক্তার মত টলমল করে আমার নয়নে সোনা!
স্বপন-আকাশ জাগরণে ঝরে
কল্পনা মোর দিবসেতে ভরে
উদাসী বাতাস লুটোপুটি খায় হৃদয়েতে জাল বোনা
অস্ত-শিখায় সোনার মুকুট উড়ে আসে হিম-কণা।

—নীল আকাশের তলে
নির্ব্বাক্ তুমি দাঁড়ায়ে একাকী হাসিতেছ কোন্ ছলে!
সুরভিত ফুল ফুটেছে গোপনে
হিমানী চলিছে হিম-কর সনে
আমার নয়ন তোমার রূপেতে জ্ঞানহারা পলে পলে!
ভাসায়ো না মোরে ব্যথা-বেদনায় তোমার চোখের জলে।

শ্রীসুধাংশু রায় চৌধুরী।

কাল মেঘ

(গল্প)

দু'টি প্রাণীর ক্ষুদ্র সংসার। সংসারে ঠাকুর আছে, চাকর আছে।—তবুও, বিছানাটা পাতা, বালিশগুলি ঠিক করিয়া রাখা, বিছানার চাদর তোষকের নীচে গুঁজিয়া দেওয়া, রাত্রিতে কি কি রাঁধিবে ঠাকুরকে বলিয়া দেওয়া—এ সব খুঁটিনাটি কাজ যাহা করিবার, তাহা সমস্তই শেষ হইয়া গিয়াছে। মঞ্জু দোতলার রাস্তার দিকের জানালাটির পাশে গিয়া বসিল।

রাস্তার আলোগুলি এক-একটি করিয়া সব জ্বলিয়া উঠিতেছে। অর্দ্ধেক আলো অর্দ্ধেক অন্ধকার,—এ দৃশ্য মঞ্জুর ভালই লাগে। গুন-গুন স্বরে সে গাহিতে লাগিল,—

"তুমি যদি আসিতে প্রিয়
আজি এমন রাতে,
বকুলের মঞ্জরী ফুটিত বনে
মধু-তিথি পূর্ণিমাতে···"

গানটিকে তাহার ভারী ভাল লাগিত। এই গানটি সে অনেক সময় গায়িত বলিয়া পূর্ব্বে তার কলেজের অন্তরঙ্গ বন্ধু গীতা তাকে যে কত রকম করিয়া ক্ষেপাইয়াছে ও ঠাট্টা করিয়াছে, তার আর ইয়ত্তা নাই! মঞ্জু মনে মনে বলে, গীতা ভারী দুষ্ট ছিল। অন্যের পশ্চাতে লাগিবার সময় তার উৎসাহ, কথা বলিবার ভঙ্গী, এবং রটাইবার কৌশল দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়, কিন্তু নিজের সম্বন্ধে সে খুবই সতর্ক এবং অত্যন্ত গম্ভীর। কোন কথাই তার নিকট হইতে বাহির করিবার উপায় ছিল না। সত্য না হইলেও সাজাইয়া-গুছাইয়া, টুক্‌টাক্ ক্ষীণ প্রমাণগুলি সংগ্রহ করিয়া তুচ্ছ ঘটনাগুলিকেও ক্লাশের মেয়েদের আলোচ্য-বিষয়ে পরিণত করিয়া তার ফিস্-ফিস্ চাপা-হাসি ও বক্র কটাক্ষেরও সীমা থাকিত না। ভারতী একবার তার কি-রকম এক মামাত-ভাইয়ের সঙ্গে বেড়াইতেছিল, কি করিয়া তাহা গীতার চোখে পড়িয়াছিল। পরে সে গোয়েন্দাগিরি করিয়া ভারতীর খাতা হইতে তার পূর্ব্বোক্ত মামাত-ভাইটির নাম, নোট প্রভৃতি উদ্ধার করে। ব্যাপারটিকে ঘোরাল ও রসাল করিয়া গীতার বর্ণনার কি ঘটা! বেচারা ভারতীকে কাঁদাইয়া তবে ছাড়ে।

মঞ্জুর হাসি পায়। গীতা কিন্তু তার সঙ্গে কোনও দিনও ও-রকম করে নাই। তবুও তাকে সে একটু ভয় করিয়াই চলিত। ক্লাশের সকলকেই সন্ত্রস্ত থাকিতে হইত।

মঞ্জু আবার গায়িল,—

"সে দিন মালতী-বিতানে
ক'য়েছিনু মোরা কোন কথা
দোঁহার হৃদয় জানে
আর জানে বন-দেবতা···"

হঠাৎ তার খেয়াল হইল, এত দেরী ত তাঁর কোন দিনই হয় না, আজ এত দেরী হইতেছে কেন? জানালার গরাদেতে মুখ রাখিয়া যত দূর দেখা যায়, মঞ্জু নির্নিমেষ নেত্রে তাকাইয়া রহিল, কিন্তু তাহার নয়ন-মণিকে দেখিতে পাইল না।

মঞ্জু ভাবিতে লাগিল—কোন বিপদ-টিপদ ঘট্‌ল না ত?

"ভজ, ভজ"—কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য মঞ্জু চিৎকার করিয়া চাকরটাকে ডাকিতে লাগিল।

পিসিমাদের বাড়ী যাইলে মাঝে মাঝে রাত্রি হয় বটে, কিন্তু কোন দিন ত এত বেশি রাত্রি হয় না! মঞ্জুর মুখে-চোখে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়িল। ব্যস্ত হইয়া সে জানালা ছাড়িয়া ঘড়ি দেখিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল।···

"ও মা! কে?"—মঞ্জু ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিল।

"অহং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রঞ্জিৎ বোস্"—গম্ভীর স্বরে এই কথা বলিয়া রঞ্জিৎ ঘরের কোণ হইতে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

"হয়েছে। তোমার আর লম্বা পরিচয় দিতে হবে না। তা—কখন এলে তুমি? সত্যিই আমি চ'মকে উঠেছিলাম। এখনও আমার বুক কাঁপচে—" মঞ্জু কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া এই কথা বলিল।

"কই দেখি" বলিয়া রঞ্জিৎ মঞ্জুর দিকে সরিয়া আসিল। উভয়ের সরল হাসিতে ঘর ভরিয়া গেল।

"মনে আছে তোমার, আর এক দিনও তুমি এমনি ভয় দেখিয়েছিলে? সে দিন তোমার ফিরতে আরো বেশি রাত্তির হয়েছিল। রাত্তির এগারটা পর্য্যন্ত একলা ব'সে-থেকে আমার সে কি দুশ্চিন্তা! ঘরের মধ্যে মশা আস্‌চে দেখে শেষে মনে ক'রলাম—মশারিটা বিছানায় খাটিয়ে রেখে আসি। ও মা! মশারি ফেল্‌তে গিয়ে দেখি, বিছানায় একটা দ্বিপদ জন্তু চিৎ হ'য়ে পড়ে আছে সেই অন্ধকারের মধ্যে—"

"কে সেই দ্বিপদ জন্তুটি?" মঞ্জুকে ক্ষেপাইবার জন্য রঞ্জিতের এই প্রশ্ন।

"আহা! কিছুই যেন জানেন না! সে দিন ত আর একটু-হ'লেই আমি ভয়ে চিৎকার ক'রে উঠ্‌তাম্, আর তা শুনে ঠাকুর-চাকর পর্য্যন্ত উপরে ছুটে আস্‌ত।"

"আচ্ছা, বেশ। আজকেই এক্ষুণি আবার তোমাকে ভয় দেখাবো।" বলিয়াই রঞ্জিৎ সহাস্যে ঘর হইতে দৌড়াইয়া বাহির হইয়া গেল।

বেগতিক দেখিয়া মঞ্জুও তার পিছনে ছুটিল। চিৎকার করিয়া বলিল, "না! না! আমার কথা শোনো। আমি ত বল্‌ছি না যে, ভয় পাবো না।—শোনো! শোনো! যাচ্ছ কোথায়?"

রঞ্জিত সে কথা শুনিল না। দৌড়াইয়া দোতালার বারান্দার ও-পাশে চলিয়া গেল। মঞ্জু আলোর সুইচ্‌টা টিপিয়া চারি দিকে চাহিল, কিন্তু কোন দিকে তাহাকে দেখিতে পাইল না।

অজ্ঞাত ভয়ে মঞ্জু শিহরিয়া উঠিল। উপায় না দেখিয়া সে ঘরের দরজাটায় খিল আঁটিয়া দিল। চারি দিকে চাহিয়া মনে মনে বলিল,—"এবার? দেখি কেমন ক'রে ভয়ে চম্‌কিয়ে দাও। এবার আর চালাকি খাটবে না। কেমন জব্দ করেছি! কাকুতি-মিনতি না ক'র্‌লে আর দুয়োর খুল্‌চিনে।"

কিছুক্ষণ মঞ্জুর রুদ্ধশ্বাসে কাটিল; কিন্তু দ্বারের বাহিরে কোন শব্দ নাই, দরজায় কোন আঘাতও নাই। নীচে চলিয়া গেল না কি?

হঠাৎ মঞ্জু দেখিতে পাইল—ঘরের বাহিরের দিকের জানালায় ও-পাশের গরাদে ধরিয়া রঞ্জিত দাঁড়াইয়া আছে। জানালার ফাঁক দিয়া এক হাত বাড়াইয়া দিয়াছে, এবং দোতলার জীর্ণ কার্ণিসের উপর বিপজ্জনক ভাবে পা রাখিয়াছে।

তাহার সেই অবস্থা দেখিয়া মঞ্জু চিৎকার করিয়া উঠিল—নিজের প্রাণের ভয়ে নয়, রঞ্জিতেরই বিপদের আশঙ্কায়!

"ছাখো! ছাখো! কি ক'র্‌ছ তুমি? ওগো, তুমি ওখানে দাঁড়িয়ো না! তোমার ভরে কার্ণিশ যে ভেঙে পড়বে এখুনি! সর্ব্বনাশ হবে! ও-রকম সাহস ভাল নয়! এস, শীগ্‌গির তুমি ভিতরে এস!"—আতঙ্কে মঞ্জুর নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল।

"দরজা যে বন্ধ!"—কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যভরেই রঞ্জিৎ এ কথা বলিল।

"দরজা আমি খুলে দিচ্ছি, তুমি ভিতরে এস,—তোমার পায়ে পড়ি!—তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে থেকো না। আমার বড্ড ভয় করচে! তুমি ঘরে এস, ও-দিক্ দিয়ে আমি দরজা খুলে দিচ্ছি।"

"না! আমি এ-দিক্ দিয়েই আস্‌চি"—কচি ছেলের মত অর্থহীন আবদারের সুরে রঞ্জিৎ উত্তর দিল।

সেই সঙ্কটজনক অবস্থাতেও মঞ্জু এইরূপ অদ্ভুত কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে রঞ্জিৎ মঞ্জুর অনুরোধ রক্ষা করিল, এবং শান্ত ছেলের মত তার পড়িবার ঘরে গিয়া বই খুলিয়া বসিল।

এবার মঞ্জু ভাবিল, সে প্রতিশোধ লইবে—রঞ্জিৎকে পাল্টা চম্‌কাইয়া দিয়া। কিন্তু তা' সে পারে না। হয় হাতের চুড়ী ঝণ্ ঝণ্ শব্দে বাজিয়া উঠে, না হয় দরজায় শব্দ হয়, না হয় একটা প্রকাণ্ড টিক্‌টিকি টিক্-টিক্ করে, অথবা এমন একটা-কিছু ঘটিয়া যায়, যাহাতে রঞ্জিৎকে পিছনে চাহিতে হয়। হইলও তাই, চাকরটা আসিয়াছিল উপরে কোন কাজে। সে হঠাৎ এম্‌নি বিকট শব্দে হাঁচিয়া ফেলিল যে, দুই জনেই একসঙ্গে চম্‌কিয়া উঠিল। যেন কিছুই জানে না, এই ভাবে কার্পেটের উপর অসম্পূর্ণ প্রজাপতিটি তুলিতে ব্যস্ত মঞ্জু রেশমী সুতা ও সূচ হাতে করিয়া গুণ্-গুণ্ শব্দে গান করিতে করিতে ঘরে প্রবেশ করিল,—

"নীল আকাশে অসীম ছেয়ে
ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো।
আবার কেন ঘরের ভিতর,
আবার কেন প্রদীপ জ্বালো।"

"ও-কি, আলোটা নিবিয়ে দিলে যে?" সবিস্ময়ে মঞ্জু বলিয়া উঠিল।

"বা রে! তুমি যে বল্‌লে!" রঞ্জিৎ সবিস্ময়ে উত্তর দিল।

"কি বল্‌লাম্ আমি?"

"ঐ যে—'আবার কেন প্রদীপ জ্বালো'?"

উত্তর শুনিয়া দুই জনেই হাসিতে লাগিল।

"তা' হোক্, তবুও আমি জ্বাল্‌বো। প্রজাপতিটি বুন্‌তে হবে যে!"

"না, আলো আমি জ্বাল্‌তে দেবো না।" রঞ্জিৎ বলিল।

"ইস্" বলিয়া মঞ্জু সুইচে হাত দিল। রঞ্জিৎ তাহার হাত সরাইয়া লইল।

মঞ্জু পরাস্ত হইলে রঞ্জিৎ তাহাকে পাশে বসাইল। বাহিরে শুভ্র জ্যোৎস্নার প্লাবন, খোলা জানালার অল্প পরিসর স্থান দিয়া যেটুকু ঘরে আসিয়া-পড়িয়াছে, তাহাতেই বেশ বোনা যাইতেছে।

"তুমি কেন এত দেরী ক'রে আস এক-এক দিন? বোঝো না ত একা-একা আমার কি রকম লাগে!"—ভারী গলায় মঞ্জু বলিল।

"বুঝি, মঞ্জু, বুঝি! আমিও ত চ'লে আস্‌বার জন্যে ব্যস্ত। কলেজ কি আমার ভাল লাগে? কত দিন ত দুপুরের পরের দু'টি ক্লাসের কাজ এড়িয়ে চ'লে এসেছি। আজ প্রিন্সিপ্যালের বাড়ীতে একটু দরকার ছিল তাই—রাগ ক'রেছ তুমি?"

"না"—অস্ফুট স্বরে মঞ্জু উত্তর দিল।

দুই জনেই নীরব। মঞ্জুর মাথার চুলে, মুখে, কোলের উপর শরতের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নারাশি পড়িয়া তাকে আরও সুন্দর, আরও মনোরম করিয়া তুলিয়াছিল।

রঞ্জিৎ মঞ্জুর জ্যোৎস্না-স্নাত ঠোঁট দু'খানির উপর চুম্বন করিল। আবেশে শিথিল হইয়া মঞ্জু চোখ মেলিতে পারিল না।

"আমার যদি কলেজ না থাক্‌ত, মঞ্জু?"

রঞ্জিতের এই প্রশ্নে গুঞ্জনেরসুরে মঞ্জু বলিল, "খুব ভাল হ'ত তা হ'লে!"

বুকের সঙ্গে সংলগ্ন মঞ্জুর মুখের দিকে তাকাইয়া মৃদু হাসিয়া রঞ্জিৎ আস্তে আস্তে বলিল,—"না! মোটেই নয়। কলেজ না থাক্‌লে খেতাম কি? শুধু কি তোমার অধরসুধা-পানে পেট ভরতো?"

"ধেৎ! জুটতই দু'মুঠো এক-রকম ক'রে। তোমাকে ত দিন-রাত কাছে পেতাম,"—মঞ্জুর উত্তরে কি গভীর নির্ভরতা!

কত দিন মনে হইয়াছে, অথচ বলি-বলি করিয়া বলা হয় নাই, আর আজই হঠাৎ এই সময় যেন কথাটা মনে পড়িল, এই ভাবে রঞ্জিৎ বলিল,—"ভাল কথা, মঞ্জু, তোমাকে যদি কলেজে ভর্ত্তি ক'রে দিই? বিয়ের পরও ত অনেক মেয়ে কলেজে পড়ছে; থার্ড ইয়ার, ফোর্থ ইয়ারেও আছে, তাদের সিঁথির সিঁদুর ডগ্-ডগ্ করছে।"

মঞ্জু হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল,—"যাক্‌গে! আমার কলেজে পড়ার এমন কি দরকার বল? এখন দেখ্‌ছি, যে পর্য্যন্ত প'ড়েছি, এও না পড়্‌লে কোন ক্ষতি ছিল না। তবু আমাকে ভর্ত্তি কর্‌তে তোমার ইচ্ছে হচ্ছে!……কিন্তু তা' হলে আমার এত হাসি পাবে যে, সারা দিন ক্লাসে বসে কেবলি হাসব—" সঙ্গে সঙ্গেই সে হাসি আরম্ভ করিল।

খাইতে যাইবার সময় হইয়াছে—ঠাকুর নীচে ঘণ্টা বাজাইয়া তাহা জানাইয়া দিল। দুই জনেই তখন উঠিয়া পড়িল।

এম্‌নি করিয়াই ছেলেমানুষের মত চেঁচামেচি, হুড়োহুড়ি, ছুটোছুটি, মান-অভিমান ও ভালবাসার ভিতর দিয়া তাহাদের দিনগুলি কাটিয়া যায়।

রঞ্জিৎ প্রোফেসর। আর মঞ্জুও শিক্ষিতা বটে; কারণ, আই-এ পাশ করিবার পরেই তার বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহ প্রায় বছর-খানেক পূর্ব্বে হইয়াছে।

মঞ্জু সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। তার বাবা স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী। ছাত্রজীবনে মঞ্জু স্বাধীন ভাবে চলাফেরায় কোন বাধা পায় নাই। কথাবার্ত্তায়, চাল-চলনে, স্পষ্ট উত্তর দিতে তাকে কোন দিন কুণ্ঠা প্রকাশ করিতে দেখা যায় নাই।

রঞ্জিৎও যে এ রকম ব্যবহার পছন্দ করে না, তা বলা

যায় না। তবে রঞ্জিৎ মধ্যবিত্ত ধরের ছেলে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে প্রথম স্থানই যেন তার এক-চেটে ছিল। কলেজ-জীবনের প্রায় সমস্তটাই সে কাটাইয়া-ছিল তার মামাবাড়ীতে—মামাদের সংস্রবে। তার মামারা বনিয়াদী বংশ, এবং পুরুষানুক্রমে ধনী। রঞ্জিতের দুই মামা এখনও বিলাতে। শুনিতে পাওয়া যায়, চাল-চলনে তাঁরা পুরা সাহেব।

তাঁহাদের আদব-কায়দা, রুচি-প্রবৃত্তি রঞ্জিতের মনের উপর অল্পবিস্তর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বটে, কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্বের প্রভাব তাহার চরিত্রে অক্ষুণ্ণ ছিল।

মঞ্জুকে পাইয়া রঞ্জিৎ খুবই সুখী হইয়াছিল। রঞ্জিৎও মঞ্জুর মনের মত স্বামী হইয়াছিল। মঞ্জু যাহা পাইয়াছিল, কোন দিন তাহার অধিক প্রত্যাশা করে নাই।

ছুটীর দিন রঞ্জিৎ আর মঞ্জু বাড়ীতে থাকিতে পারে না। বাহির হইয়া পড়ে। হয় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, না হয় গড়ের মাঠ, ইডেন গার্ডেন, বা আউটরাম ঘাট, প্রিন্সেপ ঘাট, তকতী ঘাট প্রভৃতি—গঙ্গার ধারে যতগুলি ঘাট আছে, সব যায়গায় ঘুরিয়া বেড়ায়। লেক ওদের কাহারও পছন্দ হয় না। ডায়মণ্ডহারবার, বেহালা, দমদম, শিবপুর প্রভৃতি সহরতলিতেও যায়। সারা দিন ঘুরিয়া রাত্রি কালে ক্লান্ত দেহে উভয়ে বাসায় আসে।

Inter College Football Competition-এ রঞ্জিৎদের কলেজ উঠিয়াছে final-এ। সেই final খেলার দিন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় সমগ্র কলেজ যেন গম্-গম্ করিতেছে। কলেজ বারোটার সময় বন্ধ হইয়া গেল। কমিটী সাদর নিমন্ত্রণ জানাইলেন খেলা দেখিবার জন্য।

কিন্তু রঞ্জিতের কি আর ঐ দিকে লক্ষ্য আছে? মেট্রোতে নতুন একখানা ছবি আসিয়াছে, তার আগা-গোড়া যেমন কৌতুকপ্রদ, তেমনই রোমান্সপূর্ণ, মঞ্জুকে সঙ্গে লইয়া সেই ছবি দেখিবার জন্য তার প্রাণ ছট্-ফট্ করিতেছে, তার উপর বারোটার সময় ছুটী, ম্যাটিনীও পাওয়া যাইবে। রঞ্জিৎ কি আর কোথাও দাঁড়ায়? কলেজ হইতেই ফোনে সিট্ 'রিজার্ভ' করিয়া সে বাড়ী চলিল; যাইবার সময় ভাবিল, আজও মঞ্জুকে চমকাইয়া দিবে, এত সকালে ত কোন দিন বাড়ী ফেরে না!

ট্রামে দেরী হয়, এ জন্য রঞ্জিৎ বাসে চাপিয়াছে। ধর্ম্মতলা ঘুরিয়া বাস চৌরঙ্গীতে পড়িল। মোটরের ভীড়ে বাস থামিয়া থামিয়া চলিতে লাগিল। রঞ্জিৎ মেট্রোর দিকে তাকাইয়া ভাবিল, মঞ্জুকে আজ এই বইখানি দেখাইলে তার সে-দিনের প্রতিজ্ঞা পালন হইবে।

হঠাৎ রঞ্জিতের সকল কল্পনা, সকল চিন্তা সম্মুখে যেন প্রকাণ্ড এক ধাক্কা পাইয়া থামিয়া গেল! সে চলন্তি বাসের জানালার ভিতর দিয়া তাকাইয়া হঠাৎ কাহাকে দেখিল? মঞ্জু নয়? একটি অল্পবয়স্ক পরিপাটি পোষাক-ধারী যুবকের সঙ্গে মঞ্জু মেট্রোর সম্মুখে দাঁড়াইয়া অধীর ভাবে যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতেছে!

রঞ্জিতের বুকের মধ্যে রক্তস্রোত যেন স্তম্ভিত হইল! মঞ্জু? হ্যাঁ, মঞ্জুই ত! সে ত রঞ্জিৎকে কিছুই বলে নাই; কেবল জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তার ফিরিতে কত বিলম্ব হইবে? বাহিরে অনেক কাজ ছিল; তাই রঞ্জিৎ বলিয়াছিল, কাজ শেষ করিয়া ফিরিতে সাতটা হইতে পারে। তাহার সঙ্গী যুবকটিকে রঞ্জিৎ চিনিতে পারিল না, কিন্তু মঞ্জুর এ কিরূপ ব্যবহার! মঞ্জু কি সত্যই এই প্রকৃতির? এত হাসি-কান্না, এত ভালবাসা, সবই কি মিথ্যা? সবই কি অভিনয়? ঘৃণায়, রাগে, দুঃখে রঞ্জিতের সর্ব্বাঙ্গ রি-রি করিতে লাগিল। মঞ্জুর জন্যই ত সে বন্ধুবান্ধবের সকল অনুরোধ উপেক্ষা করিল, মেট্রোতে সিট্ রিজার্ভ করিয়া আসিল; আর সেই মঞ্জু অন্য কে এক জনের সঙ্গে তার বিনানুমতিতে, তাকে লুকাইয়া বায়স্কোপ দেখিতে আসিয়াছে! সে এরূপ করিবে, ইহা কি পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল? রঞ্জিৎ হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া বাসের দরজায় আসিয়া হাণ্ডেল ধরিল; মেট্রো তখন অনেক পিছনে পড়িয়াছিল। কণ্ডাক্টর রুক্ষকণ্ঠে হাঁকিল, "জল্‌দি উৎরিয়ে, বাবু!" রঞ্জিৎ বিরক্তিভরে বলিল, "হিঁয়া কাহে উৎরেঙ্গে? দো-আনাকা টিকিট হ্যায়—কলেজষ্ট্রীট জানেকো।"—কণ্ডাক্টর এবার বলিল, "পথ ছোড়্‌কে বৈঠ্ যাইয়ে।"

বাস হইতে নামিয়া রঞ্জিৎ সোজা বাড়ী গেল না। অনেক রাস্তা, পার্ক, অনেক অলিগলি ঘুরিয়া সে যখন ক্লান্ত দেহে ফিরিল, তখন, বেলা প্রায় চারিটা। বাড়ীতে

ফিরিয়া সে মঞ্জুকে দেখিতে পাইল না। খালি ঘর যেন খাঁ-খাঁ করিতেছে। চাকর ও ঠাকুর তখনও ঘুমাইতেছিল। ঘরের টেবিল সাজানো, বিছানা-পাতা, কাপড়-চোপড় গুছাইয়া রাখা—এ সব কাজ মঞ্জু নিজেই করিত; কিন্তু সবই আজ এলোমেলো হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। টেবিলের উপর বইগুলি যে ভাবে ছিল—সেই রকমই বিশৃঙ্খল ভাবে পড়িয়া আছে। দোয়াতটা যেন কি করিয়া উল্টাইয়া পড়িয়াছে।

ঠাকুর-চাকরকে মঞ্জু সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে রঞ্জিতের প্রবৃত্তি হইল না, তার আত্মসম্মানে যেন আঘাত লাগিল। স্ত্রী কোথায় গিয়াছে, সে কথা জিজ্ঞাসা করিবে ঠাকুর বা চাকরকে?

তাহার খুবই ক্ষুধা পাইয়াছিল। কিন্তু শূন্য-ঘরে তাহার থাকিতে ভাল লাগিল না। ক্ষোভে-দুঃখে সে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল, এবং আবার বাহির হইয়া পড়িল।

বাহির হইয়া রঞ্জিৎ চলিয়া আসিল ময়দানে—ফোর্টের দক্ষিণ দিকের খোলা মাঠে। বড় বড় গাছের ছায়ায় আচ্ছন্ন নির্জ্জন পরিচ্ছন্ন রাস্তাগুলিতে ঘুরিয়া-বেড়াইতে তাহার বড় ভাল লাগিত। এই সকল স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল।

মঞ্জুর কপট ব্যবহারের কথা বারংবার রঞ্জিতের মনে পড়িতে লাগিল। সে কি প্রত্যহই দুপুরে এই ভাবে বাহির হইয়া যায়? কিন্তু আর ত কোনো দিন তাহা রঞ্জিতের চোখে পড়ে নাই। রঞ্জিত ভাবিল, আজ তার সাতটার আগে বাসায় ফিরিয়া আসা সম্ভব হইবে না জানিয়াই মঞ্জু নিশ্চিন্ত মনে বাহিরে গিয়াছে! উঃ, কি বিশ্বাসঘাতক মঞ্জু! রঞ্জিতের চোখ জলে ভরিয়া গেল।

রঞ্জিতের মনে পড়িল, সে দিন সন্ধ্যার দিকে মঞ্জুকে চমকাইয়া দিবার জন্য লুকাইয়া সে যখন ঘরে আসিয়াছিল, মঞ্জু তখন রাস্তার ধারে জানালার পাশে বসিয়া এক মনে গায়িতেছিল,—

"তুমি যদি আসিতে প্রিয়,
আজি এমন রাতে
বকুলের মঞ্জরী ফুটিত বনে
মধু-তিথি পূর্ণিমাতে···"

তার পর আবার,

"সে দিন মালতী-বিতানে
ক'য়েছিনু মোরা কোন্ কথা
দোঁহার হৃদয় জানে
আর জানে বন-দেবতা···"

আজ বার বার রঞ্জিতের মনে হইতে লাগিল, যাহার উদ্দেশে মঞ্জুর এই গান, সে নিশ্চিতই রঞ্জিত নয়। ছিঃ! ছিঃ! মঞ্জুর এই রকম প্রবৃত্তি! অতীতের কত বিরহ-মিলন, মান-অভিমানের কথা রঞ্জিতের মনে পড়িতে লাগিল। তার চোখ হইতে অশ্রুর ধারা নামিল। সে শূন্য-গৃহ ত্যাগ করিয়া গঙ্গার ধারে গিয়া বসিল, এবং কত কথাই ভাবিতে লাগিল।

অনেক চিন্তার পর সে স্থির করিল—মঞ্জুর কি কৈফিয়ৎ আছে, তাহা আগে শুনা উচিত; তবে নিজে সে কিছুই জিজ্ঞাসা করিবে না। মঞ্জু যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহা তাহাকে বলিতে পারে। আর যদি কোন অপরিহার্য্য কারণে মঞ্জু যুবকটির সহিত যাইতে বাধ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে নিজেই সকল কথা তাহাকে খুলিয়া বলিবে।

রঞ্জিতের বাড়ী ফিরিতে রাত্রি প্রায় আটটা বাজিল। মঞ্জু ব্যস্ত হইয়াছিল বটে, তবে বেশি ভাবে নাই; কারণ, সাতটা পর্য্যন্ত ত তার বিলম্ব হইবার কথাই ছিল। সে ঘরে আসিতেই মঞ্জু উৎসাহভরে তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিল,—"কি মশায়, বাইরে সাতটা পর্য্যন্ত দেরী হবে বলেছিলে, কিন্তু আরও এক ঘণ্টা বেশি দেরী হ'ল, তার মানে?"

রঞ্জিতের মুখ গম্ভীর। ছলনার যেন আর একটি দৃশ্য তার নয়ন-সমক্ষে উদ্ঘাটিত হইল! শত বৃশ্চিক যেন তাহাদের সুতীক্ষ্ণ হুল তাহার বক্ষে বিদ্ধ করিল! মঞ্জুর দিকে না তাকাইয়া গম্ভীর ভাবে সংক্ষেপে "হুঁ" বলিয়া রঞ্জিৎ পাশ কাটাইয়া ভিতরে চলিয়া গেল। রঞ্জিতের ব্যবহারে এবং এই উত্তরের মধ্যে ঠাট্টা-বিদ্রূপের লেশ মাত্র ছিল না। মঞ্জুর পুলক ও আবেগভরা প্রশ্নে এই উত্তর অত্যন্ত নির্ম্মম বেদনাদায়ক! রঞ্জিতের মুখের এই রকম গাম্ভীর্য্যের সহিতও মঞ্জুর কোন দিন পরিচয় হয় নাই। বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া রঞ্জিত বাথ্-রুম হইতে

বাহিরে আসিয়া নিঃশব্দে পড়ার ঘরে প্রবেশ করিল। অন্যান্য দিনের মত মঞ্জুর সঙ্গে হাসি-তামাসা করিল না। মঞ্জু তাহার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিল। দুপুরবেলার সকল কথাই সে তাহাকে খুলিয়া বলিবে ঠিক করিয়াছিল, কিন্তু মঞ্জু বড়ই অভিমানিনী। উপেক্ষা, অবহেলা একবিন্দুও সে সহ্য করিতে পারে না। তাহার জিদ হইল, সে সাধিয়া কোন কথা বলিবে না। সে কি অপরাধ করিয়াছে? সে ত সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, তবে হঠাৎ এ রকম ব্যবহারের কারণ কি?

ব্যাপার ক্রমশঃ জটিল হইয়া উঠিল। পরস্পরের কাহারও মুখে কোন কথা নাই, হাসি-ঠাট্টা নাই, নিজে যাচিয়া কৈফিয়ৎ দেওয়া ত দূরের কথা! রঞ্জিতের মনে হইল, এ বাড়ী যেন মঞ্জুর আর ভাল লাগে না। রঞ্জিতের সঙ্গে কথা বলা সে যেন বাহুল্য মনে করে! নিতান্ত প্রয়োজনে যে দুই-একটা কথা বলিতে হয়, তাহাও অতি নীরস ও সংক্ষিপ্ত; সংসার-নির্ব্বাহের দৈনন্দিন অপরিহার্য্য বিষয়ের মধ্যেই তাহা সংযত ভাবে সীমাবদ্ধ। জিদের বশবর্ত্তী হইয়া মঞ্জুও দেখায়—তার যেন কথা বলিবার বিশেষ কোন গরজ নাই। সে দেখায়, যেন তার দিক্ দিয়া ভাবিবার মত, মনের দুঃখে মলিন হইয়া থাকিবার মত কোন কিছুই ঘটে নাই। রঞ্জিৎ নামক একটি লোক যে এ বাড়ীতে বাস করে, মঞ্জু যেন তা' স্বীকারই করিতে চায় না। সে যে পড়াশুনা করে, খায়, ঘুমায়, দোতালায় ওঠে-নামে, ঘরের মধ্যে বিছানার উপর বই লইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিঃশব্দে কাটাইয়া দেয়, বারান্দায় পায়চারী করে, কোন সামান্য দরকারেও ঠাকুর-চাকরকে ডাকাডাকি করিয়া কোলাহল সৃষ্টি করে—মঞ্জুর যেন এ সকল বিষয়ে লক্ষ্যই নাই। রঞ্জিৎ বুঝিল, কেন মঞ্জুর এ দশা; কোন দিকেই খেয়াল নাই! এ রকম উড়ো-উড়ো ভাবের কারণ অন্য রকমে রঞ্জিতের মনে অতি যন্ত্রণাদায়ক ভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

এক দিন আগেও যে-বাড়ী ছুটাছুটি, হাসি-ঠাট্টা, অফুরন্ত গল্প-গান, এবং বাক্যোচ্ছ্বাসে প্রতিধ্বনিত হইত, এখন তাহা নিস্তব্ধ, যদিও আগের মত সকলেই আছে। সকলেই নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কাজে সময় কাটাইতেছে। রঞ্জিৎও নির্ব্বাক ভাবে তার দৈনিক কাজগুলি যথানিয়মে করিয়া যাইতেছে। পরস্পর সম্মুখে পড়িয়া গেলেও তাহাদের চোখোচোখি হয় না। মনে হয়, দু'জনেই যেন পরস্পরের বিরুদ্ধে কি-একটা ফন্দি আঁটিতেছে!

রঞ্জিৎ এক-এক সময় হয় ত ঘরের আর এক দিকে তার নিজের কোন সখের কাজে ব্যস্ত মঞ্জুর দিকে তাকাইয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যায়। পূর্ব্বদিনও সে মঞ্জুর সঙ্গে কত কথা বলিয়াছে, হাসিয়া কত ঠাট্টা-তামাসা করিয়াছে, হৃদয়ের গভীর প্রেম উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রকাশ করিয়াছে!—এ কথা ভাবিয়া রঞ্জিতের কেমন যেন লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ হয়; ভাবে, কি করিয়া সে মঞ্জুকে এত দিন আপনার মনে করিয়া আসিয়াছিল?

কিছু দিন ধরিয়া একটা গুমট ভাব দু'জনেরই মনের মধ্যে থাকিয়া গিয়াছে। কাল মেঘখানি কাটিয়া যাইবার কোনই লক্ষণ দেখা যায় না। মন-খুলিয়া কেহই কাহারও সঙ্গে কথা বলে না। অথচ বাহিরের কেহ আসিলেও তাহাদের পরস্পরের মনের বিকার বুঝিতে পারে না। দুই জনেই অতিথির অভ্যর্থনার জন্য এরূপ আকিঞ্চন প্রকাশ করে যে, অতিথি আসল ব্যাপারটার সন্ধান পায় না। দুই জনেই অভ্যাগতের সঙ্গে কথা বলিতে ব্যস্ত, অথচ তাহারা পরস্পর সম্বন্ধে যে সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ এবং উদাসীন, তাহা আদর ও যত্নের আতিশয্যে অতিথির চোখে পড়ে না।

রঞ্জিৎ এখন বিকালে বাড়ীতে চা খায় না; রাস্তার ধারে যে কোন চা'এর দোকানে বসিয়া অভ্যাসটা বজায় রাখে। বাড়ী ফিরিবার জন্যও এখন তার আর বেশি গরজ দেখা যায় না।

আর এক দিনের কথা।

সে দিন বিকালে রঞ্জিৎ বাড়ীতেই ছিল। সেই সময় চাকর আসিয়া মঞ্জুকে বলিল,—"মা, এক জন বাবু এসে ডাক্‌ছে।" অন্য ঘর হইতে রঞ্জিতের কানে এ কথা প্রবেশ করিতেই সে জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া দেখিল, আগন্তুকটি সেই দিনকার সেই যুবক—যাহাকে রঙ্গালয়ের সম্মুখে মঞ্জুর পাশে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার মনে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল।

মঞ্জুও উপর হইতে তাহাকে দেখিয়া চাকরকে

বলিয়াছিল, "যা, বল্‌গে—এখন আমি ওর সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে পার্‌বো না।"

মঞ্জু মনে করিয়াছিল, রঞ্জিৎ এবার নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করিবে, "ও কে ?"

কিন্তু রঞ্জিৎ এ সম্বন্ধে তাহাকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিল না ; যেন সে কিছুই জানিতে পারে নাই !

আজ মঞ্জুর বুকের মধ্যে হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল ; অজ্ঞাত একটা আতঙ্কে সে যেন অভিভূত হইল। রঞ্জিতের অসহিষ্ণু ভাব, বিতৃষ্ণা, রাগ, ঘৃণা এ সকলেরই কারণ আছে বলিয়া সে বুঝিতে পারিল। একবার তাহার ইচ্ছা হইল, রঞ্জিৎকে যুবকটির পরিচয় জানাইয়া আসে। সে কিন্তু তাহা করিতে পারিল না ; একটা গর্ব্বপূর্ণ অভিমানভরা স্বাধীনতার আবহাওয়ায় সে পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছে। তার আজন্মের দীক্ষা, আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান, এবং অভিমান তাহার নতি-স্বীকারে এবং আত্ম-সমর্পণে ব্যাঘাত ঘটাইল ; তাহার মনের গতির অনুকূলে যুক্তিও মিলিল। কোন বিশেষ প্রয়োজনে ভদ্রলোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল, এ জন্য তাহার কৈফিয়ৎ দেওয়ারই বা প্রয়োজন কি ?

পরের দিন রঞ্জিতের কলেজ ছিল—একটু দেরীতে। কলেজে যাইবার জন্য সে যখন প্রস্তত হইতেছিল, সেই সময় চাকর দুইখানি ডাকের চিঠি আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া গেল। একখানি রঞ্জিতের, আর একখানি মঞ্জুর চিঠি। অন্যান্য দিনের মত মঞ্জু রঞ্জিতের সম্মুখে সেই চিঠির খাম ছিঁড়িল না, বা চিঠি পড়িল না। চিঠিখানা হাতে লইয়া সে অন্য কক্ষে প্রবেশ করিল। রঞ্জিতের দৃষ্টি এড়াইল না যে, চিঠিখানি গোপন করিবার জন্য মঞ্জু অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়াছিল।

জীবনটা রঞ্জিতের আর ভাল লাগে না। জীবনের সব রং, সব সুখ, সকল সান্ত্বনা যেন নিঃশেষে ফুরাইয়া গিয়াছে। কোথাও গিয়া সে একবিন্দু শান্তিও পায় না। বিশ্বাসের বিনিময়ে বিশ্বাসঘাতকতা! ভান করিতে, অভিনয় করিতে মেয়েরা কি সর্ব্বদাই এই ভাবে অভ্যস্ত ? কি করিয়া মঞ্জু এত ভালবাসা, এত স্নেহ ও আদর পাইয়াও তাহার সঙ্গে এইরূপ প্রতারণাপূর্ণ অভিনয় করিতেছে ?—দুঃখ, ঘৃণা, রাগ রঞ্জিতের মনের কানায় কানায় ভরিয়া উঠিল। প্রতিদিনের ঘটনাগুলি যেন তাহার নিকট কঠোর প্রমাণ আনিয়া দিতেছে !

মঞ্জু বাপের বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। কিছু দিন সেখানে থাকা তার নিতান্তই দরকার।

ফোর্থ ইয়ার ক্লাশে 'জুলিয়াস্ সীজার' অধ্যাপনা আরম্ভ হইয়াছে। অনেক খাটিয়া, এবং অনেক প্রামাণ্য বই পড়িয়া রঞ্জিৎ কতকগুলি নোট সংগ্রহ করিয়াছিল ; কিন্তু বহু দিন দরকার না হওয়ায় কোথায় সেগুলি চাপা-পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু এবার যে সেগুলির দরকার। খুঁজিতে-খুঁজিতে রঞ্জিৎ ক্লান্ত হইয়া পড়িল। বইয়ের গাদা, খাতার বাণ্ডিল, আলমারি, সেল্‌ফ সবই ঘাঁটিয়া-খুঁটিয়া একাকার করিয়া ফেলিয়াছে। হঠাৎ একখানা খাতার ভিতর হইতে একখানা চিঠি মেঝের উপর পড়িয়া গেল। একমুখ ছেঁড়া খাম, তাহার উপর মঞ্জুর নাম লেখা। তারিখ মিলাইয়া রঞ্জিৎ বুঝিতে পারিল, উহা সেই চিঠি—যে চিঠি গোপন করিবার জন্য মঞ্জু প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল। দারুণ কৌতূহল-ভরে রঞ্জিৎ চিঠিখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিল,—

"ভাই মঞ্জু, তোর সঙ্গে কাটিয়ে-দেয়া কলেজের দিনগুলি বর্ষার আল্‌গা মেঘের মত আমার চোখের সামনে যেন স্পষ্ট ভাসে। তুই ত ঘর বেঁধে ফেলেছিস্ বেশ সুন্দর, আমি এখনো পারিনি ; বোধ হয় পারবোও না ! কি হবে জানি নে ! যাক্—আই-এ পাশ ক'রে তুই ত গেলি বাসা বাঁধ্‌তে, আর আমি চ'লে গেলাম লক্ষ্ণৌতে। দীর্ঘ এক বছর পরে যখন ক'লকাতায় ফিরে এলাম, মনে ক'রেছিলাম তোর সঙ্গে দেখা হ'লে আমার অনেক না-বলা-কথা তোকে বলুব। সে দিন কেবল দু'মিনিটের জন্য দেখা হ'ল ; সেই অল্প সময়ে কি ক'রে বলি সব কথা ? তার ওপর জ্যাঠামশায় ছিলেন সঙ্গে। সেই জন্যই মেট্রোতে যাবার বন্দোবস্ত ক'রেছিলাম, এবং অজয়কে পাঠিয়েছিলাম তোকে আন্‌বার জন্য। শুন্‌লাম, তোরা প্রায় এক ঘণ্টা দেরী ক'রে ফিরে গিয়েছিলি। সত্যিই আমি খুব দুঃখিত। অজয়টা এসে আমার ওপর ভয়ঙ্কর রাগ করলে। ভদ্রমহিলাকে নিয়ে ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে তার না কি মাথা-কাটা গিয়েছে ! আমার ছোট বোনটি আছাড় খেয়ে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ায় নানা

রকম গণ্ডগোলে আমার যাওয়া হয়নি। টিকিটগুলোও মাঠে মারা গেল! সে সব কথা থাক, এখন যা বলি শোন—আমাদের বাড়ীতে এক দিন তোদের নিমন্ত্রণ করতে চাই। কবে তোমাদের আসবার সুবিধা হবে—ঠিক ক'রে লিখিস্। অজয়কে পাঠিয়েছিলাম—সেই খবরটাই জানবার জন্য; তা' সে এসে বল্‌লে, তুই না কি তাকে হাঁকিয়ে দিয়েছিস্! চমৎকার! আজ-কাল হাঁকিয়ে দিতেও শিখেছিস্ না কি? দেখ্‌বো, শিক্ষাটা কেমন হয়েছে—আয় ত দু'জনে একবার আমার কাছে। কবে আস্‌চিস্ জানাবি। যে প্রাণীটিকে অবলম্বন করে বাসা বেঁধেছিস্, তাকেও আনা চাই-ই। তার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় কিছুই হয়নি যে!

"হ্যাঁ আরও একটি কথা,—যা শুনবার জন্য তুই সারা দিন আমাকে বিরক্ত ক'রে মারতিস্—কে 'অচলা' এই ছদ্ম নামে আমাকে চিঠি লেখে? তার সম্বন্ধে সব কথাই সেই দিন তোকে ব'লুব। নিশ্চয়ই আসা চাই কিন্তু। কবে যাবো বল—আমি নিজেই যাব, এবার আর অজয়কে পাঠাব না। ইতি—তোর গীতা।"

গীতা? রঞ্জিতের মাথার শিরাগুলি যেন ঝাঁ-ঝাঁ করিতে লাগিল। গীতা!—কি করিবে, তা সে ঠিক করিতে পারিল না। বিহ্বল ভাবে সে ঘন ঘন চারি দিকে তাকাইতে লাগিল। গীতা লক্ষ্ণৌএ ছিল? সম্ভব বটে! তাহার কোন গুরুজন সেখানে থাকেন। "অচলা" এই ছদ্ম-নামে রঞ্জিৎই তাহাকে চিঠি লিখিত। মামাদের বাড়ীতে গীতার সঙ্গে রঞ্জিতের পরিচয় হইয়াছিল, এবং তাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় সময়ও বেশ আনন্দে কাটিয়াছিল। লোকের নিকট পরিচয় গোপন করিতে এবং সন্দেহ এড়াইবার জন্যই রঞ্জিৎ তাহাকে ঐ ছদ্মনামে চিঠি লিখিত; আর গীতাও এক জন পুরুষের নাম দিয়া তাহাকে জবাব দিত।

রঞ্জিতের মন হইতে শান্তি যেন চির-বিদায় লইয়াছে; সে এখন বুঝিতে পারিল, নির্দ্দোষ মঞ্জুকে ভুল বুঝিয়া অন্যায় সন্দেহ করিয়াছে। মঞ্জুকে সে কত কষ্টই না দিয়াছে! মিথ্যা সন্দেহে তার কোমল মনে কি দারুণ বেদনা দিয়াছে ভাবিয়া রঞ্জিতের মন অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। মঞ্জুর পায়ে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য সে অধীর হইয়া উঠিল। মঞ্জুর খবর রঞ্জিৎ অনেক দিনই পায় নাই। সে কেমন আছে, কে জানে? মঞ্জুকে দেখিবার জন্য, তাহার দু'টি কথা শুনিবার জন্য রঞ্জিৎ আগের চেয়েও বেশি ব্যাকুল হইল।

পরদিন সকালে রঞ্জিৎ খবরের কাগজে মনঃসংযোগ করিয়াছে, সেই সময় ডাক-পিয়ন আসিয়া তাহাকে একখানা চিঠি দিয়া গেল। রঞ্জিৎ তাড়াতাড়ি চিঠিখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিল,—"দাদাবাবু, মেজদি কাল রাত্তিরে আমাদের ছেড়ে চ'লে গেছে, সেখানে হয় ত সুখ-শান্তি পাবে। সে আমাদের সান্ত্বনা-দানের জন্য রেখে গেছে—দেবদূতের মত সুন্দর একটি খোকা। বাবা-মা বড়ই অধীর হ'য়ে পড়েছেন। আপনি নিশ্চয়ই একবার আসবেন। ইতি,—নিবেদিকা অঞ্জু।"

মঞ্জুর ছোট বোন্ অঞ্জলি এই পত্র লিখিয়াছে।

রঞ্জিতের পায়ের তলা হইতে পৃথিবী যেন সরিয়া যাইতে লাগিল! তাহার চোখের সম্মুখে নিবিড় অন্ধকাররাশি কুণ্ডলী পাকাইয়া চারি দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

শ্রীনীলকণ্ঠ দাশ শর্ম্মা (বি-এ)।

চারাগাছ ও বেড়া

চারাগাছ ঘিরি এক রহিয়াছে বেড়া
কোনখানে ফাঁক নাই—চারি দিক ঘেরা।
গাছ ক্রমে বেড়ে ওঠে, বেড়া তবু হায়,
গাছেরে ঘিরিয়া রাখে ছাড়িতে না চায়।
বাহিরের আলো পানে, শাখা পড়ে ঝুঁকে,
বেড়া তারে চেপে রাখে আপনার বুকে।

বেড়া ভাবে, গণ্ডী ছেড়ে যেতে নাহি দিব,—
যত দিন পারি ওকে ঘিরিয়া রাখিব।
গাছ ভাবে, হায় হায়, এ তো জ্বালা ভালো,
আমি চাই মুক্ত বায়ু, বাহিরের আলো!
এক দিন ঝড়ে হলো বেড়ার পতন,
শাখা মেলি গাছ বলে, পেলেম জীবন!

শ্রীবিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত।

ইতিহাসের অনুসরণ

রামায়ণ কি ইতিহাস?

রামায়ণ হিন্দুর বিরাট্ গ্রন্থ। নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর ধারণা, ইহা ইতিহাস বা পুরাবৃত্ত। রামায়ণ প্রধানতঃ রাম-চরিত; কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা এবং তাহাদের এ-দেশী চেলারা—উহা যে ইতিহাস, এ কথা স্বীকার করেন না। স্বীকার না করিবার যে কারণ প্রদর্শিত হয়, তাহা অসঙ্গত নহে। উহাতে রাক্ষস এবং বানরদিগের যে বর্ণনা আছে, তাহা প্রাকৃত হইতে পারে না। উহা পাঠে জানা যায়, রাক্ষসদের রাজা রাবণের দশটা মাথা, কুড়িটা চক্ষু, এবং কুড়ি-পাটি দন্ত ছিল। ইহা অসম্ভব, অবিশ্বাস্য; কিন্তু রাবণের বর্ণনায় বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত রামায়ণেই দেখা যায়, তাঁহার—"দশ মুণ্ড, কুড়ি বাহু, বিংশতি লোচন।"

অন্যত্র,—"বিশ পাটি দাঁত মেলি রাবণ রাজা হাসে।
অশোক কিংশুক যথা ফুটে ভাদ্র মাসে॥"

দশটা মুণ্ড না হইলে কুড়ি-পাটি দন্ত হইতে পারে না; কিন্তু মানুষের দশটা মাথা হওয়াই অসম্ভব। রাবণের ভাই কুম্ভকর্ণ ক্রমাগত ছয় মাস নিদ্রাভিভূত থাকে, ইহাও সম্ভব নহে। কাজেই এ কথা বিদেশীরা বিশ্বাস করিতে পারেন না। এই জন্যই তাঁহারা গোটা রামায়ণকে ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতে অসম্মত। কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলেই প্রতীতি হয় যে, রাক্ষসপতি রাবণের কাঁধে দশটা মাথা ছিল না। তাঁহার প্রকৃতি অতি ভয়ঙ্কর এবং দুর্দ্দান্ত ছিল বলিয়া তাঁহাকে দশানন বলা হইত। সিংহ অতি ভয়ঙ্কর জন্তু; এ জন্য সিংহ পঞ্চবদন, পঞ্চবক্ত্র, পঞ্চাস্য প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। রাবণ রাজা সিংহ অপেক্ষাও ভীষণ ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে দশানন বলা হইত। এ কথা কত দূর সত্য, তাহা প্রথমে বাল্মীকির মূল রামায়ণ হইতে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা যাক। আমাদের দেশের প্রাচীনকালের বুধগণ স্বীকার করিয়াছেন যে, মানুষ যতই মায়াবী বা ছদ্মবেশ-ধারী হউক, নিদ্রাকালে এবং মৃত্যুকালেও তাহার সে ছদ্মবেশ থাকে না, থাকিতে পারে না। সে সময় মানুষ স্বকীয় প্রকৃত রূপই ধারণ করে। বাল্মীকির রামায়ণে রাবণের নিদ্রাকালের এবং মৃত্যুকালের বিশদ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে দেখা যায় যে, সাধারণ লোকের মতই রাবণের এক মুণ্ড এবং দুই হাত ছিল; অতি-প্রাকৃত কিছুই ছিল না। নিদ্রাকালে রাবণের আকৃতি কিরূপ ছিল, তাহার বিবরণ ঐ রামায়ণেই পাওয়া যায়। নিশাযোগে রামের চর হনুমান লঙ্কায় রাবণের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—"কনকময় অঙ্গদে ভূষিত মহাকায় রাক্ষসেশ্বর রাবণের বাহুদ্বয় ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় শয্যায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।(১) এখানে 'ভুজৌ ইন্দ্রধ্বজোপমৌ।' দ্বিবচন রহিয়াছে—বহুবচন নাই। তবে আর আঠারখানা হাত গেল কোথায়? উহা ছিল না। তাহার পরই লিখিত হইয়াছে যে, উল্লিখিত ভুজদ্বয় পঞ্চশীর্ষ সর্পের ন্যায় শুভ্রবর্ণ শয্যাতলে বিন্যস্ত রহিয়াছে। এখানে সর্ব্বত্রেই দুই বাহুর কথা বলা হইয়াছে। তাহার পর বলা হইয়াছে যে, তাঁহার বিশাল মুখ হইতে ভুক্তান্ন এবং পানের গন্ধনিশ্বাস-বায়ু বহির্গত হইয়া গৃহখানি পূর্ণ করিতেছে।(২) এখানে "মহামুখাৎ" একবচন; বহুবচন নহে। তবে অন্য মুখগুলি কোথায় গেল? এক স্থানে নহে, বহু স্থানে রাবণ রাজার দুইখানি হস্ত এবং একখানি মুখের কথাই লিখিত আছে। মারুতি দেখিয়াছিলেন, তাঁহার কুণ্ডলোজ্জ্বলিত মুখখানি; তাঁহার একাধিক বদন দেখেন নাই।(৩) এখানে 'আননম্' একবচনান্ত। নিদ্রাকালে দেখা গিয়াছিল যে, তাঁহার একখানি ভিন্ন দশখানি মুখ নাই। হাত ছিল দুইখানি—কুড়িখানি নহে। সুতরাং তিনি সাধারণ মানুষই ছিলেন। আবার

(১) কাঞ্চনাঙ্গদসন্নদ্ধৌ দদর্শ স মহাত্মনঃ।
বিক্ষিপ্তৌ রাক্ষসেন্দ্রস্য ভুজাবিন্দ্রধ্বজোপমৌ। ইত্যাদি
—রামা, সুন্দরকাণ্ড, ১০।১৫

(২) তস্য রাক্ষসরাজস্য নিশ্চক্রাম মহামুখাৎ।
শয়ানস্য বিনিশ্বাসঃ পরিপূরয়ন্নিব তদ্ গৃহম্।
ঐ ২৪ শ্লোক।

(৩) মুক্তামণিবিচিত্রেণ কাঞ্চনেন বিরাজিতা।
মুকুটেনাপবৃত্তেন কুণ্ডলোজ্জ্বলিতাননম্। সুন্দরা, ১০।২৫

রাবণ পঞ্চবটীর কুটীর হইতে সীতাকে হরণ করিবার পর আত্মশ্লাঘা করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"আমি আকাশে থাকিয়া আমার এই দুইখানি হস্ত দ্বারা মেদিনীকে উত্তোলন করিতে পারি, আমি সমুদ্রকে পান করিতে সমর্থ; এমন কি, যুদ্ধে যমকেও সংহার করিতে পারি।" (৪) এখানে 'ভুজাভ্যাং' দ্বিবচন, বহুবচন নহে। আত্মশ্লাঘা করিবার সময় রাবণ দুইখানি হাতের কথা বলিয়াছিলেন, কুড়িখানি হাতের কথা বলেন নাই। আবার যখন সীতাকে ভয় এবং স্বীয় ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন দ্বারা বশীভূত করিতে পারেন নাই, তখন সীতার চরণে প্রণতিপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—"রাবণ কখনও নীচের চরণে মস্তক রাখিয়া প্রণতি করে নাই।" (৫) এখানে 'মূর্দ্ধ্না' একবচনান্ত।

রাবণের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা বিভীষণ তাঁহার মৃতদেহ দর্শনে বিলাপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনার ভাস্করোজ্জ্বল মুকুট এবং অঙ্গদভূষিত বাহু দুইখানি নিশ্চেষ্ট ভাবে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।" (৬) এখানে 'নিশ্চেষ্টৌ ভুজাঙ্গদবিভূষিতৌ' দ্বিবচন। সুতরাং রাবণের দুইখানি মাত্র হাত ছিল, বিংশতি হস্ত ছিল না। মস্তক ছিল একটি। আবার রাবণের মৃত্যুর পর যখন তাঁহার পত্নীরা রণক্ষেত্রে তাঁহার মৃতদেহ দেখিতে আসিয়াছিলেন, তখন কেহ তাঁহার মুখখানি দেখিয়া মোহগ্রস্ত হইয়াছিলেন, কেহ মস্তকটি ক্রোড়ে লইয়া কাঁদিতেছিলেন। এ ক্ষেত্রে বদন এবং শির সমস্তই একবচনান্ত। (৭) রাবণের প্রধানা মহিষী মন্দোদরী মৃত্যুশয্যায় শায়িত রাবণের কিরীটোজ্জ্বল মুখখানি দেখিয়া রোদন করিয়া বলিয়াছিলেন, 'তোমার সুন্দর মুখখানি রামচন্দ্রের বাণে ভিন্ন হইয়া হতশ্রী হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।" এখানে 'আস্যং' এবং 'বক্ত্রম্' একবচনান্ত, বহুবচনান্ত নহে। (৮) অতএব মৃত্যুকালে রাবণের দশমুণ্ড ছিল না, একটি মাত্রই মুণ্ড ছিল, ইহা বাল্মীকির রামায়ণে দেখিতে পাই। আমরা রামায়ণ হইতে আর অধিক প্রমাণ দিব না। সুতরাং, রাবণ যে সত্যই দশানন ছিলেন, রামায়ণের সকল স্থানে সে কথা নাই। অনেক স্থানে তিনি দশগ্রীব, দশানন প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছেন। ক্রুদ্ধ রাবণের বর্ণনায় তাঁহাকে দশগ্রীব বা দশানন বলা হইয়াছে। খর-দূষণের মৃত্যু-সংবাদে ক্রুদ্ধ রাবণকে দশানন বলা হইয়াছে। তখন রাবণ ক্রুদ্ধ। সেই জন্য কেহ কেহ অনুমান করেন, রাবণের দশ মুখ এবং কুড়ি বাহুর কথা বাল্মীকি-রচিত রামায়ণে ছিল না, পরবর্ত্তীকালে তাহা সংযোজিত হইয়াছে। এই অনুমান অসঙ্গত নহে। পরবর্ত্তীকালে কথকগণ রাবণের ভীষণত্ব প্রতিপাদনের জন্য ঐরূপ করিয়া থাকিবেন। রাবণ ছিলেন মিশ্রবর্ণ। তাঁহার পিতা ছিলেন বিশ্রবাঃ—নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ, পুলস্ত্যের বংশোদ্ভব। তাঁহার মাতা ছিলেন রাক্ষসী—নাম কৈকসী বা মতান্তরে নিকষা। সেই জন্য রাবণ রাক্ষস হইয়াছিলেন। রাক্ষস শব্দের অর্থ—যাহাদিগের নিকট হইতে হবিঃ বা ঘৃত রক্ষা করিতে হয়। ইহারা যজ্ঞদ্বেষী ও মাংসভোজী ছিল। রাবণও সেইরূপ হইয়াছিলেন। তাঁহার ভয়ে দশ দিক্ কম্পিত হইত; সেই জন্যও তাঁহাকে দশানন বলা হইত। মহাভারতে মার্কণ্ডেয় রাজা যুধিষ্ঠিরকে রাবণের যে জন্মকথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, রাবণের মাতার নাম পুষ্পোৎকটা। পিতা সেই পুলস্ত্য-বংশের বিশ্রবাঃ বলিয়াই কথিত হইয়াছেন। বিশ্রবাঃ ছিলেন ঋষি, সুতরাং আর্য্য। এই মতে বিভীষণ সুদর্শন এবং পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি বিশ্রবার অন্যতমা পত্নী মালিনীর গর্ভজাত, সুতরাং রাবণের বৈমাত্রেয়-ভ্রাতা ছিলেন। মার্কণ্ডেয় রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট রাবণের জন্ম-কথায় তাঁহার দশটি মস্তকের কথা আদৌ উল্লেখ করেন নাই বা ঐ উপলক্ষে একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছিল, এমন কথাও বলেন নাই। ইহাতে সহজেই ধারণা হয়—

(৪) উদ্বহেয়ং ভুজাভ্যাস্তু মেদিনীমম্বরে স্থিতঃ।
আপিবেয়ং সমুদ্রঞ্চ মৃত্যুং হন্যাং রণে স্থিতঃ। অরণ্য, ৫১৩

(৫) ন চাপি রাবণঃ কাঞ্চিৎ মূর্দ্ধ্না স্ত্রীং প্রণমেত হ।
অরণ্য, ৫৫।৩৬

(৬) বিক্ষিপ্তৌ দীর্ঘৌ নিশ্চেষ্টৌ ভুজাঙ্গদবিভূষিতৌ।
লঙ্কাকাণ্ড, ১১১৬

(৭) হতস্য বদনং দৃষ্ট্বা কাচিন্মোহমুপাগমৎ।
কাচিৎ অঙ্কে শিরঃ কৃত্বা রুরোদ মুখমীক্ষতী।
লঙ্কা, ১১২।৯-১০

(৮) রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড, ১১৩ অধ্যায় ৩৫—৩৭ শ্লোক।

জন্মকালে রাবণের ঘাড়ে দশটা মাথা গজায় নাই। আবার পদ্মপুরাণ আলোচনা করিয়া কি দেখিতে পাই? পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে রামচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি অগস্ত্যও রাবণের জন্ম-কথা বলিয়াছেন; কিন্তু তাহাও অনেকটা মহাভারতের বৃত্তান্তেরই অনুরূপ—পার্থক্যের মধ্যে, তাহাতে বলা হইয়াছে—বিশ্রবার ঔরসে, এবং কৈকসীর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ তিন জনেরই জন্ম হইয়াছিল। সেখানেও রাবণ দশমুণ্ড লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, এরূপ কোন কথাই নাই। মার্কণ্ডেয় বলিয়াছিলেন, বিভীষণ সুপুরুষ ও ধার্ম্মিক ছিলেন। কুম্ভকর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ, বলিষ্ঠ, এবং রজনীচর (নিশাচর) হইয়াছিলেন, এ কথা বলিলেও দশানন যে দশটি মাথা লইয়া জন্মিয়াছিলেন, এ কথা তিনি কোথাও বলেন নাই। অগস্ত্যও রামের নিকট অনেক কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু দশানন যে দশটি মুণ্ড লইয়া জন্মিয়াছিলেন, তাহা বলেন নাই।

পক্ষান্তরে, রাবণ যে 'দশগ্রীব' হইয়া জন্মিয়াছিলেন —যে কথা রামায়ণে পরবর্ত্তীকালে সংযোজিত হইয়াছিল, রামায়ণের সেই উত্তরকাণ্ডটা যে পরে রচিত এবং সংযোজিত, তাহা রামায়ণ পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। লঙ্কাকাণ্ড শেষ হইলে সমগ্র রামায়ণপাঠের ফল ও ফলশ্রুতির কথা লিখিত আছে। রাম রাজা হইয়া দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের ১৩০ অধ্যায়ে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, রামচন্দ্র রাজ্যলাভ করিয়া—

পৌণ্ডরিকাশ্বমেধাভ্যাং বাজিমেধেন চাসকৃৎ।
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্যজ্ঞৈরযজৎ পার্থিবাত্মজঃ॥
রাজ্যং দশসহস্রাণি প্রাপ্য বর্ষাণি রাঘবঃ।
দশাশ্বমেধানাজহ্রে সদশ্বান্ ভূরিদক্ষিণান্॥
—৯৪-৯৫ শ্লোক।

রামচন্দ্র পৌণ্ডরিক, অশ্বমেধ এবং অন্যান্য বহুবিধ যজ্ঞ করিয়া দেবগণের তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন। তিনি দশ সহস্র বৎসর রাজ্যপালন করত সদশ্ব এবং ভূরিদক্ষিণা-সম্পন্ন দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এখানে সীতা-বর্জ্জনের কথা নাই, সীতার পাতাল-প্রবেশের কথা নাই, লব-কুশের যুদ্ধের কথা নাই;—অথচ দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা আছে। পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে সীতাবর্জ্জনের কথা আছে, কিন্তু সীতার পাতাল-প্রবেশের কথা নাই। পৌর-জানপদগণ এবং ঋষিগণ রামের সহিত লব-কুশের আকৃতিগত সাদৃশ্য দেখিয়াই সীতাকে নিরপরাধী মনে করিয়া রামকে সীতাগ্রহণে সম্মত করাইয়াছিলেন, এবং সীতাসহ প্রথম অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া পর পর দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন—এ কথা লিখিত আছে। ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে, রামায়ণের উত্তরকাণ্ড পরবর্ত্তী-কালে সংযোজিত হইয়াছে। উত্তর অর্থে পরবর্ত্তী—যথা উত্তরকাল। অর্থাৎ রামায়ণ রচিত হইবার পরবর্ত্তী-কালে উহা সংযোজিত, ইহাও বুঝা যায়। সেই উত্তর-কাণ্ডে কথিত আছে, অগস্ত্য ঋষি রামচন্দ্রকে রাবণের জন্ম-কথা বলিতেছেন। কৈকসী কালে যে সন্তানটি প্রসব করিল, সে সন্তান—

দশগ্রীবং মহাদংষ্ট্রং নীলাঞ্জনচয়োপমম্।
তাম্রোষ্ঠং বিংশতিভুজং মহাস্যং দীপ্তমূর্দ্ধজম্॥

"তাহার দশটি মাথা, দাঁতগুলি ভীষণ, হাত কুড়িখানি, তাহার বর্ণ নীলাঞ্জনের ন্যায়, ওষ্ঠ তাম্রবর্ণ, মুখ ভীষণ, কেশ প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায়।" ইহা পরবর্ত্তীকালের যোজনা। রাবণকে যত ভয়ানক মূর্ত্তিতে চিত্রিত করা যাইতে পারে, তাহাই তখন করা হইয়াছে। উহা প্রামাণিক নহে, অতিরঞ্জিত। লোকের মনে রাবণ সম্বন্ধে বিভীষিকা সঞ্চারের জন্য ঐরূপ বর্ণনার সার্থকতা অস্বীকার করা যায় না। এখানে আরও অনেক কথা আছে—যাহা সাধারণ লোকের মনে বিভীষিকা উৎপাদন করে। সুতরাং উহা অতিরঞ্জন বলিয়া পরিত্যক্ত হইবার যোগ্য। এখন দেখা যাউক, অন্য দিক্ হইতে এ সম্বন্ধে অনুরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় কি না।

জৈনদিগেরও অনেকগুলি পুরাণ আছে; পদ্মপুরাণ তাহাদের অন্যতম। 'পদ্ম' রামচন্দ্রেরই একটি নাম। জৈনগণ রামচন্দ্রকে বিশিষ্ট মহাপুরুষ বলিয়া সম্মান করেন। এই পদ্মপুরাণখানি প্রায় দুই হাজার বৎসর বা তাহার পূর্ব্বেও প্রাকৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে রবিসেনাচার্য্য সংস্কৃত ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন; সুতরাং পুরাণখানি পুরাতন। উহাতে সুগ্রীব, হনুমান, নল, নীল প্রভৃতি বানরদিগের

কথা আছে। কিন্তু তাহাদিগকে পশু বলিয়া বর্ণনা করা হয় নাই,—মানুষ বলিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে। আবার রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ প্রভৃতি রাক্ষসগণকেও ভীষণাকার ও সর্ব্বজীবভক্ষক বলিয়াও বর্ণনা করা হয় নাই। তাহাদিগকে বিদ্যাধর বলা হইয়াছে। ইহাদের এক জন পূর্ব্বপুরুষের নাম 'রাক্ষস' ছিল বলিয়া ইহাদিগকে রাক্ষস বলা হইত। সেই পূর্ব্বপুরুষ রাক্ষসও ছিল না,—মাংসাশীও ছিল না। মুদ্রারাক্ষসে দেখা যায়, রাজা নন্দের এক জন মন্ত্রীর নাম যেমন রাক্ষস ছিল, ইহার নামও সেইরূপ রাক্ষস ছিল। জৈন পদ্ম-পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, রাক্ষসরা হিংস্র ছিল না, কোন জীবকেই কষ্ট দিত না। উহারা বিদ্যাধর, অর্থাৎ মায়া-বিদ্যায় বা ছদ্মবেশধারণে বিশেষ পটু ছিল। (৯) এই পদ্মপুরাণের মতে বানরগণ পুচ্ছধারী শাখামৃগ ছিল না; তাহাদের মুকুটে উষ্ণীষ এবং ধ্বজায় বানর-চিহ্ন ছিল বলিয়া তাহারা বানর নামে অভিহিত হইত। (১০)

এই জৈন পদ্মপুরাণখানি দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে রচিত। উহা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বিবরণ হইতে সংগৃহীত। বিমলাচার্য্য খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ইহা রচনা করিলেও তিনি তাহার বহুকাল পূর্ব্ববর্ত্তী ইতিহাস হইতে ইহা সঙ্কলিত করেন বলিয়াছেন। শ্রীযুত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী রাক্ষস-বানর সম্বন্ধে জৈন পদ্মপুরাণ হইতে এই তথ্যটি প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, তামিল দেশে মক্কল বা মক্কড় বলিয়া একটি সুসভ্য জাতি আছে। ঐ অঞ্চলের অনেক জমিদার মক্কল জাতীয়। মক্কল বা মক্কড়কে মর্কট বানানো কঠিন নহে। সুতরাং রামচন্দ্রের বানর-সৈন্য সুসভ্য মানুষ হইলেও শাখামৃগে পরিণত হইয়াছে। রামায়ণে কোন কোন বিষয় অতিরঞ্জিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু উহার ঐতিহাসিক প্রামাণিকতা নষ্ট হয় নাই। সুষেণ বানরদিগের মধ্যে এক জন বিশিষ্ট চিকিৎসক ছিলেন। নল, নীল সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। নল রাস্তা-ঘাট-সেতু প্রভৃতি নির্ম্মাণে অসাধারণ দক্ষ ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে বিশ্বকর্ম্মার পুত্র বলা হইত। হনুমানের সহিত প্রথম আলাপেই রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন, ঋগ্বেদজ্ঞ, যজুর্ব্বেদজ্ঞ এবং সামবেদজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন কেহই এরূপ ভাষা বলিতে পারে না। ইনি অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু কুত্রাপি একটি অপশব্দ প্রয়োগ করেন নাই; সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, ইনি ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রেও বিশেষ ব্যুৎপন্ন। (১১) ইহা মর্কটের পক্ষে কখনই সম্ভব নহে। অতএব এ কথা দৃঢ়তা সহকারে বলা যাইতে পারে যে, হনুমান পণ্ডিত এবং যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু সুন্দরাকাণ্ডে রাবণ কর্ত্তৃক হনুমানের লাঙ্গুল দগ্ধ করিবার কথা আছে। ইহা সম্ভবতঃ উত্তর-কালে সংযোজিত হইয়াছিল। সাধারণতঃ, রামায়ণ-কথাই কথকদিগের দ্বারা সকল পুরাণ অপেক্ষা অধিক কথিত হইত। কথকরা রসলিপ্সু শ্রোতৃবর্গের কৌতূহলোদ্রেক বা চিত্তাকর্ষণের জন্য রাক্ষস ও বানরের কথা বিশেষ বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। সেই জন্য উহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মহাভারত রামায়ণের ন্যায় নিয়মিত ভাবে কথকদিগের দ্বারা কথিত হইত না। কারণ, মহাভারত অতি বিরাট্ গ্রন্থ। মহাভারতেও রাম-চরিত আছে। উহাতে হনুমান কর্ত্তৃক লঙ্কা-দগ্ধের কথা আছে, কিন্তু হনুমানের লাঙ্গুলে অগ্নিসংযোগের কাহিনী নাই। মহাভারতীয় আখ্যানে কপিগণের লাঙ্গুলের কথারই উল্লেখ নাই। বানর-সৈন্য লম্ফ দিতে বিশেষ পারদর্শী—এ কথা আছে, কিন্তু তাহারা যে শাখামৃগ, এ কথা কোথাও বলা হয় নাই। এমন কি, সীতার অগ্নি-পরীক্ষার কথাও নাই; রামচন্দ্র বায়ুর এবং দশরথের প্রেতাত্মার কথা শুনিয়াই জানকীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন—এই কথাই আছে। রামচন্দ্র অযোধ্যায় আসিয়া দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সে কথাও আছে; কিন্তু সীতার পাতাল-প্রবেশের কথা নাই। সেই জন্য মনে হয়, বানরগণ সভ্য মনুষ্য, এবং জাম্ববানের ভল্লুক-সৈন্যগণ সকলেই মানুষ; বিষ্ণুপুরাণ এবং কূর্ম্মপুরাণে অতি সংক্ষেপে রামের কাহিনী প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাতে হনুমানকে পবন-নন্দন এবং বানর মাত্র বলা হইয়াছে। বানর (বন+রম+ড) অর্থে অরণ্যবাসী। হনুমান যে তির্য্যক্ প্রাণী, সে কথা কোথাও বলা হয় নাই। বিষ্ণুপুরাণ এবং কূর্ম্মপুরাণ অবলম্বন করিয়া কখনও কথকতা হইত না, সেই জন্য উহাতে

---

(৯) জৈনপদ্মপুরাণ, সংস্কৃত অনুবাদ (৫।৩৭৪ শ্লোক)
(১০) ঐ (৬।২১৪)

(১১) রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড (২৮—২৯)

বিশেষ বিস্তৃতি ঘটে নাই; তবে উহাতে প্রদত্ত রাম-চরিত অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

এই রাক্ষস ও বানরদিগের সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকারই অনুমান করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তামিল দেশের এক জাতীয় লোক মক্কল। তাহারা সুসভ্য। পূর্ব্বকালে এই জাতি মধ্য-ভারতের পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র দক্ষিণাপথে বাস করিত। ঐ প্রদেশ দণ্ডকারণ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। রামচন্দ্র ইহাদের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া রাবণের লঙ্কাপুরী অবরুদ্ধ করেন। দক্ষিণাপথের মক্কল জাতি সভ্যতায় আর্য্য জাতি অপেক্ষা হীন ছিলেন না, এখনও নাই। ইঁহাদেরই পূর্ব্ব-পুরুষদের সাহায্যে রামচন্দ্র লঙ্কা-বিজয় এবং সীতা-উদ্ধার করিয়াছিলেন। হনুমান প্রভৃতি দেবাংশসম্ভূত বীরগণ ইঁহাদেরই পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। ইহা অবশ্য অনুমান মাত্র। বানরসম্প্রদায়ভুক্ত মানব-জাতি বিশেষ সুসভ্য ছিলেন, ইহার অতিরিক্ত আর কিছু বলা সম্ভব নহে।

এখন জিজ্ঞাসা, রাক্ষস কাহারা? জৈন পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে যে, রাক্ষস নামক এক ব্যক্তির বংশ-ধররাই রাক্ষস নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু হিন্দুর পুরাণগুলির মত অন্যরূপ। হিন্দু পুরাণসমূহ এক-বাক্যে বলিতেছেন, রাবণ পুলস্ত্যবংশীয় বিশ্রবার পুত্র হইলেও রাক্ষসী কৈকসীর গর্ভজাত বলিয়া তিনি রাক্ষস-চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই অধিক পরিমাণে লাভ করিয়াছিলেন। রাক্ষস নামক ব্যক্তির বংশধর আসল রাক্ষস কাহারা ছিল, তাহাদের বংশধর কেহ কোথাও এখনও আছেন কি না, তাহা অজ্ঞাত। বায়ুপুরাণে দেখা যায়, দক্ষ-কন্যার গর্ভে কশ্যপের ঔরসে যক্ষ ও রক্ষ নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়। রাক্ষসগণ রক্ষেরই বংশধর। সুতরাং উহারা অনার্য্য নহে, তবে আচারভ্রষ্ট। কেহ কেহ বলেন, দাক্ষিণাত্যের গন্দ জাতির অন্তর্ব্বর্ত্তী এক উপজাতি কুই সেই রাক্ষসদিগের বংশধর। রামায়ণ-বর্ণিত রাক্ষস-দিগের রীতি-নীতির সহিত উহাদের কতকগুলি রীতি-নীতির বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। রাক্ষসরা নানারূপ ছদ্মবেশ ধারণ করিত। তাহারা কামরূপী ছিল। কুইরা এ-কালেও নানাপ্রকার মুখোস প্রভৃতির সাহায্যে ছদ্মবেশ ধারণ করে। এরূপও শুনিতে পাওয়া যায়, তাহারা পরিচ্ছদ-ধারণ-কৌশলে পশু-পক্ষীর আকৃতির অনুকরণ করিতে পারে। কিন্তু কেবল কুই উপজাতিই সেরূপ করে না, অন্যান্য উপজাতিও ঐ কার্য্যে অভ্যস্ত। রাক্ষসরা যথেচ্ছা নারীহরণ করিয়া তাহাদিগকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিত। লঙ্কায় রাবণ রাজা সীতাকে সে কথা বলিয়াছিলেন। হনুমান রাবণের শুদ্ধান্তে নানা জাতির নারী দেখিয়াছিল। এই ভাবে বলপ্রয়োগে স্ত্রী আহরণের ব্যবস্থাও নানা জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। রাবণ প্রতারণার সাহায্যে অর্থাৎ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া রামের আরণ্যকুটীর হইতে অসহায়া সীতাকে হরণ করিয়াছিলেন; ইহা রাক্ষস-প্রথাসম্মত নহে। রাবণ ঐরূপ অসঙ্গত কার্য্য করায় কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি তাঁহাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও তাঁহার কার্য্যের নিন্দা করিয়াছিলেন। রাবণ প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ না শুনিয়া ঐ প্রকার গর্হিত কার্য্য করায় মন্দোদরীও যথেষ্ট বিলাপ করিয়াছিলেন। রাবণের এই প্রকার কাপুরুষোচিত কার্য্যে রাক্ষস জাতি যে অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, কুম্ভকর্ণের বিদ্রূপই তাহার প্রমাণ।

রাবণ কপটতাবলম্বনে সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাওয়ার পর যখন সীতা তাঁহার অঙ্কশায়িনী হইবার প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন, রাবণ তখন কি করিবেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাসভাজন জনগণের অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ ধর্ম্মনীতির সম্মান লঙ্ঘন করিয়া রাবণের চিত্তরঞ্জন মানসে তাঁহাকে কুক্কুটের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে পরামর্শ প্রদান করিলেও রাবণ তাহাতে সম্মত হইতে পারেন নাই। তিনি ব্রহ্মার বা নল-কুবরের শাপে বলপ্রয়োগে সাহসী হন নাই। আসল কথা, ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে, কপটতার সাহায্যে সীতাকে হরণ করায় লোকমত তাঁহার প্রতিকূল হইয়াছিল; তাহার উপর সাধ্বীর প্রতি বলপ্রয়োগ করিয়া তিনি রাক্ষস-সমাজের বিরাগভাজন হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করেন নাই। ইহা অনুমান বটে—কিন্তু এই অনুমানের অনুকূলে সুস্পষ্ট প্রমাণ রামায়ণে, মহাভারতে, এবং অন্যান্য পুরাণে বিদ্যমান। রাবণ সীতাকে স্বমতানুবর্ত্তিনী করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে তাঁহার প্রাসাদ হইতে দূরবর্ত্তী অশোক-কাননে অবরুদ্ধ করেন; সীতাও তখন স্বেচ্ছাচারী

রাবণের ভয়ে ভীতা হইয়াছিলেন। সেই সময় ত্রিজটা রাক্ষসী সীতার কানে কানে বলে,—ভয় নাই; অবিন্ধ্য নামক ধার্ম্মিক এবং বৃদ্ধ রাক্ষস তাঁহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছেন।(১২) চেটিরা যখন অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিত, তখন ত্রিজটাই তাহাদিগকে তিরস্কার করিত, এবং সীতাকে আশ্বাস দিত। ইহা ভিন্ন বিভীষণের পত্নী সরমাও সীতাকে সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিতেন। ইঁহারা মধ্যে মধ্যে সীতার উদ্ধারের জন্য রামের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে সংবাদ দিতেন। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, নারীহরণে রাক্ষস-সমাজের অনুমোদন থাকিলেও নারী-ধর্ষণ রাক্ষসী-নীতির অনুমোদিত ছিল না।

সীতার অগ্নি-পরীক্ষা রামায়ণের একটি অতি-প্রাকৃত ব্যাপার; কিন্তু মহাভারতে ইহার উল্লেখ নাই। অবিন্ধ্য সীতাকে রামের নিকট আনিয়াছিলেন। রাম বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন, সীতার পবিত্রতা রাবণ নষ্ট করিতে পারেন নাই; তখন তিনি সকলের সম্মতিক্রমেই পতিব্রতা পত্নীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা সকলেই জানি, উৎকট পরীক্ষাকেই অগ্নি-পরীক্ষা বলে। সেই সময় ব্রহ্মা প্রভৃতি সাক্ষ্য দিয়াছিলেন সীতা পাপশূন্যা, ইহার অর্থ—প্রামাণ্য ও সম্মানভাজন লোকের কথা শুনিয়া এবং বিশেষ অনুসন্ধানের পর রাম জানকীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, ইহার অর্থ—যাঁহাদের কথা আপ্তবাক্য, বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া রাম সীতাকে গ্রহণ করেন। অবিন্ধ্য ও ত্রিজটা প্রভৃতিকে রাম বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন।(১৩) কারণ, তাঁহারা সীতাকে রক্ষা করিয়াছিলেন; এখানে অতি-প্রাকৃত কিছুই নাই। জনসাধারণের মনে বিস্ময় ও বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যই রামায়ণে কথাগুলি ঐরূপ অতিরঞ্জিত করিয়া বলা হইয়াছে, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

সীতার পাতাল-প্রবেশের কথা রামায়ণের যথাস্থানে বর্ণিত হয় নাই; রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ১১০ অধ্যায়ে সীতার পাতাল-প্রবেশের কথা বর্ণিত হইয়াছে। উহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে; কারণ, মহাভারতে, পদ্মপুরাণে, এবং অন্যান্য স্থানেও উহার উল্লেখ নাই। পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে সীতা-বর্জ্জনের কথা থাকিলেও সীতার পাতাল-প্রবেশের কথা নাই; বরং রামচন্দ্র সীতার সহিত দশটি ভূরিদক্ষিণা-সম্পন্ন অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, ইহার উল্লেখ আছে। রামচন্দ্র দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, ইহা রামায়ণেও বলা হইয়াছে।(১৪) এখন জিজ্ঞাস্য, রামের প্রথম অশ্বমেধ যজ্ঞেই সীতার পাতাল-প্রবেশ করা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে পরবর্ত্তী অন্য নয়টি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন হইতে পারিত কি? শেষ অশ্বমেধ যজ্ঞে সীতার পাতাল-প্রবেশ করা কদাচ সম্ভব হইতে পারে না। এ অবস্থায় পাতাল-প্রবেশের কাহিনী প্রক্ষিপ্ত ভিন্ন আর কি মনে করা যাইতে পারে?

সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে সকল ব্যাপার বিশ্বাসের অযোগ্য, তাহা পরে রামায়ণে সংযোজিত হইয়াছে। রাবণের দশটা মাথাও ছিল না,—বানররা এবং ভল্লুকরাও পশু ছিল না। শেষকালে লোক উহাদিগকে পশু বলিয়াই ধারণা করিয়াছে। কথক মহাশয়রা—যাঁহারা শ্রোতৃবর্গকে বিস্ময়াভিভূত করিবার জন্য হনুমানের লোমে লোমে পর্ব্বত বাঁধিয়া লইয়া-যাইবার কাহিনী কীর্ত্তন করিতেন, তাঁহারা ঐতিহাসিক তথ্য অবিকৃত রাখিবার জন্য যে বিন্দুমাত্র উৎসুক ছিলেন না, এ কথার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। তাঁহারা বিচারমূঢ় এবং উৎকট কল্পনাকুশল শ্রোতৃবর্গের চিত্তরঞ্জনেরই প্রয়াসী ছিলেন; সেই জন্যই রামায়ণ-বর্ণিত কয়েকটি বিষয়ের অধিক বিকৃতি সাধিত হইয়াছে। কিন্তু উহাদের মূল কথাগুলি যে ঐতিহাসিক সত্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রায় সকল পুরাণেই রামায়ণের কথা অল্প-বিস্তর আলোচিত হইয়াছে; উহার মূল আখ্যায়িকা সম্পূর্ণ অভিন্ন। এ অবস্থায় উহা কেবল কল্পনাপ্রসূত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া ইতিহাসের পক্ষে ক্ষতিকর। এই জন্য উহা সমর্থনযোগ্য নহে। রাম রাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, ইহা সংক্ষিপ্ত এবং বিস্তৃত ভাবে কাব্যে ও পুরাণে বর্ণিত আছে; কিন্তু সীতার পাতাল-প্রবেশের কাহিনী

(১২) মহাভারত, বনপর্ব্ব।
(১৩) মহাভারত, বনপর্ব্ব, ২৯০ অধ্যায়।

(১৪) দশাশ্বমেধানাজহ্রে সদশ্বান্ ভূরিদক্ষিণান্। রামায়ণ, লঙ্কা, ১৩০।৯৫

রামায়ণের উত্তরকাণ্ড ভিন্ন অন্ত কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাক্ষস এবং বানরদিগের যেরূপ আচার-ব্যবহারের কথা রামায়ণে বর্ণিত আছে, তাহা আধুনিক দক্ষিণাপথের অনেক জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। বানর জাতিকে এখন কেহ কেহ শবর জাতির পূর্ব্বজ মনে করেন। কারণ, তাহাদের আচার-ব্যবহারের সহিত বানরদিগের অনেক আচার-ব্যবহারের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়; তবে বালি-সুগ্রীবের আমলে বানর জাতি যেরূপ সভ্য ও উন্নত ছিল, অধুনা শবর জাতি যে সেরূপ উন্নত নহে, তাহা অনেকেরই সুবিদিত। তামিল ভাষা-ভাষী মল্লল বা মক্কড় জাতি অনেকটা সভ্য। কিষ্কিন্ধ্যা এই জাতির প্রধান বাসস্থান ছিল। উহা মধ্য-ভারতের অরণ্য ও পর্ব্বতসঙ্কুল দণ্ডকারণ্যের মধ্যেই অবস্থিত ছিল। রাক্ষসদিগকে কেহ কেহ মুণ্ডারী জাতি বলিয়াও মনে করেন।

আমরা আর অধিক প্রমাণ উদ্ধৃত না করিলেও আশা করি, বর্ত্তমান আলোচনা হইতেই পাঠকগণের ধারণা হইবে যে, রামায়ণে ইতিহাসের যে সকল উপাদান আছে, উহা অগ্রাহ্য বা পরিত্যাজ্য নহে। তবে পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী যে কষ্টস্বীকার করিয়া এই সত্য উদ্ধার করিবেন, এবং রামায়ণকে পুরাবৃত্তের সম্মান প্রদান করিবেন, এরূপ আশা করা যায় না; পল্লব গ্রহণেই তাঁহারা পরিতৃপ্ত।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

অতিথি

যদিও আমি আমার গৃহে নৃপতি—
পেয়েছি ঘরে বিশেষ প্রতিপত্তি,
তবুও তুমি যখন এলে বেড়াতে
বন্দী হলেম আমিই ঘরে সত্যি !

আসিলে তুমি উচ্চ হাসি হাসিয়া,
নাড়িয়া চুল, উড়ায়ে বায়ে অঞ্চল,
জুড়িয়া দিলে আমোদ কত বাড়ীতে,—
কাকীমাদের সঙ্গে হয়ে' চঞ্চল !

পাখীটা ছিল আমার বসে' খাঁচাতে,—
যেখানে যাওয়া ছিল না কারো সাধ্য,—
সেথায় গেল তোমার আদর উথলি,
ছোলা ও ছাতুর করিয়া এলে শ্রাদ্ধ !

পড়ছি আমি পাশের পড়া যতনে,
সেখানে এলে ত্যজিয়া যত লজ্জা,
চলিলে লয়ে' আমার গানের খাতাটি
খুলিয়া গেলে দু'ফাল করে' দরজা !

পাশের ঘরে ধরিলে গান চেঁচায়ে,
যাহাতে আমার জ্বলিয়া গেল পিত্ত,
কুকুরটারে ছাড়িয়া দিলে উঠানে
জুড়িয়া দিলে ভায়ের সাথে নৃত্য !

খাইয়া গেলে খাবার সুখে কত কি,
আমারে তুমি করিলে না'ক গ্রাহ্য,
আমি তো শুধু নামেই র'লাম নৃপতি,
অতিথি হয়ে' তুমিই পেলে রাজ্য !

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়
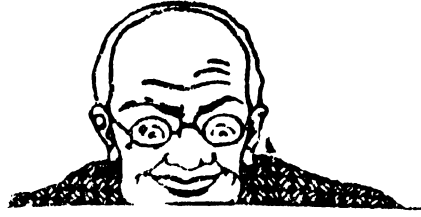
পিটুনী মাষ্টার

(সেকালের পল্লীকথা)

'পিউনিটিভ' পুলিশ একালের পাঠক সমাজে 'পিটুনী পুলিশ' নামে অভিহিত হইলেও আমি সেকালের গ্রাম্য ইংরেজী স্কুলের যে মাষ্টারটিকে 'পিটুনী মাষ্টার' নামে পরিচিত করিতেছি—তিনি অকারণে বা সামান্য কারণে স্কুলের ছেলেদের এরূপ ভীষণ প্রহার করিতেন যে, আমরা তাঁহাকে পুলিশের মতই ভয় করিতাম; একালের মাষ্টারদের সাধ্য কি সব্যসাচী হইয়া তাঁহারা সে ভাবে বেত্র চালনা করেন! ছেলেদের পিঠে 'কচার ডাল' নামক আয়ুধের শক্তি পরীক্ষা করিতে করিতে যখন তাঁহার দক্ষিণ হস্ত অবসন্ন হইত, তখন তিনি বাম হস্তে কেঁচে গণ্ডূষ করিতেন; যেহেতু তাঁহার উভয় হস্তেরই সঞ্চালন ও উত্থান-পতনের দক্ষতা সমান ছিল। সেকালের পাঠশালার খঞ্জ গুরুমশায় সীতানাথ অধিকারীর বেতকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইয়া আমরা ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার পর বেতের আস্বাদন ভুলিয়াই গিয়াছিলাম; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে স্কুলে সহসা যে নূতন হেড্-মাষ্টারটির আবির্ভাব হইল—দেখা গেল, বেত্র-প্রয়োগে তিনি পাঠশালার গুরুমশায় 'সীতে খোঁড়ার'ও গুরু হইবার যোগ্য!

আমার প্রতিবেশী ও সহপাঠী মুনুর (মনোমোহন অধিকারী) অনেক মনোহর গুণের কথাই পূর্ব্বে লিখিয়াছি। তাহাদের বাসগ্রামে একঘর জমিদার ছিলেন; তাঁহাদেরই একটি জামাই যগু ঘোষ (যোগেশ কি যোগীন—এতকাল পরে তাহা স্মরণ নাই) বি-এ পাশ করিয়া চাকরীর উমেদারী করিতে করিতে স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়-পরিচালিত 'এডুকেশন গেজেটে' কর্ম্মখালির একটা বিজ্ঞাপন দেখিয়া জানিতে পারেন—আমাদের গ্রামের ইংরেজী স্কুলের হেড্-মাষ্টারের চাকরী খালি আছে। তিনি এই সুযোগ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া শ্বশুরবাড়ী আসিলেন, এবং স্কুলের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট ঐ চাকরীর জন্য দরখাস্ত দাখিল করিলেন। সেকালে একালের মত হাটে-মাঠে বি-এ, এম-এ দেখিতে পাওয়া যাইত না; বরং কেহ বি-এ, এম-এ পাশ করিয়া পল্লীগ্রামে আসিলে, তাঁহার কাঁধে আর দুইখানি হাত গজাইয়াছে কি না, তাহা দেখিবার জন্য ভদ্র পল্লীবাসীরা সোৎসুক চিত্তে বহু দূর হইতে তাঁহার অনুসরণ করিতেন! আমার স্মরণ আছে, কৃষ্ণনগর কলেজের বিজ্ঞানাধ্যাপক আমার পিতৃবন্ধু শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সরকারের বৃত্তি লইয়া বিলাতের কৃষিকলেজ হইতে পাশ করিয়া যখন বাড়ী আসেন—বোধ হয় ১৮৯০ খৃষ্টাব্দেরও পূর্ব্বে,—তখন বিলাত হইতে তিনি 'চাষা' হইয়া আসিয়াছেন শুনিয়া 'বিলেত-ফেরত চাষা' কি রকম দেখিবার জন্য বিস্তর লোক তাঁহাদের অট্টালিকার আঙ্গিনা পূর্ণ করিয়াছিল; কিন্তু তাহারা ধুতি চাদর-পরা একটি নিরীহ ভদ্রলোক দেখিয়া অত্যন্ত হতাশ হইয়াছিল। গ্রামস্থ কাশ্যপ-পাড়ার মাতব্বর চাষা সাধু মণ্ডল ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, "ওঃ, কুতায় বাবুর বিলিতী নাঙ্গোল, আর কুতায় বা মাথার বিলিতী মাথাল?"—তাঁহাদের চাকর মণিরাম তাহাকে খুসী করিবার জন্য তাঁহার একটা 'হ্যাট্' দেখাইয়া বলিয়াছিল—'এই ত মাথাল!' সাধু বলিয়াছিল, "ঐ সায়েবী মাথাল তো এ দেশেই পাওয়া যায়, ও মাথায় দিয়ে চাষ করতে বাবু বিলেত গেলেন কেন? এ দেশে পেতেন না?"—কিন্তু তাঁহার সেই শিক্ষা নিস্ফল হইয়াছিল; ফৌজ-দারী মামলার রায় লিখিতে লিখিতে তাঁহার 'তাঁতিকুল বৈষ্ণবকুল' উভয়ই নষ্ট হইয়াছিল। স্বর্গীয় এ, কে, রায় প্রভৃতি অনেক বিলেত-ফেরত 'চাষার' পরিণামই ঐরূপ হইয়াছিল; কেবল ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ভাগ্যে

সোণা ফলিয়াছিল—সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন বলিয়া।

সেকালে বি-এ, এম-এ এতই দুর্লভ ছিল যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হদ্দা উত্তরে নেপাল হইতে দক্ষিণে সিংহল দ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিলেও সংবৎসরে তিন শতাধিক পরীক্ষার্থীকে বি-এ পাশ করিতে দেখিতাম না! সুতরাং সেই কালে যণ্ড ঘোষকে আমাদের গ্রামের স্কুলে ৫০ টাকা বেতনে হেড্-মাষ্টার নিযুক্ত হইতে বিশেষ কোন যোগাড়যন্ত্র করিতে হয় নাই। একালে এক জন এম-এ এই পদে প্রতিষ্টিত আছেন; তাঁহার বেতন এখন এক শত টাকা। কিন্তু সেকালের সেই ৫০ টাকা একালের দুই শত টাকা অপেক্ষাও অধিক প্রার্থনীয় ছিল। প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে—বাল্যকালে দেখিয়াছি, ঠাকুরদাদা গ্রামস্থ কালিবাজারের মাধব চাটুয্যের (খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মাতামহ) দোকান হইতে এক এক মণ সরু চাউল দুই টাকায় কিনিয়া আনিতেন। সেই রকম ঢেঁকি-ছাঁটা চাউল এখন সাত টাকাতেও পাওয়া যাইতেছে না! আমাদের গ্রামের অল্প দূরবর্ত্তী মঠমুড়ার কোন ঘৃত-ব্যবসায়ী টাট্‌কা গাওয়া ঘি আনিয়া এক টাকায় স-দুই সের বিক্রয় করিলে ঠাকুরদাদা আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ঘিএর দর দিন-দিনই চড়ে যাচ্ছে, ঘি কেনা আর পুষিয়ে উঠবে না। শর্ষের তেল টাকায় বার সের কিনেছি; এখন তাই টাকায় পাঁচ সের কিনতে হচ্ছে!" ঠাকুরদাদার যৌবনকালে তাঁহার ক্ষৌরকার মধু নাপিত এক দিন তাঁহাকে কামাইতে-বসিয়া গাল কাটিয়া রক্তপাত করিলে ঠাকুরদাদা তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। মধু কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিয়াছিল, "কর্ত্তা, চালের মণ পাঁচ সিকে থেকে এখন সাত সিকেয় চড়লো, কি করে সংসার চালাই, এই ভাবনায় কি হাত ঠিক থাকে?"—মধু নাপিত এত কাল বাঁচিয়া থাকিলে সংসার প্রতিপালনের দুশ্চিন্তায় লোকের গলায় বোধ হয় ক্ষুর চালাইত!

সেকালের অন্যান্য কথার আলোচনায় বক্তব্য বিষয় হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছি; এবার মূল প্রসঙ্গের অনুসরণ করি।

যণ্ড ঘোষ মহাশয় বেত হাতে লইয়া আমাদের স্কুলে মাষ্টারী করিতে আসিলেন। মুনুর পিঠেই তাঁহার বেতের প্রথম পরীক্ষা চলিল। তাহার কারণ খুলিয়া বলিতে হইতেছে। মুনু তাঁহার বেতের আস্বাদন লাভ করিয়া বলিয়াছিল, সেই গোপনন্দনকে সে যদি সায়েস্তা করিতে না পারে—তাহা হইলে সে 'অদিকিরী'ই নয়।

মুনুদের বাসায় কোন পাচক-ব্রাহ্মণ ছিল না; তাহাদের একটি প্রৌঢ়া বিধবা আত্মীয়া বাসায় থাকিয়া পাচিকার কার্য্য করিতেন। তখন পর্য্যন্ত কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে বা বাসায় পাচক-ব্রাহ্মণ নিয়োগের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। মুনুর বাবা দ্বারী অধিকারী মহাশয় মক্কেল বিদায় করিয়া কিছু অধিক বেলায় স্নানাহার করিতেন; তাহার পর আদালতে যাইতেন। এ জন্য তাঁহার পাচিকাও রন্ধনাদি কার্য্যে বিলম্ব করিতেন। মুনুকে যে তাড়াতাড়ি আহার শেষ করিয়া বেলা সাড়ে-দশটার মধ্যে স্কুলে যাইতে হইবে—সে দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না, এবং মুনুর বাবাও এ জন্য কোন দিন পাচিকাকে সতর্ক করেন নাই; সুতরাং স্কুলে যাইতে মুনুর প্রত্যহই বিলম্ব হইত! কোন দিনও সে বেলা প্রায় সাড়ে-এগারটার পূর্ব্বে ক্লাশে উপস্থিত হইতে পারিত না। স্কুলে যাইতে প্রত্যহই তাহার এইরূপ বিলম্ব হওয়ায় তাহাকে শাস্তি পাইতে হইত, এবং শাস্তি পাইলেও সে কোন দিন এই ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করিত না। মাষ্টার মহাশয় তাহাকে দুই-এক ঘণ্টা দাঁড় করাইয়া রাখিতেন। কোন কোন দিন তাহাকে বেঞ্চির উপর হাঁটু-গাড়িয়া বসিতে হইত ('নীল ডাউন'); কিন্তু তাহাতেও তাহার ত্রুটি সংশোধিত না হওয়ায় বেত্রাঘাত আরম্ভ হইল। মুনু জিহ্বা প্রসারিত করিয়া লালা-বর্ষণ করিতে করিতে বুকে, পিঠে, হাতে, মাথায় প্রচণ্ড প্রহার সহ্য করিত; কখন কখন দেহ বক্র করিয়া প্রসারিত হস্তে উদ্যত বেতের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টায় নৃত্য করিত। আঘাতের পর আঘাতে তাহার করতল ফুলিয়া উঠিত। সে হাসিত।

প্রতিকারের অন্য কোন উপায় না দেখিয়া মুনু দুই-এক দিন বেলা দশটার আগেই বেড়াইতে বেড়াইতে স্কুলে আসিয়া দেখিতে পাইল—স্কুলের চাকর বৃদ্ধ রামলাল ঘোষ স্কুলের দ্বারের তালা খুলিয়া রাখিয়া—হয় মাষ্টার

মশায়দের জন্য অদূরবর্ত্তী বাজারে তামাক আনিতে গিয়াছে, কিম্বা বাজার হইতে মাছ-তরকারী কিনিয়া বাড়ীতে রাখিতে গিয়াছে। কোন ছাত্রই তত সকালে স্কুলে আসে নাই দেখিয়া মুনু একখান চেয়ার টানিয়া ঘড়ির নীচে লইয়া গেল, এবং তাহার উপর একখান টুল রাখিয়া সেই টুলে উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর ঘড়ির ডালা খুলিয়া তাহার কাঁটা এক ঘণ্টা পিছাইয়া দিল।

কিন্তু তাহার এই কৌশলে কোন ফল হইল না; সকলেই বুঝিতে পারিল, ইহা মুনুরই কীর্ত্তি! বেলা এগারটার সময় দশটা বাজিতেছে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। সন্দেহক্রমে মুনুকে ধরা হইলে সে অপরাধ স্বীকার করিল না; বলিল, "রামলাল স্কুলের দুয়ার খুলিয়া পাহারায় ছিল, আমি ঘড়িতে হাত দিলে সে কি তাহা দেখিতে পাইত না?" রামলাল ঘোষও স্কুলের দ্বার খুলিয়া-রাখিয়া বাড়ীর জন্য বাজার করিতে গিয়াছিল—এ কথা স্বীকার করিল না। কিন্তু অবশেষে এক দিন মুনু হাতে হাতে ধরা পড়িল। হেড্-মাষ্টার সে দিন তাহাকে বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া বেঞ্চির উপর দাঁড় করাইয়া দিলেন।

কিন্তু এইরূপ শাস্তি পাইয়াও মুনুর উৎসাহ শিথিল হইল না। সে রামগোপাল পণ্ডিতকে বলিল, তাঁহারা সখের থিয়েটারে 'হরিশ্চন্দ্র নাটক' অভিনয় করিবেন; তাঁহারা যদি তাহাকে 'খগা পাগলার' পার্ট দিয়া অভিনয় করিবার সুযোগ দান করেন, তাহা হইলে সে আর কোন দিন স্কুলের ঘড়ি স্পর্শ করিবে না, এবং ঠিক সময়েই স্কুলে আসিবে। রামগোপাল বাবু মুনুকে ভাল বাসিতেন।

এই সময় গ্রামের সম্ভ্রান্ত অধিবাসীরা সখের থিয়েটারে স্বর্গীয় কবি ও নাট্যকার মনোমোহন বসুর 'হরিশ্চন্দ্র নাটক' অভিনয়ের জন্য মহলা দিতেছিলেন; স্থির হইয়াছিল—কোজাগর লক্ষ্মীপূজার রাত্রিতে স্থানীয় আদালতের উকিল স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে উহা অভিনীত হইবে। ইংরেজী স্কুলের একাধিক শিক্ষক এই নাটকের অভিনয়ে যোগদান করেন। আমাদের স্কুলে এই সময় যে শিক্ষক উচ্চ-শ্রেণীগুলিতে বঙ্গ-সাহিত্যে শিক্ষাদান করিতেন—তাঁহারই নাম ছিল রামগোপাল রায়। গৌরবর্ণ, সুপুরুষ; বলিষ্ঠদেহ, মুখে কৃষ্ণবর্ণ নিবিড় দাড়ি-গোঁফ, তাঁহার একটি চক্ষু কুঞ্চিত, তাহা তিনি সম্পূর্ণ খুলিতে পারিতেন না; সেই চক্ষুতে ছানি-পড়ায় তিনি তাহাতে দেখিতেও পাইতেন না; এ জন্য গ্রামের অনেক লোক তাঁহাকে 'কাণা রামগোপাল' বলিত। কিন্তু স্কুলের ছাত্ররা তাঁহাকে যেমন ভক্তি করিত, সেইরূপ ভয়ও করিত; অথচ তিনি ছাত্র-শাসনের জন্য বেত্র ব্যবহার করিতেন না। তিনি ছাত্রগণের হৃদয়ে স্বদেশপ্রেম সঞ্চারের জন্য স্বর্গীয় লেখক রজনীকান্ত গুপ্তের রচিত উদ্দীপনাপূর্ণ প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া বুঝাইয়া দিতেন, এবং টডের রাজস্থানের অনুবাদ পাঠ করিয়া শুনাইতেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর সতেজ ও সুমিষ্ট ছিল, এবং বর্ণনভঙ্গি এমন মনোহর ছিল যে, সহজেই আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট হইত। প্রতিদিন স্কুলের ছুটীর পূর্ব্বে তিনি বয়স্ক ছাত্রগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড়-করাইয়া কবিবর হেমচন্দ্রের কবিতাবলী হইতে 'ভারত-ভিক্ষা', 'ভারত-সঙ্গীত' প্রভৃতি কবিতা আবৃত্তি করাইতেন; এতদ্ভিন্ন, 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়?' প্রভৃতি কবিতা, 'কত কাল পরে বল ভারত রে, দুঃখ-সাগর সাঁতারি পার হবে?' প্রভৃতি জাতীয় সঙ্গীত আমাদিগকে মুখস্থ করিতে হইত। প্রথম জীবনের এই নব ভাবের উদ্দীপনার কথা এত কাল পরে এই বার্দ্ধক্যেও ভুলিতে পারি নাই; অথচ বহু পরবর্ত্তী স্বদেশী যুগের অগ্নিমন্ত্র-প্রচারের কাহিনী তখন স্বপ্নেও কাহারও মনে উদিত হয় নাই। আজ আমাদের তরুণের দল সে সব ছাড়িয়া গায়িতেছে,—

"শেফালি তোমার আঁচলখানি বিছাও শারদ প্রাতে!"

'হরিশ্চন্দ্র নাটকের' অভিনয়ে রামগোপাল পণ্ডিত মহাশয় বিশ্বামিত্রের ভূমিকায় অভিনয়-কৌশল প্রদর্শন করিয়া যে তৃপ্তিদান করিয়াছিলেন, যৌবনে কলিকাতার কোন রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ে সেরূপ তৃপ্তি পাই নাই, এবং তাহা মনকে সে ভাবে আকৃষ্ট করিতেও পারে নাই। স্কুলের নিম্নশ্রেণীর শিক্ষক পণ্ডিত গঙ্গাবিষ্ণু ভট্টাচার্য্য মহারাণী শৈব্যার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্থানীয় আদালতের প্রতিষ্ঠাপন্ন উকীল স্বর্গীয় জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রাজা হরিশ্চন্দ্রের ভূমিকায় অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। স্কুলের নিম্নশ্রেণীর ছাত্র—রামনারায়ণ দত্ত নামক

একটি বালক রোহিতাশ্বের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিল। মুনু 'খগা-পাগলা' সাজিতে পারে নাই, এ জন্য তাহার দুঃখের সীমা ছিল না।—এই সকল অভিনেতার কেহই জীবিত নাই; কেবল সেই আট বৎসরের বালক রাজপুত্র 'রোহিতাশ্বকে' কিছু দিন পূর্ব্বে আমাদের গ্রামের কালি-বাজারে বসিয়া আলু বিক্রয় করিতে দেখিয়াছিলাম; তখন সে বৃদ্ধ, কুব্জ, বিগলিত-দন্ত, এবং শুভ্রকেশ,—জীবন-সায়াহ্নে শেষ-ডাকের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে পূর্ব্বাকাশে সায়ংকালে হেলির ধূমকেতু উদিত হইতেছিল, তাহার সুবিশাল দীর্ঘ-পুচ্ছ মধ্যগগন পর্য্যন্ত প্রসারিত! তাহা দেখিয়া গ্রামস্থ বহু ব্যক্তি সম্মিলিত হইয়া গ্রাম্য বাজারের কোন কাপড়ের দোকানের গোমস্তা রামব্রহ্ম গণ্ডকের নেতৃত্বে যে বাউলের দল গঠন করে, স্কুলের উচ্চ-শ্রেণীর কোন কোন ছাত্রও সেই দলে যোগদান করিয়াছিল। তাহারা সকলে বাউল সাজিয়া, নানা বর্ণের বস্ত্রখণ্ডে তালি-দেওয়া আলুখেল্লায় দেহ আবৃত করিয়া, খঞ্জনী ও 'গাবগুবাগুব' (গোপীযন্ত্র) সহযোগে উচ্চৈঃস্বরে গান গায়িতে গায়িতে—গ্রামের বিভিন্ন পথ ঘুরিয়া, কালিবাজারের পূর্ব্বপ্রান্তে প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরের সম্মুখে আসিয়া নাচিতে নাচিতে সমস্বরে গায়িতে আরম্ভ করিত,—

"দিবা-নিশি মরি ভেবে ও মা শিবে!
উঠ্‌লো পূবে লম্বা তারা।
জরু-গরু, শিষ্য-গুরু, মোটা-সরু—
সবই যে মা যাবে মারা!
টাকার গৌরব, মানের সৌরভ,
দিন-দুনিয়া হবে সারা—
হবে সব লণ্ড-ভণ্ড, কি কুকাণ্ড
শমনের আস্‌ছে তাড়া!
তারার ল্যাজ লম্বা ভারী, সন্দো করি—
হরি হরি বল্ রে তোরা।"

কিন্তু এই সকল উদ্দীপনার মধ্যেও মুনু লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল না। স্কুলের ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা পিছাইয়া দিয়াও যখন কোন ফল হইল না, এবং সন্দেহক্রমে তাহারই পিঠে ক্রমাগত মুষলধারে বেত্র বর্ষিত হইতে লাগিল, তখন সে তাহার সকল বিপদের মূল স্কুলের ঘড়িটাকেই বিসর্জ্জন দেওয়ার সঙ্কল্প করিল।

শনিবারে 'হাফ্ ইস্কুল।'—বেলা দেড়টায় স্কুলের ছুটী হয়। এক শনিবারে ছুটীর পর মুনু তাহার পুস্তকাদি লইয়া আমাদের সঙ্গেই স্কুল হইতে বাসায় চলিল। স্কুলের নিকটেই তাহাদের বাসা—তিন-চার মিনিটের পথ। স্কুলের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হইতে একটা সঙ্কীর্ণ গলি-পথ ছিল; সেই গলিটা দক্ষিণ দিকে সোজা আসিয়া তাহাদের জামগাছ-তলার পথের সঙ্গে মিশিয়াছিল। সেই গলির দুই দিকেই চিতা ও জামাল-কোটার বেড়া। সেই গলি দিয়া কদাচিৎ কোন কোন পল্লীবাসী যাতায়াত করিত। মুনু সদর রাস্তা দিয়া প্রকাশ্য ভাবে আমাদের সঙ্গে বাসায় আসিয়া পুস্তকগুলি ঘরের ভিতর রাখিয়া দিল; তাহার পর সেই নির্জ্জন গলির ভিতর দিয়া স্কুলের সম্মুখে আসিল। সে দেখিল, মাষ্টাররা চলিয়া গিয়াছেন, এবং স্কুলের ভৃত্য রামলাল ঘোষ স্কুলের দরজা তালা-বন্ধ না করিয়াই স্থানান্তরে গিয়াছে। ছুটী হইয়া গিয়াছে, সকলেই চলিয়া গিয়াছে, তথাপি রামলাল দ্বার রুদ্ধ না করিয়া কোথায় গিয়াছে—মুনু তাহা স্থির করিতে পারিল না। স্কুলের পশ্চিম পার্শ্বে যে ক্ষুদ্র চালায় পানীয় জল ও মাষ্টার মশায়দের ধূমপানের সরঞ্জাম থাকিত, মুনু সেই চালা-ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল—জলের কলসীটা সেখানে নাই। সে বুঝিতে পারিল, রামলাল 'মিউনিসিপাল ট্যাঙ্ক' হইতে পানীয় জল আনিতে গিয়াছে।

ষাঠ-বাষট্টি বৎসর পূর্ব্বে এ দেশে ঘড়ি একালের মত সস্তা ছিল না। মুনু ভাবিয়াছিল—ঘড়ির কাঁটা পিছাইয়া দিয়া কোন ফল হইল না, লাভ—কেবল প্রহার, আর মাষ্টারের আদেশ-পালন—'নীল ডাউন অন্ দি বেঞ্চ!' ইহা অপেক্ষা ঢাকী সমেত বিসর্জ্জন দিলে তিন মাস নিশ্চিন্ত!—স্কুল-কমিটীর মিটীং বসিবে, ঘড়ির জন্য টাকা মঞ্জুর হইবে; কলিকাতায় কে কবে যাইবে, তাহারও নিশ্চয়তা নাই। চুয়াডাঙ্গা-ষ্টেশন পর্য্যন্ত যাতায়াতে প্রায় কুড়ি ক্রোশ; তাহার উপর যাতায়াতে চারি বার নদী পার! বহু কাল পরে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে 'দীনদত্ত-ঘাটে'র উপর 'হার্ডিঞ্জ ব্রীজ' হওয়ায় সেই পারঘাটায় যাতায়াতে খেয়া-নৌকায় গাড়ী পার করিবার অসুবিধা

দূর হইয়াছিল বটে, কিন্তু সনাতন গো-যান ভিন্ন তখন অন্য যান ছিল না, এবং স্প্রিং-বিহীন গো-শকটে জিলা-বোর্ডের জীর্ণ ও তালি-দেওয়া, গর্ত্তে-ভরা সেই আঠার মাইল পথ যাতায়াতে দেহের সন্ধি-স্থলের হাড়গুলির যোড়ের মুখ ঢিলা হইয়া যাইত; আর দেহের সেই দুঃসহ বেদনার উপশমের জন্য পুনঃ পুনঃ গরম জলের স্বেদ দিতে হইত বলিয়া আমাদের গ্রাম হইতে সহজে কেহ কলিকাতায় বা কোন দূরবর্ত্তী নগরে যাইতে চাহিত না। তাহার উপর পরের জন্য (ক্লক) ঘড়ি বহিয়া আনিবে—এরূপ সহৃদয় ব্যক্তিও বিরল; সুতরাং মুনু মিউনিসিপাল ট্যাঙ্কের ভিতর ঘড়িটি বিসর্জ্জন দেওয়া প্রহার হইতে নিষ্কৃতি লাভের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়াই স্থির করিল; কিন্তু স্কুলের চাকর রামলাল ঘোষ পুকুরে জল আনিতে গিয়াছিল, ঘড়ি লইয়া তাহার সম্মুখে পড়িবার ভয় ছিল। এ জন্য সে স্কুলের হলে উপস্থিত হইয়া দেয়ালের ব্র্যাকেট হইতে ঘড়িটা নামাইয়া-লইয়াই পার্শ্বস্থ চিতের ঝোপে প্রবেশ করিল, এবং ঝোপের ভিতর তাহা সোজা করিয়া বসাইয়া-রাখিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িল; ঘড়ি তখনও চলিতেছিল, সেদিকে তাহার খেয়াল ছিল না। সে স্থির করিল, সন্ধ্যার পর অন্ধকার গাঢ় হইলে 'চিতে-ঝাড়' হইতে ঘড়িটি তুলিয়া-আনিয়া অদূরবর্ত্তী পুষ্করিণীতে বিসর্জ্জন দিয়া নিশ্চিন্ত হইবে। তাহা হইলে তাহাকে আর তিন-চারি মাস বেত খাইতে হইবে না।

কিন্তু মুনু ঘড়িটা পুষ্করিণীর জলে নিক্ষেপের জন্য সন্ধ্যা-সমাগমের সুযোগ পাইল না। সেই শনিবার অপরাহ্ণে মিউনিসিপাল-আফিসে কমিশনারদের একটি কমিটীর অধিবেশন ছিল। মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান স্বর্গীয় ব্রজকুমার মল্লিক মহাশয় এই অধিবেশনে যোগদানের জন্য স্কুলের পাশ দিয়া মিউনিসিপাল আফিসে যাইতেছিলেন; স্কুলের নিকট আসিতেই তিনি স্কুলের পার্শ্বস্থ ভ্যারান্দা ও চিতের ঝোপের ভিতর ঠং-ঠং করিয়া ঘড়ি বাজিবার শব্দ শুনিয়া সেই স্থানেই থমকিয়া দাঁড়াইলেন; এবং তৎক্ষণাৎ মিউনিসিপালিটীর পিয়ন গোপাল রায়কে ডাকাইয়া বলিলেন,—বেড়ার পাশে ঝোপের ভিতর হইতে ঘড়িতে ছয়টা বাজিল; এ কি ব্যাপার? জঙ্গলের ভিতর ঘড়ি!

অতঃপর মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ম্মচারী নীলমণি দারোগা তদন্ত আরম্ভ করিলে, ব্রজকুমার বাবুর আদেশে গোপাল সেই ঝোপের ভিতর হইতে ঘড়িটা বাহির করিয়া আনিল; সকলেই চিনিতে পারিল—উহা স্কুলেরই ঘড়ি। এই ব্যাপারে এমন হৈ-চৈ পড়িয়া গেল যে, অনেক লোকই ঘড়ি দেখিবার জন্য সেখানে আসিয়া জুটিল; কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই সংবাদ শুনিয়া মুনু বুঝিতে পারিল, তাহার চালাকি ধরা পড়িয়া গিয়াছে। সে তৎক্ষণাৎ ফেরার!

বলা বাহুল্য, মুনুকেই অপরাধী বলিয়া সন্দেহ করা হইল। তাহাব সন্ধানে বাসায় লোক আসিলে মুনুর ভাই সতীশ বলিল, "দাদা তো ইস্কুল থেকে বাসায় এসে বইগুলো রেখেই বাড়ী চলে গিয়েছে। সে সোমবার সকালে বাসায় ফিরবে—বলে গিয়েছে।" সকলেই ভাবিলেন—মুনু যদি স্কুলের ছুটীর পরই বাড়ী (ঝাউবেড়ে গ্রামে) চলিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে সে কখন এই কাজ করিল? স্কুলের চাকর রামলাল ঘোষকে ডাকিয়া আনা হইলে সে বলিল, স্কুলের ছুটী হইলে সে যখন তালা দিয়া দ্বার বন্ধ করে, সে সময় দেওয়ালে ব্র্যাকেটের উপর ঘড়ি ছিল। ঘড়ি ব্র্যাকেটের উপর হইতে অদৃশ্য হইলে সে হেড্-মাষ্টারকে সেই সংবাদ জানাইত। স্কুলের দ্বার বন্ধ করিবার পর ঘড়ি কখন কিরূপে অদৃশ্য হইল, তাহা তাহার অজ্ঞাত।

রামলাল ভয়ে সত্য কথা গোপন করিয়াছিল। পুষ্করিণী হইতে জল লইয়া ফিরিয়া আসিবার পর সে যখন দরজা বন্ধ করে, তখন ব্র্যাকেটে ঘড়ি ছিল কি না, তাহা সে লক্ষ্য করে নাই; তাড়াতাড়ি দ্বার বন্ধ করিয়া বাড়ী চলিয়া গিয়াছিল। দ্বারের চাবি তাহার নিকটেই ছিল; সুতরাং ঘড়ি কখন কিরূপে ঝোপের ভিতর অপসারিত হইয়াছিল—তাহা কেহই জানিতে পারিল না।

মুনু শনিবারের রাত্রিটা লুকাইয়া-থাকিয়া রবিবার প্রত্যুষে সকলের অজ্ঞাতসারে বাড়ী চলিয়া গিয়াছিল। সোমবারে বাসায় ফিরিয়া স্কুলে আসিলে হেড্-মাষ্টার তাহাকে ঘড়িচুরির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া মুনু যেন আকাশ হইতে পড়িল! সে কিছুই জানে না বলিলেও হেড্-মাষ্টার তাহাকেই সন্দেহ করিয়া প্রচণ্ডবেগে

বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন ; কিন্তু মুনুর প্রসারিত জিহ্বা হইতে প্রচুর লালা ভিন্ন মুখ হইতে আর কিছুই বাহির হওয়া সম্ভব হইল না। এই ঘটনার পর হেড্-মাষ্টারের বেত অনেকেরই পিঠে পড়িল। আমরা সকল ছাত্রই যণ্ড মাষ্টারের অত্যাচারে অস্থির হইয়া উঠিলাম ; কিন্তু প্রতিকারের কোন উপায় দেখিতে পাইলাম না। মুনু কিন্তু অটল ; সে সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

এই ঘটনার কয়েক মাস পরে স্থানীয় জমিদার মল্লিক বাবুদের বাড়ীতে একটা উৎসবের অনুষ্ঠান হইলে সেই উৎসব উপলক্ষে যাত্রার দল বায়না করা হইয়াছিল। এই সময় আমাদের পল্লী-অঞ্চলে মতি রায়ের যাত্রার অত্যন্ত খ্যাতি ছিল। এই সময় প্রসিদ্ধ মতি রায় ও ব্রজ রায়, বৌ-কুণ্ডু, মদন মাষ্টার, সাঁতরা-কোম্পানী প্রভৃতি যাত্রাওয়ালারা আমাদের নদীয়া জিলার বিভিন্ন সহর ও পল্লীগ্রামে গান শুনাইতে আসিতেন ; কিন্তু আমাদের পল্লী-অঞ্চলের জনসাধারণ মতি রায়ের দলের পালা-গানেরই অধিক পক্ষপাতী ছিল। আমাদের বাল্যকালে বালক-বৃদ্ধ অনেকের কণ্ঠেই মতি রায়ের পালার গান শুনিতে পাইতাম। বৈশাখের মধ্যাহ্নে রাখাল-বালক গরুর পাল মাঠে ছাড়িয়া দিয়া অদূরবর্ত্তী আমবাগানের শীতল ছায়ায় বসিয়া উচ্চ মেঠো সুরে প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া গায়িত,—

"বড় আশা ছিল মনে ওহে বংশীধারী,
দাদারে করিয়া রাজা হব ছত্রধারী।
তা তো হোল না, হোল না,
এ দুরাত্মা হ'তে তা তো হোল না, হোল না ;
অন্তে পদপ্রান্তে তব স্থান দিও
ও হে মুরারী !"

সায়ংকালে গ্রাম্যপথিক সান্ধ্য অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন নির্জ্জন পল্লীপথে চলিতে চলিতে উচ্চৈঃস্বরে গায়িতে থাকিত,—

"এ ত সুধা নয়, সুধা নয়,
কুরুকুল-ক্ষয়কারী গরলরাশি,
খেলার সাগরে সে রূপসী !"

কিন্তু ক্রমশঃ সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল ; আমরা শুনিতে পাইলাম, নীলকণ্ঠের (নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়) কৃষ্ণ-যাত্রার গান এতই করুণ ও মধুর যে, মতি রায়, বৌ-কুণ্ডু প্রভৃতি বিখ্যাত যাত্রাওয়ালাদের পরিবর্ত্তে নীলকণ্ঠের পালা-গান শুনিবার জন্যই গ্রামস্থ জনসাধারণ অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করে। সে জন্য মল্লিকবাড়ী এবার নীলকণ্ঠের দলই বায়না করা হইয়াছিল। পূর্ব্বে গোবিন্দ অধিকারী যে ভাবে গান করিতেন, নীলকণ্ঠও সেই আদর্শের অনুসরণে পালা গান করেন। ছোকরাদের পোষাকের আড়ম্বর বা পারিপাট্য নাই ; চোগা-চাপকান-মণ্ডিত জুড়ির দলের সেই শ্রবণ-বিদারক ঐকতানিক উচ্ছ্বাস নাই ; কালোয়াতের মুখব্যাদান করিয়া তাল লইয়া লোফালুফি নাই ; কটিতট আন্দোলিত করিয়া ও মস্তকের রুক্ষ অলকগুচ্ছে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া, ঘাগরা-পরা নর্ত্তকী-বেশী বালকবৃন্দের ন্যাকামীভরা গান—

"আমরা গোপের বালা
না জানি বিরহ-জ্বালা—
যমুনায় জল আন্‌তে যাওয়া
সাজে না, সাজে না।
আর যেন শ্যামের বাঁশি বাজে না বাজে না।"

এ সকল নীলকণ্ঠের যাত্রায় অচল ; তথাপি নীলকণ্ঠের যাত্রা হইতেছে শুনিয়া গ্রামের ও বিভিন্ন গ্রামের সকল শ্রেণীর বহু নর-নারী মল্লিক-বাড়ীতে সমবেত হইল। তাঁহাদের চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখস্থ আঙ্গিনায় গানের আসরে স্থান অধিকার করিবার জন্য আমরাও দলবদ্ধ হইলাম।

সে-দিন আমাদের স্কুল ছিল, এবং স্কুলে অনুপস্থিত হইলে হেড্-মাষ্টার যণ্ড ঘোষের বেতের শক্তি কি ভাবে আমাদের পিঠে পরীক্ষিত হইবে, তাহাও জানিতাম ; তথাপি নীলকণ্ঠের অনুপ্রাস-ঝঙ্কারিত মধুর সঙ্গীত-রসাস্বাদনের লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না ! সে সঙ্গীত রসপিপাসু সকল শ্রোতাকে "চিনিতে পারে জিনিতে পারে কিনিতে পারে বিনামূলে।"

আমরা নীলকণ্ঠের কৃষ্ণলীলার গান শুনিয়া মুগ্ধ হইলাম। আমরা তখন বালক মাত্র, তথাপি সেই মধুর সঙ্গীত শেষ না হইলে উঠিতে পারিলাম না। বেলা দুইটার সময় গান ভঙ্গ হইলে আহারাদি করিতে তিনটা বাজিয়া গেল ; সুতরাং সে দিন আর স্কুলে যাওয়া হইল না। প্রথম হইতে চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত চারি ক্লাশের অধিকাংশ ছাত্রই গান শুনিতে গিয়াছিল ; এ জন্য ঐ সকল ক্লাশে সে দিন পড়াশুনাও তেমন হইল না। ছাত্রদের

সঙ্গীতানুরাগের পরিচয় পাইয়া হেড্-মাষ্টার যণ্ড ঘোষ ক্রোধে অধীর হইয়া স্কুলের ভিতর দাপাদাপি করিতেছিলেন শুনিয়া আমরা অত্যন্ত ভীত হইলাম। বুঝিতে পারিলাম, পরদিন পিঠের চামড়া অক্ষত থাকিবে না। যদি তিনি জরিমানা আদায় করিতেন—তাহা হইলে শাস্তিটা পয়সার উপর দিয়াই যাইত, পিঠ বাঁচিত; কিন্তু এই আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না, কারণ, যণ্ড মাষ্টার জানিতেন, আমাদের নিকট জরিমানা আদায় করিলে আমাদের অভিভাবকগণের পকেটে হাত পড়িবে, এবং তাঁহারা ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইবেন। তিনি তাঁহাদিগকে চটাইতে সাহস করিতেন না; স্কুল-কমিটীর মেম্বররা অনেক ছাত্রেরই অভিভাবক, তাঁহাদের অনুগ্রহের উপর হেড্-মাষ্টারের রুজি নির্ভর করিত। হেড্-মাষ্টারও তাহা জানিতেন, এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাদিগকে তৈলাক্ত করিয়া আসিতেন।

যাহা হউক, আমরা পরদিন যথাসময়ে স্কুলে উপস্থিত হইলে হেড্-মাষ্টার রামলালকে দিয়া বেড়া হইতে জামাল-কোটার একটি মোটা ডাল আনাইয়া লইলেন; তাহা দেখিয়াই আমাদের বুক কাঁপিয়া উঠিল। তাহার পর আমাদের প্রত্যেকের পাঁজরে, পিঠে, মাথায়, এবং পশ্চাদ্ভাগে প্রচণ্ড বেগে সেই আয়ুধের বর্ষণ চলিতে লাগিল, আর মুখে ভীষণ গর্জ্জন,—"কেমন, আর যাত্রা শুন্‌বি?" আমাদের মনে হইতে লাগিল—সে যেন প্রলয়কালের মেঘ-গর্জ্জন!—প্রহারে আমাদের সর্ব্বাঙ্গ দড়ার মত ফুলিয়া উঠিল! কিন্তু মুনু সেই হাড়-ভাঙ্গা প্রহারেও সম্পূর্ণ অবিচলিত রহিল; তাহাকে প্রহার করিতে করিতে হেড্-মাষ্টার হুঙ্কার ছাড়িলেন, "স্কুল কামাই করে আর কখন যাত্রা শুন্‌বি?"—মুনু আত্মরক্ষার জন্য উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া লালা বর্ষণ করিতে করিতে বলিল,—"হ্যাঁ, শুন্‌বো সার! যাত্রা শুন্‌তে আমার খুব ভাল লাগে; মার তো রোজই খাই, মার খাবার ভয়ে যাত্রা শুন্‌বো না? বলেন কি!"—উত্তরে তাহার মাথায়, পিঠে, পশ্চাতে পুনঃ পুনঃ বেত্রাঘাত চলিতে লাগিল; কিন্তু মুনু গোঁ ছাড়িল না, 'শুন্‌বো না'—বলিল না। সম্পূর্ণ নির্ভীক! পরাভূত হেড্-মাষ্টার বেত হাতে লইয়া হাঁপাইতে লাগিলেন।

আমাদের স্কুলের ইষ্টকালয় তখনও নির্ম্মিত হয় নাই; চূণকাম করা মাটীর দেওয়াল, উপরে খড়ের চাল। প্রথম চারি ক্লাশ সেই আটচালার হলের ভিতর বসিত; অন্য ক্লাশগুলি বাহিরের বারান্দায় বসিত। প্রহারের পর অপরাধী ছাত্রগণকে বেঞ্চির উপর দাঁড়াইয়া থাকিবার আদেশ হইল। চারি ক্লাশের অধিকাংশ ছাত্রই বেঞ্চির উপর দাঁড়াইয়া রহিল; দুই-চারি জন ছাত্র—যে সকল সুবোধ গোপাল স্কুল-কামাই করিয়া যাত্রা শুনিতে যায় নাই, তাহারাই বসিয়া রহিল; কিন্তু প্রত্যেক ক্লাশেই তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প।

বেলা বারোটা বাজিয়া গেল। এই সকল গণ্ডগোলে তখনও কোন ক্লাশে পড়া আরম্ভ হয় নাই, তখনও হেড্-মাষ্টারের বেত্র-আস্ফালন চলিতেছিল; সেই সময় স্কুলের সব-ইন্‌স্পেক্টর 'গুড় ব্যাঘ্রের' সঙ্গে চোগা-চাপকানে সজ্জিত একটি প্রাচীন ভদ্রলোক স্কুলে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া হেড্-মাষ্টার যণ্ড ঘোষ তাঁহার সুদীর্ঘ আয়ুধ কচার ডালখানা তাঁহার টেবিলে ফেলিয়া-রাখিয়া তাঁহাদের সম্মুখে অগ্রসর হইলেন।

সেই প্রাচীন ভদ্রলোকটিকে আমরা চিনিতে না পারিলেও তাঁহার সঙ্গে যে চাপরাসী আসিয়াছিল, তাহার চাপরাস্ দেখিয়াই আমরা বুঝিতে পারিলাম, তিনি স্কুল সমূহের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর। স্কুল সমূহের সব-ইন্‌স্পেক্টর 'গুড় ব্যাঘ্র' কখন এণ্ট্রেন্স স্কুল পরিদর্শন করিতেন না; তিনি আমাদের মহকুমার মাইনর, ছাত্রবৃত্তি স্কুল, এবং উচ্চ ও নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিই পরিদর্শন করিতেন; ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর আমাদের স্কুল পরিদর্শন উপলক্ষে তাঁহাকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন।

এই সব-ইন্‌স্পেক্টরের নাম ছিল মধু সিংহ। কিন্তু আমাদের গ্রামের সকল লোক তাঁহার নাম রাখিয়াছিল 'গুড় ব্যাঘ্র!' ইহার একটু কারণ ছিল, তাহা এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। একবার মফস্বলের কোন পাঠশালার পণ্ডিত কার্য্যোপলক্ষে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন; নাম জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি তাঁহার পাঠশালার সম্পাদকের নিকট জানিতে পারেন, স্কুল-ইন্‌স্পেক্টরের নাম মধু সিংহ। পাঠশালার গুরুমশায় আমাদের গ্রামে আসিয়া তাঁহার নামটি

ভুলিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার স্মরণ ছিল—ঐ নামটি খুব মিষ্ট জিনিসের নাম, এবং উপাধিটি ভীষণ হিংস্র জন্তুর নাম। তাঁহার মনে হইল, খুব মিষ্ট জিনিস ত—গুড়, আর ভয়ঙ্কর হিংস্র জন্তু—বাঘ। এই জন্য তিনি আমাদের গ্রামে আসিয়া কোন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করেন, "মশায়, 'গুড় ব্যাঘ্র' মশায়ের বাসাটা কোন্ পাড়ায়?" 'গুড় ব্যাঘ্র' অদ্ভুত নাম! ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গুড় ব্যাঘ্র' কি কাহারও নাম? তিনি করেন কি?—গুরুমশায় বলিলেন, "তিনি স্কুলের সব-ইন্‌স্পেক্টর।" ভদ্রলোক বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আপনি মধু সিংহের সঙ্গে দেখা করবেন? তাঁর নাম 'গুড় ব্যাঘ্র' বল্‌লেন কেন?" গুরুমশায় অপদস্থ হইবার পাত্র নহেন, তিনি ভ্রম স্বীকার না করিয়া বলিলেন, "মধু সিংহও যা, গুড় ব্যাঘ্রও তাই, মানে একই!" সেই দিন হইতে আমাদের গ্রামের লোক রহস্যচ্ছলে মধু সিংহকে 'গুড় ব্যাঘ্র' বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর পূর্ব্বে সংবাদ না পাঠাইয়া স্কুলে প্রবেশ করিয়া যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, সেই দিকেই ছেলেরা বেঞ্চির উপর তাল গাছের মত দণ্ডায়মান! তিনি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হেড্-মাষ্টার বা অন্য কোন মাষ্টার তাঁহার প্রশ্নের উত্তর প্রদানের পূর্ব্বেই মুস্থ বেঞ্চির উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিল, এবং ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টরকে নমস্কার করিয়া বলিল, "আজ্ঞে সার! আমরা হেড্-মাষ্টারের হুকুম না নিয়ে মল্লিক-বাড়ীতে নীলকণ্ঠর যাত্রা শুনতে গিয়েছিলাম, এ জন্য হেড্-মাষ্টার আমাদের সকলকে 'গো-বেড়েন' করে (গরুকে যে ভাবে প্রহার করা হয় সেই ভাবে) বেতিয়েছেন। সে মার কি সাধারণ মার! দেখুন সার, মারের চোটে আমাদের সর্ব্বশরীর কি রকম ফুলে উঠেছে! আমাদের শরীর গুঁড়ো করে দিয়েছেন। আমাদের হাত-পা নাড়বারও শক্তি নেই। ঐ টেবিলের উপর ওঁর 'যমদণ্ড' সেই কচার ডাল পড়ে আছে; মারের চোটে ওটা থেঁতো হয়ে গিয়েছে। এই রকম করে ঠেঙ্গিয়েও ওঁর রাগ কমেনি, শেষে আমাদের সকলকে 'ষ্ট্যাণ্ড-আপ অন দি বেঞ্চ' করিয়ে রেখেছেন! আমাদের শরীরের কি অবস্থা করেছেন দেখুন সার!"—মুস্থ শরীরের বিভিন্ন অংশ তাঁহাকে দেখাইল। ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর নির্ব্বাক্ ভাবে আরও কয়েকটি ছাত্রের দেহ পরীক্ষা করিলেন; এবং হেড্-মাষ্টারের টেবিল হইতে কচার ডালটা তুলিয়া-লইয়া তাহাও নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিলেন; তাহার পর হেড্-মাষ্টার ও অন্যান্য মাষ্টারকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ছোট ছোট ছেলেরা আপনার হুকুম না নিয়ে যাত্রা শুনতে গিয়েছিল বলে তাদের কি এই রকম শাস্তি দিতে হয়? ওরা মানুষ, না গরু? আপনার পিঠে ঐ রকম বেত পড়লে আপনি তা সহ্য করতে পারতেন? চোর-ডাকাতকেও কেউ এ রকম শাস্তি দেয় না। আপনার মত খুনে বে-আক্কেল মানুষ হেড্-মাষ্টারের দায়িত্ব-ভার গ্রহণের যোগ্য নয়। আমি আপনার এই অস্ত্র নিয়ে যাচ্ছি। প্রেসিডেন্সী বিভাগের স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর সায়েবকে এটা দেখাব, এবং আপনার মত খুনে হেড্-মাষ্টারকে যদি স্কুল-কমিটী চাকরী থেকে ডিস্‌মিস্ না করেন ত স্কুলে সরকার যে 'এড' দেন—তা আমি বন্ধ করবার ব্যবস্থা করবো। আপনি এই পদে থাকবার যোগ্য নন।"

পরিদর্শন-কার্য্য আর অধিক দূর অগ্রসর হইল না। ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর সেই কচার ডাল লইয়া সদলে প্রস্থান করিলেন।

হেড্-মাষ্টার কিছু কাল হতভম্ব হইয়া তাঁহার চেয়ারে বসিয়া রহিলেন; তিনি তাঁহার শোচনীয় অবস্থার কথা বুঝিতে পারিলেন। বলা বাহুল্য, আমরা সকলেই বেঞ্চিতে বসিবার অনুমতি পাইলাম। কচার ডালখানি তিনি আর ফেরত পাইলেন না।

তাহার পর কি হইল জানি না; তবে শুনিয়াছি, সেই দিন সন্ধ্যাকালে হেড্-মাষ্টার স্কুলের সেক্রেটারীকে সঙ্গে লইয়া গ্রামস্থ ইন্‌স্পেসন-বাঙ্গলোয় ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার কার্য্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাহার পর এই ব্যাপার লইয়া আর কোন আন্দোলন হয় নাই বটে, কিন্তু হেড্-মাষ্টার যণ্ড ঘোষ সেই দিন যে বেত ছাড়িয়াছিলেন, আর কোন দিন আমরা তাঁহার হাতে বেত দেখিতে পাই নাই; এই ঘটনার পর তিনি যত দিন আমাদের স্কুলে চাকরী করিয়াছিলেন, কোন দিনও কোন ছাত্রকে প্রহার করেন নাই। মুস্থ বলিত, তাহার এক দিনের মুষ্টিযোগেই তাঁহার রোগ সারিয়া গিয়াছে!

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।
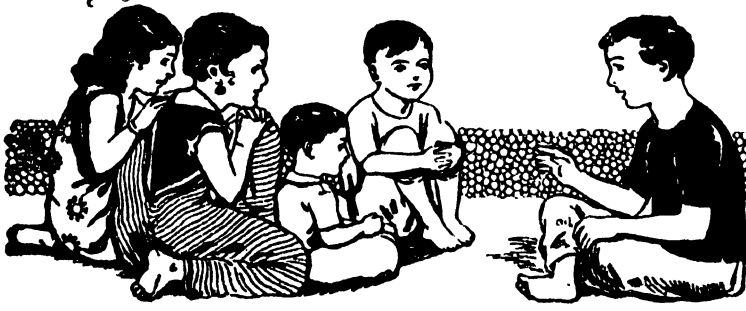
নর-বানর

নরের মতো দেখিতে কিন্তু কুৎসিত নর—অর্থাৎ বানর! মানে, ল্যাজ নাই, পায়ে হাঁটিয়া চলিতে পারে,—আবার লম্ফ দিতে ওস্তাদ! ভাষা নাই, কথা কহিতে পারে না,—কিন্তু বুদ্ধি-চাতুর্য্য মানুষের মতো—তাদের বলিতে চাই নর-বানর!

ইনি সুমাত্রার বনমানুষ

এ-জাতে আছে চার শ্রেণীর জীব—বনমানুষ, শিম্পাঞ্জি, গরিলা এবং গিবন। ডারুইন বলিয়া গিয়াছেন, এই বানরই না কি মানুষের আদি-পুরুষ! এখনকার বৈজ্ঞানিকেরা এ কথা মানেন না। এখনকার বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, বানর কেন মানুষের আদি-পুরুষ হইবে? কখনো না? মানুষের যে প্রাচীনতম কঙ্কাল ও মাথার খুলি পাওয়া গিয়াছে, সে-খুলিতে মস্তিষ্ক বা ব্রেণের 'খোপ' আছে দেখা যায়; কিন্তু বানরের প্রাচীনতম মাথার খুলিতে এই ব্রেণ-খোপটির অভাব! তাছাড়া না কি আরো বহু নিদর্শন পাওয়া যায়, যার জন্য বানরকে মানুষের পূর্ব্ব-পুরুষ বলিয়া মানিয়া লইতে একালের বৈজ্ঞানিকেরা নারাজ!

পোষা গরিলা

কিন্তু এ সব গবেষণার কথা লইয়া মাথা ঘামাইবার

প্রয়োজন নাই। আমরা আজ এই চার জাতের নর-বানরের কথা কিছু বলিব।

এই চার জাতের মধ্যে গরিলাই সব চেয়ে বনিয়াদী জীব। তার আকার প্রাংশুসদৃশ, বৃষ-স্কন্ধ, মহাভুজ এবং বিরাট বক্ষ! গরিলার দেহে প্রচণ্ড শক্তি! কচিৎ দু'পায়ে ভর দিয়া চলিতে পারিলেও সে কশরতি বেশীক্ষণ চলে না। দু'পায়ে এবং দু'হাতে ভর করিয়া চলাই গরিলার স্বভাব! গরিলার ভীম-গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিলে প্রাণ উড়িয়া যায়!

শিম্পাঞ্জির চেহারা কতকটা ক্লাউনের মতো। আচরণেও সে ঠিক ক্লাউনের জুড়িদার। বনমানুষ কিন্তু গম্ভীর-প্রকৃতির জীব। মূর্খ বনিয়াদী জমিদার-মানুষের মতোই তার ভঙ্গী! মূর্খ ভোঁদা জমিদারকে দেখিলে যেমন মনে হয়—তাবচ্চ শোভতে মূর্খ যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে, চিড়িয়াখানার বন-মানুষকে দেখিলেও তেমনি মনে হয় না কি?

এ চার জাতের মধ্যে গিবন সব-চেয়ে খর্ব্ব-কায়-বিশিষ্ট। শিশু-গিবন দেখিতে ঠিক সেলুলয়েডের ডলি-পুতুলের মতো। বড় হইলে গিবনের চাঞ্চল্য বাড়ে খুব। জিমনাষ্টিকের কৌশলে-কশরতিতে গিবনের মতো কুশলী জীব বানর-বংশে আর নাই।

সুমাত্রা দ্বীপের অদূরে ছাগাই দ্বীপ। শুধু সে-দ্বীপে এই চার জাতের সব ক'টি জীবের দেখা মেলে। দক্ষিণ আফ্রিকার অতিকায় বানরকে পূর্ব্বে এই চার জাতের সঙ্গে সমশ্রেণীর জীব বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা নির্দ্দেশ করিতেন—এখন অধিকতর অনুশীলনের ফলে তাঁরা বলেন, গরিলা, শিম্পাঞ্জি, বনমানুষ এবং গিবন—এরা বানর হইলেও সমগোত্রীয় নয়। এ চার জাতকে তাঁরা বলেন,—The great apes. লাঙ্গুলহীন এ চার জাতের বানরকে তাঁরা মানুষ এবং বানর—এই দু' জাতের অন্তর্বর্ত্তী শ্রেণীর জীব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখানকার চিড়িয়াখানায় হনুমান ও বানরাদি দেখিয়া তাদের আমরা পশুপর্য্যায়ভুক্ত করি; কিন্তু বনমানুষকে ও শিম্পাঞ্জিকে দেখিয়া কৌতুক-ভরে আমরা বলি, বাঃ! ঠিক যেন মানুষের মতো! গিবন এবং গরিলা আমাদের এখানকার চিড়িয়াখানায় থাকিলে তাদের দেখিয়াও আমরা ঠিক এই কথা বলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতাম!

শিম্পাঞ্জির দৌরাত্ম্য

হাঁক-ডাক করিয়া বিচিত্র শব্দঘোষে এ চার জাত বানর নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করে। ঐ যে উহারা উ-কু উ-কু বা হু-উ হু-উ হু-উ করিয়া ডাকে, তোমাদের মধ্যে কেহ যদি ঐ ডাকটুকু হুবহু নকল করিতে পারো, দেখিবে সে ডাকে তখনি উহারা সাড়া দিবে। দুঃখ-ব্যথা পাইলে এরা যে-রব তোলে, রাগ হইলে সে-রবের পরিবর্ত্তে তোলে আর-এক রকম রব—অর্থাৎ বিচিত্র হুঙ্কার বা রুক্ষ রব।

গার্ণার নামে এক জন পশুতত্ত্ববিদ্ একবার গরিলার ভাষা বুঝিবার বাসনায় খাঁচা তৈয়ারী করিয়া আফ্রিকার জঙ্গলে সেই খাঁচায় বাস করিয়া ছিলেন একাদিক্রমে ১১২ দিন! এই ১১২ দিনে তিনি গরিলাদের নানা-কালে-উচ্চারিত নানাবিধ শব্দ সংগ্রহ করিয়া তাহার রহস্য-নির্ণয়ে বহু গবেষণা করিয়া জানাইয়াছেন যে, ভয়, ক্রোধ এবং আনন্দ—এই ত্রিবিধ মনোভাব বানর-জাতি ত্রিবিধ রবে প্রকাশ করিতে পারে; এবং তাই তারা করে।

দশ বছর বয়সে গরিলার ছাতি

এই চার জাতের বানরের বুদ্ধি বেশী, না, কুকুরের বুদ্ধি বেশী? এ প্রশ্নের উত্তরে পশুতত্ত্ববিদ্ বিশেষজ্ঞেরা বলেন,—দেহের ও মনের গঠনের দিক দিয়া বানর জাতি কুকুরের চেয়ে উচ্চ-স্তরের জীব। তাদের দেহ-মন কুকুরের দেহ-মনের চেয়ে অনেক বেশী পরিণত। কিন্তু তা হইলে কি হইবে, মানুষের সঙ্গে মানুষের পোষ্য হইয়া বাস করিবার ফলে সংসর্গগুণে কুকুরের বুদ্ধি শাণিত হইয়াছে। গিবন, গরিলা, বনমানুষ ও শিম্পাঞ্জি মানুষের সঙ্গে মানুষের পোষ্য হইয়া বাস করে নাই বলিয়া সে-সংসর্গে বঞ্চিত এবং সেজন্য জোরালো মন লইয়াও মনের বিকাশ-সাধনে তাদের সামর্থ্য ঘটে নাই। আদিম বুনো ভাব বানরের মজ্জাগত রহিয়া গিয়াছে বলিয়া বহু চেষ্টা করিলেও বানরকে আসরে-বাসরে বসানো আজ পর্য্যন্ত সঙ্গত হইতে পারে নাই। কখন সে পোষ্য-ভাব ভুলিয়া বুনো হইয়া উঠিবে, তার কোন নিশ্চয়তা নাই! বানরকে অনেক-কিছু শেখানো যায় এবং সে শেখেও অনেক কাজ; কিন্তু সে-শিক্ষা না বুঝিয়া মূর্খ বুদ্ধিহীনের মুখস্থ-বিদ্যা শেখার মতো! সে বিদ্যার প্রয়োগ সম্বন্ধে বানরের মূঢ়তা ঘুচিবার নয়!

গরিলাকে আমরা যতখানি হিংস্র মনে করি, আসলে তার প্রকৃতি ততখানি হিংস্র নয়। তাড়া করিলে প্রাণের দায়ে অতি-দুর্ব্বল প্রাণীও চোখ রাঙায়, খানিকটা আস্ফালন-ভঙ্গী প্রকাশ করে। গরিলারাও তাই করে। তবে গরিলার দেহ প্রকাণ্ড এবং সে দেহে আছে প্রচণ্ড শক্তি—কাজেই তাড়া খাইয়া আত্মরক্ষার দায়ে সে যদি আক্রমণ করে, তাহা হইলে কি এমন অন্যায় কাজ সে করে, বলো তো? খোঁচা না দিলে, জ্বালাতন না করিলে গরিলা আপনা হইতে কদাচ কাহাকেও আক্রমণ করে না।

গরিলা নিরামিষাশী—উদ্ভিদ্‌ভোজী। গাছের ফলমূল-পাতা তার ভোজ্য। তবে পাখী বা ডিম পাইলে না খাইয়া ছাড়িয়া দেয় না। আহার সম্বন্ধে হিন্দু-বিধবার মতো অতখানি বাছ-বিচার সে করে না! চারা গাছ-পালা,

ফল, বাঁশের কোঁড়া, গাছের মূল—গরিলার প্রিয় খাদ্য। পেট বড়, ক্ষুধাও বেশী—কাজেই ও-দেহের বিকট ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য গরিলাদের বনে ঘুরিতে হয় খোরাকের সন্ধানে।

গরিলা বাস করে সপরিবারে; বিচরণ করে সদলে। নিঃসঙ্গ গরিলার দেখা বড় একটা মেলে না।

গরিলা-বালিকা বলে,—দ্বার খুলে নামি।
গাড়ী চড়িব না,—হাঁটা-পাড়ি দিব আমি।

দুপুরে সূর্য্য যখন মাথার উপর তপ্ত হইয়া ওঠে, সে সময় বয়স্ক গরিলারা গাছের ছায়ায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকে,—তরুণ-তরুণীর দল খেলা-ধূলায় মাতিয়া ছুটাছুটি করে। রাত্রে বয়স্ক গরিলা মাটীতে কিম্বা গাছের নীচু ডালে শুইয়া ঘুমায়; মেয়ে গরিলা এবং অল্প-বয়স্ক গরিলাদের তুলিয়া দেয় উঁচু ডালে নিরাপদে নিদ্রা-সুখ উপভোগের জন্য। গাছের উঁচু ডাল—মেয়েদের এবং ছেলে-মেয়েদের জন্য সব সময় রিজার্ভ থাকে। গরিলা-সমাজে এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

নিউমোনিয়ার সেবা

গরিলার ঐ বিরাট বুকে স্নেহ-মমতা আছে। জার্ম্মাণির এক চিড়িয়াখানায় একটি গরিলা ছিল। গরিলার ঘরের রক্ষককে গরিলা খুব ভালো বাসিত। রক্ষকের খুব অসুখ হয়—তার জায়গায় অন্য রক্ষক আসে। পরিচিত রক্ষককে না দেখিয়া গরিলার ব্যথা-বেদনার সীমা রহিল না। সে আহার ত্যাগ করিল; নিদ্রার ব্যাঘাত

ঘটিতে লাগিল। নূতন রক্ষক যত্ন করে—সে যত্ন সে দেখিয়াও দেখে না। অবশেষে রক্ষক সে-যাত্রা মারা গেল। গরিলাও তার অদর্শনে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া শুকাইতে লাগিল এবং সে-ও প্রাণে বাঁচিল না। নিউ ইয়র্কের এক চিড়িয়াখানাতেও ঠিক এমনি ঘটিয়াছিল। পশুতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন—নিঃসঙ্গতা গরিলারা সহিতে পারে না। এজন্য এখন যে-সব চিড়িয়াখানায় গরিলা আছে, সে-সব চিড়িয়াখানায় এক-একটি গরিলার জন্য দশ-বারো জন করিয়া রক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছে। একের অদর্শনে গরিলা কাতর হইবে না—শুধু এই কারণে।

পশুতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন, গরিলা পোষ মানে। পোষা কুকুরের মতো মনিবের সঙ্গে সঙ্গে সে তাঁর আদেশ মানিয়া চলে। নিরীহ হয় বালকের মতো! তবে বেশী বয়সে গরিলার

গরিলার দন্তরুচি-কৌমুদী!

যা মন্দ—রবো তার অন্ধ! কহিব না মন্দ! শুনিব না মন্দ—কান রাখি বন্ধ!
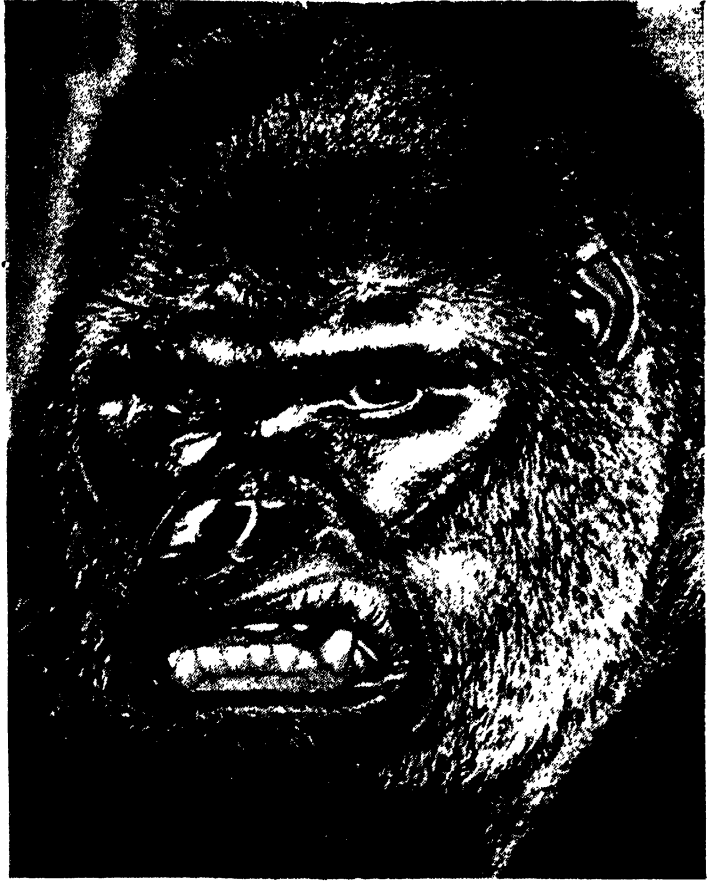
মেজাজ খুব খিট্‌খিটে হয়—রুক্ষ, কর্কশ হয়। এজন্য বেশী-বয়সের গরিলার সঙ্গে—অবশ্য ধাড়ী গরিলার কথা বলিতেছি—আলাপ-পরিচয় রাখিতে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

শিম্পাঞ্জি নিরীহ জীব। খুব সহজে পোষ মানে বলিয়া য়ুরোপে-আমেরিকায় বহু পরিবার শিম্পাঞ্জিকে গৃহে আনিয়া লালন করে। তবে চার-পাঁচ বৎসর বয়স হইলে এরা পোষ মানিতে চায় না! শিম্পাঞ্জি শিখিতে পটু। মানুষের চালচলন তাকে যা শিখাইবে, হুবহু শিখিবে। এই শিক্ষাপটুতার গুণে বহু সার্কাশে শিম্পাঞ্জির নানা ক্রীড়া-কৌশল

দেখানো সম্ভব হইয়াছে। শিম্পাঞ্জির আর এক বৈশিষ্ট্য—সে দু'পায়ে চমৎকার হাঁটিতে পারে। বাইসিক্‌ল্ চালাইতে শিখাও, দু'-দিনে এ-বিদ্যায় শিম্পাঞ্জি পারদর্শী হইবে! ছোট ছেলেমেয়েদের পারাম্বুলেটর-গাড়ী ঠেলা, তাদের মুখে ফীডিং-বোতল দেওয়া—এ সব কাজে বহু শিম্পাঞ্জি এমন পটুতা দেখাইয়াছে যে, বিলাতে দু'-একটি পরিবারে শিম্পাঞ্জি বয়-চাকরের ও দাই-ঝীয়ের কাজ করিতেছে—এ দৃশ্য বিরল নয়!

বনমানুষের আদি-বাস বোর্ণিয়ো, সুমাত্রা, মলয় প্রভৃতি দ্বীপে। গরিলার মতো বনমানুষও সদলে এবং সপরিবারে বাস করে। গাছের ডালে লতা-পাতা দিয়া ঘর বাঁধে। সে-ঘর দেখিতে অনেকটা পাখীর বাসার মতো।

বনমানুষও শিম্পাঞ্জির মতো পোষ মানে। পোষ মানিলে পরে আবার বনে ছাড়িয়া দাও—মাঝে মাঝে বন্ধুর মতো সে আসিবে দেখা-সাক্ষাৎ করিতে। সুমাত্রার বনে শীকার করিতে গিয়া এক শীকারী-সাহেব একটি বন-মানুষের দেখা পান। বনমানুষকে কাছে বসাইয়া তার গায়ে-মাথায় হাত বুলাইয়া আদর করেন, আদর করিয়া তাকে চা খাওয়ান, সিগারেট দেন! এক দিনেই বনমানুষ তাঁর স্নেহে গোলাম বনিয়া গেল! বনমানুষকে বনে রাখিয়া সাহেব ক্যাম্পে ফিরিলেন। পরের দিন বনে আসিবামাত্র বনমানুষ আসিয়া হাজির। সাহেবের গা ঘেঁষিয়া আদর কামনা করিল। সাহেব তাকে দিলেন চা, কেক, সিগারেট। বনমানুষ সানন্দে তাহা গ্রহণ করিল। তার পরের দিন সাহেব বনে আসিবামাত্র বনমানুষ মুঠা ভরিয়া তাঁকে পাকা জাম আনিয়া দিল! সাহেব অবাক্! এ বনমানুষটি পরে সাহেবের সঙ্গে চলিয়া আসিল বন ছাড়িয়া সাহেবের গৃহে!

উত্তর-সুমাত্রার বনে গিবনের বাস। সর্ব্বপ্রকার খেলার-কশরতিতে ইহারা জন্মাবধি পটু। গাছের আগডালেই গিবনের বাস। মাটীতে নামিতে চায় না। জল খায়—গাছের কোটরে বৃষ্টির জল জমিয়া থাকে, সেই জল সংগ্রহ করিয়া। জলপানের ভঙ্গীও চমৎকার। জলে হাত ভিজাইয়া সেই হাত চাটে! বাড়ীতে যাঁরা গিবন আনিয়া পুষিয়াছেন, তাঁরা বলেন—খাঁচার মধ্যে পাত্র ভরিয়া জল দাও, গিবন মুখ দিয়া সে জল পান করিবে না—জলে হাত ভিজাইয়া হাত চাটিয়া সে জল পান করিবে।

গিবন খুব দ্রুত চলিতে পারে। গাছের ডাল হইতে লাফ দিয়া উড়ন্ত পাখী ধরে। ফলমূল-পাতাই গিবন খায়—আর খায় পোকা-মাকড় ও পাখীর ডিম।

গিবন-পরিবার

স্কুলিজ নামে এক জন ইংরেজ ভদ্রলোক একটি গিবন পুষিয়াছিলেন। বাড়ীতে তার ঝাঁপ খাওয়ার রকম দেখিয়া ভদ্রলোকের হৃৎকম্প হইত! ভাবিতেন, চীনা-মাটীর প্লেট-পাত্র বুঝি ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিবে! এক দিন সত্যই দেখেন, দামী চীনামাটীর প্লেট টানিয়া

পোষা-গিবন শূন্যে ছুড়িয়া দিল! সেটা যেমন মাটীতে পড়িবে, গিবন সেটাকে লুফিয়া লইল! ভদ্রলোক কায়দা দেখিয়া অবাক্‌। গিবন সে প্লেট ছাড়িতে চায় না। ঘরময় ঘুরিয়া প্লেট ছুড়িয়া সে প্লেট লুফিয়া তার এ-খেলা চলিল প্রায় বিশ মিনিট ধরিয়া।

হিংস্র মানুষের শীকারের খেয়ালে এ চার জাতের বানর প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। এজন্য আইন-কানুন করিয়া এ চার শ্রেণীর বানরকে রক্ষা করিবার প্রয়াস চলিয়াছে! এ চার জাতের বানর মানুষের আদি-পুরুষ না হইলেও মানুষের ঠিক পরের পৈঠায় যে ইহাদের আসন, সে সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ-সমাজে মতভেদ নাই!

কি করে বেঁচে আছি!

সহরের পথে মোটর-বাসের এই নিদারুণ হুটোপাটি, নিত্য এই নানা এপিডেমিকের মার-মুখী আবির্ভাব, 'নৌকা ফী-শন্‌ ডুবিছে ভীষণ', ভুমিকম্প, ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রাঘাত, বন্যা—এ-সবের ফাঁড়া কাটিয়ে আমরা বেঁচে আছি কি করে, ভেবে আশ্চর্য্য হতে হয়!

আশ্চর্য্য হবার কথা বটে! সম্প্রতি আমেরিকায় এক-বৎসরে নানা ভাবে যে-সব অপঘাত-মৃত্যু ঘটেছে; যে-জখম, যে চোট খেয়ে মানুষ আহত হয়েছে; তার হিসাব কষে তাঁরা বলছেন, ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রায় এক লক্ষ লোক নানা দুর্বিপাকে অর্থাৎ নীরোগ-দেহে অপঘাতে প্রাণ দেছেন! প্রায় তিন লক্ষ সত্তর হাজার লোক জন্মের মতো এমন চোট-জখম খেয়েছেন যে, সে চোট-জখমের ফলে জন্মের মতো তাঁরা হয়েছেন সব-কাজের বার! এবং আটানব্বই লক্ষ একুশ হাজার লোক চোট-জখম পেয়েছেন ছোটখাট রকম।

হতাহতের এই বৃত্তান্ত সংগ্রহ করে দেখা গেছে, পথে মোটরের চোট খেয়ে যাঁরা প্রাণ দেছেন, তাঁদের মধ্যে শতকরা সত্তর জন চোট পেয়েছেন মাঝ-রাত্রে অর্থাৎ রাত্রি এগারোটার পর। বাথরুমে সাবানে পা পিছলে পড়ে প্রাণ দেছেন প্রায় দেড় হাজার; দোতলা-তেতলায় সিঁড়ি ওঠা-নামা করতে পা পিছলে প্রাণ দেছেন সাতশো বিয়াল্লিশ জন! তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমাদের দেশে যে-কথা আছে—'গৃহীত ইব কেশেষু' অর্থাৎ মরণ ফিরছে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মতো—সে কথা নেহাৎ কবি-কল্পনা নয়!

বিজ্ঞান-চর্চ্চার ফলে মানুষ অতর্কিত অপঘাত-মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার বহু হদিশ জানতে পেরেচে। সাবধানের মার নেই—এ-কথা সত্য। এবং এ সত্য কথা জেনেও আমরা কত সময়ে বেহুঁশিয়ার হয়ে কত বিপত্তি যে ডেকে আনি, তার সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না!

অনুশীলন করে এঁরা বলছেন, আমরা যে-দেশে যে-পাড়ায় বাস করি, যে-কাজ করি, যা খাই—তার উপর আমাদের পরমায়ু অনেকখানি নির্ভর করছে। এঁরা বলেন, ওকলাহোমা, উত্তর-ডাকোটা, আর রোড দ্বীপ হলো মানুষের দীর্ঘায়ু এবং অক্ষত থাকবার পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ স্থান! আমাদের পেশার উপরেও আমাদের নিরাপদ-অবস্থান অনেকখানি নির্ভর করে। ভারায় চড়ে যে-মিস্ত্রী জীবিকার সংস্থান করে, ভারা থেকে পড়ে তার চোট খাওয়া এবং অপঘাত-মৃত্যুর আশঙ্কা আছে; অথচ স্কুল-মাষ্টার বা পোষ্ট-মাষ্টার মশায়দের বা উকিল-ডাক্তারদের সে-আশঙ্কা নেই। মিলে, কল-কারখানায় যারা কাজ করে, চোট খেয়ে জখমী হওয়া বা অপঘাত-মৃত্যু তাদের পক্ষে খুব সহজ ও স্বাভাবিক ব্যাপার।

কিন্তু এ সব বড় কথা না তুলে আমরা কি করে নিরাপদে চলাফেরা করতে পারি, সে সম্বন্ধে মোটামুটি দু'-চারটে কথা বলে রাখি। এ-কথাগুলি আমেরিকার এই সব তত্ত্ব-সন্ধানীর দল বহু-পরীক্ষায় সংগ্রহ করেছেন।

পথে মোটর-বাসের ভিড় আজ বেড়েছে এবং দিনে-দিনে আরো বাড়বে। সুতরাং পথ চলতে আমাদের রীতিমত সতর্ক হতে হবে। বড় রাস্তায় মোটর-চাপা পড়বার ভয় সব চেয়ে বেশী; তেমাথা-চৌমাথা পথে এ-ভয় আরো বেশী! মোটরের চোট্‌ খেয়ে যাঁরা হতাহত হন, তাঁদের মধ্যে শতকরা আশী জন চোট খান সহরের সদর রাস্তায়, না হয় এই সব তেমাথা-চৌমাথা পথের মোড়ে রাস্তা পার হবার সময়।

কল-তলায় বা সিঁড়িতে পা পিছলে পড়ে, খোলা ছাদে ঘুড়ি ওড়াতে এবং ফুটপাথে কলার ছোবড়ায় পা

পিছলে পড়ে অসামান্য-রকমের বিপদ ঘটে। এজন্য এ সব জায়গায় সাবধান হতে হবে। মইয়ে চড়ে দেওয়ালে পেরেক ঠুকতে গিয়েও অনেকে পড়ে মাথা ভেঙ্গেছেন, হাত-পা ভেঙ্গে জড়-ভরত হয়েছেন জন্মের মতন!

তার পর পোড়ার বিপত্তি। রান্নাঘরে পোড়ার ভয় খুব বেশী। খোলা-ল্যাম্পের আলোয় বড় বড় অগ্নিকাণ্ড ঘটছে।

গোঁয়ার্তুমি করে সাঁতার কাটতে গিয়ে বহু সন্তরণ-বীর ডুবে মরেছেন। একা বা অজানা পুকুরে-বিলে দীঘিতে-নদীতে সাঁতার কাটবার সময় খুব সাবধান! কদাচ বেশী জলে যেয়ো না।

এ-সি ইলেকট্রিক কারেণ্টে বহু লোক মারা পড়েছেন। অতএব এদিকেও হুঁশিয়ারীর প্রয়োজন। ঘোড়ার চাট্, গরুর শিং—আমাদের শাস্ত্রে যে-কথা আছে বাজিনাং শতহস্তেন—সে কথা মানা উচিত। হুঁঃ, ঘোড়া আমার কি করবে?—বলে গোঁয়ার্তুমি করতে গিয়ে দু'-চার জন যে চোট না খান, এমন নয়!

কালীপূজার সময় বাজী করতে গিয়ে অনেকের প্রাণ গেছে, অনেকে হাত-পা পুড়িয়ে জন্মের মতো পঙ্গু হয়েছেন—এ সংবাদ খবরের কাগজে ছাপা আছে।

আসল কথা, রোগে মৃত্যু—তার যেন প্রতিকার নেই! তা বলে সুস্থ নীরোগ দেহে শুধু বেহুঁশিয়ারীর ফুলে চোট খাবো বা প্রাণ দেবো, এর চেয়ে বিমূঢ়তার ব্যাপার আর নেই! চোট খেয়ে মারা পড়ে বোকা না বনি, অন্ততঃ এ-কথা মেনেও আমাদের নিত্যকার চলা-ফেরায়, কাজে-কর্ম্মে যদি একটু সতর্ক হই, তাহলে অপঘাত-মৃত্যুর দায় থেকে যে রক্ষা পাবো, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই!

নির্ব্বাসিতা রাজকন্যা

(রূপকথা)

১২

ওদিকে রাণীর শিবিরটির ভিতরে সাধুকে নিয়ে যে হাঙ্গামা তাল-গোল পাকিয়ে উঠে, তা মনে আছে ত?

বেয়াদপ সাধুকে রীতিমত শিক্ষা দিবার জন্য নীলাচল ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিল—তার নিষ্ঠুর অনুচর 'সরদার' নামক সিংহলী গুণ্ডাটাকে ডেকে আনতে। কিন্তু সাধু তখনি সিংহের মত বিক্রমে একলাফে তার সামনে গিয়ে হাতখানা চেপে-ধরে বল্লেন—'থামো, তোমার সঙ্গেই শক্তির পরীক্ষাটা আগে হয়ে যাক।' সঙ্গে সঙ্গেই তিনি স্তম্ভিত নীলাচলকে শিবিরের দরজায় টাঙ্গানো মখমলের নীল পরদাটির কাছ থেকে সবলে সরিয়ে দিয়ে নিজেই পরদার গায়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালেন।

সশস্ত্র সেনাদল-বেষ্টিত নিজের শিবিরের মধ্যে রাজ্যের ভাবী রাজারাণীর সামনে দীন-দরিদ্র-অসহায় এই মানুষটির দুঃসাহসিক আচরণ রাণীকে এমনই অবাক্ করে দিল যে, রক্ষীদের ডেকে বাধা দেবার কথাটাও তার মনে হ'ল না।

নীলাচলের অবস্থা তখন আরও সাংঘাতিক। এই নজরবন্দী নিরস্ত্র লোকটা যে তার মতন মানী লোকের হাত ধরে বাধা দেবে—এটা সে কল্পনাও করেনি। হঠাৎ এ ভাবে বাধা পেয়ে প্রথমে সে চমকে উঠ্‌ল, তার পরই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তার সমস্ত দেহ একটা অদম্য রোষের আবেগে থর্-থর্ করে কাঁপতে লাগ্‌ল। নিজেকে একটু সামলিয়ে নিয়ে সে চিৎকার করে ডাকতে গেল সরদারকে। কিন্তু এই সময় সাধুর সঙ্গে চোখোচোখী হতেই তাঁর জ্বলন্ত দৃষ্টি যেন তাকে একেবারে বিহ্বল করে দিল। গলা থেকে স্বর বেরুল না, হাতও উঠল না। দেখতে দেখতে আরক্ত মুখখানা ছায়ের মত বিবর্ণ হয়ে গেল, চোখের দৃষ্টি আহত হয়ে মাটির দিকে নেমে এল। সঙ্গে সঙ্গে একখানা বেতের কেদারার উপর সে অবসন্ন দেহে বসে পড়লো।

নীলার মুখের উপর সেই জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে সাধু বললেন—দেখছ ত রাজকন্যা, এই বীরপুরুষটির অবস্থা! শক্তি-পরীক্ষা ত পরের কথা, আমার সামনে চোখ দুটো তুলে দাঁড়াবার সামর্থ্যও এখন ওর নেই। এই অপদার্থ হবে বাঙ্গলার রাজা, আর বাঙ্গালী তা সহ্য করবে—এই কথা বলতে চাও?

দেহের সমস্ত শক্তি কণ্ঠে এনে নীলা বললে—তুমি ওঁকে যাদু করেছ। নিশ্চয়ই তুমি যাদুকর!

সাধু হেসে বললেন—একটা দুরন্ত মানুষকে চোখের নিমেষে কেউ যদি মেষের মত নিরীহ করে ফেল্‌তে পারে, তাকে কি বলা উচিত—যাদুকর, না শক্তিধর?

নির্ব্বাক্ নিশ্চেষ্ট নিদ্রাচ্ছন্নের মত নতমুখ নীলাচলের অবস্থাটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার দেখেই সে দৃষ্টি সাধুর মুখের উপর তুলে নীলা বললে—শপথ করে তুমি বলতে পারো, মন্ত্র পড়ে তুমি ওঁর এ অবস্থা করনি?

সাধু বললেন—আমি মিথ্যা বলি না, সুতরাং শপথ করবার প্রয়োজন নেই। যারা সত্যদর্শী, চোখের দৃষ্টিতে তারা মানুষের আসল মূর্ত্তিই দেখে, মিথ্যার মুখোস তাদের চোখে ধাঁধা লাগাতে পারে না।

নীলার দেহটা যেন রাগে ফুলে উঠলো—সুশ্রী ভুরু দু'টি বেঁকিয়ে বিশ্রী করে, চোখ থেকে আগুনের ফুল্‌কি ছড়িয়ে সাধুকে চড়া-সুরে জিজ্ঞাসা করলে—তুমি কি তাহ'লে বলতে চাও, মিথ্যার মুখোস পরে উনি আমার চোখে ধাঁধা লাগিয়েছেন?

সহজ কণ্ঠে সাধু উত্তর দিলেন—হ্যাঁ। সত্যের আলো যদি তোমার চোখে পড়ত, তাহ'লে আমার মতন তুমিও স্পষ্ট দেখতে—মানুষের গায়ের চামড়া হচ্ছে এই জানোয়ারটার খোলস, আর আসল মূর্ত্তিটা সাপের।

কথাটা শুনতে শুনতেই নীলার সর্ব্বাঙ্গ যেন ভয়ে বিস্ময়ে কাট হবার যো হ'ল। সেই অবস্থাতেই নীলাচলের আড়ষ্ট দেহখানার দিকে ভয়াতুর দৃষ্টিতে এমন ভঙ্গীতে সে চেয়ে রইল যে, সাধুর মনে হ'ল—মানুষের ঐ খোলসটির ভিতরে সত্যই কোন সাপ ফণা তুলে রয়েছে কি না, তাই যেন সে লক্ষ্য করছে!

একটু হেসে সাধু বললেন—এ দৃষ্টিতে সারা জীবন চেয়ে থাকলেও কিছু দেখতে পাবে না। বর্ণ-পরিচয় না হ'লে অক্ষর কি চেনা যায় কখনো? চেহারা চিনতে হলেও তেমনি শিক্ষা চাই।

আস্তে আস্তে নীলা জিজ্ঞাসা করল—শিক্ষা পেলেই কি দেখতে পাবো—চামড়ার ভেতর মস্ত একটা সাপ রয়েছে?

সাধু বললেন—সাপই যে শুধু থাকবে, তার কোন মানে নেই, অন্য জানোয়ারও থাকতে পারে।

নীলা জিজ্ঞাসা করলে—তার মানে?

সাধু বললেন—সব মানুষেরই ভেতরটা ত সমান নয়। শিক্ষা পেলে দেখতে পাবে—মানুষের চামড়া গায়ে থাকলে কি হবে, স্বভাবে সে সাপ, তার ভেতরে রয়েছে সাপের মূর্ত্তি। এমনি, স্বভাবে কেউ বিছে, কেউ কচ্ছপ, কেউ কুকুর, কেউ শিয়াল, কেউ ছাগল, কেউ বাঁদর, কেউ বাঘ, কেউ কেউ বা সিংহ—

বিস্ময়ের সুরে নীলা জিজ্ঞাসা করলে—তাহ'লে সব মানুষের ভিতরেই একটা না একটা জানোয়ার রয়েছে,—এই তুমি বলতে চাও?

সাধু উত্তর দিলেন—না, এমন কথা আমি বলিনে। তবে বেশির ভাগ মানুষের ভেতরটাই যে এই রকম, তাতে সন্দেহ নেই। এমন মানুষও অনেক আছে, যাদের ভেতরের মূর্ত্তির আধখানা মানুষের, বাকি আধখানা কোন না কোন জানোয়ারের। গোটা-মানুষের মূর্ত্তিও দেখা যায়, তবে সেটা খুব কম, হাজারের ভিতরে একটি পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। আবার মানুষের মূর্ত্তির ভিতরে দেবতার জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিও থাকে।

নিবিষ্ট মনে নীলা কথাগুলো শুনছিল। সাধুর কথা শেষ হ'লে একটু ভেবে সে জিজ্ঞাসা করলে—তাহ'লে মেয়েদের ভিতরটাও কি এমনি?

সাধু উত্তর দিলেন—হ্যাঁ।

চোখের দৃষ্টি বড় করে সাধুর মুখের পানে চেয়ে নীলা বললে—তাহ'লে আমার চামড়ার ভিতরে কি আছে,—মানুষ, না জানোয়ার?

স্থিরদৃষ্টিতে নীলার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে সাধু বললেন—নাই বা জানলে, শুনলে হয় ত ব্যথা পাবে।

মুখখানা শক্ত করে নীলা বললে—না, ব্যথা আমি পাব না; তুমি বলো, আমি শুনবো।

গম্ভীর মুখে সাধু বললেন—তবে শোন, তোমার ভিতরে যে জীবটি রয়েছে, তার রূপটুকু দেবীর, দেহটি মানুষের, আর মুখখানি বাঘের।

দারুণ একটা বেদনা যেন নীলার সর্ব্বাঙ্গ মোচড় দিয়ে মস্তিষ্কের ভিতর মিশে গেল। চোখের দীপ্তি কে যেন এক ফুৎকারে নিবিয়ে দিলে। মুখ দিয়ে তার একটি কথাও বেরুল না, নিষ্প্রাণ পুতুলের মতন সে সাধুর মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

সাধু বোধ হয় মনে ব্যথা পেলেন, কি ভেবে পরক্ষণেই সহানুভূতির সুরে বললেন—কিন্তু মানুষ ইচ্ছা করলে

নিজের চেষ্টায় ভিতরের মূর্ত্তির রূপ বদলিয়ে ফেল্‌তে পারে।

ভাঙ্গা বাঁশীর সুরের মতন নীলার গলা দিয়ে মৃদু স্বর বেরুল,—কি করে?

উৎসাহের সুরে সাধু বললেন—মন্দ যেমন করে ভালো হতে পারে, তেমনি করে। ভালো চিন্তা, ভালো সঙ্গ, ভালো কাজ, লোকের সঙ্গে ভালো ব্যবহার ভিতরের মন্দ মূর্ত্তি বদলিয়ে ভালো করে দেয়। ভালো পথে চল্‌লে তোমার ভিতরকার বাঘের মুখ মানুষের মুখের মতই সুন্দর হতে পারে। এমন কি, কালক্রমে সমস্ত মূর্ত্তিটা দেবীর মতন হওয়াও অসম্ভব নয়।

জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে নীলা বললে—এটা তোমার মনগড়া কথা, আমার মন-রাখবার জন্য বললে।

সাধুর গলার স্বর এবার শাঁখের আওয়াজের মত গম্ভীর হয়ে বেরুল—আবার তুমি ভুল করছ! কারুর মন-রাখবার জন্য মনগড়া কথা বলার অভ্যাস আমার নেই। আমার কথা যে সত্য, ইচ্ছা করলে তুমি তা পরীক্ষা করে দেখতে পারো।

নীলা জিজ্ঞাসা করলে—কি করে?

স্বর্ণখচিত চতুর্দ্দোলার আসনটির পাশে একটি আধারে যে দর্পণ চিক্‌মিক্‌ করছিল, সেখানার দিকে এই সময় সাধুর দৃষ্টি পড়ল সামনের দিকে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে তা তুলে নিয়ে তিনি নীলার হাতে দিয়ে বললেন—আমার দৃষ্টিশক্তির একটু অংশ আমি তোমাকে কিছুক্ষণের জন্য দিচ্ছি, এই দর্পণেই তোমার অন্তরের মূর্ত্তিটা তুমি দেখতে পাবে।

কৌতূহলে নীলার মুখখানা হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, চোখ দুটো কপালের দিকে তুলে পূর্ণ-দৃষ্টিতে সে তাকালো হাতের দর্পণখানার উপরে। কিন্তু যে প্রতিবিম্ব তাতে পড়ল, সেটি দেখেই সমস্ত কৌতূহল তার কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে দেহটা থর্‌-থর্‌ করে কাঁপতে লাগলো, জিভ শুকিয়ে উঠলো, বুকের স্পন্দনটাও বুঝি থেমে যাবার উপক্রম হল। আশ্চর্য্য! সাধু তার ভিতরের মূর্ত্তিটার যে আভাস দিয়েছিলেন—দর্পণে সেইটিই অবিকল ফুটে উঠেছে। দেহের নীচের দিক্‌টা তারই, রূপে গঠনে আয়তনে কোন তফাৎ নেই, রূপ জ্বল-জ্বল করছে, কিন্তু মুখখানা—কি সর্ব্বনাশ! সে মুখ ত তার নয়—তার গলাটির উপরে বসানো রয়েছে—নেকড়ে বাঘের একটা হিংস্র কুটিল বীভৎস কদর্য্য মুখ!

আতঙ্কে নীলা চীৎকার করতে গেল, কিন্তু গলা তার এমনি শুকিয়ে গেছে যে—স্বর বার হ'ল না, ভাঙ্গা কাঁসরের উপর ঘা দিলে যেমন কর্কশ আওয়াজ হয়, ঠিক তেমনি একটা কর্কশ শব্দ! সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দোলার উঁচু আসনের উপর থেকে তার অচেতন দেহটি মেঝের দিকে নেতিয়ে পড়ল, দর্পণখানা হাত থেকে ঠিকরে একটা ধাতু-পাত্রের উপর পড়ে ঝন্‌-ঝন্‌ শব্দে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

সাধু সতর্ক ছিলেন,—পড়বার আগেই সবল দুটি হাতে নীলার দেহটি ধরে তাকে ধীরে ধীরে আসনের উপর বসিয়ে দিলেন।

দর্পণভাঙ্গার শব্দে নীলাচলের তন্দ্রা ছুটে গেল। সেই বিহ্বল ভাবটা কেটে যেতেই চোখ দুটো মেলে সামনের দিকে চাইতেই সে দেখতে পেলে—সাধু রাণীকে দু'হাতে ধরে ফেলেছে, রাণীর মুখে টুঁ-শব্দটিও নেই!

ঝাঁ করে সব কথা নীলাচলের মনে যেন ছবির মতন ভেসে উঠল। রাণীর কথায় সে যে সাধুকে রীতিমত শিক্ষা দেবার জন্য সরদারকে ডাকতে যাচ্ছিল—সাধু তার হাত-খানা ধরে বাধা দেয়, সেই অপমানে সে রাগে জ্ঞান হারিয়ে বেতের এই আসনখানার উপরে পড়ে যায়, আর এখন স্পষ্টই দেখছে—সেই সুযোগটুকু পেয়ে সাধু অসহায়া রাণীর গায়ে হাত দিয়েছে, তার অপমান করছে, হয় ত বা ধরে নিয়ে যাবার ফন্দী আঁটছে—

নীলাচল আর স্থির থাকতে পারলে না, তার মাথার ভিতরে তখন আগুন জ্বলে উঠেছে। সবেগে উঠে দাঁড়াতেই সে দেখতে পেলে—তাঁবুর গায়ে প্রকাণ্ড একটা বল্লম ঝুলছে। হাত বাড়িয়ে সেটা সাপ্‌টিয়ে ধরেই সে পিছন থেকে সাধুকে আক্রমণ করলে।

সাধু তখন সংজ্ঞাহীনা নীলাকে যথাস্থানে বসিয়ে হেঁট হয়ে তার মুদিত দুটি চোখের শুশ্রূষা করছিলেন; নীলা চোখ মেলে চাইতেই তিনি সোজা হয়ে সরে দাঁড়ালেন। অমনি নীলার দুর্ব্বল চোখের কালো দুটি স্বচ্ছ-তারা অস্বাভাবিক উজ্জ্বল

হয়ে উঠলো। নীলাচল এই সময় ভীষণ বল্লমটা দু'হাতে সবলে ধরে পিছন থেকে সাধুর ঘাড় আর মাথার সংযোগ-স্থলটি বিঁধবার জন্ত তাক করছিল। সেই অবস্থাতেই নীলা ডান হাতখানি তুলে চেঁচিয়ে উঠলো—থামো নীলাচল, বল্লম নামাও বলছি!

নীলার কথা শুনে সাধু চমকিয়ে উঠে পিছনে ফিরে চেয়ে নীলাচলের কাণ্ড দেখলেন; দীর্ঘ ফলার একটা বল্লম হাতে নিয়ে সাক্ষাৎ যমের মত সে তাঁকে নিশানা করছে। বুঝলেন, নীলা যদি এ ভাবে চিৎকার না ক'রত, চোরের মত পিছন থেকে বল্লম চালিয়ে নীলাচল তাঁর দেহটাকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে বিঁধে ফেলতো।

কিন্তু রাণীর কথায় হঠাৎ বাধা পেয়ে নীলাচল আক্রমণের প্রথম বেগটা দমন করলেও হাতের বল্লম নামালো না, জলন্ত দৃষ্টিতে রাণীর পানে চেয়ে সে প্রতিবাদ করে বল্‌লে—তুমি পাগল হয়েছ রাণী, তাই বাধা দিলে আমাকে, হয় ত ঐ যাদুকরটা তোমাকে যাদু করেছে, তাই আমাকে হাতের বল্লম নামাতে বললে।

গলার স্বরে জোর দিয়ে নীলা বললে—না, আমি ঠিক আছি; কেউ আমাকে যাদু করেনি। তুমি হাতের বল্লম নামিয়ে রাখ।

রাণীর মুখে এ কথা শুনেও নীলাচল হাতের বল্লম নামালো না, বরং সেটা আরো জোরে চেপে-ধরে বল্‌লে—যাদু না করলে তুমি কখন এমন করে আমার সঙ্গে কথা বলতে না রাণী! আমি স্পষ্ট দেখেছি, ঐ লোকটা তোমার গায়ে হাত দিয়েছে, নিশ্চয়ই ওর মতলব ছিল, তোমাকে ধরে নিয়ে যাওয়া। ও হচ্ছে—চোর, বদমাস, ডাকু—

নীলার মুখখানি যেন অপ্রসন্ন হয়ে উঠলো, বললে—উনি সাধু, তুমি যা ভাবছো, তা নয়। উনি আমাকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য গায়ে হাত দেননি, মাথা ঘুরে আমি পড়ে যাচ্ছিলুম দেখে ধরে ফেলেছিলেন। ওঁরই সেবায় আমি জ্ঞান ফিরে পেয়েছি। এজন্য বরং তোমার উচিত, ওঁকে ধন্যবাদ দেওয়া।

চোখ দুটো পাকিয়ে সাধুকে একবার দেখে নিয়ে নীলাচল রাণীকে লক্ষ্য করে বল্‌লে—এই ডাকুকে ধন্যবাদ দেবার ইচ্ছা হয়ে থাকে, তুমি দাও। অপমান তুমি ভুলতে পারলেও আমি পারবো না। আমার গায়ে এই ডাকু হাত দিয়েছে, তার শাস্তি আমি দেবই। কেউ একে আজ রক্ষা করতে পারবে না—

বল্‌তে বলতেই সে বল্লমটি তুলে এমনি জোরে সাধুর বিশাল বুকখানার দিকে চালিয়ে দিলে যে, নীলা আর বারণ করবারও অবসর পেলে না, একটা শব্দ শুধু আর্ত্ত-নাদের মত তার মুখ ফুটে বেরিয়ে এল।

কিন্তু বল্লমটি সাধুর বুকে বিদ্ধ হবার আগেই তিনি হাত বাড়িয়ে খপ্‌ করে বল্লমের দাণ্ডিটা ধরে-ফেলে পর-ক্ষণেই নীলাচলের দিকে তার ফলাটি ঘুরিয়ে বলে উঠলেন, —এবার? এইমাত্র ত জোর গলায় বল্‌লে—কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না, এখন তোমাকে কে রক্ষা করবে শুনি?

নীলাচলের মুখখানা তখন কালো হয়ে গেছে, চোখ-দুটো কোন রকমে তুলে বিপন্নের মত রাণীর দিকে তাকালো।

দিনের আলো বুঝি নিবে গিয়েছিল রাণীর চোখের সামনে থেকে,—নীলাচল যখন সাধুর বুকটি লক্ষ্য করে হাতের বল্লমটি সজোরে নিক্ষেপ করেছিল। কিন্তু সেই প্রাণঘাতী বল্লমটি ধরে-ফেলে সাধু আত্মরক্ষার যে অদ্ভুত শক্তিকৌশল দেখালেন, তাতে অপূর্ব্ব একটা উল্লাসের আলো ফুটে উঠে রাণীর দেহ-মন যেন উদ্ভাসিত করে তুললো। স্নিগ্ধ-দৃষ্টিতে সাধুর দিকে চেয়ে মৃদু-স্বরে সে বলে উঠলো—আপনিই ত বলেছেন, সাধুরা হিংসা করেন না, সুতরাং নীলাচল যত অপরাধই করুক না কেন, আপনি নিশ্চয়ই তা মার্জ্জনা করবেন।

রাণীর কথাটা রাণীর সামনে মুখোমুখি দণ্ডায়মান দুই যুবাকেই যেন স্তব্ধ করে দিল। সাধু দেখলেন, হিংসাচারে যে মেয়েটি কোন দিন কুণ্ঠিতা নয়, আজ তার মুখে অহিংসার কথা; হিংস্র নির্ম্মম কঠোর অন্তরটির এ কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! কণ্ঠের স্বর কি কোমল ও মর্ম্মস্পর্শী!

নীলাচলের মনে হ'ল, তার আর রাণীর মাঝখানে এক নিমেষে কে যেন একটা বেড়া বেঁধে দিয়েছে। একটু আগেই যে-মুখে রাণী এই ভণ্ড সাধুকে যা তা বলে অপমান করেছিল, এখন সেই মুখেই তাকে 'আপনি'

বলে শ্রদ্ধা করছে, সম্মান দেখাচ্ছে। রাজ্যেশ্বরী হয়ে সে একটা ডাকুর কাছে তার জন্য মার্জ্জনা চাইছে!

সাধুর কথাতেই নীলাচলের চিন্তায় বাধা পড়িল।

রাণীর অনুরোধ শুনে তিনি তখন বলছিলেন—সাধুরা হিংসা করে না সত্য, কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য হিংস্রককে আঘাত করতে একটুও কুণ্ঠিত হন না। যে সাপ দংশন করবার জন্য ফণা তোলে, সাধুরা তাকে প্রাণে মারেন না বটে, কিন্তু তার বিষ দাঁতগুলো ভেঙ্গে দেওয়া দরকার মনে করেন।

সাধুর মুখে সাপের কথা উঠতেই নীলার মনে অম্‌নি জেগে উঠলো—নীলাচলের গায়ের চামড়ার ভিতরে সাপের মূর্ত্তিটার কথা! সভয়ে শিউরে উঠে সে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো নীলাচলের পানে।

মনে মনে হেসে সাধু বললেন—বেশ, আমি এ-যাত্রা ওকে ক্ষমাই করলুম। এখন তুমি আমার সম্বন্ধে কি করতে চাও? শাস্তি দেবার ইচ্ছা হয়ে থাকে ত বলো, তোমার সেনানায়ককে ডাকি।

সাধুর কথাগুলি বোধ হয় নীলার বুকে বিঁধলো; কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, হঠাৎ সে উঠে দাঁড়ালো, তার পর হাত দু'টি যোড় করে, সাধুর শান্ত-সুন্দর মুখখানার দিকে চেয়ে গাঢ় স্বরে বলে উঠলো—অজ্ঞানে যে অপরাধ আমি করেছি, তার জন্য আমাকেও আপনি ক্ষমা করুন; ও-ভাবে আঘাত দেবেন না। এখন আপনাকে নিয়ে আমি কি করব শুনুন;—একটু আগে যে শিক্ষার কথা হয়েছিল, আপনার চরণতলে বসে আমি সেই বিদ্যাটি শিক্ষা করবো। বিদ্যার সঙ্গে জ্ঞানের আলো সাধুরাই বিতরণ করেন। সেই আলোই ভিক্ষা চাইছি আমি আপনার কাছে। আমাকে ভিক্ষা দিন সাধু!

কথাগুলি বলতে বলতে নীলা নত-দেহে সাধুর পদ-প্রান্তে বসে পড়লো। মাথাটিও তার ধীরে ধীরে নত হয়ে সাধুর পা-দু'খানি স্পর্শ করল।

হাতের বল্লমটা ফেলে দিয়ে সাধু সস্নেহে তার হাত দু'খানি ধরে ধীরে ধীরে তাকে তুলে বললেন—আমি তোমার শিক্ষার ভার নিলুম রাজকন্যা!

নীলাচল অচল পাহাড়ের মত স্তব্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখের তারা-দুটো শুধু ময়াল সাপের চোখের মত দপ্‌ দপ্‌ ক'রে জ্বল্‌তে লাগলো! সে দৃষ্টিতে ক্রোধ ও হিংসা ফুটে বেরুচ্ছিল! [ক্রমশঃ

—গল্প দাদু।

হেমন্তোৎসব

মধু-যামিনীর ফুল-উৎসবে আমার নিমন্ত্রণ!
মহুয়ার বনে কল-গুঞ্জনে চলে তাই কানাকানি,
কেমনে ফিরাব—দুয়ারে আমার আসিয়াছে প্রিয়জন,
দখিণা হাওয়ায় ভাসিয়া আসিছে বিহ্বল বন-বাণী।

প্রিয়জন শুধু নহ তুমি মোর, তুমি যে প্রাণের প্রিয়,
সুদূর-পথের বঁধুয়া আমার, মম অন্তরলীনা,
আমার ব্যথায় প্রেম যে তোমার হইয়াছে মোহনীয়,
আমার গানের সুরে বেজে ওঠে তোমারি হৃদয়-বীণা।

সঞ্চরি' চলে বন-বীথিকায় তোমারি চরণ-ধ্বনি,
নৃত্যচপল নূপুর ঘুমায় ঘন-চম্পক-তরু-তলে,
মিলন-আশায় মেলিছে নয়ন আমার সন্ধ্যামণি,
সোণালী স্বপন ঢেউ দিয়ে যায় নীল যমুনার জলে।

সন্ধ্যামণির মিনতি ভাসিছে নীল আকাশের চোখে,
তারায় তারায় ফুটিয়া উঠিল কত না যুগের কথা—
বাহির হইতে এলে কি প্রেয়সী, মম অন্তরলোকে?
মালতী-বিতানে জাগিয়া উঠিছে বিরহের বিধুরতা!

শ্রীসত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

হাঁটু

হাঁটুর সুগঠনের উপর মেয়েদের চলার শ্রী নির্ভর করে। এদেশের মেয়েরা পাশ্চাত্য যে-ফ্যাশনই গ্রহণ করিয়া থাকুন, দেশের সৌভাগ্য যে, হাঁটুর উপরে শাড়ী তুলিয়া পরার ফ্যাশন গ্রহণ করিতে তাঁদের প্রবৃত্তি হয় নাই! আশা করি, এ-প্রবৃত্তি তাঁদের কখনো হইবে না!

শাড়ীর আবরণে হাঁটু ঢাকা থাকিলেও ব্যায়ামে হাঁটুর শক্তি, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য গড়িয়া তোলার প্রয়োজন আছে। স্বাস্থ্য ভালো থাকিলে হাঁটুর গড়ন কদাচ বিশ্রী হইবে না। এবং হাঁটুর স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের উপর সারা-জীবনের স্বাস্থ্য নির্ভর করে অনেকখানি, এ-কথা মনে রাখিবেন।

যাঁদের হাঁটুর স্বাস্থ্য ভালো নয়, চলিতে-ফিরিতে উঠিতে-বসিতে তাঁদের অস্বস্তি ও বেদনার সীমা থাকে না। তাছাড়া ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর বয়সে বাত আসিয়া ঐ হাঁটুতেই প্রথমে আশ্রয় লয়। পা মুড়িয়া অনেককেই বসিতে হয়; সে সময় রক্ত-চলাচল-ক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে; সেজন্য হাঁটু যেন কাঠের মতো কঠিন হইয়া ওঠে; সঙ্গে-সঙ্গে হাঁটু টন্‌টন্ করে—হাঁটুর ব্যথায় আমরা অস্থির হইয়া পড়ি।

মুখের ও মাথার চুলের বাহার করিলেই চলিবে না; দেহখানিকে যদি সুশ্রী ছাঁদে কায়েমি ভাবে রাখিতে চান, তাহা হইলে হাঁটুকে সুশ্রী-সুঠাম-সুন্দর করিয়া গড়িতে হইবে। হাঁটুর শ্রী-সৌন্দর্য্য গড়িয়া তুলিতে পারিলে মেয়েদের চলন হইবে মনোহর!

হাঁটুর বেয়াড়া ছাঁদে দেহ বাঁকিয়া যায়—ভাঙিয়া যায়; পায়ে নানা উপসর্গ আসিয়া জমা হয়। সুগোল সুঠাম হাঁটু—স্বাস্থ্যের লক্ষণ, সৌন্দর্য্যের লক্ষণ। যাঁদের হাঁটু সুছাঁদের নয়, ব্যায়াম-সাধনায় তাঁরা কুশ্রী হাঁটুকে অনায়াসে সুশ্রী-সুঠাম-ছাঁদে গড়িয়া তুলিতে পারেন। বয়স বেশী হইলেও ক্ষতি নাই! হাঁটুর এ ব্যায়াম-বিধি পালন করিলে সকল-বয়সেই হাঁটুকে সুশ্রী-সুছাঁদে রাখিতে পারিবেন।

নাচে হাঁটুর গড়ন সুশ্রী হয়—হাঁটুর স্বাস্থ্য ভালো হয়, মানি। কিন্তু আমাদের দেশে মেয়েদের নাচের রেওয়াজ জাগাইয়া তুলিতে অনেকের উৎসাহের সীমা না থাকিলেও দশ মণ তেল পুড়িবে না, রাধাও নাচিবেন না! অর্থাৎ দু'-চারটি পরিবারের মেয়ে-মহলে নাচের রুণুঝুণু বাজিলেও 'সপ্ত কোটি' বাঙালীর ঘরে মেয়েদের নাচিবার মতি-গতি হইবে না! অতএব হাঁটুকে সুশ্রী-সুঠাম করিতে বিশেষ ব্যায়াম-সাধনার প্রয়োজন। সেই ব্যায়ামের কথাই বলিতেছি।

১। ১নং ছবির ভঙ্গীতে হাঁটু মুড়িয়া মেঝেয় বসুন। বসিয়া পায়ে-পায়ে সামনের দিকে দশ-পা অগ্রসর হোন্।

১। হাঁটু মুড়িয়া পায়ে-পায়ে

চলিবার সময় দু'-হাত প্রসারিত করিয়া দেহের ব্যালান্স রাখিতে হইবে। এ-ব্যায়ামে হাঁটু, উরু এবং কোমরের ছাঁদ হইবে সুশ্রী ও সুঠাম।

২। এবার ২নং ছবির ভঙ্গীতে দু'-হাঁটু ঈষৎ মুড়িয়া দাঁড়ান। দাঁড়াইয়া কোমরের দু'-দিকে দু'-হাত রাখিয়া

(ছবির মতো) দু'-হাঁটু সিধা-সোজা করুন। এমনি ভাবে এক-বার হাঁটু মুড়িয়া 'উপু' হইয়া বসিবেন, পরক্ষণে দু'-হাঁটু সিধা-খাড়া করিয়া দাঁড়াইবেন। এ-ব্যায়াম প্রথমে করিবেন প্রায় পাঁচ-মিনিট কাল। তার পর অভ্যাস হইলে মাত্রা বাড়াইয়া দশ-বার এ-ব্যায়াম করিবেন।

৩। এবার সিধা-খাড়া দাঁড়ান। দাঁড়াইয়া ডান হাতে চেয়ার ধরুন (৩নং ছবির ভঙ্গীতে)। চেয়ার ধরিয়া হাঁটু মুড়িয়া বাঁ-পা সামনে-পিছনে আট বার দুলান। তার পর ডান পায়ে দেহের ভর রাখিয়া দাঁড়াইয়া দু'-বার চক্রাকারে দেহ ঘুরান। এবার চেয়ার ধরিয়া ডান হাঁটু মুড়িয়া ডান-পা দুলাইবেন আট বার; তার পর বাঁ-পায়ে দেহের ভর রাখিয়া চক্রাকারে দেহকে আবার দু'-বার ঘুরান। এ-ব্যায়াম পর-পর এমনি ভাবে করা চাই আট-দশ বার।

২। একটু মুড়িয়া কোমরে হাত

৪। প্রত্যহ প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া এবং রাত্রে শয্যা-গ্রহণের পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে ৪নং ছবির ভঙ্গীতে হাঁটু মুড়িয়া ওঠ-বোস্ করিবেন অন্ততঃ পক্ষে দশ বার। বেশ জোরে-জোরে দ্রুততালে ওঠ-বোস্ করা চাই। ওঠ-বোস্ করিবার সময় দু' হাত কোমরের দু'-দিকে রাখিবেন।

৫। ৪নং ব্যায়াম-সাধনার পরে ৫নং ছবির ভঙ্গীতে চেয়ারে বসিয়া এক বার ডান-পা সামনের দিকে সবেগে প্রসারিত করিয়া দিন—বাঁ-পা রাখিবেন ৫নং ছবির ভঙ্গীতে। তার পর ডান-পা রাখিবেন সিধা এবং বাঁ-পা সবেগে প্রসারিত করিয়া দিবেন। এ ব্যায়ামও করা চাই পনেরো-ষোল বার।

৩। চেয়ারে হাত

৪। ওঠ্-বোস্ করা

৫। এক পা প্রসারিত

এ কয়টি ব্যায়াম-বিধি নিত্য নিয়মিত ভাবে পালন করিলে হাঁটুর স্বাস্থ্য ও ছাঁদ সুচারু-ভঙ্গীর হইবে; হাঁটুতে কস্মিন্ কালে বাত-ব্যাধি আশ্রয় করিবে না।

—

ব্যায়ামের কথা

ব্যায়াম বা ফিজিকাল্-এক্সারসাইজের উপকারিতা এ-যুগে অনেকেই বুঝেছেন। ব্যায়াম-চর্চ্চায় দেহ মজবুত হয়, স্বাস্থ্য ভালো থাকে এবং দেহ ভালো থাকলে মন যে ভালো থাকবে,—এ কথা পাকা।

ফিজিকাল্-এক্সারসাইজ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া খুব আশার কথা, আনন্দের কথা। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে। সে-কথা এই যে, ব্যায়াম সম্বন্ধে কতকগুলি ভুল ধারণা আমাদের অনেকের মনে বদ্ধমূল আছে। সে ভুল ধারণার উচ্ছেদ প্রয়োজন।

অফিসে, স্কুলে বা ঘরে বসে যাঁদের নিত্যদিন কাজ করতে হয়, তাঁদের অনেকে বলবেন, হপ্তার ছ'দিন সংসারের কাজকর্ম্মে ব্যায়াম-চর্চ্চার সময় পাই না, অতএব ছুটীর একটা দিনে খুব-খানিকটা ব্যায়াম-চর্চ্চা করি যদি, অর্থাৎ দু-চার ক্রোশ হাঁটা-পাড়ি দি কিম্বা দেড় ঘণ্টা একসারসাইজ করি, তাহলে সেটা উচিত হবে কি না? এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞেরা বলেন, হপ্তায় ছ'ছ'দিন যাঁদের বসে-দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয়, তাঁদেরো উচিত, প্রত্যহ এক-ঘণ্টা করে পায়ে হেঁটে বেড়ানো। তা করলে সে-ব্যায়াম তাঁদের পক্ষে পর্য্যাপ্ত এবং উপকারী হবে। ছুটীর একটি দিনে প্রাণপণে ছ' দিনের ব্যায়াম সেরে নিতে গেলে স্বাস্থ্যের পক্ষে সে-কাজ হবে দারুণ অনিষ্টকর।

সকালে বিছানা থেকে উঠেই ব্যায়াম করা উচিত। শুতে যাবার আগে ব্যায়াম করলে নিদ্রার ব্যাঘাত হবে, পরিপাক-ক্রিয়াতেও গোলযোগ ঘটবে। রাত্রে শুতে যাবার আগে হাল্কা-কাজ বা বিশ্রাম প্রয়োজন। গান-গল্প করতে পারেন। গুরু-গম্ভীর চিন্তা বা লেখা-পড়া অনুচিত। তাস-খেলাও উচিত হবে না; কারণ, খেলার হার-জিতে মেজাজ গরম হতে পারে। রাত্রে হাসি-খুশী করাই ভালো; তাতে মন ভালো থাকবে। খেয়েই তখনি শুতে যাবেন না। খাবার পর খানিকটা বিশ্রাম অবশ্য-কর্ত্তব্য।

অনেকে প্রশ্ন করেছেন, ব্যায়াম-চর্চ্চায় মোটা শরীর রোগা হয় কি না? এ প্রশ্নের উত্তরে বলবো,—ব্যায়াম করলে আমাদের দেহের জলীয় অংশ কমে যায়। ব্যায়ামে আমাদের দেহের মেদ বা চর্ব্বি কমে দশ-ভাগের এক ভাগ মাত্র। সেই সঙ্গে এমন খাদ্য গ্রহণ করা উচিত, যাতে দেহে মেদ জন্মাবার সুযোগ না ঘটে! তবে ব্যায়ামে ক্ষুধার উদ্রেক হবে এবং ক্ষুধা হ'লে সে-ক্ষুধার তৃপ্তি-সাধনের জন্য চাই অনুরূপ-পরিমাণ ভোজ্য-গ্রহণ; তার ফলে দেহের ওজন এবং মেদ বৃদ্ধি হতে পারে। এজন্য ওজন এবং মাত্রা বুঝে ব্যায়াম ও আহার করা চাই। অর্থাৎ এ-দু'টি ব্যাপারে মধ্য-পথ অবলম্বন করবেন।

বাড়ীতে যাঁরা কাজ-কর্ম্ম করেন, সে কাজ-কর্ম্মে তাঁদের ব্যায়াম-সাধনা হয়। বাটনা-বাটা, জল তোলা, বিছানা করা, ঘর-ঝাঁট দেওয়া, টেবিল-খাট প্রভৃতির ধুলা ঝাড়া—নিত্য যদি নিয়মিত ভাবে এ-সব কাজ করেন, তাহলে তাতে মোটামুটি রকমে ব্যায়াম-চর্চ্চা নিষ্পন্ন হবে, নিশ্চয়।

অনেকে আবার জিজ্ঞাসা করেছেন, খাওয়া-দাওয়ার পর ব্যায়াম করা উচিত কি না? এ প্রশ্নের উত্তরে বিশেষজ্ঞেরা বলেন,—খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানা ঝাড়া, বিছানা করা, সিঁড়ি ওঠা-নামা বা বেড়ানো—এ-সব কাজ করলে যে ব্যায়াম-সাধনা হবে, তার ফলে পরিপাক-ক্রিয়া স্বচ্ছন্দ হবে, সুনিদ্রা হবে। তবে খাওয়া-দাওয়ার পর মেহনতীর ব্যায়াম একেবারে অনুচিত।

শেষে বলি, পিত্তরক্ষা হয়, এমন অল্প-আহার কি করে করা চলে? পাঁচ-সাতটি বাদাম-পেস্তা খেলে দু'-তিন ঘণ্টা যদি আর-কিছু না খান, তাহলেও কোনো অপকার হবে না। একটি-মাত্র কমলা-লেবু যদি খান, তাহলে দেড় ঘণ্টা কাল আর-কিছু না খেলেও পিত্ত পড়বে না—দেহের শক্তিতে অপচয় ঘটবে না।

অস্বীকার

১৩

কল্লোলই!

আকাশ হইতে পরী নামিয়া যদি সামনে আসিয়া দাঁড়াইত, তাহা হইলেও কল্লোল এত আশ্চর্য্য হইত না, যেমন হইল শিপ্রাকে দেখিয়া! তার গান গেল থামিয়া। আচম্কা বেত খাইলে যেমন হয়, তেমনি সে শিহরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

শিপ্রা তার পানে চাহিয়া আছে···দু'চোখে একাগ্র দৃষ্টি···সে-দৃষ্টিতে যতখানি বিস্ময়, ঠিক ততখানি আনন্দ!

শিপ্রার পানে চাহিয়া আছে কল্লোল···তার মনের মধ্যে বিপুল উচ্ছ্বাসে যেন সাগরের জল ফুঁশিয়া উঠিতেছে! মনের উপর দিয়া পৃথিবীখানা গড়াইতে গড়াইতে দূরে কোথায় সরিয়া চলিয়াছে!

এ দুই নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ মূর্ত্তির পানে চাহিয়া মুক্তিও কেমন হক্‌চকিয়া গেছে! কোথায় কত দূরে এই মগের মুল্লুক···এখানে বৌদির চেনা লোক!

তার পর শিপ্রা প্রথমে কথা কহিল। ডাকিল—কল্লোল বাবু!

কল্লোলের মনে হইল, তার অতীত-দিনের মোটা কালো পর্দ্দার ওদিক হইতে শিপ্রা তাকে ডাকিতেছে! একবার মনে হইল, মাঝে মাঝে যেমন স্বপ্ন দেখে··· স্বপ্নে যেমন শিপ্রার কণ্ঠ শোনে···এ তেমনি?

পরক্ষণে বুঝিল, স্বপ্ন নয়। সত্যকার ডাক। শিপ্রা স্বপ্নে আসিয়া উদয় হয় নাই···সশরীরে আসিয়াছে! মনে পড়িল, অনাদির মুখে কল্লোল শুনিয়াছে শরৎ চৌধুরী আসিতেছে বর্ম্মায়···সস্ত্রীক···শিপ্রা আসিয়াছে!

কিন্তু এখানে পৌছিবামাত্র শিপ্রা তার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছে! অনাদি নিশ্চয় শিপ্রাকে বলিয়াছে কল্লোলের কথা···হয়তো বলিয়াছে, কল্লোল তার সমস্ত অতীত ভুলিয়া, অতীতকে বিসর্জ্জন দিয়া এখানে নূতন করিয়া জীবনের খাতা বাঁধিয়াছে—বাঁচিবার জন্য।

শিপ্রা চারি দিকে চাহিল, চাহিয়া বলিল,—আশ্চর্য্য কিন্তু···মনে হলো, নৌকো করে একটু বেড়াবো। খানিকটা ঘুরতেই আপনার গান শুনবো, তা কখনো ভাবিনি।

কল্লোল হাসিল···মলিন মৃদু হাসি।

শিপ্রা কহিল—গান শুনেই আমি চিনেছি···কল্লোল বাবুর গলা!

কল্লোল নিরুত্তরে শিপ্রার পানে চাহিয়া রহিল।

শিপ্রা বলিল—আজই আপনার কথা মনে হচ্ছিল··· রেঙ্গুনে নেমে। কেন, জানি না। আপনি রেঙ্গুনে আছেন, জানতুম না।···এইখানেই আস্তানা বেঁধেছেন?

শিপ্রার মুখে-চোখে হাসির বিদ্যুৎ! কল্লোল এক-দৃষ্টিতে শিপ্রার পানে চাহিয়াছিল। মন বলিতেছিল, সেই শিপ্রা! ঠিক তেমনি আছে! মাঝখানে এ ক'টা বৎসরে তার জীবনে কত ঝড়-জল, কত বিপ্লব বহিয়া গেছে···সে ঝড়ে-জলে সে-বিপ্লবে কল্লোলের ভিতরে-বাহিরে কত পরিবর্ত্তন···কিন্তু শিপ্রা···ঝড়-জল-বিপ্লবের এতটুকু আঘাত শিপ্রাকে স্পর্শ করে নাই! কেন

করিবে? নারী যা চায়···ধন-জন-ঐশ্বর্য্য···খ্যাতি-মান-সম্ভ্রম···শিপ্রা তার সব পাইয়াছে! একটা নিশ্বাস বুক চিরিয়া ছুটিয়া বাহির হইতেছিল···কল্লোল সবলে সে নিশ্বাস রোধ করিল।

শিপ্রা বলিল—এখনো অবাক্ হয়ে রইলেন! বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি, আমি শিপ্রা?

মৃদু হাস্যে অস্ফুট-কণ্ঠে কল্লোল বলিল—বিশ্বাস করবার কথা নয়।

শিপ্রা হাসিল; হাসিয়া বলিল,—কিন্তু অবিশ্বাস করবার কারণ নেই। বিশ্বাস করতেই হবে কল্লোল বাবু। আমি সত্যি শিপ্রা···তার ছায়া নই, মায়া নই।

সে-যুগে শ্রীরামচন্দ্রের স্পর্শে অহল্যা যেমন দীর্ঘ যুগ পরে পাষাণের আবরণ ভাঙ্গিয়া আবার মানুষের মূর্ত্তিতে জাগিয়া উঠিয়াছিলেন, শিপ্রার কণ্ঠস্বরে বহুদিনকার পুঞ্জিত পাষাণ-ভার ঠেলিয়া কল্লোল তেমনি মানুষ হইয়া জাগিয়া উঠিল! কল্লোল বলিল—কিন্তু···

তার পর কণ্ঠ নীরব,—চোখে হাজার প্রশ্ন!

সামনে শুষ্ক কাঠের স্তূপ। শিপ্রা একটা কাঠের উপর বসিল; বসিয়া নিজের ভ্যানিটি-ব্যাগ খুলিয়া আয়না বাহির করিল, আয়না দেখিয়া মুখের একটু প্রসাধন সাধন করিল; করিয়া আবার চাহিল কল্লোলের পানে··· কল্লোল তেমনি চাহিয়া আছে···শিপ্রার পানেই! সে-দৃষ্টিতে তেমনি প্রশ্ন···

হাসিয়া শিপ্রা বলিল—আমার কি মনে হচ্ছে, জানেন?

কোনো মতে কল্লোল বলিল—কি?

—হাসবো, না, কাঁদবো···বসবো, না, চলে যাবো, বুঝতে পারছি না!

শিপ্রার কথায় হেঁয়ালি।

কল্লোল বলিল—কেন?

শিপ্রা কহিল,—আপনি এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন! যিনি মনস্তত্ত্ববিদ্ বলে' গর্ব্ব করেন···হাভ্‌লক্ এলিস্, আল্‌ডুস হক্সলি ছাড়া যিনি আর কিছু মানেন না!

শিপ্রার চোখের দৃষ্টিতে হাসি নয়···যেন ঝক্‌ঝকে একখানা ধারালো ছুরি!

কল্লোল বলিল—মনে সে-সবের ছায়াও আর নেই, শিপ্রা। কিন্তু তুমি বলো, তোমারই বা এমন মনে হচ্ছে কেন?

শিপ্রা বলিল—আপনার সঙ্গে হঠাৎ এখানে এমন ভাবে দেখা হবে, এ ছিল আমার স্বপ্নের অগোচর! আপনার কথা আমি ভুলিনি। মাঝে-মাঝে মনে হয়। মনে হয়, আবার যদি কখনো দেখা হয়, তাহলে সে-দেখার আগে প্রচুর আয়োজন গড়ে তুলতে হবে হয়তো!··· কিন্তু সে কথা যাক্। এখানে, মানে, এইখানেই চিরদিনের আস্তানা বেঁধেছেন না কি?

মলিন মৃদু-হাস্যে কল্লোল বলিল—আস্তানা ঠিক নয়, পাখীর বাসা। মাইগ্রেটরি বার্ড···যেদিন যে-গাছ ভালো লাগে!

দাঁতে অধর চাপিয়া অকম্পিত দৃষ্টিতে শিপ্রা চাহিয়া রহিল কল্লোলের পানে। মনের মধ্যে যেন এঞ্জিনের ষ্টীম প্রধূমিত হইতেছে···শিপ্রা বলিল—কোথায় বাসা··· দেখতে পাই না?

কল্লোল যেন শিহরিয়া উঠিল! কহিল—সে কি বাসা? তোমার পায়ের ছোঁয়া পাবার যোগ্যতা সে-বাসার নেই, শিপ্রা!

শিপ্রা কহিল—অনেক বড়-বড় কথা শিখেছেন··· উন্নতি হয়েছে ঢের, দেখছি! বর্ম্মার সম্বন্ধে আমার মনে এমন সব অদ্ভুত ধারণা ছিল···আজ দেখছি, সে-ধারণা ভুল নয়!

—তার মানে?

—মানে, সেকালে বৈরাগ্য নিয়ে মানুষ যেতো হিমালয়ের দিকে···এখন সে-হিমালয়ের আদর গেছে··· বর্ম্মা তার আসন দখল করেছে।

কল্লোল কোনো জবাব দিল না···শিপ্রার পানে চাহিয়া রহিল।

শিপ্রা বলিল—আরো দু'-চার জনের কথা শুনেছি··· তাঁরাও মনের দুঃখে বৈরাগ্য নিয়ে হিমালয় না গিয়ে বর্ম্মায় এসেছিলেন।

কল্লোল বলিতে যাইতেছিল—তুমিও তাই বর্ম্মায়···? বলা হইল না। বাধা দিয়া শিপ্রা বলিল,—তবু আপনাকে বর্ম্মায় দেখবো, বলেছি তো, এ ছিল আমার স্বপ্নের অগোচর! আপনার কথা যখনি ভেবেছি, তখনি মনে

হয়েছে, আর-যেখানেই আপনি থাকুন, বর্ম্মায় কখ্‌খনো না !...এই কাল রাত্রেই ষ্টীমারের বার্থে শুয়ে কিছুতে ঘুম আসছিল না...আপনার কথা ভাবছিলুম...

কল্লোল বলিল—শুনে কৃতার্থ হলুম, শিপ্রা।

শিপ্রা কহিল—আপনি কৃতার্থ না হলেও আমার তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু যাক্, আচ্ছা, আপনার সঙ্গে সেই শেষ দেখা, সে বড় অল্পদিন নয়...তার পর থেকে ঠিক পরের চ্যাপ্‌টার থেকে যদি আমাদের কথা সুরু করি? কিন্তু বসুন...কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন? আমি এখনি চলে যাবো, এমন কথা মনে করবেন না।

এ কথা বলিয়া শিপ্রা চাহিল মুক্তির পানে। মুক্তি সকৌতুহলে আগাইয়া গিয়া বাঁশ-ঝাড়ের অন্তরালে কটা কুটীর, সেই কুটীরের পানে চাহিয়া কি দেখিতেছিল!

একটা কাঠের গুঁড়ির উপরে কল্লোল বসিল, বলিল—সঙ্গের ও সঙ্গিনীটি?

শিপ্রা কহিল—লৌকিক সম্পর্কে দাসী। কিন্তু ভারী ভালো মেয়ে। গরীবের ঘরে জন্মেছে...পেটের দায়ে দাসী-বৃত্তি করছে...কিন্তু যাদের দাস্য করে, তাদের চেয়ে ওর ভাগ্য ঢের ভালো।

কল্লোল হাসিল, হাসিয়া বলিল—তা বুঝেছি। ভাগ্য ভালো না হলে শিপ্রা দেবীর দাস্য-পরিচর্য্যার ভার পাবে কেন?

শিপ্রা কহিল,—কাব্য-কথা নয় কল্লোল বাবু...বাস্তব সত্য! ওর জীবনের যেটুকু ইতিহাস শুনেছি, তাতেই বুঝেছি, আমাদের মতো দামী শাড়ী-গহনা পরে না...পরবার সম্ভাবনা না থাকলেও ওর যা ঐশ্বর্য্য আছে...আপনার-আমার তার কণাও নেই!

কথাটা বলিয়া শিপ্রা নিশ্বাস ফেলিল!

কল্লোল সে-নিশ্বাস লক্ষ্য করিল। লক্ষ্য করিয়া বলিল,—শুনে খুশী হলুম যে, শিপ্রার জানা অন্ততঃ একটি মেয়ে আছে, যার সুখ-সম্পদে শিপ্রার হিংসা হয়।

শিপ্রা তাড়াতাড়ি জবাব দিল,—না, না, হিংসা নয়। হিংসা হলে এমন করে ওর সুখ-ঐশ্বর্য্যের কথা বলতে পারতুম না কল্লোল বাবু। একে হিংসা বলে না...একে বলে, শ্রদ্ধা।

কল্লোল বলিল—বেশ...শ্রদ্ধাই! মেনে নিচ্ছি আমি, কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা করে এই কথাই বলতে এসেছো তুমি?

শিপ্রা কহিল,—না...কোনো বিশেষ কথা বলতে আসিনি। কি-বা এমন বিশেষ কথা আছে বলবার? তা নয়। তবে দেখা হয়ে গেল...অকস্মাৎ! এখন মনে হচ্ছে, যেন অনেক কথা আছে...এত কথা যে, বসে বসে সারা জীবন ধরে বললেও সে-কথার শেষ হবে না। কি কথা যে বলবো...কোন্ কথা দিয়ে কথা সুরু করবো ভেবে পাচ্ছি না কল্লোল বাবু।...আপনি পারেন কথা সুরু করতে? কোনো কথা আপনার মনে জাগেনি...এতদিন পরে আমার সঙ্গে দেখা হলে কি-কথা বলবেন...কখনো তা ভাবেন নি?

কল্লোলের মনে যেন বিপ্লব বাধিয়া গিয়াছে! পুরানো-হারানো সব-কিছুর হিসাব শেষ করিয়া দেউলিয়া দোকানদার নূতন খাতা বাঁধিয়া নূতন করিয়া কারবারের পত্তন করিতে বসিয়া যেমন কি করিবে ভাবিয়া পায় না, কল্লোলের মনের অবস্থা ঠিক তেমনি। চট্ করিয়া সে শিপ্রার কথার জবাব দিতে পারিল না।

শিপ্রা বলিল—বলুন...কোনো কথা যদি না থাকে, তাহলে তাও না হয় বলুন। পাছে আমার আঘাত লাগে ভেবে মমতা করবার কোনো কারণ নেই। জীবনে এ বয়সে অনেক আঘাত পেয়েছি কল্লোল বাবু...সে-আঘাতে মন পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে। কোনো নতুন আঘাত সে-পাথরে আর এতটুকু আঁচড় কাট্‌তে পারবে না!

কথার শেষে নিশ্বাসের এক রাশ বাষ্প...সে বাষ্পভার সবলে শিপ্রা মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিল।

কল্লোল বলিল—তুমি এখানে আসছো, এ খপর আমি শুনেছিলুম কাল। শুনে অবধি ভাবছি, বর্ম্মায় শরৎ চৌধুরী আসতে পারেন...তাঁর আসার নানা কারণ থাকতে পারে। পৌরাণিক যুগের রাজা-রাজড়ারা যেমন মৃগয়ায় বেরুতেন! তেমনি। কিন্তু তুমি...

সস্মিত হাসি-মুখে শিপ্রা বলিল—স্বামীর প্রেমে বিভোর হয়ে তাঁর বিরহে কাতর হবো ভেবে আমি আসিনি! আমার আসার কারণ বলবো?

—বলো...

—একঘেয়ে জীবন অসহ্য বোধ হচ্ছিল।…ভাবলুম, বাড়ীর বাইরে এক্সট্রা-অর্ডিনারী কত কি ঘটে মানুষের জীবনে…দেখা যাক, আমার জীবনে যদি তেমন-কিছু ঘটে!

কল্লোল বলিল—কিন্তু বাঙালী-ঘরের বিবাহিতা বধূ… তার জীবনে এক্সট্রা-অর্ডিনারী-কিছু ঘটবার অবকাশ কোথা? যে-সব লোক খুব অর্ডিনারীভাবে বাস করছে, তাদের জীবনে এক্সট্রা-অর্ডিনারী কিছু ঘটা… অসম্ভব, শিপ্রা!…

এ কথায় কি ছিল, ঠিক না বুঝিলেও শিপ্রার অজ্ঞাতে তার মুখচোখ রাঙা হইয়া উঠিল। শিপ্রা কোনো জবাব দিল না।

কল্লোল বলিল—সে বরং আমায় বলতে পারো… এক্সট্রা-অর্ডিনারী লাইফ্…খেয়ালে ভর করে' চলেছি জীবনের পথে…আজ আমাকে এখানে দেখছো, কাল কোথায় থাকবো, নিজে জানি না…অনিশ্চয়তার অন্ত নেই!

তার পর কল্লোল বলিতে লাগিল…অনেক কথা। বলিল, প্রিন্সিপ্‌ল্ মানিয়া অনেকে চলে। কি করিয়া চলে, ভাবিয়া তার বিস্ময়ের সীমা নাই। জীবনে সে-ও অনেক প্রিন্সিপ্‌ল্‌কে মনে-প্রাণে গ্রহণ করিয়াছিল…মনে-মনে পণ করিয়াছিল, এই প্রিন্সিপ্‌ল্ মানিয়া চলিবে পারে নাই। দু'দিনে প্রাণ যেন হাঁফাইয়া উঠিয়াছে! মনে হইয়াছে, প্রিন্সিপ্‌ল্‌কে স্বীকার করা…তার মানে, বন্ধন! বন্ধনে মন যদি ব্যথা পাইল, তাহা হইলে জীবনে রহিল কি?

কল্লোলের কথায় এমন ইঙ্গিতও ফুটিয়া বাহির হইল… কল্লোল ভাবিত, শিপ্রা এবং কল্লোল…দু'জনকে বিধাতা এক-ছাঁচে গড়িয়াছেন…সমান তেজ, সমান সাহস, সমান খেয়াল…দু'জনে যদি চিরদিন পাশাপাশি থাকিত, তাহা হইলে কি যে হইত…তা হইবার নয়! হয় না!

এ-ইঙ্গিতে শিপ্রার সর্ব্বাঙ্গ ছমছম করিয়া উঠিল…

এমন সময় মুক্তি আসিয়া ডাকিল—বৌদি…

শিপ্রা যেন ছিল আর-এক-পৃথিবীতে…মুক্তির আহ্বানে চিরদিনকার এই পৃথিবীতে আবার ফিরিয়া আসিল! বলিল—কি রে?

মুক্তি বলিল—মাঝি বলছে, বেলা হয়ে যাচ্ছে…তাকে ফিরে রান্না-বান্না করতে হবে।

শিপ্রা চাহিল কল্লোলের পানে।

কল্লোল বলিল—সত্যি, সকালেই বেরিয়েছো বোধ হয়…সেখানে স্বামী-দেবতাও উতলা হবেন! প্রথম দিন দেরী করে ফেরা ঠিক হবে কি? খুব ভালো জায়গা বলে বর্ম্মার রেপুটেশন নেই…এই সব এ্যারিষ্টোক্রাট্ বাঙালীর কাছে অন্ততঃ। তিনি ভয় পেতে পারেন।

শিপ্রা কহিল—হুঁ। কিন্তু এলুম যখন, আপনার ঘর-বাড়ী দেখাবেন না?

—ঘর-বাড়ী দেখবে? এসো…সত্যি, ক্ষোভ কেন থাকে? কথাটা বলিয়া কল্লোল হাসিল।

শিপ্রা চাহিল মুক্তির পানে…বলিল—আমি এখনি আসছি মুক্তি। তুই মাঝিকে বরং বলে আয়, দেরী হবে না।

বলিয়া শিপ্রা চলিল কল্লোলের সঙ্গে…

খানিকটা আসিয়া শিপ্রা কহিল—একা আছো? না, কোনো বর্ম্মীজ রঙ্গিনী…?

এ-কথায় লজ্জা-ও-গ্লানির ভারে কল্লোলের মন কুণ্ঠিত হইল। কল্লোল বলিল—তুমি পাগল হয়েছো, শিপ্রা!

১৪

চকিত দ্বিধা! শিপ্রাকে লইয়া ঐ কুটীরে? সেখানে আছে গঙ্গা…

মনে মনে কল্লোল হাসিল। হাসিয়া মনকে বলিল, কল্লোল রায়ের মনে দ্বিধা! কখনো যা হয় নাই… না…না!

শিপ্রাকে সঙ্গে করিয়া কল্লোল আসিল গৃহের দ্বারে। অনাদির দুই ছেলে ঘরে বসিয়া জোর-গলায় কথার মানে মুখস্থ করিতেছে, ইংরেজী পোইট্রি মুখস্থ করিতেছে…

রুমালে নাক চাপিয়া শিপ্রা কহিল—পড়াশুনা হচ্ছে। …ইস্কুল? না, বোর্ডিং খুলেছেন?

কল্লোল বলিল,—না। আমার এক বন্ধু অনাদি… কলকাতার বন্ধু…তার দুই ছেলে ইস্কুলে পড়া করছে…। এসো…বাইরেটাই এমন। ভিতরে নোংরা নয়…ইনফেক্‌শনের ভয় নেই।

শিপ্রা কহিল—সে ভয় আমার কোনো কালে নেই··· কিছুতে না।

কল্লোল বলিল—ভালো কথা। কিন্তু···

কল্লোল থমকিয়া দাঁড়াইল···

শিপ্রা বলিল,—দাঁড়ালেন যে?

কল্লোল বলিল—আমার এই বন্ধু অনাদি···মানে, উনি হলেন তোমার স্বামী শরৎ চৌধুরী মশায়ের ভৃত্য। অর্থাৎ তাঁর ওপারের অফিসে বেচারী সামান্য কেরাণীর কাজ করে।

শিপ্রা চাহিল কল্লোলের পানে, কহিল,—সে আমার অপরাধ না কি?

কল্লোল বলিল—অপরাধ তোমার নয়, কিন্তু আমার হতে পারে। অপরাধ হবে এই যে, তোমার ভৃত্যের ঘরে তুমি পদার্পণ করবে!

—আপনার তামাসা একটু কম করুন, কল্লোল বাবু। তার চেয়ে বলুন, আপনার আস্তানায় আমার প্রবেশ-অধিকার মিলবে না। থাক্, আমি জোর-জুলুম করছি না। আসি তাহলে···

কথাটা শেষ করিয়া শিপ্রা ফিরিল। কল্লোল বিস্ময় বোধ করিল। শিপ্রা হঠাৎ ফিরিল যে···

কল্লোল ডাকিল—শিপ্রা···

শিপ্রা দাঁড়াইল, কল্লোলের পানে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল—ও একটা ভুল হচ্ছিল···নমস্কার-জানানো। এখন জানাচ্ছি, নমস্কার!

শিপ্রা আবার চলিল। কল্লোল ভ্রূ কুঞ্চিত করিল··· মেলোড্রামা সুরু করিয়াছ!···দাম বাড়াইতে চাও!

কল্লোল আসিল শিপ্রার পিছনে, বলিল—ভদ্রতায় খাটো করে তুমি গিয়ে তোমার স্বামীকে বলবে, একটা অসভ্য জানোয়ার···তা আমি তোমায় বলতে দেবো না। বেলা হয়েছে···খোলা নৌকো···রোদে মাথা ফেটে না গেলেও মেজাজ গরম হতে পারে। আমি ছাতা নিয়ে আসি। তার পর নৌকোয় করে তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসবো। সেজন্য গমনে যদি পাঁচ মিনিট বিলম্ব হয়··· কিম্বা বলো যদি, ট্যাক্সি করেও যেতে পারো। তোমার বাসা?

শিপ্রা বলিল—মিস বার্কার্স হোটেল।

—সে হোটেল আবার কোথায়?

হাসিয়া শিপ্রা বলিল—মিষ্টার কল্লোল রায়ের অজানা হোটেল রেঙ্গুনে আছে তা হলে!···এ হোটেল হলো আরুণ্ডেল ষ্ট্রীটে।

—ও···তা হলে কি-সিদ্ধান্ত হলো?

শিপ্রা বলিল—নৌকোয় ফিরবো।

—আমি ছাতা নিয়ে আসি। একে বর্ম্মা দেশ··· এখানকার রোদে বেশী ঝাঁজ!

শিপ্রার কি মনে হইল। হাসিয়া শিপ্রা বলিল— বেশ···আসুন আপনি ছাতা···

ছাতা লইয়া কল্লোল তখনি ফিরিয়া আসিল। আসিয়া দেখে, শিপ্রা দাঁড়াইয়া আছে।

কল্লোল বলিল—ছাতা এনেছি।

শিপ্রা কহিল—আসুন। মুক্তি বেচারী হয়তো ভাবছে!

কল্লোল বলিল—হুঁ······

দয়াময়ী আসিতেছিল এই পথে—বাজার করিয়া। দূর হইতে দেখিল, সজ্জিতা এক তরুণী মহিলার মাথায় ছাতা ধরিয়া কল্লোল চলিয়াছে জলের দিকে। দয়াময়ী আসিয়া একটা ঝোপের পাশে দাঁড়াইল···

আসিয়া কল্লোল ডাকিল—মাঝি···

মাঝি কহিল—বড় লেট্ হয়ে গেল বাবু-সাব্···

কল্লোল কহিল—আর লেট্ নয়। এসে গেছি···

শিপ্রার হাত ধরিয়া কল্লোল তাকে নৌকায় তুলিয়া দিল। মুক্তি নৌকায় উঠিল। তার পর কল্লোল।

মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল।

শিপ্রা বলিল—আমার হাতে ছাতা দিন্ কল্লোল বাবু···আপনাকে মাইনে দিয়ে ছত্রধর রাখিনি···

শিপ্রার হাতে কল্লোল ছাতা দিল। মুক্তিকে পাশে বসাইয়া ছাতা খুলিয়া সেই ছাতায় শিপ্রা দু'জনের মাথা রক্ষা করিল।

শিপ্রার কাণের কাছে মুখ আনিয়া মুক্তি বলিল—কে, বৌদি?

শিপ্রা চাহিল কল্লোলের পানে, ডাকিল—কল্লোল বাবু···

কল্লোল বলিল—কেন?

—মুক্তি জিজ্ঞাসা করছে, আপনি কে?

কল্লোল জবাব দিল না।

নৌকা চলিয়াছে···নদীর জলে রৌদ্র-কিরণ ভাঙ্গিয়া যেন মাণিকের মালা ভাসাইয়া দিয়াছে!

শিপ্রা বলিল—মুক্তিকে কি-পরিচয় দেবো, বলুন···

একটা উদ্যত নিশ্বাস চাপিয়া কল্লোল বলিল—বলতে পারো, শরৎ চৌধুরী মশায়ের আপিসের কেরাণী অনাদি···সেই অনাদির বন্ধু···

শিপ্রা কহিল—ও···

তার পর ক্ষণেক নীরব থাকিয়া মুক্তিকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—শুনলি তো মুক্তি···ওঁর কেরাণীর বন্ধু। মনিবের স্ত্রী এসেছিল বাড়ী দেখতে···খাতির করে তাঁর মাথায় ছাতা ধরে পৌঁছে দিতে চলেছেন।

মুক্তি আর কোনো কথা বলিল না···এ উত্তরে খুশী হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল!···

নৌকা চলিয়াছে। কাহারো মুখে কথা নাই।

শিপ্রা ডাকিল—কল্লোল বাবু···

কল্লোল কহিল—ইয়েস্ ম্যাডাম্···

ইচ্ছা করিয়া ইংরেজীতে জবাব দিল···মুক্তিকে পরিহাস-ছলে বা বিরক্তি-ভরে এই মাত্র শিপ্রা যে-কথা বলিয়াছে, তার পর নাম ধরিয়া ডাকিতে বাধিল!

শিপ্রা কহিল—চুপচাপ বসে না. গিয়ে যদি বলি, একটা গান···

কল্লোল বলিল—দুপুর-রোদে গান! তাছাড়া মনের অবস্থা ঠিক গান গাইবার মতো নয়!

শিপ্রা কৌতুক বোধ করিল, বলিল—মনের হঠাৎ এমন অবস্থান্তর হলো কেন? একটু আগে ঐ মন নিয়েই তো দিব্যি গান গাইছিলেন!

কল্লোল বলিল—একটা কথা আছে। বোধ হয়, জানো···পলকে প্রলয়! পৃথিবীতে পলকে-পলকে কত দিকে কত প্রলয় ঘটে যাচ্ছে···সে-খপর মাল্‌টি-মিলিয়নেয়ার শরৎ চৌধুরীর স্ত্রী কি বুঝতে পারবেন?

এ কথার পর শিপ্রা আর কোনো কথা কহিল না।

নৌকায় সকলে নীরব। নৌকা ভাসিয়া চলিয়াছে স্রোতের মুখে···

নৌকা হইতে নামিয়া শিপ্রা বলিল,—এই নৌকোতেই ফিরবেন না কি?

কল্লোলও নামিল, বলিল—না।

—যাবেন কি করে?

দু'চোখে করুণা, না, কি···কল্লোল বলিল—যেতে হবে?

শিপ্রা কহিল,—তার মানে?

কল্লোল বলিল—মানে, তোমার চাকরদের ঘর নেই হোটেলে? যদি সে-ঘরে একটু জিরিয়ে নি?

শিপ্রার রাগ হইল। শিপ্রা কহিল—এ আমার বাড়ী নয়, হোটেল-বাড়ী। চাকরদের ঘর আছে কি না, থাকলেও কত-বড় ঘর, সে-ঘরে আপনার বসবার জায়গা হবে কি না, অত খপর নেবার ফুরশৎ আমার হয়নি। তার দরকারও বোধ করিনি যে, এ-কথার জবাব দেবো!

হাসিয়া কল্লোল বলিল—রাগ হয়েছে?···ভয় নেই! তামাসা করছিলুম। আমি বাড়ী ফিরবো। হেঁটে ফিরবো—না হয় একটা রিক্‌শ নেবো'খন···

শিপ্রা বলিল—এই রোদে হেঁটে না গিয়ে দয়া করে রিক্‌শতেই ফিরবেন।

কল্লোল কহিল—ইস্, আবার দরদ?

শিপ্রা কহিল—মানুষের উপর মানুষের দরদ হবে, এ কি খুব আশ্চর্য্য কথা? তার উপর আমার মাথায় ছাতা ধরলেন পাছে আমার মাথা ধরে! আর···

কল্লোল বলিল—হোটেল পর্য্যন্ত আগে চলো। তোমাকে পৌঁছে দি। তার পর কর্ত্তব্য-চিন্তা···

হোটেলের দ্বারে কল্লোল বিদায় চাহিল। শিপ্রা কহিল,—বাঃ, ছাতাটা রেখে যাবেন না কি?

ছাতা লইবার জন্য কল্লোল হাত বাড়াইল। শিপ্রা বলিল—এই রোদে আমায় পৌঁছে দিতে এলেন···আর অন্ততঃ এক-গ্লাস জল না খাইয়ে যদি আপনাকে ছেড়ে দি, তাহলে আমার পাপের সীমা থাকবে না।

কল্লোল বলিল—কিন্তু···

শিপ্রা বুঝিল এ কিন্তুর অর্থ। বলিল—আপনার বন্ধুর মনিবের সঙ্গে দেখা হবে না। ভয় নেই! তিনি এখানে নেই···পারিষদ নিয়ে শীকারে বেরিয়েছেন।

কল্লোল বলিল—গৃহ-স্বামীর অনুপস্থিতিতে···

শিপ্রা বলিল—কথা-কাটাকাটি করে নিজের দর আর নাই বাড়ালেন কল্লোল বাবু! এত কাল পরে হঠাৎ এই বিদেশে দেখা···আপনার সঙ্গে আমার কত কথা কইতে ইচ্ছা হচ্ছে। আর আপনি আমায় বোঝাতে চান, আপনার সে-ইচ্ছা হচ্ছে না!

কল্লোল যেন শিহরিয়া উঠিল! ডাকিল,—শিপ্রা···

শিপ্রা কহিল—এটা নাট্যমঞ্চ নয় কল্লোল বাবু··· আপনি-আমি নাটকের পাত্র-পাত্রী নই যে, শুধু সংলাপ জমাবো! আমি শিপ্রা, আর আপনি কল্লোল বাবু··· টু ফ্রেণ্ডস মীট্ আফটার এ্যান্ এজ (কত বছর পরে সাক্ষাৎ)! কথাবার্ত্তা না কই, খানিকক্ষণ বসে বিশ্রাম না করে আপনি ফিরতে পাবেন না···এই আমার কথা। পারেন আপনি আমার এ-কথা ঠেলে চলে যেতে?

কল্লোল বলিল—পারি কি পারি না, তা নিয়ে তর্ক নয়, শিপ্রা। তবে আপাততঃ তোমার এ কথা ঠেলে চলে যাবো না।

শিপ্রা কহিল—নিঃশঙ্কে তাহলে আমার সঙ্গে আসুন। তাছাড়া আপনার বন্ধুর মনিব যদি থাকতেন-ও, তাহলেও আমার বন্ধুকে আমি আনতে পারবো না আমার ঘরে আমার সঙ্গে গল্প-সল্প করতে···বাঙালী ঘরের বৌ হলেও এতখানি নির্জীব অপদার্থ বৌ আমি নই!

ঘণ্টাখানেক পরে কল্লোল বিদায় চাহিল। শিপ্রা ইতিমধ্যে স্নান সারিয়া দিব্য-বেশে সাজিয়া আসিয়াছে।

শিপ্রা বলিল—কাল হয়তো আবার দেখা হবে। যাবো আমি আপনার ওখানে!··· রেঙ্গুন-সহর ভালো করে দেখতে চাই। আপনি হবেন আমার গাইড।

কল্লোল কহিল—বেশ···কিন্তু তোমার যাওয়ার চেয়ে আমার পক্ষে এখানে এসে তোমায় নিয়ে যাওয়া সহজ হবে না?

শিপ্রা কহিল—যদি মনে করেন, তাই হবে!···কাল তাহলে এখানে এসে আপনি মধ্যাহ্ন-ভোজন করবেন··· আপত্তি আছে?

—না।

—তাহলে বেলা দশটায়—কেমন?

—আচ্ছা।

কল্লোল ঘরের বাহিরে আসিল। শিপ্রা আসিল সঙ্গে।

ঘরের বাহিরে চওড়া বারান্দা। বারান্দায় আসিবা-মাত্র এক-জন বর্ম্মীজ তরুণী সেলাম করিল। তার হাতে বাঁশের তৈরী রঙীন ট্রে···সেই ট্রের উপর পাতলা ভিজা কাগজে ঢাকা রাশীকৃত ফুল।

তরুণীকে দেখিয়া কল্লোল চমকিয়া উঠিল···মা-শী!

মা-শী যেন ভূত দেখিয়াছে···পাণ্ডুর বিবর্ণ তার মুখ!

চকিতে নিজেকে সংবৃত করিয়া মা-শী ডাকিল,—মঙ্ ছি স্যোয়া (প্রিয়তম জীবন-বল্লভ)! বলিয়াই সে কল্লোলের হাতখানা চাপিয়া ধরিল।

[ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

নটরাজের প্রতি

ত্রিনয়নে জ্বলে বহ্নির শিখা ভৈরব নটরাজ!
শঙ্কর তুমি শঙ্কর রূপে ধরিয়াছ রণসাজ।
পঞ্চ বদনে শ্রীহরি ধ্বনিত,
প্রলয়ের সুর নূপুরে রণিত,
রুদ্র যে তব সংহার-লীলা সম্বর নটরাজ!
সুন্দর তুমি মদন-দহন এই ত্রিভুবন মাঝ।

ভস্ম তোমার অঙ্গ-ভূষণ, কণ্ঠে গরল ভরা;
শশাঙ্ক ভালে ভাগীরথী শিরে চরণে মৃত্যু-জরা।
উদ্যত ফণা নাগিনীর দল,
পদ-ভারে ধরা করে টলমল,
তাণ্ডব তব নৃত্য-তালেতে কম্পিত দিশি আজ।
তুমিই ধ্বংস তুমিই সৃষ্টি তবে কেন রণসাজ?

শ্রীযামিনীমোহন কর।
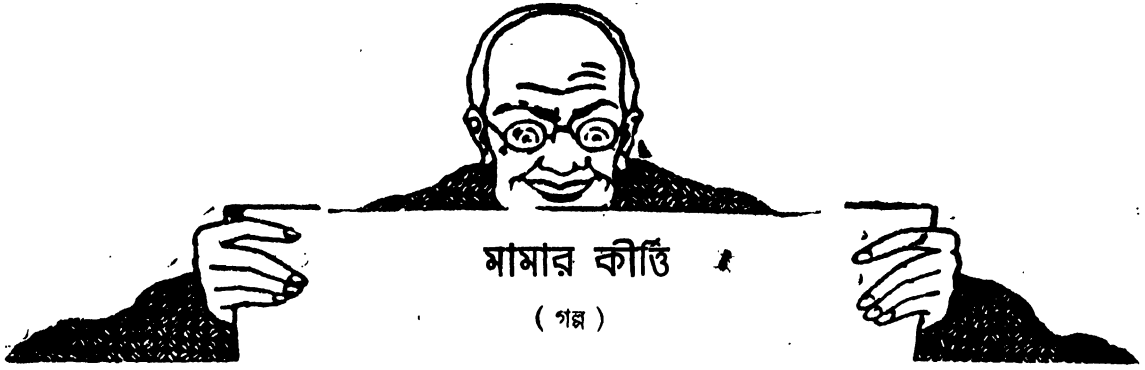
মামার কীর্ত্তি

(গল্প)

ব্রীজ খেলাটা দিব্যি জমে উঠেছে। পাশের টেবিলে পেয়ালা-ভরা ধূমায়মান চা রেখে বসন্ত যে কখন অন্তর্দ্ধান করেছে, সে দিকে কারও খেয়াল নেই! এক টাকা পার পয়েন্ট ষ্টেক্। রীডবলের খেলা। প্লেয়াররা, এমন কি, দর্শকরা পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ! এমন সময় একটা বুক-ফাটা দীর্ঘশ্বাসে আমরা চম্‌কে উঠলুম। কে?—এক কোণে ঈজি-চেয়ারে শায়িত শিবপ্রসাদ অর্থাৎ শিবু আমাদের নজরে প'ড়ে গেল! অত্যন্ত 'এনার্জেটিক' অর্থাৎ অত্যুৎসাহী ছোকরা। ফুটবল সে ভালই খেলে। তার এমন মনমরা অবস্থা! কারণ কি? এতই আন্‌মনা, উদাস ভাব যে, হাতের সিগারেটটা পুড়তে পুড়তে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে! কোন দিকেই নজর নেই। শিবনেত্র নির্লিপ্ত, যেন সমাধিস্থ। সঙীন অবস্থা নিরীক্ষণ ক'রে আর থাকতে পারা গেল না। জিজ্ঞেসা করলুম,—"হ্যাঁ রে শিবু, তোর দুঃখটা কি বল তো,—অর্থাৎ প্রাণগতিক ভাল তো?"

শিবুর চমক ভাঙ্গল। লজ্জিত হয়ে সে ঘাড় নেড়ে বললে,—"ও কিছু নয়।"

যতীনদা জিজ্ঞেসা করলে,—"তোরা হচ্ছিস্ ইয়ংম্যান। ঠিক বল, ওটা কি? প্রেম?"

"না, না," ব'লে শিবু প্রচণ্ড বেগে ঘাড় নেড়ে প্রতিবাদ জানালে।

কানু জিজ্ঞেসা করলে,—"তবে কি ভাবছিলি? ঠিক বল।"

"মানুষ আত্মহত্যা কেন করে?" প্রশ্নের উত্তরে এই অদ্ভুত প্রশ্ন জিজ্ঞেসা ক'রে শিবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অগত্যা আমরা সকলেই অবাক্ হয়ে রইলুম!

তিনকড়ি মুখুয্যে অর্থাৎ আমাদের বারোয়ারী তিনুদা অনেকেরই হাঁড়ির খবর রাখেন; তিনি সেই দিকে একটা নির্ঘাত দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে অগত্যা বললেন,—"হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে! মনের আর অপরাধ কি বলো; মন তো বেচারার খারাপ হবেই। ওর মামার জন্য—"

"কেন? অক্কালাভ করেছেন তিনি?"

"তাহলে তো বেচারা বেঁচে যেতো! তিনি কলকাতায় আসছেন।"

"এতে দুশ্চিন্তার কি কারণ থাকতে পারে?"

"বিলক্ষণ আছে। সে-বার অবস্থাটা যা করেছিলেন—"

"গল্পটা খুলেই বল না শুনি।"

"শুনবে? কিন্তু ওটা হচ্ছে পরের প্রাইভেট কথা!"

"আমরা তো আর কাউকে বলতে যাচ্ছি নে; আর আমরা ঠিক পরও নই।"

"বেশ, এ হাতটা শেষ ক'রে নাও। তার পর গোড়া থেকে আরম্ভ করলেই চলবে।"

* * *

গল্পটা এই,—

বেশ স্ফূর্ত্তির সঙ্গে চা'টা গলাধঃকরণ ক'রে শিবপ্রসাদের মাতুল রাধিকারঞ্জন বাবু বললেন—"শিবু, চল, এইবার একটু সান্ধ্য-ভ্রমণে বেরিয়ে পড়া যাক্।"

শিবুর মুখ সহসা পাংশুবর্ণ ধারণ করলে—যেন কত কালের বকেয়া রোগী। ক্ষীণ কণ্ঠে বললে,—"কিন্তু আমার শরীরটা আজ বড্ড খারাপ ঠেকছে—"

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে রাধিকা বাবু বললেন, "সেই জন্যই তো সান্ধ্য-ভ্রমণ তোমার পক্ষে আরও বেশি প্রয়োজন। তোমরা কলকাতার ছেলে, খালি ক্লাব আর সিনেমা পেলেই খুশী। চল, আর দেরী করা চলবে না। বেরিয়ে পড়া যাক—এখুনই। এতে শরীর ও মন দু'ই ভাল থাকবে। তুমি নিজেকে একদম্ আমার হাতে ছেড়ে দাও তো বাবাজি! দেখ, দু'দিনে তোমার স্বাস্থ্য কি রকম ইমপ্রুভ ক'রে তুলি।"

—মাতুলের এই অনুরোধ বা আদেশ প্রত্যাখ্যান করবার উপায় নেই। যখন-তখন দুটো-পাঁচটা টাকা চাইলে মামা কোনো দিন 'না' বলেন না; সুতরাং তাঁর অবাধ্য হওয়া চলে না। অগত্যা শিবপ্রসাদকে উঠ্‌তে হ'ল। তবু ভয়ে ভয়ে আর একবার প্রতিবাদের সুরে সে বললে, —"কিন্তু সে-বার যে রকম মুস্কিলে ফেলেছিলেন মামা!"

"আরে না, না," মাতুল হেসে বললেন,—"আর সেজন্য দায়ী ঠিক আমি তো ছিলুম না বাবাজি! পুলিশ ব্যাটারই যত নষ্টামি! যাক্, সে কথা ভুলে যাও। আজ তোমায় আমি আমার পূর্ব্বপুরুষদের অর্থাৎ তোমার মাতামহ-দের পৈতৃক ভিটা দেখতে নিয়ে যাব।—বুঝলে?"

"সে আবার কোথায়? আপনাদের পিতৃভিটা তো বসিরহাটে।"

"এখন তাই বটে; তবে এককালে সেটা—যাকে তোমরা এখন ঢাকুরিয়া বল, সেইখানে ছিল। চল, দেখিয়ে আনি। তেমন দূরে নয় তো।"

শিবুর আর আপত্তি চললো না; তাকে রাজী হ'তে হ'ল। অতঃপর দু'জনে 'যথাকালে উপনীত ঢাকুরিয়া-ধামে'।

* * * *

কিছুক্ষণ বেড়াতে বেড়াতে একটা ছোট দ্বিতল অট্টা-লিকার সামনে এসে হঠাৎ সেখানে দাঁড়িয়ে রাধিকা বাবু বললেন,—"যদি আমি ভুল না ক'রে থাকি, তবে জেনে রাখ, শতখানেক বছর আগে আমাদের পৈতৃক বাস্তভিটা ছিল ঠিক এই স্থানে; আর আজ"—মুখের কথা শেষ না করে তিনি করুণ নেত্রে চারধারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলেন।

শিবপ্রসাদ তাঁর কথার সমর্থনে বল্‌লে, "তা হবে।" তার মনটা আজ ভালই ছিল। মামার সঙ্গে সে বাড়ী থেকে বেড়িয়েছে এক ঘণ্টারও ওপর, অথচ এখন পর্য্যন্ত কোন ফ্যাসাদে পড়তে হয়নি, এ কি তার কম সৌভাগ্য? সে জানিত, মামার খেয়ালের অন্ত নেই!

এমন সময় অধিকতর খেয়ালী বরুণঠাকুর হঠাৎ বিনা-এত্তেলায় প্রবল বেগে বর্ষণ আরম্ভ করলেন। মুষলধারে নয় তো, সে বারিধারা যেন ভীমের গদার রাজসংস্করণ! মামা তাড়াতাড়ি শিবুর হাত ধরে টান্‌তে টান্‌তে সামনের বাড়ীর দরজার নীচে আশ্রয় নিলেন। অবশ্য তাকে আশ্রয় বলা যায় না। মাথার ওপর যৎসামান্য আচ্ছাদন, কিন্তু তাতে মাথা বাঁচে না। প্রাণপণে দরজা ঘেঁসে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই হঠাৎ দরজা গেল খুলে। যেন বিধাতা বিপদ জানতে পেরে দয়াপরবশ হয়েই আশ্রয় দিলেন। শিবুর মনে তখন একটু কবিত্বও যে অঙ্কুরিত হয়নি এমন নয়; একটি সুন্দরী ষোড়শী সেই খোলা দরজায় যদি দাঁড়িয়ে বীণাবিনিন্দিত স্বরে বলেন, "কাকে চাই?"—তা হলে কবিত্বের চরম!

কিন্তু তা নয়, দরজার পাশ থেকে হেঁড়ে-গলায় প্রশ্ন হ'ল, "কাকু ছাউছন্তি?"

শিবুর স্বপ্ন সেই প্রশ্নে ভেঙ্গে গেল। সে দেখলে সামনে দাঁড়িয়ে খোঁচা-খোঁচা একমুখ দাড়ী-গোঁফসমেত এক উৎকট উৎকলনন্দন! শিবু হতভম্ব হয়ে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে তার দিকে চয়ে রইল; সত্যই যেন "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ!"

মামা বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই বাড়ীটাই পুষ্পকুঞ্জ তো?"

বাড়ীর গায়ে নাম লেখা ছিল।

"আইগাঁ হুঁ"—উৎকলবাসীর কণ্ঠ হ'তে এই উত্তর নিঃসারিত হ'ল। সেই কণ্ঠস্বরের তুলনায় ষণ্ডের হুঙ্কার যথেষ্ট কোমল।

"বাবু বাড়ী আছেন কি?"

"আইগাঁ না। মা মণে শ্যামবাজারে খাইতি যাইছি। বাবু বি ঘণ্টে বাদ আপিস সু ফিরিবে পরা।"

চিন্তিত ভাবে মাতুল বললেন,—"তাই তো, বাবু যে আমাদের আসতে বলেছিলেন। তোমায় কিছু বলে যাননি?"

"আপন কু কিছু কামোটামো অছি?"

জানালা দিয়ে রেডিও দেখা যাচ্ছিল। মামা বললেন, "আমরা রেডিও সারাতে এসেছি। তুমি জানতে না?"

"না। বাবু মুক' তো কিছু বলি যাইনি। আপন মণে দয়া কিরি টিকে বসি যাউন। বাবু আইলে সবু কামো হইব।"

এই কথা বলে সে শিবু ও রাধিকা বাবুকে বৈঠকখানায় বসালে। মামা তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে রেডিওটা নেড়ে-চেড়ে দেখতে লাগলেন।

উড়ে বললে, "মোর কামো অছি। মু টিকে ঘুরি আসি। বাড়ীর' আউর' লোক আছি। যাইবার বেলে কই, কি যিব। মু তেবে চ্যল্লি।"

"আচ্ছা বেশ, বেশ! তুমি তোমার কাজে যাবে বই কি! আমাদের দেরীও হ'তে পারে। কি কি খারাপ হয়েছে, তা না দেখে তো বলতে পাচ্ছিনে। বেশ, তুমি যাও। আমার কাজ হয়ে গেলে কাউকে ডেকে দরজা বন্ধ করে যেতে বলব। তার মধ্যে যদি তুমিই এসে পড তো আর কোন ল্যাটাই থাকবে না। বুঝলে তো?"

চাকর সে কথা বুঝে বেরিয়ে গেল। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে মামা গ্যাঁট হ'য়ে সোফায় বসে বললেন,—"দেখলে তো, কেমন আশ্রয় যোগাড় করা গেল।—কিচ্ছু না, স্রেফ্ একটু বুদ্ধি, আর মুখের দুটো মিষ্টি কথা। ব্যস্! নইলে, বুঝতেই পারছো, এতক্ষণ কি অবস্থা হ'ত। তুমি সম্পূর্ণরূপে আমার হাতে আত্মসমর্পণ করো—আমি মাতুল আছি, দেখবে, কিচ্ছু ভাবতে হবে না।"

এ কথা শুনে রবি বাবুর লাইন-দু'টো তার মনে পড়লো—'যেমন মাতুল কংস, মামা কালনিমে!' কিন্তু শিবপ্রসাদ মৌখিক আপত্তি করে বললে,—"কিন্তু এখানে এ ভাবে বসে থাকা তো চলবে না।"

চক্ষু দু'টি ছানাবড়ার মত স্ফীত করে মাতুল বললেন,—"চলবে না! কি বলছ তুমি! এই বৃষ্টিতে বাইরে বার হব? ব্যাপারটা কি রকম গুরুতম হবে জান না তো! যদি ভিজে সর্দ্দি লাগে, তবে তোমার মামী কি আর আমায় আস্ত রাখ্বে? বাড়ী থেকে আসবার সময় বার বার করে বলেছিল, গরম সোয়েটার আর মাফলার পরতে, ছাতা আর ওয়াটারপ্রুফ সঙ্গে নিতে। আমি বলেছিলুম, ফুঃ, ও সব কি হবে? এখন যদি ভিজে সর্দ্দি হয়, ওরে বাপ—" রাধিকা বাবু আর ভাবতে পারলেন না। ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করলেন।

শিবু প্রশ্ন করলে,—"ধরুন, যদি বাড়ীর মালিক এসে পড়েন—" কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে দরজায় খট্‌খট্ শব্দ! শিবু তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। জানলা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মাতুল বললেন, "একটা রোগা লিক্‌লিকে চেহারার লোক। বড় বড় চুল, মাথায় টুপি, পরনে আলখাল্লা-কোট, পায়ে নাগরা; নিশ্চয়ই কবি কিংবা আর্টিষ্ট। ওর এ বাড়ী হতেই পারে না। সাহিত্যিক, কবি অথবা শিল্পী আমাদের দেশে প্রতিভার পরিচয় দিলে খেতেই পায় না, বাড়ী করবে কোত্থেকে? অতএব নির্ভয়ে দরজা খোলা যেতে পারে।" মাতুল দরজা খুলে দিলেন। আগন্তুক ভেতরে এসে চারি ধারে চেয়ে নমস্কার করে প্রশ্ন করলেন,—"জগবন্ধু বাবু কি বাড়ী আছেন?"

শিবু পিছনে দাঁড়িয়ে ভয়ে বলিদানের পাঁটার মত কাঁপছিল। পাছে ব্যাপারটা বেশি দূর গড়ায়, সেই জন্য সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল,—"না, তিনি বাড়ী নেই। আমরাও তাঁর জন্য—" কিন্তু রাধিকা বাবু তার কথা আর শেষ করতে দিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন,—"ছিঃ নকুলচন্দোর, মিথ্যে কথা বলতে নেই। আমি বাড়ী রয়েছি, ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন, আর তুমি তাঁকে ফিরিয়ে দিচ্ছ? এটা ভারী অন্যায়। দেখুন, ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, আমার হার্টের অসুখ। ডাক্তাররা লোক-জনের সঙ্গে দেখা করতে অথবা কথা কইতে বারণ করেছেন। তাই নকুল সকলকে বলে,—আমি বাড়ী নেই।—আমায় ও বড্ডই ভালবাসে, একই ছেলে কি না! তার পর আপনার নাম?"

আগন্তুক হেসে উত্তর দিলেন,—"আজ্ঞে, আমার নাম হলো গিয়ে জ্যোৎস্না সেন।"

"বসুন। মহাশয়ের কি করা হয়?"

জ্যোৎস্না সেন একটা মোড়ার ওপর আড়ষ্ট হয়ে বসে হাত নেড়ে বললেন,—"আমি বিতরণ করি, অর্থাৎ শুধু বিলিয়ে দিয়ে থাকি—"

"কি বিলোন? টাকা?" বিস্ফারিত নেত্রে রাধিকা বাবু এই প্রশ্ন করলেন।

"আজ্ঞে না, রত্ন, অর্থাৎ ভাব-রত্ন। আমি কবি।"

"ওঃ, তাই বলুন।"

মাথা চুলকিয়ে সলজ্জ ভাবে জ্যোৎস্না সেন প্রশ্ন করলেন—"বেলা এসেছে?"

শিবুকে মাতুল জিজ্ঞাসা করলেন—"নকুল, বেলা এসেছে না কি?"

শিবু উত্তর দিলে,—"না।"

মাতুল জ্যোৎস্না সেনকে বল্‌লেন,—"কই, এখনও আসেনি তো।"

জ্যোৎস্না বাবু বল্‌লেন,—"কিন্তু আমাকে সে বলেছিল—আজ এখানে আসবে।"

রাধিকা বাবু উত্তর দিলেন,—"তাহলে নিশ্চয়ই আসবে।"

জ্যোৎস্না বাবু বল্‌লেন,—"আপনি বোধ হয় তাকে দেখেননি। আপনার স্ত্রী তার মাসীমা। শুনেছি, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বিবাহের আগেই বেলার মা-বাবার ঝগড়া হয়েছিল। তাই তাঁরা কখনও আপনার সঙ্গে দেখা করেননি। এমন কি, আপনার বিবাহের সময় পর্য্যন্ত তাঁরা আসেননি।"

ঠিক, মনে পড়ছে বটে! তা একটু-আধটু মনোমালিন্য অমন হয়েই থাকে। তা মনে করে বসে থাকা ভারী অন্যায়। আমরা, বল্‌তে গেলে, ঝগড়ার কারণটা পর্য্যন্ত ভুলে গেছি।"

"ভুলে য়াওয়াই তো উচিত।—দেখুন, আমি বেলাকে বিশেষরূপে বহন অর্থাৎ বিবাহ করতে চাই।"

"এ তো অতি সাধু প্রস্তাব। আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। অবশ্য আমার বয়স হয়েছে, বলা হয় তো উচিত হবে না। কিন্তু আপনাদের মত কবিরাই ভালবাসতে জানে। তাদের হাতে মেয়ে দেওয়া সৌভাগ্য।"

তাড়াতাড়ি নতজানু হয়ে মাতুলের পদধূলি নিয়ে জ্যোৎস্না সেন বললেন,—"আশীর্ব্বাদ করুন। সকলে যদি আপনার মত উদার ও বুদ্ধিমান্ হত! ওর বাবা গুণধর বাবু, ওর কাকা হলধর বাবু, ওর মামারা—মানে গোপাল বাবু আর রাখাল বাবু এ প্রস্তাবে কিন্তু একেবারেই নারাজ। তাঁদের মতে—আমি বেলার যোগ্য পাত্র নই।"

"কেন, ওরা কি? লাট না নবাব? জমীদারী আছে?"—তাচ্ছিল্যভরে রাধিকা বাবু প্রশ্ন করলেন।

"কিছুই না। এই নিয়ে সে-দিন বেলার বাবার সঙ্গে আমার কথা-কাটাকাটি হয়ে গিছল। আমি বললুম,—আপনি কি এমন—অ্যাঁ!" জ্যোৎস্না বাবু লাফিয়ে উঠলেন। "ঐ যে ওঁরা এসে পড়েছেন। বেলা, বেলার মা, বাবা—এখন কি হবে?" মুখে ভীতির ভাব।

"কেন, আপনি ওদের সঙ্গে দেখা করতে চান না?"

"আজ্ঞে না।"

"তবে তাড়াতাড়ি সোফার পেছনে বসে পড়ুন।"

মাতুলের উপদেশ মত কার্য্য তৎক্ষণাৎ সুসম্পন্ন হ'ল। ওদিকে দরজায় কড়া-নাড়ার শব্দ। শিবপ্রসাদের গলা শুকিয়ে গেছে। মাতুল দরজা খুলতে চললেন। শিবু বাধা দিয়ে বললে—"ওদের ঢুকতে দেবেন না কি?"

"নিশ্চয়ই। না ঢুকতে দিলে সন্দেহ করবে যে! এখনও বৃষ্টি পড়ছে।"

কড়ানাড়ার ধ্বনি ক্রমশঃ প্রবলতর হ'ল। মাতুল বল্‌লেন,—"এখুনি খুলে না দিলে গোলমালে কোন চাকর-বাকর এসে পড়তে পারে।—তুমি খুব গম্ভীর মুখে রেডিও নিয়ে নাড়া-চাড়া কর।"

অগত্যা, শিবু মুখ প্যাঁচার মত গম্ভীর ক'রে রেডিওর তার টানাটানি করতে লাগল, অর্থাৎ সেটটির পরকাল ঝরঝরে করে দিল। ওদিকে আগন্তুকদের নিয়ে মাতুল এসে হাজির হলেন। এক জন মাথায় টাক-পড়া, ঝাঁকড়া-গোঁফ্ প্রৌঢ়, আর রোডরোলার টাইপের মহিলাও একটি,—শিবু মুখব্যাদান করে তার দিকে তাকিয়ে রইল। সেই সঙ্গে বেলাই বটে;—যেন সদ্য-ফোটা একটি ফুল!

মহিলাটি বললেন—"আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না। আমি হরিদাসীর বড় বোন। আমার নাম কালিদাসী। কখনও দেখেননি কি না। আপনাদের বিয়েতে আমরা আসিনি।"

তাড়াতাড়ি পায়ের ধূলো নিয়ে মাতুল বললেন,—"আপনি ওঁর দিদি, সুতরাং আমারও দিদি। আমায় আপনি জগা বলেই ডাকবেন। আগেকার মনোমালিন্যের কথা ভুলে যান।"

"এটি হচ্ছে আমার মেয়ে বেলা; আর ইনি হচ্ছেন তোমার ভায়রাভাই। আগে তো পরিচয় ছিল না।"

"আজ্ঞে না। পরিচিত হ'য়ে প্রচণ্ড রকম সুখী হলুম।"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাধিকা বাবুর দিকে চেয়ে শ্রীমতী কালিদাসী বললেন,—"আমি তোমার বয়স আরও কম মনে করেছিলুম।"

"আজ্ঞে, আমার যা বয়স, তার চেয়ে কম বয়স কি করে হবে? হবার উপায় নেই। তবে কম বয়সের মত দেখাবার চেষ্টা করি।"

হঠাৎ শিবপ্রসাদের দিকে চোখ প'ড়তেই ভদ্রমহিলাটি প্রশ্ন করলেন—"ওটি কে?"

"রেডিওর মিস্ত্রী।"

"এর সামনে আমাদের ঘরের কথা—"

"আজ্ঞে না—বলতে কোন অসুবিধা হবে না। লোকটা বদ্ধ কালা।"

শিবপ্রসাদ শুনলে; কিন্তু কালা সে, সুতরাং উত্তর দিতে পারলে না।

মহিলা বললেন,—"আমি বেলার কথা বলছিলুম। আজকালকার মেয়েরা কি যে হচ্ছে! বলে কি না —জ্যোৎস্না সেন না কে একটা বেকার নিষ্কর্ম্মা অকর্ম্মণ্য আছে—তাকেই বিয়ে করবে!"

বেলা ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে কাঁদতে বললে—"না, তিনি অকর্ম্মণ্য হবেন কেন? তিনি কবি।"

"সব বেকারই কবি,"—মহিলাটি গর্জ্জন করলেন।

মাতুল বললেন,—"কবিতা লেখা বিলক্ষণ শক্ত। আমি তো অনেক চেষ্টা করে পারিনি। অবশ্য গবিতা —মানে গদ্য কবিতা, সেটা এক রকম চালিয়ে নিই।"

কালিদাসী বললেন,—"আমার ঠাকুরপো হলধর এ-বিয়েতে একদম নারাজ।"

এতক্ষণে টেকো ভদ্রলোক ঝাঁকড়া গোঁফের মধ্যে থেকে সায় দিয়ে বললেন,—"হুঁ।"

মহিলাটি বলে চললেন,—"অথবা আমার ভাই রাখাল, কিংবা গোপালও—"

ভদ্রলোক আবার সম্মতিজ্ঞাপন করে বললেন,—"হুঁ।"

বেলা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। শিবুর ইচ্ছে হ'ল—কিন্তু উপায় নেই। সে বদ্ধ কালা!

মাতুল সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,—"কেঁদ না মা! আমার যদি মেয়ে থাকত তো আমি এক জন কবির সঙ্গেই বিয়ে দিতুম।"

ক্রন্দনরতা বেলা বললেন,—"তিনি বড় হবেনই, উন্নতি করবেনই। অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁর। কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না তাঁকে। তিনি নিশ্চয়ই উঠবেন।"

সত্যিই তিনি উঠলেন। মশার কামড় আর সহ্য করতে না পেরে সোফার পিছন থেকে জ্যোৎস্না সেন তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলেন। আগন্তুকরা বিস্মিত, স্তম্ভিত!

সেন মহাশয় এগিয়ে গিয়ে বললেন,—"বেলা!"

রোডরোলার হুমকি দিয়ে বললেন,—"থামো।"

প্যাঁকাটিমার্কা জ্যোৎস্না সেন গাছের গুঁড়িসদৃশ হলেও-হতে-পারতেন শাশুড়ীর চিৎকার শুনে থমকে দাঁড়ালেন। মহিলাটি শ্লেষপূর্ণ স্বরে বললেন,—"আচ্ছা লোকের কাছে এসেছি। তুমিও এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছ? তা থাকবে বই কি! হরিদাসীর স্বামী তো— আমাদের সঙ্গে শত্রুতাচরণ না করলে তোমার চলবে কেন?"

জ্যোৎস্না সেন বললেন,—"সত্যি বলছি, উনি এ সকল ব্যাপারের কিছুই জানেন না।"

"হুঁ, শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল!"—ঠোঁট উল্টিয়ে মহিলাটি এই মন্তব্য করলেন।

জ্যোৎস্না বাবু বললেন,—"আপনি ভুল করছেন। ওঁর মত সহৃদয় বুদ্ধিমান্ লোক আজ-কাল প্রায়ই দেখা যায় না; তাই আমি ওঁর সামনেই জিজ্ঞাসা করছি —আমার সহিত আপনারা আপনাদের কন্যা বেলারাণীর বিবাহ দিতে সম্মত আছেন কি?"

"না, না, না!" মহিলাটি গর্জ্জন ক'রে বললেন,— "তোমার আছে কি? বাড়ী, গাড়ী, জমিদারী, টাকাকড়ি এবং রকমারি—"

বাধা দিয়ে কবি বললেন—"কিন্তু এই কি সব? মানুষের কি অন্য কোন দাম নেই? কবিতা, শিল্প, প্রেম, ভালবাসা—"

মাতুল আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। বললেন, —"বটেই তো! এ সবের কি কোন দাম নেই? আজ না হয় ওর পয়সা নেই, কিন্তু তা হতে কতক্ষণ! এই গুণধর বাবুর অথবা রাখাল কিংবা গোপাল বাবুর পয়সা এল কোত্থেকে?"

ধনুকের ছিলা-ছেঁড়ার মত তড়াং করে লাফিয়ে উঠে মহিলাটি প্রশ্ন করলেন,—"কি বলতে চাও তুমি? স্পষ্ট করে বল—শুনি।"

"বলছি—গুণধর বাবু কি করে টাকা করলেন? একটি বিধবা তাঁর কাছে টাকা গচ্ছিত রেখেছিল। তিনি তাই মেরে নিয়ে শেয়ার-মার্কেটে স্পেকুলেশন করে আঙুল ফুলে কদলী তরু হয়েছেন। এ কথা তো সকলেই

জানে। এখন হয় তো বিধবার টাকাগুলি শোধ দিয়েছেন—”

বিস্ফারিত নেত্রে বেলা বললেন,—“কই, আমি তো এ কথা ঘুণাক্ষরেও জানতুম না।”

মাতুল নরম-গলায় বললেন,—“জানতে না? তা তোমাকে এ সব কথা এঁরা কি করে বলবেন? আমারও বলাটা অন্যায় হয়ে গেল।”

ভদ্রমহিলা চিৎকার করে বল্‌লেন,—“মিথ্যা কথা!”

মাতুল শান্ত ভাবে বলে চল্‌লেন,—“তার পর রাখাল বাবুর কথা। তিনি তো কুসীদজীবী; স্বয়ং শাই-লককেও হার মানিয়েছেন। কাবুলিওয়ালারা তো ওঁর কাছে শিক্ষানবিশী করে। ওঁর নাম করলে হাঁড়ী ফাটে। খেতে বসে ওঁর নাম উচ্চারণ করলে বাড়া-ভাতেব থালায় বিড়াল ঝাঁপিয়ে পড়ে—তাও দেখা গেছে!”

জ্যোৎস্না সেন প্রফুল্ল কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন,—“সত্যি!”

ভদ্রমহিলা একেবারে হন্যে হয়ে উঠেছেন। মুখ দিয়ে তাঁর কথা সরছে না। টেকো ভদ্রলোকটি নিষ্ফল ক্রোধে খালি গোঁফ নাচাচ্ছেন।

মাতুলের অশ্রান্ত বক্তৃতা চল্‌ছে।—“তার পর ধরুন গিয়ে—গোপাল বাবুর কথা। ব্যাঙ্কের চাকরী, কতখানি ঝুঁকীর কাজ! তুমি বাপু সে তহবিল থেকে টাকা নিয়ে ‘রেস’ খেল কোন্ হিসেবে? অবশ্য বরাত ভাল, তাই জিতলে। ব্যাঙ্কের টাকা তার পরদিন আবার ব্যাঙ্কেই ফিরে এল। কিন্তু যদি উল্টা ফল হ’ত। একেই তো রেস-খেলা খারাপ, তার ওপর পাবলিকের টাকা নিয়ে রেস-খেলাটা অতীব গর্হিত কার্য্য। আমাদের বংশে এত কেলেঙ্কারী কুৎসা সব রয়েছে যে, মেয়ের বিয়েতে এ ছেলে ভাল নয়, ওটা অচল বলে নাক সিঁটকানো চলে না। এ রকম পাত্র জোটা তো বরাত।”

“বটেই তো,” বেলারাণী সায় দিলেন।

রোলার চিৎকার করে এবার বললেন,—“এ সমস্তই মিথ্যা কথা। তুমি নিশ্চয়ই এর এক-বর্ণও বিশ্বাস করনি?”

বেলারাণী উত্তর দিলেন,—“আমি সমস্তই বিশ্বাস করেছি মা!”

“আমিও করেছি,”—জ্যোৎস্না সেন তাঁর উক্তির প্রতিধ্বনি করলেন।

মাতুল বললেন,—“আমাদের সংসারের এত কুৎসা জানবার পর ওঁর সঙ্গে বিয়ে না দিলে মেয়ের আর বিয়ে দেওয়া যাবে না।”

ক্ষীণ স্বরে বেলা প্রশ্ন করলেন,—“এর পর কি উনি রাজী হবেন?”

গদ্‌গদ কণ্ঠে জ্যোৎস্না বললেন,—“আমি চিরকালই রাজী। আমি তো জানি, পঙ্কের মধ্যেই পঙ্কজের জন্ম!”

শিবপ্রসাদ জানলার কাছে দাঁড়িয়ে রেডিওটির মাথা খাচ্ছিল আর রাস্তার দিকে চেয়ে দেখছিল। নিকটে কোন ঘর-বাড়ী ছিল না। এক জন প্রৌঢ় ভদ্রলোক এ-দিকেই আসছেন, সুতরাং তিনিই বাড়ীর মালিক—এরূপ মনে করা যেতে পারে। হাতে ফাইল, অতএব আপিস থেকেই ফিরছেন। শিবু প্রমাদ গণ্‌লে। তার মুখ থেকে বার হ’ল—“ঐ আসছে রে!”

মাতুলের চমক ভাঙ্গল। বুঝলেন, কোথাও একটা-কিছু ঘটেছে। তাড়াতাড়ি সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে বললেন—“একটু বসুন, আমি রেডিও-মিস্ত্রীর পাওনাটা চুকিয়ে দিয়ে আসছি।”

জ্যোৎস্না সেন প্রশ্ন করলেন,—“আপনি যে বললেন, আপনার ছেলে?”

ভদ্রমহিলা প্রতিবাদের সুরে জানালেন,—“ছেলে মানে? হরিদাসীর তো ছেলে নেই। শুধু পাঁচ মেয়ে।”

মাতুল তাড়াতাড়ি বললেন,—“বোধ হয় তোমার শুনতে ভুল হয়েছে! আমি বলেছিলুম, ওকে আমি ছেলের মতই স্নেহ করি। এস হে!”—বলেই শিবুর হাত ধরে দ্রুতপদে গৃহত্যাগ করলেন। যাবার সময় শুনতে পেলেন, ভিতরে প্রৌঢ়দের সঙ্গে যুবাদের তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডা চলছে।

একটু এগিয়ে যেতেই ফাইল-হাতে আগন্তুকের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ! মাতুল প্রশ্ন করলেন—“আপনার নাম কি জগবন্ধু বাবু?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ।”

“এটি আমার ভাইপো গদাধর চাটুজ্জ্যে। আমার

নাম নীলমণি চাটুজ্জ্যে। আমরা ঐ মোড়ের বাড়ীটা ভাড়া নিয়েছি। এদিকে বেড়াতে এসে দেখলুম, আপনার বাড়ীতে--"

"আমার বাড়ীতে ?"

"আপনার বাড়ীর নামই তো পুষ্পকুঞ্জ ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তবে আপনার বাড়ীতেই দু'জন পুরুষ আর দু'জন মহিলা চুরি করবার অথবা অন্য কোন অসদুদ্দেশ্যে ঢুকেছে। আজকাল এ রকম প্রায়ই ঘটছে। ওদের মধ্যে কোন বিষয়ে মনোমালিন্য হওয়াতে গোলমাল হচ্ছে।"

"অ্যাঁ, তাই না কি ?"

"আপনি গিয়ে ওদের আটক করুন ; আমরা পুলিশ ডেকে নিয়ে আসছি।"

"ধন্যবাদ। দেরী করবেন না।"

"এই এলুম বলে। আপনি এগিয়ে গিয়ে আট্কান।"

ভদ্রলোক আর একদফা ধন্যবাদ দিয়ে বাড়ীর দিকে ছুটলেন। রাধিকা বাবুও শিবপ্রসাদ-সহ পা চালিয়ে দৃষ্টি-পথের বাহিরে চলে গেলেন।

বাসে উঠে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে মাতুল বল্‌লেন—"যাক্, বিকেলটা মন্দ কাটল না। আমি চাই, চারি দিকে আনন্দ দান করতে। এখন বাড়ী গিয়ে খেয়ে-দেয়ে একটা নাইট-শো'তে সিনেমা গেলে মন্দ হয় না।"

শিবপ্রসাদের মুখে কিন্তু কথা নেই।

শ্রীযামিনীমোহন কর, এম-এ (অধ্যাপক)।

স্বপনে

নিদ্ নাহি ছিল নয়নে—
বাতায়নে একা ছিনু গো দাঁড়ায়ে
তেয়াগি নিশীথ-শয়নে।

ডুবে যায় চাঁদ চতুর্দ্দশীর,
কাঁপে আলো-ছায়া শিরে বনানীর,
ঝিরি ঝিরি ঝিরি দখিণ সমীর
বহিতেছে মৃদু স্বননে—
তটিনীর জল করে ছল্ ছল্,
রজনী—বিদায়-লগনে।

এ হেন সময়ে চমকি হেরিনু
অদূর-কাননে মোর—
র'য়েছে দাঁড়ায়ে কালিয়াবরণ,
নিঠুর হৃদয়-চোর।
শিথিল হইল বসন আমার,
ত্রস্তে ছুটিনু খুলিয়া দুয়ার,
এখনো র'য়েছে ধরণী আঁধার
জাগেনি পূরবে ভোর,
চলিনু ছুটিয়া ছিঁড়িয়া নিশির
কালিমা-তিমির ঘোর।

এত উচ্ছাস জেগেছিল প্রাণে
আছিল যে-পথ চেনা,
কতবার মোর ভুল হ'লো তারে
কতবার কহি—এ না।
ঘুরি বারবার বহু বনপথ
লতা-গুলঞ্চ ছিঁড়িলাম কত,
কুটিল চরণে কাঁটা শত শত
অধরে উঠিল ফেনা—
বহু'খন পর অবশেষে পাই
সেই পথ চির-চেনা।

হেরিনু তাহারে আমারি পথেতে
ফিরিয়া আসিছে ধীরে,
এত প্রতীখার পরেতে সজনী
হারাতে পারি, লো, কি রে ?
চলে না চরণ, তবু ছুটিলাম
অবশেষে তার কাছে আসিলাম—
লুটায়ে পড়িব চরণে যেমনি
অমনি দেখিনু—শয়নে
রয়েছি পড়িয়া ; ভেঙ্গে গেল নিদ্—
অশ্রু ঘনালো নয়নে !

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধ—

রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধের পাঁচ মাস পূর্ণ হইল। হিট্‌লারের দৃষ্টিতে রুশিয়ার অস্তিত্ব আর নাই; বিশ্বের ইতিহাসে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বড় সাম্রাজ্য না কি কখনও ধ্বংস হয় নাই! প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েট রুশিয়া সাম্রাজ্য নহে, উহার ধ্বংসও এখনও সাধিত হয় নাই।

সোভিয়েট রুশিয়া শ্রেণীহীন (Classless) দেশ; তথায় ধনী ও নির্ধনে বিদ্বেষ নাই, শ্রমিক ও মালিকে সংঘর্ষ নাই এবং এতদুভয়ের ভিত্তিতে ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির সুযোগও সেখানে নাই। বর্ত্তমান রুশিয়ার সমস্ত ধনসম্পদ্ জাতীয় সম্পত্তি; ফ্রান্সের ন্যায় তথায় দুই শ্রেণীর পুঁজির (Finanace Capital ও Industrial Capital) অধিকারীর চিরন্তন বিরোধ নাই। কাজেই, রণক্ষেত্রের দুঃসংবাদের সুযোগে তথায় কেহ ক্ষমতা ও প্রভুত্ব লইয়া কাড়াকাড়ি করিবে না। বহু পূর্ব্বে দূরদর্শী ষ্টালিন্ এইরূপ সম্ভাবনার সূক্ষ্মতম সূত্রও কঠোর হস্তে ছিন্ন করিয়াছেন। কাজেই, বর্ত্তমানে যুদ্ধের অবস্থা যেরূপই হউক, জার্ম্মাণীর আক্রমণে রুশিয়ার ক্ষতির পরিমাণ যতই অধিক হউক, রুশিয়া কখনও নাৎসী জার্ম্মাণীর নিকট মস্তক অবনত করিবে না। সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি মিঃ হ্যারি হপ্‌কিন্সের সহিত কথোপকথনকালে মঃ ষ্টালিন যে উক্তি করিয়াছেন, উহা তাঁহার নিজের কথা নহে;—সমগ্র রুশ জাতির অন্তরের কথা কম্যুনিষ্ট নেতার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে। মঃ ষ্টালিন বলিয়াছেন—"আমরা পশ্চাৎপদ হইব না। রুশিয়া বৃহৎ, রুশিয়া স্মরণীয়; রুশিয়া রুশিয়ার জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত—সে পুনরায় দাসত্ব-নিগড়ে আবদ্ধ হইবে না।"

অবশ্য ইহা সত্য যে, কেবল দৃঢ়তা ও সাহসের বলেই সকল সময় হিংস্র পশুকে পরাভূত করা সম্ভব নহে। কিন্তু রুশ জাতি কেবল এই দুইয়ের উপরেই নির্ভর করে না; হিংস্র শত্রুর সহিত দীর্ঘকাল সংগ্রামে রত থাকিবার উপযোগী বিশাল অঞ্চল, প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদ ও শ্রমশিল্পও রুশিয়ার আছে। উরল অঞ্চলের এবং সাইবেরিয়ার সম্পদে অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত সে শত্রুর সহিত যুঝিতে পারে। স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য রুশ নরনারীর দৃঢ়তা যদি অটুট থাকে, অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত তাহাদিগের প্রতিরোধবহ্নি যদি নির্ব্বাপিত না হয়, তাহা হইলে শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক, আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিক বায়ু তাহাদিগের অনুকূলে প্রবাহিত হইবেই।

গত পাঁচ মাসে রুশিয়া অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ইউক্রেণের উর্ব্বর গোধূম-ক্ষেত্র ও বিরাট্ শ্রমশিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে সে বঞ্চিত হইয়াছে; লেনিন্‌গ্রাড ও মস্কোএ এখনও রক্ত পতাকা উড্ডীন থাকিলেও ঐ সকল অঞ্চলের শ্রমশিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি পঙ্গু হইয়াছে। লেনিন্‌গ্রাড এখন একরূপ অবরুদ্ধ; সম্প্রতি জার্ম্মাণরা লেনিন্‌গ্রাড-ভলোগ্‌দা রেলপথের টিকৃভিন্ অধিকারের দাবী করিয়াছে। এই দাবী যদি সত্য হয়, তাহা হইলে লেনিন্‌গ্রাডের সহিত রুশিয়ার অবশিষ্টাংশের শেষ রেল-সংযোগও বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। জার্ম্মাণরা এখন মস্কোর উদ্দেশে প্রচণ্ড আক্রমণে প্রবৃত্ত। বর্ত্তমানে আব্‌হাওয়ার অবস্থা এই অঞ্চলে যুদ্ধ-পরিচালনে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে। এখানে জার্ম্মাণীর লক্ষ্যবস্তু লাভে এখনও বিলম্ব আছে বলিয়াই মনে হয়। যুদ্ধের প্রকৃত গুরুত্ব এখন দক্ষিণ অঞ্চলে। কিছুকাল পূর্ব্বে নাৎসীবাহিনী ক্রিমিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে। তাহাদিগের আক্রমণে ক্রিমিয়ার সোভিয়েট-বাহিনী দ্বিধা বিভক্ত হইবার পর সেবাস্তপোল ও কার্চ্চের দিকে পশ্চাদপসরণ করে। সম্প্রতি সোভিয়েট সেনাদল কার্চ্চ ত্যাগ করিয়াছে। এই স্থানে এখন জার্ম্মাণবাহিনী এবং ককেসাসের মধ্যে কার্চ্চ প্রণালী একমাত্র ব্যবধান। ওদিকে ট্যাগানরগ্ হইতে রষ্টভ্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটি বাহিনীও ককেসাসের উদ্দেশে আক্রমণ চালাইতেছিল। সম্প্রতি ককেসাসের দ্বারদেশে

রুশ-সৈন্যগণ ট্যাঙ্ক চালাইবার "র‍্যাম্প" স্থাপন করিতেছে

রষ্টভে নাৎসীবাহিনীর আক্রমণের বেগ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। জার্ম্মাণরা এখন রষ্টভ অধিকারের দাবী করিয়াছে।

ক্রিমিয়া অধিকার করিয়া জার্ম্মাণী কৃষ্ণসাগরে অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে; ককেসাসের তৈলসম্পদে লাভবান হইবার জন্য কৃষ্ণসাগরকে জার্ম্মাণ-হ্রদে পরিণত করা একান্ত প্রয়োজন। ককেসাসে আক্রমণের সুবিধার জন্যও কৃষ্ণসাগরে জার্ম্মাণীর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। য্যাষ্ট্রাখানের শ্রমশিল্পকেন্দ্র অধিকৃত হইবার পর জার্ম্মাণী হয় ত একাগ্র ভাবে ককেসাসের প্রতি অবহিত হইবে। রষ্টভ অঞ্চলের জার্ম্মাণ সৈন্য য্যাষ্ট্রাখানে পৌঁছিবার পর কাস্পিয়ান হ্রদের পশ্চিম উপকূল ধরিয়া বাকুর দিকে অগ্রসর হইবে। কার্চের বাহিনীটি ঐ প্রণালী অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণসাগরের পূর্ব্ব-উপকূল পথে বাটুর অভিমুখে অগ্রসর হইতে প্রয়াস করিবে! ককেসাস্ রক্ষার জন্য বৃটিশ ও সোভিয়েট-বাহিনী একসঙ্গে সংগ্রামে রত হইবে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। জার্ম্মাণীর পক্ষেও ককেসাসে অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং কৃষ্ণসাগরে প্রভুত্ব বিস্তারের উদ্দেশ্যে তুরস্কের প্রতি মনোযোগী হওয়া সম্ভব। প্রথমতঃ, ক্রিমিয়া অধিকারের পর কৃষ্ণসাগরে সোভিয়েট নৌ-বহরের প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ করিবার উদ্দেশ্যে জার্ম্মাণী হয় ত দার্দ্দানেলিজের পথে ইটালীর নৌবহর আনয়ন করাইতে চাহিবে। তুরস্ক যদি যুধ্যমান ইটালীর নৌবহরকে কৃষ্ণসাগরে প্রবেশ করিতে দেয়, তাহা হইলে স্বভাবতঃ ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী শক্তির সহিত তাহার বন্ধুত্বের অবসান হইবে। ইহা ব্যতীত, নাৎসী-বাহিনী ককেসাসে পৌঁছিবামাত্র নাৎসী-সাঁড়াশীর একটি বাহু তুরস্কের ভিতর দিয়া পরিচালনেরও প্রয়াস হইতে পারে।
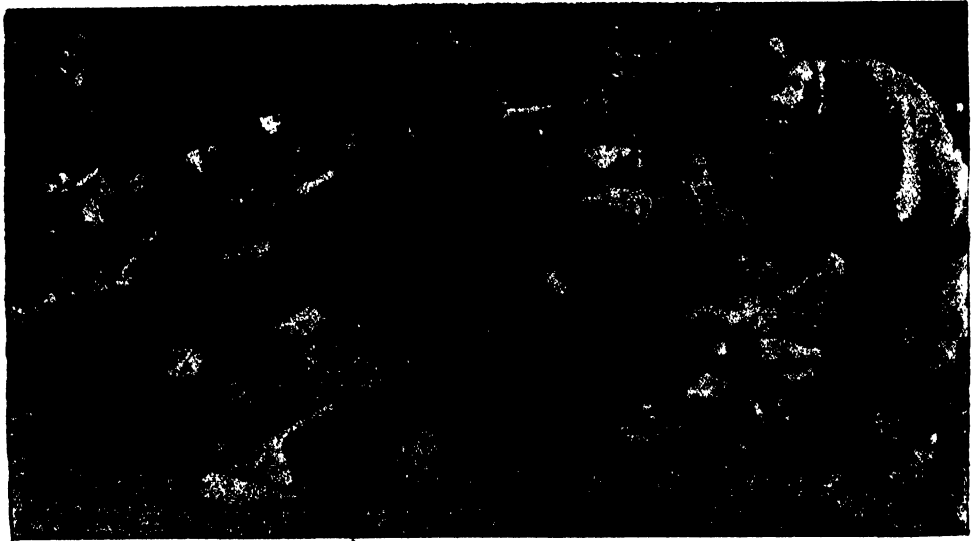
ক্লান্তিতে অবসন্নপ্রায় জার্ম্মাণ-সৈন্য

রণক্ষেত্রে কার্য্যরত রুশ-সাংবাদিকগণ

রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় জার্ম্মাণীর ব্যাপক সাফল্যের

উল্লেখযোগ্য কারণ,—জার্ম্মাণী সমগ্র য়ুরোপ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত, নিঃশঙ্ক—সে সম্পূর্ণ অনন্যমনা হইয়া বল্‌শেভিক রুশিয়ার বিরুদ্ধে "ধর্ম্মযুদ্ধে" রত। মঃ ষ্টালিনের ভাষায় সোভিয়েট-বাহিনীর বিফলতার প্রথম কারণ,—There is no second front in Europe against Germany. কেবল য়ুরোপে কেন, আফ্রিকাতেও ফ্যাসিষ্ট-শক্তি এত দিন তাহার প্রতিপক্ষের জন্য চিন্তিত ছিল না। যে ইটালী তিন মাস কাল বহু তর্জ্জনগর্জ্জন করিয়া এবং সকল আয়োজন সমাপন করিয়া ক্ষুদ্র গ্রীসকে আক্রমণের পরই "নাকের জলে চোখের জলে" ভাসিয়াছিল, রুশ-যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত "সুবর্ণ সুযোগে" সুদীর্ঘ পাঁচ মাসের মধ্যে সেই ইটালীর কেশাকর্ষণেরও কোন চেষ্টা দেখা যায় নাই।

রুশিয়ার বন্ধুর পথে জার্ম্মাণ কামান

জার্ম্মাণীর সাফল্যের দ্বিতীয় কারণ সম্বন্ধে কম্যুনিষ্ট-নেতা বলিয়াছেন,—তাহার বিমান ও ট্যাঙ্কের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। জার্ম্মাণী তাহার নিজের অস্ত্রের কারখানাগুলি ব্যতীত চেকোস্লোভাকিয়া, বেলজিয়াম্‌, হল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের কারখানাগুলি ব্যবহার করিতেছে। একক জার্ম্মাণীর শস্ত্রশক্তির সহিত সোভিয়েট-রুশিয়া সাফল্য সহকারে যুঝিতে পারিত; কিন্তু ঐ সকল অধিকৃত দেশের অস্ত্রের কারখানাগুলি তাহার শক্তি বর্দ্ধিত করিয়াছে। হিট্‌লারের দম্ভোক্তি মিথ্যা নহে—সমগ্র য়ুরোপই আজ সোভিয়েট রুশিয়ার বিরোধিতায় প্রবৃত্ত। বর্ত্তমান যুগের যুদ্ধ যন্ত্রের সংঘর্ষ; এই যুদ্ধে ব্যক্তিগত বীরত্বের স্থান অতি অল্প; প্রচুর যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত অভিজ্ঞ সেনাপতির সৈন্য-পরিচালন-নৈপুণ্যও মূল্যহীন। মিঃ ষ্টালিনের ভাষায়—A modern war is a war of machines.

রুশ-রণক্ষেত্রে হিট্‌লার, মুসোলিনি ও গোয়েরিঙ্গ

জার্ম্মাণীর ক্ষুদে মিত্র ফিন্‌ল্যাণ্ড—

আমেরিকা রুশিয়াকে যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছে, সেই সাহায্য প্রেরণের তিনটি পথ আছে—ইরাণ, আর্চেঞ্জেল ও ভ্লাডিভোষ্টক। ইরাণের পথে সাহায্য প্রেরণ করিতে হইলে মার্কিণ পণ্যপূর্ণ জাহাজের পক্ষে আফ্রিকা মহাদেশ ঘুরিয়া, ১২ হাজার মাইল বিঘ্নসঙ্কুল সমুদ্র অতিক্রম করা প্রয়োজন। তাহার পর, ইরাণে রেলপথের অসুবিধা; এই রেলপথের বিশেষ উন্নতি সাধিত না হওয়া পর্য্যন্ত ইরাণের ভিতর দিয়া প্রভূত সাহায্য প্রেরণ অসম্ভব। ককেসাস্‌ অঞ্চলে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় এই পথ অধিক কাল নিরাপদ থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। তাহার পর, ভ্লাডিভোষ্টকের পথ; সম্প্রতি সুদূর প্রাচ্যের অবস্থা যেরূপ জটিল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে এই পথও অধিক কাল নিরাপদ থাকিবে বলিয়া আশা

করা যায় না। বিশেষতঃ, জাপান ইতিপূর্ব্বেই এই পথ সম্বন্ধে তাহার আপত্তি জানাইয়া রাখিয়াছে। অবশিষ্ট রহিল, একমাত্র উত্তরাঞ্চলে শ্বেতসাগরের আর্চ্চেঞ্জেল বন্দর। মেরু-সাগরের তুষারমুক্ত মুরমানস্ক এখন আর নিরাপদ নহে। আর্চ্চেঞ্জেলের পথে পণ্য-প্রেরণ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য; তবে শীতকালে ক্রমাগত বরফ ভাঙ্গিয়া এই পথ উন্মুক্ত রাখিতে হয়। কাজেই, ধীরগামী সরবরাহ-জাহাজ ব্যবহার ব্যতীত গত্যন্তর নাই। ফিন্‌ল্যাণ্ড যদি যুদ্ধে রত থাকে, ফিন্‌ল্যাণ্ডের ঘাঁটীগুলি যদি জার্ম্মাণ-বিমানের পক্ষে ব্যবহার করা অসম্ভব না হয়, তাহা হইলে জার্ম্মাণীর বোমাবর্ষী বিমান অনায়াসে আর্চ্চেঞ্জেলে আক্রমণ চালাইতে পারে।

মঃ ষ্টালিন আর্চ্চেঞ্জেলের এই গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি ফিন্‌ল্যাণ্ড সম্পর্কে এক কূটনৈতিক কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি জানিতেন—১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের রুশ-ফিনিস যুদ্ধের সময় বৃটেন ও আমেরিকা ফিন্‌ল্যাণ্ডের সমর্থন করিয়াছিল; কাজেই, ঐ যুদ্ধের ফলে রুশিয়া ফিন্‌ল্যাণ্ডের যে সকল অঞ্চল অধিকার করে, তাহাতে রুশিয়ার দাবী তাহারা স্বভাবতঃ স্বীকার করিয়া লইতে পারে না। এই জন্য গত সেপ্টেম্বর মাসে মঃ ষ্টালিনের নির্দ্দেশে ক্যারেলিয়ান্ যোজক হইতে ১৫ ডিভিসন সোভিয়েট সৈন্য অপসারিত হয়। ইহার ফলে ফিন্‌ল্যাণ্ড একরূপ বিনাযুদ্ধেই ভীপুরী অধিকার করে এবং তাহার ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের সীমান্ত সে ফিরাইয়া পায়। ইহার পরেই আমেরিকা ও বৃটেনের পক্ষ হইতে ফিন্‌ল্যাণ্ডকে জানান হয়—১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের সীমান্ত লাভের পরও যদি সে রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত থাকে, তাহা হইলে সে ঐ দুইটি শক্তির মিত্রতায় বঞ্চিত হইবে। ফিনিস্ সরকার বৃটেন ও আমেরিকার মিত্রতার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই; তাঁহারা রুশিয়ার সহিত যুদ্ধে বিরত হইবেন না।

মঃ ষ্টালিন হয় ত আশা করিয়াছিলেন—তাঁহার কূটনৈতিক কৌশলের ফলে ফিন্‌ল্যাণ্ড যুদ্ধে বিরত হইবে। তাঁহার সেই আশা বিফল হইলেও ফিন্‌ল্যাণ্ড এখন বৃটেন ও আমেরিকার মিত্রতায় বঞ্চিত হইল। অদূর ভবিষ্যতে বৃটেনের পক্ষে ফিন্‌ল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণাও অসম্ভব নহে। বস্তুতঃ, রুশিয়ায় মার্কিণী পণ্যের প্রবেশ-পথ যদি বিঘ্নমুক্ত রাখিতে হয়, তাহা হইলে ফিন্‌ল্যাণ্ডকে নিষ্ক্রিয় করিবার জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

লিবিয়ায় বৃটিশ-বাহিনীর আক্রমণ—

গত ১৯শে নভেম্বর বৃটিশ-বাহিনী মিশর হইতে লিবিয়ায় ব্যাপক আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে; প্রথম আক্রমণের ফল উৎসাহজনক। সল্লাম হইতে জেরাবাব পর্য্যন্ত ৯০ মাইলব্যাপী স্থানে অতর্কিত আক্রমণ আরম্ভ করিয়া বৃটিশ সৈন্য ৫০ মাইল অগ্রসর হইয়াছে। শত্রুপক্ষ না কি এই আক্রমণের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না; ফলে তাহাদিগের অনেকে বন্দী হইয়াছে, অনেকগুলি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান বৃটিশ-বাহিনীর অধিকারভুক্ত হইয়াছে। অবশ্য নাৎসী-ফ্যাসিষ্ট-বাহিনী শত্রুকে যথাশক্তি প্রতিরোধ করিতে প্রয়াস পাইবে। এই প্রতিরোধের ফলাফল সম্বন্ধে এখন অভিমত প্রকাশ করা চলে না।

সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতি জার্ম্মাণীর আক্রমণের বেগ হ্রাস করিবার জন্য বহু পূর্ব্বেই বৃটেনের পক্ষ হইতে প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল। এত বিলম্বেও যে আক্রমণ আরম্ভ হইল, তাহা য়ুরোপে নহে—আফ্রিকায়। অবশ্য, ইহাতেও জার্ম্মাণী কিছু চিন্তিত হইবে, সে সহজে লিবিয়া ইটালীর হস্তচ্যুত হইতে দিবে না। লিবিয়ার বালুকারাশির মূল্য অধিক না হইলেও ডার্ণা, বেন্‌ঘাজী, ত্রিপলি প্রভৃতি ভূমধ্যসাগরের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটীগুলি লিবিয়ায় অবস্থিত। ইটালীর নৌবহর এই সকল ঘাঁটীতে বঞ্চিত হইলে বিশেষ অসুবিধায় পড়িবে। তবে, জার্ম্মাণী ফ্রান্সের নিকট হইতে ভূমধ্যসাগরের বিজার্টা, ওরাণ, এল্‌জিয়ার্স প্রভৃতি ঘাঁটী সংগ্রহের জন্য প্রয়াসী হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে জার্ম্মাণীর পরোক্ষ চাপে জেনারল ওয়েগাঁকে আফ্রিকার ফরাসী সাম্রাজ্য হইতে অপসারিত করা হইয়াছে কি না, কে বলিবে? ভিসি কর্ত্তৃপক্ষ যেরূপ ক্রমেই ঘনিষ্টভাবে জার্ম্মাণীর সহিত মিলিত হইতেছেন, তাহাতে উত্তর-আফ্রিকার এবং আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে জার্ম্মাণীর দাবীতে তাঁহারা অসম্মত হইবেন বলিয়া মনে হয় না।

লিবিয়ায় বৃটিশ-বাহিনীর আক্রমণের বেগ হ্রাস করাইবার উদ্দেশ্যে জার্ম্মাণী অতি সত্বর পশ্চিম এশিয়ায় মনোযোগী হইতে পারে। ইতোমধ্যে রুশিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলে জার্ম্মাণীর আক্রমণের প্রাবল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। সে অতি সত্বর তুরস্কের মধ্য দিয়াও সৈন্য-পরিচালনে উদ্যোগী হইতে পারে। সম্প্রতি বুলগেরিয়ায় বিপুল সমর-সরঞ্জাম স্থানান্তরিত হইবার কথা শুনা গিয়াছে; এই জনরব উপেক্ষণীয় নহে। ককেসাসে বৃটিশ ও সোভিয়েট-বাহিনীর সম্মিলিত প্রতিরোধ-প্রয়াস অসম্ভব করিবার জন্য জার্ম্মাণী হয় ত পূর্ব্ব হইতেই তুরস্কের পথে সৈন্য-পরিচালনের কথা চিন্তা করিতেছিল। এখন লিবিয়ায় বৃটিশ-বাহিনীর আক্রমণের বেগ হ্রাস করাইবার জন্য তাহার এই পন্থা অবলম্বনের সম্ভাবনা আরও বৃদ্ধি পাইল।

সন্ধির জনরব—

সম্প্রতি এইরূপ জনরব শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে, হিট্‌লার হয় ত সত্বর সন্ধির প্রস্তাব করিবেন। মিঃ চার্চ্চিল এই সম্ভাবিত প্রস্তাবের উত্তরে বলিয়াছেন,—নাৎসী দানবের সহিত তাঁহারা কখনও সন্ধির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন না। মিঃ চার্চ্চিল অপেক্ষা বৃটেনে হিট্‌লারের বড় শত্রু আর নাই। কাজেই, যদি তিনি সন্ধির প্রস্তাব করেন, তাহা হইলে চার্চ্চিল-মন্ত্রিসভার নিকট তাহা করিবেন না—বৃটিশ জনসাধারণ ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশেই সেই সন্ধির প্রস্তাব উচ্চারিত হইবে। অবশ্য, মিঃ চার্চ্চিলের বক্তৃতার পর হিট্‌লার সুস্পষ্ট ভাষায় আর সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন বলিয়া মনে হয় না। তবে, গত ৮ই নভেম্বর নাৎসী দলের বাৎসরিক উৎসবে হিট্‌লার যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে সন্ধি সম্বন্ধে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে বলিয়া মনে হয়। ঐ বক্তৃতায় যেন তিনি বৃটিশ জনসাধারণকে বলিতে চাহিয়াছেন,—"বর্ত্তমানে সমগ্র য়ুরোপ যখন আমার পতাকাতলে সমবেত হইয়া বল্‌শেভিক-ত্রাস হইতে য়ুরোপকে মুক্তিদানে প্রয়াসী, তখন ওহে বৃটিশ জনসাধারণ, তোমরা কেন মিঃ চার্চ্চিলের স্তোকবাক্যে ভুলিয়া দূরে থাকিবে?"

বৃটেনের পক্ষে এখন জার্ম্মাণীর সহিত সন্ধির আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া অসম্ভব। অন্য সকল কথা বাদ দিলেও ইহার প্রধান কারণ,—নাৎসী-জার্ম্মাণী এখন অত্যন্ত শক্তিশালী; গত

দুই বৎসরে সে কোথাও রণক্ষেত্রে পরাজিত হয় নাই; তাহার সহিত সমকক্ষরূপে সন্ধির আলোচনা করিবার উপযোগী সামরিক সাফল্যের "রেকর্ড" বৃটেনের নাই। কাজেই, এখন যদি বৃটেনকে সন্ধি করিতে হয়, তাহা হইলে জার্ম্মাণীর প্রয়োজনে এবং জার্ম্মাণীর প্রদত্ত সর্ত্তেই তাহা করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত, বৃটেনের বে-সামরিক অধিবাসীর প্রতি নির্ব্বিচারে বোমা-বর্ষণে হিট্‌লারী জার্ম্মাণী সম্বন্ধে বৃটিশ জনসাধারণের বিদ্বেষ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সুদূর প্রাচীতে আসন্ন ঝঞ্ঝা—

জাপানের নব-গঠিত টোজো-মন্ত্রি-সভার মনোভাব এখনও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করিতেছে। জেনারল টোজো আমেরিকার সহিত মীমাংসার জন্ত একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতেছেন। এই উদ্দেশ্তে বিশেষ দূতরূপে মিঃ কুরুসু সম্প্রতি আমেরিকায় প্রেরিত হইয়াছেন। এই আলোচনা যদি বিফল হয়, তাহা হইলে জাপানের আক্রমণাত্মক প্রচেষ্টা কোন্ দিকে প্রযুক্ত হইবে, তাহাই এখন আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে উৎকণ্ঠিত ভাবে লক্ষিত হইতেছে।

সম্প্রতি ইন্দো-চীনে জাপানী সৈন্তের সংখ্যা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে। জেনারল টোজো প্রধান-মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হইবার সময় উত্তর-ইন্দো-চীনে জাপানী সৈন্তের সংখ্যা যত ছিল, এখন উহা তিন গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে! হাইনান্ দ্বীপেও জাপানের ব্যাপক সমরায়োজন চলিতেছে। চুংকিং হইতে জানান হইয়াছে—চীনের ইউনান্ প্রদেশ আক্রমণ করিয়া ব্রহ্ম-চীন পথ ধ্বংস করাই জাপানের উদ্দেশ্য; জাপানের এই আয়োজনের একমাত্র কারণ ইহাই।

চীনের যুদ্ধে জাপান অত্যন্ত বিব্রত—বিপন্ন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চীনের সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী প্রদেশগুলি অধিকার করিয়া—বহির্জ্জগতের সহিত চীনের সকল সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া জাপান চীনের কণ্ঠরোধের ব্যবস্থা করিয়াছিল। কিন্তু ব্রহ্ম-চীন পথ উন্মুক্ত হওয়ায় জাপানের প্রয়াস বিফল হইয়াছে; এই পথে চীনকে সাহায্য-দান করিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া রাখা হইতেছে। এই সাহায্যের জন্তই চীনের যুদ্ধ নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে মিটিবার সম্ভাবনা নাই। বর্ত্তমানে চীন সোভিয়েট রুশিয়ার সাহায্যে বঞ্চিত হইলেও ব্রহ্ম-চীন পথ তাহার সংগ্রামশক্তি অটুট রাখিতেছে। কাজেই, জাপানের পক্ষে এই পথের প্রতি মনোযোগ প্রদান খুবই স্বাভাবিক। এই অঞ্চলের ভৌগোলিক অসুবিধা সত্ত্বেও জাপানের পক্ষে সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া ইউনান্ প্রদেশ আক্রমণ করা অসম্ভব নহে। চীনের যুদ্ধ না মিটিলে জাপান নিশ্চিন্ত চিত্তে অন্ত দিকে মনোযোগী হইতে পারে না; আর এই ব্রহ্ম-চীন পথ ধ্বংস হইবার পূর্ব্বে চীনের যুদ্ধ শেষ হওয়াও অসম্ভব।

জাপানের পক্ষে যেমন, বৃটেন্ ও আমেরিকার পক্ষেও তেমনই চীন-ব্রহ্ম পথের গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। ব্রহ্ম-চীন পথ যদি ধ্বংস হয়, তাহা হইলে উদ্ধত জাপানকে চীনের সাহায্যে ঠেকাইয়া রাখিবার সকল প্রয়াস বিফল হইবে। তখন জাপান নিশ্চিন্ত মনে সুদূর প্রাচীতে বৃটিশ ও মার্কিনী স্বার্থে আঘাত করিতে পারিবে। ইহা ব্যতীত, ইউনান প্রদেশ অধিকারের পর জাপানী খড়্গ ব্রহ্মদেশের মস্তক লক্ষ্য করিয়া উদ্যত হইবে। কাজেই জাপানের ইউনান আক্রমণে বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে কি না, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

জাপানের আক্রমণাত্মক মনোভাবে থাইল্যাণ্ড (শ্যাম) উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। জাপান যদি সুদূর প্রাচীতে বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে চাহে, তাহা হইলে সে সামরিক প্রয়োজনে থাইল্যাণ্ডে অধিকার-বিস্তারে প্রয়াসী হইবে। অবশ্য থাইল্যাণ্ড তাহার অর্থনৈতিক প্রয়োজন মিটাইতে পারিবে না। এই প্রয়োজনের জন্ত জাপানের পক্ষে ওলন্দাজ পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে অধিকার-বিস্তারে সচেষ্ট হওয়াই অধিকতর সম্ভব।

সম্প্রতি জাপানী পার্লামেণ্টের এক বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ওয়াশিংটনস্থিত জাপানী প্রতিনিধি এডমিরাল নোমুরা এবং বিশেষ দূত মিঃ কুরুসু যখন আমেরিকায় মীমাংসার আলোচনায় প্রবৃত্ত, তখন এই পার্লামেণ্টে বক্তৃতাকালে জাপানী মন্ত্রিগণ আমেরিকার উদ্দেশে তীব্র বিষোদ্গীরণ করিয়াছেন। কৃষি-মন্ত্রী মিঃ সিমাদা অবিলম্বে জাপানকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে বলিয়াছেন। নিম্নতর পরিষদে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবে জাপানের বর্ত্তমান দুরবস্থার জন্ত একমাত্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকেই দায়ী করা হইয়াছে; বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সংগ্রামের মূলেও না কি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ব-প্রভুত্ব স্থাপনের অপরিমিত আকাঙ্ক্ষাই নিহিত।

জাপানের পক্ষে একই সময়ে আমেরিকার সহিত মীমাংসার আলোচনা পরিচালন এবং তাহার উদ্দেশে এই উষ্মা প্রকাশের দুইটি কারণ থাকা সম্ভব। জাপান হয় ত আমেরিকার আভ্যন্তরীণ বিরোধে উৎসাহিত হইয়া আশা করিতেছে—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এখন প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইবে না। এই জন্ত সুস্পষ্ট ভাবে "যুদ্ধং দেহি" মনোভাব প্রকাশ করিয়া সে হয় ত কুরুসু-নোমুরার আলোচনার গুরুত্ব বৃদ্ধি করিতে চাহিতেছে। জাপ প্রতিনিধিদ্বয়ের প্রস্তাবে অসম্মত হইলে যুদ্ধ অনিবার্য্য বুঝিয়া রুজভেল্ট-সরকার "নরম কাটিবেন"—ইহাই হয় ত জাপানের ধারণা। জাপানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আর একপ্রকার অনুমান সম্ভব এবং উহাই হয় ত অধিকতর যুক্তিসঙ্গত—প্রকৃতপক্ষে আমেরিকার সহিত জাপান কোনরূপ মীমাংসা চাহে না, মীমাংসা-প্রয়াসের অভিনয়ে সে কেবল কালক্ষেপ করিতেছে। য়ুরোপীয় যুদ্ধ বিশেষ অবস্থায় উপনীত হইলে জাপান হয় ত তৎপর হইবে; তাহার ব্যাপক সমরায়োজনের—বিশেষতঃ তাহার নৌবাহিনী গঠনকার্য্যের পরিসমাপ্তির এখনও হয় ত কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে।

গত ১৭ই নভেম্বর জাপানী আইন পরিষদ দুইটির সম্মিলিত অধিবেশনে প্রধান মন্ত্রী জেনারল টোজো জাপানের ত্রিবিধ উদ্দেশ্তের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমতঃ—জাপানের চীন-জয়ে কোন তৃতীয় শক্তি বাধা সৃষ্টি করিতে পারিবে না; দ্বিতীয়তঃ—জাপানের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী শক্তিগুলি সামরিক মনোভাব ও অর্থনৈতিক অবরোধ-ব্যবস্থা বর্জ্জন করিয়া জাপানের সহিত স্বাভাবিক বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করিবে; তৃতীয়তঃ—পূর্ব্ব-এশিয়ায় য়ুরোপীয় যুদ্ধের প্রসার নিবারিত হইবে।

উল্লিখিত উদ্দেশ্যত্রয়ের মধ্যে প্রথম দুইটিই প্রধান। জাপান চীনকে ইঙ্গ-মার্কিণ সাহায্যে বঞ্চিত করাইতে চাহে এবং ইন্দোচীনে জাপানী প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর জাপানের বিরুদ্ধে যে অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহা হইতে সে পরিত্রাণ লাভে আকাঙ্ক্ষী। চীনকে জাপানের "হাতে সঁপিয়া" দিবার দিন হয় ত

ফুরাইয়াছে। সুদূর প্রাচীতে শান্তিক্রয়ের জন্ম আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মিউনিকের যূপকাষ্ঠে চেকোশ্লোভাকিয়া-সংহারের পুনরভিনয় বোধ হয় আর হইবে না। চীনকে সাহায্যদান বন্ধ করিয়া জাপানের সাম্রাজ্য-বাদী দংষ্ট্রার সম্মুখে প্রাচীর ইঙ্গ-মার্কিণ স্বার্থ আগাইয়া দিতে বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আর সাহসী হইবে না বলিয়াই মনে হয়। তবে, জাপানের বিরুদ্ধে অবলম্বিত অর্থনীতিক ব্যবস্থা প্রত্যাহৃত হওয়া অসম্ভব নহে। আপাততঃ ইহার অধিক জাপানের আশা করা চলে না। এইটুকু সুবিধা পাইয়া সে যদি এখন সাম্রাজ্যবাদী দুরাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে চীন-সম্পর্কে কোনরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্ম বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সম্মত হইতে পারে।

আমেরিকার অঘোষিত যুদ্ধ—

কিছুকাল পূর্ব্বে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সমুদ্রবক্ষে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যে অঘোষিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা এখনও সমান ভাবে চলিতেছে। ইতোমধ্যে আরও কয়েকখানি মার্কিণী জাহাজ জার্ম্মাণ সাবমেরিণের আক্রমণে সমুদ্রগর্ভে সমাহিত হইয়াছে। মার্কিণী রণপোতের আঘাতে জার্ম্মাণীর সাবমেরিণ ধ্বংসের কথা গোপন রাখা হইলেও মার্কিণী রণপোত যে জার্ম্মাণ সাবমেরিণ ধ্বংস করিতেছে, তাহা আর গোপন নাই।

আমেরিকার বাণিজ্যপোতগুলিকে অস্ত্রসজ্জিত করিবার বিধান-সম্বলিত হইয়া নিরপেক্ষতা আইনের যে সংশোধন-বিল প্রতিনিধি-সভায় গৃহীত হইয়াছিল, সেনেটে উহার রূপ আরও পরিবর্ত্তিত হয়। সেনেট ঐ বিলে মার্কিণী বাণিজ্যপোতের যুদ্ধাঞ্চলে গমনের অনুমতিও সংযোজিত করেন। সেনেটে ১৩টি ভোটাধিক্যে এবং নূতন সংশোধন সহ প্রতিনিধি সভায় ১৮টি ভোটাধিক্যে বিলটি গৃহীত হইয়াছে। সরকার-সমর্থকদিগের এই সংখ্যাল্পতা গুরুত্বপূর্ণ। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট যে তাঁহার ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী কার্য্যে কঠোর বিরোধিতার সম্মুখীন হইয়াছেন, ইহা তাহারই দ্যোতক। সম্প্রতি আমেরিকায় যে ব্যাপক শ্রমিক-চাঞ্চল্য আরম্ভ হইয়াছে, উহা দমনে সরকারের অসামর্থ্যই না কি সরকার-সমর্থক সদস্যদিগের সংখ্যা-হ্রাসের প্রধান কারণ। যে কারণেই হউক, আইন সভার এই অবস্থা নিশ্চয়ই প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে চিন্তিত করিয়াছে; অতঃপর, তিনি আরও সতর্কতার সহিত কাজ করিবেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিক-চাঞ্চল্যের ফলে সরকার-সমর্থকদিগের সংখ্যা হ্রাস ব্যতীত সমরোপকরণ উৎপাদনেও বিশেষ বিঘ্ন ঘটিতেছে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এখন বিশেষ ভাবে এই দিকে অবহিত হইয়াছেন। নিরপেক্ষতা আইন আমূল সংশোধিত হওয়ায় বৃটেন এখন মার্কিণী পণ্য-প্রাপ্তি সম্বন্ধে একরূপ নিশ্চিন্ত হইল। এখন প্রয়োজন হইলে মার্কিণী জাহাজ বৃটেনে পণ্য পৌঁছাইয়া দিয়া যাইবে; আইসল্যাণ্ড পর্য্যন্ত আসিয়াই তাহারা আর ফিরিয়া যাইবে না। চীন এই সংশোধনে বিশেষ উপকৃত হইল। অতঃপর প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধ আরম্ভ হইলেও মার্কিণী জাহাজ পণ্য বহন করিয়া চীনে লইয়া আসিতে পারিবে। অবশ্য, তখন ব্রহ্ম-চীন পথ উন্মুক্ত থাকিলেই চীনের পক্ষে ঐ পণ্য পাওয়া সম্ভব হইবে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুদূর প্রাচীর অবস্থাই এখন মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎকণ্ঠার কারণ। আটলাণ্টিক সম্বন্ধে তথা জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে আপাততঃ তাহার আর অধিক কিছু করিবার নাই। সুদূর প্রাচীতে জাপানের সহিত যদি কোনরূপ মীমাংসা না হয়, তাহা হইলে তথায় সমুদ্রবক্ষে তাহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অবশ্য, জাপানের সহিত আমেরিকার মীমাংসার সম্ভাবনা যে নাই, তাহা বলা যায় না। প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে আনন্দের কথা নহে। একই সময়ে আটলাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর—দুই দিকে শত্রুর সম্মুখীন হওয়া তাহার পক্ষে সহজসাধ্যও নহে। কাজেই, মার্কিণী রাজনীতিকগণ জাপানের সহিত মীমাংসা করিবার জন্ম আন্তরিক চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না। বিশেষতঃ, মার্কিণী ধনিকগণ জাপানের সহিত বাণিজ্য-পরিচালনের সুবিধা পাইলে আনন্দিতই হইবেন।

শ্রীঅতুল দত্ত।

পরলোকে সুবোধকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

আমাদের বিশিষ্ট বন্ধু কলিকাতা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ এটর্ণি সুবোধকুমার গঙ্গোপাধ্যায় গত ২৬শে আশ্বিন পরলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন শুনিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ২২শে জুলাই সুবোধকুমারের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ৺কুমুদনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠাপন্ন এটর্ণি ছিলেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে সুবোধকুমার বি-এ পাশ করেন; এবং ঐ বৎসর রায় ৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী ইন্দুবালা দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ব্যবসায়ে নিষ্ঠা, সৌজন্য ও অমায়িকতাদি গুণে তিনি বিভূষিত ছিলেন। সাহিত্য ও নাট্যকলাদিতে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল; এইজন্য বাঙ্গলার বহু নাট্য ও ফিল্ম-প্রতিষ্ঠানকে তিনি প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন। সুবোধকুমারের জ্যেষ্ঠ সহোদর রায় শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বাহাদুর, তাঁহার পত্নী, এবং পুত্রদ্বয়ের এই মর্ম্মান্তিক শোকে আমরা আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

সুবোধকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বাঙ্গালার বিক্রয়কর আইন

১৪ই আশ্বিন হইতে বাঙ্গালার অর্থ-সচিবের অনুগ্রহে বিক্রয় আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। 'মাসিক বসুমতী'র (১৩৪৮) আষাঢ় সংখ্যায় এই আইনের বিভিন্ন ধারা বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। ব্যবসায়ী ও ক্রেতৃগণের সংশয়-নিরসন জন্য ২৮শে কার্ত্তিক বাঙ্গালা সরকার বিভিন্ন সংবাদপত্রে এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন যে, এই কর ক্রেতাদিগকে প্রদান করিতে হইবে—ব্যবসায়িগণ ইহা সংগ্রহ করিয়া প্রতি মাসে সুদীর্ঘ তালিকা দাখিল করিবেন এবং সরকারী তহবিলে জমা দিবেন। সরকারী ফতোয়ায় আরও প্রকাশ—

"এই করের পরিমাণ খুবই কম, এই প্রদেশের স্বার্থের খাতিরে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সরকার এই কর ধার্য্য করিয়াছেন। জাতি-গঠনমূলক কার্য্য ও আর্ত্তের সাহায্যে সরকার বহু টাকা ব্যয় করিয়াছেন। অথচ ব্যয় অপেক্ষা সরকারের আয় অনেক কম। সরকার আশা করেন যে, প্রদেশের মঙ্গলের জন্য জনসাধারণ সামান্য স্বার্থত্যাগ করিতে দ্বিধা করিবেন না।"

এই করের হার আপাততঃ টাকায় এক পয়সা মাত্র নির্দ্ধারিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু বাঙ্গালা সরকারের চির-স্থায়ী অভাবের অজুহাতে এই কর ক্রমবর্দ্ধমান হওয়াও বিচিত্র নহে। কারণ, ভারত সরকারের ঋণ মকুব—পাটের শুল্ক লাভ—পাটের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ—মুণ্ডকর সংস্থাপন, এবং তাহা কায়েম-মোকাম করিয়াও বাঙ্গালা সরকারের অর্থাভাব প্রশমিত হয় নাই! আর এই বিক্রয়কর-লব্ধ অর্থে সরকারী শাসনযন্ত্রের বিপুল ব্যয় নির্ব্বাহের পর জাতিগঠন কার্য্যের—বিপন্নগণের সাহায্যের উপযোগী যে প্রভূত অর্থ উদ্বৃত্ত হইবে, দেশবাসী এমন আশা নিশ্চিন্ত মনে করিতে পারেন কি? আর বাঙ্গালার মুসলমানপ্রধান সচিবসঙ্ঘ ত' দেশবাসীকে প্রত্যেক নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিস কিনিবার সময় স্বার্থত্যাগের জন্য অনুরোধ করিতে-ছেন বা বাধ্য করিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালার সচিবগণ ত' মোটা বেতন লাভে পুষ্ট হইতেছেন, জাতি-গঠন—আর্ত্তের সাহায্যের জন্য তাঁহারাও 'দ্বিধাহীন চিত্তে' কতখানি বা কতটুকু স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, দেশবাসীর তাহা জানিবার অধিকার আছে কি?

ব্যবসায়ীগণকে ক্রেতার নিকট প্রতি-টাকায় এক পয়সা বিক্রয়কর সংগ্রহ করিয়া, সচিবসঙ্ঘের বিরাট উদর পূর্ণ করিবার জন্য সুদীর্ঘ তালিকাসহ প্রতি মাসে রিজার্ভ-ব্যাঙ্ক—কলিকাতা-কলেক্টারী বা জিলা-ট্রেজারীতে জমা করিয়া, তাহার রসিদ কমার্শিয়াল ট্যাক্স-অফিসারের বরাবর পেশ করিতে হইবে। ইহার হিসাব রাখিবার পদ্ধতিও সুবিস্তৃত। এই দুর্মূল্যের বাজারে প্রতিষ্ঠানের কার্য্য অনুসারে এজন্য দুই-তিন জন অতিরিক্ত হিসাব-নবীশের প্রয়োজন হইবে। আর টাকার অপূর্ণ অংশ—আনা-পাইএর জন্য আধলা-পাই-ছিদাম, কড়া-ক্রান্তি-দন্তী কিরূপ ভাবে আদায় করিতে হইবে—আইনে তাহার ব্যবস্থা নাই। অথচ এই আনার অঙ্কগুলি যোগ করিয়া যে সকল টাকা হইবে, তাহার উপরও ত' ব্যবসায়ীকে কর দিতে হইবে। বাঙ্গালার অর্থসচিব ব্যবসায়িগণকে এই বিড়ম্বনা-ভোগ হইতে মেহেরবাণী করিয়া অনায়াসে অব্যাহতি দিতে পারিতেন। মাড়োয়ারী ব্যবসায়িগণের গদীতে পিঁজরাপোল, বাতুলাশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে সাহায্যের জন্য যেরূপ টিনের কৌটা ঝুলান থাকে, অথবা বাঙ্গালী ব্যবসায়িগণের রীতি অনুসারে বিভিন্ন সদনুষ্ঠানে—বিপন্নের সাহায্য-দান—বারোয়ারী অনুষ্ঠান প্রভৃতির জন্য ক্রেতাদিগের নিকট তাঁহারা যে ৵বৃত্তিরূপে চাঁদা সংগ্রহ করেন, তাহা সঞ্চয়ের জন্য দোকানে যেরূপ পৃথক্ মাটীর ভাঁড় থাকে—প্রত্যেক গদীতে বা দোকানে সেইরূপ সরকারী সাহায্য-সঞ্চয়ের টিনের কৌটা, বা যুদ্ধের জন্য টিনের কৌটার অভাবে মাটীর ভাঁড় সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিলে ব্যবসায়িগণ হিসাব-বিড়ম্বনা হইতে নিস্তার পাইতে পারিতেন। বাঙ্গালা সরকারও বিশ্বস্ত মুসলমান কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া প্রতিদিন অনায়াসে অর্থ-সংগ্রহ করিতে পারিতেন।

অর্থ-সচিবের নেকনজরে প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী পাঠ্যপুস্তক—ধর্ম্মগ্রন্থ ব্যতীত সাহিত্য-গ্রন্থও বিলাস-উপ-করণরূপে সাধারণ পণ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া, বিক্রয়কর গ্রহণযোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। কোন্ কোন্ ধর্ম্মগ্রন্থ অব্যাহতি লাভের সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছে—বারংবার পত্র লিখিয়াও এ পর্য্যন্ত তাহার তালিকা নির্দ্দেশিত হয় নাই। যে দেশের সরকার সুলভ সৎসাহিত্যের উপর অতিরিক্ত হারে রেজেষ্টারী ভিঃ পিঃ মাশুল নির্দ্ধারিত করিয়া অর্থাৎ ৵০ আনা মূল্যের পুস্তকের উপর সর্ব্বনিম্ন মাত্র ।৵০ আনা ডাকমাশুল নির্দ্ধারিত করিয়া, দেশের সর্ব্বস্তরে অনায়াসে শিক্ষা-বিস্তারের পথরোধ করিয়াছেন;—যে দেশের সরকার তিন গুণ মূল্যেও দুষ্প্রাপ্য কাগজের উপরে এখনও শতকরা ২৫৲ হারে আমদানী-শুল্ক—ডিউটি গ্রহণ করিতে-ছেন—সেই দেশে জাতিগঠনমূলক কার্য্য—আর্ত্তের সাহায্যের অজুহাতে জ্ঞানবিস্তারের শ্রেষ্ঠতম উপাদান

গ্রন্থের উপরেও বিক্রয়-কর প্রবর্ত্তন নিশ্চয়ই শোভন ও সঙ্গত! বাঙ্গালার অর্থসচিব নিশ্চয়ই সৎসাহিত্যের তোয়াক্কা রাখেন না। তাঁহার সাহিত্যানুরাগ থাকিলে নিশ্চয়ই জানিতেন—শিক্ষিত-সমাজের মনের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য খাদ্য—পরিধেয়ের মতই সৎসাহিত্যের কত প্রয়োজন। তবে মদ্য ও কুইনাইন ব্যতীত যুদ্ধের বাজারে দুর্মূল্য দুষ্প্রাপ্য—জীবনরক্ষায় একান্ত প্রয়োজনীয় ঔষধের উপরেও যাঁহারা অসঙ্কোচে বিক্রয়কর ধার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সুব্যবস্থায় শিক্ষাপ্রচারের পথ বিঘ্নসঙ্কুল হইলে বিস্ময়ের অবকাশ কোথায়?

বাঙ্গালার অর্থসচিব সংবাদপত্রকে বিক্রয়-কর হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। তাহার কারণ, সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ যখন তিন গুণ মূল্য দিয়াও পাওয়া দুষ্কর হইয়াছে, কাগজের অভাবে সংবাদপত্রের আকার হ্রাস বা মূল্য বৃদ্ধি করিয়াও বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা প্রবল হইয়াছে; সেই শুভ অবসরে সরকার সেই তিন গুণ মূল্যের উপর শতকরা ২৫৲ হারে অর্থাৎ যুদ্ধপূর্ব্ব মূল্যের উপর তিন গুণ হারে ডিউটি গ্রহণ করিতেছেন—আমদানী-নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন—কিন্তু সরকার সুলভ মূল্যে কাগজ সরবরাহের কোনরূপ ব্যবস্থা বা সুবিধা করিয়া দিতে পারেন নাই। বাঙ্গালা সরকার এজন্য সংবাদপত্রকে বিক্রয়কর হইতে নিষ্কৃতি দিলেও মাসিক পত্রিকা—সাময়িক পত্রসমূহ তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টিতে বিক্রয়করযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। অথচ প্রত্যেক মাসিক পত্র সংবাদপত্ররূপে প্রকাশ জন্য মুদ্রাকর—প্রকাশককে পুলিস-কোর্টে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ডিক্লারেসন দিতে হয়—পোষ্টাফিসের বিধান অনুসারে সংবাদপত্রের সুবিধা-মাশুল পাইবার জন্য যথারীতি রেজেষ্টারী করিতে হয়। দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্রের মতই মাসিক পত্রিকায় সাময়িক সংবাদ সম্বন্ধে মন্তব্য—সচিত্র যুদ্ধসংবাদ—বৈদেশিক প্রসঙ্গ—অর্থনীতি—ইতিহাস—কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যবার্ত্তা—দেশের ও দশের কথা বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়। মাসিক পত্রিকা কি কারণে যে সংবাদপত্রশ্রেণীভুক্ত নহে, তাহা আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনার অতীত রহস্য-প্রহেলিকা।

আর মাসিক পত্রিকাকে যে কত ভাবে কর প্রদান করিয়া সরকারী শাসন-যন্ত্রের বিরাট্ ব্যয়ভার নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহা নিশ্চয়ই বাঙ্গালার অর্থসচিবের কল্পনার অতীত। প্রত্যেক সংখ্যার জন্য সরকার ডাকমাশুলরূপে এক আনা গ্রহণ করেন। বার্ষিক বা ষান্মাষিক মূল্য আদায়ের সময় রেজেষ্টারী ভিঃ পিঃ মাশুল ৵০ ও মণিঅর্ডার ফি ৵০ আনা—কোন একটি সংখ্যা ভিঃ পিঃ হইলেও মাশুল পাঁচ আনা—তবু ঐ সংখ্যার মাশুল এক আনা পত্রিকার পরিচালকই প্রদান করেন। মাসিক পত্রিকার মূল্য ৷৷০ বা ৷৷৵০ হইলে ভিঃ পিঃ মাশুল গ্রাহকের দেয় পাঁচ আনা—পত্রিকার দেয় এক আনা; অর্থাৎ পত্রিকার মূল্যের তিন-চতুর্থাংশ বা তিন-পঞ্চমাংশ।

'মাসিক বসুমতী' ছাপিবার কাগজের মূল্য তিন গুণের উপর হইয়াছে—তিন গুণ মূল্য দিয়াও কাগজ পাওয়া যায় না। বিজ্ঞাপন ছাপার কাগজের মূল্য ছয় গুণ হইয়াছে—ছবি ছাপার আর্ট পেপার ৷৵০ পাউণ্ড স্থলে ১৷৷০ পাউণ্ড দরে ৫০ পাউণ্ড হইলে ৭৫৲ টাকা; ৬০ পাউণ্ড হইলে ৯০৲ টাকা রীম হইয়াছে। এই দুর্ম্মূল্যে আমদানী কাগজের উপর সরকার উচ্চহারে ডিউটি প্রভৃতি লইতেছেন। ইহা ব্যতীত তিন চার গুণ মূল্যের ব্লকের সরঞ্জাম—কালী প্রভৃতির উচ্চহারে ডিউটি—রেল-মাশুল প্রভৃতি নিয়মিত ভাবে সরকারী তহবিল-জাত হইতেছে। 'মাসিক বসুমতী' বাঁধিবার যে সামান্য তার ৷৵০ সের-দরে পাওয়া যাইত—সরকারের যুদ্ধের প্রয়োজনে সেই তারের মূল্য ৫৲ সের—একখানি প্যাকিং কাগজ ৬।৭ পয়সা! সরকারের প্রয়োজনে ভারতীয় কাগজের কলেও কাগজ পাওয়া দুষ্কর হইয়াছে।

কাগজের এই দুর্ম্মূল্য দুষ্প্রাপ্যতার যুগে অসম্ভব ডাক মাশুল—উচ্চহারে ডিউটি প্রভৃতির উপর আয়কর—সুপার-ট্যাক্স—সারচার্জ্জ—লাইসেন্স—মুণ্ডকর—বর্দ্ধিত-হারে বাড়ীর ট্যাক্স প্রভৃতির উপর আবার বাঙ্গালা সরকারের বদান্যতা বৃদ্ধিকল্পে যদি বিক্রয়কর জোগাইতে বাধ্য হইতে হয়, তাহা হইলে 'মাসিক বসুমতী'র সাহিত্যানুরাগী পাঠকবৃন্দের আরও অসুবিধা-ভোগ অনিবার্য্য। 'মাসিক বসুমতী' কি কারণে যে উচ্চশ্রেণীর সংবাদপত্র নহে, বাঙ্গলার অর্থসচিব তথা তাঁহাদের সচিব-সঙ্ঘ ব্যতীত সাহিত্যরস-সুরসিক কোন পাঠক—গ্রাহকই বোধ হয় তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিবেন না। আর 'মাসিক বসুমতী' বা বাঙ্গালার কোন মাসিক পত্রিকার প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য যখন দশ বা আট আনার অধিক নহে এবং ডাকমাশুলসহ তাহাই বৎসরে বা ছয় মাসে একসঙ্গে জমা হয়, তখন টাকার প্রত্যেক ভগ্নাংশের উপরই বা তাঁহারা এই আইনের বিধানে কিরূপে বিক্রয়কর ধার্য্য করিতে পারেন—তাহাও আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

তবে আমরা স্বীকার করি, তাঁহাদের বুদ্ধি বুঝিবার সাধ্য কেবল তাঁহাদেরই আছে।

হিন্দু নারীর অধিকার

গত চারি বৎসর হইতে হিন্দু নারীগণের ধনাধিকার লইয়া কেন্দ্রীয় পরিষদে আলোচনা চলিতেছে। পুরাকাল হইতে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার ধারায় হিন্দু-কন্যাগণের পঞ্চম স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। (১) পুত্র (২) পৌত্র (৩) পুত্রবধূ (৪) বিধবা স্ত্রী (৫) কন্যা। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ডাঃ

দেশমুখের আইন অনুসারে পুত্র ও বিধবার সহিত কন্যাও সমান অধিকার লাভ করেন। কিন্তু ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে সার এন, এন, সরকারের সংশোধিত আইন অনুসারে কন্যা একেবারে বাদ পড়েন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্তের সংশোধন বিল অনুযায়ী কন্যাকে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চম স্থান দিবার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু বিলের আলোচনার পর স্বরাষ্ট্র-সচিব সার রেজিন্যাল্ড ম্যাক্সওয়েলের প্রস্তাবানুসারে বিলখানি সিলেক্ট-কমিটীতে দেওয়া হয়। উক্ত কমিটীর মতানুসারে কয়েকটি প্রশ্নের মতামতের জন্য বিলটি ফেডারেল কোর্টে প্রেরণ করা হয়। ফেডারেল কোর্ট মতপ্রকাশ করেন, কৃষিভূমি (এগ্রিকালচারাল ল্যাণ্ড) সম্বন্ধে আইন করিবার অধিকার কেবল প্রাদেশিক আইন পরিষদেরই আছে।"

অতঃপর খান বাহাদুর নাজিরউদ্দীন আহম্মদ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দু নারীর কৃষিভূমি সম্পর্কে দাবী করিয়া এক বিল উপস্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কন্যার অধিকারের কোন কথা নাই। যাহাতে উক্ত আইনে কন্যার অধিকার সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে মিস পি, বেলহার্ট বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি বিলের নোটিশ দিয়াছেন। মিস্ মীরা দত্তগুপ্তা এবং কয়েক জন সদস্যও এ সম্বন্ধে একটি বিল উপস্থাপিত করিয়াছেন। ইংরেজ জাতির আইন অনুসারে কন্যা পুত্রের সমানাধিকার লাভ করেন—মুসলমান আইন অনুসারে কন্যা পৈত্রিক সম্পত্তিতে পুত্রের অর্দ্ধেক অংশ পাইয়া থাকেন। ন্যায়ের খাতিরে হিন্দু কন্যারও অধিকার সম্বন্ধে ব্যবস্থা হওয়াই সঙ্গত।

• পুরাকাল হইতে কন্যা যে অধিকার লাভ করিয়া আসিতেছে, তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিবার কি ন্যায়সঙ্গত কারণ আছে, তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা উচিত। কারণ, কন্যার অধিকারের ভিত্তি দায়ভাগানুযায়ী পিণ্ডতত্ত্ব ও মিতাক্ষরানুযায়ী সম্বন্ধ সন্নিকর্ষের উপর এবং স্বাভাবিক স্নেহগত। মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও স্নেহ পুত্র ও কন্যাকে সমান ভাবে লাভবান্ করিবারই প্রেরণা দেয়। অন্ততঃ, পুত্রের পরই কন্যাকে সম্পত্তি প্রদানের বাসনা স্বাভাবিক। কোনও বিভবশালীর কন্যার ঘটকের প্রতারণায় দরিদ্রের সংসারে বিবাহ হইলে তাঁহার পুত্র প্রাচুর্য্যের স্বাচ্ছন্দ্যে থাকিবে এবং দুহিতা দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে অশ্রুপাত করিবে, ইহা কখনই শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। বিশ্বের সভ্যজাতিগণের কন্যাগণ সম্পত্তির অংশভাগিনী হন। আইনানুসারে মনু, নারদ, বৃহস্পতি, যাজ্ঞবাল্ক্য, কাত্যায়ন ও বিষ্ণুপ্রমুখ হিন্দু-ব্যবহার-শাস্ত্র প্রণেতাগণ একবাক্যে অনুশাসন প্রদান করিয়া পুত্রাভাবে কন্যা সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং, পুত্রাভাবে কন্যার পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ বা অংশভাগিনী হওয়াই সঙ্গত—হিন্দুশাস্ত্রসম্মত।

—

ঢাকার দাঙ্গা

ঢাকার দাঙ্গা থাকিয়া থাকিয়া চাগিয়া উঠিতেছে; এবং কতকগুলি লোক হত ও আহত হইতেছে। হতাহতের মধ্যে নিরীহ লোকের সংখ্যাই অধিক। ইহাতে বাঙ্গালার সচিবসঙ্ঘের অযোগ্যতা এবং অকর্ম্মণ্যতা পরিস্ফুট না হইলে আর কোন্ ব্যাপারে তাহা প্রকট হইতে পারে? গত ১২ই কার্ত্তিক বুধবার কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে যে সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার সভাপতি সৈয়দ নৌসের আলির বক্তৃতায় সরল ভাবে অনেক কথাই প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "ঢাকার ঘটনাসমূহ বঙ্গীয় মন্ত্রিমণ্ডলীরই অনুসৃত নীতির ফল।" এক জন শিক্ষিত মুসলমান সভাপতির মুখে বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘের কার্য্যের এরূপ নিন্দা হইতেই প্রতীয়মান হয় যে, এই সচিবমণ্ডলীর অযোগ্যতা সম্বন্ধে চিন্তাশীল মুসলমানদিগের মন দ্বিধাহীন নহে। তিনি আরও বলিয়াছেন, "বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদীদিগের গোমস্তা (agents) প্রভৃতির দ্বারা এই সাম্প্রদায়িকতার বীজ সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। স্বতন্ত্র নির্ব্বাচকমণ্ডলী কেন গঠিত হইয়াছে, পাকিস্থান এবং হিন্দুস্থানের রব কেন উঠিয়াছে, সে কথাও তিনি বলিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইনি ইহাও বলিয়াছেন যে, ঈদের সময় বিবাদ ভুলিয়া পরস্পর প্রেমভরে আলিঙ্গন করিবারই কথা। সেই দিন হাঙ্গামা উপস্থিত হওয়া বড়ই শোচনীয় ব্যাপার! ঈদের সময় ধ্বজা-পতাকা লইয়া শোভাযাত্রা বাহির করা হয়, এ কথা তিনি কস্মিন্‌কালেও শুনেন নাই। ঐদিন তাহাদের ঐরূপ আড়ম্বরপূর্ণ দৃশ্য বাহির করিবার কি প্রয়োজন ছিল, তাহাও তাঁহার দুর্ব্বোধ্য। এই সৈয়দ নৌসের আলি হকাই সচিবসঙ্ঘের অন্যতম সচিব ছিলেন। ইঁহারই যখন এইরূপ অভিমত, তখন বাহিরের লোকের অভিমত ইহা অপেক্ষা কি অধিক নির্ভরযোগ্য হইতে পারে?

ইনি আরও বলিয়াছেন, "আমাদের কোন পক্ষেরই সাম্প্রদায়িক ভাবে চিন্তা করা কর্ত্তব্য নহে।" সৈয়দ নৌসের আলি যাহা বলিয়াছেন, সকল দূরদর্শী মুসলমানেরই তাহা সমর্থনযোগ্য; তবে উপস্থিত সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির প্রভাব এতই প্রসারিত হইয়াছে যে, অনেকেই উন্নত স্বার্থকে উপেক্ষা করিয়া সঙ্কীর্ণ স্বার্থেরই বশীভূত হইতেছে। শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম বলিয়াছেন, "লোকের উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য্য করা উচিত।" কিন্তু যাঁহারা সে শিক্ষায় অনুপ্রাণিত নহেন, তাঁহারা উচ্চ আদর্শের মর্ম্ম কিরূপে বুঝিবেন?

আটলাণ্টিক-চার্টার সম্বন্ধে মার্কিনী মত

আটলাণ্টিক বারিধিবক্ষে নিভৃত তরণী-কক্ষে মিষ্টার রুজভেল্ট ও মিষ্টার চার্চ্চিল দুই পরিপক্ক মাথা গুপ্ত-পরামর্শের পর যে ইস্তাহার জারি করিয়াছিলেন, তাহা 'আটলাণ্টিক-চার্টার' নাম অভিহিত হইয়াছে। ইহার সম্বন্ধে কত মতই যে প্রকাশিত হইল, তাহার আর ইয়ত্তা নাই! সিকাগোর 'য়ুনিটী' পত্রিকার সম্পাদক মিষ্টার হিনস্ হোমজ গত সেপ্টেম্বর মাসে এই আটলাণ্টিক-চার্টার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এক সন্দর্ভ লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, "ঐতিহাসিক ঘটনার কেমন পুনরাবর্ত্তনই ঘটে! প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এবং প্রধান-মন্ত্রী চার্চ্চিলের এই সম্মেলন টিলসিটে নেপোলিয়ানের সহিত আলেকজাণ্ডারের মিলনের ন্যায়, এবং ফ্রান্সে ইংলণ্ডেশ্বর অষ্টম হেন্‌রীর সহিত ফ্রান্সের অধীশ্বর প্রথম ফ্রান্সিসের সাক্ষাৎকারের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। টিলসিটে এক উড়ুপের উপর উভয় সম্রাটের মিলন হইয়াছিল। কিন্তু অষ্টম হেনরীর সহিত ১৫০ খৃষ্টাব্দে যে স্থানে দেখা হইয়াছিল, তাহাতে যথেষ্ট আড়ম্বর হইয়াছিল। উভয় সম্রাট্ পরস্পরকে 'ভ্রাতৃ' সম্বোধন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার ফল কিছুই হয় নাই। যাহা হউক, আটলাণ্টিক-বক্ষে রুজভেল্ট-চার্চ্চিল মিলনে মানুষের মানসপটে আর একটা স্মৃতি পরিস্ফুট করে,—মিষ্টার উড্রো উইলসনের সেই দুর্ভাগ্য চৌদ্দ দফা সর্ত্তের স্মৃতি। মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট এবং বৃটিশ প্রধান-সচিব একযোগে যে আট সর্ত্তের কথা বলিয়াছেন, তাহার শেষ ফল কি ঐরূপই হইবে? অবশ্য এক হিসাবে এই আট দফায় সেই চৌদ্দ দফার উপর একটা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সে বৈশিষ্ট্য এই যে, দুইটি শ্রেষ্ঠ জাতির দুই জন সর্ব্বপ্রধান রাজপুরুষের সম্মিলিত উক্তি; পক্ষান্তরে উইলসনের চৌদ্দ দফা ছিল তাঁহার ব্যক্তিগত অভিলাষের অভিব্যক্তি মাত্র। তবে কথা এই যে, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এবং প্রধান-সচিব চার্চ্চিল তাঁহাদের এইরূপ ঘোষণা করিবার অধিকার পাইলেন কোথায়? তাঁহারা ত মার্কিণের কংগ্রেসের এবং বৃটিশ পার্লামেণ্টের অনুমতি গ্রহণ করেন নাই। এটা নিতান্তই পণ্ডিতি রকমের প্রশ্ন। এখন লোক শাসন-ব্যবস্থায় একনেতৃত্বেই অভ্যস্ত হইতেছে। এই সম্মিলিত ইস্তাহারের মোট মর্ম্ম উইলসনের ইস্তাহার অপেক্ষা ভাল। ইহার অর্থনৈতিক বনিয়াদ বিশেষ প্রশংসনীয়। কিন্তু প্রত্যেক জাতি কিরূপ সরকার দ্বারা শাসিত হইবে, তাহা তাহারাই পছন্দ করিয়া লইতে পারিবে—ইহার অর্থ কি? রুশিয়া এবং ভারত সম্বন্ধে ইহার বিনিয়োগ কিরূপ হইবে? যে সকল জাতিকে জোর করিয়া স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে, তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রধান অধিকার এবং আত্ম-শাসনাধিকার প্রদত্ত হইবে—ইহা কি বৃটিশ উপনিবেশ এবং জার্ম্মাণ অধিকৃত প্রদেশ সম্বন্ধে তুল্য ভাবে প্রযুক্ত হইবে? যদি না হয়, তাহা হইলে কেন হইবে না?" মিষ্টার হোমজ এইরূপ অনেক কথাই বলিয়াছেন। তাঁহারা স্বাধীন জাতি, স্বাধীন ভাবে অনেক কথাই বলিতে পারেন। তবে বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ অবস্থা দেখা যাইতেছে, এবং অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে যেটুকু উপলব্ধি হইয়াছে, তাহাতে এই আট দফা ঘোষণার পরিণাম যে যথাকালে প্রায় সেই চৌদ্দ দফার অবস্থায় উপনীত হইবে,—তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় কি? এখন ঘটনাচক্রে কোথাকার জল কোথায় গিয়া দাঁড়ায়, তাহাই দ্রষ্টব্য। চার্চ্চিল যদিই বলিতেন যে, ঐ আট দফা ভারতের সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারিবে, তাহা হইলেও উহা যে ভারতের ভাগ্যে কার্য্যকরী হইতে পারিত, তাহার নিশ্চয়তা কি? কারণ, এ কথা বলা হইয়াছে যে, ভারত সম্বন্ধে কোন কিছু করিতে হইলে, সে বিষয়ে পার্লামেণ্টের অনুমোদন চাই। ইহার উপর আর কি বলিবার থাকিতে পারে?

অহেতুক অর্ডিন্যান্স

গত ১৮ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার হইতে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ভারত-শাসন আইনের ৮৮ ধারা অনুসারে বাঙ্গালার উপদ্রুত অঞ্চলে অশান্তি দমন অর্ডিনান্স জারি করিয়াছেন। আমরা এই অর্ডিনান্সের ভঙ্গী দেখিয়া বিস্মিত! উহাতে উপদ্রুত অঞ্চলে পাইকারি জরিমানা আদায়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। পাইকারি জরিমানা যে অত্যন্ত অবিচারমূলক, তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ, ইহাতে দোষী-নির্দ্দোষ-নির্ব্বিশেষে সকল লোককেই শাস্তি দেওয়া হয়। ঢাকার দাঙ্গা কাহারা আরম্ভ করিয়াছিল, কাহারা এই দাঙ্গায় উৎসাহ দিয়াছিল, সার জন হার্ব্বার্ট কি তাহার অনুসন্ধান করিয়া এই অর্ডিনান্স জারি করিয়াছেন? এই অর্ডিনান্স আপাততঃ ঢাকা সহরে জারি করা হইয়াছে। মফস্বলে জারি করিবার জন্য আর কতকগুলি ব্যবস্থা না কি বিচারাধীন রহিয়াছে। সার জন হার্ব্বার্ট কি ঢাকা-দাঙ্গা-অনুসন্ধান কমিটীর সিদ্ধান্ত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করিলেন না? তিনি আইনানুগ শাসনকর্ত্তা হইলেও তাঁহার কি সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া এই অর্ডিনান্স প্রয়োগ করিলেই সঙ্গত হইত না? তিনি কি এই তদন্ত কমিটীর সমক্ষে ঢাকায় পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিষ্টার জে, এল, জেঙ্কিন্সের এজাহার ও জেরার প্রশ্নোত্তরের জবাব পড়িবার অবকাশ পান নাই? মুড়াপাড়ার মৌলভীকে গ্রেপ্তার-প্রসঙ্গে মিষ্টার জেঙ্কিন্স

যাহা বলিয়াছেন, তাহাও কি অর্ডিনান্স-জারির পূর্ব্বে তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন? মিষ্টার জেঙ্কিন্স স্বীকার করিয়াছেন যে, It is correct that the Maulavi was released at the intervention of the present ministry. অর্থাৎ বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘের মাতব্বরিতে মৌলভীকে মুক্তিদান করা হইয়াছিল, এ কথা সত্য। ঈদের সময় শোভাযাত্রা বাহির করিবার কি প্রয়োজন ছিল? নবাবী আমল হইতে ঐরূপ শোভাযাত্রা কতবার বাহির হইয়াছিল? পাইকারী জরিমানা আদায় করিলে যাহারা দাঙ্গাকারী গুণ্ডা, তাহাদের কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কারণ, তাহাদের অধিকাংশই তাহাদের সহযোগীদিগকে বলিতে পারে, 'তুমি খাও হাতে জল, আমি খাই ঘাটে।' এ দিকে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স নামক বণিক-সমিতির অবৈতনিক সেক্রেটারী শ্রীবুত প্রদোষ সেন কলিকাতাস্থ ভারতীয় চেম্বার অব কমার্সের কমিটীকে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন, ঢাকায় বারংবার দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইতেছে বলিয়া স্থানীয় বণিক-সমিতি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে; অতএব ভারতীয় চেম্বার অব কমার্স কমিটী যেন তাঁহাদিগের সমর্থন করেন। ব্যাপার বড়ই জটিল! ব্যাপারটা সম্বন্ধে কি বলা যায় না—"মনে মনে সবাই জানে বলিলে দোষী ঘটে?" অতএব মৌনই অবলম্বনীয়।

—

সুভাষ বাবুর সন্ধান

শ্রীযুক্ত সুভাসচন্দ্র বসু কোথায়? তিনি কয়েক মাস পূর্ব্বে নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছেন, ইহা সকলেই জানেন। কিন্তু সে দিন আচম্বিতে যুক্তপ্রদেশের অধিবাসী রাজা যুবরাজ দত্ত সিং, সুভাষ বাবু কোথায় আছেন এবং কি করিতেছেন, তাহা জানিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া ভারতবর্ষীয় রাষ্ট্রীয় সভায় এক প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন।

যুবরাজ দত্ত সিং অকস্মাৎ কি উদ্দেশ্যে, অথবা কাহারও ইঙ্গিতে এই অবান্তর প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি না, তাহা কে বলিবে? ভারত সরকার তাঁহার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন, তাঁহার এরূপ ধারণা হইবারই বা কারণ কি? সুভাষ বাবু রুগ্নদেহে এক বস্ত্রে অকস্মাৎ গৃহত্যাগ করিবার পর কাহারও কাহারও উর্ব্বর মস্তিকে এই কল্পনার আবাদ হইয়াছিল যে, তিনি হয় রোমে, বা বের্লিনে, অথবা জাপানে গমন করিয়াছেন! বস্তুতঃ, তিনি দেশেই আছেন কি বিদেশের কোন স্থানে গমন করিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত কেহই তাহা জানিতে পারেন নাই, এবং তাঁহার আত্মীয়-স্বজনগণও তাঁহার কোন সংবাদ না পাইয়া উৎকণ্ঠিত, এ সংবাদও সাধারণের অগোচর নাই। কিন্তু ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র-বিভাগের সেক্রেটারী যুবরাজ দত্ত সিংএর উক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "কিছু দিন হইতে এ দেশের কোন কোন অঞ্চলে প্রায়ই বলা হয়—সুভাবচন্দ্র হয় রোমে না হয় বের্লিনে আছেন, এবং জার্ম্মাণীর দলের শক্তিসমূহের সহিত চুক্তি করিয়াছেন, জার্ম্মাণী ভারত আক্রমণ করিলে পঞ্চম বাহিনীর দ্বারা সেই আক্রমণে সাহায্য করিবেন। এ দেশে ঐ মর্ম্মে পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, এবং তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, তিনি শত্রুপক্ষে যোগ দিয়াছেন।"

গত ১৭ই নভেম্বর 'এসোসিয়েটেড প্রেস' দিল্লী হইতেই প্রচার করিয়াছেন যে, "শুনা যাইতেছে, জার্ম্মাণী ও তাহার মিত্র-শক্তির বেতার সংবাদে (ভারত সরকারের) স্বরাষ্ট্র-বিভাগের সেক্রেটারীর ব্যবস্থাপক সভায় সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধীয় বিবৃতি সমর্থিত হইয়াছে। গত ১২ই নভেম্বর ইটালী হইতে বেতারে হিন্দীতে বলা হইয়াছিল— জার্ম্মাণী হইতে বেতারে তথায় সুভাষচন্দ্রের অবস্থিতি ঘোষিত হইয়াছে। জাপান হইতে হিন্দীতে বেতারে বলা হইয়াছিল—জাপানের ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের সভাপতি রাসবিহারী বসু, সুভাষচন্দ্র জার্ম্মাণীতে উপনীত হওয়ায় তাঁহাকে অভিনন্দন-জ্ঞাপক তার করিয়াছেন। এখন শুনা যাইতেছে, তিনি জার্ম্মাণীতে উপনীত হইয়াছেন, এবং ভারতবর্ষ স্বাধীন করিবার জন্য সেনাবল প্রেরণ সম্বন্ধে জার্ম্মাণীর সহিত চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন।"

কিন্তু কোথা হইতে কি সূত্রে 'শুনা যাইতেছে'—ইহাই সর্ব্বপ্রথম প্রশ্ন; অথচ এই প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে উক্ত সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ নীরব। আরও এক কথা, ৯ই নভেম্বর ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী ব্যবস্থাপক সভায় জনরবলব্ধ যে কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা অবগত হইয়া জার্ম্মাণীর ও তাহার পর জাপানের পক্ষে সেই উক্তির সুযোগ লইয়া বাজে গুজব প্রচার করা কি অসম্ভব? এ সকলই যে জার্ম্মাণীর পক্ষের প্রচার মাত্র হইতে পারে, এবং তাহাদের অন্যান্য সংবাদ-প্রচারের ন্যায় অসম্ভব ও অসঙ্গত, তাহা কি সংবাদ-সরবরাহকারিগণের কল্পনা করিবার শক্তি নাই?

ইংরেজ জার্ম্মাণ রেডিওর অধিকাংশ সংবাদই বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া মনে করেন; কিন্তু তাহাদের রেডিও-প্রচারিত এই মুখরোচক সংবাদটি নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে করা হইল, তাহা কি অকারণ,—উদ্দেশ্যহীন?

ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র-সদস্য সার রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েল রাজনীতিক কারণে বন্দীদিগের মুক্তিদান প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "এ দেশে যে পঞ্চম বাহিনীর ভয় আছে, এবং সে বিষয়ে সরকারের কর্ত্তব্যাবলম্বনের প্রয়োজন, সুভাষ বসুর সম্বন্ধে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার পর আর সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না।" অর্থাৎ এই উড়ো খবরে নির্ভর করিয়া একেবারে নিঃসন্দেহ!

রাজনীতিক কারণে বন্দীদিগের মুক্তিদান প্রস্তাবের আলোচনার পূর্ব্বেই সুভাষচন্দ্রের অবস্থান ও ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী-সংক্রান্ত এই উড়ো খবরে নির্ভর করিবার উপযোগিতা কি অপরিহার্য্য বলিয়াই মনে হয় নাই? কিন্তু এই আজব খবর কেবল অবিশ্বাস্য নহে, হাস্যোদ্দীপকও বটে!

বোধ গয়ার মন্দির

ডাক্তার দেশমুখ কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদে এই মর্ম্মে বিল পেশ করিয়াছেন যে, বোধ গয়ার মন্দির বৌদ্ধদিগকে দেওয়া হউক, এবং বৌদ্ধরাই তাহার উন্নতি সাধন করিবেন। বোধ গয়ার মন্দিরটি চিরকালই হিন্দুর অধিকারে আছে; বৌদ্ধরা এখানে অবাধে পূজা-অর্চ্চনা করিতে পারেন। তবে আচম্বিতে ডাক্তার দেশমুখের বোধ গয়ার মন্দিরটি বৌদ্ধদিগের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য এত আগ্রহ হইল কেন, এবং ইহাতে তাঁহার স্বার্থই বা কি? কতকগুলি লোক হিন্দুদিগের ক্ষতি করিতে পারিলেই পরমানন্দ লাভ করেন। এই ডাক্তার দেশমুখটি কি সেই দলেরই এক জন? ইতঃপূর্ব্বে হাইকোর্টের বিচারে এবং বহু মনস্বীর সিদ্ধান্তেও বোধ গয়ার মন্দিরটি বরাবর হিন্দুরই অধিকারে আছে, এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তবে আবার তাঁহার এই নূতন প্রচেষ্টার কারণ কি?

সময় পরিবর্ত্তনে হিন্দুর ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যাঘাত

বাঙ্গালা সরকারের নির্দ্দেশে ১৪ই আশ্বিন রাত্রি ১২টা হইতে সহসা যে কলিকাতায় পূর্ব্ব-প্রচলিত—চির-অভ্যস্ত সময়ের যে ৩৬ মিনিট ও ষ্টাণ্ডার্ড সময়ের এক ঘণ্টা অগ্রসর করিয়া দেওয়া হইয়াছে—তাহাতে রেলের সময় ও টাইম-টেবিল পরিবর্ত্তিত হইলেও হিন্দুর ক্রিয়াকাণ্ডের একমাত্র সম্বল পঞ্জিকায় নির্দ্দেশিত সময়ের পরিবর্ত্তন করা সম্ভব হয় নাই।

হিন্দুগণ বাঙ্গালায় সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়—এজন্য তাহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান যাহাতে পঞ্জিকা-লিখিত ঘণ্টা-মিনিট-সেকেণ্ড অনুসারে অনুষ্ঠিত—সম্পাদিত হয়, তাহা দেখা কখনই বাঙ্গালার মুসলমানপ্রধান সচিবসঙ্ঘের কর্ত্তব্য হইতে পারে না—এ জন্যই স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুগণের কথা তাঁহারা অসঙ্কোচে বিস্মৃত হইয়াছেন।

বাঙ্গালা বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বেই নূতন সালের পঞ্জিকা প্রকাশিত হইয়া, হিন্দুর গৃহে গৃহে সংস্থাপিত হয়। পরবর্ত্তী বৎসরের পঞ্জিকাও পূর্ব্ব-বৎসর রথের দিন হইতে মুদ্রণ আরম্ভ হয়। পঞ্জিকার দণ্ড-পল-বিপলের উল্লেখ থাকিলেও ঘণ্টা-মিনিট-সেকেণ্ডের নির্দ্দেশমত ঘড়ির সময় অনুসারে আচারনিষ্ঠ হিন্দুর যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম্ম—পূজা-অনুষ্ঠান—উপবাস—যাত্রা—সূর্য্যোদয়—সূর্য্যাস্ত—শুভ-মুহূর্ত্তনির্ণয়—জোয়ার-ভাঁটা—জন্মকুণ্ডলী প্রস্তুত—জ্যোতিষ আলোচনা সম্পাদিত হয়। ইহাই চিরন্তন প্রথা। এজন্য সর্ব্বদা পঞ্জিকা অনুসারে যথাযথ সময় নির্দ্দেশ প্রয়োজন। এ অবস্থায় এ বৎসর ও আগামী বৎসরের পঞ্জিকার উপর ত' হিন্দুসম্প্রদায় নির্ভর করিতে পারিবেন না এবং অতঃপর প্রতি তারিখে প্রদেশভেদে সময়ভেদ মুদ্রণের জন্য এই কাগজের দুর্ম্মূল্যতার বাজারে পঞ্জিকার আকারবৃদ্ধি ও ব্যয়বৃদ্ধি অনিবার্য্য। অবশ্য বাঙ্গালার মহিমাময় সচিবসঙ্ঘের দাপটে সকলই সম্ভব। তাঁহাদের নির্দ্দেশে স্বয়ং সূর্য্যদেবও বেলা ৯টার সময় উত্তর দিকে উঠিতে পারেন—সামান্য ঘড়ির সময় পরিবর্ত্তন ত' অতি তুচ্ছ—নগণ্য ব্যাপার। তাঁহারা কি না করিতে পারেন?

দেউলী বন্দীদিগের অনশন

বিনা-বিচারে যে সকল লোককে আটক রাখা হয়, তাহাদের সকলেই যে দোষী, ইহা এ দেশের জনসাধারণের বিশ্বাস করিবার উপায় নাই। সরকার যাহাদের উপর নির্ভর করিয়া বিনা-বিচারে লোককে আটক বা বন্দী করেন, তাহারা সকলেই যে নিত্যশুদ্ধ অপাপবিদ্ধ, তাহা কোন মতে সম্ভব হইতে পারে না। কারণ, মানুষমাত্রই ভ্রমপ্রমাদের অধীন। সেই জন্য এ দেশের লোকের ধারণা—বিনা-বিচারে আটক-বন্দীদের অধিকাংশই নির্দ্দোষ। সম্প্রতি সরকার যাঁহাদিগকে দেউলীর বন্দিবাসে আটক করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের কাহাকেও আদালতের বিচারে অপরাধী প্রতিপন্ন করিয়া শাস্তি দেওয়া হয় নাই। অথচ এক পক্ষের কথামাত্র শুনিয়া সরকার এই সকল বিনা-বিচারে দণ্ডিত ব্যক্তিকে রেল-ষ্টেশন হইতে বহু দূরবর্ত্তী রাজপুতানার শুষ্ক প্রান্তরে পাঠাইয়া আটক করিয়া রাখিয়াছেন,—ইহাই বিস্ময়ের বিষয়! তথায় বন্দীদিগকে নানারূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে—এ কথা তাহারা আজ ছয় মাসকাল ধরিয়া কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া আসিতেছে। কিন্তু সরকার এ পর্য্যন্ত তাহাদের অভিযোগে কর্ণপাতও করেন নাই। কেহ হয় ত বলিতে পারেন, তাহাদিগকে শ্বশুরালয়ের সুখ-সুবিধা দানের জন্য ত কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় নাই, তবে এত আব্দার কেন? আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন, তাহারা পরম সুখে মধু ও কলা খাইতেছে! মিষ্টার এন, এম, যোশী ইহাদের কথা আলোচনা করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক মুলতুবী প্রস্তাব উপস্থিত করেন। কংগ্রেসী দল এবং লীগের দল এই সময় সেই ব্যবস্থা পরিষদের

কার্য্যে যোগ দেন নাই ; কাজেই ভোট না লইয়াই ঐ প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। মিষ্টার যোশীর মুলতুবী প্রস্তাব আলোচনাকালে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র-সচিব সার রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েল বলেন যে, উহা রাজনীতিক ধর্ম্মঘট, সুতরাং তিনি এ সম্বন্ধে কিছুই করিবেন না। এই অনশন ছাড়িয়া দিলে তিনি ঐ অভিযোগ সম্বন্ধে বিচার করিতে পারেন। আটক-বন্দীরা যখন অনশন করে নাই, তখন ছয় মাস ধরিয়া তাহারা তাহাদের অভিযোগের কথা সরকারকে জানাইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও সার রেজিনাল্ডের ও ভারতীয় বুরোক্র্যাটদিগের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হয় নাই। সুতরাং অনশন করিবার পূর্ব্বে অর্থাৎ অনশন না করিবার অবস্থায় স্বরাষ্ট্র-সচিব তাহাদের অভিযোগে কর্ণপাত করা আবশ্যক মনে করেন নাই ; আবার অনশন করিবার পর উহা রাজনীতিক ধর্ম্মঘট —এই অজুহাতে উহাতে কর্ণপাত করিবেন না বলিতেছেন। তাঁহার এই উদার ব্যবহারে অগত্যা মনে করিতে হয়, বন্দীদিগের অভিযোগে কর্ণপাত না করাই তাঁহার সঙ্কল্প। অথচ বন্দীদিগের অভিযোগ যে সত্য, ইহা অস্বীকার করা যায় না। মিষ্টার যোশী সরকার কর্ত্তৃক শ্রমিকদিগের প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছিলেন ; তদ্ভিন্ন, তিনি শ্রমিক রয়াল কমিশনের সদস্য, এবং জেনিভার আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সমিতির সদস্যও মনোনীত হইয়াছিলেন।—সুতরাং তিনি সরকারের বিশ্বাসভাজন। তিনি সরকারের সম্মতিক্রমেই দেউলীর বন্দিবাসে গমন করিয়া তদন্তের পর আটক-বন্দীদিগের অভিযোগ যে যথার্থ, ইহা রিপোর্টে প্রকাশ করিয়াছেন। অথচ সার রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েল বেপরোয়াভাবে বলিয়াছিলেন,—ইহাদের অভিযোগ সত্য নহে। ইহাতে কাহার বিস্ময় না জন্মিবে ? দেউলীর বন্দিবাসের বন্দীদিগকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া সরকারের অবশ্যকর্ত্তব্য ; অন্ততঃ তাঁহাদের সঙ্গত অভিযোগসমূহের প্রতিকার করা উচিত ; তাহা না করিয়া নিষ্ঠুর বিদ্রূপ করিলে সরকারের কোন ক্ষতি নাই, এরূপ মনে করা ভুল। সার ফ্রান্সিস ইয়ং হাসব্যাণ্ডের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিবার যোগ্য।

—

রাজনীতিক বন্দীদিগের মুক্তি

রাজনীতিক কারণে বন্দীদিগের মুক্তিদানের প্রস্তাব মধ্যে মধ্যে আলোচিত হয়। দেশের লোক ইহাদিগের মুক্তিদানের জন্য দীর্ঘকাল হইতেই সরকারকে অনুরোধ করিয়া আসিতেছেন ; কিন্তু সরকার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। যাঁহারা বিনা-বিচারে কেবল পুলিস এবং গোয়েন্দার সুপারিসে নির্ভরশীল সরকার কর্ত্তৃক বন্দী হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে মুক্তি দেওয়াই কর্ত্তব্য। কারণ, সরকার তাঁহাদিগকে আত্মপক্ষ সমর্থনের অবকাশ না দিয়াই দোষী সাব্যস্ত করিয়া বন্দী করিয়াছেন। তাঁহাদের অপরাধ আদালতে সপ্রমাণ হয় নাই। অধিকন্তু যাঁহারা সত্যাগ্রহ করিবার অপরাধে বন্দী হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে হয় ত সরকার মুক্তি দিতে সম্মত হইতে পারেন ; কিন্তু তাহাতে এই সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া মনে হয় না। সত্যাগ্রহীদিগের মধ্যে যাঁহারা সমর্থ, তাঁহারা মুক্তি পাইলেই আবার সত্যাগ্রহ করিবেন, এ কথা গান্ধীজীও প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা যে কারণে সত্যাগ্রহ করিতেছেন, সেই কারণ দূর না করিলে এই সমস্যার মীমাংসা হইবে না। কংগ্রেসকে যুদ্ধ সম্বন্ধে এবং অন্যান্য সকল বিষয়ে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দিতেই হইবে, ইহাই গান্ধীজীর মনোগত অভিপ্রায়। কিন্তু সরকার তাহাতে সহজে সম্মত হইবেন বলিয়া মনে হয় না। এ অবস্থায় কিরূপে এই জটিল সমস্যার মীমাংসা হইবে ?

—

প্রবাসী বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন

উনিশ বৎসর পূর্ব্বে কাশীধামে সর্ব্বপ্রথম প্রবাসী বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বৈঠক বসিয়াছিল। সে-বার স্বর্গীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তাহার পর দীর্ঘ উনিশ বৎসর চলিয়া গেল। এবার আবার কাশীধামে বড়দিনের ছুটীতে সেই প্রবাসী সাহিত্য সম্মেলন হইবে। উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে। এবার রবীন্দ্রনাথের তিরোধানে এই সম্মেলন এক দিন বিশেষ ভাবে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিপূজা করিবেন। এই অধিবেশনে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, বৃহত্তর বঙ্গ-প্রবাসী বাঙ্গালীর সমস্যা, সঙ্গীত, ললিতকলা সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়কে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি করিবার প্রস্তাব হইয়াছে ; কিন্তু তিনি অসুস্থ। কাশীর সাহিত্যানুরাগী কর্ম্মিগণ, আশা করি, এই অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারিবেন।

—

জয়প্রকাশ নারায়ণের পত্র

দেউলীতে সরকারের আটক-বন্দী শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ সমাজতন্ত্রবাদী হইলেও কংগ্রেসের দলভুক্ত। ইঁহারা কংগ্রেস-সোস্যালিষ্ট নামে অভিহিত। সম্প্রতি জয়প্রকাশ নারায়ণের স্ত্রী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দেউলীর বন্দিশালায় গমন করিলে, এইরূপ প্রকাশ, জয়প্রকাশ নারায়ণ তাঁহাকে একখানা গোপনীয় পত্র প্রদানের চেষ্টা করায়, যে সরকারী কর্ম্মচারী তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাহা দেখিতে পাইয়া জয়প্রকাশ নারায়ণের

সহিত ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া চিঠিখানি হস্তগত করেন। সরকার আপনাদিগের মন্তব্য-সম্বলিত এই চিঠিখানি দৈনিক সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশ করিতে পাঠাইলে সকল সংবাদপত্র তাহা ছাপেন নাই। কিন্তু সেই পত্রে যে সরকারী মন্তব্য আছে, তাহা পাঠে মনে হয়, ডাকাতি দ্বারা অর্থ-সংগ্রহ করিয়া সরকারের বিরুদ্ধে হিংসাপূর্ণ আক্রমণ করিবার কথা সেই চিঠিতে লিখিত ছিল। ইহা ভিন্ন উহাতে রুশিয়ার কমিউনিষ্টদিগের নিন্দাও ছিল। আরও লেখা হইয়াছিল, ঐ বন্দিনিবাসের বন্দীদের কোন সঙ্গত অভিযোগ নাই। এখন এই চিঠিখানি সম্বন্ধে নানা দিকে নানা আলোচনা হইতেছে। জয়প্রকাশ নারায়ণ যদি সত্যই ডাকাতি দ্বারা অর্থ-সংগ্রহের কথা লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ফৌজদারী-সোপর্দ্দ করাই সরকারের কর্ত্তব্য ছিল; কিন্তু সরকার তাহা করেন নাই; সরকারের এই সহিষ্ণুতা ও উদারতার কারণ প্রকাশ নাই।

জয়প্রকাশ নারায়ণ যদি হিংসাশ্রয়ী হইয়া ডাকাতি করিবার অনুকূলে মতপ্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হইবে, অহিংস-পন্থী কংগ্রেসের মতের সহিত তাঁহার মতের মিল নাই। জয়প্রকাশ নারায়ণ স্বয়ং স্যোসালিষ্ট বা সমাজতন্ত্রী হইয়াও রুশিয়ার কমিউনিষ্টদিগের নিন্দা করিয়াছেন; ইহাও তাঁহার পক্ষে অসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক, এখন অনেকের ধারণা, চিঠিখানি জাল। তাহার প্রধান কারণ, জয়প্রকাশ নারায়ণের তথাকথিত চিঠিতে লেখা হইয়াছে, দেউলী-বন্দিশালার বন্দীদিগের অভিযোগ করিবার বাস্তবিক কোন হেতু নাই। অথচ মিষ্টার যোশী সরেজমিনে তদন্ত করিয়া বলিয়াছেন, বন্দীদিগের অভিযোগের অনেক কারণ আছে। বিশেষতঃ, জয়প্রকাশ সরকারের এক জন প্রহরীর সম্মুখেই বাম হস্ত দিয়া একটা চিঠির তাড়া তাঁহার স্ত্রীর হাতে গুঁজিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিবেন, তাঁহাকে এরূপ নির্ব্বোধ মনে করা যায় কি? চিঠিখানি অন্য কেহই দেখিতে পান নাই; এমন কি, জয়প্রকাশ নারায়ণের স্ত্রীও তাহা দেখেন নাই। উহা তাঁহার স্ত্রীর হস্তগত হইবার পূর্ব্বেই সরকারী কর্ম্মচারীটি তাহা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। জয়প্রকাশ তাঁহার স্ত্রীকে উহা প্রদানের চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহার অন্য কোন সাক্ষীও নাই। ব্যাপারটা সত্যই উৎকট রহস্যপূর্ণ! উহাতে তিনটি কথা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। প্রথম, দেউলী বন্দিবাসের আটক-আসামীরা নির্দ্দোষ নহে; তাহারা হিংসাশ্রয়ী ও ডাকাত। দ্বিতীয়,—দেউলীর বন্দীদিগের বাস্তবিক অভিযোগ করিবার কোন কারণ নাই; এবং তৃতীয়, রুশিয়ার কমিউনিজম্ অগ্রাহ্য ও দোষপূর্ণ। এ সব কথাই সরকারের অনুকূল। জয়প্রকাশ নারায়ণ কি সাধারণ বুদ্ধি থাকিলেও এমন চিঠি লিখিতে পারেন? তবে এ চিঠি কোথা হইতে আসিল? কে এই রহস্যভেদ করিবে?

কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ

কংগ্রেস এখন সরকারের সহিত অসহযোগ করিয়া ভারতীয় শাসন-যন্ত্রের সহিত যথাসম্ভব সংস্রব ত্যাগ করিয়াছেন। সেই জন্য তাঁহারা মন্ত্রিত্বেও ইস্তফা দিয়াছেন। কংগ্রেসের সদস্যরা যখন মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা যে সকল প্রদেশের শাসন-যন্ত্র পরিচালিত করিয়াছিলেন, সেই সকল প্রদেশের কতকগুলি হিতকর কার্য্যও করিয়াছিলেন। তাঁহারা কেবল সেলাম ঠুকিয়া, এবং যবনিকার অন্তরালে অবস্থিত স্বার্থসাধনে তৎপর কতকগুলি লোকের পরামর্শেও কোন কাজ করেন নাই। কাজেই কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহাদিগের উপর এ দেশবাসীর অনেকটা আস্থা জন্মিয়াছিল। এইবার য়ুরোপে যুদ্ধারম্ভের পর গ্রেট্ বৃটেন কি উদ্দেশ্যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং সেই উদ্দেশ্য ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও খাটিবে কি না, এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে সরকারের নিকট হইতে তাহার কোন স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায় নাই বলিয়া কংগ্রেসী দল এই যুদ্ধে সহায়তা করিবার অসামর্থ্য জানাইয়া মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু সেই সময় হইতে এক দল লোক কংগ্রেসকে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া আসিতেছেন। এবারও সেই কথা শুনা যাইতেছে। কংগ্রেসীরাও সেই জন্য বলেন, কংগ্রেসের সদস্যরা যদি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের অসহযোগ পণ্ড হইয়া যাইবে। মন্ত্রিত্ব করিতে হইলেই তাঁহাদিগের যুদ্ধোদ্যমে পূর্ণমাত্রায় সহায়তা করিতে হইবে। তাঁহাদের কার্য্যতঃ অহিংসা-ব্রত পরিহার করিয়া হিংসার কার্য্যের সহায়তা করিতে হইবে। ইহাতে তাঁহাদের আসল উদ্দেশ্য—ভারতের স্বাধীনতা লাভ পরিহার করিতে হইবে। ইহা কংগ্রেসের সমর্থক-পক্ষের কথা। কাজেই কংগ্রেসের সদস্যরা অসহযোগ ছাড়িয়া পূর্ণ সহযোগ অবলম্বন করিতে পারিতেছেন না।

মসজেদের সম্মুখে বাদ্য

মসজেদের সম্মুখে বাদ্য সম্বন্ধে প্রশ্নটা নূতন উঠিয়াছে। নবাবী আমলে ইহা লইয়া কোন দিন মতভেদ বা মনান্তর হইয়াছে, এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মিশরে মসজেদের সম্মুখে এখনও বাদ্যধ্বনি হয়। কেবল ভারতে দেখা যাইতেছে, হিন্দুরা তাঁহাদের ধর্ম্মসম্পর্কিত বাদ্যধ্বনি করিয়া মসজেদের নিকট উপস্থিত হইলেই গোঁড়া মুসলমানরা দলবদ্ধ হইয়া আপত্তি এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামা করেন। সম্প্রতি বাঙ্গালায় সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এই সম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার জন্য বাঙ্গালা সরকারের প্রধান

সচিব মিষ্টার ফজলুল হক এবং স্বরাষ্ট্র-সচিবের সহিত আলোচনা করিতে থাকেন; কিন্তু তাঁহাদিগকে এই সম্বন্ধে ন্যায়সঙ্গতরূপে চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে কার্য্যতঃ অসম্মত দেখিয়া সার মন্মথনাথ বাঙ্গালার গবর্ণরের সহিত দেখা করেন। উভয়ের দুই দিন কিছুকাল ধরিয়া আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু শেষ ফল বিশেষ-কিছু হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারা যায় নাই। এ সম্বন্ধে প্রকাশিত সংবাদ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। উহা হইতে প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তবে এইটুকু মাত্র জানিতে পারা গিয়াছে যে, সার মন্মথনাথকে অতঃপর এই বিষয়ে বাঙ্গালার স্বরাষ্ট্র-সচিব সার খাজা নাজিমুদ্দীনের সহিত আলোচনা করিতে হইবে। বাঙ্গালার গবর্ণর নিয়মানুগ শাসনকর্তা; সুতরাং তিনি এই বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে অসমর্থ। ইহাতে ইহাই প্রতীতি হয় যে, এখন বাঙ্গালার হিন্দুদিগকে সাম্প্রদায়িক ভাবে নির্ব্বাচিত মুসলমান সচিবসঙ্ঘের মর্জ্জির উপর নির্ভর করিয়াই এ দেশে বাস করিতে হইবে। ইহারই নাম ডেমক্রেসী! কিন্তু আইনে এইরূপ ব্যবস্থা আছে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের দ্বারা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কোন অনিষ্ট না হয়, গবর্ণর তাহা দেখিবেন। এই ব্যবস্থার গতি কি হইল? বাঙ্গালায় য়ুরোপীয় বণিকগণ তাঁহাদের সংখ্যানুপাতের অধিক সদস্য ব্যবস্থা পরিষদে প্রেরণ করিয়া থাকেন। ইঁহাদেরই ভোটের জোরে অনেক সময়েই বাঙ্গালার বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘ রক্ষা পাইয়া আসিতেছেন; অথচ ইঁহারা সচিবসঙ্ঘের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে নির্ব্বাকও নহেন, তথাপি ইঁহারা কার্য্যকালে কি কারণে সচিবসঙ্ঘের পোষকতা করেন, তাহা যাঁহাদের চক্ষু আছে, তাঁহাদের অগোচর নহে।

হক-লীগের মীমাংসা

বাঙ্গালা সরকারের প্রধান-সচিব মিঃ ফজলুল হকের বেমক্কা কথা বলিয়া তাহা 'তোবা' করিবার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। তিনি লীগের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য মিটাইবার জন্য যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে বলিয়াছেন—(১) অসুস্থতা-নিবন্ধন তিনি লীগের পত্রের উত্তর দিতে পারেন নাই; (২) তিনি লীগের নির্দ্দেশ মানিয়া চলেন, এবং লীগের আদেশ-মতেই দেশরক্ষা সমিতির পদ ত্যাগ করিয়াছেন; (৩) তাঁহার পত্রের কোন কোন অংশ মিষ্টার জিন্নার ও তাঁহার কতিপয় বন্ধুর মনোকষ্টের (বিরাগের?) কারণ হইয়াছে; কিন্তু তাঁহাদের মনে বেদনা দেওয়া তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু দেখা গেল, তিনি সে জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা বা দুঃখ-প্রকাশ পর্য্যন্ত করেন নাই। তাঁহার অসুস্থতার জন্য লক্ষ্ণৌ, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণে এবং নিমন্ত্রণে ভূরি-ভোজনে কোন বাধা ঘটে নাই! যাহা হউক, এই পত্রের ফলে লীগের সহিত মিষ্টার ফজলুল হকের অপ্রীতির অবসান হইয়াছে। বস্তুতঃ, এই বিবাদ মিটাইতে আগ্রহের জন্য বিবাদ সহজে মিটিয়া গেল। এখন জিজ্ঞাস্য—মিষ্টার সুরাবর্দ্দীর বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাবটি ব্যবস্থা পরিষদে পেশ করা হইবে কি না? বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘটি বজায় রাখা কতকগুলি প্রভাবশালী লোকের একান্তই অভিপ্রেত, তাঁহাদের চেষ্টাতেই এই মিলন সম্ভবপর হইয়াছে। সে জন্যই বোধ হয়, ঐ অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব উপস্থিত না হইতে, অথবা ভোটে না টিকিতে পারে। শুনা যাইতেছে, হক সাহেব না কি তাঁহার গোঁ ছাড়েন নাই। এখন দেখা যাউক, ইহার পরিণাম কি!

স্বর্গীয়া বিভাবতী দেবী

জয়পুরের ভূতপূর্ব্ব সচিবশ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় সংসারচন্দ্র সেন মহাশয়ের পুত্রবধূ বিভাবতী দেবীর অকাল-মৃত্যুতে আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত স্বামী—দিল্লীর প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত অপ্রকাশ সেন ও তাঁহার শোক-কাতর পরিজনবর্গকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি। স্বর্গীয়া বিভাবতী দেবী দিল্লীর বাঙ্গালী মহিলা-সমাজে প্রতিষ্ঠা ও সমাদর লাভ

বিভাবতী দেবী

করিয়াছিলেন। দিল্লীর সকল সদনুষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই ধর্ম্মপ্রাণ মহিলার আতিথেয়তা বড়ই মধুর ছিল। দিল্লীপ্রবাসী বাঙ্গালী সমাজ দীর্ঘকাল তাঁহার অভাব অনুভব করিবেন।

পরলোকে ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়

গত ২৫শে কার্ত্তিক প্রতিষ্ঠাবান্ ইঞ্জিনীয়ার ও ঠিকাদার ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় ৭৫ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত

হইয়াছেন। হুগলী জিলার তেলাগু গ্রামে তাঁহার জন্ম। ভবানীপুর পরে শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে অধ্যয়ন করিয়া কিছু দিন কলিকাতা করপোরেশনে কাজ করিবার পর তিনি স্বাধীন ভাবে ঠিকা লইয়া আসাম-বেঙ্গল রেলপথের কতকাংশ নির্ম্মাণ—মূর-বেটম্যান স্কীম অনুসারে কলিকাতায় জল-সরবরাহের কার্য্য করিয়াছিলেন। ১০ বৎসর তিনি অবসর লইয়া স্বগ্রামের উন্নতি-বিধানে বিশেষতঃ গো-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র—জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার ও হিন্দুসভার বিশিষ্ট নেতা। আমরা তাঁহাদের শোকে সমবেদনা জানাইতেছি।

পরলোকে সতীশচন্দ্র সেন

গত ২১শে আশ্বিন সুবিখ্যাত এটর্ণি সতীশচন্দ্র সেন ৭৪ বৎসর বয়সে, তাঁহার গিরিডির শান্তিকুঞ্জ হইতে পরলোকে গমন করিয়াছেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যবংশ কীর্ত্তিচন্দ্র সেনের বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চিরদিন স্বগ্রামের উন্নতির জন্য রাস্তা প্রস্তুত—দাতব্য চিকিৎসালয়—হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা—স্কুল পরিচালন—দেবমন্দির নির্ম্মাণ প্রভৃতিতে অর্থব্যয় করিয়াছেন। প্রথম জীবনে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবহারাজীবরূপে পরে এটর্ণিরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে এবং দুইবার ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়া জনসেবা করিয়াছিলেন। কয়লার ব্যবসায়েও তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, দুইবার কয়লা-ব্যবসায়ী সমিতি—ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেসনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সতীশ বাবু কয়েকটি ফিল্ম কোম্পানী এবং অধুনালুপ্ত আর্ট থিয়েটারের পরিচালক সমিতির সভাপতিরূপে নাট্যকলা ও চিত্রশিল্পের উন্নতিবিধানে যত্নবান্ হইয়া নাট্যানুরাগ—চিত্রপ্রীতির পরিচয় প্রকট করিয়াছিলেন। স্ত্রী-বিয়োগের পর তিনি ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে কর্ম্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বদেশহিতে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্রদ্বয়ের—জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র সেন এম-বি-ই হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ এটর্ণি—ভারত সরকারের কলিকাতার সলিসিটার; কনিষ্ঠ ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সেন আসানসোলের খ্যাতনামা চক্ষু-চিকিৎসক। আমরা তাঁহাদিগের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।
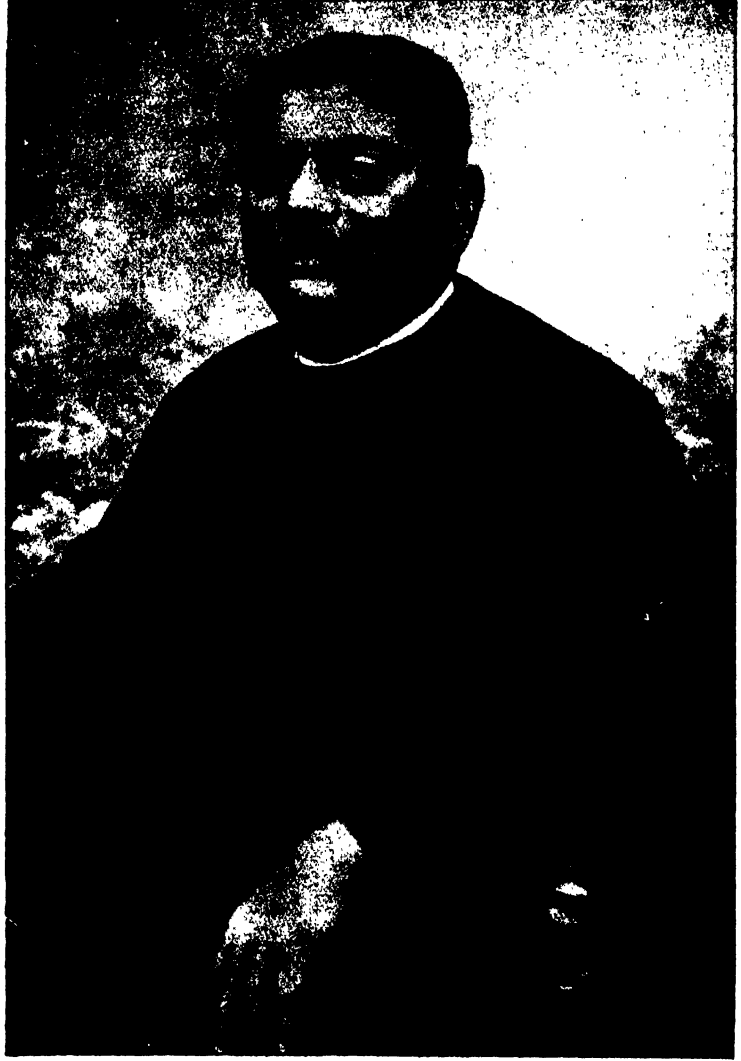
সতীশচন্দ্র সেন

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত

২০শ বর্ষ] পৌষ, ১৩৪৮ [৩য় সংখ্যা

পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে

১০

বিশুদ্ধজ্ঞানদেহায় ত্রিবেদীদিব্যচক্ষুষে।
শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিনিমিত্তায় নমঃ সোমার্দ্ধধারিণে॥

শ্লোকবার্ত্তিকের এই প্রথম শ্লোকে ঈশ্বরকে শ্রেয়ঃ-প্রাপ্তির নিমিত্তভূত বলা হইয়াছে। 'শ্রেয়ঃ' বলিতে বুঝায় কল্যাণ বা সুখ। এ স্থলে কল্যাণ বলিতে বুঝাইতেছে—গ্রন্থকারের অভিপ্রেত আরব্ধ গ্রন্থখানির নির্ব্বিঘ্ন-পরিসমাপ্তি ও তজ্জনিত তাঁহার সুখ। মীমাংসকগণ সেশ্বরবাদী—ইহা কোনরূপে না হয় স্বীকার করা যায়। কিন্তু ঈশ্বর যে শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত—এ সিদ্ধান্ত মীমাংসকমতে মোটেই স্বীকৃত হয় নাই। কারণ, ঈশ্বর যে সাক্ষাৎ বা পরম্পরাক্রমে সুখের কারণ—ইহা মীমাংসকগণ বলিতে রাজী নহেন। তবে ভট্টপাদের মত এক জন মীমাংসকধুরন্ধরের মুখ হইতে এরূপ উক্তি উচ্চারিত হইল কোন্ যুক্তিবলে?

উত্তরে বলা চলে যে, কুমারিলের পক্ষ-সমর্থনে একটি কথা বলা যায়। তাঁহার উক্তিকে সুসঙ্গত করিবার এই একটিমাত্রই উপায়—গত্যন্তর নাই। ঈশ্বরকে শ্রেয়ঃ-প্রাপ্তির 'সামান্য কারণ' বলিলে কোন আপত্তি উঠিতে পারে না। তবে তাঁহাকে শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির 'বিশেষ কারণ' বলিতে আপত্তির যথেষ্ট কারণ আছে। এই 'সামান্য কারণ' বলিতে কি বুঝা যায়? একটি দৃষ্টান্ত দিয়া ব্যাপারটি পরিষ্কার করা যাউক। পর্জ্জন্যদেব শস্যোৎ-পত্তির প্রতি সামান্য কারণ। যেহেতু, তিনি উর্ব্বর ও ঊষর উভয় প্রকার ক্ষেত্রেই সমভাবে বারিবর্ষণ করিয়া থাকেন। তথাপি উর্ব্বরক্ষেত্রে উপ্ত বীজই অঙ্কুরিত হয়—ঊষরে পতিত বীজের আর কোন পরিণতি হয় না। এ ক্ষেত্রে ভূমির উর্ব্বরতা, জলবায়ুর অনুকূলতা, বীজের অঙ্কুরযোগ্যতা প্রভৃতি শস্যোৎপত্তির বিশেষ কারণ। ঈশ্বরও এইরূপ পর্জ্জন্যবৎ সামান্য কারণ, অর্থাৎ তিনি শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির অনুকূল বস্তুসমূহের সৃষ্টি করিয়া থাকেন বলিয়াই তিনি শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির সামান্য কারণ। কিন্তু তাঁহাকে শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির বিশেষ কারণ বলা যায় না। কারণ, তিনি কোন ব্যক্তিবিশেষের সহিত শ্রেয়ঃ-সম্বন্ধ সাক্ষাৎ ঘটাইয়া দেন না। উক্ত ব্যক্তি যদি নিজ সুকৃতকর্ম্মবলে শ্রেয়ঃ-সম্বন্ধকারক অপূর্ব্বের অধিকা[illegible] হন, তাহা হইলেই তিনি শ্রেয়োলাভ করিতে[illegible] অতএব, যথাযোগ্য কর্ম্ম ও তজ্জনিত[illegible] প্রাপ্তির বিশেষ কারণ। যেহেতু

সহিত শ্রেয়ঃসম্বন্ধ ঘটাইয়া দেয়। এ স্থলেও ঈশ্বরের প্রতি নমস্কার-ক্রিয়াই অপূর্ব্বের জনক বলিয়া মীমাংসকগণ স্বীকার করেন; আর সেই অপূর্ব্বই নির্ব্বিঘ্নে গ্রন্থ-সমাপ্তিরূপ শ্রেয়োলাভের সাক্ষাৎ-কারণস্বরূপে পরিগণিত হইয়াছে। যদি এই প্রকারে উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করা যায়, তাহা হইলে আর ঈশ্বরের প্রসাদ বা ঈশ্বর শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত ইত্যাদি মীমাংসা-বিরুদ্ধ মতের উত্থিতিই হইবে না। তবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব এরূপ ব্যাখ্যাতেও অবশ্য স্বীকার্য্য।

অতএব, মীমাংসক-সিদ্ধান্তে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত—ইহা নিশ্চিত বুঝা গেল। ঈদৃশ ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য কোথায়, তাহা স্বয়ং ভট্টপাদ তাঁহার পূর্ব্বোক্ত মঙ্গলাচরণ-শ্লোকেই স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার শ্লোকমধ্যে গ্রথিত বিশেষণগুলির বিশ্লেষণ করিলেই এ বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হইবে। একটি বিশেষণ হইতেছে 'ত্রিবেদীদিব্যচক্ষুষে'—তিন বেদ তাঁহার দিব্য-চক্ষুঃ-স্বরূপ। 'চক্ষুঃ' বলিলে বুঝা যায়, উহা আমাদিগের কর্ম্মসম্পাদনের প্রধান সহায় ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান আহরণের অন্যতম প্রধান করণ বা দ্বার। অতএব, পূর্ব্বোক্ত বিশেষণটির প্রয়োগে বুঝা যায় যে, কুমারিল বুঝাইতে চাহিয়াছেন—ঈশ্বর বেদোক্ত জ্ঞানের সাহায্যে ক্রিয়া করিয়া থাকেন। বেদোক্ত জ্ঞানই তাঁহার জ্ঞান—এই দিব্য বেদজ্ঞানই তাঁহাকে বিশ্বব্যাপারে প্রণোদিত করে। অর্থাৎ—জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি কার্য্য তিনি বেদজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। ইহা হইতে মীমাংসকগণের অন্যতম প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত পাওয়া গেল যে—বেদ কৃতক অর্থাৎ ঈশ্বর-সৃষ্ট নহে—বরং ঈশ্বরই নিত্য বেদজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার কর্ম্মপ্রেরণা লাভ করেন।

দ্বিতীয় বিশেষণটি হইল—'সোমার্দ্ধধারিণে'। চন্দ্রকলা যদি তাঁহার শেখর হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ঈশ্বরেরও অবশ্যই শরীর আছে। আর এই শরীর যে আমাদিগের শরীরের ন্যায় স্থূলসূক্ষ্মাদি ভৌতিক উপাদানে গঠিত নহে—এমন কি, দেবাদির ন্যায় তৈজস দেহও নহে—তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত ভট্টপাদ তৃতীয় বিশেষণ করিয়াছেন—'বিশুদ্ধজ্ঞানদেহায়'। এই জ্ঞানই চৈতন্য—ইহা ভৌতিক বা জড় নহে—চিদ্রূপ। অতএব ঈশ্বরের দেহ তির্য্যক্‌প্রাণী, মনুষ্য, ভূত-প্রেত, পিতৃ-দেবাদির শরীর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ—অনন্যসাধারণ। কারণ, পূর্ব্বোক্ত প্রাণিবৃন্দের শরীর স্থূল-সূক্ষ্মাদিভেদে বিভিন্ন হইলেও মূলতঃ একই জড় উপাদান হইতে গঠিত; পক্ষান্তরে ঈশ্বর-শরীরের উপাদান জড় নহে—চিৎ। অর্থাৎ, তিনি স্বয়ং চিদ্রূপ—তাঁহার দেহও চিন্ময়—এক কথায়, তাঁহার দেহ ও তিনি অভিন্ন। আর দেবমনুষ্যাদির যথার্থ স্বরূপ ও তাঁহাদিগের দেহ—দুইটি বিভিন্ন পদার্থ। ইহা ছাড়া এই বিশেষণটির আরও একটি নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে। জ্ঞান অজ্ঞান বা অবিদ্যার বিরোধী। ঈশ্বর-বিগ্রহ বিশুদ্ধজ্ঞানময় বলিলে বুঝা যায়, ঈশ্বর (=তাঁহার দেহ) অজ্ঞানের অধীন নহে। এক ঈশ্বর ব্যতীত আর সকলেই মায়াধীন—একমাত্র তিনিই মায়াধীশ (১)। এস্থলে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে যে, অদ্বৈতবেদান্তমতে পরমেশ্বর নির্গুণ ও মায়াসম্বন্ধ-বর্জ্জিত শুদ্ধচিন্মাত্র-স্বরূপ।

এই প্রসঙ্গে আমাদিগের পুরাতন বন্ধু অধ্যাপক কীথ মহোদয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবে আলোচ্য। অধ্যাপকপ্রবর বলিতেছেন—

'কুমারিল কেবল ন্যায়-বৈশেষিক-মত খণ্ডন করিয়াই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তিনি সমভাবেই বেদান্তকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার বেদান্ত-খণ্ডন-প্রয়াসের পক্ষে মাত্র একটি অতি সরল যুক্তি এই যে—অদ্বৈতবাদে পরমাত্মাকে যেরূপ একান্ত শুদ্ধ (নির্গুণ) বলিয়া ধরা হয়, যদি তিনি যথার্থই সেরূপ শুদ্ধ-স্বরূপ হন, তাহা হইলে জগৎপ্রপঞ্চকেও তদ্রূপ শুদ্ধ বলিতে হইবে। তাহা ছাড়া এরূপ স্বীকার করিলে সৃষ্টি-প্রক্রিয়াও অসঙ্গত হইয়া উঠিবে; কারণ, সৃষ্টির হেতুই অবিদ্যা—অথচ এরূপ শুদ্ধ ব্রহ্মে অবিদ্যার সম্পর্কই

---

(১) অতএব একমাত্র তাঁহার উপাসনাই মোক্ষের হেতু। তাঁহার মায়াবিহীন ও মায়া-বিরোধী চিন্মাত্রস্বরূপের প্রতি চিত্ত নিবিষ্ট হইলেই সংসারপ্রপঞ্চ ও তৎকারণভূত অজ্ঞান দূরীভূত হয়—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"
—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৭।১৪

কলিকাতা, ১০..

অসম্ভব (২)। আর যদি আমরা স্বীকার করিয়া লই যে, অন্য কোন নিমিত্ত অবিদ্যারূপ উপাদানকে জগদ্রূপে পরিণত হইবার প্রেরণা দান করে, তাহা হইলেও পরমাত্মার একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ববাদ খণ্ডিত হইয়া যায়। পক্ষান্তরে যদি ধরা যায় যে, অবিদ্যা স্বাভাবিক (অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশহীন নিত্য), তাহা হইলেও অবিদ্যার নাশ অসম্ভব হইয়া উঠে, কারণ, অদ্বৈতমতে একমাত্র আত্মজ্ঞান অবিদ্যার নাশক। কিন্তু অবিদ্যার স্বাভাবিকত্ব একবার স্বীকার করিলে আর অবিদ্যার আত্মজ্ঞান-নাশ্যত্বের কথাই উঠিতে পারে না' (৩)।

কুমারিলের যে উক্তির উপর নির্ভর করিয়া কীথ মহোদয় উক্ত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"পুরুষস্য তু শুদ্ধস্য নাশুদ্ধা বিকৃতির্ভবেৎ ॥ ৮২ ॥
স্বাধীনত্বাচ্চ ধর্ম্মাদেস্তেন ক্লেশো ন যুজ্যতে।
তদ্বশেন প্রবৃত্তৌ বা ব্যতিরেকঃ প্রসজ্যতে ॥ ৮৩ ॥
স্বয়ং চ শুদ্ধরূপত্বাদসত্বাচ্চান্যবস্তুনঃ।
স্বপ্নাদিবদবিদ্যায়াঃ প্রবৃত্তিস্তস্য কিং কৃতা ॥ ৮৪ ॥
অন্যেনোপপ্লবেঽভীষ্টে দ্বৈতবাদঃ প্রসজ্যতে।
স্বাভাবিকীমবিদ্যাং তু নোচ্ছেত্তুং কশ্চিদর্হতি ॥ ৮৫ ॥
বিলক্ষণোপপাতে হি নশ্যেৎ স্বাভাবিকী কচিৎ।
ন ত্বেকাত্মাভ্যুপায়ানাং হেতুরস্তি বিলক্ষণঃ ॥ ৮৬ ॥

(শ্লোকবার্ত্তিক, সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার প্রকরণ)

পার্থসারথি যেরূপ আশয় উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্তসার নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে—

'মতান্তরে কথিত হইয়াছে যে, একমাত্র আত্মাই জগৎ-সৃষ্টির পূর্ব্বে বর্ত্তমান থাকেন,—তিনিই স্বেচ্ছায় আকাশ-বায়ু-অগ্নি-জল-পৃথিবীরূপে পরিণমমান হইয়া বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি করেন। এই মত নিরাকরণের উদ্দেশ্যে ভট্টপাদ বলিতেছেন—শুদ্ধস্বরূপ (অর্থাৎ চেতন) পুরুষের অশুদ্ধ বিকার (অর্থাৎ জড় জগদাকারে পরিণাম) হইতেই পারে না। পুরুষ চেতন—শুদ্ধ, জগৎ অচেতন অতএব অশুদ্ধ। পুরুষ জ্ঞানানন্দস্বভাব। তিনি কি হেতু বিনা কারণে (স্বেচ্ছায়) জড়রূপ সুখদুঃখমোহাত্মক বিকার অনুভব করিবেন? যদি বলা যায়, ধর্ম্মাধর্ম্মের অধীন বলিয়াই তাঁহার এই পরিণাম, তাহাও ঠিক নহে। কারণ, ধর্ম্মাদি হইতে তিনি স্বাধীন। অতএব তাঁহার ক্লেশ (অর্থাৎ বিকার—পরিণাম) সঙ্গত হয় না। তিনি সর্ব্বশক্তি পুরুষ—অত্যন্ত স্বতন্ত্র। তিনি কিরূপে ধর্ম্মাধর্ম্মের অধীন হইবেন? বরং ধর্ম্মাধর্ম্মই তাঁহার অধীন। অতএব ধর্ম্মাধর্ম্মবশে তাঁহার ক্লেশ—এ কথা বলাও অযুক্ত। তাহা ছাড়া, সৃষ্টির পূর্ব্বে আত্মাই একমাত্র বর্ত্তমান থাকেন। তদ্ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। অতএব ধর্ম্মাধর্ম্মও তখন থাকে না। কাজেই তাহাদিগের দ্বারা তাঁহার ক্লেশ কিরূপে হইবে? আর যদি ঐ সময়ে ধর্ম্মাধর্ম্মেরও অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ত আত্মব্যতিরিক্ত বস্তন্তরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়া থাকে। তাহাতে অদ্বৈতবাদের হানি হয়। পক্ষান্তরে, যাঁহারা বলিয়া থাকেন, আমরা আত্মার বিকার বা পরিণাম স্বীকার করি না; কিন্তু অপরিণত থাকিয়াও স্বপ্নদর্শনের

---

(২) অবিদ্যা, অজ্ঞান, মায়া—বিশ্বোৎপত্তির হেতু বলিলে বুঝা যায় যে, অবিদ্যা জগৎপ্রপঞ্চের পরিণামী উপাদান কারণ; ব্রহ্ম—অবিদ্যাকে জগতে পরিণত করাইবার নিমিত্ত কারণ। উপাদান অচেতন ও নিমিত্ত চেতন। কারণ, চেতন নিমিত্তদ্বারা অধিষ্ঠিত না হইলে কখনও অচেতন উপাদান স্বতন্ত্রভাবে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—কুম্ভকাররূপ নিমিত্ত না থাকিলে মৃত্তিকারূপ উপাদান কখনও ঘটরূপ কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। জগৎপ্রপঞ্চ দৃষ্টান্তে চেতন ব্রহ্ম নিমিত্ত তিনি যদি শুদ্ধ হন, তবে তাঁহাতে অবিদ্যা কোন দিনই আসিবে না—সৃষ্টিও কোন কালে হইবে না।

(৩) "Kumārila, however, does not content himself with refuting the Nyāya-Vais'esika doctrine; he attacks equally the Vedānta, on the simple ground, that if the absolute is, as it is asserted to be, absolutely pure, the world itself should be absolutely pure. Moreover, there could be no creation, for nescience is impossible in such an absolute. If, however, we assume that some other cause starts nescience to activity, then the unity of the absolute disappears. Again, if nescience is natural, it is impossible to remove it, for that could be accomplished only by knowledge of the self, which on the theory of the natural character of nescience, is out of the question."—Keith, Karmamīmāṃsā, pp. 63-64.

আপনাকে' যেন প্রপঞ্চাকারে পরিণত বলিয়া মনে করে, —তাঁহাদিগের উত্তরে বলা যাইতে পারে, যেহেতু, আত্মা শুদ্ধস্বভাব ও যেহেতু তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য বস্তুর অস্তিত্ব নাই, অতএব স্বপ্নদর্শনের ন্যায় তাঁহাতে অবিদ্যার প্রবৃত্তি কি নিমিত্ত হইতে পারে? অবিদ্যা ত ভ্রম; ভ্রমও কোন না কোন কারণের অধীন। বিশুদ্ধ-জ্ঞানস্বভাব. পুরুষ তাহার কারণ হইতে পারে না। অথচ পুরুষ ব্যতীত অন্য বস্তুও নাই। অতএব, অবিদ্যার প্রবৃত্তি সম্ভব নহে। কাজেই অবিদ্যা-নিবন্ধন সৃষ্টিও হইতে পারে না। অন্য বস্তুদ্বারা অবিদ্যা-বিকারই সৃষ্টি—ইহা স্বীকার করিলেও দ্বৈতবাদেরই প্রসক্তি হইবে। ইহার উত্তরে যদি বলা হয়, পুরুষের অবিদ্যা স্বাভাবিক ও অনাদি, আর সেই হেতু উহা কোন কারণের অধীন নহে, তাহার খণ্ডনার্থ কুমারিল বলিয়াছেন—স্বাভাবিকী অবিদ্যার উচ্ছেদ ত কেহ কোন দিন কোনরূপেই করিতে পারেন না। এস্থলে ইহাও বক্তব্য—জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম কিরূপে আবার অজ্ঞানস্বভাব হইবেন? একই বস্তুর যুগপৎ পরস্পর-বিরুদ্ধ উভয়-স্বভাবত্ব কখনও সম্ভব হইতে পারে না। অতএব, অবিদ্যা স্বাভাবিক হইলে উহার উচ্ছেদ অসম্ভব। আর তাহার ফলে মোক্ষাভাবের আশঙ্কা আসিয়া পড়ে। এখন যদি বলা যায়, বিলক্ষণ বস্তুর প্রভাবে কখনও কখনও স্বভাবেরও উচ্ছেদ হয় (যথা—পার্থিব-পরমাণুগত শ্যামরূপ তাহার স্বভাবসিদ্ধ ও অনাদি হইলেও অগ্নি-সংযোগে পাকদশায় নষ্ট হইয়া যায়), সেইরূপ অবিদ্যা স্বাভাবিকী হইলেও ধ্যানাদিবশে উচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভব, তাহার উত্তরেও বলা চলে—পার্থিব পরমাণুর শ্যামরূপ নাশের নিমিত্ত যেমন অগ্নিরূপ একটি বিলক্ষণ (অর্থাৎ পৃথক্) বস্তুর সত্তা স্বীকৃত হইয়া থাকে, আত্মাদ্বৈতবাদীর মতে সেইরূপ এক আত্মবস্তু ব্যতীত অবিদ্যার উচ্ছেদের হেতুভূত অন্য কোন আত্মবিলক্ষণ দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্বই স্বীকৃত হয় না। অতএব, তদ্দ্বারা অবিদ্যার উচ্ছেদ হইবে কিরূপে?'—(ন্যায়রত্নাকর, চৌখাম্বা সংস্করণ, পৃঃ ৬৬২-৬৬৪)

এ স্থলে একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, কুমারিল 'পুরুষ' শব্দটি 'ঈশ্বর' এই অর্থে প্রয়োগ করেন নাই। কারণ, তন্ত্রবার্ত্তিকে তিনি একই বাক্যে —ষ' ও 'ঈশ্বর' শব্দ দুইটি পাশাপাশি প্রয়োগ করিয়াছেন (৪)। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কুমারিল ঐ দুইটি শব্দের অর্থ পরস্পর বিভিন্ন বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। কীথ সাহেব 'পুরুষের' ইংরেজি করিয়াছেন 'absolute' অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্ম। কিন্তু 'পুরুষ' শব্দের অর্থ 'নির্গুণ ব্রহ্ম' হইতেই পারে না। কারণ, নির্গুণ ব্রহ্ম যাঁহারা মানেন, সেই অদ্বৈত-বেদান্তিগণ কোন স্থলেই 'পুরুষ' শব্দটিকে 'নির্গুণ ব্রহ্মের' পর্য্যায়রূপে ব্যবহার করেন নাই; অথবা তাঁহারা ইহাও স্বীকার করেন না যে, নির্গুণ ব্রহ্মের কখন কোনরূপ পরিণাম বা বিকার ঘটিয়া থাকে। অদ্বৈতমতে নির্গুণ ব্রহ্ম অবিকারী কূটস্থ চেতন মাত্র। তিনি জগতের কারণই নহেন। এক উঁহাকে জগতের 'বিবর্ত্তোপাদান' বলা চলে। মায়া বা অবিদ্যাই জগতের পরিণামী উপাদান। পারমার্থিক-দৃষ্টিতে নির্গুণ-ব্রহ্মাবস্থায় কার্য্য-কারণ-ভাবই নাই (৫)।

---

(৪) "যাশ্চৈতাঃ প্রধানপুরুষেশ্বরপরমাণুকারণাদিপ্রক্রিয়াঃ" তন্ত্রবার্ত্তিক, স্মৃত্যাচারপ্রামাণ্যাধিকরণ, পৃঃ মীঃ সূঃ ১।৩।২, আনন্দাশ্রম সং, পৃঃ ১৬৮। মদীয় প্রবন্ধের ৬ষ্ঠ অংশ (মাসিক বসুমতী, বৈশাখ, ১৩৪৮) দ্রষ্টব্য।

(৫) বিবর্ত্ত—যাহা স্বরূপের পরিবর্ত্তন না করিয়া রূপান্তরে প্রতীয়মান হয়; যথা—রজ্জু স্ব-স্বরূপ অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া সর্পাকারে প্রতিভাসমান হয়। রজ্জু সর্পের বিবর্ত্তোপাদান। ব্রহ্ম এইরূপ নিজ স্বরূপ অপরিবর্ত্তিত রাখিয়াই জগদাকারে প্রতীয়মান বা বিবর্ত্তিত হইয়া থাকেন। এই কারণে ব্রহ্ম জগতের বিবর্ত্তোপাদান। পরিণাম—স্বরূপের পরিবর্ত্তন-সহকারে রূপান্তরে প্রতীতি; যথা—দুগ্ধের স্বরূপ পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক দধিভাবপ্রাপ্তি। এ জন্য দুগ্ধ দধির পরিণামোপাদান। মায়া এইরূপ জগতের পরিণামোপাদান। এই দুই প্রকার উপাদান ব্যতীত নিমিত্ত কারণও আছে। নিমিত্ত চেতন; যথা—ঘটের উপাদান মৃত্তিকা ও নিমিত্ত কুম্ভকার। ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত কারণ। এই জন্য ব্রহ্মকে জগতের 'অভিন্ন নিমিত্তোপাদান' বা 'অভিন্ন-নিমিত্ত-বিবর্ত্তোপাদান' বলা হয়। শুদ্ধ নির্গুণ ব্রহ্মের কার্য্য-কারণভাবই অদ্বৈতিগণ স্বীকার করেন না। তাঁহাদিগের মতে সগুণাবস্থাতেই কার্য্য-কারণ-ভাব বর্ত্তমান। উপহিত ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই জগৎকারণ। শুদ্ধাবস্থা কারণাবস্থার অতীত। এ সম্বন্ধে সুবিস্তৃত বিবরণ মদীয় পুস্তিকা 'Brahman and the World' (Journal of the Department of Letters, Vol. XXVIII 1935, Calcutta Universityতে প্রকাশিত) দ্রষ্টব্য। এ প্রসঙ্গে শঙ্করের কয়েকটি উক্তি নিম্নে দেওয়া গেল—(ক) "অভ্যুপগম্য চেমং ব্যাবহারিকং ভোক্তৃভোগ্যলক্ষণং বিভাগং স্যাল্লোকবদিতি পরিহারোঽভিহিতঃ, ন ত্বয়ং বিভাগঃ পরমার্থতোঽস্তি"। (খ) "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেদিত্যাদিনা ব্রহ্মাত্মদর্শিনং প্রতি সমস্তস্য ক্রিয়াকারকফললক্ষণস্য ব্যবহারস্যাভাবম্"। (গ) "সর্ব্বব্যবহারাণামেব প্রাগ্

অবশ্য এ কথা সত্য যে, 'শাস্ত্রদীপিকা' গ্রন্থে পার্থসারথি মিশ্র স্বয়ং অদ্বৈতমত খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার এই অদ্বৈত-মত-খণ্ডন-প্রক্রিয়ার দুইটি অংশ আছে। প্রথম অংশে তিনি শাঙ্করাদ্বৈত-মত-খণ্ডনেরই চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ঐ খণ্ডন-প্রয়াস কেবল প্রপঞ্চ-মিথ্যাত্ব ও অজ্ঞানের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মস্বরূপ-খণ্ডনে তিনি কোনরূপ প্রয়াস প্রদর্শন করেন নাই। বরং দুই এক স্থলে বোধ হয় তিনি অদ্বৈতমতের অবিরোধী। তিনিও ব্রহ্মের স্বচ্ছ জ্ঞানরূপত্ব, নিষ্প্রপঞ্চ আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি উক্তির দ্বারা উপনিষদের নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ স্বীকার করিয়াছেন (৬)। এই অংশ তাঁহার নিজস্ব। আর ইহাতে অদ্বৈতবাদের অংশবিশেষের খণ্ডন থাকিলেও ইহার দ্বারা পার্থসারথির নিরীশ্বর-মতবাদে আস্থা প্রমাণিত হয় না। তাঁহার খণ্ডনের দ্বিতীয় অংশ কোন একদেশী অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত। এই অংশটিই শ্লোকবার্ত্তিকের পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশের ব্যাখ্যা বলিয়া মনে হয়। ইহা যে যথার্থ অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয় নাই বা হইতে পারে না—ইহা তাঁহার উক্তি হইতে স্পষ্ট বোধ হয়। কারণ, তিনি উক্ত মতস্বরূপ প্রদর্শনের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন—'পক্ষান্তরে কোন কোন উপনিষন্মতবাদী মনে করেন যে, আত্মা স্বেচ্ছায় পরমার্থতঃ প্রপঞ্চরূপে পরিণামপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন'···ইত্যাদি। কিন্তু ইহা অসঙ্গত। কারণ, চিদ্রূপ আত্মার জড়রূপে পরিণাম অসম্ভব (৭)। 'কোন কোন উপনিষন্মতবাদী' বলায় বুঝাইতেছে—ইহা স্বারসিক উপনিষৎসিদ্ধান্ত নহে—বেদান্তের একদেশী মত। শঙ্করাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের কোথাও ব্রহ্মের বা আত্মার জগদাকারে পারমার্থিক পরিণাম স্বীকৃত হয় নাই। অবশ্য ইহা সত্য যে—"দৃশ্যতে তু" (ব্রঃ সূঃ ২।১।৬), "ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।১।১৩) ইত্যাদি সূত্রে ব্রহ্মকে জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদান বলা হইয়াছে ; কিন্তু শঙ্করভগবৎপাদ অতি সুস্পষ্ট ভাষায় "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" (ব্রঃ সূঃ ২।১।১৪) সূত্রে বলিয়াছেন—'যে ব্যবহারদৃষ্টিতেই ব্রহ্মের জগৎকারণতা। পারমার্থিকদৃষ্টিতে কার্য্য-কারণ-ভেদ ভোক্তৃ-ভোগ্য-ভেদ প্রভৃতি কিছুই নাই···ব্রহ্মকেও জগতের যথার্থ পরিণামী উপাদান কারণ বলা যায় না (৮)।

পার্থসারথির এই দ্বিতীয় অংশটিকে 'অর্দ্ধজরতীয় অদ্বৈতবাদের খণ্ডন' বলিয়া কেহ কেহ আখ্যা দিয়াছেন। নির্ণয়সাগরের সংস্করণে ঐরূপ শিরোনামই প্রদত্ত হইয়াছে। উহার টীকায় রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, ইহা 'অদ্বৈতবাদের মতান্তর', অর্থাৎ যথার্থ শঙ্করাদ্বৈতমত নহে।

কুমারিলের মূল শ্লোকগুলিতে যে যে যুক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে, সেগুলিও শঙ্করাদ্বৈতমতের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য হয় না—

(১) শুদ্ধ (অর্থাৎ চেতন) পুরুষের স্বেচ্ছায় অশুদ্ধ (অর্থাৎ জড়) প্রপঞ্চাকারে বিকার সম্ভব নহে। এই যুক্তি শঙ্করমতের বা যথার্থ উপনিষদ্-মতের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যায় না। কারণ, পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে, অদ্বৈতমতে শুদ্ধ অর্থাৎ কূটস্থ চেতনস্বরূপের

ব্রহ্মাত্মপরিজ্ঞানাৎ সত্যত্বোপপত্তেঃ, স্বপ্নব্যবহারস্যেব প্রাগ্‌বোধাৎ"। (ঘ) "পরমার্থাবস্থায়ামীক্ষিত্রীশিতব্যাদিব্যবহারাভাবঃ প্রদর্শ্যতে। ব্যবহারাবস্থায়াং তু···ঈশ্বরাদিব্যবহারঃ"। ইত্যাদি

—ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ২।১।১৪

(৬)(ক) যদি ভ্রান্তিঃ, সা কস্য? ন ব্রহ্মণস্তস্য স্বচ্ছবিদ্যারূপত্বাৎ"। (খ) "ন হ্যাগমো বা ধ্যানাদয়ো বা তজ্জন্যং বা জ্ঞানং নিত্যজ্ঞানাত্মকব্রহ্মাতিরিক্তমস্তি যদবিদ্যাং নাশয়েৎ"। (গ) "নিত্যমেকরসং নিষ্প্রপঞ্চমাত্মানমুপেযুষং তু সমস্তলোকবেদব্যবহারোচ্ছিত্তিরেব স্যাৎ"।—শাস্ত্রদীপিকা, অদ্বৈতমতখণ্ডন, জৈ সূঃ ১।১।৫—নির্ণয়সাগর সং, পৃঃ ১১১।

(৭) "কেচিত্ত্বৌপনিষদাঃ পরমার্থত এবাত্মা প্রপঞ্চরূপেণ স্বেচ্ছয়া পরিণমতীতি মন্যন্তে···তদিদমযুক্তম্। চিদ্রূপস্যাত্মনো জড়রূপপরিণামাসম্ভবাৎ"।—শাস্ত্রদীপিকা, অর্দ্ধজরতীয়াদ্বৈতবাদখণ্ডন ; নির্ণয়সাঃ সং, পৃঃ ১১১-১১২।

"তত্রৈব মতান্তরমাশঙ্কতে"—রামকৃষ্ণকৃত যুক্তিস্নেহপ্রপূরণী সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা, নির্ণয়সাঃ সং, পৃঃ ১১১।

(৮) "চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং প্রকৃতিশ্চেত্যাগমতাৎপর্য্যস্য প্রসাধিতত্বাৎ"—ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ২।১।৬

"তস্মাৎ প্রসিদ্ধস্যাস্য ভোক্তৃভোগ্যবিভাগস্যাভাবপ্রসঙ্গাদযুক্তমিদং ব্রহ্মকারণতাবধারণমিতি চেৎ কশ্চিচ্চোদয়েৎ? তং প্রতি ব্রূয়াৎ স্যাল্লোকবদিতি। উপপদ্যত এবায়মস্মৎপক্ষেপি বিভাগঃ, এবং লোকে দৃষ্টত্বাৎ"।—ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ২।১।১৩

"অভ্যুপগম্য চেমং ব্যাবহারিকং ভোক্তৃভোগ্যলক্ষণং বিভাগং স্যাল্লোকবদিতি পরিহারোঽভিহিতঃ। ন ত্বয়ং বিভাগঃ পরমার্থতোঽস্তি"। "সূত্রকারোঽপি পরমার্থাভিপ্রায়েণ 'তদনন্যত্ব'মিত্যাহ। ব্যবহারাভিপ্রায়েণ তু 'স্যাল্লোকব'দিতি মহাসমুদ্রস্থানীয়তাং ব্রহ্মণঃ কথয়তি। অপ্রত্যাখ্যায়ৈব কার্য্যপ্রপঞ্চং পরিণামপ্রক্রিয়াং শ্রয়তি সগুণোপাসনেষূপযুজ্যত ইতি"—ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ২।১।১৪

পরিণামবাদ স্বীকৃত হয় নাই। এই যুক্তিটি বিষ্ণুস্বামী, বল্লভ, ভাস্কর প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য।

(২) ধর্ম্মাধর্ম্মের অধীনতা-নিবন্ধন পুরুষের এই পরিণাম। এই যুক্তিও অচল। অদ্বৈতমতে শুদ্ধ পুরুষ (বা চেতন তত্ত্ব) ধর্ম্মধর্ম্মাধীন নহে। বদ্ধ জীবদশায় উহার ধর্ম্মধর্ম্মাধীনত্ব—শুদ্ধ দশায় নহে।

(৩) আত্মা একমেবাদ্বিতীয়, অতএব তদ্ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু অবিদ্যার অস্তিত্ব সম্ভব নহে। ইহার উত্তর এই যে, —আত্মা একমাত্র সত্য বস্তু। অবিদ্যা বা মায়া মিথ্যা —অবস্তু। মিথ্যাকে লইয়া সত্যের সদ্বিতীয়ত্ব হয় না। অতএব, এ যুক্তিও শাঙ্কর অদ্বৈতমতের বিরোধী নহে।

(৪) অবিদ্যার কারণ কি? চেতন পুরুষ নহে। কারণ, পুরুষ বিদ্যাস্বরূপ, উহা তদ্বিরোধী অবিদ্যার কারণ হইতে পারে না। অন্য বস্তুও অবিদ্যার কারণ নহে—তাহা হইলে সেই বস্তুর অস্তিত্বহেতু পুরুষের একত্বহানি হয়। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ আত্মা অজ্ঞান বা তৎপ্রপঞ্চের বিরোধী নহে; পক্ষান্তরে, এই শুদ্ধ চেতন আত্মাই অজ্ঞানের অধিষ্ঠান আর এই অধিষ্ঠানত্বই তাঁহার কারণত্ব (যদি অবশ্য ইহাকে কারণতা বলা যায়)। বৃত্তিজ্ঞানের সহিত অজ্ঞানের বিরোধ—শুদ্ধজ্ঞানের সহিত নহে। দ্বিতীয় কল্পে যাহা বলা হইয়াছে যে, অন্য বস্তু অবিদ্যাকারণ—ইহাও অত্যন্ত হেয় উক্তি। অদ্বৈতবাদে ইহা স্বীকৃত হয় নাই। ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে এই জন্য অবিদ্যাকে 'অনাদি' বলা হয়। বস্তুতঃ ইহা চেতনে অধিষ্ঠিত। ইহার অধিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কারণ নাই। কার্য্য-কারণ-ভাব বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা অবিদ্যা-নিবন্ধন—মিথ্যা। অতএব এ যুক্তিও অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য নহে।

(৫) অবিদ্যা স্বাভাবিক হইলে উহার বাধ কিরূপে সম্ভব? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, অবিদ্যাকে 'নৈসর্গিক', 'স্বাভাবিক' বলা হইলেও উহার বাধ হইয়া থাকে; কারণ, অবিদ্যার অবিদ্যাত্বই উহার স্বভাব। এই স্বভাববশে উহাকে 'দৃষ্টনষ্টস্বভাব' বলা হইয়াছে। উহার মিথ্যাত্বই উহার স্বভাব। অতএব, বস্তুতঃ অবিদ্যাও নাই—উহার উচ্ছেদেরও প্রয়োজন নাই। উহা অপারমার্থিক বলিয়া স্বয়ংই উচ্ছিন্নস্বভাব। রজ্জুতে প্রতীয়মান সর্প যেরূপ তাহার প্রতিভাসকালেও বস্তুতঃ নাই—প্রতিভাসের পূর্ব্বে বা পরে ত নাই-ই, সেইরূপ অবিদ্যাও অবস্তু—মিথ্যা—স্বয়ং চিরবাধিত। অতএব, স্বাভাবিকত্বহেতু অবিদ্যা অবাধিতস্বরূপ—এরূপ যুক্তিও শাঙ্করাদ্বৈতমতে সম্ভব নহে।

(৬) অবিদ্যার বাধক কিছু থাকিলে তাহার অস্তিত্ব অদ্বৈতবাদের বিরোধী। ইহার উত্তর—অবিদ্যার বাধক বিদ্যা স্বয়ং ও তাহা অবিদ্যাকোটিতে প্রবিষ্ট। যেমন, লোক কণ্টকদ্বারা কণ্টক উদ্ধার করিয়া উভয় কণ্টককেই পরিত্যাগ করে, তেমনই অবিদ্যাকোটির অন্তর্গত ব্রহ্মাকারা (বা অখণ্ডাকারা) চিত্তবৃত্তির উদয়ে অবিদ্যার নাশ হয় ও সেই সঙ্গে উক্ত অখণ্ডাকারা চিত্তবৃত্তিরও নাশ হয়। তখন শুদ্ধ চৈতন্য "একমেবাদ্বিতীয়ম্" স্বয়ম্প্রকাশমান থাকেন। অতএব, অবিদ্যানাশকের দ্বারা অদ্বৈতবাদ-হানি হয়—এ যুক্তিও অদ্বৈতবাদীর বিরুদ্ধে প্রযোজ্য নহে।

উক্ত আলোচনা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, কীথ সাহেবের পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তি সম্পূর্ণই ভিত্তিহীন। প্রথমতঃ, কুমারিল শাঙ্করাদ্বৈত অর্থাৎ উপনিষদের মূল অদ্বৈতবাদের বিরোধী কোন কথা বলেন নাই। যদি ইহা কোনরূপ একদেশী অদ্বৈতমতের খণ্ডন বলিয়া ধরা যায়, তাহা বরং সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু, শুদ্ধ-চেতন-পরিণামবাদী অদ্বৈতসম্প্রদায় পূর্ব্বে থাকিলেও বর্ত্তমানে উহা লুপ্ত। উহার প্রবর্ত্তয়িতা বা প্রচারক কে ছিলেন, তাহাও বর্ত্তমানে জানা যায় না। এক বল্লভাচার্য্য-প্রচারিত শুদ্ধাদ্বৈত-সম্প্রদায়ে এরূপ শুদ্ধব্রহ্ম-পরিণামবাদের আভাস পাওয়া যায়। আরও একটি কথা। কুমারিল সমগ্র শাঙ্কর অদ্বৈতমত খণ্ডন করুন—অথবা কেবল শঙ্করের অবিদ্যাবাদই খণ্ডন করুন, কিংবা শুদ্ধ কোন পরিণামবাদ খণ্ডন করুন—চেতন পরমাত্মস্বরূপের অস্তিত্ব খণ্ডন করেন নাই। অতএব, আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, তিনি শ্লোকবার্ত্তিকের উপোদ্‌ঘাত-শ্লোকে পরমব্রহ্মস্বরূপ শিবের নমস্কার করিয়াছেন ও সেই প্রসঙ্গে অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্তের অনুসরণে ব্রহ্মের বিশুদ্ধজ্ঞানস্বরূপত্ব ইঙ্গিতে সমর্থন করিয়াছেন।

'সমন্বয়'-সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শঙ্করভগবৎপাদ মীমাংসা-সিদ্ধান্তানুসারী আচার্য্যদেশীয়গণের মত উত্থাপন করিয়া

দেখাইয়াছেন যে, বস্তুতঃ মীমাংসকগন্ধী পূর্ব্বাচার্য্যগণও নিরীশ্বর বা বেদান্তবিরোধী ছিলেন না। তবে তাঁহারা বেদান্তকে কেবল সিদ্ধবস্তু-প্রতিপাদক বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তাঁহাদিগের মতে বেদান্তের সার্থকতা ছিল উপাসনাদি কার্য্যবিধির অঙ্গভূত ব্রহ্মের স্বরূপবর্ণনে। কর্ত্তব্যবিধির অন্তর্ভূত না হইয়া কেবল সিদ্ধবস্তুর প্রতিপাদক বেদান্ত—এই মত তাঁহারা গ্রাহ্য করিতেন না (৯)। ইঁহারা ছিলেন খাঁটি মীমাংসক ও খাঁটি অদ্বৈতবেদান্তীর মধ্যে সেতুস্বরূপ—বেদান্ত ও মীমাংসার মধ্যে সমন্বয়-সাধনে তৎপর—জ্ঞানকর্ম্ম-সমুচ্চয়বাদী। ইঁহাদিগের মতে দেবতা যেরূপ যাগের অঙ্গ, ঈশ্বরও সেইরূপ উপাসনার অঙ্গভূত। আর উপাসনা যখন ক্রিয়া, তখন খাঁটি মীমাংসা-সিদ্ধান্তেও উপাসনা-প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যগুলি বিশেষ মূল্যবান্ (১০)। অতএব, উপাসনাক্রিয়ার অঙ্গভূত উপাস্য ঈশ্বরও মীমাংসকসিদ্ধান্তে কোন মতেই উপেক্ষণীয় নহেন।

দীর্ঘদিন ধরিয়া প্রকাশিত এ প্রবন্ধটির উপসংহার এইখানেই করিতে হয়। তাহার পূর্ব্বে একটি প্রাসঙ্গিক কৌতূহলকর ঘটনার উল্লেখ করার বিশেষ প্রয়োজন। এই বৎসর পূজার পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ষ্টেফানোস নির্ম্মলেন্দু ঘোষের স্মৃতিরক্ষাকল্পে প্রতিষ্ঠিত তুলনামূলক ধর্ম্মতত্ত্ব' সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতাদানের দ্বিতীয় দিবসে সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক, সংস্কৃত কলেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের ভাবী প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহোদয় বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক ও অন্যান্য শ্রোতৃবৃন্দের সমক্ষে প্রকাশ্যে নিম্নলিখিত মর্ম্মে কয়েকটি কথা বলেন :—'আমার কোন একটি তরুণ বন্ধু পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, ইহা প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে বিশেষ আয়াস স্বীকারপূর্ব্বক ধারাবাহিক বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেছেন। অবশ্য ইহা সুনিশ্চিত সত্য যে, পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে ঈশ্বরাস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। তথাপি তিনি এ বিষয়ে বিশেষ আয়াস করিতেছেন। এ প্রসঙ্গে একটি গল্পের কথা মনে হয়। কথিত আছে—নৈয়ায়িকচূড়ামণি আচার্য্যপাদ শ্রীল উদয়ন শ্রীক্ষেত্রে পুরুষোত্তমদর্শন-মানসে উপস্থিত হইলে প্রভুর পাণ্ডারা তাঁহার শ্রীমন্দির-প্রবেশে বাধাপ্রদান করিয়াছিলেন। তাহাতে ক্ষুব্ধ ও অভিমানাহত উদয়ন প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া নিম্নোক্ত শ্লোকটি বলিয়াছিলেন—

"ঐশ্বর্য্যমদমত্তঃ সন্ মামবজ্ঞায় বর্ত্তসে।
পুনর্বৌদ্ধে সমায়াতে মদধীনা তব স্থিতিঃ" ॥ (১১)

আমার এই বন্ধুটিও সেইরূপ বলিতে পারেন—'হে ঈশ্বর! পূর্ব্বমীমাংসায় মদধীনা তব স্থিতিঃ।'

অবশ্য পরমপূজ্য আচার্য্যপাদ উদয়নের সহিত এই অখ্যাত প্রবন্ধ-লেখককে এক পঙ্‌ক্তিতে বসাইয়াছেন বলিয়া লেখক প্রথমেই অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতা-স্বীকারে বাধ্য। তাহার পর বক্তব্য এই যে, এই প্রযত্ন লেখকের প্রথম ও মৌলিক নহে। প্রাচীন লেখকগণের

(৯) "অত্রাপরে প্রত্যবতিষ্ঠন্তে যদ্যপি শাস্ত্রপ্রমাণকং ব্রহ্ম, তথাপি প্রতিপত্তিবিধিবিষয়তয়ৈব শাস্ত্রেণ ব্রহ্ম সমর্প্যতে।... "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাং...। অতঃ পুরুষং কচিদ্ বিষয়বিশেষে প্রবর্ত্তয়ৎ কুতশ্চিদ্বিষয়বিশেষান্নিবর্ত্তয়চ্চার্থবচ্ছাস্ত্রম্। তচ্ছেষতয়া চান্যদুপযুক্তম্। তৎসামান্যাদ্বেদান্তানামপি তথৈবার্থবত্ত্বং স্যাৎ।...কার্য্যবিধিপ্রযুক্তস্যৈব ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্যমানত্বাৎ 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ' (বৃহঃ উপঃ ২।৪।৫)...ইত্যাদিবিধিষু সংসু কোঽসাবাত্মা কিং তদ্ব্রহ্ম ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তৎস্বরূপসমর্পণেন সর্ব্বে বেদান্তা উপযুক্তাঃ—নিত্যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বগতো নিত্যতৃপ্তো নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধমুক্তস্বভাবো বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম ইত্যেবমাদয়ঃ। তদুপাসনাচ্চ শাস্ত্রদৃষ্টোঽদৃষ্টো মোক্ষঃ ফলং ভবিষ্যতি। কর্ত্তব্যবিধ্যননুপ্রবেশে বস্তুমাত্রকথনে হানোপাদানাসম্ভবাৎ সপ্তদ্বীপা বসুমতী রাজাসৌ গচ্ছতীত্যাদিবাক্যবদ্বেদান্তবাক্যানামানর্থক্যমেব স্যাৎ"—ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ১।১।৪, নির্ণয়সাগর সং, ভামতীসহিত, পৃঃ ১০৮-১১৩।

(১০) সমগ্র বেদ ক্রিয়াপ্রতিপাদক বলিয়াই সার্থক ও প্রামাণিক; উহার অক্রিয়া-প্রতিপাদক অংশ অসার্থক ও অনিত্য লৌকিকবাক্যবৎ অপ্রমাণ—"আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাং তস্মাদনিত্যমুচ্যতে" (জৈঃ সূঃ ১।২।১)

(১১) এই শ্লোকটিতে বহু পাঠান্তর আছে :—"ঐশ্বর্য্য-মদমত্তোঽসি মামবজ্ঞায় বর্ত্তসে। পরাক্রান্তেষু (উপস্থিতেষু) বৌদ্ধেষু মদধীনা তব স্থিতিঃ"। ইহার ইঙ্গিত এই যে—পূর্ব্বে এক সময় নীলাচলে বৌদ্ধপ্রভাববশতঃ শ্রীশ্রীজগন্নাথ, শ্রীশ্রীবলভদ্র ও শ্রীশ্রীসুভদ্রা দেবীর বিগ্রহত্রয় বৌদ্ধগণকর্ত্তৃক বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সঙ্ঘের প্রতীকরূপে পূজিত হইত। শ্রীশঙ্করাচার্য্য এই বৌদ্ধপ্রভাব বিদূরিত করিয়া উহাদিগের স্বরূপ পুনঃ প্রচারিত করেন। এইরূপ বৌদ্ধপ্রভাবের বশে দেশমধ্যে নিরীশ্বর ও নাস্তিক্যবাদের প্রভূত প্রচার ঘটিলে পর শ্রীউদয়ন 'আত্মতত্ত্ববিবেক' ও "কুসুমাঞ্জলি' রচনা দ্বারা আত্মনিত্যত্ব ও ঈশ্বরাস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া বৌদ্ধ মতের উচ্ছেদ করেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টা শ্রীশঙ্করের নীলাচলে শ্রীজগন্নাথদেবের পুনঃ প্রতিষ্ঠার সমান। তাই ঈশ্বরের উদয়নের চেষ্টার উপর নির্ভর করিতেছে বলিয়া তিনি করিয়াছেন।

কথা ছাড়িয়া দিলেও লেখকের পূজ্যপাদ স্বর্গত পিতৃব্য ডক্টর পশুপতিনাথ শাস্ত্রী মহোদয়ের 'Introduction to the Purva Mīmāmsā' গ্রন্থের তৃতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে (পৃ: ১৩৩—১৭২) যে ভাবে পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে, বর্ত্তমান লেখক তাহাই মূলতঃ অনুসরণ করিয়াছেন (১২)। এতদ্ব্যতীত পূজ্যপাদ অধ্যাপক পণ্ডিতবর্য্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী মহোদয় এ বিষয়ে লেখককে বহু উপদেশাদিদানে সহায়তা করিয়াছেন। যদি এ বিষয়ে কৃতিত্ব কিছুমাত্র থাকে, তাহা এই সকল মহাপুরুষগণের প্রাপ্য। আর যদি প্রবন্ধগুলি সামঞ্জস্যহীন হইয়া থাকে, তাহা হইলে অবশ্য উহা লেখকেরই অক্ষমতার দোষে হইয়াছে বলিতে হইবে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলিবার আছে। শ্রীল উদয়নাচার্য্য যে ঈশ্বরাস্তিত্ব প্রমাণিত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার মূলে ছিল ঈশ্বরের বাস্তবিক অস্তিত্ব। ঈশ্বর বস্তুতঃ না থাকিলে শত সহস্র প্রমাণ-প্রয়োগেও তাঁহার অস্তিত্ব নিরূপণ করা দুর্ঘট হইত। যদি সূর্য্য মেঘে আবৃত হইয়া থাকেন, মেঘ সরাইয়া দিতে পারিলে সূর্য্যের স্বপ্রকাশ সম্ভব। কিন্তু গগনে সূর্য্য যদি বর্ত্তমান না থাকেন, তাহা হইলে মেঘমালার অপসারণে সূর্য্যের প্রকাশ হইতে পারে না। পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব যদি বস্তুতঃ সূত্র-ভাষ্য বার্ত্তিককারাদির অভিপ্রেত হইয়া থাকে, অথচ এ বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত কোন প্রামাণিক গ্রন্থে না থাকে, তাহা হইলে ধীরে ধীরে কালক্রমে দুর্ব্যাখ্যাকারিগণের দুরাগ্রহে পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের উপর নিরীশ্বরবাদের কলঙ্ক অযথা আরোপিত হওয়া স্বাভাবিক। এই কলঙ্ক যদি কেহ উপযুক্ত প্রমাণ-প্রয়োগে দূর করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে শাস্ত্রকারগণের ঈশ্বরাস্তিত্ব-সম্বন্ধে নিগূঢ় আশয়ও নিশ্চিত উদ্‌ঘাটিত হইতে বাধ্য। এ বিষয়ে বর্ত্তমান লেখক নিঃসন্দেহ যে—পূর্ব্বমীমাংসায় ঈশ্বরাস্তিত্বসম্বন্ধে ঠিক এইরূপ ব্যাপারই বহু দিন চলিয়া আসিতেছে। অতএব, গত দেড় বৎসর ধরিয়া প্রকাশিত এই প্রবন্ধগুলিতে পূর্ব্বমীমাংসা-শাস্ত্রকারগণের নিরীশ্বরবাদী বলিয়া যে অখ্যাতি আছে, তাহা দূর করার সাধ্যমত চেষ্টা করা হইল। ফলাফল অবশ্য ধীরমতি বাদনিপুণ সুধীগণের বিচার্য্য।

"শিবমস্তু"

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী, বেদান্ততীর্থ, এম-এ, পি, আর, এস্
(অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

---

(১২) অধ্যাপক ডক্টর স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ এ বিষয়ে স্বর্গত শাস্ত্রী মহাশয়ের ঋণ স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহার যুক্তির সারাংশ নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"In a recent work on the Pūrva Mimāmsā (Footnote : P. S'astri : Pūrva Mīmāmsā, Ch. III), an ingenious attempt is made to reconcile the Mīmāmsā view on this question with that of the Vedānta. It is argued that while Jaimini repudiates the conception of God as the distributor of rewards, he does not deny the existence of God as the creator of the world.······Scince Bādarāyaṇa takes up Jaimini's view in the third chapter of his work, he is attacking the view of Jaimini that apūrva and not God is the cause of the apportionment of the rewards. If Jaimini had denied the creatorship of God Bādarāyaṇa would certainly have taken up its refutation in the second chapter, which is devoted to the criticism of the rival hypotheses. Jaimini felt that, if God had the sole responsibility for the inequalities of the world, he could not be freed from the charge of partiality and cruelty, and for this reason traced the varying fortunes of men to their past conduct. The explanation is not convincing, for things should first exist before we can derive happiness or misery from them. If apūrva is the apportioner of our happiness or misery, then it must also be the creator of things. If God is necessary for creation, then apūrva must be simply the principle of Karma which God takes into account in the creation of the world. Directly or indirectly, God becomes the creator as well as the apportioner of the fruits

The lacuna in the Pūrva Mīmāmsā was so unsatisfactory that the later writers slowly smuggled in God.······The tendency is carried out to its fullest extent in Vedāntades'ika's Ses'vara Mīmāmsā"—Radhakrishnan, Indian Philosophy, Vol. II, First Edition, pp. 426-27.

ইহার প্রথমাংশ স্বর্গত শাস্ত্রী মহাশয়ের যুক্তির সারাংশ। এই প্রথমাংশের ধারাবাহিক বিস্তৃত বিবরণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে করা হইয়াছে। অতএব, এস্থলে উহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। দ্বিতীয় অংশে অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, প্রাচীনকালে জৈমিনীয় দর্শনে ঈশ্বরের স্থানটি শূন্য ছিল। পরবর্ত্তীকালের মীমাংসকগণ ধীরে ধীরে চুপি চুপি ঐ শূন্য স্থানে ঈশ্বরের আমদানী করিয়াছেন। ইহা ঠিক নহে; কারণ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে যে, জৈমিনীয় পূর্ব্বমীমাংসা সূত্রে ঈশ্বরের উল্লেখ না থাকিলেও বাদরায়ণ ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে জৈমিনিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন। আর কুমারিল প্রভাকর প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যগণ যে সেশ্বরবাদী ছিলেন—ইহাও বহু যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অতএব, রাধাকৃষ্ণের এই নিজস্ব সিদ্ধান্তটুকু ভিত্তিহীন বলিয়াই বোধ হয়।

অস্বীকার

১৩

মা-শী যেভাবে হাত চাপিয়া ধরিল এবং শিপ্রার সামনে—কল্লোল চমকিয়া উঠিল! মনে নিমেষের চাঞ্চল্য···মুখেও সঙ্গে সঙ্গে কেমন মলিন ছায়া! কল্লোল চাহিল শিপ্রার পানে···শিপ্রার দু'চোখ কৌতুহলে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে!

নিজেকে তখনি সংবৃত করিয়া কল্লোল মা-শীর হাতের বাঁধন কাটিয়া যেটুকু-বর্ম্মীজ শিখিয়াছিল, সেই বর্ম্মীজ-ভাষায় মা-শীকে বলিল—এখানে ফুল বেচতে এসেছো?

মা-শী বলিল,—হ্যাঁ। এই হোটেলে কাজ করে সু-ফঙ···আমার বাড়ীর কাছে থাকে। সু-ফঙ বললে, কলকাতা থেকে বাঙালী মেম-সাব এসেছে···ফুল বেচতে আসিস্ মা-শী···

মুখে এ-কথা বলিলেও মা-শীর দু'চোখে গভীর আবেশ! তার চোখের দৃষ্টি কল্লোলকে যেন নিমেষের জন্য ছাড়িতে চায় না!

কল্লোল সে-দৃষ্টি লক্ষ্য করিল, করিয়া বলিল,—মেম-সাবকে আমি বলে দেবো। অনেক ফুল নেবেন···রোজ-রোজ নেবেন।

মা-শী বলিল,—তুমি কি নিষ্ঠুর! কেন আমাকে তুমি ত্যাগ করে এলে?

মা-শীর কণ্ঠ আকুতিতে বিগলিত!

মৃদু-হাস্যে কল্লোল বলিল,—ত্যাগ নয় মা-শী। চাকরির চেষ্টায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। চাকরির জোগাড় হলেই তোমার কাছে যাবো।

মা-শীর দু'চোখে অভিমানের অশ্রু যেন ঠেলিয়া আসিল! বেদনার্ত্ত স্বরে মা-শী বলিল,—তোমার চাকরির দরকার নেই। আমি খেটে ফুল বেচে টাকা রোজগার করবো···তুমি শুধু কাছে থাকবে।

কল্লোল বলিল,—আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে। এখন তুমি ফুল বিক্রী করো। আমার কাজ আছে। কাল আমি তোমার কাছে ফিরে যাবো।

বলিয়াই কল্লোল চাহিল শিপ্রার দিকে, বলিল,—ফুল-ওয়ালী···তার উপর ওর মার হোটেল আছে···দু'-পয়সা রোজগার করে। ওর মনটা রোমান্টিক্!

শিপ্রা বলিল,—তাই দেখছি, এবং এ রোমান্স আপনাকে নিয়ে!

হাসিয়া কল্লোল বলিল,—বর্ম্মায় এসে খুব অসুখ করেছিল। তখন ওর মার হোটেলে থাকতুম। খুব যত্ন করেছিল আমাকে। একটা মায়া পড়েছে! তা ছাড়া বাঙালীকে ওরা ভাবে, ইণ্ডিয়ান্ প্রিন্স!···আর কিছু নয়।···তুমি ওর কাছ থেকে ফুল নিয়ো। বেচারী!

বলিয়া কল্লোল চলিয়া যাইতেছিল, শিপ্রা বলিল,—যে-এনগেজমেণ্ট হয়েছে কাল বেলা দশটায়··

কল্লোল বলিল,—তোমার নেমন্তন্ন কোনো দিন উপেক্ষা করেছি?

শিপ্রা বলিল,—তার জবাব নেবেন নিজের মনের

কাছ থেকে। যোদ্ধা কাল যেন আমার এ-নেমন্তন্নর জন্য আবার দেশত্যাগী হয়ে যাবেন না, বুঝলেন!

কল্লোল বলিল,—না। এখানে সে-সব সম্ভাবনা কাটিয়ে যখন দেখা হলো, তখন···

কল্লোলের মুখের কথা লুফিয়া হাস্যমুখে শিপ্রা বলিল,—God wished it (ভগবান্ ইহাই চাহিয়াছিলেন)!

হাসিয়া কল্লোল বলিল,—If there be a God (ভগবান্ যদি থাকেন)!

তার পর কল্লোল চাহিল মা-শীর পানে, বলিল,—গুড বাই মা-শী···বলিয়া দ্রুত-পায়ে কল্লোল চলিয়া আসিল।

কল্লোল চলিয়া আসিলে শিপ্রা চাহিল মা-শীর পানে ···প্রিয়জন উপেক্ষা-ভরে চলিয়া গেলে ষ্টেজের উপরে বিহ্বলা নায়িকার মুখে-চোখে যেমন ব্যথা-বেদনার ছোপ লাগিয়া থাকে, ফুলওয়ালী এই মেয়েটির মুখে-চোখে ঠিক তেমনি ছোপ! শিপ্রা ভাবিল, মেয়েটি হয়তো কল্লোলকে ভালো বাসিয়াছে···

শিপ্রা মনে-মনে হাসিল, ডাকিল,—ফুলওয়ালী···

মা-শী চাহিল শিপ্রার পানে।

রকমারি মর্শুমী ফুলের ডালা ধরিয়া মা-শী বলিল,—নাইস্ ফ্লাওয়ার্স···রিয়েল ফ্লাওয়ার্স···(ভালো ফুল··· সত্যকার ফুল)। নট পেপার-মেড!" নট সিল্ক-মেড, ম্যাডাম (কাগজের বা রেশমী কাপড়ের তৈয়ারী ফুল নয়)!

মেয়েটি ইংরেজী জানে! শিপ্রা ইংরেজীতেই কথা কহিল। বলিল,—তুমি ইংরেজী জানো?

মুখে ম্লান হাসি···মা-শী বলিল,—লিট্‌ল্-লিট্‌ল্ (একটু-আধটু জানি)।

শিপ্রা বলিল,—এই বাঙালী-সাহেবকে তুমি জানো?

মা-শীর দু'চোখের পিছনে যেন জলের আভাস! মা-শী বলিল,—ইয়েস্···

—তোমার মার হোটেল আছে?

মাথা নাড়িয়া মা-শী বলিল,—হ্যাঁ।

—ও-সাহেব সেখানে ছিলেন?

মা-শী বলিল,—হ্যাঁ···

শিপ্রা বলিল,—ও!

মা-শী একটা নিশ্বাস ফেলিল, বলিল,—ফুল নেবে না?

—নেবো···

বলিয়া শিপ্রা মুক্তিকে ডাকিল।

মুক্তি আসিল।

শিপ্রা বলিল,—আমি স্নান করতে যাচ্ছি। তুই ফুল নে। সবগুলোই নে। ও যে-দাম চায়, শম্ভুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে দাম চুকিয়ে দিবি। বুঝলি?

মাথা নাড়িয়া মুক্তি জানাইল, বুঝিয়াছে।

আহারাদি সারিতে বেলা দুটো বাজিয়া গেল।

শিপ্রা ডাকিল,—মুক্তি···

ঘরের বাহিরে বারান্দায় মুক্তি দাঁড়াইয়াছিল, বলিল,—ডাকছো বৌদি?

শিপ্রা বলিল,—হ্যাঁ। এখন ঘুমোবি, বুঝি?

—না গো বৌদি। নতুন জায়গায় এসেছি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে পথ-ঘাট লোক-জন দেখছি···

শিপ্রা বলিল,—অত ঘুরে এলি···একটু গড়াতে ইচ্ছা হচ্ছে না?

মুক্তি বলিল,—না···

শিপ্রা বলিল,—আবার ঘুরতে চাস্?

মুক্তি বলিল,—পথ-ঘাট চিনি না, নাহলে তোমায় বলে' সত্যি বেরুতুম বৌদি। ঐ যে মেয়েটি ফুল বেচতে এসেছিল···মেয়েটি ভারী নরম···দেখতে-শুনতেও বেশ, না? ওদের কথা কি বুঝি, ছাই! তবু হোটেলের একটা বেয়ারা···সে ছিল ওখানে। সে বাঙলা জানে। সে-ই দু'-চারটে কথা বুঝিয়ে দিচ্ছিল। যেটুকু বুঝলুম, মেয়েটির বিয়ে হয়েছে···কোন্ বাঙালীর সঙ্গে না কি!

শিপ্রা বলিল,—তুই থাম্ মুক্তি। তোর ও-রূপকথা শোনবার ইচ্ছা আমার নেই।

মুক্তি বলিল,—রূপকথা!

শিপ্রা বলিল,—ও কথা থাক্! আমি ভাবছি, বেরুবো। শুনেছি, এখানে খুব ভালো বৌদ্ধ-মন্দির আছে। তুই গিয়ে শম্ভুকে বল্—হোটেল থেকে যদি এমন-কাকেও পাওয়া যায়, সঙ্গে যাবে, তাহলে বেরুই।

মুক্তির মন মাতিয়া উঠিল। মুক্তি বলিল—যাবে বৌদি? সত্যি? তাই চলো···বৌদ্ধ-মন্দির তো আমাদের দেবতার মন্দির! বুদ্ধদেবের মন্দির?

—হ্যাঁ। কিন্তু তুই যদি এমন বক্‌বক্ করিস্, তাহলে আমি তোকে নিয়ে যাবো না।

—না বৌদি, আমি আর কথাটি কবো না···সত্যি বলছি। এখনি আমি শম্ভুকে গিয়ে বলি, ব্যবস্থা করতে।

মুক্তি গেল শম্ভুকে ধরিয়া গাইডের ব্যবস্থা করিতে।

মনিবের কামরার ও-পাশে ছোট কামরা। শম্ভু সে-কামরা দখল করিয়াছে। লোহার ছোট খাট; তার উপরে তোষক পাতিয়া খাশা বিছানা করিয়াছে। সেই বিছানায় শুইয়া শম্ভু ঘুমাইবার উদ্যোগ করিতেছিল···

দ্বারের সামনে মোটা পর্দা। পর্দার এদিক্ হইতে মুক্তি ডাকিল—শম্ভু···

শম্ভু বলিল—মুক্তি না কি?

—হ্যাঁ···

শম্ভু কহিল,—এসো।

মুক্তি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। শম্ভুর ফিটফাট বেশ। দু'-তিন মাসের বেশী মনিব শরৎ চৌধুরী কোনো জামা-কাপড় পরেন না; দু'-তিন মাস পরে পরা জামা-কাপড় বাতিল করিয়া নূতন জামা-কাপড় চাই, নহিলে শরৎ চৌধুরীর সৌখীনতায় বাধে! দু'-তিন মাসের সে-সব জামা-কাপড় লাগে শম্ভু এবং পারিষদ্‌বর্গের ভোগে! শম্ভুর পরণে মনিবের পুরানো চেক-পাজামা, গায়ে সিল্কের সার্ট।

মুক্তিকে দেখিয়া শম্ভু উঠিয়া বসিল। বলিল,—কি খপর মুক্তি-ঠাকরুণ? হঠাৎ এখন আমার আঁধার ঘরে···!

ভ্রূকুটি করিয়া মুক্তি বলিল,—আঃ! আবার ঐ সব কথা!···শোনো, বৌদি বললে···

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া শম্ভু বলিল—ও···মনিবের হুকুম তামিল করতে এসেছো! আমি ভেবেছিলুম, তোমার মনিব শুয়েছেন, মনের কথা কইবার জন্য তাই তুমি গরীবখানায় পায়ের ধুলো দেছ!

ভ্রূকুটি-ভরা দৃষ্টিতে শম্ভুর পানে চাহিয়া মুক্তি বলিল,—তোমাকে না বলেছি, ও-সব কথা বলো না! শোনো শম্ভু, বৌদি যা বলেছে···

শম্ভু বলিল—বলো।

মুক্তি তখন বৌদির কথা প্রকাশ করিয়া বলিল; বলিল—তুমি লোক ঠিক করে দাও, বুঝলে শম্ভু··· বৌদি সাজপোষাক করছে···বুঝলে?

শম্ভু বলিল—বুঝেছি···

—হ্যাঁ, এখনি···বলিয়া মুক্তি চলিয়া যাইতেছিল, শম্ভু ডাকিল—মুক্তি···

মুক্তি ফিরিল। শম্ভু বলিল—তোমার মনিব কোথায় বেড়াতে গেছলেন গো? এত বেলা করে ফিরলেন···তার উপর ফিরলেন এক জন বাঙালী ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে! দেখে মনে হলো, অনেক দিনের বন্ধু। কে ও-মানুষটি?

মুক্তি বলিল—আমি তার কি জানি? তোমার জানতে সাধ হয়ে থাকে, মনিবকে জিজ্ঞাসা করলেই পারো।

শম্ভু বলিল—চাকর হয়ে মনিবকে কি তা জিজ্ঞাসা করতে পারি!···তা নয়। মানে, জিজ্ঞাসা করছি··· কোথায় গেছলে তোমরা?

মুক্তি বলিল—নৌকো করে এমনি বেড়াতে গিয়েছিলুম। আমি কি কোনো জায়গার নাম জানি? শোনো কথা!

মুক্তি আবার গমনোদ্যতা হইল; শম্ভু বলিল,—আহা, রাগ করো কেন মুক্তি! যত তোমার সঙ্গে ভাব করতে চাই, তুমি চটে ওঠো!···তা, মানে কি, জানো? আমার মনিবের হুকুম আছে পাহারাদারী করবার···তাই বলছিলুম, ও-বাবুটিকে কোথায় পেলে?

মুক্তি আদর পায়, প্রশ্রয় পায়! শিপ্রা তাকে অনেক কথা বলে। তবু মুক্তি জানে, সে মাহিনা-করা বাঁদী···এমন স্পর্দ্ধা তার মনে কোনো দিন জাগে না যে, মনিবের কোনো কথার বা কাজের সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করিবে! শম্ভুর স্পর্দ্ধা যে অনেকখানি, মুক্তি তা জানে। মুক্তির সঙ্গে যা-তা রসিকতা করিতে আসে! কলিকাতাতেও করিত! স্বামী শ্যামাচরণকে মুক্তি বলিত শম্ভুর কথা। শুনিয়া শ্যামাচরণ বলিত, বড়লোকের বাড়ী চাকরি করিতে গেলে এমন কথা শুনিতেই হইবে, মুক্তি···যারা দাসীর কাজ করে, লোকে ভাবে, তাদের দেহ-মনের দাম নাই! কাজ নাই তোমার ওখানে চাকরি করিয়া। চাকরি ছাড়িয়া দাও। শুনিয়া মুক্তি বলে, না, না, কাহারো মুখের

কথায় তো গায়ে ফোস্কা পড়িবে না! সেই শম্ভু···তার স্পর্দ্ধা মুক্তি জানে। তবু সে-স্পর্দ্ধা মনিবের পত্নীকে স্পর্শ করিতে চাহিবে, ইহা ছিল তার কল্পনার অগোচর! তাই শম্ভুর স্পর্দ্ধিত কৌতূহলে সে যেন রাগে জ্বলিয়া উঠিল! দু'চোখে রোষের স্ফুলিঙ্গ ছিটাইয়া মুক্তি বলিল,—মনিব তোমায় যে-হুকুম করেছে, সে-হুকুম তামিল করো শম্ভু···বুঝলে···

কথাটা বলিয়া সেখানে সে আর এক-নিমেষ দাঁড়াইল না···সে-ঘর হইতে চলিয়া আসিল।

১৬

পরের দিন বেলা নটার মধ্যে স্নান সারিয়া শিপ্রা সযত্নে নিজেকে অপরূপ বেশে সাজাইল। তার পর ঘড়ির পানে চাহিয়া দেখে, দশটা বাজিতে তখনো পনেরো মিনিট বাকী।

ঘরে ছিল বড় অর্গান। অর্গান খুলিয়া শিপ্রা গাহিতে বসিল। গাহিতেছিল,—

আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলে দোলাও
কে আমারে কী যে বলে
ভোলাও ভোলাও···

মুক্তি আসিল। শিপ্রা যখনি গান গায়, কাজ ভুলিয়া সব ফেলিয়া মুক্তি আসিয়া কাছে দাঁড়ায়···তন্ময় হইয়া শিপ্রার গান শোনে। সব-সময়ে গানের মানে সবটুকু হয়তো বোঝে না, তবু শিপ্রার গানে যে আনন্দ, যে বেদনা নিঃসারিত হয়, সে আনন্দে, সে বেদনায় মুক্তি যেন সব ভুলিয়া যায়!

শিপ্রা গাহিতেছিল,

মনে পড়ে কত না দিন রাতি
আমি ছিলেম তোমার খেলার সাথী।
আজকে তুমি তেমনি করে
সামনে তোমার রাখো ধরে,
আমার প্রাণে খেলার সে-ঢেউ তোলাও।

দু'চোখে পরিপূর্ণ দৃষ্টি লইয়া মুক্তি দেখিতেছিল, শিপ্রার বাহিরের এই বেশভূষা, এই ইন্দ্রানীর ঐশ্বর্য্য···এ-সবের নীচে এক ভিখারিণী নারীর স্নেহ-কাঙাল মনের কি করুণ আকুতি···

গান থামিল। গানের সুরে-কথায় যে-ব্যথা, মুক্তির মনের উপর হইতে সে ব্যথা সরিতে চায় না···যেন পাথরের মতো সেগুলা মনে আঁটিয়া বসিয়া আছে!

শিপ্রা চাহিল মুক্তির পানে; মুক্তির সে-ভাব লক্ষ্য করিল। হাসিয়া শিপ্রা বলিল—কি ভাবছিস্ মুক্তি? মুখ অমন শুক্‌নো···

এ-কথায় মুক্তির চেতনা ফিরিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মুক্তি বলিল—দুঃখের গান গাইছিলে···না বৌদি?

শিপ্রার বুকে চকিত-চমক! শিপ্রা বলিল—সুখের কি দুঃখের, জানি না মুক্তি। রবি বাবুর লেখা গান···ভালো লাগে, গাই।

মুক্তি বলিল—রবি বাবু বুঝি শুধু দুঃখের গানই লিখেছেন বৌদি?

—না। সুখের গানও তিনি লিখেছেন। তবে দুঃখের গানই যেন বেশী!

মুক্তি বলিল—তিনি নিজে বুঝি খুব দুঃখ পেয়েছেন, বৌদি?

হাসিয়া শিপ্রা বলিল,—না রে পাগল, তা নয়। তিনি কবি। মানুষের মনের সব খপর তাঁর নখ-দর্পণে। তবে বেশীর-ভাগ মানুষকে দুঃখ পেতেই তিনি দেখেছেন···তাই তাঁর দুঃখের গানের আর তুলনা নেই!

কথাটা মুক্তি তেমন বুঝিল না···দু'চোখে হাজার প্রশ্ন লইয়া শিপ্রার পানে চাহিয়া রহিল। ঘরে তখনো সেই করুণ সুরের রেশ···

শম্ভু আসিয়া সে-রেশ ভাঙ্গিয়া দিল। বলিল,—এক জন বাঙালী বাবু এসেছেন।

—এসেছেন! ও···

শম্ভুর পানে শিপ্রা চাহিল। চাহিবামাত্র বুকখানা ধ্বক্ করিয়া উঠিল! শম্ভুর চোখের দৃষ্টিতে কি যে দেখিল···শিপ্রা বলিল,—তাঁকে নিয়ে এসো···

তার পর মুক্তিকে উদ্দেশ করিয়া শিপ্রা বলিল,—তুইও যা···কালকের সেই বাবু! বাবুকে নিয়ে আয়। আর শম্ভুকে বল্‌বি, বয়কে যেন বলে, খানা-কামরায় খাবার দেবে।

মুক্তি চলিয়া গেল।

কল্লোল আসিল।

শিপ্রা বলিল—বিদেশে এসে আপনার একটা দোষ সেরেছে, দেখছি···পাংচুয়াল্ হয়েছেন!

কল্লোল বলিল—দশটা বাজে···

শিপ্রা বলিল—তাই তো বল্‌ছি, পাংচুয়াল হয়েছেন! এ-গুণ তো কোনো কালে ছিল না! আগে চিরদিন আপনার জন্য সকলে বসে-বসে অস্থির হতো।

কল্লোল বলিল—ওটা অত্যুক্তি! সাহেবী পাংচুয়ালিটি না মানলেও সত্যিকারের আন্-পাংচুয়াল যাকে বলে, তেমন আমি কখনো নই!

কথাটা বলিয়া কল্লোল চাহিল শিপ্রার পানে। শিপ্রার চোখে বিদ্যুৎ! শিপ্রা বলিল—বটে! ইতিহাস খুলে সাল-তারিখ-শুদ্ধ বলবো না কি দু'-চারটে কাহিনী?

—বলো···

শিপ্রা বলিল—মনে আছে? তখন আপনার ফোর্থ ইয়ার···সে-দিন আমার জন্ম-দিন। আগের দিন আমি আপনাকে বলেছিলুম, সাড়ে সাতটার আগে আস্‌বেন, মানে, আর-সকলের আস্‌বার আগে···বিশেষ দরকার আছে। আপনি বলেছিলেন, আস্‌বেন। তার পর?

শিপ্রার পানে কল্লোল চাহিল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে।

শিপ্রা বলিল,—মনে নেই নিশ্চয়?

কল্লোল চিন্তা করিল। মনে পড়িল না। বলিল—না, মনে পড়ছে না। কি, শুনি?

শিপ্রা বলিল—মনে না থাকবার কথা। মন বলে যে-বস্তু বুকে ছিল, সে-বস্তুকে কি আর রেখেছেন! আমার কিন্তু মনে আছে। সে-রাত্তিরে আপনি এলেন সাড়ে আটটায়···ধৈর্য্য হারিয়ে সকলে তখন খেতে বসেছেন··· আমি শুধু চুপ করে বসেছিলুম···খেতে বসিনি! সেজন্য আমার উপর সকলের কি বিরক্তি! আপনি এলেন··· কিন্তু সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত নির্বিকার ভাব! আপনার দিক্ থেকে যেন কোনো ত্রুটি হয়নি!

কল্লোল বলিল,—সেই ছোট কথা···এমনি করে মনে রেখেছো শিপ্রা!

ছোট একটা নিশ্বাস ফেলিয়া শিপ্রা বলিল,—ছোট-বড় সব কথাই আমাদের মনে থাকে! মনে বন্দী হয়ে থাকে। আমাদের এ তো মন নয়···লোহার খাঁচা!

হাসিয়া কল্লোল বলিল,—জানি···ও-মনে একবার যে প্রবেশ করেছে, তারো তাই মুক্তি মেলে না! কিন্তু না, বাক্‌যুদ্ধ থাক্। এখন···

মনের খাঁচার খিল খুলিয়া গিয়াছিল···বুঝি, সেই গানের টানে! মনে অনেক কথা···মনের খিল খোলা পাইয়া সব কথা বুঝি শিপ্রার মন হইতে বাহিরে আসিবে! কিন্তু কি তাহাতে লাভ?

শিপ্রা চকিতে সে-খাঁচায় খিল আঁটিল। বলিল,—এখন খাওয়া-দাওয়া···সব রেডি!

কল্লোল বলিল,—গৃহস্বামী?

শিপ্রা বলিল,—তাঁর শীকার আজো শেষ হয়নি!··· আমি তাঁর প্রতিনিধি আছি তো···আপনার কোনো অমর্য্যাদা হবে না।

খানা-কামরায় টেবিল। কল্লোল এবং শিপ্রা খাইতে বসিয়াছে। মুক্তি একধারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। শম্ভু আসিয়া কখনো সে-কামরায় ঢুকিতেছে, কখনো বাহিরে যাইতেছে···কাহারো পরিচর্য্যায় ত্রুটি না হয়, যেন তারি তদ্বির করিতেছে! কিন্তু···

খাইতে খাইতে দু'জনে কথা হইতেছিল। অনেক কথা···

শিপ্রা বলিল,—সত্যি, যে-জায়গাটিতে থাকেন··· চমৎকার! শেলির সেই কবিতার লাইন আমার কেবলি মনে পড়ছে। সেই many a green isle there need be in the deep wide sea of misery.

কল্লোল বলিল,—বুঝচো তো, আমার এত ভালো লেগেছে কেন! এক-একবার মনে হয়, বুঝি, বাকী দিনগুলো ঐখানেই কাটবে!

শিপ্রা বলিল,—যে-বন্ধুর সঙ্গে আছেন, সে-বন্ধুর নাম?

—অনাদি···

শিপ্রা চাহিল কল্লোলের পানে, বলিল,—অনাদি! কল্‌কাতার বন্ধু?

—নিশ্চয়।···অনাদি দত্ত···গান-বাজনায় খুব সখ ছিল। তাই থেকেই আলাপ···অন্য কলেজে পড়তো।

—বোধ হয়, same tastes···(সমান রুচি)!··· বোহেমিয়ান্ ভিউজ (অত্যুদার মত)?

কথাটা বলিয়া শিপ্রা হাসিল।

কল্লোল বলিল—অত্যুদার মত, নিশ্চয়!···এখানে এসে

কিন্তু জড়-ভরত হয়ে গেছে! দিব্যি সংসার পেতে বাস করছে!···আমি তাই বলছিলুম, এই যদি ছিল তব ভালে, স্বদেশ কি অপরাধ করেছিল, অনাদি? তাতে বলে, দেহ-মন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে···ছুটোছুটি আর পারে না···একটু বিশ্রাম। তাছাড়া বলে, আসল যে প্রাণটুকু ছিল, যে-প্রাণের দাবী মেনে কোনো দিকে কোনো-কিছুর তোয়াক্কা রাখেনি, সে-প্রাণ আর নেই···তাই!

শিপ্রা এ-কথা শুনিল···গভীর মনোযোগে।···একটা উদ্যত নিশ্বাস চাপিয়া বলিল,—আপনারো ক্লান্তি হয়েছে না কি কল্লোল বাবু, আপনার এই বন্ধুর মতো?

—তার মানে?

—গ্রীন্ আইলে তাই চুপচাপ বসে আছেন!

কল্লোল বলিল—ঠিক বুঝতে পারছি না।···জানো, আমাদের মনের দুটো দিক্ আছে। একটা দিক্ হলো ধ্যান-লোক···আর-একটা দিক্ হলো কর্ম্মলোক। লাট-সাহেবদের যেমন গ্রীষ্মকালে দার্জ্জিলিং, আর শীতকালে কলকাতা, তেমনি! মন যখন ধ্যানলোকে বাস করে, তখন সে শুধু চিন্তা করে, কল্পনা করে। তার পর কর্ম্ম-লোকে এসে সেই কল্পনাকে কাজের ধারায় উৎসারিত করে ছায়। আমার মন এখন ধ্যানলোকে বাস করছে···

কথাটা বলিয়া কল্লোল হাসিল।

শিপ্রা বলিল—এবার কিসের কল্পনা চলেছে?

কল্লোল বলিল,—কল্পনার কি কামাই আছে! টুক্‌রো-টুক্‌রো কল্পনা বোনা চলেছে···সব সময়! কিন্তু ও-কথা থাক্···চকিতে যদি দেখা হলো এবং এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে এবং এ-দেখার ক্ষণ যখন চকিতে মিলিয়ে যাবে··· তখন বলো দিকিনি তোমার কথা। মানে, এত কাল তুমিই বা কেমন আছো? কি করছো?

একটা নিশ্বাস বুকের গহন-তল হইতে উঠিয়া শিপ্রার কণ্ঠকে চাপিয়া ধরিল! নিশ্বাস ফেলিয়া শিপ্রা বলিল—ধনীর স্ত্রী হয়ে তার ঘর-সংসার করছি। পার্টি, ভোজ, সাজগোজ···মেয়েদের জন্ম আপনারা জীবনের যে-ধারা চিরদিন নক্সায় ছকে রেখেছেন···

কল্লোল বলিল—কিন্তু তুমি তো গতানুগতিক-ধারা মানবার মেয়ে নও, শিপ্রা! ক্ষমা করো···তুমি এখন মিসেস চৌধুরী···এ কথা বলা হয়তো আমার সাজে না! কিন্তু না, সত্যি, তোমার কথা প্রায় আমার মনে জাগে! নিজের কথা ভাবতে বসলেই তোমার কথা মনে জাগে! ভাবি, তুমি কি করছো, কেমন আছো! দেখবার এমন ইচ্ছা হতো···

দু'চোখের পরিপূর্ণ দৃষ্টি কল্লোলের মুখে দৃঢ়-নিবদ্ধ করিয়া শিপ্রা বলিল—এখন দেখছেন তো! আমাকে কি মনে হয়? আমার পানে চান্···পরস্ত্রী বলে' সনাতন মতে নাই-বা অত দ্বিধা-সঙ্কোচ করলেন!

কল্লোল চাহিল শিপ্রার পানে, বলিল—হুঁ···

—কি···হুঁ?

কল্লোল বলিল—বাইরে থেকে যা দেখছি, তাতে বলবো you are more beautiful than you were then···(আগেকার চেয়ে তুমি আরো সুন্দর)!

শিপ্রা হাসিল, বলিল—তা থেকে ভিতরের কিছু আভাস পান্?

কল্লোল বলিল—সে-আভাস পেতে হলে আরো দু'-একদিন দেখতে হয়!

শিপ্রা বলিল,—তাহলে আরো দু'-একদিন দেখুন··· দেখে কি পান্, আমায় বলবেন কিন্তু···

কল্লোল এ-কথার জবাব দিল না···খাওয়ার প্লেটে মনোনিবেশ করিল।

আহারের পর ড্রয়িং-রুমে আসিয়া শিপ্রা বলিল,—আপনার বিশ্রাম দরকার?

কল্লোল বলিল,—না, না···নট্ ইয়েট সো ওল্ড (এখনো তেমন বুড়া হই নাই)! যে-কথা ছিল···

শিপ্রা বলিল,—বেরুবেন?···

—হ্যাঁ···কোথা যেতে চাও?

শিপ্রা বলিল,—যেখানে আপনি নিয়ে যাবেন···

কল্লোল বলিল,—আমার উপর এত বিশ্বাস!

শিপ্রা বলিল,—নিজের উপর যার বিশ্বাস আছে, কাকেও সে কোনো দিন অবিশ্বাস করে না কল্লোল বাবু। পারেন আপনি আমায় নিয়ে যেতে···সেই আগেকার দিনে···to begin over again (ফিরে-ফিরতি জীবন সুরু করিতে)?

কল্লোল চাহিল শিপ্রার পানে···

শিপ্রা উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল,—আমি এখনি আসছি। শুধু এই কাপড়খানা বদলে আসবো···

শিপ্রা চলিয়া গেল···

কল্লোল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ভাবিতেছিল, সেই শিপ্রা···এখনো তেমনি আছে! বিবাহ করিয়াছে··· স্বামী···সংসার! কিন্তু ঐ শরৎ চৌধুরী! শিপ্রার মন যেন আকাশের চঞ্চল বিদ্যুৎ-শিখা। এ-শিখাকে বশ করিবে শরৎ চৌধুরী? এমন বৈজ্ঞানিক শিক্ষা তার নয়, নিশ্চয়! টাকার পাহাড় যতই তুঙ্গ করিয়া তুলুক, সে-পাহাড়ে নিজেকে আছাড় দিয়া চূর্ণ করিবে, শিপ্রা সে-ধাতের মেয়ে নয়!

শিপ্রা আসিল। পরণে পেঁয়াজী রঙের সিল্কের শাড়ী, গায়ে আসমানি রঙের ব্লাউশ্।

কল্লোল বলিল—রেডি?···অল্ রাইট।

শিপ্রা বলিল—আমার কথার জবাব দিলেন না তো!

শিপ্রার মুখে দুষ্ট হাসির রেখা···

কল্লোল বলিল—কি-কথার জবাব?

—যা বললুম। পারেন আমায় নিয়ে যেতে আগেকার সে-জীবনে···সত্যি?

—ও···কল্লোল শিপ্রার পানে চাহিয়া শুধু নিশ্বাস ফেলিল।

শিপ্রা বলিল—But we can never get back what we threw away (যা ফেলিয়া দিয়াছি, তা আর ফিরাইয়া পাওয়া যায় না)।···সেই যে-গান আছে, 'চলে যা যায়, আর আসে না ফিরে'···জানি, কল্লোল-বাবু।···বসে কি-বা আর ভাববেন? আসুন···

দু'জনে বাহির হইল।

হোটেলের সামনে ট্যাক্সি। দু'জনে ট্যাক্সিতে বসিল। কল্লোলের কথায় ট্যাক্সি চলিল উত্তর-মুখে···

পাহারাদার ভৃত্য শম্ভু···দু'জনের অলক্ষ্যে নীচে আসিয়াছিল। শিপ্রার ট্যাক্সি চলিয়া যাইবামাত্র সামনের একটা খালি ট্যাক্সিতে সে উঠিয়া বসিল। ড্রাইভারকে বলিল—ঐ ট্যাক্সির পিছু-পিছু চলো। কিন্তু হুঁশিয়ার, ওঁরা না বুঝতে পারেন!

ট্যাক্সিওয়ালা মাথা নাড়িয়া জানাইল—তাই হইবে। সে ট্যাক্সি চালাইয়া দিল।

১৭

শিপ্রা ফিরিল···রাত্রি তখন প্রায় ন'টা। ট্যাক্সি হইতে নামিয়া কল্লোল আর হোটেলে ঢুকিল না। বলিল,—গুড্ নাইট···

শিপ্রা বলিল—গুড্ নাইট। ভালো কথা, আপনি যেখানে থাকেন, অফ্‌শুট রোড না?

—হ্যাঁ···

—বেশ···

কল্লোল চলিয়া গেল। শিপ্রা আসিল নিজের কামরায়।

মুক্তি বসিয়া কম্ফর্টার বুনিতেছিল···

শিপ্রা বলিল—কার জন্য বুনছিস্ মুক্তি?

লজ্জায় মুক্তির মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

শিপ্রা বলিল—বরের জন্য? তার এখনো কম্ফর্টার পরবার বয়স আছে?

কোনো মতে মুক্তি বলিল—আমায় বলেছিল বুনে দিতে···

—ও···

শিপ্রা গেল কাপড় ছাড়িতে। বলিয়া গেল—আমি রাত্রে খাবো না। খেয়ে এসেছি। এখনি শোবো। তোকে আজ আর আমার দরকার হবে না মুক্তি···

মুক্তি চুপ করিয়া ক্ষণকাল বসিয়া রহিল···স্তম্ভিতের মতো। তার পর কাঠি ও পশম রাখিয়া শম্ভুর ঘরের দিকে গেল।

খানা-কামরার সামনের বারান্দায় দাঁড়াইয়া শম্ভু সিগারেট ধরাইয়াছে। মনিবের সিগারেট। সম্পূর্ণ নিস্পরোয়া হইয়া সে এ-সিগারেট সেবা করে।

মুক্তি আসিয়া বলিল—বৌদি রাত্রে খাবে না, শম্ভু।

শম্ভুর চোখের যেন কী! শম্ভু বলিল—জানি, বন্ধু তোয়াজ করে খাইয়েছেন! তুমি না বললেও পারতে!

আবার এমন স্পর্দ্ধার কথা! দু'চোখে ভ্রূকুটি ভরিয়া মুক্তি চাহিল শম্ভুর পানে।

শম্ভু সে ভ্রূকুটি লক্ষ্য করিল না, বলিল—রাগ করলে আর কি করবো বলো মুক্তি-ঠাকরুণ! এই সব বড়

লোকদের আমি সব জানি···তুমি আর আমি···বুঝলে, আমরাই ভয়ে জুজু হয়ে থাকি! নাহলে এঁরা··· মনিব আমায় বলেছেন, মনিবনীর পাহারাদারী করতে! নিজে সব বোঝেন, জানেন···তবু যে কেন এমন···হুঁঃ!

দুর্জ্জনের সঙ্গ-ত্যাগ শ্রেয়ঃ বুঝিয়া মুক্তি চলিয়া আসিল।

আসিল শিপ্রার ঘরে। খাটের বিছানায় শিপ্রা শুইয়া আছে। ঘরে আলো জ্বলিতেছে···শিপ্রার দু'চোখে উদাস দৃষ্টি···কি আকাশ-পাতাল ভাবিতেছে!

মৃদু কণ্ঠে মুক্তি ডাকিল—বৌদি···

শিপ্রা বলিল—তুই যা রে। তোকে আমার দরকার হবে না, বললুম তো! খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড় গিয়ে···

মুক্তি চলিয়া আসিল।

শিপ্রার মনের উপর বিগত ক'বছরের কথা যেন পাহাড়ের মতো চাপিয়া বসিয়াছে! নিজের অজ্ঞাতে মনে কেমন যেন আতঙ্ক! মনে হইতেছিল, জীবনের বহু বৎসর যেন পার হইয়া আসিয়াছে! এখন যেন স্বপ্ন দেখিতেছে, কবে কোন্ কালে শিপ্রার মন ছিল কিশোর···সে-মনে ছিল যেন প্রচুর শক্তি, দুর্জ্জয় সাহস! সে-শক্তি, সে-সাহস আজ আর নাই! আজ শিপ্রা যেন সেই পুরানো দিনের বিশীর্ণ ছায়া! মনে হইতেছিল, জীবনের পথ যেন তার শেষ হইয়া আসিয়াছে; এবং যেখানে এখন আসিয়া পৌছিয়াছে, সেখানে তার আশেপাশে কেহ নাই, কিছু নাই! সে একা!

দু'চোখের পিছনে কোথা হইতে চকিতে অশ্রু ঠেলিয়া আসিল!

মনে হইতে লাগিল, কি করিয়াছি···আমি কি করিয়াছি! জীবনকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য হাতের কাছে সব পাইয়াছিলাম··কি ভুল করিয়া সে-সব উপেক্ষা করিয়াছি! এ ক'বছর···এ ক'বছরে মনকে দিনে দিনে শুধু ক্ষয় করিয়াছি! কি চাহিয়া কি পাইবার লোভে নিজের জীবনকে এমন মিথ্যা করিয়া ফেলিলাম!

এখনো যদি ফিরিয়া পাই! ফিরিবার উপায় সত্যই নাই?

কল্লোল···কল্লোল···কল্লোল! জোর করিয়া মন হইতে যত তাকে দূরে সরাইয়া দিয়াছে, মনকে ততই সে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে শিকল দিয়া বাঁধিয়াছে! এমন নিঃশব্দে বাঁধন দিয়াছে, এমন কৌশলে যে, আজিকার পূর্ব্বে এ-বাঁধন শিপ্রা এতটুকু বুঝিতে পারে নাই!

রাগ হইল! শিপ্রা ভুল করিয়াছে, তাই বলিয়া কল্লোলও ভুল করিবে? জোর করিয়া কেন সে শিপ্রার ভুল ভাঙ্গিয়া দিল না? মনকে ক্ষতবিক্ষত করিতে যখন শিপ্রার বাধে নাই,···হায় রে, মনের সে-সব ক্ষত মিলাইয়া গিয়াছিল! সহসা এত দিন পরে সে-সব ক্ষতের ব্যথা আবার আজ এমন জাগিয়া উঠিয়াছে···

কল্লোলই বা এত কাল কি করিয়াছে? অভিমান করিয়া সরিয়া আসিয়া জীবনকে লইয়া এ কি ছিনি-মিনি-খেলা···

চলে না···চলে না···এ-খেলা চলে না! তা যদি চলিত, শিপ্রা আজ ব্যথায় এমন কাতর হইবে কেন?

দু'চোখে জল-ধারা···বাহিরে নক্ষত্র-খচিত আকাশ ···সজল চোখের ঝাপ্‌সা দৃষ্টির সামনে আকাশ যেন দূরে···আরো-দূরে সরিয়া চলিয়াছে!

মনে মনে শিপ্রা বলিল, কাল আমি যাইব··· কল্লোলের গৃহে! বলিব, তোমার নিষেধ আমি মানিব না! কেন তুমি আমায় নিষেধ করিবে? আমার যা ভালো লাগে···আমার মনকে কেন তুমি তাহা হইতে বঞ্চিত করিবে? না···না···

বাড়ী আসিয়া কল্লোলও ঘরে থাকিতে পারিল না··· নিঃশব্দে বাহির হইল। বাহির হইয়া সে আসিল সেই নদীর বাঁকে বাঁশঝাড়ের প্রান্তে···

নদীর বুকে ষ্টীমার···ষ্টীমারে আলো জ্বলিতেছে···সে আলো আসিয়া পড়িয়াছে নদীর ঢেউয়ে-দোলা জলে।

জলের বুকে আলোর সেই নৃত্য-লীলার পানে কল্লোল চাহিয়া রহিল। মন বলিতেছিল···

সেই শিপ্রা! সব ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম···সব ভুলিয়াছিলাম···পাথর টানিয়া সেই পাথর চাপা দিয়া বুকের সব ঢাকিয়া রাখিয়াছিলাম···শিপ্রা আসিয়া সে-পাথর সরাইয়া মনকে আবার কেন জাগাইয়া তুলিল?··· যা গিয়াছে, তা ফিরিবার নয়···ফিরাইবার নয়! শিপ্রা

এখন মিসেস্ চৌধুরী···এ-কথা শিপ্রা কি করিয়া ভুলিয়া যায় ?

গঙ্গা আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। নিঃশব্দে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল।

কল্লোল দেখিল না।

গঙ্গা আসিয়া পাশে বসিল, বলিল,—খাবে না ?

একটা নিশ্বাস···নিশ্বাস ফেলিয়া কল্লোল গঙ্গার পানে চাহিল, বলিল,—গঙ্গা !

—হ্যাঁ।

কল্লোল বলিল—কিছু বলবে ?

গঙ্গা বলিল—তুমি খাবে না ?

—না।

গঙ্গা বলিল—শরীর খারাপ বোধ করছো ?

—না।

—তবে ?

কল্লোল বিরক্ত হইল···কৈফিয়ৎ ? বলিল—ইচ্ছা নেই।

কথায় রূঢ়তা···সে-রূঢ়তা গঙ্গার মনে বিঁধিল কাঁটার মতো !

গঙ্গা কিছু বলিল না। বুকের মধ্যে কোথায় ব্যথার অশ্রুপুঞ্জ···সেখানে দোলা লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে কল্লোল বলিল—এখানে বসে কেন ?

গঙ্গা বলিল—আজ ক'দিন থেকে তুমি বাইরে বাইরে আছো !···শুক্‌নো মুখ···কি ভাবছো···কত দুশ্চিন্তা···

কল্লোল বলিল—মানুষের মনে কত কি হতে পারে !

গঙ্গা বলিল—তুমি···

কল্লোল বলিল—যার কাছ থেকে যেটুকু পাওয়া যায়, তাতেই খুশী থাকতে হয় গঙ্গা। তার বেশী প্রত্যাশা করলে লাভ হয় না···তাতে ব্যথা পেতে হয়। তুমি যাও ···কারো সঙ্গ এখন আমার ভালো লাগছে না !

এ-কথার পর গঙ্গা আর বসিল না···নিঃশব্দে উঠিল; উঠিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

কল্লোল হাসিল। মনে-মনে বলিল, চমৎকার এই পৃথিবী ! কাহাকেও সামান্য-একটু দিয়াছ···অমনি সে চাহিয়া বসিবে পূর্ণপাত্র ! বাঃ ! [ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সত্য ও মিথ্যা

[জেমস্ টম্‌শন-রচিত কবিতার মর্ম্মানুবাদ]

অধর অধরে যবে চুমায় মিলায়—
কে তখন বলো, গান গায় ?
বক্ষ যবে বক্ষে চেপে ধরে—
আবেগের ভরে
রুদ্ধ শ্বাস ; আবেগ-উচ্ছ্বাস
গানেতে না ঝরে !
করাঙ্গুলি প্রেয়সীর কেশে—
বিভল আবেশে—
ছন্দোবন্ধে কবিতা রচনা
সে-সময়—অলস জল্পনা !
বাহু-বন্ধে কটি প্রেয়সীর—
বিবশ অধীর !
মর্ম্মরে রচিবে মূর্ত্তি—ধ্যানে
হেন শিল্পী নাহি কোনোখানে !
তৃপ্তি যে পায়নি কভু ভোজে,
বর্ণনায় সে তা নাহি বোঝে !

অমৃত করেনি কভু পান—
সে কি গা'বে অমৃতের গান ?
কিশোরীর অপাঙ্গ-নয়নে
দৃষ্টি-তীর বেঁধে নাই মনে,
দৃষ্টির মাধুরী জানে সে কি ?
তার কাছে সব দৃষ্টি মেকি !
নৃত্যলীলা ত্থাখেনি জীবনে,
বোঝে না সে কি-ভাষা ও নূপুর-সিঞ্জনে !
মহাযুদ্ধ—কে করে বর্ণনা ?
সেনাপতি ? সে তাহা পারে না !
চিত্র, কাব্য, মর্ম্মর প্রতিমা—
জানি, তায় আছে মধুরিমা !
তবু সে জীবন নয় ; জীবনের ছায়া !
যে-মাধুরী রয়েছে জীবনে—
তার পাশে এরা মিথ্যা ! মায়া !

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

রণক্ষেত্রে বিচিত্র যান

এ যুদ্ধে সেনাদলের কাজের যেমন অন্ত নাই, এঞ্জিনিয়ার-সম্প্রদায়ের সাধনাও তেমনি সীমাহীন! শত্রু-দমনে নব-নব উপায় উদ্ভাবনে আজ দিকে দিকে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। শত্রু-দমনে কখন্ কোন্ পথে যাইতে হইবে, সে পথ দুর্গম হইতে পারে—ইহা বুঝিয়া যাত্রা সুগম করিবার জন্ত যে-অতিকায় মোটর-গাড়ী তৈয়ারী করিয়াছেন, পথে-বিপথে তাহার গতি যেমন দ্রুত, তেমনি অবাধ-অব্যাহত।

জলের গাড়ী
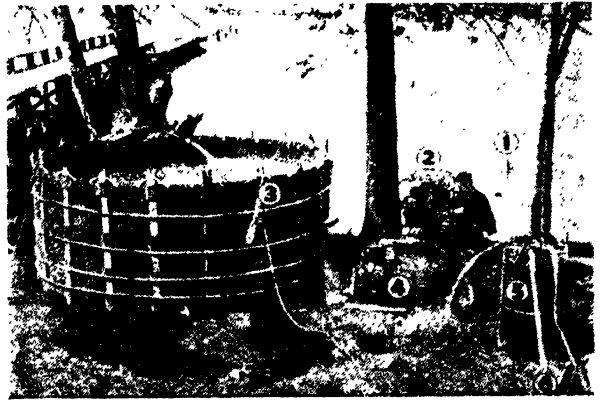
পথে নিমেষে টিউব-ওয়েল খুঁড়িয়া ট্যাঙ্কে জল ভর্ত্তি
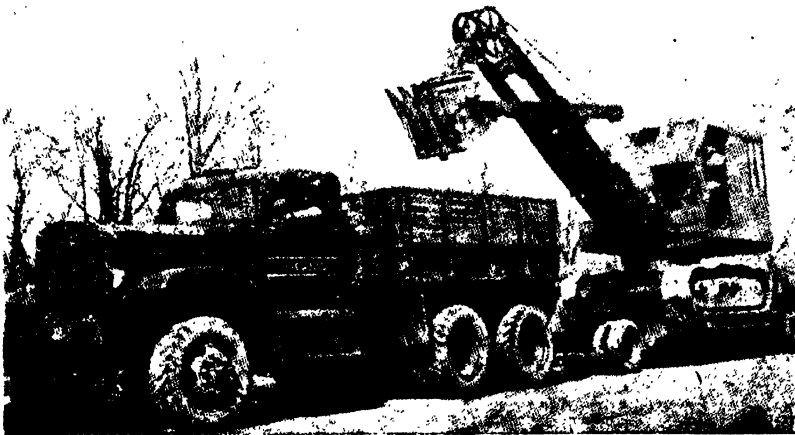
অতিকায়-মোটর—পথে-বিপথে সমান চলে

পাথর-ভাঙা হাতুড়ি-গাড়ী

যেমন তাঁরা মস্তিষ্ক চালনা করিতেছেন, আত্মরক্ষার নানা উপায় নির্দ্ধারণেও তেমনি মস্তিষ্কের বিরাম নাই। তাঁদের সৃজনী-বিদ্যা পাশে ঐ যে অতিকায় ট্রাক—ওখানি চলে ঘণ্টায় বিশ মাইল রেটে। পরের পৃষ্ঠায় যে-ট্রাক—তার নাম পুলডোজার। ও-গাড়ী

কারখানা-গাড়ী

অতি-দুর্গম পথকেও স্বচ্ছন্দ-সুগম করে এবং রণাঙ্গনে পৌছিয়া দুর্গরূপে দুর্ভেদ্য হইয়া দাঁড়ায়। নীচের ছবিতে যে-মোটর, এ মোটর চলিতে চলিতে পথে গভীর গহ্বর রচিয়া যায়। সে গহ্বরকে বলে,

পথে রন্ধ্র রচিয়া যায়

ঐ গাড়ীর পূর্ণাঙ্গ

মরণ-ফাঁদ। পথে বরাবর এমনি গহ্বর রচিয়া পথকে এ গাড়ী করে শত্রুর পক্ষে অগম্য। ঠিক উপরেই এই গাড়ীর পূর্ণাবয়ব

মিস্ত্রী-গাড়ী

দেখিলে তত্ত্ব বুঝিবেন। বাঁয়ে উপরে যে গাড়ী, এ গাড়ী রীতিমত কারখানা! এ গাড়ীতে সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রপাতি বোঝাই

বুলডোজার—পথ রচনা করে

থাকে। আগের পৃষ্ঠায় জলের গাড়ীর ছবি। ও গাড়ীতে সকল সময়ে পঁচাত্তর গ্যালন বিশুদ্ধ জল ভরা থাকে। তাছাড়া ও গাড়ীতে যন্ত্রাদির যে সরঞ্জাম, সে যন্ত্রাদির সাহায্যে
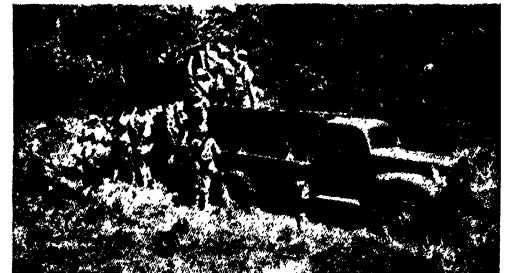
এ গাড়ীতে থাকে দশখানি করিয়া বোট

পথে টিউব-ওয়েল্ খুঁড়িয়া চকিতে জল লওয়া হয়; এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর জল তুলিয়া সে-জলকে পরিষ্কার করিয়া লইবার ব্যবস্থাও আছে। সুতরাং জলের জন্ম কোথাও এতটুকু অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটিবার

উপায় নাই। ৯ নম্বরের ছবি—এ গাড়ীতে দশখানি করিয়া হাল্কা বোট আছে। পথের মধ্যে নদী পার হইবার প্রয়োজন হইলে

পণ্টুন-ব্রিজ

এ গাড়ী হইতে চকিতে বোটগুলি বাহির করিয়া জলে ভাসানো যায়; সে বোটে চড়িয়া ফৌজের দল নদী পার হয়। এবং ঐ বোট—দশখানি বা বিশখানি বা যেমন প্রয়োজন, ততগুলি পাশাপাশি সাজাইলে তার উপরে নিমেষে পণ্টুন-ব্রিজ তৈয়ারী হয়; সেই ব্রিজের উপর দিয়া চলে ফৌজ ও কামানের ভারী গাড়ী। সুতরাং যুদ্ধের এ লীলায় বৈচিত্র্যের অভাব নাই! এক হাতে ভাঙ্গন, আর এক হাতে সৃষ্টি-বৈচিত্র্য!

মাছের ছালে জুয়েলারি

মাছের উপরে যত প্রীতিই থাকুক, মাছের ছাল বা আঁশ কোনো মহিলা বরদাস্ত করেন না, তাহা ফেলিয়া দেন! কিন্তু আমেরিকার

মাছের ছাল-আর-আঁশে তৈয়ারী কণ্ঠহার

নিউ-অর্লিন্সের শিল্পী পার্শি ভিয়েগো এই মাছের ছাল আর আঁশ লইয়া বাস্তু-সৃষ্টি করিতেছেন। মাছের ছাল হইতে তিনি তৈয়ারী করিতেছেন পুরুষদের জন্য হস্তি-দন্তের মতো শুভ্র উজ্জ্বল ঘড়ির লকেট; টাই-বন্ধনী; আংটি প্রভৃতি! এবং মেয়েদের জন্য তৈয়ারী করিতেছেন নেকলেশ, ব্রেসলেট, মাথার ক্লিপ। নীচে বাঁয়ে যে-ছবি দেখিতেছেন, ও ছবিতে শিল্পীর কন্যার কণ্ঠে যে মোতির মালা—ও মালার মোতি মাছের ছাল ও আঁশের তৈয়ারী।

অস্ত্র-শিক্ষা

আমেরিকার স্ত্রী-পুরুষ উভয় সমাজেই এ যুদ্ধ-সঙ্কটে অস্ত্র-শিক্ষার সুব্যবস্থা হইয়াছে। রাইফেলের লক্ষ্য কিসে অব্যর্থ হইবে, তাহা শিক্ষা দিবার জন্য মার্কিণ মেরিন্-কোরের কর্পোরাল পল্ ফিডেল-ম্যানের পরামর্শে নিউ-ইয়র্ক-নিবাসী মার্কিণ বৈজ্ঞানিক নাথান জাব্‌লো এক-রকম যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যন্ত্রটি একটি বাক্সের মতো। এই বাক্সের মধ্যে রাইফেল রাখা হয়। রাইফেলের ভিতরে ছোট টার্গেট; এবং ক্রম-সংখ্যায় নির্দ্ধারিত-মাপ মুদ্রিত আছে। শিক্ষার্থীরা এই বাক্সের পিছনে দাঁড়াইয়া রাইফেল ছোড়া অভ্যাস
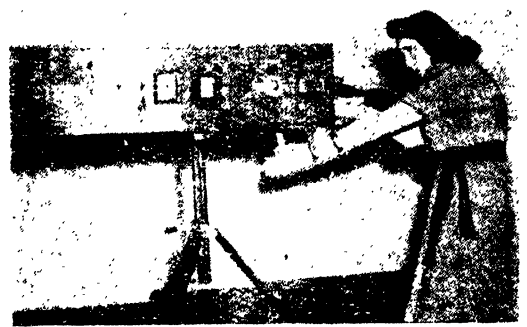
রাইফেল-ছোড়া শিক্ষা

করেন—গুরু দাঁড়ান বাক্সের পাশে। পাশে দাঁড়াইয়া তিনি ঐ মুদ্রিত মাপ দেখিয়া বুঝিতে পারেন, শিক্ষার্থীর লক্ষ্য নির্ভুল কি না। রাইফেলের ট্রিগারের সঙ্গে আর এক-সেট্ যন্ত্র সংলগ্ন আছে। পাশে দাঁড়াইয়া সে-যন্ত্র দেখিয়া গুরু বুঝিতে পারেন, শিক্ষার্থী সঠিক ভাবে ট্রিগার চালনা করিতেছে কি না। লক্ষ্যভেদের ছোট-বড় সকল ত্রুটি এ যন্ত্র-সাহায্যে চকিতে জানা যায় বলিয়া শিক্ষার্থীর ভ্রম-অপনোদনে যেমন বিলম্ব ঘটে না, তেমনি লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলী-অপচয়ের অপব্যয়ও ইহাতে রক্ষা পায়।

অশ্বতরের সমাদর

পূর্ব্বে যখন মোটরের সুপ্রচলন হয় নাই, তখন মিউল বা অশ্বতর ছিল সামরিক বিভাগে অস্ত্রশস্ত্রাদি বহিবার একমাত্র বাহন। তার পর মোটর-প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বেচারা অশ্বতরকে সামরিক বিভাগ হইতে বরখাস্ত করা হয়। সম্প্রতি জার্ম্মাণ রণাঙ্গনে আবার অশ্বতরের ডাক পড়িয়াছে। যে-সব পাহাড় বা খাড়াই জমির

অশ্বতরের পিঠে কামান-বন্দুকের বিযুক্ত অংশ

উপর দিয়া মোটর চলিবে না, সে সব পথে এখন অস্ত্রশস্ত্রাদি পাঠানো হইতেছে এই অশ্বতরের পিঠে চাপাইয়া। বড় বড় কামান-বন্দুক, হাউইট্জার প্রভৃতিকে নানা অংশে বিযুক্ত করিয়া কোনো অশ্বতরের

অশ্বতরের পিঠ হইতে অংশাদি নামাইয়া তাহা জুড়িয়া যুদ্ধ করে

পিঠে ব্যারেল, কোনোটার পিঠে কামানের চাকা, কোনো অশ্বতরের পিঠে অন্ত অংশাদি তুলিয়া পাঠানো হয়। তার পর নির্দ্দিষ্ট স্থানে অশ্বতর পৌঁছিলে সেই সব বিযুক্ত অংশ লইয়া সেগুলাকে জুড়িয়া যুদ্ধ চলে। আমেরিকার সমর-বিভাগেও অশ্বতরকে আনিয়া এ কাজে বাহাল করা হইতেছে।

পদ-রক্ষা

এদেশেও আজ পুরুষের মতো মেয়েদের জুতা পায়ে দিবার প্রথা সুপ্রচলিত হইয়াছে। পথ চলিতে পায়ে জুতা দিলে বহু বিঘ্ন-বিপত্তির হাত হইতে পরিত্রাণ মেলে; কাজেই ইহা সুলক্ষণ। কিন্তু জুতা পায়ে দিলে অনেকের পা ঘামে; ভিজা-পায়ে অস্বস্তির সীমা থাকে না! এ ত্রুটি-মোচনের জন্ম মার্কিণ-শিল্পীরা নূতন পদাবরণ

মিহি মোজা

বা মোজা তৈয়ারী করিয়াছেন। এ মোজা যেমন মিহি ও হাল্কা, তেমনি স্বচ্ছ। এ মোজা জলে ভেজে না; এবং আট জোড়া করিয়া প্যাকবন্দী ভাবে বিক্রয় হয়।

জলগুল্ম-কাটা যন্ত্র

খাল, বিল বা পুকুরের বুকে বড় বড় লতা-গুল্ম সহজে স্বচ্ছন্দ ভাবে কাটিয়া নির্ম্মূল করিবার জন্ম আর এক রকমের যন্ত্র বাহির হইয়াছে।

জল-গুল্ম কাটা

যন্ত্রটি হাল্কা; হাতে ধরিয়া চালানো যায়। যন্ত্রটিতে এক-ঘোড়ার শক্তি-যুক্ত ছোট মোটর-এঞ্জিন সংলগ্ন আছে। যন্ত্রে যে ব্লেড আছে, জমি হইতে দেড় ইঞ্চি উপরে তার অবস্থান। এবং এ যন্ত্র একবার মাত্র চালাইলে ৩৪ ইঞ্চি পরিমিত জায়গায় লতাগুল্মাদি উন্মূলিত হইবে।

পথহারা

পথহারা আমি ক্লান্ত পথিক, পথ খুঁজে খুঁজে ফিরি।
দিনের আকাশে সন্ধ্যার ছায়া নামিতেছে ধীরি ধীরি।
শ্রান্ত চরণ পড়িছে ভাঙ্গিয়া সারাদিন ঘুরে ঘুরে।
কোথা গৃহ মোর, কে দেবে দেখা'য়ে? কোন্ পথ?—
কত দূরে?

অন্তর-মাঝে জাগিছে সতত তাহারি পুণ্য-ছবি।
ধরণীর ধূলি নাহিক সেথায়, খাঁটি সোনা তা'র সবি।
জান কি কোথায় আমার সে দেশ, কোথা মোর সেই গৃহ—
জগতের মাঝে অতুলনীয় যা—স্বর্গ হ'তেও প্রিয়?

পল্লীর মাঝে যেথায় বিরাজে দেবতার মন্দির,
সন্ধ্যারতির শব্দে বাতাস স্তব্ধ সুগম্ভীর,
নিশীথে চাঁদিমা ঢালে দিশি দিশি তরল রজত-ধারা,
মাণিকের চোখে উঁকি দিয়া দেখে আকাশে লক্ষ তারা,
গাছে গাছে পাখী নির্ভয়ে থাকি' প্রাণ খুলে যেথা গায়,
সোনার সে দেশ সেই ত আমার; পথ-হারা আমি হায়!

মেঠো-পথে ওই 'ছই'-ঢাকা এক চলেছে গরুর গাড়ী।
এ-গাঁয়ের মেয়ে, ও-গাঁয়েতে বুঝি যেতেছে শ্বশুরবাড়ী।
বাঁশ-বনতলে জমিল আঁধার; সন্ধ্যা নামিল ধীরে।
'লুকোচুরী' আর 'কাণা-মাছি' খেলে ছেলেরা
আসিল ফিরে।
'হাট' কোরে ওই ফেরে গৃহস্থ, কাঁধে-পিঠে ল'য়ে বোঝা।
তুলসীর তলে বধূ দীপ জ্বালে, খোঁপায় 'মালতী' গোঁজা।
ঘরে-ঘরে শাঁক উঠিল বাজিয়া; চারি দিকে ঝিঁঝিঁ ডাকে।
আঁধারের বুকে করে ঝিকি-মিকি জোনাকীরা
ঝাঁকে-ঝাঁকে।

'সিপ্রা'র ঘাটে বেলা-শেষে ওই রূপসীরা চলিয়াছে।
সরমে জড়িত চরণ সবার, মরমে পুলক নাচে।
নয়নে কাজল, চাহনি বিভল, মুখে ফুল-রেণু মাখা।
পৃষ্ঠে দুলিছে কৃষ্ণ ফণিনী, রঙ্গীন সাড়ীতে ঢাকা।
কপালেতে টিপ্, কাঁকালে কলসী, হেলিয়া-দুলিয়া যায়।
রস-আলাপনে মত্ত সকলে, চপল নয়নে চায়।

ফিরাও নয়ন, দেখ চেয়ে ওই—আরো দূরে আরো দূরে।
আঁকিয়া-বাঁকিয়া এই পথ গিয়া মিশিয়াছে যেথা ঘুরে।
তপন হোথায় পড়েছে ঢলিয়া, সন্ধ্যা নামিছে ধীরে।
ঘরের মায়ায়, সাঁঝের ছায়ায়, পাখীরা ফিরিছে নীড়ে।
নগরপ্রান্তে বৌদ্ধ-ভিক্ষু ফিরিল ভিক্ষা সারি'—
সৌম্য, শান্ত, উদার, মহান্, অহিংসা-ব্রতচারী।

তপোবনে হোথা তাপস-তাপসী গাহে বন্দনা-গীতি।
সকাল-সন্ধ্যা 'সাম'-গান হোথা মুখরিয়া ওঠে নিতি।
হোম-ধূমরাশি কুণ্ডলি' হোথা গগন ভেদিয়া ওঠে।
ওঙ্কার-ধ্বনি কাঁপায়ে বনানী দিগ্-দিগন্তে ছোটে।

ওই হোথা আসে গোধূলি-আকাশে আঁধার নামিয়া ধীরে।
হোমধেনুগণ ছাড়ি গো-চারণ মন্থরপদে ফিরে।
তরু-আলবালে ওই জল ঢালে ঋষি-কুমারীরা যত।
কুটীরে-কুটীরে মুনিঋষিগণ সায়ং-সন্ধ্যারত।
শ্যাম বনতলে সাঁঝের আঁধার ধীরে ধীরে পড়ে লুটি'।
একে একে একে মাণিকের দীপ আকাশে উঠিছে ফুটি'।
দুঃখের দাহ নাহিক ওখানে, নাহি বিলাসের বিষ।
শান্তি তৃপ্তি ঘরে-ঘরে হোথা বহিছে অহর্নিশ।
গগনে-পবনে ঝরিছে ওখানে পুণ্যের নির্ঝর।
ওই দেশেতেই আমার যে সেই চিরন্তনের ঘর।
জ্ঞানে-অজ্ঞানে, ঘুমে-জাগরণে, গভীর মমতাভরে—
ওই ছবি ফোটে নিশিদিন মোর অশান্ত অন্তরে।
আমার মাটির স্বর্গ ও যে রে—জগতে অতুলনীয়!
আমার মহান্ তীর্থ ও যে রে—প্রাণ হ'তে মোর প্রিয়!
ওই মোর দেশে নিয়ে যাও প্রভু!—নিয়ে যাও—
নিয়ে যাও!
পথের ঠাকুর! পথ-হারা আমি, পথ দেখাইয়া দাও।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।
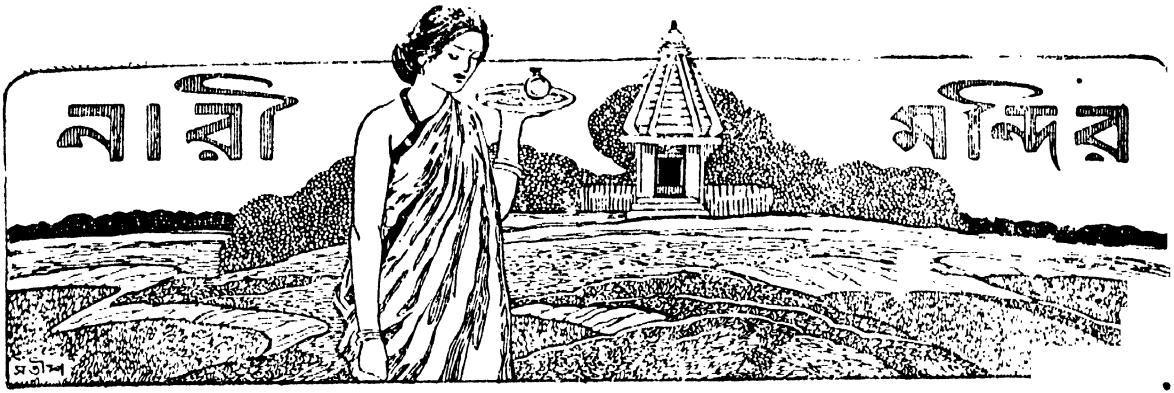
চেক্‌-পুল্‌-ওভার

শীত এসেছে। এবার শীতের উপযোগী পোষাক-পরিচ্ছদের কথা বলা যাক্‌!

এ-মাসে বলছি শ্লীভ-লেশ চেক্‌-পুল্‌-ওভারের কথা।

এটি তরুণ-গায়ের প্রমাণ পুল্‌-ওভার। এর ঝুল হবে ২১ ইঞ্চি; ছাতি ৩৯ ইঞ্চি।

এটি তৈরী করতে উল লাগবে (৪ প্লাই) ৬ আউন্স; অবশ্য আমাদের এই নির্দ্দেশ ধরে যদি তৈরী করেন। গ্রে রঙের উল নেবেন—তাহলে বেশ মানানসই হবে। তবে রঙ সম্বন্ধে কোনো বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই। যে-রঙ খুশী, সেই রঙের উল নিয়ে বুনতে পারেন। উল ছাড়া বোনবার জন্য চাই ৮ নম্বরের ষ্ট্রাটনয়েড (stıatnoid) কাঠি একজোড়া; এবং চারটি ১০ নম্বরের কাঠি। ১০ নম্বরের এ-চারটি কাঠির মাথা হবে ছুঁচলো।

আমাদের নির্দ্দেশ ধরে মাপ বুঝে পুল-ওভারটি ছোট বা বড় করেও বুনতে পারেন।

• সংক্ষেপোক্তি যদি ভুলে গিয়ে থাকেন, নতুন করে তার হদিশ দিচ্ছি। সোঃ=সোজা; উঃ=উল্‌টো; রিঃ =রিপিট; ঘঃ কঃ=ঘর কমানো; ঘঃ বাঃ=ঘর বাড়ানো।

পিঠের দিক

তলার দিক থেকে বোনা সুরু করুন। প্রথমে ১০ নম্বরের কাঠিতে ৯৮টি ঘর তুলুন। তার পর ২॥০ ইঞ্চি বুনুন ১টা সোঃ, ১টা উঃ। তার পর ৮ নম্বরের কাঠি নিয়ে প্যাটার্ণ সুরু করুন।

১ম লাইন আগাগোড়া সোঃ বুনে যান। ২য় লাইন ২টো সোঃ, * ১০টা উঃ, ২টা সোঃ। এখন * চিহ্ন থেকে বাকী ঘরগুলি রিঃ করুন। এর পর থেকে ঐ ১ম এবং ২য় —এ দু'টি লাইনের নিয়মে আরো আটটি লাইন পর-পর বুনুন। বুনে ১১শ লাইনে আগাগোড়া সোঃ বুনবেন। এর পরের তিন লাইন বুনবেন গার্টার-ষ্টিচে, অর্থাৎ প্রত্যেকটি লাইন বুনবেন সোঃ।

এখন ১৪টি লাইন হলো। এই ১৪টি লাইন হলো আসল প্যাটার্ণ। এই প্যাটার্ণটি এবার আগাগোড়া রিঃ করে যান্‌—শুধু মনে করে প্রত্যেক ৫ম লাইনের গোড়ায় আর শেষে ১টি করে ঘর বাড়িয়ে যেতে হবে। তার পরে যে-বোনা চলবে, তার প্রত্যেক ৪র্থ লাইনের গোড়ায় আর শেষে (at both ends) ১টি করে ঘর বাড়িয়ে যাবেন—যতক্ষণ না কাঠিতে ১১৮টি ঘর বাকী আছে, দেখবেন। অর্থাৎ যেখান থেকে সর্ব্বপ্রথম ঘর
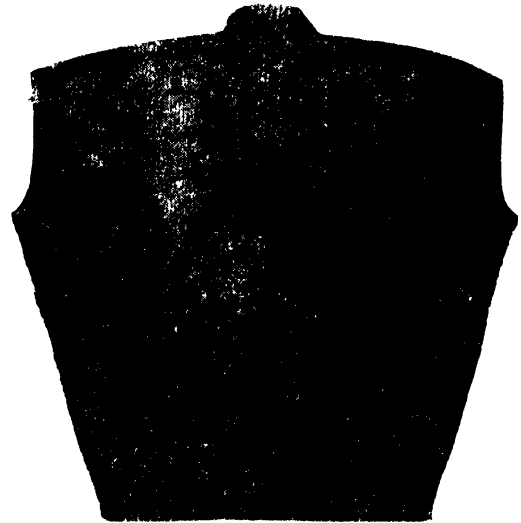
প্যাটার্ণের শ্রী

কমাতে আরম্ভ করেছেন, সেখান থেকে পাঁচটি প্যাটার্ণ সম্পূর্ণ হলো কি না দেখবেন; আর দেখবেন, পরের ৬য়ের প্যাটার্ণের ৮টি লাইন বাকী থাকা চাই।

এর পরের প্যাটার্ণে ১ম ও ২য় লাইনের গোড়ায় ৬টি করে ঘর কমান্‌। তার পরের ৪ লাইনের গোড়ায় এবং শেষে ১টি ঘঃ কঃ। এখন দেখবেন, কাঠিতে ৯৮টি ঘর বাকী আছে। এবারে ঘর না কমিয়ে বরাবর বুনে যান, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না গোড়া থেকে ১০টি প্যাটার্ণ কমপ্লীট হয়। তার পর শেষের ৩ লাইন ষ্টকিং-ষ্টিচ

দিয়ে অর্থাৎ মোজার ঘরের রীতিতে বন্ধ করুন।

এবার ঘাড়ের শেপিং। গোড়ায় ৬ লাইনের প্রত্যেকটি লাইনে ১২টি করে ঘঃ কঃ। এ ৬ লাইন শেষ হলে দেখবেন, কাঠিতে ২৬টি ঘর আছে। এই ২৬টি ঘর এবারে বন্ধ করে ফেলুন।

সামনের দিক

পিঠের দিককার জন্য যে-নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে, সামনের দিকটা আগা-গোড়া সেই নির্দ্দেশ-অনুযায়ী বুনে যান। এই ভাবে বুনে যখন দেখবেন, কাঠিতে ১১৮ ঘর বাকী, তখন গলা ধরতে হবে।

১ম লাইনে ৫৯ ঘর বুনে যান। আর-এক বাণ্ডিল উল নিয়ে আগের উলের সঙ্গে জুড়ে দিন। দিয়ে ৫৯ ঘর বুনবেন। দু'ধারের ৫৯টি ঘর এক-নিয়মে বুনবেন, তবে গলার দিকে প্রতি ৩য় এবং ৪র্থ লাইনে ১টি করে ঘঃ কঃ; এখন দেখবেন, পিঠের দিককার পুট-হাতার ঝুলের সঙ্গে সামনের দিককার পুট-হাতার ঝুল সমান মিলে গেছে। এবং আরো দেখবেন, দু'-দিকে এখন আর ৩৬টি ঘর বাকী। এই ৩৬টি ঘর না কমিয়ে বুনে যাবেন। শেষের ৪ লাইন কিন্তু এ ক'টি লাইনের চেয়ে একটু লম্বা হবে; কারণ, এ লাইনের ঘর কমানো হয়নি।

চেক্-দেওয়া পুল্-ওভার

কাঁধের শেপ্—প্রত্যেকটি লাইনের গোড়ায় ১২টি করে ঘর কমাবেন হাতের ফাঁদের দিকে। তার পর সমস্ত ঘরগুলি বন্ধ করতে হবে।

উল্টো দিক থেকে এবারে কাঁধের কাছে সামনের আর পিঠের দিক সেলাই করে জুড়ে নিন। তার পর সোজা করে পুল্-ওভারটি ভারী জিনিষের চাপ দিয়ে ঠিক করে নিন।

হাতের ব্যাণ্ড

পুল্-ওভারের সোজা দিকে ১০ নম্বর কাঠি দিয়ে ৮৬টি ঘর তুলুন। প্রথম আট লাইন বুনবেন ১টা সোঃ, ১টা উঃ। তার পর ঘর বন্ধ করে দিন। এর পর ১০ নম্বরের কাঠি নিয়ে ২০০টি ঘর বুনুন ঘাড়ের দিকে গোল করে; তার পর বুনে যান ১টা সোঃ, ১টা উঃ। কিন্তু ১০ম লাইনের পর থেকে প্রতি ২য় লাইনে দু'দিকে ১টি করে ঘঃ কঃ। তার পরেই ঘর বন্ধ করুন।

এখন যেমন রীতি আছে, সেই রীতি মেনে সামান্য-ভিজে-কাপড় ঢাকা দিন পুল্-ওভারটির উপরে—ভিজে কাপড় ঢাকা দিয়ে তার উপর গরম ইস্ত্রী চালান্। তার পর দু'টি পাশ সেলাই করুন,—সেলাই করে তার উপর ঠাণ্ডা-ইস্ত্রী চেপে দিন।

পুল্-ওভার এখন কমপ্লীট হলো।

পঞ্চদশ তরঙ্গ

অঙ্গুলি-চিহ্নের পরিণাম

রবার্ট ব্লেকের টেলিফোন 'ক্রিং-ক্রিং' শব্দে বাজিতে লাগিল।

ব্লেক তাঁহার সহকারী স্মিথকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ ত স্মিথ, টেলিফোনে কে ডাকাডাকি করিতেছে! এই দুপুর রাতে কাহার এমন কি কাজ পড়িল যে, সে সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিল না? জ্বালাতন আর কি!"

স্মিথ মুখভঙ্গি করিয়া বলিল, "বিখ্যাত হইলে মানুষকে এইরূপ দণ্ডই ভোগ করিতে হয় কর্ত্তা! আপনি এক কাজ করুন, সদর দরজায় ডাক্তারদের মত পিতলের চাক্তি আঁটিয়া তাহাতে লিখিয়া রাখুন—'সাক্ষাতের সময়, বেলা ১০টা হইতে ১টা, এবং ২টা হইতে ৪টা,' যদি কেহ ফোন করে, তাহাকে জানাইয়া দেওয়া উচিত—অন্য সময় আপনার সহিত সাক্ষাতের সুযোগ হইবে না।"

ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তুমি বক্তৃতা বন্ধ করিয়া শোন—টেলিফোনে কে কি বলিতে চায়। সে বেচারার সময় নষ্ট করিও না।"

ব্লেকের পাচিকা মিসেস্ বার্ডেল অনেক পূর্ব্বেই শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল; ব্লেক ও স্মিথ উভয়েই যখন শয়ন-কক্ষে গমনোদ্যত, সেই সময় টেলিফোন ঝন্-ঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠিল, সুতরাং তাহা শুনিয়া তাঁহাদের আর শয়ন করিতে যাওয়া হইল না।

স্মিথ টেলিফোনের রিসিভার কানে তুলিয়া-ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে মহাশয়?—কি বলিলেন? আপনি লর্ড ব্ল্যাক্‌উড? আপনার ঘরে চুরি হইয়াছে? দয়া করিয়া এক মিনিট অপেক্ষা করুন।"

স্মিথ রিসিভারটা বুকের কাছে ধরিয়া ব্লেকের দিকে চাহিয়া বলিল, "কর্ত্তা, লর্ড ব্ল্যাক্‌উড অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে আপনাকে ডাকিতেছেন। তাঁহার বর্জ্জিয়া না কি জিনিস চুরি গিয়াছে বলিলেন—বুঝিতে পারিলাম না! আমি তাঁহাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়াছি।"

ব্লেক বলিলেন, "লর্ড ব্ল্যাক্‌উড আমাকে ডাকিতেছেন? এই অসময়ে? আমি জানি, তিনি মূল্যবান্ ও দুর্লভ বহু-পুরাতন শিল্প-দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে ভালবাসেন; তাঁহার ঐ রকম কোন জিনিস হঠাৎ চুরি গিয়া থাকিবে। শুনি ব্যাপার কি, রিসিভারটা আমার হাতে দাও।"

ব্লেক টেলিফোনের নিকট উপস্থিত হইয়া রিসিভারটা হাতে লইলেন; তাহার পর বলিলেন, "আমি ব্লেক কথা বলিতেছি; আপনার কি বলিবার আছে বলুন—শুনিতেছি।"

লর্ড ব্ল্যাক্‌উড উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, ওঃ, মিঃ ব্লেক! এই অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করিতে হইল, এ জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি দয়া করিয়া শীঘ্র এখানে আসিবেন? আমার বাড়ীতে চুরি হইয়া গিয়াছে। —হাঁ, ভয়ানক চুরি!"

ব্লেক বলিলেন, "ওখানে আমার যাওয়ার যদি নিতান্তই প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে যাইতেই হইবে। কিন্তু আমার মনে হয়, তাহার পূর্ব্বে আপনি যদি পুলিশকে—"

লর্ড ব্ল্যাক্‌উড তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "আপনি পুলিশকে সংবাদ দেওয়ার কথা বলিতেছেন? আমি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে টেলিফোনে সংবাদ দিয়াছি; কিন্তু আমার ইচ্ছা, আপনিও এখানে আসুন। পুলিশকে আমার অবিশ্বাস নাই; কিন্তু এ বিষয়ে যাঁহার অভিজ্ঞতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, আমি তাঁহারও সাহায্য চাই। আপনার শক্তির উপর আমি নির্ভর করিতে পারি।"

ব্লেক বলিলেন, "উত্তম; আমি কুড়ি মিনিটের মধ্যেই

আপনার নিকট উপস্থিত হইতেছি! আপনার ঠিকানা তো—গ্লোন স্কোয়ারের হলষ্টেড্ টেরেস?"

উত্তর হইল, "সহস্র ধন্যবাদ, মিঃ ব্লেক!"

ব্লেক রিসিভার যথাস্থানে রাখিয়া স্মিথের মুখের দিকে চাহিতেই স্মিথ অদ্ভুত মুখভঙ্গি করিয়া বলিল, "ঘুম কামাই করিয়া এই অসময়ে তাহা হইলে আপনাকে যাইতেই হইবে? বড় লোকের অনুরোধ—অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই ত।"

ব্লেক বলিলেন, "কি করিয়া উঁহার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করি বল? চুরি-ডাকাতি সম্বন্ধে যাঁহার অভিজ্ঞতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, উনি তাঁহারই সাহায্যপ্রার্থী।"

স্মিথ গম্ভীর হইয়া বলিল, "কর্ত্তা, আমার কথার দোষ ধরিবেন না, কিন্তু এ কথায় আপনার আত্মম্ভারিতারই পরিচয় পাওয়া গেল!"

ব্লেক বলিলেন, "ওটা লর্ড ব্ল্যাক্‌উডেরই কথা, আমার কথা নয়। উঁহার ও-কথার পর আমি কি করিয়া এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করি?"

স্মিথ মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমি কিন্তু পূর্ব্বে কোন দিনও আপনাকে তোষামোদের বশীভূত হইতে দেখি নাই কর্ত্তা! সুতরাং এই অসময়ে আমাদিগকে লর্ড ব্ল্যাক্‌উডের ভবনে উপস্থিত হইয়া স্থানে ও অস্থানে সেই দুর্লভ দ্রব্যের সন্ধানে হয়রাণ হইতেই হইবে। খুঁজিতে খুঁজিতে তাহা হয় ত তাঁহার কোন সোফার নীচে পাওয়া যাইবে। বড় লোকদের কাণ্ড-কারখানাই ঐ রকম!"

ব্লেক বলিলেন, "বাজে কথা রাখিয়া এখন ভদ্রলোকের মত পোষাক করিয়া লও; তাহার পর বাহিরে গিয়া একখানি ট্যাক্সি ডাকিয়া আন, আর বিলম্ব করিলে চলিবে না।"

স্মিথ বলিল, "টাইগারকেও সঙ্গে লইবেন না?"

ব্লেকের প্রিয় ব্লড্‌হাউণ্ড টাইগার তখন দ্বার-প্রান্তে র‍্যাগের উপর দীর্ঘ দেহ প্রসারিত করিয়া সুপ্তিমগ্ন; কিন্তু তাহার পায়ের থাবা ও মুখের দিকে চাহিয়া ব্লেকের মনে হইল—টাইগার স্বপ্নঘোরে শিকারে বাহির হইয়া, অরণ্যে বাঘ দেখিয়া তাহাকে তাড়া করিয়াছিল! তাহার মুখভঙ্গি সেইরূপই ভীষণ দেখাইতেছিল!

ব্লেক বলিলেন, "টাইগার সেখানে গিয়া আমাদের কোন সাহায্য করিতে পারিবে না; তবে আর ও-বেচারাকে কষ্ট দিয়া লাভ কি? ও বেশ আরামে ঘুমাইতেছে, উহার ঘুম ভাঙ্গাইবার প্রয়োজন নাই।"

অতঃপর ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া যথাসময়ে হলষ্টেড্ টেরেসে লর্ড ব্ল্যাক্‌উডের বাসভবনে উপস্থিত হইলেন। ট্যাক্সি থামিলে তাহা হইতে তাঁহারা নামিবার পূর্ব্বেই অদূরে একটি লোককে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন; তিনি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের চীফ্-ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড।

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডের সহিত ব্লেকের বন্ধুত্ব ছিল। লেনার্ড তাঁহাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "তুমিও আসিয়া জুটিয়াছ দেখিতেছি! আমি অনেক আগেই আসিতে পারিতাম; কিন্তু এই গভীর নিশীথে আমাদের ট্যাক্সি জুটাইবার সুবিধা নাই; সুতরাং হাঁটিয়াই এই লম্বা পথ পাড়ি দিতে হইল।"

ব্লেক তাঁহার করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন, "লর্ড ব্ল্যাক্‌উডকে আপ্যায়িত করিবার জন্যই আমাকে আসিতে হইল। তুমি আসিয়াছ দেখিয়া খুসী হইলাম লেনার্ড! সাধারণ চুরি; সুতরাং কেসটা তেমন জটিল বলিয়া মনে হয় নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম, পুলিশের কোন বিভাগীয় ইন্‌স্পেক্টর তদন্তে আসিলেই যথেষ্ট হইবে। এই তুচ্ছ ব্যাপারের তদন্তে তোমাকে আসিতে হইবে, ইহা ভাবিতে পারি নাই।"

লেনার্ড বলিলেন, "আমি আফিসেই ছিলাম; লর্ড ব্ল্যাক্‌উড এতই অধীরতা প্রকাশ করিলেন যে, আমি তাঁহার অনুরোধ এড়াইতে পারিলাম না। অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত আফিসে বসিয়া কাজ করিবার শাস্তিই এই রকম! কোন্ দিক হইতে কি ঝঞ্ঝাট্ ঘাড়ে আসিয়া পড়ে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। পাঁচ ঘণ্টা ধরিয়া বাড়ী যাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম, তাহার পর বাড়ী গিয়া বিশ্রাম করিবার আশা ত্যাগ করিয়া এখানে হাজিরা দিতে হইল! পুলিশের চাকরী কি না।"

ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "তবু লোকে হিংসা করিয়া বলে—চাকরী ত দারগাগিরি, সকল চাকরীর সেরা!"

তাঁহারা গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রকাণ্ড হলের ভিতর লর্ড ব্ল্যাক্‌উডের সাক্ষাৎ পাইলেন। তিনি তখন এক জন

কনষ্টেবলের সহিত আলাপ করিতেছিলেন। সেই কক্ষে কয়েক জন ভদ্রলোক ও মহিলাকে চিন্তিত ভাবে ঘুরিয়া-বেড়াইতে দেখা গেল। কাহারও মনে শান্তি ছিল না। লর্ড ব্ল্যাক্উড ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার কোষাগারে প্রবেশ করিলেন।

চলিতে চলিতে তিনি ব্লেককে বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, আপনি দয়া করিয়া এই অসময়েও আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন, এজন্য আমি অত্যন্ত বাধিত হইলাম; আমার আশা হইয়াছে—এখন চুরির একটা কিনারা হইবে।"

চীফ্-ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "আমারও ধন্যবাদ মহাশয়!"—তাঁহার কণ্ঠস্বরে শ্লেষের আমেজ ছিল।

লর্ড ব্ল্যাক্উড তাঁহার শ্লেষপূর্ণ মন্তব্যের কারণ বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ লজ্জিত ভাবে তাড়াতাড়ি বলিলেন, "আমার ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না, ইন্‌স্পেক্টর! আমার অনুরোধে, কর্ত্তব্যবোধেই স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে কেহ আসিবেন জানিতাম; কিন্তু আপনার ন্যায় বহুদর্শী যোগ্য কর্ম্মচারী আসিবেন, এরূপ আশা করি নাই। আপনি আসিয়াছেন দেখিয়া যে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি—সে কথা প্রকাশ করাই বাহুল্য।"

লেনার্ড বলিলেন, "আপনার ক্ষতির পরিমাণ কত?"

লর্ড ব্ল্যাক্উড বলিলেন, "দেখুন, চুরিটা বিস্ময়কর! কারণ, আমার ধনাগার হইতে একটি মাত্র দ্রব্য চুরি গিয়াছে; উহা একটি বিচিত্র, বহু-পুরাতন স্বর্ণমঞ্জুষা, এবং উহা বর্জ্জিয়াসের সম্পত্তি ছিল। নর্ব্বির নিলাম-ঘরে আজই আমি তাহা নিলামে ক্রয় করিয়াছিলাম।"

লেনার্ড বলিলেন, "কি মূল্যে উহা কিনিয়াছিলেন?"

লর্ড ব্ল্যাক্উড বলিলেন, "জিনিসটি বেশ সুলভেই পাইয়াছিলাম; উহার মূল্য বাবদ আমাকে মাত্র পাঁচ হাজার গিনি দিতে হইয়াছিল।"

লেনার্ড বলিলেন, "হুম্! আপনার পক্ষে উহা অল্প টাকা হইলেও অনেকগুলি টাকাই দিতে হইয়াছিল। আপনার ধনাগার হইতে ঐ একটি ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্যই অপহৃত হয় নাই?"

লর্ড ব্ল্যাক্উড বলিলেন, "ঐ একটি দ্রব্য ভিন্ন আর কিছুই অপহৃত হয় নাই; এই জন্যই ত বলিলাম—চুরিটা বিস্ময়জনক, অত্যন্ত অসাধারণ! কারণ, আমার ধনাগারে উহা অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ দ্রব্য বিস্তর ছিল।"

এবার ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "উহা চুরি গিয়াছে—ইহা কখন জানিতে পারিলেন?"

লর্ড ব্ল্যাক্উড বলিলেন, "প্রায় আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে; উহা জানিতে পারিয়াই টেলিফোনে আপনাকে আহ্বান করি। আজ সন্ধ্যাকালে লেডি ব্ল্যাক্উড কয়েক জন অতিথিকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছিলেন। মধ্য-রাত্রে আমি দুই জন ভদ্রলোককে এই কক্ষে আনিয়া, সেই স্বর্ণমঞ্জুষা তাঁহাদিগকে দেখাইবার জন্য বাহির করিতে গিয়া আর তাহা দেখিতে পাইলাম না! তাহার পর জানালার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, জানালার লোহার গরাদেগুলি দুমড়াইয়া বাঁকা করা হইয়াছে। বুঝিলাম, চোর তাহার ফাঁক দিয়া এই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। ইহা দেখিয়া আমি টেলিফোনে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে সংবাদ দিই; তাহার পরই আপনাকে ফোন করি। তাহার পর আমি বীটের পুলিশম্যানকে ডাকাইয়াছিলাম; ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই করি নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "আপনার অনুমতি হইলে এখনই আমরা চারি দিক্ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে চাই।"

লর্ড ব্ল্যাক্উড বলিলেন, "হাঁ, নিশ্চিতই দেখিবেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে একটা কথা আপনাদিগকে জানাইয়া রাখা কর্ত্তব্য মনে করিতেছি। আপনারা কি নাইটব্রীজের পুরাতন দুর্লভ পণ্যবিক্রেতা অস্কার মেট্‌ল্যাণ্ডকে জানেন?"

কথাটা শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন, এবং স্থির বিস্ফারিত নেত্রে ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া অদ্ভুত মুখভঙ্গি করিল!

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "হাঁ, মেট্‌ল্যাণ্ডকে বিলক্ষণ জানি। সত্য কথা বলিতে কি, তাহার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আছে। সম্ভ্রান্ত পণ্যবিক্রেতা বলিয়া লোকটির খ্যাতি আছে; তবে তাহাকে যে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই—এ কথাও বলা যায় না।"

লর্ড ব্ল্যাক্উড উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, "আমিও

তাহাকে সন্দেহ করিবার কারণ পাইয়াছি। এমন কি, আমি বাজি রাখিয়া বলিতে পারি—এই রাস্কেলই আমার কোষাগারে প্রবেশ করিয়া সেই দুর্লভ স্বর্ণমঞ্জুষাটি চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। সে স্বয়ং আসিয়া এই কাজ করিয়াছে, না হয় কোন লোককে অর্থে প্রলুব্ধ করিয়া তাহাকে দিয়া এই কাজ করাইয়াছে। তবে মঞ্জুষাটি যে তাহারই হস্তগত হইয়াছে—এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।"

এ কথা শুনিয়া ইন্স্পেক্টর লেনার্ড মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, মেট্‌ল্যাণ্ড ঐ শ্রেণীর তস্কর নহে। সে অবৈধ কার্য্যে অভ্যস্ত বটে, কিন্তু সে সকল কার্য্য ভিন্ন প্রকার। সে যে নিজে আসিয়া আপনার ধনাগার হইতে ঐ দ্রব্য চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে—ইহা আমি বিশ্বাস করি না; সে এরূপ নির্ব্বোধ নহে।"

ব্লেক লর্ড ব্ল্যাক্‌উডকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেট্‌ল্যাণ্ডই যে আপনার স্বর্ণমঞ্জুষা চুরি করিয়াছে—আপনার এরূপ ধারণার কারণ কি?"

লর্ড ব্ল্যাক্‌উড দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "আমার নিঃসন্দেহ হইবার সঙ্গত কারণ আছে। আজ আমি যখন স্বর্ণমঞ্জুষাটি নিলামে ডাকি, সেই সময় মেট্‌ল্যাণ্ডও সেখানে উপস্থিত ছিল, এবং সে আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়া নিলাম ডাকিতেছিল। আমি তাহাকে নিলামে পরাস্ত করিয়া অধিক টাকায় উহা ডাকিয়া লইলাম; ইহাতে সে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। আজ সন্ধ্যাকালে এই বদ্‌মায়েস টেলিফোনে আমাকে ডাকিয়া ভয়-প্রদর্শন করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই! সে তাহার কোন ধনাঢ্য মক্কেলের জন্য আরও অধিক মূল্যে মঞ্জুষাটি ক্রয় করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে; কিন্তু আমি যে সখের জিনিস কিনিয়াছি, কোন মূল্যেই তাহা হস্তান্তর করিতে সম্মত হই নাই। আমার কথা শুনিয়া সেই রাস্কেলটা অসঙ্কোচে আমাকে বলিল,—ছলে-বলে-কৌশলে যেরূপেই হউক, উহা সে হস্তগত করিবেই। হাঁ, আমাকে সে ঠিক এই কথাই বলিয়াছিল। ইহা তাহারই উক্তি।"

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "বড়ই আশ্চর্য্য ত! সে যে কথা বলিয়া আপনাকে ভয়-প্রদর্শন করিল, সেই কথা অবিলম্বেই কার্য্যে পরিণত করিল? অত্যন্ত অদ্ভুত বটে! অত্যন্ত নির্ব্বোধের কার্য্য। তাহার উহা চুরি করিবার ইচ্ছা থাকিলে, সে কথা সে কি উদ্দেশ্যে আপনার নিকট প্রকাশ করিল, ইহা বুঝিতে পারিতেছি না!"

লেনার্ড এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াই ব্লেকের মুখের দিকে চাহিলেন; কিন্তু কথাটা শুনিয়া ব্লেকের মনের ভাব কিরূপ হইল, লেনার্ড তাঁহার মুখ দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারিলেন না। এমন কি, তিনি ব্লেকের মুখে কৌতূহলেরও কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু ব্লেকের মনে হইল—রোপার ওয়াইল্ড কি এই ব্যাপারের সহিত জড়িত আছে? তাঁহার মন কৌতূহলে পূর্ণ হইলেও তাঁহার মুখের ভাবে তাহা পরিস্ফুট হইল না।

লেনার্ড সেই বাতায়নের দিকে চাহিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "বড়ই দুর্ব্বোধ্য ব্যাপার! এই জানালার গরাদেগুলি কোন যন্ত্রের সাহায্যে ঐ ভাবে বাঁকাইয়া, উহার ফাঁক দিয়া চোর ঘরে ঢুকিয়াছিল সন্দেহ নাই।"

এ কথা শুনিয়া ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তোমার এই অনুমান সত্য না হইতেও পারে। অন্য উপায়েও এই কাজ করা সম্ভব।"

লেনার্ড বলিলেন, "আমি সেরূপ ধারণা করিতে পারিতেছি না। প্রত্যেক কার্য্যেই অত্যন্ত অসতর্কতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ঐ দিকের পদচিহ্নগুলি লক্ষ্য করিয়াছ?—লাল সুরকীর উপর জুতার দাগগুলি?"

ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, তাহা পূর্ব্বেই উহা দেখিয়াছি; তদ্ভিন্ন আর একটি জিনিস দেখিয়াছ লেনার্ড?"

ব্লেক বাতায়নের ছিট্‌কিনি হইতে জামার একটা ফালি টানিয়া বাহির করিলেন। উহা কোন জ্যাকেটের আস্তিনের অংশ—চোরের পলায়ন-কালে খোঁচে বাধিয়া ছিঁড়িয়া ছিট্‌কিনিতে আট্‌কাইয়াছিল।

লেনার্ড ব্লেকের হাত হইতে সাগ্রহে তাহা গ্রহণ করিলেন; তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "এই সূত্র আমাদের কাজে লাগিতে পারে।"

ব্লেক সেই কক্ষের চারি দিক্ ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার মুখে মনের ভাব প্রকাশিত হইল না। সিন্দুকের পায়ার নিকট একখণ্ড কাগজ দেখিয়া তিনি তাহা কুড়াইয়া লইলেন। কাগজখানি দলা পাকাইয়া

পড়িয়া ছিল। কাগজখানি দিয়া সিন্দুকের হাতলটি চাপিয়া ধরা হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা গেল। ব্লেক তাহার একপ্রান্ত সতর্ক ভাবে দুই আঙ্গুলে চাপিয়া ধরিলেন; তাহার পর লেনার্ডকে বলিলেন, "এই কাগজখানি কি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিতে পার?"

লেনার্ড বলিলেন, "তুমি কি উহা সিন্দুকের পায়ার নিকট হইতে কুড়াইয়া লইয়াছ? আমি বুঝিতে পারিতেছি, সেই নির্ব্বোধটা ইহা দ্বারা সিন্দুকের হাতলটা চাপিয়া ধরিয়াছিল; কারণ, তাহার আশঙ্কা হইয়াছিল—আঙ্গুল দিয়া সিন্দুকের হাতল চাপিয়া-ধরিলে হাতলে তাহার অঙ্গুলি-চিহ্ন আবিষ্কৃত হইতে পারে। কিন্তু এই কাগজেও যে তাহার অঙ্গুলিচিহ্ন পাওয়া যাইতে পারে—নির্ব্বোধটা তাহা বুঝিতে পারে নাই! আনাড়ি চোর!"

ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, ঠিক ঐ কথা আমারও মনে হইতেছিল। কিন্তু ইহা সতর্কতার অভিনয়, না আর কিছু?"

ব্লেক পকেট হইতে একটি ক্ষুদ্র কৌটা বাহির করিলেন, এবং তাহা হইতে কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম গুঁড়া তুলিয়া-লইয়া সেই কাগজখানির উপর ছড়াইয়া দিলেন। দুই-তিন মিনিট পরে সেই গুঁড়া ফুৎকারে উড়াইয়া দিলে কাগজের উপর কয়েকটি অঙ্গুলির চিহ্ন সুপরিস্ফুট হইল।

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড এবার সেই কাগজখানি তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিয়া উৎসাহভরে বলিলেন, "চমৎকার! অতি পরিপাটি!"

ব্লেক কাগজখানি তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন, "এই কাগজে তুমি নিখুঁত অঙ্গুলি-চিহ্ন পাইলে; প্রত্যেক চিহ্নই পরিষ্কার উঠিয়াছে। কিন্তু ইহা তোমার কোন কাজে লাগিবে কি না, তাহা বলিতে পারি না। এই কাগজে যাহার অঙ্গুলি-চিহ্ন উঠিয়াছে, তাহার হাতের অঙ্গুলি-চিহ্ন যদি পূর্ব্বে সংগৃহীত হইয়া থাকে, তাহা হইলেই এগুলি কাজে লাগিবে, নতুবা ইহাদের কোন মূল্য নাই।"

স্মিথ ব্লেকের কথা শুনিয়া বলিল, "কিন্তু মেট্‌ল্যাণ্ডের অঙ্গুলি-চিহ্ন পুলিশ-আফিসের দপ্তরে আছে বলিয়াই মনে হয়।"

লেনার্ড বলিলেন, "স্মিথ সত্য কথাই বলিয়াছে। মেট্‌ল্যাণ্ডের গতিবিধির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আছে—ইহার কারণ কি তুমি জান না ব্লেক! কোন ভদ্রলোককে ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে শোষণ করায় উহার তিন বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছিল; সেই সময় আমরা উহার ফটো, অঙ্গুলি-চিহ্ন প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। মেট্‌ল্যাণ্ড তাহা জানে বলিয়াই সিন্দুকের হাতলে অঙ্গুলি-স্পর্শ করা বিপজ্জনক বলিয়া মনে করিয়াছিল; এই জন্যই সে হাতলটিতে কাগজ জড়াইয়া উহা টানিয়া সিন্দুক খুলিয়াছিল। সুতরাং হাতলে অঙ্গুলি-চিহ্ন না থাকিলেও এই কাগজে আমরা অঙ্গুলি-চিহ্ন পাইলাম।"

ব্লেক বলিলেন, "তাহা হইলে তুমি মেট্‌ল্যাণ্ডকেই চোর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছ?"

লেনার্ড বলিলেন, "অন্য কোন অপরাধীর অভাবে মেট্‌ল্যাণ্ডকেই চোর বলিয়া সিদ্ধান্ত করা ভিন্ন উপায় কি? মেট্‌ল্যাণ্ডের আর যে দোষই থাক, পরের ঘরে ঢুকিয়া চুরি করিতে সে অভ্যস্ত নহে বলিয়াই আমার ধারণা ছিল; কিন্তু এই চুরি কোন আনাড়ী চোরের কাজ; পাকা চোর চুরি করিতে আসিয়া এই সকল সুস্পষ্ট প্রমাণ কখন রাখিয়া যাইত না। বিশেষতঃ, আমরা জানিতে পারিয়াছি, অপহৃত মঞ্জুষার প্রতি মেট্‌ল্যাণ্ডের অসাধারণ লোভ ছিল, এবং উহা যে-কোন উপায়ে সে হস্তগত করিবে—এ কথাও ব্ল্যাক্‌উডের নিকট স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিল। সুতরাং মেট্‌ল্যাণ্ডকে চোর বলিয়া সন্দেহ করা অযৌক্তিক নহে। দুই আর দুই যোগ করিলে চার হয়, তাহার কমও হয় না, বেশীও হয় না।"

ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, দুই আর দুই যোগ করিয়া চার হয়, এ কথা সত্য; কিন্তু চার এই সংখ্যাটিই ঠিক কি না, আমার সন্দেহ আছে। যদি 'দুই' এই সংখ্যার সহিত তোমার অজ্ঞাতসারে আর একটি সংখ্যা যোগ করা হয়—তাহা হইলে যোগফল চার হইবে কি? যাহা হউক, তুমি তোমার সিদ্ধান্তের অনুসরণ কর; আমি নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে এই রহস্যভেদের চেষ্টা করিব।"

লেনার্ড বলিলেন, "অপহৃত মঞ্জুষাটিই এই রহস্যের চাবি (key to the mystery) বলিলে অত্যুক্তি হয় না।"

অতঃপর তিনি লর্ড ব্ল্যাক্‌উডকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "স্বর্ণ-মঞ্জুষাটির যদি কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তাহা আমি জানিতে চাই।"

লর্ড ব্ল্যাক্‌উড বলিলেন, "না, উহার কোন বৈশিষ্ট্যই নাই, উহা কারুকার্য্যখচিত সাধারণ মঞ্জুষা মাত্র; তবে নিলামে আমি পাচ হাজার গিনি দর চড়াইয়া উহা ক্রয় করিয়াছিলাম,—ইহার কারণ, উহা বিখ্যাত বর্জ্জিয়া-বংশের সম্পত্তি, সুতরাং উহার ঐতিহাসিক মূল্য উপেক্ষার যোগ্য নহে।"

অনন্তর তিনি ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডের নিকট স্বর্ণ-মঞ্জুষার আকারাদির বর্ণনা করিলেন।

লেনার্ড সকল কথা শুনিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "হুম্! উহা সাধারণ মঞ্জুষাই বটে; তবে উহার ভিতর কোন গুপ্ত প্রকোষ্ঠ থাকা অসম্ভব নহে। যদি সেখানে কোন মহামূল্য দ্রব্য সঞ্চিত থাকে, তাহা আবিষ্কৃত হইলে আমি বিস্মিত হইব না। যাহাই হউক, উহা হস্তগত করিবার জন্য মেট্‌ল্যাণ্ডের উৎকট লোভ হইয়াছিল, ইহার কোন কারণ আছেই। সম্ভবতঃ, সেই কারণটি তাহার অজ্ঞাত নহে। মেট্‌ল্যাণ্ড আপনার নিকট হইতে উহা ক্রয় করিবার জন্য দশ হাজার গিনি মূল্য প্রদান করিতেও সম্মত হইয়াছিল—বলিলেন না? কিন্তু তাহাতেও উহা বিক্রয় করিতে যখন আপনি অসম্মত হইলেন, তখনই সে উহা ছলে-বলে বা কৌশলে আত্মসাৎ করিবে বলিয়া আপনাকে ভয় দেখাইয়াছিল। ইহা অপেক্ষা তাহার সুস্পষ্ট অভিসন্ধি আর কি হইতে পারে?"

লেনার্ড অতঃপর সেই কক্ষে ঘুরিয়া অন্যান্য সামগ্রী পরীক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি তৎপূর্ব্বেই এক জন কন্‌ষ্টেবলকে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের আফিসে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি ব্লেককে বলিলেন, "অঙ্গুলি-চিহ্ন সম্বন্ধে অকাট্য সংবাদ আর এক ঘণ্টার মধ্যেই পাওয়া যাইবে। অস্‌কার মেট্‌ল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত মামলার নথিতে তাহার যে অঙ্গুলি-চিহ্ন সংরক্ষিত হইয়াছে, কাগজের অঙ্গুলি-চিহ্ন তাহার সহিত মিলাইয়া-দেখিতে অধিক বিলম্ব হইবে না।"

ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডের কথা শুনিয়া বলিলেন, "আমি এই স্থান ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তোমাকে একটা উপদেশ দিয়া যাই; তুমি রহস্যভেদ করিতে না পারিলে অনেক সময় আমার উপদেশ গ্রহণ কর, সুতরাং আশা করি, আমার পরামর্শ অগ্রাহ্য করিবে না। মেট্‌ল্যাণ্ড দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন শিল্পদ্রব্যের বিক্রেতা; সে যদি লর্ড ব্ল্যাক্‌উডের কোষাগারে প্রবেশ করিত, তাহা হইলে এই কোষাগারে বর্জ্জিয়া-রত্নমঞ্জুষা অপেক্ষা যে সকল বহুগুণ অধিক মূল্যের দুর্লভ প্রাচীন শিল্পসম্ভার সঞ্চিত আছে, তাহা সে দেখিলেই তাহাদের মূল্য বুঝিতে পারিত, এবং সেগুলি উপেক্ষা করিয়া সে কখনই বর্জ্জিয়া-রত্নমঞ্জুষা চুরি করিত না। সুতরাং তাহার হাতের অঙ্গুলি-চিহ্ন সনাক্ত হউক বা না হউক, এ ক্ষেত্রে তাহার কোন মূল্য আছে বলিয়া আমার মনে হয় না।"

লেনার্ড বলিলেন, "সেই স্বর্ণ-মঞ্জুষার গুপ্ত-প্রকোষ্ঠে এমন কোন মহামূল্য দ্রব্য সঞ্চিত থাকিতে পারে—যাহার সম্বন্ধে তোমার বা আমার কোন ধারণা না থাকিলেও তাহা সম্ভবতঃ মেট্‌ল্যাণ্ডের অজ্ঞাত নহে, এবং এই জন্যই সে অন্যান্য বহুমূল্য দ্রব্য উপেক্ষা করিয়াছে, এরূপ অনুমান করা কি অসঙ্গত?"

ব্লেক বলিলেন, "ও-কথা আমি বিশ্বাস করি না। ঐ স্বর্ণ-মঞ্জুষা সুবিখ্যাত বর্জ্জিয়া-পরিবারের সম্পত্তি বলিয়াই তাহাতে গুপ্ত-প্রকোষ্ঠ থাকিবে, ও তাহাতে বহুমূল্য রত্ন বা আর কিছু সঞ্চিত থাকিবে, এরূপ তুমি আশা করিতে পার না। বস্তুতঃ, মেট্‌ল্যাণ্ড উহা চুরি করিয়াছে, এ কথাই আমি বিশ্বাস করি না।"

লেনার্ড বলিলেন, "তুমি কি বলিতে চাও—এই চুরির ভিতর কোন জটিল রহস্য আছে?"

ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, আমি সেইরূপই মনে করি। মেট্‌ল্যাণ্ডকে অভিযুক্ত করিয়া সেই রহস্যভেদের সম্ভাবনা নাই।"

লেনার্ড গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কিন্তু ইহা তোমার অনুমান মাত্র; তোমার অনুমান অনুসারে তুমি কাজ করিতে পার, কারণ, লর্ড ব্ল্যাক্‌উড তাঁহার অপহৃত মঞ্জুষা উদ্ধারের আশায় তোমাকেও নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু আমি যে প্রমাণ পাইব, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া কাজ করিব;—আমার বিশ্বাস, তাহাতে আমাকে ঠকিতে হইবে না।"

ব্লেক নীরস স্বরে বলিলেন, "হাঁ, প্রমাণের উপর নির্ভর করাই উচিত বটে; কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমি যে প্রমাণ পাইয়াছি, সে সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা নাই।"

লেনার্ড বলিলেন, "সত্যই তুমি অন্য কোন অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছ ? সে কিরূপ প্রমাণ ? কাহার বিরুদ্ধে ?"

ব্লেক ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "দেখ লেনার্ড, আমাদের উভয়েরই চক্ষু আছে, তুমি তোমার দৃষ্টি-শক্তির অনুসরণ কর, এবং তাহার কি ফল হয়, তাহা লক্ষ্য কর। আমার আর কিছুই বলিবার নাই।"

অতঃপর ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া অন্য দিকে গমন করিলে স্মিথ চারি দিকে চাহিয়া অন্য কোন লোক নিকটে নাই দেখিয়া ব্লেককে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি কর্ত্তা! এখানে চুরির তদন্ত করিয়া আপনার কিরূপ ধারণা হইয়াছে ?"

ব্লেক বলিলেন, "প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা এখনও আমি জানিতে পারি নাই। লর্ড ব্ল্যাক্‌উডের যে বাতায়নের গরাদেগুলি বাঁকাইয়া চোর তাঁহার কোষাগারে প্রবেশ করিয়াছিল, আমি সেই বাতায়নের কথা চিন্তা করিতেছি। এই প্রসঙ্গে অস্‌কার মেট্‌ল্যাণ্ড, সার রডনে ড্রমণ্ড, এবং আরও এক জনের কথা আমি মনে মনে আলোচনা করিতেছি।"

স্মিথ বলিল, "আরও এক জন ? কে সে কর্ত্তা ?"

ব্লেক বলিলেন, "তুমি বুঝিতে পার নাই ? আমি ওয়াইল্ডের কথা বলিতেছি।"

স্মিথ সবিস্ময়ে বলিল, "আপনি কি তবে মনে করেন—"

ব্লেক তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "জানালার গরাদেগুলির অবস্থা দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিয়াছি—কেবল ওয়াইল্ডই হাতের জোরে ঐ সকল স্থূল লোহার গরাদে চৌকাঠের ছিদ্র হইতে টানিয়া-তুলিয়া ঐ ভাবে বাঁকাইতে পারে। আমি এ কথা বলিতেছি না যে, ওয়াইল্ডই এই কাজ করিয়াছে; কিন্তু আমি তাহাকেই সন্দেহ করিতেছি।"

স্মিথ বলিল, "ওয়াইল্ডই যদি এই কাজ করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা শীঘ্রই তাহা জানিতে পারিব। ঐ অঙ্গুলি-চিহ্নগুলি ওয়াইল্ডের অঙ্গুলি-চিহ্ন হইলে আমাদের সন্দেহের কোন কারণ থাকিবে না। কিন্তু ব্যাপারটা দুর্ব্বোধ্য ! ওয়াইল্ড মেট্‌ল্যাণ্ডকে মুঠায় পুরিবার চেষ্টা করিতেছে—এইরূপই কি আপনার ধারণা নহে ?"

ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "তাহাকে মুঠায় পুরিবার চেষ্টা করিতেছে কি ? ওয়াইল্ড তাহাকে মুঠায় পুরিয়াছে।"

এই সময় ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড দ্বার-প্রান্তে এক জন কন্‌ষ্টেবলের সহিত আলাপ করিতেছিলেন; সে অল্পকাল পূর্ব্বে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের আফিস হইতে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল।

লেনার্ড কয়েক মিনিট পরেই ব্লেকের নিকট উপস্থিত হইলেন; আনন্দে উৎসাহে তাঁহার চক্ষু প্রদীপ্ত। তিনি ব্লেককে বলিলেন, "এখন তুমি কি বলিবে ব্লেক ! আমাদের আফিসের দপ্তরে মেট্‌ল্যাণ্ডের যে অঙ্গুলি-চিহ্ন আছে, তাহার সহিত কাগজের অঙ্গুলি-চিহ্নগুলি ঠিক মিলিয়া গিয়াছে! এগুলি মেটল্যাণ্ডেরই অঙ্গুলি-চিহ্ন—ইহা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইয়াছে।"

ব্লেক বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া বলিলেন, "এবার তাহা হইলে মেট্‌ল্যাণ্ডকে গ্রেপ্তার করিবার সুযোগ ত্যাগ করিবে না ?"

লেনার্ড সোৎসাহে বলিলেন, "আমি যাহা বলিয়াছিলাম; তাহা ঠিক হইল ত ? আমি এখন সোজা নাইট-ব্রীজে মেট্‌ল্যাণ্ডের বাড়ীতে উপস্থিত হইব। তুমি আমার সঙ্গে যাইবে কি ?"

ব্লেক বলিলেন, "আমার অভিমত তুমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছ। তোমার সঙ্গে আমার যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। ব্যাপারটা যখন এত সহজ বলিয়াই তোমার মনে হইয়াছে, তখন বাকি কাজ তুমিই শেষ কর; উহা হইতে আমি দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করি।"

লর্ড ব্ল্যাক্‌উড উৎফুল্ল ভাবে বলিলেন, "কিন্তু মিঃ ব্লেক, আপনি আমার জন্য যে পরিশ্রম করিয়াছেন, সে জন্য আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ; তবে—"

ব্লেক তাঁহার কথায় বাধা দিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, আমি আপনার কোনই উপকার করি নাই; এ জন্য যদি কাহারও প্রশংসা করিতে হয়, তাহা হইলে সে প্রশংসা লেনার্ডেরই প্রাপ্য, এবং আপনিও বোধ হয় এ কথা অস্বীকার করিবেন না।"

অতঃপর ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া বেকার ষ্ট্রীটে যাত্রা করিলেন।

পথে আসিয়া স্মিথ ব্লেককে বলিল, "ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড

যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ঠিক কর্ত্তা! অঙ্গুলি-চিহ্ন-গুলি যে মেট্‌ল্যাণ্ডের, ইহা ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মেট্‌ল্যাণ্ড সত্যই লর্ড ব্ল্যাক্‌উডের কোষাগারে প্রবেশ করিয়া—"

ব্লেক স্মিথকে কথা শেষ করিতে না দিয়া বলিলেন, "যদি সিন্দুকের হাতলের উপর ঐ সকল অঙ্গুলি-চিহ্ন থাকিত, তাহা হইলে আমাকে স্বীকার করিতে হইত, মেট্‌ল্যাণ্ড সত্যই লর্ড ব্ল্যাক্‌উডের ধনাগারে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু অঙ্গুলি-চিহ্নগুলি একখানা খোলা কাগজের উপর পাওয়া গিয়াছে—এ কথা ভুলিলে চলিবে না স্মিথ! বস্তুতঃ, লেনার্ড এত অল্পে সন্তুষ্ট হইবে, ইহা পূর্ব্বে ধারণা করিতে পারি নাই। যে কোন লোক মেট্‌ল্যাণ্ডের অঙ্গুলি-চিহ্নসংযুক্ত কাগজখানি ঐ কক্ষে লইয়া আসিতে পারিত।"

স্মিথ বিস্মিত ভাবে বলিল, "আপনার এ কথা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু এ কথা পূর্ব্বে আমার মনে হয় নাই।"

ব্লেক বলিলেন, "লেনার্ড ভুল-পথে চলিয়াছে; কিন্তু পরে সে তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিবে। মেট্‌ল্যাণ্ডের অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায়—তাহা আমরা শীঘ্রই জানিতে পারিব।"

ষোড়শ তরঙ্গ

মেট্‌ল্যাণ্ডের বিপদ

অস্কার মেট্‌ল্যাণ্ড টেলিফোনের রিসিভারে মুখ রাখিয়া অধীর স্বরে বলিল, "হাঁ, এই মুহূর্ত্তেই তোমাকে আসিতে হইবে।"

উত্তর হইল, "ক্ষেপিয়াছ? রাত্রি এখন যে একটা!"

"রাত্রি যতই হোক, তুমি এস; আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিও না।"

"না মেট্‌ল্যাণ্ড, এখন আমি শুইয়া আছি, ঘুম আসিতেছে; এখন আমার যাওয়া অসম্ভব।"

মেট্‌ল্যাণ্ড অধিকতর ব্যগ্র ভাবে বলিল, "তা হোক্, কার্ণ! তোমাকে এখনই আসিতে হইবে। রোর্কিকেও আসিতে অনুরোধ করিয়াছি। সে বলিয়াছে—কুড়ি মিনিটের মধ্যেই এখানে আসিয়া পড়িবে। তুমি চেষ্টা করিলে তাহার আগেই এখানে পৌঁছিতে পারিবে। তুমি আর বিলম্ব করিও না।"

কার্ণ বিরক্তিভরে বলিল, "এই অসময়ে কষ্ট না দিয়া ছাড়িবে না দেখিতেছি! বেশ, পোষাকটা বদলাইয়া-লইয়া যাইতেছি; বেশী দেরী হইবে না। কি এমন জরুরী দরকার, তাহা ত খুলিয়া বলিলে না। টেলিফোনে বলা যায় না—এমন সাংঘাতিক কথা!"

মেট্‌ল্যাণ্ড আর কোন কথা না বলিয়া রিসিভার রাখিয়া দিল; তাহার পর সেই কক্ষে অধীর ভাবে পাদচারণা করিতে লাগিল। তাহার উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না। তাহার বন্ধু হুবার্ট রোর্কি মায়ডাভেল নামক পল্লীতে বাস করিত, এজন্য মেট্‌ল্যাণ্ডের বাড়ীতে তাহার আসিতে অধিক বিলম্ব হইল না। সাইমন কার্ণ কিছু অধিক দূরে উইম্বলডন কমনে বাস করিত বটে, কিন্তু সেই দিন সে তাহার পার্ক লেনের ফ্ল্যাটে থাকায় তাহারও শীঘ্র আসাই সম্ভব হইল।

কার্ণ, রোর্কি এবং মেট্‌ল্যাণ্ড একত্র পরামর্শ করিত। তাহারা বিভিন্ন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিলেও লোকের সর্ব্বনাশ সাধনের সময় একযোগে কার্য্য করিত। গুপ্তকথা প্রকাশের ভয়-প্রদর্শন করিয়া ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের অর্থ-শোষণই তাহাদের প্রধান উপজীবিকা। সার রডুনের প্রতি উৎপীড়নের অভিযোগে তাহাদের প্রত্যেকে তিন বৎসরের জন্য কারাগারে প্রেরিত হইয়াছিল। কারাগার হইতে প্রত্যাগমনের পর তাহারা সতর্ক হইয়াছিল, এবং অর্থবলে ভদ্রসমাজে মিশিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয় নাই। তাহারা সার রডুনে ড্রুমণ্ডের নিকট হইতে যে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিল, সেই অর্থবলে তাহারা ধনাঢ্য বলিয়া সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

প্রতারণা, প্রবঞ্চনার সাহায্যে অর্থোপার্জ্জন করে—লণ্ডনে এরূপ লোকের সংখ্যা অল্প নহে; কিন্তু এই বিদ্যায় তাহাদের তিন বন্ধুর সমকক্ষ লোক সমগ্র ইংলণ্ডে আর এক জনও ছিল না।

মেট্‌ল্যাণ্ডের দুশ্চিন্তার যথেষ্ট কারণ ছিল। সে ঘটনাক্রমে জানিতে পারে, তাহার হাতের ঘড়ি পঁয়তাল্লিশ মিনিট 'স্লো' হইয়াছিল। তাহার এই ঘড়ি ক্রনোমিটার;

তাহা সে একশত গিনি মূল্যে ক্রয় করিয়াছিল, এবং তাহাতে কখন এক সেকেণ্ডও সময়েরও তফাৎ হইত না। সেই ঘড়ি হঠাৎ পঁয়তাল্লিশ মিনিট 'শ্লো' হওয়ায় সে প্রথমে ভাবিল—কোন কারণে তাহার ঘড়িটা বিগড়াইয়া গিয়াছে! কিন্তু তাহার পর সে দেখিতে পাইল, তাহার ক্লকটাও পঁয়তাল্লিশ মিনিট 'শ্লো'! মেট্‌ল্যাণ্ড তাহা খুলিয়া পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিল, কেহ তাহার কাঁটা ঘুরাইয়া রাখিয়াছে।

তাহার স্মরণ হইল—মিঃ ওটিস্ হারকোর্ট তাহার সহিত দেখা করিবার অল্পকাল পরে সে হঠাৎ মোহাচ্ছন্ন হইলে এই কাণ্ড ঘটিয়াছিল। দুই মিনিট মাত্র তাহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়াছিল, এইরূপই তাহার ধারণা হইয়াছিল; কিন্তু তাহার মোহাচ্ছন্ন ভাব কি সত্যই দুই মিনিট মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল?

মেট্‌ল্যাণ্ড পরে বুঝিতে পারিল—যে সময়টি সে দুই মিনিট বলিয়া মনে করিয়াছিল—প্রকৃত পক্ষে তাহা পঁয়তাল্লিশ মিনিট!

কিন্তু এই পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে তাহার ভাগ্যে কি ঘটিয়াছিল? তাহার চেতনা লাভের পর মিঃ ওটিস্ হারকোর্ট তাহার নিকট বিদায়-গ্রহণ করিয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিয়াছিলেন। এই হারকোর্ট কি আসল হারকোর্ট, না কোন প্রতারক হারকোর্ট সাজিয়া তাহাকে প্রতারিত করিতে আসিয়াছিল? সেই ব্যক্তিই কি তাহার অচেতন অবস্থায় ঘড়ি দুইটির কাঁটা ঘুরাইয়া দিয়াছিল? কি উদ্দেশ্যে সে এই কার্য্য করিয়াছিল? পঁয়তাল্লিশ মিনিট তাহার চেতনা ছিল না; এই সুযোগে সেই লোকটি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিল? কে এই রহস্য-ভেদ করিবে?

ইহা দুর্ব্বোধ্য রহস্য বলিয়াই মেট্‌ল্যাণ্ডের ধারণা হইল। তাহার সিন্দুকে হীরক-রত্নাদি অনেক বহুমূল্য দ্রব্য ছিল; তাহা অপহৃত হইয়াছিল কি না, দেখিবার জন্য সে প্রথমেই সিন্দুক খুলিল। সিন্দুকের যে খোপে ঐ সকল দ্রব্য ছিল—তাহা সে পরীক্ষা করিয়া দেখিল—যেখানে যাহা রাখিয়াছিল, তাহার কিছুই অপহৃত হয় নাই। এই জন্য সিন্দুকের যে অংশে তাহার খাতা-পত্র ও দলিলাদি ছিল, সেই অংশ সে স্পর্শ না করিয়া সিন্দুক বন্ধ করিল। হীরা-জহরতাদি মূল্যবান্ দ্রব্যই যখন চুরি যায় নাই, তখন খাতাপত্রগুলি ঠিক আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার কি প্রয়োজন?

সিন্দুক হইতে কোন মূল্যবান্ দ্রব্য অপহৃত হয় নাই, ঘরের কোন দ্রব্যই স্থানান্তরিত হয় নাই; এ অবস্থায় তাহার কি কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া সকল কথা জানাইবার জন্য সে তাহার বন্ধুদ্বয়কে টেলিফোনে আহ্বান করিল। ইতিমধ্যে হঠাৎ একটা কথা তাহার মনে পড়িল। সে তাড়াতাড়ি টেলিফোনের রিসিভার তুলিয়া-লইয়া হাঁকিল, "জেরার্ড ৪৪৩৪৮০!"

ক্ষণকাল পরে সাড়া পাইয়া মেট্‌ল্যাণ্ড বলিল, "কস্‌মো হোটেল? উত্তম। তুমি এই মুহূর্ত্তেই মিঃ ওটিস্ হার-কোর্টকে জানাও—তাঁহার সঙ্গে আমার অর্থাৎ অস্কার মেট্‌ল্যাণ্ডের কথা আছে,—তিনি টেলিফোনটা ধরুন। যদি তিনি ঘুমাইয়া থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহার নিদ্রা-ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে বল, তাঁহার সঙ্গে আমার অত্যন্ত জরুরি কথা আছে, এই মুহূর্ত্তেই শুনিতে হইবে।"

যে কেরাণীর উপর হোটেলের মধ্য-রাত্রির কার্য্যভার ন্যস্ত ছিল, সে বলিল, "কি নাম বলিলেন? মিঃ ওটিস্ হারকোর্ট? একটু অপেক্ষা করুন মহাশয়, আমি ভদ্রলোকটির সন্ধান লই।"

অগত্যা মেট্‌ল্যাণ্ড রিসিভার হাতে লইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল; দুশ্চিন্তায় সে অধীর হইয়া উঠিল।

মিনিট-দুই পরে কেরাণীটি ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কাহার নাম বলিলেন? নামটি আর একবার বলুন মহাশয়!"

মেট্‌ল্যাণ্ড বিরক্তিভরে বলিল, "তাঁহার নাম হার-কোর্ট,—মার্কিণ কোটিপতি ওটিস্ হারকোর্ট। তাঁহার ন্যায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নামও তোমার স্মরণ নাই? আশ্চর্য্য বটে!"

কেরাণী বলিল, "আমাকে দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে, ওটিস্ হারকোর্ট নামক কোন ব্যক্তির নাম আমাদের রেজিষ্ট্রী-বহিতে নাই; আমাদের হোটেলে তিনি থাকেন না। আপনি কি ঠিক জানেন, তিনি কস্‌মো হোটেলেই বাসা লইয়াছেন?"

মেট্‌ল্যাণ্ড চিৎকার করিয়া বলিল, "ওটিস্ হারকোর্ট

তোমাদের হোটেলে থাকেন না? পাগলের মত কথা! তিনি নিশ্চয়ই তোমাদের হোটেলে আছেন; ভাল করিয়া সন্ধান লও।"

কেরাণী ক্ষুণ্নস্বরে বলিল, "আমি সন্ধান লইয়াছি মহাশয়! আপনারই ভুল হইয়াছে। ঐ নামের কোন ব্যক্তি আমাদের হোটেলে নাই, এবং কোন দিন ছিলেনও না। আমার শেষ কথা আপনাকে বলিয়া দিলাম। নমস্কার!"

সে টেলিফোনের রিসিভার নামাইয়া রাখিল।

মেট্ল্যাণ্ড অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সে বুঝিতে পারিল, কেহ তাহাকে প্রতারিত করিয়াছে! যে ব্যক্তি তাহার সঙ্গে আলাপ করিতে আসিয়াছিল, সে ওটিস্ হারকোর্ট নহে, সে কোন প্রতারক, যে কারণেই হউক, তাহাকে প্রতারিত করিতে আসিয়াছিল। কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য কি?

সহসা বাঁ-পায়ের জুতার দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। সে তাহার জুতার গোড়ালীতে লাল সুরকীর সূক্ষ্ম গুঁড়া লিপ্ত দেখিতে পাইল! তাহার পায়ের জুতায় সুরকী আসিল কোথা হইতে? এই জুতা পরিয়া সে তিন দিনের মধ্যে কোন স্থানে বেড়াইতে যায় নাই!

আর একটা উৎকট চিন্তায় সে অধীর হইয়া উঠিল! যে পঁয়তাল্লিশ মিনিট তাহার চেতনা ছিল না—সেই সময় সে কি তাহার ঘর হইতে বাহির হইয়া কোন দূরবর্ত্তী স্থানে গমন করিয়াছিল? কিন্তু অচেতন অবস্থায় এই ভাবে ভ্রমণ করা কিরূপে সম্ভব? সংজ্ঞা নাই, তথাপি সে পথে বাহির হইয়া বেড়াইয়া আসিল? সে এরূপ কোন্ পথে গিয়াছিল, যে পথ সুরকীসমাচ্ছন্ন!

মেট্ল্যাণ্ড পায়ের জুতা খুলিয়া সতর্ক ভাবে পরীক্ষা করিল; জুতার তলাতেও লাল সুরকী লাগিয়া ছিল। গুঁড়া হাতে লইয়া দেখিল—সুরকীই বটে! দুর্ব্বোধ্য রহস্য!

মেট্ল্যাণ্ড এই সকল কথা চিন্তা করিতেছিল, সেই সময় তাহার হিতৈষী সুহৃদদ্বয় সাইমন কার্ণ ও হবার্ট রোর্কি তাহার গৃহে প্রবেশ করিল। পথেই তাহাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহাদের মেজাজ তখন ভাল ছিল না।

তাহাদিগকে দেখিয়া মেট্ল্যাণ্ড হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "এসো ভাই, এসো! আজ রাত্রে একটা বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছে! তোমরা রহস্যভেদ করিতে পারিবে, এই আশায় তোমাদিগকে ডাকিয়াছি। আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; আমার মাথার ভিতর সকল চিন্তাই ওলট্-পালট্ হইয়া গিয়াছে! বুদ্ধিচালনা করা আমার অসাধ্য হইয়াছে। দুশ্চিন্তার সমুদ্রে আমি ভাসিয়া বেড়াইতেছি।"

মেট্ল্যাণ্ডকে অত্যন্ত বিচলিত দেখিয়া কার্ণ বলিল, "স্থির হও মেট্ল্যাণ্ড! তোমাকে ত কোন দিন এ রকম উত্তেজিত হইতে দেখি নাই! তোমার এরূপ বিচলিত হইবার কারণ কি? তুমি যে একবারে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছ!"

মেট্ল্যাণ্ড ওটিস্ হারকোর্ট-সংক্রান্ত সকল বিবরণই তাহার বন্ধুদ্বয়ের গোচর করিল, তাহাদের নিকট কোন কথা গোপন করিল না। কার্ণ ও রোর্কি তাহার বর্ণিত কাহিনী শ্রবণ করিল বটে, কিন্তু তাহা বিশ্বাস করিতে পারিল না।

সকল কথা শুনিয়া রোর্কি অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল, "মেট্ল্যাণ্ড, তুমি নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখিয়াছ! পাগলের মত কি কতকগুলা বাজে কথা বলিলে! অকারণ নিজেকে হাস্যাস্পদ করিয়া কি লাভ? কার্ণ, মেট্ল্যাণ্ডের সকল কথাই শুনিলে ত? তোমার কিরূপ ধারণা?"

কার্ণ বলিল, "আমার ধারণা অন্যরূপ; মেট্ল্যাণ্ড, আমার বিশ্বাস, তুমি ঘুমের ঘোরে কিছু দূর ঘুরিয়া আসিয়াছ। আমি জানি, অনেকের স্বপ্নসঞ্চালনের অভ্যাস আছে; তোমাকেও সেই রোগে ধরিয়াছিল। তোমার জুতায় সুরকীর গুঁড়া লাগিয়া আছে, ইহা মিথ্যা নহে; কিন্তু অন্য লোক তোমার ঐ জুতা পরিয়া সুরকীর উপর হাঁটিয়াছিল, ইহা কদাচ সম্ভব নহে। হয় ত অচেতন অবস্থায় তুমি এই ঘর হইতে—"

বন্ধুর কথা শুনিয়া মেট্ল্যাণ্ড ক্রোধে জলিয়া উঠিল; উত্তেজিত স্বরে বলিল, "রাবিস! তুমিই প্রলাপ বকিতেছ! আমার বিশ্বাস, সেই রাস্কেল আমেরিকানটাই এ জন্য দায়ী। এ তাহারই খেলা! সে আমার রিষ্টওয়াচ ও ক্লক খুলিয়া সময় পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল। আমি

পঁয়তাল্লিশ মিনিট বেহুঁস হইয়া বসিয়া ছিলাম। সেই সময় কি ঘটিয়াছিল? ইহা যে আমার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রের ফল—এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। এই হারকোর্ট কস্‌মো হোটেলে নাই, কোন দিন ছিলও না। কোন দুর্ব্বৃত্ত কর্ত্তৃক আমি প্রতারিত হইয়াছি। অথচ আমার ঘর হইতে কোন সামগ্রীই অপহৃত হয় নাই; সিন্দুকের সব জিনিসই—"

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই দ্বারে ঝণ্-ঝণ্ শব্দ হইল।

রোর্কি বিস্ময়ভরে জিজ্ঞাসা করিল, "ও আবার কে?"

মেট্‌ল্যাণ্ড বলিল, "দরজায় কে শব্দ করিতেছে! এই অসময়ে কে কি কারণে আমার দরজা গুঁতাইতেছে? কে আসিল—দেখি।"

মেট্‌ল্যাণ্ড অগ্রসর হইয়া পথের দিকের দ্বার খুলিয়া দিল। সে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের চীফ্-ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডকে দুই জন অনুচর সহ দ্বারের বাহিরে দণ্ডায়মান দেখিল।

তাঁহাদিগকে দেখিয়াই মেট্‌ল্যাণ্ডের মাথা ঘুরিয়া উঠিল; পুলিশ দেখিয়া সে জড়িত স্বরে বলিল, "আপনারা এখানে কি চান?"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে মেট্‌ল্যাণ্ডের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মিঃ মেট্‌ল্যাণ্ড কি আপনিই?"

মেট্‌ল্যাণ্ড অস্ফুট স্বরে সভয়ে বলিল, "হাঁ-আ-আমিই মেট্‌ল্যাণ্ড।"

মেট্‌ল্যাণ্ডের ভাবভঙ্গি দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টরের সন্দেহ দৃঢ়মূল হইল। তাহার মুখ মুহূর্ত্তের মধ্যে চা-খড়ির মত সাদা হইয়া গেল! সে দ্বারের হাতল ধরিয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু তাহার পদদ্বয় থর্-থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাহার চক্ষুতে আতঙ্ক-চিহ্ন পরিস্ফুট হইল। মেট্‌ল্যাণ্ডের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া লেনার্ড অত্যন্ত উৎফুল্ল হইলেন।

কিন্তু তিনি বিনীত ভাবে বলিলেন, "মিঃ মেট্‌ল্যাণ্ড, আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে আমরা কয়েক মিনিটের জন্য আপনার ঘরের ভিতর যাইতে চাই। আপনাকে আমার দুই-একটি কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে। আমাকে বোধ হয় আপনি চেনেন না। আমি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের চীফ্-ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড।"

মেট্‌ল্যাণ্ডের ইচ্ছা না থাকিলেও সে অস্ফুট স্বরে বলিল, "হাঁ, আপনারা নিশ্চয়ই ভিতরে আসিতে পারেন। এ প্রস্তাবে আমার আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে? কিন্তু একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই,—কোন গোলমালের খবর পাইয়াছেন কি?"

লেনার্ড বলিলেন, "তা একটু পাওয়া গিয়াছে বৈ কি! বিনা-কারণে পুলিশ কখন কি কাহারও বাড়ীতে প্রবেশ করে?"

মেট্‌ল্যাণ্ড তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া তাহার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। সাইমন কার্ণ ও হুবার্ট রোর্কি পুলিশের সম্মুখে পড়ে—এরূপ তাহাদের ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু তাহারা কক্ষান্তরে লুকাইবার সুযোগ পাইল না। সুতরাং তাহাদিগকে সেখানে বসিয়া স্তব্ধ ভাবে তাঁহাদের সকল কথা শুনিতে হইল।

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাহাদের উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আপনাদের আলাপে আমি বাধা দিতে বাধ্য হইলাম, এ জন্য দুঃখ-বোধ করিতেছি। মিঃ মেট্‌ল্যাণ্ড, আপনাকে আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা শুনুন। আমি জানিতে চাই, আপনি আজ রাত্রি সাড়ে-এগারটা হইতে সাড়ে-বারটা পর্য্যন্ত কোথায় কি ভাবে কাটাইয়াছেন? আপনি জানিয়া রাখুন, আমি পুলিশের ইন্‌স্পেক্টররূপে আপনাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না। তথাপি আমার প্রশ্নের উত্তর চাই।"

মেট্‌ল্যাণ্ড জড়িত স্বরে বলিল, "আপনার প্রশ্নটা আমি ঠিক বুঝিতে পারিলাম না! সন্ধ্যা হইতে এখন পর্য্যন্ত আমি বাড়ীতেই আছি; আমার বাহিরে যাইবার প্রয়োজন হয় নাই, এবং বাহিরে যাই নাই।"

লেনার্ড হঠাৎ মেট্‌ল্যাণ্ডের জুতার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আপনার ঘরের মেঝেতে সুরকী বিছান আছে—তাহা জানিতাম না!"—মেট্‌ল্যাণ্ডের জুতার গোড়ালিতে তখনও সুরকীর সূক্ষ্ম গুঁড়া লাগিয়া ছিল। তাহা সে ঝাড়িয়া-ফেলিবার প্রয়োজন বুঝিতে পারে নাই।

তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া মেট্‌ল্যাণ্ডের বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিলেও সে অতিকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, "সুরকীর গুঁড়া! ও জিনিস আমার জুতায় কিরূপে

লাগিল, তাহা আমি বুঝিয়া-উঠিতে পারি নাই ইন্‌স্পেক্টর! আমি আপনাকে সত্যই বলিয়াছি, সন্ধ্যার পর হইতে আমি ঘরেই আছি, বাহিরে যাই নাই।"

লেনার্ড বলিলেন, "মিঃ মেট্‌ল্যাণ্ড, আপনার কথা বিশ্বাস করিবার মত শক্তির অভাবের জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আপনাকে আমার অনুরোধ, আপনি আমার নিকট খাঁটি সত্য কথাটা প্রকাশ করিয়া বলুন। আপনি স্মরণ রাখিবেন, আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করিলাম; এ অবস্থায় মিথ্যা কথা বলিয়া আপনার কোন লাভ হইবে না।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডের কথা শুনিয়া মেট্‌ল্যাণ্ড ক্রোধে আগুন হইয়া উঠিল, এবং তাহার ভদ্রতার মুখোস খসিয়া পড়িল। সে সক্রোধে বলিল, "কি! তুমি আমাকে গ্রেপ্তার করিলে? তুমি কি পাগল হইয়াছ ইন্‌স্পেক্টর! আমি এরূপ কোন অপরাধ করি নাই—যে জন্য তুমি আমাকে গ্রেপ্তার—"

ইন্‌স্পেক্টর তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "তোমার চাবির গোছাটার প্রয়োজন আছে—আমাকে দাও।"

মেট্‌ল্যাণ্ড গর্জ্জন করিয়া বলিল, "কখন না; আমার চাবি কেন তোমাকে দিব? তোমাকে এই অন্যায় অত্যাচারের প্রতিফল পাইতে হইবে।"

লেনার্ডের আদেশে তাঁহার অনুচরদ্বয় তাহার দুই পাশে আসিয়া, চক্ষুর নিমেষে হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিল। মেট্‌ল্যাণ্ড ক্রোধে, ক্ষোভে, অপমানে থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল; সে চক্ষুর সম্মুখে সবই অন্ধকার দেখিল। কার্ণ ও রোর্কি লেনার্ডের ব্যবহারের প্রতিবাদে কোন কথা বলিতে পারিল না; তাহারা মেট্‌ল্যাণ্ডের আহ্বানে সেখানে আসিয়া অনুতপ্ত হইল; তাহাদের আশঙ্কা হইল, আদালতে হয় ত তাহাদিগকে সাক্ষ্য দিতে হইবে, এবং ফরিয়াদী পক্ষের জেরায় তাহাদের অনেক কুকীর্ত্তির কথা বাহির হইয়া পড়িবে!

লেনার্ড গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "শীঘ্র চাবি বাহির কর।"

মেট্‌ল্যাণ্ড অধীর স্বরে বলিল, "মূর্খ, তুমি ভুল করিয়া অনর্থক আমার উপর জুলুম করিতেছ! তুমি বুঝিতে পারিতেছ না—এ সব একটা হীন-ষড়যন্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নয়।"

লেনার্ড অবজ্ঞাভরে হাসিয়া বলিলেন, "আমি ভুল করিয়াছি? ইহার পর তুমি হয় ত বলিবে—আজ রাত্রে লর্ড ব্ল্যাক্‌উডের ঘরে চুরি করিতে গিয়াছিলে, সে কথা তোমার স্মরণ নাই; কিন্তু তুমি সেখানে যে অঙ্গুলি-চিহ্ন রাখিয়া আসিয়াছ, তাহা তোমার সাধুতারই নিদর্শন বটে! আর লর্ড ব্ল্যাক্‌উডের ঘরের পাশের রাস্তায় যে নূতন সুরকী বিছান হইয়াছে—সেই সুরকী মন্ত্রবলে উড়িয়া-আসিয়া তোমার জুতায় লাগিয়াছে!"

এবার মেট্‌ল্যাণ্ড বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিল, "আমার অঙ্গুলি-চিহ্ন লর্ড ব্ল্যাক্‌উডের ঘরে? তাঁহার বাড়ী কোথায়, তাহাই আমি জানি না! তথাপি তুমি স্বীকার করিতেছ না—আমার বিরুদ্ধে একটা প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্র হইয়াছে! আমি তোমাকে বলিয়াছি, সন্ধ্যার পর আমি ঘরের বাহিরে যাই নাই, কিন্তু মূর্খ তুমি, আমার কথা তোমার—"

লেনার্ড তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "বাজে কথা বন্ধ কর মেট্‌ল্যাণ্ড! তুমি খুব চালাক লোক; কিন্তু আমার কাছে তোমার চালাকি খাটিবে না। তুমি লর্ড ব্ল্যাক্‌উডের কোষাগারে ঢুকিয়া যে বর্জ্জিয়া-স্বর্ণমঞ্জুষা চুরি করিয়া আনিয়াছ—তাহা অবিলম্বে বাহির করিয়া দাও।"

এ কথায় মেট্‌ল্যাণ্ড যেন আকাশ হইতে পড়িল; ব্যাকুল স্বরে বলিল, "বর্জ্জিয়া স্বর্ণমঞ্জুষা? তুমি কি আমার ঘরে তাহা পাইবার প্রত্যাশা করিতেছ? লর্ড ব্ল্যাক্‌উড তাহা পাইয়াছেন; তিনি আমাকে নিলামে পরাস্ত করিয়া—"

ইন্‌স্পেক্টর তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "জানি; কিন্তু আজ রাত্রিকালে তুমি চুরি-বিদ্যাবলে তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া উহা আত্মসাৎ করিয়াছ। শীঘ্র তাহা বাহির কর।"

মেট্‌ল্যাণ্ড গর্জ্জন করিয়া বলিল, "ও-কথা যে বলে, সে মিথ্যাবাদী! বলিয়াছি, আজ রাত্রে আমি ঘরের—"

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "জ্যাক, ডোনাল্ড, এই রাস্কেলের পকেট খানাতল্লাসী করিয়া দেখ—উহার পকেটে চাবি পাও কি না। উহাকে ধরিয়া রাখ, যেন আমার কাজে বাধা দিতে না পারে।"

কন্‌ষ্টেবলদ্বয় মেট্‌ল্যাণ্ডের পকেট হইতে চাবির গোছা বাহির করিয়া ইন্‌স্পেক্টরকে প্রদান করিল; তাহার পর তাহার দুই পাশে আসিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিল।

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড মেট্‌ল্যাণ্ডের চাবির গোছা হইতে তাহার প্রকাণ্ড সিন্দুকের চাবি বাছিয়া লইলেন; তাহার পর তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, এই চোরাই স্বর্ণমঞ্জুষা তুমি সিন্দুকেই লুকাইয়া রাখিয়াছ; আগে সিন্দুকটাই পরীক্ষা করিয়া দেখি; তাহার ভিতর না পাইলে তোমার ঘরের প্রতি-ইঞ্চি স্থানে তাহার সন্ধান করিব।"

মেট্‌ল্যাণ্ড উভয় কন্‌ষ্টেবলের বাহু-পাশে বন্দী হইয়া স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার বন্ধুদ্বয়ও নির্ব্বাক্‌! ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড সিন্দুক খুলিয়া তাহার ভিতর হীরা-জহরতের স্তূপ দেখিতে পাইলেন বটে, কিন্তু স্বর্ণমঞ্জুষার সন্ধান পাইলেন না; কিন্তু তিনি হতাশ না হইয়া, সিন্দুকের অন্য দিকে যে সকল দলিল ও খাতাপত্রাদি সঞ্চিত ছিল, সেগুলি অপসারিত করিতেই তাহার ডালার নীচে স্বর্ণমঞ্জুষা সংরক্ষিত দেখিলেন। তিনি আনন্দে ও উৎসাহে অস্ফুট হুঙ্কার দিয়া তাহা টানিয়া বাহির করিলেন, তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, "এটা কি জিনিস মিঃ মেট্‌ল্যাণ্ড! তুমি না কি লর্ড ব্ল্যাক্‌উডের বাড়ী কোথায়, তাহাও জান না?"

মেট্‌ল্যাণ্ড যেন সম্মুখে ভূত দেখিতেছে—এই ভাবে সেই স্বর্ণমঞ্জুষার দিকে চাহিয়া রহিল! তাহার পর জড়িত স্বরে বলিল, "আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, ঐ স্বর্ণমঞ্জুষা আমি চুরিও করি নাই, আমার সিন্দুকেও লুকাইয়া রাখি নাই। এ ষড়যন্ত্র! আমাকে বিপন্ন করিবার জন্য ইহা কোন দুর্জ্জনের ষড়যন্ত্রের ফল! আমার বিশ্বাস, ইহা সেই হারকোর্টেরই কাজ!"

লেনার্ড বলিলেন, "হারকোর্ট! হারকোর্টটা কে?"

মেট্‌ল্যাণ্ড হতাশ ভাবে বলিল, "আমি তাহাকে চিনি না। আজ রাত্রি এগারটার কিছু পরেই সে আমার ঘরে আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিয়াছিল, বলিয়াছিল, সে এক জন মার্কিণ কোটিপতি; আমার কাছে কিছু জিনিস-পত্র কিনিবার প্রস্তাব করিয়াছিল। তাহার নিকট শুনিয়াছিলাম, সে কস্‌মো হোটেলে বাস করিতেছে। কিন্তু সন্ধান লইয়া জানিয়াছি—তাহার এ কথা সত্য নহে। সম্ভবতঃ সে আমার—"

লেনার্ড বলিলেন, "গুলীর আড্ডার গল্প! বিচারালয়ে তোমার সমর্থনের জন্য যে কৌসিলী নিযুক্ত করিবে, এ সকল আস্‌মানী-কাহিনী তাহাকে শুনাইও; ও-সকল কথা আমার শুনিবার অবসর নাই, প্রয়োজনও নাই। চোরাই মাল তোমার ঘরে পাইয়াছি, তোমার এই দুই জন বন্ধুই তাহার সাক্ষী। তুমিই চুরি করিয়াছ—তাহার প্রমাণেরও অভাব নাই; আমার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইতেছি।"

লেনার্ড, কার্ণ ও রোর্কির মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, তাহাদের দুই জনকেও গ্রেপ্তার করিবেন, কিন্তু তাহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ না থাকায় তাঁহাকে সেই ইচ্ছা দমন করিতে হইল। তিনি মেট্‌ল্যাণ্ডকেই লইয়া চলিলেন।

* * *

মেট্‌ল্যাণ্ডকে লইয়া পুলিশের গাড়ী যে সময় নাইট-ব্রীজ অতিক্রম করে, তখন রাত্রি গভীর হইয়াছিল; কিন্তু সেই সময়েও একটি দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ যুবককে সেই পথের ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা গেল; বলা বাহুল্য—সে রোপার ওয়াইল্ড!

ওয়াইল্ড পুলিশের গাড়ীতে ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডের পার্শ্বে মেট্‌ল্যাণ্ডকে উপবিষ্ট দেখিয়া উৎসাহভরে বলিল, "আমার কৌশলটা তবে ব্যর্থ হয় নাই! এত সহজে ও অল্প সময়ে কার্য্যোদ্ধার হইবে, এরূপ আশা করিতে পারি নাই। মেট্‌ল্যাণ্ড পুরাতন পাপী, একবার তিন বৎসর জেল খাটিয়া আসিয়াছে; এবার চুরির অভিযোগে উহাকে অন্যূন সাতটি বৎসর শ্রীঘরে বাস করিতে হইবে। সেই ধাক্কা সাম্‌লাইয়া ফিরিয়া আসিয়া আবার যে রাস্কেলটা সার রড্‌নের অনিষ্ট-চেষ্টা করিতে পারিবে—ইহা সম্ভব মনে হয় না। আশা করি, উহার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া উহার অন্য দুই বন্ধুর দিকে মন দিতে পারিব।"

কিন্তু রবার্ট ব্লেকের কথা সে তখনও ভুলিতে পারে নাই। সে জানিত—তাঁহার চক্ষুতে ধূলা দেওয়ার শক্তি তাহার নাই। কিন্তু ওয়াইল্ড ভাবিল—তিনি কি এই নরপিশাচকে সাহায্য করিবেন? [ক্রমশঃ

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।
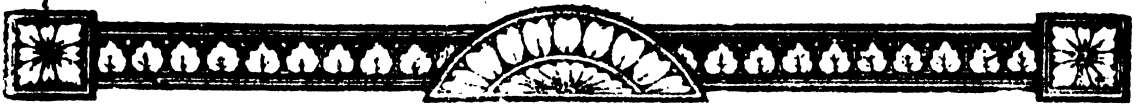
উপনিষদের ব্রহ্মবাদ

৩

পঞ্চাগ্নি বিদ্যা

উপনিষদুক্ত পঞ্চাগ্নি বিদ্যা ভাবনাযজ্ঞের অতি উপাদেয় দৃষ্টান্ত।

এই পঞ্চাগ্নি বিদ্যায় দ্যুলোক, ভূলোক, পর্জ্জন্য (মেঘ) পুরুষ এবং স্ত্রী (যোষা) এই পাঁচটি পদার্থকে অগ্নিরূপে কল্পনা করিয়া জীবের উৎপত্তিকে একটি বিরাট্ যজ্ঞ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। দ্যুলোকরূপ অগ্নিতে দেবতাগণ শ্রদ্ধাকে আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন, ঐ আহুতির ফলে দেবলোক ও পিতৃলোকেরও পোষক সোম (সোমরস বা চন্দ্র) উৎপন্ন হইয়া থাকে। পর্জ্জন্য বা মেঘরূপ অগ্নিতে—দেবতারা ঐ সোমকে আহুতি দিয়া থাকেন, ফলে সোম বা চন্দ্র হইতে বৃষ্টির উৎপত্তি হয়। পৃথিবীরূপ অগ্নিতে দেবতারা বৃষ্টিকে আহুতিস্বরূপ অর্পণ করেন, ফলে শস্য উৎপন্ন হয়। পুরুষরূপ অগ্নিতে সেই শস্য ভোজ্যরূপে আহুত হয় এবং সেই আহুতির ফলে পুরুষশরীরে বীর্য্যের উৎপত্তি হয়। ঐ বীর্য্য স্ত্রী-রূপ অগ্নিতে নিহিত হয়, ফলে হস্তপদাদিযুক্ত প্রাণীর উৎপত্তি হয়। এইরূপে যিনি জীবের সৃষ্টি-যজ্ঞ রহস্য বুঝিতে পারেন, তিনিই অশুচি শরীরের প্রতি আকৃষ্ট হন না। অসহ্য গর্ভযাতনার কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া স্বীয় শরীরে এবং সংসারে বৈরাগ্য দৃঢ় করেন। ঐরূপ অনাসক্ত ব্যক্তি গৃহস্থ হইলেও জ্ঞানী। তিনি এবং অপরাপর বানপ্রস্থিগণ, যাঁহারা শ্রদ্ধাসহকারে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা দেহাবসানে দেবযান-পথে দেবলোক, সূর্য্যলোক এবং ব্রহ্মলোকে গমন করেন এবং ব্রহ্মলোকেই বাস করেন। এই দেবযান-মার্গ সর্ব্বদা আলোকমালায় সমুজ্জ্বল। এই মার্গে যাঁহারা গমন করেন, তাঁহারা প্রথমতঃ সূর্য্যকিরণকে (অর্চ্চিঃ) আশ্রয় করেন, পরে সূর্য্যকরোজ্জ্বল দিবস ও চন্দ্র-কিরণ-স্নাত শুক্লপক্ষ অতিক্রম করিয়া সূর্য্যের যে ছয় মাস কাল উত্তরায়ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই উত্তরায়ণকাল প্রাপ্ত হন; সেখানে মাস ও বৎসর অতিবাহিত করিয়া তথা হইতে আদিত্যলোক, চন্দ্রলোক ও বিদ্যুল্লোকে গমন করেন; সেখানে এক জ্যোতির্ম্ময় অতিমানব পুরুষের সহিত তাঁহাদের পরিচয় হয়। সেই পুরুষই তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়। ইহাই দেবযান। অতিমানব জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ দেবযানপন্থীকে ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়া তাঁহার জ্ঞানের পূর্ণতা সাধন করেন, ফলে ব্রহ্মজ্ঞ দেবযানপন্থীর আর মর জগতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না।১

উপনিষদুক্ত মুক্তির সাধন

ইহা ক্রম-মুক্তি; বানপ্রস্থীর ন্যায় গৃহস্থও এই ক্রমমুক্তির অধিকারী। গৃহস্থের তো কর্ম্ম নিঃশেষ হয় না, কর্ম্ম থাকিতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় কি? কর্ম্ম ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক, সুতরাং কর্ম্মী গৃহস্থ দেবযান-পথে অগ্রসর হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবে কিরূপে? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, যেখানে কর্ম্মের মূলে কামনা বা ভোগের দুরাকাঙ্ক্ষা আছে, কর্ম্ম সেইখানেই পুণ্যাপুণ্য ফল প্রসব করে এবং জীবের সংসার-বন্ধন দৃঢ় করে। কামনাই কর্ম্ম-ফলের কারণ। কামনা না থাকিলে কর্ম্ম ফল উৎপাদনে সমর্থ হয় না। যাহারা কামনার দাস হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা কোন দিনই কর্ম্মপাশ ছেদন করিতে পারে না; পক্ষান্তরে, ঐরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে অন্ধকার হইতে গাঢ় অন্ধকারে প্রবেশ করিয়া বিভ্রান্ত হয়। ভোগের দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া বেদোক্ত যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও কর্ম্মপাশ শিথিল হয় না। ঐরূপ বেদমার্গী ব্যক্তি অজ্ঞ কর্ম্মী হইতেও অধিকতর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়।২ বৈদিক যজ্ঞ প্রভৃতি যদি সর্ব্বভূতপ্রীত্যর্থে, জগদ্ধিতায় অনুষ্ঠান করা যায়, তবে ঐ নিষ্কাম ত্যাগমূলক যজ্ঞাদি বন্ধের কারণ হয় না, মুক্তিরই কারণ হয়—যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ। গীতা ৩।৯। নিষ্কাম যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলে যজমানের চিত্ত নির্ম্মল, উজ্জ্বল ও প্রশান্ত

১। বৃহদাঃ ৬।২।১৪-১৫, ছান্দোগ্য ৫।১০।১-৮

২। অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।

—বৃহদাঃ ৪।৪।১০, ঈশ ৯

হয়; ঐরূপ চিত্তে স্বতঃই ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিফলিত হয়। এই অবস্থায় কর্ম্ম জ্ঞানের প্রতিবন্ধক নহে, সহায়ক। ঐরূপ কর্ম্ম জ্ঞানেরই নামান্তর, পরিণামে জ্ঞানেই পর্য্যবসিত হয়—সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। গীতা ৪।৩৩। কর্ম্মত্যাগ জীবের পক্ষে অসম্ভব, কেন না, জীবের জীব-ভাবের মূলেও রহিয়াছে কর্ম্ম, সুতরাং কর্ম্মী জীব কর্ম্মত্যাগ করিবে কিরূপে? কর্ম্ম লইয়াই তাঁহাকে চলিতে হইবে—কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ—ঈশোপনিষৎ ২; কর্ম্ম-ফল-ত্যাগই যথার্থ কর্ম্মসন্ন্যাস বা কর্ম্মযোগ, ফলত্যাগীই প্রকৃত ত্যাগী।১ এইরূপ ত্যাগকে জীবনে বরণ করিতে পারিলে ফলত্যাগী সাধকের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। মুক্তি কর্ম্মসাধ্য নহে, উহা সিদ্ধ বা নিত্য। জীবের শিবভাব বা ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিই মুক্তি। শিবভাব বা ব্রহ্মভাব নিত্য, সুতরাং মুক্তিও নিত্য। মুক্তি কর্ম্মসাধ্য হইলে তাহা নিত্য হইতে পারিত না, কারণ, প্রথমতঃ, যাহা সাধ্য, তাহা নিত্য হইতে পারে না; দ্বিতীয়তঃ, কর্ম্ম যখন ভঙ্গুর ও অনিত্য, তখন সেই কর্ম্মলভ্য মুক্তি নিত্য হইবে কিরূপে? অধ্রুবের (কর্ম্মের) দ্বারা ধ্রুবফল (মুক্তি) লাভ হইবে কিরূপে? নহ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ—কঠ ২।৯; মুক্তি কর্ম্মলভ্য নহে বলিয়াই শ্রুতি যজ্ঞাদি-কর্ম্মকেও সংসার-সমুদ্রতরণের পক্ষে "অদৃঢ় ভেলা" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—প্লবা হ্যেতা অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ—মুণ্ডক ১।২।৭; কর্ম্ম স্বাধীন ভাবে যেমন মুক্তির কারণ হয় না, সেইরূপ জ্ঞানের সহিত সমুচ্চিত বা মিলিত হইয়াও তাহা মুক্তির সাধন হইতে পারে না, কেন না, জীবের অবিদ্যার উচ্ছেদই মুক্তি, অবিদ্যা একমাত্র বিদ্যা দ্বারাই উচ্ছিন্ন হয়, অন্য কিছুর দ্বারা হয় না; সুতরাং বিদ্যা বা জ্ঞানকেই মুক্তির একমাত্র সাধন বলিয়া জানিবে—বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে—ঈশঃ ১১; সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যগ্‌ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্—মুণ্ডক ৩।১।৫; এই মুক্তি ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি এ জগতে থাকিয়াই লাভ করেন, ইহার জন্য তাঁহাকে পরজগতে গমন করিতে হয় না। যখন তাঁহার হৃদয়স্থিত সমস্ত কামনা ব্রহ্মজ্ঞান প্রভাবে বিদূরিত হয়, তিনি নিষ্কাম, আপ্তকাম বা আত্মকাম হন, তখন তিনি মরজগতে থাকিয়াই অমৃতত্ব লাভ করেন, এই ভৌতিক জড় দেহে অবস্থান করিয়াই মুক্তির আনন্দ আস্বাদ করেন।১ তাঁহার প্রাণ, ইন্দ্রিয়সমূহ কিছুই উর্দ্ধে বা পরলোকে গমন করে না, এখানেই স্ব স্ব কারণে বিলীন হইয়া যায়। সাপের খোলস যেমন উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়া থাকে, সেইরূপ এই ভৌতিক শরীরও ব্রহ্মদর্শি-কর্ত্তৃক অনাদরে উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত শরীরাভিমান থাকে, সেই পর্য্যন্তই আত্মাও শরীরী থাকেন, শরীরাভিমান শূন্য হইলে শরীরের ধর্ম্ম জরা, মৃত্যু তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তখন তিনি অমৃত, জ্যোতির্ম্ময়, ব্রহ্মস্বরূপ হন। ব্রহ্মভাব সুস্থির করিতে হইলে কাম বা কামনার (এষণার) উচ্ছেদ যেমন প্রয়োজন, সেইরূপ অহমিকা বা আত্মাভিমান, পাণ্ডিত্যের অভিমান, আভিজাত্যের অভিমান, ধনের অভিমান প্রভৃতি অহঙ্কারেরও পরিহার একান্ত আবশ্যক। যে পর্য্যন্ত কোনরূপ অভিমান বিদ্যমান থাকিবে, সে পর্য্যন্ত সন্ন্যাস বা বৈরাগ্য অবলম্বন করা সম্ভব হইবে না। সন্ন্যাস ব্যতীত আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় না, সুতরাং সন্ন্যাস অবলম্বনপূর্ব্বক এষণাকে (বাসনাকে) জয় করিতে হইবে, অভিমানের কণ্ঠরোধ করিতে হইবে, ফলে নিরভিমান, বালক-স্বভাব সরল, উদার সন্ন্যাসী জ্ঞানবলে আত্মাকে মনন ও ধ্যান করিয়া ক্রমে ব্রহ্মে তন্ময় হইবেন। এইরূপ ব্রহ্মদর্শীর নিকট জীব ও জগৎ কিছুই থাকিবে না, এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই থাকিবে। ব্রহ্মই সত্য আর সমস্তই মিথ্যা।২

জীব ও জগৎ মিথ্যা, অদ্বৈত ব্রহ্মই একমাত্র সত্য

ব্রহ্মে কোন দ্বৈতবোধ নাই, দ্বৈতবোধ বিভ্রম মাত্র। এই বিভ্রমদর্শী পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণ-প্রবাহে পতিত হইয়া দুঃখ ভোগ করে—মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ

১। কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ত্যাগং প্রাহুর্ব্বিচক্ষণাঃ। —গীতা ১৮।২
তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ। —গীতা ৩।১৯

১। যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।
—কঠ ৬।১৪, বৃহদাঃ ৪।৪।৬-৭

২। বৃহদাঃ ৬।৫।১

নানেব পশ্যতি—বৃহদাঃ ৪।৪।১৯; এই নানাত্ববোধ যে মিথ্যা, তাহা বুঝাইবার জন্য ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে, "হে মৈত্রেয়ি! দ্বৈত জগৎ বস্তুতঃ না থাকিলেও যখন কোনও ব্যক্তি কোন বস্তুকে দর্শন করে, তখন এক আত্মাই দ্রষ্টা, দৃশ্য এই দুইরূপে (দ্বৈতমিব) প্রতিভাত হইয়া থাকে। দর্শন-স্পর্শনাদি জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, দ্রষ্টা, দৃশ্য প্রভৃতি দ্বৈতভাব ব্যতীত সম্ভব হয় না—সুতরাং ব্যাবহারিক জীবনে ব্যবহার নির্ব্বাহের জন্য দ্বৈতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। সেই অস্তিত্ব কল্পিত, যথার্থ নহে, ইহা বুঝাইবার জন্যই শ্রুতি দ্বৈতমিব (দ্বৈতের ন্যায়) এই "ইব" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞানের ফলে যখন সমস্ত জীব-জগৎই ব্রহ্মময় হইয়া যাইবে, তখন কে কাহাকে দেখিবে? কে কাহাকে জানিবে?"১—সর্ব্বং ব্রহ্মময়ম্ এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইলে আর দ্বৈতভাব থাকিবে না, বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। যাহা মিথ্যা তাহাই বিলুপ্ত হয়, আত্মবোধ মিথ্যা নহে, সত্য, এই জন্য তাহা কখনও বিলুপ্ত হয় না, জীব ও জগদ্বোধ মিথ্যা বলিয়াই তাহা বিলুপ্ত হয়। এই জন্যই বৃহদারণ্যক স্পষ্টবাক্যে নানাত্বের নিষেধ ঘোষণা করিয়াছেন—নেহ নানাস্তি কিঞ্চন—বৃহদাঃ ৪।৪।১৯; ঈশ, কঠ, প্রভৃতি উপনিষদেও এই নানাত্বের অসত্যতা স্পষ্টতঃ ঘোষণা করা হইয়াছে। মৈত্রায়ণীয় উপনিষদে ব্রহ্মবস্তুকে জ্যোতির্ম্মণ্ডলস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং জড় জগৎকে সেই ব্রহ্ম-জ্যোতিশ্চক্রের বিভ্রম বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।২ সম্ভবতঃ, এই মৈত্রায়ণীর ব্যাখ্যাকে উপজীব্যরূপে গ্রহণ করিয়াই গৌড়পাদ তদীয় মাণ্ডুক্য কারিকার অলাতশান্তি প্রকরণে আলোক-বলয়ের দৃষ্টান্তে জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।৩

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে দ্বৈতজগতের মিথ্যাত্বই যে উপনিষদের অভিপ্রেত, তাহাই বুঝা যায়। জীবাত্মা পরমাত্মার ঔপাধিক অভিব্যক্তি। উপাধির বিলয়ে জীব-চৈতন্য ব্রহ্মচৈতন্যে বিলীন হইয়া যায়, সুতরাং জীবাত্মাও স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহে, ইহাই উপনিষদের রহস্য। কঠ ও মুণ্ডক-শ্রুতিতে১ (বৃক্ষ ও পক্ষীর দৃষ্টান্তে) জীবাত্মা ও পরমাত্মার পৃথক্ উল্লেখ থাকিলেও জীবাত্মাকে পরমাত্মার ছায়া বলিয়া ব্যাখ্যা করায় জীবাত্মার পরমাত্মার ন্যায় স্বতন্ত্র সত্যতা প্রমাণিত হয় না, পরমাত্মার আভাস বলিয়াই বুঝা যায়। জীবাত্মা সংসারী সাজিয়া সংসারের সুখ, দুঃখ, শোক, মোহের অভিনয় করেন। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে বিচরণ করেন। শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের বন্ধনে নিজকে আবদ্ধ করেন। এইরূপ শরীরাভিমানী জীব অশরীরী পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হইবেন কিরূপে? জীব পুরুষকে অশরীরী আত্মার ছায়া বলিয়া যে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাই বা সঙ্গত হয় কিরূপে?

জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থার বর্ণনা ও তাহা দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদনির্দ্দেশ

এই প্রশ্নের উত্তরে বৃহদারণ্যক বলেন যে, জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থা পরীক্ষা করিলে জীব পুরুষ যে সর্ব্বপ্রকার অবস্থার অতীত, সর্ব্ববিধ বন্ধনের অতীত, শরীরে বিচরণ করিয়াও প্রকৃতপক্ষে অশরীরী; অসঙ্গ ও নির্লেপ অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ—বৃঃ ৪।৩।১৫, তাহা স্পষ্টতঃ বুঝা যায়। এইরূপ আত্মার দেহেন্দ্রিয়াদি বন্ধন সত্য হইতে পারে কি? জাগরিত অবস্থায় জীব শরীর ও মনের সাহায্যে স্থূল বিষয় অনুভব করে, সুতরাং বিষয় অনুভবিতা জীবকে তখন শরীর, মনঃ

১। যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি ইতর ইতরং বিজানাতি, যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ কেন কং পশ্যেৎ কেন কং বিজানীয়াৎ। —বৃহদাঃ ৪।৫।১৫

২। অলাতচক্রমিব স্ফুরন্তমাদিত্যবর্ণমূর্জ্জবন্তং ব্রহ্ম, মৈঃ ২৪, আবৃত্তচক্রমিব সংসারচক্রমালোকয়তীত্যেবং হ্যাহ।—মৈঃ ২৮

৩। In the late Maitrayaniya Upanisad we find the comparison of the absolute with the park which, made to revolve, creates apparently a fiery circle, an idea which is taken up and expanded by Goudapada in the Mandukya Karika, and which undoubtedly is consistent with the conception of the illusory nature of empirical reality.—Keith. The Philosophy of the Veda p. 530—35.

১। ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে। ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিনাচিকেতাঃ।
—কঠ ১।৩।১

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।
—মুণ্ডক ৩।১

ও ইন্দ্রিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। স্বপ্নাবস্থায় জীব শরীর ও ইন্দ্রিয়কে নিষ্ক্রিয় করিয়া শরীরের বাহিরে স্বীয় জ্ঞান শক্তি বলে বিচরণ করে এবং স্বীয় বাসনার অনুরূপ বিষয়সমূহ ভোগ করিয়া থাকে। ইহা হইতে জীবাত্মার শরীরবন্ধন যে যথার্থ নহে, তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। স্বপ্ন অবস্থায় মনঃ ক্রিয়াশীল থাকে, আত্মার মনের বন্ধন বিলুপ্ত হয় না। সুষুপ্তি অবস্থায় মনের বন্ধনও বিলুপ্ত হইয়া যায়। ঐ অবস্থায় সর্ব্ববিধ বন্ধন-বিনির্ম্মুক্ত জ্যোতির্ম্ময় আত্মা আনন্দময়রূপেই অবস্থান করেন, ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া ব্রহ্মানন্দ আস্বাদ করেন। বিষয়-বন্ধন-বিমুক্ত, শোক-মোহের অতীত সদাপূর্ণ, নিত্যতৃপ্ত জীব ও ব্রহ্ম যে অভিন্ন, তাহাতে সন্দেহ কি? সুষুপ্তির আনন্দ জীবের সাময়িক মাত্র, অজ্ঞানের বীজ তখনও সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয় না; সুতরাং পুনরায় সুষুপ্তি-ভঙ্গে জীবকে স্বপ্নরাজ্যের পথ ধরিয়া সংসারের রঙ্গমঞ্চে আসিয়া পৌঁছিতে হয়, এবং সংসারী সাজিয়া বিচিত্র জীবন-নাটকের অভিনয় করিতে হয়। জ্ঞানাগ্নি দ্বারা অজ্ঞানবীজ দগ্ধ হইলে জীব সর্ব্ববিধ বন্ধন হইতে চিরতরে মুক্তি লাভ করে এবং জীব-বিন্দু ব্রহ্ম-সিন্ধুতে বিলীন হইয়া চিরনির্ব্বাণ লাভ করে। জীবকে যে পরমাত্মার ছায়া বলা হইয়াছে, ইহার অর্থ এই যে, কায়া ব্যতীত ছায়ার যেমন কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, সেরূপ পরমাত্মা ব্যতীত জীবেরও কোন স্বাধীন সত্তা নাই। ছায়া কায়ারই প্রতিবিম্ব, জীবও ব্রহ্মেরই প্রতিবিম্ব, বিম্ব ও প্রতিবিম্ব অভিন্ন, জীব ও ব্রহ্ম সুতরাং বস্তুতঃ অভিন্ন।১

কঠ ও মুণ্ডক শ্রুতিতে (ঋতং পিবন্তৌ, দ্বাসুপর্ণা ইত্যাদি দ্বিবচন প্রয়োগ দ্বারা) জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ভেদ যে বাস্তব এবং সত্য, শ্রুতিতে এমন কোন কথা শুনা যায় না, বরং শ্রুতির পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে ভেদ যে বাস্তব নহে, কল্পিত, তাহাই বুঝা যায়। পরবর্ত্তী কঠ-শ্রুতিতে দ্বৈতদর্শীর নিন্দা করিয়া বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মে ভেদ বা নানাত্বের কোন স্থান নাই, যে ব্যক্তি ব্রহ্মে বিন্দুমাত্রও ভেদ দর্শন করে, সে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হয়।১ এইরূপে স্পষ্টতঃ দ্বৈতবাদ বা ভেদবাদের নিন্দা করায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে ভেদ উল্লিখিত শ্রুতিতে বিবৃত হইয়াছে, সেই ভেদ যে কল্পিত এবং অবাস্তব, ইহাই বুঝা যায়, নতুবা পরবর্ত্তী শ্রুতিতে ভেদদর্শীর যে নিন্দা করা হইয়াছে, তাহার কোনরূপ সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় না। ভেদ সত্য হইলে শ্রুতির পূর্ব্বাপর বিরোধ অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। দেহ-কুলায়ে অবস্থিত সহচর পক্ষিদ্বয়ের দৃষ্টান্ত উপন্যাস করিয়া মুণ্ডক-শ্রুতিতে দ্বৈত সত্যতার অনুকূলে যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই সকল যুক্তির খণ্ডনেও কঠশ্রুতির অনুরূপই উত্তর দেওয়া যাইতে পারে।

মুণ্ডক উপনিষদে "কাহাকে জানিলে সকল জানার শেষ হয়?—

কস্মিন্ নু খলু বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি?"

এই শৌনকের প্রশ্নের উত্তরে ঋষি পিপ্পলাদ বলিয়াছেন যে, "পুরুষই এই বিশ্ব, ব্রহ্মই এই বিশ্ব—পুরুষ এবেদং বিশ্বম্, ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বম্, নিখিল বিশ্বই ব্রহ্মময়, ব্রহ্মকে জানিলেই সকল জানার শেষ হয় এবং যে ব্যক্তি এই ব্রহ্মতত্ত্ব জানেন, তিনি ব্রহ্মস্বরূপই হইয়া যান।" এইরূপে মুণ্ডক উপনিষদে পূর্ণ অদ্বৈতবাদ প্রতিপাদিত হইয়াছে, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত "দ্বা সুপর্ণা" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যে যে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদের কথা বলা হইয়াছে, সেই ভেদ মায়িক ও অসত্য, ইহাই বুঝিতে হইবে। উক্ত মুণ্ডকশ্রুতির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে আরও বক্তব্য এই যে, ঐ শ্রুতিবাক্যটির পৈঙ্গি-রহস্য ব্রাহ্মণে একটি ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। এ ব্যাখ্যা শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে (ব্রঃ সূঃ ১।২।১১) উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের মন্ত্র-ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে বলিতে হয় যে, জীবাত্মা, পরমাত্মা বা তাঁহাদের ভেদ প্রভৃতি কিছুই এই মুণ্ডক-শ্রুতির আদৌ প্রতিপাদ্যই নহে। অন্তঃকরণ এবং জীবাত্মা এই দুইএর কথাই উক্ত শ্রুতিতে আলোচিত হইয়াছে।২

১। বৃহদাঃ অঃ ৪ ব্রাঃ দ্রষ্টব্য।

১। মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।—কঠ ৪।১১

২। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তীতি (মুঃ ৩।১।১,) সত্ত্বম্, অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি, ইতি অনশ্নন্নন্যোঽভিপশ্যতি জ্ঞস্তাবেতৌ সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞাবিতি সত্ত্বশব্দো জীবঃ, ক্ষেত্রজ্ঞশব্দঃ পরমাত্মেতি যদুচ্যতে তন্ন।—ব্রঃ সূঃ শং-ভাষ্য ১।২।১১

অন্তঃকরণই ফলভোক্তা, জীবাত্মা শুধু দ্রষ্টা ও সাক্ষিমাত্র, সে ভোক্তা নহে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, অন্তঃকরণ তো জড়, সে ফলভোগ করিবে কিরূপে? ব্রাহ্মণের এই অর্থ কি প্রকারে সঙ্গত হয়? এই আশঙ্কার উত্তরে আচার্য্য শঙ্কর উক্ত শ্রুতির ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, অচেতন অন্তঃকরণের ভোক্তৃত্ব প্রতিপাদন করা এই মন্ত্র-বাক্যের উদ্দেশ্য নহে, চেতন জীবাত্মাকে দ্রষ্টা বলিয়া সাক্ষিস্বরূপ ব্যাখ্যা করা এবং জীবাত্মা যে ভোক্তা নহে, স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ, ইহা প্রদর্শন করাই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য।[১] জীব যদি ভোক্তা না হয়, তবে ভোক্তা কে? জড় অন্তঃকরণকে ভোক্তা বলা যায় কি? এই প্রশ্নের উত্তরে আচার্য্য শঙ্কর বলেন যে, বিশুদ্ধ চিন্ময় ব্রহ্মই অন্তঃকরণরূপ উপাধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া জীব-ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অন্তঃকরণ ও চৈতন্যের অধ্যাসের ফলে অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, সুখ, দুঃখ, কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি চেতন জীবে আরোপিত হয়, জীব তাঁহার শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব বিস্মৃত হইয়া নিজকে শোক-দুঃখাকুল, কর্ত্তা, ভোক্তা বলিয়া মনে করে, জীব বাস্তবিক ভোক্তা নহে, সে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ। ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের ভোক্তৃত্ব কল্পিত ও অসত্য। পক্ষান্তরে অন্তঃকরণে চৈতন্যাধ্যাসের ফলে অন্তঃকরণেও মিথ্যা কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-বোধের উদয় হইয়া থাকে। অন্তঃকরণ ও চৈতন্যের এইরূপ অধ্যাসের কথাই উক্ত শ্রুতির ব্যাখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে। জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ সূচিত হয় নাই।

নির্গুণ অদ্বয় ব্রহ্মবাদই উপনিষদের প্রতিপাদ্য

উপনিষদে ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ, এই দ্বিবিধ বিভাবের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, সেখানেও দেখা যায় যে, ঐ দুইটি বিভাব আলোক ও অন্ধকারের মত পরস্পর-বিরোধী। সুতরাং ইহার একটি সত্য হইলে অপরটি মিথ্যা হইবেই, দুইটি কখনই সত্য হইতে পারে না। ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ এই দ্বিবিধ বিভাবের মধ্যে কোন্ বিভাবটি সত্য, এ বিষয়ে বৈদান্তিক মহাচার্য্যগণের মধ্যে ঘোরতর মতবিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। আচার্য্য শঙ্করের মতে ব্রহ্মের নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ বিভাবই সত্য, সগুণ ও সবিশেষ বিভাব মায়িক ও অসত্য।[১] আচার্য্য রামানুজের মত শঙ্করাচার্য্যের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। আচার্য্য রামানুজের মতে সগুণ ব্রহ্মই সত্য, ব্রহ্ম অনন্ত-কল্যাণগুণময়, তিনি গুণ-রহিত হইবেন কিরূপে? ব্রহ্মকে শ্রুতিতে যে নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা দ্বারা ব্রহ্মে গুণশূন্যতা বুঝায় না, ব্রহ্মের কল্যাণগুণ-গণেরই সমাবেশ আছে, কোনরূপ নিকৃষ্ট গুণ নাই, ইহাই বুঝা যায়। আচার্য্য রামানুজ তৎকৃত শ্রীভাষ্যে শঙ্করোক্ত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদ ও মায়াবাদ অপূর্ব্ব মনীষার সহিত খণ্ডন করিয়াছেন। রামানুজের মত অপরাপর বৈষ্ণব বেদান্তিগণেরও অনুমোদিত। দ্বৈতবেদান্তী মাধ্বও আচার্য্য শঙ্করের নির্ব্বিশেষ-বাদের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রত্যেক বৈদান্তিক আচার্য্যই উপনিষদের পটভূমিতে তদীয় দার্শনিক মত চিত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বৈদান্তিক মহাচার্য্যগণের মধ্যে উক্তরূপ মতবিরোধের ফল উপনিষদের দার্শনিক রহস্য জিজ্ঞাসুর নিকট দুর্জ্ঞেয় হইয়া পড়িয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব-বিচার করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, উপনিষদের মতে সগুণ ও নির্গুণ ভিন্ন তত্ত্ব নহে, যিনি স্বতঃ নির্গুণ, তিনিই মায়া-উপাধি অবলম্বন করিয়া সগুণ, সবিশেষ হন এবং জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় সাধন করেন—গৃহীতমায়োরুগুণঃ সর্গাদাবগুণঃ স্বতঃ—ভাগবত ২।৬।২৯। সগুণরূপ ব্রহ্মের মায়িকরূপ, সুতরাং পরমার্থরূপ নহে, নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই চরম ও পরম তত্ত্ব। নির্গুণ শব্দে স্বভাবতঃ গুণ-রহিত, এই অর্থই বুঝা যায়, এই স্বাভাবিক অর্থ পরিত্যাগ

১। নেয়ং শ্রুতিরচেতনস্য সত্ত্বস্য ভোক্তৃত্বং বক্ষ্যামীতি প্রবৃত্তা, কিন্তর্হি, চেতনস্য ক্ষেত্রজ্ঞস্য অভোক্তৃত্বং ব্রহ্মস্বভাবতাং বক্ষ্যামীতি, তদর্থং সুখাদিবিক্রিয়াবতি সত্ত্বে ভোক্তৃত্ব-মধ্যারোপয়তি। শং-ভাষ্য ব্রঃ সূঃ ১।২।১১

১। দ্বিরূপং হি ব্রহ্ম অবগম্যতে নামরূপভেদোপাধিবিশিষ্টং তদ্বিপরীতঞ্চ। সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিতং। শংভাষ্য ব্রঃ সূঃ ১।১।১১

সন্তি চ উভয়লিঙ্গাঃ শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিষয়াঃ সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরস ইত্যেবমাদ্যাঃ সবিশেষলিঙ্গাঃ। অস্থূলমনণু অহ্রস্বমদীর্ঘমিত্যেবমাদ্যাশ্চ নির্ব্বিশেষলিঙ্গাঃ, অতশ্চ অন্যতরলিঙ্গপরিগ্রহেঽপি সমস্তবিশেষরহিতং নির্ব্বিকল্পকমেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যম্, নতু তদ্ বিপরীতম্, সর্ব্বত্র হি ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনপরেষু বাক্যেষু অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়-মিত্যেবমাদিষু অপাস্তসমস্তবিশেষমেব ব্রহ্ম উপদিশ্যতে। —ব্রঃ সূঃ শং-ভাষ্য ৩।২।১১

করিয়া "নিঃ" উপসর্গের "নিকৃষ্ট" অর্থ গ্রহণ করিয়া ব্রহ্ম নিকৃষ্ট-গুণরহিত এইরূপ অর্থ স্বীকার করিলে শব্দার্থের স্বাভাবিক মর্য্যাদা ও সহজবোধ্য রীতি পরিত্যাগ করিতে হয় বলিয়া আমরা রামানুজের ব্যাখ্যাকে শ্রুতির সহজ ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। উপনিষদে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ ও নির্গুণ রূপ অনেক শ্রুতিতে অতি স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা আমরা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদের আলোচনায় দেখাইয়াছি। সেই আলোচনার সহজ ভঙ্গী পরিত্যাগ করিয়া কষ্টকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করার কোন সঙ্গত হেতু নাই। ব্রহ্ম উপাধি অঙ্গীকার করিয়াই যে সগুণ পরমেশ্বর হন, জগৎ সৃষ্টি করেন, ইহা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে—মায়িনন্তু মহেশ্বরম্, তস্মান্মায়ী সৃজ্যতে বিশ্বমেতৎ—শ্বেতাশ্ব; ৪।১০; শ্বেতাশ্বতরের উল্লিখিত উক্তি হইতে ব্রহ্মের সগুণ বিভাব যে মায়িক, তাহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। যাহা মায়িক, তাহা পরমার্থ সত্য হইতে পারে না, সুতরাং সগুণ ব্রহ্ম চরম তত্ত্ব নহে। জীব-ভাব এবং জগদ্-বিভাব অবিদ্যা-কল্পিত, সুতরাং তাহা যে সত্য নহে, তাহাও আমরা দেখাইয়াছি। একমাত্র অদ্বয় নির্গুণ পরব্রহ্মই সত্য, ইহাই উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবিদ্যার রহস্য।

শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী
(অধ্যাপক, এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি)

প্রাচীন

জীবন যখন হয়ে আসে পুরাতন
কমায় ধরণী তাহার আকর্ষণ।
শিথিল-বৃন্ত কুসুমের প্রায়
আছে ক্ষতি নাই, যাক্ ঝরে যায়,
সাঙ্গ হয়েছে ছিল যাহা প্রয়োজন।

যেন সে থাকার সময় অতীত করি
পান্থশালায় রয়েছে একাকী পড়ি।
আসে যায় যারা উদাসীনতায়
কেহ দেখে, কেহ বনে চলে যায়—
পথের কথা কি হয়েছে বিস্মরণ?

গত উৎসব-তিথির তালিকা লিখা
ও যেন ধরার পুরাতন পঞ্জিকা।
দিবসের শেষে ও ইতুর ঘট
পূজা শেষে ম্লান প্রতিমার পট
বিসর্জ্জনের শুনিতেছে গুঞ্জন।

যজ্ঞের চরু শেষ হয়ে গেছে কাজ
সলিলের ভাগ—যাহা পড়ে আছে আজ।
পূর্ণাহুতির এই শেষ ঘৃত
আর কার সনে হইবে মিলিত
মাসে জলন্ত অঙ্গার-পরশন।

ফুল ফল শেষে ভাঙনের অতি কাছে
এ প্রাচীন তরু একাকী দাঁড়ায়ে আছে।
ভরা প্লাবনের ঘন রাঙা জল
কবে ভাসাইবে—ভাবিছে কেবল,
শিকড়ের মাটি লভিতেছে শিহরণ।

থাকে উৎসুক-আগ্রহে আঁখি তুলি
ডাকে জননীর চম্পক-অঙ্গুলি।
ঊর্দ্ধলোকেই তার লোকালয়
আকাশ-প্রদীপে আলোকিত হয়,
পায় সুদূরের নিবিড় আকর্ষণ।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বৈষ্ণবমত-বিবেক

জগৎ-তত্ত্ব

প্রত্যেক আর্য-দর্শনেই জগৎ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। পরিদৃশ্যমান জগৎকে অবশ্যই অগ্রাহ্য করা যায় না। ব্রহ্মসূত্রে এই জন্যই 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' অর্থাৎ ব্রহ্ম সম্বন্ধে জানিবার ইচ্ছা উদয় হইবা মাত্রই সূত্রকার ঋষি দ্বিতীয় সূত্রেই "জন্মাদ্যস্য যতঃ" অর্থাৎ যাহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হয় বলিয়া ব্রহ্মকে জানিবার জন্য জগতই সর্ব্বপ্রথমে গ্রহণ করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ যে ভাগবতকে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভাগবত 'জন্মাদস্য যতঃ' বলিয়া যাহা হইতে জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় বলিয়া সেই জগতের কারণকেই পরম সত্য নির্দ্ধারণপূর্ব্বক প্রথম শ্লোকের আরম্ভ করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী ভাগবতের ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, 'অস্য বিশ্বস্য ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানেককর্ত্তৃভোক্তৃসংযুক্তস্য প্রতিনিয়তদেশকালনিমিত্তক্রিয়াফলাশ্রয়স্য মনসাপ্যচিন্ত্য বিবিধ বিচিত্র-রচনারূপস্য যতো যস্মাৎ অচিন্ত্য শক্ত্যা স্বয়মুপাদানকারণরূপাৎ কর্ত্রাদিরূপস্য জন্মাদি তৎপরং ধীমহীত্যন্বয়ঃ'।

অর্থাৎ 'তৃণ হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত বহু কর্ত্তৃ ও ভোক্তৃসমন্বিত এবং অনবরত দেশকাল নিমিত্ত ক্রিয়ার ফলাশ্রয় স্বরূপ যাহার নানা প্রকার বিবিধ বিচিত্র সৃষ্টির রূপ মনের দ্বারাও অচিন্তনীয়, সেই বিশ্বের যাহা হইতে জন্মাদি অর্থাৎ যিনি অচিন্ত্যশক্তির দ্বার' নিজেই উপাদান কারণরূপে ও কর্ত্রাদিরূপে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করিতেছেন—সেই পরম পুরুষকে ধ্যান করিতেছি।'

শ্রীজীবের এই ব্যাখ্যা হইতে দুইটি কথা বিশেষরূপে পাওয়া গেল। একটি এই যে, ব্রহ্ম বা ভগবান স্বীয় অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা এই বিশ্ব বা জগৎ রচনা করিয়াছেন; দ্বিতীয়তঃ, তিনিই অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা স্বয়ং এই সৃষ্টির নিমিত্ত উপাদান-কারণ হইয়াছেন। কুম্ভকার ঘট নির্ম্মাণ করিতে নিজের শরীরের বাহির হইতে মৃত্তিকা সংগ্রহ করে, কিন্তু ভগবান নিজেই অচিন্ত্য শক্তিবলে নিজ হইতেই এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।

এখন ব্রহ্মই যদি এই জগতের উপাদান-কারণ হন, তবে তিনিই কি এই জগৎরূপে পরিণত হইলেন? সমগ্র ব্রহ্মই এই জগৎরূপে পরিণত হইলেন, না তাঁহার এক অংশ জগৎরূপে পরিণত হইল? এখানে আবার আমাদিগকে সেই উপনিষদ্-পরিভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে,—

> পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
> পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।

অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব তত্ত্বতঃ পূর্ণ, আর যিনি ইহার অদৃশ্য মূলীভূত কারণ তিনিও পূর্ণ; পূর্ণ হইতেই পূর্ণের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে, এবং পূর্ণ হইতে পূর্ণ গ্রহণ করিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকিয়া যায়।

এই কথাকে অবলম্বন করিয়া বুঝিতে গেলে সেই পরমব্রহ্ম বিশ্বরূপে পরিণত হইয়াও নিজে পরিপূর্ণ থাকেন। কেমন করিয়া তাহা সম্ভব হইতে পারে? তজ্জন্য শ্রীজীব বলেন—তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির দ্বারাই ইহা সম্ভবপর।

শ্রীমদাচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন, জগৎ বলিয়া একটি স্বতন্ত্র কিছু নাই, অজ্ঞানের দ্বারাই ব্রহ্মরূপ নিত্য সত্য পদার্থে জগদ্রূপ একটি পদার্থ কল্পিত হইয়াছে। অন্ধকার রাত্রিতে কেহ রজ্জু দেখিয়া যেমন উহা সর্প বলিয়া ভ্রম করে, সেইরূপ অজ্ঞানবশতঃ ব্রহ্মই জগদ্রূপে পরিদৃষ্ট হইতেছেন। ইহাতে ব্রহ্ম যেমন তেমনই আছেন, কিন্তু অজ্ঞানের জন্য সর্প নামক একটি স্বতন্ত্র পদার্থ যে রজ্জুতে কল্পিত হইতেছে। ইহাকে "বিবর্ত্তবাদ" বলে—অতাত্ত্বিক অন্যথা ভাবই বিবর্ত্ত। অর্থাৎ পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়া রূপান্তর-প্রতীতি বিষয়কত্বই বিবর্ত্ত। যেমন শুক্তিতে রজতপ্রতীতি, রজ্জুতে সর্পপ্রতীতি, এস্থানে শুক্তি বা রজ্জু আপন আপন রূপ পরিত্যাগ করে না, অথচ উহাতে রজত ও সর্প ভ্রম হয়; ইহাই বিবর্ত্ত।

নানা যুক্তি ও প্রমাণবলে শ্রীজীব গোস্বামী পরমাত্মসন্দর্ভে ও সর্ব্বসম্বাদিনীতে বিবর্ত্তবাদ খণ্ডন করিয়া তাহা যে শ্রুতিবিরুদ্ধ, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার মধ্যে একটি যুক্তি এই যে, ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, নির্ব্বিশেষ বস্তু কি করিয়া সবিশেষ জগদ্জ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে? অপিচ, অজ্ঞান অর্থ অন্যথা জ্ঞান, উহাও সবিশেষ জ্ঞানান্তর হইতে উৎপন্ন হইয়া নিজেও সবিশেষ হইয়া থাকে। (কিঞ্চাজ্ঞানং নামান্যথা জ্ঞানং; তচ্চ সবিশেষাদেব জ্ঞানান্তরাদনন্তরং স্বয়মপি সবিশেষং জায়তে)। শুক্তিরজত দৃষ্টান্তে শুক্তি ও রজত উভয়ই শুক্লত্বরূপ গুণসম্পন্ন; শুক্লত্বাদি বিষয়ে বুদ্ধি অধিরূঢ় হইলে শুক্তিতে রজত এই মিথ্যাজ্ঞান হয়। কিন্তু নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে এইরূপ সবিশেষ সাদৃশ্যমূলক ভ্রম ও জ্ঞানের বা অজ্ঞানের সম্বন্ধ হওয়া অসম্ভব।

বিবর্ত্তবাদের দ্বারা জগৎসম্বন্ধি জ্ঞান যে অজ্ঞানমূলক, শ্রীমদাচার্য্য শঙ্কর তাহা সিদ্ধান্ত করিয়া দ্বৈতসম্বন্ধি জ্ঞানমাত্রই যে অজ্ঞানকল্পিত, এই উক্তি করিয়াছেন। শ্রীজীব তাহার খণ্ডনপ্রসঙ্গে বলিতেছেন,—

"কিঞ্চ যদি সর্ব্বমেব দ্বৈতজাতং জীবস্যাজ্ঞানকল্পিতং স্যাৎ জীবস্বরূপঞ্চ ব্রহ্মণোঽন্যন্নং, ততো বস্তুতঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাভিমানী কশ্চিদীশ্বরো নামান্যো নাস্তি। কিন্তু স্থাণৌ পুরুষবৎ স্বস্বরূপ একেশ্বর কল্প্যতে, স্বাপ্নিক রাজবদ্বা। তর্হি স্থাণু পুরুষাদিবদীশ্বরাভিমানিনস্তদানীপমপ্যভাবাৎ। তদা তস্য জীবাগোচরত্বেন পুরুষাজ্ঞান কল্প্যমানস্যাপ্যদর্শনাদনুমানসিদ্ধত্বাৎ সম্প্রতিপত্তেঃ, শাস্ত্রৈকগম্যত্বাভ্যুপগমাচ্চ, যানি 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' (ব্রহ্মসূত্র ১।১।২) ইত্যাদীনি সূত্রাণি, যানি চ তদ্বিষয়বাক্যানি তানি প্রলাপরূপাণ্যেব স্যুঃ।"—সর্ব্বসম্বাদিনী ১৪১ পৃঃ।

অনুবাদ—"যদি নিখিল দ্বৈতজাত পদার্থই জীবের অজ্ঞান কল্পিত হয় এবং জীবের স্বরূপ যদি ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু না হয়,

তাহা হইলে বাস্তবপক্ষে সর্ব্বজ্ঞাদি অভিমানী অন্য কোনও ঈশ্বর আছেন, এমন বলা যায় না। তাহা হইলে স্থাণুতে (মুড়া গাছে) যেরূপ পুরুষ কল্পিত হয়, সেইরূপ জীবের স্বরূপেই ঈশ্বর বলিয়া কল্পিত হন, ইহাই বুঝিতে হইবে। মানুষ যেমন স্বপ্নে আপনাকে রাজা বলিয়া মনে করে, এই ঈশ্বর-কল্পনাও তাদৃশ হইয়া পড়ে। যথার্থ জ্ঞানোদয়ে স্থাণুতে যেমন পুরুষ-কল্পনা ব্যর্থ হইয়া যায়, সেই-রূপ অজ্ঞানবিনাশ কালে জীবের ঈশ্বর-অভিমানেরও অভাব হয়। এই অবস্থায় অজ্ঞান কল্প্যমান ঈশ্বরেরও অভাব হওয়া অনুমানসিদ্ধ, সম্প্রতিপন্ন, শাস্ত্রোদিত 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' ইত্যাদি যে জগৎকর্তৃত্ব-দ্যোতক সূত্র ও তদ্বিষয়ক বাক্য আছে, তৎসকলই প্রলাপবাক্যবৎ হইয়া পড়ে।"—বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অনুবাদ ৩৩১।

বিবর্ত্তবাদ যখন শাস্ত্র ও যুক্তিবিরুদ্ধ, তখন পরিণামবাদ স্বীকার ব্যতীত অন্য উপায় নাই—ইহা শ্রীজীব দেখাইয়াছেন।

পরিণামবাদ

—"তত্ত্বতোঽন্যথাভাবঃ পরিণামঃ"

তাত্ত্বিক অন্যথাভাবপ্রাপ্তিকেই পরিণাম বলে। দুগ্ধ যেমন দধিরূপে পরিণত হয়। পরিণামবাদ সম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্রে চারিটি সূত্র আছে—

১। উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি।—(ব্রঃ সূঃ ১।১।২৪) দুগ্ধ ও জল যেমন বাহ্য সাধন অপেক্ষা করে না অথচ দধি ও হিমানী-রূপে পরিণত হয়, তেমনি সাধনান্তর ব্যতীতও অদ্বিতীয় বৈচিত্রী-সম্পন্ন ব্রহ্মেরও জীব ও জগদাকারে বিচিত্র পরিণাম উৎপন্ন হয়।

অনেকে হয় ত বলিবেন—দুগ্ধের দধিতে পরিণত হইবার এবং জলের হিমানীতে পরিণত হইবার কারণ তাপ বা তাপাভাব। কিন্তু সে কারণ দুগ্ধ বা জলের অন্তর্নিহিত দুগ্ধই দধিরূপে পরিণত হয়, জল ত' দধিরূপে পরিণত হয় না। আর এইরূপ পরিণামবাদ যে ব্রহ্মসূত্রের অভিপ্রেত নহে—পরন্তু অবিকৃত পরিণামবাদ বা অচিন্ত্য পরিণামবাদ যে ব্রহ্মসূত্রের অভিপ্রেত, তাহা পরবর্ত্তী সূত্রেই প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—

২। দেবাদিবদপিলোকে—(ব্রঃ সূঃ ২।১।২৫)

চেতন ব্রহ্ম এক বা অসহায় হইলেও দেবতাদির দৃষ্টান্তে বিনাসাধনে সৃষ্টি করিতে পারেন। মন্ত্রে, ইতিহাসে, অর্থবাদে ও পুরাণে দেখা যায়, দেবাদি কোনও প্রকার বিকার প্রাপ্ত হন না, অথচ ঐশ্বর্য্যযোগ-বিশেষে বহু প্রকার নানা স্থানাবস্থিত শরীর, প্রাসাদ, রথ প্রভৃতি কোনও প্রকার উপাদান না লইয়া সৃষ্ট করিয়া থাকেন। মহাপ্রভাবসম্পন্ন দেবগণের এই সকল সৃষ্টি মায়িক নহে—ইহা শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন। দেবগণ যখন অন্য উপাদানের সাহায্য ব্যতীত সৃষ্টি করিতে পারেন, তখন সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মের পক্ষে তাহা অসম্ভব হইবে কেন?

৩। কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দব্যাকোপো বা—(ব্রঃ সূঃ ২।১।২৬)

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন, ব্রহ্ম নিষ্কল, নিষ্ক্রিয় ও শান্ত; ইহাতে জানা যায় যে, ব্রহ্মের অবয়ব নাই। ব্রহ্মের যখন অংশ নাই, তখন তাঁহার আংশিক পরিণামও সম্ভবপর নহে, (কিন্তু শ্রীল রামানুজ-প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এ কথা মানেন না—তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম অবয়বহীন, এ কথার অর্থ এই যে, ব্রহ্মের প্রাকৃত অবয়ব নাই—তিনি অপ্রাকৃতাবয়ববিশিষ্ট। অর্থাৎ প্রাকৃত বুদ্ধির দ্বারা ব্রহ্মের অবয়ব সম্বন্ধে কেহই ধারণা করিতে পারেন না, কিন্তু তাঁহার যে অবয়ব আছে—তাহা "তনুং স্বাম্" "স্বীয় তনু" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা উক্ত হইয়াছে।) এ অবস্থায় মানিতেই হয় যে, সমগ্র ব্রহ্মই জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন। কিন্তু সমুদয় পরিণাম স্বীকার করিলে মূলোচ্ছেদ প্রসঙ্গ হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব বিনষ্ট হইয়া তিনি জগতে পরিণত হইয়াছেন এবং ব্রহ্মত্ব আর অবশিষ্ট নাই—ইহাই প্রতীত হয়। কিন্তু যদি মূলেরই অভাব ঘটে, তাহা হইলে শ্রুতিতে "ব্রহ্মকে দেখিতে হইবে, তাঁহাকে জানিতে হইবে"—এই সকল উপদেশ ব্যর্থ হয় এবং ব্রহ্ম সম্বন্ধে অজর, অমর ইত্যাদি শব্দ একেবারে নিরর্থক হয়। অথচ তাঁহাকে সাবয়ব বলিয়া মনে করিলে তাঁহার সম্বন্ধে শ্রুতিতে নিরবয়ব প্রভৃতির যে উল্লেখ আছে, তাহারও ব্যাঘাত হয়। তাহাতে নিত্য শাশ্বত ব্রহ্ম অনিত্য হইয়া পড়েন। এই জন্য ব্রহ্মসূত্রকার স্বয়ংই উত্তর পক্ষে বলিতেছেন।

৪। শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ—(ব্রঃ সূঃ ২।১।২৭)

পূর্ব্বে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে, তাহার খণ্ডনার্থই এ স্থলে "তু" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ সকল দোষের কোনও আশঙ্কা নাই। শ্রুতিসমূহ স্বকীয় শব্দে যাহা বলিবেন, তাহাই মূল বা প্রকৃতার্থ—নিরর্থক তর্কের দ্বারা কিছু বলা হইলে তাহা শ্রুতির তাৎপর্য্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। শ্রুতি অপৌরুষেয় অর্থাৎ ইহাতে ব্যক্তিবিশেষের উৎপ্রেক্ষাজনিত কোনও কথা বলা হয় নাই; সুতরাং শ্রুতি পরম প্রমাণ। অপিচ, শ্রুতি অলৌকিক পদার্থেরই প্রতিপাদন করিয়াছেন, ইহাতে লৌকিক তর্কের ও লৌকিক জ্ঞানের প্রবেশাধিকার নাই। অচিন্ত্য সম্বন্ধে লক্ষণ এই যে—

"যাহা প্রকৃতি সমূহের অতীত অর্থাৎ যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়াতীত ও ইন্দ্রিয়গোচর সূক্ষ্ম ও স্থূল জড় প্রাকৃত পদার্থনিবহের জ্ঞানাতীত, তাহাই অচিন্ত্য।"

এ সম্বন্ধে শ্রুতি এই—পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি।—কঠ উ ২।১। অর্থাৎ সেই স্বয়ম্ভু ঈশ্বর অনাত্ম বস্তু ও বাহেন্দ্রিয় সমূহকে বিস্তৃত করেন এবং সেই জন্যই লোকে বাহ্যবিষয় সমূহ দর্শন করে।

"ন চক্ষুর্ন শ্রোত্রং ন তর্কো ন স্মৃতির্ন বেদোহ্যেবেনং বেদয়তি ইতি ঔপনিষদং পুরুষং"—বৃ-আ উ ৩।৯।২৬। অর্থাৎ "চক্ষুঃশ্রোত্র, তর্ক, স্মৃতি বা বেদ কেহই ইহাকে জানিতে পারেন নাই, ইনি উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য পুরুষ।"

শ্রীজীব বলিতেছেন—সুতরাং ব্রহ্মকে নিরবয়ব বলিলেও কৃৎস্ন প্রসক্তি (অর্থাৎ ব্রহ্মের সর্ব্বাংশ জগদ্রূপে পরিণতি) দোষ ঘটে না। ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি ঘটে, এ সম্বন্ধে যেমন শ্রুতি আছে—বিকার ব্যতীতও ব্রহ্মের অবস্থান সম্বন্ধে তেমনই শ্রুতি আছে। যথা—

"অজায়মানো বহুধা বিজায়তে।"

অর্থাৎ "তিনি জন্মগ্রহণ না করিয়াও বহু প্রকারে বিশেষ বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হন।" এই জন্য শ্রীজীব বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মের এই জীব ও জগদ্রূপে পরিণাম—"অচিন্ত্যশক্ত্যা বিকাররহিতস্যৈব পরিণামঃ। প্রসিদ্ধিশ্চ লোকশাস্ত্রয়োঃ চিন্তামণিঃ স্বয়মবিকৃত এব নানা দ্রব্যানি প্রসূতে ইতি" অর্থাৎ "অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা বিকাররহিত

ব্রহ্মেরই এই পরিণাম। লোকে ও শাস্ত্রে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, চিন্তামণি নিজে অবিকৃত থাকিলেও নানা দ্রব্য সৃষ্টি করে।"

তিনি অচিন্ত্যস্বভাব, তাঁহাতে সাবয়বত্ব ও নিরবয়বত্ব এই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাশ্রয় অসঙ্গত নহে। তদ্বিষয়ে শ্রুতিই প্রমাণ। শ্রুতিতে যেমন নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত ইত্যাদি বাক্য আছে, তেমনই তিনি চতুষ্পাদ, অষ্টাদশকল, ষোড়শকল ইত্যাদি বাক্যও আছে। এ জন্যই বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে, ইনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন অর্থাৎ পরস্পর-বিরুদ্ধ সর্ব্বশক্তির সমাশ্রয়।

এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা হইয়াছে—

"অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগদ্‌রূপে পায় পরিণাম॥
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অধিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত যে ধরি॥
নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হইতে।
তথাপি ত মণি রহে স্বরূপ অবিকৃতে॥
প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি ইথে কি বিস্ময়?"

—আদি, ৭ম পরিচ্ছেদ।

পরিণামবাদ স্থাপন করিতে গেলে বিশ্বকে কার্য্য এবং ভগবান্‌কে তাহার কারণ, বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কারণ, যে স্থলে সৎ, কার্য্যও সে স্থলে সৎ—কেন না, কারণ হইতে কার্য্য অভিন্ন; কিন্তু তথাপি কার্য্য ও কারণ এক নহে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব নানাবিধ শ্রুতি-প্রমাণের দ্বারা কারণ ও কার্য্য উভয়েরই সত্যতা অঙ্গীকার করিয়া বলিয়াছেন,—

"অতঃ কার্য্যাবস্থঃ কারণাবস্থশ্চ স্থূলসূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তুশক্তিঃ পরমপুরুষ এব কারণাৎ কার্য্যস্যানন্যত্বাৎ।"—সর্ব্বসম্বাদিনী, পৃঃ ১৪৫।

পুনশ্চ:—"একস্যৈব সঙ্কোচাবস্থায়াং কারণত্বং বিকাশাবস্থায়াং কার্য্যত্বমিতি।" অর্থাৎ—অতএব কার্য্যাবস্থাপন্ন এবং কারণ অবস্থায় অবস্থিত স্থূল ও সূক্ষ্ম, চিদচিদ্‌বস্তুশক্তি সেই পরমপুরুষই—যেহেতু, কারণ হইতে কার্য্য অভিন্ন। একই তত্ত্বের সঙ্কোচ অবস্থায় যাহা কারণত্ব, প্রকাশ অবস্থায় তাহাই কার্য্যত্ব, এইরূপ কার্য্যকারণের সম্বন্ধনির্দ্দেশে ভেদাভেদ অনিবার্য্য হইয়া উঠে; তাই শ্রীজীব বলিতেছেন,—

"অতো ভেদাভেদবাদো বিশিষ্ট বস্ত্বপেক্ষয়া প্রবর্ত্ত্যতাম্। অভেদবাদশ্চ বিশেষানুসন্ধানরাহিত্যেনৈবেতি।"

"অপরে তু তর্কপ্রতিষ্ঠানাৎ (ব্রহ্মসূত্র ২।১।১১) ভেদেঽপ্যভেদেঽপি নির্ম্মর্য্যাদদোষসন্ততিদর্শনেন ভিন্নতয়া চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদং সাধয়ন্তঃ তদ্বদভিন্নতয়াপি চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ভেদমপি সাধয়ন্তোঽচিন্ত্যভেদাভেদবাদং স্বীকুর্ব্বন্তি। তত্র বাদর-পৌরাণিকশৈবানাং মতে ভেদাভেদৌ ভাস্করমতে তু। মায়াবাদিনাং তত্র ভেদাংশো ব্যাবহারিক এব প্রাতীতিকো বা। গৌতমকণাদ-জৈমিনি-কপিল-পতঞ্জলিমতে ভেদ এব। শ্রীরামানুজমধ্বাচার্য্যমতে চেত্যপি সার্ব্বত্রিকী প্রসিদ্ধিঃ। স্বমতে ত্বচিন্ত্যভেদাভেদাবেব অচিন্ত্যশক্তিময়ত্বাৎ।"

অনুবাদ—অতএব বিশিষ্ট বস্তুর অপেক্ষা হেতু ভেদাভেদবাদই প্রবর্ত্তিত হউক, আবার যেখানে ঐরূপ বিশেষানুসন্ধান থাকিবে না, সেখানে অভেদবাদই প্রবর্ত্তিত হউক।

অপর কেহ কেহ "তর্কের অপ্রতিষ্ঠা হেতু" ব্রহ্মসূত্রের এই সূত্র অবলম্বনপূর্ব্বক ভেদ ও অভেদ ইহার কোনও একটি মানিতে গেলে শ্রুতিবাক্যের মর্য্যাদালঙ্ঘনরূপ দোষসমূহ উপস্থিত হয় বলিয়া যেমন ভিন্নরূপে চিন্তা করিতে অসমর্থ হইয়া অভেদ সাধন করেন, আবার সেইরূপে অভিন্নরূপে চিন্তা করিতে অসমর্থ হইয়া ভেদবাদসাধনপূর্ব্বক অবশেষে ভেদ ও অভেদ উভয় প্রকার সাধন দুষ্কর দেখিয়া অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ স্বীকার করিয়া থাকেন। বাদর পৌরাণিক ও শৈবসম্প্রদায় ভেদাভেদবাদ স্বীকার করেন, ভাস্করমতেও তাহাই। মায়াবাদিগণ ভেদাংশকে ব্যাবহারিক বা প্রাতীতিক বলিয়া অভেদ স্বীকার করেন। গৌতম, কণাদ, জৈমিনি, কপিল ও পতঞ্জলির মতে ভেদই স্বীকৃত হয়। শ্রীরামানুজ ও মধ্বাচার্য্যমতেও উহাই সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। শ্রীজীব-স্বীকৃত গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মতে "ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিময়ত্ব হেতু অচিন্ত্যভেদাভেদবাদই সঙ্গত।"

শ্রুতির এই প্রকার স্বারস্যরক্ষার চেষ্টা এ পর্য্যন্ত আর কোনও সম্প্রদায়ই এ ভাবে করেন নাই, এই জন্য এই সম্প্রদায়কে স্পষ্ট ভাবে "শুদ্ধশ্রৌতসম্প্রদায়" নামে অভিহিত করিতে পারা যায়।

[ক্রমশঃ

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল)।

অপরূপ

জননীর রূপে পূজেছি তোমায়
সন্তানরূপে করেছি স্নেহ,
বন্ধুর রূপে লভিয়াছ প্রীতি
তুমি ত আমার অচিন্ নহ।
অতিথির রূপে তুমি বার বার
এসেছ আমার কুটীর-দ্বারে।
নানা উপচারে পূজেছি তোমায়
রচিয়া অর্ঘ্য অশ্রুধারে।
ভ্রাতা ও ভগিনী মূরতি তোমার
বন্ধু স্বজন তোমার ছবি।

মধুর ছন্দে জীবন-কবিতা
রচেছ তুমি হে অনাদি কবি,
প্রেয়সীর রূপে রহিয়াছ পাশে
ভরিছ হৃদয় গন্ধে-গানে।
হাস্যোজ্জ্বলা তরুণী চপলা
নিতুই তোমার পরশ আনে।
শ্রমিকের সাজে করিছ কর্ম্ম
চাষার রূপেতে চষিছ ভূমি।
তুমি পরিচিত, তুমি চিন্ময়,
ওগো অপরূপ তোমারে নমি:

শ্রীরেণু গঙ্গোপাধ্যায় (এম-এ, বি-টি)

বাঁশীর ডাকে

১

বেলা তখন সাড়ে-তিনটারও বেশী। পৌষের রৌদ্র তখনই মাটী ছাড়িয়া গাছের পাতায় পাতায় ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। দেবু বৈঠকখানার জানালার শিক ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। যেন কাহারও প্রতীক্ষায় তাকাইয়া থাকায় তাহার চক্ষু দু'টি ঈষৎ চঞ্চল। হঠাৎ মাতার কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে পিছনে চাহিয়া দেখিতে পাইল, তাহার মা আসিয়া তাহার পিছনে দাঁড়াইয়াছেন, তাঁর হাতে এক বাটি দুধ।

মা (মনোরমা) কহিলেন, "তুই ত আচ্ছা ছেলে! আমি ওপর নীচে সারা বাড়ী তোকে খুঁজে মরছি, আর তুই এখানে এসে এমনি ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস্? বেশ করেছিস্! এখন এই দুধটুকু খেয়ে নে।"

দেবু এক নিঃশ্বাসে সব দুধটুকু পান করিয়া মায়ের আঁচলে মুখ মুছিতে মুছিতে কহিল, "সুধীর কখন আসবে, মা? বাবা বলেছিলেন—সাড়ে তিনটেয় ছোটদের ছুটি হয়, কিন্তু এখন যে চারটে বাজে!"

মা কহিলেন,—"তাই বুঝি তুই তার জন্তে এখানে দাঁড়িয়ে আছিস্? সে আসবে গাড়ীতে; সকলের বাড়ী গাড়ী থামতে থামতে আসে কি না, তাই তার আসতে একটু দেরী হয়।"

দেবু পুনরায় প্রশ্ন করিল,—"আচ্ছা মা, সুধীরকে মেয়েদের ইস্কুলে ভর্ত্তি করলে কেন?"

মা হাসিয়া বলিলেন,—"বড্ড ছোট যে, হেঁটে অত দূর যেতে পারবে না তাই;—দু'-এক বছর পরে সে ছেলেদের স্কুলেই প'ড়বে।"—দেবু অবাক্ হইয়া মার কথাগুলি শুনিতেছিল। মা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কার্য্যান্তরে গমন করিলেন।

দেবু তাঁহার প্রথম সন্তান, সুধীর তার ছোট; কিন্তু ভাগ্য-দোষে দেবু ছোটই রহিয়া গেল! মা চলিয়া গেলে দেবু সেই একই ভাবে রাস্তার দিকে চাহিয়া জানালার কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ছোট ভাইটিকে সে চোখের আড়াল করিতে চাহিত না।

প্রায় বছর নয় পূর্ব্বে দেবু দুরারোগ্য মৃগী রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। তখন তাহার বয়স তিন-চার বৎসরের অধিক ছিল না। দেবুর পিতা ভুবন বাবু পুত্রের চিকিৎসার কোন ত্রুটি করেন নাই,—এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, কবিরাজী, এমন কি, অবশেষে হাকিমী মতে চিকিৎসা করাইয়াও কোন ফল হইল না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে রোগ ক্রমশঃই উগ্র হইয়া উঠিল।

এই অবস্থায় কখনও খেলিতে খেলিতে দেবু রাস্তার উপর আছাড় খাইয়া পড়ে। সঙ্গী বালকেরা ভয় পাইয়া মনোরমাকে সেই সংবাদ জানাইয়া আসে। তখন দাস-দাসীর সাহায্যে দেবুকে তুলিয়া আনিতে হয়। আগের মত মনোরমা একা আর ছেলেকে সামলাইতে পারেন না। দুই-চারি জনকে একযোগে দেবুকে ধরিয়া রাখিতে হয়। ফিটের সময় দেবুর গায়ের জোর যেন দশগুণ অধিক হয়!

কখন কখন খাইতে বসিয়া দেবু ভাতের থালার উপরেই মুখ-গুঁজিয়া পড়িয়া যায়। কোন দিন বা থালার কাণায় কপাল কাটিয়া রক্ত পড়ে। তখন ভুবন বাবুকে আফিসে যাইবার সময়ের দিকে না চাহিয়া ডাক্তারের বাড়ী ছুটিতে হয়, আর ছেলের অবস্থা দেখিয়া সংসারের কাজকর্ম্ম, খাওয়া-দাওয়া মনোরমার মাথায় ওঠে! এমনি করিয়া দিনগুলি কাটিতে লাগিল।

ভুবন বাবুর মাতা পৌত্রের আরোগ্য-কামনায় তাঁহার বাসগ্রাম হইতে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিয়া, রিষ্টি কাটাইয়া, মাদুলী, কবচ প্রভৃতি পাঠাইতে থাকেন। দেবুর কোমরে, গলায়, এবং বাহুতে মাদুলী, ও কবচের মালা ঝুলিতে লাগিল; কিন্তু দৈব তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন না। দেবুকে দেবতার কৃপায় বঞ্চিত থাকিতে হইল।

এমনি করিয়া সুদীর্ঘ আট বৎসর কাটিয়া গেল। মানুষের বিরুদ্ধে দৈব ও দৈবের বিরুদ্ধে মানুষ সংগ্রাম করিতে করিতে মানুষই ক্লান্ত হইয়া পড়িল।

দেবুকে লইয়া এখন আর কেহ অতখানি ব্যস্ত নহেন। একা তাহার কোথাও যাওয়া নিষিদ্ধ। তাই বিছানার কাছে থাকিয়াই তাহার সমস্ত দিন কাটিয়া যায়।

মনোরমা দেবতার উদ্দেশে মনে মনে বলেন—"ঠাকুর, সংসারে আমার আর ত কিছু নেই, ঐ একটা ছেলে, সে যে চিরদিন বাপ-মায়ের ভার হ'য়েই রইল।" ভগবান্ বোধ হয় তাঁহার এই আক্ষেপ শুনিলেন। দীর্ঘ আট বৎসর পরে তিনি মনোরমাকে আর একটি সন্তান দান করিলেন।

সংসারে নিরাশার মেঘ কাটিয়া যেন আশার আলো ফুটিয়া উঠিল। বাপ-মায়ের আদরে সুধীর শুক্লপক্ষের শশিকলার মত বাড়িতে লাগিল। পাঁচী দেবুকে ছেলেবেলা হইতে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে। সে এখন ছোট খোকা সুধীরের রক্ষণাবেক্ষণ করে। দেবু চোরের মত চুপি-চুপি পাঁচীর কাছে আসিয়া তাহাকে বলে—"খোকাকে একটিবার আমার কোলে দে না পাঁচী, আমি ওকে ফেলে দেব না।" পাঁচী সভয়ে বলে—"না, দাদা, ওকে তোর কোলে দেবো না; তুই রোগা ছেলে, কে জানে, কখন মূর্চ্ছো

যাবি ? আর খোকা প'ড়ে-গিয়ে খুন হবে, তখন তোর কতই খোয়ার হবে !"

দেবু সতৃষ্ণ নয়নে খোকার দিকে চাহিয়া থাকে। কি সুন্দর তাহার ভাই! দেখিতে ঠিক যেন শ্বেত-পাথরের পুতুল! নিজের শরীরের দিকে চাহিয়া দেবু ভাবে—তার নিজের রংটা সত্যই ভারী কালো।

২

দেবুর নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গী শুধু এই ছোট ভাইটি। যতক্ষণ সুধীর বাড়ীতে থাকে, দেবু ছায়ার মত সঙ্গে থাকে। চাকরের হাত ধরিয়া সুধীর বেড়াইতে বাহির হইলে, দেবু তাহার ফিরিবার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে। সন্ধ্যায় মাষ্টার আসেন—সুধীরকে পড়াইতে। দেবু অবাক্ হইয়া অধ্যয়নরত ছোট ভাইটির দিকে চাহিয়া থাকে। সুধীর বই না দেখিয়া পড়া মুখস্থ বলে,—দেখিয়া দেবুর বিস্ময়ের সীমা থাকে না। সে ভাবে, বই-এর একটা কথাও ত তার মনে থাকিত না।

মানুষ বড় স্বার্থপর। সে যখন দেখে, ইহার দ্বারা ঝঞ্ঝাট সহ্য করা ছাড়া কোন কালে নিজেদের বিন্দুমাত্র স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই, তখন মানুষ সে বেচারাকে যেন আবর্জ্জনার স্তূপে ফেলিয়া দিতে পারিলেই বাঁচে।

জ্ঞান হইবার পর হইতেই সুধীর শুনিতেছে, দাদা রুগ্ন, বুদ্ধিহীন, এবং একান্ত পরপ্রত্যাশী, তাহার বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনা! তাই তাহার ধারণা হইয়াছে—দেবু তাহাদের সংসারের একটা অনাবশ্যক বোঝা, আর সে নিজে সকলের আশা-ভরসার স্থল, বংশের গৌরব। দাদার আর তাহার মধ্যে প্রভেদ বিস্তর! এমনি ধারণা, এবং অনুরূপ পরিবেষ্টনীর মধ্যে সুধীর মানুষ হইতে লাগিল।

সুধীর মেধাবী ছাত্র। প্রথম পুরস্কারের বইগুলি আনিয়া সে পিতার হাতে দিয়া বলিল,—"বাবা, এই দেখ, আমার প্রাইজের বই।" ভুবন বাবু বইগুলি হাতে লইয়া সোল্লাসে বলিলেন—"বাঃ, এ যে অনেক বই রে!" তার পর পুত্রের পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"আশীর্ব্বাদ করি, জীবনের সব পরীক্ষাতেই তুমি যেন এমনি ভাবে উত্তীর্ণ হ'তে পার।" গৃহিণী নিকটেই ছিলেন; তিনি আনন্দাশ্রু মোচন করিয়া কহিলেন,—"ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, বাবা, তুই আমার নীরোগ হ'য়ে বেঁচে থাক।" আর এক জনও সকল কথা শুনিয়া নীরবে সুধীরের কল্যাণ কামনা করিল; কিন্তু এ সংসারে তাহার প্রার্থনার কোনও মূল্য নাই বুঝিয়া সে কাহাকেও তাহার কামনার কথা জানিতে দিল না।

সুধীর চা খাইয়া বন্ধুদের সঙ্গে খেলার মাঠে চলিয়া গেল। দেবু কি ভাবিয়া চুপি-চুপি চোরের মত সুধীরের পড়ার ঘরে গিয়া দাঁড়াইল। জরীর ফিতায় বাঁধা একতাড়া বই। টেবিলের কাছে গিয়া সে বাঁধন খুলিয়া একখানা বাংলা বই তুলিয়া লইল। পাতা উল্টাইতেই তাহার দৃষ্টি পড়িল একখানি সুন্দর ছবির উপর। মা সরস্বতী কালিদাসকে বরদান করিতেছেন। ছবির নিম্নের কথাটি দেবু অস্ফুট স্বরে পড়িতে লাগিল—"বৎস, তোমার তপস্যায় আমি তুষ্ট হইয়াছি। তোমার সকল অজ্ঞতা দূর করিয়া আজ হইতে তোমার কণ্ঠে আমি অধিষ্ঠিত থাকিব।"

দেবু ভাবিতে লাগিল—আহা! ভগবান্ যদি অমনি করিয়া তাহাকে দয়া করিতেন। নিমেষে যদি তাহার সকল রোগ-বালাই দূরে সরিয়া যাইত, তাহা হইলে সে-ও আর সকলের মত হাসিয়া-খেলিয়া বেড়াইতে পারিত। স্কুলে যাইতে পারিত, লেখাপড়া শিখিয়া শেষে মানুষের মত মানুষ হইয়া……। সে আর ভাবিতে পারিল না। তাহার হাতের বইখানা যেন লাফাইয়া উঠিল, এবং পায়ের তলার মাটী ঘর-বাড়ীর সঙ্গে যেন দুলিতে লাগিল! দেবু মূর্চ্ছিত হইয়া সশব্দে সেই স্থানে পড়িয়া গেল।

মনোরমা তখন কাপড় কাচিয়া উপরে উঠিতেছিলেন। দেবুর পতনের শব্দে চমকিয়া উঠিয়া ভিজা কাপড় ও সেমিজের গোছাটা বারান্দায় ফেলিয়া-রাখিয়াই ছুটিয়া আসিলেন; তিনি দেবুর অবস্থা দেখিয়া আর্ত্ত স্বরে কহিলেন,—"ওমা, কপালের কতখানি কেটে গেছে রে!·· ওগো শীগ্‌গির এসো, দেবু এ ঘরে পড়ে গেছে।" পাঁচীর সাহায্যে মনোরমা দেবুকে সজোরে চাপিয়া ধরিয়া রহিলেন। অল্প-কাল পরে ভুবন বাবু নীচে নামিয়া আসিয়া পত্নীকে কহিলেন,—"আইডিন্ দিয়ে বেঁধে দাও, তাতেই সেরে যাবে। হামেশাই ত বাড়ীতে কাটা-ছেঁড়া লেগে আছে, আর রক্তপাতেরও বিরাম নেই। হতচ্ছাড়া ছোঁড়াকে বিছানায় বসিয়ে রাখতে পার না? ওর জন্মে যখন-তখন বাড়ীতে একটা অনর্থ লেগেই আছে। জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মারলে!"

মনোরমা বিরক্তিভরে কহিলেন,—"মানুষ সারাদিন কি বিছানায় ব'সে থাকতে পারে?"

ভুবন বাবু ঝাঁঝিয়া উত্তর দিলেন,—"মানুষে পারে না, কিন্তু জানোয়ারে পারে। মানুষের স্বভাবের কি আছে ওটার? ওটা ছিল আর-জন্মে আমার মহাজন। সে জন্মে পেরে ওঠেনি, তাই এ জন্মে আমার ঘাড় ধ'রে দেনার টাকাগুলো আদায় করচে। হতভাগা মরেও না ত, মরলে যে বাঁচি!" এই মন্তব্য করিয়া ভুবন বাবু চটি জুতার ফট্-ফট্ শব্দ করিতে করিতে উপরে উঠিতে লাগিলেন।

অভিমানে ও অন্তর্বেদনায় জননীর চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। আহা! হ'লই বা সে অক্ষম, অকর্ম্মণ্য,—তবু ত তাঁর নাড়ী-ছেঁড়া ধন!

৩

কাল অশ্রান্ত গতিতে ধাবিত হয়। মানুষের সুখে, দুঃখে, হাসি-কান্নায় তাহার গতি স্থগিত বা মন্থর হয় না। তাহার অব্যাহত গতি কোন কারণেই ব্যাহত হয় না।

সে বৎসর কলিকাতায় বসন্ত রোগ মহামারীরূপে দেখা দিল। ভুবন বাবু বসন্তের আক্রমণে সাত দিন নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগের পর রোগের হাত হইতে চিরনিষ্কৃতি লাভ করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি সুধীরকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন,—"বাবা সুধীর, তোমার মা আর তোমার দাদাকে দেখো। দেবুকে তোমার দাদা ব'লে ভাবতে না পার, মনে ক'রো, ও তোমার বিধবা বোন!…"

শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকিলে সুধীর মাতাকে কহিল,—"মা, তোমরা যদি দেশের বাড়ীতে গিয়ে সেখানে থাকো, তা হ'লে বোধ হয় একটু সুবিধে হয়। কলকাতার বাড়ীটা ভাড়া দেওয়া যাক, তাতেই আমাদের খরচ চলে যাবে। আমি মেসে থেকে প'ড়বো, আমার ইচ্ছে নয় যে, পড়া ছেড়ে দিই।"

সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া ও পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া

মনোরমাকে এই প্রস্তাবে রাজী হইতে হইল। সময়ে শোকের প্রথম বেগ প্রশমিত হইলে মনোরমা তল্পী-তল্পা বাঁধিয়া, কলিকাতার বাস উঠাইয়া দেবুর সহিত এক দিন তাঁহাদের পল্লী-ভবনে ফিরিয়া চলিলেন।

পল্লীগ্রামের বাড়ীতে আসিয়া দেবু যেন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। সহরের মত এখানে নিজের দীনতা সে অনুভব করিতে পারিল না। পল্লীগ্রামের মুক্ত নীল আকাশ, শ্যামল মাঠ, দীঘির কাল জল, সোণার ক্ষেত হইতে আরম্ভ করিয়া পাড়ার দীনু ঘোষাল, নকুড় মণ্ডল, হীরু ঠাকুর্দ্দা, এমন কি, বাঁশতলার প্রতিবেশী গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান উদয় কাণা পর্য্যন্ত দেবুকে অত্যন্ত সহজ ভাবেই গ্রহণ করিল। দেবু ভাবিল, ইহারা কি অন্য জগতের লোক? নহিলে তাহারা তাহার সহিত প্রাণ খুলিয়া মিশিতেছে কিরূপে?

প্রথম বৎসরটা সুধীর নিয়মিত ভাবে টাকা পাঠাইয়া তাহাদের খোঁজ-খবর লইয়াছিল। পরে টাকার পরিমাণ ও তাহার বাড়ী আসিবার আগ্রহ এ দুই-ই অনেকটা কমিয়া গেল। এবার আট মাস পরে সে বাড়ী আসিল। মাতাকে জানাইল, সে ভালই ছিল, তবে পড়ার চাপে বাড়ী আসিবার সময় করিয়া উঠিতে পারে না, সময়মত চিঠি-পত্র লেখাও ঘটিয়া উঠে না—ইত্যাদি।

দ্বিপ্রহরে দুই পুত্রকে ভাত বাড়িয়া দিয়া মনোরমা তাহাদের কাছেই বসিয়া ছিলেন। সুধীর এক-টুক্‌রা মাছ মুখে দিয়া বলিল, —"কলকাতায় কিন্তু এমন মিষ্টি মাছ খেতে পাওয়া যায় না। বরফ-দেওয়া চালানী মাছে না আছে স্বাদ, না আছে টাট্‌কা মাছের গন্ধ।"

মনোরমা বলিলেন,—"আজ তুই আসবি ব'লে দেবু সকাল থেকে বসে পশ্চিমের পুকুরটায় ছিপ ফেলেছিল,—পুকুরের টাট্‌কা মাছ খাচ্ছিস্ কি না।" আহার বন্ধ করিয়া দেবু সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ করিয়া শুনিতে চাহিল সুধীর কি বলে।

সুধীর বলিল,—"দাদা বুঝি এখানে এসে ছিপ দিয়ে মাছ ধ'রতে শিখেছে? তবু ভাল যে, একটা কিছু শিখ্‌তে পেরেছে।" মুহূর্ত্তে দেবুর মুখের ভাত যেন বিস্বাদ হইয়া গেল। ছোট ভাইএর তাচ্ছিল্যপূর্ণ মন্তব্য শুনিয়া, এত চেষ্টা করিয়া ধরা রুই মাছ তাহার আর মুখে দিতে ইচ্ছা হইল না। সকালে মাতার নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া, রোগা শরীর লইয়াই সে পুকুরে ছিপ ফেলিতে গিয়াছিল। পাঁচী সকল কাজ ফেলিয়া মূর্চ্ছারোগগ্রস্ত দেবুকে পুকুরঘাটে আগলাইয়া বসিয়া ছিল।

চার-পাঁচ দিন পল্লীভবনে বাস করিয়া সুধীর কলিকাতায় যাত্রা করিল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, সাম্‌নের ছুটিতে সে দেশে আসিতে পারিবে না, কোন বন্ধুর সহিত রাঁচি বেড়াইতে যাইবে। মনোরমা বাধা দিলেন না, শুধু বলিলেন,—"যেখানেই থাকো বাবা, মাঝে মাঝে চিঠি-পত্র লিখো। ছেলেটাকে নিয়ে একলাটি এখানে প'ড়ে আছি, সময়মত তোমার খবর না পেলে দুশ্চিন্তায় মনটা বড়ই হু হু করে।" তাহার পর একটু থামিয়া সঙ্কোচ ঠেলিয়া অতি কষ্টে বলিলেন,—"কলকাতায় গিয়ে অন্তত: গোটা-দশেক টাকা পাঠিয়ে দিও। মুদীর দোকানে কিছু দেনা হ'য়েছে, সে আর টাকা ফেলে রাখতে চাইছে না। আর ঘরের অবস্থাও তো দেখছো। বর্ষার আগে ছাদটা সারাবার একটা ব্যবস্থা না করলে সারা-বর্ষায় জলটা মাথার উপর দিয়ে যাবে। আর চণ্ডীমণ্ডপের ও-ধারটাতো"—

অসহিষ্ণু ভাবে বাধা দিয়া সুধীর কথার মাঝখানেই বলিল,— "তোমার চিঠি-লেখা মানেই তো টাকার তাগিদ দেওয়া। সেই জন্যই তো জবাব দিইনে। টাকা পাঠাব কোথা থেকে বলতে পার? আমি কি রোজগার করছি? সম্পর্ক তো তোমাদের আমার সঙ্গে নয়, আমার টাকার সঙ্গে।"

ক্ষোভে ও বিস্ময়ে মনোরমা হতবাক্ হইয়া রহিলেন। তাঁহার মাতৃহৃদয়ে অভিমান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। গর্ভের সন্তান, যাহাকে বুকের রক্ত দিয়া পরিপুষ্ট করিয়াছেন, নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য আজ তাহার কাছেও হাত পাতিতে তিনি মর্ম্মান্তিক কষ্ট অনুভব করিলেন; কিন্তু উপায় নাই, দেবুর জন্য তাঁহাকে এ হীনতা স্বীকার করিতেই হইবে। দেবু যদি সুধীরের মত এমন করিয়া মাকে ভুলিতে পারিত, তবে বোধ হয় তিনি মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিতেন; কিন্তু ভগবান্ সে সাধে বাদ সাধিয়াছেন, তাহা যে সম্ভব নয়। মনোরমা স্থির-স্বরে বলিলেন,—"কলকাতার বাড়ী থেকে প্রতি-মাসে ষাট টাকা ভাড়া পাওয়া যায়, সেটা তো তোমার রোজগার করতে হয় না।"—দেবু কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল, মায়ের কথা শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।

দেবুর সে হাসি সুধীরের দৃষ্টি এড়ায় নাই; তাহা তাহার গায়ে তীরের মত বিঁধিল। তীক্ষ্ণ স্বরে সে মাতাকে ব'লল,—"তুমি সব জেনে-শুনেও কিছু না-জানার মত কথা বল্‌লে, মা! দাদা হয় তো জানে না, কিন্তু তুমি তো জান, ক'লকাতার বাড়ীটা বাবা আমার নামেই উইল করে দিয়ে গেছেন; কাজেই তার আয়টাও আমার। আর দেশে থাকলে তোমাদের এত বেশী খরচই বা হয় কেন? দেশের যা-কিছু, সবই তো দাদা পেয়েছে। আমি তো তার ভাগ চাচ্ছিনে; কারণ, বাবা এ-সব দাদাকেই দিয়ে গেছেন। এখানকার ক্ষেতের কলা-মূলোতেই তো পেট চলে যায়। কলকাতায় কি তা চলে? আমার নিজের খরচই আমি এত কষ্ট করেও চালাতে পারিনে; তার ওপর তোমাদের আবদারের আর সীমা নেই! আমাকে কলকাতার সভ্য-সমাজে বাস করতে হয়, কাজেই সব দিক্ মানিয়ে চ'লতে হবে তো। বাবা তোমাদের যা দিয়ে গেছেন, তাতেই তোমাদের চালিয়ে নেওয়া উচিত।"

মনোরমা এইবার একটু হাসিয়া পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,— "তোমাদের মানেটা কি বাবা?"

সুধীর অম্লান বদনে বলিল—"কেন, তোমার আর দাদার।"

কোন বাধা না মানিয়া অবাধ্য দীর্ঘশ্বাস অকৃতজ্ঞ পুত্রের সম্মুখেই মনোরমার বুক ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। মনোরমা অবিচলিত স্বরে কহিলেন,—"কেবল তোর দাদাকেই কি আমি পেটে ধরেছিলুম, সুধীর? তোকেও কি আমায় পেটে ধ'রে ছেলেবেলা থেকে মানুষ ক'রতে হয়নি? আজ তুই সচ্ছন্দে আমাদের ছেঁটে-ফেলে নিজের মান আর সুখ-সাচ্ছন্দ্য বজায় রাখতে চাইছিস্? উনি রাগ করে মধ্যে মধ্যে ব'লতেন, দেবু ওঁর মহাজন, এ জন্মে ঘাড় ধ'রে ঋণ শোধ করিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু আমি বলি, তুই তার চেয়েও ভীষণ! যে পরগাছাগুলো তাদের আশ্রয়ের গাছটাকে শুকিয়ে-মেরে নিজে পুষ্ট হতে চায়, এখন দেখছি, তুই তো তাদেরই সমান রে! তোর মত পরগাছা পেটে ধ'রে এক দিন আমার আনন্দের সীমা ছিল না। সে দিন ভগবান্ বোধ করি অলক্ষ্য থেকে আমার নির্ব্বুদ্ধিতা

লক্ষ্য করে হেসেছিলেন ! ছেলে তুই, এর বেশী কি আর তোকে ব'লতে পারি ?"

৪

দ্বিপ্রহরের কাঠ-ফাটা রৌদ্রে দেবু হন্-হন্ করিয়া পোষ্ট আফিস হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল। হীরু ঠাকুর্দার চণ্ডীমণ্ডপের কাছে আসিয়া তাহার মাথাটা কেমন ঝিম্-ঝিম্ করিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি দালানের একধারে বসিয়া পড়িল। সেখানে তখন দ্বিপ্রহরের দাবার অধিবেশন প্রবল ভাবেই জাঁকিয়া উঠিয়াছে। তখন যদি তাঁহাদের চণ্ডীমণ্ডপে মা চণ্ডী স্বয়ং আসিয়া দেখা দিতেন, তাহা হইলেও বোধ হয় খেলোয়াড়দের দৃষ্টি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত না।

তথাপি দেবুকে ঐ ভাবে বসিয়া-পড়িতে দেখিয়া হীরু ঠাকুর্দা ব্যগ্র ভাবে বলিয়া উঠিলেন,—"দেখ তো, ছোঁড়াটা অমন ক'রে ব'সে পড়ল কেন ? ভীরমী লাগলো না তো ? তোমরা এসে ধর ওকে ; যা ভেবেছি তাই ! মুখটা ইটের ওপর থেকে তুলে ধর, ঘসে না যায়।"

তখন কেহ জল, কেহ পাখা আনিয়া তাহার সেবা আরম্ভ করিল। কেহ বা তাহার হাত-পা ধরিয়া টানিয়া দিতে দিতে তাহার দুর্ভাগ্যের বিষয় আলোচনা করিতে লাগিল। পথে, মাঠে, পুকুরঘাটে, আমবাগানে, যেখানে-সেখানে দেবুর মূর্চ্ছা হয়। সকলেরই তাহা একরকম গা-সহা হইয়া গিয়াছিল ; তথাপি তাহার শুশ্রূষার কোন ত্রুটি হইল না।

খানিক পরে দেবু চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল। হীরু ঠাকুর্দা কহিলেন, "একা কেন বেরিয়েছিলি, দাদা ? কাউকে সঙ্গে নিতে হয়। পাড়ায় আমরা এত লোক থাকতে তুই কি শেষে বেঘোরে মারা যাবি ? লোকে কি ব'লবে আমাদের, বল্ দেখি ?"

হীরু ঠাকুর্দার পাঁচ-ছয় বৎসর বয়সের পৌত্র মন্টু কহিল,—"আমাকে ডাকলে না কেন দেবুদা ! আমি তোমার সঙ্গে যেতুম। জেঠাইমার জ্বর হ'য়েছে কিনা, তাই তুমি একা পালিয়েছ।"

নবীন ঘোষাল কহিলেন,—"বৌমার জ্বরটা একটু ভোগাবে ব'লে মনে হচ্ছে। কাল বৈকালে দেখতে গিয়েছিলাম, যেন একটু শ্লেষ্মাধিক্য ব'লেই মনে হোলো।" তার পর দেবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"মকরধ্বজটা তুলসীপাতার রস ও মধু দিয়ে মেড়ে খেয়েছিলেন তো ?"—দেবু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে, তাঁহার উপদেশ পালিত হইয়াছিল।

গ্রাম্য কবিরাজ ঘোষাল মশায় দয়া করিয়া দেবুর মাতাকে দেখিতেছেন। সুধীর এখন ডাক্তারী পড়িতেছে, কাজেই তাহার খরচও বেশী, সময়ও কম।

আজ দেবু মাতার নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়াই সুধীরকে মাতার সাংঘাতিক অসুখের কথা জানাইয়া টেলিগ্রাম পাঠাইয়া আসিল। পাঁচ জন প্রতিবেশী দেবুর মাকে সযত্নে দেখাশুনা করিতেছিলেন। সন্ধ্যার সময় ঘোষাল-গৃহিণী বাড়ী ফিরিবার পূর্ব্বে দেবুকে কহিলেন, —"রাতে যদি দরকার বুঝিস্, তাহ'লে পাঁচীকে দিয়ে একটা খবর পাঠাস্। কথাটা মনে রাখিস্ বাবা, বুঝেছিস্ ?"

দেবু শুধু মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। শিশুর মত সরল এবং একান্ত অসহায় এই যুবকটিকে পল্লীবাসী সকলেই অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।

ঘোষাল-গৃহিণী চলিয়া গেলে মনোরমা ডাকিলেন—"বাবা দেবু !"

—"কি, মা ?"

—"তুই আমার বড় ছেলে। মরবার সময় তোর মুখ দেখে ম'রবো, আর মরবার পর তোর হাতের আগুন পাব—এ দুটোই আমার বড় আশার কথা বাবা, তা জানিস্ তো ?"

দেবুর চোখে জল আসিতেছিল ; সে কহিল,—"সুধীরকে আমি টেলিগ্রাম করেছি মা, সে কাল দুপুর-নাগাদ এসে পৌঁছবে।"

পরদিন বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিলে হয় তো মনোরমার কৃতী পুত্রের দর্শন লাভ ঘটিলেও ঘটিতে পারিত ; কিন্তু প্রদীপের তেল ফুরাইলে তাহাকে জ্বালাইয়া রাখা মানুষের অসাধ্য। তাই মনোরমাকে তাঁহার অক্ষম, নিরুপায় পুত্রের অসহায় মুখখানি দেখিতে দেখিতেই মরিতে হইল। পরদিন প্রত্যূষে সকলের সহিত "হরিবোল" দিয়া দেবু মায়ের মৃতদেহ নদীতীরস্থ শ্মশানঘাটে লইয়া চলিল। সকলেই অবাক্ হইয়া দেখিল, মায়ের শোকে দেবুর চোখে এক ফোঁটাও জল নাই ! কেবল মুখাগ্নি করিবার সময় হাতের আগুন-শুদ্ধ সে মায়ের মুখের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল ; সঙ্গে সঙ্গে তাহার রুদ্ধ কণ্ঠ হইতে বুক-ফাটা "মা গো !"—শব্দমাত্র নিঃসারিত হইল।

শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটিয়া গেলে সুধীর কহিল—"দাদা, আমার সঙ্গে কলকাতায় চল। এখানে তোমাকে দেখবে কে ? আমার তো এখানে থাকা সম্ভব হবে না। সেখানে ঠাকুর, চাকর আছে।"

কথাটা শুনিয়া দেবুর বুকের অন্তস্তল পর্য্যন্ত ভয়ে শুকাইয়া উঠিল। কলিকাতা তাহার পক্ষে স্নেহহীন, নীরস মরুভূমি-তুল্য স্থান ! মা-বাবা বাঁচিয়া থাকিতেই সেখানে তাহার জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল ; আর আজ সে সেখানে কি অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইবে ? সেখানে আছে স্নেহের পরিবর্ত্তে বিদ্রূপ, সেবার পরিবর্ত্তে উপেক্ষা। বিশেষতঃ, সুধীরের সচ্ছন্দ উজ্জ্বল জীবন-যাত্রার পাশে তাহার আশা-ভরসাহীন, নিরানন্দ জীবনের ভার লইয়া সে এক দিনও থাকিতে পারিবে না। তাই সে কুণ্ঠিত ভাবে বলিল,—"পাড়ার সকলেই আমায় খুব ভালবাসেন। এখানে আমার কোন কষ্ট হবে না, ভাই !"

সুধীর বলিল,—"তবুও আমার একটা কর্ত্তব্য আছে তো ? এখানে তুমি একলাটি প'ড়ে থাকবে, আর সেখানে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকবো—সে তো আর সম্ভব নয়।"

দেবুর বুকের ভিতরটা একটা অনাস্বাদিত পুলকে নাচিয়া উঠিল। আজ মা নাই, তাই ছোট ভাইটি তাহাকে নিজের কাছে রাখিতে চাহিতেছে। তাহা হইলে সুধীর সত্যই দাদাকে ভালবাসে ; কিন্তু সেই ভালবাসার জোরে দেশের মাটি ছাড়িয়া যাইবার মত প্রেরণা সে মনের মধ্যে খুঁজিয়া পাইল না ; তাই সে একটু হাসিয়া বলিল,—"আমাকে নিয়ে তুমি দু'দিনেই বিব্রত হ'য়ে পড়বে ভাই ! জানো তো, আমার দেহ আমার নিজের বশে নয়। তোমার পড়াশুনার ক্ষতি হ'তে পারে। তার চেয়ে তুমি মাঝে মাঝে এসে খোঁজ-খবর নিও, সেই ভাল হবে।"

ক্ষুণ্ণ স্বরে সুধীর বলিল—"বেশ, তাই থাকো ; কিন্তু এর পরে আমার ওপর কোন দোষ না পড়ে !"

দেবু হাসিয়া বলিল,—"না রে, না, এতে দোষের কথা কি আছে ?"

৫

লেকের ধারে একটা বেঞ্চির উপর সুধীর বিষণ্ণ মুখে স্তব্ধ ভাবে বসিয়া ছিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে তাহার দুই চোখে হতাশার ছায়া যেন ঘনাইয়া আসিতেছিল। তাহার পার্শ্বোপবিষ্টা তরুণীর মুখও সেইরূপ ম্লান।

সুধীর তরুণীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—"রীতি, তুমি এ ভাবে আর আমার সঙ্গে মেলামেশা ক'রো না। তোমার বাবার যখন এমন অদ্ভুত খেয়াল, তখন তুমি আমায় ভুলে যাও; আর আমিও…" কথাটা সুধীর শেষ করিতে পারিল না।

রীতি সুধীরের হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে চাপিয়া-ধরিয়া বলিল,—"কেন কতকগুলো বাজে কথা নিয়ে মন-খারাপ করছ, বলো তো? বাবা যাই বলুন না কেন, তুমি কি আমার মন জানো না? আমি তো কচি খুকী নই, আমারও তো একটা স্বাধীন মত আছে।"

সুধীর বলিল,—"তা কি হয়? আমার জন্য তুমি তোমার বাবার অবাধ্য হবে? তা তো উচিত নয়, রীতি!"

রীতি দৃঢ় স্বরে উত্তর দিল,—"অবাধ্যতার কোন প্রশ্নই উঠ্‌তো না—যদি তিনি গৌরীদানের পুণ্যের লোভে আট বছর বয়েসে আমার বিয়ে দিয়ে ফেল্‌তেন। কিন্তু তা তো হয়নি। এই সতের-আঠার বছর বয়স পর্য্যন্ত তিনি আমাকে যে ভাবে মানুষ ক'রে তুলেছেন, তাতে যদি আমি এখন এ বিষয়ে দু-একটা কথা বলি, বাবার তা অসহ্য হবে না, নিশ্চয়ই। এটা তুমি ঠিক জেনে রেখো—বাবা যাই বলুন না কেন, আমি তোমাকে ভিন্ন আর…" কথার বাকি অংশটা লজ্জায় আলোকপ্রাপ্তা আধুনিকা, তরুণী রীতিরও মুখে বাধিয়া গেল! তাহার গোলাপী গণ্ড যেন আবীর-রঞ্জিত হইল। সন্ধ্যার অন্ধকারে সুধীর তাহা দেখিতে পাইল না।

সুধীর ধীরে ধীরে বলিল,—"কিন্তু বিলেত যাবার মত আমার তো অবস্থা নয়; আর তোমার বাবারও ধনুর্ভঙ্গ পণ—বিলেত ফেরৎ ছাড়া অন্য কেউ তাঁর জামাই হবে না।"

রীতি বলিল,—"ওটা বাবার শুধু জিদ্ নয়, ওটা তাঁর মস্ত একটা মোহ! আমাদের তিন জামাই-বাবুকেই তো তুমি দেখেছ।"

সুধীর ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল,—"কিন্তু আমাকে দিয়ে বোধ হয় শেষ-রক্ষা হবে না।"

রীতি সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিল,—"নিশ্চয়ই হবে। ইচ্ছে থাক্‌লেই উপায় হয়।"

নিরুপায়ের মত সুধীর বলিল,—"কৈ, উপায় তো আমি কোন দিকেই দেখ্‌তে পাচ্ছিনে।"

বার দুই ঢোক গিলিয়া রীতি বলিল—"তোমার কলকাতার বাড়ীটা বিক্রী ক'রে দাও না!" সুধীরকে নিরুত্তর দেখিয়া সে উৎসাহে বলিতে লাগিল,—"সেখানে গেলে তোমার টাকার জন্যে আটকাবে না। এখন বাবার ধারণা হয়েছে, তুমি কেবল জিদ্ ক'রেই যেতে চাইছ না।"

সুধীর দৃঢ় স্বরে বলিল—"তা হয় না, রীতি! পৈতৃক বাড়ী, ওটা বাবা আমায় দিয়ে গেছেন; তাঁর স্নেহের দান—সেই বাড়ী বিক্রী করে আমি বিলেতী শিক্ষার খরচ চালাতে চাইনে। তা ছাড়া, পৈতৃক যে সম্পত্তি আমার অর্জ্জনের শক্তি নেই, সে শক্তি কখন হবে কি না তাও জানি নে—সেই সম্পত্তি নষ্ট করা আমি আমার স্বর্গগত পিতার অসম্মান বলেই মনে করি।"

রীতি ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিল,—"তা বেশ, যেও না বিলেতে। আমার ভুল ভেঙ্গে গেল, সে ভালই হ'ল। আমি জানতুম, এ রকম কথা ব'লতে তোমার মুখে একটুও বাধ্‌বে না।"—শেষের দিকে তাহার স্বর গাঢ় হইয়া আসিল।

সুধীর কোমল কণ্ঠে কহিল,—"তুমি কিছুই জান না, আর কিছুই বোঝ না; বড়ই ছেলেমানুষ তুমি! কিন্তু আমি একটা উপায় স্থির ক'রেছি।"

অভিমান ভুলিয়া রীতি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি উপায়, বল্‌তে বাধা আছে?"—সুধীর অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া রহিল, কোন জবাব দিল না। রীতি নিজের কথার জের টানিয়া বলিতে লাগিল,—"তোমার মত 'ব্রিলিয়াণ্ট্ স্কলারের' একবার বিলেত ঘুরে আসা খুবই দরকার। বিলাতী ডিগ্রীর কদর তখন বুঝতে পারবে হয় তো।"

সুধীর হাসিয়া বলিল—"তোমার চেয়েও?"

রীতি তেমনি হাসিতে হাসিতে বলিল,—"নিশ্চয়ই; অন্ততঃ বাবার কাছে আগে বিলাতী ডিগ্রির কদর, তার পর আমার কদর। বুঝলে? আমি তা'হলে বাবাকে বলি, রাজী আছ বিলেত যেতে, —কেমন?"

সুধীর বলিল—"আচ্ছা, আমাকে তবে দু'দিন সময় দাও, আমি ভাল ক'রে ভেবে দেখি।"

৬

প্রায় দেড় বৎসর পরে, সুধীর দেশে আসিতেছে। দেবুর আনন্দের সীমা নাই। সে দু'দিন ধরিয়া নিজেকে, সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার আর পাঁচ জনকেও ব্যস্ত করিয়া তুলিল। পুঁটুর মাকে সে দিনের মধ্যে দশ বার স্মরণ করাইয়া দেয়, এ-কয়দিন যেন সে এ-বাড়ীতে রাঁধিয়া দিয়া যায়। ভৈরব জেলেকে পঞ্চাশ বার তাগিদ দিয়াছে, যেন সে কাল বেলা সাতটার মধ্যে পশ্চিমের পুকুরটায় একবার জাল টানিয়া দেয়। রঘুনাথ গোয়ালাকে দেবু দু-হাঁড়ি দৈএর ফরমাস দিয়া আসিবার সময়েই সতর্ক করিয়া দিয়াছে যে, তাহার দৈ যেন ঠিক ক্ষীর-পাতা দৈ হয়; না হইলে সুধীর তা ছোঁবেও না।

ভোর না হইতেই আজ দেবু বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুইয়া পাঁচীকে যথারীতি ঘর-দুয়ার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিতে আদেশ দিয়া সে ছুটিল বাঁশতলায় উদয় কাণার বাড়ীতে গরুর গাড়ীর সন্ধানে। এত ভোরে দেবুকে তাহার বাড়ী আসিতে দেখিয়া উদয় অবাক্ হইয়া গেল। সে দেবুকে বলিল, "আমি গাড়ী নিয়ে সাতটা-নাগাদ বেরুবো। ছোট দাদাবাবু আস্‌বে তো সেই দশটার গাড়ীতে? এখন যে ছটাও বাজেনি!"

দেবু কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণু ভাবেই বলিল—"ইস্, তোর সাতটা মানেই তো আটটা রে। তার পর গরু ঠেঙ্গাতে ঠেঙ্গাতে তুই ষ্টেশনে পৌঁছুতেই হয় তো এগারটা বাজিয়ে দিবি। এক দিন আর একটু তাড়াতাড়ি উঠতে পারিস্‌নে, উদয়! ভাড়া তো আমি তোকে আগাম দিয়ে রেখেছি বাপু!"

জিভ কাটিয়া উদয় কহিল,—"তুমি ভাড়া না দিলেও আমি

ছোট দাদাবাবুকে তোমার বাড়ী পৌঁছে দিতাম। গরুর গাড় চালিয়ে আমি বুড়ো হয়ে গেনু, ঠিক সময়েই আমি ইষ্টিসানে গাড়ী নয়ে হাজির হব। তুমি একটুও ভেবো না, দাদাবাবু!"

দাওয়া হইতে নামিতে নামিতে দেবু বলিল,—"দেখিস, গড়িমসি ক'রে দেরী ক'রে ফেলিস্‌নি যেন।"—খানিকটা গিয়া আবার ফিরিয়া বলিল,—"হ্যাঁ, দেখ, সে যদি কিছু বলে, তাহ'লে তুই বলিস, বাড়ীতে আমার অনেক কাজ, তাই আমি নিজে যেতে পারলুম না।"

তাহার ব্যাকুলতা দেখিয়া উদয় হাসিয়া বলিল,—"ফি-বারেই তো আমি ছোট দাদাবাবুকে নিয়ে আসি. তুমি ভাবছ কেনে গো?"

যথাসময়েই সুধীর বাড়ী পৌঁছিল। তাহার সঙ্গে এক জন ভদ্রলোক। সুধীরের অপেক্ষা বয়সে কিছু বড়। ভদ্রলোকের সর্ব্বাঙ্গে পুরাদস্তুর আধুনিকতার ছাপ। দাড়ী-গোঁফ কামান। মাথার চুল পিছন দিকে উলটাইয়া একেবারে প্লেন করিয়া আঁচড়ান। গায়ে সিল্কের একটা ঢিলা পাঞ্জাবী। পরনের ধুতিটাও অভিনব ভঙ্গীতে পরা। কোঁচার পত্তন আগে হয় তো ছিল; কিন্তু এখন আর কোঁচার বালাই নাই, সেটাও কাছার সহিত এক সঙ্গে পশ্চাদ্‌ভাগে গোঁজা ছিল। হাল-ফ্যাসানের ছোকরাদের ঢঙ্।

এই ব্যক্তিটি রীতির বড়দাদা। কলিকাতার লেক অঞ্চলে প্রাসাদোপম অট্টালিকায় ইনি বাস করেন। বিলাত-ফেরৎ ইঞ্জিনিয়ার, এবং সদ্য-বিবাহিত। ইঁহার পল্লী-প্রীতি একটু অতিরিক্ত; তাই সহরের কোলাহল হইতে দূরে পল্লীর নির্জ্জন প্রান্তে মনের মত একটি বাগান-বাড়ীর খোঁজে তাঁহার এই পল্লীগ্রামে পদার্পণ।

বিস্মিত দেবুর বিস্ময় দূর হইলে সুধীর পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল,—"দাদা, ইনি মিষ্টার রীতেন্ চ্যাটার্জি। আমার বন্ধু—মানে হিতৈষী। ইনি কলকাতার মানুষ, তার ওপর বিলেত-ফেরৎ, কিন্তু পল্লীগ্রামের ওপর এঁর খুব টান; তাই আমার সঙ্গে পাড়া-গাঁ দেখতে এসেছেন।" আসল উদ্দেশ্যটা সুধীর আপাততঃ চাপিয়া গেল।

দেবু খুসী হইয়া বলিল,—"বেশ তো, দু'-চার দিন থাকলেই বুঝতে পারবেন, কলকাতার চেয়ে পাড়া-গাঁ কত ভাল।"

রীতেন হাসিতে হাসিতে বলিল—"ঠিক ব'লেছেন দাদা! সহরে আর পল্লীগ্রামে অনেক তফাৎ। সহরটা যেন সৎমা। তার যা কিছু আদর-আপ্যায়ন সবটাই যেন লোক-দেখান বাহ্যাড়ম্বরে পূর্ণ; আন্তরিকতা তাতে আদৌ নেই। আর পল্লীগ্রাম যেন নিজের মা। স্নেহের অনাড়ম্বর স্নিগ্ধতা ও আন্তরিকতা এখানে মানুষের সকল অভাবই মিটিয়ে দিতে পারে।"

সহরে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের এতখানি পল্লীপ্রীতি দেখিয়া দেবু অবাক্ হইয়া গেল।

দেবু কার্য্যান্তরে গমন করিলে সুধীর রীতেনকে বলিল,—"দাদা যদি বাড়ী বেচতে রাজি না হয়, তবেই মুস্কিল!"

বিস্মিত হইয়া রীতেন কহিল,—"তুমি কি দাদাকে কিছুই জানাও নি?"

ঘাড় নাড়িয়া সুধীর বলিল,—"বলতে সাহস পাইনি। তা ছাড়া, আপনি বাড়ীটা কিনবেন, আপনার পছন্দ-অপছন্দের কথাটা ভেবেও দাদাকে আগে কিছুই জানাইনি।"

রীতেন কহিল,—"তাহ'লেও ওঁকে জানান তোমার উচিত ছিল, সুধীর! আর পছন্দ-অপছন্দের কথা তুমি যা বললে, সেটাও এক কথা বটে। তা…এতে কিছু টাকা ঢালতে পারলে প্রাণ্ড বাগান-বাড়ী হবে। অপছন্দ আমার হয়নি, জেনো।"

দ্বিপ্রহরে সকলেই অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত গুরু-ভোজন শেষ করিল। আজ অনেক দিন পরে সুধীরের আচরণে দেবু যেন সেই শিশু সুধীরকেই ফিরিয়া পাইল।

সুধীর যে তাহাকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে, ইহা অন্তরের সহিত অনুভব করিয়া দেবু অত্যন্ত পুলকিত হইল; ভাবিল, এত দিন সে তাহার ছোট ভাইকে ভুল বুঝিয়া আসিয়াছে। দেবু এত দিনের ক্রটির জন্য নিজেকে অপরাধী মনে করিতে লাগিল। সে ভাবিতেছিল, তাহার দেহটার মত মনটাও বোধ হয় রোগগ্রস্ত, নহিলে অমন গুণের ভাই যার, তার কিসের অভাব? সে দেবতার উদ্দেশ্যে দুই হাত যুক্ত করিয়া প্রার্থনা করিল, যেন সুধীর মানুষের মত মানুষ হয়। ভগবান্ যেন তাহার কোনও কামনাই অপূর্ণ না রাখেন। এ জগতে দেবুর কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা নাই। সুধীরের আশা মিটিলেই তাহার আশা মিটিবে; তাহাদের স্বর্গগত জনক-জননীর আত্মা পরিতৃপ্ত হইবে। এমনি অপার্থিব চিন্তার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে দেবুর দুই চোখ যেন ঘুমের ঘোরে জড়াইয়া আসিল।

পাশের ঘরে রীতেন ও সুধীরের কথাবার্ত্তার মৃদু গুঞ্জনধ্বনি তখনও থামে নাই। মাথার দিকের ফুল-বাগানটায় একটা মস্ত কালো ভ্রমর দ্বিপ্রহরের স্তব্ধতাকে যেন একটা অভিনব রূপদান করিতে সমানে গুন্-গুন্, গুন্-গুন্ শব্দে গুঞ্জন করিয়া বাইতেছে। পুকুরপাড়ের ঐ ঝাঁকড়া বকুল গাছটার ঘন পল্লবের ভিতর হইতে একটা ঘুঘুর বিষাদাপ্লুত অশ্রান্ত কণ্ঠস্বরে স্তব্ধ-মধ্যাহ্নের সুপ্ত বেদনা যেন চরাচরে পরিব্যাপ্ত হইতেছে।

দিবানিদ্রা দেবুর অভ্যাস নাই। একটু পরেই সে বিছানায় উঠিয়া বসিল। সুধীর তাহার ঘরের জানালার কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। দেবু হাসিয়া সুধীরকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোর বুঝি ঘুম হ'লো না? রীতেন বাবু কি ক'রছেন?"

সুধীর খাটে বসিতে বসিতে বলিল—"তিনি ঘুমুচ্ছেন। আমার ঘুম হ'লো না, তাই তোমার কাছে উঠে এলুম।"

দেবু সস্নেহে তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—"বেশ ক'রেছিস্, ভাই, খুব ভাল ক'রেছিস্।"—তার পর কি বলিবে, তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া দেবু চুপ করিয়া রহিল।

সুধীরও চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। সে কি যে বলিবে, আর কেমন করিয়া যে কথাটা পাড়িবে, তাহা ভাবিয়া যেন কূল পাইতেছিল না! বলিবার মত কোন কথা না পাইয়া দেবুই প্রথমে কথা আরম্ভ করিবার চেষ্টায় গলা ঝাড়িয়া ঢোঁক গিলিয়া বলিল,—"এইবার ডাক্তার হ'য়ে দেশে এসে একটা ডিস্পেন্সারি খুলে ব'স। তাতে দেশেরও উপকার হবে, আর আমারও……।" বাকি কথা সে শেষ করিতে পারিল না। লজ্জায়, সঙ্কোচে তাহার কণ্ঠ যেন বন্ধ হইয়া আসিল। এ ভাবে কথা বলা তাহার স্বভাববিরুদ্ধ। জীবনে সে সকলের উপদেশ মানিয়াই আসিয়াছে, কিন্তু উপদেশ দান করার মত সুযোগ তাহার জীবনে কখনও ঘটে নাই। তা প্রথম এই অযাচিত উপদেশ দান করিতে গিয়া সে যেন হোঁচট খাইয়া পড়িল। তাহার মুখ দিয়া কথা সরিল না।

বুদ্ধিমান্ সুধীর কিন্তু এ সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিল না।

আর কেনই বা করিবে? যাহাকে সব দিক্ দিয়া সর্ব্বরকমে বঞ্চিত করিতে করুণাময়ের এতটুকু করুণার উদ্রেক হয় নাই, মানুষ তাহার মুখের পানে চাহিবে কেন? সুতরাং সুধীর বলিল,—"তোমার যা ইচ্ছা, আমারও তাই। কিন্তু দাদা, আজ-কাল আমাদের মত পাশ-করা ডাক্তার অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পশার জমাতেই জীবনটা কেটে যায়! তাই আমি ব'লছিলাম, যদি একবার……"

তাহার দ্বিধা দেখিয়া দেবুর ভারী ভাল লাগিল। সে প্রসন্ন মনে কহিল,—"তুই কি চাস বল না, যাতে তোর ভালো হবে, তাতে কি আমার অমত হবে ভেবেছিস্? বিদ্যা, বুদ্ধি তো তোর সবই বেশী ভাই! আমার চেয়ে তুই ভাল বুঝিস্।"

ইহার পর আর আসল উদ্দেশ্য গোপন রাখিয়া কথা বলা চলে না; তাই সে দেশের বাড়ীখানি বিক্রয় করিয়া, তাহারি অর্থে বিলাত-যাত্রার ইচ্ছাটা প্রকাশ করিয়া ফেলিল। মিনতি করিয়া সুধীর কহিল,—"তুমি অমত ক'রো না, দাদা! তাহ'লে আমার জীবনের সব আশা, আকাঙ্ক্ষা মাটি হ'য়ে যাবে।"

প্রার্থনা শুনিয়া দেবু স্তম্ভিত হইয়া গেল! এ যেন বামনদেবের সেই ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষার ছলে মাথায় পা দিয়া রসাতলে প্রেরণের ব্যবস্থা! কোন রকমে গলার স্বর বাহির করিয়া দেবু কহিল,—"পৈতৃক ভিটে বিক্রী ক'রে দাঁড়াব কোথায়?"

সুধীর কহিল,—"যত দিন আমি না ফিরি, তত দিন তুমি আমার কলকাতার বাড়ীতেই থাকবে। যে ঘরটায় আমি থাকি, সেই ঘরেই তুমি থাকবে; আর বাকিটা ভাড়ায় খাটাবে। আমি সব ব্যবস্থা ক'রে দেবো। তোমার কোনও অসুবিধা হবে না, দাদা!"—সুধীরের কণ্ঠে অনুনয়ের সুর স্পষ্ট ধ্বনিয়া উঠিল।

সুধীরের কাতরতা দেখিয়া এমন অবস্থাতেও দেবুর হাসি পাইল। স্বার্থসিদ্ধির ছদ্মাবরণে সুধীর আজ যে ভ্রাতৃভক্তির অভিনয় দেখাইতে আসিয়াছে, টাকা হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহা যে কর্পূরের মত উবিয়া যাইবে, তাহা বুঝিতে দেবুর এতটুকু বিলম্ব হইল না। একবার ভাবিল, এ প্রস্তাবে আপত্তি করিবে; কেন সে অন্যের স্বার্থসিদ্ধির জন্য পথে দাঁড়াইবে? কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, পিতামাতার আশা ও ভরসার স্থল সুধীরের যদি তাহারই জন্য জীবনের আশা পূর্ণ না হয়, তাহা হইলে হয় তো উপর হইতে জননী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিবেন, পিতা সন্তপ্ত হইবেন। পূর্ব্বজন্মে নিশ্চয়ই সে অনেক পাপ করিয়াছিল, তাই এ জন্মে তাহার এই দশা! দেবু ভাবিতেছিল, তাহার বাঁচিয়া-থাকা বিড়ম্বনা-ভোগ ভিন্ন আর কি? তাহার আবার ভবিষ্যতের ভাবনা কেন? তাহার পক্ষে গৃহ ও গাছতলা উভয়ই সমান।

দেবু ধীরে ধীরে বলিল,—"বাড়ী তুমি বিক্রি ক'রে টাকা নিয়ে যাও। আমায় যা-যা ক'রতে হবে, আমি সবই ক'রবো।" তাহার মাথাটা কেমন ঝিম্-ঝিম্ করিতেছিল। সে তাড়াতাড়ি বিছানায় শুইয়া পড়িল। সুধীর অপরাধীর মত ঘর হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

রীতেন ন্যায্য দামের কিছু বেশী দিয়াই বাড়ীটা কিনিয়া লইল। যাত্রাকালে বিস্মিত সুধীর বলিল—"দাদা, তুমি যাবে না আমাদের সঙ্গে?"

দৃঢ় স্বরে দেবু বলিল,—"না।"

—"তবে তুমি থাকবে কোথায়?"

ম্লান হাসি হাসিয়া দেবু বলিল,—"ভগবান্ যেখানে রাখ্‌বেন।"

রীতেন আমতা আমতা করিয়া কহিল,—"আপনি এক হপ্তা কি দু'হপ্তা এখানে অনায়াসে থাকতে পারেন। তার আগে মেরামতের কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হবে না।"

রীতেনের ভয় দেখিয়া দেবু মনে মনে হাসিল, মুখে কিছুই বলিল না।

সুধীর বলিল,—দিন-দশেক বাদে এসে আমি তোমায় নিয়ে যাব, তুমি ভেবো না দাদা!"—কণ্ঠস্বরে অমৃতের প্লাবন।

বিদায়ের কালে সুধীর নত হইয়া অগ্রজের পদধূলি গ্রহণ করিলে, দেবু তাহার মাথায় হাত রাখিয়া বলিল,—"ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, ভাই, যেন তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। তুমি সুখী হও।"

৭

পরদিন সকলের মুখে মুখে কথাটা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। হীরু ঠাকুর্দ্দা, ঘোষাল মশায়, নবীন কবিরাজ প্রভৃতি বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দেবুর বোকামির জন্য যথেষ্ট আফশোষ করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর্দ্দা রাগ করিয়া দেবুকে বলিলেন,—"হতভাগা, তোর ঘটে কি এতটুকু বুদ্ধি নেই? না থাকে তো, আমাদের কোনও-একটা কথা জিজ্ঞাসা করেছিলি? এখন ভিটে-মাটি খুইয়ে যাও ছোট ভাইয়ের তাঁবেদারী করোগে, আর উঠতে বসতে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা,—সে খুবই মিষ্টি লাগবে?" কেহ কেহ বলিল,—"রোগে রোগে দেবু যেন না-মানুষ, না-জানোয়ার—কি একটা বনে গেছে।"

অনেকেই কথাটার সমর্থন করিয়া বলিল,—"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! না হ'লে নিজের জিনিষ কেউ ভাইকে দিয়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায়? কথায় বলে—'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই'!"

দেবু কাহারও কথায় প্রতিবাদ করিল না। নিজের দোষ-স্খালনের জন্যও কোন কথা বলিল না। কৃতকর্ম্মের জন্য তাহার মনে বিন্দুমাত্র অনুতাপেরও সঞ্চার হইল না।

হিতৈষী প্রতিবেশীরা নানা উপদেশ বিতরণ করিয়া গৃহে প্রস্থান করিলে, দেবু উঠিয়া দাঁড়াইল। আজ বিকালের দিকে তাহাকেও যাত্রা করিতে হইবে; তাই উদয়কে একবার বলিয়া-রাখা দরকার। ষ্টেসনের পথ অনেকখানি, বিলম্ব হইলে সময়মত ট্রেণ ধরিতে পারিবে না।

নিজের প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করিয়া দেবু দুপুরবেলা চুপ করিয়া যেন বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া ছিল। পাঁচী আহারের জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া হতাশ হইয়াছিল। এখন পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—"কিছু যখন খেলে না, তখন শেষ-বেলায় কিছু কিনে নেবো।"

তাহার কথায় দেবুর যেন চমক্ ভাঙ্গিল। দেবু কহিল,—"তুইও কি আমার সঙ্গে যাবি না কি?"

—"তোমাকে একা ছেড়ে দেবো ভেবেছ? আজ বুড়ো হ'য়েছি ব'লেই আমার কথা কাণে তোল না। নইলে, এই পাঁচীই তোমাকে সব সময়ে সামলে নিয়ে বেড়িয়েছে! দু'মাস বয়েস থেকে তোমাকে কোলে-পিঠে ক'রে মানুষ করু, আর আজ তুমি আমাকে বিদায়

ক'রে দিলেই কি তোমাকে ছেড়ে যেতে পারি?"—শেষের দিকে পাঁচীর গলার আওয়াজ ভারী হইয়া আসিল।

পাঁচীর কথায় দেবুর মা'র কথা মনে পড়িল। মা নাই, কিন্তু পাঁচী আছে।

মানুষের চোখে দেবুর জননী ও এই নীচজাতীয়া রমণীর মধ্যে যতই প্রভেদ থাক, একই মাতৃহৃদয়ের স্নেহ-করুণার অমৃত-ধারা উভয়েরই বুকে সঞ্চিত ছিল—এ বিষয়ে দেবুর আর কোনও সন্দেহ রহিল না।

পাঁচী কি সব জিনিস-পত্র আনিতে দোকানে গিয়াছে,—এখনও ফিরিয়া আসে নাই। পাশের বাড়ীতে পাঠনিরত মন্টুর কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছিল। সকাল-স্কুল বলিয়া বালক দ্বিপ্রহরে পাঠাভ্যাস করিতেছিল। তাহার পাঠের কয়েকটা কথা ঠিক বল্লমের খোঁচার মত দেবুর বুকে গিয়া বিঁধিল। মন্টু চীৎকার করিয়া পড়িতেছিল—

"সপ্ত পুরুষ যেথায় মানুষ, সে মাটি সোণার বাড়া।
দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে, এমনি লক্ষ্মীছাড়া?"

দুই হাতে কাণ চাপিয়া-ধরিয়া দেবু ঘরের দরজা বন্ধ করিল।

এই ভাবে কতক্ষণ কাটিল সে দিকে দেবুর হুঁস্ নাই! পাঁচীর কণ্ঠস্বরে তাহার চিন্তাজাল ছিন্ন হইল। পাঁচী বলিতেছিল,—"খাবার কিনে রেখেছি, কিছু মুখে দাও; বেলা তিনটে বেজে গেছে, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ি এস। উদয় গাড়ীতে গরু জুতে বাঁশতলার এদিকে দাঁড়িয়ে আছে।"

পাঁচীর পীড়াপীড়িতে দেবু কিছু খাইয়া গৃহত্যাগের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল।

যে ঘরটিতে জননী অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই ঘরে গিয়া দেবু মাতার উদ্দেশে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। উদ্গত অশ্রু টপ্-টপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। দেবু মনে মনে বলিল—"মা, তোমার সুধীরের জন্য আমি সব ছেড়ে দেশত্যাগী হ'লুম। সে তোমাদের বংশের দুলাল, আর আমি এসেছিলাম তোমাদের সংসারের বোঝা হয়ে।"—পিতার আক্ষেপ সে কোন দিন ভুলিতে পারে নাই।

৮

গরুর গাড়ী তখন গোঁসাইদের রথতলা পার হইয়া ষ্টেশনের লাল সুরকীর পথ ধরিয়া চলিতে সুরু করিয়াছে। দেবু উঠিয়া-বসিয়া কহিল—"গাড়ীতে উঠেই আমার ফিট্ হ'য়েছিল না?"

পাঁচী হাতের পাখাটা নাড়িতে নাড়িতে বলিল,—"হ্যাঁ"।

উদয় এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই, দেবুকে বসিতে দেখিয়া সে বলিল,—"দাদাবাবু, তুমি কার জন্যে গাছতলা সার ক'রলে? দুনিয়ায় ভাই বল, বন্ধু বল, কেউ আপনার নয়; অক্ষম ছেলেকে বাপ পর্য্যন্ত ভারী বোঝা ব'লে মনে করে না?"

দেবু একটু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল,—"সেই জন্যেই তো এমন দেশে যাচ্ছি—যেখানকার রাজা-শুদ্ধ গাছতলা ভালবেসেছেন।"

উদয় বলিল,—"দাদাবাবু পাগল!"

দেবু কহিল,—"না রে, পাগল নই। শ্রীবৃন্দাবনের রাখাল-রাজা গাছতলাই ভালবাস্তো। আর এখনও সে সেই ভাবেই বাঁশী বাজিয়ে সবাইকে 'আয় রে আয়' বলে ডাকে; যার কান আছে, সে শুনতে পায়। সে ডাক শুনেছি, তাই তো আমি সেইখানে যাচ্ছি। শুনিস্‌নি তার সেই গান,—'আমি বৃন্দাবনে বনে বনে ধেনু চরাব'।"

উদয় বোষ্টমের ছেলে। গলায় তাহার তৈলপক্ক তিনকণ্ঠী তুলসীর মালা; কাজেই সে কিছু না জানিলেও বলিল,—"জানি বৈ কি একটু একটু। তা গান-টান আর শিখলাম কবে, দাদাবাবু? গরু ঠেঙ্গিয়ে ঠেঙ্গিয়েই জনমটা তো প্রায় কেটে গেল।"

পাঁচী উদয়কে জিজ্ঞাসা করিল,—"টিসন্ আর কত দূরে?"

উদয় কহিল,—"বেশী দূরে নয়, এই আর খানিকটে পথ"—বলিয়া বলদের পিঠে হাত দিয়া গাড়ী জোরে চালাইবার চেষ্টা করিল; তাহা দেখিয়া দেবু বলিল,—"এখনও সময় আছে, উদয়, তুমি আস্তে গাড়ী চালাও ভাই!"

উদয় একটু হাসিয়া বলিল,—"ছাশের মায়া কাটাতে পারচো না, দাদাবাবু! এ বড্ডা জবর মায়া।"

সত্যই দেবুর মনে হইতেছিল, যাহারা এত দিন ধরিয়া তাহার জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়াছিল, তাহাদের সে আজ এইখানে ছাড়িয়া যাইতেছে। নিবিড় বন্ধন মুক্ত করিতে গিয়া তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন দুঃসহ বেদনায় ছিঁড়িয়া পড়িতেছে।

পাঁচী একটা পোঁট্‌লা ও একটা টিনের বাক্স লইয়া দেবুর সঙ্গে রেলগাড়ীতে উঠিয়া বসিল। দেবু উদয়ের হাতে দুইটি টাকা দিয়া বলিল,—"তোমার দুলীকে মিষ্টি কিনে দিও।"

বিস্মিত হইয়া উদয় বলিল,—"এতো কেনে দিচ্ছ, দাদাবাবু? গাড়ী-ভাড়া তো আমার এতো বেশী নয়।"

বাধা দিয়া দেবু কহিল,—"আর তো কখনও দিতে আসবো না, উদয়, এ তুমি নাও।"

গাড়ীর বাঁশী বাজিলে উদয় দেবুর পায়ের উপর মাথা রাখিয়া হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল,—"এ জন্মের মতোন আমাদের ছেড়ে চল্লে, দাদাবাবু!"

দেবুর দৃষ্টি চোখের জলে ঝাপ্‌সা হইয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না।

ট্রেণ ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিল। গাছ-পালা, ধানের ক্ষেত, ছোট নদী, টেলিগ্রাফের তার সকলে মিলিয়া দেবুকে যেন ডাকিতে ডাকিতে পিছনে ছুটিয়া চলিয়াছে,—আর সে সকলকেই পিছনে ফেলিয়া-রাখিয়া কোন্ অজানার আশ্রয় গ্রহণের জন্য সম্মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। হায়, অপদার্থ অক্ষম যুবক! তোমার হৃদয় কি স্বর্গের সম্পদ, এই স্বার্থপর সংসারে তাহা কি কেহ বুঝিতে পারিল?

শ্রীমতী মীরা মুখোপাধ্যায়।

২৮

দিন চার-পাঁচ পরে নেলীর পত্র আসিল। সে সুধীশের প্রস্তাবে সম্মত আছে, আসিতে তার আপত্তি নাই, তবে যাইবার পূর্ব্বে সুধীশ আসিয়া একটু বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া যাইলে ভাল হইত।

সুধীশ পত্রখানা চোখের সম্মুখে খুলিয়া-রাখিয়া নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিল। এক হিমানীকে লইয়াই তাহার সংসারে দারুণ বিশৃঙ্খলা লাগিয়াই আছে, আবার নেলী আসিতেছে!

ভগবান্ যাহার দণ্ডবিধান করেন, তাহার সম্বন্ধে এমনই করেন। কোথায় ছিল হিমানী ও নেলী—তাহাদের স্মৃতি ক্রমেই অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছিল,—কিন্তু ভগবানের কি অমোঘ বিধান, আবার হিমানী আসিল, নেলী আসিল, এবং সঙ্গে করিয়া আনিল আর একটিকে—গায়ত্রীকে! সকলে মিলিয়া তাহার জীবনে একটা বিপ্লব বাধাইয়া দিয়াছে। এখন কেমন করিয়া যে এই তিন জনকে সুধীশ সমভাবে সাম্‌লাইবে, তাহা ভাবিয়া সে দিশাহারা হইয়া গেল।

সুধীশ গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে পাদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। নেলী ডাকিয়াছে—তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে!...হায় নেলী! যে তোমার সকল ভার বহিতে একান্ত উৎসুক ছিল, তাহাকে ত নির্ম্মম ভাবে ফিরাইয়া দিয়াছিলে, তবে আজ এত দিন পরে এ আহ্বান কেন?

সে বর্ষণসিক্ত বহিঃপ্রকৃতির দিকে বেদনাম্লান দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। হিমানীর প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছিল—সে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য; কিন্তু নেলীর সম্বন্ধে সে কোন দিক্ দিয়া অপরাধী নয়,—নেলীই তাহাকে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়াছিল;—তথাপি সে-ও—সে-ও যেন আজ সুধীশের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে উদ্যত!—অথচ তাহার এ কাতর আহ্বান উপেক্ষা করিবার মত শক্তি সুধীশের ত নাই।

আর বেচারী গায়ত্রী! সুধীশের উপর সে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত আছে, আর সুধীশ প্রতি-পদে তাহাকে প্রতারণা করিতেছে। তার সরল বিশ্বাসের এই পুরস্কার! অথচ সুধীশের এ ভিন্ন দ্বিতীয় উপায়ও নাই।

* * * * *

নেলী আসিল।

হিমানীর বাড়ী খালি পড়িয়াছিল, সুধীশ উহাই নেলীকে ভাড়া দিল। বাড়ীর সন্নিকটে সর্ব্বদা তত্ত্ব লওয়ারও সুবিধা এবং হিমানীও ভাড়া পাইবে, অতএব একই উপায়ে সুধীশ তাহার বিগত কালের প্রেমভাগিনী এবং অধুনা আশ্রিতাদ্বয়ের উপকার করিল।

গায়ত্রীর কাছে সে হিমানীকে গোপন করিয়াছিল, এবার দু'জনের নিকটেই নেলীকে গোপন করিল। তাহাদের জানাইল, উনি ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শিনী, কলিকাতায় পূর্ব্বে ছিলেন, সেখানে গুছাইয়া উঠিতে না পারায় বাধ্য হইয়া মফঃস্বলে আসিয়া বসিয়াছেন। এক দিন হিমানী ও গায়ত্রীর সহিত আলাপ করাইবার জন্য তাহাকে লইয়া আসিল।

নেলী চলিয়া গেলে হিমানী গায়ত্রীকে বলিল, "তোমার খালাস হতে না হতে ধাত্রী নিজে সরে না পড়েন।"

গায়ত্রী বলিল, "যা বলেছ! যেন ধুঁকছে। আমরা মনে করি, লেখাপড়া শিখে স্বাবলম্বী হ'লে বুঝি আর দুঃখ থাকে না, কিন্তু এঁকে দেখে সে ভ্রম ঘুচে গেল।"

হিমানী বলিল, "কিছুতেই কিছু হয় না রে ভাই, অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই। পাঁচ জনের দেখেই মনে সান্ত্বনা পাওয়া যায়। নিজের কথা ভাবি,—কিন্তু ওর কি ?"

প্রসঙ্গক্রমে অনুপ জড়িত হইতেছে দেখিয়া ব্যথিতা গায়ত্রী সরিয়া গেল। ইহার পর এক দিন সুধীশ নেলীর ছেলেমেয়েকে সঙ্গে করিয়া গৃহে আনিল। ছবি ও মৃণার সহিত আলাপ করাইয়া দিয়া সে ক্রীড়ারত বালক-বালিকা চতুষ্টয়ের দিকে চাহিয়া রহিল। বিভিন্ন গঠন, বিভিন্ন আকৃতি, বিভিন্ন ভঙ্গিমা, তত্রাচ সুধীশের মনে হইল, যেন প্রত্যেকের প্রত্যেকটি অবয়ব তাহার পরিচিত, তাহার সুবিদিত, তাহার প্রিয়! বহুপত্নীক পুরুষ যেমন করিয়া বিভিন্ন পত্নীর গর্ভজাত সন্তানদের প্রতি চাহিয়া থাকে, সুধীশও তেমনি করিয়া নেলী ও হিমানীর সন্তানদের প্রতি চাহিয়া রহিল।

ছেলেদের ডাকিয়া সে বলিল, "তোমরা লুকোচুরি খেল, আমি তোমাদের বুড়ি।" প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি শিশুদের খেলায় যোগ দিলে তাহাদের আনন্দ শতগুণ বর্দ্ধিত হয়, সুধীশকে দলে পাওয়ায় তাহারা আরও মাতিয়া উঠিল, এবং শিশুদের কলহাস্যে গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল।

গায়ত্রী আসিয়া তাহার পাশের স্থানটুকুতে বসিল, তাহার একখানা হাত হাতের মধ্যে টানিয়া-লইয়া সহাস্যে বলিল, "দিব্বি যষ্ঠী-বুড়ি সেজে বসে আছ ত! গণ্ডা-খানেক ছেলে জড়ো করে খাসা খেলা হচ্ছে।"

সুধীশ হাসিমুখে বলিল, "তুমি তবু তোমারটি এখনও দাওনি!"

গায়ত্রী লজ্জারক্তিম মুখ ফিরাইয়া বলিল, "যাও!" তাহার পর একটু হাসিয়া নিম্নস্বরে বলিল, "তুমি এমন করে বললে, যেন ওরা সকলেই তোমার ছেলে!" সুধীশের মুখে শুষ্ক হাসি ফুটিল।

গায়ত্রী নেলীর ছেলেমেয়ের দিকে চাহিয়া মমতার সহিত বলিল, "আহা, ছেলেমেয়ে দু'টিকে দেখলে কষ্ট হয়, কি রোগা!" একটু থামিয়া বলিল, "কি দুর্ভাগ্য এদের! সক্ষম বাপ বেঁচে, অথচ কত অভাবেই প্রতিপালিত হচ্ছে।"

সুধীশ শূন্যদৃষ্টিতে অন্য দিকে চাহিয়া ছিল, তদবস্থ থাকিয়াই বলিল, "সমান। যেমন এ-দু'টি, তেমনই ও-দু'টি, বাপ আছে মাত্র, কিন্তু সে শুধু পরিচয়স্থল।"

গায়ত্রী মৌন হইয়া রহিল, দাদার কথা এড়াইতে পারিলে সে বাঁচে, নিন্দা সে সহিতে পারে না। অথচ এমনই দুরদৃষ্ট যে, কোন না কোন ঘটনার সঙ্গেই সে জড়াইয়া যায়।

সুধীশ গায়ত্রীর দিকে না চাহিয়াই বলিল, "কাল অনুপ বাবুর একখানা চিঠি এসেছে, তোমায় বলতে ভুলে গেছি।" অত্যন্ত নিরাসক্ত নিস্পৃহ কণ্ঠস্বর।

গায়ত্রী তথাপি উৎসুক হইয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, "কি লিখেছেন? কেমন আছেন?"

সুধীশ আগ্রহহীন স্বরেই বলিল, "ভালই। তোমরা কে কেমন আছ, এই সব,—আর কি?"

গায়ত্রীর আঁখিপল্লব ভিজিয়া উঠিল; আপন-মনেই বলিল, "এখনও এক বছর বাকি, কি করেই যে দিনগুলো কাটবে,—"

সুধীশ ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিল, "কিন্তু সে ফিরে এলেও সেই খুনের কাছে হিমানীকে পাঠান যাবে কি করে? ওকেও ত খুন করে ফেল্‌তে পারে···"

গায়ত্রীর গায়ে জলবিচুটীর ঘা পড়িল, সে অধীর কণ্ঠে বলিল, "ফেলে ফেলবে। যার পাঁঠা, ইচ্ছে হয় সে ল্যাজের দিকে কাটবে, ইচ্ছে হয় মুড়োর দিকে কাটবে, সে জন্যে অন্যের কি এত মাথা-ব্যথা?"—বলিয়া সে বিরক্তিভরে উঠিয়া গেল।

২৯

গায়ত্রী পূর্ণগর্ভা।

গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া সুধীশ দেখিল, সে বসিয়া আছে। সুধীশ উঠিয়া-বসিয়া উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলিল, "বসে কেন? অসুখ কচ্ছে কি?"

গায়ত্রী সুধীশের কাঁধের উপর এলাইয়া পড়িল, ম্লান হাসির সহিত বলিল, "ও কিছু নয়, এখুনি সেরে যাবে।" বলিতে বলিতে আশু-মাতৃত্বের বেদনায় সে বিহ্বল হইয়া উঠিল। সুধীশ তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে সযত্নে চিবুক ধরিয়া মুখখানি উচু করিয়া ধরিয়া সস্নেহে কহিল, "না রাণু, ও সারবে না। তুমি যে মা হতে যাচ্ছ! সন্তান পাবার কষ্টটুকু যে তোমায় সহ্য করতেই হবে!"

গায়ত্রী শঙ্কিত ভাবে সুধীশের হাতখানা চাপিয়া ধরিল,

—বুঝি সুধীশের স্পর্শের ভিতর পরিপূর্ণ আশ্বাস আছে ! স্বামীর স্পর্শ ;—এ যেন সর্ব্বকামফলপ্রদ—এ যেন কল্পতরু, বরাভয়, সবই বুঝি ঐ দুইখানি হাতে উপচাইয়া পড়িতেছে।

আজ মনে পড়িল, হিমানী যখন প্রসব-বেদনায় ছট্‌ফট্ করিত,—তখন তাহা দেখিয়া গায়ত্রী ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিত, এবং ভবিষ্যতে হয় ত তাহাকেও এই কষ্ট সহ্য করিতে হইবে ভাবিয়া ভয়ে ব্যাকুল হইত, এবং মনে মনে একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করিত, যেন তাহাকে কোন দিন মা হইতে না হয়।

আজ কুমারী-জীবনের সেই কথাটি মনে পড়িতেই গায়ত্রী মনে মনে হাসিল। কৈ, তেমন ভয় ত করিতেছে না, বরং পুত্রমুখ-সন্দর্শন-কামনায় মনে হইতেছে, কতক্ষণে এই অধ্যায়টা সমাপ্ত হইবে এবং সে তাহার আকাঙ্ক্ষিত ধনটিকে বুকে লইতে পারিবে ! কুমারী ও বিবাহিত-জীবনের পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া গায়ত্রী কৌতুক বোধ করিল।

সুধীশ তাহার পাংশু মুখ সস্নেহে চুম্বন করিয়া বলিল, "তুমি একটু শোও, আমি একবার দেখি, তার পর মিসেস্ সেনকে খবর দিই।"

গায়ত্রী মলিন মুখে বলিল, "কি হবে মিসেস্ সেনকে এখনই খবর দিয়ে ? এইটুকু কষ্টভোগেই কি আর আমি মুক্তি পাব ? আমায় এখনও অনেক যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে। কত দুর্গতিই হয় ত বরাতে আছে !"

সুধীশ প্রমাদ গণিয়া বলিল, "ও-সব কি বলছ বল ত ? তোমার কোন ভয় নেই ; তবে এত ভয় পাচ্ছ কেন ? ভয় পাবার মত তোমার কিছুই হয়নি।"

গায়ত্রী সহসা কাঁদিয়া ফেলিল ; বলিল, "না, নেই বৈ কি ! যদি আমি না বাঁচি—সে ভয়ও ত আছে !" তাহার পর সুধীশকে দৃঢ় বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া-উঠিয়া বলিল, "তোমায় ছেড়ে আমি স্বর্গেও যেতে চাইনে ;—যেমন করে পারো, আমায় তুমি বাঁচিয়ো—আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারব না।"

সুধীশ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তুমি ক্ষেপেছ না কি ! মরবার কথা মুখে আনছ কেন ? ছেলে-মেয়ে সকলেরই হয়, তাতে কি সকলেই মারা যায় ? আমাদের জন্মের পরেও ত আমাদের মায়েরা বেঁচে ছিলেন। ও-কথা আর ভেব না তুমি ; একটু শান্ত হও, আমি হিমানীকে ডেকে আনি। ছেলে-মানুষের মত ভয় করতে আছে ? ছিঃ !"

গায়ত্রী তবু চোখ মুছিতে লাগিল দেখিয়া সুধীশ নিজেও বড় দমিয়া গেল ; তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া একটু শান্ত করিল বটে, কিন্তু প্রসূতি-চিকিৎসক হিসাবে তাহার নিজের মনেও নানা প্রকার অমঙ্গলের চিন্তা আসিয়া জুটিতে লাগিল।

হিমানী গায়ত্রীর গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে সুধীশকে ডাকিয়া বলিল, "মিসেস্ সেনকে খবর দিয়েছ, সুধীশ ?"

সুধীশ চিন্তিত ভাবে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, বলিল, "দিয়েছি।—শোন হিমানী !"

হিমানী বাহিরে আসিয়া বলিল, "কি ? আমায় ডাকলে ?" বলিতে বলিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুধীশের মুখের ভাব লক্ষ্য করিল। তাহার ভয়ার্ত্ত চিন্তিত মুখ দেখিয়া সহানুভূতিভরে বলিল, "তোমার মুখ শুকিয়ে চূণ হয়ে গেছে যে ! এত ভয় কিসের ? এই নিয়ে তুমি নিত্যি নাড়াচাড়া করো না ?"

সুধীশ সত্য কথাই বলিল। বলিল, "তা করি ; কিন্তু সেখানে আমার প্রাণের টান নেই ত, সে করি ব্যবসা হিসেবে। আর এখানে আমার জীবন নিয়ে কথা—" কথাটা সুধীশের মুখ দিয়া ফস্ করিয়া বাহির হইয়া গেল,—সে বলিবে মনে করে নাই। গায়ত্রী যে তাহার জীবনাধিক প্রিয়তমা—এ কথা হিমানীর সম্মুখে বলিবার কল্পনাও সুধীশ করে নাই ; এবং সত্য কথা বলিতে কি, এ কথা বলিবার সাহসও তাহার ছিল না ; কিন্তু আজ দুশ্চিন্তাপ্রপীড়িত অন্তর ও অসংযত জিহ্বা হইতে হঠাৎ তাহা বাহির হইয়া গেল।

গায়ত্রী সুধীশের প্রিয়া, হিমানী তাহা জানে, সেজন্য সে আনন্দিত ভিন্ন ব্যথিত নয় ; তথাপি এ সময়ে সুধীশের কথাটা যেন সপাং করিয়া তাহার পিঠে চাবুকের মত পড়িল। তাহার জ্বালায় হিমানী অধীর হইয়া শ্বসিতস্বরে বলিল, "মেয়ে-জন্ম নিলেই ও-কষ্টটা পেতে হয় সুধীশ ! তোমার জীবনসর্ব্বস্বই হোক আর অবহেলার পাত্রীই হোক, প্রসব-বেদনা কারুর কম হয় না !"—বলিয়া সুধীশ কি জন্য ডাকিয়াছিল, তাহা না জানিয়াই দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

গায়ত্রী তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "কেন ডাকছিলেন, বৌদি? বাইরে কেন বেড়াচ্ছেন? ও-ঘরে শুতে বলো না ভাই, বাইরে বড্ড ঠাণ্ডা যে!"

হিমানীর মুখ-চোখ উত্তেজনায় লাল হইয়া উঠিয়াছিল, সে কথা কহিল না, যদি কণ্ঠস্বরে তাহার মানসিক চাঞ্চল্য প্রকাশ হইয়া পড়ে! মনে মনে সে তুলনা করিয়া দেখিতেছিল, তাহার নিজের প্রথম প্রসবকালীন অবস্থার সহিত গায়ত্রীর এই অবস্থার। সুধীশ আজ যেমন করিয়া চিন্তাকুল চিত্তে অস্থির হইয়া বেড়াইতেছে, অনুপ কি এমনই করিয়া বেড়াইয়াছিল? সে কি ভাবিয়াছিল, হিমানী কতখানি যন্ত্রণা পাইতেছে! আরও নানা চিন্তায় তাহার মন আলোড়িত হইতেছিল; সুধীশের চিন্তাও তাহার মধ্যে ছিল না, ইহা অবাধ্য-মনের নিকট সে অস্বীকার করিতে পারিত না।

মিনিট পনের-কুড়ি বাদে নেলী আসিল, সুধীশ আগাইয়া গেল। করমর্দ্দনান্তে তুই চিকিৎসকের মধ্যে প্রসূতির অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে লাগিল।

কথা কহিতে কহিতে তাহারা অগ্রসর হইতেছিল, সহসা আলোটা পরিপূর্ণ ভাবে সুধীশের মুখে পড়ায় নেলী বিস্মিত হইয়া বলিল, "ও-কি সুধীশ, তোমার মুখ এত শুকিয়ে গেছে কেন? নিজে তুমি যশস্বী চিকিৎসক, অথচ তুমি এত নার্ভাস হয়েছ?"

সুধীশ নিশ্বাস ফেলিয়া বিমর্ষ মুখে বলিল, "গায়ত্রী বড়ই ভয় পেয়েছে। তার ভয়-কাতর চোখের জল আমাকে একটু বিচলিত করে তুলেছে; তাই—"

নেলী বাধা দিয়া বলিল, "ওর জন্যে কিচ্ছু ভয় পেয়ো না। সব মেয়েই প্রথমবার ভয় পায়। বয়স হওয়ার সঙ্গেই মেয়েদের মনে এর বিভীষিকা জেগে উঠে। আমি ত এত শিখেছি, তবু সুবোধ হওয়ার আগে কি ভয়ই পেয়েছিলুম! কিন্তু তোমার উচিত ছিল তাঁকে সাহস দেওয়া।"

সুধীশ মলিন মুখে বলিল, "তাকে সাহস দিয়েছি; কিন্তু নিজে সাহস পাচ্ছিনে যে! গায়ত্রী বড়ই কাঁদলে, আমি কিছুতেই তার কান্না ভুলতে পাচ্ছিনে।" তাহার পর বিচলিত স্বরে বলিল, "তোমার হাতে আমি আমার জীবনের সুখ-শান্তি সবই তুলে দিলুম নেলী!—যা করতে হয়, তুমিই কোর। আমার আজ আর তিলমাত্র আত্মপ্রত্যয় নেই!" গায়ত্রীর ভয়বিহ্বল অশ্রুসজল চক্ষু দুটি তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল!

যে নেলী এক দিন সানন্দে স্বেচ্ছায় সুধীশকে ত্যাগ করিয়াছিল,—সেই নেলীর বুকের ভিতরটা যেন মুচড়াইয়া উঠিল! পত্নীর জন্য সুধীশ আজ কত বিচলিত, কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়,—সুধীশের সুখ-শান্তি তাহার পত্নীর জীবনের উপর নির্ভর করিতেছিল!…কিন্তু এক দিন ত নেলীই ছিল সুধীশের সুখ-শান্তির উৎস!…বেশী দিনের কথা নয়, মাত্র নয়-দশ বৎসর পূর্ব্বের কথা! অথচ আজ সেই সুধীশ কত পর!…সে এখন শুধু ধাত্রী,—তাই সুধীশের প্রাণাধিকা পত্নীকে সে প্রসব করাইতে আসিয়াছে, সম্বন্ধ এইটুকু মাত্র!

উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া সে সহজ স্বরে বলিল, "আমার যতটুকু শক্তি তার ত্রুটি হবে না, এ কথা তোমায় বলতে হবে কেন? কোন ভয় নেই, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"—বলিয়া সুধীশের দিকে আর না চাহিয়াই নেলী সোজা গিয়া ঘরে ঢুকিল। হিমানী নমস্কার করিয়া বলিল, "যাক্, বাঁচা গেল! একা একা বড্ডই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলুম। সুধীশকে জিজ্ঞাসা করছিলুম, আপনাকে খবর দেওয়া হয়েছে কি না।"

নেলী গায়ত্রীকে পরীক্ষা করিয়া হিমানীর দিকে ফিরিয়া কহিল, "আপনি একটা ঘুম দিয়ে উঠতে পারেন। ভোর পাঁচটার আগে হবে বলে ত মনে হয় না।"

রাগে হিমানীর গা জলিয়া গেল; কেন কে জানে, এই মিসেস্ সেনকে দেখিলেই তার বিরক্তি ধরে। সে মনে মনে বলিল, "আ মর মাগী, কি আমার দরদ রে!" কিন্তু মুখে বলিল, "এখন আমার ঘুমুবারই সময় বটে!"

গায়ত্রী ভীত ভাবে বলিল, "পাঁচটা? এখন ত মোটে আড়াইটে! আরও—আরও আড়াই ঘণ্টা!"

নেলী হাসিয়া বলিল, "তা এ আর এত বেশি কি? প্রথমবার এর কমে কি আর হয়? শুনলুম, আপনি না কি বড় ভয় পেয়েছেন? ডাঃ রায় ত মুখ শুকনো ক'রে এই দারুণ শীতে বাইরে সমানে পায়চারী করছেন। মনে হচ্ছে, আপনার চেয়ে তিনি বেশি যন্ত্রণায় অস্থির হয়েছেন!"

হিমানী হাসিয়া বলিল, "সুধীশের কাণ্ড ত! ওর কথা ছেড়ে দিন,—ঠাকুরঝি দু'বার হাঁচলে সে ডিস্‌পেন্সারী উজাড় করে ওষুধ খাওয়ায়! ও যে কেন এখনও এখানে

এসে বসেনি, আমি তাই ভাবছি! আহা! ডেকে দেব ঠাকুরঝি? ব্যথার ব্যথী সে!"

গায়ত্রী লজ্জারক্তিম মুখ ফিরাইয়া বলিল, "দেখ বৌদি, ভাল হবে না বলছি! তুমি মনে কোর না, আমি এতই অক্ষম হয়েছি যে, আমার হাত উঠবে না! মরছি আমি নিজের কষ্টে, উনি রসিকতা করবার আর সময় পেলেন না!"

নেলীও হাসিতেছিল, বলিল, "মরবেন কি দুঃখে? আমিও বেঁচে আছি, আর ঐ দেখুন, আপনার বৌদিও জাজ্বল্যমান জীবিত। মরতে হবে না, একটু কষ্ট পাবেন। তা ও-কষ্টটুকু খোকা কোলে করলেই ভুলে যাবেন,—আবার যে দিন আপনি স্বামীর কোলে ছেলেটিকে দিবেন, সে দিন আজকের স্মৃতিটাও মনে থাকবে না।"

হিমানীর এতটা আত্মীয়তা ভাল লাগিল না, সে ওষ্ঠ বক্র করিয়া মুখ ফিরাইল। ধাইগিরি করিতে আসিয়া সখী সাজিতে সখ, মরণ আর কি!

তাহার পর তাহারা দুই জনে সতর্ক প্রহরীর মত দুই পাশে বসিয়া গায়ত্রীর গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল, এবং অতীতের পুরাতন ছিন্ন পত্রাংশগুলি একত্র গাঁথিয়া কি সব স্বপ্ন দেখিতে লাগিল, তাহারাই জানে।

ভোর সাড়ে পাঁচটায় গায়ত্রী নির্ব্বিঘ্নে একটি পুত্র প্রসব করিল।

হিমানীর ইচ্ছা, তার বাঞ্ছিতের রক্তে-গড়া এই পুতুলটিকে বুকে লইবে,—নেলীও তাই চায়। অবশ্য, ধাত্রী হিসাবে সেই প্রথমে লইল; তবু দু'জনের মধ্যে একটু সংঘর্ষের ভাব ফুটিয়া উঠিল।

গায়ত্রীর পরিচর্য্যা শেষ করিয়া নেলী যখন গৃহে ফিরিতেছিল, তখন বেলা প্রায় আটটা। বাহিরে আসিয়া ক্রুদ্ধা নেলী বলিল, "দেখ সুধা, তোমার ঐ শালাজটির ব্যবহারে আমি বড়ই বিরক্ত হলুম!"

সুধীশের মন প্রসন্নতায় ভরিয়াছিল, সে হাসিমুখে বলিল, কি করলেন তিনি?

নেলী রাগে গস্-গস্ করিতে করিতে বলিল, "আমাকে ঠাউরিয়াছিলেন, ওঁদের পাড়াগাঁয়ের হাড়িনী ধাই! আর ছেলে নিয়ে কি আদিখ্যেতা! আমি যত বলি, বেবী আমায় দিন; ততই বলেন, 'আমি ছেলে দেখছি, আপনি পোয়াতী দেখুন।' উনি ছেলে দেখার জানেন কি?"

এই রবিকরোজ্জ্বল স্নিগ্ধ প্রভাত, কিন্তু সুধীশের চক্ষুতে ধরিত্রী যেন কপিশ বর্ণ ধারণ করিল। কেহ কাহারও সত্য পরিচয় জানে না, তবু বুঝি তাহাদের অজ্ঞাতসারে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে! তাহার সন্তানকে বুকে তুলিয়া লইতে দু'জনেরই কি অসীম আকিঞ্চন! তাহার এই ক্ষুদ্র সত্তাকে একটিবার তাহাদের বুভুক্ষিত বক্ষে তুলিয়া লইতে উভয়েই আগ্রহশীলা,—অথচ তাহারা জানে না, উভয়ে উভয়ের কত বড় প্রতিদ্বন্দ্বী! বাহিরের ঘর হইতে ভিতরে আসিয়া সুধীশ দেখিল, হিমানী স্নানান্তে পিঠে চুল মেলিয়া দিয়া ভিজা কাপড় শুকাইতে দিতেছে। সুধীশকে দেখিয়া সহাস্যে বলিল, আনন্দ আর ধরছে না বুঝি, কি বলো? বুড়ো বয়সের ছেলে!"

সুধীশও হাসিতে হাসিতে বলিল, "গায়ত্রী কি ঘুমুচ্ছে? একবার দেখে আসতুম।"

হিমানী হাসিমুখে বলিল, "এতটুকু অদর্শন আর সইছে না?...এখন যেও না, এইমাত্র একটু ঘুমিয়েছে। আর আঁতুড়ে ঢুকবে কোন্ সাহসে বলো ত? মা থাকলে আজ গায়ত্রীকে দেখতে যাওয়া তোমার বের করে দিতেন!

সুধীশ স্মিত হাসির সহিত বলিল, "মা তাহলে ছেলেকে এ বিদ্যে শিখতে দিলেন কেন? আমি ত প্রতিদিন ছত্রিশ জাতের আঁতুড় ঘেঁটে বেড়াই! ওই ত আমার লক্ষ্মী আঁতুড় বলে ঘৃণা করলে চলবে কেন?"

হিমানী আনন্দের হাসি হাসিতে হাসিতে বলিল, "ছেলেটা যেন তোমারই ছবি। মুখখানি যেন ছাঁচে-ঢালা তোমারই মত। বেশী কি, তোমার কপালে চুলের কাছে যে তিলটা আছে সেটা শুদ্ধ ছেলে পেয়েছে। ঠাকুরঝি তোমায় ভালবাসে বটে!"—বলিয়া হাস্য-বিকশিত মুখে সে সুধীশের মুখের দিকে চাহিল।

সুধীশের মনটা নিশ্চিন্ততা ও তৃপ্তিতে হাল্কা হইয়াছিল, তাই সে একটা অবুঝ রসিকতা করিয়া ফেলিল। কপালের ঐ রকম তিল ত ছবিরও আছে!

চক্ষের পলকে হিমানীর মুখ প্রবল শোণিতোচ্ছ্বাসে লাল হইয়া উঠিল, মুখ ফিরাইয়া সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

[ক্রমশঃ

শ্রীমতী মায়াদেবী বসু।
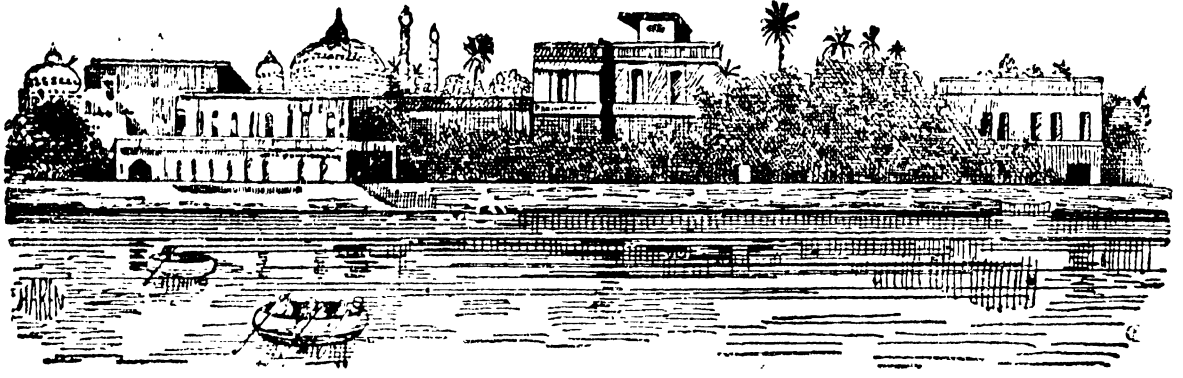
তূলার কথা

তূলার চাষ একদিন এদেশের প্রায় একচেটিয়া ছিল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। পাশ্চাত্য বহু প্রদেশে কেহ যখন কাপড়-চোপড়ের ব্যবহার জানিত না, তখন আমাদের ভারতবর্ষে এই তূলা হইতে মোটা-মিহি নানাবিধ ধুতি-শাড়ী-চাদর তৈয়ারী হইত। বেশী দিনের কথা নয় —মুসলমান-আমলেও এই তূলা হইতে যে-সব মিহি কাপড় তৈয়ারী হইত, সে-কাপড়ের কাছে ফরাসী-দেশের সৌখীন সিল্কও হার মানে!

তার পর বলিতে গেলে আমাদের চোখের সামনেই রকমারি মিহি কাপড়ের সে-সব কারিগর যেন উবিয়া গেল! আজও আমরা তূলার চাষ করি, কিন্তু বস্তা-বন্দী হইয়া সে তূলার বেশীর ভাগ যায় পাশ্চাত্য দেশে। সেখানকার মিল আমাদের এই তূলা লইয়া সূতা বোনে; সেই তূলায় কাপড়-চাদর তৈয়ারী করে। এবং সেই কাপড়-চাদরই একদা আমাদের লজ্জা-নিবারণের একমাত্র উপায়-স্বরূপ ছিল। আজ সৌভাগ্য-বশে ভারতে কাপড়ের মিল বসিয়াছে, নিত্য বসিতেছে; এবং সে-মিলের দৌলতে এইখানেই আমাদের কাপড়-চাদর তৈয়ারী হইতেছে। কিন্তু এ কাপড়ের জন্য সূতা আনিতেছি আমরা সেই পাশ্চাত্য প্রদেশ হইতে। আমাদের তূলা—ও-পার হইতে সেই তূলায় বোনা সূতা না পাইলে আমাদের মিলের ও তাঁতের কাপড়-বোনা বন্ধ হইতে পারে। কোনো কোনো মিলে সূতা তৈয়ারী হইতেছে; কিন্তু বিলাতী সূতার উপরেই

এ যন্ত্র-সাহায্যে ক্ষেত হইতে তূলা সংগ্রহ করা হয়

অনেকের নির্ভর। সেজন্য কাপড়ের দর আজ যেরূপ চড়িয়াছে, অচিরে যদি না কমে, তাহা হইলে ভয় হয়, বুঝি-বা আবার বনে গিয়া বল্কলের সন্ধান লইতে হইবে।

ইহা গেল সুতার কথা! তার উপর যে-তুলা এদেশের প্রায় একচেটিয়া ছিল, সে-তুলার সার্ব্বজনীন প্রয়োজন বুঝিয়া পাশ্চাত্য জগৎ তুলার চাষে অসামান্য অধ্যবসায় করিয়াছে। ভারতবর্ষ এবং আফ্রিকা—এ দুই প্রদেশের তুলাই ছিল য়ুরোপ-আমেরিকার মিল-ওয়ালাদের প্রাণ! তুলার চাষে আমেরিকা এখন যেরূপ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে, তার ফলে বাণিজ্য-জগতে যুগান্তর আনিয়াছে। যে-আমেরিকা একদিন তুলার জন্ম ভারতবর্ষ এবং আফ্রিকার দ্বারে হাত পাতিত, আজ তার হাতেই আমেরিকার মাটীতে কার্পাশে সমৃদ্ধি ফলিয়াছে! এই তুলার কল্যাণেই ম্যাঞ্চেষ্টারের এত পশার। এই তুলার জন্যই সুয়েজ-খালের সৃষ্টি; এবং এই তুলা নিরাপদে ইংলণ্ডে পৌছিবে বলিয়াই ইংরেজ জিব্রালটারে দুরধিগম্য দুর্গ তৈয়ারী করিয়াছে। তুলায় ইংলণ্ডের লক্ষ্মীশ্রী ফিরিয়াছে। আমেরিকাও এই তুলার কল্যাণে বাণিজ্য-ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছে। আমেরিকা তাই তুলার নাম দিয়াছে white gold—বা সাদা সোনা।

মেঘ নয়! তুলার বাছাই বীজ-দানা

তুলার বীজ আপনা হইতে ফাটিয়া চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া মাটার বুকে আশ্রয় লয়। প্রকৃতির এমন বিধান আর কোনো উদ্ভিদ-সম্বন্ধে দেখা যায় না। অনুবীক্ষণ-যোগে বিশেষজ্ঞেরা দেখিয়াছেন, একটি ছোট বীজ-দানা—এ বীজ-দানা পাকিবার সঙ্গে তৈলে সে-বীজ ভরিয়া ওঠে; তার পর বীজ-দানা ফাটিয়া যায় এবং বীজ-মধ্যস্থ ঐ তৈল পিচকারী-ধারায় চারিদিকে ঝরিয়া পড়ে। একটি বীজ-দানা হইতে অসংখ্য বীজ-দানার সৃষ্টি হয় বলিয়া তুলার চাষ চকিতে প্রসার লাভ করে; এবং এ-চাষে মানুষের তদারকীর বা পরিশ্রমের বড় একটা প্রয়োজন থাকে না। হেলায় তুলা পাই বলিয়া আমাদের শ্রম-বিমুখতার অন্ত নাই! তুলার চাষ সম্বন্ধে আমরা মাথা ঘামাই না! মা-বসুন্ধরা যেটুকু দেন, সেই দানটুকু লইয়াই কৃতার্থ থাকি।

কিন্তু আমেরিকা বণিকের দেশ। প্রকৃতির উপরে তুলার ভার ছাড়িয়া আমেরিকা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে নাই! বৈজ্ঞানিক অনুশীলনে রাসায়নিক উপায়ে তুলার চাষে শুধু উৎকর্ষ সাধন করে নাই, এই তুলা হইতে আমেরিকা পশম-রেশম তৈয়ারী করিতেছে!

সেকন্দার শাহের আমলে সম্রাট্‌ সেকন্দার শাহের

সেনাধ্যক্ষেরা গিয়া সম্রাট্‌কে সংবাদ জানাইলেন, ভারতবর্ষে এক আশ্চর্য্য জিনিষ দেখিয়া আসিলাম, সম্রাট্! সেখানকার গাছে পশম ফলে! সম্রাট্ চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—বলেন কি সেনাপতি! প্রাচীন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরাও লিখিয়া গিয়াছেন, ভারতবর্ষে একরকম গাছ আছে, সে-গাছে ফল হয়। সেই ফলের মধ্যে দুগ্ধ-শুভ্র মেষ-শাবক বসিয়া থাকে। তার গায়ে শুভ্র কোমল পশম। (plant bearing fruit within which there is a lamb having fleece of surpassing beauty).

নিউ অর্লিন্সের মিলে গাঁট-বাঁধা।

সিমেণ্টের সঙ্গে কাপড় মিশাইয়া মজবুত ছাদ তৈয়ারী—আমেরিকায়

দু'-তিন শত বৎসর পূর্ব্বেও তুলাকে ইংলণ্ডে তূলা-পশম (Cotton wool) বলিয়া অভিহিত করা হইত। এবং আজ এ তুলা লইয়া পাশ্চাত্য জগৎ যেন ভেল্‌কি খেলা খেলিতেছে! সব কাজে তুলার প্রয়োজন। তুলার খোশাগুলাকেও তারা ফেলিয়া দেয় না; সে খোলায় মাথার ব্রাশ, ঘোড়ার কলার তৈয়ারী
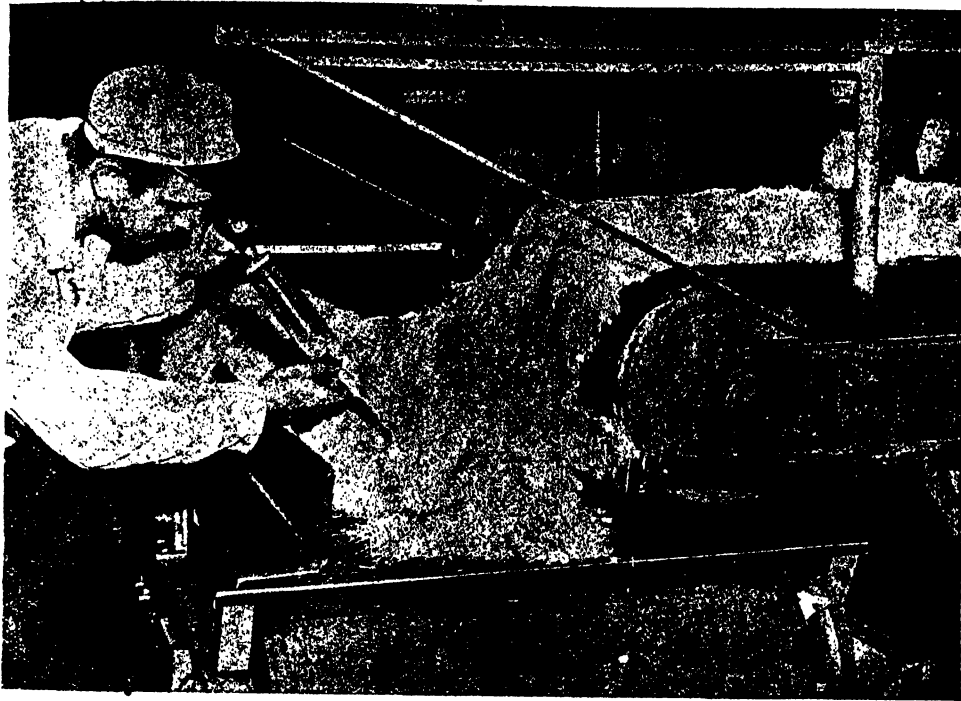
কলে পেঁজা তুলার পরীক্ষা

বস্তা-বন্দী ব্রেজিলের তুলা

হইতেছে। তাছাড়া ব্যাণ্ডেজ, গজ, মোটরের টায়ার—কিসে না আজ তুলার প্রয়োজন! প্রকৃতির এই বিচিত্র উপহার—সে-উপহারকে সভ্য জগৎ কি সাধে শিরোধার্য্য করিয়াছে? এই তুলা হইতে জামা-কাপড়, সৌখীন সজ্জা-ভূষণ তৈয়ারী হইতেছে! এ তুলায় ধূমহীন বারুদ, বই বাঁধা, ভূমির সার, মুখের ক্রীম, তৈল, বার্ণিশ, কাগজ, মাদুর, অর্থাৎ প্রয়োজনীয় সব সামগ্রী তৈয়ারী হইতেছে। শাঁস, খোশা কিছুই সেখানে বাদ দেওয়া হয় না। খোশা হইতে গো-মহিষের খাইবার ভূষি হয়; ব্লটিং কাগজ, প্যাকিং কাগজ,—এমন কি, ফাউণ্টেন পেনের খোল তৈয়ারী হইতেছে। শাঁস হইতে মাথার কেশের পরিপুষ্টি-কল্পে তৈল তৈয়ারী হয়। তাছাড়া এই শাঁস হইতেই জুতার উৎকৃষ্ট ক্রীম, জাহাজের কাঠ জুড়িবার আঠা, শীলিং-ওয়াক্স এবং জমির উৎকৃষ্ট সার তৈয়ারী হইতেছে। শাঁস হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আরও বিবিধ তৈল

প্রস্তুত হয় ; সে তৈলের কোনোটায় পাওয়া যায় মোটরের যন্ত্রপাতিতে ব্যবহারের উপযোগী গ্রীজ ; সাবান ; টিনে মাছ ভরিয়া রাখিবার সময় যে-তৈল মিশানো হয় সেই তৈল ; কসমেটিক ; ছাদের ফাট জুড়িবার জন্য 'টার' ; এবং এ তৈলে ভর্নিশ-ইমালেশন তৈয়ারী হইতেছে।

আমেরিকার কেরোলাইনা প্রদেশ পর্ব্বতসঙ্কুল। এখানকার পাহাড়ী অধিবাসীরা কার্পাশের চাষে সমৃদ্ধি গড়িয়া তুলিয়াছে। তুলা হইতে খুব মিহি সুতা তৈয়ারী করিয়া সেই সুতাই তারা অত্যধিক পরিমাণে আমাদের এই ভারতবর্ষে চালান দিতেছে। মার্কিন যুক্তরাজ্যে এই সুতার সহিত পাট মিশাইয়া যন্ত্র-সাহায্যে যে মোটা কাপড় তৈয়ারী হইতেছে, বস্তা বা গাঁট বাঁধিবার পক্ষে সে কাপড় খুব মজবুত!

সম্প্রতি এই সমর-সঙ্কটের দিনে নিউ অর্লিন্সের একটি কারখানায় হাইড্রলিক্ যন্ত্রযোগে এই কার্পাশ তুলা গাঁট-বন্দী হইতেছে,—এক-একটি গাঁট লম্বে ৫৪ ইঞ্চি, প্রস্থে ৪৬ ইঞ্চি এবং পুরু প্রায় ২৭ ইঞ্চি। এমন প্রচুর গাঁট নিত্য আজ রেলে-ষ্টিমারে অজস্র ভাবে য়ুরোপে চালান যাইতেছে। মার্কিন যুক্তরাজ্যে ভার্জিনিয়া হইতে কেরোলাইনা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ প্রদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভূ-ভাগ ব্যাপিয়া আজ তুলার চাষ চলিয়াছে ; এবং মার্কিন যুক্তরাজ্যের এগারোটি প্রদেশে এই তুলা হইল সেখানকার জনগণের জীবিকা ও সমৃদ্ধির একমাত্র উপায়। মিসিশিপি নদী হইতে খাল কাটিয়া এই সব ক্ষেতে সহজে এবং সুলভে জল আনিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। টেক্সাশের কঠিন-শুষ্ক ভূমি এই খালের জলে এমন তৈরী হইয়াছে যে, এখানকার তুলার ফশল দেখিলে মনে হইবে, কমলা দেবীর অধরে যেন শুভ্র হাস্যের নির্ঝর ঝরিতেছে!

সূতি-কাপড়ে রকমারি নক্সা তোলা

এ-যন্ত্রে সূতি-কাপড়ে কাগজের মতো নক্সা ছাপা হয়

পৃথিবীতে এখন যে-পরিমাণ তুলা উৎপন্ন হইতেছে, তার শতকরা সত্তর ভাগ জন্মায় এই মার্কিন যুক্তরাজ্যে। অধ্যবসায় ও কৃষিকৌশলের দৌলতে এ-ফশলের পরিমাণ দিনে দিনে বাড়িয়া চলিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাজ্যের

পর তুলার সমৃদ্ধি দেখা যায় ভারতবর্ষে এবং রাশিয়ায়। ভারতবর্ষে এবং রাশিয়ায় বছরে এখন চল্লিশ-লক্ষ গাঁট তুলা উৎপন্ন হইতেছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে ব্রেজিলে তুলা জন্মিত বছরে প্রায় সাড়ে পাঁচ-লক্ষ গাঁট। এখন সেই ব্রেজিলে তুলা উৎপন্ন হইতেছে একুশ লক্ষ গাঁট। তুলার চাষে চীন এবং মিশর আজ ব্রেজিলের কাছে পরাজয় মানিয়াছে। তুলার কাজে সমৃদ্ধি বাড়িবার ফলে মার্কিন যুক্তরাজ্যে এবং ব্রেজিলে শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসার বাড়িয়াছে। বন কাটিয়া, বড় পাহাড় ভাঙ্গিয়া যেমন ফ্যাক্টরি তৈয়ারী হইতেছে, তেমনি সে-সব ফ্যাক্টরিতে যাঁরা নানা কাজ করেন, তাঁদের জন্য নির্ম্মিত বসতি, তাঁদের পুত্র-কন্যাদের শিক্ষার জন্য স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, লাই-ব্রেরী, বাজার প্রভৃতির দৌলতে বহু জঙ্গল আজ সভ্যতার লীলা-ভূমি হইয়া উঠিয়াছে। এই সব নব-নির্ম্মিত গ্রাম-নগর স্বাস্থ্যশ্রীতে সমুজ্জ্বল। সুতরাং এক-মাত্র তুলার কল্যাণেই সেখানে কত ভূধর হইল নগর, কত কানন বসতিকেন্দ্র!

পালকের চেয়ে হাল্‌কা তুলার পাঁজ—এ তুলায় লিণ্ট তৈয়ারী হয়

তুলার ফশল ফলাইয়া, সেই তুলা হইতে সুতা বাহির করিয়া, সে সুতায় দু'-চার রকমের কাপড় বুনিয়াই আগেকার মতো এখনকার কলওয়ালারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া নিশ্চিন্ত নয়। ধনী-গরীব-গৃহস্থ-ঘরেও স্ত্রীপুরুষ-বালক-বালিকাদের ঘরে-বাহিরে সকল ঋতুতে সুলভে কিরূপ কাপড়-চোপড় জোগানো যায়—সে সম্বন্ধে কলওয়ালাদের অনুশীলনাদির সীমা নাই।

কম্বল বুনিবার জন্ম সুতি-কাপড়ের টেম্পারেচার পরীক্ষা

কথাটা একটু খুলিয়া বলি। অর্থাৎ ৯৯ নম্বরের মজবুত মার্কিন-থান বাহির করিয়াই এখনকার কলওয়ালারা সেই কাপড় জোগান দিয়া নিরস্ত নন; ৯৯ নম্বরের থানের চেয়ে আরো মজবুত অথচ আরো সুলভে অন্য কি থান বাজারে জোগান দিতে পারা যায়, সে সম্বন্ধে কলের এঞ্জিনীয়ার-শিল্পী-সম্প্রদায়ের সাধনার অন্ত নাই! এবং এই সাধনার ফলে গরীব-গৃহস্থ-সাধারণ আয়ের অনুরূপ অর্থ ব্যয় করিয়া যেমন মজবুত ও মানানসই কাপড়
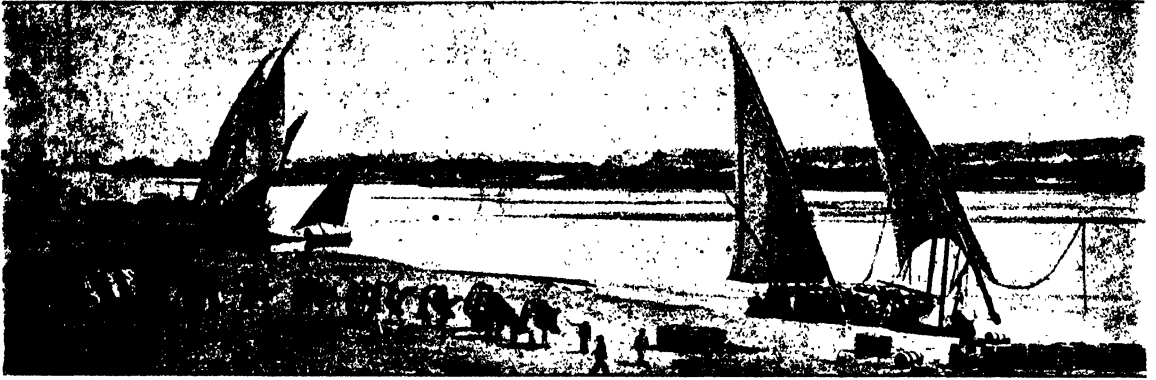
মিশরে উটের পিঠে তুলার বস্তা—জাহাজে চড়িয়া চালান যাইবে

কিনিয়া ব্যবহার করিতে পারিতেছে, তেমনি রকমারি থান জোগাইয়া কল-ওয়ালাদের লাভের অঙ্কও পরিমাণে উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। আমেরিকার বহু মিলে আজ এমন মিহি ধুতি তৈয়ারী হইতেছে, যে প্যারিসের সাধারণ-সিল্ক সে-কাপড়ের কাছে হার মানে। বিশেষজ্ঞেরা সদম্ভে বলিতেছেন—ভারতবর্ষের মশলিন একদা যে সমাদর ও খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, মার্কিন-মিলের এই সব মিহি ধুতি-কাপড় অচিরে ঢাকার সে-মসলিনের আসন অধিকার করিবে! তাঁরা বলেন, য়ুরোপে সিল্কের আদর আছে; আমেরিকা সিল্কের কাপড়ের চেয়ে সুতির কাপড়কে বেশী ভালোবাসে; তার কারণ, সুতি-কাপড় যেমন খুশী, যে-মাপে খুশী, তৈয়ারী করা সহজ; তার উপর সুতি-কাপড়ে যত রকমারি রঙ ও ডিজাইন তোলা যায়, সিল্কে তার সিকি-ভাগ তোলা যায় না। সর্ব্ব দেশের সর্ব্ব প্রকার কাপড়ের আদর্শে আজ সেখানে যে-সব সুতি-কাপড় তৈয়ারী হইতেছে, তার বৈচিত্র্য দেখিলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

এ-যন্ত্রে সুতি-কাপড়ে পাঁচমিশেলি-রঙের নক্সা তোলা হয়

ফ্যাশন-সিটি বলিয়া নিউ-ইয়র্কের যে-খ্যাতি আজ বিশ্ব-বিশ্রুত, তার মূলে মার্কিন তুলার তৈয়ারী সুতি-কাপড়ের বৈচিত্র্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর চারিদিক হইতে এ সব মিলে কাপড়ের অর্ডার আসে। কোনো থানের অর্ডার পঁচিশ-লক্ষ গজের কম নয়! যেখান হইতে যে

মিশর—তুলার ইংরেজ গ্রাহক

সুতি-কাপড়েও বাহার খোলে

প্রতি-কাটিমে ৫০।৬০।৭০।৮০।১০০।১২০। ১৫০ গজ করিয়া সুতা থাকে। এ কাজে হাতের স্পর্শ নাই। সুতা বাহির করা, কাটিম টানিয়া সে-সুতা কাটিমে জড়ানো, কাটিমে লেবেল আঁটা—সব কাজ যন্ত্র-যোগে নির্ব্বাহিত হইতেছে। এ সব সুতায় সরু-মোটার সূক্ষ্ম স্তর, নানা বর্ণের শেডের বৈচিত্র্য দেখিলে মনে হইবে সেই পদ্যপাঠের কবিতার ছত্র, "ঠিক যেন ঈশ্বরের খড়ি!"

কাপড় রঙ করার ব্যাপারে একবার বেশ খানিকটা চাঞ্চল্য জাগিয়াছিল। মার্কিন মুল্লুকে জাতীয় পতাকার রঙ লইয়া গোলযোগ ঘটে। অর্থাৎ নানা মিলের নানা শেডের রঙদার কাপড় লইয়া সাধারণে পতাকা তৈয়ারী করিয়া গৃহ-সজ্জা বিধান করিত। ইহার ফলে রঙের শেডে বহু তারতম্য ঘটিল। তখন ওখানকার সেক্রেটারি অফ কমার্শ হার্বার্ট হুভার সুতার আইন রচিয়া রঙের শেড সম্বন্ধে বিধি নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। আমেরিকায় এখন সরকারী বর্ণ-কমিটী

ডিজাইন, যে প্যাটার্ণের অর্ডার আসুক, মার্কিন-মিল সেই অর্ডার-অনুযায়ী নিখুঁত কাপড় জোগায়! এক-একটি মিলে সেলাইয়ের কল আছে ৪০০।৫০০ করিয়া। এ সব কল সারাদিন চলিতেছে—যেন লক্ষ মৌমাছির গুঞ্জন-রব উঠিয়াছে! এ সব কলে জামা-কাপড় সেলাই হয় না; নানা ছাঁদের নানা রঙের সুতা তৈয়ারী হইতেছে।

(Colour Committee) গঠিত হইয়াছে। এই সমিতি সেখানকার সামরিক বিভাগের নেভি ও মেরিন কোরের পোষাকের বর্ণ নির্দ্দেশ করিয়া দেন।

তার উপর সামাজিক বহু সমিতিও মেয়েদের সাজ-পোষাকের কাপড়ের রঙ নির্দ্দেশ করিয়া মহিলা-সমাজের ফ্যাশন নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। ছেলেমেয়েদের স্কুলের

পোষাক, খেলার পোষাক—এ-সবের রঙও স্কুল-কর্ত্তৃপক্ষ নির্দ্দেশ করেন। নাট্য-সম্প্রদায় হইতে বড় বড় অভিনেতা ও প্রযোজকগণ পোষাক-পরিচ্ছদের বর্ণ ও ডিজাইন নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। এবং যে রঙের কাপড় যখন প্রয়োজন হয়, ফ্যাক্টরিগুলির কর্ম্মতৎপরতায় তখনি তাহা পাইতে কাহারো কোনো অসুবিধা ঘটে না।

গলার 'কলার, পুরুষ-মানুষের সার্টের কাপড়, পা-জামা, অফিসী-সাজ—এ সবের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য গঠনে এবং রক্ষায় মার্কিন জাতির মতো পটুতা আর কোনো জাতির নাই! আটপৌরে বা পোষাকী সকল পরিচ্ছদেই এই সুতি-কাপড়ের প্রচলন করিয়া মার্কিন জাতি পৃথিবীতে অভিনবত্বের সৃষ্টি করিয়াছে।

জামার কলার, হাতের কফ্—এ সব নানা ছাঁদে স্বতন্ত্র ভাবে তৈয়ারী হইতেছে। হাফ-সার্টে যে যে-ফ্যাশনের কফ্ লাগাইতে চায়, স্বচ্ছন্দে লাগাইতে পারে। ইহাতে লাভ হইয়াছে এই কোটের নীচে যে-সার্ট গায়ে দেওয়া হয়, নিত্য সে-সার্ট কাচাইতে গেলে খরচ পড়ে অনেক; তাছাড়া ছ'দিনে ছটা আলাদা সার্ট গায়ে দিবার সামর্থ্য ক'জনের থাকে! কিন্তু একই হাফ-সার্ট গায়ে দিলাম—সে সার্টে নিত্য নূতন কফ্ এবং কলার আঁটিয়া পরা কঠিন নয়! তাছাড়া এই কলার ও কফ্ বাড়ীতে কাচা চলে। আমেরিকাই সর্ব্ব-প্রথম এই আলাদা কফ্ ও কলারের প্রবর্ত্তন করিয়াছে; এবং তাহা করিতে পারিয়াছে শুধু তুলার চাষে তার প্রচুর সমৃদ্ধির ফলে।

সার্ট তৈয়ারী করা সহজ বলিয়া মনে হয়। আসলে তা নয়। সার্টে আছে ৩১টি বিভিন্ন অংশ (parts); তার উপর বোতাম আঁটিতে হয়; মেকারের লেবেল মারিতে হয়। কলারে আছে ছ'টি অংশ। একটি কলার তৈরী করিতে তেরো রকমের ভাঁজ, কাটা ও সেলাইয়ের কশরতি সাধন করিতে হয়। সার্ট ও কলার সৃষ্টির এ-কাহিনী গল্প-উপন্যাসের মতোই কৌতূহলোদ্দীপক।

সুতা হইতে যে-কাপড় বোনা হয়, সে-কাপড়ে এত
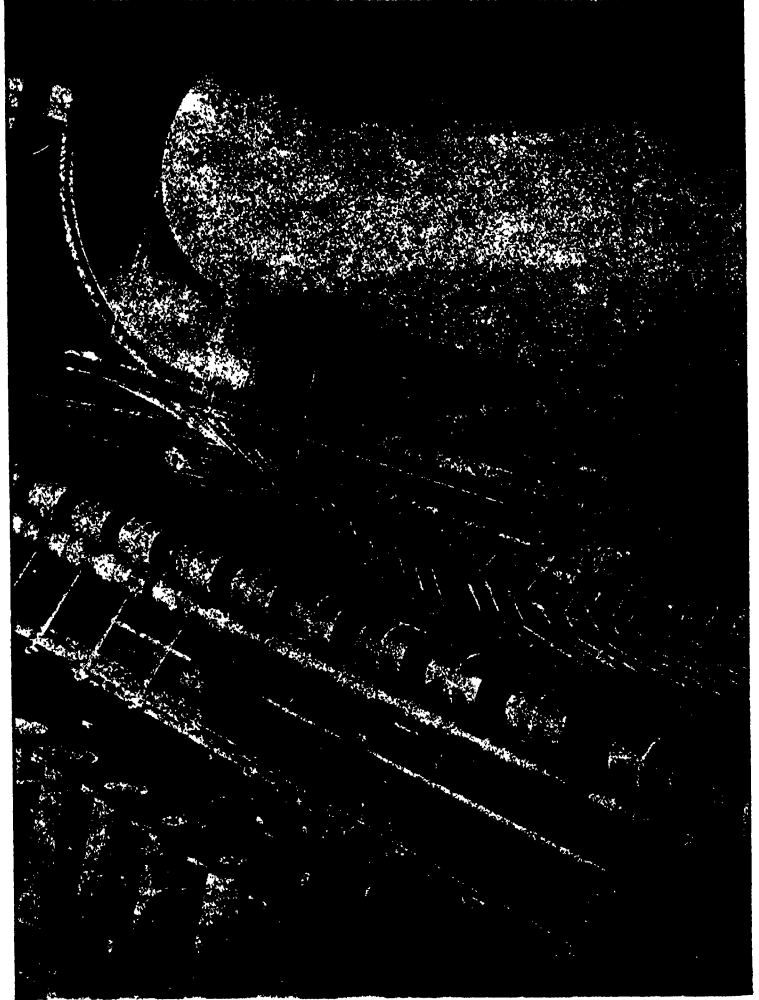
টায়ারের কারখানায় রবারের সঙ্গে সুতার মিশেল-প্রণালী

বৈচিত্র্য কি করিয়া ঘটে, ভাবিলে বিস্ময় বোধ হয়! ঐ একই তুলা,—সুতায় না হয় মিহি-মোটার পার্থক্য আছে—কিন্তু তাই বলিয়া কোনো কাপড় রেশমের মতো কোমল, আবার কোনো কাপড় কম্বলের মতো রুক্ষ, কর্কশ কি করিয়া এমন হয়? তার উপর ছিট ও রঙের ঐ রকমারি বৈচিত্র্য! যাহাকে আমরা বলি লংক্লথ, টুইল, সেলুলা—ঐ একই সুতা হইতে

কাপড়ে এ-পার্থক্যের সৃষ্টি যেন যত্নকরের যাদু বলিয়া মনে হয়!

এক শত বৎসর পূর্ব্বে সোডা-দ্রাবকে ভিজাইয়া এক জন কাপড়-ছাপা-ওয়ালা (printer) রাসায়নিক উপায়ে কাপড়কে খুব মজবুত করিতেন। পরবর্ত্তী যুগে নানা শিল্পী ও বৈজ্ঞানিক নানা ভাবে কাপড়ের বুননে পার্থক্য সৃষ্টি করেন। অবশেষে জন মার্সার নামে এক জন ইংরেজ বৈজ্ঞানিক কাপড়কে 'মার্সিরাইজ' করিতে সমর্থ হন। তাঁর নাম হইতেই বিশেষ-জাতের কাপড়ের নাম হইয়াছে 'মার্সিরাইজড্ কটন্'। মার্সারের পরেও গবেষণা-পরীক্ষার নিবৃত্তি নাই। সে-পরীক্ষার ফলে এমন কাপড় তৈয়ারী হইতেছে, যাহা কাচিলে গুটাইয়া খাটো হয় না অর্থাৎ স্রিঙ্ক করে না। কাপড়কে 'কুঞ্চনে'-খাটো-হওয়া হইতে নিরাপদ করিবার জন্ত আলাদা যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। এদেশী মিলে বিছানার মোটা চাদর প্রভৃতি যাহা তৈয়ারী হইতেছে, সে-সব চাদরকে এখনো unshrinkable অর্থ ধোলাইয়েও সমান থাকিবে, গুটাইয়া খাটো হইবে না, এমন নিরাপদ-নিরাময় করিয়া তুলিতে আমরা পারি নাই। তাছাড়া থান কাটিবার সময় হাত দিয়া টানিয়া ফাঁড়িতে গেলে অনেক সময় সে-কাটা বাঁকিয়া যায়। কিন্তু বিলাতী বা মার্কিন থান ফাঁড়িলে তাহা সোজা আলাদা লাইনেই বিভক্ত হয়। কেন এমন ঘটে? তার কারণ, য়ুরোপ-আমেরিকার ফ্যাক্টরিগুলিতে কাপড় তৈয়ারী হইবামাত্র সে-কাপড়ের তন্তু-জালকে (fibres) সর্ব্বংসহ করিতে শিল্পীর যত্নের সীমা নাই! কোনো মতে কাপড় বুনিয়া বাজারে পাঠাইয়া মার্কিন ব্যবসায়ী তৃপ্তি পান না, সে কাপড় নিখুঁত ও রকমারি, সুলভ ও মজবুত করিতে তাঁর তৎপরতার সীমা নাই এবং সে-দিকে তাঁদের সাধনা চলিয়াছে যুগ-যুগান্তর ব্যাপিয়া সমান উৎসাহে, সমান যত্নে! ভারতীয় মিলের মালিক ও শিল্পীর দল যদি এ-দিকে সচেতন না হন, তাহা হইলে আন্তর্জাতিক-প্রতিযোগিতায় তাঁদের পক্ষে পশার-প্রতিপত্তি রাখা দূরের কথা, টিঁকিয়া থাকা কঠিন হইবে। কারণ, দেশের ও জাতির উপর ভালোবাসার দোহাই দিয়া মানুষ কত দিন অর্থহানির গুরু-ক্ষতি সহ্য করিবে? এ-কথা এদেশী মিলওয়ালাদের ভাবিয়া দেখা উচিত।

তুলার বাজার—নিউ অর্লিন্স

বহু-সাধনায় আমেরিকার মিল সম্প্রতি সুতির কম্বল তৈয়ারী করিয়াছে। সুতি-কম্বলে কি করিয়া শীত নিবারণ হইবে, সে বিষয়ে তাঁরা লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়

করিয়া বহু পরীক্ষা করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তাঁদের ক্লান্তি বা অবসাদ ছিল না। সুতার কাপড়ে কি পরিমাণ বাতাসকে আবদ্ধ (confined) রাখা যায় এবং শৈত্য নিবারিত হয়, তাহাও তাঁরা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। নির্দ্ধারণ করিয়া বিশেষ যন্ত্র-সাহায্যে insulation-প্রণালীতে তাঁরা শীতাতপ সুতি-কম্বল রচনা করিতেছেন।

তার পর এই সুতির কাপড়কে রবারের সহিত জুড়িয়া রবারের জুতা, রবারের পোষাক-পরিচ্ছদ, হোজ-পাইপ, টিউব, ইনসুলেট-করা তার—কি না আজ তৈয়ারী হইতেছে! মোটরের টায়ার-নির্ম্মাণে আমেরিকার রবারের সঙ্গে প্রতি বৎসর যে-কাপড় লাগে; তার পরিমাণ প্রায় পাঁচ লক্ষ বেল্।

তুলা বা সুতার ছাঁট ও ধুলা-গুঁড়াও আমেরিকায় আবর্জ্জনা বা জঞ্জাল বলিয়া পরিত্যক্ত হয় না। এ ছাঁট বা ধুলা-গুঁড়াকে আমেরিকা দেখে স্বর্ণরেণুর মতো! এ ধুলা-জঞ্জাল জড়ো করিয়া রাসায়নিক দ্রাবকে ফেলিয়া জ্বাল দিয়া যে মণ্ড তৈয়ারী হয়, সে মণ্ড হইতে আবার সুতা ও কাপড়ের সৃষ্টি হয়। এ সুতা লাগে অবশ্য হাল্কা প্যাকেজ বাঁধিতে; এবং এ কাপড় লাগে প্যাকেট র‍্যাপ করিতে বা মুড়িতে।

মার্কিন মিউজিয়মে রক্ষিত প্রাচীন ভারতীয় তুলা ও কাপড়ের তৈয়ারী মুকুট

রেশম ও পশমের মূল্য সুতির কাপড়ের চেয়ে অনেক বেশী। এজন্য এই সুতির কাপড় হইতেই নানা বৈজ্ঞানিক কৌশলে বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীর দল আজ নকল রেশমী ও পশমী কাপড় তৈয়ারী করিতেছেন। সে নকল রেশমী ও পশমী কাপড় আসল-রেশমী-পশমী কাপড়ের চেয়ে নিরেস নয়। অথচ নকলের দাম আসলের চেয়ে এত কম যে, আসলের তুলনায় ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে সকলেই এ নকল অনায়াসে ব্যবহার করিতে পারেন। কঠিন সত্য-কার জগতে সৌখীনতার হ্রাস হইবে না এবং কত কম-খরচে এ-সৌখীনতা রক্ষা করা যায়, সে-দিকে কাহারো লক্ষ্য কোনো দিন শিথিল হইবে না! মনুষ্য-চরিত্রের এই দুর্ব্বলতা বলুন বা স্বাভাবিক গঠন বলুন, ইহারি উপর নির্ভর করিয়া এ যুগের বৈজ্ঞানিক-শিল্পীর দল বলিতেছেন,—এই তুলা আমাদের প্রাণ, এই তুলা আমাদের মান, এই তুলা আমাদের রক্ষা করিবে। আজিকার এ যুগে রাশিয়া এই তুলার উপর মান ও প্রাণের জন্য কতখানি নির্ভর রাখিয়াছে, সে-সম্বন্ধে এক মার্কিন প্রাজ্ঞের বচন উদ্ধৃত করিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি।

তিনি বলেন, তুলার গাছ যেন কল্পতরু (Royal plant)! তুলার ফশলের উপর সারা পৃথিবীর সমৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে। রৌদ্রে শিশিরে বা বর্ষার ধারায় তুলার ক্ষয় নাই। ইহার তন্তুরাজিতে কুবেরের ঐশ্বর্য্য নিহিত আছে। ইহার তৈল প্রাসাদে আরাম এবং

পেরুর ক্ষেতে মামুলি প্রথায় তুলার চাষ
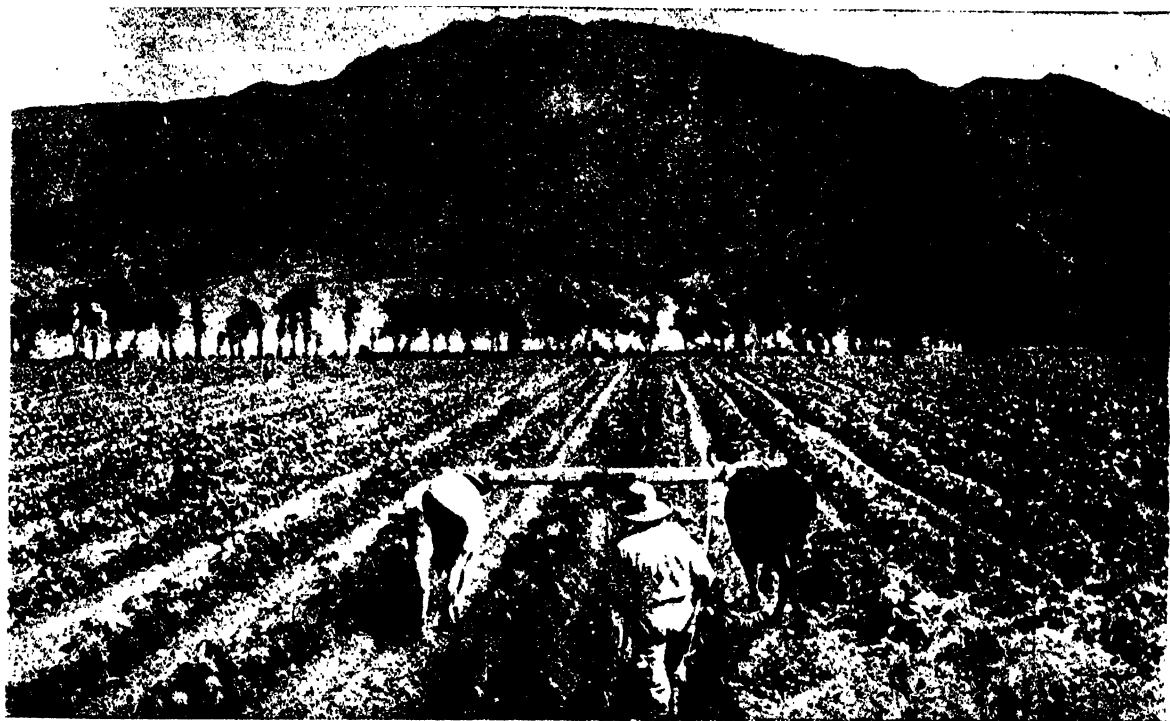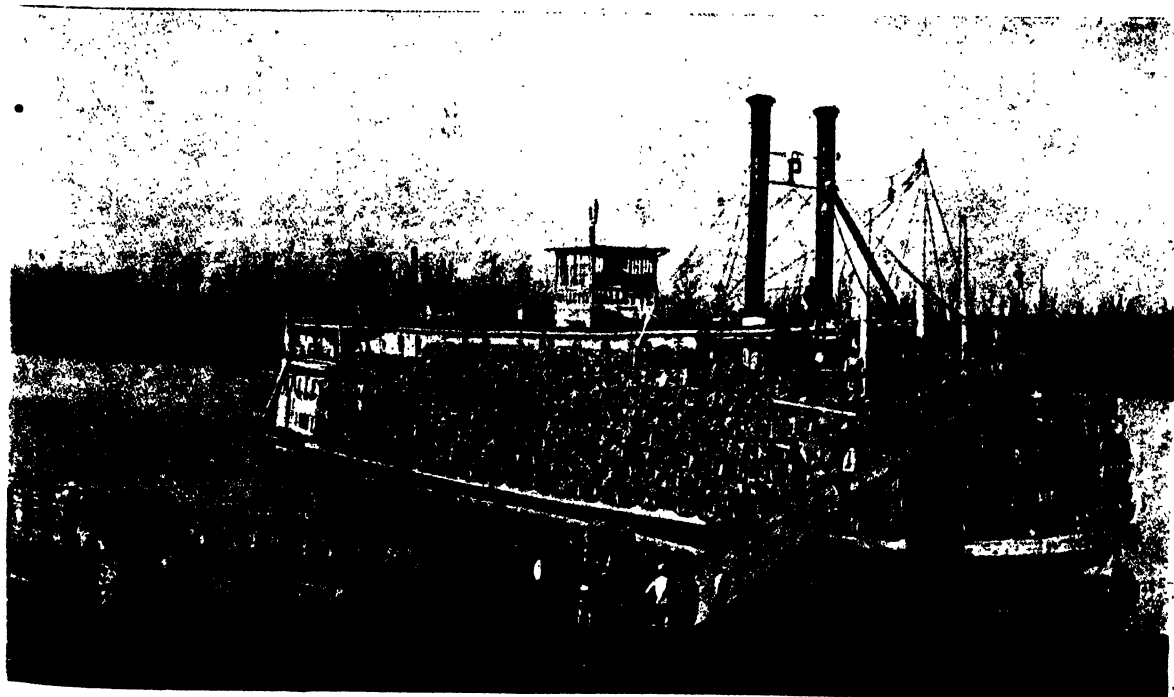
আমেরিকার ঘাটে মিসিশিপির খাল বহিয়া ভারতীয় তুলার নৌকা

কুটীরে স্বাচ্ছন্দ্য দান করে। ইহার শাঁস মানুষকে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দান করে। বসুমতীর এ দানের তুলনা নাই! হিম-শীতল মেরু প্রদেশ হইতে রৌদ্রতপ্ত আফ্রিকা পর্য্যন্ত সর্ব্ব দেশের সর্ব্ব জীবের অন্ন ও পুষ্টি এই কার্পাসে নিহিত আছে। ধান-চাল, গম-ডাল যদি এক দিন পৃথিবীর বুক খালি করিয়া নিশ্চিহ্ন হয় এবং পৃথিবীর সে-খালি বুক তুলার ফশলে ভরিয়া ওঠে, তবু পৃথিবীর সর্ব্ব জীব এই ফশলে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও তুষ্টি লাভ করিয়া পৃথিবীতে স্বচ্ছন্দে নিরাপদ দেহ-মন লইয়া বাস করিবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই!

কাফ্রী-মেয়ের সুতা বোনা

পর্দ্দার কাপড় বৈজ্ঞানিক কৌশলে আজ আগুনে পোড়ে না

আমেরিকায় এবং রাশিয়ায় তুলার চাষে আজ যে-সমৃদ্ধি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা সেখানকার গভর্ণমেণ্টের সযত্ন-সহযোগিতায়! আমাদের দেশে সে-দরদ ও সহযোগিতার সম্ভাবনা যদি না থাকে, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্টের মুখের পানে সতৃষ্ণ নয়নে না চাহিয়া তুলার চাষে আমাদের বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। তুলার চাষে বহু টাকা মূলধন বা সৌখীন ও বিপুল আয়োজনের কোনো প্রয়োজন নাই! অল্পায়াসে এ চাষের কাজে সাফল্য লাভ হইবে!

আমেরিকায় আজ তুলার এমন পশার-প্রতিপত্তি এবং ঐ তুলার দৌলতে আমেরিকার সমৃদ্ধির অন্ত নাই। আর এই তুলার চাষে আমাদের বিপুল শৈথিল্য-বশতঃ অন্ন-বস্ত্রের অভাবে আমরা এখানে হাহাকার করিতেছি! বিশেষ করিয়া বর্ত্তমান এই যুদ্ধ-সঙ্কটে মার্কিন সুতার দাম বাড়িয়াছে, তার উপর ফাট্‌কার কল-কাঠি—বাঙলায় সুতার দাম সাত টাকা হইতে কুড়ি টাকায় উঠিয়াছে! এ অবস্থায় বাঙলার তন্তশিল্পের বাঁচিবার সকল আশা তিরোহিত এবং লক্ষ লক্ষ তন্তশিল্পী একান্ত নিঃস্ব ও নিরুপায়! ইহার আশু-প্রতিকারে যদি আমরা মনোযোগী না হই, তাহা হইলে বনের বল্কল আশ্রয় দূরের কথা, বাঙালীর ভদ্রতা ও প্রাণ রক্ষা করা কঠিন হইবে!

কিংশুক, কুমুদ, পলাশ, আর তাদের বৈমাত্রেয় ভগিনী পারুল, বড় দিনের ছুটিটা উপভোগ করিবার জন্য একটা প্রোগ্রাম করিয়া ফেলিল—এক দিন জু, এক দিন সার্কাস্, এক দিন বোটানি-উদ্যানে বনভোজন এবং শেষের দিনটাতে সিনেমা।

পারুল হাততালি দিয়া লাফাইয়া উঠিয়া কহিল,—"বড়-দা, তোমার মাথা আছে। চমৎকার 'সাজেষ্ট' করেছ।"

পলাশ কহিল, "এর চেয়ে 'বেটার' আর কিছু হতে পারতো না।"

কুমুদের গাড়ী চালাইবার প্রচণ্ড সখ, লাইসেন্সও পাইয়াছে; তথাপি পিতার নতুন গাড়ীখানাতে হাত দিবার অনুমতি পায় না। এই সুযোগে যদি সেটা লাভ হয়! দাদার দিকে তাকাইয়া সে কহিল,—"বাবার গাড়ীখানা যদি সুবিধা করতে পারা যায়—"

কিংশুক বাধা দিয়া কহিল, "ওরে বাবা!—আচ্ছা পারুল, তুমিই সে চেষ্টা কর।"

গাড়ীর উপর পারুলের বিশেষ ঝোঁক ছিল না। কুণ্ঠিত ভাবে সে কহিল,—"আমি?"

পলাশ জোর দিয়া কহিল, "নিশ্চয়ই তুমি।—আমরা সকলেই যখন কিছু-না-কিছু কচ্ছি, তুমি তখন এ কাজটা করতে পারবে না বল্লে চলবে কেন?"

পলাশের সহিত পারুলের ভাব ছিল যতখানি, ঝগড়াও হইত ততোধিক। বছর-দুই বয়সের ব্যবধানের মাঝে মস্ত একটা ছেদ থাকিলেও পরস্পরের ঈর্ষা, ভালবাসা এক মাতৃকোলে পালিত হওয়ার মতই অক্ষুণ্ণ ছিল!

পলাশের কথায় পারুল একটু গরম হইয়া উঠিল। চড়া-সুরে কহিল, "দেখ ছোড়-দা, তোমার অত মোড়লী ভাল লাগে না। তুমি কার কি উপকার কচ্ছ? কি কাজে আছ? খালি খরচের বোঝা!"

সতরঞ্চির উপর পা দু'খানা লম্বা করিয়া ছড়াইয়া দিয়া অত্যন্ত অবজ্ঞার সুরে পলাশ কহিল, "হ্যাঁ, আমার বিয়েতে বাবাকে দশ হাজার টাকা বের করতে হবে।"

—বাস্! আর যাবে কোথায়? পারুল যেন আগুন হইয়া উঠিল; ঝাঁঝাল সুরে কহিল,—"অত হিংসে হ'য়ে থাকে যদি, তাহলে নিজের ঘর-বাড়ী ছেড়ে পরের বাড়ী যেও।"

কিংশুক কহিল,—"পরি, তা হলে তোরা ঝগড়া কর। আমি ওর মধ্যে নেই।"

স্বার্থে আঘাত লাগিলে মিত্রের সহিত শত্রুতা হইতেও বিলম্ব হয় না। গরজের চেয়ে এক করিবার বস্তু আর কি আছে?

পলাশ, পারুল মুহূর্তে কলহ ভুলিয়া একসঙ্গে বলিয়া উঠিল,—"না বড়-দা, তোমার পরামর্শই আমরা শুনব।"

কুমুদ স্বত্বটা ঝালাইয়া পাকা করিয়া লইবার জন্য কহিল,—"কিন্তু গাড়ীর ভার পারুল তোমার উপর।"

পারুল মাথা নাড়িয়া কহিল, —"আচ্ছা",—কিন্তু মনে তেমন ভরসা পাইল না। কি জানি, বাবা সম্মত হইবেন কি না—সেই ভয়টাই যেন খোঁচের মত তাহার বুকে ভিতর খচ্-খচ্ করিতে লাগিল।

সেটা রবিবার। সৌরেন অধিক বেলায় ভোজন করিয়া মেঝের বিছানাতে শুইয়া পড়িলেন।

পারুল আজ না ডাকিতেই পিতার আহারের সময় উপস্থিত ছিল। এখন তিনি শয়ন করিতেই সে আড়ম্বর করিয়া তাঁহার পা টিপিতে বসিয়া গেল।

বাবা হাসিয়া কহিলেন,—“কি চাই?”

লজ্জিত মুখখানা ঈষৎ অবনত করিয়া পারুল একটু হাসিল; কিন্তু পদসেবা বন্ধ করিল না,—কোমল হস্তের মৃদু সঞ্চালনে আরামের সৃষ্টি করিয়া চলিল।

এই সেবাটা ছিল সৌরেনের অত্যন্ত প্রিয়। তৃপ্তি-সূচক আঃ! উঃ। শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতেই তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হইলেন।

বৈকাল চারিটায় সৌরেনের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সেবারতা কন্যাকে তখনও পদতলে উপবিষ্টা দেখিয়া তিনি সস্নেহে হাসিয়া কহিলেন, “তার পর তোমার মতলবখানা কি?”

শোভা ছাদের উপর বড়ির তদারক করিতে করিতে ডাক দিলেন,—“ও পরি, এইখানেই চুল বাঁধ্‌বি আয়!”

—“যাই মা!” বলিয়া পারুল কহিল,—“বাবা চার দিন তোমার অফিসের ছুটী, নয়?”

—“হ্যাঁ! তাতে তোর আপত্তি কি?”

—একটা ঢোঁক গিলিয়া পারুল কহিল,—“তোমার গাড়ীটা যদি ‘ক্রিস্‌মাসের’ ক’টা দিন আমাদের দাও।”

বিস্ময়ের সুরে সৌরেন কহিলেন,—“তোমাদের মানে?”

আর একটা ঢোঁক গিলিয়া পারুল কহিল,—“মানে আর কি? আমি, বড়-দা, মেজ-দা, ছোড়-দা—এই ক’দিন গাড়ীখান ‘রিজার্ভ’ করতে চাই।”

—“কোথা যাবে—?”

পারুল তাহাদের বেড়াইবার ফিরিস্তিটা মুখে মুখে দাখিল করিয়া কহিল,—“যাব বাবা?”

সৌরেন হাসিলেন। কহিলেন, “বেশ, আমার আপত্তি নেই! নগেনকে বলে দেব। আমি তো ছুটীতে মধুপুর যাচ্ছি! ক’টা দিন গাড়ী ‘ফ্রি’ থাকবে; তোমরা নিতে পার।”

পারুল যেন এইমাত্র একটা রাজ্য জয় করিয়া ফিরিল, এই ভাবে কিংশুকের ঘরে আসিয়া উৎসাহ-ভরে কহিল,—“বড়-দা, কেল্লা ফতে! বাবা একদম্ চার দিনের জন্য গাড়ী ছেড়ে দিয়ে মধুপুর যাচ্ছেন! গাড়ী ফ্রি থাকবে! আমাদের নিতে বল্লেন।”

* * * *

এক সপ্তাহ অধীর প্রতীক্ষার পর অবশেষে সেই প্রার্থিত রবিবারটা সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে আসিয়া দেখা দিল। সৌরেন বাঁধা-ছাঁদা করিয়া বিদেশে পাড়ি দিলেন। কিংশুক আসিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল,—“প্রথমেই বোটানিক্যাল্ গার্ডেন।”

প্রস্তাবটা ভোটে দিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। দাদার সহিত সকলেই একমত। কুমুদ কহিল,—“নিশ্চয়। আর দেখ, মা বল্‌তে পারবে না, একা রইলুম! নগেন বাড়ী থাকবে, কি বল বড়-দা!”

বড়-দা গম্ভীর মুখে কহিলেন,—“ও-সব তো আগে হতেই ঠিক হয়ে গেছে। আর দেরী নয়! চট্‌পট্ খাওয়া শেষ ক’রে সবাই ‘রেডি’ হয়ে নাও।”

পলাশ কহিল,—“কুকারটাও সঙ্গে নিতে হবে।”

কুমুদ কহিল,—“তা না’হলে তিরিশ টাকা খরচ করে কেনা হোলো কি জন্যে? নে পরি, তোর তো চুল ঠিক করতেই এক ঘণ্টা!”

—বাঃ! আমার একটুও দেরী হবে না। তোমাদেরই টেরির বাহার কর্ত্তে গিয়ে আর কোন কথা মনে থাকে না।”

শোভনা সেখানে আসিয়া বলিলেন,—“ওরে কিংশুক, আজ পূর্ণিমা, কালীঘাটে যাব, পৌষ-কালী এখনও দেখা হয়নি যে—আমার সঙ্গে চল।”

কিংশুক কুমুদের মুখের দিকে চাহিল। পলাশ আর স্থির থাকিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কিসে যাবে তুমি?”

—“কেন? উনি যে বলে গেলেন, গাড়ী চার দিন ফ্রি রইল।”

পারুল ঘাবড়াইয়া গেল; কহিল, “কি রকম! বাবা চার দিন গাড়ী আমাদের দিয়ে গেছেন। মোটর নিয়ে আমরা এক্সমাসের কটা দিন এন্‌জয় করব বলে প্রোগ্রাম করেছি।”

শোভনা ধমক দিয়া বলিলেন,—“সাধে কি মেয়েদের ইস্কুল-কলেজে দিতে চাইনে? ভারী স্বাধীনতা

পেয়েছে! কিংশুক, তুই এখন আমায় নিয়ে যাবি কি না শুনতে চাই।"

অসন্তুষ্ট মুখে ঔদাস্যভরে কিংশুক কহিল, "তা চল না। আমি যাব না বলেছি?"

পৌষের প্রভাতে সূর্য্য মেঘাবৃত হইল; হাস্যোজ্জ্বল মধুর প্রভাত বিরস হইয়া উঠিল। প্রফুল্ল কিশোর-অন্তর ক্ষোভে বিচলিত হইল। তথাপি তরুণের দল পরের দিনটির প্রতীক্ষায় রহিল। যথাসময়ে সে দিনটাও দেখা দিলে তরুণের দল আনন্দ-কোলাহল-ধ্বনি তুলিবার পূর্ব্বেই শোভনার নূতন ইস্তাহার জারী হইল।

ছেলে-মেয়েদের লক্ষ্য করিয়া তিনি কহিলেন,—"ধেই ধেই ক'রে অত নাচছ যে! গাড়ী কিন্তু আজ হবে না। চক্রোত্তীদের বড় গিন্নী আজ দু'মাস ধরে গাড়ী চাইছে, ওদের শশীর 'মানত'-পূজো দিতে কল্যাণেশ্বর যাবে বলে। উনি বড়দিনের ছুটীতে গাড়ী দিতে রাজি হয়েছিলেন। আমায় কাল জিজ্ঞেস করতে এসেছিল ওরা,—আমি বলে দিয়েছি—গাড়ী পাবে আজ!"

ছেলেরা এ কথার প্রতিবাদ করিল না; কিন্তু অভিমানের মেঘ যেন তাহাদের মুখের উপর থম্-থম্ করিতে লাগিল!

বুধবারেও গাড়ী পাইবার উপায় রহিল না! শোনা গেল, কিংশুকের দিদিমা সে দিন ওলাইচণ্ডীর পূজো দিতে যাইবেন! তিন মাস পূর্ব্বেই তিনি জামাতাকে সে কথা বলিয়া রাখিয়াছেন।

কুমুদ কহিল, "বেশ তো, সবাই মিলে একটা ট্যাক্সি—"

কিংশুক মুখ ভেংচাইয়া বলিয়া উঠিল, "দায় কেঁদেছে! ভাড়াটে গাড়ী! কোথ্থাও যাব না। নিজেদের গাড়ীই যখন এ ভাবে—"

কিংশুকের এবার থার্ড-ইয়ার। তাই পলাশ কহিল, "বড়-দা, আর বছর তো তুমি বি-এ পাশ করবে।"

কুমুদ কহিল, "বড়-দা, তুমি একটা ব্যবসা সুরু করে দাও; এটা আমাদের ব্যবসার যুগ।"

ম্যাট্রিক পাশ করিয়া কুমুদ সবে যাদবপুরে ঢুকিয়াছে।

পারুল কহিল, "বড়-দা, তুমি কোন্ লাইনে যাবে? আমি বলি, কাপড়ের মিল খোল।"

পলাশের ফার্ষ্ট-ইয়ার চলিতেছিল; সে কহিল, "দূর গাধা! অত ক্যাপিট্যাল কোথা থেকে জুটবে?"

পারুল কহিল, "কেন, লিমিটেড কোম্পানি ষ্টার্ট্ করবে বড়-দা। সেয়ার বিক্রি করতে হবে। দেখ বড়-দা, আমি তোমার সেয়ার বিক্রির জন্যে ক্যান্‌ভাস্ করব।"—পারুল সেকেণ্ড ক্লাসের ছাত্রী।

কিংশুক কিন্তু কোন কথাই কহিল না। দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া নীরবে যেমন বসিয়া ছিল, সেই ভাবেই বসিয়া রহিল।

বড়-দা'র প্রাজ্ঞোচিত গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া ছোটর দল নিমেষে বুঝিয়া লইল, তাহাদের কথা ঠিক বিজ্ঞের মত হইতেছে না।

পারুল সেকেণ্ড ক্লাসের ছাত্রী হইলেও, উপন্যাসে তাহার প্রবল আসক্তি ছিল; এবং তাহার পনের বছর বয়েসের মধ্যেই সে বিস্তর উপন্যাস পড়িয়াছিল। তাহার উপর প্রচুর সিনেমা দেখিয়া জীবনটাকে সে পর্দ্দার বুকে ছবির মতই রোমাঞ্চকর করিয়া-তুলিবার উৎকট আকাঙ্ক্ষা অনুক্ষণ তাহার কিশোর-চিত্তে পোষণ করিত।

পারুল প্রস্তাব করিল, "দাদা, আমি বলি,—এসো আমরা ক' ভাই-বোনে মিলে নিরুদ্দেশ-যাত্রা করি! সেই দিন দেশে ফিরব—যে দিন আমাদের অভ্যর্থনা করতে, বরণ করতে দেশবাসীরা চার দিক থেকে ছুটে আসবে।"

পলাশ লাফাইয়া উঠিল, সোল্লাসে কহিল,—"এক্সেলেণ্ট প্রোপোজাল।"

কথাটা কিংশুকেরও মনে ধরিল। সে ভাবিল, "নাঃ! এ পরাধীনতার পীড়ন অসহ্য।" তরুণ মন বিদ্রোহের জন্য যেন ক্ষেপিয়া উঠিল; অভিমান, ভয়, দুশ্চিন্তা, শাসনের সঙ্কোচ,—সবগুলাকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া মহোল্লাসে যেন নৃত্য করিতে লাগিল।

গুপ্ত বৈঠকের অধিবেশনে স্থির হইয়া গেল, বহু দূরে পাড়ি দেওয়া সম্বন্ধে সকলেই একমত।

মায়ের নাম করিয়া নগেনের নিকট হইতে গ্যারেজের চাবী সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হইল না! এই জরুরি কার্য্যটি নির্ব্বিঘ্নেই সম্পন্ন হইল। কি এক দুর্লভ বস্তু যেন তাহাদের হস্তগত হইয়াছে—এমনি উত্তেজনা ও আনন্দের

প্রচ্ছন্ন দীপ্তিতে কিশোরদের হাস্যোজ্জ্বল চক্ষুগুলি উজ্জ্বল শুকতারার মত জ্বল্-জ্বল্ করিতে লাগিল।

মাতৃচক্ষুর অন্তরালে পলায়নের নিখুঁত আয়োজনে, মহাকার্য্য সাধনোদ্দেশ্যে ভগবান্ তথাগতের গৃহ-ত্যাগের সঙ্কল্পের ন্যায় একটা গৌরবময় অনুভূতি প্রত্যেকের বুকে ক্ষণে ক্ষণে পরিস্ফুট হইতে লাগিল।

যাত্রাকালে পলাশ কহিল,—"পারুল মার কাছে থাক্—মা একেবারে একা হবে।"—কথাটা সকলেরই মনে আঘাত করিল। অদৃশ্য মায়া-ডোর মানুষকে কেবলই পিছনের দিকে টানে—ইহা ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ভ্রাতারা ভগিনীর মুখের দিকে চাহিল।

পারুলের দুই চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। এত বড় চিত্তোন্মাদক অভিযান,—কত নদ-নদী, কান্তার, দুরারোহ গিরিশ্রেণী, তুষারমণ্ডিত শৈল-চূড়া, দুর্গম অরণ্য, কত বন্ধুর পথ অনুক্ষণ তাহার অন্তরে স্বপ্নজাল রচনা করিত। অদৃশ্য হস্তের ইঙ্গিতে তাহারা অনুক্ষণ যেন পারুলকে নিকটে আকর্ষণ করিতেছে। পুস্তকের ভিতর দিয়া সে প্রকৃতি-জননীর যত কিছু রূপ ও সম্পদ্ দেখিয়া, বসুমতীর যত কিছু ঐশ্বর্য্য ও বৈভবের কাহিনী মুখস্থ করিয়া মনের ভিতর মালার ন্যায় গাঁথিয়া রাখিয়াছে; সে সকলই এই ভ্রমণের সময় স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিবে। এত বড় প্রলোভন কে সহজে ছাড়িতে পারে?

পারুল ডাকিল,—"বড়-দা!" তাহার সেই স্বরে গভীর মিনতি পরিস্ফুট।

যৌবন সামান্য ত্রুটিতেই যেমন রুষ্ট এবং উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, তেমনি আবার অল্প দুঃখেই অনেকখানি বোধে কাতর হইয়া পড়ে! ইহাই তাহার ধর্ম্ম। এই বয়সে মানুষ গ্রহণের জন্য যেমন ব্যগ্র, দানের জন্যও তেমনি আকুল! অভিজ্ঞেরা বলেন,—হৃদয়ের উদারতা, সহানুভূতির ব্যাপকতা যৌবনেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে।

কিংশুক কহিল,—"না, না, তুইও চল,—আমাদের এই নবজীবনের প্রভাতে কাউকেই আমরা বাঞ্ছিত আনন্দে বঞ্চিত করতে চাইনে।"

কুমুদ কহিল,—"কিন্তু মাকে—"

কিংশুক তাড়া দিয়া উঠিল; কহিল,—"ওরে ইডিয়ট্! মায়ের মনে দুঃখ না দিয়ে জগতে কেউ কোন দিন কি বড় হতে পেরেছে? মহাপুরুষের লক্ষণই তো—এই! রামচন্দ্র থেকে বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, বিবেকানন্দ, সকলেই মাকে ছেড়ে সংসার ত্যাগ করে গেছেন। প্রত্যেক মহামানবের স্নেহময়ী জননী সন্তানের জন্য কেঁদে কেঁদে দিনাতিপাত করেছেন। জানিস্, অসাধারণ মানবগণের বিধানই অন্য রকম? আর সাধারণের আইন-কানুন আর এক রকম!"

যে ক্ষুব্ধতা নিঃশব্দে সকলের মনের কোণে উঁকি মারিতেছিল, এক নিমেষে তাহা কোথায় উধাও হইয়া গেল! নিরুদ্দেশের যাত্রীরা অজানা পথের উদ্দেশে প্রফুল্ল চিত্তেই অভিযান করিল।

* ৬ * *

বিজ্ঞান-জগৎ বিশাল বিশ্বকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে আবদ্ধ করিতে পারিলেও মনের বে-পরোয়া গতিশক্তিকে সে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করিতে সমর্থ হয় নাই। অজরামর মানবচিত্ত উদ্ধতায় যেমন উন্মুখ, সাধুতায় তেমনই নিষ্ঠাবান্। কিন্তু বিজ্ঞান তা নয়; তাহাকে থাকিতে হয় একটা হিসাবের আবেষ্টনে। তাহার গতি, ছন্দ গণিত-শাস্ত্রেই অন্তর্নিবিষ্ট।

কিংশুকদের গাড়ীখানা গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড দিয়া সবেগে ধাবিত হইতেছিল। সকলেরই মুখ আনন্দোদ্ভাসিত। এ যাত্রার বিরতি কোথায় এবং তাহার পর কি হইবে—এরূপ কোন চিন্তাই কিশোরদলের উদ্দাম চিত্তে স্থান পায় নাই! তরুণ মন নিরুদ্দেশ-যাত্রার নেশাতেই মসগুল।

গাড়ীখানার গতি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিল।

পলাশ কহিল,—"কি হোলো?"

মুখখানা বিকৃত করিয়া কুমুদ কহিল,—"কি আর হবে? তৈলাভাব; তেল ফুরিয়েছে।"

চকিত স্বরে কিংশুক কহিল,—"সে কি? রিজার্ভ ট্যাঙ্ক দেখ তো?"

—"এতক্ষণ তো সেই তেলেই গাড়ী চল্‌ছিল।"

পলাশ কহিল, "মেজ-দা, তোমারই দোষে এই

বিভ্রাট্! তুমি কেন গাড়ী বার করবার সময় ট্যাঙ্কে তেল ভরে নাওনি?"

কুমুদ রাগিয়া উঠিল; কহিল,—"বাজে বকিসনি—বাবা বলে দিয়ে গেছে, রোজ এক গ্যালন্ করে তেল দেবে। তবু কত ফন্দী-ফিকির করে দোকান থেকে চার দিনের পেট্রল এ্যাড্ভান্স নিয়েছি।"

বিষাদক্লিষ্ট মুখে কিংশুক কহিল,—"তবেই তো মুস্কিল! এখন উপায়?"

কুমুদ কহিল,—"ফ্যালো কড়ি মাখো তেল,—এ তো সোজা কথা! টাকা দাও, কেনা যাক্ তেল।"

কিংশুক পকেটে হাত দিল। এ-পকেট ও-পকেট করিয়া কোটের চারিটা পকেটই খুঁজিয়া দেখিল; শেষে সার্টের পকেটেও হাত পূরিল, তথাপি নোট কি টাকা মিলিল না! সে তখন ব্যগ্র ভাবে কহিল,—"পলাশ, আমার ব্যাগটা তোর হাতে দিয়েছিলাম যে?"

—"বাঃ! তুমি চাইতেই টেবিলের ওপর আমি দিলুম না? সেই যে, মা যখন খেতে ডাকছিল।"

কিংশুক দাঁত বাহির করিয়া, মুখের অপরূপ ভঙ্গি করিয়া বলিয়া উঠিল,—"তবেই সব মাটী! দু'শো বার বলেছিলুম, ওটা পকেটে রাখবি,—যেন ভুল না হয়।"

মুখখানা কাঁচু-মাচু করিয়া পলাশ কহিল,—"আমি মনে করেছিলুম, মাফলারটা নেবার সময় তুমি সেটা তুলে নিয়েছ।"

প্রায় কাঁদিবার মত চীৎকার করিয়া কিংশুক কহিল,—"সব মাটী করেছে—এখন উপায়? পারুল, তোর কাছে কিছু আছে রে?"

পারুল জড়ের মত গাড়ীর একটা কোণে বসিয়া ছিল; কহিল,—"একখানা পাঁচ টাকার নোট এনেছিলুম তো।"

পলাশ সহর্ষে কহিল,—"থ্যাঙ্ক গড্! তবু ওতে তিন গ্যালন্ হবে।"

পেট্রল সংগ্রহ হইল। এইবার একটা চা'এর দোকান খুঁজিয়া লইয়া পেট্রল ক্রয়ের অবশিষ্ট আধুলীটা দিয়া ভাই-ভগিনী সকলে চা ও অগ্নিশুষ্ক রুটি উদরস্থ করিল। তাহারা পথে বাহির হইয়া পড়িল বটে, কিন্তু সকলেই রিক্তহস্ত হইলেও কেহই সে জন্য ক্ষুণ্ণ হইল না। যেন ইহারা বহিমিয়ার দল! এ্যাডভেঞ্চারের প্রচণ্ড নেশায় কিশোর-চিত্তগুলি ভরপূর।

গাড়ী ছুটিল বিদ্যুৎ বেগে; কিন্তু তিন গ্যালন্ মাত্র তেল, তাহার দৌড় কতটুকু? যেখানে তাহা নিঃশেষিত হইল, সে একটা জঙ্গল-সমাচ্ছন্ন স্থান; মানুষের বসতিহীন! জনমানব-বর্জ্জিত এই স্থানটি কাহারও পছন্দ হইল না; কিন্তু গাড়ীকে ঠেলিয়া তাহা লোকালয়ে লইয়া যাইবার সামর্থ্য বা স্পৃহা কাহারও ছিল না। চেতনাহীন গাড়ীখানার মতই তাহার সচেতন আরোহীরাও তখন বুভুক্ষু। সকলেই ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর। আশ্রয়লাভের জন্য উদ্বিগ্ন, কিন্তু অস্তগামী তপনের রশ্মিজাল তখন ধরাতল ত্যাগ করিয়া তরুশিরে ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। সন্ধ্যার তরল অন্ধকার বিশাল গগনের বুক হইতে ধরাতলে প্রসারিত হইতে-ছিল। অরণ্যের ঘন-সন্নিবিষ্ট গাছপালার নিবিড় ছায়া স্থানে স্থানে অন্ধকার ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছে। অদূরস্থ পল্লীগ্রাম হইতে সন্ধ্যার শঙ্খ ও কাঁসর-ঘণ্টা-ধ্বনি বাতাসে ভাসিয়া আসিয়া রজনীর সমাগম-বার্ত্তা বিঘোষিত করিতেছিল।

কুমুদ কহিল,—"গাড়ী হতে নেমে এসো। গ্রামের খোঁজ করি।"

কিংশুক তখন রাগে গস্‌গস্ করিতেছিল; সকলের চেয়ে তাহারই বেশী রাগ হইয়াছিল। ক্ষুধা সে আদৌ সহ্য করিতে পারে না। দাঁত খিঁচাইয়া সে কহিল,—"গ্রামের খোঁজে ত যাবি—কিন্তু হাতে যখন একটাও পয়সা নেই, তখন সকলে বেরুলি কোন্ ভরসায়?"

কুমুদ কহিল,—"পয়সা নেই কি রকম? কার দোষ? তুমি যদি ব্যাগটা ফেলে না আস্‌তে—"

কথাটা মিথ্যা নয়; বোকামী কিংশুকেরই! সুতরাং উষ্মা দেখাইয়া অগত্যা সে নীরব রহিল। কিন্তু অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন গাছপালার দিকে চাহিয়া পারুলের মনের ভিতর নানা প্রকার আতঙ্ক পুঞ্জীভূত হইতেছিল। সহস্র বিভীষিকা নানা প্রকার অসম্ভব মূর্ত্তিতে তাহার মনের ভিতর ঘুরিয়া-ফিরিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ আড়ষ্ট ও বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। এতক্ষণ যাহোক আশার ক্ষীণ রশ্মি-রেখাও দেখা যাইতেছিল। সে ভাবিয়াছিল,

আশ্রয় সম্বন্ধে দাদারা যাহোক একটা উপায় অবলম্বন করিবে। বড়-দা'র উপর তাহার গভীর আস্থা! কিন্তু সেই বড়-দা'ই যখন তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিল,—তখন সে বেচারা আর নীরব থাকিতে পারিল না। ভিতরের ভয়টা যেন তাড়া দিয়া এবার তাহার মুখে কথা ফুটাইল। সে কহিল,—"রাতটা কি তবে এমনি ভাবে এই বনের ধারেই কাটাতে হবে—এই নিশ্চল গাড়ীর মধ্যে বসে?"

কুমুদ কহিল,—"হোক না বনের ধার; জঙ্গল-টঙ্গল দেখে আমি ভয় করিনে।"

পারুল কহিল,—"বাঘ-টাগ যদি কিছু—"

কিংশুক বাধা দিয়া কহিল,—"এখানে বাঘ না ঘোড়ার ডিম আছে!" কথাটা বলিয়াই সে হাসিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু অন্ধকারে কেহ বুঝিতে পারিল না যে, তাহার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে!

পারুল কহিল,—"বাঘ-ভালুক নাই বা থাক্‌লো, কিন্তু যদি ডাকাত—কিংবা—ঐ রকম কিছু—"

পলাশ কহিল,—"কিছু—বলেই চুপ করলি যে পরি?"

পারুল, কহিল,—"না, বলছিলুম যদি ভূত কি পেতনী-টেতনী—"

ভূতের ভয় পলাশেরই সব চেয়ে বেশী। জঙ্গলের দিকে চাহিয়া তাহার মনে ঐরূপই একটা শঙ্কা জাগিতে-ছিল; তথাপি পুরুষ-মানুষ সে, পৌরুষ-গর্ব্বে কোন মতেই সেটাকে আমল দিতেছিল না। কথাটা চাপা দেওয়ার জন্য তাহার মনের ভিতর প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি চলিতেছিল; কিন্তু পারুলের কথায় সেই ভয়টাই যেন জোর পাইয়া তাহাকে তাড়াইয়া ধরিতে আসিল! নিরুপায় পলাশ ভয়ে অভিভূত হইল। সে চক্ষুর নিমেষে সম্মুখের দরজা খুলিয়া ও পশ্চাতের দরজা ঠেলিয়া একেবারে কিংশুক ও পারুলের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল।

কিংশুক কহিল,—"কি হলো রে?"

"বড়-দা দেখ, ওদিকে যেন কি একটা—আচ্ছা বড়-দা, ভূত-টুত কিছু নেই? কি বলো তুমি?"

কুমুদ কহিল,—"রাবিস্! তোর কি ভয় কচ্ছে?"

—ভয়! কিন্তু মেজ-দা, আমি স্পষ্ট বলতে পারি—ও কি! কে যেন কাঁদছে!"

কিংশুক কহিল,—"দূর পাগল! ও বাতাসের শব্দ।"

পারুল কহিল,—"হ্যাঁ বড়-দা! মা বলে, অপদেবতারা বাতাস হয়ে চার দিকে ঘুরে বেড়ায়—সত্যি?"

কুমুদ উঠিয়া দাঁড়াইল। কিংশুক কহিল,—"তোর আবার হোলো কি?"

"কিছু হয় নি। গাড়ীর কাচগুলার ওপর পর্দ্দা টেনে দিচ্ছি—ঠাণ্ডা আস্‌চে কি না। দেখ বড়-দা, আকাশে একটাও তারা নেই; মেঘ করেছে।"

কিংশুক কহিল,—"আমিও ভাবচি সেই কথা—যদি বৃষ্টি আসে।"

—"উঃ! কি অন্ধকার বড়-দা!"

হঠাৎ এক ঝলক বিদ্যুতের আলোকে চারি দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

কুমুদ কহিল, "বড়-দা গাড়ী ছেড়ে চলো,—গতিক বড় ভাল মনে হচ্ছে না, তবু কাছে টর্চ্চ আছে।"

কিংশুক মাথা নাড়িয়া কহিল,—"উহুঁ, যাই হোক, সকালের প্রতীক্ষা করতে হবে। বুঝ্‌ছিস্‌নে, এত রাতে আমাদের হঠাৎ দেখে লোকে ভাববে আর কিছু—"

কথাটা সকলেরই মনে লাগিল। বিপন্ন, পথক্লান্ত পথিক? এ সত্যটা বর্ত্তমান আবহাওয়ায় বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বেও এ উদ্ভট চিন্তা, উৎকট কল্পনা তাহাদের কিশোর-হৃদয়ে নিমেষের জন্য স্থান পায় নাই।

পারুলের সহসা মনে হইল—উপন্যাস, গল্প সবই কেবল মিথ্যার মালা গাঁথা। বাস্তব জগতে তাহাদের স্থান নাই!

* * * * *

রাত্রিটা বনের ধারে গাড়ীর মধ্যে অতিবাহিত হইলেও এখন তাহাদের মনে একটা আনন্দের স্রোত বহিতেছিল। অনেক চেষ্টায় একটা মাটীর হাঁড়ি ও কিছু চাল-ডাল সংগৃহীত হইল। একটা বৃক্ষতলে শিলাখণ্ড দ্বারা উনান করিয়া, গাছের শুষ্ক ডাল ও গুল্মলতা জ্বালাইয়া খিঁচুড়ি রন্ধনের আয়োজন চলিল।

পারুল কহিল,—রান্না করব আমি, কারণ—"

কিংশুক কথাটা তৎক্ষণাৎ সমর্থন করিয়া কহিল,—"সেই ভাল,—জোগাড় তো আমরা করেছি। পারুল তুই

ওগুলো সেদ্ধ করে ফেল ভাই,—একটু চট্‌পট্ সব শেষ করে নিবি।"

পারুল কহিল, "সে আমি নিচ্ছি বড়-দা,—আর কোন ভাবনা নেই, দেশলাইও যখন পেলুম।"

কুমুদ কহিল,—"দেখলে বড়-দা, একেই বলে অসহায়ের সহায় ভগবান্,—লোকটা উপযাচক হয়ে উপকার কল্লে! টাকাটাও ধার দিলে! আমরা তো নিতে চাই নি।"

কিংশুক কহিল,—"আমি তো ভাবতেও পারিনি,—পলাশ বল্লে, মাধুকরী করব? আরে, আমরা কি সত্যি-কারের ঘরছাড়া সন্ন্যাসী? লোকের কাছে হাত পাতব কি করে? আর দেখ, দুনিয়াকে চিন্‌তে হলে শুধু-হাতেই পথে বেরুতে হয়।"

পলাশ কহিল,—"আমাদের কথাগুলো লোকটা বোধ হয় শুন্‌তে পেয়েছিল। আমি অনেকক্ষণ হতে দেখ্‌ছি, বন্দুক-হাতে ভদ্দোর লোক আমাদের গাড়ীর দিকেই চেয়ে ছিল! কিন্তু লোকটার খুব দয়া। বুঝতে পাল্লে, আমরা ভদ্রলোকের ছেলে—"

কুমুদ কহিল,—"সে কথা আর বলতে? তা না হলে ও এসেছে শিকার করতে, পাখী মারতে, কিন্তু কিন্‌তে গেল আমাদের জন্য চাল ডাল হাঁড়ি! দেখ্ পলাশ, সহৃদয় কাকে বলে বুঝতে পারলি?"

কিংশুক কহিল,—"ব্যবহারও খুব ভদ্র। কি রকম আপনি আপনি করে কথা কওয়া, পরিকে জিজ্ঞাসা কল্লে, 'আপনারা চা খাবেন? তার যোগাড় করব কি?' ফ্লাস্কে ওর চা আছে বল্লে।"

পারুল কহিল,—"লোকটার কানও খুব তীক্ষ্ণ! আমি তোমাকে বড়-দা, দেশলাইয়ের কথা বলছিলুম,—অমনি শুন্‌তে পেয়ে নিজের পকেট হতে ম্যাচবাক্সটা বার করে দিলে,—বল্লে, আমারও ভুল হয়ে গেছে! দেখ বড়-দা, রূপোর খাপটাও দিয়ে গেল।"

কিংশুক কহিল,—"দেখ, যারা খাঁটি ভদ্রলোক, তাদের ধরণ-ধারণই আলাদা! আরও বড় হ, বুঝ্‌বি—তোরা তো কথা কইতে সঙ্কোচ বোধ কচ্ছিলি—আমি কিন্তু চেহারাখানার দিকে চেয়েই বুঝতে পাল্লুম, ভাল লোক।"

কুমুদ কহিল,—শুধু কি ভাল! সহৃদয়, দয়ালু।"

পলাশ কহিল,—"চেহারাটিও খাসা।"

পারুল কহিল,—"কথা বলবার মাঝেও মানুষকে চট্ করে কেমন আপনার করে নেয়! অদ্ভুত ক্ষমতা—"

এমনিতর বহুবিধ প্রশংসার ভাষায় তাহারা একমত হইয়া সেই অপরিচিতের যশোগান করিতেছিল। সেই সদাশয় ব্যক্তি তখন ষ্টেশন হইতে আলমবাজার পুলিশের হেড আফিসে সাঙ্কেতিক ভাষায় যে সব কথাবার্ত্তা বলিতেছিল, তাহার মর্ম্ম এইরূপ,—

"সন্ধান পেয়েছি! রিওয়ার্ড আমিও নেব! হাঁ, হাঁ, ভুরুর পাশে তিল! কপালের একটা পাশ কাটা!—গাড়ীর নম্বর? হাঁ, তাও মিলেছে! চোখে চোখে ওয়াচ করছি। হ্যাঁ, ভাব-সাব-আলাপও কিছু হয়েছে বই কি,—তবে কিছু ভাঙ্গচে না! কেমন আমতা-আমতা ভাব। নিঃসন্দেহ! এরাই সেই পলাতকের দল। শীঘ্রই আসবেন, নতুবা সরে পড়বে।—আট্‌কিয়ে রাখবো? ঠিক বলতে পাচ্ছিনে! আচ্ছা, চেষ্টা দেখ্‌ছি।"

মিনিট দশেক পরে ভদ্রলোক ফিরিয়া আসিলেন। কহিলেন,—"আপনাদের কদ্দূর হলো? ও কি, আগুন জ্বল্‌চে না?"

কিংশুক বিনীত স্বরে কহিল,—"আপনাকে আর একবার জ্বালাতন করব—এ কাঠগুলো কালকের বৃষ্টিতে ভিজে রয়েছে! যদি কিছু শুকনো কাঠ—"

পারুল মুখ তুলিয়া রহিল। আগুনে ফুঁ দিয়া তাহার চোখ-মুখ লাল হইয়াছে; ধোঁয়া লাগিয়া দুই চোখ দিয়া জল ঝরিতেছে—যেন দু'টি সজল রক্তোৎপল!

—"ইস্! এতখানি ধোঁয়া আপনার লেগেছে। আচ্ছা সরুন, দেখি, আমি জ্বেলে দিচ্ছি।" আগন্তুক চুলীর নিকট বসিলেন।"

পারুল আঁচলে চোখ মুছিয়া ধরা-গলায় কহিল,—"ও কিছু হবে না! আমি অনেক চেষ্টা করলুম।" —চোখের জল তাহার গাল দিয়া গড়াইয়া পড়িল।

আগন্তুক সেই অশ্রুপ্লাবিত শিশির-সিক্ত পদ্মের মত মুখের দিকে মুহূর্ত্ত চাহিয়া কহিলেন,—"ওঃ! আপনার বড্ড কষ্ট হয়েছে—আমি এক্ষুনি শুকনো কাঠ এনে দিচ্ছি—আপনারা একটু অপেক্ষা করুন।"

লোকটি প্রস্থান করিতেই পলাশ কহিল,—"আচ্ছা বড়-দা, মা তো বলে, বনে দেবতারা থাকেন!"

কিংশুক কহিল,—"দূর মুখ্যু! দেবতা কি প্যাণ্ট, সার্ট, আর অমন টপবুট পায়ে দেয়, না, শিকারের ড্রেস্ পরে? না, তাদের সঙ্গে রাইফেল্ থাকে?"

পলাশ ও পারুল একসঙ্গে কহিয়া উঠিল,—"বা রে! মানুষের মত ছদ্মবেশ না কল্লে, মানুষ যে তাদের চিনে ফেল্‌বে!"

আগন্তুক ফিরিয়া আসিলেন,—হাতে তাঁহার এক গোছা শুষ্ক কাঠ—ফালি করিয়া কাটা।

মেঘের উপর রৌদ্র পড়িয়া ইন্দ্রধনু রচনার মত পারুলের অশ্রুপ্লাবিত মুখে একটা মৃদু আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়া মুখখানাকে যেন আরো মনোহর করিয়া তুলিল। মুহূর্ত্তে দুঃখ ভুলিয়া সে সহর্ষে কহিল,—"এই কাঠগুলো খাসা জ্বল্‌বে।"

অপরিচিত ভদ্রলোক কহিলেন,—"আমি জ্বেলে দিচ্ছি! আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না!" তিনি পারুলের পাশে চুলীর সম্মুখে বসিয়া স্বহস্তে উননে শুক্‌নো কাঠ গুঁজিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন।

এবার অল্প চেষ্টাতেই আগুন জ্বলিয়া উঠিল। প্রজ্বলিত অগ্নির লেলিহান শিখায় খিঁচুড়ি টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতে লাগিল। সুন্দর গন্ধ! উপবাসক্লিষ্ট পথিকগণের চোখে-মুখে আনন্দের আভা ফুটিয়া উঠিল। সুগন্ধে বুঝিতে পারা গেল, খিঁচুড়ি সুসিদ্ধ হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই।

কুমুদ কহিল,—"আপনাকে আমাদের সঙ্গে বনভোজনে বস্‌তে হবে।"

পলাশ কহিল,—"আপনার নামটা ত শুনতে পাইনি।"

ভদ্রলোক হাসিলেন; কহিলেন,—"আপনারাও আমায় নাম-পরিচয় বলেননি।—আচ্ছা আমায় 'বন্ধু' বলে ডাকবেন।"

একটা বটবৃক্ষের তলায় শুইয়া কিংশুক রবিকরোজ্জ্বল আকাশের পানে চাহিয়া ছিল। কথাটা শুনিয়া সে ভদ্র-লোকটির দিকে চাহিয়া কহিল, "বন্ধু!—এই বন্ধুত্ব যেন আমাদের চিরজীবন স্থায়ী হয়, দেবতার নিকট এই প্রার্থনা।"

বন্ধু হাসিয়া কহিলেন,—"আমার—না, না, আপনি হাঁড়ি নামাতে পারবেন না। আমিই নামিয়ে দিচ্ছি।" পারুলের হাতখানা সাগ্রহে সরাইয়া দিয়া 'বন্ধু' স্বয়ং খিচুড়ীর হাঁড়ি নামাইয়া দিলেন।

কুমুদ কহিল,—"কিসে খাব?"

বন্ধু হাসিলেন। রহস্যের সুরে কহিলেন, "আমি কি আমার বাড়ীতে আপনাদের নেমন্তন্ন করে খাওয়াচ্ছি?"

কুমুদ ও পলাশ অপ্রতিভ হইয়া লজ্জিত ভাবে কহিল,—"না, না, আমরাই পাতা কেটে আনচি।" তাহারা তৎক্ষণাৎ পাতার সন্ধানে চলিল।

কিংশুক কহিল,—"ওদের যদি আর কোন খেয়াল থাকে, আচ্ছা, নদী হতে আমি এখনই আসচি।"—সে আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দৌড়াইয়া গেল।

নীরব নিস্তব্ধ শীতের দুপুর। নিভৃত তরুতলে উপবিষ্ট যুবক ও কিশোরী, কি এক অস্বস্তিতে পারুলের মনটা ভরিয়া উঠিল। কেমন একটা সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড হইতে দৃষ্টি তুলিয়া সে অপরি-চিতের পানে চাহিতেই দেখিল,—রাজ্যের মুগ্ধতা নয়নে ভাষাময় হইয়া আগন্তুকের দৃষ্টি তার মুখের উপর নিবদ্ধ। চারি চক্ষু মিলিত হইতেই পারুল মুখ নামাইয়া লইল।

বন্ধু একেবারে পারুলের নিকটস্থ হইয়া ডাকিল,—"বন্ধু"—স্বরে তাহার আবেগ।

পারুল চমকিত হইয়া জড়িত সুরে কহিল,—"আপনি, আপনি—আমাকে—"

মধুর হাস্যে আগন্তুক কহিল,—"বন্ধু বলে ডাকলে লজ্জা করে? হ্যাঁ, আমারও অন্তর ও-ডাক চাইবে না! আরও নিকট-সম্ভাষণ চাইবে!"

যিনি এতখানি উপকার করিয়াছেন, সহৃদয়তা দেখাইয়াছেন, কঠিন বাক্যে তাঁহাকে তিরস্কার করা যায় না; কিন্তু এই লোকালয়শূন্য জনহীন স্থানে সে একা! অপরিচিতের শিষ্টতা যদি সীমা লঙ্ঘন করে—বিদ্যুৎ-স্ফুরণের মত কথাটা পারুলের মনে আসিয়া তাহার মুখ ফ্যাকাশে করিয়া দিল।

আগন্তুকের বোধ করি অন্তর্দৃষ্টি ছিল। নিঃশব্দে তিনি

যেন পারুলের মনের কথাটা পাঠ করিলেন। তাই মধুর হাস্তে কহিলেন,—"ভয় নেই বন্ধু!—আমি বন্ধুই।"

পারুলের কপোল রাঙিয়া উঠিল। ঠিক সেই সময়ে কিংশুক ফিরিয়া আসিল। তাহার চোখে-মুখে একটা স্বচ্ছতা ঝরিয়া পড়িতেছে। আসিয়াই কহিল, "এ কি, ওরা এখনও ফেরেনি। আমি বলি, আমার জন্তে সবাই পাতা সাম্‌নে নিয়ে বসে আছে—তাই তাড়াতাড়ি ফিরে এলুম।"

অপরিচিত হাসিয়া কহিলেন,—"ব্যস্ত হবার কোন কারণ নেই বন্ধু,—অচিরেই তারা এসে পড়বে।"

কিংশুক হাসিয়া বলিল, "আপনার দয়া চিরকাল মনে থাকবে।"

—"শুধু তাই নয় বন্ধু! আমি যখন দয়া চাইব, তখন বিমুখ হতে পাবে না। সে করুণা তোমাদের করতেই হবে।" বন্ধুর কণ্ঠস্বর গম্ভীর।

কিন্তু কিংশুক অতখানি বিচার করিল না। কথাগুলায় যে কোন প্রচ্ছন্ন অর্থ নিহিত থাকিতে পারে তেমন করিয়া সে ভাবিয়া দেখিল না। বন্ধুত্বের প্রীতিতে—সৌহৃদ্যের উল্লাসে অন্তর তখন কানায় কানায় পূর্ণ! সে সোল্লাসে কহিল,—"নিশ্চয়! নিশ্চয়! আপনাকে কিছুই আমাদের অদেয় নেই।"

কুমুদ ও পলাশ আসিল, হাতে তাহাদের সদ্য-কর্ত্তিত এক গোছা কলাপাতা; কহিল,—"পাওয়া কি যায়—খোঁজ করে, অনেক দূরে গিয়ে সংগ্রহ করতে হোলো। একেবারে একটা পুকুর হতে ধুয়ে নিয়ে এলুম।"

—"বেশ করেছিস্! বেশ করেছিস্! আয় সব বসে পড়ি—বন্ধু আপনিও বসুন।"

—"আপত্তি নেই।"

খিঁচুড়ীর হাঁড়ি মধ্যে রাখিয়া চক্রাকারে সকলে আহারে বসিল। মণ্ডলের প্রথমে বসিয়াছিল, পারুল, তাহার পর পলাশ, তাহার পর কুমুদ, তাহার পর কিংশুক, এবং সব শেষে বসিলেন বন্ধু! সর্ব্বশেষে উপবিষ্ট হইয়াও বন্ধুর পাশেই পারুলের স্থান হইল। পারুল ঈষৎ আড়ষ্ট হইয়া পড়িল।

কিংশুক কহিল,—"তোর পাতাতেও ঢেলে নে, পারুল,—নিন্ বন্ধু, আপনি যে বড্ড অল্প নিলেন।"

হাসিয়া বন্ধু কহিলেন,—"বেশী নিতেও আপত্তি নেই! দিতেই উনি কৃপণতা কচ্ছেন।"

পারুল লজ্জিত হইয়া হাঁড়িটা একেবারে বন্ধুর পাতের উপর কাৎ করিয়া ধরিল; অনেকটা খিঁচুড়ী তাঁহার পাতে পড়িয়া গেল।

"—ও কি কচ্ছেন! কত দিচ্ছেন? ইস্, এত খাবে কে? নিজের জন্তে যে রাখছেন না; হাঁড়ি খালি করে ফেল্লেন! বেশ তো!" বলিয়া 'বন্ধু' নিজের পাত হইতে খানিকটা খিঁচুড়ী তুলিয়া দিলেন, গরম খিঁচুড়ীর তাতে হাতটা পুড়িয়া যাইতেই তিনি উঃ! আঃ! শব্দ করিলেন।

পারুল ত্রস্তে তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিল। "না, না, অমন করে হাতটা পোড়াবেন না। আমি ঠিক এই পাতাটা দিয়ে টেনে নিচ্ছি।" অন্য একটা পাতা মুড়িয়া সে বন্ধুর পাতা হইতে নিজের পাতে খানিকটা খিঁচুড়ী তুলিয়া লইল।

কিংশুক কহিল,—"এই তো সহজে কাজটা হয়ে গেল। মিছে আপনি হাতটা পোড়ালেন।"

হাতে ফুঁ দিতে দিতে কৃত্রিম কলহের সুরে বন্ধু কহিলেন,—"অন্নপূর্ণার কাজ শিব করতে গেলেই তাঁকে শাস্তি পেতে হবে।"

অনাবিল হাস্তে সকলের মুখ প্রফুল্ল হইল। রঙ্গ-কৌতুকের মধ্যে বুভুক্ষিত উদরগুলি গরম খিঁচুড়ীতে পরিতৃপ্ত হইল।

নদীতে সকলে হাত-মুখ ধুইয়া আসিল।

বন্ধু কহিলেন,—এইবার বিশ্রামের প্রয়োজন, ঐ তো আপনাদের গাড়ী?"

ভাই-বোনে মুখ-চাওয়াচায়ি করিল।

সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া বন্ধু কহিলেন,—"কি অভাব? তেলের না—ইঞ্জিন বিগ্‌ড়েছে?"

হাসিয়া কহিল,—"ইঞ্জিন বিগ্‌ড়ানোকে ভয় করিনে মশায়! 'মেকানিকস্' শিখ্‌চি। ও-সব বুঝি, মেরামৎ করতে কতক্ষণ?"

বন্ধু কহিলেন,—"তবে?"

কাহারও মুখে কথা নাই।

বন্ধু হাসিয়া কহিলেন,—"ওঃ, তেল নেই। তা এতক্ষণ বলনি কেন? ভারী অন্যায়! ক'-গ্যালন চাই?"

কিংশুক সাগ্রহে বন্ধুর হাত ধরিয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে ডাকিল,—"বন্ধু !"

সেই ধৃত হাতখানির উপর মৃদু একটা চাপ দিয়া বন্ধু কহিলেন,—"একটা অনুরোধ, আমার বাড়ী আজ আপনারা অতিথি হবেন—কাল নিশিশেষে যে কয় গ্যালন্ পেট্রলের প্রয়োজন, গুদাম হতে তা দেওয়া যাবে।"

কুমুদ কহিল,—"আপনার বাড়ী এইখানে ?"

—"হ্যাঁ, মাথা গোঁজবার মত সামান্য একটা আস্তানা আছে বটে।"

* * * *

প্রাসাদোপম সুরম্য অট্টালিকা কেমন করিয়া মাথা গুঁজিবার মত সামান্য আস্তানা হয়, এ প্রশ্ন সকলের মনে জাগিলেও এই কিশোরদল তা লইয়া তর্ক তুলিল না। চব্বিশ ঘণ্টা মোটরে পরিভ্রমণ করিয়া, কষ্ট সহিয়া, তাহাদের দেহ বিছানাই খুঁজিতেছিল।

মূল্যবান্ সুকোমল সোফা, কৌচ, কুসানে সকলে উপবিষ্ট। বেহারা ট্রেতে পেয়ালাপূর্ণ চা আনিল। গৃহের শান্তির মধ্যে এ্যাডভেঞ্চারের উপদ্রব সুখ-নিদ্রার মাঝে যেন দুঃস্বপ্ন! কুমুদ, পলাশ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল,—নাকে-কাণে খৎ! এমন কুমতি আর তাহাদের কোন দিন হইবে না। পারুল একখানা সোফাতে নির্জীবের ন্যায় পড়িয়া ছিল। মুক্ত বাতায়ন-পথে অস্তগামী তপনের লোহিতরশ্মি তাহার মুখে পড়িয়া তাহাকে অপরূপ দেখাইতেছিল। সেই দিকে চাহিয়া বন্ধু কহিলেন,—"বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, না ?"

বিশুষ্ক হাসি পারুলের ওষ্ঠাধর হইতে ঝরিয়া পড়িল। মায়ের জন্য তাহার মন কেমন কাতর হইয়াছিল।

সেই সময় উদ্যানমধ্যে দুইখানি মোটর-গাড়ী প্রবেশ করিয়া অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার এক-খানিতে উর্দ্দী-পরিহিত কয়েক জন পুলিশ-কর্ম্মচারী! অপর খানিতে ভদ্রবেশী দুই জন প্রৌঢ় উপবিষ্ট।

বেহারা দৌড়াইয়া আসিয়া কহিল,—"সাব আয়া!"

—"যাতা হায়।"

কিংশুক ধড়মড় করিয়া উঠিল। কহিল,—"কে ?"

—"দেখ্‌ছি" বলিয়া বন্ধু বাহিরে চলিলেন।

নিমাই বাবু অজয়কে দেখিয়াই কহিলেন,—"অজয়, ফোনে খবর পেতেই সৌরেন বাবুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। সৌরেন বাবু, এই আমার ছেলে অজয় ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে দু'মাস হলো বিলেত থেকে ফিরেছে।"

সৌরেন কহিলেন, "খুব টাইমে ফিরেছেন তো—কিন্তু আপনি পুলিশের হোমরা-চোমরা এক জন হয়ে—"

নিমাই বাবুর মনের ক্ষোভ এইখানে। কহিলেন,—"আরে মশায়, সে কথা আর বলেন কেন ? এটা হোলো স্বাধীনতার যুগ; তবে হ্যাঁ, সখের ডিটেক্টিভ-গিরি একটু-আধটু আছে—যেমন আজ আপনার কাজটা।"

সৌরেন বাবু কহিলেন,—"ওটা রক্ত-সংস্পর্শে।"

অজয় কহিলেন,—"ওটার আলোচনা পরে হবে। আমাদের কাজের কথা হোক। আপনি বলেছিলেন, আপনার বড় ছেলের নাকে 'তিল' আছে! মেজ ছেলের কপালের পাশ কাটা! ছোটরও ভুরুর পাশে একটা লাল জড়ুল, মোটর-নম্বর ইত্যাদি—রেডিও হতে শোনবার পরের দিন আমি শিকার করতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ কয় মূর্ত্তি বনের ধারে দৃষ্টিগোচর হলো। দপ্ করে আপনার বর্ণনার কথা মনে পড়ে গেল। দেখ্‌লুম, হুবহু সব মিলে যাচ্ছে! অমনি গিয়ে আলাপ জমালুম—এখন আমার বসবার ঘরে তারা রয়েছে।"

সৌরেন কহিলেন,—"আমার মেয়ে ?"

—হ্যাঁ, তিনিও রয়েছেন। কিন্তু আপনি হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। এই আপনার গাড়ীখানা—"

গাড়ীখানার দিকে চাহিয়া সৌরেন বাবু কহিলেন,—নিশ্চয়! ওই 'বিউক'খানা কিনতে মশায় সাতটি হাজার টাকা গুণে বার করে দিয়েছি! তাই বুকের হাড়ের মত গাড়ীখানাকে ভালবাসি; কি বলব আর—চলুন, গুণধরদের দেখিগে।"

নিমাই বাবু কহিলেন, "বসুন মশায়, অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আজ-কালকার ছোকরাগুলো বড্ড বাড়াবাড়ি কচ্ছে; একটু তাদের জব্দ করতে, ভয় দেখাতে দিন।"

অজয় একখানা চেয়ার দিলেন।

সৌরেন বাবুর মনে হইল,—"হোক ছেলে-মেয়ে জব্দ!

পাক্ একটু ভয়! মজা টের পাক্। কিন্তু তাঁহার মন—সেই চাঁদমুখগুলি দেখিবার বিলম্ব সহিতে পারিতেছিল না।

* * * *

—"তোমার পরিচয়?"

কিংশুক চমকিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন নয়ন মেলিল। মুখ তাহার সাদা হইয়া গেল। বজ্রাহতের মত বিহ্বল দৃষ্টিতে সে কেবল ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া সম্মুখের লোক-গুলার দিকে চাহিয়া রহিল।

কঠোর স্বর পুনর্ব্বার ধ্বনিত হইল। "ও কি,—অমন বোবার মত চেয়ে আছ! কাণে কিছু শুনতে পাচ্ছ না?"

মৃতের ন্যায় বিবর্ণ মুখে পারুল কহিল,—"আমাদের বাবার নাম শ্রীযুত সৌরেন্দ্রনাথ মিত্র, রিজার্ভ ব্যাঙ্কে একাউণ্ট ডিপার্টমেণ্টে কাজ করেন।"

জড়িত স্বরে উত্তর হইল, "আর তোমরা ডাকাতি করে বেড়াও?"

ইন্‌স্পেক্টর, সাব-ইন্‌স্পেক্টর, জমাদার, কনেষ্টবল প্রভৃতি সকলেই নিমাই বাবুর কথাটাকে মাথা নাড়িয়া সায় দিলেন।

অত্যুৎকট মিথ্যা, তথাপি এতগুলা পুলিশ-কর্ম্মচারী দ্বারা তাহা সমর্থিত। তাহারা অন্যায় না করিয়াও অপরাধী। উঃ! কি ভয়ঙ্কর বিপত্তি! কি ভয়ানক দুর্ম্মতিতে তাহারা এ পথে পা বাড়াইয়াছিল। আর সেই দুর্বৃত্ত, যে ফাঁদ পাতিয়া তাহাদের বন্দী করিল,—লোকটা কি নৃশংস! নিশ্চয়ই সে অপরাধী! কিন্তু প্রমাণ কোথায়? রাগে ক্ষোভে কিংশুকের চোখে জল আসিল। কোন মতে আপনাকে সামলাইয়া জড়িত স্বরে সে কহিল, "অমূলক সন্দেহ! কোন বিরুদ্ধ-প্রমাণ পাবেন না! বড়দিন উপলক্ষে আমরা বেড়াতে বেরিয়েছিলুম।"

নিমাই বাবুর মুখে ব্যঙ্গের হাসি ফুটিয়া উঠিল। বিদ্রূপের স্বরে তিনি কহিলেন,—"হাঁ, মনুষ্যসমাজের অন্তরালে তস্করের মত লুকিয়ে লুকিয়ে; কিন্তু মহাবিদ্যেটা এখনও আয়ত্তে আনতে পারনি? কি বল?"

কুমুদ কহিল, "বিশ্বাস না হয়, বাবার কাছে তার করুন? আমরা এ্যাড্রেস্ দিচ্ছি! কিন্তু ভুল করেই আমাদের ধরেছেন। প্রকৃত অপরাধী হয় তো এই সুযোগে পালাচ্ছে; আর আমরা তার আভাসও পেয়েছি।"

নিমাই বাবু হাসিয়া ফেলিলেন। বিদ্রূপভরে কহিলেন, —তাই না কি, বেশ পাকা-পোক্তও হয়েছ। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যা বলবার আছে বলবে, এখন তো চল।" নিমাই বাবু ইন্‌স্পেক্টরের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিতেই ইঙ্গিত পাইয়া তাহারা অগ্রসর হইল।

পারুল সভয়ে চেঁচাইয়া উঠিল, "আমাদের এ্যারেষ্ট কচ্ছেন—সম্পূর্ণ নিরপরাধী আমরা!"—তাহার কথার শেষ দিক্‌টা কান্নার মত শুনাইল।

সৌরেন বাবু আর অন্তরালে থাকিতে পারিলেন না। অজয়ের সহিত সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

যাদুকর যেন দংশনোদ্যত কৃত্রিম বিষধরকে চক্ষুর নিমেষে পুষ্পগুচ্ছে পরিণত করিয়া আতঙ্কাতিভূত দর্শক-বৃন্দকে নির্ব্বাক্ করিয়া দিল। সকলেই স্তব্ধ, নীরব। পর-মুহূর্ত্তেই পুলিশ-কর্ম্মচারীবৃন্দের মুখের প্রচ্ছন্ন হাসি সশব্দে সেই কক্ষ মুখরিত করিয়া তুলিল।

* * * *

শোভনা ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। একটি—কন্যা গৃহে ফিরিলেই নিজ হাতে কাঁচি দিয়া তাহার চামর-চিকুর কেশরাশি কাটিয়া ইস্কুল ছাড়াইয়া তাহাকে গৃহে বন্দিনী করিবেন। দ্বিতীয়টি—পুত্রেরা গৃহে ফিরিলে বুক চিরিয়া রক্ত দিয়া তিনি কালীঘাটে মা-কালীর পূজা দিবেন।

সৌরেন বাবু তার করিয়াছেন, চিন্তার কোন কারণ নাই। সকলে নিরাপদেই আছে। মেয়েকে ও ছেলেদের লইয়া কল্য প্রাতেই বাড়ী ফিরিব। টেলিগ্রামখানা শোভনা কম করিয়া দশ বার পাঠ করিয়াছেন। ভোরের আলো মাটীর বুকে পড়িতে না পড়িতে ভৃত্যকে ডাকিয়া বকাবকি করিয়া বাজার হইতে কদলীবৃক্ষ, সশীষ ডাব, আম্রপল্লবের গুচ্ছ সব আনাইয়া রাখিয়াছেন। দুইটা পিতলের কলসী ঝক্‌ঝকে করিয়া মাজাইয়া জল ভরাইয়া, ডাব দিয়া সেই মঙ্গল-চিহ্ন গৃহদ্বারে স্থাপন করিয়া এখন পূজায় বসিয়াছেন।

মোটরের হর্ণ বাজিতেই শোভনা ত্রস্ত ভাবে পূজার আসন ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি সদর দরজার দিকে ছুটিলেন। ব্যগ্র ভাবে ডাকিলেন,—"ওরে গোবিন্দ, কলসী দুটো ভরা আছে তো? বামুন-মা, শাঁখটা নিয়ে এস না।"

গোবিন্দ কহিল, "হ্যাঁ, মাঠান, মোটর-বাবুকে দাঁড় করিয়ে এসেছি। দাদাবাবুরা, দিদিমণি এলো বুঝি।"—সে হাতের কাজ ফেলিয়া বহির্বাটী অভিমুখে ছুটিল।

ছদ্ম গাম্ভীর্য্যের আবরণে আনন্দটাকে ঢাকিয়া সৌরেন বাবু গম্ভীর মুখে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। পশ্চাতে অপরাধীর ন্যায় নত-মস্তকে নিঃশব্দে পুত্র-কন্যা গাড়ী হইতে নামিল। বামুন-মা ঘন ঘন শঙ্খরোল তুলিয়া আনন্দ বিঘোষিত করিতে লাগিল।

শোভনা কহিলেন, "দাঁড়াও, আমি বরণ করব সবাইকে—"

সৌরেন বাবু সবিস্ময়ে কহিলেন, "ব্যাপার কি? এ সব কলাগাছ, আম্রপল্লব, পূর্ণঘট! আজ কিছু পুজোপার্ব্বণ না কি?"

"বাঃ! আজ আমার হারানিধিরা ঘরে ফিরে এলো"—শোভনার কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া আসিল। আনন্দাশ্রু টপ্ টপ্ করিয়া তাঁহার গাল বহিয়া ঝরিয়া পড়িল।

কিংশুক নিজেকে সংবৃত রাখিতে পারিল না। ছুটিয়া গিয়া সে মায়ের পদধলি লইয়া কহিল,—"মা, আমাদের তুমি মাপ কর।"

সস্নেহে পুত্রের চিবুকে হাত দিয়া চুম্বন করিয়া কহিলেন, "রাগ-দুঃখ সব তোদের মুখ দেখে মন হতে মুছে গেছে বাবা! দাঁড়া, আমি তোদের বরণ করে নিই।"—বলিয়াই সহসা মাথার কাপড়টা তিনি কপালের উপর টানিয়া দিলেন। ড্রাইভারের আসন হইতে নামিয়া যে যুবকটি অদূরে অবস্থান করিতেছিলেন, এতক্ষণে দৃষ্টি পড়িল তাঁহার প্রিয়দর্শন মুর্ত্তিটির উপর।

সৌরেন বাবু কহিলেন, "ও আমাদের নিমাই বাবুর ছেলে অজয়। বিলেত হতে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে এসেছে! ঐ তোমার ছেলে-মেয়েদের চিনতে পেরে ফিরিয়ে আনলে।"

* * * *

তার পর উপসংহার।

পারুলের চুল আর কাটা হইল না।

তবে কালীঘাটে পূজা দেওয়া অবশ্যই হইবে। একেবারে কন্যা-জামাতাকে জোড়ে লইয়া যাইবেন। পূজা সেই সময়ে দিবেন, এবং ইস্কুল বন্ধ প্রভৃতি অনুরূপ শাসন করিবার স্পৃহাও শোভনার এতটুকু রহিল না। শরতের সোনালী আলোমাখা অম্লান আকাশের মত মন যে তাঁহার আনন্দে ভরপুর। বিপত্তির পথ দিয়া সন্তানরা কল্যাণকেই গৃহে আনিয়াছে; এ যাত্রা যে বিজয়যাত্রার মতই উল্লাসময়।

তবে নিমাই বাবু? আপশোষ তাঁহারই বুকে জাগিতেছিল। পুত্রের বৌ-ভাতের দিন তিনি সুহৃদবর্গের নিকট একাধিক বার কহিলেন,—"মনে করেছিলুম, ছেলের বিয়ে দিয়ে বিশ হাজার টাকা ঘরে তুলব! সব মাটী! তোর জন্যে যে এত টাকা খরচ কল্লুম, কিসের প্রত্যাশায়! হতভাগা একবার ভাবলে না! আজ-কালকার ছোঁড়াগুলা এমনি বেইমান! বাপ বলে একটা সমীহ আছে? বিয়ের ঠিক করেছিলুম মশায়, ওই নন্দীপুরের জমিদারের একমাত্র মেয়ের সঙ্গে। বাপ কাউন্সিলার, এক মেয়ে; ভাবলুম, একটা দাঁও জুটলো। সাম্‌নে পৌষ মাস, সর্ব্বনাশ কল্লে—আমারই হতভাগা গেল শীকার করতে। হ্যাঁ, শীকারই বটে—তবে ও করেনি, ওকেই করেছে মশায়!"

বন্ধুরা হাসিয়া ফেলিলেন।

অজয় ফুলশয্যার রাত্রে নবপরিণীতা পত্নীকে বাহু-পাশে বাঁধিয়া কহিল, "বড়দিনের অভিযানটা কেমন হলো?"

"যাও!" বলিয়া কিশোরী বধূ স্বামীর বুকে সরমরাঙা মুখখানা লুকাইল। মনে মনে কহিল,—"সার্থক!"

কিন্তু কুমুদ, পলাশ প্রতিজ্ঞা করিল,—জীবনে আর কখন অমন কুকর্ম্ম করিবে না।

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী।

জ্ঞানের ক্ষুদ্রতা

কোথা ভগবান্, কি তা'র প্রমাণ, কহে তার্কিক সবে,
কহিছে অন্ধ, সূর্য্য-চন্দ্র, কোন কিছু নাই ভবে।

শ্রীসুধীর বাগচী (বি-এ)।

ইতিহাসের অনুসরণ

পুরাণে লুপ্ত ইতিহাস

লুপ্ত ইতিহাসের উদ্ধারের জন্য আজকাল শিক্ষিত সমাজের আগ্রহ লক্ষিত হইতেছে। এ বিষয়ে চেষ্টাও কিছু কিছু হইতেছে। কিন্তু যাহা বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহার উদ্ধার-সাধন করিতে যে পরিমাণ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়, পূর্ব্ব-গঠিত সংস্কার বর্জ্জন করিয়া যে পরিমাণ তথ্যের সংগ্রহ ও সিদ্ধান্ত সংগঠন করিতে হয়, বর্ত্তমান যুগের প্রত্নতাত্ত্বিকগণ তাহা করিতেছেন কি না সন্দেহ। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত-সমাজ কতকগুলি অতিরঞ্জিত কাহিনী দেখিয়াই পুরাণগুলিকে ছাঁটিয়া ফেলিতে চাহেন,—কিন্তু তাহা করিলে ইতিহাসের উদ্ধার-সাধন সম্ভব হইবে না। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বিষয়টি বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। প্রায় সকল দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রে এবং ইতিহাসেও অতি প্রাচীন কালে একটা ভীষণ জলপ্লাবনের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। ইহুদী প্রভৃতি সেমেটিক জাতিসমূহের ধর্ম্মশাস্ত্রে উহা বর্ণিত আছে ; এবং ভারতের বেদে পুরাণেও উহার বিবরণ আছে। যিনি তখন রাজা ছিলেন, তাঁহার নামও লিখিত আছে এবং সকল দেশের সকল কাহিনীতে সেই রাজার নামেরও বিস্ময়কর সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। হিব্রু-ইতিহাসে লিখিত আছে, সেই রাজার নাম নোয়া (Noah), আর ভারতীয় পুরাণে লিখিত আছে—তাঁহার নাম মনু। এইরূপ একটা জলপ্লাবনের কথা ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণও স্বীকার করেন। ধরাপৃষ্ঠে তাঁহারা তাহার চিহ্ন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ; তবে ইহার সময় সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। বাইবেলের মতে উহা খৃষ্টের জন্মের ২ হাজার ২ শত ৯৩ বৎসর মাত্র পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা ;—কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, উহা অন্ততঃ পঁচিশ-ত্রিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল ! মিষ্টার এইচ, জি, ওয়েলসের এই মত। ভারতীয় কাল-নির্দ্দেশও অনেকটা এইরূপ। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতরা স্থির করিয়াছেন, ৫০ কিম্বা ৫৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর মানচিত্র অন্যরূপ ছিল। একটা ভীষণ উপপ্লবে পৃথিবীর ভূমি এবং সাগরের পূর্ব্ব-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। এখন যেখানে ভারত মহাসাগর, সেখানে একটা বিস্তীর্ণ মহাদেশ ছিল। উহা এক মহা-বিপ্লবে অতল তলে নিমজ্জিত হইয়াছে। ঐ সময়েই এই জলপ্লাবন ঘটিয়াছিল কি না, তাহার নিশ্চয়তা নাই। এই জলপ্লাবনের বিবরণ কেবল যে বাইবেলে এবং হিন্দুর পুরাণেই বর্ণিত আছে এরূপ নহে,—ইহা চীনের, গ্রীসের, পারসিকদিগের ধর্ম্মগ্রন্থেও বর্ণিত আছে। এমন কি, পেরু, মেক্সিকো, এবং আমেরিকার অন্যান্য দেশের প্রাচীন গ্রন্থেও এই কাহিনী কীর্ত্তিত হইয়াছে ; সুতরাং ইহা অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। বিশেষতঃ, ভূতত্ত্ববিৎরা যখন উহা সংঘটনের লক্ষণ দেখিয়াছেন, তখন উহা অস্বীকার করাও সঙ্গত নহে। ভূতত্ত্ববিৎরা বলেন, অতি প্রাচীন কালে মাদাগাস্কার হইতে সিংহল দ্বীপ পর্য্যন্ত একটা প্রকাণ্ড ভূভাগ ছিল, এ-কালের পণ্ডিতগণ তাহা 'লামুরিয়া' নামে অভিহিত করিয়াছেন। উহা ৫০ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রচণ্ড প্রাকৃতিক উপপ্লবে সাগরতলে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু উহা এই জলপ্লাবনের ফল কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই। কারণ, যখন আটলান্টিক মহাসাগরস্থ 'আটলান্টিস' নামক মহাদেশ বারিধি-তলে নিমজ্জিত হয়, তখন আমেরিকায় হয় ত ঐরূপ জলপ্লাবন সংঘটিত হইয়াছিল ; অথবা দুই-ই এক সময়ের ঘটনা হইতেও পারে। তবে উহা চারি হাজার বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা নহে ; তাহারও বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে উহা সংঘটিত হইয়াছিল।

ঐ জলপ্লাবনের বিবরণ বাইবেলে এবং হিন্দুর পুরাণে প্রায় একই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মৎস্যপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—মহারাজ মনু এক দিন যথাস্থানে বসিয়া পিতৃ-তর্পণ করিতেছিলেন, এমন সময় একটা পুঁটি মাছ তাঁহার হাতের উপর (কোশায় ?) আসিয়া পড়ে। মনু তাহাকে কমণ্ডলুর ভিতর রাখিয়া দিলে উহা বর্দ্ধিত হইয়া কমণ্ডলু পূর্ণ করিল। রাজা অতঃপর তাহাকে একটা মাটীর জালার ভিতর রাখিলেন, মাছটা এক রাত্রির মধ্যেই

তিন হাত দীর্ঘ হইল। মনু তাহাকে একটি বিস্তীর্ণ সরোবরে নিক্ষেপ করিলেন। সেখানে মাছটির দেহ এরূপ বৃহৎ হইল যে, সেই সরোবরেও আর তাহার স্থান হইল না; অবশেষে মহারাজ মনু তাহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। তাহার বর্দ্ধিত দেহ অতঃপর সমুদ্রের গভীরতাও অতিক্রম করিল। মহারাজ তখন সঙ্কটে পড়িয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সেই মৎস্যবরকে কহিলেন, "আমাকে আর কষ্ট দেন কেন?" তখন সেই বিশালকায় মৎস্য বলিলেন, "এই পৃথিবী শীঘ্রই জলমগ্ন হইবে। আমি জীবনিচয়ের রক্ষার জন্য নিখিল দেবগণ দ্বারা একখানি নৌকা প্রস্তুত করিয়াছি। ইহাতে যাবতীয় স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, ও জরায়ুজ প্রভৃতি অনাথ জীবদিগকে স্থাপন করিয়া এই আসন্ন জলপ্লাবন হইতে রক্ষা কর।" মৎস্য আরও বলেন, "কিছুকাল ধরিয়া অনাবৃষ্টির পর অতিবৃষ্টি হইবে। তাহাতে সশৈলবনকাননা মেদিনী সম্পূর্ণরূপে প্লাবিত হইবে, সমুদ্র সকল ক্ষুব্ধ হইয়া একার্ণবে পরিণত হইবে। তৎপূর্ব্বে তুমি সর্ব্বপ্রাণীর বীজরাজিকে সেই বিশাল নৌকায় তুলিয়া নৌকা ভাসাইয়া দিবে।" তখন পৃথিবীতে প্রলয় হইবে। ইহাই মন্বন্তর। বাইবেলের কথাও ঐরূপ। ভগবান্ নোয়াকে সেই আসন্ন মহাপ্রলয়ের কথা বলিয়া তাঁহাকে একখানি বৃহৎ নৌকা নির্ম্মাণ করিতে বলেন, এবং সেই নৌকায় সমস্ত প্রাণীর এক একজোড়া লইয়া সেই একাকার মহার্ণবে নৌকা ভাসাইতে বলেন। নৌকা ভাসিয়া যাইতে যাইতে আর্ম্মেনিয়ার এরারাট পর্ব্বতের চূড়ায় আসিয়া বাঁধা পড়িল। জলরাশি অপসারিত হইলে নোয়া সেই তরণী হইতে জীবগণসহ ভূতলে অবতরণ করেন। এই উভয় আখ্যায়িকাই প্রায় অভিন্ন। অন্যান্য গল্পও ঠিক এই প্রকার। ইহাতে অতিপ্রাকৃত কথা আছে বটে, কিন্তু জলপ্লাবনের কথা সম্পূর্ণ সত্য; কারণ, বৈজ্ঞানিকদিগের গবেষণায় তাহার পরিচায়ক লক্ষণ পাওয়া গিয়াছে। এই জলপ্লাবনের পর ভূমণ্ডলের অনেক স্থানের বিশাল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়—ইহা ভূতত্ত্ববিদ্গণের ধারণা। সম্ভবতঃ, এই সময়েই অনেক দেশ সাগরতলে বিলীন হয়।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা এবং তাঁহাদের ভারতীয় শিষ্যরা বলিয়া থাকেন, এই জলপ্লাবন অতি প্রাচীন কালে ঘটিয়াছে, আর পুরাণগুলি খুব পুরাতন হইলেও দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। এ অবস্থায় পুরাণগুলির বর্ণিত বিবরণ সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় কি করিয়া? বর্ত্তমান আকারে যে পুরাণগুলি প্রচলিত আছে, তাহাদের ভাষা এবং রচনাভঙ্গী প্রভৃতি দেখিয়া সেগুলি অনেক পরবর্ত্তী কালের রচিত বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু ঐগুলি যদি পুরাতন পুরাণের পরবর্ত্তী কালের সংস্করণ বা পরবর্ত্তী ভাষায় অনুবাদিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহার তথ্যগত সংবাদ মিথ্যা বলিবার কি কারণ থাকিতে পারে? স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের মহাভারত উনবিংশ শতাব্দীতে অনূদিত বা লিখিত হইয়াছে,—ইহা জাজ্বল্যমান সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া বিষয়গত ব্যাপারের সত্যতা সম্বন্ধে মূল মহাভারত অপেক্ষা উহার প্রামাণিকতা অল্প নহে। জলপ্লাবন সম্বন্ধে এই ইতিহাস সত্য, ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে, তবে শফরীর কলেবর-বৃদ্ধি প্রভৃতি অতিপ্রাকৃত ব্যাপার বিশ্বাসের অযোগ্য বটে! ইহার অন্তরালে যে একটা রূপক নিহিত আছে, তাহা না বুঝিলে ইহাকে উৎকট কল্পনা-বর্ণিত বলিয়াই ধারণা হয়। পুরাণগুলিতে ঐরূপ প্রচ্ছন্ন রূপক আছে। রাজা উত্তানপাদের এবং ধ্রুবের কাহিনীতে ঐ রূপক স্পষ্ট সপ্রকাশ।

পুরাণগুলিতে ঐ বিশাল জলপ্লাবনের পূর্ব্বের ইতিহাসও কিছু কিছু পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে বৈবস্বত মনুর শাসন-কাল বা আমল চলিতেছে। ইহার পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তমি, তামস, রৈবত এবং চাক্ষুষ এই কয় জন মনুর আমল অতীত হইয়াছে। প্রত্যেক মনুর কার্য্যকালের অবসান-সময়ে এক-একটা প্রলয় বা মন্বন্তর হইয়া থাকে। এ সকল কথা ইতিহাস হিসাবে বিশ্বাস্য কি না, তাহার আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। বর্ত্তমান বৈবস্বত মনুর আমলের প্রারম্ভে যে মন্বন্তর ঘটিয়া গিয়াছে, পুরাণে তাহার পরবর্ত্তী ইতিহাস অনেকটা পাওয়া যায়। আর্য্যগণ অন্য স্থান হইতে ভারতে আসিয়াছেন কি না, সে সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোন স্থির মীমাংসা হয় নাই। য়ুরোপীয় অনুসন্ধানকারীদিগের মধ্যেই এখন এ বিষয়ে অনেকটা মতভেদ ঘটিতেছে।

কেহ কেহ বলেন, আর্য্যগণ মধ্য-এসিয়া হইতে ভারতে আসিয়াছেন। কেহ বলেন, এসিয়া মাইনর; কেহ বলেন, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া; কেহ বলেন, মেরু প্রদেশ; কেহ বলেন, ককেসাস অঞ্চল। কেহ কেহ এমনও বলিয়া থাকেন যে, আর্য্যগণ মধ্য-য়ুরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল হইতে ভারতে আসিয়াছেন। এ সম্বন্ধে মতের এত বিভিন্নতা ইহার মিথ্যাত্বই প্রতিপন্ন করে। এখন এক দল পুরাতত্ত্ববিৎ বলিতেছেন, ভারতবর্ষই আর্য্যদিগের আদি নিবাস। ভারতে সুমেরীয়গণেরও বসতি ছিল, তাহার প্রমাণও পাওয়া যায়।

ব্রহ্মাবর্ত্ত এবং আর্য্যাবর্ত্তই আর্য্যদিগের আদি বাসভূমি বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে; এবং বৈবস্বত মনুই অযোধ্যা নগরী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বলিয়া পুরাণে বর্ণিত আছে। সুতরাং আর্য্যগণ আর্য্যাবর্ত্তেই ছিলেন, ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। ইঁহারা যে অন্য দেশ হইতে আসিয়াছিলেন, বেদে তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁহারা পশ্চিম দিক্ হইতে পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন, বেদে এই ভাবেরই কথা আছে সত্য; কিন্তু তাহা লিখিত প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। অনেকটা টানিয়া-বুনিয়া ঐরূপ অর্থ করা হয়। পুরাণগুলি পাঠে মনে হয়, বিগত মন্বন্তরের পূর্ব্বে পৃথিবীতে ছয়টি জাতি ছিল। যথা দেব, দৈত্য, দানব, নাগ, গরুড় এবং মানব। এই মানবরাই মনুর বংশধর, এবং তাহারাই আর্য্য জাতি। স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মার পুত্র। কশ্যপ ব্রহ্মার অপর পুত্র। মানব ভিন্ন অন্য সকল জাতিই কশ্যপের বংশধর। কশ্যপের অনেকগুলি পত্নী ছিলেন। তাঁহার বিভিন্ন পত্নীর গর্ভে দেব, দৈত্য, দানব, নাগ এবং গরুড়-জাতি উৎপন্ন হয়। এ সম্বন্ধেও মতভেদ আছে; তবে দেব এবং দৈত্যগণ যে কশ্যপের সন্তান, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ গবেষণা করিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, দৈত্যরা কশ্যপসাগরের দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব ভাগে বাস করিতেন। কশ্যপসাগর বর্ত্তমান কাস্পিয়ান সাগর বা হ্রদ। কশ্যপসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকেই হাইর্কেনিয়া নগর নির্ম্মিত হয়। এই হাইর্কেনিয়া নগরের প্রতিষ্ঠাতার নাম ছিল হিরণ্যকশিপু। ইনি কশ্যপ-পত্নী দিতির গর্ভজাত। ইনিই দৈত্যগণের প্রথম রাজা। ইঁহার আর এক ভ্রাতার নাম ছিল হিরণ্যাক্ষ। প্রহ্লাদই এই হিরণ্যকশিপুর পুত্র। প্রহ্লাদ আর্য্যগণের ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন বলিয়া পিতার কোপে পতিত হন। মিষ্টার জওলাপ্রসাদ সিংহল বলেন, হিরণ্যকশিপু ঘোর নাস্তিক ছিলেন। তিনি ভগবানের নাম পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার প্রথম পুত্র প্রহ্লাদ আস্তিক ও ঈশ্বরপরায়ণ হওয়ায় তিনি পুত্রের প্রতি দারুণ অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। শেষে এই হিরণ্যকশিপু নরসিংহের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। প্রতীচ্য গবেষণাকারীদের কাহারও কাহারও মতে নরসিংহ হিন্দু রাজা ছিলেন। তিনি হাইর্কেনিয়ায় গমন করিয়া হিরণ্যকশিপুকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ-চরিত্রের মধুর কাহিনী সকলেরই সুবিদিত। তবে ইহা যে বাস্তব ঘটনা, পৃথিবীর বুকের উপর স্মরণাতীত কালে ঘটিয়া গিয়াছে—তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ এক অদ্ভুত ভাবে মিলিয়াছে। সেই প্রমাণের কথা বলিবার পূর্ব্বে আর একটা কথা বলা আবশ্যক।

বর্ত্তমান য়ুফ্রেটিস্ (Euphrates) নদীর মোহনা হইতে প্রায় ৫০ ক্রোশ দূরে প্রাচীন উর নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে মেজর য়ুলী (Wooly) তথায় খনন করিয়া পুরা-বস্তুর সন্ধান করিয়া আসিতেছেন। এই প্রাচীন উপসাগর হইতে কিছু দূরে টেল-এল ও-বেইদ নামক স্থানে একটি প্রাচীন লিপি পাওয়া গিয়াছে। এ পর্য্যন্ত যত শিলালিপি এবং তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, সে সকল অপেক্ষা এই তাম্রশাসনখানি অধিক প্রাচীন। ইহা খৃষ্ট-পূর্ব্ব সাড়ে চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে উৎকীর্ণ হয়; অর্থাৎ উহা বর্ত্তমান সময়ের সাড়ে ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বের শাসন। মার্কিণ মুলুকের পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বুধগণ ইহার পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন। উহা পাঠে জানা যায় যে, রাজা অ-অন্নিপদ্ম, তদানীন্তন উর নগরের অধিপতি, একটি মন্দিরে নিনহয়সগ দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। নাম দুইটি দেখিয়াই উহা ভারতীয় বলিয়া মনে হয়। রাজার নাম অ-অন্নিপদ্ম বা অন্নপদ একটু বিকৃত হইতে পারে, কিন্তু নৃসিংহ-সঙ্গী নামটি অনেকটা

ঠিকই আছে। অতি প্রাচীন লেখার অক্ষরগুলি বিকৃত হওয়াই সম্ভব। তবে ইহা বুঝা যায় যে, নৃসিংহদেব ও তাঁহার সঙ্গিনী নৃসিংহ-সঙ্গী বা নৃসিংহ-সঙ্গিনী সাড়ে ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে তথায় দেবদেবী বলিয়া পূজা পাইতেছিলেন। নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুর রাজ্য জয় করিয়া ঐ রাজ্য প্রহ্লাদকে দিয়াছিলেন। তখন ঐ দেশ নাস্তিক মতবাদে পরিপ্লাবিত ছিল। সেই জন্য নৃসিংহদেব শুক্রাচার্য্যকে রাজগুরু পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তথা হইতে চলিয়া আসিয়াছিলেন ; কিন্তু ইহাতেও ঐ কাহিনী সম্পূর্ণ সপ্রমাণ হয় না।

কতকগুলি পুরাণে (যথা মৎস্যপুরাণে) কথিত হইয়াছে, নৃসিংহদেবের সহিত হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি দৈত্যগণের তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। অবশেষে হিরণ্যকশিপু পরাজিত হয়। প্রহ্লাদ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন ; কিন্তু তিনি তাঁহার পৌত্র বলিকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। শুক্রাচার্য্যের নেতৃত্বে বলি যজ্ঞশীল ও ধার্ম্মিক হইয়া উঠিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি দেবতাদিগের অধিকার কাড়িয়া লইয়াছিলেন। যুদ্ধে বলিকে পরাজিত করিবার সামর্থ্য কাহারও ছিল না। তখন বামন বলির নিকট হইতে ত্রিপদ ভূমি ভিক্ষা করিয়া দেবগণের ও মনুষ্যগণের অধিকার উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই বলিই উত্তরকালে ব্যাবিলোনিয়ায় এবং ফিনিসিয়ায় প্রাচীন অধিবাসীদিগের দ্বারা পূজিত হইতেন। তাঁহার নামও কতক কালবশে আর কতক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদিগের উচ্চারণ-দোষে বিকৃত হইয়া বল, বয়ালরূপে পরিণত হইয়াছে। এই বলিই তাঁহাদের দেবতা (১)। আমেরিকার মায়া জাতির মধ্যে বলিই স্বনামে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। মায়া জাতির রাজধানী চিচনইটজা সহরে অনুসন্ধান করিতে করিতে ডক্টর টমাস গান বলি দেবকে উৎসর্গীকৃত অনেক মন্দিরের সন্ধান পাইয়াছেন (২)। এই বলি রাজা সম্বন্ধে জানিতে পারা যায় যে, তিনি মহাবল-পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তাঁহার আমলে দেবতা, গন্ধর্ব্ব এবং অসুর সকলেই বিবাদ পরিহার করিয়া শান্তিতে বসবাস করিত। বলি আর্য্য হইলেও শুক্রাচার্য্যের প্রভাবে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন, এবং তিনি অসাধারণ দাতা ছিলেন। প্রাচীন মেসোপোটেমিয়াতে বলিরাজের অনেক কীর্ত্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি হিরণ্যকশিপুর বংশে জন্মিয়াছিলেন—প্রহ্লাদ বা প্রহ্লাদের পুত্র অথবা পৌত্র (বিরোচনের পুত্র), এ কথা ঐ অঞ্চলের প্রাচীন কাহিনীতেও পাওয়া যায়। তবে নারায়ণ নরসিংহ-মূর্ত্তিতে স্ফটিক স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া আবির্ভূত হইয়া হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছিলেন, এ কথা কুত্রাপি নাই। বরং যুদ্ধে হিরণ্যকশিপু হত হইয়াছিলেন, এইরূপ একটা আভাস তথাকার জনশ্রুতিতে পাওয়া যায়। মৎস্যপুরাণের ১৬১-১৬২ এবং ১৬৩ অধ্যায়ে নরসিংহ কর্ত্তৃক হিরণ্যকশিপুর রাজ্য আক্রমণ এবং যুদ্ধে হিরণ্যকশিপুর মৃত্যুর কথা আছে ; স্ফটিক স্তম্ভ হইতে নরসিংহের আবির্ভাব-কথা নাই। উহাকেই আদি বিবরণ মনে করা যাইতে পারে। মেসোপোটেমিয়ার বিবরণ কতকটা ঐরূপ। তবে এই নরসিংহ বা মানব-ব্যাঘ্ররা যে ভারত হইতে হিরণ্যকশিপুর রাজধানীতে গিয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই। এক জন সুধী লেখক লিখিয়াছেন যে, রামায়ণে মানবব্যাঘ্র নামক এক জাতির উল্লেখ আছে। তাহারাই হিরণ্যকশিপুর রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। উহারা মানব, সুতরাং আর্য্য। কিন্তু এ কথা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। রামায়ণে বর্ণিত আছে যে, সুগ্রীব যখন সীতাকে অন্বেষণ করিবার জন্য চারিদিকে চর পাঠাইতেছিলেন, তখন তিনি পূর্ব্ব দিকে যাহাদিগকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, ঐ দিকে মানবব্যাঘ্র নামে একটা জাতি আছে, তাহারা কিরাত। ইহারাই যে এত দূর হইতে কশ্যপহ্রদতীরস্থ হিরণ্যকশিপুর রাজ্য আক্রমণ করিতে যাইবে, ইহা মনে হয় না। অন্য কোন হিন্দু রাজা উহা করিয়াছিলেন।

হিরণ্যকশিপু, প্রহ্লাদ, এবং বলি এই তিনটি রাজার নাম ঐ দেশে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া উহা যে সত্য ঘটনা, তাহা সহজেই প্রতীতি হয়। কেনা নাইট এবং ফিনিসিয়াবাসীদিগের মধ্যেই বয়াল (Baal) বা বলির পূজা হইত। বেবিলোনীয়াতে ইনি বেল, এবং ফিনিসিয়ায় ইনি বয়াল নামে পূজা পাইতেন। কিন্তু

(১) Remont's Outlines of General History.
(২) Scientific American, February 1926.

আমেরিকার মায়া জাতি উহাকে বলি নামেই পূজা করিয়া থাকে। আমেরিকার মায়া জাতি কোথা হইতে তথায় গিয়াছে, তাহা এখন বুঝা কঠিন। সম্ভবতঃ ময় নামক যে দানব জাতির কথা পুরাণে পাওয়া যায়—সেই দানব জাতিই আমেরিকার মায়া জাতির * আদিপুরুষ ছিলেন। মধ্য-আমেরিকার হণ্ডুরাজস্থিত তক্ষণশিল্প লইয়াই এই মায়া জাতি কোথা হইতে আসিল, তাহার সম্বন্ধে তীব্র আলোচনা ও বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে। উহাতে হস্তীর মূর্ত্তি আছে। অধ্যাপক স্মিথ (G. E. Smith) বলেন—ঐ হস্তীর আকার হইতেই বুঝা যায় যে, ময় বা মায়া জাতির সভ্যতা ভারত হইতে আমেরিকায় প্রবেশ করিয়াছে (১)। কি প্রকারে ঐ সভ্যতা ভারত হইতে আমেরিকায় প্রবেশ করিয়াছে অধ্যাপক স্মিথ তাহারও কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। ময়রাজের (ময় দানব) কন্যা মন্দোদরীকে রাবণ রাজা বিবাহ করিয়াছিলেন। ময় জাতি দানবদিগের মধ্যে শিল্পীসম্প্রদায় বলিয়া প্রথিত। আর এক জন দানব ময়, রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সভা এবং প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। ময়গণ পাতালে বাস করিতেন, এরূপ কথাও পুরাণে লিখিত আছে। অধ্যাপক স্মিথ বলেন, ময় জাতি পারস্য হইতে কাম্বোডিয়ার ভিতর দিয়া আমেরিকায় গিয়াছিল। ভারতের সহিত তাহাদের বিশেষ সংযোগ ছিল। অর্জ্জুন যখন খাণ্ডবপ্রস্থ দগ্ধ করেন, তখন ময় তথায় বাস করিতেন। তিনি অর্জ্জুনকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে যেন দগ্ধ করা না হয়। কিন্তু এই শিল্পী-জাতি কোন্ স্থান হইতে আমেরিকায় গমন করেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। অসুরদিগের শিল্পী এই দানবদিগের আদি নিবাস এসিয়ায় হওয়াই সম্ভব।

বর্ত্তমান আলোচনা হইতেই প্রতীতি হয়, পুরাণগুলির ভিতর অনেক ঐতিহাসিক তথ্য প্রচ্ছন্ন রহিয়া গিয়াছে। আজ আমেরিকায় ভারতীয় সভ্যতার সহিত মায়া জাতির আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি এবং ধর্ম্ম-ব্যবস্থার বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখিয়া য়ুরোপীয় জাতিরা বিষম সমস্যায় পড়িয়াছেন! কিন্তু পুরাণের কথা আলোচনা করিলে সেই সমস্যার সমাধান হওয়া দুরূহ মনে হয় না; তবে পুরাণগুলির লেখার ভঙ্গী বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া দেখিতে হয়। উহাতে অনেক কথা রূপক ভাবেই বর্ণিত আছে। উদাহরণস্বরূপ পূর্ব্বেই একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হইয়াছে। পুরাণে বর্ণিত আছে—রাজা উত্তানপাদের দুই স্ত্রী। উত্তানপাদ শব্দের যৌগিক অর্থ মনুষ্য হইতে পারে। উত্তানপাদ রাজার দুই পত্নী—সুরুচি এবং সুনীতি। সুরুচির গর্ভে উত্তম নামে পুত্র জন্মে। সুনীতির গর্ভে জন্মিয়াছিল ধ্রুব। ইহাতে বেশ বুঝা যায়, মানুষ সুরুচির সেবা করিলে যাহা-কিছু লাভ করে, তাহাই "উত্তম" মনে হয়; আর সুনীতির সেবা করিলে যাহা ধ্রুব বা শাশ্বত মঙ্গলজনক, তাহাই লাভ হয়। ধ্রুবের আবার দুই পুত্র—শিষ্টি আর ভব্য। শিষ্টি অর্থে শিষ্টতা, আর ভব্য অর্থে যেরূপ হওয়া উচিত সেইরূপ। এখানে রূপক স্পষ্টই প্রতীয়মান। উত্তম নিঃসন্তান বা নিষ্ফল। এখানে এই আখ্যানের রূপক দিক্‌টা পরিস্ফুট। তাই বলিয়া উত্তানপাদ বলিয়া কোন রাজা ছিলেন না, ইহা মনে করা সঙ্গত হইবে না। উত্তানপাদ নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম ছিল সুনৃতা। সুনৃতার গর্ভে উত্তানপাদের চারিটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ঐ চারি জন পুত্রের নাম যথাক্রমে—ধ্রুব, কীর্ত্তিমান্, আয়ুষ্মান্ এবং বসু (১)। সুতরাং উত্তানপাদের দুই পত্নী ছিল না। ধ্রুব কঠোর তপস্যা করিয়া সপ্তর্ষিমণ্ডলের অগ্রে স্থানলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। মৎস্যপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ এবং কূর্ম্মপুরাণ প্রভৃতিতে এই কথাই আছে। উহাতে উত্তানপাদের দ্বিতীয়া মহিষী সুরুচির এবং তাঁহার পুত্র উত্তমেরও নাম নাই। ইহাতে স্বতঃই মনে হয় যে, প্রাচীন পণ্ডিতগণ উত্তানপাদের পত্নী সুনৃতার নাম সুনীতিতে পরিবর্ত্তিত করিয়া, এবং সুরুচি নাম্নী তাঁহার দ্বিতীয়া মহিষীর এবং তদ্গর্ভজাত উত্তমের নাম কল্পনা করিয়া লোকশিক্ষার্থ একটি সুন্দর

* মায়াজাতির পরিচয় সম্বন্ধে ১৩৪৬ সালের ভাদ্র-সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী'র "ভারতীয় আর্য্য-সভ্যতার একটি ধারা" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(১) Scientific American, January 1926.

(১) মৎস্যপুরাণ ৪র্থ অধ্যায় ৩৪ হইতে ৩৭ শ্লোক এবং ব্রহ্মপুরাণ ২য় অধ্যায় ৭ হইতে ৯ শ্লোক। কূর্ম্মপুরাণের ১৪ অধ্যায়েও উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুবের নাম পাওয়া যায়, সুরুচি বা উত্তমের নাই।

রূপকের সৃষ্টি করিয়াছেন। পুরাণে ঐতিহাসিক ব্যক্তিদিগের নামের ও প্রধান ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া জনসাধারণকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদত্ত হইত। সেই জন্য রূপক হইলেই যে সেই নামে কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিল না, ইহা মনে করা ভুল। পুরাণে ঐতিহাসিক লোককে অবলম্বন করিয়াই লোকশিক্ষা দেওয়া হইত।

পুরাণের কাহিনীর নামগুলি যে ঐতিহাসিক, তাহার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। মিশরের ইতিহাসে দেখা যায়, সেই প্রলয়কালীন জলপ্লাবনের পর মিশরের প্রথম রাজা হন মেনেস। মেনেসের পুত্র অট্টিখোস, তাঁহার পুত্র কেনেকেনেস। নামগুলি যে ঠিক উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহা মনে হয় না। তবে এই নামগুলির সহিত ভারতীয় আদি রাজগণের নামের বিস্ময়কর মিল আছে। মেনেস বা মনেসের নামের সহিত মনুর নাম মিলে। অট্টিখোস বা হট্টিখোসের নামের সহিত ইক্ষ্বাকু নামের সাদৃশ্য আছে। আবার ইক্ষ্বাকুর পুত্র কুক্ষির (কুক্‌সি) নামের সহিত কেনেকেনেসের নামের সাদৃশ্য দেখা যায়। প্রাচীন ইতিহাস-লেখক রলিনসন সে কথার উল্লেখ করিয়াছেন (১)। নাম বিকৃত হয় উচ্চারণের দোষে। কলিকাতার নাম ক্যাল্‌কাটা, বারাণসীর নাম বেনারস যদি হয়, তাহা হইলে ইক্ষ্বাকুর নাম অট্টিখোস এবং কুক্ষির নাম কেনেকেনেস হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? বিশেষতঃ, মিশরের প্রাচীন লিপি ছিল চিত্রলিপি (Hieroglyphy), উহাতে ঠিক উচ্চারণ পাওয়া যায় না; ইহার ফলে উচ্চারণের কিছু ব্যতিক্রম ঘটে। সেই জন্য এই ধ্বনিগত মিলটা আকস্মিক মিল বলা যায় না—বিশেষতঃ যখন পুরুষানুক্রমে সেই মিল লক্ষিত হয়।

এখন প্রাচীন ভারতের অতীত ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু পুরাণগুলিকে বাদ দিয়া সে চেষ্টা করিলে তাহা সফল হইবে না। জলপ্লাবন অতীত ইতিহাসের কালবক্ষে একটা কাল, এবং স্থাননির্দ্দেশক স্তম্ভস্বরূপ। ইহার পূর্ব্বের এবং পরের অনেক ঐতিহাসিক তথ্য পুরাণে নিহিত আছে। ধরাতলে মনুষ্য কত কাল পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাহার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় নাই। ইহার কিয়দংশ যদি উদ্ধার করিতে হয়, তাহা হইলে পুরাণগুলিকে লইয়া সাবধানে তাহা করাই কর্ত্তব্য। পৌরাণিক কাহিনী রূপকের ভাষায় বলিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল বলিয়া তাহার উদ্ধার-সাধন কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া ঐ দিক্ দিয়া ইতিহাসের উদ্ধার-সাধন করিবার চেষ্টা ত্যাগ করা উচিত নহে। ভুল হইতে পারে এবং হইবেও। পুরাণগুলি অতি প্রাচীন। বৈদিক সাহিত্যে পুরাণের উল্লেখ আছে। সেই প্রাচীন পুরাণের কাহিনী লইয়া অর্ব্বাচীন পুরাণ লিখিত হইয়াছে। উহা অর্ব্বাচীন বলিয়া ত্যাগ করিলে ইতিহাসের অনেক স্থান ভ্রমের বারিরাশির দ্বারা প্লাবিত হইতে পারে।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

(১) Manual of Ancient Hfstory by Rawlinson.

জ্যোতিরেণু

সুন্দর ও জীবনের চিরোজ্জ্বল দীপ্ত শিখা হ'তে—
জ্বালিলাম আপনার অন্তরের ক্ষুদ্র দীপখানি।
তোমার জীবন ভ'রি যে-আলো উছলে মুক্ত স্রোতে
আঁধার জীবনে মোর তারি কিছু আনিলাম টানি।

ওগো বন্ধু, এ-অন্তরে তোমার অন্তর-ইতিহাস—
জাগিয়া রহিবে নিত্য সুমহান্ স্মরণ-গৌরবে।
দূর হ'তে দিয়াছ যা অগ্নিময় তাহারি আভাস
দানের সম্মানে হেথা রূপ ধরি' বিকশিয়া রবে।

আজো তব সেই রূপ চিরন্তনী জ্যোতির আলোতে—
জ্বালায় প্রদীপ মোর—নেবে যবে উতলা সমীরে।
আজো তব অনাবিল স্নিগ্ধ নীল আঁখি-দু'টি হ'তে
ঝরিছে আশিসরাশি অভিশপ্ত এ-জীবন ঘিরে।

তোমারে পাইনি চেয়ে—রহিয়াছ দূর হ'তে দূরে,
অক্ষয় আলোকে হিয়া রাঙিয়াছ বেদনা-সিন্দুরে।

শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত।

মীরা

শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "মা, এই নাও তোমার অজ্ঞান (ভোগ), এই নাও তোমার জ্ঞান (মোক্ষ); আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।" বস্তুতঃ ভক্ত ভোগ চায় না, ভক্ত মোক্ষ চায় না; ভক্ত চায় শুদ্ধা ভক্তি! এই ভক্তির নিকট নির্ব্বাণ, মুক্তি কিছুই নয়। ভক্ত শ্রীরামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি!

বাস্তবিক রস-আস্বাদনই জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য। এই বিশ্বের প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থে, স্থূলে, সূক্ষ্মে, জড়ে-অজড়ে, অণুতে-পরমাণুতে, ধ্বনিতে, সঙ্গীতে, লীলাময়ের লীলা-রস নিত্যই উছলিয়া উঠিতেছে। আর সেই রসমাধুরী-আস্বাদনে ধন্য হইতেছে ভক্ত। ব্রজগোপীগণ এই রসের প্রধানা আস্বাদিকা। পরম ভক্ত উদ্ধব এই গোপীগণের ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

বসুদেব-ভ্রাতা দেবভাগের পুত্র শ্রীউদ্ধব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত। তাঁহার ভক্তিপ্রসঙ্গে ভাগবতকার বলিয়াছেন,—

যঃ পঞ্চহায়নঃ মাত্রা প্রাতরাশায় যাচিতঃ।
তৎ নৈচ্ছত রচয়ন্ যস্য সপর্য্যাং বাললীলয়া॥

পঞ্চবর্ষ-বয়স্ক বালক উদ্ধবের শিশু-সুলভ অন্য ক্রীড়া ছিল না। তাঁহার ক্রীড়া ছিল, কল্পিত শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে উপহার-রচনা। এই খেলায় তিনি এরূপ নিবিড় ভাবে ব্যাপৃত থাকিতেন যে, মাতা প্রাতরাশের জন্য আহ্বান করিলেও তাঁহার আহারের ইচ্ছা হইত না। ভগবানের পবিত্র নামোচ্চারণে তাঁহার হৃদয়ে কি ভাব উদিত হইত, তাহা ভাগবতকার বিদুরোদ্ধব-সংবাদে বর্ণনা করিয়াছেন,—

স মুহূর্ত্তং অভূৎ তূষ্ণীং কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিসুধয়া ভৃশং।
তীব্রেন ভক্তিযোগেন নিমগ্নঃ সাধুনির্বৃতঃ॥
পুলকোদ্ভিন্নসর্ব্বাঙ্গঃ মুঞ্চন্ মীলদ্দৃশা শুচঃ।
পূর্ণার্থঃ লক্ষিতঃ তেন স্নেহপ্রসর-সংপ্লুতঃ॥

বিদুর কর্ত্তৃক ভগবানের নামোল্লেখ মাত্রেই উদ্ধবের প্রাণক্রিয়া স্পন্দনরহিত; ভক্তির নির্ম্মল প্রবাহে চিত্ত বিভোর, এবং পরে সর্ব্বাঙ্গে পুলক-সঞ্চার ও নয়নে দর-দর ধারে অশ্রু বিগলিত হইত। পরম-ভক্ত বিদুর দেখিলেন, উদ্ধবের সাধনা সফল হইয়াছে, কারণ, ভগবানের নামোল্লেখেই উদ্ধবের গভীর সমাধি।

এহেন ভক্ত উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের আদেশে ব্রজধামে গিয়া গোপীগণের ভক্তি-তন্ময়তা ও ব্যাকুলতা দেখিয়া বলিয়াছিলেন—

এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপীবধ্বো
গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ।

দেহধারী জীবের মধ্যে এই গোপীরাই ধন্য! কারণ, নিখিলাত্মা গোবিন্দে তাহাদের প্রেম অপূর্ব্ব।

ক্কেমা স্ত্রিয়ো বনচারীর্ব্যভিচারদুষ্টাঃ
কৃষ্ণে ক্কচৈব পরমাত্মনি রূঢ়ভাবঃ।

কোথায় সেই বনচারী ব্যভিচারদুষ্টা গোপী? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে এ কি প্রেম!

গোপীদের চরণরেণু লইয়া প্রণাম করিতে করিতে উদ্ধব প্রার্থনা করিলেন

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।

যেন এই বৃন্দাবনে লতাগুল্মরাজির মধ্যেও আমি কোন একটা কিছু হই এবং এই গোপীগণের চরণ-রেণুলাভে জীবনকে ধন্য করিতে পারি! ভগবদ্-ভক্তের মনে গোপী হইবার প্রার্থনা জাগে নাই। বস্তুতঃ গোপী-প্রেমের তুলনা নাই।

মীরার ভজন-গানেও আমরা এমনি গোপীসুলভ বিরহ, এমনি ব্যাকুলতা, এমনি রসাস্বাদন পূর্ণ ভাবে বিদ্যমান দেখি।

মেড়তিয়া-রাজকন্যা মীরা বাল্যকাল হইতে তাঁহার ইষ্টদেবতা গিরধরে ভক্তিমতী। গিরধর তখন তাঁহার প্রভু ও ভর্ত্তা। মীরার প্রত্যেক ভজন-গান "মীরাকে প্রভু গিরধরে" নিবেদিত নির্ম্মাল্য।

বয়োবৃদ্ধির সহিত রাজকন্যা মীরার বিবাহ-কথা চলিতে লাগিল। এই বিবাহ-প্রসঙ্গে এক দিন মীরা তাঁহার মাতাকে বলিলেন, "মা গো! আমার বিবাহের আর কি দরকার! স্বপ্নে ত আমার বিবাহ হইয়াছে গোপালের সহিত।"

মীরা—মাঈ, মহাঁনে সুপনে মেঁ, পরণ গয়া জগদীশ।
সোতীকো সুপনা আবিয়া জী সুপনা বিশ্বাবীস॥

"মা, স্বপ্নে ভগবান্ আমাকে বিবাহ করিয়াছেন। সেই স্বপ্ন যে কিরূপ জাঁকালো ভাবে আসিয়াছিল, তাহা তোমাকে কি বলিব? সেই স্বপ্ন বিশ্বাস করো।"

মা—গৈলী দীখে মীরা বাব্‌লী, সুপনা আল জঞ্জাল।

মাতা অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "মীরা, তুই পাগল হলি! ওরে, স্বপ্ন মিথ্যা।"

মীরা—মাঈ, মহাঁনে সুপনে মে, পরণ গয়া গোপাল।
অংগ অংগ হলদী মেঁ করী জী, সুধে ভীজ্যো গাত।
মাঈ মহাঁনে সুপনে মেঁ, পরণ গয়া দীননাথ॥
ছপ্পন কোট জাঁহা জান পধারে দুলহা শ্রীভগবান।
সুপনে মেঁ তোরন বাঁধিয়ো জী, সুপনে মে আঈ জান॥
মীরাকে গিরধর মিল্যা জী, পুর্ব্ব-জনমকে ভাগ।
সুপনে মেঁ মহাঁনে, পরণ গয়া জী হো গয়া অচল সোহাগ॥

মীরা দৃঢ়স্বরে মাতার উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "না, মা, সত্যই গোপাল আমায় বিবাহ করিয়াছেন। এই দেখ, মাঙ্গলিক-চিহ্ন হরিদ্রা আমার গায়ে বর্ত্তমান। আর আমার হৃদয় সুধাসিক্ত হইয়াছে। বরবেশী ভগবান্ ছাপ্পান্ন কোটি দেবতাকে বরযাত্রিরূপে আনিয়াছিলেন এবং আমার হস্তে ডুরী বাঁধিয়া দিয়াছেন। এই ডুরী অচল সোহাগের ডুরী। না জানি, পূর্ব্ব-জন্মে কি সুকৃতি করিয়াছিলাম। তাই আমি গিরধরকে পতিরূপে পাইয়াছি।"

সাধারণ লোক অবিশ্বাসের হাসি হাসিতে পারে, কিন্তু ভক্তের হৃদয়ে শয়নে-স্বপনে অহরহ এই রসাস্বাদন চলিয়াছে।

মীরা মাতাকে বলিতেছেন, "মরি, মরি, আমার শ্যামসুন্দরের কি অপরূপ রূপ-মাধুরী! সেই কোটি-চাঁদ-নিংড়ানো বিশ্ববিমোহন রূপ যে দেখেছে, সে ভুলেছে। সে ভুলেছে তার সত্তা, ভুলেছে তার ইহলোক, পরলোক।"

জবসে মোহি নন্দনন্দন দৃষ্টি পড়্যো মাঈ।
তবসে পরলোক লোক কছু না সোহাঈ।
মোরন কী চন্দ্রকলা সীস মুকুট সোহৈ।
কেসর কো তিলক ভাল তিন লোক মোহৈ।
কুণ্ডলকী অলক-ঝলক কপোলন পর ছাঈ।
মনো-মীন সরোবর ত্যজি, মকর মিলন আঈ।
কুটিল ভৃকুটি তিলক ভাল, চিতবন মেঁ টৌনা।
খঞ্জন অরু মধুপ মীন, ভুলে মৃগ ছৌনা।
সুন্দর অতি নাসিকা, সুগ্রীব তিন রেখা।
নটবর প্রভু ভেষ ধরে, রূপ অতি বিশেষা।
অধর বিম্ব অরুণ নৈন, মধুর মন্দ হাসি।
দশন-দমক দাড়িম-দ্যুতি চমকে চপলা—সী।
ছুদ্র ঘণ্ট কিংকিণী অনূপ ধুনি সোহাঈ।
গিরধর অঙ্গ অঙ্গ মীরা বলি জাঈ।

—"মা গো, যখন নন্দদুলালের দৃষ্টির সহিত আমার দৃষ্টির বিনিময় হয়, তখন ভুলে যাই, ইহলোক-পরলোকের কথা। আমার চির-সুন্দরের মাথার মুকুটের উপর ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রক শোভা পাইতেছে, আর কপোলদেশের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে ত্রিলোকমুগ্ধকর কুমকুমের তিলক। কর্ণকুণ্ডলের শোভা দুইটি গণ্ডের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে, আর চক্ষুতারকা সেই কুণ্ডলরূপী মকরের সহিত মিলিবার জন্য আসিতেছে। তিলক-আঁকা কপালে কুটিল ভ্রূকুটি যেন যাদুকরের যাদু। আর তাঁর নয়নের কি তুলনা দিব মা, খঞ্জন, মধুকর, মীন ও মৃগশাবক সেই নয়ন দেখিয়া আপন-ভোলা হয়। কি সুন্দর আমার প্রভুর নাসিকা! গ্রীবাদেশের তিনটি দাগ কি সুন্দর! নটবর প্রভুর অপূর্ব্ব বেশের তুলনা মিলে না। বিম্বের মত অধর, অরুণ-লোচন এবং মুখে সেই মধুর হাসি। সেই সহাস দশন-কান্তিতে দাড়িমের দ্যুতি যেন বিদ্যুতের মত চমকিত হইতেছে। কটিদেশে ক্ষুদ্র ঘণ্টার রব ও পদে সুমধুর নূপুর-নিক্কণ। মরি মরি, গিরধরের কি অপরূপ রূপ-মাধুরী!"

হৃদয়বল্লভের রূপ ভক্তের হৃদয়ে রূপ-পিপাসার তৃপ্তি দিতে পারে না; অতৃপ্তি বাড়াইয়া তোলে।

নৈনা লোভীরে বহুরি সকে নাহি আয়।
রোম-রোম নখ-শিখ সব নিরখত ললচ রহে ললচায়।

"দুইটি নয়নে আমার বড়ই লোভ, কিছুতেই আয়ত্তের মধ্যে আসে না। গিরধরের রূপ দেখিতে নখ হইতে মাথা পর্য্যন্ত প্রতি-রোমকূপ যেন আঁখিরূপে ফুটিয়া ওঠে! তবু যে অতৃপ্তি, সেই অতৃপ্তি থাকিয়া যায়। কিছুতেই রূপ-পিপাসা মিটে না।"

বৈষ্ণব-কবির ভাষায় ইহার প্রতিধ্বনি—

লখিল নহে রূপ, লখিল নয়,
যে অঙ্গে পড়ে দিঠি, সে অঙ্গে রয়।
দেখিতে দেখিতে মন এমনি লয়
সকল অঙ্গে যদি নয়ান হয়।

মীরার বিবাহ হইয়া গেল। শিশোদীয়-কুলতিলক মেবারের মহারাণা মানমধন্য নরপতি কুম্ভের সহিত। বিপুল ঐশ্বর্য্য, বিরাট্ সমারোহ, আড়ম্বরপূর্ণ শোভাযাত্রা মীরার প্রাণ অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণী, ননদিনী সকলে মীরার রূপলাবণ্যে মোহিত। কুলধর্ম্মানুসারে মীরার কুলদেবী গৌরীর আরাধনে শাশুড়ী বধূমাতাকে লইয়া গেলেন। মীরার হৃদয় কাতর হইল। এ কি ঐশ্বর্য্যের খেলা! এ কি ভোগবিলাস! দেবীর ঐশ্বর্য্যময়ী মূর্ত্তি ও আড়ম্বরপূর্ণ পূজার উপহার দর্শনে বেদনায় মীরার মন বিদ্রোহী হইল। কোথায় সেই গিরধরের মোহন মুরতি, কোথায় নিভৃতে তাঁহার চিন্তা, কোথায় তাঁহার পূজার উপকরণ প্রেমসিক্ত ভজন-সঙ্গীত! আর এ কি কোলাহল! এ কি পার্থিব ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর! বলির জন্য প্রস্তুত পশুগণের কি মর্ম্মস্পর্শী আর্ত্তনাদ! এ কি আরাধনা? এ যে পূজার নামে ব্যঙ্গ! মীরা পূজায় অসম্মতি জ্ঞাপন করিল।

মীরা—গুরু গোবিন্দরো আণ, গোরল ন পুজ্যা
"গোবিন্দের দিব্য, আমি গৌরীদেবীর পূজা করিব না।"
শাশুড়ী—ওরজ পুজৈ গোবজ্যাজী, যে কুঁ্যপুজো ন গোর,
মন বংছত ফল পারস্যোজী, যে কুঁ্যপূজোওর।

"সকলেই ত গৌরীদেবীর পূজা করে, তুমি করিবে না কেন? মাতা সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। তুমি অন্য দেবতার পূজা করিবে কেন?"

মীরা—নহি হম পূজাঁ গোরজ্যা জী, নহি পূজ্যা অনদেব।
পরম সনেহী গোবিংদো, যে কাঁই জানো মহাঁরো ভেব।

"না মা, আমি গৌরীর পূজা করবো না, কিম্বা অন্য কোন দেবতার পূজা করবো না। আমার অন্তরের দেবতা গোবিন্দ। তাঁহার পায়ে জীবন বিকাইয়াছি।"

শাশুড়ী—বাল সনেহি, গোবিংদো সাধ, সংতাকো কাম।
যে বেটী রাঠোড়কী, যাঁ নে রাজ দিয়ে ভগবান্।

"সাধুগণ বাল্যকাল থেকে গোবিন্দ কামনা করে। তুমি মা রাঠোর-কন্যা, তুমি রাজরাণী। ভগবান্ তোমায় বিপুল ঐশ্বর্য্য দান করেছেন।"

মীরা—রাজ করৈ জানোঁ করণে দিজ্যো মে ভগতারী দাস।
সেবা সাধুজননকী মহাঁরে রাম মিননকী আশ।

"যারা রাজ্য চায়, তারা রাজত্ব করুক। আমি ভগবানের দাসী। সাধুজন-সেবা ও ভগবানে ভক্তি আমার কাম্য।"

শাশুড়ী—লাজৈ পীহর সাসরো মাইতনো মোপাল।
সবহি লাজৈ মেড়তিয়া ঝি, থাঁসু বুরা কহে সংসার।

"মীরা, তোমার কার্য্যে তোমার পিতৃকুল শ্বশুরকুল মাতুলকুল সকলে লজ্জিত। মেড়তিয়া-রাজকন্যা, আজ সংসারে সকলে তোমায় মন্দ বলিতেছে।"

মীরা—চোরী কঁবা ন মারগী, নহি মেঁ করু অকাজ
পুন্নকে মারগ চলতা, ঝকমারো সংসার।
নহি মে পীহর সাসরো নহী পিয়াজীরী সাথ।
মীরা নে গোবিংদো মিল্যাজী, গুরু মিলিয়া রৈদাস।

"চুরি করি নাই বা কোন কুকর্ম্ম করি নাই। আমি পুণ্যমার্গে বিচরণ করিতেছি। আমি সংসারের কোন কিছুই দৃক্‌পাত করি না। মীরার গোবিন্দ মিলিয়াছে, আর মিলিয়াছে ভক্ত রবিদাসের মত গুরু।"

শ্বশ্রূমাতা হার মানিলেন।

পার্থিব ভোগ-বিলাস, সাংসারিক প্রলোভন ভগবানে অর্পিত চিত্তে কি বিক্ষোভ সৃষ্টি করিতে পারে? যাহার অমৃতের সন্ধান

মিলিয়াছে, তাহার সবল হৃদয়ে কি লোক-লজ্জা স্থান পায়? সেই চিত্ত কামনাহীন। দেহ তাহার দেবতার নির্ম্মাল্য, ধাতু-প্রসাদ।

ভক্তহৃদি-বৃন্দাবনে, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাসনে,
আছেন সর্ব্বক্ষণ।

ভক্ত-হৃদয়ে ভক্তের কামনাহীন চিত্তে ভগবান্ সর্ব্বদা বিরাজ করেন। তবু ভক্তের অতৃপ্তি! কারণ, প্রেমময়কে সে সম্পূর্ণরূপে পাইতে চায়। অসীমকে সম্পূর্ণরূপে সীমার মধ্যে পাইতে চায় বলিয়া তার এত অতৃপ্তি, এত ব্যাকুলতা, এত চাঞ্চল্য। অসীমের প্রতি সসীমের এই ধাবন, পাওয়ার মধ্যে না-পাওয়ার এই ব্যাকুলতা হার মানিয়া প্রাণের এই ক্রন্দনই বিরহ। গোপীপ্রেমের ইহাই বৈশিষ্ট্য।

ঘড়ি এক নহি আব্‌য়ে তুম দরশন বিন মোয়।
তুমহো মেরে প্রাণজী কাসুঁ জীবন হোয়॥

প্রভু, তোমায় না দেখিয়া আমি একদণ্ড থাকিতে পারি না। তুমি আমার প্রাণ! তোমা ছাড়া জীবনের গতি কোথায়?

ধান ন ভাবে, নীদ ন আবে,, বিরহ সতাবে মোয়।
ঘায়লসী ঘুমত ফিরু রে মেরে দরদ না জানে কোয়॥

অন্নে রুচি নাই, চোখে নিদ্রা নাই। বিরহে অন্তর জর-জর। গভীর ভাবে আঘাতিত হইয়া ঘুরিয়া মরিতেছি। আমার এ ব্যথা কে বুঝিবে?

পন্থ নিহারু ডগর বুহারু ডভবী মারগ জোয়।
মীরাকে প্রভু, কবরে মিলোগে তুম মিলিয়া সুখ হোয়॥

পথপানে অনিমেষ চাহিয়া আছি। পথ ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার রাখিয়াছি। আর দাঁড়াইয়া আছি তোমার প্রতীক্ষায়। এস এস, মীরার প্রভু, তোমার সহিত কবে মিলন হবে? তোমায় না পেলে আমার সুখ নাই!

এইরূপ "হিয়া-দগ্‌দগি পরাণ-পোড়ানি" বিরহ-ভাব মীরার ভজন-গানে একটি বিশিষ্ট রূপ দিয়াছে।

নীদলড়ী নহিঁ আবৈ, সারা রাত কিস্ বিধ হোঈ পরভাত।
চমক উঠি, সুপনে সুধ ভুলী চন্দ্রকলা ন সোহাত॥

সারা রাত চোখে ঘুম নাই—কেবল মনে হয়, কখন্ প্রভাত হইবে! স্বপ্নে তাঁকে দেখি, কিন্তু চমকে উঠি। সে স্বপ্নসুখ ভুলিয়া যাই। সুবিমল স্নিগ্ধ চন্দ্রকর বিষবৎ মনে হয়।

প্যারে দরশন দীর্ষ্যো আয় তুম বিন রহ্যো ন জায়।
ব্যাকুল ব্যাকুল ফিরু রৈণ দিন বিরহ কলেজা খায়॥

এস নাথ, একবার দর্শন দাও, তোমা ছাড়া থাকিতে পারি না। রাত-দিন তোমার জন্ত আকুল-ব্যাকুল হইয়া ফিরিতেছি। বিরহ হৃদয় দগ্ধ করিতেছে!

আব্‌ণ আব্‌ণ হয় বহ্যো রে নহিঁ আব্‌ণ কি বাত।
মীরা ব্যাকুল বিরহনীরে বাল জ্যোঁ বিল্লাত॥

প্রভু, এস এস। আমি রহিয়াছি তোমার প্রতীক্ষায়। কৈ, তোমার আসিবার নাম নাই! তোমার জন্ত ব্যাকুল বিরহিণী মীরা শিশুর মত কাঁদিতেছে।

খিন মন্দির খিন আঁগণে রে খিন খিন ঠারী হোয়।
গায়ল জ্যুঁ ঘমু খড়ী মহারী বিথা ন বুঝে কোয়।

কখন গৃহে, কখন অঙ্গনে, কখন পথপানে চেয়ে চেয়ে দিন কাটে। ব্যথিত আমি—ব্যথায় কাতর। আমার ব্যথা কে বুঝিবে!

আব ছোড্যা নহিঁ বনৈ প্রভূগী হঁস কর তুরত বুলাবো।
মীরা দাসী, জনম জনমকী অঙ্গ সুঁ অঙ্গ লগাবো॥

প্রভু আমার, আমায় ছাড়িলে চলিবে না। একবার হাসিয়া শীঘ্র ডাকিয়া লও। মীরা যে তোমার জন্ম-জন্মান্তরের দাসী। আমার অঙ্গে অঙ্গ মিলাও।

এই তীব্র আকাঙ্ক্ষা, এই দারুণ উৎকণ্ঠা, এই ব্যাকুলতা, এই গভীর বিরহ, দয়িতকে পূর্ণ ভাবে পাইবার জন্ত প্রতি অঙ্গ লাগিয়া প্রতি অঙ্গের কাঁদুনি ভক্তিমতী মীরার ভজনকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

আবার প্রিয়ের প্রতি দারুণ অভিমান—

জো মৈঁ এসা জানতীরে প্রীত কিয়ে দুঃখ হোয়।
নগর ঢঁঢোরা চোরা ফেরতা রে "প্রীত করো মৎ কোয়।"

হায়! যদি জানিতাম, প্রেম করিলে এমন দুঃখ পাবো, তাহলে নগরে ঘুরে ঘুরে এই কথা বলে বেড়াতাম যে, "তোমরা কেউ প্রেম কোর না।"

এত অভিমান সব ভাসিয়া গেল প্রভুর দর্শনে!—

মৈঁ ঠাঢ়ী গৃহ আপনে রে মোহন নিকসে আয়।
সারঙ্গ ওট ত্যজে কুল অঙ্কুশ বদন দিয়ে মুসকায়॥

আপনার ঘরে দাঁড়াইয়াছিলাম, এমন সময় মদনমোহন পথে বাহির হইলেন। অমনি মন-হরিণী কুলের শাসন মানিল না। সর্ব্বাঙ্গে পুলক-শিহরণ হইল।

লোক কুটম্বী বরজ বরজ হী বতিয়াঁ কহত বনায়—
"চঞ্চল-চপল, অটক নাহিঁ মানত, পর-হথ গয়ে বিকায়।"

আত্মীয় স্বজন আর কেহ আমার দিকে আসে না। কত রচা কথা তারা বলে। এমন চঞ্চল-চপল চিত্ত দেখি না। কিছুতেই আটক মানে না। পরের হাতে বিকিয়ে গেল।

ভলী কহে কোঈ বুরী কহো মৈঁ সব লঈ সীস চঢ়ায়।
মীরা কহে, প্রভু গিরধর কে বিন্ পল ভর রহো না জায়॥

ভাল বল, আর মন্দ বল, ভাল-মন্দ কথা আমি মাথায় তুলিয়া লইলাম। প্রভু গিরধারীকে ছাড়িয়া মীরা এক পল থাকিতে পারে না।

প্রভুর নিকট কি মধুর আত্মসমর্পণ!—

পিয়া ইতনী বিনতী সুন মোরী কোঈ কহিয়ো রে জায়।

* * * *

তুম্ বিন মেরে ঔর ন কোঈ মৈঁ সরণাগত তোয়॥

প্রিয়, আমার মিনতি শুন। আমি আর কি বলিব? তুমি ছাড়া আমার আর কেহ নাই। আমি তোমার শরণাগত।

মীরার জন্ত মহারাণা একটি সুরম্য বাস-ভবন নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। এই বাস-ভবনে মীরার ভজন চলিতে লাগিল। রাণা মনে ভাবিয়াছিলেন যে, কিছু দিন পরে মীরার মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইবে। দেহ ও মনের পবিত্রতা মীরার অপরূপ সৌন্দর্য্যে এক অপূর্ব্ব শ্রী বিকাশিত করিয়াছিল। রাণা সেই রূপ-লাবণ্যে মোহিত। কিন্তু ভোগাকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। সুনীল গগনবিহারী মনোরম বিহঙ্গম কি কভু পিঞ্জরাবদ্ধ হইবে? মীরার চিত্ত-পরিবর্ত্তনের জন্ত রাণা স্বীয় ভগিনী যোধাবাইকে মীরার নিকট প্রেরণ করিলেন। যোধাবাঈ মীরাকে বুঝাইতে লাগিলেন।

উদাবাঈ—থাঁনে বরজ বরজ মৈঁ হারী ভাবী মানো বাত হামারী।
রাণে রোস কিয়ো থাঁ উপর সাধো মে মত জারী॥
কুলকে দাগ লগে ছৈ ভাবী নিংদা হো রহী ভারী।
সাধো রে সংগ বন বন ভটকো লাজ গুমাই সারী॥
বড়া ঘরা থেঁ জনম লিয়োছৈ নাচো দে দে তারী।
বর পায়ো হিংদরাণী সূরজ তেঁ কাঁঈ মনধারী।
মীরা গিরধর সাধ সংগ তজ, চলো হামারে লারী॥

"ভাবী, তোমায় বার-বার বলিয়া হার মানিয়াছি, এখনও আমার কথা শুন। রাণা তোমার উপর রাগ করিয়াছেন, সাধুসঙ্গে আর যাইও না। ইহাতে রাজকুলে কলঙ্ক হইতেছে ও ভারী নিন্দা হইতেছে। সাধুর সঙ্গে বনে বনে বেড়াও? ছি ছি! আমরা লাজে মরি! বড়-ঘরে জন্ম লইয়া করতালি দিয়া নৃত্য? তুমি আজ হিন্দুকুলসূর্য্য উপাধি পাইয়াছ, তাহাতে তোমার মন ওঠে না? মীরা, গিরধরের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া আমার সহিত অন্তঃপুরে চল।"

মীরা—মীরা বাত নহী জগছাণী, উদাবাই সমঝো সুঘর সরাণী।
সাধু মাত পিত কুল মেরে, সজন সনেহী জ্ঞানী॥
সংত চরণকী শরণ রৈন দিন, সও কহত হু বাণী।
রাণা নে সমঝারো জারো মৈঁ তো বাত ন মানী।
মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর সংতা হাথ বিকানী॥

"উদাবাঈ, মীরা তোমার কথা শুনিবে না। সাধুজন আমার পিতৃ-মাতৃকুল ও স্বজনস্বরূপ। রাণাকে বলিয়া দিও, এ বিষয়ে তাঁর কথা শুনিব না। মীরার প্রভু গিরিধর। সাধুর হাতে বিকাইয়াছি।"

উদাবাঈ—ভাবী বলো বচন বিচারি।
সাঁধোকো সংগত দুঃখ ভারী, মানো বাত হামারি॥
ছাপা তিলক গলহার উতারো পরিহো হার হাজারী।
রতন-জড়িত পহিরো আভূষণ, ভোগো ভোগ অপারী।
মীরা জী থেঁ চলো মহলমেঁ, থাঁনে সোগন মহারী॥

"ভাবী, বিচার করে কথা বোলো। আমার কথা শুন, সাধু-সঙ্গে বড় দুঃখ। ছাপা তিলক গলার মালা খুলে ফেল। তাহার বদলে হাজার রত্ন-শোভিত কণ্ঠহার পর। রত্নালঙ্কারে দেহ ভূষিত কর। অনন্ত ভোগ কর। অন্দরমহলে চল।"

মীরা—ভাব-ভগতভূষণ সজে, সীল সংতোষ সিগার।
ওঢ়ী চূণর প্রেমকী, গিরধরজী ভরতার॥
উদাবাঈ, মন সমঝ, জারো আপন ধাম
রাজপাঠ ভোগো তুমহী, হাঁমে ন তাসূঁ কাম॥

"ভাব, ভক্তি, শীল, সন্তোষ সত্যকার ভূষণ। প্রেম সত্যকার পরিচ্ছদ। আমার ভর্ত্তা গিরিধারী। উদাবাঈ, গৃহে যাও, তুমি রাজপাট ভোগ কর। আমার তাতে কোন প্রয়োজন নাই।"

মীরার চিত্তের দৃঢ়তা উদাবাঈকে মুগ্ধ করিল। মীরা তাঁহার দেহ-মন ভগবানে অর্পণ করিয়াছেন। মীরা তাঁহার সঙ্কল্পে অবিচলিত।

জনসাধারণ এই উচ্চ ভাব বুঝিতে অক্ষম। তাহাদের মাপ কাটিতে জাগতিক সুখ-সম্পদের গুরুত্ব অধিক। রাজপুত কুল-গৌরবকে একটা উচ্চ স্থান প্রদান করে। মেবারের মহারাণীর কি না সর্ব্বসমক্ষে করতালি দিয়া নৃত্য ও গান! মীরার পবিত্র জীবনের অবসানকল্পে রাণা গোপনে বিষপাত্র প্রেরণ করিলেন। এই কার্য্যের সহায়ক মীরার সখী কোন মেড়তানী। মীরা রাণার অভিপ্রায় বুঝিলেন। আজ এ কি পরীক্ষা! দাও ভক্তবৎসল গোপাল, আমার হৃদয়ে বল। তোমার দাসী মীরা যেন এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এই আকুল প্রার্থনা।—

পিয়া মহাঁরে নৈনা আগে রহজ্যো জী।
নৈনা আগে রহজ্যো, মহাঁনে ভূল মতজাজ্যো জী॥
ভৌসাগর মৈঁ বহী জাত হুঁ, কো মহাঁরী সুধ লীজ্যো জী।
রাণাজী ভেজ্যা বিষকা প্যালা, সো অমৃত কর দীজ্যো জী।
মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর, মিল বিছুরণ মত কীজ্যো জী॥

এস প্রিয় আমার, নয়নের সম্মুখে এসে দাঁড়াও। এস, এস, নয়ন ভ'রে দেখি। আমায় ভুলো না নাথ! এই ভবসাগরে ভেসে চলেছি, একবার আমার খবর লও। রাণা যে আমার জন্য বিষের পাত্র পাঠিয়েছেন, সেই বিষ অমৃত করে দাও। তুমি যে মীরার প্রভু গিরিধর! তোমার সঙ্গে যেন অনন্ত মিলন থাকে। তাতে যেন কভু বিচ্ছেদ না ঘটে!

ভক্তের প্রার্থনা ভগবান্ চিরদিন শুনিয়াছেন! তিনি ভক্ত-বৎসল। ভক্তের আকুল আবেদনে বিশ্বরূপ সর্ব্বদাই সাড়া দিয়া তাহাকে মৃত্যুঞ্জয় শক্তি প্রদান করেন। মীরার আকুল প্রার্থনা তাঁহার পাদপদ্মে স্থান পাইল। গরল অমৃত হইল।

বিষকা প্যালা রাণোজী ভেজ্যা দীজ্যো মেড়তানীকে হাত।
কর চরণামৃত পী গঈ ভজন করে উস ঠৌর।
আঁরী মারী না মরূ মহাঁরো রাখন হারো ওর॥

বিষের পাত্র রাণা মেড়তাণীর হাত দিয়া পাঠাইয়াছিলেন মীরার মরণ ঘটাইবার জন্য। কর সেই গরল গ্রহণ করিয়াছিল। সে ত বিষ নয়, প্রভুর চরণামৃত। ওষ্ঠ সেই গরল-পান করিয়া নীলবর্ণ ও নিস্তেজ হওয়া দূরে থাকুক, ভগবানের নাম-কীর্ত্তন করিল। যাহার রক্ষাকর্ত্তা হরি, তাহার কি মরণ আছে?

রাণা বিফলমনোরথ হইলেন। কিন্তু রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গী অন্যরূপ। আভিজাত্য-গৌরব ও কুল-মর্য্যাদার মোহ আজ মহারাণার বুদ্ধি সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। দেববালার এই ভক্তির উন্মাদনা তিনি রাজসম্মানের হানিকর বিবেচনা করিলেন। মীরার জীবন-নাশের জন্য আর এক হীন উপায় অবলম্বন করিলেন। একটি পুষ্পাধার সুন্দর সুন্দর কুসুমরাজিতে পূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে এক বিষধর সর্প রাখিয়া দিলেন এবং এক বিশ্বাসী অনুচর দ্বারা পুষ্পপাত্রটি মীরার নিকট পাঠাইলেন। মীরা তখন প্রভু গিরধরের আরাধনায় নিযুক্ত। সেই মধুর-কণ্ঠে মধুর ভজন-গান—

মেরে ত গিরধর গোপাল, দোসরা ন কোঈ।
যাকে গির মুকুট, মোর পতি মেরে সোঈ।

পূজার জন্য আনীত রাজদত্ত মনোহর সাজিটির আবরণ মোচন করিলেন পূজারিণী। কিন্তু এ কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! বিষধরের পরিবর্ত্তে একটি সুন্দর শালগ্রাম শিলা।

ডব্বা এক রাণাজী ভেজ্যো, উসমে কারা-নাগ।
ডব্বা খোলে মীরা যব দেখ্যো হৈব গয়ে সালিগরাম।
জৈ জৈ ধুনি সব সন্ত সভা ভঈ কৃকিরূপা করী ঘনশ্যাম॥

যে পদ্মহস্ত ভক্ত প্রহ্লাদকে হস্তি-পদতল হইতে রক্ষা করিয়াছিল, সেই অভয়-কর আজ ভক্তিমতী মীরাকে বিষধর সর্প হইতে রক্ষা করিয়া সেই ভগবদ্বাণীর সার্থকতা সপ্রমাণ করিল।

কৌন্তেয় ! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ।

আঘাতের পর আঘাতে মীরার পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। মানসপটে জাগিয়া উঠিল—সেই মধুর বৃন্দাবন-দৃশ্য । সেই কদমতলা, সেই যমুনাতট, সেই বংশীবট, সেই গিরি গোবর্দ্ধন, সেই বেণুরবে আকৃষ্ট গাভীগণ, সেই গোপ-গোপীগণের সহিত শ্যামরায়ের লীলাখেলা ! নটবরের মুরলীর মধুর ধ্বনি তিনি শুনিলেন। যে বাঁশরীর তানে কালিন্দীর কালো জল উজানে বহিত, যে বাঁশরীর রবে সপ্তসুরের তরঙ্গ উঠিত, আর যে স্বরলহরী জাগাইয়া তুলিত কুসুমে-কুসুমে মধুপ-ঝঙ্কার, তমাল-শাখে শিখীর পুলক-নর্ত্তন, জাগাইয়া তুলিত শুকশারী-কণ্ঠে মধুর কূজন, আর লতা-পল্লবে অপূর্ব্ব শিহরণ; যে মোহন সুরের উন্মাদনায় গোপবধূগণ আত্মহারা হইয়া বিস্রস্ত-কুন্তলে শ্যামসুন্দরের পানে ছুটিয়া আসিত! কোথায় পড়িয়া থাকিত তাহাদের বসন-ভূষণ, কোথায় পড়িয়া থাকিত তাহাদের জলের গাগরী। ভুলিয়া যাইত তারা প্রিয়-পরিজনের কথা, ভুলিয়া যাইত তারা গুরুজন-উপরোধ। সেই পাগল বাঁশী মীরাকে ব্রজের পথে টানিল। পুনঃ পুনঃ সেই মধুর মুরলী-ধ্বনি! সেই শ্যামরায়ের কোমল করপল্লবের মধুর মূর্চ্ছনা !

বাজন দে রে গিরধরলাল, মুরলিয়া বাজন দে।
সপ্তসুরণ সোঁ মুরলী বাজী কহুঁ কালিন্দীতীর।
সোর সুনত সুধী না রহী মেরী, কিত গাগর কিত চীর।
বৈঠি কদমকে চৌতরা, সব গ্বালন নিয়ো বুলাঈ।
খেলত রোখত গ্বীলনী, মুরলী সবদ সুনাঈ।
পাসা ডালে প্রেমকে মেরো, ধন মন লৈ গয়ে লুটি।
মীরাকে প্রভু সারবে তুম, অব কই জৈহা ছুটি।

এক দিন এই মুরলীধ্বনি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুকে মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছিল, আজ সেই বেণুরব মীরাকে ব্রজের পথে টানিল। মীরা ঘরের বাহির হইলেন।

• তেরা কোঈ নহি রোকন হার, মগন হোয় মীরা চলী।
লাজ-সরম কুলকী মরজাদা শির সে দূর করী,
মান-অপমান দোউ ধর পটকে নিকলী হুঁ প্রেম গলী।

লজ্জা-সরম কুলমর্য্যাদা ভাসাইয়া দিয়া, মান-অপমান সমান জ্ঞান করিয়া, প্রভু, আজ মীরা আপনা-ভোলা হইয়া তোমার পথে বাহির হইল ! আর তাকে রোখে কে ?

জৈসে সোনা মিলত সোহাগা
তৈসে হম রৌবে দিললাগা।
জৈসে চন্দ্রহি মিলত চকোরা
তৈসে হম রৌবে দিল জোরা।

যেমন সোনার সহিত সোহাগা মিলে, সেইরূপ তোমায় আমায় অনন্ত মিলন হোক্। যেমন চকোরের হৃদয় জুড়িয়া শশাঙ্ক থাকে, তুমিও প্রভু আমার হৃদয় জুড়িয়া আছ।

প্রভু তুমি টানিতেছ, তাই আমি তোমার দিকে চলিতেছি। এ টানে কে না যায়? তোমার মোহন মুরলীধ্বনি কাকে না টানে ?

চন্দ্র যায়গা, সুরজ যায়গা যায়গা ধরণ অকাসী।
পবন পানী দোনো হী যায় গে অটল রহে অবিনাশী।

এই আকর্ষণে চন্দ্র যায়, সূর্য্য যায়, ধরণী যায়, আকাশ যায়। পবন, অম্বু দুটিই ছুটে। কেবল তুমি প্রভু অটল হইয়া বিশ্বরাজ্যে এই বিরাট্ আলোড়ন দেখ। এ যে সসীমের প্রতি অসীমের টান। এ যে নশ্বরের প্রতি অবিনশ্বরের টান। এ বিশ্বজগৎ এই আকর্ষণে ঘুরিতেছে। এ যে জগন্নাথের টান !

মীরা চলিতে চলিতে ব্রজধামে শ্রীরূপ গোস্বামীর আশ্রমে উপনীত হইলেন। শ্রীরূপ বিখ্যাত "বিদগ্ধমাধব" ও "ললিতমাধব" গ্রন্থ-প্রণেতা—শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব। রাজসম্মান, রাজপদ, অতুল ঐশ্বর্য্য উপেক্ষা করিয়া, সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া ভগবানের লীলাক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবনে ভগবচ্চিন্তায় জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিতেছিলেন। মীরা তাঁহার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলেন। গোস্বামী তাহা প্রত্যাখ্যান করেন।

গোস্বামী কহেন মুই বনে করি বাস।
নাহি করি স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষ।
এ কথা শুনিয়া বাঈ ক্ষোভ পাই মনে।
পুনঃ কহি পাঠাইল গোস্বামীর স্থানে।
এত দিন শুনি নাই শ্রীধাম বৃন্দাবনে।
আর কেহ পুরুষ আছয়ে কৃষ্ণ বিনে।

পরমবৈষ্ণব শ্রীরূপ গোস্বামীর ভক্তির আভিজাত্য-গর্ব্ব আজ বিদূরিত হইল। এক দিন গোপীগণ শ্রীউদ্ধবের ভক্তির আভিজাত্য এইরূপে হরণ করিয়াছিলেন। আজ মীরার সর্ব্বকামনার বস্তু গিরধরের দর্শন মিলিল। মরি মরি রণছোড়জীর কি চিত্তবিমোহন রূপ! মদনমোহনের রূপে আজ জগৎ আলো! নিকুঞ্জ বনে এ কি বংশীবাদন! কত রাগ-রাগিণীর তরঙ্গপ্রবাহ! সেই মধুর স্বরে গোপিনীরা আনন্দে নৃত্য করিতেছে! আজ প্রভু আমার হৃদয় জুড়িয়া পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছ! আজ ত এক পলকের জন্য অদৃশ্য হইতেছ না! আজ মীরা তোমায় পূর্ণভাবে পাইয়াছে। আজ মীরার জন্ম সাথক।

আজ হোঁ দেখ্যো গিরধারী।
সুন্দরবদন মদনকী শোভা চিতবন অনিয়ারী
বজাবে বংশী কুঞ্জনমে,
গাবত তাল-তরঙ্গ, রঙ্গধুনি নাচত গ্বালন মে,
মাধুরী মুরতি হৈ প্যারী,
বসো রহি নিশদিন, হিরদৈ মে, ঠরে না ঠারী।
তা পর তন মন বারী,
রহ মুরতি মোহিনী নিহারত, লোকলাজহারী
তুলসীবন কুঞ্জন সঞ্চারী,
গিরধরলাল, নবল নট নাগর মীরা বলিহারী।

মীরা গিরিধরের অঙ্গে বিলীন হইলেন। অসীমে সসীম মিলিল। অনন্তে সান্তের লয় হইল। অরূপে রূপ মিশিল। রস-আস্বাদন পরিপূর্ণ হইল। সাধনায় সমাধি হইল।

শ্রীভুবনমোহন মিত্র।

সুয়েজ-খাল

জিওগ্রাফিতে তোমরা পড়েছো, সুয়েজ কেনাল বা খাল; —এবং এই সুয়েজ-খালের দৌলতে য়ুরোপ থেকে ভারতবর্ষে জাহাজ আসবার পথ সুগম এবং নিরাপদ হয়েছে; এবং এখন এ-মহাযুদ্ধে সুয়েজ-খালকে যথাসম্ভব দুর্ভেদ্য রাখবার জন্য ইংরেজের অধ্যবসায়ের সীমা নেই!

ফার্দিনান্দ লেশেপ

পোর্ট সৈয়দ বন্দরের মুখে লেশেপের প্রতিমূর্তি

সুয়েজ-খালের ইতিহাস যদি শোনো, বুঝবে, সে-ইতিহাস রূপ-কথার চেয়েও মনোজ্ঞ! মহাবীর নেপোলিয়নের সঙ্কল্প ছিল, মিশর-অভিযানের পর এই সুয়েজ হয়ে ভারতবর্ষে আসবেন! কিন্তু ভাগ্য তাঁকে
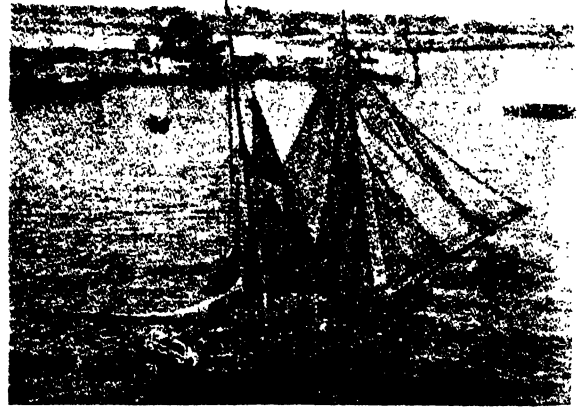
সুয়েজ-খালের মুখে—পোর্ট সৈয়দ

বিড়ম্বিত করার দরুণ রাবণ-রাজার স্বর্গের সিঁড়ি তৈরী করবার কল্পনার মতো নেপোলিয়নের সে-বাসনা স্বপ্নে উদয় হয়ে স্বপ্নেই মিলিয়ে গেল! কিন্তু নেপোলিয়নের সেই সঙ্কল্পের কথা স্মরণ করেই নেপোলিয়নের মৃত্যুর ত্রিশ বৎসর পরে ফার্দিনান্দ গু লেশেপ এই সুয়েজ-খাল রচনায় প্রবৃত্ত হন।

লেপেয়ার নামে এক জন ফরাসী লেখক সুয়েজ-অন্তরীপের সম্বন্ধে একখানি বই লিখেছিলেন। সে-বইয়ে তিনি

(১৮৬৯) খাল-খোলা অনুষ্ঠানে উটের পিঠে রাণী ইউজিনি

খাল খুলিবার পর জাহাজ চলিয়াছে (১৮৬৯)

লিখেছিলেন, বালির স্তূপ সরিয়ে সুয়েজ-অন্তরীপের বক্ষ ভেদ করে যদি খাল কাটা যায়, তাহলে য়ুরোপ থেকে এসিয়ায় জাহাজ প্রভৃতি আসার পথ সহজ এবং অচিরলভ্য হবে! নেপোলিয়ন এ-বইখানি পড়েছিলেন। পড়ে ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে মিশরে ইংরেজ-দলনে বহির্গত হয়ে তিনি স্থির করেছিলেন, মিশর-জয়ের পর সুয়েজ-খাল রচনা করবেন, তার পর সেই খালের মধ্য দিয়ে সৈন্যবাহিনী-সমেত এসে ভারতবর্ষ আক্রমণ করবেন।

মিশর-অভিযানে নেপোলিয়নের সেনাদল বহু কষ্টে কোনো মতে কায়রোয় এসে পৌছোল। কায়রোয় এসে কার্য্য-বিপাকে বহু বিলম্ব হলো। তার পর তিনি সুয়েজে এলেন। এসে দেখেন, ছোট একটি গ্রাম—নোংরা আবর্জ্জনায় সমাচ্ছন্ন; লোক-জনের বসতি নেই, হাট-বাজার নেই—বালির চড়া সেই লোহিত সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত; এবং সেই বালির বুক চিরে মাঝে-মাঝে শীর্ণ জলরেখা—দেখলে মনে হয়, প্রাণটুকু যেন কোনো মতে ধুক্‌ধুক্ করছে! সে জলে জাহাজ-চলা দূরের কথা, মানুষ স্নান করতে পারে না! প্রায় তিনশো বছর ধরে সুয়েজের কাছে লোহিত-সাগর এমনি বালিতে ভরে বিশুষ্ক মরু হয়ে আছে! নেপোলিয়ন সেখানকার সর্দারদের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। লোক-জন দিয়ে বালির বুক খোঁড়াতে লাগলেন; লেখক-লেপেয়ারকে বললেন, আপনার বইয়ে যা লিখেছেন, এবার তা কাজে পরিণত করুন। সুয়েজ-খাল কেটে য়ুরোপকে টেনে মিলিয়ে দিন এশিয়ার সঙ্গে!

খাল তৈরী হবার সময় উটের পিঠে রসদ-পত্র আসছে

লেপেয়ার কাজ সুরু করলেন। কিন্তু তিনি এক ভুল করে বসলেন—মহা-ভুল! তিনি ভেবেছিলেন, লোহিত-সাগর ভূমধ্য-সাগরের চেয়ে ত্রিশ ফুট উঁচু; কাজেই লোহিত-সাগরের সঙ্গে ভূমধ্য-সাগরকে বুকে-বুকে মিশুতে গেলে খালের লক প্রভৃতি তৈরী করতে রীতিমত কৌশল চাই। সে কাজ বহু-কাল এবং ব্যয়-সাপেক্ষ; এজন্য নেপোলিয়নের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলো। তিনি এ সঙ্কল্প ত্যাগ করলেন।

তার পর ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ফার্দিনান্দ লেশেপ এলেন আলেকজান্দ্রিয়ার ভাইস-কনসাল হয়ে। লেপেয়ারের বই পড়ে তিনি নেপোলিয়নের সুয়েজ-খালের স্বপ্নকে সত্য

করে তুলতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হলেন। লেশেপের বাপ মিশরে ছিলেন বহু কাল; মিশরে তাঁর বহু বন্ধু ছিলেন। সেই বন্ধুদের সাহায্যে মিশরের পাশা মহম্মদ আলির দরবারে এক দিন পাশার সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি পেলেন।

মহম্মদ আলি তামাকের কারবার করে' বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। তার পর তিনি ফৌজ-বিভাগে ঢোকেন এবং অচিরে নিজের শক্তিতে মিশরের পাশার পদ-গৌরব লাভ করেন। এ জায়গা ছিল তখন তুর্কির সুলতানের অধীন।

ফার্দ্দিনান্দ এলেন পাশা মহম্মদ আলির কাছে। নেপোলিয়নের বীরত্বে বিমুগ্ধ পাশা ফার্দ্দিনান্দকে সাদরে গ্রহণ করলেন। নেপোলিয়নের সম্বন্ধে দু'জনের অনেক কথা হলো। সে-কথার মধ্যে ফার্দ্দিনান্দের মনে সুয়েজ-খাল-রচনার কথা কাঁটার মতো ফুটে ছিল—কিন্তু সে-কথা মহম্মদ আলির কাছে প্রকাশ করে বলতে পারলেন না।

মহম্মদ আলির এক ছেলে ছিলেন—প্রিন্স সৈয়দ। সৈয়দ খুব উড়নচণ্ডী; সেজন্য ছিলেন বাপের চক্ষুশূল। বাপ তাঁকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন। এই সৈয়দের সঙ্গে লেশেপের খুব অন্তরঙ্গতা হয়েছিল। বাপ তাড়িয়ে দিলে সৈয়দ এসে আশ্রয় নিলেন লেশেপের গৃহে।

তার পর ফার্দ্দিনান্দ পাঁচ বছর মিশরে ছিলেন। পাঁচ বছর পরে য়ুরোপের আর পাঁচ-জায়গায় চাকরি করবার পর রোমে এসে বিভ্রাট ঘটলো! সে বিভ্রাটের ফলে তিনি দেশে ফিরে বৈষয়িক-কার্য্যে মনোনিবেশ করলেন।

ক'বছরে সুয়েজের কথা কিন্তু তিনি ভোলেননি। ওদিকে মহম্মদ আলি হলেন রাজ্যচ্যুত এবং তাঁর এক পুত্র হলেন পাশা। তার ক'বছর পরে লেশেপ হঠাৎ মিশর থেকে পত্র পেলেন। সৈয়দের পত্র। সৈয়দ লিখেছেন, আমার দাদাও মারা গেছেন। আমি এখন এখানকার পাশা। তুমি নিশ্চয় এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে।

সুয়েজের সে-সঙ্কল্প এবার সিদ্ধ হবে ভেবে লেশেপ খুশী-মনে মিশরে এলেন। সৈয়দ তাঁকে মহা-সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন। সৈয়দের পাশে হলো তাঁর আসন; এবং এই শুভ সুযোগে লেশেপ এক দিন সুয়েজ-খালের প্রস্তাব করলেন। সৈয়দ পাশা বললেন, বেশ, এ ইচ্ছা পূর্ণ করো, বন্ধু।

সব ঠিক! কিন্তু মুস্কিল বাধলো এই যে, তুর্কির সুলতানের অনুমতি চাই! এ অনুমতি পাবার পথে মস্ত বিঘ্ন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লর্ড পামারষ্টন্। অন্যান্য য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যও তখন লেশেপের প্রস্তাব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন। সকলে বলছিলেন, এ বাতুলের সঙ্কল্প! অষ্ট্রিয়া-রাজ কিন্তু ছিলেন লেশেপের পক্ষে; বিশেষ করে অষ্ট্রিয়ার রাণী ইউজিনি। লেশেপ যাতে সুলতানের অনুমতি পান, সে সম্বন্ধে রাণীর চেষ্টার আর অন্ত ছিল না! এবং তিনিই সে-অনুমতি সংগ্রহ করলেন। কিন্তু সুয়েজ-খাল তৈরী করতে খরচ হবে অজস্র টাকা। এত টাকা কোথায় মেলে? তখন অষ্ট্রিয়া-রাজের চেষ্টায় খাল তৈরী করবার জন্য একটি লিমিটেড কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হলো। নানা সাম্রাজ্য টাকা দিয়ে কোম্পানির শেয়ার কিনবেন, স্থির হলো। ফ্রান্সের রাজা প্রথমেই অনেক টাকার শেয়ার কিনলেন। রাজার আনুকূল্য পেয়ে লেশেপ কাজে নামলেন, কিন্তু তখনো ইংলণ্ড আছে এ ব্যাপারের বিরুদ্ধে! তবু লেশেপ দমলেন না। তিনি প্রায় বিশ-হাজার কুলি সংগ্রহ করলেন; এবং কাজ আরম্ভ হলো। ফ্রান্সের রাণী অভয়-বাণী প্রচার করলেন,—খাল তৈরী হলে আমি নিজে মিশরে গিয়ে সে খালখোলা-অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব করবো।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১৮ নভেম্বর তারিখে খালের অর্দ্ধাংশ —ফোর্ট সৈয়দ থেকে তিম্‌সা হ্রদ পর্য্যন্ত ৪৫ মাইল— সম্পূর্ণ হলো। এই অনুষ্ঠান-পর্ব্বে নেতৃত্ব করে লেশেপ বললেন—ভগবানের অনুগ্রহে সম্রাট্ মহম্মদ সৈয়দের নামে আমি ভূমধ্য-সাগরকে আদেশ করছি, তিম্‌সা হ্রদে সে এসে প্রবেশ করবে! ফ্রান্সে জয়-ধ্বনি উঠলো। ইংলণ্ড হলো অপমানে পাংশু! লর্ড পামারষ্টনের এমন পরাজয়!

তার পর বিপদ ঘটলো। টাকায় পড়লো টান্। 'লোন্' চাই! সেই সঙ্গে আরো অনেক-বেশী লোক চাই। খালে তখন লোক খাটছিল ষাট হাজার; তার মধ্য থেকে বিশ হাজার লোক বাড়ী যাবে। বাকী লোকজন নিয়ে আরো সাত বৎসর কাজ চললো। খাল সম্পূর্ণ হলো। এবং অষ্ট্রিয়ার রাণী ইউজিনি খালখোলার অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব করলেন। ক'বছর ফার্দ্দিনান্দ বরাবর শিলোমিয়া গ্রামে ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করে এ কাজে তন্ময়

ছিলেন। তাঁর চারি দিকে টাকা-বৃষ্টি হচ্ছে—তাঁর পকেট কিন্তু শূন্য! কোনো মতে যা-তা খেয়ে উদর-পূর্ত্তি—গ্রীষ্ম বর্ষা শীত সব-ঋতুর নিগ্রহ সর্ব্বাঙ্গে গ্রহণ করেছেন —বিলাস-সুখ দূরের কথা, নিদ্রা-সুখও তিনি ভোগ করেননি!

যারা কাজ করছিল, তাদের কোনো অসুবিধা না হয়, সেদিকে ছিল তাঁর গভীর লক্ষ্য। তাদের জন্য পানীয় জল, তাদের কাপড়-চোপড়, খাদ্যাদি এ-সব বহু দূর থেকে উটের পিঠে চাপিয়ে আনা হতো। সে সব আসতো বাঁধা রুটিনে!

খাল তৈরী হবার সঙ্গে সঙ্গে মরু-মাঠ ভেঙ্গে তার উপর গড়ে উঠলো গ্রাম, নগর, পুল, পথ-ঘাট, কারখানা। সব কাজ যখন সম্পূর্ণপ্রায়, তখন ইংলণ্ড বুঝলো, বাতুলের সে-স্বপ্ন আজ সত্যই সফল হচ্ছে!

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ পাশা মারা গেলেন। তাঁর জায়গায় বসলেন ইসমাইল পাশা। তিনি হলেন মিশরের খেদিভ্‌। সৈয়দের মতো তিনিও এই খাল-তৈরীর কাজে অজস্র অর্থ জোগাতে লাগলেন! শেষে তাঁর রাজকোষ শূন্য হলো। তুর্কির সুলতানের কাছ থেকে তিনি প্রচুর অর্থ ধার করলেন। কিন্তু তাতেও কুলোয় না! আরো টাকা চাই—আরো টাকা! এ টাকা কোথায় পাওয়া যাবে? ইস্‌মাইলের নিজের শেয়ার ছিল এক লক্ষ সাতাত্তর হাজার। কাঠের বড়-বড় বাক্সে বন্ধ হয়ে সে-সব শেয়ার চললো লণ্ডনে বিক্রয়ের জন্য!

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ডিশরেলির কাছে পেলমেল-গেজেটের সম্পাদক গ্রীনউড সাহেব খপর নিয়ে এলেন; বললেন, এ শেয়ারগুলি নেবার ব্যবস্থা করুন। অমূল্য শেয়ার। ডিশরেলির দূর-দৃষ্টি ছিল অসাধারণ। তিনি বললেন,— নিশ্চয়! তিনি ছুটলেন ব্যারণ রথ্‌স্‌চাইল্ডের কাছে টাকা ধার করতে। রথ্‌স্‌চাইল্ড বিলাতের ধন-কুবের। টাকা ধার করে ডিশরেলি সেই টাকা দিয়ে কিনলেন খেদিভ্‌ ইস্‌মাইলের সেই এক লক্ষ সাতাত্তর হাজার শেয়ার। সব চেয়ে বেশী শেয়ার তাঁর—কাজেই এই শেয়ারের দৌলতে তিনি পেলেন সুয়েজ-খালের নিয়ন্ত্রণের সকল ভার!

সুয়েজ-খাল তৈরী হলো স্বার্থত্যাগী কর্ম্মবীর লেশেপের তপশ্চর্য্যায়; কিন্তু ভাগ্য-বিধাতা সে-খালের অধিকারী করলেন ডিশরেলিকে; এবং তার ফলে ব্রিটিশ জাত আজ এ খালের মালিক।

লেশেপের এই অমূল্য দানকে অবশ্য একেবারে অস্বীকার করা হয়নি! পোর্ট সৈয়দে বন্দরের মুখে সুয়েজ-স্রষ্টা লেশেপের ষ্টাচু আছে। সেই ষ্টাচু তাঁকে চিরদিন অমর করে রাখবে!

মানুষ হবার উপায়

পৃথিবীতে যাঁরা সত্য সত্য বড় হয়েছেন, তাঁদের মন খুব উদার। বড় হওয়া মানে, অনেক বেশী টাকা রোজগার করে বিলাস-সুখ উপভোগ করা নয়। বড় হবার মানে, বড় মন—সাধুতা, বিনয়, প্রীতি, সৌজন্য, অমায়িকতা, দাক্ষিণ্যাদি গুণে বিভূষিত হওয়া। যাঁরা বড় হয়েছেন, ছোট বলে কাকেও কোনো দিন তাঁরা তাচ্ছল্য করেননি! সকলকেই তাঁরা বড় করে তোলবার জন্য জীবন-মন উৎসর্গ করে গেছেন!

যে-সব মানুষ সত্য সত্য এমনি বড় হয়েছেন, তাঁদের জীবনী ও বাণী আলোচনা করে' যে ক'টি বিধি-নিয়ম আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি, সেগুলি বলছি। এ সব বিধি-নিয়ম যদি নিষ্ঠাভরে মেনে চলতে পারো, তাহলে তোমরাও এক দিন পৃথিবীতে সত্যকার বড় মানুষ হতে পারবে।

মানুষ হতে গেলে দেহ-মনকে সুস্থ-স্বচ্ছন্দ রাখা চাই সব-আগে। এজন্য প্রথম বিধি হলো স্বাস্থ্য-পালন। এর জন্য সকলে পণ করবে—

১। কাপড়-চোপড়, দেহ এবং মনকে সর্ব্বদা পরিচ্ছন্ন রাখা চাই।

২। যে-সব অভ্যাসে বা আচরণে নিজের কোনো রকম অনিষ্ট হতে পারে, সে সব অভ্যাস-আচরণ ত্যাগ করতে হবে।

৩। আহার, নিদ্রা, ব্যায়াম—এগুলি এমন ভাবে করতে হবে, যাতে দেহে-মনে এতটুকু অস্বাচ্ছন্দ্য না বোধ হয়!

তার পর চাই নিজেকে সংযত ভাবে পরিচালনা করা।

১। কাকেও কখনো দুর্ব্বাক্য বা অন্যায় বাক্য বলবে না। রূঢ়, অশ্লীল বা অভদ্র কথা বলবে না; এবং শুনবে না।

২। ক্রোধকে সব সময়ে দমন করতে হবে। মেজাজ না চটে! কারো উপর ভাবে-ভাষায় কদাচ রোষ প্রকাশ করবে না।

৩। চিন্তাতেও যেন কদাচ হিংসা-লোভ না স্থান পায়!

৪। যাঁরা জ্ঞানী, বয়োবৃদ্ধ—তাঁদের কথা হেসে উড়িয়ে দেবে না; তাঁদের কথা ধীর-বুদ্ধিতে বিচার-বিবেচনা করবে সর্ব্বদা।

৫। কেউ যদি তোমার কাজে বা কথায় হাসে, তাতে বিচলিত হয়ো না।

৬। যা ন্যায়, তা করতে কদাচ ভয় পাবে না!

তার পর জগতে থাকতে হলে নিজেকে এমন করে গড়ে তুলতে হবে, যেন অপরে তোমাদের উপর বিশ্বাস রাখতে পারেন। এজন্য—

১। কথায় ও কাজে সাধুতা রক্ষা করতে হবে। কখনো মিথ্যা কথা বলবে না; ছল-চাতুরীর আশ্রয় নেবে না।

২। ধরা পড়বার সম্ভাবনা না থাকলে অন্যায় করবো —এমন স্বভাব কদাচ যেন না হয়!

৩। যে কাজ করবো বলে' অপরকে কথা দেবে, নিজের স্বার্থ-হানি করেও সে কাজ অতি-অবশ্য করা চাই।

৪। কাকেও বাক্যে বা আচরণে ঠকাবে না। বিপক্ষের কাছে অবিনয় প্রকাশ করবে না।

৫। পাঁচ জনে মিলে যে-কাজ করতে হবে, সে-কাজে নিজের বাহাদুরি দেখাবার ইচ্ছা যেন মনে না স্থান পায়! সকলের সঙ্গে মন খুলে মিলে-মিশে সে-কাজ করতে হবে।

৬। পরের বিচার করতে বসে তার প্রতি মনে মনে অনুদার হলে চলবে না।

৭। বাক্যে বা আচরণে অপরকে কদাচ আঘাত দেবে না।

৮। নিজের আত্মীয়-স্বজনের মান সর্ব্বদা রক্ষা করে চলবে—আজীবন। তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করবে না; এবং তাঁদের যাতে অপ্রীতি, এমন কাজ নিজের স্বার্থে আঘাত লাগলেও কদাচ করবে না।

আত্মীয়-বন্ধু, স্বজন-প্রতিবেশী, দেশ, এবং সমগ্র মানব-জাতিকে সমান-দরদে মনে গ্রহণ করতে হবে।

নির্ব্বাসিতা রাজকন্যা

১৩

ওদিকে লীনার পিছনে বাঘের মত বারোটি শিকারীকে লেলিয়ে দিয়েও দুলু রাজা কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। শিকারীরা যে মাঝ-পথেই মেয়েটিকে আট্‌কাবে, সে বিষয়ে রাজার একবিন্দুও মনে সন্দেহ ছিল না; কিন্তু পাছে শিকারীরা রাজার মনে মনে এঁচে-রাখা ভাবী রাণীটির উপর ঝাঁপিয়ে-প'ড়ে তাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলে, সেই ভাবনায় রাজা অস্থির হয়ে প'ড়লো। তাই রাজাকেও তীরের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে শিকারীদের পেছনে চল্‌তে হ'ল। জঙ্গলের পথে পাছে ভুল-চুক হয়—তাই রাজার হুকুমে প্রত্যেক সওয়ার এক একটা মশাল জ্বেলে নিয়েছে; রাজার হাতেও একটা মশাল দাউ-দাউ করে জ্বল্‌ছে। সেই গভীর রাতে দুর্গম বনপথে ছাব্বিশটি কালো কালো ভীষণ মূর্ত্তি ঘোড়ায় চড়ে, হাতের বল্লমের মাথায় জ্বলন্ত মশাল বেঁধে নিয়ে রীতিমত সতর্ক ভাবেই সামনের শিকারীগুলোর অনুসরণ করছিল। শিকারীদের গর্জ্জনে বিশাল জঙ্গলটা যখন কেঁপে উঠেছিল, দুলু রাজা ও তার অনুচররা তখন বুঝতে পেরেছিল যে, শিকারীরা শিকারের সন্ধান পেয়েছে, মেয়েটিকে ধরা পড়তে হ'য়েছে। উত্তেজনায় রাজার দেহের রক্ত যেন টগ্‌বগ্ ক'রে ফুট্‌তে লাগ্‌লো। শব্দ লক্ষ্য করে তখুনি সে ঘোড়াকে সাম্‌নের দিকে ছুটিয়ে দিলে আরও বেশী বেগে।

কিন্তু রাক্ষুসে-গাছের এলাকায় এসেই রাজার ঘোড়াটা হঠাৎ ভয়ে চীৎকার ক'রে এমনি বেগে পিছিয়ে এলো যে, অতি কষ্টে রাজা নিজেকে সামলে নিলে, আর একটু হলেই সে ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিট্‌কে নীচে পড়তো। এরই মধ্যে তার সঙ্গীরাও তার কাছে এসে পড়েছিল। তাদের ঘোড়াগুলোও তখন থ হয়ে দাঁড়িয়েছে, কোন

কোনটা পিছনের পা দিয়ে জঙ্গলের মাটির উপরে অধীর ভাবে ঘা দিচ্ছে। হাতের মশালটি উঁচু করে তুলে সাম্‌নের দিকে চেয়ে দুলু রাজা বলে উঠ্‌লো—সর্ব্বনাশ হয়েছে! আমার সব কটা শিকারী ঐ দিকের ভূতুড়ে গাছের পাল্লায় পড়েছে!

রাজার পিছনের অনুচরটি তাড়াতাড়ি ঘোড়া থেকে নেমে মশালটি উঁচু করে তুলে এগিয়ে এলো, রাক্কুসে-গাছগুলোর ডালপালায় বন্দী শিকারীদের চূর্ণ দেহের অবস্থা দেখে সে কাঁপতে কাঁপতে বল্‌লো—মেয়ে-মুলুকের এলাকায় বলে আমরা এর কোন পাত্তা পাইনি, শুধু শুনেই আসছি মহারাজ! শিকারী জানোয়ারগুলো চিনতে পারেনি, তাই ঝাঁপিয়ে পড়ে মারা গিয়েছে।

রাজা জিজ্ঞাসা করলো, গাছের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল কেন? আর সেই মেয়েটিই বা কোথায় গেল?

আর এক জন অনুচর বললো, সে-ও তা হলে মারা গেছে। তাকে দেখেই ওরা গাছের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নিশ্চয়ই।

রাজা হাতের জ্বলন্ত মশালটির সাহায্যে গাছটিকে ভাল করে দেখছিল; অনুচরের কথা শুনে বললো—না, মেয়েটা এর খপ্পরে পড়েনি। তা হলে তার ঘোড়াটাও আটকে থাকতো। ঘোড়াই তাকে বাঁচিয়েছে। শিকারী জানোয়ারগুলো মাংসখোর ব'লে ভূতুড়ে গাছটাকে চিনতে পারেনি। ঘোড়া মাংস খায় না ব'লেই চেনে।

আগের অনুচরটিও আশে-পাশে মশালের আলো ফেলে ঘোড়সওয়ার মেয়েটির সন্ধান করছিল। হঠাৎ তার মনে যে নতুন কথা জাগলো, সেটা এই জাতের পক্ষে খুব স্বাভাবিক। এরা যেমন অতিমাত্রায় দুর্দ্ধর্ষ ও দুঃসাহসী, তেমনি ভূতের ভয়ও এদের খুব বেশী। মানুষ যতই বলবান্ হউক না কেন, এরা তাকে গ্রাহ্যও করে না —বাঘের মত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে টুঁটি চেপে ধরতে ভয় পায় না; কিন্তু ভূতের কথা শুন্‌লেই এদের শক্তি-সাহস-উৎসাহ সমস্তই যেন এক লহমায় উড়ে যায়। এই বুদ্ধিমান্ অনুচরটি সেই মেয়েটির কথাই তলিয়ে তলিয়ে ভাবছিল। কোন মেয়েকে এ পর্য্যন্ত তারা এমন করে এত রাতে লালুংদের এলাকায় ঘোড়ায় চড়ে যেতে দেখেছে কি? কোন মেয়েমানুষের মনে কি এতখানি সাহস হতে পারে? ঘোড়ায় চড়ে সে চলে গেল, বাঘের মত বেগে শিকারীগুলো তার পিছু নিল, অজানা জঙ্গলে তাদের টেনে এনে ভূতুড়ে-গাছের পাল্লায় ফেলে পিসে মারলে, কিন্তু সেই মেয়েটির আর পাত্তা নেই! কখনই সে মানুষ নয়।

দুলু রাজাও গাছের এই কাণ্ড দেখে একেবারে যেন আকাশ থেকে পড়েছে! তাড়াতাড়ি ঘোড়া থেকে নেমে হাতের মশালটির আলোয় তন্ন তন্ন করে চার দিক্ সে দেখ্‌তে লাগলো। তার ইচ্ছে হচ্ছিল—হাতের জ্বলন্ত মশালের আগুনে এই ভূতুড়ে গাছগুলোকে একসঙ্গে পুড়িয়ে মারে। ঠিক এই সময়ে তার অনুচরটি পিছন থেকে ভয়ার্ত্ত স্বরে জানালো—মহারাজ, ভূতের পিছনে ছুটে কোন লাভ নেই, প্রাণ নিয়ে এখন গড়ে ফিরে যাওয়াতেই মস্ত লাভ।

অনুচরগুলো যে ভয় পেয়েছে, আর এ অবস্থায় ভয় পাওয়াটা যে আশ্চর্য্য নয়, তা বুঝতে পেরে দুলু রাজা ঝাঁ করে পিছনের লোকটার দিকে ফিরে মশালের আলোতে তার মুখখানা ভাল করে দেখে নিয়ে চড়া-গলায় বললো,—ভারী ভয় পেয়েছিস্, নয়? কিন্তু তোদের রাজা তোদের সাম্‌নে রয়েছে, ভয়টা কিসের শুনি? ভূতের ভয়েই তোরা মারা গেলি! কিন্তু আমি ভূত-টুত গ্রাহ্য করি না, —মানিও না।

অনুচরটি ভয়ে ভয়ে বললো—ভূত যদি না হবে মহারাজ, এমন করে এই নিশুতি রাতে টেনে আনবে কেন, আর সেই ঘোড়সওয়ার মেয়েটি গেলই বা কোথায়?

কালো মুখখানা বিকৃত করে দুলু রাজা বলে উঠলো—চালাকীর খেলাটা খেলে কাজ হাসিল করে ভাগলো। তোদের মগজে ত বুদ্ধিশুদ্ধির নামগন্ধও নেই, তলিয়ে কিছু ত দেখিস্‌নে, খালি ভয় কর্ত্তেই জানিস্। আমি তা হলে এতক্ষণ দেখছিলুম কি? সেই চতুর মেয়েটির হদিশ আমি পেয়েছি।

রাজাকে ঘোড়া থেকে নামতে দেখেই পিছনের সওয়ারগুলোর প্রত্যেকেই ঘোড়া থেকে নেমে রাজার কাছাকাছি এসে তার সব কথা শুনছিল। তারা ভূতের পাল্লায় পড়েছে, এই ধারণাটা দুলু রাজার এই দুঃসাহসী

পঁচিশটি অনুচরের মনেই শক্ত হয়ে বসেছিল। কাজেই রাজার কথায় তাদের মুখগুলোর উপর বিস্ময়ের রেখা স্পষ্ট হয়ে যেন ফুটে উঠলো। আগের অনুচরটির সাহস বোধ হয় অনেকটা বেশী, তাই সে একটু শক্ত হয়েই ভাঙ্গা-গলায় জিজ্ঞাসা করলো—হদিশ পেয়েছেন তার? দেখতে পেয়েছেন মহারাজ?

মুখখানা এবার গম্ভীর করে ফুলু রাজা বললো, হুঁ, নিশানা পেয়েছি। বুঝতে পারছি, চালাকীতে সে আমারও উপরে গেছে। ভাবতুম কি জানিস্? দুনিয়ায় আমার মতন চালাক-চতুর মানুষ আর দু'টি নেই। এখন দেখছি, এই মেয়েটি আমার জুড়িদার। ঐ গাছের দিকে চেয়ে ছাখ, একখানা রঙ্গিন কাপড় যেন নিশানের মতন দুলছে। মেয়েটা যখন জানতে পারলে শিকারীরা এসে পড়েছে, এখনি ধরে ফেলবে, তখুনি সে ফন্দী করে তার গায়ের ঐ কাপড়খানা গাছের উপরে ফেলে পাশ কাটিয়ে পালায়, আর আমার শিকারীর পাল ঐ কাপড়খানার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে জ্যান্ত গাছের চাপে একসঙ্গে সবাই অক্কা পায়। মেয়েটিও যে এখানে এসে তার ঘোড়ার জন্যেই আমাদের মতন ভুতুড়ে গাছের হদিশ পায়, আর থপ করে নেমে প'ড়ে ঐ মতলবটা ঠিক করে ফেলে—তার চিহ্ন রয়েছে এইখানে। এই ছাখ তার পায়ের দাগ; এইগুলো হচ্ছে তার ছোট্ট টাট্টু ঘোড়াটির পায়ের খুরের চিহ্ন। গাছগুলোর নাগালের বাইরে দিয়ে বরাবর এই চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এই চিহ্ন ধরেই আমরা যাবো, —তাকে ধরবো।

ফুলু রাজা হেঁট হয়ে মশালের আলো ফেলে চিহ্নগুলি দেখাতে লাগলো, পিছনের অনুচরটির সঙ্গে আরো অনেকে হাতের মশালের আলোকে চিহ্নগুলি দেখতে পেলো। তারা বুঝতে পারলো, রাজার কথা মিছে নয়, টাট্টু ঘোড়ার ছোট ছোট পায়ের দাগগুলি স্পষ্ট রয়েছে।

ফুলু রাজার মুখের হুকুমটিও সঙ্গে সঙ্গে তাদের মাতিয়ে তুললো—কালই এই গাছগুলিকে জালিয়ে সারা জঙ্গলকে শ্মশান করে দেব। কিন্তু তার আগে ঐ মেয়েটিকে ধরা চাই-ই। বলেই থপ করে বাঁ হাতে নিজের ঘোড়ার লাগামটি জোর করে ধরে, ডান হাতের মশালটির আলো সেই চিহ্নগুলোর উপর ফেলে ফুলু রাজা এগিয়ে চললো সেই পথে—একটু আগে যে পথটি লীনাও ধরেছিল।

সঙ্গিদলটিও রাজার দিকে দৃষ্টি রেখে সতর্ক ভাবেই তার পিছু পিছু পিপ্‌ড়ের সারের মত আস্তে আস্তে এগিয়ে চললো।

১৪

ফুলু রাজা তার সঙ্গীদের নিয়ে ঘোড়ার পায়ের চিহ্নগুলি ধরে এ ভাবে যে অজানা পথে এগিয়ে যাবে, এ কথা মোটেই লীনা বোধ হয় ভাবেনি, বা ভাববারও সময় পায়নি। সারবন্দী রাক্ষুসে-গাছগুলা ঘুরে জঙ্গলের যে জায়গায় সে উপস্থিত হ'ল, সে আরো চমৎকার স্থান। বিজলীর পিঠে বসে লীনা অবাক্ হ'য়ে দেখতে লাগলো—অতি বিশাল ছাতার মত বৃহৎ আকারের পাতাভরা একই রকমের অদ্ভুত গাছ সে অঞ্চলটা যেন ছেয়ে ফেলেছে। গাছগুলো খুব উঁচু না হলেও তার নিবিড় পাতাগুলো লম্বায়-চওড়ায় এত বড় যে—লীনার মত একটি মেয়ে তার উপরে স্বচ্ছন্দে হাত-পা মেলে শয়ন করতে পারে! হঠাৎ লীনার মনে পড়ে গেল—সাধু-দাদুর মুখে এই বিরাট্ পাতাওয়ালা গাছের কথা সে শুনেছিল; শুনেছিল, এ গাছের নাম—আনরকলি। শোনা কথাটা এখন স্পষ্ট হয়ে চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠলো। লীনা লক্ষ্য করলো, গাছগুলো বিজলীর যেন অতি পরিচিত; সে মনের আনন্দে দু'পাশে চাঁদোয়ার মত বিছানো আনর-কলির বনের ভিতর দিয়ে কদম-চালে এগিয়ে চললো।

আনরকলির বনের শেষে আসতেই একটা মিষ্ট গন্ধে লীনার অবসন্ন মনটি প্রফুল্ল হয়ে উঠলো। এই সময় সাম্‌নের দিকে দৃষ্টি পড়তেই বিধাতার অপরূপ সৃষ্টিবৈচিত্র্য লীনার মনে একটা নতুন ভাবের সঞ্চার করলো। আনরকলি-বনের এলাকার পরেই এবার যে অঞ্চলটি স্পষ্ট হয়ে উঠলো—সেখানে একই আকারের যে গাছগুলি গায়ে গায়ে ডালে ডালে পাতায় পাতায় মিশে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের পাতাগুলি আগের জঙ্গলের আনরকলির পাতাগুলির তুলনায় কত ক্ষুদ্র! কিন্তু ক্ষুদ্র হলেও এই গাছগুলি দেখতে অতি সুন্দর। এই আরণ্যভূমিতে প্রবেশ করতেই লীনা তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলো যে, এই অঞ্চলের বিখ্যাত কমলার বনে সে এসে

পড়েছে! গাছগুলিতে তখন সবে মাত্র মুকুল ধরেছে, তারই মিষ্ট গন্ধে সমস্ত বনভূমি আমোদিত। কমলার সুগন্ধ বিজলীকে পর্য্যন্ত আকুল করে তুলেছে, দীর্ঘ পর্য্যটনের ক্লান্তির পর তার দেহে-মনে যেন নতুন একটা উন্মাদনা জেগেছে, তারই আবেগ যেন ঠেলে নিয়ে চলেছে তাকে সামনের দিকে উদ্দাম বায়ুর গতিতে।

ক্রোশের পর ক্রোশ ধরে কমলার বন ক্রমশঃ যে উঁচু হয়ে পাহাড়ের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, বিজলীর চলবার গতি দেখেই লীনা তা বুঝেছিল। শুধু তাই নয়, পাহাড়ে ওঠবার পথটিও যে বিজলীর সুপরিচিত—তার চাল-চলনে সেটাও ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এখন লীনার মনের মধ্যে কেবলই জাগছে জয়ন্তী দেবীর কথা। রাতটুকু শেষ হবার আগেই তাকে যেমন করেই হোক্, এই জাগ্রতা দেবীর পীঠে পৌছতে হবে। সাধুদাদুর কাছে সে শুনেছে, কোন দুঃসাহসী লোক রাতারাতি সেখানে গিয়ে দেবীকে জাগাতে পারলে তার মনস্কামনা সিদ্ধ হবেই হবে। তাই লীনাও ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসেছে, রাতারাতিই তাকে দেবীর স্থানটিতে পৌছতে হবেই—তা পথ যত দুর্গমই হোক্। চলার পথে তাই বার বার সে বিজলীর কানের কাছে মুখখানি নামিয়ে জোর-গলায় বলছে—'দেবীর স্থান বিজলী, —জয়ন্তী দেবীর পীঠ,—যেন মনে থাকে।'

কিন্তু শুধু বিজলীর উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত থাকবার মেয়েই সে নয়। নিজেও সে এ সম্বন্ধে রীতিমত সচেতন হয়েই তার পিঠে ব'সে আছে। আগেই আমরা বলেছি, সাধুদাদুর শিক্ষায় ছেলেবেলা থেকেই লীনার দৃষ্টিশক্তি আশ্চর্য্য রকমের তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। পাঁচ বছর বয়সে সে তার দৃষ্টির তীক্ষ্ণতায় একটা পাহাড়ে সাপের চোখ-দুটো ঝল্‌সে দিয়ে কি কাণ্ড করেছিল, সে কাহিনী ত তোমরা আগেই শুনেছ। সাধু তখন লীনার মা'কে বলেছিলেন—'এই বয়সেই তোমার মেয়ে চাইতে শিখেছে মা। প্রত্যেক জীবের চোখে একটা আশ্চর্য্য রকমের আলো আছে। সেই আলোটি যে জ্বাল্‌তে জানে—সবই সে দেখ্‌তে পায়। জন্তু-জানোয়ারই বলো, আর চোর-ডাকাতই বলো—কেউ তার সামনে মাথা তুলতে পারে না।'

চোখের এই আলোটি কি করে জালতে হয়, সে কৌশলটুকু জানা ছিল বলেই যে লীনা কোন আলো না নিয়েই আঁধারে-ঘেরা বন-পাহাড় ভেঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে চলেছে,—আর তার এই অদ্ভুত বাহনটির চোখ দু'টিও অন্ধকারে দিশেহারা হয়নি, তাই দিনের মত সে-ও যে সওয়ার পিঠে নিয়ে অন্ধকারেই সমান বেগে ছুটেছে—এ রহস্যটুকু তোমরা বোধ হয় এখন বুঝতে পেরেছ।

এই অদ্ভুত মেয়েটি তার সাধু-দাদুর কাছে পড়াশুনা, নীতিকথা, শক্তিচর্চ্চা আর চোখের আলো জ্বালবার এই কৌশলটুকু আয়ত্ত করেই শিক্ষা শেষ করেনি। বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করতে কিংবা এক-একটা রাজ্য চালাতে মাথাওয়ালা ঝুনো মন্ত্রীরা বুদ্ধিকে বাঁকা রাস্তা দিয়ে চালিয়ে অনেক সময় সহজে কাজ হাসিল করে থাকেন। একেই বলে কূটবুদ্ধি;—লীনা এ-বুদ্ধিতেও রীতিমত পরিপক্ক হয়েছে। সহজে কাউকে বিশ্বাস করবে, এমন পাত্রীই সে নয়। এমন কি, বিজলীর পিঠে চেপে এই দীর্ঘ পথ সে এসেছে, তবু তাকে এখনো পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেনি। তার ধারণা, লীনা বেশ জেনে রেখেছে, মেয়ে-মুলুক থেকে বিজলী যখন এসেছে, আর লীনা তার পিঠে যখন চেপেছে, তখন বিজলীর কর্ত্তব্য হচ্ছে লীনাকে পিঠে নিয়ে মেয়ে-মুলুকের রাজধানীতেই ফিরে যাওয়া। বিজলী যে যেমন-তেমন ঘোড়া নয়, মেয়ে-মুলুকের মেয়েরা তাকে যে এ ব্যাপারে রীতিমত শিক্ষা দিয়েছে, আর তার বুদ্ধিও যে খুব তীক্ষ্ণ, লীনা তা বেশ ভালই জানে। তাই বিজলীর গতির দিকেও তাকে কড়া নজর রাখতে হয়েছে, আর ক্রমাগতই এই বলে সে তাকে সতর্ক করে দিয়েছে—'খবরদার বিজলী, মেয়ে-মুলুকের দিকে পা বাড়ালেই তোর সঙ্গে আমার ঝগড়া বাধবে, আগে আমাকে দেবীর পীঠে নিয়ে চল্—তার পর যা করতে হয় করা যাবে।'

কান-দুটো খাড়া করে বিজলী যেন লীনার কথা শোনে। তার ভঙ্গী দেখে মনে হয়, সে যেন মনে মনে হাসছে। সত্যই তার মনের ভিতরে একটা গুপ্ত মতলব আছে, লীনা যেন সেটা ঠিক ধরতে পারছে না! বন ছেড়ে পাহাড়ের পথে আসতেই লীনা তার চোখ-দু'টোর উজ্জ্বল দৃষ্টি দীপের তীক্ষ্ণ রশ্মির মত দু'ধারের পাহাড়ে নিবদ্ধ

করে, বেশ সোজা ও শক্ত হ'য়ে বিজলীর পিঠে চেপে বসেছে। সোয়ার হ'য়ে তার দেহের উপরের অংশটি যেন উত্তেজনায় ফুলে উঠেছে, মুখখানি শক্ত, আরক্ত ; তার নাকের ভিতর দিয়ে নিশ্বাস নির্গত হচ্ছে তপ্ত বাতাসের মত !

বিজলী তখন মানুষের মত সতর্ক ভাবে আস্তে আস্তে পর্ব্বতের বন্ধুর পিঠ বেয়ে এঁকে-বেঁকে উপরের দিকে চলেছে। এই ভাবে প্রায় একটি ক্রোশ উপরে উঠে সে এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়ালো, পথ যেখানে শেষ হয়েছে, দু'পাশে অতলস্পর্শ খাদ, আর সাম্‌নে একটা বিশাল গুহা, তার ভিতরটা গাঢ় তিমিরে ঢাকা। এই গুহামুখে এসেই বিজলী সহসা থমকে দাঁড়ালো ; সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়টি বেঁকিয়ে উঁচু করে লীনার মুখের দিকে তাকাবার চেষ্টা করলো। লীনা বুঝলো, বিজলী জিজ্ঞাসা করছে—গুহার ভিতরে ঢুকবে কি না ? চোখের পলকে লীনা এই সাংঘাতিক অবস্থাটা উপলব্ধি করলো। পিছু হটবার উপায় নেই ; দু'পাশে এমন গভীর খাদ যে, এক পা এদিক্-ওদিক্ হলেই ঘোড়াশুদ্ধ খাদের গহ্বরে পড়ে তলিয়ে যেতে হবে। সামনে গুহা-রাক্ষসী তার বিশাল মুখব্যাদান করে বসে রয়েছে, নির্ব্বিচারে তারই মধ্যে প্রবেশ করা ছাড়া আর উপায় নেই !

অল্পক্ষণের জন্যে লীনা তার দৃপ্ত চোখ দু'টো বুজিয়ে মনে মনে কি ভাবলো, আর সেই সঙ্গে মনের পটে আঁকা ছবিখানা দেখে নিলো। সাধু-দাদুর কাছে পাহাড়-পুরী থেকে বাঙ্গালা দেশের সীমান্ত-ভূমিতে পৌছানর সারা পথটির কথা লীনা মনে মনে যে মুখস্থ করে রেখেছে শুধু তাই নয়, তার নক্সাটিও মনের পটে ছবির মতন এমন উজ্জ্বল ভাবে এঁকে রেখেছে যে, কোথাও একটু সন্দেহ হলেই চোখ দু'টো বুজিয়ে একটু ভাবলেই সেটা স্পষ্ট হয়ে সব ধোঁকাই কাটিয়ে দেয়। হাতে-আঁকা নক্সা দেখবার কোন দরকারই হয় না। একটু পরে চোখ-দু'টো খুলে চাইতেই লীনার মুখখানি আবার আনন্দের কিরণে ঝলমল করে উঠলো ; সে জানতে পারলো, জয়ন্তী দেবীর পীঠে যেতে হলে এই ভীষণ গুহার ভিতরেই প্রবেশ করতে হবে। তখুনি বিজলীর পিঠের জীনের উপর অল্প চাপ দিয়েই লীনা বলে উঠলো—হ্যাঁ, আমার আপত্তি নেই বিজলী, গুহার মধ্যেই চল্।

কান-দু'টো নাড়া দিয়ে, আর খুব জোরে মুখ থেকে একটা শব্দ বের করে বিজলী গুহায় প্রবেশ করলো। লীনার মনে হল—বিজলী যেন মানুষের মতই মুখ দিয়ে এমন একটা আওয়াজ বার করলো, সেটা ঠিক বাঁশীর তীক্ষ্ণ সুরের মত শোনালো বটে, কিন্তু এ ভাবে মুখের আওয়াজ করবার কোন উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে। ডাকাতরা যেমন 'কুকি' দিয়ে সঙ্গীদের ইঙ্গিত করে, রক্ষীরা বাঁশী বাজিয়ে যেমন উপরওয়ালাদের সতর্ক করে থাকে, বিজলীর এই শব্দটাও যেন সেই রকম। তবে কি সে গুহামুখে ঢুকেই নারী-রাজ্যের রক্ষিগণকে জানিয়ে দিলে—'নতুন রাণীকে নিয়ে এত দিন পরে আমি ফিরে এসেছি, তোমরাও এসো !'

মনের ভাব মনেই চেপে রেখে গুহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে লীনা বিজলীর পিঠে বসে রইল। গুহার ভিতরটি যেন যুগযুগান্ত ধরে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, সে আঁধার এতই গাঢ় যে, লীনার চোখের অপূর্ব্ব আলোও যেন ম্লান হয়ে যাচ্ছিল। পুঞ্জীভূত অন্ধকার যে একটা বিশাল গুহার ভিতর এমন গাঢ় ভাবে সঞ্চিত থাকতে পারে—তা যেন কল্পনারও অতীত !

যেতে যেতে হঠাৎ উপরের দিকে দৃষ্টি পড়তেই একটা অদ্ভুত দৃশ্য লীনার চোখ দু'টোতে ধাঁধা লাগিয়ে দিলে। তার মনে হল, লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রখচিত অনন্ত আকাশ মাথার উপরে যেন হাসছে, অসংখ্য তারকার ক্ষীণ আভায় গুহার গাঢ় অন্ধকারও ক্রমশঃ যেন পাতলা হয়ে আসছে। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই লীনার সন্দেহ হ'ল—গুহার ভিতরে আকাশ এল কোথা থেকে ?

ঘোড়ার পিঠে বসে স্থির-দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ উপরের দিকে তাকাতেই আসল রহস্য লীনার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। সে বুঝলে, গুহার ভিতর পার্ব্বত্য প্রকৃতির এক অপরূপ সৃষ্টি-সৌন্দর্য্য ফুটে উঠেছে। মাথার উপরে নক্ষত্র-খচিত আকাশ বলে যেটি তার মনে ভ্রান্তি জন্মিয়েছিল, আসলে সেটি একখণ্ড বিশাল পাথর, তার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে পাহাড়ে-ঝরণার ধারা, সেই ধারা থেকে বিন্দু বিন্দু জলকণা পাথরখানার নীচে জমেছে, ভিজা পাথরের উপর-পিঠে আকাশ থেকে ছড়িয়ে পড়েছে চাঁদের আলো ; প্রকৃতির এই বিচিত্র সংযোগ এমনি নয়ন-রঞ্জন শোভার সৃষ্টি করেছে যে, গুহার ভিতর থেকে উপরে তাকালে

জলবিন্দুশোভিত পাথরখানা নক্ষত্রখচিত আকাশ বলেই ভ্রম হয়। এ ভ্রম কেটে গেলে মনে হয়, মাথার উপরে ঝালর-দেওয়া কিংখাপের একখানা সামিয়ানা যেন ঝুলছে। প্রকৃতির এই বিচিত্র সৌন্দর্য্য লীনাকে বুঝি তন্ময় করে দিল। ঘোড়ায় চড়ে কতক্ষণ ধরে চলেছে, তবুও তার মনে হচ্ছে, মাথার উপরের বিচিত্র আবরণখানির সীমানা এখনো শেষ হয়নি, উপর থেকে যেন সৌন্দর্য্য ছড়াচ্ছে।

গুহার ভিতরে ঢুকে অবধি বিজলী গভীর অন্ধকার ভেদ করে বরাবর সমান চালেই চলেছে। এই অদ্ভুত চাঁদোয়াটির নীচে আসতেই উপর থেকে আলোর ক্ষীণ আভাটুকু পড়ে গুহার ভিতরে আলো-আঁধারের এমন অপূর্ব্ব রূপশ্রী ফুটিয়ে তুলেছে যে, গুহার সমস্ত অংশটাই যেন তার অস্পষ্ট আলোকে আঁধারের ঘোমটাটি ধীরে ধীরে খুলে মুখখানি দেখাবার উপক্রম করেছে।

আরো খানিকটা এই ভাবে এগিয়ে যেতেই লীনার চোখে পড়ল—পাথরের বড় বড় পাঁচটি স্তম্ভ অতিকায় দৈত্যের মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে! বহু কালের পুরোনো বটগাছের ডাল থেকে যে ভাবে মোটা মোটা বয়া গোড়া পর্য্যন্ত নেমে আসে, স্তম্ভগুলোর গা বেয়ে তেমনি বয়ার মত পাথরের শিকল ঝুলছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, কে যেন এই বিরাট্ দৈত্যগুলোকে লোহার শিকলে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে; শিকলের প্রান্তগুলো আশেপাশে ঝুলছে। এদের ভিতর দিয়েই বিজলী এগিয়ে চলল। আরও খানিকটা গিয়েই সে হঠাৎ এমন ভাবে ও ভঙ্গীতে দাঁড়াল যে, স্পষ্ট বুঝা গেল —যাবার আর জো নেই, এখানেই নামতে হবে।

দৃষ্টি প্রখর করে তাকাতেই লীনা বুঝতে পারলো—সত্যই আর সামনে যাবার উপায় নেই; সামনেই গুহার কর্কশ প্রান্তটি প্রাচীরের মত পথ আটক করে দাঁড়িয়ে আছে। এক লাফে অমনি লীনা বিজলীর পিঠ থেকে নীচে নেমে পড়ল। তার মনের ভিতর থেকে একটা প্রশ্ন তখন যেন ঠেলে ঠেলে উঠছিল—দেবীর স্থান তা হলে কোথায়?

হঠাৎ চোখ দু'টো তার বিস্ময়ানন্দে বড় হ'য়ে উঠলো। লীনা তার ডাগর ডাগর দু'টি চোখের অপূর্ব্ব দৃষ্টিতে লক্ষ্য ক'রল—সেই রুক্ষ কর্কশ গুহা-প্রাচীরের গায়ে রক্তবর্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত দু'টি প্রকাণ্ড ত্রিশূল যেন হাত-ধরাধরি করে ভীষণাকার দ্বারি-যুগলের মত দাঁড়িয়ে আছে!

আনন্দের আবেগে ত্রিশূলদু'টির নিকটে গিয়েই লীনা সবিস্ময়ে দেখলো—নীচেই আর একটি অন্তর্গুহা। বুঝতে তার বিলম্ব হ'ল না যে, এই গুহার মধ্যেই দেবীর স্থান। দেবী-দর্শনের আনন্দে লীনা অকুতোভয়ে সেই অন্ধকারময় গুহার ভিতরে প্রবেশ করলো, বিজলীকে কিছু বলবার বা তার পানে ফিরে তাকাবার কথাটি পর্য্যন্ত সে ভুলে গেল।

গুহার ভিতরে আবার একটা গুহা! বুঝতেই পারছো —সেখানে অন্ধকার আরও কত গাঢ়! আর সে গুহা কি ভীষণ দুর্গম! অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে পা টিপে-টিপে লীনা সেই গুহার ভিতরে এগিয়ে চললো। আশ্চর্য্য! তার চোখের স্বাভাবিক উজ্জ্বল দৃষ্টিও এই গুহার জমাট অন্ধকার ভেদ করতে পারলো না। লীনার মনে হ'তে লাগলো—সে বুঝি একটা অতিকায় অজগরের পেটের ভিতর দিয়ে চলে যাচ্ছে, অপূর্ব্ব দৃষ্টিশক্তির সাহায্যেও কিছুই সে অনুভব করতে পারছে না।

আরও কিছু কাল এই ভাবে সে অগ্রসর হলে সহসা আলোর একটা ক্ষীণ রশ্মি যেন সেই নিবিড়তম অন্ধকারের ভিতরে ফুটে উঠল। লীনা লক্ষ্য করল—সে এতক্ষণে এমন একটি অপূর্ব্ব স্থানে এসে পড়েছে, যেটি অবিকল একখানি ঘরের মত। তার উপরে ছাদের দিকে কতিপয় ছিদ্র, সেই ছিদ্রপথের উর্দ্ধ থেকে মিটিমিটি আলোর আভা ঘরের ভিতরে আসছে, ঘরখানি তাতে যেন ধীরে ধীরে আলোকিত হয়ে উঠছে। এবার চোখ দু'টো বড় করে সামনে চাইতেই সেই অন্ত-র্গৃহের অপূর্ব্ব শোভায় লীনার হৃদয় মুগ্ধ হ'ল, তার সারা দেহ-মন সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে নেচে উঠলো; বিরাট আঁধারের পর আনন্দের এই বিপুল উচ্ছ্বাস জানিয়ে দিল—এতক্ষণে সে তার বাঞ্ছিতা দেবীর দুর্লভ পীঠের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির আবেগে তার সুঠাম দেহটি নত হয়ে লুটিয়ে পড়লো দেবীর পীঠে; কণ্ঠ থেকে মন্ত্র নির্গত হল ঝর্ণার বেগে ঝঙ্কার দিয়ে—জাগো মা পাষাণি, জাগো! তোমাকে জাগাতে এসেছি ধূলপায়ে—রণবেশে; জেগে উঠে জানাতে হবে মা তোমাকে…নারীর অসুরদলনী মূর্ত্তি সত্য না মিথ্যা!

—গল্পদাদু।

শ্বাস-প্রশ্বাস

আমাদের বাঙলার অন্তঃপুরে অস্বাস্থ্যের যে-বাতাস আসিয়াছে, সে-বাতাসে বাঙলার ঘর-সংসার লক্ষ্মীছাড়া হইতে বসিয়াছে! প্রসূতি রোগ ও যক্ষ্মা—এ দুই কাল-ব্যাধি বাঙলার অন্তঃপুরকে যেন কালো মেঘে ঢাকিয়া রাখিয়াছে! মেয়েরা উচ্চ-শিক্ষা লাভ করিতেছেন, পর্দা-ঢাকা অন্ধকার গৃহকোণ ছাড়িয়া পথে-ঘাটে বাহির হইতেছেন, খুবই আশা ও আনন্দের বিষয়! কিন্তু বাহিরে বাঙলার যে নারী-সমাজকে দেখি, সে-সমাজে কোথায় সে স্বাস্থ্যশ্রী! সে উজ্জ্বল লাবণ্য-দীপ্তি! অসূর্য্যম্পশ্যা কুল-কামিনীর সে ললিত-মোহন দেহ-ছাঁদ!

এ অস্বাস্থ্যের কারণ খুঁজিতে গেলে বলিব—আমাদের জীবন-যাপনের প্রণালীতে এমন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, যার জন্য বাঙলার কুলনারীদের দেহে স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্যের অভাব ঘটিতেছে! কি সে পরিবর্ত্তন?

অর্থ-সঙ্কটের কথা ছাড়িয়া দিই। সে সমস্যা নিরাকরণের উপায়-নির্দ্ধারণে বহু জটিলতা নিহিত আছে। তার উপর সহরে-গ্রামে সর্ব্বত্র পানীয় জলে ও বাতাসে আবিলতার সঞ্চার হইয়াছে। সহরে ছোট বাড়ী—সে-বাড়ীতে বাস,—মাথার উপর আকাশ ধূলি-ধূমাচ্ছন্ন—বাঙালী-পাড়ায় পথের আনাচে-কানাচে আবর্জ্জনার স্তূপ—বিশুদ্ধ নির্ম্মল বাতাস কি করিয়া মিলিবে?

অথচ আমাদের এই দেহ-যন্ত্রটিকে সুস্থ রাখিতে নির্ম্মল বাতাস আমাদের প্রধান সহায়। যে-ক্ষণে জন্ম-গ্রহণ করি, সেই-ক্ষণ হইতেই শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া সুরু হয় —এ ক্রিয়ার নিমেষ-বিরাম নাই। এই শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া এমন অনায়াসে চলে যে, তাহা উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন বা অবকাশ ঘটে না! যখন ছুটাছুটি করি, তখন হাঁফ ধরে; এবং হাঁফ ধরার জন্ত যে অস্বাচ্ছন্দ্য, সে অস্বাচ্ছন্দ্য মোচনের জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসে আমাদের আরো বেশী বাতাসের প্রয়োজন হয়।

আমাদের দেহ-যন্ত্রটিকে সজীব ও সক্রিয় রাখিতে খাদ্য এবং জলের প্রয়োজন, সত্য; কিন্তু দেহের রক্তধারাকে সুস্থ সজীব রাখিবার জন্য চাই বাতাস। নিশ্বাসে এই বাতাস ফুশফুশ-(lungs)-যন্ত্র দ্বারা দেহমধ্যে আসিয়া আমাদের দেহের রক্তধারাকে সর্ব্বক্ষণ পরিশুদ্ধ নির্ম্মল রাখিতেছে। শ্বাস-প্রশ্বাসে যাঁদের কষ্ট হয়—তাঁদের ফুশ্‌ফুশ্‌-যন্ত্র বাহিরের বাতাস অনুরূপ-পরিমাণে জোগান্‌ পায় না। সেজন্য তাঁদের স্বাস্থ্য হয় জীর্ণ এবং শরীর অচিরে ক্ষয় পায়। নিশ্বাস-গ্রহণে যাঁর যতখানি স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাস্থ্য তাঁর ঠিক সেই পরিমাণেই ভালো। এজন্য শ্বাস-গ্রহণের বিধি-নিয়ম জানা প্রয়োজন। জানিয়া সে বিধি-নিয়ম যদি মানিয়া চলি, তাহা হইলে দেহ স্বাস্থ্যশ্রীতে যেমন প্রদীপ্ত থাকিবে, তেমনি সুস্থ থাকিতেও পারিব। নিশ্বাস-গ্রহণেও তাল-মান-ছন্দ আছে এবং এই তাল-মান-ছন্দ মানিয়া নিশ্বাস-গ্রহণ যদি অভ্যাস হয়, তাহা হইলে স্বাস্থ্যশ্রী অক্ষুণ্ণ রাখিবার সঙ্গে সঙ্গে দেহের ছাঁদকেও সুশ্রী সুচারু রাখিতে পারিবেন। ছুটাছুটি করিলে বা সাঁতার কাটিতে গেলে একটুতে অনেকে হাঁফাইয়া পড়েন, তাল-মান-ছন্দ মানিয়া নিশ্বাস-গ্রহণের অভ্যাস হইলে সাঁতারে বা দৌড়ে হাঁফ ধরিবে না। স্বচ্ছন্দ শ্বাস-গ্রহণে ফুশফুশ এবং মস্তিষ্ক—কোথাও এতটুকু গ্লানি বা বিষ জন্মিতে পারে না।

আমাদের ফুশফুশ-যন্ত্রে বাতাস ধরে প্রায় ছ'-পাইট। খুব জোরে যদি আমরা শ্বাস ত্যাগ করি, তাহা হইলেও তিন পাইটের বেশী বাতাস ফুশফুশ-যন্ত্র হইতে নিষ্কাশিত হইতে পারে না। অর্থাৎ তখনো আমাদের ফুশফুশ-যন্ত্রে বাতাস থাকে প্রায় তিন পাইট। যাঁরা সঠিক ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস লইতে পারেন না, তাঁদের ফুশফুশ-যন্ত্র হইতে দূষিত বাতাস বাহির হইতে পারে না;

১। বসিয়া ধীর মাত্রায় শ্বাস ত্যাগ

২। দু'হাত দু'দিকে প্রসারিত

৩। দু'হাত সমান-সিধা

এবং এই দূষিত বাতাস জমিয়া থাকার জন্য তাঁদের দেহে যক্ষা হাঁপানি প্রভৃতি বহু ব্যাধি আশ্রয় পায়। এজন্য আমাদের উচিত, অভ্যাসে শ্বাস-প্রশ্বাসকে সুনিয়ন্ত্রিত করা।

নিদ্রার সময় অনেকে হাঁ করিয়া মুখ দিয়া নিশ্বাস লন,—ইহার মতো কদভ্যাস আর নাই। মুখ দিয়া নিশ্বাস লইলে শরীরে বহু ব্যাধির প্রবেশ অব্যাহত হয়! ব্যায়াম-বিধিতে এ অভ্যাস ত্যাগ করিতে হইবে! নিদ্রাকালে যাঁরা মুখ দিয়া নিশ্বাস লন, নিয়ম করিয়া অন্ততঃ ছ'মাস তাঁরা চিৎ হইয়া শয়ন করিবেন।

উত্তেজনা ঘটিলে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া খুব দ্রুত হয়; তাহাতে অস্বাস্থ্যের সীমা থাকে না। এবং এ অবস্থার পর সহজ ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিন, আরাম পাইবেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, শ্বাস-প্রশ্বাসে ফুশফুশ-যন্ত্রে যে-বাতাসের প্রবেশ ঘটে, সে-বাতাসকে ছন্দ-তাল মানিয়া গ্রহণ করা চাই—নহিলে অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটিবেই।

তার উপর শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য চাই নির্ম্মল বিশুদ্ধ বাতাস। খাদ্য-সম্বন্ধে যেমন শুদ্ধি-বিচারের প্রয়োজন,

বাতাসের বেলাতেও তেমনি বিচারে নিষ্ঠা চাই। দুর্গন্ধ বা দূষিত বাতাস কদাচ গ্রহণ করিবেন না। ধূম-ধূলিভরা সহর ছাড়িয়া সমুদ্র বা পাহাড়ের ধারে গেলে আমরা যে স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাই, তার প্রধান কারণ, সেখানে আমরা শ্বাস-প্রশ্বাসে নির্ম্মল বাতাস প্রচুর ভাবে পাই। গাছ-পালা তার পত্রপল্লব দিয়া বাতাস গ্রহণ করে; এ বাতাস গাছের স্বাস্থ্য ও প্রাণ। মিলের ধারে যে-সব গাছ, সে-গাছে ধোঁয়া-ধূলা-কালি লাগে, এজন্য সে গাছ নির্ম্মল বিশুদ্ধ বায়ু পায় না—তাই তার পক্ষে স্বাস্থ্যশ্রী লইয়া বাঁচিয়া থাকা দুষ্কর হয়। কিন্তু যে গাছ খোলা জায়গায়, দেখিবেন, প্রাণের লীলায় স্বাস্থ্য-মাধুরীতে সে গাছের শ্রী চমৎকার! এজন্য যেখানে ধোঁয়া-ধূলা নাই, এমন জায়গায় আমাদের বাস করা উচিত।

৪। দু' হাত কাঁচির মতো

৫। দু' হাতে ডান পা ছোঁওয়া

৬। মাথার পিছনে খোঁপার উপর দু' হাত অঞ্জলিবদ্ধ

কিন্তু তাহা হইবার উপায় যখন নাই, তখন সকালে-বিকালে খোলা জায়গায় নিয়ম-মতো খানিকটা বেড়ানো অভ্যাস করুন, দেখিবেন, সে সময় নিশ্বাসে যে নির্ম্মল বাতাস গ্রহণ করিবেন, তার কল্যাণে ব্যাধি সারিয়া যাইবে।

এবার শ্বাস-প্রশ্বাসের বিশেষ ব্যায়াম-বিধির কথা বলি।

এ ব্যায়ামের মূল কথা—deep breathing বা গভীর-ভাবে নিশ্বাস লওয়া। বসিয়া, দাঁড়াইয়া এবং শুইয়া গভীর-ভাবে নিশ্বাস লওয়া চলে। তবে দাঁড়ানো-অবস্থাই সব চেয়ে ভালো। শুইয়া-বসিয়া শ্বাস-ত্যাগ প্রশস্ত। শ্বাস-প্রশ্বাস-কালে নাক টানিয়া যতখানি সম্ভব, বাতাস গ্রহণ করিয়া প্রশ্বাসে যদি তার সবটুকু আমরা ত্যাগ করি, তাহা হইলে প্রচুর উপকার হইবে। তবে প্রশ্বাস-ত্যাগের সময় বিবিধ ভঙ্গীতে অঙ্গ-চালনা করা চাই। তাহাতে গ্লানি ঘুচিয়া দেহের ছাঁদ ভালো ভাবে গড়িয়া উঠিবে।

১। চেয়ারে বা উঁচু কোনো আসনে বসুন। বসিয়া নাক দিয়া নিশ্বাসে যতখানি-সাধ্য বাতাস গ্রহণ করুন। তার পর ১নং ছবির মতো দু' হাত দু'দিকে প্রসারিত করিয়া ঐ কিশোরীর মতোই শীষ দিবার ভঙ্গীতে দুই ঠোঁট ফাঁক করিয়া শ্বাস ত্যাগ করুন। এঞ্জিনের ধোঁয়া যে ভাবে ছাড়ে, তেমনি ফুঃ ফুঃ করিয়া মাত্রা-ক্রমে এবং এক-তালে শ্বাস ত্যাগ করিবেন। এ ব্যায়াম করা চাই উপর্য্যুপরি অন্ততঃ-পক্ষে ছ'বার।

২। এবার ২নং ছবির ভঙ্গীতে দুই হাত দু'দিকে প্রসারিত করিয়া পিঠ ঈষৎ বাঁকাইয়া—অস্বাচ্ছন্দ্য না বোধ করেন এমন ভাবে বাঁকাইবেন—জোরে-জোরে নিশ্বাস-বায়ু গ্রহণ করুন। তার পর পনেরো-সেকেণ্ড থাকিবেন শ্বাসরুদ্ধ করিয়া নিশ্চল নিস্পন্দ। তার পর দুই হাত সামনের দিকে আনিয়া বুকের কাছে সে দুই হাত অঙ্গুলিবদ্ধ এবং সঙ্গে সঙ্গে পিঠকে সহজ-সিধা করিতে করিতে শ্বাস ত্যাগ করুন। এ ব্যায়ামও অন্ততঃ-পক্ষে ছ'বার করা চাই।

৩। ৩নং ছবির ভঙ্গীতে দু' হাত সম্পূর্ণ সিধা প্রসারিত করিয়া দিন। দিয়া মাত্রা-ক্রমে ধীরে ধীরে উঃ-উঃ উঃ-এমনি ভাবে নিশ্বাস-বায়ু গ্রহণ করুন। সাত দফায় পূর্ণ নিশ্বাস-বায়ু গ্রহণ করিতে হইবে। করিয়া পনেরো সেকেণ্ড মাত্র রুদ্ধশ্বাসে নিশ্চল, নিস্পন্দ থাকুন। তার পর একটানে শ্বাস ত্যাগ করুন। এ ব্যায়ামও করা চাই অন্ততঃ-পক্ষে ছ'বার।

৪। এবারও দু' হাত সম্পূর্ণ সিধা প্রসারিত করিয়া বসিয়া এক-দমে যতখানি সাধ্য সম্পূর্ণ নিশ্বাস-বায়ু গ্রহণ করুন; করিয়া ৪নং ছবির ভঙ্গীতে দুই হাত কাঁচির মতো আবদ্ধ করুন; করিয়া শ্বাস ত্যাগ করুন। এ ব্যায়ামও করা চাই অন্ততঃ-পক্ষে ছ'বার। তবে প্রথমবারের পর দ্বিতীয়বারে ব্যায়ামের বেগ ও মাত্রা একটু বাড়াইতে হইবে। তৃতীয়বারে বেগ ও মাত্রা দ্বিতীয়বারের চেয়ে আর-একটু বেশী বাড়িবে। এমনি ভাবে পর-পর বেগ ও মাত্রা উত্তরোত্তর বাড়াইয়া এ-ব্যায়াম করিতে হইবে। বেগ ও মাত্রা বাড়াইতে হইবে বলিয়া যেন সাধ্যাতীত কিছু করিবেন না। যা রয় সয়, এমন ভাবে মাত্রা বাড়াইবেন।

৫। এবার দাঁড়ান। দাঁড়াইয়া দু' হাত সিধা উর্দ্ধে তুলুন। তুলিয়া মাথা উঁচু করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করুন। তার পর ৫নং ছবি দেখিয়া কোমরের কাছ হইতে উপরার্দ্ধ-দেহ নোয়াইয়া শ্বাস ত্যাগ করিতে হইবে। দু' হাত দিয়া প্রথমে ডান্ পা স্পর্শ করুন; এবং এই শ্বাস ত্যাগ করিতে-করিতেই মেঝে ছুঁইয়া দু' হাত দিয়া বাঁ পা স্পর্শ করুন। এ ব্যায়াম অর্থাৎ হাত তুলিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে-দাঁড়াইতে নিশ্বাস-গ্রহণ এবং এমনি ভঙ্গীতে দেহ নোয়াইয়া শ্বাস-ত্যাগ করিতে করিতে দু' হাত দিয়া পর্য্যায়ক্রমে দুই পা স্পর্শ করা—এ ব্যায়ামও ছ'বার করা চাই।

৬। এবার আগেকার মতো বসিয়া দুই হাত ৬নং ছবির ভঙ্গীতে মাথার পিছনে অঙ্গুলিবদ্ধ করুন; করিয়া নিশ্বাস-বায়ু গ্রহণ করুন। তার পর সামনের দিকে ঐ ৬নং ছবির ভঙ্গীতেই ঘাড় নোয়াইয়া শ্বাস ত্যাগ করুন। তার পর আবার মাথা তুলিয়া ধীরে ধীরে নিশ্বাস গ্রহণ করিতে-করিতে মাথা পিছন-দিকে হেলাইয়া দিন। নিশ্বাস-গ্রহণের পর আগেকার মতো আবার সামনের দিকে ঘাড় নোয়াইয়া শ্বাস ত্যাগ করুন। এ ব্যায়ামও করা চাই অন্ততঃ-পক্ষে ছ'বার।

এ ব্যায়াম অভ্যাস করিলে কখনো সর্দ্দি-কাশি হইবে না; দেহ সুছাঁদে সুশ্রী এবং চির-যৌবনে বিভূষিত থাকিবে।

অসহ্য

বাড়ীর কর্ত্তার বয়স হয়েছে! ছুটীর দিনে দুপুর-বেলায় বাড়ীতে আছেন,—ছেলে-মেয়েরা ইস্কুলের বাঁধন খোলা পেয়ে লুকোচুরি হুটোপাটি খেলায় বাড়ীতে রীতিমত মাতন তুলেছে। কর্ত্তা চটে উঠলেন, বললেন,—অসহ্য! ছেলে-মেয়েদের তখনি ধমকে-চমকে এমন ঠাণ্ডা করে দিলেন, যে সব ঠাণ্ডা! কাউকে দিলেন একগাদা অঙ্ক—বসে অঙ্ক কষো! কাউকে দিলেন, পাঁচ-পাতা ট্রান্সলেশন করতে। মেয়েদের মধ্যে কাউকে দিলেন বালিশের ওয়াড় সেলাই করতে,—কাউকে দিলেন ডালে-চালে-মেশানো একটা চ্যাঙারি! দিয়ে বললেন, বেছে চাল আর ডাল

—ছু'টো আলাদা করে রাখো। বাড়ী নিমেষে যেন নিঝুম-পুরী হলো!

আমরা বলবো, কর্ত্তার এই যে আচরণ, এ আচরণ রীতিমত জুলুম-বাজী! হাতে শক্তি আছে বলে এমন করে ছেলেমেয়েদের আনন্দের উৎস বন্ধ করা—সে-কালের দস্যুরা হুহুঙ্কার-আক্রমণে উৎসব-গৃহকে চকিতে যেমন শ্মশানে পরিণত করতো, এ ঠিক তার সামিল! কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করি, ছেলে-বয়সে ওরা ছুটোছুটি মাতামাতি করবে না? আপনি যখন ছোট ছিলেন, তখনকার দিনের কথা ভেবে দেখুন তো! ছেলে-মেয়েদের ছেলেমানুষী যদি আপনার অসহ্য ঠেকে, তাহলে আপনার বুড়োমি, আপনার গাম্ভীর্য্য, পদে-পদে নিজের স্বাচ্ছন্দ্য-অস্বাচ্ছন্দ্য বুঝে সংসারে যে-সব বিধি-নিষেধের সৃষ্টি করেন, ছেলে-মেয়েরা তাকে কেন অসহ্য বলবে না—তার কারণ বলতে পারেন? অনেক বাড়ীতে দেখেছি, ছুটীর দিনে বাড়ী নিস্তব্ধ—বাড়ীতে যেন জন-মানব নেই! এ নিস্তব্ধতার কারণ খুঁজলে দেখবো, কর্ত্তা বুঝি দুপুরে দিবা-নিদ্রায় আরাম-সুখ উপভোগ করছেন; ছেলে-মেয়েরা পাছে কলরব তোলে, বেচারী গৃহিণী শঙ্কিত চিত্তে ছেলে-মেয়েদের পাহারাদারী করে বেড়াচ্ছেন, আর ছেলে-মেয়েরা ছুটীর দিনে নিজেদের গৃহে রয়েছে যেন জেলের কয়েদী! ছেলে-মেয়েরা চুপচাপ থাকবে, বাড়ীতে ছুটো-ছুটি করবে না,—যদি কেউ বলেন এ সভ্যতার পরিচয়, তাহলে তার জবাবে আমরা বলবো, এ-সভ্যতায় মানুষের স্বাস্থ্য হয় নির্জীব—মন হয় পাথর। এবং এমনি কড়া শাসন যে গৃহে, সে গৃহের ছেলেমেয়ে কোনো দিন সত্যকার মানুষ হয়ে উঠতে পারবে না।

এ গেল ছেলেমেয়েদের দাপাদাপিতে অসহ্য-বোধ করা। আমাদের অনেকের স্বভাব—অপরকে আমরা কেমন সইতে পারি না। আমার বাড়ীতে মেয়েরা শুধু ডাল-ভাত রাঁধছেন, আর পুজোয়-পার্ব্বণে ঠাকুর-ঘরের কর্ণা করছেন। আমার পাশের বাড়ীতে ত্রিপুরাচরণ বাবুর বাড়ীর মেয়েদের দেখি, গান-বাজনা করছেন, স্কুল-কলেজে যাচ্ছেন; ত্রিপুরাচরণ বাবুর স্ত্রী সেজেগুজে হাওয়া খেতে বেরুচ্ছেন—বাড়ীতে গাড়ী না পেলে হেঁটেই বেরুচ্ছেন। এ-ব্যাপার আমার অসহ্য লাগে! কেন? ভেবে দেখলে বুঝবেন, এ অসহ্য লাগার কারণের মধ্যে আমার মনের দৈন্য আর হীনতা রয়েছে! বর্ব্বর হিংসার ফলে শুধু ওঁদের এ-আচরণ আমার অসহ্য লাগে।

ছোটদের হাসি-খুশী বড়দের অসহ্য লাগে, তার একটি কারণ এবং প্রধান কারণ, বড়র ক্ষুদ্রতা-বোধ (inferiority complex)! অর্থাৎ ও-হাসি-খুশী করবার শক্তি বড় হারিয়েছে, ওদের সে-শক্তি রয়েছে ভরপুর! এই বুঝেই অনেক ক্ষেত্রে ছোটদের অনেক আচরণ বড়দের অসহ্য বোধ হয়!

অপরের বাড়ীর কাজে সমারোহ দেখলে আমরা বলি, ঐশ্বর্য্য জাহির করছেন! এ কথা যে বলি, তা মনের ঐ ক্ষুদ্রতা-হেতু। দুর্দ্দৈব-বশে ও-রকম ভোজে কাকেও আপ্যায়িত করবার সামর্থ্য আমার নেই, ওঁর আছে! আমার চেয়ে উনি জিতে যাবেন—এতে আমার মন জ্বলে ওঠে! তাই ও-বাড়ীকে আমার অসহ্য লাগে!

মল্লিক-বাড়ীর গিন্নী এ-বাড়ী থেকে ও-বাড়ী যেতে হলে শান্তিপুরের শাড়ী পরে তবে বেরোন, আর সেই সঙ্গে দু'-চারখানা জুয়েলারি গায়ে না দিলে তাঁর চলে না! কেন—নেমন্তন্ন যাচ্ছেন না তো! আমি বলি, ওটা দেমাক! মল্লিক-গিন্নীকে আমার অসহ্য লাগে কেন? সে-ও ঐ এক কারণে—নিজের মনের হিংসা-বশে!

অর্থাৎ এমনি ভাবে যাকে বা যার কাজকে বা আচরণকে আমাদের অসহ্য লাগে, তলিয়ে বুঝে দেখবেন, সে অসহ্য লাগার কারণ ঐ এক। নিজের হীনতা সম্বন্ধে সজাগ-চেতনা এবং এই হীনতা-বোধ থেকেই আমরা হিংসুটে হয়ে উঠি এবং অপরকে সহ্য করতে পারি না।

অসহ্য লাগার আর-এক কারণ আমাদের অনভিজ্ঞতা। অর্থাৎ যা আমাদের অজানা, অদেখা, তার উপর প্রথম যে মনোভাব জাগে, তাও ঐ অসহ্যতার। নিজের সামাজিক বা পারিবারিক গণ্ডীটুকুর মধ্যে আবদ্ধ থেকে যাঁর মন তার গতিবেগ এবং জীবন-আবেগ হারিয়েছে, তাঁর পক্ষে গণ্ডীর বহির্ভূত নূতন কোনো-কিছুকে মেনে নেওয়া খুব কঠিন হয়। মন যাঁর সত্যই সংস্কৃতি-বশে সমুদার,

তিনি যেমন গণ্ডী-বহির্ভূত বা অভিজ্ঞতা-বহির্ভূত নূতনকে সহ্য এবং গ্রহণ করতে পারেন, এমনটি অপরে পারে না। যাঁরা পারেন না, মুখে কালচার্ড বলে যত অহঙ্কারই তাঁরা করুন, আমরা বলবো, তাঁদের মন এখনো আদিম বর্ব্বরতা থেকে মুক্ত নয়।

এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা বলছেন—ভয়, সংশয়, নিজের হীনত্ববোধ—এ তিনটি কারণে নূতনকে আমরা সহ্য করতে পারি না—বলি, অসহ্য! (Fear guilt or inferiority-complexes make one intolerant). নিজের মনকে যদি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাইরে আনতে পারেন, দেখবেন, জগতে কোনো-কিছুকে অসহ্য মনে হবে না!

মনের এই অসহিষ্ণুতা—এতে কারা ব্যথা পায়? যাঁদের কাছে অসহ্য ঠেকে, তাঁরা! কোনো-কিছু অসহ্য লাগলে মনে কতখানি কর্‌করানি, কি যাতনাই না ভোগ করতে হয়!

মনের এই ব্যাধি-প্রতিকারের উপায় আছে। সে উপায়—১। আত্ম-মর্য্যাদায় আস্থা রাখুন। নিজের উপর যাঁর সম্ভ্রম আছে, বাহিরের কোনো বৈসাদৃশ্যে তিনি বিচলিত হন্ না। সে বৈসাদৃশ্যে তাঁর ভয়, দ্বিধা বা সংশয় থাকতে পারে না! সে বৈসাদৃশ্যের উর্দ্ধে তিনি—সে বৈসাদৃশ্য তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না। তাঁর এই আত্ম-বিশ্বাসই তাঁকে সব-দিকে সহিষ্ণু অবিচল রাখবে।

২। অসহ্যবোধ-ব্যাধির অমোঘ ঔষধ—নিজের রস-বোধ বা humour। বাহিরে যদি কোনো বৈসাদৃশ্য দেখেন, তা হলে রসিক-মন কৌতুক-হাসিতে সে-ভাব তাড়িয়ে দেয়।

৩। তার পর থাকা চাই sense of proportion বা সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি-রক্ষা। অর্থাৎ যে-দলে যখনই থাকুন, মিলিয়ে-মিশিয়ে সে-দলের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে হবে। তা যদি পারেন, দেখবেন, কোনো-কিছু আর অসহ্য বোধ হবে না। দারুণ গোঁড়া ধর্ম্মধ্বজ বলুন, অহঙ্কারী আর্টিষ্ট, বা সৌখীন ও রূপসী রমণী বলুন, এঁদের দলে পড়লে এঁদের আত্ম-মহিমা-প্রচারের সদর্প-বাণী মোটে অসহ্য লাগবে না। সে-সব বাণী শুনে মনে-মনে কৌতুক বোধ করবেন। তাতে গা জ্বলবে না, মন কর্‌কর্ করবে না, রঙ্গ-হাসিতে মন ভরে উঠবে।

আর একটি কথা, বাইরে যাকে যেমনই দেখুন, তার মনের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস সম্বন্ধে নাই বা কৌতূহলী হলেন! কারো ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি নিয়ে তার বিচার করতে যাওয়া উচিত নয়। যার সঙ্গে যেটুকু সম্পর্ক, যাকে যেখানে যতটুকু পান ব্যস্, দেখবেন, কাকেও অসহ্য মনে হবে না! অসহ্য-বোধে নিজের মনকেই আমরা ক্ষত-বিক্ষত করি, অপরের মনে তার বিন্দুমাত্র আঁচ লাগে না।

পুরাকালে বাপ ছিলেন সর্ব্বময় কর্ত্তা—সেই রোমান যুগে। সে-দিন আর নেই। তার পর স্বামি-স্ত্রীর সম্পর্ক! স্বামী ছিলেন স্ত্রীর দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা—তাঁর ইহকাল ও পর-কালের ভাগ্য-বিধাতা! এ দাস-ভাব চলে গেছে। কেন গেল? তার কারণ দিন-দিন অভিজ্ঞতায় এবং যুগধর্ম্মের প্রভাবে আমরা বুঝছি, যেখানে ভালোবাসার সম্পর্ক, সেখানে কাফ্রী-দেশের ও-দাস-ভাব চলতে পারে না। সংসারে ভালো-মন্দ পাঁচ জনকে সয়ে যেমন থাকতে হয় নিজেদের শান্তি-সুখের জন্য,—পৃথিবীকেও তেমনি বড় সংসার বলে মনে করে চলুন। আত্মীয়, অনাত্মীয়—সকলের সঙ্গে নিজেকে খাপ-খাইয়ে সকলকে সয়ে আমাদের বাস করতে হবে। উনি যদি আপনার জন্য স্বার্থ-ত্যাগ করেন, আপনিই বা তবে ওঁর জন্য স্বার্থত্যাগ কেন না করবেন? এ নীতি শুধু পর-অনাত্মীয়ের সম্বন্ধে নয়; মা-বাপ, ভাই-বোন, স্বামি-স্ত্রী, বন্ধু-আত্মীয়—সকলের বেলায় মানতে হবে। তা মেনে যে-দিন চলতে পারবেন, সে-দিন বুঝবেন, সত্যকার সভ্য হয়েছেন এবং সে-দিন আর কোনো-কিছু অসহ্য বোধ হবে না—জীবন সহনীয়-রমণীয় হবে।

মাধবী

(গল্প)

"না—না—না," মাধবী ঘুমের ঘোরে চেঁচাইয়া উঠিল, "আমি কিছুতেই যাব না তোমার সঙ্গে—কিছুতেই না। তুমি আমায় ব'কেছ। ছেড়ে দাও আমার কাপড়,—ছিঁড়ে গেলে মা ব'ক্‌বে।"

মাধবীর মা চমকিয়া উঠিলেন। পার্শ্বে নিদ্রামগ্না মেয়ে—ঠেলা দিয়া ডাকিলেন, "মাধু, মাধু—ও কি রে? ঘুমের ঘোরে কি বিড়-বিড় ক'র্‌ছিস্?"

মাধবী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কি মা?"

—"কি ব'ক্‌ছিলি রে ঘুমের ঘোরে? ও মা, তোর চোখে যে জল?"

মাধবী প্রথমটা রাগিয়া উঠিল—"কেন মা তুমি আমায় ডাক্‌লে?"

—"সে কি রে! তোর কি হ'য়েছে?" মাধবীকে বুকের কাছে টানিয়া মা বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছাইয়া দিলেন।

মাধবী এতক্ষণে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। সে ম্লান একটুকু হাসিয়া বলিল, "জান মা, ভারী মজার একটা স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম···"

মেয়ের মুখে হাসি দেখিয়া মা কিছুটা আশ্বস্ত হইলেও বিব্রত কণ্ঠে কহিলেন, "আবার তোর নন্দকিশোর নয় তো রে?"

—"হ্যাঁ মা," মাকে বিশ্বাস করাইবার জন্য কথাটায় অনাবশ্যক জোর দিয়া মাধবী বলিল, "সত্যি। নন্দকিশোর এসেছিল। আমায় কত আদর ক'র্‌লে, ব'ল্‌লে, আস্‌বে রাণী আমার কাছে?—বড্ড একা আমি। সত্যি মা এই দেখ," মাধবী হাতখানা বাড়াইয়া দিল, "হাতখানা ধ'রেছিল, এখনো লাল হ'য়ে আছে।"

মা মনে-মনে শিহরিয়া উঠিলেন—"ঠাকুর, ঠাকুর! তোমায় ষোড়শ উপচারে পূজা দেব ঠাকুর, আমার মেয়েকে বাঁচিয়ে রাখ ঠাকুর!"

মেয়ের গায়ে হাত বুলাইতে-বুলাইতে প্রকাশ্যে বলিলেন, "ও কিছু নয়, তুই ঘুমো।"

মাধবী মাথা নাড়িয়া প্রবল প্রতিবাদ করিল, "না মা, সত্যি। রোজ আমি ঘুমুলে দুষ্টুটা আমার কাছে আসে।"

মা এবার মুখে একটু রাগ দেখাইয়া বলিলেন, "আচ্ছা আসে তো আসে। তুমি ঘুমোও দিকি?"

নয় বছরের মাধবী আর একবার প্রতিবাদ করিতে গিয়া থামিয়া গেল। তার পর ঘুমাইয়া পড়িল।

এখানে কিন্তু কয়েক বছরের পূর্ব্বকথা বলা আবশ্যক। মাধবীর পিতা নির্ম্মলেন্দু বসু মহাশয় হাইকোর্টের বড় উকীল—তাঁহার পয়সা ও পসার অনেকেরই ঈর্ষাস্থল। কলিকাতার অভিজাত-মহলে পুষ্পোদ্যান-সমন্বিত প্রাসাদোপম অট্টালিকা, দাস-দাসী, মোটর জুড়ি—কিছুরই তাঁহার অভাব নাই। দুই পুত্র তাঁহার উপযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু নিষ্কণ্টক সুখ ধরণীতে মেলে না। নির্ম্মলেন্দু বাবুরও বুকে এত সুখের মাঝখানে এক ক্ষুদ্র অথচ সুতীক্ষ্ণ কণ্টক বিঁধিতে থাকে,—তাঁহার কন্যা নাই।

এ দুঃখ কন্যাদায়গ্রস্ত অনেকের কাছেই আশীর্ব্বাদ বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু নির্ম্মলেন্দু কাঁটাটা তীব্র-ভাবেই অনুভব করেন। একটি কচি-হাতের যত্নের অভাবে জীবন তাঁহার যেন অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।

রোজই নির্ম্মলেন্দু গৃহ-বিগ্রহ নন্দকিশোরের নিকট প্রার্থনা জানান, "হে ঠাকুর, আর কিছু চাই না ঠাকুর, আমায় একটি মেয়ে দাও!"

এমনি করিয়াই সুখে-দুঃখে দিন যাইতেছিল, অবশেষে এক দিন সত্য-সত্যই শোনা গেল, গড়াইতে-গড়াইতে জীবনের চল্লিশটি বছর পার করিয়া দিয়া নির্ম্মলেন্দু-পত্নী আবার সন্তান-সম্ভবা। স্বামি-স্ত্রী শতবার নন্দকিশোরের পায়ে মাথা কুটিয়া কন্যা কামনা করিলেন!

সে-বার পূর্ণিমার কোল জুড়িয়া কুসুম-সুকুমার যে

মেয়েটি জন্মিল, সেই বড় আদরের, বড় দুঃখের ধনটির নাম নির্ম্মলেন্দু রাখিলেন মাধবী।

সন্তানের সুকুমার মানসিক বৃত্তিগুলির উপর পিতা-মাতার মনের প্রভাব কতখানি, তাহা আজও বৈজ্ঞানিকের সমস্যা। কিন্তু জ্ঞানলাভের সঙ্গে-সঙ্গেই মাধবী নন্দকিশোরকে বড় আপনার করিয়া চিনিয়া ফেলিল। অতি শৈশব হইতেই তাহার অধিকাংশ সময় নন্দকিশোরের মন্দিরে অতিবাহিত হইত। অতি পরিপাটি করিয়া পূজার আয়োজন করাই ছিল, শিশু মাধবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খেলা। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া গৃহের সম্মুখের পুষ্পোদ্যান হইতে পুষ্প চয়ন না করিলে তাহার মনে হইত দিনটা বুঝি নিতান্তই বিফলে গেল। আর কোনো দিকে মাধবীর মন নাই—লেখাপড়া তাহার ভাল লাগে না, শৈশবের শিশু-খেলা তাহার নিকট হাস্যকর ছেলে-মানুষি বলিয়া বোধ হইত। কত দিন দুপুরে বাপ কাছারি যাইবার পর, মা ঘুমাইলে সে চুপি-চুপি আসিয়া নন্দকিশোরকে বুকে চাপিয়া বসিয়া থাকিত। মা মুখে রাগ দেখাইতেন, "হ্যাঁ রে, ভাত-খেও কাপড়ে ঠাকুর ছুঁয়েছিস্! কি আক্কেল তোর!" কিন্তু তনয়ার ভক্তি দেখিয়া অন্তরে পিতা-মাতা উভয়েই প্রীতিলাভ করিতেন। বাবা বলিতেন, "বেশ তো, তোমার মাধবীর আমি নন্দকিশোরের সঙ্গেই বিয়ে দেব—আর পণ লাগ্‌বে না।"

এমনি করিয়া নন্দকিশোরের ভালবাসার দান, সেই ছোট্ট জীবনটি নন্দকিশোরকে অবলম্বন করিয়াই বাড়িয়া উঠিল।

মা বলিলেন, "হ্যাঁ গা, মাধু আমার চৌদ্দ বছরেরটি হ'ল, এবার ওর বিয়ের জোগাড় কর?"

মেয়েকে এত শীঘ্র পর করিয়া দিতে পিতার ইচ্ছা ছিল না। ছোট্ট চিন্তিত একটা 'হুঁ' দিয়া তিনি আপাততঃ চুপ করিয়া গেলেন।

কিন্তু মাধবীর বিবাহের ফুল ফুটিতে বিলম্ব হইল না। নন্দকিশোরই যেন তাহার পাত্র ঠিক করিয়া আনিলেন!

আজ কয় দিন হইল, প্রত্যূষের আবছা আলোয় ফুল তুলিতে গিয়া মাধবী যেন অনুভব করে, কে যেন তাহাদের গেটের কাছে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে তাহাকে লক্ষ্য করে।

মাধবী জানে, উপদেবতারা অনেক সময় ভোরে বাগানে বেড়াইতে আসেন—তাহাদের দিকে চাহিতে নাই। তাই সে আপনমনে ফুল তুলিয়া বাড়ী চলিয়া যায়।

কিন্তু না দেখিয়াও যেন লোকটিকে মাধবীর দেখা হইয়া যায়—উপদেবতার মুখখানি যেন তাহার চেনা হইয়া যায়।

চেনা হইয়া যায় বলিয়াই এক দিন বৈকালে উপদেবতাটিকে আর এক জন প্রৌঢ় ভদ্রলোক সহ তাহার বাবার কাছে আসিতে দেখিয়া মাধবী বিস্মিত হয়।

কোথা দিয়া যেন কি হইয়া গেল! মাধবী বুঝিতে পারে না, তাহাদের বাড়ীতে এত লোক-জন কেন, এত আয়োজন কিসের। সে মাকে জিজ্ঞাসা করে, "খুব বড় ক'রে নন্দকিশোরের পুজো হবে বুঝি মা?"

মা হাসেন, "দূর্ পাগলী, তোর যে বিয়ে!"

তার বিয়ে! মাধবী বিশ্বাসই করিতে চায় না।

মা বলেন, "হ্যাঁ রে, চিরকাল আইবুড়ো থাক্‌বি না কি?"

অভিমানে মাধবীর ঠোঁট দু'টি ফুলিয়া উঠে, "বা রে, বাবা তো নন্দকিশোরের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছে!"

মা আবার হাসেন, "পাগলী মেয়ে, যা দিকি তুই এখন!"

যথাকালে শুভলগ্নে মাধবীর বিবাহ হইয়া গেল।

মাধবী পতিগৃহে আসিয়াছে। রূপবান্ স্বামী, অর্থবান্ শ্বশুর, স্নেহময়ী শাশুড়ী—যৌবনে নারীর যা কাম্য—সবই সে পাইয়াছে; তবু—তবু কোথায় যেন ভুল রহিয়া গিয়াছে! মাধবীর স্বামী অসীম বুঝিতে পারে না, কেন এমন হয়! এত করিয়াও এই মেয়েটির মন সে কেন পায় না! তাহার পৌরুষে ঘা লাগে—অসীম রাগিয়া উঠে। মাধবী কাঁদিয়া বলে, "ওগো, একটিবার—একটিবার শুধু আমায় নন্দকিশোরকে দেখাও!"

নন্দকিশোরের উপর অসীমের রাগ হয়, হিংসা হয়—সেই তো এমন করিয়া স্বামি-স্ত্রীর মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! তাহার কাছ হইতে মাধবীকে ছিঁড়িয়া আনিতে হইবে। তবে মাধবী আসিবে স্বামীর পার্শ্বে।

একটি-একটি করিয়া দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে—মাধবী একটি দিনের জন্যও পিতৃগৃহে পদার্পণ করে নাই। অসীম জোর করিয়া তাহাকে রাখিয়াছে—কিন্তু এবার সে ক্লান্ত হইয়াছে। দীর্ঘ দিনের যুদ্ধ তাহাকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলিয়াছে। স্নেহহীন এই সংসার তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়াছে।

কিন্তু কেন এমন হয়? এত করিয়াও কেন মাধবীর মন সে পায় না? তাহার ভালবাসা, তাহার আদর, তাহার রাগ, তাহার অত্যাচার—সবই কেন ঐ মেয়েটির নিকট অর্থহীন? অসীম বুঝিতে পারে না। আচ্ছা, একবার বাপের বাড়ী ঘুরাইয়া আনিলে হয় তো মাধবীর মন ফিরিবে। অসীম আর ভাবিতে পারিতেছিল না, সে সেই দিনই মাধবীকে লইয়া শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করিল।

পাঁচ বৎসর পরে মেয়েকে পাইয়া মা যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন।

গভীর রাত্রে অসীমের নিদ্রাভঙ্গ হইল—মাধবী পাশে নাই! কোথায় গেল সে? অনুমানে অসীম তাহা বুঝিতে পারে—সে ঠাকুরঘরের দিকে চলিল। ঘরে ঢুকিয়া দেখে, মাধবী একদৃষ্টে নন্দকিশোরের দিকে তাকাইয়া আছে—ঠোঁট দু'টি দারুণ অভিমানে কাঁপিতেছে—যেন কি বলিতে চায়, পারে না।

অসীম কোমল কণ্ঠে ডাকিল, "মাধু!"

সাড়া নাই।

অসীম আগাইয়া গিয়া মাধবীর স্কন্ধে হস্ত স্পর্শ করিল। মাধবী চমকিয়া দৃষ্টিহীন চোখে তাহার দিকে চাহিল, তার পর ভূতগ্রস্তের ন্যায় অসীমের পিছনে-পিছনে ফিরিয়া আসিল।

অসীমের সে রাত্রে ভাল ঘুম হইতেছিল না। আবার যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন প্রায় ভোর হইয়াছে। অসীম চমকিয়া দেখে, মাধবী বিছানায় নাই। এবার অসীমের বড় রাগ হইল। সে প্রায় ছুটিতে-ছুটিতে ঠাকুর-ঘরের দিকে চলিল।

তেমনি করিয়া দেওয়ালে হেলান দিয়া মাধবী দাঁড়াইয়া আছে—এবার কিন্তু তাহার ঠোঁট দু'টি নিস্পন্দ। চোখ দু'টি মুদিয়া আসিয়াছে। মুখে—সমস্ত দেহে বাঞ্ছিত মিলনের আবেশ···

অসীম কোমল কণ্ঠে ডাকিল, "মাধু!"

সাড়া নাই!

অসীম আগাইয়া গিয়া তাহার স্কন্ধে হস্ত স্পর্শ করিল। এবার কিন্তু কেহ চমকিয়া ফিরিল না—কেহ সাড়া দিল না। অসীম বোকার মত দাঁড়াইয়া রহিল! এত দিনের বিরহের পর বুঝি মাধবী তাহার প্রিয়কে ফিরিয়া পাইয়াছে—তাই আবেশে তার চোখ বুঁজিয়া আসিয়াছে। তাই তার সারা দেহ মিলনের পুলকে শিহরিয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে।

শ্রীমতী সুমতি দেবী।

মা ও তিন শিশু

প্রকৃতির খেয়াল

গত ২রা কার্ত্তিক কলিকাতা বাগবাজারে রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট-নিবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষালের পত্নী তিনটি পুত্র-সন্তান প্রসব করিয়াছেন। তিনটি শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে পর-পর; অর্থাৎ বেলা দশটায়, এগারোটায় এবং এগারোটা-ছাব্বিশ মিনিটে। তিনটি শিশুই বেশ সুস্থ, পুষ্ট, ও পূর্ণাঙ্গ; এবং তিনটিই জীবিত ও সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। পার্শ্বে প্রসূতির এবং সে তিনটি শিশুর ছবি দেওয়া হইল।

বিশ্বব্যাপী সমরাগ্নি—

সমগ্র বিশ্বে ভীষণ সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে; পাঁচটি মহাদেশ আজ এই বিশ্বব্যাপী মারণযজ্ঞে ব্যাপৃত। আভ্যন্তরীণ সমাজব্যবস্থায় ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্বন্ধে অন্তর্নিহিত ত্রুটির ফলে যে অসন্তোষ ও বিদ্বেষ যুগ যুগ ধরিয়া সঞ্চিত হইতেছিল, তাহাই আজ বিশাল নরমেধ-যজ্ঞে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই যজ্ঞের বীভৎস ধূমে মনুষ্য-সমাজের বিষাক্ত ক্ষত শুষ্ক হইয়া প্রকৃত সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইবে, না ধরিত্রী তখনও শক্তিমানের ভোগ্যা হইয়া থাকিবেন, তাহাই আজ নর-সমাজের প্রত্যেক কল্যাণকামীর লক্ষ্য করিবার বিষয়।

গত ৭ই ডিসেম্বর জাপান অকস্মাৎ বৃটেন ও মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে; তাহার ৪ দিন পরেই জার্ম্মাণী ও ইটালী মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রের সহিত যথারীতি যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ প্রাচী ও প্রতীচী—কোথাও কেহ আর "এ মহা আহব" হইতে দূরে নাই। বর্ত্তমান বিশ্ব-পরিস্থিতিতে জাপান ও ফ্যাসিস্ত শক্তিদ্বয়ের স্বার্থ ও উদ্দেশ্য অভিন্ন; কাজেই, তাহাদের রাজনীতিক ও সামরিক মিলনও স্বাভাবিক। সমগ্র বিশ্বে বৃটেন্ এবং আমেরিকার রাজনীতিক ও অর্থনীতিক প্রতিপত্তি দূর করিয়া নিজেদের প্রভুত্ব স্থাপনই এই তিনটি শক্তির উদ্দেশ্য। কম্যুনিষ্ট রুশিয়া যাহাতে এই বিরোধের সুযোগে তাহার সাম্যবাদী আদর্শ প্রতিষ্ঠায় সমর্থ না হয়, তদুদ্দেশ্যে জার্ম্মাণী তাহার প্রকৃত সমর-প্রচেষ্টায় সাময়িক বিচ্যুত হইয়া রুশিয়ার প্রতি অবহিত হইয়াছিল। রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধ বর্ত্তমান বিশ্ব-সংগ্রামের প্রধান অঙ্গগুলি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্; উহা স্বার্থের দ্বন্দ্ব নহে—আদর্শের সঙ্ঘর্ষ। চীন-জাপান যুদ্ধ বিশ্ব-সংগ্রামের একটি গৌণ অঙ্গ। ইহা দুর্ব্বলকে প্রভুত্বাধীন করিবার সেই সনাতন প্রয়াস—শক্তিমানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নহে; তবে একটি শক্তিমান্ পক্ষ তাহার নিজের প্রয়োজনে চীনের সহায়ক হইয়াছে বটে।

জাপানের যুদ্ধ-ঘোষণা—

গত ৮ই ডিসেম্বর প্রাতে অকস্মাৎ সমগ্র বিশ্ব সবিস্ময়ে শ্রবণ করে—পূর্ব্ব-রাত্রিতে বৃটেন্ ও মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রের সহিত জাপান যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে। যুদ্ধ-ঘোষণার কথা প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বেই প্রশান্ত মহাসাগরের সুদূরবর্ত্তী অঞ্চলে মার্কিণ-অধিকৃত বিভিন্ন দ্বীপে জাপানের আক্রমণ আরম্ভ হয়। নমুরা ও কুরুসুকে ওয়াশিংটনে মীমাংসা-প্রয়াসের অভিনয়ে ব্যাপৃত রাখিয়া শত্রুতাসাধনের এই ব্যাপক আয়োজন এবং অতর্কিতে এই প্রচণ্ড আক্রমণ আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিতে ভণ্ডামী ও বিশ্বাসঘাতকতার আর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের

জাপানের বর্ত্তমান প্রধানমন্ত্রী টোজো

ভাষায় জাপানের এই আক্রমণ—"provide the climax to a decade of international immorality."

জাপানের প্রথম আক্রমণের পদ্ধতি লক্ষ্য করিলে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রের সহিত সুদূর প্রাচীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা এবং সিঙ্গাপুরের উদ্দেশে প্রত্যক্ষ আক্রমণ পরিচালনের প্রাথমিক ব্যবস্থাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। জাপানী নৌবহর হাওয়াই, মিড্‌ওয়ে, ওয়েক্ ও গুয়াম আক্রমণ করিয়া মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রের সহিত ফিলিপাইন ও সিঙ্গাপুরের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে চাহিয়াছিল; থাইল্যাণ্ড আক্রমণ করিয়া সিঙ্গাপুরে প্রত্যক্ষ আক্রমণের প্রাথমিক ব্যবস্থা করিয়াছিল

ইতোমধ্যে গুয়াম জাপানীদিগের অধিকৃত হইয়াছে; অন্যান্য দ্বীপের অবস্থাও বিশেষ আশাপ্রদ নহে। থাইল্যাণ্ড জাপানের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে; এই দুইটি রাষ্ট্রে সামরিক চুক্তিও হইয়াছে। ইহার ফলে জাপানীদিগের অধিকারভুক্ত। ব্রহ্মদেশের সুদূর দক্ষিণে ভিক্টোরিয়া পয়েণ্টে জাপানীদিগের প্রবেশের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে; টেনাসেরিমে জাপানী বিমান বোমাবর্ষণ করিয়াছে; রেঙ্গুণে জাপানী বিমান পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে।

সুদূর প্রাচীর রণাঙ্গন
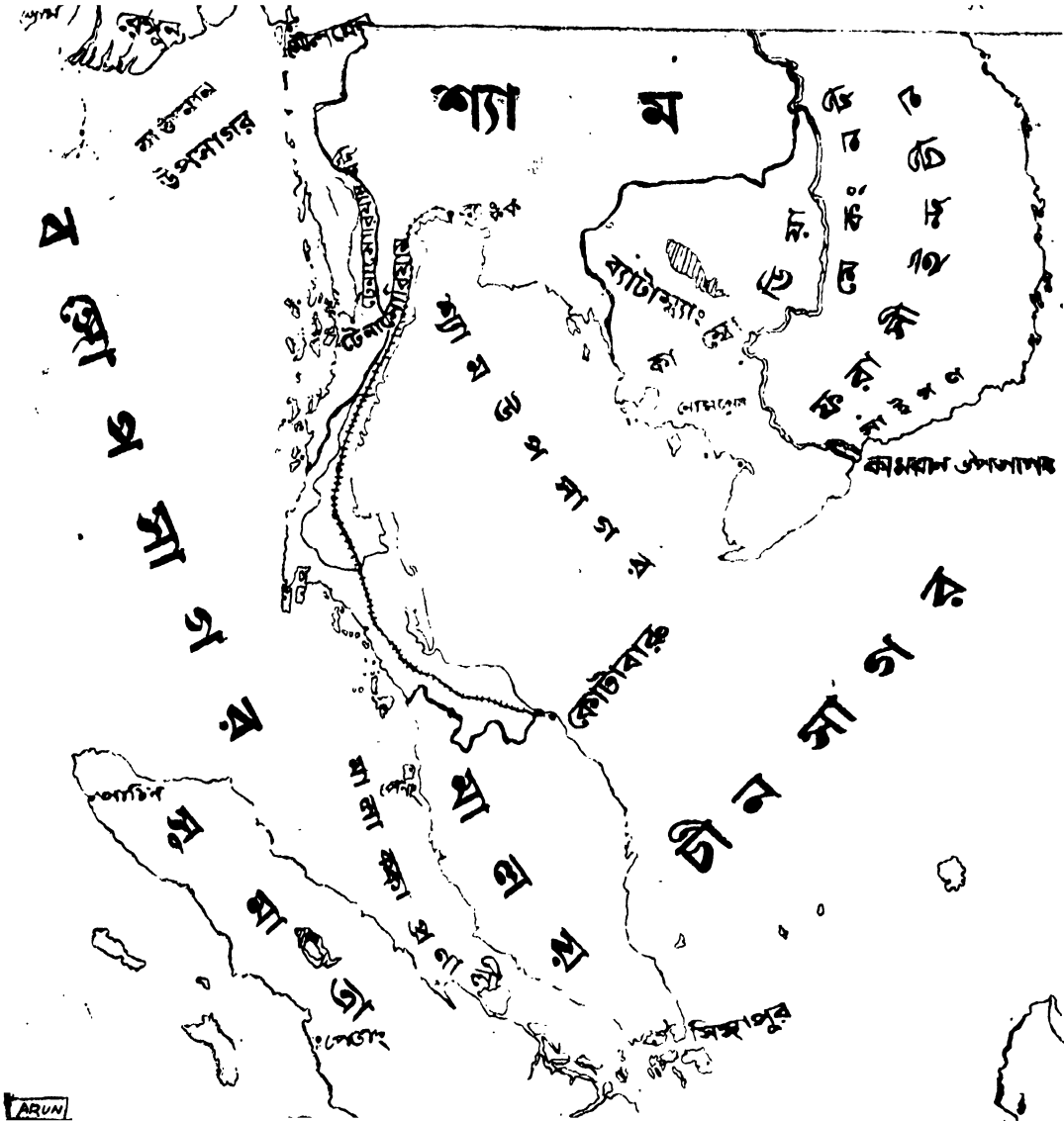
স্থলপথে মালয়ে আক্রমণ পরিচালন সহজসাধ্য হইয়াছে। সমুদ্রপথে কিছু জাপানী সৈন্য উত্তর-মালয়ে অবতরণ করিয়া কোটা-বাহারুর বিমানঘাঁটী অধিকার করিয়াছে; থাইল্যাণ্ড হইতে আগত একটি বাহিনী এখন কেদা অঞ্চলে জয়ী হইয়াছে। সমগ্র ওয়েলেসলী প্রদেশ এখন মালয়ের পূর্ব্ব-উপকূলে পেনাং দ্বীপে বৃটিশের একটি বিশাল বিমানঘাঁটী অবস্থিত; জাপানীদিগের হস্তে এই দ্বীপের পতন আসন্ন। পেনাং যদি জাপানের কুক্ষিগত হয়, তাহা হইলে সিঙ্গাপুরের সহিত ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের সংযোগ বিঘ্নসঙ্কুল হইবে। ওদিকে হংকং এবং ফিলিপাইন

দ্বীপপুঞ্জের লুজন্ দ্বীপে জাপানীদিগের প্রবল আক্রমণ চলিতেছে। হংকংএর নিকটবর্ত্তী কৌলুন্ আক্রমণকারী-দিগের অধিকারভুক্ত হইবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে; জাপানী সেনা হংকং অবরোধে প্রয়াসী। তাহারা উহার অধিকংশ অধিকারের দাবীও জানাইয়াছে। ফিলি-পাইনের লুজন্ দ্বীপের য়্যাপারি, ভিগান্ ও লেগাস্পিতে জাপানী সেনা অবতরণ করিয়াছে।

বর্ত্তমানে জাপানের আক্রমণ প্রধানতঃ মালয়, হংকং ও ফিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জে নিবদ্ধ। ব্রহ্মদেশের ভিক্টোরিয়া পয়েণ্ট অধিকার ও টেনাসেরিম্ আক্রমণ সিঙ্গাপুরের উদ্দেশে পরিচালিত যুদ্ধের অঙ্গ। জাপানীরা এখন ব্রহ্মদেশের সহিত সিঙ্গাপুরের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে চাহিতেছে, এবং থাইল্যাণ্ড-মালয় রেলপথে উত্তর-মালয়ে সরবরাহ-ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াসী হইয়াছে। ভিক্টোরিয়া পয়েণ্ট ও টেনাসেরিমে জাপানের অবহিত হইবার প্রধান কারণ ইহাই। মালয়ে যুদ্ধের অবস্থা আশাপ্রদ নহে। বিশেষতঃ যুদ্ধ আরম্ভ হইবার তিন দিন পরেই জাপানের আক্রমণে "প্রিন্স অফ্ ওয়েল্‌স্" ও "রিপাল্‌স্" নামক দুইখানি বিরাট্‌কায় বৃটিশ রণতরী মালয়ের উপকূলে বিনষ্ট হইয়াছে। এই দুইখানি রণতরীর ক্ষতি সুদূর প্রাচীর নৌযুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে। 'রয়টারের' নৌবিভাগীয় সংবাদদাতা জানান—It is not only a grievous loss to the British Navy but also a serious blow to the whole strategical position in the Far East. সমুদ্রবক্ষে বৃটেন এইরূপ দুর্ব্বল হইবার পর মালয়ের স্থল-যুদ্ধে জাপান বৃটিশের অপেক্ষা অধিক বিমান ও অন্যান্য সমরোপকরণ নিয়োগ করিয়াছে। থাইল্যাণ্ড-জাপান মৈত্রীর ফলেও এই অঞ্চলের সামরিক অবস্থা জাপানের অনুকূল হইয়াছে।
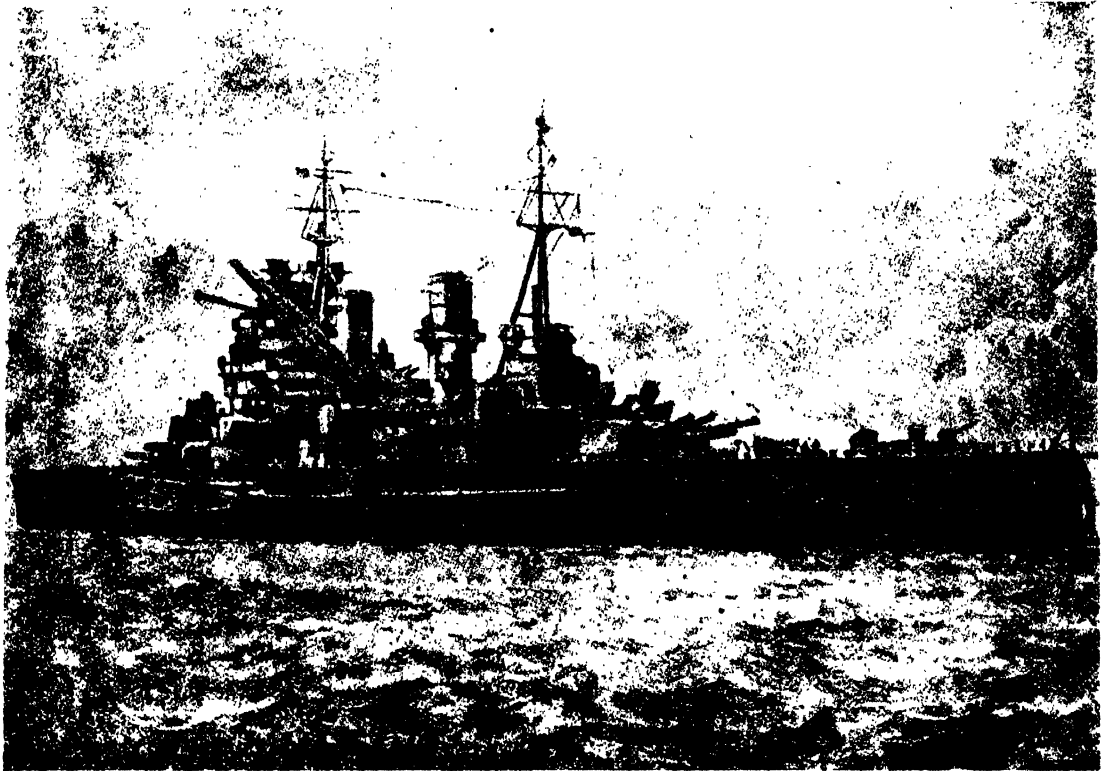
৩৫ হাজার টনের বৃটিশ রণতরী 'প্রিন্স অফ ওয়েলস' ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে কার্য্যভার প্রাপ্ত হয়; এই শ্রেণীর জাহাজ সমূহের মধ্যে ইহার শক্তি অসাধারণ ছিল; জাপানীরা মালয়ের উপকূলে ইহা ডুবাইয়া দিয়াছে

প্রশান্ত মহাসাগরের মার্কিণী ঘাঁটীগুলি বিপন্ন করিয়া জাপান সুদূর প্রাচীতে মার্কিণী সাহায্য আগমনে বিশেষ বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছে। তাহার পর, বৃটিশ নৌবহরের দুষ্পূরণীয় ক্ষতি এই অঞ্চলের অবস্থা আশঙ্কাজনক করিয়া তুলিয়াছে। এইরূপ অনুমান করা হইতেছে যে, বৃটিশ সৈন্য হয় ত সিঙ্গাপুরের দিকে পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য

হইবে। আপাততঃ পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে আগত ওলন্দাজ বিমান বৃটিশ বিমানবহরের কিছু শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে। অবিলম্বে যদি বৃটিশের বিমান-শক্তি আরও বর্দ্ধিত না হয়, তাহা হইলে অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিতে পারে।

হংকং ও ফিলিপাইনের লুজন্ দ্বীপে যদি জাপানের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে সিঙ্গাপুর ও ওলন্দাজ পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের দিকে জাপানী নৌবহরের গমন-পথ নির্ব্বিঘ্ন হইবে। এই জন্য জাপান এই দুইটি স্থানে প্রচণ্ড ব্রহ্ম-চীন সরবরাহ-সূত্র ছিন্ন করিবার প্রয়োজনও তাহার আছে। অবশ্য, ইতিমধ্যে জাপানী সেনা সারওয়াকের তৈলকূপগুলিতে অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হইয়াছে। লুবং ও মিরিতে জাপানী সেনা অবতরণ করিয়াছে এবং বৃটিশ সৈন্য ঐ সকল স্থান ত্যাগ করিয়াছে। মিরিতেই সারওয়াক্ অয়েল ফিল্ডস্ লিমিটেডের প্রধান কেন্দ্র অবস্থিত।

জাপান যুদ্ধরত হওয়ায় ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষ ভাবে যুদ্ধের সম্মুখীন হইয়াছে। সিঙ্গাপুরের যদি পতন হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষ বিশেষ ভাবেই বিপন্ন হইবে। তখন
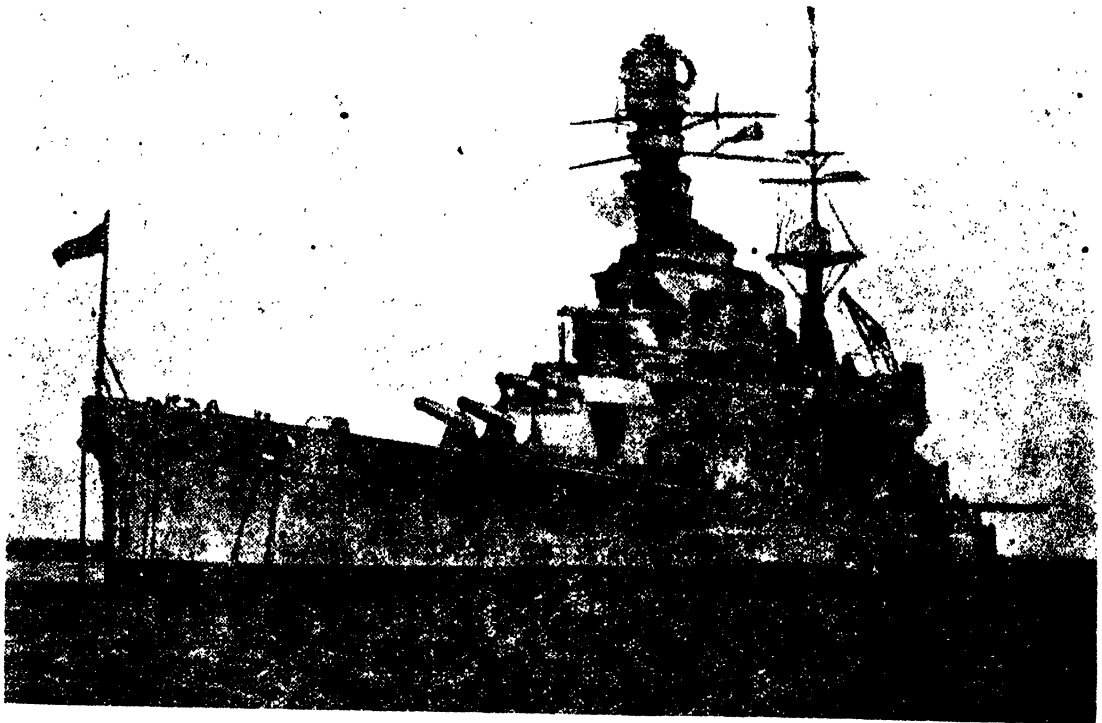
'রিপাল্‌স্' নামক ৩২ হাজার টনের বৃটিশ রণক্রুজার, ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে প্রস্তুত, এবং ১৯৩২—৩৬ খৃষ্টাব্দে পুনঃসংস্কৃত হয়; ইহা ১২০০ লোক দ্বারা পরিচালিত, ১৫ ইঞ্চি ফাঁদের ছয়টি কামানে সজ্জিত। ইহাও জাপানীরা ডুবাইয়া দিয়াছে

আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। সিঙ্গাপুরের ঘাঁটী পঙ্গু হইবার পূর্ব্বে জাপান ওলন্দাজ পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের দিকে অগ্রসর হইবে না বলিয়া মনে হয়। তবে, ইতোমধ্যে বৃটিশ-বোর্ণিওয় জাপানী সেনা অবতরণ করিয়াছে। সিঙ্গাপুর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইবার পরই জাপান হয় ত ব্রহ্মদেশের প্রতিও বিশেষ ভাবে অবহিত হইবে। সামরিক প্রয়োজনে যেমন সিঙ্গাপুর, হংকং ও ফিলিপাইন জাপানের সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, তেমনই সুদীর্ঘ সংগ্রাম পরিচালনে চাউল, পেট্রল, রবার এবং বিভিন্ন খনিজ পদার্থের জন্য ব্রহ্মদেশ ও পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ তাহার চাই-ই। ইহা ব্যতীত, ভারত মহাসাগরে জাপানী নৌবহর প্রবেশপথ পাইবে; ভারতবর্ষের বিশাল উপকূলে জাপানী অভিযান প্রতিরোধ করা দুষ্কর হইয়া উঠিবে। সিঙ্গাপুর-পতনের পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে বিপদের আশঙ্কা আছে। ব্রহ্মদেশের পূর্ব্বদিকে জাপান যে সকল ঘাঁটী লাভ করিয়াছে, সেখান হইতে বাঙ্গালা, আসাম প্রভৃতি স্থানে অনায়াসে বিমান-আক্রমণ পরিচালন সম্ভব। ব্রহ্মদেশের নিকটবর্ত্তী থাই-ল্যাণ্ডের চীঙ্গমাই হইতে কলিকাতার দূরত্ব মাত্র ৭ শত মাইল। ভারতবর্ষের সমর-প্রচেষ্টায় বিঘ্ন উৎপাদনের জন্য জাপানের পক্ষে ভারতবর্ষের বিভিন্ন কারখানায়, বড়

বড় সেতুতে, রেল-ষ্টেশনে এবং বন্দরে বিস্ফোরক বোমা-বর্ষণ খুবই সম্ভব। কারখানাগুলি বিধ্বস্ত হইলে সমরোপকরণ উৎপাদনে বিঘ্ন সৃষ্টি হইবে। সেতু, বন্দর ও রেল ধ্বংস হইলে সমরোপকরণ প্রেরণে বাধা উপস্থিত হইবে। ইহা ব্যতীত, জাপানের পক্ষে বেসামরিক অধিবাসীর মধ্যে আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খলা-সৃষ্টিতে প্রয়াসী হওয়াও সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে সে বড় বড় সহরে অগ্ন্যুৎপাদক বোমা নিক্ষেপ করিতে পারে। বে-সামরিক অধিবাসীর আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খলার ফলে সমর-প্রচেষ্টায় পরোক্ষে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়া সম্ভব।

তবে, জাপানের মজুত পেট্রোলের পরিমাণ অধিক নহে; প্রচুর পেট্রোল-উৎপাদক কোন অঞ্চলও তাহার অধিকারে নাই। এই জন্য দূরবর্ত্তী ঘাঁটী হইতে ভারত অভিমুখে বিমান প্রেরণে সে ইতস্ততঃ করিতে পারে। বিশেষতঃ, বোমাবর্ষী বিমানে পেট্রোলের ব্যয় অত্যন্ত অধিক। জাপান যে পেট্রোল ব্যয় সম্বন্ধে মিত-ব্যয়ী হইয়াছে, তাহা রেঙ্গুণ ও রেঙ্গুণ-লাসিও রেলপথের প্রতি তাহার স্বল্প মনোযোগ হইতেই প্রতীয়মান হয়। জাপান যুদ্ধে রত হইবার পরই চীনে বৈদেশিক সাহায্য প্রেরণ বন্ধ করিবার জন্য রেঙ্গুণ ও রেঙ্গুণ-লাসিও রেলপথ সর্ব্বাগ্রে বোমা-বিধ্বস্ত হইবার আশঙ্কা ছিল; কিন্তু জাপান এই দিকে এখনও অবহিত হয় নাই। টেনাসেরিমের কথা স্বতন্ত্র; আশু সামরিক প্রয়োজনে জাপান এই অঞ্চলে বোমাবর্ষণ করিয়াছে।

যত দূর মনে হয়—ভারতবর্ষের দিকে নিয়মিত ভাবে বিমানবহর প্রেরণের পূর্ব্বে জাপান ব্রহ্মদেশ অথবা পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের পেট্রোলে অধিকার স্থাপনের প্রয়াসী হইবে। ব্রহ্মদেশে অধিকার বিস্তৃত হইলে ভারতবর্ষ-আক্রমণের ঘাঁটীও নিকটবর্ত্তী হইবে। অবশ্য, আতঙ্ক-সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দুই-একখানি জাপানী বিমান যে-কোন সময়ে ভারতবর্ষের দিকে প্রেরিত হওয়া অসম্ভব নহে।

জাপান নিতান্ত বাধ্য হইয়া বর্ত্তমান যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে; তাহার পক্ষে যুদ্ধ-ঘোষণা ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। চীনের সহিত সাড়ে চারি বৎসর যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় জাপান এখন অন্তঃসারশূন্য; তাহার সামরিক মর্য্যাদাও ধূলিলুণ্ঠিত। তার পর, ইন্দো-চীনে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া সে বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কোপ-দৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিল। তাহাদের অবলম্বিত অর্থনীতিক ব্যবস্থা জাপানকে বিশেষ ভাবেই বিপন্ন করিয়াছে। অথচ, চীনে যদি প্রতীচ্য শক্তিবর্গের সাহায্য অবাধে প্রবেশ করিতে থাকে, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে চীনের যুদ্ধ মিটিবার সম্ভাবনা নাই। প্রতীচ্য শক্তিবর্গের সহিত স্বাভাবিক ব্যবসা-সম্বন্ধ পুনঃ-প্রবর্ত্তিত না হইলে চীনের যুদ্ধ যথাযথ পরিচালনও জাপানের পক্ষে অসম্ভব; কেবল ইন্দো-চীন তাহার সকল প্রয়োজন মিটাইতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় জাপানের স্বাভাবিক দাবী—"চীনে সাহায্য প্রেরণ বন্ধ কর; আমার সহিত পুনরায় ব্যবসা-সম্বন্ধ স্থাপন কর।" এই দাবীতে সম্মত হইলে বর্দ্ধিত শক্তি জাপানী সাম্রাজ্যবাদের সম্মুখে সুদূর প্রাচীর বৃটিশ ও মার্কিণী স্বার্থ নিরাপদ থাকিতে পারে না। কাজেই, স্বভাবতঃ এই দাবী অগ্রাহ্য হইয়াছে। জাপানও তাই নিরুপায় হইয়া নিজের অস্তিত্ব ও আত্মমর্য্যাদা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইবার পূর্ব্বে প্রাণপণ শক্তিতে উহা রক্ষার জন্য প্রয়াসী হইয়াছে। ইহা সত্যই তাহার পক্ষে জীবন-মৃত্যু সংগ্রাম।

ব্লাডিভোষ্টক বন্দর

জাপান ইচ্ছা করিয়াই সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতেছে। ইহার প্রধান কারণ, সাইবেরিয়ার ব্লাডিভোষ্টক অঞ্চল হইতে জাপানের দ্বৈপায়ন বাসভূমির কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহগুলি বিমান-আক্রমণে ভস্মীভূত হইতে পারে। জাপানের আকাঙ্ক্ষিত প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলিও দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। অবশ্য, শেষ পর্য্যন্ত রুশিয়া এই যুদ্ধের বাহিরে থাকিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। ইতিমধ্যেই বোমাবর্ষী মার্কিণী বিমান ব্লাডিভোষ্টক অঞ্চলে প্রেরণের কথা শুনা যাইতেছে। হয় ত

এই জন্যই আলেউটিয়ান্ দ্বীপপুঞ্জের নিকটে জাপানী নৌবহর তৎপর হইয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত পূর্ব্ব-রুশিয়ার সংযোগ বিঘ্নসঙ্কুল করিতে প্রয়াসী হইয়াছে।

মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ইটালী ও জার্ম্মাণী—

গত ১১ই ডিসেম্বর ইটালী ও জার্ম্মাণী মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে হিট্‌লার বলিয়াছেন—তাঁহারা মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রের সহিত বিরোধ এড়াইয়া চলিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ত্রিশক্তির চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে তাঁহারা জাপানের পক্ষাবলম্বনে বাধ্য হইতেছেন। হিট্‌লার বোধ হয় এই সর্ব্বপ্রথম স্বাক্ষরিক চুক্তির মর্য্যাদা রক্ষার কথা বলিলেন। কেবল চুক্তির মর্য্যাদা কেন—চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে তাঁহার বাধ্যবাধকতার অতিরিক্তই তিনি করিতেছেন। গত ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ২৭শে সেপ্টেম্বর বার্লিনে ইটালী, জার্ম্মাণী ও জাপান যে চুক্তি স্বাক্ষর করে, তাহার তৃতীয় অনুচ্ছেদের ভাষা এইরূপ—"The three contracting parties...undertake to support each other militarily, economically and politically with all the means in thier power in the event of any of them being attacked by a power not yet involved in the war with Great Britain or in the Sino-Japanese war." বর্ত্তমান ক্ষেত্রে জাপান নিজেই আক্রমণকারী ; কাজেই, এইরূপ অবস্থায় উল্লিখিত সর্ত্ত প্রযোজ্য হইতে পারে না।

সে যাহাই হউক, চুক্তির সর্ত্ত অথবা ভাষা বড় কথা নহে—স্বার্থ ও উদ্দেশ্যের দিক হইতে ফ্যাসিষ্ট শক্তির সহিত জাপানের মিলন যেমন স্বাভাবিক, সামরিক কারণে ইহাদিগের সহযোগিতাও তেমনি প্রয়োজনীয়। স্থলযুদ্ধে জার্ম্মাণী দুর্দ্ধর্ষ ; কিন্তু সে জলে নামিতে জানে না। ইটালীয় নৌবহর হিট্‌লারকে বিশেষ ভাবেই নিরাশ করিয়াছে। জার্ম্মাণ সাবমেরিণের গুপ্ত আক্রমণ প্রকৃত জলযুদ্ধ নহে। পক্ষান্তরে, স্থলযুদ্ধে জাপানের "দৌড়" চীনে শোচনীয় ভাবে প্রকট হইয়াছে। কিন্তু সমুদ্রবক্ষে তাহার শক্তি সম্বন্ধে দ্বিমত নাই। জলে ও স্থলে প্রচণ্ড যুদ্ধ-পরিচালনের জন্য এই দুই পক্ষের সামরিক মিলনের প্রয়োজনীয়তা হয় ত বহু পূর্ব্ব হইতেই উপলব্ধ হইতেছিল ; এখন সেই মিলন সম্পাদিত হইল।

বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-পরিচালনে জাপান ও ফ্যাসিস্ত শক্তিদ্বয়ের সহযোগিতা কিরূপ আকার ধারণ করিবে, তাহা হয় ত অনুমান করা যাইতে পারে। শীতকালে রুশ-রণক্ষেত্রে যুদ্ধ-পরিচালন জার্ম্মাণীর পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিতেছে ; ঐ অঞ্চলে সকল রণক্ষেত্রেই সে সম্প্রতি পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হইয়াছে। এই অঞ্চলে জার্ম্মাণ-বাহিনীকে সমগ্র শীতকাল আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত থাকিতে হইবে। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আক্রমণ পরিচালনও শীতকালে সম্ভব নহে। কাজেই, এখন বৃটেনের প্রাচ্য সাম্রাজ্যের প্রতি জার্ম্মাণীর অবহিত হওয়া স্বাভাবিক। এই মনোযোগ কি ভাবে এবং কোন্ দিক হইতে পতিত হইবে, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। তবে, ককেসাস্ অঞ্চলে নাৎসী-বাহিনীর অগ্রগতি প্রতিহত হওয়ায় তুরস্কের কথা স্বভাবত: মনে হয়। তুরস্কের সম্মতিতেই হউক, আর অসম্মতিতেই হউক—এই পথে পশ্চিম-এশিয়ার দিকে জার্ম্মাণ অভিযান আরম্ভ হইবার প্রবল সম্ভাবনা আছে। এই সময় জাপান প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরে বিশেষ ভাবে তৎপর হইয়া মধ্য-প্রাচীর সহিত ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ডের সংযোগ এবং এই সকল অঞ্চলের পারস্পরিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে প্রয়াসী হইবে। জাপানের এই তৎপরতায় রুশিয়ায় মিত্রশক্তির সাহায্য প্রবেশও অসম্ভব হইতে পারে। ইতোমধ্যে উত্তর-প্রশান্ত মহাসাগরে আলেউটিয়ান্ দ্বীপপুঞ্জের নিকট জাপানী রণতরীর উপস্থিতি ভ্লাডিভোষ্টকের পথ বিঘ্নাস্তীর্ণ করিয়াছে। জাপানী নৌবহর যদি ভারত মহাসাগরে প্রবেশপথ পায়, তাহা হইলে ইরাণের দ্বারও আর নিরাপদ থাকিবে না। অবশ্য যুদ্ধের এই বিস্তৃতির ফলে মিত্রশক্তির রুশিয়াকে সাহায্যদানের ক্ষমতা স্বভাবত: হ্রাস পাইবে।

আমেরিকার সহিত যুদ্ধে ফ্যাসিস্ত শক্তির পক্ষে জাপানের সমর-প্রচেষ্টায় স্থলপথে কোনরূপ সহযোগ সম্ভব নহে। তবে, আটলান্টিকে সাবমেরিণের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। এই উদ্দেশ্যে ফরাসী পশ্চিম-আফ্রিকা জার্ম্মাণীর প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইবে। আজোর্স কেপ্ ভার্ডী, ক্যানারী প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে হয় ত অতি সত্বর নাৎসী-পতাকা উড্ডীন করিবার চেষ্টা হইবে। এই ভাবে দক্ষিণ-আটলান্টিক বিঘ্নসঙ্কুল করিয়া জার্ম্মাণী মার্কিণী সামুদ্রিক বাণিজ্যে প্রবল বাধা দান করিবে ; দক্ষিণ আমেরিকা হইতে বৃটেনে কাঁচা মাল প্রবেশ অসম্ভব করিয়া তুলিবে। অবশ্য দক্ষিণ দিক্ হইতে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে প্রবেশপথ বহু পূর্ব্ব হইতেই বিঘ্নাস্তীর্ণ হইয়াছে। উত্তর-আটলান্টিকের পথই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ছিল ; আইস্ল্যাণ্ডে মার্কিণী ঘাঁটী স্থাপিত হইবার পর ঐ পথ আরও নিরাপদ হয়। জার্ম্মাণী এখন ঐ অঞ্চলে মার্কিণী নৌবহরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারে ; আইস্ল্যাণ্ডে প্রত্যক্ষ আক্রমণ পরিচালনে উদ্যোগী হওয়াও অসম্ভব নহে। বস্তুত:, আটলান্টিকে তৎপর হইয়া জার্ম্মাণী মার্কিণী নৌবহরকে ঐ অঞ্চলে বিশেষ ভাবে ব্যাপৃত রাখিতে প্রয়াসী হইবে এবং সর্ব্বোপরি, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের অবরোধের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

এই প্রসঙ্গে ভূমধ্য সাগরের কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। সম্প্রতি উত্তর-আফ্রিকায় জার্ম্মাণী যে সকল ফরাসী

ঘাঁটী লাভ করিয়াছে, তাহার সাহায্যে ইটালীয় নৌবহর পশ্চিম-ভূমধ্য সাগরে বৃটিশ নৌবাহিনীকে বিব্রত করিতে পারে। স্পেনের সহযোগিতায় জিব্রাল্টরে আক্রমণ চালিত হওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল। বৃটিশ নৌবাহিনীকে এই অঞ্চলে নিযুক্ত রাখিয়া জার্ম্মাণী আটলান্টিকে মার্কিনী নৌবহরের প্রতি মনোযোগী হইতে পারে। বৃটিশ ও মার্কিনী নৌবহর যদি পশ্চিম অঞ্চলে বিশেষ ভাবে ব্যাপৃত থাকে, তাহা হইলে জাপান উহাতে পরোক্ষে অত্যন্ত উপকৃত হইবে।

রুশ-রণক্ষেত্রে জার্ম্মাণীর পরাজয়—

রুশিয়ার উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্য-রণক্ষেত্রে সোভিয়েট বাহিনী সম্প্রতি বিশেষ সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে। রষ্টভ অঞ্চলে সেনাপতি ক্লাইষ্টের বাহিনী শোচনীয় ভাবে পরাজিত হইবার পর আজভ সাগরের তীর ধরিয়া বহু দূরে বিতাড়িত হইয়াছে। সোভিয়েট বাহিনী লেলিনগ্রাড-ভলগদা রেলপথের বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান টিকভিন্ পুনরধিকার করিয়া লেলিনগ্রাড অবরোধের প্রয়াস বিফল করিয়াছে। সম্প্রতি মস্কৌ অঞ্চলে জার্ম্মাণবাহিনী বিশাল পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হইয়াছে। সোভিয়েট সেনাদল ক্যালিনিন্ পুনরুদ্ধার করিয়াছে। মস্কৌ-লেনিনগ্রাড সংযোগ পুনরায় স্থাপিত

জার্ম্মাণীর বিমান আক্রমণের পর সোভিয়েট বাহিনীর সরবরাহ-শকট

পূর্ব্ব-রণক্ষেত্রে জার্ম্মাণদিগের সাম্প্রতিক ব্যর্থতার প্রথম কারণ—রুশিয়ার প্রচণ্ড শীত। এই শীতে যথাযথ বিমান-যুদ্ধ পরিচালন অসাধ্য; ট্যাঙ্ক পরিচালনও দুঃসাধ্য। তার পর, শীতকালে রুশিয়ার যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকিবার জন্য জার্ম্মাণী পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হয় নাই। পরে, শীত আসন্ন হওয়ায় সে দ্রুত কিছু আয়োজন করিয়াছিল। পক্ষান্তরে ফিন্ল্যাণ্ডের যুদ্ধে সোভিয়েট সেনাপতিগণ শীতকালীন সমর-প্রচেষ্টার অসুবিধা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেন এবং রুশ সামরিক বিভাগের এই দৌর্ব্বল্য দূর করিবার জন্য বহু-পরিকর হন। কিছু দিন পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল—সেনাপতি ঝুচারের নেতৃত্বে রুশিয়ার সৈন্য-বাহিনী শিক্ষা লাভ করিতেছিল।

তাহার পর হিটলার হয় ত বর্ত্তমান ঋতুর প্রাকৃতিক অসুবিধার জন্য রুশিয়ায় সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগে বিরত আছেন। এই ঋতুতে কোন প্রকারে সোভিয়েট বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া যাওয়াই হয় ত তাঁহার উদ্দেশ্য। অবশ্য, এই প্রতিরোধ-প্রচেষ্টা বিফল হইবার সংবাদই পুনঃ পুনঃ পাওয়া যাইতেছে, এই অঞ্চলে যদি বিরাট পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে, তাহা হইলে সৈন্য ও সমরোপকরণ ক্ষয় উপেক্ষা করিয়াই তিনি বিশেষ শক্তি প্রয়োগে বাধ্য হইবেন। এইরূপ অবস্থার উদ্ভব যদি না হয়, তাহা হইলে শীতকালে জার্ম্মাণীর বিশেষ মনোযোগ অন্য দিকে নিবদ্ধ থাকাই সম্ভব। এই সম্পর্কিত অনুমান পূর্ব্বেই ব্যক্ত হইয়াছে।

বর্ত্তমানে কোন কোন সূত্র হইতে সোভিয়েট-জার্ম্মাণ সন্ধির জনরব শুনা যাইতেছে। এই জনরবে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত জার্ম্মাণীর যে যুদ্ধ, ইহা স্বার্থের দ্বন্দ্ব নহে—আদর্শের সঙ্ঘর্ষ। কাজেই, রণক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত হইবার পূর্ব্বে এই সঙ্ঘর্ষের অবসান অসম্ভব। রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধ মিটিবার পূর্ব্বে সুস্পষ্ট

সিদ্ধান্ত হওয়া প্রয়োজন—জগতে নাৎসীবাদ থাকিবে, না সাম্যবাদ থাকিবে।

জার্ম্মাণী সোভিয়েট রুশিয়ার যত দূর অধিকার করিয়াছে, তাহাতে কম্যুনিষ্ট-রাষ্ট্র দুর্ব্বল হইলেও পঙ্গু হয় নাই। তাহার সংগ্রাম-শক্তি এখনও নাৎসী জার্ম্মাণীতে আশঙ্কা সৃষ্টি করিতেছে; কাজেই, এইরূপ অবস্থায় কম্যুনিষ্ট-রাষ্ট্রকে পুনরায় শক্তিবৃদ্ধির সুযোগ দিয়া জার্ম্মাণী বিশ্ব-সংগ্রামের অনিশ্চিত ফলাফলের পশ্চাতে ছুটিবে কিরূপে? ক্ষুণ্ণ-শক্তি নাৎসী-জার্ম্মাণীকে কম্যুনিষ্ট-রাষ্ট্র যাহাতে পর্য্যুদস্ত করিতে না পারে, তদুদ্দেশ্যেই হিট্‌লার রুশিয়া আক্রমণের "কঠোরতম" সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই আশঙ্কা এখনও দূরীভূত হয় নাই। কাজেই জার্ম্মাণীর দিক্ হইতে বর্ত্তমান অবস্থায় রুশিয়ার সহিত সন্ধি স্থাপনের কথা উঠিতেই পারে না। আর রুশিয়ার দিক হইতে বলা যায়—রুশ রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় ইউক্রেণ ত্যাগ করিয়া এবং লেনিনগ্রাড অঞ্চলের শ্রমশিল্পে বঞ্চিত হইয়া কম্যুনিষ্ট-রাষ্ট্র নাৎসী-জার্ম্মাণীর সহিত সন্ধি-স্থাপনের কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না। সোভিয়েট রুশিয়ার পক্ষে এই ভাবে নাৎসী-জার্ম্মাণীর শক্তিবৃদ্ধি করিয়া কখনও আপনাকে নিরাপদ মনে করা সম্ভব নহে। পুনরায় সুযোগ পাইবামাত্র নাৎসী-জার্ম্মাণী যে কম্যুনিষ্ট-রাষ্ট্রের শ্বাসরোধে প্রবৃত্ত হইবে—ইহা নিশ্চিত।

সর্ব্বোপরি সোভিয়েট রুশিয়া ধনিকশাসিত রাষ্ট্র নহে; মুষ্টিমেয় ধনিকের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে আরব্ধ যুদ্ধে মূক জনসাধারণ স্বাদেশিকতার স্তোকবাক্যে ভুলিয়া তথায় রণক্ষেত্রে প্রাণ দিতে যায় না। ধনবণ্টন-ব্যবস্থায় রুশিয়া যেমন সাম্যবাদী, তেমনই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রুশিয়া প্রকৃত গণতান্ত্রিক দেশ—জনসাধারণই সেখানে রাষ্ট্রের কর্ণধার। এই জনসাধারণের মধ্য হইতে যে অগণিত যুবক ধরাবক্ষে শায়িত হইয়াছে, এবং এখনও যাহারা নাৎসী পশুদিগের হস্তে বর্ব্বরোচিত অত্যাচার সহিতেছে, তাহাদিগের কথা রুশিয়ার রাষ্ট্রনায়কদিগের পক্ষে বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নহে। সে দেশের রাষ্ট্রনায়করা জনসাধারণের মধ্য হইতেই উদ্ভূত—তাহারা "ছোট লোকের" সহিত সযত্ন পার্থক-রক্ষিত শ্রেণী-বিশেষের অন্তর্ভুক্ত নহে।

ভস্মীভূত রুশ-পল্লী

লিবিয়ার যুদ্ধ—

লিবিয়ার যুদ্ধ অপেক্ষাকৃত গুরুত্বহীন। সেনাপতি অচিনলেক যে পরিকল্পনা অনুযায়ী যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা সফল না হইলেও এই অঞ্চলে যুদ্ধের অবস্থা এখনও বৃটেনের অনুকূল। তবে সমগ্র মধ্য-প্রাচী সম্পর্কে হিট্‌লারের গূঢ় অভিসন্ধি সত্বর প্রকাশ পাইতে পারে, এবং তাহার ফলে আফ্রিকায় যুদ্ধের অবস্থা নূতন রূপ ধারণ করা অসম্ভব নহে।

শ্রীঅতুল দত্ত।

নূতন সচিব-সঙ্ঘ

বাঙ্গালা সরকারের ভূতপূর্ব্ব সচিবগণের অভিনয়-ভঙ্গিতে একযোগে পদত্যাগের পর প্রধান-সচিব মিঃ ফজলুল হক প্রোগেসিভ কোয়ালিসন দল (প্রগতিশীল সম্মিলিত) নামক যে দল সংগঠন করেন, তাহা—

(১) পরিষদের প্রগতিশীল দল; (২) কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দল (শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর নেতৃত্বাধীন); (৩) জাতীয় কৃষক-প্রজাদল; (৪) তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র দল; (৫) এবং তিন জন এংলো-ইণ্ডিয়ান সদস্য ও অন্যান্য কয়েক জন সদস্যকে লইয়া গঠিত হইলে জানা যায়, এই প্রগতিশীল কোয়ালিশন দলে ১৩৪ জন সদস্য যোগদান করেন, ইহার পরও কোন কোন সদস্য এই দলের সমর্থন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে লীগদলেরও সদস্য আছেন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর নেতৃত্বের প্রভাবে ও অক্লান্ত চেষ্টায় হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলনে এই প্রোগেসিভ কোয়ালিশন দল সংগঠন করা সম্ভব হইয়াছে। সচিবসঙ্ঘ-সংগঠন ব্যাপারে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা আর কিছুই হইতে পারিত না।

মিঃ ফজলুল হক কর্ত্তৃক নূতন সচিব-সঙ্ঘ সংগঠনের ঘোষণা প্রচারিত হইলে মিঃ ফজলুল হক তাঁহার স্বদেশবাসীর উদ্দেশ্যে যে বাণী প্রচার করেন, তাহার মর্ম্ম এই—

"জাতীয় সঙ্কটের এই চরম মুহূর্ত্তে আমি জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল দেশবাসীকে আমাদিগের সমর্থনের জন্য, এবং বাঙ্গালার উন্নতি, সুখ ও সংহতির নিমিত্ত আমরা যাহাতে আমাদিগের আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার উপযোগী শক্তি ও সাহস পাই, তাহার জন্য, আমাদিগকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতেছি। আমি আশা করি যে, আমার অনুরোধ প্রত্যেক বাঙ্গালীর অন্তর স্পর্শ করিবে।"

মিঃ ফজলুল হক যে ভাবে সুদীর্ঘ কাল সচিব-সঙ্ঘ পরিচালনে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা সম্প্রদায়-বিশেষের পক্ষে কিরূপ ক্ষোভজনক ও অনিষ্টকর হইয়াছিল, ইহা দেশের লোকের অজ্ঞাত নহে; কিন্তু নাটকের শেষ অঙ্কের পর যবনিকার ন্যায় সমগ্র সচিব-সঙ্ঘের পতন হইলে মিঃ হক যে সুদীর্ঘ বিবৃতিতে চারি বর্ষাধিক কালের কীর্ত্তি-কাহিনী প্রকাশ করিয়া আত্মসমর্থনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা পাঠে লোকের ধারণা হইয়াছে, তাঁহার অজ্ঞাতসারে এবং অসম্মতিতে অনেক অন্যায় কার্য্য পরিষদে প্রশ্রয় পাইয়াছিল। আমরা আশা করি, নব-গঠিত সচিবসঙ্ঘ অতীতের ভুল-ভ্রান্তি হইতে মুক্তিলাভ করিবেন।

মিঃ ফজলুল হক, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও ঢাকার নবাব খাজা হবিবুল্লা বাহাদুর—হিন্দু-মুসলমান সমাজের এই দুই মাথা লইয়া সচিবসঙ্ঘ সংগঠন করিলে গবর্ণর (১) শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসু (২) খান বাহাদুর আবদুল করিম (৩) শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (৪) খান বাহাদুর মৌলবী হাসেন আলি খান (৫) মিঃ সামসুদ্দিন আহমেদ এবং (৬) শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ এই ছয় জনকে নূতন সচিব নিযুক্ত করিয়াছেন। এই নয় জন সচিবের কে কোন্ কোন্ বিভাগের ভার পাইয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল—

(১) মিঃ এ, কে, ফজলুল হক—প্রধান-সচিব, স্বরাষ্ট্র ও প্রচার বিভাগ।

(২) ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—অর্থ বিভাগ।

(৩) নবাব খাজা হবিবুল্লা বাহাদুর—কৃষি ও শ্রমশিল্প বিভাগ।

(৪) শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসু—স্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগ।

(৫) খান বাহাদুর আবদুল করিম—শিক্ষা, বাণিজ্য, ও শ্রম বিভাগ।

(৬) শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—আইন ও ব্যবস্থা বিভাগ।

(৭) খান বাহাদুর মৌলভি হাসেন আলি খান—সমবায় ঋণ ও গ্রামাঞ্চলের ঋণ-সম্পর্কিত বিভাগ।

(৮) মিঃ সামসুদ্দীন আহমেদ—পূর্ত্ত বিভাগ।

(৯) শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ—বন ও আবগারী বিভাগ।

শেষোক্ত সচিব ব্যতীত অন্য সকলেই পাঠকগণের সুপরিচিত। শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ জলপাইগুড়ির উকিল। অন্যান্য সচিবগণের সম্বন্ধে এইমাত্র বলিতে পারা যায়, যাঁহার যে বিষয়ের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহাকেই সেই বিষয়ের ভার প্রদত্ত হইয়াছে। ইঁহাদের ভবিষ্যৎ কার্য্য-প্রণালী সকলেই সাগ্রহে লক্ষ্য করিবেন। আমরা আশা করি, অতঃপর আপত্তিজনক ও প্রতিক্রিয়াশীল বিলগুলি পরিত্যক্ত হইবে। এবার সচিব-সঙ্ঘে সাম্প্রদায়িকতাবাদী খাজা সার নাজিমুদ্দীনের স্থান না হওয়ায় অনেকেরই দুঃখ হইয়াছে। সার নাজিমুদ্দীন বিরোধী দলের নেতা হইয়াছেন। উক্ত নয় জন ব্যতীত আরও কয়েক জন সচিব নিযুক্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। শ্রীযুত

শরৎচন্দ্র বসু আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও সচিব-সঙ্ঘে যোগদান করিতে সম্মত ছিলেন ; কিন্তু পূর্ণ সচিব-সঙ্ঘ সংগঠনের পূর্ব্বেই তিনি সম্পূর্ণ অতর্কিত ভাবে ভারত সরকারের আদেশে আটক হওয়ায় তাঁহার এই সাধু ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর গ্রেপ্তার

নূতন সচিব-সঙ্ঘে যে দিন শরৎচন্দ্রের আইন ও শৃঙ্খলা বিভাগের ভার গ্রহণ করিবার কথা, নানা ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও যখন তিনি সচিব-সঙ্ঘে যোগদানের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তাহার ঠিক পূর্ব্বদিন ভারত সরকারের আদেশে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সে সময় বড়লাট দিল্লীতে না থাকিলেও ভারত সরকার শরৎচন্দ্রের গ্রেপ্তার সম্পর্কে যে বিবৃতি প্রচার করেন, তাহাতে প্রকাশ—

ভারত সরকারের এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই যে, শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর সহিত জাপানীদিগের যেরূপ যোগ ঘটিয়াছে, তাহাতে অবিলম্বে তাঁহাকে বন্দী করা প্রয়োজন। সেই জন্য ভারত সরকার ভারতরক্ষা আইনের নিয়মবলে তাঁহাকে আটক রাখিবার জন্য আদেশ প্রচার করিয়াছেন।

২৫শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে শরৎচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করিয়া সেই দিন রাত্রির জন্য তাঁহাকে তাঁহার বাসভবনেই রাখা হইয়াছিল। পরদিন শুক্রবার পূর্ব্বাহ্নে তাঁহাকে (আলিপুরের) প্রেসিডেন্সী জেলে প্রেরণ করা হয়। পুলিশের ডেপুটি কমিশনর মিঃ জে জানব্রিন ঐ দিন প্রভাত ৯টা'র কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে শরৎচন্দ্রের উডবার্ণ পার্কের বাড়ীতে আসিয়া তাঁহাকে জেলে লইয়া যান। সেই দিন মধ্যাহ্নে মিঃ ফজলুল হক, শ্রীযুত ডক্টর শ্যামা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ও নবাব খাজা হবিবুল্লা এই সহযোগি-সচিবদ্বয় সহ প্রেসিডেন্সী জেলে শরৎচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

২৬শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে একটি বিশেষ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সেই প্রস্তাবে বাঙ্গালা সরকারকে ভারতরক্ষা বিধি অনুসারে আটক শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর অবিলম্বে মুক্তির জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থাই করিতে বলা হইয়াছে। শ্রীযুত সন্তোষ-কুমার বসু এই প্রস্তাব করিলে শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায় তাহার সমর্থন করেন, এবং প্রস্তাবটি পরিষদে গৃহীত হয়।

শরৎচন্দ্রের সচিব-সঙ্ঘে যোগদানে য়ুরোপীয় দলের, এবং বাঙ্গালার ধরাশায়ী সচিব-সঙ্ঘের প্রতিক্রিয়াশীল দলেরও আপত্তি ছিল। বস্তুতঃ, রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাঁহার শত্রুর অভাব ছিল না ; কিন্তু একটি বিষয় বিশেষ বিবেচ্য। যদি বাঙ্গালার লাট সার জন হার্বার্টকে না জানাইয়া, এবং তাঁহার বিনা-অনুমোদনে ভারত সরকার শরৎচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাতে সার জনের কি আপত্তির কোন কারণ নাই ? ইহাতে কি প্রাদেশিক শাসকের অভিমতের মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে ? সরকার হয় শরৎচন্দ্রের অপরাধ সপ্রমাণ করুন, না পারেন, তাঁহাকে অবিলম্বে মুক্তিদান করুন, আজ নিখিলবঙ্গ মিলিত কণ্ঠে এই দাবীই জানাইতেছে ; ইহা ভিন্ন অন্য পথ নাই।

আসাম সচিবসঙ্ঘের পদত্যাগ

আসামের প্রধান-সচিব সার মহম্মদ সাদুল্লা তাঁহার সচিবসঙ্ঘের পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিলে আসামের গভর্ণর ভূতপূর্ব্ব প্রধান-মন্ত্রী শ্রীযুত গোপীনাথ বরদলইকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করেন ; তদনুসারে শ্রীযুত বরদলই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। গভর্ণর সচিব শ্রীযুত রোহিণীকুমার চৌধুরীর পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করিয়াছেন। আসামের গভর্ণরের সেক্রেটারী ১৮ই ডিসেম্বর এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন, যত দিন অন্য ব্যবস্থা না-হইতেছে, তত দিন আসামের সচিবসঙ্ঘ (পদত্যাগ করিলেও) কাজ করিতে থাকিবেন। সচিব শ্রীযুত রোহিণীকুমার চৌধুরী গত ৯ই ডিসেম্বর প্রধান-সচিবকে তাঁহার পদত্যাগ-পত্র দিয়াছেন, তিনি আর সচিব নহেন। এখন কথা এই—আসামের প্রধান-সচিব তাঁহার সচিব-সঙ্ঘের পদত্যাগ পত্র দাখিল করিয়াছেন, শ্রীযুত রোহিণী-কুমার চৌধুরীও পদত্যাগ-পত্র দাখিল করেন ; কিন্তু গভর্ণর তাঁহার পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহার সেক্রেটারী ঘোষণা করিলেন, তিনি আর সচিব নহেন ; অথচ প্রধান-সচিব সার মহম্মদ সাদুল্লা তাঁহার সচিবসঙ্ঘের পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিলেও অন্য ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে কাজ করিতে অনুরোধ করা হইল। শ্রীযুত রোহিণীকুমার চৌধুরী সম্বন্ধে এক যাত্রার পৃথক্ ফল হইবার কারণ কি ?

রাজনীতিক সমস্যা সমাধানে মিঃ এনির আবেদন

প্রবাসী ভারতীয় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য শ্রীযুত এনি ৩রা পৌষ বোম্বাই কাওয়াসজি জাহাঙ্গীর হলের এক সভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ভারতের বিভিন্ন রাজনীতিক দলকে বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁহাদের ভাবগতি স্থির করিতে অনুরোধ করিয়া বলিয়া-ছেন, এ বিষয়ে আর বিলম্ব করিবার সময় নাই। পূর্ণ স্বরাজ অর্জ্জনের ব্যাপারে তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত এখন ও পরে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে, তৎপ্রতি

লক্ষ্য রাখিয়া কংগ্রেসকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সহযোগিতার জন্য কোন মূলনীতি বিসর্জ্জনের প্রয়োজন নাই। আমরা যদি সপ্রমাণ করিতে পারি যে, বিভিন্ন দলের সাহায্যে গঠিত মন্ত্রিসভা ও শাসন-পরিষদের সাহায্যে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রী শাসনকার্য্য সুচারুরূপে পরিচালিত হইতে পারে, তাহা হইলে হিন্দু-মুসলমানের মতভেদ ও সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার অজুহাতে আর ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রদানে আপত্তি করা চলিবে না। উড়িষ্যার সচিব-সঙ্ঘ গঠন ও বাঙ্গালার মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন হইতে বুঝা যায়, জনমতও পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই পরিবর্ত্তন ভালর দিকে।

শ্রীযুত এনি আশা করিয়াছেন, প্রদেশগুলিতে গভর্ণর-দিগের শাসনের প্রয়োজন যাহাতে দূর হয়, ভারতীয় নেতৃবৃন্দ অদূর ভবিষ্যতে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। ইহা সম্ভব হইলে যুদ্ধান্তে আমাদিগের লক্ষ্যপথে যাত্রা কেহই রোধ করিতে পারিবে না। কিন্তু মিঃ এনি ছায়াকে কায়া বলিয়া ভ্রম করিয়া কি আমাদিগের লক্ষ্য-পথে যাত্রার সাফল্যের স্বপ্নই দেখিতেছেন না? ভারত সরকার কি কোন দিন তাঁহাদের ক্ষমতা ত্যাগে সম্মত হইবেন?

মিঃ জিন্নার ক্রোধ

মিঃ জিন্না আশা করিয়াছিলেন মিঃ ফজলুল হক তাঁহার আদেশ পালন করিবেন, এবং খাজা সার নাজিমুদ্দীন-কোম্পানীর অনুগত হইয়া ব্যবস্থা-পরিষদে বিরোধীদলের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিবেন না; সাম্প্রদায়িকতাই জয়লাভ করিয়া হিন্দুদিগকে পদানত করিয়া রাখিবে; কিন্তু মিঃ জিন্নার এই আশা বিফল হওয়ায় তিনি ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া মিঃ হককে দংশন করিয়াছেন। তিনি মিঃ ফজলুল হককে যে তার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার শিষ্টাচারের মুখোস কি ভাবে খসিয়া পড়িয়াছে দেখুন,—

"আপনার ৭ই তারিখের তার পাইয়াছি। আপনার আচরণকে বিশ্বাসঘাতকতা বলা যাইতে পারে।...আপনি আমাকে অথবা নিঃ ভাঃ মোসলেম লীগের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিকে পূর্ব্বে কিছু না জানাইয়া প্রাদেশিক লীগ ও উহার সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিয়াছেন। একটি সম্মিলিত দল গঠন করিয়াছেন।...আপনি প্রাদেশিক লীগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মোসলেম-লীগদলে যোগদান করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। আপনি পরিষদের বিরোধী দলগুলির সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া পূর্ব্বোক্ত কোয়ালিশনদলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন।...আপনি দশ দিনের মধ্যে কৈফিয়ৎ পাঠাইবেন, অন্যথা আপনার সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিব।"—'ব্যবস্থা অবলম্বনের' অর্থ লীগ হইতে বিতাড়িত করা। যেহেতু 'মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্য্যন্ত।'

এ যেন কোন জমিদারের নায়েব তাহার অধীন চোদ্দ-শিকে বেতনের গোমস্তার নিকট তাহার অপকার্য্যের জন্য কৈফিয়ৎ চাহিতেছে! মিঃ হক উত্তরে ঐ প্রকার অভদ্রতা প্রকাশ করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু প্রভুর এই ধমকানিতে সঙ্কল্প ত্যাগ করেন নাই; তাঁহার এই সাহস প্রশংসনীয়। বাঙ্গালার শিক্ষিত মুসলমান সমাজ তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন না, এ আশা তিনি অবশ্যই করিতে পারেন।

বঙ্গদেশ সঙ্কটমণ্ডল

সুদূর প্রাচীতে সংপ্রতি যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে সমগ্র বঙ্গদেশ অবিলম্বে সঙ্কট অঞ্চলরূপে ঘোষিত হইতেছে।

সকল সরকারী আফিস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে মূল্যবান্ কাগজপত্র রক্ষা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিতে এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বন্দোবস্ত করিতে নির্দ্দেশ-দান করা হইতেছে।

সরকার কলিকাতার হাসপাতাল সমূহের উপর এই মর্ম্মে এক সার্কুলার জারি করিয়াছেন যে, জরুরী অবস্থার জন্য জেনারল ওয়ার্ডের ও কেবিনের শতকরা ৫০ জন রোগী ছাড়িয়া দিতে হইবে, এবং যতখানি স্থান সম্ভব পৃথক্ করিয়া রাখিতে হইবে। তদনুসারে গত ১২ই ডিসেম্বর হইতে রোগীদিগকে বিদায় করা হইতেছে। শুনা গিয়াছে, উহার ফলে জরুরি অবস্থার জন্য দেড় হাজার 'বেড' রক্ষিত হইবে। চারিদিকেই সাজ-সাজ রব!' ইহাতে কলিকাতার জনসাধারণের আতঙ্ক বর্দ্ধিত হইয়াছে, এবং হাওড়া ও শিয়ালদহ ষ্টেশনে পলায়নোন্মুখ নরনারীর সংখ্যা এতই অধিক হইয়াছে যে, ট্রেণসমূহে তাহাদের স্থান সঙ্কুলান করা দুরূহ হওয়ায় কর্ত্তৃপক্ষকে গাড়ী ও ট্রেণ উভয়েরই সংখ্যা বর্দ্ধিত করিতে হইয়াছে; কিন্তু নানাপ্রকার ভীতিপ্রদ অমূলক জনরব প্রচারিত হওয়ায় অশিক্ষিত জনসাধারণের আতঙ্ক দিন-দিন বর্দ্ধিতই হইতেছে। অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কর্ম্মস্থল কলিকাতা ত্যাগ করিয়া পল্লীগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করিলে কি উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে, তাহা চিন্তা না করিয়াই প্রাণভয়ে স্থায়ী আশ্রয় ত্যাগ করায় অনেকে সপরিবারে বিপন্ন হইতেছে। শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, পল্লীগ্রামে মাসিক পাঁচ টাকা ভাড়া দিয়া যে সব বাসা কেহ লইত না, তাহাদের ভাড়া এখন পনের কুড়ি টাকা হইয়াছে, এবং তাহাও দুষ্প্রাপ্য! এইরূপ হুজুগে ক্ষতিই হইবে।

সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিজম

বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য প্রতিষ্ঠিত বৃটিশ এসোসিয়েসনের সভাপতি সার রিচার্ড গ্রেগরীর নিকট আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় যে খোলা চিঠি প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

সংপ্রতি লণ্ডনে বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য প্রতিষ্ঠিত বৃটিশ এসোসিয়েসনের সভায় বিজ্ঞানের সহিত সমাজের সম্বন্ধ সম্পর্কে সকলে যেরূপ মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, ভারতের বৈজ্ঞানিকগণ তাহা লক্ষ্য করিয়া আনন্দিত। ...কয়েক বৎসরের মধ্যে য়ুরোপে যুযুৎসু ফ্যাসিজমের অভুত্থান, এবং তাহার ফলে যে নৈতিক, সামাজিক ও মানসিক উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই যে সভায় আলোচনা চলিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ অন্যান্য দেশের বৈজ্ঞানিকগণকে জানাইতে চাহেন যে, মানব-সমাজের কল্যাণসাধনই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য কেবল ফ্যাসিষ্ট মতবাদের দ্বারাই নহে, ভারতে এবং বৃটেনের অধীন অন্যান্য দেশে সাম্রাজ্যবাদ অনুসারে যে ভাবে কাজ চলে, তাহার দ্বারাও সমান ভাবে ব্যর্থ হয়। বর্ত্তমান যুগে শ্রমশিল্পের বিস্তার-সাধন জাতির সমৃদ্ধি ও শক্তির পক্ষে অপরিহার্য্য, তাহাতে ক্রমাগত বাধাদান করা হইতেছে।...দুই শত বৎসর বৃটিশ-শাসনের পরও দেশের শতকরা ৯০ জন নিরক্ষর। গড়ে বার্ষিক আয় পাঁচ পাউণ্ডের এবং লোকের আয়ু সাধারণতঃ ২৫ বৎসরের অধিক নহে। ভারতের অতি সামান্য অংশ শ্রমশিল্প-প্রধান।

বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রী সুস্পষ্ট ভাবে জানাইয়া দিয়াছেন, জার্ম্মাণরা যে সকল দেশ গ্রাস করিয়াছে, আটল্যাণ্টিকের ঘোষণা কেবল সেই সকল দেশ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। বৃটিশরা পূর্ব্বে যে সকল দেশ গ্রাস করিয়াছে, সে সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের লিপ্সাই জার্ম্মাণ ফ্যাসিজমের ক্ষুধা তীব্রতর হইবার অন্যতম কারণ।... ন্যায় ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে সমাজের বিজ্ঞানসম্মত পুনর্গঠন ব্যাপারে কোন ভৌগোলিক সীমা থাকা উচিত নহে। জগতের সকল স্থানের বৈজ্ঞানিকগণ যেন এই মত প্রকাশ করেন, ইহাই আমাদের অনুরোধ। আশা করি, আপনারাও বিশ্বাস করেন যে, আধুনিক জগতে মনুষ্যের স্বাধীনতা, প্রগতি ও সুখশান্তির সমস্যা অবিভাজ্য।

আমাদের বিশ্বাস—আচার্য্য রায়ের এই মন্তব্য অরণ্যে রোদন ভিন্ন আর কিছুই নহে। উচ্চ আদর্শ এক কথা, স্বার্থত্যাগ অন্য কথা। যুক্তি-তর্ক দ্বারা পণ্ডিত লোককেও সকল সময় স্বার্থত্যাগে বাধ্য করা যায় না; বিশেষতঃ, সেই জাতির কল্যাণ যদি সেই স্বার্থের উপর নির্ভর করে।

দেশরক্ষার দৈনিক ব্যয়

গত ৩রা অগ্রহায়ণ বুধবার রাষ্ট্রীয় পরিষদে রাজা যুবরাজ দত্তসিংএর প্রশ্নের উত্তরে ভারত সরকারের অর্থবিভাগের সেক্রেটারী মিঃ সি, ই, জোন্স বলেন, দেশরক্ষার বিভিন্ন বিভাগে ভারতের ব্যয় বৃদ্ধি পাইতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে এই ব্যাপারে প্রত্যহ গড়ে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইত। ১৯৪১-৪২ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধহিসাবে দৈনিক ব্যয় ২৫ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ সপ্তাহে পৌনে-দুই কোটি টাকা দাঁড়াইতে পারে।

মিঃ জোন্স আরও বলেন, যুদ্ধ-সম্পর্কে যে-সামরিক ও দেশরক্ষার খাতে কি পরিমাণে ব্যয়বৃদ্ধি হইবে, তাহার সঠিক হিসাব দেওয়া সম্ভব নহে। ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে দেশরক্ষার বিভিন্ন বিভাগে মোট পৌনে ৭৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়। বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম পাঁচ মাসের প্রতিমাসে গড়ে প্রায় ৭ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে যেখানে দৈনিক ব্যয় গড়ে ২০ লক্ষ টাকা ছিল— বর্ত্তমান বর্ষে সেখানে দৈনিক ব্যয় ২৩ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

জাপান কর্তৃক বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণার পূর্ব্বে এই হিসাব ধরা হইয়াছিল; জাপানের যুদ্ধ-ঘোষণার পর ব্যয় কি পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়, তাহা পরে জানিতে পারা যাইবে। কিন্তু সমুদ্রে যাহার শয্যা, শিশির-পাতে তাহার ভয় কি? যে দেশের অধিকাংশ লোক অর্দ্ধাহারে এবং ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া দুঃখময় জীবন অতিবাহিত করে, তাহারা দেশরক্ষার জন্য বক্ষের রুধির-স্বরূপ এই কোটি কোটি টাকা যোগাইতেছে, এ কথা চিন্তা করিলে কি কল্পনাশক্তি স্তম্ভিত হয় না? দেশ দরিদ্র, কিন্তু যুদ্ধের ব্যয় আমিরী। উভয়ের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; যুদ্ধ চলিবেই, মুখের গ্রাস কেহ শত্রুকে তুলিয়া দেয় না। কিন্তু যে ব্যবস্থা করিলে এই ব্যয় অর্দ্ধেকেরও অধিক হ্রাস হইতে পারিত, সেই ব্যবস্থা পূর্ব্বে হয় নাই, এবং এখন তাহা অবলম্বনের কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না।

ইংলণ্ডের আত্মা ও ভারত

সার ফ্রান্সিস ইয়ংহাস্‌ব্যাণ্ড ইংরেজ সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি এবং তাঁহার পিতা মেজর-জেনারেল ইয়ংহাস্‌ব্যাণ্ড বহু দিন যাবৎ ভারতের সহিত ঘনিষ্ঠতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। সার ফ্রান্সিস উদারচেতা, এবং সহৃদয় ব্যক্তি। সম্প্রতি তিনি ইংরেজগণকে ভারতের প্রতি ন্যায়-বিচার করিতে অনুরোধ করিয়া এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—ইংলণ্ডের আত্মা বা অন্তঃকরণ বহু ভারতের অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্। তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীদিগের নিকট এই নিবেদন করিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন ন্যায়নিষ্ঠ সত্যাশ্রয়ী হইয়া, আপনাদের

লোভ সংযত করিয়া ভারতবাসীর প্রতি স্থায়সঙ্গত ব্যবহার এবং ভারতবাসীদিগকে তাহাদের স্থায্য অধিকার প্রদান করেন। বিলাতের এক জন কূটবুদ্ধি লেখক পরম উৎসাহে সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁহার আবেদনের প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইঁহার কথা ইংলণ্ডের ধনী ও সাম্রাজ্যবাদীদিগের বাঁধা-বুলিরই প্রতিধ্বনি। ইনি বলিয়াছেন, এখন বৃটিশ জাতি ভারতবাসীদিগকে স্বায়ত্ত-শাসন দিতে পারেন না। সকল ভারতবাসী যখন সর্ব্ববিষয়ে একমত হইবে, কাহারও সহিত কাহারও কোন বিষয়ে মতের ভিন্নতা থাকিবে না, তখনই ভারতবাসী স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার লাভের যোগ্য বিবেচিত হইবে। ইহা মিঃ আমেরী প্রভৃতি ভারতের মুরুব্বি কূটপন্থী ইংরেজের উক্তিরই প্রতিধ্বনি; সেই একই ধূয়া! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ইংলণ্ডে কি সকলেই সকল বিষয়ে একমত? সার ফ্রান্সিস ইংরেজদিগকে তাঁহাদের আত্মাকে রক্ষা করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু যাঁহাদের আত্মা আছে, তাঁহারাই কেবল আত্মার মূল্য বুঝিবেন। স্বার্থের নিকট যাহারা আত্মবিক্রয় করিয়াছে বা আত্মাকে বাঁধা দিয়াছে, তাহাদের নিকট সার ফ্রান্সিসের উক্তির মূল্য কি?

ভারতীয় সেনাদলে অষ্ট্রেলিয়ান সেনানায়ক

এই যুদ্ধের সময় ভারতে দশ লক্ষ সৈনিক শীঘ্রই প্রস্তুত হইবে, ভারত সরকার এ কথা বলিয়াছিলেন। কতক কতক ভারতবাসীকে সৈন্যদলে গ্রহণ করা হইতেছে বটে, কিন্তু এই সকল ভারতীয় সৈন্য পরিচালিত করিবার জন্য পর্য্যাপ্ত-সংখ্যক ভারতবাসীকে সেনানায়কের কার্য্য শিক্ষা দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই। সেনানায়কদিগকে অষ্ট্রেলিয়া হইতে আমদানী করা হইতেছে। অনেকেরই ধারণা, এই ব্যবস্থায় ভারতবাসীর প্রতি অবজ্ঞা এবং উপেক্ষা প্রদর্শিত হইতেছে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, ভারতবাসীর কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় অবিশ্বাসই ইহার প্রধান কারণ। ইংরেজ পৌনে দুই শত বৎসর ভারতে থাকিয়াও ভারতবাসীদিগকে চিনিতে পারিলেন না, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা আক্ষেপের বিষয়। আশা করি, যিনি ভ্রান্তিরূপে সর্ব্বলোকের অন্তরে বাস করেন,—তিনি সত্বরই ইংরেজ জাতির মন হইতে ভারতবাসীর প্রতি অবিশ্বাস অপসারিত করিবেন; তাহা হইলে বৃটেন ও ভারত উভয় দেশেরই মঙ্গল হইবে। যত দিন পর্য্যন্ত ইংরেজ ভারতবাসীর স্বার্থকে নিজ স্বার্থ, এবং ভারতবাসী ইংরেজের স্বার্থকে নিজের স্বার্থ মনে করিতে না শিখিবে, তত দিন উভয় জাতির প্রকৃত মিলন সম্ভব হইবে না; কিন্তু ইংরেজ কি কোন দিন ভারতের স্বার্থকে নিজের স্বার্থ বলিয়া মনে করিতে পারিবে?

ভারতের জনসংখ্যা

১৯৪১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারের বিবরণ গত ৩রা অগ্রহায়ণ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ ভারতের জনসংখ্যা ৩৮ কোটি ৮৮ লক্ষ ছিল, ইহার মধ্যে ৪ কোটি ৭৬ লক্ষ ২২ হাজার লোক লিখিতে-পড়িতে জানে।

দশ বৎসর পূর্ব্বে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারে ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৩৩ কোটি ৮১ লক্ষ। সুতরাং গত দশ বৎসরে জনসংখ্যা শতকরা ১৫'২ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে সকল সহরের জনসংখ্যা এক লক্ষের অধিক, সেই সকল সহরেই বৃদ্ধির হার অধিক।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার শতকরা ২৫ জন। তাহার নিম্নেই বাঙ্গালায় বৃদ্ধির হার, শতকরা ২০ জন। ভারতে বাঙ্গালীরাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় লিখিতে-পড়িতে পারে। বাঙ্গালায় ৯৭ লক্ষ ২০ হাজার লোক লিখিতে-পড়িতে পারে। মাদ্রাজে ৬৪ লক্ষ ২০ হাজার লোক লেখাপড়া জানে।

দিল্লীর জনসংখ্যা শতকরা ৪৪ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। বেলুচিস্থানের কোন অংশে এবং কয়েকটি সামন্তরাজ্যে জনসংখ্যা হ্রাস হইয়াছে। উড়িষ্যায় জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার শতকরা ৮'২। এবার আদমসুমারের গণনায় যে সকল গণ্ডগোলের কথা শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল—তাহাতে অনেকের ধারণা, গণনায় ভুল রাখা হইয়াছে; কিন্তু আবার যে নূতন করিয়া কোন ব্যবস্থা হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। যে সাপে কামড়ায়, সে সাপে ঝাড়ে না।

বর্দ্ধমানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলন

গত ১৩ই অগ্রহায়ণ শনিবার অপরাহ্নে বর্দ্ধমান টাউন হলের বিপরীত দিকে 'বিজয় নগরে' নির্ম্মিত একটি সুবিশাল ও সুসজ্জিত মণ্ডপে ডক্টর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুসভার দশম অধিবেশন আরম্ভ হয়। বঙ্গদেশের বিভিন্ন জিলা হইতে প্রায় পাঁচ শত উৎসাহশীল প্রতিনিধি এবং তিন সহস্র দর্শক সম্মেলনের সেই প্রথম দিনের অধিবেশনে যোগদান করেন। এই অধিবেশনে প্রায় এক শত মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুমহাসভার সভাপতি সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় হিন্দু-পতাকা উত্তোলন করিবার পর সম্মেলনের কার্য্য আরম্ভ হয়। সার মন্মথনাথ সম্মেলনের উদ্বোধনে যে বক্তৃতা করেন, তাহা উদ্দীপনা-পূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত জীবনমল ভুতোরিয়া যে অভিভাষণ

প্রদান করেন, তাহাতে বর্দ্ধমানের অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাসের বিবরণ ছিল; তাহাতে অনেক কথা ছিল—যাহা অনেক শিক্ষিত শ্রোতারও অজ্ঞাত, সেই জন্য সকলেই তাহা সাগ্রহে শুনিয়াছিলেন। বিশেষতঃ, সভাপতি ডক্টর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ বঙ্গভাষায় যে সুদীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করেন, তাহা যেরূপ সুচিন্তিত ও সুললিত, সেইরূপ প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল। তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদ করিয়া ভাষা ও ভাবের সেই উচ্ছ্বাস উৎসারিত হইয়া সকলকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। বাঙ্গালী হিন্দুকে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার জন্য তাঁহার আহ্বানে যেন বৈদ্যুতিক শক্তির জীবন্ত প্রেরণা নিহিত ছিল।

এই সম্মিলনী উপলক্ষে বর্দ্ধমান নগর উৎসব-মুখর হইয়াছিল। বহু স্বেচ্ছাসেবক দল সম্মিলনের শৃঙ্খলা-বিধানের জন্য উপস্থিত ছিলেন। সম্মিলনের প্রথম দিনের অধিবেশনের পর বিষয়নির্ব্বাচনী সমিতির অধিবেশন হয়। যুদ্ধ, পাকিস্থান-পরিকল্পনা, ঢাকার দাঙ্গা, বিভিন্ন জিলায় বিগ্রহের বিসর্জ্জন-সমস্যা, ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশের সীমা-সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে কতকগুলি প্রস্তাব দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে আলোচিত হয়। সম্মিলনের অধিবেশন সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিয়াছিল।

দণ্ডিত আটক বন্দীদিগের সম্বন্ধে ব্যবস্থা

নবদিল্লী হইতে প্রেরিত ১৭ই অগ্রহায়ণের সংবাদে প্রকাশ, জয়লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত সমর-প্রচেষ্টায় সাহায্য করিবার বিষয়ে ভারতবর্ষের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, এই বিশ্বাসে ভারত সরকার এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, যে সকল সত্যাগ্রহী বন্দীর অপরাধ মামুলী, অথবা এক বিশিষ্ট মনোভাবের পরিচয়মাত্র, তাঁহাদিগকে মুক্তিদান করা যাইতে পারে। যথাসম্ভব শীঘ্র এই সিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত করিবার অভিপ্রায় জানিতে পারা গিয়াছে; তবে এমন কতকগুলি প্রদেশ আছে—যেখানে সত্যাগ্রহী বন্দীদিগের সংখ্যা ও স্থানীয় অবস্থার জন্য কিছু বিলম্ব হইতে পারে। ভারত সরকার আশা করেন, বর্ত্তমান বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বেই ভারতের সর্ব্বত্র ঐরূপ প্রায় সকল সত্যাগ্রহী বন্দীই মুক্তি পাইবেন।

'য়ুনাইটেড প্রেস' অবগত হইয়াছেন, বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের সম্মতিক্রমে দেউলী বন্দিনিবাসে আবদ্ধ সিকিউরিটি বন্দীদিগকে স্ব স্ব প্রদেশে অথবা যে সকল প্রাদেশিক সরকারের পরোয়ানা বলে তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়, সেই সকল প্রদেশে ফেরত পাঠান হইবে—ইহা নিশ্চিত ভাবে স্থির হইয়াছে।

ইহাও প্রকাশ যে, প্রায়োপবেশনের জন্য বন্দীদিগের স্বাস্থ্যহানি হওয়ায় তাঁহাদের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার হইলেই তাঁহাদিগকে স্ব স্ব জিলায় প্রেরণ করিবার আশু ব্যবস্থা হইবে।

পণ্ডিত জওহরলাল ও মৌলানা আজাদের মুক্তি

লণ্ডন হইতে যে তার পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতেই মনে হইয়াছিল, বৃটিশ সরকার সত্যাগ্রহী বন্দীদের মুক্তিদান সম্বন্ধে কেন্দ্রী সরকারের সিদ্ধান্তের অনুমোদন করিয়াছেন। গত ১৬ই অগ্রহায়ণ রাত্রিকালে বড়লাটের শাসন-পরিষদে এ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। তাহার পর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও কংগ্রেসের সভাপতি আবুল কালাম আজাদকে মুক্তিদান করা হয়। মৌলানা আজাদ নৈনী সেন্ট্রাল জেল এবং পণ্ডিত নেহরু দেরাদুন জেল হইতে গত ১৮ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার প্রভাতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

থলিয়ার বায়না

ভারত সরকার 'ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েসনে'র নিকট বালি-বোঝাই করিবার উপযোগী আর এক দফায় দশ কোটি থলির বায়না দিয়াছেন। আগামী জানুয়ারী মাস হইতে অক্টোবর মাসের মধ্যে এই সকল থলিয়া সরবরাহ করিতে হইবে। এবার পাটের ফসল কম জন্মিয়াছে; কিন্তু চাষীদের ঘরে ও মহাজনদের গুদামে গত বৎসরের পাট কি পরিমাণ মজুত আছে, তাহা স্থির করা কঠিন। তবে মোটের উপর যাহাদের পাট মজুত আছে, বা পাট জন্মিবার আশা আছে, তাহাদের কিছু সুবিধা হইবে বলিয়াই মনে হয়। ইহাতে পাটের কাটতি বাড়িবারই আশা আছে। কিন্তু উহার মূল্য কিরূপ বাড়িবে, তাহা বলা যায় না। পাটের দর কিছু বাড়িলেও দরিদ্র কৃষকগণ লাভবান হয় নাই। যে সকল সম্পন্ন কৃষক ও পাট-উৎপাদক পাট বাঁধাই করিয়া রাখিতে পারিয়াছে,—তাহাদের কিছু কিছু লাভ হইতেছে বটে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। পাটের মহাজনরাও কিছু কিছু লাভ পাইতেছেন। জাপান যুদ্ধ-ঘোষণা করিবার পর আরও বালির বস্তার বায়না হইবে কি না এবং পাটের বাজার কিরূপ দাঁড়াইবে—এখন তাহা বুঝিবার উপায় নাই; কিন্তু এত অধিক থলিয়ার বায়না দেওয়ায় মনে হইতেছে, যুদ্ধ শীঘ্র মিটিবার সম্ভাবনা নাই।

লণ্ডনে নূতন হাই-কমিশনার

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের স্পীকার সার মহম্মদ আজিজুল হক্ সার ফিরোজ খাঁ নুনের স্থানে ভারতের পক্ষে—লণ্ডনে

হাই-কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। সার ফিরোজ খাঁ এখন ভারতের বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্য। সার আজিজুল হক্ ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে নূতন কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন এইরূপ প্রকাশ। সার আজিজুল হক্ নদীয়ার লোক—শান্তিপুরের অধিবাসী। তিনি বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত। এক জন বাঙ্গালী—এবং বঙ্গ সাহিত্যের অনুরাগী ও স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ভদ্রলোক, বড়লাটের মনোনয়নে এই উচ্চপদ লাভ করিলেন, এজন্য তিনি বঙ্গসাহিত্যানুরাগী বাঙ্গালী মাত্রেরই অভিনন্দনের পাত্র। আমরা আশা করি, সার আজিজুল এই নূতন পদের গৌরব রক্ষা করিবেন।

উড়িষ্যার নূতন সচিবসঙ্ঘ

উড়িষ্যার গবর্ণর পারলাকেমেদীর মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র গজপতি নারায়ণদেওকে উড়িষ্যার প্রধান সচিব করিয়া পণ্ডিত গোদাবরী মিশ্র ও মৌলবী আবদুল সোভান খাঁনকে সচিবপদে নিয়োগ করিয়াছেন। উড়িষ্যায় কংগ্রেসী মন্ত্রিগণের পদত্যাগের পর এই সর্ব্বপ্রথম অচল শাসন-ব্যবস্থা সচল করিবার জন্য এই নূতন সচিবসঙ্ঘ সংগঠিত হইয়াছে। প্রাদেশিক আইন-সভার সাধারণ নির্ব্বাচনের পর সর্ব্বপ্রথম উড়িষ্যা-পরিষদেই কংগ্রেসী-দলের সংখ্যাধিক্য লাভের সংবাদ ঘোষিত হয়।

কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের রজত জয়ন্তী

গত ২৯এ অগ্রহায়ণ সোমবার হইতে কলিকাতার কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের রজত জয়ন্তী উৎসব আরম্ভ হয়। ইহা এইজন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, ভারতে অনেক বে-সরকারী কলেজ থাকিলেও চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার ইহাই একমাত্র বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান। ইহার প্রতিষ্ঠার পর ২৫ বৎসর পূর্ণ হইল। অন্ধ্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডাক্তার সি. আর. রেড্ডি এই উৎসবের উদ্বোধন করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, সার নীলরতন সরকার, সার আজিজুল হক প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বিখ্যাত চিকিৎসকগণ এই উৎসবে যোগদান করেন। শ্রীযুত ঘনশ্যাম দাস বিরলা ইহার প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। সুবিখ্যাত ডাক্তার স্বর্গীয় রাধাগোবিন্দ কর লোকহিতের আগ্রহে এই চিকিৎসালয়ের উন্নতির জন্য যে ত্যাগস্বীকার ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহাই এই চিকিৎসালয়ের দ্রুত উন্নতির প্রধান কারণ। তাঁহার প্রাণপণ চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে। আমরা প্রার্থনা করি, ইহা উন্নতি লাভ করিয়া অদূর ভবিষ্যতে সকল চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানের পুরোবর্ত্তী হউক।

বিষ্ণুপুর সাহিত্য-সম্মিলন

গত ২৭শে অগ্রহায়ণ শনিবার সায়ংকালে বাঁকুড়া জিলার বিষ্ণুপুরের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের হলে বিষ্ণুপুর সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। প্রভূত উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। রামানন্দ বাবু প্রাচীন সাহিত্যসেবী, বঙ্গসাহিত্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগ অসাধারণ, তিনি বাঁকুড়ার অধিবাসী ; সুতরাং তাঁহাকে সভাপতি মনোনীত করিয়া এই অনুষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ সুবিবেচকেরই কার্য্য করিয়াছেন সন্দেহ নাই। বিষ্ণুপুর বহু প্রাচীন ও বিখ্যাত নগর, ইহার মল্লরাজগণ বহু কাল পর্য্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং এক সময় বিষ্ণুপুরের গৌরব বঙ্গদেশকে সম্মানিত করিয়াছিল।

বিষ্ণুপুরের মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত অশোককুমার রায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ রায় সম্মিলনের উদ্বোধন উপলক্ষে বিষ্ণুপুরের অতীত কাহিনী বিবৃত করেন। সভাপতি প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। রামানন্দ বাবুর অভিভাষণ যেমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ, সেইরূপ মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল ; তাহাতে অনেক নূতন কথা ছিল, তাহা প্রকৃতই কাজের কথা। সভাপতির অভিভাষণের পর স্থানীয় মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান স্থানীয় অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে সমাগত সাহিত্যিকগণকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। এই সম্মেলন উপলক্ষে সঙ্গীত-শাখারও অধিবেশন হইয়াছিল। সুবিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এই শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন, এবং অনেক বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট সঙ্গীতে সমাগত সাহিত্যিকগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। এই সম্মিলনের জন্য ইহার উদ্যোক্তাগণ বঙ্গসাহিত্যের সেবক ও হিতৈষীবর্গের ধন্যবাদের পাত্র।

হিন্দুমহাসভার অধিবেশনের স্থান

বিহার কর্ত্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও হিন্দুমহাসভার আগামী অধিবেশন বড়দিনের বন্ধে ভাগলপুরেই হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছিল। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা তাঁহার এলাকায় হিন্দুমহাসভার আগামী অধিবেশনের ব্যবস্থা করিবার জন্য মহাসভাকে আমন্ত্রণ করিলে সাভারকর মহাশয় এই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া ভাগলপুরেই অধিবেশন হইবে বলিয়া নেতৃবর্গকে মত জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তদনুসারে নিখিল ভারত হিন্দু-মহাসভার অধিবেশনের জন্য ভাগলপুরের লাজপত-পার্কে মণ্ডপের নির্ম্মাণকার্য্য চলিতেছিল ; কিন্তু

জিলার কর্তৃপক্ষ লাজপত-পার্ক দখল করেন। কেবল তাহাই নহে, ১লা পৌষ হিন্দুমহাসভার অভ্যর্থনা সমিতির কার্য্যালয়, এবং রায় সাহেব এস, এন, বসু, বাবু গৌরীশঙ্কর প্রসাদ প্রভৃতি হিন্দুসভার কয়েক জন প্রধান উদ্যোগীর গৃহ তল্লাস করিয়া পুলিস কতকগুলি কাগজপত্র লইয়া যায়, এবং ২রা পৌষ প্রভাতে স্থানীয় পুলিস স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিসের সহযোগে বাঁকীপুরের প্রাদেশিক হিন্দুমহাসভার কার্য্যালয়ে তল্লাস করিয়া কতকগুলি প্রচারপত্র লইয়া যায়। ঐ দিনই প্রভাতে নিখিল ভারত হিন্দুমহাসভার অভ্যর্থনা সমিতির কার্য্যালয়ের পরিচালক পণ্ডিত রাঘবাচার্য্য শাস্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা হয়। গত ৮ই পৌষ রাত্রিশেষে গয়া রেলষ্টেশনে শ্রীযুত সাভারকরকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, মিঃ দেশপাণ্ডেকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এই ব্যাপারে ভাগলপুরের জনসমাজে অত্যন্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কতকগুলি সশস্ত্র পুলিস আমদানী করিয়াছেন। ডাক্তার মুঞ্জে, শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিকে এবং নিখিল-ভারত হিন্দুমহাসভার সম্পাদককেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও গ্রেপ্তার হইয়াছেন। বর্ত্তমান সঙ্কটকালে প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের এই প্রকার অধীরতা প্রকাশ করা সঙ্গত হয় নাই।

ভারতের কাগজ-সঙ্কট

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের আরম্ভকাল হইতেই আমাদের দেশে কাগজের অভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে। কাগজ জ্ঞান-বিস্তারের সহায়, সুতরাং সভ্যসমাজে ইহার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য। সভ্য-সমাজে জ্ঞানহীন মানুষ পশুতুল্য বলিয়াই গণ্য হয়। সভ্যজনগণের মূলমন্ত্র এই হওয়া উচিত যে, Let knowledge grow from more to more. জ্ঞানের বিস্তার এবং বিকাশ ক্রমশঃ অধিক হওয়া চাই। এই জ্ঞান-বিকাশে যাহাতে বাধা না ঘটে, তাহার জন্য সকলেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত। সেই জন্য যে সকল শিল্প জ্ঞান-বিকাশের সহায়, সে সকলের প্রসার সাধন সকল সরকারের লোকতঃ, ধর্ম্মতঃ এবং ন্যায়তঃ সম্পূর্ণ ভাবেই করা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান কালে কাগজ-শিল্প জ্ঞান-প্রকাশের এবং জ্ঞান-বিস্তারের বিশেষ সহায়। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আমাদের সরকার এই দেশে এই অত্যাবশ্যক শিল্পটির বিস্তার-সাধনে কোন উল্লেখযোগ্য চেষ্টা করেন নাই। ইংরেজ ভারতের শাসনদণ্ড স্বহস্তে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে এদেশে কাগজের ব্যবহার প্রচলিত ছিল, কাগজও বিস্তর প্রস্তুত হইত। কিছু দিন পূর্ব্বে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের শ্রমশিল্প বিভাগের চেষ্টায় ভারত, নেপাল এবং ব্রহ্মদেশের বহু স্থানে হস্তনির্ম্মিত কাগজ কি পরিমাণে প্রস্তুত হইত, তাহার সম্বন্ধে তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল। প্রকাশ, মণিপুর অঞ্চলে নানা আকারের এবং প্রকারের কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঐ সকল কাগজ অত্যন্ত শক্ত এবং স্থায়ী। উহা সহজে নষ্ট হয় না বা ছিঁড়িয়া যায় না। সেই জন্য উহা প্রায়ই অতি প্রয়োজনীয় দলিল দস্তাবেজ লিখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। কাশ্মীর অঞ্চলে হস্তে প্রস্তুত কাগজের কারখানা অনেক আছে। বোম্বাই অঞ্চলে এই কাগজ-প্রস্তুত শিল্প কুটীর-শিল্পরূপেও চলিতেছে। বাঙ্গালা প্রদেশের কোন কোন স্থানে এখনও কাগজ-প্রস্তুত-শিল্পের ক্ষীণ অবশেষ আছে। সেই কাগজ ব্যবসায়ীরা তাঁহাদের খাতা প্রভৃতি প্রস্তুত জন্য ব্যবহার করেন। প্রয়োজনীয় দলিলাদি লিখিবার জন্যও এই প্রকার কাগজ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিছু কাল পূর্ব্বেও বাঙ্গালায় হরিদ্রা বর্ণের যে কাগজ ব্যবহৃত হইত, তাহা বেশ টেকসই এবং বহুদিন চলিত। উহা পোকায় কাটিত না। এখন তাহা প্রায় লোপ পাইয়াছে। এখনও শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের বিদায়-নিমন্ত্রণে এই কাগজ 'বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত'—এই ভ্রান্তধারণাবশে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। কিন্তু কাগজী-সম্প্রদায় সাধারণতঃ মুসলমান; তাহাদের ভাতের ফেন প্রভৃতি এই কাগজ জমাইবার প্রধান উপাদান। বিস্ময়ের বিষয়, এদেশে বিদেশ হইতে অনেক হাতে-তৈয়ারী (hand-made) কাগজ আমদানী হইয়া থাকে; কিন্তু সরকার বা দেশের জনসাধারণ আমাদের দেশের এই হস্তে-প্রস্তুত কাগজ-শিল্পের উন্নতি-সাধনে কোনরূপ চেষ্টা এ পর্য্যন্ত করেন নাই।

এই কাগজ-শিল্প ভারতের খুব প্রাচীন শিল্প নহে। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে প্রধানতঃ তালপত্র এবং ভূর্জ্জপত্রে গ্রন্থাদি লিখিত হইত। বিদ্যার্থীরা তালপাতায় এবং কলাপাতায় হাতের লেখা মক্স করিত। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা খড়ি দিয়া ঘরের মেঝেতে বা রোয়াকে অক্ষর লিখিতে শিখিত; বড় হইলে চিলুতা (কলার পাতায়) লিখিবার পর কাগজে লিখিতে আরম্ভ করিত। সেই কাগজ এদেশে অনেক প্রস্তুত হইত বটে, কিন্তু অধিকাংশ চালান আসিত চীনদেশ হইতে। কেহ কেহ অনুমান করেন, মুসলমানগণ এদেশে কাগজ-শিল্প প্রবর্ত্তিত করেন। সার জর্জ্জ ওয়াট কাগজ-শিল্পের কথা বিশেষভাবে বিবৃত করিয়াছেন। বুকানন হামিল্টন তাঁহার Statistical Account of Dinajpur সন্দর্ভে এদেশে কাগজ-প্রস্তুতের কথা বলিয়াছেন। খৃষ্টীয় ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে এদেশে কাগজের কাটতি অনেক বাড়িয়া যায় এবং হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই কাগজ

প্রস্তুতকার্য্যে বিশেষ ভাবে আত্মনিয়োগ করে। ঐ সময়ে ভারতের সর্ব্বত্র কাগজ-প্রস্তুতের ছোট ছোট কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তখন ভারত সরকার এদেশ হইতে তাঁহাদের প্রয়োজনীয় কাগজ গ্রহণ করিতেন। তাহার পর লর্ড আরউইনের (অধুনা লর্ড হালিফ্যাক্সের) পিতামহ সার চার্লস্ উড যখন ভারত-সচিবের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তখন এই মর্ম্মে এক ইস্তাহার প্রচারিত হইয়াছিল যে, ভারত সরকারের যত কাগজ প্রয়োজন, তাহা সমস্তই বিলাতে খরিদ করিতে হইবে। সার জর্জ্জ ওয়াট লিখিয়াছেন যে, এই ইস্তাহারের পরে বর্দ্ধমান ভারতীয় কাগজ-শিল্পের উন্নতি প্রতিহত হইয়াছিল (This threw back very seriously the growing Indian production)। সার চার্লস্ উড ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ভারত-সচিব ছিলেন। সুতরাং এই সময় হইতেই ভারতীয় কাগজ-প্রস্তুত শিল্পের ঘোর অবনতি আরম্ভ।

তথাপি ভারতে দেশীয় কাগজ-শিল্প কোনরূপে জীবিত ছিল। কিন্তু তাহার পর বিদেশ হইতে এদেশে কাগজের আমদানী যত বাড়িতে লাগিল, দেশীয় কাগজ-প্রস্তুত-শিল্পের অন্তিম শ্বাস ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। ভারতে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল,—সংবাদপত্রাদি প্রচারিত হইতে থাকিল—তাহার ফলে কাগজের কাট্তি বাড়িয়া চলিল। এই সমস্ত কাগজের অধিকাংশই বিদেশ হইতে আমদানী হইতে থাকে। তাহার পর প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক কাল হইল, ভারতে কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাঙ্গালায় বালি পেপার মিল টিটাগড়ে স্থানান্তরিত—পরিবর্দ্ধিত হইবার পর, রাণীগঞ্জ এবং কাকিনাড়ার কাগজের কল প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহা ভিন্ন লক্ষ্ণৌএর কুপার পেপার মিল ছিল এবং পুণায় রিয়ে মিলস্ প্রতিষ্ঠিত হয়। অধিকাংশ কল ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইলেও বিদেশী মূলধনে এবং তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। এই কলগুলি ৫।৬ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিদেশ হইতে কাগজের মণ্ড আনাইয়া কাগজ প্রস্তুত করিত। এই বনবৃক্ষ-বহুল ভারতে কোন উদ্ভিদ্ বা বনজাত তৃণ হইতে কাগজের মণ্ড প্রস্তুত হইতে পারে কি না, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তাহা কেহই সন্ধান লয়েন নাই। ইহা তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে। সরকারও এ বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। বিগত যুদ্ধের সময় যখন বিদেশ হইতে ভারতে কাগজ-প্রস্তুতের মণ্ড আনাইবার পথ বিঘ্ন-বহুল হইয়াছিল, তখন কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান-ফলেই জানা গিয়াছিল যে, সাবাই ঘাস নামক এক জাতীয় ঘাস হইতে কাগজ-প্রস্তুতের উত্তম মণ্ড প্রস্তুত হইতে পারে। তখন এই ঘাসের মণ্ডে ভারতের কলে সুলভ মূল্যের কাগজ প্রস্তুত হইতেছিল। তাহার পর এই বিষয়ে আরও কিছু অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পারা যায় যে, ভারতে যে নানাজাতীয় বাঁশ আছে—তাহার মধ্যে দুই-তিন জাতীয় বাঁশ হইতে কাগজের মণ্ড প্রস্তুতের যথেষ্ট উপাদান তৈরী করা যায়। সেই জন্য ইদানীং বাঁশের মণ্ডও কাগজ-প্রস্তুতের জন্য সমধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। মাড়োয়ারীগণের প্রভূত অর্থব্যয়ে বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বে যে সকল কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার সহিত চিনি-প্রস্তুতের কল সংলগ্ন থাকায় আখের নির্য্যাস বাহির করিবার পর তাহার খোলা ও ছিব্ড়া হইতেও কাগজের মণ্ড প্রস্তুত হইতেছে! ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত ডালমিয়া শোণ-নদী সন্নিকটে যে কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেই কলে আখের খোলা ও ছিবৃড়া কাগজ-প্রস্তুতের উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। এই আখের খোলা ও ছিব্ড়া উপাদানে এবং বাঁশের মণ্ডে প্রস্তুত কাগজ চিম্ড়া, শক্ত ও স্বচ্ছ। চিম্ড়া ও শক্ত কাগজে ভাল ছাপা হয় না এবং স্বচ্ছতার জন্য এক পৃষ্ঠার ছাপা অপর পৃষ্ঠায় ফুটিয়া উঠে। কিন্তু যুদ্ধে কাগজ দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এই কাগজের চাহিদাও যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে—এমন কি, চতুর্গুণ মূল্য দিয়াও পাওয়া দুষ্কর। ভারতে কাগজের প্রয়োজনের তুলনায় তাহা আদৌ পর্য্যাপ্ত নহে। আবার ভারতীয় মিলে প্রস্তুত কাগজের বহু অংশই সরকারী প্রয়োজনে ব্যবহারও হইতেছে।

য়ুরোপ মহাপ্রলয়ে জার্ম্মাণী—নরওয়ে—সুইডেনের কাগজ আমদানী সম্পূর্ণ বন্ধ হওয়ায় বর্ত্তমান সময়ে ভারতে কাগজ যে ভাবে দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, তাহাতে সংবাদপত্র—মাসিকপত্র—পুস্তকাদি মুদ্রণ বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে; ভারত সরকার তাহার কোনরূপ প্রতিবিধান করিতে পারেন নাই; কিন্তু কাগজের এই তিন-চারি গুণ বর্দ্ধিত মূল্যের উপর অনায়াসে শতকরা ২৫৲ হারে ডিউটী নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, এবং বর্ত্তমান সময়ে একমাত্র কানাডা হইতে যে কাগজ আসিতেছে, তাহার সঙ্কোচ-বিধান—আমদানী হ্রাসের জন্য 'কোটা' প্রবর্ত্তন করিয়া লাইসেন্স লইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কাগজ আমদানীর পূর্ব্বে লাইসেন্স না লইলে কাগজের বর্দ্ধিত মূল্যের উপর শতকরা ২৫৲ পর্য্যন্ত হারে পেনেলটী দিতে হইবে। যে সরকার সংবাদপত্র মুদ্রণোপযোগী সুলভ মূল্যের কাগজ সরবরাহের কোনরূপ ব্যবস্থা করিয়া সহায়তা করিতে পারেন নাই,—সেই সরকারের পক্ষেই সঙ্কট-সময়ে আমেরিকা হইতে কাগজ আমদানী নিয়ন্ত্রণ করা শোভন ও সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হওয়া সম্ভব।

ভারতের কাগজ-সমস্যার কোনরূপ সমাধান করিতে পারিলেও কিছু দিন পূর্ব্বে ভারত সরকারের ডেরাডুনের

বন-গবেষণা প্রতিষ্ঠান (Forest Research Institute) অনুসন্ধান করিয়া সগর্ব্বে ঘোষণা করিয়াছিলেন, কাইডিয়া ক্যালিসিনা (Kydia Celicina) নামক উদ্ভিদের মণ্ড হইতে উত্তম কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে; এই মণ্ড দ্বারা প্রস্তুত কাগজে ছাপার কাজ ভাল হইবে; এই গাছ কাশ্মীরের জঙ্গলে যথেষ্ট আছে; ইহার সহিত শতকরা ৩০ ভাগ বাঁশের মণ্ড মিশাইলে বেশ ভাল কাগজ প্রস্তুত করা যাইবে। বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ এই আনন্দ-উল্লাসময় সংবাদ বড় বড় অক্ষরে টপ হেডিং দিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, —যেন ভারতের কাগজ-সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। বহুকালব্যাপী আরও অধিক অনুসন্ধানের ফলে ভারতীয় বনজ সম্পদ্ হইতে কাগজের বহুবিধ মণ্ড প্রস্তুতের উপাদান আবিষ্কৃত হইতে পারে সত্য; কিন্তু ভারতে কাগজ-প্রস্তুতের উপযোগী মণ্ডের অভাবেই যে সুলভে —পর্য্যাপ্ত পরিমাণে—প্রয়োজনের উপযোগী কাগজ প্রস্তুত হইতেছে না, তাহা নহে।

সরকারী গবেষণাগারে পরীক্ষিত হইলেও এই অজ্ঞাত-কুলশীল গাছের মণ্ডে প্রস্তুত কাগজ কতটা সস্তা হইবে এবং কতটা মুদ্রণ-কার্য্যোপযোগী হইবে, তাহাও পরীক্ষা-সাপেক্ষ। আর উড়িষ্যা বা ময়ূরভঞ্জের জঙ্গল হইতে বাঁশ আনাইয়া বাঙ্গালা বা বিহারের কাগজের কলে কাগজ প্রস্তুত করিতে রেলভাড়া প্রভৃতিতে যে ব্যয় হয়, তাহা অপেক্ষা কাশ্মীরের জঙ্গল হইতে গাছ কাটাইয়া আনিতে যে রেলমাশুল বহুগুণ বেশী পড়িবে—সেজন্য কাগজের মূল্য বৃদ্ধি হইবে, ইহা সুনিশ্চিত।

ভারতীয় কাগজের কলে আসল অভাব কেমিক্যালের —সেজন্য য়ুরোপ বিশেষতঃ জার্ম্মাণীর উপর নির্ভর করিতে হয়। ভারতীয় কাগজের কলে ব্লিচিং পাউডার—কষ্টিক সোডা প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্যের যত অভাব, মণ্ডের অভাব তত নহে। শ্রীযুক্ত ডালমিয়ার প্রতিষ্ঠিত কাগজের কলে ব্লিচিং পাউডার—কষ্টিক সোডা প্রস্তুতের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু জার্ম্মাণ বিশেষজ্ঞগণ আবদ্ধ হওয়ায় এখন তাহা প্রস্তুত সম্ভব হইতেছে বলিয়া বোধ হয় না।

ভারত সরকারের কাগজ উৎপাদনের কেমিক্যাল প্রস্তুতের উদাসীনতার ফলেই আজ ভারতে যে কাগজের এরূপ নিদারুণ অভাব উপস্থিত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে টেরিফ বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুসারে আমদানী কাগজের উপর অসম্ভব উচ্চহারে শুল্ক ধার্য্য হইবার পর হইতে ভারতে কাগজ-শিল্প ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। এদেশে অধিক কাগজের কলও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল।

খৃষ্টাব্দ	কলের সংখ্যা	সংগৃহীত মূলধন
১৯৩৫-৩৬	১৭	১ কোটি ৪ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা
১৯৩৬-৩৭	২৩	১ " ৫০ " ৩ " "
১৯৩৭-৩৮	১৮	১ " ৬৯ " ৮৯ " "
১৯৩৮-৩৯	২১	২ " ৪৩ " ৪০ " "
১৯৩৯-৪০	২২	২ " ৪৭ " ৬৩ " "

১৯৩৭ এবং ৩৮ খৃষ্টাব্দে টেরিফ বোর্ড অনুসন্ধান করিয়া সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন যে, কাগজ সম্বন্ধে সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করার ফলে ভারতে অধিক সংখ্যক কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, সেই জন্যই তাঁহারা এই সংরক্ষণ-নীতি বজায় রাখিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন। আর সেই জন্যই ভারতে কাগজের শিল্প বিশেষ বিস্তার লাভ করিয়াছে।

বিদেশী কাগজের উপর অসম্ভব উচ্চহারে ডিউটী নির্দ্ধারণের ফলে ভারতে অধিক সংখ্যক কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সত্য, ইহাতে কাগজের কলের মালিক বা অংশীদার বিদেশীয় ও ধনকুবের মাড়োয়ারী-সম্প্রদায়ের প্রভূত অর্থাগমের পথ সুপ্রশস্ত হইয়াছে বটে,—হয়ত সম্প্রতি ধর্ম্মঘটের ফলে কলের শ্রমিকগণের পারিশ্রমিক বর্দ্ধিত হইয়াছে—কিন্তু শিক্ষানুরাগী জনসাধারণের বা মুদ্রাযন্ত্র-সংবাদপত্র-ব্যবসায়ী বা প্রকাশকগণের ইহার দ্বারা কিছুমাত্র উপকার হয় নাই। ইহার ফলে বিদেশাগত কাগজের মূল্যের তুলনায় ভারতে প্রস্তুত কাগজের মূল্য যুদ্ধের পূর্ব্ব সময়েও সুলভ হওয়া সম্ভব হয় নাই। এখন যুদ্ধ-সঙ্কটে ভারতীয় কলে প্রস্তুত কাগজ আরও দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। অথচ সংরক্ষণ-নীতির অজুহতে সরকার কেবল বিদেশী কাগজের উপর উচ্চহারে ডিউটী নির্দ্ধারিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। সুলভ মূল্যের বিদেশাগত কাগজ যাহাতে ভারতীয় কাগজ অপেক্ষা নিকৃষ্ট হয়, সেজন্য বিদেশী কাগজে শতকরা ৬৫ পারসেণ্ট হারে মেকানিক্যাল মণ্ড না থাকিলে উচ্চহারে ডিউটী নির্দ্ধারণের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বিষম প্রতিযোগিতায়ও বিদেশী কাগজের মূল্য সুলভ ছিল।

ভারতের কাগজশিল্প সংরক্ষণের অজুহাতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে বিদেশী কাগজের উপর অত্যধিক উচ্চহারে ডিউটী-রূপে আদায় হইয়া যে অর্থরাশি সরকারী তহবিলে জমা হইয়াছে, তাহার বিনিময়ে সরকার যদি ভারতবাসীকে এই কাগজ-শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যাবশ্যক কেমিক্যাল প্রভৃতি সরবরাহের সর্ব্ববিধ সুবিধা করিয়া দিতেন, তাহা হইলে আজ ভারতে কাগজের অভাবে এত হাহাকার পড়িয়া যাইত না; সাহিত্য—সংবাদপত্র প্রচারে পর্ব্বতসম বাধার সৃষ্টি হইত না; ভারতে উৎপন্ন কাগজেই ভারতের প্রয়োজন মিটিত। যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বেও কয়েক বৎসর কিরূপ হারে ভারতে বিদেশ হইতে

কাগজ আমদানী হইয়াছিল, তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল—

খৃষ্টাব্দ	আমদানী কাগজের পরিমাণ
১৯৩৫-৩৬	১ লক্ষ ৪১ হাজার ৮০০ টন
১৯৩৬-৩৭	১ " ৩৫ " ৭০০ "
১৯৩৭-৩৮	১ " ৫০ " "
১৯৩৮-৩৯	১ " ২৬ " ৬০০ "

সুতরাং যুদ্ধের পূর্ব্বে বিদেশ হইতে গড়ে ১ লক্ষ সাড়ে ৩৮ হাজার টন কাগজ প্রতিবৎসর ভারতে আমদানী হইত, ইহা ধরা যাইতে পারে। ইহার মূল্য গড়ে বার্ষিক পৌণে তিন কোটি টাকার উপর। এক কাগজ বাবদ ভারতের এত টাকা বিদেশে নীত হইত, ইহা শাসক-সম্প্রদায়ের পক্ষে নিশ্চয়ই শ্লাঘার কথা নহে। কিন্তু তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত-সংরক্ষণ-নীতির অজুহতে অসম্ভব উচ্চহারে ডিউটী—টোল—জাহাজভাড়া—ইনসিওর প্রভৃতি ব্যয় বহন করিয়াও বিদেশী কাগজ যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতে ভারতীয় কাগজ অপেক্ষা সস্তা দামে বিক্রীত হইত। এই সময়েই যে সকল কাগজ সরকারী শুল্ক দ্বারা সংরক্ষিত, তাহা বার্ষিক গড়ে ৪৭ হাজার টন হিসাবে ভারতে প্রস্তুত হইতেছিল। আর গড়ে ৬ হাজার টন করিয়া যে কাগজ সংরক্ষিত নহে, তাহাও ভারতে প্রস্তুত হইত। ভারতীয় কাগজের কলে কিরূপ হারে কাগজ প্রস্তুত বাড়িয়া যাইতেছিল, তাহা নিম্নলিখিত তালিকা দেখিলে বুঝা যাইবে—

খৃষ্টাব্দ	উৎপত্তির পরিমাণ
১৯৩৪—৩৫	৪৪,৪৭,৮৫০ টন
১৯৩৫—৩৬	৪৮,০৫,১০০ টন
১৯৩৬—৩৭	৪৮,৫১,১০০ টন
১৯৩৭—৩৮	৫১,২৬,৩৫০ টন

এই তালিকা দেখিলেই বুঝা যাইবে, ইদানীং ভারতীয় কলে উৎপন্ন কাগজের পরিমাণ উত্তরোত্তর কি ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছিল এবং শিক্ষা-বিস্তার—সাহিত্য-প্রচারের জন্য ভারতে কি পরিমাণ কাগজের প্রয়োজন। কিন্তু যুদ্ধের আরম্ভ হইতে এই বৃদ্ধির ব্যাঘাত দুইটি প্রধান কারণে ঘটিয়াছে। প্রধান কারণ—এই কাগজ প্রস্তুত করিতে যে সকল রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি প্রয়োজন হয়, তাহা এদেশে প্রস্তুত হয় না। যুদ্ধের পূর্ব্বে উহা জার্ম্মাণী হইতে আমদানী করা হইত। এখন আর বিদেশ হইতে উহা আমদানী সম্ভব নহে। মার্কিণ হইতেও ঐ সকল বিশেষ প্রয়োজনীয় কেমিক্যাল আমদানী করিতে দেওয়া হইতেছে না। অজুহত—তাহা হইলে মার্কিণী চলিত মুদ্রা ডলারের মূল্য বিপর্য্যস্ত হইবে! কাজেই ভারতকে এখন ঐ সকল রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য বিলাতের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইতেছে। কিন্তু বিলাত বেশী মাল সরবরাহ করিতে পারিতেছে না। তাহার কারণ, জাহাজের অভাব এবং বিলাতের কলকারখানাগুলি এখন সামরিক পণ্য প্রস্তুত করিবার জন্যই ব্যস্ত রহিয়াছে। কাজেই তাঁহারা ঐ সকল রাসায়নিক পণ্য অধিক মাত্রায় প্রস্তুত করিতে পারিতেছেন না। সাগরপথ বিঘ্নবহুল হওয়ায়ও অনেক মাল অতলে তলাইয়া যাইতেছে। কাজেই বিলাতের ব্যবসায়ীরা ভারতে ঐ সকল কাগজ-প্রস্তুতের উপাদান প্রভৃতি অধিক পরিমাণে চালান দিতে পারিতেছেন না। ইহা ভিন্ন উহার মূল্যও তিন-চারি গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যন্ত্রপাতির কোন অংশ ভাঙ্গিয়া গেলে আর তাহা পাওয়া যাইতেছে না। ফেল্ট ও তার অতিশয় দুর্ম্মূল্য। শুনিতেছি, কোন কোন কলওয়ালা বিমানযোগে ফেল্ট এবং তার আমদানী করিয়াছিলেন—এখন তাহাও সম্ভব হইতেছে না।

তাহার পর একটা বড় অসুবিধাও ঘটিয়াছে। কাগজ-কলে যুদ্ধারম্ভের পর হইতে কাগজ-প্রস্তুত-শিল্প সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণের (technicians) বিশেষ অভাব ঘটিয়াছে। অনেক কলে যাহারা ঐ কাজ করিত, তাহারা জার্ম্মাণ বা জার্ম্মাণদিগের বংশজ। যুদ্ধের সময় সরকার তাহাদিগকে শত্রু বলিয়া আটক করিয়াছেন। ইহার উপর আর কোন কথা বলিবার উপায় নাই। কারণ, রাজ্যরক্ষা এবং সাম্রাজ্যের প্রয়োজন হিসাবে সরকার যাহা কর্ত্তব্য মনে করিবেন, তাহাতে আপত্তি করা যায় না। উহা-দিগকে আটক করায় কলগুলির কার্য্যে বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। কতকগুলি ইংরেজ-বিশেষজ্ঞকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল সত্য, কিন্তু জাতীয় প্রয়োজনের অজুহতে তাহাদিগকে কার্য্যান্তরে যাইতে হইয়াছে। ইহার ফলে কাগজ-শিল্পের বিশেষ ক্ষতি ঘটিতেছে। কেহ কেহ বলেন, জার্ম্মাণ-বংশজ যে সকল কাগজ-শিল্পের বিশেষজ্ঞকে সরকার আটক করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে যাহারা নাৎসীবাদী বা ফ্যাসিবাদী নহে,—তাহাদিগকে সরকার প্রতিশ্রুতি লইয়া ছাড়িয়া দিতে পারেন। না হয় মার্কিণ হইতে বিশেষজ্ঞ আনিয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। সঙ্গে সঙ্গে কাগজ-শিল্পের এই সকল কাজ যাহাতে ভারতবাসীরা ভাল ভাবে শিখিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা সরকারের করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কাগজের ন্যায় প্রয়োজনীয় শিল্পের জন্য কোন জাতিরই পরমুখাপেক্ষী থাকা উচিত নহে।

৩৮ কোটি লোকের বাসভূমি ভারতে কাগজের প্রয়োজন অল্প নহে। ভারতীয় কলগুলিতে এখন বার্ষিক ৮০ হাজার টন পর্য্যন্ত কাগজ উৎপন্ন হইতে পারে। ইহার অধিক আর উপস্থিত কলগুলির প্রস্তুত করিবার সাধ্য নাই। এই কার্য্য যাহাতে সুলভে সম্পন্ন হয়, যাহাতে ভারতীয় কলওয়ালারা অল্প মূল্যে কাগজ বেচিতে

পারেন, সেজন্য সরকারের বিশেষ ভাবে সত্বর চেষ্টা করা আবশ্যক। কিন্তু বিশেষজ্ঞদিগের তত্ত্বাবধানের ও পরামর্শের অভাবে সে কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে না। ইহাতে ভারতের প্রয়োজনীয় কাগজের অভাব মিটিতে পারে না। ইহার বহুগুণ অধিক কাগজ ভারতের প্রয়োজন। কাগজের অভাবে অনেক সাময়িক পত্র এবং সংবাদপত্র বন্ধ হইবার মত হইয়াছে। ইহার সত্বর প্রতিকার হওয়া আবশ্যক। কাগজের অভাবে ছেলেদের লেখাপড়া বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। ইহা এদেশের শাসক-সম্প্রদায়ের লজ্জার কথা সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি ভারতে 'ক্রাফ্‌ট' নামক প্যাকিং কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। ইহা এত দিন ভারতে প্রস্তুত হইত না,—নরওয়ে, সুইডেন হইতেই প্রধানতঃ ভারতে আসিত। যুদ্ধের পূর্ব্বে এই কাগজ প্রায় ৮ হাজার টন করিয়া প্রতিবৎসর ভারতে আমদানী হইত। এই কাগজ প্রধানতঃ খড়, ঘাসের মণ্ড হইতে প্রস্তুত হয়। কিন্তু নরওয়ে, সুইডেন হইতে জাহাজ ভাড়া—উচ্চ ডিউটী প্রভৃতি দিয়া এই কাগজ ভারতে আসিয়া, দুই আনা দশ পয়সা পাউণ্ড দামে ভারতের বাজারে বিকাইত আর ভারতের কলে প্রস্তুত এই কাগজের মূল্য চৌদ্দ আনা পাউণ্ড! সম্প্রতি ভারতে প্রস্তুত ক্রাফ্‌ট কাগজ হইতে যে ওয়াটারপ্রুফ কাগজ প্রস্তুত হইতেছে, তাহা যুদ্ধের প্রয়োজনে বহু পরিমাণে গৃহীত হইতেছে। সুতরাং ভারতবাসী ক্রেতাগণ ইহার দ্বারা লাভবান্‌ হইতে পারিবেন না।

ভারতীয় কাগজের কলে পূর্ব্বে যে বাদামী রংয়ের মোটা প্যাকিং কাগজ প্রস্তুত হইত—অসম্ভব ডাকমাশুল বৃদ্ধির জন্য এখন তাহার ব্যবহার সম্ভব নহে—এজন্য লোপ পাইয়াছে। ভারতীয় কাগজের কলে ছবি ছাপিবার আর্টপেপার প্রস্তুত করিবার জন্যও বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু আর্টপেপারের উপরের অতি মসৃণ অংশের জন্য কেজিন বা ছানার প্রলেপ দিবার বিশেষ প্রয়োজন। যে দেশে দুগ্ধের অভাবে অসংখ্য শিশু নিতান্ত প্রয়োজনীয় আহার্য্যে বঞ্চিত হইয়া অকালে মৃত্যুবরণ করিতেছে—সে দেশে কাগজে ছানার প্রলেপ দিবার কল্পনা আকাশ-কুসুমবৎ অলীক স্বপ্ন নহে কি?

এখন সমস্যা হইতেছে, কিসে ভারতে প্রস্তুত কাগজ সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা সম্ভব হয়, সত্বর তাহার উপায় বিধান আবশ্যক। কাগজ দুর্ম্মূল্য হইলে এই দরিদ্র দেশে শিক্ষা-বিস্তারে—সাহিত্য-প্রচারে বিশেষ ক্ষতি হইবে। এখন কাগজ প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক জিনিষের মূল্যাধিক্যের জন্য কাগজ সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা সম্ভব হইতেছে না। কিন্তু ঐ সকল রাসায়নিক পদার্থ ত এদেশে অল্পায়াসে প্রস্তুত করা যায়। কিন্তু সরকারের ঔদাসীন্য ঘোর নৈরাশ্যজনক। দেশীয় কাগজ সস্তা দরে যাহাতে বিক্রীত হইতে পারে, সত্বর তাহার সুব্যবস্থা করা সরকারের একান্ত কর্ত্তব্য। নতুবা উপায় নাই। সরকার এত দিন পরোক্ষভাবে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের নিকট হইতে বিদেশী কাগজের উপর উচ্চহারে ডিউটীরূপে যে বিপুল কর আহরণ করিয়াছেন, তাহার সদ্ব্যয় করিয়া ভারতে রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের কারখানা সত্বর সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, ভারতীয় কাগজের কলে অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয় কেমিক্যাল ন্যায্য মূল্যে সরবরাহের সুব্যবস্থা করুন। এই সঙ্কট সময়ে কাগজের অভাবে সংবাদপত্র—মাসিকপত্র—সাহিত্য-গ্রন্থ প্রচার যাহাতে স্তব্ধ—রুদ্ধ না হয়, তাহার যথাযথ প্রতিবিধান করিয়া সরকার কর্ত্তব্য সম্পাদন করুন।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন

গত ১০, ১১, ১২ই ও ১৩ই পৌষ বারাণসীধামে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের ঊনবিংশ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত প্রমথনাথ তর্কভূষণ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী সরস্বতী মহিলা বিভাগের সভানেত্রী ছিলেন। প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মূল সভার সভাপতি এবং শ্রীযুত অমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ সরকার যথাক্রমে বিজ্ঞান ও দর্শন-শাখায় সভাপতিত্ব করেন। শ্রীমতী নিরুপমা দেবী মহিলা-শাখার সভানেত্রী এবং শ্রীযুত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী রবীন্দ্র-স্মৃতিবাসরের ও শ্রীযুত বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী সঙ্গীত-শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন। সাহিত্য-শাখায় শ্রীযুত অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ইতিহাস-শাখায় ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন, ললিতকলা-শাখায় শ্রীযুত প্রমোদ-কুমার চট্টোপাধ্যায়, বৃহত্তর বঙ্গ ও প্রবাসী বাঙ্গালীর সমস্যা-শাখায় শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত এবং শিশু ও কিশোর সাহিত্য-শাখায় শ্রীযুত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার সভাপতি ছিলেন।

ভারতীয় সংবাদপত্র বিদেশে প্রেরণে বাধা

বৃটিশ পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় মিঃ গর্ডন ম্যাকডোনাল্ড ভারত-সচিবকে জিজ্ঞাসা করেন, ভারতবর্ষে প্রকাশিত কতকগুলি সংবাদপত্র কেন বিদেশে প্রেরণের অনুমতি প্রদান করা হইতেছে না? এবং অনুমতি প্রদান না করিবার কারণ কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে ভারত-সচিব মিঃ আমেরি বলেন, যে সকল সংবাদপত্রের ভারতবর্ষ হইতে নিরপেক্ষ দেশে

প্রেরণ নিষিদ্ধ ছিল, গত জুন মাসে সেইরূপ পত্রের সংখ্যা ছিল ১৮৮ খানি। কি কারণে নিষিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা তিনি অবগত নহেন। বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রেরণ ভিন্ন ভিন্ন কারণে নিষিদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে; তবে যুদ্ধ-পরিচালনার সহিত যে উহার বিশেষ সম্পর্ক আছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই উত্তর শুনিয়া মিঃ ম্যাকডোনাল্ড বলেন,—মিঃ আমেরি কি অবগত আছেন—এইরূপ নিষেধের ফল বিশেষ নিরুৎসাহজনক? অতগুলি সংবাদপত্র দমনের কারণ কি, তাহা কি তিনি পুনর্ব্বার অনুসন্ধান করিবেন?

ভারত-সচিব এই প্রশ্ন শুনিয়া নির্ব্বাক্ ছিলেন, কোন উত্তর প্রদান করেন নাই; কিন্তু এক্ষেত্রে 'মৌন সম্মতি-লক্ষণ' এরূপ অনুমান করিবার উপায় নাই; বরং 'বোবার শত্রু নাই' এই সিদ্ধান্তই সঙ্গত, এবং বর্ত্তমান সঙ্কটজনক অবস্থার উপযোগী। আমাদের দেশের অনেকে অবস্থা বিবেচনায় 'কানে তুলা গুঁজিয়া' ও 'পিঠে কুলো বাঁধিয়া' থাকেন। বিলাতেও সময়-বিশেষে তাহার প্রয়োজন হয় না—এমন কথা বলা যায় কি?

নির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোকে

নির্ম্মল বাবু ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর কালীঘাটের প্রসিদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রসিদ্ধ উকিল ও কলিকাতা করপোরেশনের ভূতপূর্ব্ব কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পিতা। শৈশব হইতেই নির্ম্মল বাবু কাব্য ও সাহিত্য-চর্চ্চায় অনুরাগী ছিলেন। প্রায় ২০ বৎসর বয়স হইতেই তিনি নাট্যাভিনয়ের দিকে আকৃষ্ট হন। তিনি সুলেখক ও সুকবি ছিলেন। কবিতাগ্রন্থ 'শাশ্বতী' তাঁহার প্রথম দান। সঙ্গীত রচনাতেও তাঁহার পারদর্শিতা কম ছিল না। "হিন্দোল" নামে তাঁহার দ্বিতীয় কাব্য-গ্রন্থের রচনা প্রায় শেষ হইয়াছিল, কিন্তু প্রকাশিত হয় নাই। গত ১৩ই নভেম্বর গভীর নিশীথে সিমুলতলায় কবির মৃত্যু হয়। স্নেহময় পিতা, বিদুষী ভার্য্যা, তিন কন্যা, বহু আত্মীয়-স্বজন তাঁহার শোকে মুহ্যমান। শ্রীভগবান্ তাঁহার আত্মায় শান্তিধারা বর্ষণ করুন।

পরলোকে সুশীলাসুন্দরী দেবী

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেনের বিধবা পত্নী ও শ্রীযুত কবিরাজ সুধীন্দ্রনাথ সেনের মাতা সুশীলাসুন্দরী তাঁহার পুত্র, পাঁচ কন্যা, তিন জামাতা, পুত্রবধূ ও বহু পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী রাখিয়া গত ২১শে কার্ত্তিক পরলোক গমন করিয়াছেন। এই মনস্বিনী মহিলা নানাগুণে ভূষিতা ছিলেন।

স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ

কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার সুবিখ্যাত ঘোষ-পরিবারের ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ গত ২৮শে অগ্রহায়ণ রবিবার ৫৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। বঙ্গদেশে ইংরেজের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল বাঙ্গালী-পরিবার ধনে, মানে, সমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, এই ঘোষ-পরিবার তাঁহাদের অন্যতম। ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত-সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রচুর ধনের অধিকারী হইয়াও সরল ভাবে জীবন যাপন করিতেন, এবং তাঁহার সামাজিক শিষ্টাচার প্রশংসনীয় ছিল। তিনি পত্নী, তিন পুত্র, ও এক কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন; তাঁহাদের নিদারুণ শোকে আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরলোকে নিকুঞ্জবিহারী দত্ত

সুপ্রসিদ্ধ রাসায়নিক ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিৎ নিকুঞ্জবিহারী দত্ত গত ২২শে নভেম্বর কলিকাতা মেডিকেল স্কুল-হাসপাতালে নিউমোনিয়া রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৫ বৎসর হইয়াছিল।

তিনি দীর্ঘকাল পাতিয়ালা রাজ্যের ব্যাবহারিক রসায়ন ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। বহুবাজারের ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন তাঁহারই অক্লান্ত চেষ্টা ও যত্নে প্রতিষ্ঠিত। তিনি বহু দিন 'কৃষক' পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন। তিনি অনেকগুলি ইংরেজী ও বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, এবং 'মাসিক বসুমতী'র নিয়মিত লেখক ছিলেন; তিনি সহসা আমাদিগকে ত্যাগ করিবেন—ইহা আমাদের ধারণার অতীত ছিল। তিনি পঞ্জাব, কাশ্মীর, তেরাই অঞ্চল ও কাবুল পরিভ্রমণ করিয়া অনেক উপকারী গাছ-গাছড়া আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এবং নানা প্রবন্ধে তাহাদের উপকারিতার বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তিনি বাঙ্গালীর মধ্যে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার ব্যবহার বড়ই মধুর ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে এক জন দেশহিতৈষী, উদ্ভিদ্‌তত্ত্বজ্ঞ চিন্তাশীল লেখকের অভাব হইল। ভগবান্ তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুন।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত

২০শ বর্ষ] মাঘ, ১৩৪৮ [৪র্থ সংখ্যা

রস

(শ্রীমন্মহর্ষি-ভরত-কৃত নাট্যশাস্ত্রের অনুসরণে)

[মহর্ষি-ভরত-প্রণীত 'নাট্যশাস্ত্রে'র যে সকল সংস্করণ বর্ত্তমানে প্রচলিত আছে, তাহা এতই পাঠান্তর-কণ্টকিত যে, তাহা হইতে বিভিন্ন রসের সংখ্যা সম্বন্ধে মহর্ষির যথার্থ সিদ্ধান্ত কি, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। ষষ্ঠাধ্যায়ের প্রথম অংশে মহর্ষি ভরত বলিয়াছেন—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত—নাট্যে এই আটটি 'রস' বলিয়া গণ্য হয় (১)। আবার নাট্যশাস্ত্রের অন্য অধ্যায়ে নব রসের উল্লেখ আছে ও বাৎসল্য একটি পৃথক্ রস বলিয়া গণ্য হইয়াছে—যদিও নাট্যশাস্ত্রের কুত্রাপি বাৎসল্যের লক্ষণ প্রদত্ত হয় নাই (২)। আরও একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে আলোচ্য। ষষ্ঠ অধ্যায়ে যে শ্লোকটিতে অষ্ট নাট্যরসের উল্লেখ আছে, সেই শ্লোকেরই এমন একটি পাঠান্তর পাওয়া যায়—যাহাতে বলা হইয়াছে যে, নাট্যরস নয়টি—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস অদ্ভুত ও শান্ত। আচার্য্য উদ্ভটও তাঁহার 'কাব্যালঙ্কার-সারসংগ্রহে' নাট্যশাস্ত্রের এই পাঠটি যথাযথ ভাবে

(১) "শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ"।

ভরত-নাট্যশাস্ত্র, ষষ্ঠ অধ্যায়, ১৫ শ্লোক (কাব্যমালা, কাশী-সংস্কৃত-সিরিজ, ডক্টর সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'রসাধ্যায়')। বরোদা সংস্করণে উহা ১৬ শ্লোক।

(২) "অব্যক্তরূপং সত্ত্বং হি জ্ঞেয়ং নবরসাশ্রয়ম্" (নাট্যশাস্ত্র কাব্যমালা সংস্করণ, ২২ অঃ, ৩ শ্লোক, পৃঃ ২৪১)। পক্ষান্তরে কাশী-সংস্কৃত-সিরিজের সংস্করণে পাঠ আছে—"ভাবরসাশ্রয়ম্" (২৪ অঃ ৩ শ্লোক, পৃঃ ২৬৯)। এই পাঠান্তর হেতু নির্ণয় করা সুকঠিন—ভরত-নাট্যশাস্ত্র-মতে রস আটটি অথবা নয়টি।

আবার কাব্যমালা-সংস্করণে সপ্তদশ অধ্যায়ের ১০৫ শ্লোকের পর (পৃঃ ১৮৭) দেখিতে পাওয়া যায়—"করুণবাৎসল্যভয়ানকেষ্বনুদাত্তস্বরিতকম্পিতৈর্বর্ণৈঃ পাঠ্যমুপপাদয়তি"। কাশী-সংস্কৃত-সিরিজের সংস্করণে উনবিংশ অধ্যায়ের ৪৩ শ্লোকের পরবর্ত্তী গদ্যাংশে (পৃঃ ২২২) উহার পাঠান্তর পাওয়া যায়—"করুণবাৎসল্য-ভয়ানকেষ্বনুদাত্তস্বরিতকম্পিতৈর্বর্ণৈঃ পাঠ্যমুপপাদয়েদিতি"।

বাৎসল্য যে ভরত-মুনি-সম্মত রসবিশেষ—ইহার উল্লেখ সাহিত্য-দর্পণকার করিয়াছেন—

"অথ মুনীন্দ্রসম্মতো বৎসলঃ—
স্ফুটং চমৎকারিতয়া বৎসলং চ রসং বিদুঃ" (সাহিত্যদর্পণ ৩।২৫১)। ইহার পর এই রসের বিস্তৃত বিবরণও দর্পণকার দিয়াছেন। তাহা যথাস্থানে বিবৃত করা যাইবে।

কিন্তু এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, দর্পণকার বাৎসল্যকে মুনীন্দ্র-সম্মত দশম রস বলিলেও উপলভ্যমান নাট্যশাস্ত্রে এ সম্বন্ধে কোন বিবরণই পাওয়া যাইতেছে না।

একটি দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, ডক্টর সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'রসাধ্যায়ে', কাব্যমালা-সংস্করণে ও কাশী-সংস্কৃত-সিরিজে

গ্রহণ করিয়া রসের সংখ্যা নিরূপণ করিয়াছেন—নয়টি মাত্র (৩)। অবশ্য উদ্ভট একথা বলেন নাই যে, তিনি নাট্যশাস্ত্র হইতে উক্ত কারিকাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তবে দুইটি স্থলের পাঠই একরূপ বলিয়া অনুমান হয় যে, উদ্ভটের মূল নাট্যশাস্ত্র ভিন্ন আর কিছু নহে।]

তাহা হইলে মোটের উপর নাট্যশাস্ত্রোক্ত রসের সংখ্যা দাঁড়াইল একমতে আটটি—(১) শৃঙ্গার, (২) হাস্য, (৩) করুণ, (৪) রৌদ্র, (৫) বীর, (৬) ভয়ানক, (৭) বীভৎস, ও (৮) অদ্ভুত। মতান্তরে অতিরিক্ত নবম রস (৯) শান্ত। ইহা ছাড়া আরও একটি দশম রসের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে—(১০) বাৎসল্য।

যাঁহারা অষ্টরস-বাদী(৪) তাঁহাদিগের মতে—পূর্ব্বোক্ত আটটি রসের 'স্থায়ী' ভাবও আটটি। উহাদিগের নাম যথাক্রমে উল্লিখিত হইল—(১) রতি, (২) হাস, (৩) শোক, (৪) ক্রোধ, (৫) উৎসাহ, (৬) ভয়, (৭) জুগুপ্সা ও (৮) বিস্ময়। নবরস-বাদীর মতে—নবম স্থায়ী ভাব (৯) শম বা নির্ব্বেদ। আর যাঁহারা বাৎসল্যরস স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের মতে —অতিরিক্ত দশম স্থায়ী ভাব (১০) বৎসলতা-স্নেহ। এই 'স্থায়ী ভাব' কি পদার্থ, তাহার বিচার অবশ্য পৃথক্ প্রবন্ধে করা যাইবে। তথাপি বর্ত্তমানে সংক্ষেপে এইটুকু মাত্র বলা চলে যে—অবিরুদ্ধ বা বিরুদ্ধ কোন প্রকার 'সঞ্চারী' ভাবই যে ভাবের তিরোধান ঘটাইতে পারে না, যাহা আস্বাদাঙ্কুর-কন্দ-স্বরূপ, তাহার নাম 'স্থায়ী ভাব'। স্থায়ী ভাব অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষ। অতএব, উহার উৎপত্তি-বিনাশ আছে। কিন্তু স্বরূপতঃ বিনাশশীল হইলেও উহা সংস্কাররূপে অন্তঃকরণে চিরদিন অবস্থান করে, আর এই কারণেই প্রতীতিকালে উহার অনুসন্ধান করা সম্ভব হয়। তাই উহার নাম 'স্থায়ী ভাব'। কাব্যার্থের (অর্থাৎ আস্বাদ্য রসের) ভাবক (অর্থাৎ নিষ্পাদক) বলিয়াই উহার নাম হইয়াছে 'ভাব'। ইহা প্রথমে সংস্কাররূপে অনাস্বাদ্য থাকে। কিন্তু বিভাবাদি-জনিত সাধারণীকরণ-প্রক্রিয়ার সাহায্যে ইহা উদ্ভূত হইয়া যখন আস্বাদ্যমান হয়, তখনই রসনিষ্পত্তি ঘটে। 'ভাব' শব্দটির মুখ্যার্থ চিত্তবৃত্তি-বিশেষ হইলেও

অষ্টরস-বিবরণের পরই নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠাধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে—

"এবমেতে রসা জ্ঞেয়াস্ত্বষ্টৌ লক্ষণ-লক্ষিতাঃ।
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি ভাবানামপি লক্ষণম্" ৷ (৮৩ শ্লোক—কাব্যমালা ও কাশী-সংস্কৃত-সিরিজ; ৮৫ শ্লোক—ডক্টর সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত সংস্করণ)।

পক্ষান্তরে, বরোদা-সংস্করণে রসাধ্যায়ের পরিসমাপ্তি এই স্থলে হয় নাই। কাব্যমালা ও কাশী-সংস্কৃত-সিরিজে পূর্ব্বোক্ত অন্তিম-শ্লোকের পূর্ব্ব শ্লোকের সংখ্যা ৮২; ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের সংস্করণে উহার সংখ্যা ৮৪; আর বরোদা-সংস্করণে উহার সংখ্যা ১০২। ইহার পর বরোদা-সংস্করণে পূর্ব্বোদ্‌ধৃত চরম শ্লোকটির পরিবর্ত্তে শান্তরসের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। আর উপসংহারে বলা হইয়াছে—

"এবং নবরসা দৃষ্টা নাট্যজ্ঞৈর্লক্ষণান্বিতাঃ।
এবমেতে রসা জ্ঞেয়া নব লক্ষণলক্ষিতাঃ।
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি ভাবানামপি লক্ষণম্" ৷ ১০৯ ৷

কেবল এই অতিরিক্ত পাঠই বরোদা-সংস্করণে প্রদত্ত হয় নাই—উক্ত অতিরিক্ত অংশের উপর আচার্য্য অভিনবগুপ্তের টীকাটিও সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন—যাঁহারা নবরস-বাদী, তাঁহাদিগের মতে শান্তরসের স্বরূপ বলা হইতেছে ইত্যাদি (বরোদা সং, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩৩৩)। ডক্টর সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সংস্করণেও 'অভিনব-ভারতী'র এই অংশটুকু প্রদত্ত হইয়াছে (পৃঃ ১০৯-১১৭)। অথচ উহার মূলাংশ তিনি ছাপেন নাই; অথবা উহার মূলাংশ যে পাঠান্তররূপে বর্ত্তমান থাকা সম্ভব—এরূপ ধারণাও হয় ত ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের 'রসাধ্যায়' সম্পাদন-কালে ছিল না—অন্ততঃ তাহার কোন নিদর্শন তিনি স্পষ্ট ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার সংস্করণেও অভিনবভারতীর ১১৭ পৃষ্ঠায় মূল হইতে প্রতীক উদ্‌ধৃত হইয়াছে—"এবমেতে রসা জ্ঞেয়া নবেতি"। অথচ তিনি ঐ অংশ সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা করেন নাই। কেবল বলিয়াছেন—'ষষ্ঠাধ্যায়ের ১৫ শ্লোকে অষ্ট রসের স্পষ্ট উল্লেখ থাকিলেও উদ্ভট উহার যে পাঠ উদ্‌ধৃত করিয়াছেন তাহাতে নব রসের উল্লেখ আছে ও অভিনবগুপ্তও সেই পাঠেরই অনুসরণ করিয়াছেন—"It is curious to note that the text of Bharata, Chapter VI, verse 15, in most of the manuscripts, mentions eight rasas, which agrees also with the number mentioned in the last s'loka, but the same s'loka 15 quoted by Udbhata mentions nine rasas including S'ānta the tranquil, as a separate sentiment, a reading which is followed by Abhinavagupta in his commentary."
—ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থের Preface. p. V.

(৩) "শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতশান্তাশ্চ নব নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ" ৷
(নাঃ শাঃ ৬।১৫)
উদ্ভটের গ্রন্থে ইহার স্থান চতুর্থ বর্গের চতুর্থ শ্লোক।

(৪) "কাব্যার্থান্ ভাবয়ন্তীতি তেন প্রথমং রসাঃ, তে চ নব। শান্তাপলাপিনস্ত্বষ্টাবিতি তত্র পঠন্তি"
—অভিনবভারতী, বরোদা সং, প্রথম ভাগ, পৃঃ ২৭৯।

উহার আলঙ্কারিক-সম্মত অর্থ—যাহা বাগঙ্গসত্ত্বযুক্ত কাব্যার্থকে (রস) ভাবিত (উৎপাদিত) করে। লৌকিকদশায় প্রথমে সংস্কাররূপে অনাস্বাদ্য থাকিবার পর যাহা বাচিকাদি অভিনয়-প্রক্রিয়ারূঢ় হইয়া আপনাকে আস্বাদ্য রসরূপে পরিণামিত করে, তাহাই ভাব। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—বাক্য-অঙ্গ-মুখরাগ-সত্ত্বাত্মক চতুর্বিধ অভিনয়ের দ্বারা বর্ণনানিপুণ কবির চিত্তান্তর্গত অনাদি প্রাক্তন সংস্কার-প্রতিভাময় ভাবকে যাহা ভাবিত (অর্থাৎ আস্বাদনযোগ্য) করে, তাহাই 'ভাব'। ইহাই 'স্থায়ী ভাব' নামে সাধারণতঃ পরিচিত।

এই সকল স্থায়ী ভাব ব্যতীত তেত্রিশটি 'ব্যভিচারী' বা 'সঞ্চারী' ভাবের নাম পাওয়া যায়— ১ নির্ব্বেদ, ২ গ্লানি, ৩ শঙ্কা, ৪ অসূয়া, ৫ মদ, ৬ শ্রম, ৭ আলস্য, ৮ দৈন্য, ৯ চিন্তা, ১০ মোহ, ১১ স্মৃতি, ১২ ধৃতি, ১৩ ব্রীড়া, ১৪ চপলতা, ১৫ হর্ষ, ১৬ আবেগ, ১৭ জড়তা, ১৮ গর্ব্ব, ১৯ বিষাদ, ২০ ঔৎসুক্য, ২১ নিদ্রা, ২২ অপস্মার, ২৩ সুপ্ত, ২৪ বিবোধ, ২৫ অমর্ষ, ২৬ অবহিত্থ, ২৭ উগ্রতা, ২৮ মতি, ২৯ ব্যাধি, ৩০ উন্মাদ, ৩১ মরণ, ৩২ ত্রাস ও ৩৩ বিতর্ক। ইহারা বিবিধ প্রকারে ও বিশিষ্টরূপে রসনিষ্পত্তির অনুকূল-ভাবে সঞ্চারিত হয় বলিয়া ইহাদিগের নাম 'ব্যভিচারী' বা 'সঞ্চারী'। বিশ্বনাথ বলেন, স্থিরভাবে বর্ত্তমান রত্যাদি স্থায়িভাবের প্রতি বিশেষ অভিমুখভাবে চরণশীল ভাবই ব্যভিচারী। ইহারা অস্থায়ী। সমুদ্রজলে তরঙ্গের মত রত্যাদির উপর ইহারা কখনও আবির্ভূত কখনও বা তিরোহিত হয়। যতক্ষণ রসপুষ্টির প্রয়োজন, ততক্ষণ ইহাদিগের আবির্ভাব ও রসনিষ্পত্তির পরেই তিরোভাব। ইহাই সঞ্চারি-ভাবগুলির বিশেষত্ব। ইহাদিগের লক্ষণাদি যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

ইহা ছাড়া আরও আটটি 'সাত্ত্বিক' ভাবের নাম নাট্য-শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়; যথা— ১ স্তম্ভ, ২ স্বেদ, ৩ রোমাঞ্চ, ৪ স্বরভঙ্গ, ৫ বেপথু (কম্প), ৬ বৈবর্ণ্য, ৭ অশ্রু ও ৮ প্রলয় (মোহ-মূর্চ্ছা প্রভৃতি, যাহাতে সুখ বা দুঃখ দ্বারা চেষ্টা ও জ্ঞান লোপ পায়) ইহাদিগেরও বিবরণ পরে প্রদত্ত হইবে।

রস বস্তুতঃ এক ও অখণ্ড। উপনিষদ্ এই রসস্বরূপকেই পরম ব্রহ্ম বলিয়াছেন—"রসো বৈ সঃ"। সাহিত্যদর্পণ-কার বলিয়াছেন—'চিত্তসত্ত্বের উদ্রেকবশতঃ অখণ্ড স্বপ্রকাশ আনন্দ-চিৎস্বরূপ অপরবেদ্য পদার্থের সম্পর্কশূন্য ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর অলৌকিক চমৎকারাত্মক এই রস-বস্তু'। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ বলিয়াছেন, রস "ভগ্নাবরণা চিৎ," অর্থাৎ অনাবৃত স্বপ্রকাশ অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপ।

কিন্তু পরমার্থ-দৃষ্টিতে রস এক, অখণ্ড, আনন্দস্বরূপ হইলেও বিভাগদর্শীর দৃষ্টিতে রসের আটটি, নয়টি বা দশটি পূর্ব্বোক্ত ব্যাবহারিক বিভাগ কল্পিত হইয়াছে (৫)। অতএব, মূলতঃ এক হইয়াও রসের বহুত্ব যুক্তিবিরুদ্ধ নহে।

মহর্ষি বলিয়াছেন—বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারি-ভাবের সংযোগে রসনিষ্পত্তি ঘটিয়া থাকে (৬)।

রসনিষ্পত্তির স্বরূপ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিচার পৃথক্ প্রবন্ধে করা যাইবে। তথাপি এ প্রসঙ্গে নবীন আলঙ্কারিক

---

(৫) "এক এব তাবৎ পরমার্থতো রসঃ সূত্রস্থানীয়ত্বেন রূপকে প্রতিভাতি। তস্যৈব পুনর্ভাগদৃশা বিভাগঃ। সোঽপি চ ন অনেকমুখপ্রেক্ষিতামতিবর্ত্ততে"—অভিনব-ভারতী, নাট্যশাস্ত্র, বরোদা সংস্করণ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ২৭৩।

(৬) মহর্ষি-কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ এই সূত্রটির উপরই সুবিস্তীর্ণ রসবিচারের ভিত্তি। "বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রস-নিষ্পত্তিঃ"—নাঃ শাঃ, বরোদা সং, প্রথম ভাগ, পৃঃ ২৭৪।

এস্থলে অভিনব-ভারতীতে ভট্টলোল্লট, শ্রীশঙ্কুক, ভট্টনায়ক প্রভৃতি পূর্ব্বপক্ষীয়গণের মত বিচারপূর্ব্বক অভিনবগুপ্ত রস-নিষ্পত্তি সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা ভবিষ্যতে এক পৃথক্ প্রবন্ধে বিবৃত করিবার ইচ্ছা রহিল। আলোচ্য প্রবন্ধে কেবল নাট্যশাস্ত্র-রসাধ্যায়ের মূলাংশ অনুসৃত হইয়াছে।

বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারি-ভাবের লক্ষণ মহর্ষি ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেন নাই—দিয়াছেন সপ্তম অধ্যায়ে। ঐগুলিরও ব্যাখ্যা যথাস্থানে সবিস্তরে করা হইবে। তথাপি সংক্ষেপে আলোচ্য বিবেচনায় উহাদিগের স্বরূপ নিম্নে প্রদত্ত হইল। বিভাব—রত্যাদির উদ্বোধক —হেতুস্বরূপ। বিভাব দ্বিবিধ:—(১) আলম্বন—নায়ক-নায়িকাদি—যাহা অবলম্বনপূর্ব্বক রসোদ্গম হয়; (২) উদ্দীপন —আলম্বনের চেষ্টা, রূপ, ভূষণ, দেশ-কাল, চন্দ্র-চন্দন-কোকিলকূজন ভ্রমরগুঞ্জন প্রভৃতি রসের উদ্দীপক। অনুভাব—আলম্বন ও উদ্দীপনের দ্বারা উদ্বুদ্ধ স্থায়ী ভাব যাহার দ্বারা বাহিরে প্রকাশিত হয়—সেই কার্য্যরূপ ভাবই অনুভাব; যথা—ভ্রূবিলাস, কটাক্ষ প্রভৃতি। অনুভাব দ্বারা স্থায়িভাব সহৃদয় দর্শকসমাজে অনু-ভাবিত (অর্থাৎ উদ্বোধনানন্তর বহিঃপ্রকাশিত) হয়। বিভাব যেমন রত্যাদি স্থায়িভাবের উদ্বোধন ও উদ্দীপনের কারণ, অনুভাব তেমনই আলম্বন ও উদ্দীপন এই দ্বিবিধ বিভাব-দ্বারা

মতানুসারে সংক্ষেপে এইটুকু আপাততঃ বলা যায় যে—বিভাব-অনুভাব-(সাত্ত্বিক)-ব্যভিচারিভাবসমূহের দ্বারা আস্বাদনযোগ্য অবস্থায় আনীয়মান স্থায়ী ভাবই 'রস'। বিভাবাদি-সংযোগে রসনিষ্পত্তি ঘটিলেও বিভাবাদি রসের কারণ নহে। কার্য্যজ্ঞান ও কারণজ্ঞান যুগপৎ বর্ত্তমান থাকা সম্ভব নহে; কিন্তু বিভাবাদিসমূহালম্বনাত্মক রসের প্রতীতিকালে বিভাবাদির প্রতীতিও ঘটিয়া থাকে। আবার রস জ্ঞাপ্যও নহে। জ্ঞাপ্য বস্তু কখনও কখনও অজ্ঞাত অবস্থাতেও বর্ত্তমান থাকিতে পারে। এমন অনেক পদার্থ জগতে বিদ্যমান আছে, যাহার জ্ঞান আমার নাই। কিন্তু তাহাদিগের সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নাই বলিয়াই যে সে সকল বস্তুর অস্তিত্ব নাই—ইহা বলা চলে না। অতএব, মোটের উপর দেখা যাইতেছে যে, প্রতীতি ব্যতীত রসের পৃথক্ সত্তাই নাই। সহৃদয় সামাজিকগণের চর্ব্বণা বা আস্বাদনই এবংবিধ অলৌকিক রসের অস্তিত্বের প্রতি একমাত্র প্রমাণ। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, রসের আস্বাদন রসস্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে। আর এই রসাস্বাদনকালে অপর জ্ঞেয় বস্তুর (বেদ্যান্তর) অনুভবই হয় না। ইহা মনে রাখিলে দর্পণকার রসস্বরূপের বর্ণনা করিতে যাইয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহার গূঢ়ার্থ উপলব্ধি হইবে—চিত্তসত্ত্বের উদ্রেকের ফলে অখণ্ড স্বপ্রকাশ আনন্দস্বরূপ চিন্ময় অপর জ্ঞেয় পদার্থের সহিত সম্পর্কবিহীন ব্রহ্মাস্বাদ-তুল্য রস স্বাভিন্নরূপে আস্বাদ্যমান হইয়া থাকে; আর লোকোত্তর-চমৎকার বা বিস্ময় এই রসের প্রাণ (৭)। বিশ্বনাথ বরং একটু কমাইয়া বলিয়াছেন—রসাস্বাদ ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর। বস্তুতঃ উপনিষদে পরব্রহ্মকেই রসস্বরূপ বলা হইয়াছে। জগন্নাথও শ্রুতি-সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—ব্রহ্মরস ও কাব্যরস অভিন্ন—রস 'ভগ্নাবরণা চিৎ'। বিভাবাদি দ্বারা আস্বাদয়িতার অজ্ঞানরূপ আবরণভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই রস স্বতঃপ্রকাশিত হইতে থাকে—ইহাকেই রসের চর্ব্বণা বা আস্বাদন বলে। মহর্ষি ভরত এই ব্যাপারকেই 'রস-নিষ্পত্তি' বলিয়াছেন। এই রসনিষ্পত্তিই কাব্য-নাটক-নৃত্য-নৃত্ত-গীত-বাদ্য-অভিনয় প্রভৃতি সকল কলা-সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য। বোধ হয়, বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিকপ্রবর হেগেল এইরূপ ভগ্নাবরণ-চিদ্রূপ রসকেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—'the beautiful is the manifestation of Idea.'

ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপে মহর্ষি বলিয়াছেন,—দধি-কাঞ্জি

উদ্বুদ্ধ ও উদ্দীপিত রত্যাদি স্থায়িভাবের বহিঃপ্রকাশরূপ কার্য্য। বিভাব—কারণ, অনুভাব—কার্য্য। ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব—স্থায়িভাব স্থিরভাবে বর্ত্তমান থাকে; তাহাদিগের উপর আবির্ভাব-তিরোভাবের দ্বারা যাহারা প্রকাশিত হয় ও সেই সঙ্গে স্থায়িভাবের অনুকূলতাচরণ করে, তাহারা ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব। সাত্ত্বিক—সত্ত্বসম্ভূত বিকার। এগুলি অনুভাবেরই অন্তর্গত। তথাপি সত্ত্বসম্ভূত বিকার বলিয়া আটটি বিশিষ্ট ভাবকে পৃথক্ করিয়া 'সাত্ত্বিক' নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। বিশ্বনাথের মতে সাত্ত্বিকভাব অনুভাব হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন।

'সত্ত্ব' বলিতে বুঝায় বাহ্য জ্ঞেয় বস্তু হইতে বিমুখ চিত্তবৃত্তি, অথবা বাহ্য প্রমেয় হইতে বিমুখতাজনক আন্তর ধর্ম্মবিশেষ। বিশ্বনাথের মতে রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা অস্পৃষ্ট মনই সত্ত্ব।

এ প্রসঙ্গে মৎসম্পাদিত শ্রীভগবন্নন্দিকেশ্বর-কৃত 'অভিনয়দর্পণ' (পৃঃ ২১-২৪) দ্রষ্টব্য।

(৭) এই কারণে সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথের বৃদ্ধপ্রপিতামহ সহৃদয়-গোষ্ঠী-গরিষ্ঠ কবি-পণ্ডিতমুখ্য নারায়ণ অদ্ভুতকেই একমাত্র রস বলিয়াছেন। ধর্ম্মদত্ত নিজ গ্রন্থে নারায়ণের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"রসে সারশ্চমৎকারঃ সর্ব্বত্রাপ্যনুভূয়তে।
তচ্চমৎকারসারত্বে সর্ব্বত্রাপ্যদ্ভুতো রসঃ।
তস্মাদদ্ভুতমেবাহ কৃতী নারায়ণো রসম্‌"।

চমৎকার (অর্থাৎ চিত্তবিস্তার বা বিস্ময়) রসের সারভূত—সকল রসেই ইহা অনুভূত হয়। অতএব বিস্ময় (æsthetic thrill) যাহার স্থায়ী ভাব, সেই অদ্ভুত রসই সর্ব্বত্র বিদ্যমান। এই কারণেই দশরূপকের প্রকৃতিস্থানীয় শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর রূপক যে নাটক, তাহার উপসংহারে অদ্ভুত রসের স্ফূর্ত্তি প্রয়োজন—এই কথা শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন। এ অদ্ভুত রস কেবল অলৌকিক ঘটনার সন্নিবেশেই জন্মে না। লোকোত্তর-চমৎকার অর্থাৎ অনন্যসাধারণ রমণীয়তার (æsthetic thrill) উদ্রেক ব্যতীত যথার্থ সরসভাবে নাটকের পরিসমাপ্তি হইতে পারে না।

নারায়ণের এই মতদর্শনে বোধ হয় রসের অখণ্ডতা তিনি যথার্থই উপলব্ধি করিয়াছিলেন; নতুবা সর্ব্বত্র অদ্ভুতই একমাত্র রস—ইহা তিনি বলিতেন না। মহাকবি ভবভূতিও উত্তরচরিতে বলিয়াছেন—রস এক—উহা করুণ। তবে সে ভাবাবেগের কথা। সীতাবিরহ-ব্যাকুল শ্রীরামচন্দ্রের চিত্তের সহিত একতানচিত্ত হইয়া তিনি এই উক্তি করিয়াছিলেন—ধীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণের পর এ কথা বলেন নাই।

প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্যঞ্জন (৮), তিন্তিড়ী-গোধূম-হরিদ্রা প্রভৃতি ওষধি (৯) ও গুড় প্রভৃতি দ্রব্যের (১০) যথাযোগ্য সুনিপুণ সংযোগে যেমন এক অপূর্ব্ব (১১) রসের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ নানাপ্রকার বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারিভাব-সাত্ত্বিকভাবাদির দ্বারা প্রত্যক্ষভাবাপন্ন হইয়া স্থায়িভাব রসত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অভিনবগুপ্ত ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—দধি প্রভৃতি সরস ব্যঞ্জন বিভাব-স্থানীয়, হরিদ্রা প্রভৃতি ওষধি অনুভাব-স্থানীয়, আর গুড়াদি দ্রব্য ব্যভিচারি-স্থানীয়। সাত্ত্বিক-ভাবগুলি অবশ্য অনুভাবেরই অন্তর্ভুক্ত। এই কারণে তাহাদিগের আর পৃথক্ উল্লেখ করা হয় নাই। মূল সূত্রে দার্ষ্টান্তিক-স্থলে বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারি-ভাব এই তিনটির উল্লেখ আছে বলিয়া দৃষ্টান্তেও ব্যঞ্জন-ওষধি-দ্রব্য এই তিনের উল্লেখ করা হইয়াছে। অবশ্য স্থায়িভাব যে অন্নস্থানীয়—তাহা মহর্ষি পরবর্ত্তী স্বকৃত ভাষ্যগ্রন্থে স্পষ্টরূপে বিবৃত করিয়াছেন।

নানাবিধ ব্যঞ্জন-ওষধি-গুড়াদি দ্রব্যের একত্র পাকের ফলে তাহাদিগের সম্যক্ মিশ্রণে (১২) যে অপূর্ব্ব রসের উৎপত্তি হয়, তাহা ঐ সকল উপাদানের পৃথক্ পৃথক্ আস্বাদ বা উহাদিগের সকলের কেবল বাহ্য-মিশ্রণ-জনিত সমষ্টিভূত স্বাদ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। ধরুন, কোন্ ব্যক্তি অম্ল (অম্বল) রন্ধন করিতেছে। সে ঐ উদ্দেশ্যে দধি, হরিদ্রা ও গুড় একত্রে মিশাইয়া পাক করিল। এই পাকের পর যে দ্রব্যটি প্রস্তুত হইল, তাহার স্বাদ দধির আস্বাদ, হরিদ্রার আস্বাদ ও গুড়ের আস্বাদ হইতে যেমন পৃথক্, দধি-হরিদ্রা ও গুড় একত্র মিশাইলে যে মিশ্র স্বাদ পাওয়া যায় তাহা হইতেও তেমনই সম্পূর্ণ ভিন্ন। পাকের ফলে উহাতে এমন একটি অপূর্ব্ব রসের সঞ্চার হইয়াছে, যাহা কেবল বাহ্য-মিশ্রণ-দ্বারা জন্মিতেই পারে না। ইহারই নাম অপূর্ব্ব রসের নিষ্পত্তি।

ঠিক এইরূপে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব দ্বারা উপগত (অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবাপন্ন) হইয়া অন্তঃকরণে বাসনা-রূপে অবস্থিত স্থায়িভাব রসত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভোজ্যরসের ন্যায় নাট্যরসেরও প্রাণ আস্বাদ (১৩)। রস্যমানতা (অর্থাৎ আস্বাদ্যমানতাই) ইহার জীবন বলিয়া ইহার নাম 'রস' (১৪)।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে—রস কিরূপে আস্বাদিত হইয়া থাকে? তাহার উত্তরে মহর্ষি ভরত বলিয়াছেন—

---

(৮) ব্যঞ্জন—'ব্যঞ্জন' বলিতে বাঙ্গালা ভাষায় বুঝায় রন্ধন-করা তরকারী। সংস্কৃতে 'ব্যঞ্জন' শব্দের অর্থ 'উপসেচন'-দ্রব্য অর্থাৎ যাহা দ্বারা অন্নকে সরস করা যায়—ভাত মাখা যায়। ডাল, ঝোল, দুধ, দই, ঘোল ব্যঞ্জনের দৃষ্টান্ত। পক্ষান্তরে, শুক্‌না তরকারী—যাহা দ্বারা অন্ন সরস হয় না (যেমন, ভাজা প্রভৃতি)—ব্যঞ্জন নহে—ভক্ষ্য-দ্রব্যবিশেষ মাত্র। ব্যঞ্জন—condiment, sauce, an article used in seasoning food. —Apte.

(৯) ওষধি—সাধারণতঃ 'ওষধি' বলিতে বুঝায় সেই সকল গাছ—যাহাদিগের ফল পাকিলেই গাছ মরিয়া যায়—"ওষধ্যঃ ফলপাকান্তাঃ" (মনু ১।৪৬)। এস্থলে অভিনবগুপ্ত দৃষ্টান্তস্বরূপে তেঁতুল, গম, হলুদ প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ওষধি বলিতে এক্ষেত্রে বুঝাইতেছে 'মস্‌লা' জাতীয় দ্রব্য। ওষধি—herbs.

(১০) দ্রব্য—অভিনবগুপ্ত দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, গুড় প্রভৃতি।

(১১) অপূর্ব্ব রস—মূলে আছে 'ষাড়বাদি' রস। অভিনবগুপ্ত ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—মধুর, তিক্ত, অম্ল, লবণ, কটু ও কষায় এই ছয়টি মূল রস পরস্পর পরস্পর হইতে অত্যন্ত পৃথক্। ইহাদিগের প্রত্যেকটি হইতে অথবা ইহাদিগের দুই তিন বা ততোধিক রসের কেবল বাহ্য মিশ্রণ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন এই ষাড়বাদি রস। এই কারণে ইহাদিগকে অপূর্ব্ব বলা হইয়াছে। পাকরূপ সংযোগের দ্বারাই এই অপূর্ব্ব রস জন্মে, কেবল মিশ্রণে জন্মে না। ইহার একটি অতি সাধারণ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। সরবৎ তৈয়ারী করিতে হইলে উহাতে দই, ঠাণ্ডা জল বা বরফ, মিষ্ট দ্রব্য (গুড়, চিনি বা সিরাপ), সুগন্ধি দ্রব্য প্রভৃতি একসঙ্গে মিশাইয়া খানিকক্ষণ বেশ করিয়া নাড়িতে হয়। ঐ সব জিনিষ বেশ ভাল ভাবে মিশিয়া গেলে যে সরবৎ তৈয়ারী হয়, তাহার আস্বাদ দই বরফ গুড় প্রভৃতি জিনিষের আলাদা আলাদা আস্বাদ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এমন কি, ঐ জিনিষগুলি কেবল উপর-উপর মিশাইলে যে মিশ্র আস্বাদ হয় তাহা হইতেও সরবতের আস্বাদ পৃথক্। উক্ত জিনিষগুলির সংযোগে (অর্থাৎ সরবৎ তৈয়ারী করিবার বিশেষ প্রক্রিয়া অনুসারে সম্যগ্রূপে মিশ্রণের ফলে) সরবতে একটি অভিনব অপূর্ব্ব আস্বাদের উৎপত্তি হয়। এই আস্বাদ সরবতের কোন উপাদানেই পূর্ব্বে ছিল না—সরবতেই প্রথম উৎপন্ন হইল। বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারিভাব-সংযোগে উৎপন্ন রসের আস্বাদও সেইরূপ বিভাবাদি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

(১২) এই সম্যক্ মিশ্রণ পাক ব্যতীত কেবল বাহ্য মিশ্রণে নিষ্পন্ন হয় না। এই কারণে অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন—"এবং পাকক্রমেণ সম্যগ্‌যোজনারূপাৎ কুশলসম্পাদ্যাৎ সংযোগাৎ"—অভিনব-ভারতী, বরোদা সং, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৮৯।

(১৩) "নানাভূতৈর্বিভাবাদিভিরুপসমীপং প্রত্যক্ষকল্পতাং গতা লোকাপেক্ষয়া যে স্থায়িনো ভাবাস্তে রস্যমানৈকজীবনং রসত্বং অত্র প্রতিপদ্যন্তে"—অভিনবভারতী, বরোদা সং, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৮৯।

(১৪) "রস ইতি কঃ পদার্থঃ? উচ্যতে—আস্বাদ্যত্বাৎ"।

যেমন স্বস্থচিত্ত পুরুষ নানা-ব্যঞ্জন-সংস্কৃত অন্ন ভোজন করিতে করিতে ভোজ্যরস আস্বাদন করেন ও তজ্জন্য হর্ষাদি প্রাপ্ত হন, ঠিক সেইরূপ সহৃদয় দর্শক নানা ভাব (অর্থাৎ বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারিভাব) ও বাগঙ্গ-সত্ত্বাভিনয় দ্বারা অভিব্যক্ত স্থায়িভাব আস্বাদন করিয়া থাকেন ও তজ্জন্য হর্ষাদি অনুভব করিয়া থাকেন। এই প্রকারে ভাবাভিনয়-ব্যঞ্জিত স্থায়িভাব 'নাট্যরস'-পদবাচ্য ও আস্বাদনযোগ্য হইয়া থাকে (১৫)।

কথাটি আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝা প্রয়োজন। রস কিরূপে আস্বাদিত হইতে পারে?—এ প্রশ্নের নিগূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, আস্বাদন বলিতে বুঝায় রসনেন্দ্রিয়-জনিত জ্ঞান। আস্বাদ-গ্রহণ কেবল রসনেন্দ্রিয়সাধ্য। অতএব ভোজ্যরসের আস্বাদন সম্ভব। পক্ষান্তরে, নাট্যরসের অনুভূতি ত রসনেন্দ্রিয়সাধ্য নহে। অতএব, নাট্যরসের আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে কিরূপে? ইহার উত্তর অভিনবগুপ্ত সবিস্তরে দিয়াছেন। এস্থলে তাহার সারাংশমাত্র উদ্ধৃত করা হইল। 'আস্বাদন' শব্দের মুখ্যার্থ রসনেন্দ্রিয়-জনিত জ্ঞান—ইহা সত্য বটে। আর এই কারণে 'ভোজ্য-রসের আস্বাদন'—এইরূপ প্রয়োগে 'আস্বাদন'-পদের মুখ্য (অভিধাবৃত্তি-লভ্য আভিধানিক) অর্থ যথাযথ-ভাবে রক্ষিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, 'নাট্যরসের আস্বাদন'—এইরূপ প্রয়োগস্থলে 'আস্বাদন'-পদের গৌণ (লক্ষণাবৃত্তি-লভ্য ঔপচারিক) অর্থ কল্পনা করিতে হয়। এই দুই প্রকার আস্বাদনেই আস্বাদয়িতা আস্বাদ্য ও আস্বাদনফলের সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্যই এইরূপ গৌণ প্রয়োগের কারণ (১৬)। ভোজ্যরসের আস্বাদন-স্থলে—ব্যঞ্জনসংস্কৃত অন্ন আস্বাদ্য; অন্নভোজনে একাগ্রচিত্ত ভোক্তাই আস্বাদয়িতা (কারণ অন্যমনস্ক হইয়া ভোজন করিলে ভোজনকর্ত্তা অন্নের আস্বাদ পান না); আর হর্ষ-তৃপ্তি-পুষ্টি-বল-আরোগ্য-জীবন প্রভৃতি আস্বাদনের ফল বলিয়া পরিগণিত হয়। নাট্যরসের আস্বাদন-স্থলেও—বিভাবাদি নানা ভাব ও বিবিধ অভিনয় দ্বারা অভিব্যক্ত স্থায়িভাব রসরূপাপন্ন হইয়া আস্বাদ্য হইয়া থাকে; অভিনয়দর্শনে তন্ময়চিত্ত একাগ্র-হৃদয় সামাজিক উহার আস্বাদনকর্ত্তা; আর হর্ষ-ধর্ম্ম-ব্যুৎপত্তি-বৈদগ্ধ্য প্রভৃতি আস্বাদনফল বলিয়া গণ্য হয়। ভোজ্যরসাস্বাদনের সহিত নাট্যরসাস্বাদনের এইরূপে কর্ম্ম-কর্ত্তৃ-ফল-গত সাদৃশ্য বর্ত্তমান। বস্তুতঃ, বিভাবাদি-জনিত প্রতীতিবিশেষই এই আস্বাদন বা রসনাক্রিয়া। আরও সরলভাষায় বুঝাইতে হইলে বলা যায়—ভোজ্য-রসের আস্বাদন বাহ্যেন্দ্রিয় রসনা দ্বারা হইয়া থাকে, আর নাট্যরসের আস্বাদন অন্তরিন্দ্রিয়সাধ্য। প্রথমটি লৌকিক আস্বাদন, ও দ্বিতীয় আস্বাদনটি অলৌকিক। তাহার কারণ—ভোজ্যরস স্থূল পদার্থ, উহা ভোজনবিলাসীর বাহ্যেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য; আর নাট্যরস সূক্ষ্ম—অতীন্দ্রিয়; উহা কেবল সহৃদয় সামাজিকের সুসংস্কৃত অন্তঃকরণ গ্রাহ্য (১৭)।

---

(১৫) "কথমাস্বাদ্যতে রসঃ? যথা হি নানাব্যঞ্জনসংস্কৃতমন্নং ভুঞ্জানা রসানাস্বাদয়ন্তি সুমনসঃ পুরুষা হর্ষাদীংশ্চাধিগচ্ছন্তি, তথা নানাভাবাভিনয়ব্যঞ্জিতান্ বাগঙ্গসত্ত্বোপেতান্ স্থায়িভাবানাস্বাদয়ন্তি সুমনসঃ প্রেক্ষকা হর্ষাদীংশ্চাধিগচ্ছন্তি, তস্মান্নাট্যরসাঃ"—নাঃ শাঃ, বরোদা সং, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৮৯-৯০।

বাগঙ্গসত্ত্বাভিনয়—অভিনয় চতুর্ব্বিধ:—(১) আঙ্গিক, (২) বাচিক, (৩) আহার্য্য ও (৪) সাত্ত্বিক (নাঃ শাঃ, বরোদা সং, ষষ্ঠ অধ্যায়, ২৪শ শ্লোক)। আঙ্গিক—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-উপাঙ্গ-দ্বারা নিদর্শিত অভিনয়। বাচিক—দশরূপকাদিতে বাক্যের দ্বারা বিরচিত (ক্রিয়মাণ) অভিনয়। আহার্য্য—(নাট্যপ্রয়োগে) হার-কেয়ূর নানাবিধ বেশ প্রভৃতি দ্বারা শরীরের অলঙ্করণ আহার্য্য অভিনয়। সাত্ত্বিক—ভাবজ্ঞ (নটাদি)-কর্ত্তৃক সাত্ত্বিক ভাবসমূহের ভিতর দিয়া বিভাবিত (অর্থাৎ বিশিষ্টভাবে নিষ্পাদিত) অভিনয়। সাত্ত্বিক ভাবসমূহের নাম পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ মদীয় 'অভিনয়দর্পণে' (পৃঃ ২৪—২৯) দ্রষ্টব্য।

(১৬) গৌণ প্রয়োগের নানা প্রকার কারণ আছে; সাদৃশ্য তাহাদিগের মধ্যে একটি। নায়িকার মুখের সহিত পদ্ম বা চন্দ্রের সাদৃশ্য থাকায় পদ্ম বা চন্দ্রের বিশিষ্ট গুণগুলিও নায়িকা-মুখে উপচারক্রমে আরোপিত হইয়া থাকে।

(১৭) এস্থলে ইহা প্রণিধানযোগ্য যে, ভোজ্যরসের আস্বাদনেও কেবল জিহ্বাচালনা-রূপ ভোজনক্রিয়াকেই আস্বাদন বলা চলে না। জিহ্বাচালনা হইতে অতিরিক্ত যে মানস ব্যাপার (অর্থাৎ আন্তর অনুভূতি), উহাই আস্বাদন। এই আন্তর অনুভূতি ভোজ্যরস ও নাট্যরস এই উভয়বিধ রসের আস্বাদনস্থলেই সমভাবে বিদ্যমান। কেবল পার্থক্য এই যে—ভোজ্যরস বাহ্যেন্দ্রিয় রসনা-দ্বারা প্রথম গৃহীত হইয়া অন্তঃকরণ-দ্বারা অনুভূত হইয়া থাকে; আর নাট্যরস কোন বাহ্যেন্দ্রিয়-দ্বারা গৃহীত হয় না—একেবারেই অন্তঃকরণে অনুভূত হয়। "রসনাব্যাপারাদ্ ভোজনাদধিকো যো মানসো ব্যাপারঃ স এবাস্বাদনম্…ন রসনাব্যাপার আস্বাদনমপি তু মানস এব, স চাত্রাবিকলোঽস্তি। কেবলং লোকে রসনাব্যাপারানন্তরভাবী স প্রসিদ্ধ ইত্যুপচার ইহ দর্শিতঃ"—অভিনব-ভারতী, পৃঃ ২১১।

এই প্রসঙ্গে শিষ্যাচার্য্য-পরম্পরা-ক্রমে বিজ্ঞাত দুইটি শ্লোক মহর্ষির নাট্যশাস্ত্রে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাদিগের তাৎপর্য্য এইরূপ—

যেমন ভোজনবিলাসী অন্নরসাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ গুড়াদি নানাবিধ দ্রব্য ও দধি প্রভৃতি বহু ব্যঞ্জন সহযোগে অন্ন ভোজন করিতে করিতে উহার রস আস্বাদন করিয়া থাকেন, ঠিক সেইরূপ সুপণ্ডিত সহৃদয় সামাজিকগণ বিভাবাদি নানাবিধ ভাব ও বিবিধ অভিনয়সম্বদ্ধ স্থায়িভাব-সমূহকে অন্তঃকরণ-দ্বারা আস্বাদন করেন। এই সকল ভাবাভিনয়-ব্যঞ্জিত স্থায়িভাবই 'নাট্যরস' নামে উক্ত হইয়া থাকে (১৮)।

এই স্থলে আর একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে—রস হইতে ভাবের অভিনিষ্পত্তি অথবা ভাব হইতে রসের? মহর্ষি বলিয়াছেন—কাহারও কাহারও মতে পরস্পর সম্বন্ধবশতঃ ইহাদিগের উভয়ের নিষ্পত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। মহর্ষির সিদ্ধান্তে ভাব হইতেই রসনিষ্পত্তি, রস হইতে ভাবের নিষ্পত্তি নহে। আর রস ও ভাব পরস্পর পরস্পরের জনক—ইহাও বলা চলে না। কথাটি আর একটু পরিষ্কারভাবে বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

বিভাব-অনুভাব-সঞ্চারিভাব-সংযোগে রসনিষ্পত্তি হইয়া থাকে—এ কথা ত মহর্ষি পূর্ব্বেই বলিয়াছেন। অতএব, ভাব হইতে রসের অভিনিষ্পত্তি বলাই ত একমাত্র সঙ্গত পক্ষ। তবে অন্য কল্পের প্রশ্নই বা উঠে কেন? ইহার উত্তরে

(১৮) "অত্রানুবংশ্যৌ শ্লোকৌ ভবতঃ—
যথা বহুদ্রব্যযুতৈর্ব্যঞ্জনৈর্বহুভির্যুতম্।
আস্বাদয়ন্তি ভুঞ্জানা ভক্তং ভক্তবিদো জনাঃ॥ ৩৫॥
ভাবাভিনয়সম্বদ্ধান্ স্থায়িভাবাংস্তথা বুধাঃ।
আস্বাদয়ন্তি মনসা তস্মান্নাট্যরসাঃ স্মৃতাঃ" ॥ ৩৬॥
(—নাঃ শাঃ, বরোদা সং, ৬ অঃ, পৃঃ ২৯১)

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিশেষ বক্তব্য আছে। মহর্ষি সর্ব্বত্রই 'নাট্যরস' শব্দটির প্রয়োগ করিয়াছেন। তবে কি বুঝিতে হইবে যে, কেবল নাট্যেই রস বর্ত্তমান, অন্য কাব্যে নাই। অভিনবগুপ্ত ইহার বিচার-প্রসঙ্গে প্রথমে প্রাচীন আচার্য্যগণের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে—কেবল যে নাট্যেই রস বিদ্যমান একথা বলিবার প্রয়োজন নাই; কাব্যও নাট্যায়মান হইলে উহাতে রসানুভূতি সম্ভব। যখনই কাব্যার্থবিষয়ে প্রায় প্রত্যক্ষের ন্যায় জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখনই রসের উদয় হইয়া থাকে। নাট্যপ্রয়োগ ব্যতীত এই প্রত্যক্ষপ্রায় কাব্যার্থজ্ঞানের উদয় সম্ভব নহে। অতএব, নাট্যপ্রয়োগ ব্যতিরেকে রসাস্বাদনও সম্ভব নহে।—"ন নাট্য এব চ রসাঃ কাব্যেঽপি নাট্যায়মান এব রসাঃ; কাব্যার্থবিষয়ে হি প্রত্যক্ষকল্পসংবেদনোদয়ে রসোদয় ইত্যুপাধ্যায়াঃ। যদাহুঃ কাব্যকৌতুকে—'প্রয়োগত্বমনাপন্নে কাব্যেনাস্বাদসম্ভবঃ' ইতি"।—অভিনবভারতী, পৃঃ ২৯১-৯২। কেহ কেহ বলেন—নাট্য ব্যতীত অন্য প্রকার শ্রব্য কাব্যেও গুণালঙ্কার-সৌন্দর্য্যের আতিশয্যবশে রস-চর্ব্বণা (রসাস্বাদন) সম্ভব হয়—"অন্যে তু কাব্যেঽপি গুণালঙ্কার-সৌন্দর্য্যাতিশয়কৃতং রসচর্ব্বণমাহুঃ"—অভিনবভারতী, পৃঃ ২৯২। কিন্তু অভিনবগুপ্তের মতে—কাব্য মুখ্যতঃ দশরূপকাত্মক (অর্থাৎ নাট্যস্বরূপ)। যথাযথ ভাষা-বৃত্তি-কাকু-বেশক্রিয়া (নেপথ্য) প্রভৃতি দ্বারা একমাত্র নাট্যেই রসের পূর্ণতা সম্পাদিত হইয়া থাকে। সর্গবদ্ধ মহাকাব্য প্রভৃতি শ্রব্যকাব্যে এরূপ রসপূর্ত্তির যোগ্যতা নাই। কারণ, উহাতে নায়িকার মুখে সংস্কৃতভাষাময়ী উক্তিপ্রদান প্রভৃতি বহু অনুচিত ব্যাপার নিতান্ত অনুপায় বিবেচনায় কাব্যকার-কর্ত্তৃক স্বেচ্ছায় সংঘটিত হইয়া থাকে। তবে বর্ণনার সুন্দরতা-নিবন্ধন ঐ সকল ত্রুটি সাধারণতঃ উপেক্ষিত হয় বলিয়া শ্রব্য-কাব্যের অনৌচিত্য প্রায় প্রতিভাত হয় না। এই কারণে কাব্যনিবদ্ধ-সমূহের মধ্যে দশরূপককেই (অর্থাৎ নাট্যরচনাকেই) শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করা হইয়াছে—"সন্দর্ভেষু দশরূপকম্"। অতএব, একমাত্র দশরূপকই রসস্ফূর্ত্তির হেতু। তবে দশরূপকের অভিনয়ই যে সকলের চিত্তে রসের উদ্রেক করিবে—এমন কোন নিয়ম নাই। যে সকল স্বভাবতঃ নির্ম্মল-হৃদয় মনস্বী ব্যক্তি সাংসারিক ক্রোধ-লোভ-মোহাদি রিপুর অধীন নহেন, দশরূপক পাঠ বা শ্রবণের সময়েও তাঁহাদিগের চিত্তে রসোদ্রেক হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, যাঁহারা স্বভাবতঃ এরূপ স্বচ্ছ-হৃদয় নহেন, তাঁহাদিগের নিকট নাট্যবিষয়ের প্রত্যক্ষবৎ পরিস্ফুরণের নিমিত্ত নটগণের দ্বারা সম্পাদ্য নানাবিধ অভিনয়-প্রক্রিয়া ও গীতাদি-প্রক্রিয়া নাট্যশাস্ত্রাদিতে মহর্ষি ভরতাদি আচার্য্য-কর্ত্তৃক বিবৃত হইয়াছে। কারণ, শাস্ত্র কেবল বিদগ্ধ সহৃদয় মনীষীদিগের নিমিত্তই রচিত হয় নাই—শাস্ত্র আপামর সাধারণের অনুগ্রাহক। এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে দেখিলে বুঝা যায় যে, রস-বস্তুকে সর্ব্ব-সাধারণের আস্বাদনে-যোগ্য করিবার উদ্দেশ্যে নাট্যাভিনয়কেই রসাস্বাদনের নিমিত্ত বলা হইয়াছে। যাঁহাদিগের নাট্যরচনা-শ্রবণের দ্বারাই রসোদ্রেক হয়, তাঁহাদিগের যে নাট্যাভিনয়-দর্শনেও রসস্ফূর্ত্তি হইবে—এ কথা ত বলাই বাহুল্য। পক্ষান্তরে, যাঁহাদিগের কেবল দশরূপক-শ্রবণে রসস্ফূর্ত্তি হয় না—অভিনয়দর্শনে তাঁহাদিগেরও রসোদ্রেক হইতে দেখা যায়। অতএব, উত্তম-মধ্যম-অধম—সকল শ্রেণীর সামাজিকের পক্ষেই নাট্যাভিনয়দর্শন রসোদ্রেকের সাধারণ হেতু বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কিন্তু দশরূপক-শ্রবণ সকল শ্রেণীর সামাজিকের পক্ষে রসোদ্রেককর হয় না—কেবল উত্তম শ্রেণীর নিকট রসস্ফূর্ত্তিকর হয়। অতএব, নাট্যাভিনয় উত্তম-মধ্যম-অধম-নির্ব্বি-শেষে সকল শ্রেণীর সামাজিকের পক্ষে সমভাবে রসোৎপত্তির সাধারণ নিমিত্ত বলিয়া কেবল নাট্যেই রস বিদ্যমান—পূর্ব্বা-চার্য্যগণ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। আর এই কারণেই মহর্ষির নাট্যশাস্ত্রে বহু স্থলেই 'নাট্যরস' পদটি প্রযুক্ত হইয়াছে।—অভিনব-ভারতী, বরোদা সং, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৯২।

বলা চলে, বস্তুতঃ লৌকিক জগতের ব্যবহারে গো-মহিষা-দির ন্যায় বিভাব-অনুভাব প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ জাতি বা শ্রেণীভুক্ত কোন পদার্থই নাই। উহারা রসনিষ্পত্তি-প্রক্রিয়ায় যথাক্রমে হেত্ববস্থা কার্য্যাবস্থা প্রভৃতির নামমাত্র। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বিভাব—হেতু, অনুভাব—কার্য্য, ইত্যাদি। যখন রসনা অর্থাৎ রসাস্বাদনের উপযোগী হয়, তখনই হেতু-কার্য্যাবস্থাপন্ন এই ভাবগুলি বিভাবাদি নাম-রূপ গ্রহণ করে। এ কারণে রসের খাতিরেই বিভাবাদির আত্মপ্রকাশ—ইহা বলা চলে। তাহা হইলেই দাঁড়াইল এই—(১) বিভাবাদি-সংযোগ হইতে রসনিষ্পত্তি, আবার (২) রসের কৃপায় বিভাবাদির বিভাবাদি-রূপ-প্রাপ্তি ; অতএব (৩) রস ও ভাব পরস্পর পরস্পরের জনক—আর তাহার ফলে অন্যোন্যজনকতা বা পরস্পরাশ্রয়ত্ব দোষের উৎপত্তি ।

মহর্ষি প্রথমেই এই তৃতীয় পক্ষটির খণ্ডন করিলেন। আবার পরিশেষে প্রকারান্তরে এই মতটিরও সমর্থন করিয়াছেন। কয়েকটি শ্লোকের সাহায্যে তিনি সুন্দর-রূপে বিষয়টি বুঝাইয়াছেন। প্রথমে ভাব-শব্দের নির্ব্বচন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, যেহেতু হৃদয়ে সূক্ষ্ম-সংস্কাররূপে অবস্থিত ও নানাবিধ অভিনয়-সম্বদ্ধ রস-গুলিকে ইহারা ভাবিত (অর্থাৎ নিষ্পাদিত) করে, সেই কারণে ইহাদিগের নাম 'ভাব'। অর্থাৎ মোট কথা—ভাব হইতে রসের নিষ্পত্তি। ইহার দৃষ্টান্ত :—যেমন নানাবিধ দ্রব্যের মিশ্রণে পানকরসের নিষ্পত্তি হয়, ঠিক সেইরূপ নানাবিধ অভিনয়ের সাহায্যে ভাবসমূহ রসের নিষ্পত্তি করিয়া থাকে। বস্তুতঃ ভাবহীন কোন রসও যেমন থাকিতে পারে না, তেমনই রসবর্জ্জিত কোন ভাবও দেখা যায় না। অতএব, রস ও ভাবের সিদ্ধি পরস্পরকৃত। ইহার দৃষ্টান্ত :—ব্যঞ্জন ও ওষধি যেমন অন্নকে সরস করে, আবার অন্নও যেমন ব্যঞ্জনাদিকে ভোজনযোগ্য স্বাদু করিয়া তুলে—ঠিক সেই ভাবে ভাব ও রস পরস্পর পরস্পরকে ভাবিত করিয়া থাকে।

অবশ্য 'ভাবিত' শব্দের প্রচলিত অর্থ—সম্পাদিত নিষ্পাদিত, উৎপাদিত ইত্যাদি। তাহা হইলে পরিশেষে পরস্পরাশ্রয় দোষ ত ঘটিতেছেই। তবে আর প্রথমে মহর্ষি রস-ভাবের অন্যোন্য-জনকতা খণ্ডন করিতে যাইলেন কেন? উত্তরে অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন—না, এস্থলে ইতরেতরাশ্রয় দোষ হয় নাই। একই সময়ে একই স্থানে ও একই ক্রিয়ায় যখন দুইটি পদার্থ পরস্পর পরস্পরে আশ্রিত হয়—তখনই ইতরেতরাশ্রয় দোষ বলিয়া গণ্য হয়—কিন্তু ক্রিয়াভেদ হইলে আর এ দোষ ঘটে না। যে দেশে ও যে কালে রাম, শ্যামের পিতৃত্ব-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট, সেই দেশে ও সেই কালে শ্যাম আর রামের পিতা হইতে পারেন না। কিন্তু দেশান্তরে ও কালান্তরে (অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মে) শ্যাম রামের পিতা ছিলেন—ইহা অসঙ্গত হয় না। যে বিশিষ্ট বীজটি যে বিশিষ্ট অঙ্কুরের জনক, সেই অঙ্কুরটিকেই আবার সেই নির্দ্দিষ্ট বীজের উৎপাদক বলা চলে না—তাহাতে ইতরে-তরাশ্রয়-দোষ ঘটে। কিন্তু কোন একটি বীজ একটি বিশিষ্ট অঙ্কুরের জনক, সেই অঙ্কুরটি আবার অন্য আর একটি বীজের জনক, সেই বীজটি আবার অপর এক অঙ্কুরের জনক—এই ভাবে অনাদিকাল ধরিয়া বীজাঙ্কুর-প্রবাহ স্বীকার করিলেও কোনরূপ অন্যোন্যজনকতা বা ইতরেতরাশ্রয়-দোষ ঘটে না। কারণ, ইহা দৃষ্টসিদ্ধ।

বর্ত্তমান প্রসঙ্গেও এইরূপ ব্যাখ্যা করা চলে যে—ভাব রসকে 'ভাবিত' করে, অর্থাৎ রসনিষ্পত্তি করে—রসকে আস্বাদনযোগ্য করে; আর রস ভাবকে 'ভাবিত' করে, অর্থাৎ—ভাবকে 'ভাব'-নাম-গ্রহণের যোগ্য করিয়া তুলে—রসের নিষ্পত্তি হইলেই তবে বিভাবাদি স্ব-স্ব-ব্যপদেশ (নাম) ধারণ করে। যেমন কাপড়ের তুলনায় সূতাগুলি উহার 'কারণ' বলিয়া গণ্য হয়। আবার সূতাগুলির অপেক্ষায় কাপড় উহা-দিগের 'কার্য্য'-রূপে গৃহীত হইয়া থাকে। তথাপি সূতা ও কাপড়ের এই কার্য্য-কারণ-ভাবে ইতরেতরাশ্রয়-দোষ স্পর্শ করে না। একথা ঠিক যে, কাপড় তৈয়ারী না হওয়া পর্য্যন্ত সূতাগুলিকে কাপড়ের 'কারণ' বলা চলে না; অর্থাৎ—সূতার 'কারণত্ব' কাপড়ের উপর নির্ভর করে। কিন্তু তাই বলিয়া ত ইহাও বলা যায় না যে, সূতার অস্তিত্বও কাপড়ের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। সূতার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এইরূপ বিভাবাদি পদার্থের অস্তিত্বও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু রসনিষ্পত্তির পূর্ব্বে উহারা

,বিভাবাদি' নামে পরিচিত হয় না। এই দৃষ্টিতে দেখিলে বলা চলে, বিভাবাদির বিভাবাদিত্ব রসসাপেক্ষ—কিন্তু বিভাবাদির অস্তিত্ব রসসাপেক্ষ নহে। অতএব, যেমন কাপড় হইতে সুতার উৎপত্তি অথবা উভয়ের অন্যোন্য-জনকতা স্বীকার করা যায় না, বরং সুতা হইতে কাপড়ের জন্ম যেমন সর্ব্ববাদি-সম্মত, অথচ কাপড়ের উৎপত্তির পূর্ব্বে সুতাকে যেমন কাপড়ের 'কারণ' বলা যায় না, ও সেই হিসাবে সুতার কারণ-ভাব যেরূপ বস্ত্রসাপেক্ষ,—ঠিক সেইরূপ রস হইতে বিভাবাদি-নিষ্পত্তি বা রস-ভাবের অন্যোন্যজনকতা স্বীকার করা চলে না, বরং বিভাবাদি ভাব হইতে রসনিষ্পত্তিই সিদ্ধান্ত-পক্ষ-রূপে সুস্থিত হয়, অথচ বিভাবাদি পদার্থের বিভাবাদি-ব্যপদেশ রসনিষ্পত্তির পূর্ব্বে সম্ভব হয় না ও সেই হিসাবে বিভাবাদি রস-দ্বারা ভাবিত (অর্থাৎ বিভাবাদি-ব্যপদেশযোগ্য—বিভাবাদি নাম রসসাপেক্ষ)—একথা বলা চলে (১৯)।

এই প্রসঙ্গে মূলে আর একটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে:—যেমন বীজ হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে পুষ্প ও পুষ্প হইতে ফল, সেইরূপ সকলের মূল রস—তাহাতে ভাব বিশেষরূপে অবস্থিত। ইহা পড়িলেই মনে হয়, তবে ত এস্থলে মহর্ষি স্বয়ং রস হইতে ভাবনিষ্পত্তিও স্বীকার করিয়াছেন। তবে তিনি সে পক্ষের খণ্ডনপূর্ব্বক ভাব হইতে রসনিষ্পত্তি পক্ষ স্থাপন করিলেন কিরূপে? উত্তরে অভিনবগুপ্ত বলিতেছেন—মহর্ষি রসনিষ্পত্তির কথা বলিবার পূর্ব্বেই সূচনা করিয়া রাখিয়াছেন যে, রস ব্যতীত কোন বিষয়েরই প্রবৃত্তি হয় না ("ন হি রসাদৃতে কশ্চিদপ্যর্থঃ প্রবর্ত্ততে"—নাঃ শাঃ বরোদা সং, ৬ অঃ, পৃঃ ২৭৪)। যদি তাহাই হয়, তবে আবার ভাব হইতে রসনিষ্পত্তি হয় কিরূপে? উত্তরে অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন যে—যেমন একটি ফল হাতে পড়িলেই উহার কারণভূত পুষ্প, পুষ্পের জনক বৃক্ষ, ও বৃক্ষের হেতু বীজের কথা মনে পড়ে, সেইরূপ সহৃদয় সামাজিকগণ রসাস্বাদনকালে তাঁহাদিগের রসাস্বাদনরূপ ফলের মূল-বীজ-স্থানীয় কবিচিত্ত-গত রসের সন্ধান পাইয়া থাকেন। আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য এই ব্যাপারটিরই সূক্ষ্মভাবে ইঙ্গিত করিয়াছেন—"শৃঙ্গারী চেৎ কবিঃ" ইত্যাদি। অতএব, দাঁড়াইতেছে এই যে—মূলবীজ-স্থানীয় কবিগত রস, বৃক্ষ-স্থানীয় তাঁহার কাব্য, পুষ্প-স্থানীয় অভিনয় প্রভৃতি নট-ব্যাপার, আর ফল-স্থানীয় সামাজিকগণের রসাস্বাদ। তাই এই সমগ্র বিশ্বই রসময় (২০)।

এই ভাবে বিশ্লেষণ করিলে পূর্ব্বোক্ত তিনটি পক্ষকেই কোন না কোন উপায়ে সমর্থন করা যায়—ইহা অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে ভবিষ্যতে আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী।

(১৯) "ভাবা রসান্ ভাবয়ন্তি নিষ্পাদয়ন্তি, রসাস্তু ভাবান্ ভাবয়ন্তি ভাবান্ কুর্ব্বন্তি ভাবাদিব্যপদেশ্যান্ কুর্ব্বন্তি···যথা পটাপেক্ষয়া তন্তবঃ পটকারণমিতি ব্যপদেশ্যাঃ, তন্তুপেক্ষয়া পটঃ কার্য্যো, ন চেতরেতরাশ্রয়ং, তথা প্রকৃতেঽপীতি"—অভিনব-ভারতী, প্রথম খণ্ড, বরোদা সং, পৃঃ ২৯৪।

(২০) অভিনব-ভারতী, প্রথম খণ্ড, বরোদা সং, পৃঃ ২৯৫।

সম্ভবামি যুগে যুগে

সারা বিশ্বটা বারুদের ঘর, বিজ্ঞান শুধু বজ্র গড়ে,
সহিতে না পারি ধরণীর ভার, বাসুকির শির নিয়ত নড়ে।

শ্রমিক কাঁদিছে পর্ণকুটীরে, ধনিক দু'হাতে লুঠিছে স্বর্ণ,
মাছি মারিবারে কামান পেতেছে,—রাবণ, শুম্ভ, কুম্ভকর্ণ;
মেঘের আড়ালে শত মেঘনাদ, প্রতি জনে হানে ব্রহ্ম-অস্ত্র,
মন্দির ভাঙ্গে,—পুড়ে হয় ছাই—তন্ত্র, মন্ত্র, ধর্ম্ম-শাস্ত্র।
যীশুর রাজ্যে, বুদ্ধের দেশে নরবলি চলে দিবস-রাত্রি,
শুষ্ক-কণ্ঠে 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' ডাকে সংসার-মরু-পথের যাত্রী।

"ধর্ম্মের গ্লানি যখন ধরায়, আপনারে সৃজি তখনই নিত্য"
'গান্ধী' 'ভ্যালেরা' 'কামালের' কাজ প্রমাণ ক'রেছে
এ কথা সত্য।
বিশ্বমাতার প্রসব-বেদনা—মহামানবের জনম জন্য—
নব-যুগ হেরি, "নব-গীতা" শুনি কত দিনে
হবে জীবন ধন্য!

শ্রীচণ্ডীদাস মজুমদার।

(উপন্যাস)

১৮

কিন্তু মূঢ়ের মতো বসিয়া কল্পনা, বা আকাশ-কুসুম লইয়া মিথ্যা এই মালা গাঁথা···শিপ্রা চমকিয়া উঠিল! ভাবিল, কল্পনা লইয়া সুখী হয় তারা, যারা ভীরু! শিপ্রা তাদের দলের নয়। যা করিবে ভাবিয়াছে, শিপ্রা চিরদিন তা করিয়াছে সাহসে ভর করিয়া! অতএব···

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া শিপ্রা উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘড়িতে ঢং করিয়া একটা বাজিল। ঘড়ির পানে চাহিয়া দেখে, সাড়ে দশটা। ভাবিল, এখন আর চিন্তা নয়, কল্পনা নয়···নিদ্রা। তার পর কাল সকালে···

সুইচ্-অফ্ করিয়া আলো নিবাইয়া শিপ্রা শয়ন করিল। সিল্কের সুজনি টানিয়া গা ঢাকিয়া চক্ষু মুদিল। দেহ-মন শ্রান্ত ছিল। নিদ্রা আসিয়া তখনি দু'চোখে যেন মন্ত্র পড়িয়া দিল!

একটা স্বপ্নের আভাস! সঙ্গে সঙ্গে কার হাতের স্পর্শ···শিপ্রার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চোখ খুলিয়া চাহিয়া দেখে, শরৎ। ঘরে সবুজ বাল্‌বে আলো জ্বলিতেছে। শরৎ জ্বালিয়া দিয়াছে। সবুজ বাল্‌বের স্তিমিত আলোয় শিপ্রা দেখিল, শরতের দু'চোখের দৃষ্টিতে যেন···

ধড়মড়িয়া শিপ্রা উঠিয়া বসিল। কহিল—তুমি!

শরৎ বসিল খাটে···শিপ্রার পাশে। বলিল—হ্যাঁ। ফিরে এলুম।

—হঠাৎ?

শরৎ বলিল—মনটা কেমন করে উঠ্‌লো! মনে হলো, তুমি বেচারী একা আছো, আর আমি এমন আমোদ করে বেড়াচ্ছি!

শিপ্রার দু'চোখে বিরক্তি! ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া শিপ্রা বলিল,— লক্ষণ ভালো নয়। মনের দুর্ব্বলতা। ড্রিঙ্ক করো গে···দুর্ব্বলতা কেটে মন সুস্থ হবে!

শরৎ নিঃশব্দে শুনিল। শুনিয়া ছোট একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—দুর্ব্বলতা নয়···আমার মন আজ প্রিয়ার জন্য আকুল! কথাটা বলিয়া সে উঠিয়া শিপ্রার হাত ধরিল।

টানিয়া নিজের হাত সরাইয়া শিপ্রা উঠিয়া দাঁড়াইল। দু'চোখে আগুন জ্বালিয়া শিপ্রা বলিল—এ রোগ তো ছিল না! আমাকে অপমান করবার জন্য এ-রকম পরিহাস···

কথা শেষ না করিয়া শিপ্রা সরিয়া গেল। বলিল—যাও আমার ঘর থেকে···যাও···আমাকে ঘুমোতে দাও।

শরৎ বলিল—আমি স্বামী···

শিপ্রা বলিল—জানি। অস্বীকার করছি না··· কোনো দিন অস্বীকার করিনি। তা বলে' তোমার মর্জ্জি হলে তুমি এসে উৎপাত করবে, আমার মর্জ্জির পানে চাইবে না···এমন কন্‌ট্রাক্ট তোমার সঙ্গে নেই আমার, নিশ্চয়!

শিপ্রার পানে চাহিয়া শরৎ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রায় দু' মিনিট···তার পর বলিল—খুব বেড়িয়ে এসেছো, শুনলুম। সারা রেঙ্গুন সহর প্রদক্ষিণ করেছো!

—করেছি। আমি শ্রান্ত···ভ্রমণ-কাহিনী শুনতে চাও, কাল সকালে আমার কাছে এসো, বলবো'খন··· সবিস্তারে শুনো।

শরতের দু'চোখে ভ্রূকুটি···শরৎ বলিল—একা নয়··· বন্ধু পেয়েছো! বন্ধুর সঙ্গে রেঙ্গুন-প্রদক্ষিণ!

শিপ্রা ঘুরিয়া দাঁড়াইল···দু'চোখে সেই অগ্নি-শিখা!

শিপ্রা বলিল—হ্যাঁ· অনেক দিনের পুরোনো বন্ধু। কিন্তু এ-কথা কেন, জানতে পারি?

শরৎ বলিল—I was just interested (কৌতূহল)!

শিপ্রা বলিল—ও!···তাহলে শোনো, এ বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো প্রায় দশ-বারো বৎসর পরে···

শরৎ ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, কহিল—ইনি খুব গুণী-লোক ···কল্লোল রায়···যিনি সেই সর্ব্ব-বিদ্যায় পারদর্শী···

শরৎ এত খবর পাইয়াছে!···

শিপ্রা বলিল,—হ্যাঁ···

শিপ্রার স্বর গম্ভীর···ভঙ্গী কঠিন!

শিপ্রা আবার চাহিল শরতের পানে, বলিল—শম্ভু খপর দেছে, নিশ্চয়। জানি, শম্ভুকে তুমি রেখেছো···স্পাই ··আমাকে ওয়াচ করতে! চমৎকার ব্যবস্থা! স্ত্রীকে যে-লোক সন্দেহ করে, সে যদি সত্যিকারের পুরুষ-মানুষ হয়, তাহলে জোর-গলায় স্ত্রীকে সে সে-কথা বলে। যারা কাওয়ার্ড, তারাই শুধু স্পাইয়ের ব্যবস্থা করে! কিন্তু শোনো, when you are so much interested (এত যখন তোমার কৌতূহল), এই বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ আমার দেখা হয়েছিল···তার পর তাঁকে এখানে নিমন্ত্রণ করে এনে খাইয়েছি। আমিই তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলুম! এবং ভেবেছি, কালও তাঁকে নিয়ে বেড়াতে বেরুবো। তিনি এখানে অনেক দিন আছেন···সব জানেন।

কথাটা বলিয়া শিপ্রা স্বামীর পানে চাহিয়া সুদৃঢ় ভঙ্গীতে দাঁড়াইল।

শরৎ বলিল—অনেক দিন এখানে আছেন···বটে? তাহলে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে হবে তো! মানে, আমার মাথায় ক'টা প্ল্যান্ জেগেছে···business plan (ব্যবসার মতলব)···নিশ্চয় তিনি তাহলে আমাকে সাহায্য করতে পারবেন।

শিপ্রা বলিল—কিন্তু ব্যবসা-বুদ্ধি তাঁর মোটে নেই।

শরৎ বলিল—তার মানে?···ও, আমার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়, তোমার ইচ্ছা নয়?

শিপ্রা বলিল—আমার ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তোমার কিছু এসে যাবে না। তাছাড়া কবে তুমি আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা বুঝে চলেছো যে সে-কথা তুলে তোমায় নিষেধ করবো!

শরৎ এ-কথার জবাব দিল না···নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। শিপ্রাও কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল···ভাবিতে-ছিল, শরৎ শুধু এটুকু সংবাদ লইয়াই চুপ করিয়া আছে, তা নয়। নিশ্চয় সে জানে, এক দিন এই কল্লোলের সঙ্গে শিপ্রার অন্তরঙ্গতা ছিল কতখানি···

কিন্তু পুরুষের সঙ্গে শিপ্রার বন্ধুত্ব লইয়া শরৎ কোনো দিন তাকে ছোট একটা প্রশ্ন করে নাই··· কোনো দিন এতটুকু মাথা ঘামায় নাই! আজ তবে রাত্রে হঠাৎ বাড়ী ফিরিয়া এমন···

শরৎ কথা কহিল। বলিল—ইনি তোমার বিশেষ বন্ধু?

শিপ্রা বলিল,—এক-কালে খুব বেশী বন্ধুত্ব ছিল···

—কত দিন আগে?

—প্রায় দশ বছর আগে। উনি তখন কলকাতায় থাকতেন। আমি কলেজে পড়তুম···

—তার পর বৈরাগ্য নিয়ে উনি বেরিয়ে পড়লেন?

—বৈরাগ্য কি কি, তা আমি জানি না। তবে দশ-বারো বছর তাঁকে আর দেখিনি···

—চিঠি লিখে নিজের খপর জানাননি?

—না।

শরৎ আবার চুপ করিয়া রহিল···তার পর পকেট হইতে চুরুট বাহির করিয়া দেশলাই জ্বালিল।

শিপ্রা বলিল—এ-ঘরে নয়···কত দিন তোমায় বলেছি, তোমার ও তামাকের ধোঁয়া আমি সহ্য করতে পারি না··· চুরুটের ধোঁয়ায় আমার মাথা ধরে! সিগারের বাসনা থাকে, দয়া করে নিজের ঘরে গেলে ভালো হয়···

একাগ্র দৃষ্টিতে শিপ্রার পানে চাহিয়া শরৎ এ-কথা শুনিল, তার পর পকেটে দেশলাই রাখিয়া মৃদু হাস্তে বলিল—আই বেগ্ ইওর পার্ডন লেডি…(আপনার কাছে ক্ষমা চাহিতেছি ভদ্রে)!

শিপ্রা বলিল—তোমার কথা শেষ হয়েছে?

শরৎ বলিল—তার মানে?

শিপ্রা বলিল—তার মানে, আজ তাহলে ছুটী দাও। আমি ঘুমোতে চাই। আমার দেহ-মন শ্রান্ত…

শরৎ বলিল—ওল্ড মেমরিস্ (পুরাতন স্মৃতির)… তার ভারে?

শিপ্রা বলিল—সে-কথা শুনলে যদি শান্তি দাও… তাহলে তাই।

—হুঁ…কিন্তু আমি স্বামী, তুমি স্ত্রী…কাজেই তোমার সঙ্গে এ-সম্বন্ধে দু'-চারটে কথা বলার প্রয়োজন আছে। তাই…

দৃপ্ত ভঙ্গীতে শিপ্রা বলিল—বলো…পতি গুরু, তাঁর উপদেশ আমি সব সময়ে শুনতে প্রস্তুত আছি।

শরৎ সুরু করিল—অভিযোগের সুদীর্ঘ তালিকা। বেশে-ভূষায় শিপ্রা যে-ভাবে নিজেকে সাজাইয়া তোলে, তাহাতে পুরুষের মনে বিভ্রম জাগা বিচিত্র নয়…সম্ভ্রান্ত ঘরের বধূ শিপ্রা…সে-দিক্ দিয়া অর্থাৎ, ঐ কল্লোল একটা ভ্যাগাবণ্ড…এখানে নীচ-ইতর স্ত্রীলোক লইয়া বাস করে …তার সঙ্গে শরৎ চৌধুরীর স্ত্রী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে…শুধু শত্রু নয়, শরতের দু'-চার জন কর্ম্মচারীও তাহা দেখিয়াছে; তাই এখানে সম্ভ্রম রাখিয়া চলা শিপ্রার পক্ষে…ইত্যাদি।

নিঃশব্দে শিপ্রা স্বামীর কথা শুনিল। এমন কথা চিরদিন শোনে। নেশার ঝোঁকে স্ত্রীর সনাতন কর্ত্তব্যের কথা তুলিয়া স্বামী বহু লেকচার দিয়াছে…এ সব লেকচার শিপ্রার দেহে-মনে সহিয়া গিয়াছে। আগে এ উপদেশ মনে বিঁধিত কাঁটার মতো! শিপ্রা রাগ করিত, তর্ক করিত। এখন আর করে না। স্বামী বলে, সে নীরবে শুনিয়া যায়। এ-সব কথা তার শ্রুতি ভেদ করিয়া মনের দ্বারেও আর পৌঁছায় না…মনের দ্বার বন্ধ করিয়া শিপ্রা দু'কাণে শুধু শুনিয়া যায়।

শরতের কথা শেষ হইলে শিপ্রা বলিল—আর কিছু বলবে?

শরৎ বলিল—ও-লোকটাকে নাই বা প্রশ্রয় দিলে!

শিপ্রা বলিল—প্রশ্রয় দেওয়ার মানে?

—ওকে নিমন্ত্রণ করে আনা…ওকে নিয়ে বেড়াতে বেরুনো…

—কাকে নিমন্ত্রণ করবো, কার সঙ্গে বেরুবো…আগে তোমার কাছ থেকে তার সার্টিফিকেট নিতে হবে?

—সার্টিফিকেট নয়…

—তবে?

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে শিপ্রার চোখের আগুন প্রখর হইয়া উঠিল। শিপ্রা বলিল,—কি তুমি বলতে চাও, শুনি? অন্য পুরুষ-মানুষের সঙ্গে আমি মিশবো না? কথা কইবো না? তাই যদি, তাহলে আমাকে বিয়ে করা তোমার উচিত হয়নি! পাড়াগাঁ থেকে ঘোমটা-ঢাকা কলাবৌ-গোছ দেখে মেয়ে বিয়ে করলে পারতে! এ-দিকে সোসাইটি চাই! সে-সোসাইটিতে শাইন্ করবে, মনে দুর্ব্বার লোভ আছে…সেই লোভে হাই-সোসাইটির মেয়ে বিয়ে করেচো—অথচ সে-মেয়েকে রাখবে তুমি পায়ের তলায় পায়ে চেপে! লোকের কাছে অহঙ্কার করতে চাও যে তুমি যা চাও, টাকার জোরে তা পাওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব নয়! আমাকে বিয়ে করে যদি ভেবে থাকো, আমার দেহ-মনের উপর প্রভুত্ব করবে, তাহলে ভুল করেছো! তোমার এ ভুলের কথা চিরদিন তোমাকে আমি স্পষ্ট ভাষায় বলে আসছি। তুমি জানো, তোমার অনাচার-অত্যাচারকে শিরোধার্য্য করে তোমার পায়ে বাঁদী হয়ে থাকবো, ভগবান্ সে-ধাতে আমাকে গড়েননি। তোমায় আমি জানি, বিয়ের আগে থেকেই তোমায় জানতুম, তুমি কি-বস্তু! আমার পরিচয়ও তুমি জানো, এ'ও আমি জানি। শরৎ চৌধুরী অনাচারী হলেও ব্যবসাদারী-বুদ্ধিতে খাটো নয়।

শিপ্রার কথা শুনিয়া শরৎ তর্ক তুলিল না। শুধু একটি প্রশ্ন করিল। শরৎ বলিল,—আমাকে যদি এতই জানতে, তাহলে আমায় বিয়ে করেছিলে কেন?

শিপ্রা বলিল—প্রেমের মোহে বিয়ে করিনি, এ তুমি মর্ম্মে-মর্ম্মে বোঝো! তোমায় বিয়ে করেছিলুম…তার কারণ, আমার বাবার ছিল তখন অনেক টাকা দেনা…

যোগ্য ঘরে আমার বিয়ে দেবেন, এমন সঙ্গতি তাঁর ছিল না। অথচ মান-সম্ভ্রম ছিল...এবং সে মান-সম্ভ্রম বজায় রাখতে আমার বিয়ে দেবারও দরকার ছিল। এ মান-সম্ভ্রম তিনি আর পাঁচ জন পুরুষ-মানুষের মতো বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। আমার সঙ্গে বিয়ে হলে আমাকে তুমি দিতে চাইলে, বালিগঞ্জে মস্ত বাড়ী-বাগান... এক-লাখ টাকার গভর্ণমেণ্ট-পেপার...তাই বিয়ে হলো। নাহলে ভালোবাসা...যাকে ভালোবাসা বলে, সে ভালোবাসাও আমি জানি। আমি ভালোবেসেছিলুম অন্য লোককে। বিয়ে তার সঙ্গে হবার নয়...সে জন্য আমার মনে ছিল দারুণ অস্বস্তি...অশান্তি! অথচ এ-দিকে সমাজ...মান-সম্ভ্রম...বিলাস-সুখ...প্রাক্‌টিকাল্ হয়ে সেই মান-সম্ভ্রম আর বিলাস-ঐশ্বর্য্যের হাতে নিজেকে আমি বিসর্জ্জন দিয়েছিলুম!

আবেগের উত্তেজনায় শিপ্রার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া শিপ্রা আবার কথা কহিল। বলিল,—তোমার সেই দান-পত্র...তারি জোরে এ বিয়ে হলো! তোমার বোধ হয় মনে আছে, বিয়ের আগে তোমার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল, তুমি আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিয়ে মাথা ঘামাবে না, আমিও তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা খেয়ালের সম্বন্ধে কোনো নিষেধ বা আপত্তি করবো না...আর তখন আমার এ-হুকুম মাথা পেতে নিয়েছিলে!...এখন ভেবেছো, তুমি স্বামী... তাই আদিম-বিধি-নিয়মের কথা তুলে আমাকে করবে তোমার বাঁদী?...অসম্ভব! তুমি যে-ই হও, আমি আমি...শিপ্রা!

শরৎ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া শিপ্রার কথা শুনিল...তার দু'চোখের দৃষ্টি অকম্পিত।

উত্তেজনার বশে এক-নিশ্বাসে এত কথা বলিয়া শিপ্রা শ্রান্তি বোধ করিতেছিল...একটু পরে শিপ্রা বলিল—রাত এগারোটা বাজে। চমৎকার নাট্যাভিনয় হয়ে গেল। এবার যবনিকা ফেলা যাক্!...অর্থাৎ এখন আমায় ছুটী দাও...দিয়ে ঘুমোওগে! ঘুমোলে তুমি যেমন শান্তি পাবে, আমিও তেমনি...

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া শরৎ বলিল—হুঁ। কিন্তু...

শিপ্রা বলিল—আর কিন্তু নয়! আমি বুঝেছি, এত দিন পরে হঠাৎ তোমার মনে স্বামিত্বের যে এমন আস্ফালন জেগে উঠেছে, বোধ হয় ড্রিঙ্কটা তেমন ষ্ট্রং ছিল না! তোমার বন্ধু শম্ভুকে বলো গে, বেশ ষ্ট্রং ড্রিঙ্ক দেবে...সব ঠিক হয়ে যাবে। যাও... মাই ডার্লিং...

মৃদু হাস্যের ঝিলিক মিশাইয়া শিপ্রা কথা শেষ করিল।

শরৎ কাঠের পুতুলের মতো ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিল; তার পর যন্ত্র-চালিতের মতো নিঃশব্দে সে-ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

শিপ্রা নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া ছিল। শরৎ চলিয়া গেলে ভিতর হইতে ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া আলো নিবাইয়া বিছানার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল...দু'মিনিট দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর বিছানায় শুইয়া চক্ষু মুদিল।

১৯

ঘুম আসে না! মনে এত কথার ভিড়...এত কলরব! সে-কলরবে মাথা পর্য্যন্ত ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছিল!...কোনো কথাকে আশ্রয় করিয়া খানিকটা চিন্তা করিবে, পারে না! কথাগুলায় যেন তেমন জোর নাই! লতার মতো এলাইয়া আছে! তবু সে সব লতায় দোলনের অন্ত নাই! শিপ্রা অস্বস্তি বোধ করিল।

কিছু দিন হইতে ঘুমের ব্যাঘাত হইতেছিল বলিয়া শিপ্রা ডাক্তারী বড়ির শরণ লইয়াছে। উঠিয়া একটা বড়ি খাইল।

ঘুম তবু আসে না। ঘড়িতে ঢং করিয়া একটা বাজিল। উঠিয়া ঘড়ির পানে চাহিল। ভাবিয়াছিল, বুঝি সাড়ে বারোটা! তা নয়...একটা। আরো দুটো বড়ি খাইয়া আবার আসিয়া বিছানায় শুইল!

বোধ হয় একটু ঘুম আসিয়াছিল...দ্বারের বাহিরে করাঘাত! সে-শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কে ডাকে?... শিপ্রা উৎকর্ণ হইয়া রহিল...দ্বারে আবার করাঘাত... আবার...আবার...

শিপ্রা বলিল—কে?

—শম্ভু...

—এত রাত্রে শম্ভু! কেন?

—খপর আছে মেম-সাব...

খপর! শিপ্রা উঠিয়া জাপানী কিমানো গায়ে জড়াইল···তার পর দ্বার খুলিল। শম্ভু বলিল—সাহেবের অসুখ···

·—কি অসুখ?

—ঘুম নেই···যা-তা বকছেন···খুব জ্বর।

—জ্বর! তা আমি কি করবো? এত রাত্রে? কার্ত্তিক বাবু আছেন, নিতাই বাবু আছেন···তাঁদের বলো গে, হোটেলের ডাক্তারকে খপর দেবেন।

শম্ভু বলিল—তাঁরা তো এখানে নেই। সায়েব তাঁদের পেগুতে পাঠিয়েছেন উনি একলা ফিরেছেন কি না!

শিপ্রা বলিল—তুমি আছো, ডাক্তারকে খপর দাও গে। রাত্রে আমায় মিথ্যা বিরক্ত করো না। যাও···

কথা শেষ করিয়া শিপ্রা দ্বার বন্ধ করিয়া এক-মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া দাঁড়াইল···তার পর আবার দ্বার খুলিয়া বাহিরের বারান্দায় আসিল।

শম্ভু নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছিল, শিপ্রা ডাকিল,—শম্ভু···

শম্ভু ফিরিল, বলিল—মেম-সাব ডাকছেন?

—হ্যাঁ। কাল সকালে আমায় খপর দিয়ো, সায়েব কেমন থাকেন। আজ রাত্রে হোটেলের ডাক্তারকে তুমি খপর দাও···তাঁকে এনে দেখাও · বুঝলে?

মাথা নাড়িয়া শম্ভু জানাইল, বুঝিয়াছে।

শিপ্রা আবার ঘরে আসিল। দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। চোখ ঘুমের ঘোরে একেবারে আচ্ছন্ন।

দূরে কোথায় বাজনা বাজিতেছে···বর্ম্মীজদের আসরে, নিশ্চয়। মশারির বাহিরে মশার ব্যাণ্ড। শিপ্রা এক-মনে শুনিতে লাগিল···

তার পর কখন সে ঘুমাইয়া পড়িল···

ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিল। শিপ্রা কি যেন খুঁজিতে বাহির হইয়াছে! সারা পথ ছুটিয়া চলিয়াছে···জলা-জঙ্গল মাড়াইয়া পাহাড় ডিঙ্গাইয়া চলিয়াছে···নদীর তীর ধরিয়া চলিয়াছে। পথের শেষ নাই···কি খুঁজিতে বাহির হইয়াছে, তাও জানে না! তবু খোঁজার কি আগ্রহ! চাই-ই···যা খুঁজিতেছে, তা না পাইলে যেন চলিবে না!···মনে গভীর উদ্বেগ···গতিতে প্রচণ্ড বেগ···এখনি তা খুঁজিয়া পাওয়া চাই···এই রাত্রি থাকিতে···নহিলে ভোরের আলো ফুটিলে পাওয়ার আর কোনো আশা থাকিবে না! নদীর তীর ধরিয়া···প্রান্তর মাঠ ঘুরিয়া শিপ্রা চলিয়াছে। মাঠের পর বন···সে-বনে পাখী ডাকিতেছে···মৃদু বাতাসে পত্র-পল্লব দুলিতেছে! পাখীর গান, পল্লবের মর্ম্মরধ্বনি শুনিতে শুনিতে শিপ্রা চলিয়াছে···চলিয়াছে···চলিয়াছে! পায়ে জুতা নাই, কাঁটা ফুটিতেছে···কাঁটার সে-যাতনা শিপ্রা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছে। চলিতে চলিতে সাম্‌নে যেন মস্ত আগুনের হ্রদ! বনের বুক ভাঙ্গিয়া আগুনের লক্‌লকে শিখা···শিপ্রার দেহে সে-আগুনের আঁচ লাগিল···দেহ যেন ঝলসিয়া গেল! শিপ্রা ফিরিল···পিছনেও কিন্তু অমনি আগুনের কুণ্ড···আগুন! দেখিতে দেখিতে সে-আগুন চারিদিকে শিখা বিস্তার করিল। এক-একটি শিখায় যেন একজোড়া করিয়া চোখ···সে-চোখ আক্রোশে-হিংসায় ভরিয়া শিপ্রার পানে চাহিয়া আছে!

ভয়ে শিপ্রা চীৎকার করিয়া উঠিল! সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল! শিপ্রা চোখ মেলিয়া চাহিল। মনে হইল, চোখের সাম্‌নে হইতে ঐ হাজার-হাজার আগুন-চোখ···নিমেষে মিলাইয়া এখনি যেন অদৃশ্য হইয়া গেল···

চীৎকার শুনিয়া মুক্তি ছুটিয়া আসিল। ডাকিল,—বৌদি···

—মুক্তি···

—হ্যাঁ। ভয় পেয়েছো?

হাসিয়া শিপ্রা বলিল—কিছু নয় রে···স্বপ্ন দেখছিলুম। তুই যা···আমি ঘুমোবো!

সকালে ঘুম ভাঙ্গিল, বেলা তখন আটটা বাজে। উঠিয়া শিপ্রা মুখ-হাত ধুইয়া বেশ-ভূষায় মন দিল···মুক্তি আসিয়া সাম্‌নে দাঁড়াইল।

শিপ্রা বলিল—আমার চা আর টোষ্ট দিতে বল্‌, মুক্তি···আমি এখনি বেরুবো।

মুক্তি বলিল—সাহেবের জ্বর হয়েছে।

—জানি। ডাক্তার দেখছে তো?

—শম্ভু বললে, রাত্রে ডাক্তার এনেছিল···সাহেব এখন ঘুমোচ্ছেন।

—বেশ।···তুই যা···

মুক্তি চলিয়া গেল।

তার পর চা খাইয়া শিপ্রা শরতের ঘরের দিকে গেল না···বাহির হইল। হোটেলের সামনে ছিল ট্যাক্সি। ট্যাক্সিতে বসিয়া শিপ্রা বলিল—অফ্‌গুট্‌ ষ্ট্রীট···

বেণু-বনে সেই বাড়ী। অদূরে একটু খোলা জমি। জমিতে অজস্র রঙীন ফুল ফুটিয়া আছে। গঙ্গা ফুল তুলিতেছিল।

শিপ্রা আসিয়া বলিল—কল্লোল বাবু এ-বাড়ীতে থাকেন না?

শিপ্রার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কুণ্ঠিত স্বরে গঙ্গা বলিল—হ্যাঁ।

—বাড়ী আছেন?

—না।

—কোথা গেছেন?

—জানি না।

শিপ্রা দাঁড়াইল। গঙ্গাকে ভালো করিয়া দেখিল। গঙ্গা দেখিতে মন্দ নয়! দেহের ছাঁদ নিটোল···বর্ণ গৌর···দু'চোখের দৃষ্টিতে করুণ শ্রী! এ-জায়গায় গঙ্গাকে যেন ঠিক মানায় না!

শিপ্রা বলিল—কখন্ আসবেন, তাও বোধ হয় জানেন না?

গঙ্গা বলিল—ব'লে তো কোথাও যান্ না!

—ও···

শিপ্রা ফিরিতেছিল, গঙ্গা বলিল—এলে কিছু বলতে হবে?···আপনি···?

শিপ্রা বলিল—না, এমন কিছু নয়। তবে, আচ্ছা, বলবেন, মিসেস্ চৌধুরী এসেছিলেন···বিশেষ দরকারে!

—বলবো।

মেয়েটি শান্ত। শিপ্রার কৌতূহল হইল। শিপ্রা বলিল—আপনি তাঁর কে হন?

ছোট একটা নিশ্বাস গঙ্গা রোধ করিতে পারিল না। নিশ্বাস ফেলিয়া গঙ্গা বলিল—কেউ না।

গঙ্গার হাতের ফুলগুলার পানে চাহিয়া শিপ্রা বলিল,—ফুল আপনি খুব ভালো বাসেন?

মুখে ম্লান হাসি···গঙ্গা বলিল—উনি ভালো বাসেন, তাই তুলে ওঁর ঘরে রাখি।

বটে! শিপ্রার বিস্ময়ের অন্ত নাই। কল্লোলের কেহ নয়···তবু কল্লোল ভালোবাসে বলিয়া তার জন্য ফুল তুলিয়া তার ঘরে রাখে···ইহার অর্থ? মনে যেন কেমন কাঁটার যাতনা···শিপ্রার ভালো লাগিল না।

শিপ্রা বলিল,—আমায় দেবেন ফুলগুলি? আমিও খুব ফুল ভালোবাসি। বিশেষ এই বর্মা-মুল্লুকের ফুল!

গঙ্গা বলিল—নিন্···

ফুলগুলি সে শিপ্রার হাতে দিল। ফুল লইয়া শিপ্রা বলিল—তিনি এলে বলবেন, আমি তাঁর ফুল নিয়ে গেছি। মনে থাকবে তো?···আমি হচ্ছি মিসেস্ চৌধুরী···তাঁকে খুব দরকার ছিল··জরুরি কাজ। যদি আমাদের ওখানে একবার আসতে পারেন, বলবেন, তাহলে বড্ড ভালো হয়!

গঙ্গা বলিল,—বলবো···

শিপ্রা বলিল—থ্যাঙ্কস্!···ভালো কথা, আপনার নাম জানতে পারি?

গঙ্গা বলিল—আমার নাম গঙ্গা।

—বাঃ! চমৎকার নামটি!···

বলিয়া হাসির ঝলকে গঙ্গাকে কৃতার্থ করিয়া শিপ্রা ফিরিল।

হোটেলে ফিরিতেই মুক্তির সঙ্গে দেখা। স্নান সারিয়া বারান্দার নিরালা কোণে পিঠের উপর ভিজা চুল এলাইয়া দিয়া মুক্তি বসিয়া সেই কম্ফর্টার বুনিতেছে···

শিপ্রা ডাকিল,—মুক্তি··

···বৌদি···বলিয়া মুক্তি উঠিয়া কাছে আসিল।

শিপ্রা কহিল—সাহেব কেমন আছে?

—জানি না। তুমি চলে গেলে আমিও চান করতে গেলুম। চান করে গিয়ে শম্ভুকে জিজ্ঞাসা করলুম,—সাহেব কেমন আছেন? তাতে আমায় যা করে উঠলো···বাবাঃ, কে ওর সঙ্গে কথা কইবে! যেন গোরা-পল্টন!···

শিপ্রা কোনো জবাব দিল না।

মুক্তি কহিল—আমি যে, ও-ও সে···তুই করিস

সাহেবের কাজ, আমি করি মেম-সাহেবের কাজ··· সত্যি, কেন ও এমন করে ঝঙ্কার দেবে, বলো তো বৌদি? ও কি মনিব?

শেষের দিকে মুক্তির কণ্ঠ একটু আর্দ্র হইয়া আসিল।

শিপ্রা ভ্রূ কুঞ্চিত করিল···বলিল—কি তোকে বলেছে, শুনি?

মুক্তি বলিল—না, সে আমি তোমায় বলতে পারবো না বৌদি···

এমন কথা! মুক্তি তাহা বলিতে পারিবে না! শম্ভুর স্পর্দ্ধা তবে···

শিপ্রা বলিল—তোকে বলতেই হবে, মুক্তি! আমার কাছে বললে দোষ হবে না। না বললেই বরং দোষের হবে···

করুণ চোখে মুক্তি চাহিল শিপ্রার পানে।

শিপ্রা বলিল—বল্···

অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভঙ্গীতে মুক্তি বলিল—বললে, তোর মনিব সাহেবের খপর ভারী রাখে···তুই তো কোন্ বাঁদী-কা বাঁদী···

শিপ্রার মনের মধ্যে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল! তাকে শ্লেষ করিয়া কথা কয়···ভৃত্য শম্ভু!

শিপ্রা বলিল,—ফের যদি তোকে কখনো কোনো মন্দ কথা বলে, আমার কাছে বলবি। ওর আস্পর্দ্ধা খুব বেড়েছে···আর বাড়তে দেওয়া উচিত হবে না!

মুক্তি বলিল—বলবো।

পরক্ষণেই চোখে-মুখে হাসি ফুটাইয়া মুক্তি বলিল—চমৎকার ফুল, বৌদি। কিনে আনলে?

—না। এক জন তুলছিল···চেয়ে আনলুম। আমার ঘরে সাজিয়ে রাখ্‌গে!

ফুল লইয়া মুক্তি গেল ফুলদানীতে সাজাইয়া রাখিতে। শিপ্রা ঢুকিল শরতের ঘরে।

শম্ভু একদিকে দাঁড়াইয়া আছে···শিপ্রাকে দেখিয়া মৃদু-স্বরে শম্ভু বলিল—ঘুমোচ্ছেন। সারা রাত ঘুমোননি মোটে।

শিপ্রা তার পানে চাহিল না···তার কথায় ভ্রূক্ষেপও করিল না। টেবিলের সাম্‌নে আসিয়া প্রেসক্রপসনের কাগজখানা তুলিয়া দেখিতে লাগিল।

শম্ভু বলিল—দু'দাগ মিকশ্চার দেওয়া হয়েছে···আর একটা পাউডার। সকালেও জ্বর ছিল ১০২।

প্রেসক্রপসন রাখিয়া নিঃশব্দে শিপ্রা আসিল নিজের ঘরে।

ভালো লাগে না! ভালো লাগে না! কিছু ভালো লাগে না! কোথায় গেল কল্লোল? কালিকার মতো আজ যদি···

নাই বা নিমন্ত্রণ করিলাম! তাকে কাছে পাইবার জন্য আমার মনে এত আকুলতা! আর সে···

চিরদিন মানুষকে এমন দগ্ধাইয়া মারিবে? দগ্ধাইয়া কি আনন্দ পায় কল্লোল?

মনে হইল, গঙ্গাকে বলিয়া আসিয়াছে, জরুরী কাজ! শুনিলে নিশ্চয় আসিবে!

কিন্তু কল্লোল আসিল না। দশটা বাজিয়া গেল। দশটার পর এগারোটা···বারোটা··· একটা···

শেষে তিনটা বাজিয়া গেল···কল্লোলের দেখা নাই! সারা দিনটা শিপ্রার কি অধীর প্রতীক্ষা-ভরে কাটিয়াছে! যেন সেই গল্প-উপন্যাসের মতো···বাতায়নে নায়িকারা যেমন বসিয়া থাকে পথের পানে চাহিয়া, ঠিক তেমনি!

ঘড়িতে চারিটা বাজিল।

মুক্তি আসিল। বলিল—ডাক্তার এসেছে সাহেবের ঘরে। যাবে না বৌদি?

গাঢ় কণ্ঠ···শিপ্রা বলিল,—না···

মুক্তি অবাক্! সাহেবের অসুখ, আর বৌদি···

শিপ্রা ডাকিল—মুক্তি···

—বৌদি···

শিপ্রার সাম্‌নে টেবিলের উপর ফুলদানীতে সেই গঙ্গার-কাছ-হইতে-চাহিয়া-আনা ফুলের গুচ্ছ···

সেগুলা লইয়া সবেগে মুক্তির দিকে শিপ্রা নিক্ষেপ করিল। বলিল—কোনো দিন তোর বুদ্ধি হবে না? কোথা-কার বনের এই লক্ষ্মীছাড়া ফুল···এ-ফুল রেখেছিস্ আমার অত-সখের ফুলদানীতে! দে, ফেলে দে···বাইরে···

বৌদির রাগ দেখিয়া মুক্তি একেবারে যেন কাঠ হইয়া গেল। [ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বিপদ-বারণ পরিচ্ছদ

অতর্কিত বিমান-আক্রমণে পথিকের প্রাণ-সংশয় ঘটে। সে আক্রমণে দেহ অক্ষত থাকিবে, মার্কিণ শিল্পী এমন নূতন পরিচ্ছদ তৈয়ারী করিয়াছেন। এ পরিচ্ছদ বাদামী ও নীল রঙে তৈয়ারী হইতেছে। এ পরিচ্ছদ ফায়ার-প্রুফ। আগুনে পোড়ে না, কাজেই এ পরিচ্ছদ গায়ে থাকিলে তীব্র আগুনের ঝলক বা আঁচ গায়ে লাগিবে না।

এ পোষাকে বোমার ভয় নাই

বোমা ফাটিয়া তাহা হইতে ছোরা-ছুরির মতো ভীষণ-ধার অস্ত্রকণা বর্ষিত হইয়া গায়ে পড়িলেও এ পরিচ্ছদ ভেদ করিয়া তাহা গায়ে বিঁধিবে না। উপরের দুখানি ছবিতে এ পরিচ্ছদের স্ব-রূপ দেখুন। এ পরিচ্ছদের ওজন সাড়ে সাত সের মাত্র। সুতরাং গায়ে ভার সহিবে। পরিচ্ছদ নির্ম্মিত হইয়াছে ঢিলা-ঢালা ষ্টাইলে। এ পরিচ্ছদ গায়ে থাকিলে শীত যেমন সহিবে, তেমনি গরমে ভ্যাপসাইয়া ক্লান্তি বোধ করিবেন না।

কাঁচি-ডিটেক্‌টিভ

সেলাই করিতে বসিয়া হাত হইতে ছুঁচ পড়িয়া কোথায় রাশীকৃত কাপড়-চোপড়ের মধ্যে আত্মগোপন করিল! সে ছুঁচকে খুঁজিয়া পাইতে অনেক সময় গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয়; অনেক সময় হয়তো ছুঁচ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না! এজন্য মনে বিরক্তি জাগে। ছুঁচ খুঁজিবার জন্য কাঁচির গা চুম্বকে যদি একটু ঘষিয়া লন, তাহা
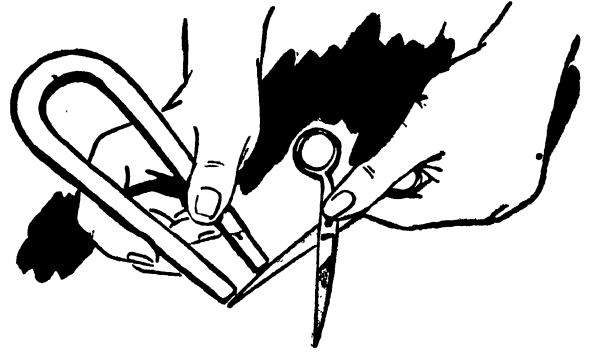
ছুঁচের সন্ধান

হইলে সে কাঁচিতে চুম্বক-গুণ বর্ত্তাইবে। এবং ঐ কাঁচি ধরিয়া সন্ধান করিলে ছুঁচকে লাফ দিয়া কাঁচির গায়ে চড়িয়া আত্মপ্রকাশ করিতে হইবেই!

ব্রহ্মার রোষাগ্নি

আমেরিকার কালিফোর্ণিয়া প্রদেশে আগুন নিবাইবার দম-কলে জল রাখিয়া তাহা বহিবার চমৎকার ব্যবস্থা হইয়াছে। অনেক-সময় এমন হয় যে, কোথাও আগুন লাগিলে দম-কল সে-আগুন নিবাইতে গিয়া জল পায় না—তাহার ফলে ব্রহ্মার রোষাগ্নি নির্ব্বাপিত করা অসম্ভব হয়। সম্প্রতি বাহান্ন হাজার পাউণ্ড (ছাব্বিশ হাজার সের) ওজনের যে দম-কল তৈয়ারী হইয়াছে, এ দম-কলে জলের ট্যাঙ্ক আছে; সে ট্যাঙ্কে সব সময়ে আড়াই হাজার গ্যালন জল মজুত থাকে। ট্যাঙ্কের সহিত হোজ-পাইপ সংলগ্ন আছে। এ হোজের সাহায্যে মিনিটে ৯০০ গ্যালন জল অতি-অনায়াসে অগ্নিকুণ্ডে বর্ষিত হয়। হোজ-পাইপগুলির বের দেড় ইঞ্চি করিয়া। আর আছে
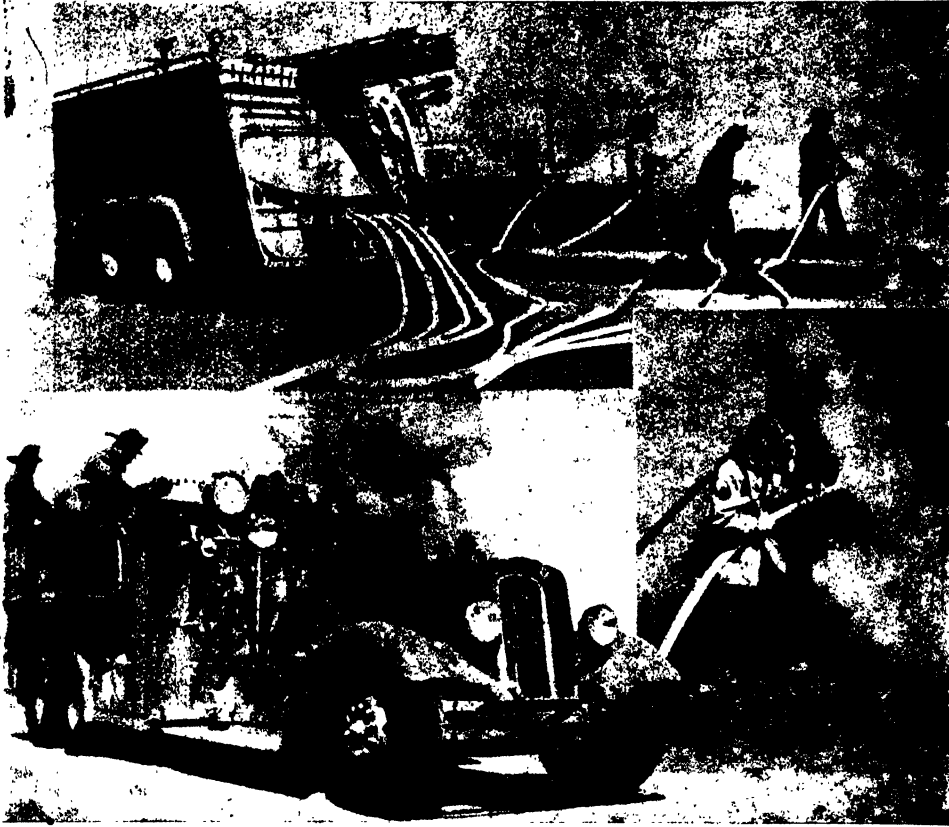
জল-ভরা দম-কল

জল দিবার চমৎকার ব্যবস্থা! এ দম-কলের সাহায্যে বিরাট্ অগ্নিকাণ্ড চকিতে নির্ব্বাপিত করা যায়।

সাবান-জল

বিছানার ময়লা চাদর, বালিশের ওয়াড় বা ধুতি শাড়ি গেঞ্জি সেমিজ কাচিবার জন্ম অনেকে সাবান কুচাইয়া বালতির জলে ফেলিয়া সেই জলে ময়লা কাপড়-চোপড় ফেলিয়া কাচিয়া সাফ করেন। সাবান কুচাইতে অনেক-সময় সেগুলির আকারে সামঞ্জস্য থাকে না—ছোট-বড় ডুমো-সাবান জলে ফেলি। তার ফলে সাবানের পরিমাণ কখনো বেশী, কখনো কম হয়। ছুরি বা বঁটি দিয়া সাবান না কুচাইয়া সাবানকে যদি আরো সহজ উপায়ে কুচাইতে চান, তাহা হইলে যে-বালতিতে জল ভরিবেন, সে বালতির মাথার কাছে ব্লেড-সমেত একখানি গিলেট-ক্ষুর আটকাইয়া নিন এবং সেই ক্ষুরের গায়ে ঘষিয়া সাবান কাটুন। তাহা হইলে সাবানের মিহি-কুচি জলে মিশিয়া অতি-শীঘ্র সে-জল কাপড়-কাচার উপযোগী হইবে। এ প্রণালীতে সাবান-খরচ হইবে কম। পুরানো যে-ব্লেডে দাড়ি কামানো চলে না, সে-ব্লেডেও এ-কাজের কোনো অসুবিধা হইবে না।

সাবান কুচানো

লেখকের আরাম

লিখিতে গিয়া অনেকের হাত ঘামে,—টেবিলে ধুলা-বালি ও কালির দাগ থাকিলে সে-টেবিলে হাত রাখিয়া লেখাপড়া করিলে হাতের জামা ময়লা হয়; হাতের ঘামে লেখা চুপ্‌সিয়া যায়—এমনি বহু অনর্থ ঘটে। এজন্য মার্কিণ শিল্পীর উদ্যোগে প্লাষ্টিক দিয়া জামার হাতার ও হাতের আবরণ রচিত হইয়াছে। এই প্লাষ্টিক বস্তুটি আগুনে পোড়ে না, জলে ভেজে

হাত-ঢাকা

কুন্দনন্দিনীর মুখ দেখিয়া বিষবৃক্ষের দেবেন্দ্র দত্ত পৃথিবী ভুলিয়াছিল! এবং সে মুখ দেখিবার জন্য হরিদাসী বৈষ্ণবী সাজিয়া নগেন্দ্র দত্তর অন্তঃপুরে আসিয়া গান গাহিয়াছিল—

শ্রীমুখপঙ্কজ দেখবো বলে হে
তাই এসেছি এ গোকুলে!

শুধু দেবেন্দ্র দত্ত নয়, বহু যুগের বহু কবি রমণী-মুখকে পঙ্কজের মতো রমণীয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ট্রয়ের রূপসী হেলেনের মুখশ্রীর কথায় বিখ্যাত পাশ্চাত্য নাট্যকার মার্লো লিখিয়া গিয়াছেন—the face that launched a thousand ships and burnt the towers of Ilium, অর্থাৎ সে-মুখের জন্য হাজার-হাজার জাহাজ আসিয়া গ্রীসের কূলে ভিড়িয়াছিল এবং ইলিয়ামের তুঙ্গ-শির হর্ম্ম্য-প্রাসাদ পুড়িয়াছিল সেই মুখের জন্য! মহাকবি সেক্সপীয়রও বলিয়া গিয়াছেন—Was this fair face the cause why the Grecians sacked Troy? অর্থাৎ ঐ শ্রীমুখের জন্যই কি গ্রীক্-জাতি ট্রয় ধ্বংস করিয়াছিল?

হেলেন, ক্লিওপেট্রা—তাঁদের মুখশ্রীর জন্য জগতে প্রলয় আনিয়াছিল। এ দেশেও বেচারী শুম্ভ-নিশুম্ভ প্রাণ দিয়াছিল একখানি রমণী-মুখের শ্রী-সৌন্দর্য্যের মোহে! বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন, সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র!

সুতরাং এ-মুখশ্রী কি অবহেলার সামগ্রী?

ক'জন ভাগ্যবতী এ-মুখশ্রী লাভ করেন? যিনি এমন মুখের অধিকারিণী, তাঁকে বহু-যত্নে এ-মুখশ্রী রক্ষা করিতে হয়!

আজ বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন, সাধনায় এ-মুখশ্রী মিলিবে।

এ-মুখশ্রীর অধিকারিণী হইতে হইলে মনকে করিতে হইবে মোহন-সুন্দর। অর্থাৎ মনে হিংসা-দ্বেষ ক্রোধ-অসন্তোষ বা কোনো ক্ষুদ্রতার উপসর্গ পুষিবেন না! সুস্থ স্বচ্ছ মন—সকল অবস্থায় সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া মনকে হাল্‌কা রাখা—এটুকু না করিতে পারিলে সুন্দর মুখ অসুন্দর হইবে—সৌন্দর্য্যের ছায়াও মুখে থাকিবে না! হাসি-খুশী যাঁর মন হইতে সকল অবস্থায় স্বতঃ-উৎসারিত হয়, তাঁর মুখশ্রী কোনো দিন মলিন হইবার নয়! চল্লিশ বৎসর বয়সেও দেখিব, তাঁর মুখখানি লাবণ্যে ঢলঢল, দিব্যশ্রীতে বিভূষিত! সতেরো বৎসর বয়সেই অনেকের মুখ পাকিয়া যেন কাঠ হইয়া ওঠে। তার কারণ, চল্লিশ বৎসর বয়সেও যিনি অমন সুঠাম, সুশ্রী, তাঁর মনে খলতা নাই, কাপট্য নাই, দ্বেষ-হিংসা নাই, তাঁর মেজাজ শিষ্ট শান্ত। সপ্তদশীর যে শ্রী থাকে না, সে শুধু তাঁর মেজাজ ও মনের দোষে! মনের দোষেই নবযৌবনে তিনি ধূমাবতীর মতো বিভীষণা হইয়া ওঠেন!

মুখের শ্রী লাভ এবং রক্ষা করিতে হইলে মনে তৃপ্তি থাকা চাই। মনে তৃপ্তি থাকিলে বর্ণে দীপ্তি ফুটিবেই। শ্রী-সাধনায় অবশ্য খাদ্য-বিচারে নিষ্ঠা চাই। শাক-সব্জী ফলমূল খাওয়া চাই এবং প্রচুর জল পান করা চাই! কোষ্ঠবদ্ধতা যেন কদাচ না ঘটে! আহার সম্বন্ধে যাঁর বিচার-নিষ্ঠা আছে, তাঁর দেহে বর্ণ-বিভা যেমন প্রদীপ্ত থাকিবে, তেমনি বয়স বাড়িলেও তারুণ্য ঝরিয়া যাইবে না। তার পর চাই মুখের পেশীসমূহকে নিত্য-ব্যায়ামে সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ রাখা।

সেই ব্যায়ামের কথাই বলিতেছি। এ-ব্যায়ামে দলন-মলনের কাজ হইবে।

নানা কারণে কচি মুখকে পাকা দেখায়! যাঁদের নীচু ভ্রূ (low eye-brow), অল্প বয়সেই তাঁদের মুখ দেখায় যেন বেশী-বয়সের মতো। এ-ত্রুটি থাকিলে ভ্রূযুগ

যতখানি সম্ভব ঊর্দ্ধে টানিয়া চাহিবেন—দিনে বিশ-পঁচিশ বার করিয়া কপালের যতখানি উপরে পারেন ভ্রূ টানিয়া চাহিবেন এই ১নং ছবির ভঙ্গীতে। তার পর আবার সহজ ভাবে চাহিতে হইবে। এ ব্যায়াম প্রত্যহ সকালে-সন্ধ্যায় বিশ-পঁচিশ বার করিয়া করা চাই।

তার পর দুই চোখের নীচে নাকের দুই দিকে ২নং ছবির ভঙ্গীতে হাতের আঙুল চাপিয়া-চাপিয়া অথচ ধীরে-ধীরে (মর্দ্দনের রীতিতে) একবার নাক হইতে কাণের পাশ পর্য্যন্ত

১। ভ্রূ তুলিয়া চাহিবেন

এবার মুঠার মতো মুড়িয়া দু' হাতের দুই তর্জ্জনী ৩নং ছবির ভঙ্গীতে দুই চোখের পাশে রাখিয়া ধীরে ধীরে দু' চোখের পাশ হইতে নাকের দু' দিক্ পর্য্যন্ত মর্দ্দন করুন। এ ব্যায়ামও প্রত্যহ দশ বার করিয়া করা চাই।

এবারে হাঁ করুন। যতখানি পারেন, হাঁ করিতে হইবে। এক-সেকেণ্ড হাঁ করিয়া মুখ খুলিয়া (৪নং ছবি দেখুন) চট্ করিয়া মুখ বন্ধ করুন। বেশ সিধা ভাবে মুখ বন্ধ করিবেন। মুখ বন্ধ করিবার সময় দু' ঠোঁট

২। হাতের আঙুল চাপিয়া

৩। মুঠি মুড়িয়া

পরক্ষণে কাণের পাশ হইতে নাকের পাশ পর্য্যন্ত টানিবেন। এ ব্যায়াম করা চাই প্রত্যহ অন্ততঃ দশ বার।

করিবেন ৫নং ছবির মতো। এ ব্যায়ামও প্রত্যহ দশ বার করা চাই।

সপ্তদশ তরঙ্গ

প্রত্যাখ্যান

স্মিথ বিস্মিত ভাবে ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কর্ত্তা, আপনার মুখ দেখিয়া মনে হইতেছে, আপনি ইন্স্পেক্টর লেনার্ডের সিদ্ধান্তের সমর্থন করেন না।"

ব্লেক বলিলেন, "না, উহার সিদ্ধান্ত সমর্থনযোগ্য নহে স্মিথ! কারণ, এই চুরির জন্য ওয়াইল্ডই দায়ী। লেনার্ড দুই আর দুই যোগ করিয়া দেখাইয়াছে, উভয়ের যোগফল চার। এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু আমি নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই; কারণ, আর যে সংখ্যাটি উহ্য আছে—তাহা ঐ সঙ্গে ধরিলে যোগফল চার হয় না। সেই সংখ্যাটি লেনার্ডের চোখে ধরা পড়ে নাই। মেট্‌ল্যাণ্ড লর্ড ব্ল্যাকউডের কোষাগার হইতে তাঁহার স্বর্ণমঞ্জুষা চুরি করে নাই; তাঁহার ঘরে সে প্রবেশও করে নাই।"

স্মিথ বলিল, "তথাপি বোধ হয় তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, এবং সম্ভবতঃ এতক্ষণ সে পুলিশের হাজতে বিশ্রাম করিতেছে!"

ব্লেক বলিলেন, "লেনার্ড বলিয়া গিয়াছে, এখান হইতে সে নাইটস্ ব্রীজে মেট্‌ল্যাণ্ডের বাড়ীতে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইবে; আমারও বিশ্বাস, সে মেট্‌ল্যাণ্ডকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।"

ব্লেক লর্ড ব্ল্যাকউডের বাড়ী হইতে বেকার ষ্ট্রীটে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার বসিবার ঘরে বসিলে, স্মিথের সহিত তাঁহার এই সকল কথার আলোচনা হইতেছিল।

স্মিথ তাঁহার কথা শুনিয়া ক্ষণকাল কি চিন্তা করিয়া বলিল, "কিন্তু কর্ত্তা, আপনার এই সিদ্ধান্ত অনুমান মাত্র। আপনার এই অনুমান অসঙ্গত না হইলেও ইহা সম্পূর্ণ সত্য—এ কথা কি করিয়া বলিতে পারেন? আপনার বিশ্বাস, ওয়াইল্ড মেট্‌ল্যাণ্ডকে বিপন্ন করিবার জন্য যে খেলা খেলিয়াছে, তাহাতে সে কৃতকার্য্য হইয়াছে, মেট্‌ল্যাণ্ডকে কিছু কাল কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে;—আপনি কি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ নহেন কর্ত্তা?"

ব্লেক বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, সার রডনে ড্রুমণ্ড তাঁহার তিন মহাশত্রু—সাইমন কার্ণ, হুবার্ট রোর্কি, এবং অস্কার মেট্‌ল্যাণ্ডের বিষদাঁত ভাঙ্গিবার জন্য ওয়াইল্ডের সঙ্গে চুক্তি করায় ওয়াইল্ড তাঁহার উপদেশ অনুসারেই এই কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু মেট্‌ল্যাণ্ডের বিপদে আমাদের দুশ্চিন্তার কোন কারণ আছে কি?"

ব্লেক বলিলেন, "না, আমাদের দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই।"

স্মিথ বলিল, "তাহা হইলে এই ব্যাপারে আমরা কি জন্য হস্তক্ষেপ করিব?"

ব্লেক বলিলেন, "আমি কি বলিয়াছি, এই ব্যাপারে আমি হস্তক্ষেপ করিব? তবে এ কথা সত্য যে, ইন্স্পেক্টর লেনার্ডের কার্য্যপ্রণালী আমি অনুমোদন-যোগ্য বলিয়া মনে করি না। ওয়াইল্ড অসাধারণ ধূর্ত্ত রাস্কেল। আমার বিশ্বাস, মেট্‌ল্যাণ্ড যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও এই ফাঁদ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না।"

স্মিথ বলিল, "ভদ্রলোকের গুপ্ত কথা ভদ্রসমাজে প্রকাশের ভয় প্রদর্শন করিয়া এই নরপ্রেত তাঁহাদের অর্থ-রাশি শোষণ করে। কার্ণ ও রোর্কি মেট্‌ল্যাণ্ডেরই সহযোগী; উহাদের তিন জনেরই পেশা অভিন্ন। ওয়াইল্ড তাহাদিগকে চূর্ণ করিবার জন্য যাহা করিতেছে, আমরা কেন তাহাতে বাধা দিব? আমার ইচ্ছা, তাহার চেষ্টা সফল হউক।"

ব্লেক বলিলেন, "দেখ স্মিথ, একটা অন্যায় কার্য্য দ্বারা আর একটা অন্যায় কার্য্যের সমর্থন করা যায় না, এবং তাহা সঙ্গতও নহে! মেট্‌ল্যাণ্ড যে সকল কুকর্ম্ম করিয়াছে, সে জন্য তাহার যেরূপ শাস্তি পাওয়া উচিত, সে যদি সেই শাস্তি পায়—তাহা হইলে তাহার শাস্তির প্রতিকূলে কোন কথাই বলিবার থাকে না; কিন্তু কোন ব্যক্তি যে অপরাধ করে নাই, সেই অপরাধে অভিযুক্ত হইলে, এবং সে জন্য শাস্তি পাইলে, সেই অন্যায় আমি বরদাস্ত করিতে পারি না। মেট্‌ল্যাণ্ড লর্ড ব্ল্যাকৃউডের স্বর্ণমঞ্জুষা চুরি করে নাই, তথাপি উহা চুরির মিথ্যা অভিযোগে সে শাস্তি পাইবে—ইহা সত্যই অসহ্য স্মিথ!"

স্মিথ বলিল, "আপনার এই যুক্তি যে সম্পূর্ণ সঙ্গত, কে ইহা অস্বীকার করিবে? এই দুর্বৃত্ত যে সকল গর্হিত কার্য্য করিয়াছে—সেই সকল কার্য্যের জন্যই তাহার প্রতি দণ্ডবিধান প্রার্থনীয়; কিন্তু ওয়াইল্ড যে যুক্তির অনুসরণ করিয়াছে, তাহাও আমি আলোচনা করিয়াছি। তাহার ধারণা এই যে, নানাবিধ কুকর্ম্ম করায় মেট্‌ল্যাণ্ড যখন শাস্তি পাইবার যোগ্য, তখন যে উপায়েই হউক, তাহাকে ফাঁদে ফেলিয়া শাস্তি দান করিলে তাহার কৃতাপরাধের কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে। কার্য্যফলের কি কোন পার্থক্য আছে কর্ত্তা!"

ব্লেক অপ্রসন্ন ভাবে বলিলেন, "হাঁ, যথেষ্ট পার্থক্য আছে; কিন্তু এ সকল কথা লইয়া তোমার সহিত তর্কে সময় নষ্ট করিতে আমার ইচ্ছা নাই। যদিও এই চুরির তদন্ত-ভার ত্যাগ করিয়া লর্ড ব্ল্যাকৃউডের নিকট বিদায় লইয়া আসিয়াছি, তথাপি মেট্‌ল্যাণ্ড যে এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপরাধ, ইহা প্রতিপন্ন করা আমি আমার ব্যবসায়-সংক্রান্ত শিষ্টাচার (Professional etiquette) বলিয়াই মনে করি। আমার মনে হয়—ওয়াইল্ড আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াই এই কার্য্য করিয়াছে। সে বোধ হয় মনে করিয়াছে—তাহার চালাকি বুঝিতে পারি—এতটুকু বুদ্ধিও আমার নাই!"

স্মিথ তাঁহার কথা শুনিয়া আর কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই ব্লেকের বহির্দ্বারে ঘণ্টাধ্বনি হইল! তাহা শুনিয়া স্মিথ বলিল, "সদর দরজায় এখন কে আসিল? রাত্রি ত একটা বাজিয়া গিয়াছে; এখন কি কাহারও সঙ্গে আলাপ করিবার সময়? কি করিব বলুন।"

ব্লেক বলিলেন, "দেখ কে আসিয়াছে। আমরা এখনও জাগিয়া বসিয়া আছি; এ অবস্থায় যদি কেহ কোন জরুরি কাজে আসিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার দরকারটা কি, তাহা জানাই উচিত।"

স্মিথ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া বহির্দ্বারে ধাবিত হইল। সে দ্বার খুলিতেই দ্বারপ্রান্তে সাইমন কার্ণ ও হুবার্ট রোর্কিকে দণ্ডায়মান দেখিল; তাহারা যে ট্যাক্সিতে আসিয়াছিল—তাহা দূরে প্রস্থান করিল।

কার্ণ স্মিথকে গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "মিঃ ব্লেকের সঙ্গে এখন আমাদের দেখা হইতে পারে?"

স্মিথ বলিল, "প্রয়োজনের গুরুত্বের উপর তাহা নির্ভর করিতেছে। মিঃ ব্লেক এখন বাড়ীতেই আছেন; কিন্তু রাত্রিশেষে এই রকম অসময়ে তিনি যাহার-তাহার সঙ্গে দেখা করিবেন—এরূপ আশা করা সঙ্গত নহে।"

কার্ণ বলিল, "ইহা কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করিবার সময় নহে—এ কথা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না; কিন্তু আশা করি, আমাদের প্রয়োজনের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করিয়া মিঃ ব্লেক আমাদের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। আমরা অত্যন্ত জরুরি কার্য্যের জন্য তাঁহার সাক্ষাৎপ্রার্থী, নতুবা আমরা প্রভাত পর্য্যন্ত বিলম্ব করিতে পারিতাম। আমার নাম কার্ণ—সাইমন কার্ণ, এবং এই ভদ্রলোকটির নাম মিঃ হুবার্ট রোর্কি।"

তাহার কথা শুনিয়া স্মিথ বলিল, "ওঃ—আপনিই!"

স্মিথের কণ্ঠস্বরে বিস্ময়ের আভাস না থাকিলেও সে সেই অসময়ে তাহাদিগকে সেখানে দেখিয়া সত্যই অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল; কারণ, অল্পকাল পূর্ব্বে সে ব্লেকের সহিত তাহাদেরই সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল!

স্মিথ বলিল, "আপনারা এক মিনিট অপেক্ষা করুন। কিন্তু ওখানে দাঁড়াইয়া না থাকিয়া আপনারা ভিতরে আসুন; মিঃ ব্লেক আপনাদের সঙ্গে দেখা করিবেন কি না, তাহা এখনই জানিয়া আসিতেছি।"

"ধন্যবাদ!" বলিয়া তাহারা উভয়ে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। স্মিথ বাহিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ব্লেককে সংবাদ দিতে চলিল।

স্মিথ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই ব্লেক বলিলেন, "উহাদিগকে এখানে লইয়া এস স্মিথ!"

স্মিথ বিস্মিত ভাবে বলিল, "আপনি কি উহাদের কথা শুনিতে পাইয়াছেন, কর্ত্তা!"

ব্লেক বলিলেন, "তুমি উহাদের সঙ্গে দেখা করিতে যাইবার সময় অসতর্কতা বশতঃ এই কক্ষের দ্বার খুলিয়া-রাখিয়াই নীচে নামিয়া গিয়াছিলে। এখন গভীর রাত্রি, চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ—এ জন্য তোমাদের সকল কথাই শুনিতে পাইয়াছি। কার্ণ ও রোর্কি আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে; কিন্তু উহাদের কি প্রয়োজন? উহাদের কি বলিবার আছে—তাহা শীঘ্রই শুনিতে পাইব।"

স্মিথ নীচে নামিয়া-গিয়া কার্ণ ও রোর্কিকে সঙ্গে লইয়া সেই কক্ষে প্রত্যাগমন করিল।

এবারও কার্ণই ব্লেকের সহিত আলাপ আরম্ভ করিল। সে বলিল, "মিঃ ব্লেক, এই অসময়ে আসিয়া আপনাকে বিরক্ত করিতে হইল, এজন্য আপনার নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা করিতেছি। কিন্তু আমাদিগকে অত্যন্ত জরুরি কার্য্যে আসিতে হইয়াছে। আমাদের একটি বন্ধুকে পুলিশ বিনা-অপরাধে অর্থাৎ একটা মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে। আমাদের প্রার্থনা, আপনি তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া, সে যাহাতে মুক্তিলাভ করিতে পারে—দয়া করিয়া তাহার ব্যবস্থা করুন।"

ব্লেক বলিলেন, "কি কারণে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইল, তাহা দয়া করিয়া খুলিয়া বলুন; এ সম্বন্ধে সকল কথাই আমি জানিতে চাই।"

বস্তুতঃ, কার্ণ ও রোর্কি সাহায্যপ্রার্থী হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়ায় তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা কি কারণে প্রতিকার-চেষ্টায় পুলিশের নিকট গমন না করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়াছিল, তাহা তিনি সহজেই বুঝিতে পারিলেন। তিনি জানিতেন, ইহাদের গুণের কথা পুলিশের অজ্ঞাত ছিল না; সুতরাং তাহারা পুলিশের সাহায্যপ্রার্থী হইলে তাহাদের সহানুভূতি লাভ করিবে—তাহার সম্ভাবনা ছিল না।

কার্ণ রবার্ট ব্লেকের নিকট সহায়তা-প্রার্থনায় আসিবে শুনিয়া রোর্কি প্রথমে এই প্রস্তাবে আপত্তি করিয়াছিল। কিন্তু কার্ণ তাহার প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিয়া তাহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোর করিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিয়াছিল। তাহারা উভয়েই ধনবান্, এবং সমাজে তাহাদের প্রতি-পত্তিও যথেষ্ট ছিল; বিশেষতঃ, ব্লেক উপযুক্ত দর্শনী পাইলে কোন বিপন্ন আসামীর পক্ষ-সমর্থনে আপত্তি করিতেন না। কার্ণের ধারণা ছিল, ব্লেককে অধিক টাকার লোভ দেখাইলে তাঁহার দ্বারা কার্য্যোদ্ধার করা কঠিন হইবে না; এই জন্য সে আশ্বস্তচিত্তে, রোর্কির অনিচ্ছা সত্ত্বেও, তাহাকে লইয়া অসময়ে ব্লেকের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিল। সে স্থির করিয়াছিল, মেট্‌ল্যাণ্ডের পক্ষ-সমর্থনের জন্য ব্লেক যত টাকা পারিশ্রমিক চাহিবেন, সে তাহাতেই সম্মত হইবে। ব্লেক চেষ্টা করিলে মেট্‌ল্যাণ্ডের নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন, এ বিষয়ে কার্ণের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

কার্ণ বলিল, "আমাদের বন্ধু মিঃ অস্‌কার মেট্‌ল্যাণ্ড নাইটসব্রীজে বাস করেন। তিনি সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক; প্রাচীন কালের দুর্লভ ও মূল্যবান্ পণ্যদ্রব্যাদি বিক্রয় তাঁহার পেশা। এই ব্যবসায়ে তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি, এবং তিনি বিপুল সম্পত্তির অধিকারী; কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, চুরির একটা মিথ্যা অভিযোগে পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে!

"আজ রাত্রিকালে লর্ড ব্ল্যাকউডের গৃহ হইতে তাঁহার একটি স্বর্ণমঞ্জুষা চুরি গিয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে পুলিশ মেট্-ল্যাণ্ডের বাসগৃহ খানাতল্লাস করিয়া তাঁহার সিন্দুকের ভিতর সেই চোরামাল পাইয়াছে! এই জন্যই পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে; কিন্তু এই ব্যাপারটার আগাগোড়াই একটা নোংরা ষড়যন্ত্রের ফল! আপনি দয়া করিয়া এই কেস্‌টার তদন্তভার গ্রহণ করুন। আপনি চেষ্টা করিলেই মেট্‌ল্যাণ্ডের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিতে পারিবেন। আমার ধারণা, আপনার ন্যায় প্রতিভাবান্ ডিটেক্‌টিভের পক্ষে তাঁহার নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করা আদৌ কঠিন হইবে না।"

ব্লেক সকল কথা শুনিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "এই 'কেস' গ্রহণ করিতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই।"

কার্ণ বলিল, "উপযুক্ত পারিশ্রমিক-বিনিময়ে আপনি ত সর্ব্বদাই আসামীর পক্ষ সমর্থন করেন। আমরা

আপনাকে প্রচুর পারিশ্রমিক প্রদানের জন্য প্রস্তুত আছি, মিঃ ব্লেক !"

ব্লেক বলিলেন, "আমাদের এই আলোচনায় পারিশ্রমিক সম্বন্ধে কোন কথাই উঠে নাই মিঃ কার্ণ ! আমি আপনাকে বলিয়াছি—এই 'কেস' গ্রহণ করিতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই ; এই জন্যই আমি ইহা প্রত্যাখ্যান করিতেছি।"

কার্ণ বিচলিত স্বরে বলিল, "কিন্তু মহাশয়, আপনি যখন গোয়েন্দাগিরি ব্যবসায়ে—"

ব্লেক তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "আমি আসামীদিগের পক্ষ-সমর্থন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করি, এ কথা সত্য ; কিন্তু আমি সকল 'কেস'ই গ্রহণ করিব, এরূপ সঙ্কল্প করিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হই নাই ; আর এ সম্বন্ধে আপনার সহিত আমার তর্ক করিবারও ইচ্ছা নাই। যদি আপনারা পুলিশের কার্য্য-প্রণালীতে অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে আবেদন করুন। লণ্ডনে 'প্রাইভেট' ডিটেক্‌টিভেরও অভাব নাই ; তাহাদের কাহারও সাহায্য গ্রহণ করিতে পারেন। আমার কথা এই যে, আমি আপনাদের বন্ধুর পক্ষ-সমর্থন করিতে অনিচ্ছুক। আমার অনিচ্ছার কারণ নির্দ্দেশের কোন প্রয়োজন দেখি না।"

ব্লেকের কথা শুনিয়া সাইমন কার্ণের মুখ ক্রোধে লোহিতাভ হইল। সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "আপনি অকারণ আমাদের অপমান করিলেন মিঃ ব্লেক ! ভদ্রলোকের সহিত এরূপ ব্যবহার সমর্থনযোগ্য নহে।"

ব্লেক বলিলেন, "অপমান ? আমি আপনাদের অপমান করিয়াছি—এরূপ ধারণা করা আমার অসাধ্য মিঃ কার্ণ ! কিন্তু এ কথা লইয়া আমি আপনার সহিত তর্ক করিতে অনিচ্ছুক।—স্মিথ, এই ভদ্রলোক-দুটিকে বাহিরে যাইবার পথ দেখাইয়া দাও।"

কার্ণ বলিল, "দেখুন মিঃ ব্লেক, আমরা পাঁচ হাজার পাউণ্ড পর্য্যন্ত আপনাকে পারিশ্রমিক—"

ব্লেক তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "আমার শেষ কথা আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি মিঃ কার্ণ ! আপনার আর কোন কথা আমার শুনিবার নাই।"

কার্ণ তথাপি বলিল, "যদি আপনাকে আমরা দশ—"

ব্লেক বলিলেন, "নমস্কার মহাশয় !"

স্মিথ বলিল, "আসুন,—পথটা এই দিকে—আশা করি, মহাশয়ের দিক্‌ভ্রম হয় নাই।"

কার্ণ ও রোর্কি স্মিথের মুখের উপর ক্রুদ্ধ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল ; কিন্তু সেই কক্ষ ত্যাগ করা ভিন্ন তাহাদের গত্যন্তর ছিল না। স্মিথ অত্যন্ত বিনীত ভাবে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া বহির্দ্বার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল, এবং মাথাটা বুক পর্য্যন্ত নামাইয়া তাহাদিগকে বিদায়াভিবাদন করিল। তাহার অভিবাদনের ঘটা দেখিয়া কার্ণ বুঝিতে পারিল, স্মিথ তাহাদিগকে উপহাস করিল ; কিন্তু সে জন্য ক্রোধ প্রকাশ নিষ্ফল। সুতরাং ক্রোধে তাহারা নিজেরাই দগ্ধ হইতে লাগিল।

স্মিথ ব্লেকের নিকট ফিরিয়া-আসিয়া অদ্ভুত মুখভঙ্গি করিয়া বলিল, "কর্ত্তা, আপনি আমাকে পেশাদারী শিষ্টাচার না ঐ রকম কি-একটা কথা বলিয়াছিলেন ; কিন্তু উহাদের সহিত ব্যবহারে তাহার ত কোন পরিচয় পাইলাম না ! আমি মনে করিয়াছিলাম, ওয়াইল্ড আপনার চক্ষুতে ধূলা দিতে পারে নাই, তাহা তাহাকে বুঝাইবার জন্যও আপনি মেট্‌ল্যাণ্ডের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার এই সুযোগ ত্যাগ করিবেন না।"

ব্লেক বলিলেন, "আমার সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—এ কথা ত বলি নাই স্মিথ ! কিন্তু কথা এই যে, আমি কার্ণ ও রোর্কির অনুরোধে তাহাদের বন্ধুর পক্ষাবলম্বন করিয়া কাজ করিতে অসম্মত। উহারা মেট্‌ল্যাণ্ডের বিপদে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে বলিয়াই মনে হইল। তোমার কি মনে হয় ? আমার এই অনুমান কি সত্য নহে ?"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু কার্ণ বলিতেছিল, আপনি মেট্‌ল্যাণ্ডের পক্ষ সমর্থন করিলে সে আপনাকে দশ হাজার পাউণ্ড পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে প্রস্তুত। কিন্তু কথাটা তাহাকে শেষ করিতেও দিলেন না ! তাহাদের অর্থ অসৎ উপায়ে উপার্জ্জিত ; তাহা স্পর্শ করিতে আপনার ঘৃণা হওয়াই স্বাভাবিক ; কিন্তু উহারা বিপন্ন হইয়া আপনার সাহায্যপ্রার্থী হইল, ইহা কি বিচিত্র নহে ? উহারা তিন জনেই বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ, এবং লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া অর্থোপার্জ্জনই উহাদের পেশা। যাহা হউক, এখন কি করিবেন মনে করিতেছেন ?"

ব্লেক বলিলেন, "এখন? মনে করিতেছি, এখন শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখ উপভোগ করিব।"

স্মিথ হাসিয়া বলিল, "চমৎকার সঙ্কল্প, কর্ত্তা! এ বিষয়ে আমি আপনার সহিত একমত।"

ব্লেক বলিলেন, "কাল সকালে কোর্ট খুলিলে মেট্‌ল্যাণ্ড বিচারালয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নীত হইবে। তখন আমরা কি করিতে পারি, তাহা দেখা যাইবে। কিন্তু আমি একটু সঙ্কটে পড়িয়াছি স্মিথ! যদি আমি মেট্‌ল্যাণ্ডের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করি—তাহা হইলে লেনার্ড বেচারা বড়ই অপদস্থ হইবে; কিন্তু লেনার্ড অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কর্ম্মচারী, এবং আমাকে সে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে। যে কার্য্যে তাহাকে অপদস্থ হইতে হয়—তাহা করিতে আমার ইচ্ছা নাই। কিন্তু ওয়াইল্ড যে আমাকে ঠকাইয়া বাহাদুরী প্রকাশ করিবে—ইহাও অসহ্য! এই জন্য আমি কোন্ পথ অবলম্বন করিব—তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু ওয়াইল্ড যে এই ব্যাপারে লিপ্ত আছে, ইহা এখনও ত আমরা জানিতে পারি নাই কর্ত্তা!"

ব্লেক বলিলেন, "সে কথা সত্য; কিন্তু আমাদের সন্দেহ অমূলক না হইতেও পারে, ইহা ত তুমি অস্বীকার করিবে না।"

স্মিথ 'হুঁ' বলিয়া নীরব হইল।

অষ্টাদশ তরঙ্গ

ওয়াইল্ডের নূতন চাল!

রোপার ওয়াইল্ড সত্যই অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল; তাহার বিরক্তির কারণও ছিল। সে সেই গভীর নিশীথে রবার্ট ব্লেকের বাড়ীর বিপরীত দিকের ফুটপাথে দাঁড়াইয়া তাঁহার বাড়ী লক্ষ্য করিতেছিল; কিন্তু ব্লেকের বাড়ী হইতে তাহাকে দেখিবার উপায় ছিল না। সে একটা আলোক-স্তম্ভের আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সে যাহা দেখিবার আশায় সেই স্থানে প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহা সে সুস্পষ্টরূপেই দেখিতে পাইল।

ওয়াইল্ড মনে মনে বলিল, "বড়ই নোংরা ব্যাপার! গোলমালটা শেষে এই ভাবে গড়াইবে—ইহা মুহূর্ত্তের জন্যও আমার মনে হয় নাই! ব্লেককে আমি যথাসাধ্য সতর্কতার সঙ্গে এড়াইয়া চলিতে চাহি; অথচ তিনি এই ব্যাপারেও জড়াইয়া পড়িলেন! ব্লেকের চোখে ধূলা দিয়া কার্য্যোদ্ধার করি, সে শক্তি আমার নাই। ভয়ঙ্কর ধূর্ত্ত লোক! যদি তিনি নিজের ইচ্ছায় এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করেন, তাহা হইলেও অন্য লোক তাঁহাকে ইহার মধ্যে টানিয়া আনিবে,—এ অবস্থায় আমার কর্ত্তব্য কি?"

ওয়াইল্ড দুশ্চিন্তায় অধীর হইল। সে কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া মেট্‌ল্যাণ্ডের বাড়ীর নিকট হইতে কার্ণ ও রোর্কির অনুসরণ করিয়াছিল।—তাহারা উভয়ে ট্যাক্সিতে বেকার ষ্ট্রীটে আসিয়া ব্লেকের গৃহে প্রবেশ করিলে ওয়াইল্ড যে ট্যাক্সিতে তাহাদের অনুসরণ করিয়াছিল, সেই ট্যাক্সি ছাড়িয়া-দিয়া উঁহাদের প্রতীক্ষায় পথের ধারে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছু কাল পরে সে তাহাদিগকে ব্লেকের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পথে আসিতে দেখিল; কিন্তু তাহার দৃষ্টিশক্তি অসাধারণ প্রখর হইলেও সে দূর হইতে উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া ক্রোধ ও বিরক্তি-নিবন্ধন তাহাদের মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করিতে পারিল না। এই জন্য তাহার অনুমান হইল, কার্ণ ও রোর্কি ব্লেককে প্রচুর টাকা 'ফি' প্রদান করিতে সম্মত হওয়ায় ব্লেক মেট্‌ল্যাণ্ডের পক্ষ সমর্থন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তিনি মেট্‌ল্যাণ্ডের পক্ষ সমর্থন করিলে অতি সহজেই তাহার নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন হইবে; বিচারক তাহাকে তখন মুক্তিদান করিবেন। সুতরাং ওয়াইল্ডের সকল কৌশলই ফাঁসিয়া যাইবে; তাহার এত চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রম সকলই বিফল হইবে। মেট্‌ল্যাণ্ডের কবল হইতে সে সার রড্‌নেকে মুক্ত করিতে পারিবে না।

ওয়াইল্ড মনে মনে বলিল, "ব্লেককে আমি শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি; তথাপি তাঁহাকে অভিসম্পাত করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে! কিন্তু আমার অভিশাপে তাঁহার কি ক্ষতি হইবে? তাঁহাকে ত প্রতিমুহূর্ত্তে অনেক লোকই অভিসম্পাত করিতেছে; কিন্তু তাহাতে তাঁহার কোন ক্ষতি হইয়াছে কি? এ-কালে অভিশাপের কোন শক্তি নাই! সে শক্তি সে-কালে ছিল বটে; কিন্তু

সে-কাল আর নাই। কাজেই ব্লেকের চেষ্টা বিফল করিতে হইলে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।"

ওয়াইল্ড ব্লেকের ভয়ে অত্যন্ত বিচলিত হইল বটে, কিন্তু সে জানিতে পারিল না যে, ব্লেক মেট্‌ল্যাণ্ডের বন্ধুদ্বয়কে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন! তাহারা প্রচুর 'ফি' দিতে চাহিলেও ব্লেক যে কোন কারণে তাঁহাদের সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন—ইহা সম্ভব বলিয়া ওয়াইল্ডের মনে হইল না। বিশেষতঃ, ব্লেক মেট্‌ল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের তদন্ত করিয়া চুরি-সংক্রান্ত সকল সংবাদই অবগত হইয়াছেন, ওয়াইল্ড তাহা জানিতে পারে নাই। ব্লেক যে মেট্‌ল্যাণ্ডকে নিরপরাধ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ইহাও সে বুঝিতে পারে নাই।

ওয়াইল্ড চলিতে চলিতে অস্ফুট স্বরে বলিল, "এখন আমাকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে; কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। ব্লেক আমার অনিষ্টসাধনের চেষ্টা করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে বাধা দিতে হইবে। তাঁহার কার্য্যে বাধা দিতে হইলে আমার সম্মুখে একটি মাত্র পথ মুক্ত আছে। কিছু দিনের জন্য ব্লেক ও স্মিথকে কার্য্যক্ষেত্র হইতে দূরে রাখিতে হইবে। এই পথই আমাকে অবিলম্বে অবলম্বন করিতে হইবে।"

তাহার এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে তাহার কি কর্ত্তব্য, তাহাও সে তাড়াতাড়ি ভাবিয়া লইল। সে স্থির করিল, যদি সে এক মাস সময় পায়, এই সময়ের জন্য যদি সে ব্লেক ও স্মিথকে নিশ্চেষ্ট করিয়া দূরে রাখিতে পারে, তাহা হইলে সেই সুযোগে সে কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারিবে; সে সার রড্‌নে ড্রুমণ্ডের সহিত যে চুক্তি করিয়াছে, সেই চুক্তি অনুসারে সকল কাজই শেষ করিতে পারিবে। কিন্তু সে ব্লেক ও স্মিথকে কার্য্যক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিতে পারিবে কি?—শেষ ফল যাহাই হউক, সে অবিলম্বে চেষ্টা আরম্ভ করিবে। নতুবা বার ঘণ্টার মধ্যে মেট্‌ল্যাণ্ড মুক্তিলাভ করিবে, এবং ওয়াইল্ডকে আবার নূতন নূতন ফন্দী-ফিকিরের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

এই সকল কথা চিন্তা করিয়া ওয়াইল্ড ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার পরিচিত একটি গ্যারেজে উপস্থিত হইল। সেই গ্যারেজে দিবারাত্রির সকল সময় মোটর-গাড়ী ভাড়া পাওয়া যাইত। ওয়াইল্ড সেই গ্যারেজ হইতে একখানি বেগবান্ 'টুরিং-কার' ভাড়া করিল, এবং তাহা লইয়া বেকার ষ্ট্রীটে ব্লেকের বাড়ীর অদূরে উপস্থিত হইল। সে গাড়ীখানি সেই পথের একটি নিভৃত অংশে রাখিয়া তাহার সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য ব্লেকের বাসভবনের পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হইল।

এবার সে একটা বিষম বে-আইনি কার্য্য আরম্ভ করিল! ওয়াইল্ড সেই গভীর রাত্রিতে ব্লেকের বাড়ীর পশ্চাদ্বর্ত্তী কয়েক জন গৃহস্থের বাড়ীর প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া ব্লেকের বাড়ীর ঠিক পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া ঘরের উচ্চতা ও ঘরের পশ্চাতে ছাদের জল-নিঃসারণের যে নল—তাহা পরীক্ষা করিয়া উৎফুল্লচিত্তে মাথা নাড়িয়া বলিল, "একটুও কঠিন হইবে না।"

বিড়ালধর্ম্মী তস্করেরা যে ভাবে প্রাচীর বহিয়া প্রাচীরের মাথায় উঠে, সেই ভাবে প্রাচীরে উঠিবার অভ্যাস না থাকিলেও ওয়াইল্ড অবলীলাক্রমে ব্লেকের বাড়ীর পশ্চাতস্থ প্রাচীরে উঠিল; তাহার পর ছাদের জল-নিঃসারণের নলের সাহায্যে অত্যন্ত সতর্ক ভাবে ছাদে উঠিয়া, তাহার নিম্নস্থিত কার্ণিশে নামিয়া পড়িল; এবং এক হাতে কার্ণিশ ধরিয়া নীচে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া, একটি বাতায়নের চৌকাঠ অন্য হস্তে ধরিয়া ফেলিল, তাহার পর অল্প চেষ্টায় সেই বাতায়নের ভিতর দিয়া কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিল।

সেই কক্ষটি কাহার শয়ন-কক্ষ, ওয়াইল্ড প্রথমে তাহা স্থির করিতে পারিল না। তাহার আশঙ্কা হইল, সে হয় ত ব্লেকের পাচিকা মিসেস্ বার্ডেলের শয়ন-কক্ষেই প্রবেশ করিয়াছে! মিসেস্ বার্ডেল যদি হঠাৎ জাগিয়া-উঠিয়া তাহাকে দেখিয়া ভয়ে চিৎকার করে—তাহা হইলে তাহার সকল চেষ্টা বিফল হইবে ভাবিয়া ওয়াইল্ড চিন্তিত হইল; কিন্তু সে সেই বাতায়নের নিকট দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিক্ লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিল, তাহা কোন পুরুষের শয়ন-কক্ষ। সে অদূরবর্ত্তী শয্যায় কোন পুরুষকে নিদ্রিত দেখিয়া শয্যার নিকট উপস্থিত হইল। ওয়াইল্ড জানিত, মিঃ ব্লেকের বাড়ীতে ব্লেক ও স্মিথ ভিন্ন অন্য কোন পুরুষমানুষ বাস করিত না; এজন্য তাহার

ধারণা হইল—নিদ্রিত ব্যক্তি স্মিথ ভিন্ন অন্য কেহ নহে। সে স্মিথের শয়ন-কক্ষেই আসিয়া পড়িয়াছে বুঝিয়া আনন্দিত হইল। উহা যে ব্লেকের শয়ন-কক্ষ নহে—এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হইয়াছিল।

স্মিথ সর্ব্বাঙ্গ র‍্যাগে আবৃত করিয়া ঘুমাইতেছিল, এজন্য ওয়াইল্ড তাহার মুখ দেখিতে পায় নাই; তথাপি সে নিম্নস্বরে বলিল, "তোমাকে একটু অসুবিধায় ফেলিতে হইল—এজন্য আমি দুঃখিত বন্ধু! কিন্তু অন্য কোন উপায় নাই!"

ওয়াইল্ড স্মিথকে তাহার শয্যাসহ জড়াইয়া একটা বাণ্ডিলে পরিণত করিতেই স্মিথ হঠাৎ জাগিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "আরেঃ! কে আমাকে বিছানার সঙ্গে জড়াইতেছে? কর্ত্তা, এ আপনার কি রকম অদ্ভুত খেয়াল? আমার ঘুমের সময়—"

ওয়াইল্ড তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "মিঃ ব্লেককে এজন্য দায়ী করিও না বন্ধু! তোমাদের একটি পুরাতন বন্ধু দরকারে পড়িয়া এই অসময়ে তোমাদিগকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছে, এজন্য রাগ করিও না। আমি সত্যই নিরুপায়!"

কণ্ঠস্বর শুনিয়া স্মিথ বুঝিতে পারিল—ইহা ওয়াইল্ডেরই কাজ! সে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি! ওয়াইল্ড?"

"হাঁ আমি, তোমার একান্ত বিশ্বস্ত বন্ধু—ঐ ব্যক্তিই ঠিক।"

স্মিথ বাণ্ডিলের ভিতর হইতে জড়িত স্বরে বলিল, "চুরি করিয়া ঘরে ঢুকিয়া ঠাট্টা করিবার আর লোক পাইলে না? আমি যে দম-বন্ধ হইয়া মরিলাম! ছাড়, ছাড়।"

ওয়াইল্ড স্মিথের আর্ত্তনাদে কর্ণপাত না করিয়া তাহাকে বিছানার বাণ্ডিলে জড়াইয়া-লইয়া একটা বোঁচকার মত কাঁধে ফেলিল। স্মিথ মুক্তিলাভের জন্য হাত-পা ছুড়িবার চেষ্টা করিল; কিন্তু ওয়াইল্ড বিছানা, র‍্যাগ প্রভৃতির দ্বারা তাহার আপাদ-মস্তক জড়াইয়া ফেলিয়াছিল, তাহার চেষ্টা বিফল হইল।

ওয়াইল্ড স্মিথকে কাঁধে লইয়া সতর্ক ভাবে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল; অতঃপর সে দোতালার সিঁড়ির মাথায় আসিয়া, কোন্ দিকে যাইবে তাহাই ভাবিতে লাগিল। ব্লেককে ছাড়িয়া যাওয়া সে সঙ্গত মনে করে নাই; কিন্তু ব্লেকের শয়ন-কক্ষ কোন্ দিকে, তাহা সে জানিত না। সে স্থির করিয়াছিল, ব্লেককেও সে ঐ ভাবে চুরি করিয়া লইয়া যাইবে। তাঁহাকে যে চাই-ই।

ওয়াইল্ড ব্লেকের শয়ন-কক্ষের সন্ধানে যাইবার পূর্ব্বেই ব্লেক তাঁহার শয়ন-কক্ষ হইতে ধস্তাধস্তির শব্দ শুনিয়া, তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করিয়া সিঁড়ির মাথায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। ব্লেক বিপদের আশঙ্কায় একটা রিভলবার লইয়া আসিয়াছিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে ওয়াইল্ডের সহিত তাঁহার দৃষ্টি-বিনিময় হইল।

ব্লেককে সম্মুখে দেখিয়া ওয়াইল্ডই প্রথমে কথা কহিল; সে বলিল, "হাল্লো ব্লেক! এই অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিতে হইল, এ জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত। কিন্তু আমি অত্যন্ত নিরুপায়; আমার নিশ্চিন্ত হইবার অন্য কোন উপায় নাই।"

ব্লেক ওয়াইল্ডের স্কন্ধস্থিত সেই বোঁচকাটি দেখিতে পাইলেন। বোঁচকায় আবদ্ধ হইয়া স্মিথ হাত-পা ছুড়িবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহাও তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিল না। ব্লেক সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কাঁধের ঐ বোঁচকার ভিতর কি আছে?"

ওয়াইল্ড নিতান্ত ভালমানুষের মত বলিল, "আমার এই বোঁচকায়? উহার ভিতর একটি জীবিত প্রাণী ভিন্ন আর কিছুই নাই।—সে আপনার সহকারী স্মিথ।"

ব্লেক বিচলিত স্বরে বলিলেন, "স্মিথকে তুমি প্যাক্‌বন্দী করিয়া কাঁধে তুলিয়া আনিয়াছ? কি রকম তোমার আক্কেল? ছাড়ো, ছাড়ো! এই মুহূর্ত্তেই উহাকে ছাড়িয়া দাও।"

ওয়াইল্ড বলিল, "ধীরে, মিঃ ব্লেক, ধীরে! আপনি এক মিনিট অপেক্ষা করুন। আশা করি, কোন রকম গোলমাল করিতে আপনার আগ্রহ নাই। মিঃ ব্লেক, আমি জানি, আপনি অনর্থক গণ্ডগোল করিতে ভালবাসেন না; বরং ঐরূপ কার্য্যের প্রতি আপনার ঘৃণাই যথেষ্ট। কথা এই যে, আমি আপনাকে ও স্মিথকে কিছু কালের জন্য লণ্ডন হইতে দূরে সরাইয়া রাখিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। সুতরাং আপনারা আমার সঙ্গে কিছু দূরে বেড়াইতে যাইবেন।"

ব্লেক বলিলেন, "নিজের খেয়ালের উপর তোমার বিশ্বাস অসাধারণ বলিয়াই মনে হইতেছে!"

ওয়াইল্ড বলিল, "আপনি বলিতে পারিতেন—নিজের শক্তির উপর আমার বিশ্বাস অসাধারণ। আমি আপনার সে কথার প্রতিবাদ করিতাম না। আমি কি ভাবে আমার সঙ্কল্প সফল করিতে উদ্যত হইয়াছি, তাহা আমার জানা আছে। যেরূপে হউক, আমি সেই সঙ্কল্প সুসিদ্ধ করিবই। আপনি তাহাতে আপত্তি করিলে বা বাধা দিলে, আমি তাহা আদৌ গ্রাহ্য করিব না; কিন্তু এ কথাও সত্য যে, আমি কোন রকম হাঙ্গামার পক্ষপাতী নহি; গণ্ডগোলের প্রতি আমারও অত্যন্ত ঘৃণা।"

ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "দেখিতেছি—তুমি তোমার খেয়াল অনুসারে কার্য্য করিতে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছ; কিন্তু তুমি কি আমার হাতের এই হাতিয়ারের কথা বিস্মৃত হইয়াছ?"—ব্লেক তাঁহার হাতের রিভলভার ওয়াইল্ডের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন।

ওয়াইল্ড মুখভঙ্গি করিয়া বলিল, "ঐ জিনিস? আপনি আমার সম্মুখে আসিবামাত্র উহার প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে; কিন্তু উহা দেখিয়া আমার সঙ্কল্প বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই। আর আপনি ঐ ক্ষুদ্র হাতিয়ারটি দেখাইয়া আমাকে বোকা-বানাইতে পারিবেন—এরূপও আশা করিবেন না; কারণ, আমি সত্যই নির্ব্বোধ নহি। আমি জানি, কোন কারণে আপনার জীবন বিপন্ন হইলেই আপনি আপনার শত্রুর বিরুদ্ধে উহা ব্যবহার করেন। আত্মরক্ষার জন্যই আপনার উহা ব্যবহারের প্রয়োজন; কিন্তু আমার ন্যায় নিরীহ ব্যক্তিকে আপনি বিনা-উত্তেজনায় গুলী করিতে পারেন না; আমি জানি, আপনার প্রকৃতি সেরূপ নহে। সুতরাং আমাকে বৃথা ভয়-প্রদর্শন না করিয়া আপনি অনায়াসেই উহা সরাইয়া রাখিতে পারেন।"

ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "আমি বিনা-উত্তেজনায় তোমাকে গুলী করিতে পারি না, তোমার এ কথা সত্য, ইহা আমি অস্বীকার করিব না; কিন্তু তুমি আমার নিকট কি চাও বল।"

ওয়াইল্ড বলিল, "আমি ত পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছি, আমার সঙ্গে আপনাদের দু'জনকে কিছু দূরে ভ্রমণ করিতে যাইতে হইবে। কার্য্যক্ষেত্র হইতে কয়েক দিন আপনাদিগকে দূরে রাখিব—এইরূপই আমার ইচ্ছা। আমি আপনাকে ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া লণ্ডন হইতে কিছু দূরে বেড়াইতে যাইব। কাজটা আদৌ কঠিন নহে।"

ব্লেক বলিলেন, "আমাদিগকে লইয়া যাইবে—এইরূপই স্থির করিয়াছ?"

ওয়াইল্ড বলিল, "হাঁ, ইহাই আমার সঙ্কল্প। আপনি দেখিতেছেন আমি নিরস্ত্র; কোন অস্ত্রই আমি সঙ্গে আনি নাই। কিন্তু আপনি যদি আমার এই প্রস্তাবে আপত্তি করেন, তাহা হইলে আমাকে বাহুবলের আশ্রয় লইতে হইবে। আপনি কি আমার সহিত বাহুযুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছেন? যদি না থাকেন, তাহা হইলে আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আমার সঙ্গে আসুন; নতুবা আপনারও অবস্থা স্মিথের অবস্থার মত হইবে।"

ব্লেক বলিলেন, "বেশ, চল, তোমার সঙ্গে যাইতেছি; তোমার দৌড় কত দূর, তাহা দেখিবার জন্য আমার কৌতূহল হইয়াছে।"

ঊনবিংশ তরঙ্গ

সার রডনের আরণ্যনিবাসে

রোপার ওয়াইল্ড তাহার প্রস্তাবে ব্লেকের সম্মতি লাভ করায় স্মিথকে বিছানার বাণ্ডিলে বাঁধিয়া রাখা অতঃপর নিষ্প্রয়োজন বোধে কাঁধের উপর হইতে নামাইয়া দিল। স্মিথ বিছানা হইতে বাহির হইয়া র্যাগখানা গায়ে জড়াইতে জড়াইতে সক্রোধে বলিল, "তুমি অধঃপাতে যাও! হতভাগা, বদ্‌মায়েস, রাস্কেল—"

ওয়াইল্ড দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, "তোমার কর্ত্তাটি সুশীল বালকের মত আমার সঙ্গে আসিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন, তুমিও কোন আপত্তি না করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিবে, এই আশায় তোমাকে ছাড়িয়া দিয়াছি; তুমি কি তাঁহার অবাধ্য হইবে? গালাগালি মুলতুবি রাখিয়া আমার এই প্রশ্নের উত্তর দাও!"

স্মিথ মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমি তোমার কথা গ্রাহ্য করি না।"

ব্লেক স্মিথকে বলিলেন, "তুমি আপত্তি করিও না স্মিথ! আমাদের সঙ্গে চল।"

স্মিথ সবিস্ময়ে ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি আশ্চর্য্য! কর্ত্তা, আপনি বলিতেছেন কি? আপনারও কি মতিভ্রম হইল? এই শয়তানের সঙ্গে লড়াই না করিয়াই আপনি উহার মতানুবর্ত্তী হইলেন! ইহার কারণ কি?"

ব্লেক বলিলেন, "জ্ঞানী লোক পরাজিত হইয়া পরাজয় অস্বীকার করেন না, তাহা কি তুমি জান না স্মিথ?"

স্মিথ বলিল, "তা জানি; কিন্তু আমি জানিতাম না যে, আপনি এই নির্লজ্জ দস্যুর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া উহার আদেশ পালনে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন!"—তাহার কণ্ঠস্বর ক্ষোভপূর্ণ।

ব্লেক বলিলেন, "ওয়াইল্ডের সহিত যুদ্ধে আমি পরাজিত হইয়াছি, এ কথা স্বীকার করিতেছি না; কিন্তু ওয়াইল্ডের ন্যায় বলবান্ ব্যক্তির সহিত যদি আমাকে যুদ্ধ করিতে হইত, তাহা হইলে আমার জয়লাভের আশা ছিল না; সুতরাং বিনাযুদ্ধেই আমাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। এজন্য তুমি আমাকে কাপুরুষ মনে করিও না। ওয়াইল্ড জানে, আমি তাহাকে গুলী করিব না; এবং আমিও জানি, তাহার সহিত হাতাহাতি করিলে সে আমাকে অবলীলাক্রমে বাঁধিয়া ফেলিতে পারিত।"

ওয়াইল্ড ব্লেকের কথা শুনিয়া খুসী হইয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "হাঁ, মিঃ ব্লেক বিজ্ঞ লোকের মতই কথা বলিয়াছেন।—পাকা কথা!"

স্মিথও সকল কথা ভাবিয়া বুঝিতে পারিল, ব্লেক সুবিবেচনার কাজই করিয়াছেন। সে জানিত, ওয়াইল্ড দশ-বার জন কন্‌ষ্টেবল কর্ত্তৃক একযোগে আক্রান্ত হইলেও তাহাদিগকে অনায়াসে ভূতলশায়ী করিতে পারে। সে অসাধারণ শক্তির অধিকারী; তাহার মাংসপেশীগুলি লৌহের ন্যায় সুদৃঢ়। সুতরাং কে তাহার সহিত বাহু-যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সাহসী হইবে? কিন্তু ব্লেক যে সহজেই ওয়াইল্ডের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন, তাহার প্রধান কারণ, ওয়াইল্ড কি খেলা খেলিতে উদ্যত হইয়াছে,—তাহা জানিবার জন্য তাঁহার প্রবল আগ্রহ হইয়াছিল।

ওয়াইল্ড ব্লেককে বিনীত ভাবে বলিল, "আপনারা উভয়েই পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া লইলে অত্যন্ত বাধিত হইব। আমি আপনার বাড়ীর অদূরে একখান ট্যাক্সি রাখিয়া আসিয়াছি। এই রাত্রিকালে দূরে ভ্রমণ করিতে ঠাণ্ডা লাগিবার সম্ভাবনা; সুতরাং আপনারা গরম কাপড়ে শরীর ঢাকিয়া লইলেই সঙ্গত কাজ করিবেন।"

স্মিথ বিস্মিত ভাবে বলিল, "আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া কি নিরুদ্দেশ-যাত্রা করিবে? তোমার মতলবটা কি বল ত শুনি।"

ওয়াইল্ড বলিল, "আমার আর নূতন কিছুই বলিবার নাই। আপনারা যতক্ষণ প্রস্তুত হইতে না পারেন, ততক্ষণ আমাকে এখানে অপেক্ষা করিতে হইবে; কিন্তু মিঃ ব্লেক, আপনাকে আমার নিকট এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইতে হইবে যে, আপনি আমার দৃষ্টির আড়ালে গিয়া গোপনে পলায়নের চেষ্টা করিবেন না।"

ব্লেক বলিলেন, "আমি অঙ্গীকার করিলাম, তুমি আমার কথায় নির্ভর করিতে পার।"

ওয়াইল্ড বলিল, "চমৎকার! স্মিথ, তুমি কি বল?"

স্মিথ বলিল, "আমি? কর্ত্তার অঙ্গীকারের পর আমার আর অন্য কথা কি থাকিতে পারে? কিন্তু এ-রকম অসম্ভব আবদার আমি আর কখন শুনি নাই! কর্ত্তার সম্মতি না থাকিলে আমি তোমার এই অসঙ্গত প্রস্তাবে কখন রাজি হইতাম না।"

ওয়াইল্ড বলিল, "কিন্তু সেজন্য এখন আর আক্ষেপ করিয়া কোন ফল নাই। মিঃ ব্লেক, আপনাদের আর কত বিলম্ব হইবে দয়া করিয়া বলিবেন?"

ব্লেক বলিলেন, "বিলম্ব করিয়া ত লাভ নাই; যত শীঘ্র সম্ভব আমরা প্রস্তুত হইয়া আসিতেছি। তুমি এখানে অপেক্ষা করিতে পার।"

ওয়াইল্ডের সরল ব্যবহারে ব্লেক সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সে তাহার সঙ্কল্প সম্বন্ধে ব্লেকের নিকট মনের ভাব গোপন করে নাই। ব্লেক বুঝিতে পারিলেন—সেই রাত্রির অবশিষ্ট অংশ কৌতূহলেই অতিবাহিত হইবে।

ওয়াইল্ড বলিল, "দেখুন মিঃ ব্লেক, আমি যে তুচ্ছ খেলা খেলিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহা আপনি অতি সহজেই নষ্ট করিয়া দিবেন, ইহা আমার বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। কাজেই কিছু কালের জন্য আপনাকে সরাইয়া দিতে না পারিলে আমার সকল ফন্দিই বিফল হইবে; আবার

আমাকে ঢালিয়া সাজিতে হইবে! কিন্তু আমি তাহা করিতে চাহি না; তবে আমি আপনাদিগকে কার্য্যক্ষেত্র হইতে দূরে লইয়া যাইতেছি, এজন্য আপনার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই। আমি আপনাদিগকে দূরে লইয়া-গিয়া খুব ভাল লোকেরই জিম্মা করিয়া দিব, এবং সেখানে আপনাদের কোন প্রকার কষ্ট বা অযত্ন হইবে না—এ কথা বলাই বাহুল্য।"

ব্লেক বলিলেন, "এ সকল আলোচনা পরে করিলেও ক্ষতি নাই।"

ব্লেক ও স্মিথ যে একটা তস্করের খেয়ালে পরিচালিত হইবেন, ইহা অবশ্যই কেহ আশা করিতে পারেন না; কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা করিয়া কাজ করাই ব্লেকের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য, এবং স্মিথ কখন তাঁহার অবাধ্য হইত না। ব্লেক জানিতেন, ওয়াইল্ডকে পিস্তলের ভয় দেখাইয়া সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিবেন না, এবং তাঁহারা বলপ্রকাশ করিলে ওয়াইল্ড তাঁহাদিগকে দুই মিনিটের মধ্যেই বগলে পূরিয়া বন্দী করিবে! অস্ত্রের সাহায্যে ওয়াইল্ডের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিবেন, ব্লেকের সেরূপ ইচ্ছা ছিল না। তাহার উপর ওয়াইল্ড তাঁহাদিগকে কোথায় লইয়া যায়, তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, তাহাও জানিবার জন্য ব্লেকের কৌতূহল হইয়াছিল। এজন্য ব্লেক স্বেচ্ছায় তাহার অনুসরণ করাই সঙ্গত মনে করিলেন। তাঁহার বাড়ী হইতে সে তাঁহাদিগকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া যাইবে, ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত বলিয়াই ব্লেকের ধারণা হইয়াছিল।

স্মিথ ব্লেকের সহিত তাঁহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কর্ত্তা, আপনি কেন উহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন?"

ব্লেক বলিলেন, "স্মিথ, এ কথা লইয়া আমার সঙ্গে তর্ক করিও না; আমি যাহা ভাল বুঝিয়াছি তাহাই করিয়াছি। বিশেষতঃ, ওয়াইল্ডকে তুমি ত জান; আমাদিগকে চুরি করিয়া লইয়া যাইবে বলিয়াই সে এখানে আসিয়াছে; আমরা আপত্তি করিলেও সে তাহার সঙ্কল্প ত্যাগ করিত না। এখন আমরা তাহার মতানুবর্ত্তী হই, পরে তাহাকে কৌশলে পরাস্ত করিতে পারিব। তুমি শীঘ্র পোষাক পরিয়া লও; আমরা এখানে আর অধিক বিলম্ব করিব না।"

স্মিথ মাথা চুলকাইয়া বলিল, "আপনার কথাই ঠিক কর্ত্তা! ওয়াইল্ড সত্যই অদ্ভুত লোক, সকল দিক্ দিয়াই অদ্ভুত! আপনি তাহাকে গুলী করিবার জন্য পিস্তল তুলিলেন, সে ভয় না পাইয়া হাসিতে লাগিল। এ-রকম অদ্ভুত প্রকৃতির লোক আমি আর একটিও কোথাও দেখি নাই কর্ত্তা!"

স্মিথ ক্ষোভ ত্যাগ করিয়া পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের জন্য তাহার ঘরে চলিয়া গেল। সে বুঝিতে পারিল, ওয়াইল্ড সত্যই ব্লেককে ভয় করে; ব্লেক তাহার গুপ্ত সংকল্প ব্যর্থ করিতে পারেন ভাবিয়াই সে এই ভাবে তাঁহাকে কার্য্যক্ষেত্র হইতে দূরে রাখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। সে ব্লেকের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার না করিলে কখন প্রকারান্তরে তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইত না। কিন্তু ওয়াইল্ড কি ভাবে তাঁহাদিগকে আটক করিয়া রাখিবে, স্মিথ তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না; তবে ব্লেককে নিশ্চিন্ত দেখিয়া তাহার উৎকণ্ঠা দূর হইল। ওয়াইল্ড কর্ত্তৃক তাহাদের কোন বিপদ ঘটিবে—এ আশঙ্কা তাহার মনে স্থান পাইল না। ওয়াইল্ড কোন প্রকার হীন-চাতুর্য্যের আশ্রয় লইবে—ইহাও স্মিথের বিশ্বাস হইল না।

বস্তুতঃ, ব্লেক ও স্মিথ ওয়াইল্ডের কু-কার্য্যের সমর্থন না করিলেও ওয়াইল্ড যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল, তাহার সেই কার্য্যে ব্লেকের আপত্তি ছিল না। ব্লেক প্রকাশ্য ভাবে তাহার কার্য্যের সমর্থন না করিলেও অসৃকার মেট্‌ল্যাণ্ডের বিপদে তিনি বিন্দুমাত্র দুঃখ বোধ করেন নাই।

দশ মিনিটের মধ্যে তাঁহারা তিন জন ওয়াইল্ডের ভাড়াটে ট্যাক্সিতে প্রবেশ করিলেন। ব্লেক অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তিনি তাহার কবল হইতে পলায়নের চেষ্টা করিবেন না; তাঁহার এই কথায় নির্ভর করিয়া ওয়াইল্ড নিশ্চিন্ত হইয়াছিল; সে গাড়ী চালাইবার সময় একবারও তাঁহাদের দিকে ফিরিয়া চাহিল না।

ওয়াইল্ড ট্যাক্সি লইয়া লণ্ডনের বাহিরে আসিয়া ব্লেককে বলিল, "আমরা এখন কোথায় যাইতেছি, সে কথা আপনার নিকট গোপন করিবার কোন কারণ দেখি না। আমরা ষ্ট্রেথাম ও ক্রয়ডন অতিক্রম করিয়া সারে জিলার বিস্তীর্ণ অরণ্য-অঞ্চলে প্রবেশ করিব।"

ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "টোক পড্‌নের সন্নিহিত কোন অরণ্যই কি তোমার লক্ষ্য ?"

ওয়াইল্ড সোৎসাহে বলিল, "আপনার অন্তর্দৃষ্টি চমৎকার মিঃ ব্লেক ! আপনার বুঝিবার শক্তি একবিন্দুও হ্রাস হয় নাই, ইহা আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে। হাঁ, আমরা সার রড্‌নে ড্রুমণ্ডের অরণ্য-নিবাসে যাইতেছি। আপনি ত পূর্ব্বে সেখানে গমন করিয়াছিলেন। যে সময় আপনি গোল্ডবার্গের জহরতগুলি উদ্ধার করেন, সেই সময় সেখানে আপনার সাক্ষাৎলাভ করিতে পারি নাই, এজন্য আমি দুঃখিত।"

স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা তোমার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছিলেন; তোমার চোরা মাল তিনি হস্তগত করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যোদ্ধার হওয়ায় তিনি তোমাকে ধরিবার চেষ্টা করেন নাই।"

ওয়াইল্ড হাসিয়া বলিল, "উনি আমার চালাকি ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন, আমি উঁহার নিকট পরাস্ত হইয়াছিলাম, এজন্য আমি দুঃখিত নহি। এ পর্য্যন্ত আমি আর কাহারও নিকট পরাজয় স্বীকার করি নাই। আমি জঙ্গলের ভিতর মাটী খুঁড়িয়া জহরতগুলি লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, আমার ধারণা ছিল, কেহই সেগুলির সন্ধান পাইবে না; কিন্তু পরে আমি সেগুলি গর্ত্তের ভিতর হইতে তুলিয়া আনিতে গিয়া আর তাহা দেখিতে পাইলাম না! কিন্তু তখনই বুঝিতে পারিলাম—এ কাহার কাজ! সে-বার আপনি আমাকে পরাস্ত করায় এ-বার আমাকে সতর্ক হইতে হইয়াছে, এবং এই জন্যই আপনাদিগকে আমার সঙ্কল্প-পথ হইতে অপসারিত করিতেছি।"

ব্লেক বলিলেন, "তুমি আমাকে ভয় কর, ইহা জানিয়া আমি আনন্দবোধ করিতেছি ওয়াইল্ড!"

ওয়াইল্ড একটা চুরুট বাহির করিয়া, ব্লেককে তাহা প্রদানের জন্য হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিল, "আশা করি, আমার এই চুরুটটি ব্যবহার করিয়াও আপনি আনন্দবোধ করিবেন। আমার এই চুরুট অতি উৎকৃষ্ট; আপনার চেতনা বিলুপ্ত হইতে পারে, এরূপ কোন বিষাক্ত দ্রব্য এ-চুরুটে নাই, আমার এ-কথায় আপনি অনায়াসে নির্ভর করিতে পারেন। আমি আপনার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিব না।"

ব্লেক অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহার চুরুটটি গ্রহণ করিয়া মুখে পুরিলেন, এবং তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া ধূমপানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুকাল পরেই তাঁহারা সার রড্‌নে ড্রুমণ্ডের অরণ্যনিবাসে উপস্থিত হইলেন।

অতঃপর ব্লেক সার ড্রুমণ্ডের সহিত আলাপ করিবার জন্য উৎসুক হইলেন। তাঁহারা যে সেখানে বন্দী হইবেন, ব্লেক ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; কিন্তু যে সকল কাণ্ড অতঃপর সেখানে সংঘটিত হইল, তাহা অতীব কৌতূহলজনক।

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

এলো নির্জন রাতি

আলো-হারা ওই ঘন বন-পথে নীল-অঞ্চল পাতি
শান্ত গভীর রিক্ততা নিয়ে এলো নির্জ্জন রাতি।

মিলালো কমলে চুম্বন আঁকি শ্রান্ত সূর্য্য দূরে—
নিঝুম কাননে ঝঙ্কার তোলে ঝিল্লী ছন্দ-সুরে।
নিয়ে চন্দনা সুগভীর প্রীতি
গাহিল রাতের বন্দনা-গীতি,

গন্ধ ছড়ালো চাঁপা-ফুল-বীথি মৌন অন্ধকারে,
বাউল সমীর কানে কানে যেন কি-কথা কহিল তারে।
গোধূলি-বেলার শেষ আলোটুকু কোথায় হারায়ে গেল,
স্বপ্ন-মেদুর স্তব্ধতা নিয়ে অলস রাত্রি এল!

কুমারী নীলিমা রায়।

প্রতিশ্রুতি

অরুণের আজ সবচেয়ে বেশী করিয়া মনে পড়ে সে-দিনের কথা,—সুধীরা যে-দিন রুমাল উড়াইয়া তাহাকে হাওড়া ষ্টেশনে বিদায় দিয়াছিল। সে-দিন সুধীরার অন্তরে ছিল গভীর বেদনা, বাহিরে তার প্রকাশ ছিল না। হাসির অবগুণ্ঠনের মধ্যে সে-দিন বেদনার যে নূতন রূপ সুধীরার মুখে তখন ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা অপূর্ব্ব। তার পর গাড়ী ছাড়িয়া দিলে, দূরে যত দূর দেখা যায়—অরুণ নির্নিমেষ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সুধীরার মূর্ত্তির শেষ অস্পষ্ট আভাসটুকু দেখিবার জন্য তাকাইয়া ছিল। অরুণের মনে ছিল আনন্দ—উচ্চশিক্ষার পিপাসা। সেই সঙ্গে বেদনাও ছিল—আসন্ন বিরহের। গাড়ী ছাড়িবার ঠিক পূর্ব্বমুহূর্ত্তে অরুণের কাণের কাছে মুখ আনিয়া সুধীরা বলিয়াছিল—বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না, দূরেও ঠেলে দেয়,—মনে রেখ আমাদের শরৎচন্দ্রের এই কথা। অরুণের কাণে যেন আজও সেই কথা ঝঙ্কার দিয়া ফিরিতেছে। কত আন্তরিকতাই না তার মধ্যে ছিল!

সেই এক দিন, আর এই এক দিন। আজ বেদনা নাই—শুধু আনন্দ। এত কালের বিরহ আজিকার এই মিলন-মুহূর্ত্তের জন্য যে আনন্দ সঞ্চয় করিয়াছে, অরুণের অন্তরে তাহাই আজ শতধারে ঝরিয়া পড়িতেছে। এ জগতে ইহার তুলনা কোথায়? হাওড়া ষ্টেশন পবিত্র স্থান—তীর্থকামীর বারাণসী। অরুণের মনে এক দিন সুধীরা যে ছবি অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল, তাহা মুছিয়া দিতে পারে নাই ইংরেজ-তরুণী "বার্থা।" কন্টিনেন্টাল হোটেলে প্রথম দিনের পরিচয় হইতে সে কত রকমে চেষ্টা করিয়াছিল অরুণের হৃদয়রাজ্যে এতটুকু স্থান সংগ্রহ করিতে, কিন্তু যেখানে সুধীরার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত সেখানে বার্থার স্থান কোথায়? পূর্ণ পাঁচটি বছর বিলাতে থাকিয়া অরুণ পড়িয়াছে ইঞ্জিনিয়ারীং, আর কোন প্রসিদ্ধ ফার্ম্মে ট্রেণিং লইয়াছে। ইহার পূরা তিন বছরই বার্থার সঙ্গে তাহার পরিচয়। সেবায়, শুশ্রূষায়, যত্নে এবং জীবনের সঙ্গিনী হিসাবে ইংরেজ-তরুণী যে কাহারও চেয়ে ছোট নয়, বার্থা সর্ব্বরকমেই তার প্রমাণ দিয়াছে; কিন্তু অরুণের হৃদয় হইতে সুধীরার ছবি সে মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। সুদূর বিদেশেও সুধীরার প্রতিচ্ছবি সজাগ প্রহরীর মত অন্তরের সকল দ্বার আগলাইয়া পাহারা দিয়া ফিরিয়াছে। যে ভালবাসার অঙ্কুর প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার কোন এক অখ্যাত অজ্ঞাত "ললিত-লাবণ্য লজে" নিভৃতে গজাইয়া উঠিয়াছিল, পশ্চিমের কঠোর সাধনার দিনেও তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই। অন্তরের অন্তরালে বাড়িয়া ফলে-ফুলে পূর্ণ তরুতে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

অরুণ আজ আর নিজেকে সামলাইয়া রাখিতে পারিতেছে না। সে-দিন যে ট্রেণ তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া পবন-গতিতে দূরে লইয়া গিয়াছিল, সেই ট্রেণই আজ যেন গরুর গাড়ীর মত ধীর-মন্থর গতিতে চলিয়াছে। অরুণ কেবলই সেই শুভ মুহূর্ত্তটির কথাটি ভাবিতেছিল, যখন চারি চক্ষুর মিলন হইবে। অরুণ তখন কি করিবে? এত আনন্দ তাহার সহ্য হইবে কি?

আবার সে ভাবিল, সুধীরার পিতা মিষ্টার বসু কত খুশীই না হইবেন? বিলাতে যাইবার দিন অরুণের আশ্বাস-বাক্য তিনি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তাঁহার ধারণা ছিল, অরুণ হয়তো মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়া বিলাতে চলিয়া যাইতেছে, যখন ফিরিয়া আসিবে, তখন তাহার সঙ্গে আসিবে একটি ইংরেজ-তরুণী। আজ তিনি গভীর বিস্ময়ে দেখিবেন—তেমন কিছু ঘটে নাই, ঘটনাস্রোত তেমনি অনুকূল ভাবে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে।

অরুণ আবার ভাবিল, হয়তো হাওড়া ষ্টেশনে নামিতেই সুধীরা তাহার কণ্ঠে জয়মাল্য পরাইয়া দিবে, না হয় কিছুই করিবে না। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে প্রথম দর্শনের অভূত-পূর্ব্ব আনন্দের গভীরতায় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া সকল ইন্দ্রিয় দিয়া প্রথম মিলন-মুহূর্ত্তটুকু উপভোগ করিবে। গাঁটছড়া যেখানে অন্তরের সঙ্গে বাঁধা হইয়াছে, বাহিরের অনুষ্ঠান সেখানে কিছুই নয়। যে মিলনে এতটুকু ফাঁক নাই, ফাঁকি নাই, সেখানে বিচ্ছেদ ঘটাইবার সাধ্য মানুষের নাই—আছে একমাত্র ভগবানের,—শত বাধাও এতটুকু মলিনতার দাগ সেখানে টানিতে পারে না।

কুলীর চীৎকারে সচকিত হইয়া অরুণ দেখিল, গাড়ী হাওড়া ষ্টেশনে প্রবেশ করিয়াছে। প্রথম শ্রেণীর কামরা হইতে অপরিসীম আগ্রহে অরুণের দুই চোখ সুধীরাকে খুঁজিতে লাগিল; কিন্তু প্ল্যাটফর্ম্মের শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াও সুধীরার ছায়াও সে দেখিতে পাইল না। তাহার চোখে পড়িল শুধু সুধীরার বাড়ীর বুড়া চাকর কালীচরণ আর পুরাতন ড্রাইভার রমজান। প্ল্যাটফর্ম্মের একধারে দাঁড়াইয়া উহারা ট্রেণের দিকে তাকাইয়া যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতেছে।

ট্রেণ থামিতেই অরুণ নিরুৎসাহ চিত্তে নামিয়া পড়িল, অমনি কোথা হইতে এক স্থূলাঙ্গী তরুণী আসিয়া তাহার গলায় পরাইয়া দিল ফুলের মালা, এবং কালীচরণও তখনি দৌড়াইয়া আসিয়া "এই যে গাড়ী, এই দিকে", বলিয়া আপ্যায়িত করিতে লাগিল।

অরুণ বিস্মিত হইল। বাক্ এবং চলৎশক্তি হারাইয়া ক্ষণেকের জন্য সে তরুণীর মুখের দিকে তাকাইল। তরুণী বলিল—চলো, আর দাঁড়িয়ে কি হবে? একেবারে গাড়ীতে বসে কথা বল্‌বো। মালপত্র কালীচরণ খালাস করে নিয়ে আসবে।"

কণ্ঠস্বর পরিচিত বলিয়াই মনে হইল, কিন্তু চেহারায় এতটুকু আভাস নাই। বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির প্রফেসর খুল্লতাত কুলদা বাবুর বাসায় থাকিয়া সুধীরার দিদি 'অধীরা' য়ুনিভার্সিটিতেই আই-এ পড়িত। অরুণ তাহা জানিত। অরুণ ভাবিল, হয়তো এ সেই অধীরা। সহোদরা বলিয়াই হয়তো গলার স্বরে কিছু সাদৃশ্য আছে। সুধীরার কি হইয়াছে, কেন আসে নাই? —এমনি নানা প্রশ্ন তাহার মনের ভিতর ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া তাহা বাহিরে প্রকাশ করিবার সাহস অরুণ সঞ্চয় করিতে পারিল না। উৎকট লজ্জা ক্রমাগত বাধাদান করিতে লাগিল।

বাসায় পৌছিয়া গাড়ীর হর্ণ বাজিতেই সুধীরার মাতা গায়ত্রী দেবী এবং পিতা মিষ্টার বসু সাগ্রহে আসিয়া পরম সমাদরে অরুণকে গাড়ী হইতে নামাইলেন। তরুণী বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। সুধীরার সন্ধানে অরুণের করুণ আঁখি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ফিরিতে লাগিল—কিন্তু বৃথা!

অরুণ ইউরোপীয় পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া ধুতি ও পাঞ্জাবী পরিয়া চায়ের টেবিলে বসিয়াছে। বন্ধু খগেন আসিয়া বলিল—"চল্ অরুণ, আকাশের অবস্থা ভাল আছে—চা খেয়ে একটু ড্রাইভ করে আসা যাক্। আমি নতুন অষ্টিনটা কিনেছি, একটু চড়ে দেখ্‌বিনে?"

অরুণ বলিল—বেশ, আপত্তি কি?"

মিষ্টার বসু সেখানে ছিলেন। তিনি বলিলেন—"এখন তা হতে পারে না খগেন! আর বেশী দেরী নেই। এই সপ্তাহের মধ্যেই যে-দিন থাকে, সেই দিন দুই হাত এক করে দেবো ভাবছি। অরুণকে তো একটু বেরুতে হবে মার্কেটে। কিছু জিনিষ-পত্তর কিনে ফেলুক। যতটা এগিয়ে যায়, ততটাই ভাল।"

খগেন বিনীত ভাবে বলিল—"এর উপরে আর কথা চলে না। আমিও তাতেই রাজী। আপাততঃ আমি একাই ঘুরে আস্‌ছি। পরে দেখা যাবে।"

চা খাইয়া খগেন চলিয়া গেল। ড্রাইভার আসিয়া জানাইয়া গেল—গাড়ী প্রস্তুত। গায়ত্রী দেবী বলিলেন—"যাও অরুণ, তুমি আর দেরী করো না। চট্ করে মার্কেট ঘুরে এস। বিয়ের তো আর দেরী নেই, জিনিষগুলা কেনা চলুক।

গাড়ীতে আসিয়া অরুণ দেখিল, এবারও সুধীরার পরিবর্ত্তে সেই স্থূলাঙ্গীটির বিশাল বপু অল্প-পরিসর গাড়ীর পিছনের সিটের প্রায় সবটুকুই জুড়িয়া বসিয়া আছে। ইহার প্রতিবাদ চলে না। অরুণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও অগত্যা গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

গাড়ী আর কাহারও প্রতীক্ষা না করিয়া চলিতে সুরু

করিল। অরুণের এবারও ইচ্ছা হইতেছিল—জিজ্ঞাসা করে, "সুধীরার কি হয়েছে?" কিন্তু মুখে কথা ফুটিল না।

গাড়ী সবেগে ছুটিয়া চলিল। এই নিদারুণ রহস্যকে উপলক্ষ করিয়া অরুণের মনে ভীষণ দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল; কোন মীমংসায় সে উপনীত হইতে পারিল না। ইহার উপর সেই তরুণী প্রশ্নের পর প্রশ্ন-বর্ষণে তাহাকে একেবারে বিব্রত করিয়া তুলিল।

"বিলাতের স্মৃতি আপনি আজও ভুলতে পারেননি?"

"না, তেমন কিছুই নয়!"

"আপনার শরীর বোধ করি আজ তেমন ভাল নেই?"

"শরীর ভালই আছে, তবে—"

"তবে কি, বলুন শুনি।"

"শরীর ভাল আছে—তবে ভাবছি, খগেনকে ফিরিয়ে দিলুম।"

"উপায় কি? এগুলোও তো করা দরকার।"

"দরকার তো বটেই; তবে একটু দেরীতেও করা যেতে পারতো, তাতে এমন কি ক্ষতি হ'ত?"

"বিয়ের আর তো দেরী নেই, কাজেই ও-কাজগুলা শীঘ্র শেষ করাই ভাল।"

অরুণ ভাবিল, জিজ্ঞাসা করে—বিয়ে? কার সঙ্গে? —কিন্তু পারিল না; শুধু বলিল, "তা তো বটেই।"

তরুণী বলিল,—"আপনিই পছন্দ করে সব জিনিষ কিনবেন। মেয়েদের আবার আলাদা পছন্দ কি? স্বামীর পছন্দেই তাদের পছন্দ।"

অরুণ উদাস ভাবে এবারও বলিল,—"সে তো ঠিকই।"

"আজকাল জর্জ্জেটের চেয়ে বেনারসী সাড়ীরই বেশী আদর, কি বলেন?"

"হুঁ।"

"গয়না-পত্তরও আজকাল সাদাসিদেই লোকে বেশী পছন্দ করে।"

"সে তো করবেই। সোনার দাম খুব চড়ে গেছে কি না।"

"হ্যাঁ, যে যুদ্ধ চলেছে, সে তো চড়বেই। কিন্তু লোকের পছন্দও বদ্‌লেছে।"

অরুণ ইহার কোন জবাব দিল না।

তরুণী বলিল,—"আচ্ছা, বিলাতের মেয়েরা কি গিল্ট-গয়না পরে না?"

"খুব কদাচিৎ, আর তাও অতি সামান্যই।"

"আপনার আংটীটা আপনি নিজেই পছন্দ করে কিন্‌বেন। মায়ের তাই ইচ্ছা।"

অরুণ এবারও কোন উত্তর করিল না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

"আপনি কি মনে করছেন, খগেন বাবু দুঃখিত হয়েছেন?"

"না, তা মনে কর্‌ছিনে। সে হয় তো কিছুই মনে করেনি; তবে আমার নিজেরই কেমন কেমন লাগছে।"

"খগেন বাবুকে আমরাও জানি। উনি রাগ করবার ছেলেই নন্। ওঁর সঙ্গে ছোট বোনের বিয়ে দেবার ইচ্ছে মায়ের খুবই বেশী। ব্যারিষ্টারীতে আজ-কাল ওঁর দু'পয়সা হচ্ছে।"

এ কথার উত্তরে অরুণ শুধু একটু কাষ্ঠ-হাসি হাসিল, এবং বলিল,—"খুবই সুসংবাদ!"—'সুসংবাদ' মুখে বলিল বটে, কিন্তু সন্দিগ্ধ মন সন্দেহের অতল গহ্বরে একেবারে তলাইয়া গেল। মুহূর্ত্তে তাহার মনে হইল, খগেনের দু'পয়সা রোজগারই তাহলে তাহার বিলাতে অবস্থান-কালে সুধীরাকে কক্ষচ্যুত করিয়া নিজের গণ্ডীর মধ্যে আকর্ষণ করিয়াছে, এবং তারই পরিবর্ত্তে অরুণের জন্য আসিয়াছে কাশীর হিন্দু ইউনিভার্সিটির এই অধীরা! কিন্তু মুখে এ কথা প্রকাশ করিয়া বলিবার নির্লজ্জতা বা রূঢ়তা তাহার নাই। তাহার পরিবর্ত্তে মনের অবস্থা লুকাইবার জন্য সে মুখে কৃত্রিম হাসি ফুটাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু বৃথা চেষ্টা!

আরও দু'-চারিটি প্রশ্ন করিতে না করিতেই তাহারা নিউ মার্কেটে পৌঁছিল, এবং জিনিষপত্রগুলি কিনিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু কোন কাজেই অরুণের আগ্রহ নাই। তরুণী যে কথা জিজ্ঞাসা করে, তাহাতেই 'হ্যাঁ,-'হুঁ' বলিয়া সায় দিয়া যায়।

তাহাতে তরুণীর জিনিষ কেনায় বাধা নাই; সুতরাং নানা জিনিষে গাড়ী বোঝাই হইয়া গেল। অরুণের মনে এক চিন্তা—যেন আগুন জলিতেছে! বুঝিয়াছে, বন্ধু খগেন তাহার দু'-পয়সা রোজগারের যাদুদণ্ডে সুধীরাকে

তার দিকে পরিচালিত করিয়াছে; এবং বারাণসীর অধীরা নিখুঁত ভাবে সুধীরার ভূমিকা অভিনয় করিয়া চলিয়াছে। খগেনের উপরেও মন বিষাক্ত হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু সে-চিন্তাকে নিঃসংশয়ে প্রশ্রয় দিতে পারিতেছিল না এই ভাবিয়া যে, খগেনের অপরাধ কি? অপরাধ থাকিলেই বা তাহা কতটুকু? সুন্দরী নারী চিরকালই পুরুষের কামনার বস্তু। সুধীরা রূপবতী; খগেন তাহার রূপে আকৃষ্ট হইয়াছে। খগেন তরুণ—তাহার হৃদয় আছে, সে ভালবাসিয়াছে। ভালবাসা নিয়ম মানিয়া চলে না, বন্ধুত্বেরও খাতির করে না। খগেনের অপরাধ নাই; অপরাধ সুধীরারই! তাহার সঙ্গে সব কথা—এ-দিকে খগেনকে প্রলুব্ধ করিয়াছে! এই সকল চিন্তা অরুণের মনকে গ্রাস করিয়া বসিল। তাহারা বিবাহের অনেক দ্রব্যাদি কিনিয়া বাড়ীতে ফিরিল বটে, কিন্তু এই বিবাহের বিরুদ্ধে অরুণের মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল—সে খবর বাহিরের কেহই জানিতে পারিল না।

রাত্রে খাবারের টেবিলে যোগদান করিতে খগেনও অনুরুদ্ধ হইয়াছিল, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুদেরও অনেকেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; সকলেই ঠিক সময়ে সমবেত হইলেন। তখনও পর্য্যন্ত সুধীরার দেখা নাই, অরুণের বুকের মধ্যে জ্বালা করিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল—সমগ্র অনুষ্ঠানটি পণ্ড করিয়া সেখান হইতে পলাইতে পারিলেই যেন সে বাঁচিয়া যায়! কিন্তু সাধারণ শিষ্টাচারের অনুরোধে তাহাকে এই কার্য্যে বিরত হইতে হইল। আবার সে ভাবিল, সমাগত তরুণীদের দলের কেহ সুধীরা নয় তো? তাই বা কিরূপে সম্ভব হইবে? যদিও পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে মাত্র পাঁচ মাসের পরিচয়; তবুও একটি তরুণীকে আজীবনের মত চিনিবার পক্ষে পাঁচ মাসের পরিচয়ই কি যথেষ্ট নয়? পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যাহার চলা-ফেরা কথা-বার্ত্তা হাব-ভাব অরুণকে চুম্বকের মত আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহাকে আজ সে চিনিতেই পারিবে না, ইহা কি সম্ভব? না, তাহা হইতেই পারে না। তবে কি ইংরেজ-তরুণী বার্থার প্রভাব তাহার হৃদয় হইতে সুধীরার ছবি তাহার অজ্ঞাতসারেই মুছিয়া দিয়াছে?

ইতিমধ্যে গায়ত্রী দেবী খাবার-টেবিলের নিকটে আসিয়া বলিলেন—"সুধীরা, তুই মা এই নেবুগুলি পাতে পাতে দিয়ে রাখ্‌। আমি পোলাও নিয়ে আস্‌ছি, ঠাকুর ওখানে দাঁড়িয়ে আছে।"

সুধীরার নাম শুনিয়া অরুণ সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, সেই স্থুলাঙ্গী তরুণী স্বহস্তে প্লেট হইতে লেবু তুলিয়া বিতরণ করিতেছে! অরুণ নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল, এবং তার বিস্ময়ের মাত্রা একেবারে সীমা অতিক্রম করিল—যখন খগেন তার কাণের কাছে মুখ আনিয়া বলিল,—"দেখেছ ভাই, সুধীরা অল্পদিনেই কি ভীষণ মুটিয়ে গেছে? অনেক দিন পরে দেখে আমি তো ভাল করে চিন্‌তেই পারিনি সে-দিন। তার পর এই বছর-খানেকের মধ্যেই ও যেন আরও বেশী মোটা হয়েছে দেখ্‌ছি! যারা ছেলেবেলায় ওকে দেখেছিল, তারা এখন চিন্‌তেই পারবে না।"

অরুণ এ কথা শুনিয়া নির্ব্বাক্ রহিল। পোলাও এবার সকলেরই পাতে বিতরিত হইল; কিন্তু অরুণের হাত মুখে উঠিতে চাহিল না। কয়েক মিনিট সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; অনেকেরই দৃষ্টি সে-দিকে আকৃষ্ট হইল। গায়ত্রী দেবী নিজেও ইহা লক্ষ্য করিয়া বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, এবং অরুণকে নারীসুলভ লজ্জা ত্যাগ করিয়া খাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; অরুণ পোলাও হাতে তুলিয়া কোনও রকমে মুখে ঠেকাইতে লাগিল, এবং সকলের অনুরোধ সহজে এড়াইবার জন্য শেষ জানাইল, তাহার শরীরটা হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাহাতেও সে নিষ্কৃতি পাইল না। 'কি হয়েছে?'—'কেমন ঠেক্‌ছে?'—'কি খেয়েছ রাস্তায়?'—ইত্যাদি প্রশ্নবাণ চারিদিক্ হইতে বর্ষিত হইয়া তাহাকে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিল।

অরুণের মানসিক বিচলিত ভাব সুধীরাও অনেকক্ষণ হইতেই সন্দিগ্ধচিত্তে লক্ষ্য করিতেছিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া সুধীরার স্থির ধারণা হইল, তাহাদের সম্বন্ধের কোথাও ঘুণ ধরিয়াছে। মিঃ বসু ঠিক এই সময়ে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বসমক্ষে বিবাহের দিনটি ঘোষণা করিয়াছিলেন; কিন্তু ভোজের অনুষ্ঠানটা তবুও তেমন জমিল না; খানিকটা নিরানন্দের মধ্যেই তাহা শেষ হইয়া গেল।

হায় রে অদৃষ্টের পরিহাস! এক দিন যে সংবাদ অরুণের প্রাণে সুধাবর্ষণ করিত, আজ তাহাই তাহার মর্ম্মস্থলে শেল বিদ্ধ করিল। তাহার মনে হইল, এই ভোজসভা যেন বিচারকের এজলাস, এবং জজের আসন হইতে সুধীরার পিতা প্রিয়নাথ বাবু তাহার ফাঁসির আদেশ এইমাত্র প্রদান করিলেন।

উপায়ান্তর না দেখিয়া অরুণ পার্শ্বে উপবিষ্ট খগেনকে মৃদুস্বরে বলিল, "এক্ষুনি গিয়ে বালীগঞ্জে আমার বোনের ভয়ঙ্কর পীড়া হয়েছে ব'লে টেলিফোন্ কর। কারণ পরে জানাব! প্রশ্ন করিসনে ভাই!"

খগেন ব্যাপারটা ঠিক অনুধাবন করিতে না পারিলেও রাজি হইল, এবং অবিলম্বে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে অরুণের ভগিনী সবিতার পীড়ার সংবাদ ফোনের ভিতর দিয়া আসিয়া পড়িল; সুতরাং অরুণের যাওয়া সহজেই সকলে অনুমোদন করিলেন; কিন্তু ব্যাপারটা সকলেরই অত্যন্ত খাপ্‌ছাড়া ঠেকিল, এবং সকলেই মুখ-চাওয়াচায়ি করিতে লাগিলেন। কেহ কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না।

গায়ত্রী দেবী স্বামীকে আড়ালে পাইয়া বলিলেন,—"আর ভাবছো কি? তখনই বলেছিলাম, বিলাতে গেলে এ দেশের ছোঁড়াদের কেউ নির্দ্দোষ অবস্থায় ফিরে আসে না।"

প্রিয়নাথ বাবু স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন; কোন কথাই বলিলেন না। গায়ত্রী দেবী প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "সাদা সাদা শাঁখচূর্ণী বিলিতী ছুঁড়িগুলোকে দেখে মাথা ঠিক রাখ্‌তে পারবে না, তা আমি আগেই জানতাম; নইলে হাভাতেটা আমার লক্ষ্মী-প্রতিমা মেয়ে অপছন্দ করে!"

প্রিয়নাথ বাবু গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তোমার হ'ল লক্ষ্মী-প্রতিমা, কিন্তু ও চায় যে সরস্বতী! বিলাতে সরস্বতীর অভাব নেই তো! বুঝেছ ঠিকই—এখন চুপ করে থাক। বাগবাজারের চৌধুরী-বাড়ীর সেই ছেলেটার কালই সন্ধান নিয়ে আসি।"

শ্রীসুধাংশুকুমার বসু।

অস্ত শেষে

ডুবে গেছে রবি! দিগন্তশিরে দিবার আলোক-ভাতি,
আজও যায় দেখা; শশাঙ্ক-লেখা-বিহীনা আসিছে রাতি;
প্রদীপ জ্বালিনি কুটীরে এখনও আঁধারের আয়োজনে,
হায় রে ভাবিনি, আশার আলোক নিভে যাবে এইক্ষণে!

আজ মনে হয়, দীর্ঘ দিবস ছিল যে কিরণ-ছটা
এত কাছে পেয়ে হেলায় হারানু, কাটিল না
ঘুম-ঘটা!
প্রহরের পর প্রহর মিলালো, নিতি নব নব বেশে,
মরু-কান্তার-সিন্ধু উজলি ছড়ালো তা দেশে দেশে;

মোরা সচকিতে দেখি আর ভাবি,—'এমনটি হ'ল কিসে',
মর্ম্মগহনে গূঢ় লজ্জায় গৌরব এসে মিশে;
আপনার ধন আপন আঁচলে কুড়াইব অনুরাগে,
চির-যাওয়া যাবে এমনি সে খ'ণে?
মোরা তা ভাবিনি আগে!

পশ্চিম এলো জয়মালা নিয়ে বাঙলার ধূলি পরে,
উত্তর এলো গিরি উত্তরি পুনঃ বুদ্ধের ঘরে,
উদয়াকাশের দেশ হতে এলো প্রীতির পরশ মাগি',
দক্ষিণ এলো বহু-দক্ষিণ যজ্ঞ-শালার লাগি।

হোক্ না প্রবীণ, পাই যত দিন ছেড়ে দেওয়া কি গো যায়?
আপনার জন যখনই হারায়, প্রাণ করে 'হায় হায়!'
সে-দিন ভাবিনি কিছুই থাকে না,—আসে বিদায়ের ক্ষণ,
তাই মনে হয় আরো কেন ভালোবাসিনি আপন-জন!

কবি, ঋষি, গুরু, প্রেমিক, বন্ধু, আত্মীয়, পিতামহ!
মিথ্যা-মরণ-যবনিকা ঠেলি' কথা কহ, কথা কহ;
তুমি অমূর্ত্ত, তুমি অমর্ত্ত্য, তুমি মুছিবার নও,
অরূপ তোমার বাণীরূপ নিয়ে চির-জাগ্রত রও।

শ্রীগোপাললাল দে (বি-এ)।

বৈষ্ণবমত-বিবেক

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ

জীবতত্ত্ব

সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব দার্শনিকগণের মধ্যে আচার্য্য রামানুজ জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া পদ্মপুরাণের প্রণবতত্ত্ব ব্যাখ্যানে প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল জামাতৃমুনির উপদিষ্ট জীবের স্বরূপ লক্ষণের উদ্ধার করিয়াছেন। যথা—

জ্ঞানাশ্রয়ো জ্ঞানগুণশ্চেতনঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
ন জাতো নির্ব্বিকারশ্চ একরূপঃ স্বরূপভাক্ ॥
অণুর্নিত্যো ব্যাপ্তিশীলশ্চিদানন্দাত্মকস্তথা।
অহমর্থোঽব্যয়ঃ ক্ষেত্রী ভিন্নরূপঃ সনাতনঃ ॥
অদাহ্যোঽচ্ছেদ্য অক্লেদ্য অশোষ্যোঽক্ষর এব চ।
এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শেষভূতঃ পরস্য বৈ ॥
মকারেণোচ্যতে জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরবান্ সদা।
দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচ ন ॥
আত্মা ন দেবো ন নরো ন তির্য্যক্ স্থাবরো ন চ।
ন দেহো নেন্দ্রিয়ং নৈব মনঃ প্রাণো ন নাপি ধীঃ ॥
ন জড়ো ন বিকারী ন জ্ঞানমাত্রাত্মকো ন চ।
স্বস্মৈ স্বয়ং প্রকাশঃ স্যাদেকরূপঃ স্বরূপভাক্ ॥
চেতনো ব্যাপ্তিশীলশ্চ চিদানন্দাত্মকস্তথা।
অহমর্থঃ প্রতিক্ষেত্রং ভিন্নোঽণুর্নিত্যনির্ম্মলঃ ॥
তথা জ্ঞাতৃত্ব-কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বনিজধর্ম্মকঃ।
পরমাত্মৈক-শেষত্ব-স্বভাবঃ সর্ব্বদা স্বতঃ ॥

অনুবাদ—জীব জ্ঞানাশ্রয়, জ্ঞানগুণ (অর্থাৎ অগ্নির দাহিকাশক্তি জলের তরলতার ন্যায় জ্ঞান ও জীবের গুণ) চেতন, জড় প্রকৃতির অতিগ, অজ, নির্ব্বিকার, একরূপ, স্বরূপভাক্, অণু, নিত্য, ব্যাপ্তিশীল চিদানন্দাত্মক, অহমর্থ (অর্থাৎ "অহং" শব্দের উদ্দিষ্ট) অব্যয়, ক্ষেত্রী ভিন্নরূপ, সনাতন, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, অক্ষর, পরমাত্মার শেষ ভূতপ্রণবরূপ অ×উ×ম্ এই অক্ষরসমষ্টির দ্বারা যে পরব্রহ্ম উদ্দিষ্ট হন, ইনি তাহার মধ্যে "ম্" এই জন্য ইন ক্ষেত্রজ্ঞ এবং পরবান্ মাত্র শ্রীহরির দাস অন্য কাহারও নহেন। শুদ্ধ জীবাত্মা—দেব, নর, তির্য্যক্, স্থাবর, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, ধীশক্তি, জড়, বিকারী বা জ্ঞান-মাত্রাত্মক নহেন; ইনি নিজের নিকট স্বয়ংপ্রকাশ, একরূপ, স্বরূপভাক্ চেতন, ব্যাপ্তিশীল, চিদানন্দাত্মক, অহম্ শব্দের উদ্দিষ্ট, প্রতিক্ষেত্রে ভিন্ন, অণু, নিত্যনির্ম্মল, এবং জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাদি নিজ ধর্ম্মবিশিষ্ট। সর্ব্বস্বতঃই পরমাত্মার অংশ বিশেষত্বই ইঁহার স্বভাব।

শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য এই কয়টি শ্লোকের ব্যাখ্যার দ্বারাই জীবতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া জীবকে পরমাত্মার অংশরূপে স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীজীবও পরমাত্মসন্দর্ভে ঐ শ্লোক কয়টিকে অবলম্বন করিয়াই জীবতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং পরে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জীব ভগবানের তটস্থা শক্তি। জীবের শক্তিত্ব সিদ্ধ হইলে শ্রীজীব বলিতেছেন—

"তদেবং শক্তিত্বে সিদ্ধে শক্তি-শক্তিমতো পরস্পরানুপ্রবেশাৎ শক্তিমদ্ব্যতিরেকে শক্তিব্যতিরেকাৎ চিত্ত্বাবিশেষাচ্চ কচিদভেদনির্দ্দেশঃ একস্মিন্নপি বস্তুনি শক্তিবৈবিধ্যদর্শনাৎ ভেদনির্দ্দেশশ্চ নাসমঞ্জসঃ ॥ ৩৭। (পরমাত্মসন্দর্ভে)

অর্থাৎ—এই প্রকারে জীবের ভগবৎশক্তিত্ব স্থাপিত হইলে, শক্তি ও শক্তিমানের পরস্পরানুপ্রবেশ হেতু শক্তিমানের ব্যতিরেকে শক্তির ব্যতিরেক হেতু এবং চেতনত্ব সম্বন্ধে জীবের ও পরমেশ্বরের কোনও বিশেষ না থাকায় কোন কোন স্থলে অভেদ নির্দ্দেশ—আর একই বস্তুতে বিবিধ শক্তির সমাবেশ দর্শনে—ভেদনির্দ্দেশও অসঙ্গত নহে।

ব্রহ্ম সকল বস্তুতে নিয়ামকরূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার এই ঐশী শক্তি প্রভাবই বিশ্বের অস্তিত্ব; সুতরাং ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ড ও সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ড হইতে ব্রহ্ম ভিন্নও বটেন, অভিন্নও বটেন।

জীবে তিনি পরমাত্মারূপে বর্ত্তমান, সুতরাং জীব সেই ব্রহ্মের চেতনাশক্তির আংশিক প্রকাশ। এই হেতু জীবের সহিত ব্রহ্মের ভেদাভেদ সম্বন্ধ। ভগবান্ বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রের (৪।৪।১৭) "অংশ নানা ব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাশ" কিন্তু এই সূত্রে জীবের সহিত ব্রহ্মের ভেদাভেদ স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীমদাচার্য্যশঙ্করও এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—

"চৈতন্যঞ্চাবিশিষ্টং জীবেশ্বরয়োর্যথাগ্নি-বিস্ফুলিঙ্গয়োরৌষ্ণ্যম্, অতো ভেদাভেদাবগমাভ্যাসংসম্ভাবগমঃ।"

অর্থাৎ—যেমন অগ্নির ও স্ফুলিঙ্গের উষ্ণতা বিষয়ে ভেদ নাই, তদ্রূপ চৈতন্য বিষয়ে জীব ও ঈশ্বরে কোনও ভেদ নাই; অথচ স্থির হইল যে, শ্রুতিবাক্যে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ ও ভেদ উক্ত হওয়ায় জীব ঈশ্বরের অংশ বলিয়া জানা যায়।

শ্রীমান্ নিম্বার্কাচার্য্যও ঐ সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—

"অংশাংশিভাবাৎ জীবে পরমাত্মানো ভেদাভেদৌ দর্শয়তে" অর্থাৎ জীব ও পরমাত্মার অংশ ও অংশী ভাবহেতু জীবে ও পরমাত্মায় যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ—ভগবান্ বেদব্যাস এখানে তাহাই দেখাইতেছেন

বাস্তবিক বহু শ্রুতিবাক্যে জীবের সহিত ব্রহ্মের ভেদ ও অপর বহুবাক্যে ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় ভেদাভেদই শ্রুতিসম্মত বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, তবে এই ভেদাভেদ শ্রীজীবাদির মতে "অচিন্ত্য।" শ্রীজীব সর্ব্বপ্রথমে জীব যে ভগবৎশক্তি শ্রুতি-স্মৃতির প্রমাণের দ্বারা তাহাই স্থাপন করিয়াছেন। পরন্তু তন্মতে জীব তটস্থাশক্তি। এই জন্য শক্তি শক্তিমানের অভেদ পুরস্কারে জীব ভগবান্ হইতে তত্ত্বতঃ অভিন্ন হইলেও লীলাহেতু ভিন্ন। শুদ্ধ জীব—চিৎকণ, ভগবানের অংশ এবং সর্ব্বপ্রকারে ভগবানের অধীন। বোধ হয়, শ্রীজীব নারদ-পঞ্চরাত্র হইতে এই "তটস্থ" শব্দটি গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ, নারদ-পঞ্চরাত্রেও জীবকে "তটস্থ" বলা হইয়াছে। যথা—

যৎতটস্থঞ্চ চিদ্রূপং স্বসংবেদ্যাদ্ বিনির্গতম্ ।
রঞ্জিতং গুণরাগেণ স জীব ইতি কথ্যতে ॥

অর্থাৎ যিনি স্বীয় সংবেদ্য পরমেশ্বর হইতে বিনির্গত অতএব স্বভাবতঃ সর্ব্বগুণাতীত হইয়াও গুণরাগের দ্বারা রঞ্জিত, সেই তটস্থ চিদ্রূপকে "জীব" বলা হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও এই জীবশক্তিকে ভগবানের পরাপ্রকৃতি আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে। যথা—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ গীতা ৭।৫

অর্থাৎ—হে অর্জ্জুন! পূর্ব্বকথিত অষ্টধা অপরা প্রকৃতি হইতে আমার জীবস্বরূপা এক পরাপ্রকৃতি আছে, এই প্রকৃতিই এই জগৎ ধারণ করিয়া আছে। এই পরাপ্রকৃতি বা জীব যে ভগবানেরই প্রকৃতি বা শক্তি, তাহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও স্বীকৃত হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই প্রকৃতিকে শ্রীভগবানের "আত্মভূতা" প্রকৃতি বলিয়াছেন।

শ্রীজীব সর্ব্বসম্বাদিনীতে জীবের ব্রহ্মাত্মকত্ব স্বীকার করিয়াছেন। যথা—"অত্রাপি 'অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপ ব্যাকরবাণি' (ছান্দোগ্য ৬।৩।২) ইতি ব্রহ্মাত্মক জীবানুপ্রবেশেনৈক সর্ব্বস্য বস্তুত্বং শব্দবাচ্যত্বং প্রতিপাদিতম্। 'তদনুপ্রবিশ্য সচ্চত্যচ্চাভবৎ' (তৈঃ—আরণ্যক ৬।২) ইত্যানেনৈকার্থ্যাজ্জীবস্যাপি ব্রহ্মাত্মকত্বং ব্রহ্মানুপ্রবেশাদেবেত্যবগম্যতে।"

"তস্মাদ্‌ব্রহ্ম ব্যতিরিক্তস্য কৃৎস্নস্য তৎশরীরত্বেনৈব বস্তুত্বাৎ তস্য প্রতিপাদকোঽপি শব্দস্তৎপর্য্যন্তমেব স্বার্থমভিদধাতি। অতঃ সর্ব্ব-শব্দানাং লোকব্যুৎপত্ত্যাবগততৎপদার্থবিশিষ্ট ব্রহ্মাভিধায়িত্বং সিদ্ধমিতি "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" ইতি প্রতিজ্ঞার্থস্য "তত্ত্বমসি" ইতি সামান্যাধিকরণ্যেন বিশেষ উপসংহারঃ।

(শ্রীভাষ্য হইতে শ্রীজীব কর্ত্তৃক সর্ব্বসম্বাদিনীতে সাহিত্যপরিষদ্ সংস্করণে উদ্ধৃত ১৩৭ পৃঃ)

অনুবাদ—ছান্দোগ্য শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে, ইনি জীবাত্মারূপে প্রবেশ করিয়া নাম ও রূপে সমস্ত ব্যক্ত করেন। ব্রহ্মাত্মক জীব-রূপ অনুপ্রবেশ দ্বারাই সকল পদার্থেরই বস্তুত্ব ও শব্দবাচ্যত্ব প্রতিপাদিত হয়। এই সকল শ্রুতির তাৎপর্য্যে জানা যায় যে, জীব ব্রহ্মাত্মক। কেন না, ব্রহ্মই চিৎ ও জড়ে অনুপ্রবেশ করেন। সুতরাং ইহাও বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মাতিরিক্ত সমস্ত বস্তুই যখন ব্রহ্মের শরীর বলিয়াই বাস্তবরূপে অভিহিত—এ অবস্থায় তৎপ্রতিপাদক শব্দ সকল ঐরূপ অর্থের প্রতিপাদন করে। এই কারণে লৌকিক ব্যবহারগত ব্যুৎপত্তি অনুসারে লৌকিক পদার্থপ্রতিপাদক শব্দসমূহও তদ্বিশিষ্ট ব্রহ্মেরই প্রতিপাদক; সুতরাং ইহাও স্বীকার্য্য যে, "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং" শ্রুতিতে যে অর্থ প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে, তত্ত্বমসি বাক্যে সামানাধিকরণ্যে তাহারই বিশেষ ভাবে উপসংহার করা হইয়াছে।—(ঐ অনুবাদ ৩২৭ পৃঃ)

ভগবৎসন্দর্ভেও শ্রীজীব শ্রীভাগবতের একটি শ্লোকের ব্যাখ্যায় জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে জীব যে ভগবদাত্মক, তাহা বলিয়াছেন। যথা—

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবৃদেকমাদৌ
সূত্রং মহানহমিতি প্রবদন্তি জীবম্।
জ্ঞানক্রিয়ার্থ ফলরূপতয়োরুশক্তি
ব্রহ্মৈব ভাতি সদসচ্চ তয়োঃ পরং যৎ ॥—ভাঃ, ১১।৩।৩৭

ব্রহ্মৈব উরুশক্তিরনেকাত্মশক্তিমদ্ভাতি। ব্রহ্মণ এব সা শক্তির্ন তু কল্পিতেতি স্বাভাবিকরূপত্বং শক্তের্বোধয়তি। তত্র হেতুঃ। যৎ ব্রহ্ম সৎ স্থূলং কার্য্যং পৃথিব্যাদিরূপং অসৎ সূক্ষ্মং কারণং প্রকৃত্যাদি রূপং তয়োর্বহিরঙ্গবৈভবয়োঃ পরং স্বরূপবৈভবং শ্রীবৈকুণ্ঠাদিরূপং তটস্থ-বৈভবং শুদ্ধজীবরূপঞ্চ। অন্যথা তদ্ভাবাসিদ্ধিঃ। কিংরূপতয়া তত্তদ্রূপং তত্রাহ—জ্ঞানক্রিয়ার্থ ফলরূপতয়া—মহদাদিলক্ষণজ্ঞান শক্তিরূপত্বেন সূত্রাদিলক্ষণ ক্রিয়াশক্তিরূপত্বেন, প্রকৃতি লক্ষণ-তত্ত্বং সর্বৈককরূপাত্মন সদসদ্রূপং, ফলরূপত্বেন তয়োঃ পরম্। তত্র ফলং পুরুষার্থরূপং সবৈভবং ভগবদাখ্যং চিদ্বস্তু, তদনুগতত্বাৎ শুদ্ধজীবাখ্যং চিদ্বস্তু চ। এতেন জ্ঞানক্রিয়াদিরূপেণোরুশক্তিত্বং ব্যঞ্জিতম্। শক্তেঃ স্বাভাবিকরূপত্বং সপ্রমাণং স্পষ্টয়তি আদৌ যদেকং ব্রহ্ম তদেব সত্ত্ব রজস্তম ইতি ত্রিবৃৎপ্রধানং ততঃ ক্রিয়াশক্ত্যা সূত্রং জ্ঞানশক্ত্যা মহানিতি. ততোঽহঙ্কার ইতি, তদেব চ জীবং শুদ্ধস্বরূপং জীবাত্মানং তদুপলক্ষণকং বৈকুণ্ঠাদি-বৈভবঞ্চ প্রবদন্তি বেদাঃ। তে চ "সদেব-সৌম্যেদমগ্র আসীৎ"-(ছাঃ উঃ ৬।২।১ ইত্যাদ্যাঃ। আদাবেকং ততস্তত্তদ্রূপমিতি শক্তেঃ স্বাভাবিকত্বমায়াতম্, অন্যস্যাসম্ভাবেনৌ-পাধিকত্বাযোগাৎ। স্বরূপ-বৈভবস্যাঙ্গপ্রত্যঙ্গবন্নিত্যসিদ্ধত্বেঽপি, সর্ব্ব-সত্তয়া তদ্রশ্মিপরমাণুবৃন্দস্যেব, তৎসত্তয়া লব্ধসত্তাকত্বাৎ তদুপাদানত্বং তদাদিকত্বঞ্চ স্যাৎ তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি—(বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৬) ইতি শ্রুতেঃ। শক্তেরচিন্ত্যত্বং স্বাভাবিকত্বঞ্চোক্তং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে।

—শ্রীভগবৎসন্দর্ভ ১৬।

অনুবাদ—সৃষ্টির আদিতে শ্রুতিসমূহ একই ব্রহ্মকে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয়ের আশ্রয়ে প্রধান, জ্ঞানশক্তির আশ্রয়ে মহত্তত্ত্ব, ক্রিয়াশক্তির দ্বারা সূত্র, অহঙ্কার, জীবাত্মা বা শুদ্ধজীব এবং তদুপলক্ষিত বৈকুণ্ঠাদি বৈভব বলিয়া থাকেন। অনেকাত্মক শক্তিমৎ ব্রহ্মই কারণরূপে কার্য্যরূপে এবং যাহা কার্য্যকারণের অতীত, সেই পরতত্ত্বরূপেও প্রকাশিত হইয়া থাকেন।

ব্রহ্মই উরু—অনেকাত্মক শক্তিমদ্রূপে তিনি প্রকাশিত হইয়া থাকেন। মূল শ্লোকের 'ব্রহ্মৈব' এই 'এব' কারের দ্বারা শক্তি যে কল্পিত নহে, পরন্তু স্বাভাবিক, ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই সকল শক্তিকে স্বাভাবিক বলিবার হেতুও আছে। যথা, অনন্তশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মই সৎ অর্থাৎ নিত্যবিদ্যমান। পৃথিব্যাদি স্থূলকার্য্য অসৎ। উক্ত পৃথিব্যাদির সূক্ষ্মকারণ প্রকৃত্যাদি—স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়ই বহিরঙ্গা শক্তির বৈভব। ইহা হইতে বিলক্ষণ শুদ্ধজীবরূপ তটস্থ-বৈভব। অন্যথা তাবৎ ভাবেরই অসিদ্ধি হইয়া পড়ে।

এক্ষণে কিরূপে ঐ অখণ্ড রূপের প্রকাশ হইয়াছে, তাহাও উক্ত শ্লোকে বিশদীকৃত হইয়াছে; অর্থাৎ জ্ঞানশক্তিরূপে মহত্তত্ত্ব, ক্রিয়া-শক্তিরূপে সূত্রাদি, অর্থশক্তিরূপে ভূততন্মাত্র, জ্ঞান, ক্রিয়া ও অর্থের ঐক্যরূপ সমুদয় শক্তিদ্বারা কার্য্যকারণরূপা প্রকৃতি এবং ফলরূপে কার্য্যকারণের অতীত বিলক্ষণ বস্তু; অর্থাৎ ফল বলিতে এখানে জীবগত সুখদুঃখাদি নহে, পরন্তু পরমপুরুষার্থস্বরূপ স্ববৈভব শ্রীভগবদাখ্য চিদ্বস্তুই ফল শব্দে অভিহিত হইয়াছে। এখানে জ্ঞানক্রিয়াদি দ্বারা তাঁহার উরুশক্তিত্ব প্রখ্যাপিত হওয়ায় ঐ সকল শক্তি যে স্বতঃই তাঁহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে, উহা যে অনারোপিত স্বাভাবিক শক্তি, তাহা প্রমাণের সহিত বিশেষ স্পষ্টীকৃত হইতেছে। যথা, আদিতে যে এক ব্রহ্ম ছিলেন, তিনিই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ে প্রধান, অনন্তর ক্রিয়াশক্তির দ্বারা সূত্র, অনন্তর জ্ঞানশক্তির

দ্বারা মহান্ এবং তদনন্তর অহঙ্কার উহাই শুদ্ধজীব বা জীবাত্মা এবং তদুপলক্ষিত বৈকুণ্ঠাদি বৈভবের বিষয়—ইহা বেদ সকল বলিয়া থাকেন।

যথা,— "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ"

(ছান্দোগ্য উঃ, ৬।২।১) ইত্যাদি।

অর্থাৎ হে সৌম্য! অগ্রে ইহা সদ্রূপেই বর্ত্তমান ছিল এই শ্রুতিতে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে, আদিতে এক ব্রহ্ম, অনন্তর প্রধানাদিরূপে তাঁহার শক্তি যে স্বাভাবিক, তাহা স্বতঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে। যেহেতু, এক ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তন্তরের অসম্ভাবনিবন্ধন ঔপাধিক সম্বন্ধেরও অসম্ভাব হইতেছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির মত স্বরূপ বৈভবের নিত্যসিদ্ধতা থাকিলেও, যেমন সূর্য্যের সত্তায় তদীয় রশ্মিকিরণ-কণাদির সত্তার উপলব্ধি হইয়া থাকে, তদ্রূপ ঐ ব্রহ্মসত্তার বৈভবাদি সত্তার উপলব্ধি হওয়ায় বৈভবাদি তাবৎ বস্তুর উপাদানতা ও প্রাথমিকতা ব্রহ্মেই পর্য্যবসিত হইতেছে। "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"— অর্থাৎ যাঁহার প্রভায় এই সমস্ত বিশেষরূপে দীপ্তি পাইতেছে—এই শ্রুতিও তাহাই ঘোষণা করিতেছেন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও শক্তির অচিন্ত্যত্ব ও স্বাভাবিকতার কথাই বলা হইয়াছে।

সুতরাং জীবশক্তির ব্রহ্মাত্মকতা অংশে অভেদ এবং চিৎকণত্ব হিসাবে ভেদ প্রতিপন্ন হইল। কিন্তু এই ভেদ ও অভেদ অচিন্ত্য, অতএব অচিন্ত্যভেদাভেদবাদই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের প্রতিপাদ্য। ফলতঃ, শক্তি ও শক্তিমানের অচিন্ত্যভেদাভেদকে অবলম্বন করিয়াই এই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং জগৎ ও জীবেও সেই শক্তিতত্ত্ব বিরাজিত থাকিয়া পরিণামবাদাদি শ্রৌতপথে তাহা সার্থক হইয়াছে। সর্ব্বশ্রুতির সমন্বয়ের ও সামঞ্জস্যের এই শ্রৌত-প্রক্রিয়াই আর্যদর্শনের শেষ কথা। দক্ষস্মৃতিতে এই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের মূল তত্ত্ব "দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিত" তত্ত্ব নামে আখ্যাত হইয়াছে।

শ্রীজীবের পরবর্ত্তী গৌড়ীয় আচার্য্যগণের অভিমত

শ্রীজীব গোস্বামীর পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের মধ্যে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ ও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ—এই তিন জন স্বনামধন্য আচার্য্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জন্য নানাবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সম্প্রদায়কে সুরক্ষিত করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য ছয় গোস্বামীর প্রচারিত সর্ব্বগ্রন্থের সার অতি সুকৌশলে সংরক্ষিত হইয়াছে। শক্তি ও শক্তিমানের অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের সর্ব্বত্রই শ্রীজীবের মত অনুসৃত হইয়াছে। এমন কি, শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার অন্তরঙ্গাশক্তি শ্রীরাধার মধ্যে বিন্দুমাত্র প্রভেদ না থাকিলেও যে লীলাবশে ভেদ অঙ্গীকৃত হইয়াছে—তৎসম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিতেছেন—

"রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ।
মৃগমদ—তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ।
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।"

—চৈঃ চঃ, আদি, ৪

অনন্তর জীবশক্তি ও অন্যান্য শক্তি সম্বন্ধেও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন—

"জীবের স্বরূপ হয়—কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি—ভেদাভেদ প্রকাশ।
সূর্য্যাংশ-কিরণ যৈছে অগ্নি জ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয়।
কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি।"

— চৈঃ চঃ মধ্য, ২০

শ্রীল চরিতামৃতকার এস্থলে প্রধানতঃ শ্রীবিষ্ণুপুরাণ হইতেই প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। তন্মধ্যে এই শ্লোকটি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য, যথা—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে।

(বিঃ পুঃ, ৬।৭।৬১)

অর্থাৎ এই তিন শক্তির মধ্যে বিষ্ণুশক্তি বা বিষ্ণুর স্বীয়া অন্তরঙ্গাশক্তি, অন্য শক্তি হইতেছেন ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা বা জীবশক্তি, অন্যা তৃতীয়া শক্তি অবিদ্যা-কর্ম্মসংজ্ঞায় আখ্যাতা হইয়া থাকেন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এখানেও শ্রীবিষ্ণুপুরাণের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া শক্তি হইতে শক্তিমানের অভেদের ও ভেদের অচিন্ত্যত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন, এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার (৭।৫) শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, জীবও যে শ্রীভগবানের শক্তি, তাহার প্রমাণ দিয়াছেন।

অতঃপর শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর অভিমত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তিনিও সর্ব্বত্র দার্শনিক সিদ্ধান্তে শ্রীজীবেরই অনুগামী। শ্রীভাগবতের চতুঃশ্লোকীর টীকার শেষে শ্রীল বিশ্বনাথ বলিতেছেন—

"চিজ্জীবমায়য়া নিত্যাঃ স্যুস্তিস্রঃ কৃষ্ণস্য শক্তয়ঃ।
তদ্বৃত্তয়শ্চ তাভিঃ স ভাত্যেকঃ পরমেশ্বরঃ।
কার্য্যকারণয়োরৈক্যাচ্ছক্তিশক্তিমতোরপি।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।

(ভাঃ ২।৯।৩৩ শ্লোকে বিশ্বনাথকৃত টীকা)

অর্থাৎ চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তিভেদে শ্রীকৃষ্ণের তিন প্রকার নিত্যা শক্তি ও তাহাদের নানাবিধ বৃত্তি আছে, সেই এক পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের সহিত বিরাজিত। কার্য্যকারণ যেরূপ ভিন্ন হইলেও এক, শক্তি-শক্তিমান্‌ও সেইরূপ ভিন্ন হইয়া একই অদ্বয় ব্রহ্মরূপে বিরাজ করিতেছেন—এই বিশ্বে তাঁহা হইতে ভিন্ন কিছুই নাই।

টীকাকার শ্রীল বিশ্বনাথ যেমন শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদ স্বীকার করিলেন, ভাগবতের টীকায় অন্যান্য স্থলেও তাহাই স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের ৭ম অধ্যায়ের ৫২ শ্লোকের টীকায়—"ভূতানাং মদীয় তটস্থশক্তিত্বাৎ ব্রহ্মরুদ্রয়োর্গুণাবতারত্বা-স্মদভেদঃ ইত্যর্থঃ।" অর্থাৎ—আমার তটস্থশক্তিহেতু প্রাণিগণের এবং আমার গুণাবতারত্বহেতু ব্রহ্মার ও রুদ্রের আমা হইতে অভেদ বুঝিতে হইবে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ জীবের সহিত শ্রীভগবানের অভেদ স্বীকার করিতেছেন। ফলতঃ, ভাগবতের অভিপ্রায় অনুসারেই বিশ্বনাথ ভগবানের সহিত তাঁহার শক্তির, জগতের ও জীবের ভেদাভেদবাদ স্বীকার করিয়াছেন। এই ভেদাভেদ যে একেবারে

ব্যাবহারিক নহে, পরন্তু শক্তির অচিন্ত্যত্ব হেতু পারমার্থিক, এই হেতুবাদে শ্রীল বিশ্বনাথও অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীমৎ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার গোবিন্দভাষ্যে, সিদ্ধান্ত-রত্নে, ও প্রমেয়রত্নাবলীতে শ্রীমধ্বানুগত্য প্রকাশ পূর্ব্বক মধ্বপ্রোক্ত দ্বৈতবাদের দিকেই বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইলেও পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীজীবাদির তিনি বিরোধিতা করেন নাই। ভেদবাদ সর্ব্বজনের পক্ষেই সহজবোধ্য ও উপাসনাকাণ্ডে তাহাতে ফলব্যত্যয় হয় না; বোধ হয়, এই কারণেই তিনি সর্ব্বজনের বোধ্য ও সর্ব্বজনের অবলম্বনের পক্ষে সুগম বলিয়া তিনি ভেদবাদ বিশেষভাবেই প্রপঞ্চিত করিলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে অনাদৃত নহেন।

তবে শ্রীজীব ও অন্যান্য শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের আচার্য্যের অভিমত যাঁহারা নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করিবেন, তাঁহারা অচিন্ত্যভেদাভেদবাদকেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল অভিমত বলিয়া স্বীকার করিবেন. ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। আর সমস্ত নদীর গতি যেমন সেই মহাসমুদ্রের দিকে—সেইরূপ সমস্ত বাদ-বিবাদের গতিও শ্রীভগবানের দিকে। অতএব অচিন্ত্যভেদা-ভেদবাদই সমস্ত আস্তিক-দর্শনের সার্থকতা। এই তত্ত্বে কোনও বিরোধের অবকাশ নাই ও সর্ব্বমতেরই সুসামঞ্জস্য সুরক্ষিত হয়, এবং সমস্ত শ্রুতিবাদেরও সার্থকতা প্রতিপাদিত হয়। এই জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই মত প্রপঞ্চিত করিয়া বেদ-পুরাণাদি আর্য্যশাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, এবং ভারতবর্ষে অকপট শ্রৌতবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ. বি-এল)।

পেন্সনার

মনে পড়ে তার নিত্য আফিসে যাওয়া,
কোথাও কর্ত্তা—কোথাও বা তাঁবেদার,
কভু প্রশংসা কখনো নিন্দা পাওয়া
দাস কি মনিব বুঝাই হ'ত যে ভার।

কত কাজ, কত কথা, কত খুঁটি-নাটি,
কত আনন্দ, কতই ভাবনা ভয়।
কতই সফর বেশভূষা পরিপাটী
কত দর্শক আশা উদ্বেগময়।

কত রকমের আদেশ পালন করা
কতই আদেশ দেওয়া দৈনন্দিন,
দিবসের স্মৃতি, সন্ধ্যায় বসে স্মরা
কত নব নব পরিচয় প্রীতিহীন।

জীবন-বীমার চাঁদা পাঠাবার কথা
ছেলের পড়ার টাকার তাগিদ আসা,
চিঠি না পাওয়ার লাগি কত ব্যাকুলতা,
মোটের উপর গেছে দিনগুলি খাসা।

দীর্ঘ দিনের পরে এলো অবকাশ
পোষ মেনে গেছে এমনি খাঁচার পাখী,
মুক্ত পবন সুন্দর নীলাকাশ
টানিতে পারে না দাঁড়ে-নিবদ্ধ আঁখি।

চকোর না হয়ে বাবুই হইল ও যে
আর সে সুধার সন্ধান পাবে কবে?
গীত ভুলি' পিক রহিল নীড়ের খোঁজে
কত সহজে সে ত্যজেছে সুদুর্লভে।

আজ মাঝে মাঝে বিহগের মনে পড়ে
সবল পক্ষ, গিরিশিখরের বাসা
গরুড়ের জ্ঞাতি অমৃতের কথা স্মরে
ভাবে এবারেও বৃথা হ'ল ভবে আসা।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

সৌর জগৎ এবং পৃথিবীর উৎপত্তি

"ধন-ধান্য-পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা"—কবির এই গান বর্ণে বর্ণে সত্য। প্রকৃতই আমাদের আশ্রয়দাত্রী জননী এই উজ্জ্বল-রবিকরোদ্ভাসিতা ধরণীর কোথাও ফল-পুষ্প-সুশোভিত বা মহামহীরুহ-সমাকীর্ণ দিগন্ত-বিস্তৃত শ্যামল বনরাজি, আবার কোথাও অত্যুত্তপ্ত শুভ্র বালুকারাশি-সমাচ্ছন্ন বিশাল মরুভূমি। কোথাও অভ্রভেদী বিরাট্ ভূধরশ্রেণী, আবার কোথাও অতলস্পর্শী সুনীল মহাসাগরের সুগম্ভীর ধ্বনি-মুখর ফেন-কিরীট তরঙ্গরাশির অবিরাম উচ্ছ্বাস!

এই শস্য-শ্যামলা পুষ্পাভরণবিভূষিতা, নয়ন-মনোমোহিনী ধরিত্রীর সৌন্দর্য্য এক দিকে যেমন কবির চিত্ত বিমোহিত করে, অন্য দিকে তেমনি ইহার উৎপত্তির জটিলতা বৈজ্ঞানিকের সূক্ষ্ম চিন্তাধারাকে স্তম্ভিত করিয়া থাকে। আমরা সকলেই জানি, পৃথিবী সৌর জগতের একটি গ্রহ; পৃথিবী এবং আরও কয়েকটি গ্রহ সূর্য্যের চারিদিকে নির্দ্দিষ্ট পথে অবিরাম গতিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কোন কোন গ্রহের উপগ্রহও তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। চতুর্দ্দিকের এই সমস্ত ঘূর্ণায়মান গ্রহ এবং তাহাদের উপগ্রহগুলি লইয়াই আমাদের এই সৌর জগৎ কোথা হইতে কি ভাবে কবে এই সৌর জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বৈজ্ঞানিকগণ আজও অভ্রান্তরূপে নির্ণয় করিতে পারেন নাই; কিন্তু গবেষণার বিরাম নাই। ভিন্ন ভিন্ন যুগে, ভিন্ন ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভিন্ন রূপে ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন। দুই-তিন শত বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের ধারণা ছিল—চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র সমস্তই এক দিনে একই সময়ে সৃষ্ট হইয়াছে। আজ হইতে মাত্র কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এক গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে অলস নিদ্রার পর, ভগবান্ স্বয়ং তাঁহার অদ্ভুত খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়াই এই বিশাল জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সৃষ্টি করিয়াছেন! কেবল মাত্র এই জ্যোতিষ্কমণ্ডলীই নহে, তাহাদের বক্ষস্থ আবশ্যক, অনাবশ্যক, সজীব, নির্জ্জীব যাবতীয় পদার্থ নির্ম্মাণ করিয়া একেবারে পরিপূর্ণ অবস্থায় তাহাদিগকে মহাকাশে ছাড়িয়া দিয়াছেন। পৃথিবীর বক্ষে মানুষ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি প্রাণী, পাহাড়, পর্ব্বত, নদ, নদী, মরু, কান্তার—যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাইতেছি, তাহা সমস্তই সৃষ্ট হইয়াছিল পৃথিবী-সৃষ্টির গোড়ায়, ভগবানের সেই খেয়াল অনুসারে। আদিকালে সৃষ্ট সেই জীব-জগৎ জন্ম-মৃত্যুর ভিতর দিয়া আজ পর্য্যন্তও অবিকৃত অবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহার না হইয়াছে কোন পরিবর্ত্তন, না হইয়াছে কোন উৎকর্ষ-সাধন।

কিন্তু বর্ত্তমান যুগ—বৈজ্ঞানিক যুগ। বিজ্ঞান সুসংস্কার বা কুসংস্কার কোন সংস্কারেরই প্রশ্রয়দাতা নহে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গবেষণার কষ্টিপাথরে পরীক্ষা দ্বারা যাচাই না করিয়া কোন তথ্যই আজ আর অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবার উপায় নাই। তাই সহস্র বৎসরের সুপ্রতিষ্ঠিত পূর্ব্ব-সংস্কার আজ বৈজ্ঞানিক যুগে পরিত্যক্ত। বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা দ্বারা আজ অভ্রান্তরূপে নির্ণয় করিয়াছেন—পৃথিবীর বয়স কয়েক সহস্র বৎসরের বহুগুণ অধিক। পৃথিবীর বয়সের গাছপাথর নাই! কয়েক সহস্র বৎসর তাহার নিকট মুহূর্ত্তমাত্র, অর্থাৎ পৃথিবীর বয়স কয়েক শত কোটি বৎসর!

তাই পৃথিবীর সৃষ্টির সেই প্রাচীন মতবাদকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে নূতন ভাবে গঠন করিয়া তুলিতে হইয়াছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও 'নানা মুনির (বৈজ্ঞানিকের) নানা মত'। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক জগৎসৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই সকল পরিকল্পনা অনেক বিষয়ে পরস্পরবিরোধী হইলেও এক বিষয়ে অভিন্ন। সকলেই মানিয়া লইয়াছেন, সমগ্র সৌর জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে একটিমাত্র নীহারিকা হইতে। নির্মেঘ তমোময়ী রাত্রিতে লক্ষ্য করিয়া দেখিলে আকাশে নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে স্থানে স্থানে উজ্জ্বল হাল্কা মেঘের মত যে বায়বীয় পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই নীহারিকা। নীহারিকা অতি উত্তপ্ত বাষ্পাকার বিভিন্ন উপাদানে প্রস্তুত। ইহা স্বচ্ছ; এই জন্যই ইহাদের ভিতর দিয়া পশ্চাদ্‌বর্ত্তী উজ্জ্বল নক্ষত্রসমূহকে অবাধে দেখিতে পাওয়া যায়। আদিকালের বিভিন্ন নীহারিকা হইতেই বিভিন্ন সৌর জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন সৌর জগতের সূর্য্যসমূহই রাত্রিকালে নক্ষত্র-রূপে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এখন পর্য্যন্তও অনেক অপরি-বর্ত্তিত নীহারিকা হইতে নূতন নূতন সৌর জগতের সৃষ্টি হইতেছে।

আমাদের সৌর জগৎও এইরূপ একটি নীহারিকা হইতেই সৃজিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ নীহারিকা কোথা হইতে কিরূপে মহাশূন্যে আবর্ত্তিত হইল? এই প্রশ্ন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ আজও নিরুত্তর। এই পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াই তাঁহাদের কল্পনা অচল হইয়া পড়িয়াছে, চিন্তাধারা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, পরীক্ষাও অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। মহাকাশের এই নীহারিকাকে অবলম্বন করিয়াই বৈজ্ঞা-নিকের কল্পনাজাল রচিত হইয়াছে। অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক স্যার

জেমস্ জিন্সের জগৎসৃষ্টির পরিকল্পনাই এখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য। তিনি কল্পনা করিয়াছেন – বহু—বহুকাল পূর্ব্বে অর্থাৎ কয়েক সহস্র-কোটি বৎসর পূর্ব্বে আমাদের সৌর জগতের প্রসূতি নীহারিকাটি মহাকাশের অন্যান্য নীহারিকার আকর্ষণে প্রবল বেগে মহাশূন্যে বিঘূর্ণিত হইতেছিল। এই ভ্রমণপথে ইহা অবিরাম তাপ বিকিরণ করিয়া ক্রমশঃ শীতল হইতে থাকে। এই অবস্থায় হঠাৎ আর একটি বিরাটকায় নীহারিকা ইহার নিকটে আসিয়া পড়ে। আগন্তুক নীহারিকার প্রবল আকর্ষণে আমাদের নীহারিকা হইতে বাষ্পাকার একটি বৃহৎ পিণ্ড ঠেলিয়া বাহির হইয়া তাহার দিকে ধাবিত হইতে থাকে। কিন্তু এই পিণ্ডটি আগন্তুক নীহারিকার নিকটস্থ হইবার পূর্ব্বেই আমাদের নীহারিকা তাহার স্বকীয় বক্ষ হইতে উদ্ভূত সন্তানটিকে আকর্ষণ করিয়া বহু দূরে টানিয়া লইয়া যায়। তাহার পর এই সন্তান-পিণ্ডটি তাহার প্রসূতি-নীহারিকাকেই আবর্ত্তন করিয়া মহাশূন্যে ধাবিত হইতে থাকে। মহাশূন্যে ধাবিত হইবার সময় নীহারিকা ও তাহার শিশুটি অবিশ্রান্ত ভাবে তাপ বিকিরণ করিতে থাকে। এই ভাবে তাপ বিকীর্ণ করায় তাহার উত্তপ্ত দেহ ক্রমশঃ শীতল হইয়া সঙ্কুচিত হয়। উক্ত পিণ্ডটি ক্ষুদ্র, এজন্য অতি শীঘ্রই তাহার তাপ নিঃশেষিত হওয়ায় বাষ্পাবস্থা হইতে তাহার দেহ কঠিন অবস্থায় পরিণত হয়। এই কঠিন পিণ্ডটি পুনর্ব্বার কোন অজ্ঞাত নৈসর্গিক কারণে চূর্ণ হইয়া মহাশূন্যের চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়। এই চূর্ণীভূত খণ্ডগুলিও পূর্ব্বের ন্যায় প্রসূতি-নীহারিকার চতুর্দ্দিকে প্রচণ্ডবেগে আবর্ত্তিত হইতে থাকে। মহাশূন্যের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিঘূর্ণিত এই সকল চূর্ণখণ্ডই উল্কা নামে প্রসিদ্ধ। এইরূপ বহুসংখ্যক উল্কা অনেক সময় তাহাদের ভ্রমণ-পথে ঘুরিতে ঘুরিতে বহুবিধ নৈসর্গিক কারণে এক স্থানে সম্মিলিত হয়, এবং তাহাদের পরস্পরের সংঘর্ষণ-বশতঃ উদ্ভূত প্রচণ্ড উত্তাপে সেগুলি এতই উত্তপ্ত হয় যে, গলিয়া গিয়া পুনর্ব্বার একত্র সংযুক্ত হইয়া থাকে। এই সকল একত্রীভূত উল্কাপিণ্ডের সমষ্টিই এক একটি গ্রহ, এবং তাহাদের প্রসূতি নীহারিকাই আমাদের সৌর জগতের সূর্য্য।

লৌহ, নিকেল প্রভৃতি উল্কাপিণ্ডের ভারী অংশ নবোৎপন্ন তরল গ্রহ-পিণ্ডের কেন্দ্রের দিকে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং অপেক্ষাকৃত পাতলা পদার্থসমূহ তাহার উপর দিকে ফেনার মত ভাসিয়া উঠে। বায়বীয় এবং বাষ্পীভূত জলীয় অংশ তাহার উপরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বায়ুমণ্ডল সৃষ্টি করে। বহু শত-কোটি বৎসর পূর্ব্বে ইহাই ছিল আমাদের এই শস্যশ্যামলা, কুসুমকুন্তলা, নদনদীমেখলা ধরিত্রীর নগ্নমূর্ত্তি। ইহার কোথাও জল, স্থল, বা কোনও আশ্রয় ছিল না। অত্যুত্তপ্ত অগ্নিবর্ণ ফুটন্ত তরল পদার্থের এক মহাসমুদ্র সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া বিরাজিত ছিল। অগ্ন্যুৎপাত, অগ্নিবৃষ্টি, জ্বলন্ত বায়ুর ঘূর্ণীবাত্যা পৃথিবীর বক্ষ সর্ব্বদা প্রচণ্ডবেগে আলোড়িত ও দলিত মথিত করিতে থাকিত; কিন্তু বসুন্ধরার কর্ম্মশক্তি অপরিমেয়। কোন বাধাবিঘ্নই তাহাকে ব্যাহত করিতে পারে না। তাহা হইতে ক্রমাগত অপ্রতিহত ভাবে তাপ বিকীর্ণ হইতে থাকে। তাহার ফলে ইহার উপরের স্তর শীতল হইয়া জমিয়া কঠিন হয়, এবং সঙ্কোচনের ফলে সেই স্তর বন্ধুর হইয়া উঠে। এইরূপেই কোথাও অভ্রভেদী পর্ব্বতশ্রেণী, আবার কোথাও বা গভীর গহ্বরের সৃষ্টি হয়। ইতোমধ্যে বায়ুমণ্ডলের জলীয় অংশও শীতল হইয়া জমিয়া যায়, এবং তাহা হইতে মেঘের উৎপত্তি হয়। এই মেঘ বৃষ্টিরূপে পৃথিবীকে সিক্ত ও পরিপ্লাবিত করিয়া পৃথিবীর সেই গহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করে; এইরূপে সমুদ্রের সৃষ্টি করে। এই বৃষ্টি দুই-এক দিন বা দুই-এক মাস ধরিয়া নহে, বস্তুতঃ শত সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া অনবরত অবিশ্রান্ত ভাবে বর্ষিত হইতে থাকায় বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উপাদান বৃষ্টির ধারায় মিশ্রিত হইয়া ধরাতলে নামিয়া আসে, এবং সেখানে ভূপৃষ্ঠের অন্যান্য উপাদানের সহিত রাসায়নিক সংযোগের ফলে অনাগত জীব-জগতের আশ্রয়-স্থল কোমল ভূত্বক্ মৃত্তিকা সংগঠন করে। তাহাই ভবিষ্যৎ প্রাণস্পন্দনের পাদপীঠ।

মহাশূন্যে পৃথিবীর স্থান

সকলেই জানেন—আমাদের পৃথিবী গোলাকার জড়পিণ্ড; তাহা উত্তর ও দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা। এই জন্য কমলালেবুর সহিত ইহার তুলনা করা হয়। কিন্তু ইহার আয়তন অতি বৃহৎ। ইহার পরিধি ২৫০০০ এবং ব্যাস ৮০০০ মাইল। কোন পর্য্যটক যদি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবার জন্য পদব্রজে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে অবিশ্রাম চলিতে থাকেন, তাহা হইলে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে তাঁহার প্রায় এক বৎসর সময় লাগিবে। প্রতি ঘণ্টায় ২০০ মাইল বেগে ধাবমান কোন এরোপ্লেনের সাহায্যে পৃথিবী ঘুরিয়া আসিতে অবিশ্রান্ত ভাবে চলিয়াও ৫ দিন লাগিবে। পৃথিবীর ভারও অল্প নহে। সমান আয়তনের জল অপেক্ষা ইহা সাড়ে ৫ গুণ ভারী। ইহার ওজন :৮০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ (আঠারোর পিঠে ২২টি শূন্য দিলে যত হয় তত) মণ!

এই বিরাট্ এবং ভারী জড়পিণ্ড কি করিয়া মহাশূন্যে ঝুলিয়া আছে, তাহা ধারণা করাও অসাধ্য। বহু প্রাচীন কাল হইতেই নানা জনে নানা ভাবে ইহা বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। কেহ কল্পনা করিতেন--সর্পরাজ বাসুকি ইহাকে মস্তকে ধারণ করিয়া আছেন। আবার কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, অমিত-বলশালী এক মহাপুরুষের স্কন্ধে পৃথিবী সংস্থাপিত আছে। কিন্তু মহাশূন্যে বাসুকির বা সেই মহাপুরুষের আশ্রয় বা অবলম্বন কি, তাহা ধারণা করিবার উপায় নাই। নানাবিধ পরীক্ষা ফলে এখন সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে—এই সকল কল্পনার কোনটিই ঠিক নহে; প্রকৃত পক্ষে মহাশূন্যে পৃথিবীর নিজের কোন অবলম্বন নাই। বায়ুপূর্ণ বেলুন যেমন শূন্যমার্গে বাতাসে ভাসিতে থাকে, পৃথিবীও সেইরূপ মহাশূন্যে ভাসমান রহিয়াছে। সূর্য্য এবং অন্যান্য গ্রহের পরস্পরের আকর্ষণের ফলে ইহা নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে ২৪ ঘণ্টায় একবার আবর্ত্তন করিয়া থাকে, এবং সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে ইহার এক বৎসর সময় লাগে। এই আবর্ত্তন এবং প্রদক্ষিণের গতির বেগও অতি প্রচণ্ড। ইহার আবর্ত্তনের গতিবেগ ঘণ্টায় ১০০০ মাইলেরও উপর। মানবনির্ম্মিত কোন যান-বাহনের গতিবেগই ইহার সমকক্ষ নহে; এবং মানুষ বিজ্ঞানবলে কখন এরূপ বেগবান্ যান প্রস্তুত করিবে—আপাততঃ তাহারও সম্ভাবনা দেখা যায় না। অতিশয় দ্রুতগামী এরোপ্লেন ঘণ্টায় ৫০০ মাইল যাইতে পারে। পৃথিবীর প্রদক্ষিণ-বেগ আরও প্রচণ্ড; মহাশূন্যে ইহা প্রতি সেকেণ্ডে ২৯ মাইল বেগে ধাবিত হইয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। সুতরাং ঘণ্টায় এই গতিবেগ এক লক্ষ মাইলেরও অধিক। এইরূপ বেগবান্ কোন যান যদি কোন দিন বিজ্ঞানবলে আবিষ্কার

করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে আমরা তাহার সাহায্যে ঘণ্টায় চারি বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে পারিব। এইরূপ প্রচণ্ড গতিতে দিবারাত্রি অবিশ্রাম ছুটিয়াও সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে পৃথিবীর এক বৎসর সময় লাগে। ইহা হইতেই আমরা ধারণা করিতে পারি—পৃথিবীর ভ্রমণ-পথ কত দীর্ঘ, সূর্য্য হইতে ইহার দূরত্ব কত অধিক! পৃথিবীর উপবৃত্তাকার ভ্রমণ-পথের দৈর্ঘ্য ৫৪ কোটি মাইল, এবং সূর্য্য হইতে ইহার দূরত্ব ৯ কোটি মাইলেরও অধিক।

আমাদের পৃথিবী অতি বৃহৎ; কিন্তু এইরূপ কতকগুলি পৃথিবীকে উপর্য্যুপরি রাখিয়া যদি সূর্য্য পর্য্যন্ত একটি সিঁড়ি প্রস্তুত করা যায়, তাহা করিতে ১১,৬৪০টি পৃথিবীকে উপর্য্যুপরি স্থাপন করিতে হইবে। এই সিঁড়ির সাহায্যে যদি কোন ব্যক্তি পদব্রজে সূর্য্যে পৌঁছিবার জন্য যাত্রা করে, এবং তাহার পুত্র, পৌত্র প্রভৃতি সকলেই যদি জন্মের পর হইতেই অনবরত দ্রুতবেগে সূর্য্যের দিকে চলিতে থাকে, তাহা হইলে প্রথম যাত্রাকারীর অধস্তন সপ্তম পুরুষ সূর্য্যে পৌঁছিতে পারিবে। কিন্তু তাহার পুত্র যদি ভূমিষ্ঠ হইয়াই সূর্য্যাভিমুখে দৌড়াইতে থাকে, তাহা হইলে তাহাদের পুত্র-পৌত্রাদি কোথা হইতে আসিবে? সাত পুরুষ ত দূরের কথা! কিন্তু ইহা পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্বের দৃষ্টান্ত মাত্র। আর একটি দৃষ্টান্ত,—এই সিঁড়ি দিয়া যদি একটি দ্রুতগামী এক্সপ্রেস-ট্রেণ পূর্ণবেগে ছুটিয়া চলে, এবং এক মুহূর্ত্তও তাহাকে থামিতে না হয়—তাহা হইলে তাহারও সূর্য্যে পৌঁছিতে ২৮০ বৎসর অতীত হইবে!

আমাদের দেহের কোন অংশ অগ্নিতে দগ্ধ হইলে তাহার জ্বালা আমরা তৎক্ষণাৎ অনুভব করিয়া থাকি; কারণ, সেই দগ্ধ অঙ্গের জ্বালার স্পন্দন স্নায়ুর সাহায্যে অতি দ্রুতবেগে মস্তিষ্কে উপনীত হয়। এই স্পন্দনের গতি ঘণ্টায় ৭৫ মাইলেরও অধিক। যদি কোন অশান্ত শিশু চাঁদের মত সূর্য্যকেও ধরিতে চায়, এবং পৃথিবী হইতে হাত বাড়াইয়া সূর্য্যকে স্পর্শ করিয়া হাত পুড়াইয়া ফেলে, তাহা হইলে সেই পোড়ার জ্বালা এইরূপ দ্রুতগতিতে প্রবাহিত হইয়াও ১৬০ বৎসর পরে তাহার মস্তিষ্কে পৌঁছিবে!

আলোকের গতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল। এইরূপ প্রচণ্ড বেগে দৌড়াইলে পৃথিবীকে প্রতি সেকেণ্ডে ৮ বার প্রদক্ষিণ করা যায়; কিন্তু এই দ্রুতগামী আলোক-রশ্মিরও সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে পৌঁছিতে ৮ মিনিট সময় লাগে।

কিন্তু মহাশূন্যে অবস্থিত অন্যান্য নক্ষত্রের তুলনায় এই সুদূরবর্ত্তী সূর্য্যও আমাদের অতি নিকট-প্রতিবেশী। সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী নক্ষত্রের দূরত্বও সূর্য্যের দূরত্ব অপেক্ষা অনেক অধিক। যে আলোক-রশ্মি পৃথিবীকে প্রতি সেকেণ্ডে ৮ বার প্রদক্ষিণ করিতে পারে, সুদূরবর্ত্তী সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে পৌঁছিতে যাহার ৮ মিনিট মাত্র সময় লাগে, সেই আলোক-রশ্মিও নিকটতম নক্ষত্র হইতে পৃথিবীতে পৌঁছে পূর্ণ চারি বৎসর পর! ইহাই আমাদের নিকটতম নক্ষত্রের দূরত্ব। অন্যান্য নক্ষত্র সমূহের দূরত্ব ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক। তাহাদের কাহারও কাহারও আলোক-রশ্মি পৃথিবীতে পৌঁছিতে ১০ বৎসর, ১৫ বৎসর, শত বৎসর, এমন কি, সহস্র বৎসরও অতীত হয়! আবার এরূপ নক্ষত্রও অনেক আছে, যাহাদের আলোক-রশ্মি পৃথিবীর সৃষ্টিকাল হইতে চলিতে আরম্ভ করিয়া আজও পৃথিবী স্পর্শ করে নাই! জগৎ-সৃষ্টির প্রথম হইতে শত-সহস্র-কোটি বৎসর অনবরত অবিশ্রাম এইরূপ প্রচণ্ড গতিতে ধাবিত হইয়াও আজও যাহার আলোক-রশ্মি পৃথিবীতে পৌঁছিতে পারে নাই—তাহার দূরত্ব কি বিপুল! মহাশূন্যের বিস্তার কি বিশাল, তাহা ভাবিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়! চিন্তাশক্তি বিলুপ্ত হয়।

এই অনন্ত, অসীম মহাশূন্যে সূর্য্য এবং তাহার পরিবারবর্গ মহাসমুদ্রের বুদ্‌বুদ্‌তুল্য; অথচ সূর্য্য একাই আমাদের পৃথিবী অপেক্ষা কতগুণ বৃহৎ! আমাদের পৃথিবীর ব্যাস ৮০০০ মাইল, সূর্য্যের ব্যাস ৮ লক্ষ মাইল; পৃথিবীর পরিধি ২৫ হাজার মাইল, সূর্য্যের পরিধি ২৫ লক্ষ মাইলেরও অধিক। যদি কোন অজ্ঞাত শক্তি সূর্য্যকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিতে পারে, তাহা হইলে সূর্য্যের সেই চূর্ণীকৃত উপাদান লইয়া ১৩ লক্ষ নূতন পৃথিবী গঠিত হইতে পারে! যদি আমাদের এই পৃথিবীকে তাহার বক্ষস্থ সকল পাহাড়, পর্ব্বত, নদ, নদী, হ্রদ, সরোবরাদি সহ সূর্য্যের বক্ষে স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে পৃথিবীকে দেখা যাইবে—একটি বড় থালার উপর সুরক্ষিত একটি ক্ষুদ্র মটর-দানার মত। চন্দ্র পৃথিবীকে আবর্ত্তন করিয়া বেড়াইবে থালার মধ্যস্থলে একটি বৃত্ত-পথে। এইরূপে চন্দ্রের বাহিরেও সূর্য্যের অর্দ্ধেক স্থান শূন্য পড়িয়া থাকিবে। অত্যুত্তপ্ত বিভিন্ন তরল মৌলিক পদার্থে সূর্য্যবক্ষ নির্ম্মিত। এই ফুটন্ত তরল পদার্থ হইতে মধ্যে মধ্যে যে বুদ্‌বুদ উত্থিত হইয়া থাকে, তাহার এক-একটির মধ্যে আমাদের কয়েক শত পৃথিবী অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে। সূর্য্যের আয়তনই এইরূপ। সমগ্র সৌর জগতের বিস্তার আরও কত অধিক। পৃথিবীর ন্যায় আরও ৮টি গ্রহ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে; তাহাদের অনেকেই আমাদের পৃথিবী অপেক্ষা অনেক বড়। তাহাদের দূরত্বও সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্বের তুলনায় অনেক অধিক। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দূরবর্ত্তী গ্রহের দূরত্ব সাড়ে তিন শত কোটি মাইলেরও অধিক। কিন্তু এই বিরাট্ বিশাল সৌর জগৎও অনেক নক্ষত্রের আয়তনের তুলনায় নিতান্ত ক্ষুদ্র। এমন নক্ষত্র অনেক আছে—যাহাদের দেহের ভিতর আমাদের এই সূর্য্য তাহার সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহ সহ অনায়াসেই লুকাইয়া থাকিতে পারে। চিনির পাহাড়ে একটি পিঁপড়ের অবস্থিতি কল্পনা করুন। এমনি তাহাদের বিশাল বিস্তার! এইরূপ বিরাট্ বিস্তৃত ৪০ কোটি ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রের অস্তিত্ব আজ পর্য্যন্ত যন্ত্র সাহায্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে! ইহা ভিন্ন মহাশূন্যে আরও কত কোটি কোটি নক্ষত্র আছে—যাহাদিগকে আমাদের অতি-আধুনিক যন্ত্র সাহায্যেও দেখিতে পাওয়া সম্ভব হয় নাই। আরও কত কোটি কোটি নক্ষত্র আছে—যাহাদের আলোক আজও পৃথিবীবক্ষ স্পর্শ করে নাই; এবং তাহা পৃথিবীতে আসিতে আরও কত সহস্র কোটি বৎসর অতীত হইবে, মানবকল্পনা তাহা ধারণা করিতে পারে না।

শ্রীনৃপেন্দ্রমোহন সাহা (এম-এস-সি, অধ্যাপক)।

৩০

খোকার অন্নপ্রাশন উপলক্ষে সুধীশ অতীশকে আসিতে লিখিয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অত সাধ্য-সাধনা সত্ত্বেও অপর্ণা পূর্ব্বে যাইতে অসম্মত হইলেও এবার বিনা-আহ্বানেই যাইবার জন্য জিদ করিতে লাগিল। অতীশ প্রমাদ গণিয়া বলিল, "তুমি কি করতে যাবে? দাদা কি তোমায় যেতে বলেছে?"

অপর্ণা বলিল, "নাই বা বললেন? শ্বশুর-ভাসুরের কাছে মান-অপমান আছে না কি? তা ছাড়া, বট্‌ঠাকুর সদাশিব মানুষ, সাতেও থাকেন না, পাঁচেও থাকেন না, অত লোক-লৌকিকতাও জানেন না। গেলে তাঁর আহ্লাদ হবে,—আমি যাবই।"

অগত্যা নিরুপায় হইয়া অতীশ সম্মত হইল; কিন্তু তাহার মনে গভীর ভয়ের ছায়া পড়িল। হিমানী সেখানে আছে, অপর্ণা চক্ষের নিমেষে বুঝিবে সে কে, এবং সে যদি গায়ত্রীকে তাহা বলিয়া দেয়? কিন্তু অপর্ণা যখন জিদ করিতেছে, তখন সে যাইবেই।

হইলও তাহাই। আসিবার পর এক সময় সে ঘরের ভিতর হইতে লক্ষ্য করিল—সুধীশ খোকনকে কোলে লইয়া ডাকিল, "শোন হিমানী!"

এই আহ্বানে হিমানী আসিয়া হাসিমুখে কি বলিতে বলিতে খোকনকে তাহার নিকট হইতে লইবার জন্য আগাইয়া গেল। পরপুরুষের কোল হইতে ছেলে লইবার সময় সাধারণতঃ মেয়েরা হাত বাড়াইয়া যতটা দূরত্ব রক্ষা করে, হিমানী মোটেই তাহা করিল না, অসঙ্কোচে তাহার বুকের উপর হইতে দুই হাতে ছেলে তুলিয়া নিজের বুকে লইল; এজন্য উভয়ের গায়ে গায়ে ঠেকিল, তাহা অপর্ণা হলফ করিয়া বলিতে পারিত।

হিমানীর ছবি অপর্ণা নিত্য দেখিতেছে, নামটাও শুনিল, এবং সর্ব্বোপরি সে লক্ষ্য করিল—ভাসুরের সহিত তাহার আচরণ। অতীশকে সে ধরিয়া বসিল, ফাঁকি সে শুনিবে না। নিষ্ফল চেষ্টা না করিয়া অতীশ সত্য কথা স্বীকার করিল; কিন্তু অনেক দিব্যি দিয়া ও-কথা লইয়া আলোচনা করিতে নিষেধ করিল। বলিল, "ও সব পুরানো কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করে কি হবে? সে তো মিটে-চুটেই গেছে; দাদা তো দেখছি বৌদির পায়ে-পায়ে ঘুরছে।" একটু হাসিয়া বলিল,—"দাদা হ'ল সঞ্চারিণী লতা, একটা অবলম্বন না হলে দাঁড়াতে পারে না। মনে হচ্ছে, বৌদি বেশ করে কষে আঁচলে গেরো বেঁধেছে!"

অপর্ণা ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "কি জানি, তোমরা কি বোঝ, আমার তো হিমানীর ব্যবহার দেখে ভাল ঠেকে না। বট্‌ঠাকুরেরও হিমানী বলতে মুখ থেকে মধু ক্ষরে!"

অতীশ বিরক্ত হইয়া বলিল, "ভাসুরের চরিত্র নিয়ে তোমার এ রকম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা খুবই অন্যায়। মধু ক্ষরুক, আর বিষই ঝরুক, সে সব তুমি আমার চরিত্র নিয়ে আলোচনা কোর, দাদার নয়। ভাসুরকে দেখে দেড় হাত ঘোমটা দেওয়া আর পেছনে থেকে গোয়েন্দাগিরি করা বড়ই লজ্জার কথা, ছি ছি ছি!"

অন্নপ্রাশন চুকিয়া গেলে অপর্ণা বলিল, "আমি এখন এখানে দু'মাস থাকব। বাপের বাড়ী যেতে পাই নে, ঘরে বারো মাস বন্ধ হয়ে থাকি,—দিদি এত যত্ন কচ্ছে, আমি কিছু দিন থাকব, মোটা হয়ে তবে যাব।"

গায়ত্রী আনন্দে দেবরকে অনুরোধ করিতে লাগিল। বিপদের আশঙ্কা করিয়া অতীশ অনেক আপত্তি তুলিল, কিন্তু কিছু ফল হইল না, অপর্ণা কিছুতেই গেল না।

যাইবার পূর্ব্বদিন হিমানীকে একান্তে পাইয়া

অতীশ মৃদুস্বরে বলিল, "হিমু, তুমি একটু সাবধানে থেক ভাই! অপর্ণা পুরানো কথা সব জানে। আমার স্ত্রী হলেও বলছি, তার মন ভাল নয়! সে হয় ত সত্যি-মিথ্যে পাঁচ রকম করে বৌদির কাছে লাগাতে পারে।"

হিমানীর মুখ সাদা হইয়া গেল, ক্ষণকাল বিমূঢ়দৃষ্টিতে অতীশের মুখপানে চাহিয়া-থাকিয়া ব্যথিত কণ্ঠে মৃদুস্বরে বলিল, "পৃথিবীতে সব দুঃখই ত পেয়েছি ভাই! আর এটুকুই বা বাকি থাকবে কেন? পৃথিবীতে যে আমায় ভালবেসেছে, সেই সরে গেছে; ঠাকুরঝি ভালবাসে, তাই বা আমার ভাগ্যে সইবে কেন?"

অতীশ যাইবার দিন পনের-কুড়ি পরে অপর্ণা এক দিন গায়ত্রীকে বলিল, "কিছু মনে কোর না দিদি! বৌদির ভাই রকম-সকম যেন কেমন-কেমন!"

গায়ত্রীর নিজের মনেও ইদানীং এই প্রশ্ন উঠিত, কাজেই সে এ কথা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিল। অপর্ণা বলিল, "হাজার হোক, স্বামী যার ঘানি টানছে, তার কি অমন সেজে-গুজে হেসে-খেলে বেড়াতে ইচ্ছে করে?"

গায়ত্রী অপ্রিয় সত্যটা শুনিয়া লজ্জা এবং ব্যথা পাইল; কিন্তু প্রতিবাদের কোন উপায় নাই দেখিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল।

অপর্ণা বলিল, "আর মাফ্ কোর দিদি, একটা কথা বলছি বলে; বঠ্ঠাকুরকে দেখলে বৌদি যেন গলে জল হ'য়ে যায়! নন্দাইকে দেখে অত বাড়াবাড়ি কেন রে বাপু।"

এবার গায়ত্রী মাথা তুলিল, মৃদু তিরস্কারের সুরে বলিল, "ছি ছি ছোট বউ, এ সব কি বলছ!"

সে উঠিয়া গেল।

উঠিয়া গেল বটে, কিন্তু এমনই বালাই যে, মন হইতে সে সব মুছিতে পারিল না। তার মনে ত সন্দেহ জাগেই, কিন্তু সেটা যে অপরের অগোচর থাকিতেছে না, ইহা ভাবিতেই গায়ত্রীর বুক ভাঙ্গিয়া গেল। নন্দাইকে দেখিয়া শুধু হিমানীই জল হয় না, নন্দাই স্বয়ংও জল হয়! উহারা যে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত, তাহা গায়ত্রীর অবিদিত নয়, কিন্তু গায়ত্রী ইহার কি প্রতিবিধান করিবে?

ইহার পর গায়ত্রীর উৎসুক চক্ষু দু'টি অহর্নিশি স্বামী ও ভ্রাতৃজায়ার অনুসরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল, এবং তুচ্ছাদপি তুচ্ছ কত কি যে তার চোখে পড়িতে লাগিল, যাহা সে এত দিন গ্রাহ্যও করে নাই। গায়ত্রী যেন ক্রমেই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতে লাগিল, এবং মনে মনে ব্যাকুল ভাবে অনুপের আসিবার দিনটির প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

অনুপের মুক্তির দিন আসন্ন হইয়া আসিয়াছিল,—নেলীকে ও-বাড়ী ছাড়িতে হইবে। কিন্তু নেলী কয় দিন যাবৎ পীড়িতা হইয়া পড়িয়াছিল। বিপন্ন সুধীশ এক সময় গায়ত্রীকে বলিল, "তোমার দাদার আসার দিন নিকট হয়ে এলো,—আর এই সময়েই মিসেস্ সেনও অসুখে পড়লেন; তাঁকে এখন অন্য বাড়ীতে পাঠানও মুস্কিল, অথচ ও-বাড়ীখানা খালি রাখা চাই ত! কি মুস্কিলেই যে পড়েছি! কি করি বলো ত!"

গায়ত্রী পুত্রকে জামা পরাইতেছিল; সে একটু চুপ করিয়া রহিল। তাহার ইচ্ছা ছিল, অনুপকে নিজের নিকট দুই-চারি দিন রাখিয়া ভালো করিয়া যত্ন-পরিচর্য্যা করে। ভ্রাতৃজায়ার উপর তাহার আর আস্থা ছিল না। কিন্তু সুধীশের কথা শুনিয়া বুঝিল, অনুপ এখানে আসে, এমন ইচ্ছা সুধীশের নাই। গোপনে সে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমি কি বলব?"

সুধীশ তাহার কোল হইতে খোকাকে তুলিয়া লইল, তাহাকে আদর করিয়া গাল টিপিয়া বুকের উপর নাচাইতে নাচাইতে একটু বাধ-বাধ গলায় বলিল, "তা হলে মিসেস সেন কি এখন এখানে এসেই থাকবেন? তুমি কি বলো? ছেলেমেয়ে দুটিকেও তুমি একটু দেখাশোনা করতে পারবে। তোমার দাদার বাড়ীটার যদি তাগাদা না থাকত, তাহলে ও-সব কিছুই দরকার হ'ত না।"

গায়ত্রী ছেলের মা, বাড়ীতে একটা রোগ ঢুকাইতে তাহার ইচ্ছা ছিল না, বিশেষতঃ এইমাত্র অনুপের এ-বাড়ীতে আসার সম্বন্ধে একটা বাধা হওয়ার পর। কিন্তু স্বামীর প্রস্তাবের সে প্রতিবাদ করিল না। একটু নীরব থাকিয়া বলিল, "তুমি যা ভাল বোঝ করো।"

সুধীশ আসিয়া তাহার পাশে বসিল, একখানা হাত কাঁধের উপর টানিয়া লইয়া বলিল, "তুমি কি রাগ করে বললে, রাণু!"

গায়ত্রী ম্লান দৃষ্টি তুলিয়া তাহার দিকে চাহিল, বলিল, "না না, রাগ কোরব কেন?"

সুধীশ তাহাকে বক্ষ-সংলগ্ন করিয়া বলিল, "তবে

আমার সোণামণির মুখে হাসি নেই কেন? কেন মুখখানি এত শুকন-শুকন লাগচে? মনে হয়, কি যেন একটা অশান্তি তুমি ভোগ করছ, যা তুমি আমার কাছেও বলতে পাচ্ছ না। কি হয়েছে রাণু?"

গায়ত্রীর দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। সত্যই স্বামী তার ভোলানাথ, হয় ত মানসিক দুর্ব্বলতা তার একটু থাকিতে পারে,—তবু তার মনোমন্দিরে গায়ত্রীই অধিষ্ঠাত্রী দেবী!

সুধীশ তাহার চোখে জল দেখিয়া ব্যথিত স্নেহভরে তাহা কোঁচায় মুছাইয়া দিয়া বলিল, "কি করেছি রাণু, কেন তুমি কাঁদছ? যদি কোন দোষ করে থাকি, আমায় তা বলোনি কেন?"

গায়ত্রী লজ্জা পাইল, তবু যা-হোক একটা-কিছু বলিতে হইবে ত? তাই অভিমানভরা স্বরে বলিল, "তুমি আর আমায় ভালবাস না!"

সুধীশ স্তব্ধ ভাবে ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ থাকিবার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমি এ জানতুম গায়ত্রী, তুমিই জানতে না। এই জন্যেই বিয়ের আগে সব কথা তোমাকে জানিয়ে তোমায় ভেবে দেখতে অনুরোধ করেছিলুম; তা তুমি তখন বিশ্বাস করোনি। কিন্তু আজ দেখছ, আমি যা বলেছিলুম তা সত্যি,—আমি নিঃস্ব,—তোমায় পরিতৃপ্ত করবার মত আমার কিছুই নেই। ভুলের বোঝা কি মানুষ চিরকাল টান্‌তে পারে?"—তাহার পর আর্দ্র—সজল কণ্ঠে বলিল, "কোন পথ আর তোমার খোলা নেই রাণু, এই হৃদয়হীন অসার স্বামী নিয়েই অতৃপ্ত জীবন তোমায় কাটাতে হবে! আমা হতে তুমি শান্তি পেলে না। খোকন দীর্ঘজীবী হোক, ও যেন তোমায় শান্তি দিতে পারে। ওর বাপের পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও যেন করতে পারে!"—কণ্ঠস্বর তাহার অব্যক্ত বেদনায় রুদ্ধ হইয়া গেল।

গায়ত্রী আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, "তুমি থাম,—ওগো তুমি থাম! তুমি কি চাও, আমি আত্মহত্যা করি? অভিমান করে যদি একটা কথা তোমায় বলেই থাকি, তাই বলে কি এত শাস্তি দিতে হয়? এক দিনের একটা কথার কি ক্ষমা নেই? লঘু পাপে এত গুরুদণ্ড দেবে তুমি? তোমার ভালবাসায় যদি তৃপ্ত না হয়ে থাকি, তবে আর কিসে নির্ভর ক'রে সুখী হতাম বল্‌তে পার?"—সে আকুল হইয়া উঠিল।

সুধীশ নীরবে তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল, কথা বলিল না। গায়ত্রীর প্রতি মমতায় তাহার প্রত্যেকখানি পঞ্জর ব্যথিত হইয়া উঠিতেছিল। খানিক পরে গায়ত্রী শান্ত হইয়া উঠিয়া বসিল, দু'জনে চোখোচোখী হইতেই হাসিয়া ফেলিল, গায়ত্রীর মুখে সলজ্জ, সুধীশের মুখে বেদনাপাণ্ডুর হাসি। গায়ত্রী সুধীশের মুখখানি নিজের মুখের উপর টানিয়া লইয়া বলিল, "ও হাসি দেখে আমার মন ভরে না ত, তোমার স্বাভাবিক মিষ্টি হাসিটি হাস। দোষ করেছি বলে কি এত শাস্তি দেবে? তোমার কি একটু দয়া-মায়া নেই?"

সুধীশ আস্তে আস্তে তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "পাগলী!"

দু'জনেই খানিকটা নীরবে থাকিবার পর গায়ত্রী বলিল, "মিসেস সেনকে কবে আনবে?"

সুধীশ অন্যমনস্ক ভাবেই বলিল, "থাক্, বাড়ী এনে কাজ নেই। না হয় হস্পিট্যালেই পাঠাব; ছেলে-মেয়ে দু'টো—বলো যদি না হয় এখানে আসুক। জিনিস-পত্র একটা ঘরে চাবী দিয়ে রেখে বাকী বাড়ীটা খালি করে দিলেই হবে বোধ হয়, কি বলো?"

উত্তর শুনিয়া গায়ত্রীর মুখ পাংশু হইয়া গেল; খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া সে মর্ম্মপীড়িত স্বরে বলিল, "আমি তোমার পায়ে শত অপরাধী, কথা বলতে আমার লজ্জা কচ্ছে; কিন্তু শুধু এবারটি আমায় মাফ্ করো। মিসেস্ সেনকে আনো, আমার অপরাধ আর বাড়িয়ো না।"—সে সুধীশের পায়ে হাত রাখিল।

সুধীশ তাহার হাতখানি পায়ের উপর হইতে তুলিয়া ওষ্ঠে ঠেকাইল; তাহার পর বলিল, "তোমার অপরাধ কিছুই হয়নি গায়ত্রী, তুমি লজ্জা পাচ্ছ কেন? তবু বলছি—থাক্, যখন উপায় হতে পারে, তখন দরকার কি? আর যা তাঁর অবস্থা, কি যে হবে বলা শক্ত!"

গায়ত্রী শুনিয়া কাঁপিয়া উঠিল, বলিল, "যদি আমায় ক্ষমা করে থাক, তবে তাঁর এ অবস্থায় তাঁকে আনতে আপত্তি কোর না। বলো, আজই আনবে?"

সুধীশ ঘাড় হেলাইয়া স্বীকার করিল। সেই দিনই সুধীশ নেলীর কতক কতক জিনিসপত্র এ বাড়ীতে আনাইবার ব্যবস্থা করিয়া ফেলিল। বাড়ী খালি করিয়া

কলি ফিরাইয়া রাখিতে হইবে; কাজেই আর বিলম্ব করা চলে না।

নেলীর জন্য নীচের একটা ঘর খালি করিয়া রাখা হইয়াছিল। সুধীশ তাহার জিনিসপত্র গোছগাছ করিয়া দিতে দিতে এক সময় কাছে গিয়া বসিতে দেখিতে পাইল, নেলীর দুই চোখে শতধারে অশ্রু বহিতেছে!

সুধীশ তাহার সন্নিকটে সরিয়া আসিয়া বলিল, "কেন কাঁদচো নলিনী, কি কষ্ট হচ্ছে রাণি!"—সে সযত্নে কোঁচার কাপড়ে তাহার বিবর্ণ গাল দু'খানি মুছাইয়া দিল।

সেই অতীত কালের প্রিয় সম্বোধন! সুধীশ বিলিতী নাম পছন্দ করিত না, নলিনী বলিয়া ডাকিত। এত দিন পরে পুনরায় সুধীশ তাহাকে সেই নামে ডাকিল।

নেলী সুধীশের একখানা হাত তার জীর্ণ বক্ষের উপর টানিয়া লইয়া ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল, "আমায় ক্ষমা করো সুধী, আমি তোমার কাছে বড় অপরাধী।"—সে তাহার আয়ত নয়নের ব্যথাতুর দৃষ্টি সুধীশের মুখে সন্নিবিষ্ট করিল। সেই মুগ্ধ তন্ময় চাহনি! এমনই করিয়াই দশ বৎসর পূর্ব্বে সে সুধীশের মুখপানে চাহিত। সুধীশের দুই চক্ষুও জলে ভরিয়া উঠিল! সে-দিন এই বুকে কত সাধ, কত আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল, আর আজ তাহার কি শোচনীয় পরিণতি! সুধীশ দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া রাখিয়া তাহার রুক্ষ কেশগুচ্ছের ভিতর ধীরে ধীরে অঙ্গুলি চালাইতে চালাইতে গাঢ়স্বরে বলিল, "আবার সেই পাগলামী কোচ্ছ? ও-কি তুমি ভুলবে না? কত দিনই ত বলেছি, ও-কথা তুলো না!"

নেলী পাশ-ফিরিয়া সুধীশের কোলের কাছে সরিয়া আসিল; সুধীশের জানুর উপর হাত রাখিয়া কাতর স্বরে বলিল, "তোমার পক্ষে ওটা বলা সহজ, আমার পক্ষে করা সহজ নয়। তুমি গুণবতী স্ত্রী পেয়েছ, তুমি সংসারী; তাঁর ভালবাসায় তোমার মন কানায় কানায় ভরা, তাই তোমার কাছে ওটা তুচ্ছ। কিন্তু আমি অপরাধী, আবার যখন আমি ডুবে যাচ্ছি, তখন তুমি আমার হাত ধরে টেনে তুলেছ—এ যে আমার মনে কাঁটার মত খচ্-খচ্ করছে!" একটু থামিয়া বলিল, "যাকে নিজের মনের কাছে জবাব-দিহি করতে হচ্ছে, সে কি অতীতকে ভুলতে পারে?"

সুধীশ তাহার আঙুলগুলি লইয়া নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "এ সব তোমার বাজে কথা!"

নেলী জলন্ত শ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বাজে কথা নয় সুধী, এ অনুশোচনা। মানুষ অন্যায় ক'রলে এক দিন না এক দিন তা কাঁটার মত বিঁধবেই। তুমিও এক জনের প্রতি অবিচার করেছিলে, আজ যদি কোন কারণে তাঁর কাছে উপকার পাও, তা হলে কি তোমার মনে অনুশোচনা জাগবে না?"

হায় নেলী, কি মর্ম্মদাহী সন্তাপ, কি দুঃসহ অগ্ন্যুৎপাত তাহাকে পলে পলে দগ্ধ করিতেছে, যদি তুমি তাহা বুঝিতে পারিতে!

নেলী বলিতে লাগিল, "এত দিনের মধ্যে কোন দিন কি তাঁর কোন খবর পাওনি? কি ভাবে কোথায় আছেন তিনি?"

সুধীশ যেন পাথর হইয়া যাইতেছিল, সে উত্তর দিবে, সে শক্তি তার ছিল না।

নেলী উত্তরের অপেক্ষাও করিল না; সে বলিতে লাগিল, "এত দিন অবশ্য হত না, কিন্তু এখানে আসার পর থেকে ক্রমাগত মনে হয়, আমি অকারণে একটা মানুষের জীবন ভেঙ্গে-চুরে শ্মশান করে দিলুম, অথচ না দিলুম তাঁকে—না নিলুম নিজে, সেই পাপেই আমার সারা জীবন এমন অভিশপ্ত হয়ে গেল।"

সুধীশ ম্লান হাসির সহিত বলিল, এত শিক্ষাতেও তোমার কুসংস্কার ঘুচল না?"

নেলী বলিল, "কুসংস্কার তুমি কাকে বলো সুধী, প্রাণে ব্যথা দিলে ব্যথা পেতে হবে না?" ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া নেলী ছেলেমানুষের মত আত্মহারা হইয়া মিনতি-ভরা ব্যাকুল কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "আর কি সে-দিন ফিরে আসে না? সেই তুমি,—সেই আমি!"

সুধীশ এতক্ষণ তাহার মুখের পানেই চাহিয়া ছিল; সে দেখিয়া শিহরিল,—কাল তাহার করাল স্পর্শে নেলীর মুখে মৃত্যুর পাণ্ডুরতা ঘনাইয়া তুলিয়াছে! নেলী সুদূর অজ্ঞাত দেশে যাত্রা করিয়াছে, তাহাকে ফিরাইবার আর পথ নাই! সে এই অনন্তপথের যাত্রীর বিবর্ণ ম্লান মুখের দিকে সভয়ে ক্ষুব্ধ হৃদয়ে চাহিয়া রহিল।

নেলী উষ্ণশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমার ডাক এসেছে, আমি যাব; কিন্তু বড্ড অশান্তি নিয়ে চল্লুম সুধী!" সহসা আবার পূর্ব্ববৎ আত্মহারা হইয়া উচ্ছ্বসিত আবেগের সহিত

বলিল, "আমায় বাঁচাও, আমি বাঁচতে চাই;—বাঁচতে চাই আমি, মরতে চাই নে। আমায় বাঁচাও সুধী, আমি তোমার কাছে থাকতে চাই,—মরতে চাই নে।" সে সুধীশের হাতখানা বুকের উপর সবলে চাপিয়া ধরিল।

নিরুপায়ের এই ব্যাকুল আকিঞ্চন,—সুধীশকে অভিভূত করিয়া ফেলিল।—হায় রে, মানুষের যদি সে ক্ষমতা থাকিত! তাহার দুই চক্ষু অশ্রুতে আবিল হইয়া আসিল, সে গাঢ় নিশ্বাস দমন করিয়া নেলীকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া ব্যথিত স্বরে বলিল, "ভয় কি নলিনী! তুমি ভাল হবে, কি-ই বা এমন তোমার হয়েছে? কোথাও যেও না তুমি, আমার কাছেই থাক। তুমি ত আবার আমার কাছে সেই নলিনী হয়েই ফিরে এসেছ।"

নেলী সুধীশের কোলের উপর মাথা রাখিয়া জ্বরতপ্ত শীর্ণ হাত দুখানি দিয়া তাকে বেড়িয়া-ধরিয়া শ্রান্তিভরে নয়ন মুদিত করিল।

৩১

অতীশ অপর্ণাকে লইতে আসিয়াছিল।

নেলীর অবস্থা তখন বড়ই সঙ্কটজনক। অতীশ ব্যথিত হইলেও ধীরে ধীরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। সুধীশের রাশিচক্রে কুণ্ডলীতে যে রাহু-কেতু বিরাজ করিতেছিল, এক জন যে তাহাকে মুক্তি দিতেছে, ইহা সুধীশের দিক্ হইতে বাঞ্ছনীয় বটে!

হিমানীও পরদিন প্রাতে নিজের বাড়ীতে যাইবে; বারোটার ট্রেণে তাহার স্বামী আসিবে। ইহা সুসংবাদ! তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী অপর্ণা নেলীকে দেখিতে যাইয়া, সুধীশের সহিত তাহার কথার দুই-এক টুকরা গোপনে শুনিয়া, সে যে কে, তাহা আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। এই জন্যই সে গায়ত্রীকে সে-দিকে ঘেঁসিতে দেয় নাই; বলিয়াছিল, "তুমি ওখানে কি করতে যাবে দিদি! কচি ছেলের মা রোগীর পাশে না যাওয়াই ভাল।"

সুধীশ প্রায় অধিকাংশ সময় রোগীর কাছে থাকে, এজন্য আশঙ্কায় গায়ত্রীর গলা দিয়া মুখের অন্ন নামিতে ছিল না, সে বিষণ্ণ মুখে বলিয়াছিল, "উনি ত সর্ব্বদাই ওখানে আছেন ভাই! ওঁর চেয়ে কি খোকার জীবনের দাম বেশী?

অপর্ণার মনে নেলীর রোগ সম্বন্ধে একটা নিদারুণ সন্দেহ ছিল। অতীশ আসিলে সে নিজের আবিষ্কারের কথা তাহাকে জানাইয়া ধারণাটা দৃঢ় করিয়া লইল।

অপর্ণা সন্ধ্যার পর আসিয়া গায়ত্রীর কাছে বসিল। দুই-চারিটা অবান্তর কথার পর বলিল, "কালই ত যাচ্ছি দিদি! তাই তোমায় একটা কথা বলে যাই। না বললেও চলতো; কিন্তু তুমি বড্ড ভালমানুষ কি না, আর বঠ্‌ঠাকুরকে বড়ই বিশ্বাস করো, তাই সাবধান করে দিতে হচ্ছে।"

গায়ত্রীর চিন্তাক্লিষ্ট মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল; সে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "কেন, কি হয়েছে ছোট বউ?"

অপর্ণা একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বঠ্‌ঠাকুরের বয়স যখন অল্প, সেই সময় তাঁর একটা বিয়ের সম্বন্ধ পাকাপাকি হয়েছিল, সে কথা জান কি? তোমায় তিনি কি তা বলেছেন?

গায়ত্রী নির্ব্বাক্ ভাবে ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিল।

অপর্ণা বলিল, "দু'জনের মধ্যে খুব ভালবাসা ছিল; আদর করা, চুমো খাওয়া—সবই চলতো। আমি অবিশ্যি তোমার দেওরের মুখে যা শুনেছি তাই বলছি।"

গায়ত্রীর চোখে পলক নাই, নিস্পন্দ হইয়া শুনিতেছিল; না জানি, অপর্ণা তাহার জন্য কোন্ একাঘ্নী বাণ শানাইতে বসিয়াছে!

অপর্ণা বলিল, "বুঝতে পাচ্ছি দিদি! তুমি জ্বলে-পুড়ে মরছ। তবু তোমার এত-বড় সর্ব্বনাশ দেখে চুপ করে থাকি কি করে?

গায়ত্রী একই ভাবে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

অপর্ণা বলিল, "তার পর বঠ্‌ঠাকুর কলকাতায় গেলেন পড়তে। সেখানে একটা মেয়ে ওঁদের সঙ্গে পড়ত,—তারই প্রেমে পড়ে গেলেন। তার পর আমাদের শাশুড়ী মারা যাওয়ার পর শ্বশুর যখন বঠ্‌ঠাকুরকে সেই মেয়েটির কথা বললেন, তখন উনি রাজী হলেন না; ও-দিকে তাঁর সেই সঙ্গে-পড়ুনী মেয়েটাও ফস্ করে আর এক জনকে বিয়ে করে বসলো।"

গায়ত্রী কষ্টে উচ্চারণ করিল, "জানি।"

অপর্ণা বলিল, "জানো? কিন্তু তারা কে, তা জানো?"

গায়ত্রী ঘাড় নাড়িল।

অপর্ণা বলিল, "প্রথমটি তোমার বৌদি; আর—আর দ্বিতীয়টি ঐ মিসেস্ সেন!"

গায়ত্রী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল; কিন্তু তাহার পরই যেন একেবারে স্তব্ধ পাথর!

অপর্ণা থামিল, বোধ হয় গায়ত্রীকে আঘাতটা সহ্য করিবার জন্য একটু সময় দিল। তাহার পর বলিল, "ঐ নেলী সেন যদি বাড়ীতে না ঢুকত, আমি তোমায় কিছুই জানাতুম না। কিন্তু দেখছি, এক পাপ বিদায় করবার আশা হতে না হতে আর এক পাপ এসে ঢুকল। ঝাঁটা মেরে সব বিদায় করে দাও। রোগ? আমার মনে হয়, যতটা শুনছ ততটা নয়, বাড়ী ঢোকবার ও-একটা অছিলে! দেখছ না, বঠ্‌ঠাকুরের নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই!"

গায়ত্রী সহসা অপর্ণার একখানা হাত টানিয়া ক্রোড়-স্থিত পুত্রের মাথায় রাখিয়া শুষ্ক ক্লিষ্টকণ্ঠে কহিল, "ছোট বউ, তুমি যা বলছ, সব সত্যি?"

অপর্ণা হাত টানিয়া-লইয়া বলিল, "তুমি ক্ষেপেছ দিদি! ছেলের মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করতে আছে? তবে তুমি আমায় বিশ্বাস করো, আমি যা শুনেছি তাই বলেছি! কিছুই আমার চোখে দেখা নয়, সবই তোমার দেওরের কাছে শোনা।"

গায়ত্রী ভগ্নস্বরে বলিল, "ছোট বউ, আমিও কাল তোমার সঙ্গে যাব ভাই। আমায় তুমি নিয়ে চলো। এখানে কারুকে আমার বিশ্বাস নেই। ওরা সব পারে! হয় ত ঐ রাক্ষুসী আর ডাকিনীতে মিলে আমার দুধের বাছাকে—" রোদনে তাহার কণ্ঠরোধ হইল।

অপর্ণা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "তা কি হয় দিদি! এ সময় এখান থেকে এক-পা তোমার নড়া চলে না। আগে আপদ বিদায় করো, তার পর যেয়ো। সে আমাদের শ্বশুরের ভিটে, যাবে বৈ কি। কিন্তু এখন থাক।"

গায়ত্রী ত্রস্ত স্বরে বলিল, "না ছোট বউ, না; ওরা মেরে ফেলবে আমার খোকাকে।"

অপর্ণা বলিল, "তুমি কি সত্যিই পাগল হলে? মারবে কে? বৌদি ত কাল সকালেই বিদায় হচ্ছে। নেলী কাল মরে ত ভালই; তা না হলে কালই ওকে হাসপাতালে চালান দিও। আপদ-বালাই বিদেয় হলে আর ভয় কি? তুমি ত তখন জাঁকিয়ে গিন্নী হয়ে বসবে। আর, খোকার জন্যে মিছে ভয় পাচ্ছ! ও কি তোমার একারই, বঠ্‌ঠাকুরের কেউ নয়?"

গায়ত্রী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মর্ম্মবেদনায় আকুল কণ্ঠে কহিল, "ঠিক বলেছ ছোট বউ, কিন্তু আমি যে বিশ্বাস হারালুম ভাই! আড়াই বছর ধরে যিনি আমার সঙ্গে অকারণে এমন প্রবঞ্চনা করে এসেছেন, তাঁকে আর কি করে শ্রদ্ধা করতে পারি? তিনি স্বামী, গুরুজন,—কিন্তু তাঁর ওপর আমার সব শ্রদ্ধা যে লোপ পেলে ছোট বউ!" বলিতে বলিতে রুদ্ধকণ্ঠ দুঃসহ বেদনায় অসাড় হইল। একটু সম্বরণ করিয়া পুনরায় বলিল, "ঘুম ভেঙ্গে গেলে মুখ পানে চেয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকেছি, দেখে দেখে চোখের আশ মিটত না,—জীবন-দেবতা বলেই মনে করি,—সেই মুখপানে অশ্রদ্ধার দৃষ্টিতে চাইব কি করে? হয় ত সংসারের গিন্নী হয়ে বসব, ওঁর ওপর ষোল আনা হুকুম চালাবারও ক্ষমতা থাকবে, কিন্তু বিশ্বাস হারিয়ে শ্রদ্ধাহীন অন্তর আমার কি অবলম্বনে বাঁচবে!"

৩২

ক্ষীণ কণ্ঠে নেলী বলিল, "আঃ, ওটা মুখের কাছ থেকে সরাও না। আমার আর ভাল লাগছে না। মিস্ বাক্‌চি, ডাঃ রায় কি ওপরে গেছেন?"

পূর্ব্বদিন হইতে নেলীকে অক্সিজেন দেওয়া হইতেছে। সুধীশ ফানেলটা বালিসের পাশে রাখিয়া মুখের কাছে ঝুঁকিয়া বলিল, "না নলিনী! এই যে আমি তোমার কাছে রয়েছি। নেলীর মরণাহত মুখে হাসির একটু আভাস দেখা দিল; স্তিমিত দৃষ্টি সুধীশের মুখের উপর স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল, "মিস্ বাক্‌চি কোথায়?"

সুধীশ তাহার হাতখানি কোলে তুলিয়া লইয়া বলিল, "পাশের ঘরে একটু শুয়েছেন। কেন?"

নেলী সুধীশের হাতখানি ধরিয়া-থাকিয়া বলিল, "তবে এ-পাশে এসে একটু বোস, তোমার মুখখানি আমি ভাল করে দেখতে পাচ্ছি না সুধী!"

সুধীশ উঠিয়া-আসিয়া তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিল!" নেলী অত্যন্ত চেষ্টার সহিত মাথাটা তুলিয়া তাহার কোলের উপর রাখিয়া হাসিল; শিশুর মত আনন্দের হাসি! যেন কি একটা অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত বস্তু সে অনায়াসে লাভ করিল।

সুধীশ আস্তে আস্তে তাহার চুলে হাত বুলাইতে

বুলাইতে একটু বাধ-বাধ স্বরে বলিল, "তোমার এত অসুখ! মাষ্টার মশাইকে খবর দেব কি?"

যেন তীব্র যন্ত্রণায় নেলীর মুখমণ্ডল বিকৃত হইয়া উঠিল, ক্ষণকাল সে কথা বলিতে পারিল না; তাহার পর টানিয়া-টানিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "না সুধী, আমি বড্ড অশান্তি ভোগ করেছি, মরবার সময় একটু শান্তিতে মরতে দাও।"

সুধীশ বেদনামাখা দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল; তাহার পর মৃদুস্বরে বলিল, "কিন্তু আমাকে যে নিমিত্তের ভাগী করবেন তিনি! তুমি আমার বাড়ীতে থেকে এত অসুস্থ হয়েছ, তবুও তাঁকে যদি তা না জানাই, তা হলে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ আমি অপরাধী হব নলিনী!"

নেলী উত্তর দিল না, শীর্ণ বাহুর নিবিড় আলিঙ্গনে সুধীশকে জড়াইয়া-ধরিয়া নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল। সুধীশ খানিকটা পরে পুনরায় বলিল, "কি করব নলিনী! কি তোমার ইচ্ছে বল।"

নেলী বিষণ্ণ মুখে বলিল, "ঠিকই বলেছ সুধী, তুমি অযথা অপকলঙ্কের ভাগী হবে বটে! তুমি কালই খবর দিও।"-- কিন্তু বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, অস্ফুট ভগ্নস্বরে বলিতে লাগিল, "মরবার সময় তার মুখ আমার চোখে পড়বে? যা সব চেয়ে আমি বেশী ভয় করেছি! এমনি করে তোমার কোলে মাথা রেখে শেষ-যাত্রার শান্তিটুকুও ঈশ্বর দিলেন না! আমি ত সতী সাধ্বীর সম্মান চাইনি,—আমি জানি, আমি সে সম্মানের যোগ্য নই,—তবে কেন আমি আমার আকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু পেলুম না?"

সুধীশ তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল, "অমন করে যদি আবোল-তাবোল বকো, তা হ'লে মিস্ বাক্‌চিকে ডেকে দিয়ে আমি উঠে চলে যাব।"

নেলী মলিন হাসি হাসিয়া বলিল, "দু'টো কথা বলে নিই, আর ত বলব না। রাগ কোর না, এ সময় আমায় বলতে দাও।"

সুধীশ সান্ত্বনার সুরে বলিল, "বলো, কি বলতে চাও। কিন্তু হতাশ হয়েছ কেন? তুমি নিজে ডাক্তার, অথচ সাধারণ মেয়েদের মত ভয় পেয়ে আবোল-তাবোল বকছ!"

নেলী বলিল, "হতাশ হইনি, সুধী! এত দিনে শান্তি পাচ্ছি। কি জ্বালায় জ্বলেছি, সে কি তুমি ধারণা করতে পারো? এক দিনের ভুল একটা মানুষের জীবনকে ভেঙ্গে-চুরে মাটীতে মিশিয়ে দিলে! এ অনুশোচনার আগুন যার বুকে দিবারাত্রি জ্বলে, সে কি মরতে ভয় পায়; শুধু ছেলেমেয়ে দুটোর জন্যেই অশান্তি ভোগ কচ্ছি, ওরা আমার যে ভেসে গেল! আহা!"

সুধীশ স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিল, "ওরা যদি মাষ্টার মশায়ের কাছে আদর-যত্ন না পায়, তবে ওদের ভার তাঁর কাছে আমি চেয়ে নেব।—ছেলেমেয়ের জন্যে তুমি ভেব না।"

নেলী তৃপ্তির সহিত চোখ বুজিল; তাহার একটু পরে অত্যন্ত ধীরে ধীরে বলিল, "সুধীশ, একবার কি—একবার কি আগের মত তেমনি করে—" কথাটা সে শেষ করিতে পারিল না।

সুধীশ তাহার কুণ্ঠাকাতর অসমাপ্ত বাক্যের অর্থ বুঝিল, এবং তাহার শীতল ঘর্ম্মাক্ত ললাটে মৃদু চুম্বন করিয়া বলিল, "এবার একটু ঘুমিয়ে পড়ো, অনেকক্ষণ জেগে আছ নলু!"

নেলী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।

ভোরের দিকে মিস্ বাক্‌চি অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "আমি বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, ডাঃ রায়! মিসেস সেন কেমন আছেন?"

সুধীশ সন্তর্পণে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "সেই রকমই। আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, আপনি বসুন।"— বলিয়া আলস্য ভাঙ্গিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

উপরের 'বাথরুম' হইতে বাহির হইয়া সে ছোট ছাদে আসিয়া দাঁড়াইল; একবার মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস লইতে ইচ্ছা হইল। আজ ছয়-সাত দিন হইতে রোগীর ঘরে সে প্রায় বন্দী হইয়াই আছে। সহসা রেলিংয়ের দিকে দৃষ্টি পড়িল, কে এক জন দাঁড়াইয়া আছে! সুধীশ অগ্রসর হইয়া কাছে গিয়া বুঝিল, হিমানী।—সে তাহার গোপন বেদনা নিঃশব্দে লঘু করিতেছে। সুধীশ তাহার সমীপবর্ত্তী হইয়া ডাকিল, "হিম্!"

হিমানী মুখ তুলিয়া চাহিল, তাহার পর ব্যাকুল রোদনের বেগে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সুধীশ বেদনামথিত নিঃশ্বাস ফেলিয়া রেলিংয়ে কনুইয়ের ভর দিয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। যে জমাট মেঘ গুমট বাঁধিয়া

তাহার বুকের ভিতর অহোরাত্রি গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছিল, যাহা নেলীর মৃত্যু-শয্যার পার্শ্বে আত্মপ্রকাশ করিতে না পারিয়া সুধীশকে বজ্রানলে দগ্ধ করিতেছিল,—বিচ্ছেদ-ব্যথিতা হিমানীর অশ্রুজলে তাহা বুঝি মুক্তির পথ পাইয়া বাঁচিয়া গেল। নিঃশব্দে ভীরু অশ্রুধারা সুধীশের শুভ্র গণ্ড বাহিয়া ধীরে ধীরে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরে সুধীশ আত্মসম্বরণ করিল, সিক্তকণ্ঠে কহিল, "চোখ মোছ হিমানী, কেঁদে কি করবে? এই যখন অদৃষ্টলিপি, তখন এক দিনের কান্নায় ত এর শেষ নেই!"

হিমানী মর্ম্মপীড়িত আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, "কেন আবার দেখা হ'ল সুধীশ, এত দিন ত আমি তোমার স্মৃতি ভুলতেই চেষ্টা করে এসেছি, কিন্তু এই পরিণত বয়সের স্মৃতি আমি কি দিয়ে ভুলব!"—সে রেলিংয়ের উপর মাথা লুটাইয়া বিহ্বলা বালিকার মত কাঁদিয়া উঠিল।

সুধীশ তাহার কাছে সরিয়া-আসিয়া তাহার অবলুণ্ঠিত মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে সনিঃশ্বাসে বলিল, "সেইটেই আমাদের দুর্ভাগ্য! আমি শুধু তোমার জীবনই বিষে জর্জ্জরিত করে দিইনি হিমানী, নিজের জীবনটাও অশান্তিতে ছারখার করেছি।...তুমি আমায় সুখী করবার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করোনি, অমূল্য রত্ন আমায় দিয়েছিলে, কিন্তু না পারলুম তাকে শান্তি দিতে, না পেলুম নিজে!"—সে হিমানীর অবরুদ্ধ ক্রন্দনের ভারে বিচলিত দেহের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল।

"আমি আজ ছোট বউয়ের সঙ্গে দেশে যাচ্ছি!"—গায়ত্রীর কণ্ঠস্বর শুষ্ক, ক্ষীণ, কিন্তু সতেজ।

হিমানী ও সুধীশ যেন প্রেতাত্মা দেখিয়া চমকিয়া উঠিল! নিজেদের অজ্ঞাতেই পরস্পরের নিকট হইতে সরিয়া অধোমুখে দাঁড়াইল।

গায়ত্রী কথা বলিল, কণ্ঠস্বর যেন তাহার বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। সে বলিল, "তোমার জীবনে আমি এতখানি অশান্তি এনে দিয়েছি জেনে বড়ই দুঃখ পেলুম। কি করব, সবই আমার কপাল! কিন্তু কি হবে ও-কথা তুলে? আমি ছোট বউকে বলেছি; সে আমায় নিয়ে যাবে বলেছে। আমি তোমাকে সেই কথাই বলতে এসেছি,—তোমাদের নিভৃতের কথাবার্ত্তা শুনতে আসিনি!"—বলিতে বলিতে সুধীশের মুখপানে ভাল করিয়া চাহিয়া, তাহার অর্দ্ধশুষ্ক অশ্রুধারা লক্ষ্য করিয়া বিচলিত স্বরে বলিল, "কিন্তু তোমার চোখে জল কেন? তুমি ত দু'জনকেই ফিরে পেয়েছো,—আর যে, তোমার অশান্তি, সে ত সরেই যাচ্ছে,—তবে?"—বলিয়া সে ফিরিয়া যাইতে গিয়াও আবার দাঁড়াইল; ধীর স্বরে বলিল, "আমি তোমায় লজ্জা দেব না, তোমায় ছোট করতেও আমি চাই নে। রোগীর বাড়ী ছেলে নিয়ে আমি থাকব না—এই কথাই সকলের কাছে রাষ্ট্র করে দিয়ে চলে যাব।"—সে ধীর পদক্ষেপে চলিয়া গেল।

সুধীশ ও হিমানীর পায়ে কে যেন স্ক্রু আঁটিয়া দিয়াছিল; তাহারা চিত্রার্পিতের মত স্থির, নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সুধীশের মনে হইল, যে শীর্ণা ক্ষীণা ব্রততীটিকে সে সযত্নে সঞ্চারিণী পল্লবিতা লতিকায় পরিণত করিয়াছিল, নিষ্ঠুর আঘাতে সে স্বহস্তেই তাহা দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিল!

* * * *

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সুধীশ করলগ্ন কপোলে বসিয়াছিল। রামু আলো জ্বালিয়া দিতে আসিয়াছিল, সুধীশ ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়াছে। বাড়ীখানা নিস্তব্ধ,—বুঝি একটা ছুঁচ পড়িলেও সে শব্দ শোনা যায়।

সুধীশ অন্ধকারে বসিয়া শুধু নিজের অতীত ও ভবিষ্যৎ ভাবিতেছিল;—বর্ত্তমান তাহার কিছুই নাই! চোখের সম্মুখের অন্ধকার অপেক্ষা তাহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখের অন্ধকার আরও গাঢ়—সূচীভেদ্য—নিবিড়!

তাহার জীবনের সহিত ওতঃপ্রোত ভাবে যে তিনটি নারী জটিল ভাবে জড়াইয়া গিয়াছিল, সুধীশ ব্যথাহত চিত্তে তাহাদের কথাই ভাবিতেছিল। গায়ত্রী মনস্তাপে মর্ম্মাহত হইয়া অতীশের সহিত চলিয়া গিয়াছে। অতীশ লইয়া যাইতে চাহে নাই, সুধীশকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল; সুধীশ বাধা দেয় নাই। সে জানে, কতখানি অসহ্য হইলে গায়ত্রীর মত সহিষ্ণু নারী প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করে? বড় জ্বালায় না জ্বলিলে গায়ত্রী তাহার বাহিক বিকাশ হইতে দেয় নাই। প্রবঞ্চনার দায়ে তাহাকে দায়ী করিয়া গায়ত্রী নিঃশব্দে তাহাকে ছাড়িয়া গেল!

হিমানী পুত্রকন্যাসহ পতিগৃহে গিয়াছে, বাটীর ও-অংশটা শিশুর কোলাহলে বঞ্চিত হইয়া আজ শ্মশানের ন্যায় নিস্তব্ধ!

আর নেলী গিয়াছে অজানা অচেনা পথে,—সে চিরতরে গিয়াছে।—সুধীশই তাহার মুখাগ্নি করিয়া আসিয়াছে।

যে তিনটি হেমলতা তাহাকে সহকাররূপে সস্নেহে সযত্নে জড়াইয়া ছিল, একটা প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা আসিয়া সেই তিনটিকেই সমূলে উৎপাটিত করিয়া ভূমিসাৎ করিয়াছে।

[শেষ]

শ্রীমতী মায়াদেবী বসু।

পতঞ্জলি-বিরচিত-ব্যাকরণ-মহাভাষ্য

পস্পশাহ্নিক—অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

৯

মূল। অপর আহ—

চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানি
তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।
গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি
তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি।

'চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানি' নামাখ্যাতোপসর্গনিপাতাশ্চ। 'তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ' মনস ঈষিণো মনীষিণঃ। 'গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি' গুহায়াং ত্রীণি নিহিতানি নেঙ্গয়ন্তি ন চেষ্টন্তে, ন নিমিষন্তীত্যর্থঃ। 'তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি' তুরীয়ং বা এতদ্ বাচো যন্মনুষ্যেষু বর্ত্ততে চতুর্থমিত্যর্থঃ। "চত্বারি"

অনুবাদ—অপর (মন্ত্র) (এই বিষয়) বলিতেছে—শব্দের পরিমিত পদ চারি জাতীয়; মনীষী ব্রাহ্মণগণ সে সকল জানেন। (ইহাদের মধ্যে) গুহাতে (অজ্ঞানে) তিন (ভাগ) নিহিত আছে, তাহারা ইঙ্গিত করে না; মনুষ্যগণ বাক্যের (=শব্দের) চতুর্থ (ভাগ) বলিয়া থাকে।

'বাক্যের পরিচ্ছিন্ন পদ (স্বরূপ) চারি প্রকার—নাম, আখ্যাত, উপসর্গ এবং নিপাত। 'মনীষী ব্রাহ্মণগণ সে সকল জানেন'—মনের ঈষী (প্রেরক) মনীষী। 'গুহাতে (অজ্ঞানে) তিন (ভাগ) নিহিত আছে' (তাহারা) ইঙ্গিত করে না,—গুহাতে তিন (ভাগ) নিহিত আছে, (তাহারা) ইঙ্গিত করে না (কোনরূপ) চেষ্টা করে না—নিমেষ ফেলে না (অর্থাৎ নিজের অস্তিত্বের প্রকাশক কোন ব্যাপার তাহাদের নাই)—এই অর্থ; মনুষ্যগণ বাক্যের (=শব্দের) তুরীয় (ভাগ) বলিয়া থাকে'—ইহা বাক্যের (=শব্দের) চতুর্থ (ভাগ) মাত্র,—যাহা মনুষ্য-সমাজে প্রচলিত আছে; ('তুরীয়' শব্দের) চতুর্থ—এই অর্থ।

মন্তব্য—মহাভাষ্যকার পূর্ব্বে 'শব্দানুশাসনে'র প্রয়োজন পরিগণনার সময়ে 'চত্বারি' এই প্রতীক গ্রহণ করিয়াছেন; এই প্রতীকের দ্বারা "চত্বারি শৃঙ্গা" ইত্যাদি মন্ত্রের সূচনা করার ন্যায় "চত্বারি বাক্‌পরিমিতা" ইত্যাদি মন্ত্রেরও সূচনা করিয়াছিলেন। একটি প্রতীকের দ্বারা দুইটি মন্ত্রই এক সঙ্গে সূচিত হইলেও এক সঙ্গে দুইটি মন্ত্রের ব্যাখ্যা করা যায় না; এই জন্য প্রথমে "চত্বারি শৃঙ্গা" এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া তাহার পরে "চত্বারি বাক্‌পরিমিতা" ইত্যাদি মন্ত্রের ব্যাখ্যা করা হইতেছে।

মহাভাষ্যকারের ব্যাখ্যা অনুসারে "চত্বারি বাক্‌পরিমিতা" এই মন্ত্র অপেক্ষা "চত্বারি শৃঙ্গা" এই মন্ত্রে ব্যাকরণশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় অধিক পরিমাণে বর্ণিত আছে; এই জন্য একটি প্রতীকের দ্বারা এই উভয় মন্ত্র সূচিত হইলেও "চত্বারি শৃঙ্গা" এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রথমে করা হইয়াছে।

পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রে 'শৃঙ্গাণি' এইরূপ পদের পরিবর্ত্তে বৈদিক প্রক্রিয়া অনুসারে 'শৃঙ্গা' এই রূপ হইয়াছে, ইহা সেই মন্ত্রের প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। এইরূপ "চত্বারি বাক্‌পরিমিতা"—এই মন্ত্রে "পরিমিতানি" এইরূপ পদের পরিবর্ত্তে বৈদিক প্রক্রিয়া অনুসারে "পরিমিতা" এই রূপ হইয়াছে।

'বাক্‌পরিমিতা' এই স্থলে বাক্ শব্দের উত্তরবর্ত্তী ষষ্ঠী বিভক্তির ছান্দস লুক্ (অষ্টাধ্যায়ী ৭।১।৩৯) হইয়াছে বুঝিতে হইবে; "গুহা ত্রীণি" এই স্থলে লৌকিক ব্যাকরণ অনুসারে "গুহায়াং ত্রীণি" এই রূপ প্রয়োগ হয়; কিন্তু বৈদিক প্রক্রিয়া অনুসারে 'গুহা' শব্দের উত্তরে বিহিত সপ্তমী বিভক্তির এক বচনের লুক্ হইয়াছে।* মনস্+ঈষিন্=মনীষিন্—এখানে 'শকন্ধু' প্রভৃতি শব্দের ন্যায় পররূপ হইয়া 'মনীষিন্' এইরূপ সিদ্ধ হইয়া প্রথমার বহুবচনে "মনীষিণঃ" এই প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে। † এই প্রসঙ্গে

---

* সুপাং সুলুক্‌পূর্ব্বসবর্ণাচ্ছেযাডাড্যাযাজালঃ (৭।১।৩৯) ছন্দসি বিষয়ে সুপাং স্থানে সু লুক্ পূর্ব্বসবর্ণ আ আৎ শে যা ডা ড্যা যাচ্ আল্ ইত্যেতে আদেশা ভবন্তি।...লুক্। আর্দ্রে চর্ম্মন্। লোহিতে চর্ম্মন্। চর্ম্মণীতি প্রাপ্তে।...কাশিকা। কার্য্যবিশেষের উদ্দেশে প্রত্যয়ের লোপের লুক্, শ্লু এবং লুপ্ এই তিনটি সংজ্ঞা করা হইয়াছে; প্রত্যয়স্য লুক্‌শ্লুলুপঃ (১।১।৬১) লুক্‌শ্লুলুপ্‌শব্দৈঃ কৃতং প্রত্যয়াদর্শনং ক্রমাৎ তত্তৎসংজ্ঞং স্যাৎ।—সিদ্ধান্তকৌমুদী।

† "এঙি পররূপম্" (৬।১।৯৪) এই সূত্রের মহাভাষ্যে "শকন্ধ্বাদিষু চ" এই বার্ত্তিক পঠিত আছে। পতঞ্জলি ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"শকন্ধ্বাদিষু চ পররূপং বক্তব্যম্।"

কাশিকাতে এই বার্ত্তিক "শকন্ধ্বাদিষু পররূপং বক্তব্যম্" এই আকারে পঠিত হইয়াছে; সিদ্ধান্তকৌমুদীতে "বক্তব্যম্" শব্দের পরিবর্ত্তে "বাচ্যম্" এই রূপ পঠিত আছে। এই বার্ত্তিকের মহাভাষ্যে প্রদর্শিত আকারই যথার্থ আকার। পরবর্ত্তী বৃত্তিকারগণ

কৈয়ট লিখিয়াছেন, এই প্রয়োগ পৃষোদরাদির অন্তর্গত বলিয়া শুদ্ধ। * কৈয়টের এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, যে সকল শব্দ ব্যাকরণের সূত্রের সাধারণ নিয়মে সিদ্ধ হয় না, তাহাদের শুদ্ধতা-সম্পাদনের উদ্দেশে "পৃষোদরাদীনি যথোপদিষ্টম্" † (৬৷৩৷১০৯) এই সূত্র প্রণয়ন করা হইয়াছে; শকন্ধু, কুলটা মনীষী, প্রভৃতি শব্দকে পৃষোদরাদির মধ্যে গ্রহণ করিলে আর স্বতন্ত্র বার্ত্তিক প্রণয়নের কোন প্রয়োজন থাকে না। এরূপ ক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র বচন (বার্ত্তিক) না করিয়া 'শকন্ধু' প্রভৃতি শব্দকে পৃষোদরাদির মধ্যে গ্রহণ করাই লাঘব-যুক্তির অনুকূল। এই ভাবে বার্ত্তিকের প্রত্যাখ্যানই কৈয়টের অভিমত। 'শকন্ধু' প্রভৃতি শব্দ পৃষোদরাদির অন্তর্গত—এই অভিপ্রায় যে পাণিনির ছিল না, ইহা বলা যায় না; পাণিনির এইরূপ অভিপ্রায় ছিল বলিয়াই তিনি 'শকন্ধু' প্রভৃতি শব্দের সিদ্ধির জন্য কোন পৃথক্ সূত্র প্রণয়ন করেন নাই—ইহা বলিলে বোধ হয় কোন দোষ হয় না।

এখানে বার্ত্তিককার যে সূক্ষ্মদৃষ্টি ও গবেষণার ফলে পৃথক্ একটি বার্ত্তিক প্রণয়ন করিয়াছেন,—আমাদের মনে হয়,—কৈয়ট তাহার প্রতি লক্ষ্য করেন নাই।

প্রয়োগের সাধুত্ব প্রতিপাদনের জন্য ব্যাকরণশাস্ত্র; এই ব্যাকরণে প্রয়োগের সিদ্ধির জন্য কতকগুলি নিয়ম রচনা করা হইয়াছে। যে সকল প্রয়োগ সাধারণ নিয়মানুসারে সিদ্ধ হয় না, তাহাদের জন্য বিশেষ নিয়মও রচিত হইয়াছে। এমন কতকগুলি প্রয়োগ আছে, যে গুলি সাধারণ নিয়মে সিদ্ধ হয় না অথচ সেগুলি এমনই বিচিত্র প্রকারের যে, তাহাদের মধ্যে কোন দিক্ দিয়াই কোন ঐক্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; এরূপ ক্ষেত্রে কোন ভাবেই কোন শ্রেণীর অন্তর্গত না হওয়ায় এই সকল শব্দের সিদ্ধির জন্য কোন সাধারণ নিয়ম করা যায় না। এই প্রকারের শব্দের শুদ্ধতা প্রতিপাদনের উদ্দেশে পাণিনিকে কোন কোন সময় এক একটি পৃথক্ সূত্র প্রণয়ন করিতে হইয়াছে! এই ভাবে তিনি অনিয়ন্ত্রিত শব্দগুলিকে নিয়মের অধীন করিতে যত্ন করিয়াছেন।

এই স্থলে বার্ত্তিককার ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, যদিও পৃষোদরাদির অন্তর্গত সকল শব্দকে নিয়ম-প্রণয়নের দ্বারা এক শ্রেণীর অন্তর্গত করিতে পারা যায় না, তথাপি কোন কোন ক্ষেত্রে এইরূপ নিয়ম-প্রণয়ন অসম্ভব নহে; তাই তিনি 'শকন্ধু' প্রভৃতি শব্দের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পাইয়া তাহার জন্য বার্ত্তিকের আকারে নিয়ম-প্রণয়ন করিয়াছেন; সুতরাং এ ক্ষেত্রে পাণিনি অপেক্ষা বার্ত্তিককার কাত্যায়নের সূক্ষ্ম-দৃষ্টি ও গবেষণা অধিক বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ এই কারণেই মহাভাষ্যকার "শকন্ধ্বাদিষু চ" এই বার্ত্তিকের প্রত্যাখ্যান করেন নাই।

ইহা যে বার্ত্তিক, ইহা বুঝাইবার উদ্দেশে "বক্তব্যম্" অথবা "বাচ্যম্" এই শব্দের যোগ করিয়া দিয়াছেন।

* মনীষিশব্দঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।—মহাভাষ্য-প্রদীপ।

† পৃষোদরাদীনি শব্দরূপাণি যেষু লোপাগমবর্ণবিকারাঃ শাস্ত্রেণ ন বিহিতাঃ, দৃশ্যন্তে চ, তানি যথোপদিষ্টানি সাধূনি ভবন্তি। যানি যথোপদিষ্টানি শিষ্টৈরুচ্চারিতানি প্রযুক্তানি তথৈব অনুগন্তব্যানি—কাশিকা।

* ব্যাখ্যা। বাক্যের পরিমিত পদ-সমূহ চারি প্রকার, ইহা এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে। এখানে 'পরিমিত' এই শব্দের প্রয়োগের দ্বারা সূচিত করা হইয়াছে, এই চারি প্রকার পদ ছাড়া আর অন্য প্রকার পদ নাই। * 'মনীষী' শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়-লভ্য অর্থ—যাঁহারা মনের প্রেরণা করিতে সমর্থ; সাধারণ মানুষ মনের অধীন,—মনঃ যে দিকে চলে, সাধারণ মানুষ বিচার না করিয়া মনের বেগের অনুগমন করিয়া থাকে; যাঁহারা মনীষী, তাঁহারা সেরূপ করেন না, তাঁহারা মনকেই নিজের ইচ্ছাশক্তির বলে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা নিজের চিত্তশুদ্ধি সম্পাদনের দ্বারা মনকে বশীভূত করিয়াছেন অথবা যাঁহারা বাহ্য বিষয় হইতে চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ করিয়াছেন, তাঁহারাই মনীষী। † এই মন্ত্রটিতে "ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ" এইরূপ বলা হইয়াছে। যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ, তাঁহাদের উদ্দেশে এখানে এই 'ব্রাহ্মণ' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে,—যদি এইরূপ মনে করা যায়, তাহা হইলে এই স্থলে "মনীষিণঃ" এই পদটির কোন প্রয়োজন থাকে না। পূর্ব্বে 'মনীষী' শব্দের যে অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার অনুরূপ যোগ্যতা যাঁহার নাই, তিনি কখনও ব্রহ্মজ্ঞ হইতে পারেন না; ব্রহ্মজ্ঞ ইহা বলাতেই, সেই ব্রহ্মজ্ঞ যে 'মনীষী' ইহাও সূচিত হয়; অতএব ব্রাহ্মণ শব্দের পূর্ব্বোক্ত অর্থ এখানে অভিপ্রেত নহে; যদি ব্রাহ্মণ ভিন্নেরও মনীষী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কিংবা মনীষী ব্যতীতও কেহ ব্রাহ্মণ হইতে পারে, তাহা হইলেই এখানে 'মনীষী' শব্দের প্রয়োগের সার্থকতা ঘটে। সেরূপ অবস্থায় 'ব্রাহ্মণ' শব্দটিকে শুদ্ধ যৌগিক শব্দ মনে না করিয়া জাতিবাচকরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

পর্ব্বতের গুহার ভিতরে যে বস্তু থাকে, তাহা

* পরিমিতানি পরিচ্ছিন্নানি এতাবন্ত্যেবেত্যর্থঃ।—মহাভাষ্য-প্রদীপ।

† মনীষী শব্দের পরবর্ত্তী অর্থ গ্রহণ করিতে হইলে 'মনীষী' শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়-লভ্য যে অর্থ উপরে বলা হইয়াছে, সে অর্থ গ্রহণ করা চলিবে না। সে ক্ষেত্রে 'মনীষী' শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়-লভ্য অর্থ—মনের হিংসাকারী—এইরূপ বলিতে হইবে। গতি, হিংসা এবং দর্শন অর্থে পঠিত ঈষ্ ধাতু (ঈষ, গতিহিংসাদর্শনেষু) হইতে 'মনীষী' শব্দের অন্তর্গত 'ঈষিন্' শব্দের সিদ্ধি হওয়ায় দুই অর্থই প্রকৃতি-প্রত্যয়লভ্য হইয়াছে। চিত্তশুদ্ধিক্রমেণ বশীকর্ত্তারো বিষয়ান্তরেভ্যো ব্যাবৃত্ত্যা হিংসকা বা।—মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত।

অন্ধকারের দ্বারা আবৃত থাকে; এই জন্য সে বস্তু দৃষ্টি-গোচর হয় না। এই গুহাতে অন্ধকারের প্রভাবে যেরূপ বস্তুর জ্ঞান হইতে পারে না, সেইরূপ অজ্ঞানের প্রভাবে যথার্থ বস্তুর জ্ঞান হইতে পারে না। এই জন্য এখানে অজ্ঞান অর্থে গুহা শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। গুহা যেরূপ নিজের অন্তর্বর্ত্তী বস্তুর জ্ঞানের পক্ষে প্রতিবন্ধক-স্বরূপ, সেইরূপ অজ্ঞানও বস্তুর যথার্থ স্বরূপের পরিজ্ঞানের পক্ষে প্রতিবন্ধক। *

"তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি"—ইহার অর্থ—মনুষ্য-সমাজে যত শব্দের ব্যবহার আছে, সে গুলি শব্দরাশির চতুর্থ ভাগ মাত্র অর্থাৎ সাধারণ মনুষ্যগণের শব্দ-জ্ঞানের পূর্ণতা নাই,—তাহাদের সমস্ত শব্দের জ্ঞান নাই। নাম, আখ্যাত, উপসর্গ এবং নিপাত—এই চতুর্বিধ শব্দরাশির প্রত্যেকের তিন ভাগ সাধারণ মনুষ্যের অজ্ঞতাবশতঃ তাহাদের বুদ্ধির অগম্য; এই শব্দরাশির প্রত্যেকের এক ভাগ (চতুর্থ ভাগ) মাত্র সাধারণ মনুষ্যগণ ব্যবহার-ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া থাকে। †

নিরুক্তের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে (নিরুক্ত-পরিশিষ্টে) এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। সে স্থলে এই মন্ত্রের প্রথম তিন পাদের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; চতুর্থ পাদের ব্যাখ্যা না করিয়া সেই পাদের অন্তর্গত 'গুহা' এবং 'তুরীয়' এই দুইটি পদের মূলভূত ধাতুর উল্লেখ করা হইয়াছে। ‡

নিরুক্ত-পরিশিষ্টের ব্যাখ্যায় কিছু বিশেষত্ব আছে; এই ব্যাখ্যায় 'মনীষী' শব্দের অর্থ মেধাবী করা হইয়াছে এবং বিভিন্ন মতের অনুসরণে চারি প্রকার পদের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

প্রণব (ওঁ) এবং তিনটি মহাব্যাহৃতি (ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ) এই চারি প্রকার পদের কথা এখানে বলা হইয়াছে—এইরূপ ব্যাখ্যা আর্ষ *—অর্থাৎ বেদকে লক্ষ্য করিয়া করা হয়। প্রণব এবং তিনটি মহাব্যাহৃতিই বেদের সারভূত; এখানে ইহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্রে চারি প্রকার পদের উল্লেখ করা হইয়াছে—ইহাই এই আর্ষ বা বৈদিক ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য।

নাম, আখ্যাত, উপসর্গ এবং নিপাত—এই চারি প্রকার পদরাশি এই মন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে,—ইহা বৈয়াকরণগণ বলিয়া থাকেন।

মন্ত্র, কল্প (যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধি) ও ব্রাহ্মণ, এই তিন প্রকার এবং চতুর্থ ব্যাবহারিক বাক্ (অর্থাৎ যে সকল শব্দকে আমরা ব্যবহারক্ষেত্রে প্রয়োগ করি), এখানে এই চারি প্রকার শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে—ইহা যাজ্ঞিকগণের মত।

ঋক্, যজুঃ ও সাম—এই ত্রিবিধ বাক্ এবং চতুর্থ ব্যাবহারিক বাক্—এই চারি প্রকার শব্দের কথা এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে—ইহা নিরুক্তবিদ্গণের অভিমত।

সর্পের শব্দ, পক্ষীর শব্দ ও ক্ষুদ্র সরীসৃপের শব্দ,—এই তিন প্রকার শব্দ এবং চতুর্থ ব্যাবহারিক শব্দ—এই চারি প্রকার শব্দ এ স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে—ইহা এক সম্প্রদায়ের মত।

পশুসমূহে, তূণবে (বংশীতে) †, মৃগ-(হরিণ) সমূহে ‡ এবং আত্মাতে বিদ্যমান যে সকল শব্দ, তাহাই এখানে চতুর্বিধ শব্দরূপে উল্লিখিত হইয়াছে, ইহা আত্মবিদ্গণের অভিমত। §

* অজ্ঞানমেব গুহা তস্যামিত্যর্থঃ।—মহাভাষ্য-প্রদীপ।

গুহেতি লুপ্তসপ্তমীকম্ অজ্ঞানার্থকম্।—ব্যাকরণসিদ্ধান্ত-সুধানিধি।

† অমনুষ্যা অবৈয়াকরণাঃ চতুর্থাং পদজাতানামেকৈকস্য চতুর্থং ভাগং বদন্তি সামস্ত্যেন ন জানন্তীতি যাবৎ। ব্যাকরণসিদ্ধান্ত-সুধানিধি।

এখানে প্রণিধান-যোগ্য একটি বিষয় আছে। "তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি"—এই স্থলে ভাষ্যকার মনুষ্যাঃ—মনুষ্যগণ (সাধারণ মনুষ্য-বর্গ) এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

ব্যাকরণসিদ্ধান্তসুধানিধি-কার বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত এই স্থলে "মনুষ্যাঃ" ইহার পরিবর্ত্তে "অমনুষ্যাঃ" এইরূপ পদচ্ছেদ করিয়া "অমনুষ্যাঃ" পদের "অবৈয়াকরণাঃ" এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এস্থলে 'নঞ্'এর অর্থ অপ্রাশস্ত্য;—

তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা।

অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতাঃ।—বৈয়াকরণ-ভূষণসার, প্রৌঢ় মনোরমা প্রভৃতিতে উদ্ধৃত;

‡ চত্বারি বাচঃ পরিমিতানি পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মেধাবিনঃ। গুহায়াং ত্রীণি নিহিতানি নার্থং বেদয়ন্তে। গুহা গূহতেঃ। তুরীয়ং ত্বরতেঃ। নিরুক্ত ১৩।৯

* এখানে 'ঋষি' শব্দের অর্থ বেদ; কৈয়ট ৩।১।৭ সূত্রের মহাভাষ্যের 'ঋষিঃ পঠতি' এই বাক্যের অন্তর্গত ঋষি শব্দের 'বেদ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এই 'আর্ষ' ব্যাখ্যা বেদবাদীদের সম্মত, ইহা সায়ণাচার্য্য এই মন্ত্রের ভাষ্যে (ঋগ্বেদসংহিতা ২।৩।৮।৪৫) বলিয়াছেন। এই মন্ত্রের দেবতা 'বাক্'।

† 'তূণব' শব্দের অর্থ বংশী হইলেও এখানে 'তূণব' শব্দের দ্বারা সমস্ত বাদ্যযন্ত্রকে গ্রহণ করা হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে।

‡ 'মৃগ' শব্দের অর্থ পশু হইলেও, 'পশু' শব্দ পৃথগ্ভাবে উল্লিখিত আছে বলিয়া এ স্থলে 'মৃগ' শব্দের 'হরিণ' অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। ২।৪।১২ সূত্র এবং এই সূত্রের মহাভাষ্য দ্রষ্টব্য।

§ কতমানি তানি চত্বারি পদানি? ওঙ্কারো মহাব্যাহৃতয়শ্চেত্যার্ষম্। নামাখ্যাতে চোপসর্গ নিপাতাশ্চেতি বৈয়াকরণাঃ। মন্ত্রঃ কল্পো ব্রাহ্মণং চতুর্থী ব্যাবহারিকীতি যাজ্ঞিকাঃ। ঋচো যজূংষি সামানি চতুর্থী ব্যাবহারিকীতি নৈরুক্তাঃ। সর্পাণাং বাগ্ বয়সাং ক্ষুদ্রসরীসৃপস্য চতুর্থী ব্যাবহারিকীত্যেকে। পশুষু তূণবেষু মৃগেষ্বাত্মনি চেত্যাত্মপ্রবাদাঃ। নিরুক্ত ১৩।৯

চতুর্ব্বিধ বাক্ সম্বন্ধে এইরূপ বিভিন্ন মতের উল্লেখ করিয়া, তাহার পরে, নিরুক্তপরিশিষ্টে ব্রাহ্মণগ্রন্থ * হইতে বাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে; তাহার দ্বারা আর একটি ব্যাখ্যাও সূচিত হইয়াছে। এই ব্যাখ্যার অভিপ্রায় এই যে, "চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানি"—এই স্থলে 'পদ' শব্দের অর্থ স্বরূপ; তাহা হইলে সমগ্র চরণটির অর্থ হইতেছে,—বাক্যের পরিমিত স্বরূপ চারিটি। এই চারিটি স্বরূপের পরিচয় নিরুক্তপরিশিষ্টে উদ্ধৃত সেই ব্রাহ্মণ-বাক্যে আছে।

তাহাতে বলা হইয়াছে,—বাক্-সৃষ্টির পরে প্রথমে সেই বাক্ চারি প্রকার হইয়াছিল। যে 'বাক্' পৃথিবীতে (=মনুষ্যলোকে) নিহিত আছে, সেই 'বাক্'ই পৃথিবীস্থিত দেবতা অগ্নিতে এবং 'রথন্তর' নামক সামমন্ত্রে নিহিত আছে; যে বাক্ অন্তরীক্ষে (শূন্যলোকে) নিহিত আছে, সেই 'বাক্'ই অন্তরীক্ষস্থিত দেবতা বায়ুতে এবং 'বামদেব্য' নামক সামমন্ত্রে নিহিত আছে; যে 'বাক্' স্বর্গলোকে (শূন্যলোকের উপরে * *) নিহিত আছে, সেই 'বাক্' স্বর্গলোকের দেবতা আদিত্যে 'বৃহৎ' নামক সামমন্ত্রে এবং মেঘে নিহিত আছে। এই 'বাকে'র কিছু অংশ পশুসমূহে নিহিত আছে। এইরূপে চারি স্থানে অবস্থিত হওয়ার পরে যে 'বাক্' অবশিষ্ট ছিল, তাহা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে নিহিত হইয়াছে; এই কারণে ব্রাহ্মণরা দুই 'বাক্' বলিযা থাকেন—দেবতাগণের বাক্ এবং মনুষ্যগণের বাক্। †

নিরুক্ত-পরিশিষ্টের এই শেষোক্ত ব্যাখ্যা অনুসারে দেখা যাইতেছে, চারি প্রকার 'বাকে'র কতক অংশ বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত হওয়ার পরে, তাহার অবশিষ্ট অংশ ব্রাহ্মণ-গণের মধ্যে নিহিত হইয়াছে।

এখানে এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা আবশ্যক। নিরুক্তের ত্রয়োদশ অধ্যায়,—যাহা নিরুক্তপরিশিষ্ট নামে প্রসিদ্ধ—ইহা যাস্কের প্রণীত কি না, এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ করিবার কারণ আছে। 'যাস্কে'র নিরুক্ত 'নিঘণ্টু' নামক বৈদিক শব্দ-কোষের ব্যাখ্যা; নিরুক্তের দ্বাদশ অধ্যায়েই এই ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইয়াছে। যাস্ক নিরুক্তের প্রথমে এই 'নিঘণ্টু'র ব্যাখ্যা করিবেন বলিয়া গ্রন্থের আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, 'নিঘণ্টু'র ব্যাখ্যা সমাপ্ত হওয়ার পরে, তাঁহার আর কোন বক্তব্য থাকিতে পারে না। সুতরাং এই নিরুক্তপরিশিষ্ট যাস্কের রচিত না হওয়াই সঙ্গত। নিরুক্তপরিশিষ্টের প্রথম অংশে (ত্রয়োদশ অধ্যায়ে) দুর্গাচার্য্যের ব্যাখ্যা আছে; এই জন্য এই অংশ পরবর্ত্তী হইলেও দুর্গাচার্য্যের সময়ে প্রামাণিক-রূপে পরিগৃহীত হইয়াছিল, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

ঋগ্বেদসংহিতায় (২।৩।৮।৪৫) এবং অথর্ববেদসংহিতায় (৯।৫।২।২৭) এই মন্ত্রটি পঠিত আছে। অথর্ববেদসংহিতার ভাষ্যে এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যা করা হয় নাই। * আচার্য্য সায়ণ ঋগ্বেদসংহিতার ভাষ্যে এই মন্ত্রটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তিনি প্রথমে নিরুক্ত-পরিশিষ্টের ব্যাখ্যার অনুসরণে এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যা করিয়া, তাহার পরে, অন্য একটি ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই পরবর্ত্তী ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য প্রদর্শিত হইতেছে;—

পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা এবং বৈখরী—এই চারি প্রকার পদ (শব্দ); যাঁহারা মনীষী অর্থাৎ বশীকৃত-চিত্ত ব্রাহ্মণ—যাঁহারা যোগবলে শব্দ-ব্রহ্মকে অধিগত করিয়াছেন—তাঁহারাই এই চারি প্রকার বাক্ জানেন। এই চারি প্রকার 'বাকের' মধ্যে প্রথমোক্ত তিন প্রকার 'বাক্' হৃদয়-গুহাতে নিহিত আছে। 'বৈখরী' নামক চতুর্থ প্রকারের 'বাক্' সকল মনুষ্য ব্যবহারক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া থাকে। †

আমরা এই প্রবন্ধে পূর্ব্বে (মাসিক বসুমতী—পৌষ ১৩৪৮,—৩৪৫-৩৪৬ পৃষ্ঠা) পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। সেই স্থলে এই বিষয়ে আচার্য্য ভর্ত্তৃহরির মত প্রদর্শন করা হইয়াছে। আচার্য্য ভর্ত্তৃহরির মতে ত্রিবিধ বাক্ স্বীকৃত হইয়াছে—পশ্যন্তী, মধ্যমা এবং বৈখরী; ভর্ত্তৃহরির মতে 'পশ্যন্তী'ই 'পরা' বাক্; পশ্যন্তী হইতে ভিন্ন 'পরা' বাক্ স্বীকৃত হয় নাই।

---

* অথাপি ব্রাহ্মণং ভবতি—সা বৈ বাক্ সৃষ্টা চতুর্দ্ধা ব্যভবদ্ এষ্বেব লোকেষু ত্রীণি পশুষু তুরীয়ম্। যা পৃথিব্যাং সাঽগ্নৌ সা রথন্তরে। যাঽন্তরিক্ষে সা বায়ৌ সা বামদেব্যে। যা দিবি সাঽদিত্যে সা বৃহতি সা স্তনয়িত্নৌ। অথ পশুষু। ততো যা বাগত্যরিচ্যত তাং ব্রাহ্মণেষ্বদধুঃ, তস্মাদ্ ব্রাহ্মণা উভয়ীং বাচং বদন্তি যা চ দেবানাং যা চ মনুষ্যাণাম্ ইতি।—নিরুক্ত (১৩।৯)

কোন্ ব্রাহ্মণগ্রন্থ হইতে এই অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই।

* * নিরুক্তে (৭।৫) দেবতা-বিচার প্রসঙ্গে দেবতাদের তিনটি স্থানের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং স্বর্গ; অগ্নিদেবতার স্থান পৃথিবী, বায়ুদেবতার স্থান অন্তরীক্ষ, এবং সূর্য্য-দেবতার স্থান স্বর্গ। ইহার দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, পৃথিবীর উপরে যত দূর পর্য্যন্ত বায়ুসঞ্চার আছে, সেই স্থানই যাস্কের মতে অন্তরীক্ষ; তাহার পরে স্বর্গ (দিব্)।

† নিরুক্তের টীকাকার দুর্গাচার্য্যের ব্যাখ্যা অনুসারে দেবতা-গণের বাক্ বৈদিকী বাক্ এবং মনুষ্যগণের বাক্ লৌকিকী বাক্।

* সায়ণাচার্য্য অথর্ববেদসংহিতার সকল মন্ত্রের ব্যাখ্যা করেন নাই, ইহা অভিজ্ঞ পাঠকগণের অবিদিত নহে।

† শাক্ত দার্শনিক ভাস্কর রায়, 'চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি'—এই মন্ত্রটিকে পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা এবং বৈখরী এই চতুর্ব্বিধ 'বাকে'র প্রতিপাদক প্রমাণরূপে 'বরিবস্যারহস্যপ্রকাশে' (২।৬১—৬৮) এবং 'সৌভাগ্যভাস্করে' (ললিতাসহস্রনামভাষ্য ১৩২) উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বাক্যপদীয়ের টীকাকার পুণ্যরাজ বাক্যপদীয়-প্রথম-কাণ্ডের ১৪৪ শ্লোকের * ব্যাখ্যায় 'পশ্যন্তী'কেই পরম সূক্ষ্ম 'বাক্' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; এই প্রসঙ্গে তিনি ইহা বলিতে ভুলেন নাই যে, ইহা সকলের মত নহে, কিন্তু ইহা এক সম্প্রদায়ের মত—"একেষামাগমঃ"। † কাশ্মীরক শৈবাচার্য্যগণ এই মতটিকেই বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ‡ পুণ্যরাজ বাক্যপদীয়-প্রথমকাণ্ডের ১৪ শ্লোকের § ব্যাখ্যায় পশ্যন্তী অপেক্ষাও সূক্ষ্ম 'পরা প্রকৃতি'র উল্লেখ করিয়াছেন। ¶ ইহার দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, ভর্ত্তৃহরির পরবর্ত্তী বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ে এ বিষয়ে মত-ভেদ উপস্থিত হইয়াছিল।

কাশ্মীরদেশের প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের আচার্য্যগণ পশ্যন্তী হইতে সূক্ষ্ম অবস্থা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে পরমশিব প্রকাশস্বরূপ; সেই পরমশিবের অনুগ্রহময়ী 'বিমর্শশক্তি' পরা বাক্। ইঁহাদের মতে শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে কোনরূপ ভেদ স্বীকৃত হয় নাই, ইঁহারা শক্তি এবং শক্তিমানের অভেদ স্বীকার করিয়াছেন; সুতরাং শক্তিমান্ পরমশিব হইতে এই বিমর্শশক্তি অভিন্ন; এই বিমর্শশক্তি পরমেশ্বরের ইচ্ছাশক্তি এবং ইহাই তাঁহার স্বাতন্ত্র্যশক্তি। এই ইচ্ছাশক্তিই জ্ঞানরূপে প্রকটিত হইয়া পরে ক্রিয়ারূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; পশ্যন্তী পরমেশ্বরের এই জ্ঞানশক্তি হইতে অভিন্ন; 'মধ্যমা' বাক্ পরমেশ্বরের ক্রিয়াশক্তিস্বরূপ। এই প্রত্যভিজ্ঞামতে 'পশ্যন্তী' অবস্থায় বাচ্য অর্থ ও বাচক শব্দের যে পরস্পর ভেদ, সেই ভেদ প্রকাশিত হয় না, কিন্তু এই উভয়ের অভেদই প্রকাশিত হইয়া থাকে; মধ্যমা অবস্থায় যদিও বাচ্য এবং বাচকের পরস্পর ভেদ প্রকটিত হয়, তথাপি সে অবস্থায় অভেদও প্রকাশিত হয়; এই অবস্থায় ভেদের স্পষ্টভাবে প্রকাশ হয় না, অভেদেরই প্রাধান্য থাকে। বৈখরী অবস্থায় বাচ্য এবং বাচকের ভেদ স্পষ্টভাবে অবভাসিত হয়; এই অবস্থায় শব্দের মধ্যে বর্ণের ক্রম শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে; এই বৈখরী কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি উচ্চারণ-স্থানে বায়ুর সংযোগ হইলে, অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। অভিনব গুপ্ত-প্রণীত 'তন্ত্রালোকে' পশ্যন্তী, মধ্যমা এবং বৈখরীর মধ্যে স্থূল, মধ্য ও সূক্ষ্ম—এই তিন প্রকার ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। *

ইহাদের মধ্যে বৈখরী শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য; 'মধ্যমা' মানস-প্রত্যক্ষের বিষয়; 'পশ্যন্তী' যোগিগণের প্রত্যক্ষের বিষয় এবং 'পরা' বাক্ পরমেশ্বরের স্বরূপের অন্তর্গত; † এই জন্য এই 'পরা বাক্' যোগিগণের নির্ব্বিকল্পক সমাধির বিষয়।

এ বিষয়টি এখানে প্রাসঙ্গিক; এই জন্য এখানে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা বাঞ্ছনীয় নহে। যাঁহারা জিজ্ঞাসু, তাঁহারা শাক্তসম্প্রদায়ের তথা দ্বৈত এবং অদ্বৈত শৈব সম্প্রদায়ের গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিলে এ বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারিবেন।

কৈয়ট 'মহাভাষ্যপ্রদীপে' এই স্থলে ভাষ্যের ব্যাখ্যায় পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা এবং বৈখরীর কোন উল্লেখ করেন নাই; কিন্তু নাগেশভট্ট 'মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোতে ইহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। নাগেশভট্টের এই ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য এইরূপ মনে করা যাইতে পারে;—

মহাভাষ্যে "নামাখ্যাতোপসর্গনিপাতাশ্চ" এই স্থলে 'চ' কারের প্রয়োগ করা হইয়াছে। নাম, আখ্যাত, উপসর্গ এবং নিপাত—যাহা এখানে মহাভাষ্যে উল্লিখিত আছে, ইহা ব্যতীত 'বাকে'র অন্য প্রকার ভেদও আছে,—ইহা এই 'চ'কারের দ্বারা সূচিত করা হইয়াছে। এই ভাবে নাগেশভট্ট মহাভাষ্যকারের ব্যাখ্যা হইতে আগম-শাস্ত্রানুমোদিত অভিপ্রায় নিষ্কাসিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মহাভাষ্যকারের এইরূপ তাৎপর্য্য কল্পনা করা উচিত কি না, তাহা বিচারশীল সুধীগণের চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

ব্যাকরণের অধ্যয়নের প্রয়োজনের প্রতিপাদনের প্রসঙ্গে এই বেদ-মন্ত্রটির প্রদর্শন করার সার্থকতা কি,—

---

* বৈখর্য্যা মধ্যমায়াশ্চ পশ্যন্ত্যাশ্চৈতদদ্ভুতম্।
অনেক তীর্থভেদায়া ত্রয্যা বাচঃ পরং পদম্॥
—বাক্যপদীয় ১।১৪৪

† পশ্যন্তী রূপমনপভ্রংশং লোকব্যবহারাতীতম্। তস্যা এব বাচো ব্যাকরণেন সাধুত্বজ্ঞানলভ্যেন শব্দপূর্ব্বেণ যোগেনাধিগম ইত্যেকেষামাগমঃ।—বাক্যপদীয়-পুণ্যরাজটীকা ১।১৪৪

‡ দ্রষ্টব্য—আচার্য্য সোমানন্দনাথপ্রণীত শিবদৃষ্টি ২।১-২ এবং আচার্য্য ক্ষেমেন্দ্র প্রণীত প্রত্যভিজ্ঞা-হৃদয় ৮ম সূত্র।

§ তদ্দ্বারমপবর্গস্য বাঙ্মলানাং চিকিৎসিতম্।
পবিত্রং সর্ব্ববিদ্যানামধিবিদ্যং প্রকাশতে॥—বাক্যপদীয় ১।১৪

¶ শব্দস্বরূপতত্ত্বজ্ঞঃ ক্রমসংহারেণ যোগং লভতে, সাধুপ্রয়োগাচ্চাভিব্যক্তধর্ম্মবিশেষো মহান্তং শব্দাত্মানমভিসম্ভবং কৈবল্যং প্রাপ্নোতি। সোঽব্যতিকীর্ণাং বাগবস্থাং মধ্যমাখ্যামধিগম্য বাখিকারাণাং প্রকৃতিং পশ্যন্ত্যাখ্যাং প্রতিভামুপৈতি, তস্মাচ্চ সত্তামাত্রাৎ প্রতিভাখ্যাচ্ছব্দপূর্ব্বযোগভাবনাভ্যাসাৎ প্রত্যস্তমিত সর্ব্ববিকারোল্লেখাং পরাং প্রকৃতিং প্রতিপদ্যতে। বাক্যপদীয়-পুণ্যরাজটীকা ১।১৪

* দ্রষ্টব্য—আচার্য্য অভিনবগুপ্ত-প্রণীত 'পরাত্রিংশিকা'-ব্যাখ্যা ১—২,
আচার্য্য অভিনবগুপ্তবিরচিত 'তন্ত্রালোক' এবং তাহার ব্যাখ্যা ৩।২৩৬—২৪৭

† মহেশ্বরানন্দপ্রণীত প্রত্যভিজ্ঞামতের প্রামাণিক গ্রন্থ প্রাকৃত গাথা-নিবদ্ধ "মহার্থমঞ্জরীতে এবং তাহার সংস্কৃত-ভাষা-নিবদ্ধ "পরিমল" নামক ব্যাখ্যায় এ বিষয়ে কিছু বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়—মহার্থমঞ্জরী ৫০ শ্লোক এবং তাহার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

তাহা মহাভাষ্যকার বলেন নাই। তিনি এই প্রকরণে অন্য স্থলে প্রত্যেকটি প্রমাণের উল্লেখ করার পরে, সেই প্রমাণ প্রদর্শনের উদ্দেশ্য কি, তাহা বলিয়াছেন; কিন্তু এখানে তাহার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যাইতেছে। আমাদের মনে হয়, এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা হইতেই এখানকার যাহা বক্তব্য,—তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে,—এইরূপ মনে করিয়া মহাভাষ্যকার এ বিষয়ে স্বতন্ত্র ভাবে কিছু বলেন নাই।

যাঁহারা 'মনীষী'—বিদ্বান্—বৈয়াকরণ, তাঁহারাই শব্দের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন; যাঁহারা 'মনীষী' নহেন, তাঁহারা শব্দের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইবার যোগ্য নহেন; নিখিল শব্দের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হওয়ার জন্য ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্ত্তব্য—ইহা সূচিত করিবার উদ্দেশে এখানে এই মন্ত্রটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

মূল।—"উতত্বঃ"

উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচম্
উত ত্বঃ শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাম্।
উতো ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে
জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ॥

(ঋক্‌সংহিতা ৮।২।২৩।৪)

অপি খল্বেকঃ পশ্যন্নপি ন পশ্যতি বাচম্। অপি খল্বেকঃ শৃণ্বন্নপি ন শৃণোত্যেনাম্। অবিদ্বাংসমাহার্দ্ধম্। 'উতো-ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে' তনুং বিবৃণুতে। 'জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ' তদ্ যথা জায়া পত্যে কাময়মানাঃ সুবাসাঃ স্বমাত্মানং বিবৃণুতে এবং বাগ্ বাগ্বিদে স্বমাত্মানং বিবৃণুতে।

বাঙ্নো বিবৃণুয়াদাত্মানমিত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। "উতত্বঃ"

অনুবাদ।—অন্য (=কোন ব্যক্তি) 'বাক্'কে দেখিয়াও দেখিতে পায় না, অন্য (=কোন ব্যক্তি) ইহাকে ('বাক্'কে) শুনিয়াও শোনে না। অন্যকে (=কোন ব্যক্তিকে) (বাক্) শরীর (—নিজের স্বরূপ) বিসারিত (প্রকাশিত) করিয়া দেয়; যেমন কামনাবতী (ঋতুস্নাতা) জায়া শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া পতির নিকটে (নিজের শরীর প্রকাশিত করে।)

এক (ব্যক্তি) 'বাক্'কে দেখিয়াও দেখে না, এক (ব্যক্তি) ইহাকে (='বাক্'কে) শুনিয়াও শোনে না। (এই) অর্দ্ধ (মন্ত্র) অবিদ্বান্‌কে (অবৈয়াকরণকে) বলিতেছে। 'অন্য (ব্যক্তির) (নিকট) তনুকে বিসারিত করে'—তনুকে (নিজের স্বরূপকে) বিবৃত করে; 'পতির নিকটে শোভন-বস্ত্র-পরিহিতা কামনাবতী জায়ার ন্যায়'—যেমন কামনাবতী শোভন-বস্ত্র-পরিহিতা জায়া পতির নিকটে নিজের শরীরকে বিবৃত করে, এইরূপ 'বাক্' বাগ্বিদের (বৈয়াকরণের) নিকট নিজের শরীরকে বিবৃত করে।

'বাক্' আমাদের (নিকট) তনুকে (নিজের স্বরূপকে) বিবৃত করিবে, এই জন্য ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্ত্তব্য।

মন্তব্য।—এই মন্ত্রে 'তন্বম্' এবং 'বিসস্রে'—এই দুইটি বৈদিক প্রয়োগ আছে। 'তন্বম্' পদটি 'তনু' শব্দের দ্বিতীয়ার একবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। * 'বিসস্রে' এই প্রয়োগটিতে পরোক্ষ অতীতকালের বোধক 'লিট্' লকার প্রযুক্ত হইয়াছে। "বিসস্রে" এই স্থানে এই 'লিট্' লকারের দ্বারা পরোক্ষ অতীত কালের প্রতীতি হইতেছে না, কিন্তু বর্ত্তমানকালের প্রতীতি হইতেছে.—ইহা পতঞ্জলির ব্যাখ্যা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি। বেদে এইরূপ লকারের ব্যত্যয় হইয়া থাকে—এক 'ল'কারে অর্থে অন্য 'ল' কারের প্রয়োগ হয়,—ইহা সূত্রকারের সম্মত। †

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'ত্ব' শব্দটি সর্ব্বনাম অকারান্ত শব্দ; ইহার অর্থ—অন্য। যদিও লৌকিক সংস্কৃতে এই শব্দটির প্রয়োগ নিষিদ্ধ নহে, তথাপি ইহার প্রয়োগ লৌকিক সংস্কৃতে প্রায় দেখা যায় না, বেদেই ইহার বহুল প্রয়োগ লক্ষিত হয়।

এই মন্ত্রে পঠিত 'উত' শব্দ 'অপি' শব্দের সমানার্থক।

ব্যাখ্যা। এই মন্ত্রের প্রথমার্দ্ধের দ্বারা অবিদ্বানের (অবৈয়াকরণের) নিন্দা করা হইয়াছে,—যাহারা ব্যাকরণ জানে না, তাহাদের অর্থজ্ঞান নাই; সুতরাং তাহারা শব্দ শুনিলেও তাহার অর্থ বুঝিতে পারে না বলিয়া তাহাদের সেই শব্দজ্ঞান ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। মন্ত্রের উত্তরার্দ্ধে বিদ্বান্ অর্থাৎ বৈয়াকরণের প্রশংসা করা হইয়াছে। সাধ্বী নারী পরপুরুষের নিকট স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা হইলেও, ঋতুস্নানের পরে পবিত্র বস্ত্র ধারণ করিয়া, সে নিজের পতির নিকট নিজকে প্রকটিত করিতে কোন সঙ্কোচ রাখে না, তাহার পতিকে তাহার অন্তর পর্য্যন্ত জানিতে দিতে কোনরূপ দ্বিধা করে না। এইরূপ যে অবৈয়াকরণ, তাহার নিকট 'বাক্' নিজের স্বরূপকে কোন কালে প্রকাশিত করে না, নিজকে সংবৃত করিয়া রাখে; যে বৈয়াকরণ, তাহার নিকট বাক্ অসংকোচে নিজের স্বরূপকে স্পষ্টরূপে প্রকাশিত করিয়া দেয়। এই উপমার দ্বারা ইহা সূচিত হইতেছে যে, ব্যাকরণের অধ্যয়নই 'বাক্' অর্থাৎ শব্দকে পূর্ণরূপে জানিবার একমাত্র উপায়।

কিছু দিন পূর্ব্বে (ইংরেজী ১৯২৭ সালে) ত্রিবেন্দ্রম্ হইতে ভরতমিশ্র-প্রণীত "স্ফোট-সিদ্ধি" নামক (Trivandrum Sanskrit Series No LXXXIX) একখানি

* ইয়ঙাদিপ্রকরণে তন্বাদীনাং ছন্দসি বহুলম্ (কাত্যায়ন-বার্ত্তিক)।—ইয়ঙাদিপ্রকরণে তন্বাদীনাং ছন্দসি বহুলমুপসংখ্যানং কর্ত্তব্যম্। তন্বং পুষেম, তনুবং পুষেম। মহাভাষ্য ৬।৪।৭৭ সিদ্ধান্তকৌমুদীতে এই বার্ত্তিকের "ইয়ঙাদিপ্রকরণে" এই অংশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল "তন্বাদীনাং ছন্দসি বহুলম্" এই অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য—সিদ্ধান্তকৌমুদী বৈদিকপ্রক্রিয়া ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

† ছন্দসি লুঙ্‌লঙ্‌লিটঃ ৩।৪।৬

গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। * এই গ্রন্থে বিভিন্ন তিনটি পরিচ্ছেদ আছে; এই তিনটি পরিচ্ছেদেই বিভিন্ন প্রমাণের দ্বারা বর্ণ হইতে অতিরিক্ত "স্ফোট" সাধন করা হইয়াছে। প্রথম পরিচ্ছেদের নাম প্রত্যক্ষ-পরিচ্ছেদ; এই পরিচ্ছেদে প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা স্ফোটের সিদ্ধি করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নাম অর্থ-পরিচ্ছেদ; এই পরিচ্ছেদে অর্থাপত্তি প্রমাণের সাহায্যে স্ফোটের সাধন করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদের নাম আগম-পরিচ্ছেদ; এই পরিচ্ছেদে স্ফোট-সিদ্ধির অনুকূলে বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ প্রমাণরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই তৃতীয় পরিচ্ছেদের আরম্ভেই এই "উতত্বঃ" ইত্যাদি মন্ত্র স্ফোট-সিদ্ধির অনুকূল ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই মন্ত্রের

"উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচম্"

এই প্রথম পাদের ব্যাখ্যায় † বলা হইয়াছে, "স্ফোট" নামক অখণ্ড নিত্য শব্দে এই বিশ্ব-প্রপঞ্চ কল্পিত হইয়াছে; সুতরাং "স্ফোট"ই এই বিশ্বপ্রপঞ্চরূপে প্রতীয়মান হইতেছে; অতএব এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-প্রপঞ্চ "স্ফোটের" "বিবর্ত্ত"। ‡

কোন ব্যক্তি এই "বিবর্ত্ত"রূপে অবস্থিত বাক্তত্ত্বকে প্রত্যক্ষ করিয়াও তাহার যথার্থ স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করে না, কিন্তু 'বাক্তত্ত্ব' ভিন্ন অন্য বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিতেছি, এইরূপ মনে করে; সুতরাং ইহারা 'বাক্তত্ত্ব'কে প্রত্যক্ষ করিয়াও, তাহার যথার্থ স্বরূপের বিষয়ে অজ্ঞ থাকে বলিয়া 'বাক্তত্ত্ব'কে দেখিয়াও বস্তুতঃ দেখিতে পায় না। এই 'বাক্তত্ত্ব' অর্থকে প্রকাশ করিয়া থাকে; এই অর্থ-প্রকাশ-ব্যাপারে বাক্তত্ত্বের অভিব্যক্তির অপেক্ষা আছে। এই অভিব্যক্তি-ব্যাপারে পূর্ব্ববর্ত্তী ধ্বনিসমূহের দ্বারা স্ফোটের অস্ফুট অভিব্যক্তি হয়; সেই অস্ফুট অভিব্যক্তি হইতে উৎপন্ন সংস্কারের সহায়তায় পরবর্ত্তী ধ্বনিসমূহ হইতে ক্রমশঃ স্ফোটের স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। সেই অভিব্যক্ত স্ফোটতত্ত্বকে অখণ্ড পদ, অখণ্ড বাক্য এবং অখণ্ড মহাবাক্যরূপে শ্রবণ করিয়াও, কেহ কেহ তাহার যথার্থ স্বরূপের নিশ্চয় করিতে পারে না; তাহারা অভিব্যঞ্জক ধ্বনির ভেদ, ক্রম এবং বিচ্ছেদ (বিরাম) স্ফোটে আরোপ করিয়া প্রতারিত হয়; সুতরাং স্ফোটের যথার্থ স্বরূপ তাহাদের বুদ্ধি হইতে দূরে থাকিয়া যায়; এই জন্য ইহারা 'বাক্তত্ত্ব'কে শ্রবণ করিয়াও বস্তুতঃ তাহাকে শ্রবণ করে না। *

ব্যাকরণশাস্ত্রে প্রকৃতি-প্রত্যয়াদির বিভাগের দ্বারা শব্দের সাধন করা হইয়াছে। ব্যাকরণশাস্ত্রে যে সকল কার্য্যের বিধান করা হইয়াছে, তাহাকে 'সংস্কার' নামে অভিহিত করা হয়। যিনি এই 'সংস্কারে'র জ্ঞান লাভ করিয়া, যোগাভ্যাসের দ্বারা অন্তঃকরণের শুদ্ধি সম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহার নিকট 'বাক্' নিজের শরীরকে (স্বরূপকে) প্রকটিত করে। অপশব্দ (অশুদ্ধ অপভ্রংশ শব্দ) এবং বর্ণ এই দুইটি আবরণের দ্বারা 'বাকে'র যথার্থ স্বরূপ আচ্ছাদিত হইয়া আছে বলিয়া 'বাকে'র এই যথার্থ স্বরূপের গ্রহণ সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে সম্ভাবিত নহে; যিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অন্তঃকরণের শুদ্ধতা সম্পাদন করিয়াছেন; তাঁহার সম্মুখ হইতে এই দুইটি আবরণ অপসারিত হয়; এই জন্য 'বাক্' তাঁহার নিকট নিজের স্বরূপকে প্রকাশিত করিয়া দেয়। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রে ঋতুস্নাতা জায়ার যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, ভরতমিশ্র তাহারও মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা এস্থলে এই দৃষ্টান্তের সেই 'বিশদ'

---

* সুপ্রসিদ্ধ আচার্য্য মণ্ডনমিশ্র-প্রণীত অন্য একখানি "স্ফোটসিদ্ধি" (Madras University Sanskrit Series No. 6) আছে; সেই গ্রন্থ এই ভরতমিশ্র-প্রণীত "স্ফোটসিদ্ধি" হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই দুইখানি গ্রন্থই বৈয়াকরণগণের সিদ্ধান্তে স্বীকৃত স্ফোটের সমর্থনের উদ্দেশে রচিত হইলেও, আচার্য্য মণ্ডন প্রধানভাবে কুমারিলভট্টপ্রণীত শ্লোকবার্ত্তিকে (১।১।৫) বিস্তৃতভাবে যে স্ফোটের খণ্ডন করা হইয়াছে, তাহারই উত্তর দিয়াছেন এবং আনুষাঙ্গিক ভাবে বৌদ্ধ আচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তি তাঁহার "প্রমাণবার্ত্তিকে" (১ম পরিচ্ছেদ—২৫৩—২৬১) যে স্ফোটের খণ্ডন করিয়াছেন, তাহারও উত্তর দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি স্ফোট স্থাপনের যুক্তি প্রদর্শন করিলেও, তাহা অপেক্ষা স্ফোট-খণ্ডনের সমাধানের দিকেই তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ভরতমিশ্র-প্রণীত "স্ফোটসিদ্ধি"তে স্ফোটের স্থাপনের উদ্দেশেই বিশেষ যত্ন করা হইয়াছে।

† ত্বঃ কশ্চিদ্ বাচং স্বাভেদাবসেয়ভুধরাদিবিবর্ত্তাত্মনাঽবস্থিতাং পশ্যন্নপি বিপর্য্যাসত্বাদ্ বাচং পশ্যামীতি নানুসন্ধত্তে; অপি ত্বন্যদেব পশ্যামীত্যভিমন্যত ইতি ফলতো ন পশ্যতি।

—ভরতমিশ্রপ্রণীত স্ফোটসিদ্ধি, আগমপরিচ্ছেদ ২৭ পৃষ্ঠা।

‡ কোন বস্তুর মধ্যে বাস্তব কোন বিকার না হইয়াও, যদি তাহা অন্যথারূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে 'বিবর্ত্ত' বলে। যে স্থলে রজ্জুর মধ্যে কোনরূপ বিকার না হইয়াও, সেই রজ্জু সর্পরূপে প্রতীয়মান হয়, সে ক্ষেত্রে এই সর্পকে রজ্জুর 'বিবর্ত্ত' বলা হয়। এই অখণ্ড 'স্ফোট'রূপ বাক্তত্ত্বের কোনরূপ বিকার না হইয়াও, তাহা বিশ্বপ্রপঞ্চরূপে প্রতীয়মান হয়,—যাঁহারা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন,—তাঁহাদের মতে এই বিশ্বপ্রপঞ্চ বাক্তত্ত্বের বিবর্ত্ত।

'বিবর্ত্ত' শব্দের পরিণাম অর্থে ব্যবহার ব্রহ্মসূত্র শাঙ্করভাষ্যে (২।২।১) দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু এখানে সে অর্থে 'বিবর্ত্ত' শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই।

* তথা অন্যো বাচমর্থং ব্রুবাণাং পূর্ব্বপূর্ব্বনাদপ্রভাবিতাব্যক্তজ্ঞানজনিতবাসনাসনাথৈরুত্তরোত্তরনাদৈঃ ক্রমেণ স্ফুটীভবন্তীমেকং পদমেকং বাক্যমেকং মহাবাক্যমিত্যাদিরূপেণ শৃণ্বন্নপি ব্যঞ্জকারোপিতনানাত্বীয়কভেদ-ক্রম-বিচ্ছেদ বিপ্রলব্ধতয়া 'গকারৌকারবিসর্জনীয়া ইতি ভগবানুপবর্ষঃ' ইতি ব্রুবাণোঽপলপতীতি ফলতো ন শৃণোতি।—ভরতমিশ্রপ্রণীত স্ফোটসিদ্ধি, আগমপরিচ্ছেদ ২৮ পৃষ্ঠা।

ব্যাখ্যার অভিপ্রায় সঙ্কলন করা তত আবশ্যক মনে করিলাম না। *

এই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করিবার যোগ্য একটি বিষয় আছে। ভরতমিশ্র এই মন্ত্রের মহাভাষ্যকারের ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই—তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। অনুসন্ধিৎসুগণ ভরতমিশ্রের স্ফোটসিদ্ধির আগম-পরিচ্ছেদে এই খণ্ডন দেখিতে পাইবেন এবং নিজের বিচার-বুদ্ধির সহায়তায় সেই খণ্ডনের মূল্য অবধারণ করিবেন।

শ্রীহারাণচন্দ্র শাস্ত্রী।

* উতো ত্বস্মৈ অপাক্তস্মৈ ব্যাকরণসংস্কারপূর্ব্বকযোগশোধিতান্তঃকরণায় তাত্ত্বিকীং তনুমাত্মীয়াং বিসস্রে অপশব্দবিপর্য্যাসেন বর্ণবিপর্য্যাসেন চ সঙ্কুলাং তত্তত্স্থাপনয়েন প্রকাশয়তে। যথা ঋতুস্নাতা জায়া প্রাক্তনং রজোদূষিতং বসনমপাস্য সুবাসাঃ সতী সম্ভোগেচ্ছুঃ প্রণয়প্রকর্ষাপনীয়মানত্রপা তস্মিন্নপি বাসসি শনৈঃ স্রংসমানে স্বাং তনুমনবয়বেন পরিণায়কায় বিবৃণুতে, তদ্বদিয়ং বাণী ব্যাকরণতীর্থস্নানাপনীতদুষ্টশব্দাচ্ছাদনা প্রয়োগনিয়মানুমজ্জমানশোভনবর্ণবসনা সতী উশতী প্রসীদন্তী সতী যোগাভ্যাসরূপপ্রণয়াতিশয়শিথিলীকৃতাজ্ঞানলজ্জা বর্ণাকারবিপর্য্যাসবসনেঽপি শনৈঃ স্রংসমানে স্বাং তনুমনবয়বেন শাব্দিকপরিণায়কায় বিবৃণুত ইত্যুমার্থঃ।
—ভরতমিশ্রপ্রণীত স্ফোটসিদ্ধি আগমপরিচ্ছেদ ২৮—২৯ পৃষ্ঠা।

অনাগত ভগবান্

মানুষ যে-দিন প্রথম চিনিল তারে
আকাশের পানে দু'বাহু বাড়ায়ে
ডেকেছিল বারে বারে ;—
পায় নাই সন্ধান,
ধূসর ধূলায় তাই আজো কাঁদে
আত্মার অভিমান।

সম্মুখে তার ক্ষুধিত করাল পিছনে অন্ধকার,
মাঝখানে হয় ছন্দ-পতন জীবনের বার বার,
বিশ্বাস তবু করেনি কখন অনভিশপ্ত দান—
মাঝে মাঝে তাই ফুৎকারী উঠে ভগবান্ ভগবান্ !
নিখিলের সেই প্রথম প্রভাত মনে পড়ে বার বার,
ধূসর ধূলায় শত পরাজয় করে অনলোদ্গার,
স্বপ্নের ঘোরে উঠে যেন কার সুকঠিন আহ্বান—
'আর দেরী নয় এইবার তোর সুরু হ'ক অভিযান !'
ভাষা খুঁজে বুঝি পেল না মানুষ উত্তর দিতে তার,
পাষাণের বুকে দেখা-পাওয়া গেল প্রাণহীন দেবতার !
সে পাষাণ আজো নিথর নীরব অতীত কালের মত,
বুকে জাগে শুধু মৃত পূজারীর ব্যর্থতা শত শত।
জাগিবে না কভু মাটীর ঠাকুর ধরার ধূলির পরে !
তবু তার লাগি বলিদান চলে যুগ-যুগান্ত ধরে।
আদিম যাহারে সৃষ্টি করিল আঁধারের কারাগারে,
আলোর মাঝারে তাহারে মানুষ খুঁজে মরে বারে বারে।
চির মিথ্যারে সত্য করিয়া সম্মুখে রাখি ধরি—
কালের রাখাল নব-ইতিহাস চলে প্রতিদিন গড়ি।
মাঝে মাঝে শুধু ক্রন্দন করে মানুষের হাহাকার,
মনে হয় তাই সুপ্তি ভাঙ্গিছে অনাগত দেবতার ;
পাষাণ জাগেনি, তবু মনে হয় জাগিয়াছে ভগবান্,
পাপ-পঙ্কিল জীবনের পথে শুনি তার আহ্বান।
চার্চ্চ, মসজিদ, মন্দিরে নয় মৃতের বেদীর পরে
অশরীরী কোন আত্মার কায়া আনাগোনা যেন করে ;
শীতের প্রকোপে ফুটের উপর কাঁপে মানুষের ভ্রূণ,
আগুনের আঁচে লোহার চাকায় ঝরে মজুরের খুন !
সাত শত ফুট মাটীর তলায় কয়লা-খনির খাদে
চির-বিবসনা ক্ষুধায় কাতর নব দ্রৌপদী কাঁদে !
অন্ধকূপেতে মাংসের দরে দেহ বিক্রয় করে,
মানুষের দেবী লাঞ্ছনা সয় যুগ-যুগান্ত ধরে !
অতীতের যত ভুলের ফসল আজিও হয়নি তোলা,
কবরখানার আকুল গন্ধে রক্তে জেগেছে দোলা।

মানুষের মাঝে খুঁজিছে মানুষ শক্তির হোমানল ;
আসে ভগবান্ চড়ি জয়রথে ধরা করে টলমল !

শ্রীঅমরনাথ ভট্ট।

পেট্রল পরিবেশন

পেট্রল বর্ত্তমান সভ্যতার একটি শ্রেষ্ঠ উপকরণ। শিল্প-বাণিজ্যে এবং যানবাহন পরিচালন-ব্যাপারে ইহার প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক :—আধুনিক যুদ্ধে ইহার ব্যবহার অপরিসীম এবং অপরিহার্য্য। আধুনিক যুদ্ধের প্রধান অঙ্গ বিমান-বাহিনী। পেট্রল ব্যতীত বিমান-পরিচালনা অসম্ভব। অর্ণবপোত, চলমান-স্থল-দুর্গ (Tanks) ও বড় বড় কল-কারখানার পরিচালন-কার্য্যে পেট্রলই প্রধান ইন্ধন। যুদ্ধের ক্রমবর্দ্ধমান প্রয়োজনবশতঃ যুদ্ধেতর প্রয়োজনের পরিমাণ হ্রাস করিতে হইতেছে; কারণ, বৃটিশ সাম্রাজ্যের সীমামধ্যে পেট্রলের উৎস ও পরিমাণ সঙ্কীর্ণ। এই হেতু সম্প্রতি ভারত সরকার পেট্রল পরিবেশনের ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। অনর্থক ব্যয় এবং অপচয় নিবারণ করিয়া, আমাদের আয়ত্তাধীন পেট্রলের সঙ্কীর্ণ ভাণ্ডারকে যথাসম্ভব দীর্ঘস্থায়ী করিবার প্রচেষ্টাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

বিগত মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ হইতেই পেট্রলের ব্যবহার অত্যধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। 'পেট্রোলিয়াম্' নামক খনিজ-তৈল হইতেই পেট্রলের উৎপত্তি : সহজ-দাহ্য খনিজ-তৈলের মধ্যে ইহার পরিমাণ প্রচুর। গত পঞ্চাশ বর্ষ যাবৎ ইহা প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইহার বণিজ-মূল্য নিতান্ত নগণ্য ছিল। উক্ত খৃষ্টাব্দেই পেট্রোলিয়াম্-পরিস্রুতির উপায় উদ্ভাবিত হয় : এবং তদবধি রেলট্রেণে ও জাহাজে—বিশেষতঃ, যুদ্ধ-জাহাজে ইহার ব্যবহার দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের সমগ্র জগতের পেট্রোলিয়ামের পরিমাণ ছিল—বিয়াল্লিশ গ্যালনী (এক গ্যালন প্রায় সাড়ে তিন সের) ব্যারেলের (পিপার) ৪০,০৪,৮৩,৪৮৯ (চল্লিশ কোটি, চার লক্ষ, তিরাশী হাজার, চারি শত, উননব্বই) ব্যারেল। এই সমষ্টির শতকরা ৬৭ অংশ, অর্থাৎ ২,৬৫,৭৬,২৫৩ (দুই কোটি, পয়ষট্টি লক্ষ, ছিয়াত্তর হাজার, দুই শত তিপ্পান্ন) পিপা ছিল আমেরিকার; ৬,৭০,২০,৫২২ (ছয় কোটি, সত্তর লক্ষ, কুড়ি হাজার, পাঁচ শত বাইশ) পিপা রাশিয়ার, এবং ২,১১,৮৮,৪২৭ (দুই কোটি, এগার লক্ষ, অষ্টাশী হাজার, চারি শত সাতাশ) পিপা মেক্সিকোর। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে মেক্সিকো দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে, এবং তদবধি ইরাণও প্রচুর পরিমাণে পেট্রোলিয়াম সরবরাহ করিয়া আসিতেছে।

পৃথিবীর বহু স্থানের ভূগর্ভে প্রচুর পরিমাণ পেট্রোলিয়ামের খনি আছে; তন্মধ্যে উত্তর-আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকো; দক্ষিণ-আমেরিকায় পেরু হইতে ভেনিজুয়েলা; য়ুরোপে রাশিয়া, গ্যালিসিয়া ও রুমেনিয়া : এবং এসিয়া মহাদেশে ইরাণ, ইরাক, ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ (Dutch East Indies), ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষ প্রধান। বর্ত্তমানে সমগ্র পৃথিবীর সরবরাহের পরিমাণ কুড়ি কোটি টন; এই সমষ্টির শতকরা ৬০ হইতে ৭০ অংশ আমেরিকার।

খনিজ পেট্রোলিয়াম্ পরিস্রুত করিয়া আমরা পাই পেট্রল, কেরোসিন তৈল, পিচ্ছিল তৈল (Lubricating oil), বেঞ্জিন, ভ্যাসেলিন, প্যারাফিন প্রভৃতি। পেট্রোলিয়ামের সজল-অঙ্গারকাংশই (Hydrocarbon) পেট্রল। ইহা প্রায় শতকরা ১৫ অংশ। পেট্রোলিয়াম-পরিস্রুতির প্রাথমিক ভগ্নাংশ (Earlier fraction)রূপে আমরা ইহা পাই। ইহার স্ফুটনাঙ্ক (Boiling point) ৭০°—১৪০° এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব (specific gravity) ০·৭০৫—০·৭৪০। পেট্রল আভ্যন্তরীণদাহন-যন্ত্রে (Internal Combustion Engine) ব্যবহৃত হয়, এবং ইহার সাধারণ নাম 'মোটর-তৈল'। ইহা

অপেক্ষাও নির্ম্মল এবং অধিকতর উদ্বায়ী (volalile) ভগ্নাংশ বিমান-আরক-(Aviation spirit)রূপে ব্যবহৃত হয়। খনিজ পেট্রোলিয়ামের শতকরা ৫০ অংশ কেরোসিন, এবং ইহার স্ফুটনাঙ্ক ১৫০°—৩০০° ডিগ্রী। পেট্রোলিয়ামের শতকরা ১৭ অংশ পিচ্ছিল তৈল, এবং শতকরা ২ অংশ প্যারাফিন মোম।

শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি ব্যাপারে মনুষ্যের প্রত্যেক প্রয়োজনে, বিশেষতঃ, বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রয়োজনে, পেট্রলের ব্যবহার দিন দিন এতই বর্দ্ধিত হইতেছে যে, খনিজ তৈলে তাহার চাহিদা সম্পূরণ হওয়া অসম্ভব। এই নিমিত্ত বৈজ্ঞানিকগণ বুদ্ধিবলে পোড়া-কয়লা (coke) হইতে কৃত্রিম উপায়ে মোটর-তৈল প্রস্তুত করিবার বিবিধ পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। উচ্চতর সজল-অঙ্গারক তৈলকে উগ্রতর তাপ ও গুরুতর চাপ দ্বারা নিম্নতর সজল-অঙ্গারকে পরিক্ষীণ করিয়া পেট্রলের মূল-উপাদানে বিশ্লিষ্ট করিবার প্রক্রিয়া সফল হইয়াছে।

খনিজ পেট্রোলিয়াম ব্যতীত, পেট্রল, কেরোসিন ও অন্যান্য ইন্ধন-তৈল পাইবার অন্য উপায়ও আছে। মেটে তৈল-যুক্ত (Bituaminous), কর্দ্দমযুক্ত (Shale) এবং বাদামী (Brown) কয়লাকে স্বল্প তাপে ভাটিতে চুয়াইয়া (Low temperature distillation) আমরা ঐ সকল তৈল পাই। Shale oil শিল্প—স্কট্‌ল্যাণ্ডের জাতীয় শিল্প। বাদামী কয়লা হইতে তৈল নিষ্কাশন-কার্য্য জার্ম্মাণীতেই অধিক পরিমাণে সম্পাদিত হয়, এবং মেটে-তৈলযুক্ত কয়লা হইতে তৈল নিষ্কাশন-কার্য্য সর্ব্বদেশেই প্রচলিত আছে। সাধারণ মেটে-তৈলযুক্ত কয়লাকে উগ্রতাপে অঙ্গারীকৃত (High temperature carbonisation) করিলে আমরা আলকাতরা (Tar), নিশাদল (Ammonia), গ্যাস (Gas) ও লৌহ-শিল্পোপযোগী খর-পোড়া কয়লা (High coke) পাই। আলকাতরা চুয়াইয়া আমরা বেঞ্জিন্ (Benzene), সজল অঙ্গারক (Hydro-carbons), কার্ব্বলিক এসিড (Carbolic acid), ন্যাফ্‌থেলিন (Naphthalene) ক্রিয়োজোট তৈল (Creosote oil), অঙ্গার-বিশেষ (Anthracene) ও পিচ (Pitch) পাই। স্বল্পতাপে অঙ্গারীকরণে (Low temperature carbonisation) আমরা এই মেটে-তৈলযুক্ত কয়লা হইতে প্রাপ্ত হই—পেট্রল (Petrol), কেরোসিন, পিচ্ছিল তৈল, পিচ এবং মৃদু-পোড়া কয়লা, যাহা ধূমশূন্য ইন্ধন-(Soft coke or smokeless fuel)রূপে ব্যবহৃত হয়।

ভারতবর্ষ প্রতি বৎসর ২.৫ কোটি টাকা মূল্যের পেট্রল উৎপাদন করে; এতদ্ব্যতীত ২.৫ কোটি টাকা মূল্যের পেট্রল ও ৫ কোটি টাকা মূল্যের কেরোসিন ব্রহ্মদেশ হইতে আমদানী করে, এবং ইরাণ হইতেও প্রতি বৎসর আরও ২.৫ কোটি টাকা মূল্যের ইন্ধন-তৈল (Fuel oils) আমদানী করে। কিন্তু, কয়লা-সম্পদে সমৃদ্ধ ভারতে স্বল্প-তাপে-অঙ্গারীকরণ প্রথায় ইন্ধন-তৈল-উৎপাদন প্রচেষ্টার একান্ত অভাব। প্রতি বর্ষে ভারতবর্ষ ২.৮ কোটি টন কয়লা উৎপাদন করে। এই সমষ্টির শতকরা ৯১ অংশ কাঁচা অবস্থায় পোড়ান হয়, এবং বাকী ৯ অংশ উগ্রতাপে লৌহ-শিল্পোপযোগী ইন্ধনে (Metallurgical coke) পরিণত করা হয়। যদি দুই কোটি টন কাঁচা কয়লাকে স্বল্প তাপে অঙ্গারীকরণ-প্রথায় চুয়াইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে আমরা পেট্রল, কেরোসিন, এবং পিচ্ছিল তৈলের মূল উপকরণ—অন্যূন ৩.৫ কোটি টাকা মূল্যের—২০ কোটি গ্যালন আলকাতরা পাইতে পারি। যে দ্বিতীয় শ্রেণীর অপকৃষ্ট কয়লা এখন স্তূপাকারে খনি-খাৎমুখে ধূমশূন্য-ইন্ধন প্রস্তুতার্থ দগ্ধ করা হয়, তাহা যদি স্বল্প তাপে অঙ্গারীকরণ প্রথায় চুয়াইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে আমরা প্রচুর পরিমাণে ইন্ধন-তৈল (Motor and Oil-fuels) পাইতে পারি। এই প্রক্রিয়ার ফলে, ধূমশূন্য-ইন্ধন ব্যতীত, আমরা উপ-উপপত্তি-(Bye-product)রূপে যে গ্যাস (coal gas) পাইব, তাহা পরিচালনশক্তি উৎপাদনার্থ (power production) ব্যবহৃত হইতে পারিবে। এই শিল্পের আশু প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। প্রতিষ্ঠা মাত্রই যে এই শিল্প লাভজনক হইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং সরকারী সাহায্য ব্যতীত দেশে এরূপ মৌলিক শিল্প প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর নহে।

কয়লা-শিল্প সংশ্লিষ্ট খনি-মালিক ও ব্যবসায়ীবর্গ শিল্পের কল্যাণার্থ, বহু দিন হইতে এইরূপ একটি প্রচেষ্টাকে

কার্য্যকরী করিবার নিমিত্ত আবেদন-নিবেদন ও আলোচনা-আন্দোলন যথেষ্টই করিতেছেন; কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও কয়লা-শিল্পের দুর্গতিনিবন্ধন তাঁহাদের সাধনা সিদ্ধিলাভ করে নাই।

মানুষের বুদ্ধির অন্ত নাই। স্বাভাবিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব হইলেই মানুষ বুদ্ধিকৌশলে কৃত্রিম উপায়ে তত্তুল্য দ্রব্য আবিষ্কার করিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকেরা কয়লা হইতে তৈল-নিষ্কাশনের কয়েকটি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। সেই সকল প্রক্রিয়ার খুঁটিনাটি বিবরণ সাধারণ পাঠকের প্রীতিকর হইবে না।

ক্ষয়িষ্ণু কয়লা-সম্পদের স্থায়িত্ব যথাসম্ভব দীর্ঘতম করিবার নিমিত্ত, অপচয় নিবারণ পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকারে তাহার যথোপযুক্ত ব্যবহার-বিধান হেতু, কয়লা-শিল্পনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ, বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাহায্যে কয়লা হইতে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা সমুৎপন্ন বিবিধ উপ-উৎপত্তির সদ্ব্যবহার-প্রচেষ্টায় কিছু দিন হইতে বিশেষ ভাবে লিপ্ত আছেন। কিন্তু সরকারের যথোপযুক্ত সহানুভূতির অভাবে তাঁহারা এত দিন এই প্রচেষ্টায় অগ্রসর হইতে পারেন নাই। বর্ত্তমান যুদ্ধের অভিঘাতে সরকারের কর্ত্তব্যজ্ঞান উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, এবং বৎসরাধিক পূর্ব্বে যুদ্ধ-প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক ও শিল্প-গবেষণা-মণ্ডলীর (Board of Scientific and Industrial Research) অধীনে ডাঃ এইচ, কে, সেনের নেতৃত্বে একটি ইন্ধন-গবেষণা-সমিতি (Fuel Research Committee) সংগঠিত হইয়াছে। ধানবাদের খনিজ-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডাঃ ফরেষ্টার, টাটা-প্রতিষ্ঠানের মিঃ ফারকুহার, ভারতীয়-খনিজ-সমবায়ের (Indian Mining Fedaration) ধুরন্ধর মিঃ ওঝা, এবং সুপ্রসিদ্ধ খনি-মালিক মিঃ এইচ, কে, নাগ এই সমিতির সদস্য। সমিতি ধানবাদে একটি কেন্দ্রীয় ইন্ধন-গবেষণা-প্রতিষ্ঠানের (Central Fuel Research Station) অনুষ্ঠান-হেতু সুপারিশ পেশ করিয়াছেন। এই প্রস্তাব বর্ত্তমানে কর্ত্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন। বহু দিন পূর্ব্বেই ভারতে এইরূপ একটি অনুষ্ঠানের সূচনা হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু ভাগ্যচক্রে আমরা সর্ব্বদা পরমুখাপেক্ষী, এবং যথাযোগ্য সাহস, সহায় ও সম্পদবিহীন।

যাহা হউক, বৈজ্ঞানিক ও শিল্প-গবেষণা-মণ্ডলীর সুপারিশ অনুযায়ী সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-পীঠে (University Collage of Science) স্বল্পতাপে অঙ্গারীকরণ-প্রথায় কয়লা হইতে মোটর-আরক প্রভৃতি বিভিন্ন উপাদান উৎপাদন হেতু গবেষণা-প্রচেষ্টার জন্য কিঞ্চিৎ অর্থ (দশ হাজার টাকা) মঞ্জুর করিয়াছেন। বিহার সরকার একটি পরীক্ষক কল (Pilot plant) প্রতিষ্ঠা দ্বারা স্বল্লাকারে সাফল্য লাভ করিয়াছেন। এই কল চব্বিশ ঘণ্টায় এক টন কয়লা রূপান্তরিত করিতে পারে। দৈনিক পঞ্চাশ টন কয়লা রূপান্তরিত করিবার সামর্থ্য দানের নিমিত্ত এই কলের জন্য আরও চল্লিশ হাজার টাকার প্রয়োজন। ক্ষুদ্রাকারে পরীক্ষামূলক ভাবে, কয়লা হইতে মোটর-আরক (Motor spirit) নিষ্কাশন করিবার দিন বহু কাল পূর্ব্বে অতীত হইয়াছে। এখন বৃহদাকারে ব্যাপক ভাবে কার্য্যারম্ভ করিবার শুভ সুযোগ সমুপস্থিত। ধানবাদে ইন্ধন-গবেষণা-প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠান যত শীঘ্র সুসম্পন্ন হয়, ততই মঙ্গল। এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিতে তাহার আরম্ভকালেই সাড়ে তিন লক্ষ মুদ্রা, এবং বার্ষিক ব্যয়ের জন্য অনূ্যন পঞ্চাশ হাজার টাকার প্রয়োজন। ইন্ধন-গবেষণা-সমিতি প্রতি টন পোড়া কয়লার (coke) উপর ৪'৫ পাই হিসাবে কর (cess) নির্দ্ধারণ দ্বারা সাড়ে তিন লক্ষ টাকা এবং সরকারের নিকট হইতে সমপরিমাণ অর্থ —মোট এই সাত লক্ষ টাকা—সংগ্রহ করিবার প্রস্তাব দাখিল করিয়াছেন।

সম্প্রতি কলিকাতায় ভারতীয় বণিক্ সমিতি (Indian Chambors of Commerce) প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ভারতীয় কয়লা-শ্রেণী-বিভাগকরণ-সমিতির (Indian Coal Grading Board) হস্তে যে তিন লক্ষ টাকা জমা আছে, তাহা এই উদ্দেশ্যে খাটাইলে ভাল হয়। প্রস্তাব সমীচীন।

যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র, শিল্প-সমুন্নয়নার্থ ইন্ধন-গবেষণার প্রতি বিশেষ প্রযত্নশীল, এবং এজন্য প্রতি বৎসর প্রভূত অর্থ অকাতরে ব্যয় করে। ইংলণ্ড ইন্ধন-গবেষণার্থ প্রতি বৎসর ১০'৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করে। এমন কি, দক্ষিণ-আফ্রিকাও ইন্ধন-গবেষণা-প্রতিষ্ঠানের

নিমিত্ত প্রতি বৎসর তিন লক্ষ টাকারও অধিক অর্থ ব্যয় করে। ভারতে এইরূপ প্রচেষ্টার সূত্রপাত মাত্র হইয়াছে। কোন কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠান, স্বল্পাকারে পরীক্ষা-মূলক ভাবে, ইন্ধন-গবেষণায় লিপ্ত হইয়াছেন বটে; কিন্তু ব্যাপক ভাবে, জাতীয় শিল্পের সমুত্থানকল্পে কোন প্রচেষ্টাই আরম্ভ হয় নাই।

মোটর-ইন্ধন দুই প্রকার। তরল এবং বাষ্পীয়। আমরা কাঠ, পাথুরিয়া কয়লা প্রভৃতি কঠিন ইন্ধন সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করিতেছি না। তরল-ইন্ধনের প্রধান উপাদান পাথুরিয়া কয়লা। তিন উপায়ে কয়লা হইতে ইন্ধন-তৈল সংগৃহীত হয়। প্রথম দুইটি উপায়ে তৈল নিষ্কাশন করিতে বিলাতে প্রতি গ্যালনে এগার পেন্স ব্যয় হয়। তৃতীয়—অর্থাৎ স্বল্প-চাপ প্রথায় উহার উৎপাদনের ব্যয় অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প। শেষোক্ত প্রক্রিয়া-সাহায্যে এক টন কয়লা হইতে চারি গ্যালন মোটর-তৈল পাওয়া যায়। ভারতের কয়লা-খনিতে অপকৃষ্ট কয়লার পরিমাণই অধিক। কিন্তু নিকৃষ্ট রাণীগঞ্জ-কয়লা হইতেও প্রতি টনে চারি গ্যালন হিসাবে তৈল পাইতে পারি। দ্বিতীয় ইন্ধন বেন্‌জল (Benzol)। বেন্‌জল বহু প্রকার উৎপন্ন-শিল্পে ব্যবহৃত হয়; সুতরাং মোটর-পরিচালনকল্পে এই ইন্ধনের ব্যবহার সম্ভবপর ও সমীচীন নহে। বাষ্পীয়-ইন্ধন-গ্যাস্ কাঠ হইতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, এবং ভারতে কাঠের অভাব নাই। মহীশূর রাজ্যে বৈজ্ঞানিক প্রথায় এই শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সম্প্রতি যে ইন্ধন-গবেষণা-মণ্ডলী অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার আশু সতর্ক দৃষ্টি এই শিল্পের উন্নতি-প্রচেষ্টায় আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক।

মোটর-পরিচালনকল্পে আর একটি ইন্ধন আমাদের দেশে সহজ এবং সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ। তাহা গুড় হইতে প্রস্তুত মদ্যের সার (Power alcohol)। তরল ইন্ধনের মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুলভ। এক টন গুড় হইতে প্রায় ৬০ গ্যালন মদ্য-সার পাওয়া যায়, এবং গ্যালন-প্রতি পাঁচ আনা মাত্র ব্যয় হয়। গুড় হইতে মদ্য-সার প্রস্তুত করিবার যন্ত্রপাতিও সুলভ, এবং ভারতের অভ্যন্তরে সহজপ্রাপ্য।

দশ বৎসর পূর্ব্বে, যখন এ দেশে শর্করা-শিল্পের অভ্যুদয় আরম্ভ হয়, তখন হইতে পুনঃ পুনঃ এই শিল্পের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার ঐকান্তিক চেষ্টা হইয়াছে। বর্ত্তমান লেখক ঐ সময় "কমার্স" পত্রিকায় সহকারী সম্পাদকরূপে এ বিষয়ে প্রমাণ-প্রয়োগসহ বহু যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়াছিলেন। শর্করা-শিল্পে নিযুক্ত ধনিক ও বণিক্ এবং শর্করা-শিল্প সংশ্লিষ্ট সভা-সমিতিও এই শিল্প-প্রতিষ্ঠায় অবশ্য প্রয়োজনীয় সরকারী সাহায্যলাভার্থ বিপুল চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সকল প্রচেষ্টাই বিফল হইয়াছিল। সম্প্রতি ভারতীয় শিল্পী-বণিক-সঙ্ঘ-সমবায়ের কার্য্যকরী সমিতি (Committee of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry) পুনরায় এই শিল্পের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের আশু মনোযোগ বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করেন। আশা করি, পেট্রল-পরিবেশন সঙ্কোচের ফলে যে জটিল ও দুরূহ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহার প্রভাবে ও প্রকোপে সম্বদ্ধ-চৈতন্য সরকার এই শিল্পে আগ্রহবান্ ব্যক্তিবর্গকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য প্রদানে কুণ্ঠিত হইবেন না।

ভারতে উৎপন্ন গুড়ের পরিমাণ বার্ষিক সাড়ে-চারি লক্ষ টন। ইহার অতি সামান্য অংশই গুড়ুক তামাক প্রস্তুতে (Curing of tobacco) ও দারু (Liquor) প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়, এবং অধিকাংশেরই অপচয় ঘটে। শিল্পী-বণিক-সমবায় সমিতির বিবৃতি অনুযায়ী কিঞ্চিদধিক সওয়া-চারি লক্ষ টন গুড় এই মদ্যসার শিল্পের প্রতিষ্ঠার জন্য পাইবার যোগ্য, এবং ইহা হইতে অন্যূন চব্বিশ মিলিয়ন (নিযুত) গ্যালন মদ্য-সার পাওয়া যাইতে পারে। এই মদ্য-সার পেট্রলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, মোটর-তৈলরূপে ব্যবহার করিলে কেবল যে বর্ত্তমান পেট্রল অনটন সমস্যার সমাধান হইবে এরূপই নহে, অধিকন্তু প্রচুর গুড়ের অপচয় নিবারণ, বহু বেকার ব্যক্তির উপজীবিকার সংস্থান, বর্ত্তমানে অনর্থক মজুত মূলধনের সদ্ব্যবহার, এবং কয়েকটি উপ-উৎপত্তি-শিল্পের প্রসার-সাধন দ্বারা দেশ প্রভূত পরিমাণে সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইবে। পেট্রলের নিমিত্ত আমরা বর্ত্তমানে যে ৬৫ লক্ষ টাকা বিদেশে প্রেরণ করি, তাহা স্বদেশে ব্যয়িত হইলে দেশবাসীর অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান ও জনসাধারণের

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পথ সুগম হইবে। সরকারও এই শিল্প হইতে শুল্ক সংগ্রহ করিয়া আর্থিক সচ্ছলতার অধিকারী হইবেন।

সকল দেশেই গুড় হইতে মদ্য-সার প্রস্তুত করিয়া তাহা পেট্রলের সহিত মিশ্রিত করা হয়। আমাদের দেশে শিল্পে অগ্রগতি-সম্পন্ন মহীশূর রাজ্যে এই প্রক্রিয়া ও প্রথা প্রচলিত আছে। ভারতে শর্করা-শিল্পে সম্পন্ন অন্যান্য দেশীয় রাজ্যে ও প্রদেশে এই প্রক্রিয়া ও প্রথার প্রবর্ত্তন অত্যাবশ্যক। যুক্তপ্রদেশ ও বিহার শর্করা-শিল্পে বিশেষ সমৃদ্ধ। এই নিমিত্ত গুড় হইতে মদ্য-সার প্রস্তুত করিয়া গুড়ের অকারণ অপচয় নিবারণ-প্রচেষ্টা এই দুই প্রদেশেই প্রথমে অনুসৃত হয়। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে এই দুই প্রদেশের শাসন-তন্ত্র একযোগে গুড় হইতে মদ্যসার প্রস্তুতার্থ একটি অনুসন্ধান-সমিতি (Joint Power Alcohol and Molasses Enquiry Committee) সংগঠন করেন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে সমিতি তাহার বিবৃতি উক্ত উভয় সরকারেই দাখিল করেন। যুক্তপ্রদেশ ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে মদ্যসার-আইন (Power Alcohol Act 1940) বিধিবদ্ধ করেন। এই আইনে পেট্রলের সহিত শতকরা ৫ হইতে ৩০ অংশ মদ্য-সার মিশাইবার বাধ্যতামূলক বিধি প্রবর্ত্তিত হয়; কিন্তু ভারতীয় শর্করা-কল-সভার সভাপতি (President of the Indian Sugar Mills Association) গত দিল্লী অধিবেশনে এই বিধির বিধানকে শর্করা-শিল্পীর পক্ষে "কঠোর, না-লোভজনক, না-লাভজনক" (Stringent, unattractive and unremunerative for industrialists) বলিয়া অভিহিত করেন। যুক্তপ্রদেশ যাহা হউক কিছু করিয়াছেন, কিন্তু বিহার-সরকার এ পর্য্যন্ত সমিতির সুপারিশ-সম্পর্কে কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করেন নাই। সুখের বিষয়, ভারত সরকার এই শিল্প-প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত "লাইসেন্" (Licence) দিতে ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বিদেশ হইতে আমদানীর অনুকূলে প্রাধান্য (Priority) দানে সম্মত হইয়াছেন।

বাষ্পীয় ইন্ধনের উপযোগিতাও প্রচুর। বর্ত্তমান পেট্রল-পরিবেশন সমস্যার সহজ সমাধান-হেতু মোটর-পরিচালকেরা পেট্রলের সহিত কেরোসিন মিশ্রিত করিয়া দায় সারিতেছেন; কিন্তু এই মিশ্রিত ইন্ধন এঞ্জিনকে অতি শীঘ্রই অকর্ম্মণ্য করে, সুতরাং বৈজ্ঞানিক ইন্ধন ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত। পেট্রলের পরিবর্ত্তে অনেকেই বাষ্পীয় ইন্ধন (Gaseous fuel or Producer gas) ব্যবহার করিয়া মোটর চালাইতেছেন। বাষ্পীয় ইন্ধন কাষ্ঠ হইতে সংগৃহীত হয়। ভারতে প্রচুর পরিমাণে কাঠ পাওয়া যায়। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। বাষ্পীয় ইন্ধন ব্যবহার করিবার নিমিত্ত মোটর-এঞ্জিনের পরিবর্ত্তে গ্যাস-এঞ্জিন ব্যবহার করিতে হয়। এই পরিবর্ত্তন আয়াসসাধ্য নহে। এক সপ্তাহের মধ্যেই সম্পন্ন হয়। ক্ষতিরও কোন কারণ নাই; যেহেতু, পেট্রল ব্যয়-সাশ্রয়ের তুলনায় এঞ্জিন-পরিবর্ত্তন-ব্যয় অতি অল্প; নিত্য ব্যয়ও কম হয়।

সম্প্রতি কলিকাতায় এক খনিজ তৈল-শিল্পে অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক-বৈঠকে সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মদ্যসারের সহিত বাষ্পীয় ইন্ধন মিশ্রণ সরকার কর্ত্তৃক বাধ্যতা-মূলক হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। মদ্য-সার এবং বাষ্পীয় ইন্ধন, উভয়ই অতি সহজে ও প্রচুর পরিমাণে ভারতেই উৎপাদন করা যায়। কলিকাতায় কোন কোন মোটর-বাস বাষ্পীয় ইন্ধনে চলিতেছে। ডাক্তার নিয়োগীর অভিমত, হাল্কা মোটর-গাড়ী, মোটর-বাস্ ও মোটর-লরী, এ তিনের পক্ষেই গুড় হইতে প্রস্তুত মদ্য-সার এবং গ্যাস-ব্যবহার বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। তিনি এক ভাগ সুরা-সারের সহিত তিন ভাগ পেট্রল মিশ্রণের পক্ষপাতী। এই পেট্রল-কৃচ্ছ্রতার দিনে, এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে পেট্রল-পরিবেশনের কার্পণ্যজনিত অসুবিধা বহুল পরিমাণে হ্রাস হইবে। কাষ্ঠ-নিঃসৃত আরকের সহিত মিশ্রিত সুরা-সার (Power alcohol in this form of methylated spirit) ব্যবহারই অনুমোদিত। ইহা শিকি পরিমাণেও পেট্রলের সহিত মিশ্রিত করা যাইতে পারে। পেট্রলের তুলনায় ইহা অধিকতর উদ্বায়ীগুণ-(Greater volatility)বিশিষ্ট এবং ইহার স্ফুরণাঙ্কও (Flash-point) উচ্চতর। অধিকন্তু, ইহা এঞ্জিনের আকস্মিক বিপরীত-গতি (Back-firing) দোষ বিবর্জ্জিত। কিন্তু ইহার একটি দোষ—মূল্য। গ্যাসের সহিত অঙ্গারক-মিশ্রণ

যন্ত্রের (carburater) অথবা প্রকৃতি-পরিবর্ত্তনকারী উপাদানের (Denaturating ingredients), কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন দ্বারা এই দোষ নিরাকৃত হইতে পারে। শেষোক্ত প্রক্রিয়ার ফলে এই দ্রব পদার্থ ধূমশূন্য (Non-smokey), কিন্তু বিষাক্ত বলিয়া পানের উপযোগী নহে (Poisonous for human consumption)। ভারতের চিনির কলসমূহে এখন গুড়ের প্রচুর পরিমাণে অপচয় হয়। এই গুড় হইতে উত্তাপ দ্বারা (Fermentation) প্রচুর শক্তি-পরিচালক সুরা-সার (power alcohol) উৎপাদন করিয়া অন্ততঃ বর্ত্তমান পেট্রলব্যয়ের এক-চতুর্থাংশ সাশ্রয় করা যায়। মেথিলেটেড স্পিরিটের উপর নির্দ্ধারিত শুল্কের (Excise duty) কিঞ্চিৎ হ্রাস হওয়াও বাঞ্ছনীয়। সরকারের এই অনুগ্রহ ব্যতীত ইহার বর্ত্তমান উৎপাদনব্যয় লঘুতর হইবার কোন আশা নাই।

ভারতের খনিজ তৈলসম্পদ অতি কম। বর্ম্মা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সে সম্পদ্ যথেষ্ট হ্রাস হইয়াছে। ভারতের বহির্ভাগ হইতে পেট্রল আমদানীর উপায় এক প্রকার তিরোহিত হইয়াছে। আমাদের পেট্রল-সংস্থান দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে। ফলে সরকারকে বাধ্য হইয়াই পেট্রল-পরিবেশনের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। গত ৩১শে ডিসেম্বর দিল্লী হইতে ভারত সরকার যে নূতন আদেশ জারি করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ, সরকার স্থির করিয়াছেন, ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে বে-সামরিক অধিবাসীরা যে পরিমাণ পেট্রল ব্যবহার করিতেন, এখন তাহার শতকরা ৬০ ভাগমাত্র ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে। এই উদ্দেশ্যে ভারত সরকার নির্দ্দেশ দান করিয়াছেন, ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর হইতে পেট্রল-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অনুসারে যাঁহারা প্রত্যহ এক গ্যালন পেট্রল পাইতেন, তাঁহারা অর্দ্ধ গ্যালন পেট্রল পাইবেন; অর্থাৎ প্রাইভেট মোটর গাড়ীর জন্য পেট্রল ব্যবহার অর্দ্ধেক হ্রাস করিতে হইবে।

সুদূর প্রাচীর অবস্থা এবং যুদ্ধ ভারতের নিকটবর্ত্তী হওয়ায় ভারত সরকার এই ব্যবস্থাবলম্বনে বাধ্য হইয়াছেন। ভারতের পূর্ব্বদিকের ঘাঁটীগুলি রক্ষার জন্যও পেট্রলের চাহিদা বর্দ্ধিত হইবে।

সুতরাং সরকারের এই নূতন ব্যবস্থার ফলে ভারতের শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, এবং সর্ব্ব প্রকার কার্য্য-কলাপ ও গতিবিধি প্রচণ্ডরূপে সংহত হইয়াছে। সর্ব্বদিকে কর্ম্মপ্রেরণা, কর্ম্ম-প্রবৃত্তি, এবং কর্ম্মতৎ-পরতার অযথা সঙ্কোচহেতু আমাদের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণও দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। সুলভ মোটর যান-বাহনে প্রাথমিক ও পরিণত পণ্যের আদান-প্রদান প্রতিরুদ্ধ হওয়ার ফলে, আমাদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি জটিল ও কুটিল গতি অবলম্বন করিতেছে। পেট্রলের মিতব্যয় সংরক্ষণ হেতু অচিরে পাথুরিয়া কয়লা হইতে কৃত্রিম মোটর-তৈল, গুড় হইতে শক্তিপরিচালক মদ্য-সার, এবং কাষ্ঠ হইতে গ্যাস প্রস্তুতার্থ সর্ব্বপ্রকার বিধি-বিধান অবলম্বন করিতে হইবে। সরকার এবং শিল্পনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ এ বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন। বৃথা কালক্ষেপণের অবকাশ নাই। যত শীঘ্র এই তিনটি শিল্পের অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান কার্য্যকরী হয়, ততই দেশের মঙ্গল।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রীতি ও স্মৃতি

কত কথা পড়ি শুনি দু'দিনেই ভুলে যাই
তারা ত অতিথি,
প্রীতিরূপে আসে যাহা তুচ্ছ হোক, হয় তাহা
ক্ষয়হীন স্মৃতি।

', নালান্দা,
১ এবং পুরাতন
াছে এই যুদ্ধে এই
ভয়ে আপনার সঙ্গে
।, সেই সঙ্গে আমার
নারা, নিশ্চয়ই অবগত
রিস, এণ্টওয়ার্প প্রভৃতি
ম ধ্বংস হওয়ায় জগতের
শ্রীকা

যুদ্ধের ভয়ে

(নাটিকা)
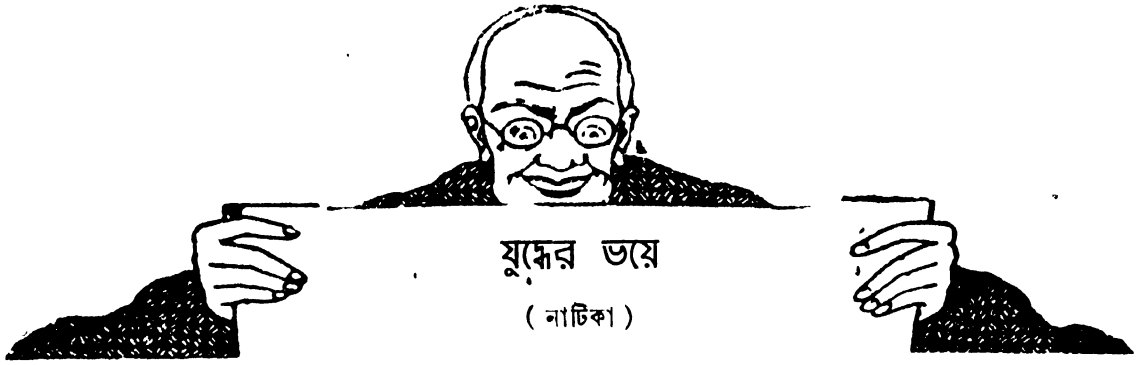
[কথা কহিতে কহিতে সতীশ বোস ও তাঁর স্ত্রী মনোরমার প্রবেশ। দু'জনেই একটু সাহেবী-ভাবাপন্ন। সতীশের গ্রামস্থ বাগান-বাড়ীর বৃদ্ধ চাকর গোবরা অর্থাৎ গোবর্দ্ধন তাঁদের সঙ্গী।]

সতীশ—যাক্, কোন-রকমে এখানে এসে পৌঁছানো গেছে। উঃ, কি ভাবনাই হয়েছিল! গোবর্দ্ধন, বালি এসেছে?

গোবর্দ্ধন—আজ্ঞে হ্যাঁ। কাল চার-গাড়ী এসেছে।

সতীশ—ভালই হয়েছে। যাও, গাড়ী থেকে আমাদের সুটকেশ আর বিছানার বাণ্ডিল নামিয়ে আনো।

গোবর্দ্ধন—আজ্ঞে, যাই।

[প্রস্থান।

সতীশ—পরশু শুনলুম, বালির দর না কি সোনার চেয়েও বেড়ে যাবে!

মনোরমা—বলো কি?

সতীশ—হ্যাঁ, সত্যি! সোনা প'রে তো আর মানুষ বাঁচবে না। প্রাণ বাঁচাতে দরকার হবে বালি আর চট। একশো বস্তা বালি ছাতের উপর রেখে দেবো। আমাদের এই "মনোরমা-কুটীর" একেবারে বোমা-প্রুফ হয়ে থাক্‌বে। এবার যুদ্ধটা হচ্ছে আকাশে। কাগজে দেখ্‌লুম—মানুষকে উড়োনো যায় কি না, বিলেতে তার experiment চল্‌ছে।

মনোরমা—কেন, এরোপ্লেন কি বাতিল হলো?

যাহা ... [সত]ীশ—ও-দিয়ে আর চলবে না। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে এ পর্য্যন্ত ... [এ]রোপ্লেন চলতো; বন্দুক, কামান চলতো। ... আর চলবে না। বুঝ্‌ছো না, ও-গুলোর অবলম্বন করে... ময় আর পয়সা খরচ? ভেবে ছাখো, এই শিল্প-প্রতিষ্ঠা ...ড়ে তুলতে কত-রকম material চাই, দিতে ও প্রয়োজনীয় ... পেট্রোল চাই! সে-দিন কাগজে অনুকূলে প্রাধান্য (Pri... [দ]েশের হাওয়া-মন্ত্রী বলেছেন— ...ন্ত্রী! সে আবার কি পদার্থ? বাষ্পীয় ইন্ধনের উ... ...er গো! ছাখোনি, আজকাল পেট্রল-পরিবেশন সমস্যার; এই-রকম বিদ্‌ঘুটে অনুবাদ পরিচালকেরা পেট্রলের সা... ; বলেছেন—যদি কোন লোক ওষুধ, যন্ত্র, অথবা এমন একটা-কিছু বার করতে পারে—যাতে মানুষ কোনো মেশিনের সাহায্য না নিয়ে উড়তে পারবে, তাহলে তাকে বংশগত পেটেণ্ট দেবেন। Von Zepplin বেচারা জেপলিন আবিষ্কার করলে, কিন্তু পেটেণ্ট পেলে না। তাই মনের দুঃখে সে বেচারা আত্মহত্যা করেছিল।

(দুটো সুটকেশ এনে গোবর্দ্ধন ঘরে রাখলে)

গোবর্দ্ধন—আমি ভেবেছিলুম, আপনারা কাল আসবেন, তাই রান্না-বান্না করিয়ে রেখেছিলুম।

মনোরমা—সেই রকমই কথা ছিল বটে, কিন্তু ঘ'টে উঠ্‌লো না। কাল আমরা ম্যাটিনীতে সিনেমা দেখলুম; তার পর থিয়েটার। রাত্রে হোটেলে ডিনার খেয়ে গেলুম গ্রে-হাউণ্ড রেসে।

সতীশ—আবার কত দিন পরে সহরে ফিরবো, কে বলতে পারে? তখন সহরের কি অবস্থা হবে কে জানে? শত্রু যদি এসে পড়ে—তা হ'লে বোমা ফেলে হয়ত সব ছারখার করে দেবে!

গোবর্দ্ধন—কারা আসবে?

সতীশ—শত্রুরা। যদি কোন উপায়ে আসতে পারে, তা হ'লে বড় বড় সহর, মিল, কারখানা সব ধ্বংস করতে ছাড়বে কি?

গোবর্দ্ধন—ঠিক বলেছেন। এ সবই তো গরুর সামিল।

সতীশ—গরু?

গোবর্দ্ধন—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার নাতি এখন এখানেই এসে রয়েছে। সে বলছিল, এবার লড়াইয়ে কারখানা আর গরু দুই-ই সমান। যে-যে দেশে বেশী কারখানা কি বেশী গরু আছে, সেই-সেই দেশেই না কি আগে তারা বোমা ফেলছে।

মনোরমা—গরুর সঙ্গে বোমা-ফেলার সম্পর্ক?

গোবর্দ্ধন—কানাই,—আমার নাতি, সে বলে, গরু হলো খাবারের কারখানা। সৈন্যরা গরুর দুধ খেয়ে লড়বে। সেই জন্যে গরু, মোষ, ছাগল সব সাবাড় করবে।—যাই, বিছানাটা নিয়ে আসি।

[প্রস্থান।

সতীশ—হ্যাঁ গা, কাছেই যে পিঁজরাপোল।

মনোরমা—না, না, ও-সব বাজে কথা! ও-নিয়ে মাথা ঘামালে চলে না। গরু তো সব দেশেই আছে।

সতীশ—তা বটে; আর বেছে বেছে এই গ্রামেই বা বোমা ফেল্‌বে কেন?

(গোবর্দ্ধন বিছানার বাণ্ডিল এনে ঘরে রাখ্‌লো)

মনোরমা—চার ধারে এত গাছপালা; এরোপ্লেন থেকে আমাদের বাড়ী নজরেই পড়বে না।

সতীশ—আজই কোন নার্শারীতে আরও কতকগুলো গাছের অর্ডার দিয়ে দিই। সেগুলো ছাদে রাখা যাবে। গোবর্দ্ধন আজই মালীদের নিয়ে থলেগুলোতে বালি পূরে সেগুলো ছাদে রেখে আসুক।

গোবর্দ্ধন—বালি-বোঝাই অতগুলো থলে ছাদে রাখ্‌লে ছাদ হুড়মুড় কোরে ভেঙ্গে পড়বে না? বোমার কাজ ওরাই করবে!

সতীশ—তা হোক্, তুমি বস্তাগুলোতে বালি ভ'রে রাখো তো, তার পর ভেবে দেখা যাবে। বসো মনো, দাড়িয়ে রইলে কেন?

(উভয়ের কৌচে উপবেশন)

সতীশ—এ জায়গাটা যেন মরুভূমির মধ্যে ওয়েসিস্! সহরে কিন্তু সব সময়েই ভয় আর ভাবনা! কাল রাস্তায় একটা বাসের টায়ার ফাট্‌লো। বোমা পড়লো ভেবে সকলেই উর্দ্ধশ্বাসে ছুট! দু'জন সার্জ্জেণ্ট তখনি রিভলভার নিয়ে হাজির! তবে ভারতবর্ষে এখনো তেমন কোন ভয় নেই। কর্ত্তারা সময় থাকতে সজাগ, তৈরীও হচ্ছেন। গলিতে গলিতে টিউবওয়েল। আরও কত কি!

গোবর্দ্ধন—আমার নাতি বলছিল, যে-কোন দিন লড়াই এখানে গড়িয়ে আস্‌তে পারে।

সতীশ—তোমার নাতিটি কে হে বাপু? তার তো বুদ্ধি খুব ধারালো!

গোবর্দ্ধন—আজ্ঞে, সে হ'ল আমার মেয়ে গেঁদীর ছেলে। ছেলে নয়, হীরের টুক্‌রো। গাঁয়ের ইস্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়ে পুলিশে ঢুকেছে, সরকার তাকে রাইটারী চাকরী দিয়েছে। সে বলেছে—

(সোফারের প্রবেশ; হাতে দুটো গ্যাস-মাস্ক)

সোফার—এ-দুটো গাড়ীতে পড়েছিল।

সতীশ—তাই তো, কি ভুল! ইঃ! (গ্রহণ)

গোবর্দ্ধন—এগুলো কি, কর্ত্তা?

মনোরমা—মুখে পরতে হয়।

গোবর্দ্ধন—মুখোস? মন্দ নয়! তবে রথের মেলায় যেগুলো বিক্রী হয়, সেগুলো দেখ্‌তে খাসা রঙ-চঙে। এক-একটার দাম দু' পয়সা।

সতীশ—না, এ সে মুখোস নয়। একে বলে গ্যাস-মাস্ক।

গোবর্দ্ধন—আজ্ঞে হ্যাঁ, মাস্‌কো আর মুখোস—ও একই কথা।

সোফার—এক জন লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

সতীশ—এখানেও লোক? আচ্ছা বিপদ! কি নাম বল্লে?

সোফার—অমূল্যরতন গাঙ্গুলী।

মনোরমা—কে এ?

সতীশ—জানি না।—আচ্ছা, পাঠিয়ে দাও।

[সোফারের প্রস্থান।

গোবর্দ্ধন—হ্যাঁ, একটা জিনিষের কথা একেবারে ভুলে গেছি। এখনি আন্‌ছি।

(অমূল্য বাবুর প্রবেশ)

অমূল্য—আমার নাম অধ্যাপক অমূল্যরতন গঙ্গোপাধ্যায়। জাঞ্জিবারের পি, এইচ, ডি; কঙ্গোর ডি-লিট্; আর বোর্ণিওর ডি-এস্-সি। "ছন্দের গন্ধ" "বৈষ্ণব-যুগের বিজ্ঞান"—"কঙ্গোর ভাষা সংস্কৃতের ভায়রা-ভাই" এই সব গবেষণামূলক প্রবন্ধের জন্য আমাকে বিবিধ সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমার—অমূল্যরতনের কদর বুঝতে না পেরে বঙ্গভাষায় একটি তৃতীয় শ্রেণীর এম-এ ক্লাসে মানপত্র দিয়েছিলেন।

সতীশ—আপনি কি কোন কলেজে পড়ান?

অমূল্য—আজ্ঞে না। গবেষণা নিয়ে এত পরিশ্রম করতে হয়, অধ্যাপনার সময় কোথায়? আমার নূতন আবিষ্কার শীঘ্রই প্রকাশিত হবে—অর্থাৎ "বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম বিকাশ মাল্টায়, না জিব্রাল্টারে?"

মনোরমা—আপনার লেখা প্রবন্ধ কোন কাগজে পড়েছি বলে তো মনে পড়ছে না।

অমূল্য—না। তার কারণ, আমার রচনার বৈশিষ্ট্য এবং তাৎপর্য্য উপলব্ধি করবার মত সম্পাদক ও পাঠক এখনও এ দেশে জন্মগ্রহণ করেনি। এই জন্যেই আমার লেখা সম্পাদকদের বোধগম্য না হওয়ায় তাঁরা ফেরৎ দেন। তাঁদের দুর্ভাগ্য!

সতীশ—কিন্তু আমি কি করবো?

অমূল্য—হিমালয়, তিব্বত, কামাখ্যা, নালান্দা, তক্ষশিলা ইত্যাদি স্থান থেকে অনেক দুর্লভ এবং পুরাতন পুঁথি, নথি, পত্রাদি সংগ্রহ করেছি। পাছে এই যুদ্ধে এই সকল অমূল্য-রত্ন নষ্ট হয়ে যায়, এই ভয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। বলা বাহুল্য, সেই সঙ্গে আমার রচনাগুলিও সঞ্চিত আছে। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, গত মহাযুদ্ধে প্যারিস, এণ্টওয়ার্প প্রভৃতি নগরীর গ্রন্থাগার আর মিউজিয়াম ধ্বংস হওয়ায় জগতের

কি অভাবনীয়, অচিন্তনীয়, অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে! আপনি যদি কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় ক'রে—

সতীশ—দেখুন, আজ আমরা এইমাত্র এসে পৌঁছেছি। ভয়ানক ক্লান্ত।

অমূল্য—উত্তম। কাল এসে আপনার সাহচর্য্যে আমার অমূল্য সময় নষ্ট ক'রে অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করবো। নমস্কার!

[প্রস্থান।

মনোরমা—পাগল, তাতে আর সন্দেহ নেই। তবে উন্মাদ হ'তে এখনও কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে।

সতীশ—কলকাতায় একদল লোক আছে। কারুর সঙ্গে দেখা হলে তারা বলে—"আজ্ঞে আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান। ক'দিন থেকে খাওয়া হয়নি। চাকরী গেছে, তাই ভদ্র-সন্তান হয়েও বাধ্য হয়ে ভিক্ষে করতে হচ্ছে। বাড়ীতে রুগ্না মা আছেন, স্ত্রী-পুত্র আছে। তারা সব না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে।"—এও সেই দলের লোক; তবে খুব চালাক। গৎটা বেশ নতুন করেছে। জানে, এই সময় সব লোক-জন পাড়াগাঁয়ের দিকে যাদের বাড়ী-ঘর আছে সেখানে আসবে—তাই আগে থেকেই এসে ওৎ পেতে বসেছে—শিকারের আশায়।

(একটা কাগজ-হাতে গোবর্দ্ধনের প্রবেশ)

গোবর্দ্ধন—কালকে এক জন সাহেব এসেছিল—গোরা। এই চেহারা—ইঁয়া গোঁফ! আমার নাতিও সঙ্গে ছিল। সব বাড়ীটা ভাল করে ঘুরে ঘুরে দেখে বল্লে, এখানে দশ জন লোক থাকবে। তিনটে বড় ঘর, একটা ছোট ঘর। অবিশ্যি, আমি কিছুই বুঝতে পারিনি; তা আমার নাতি তো সব জানে। আমাকে সে-ই সব বুঝিয়ে দিলে।

সতীশ—দেখি, কাগজটায় কি লেখা আছে। (দেখে) কাগজে সেই খবর বেরুবার পর সহরের বহু লোক Evacuation প্রাকটিস করছিল। তা বলে কোথাকার কে কোথা থেকে এসে আমার বাড়ীতে থাকবে! বস্তী থেকে এলো কি না তাই বা কে জানে? বুদ্ধি করে আমি আগে থেকে মাথা গোঁজবার জায়গা ঠিক করলুম।

মনোরমা—হয়তো, আরও অনেকে ভেবেছিল—

সতীশ—ছাই ভেবেছিল। যদি ভেবেই থাকবে তো কার্য্যে পরিণত করেনি কেন? তারাও এমনি পাড়াগাঁয়ে একটা বাড়ী কিনে রাখ্‌লে পারতো।

মনোরমা—আমাদের কেনবার পয়সা ভগবান্‌ দিয়েছেন, তাদের বোধ হয় তা নেই।

সতীশ—"আশা করি, আপনার বাড়ীতে স্থান দেবেন।"—এ অত্যাচারের অর্থ? আমার পয়সায় কেনা আমার বাড়ী,—সেখানে তুমি স্থান চাও কেন বাপু?

গোবর্দ্ধন—আপনাদের জন্য চা করে আনবো?

সতীশ—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। এসে অবধি এতক্ষণের মধ্যে এই একটা ভালো কথা শুনলুম।

গোবর্দ্ধন—আনছি। [প্রস্থান।

সতীশ—সমস্ত জিনিষের দর বেড়ে যাচ্ছে আগুনের মত হু-হু করে; এক পয়সার বর্ণপরিচয়, ধারাপাত পর্য্যন্ত চার পয়সা, আট পয়সা হয়ে গেছে। এগারো পয়সার স্পিরিটের বোতল ব্যাটারা বারো আনায় বিক্রী করছে।

মনোরমা—কেন? আসবার আগে দেখে এলুম, পুলিশ অনেক লোককে ধরে নিয়ে যাচ্ছে—ইচ্ছামত দাম বাড়িয়েছে বলে।

সতীশ—এই যে আমি এখানে খাবার চাল, ডাল সব কিনে সঞ্চয় করেছি, এ তো পাঁচ ভূতে খাবে? সময় বুঝে কাজ করেছি নিজের সুবিধের জন্য। খরচ করলুম আমি, ওড়াবে কোথাকার কে! দশ-দশটা অনাহূত রবাহূত গুণ্ডার দল বস্তী থেকে এসে চড়াও হবে!

মনোরমা—গুণ্ডাই যে হবে, এমন তো কোন কথা নেই। আর বস্তী থেকে তো না-ও আসতে পারে! হয়তো জন-কতক শিশু, বৃদ্ধা, কিংবা—

সতীশ—বৃদ্ধা? সে যে আরও বিপদ! দিন-রাত গোবর, গঙ্গাজল আর গজ্‌-গজ্‌! দু'দিনেই প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠবে না? নড়বার নামটি করবে না। হয় আমাদের প্রাণের মায়া কাটিয়ে এখান থেকে সরে পড়তে হবে, না হয় ক্ষেপে উঠতে হবে।

(একটা ট্রেতে চা-সহ গোবর্দ্ধনের প্রবেশ; টেবিলের ওপর রেখে দিল)

গোবর্দ্ধন—আপনার সঙ্গে এখানকার দু'-চার জন ছেলে দেখা করতে এসেছে।

সতীশ—না, না, দেখা-টেখা হবে না।

মনোরমা—আহা একবার শোনোই না, কি চায়।

সতীশ—আচ্ছা, পাঠিয়ে দাও।

[গোবর্দ্ধনের প্রস্থান।

সতীশ—আচ্ছা জ্বালাতন রে বাবা! নিজের বাড়ীতে এসে দু'দণ্ড শান্তিতে থাকবো—তারও উপায় নেই!

(তিন জন যুবকের সঙ্গে গোবর্দ্ধনের প্রবেশ; মিসেস্‌ বোস চা তৈয়েরী করছেন, গোবর্দ্ধন সাহায্যরত)

১ম—আমরা ভিলেজ্‌ ডিফেন্স সোসাইটীর ভলান্টিয়ার; ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড থেকে আমাদের মোতায়েন করা হয়েছে।

সতীশ—কেন?

২য়—গ্রামবাসীদের রক্ষা করতে।

সতীশ—এখন চা থাক। গোবর্দ্ধন, আগে এক বোতল সোডা এনে দে। সোডা খেয়ে চা খাবো।

গোবর্দ্ধন—আজ্ঞে, যাই। [প্রস্থান।

সতীশ—কি করে রক্ষা করবে, শুনি?

৩য়—আমাদের ভলান্টিয়ার-কোরের "জি ও সি"

বলেন, এই যুদ্ধ-টুদ্ধর সময় চোর-গুণ্ডাদের উপদ্রব বড্ড বেড়ে যায়। আমরা সব লাঠি-খেলা, যুযুৎসু ইত্যাদি শিখ্ছি—এই দুর্বৃত্তদের দমন করতে।

সতীশ—আমার তো চাকর, দরওয়ান, মালী, সবই রয়েছে। আর এবার যা-কিছু ভয়, সবই তো আকাশ থেকে।

১ম—আমরা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের বাড়ীর চার ধারেই বাঁশের খুঁটী পুঁতে তাতে কাঁটা-তার লাগিয়েছি। বাড়ীটার ওপরে বালির থলে সাজিয়ে রেখেছি।

সতীশ—সে তো আমিও আমার বাড়ীতে করতে হুকুম দিয়েছি।

২য়—থানার চার ধারে আমরা এ্যাণ্টি-এয়ার-ক্র্যাফ্‌ট বন্দুক বসিয়েছি।

সতীশ—কোথা থেকে জুটোলে?

৩য়—বাঁশের খোঁটায় একটা করে হুক্ মেরে রেখেছি। শত্রুর এরোপ্লেন এলেই হুকের মধ্যে রাইফেল ফিট করে সব ছুড়বো।

সতীশ—চমৎকার! গুল্‌তি-বাহিনীর ব্যবস্থা নেই?

১ম—আজ্ঞে, সেটা কি কোন নতুন রকম বন্দুক?

সতীশ—না। (সোফা থেকে একটা মাস্ক তুলে দেখিয়ে) তোমাদের এ-সবের ব্যবস্থা নেই?

২য়—এটা কি? কখনও দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না।

সতীশ—এর নাম গ্যাস-মাস্ক। এরোপ্লেন থেকে শত্রুরা বিষাক্ত গ্যাসের বোমা ছুড়ে মারতে পারে। তখন এই সব মুখে এঁটে প্রাণ বাঁচাতে হবে। দেখ্‌তে পাচ্ছ তো, ডিফেন্সের সব ব্যবস্থাই আমি করেছি।

৩য়—এ-সব ব্যবস্থা করেছেন, আর বয়সও আপনার পঁয়ত্রিশের বেশী বোধ হয় হবে না। আপনি সহর থেকে পালিয়ে—অর্থাৎ চলে এলেন কেন?

সতীশ—আমার বাড়ীতে আমি এসেছি, তাতে কারুর আপত্তি করার কিছু থাক্‌তে পারে না।

মনোরমা—আর ওঁর বয়সও হয়েছে। দেখায় পঁয়ত্রিশ বটে, কিন্তু তিপ্পান্নর এক-দিন কম নয়, বরং বেশী। আর শরীরটা খুবই খারাপ কি না। Heart delicate. গত যুদ্ধে উনি 49th Bengalএ ছিলেন।

১ম—ওঃ! তাহলে তো আপনাকে পেয়ে আমাদের ভারী সুবিধেই হ'ল। অনেক কৌশল শেখা যাবে। আমাদের "জি ও সি"কে কাল আনবো। আমরা এসে-ছিলুম চাঁদার জন্য।

২য়—এই ডিফেন্স কোরকে চালাতে হলে আপনাদের মত মহানুভব মহোদয়দের কৃপাই প্রধান সম্বল।

সতীশ—আমি এইমাত্র এসেছি। দেখছো তো, সুটকেশগুলো এখনো ভেতরে তোলা হয়নি।

৩য়—মাপ্ করবেন; কিছু মনে করবেন না। আমরা কাল সকালে না হয় আসবো। সঙ্গে "জি ও সি"-কেও আনবো। গত মহাযুদ্ধের সম্বন্ধে কিছু আমাদের বলবেন।

তিন জনে—নমস্কার!　　[প্রস্থান।

সতীশ—উঃ। এরা যা জেরা আরম্ভ করেছিল! ভাগ্যিস্ বুদ্ধি করে পঁয়ত্রিশকে তিপ্পান্ন করেছিলে! স্ত্রীরা সাধারণতঃ স্বামীর বয়স কমিয়েই থাকে।

(গোবর্দ্ধনের প্রবেশ)

গোবর্দ্ধন—এক বোতল সোডা চার আনা নিলে বাবু!

সতীশ—চা-র আনা! বলিস্ কি? পুলিশে দেবো। লোকটা জোচ্চোর। যত সব war pofiteering!

(নেপথ্যে—"আসতে পারি কি?")

সতীশ—আবার 'আসতে পারি কি!' এরা কি আমায় টিঁকতে দেবে না? হয়তো সেই কলকাতার সব experimental evacuated persons আসতে আরম্ভ করেছে, (বল্‌তে বল্‌তে একটি মহিলা ঘরে ঢুকলেন। অত্যধিক সাজসজ্জা)

মহিলা—আর দাঁড়াতে পারলুম না। অনেক দূর থেকে আসছি। ভয়ানক ক্লান্ত। (একটি সোফায় বসে অজ্ঞান হয়ে গেলেন)

সতীশ—অ্যাঁ! অজ্ঞান হয়ে গেল না কি? মনো, দ্যাখো! গোবর্দ্ধন, একটু জল—জল—

[গোবর্দ্ধনের প্রস্থান।

মনোরমা—জলের দরকার নেই। মুখের পেণ্ট উঠে যাবে।

সতীশ—এ-রকম কথা বলতে নেই। ও-বেচারী মনে কষ্ট পাবে।

মনোরমা—ও-তো অজ্ঞান হয়ে রয়েছে, শুনবে কি করে?

সতীশ—এখন আমাদের কি কর্ত্তব্য?

(জল নিয়ে গোবর্দ্ধনের প্রবেশ)

গোবর্দ্ধন—এই যে জল!

সতীশ—জল দিয়ে কি করবো মনো?

মনোরমা—ওর মাথায় ঢেলে দেবে।

(মহিলাটির মুখে সতীশ জলের ঝাপ্‌টা দিতে যেতেই তাঁর জ্ঞান ফিরে এল; তিনি চোখ মেলে চাইলেন)

মহিলা—আমি কোথায়?

মনোরমা—যেখানে এসেছেন, সেইখানেই আছেন।

মহিলা—(চারি ধারে চেয়ে) তাই তো! কিছু মনে করবেন না, আপনাদের বড় অসুবিধায় ফেললুম।

সতীশ—নিন্, এই চা'টুকু খেয়ে ফেলুন। (নিজের চায়ের বাটিটা এগিয়ে দিলে; মহিলাটি চা-পানে রত হোলেন)।

সতীশ—গোবর্দ্ধন, আর একটু চায়ের জল চাপিয়ে দাও।

গোবর্দ্ধন—আজ্ঞে, যাই। [প্রস্থান।

সতীশ—আপনার সঙ্গে জিনিষ-পত্তর কিছু এনেছেন ?

মহিলা—হ্যাঁ, একটা সুটকেশ। বাইরের বারান্দায় আছে।

সতীশ—ওঃ, আমি এনে দিচ্ছি।

মনোরমা—তাড়াতাড়ির দরকার নেই। কেউ তো নিয়ে পালাচ্ছে না।

মহিলা—আমাদের এখন সকলেরই প্রায় সমান অবস্থা।

সতীশ—সে তো বটেই !

মনোরমা—কি অবস্থা ?

সতীশ—তাই তো, কি অবস্থা ?

মনোরমা—আপনার সম্বন্ধে আমার কিছু জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।

মহিলা—ইচ্ছে হওয়াটা খুব স্বাভাবিক। বাড়ীতে কেউ থাকতে এলে তার সম্বন্ধে সকলেই জানতে চায়।

মনোরমা—থাকতে এলে—মানে ?

মহিলা—এখন তো আমায় এইখানেই থাকতে হবে। নইলে যাবো কোথায় ? দেশব্যাপী ভয়। বিদেশে মহাযুদ্ধ। এমন সময় সকলে সকলের প্রতি ভদ্র আচরণ করবে, এইটেই আশা করা যায়,—কি বলেন ?

সতীশ—সে তো বটেই।

মহিলা—কিন্তু বাসে আসবার সময় সে কি ফিস্‌ফিস্ আর হাসাহাসি ! আমার কান্না পেতে লাগলো। শেষে আর সহ্য করতে না পেরে যে-দিকে দু'চক্ষু গেল, চলে এলুম।

মনোরমা—আপনি কে ? আপনার নাম ?

মহিলা—আমার নাম রেবা রায়। ফিল্মে প্লে করি। নাম শুনে থাকবেন নিশ্চয়ই !

মনোরমা—না। দেশী বই আমরা দেখি না। কিন্তু এখানে কেন ?

রেবা—আমাদের কোম্পানী আর ছবি তুলতে পারছে না। লড়াইয়ের জন্য Agfa ফিল্ম আসছে না। কোডাকের দাম বেশী। তারা হঠাৎ ভারতবর্ষের সব জায়গা থেকে অর্ডার পেয়ে মাল দিয়ে উঠতে পারছে না। কলকাতায় যা কিছু ষ্টক ছিল, সব "রস ও লাস্য" কোম্পানী কিনে নিয়েছে। তাই অন্য কোম্পানী সব বন্ধ। আমাদের অন্ন উঠেছে।

মনোরমা—বেশ তো। তা এখানে এসেছেন কেন ?

রেবা—যে কারণে আপনারা এসেছেন। বাইরে দেখলুম, একখানা ্কার দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিশ্চয় আপনাদের। ঘরে সুটকেশ। বোঝা যাচ্ছে, আপনারা এখনি এখানে এসেছেন। কেন ? প্রাণ বাঁচাতে। আমার উদ্দেশ্যও ঠিক তাই। আমি বাঁচতে চাই। আমার অনেক **latent parts** আছে। জগৎকে তা থেকে অকালে বঞ্চিত হ'তে দিতে চাইনে।

মনোরমা—কিন্তু—

সতীশ—কিন্তু কেন ? দশ জন লোক তো আমাদের রাখতেই হবে। বস্তীর কোথাকার কে—

মনোরমা—তার চেয়ে খুব বেশী উন্নতি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না।

(এক জন হাফ্-হাতা শার্ট, ফুল প্যাণ্ট ও হ্যাট্‌পরা যুবকের প্রবেশ)

যুবক—"মনোরমা-কুটীর" I believe ?

সতীশ—ফটকের ওপরেই নাম লেখা আছে। কিন্তু আগে খবর না দিয়ে আস্‌বার কারণ ?

যুবক—Sorry, আমি ভেবেছিলুম—

সতীশ—তবে কি আমি ধরে নেবো যে, you have been sent ?

যুবক—Sent ? কি বল্‌ছেন, আমি বুঝতে পারছি-নে যে ?

সতীশ—আমি ভেবেছিলুম যে, evacuation রিহার্শাল হচ্ছে।

যুবক—Quite so.

সতীশ—আপনার সঙ্গে কোন document আছে ?

যুবক—না। ষ্টার্টে organisation একটু ভুলচুক করবে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ করছে। (একটা চেয়ারে বসে) বাড়ীটা বেশ পছন্দসই দেখ্‌ছি।

সতীশ—কিন্তু আমি—

যুবক—কিন্তু কেন ? কিছু doubt আছে ?

সতীশ—আমি এত young man expect করিনি। তার ওপর আপনার বাঙলাটা যেন কেমন-কেমন ঠেকছে।

রেবা—অনেকটা ষ্টেজে কিম্বা ফিল্মে-সাজা সাহেবের বাঙলা কথা বলবার চেষ্টার মতো।

মনোরমা—কিম্বা বাঙ্গালীর সাহেব সাজবার প্রচেষ্টা।

যুবক—No, No, I am an Anglo-Indian—real and genuine Anglo-Indian.

সতীশ—কিন্তু Anglo-Indianদের তো A. P. I. join করতে বলা হয়েছে।

যুবক—আমার ও-সব গোলমাল ভালো লাগে না। টাইমে খাওয়া না হলে আমার হার্ট palpitate করে।

সতীশ—জোয়ান বয়স, তাগ্‌ড়া চেহারা।

যুবক—আপনি হন কি ডাক্তার ?

সতীশ—না।

যুবক—সে আমি আগেই বুঝেছে। ডাক্তার হ'লে আগেই you could have spotted it !

সতীশ—(ভয়ে পেছিয়ে) অ্যাঁ, বলেন কি !

যুবক—ভয় আছে না। Nothing infectious. হাট উইক আছে।

সতীশ—যদি আপনি unfit, তাহলে বাঁচবার জন্য এত ব্যগ্র কেন ?

যুবক—আপনি কি ফিট্ আছেন ?

মনোরমা—ওঁর বয়স তিপ্পান্ন বছর।

যুবক—Really ? বেশ, আপনি যদি old আর আমার মত unfit হন, তবে আমরা দুজনেই বাঁচতে চেয়েছে। Nothing to choose between us, হ্যাঁ, আমার ঘর দেখাবেন আসেন।

সতীশ—আমি বলছিলুম—

যুবক—কি বলতেছিলেন ? আমার ঘর আছে কোথা ?

সতীশ—(ভীত স্বরে) মানে, this is all so sudden. আমরা এইমাত্র এসে পৌছেচি।

যুবক—ওঃ ! এখনও ঘর ঠিক না করা হয়েছে ? Well, take your time, আপনার wife আর daughterএর সঙ্গে পরামর্শ করে—

মনোরমা—ও আমাদের মেয়ে নয়।

যুবক—I thought so.

সতীশ—আমি বলছিলুম Mr...

যুবক—Charles O'nath Padder.

রেবা—ওঃ, তাই বলুন !

সতীশ—কি ?

রেবা—অনাথ পোদ্দার ! তা অত মুখ ভেঙ্চে বলবার কি দরকার ছিল ?

সতীশ—আপনার এখানে আসার প্রণালীটা যেন একটু irregular ঠেকছে।

চার্লস—Irregular ! কেন ?

সতীশ—আমার নাম জানেন ?

চার্লস—না।

সতীশ—আমার বাড়ীতে আপনাকে তারা পাঠালে, অথচ বাড়ীর মালিকের নাম বলে দিলে না ?

চার্লস—বলেছে "মনোরমা-কুটীর" নাম আছে।

সতীশ—সে তো ফটকের লেখা দেখে বলছেন। আমার নামটা তারা আপনাকে জানালে না—এটা highly suspicious !

মনোরমা—একেবারেই অবিশ্বাস্য।

সতীশ—কথাটা রূঢ় শোনাচ্ছে, কিন্তু উপায় নেই। You must—কিছু মনে করবেন না।

চার্লস—বাড়ীটা আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। I am going to stay here.

(মিষ্টার সনৎ ও মিসেস্ মায়া হোড়ের প্রবেশ ; দুজনেই বেশ মোটা ও বেঁটে ; তবে মিসেস্ হোড় যেন একটু বেশী ; দেখেই মনে হয়, পয়সাওয়ালা লোক)

সনৎ—আপনাদের কাজের ব্যাঘাত করলুম কি ?

রেবা—তা একটু করলেন বই কি ! Mr. Padder-এর সলিলকিটা শোনা হলো না।

সতীশ—আপনাকেও কি ওরা এখানে পাঠিয়েছে ?

সনৎ—ওরা ? কারা ?

মায়া—তুমি চুপ করো। আমি গুছিয়ে বল্‌ছি। আমাদের পাঠিয়েছেন ভগবান্। পথে পথে আশ্রয়ের জন্য ঘুরছি, কিন্তু আশ্রয় পাচ্ছিনে। আমরা বাঁচতে চাই, আশ্রয় চাই।

সনৎ—আমরা মরিয়া হয়ে উঠেছি।

মায়া—আবার তুমি কথা কইছ ! আপনার দয়া-ভিক্ষা করছি। এ বিপদের সময় আপনি না রাখ্‌লে কে আর রাখ্‌বে, বলুন ?

রেবা—মিষ্টার প্যাডারের চেয়ে আপনার বক্তৃতাটা ভালো। আমি অনেক জিনিষ শিখে নিতে পার্‌ছি। আমার next বইয়ে কাজে লাগবে !

সনৎ—আমাদের পয়সা আছে। সুতরাং আপনার ভয় নেই।

মায়া—আবার ! বল্লুম না—তুমি পারবে না, আমি বলছি ! আমরা ভদ্রলোক। Paying guest হয়ে থাকতে চাই। যা লাগে, দেবো। শুধু আমাদের থাকতে দিন। আমার স্বামীর কার্ড আমাদের respctability সম্বন্ধে assurance দেবে।

সনৎ—এই নিন আমার কার্ড।

(সতীশ বাবুর হাতে কার্ড প্রদান)

সতীশ—না মিষ্টার হোড়, সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ থাকতেই পারে না। আমার নাম সতীশ বোস।

মনোরমা—মিসেস্ হোড়, বসুন। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?

মায়া—(বসিয়া) ধন্যবাদ। দেখুন মিসেস্ বোস, আপনি আমার বোনের মত। আমাদের একটু মাথা গোঁজবার জায়গা। একটা ঘর—তা যত ছোটই হোক না কেন !

মনোরমা—আমাদের জায়গার ভয়ানক অভাব। বাড়ীটা ছোট।

মায়া—ভাই, তোমার মনে কি করুণা নেই ?

সতীশ—যেমন করে হোক, আপনাদের থাকবার একটা বন্দোবস্ত করে দিতেই হবে।

সনৎ—ধন্যবাদ।

মায়া—আমাদের হৃদয়ের অন্তস্তম কন্দর হ'তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর্‌ছি।

সতীশ—না, না, এ আর এমন কি ? (পকেট থেকে কাগজ বার করে) আমাদের তো দশ জন লোক নিতেই হবে ! ভালো লোক পাওয়া যায় সে তো ভালোই।

মায়া—আমাদের আলাদা একটা ঘর দেবেন।

মনোরমা—বুঝতে পারছেন, আপনাদের পুরো একটা ঘর ছেড়ে দেওয়া কত মুস্কিল ?

মায়া—না, সেটা বুঝতে পারছি নে। আমাদের স্বামি-স্ত্রীর একটা privacy থাকবে না ?

রেবা—উচিত বটে, তবে অন্যত্র দেখুন।

সনৎ—মিষ্টার বোস, আপনি যা চাইবেন, আমি তাই দিতে রাজি আছি।

মায়া—একটা ফার্ষ্ট ক্লাশ হোটেলের যা রেট, আমরা তাই দেবো। আমাদের কাছে যথেষ্ট টাকা আছে।

চার্লস—That interests me.

সনৎ—মানে, আপনি আমাদের againstএ bid করতে চান ?

চার্লস—That would be undemocratic. তবে এই warএর সময় বড়লোকের টাকা আছে, তাই গরীবদের আমি মরতে দেবো না।

সনৎ—বাড়ী আপনার বলে তো মনে হচ্ছে না।

চার্লস—Never mind. আমি যা বলছে—

(কানাই দাস-ঘোষের প্রবেশ—পুলিশের বেশ ; মাথায় পাগড়ী তার ওপরে একটা sand-bag. হাতে মোটা লাঠি)

কানাই—নমস্কার হুজুর ! আমার নাম কানাই দাস-ঘোষ।

সতীশ—আমাদের গোবর্দ্ধনের নাতি ?

কানাই—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি এই গ্রামের এয়ার-ওয়ার্ডেন। সাহেব বলেছেন, "কানাই, তোমার মতন কাজের লোক সোদপুরে আর নেই। লড়াই-ব্যাপার তুমি বেশ বোঝো।"

মনোরমা—সে পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি।

কানাই—পাবেন বই কি ! এ-পাড়ায় আমায় সকলেই চেনে।

মনোরমা—তোমার মাথায় ওটা কি ?

কানাই—বালির থলে। A. R. P.

সতীশ—I see. ইনি আমার স্ত্রী। আর এঁরা—

সনৎ—আমরা ওঁর অতিথি।

কানাই—ছ' জন রয়েছেন। বেশ, সে আপনি বুঝবেন হুজুর ! কিন্তু সে জন্ত দশ জন লোক কমবে না।

সতীশ—কেন ? সবশুদ্ধ দশ জন লোক নেওয়া নিয়ে কথা। (পকেট থেকে কাগজ বার করে) এই তো তোমাদের নোটিশ···though the number is monstrous.

কানাই—(কাগজটা নিয়ে ছিঁড়ে) এটা বাতিল হয়ে গেছে। (এই বলে আর একটা কাগজ নিয়ে লিখতে লাগলো)

সতীশ—যাক্, বাঁচা গেছে। মানে বাড়ীটা এখন আবার আমরা ফেরত পেলুম।

সনৎ—কিন্তু আমাদের—

মায়া—যা লাগে—যত বলবেন।

রেবা—আমি অবলা।

সতীশ—না, আপনাদের যেতে বলতে পারিনে। কিন্তু (চার্লসকে দেখিয়ে) ওকে রাখবো না। Bluff দিয়ে আমাকে বেকুব বানানো চলবে না।

চার্লস—(সুটকেশ নিয়ে) বেশ, আমি চলে যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

সতীশ—কানাই, তুমি আমায় খুব বাঁচিয়েছ বাবা !

কানাই—বাতিল বলাটা ঠিক হয়নি, বদলে গেছে বলা উচিত ছিল। (কাগজটা সতীশ বাবুকে দিল) আপনার ভাগে গোবরার কর্পোরেশনের ফ্রী-প্রাইমারী স্কুলের কুড়িটি ছেলে পড়েছে। একটু আগে তারা এসে পৌঁছেচে।

সতীশ—বল কি হে ! বস্তীর যত সব হাড়-হাবাতের ছেলে। তা আবার কুড়িটা !

(রিভলভার হাতে চার্লসের প্রবেশ)

চার্লস—আপনার গাড়ীটা আমি নিচ্ছে মিষ্টার বোস।

কানাই—পুলিশের চোখের সাম্নে ?

চার্লস—Shut up.

মায়া—এই কি ঠাট্টার সময় ?

চার্লস—Joke নয় old lady. বলেন তো, আপনার husband-এর একটা কান উড়িয়ে দিয়ে prove করি যে, I am serious.

সনৎ—(দুই কান ঢেকে) মায়া, পালিয়ে এসো আমার কাছে।

চার্লস—Hands up you constable.

কানাই—আমি পুলিশের লোক। আমার কথা—

চার্লস—Shut up or I will shoot. আপনাদের যার যা টাকা-কড়ি আছে, এই টেবিলের ওপর রাখেন।

(সকলে এক-এক করে রাখলে)

চার্লস—You, young lady.

রেবা—আমার তো কিছু নেই। কানের এই দুলটা আছে—তাও ধর্ম্মতলা থেকে কেনা পাঁচ সিকে দিয়ে।

চার্লস—All right. Keep them. আমরা ভদ্র-লোক আছে। লেডিদের গহনা নেয় না।

(মনিব্যাগগুলো নিয়ে পেছোচ্ছে, এমন সময় সাদা দাড়ী-গোঁফযুক্ত এক জন লোক ছুটে ঘরে ঢুকে দরজাটা জুড়ে দাঁড়ালো ; চার্লস জানলার কাছে সরে গেল)

মানিনী রাই

আগন্তুক—সতীশ, বাবা, কেমন আছিস্? কত দিন তোকে দেখিনি। (বল্‌তে বল্‌তে সনৎ বাবুকে জড়িয়ে ধরলে)

সনৎ—আমি সতীশ বাবু নয়। আমার নাম সনৎ হোড়। ওঁর নাম সতীশ বাবু। (সতীশকে দেখাইলেন)

আগন্তুক—ঠিকই তো। কি ভুল আমার! চোখটা একেবারে গেছে। সেই নাক! সেই চোখ! ছেলে-বেলায় আমায় দেখেছিলে। তোমার বোধ হয় এখন মনে নেই। আমি তোমার পিসে হই।

সতীশ—পিসে? আমার বাবার তো বোন ছিল না।

আগন্তুক—আপন-ভগিনী ছিল না বটে। খুড়তুতো বোন।

সতীশ—কিন্তু ঠাকুর্দ্দা তাঁর বাবার ছেলে-মেয়ের মধ্যে সব-চেয়ে ছোট ছিলেন।

আগন্তুক—তবে জ্যেঠ্‌তুতো। বয়স হয়েছে কি না বাবা, তাই কিছু মনে রাখতে পারিনে। তার পর মা মনো—(বলিতে বলিতে রেবা রায়ের কাছে এগিয়ে গিয়ে) কেমন আছো মা? সতীশের যুগ্যি বউ বটে!

মনোরমা—আপনার নামটা জানলে—

সতীশ—সবই যেন কি রকম ঠেক্‌ছে!

আগন্তুক—বাবা সতীশ, নিজের পিসেকে চিন্‌তে পারছো না!

কানাই—না। আমার যেন কি রকম সন্দেহ হচ্ছে। গলাটা যেন চেনা-চেনা ঠেক্‌ছে। (হঠাৎ এগিয়ে এসে দাড়ী ধরে টান; সব খুলে পড়ল) অ্যাঁ! এ কি! (ভালো করে তাকে ধরলে)

আগন্তুক মাণিক—(হঠাৎ চার্লসকে দেখে) আরে, তুমিও জুটেছ দেখ্‌ছি! আবার সায়েব সাজা হয়েছে!

চার্লস—তুমি কে? আমি তোমায় চিন্‌তে না পারে।

মাণিক—তা চিন্‌বে কেন? আগড়পাড়া থেকে নতুন এসেছ, তাই পুলিশ তোমায় চেনে না; কিন্তু আমরা তো চিনি। এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে না। আমি ধরা পড়েছি, তুমিও পড়বে।

কানাই—ওকে তুমি চেনো?

মাণিক—নিশ্চয়ই। আমরা একসঙ্গে কত দিন কাজ করেছি। ওর নাম গুপীনাথ পাল। বি-এ পাশ।

চার্লস—আমার নাম চার্লস ওনাপ প্যাডার আছে।

মাণিক—গুপী থেকে হয়েছে অনাথ? বেশ বাবা!

চার্লস—আমি এখুনি তোমায় গুলী কোর্ব্বে।

মাণিক—এখনও সেই দু-টাকা দামের toy-gun চালাচ্ছো!

চার্লস—আমি খ্রিষ্টান কর্চ্ছে। তোমাদের সঙ্গে কথা বল্‌বে না।

(তাড়াতাড়ি বেরুতে গেল, ওদিক্ দিয়ে গরম চায়ের কেট্‌লী নিয়ে গোবর্দ্ধন ঢুকতেই দুজনে ধাক্কা লাগল; এবং দুজনেই পড়ে গেল। ফুটন্ত গরম চা চার্লসের গায়ে পড়ল)

চার্লস—দগ্ধ করিয়া হত্যার চেষ্টা! (হাত থেকে ব্যাগগুলো ও রিভলভার পড়ে গেল)

(গোবর্দ্ধন চার্লসকে সাপটিয়ে ধরলে)

কানাই—লাগেনি তো দাদু!

গোবর্দ্ধন—না। লোকটা কি কানা?

কানাই—এদের পুলিশে দিয়ে আসি হুজুর! দাদু শক্ত করে ধরো, পালিয়ে যেতে না পারে!

রেবা—আমার যদি কোন সাহায্য কিম্বা সাক্ষ্য লাগে, জানিও। আর কাগজে রিপোর্ট দেবার সময় আমার নামটা উল্লেখ করতে ভুলো না।

(মাণিককে নিয়ে কানাই আর চার্লসকে নিয়ে গোবর্দ্ধন যাচ্ছে, এমন সময় সতীশ বাবু ডাকলেন)

সতীশ—কানাই, বাড়ীটা তোমার জিম্মায় রেখে যাচ্ছি।

কানাই—হুজুর, চলে যাচ্ছেন না কি?

মায়া—তাহলে আমাদের কি হবে?

রেবা—আপনি চলে গেলে আমি কার কাছে থাকবো সতীশ বাবু?

মনোরমা—তুমি যেখানে যার কাছে ইচ্ছে হয় থেকো!

সতীশ—আপনাদের যত দিন ইচ্ছে হয়, এখানে থাকুন। আমরা চল্লুম। এসো মনো! সহরে Air-raid হলে এর চেয়ে বেশী আর কি হবে? এখানে এই ভাবে বাঁচবার চেষ্টা করার চেয়ে সহরে থেকে মরাও ভালো!

[মিষ্টার সতীশ বোস ও মিসেস্ মনোরমা বোসের গৃহত্যাগ]।

শ্রীযামিনীমোহন কর (এম-এ অধ্যাপক)।

অশ্রুজল

শুধু জল দিয়ে আল্‌পনা দিলে,
সে-দাগ যায় না রাখা।
সজল আঁখির দাগ শুকাইলে,
মর্ম্মে সে রহে আঁকা।

শ্রীঅরুণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

প্রাচীন বাঙ্গালার শিল্প ও বাণিজ্যসম্পদ

কোন দেশের ইতিহাস আলোচনা করিতে হইলে সেই দেশের শিল্পের এবং বাণিজ্যের অবস্থা আলোচনা না করিলে তাহা সম্পূর্ণ হয় না ; কারণ, শিল্প এবং বাণিজ্যের অবস্থা হইতে দেশের লোকের সভ্যতা এবং অন্যান্য অবস্থার আভাস পাওয়া যায়। বর্ব্বরজাতি কখনই শিল্প এবং বাণিজ্য বিষয়ে উন্নতিলাভ করিতে পারে না। শিল্প এবং বাণিজ্যের উন্নতি করিতে হইলে যে পরিমাণ বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হয়, তাহাতে সেই জাতির সভ্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলে। এক দল য়ুরোপীয় পণ্ডিত বলিয়া থাকেন যে, আমাদের এই বাঙ্গালাদেশ প্রাচীনকালে অসভ্য কিরাত জাতীয় লোকের বাসভূমি ছিল। সে কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বেও এই বাঙ্গালাদেশের শিল্প এবং বাণিজ্যের অবস্থা যেরূপ ছিল বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে এই দেশ সভ্যতার পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অথচ এ সকল বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে হইলে প্রাচীন সাহিত্যের ভিতর তাহার অনুসন্ধান করিতে হয়। প্রাচীন ভারত যে শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ে বিশেষ অগ্রসর হইয়াছিল, তাহা অনেক য়ুরোপীয় পণ্ডিতই স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রসিদ্ধ ইংরেজ ঐতিহাসিক এডোয়ার্ড থর্ণটন লিখিয়া গিয়াছেন যে, মিশরের নীল নদীর উপত্যকা-ভূমিতে পিরামিডগুলি যখন মস্তক উত্তোলন করে নাই,—যে সময়ে গ্রীস এবং ইটালী অসভ্য বন্যভাবাপন্ন মানবের বাসভূমি ছিল, সেই সময়েও ভারতবর্ষ ঋদ্ধি এবং গৌরবের লীলাস্থল ছিল। এই স্মরণাতীতকালেই ভারত শিল্প-প্রধান হইয়াছিল। ভারতের দক্ষ শিল্পীরা নানাবিধ শিল্পজ পণ্য উৎপাদন করিত—ইত্যাদি। (১) ইহার পর সার উইলিয়ম হাণ্টারও তাঁহার Indian Empire নামক গ্রন্থে স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষ বাণিজ্যপ্রধান দেশ ছিল। ভারতের অধিবাসীদিগের শিল্পোদ্ভাবিনী প্রতিভা এবং তাহার বিস্তীর্ণ বেলাভূমি এশিয়ার অন্যান্য দেশ হইতে তাহাকে বিশিষ্ট করিয়াছিল। পশ্চিম-ভারত উপদ্বীপের পূর্ব্ব-মালয় উপদ্বীপের এবং বিস্তীর্ণ চীনভূমির সুজলা সুফলা দেশ হইতে ইহার পার্থক্য এই যে, ভারত য়ুরোপের সহিত কর্ম্মতৎপরতা সহকারে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। (২)

এই সকল পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক মোটামুটি ভারতের কথাই বলিয়াছেন—বাঙ্গালার কথা বিশেষ ভাবে বলেন নাই। মহাভারতের সভাপর্ব্বে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, তাম্রলিপ্তি ও পৌণ্ড্রদেশের রাজগণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে বহুমূল্য আচ্ছাদনের সহিত অনেক হস্তী উপহার দিয়াছিলেন। (৩) ইহা ভিন্ন প্রাচ্যদেশীয় রাজগণ নানা প্রকার সুবর্ণখচিত আসন, শয্যা উপহার দিয়াছিলেন। উহা গজদন্তনির্ম্মিত। উইলসন সাহেবের মতে উহা বাঙ্গালাদেশের রাজগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। পৌণ্ড্রদেশ বাঙ্গালারই পশ্চিম ভাগে অবস্থিত। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পৌণ্ড্রদেশ বাঙ্গালারই অন্তর্গত। এখন পৌণ্ড্রদেশের কিয়দংশ বেহারেরই অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। আর সুহ্ম দেশ ঠিক কোন্‌খানে ছিল, তাহা বলা বড়ই কঠিন। উহা বঙ্গদেশের পূর্ব্বদিকেই ছিল। আসুহ্ম হইতে আসাম নাম হইয়াছে। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ রাঢ়দেশকেই সুহ্ম বলিয়াছেন। যাহা হউক, মহাভারতের সভাপর্ব্বে বঙ্গ, কলিঙ্গ, পৌণ্ড্র, তাম্রলিপ্তি, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশের রাজগণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে যে সকল দ্রব্য উপঢৌকন দিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা প্রস্তুত করিতে হইলে শিল্পকার্য্যে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন। গজদন্তের চৌকি, আসন প্রভৃতি এবং হাতীর হাওদা নির্ম্মাণ বড় সহজসাধ্য নহে। হস্তীর সুবর্ণখচিত আবরণ প্রস্তুত করিতেও বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন। সুতরাং রাজা যুধিষ্ঠিরের আমলে বঙ্গদেশে সূক্ষ্ম কারুশিল্পের যে বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা ভিন্ন নানাবিধ যুদ্ধাস্ত্র, তরবারি শার্দ্দূলচর্ম্মাচ্ছাদিত রথ প্রভৃতির বিবরণ পাঠেই বুঝা যায় যে, খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় দুই হাজার-আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে যখন ভারতে যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, তখন

---

(১) Ere yet the Pyramids looked down upon the valley of the Nile—when Greece and Italy, these cradles of European civilization, nursed only the tenant of wilderness—India was the seat of wealth and grandeur. A busy population has covered the land with the marks of its industry × × skilful artisans converted the rude produce of the soil; into fabrics of unrivalled delicacy and beauty; and archetects and sculptors joined in constructing works, the solidity of which in some instances been overcome by the revolution of thousands of years etc.—History of the British Empire in the East, (2nd Vol) P. I.

(২) Indian Empire 3rd Ed. P. 958

(৩) মহাভারত সভাপর্ব্ব ৫২।২০-২১

বঙ্গদেশ শিল্পকলায় সমুন্নত হইয়াছিল। সুতরাং প্রায় চারি-পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে আমাদের বঙ্গদেশ শিল্পকলায় বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সকল পণ্যে বঙ্গবাসীরা বিদেশীর সহিত বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। রামায়ণে বর্ণিত আছে, মগধ, মহাগ্রাম, অঙ্গ, পৌণ্ড্র প্রভৃতি কৌষেয়-তন্তুৎপাদক দেশগুলি অবস্থিত। তথায় অনেক রৌপ্য-খনি বিদ্যমান। (৪) পৌণ্ড্র হইতে অঙ্গ পর্য্যন্ত দেশ ধরিলে বঙ্গ তাহারই অন্তর্ভূত বলা যায়। সুতরাং অতি প্রাচীনকালেই বাঙ্গালা ও বিহার অঞ্চলে রেশম-শিল্প সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই রেশম-শিল্প অনেক প্রকার ছিল। কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে বঙ্গদেশের রেশম-শিল্পের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, বঙ্গদেশীয় বস্ত্র ক্ষৌম, শুভ্র এবং কোমল। পৌণ্ড্রদেশীয় বস্ত্র ক্ষৌম, কৃষ্ণবর্ণ, এবং রত্নের ন্যায় স্নিগ্ধ। সুবর্ণকুড্যদেশীয় ক্ষৌম রক্তবর্ণ এবং স্নিগ্ধ। অর্থশাস্ত্রে মগধ, পৌণ্ড এবং সুবর্ণকুড্যক দেশের বস্ত্রের বিশেষ প্রশংসা দেখা যায়। নাগবৃক্ষ, লিকুচ, বকুল এবং বট হইতে পূর্ব্বকালে তন্তু নির্ম্মিত ও তাহা হইতে বস্ত্র বয়ন করা হইত। নাগবৃক্ষের তন্তু পিত্তবর্ণ, লিকুচ (তেহুয়া) গাছের আঁশ গোধূমবর্ণ, বকুল বৃক্ষের তন্তু শ্বেতবর্ণ, এবং বটবৃক্ষের তন্তু মাখনের ন্যায়। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই সকল তন্তু হইতে বস্ত্র নির্ম্মিত হইত। ইহা প্রস্তুত করিতে যে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হইত, তাহার উল্লেখ বাহুল্য ; সুতরাং বাঙ্গালায় অন্ততঃ দুই-তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে শিল্পের ও বাণিজ্যের যে বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অনেকের ধারণা, সর্ব্বপ্রথম চীনদেশেই রেশমের বস্ত্র প্রস্তুত হয়। এই ধারণা সত্য নহে। ভারতে, বিশেষতঃ পূর্ব্ব-ভারতেও ক্ষৌমবস্ত্র ভূরি পরিমাণে প্রস্তুত হইত।(৫)

বাঙ্গালা যে কার্পাস-বস্ত্রের আদি-ভূমি, তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। কার্পাসিকা বা কার্পাসবস্ত্র বাঙ্গালা দেশেই প্রথম প্রস্তুত হয়, এ কথা অনেক য়ুরোপীয়ই স্বীকার করিয়াছেন।(৬) এক জন য়ুরোপীয় লিখিয়াছেন, "আমাদের যত দূর জ্ঞান, তাহাতে ভারতই কার্পাস বস্ত্রের সর্ব্ববাদিসম্মত জন্মস্থান বলিয়া স্বীকৃত। ঋগ্বেদের একটি স্তোত্রে তাঁতে কার্পাস-বস্ত্রের উল্লেখ আছে। খৃষ্ট-জন্মের দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে উহা রচিত হইয়াছিল। তখন উহা বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। মহাভারতের সভাপর্ব্ব এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, অতি প্রাচীনকালে বাঙ্গালাদেশে সুবর্ণখচিত বস্ত্র নির্ম্মিত হইত। বাঙ্গালায় বিস্তর রৌপ্য-খনি ছিল ; তাহা হইতে রৌপ্য উত্তোলিত করিয়া সেই রৌপ্য হইতে সূক্ষ্ম তন্তু নির্ম্মাণ করিয়া তদ্দ্বারা ক্ষৌম এবং কার্পাস-বস্ত্রের উপর কারুকার্য্য করা হইত। উহা যে বিদেশে নীত হইত, তাহারও প্রমাণ আছে। সুতরাং এই সকল শিল্প যে বাঙ্গালায় বিশেষ উন্নত হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। এই সকল খনিতে এবং কর্ম্মকারদিগের কারখানায় যে অতি প্রাচীনকাল হইতে বহু সহস্র শ্রমিক ও কারিগর কাজ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত, তাহাও সর্ব্বজনস্বীকৃত।

এই সকল শিল্পজ পণ্য বিদেশে বিক্রয় করিয়া সেই প্রাচীনকালে বাঙ্গালী জাতি যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিত। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ম্যাকফার্শন বলেন যে, মিশর হইতে বাণিজ্য জাহাজ সিন্ধুদেশে এবং বঙ্গদেশে পণ্য গ্রহণের জন্য আগমন করিত, এবং পঞ্চনদ ও বঙ্গদেশ হইতে বাণিজ্য দ্রব্য তাহাদের দেশে লইয়া যাইত। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে বাঙ্গালা হইতে অনেক কৃষিজ এবং শিল্পজ পণ্য ভারতের বাহিরে—মিশর প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হইত। পেরিপ্লাস সে কথা বিশেষ ভাবেই বলিয়াছেন। তৈল সুরভিত করিবার মশলা বাঙ্গালা হইতেই দূরদেশে নীত হইত। শুনা যায়, ঐ সকল মশলা হিমালয় হইতে সংগৃহীত হইত। গঙ্গাজাত মুক্তা ও তেজপত্র প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানী করা হইত। বাঙ্গালায় মসলিন-বস্ত্রের কথা পেরিপ্লাস বিশেষ ভাবে বিবৃত করিয়াছেন। মসলিন ঢাকা জিলাতেই উৎপন্ন হইত। ইহার ন্যায় কোমল বস্ত্র আর ভারতে প্রস্তুত হইত না। মসলিন এরূপ সূক্ষ্ম সূতায় প্রস্তুত হইত যে, একটি আংটীর ভিতর দিয়া ইহা অনায়াসে টানিয়া লইয়া যাওয়া যাইত। ইহা এত কোমল যে, ইহাকে রোমানগণ নীহারিকা বলিত। এই মসলিন বাঙ্গালার অন্যত্রও প্রস্তুত হইত ; কিন্তু ঢাকার মসলিনের ন্যায় সূক্ষ্ম এবং কোমল মসলিন অন্য কোন স্থানে প্রায় প্রস্তুত হইত না। ঢাকা ও তাহার সন্নিহিত অঞ্চলে নানা প্রকার মসলিন প্রস্তুত হইত। বস্ত্র-শিল্পে বাঙ্গালাদেশ অতি প্রাচীনকাল হইতেই খ্যাতিলাভ করিয়া আসিয়াছে। বাঙ্গালায় একটি গঞ্জের নিকট সুবর্ণের খনি ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন, উহা ছোটনাগপুরের অধিত্যকা-ভূমিতেই অবস্থিত ছিল। অন্যান্য স্থান হইতেও বাঙ্গালাদেশে সুবর্ণ আমদানী কর'

(৪) রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৪০।২৩

(৫) T W. Helfer the Indigenous silk-worms of Bengal, P 40.

(৬) India being according to our knowledge its accredited birthplace. In one of the hymns of Rigveda, said to have been written fifteen centuries before our christian era reference is made to the cotton in the loom, at which early date, therefore, it must have acquired some considerable footing.—J R A S vol 17. Also Mann on the Cotton-trade of India.

হইত। আসাম এবং উত্তর-ব্রহ্মদেশ হইতে অনেক সুবর্ণ বাঙ্গালায় আমদানী হইত।

বঙ্গদেশে নানা প্রকার মণি পাওয়া যাইত। প্লিনি বলেন যে, গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র নদীতে অনেক মণি মিলিত। টলেমীর মতে গঙ্গাতীরবর্ত্তী কোন সহরে হীরক পাওয়া যাইত। ইহা কোন্ সহর, এখন তাহা অনুমান করা কঠিন; তবে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, উহা ছোট-নাগপুরে অবস্থিত ছিল, কিন্তু এ অনুমান ঠিক কি না, বলা কঠিন। খৃষ্টীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ শতাব্দীতে বাঙ্গালা হইতে সার্থবাহগণ নানাবিধ পণ্য বিদেশে লইয়া যাইত। বৌদ্ধ জাতক-গ্রন্থে তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।(৭) সার্থবাহগণ বাঙ্গালা হইতে নানা দিগ্‌দেশে পণ্য লইয়া যাইত; সুতরাং বাঙ্গালায় যে বিবিধ মূল্যবান পণ্য প্রস্তুত হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। চম্পা (বর্ত্তমান ভাগলপুর) বাঙ্গালার গঙ্গাতীরবর্ত্তী একটি প্রধান গঞ্জ ছিল, এবং তাম্রলিপ্তি (তমলুক) বাঙ্গালার একটি বিশিষ্ট সাগরতীরস্থ বন্দর ছিল। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন্থসাং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালাকে কৃষি এবং শিল্প-সম্পদে বিশেষ সম্পন্ন দেখিয়াছিলেন। তিনি বলেন, সমতটে বিবিধ কৃষিজ পণ্য উৎপাদন করা হইত। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে সুলেমান নামক আরবদেশীয় কোন পর্য্যটক বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। তিনি রুমি নগরীতে অতি সুন্দর মসলিন-বস্ত্র দেখিয়া গিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, সুবর্ণ এবং রজত ঐ অঞ্চলে ভূরি পরিমাণে পাওয়া যায়। ঘৃতকুমারী, মুসব্বর প্রভৃতি ঔষধিও যথেষ্ট। বাঙ্গালার প্রধানতঃ রুমিগঞ্জ এবং তাম্রলিপ্তি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। রুমি ঢাকার সন্নিহিত কোন স্থান বলিয়া য়ুরোপীয়রা অনুমান করিয়া থাকেন। খুদ্দাদজ নামক এক জন আরবদেশীয় ভৌগোলিক রুমিগঞ্জের কথা বিশেষ ভাবে বলিয়াছেন। মুসলমান কর্ত্তৃক বাঙ্গালা-বিজয়ের প্রারম্ভকালে এক জন চীনদেশীয় পর্য্যটক ভারতভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তিনি ভারতের উভয় দিকেই ধারযুক্ত তরবারি, এবং বাঙ্গালার বস্ত্রশিল্পের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অতি প্রাচীনকাল হইতে বাঙ্গালাদেশ শিল্পে এবং বাণিজ্যে সমৃদ্ধ ছিল। মহাভারতের সময় হইতে মুসলমান-বিজয়ের সমকাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মিত হইত। ইহাতে বাঙ্গালার কারুশিল্পের যে বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। য়ুরোপীয়রা অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার বাণিজ্যের যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক অর্ম্ম' (Orme) তাঁহার Historical Fragmentsএ লিখিয়াছেন, "সমগ্র সাম্রাজ্যের মধ্যে বাঙ্গালাদেশ তাহার অবস্থিতি-স্থানের এবং পণ্য-উৎপাদনের প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। বাঙ্গালা-দেশ দিল্লীকে কার্পাস এবং রেশমজাত পণ্য যোগায়, আরব এবং পারস্যদেশকে রেশম এবং রেশমজাত পণ্য, কার্পাস-পণ্য, চিনি, আফিং, শস্য প্রভৃতি প্রদান করে। এই দেশেই য়ুরোপীয় জাতি তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অর্থ বিনিয়োগ করিয়া থাকেন" ইত্যাদি। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা শিল্প-বাণিজ্যে বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল।' রবার্টসন লিখিয়া গিয়াছেন যে, অতি প্রাচীন প্লীনির আমল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গালাদেশকে অন্য দেশের ধনরত্ন-গ্রাসকারী বলিয়া লোক মনে করে, এবং নিন্দাও করে; ঐ ধনরত্ন বাঙ্গালায় আসে, কিন্তু বাঙ্গালা হইতে আর বাহির হইয়া যায় না।(৮) এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক,—ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, কঠোর ও অত্যাচারপূর্ণ শাসনের ফলে কখন কোন দেশের বাণিজ্যই সমৃদ্ধিলাভ করিতে পারে না। মুসলমান-রাজগণ যেরূপ অত্যাচারী বলিয়া কেহ কেহ বর্ণনা করিয়া থাকেন,—তাহা যে মিথ্যা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Dow তাঁহার ভারতবর্ষের ইতিহাসে সে কথা বিশেষ ভাবে বলিয়াছেন। তাইমুরবংশীয় নৃপতি-গণ শিল্পী ও বণিক্‌দিগের রক্ষাকর্ত্তা ছিলেন। পৃথিবীর সহিত বাঙ্গালা যে বাণিজ্য করিত, তাহাতে বাণিজ্যের পাল্লা বরাবর বাঙ্গালারই অনুকূল ছিল,—সেই জন্য বাঙ্গালা কোন কালেই দারিদ্র্য-দুঃখ ভোগ করে নাই। য়ুরোপীয়রা এই বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়া নানা স্থানে পণ্য-বীথিকা স্থাপনপূর্ব্বক প্রথমে বাঙ্গালায় সেই বাণিজ্যের কিঞ্চিৎ প্রসারবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজরা বাঙ্গালায় প্রথমে (১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে) হুগলী নগরী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। হুগলী সহর প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই বাঙ্গালার বাণিজ্য-প্রধান সপ্তগ্রাম নগরের প্রভা মলিন হইয়া যায়। ইহা ভিন্ন বাঙ্গালার চট্টগ্রাম, চন্দননগর, চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর, কাশিমবাজার, মালদহ প্রভৃতি নগরগুলি বাণিজ্যপ্রধান নগরে পরিণত হইয়াছিল। বাঙ্গালায় য়ুরোপ হইতে প্রায় আটটি জাতি বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল। ইহাদের আগমনে প্রথম আমলে বাঙ্গালায় কিছু সুবিধা হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সেই সময়ে মুসলমান নৃপতিদিগের অদূরদর্শিতার এবং বিলাসপরায়ণতার

(৭) Rhys Davids Buddhist India P. 200

(৮) From the age of Pliny to the present times, it has always been considered and execreted as the gulf which swallowsup the wealth of any other country that flows incessently towords it and from which it never returns.—Robertson's Disquisitions on Ancient India.

ফলে ঐ সকল য়ুরোপীয় জাতিই অনেকটা সুবিধা করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল। যে আটটি জাতি বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে পোর্ত্তুগীজ, ইংরেজ, ফরাসী এবং ওলন্দাজ এই চারিটি জাতিই কিছু কাল যাবৎ টিকিয়াছিল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথমে বাঙ্গালা অধিকার করিয়া লইবার পর হইতেই বাঙ্গালায় শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভীষণ দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়। এক শতাব্দীর মধ্যেই শিল্প-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ বঙ্গদেশ কৃষিমাত্র-সম্বল হইয়া পড়িল; বাঙ্গালার শ্রী ও ঋদ্ধি অন্তর্হিত হইল। বাঙ্গালায় সর্ব্বপ্রকার শিল্পজ পণ্যই প্রস্তুত হইত। যে সকল পণ্য প্রস্তুত হইত, তাহার তালিকা যথাসম্ভব নিম্নে প্রকাশিত হইল।

(১) লৌহ ও ইস্পাত হইতে প্রস্তুত পণ্য। মহাভারতের সভাপর্ব্ব প্রভৃতি পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়, বাঙ্গালায় নৃপতিগণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে নানারূপ অস্ত্র-শস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ সকল অস্ত্র, তরবারি, বাণ প্রভৃতি বহুমূল্য। বাঙ্গালায় উহা প্রস্তুত হইত বলিয়া বাঙ্গালার নৃপতিরা ঐ সকল দ্রব্য রাজা যুধিষ্ঠিরকে উপহার দিয়াছিলেন। নানারূপ বর্ম্মও তাঁহারা উপহার দিয়াছিলেন। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, বঙ্গদেশে লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। সুতরাং এদেশে সাধারণ গৃহস্থের ব্যবহার্য্য লৌহজাত উৎকৃষ্ট যন্ত্রও যে প্রস্তুত হইত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা ভিন্ন এই প্রাচ্যদেশের নৃপতিগণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে নানাবিধ যুদ্ধ-রথ উপহার দিয়াছিলেন। ঐ সকল যুদ্ধ-রথ ব্যাঘ্র-চর্ম্ম এবং সুবর্ণ দ্বারা বিভূষিত ছিল। ইহাতে সুবর্ণ-শিল্পও যে প্রাচীনকালে বঙ্গদেশে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। ইহা ভিন্ন দারু-শিল্পেরও বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। প্রাচ্য-রাজগণ যুধিষ্ঠিরকে নানাবিধ চৌকি, আসন, শয্যা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। উহার কতকগুলি গজদন্তনির্ম্মিত, এবং কতকগুলি কাষ্ঠনির্ম্মিত। ঐ সকল আসন, চৌকি, খট্টা ও পালঙ্ক সুবর্ণ ও মণি-রত্ন-খচিত ছিল। অধ্যাপক এচ, এচ, উইলসন বলেন, ঐ প্রাচ্যদেশ বলিতে বঙ্গদেশও বুঝায়। তদ্ভিন্ন, তৎকালে সুবর্ণ-রজত প্রভৃতি শিল্পের যে এদেশে বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল, তাহারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সুবর্ণের তার, জরি-দেওয়া বস্ত্র, এবং হস্তীর আচ্ছাদন প্রস্তুত করিতে যথেষ্ট শিল্প-দক্ষতার প্রয়োজন।

ইহা ভিন্ন বাঙ্গালায় রেশম-শিল্প যে বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র পাঠ করিলেই জানা যায়। দুকুল, ক্ষৌম পত্রোর্ণ, কৌষেয় প্রভৃতি নানাবিধ রেশমী বস্ত্র প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই বঙ্গদেশে প্রস্তুত হইত। ইহাতে যে বহু লোকেরই অন্ন-সংস্থান হইত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ইহা ভিন্ন বঙ্গদেশে কার্পাস-পণ্যের যে অসাধারণ উন্নতি হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভারতবর্ষ যে কার্পাসবস্ত্রের আদি-স্থান, তাহা কেহই অস্বীকার করেন না। (১) ওয়াট বলেন, বাঙ্গালার কোন রাজা চীনের রাজা উটিকে একজোড়া কার্পাসবস্ত্র উপহার দিয়াছিলেন। উটি সেই কাপড়-জোড়াটি একটি সুবর্ণ-পেটিকায় রাখিয়া দিয়াছিলেন, এবং সকলকে উহা দেখাইয়া বলিতেন, "দেখ, বাঙ্গালাদেশের লোক গাছের ফুল হইতে কেমন সুন্দর কাপড় প্রস্তুত করিয়াছে।" ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, অতি প্রাচীনকালেই এই অধঃপতিত বাঙ্গালাদেশেই কার্পাসবস্ত্রের উৎপাদন-কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বাঙ্গালায় নানা জাতীয় বস্ত্র নির্ম্মিত হইত। সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রায় ছয় প্রকার ছিল; ইহাদের সমস্তই প্রায় মস্‌লিনের ন্যায় সূক্ষ্ম, এবং কারু-কৌশলসমন্বিত। মোটামুটি এই সকল বস্ত্রই মস্‌লিন নামে পরিজ্ঞাত। পিচিই নামক একজাতীয় সূক্ষ্ম বস্ত্র বাঙ্গালায় নির্ম্মিত হইত। উহা প্রস্থে এক গজ, এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৯ গজ হইত। মনচেটি নামক আর এক প্রকার দৃঢ় সূক্ষ্ম বস্ত্র নির্ম্মিত হইত, উহা প্রস্থে প্রায় পৌনে তিন হাত, দৈর্ঘ্যে ১৭ গজ হইত। শণকি নামক আর এক প্রকার বস্ত্র ছিল, উহা প্রস্থে প্রায় পৌনে চারি হাত, এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৩ হাত হইত। ছিংপৈটাংতলি নামক এক প্রকার মস্‌লিন প্রস্থে এক গজ, এবং লম্বে ৪০ হাত, ইহা জালের ন্যায়। ইহার ছিদ্র সবগুলি সমান হইত। ইহা পাগড়ীর জন্য ব্যবহৃত হইত। ইহা ভিন্ন শতউড় এবং মহীমনে নামক আরও দুই প্রকার মস্‌লিনের নাম পাওয়া যায়। আবুল ফজল আইন-ই আকবরীতে লিখিয়াছেন, সরকার বর্কাবাদে গঙ্গাজল নামক এক প্রকার সূক্ষ্ম বস্ত্র, সরকার সোণার গ্রামে সুন্দর মস্‌লিন, এবং সরকার যোড়াঘাটে এক প্রকার সুন্দর রেশমী কাপড় ও শোক-বস্ত্র নির্ম্মিত হইত। 'সান্ধ্য শিশির' নামক (Evoning dew) এক প্রকার অতি সুন্দর বস্ত্রও বাঙ্গালায় প্রস্তুত হইত। উহা ঘাসের উপর প্রসারিত করিলে শিশিরবিন্দু বলিয়া ভ্রম হইত। আর এক প্রকার বস্ত্র ছিল, উহার নাম ছিল অব্রবন বা অভ্রবন। উহা অতি সূক্ষ্ম। মিস্ ম্যানিং লিখিয়াছেন, নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর শাসনকালে এক জন তন্তুবায় একখানি কাপড় ভ্রমক্রমে ঘাসের উপর মেলিয়া দিলে তাহার গাভী তাহা ভক্ষণ করে। সেই অপরাধে তন্তুবায় ঢাকা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। প্রথম শ্রেণীর মস্‌লিনের নাম ছিল

(১) On the Cotton Trade of India by T. A Mann P 347

উতপবন বা বায়ুকে বয়ন করিয়া নির্ম্মিত বস্ত্র। উহা অতি সূক্ষ্ম। এই তিন প্রকার মসলিনের নাম ছিল "মলমল খাস।" রাজা ও আমীরগণই উহা ব্যবহার করিতেন; ইহার মূল্য অত্যন্ত অধিক ছিল। প্রতি গজ এক পাউণ্ড দরে বিকাইত। সেই সময় এক পাউণ্ডের মূল্য দশ টাকা ছিল। সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব এক একখানা মসলিন ৩১ পাউণ্ড বা ৩১০ টাকা মূল্যে ক্রয় করিতেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে এই মসলিন এক একখানির মূল্য ধার্য্য হয়—৫৬০ টাকা। (১০) মসলিন সূক্ষ্ম হইলেও উহা অল্প মজবুত হইত না। ডক্টর ফর্বিস ওয়াটসন বলেন, ইহার সূতা অত্যন্ত মজবুত হইত। হিন্দুরা ঐ সূতা এরূপ ভাবে পাকাইত যে, য়ুরোপের কোন প্রকার মোটা সূতাও এই সূক্ষ্ম সূতার ন্যায় টেকসই হইত না। বস্ত্র-শিল্পই বাঙ্গালার প্রধান সম্পদ্। সেই জন্য আদি বাঙ্গালায় বস্ত্র-শিল্পের কথাই বিশেষ ভাবে বলিলাম। কিন্তু শিল্পজ পণ্য ব্যতীত বাঙ্গালা হইতে বিবিধ কৃষিজ পণ্যও বিদেশে চালান যাইত। বাঙ্গালার চাউলে কেবল নিখিল ভারতেরই চাউলের অভাব পূর্ণ হইত না, উহা সিংহল, পেগু, মালাক্কা, সুমাত্রা দ্বীপ প্রভৃতি স্থানেও রপ্তানী হইত। আর আজ বাঙ্গালার উৎপন্ন চাউলে বাঙ্গালার লোকের ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না! বার্থেমা নামক জনৈক পর্য্যটকের লিখিত বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, এই বাঙ্গালা হইতে রেশমের এবং কার্পাসের বস্ত্রাদি ভারতের নানা স্থানে, এবং তুরস্ক, সিরিয়া, পারস্য, আরব, ইথিওপিয়া প্রভৃতি রাজ্যে নীত হইত। খৃষ্টান বণিক্রা বাঙ্গালার বন্দর হইতে মুসব্বর, গুগ্‌গুল, মৃগনাভি এবং রেশমের কাপড় লইয়া যাইত। বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণ বা মনসামঙ্গলে চাঁদ সওদাগর কর্তৃক কত প্রকার পণ্য সিংহলে নীত হইত, তাহা কথিত আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বাঙ্গালা হইতে কৃষিজ ও শিল্পজ পণ্য বিদেশে কত রপ্তানী হইত। চন্দ্রাতপ, মশারি, গালিচা, শয্যা, তাম্বু, সামিয়ানা, বিছানার চাদর, তৈল, ঘৃত, নিদ্রাকর্ষক বস্ত্র, মসলা প্রভৃতি পণ্য বাঙ্গালা হইতে বিদেশে রপ্তানী হইত। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেও বাঙ্গালার নানা প্রকার পণ্য, এবং নানা জাতীয় বণিকের কথা লিখিত আছে। শঙ্খ-বণিক, মণি-বণিক, গন্ধ-বণিক, মোদক, তিলি, তাম্বলি, মালী, বারুই, কাঁসারি প্রভৃতি জাতি শিল্পকার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিত, এবং তাহারা দূরদেশে স্ব স্ব পণ্য বিক্রয় করিত। মালাকার জাতি শোলা হইতে নানা প্রকার কারু-শিল্পজ পণ্য প্রস্তুত করিয়া বিভিন্ন দেশে বিক্রয় করিত। প্রতিমার সাজসজ্জা ইহারাই প্রস্তুত করিত। এইরূপ কত শিল্পই যে বাঙ্গালায় ছিল, এবং কত লোকই যে অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না।

আজ বাঙ্গালার সেই সমৃদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে। য়ুরোপীয়রা—বিশেষতঃ ইংরেজ জাতি, বাঙ্গালা চিরকালই কৃষিপ্রধান—এই কথাই এখন জোর-গলায় প্রচার করিতেছেন। এ কথা মিথ্যা। ভূতপূর্ব্ব অনেক য়ুরোপীয় লেখকের রচনা হইতে তাহা সপ্রমাণ করা যায়। ম্যাগেস্থিনিস হইতে যত বিদেশী ভারতে আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্রায় একবাক্যেই বাঙ্গালার শিল্প এবং বাণিজ্যজাত ঋদ্ধির কথা লিখিয়া গিয়াছেন। এখন বাঙ্গালী জাতি আবার শিল্প এবং বাণিজ্যে উন্নতি করিতে না পারিলে বাঙ্গালার আর আত্মরক্ষার উপায় নাই।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

(১০) Dr. Forbis Watson Taxtile Manufactures p. 79.

হারানো পাতা

কবে কোন্ জন্মান্তরে জীবনের কোন্ পরিচ্ছেদ
সহসা হারায়ে গেছে, আজো তাই যুগান্ত-বিচ্ছেদ

চিরন্তনী কাব্য হ'তে আকস্মিক স্বপ্নসম খসি'
উন্মন করেছে মোরে, দূরে রয় দূরের উর্ব্বশী।
ধূলির ধরণী-পরে পরিপূর্ণ মিলনের ভাষা
ধ্বনিত হ'ল না কভু, জীবনের অতৃপ্ত পিপাসা
হৃদয়-কোরকতলে তুলিয়াছে অস্ফুট গুঞ্জন;
যতটুকু পেল মধু তার বেশী ব্যর্থ আলাপন।
প্রগাঢ় মিলন-রাত্রে হু'টি চক্ষে অশ্রু কেন ফুটে,
মিলন-সঙ্গীত মাঝে সেতারের তার যায় টুটে;
কার যেন অভিশাপ অদৃশ্য আকাশ-তলে রহি'
ফুলে দেছে কাঁটা আর প্রেমিকেরে করেছে বিরহী।
মদির বসন্ত-রাতে বনান্তের চঞ্চল বাতাস
উৎসব-পিয়ালা মাঝে ফেলেছে কি সুদীর্ঘ নিশ্বাস?
তাই বুঝি মনে হয় দু'দিনের এই গৃহ ছাড়ি'
অনন্ত-যাত্রার পথে এক দিন দিতে হ'বে পাড়ি।
জীবনের কাব্য হ'তে যে পাতা হারায়ে গেছে জানি,
তাহারে খুঁজিতে হ'বে, সেই আনে দূরতর বাণী।

শ্রীকরুণাময় বসু।

প্রোফেশর কৃপানাথ

(গল্প)

জানুয়ারি মাসটা ছুটী লইয়া বড়দিনের ছুটীর সঙ্গে সে ছুটী জুড়িয়া প্রোফেশর কৃপানাথ আসিয়াছেন রাঁচিতে—সপরিবারে হাওয়া খাইবার বাসনায়।

এ-বাসনা আপনা হইতে মনে জাগে নাই। পূজার ছুটীতে প্রেসিডেন্সি-কলেজের কেমিষ্ট্রীর প্রোফেশর সীতাপতি বিশ্বাস হঠাৎ মারা গেলেন। কৃপানাথ আর সীতাপতি একসঙ্গে একই-বছরে কেমিষ্ট্রীতে এম-এ পাশ করিয়াছিলেন,—এক-ব্রাকেটে দুজনে ফার্ষ্ট-ক্লাশ ফার্ষ্ট। তার পর সীতাপতি ঢুকিলেন গভর্ণমেণ্ট সার্ভিসে; আর কৃপানাথকে লুফিয়া লইল উত্তরপাড়ার প্রাইভেট কলেজ। সীতাপতির এই আকস্মিক মৃত্যুতে কৃপানাথ চমকিয়া উঠিলেন! সুস্থ মানুষ—ছুটীর আগের দিনও কলেজ করিয়া উত্তরপাড়ায় তাঁর গৃহে আসিয়াছিলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে। দু'জনে কত গল্প; সীতাপতির সেই প্রাণখোলা হো-হো হাসি! আর মহা-পঞ্চমীর রাত্রে এমন ঘুম ঘুমাইলেন যে, মহা-ষষ্ঠীর দিন সে-ঘুম আর ভাঙ্গিল না! পরে শুনিলেন, সীতাপতির না কি ব্লাড-প্রেসার ছিল—চাকরির জোয়াল ঘাড়ে বহিয়াছেন অবিরাম; যে-সব ছুটী প্রাপ্য, সেগুলা হইতে চিরদিন নিজেকে বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছেন,—ডাক্তারের নিষেধ, স্ত্রীর মিনতি—কোনো দিন কোনোটা মানেন নাই এবং তাহারি অবশ্যম্ভাবী পরিণাম যা ঘটে, অর্থাৎ জলবিম্বপ্রায় এই মানব-জীবন···

স্তম্ভিত কৃপানাথের সামনে আসিয়া পত্নী সারদাসুন্দরী মিনতি জানাইলেন, বলিলেন—বরাবর বলছি তোমায়, ওগো, একবার অন্ততঃ মাস-খানেকের জন্য ছুটী নাও। ছুটী নিয়ে কোনো ভালো জায়গায় চুপচাপ বিশ্রাম···তা তুমি শুনবে না! সীতাপতি বাবু কি করে সব ভেঙ্গে-চুরে দিয়ে গেলেন, বলো তো! বড় ছেলেটি এবারে বি-এ দেবে···একেবারে অসহায় হলো! ···ভিক্ষে তো নয়···পাওনা-ছুটী কেন নেবে না, বুঝিয়ে দাও আমায়? না, এবার আমি শুনবো না··· ছুটী তোমাকে নিতেই হবে। চাকরিকে যে এমন সর্ব্বস্ব করেছো, আমাদের ওপরও তো একটা কর্ত্তব্য আছে···

সারদাসুন্দরী ঠাণ্ডা মানুষ, চিরদিন চুপচাপ থাকেন ···স্বামীর তর্জ্জন-গর্জ্জন···ছেলেমেয়ের চ্যা-ভ্যাঁ···দাসী-চাকরের আস্ফালন···সব নিঃশব্দে সহিয়া আসিতেছেন সর্ব্বংসহা বসুমতীর মতো! আজ তিনি এত কথা বলিলেন! কৃপানাথ নির্ব্বাক্‌-স্তম্ভিত বিস্ময়ে সে-সব কথা শুনিতে লাগিলেন। তাঁর মনে হইতেছিল, সীতাপতির প্রেতাত্মা যেন এই মূক ভাষাহীন পত্নীকে দম্‌ দিয়া বেদম্‌ভাবে কথা বলাইতেছে···

—ছুটী নিচ্ছ তো? বলো···না, তুমি কথা দাও··· নাহলে সত্যি আমি মাথামুড় খুঁড়ে মরবো···বলিয়া সারদাসুন্দরী কথা শেষ করিয়া সতৃষ্ণ নয়নে প্রোফেশর স্বামীর পানে চাহিলেন।

কৃপানাথ মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন,—হুঁ···

সারদাসুন্দরী বলিলেন—হুঁ নয়···বলো, কবে থেকে ছুটী নিচ্ছ?

কৃপানাথ বলিলেন—কিন্তু এই পূজোর ছুটীর পরে কলেজ খুললেই সেকণ্ড-ইয়ার ফোর্থ-ইয়ারের টেষ্ট-এগজামিনেশন্‌···

সারদাসুন্দরী বলিলেন—একটা কিছু হলে কে তখন তোমার এগজামিন্‌ দেখবে? এই যে সীতাপতি বাবু···

কৃপানাথের বুকখানা ছাঁৎ করিয়া উঠিল! মানস-নয়নের সম্মুখে সীতাপতির অসহায় মূর্ত্তি যেন ছায়ার মতো ভাসিয়া উঠিল! কৃপানাথের মুখে কথা ফুটিল না।

সারদাসুন্দরী বলিলেন—আমার কথার জবাব দিলে না যে···

কৃপানাথ চাহিলেন সারদাসুন্দরীর পানে। সারদাসুন্দরীর দু'চোখের স্বচ্ছ তারকার নীচে যেন অশ্রুর সাগর দেখিলেন!

সারদাসুন্দরী বলিলেন—কালই আমি নিধুকে ডেকে

পাঠাই···তোমার ব্লাড-প্রেসার আছে কি না দেখে যাক! ···তোমার মেজাজ যা হচ্ছে···আমার ভয় করে।

কৃপানাথের বুকে আবার স্পন্দন! ভাবিলেন, ঠিক··· ব্লাড-প্রেসারে মেজাজ না কি খুব রুক্ষ হইয়া ওঠে!··· ইদানীং তাঁর যেন···হাঁ, একটুতেই রাগ হয়। এবং সে-রাগ নিমেষে একেবারে দেহ-মনকে তাতাইয়া তোলে!

কৃপানাথ বলিলেন—নিধুকে ডাকাবে? ডাকাও···

কৃপানাথের ভাগিনেয় নিধু ডাক্তার। নিধু আসিয়া মামাকে দেখিয়া বলিল—ব্লাড্‌প্রেসার ঠিক নয়···তবে, মানে, মামীমার কথামতো ছুটী নিয়ে এক মাস যদি বিশ্রাম করেন, তাহলে এ-বয়সে পরমায়ুর লীজ বাড়বে বৈ কি, নিশ্চয়! ছুটী নিন্ মামাবাবু···সারা জীবন খাটছেন! পাওনা-ছুটী···কেন নেবেন না?

মনোযোগ দিয়া কৃপানাথ শুনিলেন ডাক্তার ভাগিনেয় নিধুর কথা। শুনিয়া তিনি বলিলেন,—বেশ, তাহলে···

নিধু বলিল—বলছেন টেষ্ট-এগজামিন্···বেশ! তার পর তো একমাস···ঐ একমাসের ছুটীর সঙ্গে জানুয়ারি মাসটা ছুটী নিন···দেখবেন, গ্র্যাণ্ড হবে। ছুটী নিয়ে চলে যান কোথাও! দূরে যেতে না চান, কাছে রাঁচি। চেঞ্জের পক্ষে রাঁচি স্‌প্লেন্‌ডিড হবে!

কৃপানাথ চাহিলেন সারদাসুন্দরীর পানে। সারদাসুন্দরী বলিলেন—আমার সামনে আর নিধুর সাম্‌নে এখনি তুমি লেখো দিকিনি ছুটীর দরখাস্ত। তোমার মামাবাবুকে তুমি বলো বাবা নিধু, নাহলে এ-চিঠি আর কোনো কালে লেখা হবে না।

হাসিয়া নিধু বলিল,—আপনি ছুটী নিন মামাবাবু··· মামীমা বলছেন! আর দেখুন, খাবার জন্য আমি ক'টা ব্যবস্থা করে যাচ্ছি···মেনে চলবেন। বয়স হলে একটু-আধটু ব্যবস্থা মানা দরকার। তাতে দেহ-যন্ত্রটির টোনিং হয়। কল-কব্জায় যেমন তেল দ্যায় না? তেমনি আর কি!

সীতাপতির মৃত্যুকে কেন্দ্র করিয়া সেই যে দুর্ভাবনা এবং আলোচনা···তাহারি ফলে অবশেষে প্রোফেশর কৃপানাথ ছুটী লইয়া রাঁচি আসিয়াছেন!

মোরাবাদিতে চমৎকার এক-তলা বাড়ী। সঙ্গে প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড। কম্পাউণ্ডে লন, বাগান। ও-পাশে মোরাবাদি পাহাড়···

কৃপানাথের চমৎকার লাগে। সকালে উঠিয়া মুখ-হাত ধুইয়া এক-পেয়ালা ওভালটিন খাইয়া খুব-খানিকটা ঘুরিয়া আসেন। তার পর লনে বেতের চেয়ারে বসিয়া খবরের কাগজ এবং চিঠিপত্র পড়া···বেলা নটায় বাথ-রুমে ঢুকিয়া গরম জলে স্নান এবং বেলা দশটায় আহার···তার পর ও-দিকে বেলা চারিটা বাজিতে না বাজিতে সামান্য-কিছু মুখে দিয়া আবার খানিক ঘুরিয়া আসা। কলেজের বাঁধা রুটিন নাই···হাজার-রকম মনের ছেলের সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধ নাই···কোনো হাঙ্গামা নাই··· চমৎকার! মনে হয়, চাকরির গোড়ার দিক্ হইতে যদি এমনি ছুটী লইয়া বাহিরে আসিতেন! বাহিরে দেখিবার মতো কত কি আছে···জীবনের বেলা-শেষে তার কতটুকু-বা দেখিবার অবসর মিলিবে?··· ঐ যে কটা উঁচু পাহাড়···ঐ পাহাড়ের পাশ ঘেঁসিয়া বেড়াইবার সময় কতবার মনে হইয়াছে, যদি ও-পাহাড়ে চড়িবার সামর্থ্য থাকিত, পাহাড়ে উঠিয়া পৃথিবীর কতখানি দেখিয়া লইতেন!

সে-দিন সকালে নিত্যকার মতো বেড়াইয়া আসিয়া কৃপানাথ বসিলেন লনে বেতের চেয়ারে।

সাম্‌নে পথ। পথের ও-দিকে প্রকৃতি যেন সবুজ আঁচল মেলিয়া রৌদ্র পোহাইতেছে!

নিস্তব্ধ বাড়ী। ছেলেমেয়েরা বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। এখনো ফেরে নাই। সারদাসুন্দরী? কৃপানাথ বিরক্ত হইলেন। প্রত্যহ বলেন, আমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ো, ঘুরে আসবে! পশ্চিমে হাওয়া খেতে এসেও যদি সেই কুটনো-বাটনার চিন্তা নিয়ে রইলে, তাহলে এত পয়সা খরচ করে আসার মানে? পাখী-পড়ানোর মতো নিত্য এত উপদেশ দিয়াও কোনো দিন···হুঁঃ! স্ত্রী-জাতিকে লোকে সাধে নির্ব্বোধ বলে? হুঁঃ!

সারদাসুন্দরীর নির্ব্বুদ্ধিতার কথা চিন্তা করিতে করিতে মাথা তাতিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে মন···

এবং কৃপানাথ উঠিলেন। উঠিয়া বারান্দা পার হইয়া হল-ঘরে আসিলেন।

হল-ঘরে আসিয়া দেখেন, কৌচে বসিয়া সারদাসুন্দরী একটা সোয়েটার রিপু করিতেছেন, আর তাঁর পাশে বসিয়া সারদাসুন্দরীর ভগ্নী নিরুপমা এক-পাটী লেডিশ শু'য়ে বোতাম বসাইতেছে। ঠিক···নিরুপমা কাল আসিয়াছে···মনে ছিল না! নিরুপমা তাঁদের অতিথি···কলিকাতার কলেজে পড়ে···এবারে বি-এ দিবে···ছুটীতে এখানে পড়াশুনার সঙ্গে হাওয়া খাওয়া চলিবে!

একে সম্পর্কে শ্যালিকা, তার উপর বয়সে তরুণী এবং রূপসী ও বিদুষী! নিরুপমাকে দেখিবামাত্র বিধাতার অমোঘ বিধানে কৃপানাথের মাথার তাপ নিমেষে জল হইয়া গেল! কণ্ঠে যথাসম্ভব দরদ ভরিয়া তিনি বলিলেন,—সকালে ঘরে বসে ঘরকর্ণার কাজ না করে' দু'জনে একটু ঘুরে এলে না কেন?

নিরুপমা জবাব দিল। বলিল—তাই তো যাচ্ছিলুম। দিদি বললে, একটু সবুর কর্ রে···কুটনোগুলো কুটে দিয়ে যাই···কি রান্না হবে ঠাকুরকে বলে দিয়ে যাই···সেই করতে-করতেই বেলা হলো! তার পর বেরুবার সময় দেখি, গরম জ্যাকেট ছাড়া দিদির আর জামা নেই। নবুর সোয়েটার ছিল···ছেঁড়া ··দিদি সেই ছেঁড়া বুজোচ্ছে ···এক-পাটি জুতোয় বোতাম ছিল না! পায়ে থাকবে কেন? দুই বোনে তাই···

কৃপানাথ বলিল—শীগ্‌গির-শীগ্‌গির সেরে নাও। বেলা বারোটায় মানুষ বেড়াতে যায় না।

নিরুপমা বলিল—আপনার জন্যই তো যাত্রায় বিঘ্ন ঘটলো।

—আমার জন্য?

—নয়? শীতকালে রাঁচি আসছেন···দিদির জন্য গরম জামা একটা কিনে আনলে পারতেন! তাছাড়া এই জুতোজোড়া···দেখুন তো, দিদি বলে, কবে সেই পাঁচ বছর আগে কিনে দিয়েছিলেন!

কৃপানাথ বলিলেন—আসবার সময় ওঁর উচিত ছিল ফর্দ্দ করে দেওয়া। যা যা ফর্দ্দ দিয়েছিলেন, কিনে দিইনি কি?···এ হলো ওঁর···মানে, অর্থাৎ নিজের সম্বন্ধে ঔদাস্য···

নিরুপমা বলিল—দিদি হলো মেয়ে-মানুষ। জানেন তো মেয়ে-জাত নিজের জন্য কোনো-কিছু চাইতে পারে না···চায় না। আপনার উচিত ছিল ··

কৃপানাথের মনের মধ্যে যে প্রোফেশর-মানুষটি চির-দিন জ্ঞান-মণ্ডিত হইয়া বিরাজিত আছেন, তরুণীর এ-কথায় সেই প্রোফেশর-মানুষের অহঙ্কারে আঘাত লাগিল! কৃপানাথ বলিলেন—আমি কি ট্রাঙ্ক হাঁটকে দেখে বেড়াবো, কার কি আছে···বলো?

কথাটা বলিয়া তিনি চাহিলেন নিরুপমার দিকে। নিরুপমার দু'চোখে বিদ্যুৎ! নিরুপমা বলিল—সব বিষয়ে স্ত্রী করবে স্বামীর তাঁবেদারি···আর স্ত্রীর কি দরকার, স্বামী বুঝি ভালোবেসে একটি-বার তার খপর নেবে না?

কৃপানাথ চাহিলেন সারদাসুন্দরীর পানে। মনে হইল, বোনকে সারদাসুন্দরী নিশ্চয় এমন-কিছু বলিয়াছেন··· তিনি বলিলেন,—কি গো, আমার নামে নালিশ-টালিশ···

হাসিয়া সারদাসুন্দরী বলিলেন—তুমি শোনো কেন ওর কথা? ওরা এখন লেখাপড়া শিখে সাম্য প্রচার করতে চায়।

বাধা দিয়া কৃপানাথ বলিলেন—তোমার উচিত ছিল এখানে আসবার সময় আমাকে বলা—তোমার জামা নেই, জুতো নেই! কেন বলোনি, জানতে পারি?

মানুষটিকে সারদাসুন্দরী ভালো করিয়া জানেন। মনে যদি অতি-তুচ্ছ, অতি-ছোট প্রশ্ন জাগে এবং সে-প্রশ্ন যদি একবার মুখ হইতে বাহির হয়, তাহা হইলে ছাত্রের মতোই সে প্রশ্নের সদুত্তর দিতে হইবে। নহিলে অনর্থ বাধিবে! কৃপানাথের মুখে ছোট প্রশ্ন···

তাড়াতাড়ি তিনি জবাব দিলেন। বলিলেন—দরকার ছিল না বলেই বলিনি! বড় কম টাকার জিনিষ কেনা হয়নি.তো। তাছাড়া শীতের এই একটা মাস···গরম জামা আমি কবে পরি বলো যে···

কৃপানাথ বলিলেন—পরবেই না বা কেন? আমি পরবো···ছেলেমেয়েরা পরবে···আর তুমি হলে আমার স্ত্রী···

ঘড়িতে ঢং-ঢং করিয়া ন'টা বাজিল। সারদাসুন্দরী বলিলেন—তুমি যাও, স্নান করো গে, ন'টা বাজলো। এই গ্যাখ্ নিরু···কেমন হয়েছে। জুতোয় তোর বোতাম আঁটা হলো?

—হয়েছে। এই নাও, পায়ে দাও। ভাগ্যে, টুকিটাকি সব তুমি গুছিয়ে রাখো···নাহলে এখানে কোথায় এ-জুতোর একটা বোতাম কিনতে ছুট্‌তুম বলো তো?

কথাটা বলিয়া সারদাসুন্দরীর পায়ের কাছে নিরুপমা জুতা রাখিল। বলিল—সোয়েটারটা গায়ে দাও···দেখি।

সারদাসুন্দরী বলিল—পরে আসছি···

তিনি গেলেন ঘরের মধ্যে সোয়েটার গায়ে দিতে··· নিরুপমা বলিল ভগ্নীপতিকে—চান্ করতে যান্···

—যাই।···মোদ্দা এত বেলায় তোমরা আর বেশী দূর যেয়ো না যেন!

বলিতে বলিতে ছেলেমেয়েদের কথা মনে জাগিল। বলিলেন,—এই গ্যাখো ছেলেমেয়েদের কাণ্ড! এতখানি বেলা হলো···বাড়ী ফিরতে হবে, খেয়াল নেই! একটু স্বাধীনতা দেছো কি অমনি তার abuse. তোমার দিদি যদি কখনো ওদের শাসন করবেন!···জানি, হতভাগারা সব গোল্লায় যাবে! সেকালে চাণক্য বলে গেছেন, হুঁ:!

কথাটা এইখানেই শেষ করিয়া কৃপানাথ চলিলেন স্নান করিতে। ছুটী লইয়া এখানে আসিয়াছেন দেহ-যন্ত্রটিকে নিধুর উপদেশে টোনিং দিতে···ডাক্তার নিধুর কথা তাই প্রাণপণে মানিয়া চলেন! না মানিলে শেষে এক দিন অকস্মাৎ যদি ঐ বন্ধু সীতাপতির মতো···

সীতাপতির কথা মনে হইবামাত্র গা ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিল!

সারদাসুন্দরী আসিলেন। গায়ে সোয়েটার আঁটা···· বলিলেন,—এই গ্যাখ্, দেখে চক্ষু সার্থক কর্···

নিরুপমা দেখিল, বলিল—হুঁ···আচ্ছা, এখানে নিশ্চয় উলের দোকান আছে···এ-বেলায় হবে না···ও-বেলায় উল কিনে সেই উলে একালের ফ্যাশন-মতো তোমার জন্য আমি জাম্পার বুনে দেবো, দিয়ে তবে রাঁচি থেকে যাচ্ছি।

হাসিয়া সারদাসুন্দরী বলিলেন—বেশ, বেশ, তাই দিস্। এখন চ, আর দেরী করলে তোর ভগ্নীপতি আবার হয়তো রাগ করবেন।

দু'জনে লনে নামিয়াছেন, সহসা বাথ-রুমের দিকে যেন বোমা ফাটিল।

সপ্তমে গলা তুলিয়া কৃপানাথ হাঁকিতেছেন—দর্শন··· দর্শন···দর্শন···

সারদাসুন্দরীর পা বাধিয়া গেল। নিরুপমা হতভম্ব।

সারদাসুন্দরী বলিলেন—কি হলো আবার? আঃ! তুই দাঁড়া নিরু, চট্ করে আমি দেখে আসি···

বলিয়া প্রায় ছুটিয়া তিনি আসিলেন গৃহ-মধ্যে··· কৃপানাথ তখন খালি-গায়ে হল-ঘরে আসিয়াছেন।

সারদাসুন্দরী বলিলেন—কি হয়েছে?

কৃপানাথ বলিলেন—দর্শন? কোথায় গেলেন বাবু? ডেকে-ডেকে গলা আমার ফেটে গেল, দর্শনবাবুর সাড়া নেই, শব্দও নেই···

সারদাসুন্দরী বলিলেন—কি যে বলো! দর্শন চাকর, তাকে বলছো বাবু!

—চাকর নয়, চাকর নয়! বাবু! চাকর হলে মনিবের কখন কি দরকার হবে, তার জন্য হাজির থাকে না? বাবু বোধ হয় হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন···রাঁচি সহর!

সারদাসুন্দরী বলিলেন—যদি বেরিয়ে থাকে, আমি তাকে খুব বকবো। তোমার দরকারের সময়···সত্যিই তো!···তা আমায় বলো দিকিনি, কি দরকার?

—গরম জল!···বাবু জানেন ন'টায় আমি স্নান করি এবং গরম জলে স্নান করি।

—বাথ-রুমে গরম জল রাখেনি?

—না···

—আচ্ছা, আমি ঠাকুরকে ডাকি।···সে এখনি দিয়ে যাবে গরম জল।

সারদাসুন্দরী ডাকিলেন,—ঠাকুর···

সঙ্গে সঙ্গে নিজে ছুটিলেন ওধারে রান্নাঘরের দিকে। কৃপানাথ দাঁড়াইয়া গজ্‌গজ্ করিতে লাগিলেন,—এমনি করেই সকলের মাথা খেলে তুমি! চাকরকে চাকরের মতো রাখবে, তা নয়, মাথায় তোলা! হুঃ! চাকর বললেন, ছুটী চাই মা, অমনি ছুটী! যাত্রা দেখতে যাবো মা···যাও বাবামণি···হুঃ!

গজ্‌গজানির সঙ্গে কণ্ঠে বিভিন্ন সুর···

নিরুপমা আসিয়া সে স্বর-গ্রাম শুনিল। শুনিয়া হাসিয়া সে বলিল—ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম্ করছেন না কি জামাইবাবু?

সে-কথা জামাইবাবুর কাণে গেল না। রাগের আগুনে জ্বলিতে জ্বলিতে তিনি আসিলেন হল-ঘর ছাড়িয়া বাহিরের বারান্দায়। জামাইবাবুকে ছাড়িয়া নিরুপমা গেল দিদির পিছনে এ নাট্যাভিনয়ের রহস্য-সন্ধানে।

সারদাসুন্দরী তখনি ফিরিলেন···সঙ্গে নিরুপমা··· কৃপানাথ তখনো বারান্দায় পায়চারি করিতেছেন।

সারদাসুন্দরী বলিলেন—ঠাকুর গরম জল দেছে··· বাথ-টবের ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে মিশিয়ে আমি ঠিক করে দিয়ে এসেছি। যাও গো, খালি-গায়ে বাইরের এ ঠাণ্ডাটুকু আর নাই বা লাগালে!

প্রোফেশর দাঁড়াইলেন—কুঞ্চিত ভ্রূযুগ। স্নান করিতে যাইবেন, এমন সময় সাম্‌নের লনে কুকুরের ডাক···

সে-ডাক শুনিয়া কৃপানাথ সেই দিকে চাহিলেন। চাহিয়া দেখেন, যে দর্শন-ভৃত্য ছিল দর্শনের বাহিরে, সে সুদর্শন হইয়াছে; এবং তার হাতে চেনে-বাঁধা একটা বিলাতী কুকুর! দেখিবামাত্র কৃপানাথের দেহে-মনে যেন বিদ্যুতের প্রবাহ ছুটিল···বোমা ফাটিল! তিনি হাঁকিলেন—দর্শন···

ভীত কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে দর্শন চাহিল প্রভুর পানে।

প্রভু হুঙ্কার তুলিলেন, বলিলেন—কার কুকুর চুরি করে আনলে পথ থেকে? আমার হাতে দড়ি দেবে শেষে!

প্রভুর ভৎর্সনায় দর্শন একেবারে যেন ষ্টাচু! তার বুকের স্পন্দন যেন থামিয়া গেছে···চোখ দু'টা যেন কাচের ভাঁটা!

কাছে আসিয়া সারদাসুন্দরী কৃপানাথের হাত ধরিলেন, বলিলেন,—অনর্থক কেন রাগ করছো! কুকুর ও চুরি করবে কেন? রাঁচি-পাহাড়ের কাছে নয়ন বাবুরা থাকতেন···আমার পিশিমার জামাই নয়ন বাবু! তিনি বদলি হয়ে পাটনা যাচ্ছেন···দু'টো কুকুর ছিল···নবুকে তিনি বললেন, কুকুর নেবে? ছেলে নেচে উঠলো, বললে, নেবো। তাই বলেছিলেন, সকালে লোক পাঠিয়ো ···কুকুর দেবো। দর্শনকে বুঝি ছেলেরা তাই পাঠিয়েছিল ···কুকুর দেছেন···

শুনিতে শুনিতে কৃপানাথের শিরাগুলার মধ্যে রক্ত-স্রোতে প্রখর বেগ! সে-বেগে রগ্ পর্য্যন্ত ঝন্‌ঝন্ করিয়া উঠিল। কৃপানাথ বলিলেন—তাই দর্শনকে সেখানে পাঠিয়ে-ছিলে কুকুর ভিক্ষা করতে? আর আমি এ-দিকে ডেকে গলা ফাটাচ্ছি! আমার সঙ্গে এ-মিথ্যা···তাছাড়া জানো, কুকুর আমি দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারি না। কুকুর-বেরাল হলো নোংরা জীব!

সারদাসুন্দরীর মুখ পাংশু, মলিন। নিরুপমা সে-মুখ দেখিল। তার মনে পড়িল, কবে ছবি দেখিয়াছিল কুরু-সভায় লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীর! দিদির মুখ যেন সেই ছবির বিপন্না দ্রৌপদীর মুখের মতো!

নিরুপমা চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না···বলিল—বেশ তো, ছেলেমানুষ সখ করে কুকুর এনেছে···আপনি পছন্দ না করেন, বিলিয়ে দিলেই চলবে। তার জন্য এ-রকম ··

কথা নয়···কৃপানাথের তপ্ত শিরে যেন আইস-ব্যাগ্!

কৃপানাথ তাকাইলেন নিরুপমার দিকে। তার পর নিঃশব্দে চলিলেন বাথ-রুমের দিকে···

তিনি চলিয়া গেলে সারদাসুন্দরী চাহিলেন দর্শনের দিকে; বলিলেন—লক্ষ্মীছাড়া কোথাকার, বাবুর গরম জল দিতে হবে না? কুকুর নিয়ে খেলা করছো!

দর্শন বলিল,—না মা, ওখানে দেরী হয়ে গেল। ওঁরা ছেলে-মেয়েদের খাবার দিলেন কি না···

সারদাসুন্দরী বলিলেন—তাঁরা ফিরেছেন? না, তাঁদের জন্য গাড়ী পাঠাতে হবে?

দর্শন বলিল—আসছেন···

দুপুরবেলাটা শান্তিতে কাটিল। নিরুপমাকে ডাকিয়া কৃপানাথ কলেজের কথা পাড়িয়া বসিলেন···টেক্সট্-বুক লইয়া নানা কথা···কৃপানাথ বলিলেন,—তোমাদের আমলে অনেক উন্নতি হয়েছে! আমাদের সে-কালে বই-গুলো ছিল কি টার্স এ্যাণ্ড ট্যফ! মোষ্ট আন-ইন্টারেষ্টিং!

হাসিয়া নিরুপমা বলিল—আমরা এ-কালে জন্মেছি, আমাদের সৌভাগ্য, তাহলে?

—তা তো বটেই!

ঘড়িতে চারিটা বাজিল··সারদাসুন্দরী আসিয়া ডাকিলেন,—নে নিরু, ছেলেদের খাওয়া হয়েছে। ওরা বেড়াতে বেরুচ্ছে। বলছে, ওই বরিয়াতু পাহাড়ের দিকে যাবে। চ, আমরাও সঙ্গে যাই···

নিরুপমা চাহিল কৃপানাথের পানে, বলিল—আপনিও চলুন না আমাদের সঙ্গে। বেশ সকলে মিলে ··

—হুঁ···বেশ···কৃপানাথ বলিলেন—তোমরা তৈরী হও। আমি কিন্তু পাহাড়ে উঠতে পারবো না। তোমরা পাহাড়ে উঠবে না কি?

নিরুপমা বলিল—উঠলে মন্দ হয় না···

কৃপানাথ বলিলেন—তাহলে তৈরী হও···আমিও তৈরী হই।

তৈরী হইয়া কৃপানাথ আসিয়া পথে দাঁড়াইলেন···সঙ্গে সঙ্গে আবার বোমা ফাটিল!

বড় ছেলে নবু আর মেজ ছেলে দাশু···দু'জনে একটা ফুটবল লইয়া মাতন করিতেছিল···সে-মাতনের বেগে বল গিয়া ধুপ্ করিয়া পড়িল একেবারে ফোটা ন্যাস্টার্সিয়ামের ঝাড়ে···

কৃপানাথ চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—অসভ্য জানোয়ার সব! ঐখানে মানুষ বল খেলে? পরের বাড়ী··· পরের বাগান···ওদের মালী এসে ধমক দিয়ে যদি একটা কথা বলে?

গৃহ-রাজ্যের অধীশ্বর প্রোফেশরের ভৎ'সনায় দুই ছেলে যেন কাঁটা! চোরের মতো তারা সরিয়া গেল।

বাপ ডাকিলেন,—নবু···

নবু চাহিল বাপের পানে।

বাপ বলিলেন,—বল এনে আমার হাতে দাও···

পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া নবু বল আনিয়া কৃপানাথের হাতে দিল। বল লইয়া বাপ ডাকিলেন—দাশু···

মেজো ছেলে আসিয়া দাঁড়াইল পিতার সামনে··· থিয়েটারের ষ্টেজে সাজা-বাদশার সামনে দৌবারিক আসিয়া যেমন দাঁড়ায়! বাদশা-বাপ বলিলেন—এ-বল ছুড়ে ঐ ওপরের ছাদে তুলে দাও।

দৌবারিক-দাশু বাদশা-পিতার আদেশ পালন করিয়া বল ছুড়িল। বল গিয়া পড়িল এক-তলা বাড়ীর ছাদে···ও-ছাদে উঠিবার সিঁড়ি নাই।

বাদশা-বাপ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন—যে-বল পরের বাগান নষ্ট করে, সে-বলের ঠাঁই ঐ নিরালা ছাদের উপর···

তার পর আদেশ হইল—এবার বেড়াতে চলো···

কমাণ্ডার-ইন-চীফের হুকুমে যেন ফৌজ চলিল! কাহারো মুখে কথা নাই···বেড়ানোর আনন্দ ঐ বলের সঙ্গে বাড়ীর ছাদে তুলিয়া দম-খাওয়া পুতুলের মতো চলা! রাঁচির কোমলে-কঠোরে-মেশা রকমারি দৃশ্য··· পাহাড়, বন, মাঠ, ঘর···যেন চোখের সামনে দিয়া পটে-আঁকা ছবির মতো সরিয়া-সরিয়া চলিয়াছে!

প্রায় বিশ মিনিট পরে কৃপানাথের মনের পাল্লা দোল খাইতে-খাইতে থামিয়া সুস্থির হইল।···তিনি বলিলেন—এমন চুপচাপ করে মানুষ বেড়ায় না। বেড়াতে হয় কথা কইতে কইতে··· যাকে বলে প্লেজেণ্ট টক্স···এ সম্বন্ধে তোমাদের এ-কাল কি বলে, নিরুপমা?

নিরুপমা বলিল—এখনো সে সম্বন্ধে কিছু জানবার সময় পাইনি জামাই-বাবু।

কৃপানাথ বলিলেন—ভালো! তাহলে আমাদের সে-কালের নিয়ম-কানুন একটু মানো না হয়! কথাবার্ত্তা কও। দু'বোনে চলেছো যেন সেই গোরারা মার্চ্চ করছে!

নিরুপমা বলিল—আপনি থাকতে আমরা কি কথা কইবো, বলুন?

—তার মানে?

নিরুপমা বলিল—আমাদের তো মেয়েলি কথা! দিদি বলবে, মাছের অম্বলটা কেমন হয়েছিল রে? আমি বলবো—এক দিন খিচুড়ী করতে দাও না দিদি, মাংস দিয়ে বীট-গাজর-ফুলকপি মিশিয়ে…সে-কথা আপনার ভালো লাগবে কেন?

কৃপানাথ হাসিলেন, বলিলেন—বলবার মতো যদি বলতে পারো, তাহলে ঐ খিচুড়ীর কথা, মাছের অম্বলের' কথাও ইন্‌টারেষ্টিং হবে।

রাত্রে আহারাদির পর দুই বোনে কথা হইতেছিল। সারদাসুন্দরী বলিলেন—আশ্চর্য্য মানুষ! আছেন তো বেশ আছেন, যেন ব্যোম ভোলানাথ! ছেলেমেয়ে বড় বড় অপরাধ করছে…দেখেও কিছু বলবেন না! কিন্তু মনের কল যদি বেগড়ায়, জল খেয়ে কে গেলাস রাখলো টেবিলের উপর…রেগে একেবারে অনর্থ বাধাবেন! ঝোলে নুণ নেই, দিব্যি খেয়ে যাবেন! কিন্তু দুধে একটু সরের কুঁচি দেখলে রেগে বাড়ী মাথায় করবেন!

একাগ্র মনোযোগে নিরুপমা শুনিতেছিল। বলিল—এর মানে কি, জানো দিদি? আমার মনে হয়, চিরকাল প্রভুত্ব করে-করে পুরুষের মন যা হয়…তাতে ওঁরা ভাবেন, ওঁদের সুখের জন্যই সারা দুনিয়া তাঁবেদারী করবে! ভূমিকম্পে পৃথিবী যদি চুরমার হয়ে যায়, তবু পুরুষের পাণ থেকে চুণ খশলে চলবে না!…এক দিকে মনের মধ্যে এই আদিম-সংস্কার…আর-এক দিকে প্রোফেশরি করেন। সহজ-বুদ্ধিতে বোঝেন, মেয়েরা সত্যি দাসী-বাঁদী নয়, যন্ত্র তন্ত্রও নয়—পুরুষের মতোই মেয়েদের সুখ-দুঃখ-বোধ আছে…শিক্ষার গুণে মনের আদিম-সংস্কারকে প্রতি-পদে দাবিয়ে রাখতে চান! মন যখন শিক্ষা মেনে চলে, তখন ওঁরা ঠিক থাকেন। কিন্তু আদিম-সংস্কার যখন মাথা তুলে দাঁড়ায়, তখন ওঁরা ধরাকে দেখেন সরা…একেবারে তাণ্ডবে নৃত্য সুরু করে দেন! যাকে বলে, প্রলয়-ডম্বরু-নৃত্য!

কথাটা বলিয়া নিরুপমা হাসিল।

সারদাসুন্দরী বলিলেন,—হবে। আমি যে কি করে বাস করছি! এই সে-দিন ছেলেমেয়েরা ভারী দৌরাত্ম্য করছিল, আমি গিয়ে বললুম, সত্যি একটু শাসন করো গো…খেয়ালের ঝোঁকে তখন বললেন—এ-বয়সে একটু দৌরাত্ম্য করবে বৈ কি! আবার যখন নিজের কাজ করেন, ওর' একটু চ্যাঁ-ভ্যাঁ করুক দিকিন্, অগ্নিশর্ম্মা হয়ে যাচ্ছেতাই যা-তা বলে শুধু কি ওদের বকবেন—সে-রাগের তাল এসে পড়বে আমার মাথায়!…আমায় নরকে বসিয়ে দেবেন!

নিরুপমা বলিল—প্রোফেশরদের জন্য আমার মনে সত্যি অনুকম্পা জাগে, দিদি! সকলে কেমন, জানি না…তবে দু'-চার জনকে ভালো করে যা দেখেছি, তাতে আমার মনে হয়, একই সাবজেক্ট নিয়ে, একই বাঁধা রুটিন নিয়ে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কাটিয়ে ওঁদের মধ্যে আর পদার্থ থাকে না,…মন ওঁদের পাথর হয়ে যায়! পরের মন আছে, সে-কথা মনে থাকে না! তার উপর হয়ে ওঠেন ভয়ঙ্কর এক-বগ্‌গা! ভাবেন, ওঁদের মতো লোক আর দুনিয়ায় নেই…ওঁদের বিশেষ সাবজেক্ট ছাড়া সারা দুনিয়ায় আর কোনো সাবজেক্ট বা বস্তু নেই…সকলকে ওঁরা দেখেন ওঁদের ছাত্র-ছাত্রীর মতো। একে বলে, কম্‌প্লেক্স!

সারদাসুন্দরী একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—তোর ও-সব বড় বড় কথা আমি বুঝি না, তবে আমার মনও পাথর হয়ে গেছে! বোনার সখ, গান গাইবার সখ, ভালো দু'-চার রকম রান্নার সখ…সে-সব আমি বিসর্জ্জন দিয়ে বসেছি। তুই বললি গান গাইতে…বলিস্, একদিন গাইতুম, এখন কেন গাই না? তার জবাব কি, জানিস্? সংসারে গোলামি করতে করতে আমার মনে গানের ঝর্ণা শুকিয়ে ঝামা হয়ে গেছে।

দু'দিন পরের কথা…

দুপুরবেলায় বারান্দায় বসিয়া ষ্টোভ জ্বালিয়া সারদা-সুন্দরী খাজা তৈরী করিতেছিলেন…নিরুপমা পাশে বসিয়া দেখিতেছে…খাজা-তৈরী শিখিবে তার সখ!

কৃপানাথ আসিয়া দেখা দিলেন…তাঁর হাতে একটা টুইলের সার্ট। বলিলেন,—এই ছাখো, তোমার ধোপার কীর্ত্তি! সমস্ত বোতামগুলি কেটে নেছে…চারটের সময় বেরুবো…এই জামা গায়ে দিয়ে কি করে এখন বেরুই?

সারদাসুন্দরী বলিলেন,—অন্য জামা নেই?

কৃপানাথ বলিলেন,—থাকবে না কেন? কিন্তু এইটে গায়ে দেবো বলে যখন ঠিক করেছি…

সারদাসুন্দরী বলিলেন—তাহলেও এখনো চারটে বাজতে দু'ঘণ্টা দেরী…জামাটা বার করে রাখো…, বোতাম টেঁকে দি কি না ছাখো…

কৃপানাথ বলিলেন,—এইটে তোমার ভুল! কোনো কাজ করবে বলে' ফেলে রাখা ঠিক নয়। ধরো, আমি যদি এখনি বেরুই?

সারদাসুন্দরী জবাব দিলেন না…নিরুপমা বলিল—এখনি যদি আপনি বেরোন…অন্য জামা গায়ে দিয়ে যাবেন।

—তা কেন যাবো? তাছাড়া উনি জানেন, এ-বেলায় বেরুবার সময় আমি গায়ে দি গেঞ্জি, তার উপর এই সার্ট…সার্টের উপরে গরম কোট…ব্যস্!

নিরুপমা বলিল—আমাকে দিন, আমি দিচ্ছি বোতাম সেলাই করে···

কৃপানাথ বলিলেন—কথা তা নয় নিরুপমা···কথা হচ্ছে এই, তোমাদের এ-কালের গৃহিণীপনায় মস্ত খুঁত থাকছে! এটা তোমরা বোঝো না, কোন্ কাজটা দরকার। মানে, যাকে বলে, রুটিন-ওয়ার্ক···ডিসিপ্লিন্···

নিরুপমা হাসিয়া উঠিল, বলিল—বাড়ীটাকে যদি আপনি সব সময়ে আপনার কলেজের ক্লাশ মনে করে লেক্‌চার সুরু করেন, তাহলে বাড়ীতে থাকা দায় হবে জামাইবাবু···

কৃপানাথ বলিলেন—কিন্তু জানো নিরুপমা··তোমরা যে-সব মাষ্টার-মাইণ্ডের লেখা টেক্সট্ পড়ছো, তাঁরা বলেন, আমাদের সারা-জীবনই হলো শিক্ষার ক্ষেত্র··· বাড়ীও স্কুল-কলেজের আলাদা ব্রাঞ্চ···

নিরুপমা বলিলেন—এবং এ-সব শিক্ষাক্ষেত্রে আর রাঞ্চে আপনি একমাত্র প্রোফেশর···

কথাটা বলিয়া নিরুপমা উচ্চকণ্ঠে হাস্য করিল। তরুণী রূপসী বিদুষী শ্যালিকার হাস্যে বিজলী-চমকে কৃপানাথের মনখানা ঝলমল করিয়া উঠিল···নিরুপমার কথার শ্লেষ সে বিদ্যুৎ-ঝলকানির তীব্র ছটায় তাঁর লক্ষচ্যুত হইল।

তার পর নিরুপমা জামাইবাবুর দিকে মন দিল। ···সন্ধ্যার পর সে-দিন গান গাহিয়া শুনাইল।

শুনিয়া কৃপানাথ বলিলেন—ভালো! মেয়েদের এই সঙ্গীত-চর্চ্চা···মনকে সুস্থ রাখে। এর ফলে মনে হীনতার ছোঁয়াচ লাগতে পারে না।

কৃপানাথকে ধরিয়া আর এক-সময় নিরুপমা বলিল—এক দিন চলুন সকালে উঠে সকলে জগন্নাথ-পাহাড় দেখতে যাই···সেখানে পিক্‌নিক্ করবো···চমৎকার হবে।

কৃপানাথ বলিলেন,—বেশ!

নিরুপমা বলিল—আমার গান সে-দিন আপনার ভালো লেগেছিল?

—চমৎকার!

নিরুপমা বলিল—আমার শিক্ষা কার কাছে, জানেন?

—কার কাছে?

—দিদির কাছে। দিদির গান শোনেননি কখনো?

দু'চোখ বিস্ফারিত করিয়া কৃপানাথ চাহিলেন সারদাসুন্দরীর পানে···তিনি বসিয়া তখন পশমের জাম্পার বুনিতেছিলেন।

কৃপানাথ ডাকিলেন—হ্যাঁ গো···

চোখ না তুলিয়াই সারদাসুন্দরী বলিলেন—কেন?

—তুমি না কি গান গাও?

—না।

—না কি রকম! নিরুপমা বলছে, গাও···

সারদাসুন্দরী বলিলেন—নিরুপমা ভুল বলেছে! গান আমি গাই না। গাইতুম।

—সত্যি?···বাঃ, আমি কখনো শুনিনি তো···

নিরুপমা বলিল—আমাদের বাঙালীর ঘরে স্ত্রীর সম্বন্ধে ক'জন স্বামী কতটুকু সন্ধান রাখে, বলুন তো? আপনারা জানেন, স্ত্রী শুধু আপনাদের পরিচর্য্যা করবে, আর দাস্য করবে···ব্যস্!···দিদি গান গাইতে জানে··· ভালো গায়···আপনি তা জানেন না···এ-কথা আর কারো সাম্‌নে বলবেন না, জামাইবাবু··শুনে লোকে হাসবে!

নিরুপমার কথায় ঝাঁজ আছে···তবু কথাগুলা ভালো লাগে! কৃপানাথ নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলেন নিরুপমার পানে।

পরের দিন নিরুপমার কথায় জগন্নাথ-পাহাড়ে পিক্‌নিকের আয়োজন। নিরুপমা বলিল - বেলা আটটায় বেরুবো জামাইবাবু···পাংচুয়ালি···

কৃপানাথ বলিলেন—স্নান?

নিরুপমা বলিল—সেইখানে···

কৃপানাথ বলিলেন—গরম জল?

নিরুপমা বলিল—শুনেছি সেখানে পুকুর আছে। তার জল ভালো। যদি ঠাণ্ডা জলে স্নান করেন···

—ওরে বাবা···কৃপানাথ শিহরিয়া উঠিলেন!

নিরুপমা বলিল—তাহলে?

কৃপানাথ বলিলেন—আটটার মধ্যে বাড়ীতেই আমি স্নান করে নেবো···একটু গরম জল পাবো না?

সারদাসুন্দরী বলিলেন—পাবে।

তাই হইল। ঘড়ি ধরিয়া যাত্রা···

কৃপানাথ তাড়া দিতে লাগিলেন। ট্যাক্সি আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ছেলেমেয়েরা তখনো ছুটোপাটি করিতেছে।

ঘড়িতে আটটা বাজিল। কৃপানাথ হাঁকিলেন,—বুনো···

সেজ ছেলে বুনো আসিয়া দাঁড়াইল চোরের মতো।

কৃপানাথ বলিলেন,—কখন তৈরী হবে, শুনি?···দু'-মিনিট সময় দিলুম··গাড়ীতে যদি সকলকে না দেখি, যাওয়া বন্ধ হবে।·· তোমার উনি কোথায়?

বুনো বলিল—মা টিফিন-ক্যারিয়ার গুছোচ্ছে।

—এখন? কৃপানাথ আসিয়া দাঁড়াইলেন ভাঁড়ারের কাছে; বলিলেন,—এখনো গুছোনো হচ্ছে?

সারদাসুন্দরী জবাব দিলেন না। ঘরের মধ্য হইতে নিরুপমা বলিল—সব হয়ে গেছে···টিফিন-ক্যারিয়ারটা একটু নোংরা ছিল···তাই আবার মাজতে দেরী হলো।

—কিন্তু আটটা বেজে দু' মিনিট হয়েছে। তুমি বলেছিলে পাংচুয়ালি আটটা···

সকলে ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিলেন। কৃপানাথ বসিলেন সাম্নে ড্রাইভারের পাশে।

গাড়ী ছাড়িল।···গাড়ীর পিছনের শীট্ হইতে বিড়ালের কণ্ঠ···বিড়াল ডাকিল,—মিউ···

চমকিয়া কৃপানাথ চাহিলেন পিছনের দিকে···ছোট মেয়ে সুধা একটা সাদা বিড়ালকে প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে।

কৃপানাথ বলিলেন—ওটা কি, সুধা?

সুধা বলিল—বেরাল।

—জ্যান্ত?

নবু বলিল—হঁ্যা···

—বেরাল এলো কোথা থেকে?

নবু বলিল—দাই ওকে এনে দেছে।

ড্রাইভারের পানে চাহিয়া কৃপানাথ বলিলেন,··· রোখো···

ড্রাইভার গাড়ীর ষ্টার্ট বন্ধ করিল। গাড়ী হইতে কৃপানাথ নামিলেন। ডাকিলেন,—সুধা···

সুধা যেন কেঁচো!

কৃপানাথ বলিলেন—বেরাল ফেলে দাও। দাও ফেলে।···সে-দিন এলো কুকুর! আজ আবার বেরাল! বেরাল হলো ডিপ্‌থিরিয়া-রোগের বাহন!···দাও ফেলে···

সুধার কাঁদ-কাঁদ মুখ। সারদাসুন্দরী বলিলেন,—ভালো জ্বালা! গাড়ীতে নিজেদের জায়গা হয় না··· এর মধ্যে আবার একটা বেরাল···দে আমাকে বেরাল!

বিড়াল লইয়া সারদাসুন্দরী নামিয়া গেলেন।

ফিরিলেন তখনি। কৃপানাথ তখনো গাড়ীর সাম্নে দাঁড়াইয়া আছেন···যেন কাষ্টম্‌স্-ইন্‌স্পেক্টর! কৃপানাথ বলিলেন,—কোথায় ওকে রেখে এলে, শুনি?

সারদাসুন্দরী বলিলেন—দাইকে দিয়ে এসেছি। বলেছি, নিয়ে যাবি। ফিরে এসে বাড়ীতে যেন বেরাল না দেখি!

সারদাসুন্দরী গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। কৃপানাথ গাড়ীতে উঠিলেন। ড্রাইভারকে বলিলেন,—চালাও···

গাড়ী চলিল। গাড়ীতে কাহারো মুখে কথা নাই··· যেন কি মহাপ্রলয় ঘটিয়া গিয়াছে!

জগন্নাথ-পাহাড়···প্রাণে আবার স্পন্দন জাগিল!

কৃপানাথকে একা রাখিয়া সকলে উঠিলেন পাহাড়ে মন্দির দেখিতে। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কৃপানাথ ক্রমে জ্বলিয়া উঠিলেন। উচ্চকণ্ঠে নাটকের ভঙ্গীতে স্বগত-উক্তি করিলেন—আশ্চর্য্য মানুষ! গাড়ীতে জিনিষ-পত্তর··· তার সম্বন্ধে ব্যবস্থা নেই! নাচতে নাচতে ছুটলেন সব পাহাড়ে! হুঁঃ!···

সারদাসুন্দরী ফিরিয়া আসিলেন। বলিলেন—চুপ করে দাঁড়িয়ে আছো! ঠাকুর দেখবে না?

—না···

রুদ্র কণ্ঠ···অত্যল্প ভাষা! সারদাসুন্দরী ইহার মর্ম্ম জানেন। বলিলেন,—তুচ্ছ বেরালের কথা এখনো মন থেকে গেল না?

কৃপানাথ হুঙ্কার তুলিলেন,—বেরাল নয়।

—তবে?

—তোমাদের আক্কেল!

—আমাদের আক্কেল!

—হঁ্যা। গাড়ীতে জিনিষ-পত্তর···তার ব্যবস্থা নেই! সকলে ছুটলে···হুঁঃ!

সারদাসুন্দরী বলিলেন—ড্রাইভার রয়েছে···

—ওর সাধুতার কি এমন পরিচয় পেয়েছো, শুনি?

—কি নেবে? ঘী? হাঁসের ডিম? কপি? কলাইশুঁটি?

কৃপানাথ এ-কথার জবাব দিলেন না। সারদাসুন্দরী বলিলেন—নিরু বললে, একটা জায়গা দেখে ঠিক করি দিদি, রান্না হবে তো···তাই।

সারদাসুন্দরী খিচুড়ী চড়াইয়া দিয়াছেন। নিরুপমা ষ্টোভ জ্বালিয়া ডিমের বড়া ভাজিতেছে, কৃপানাথ একটা পাথরের উপরে বসিয়া আছেন।

নিরুপমা বলিল,—তুমি এবার যাও দিদি। আমি তোমার রান্না চৌকি দেবো আর আমাকে চৌকি দেবেন জামাইবাবু···

সারদাসুন্দরী বলিলেন,—তুই পারবি ঠিক সময়ে নামাতে?

—পারবো, পারবো। কলেজের পিক্‌নিকে আমি রান্না করি। তুমি যাও, সত্যি, দর্শনের সঙ্গে ছেলেমেয়েরা পুকুরে নাইতে গেছে।

কৃপানাথ চুপ করিয়া ছিলেন···এ-কথায় মনে আবার আগুন জ্বলিল! তিনি বলিলেন—পুকুরে নাইতে গেছে ছেলে-মেয়ে?

নিরুপমা বলিল—হঁ্যা···

কৃপানাথ বলিলেন—সর্ব্বনাশ! সর্দ্দি-কাসি হোক··· না হয় ডুবে একটা মরুক!

নিরুপমা বলিল—কেন ও-সব ভাবেন? মানুষ হতে দেবেন না ওদের? কিচ্ছু হবে না···

কৃপানাথ বলিলেন—না, হবে না! সাধে বলে, স্ত্রীবুদ্ধি!

সারদাসুন্দরী বুঝিলেন, তিনি থাকিলে রাগ আরো বাড়িবে! তিনি বলিলেন,—আমি তাহলে যাই নিরু। ছেলে-মেয়েগুলাকে ধমকে তুলে আনিগে…বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

তার পর ঠিক সেই থিয়েটারের দৃশ্য-পরিবর্ত্তন! অর্থাৎ পাহাড়তলীতে রূপসী শ্যালিকা নিরুপমা এবং ভগ্নীপতি বিজ্ঞ-বিচক্ষণ প্রোফেশর কৃপানাথ…দুজনের কাহারো মুখে কথা নাই…অনেকক্ষণ…

নিরুপমাই প্রথমে কথা কহিল। বলিল,—জায়গাটি বেশ…না?

কৃপানাথ বলিলেন,—হুঁঃ…

নিরুপমা বলিল,—কি ভাবচেন জামাই-বাবু?

—ভাবছি সংসারের কথা!…অরাজক যাকে বলতে হয়!

—অরাজক কিসে? আপনি আছেন রাজা… একচ্ছত্র অধীশ্বর! শাসন করছেন!

—আমায় ওঁরা মানেন কি না! অবাধ্য ছেলে-মেয়ে…অসভ্য! যাকে বলে disobedient and disorderly! দেখ্‌চো তো, এখানে এলুম সকলে নির্ব্ঝাটে বিশ্রাম করবো, হাওয়া খাবো…তা নয় এখানেও ঐ বেরাল!

হাসিয়া নিরুপমা বলিল—বেরাল ত আনা হয়নি। তাছাড়া এ বয়সে ও-ইচ্ছা হবে বৈ কি ওদের, জামাইবাবু! অমন নধর বেরাল…সাদা ধপ্‌-ধপ্‌ করচে…

—কিন্তু জানো বড় বড় অথরিটির মত, বেরাল হলো সব রোগের, বিশেষ করে ডিপ্‌থিরিয়ার…

নিরুপমা বলিল—তিলকে তাল করা আপনাদের স্বভাব! অত ভয়ে ভয়ে ছেলেমেয়ে থাকতে পারে না!

বাধা দিয়া কৃপানাথ বলিলেন—ভয় কিসের? তাছাড়া এক জনকে একটু ভয় করা ভালো। তোমার দিদি বড় বেশী আদর দ্যান…উনি যদি একটু শাসন করতেন! হুঁঃ…

নিরুপমা বলিল—কর্ত্তা হয়ে আপনারা মনকে এমন করে তোলেন…

—ও তোমাদের ভুল। আমাদের দায়িত্ব কত! হুঁঃ! আদর দিলেই তো চলবে না…মানুষ করতে হবে।

হাসিয়া নিরুপমা বলিল—একটা কথা বলবো… নির্ভয়ে?

—বলো…

—আপনি ওদের কত দেখেন, বলুন তো? ছেলে-মেয়েদের খোঁজ ন্যান যখন ওরা চ্যাঁ-ভ্যাঁ করে ওঠে…তখন এসে ধমক দেন! এ-বয়সে আপনি গম্ভীর বলে' আপনি ভাবেন, ছেলেমেয়েরাও এ-বয়সে গম্ভীর হয়ে থাকবে? দিদি কত দুঃখ করছিল…সত্যি…দিদিকে যা বলেন, যে-তর্জ্জন করেন…

কৃপানাথ গম্ভীর হইলেন। নিরুপমা খিচুড়ীর হাঁড়ি নামাইল। ওদিকে মন্দিরে দু'-চার জন করিয়া যাত্রী চলিয়াছে…

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। তার পর কৃপানাথ ডাকিলেন,—নিরুপমা…

—বলুন…

—তুমি তো এবার বি-এ দেবে। তার পর?

নিরুপমা বলিল—পাশ করতে পারি, এম-এ পড়বো।

—এম-এ যেন পাশ করলে! তার পর?

নিরুপমা বলিল—অত-দূর-ভবিষ্যতের কথা ভাবি না।

কৃপানাথ বলিলেন—যদি না ভাবো, তাহলে সেটা অন্যায়! মানে, যতই লেখাপড়া শেখো না কেন, তুমি মেয়েমানুষ, এ কথা মানবে তো?

হাসিয়া নিরুপমা বলিল—তা মানবো না, এমন নিরেট গাধা আমায় ঠাওরালেন কি বলে, বলুন তো জামাইবাবু? কাছা আঁটি না, কোঁচা দুলুই না, সার্ট গায়ে দিই না… বলুন!

জামাইবাবু গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—তোমার উচিত, বিয়ে করা। যে-বয়সে যা…বি-এ পাশ করছো, বেশ! বি-এ-পাশ মেয়ের যোগ্য পাত্রের অভাব নেই দেশে…

নিরুপমা বলিল—বিয়ে আমি করবো না, ঠিক করেছি।

কৃপানাথের চোখদু'টো যেন কপালে উঠিল! তিনি বলিলেন,—বিয়ে করবে না? হুঁঃ! ও-কথা আজকালকার মেয়েরা সবাই বলে। তার পর হুঁঃ…

নিরুপমা বলিল—আর সকলে কি বলে না বলে, জানি না। তবে আমার এই পণ…

—বটে! বিয়ে করবে না?

—না!

—পাগল!…বিয়ের আনন্দ জানো না তো! তার সাক্ষী তোমার দিদিকে ছাখো! হুঁঃ, ম্যাট্রিক পাশ করেছেন তো! বিয়ে করে কি-আরামে আছেন! স্বামী, না, পর্ব্বতের আড়াল! তার পর সংসার…নিজের ছেলেমেয়ে…শান্তি-সুখ কতখানি বলো তো…

—শান্তি-সুখ!

কৃপানাথ চাহিলেন নিরুপমার পানে…দিদির শান্তি-সুখের সম্বন্ধে নিরুপমার মনে সংশয় আছে না কি?

নিরুপমা বলিল—দু'দিন দিদিকে এখানে দেখে আমার ও-প্রতিজ্ঞা ভীষ্মের মতো আরো অটল হয়েছে, জামাইবাবু! এই দিদি…কি ছিল এক দিন! যাকে বলে, হাস্যময়ী! সে দিদির মুখে আজ হাসি নেই…ভয়ে সব সময়ে যেন নেতিয়ে আছে! গা ছম্‌-ছম্‌ করছে! ছেলেমেয়ে…

সংসার···স্বামী···এ-সব শুনতে বেশ! কিন্তু সে-কালের গুরুমশায়ের মতো যে-রকম আপনি বেত উঁচিয়ে আছেন সারাক্ষণ, এতে মানুষের দেহ-মনে পদার্থ থাকে না জামাইবাবু। এ রকম বাঁচা···এর চেয়ে কুকুর-বেরালের বাঁচাও ঢের আরামের, মনে হয়! দিদি নিজের পানে কখনো চেয়ে ছাখে না···দিদির দিন কাটছে শুধু আপনাদের সুখ দেখতে! যেখানে জল পড়ছে, বেচারী নিজে ভিজে সেইখানে ছাতা ধরছে!

কৃপানাথ বলিলেন—হ্যাঁ, তা তো উনি ধরবেনই! ওঁর সংসার···

নিরুপমা বলিল—সংসার চলে দেয়া-নেয়া নিয়ে··· বুঝলেন জামাইবাবু। পাশ করে, প্রোফেশরি করে এ-শিক্ষা আপনারা পান না। তাই সংসারে এত দুঃখ, এত অশান্তি! ভাবুন তো, আমার দেহ ছেঁচে মন ছেঁচে আমি আপনাকে শুধু দিতে থাকবো, আর আমাকে নিংড়ে আপনি নিঃশেষে খাবেন,—এতে সংসার চলে না। আপনি বলবেন, রাগারাগি করলেও দিদিকে আপনি ভালো-বাসেন! মানি, ভালো আপনি বাসেন। কিন্তু প্রত্যেকটি দিনের ছোট বড় সুবিধা-অসুবিধা যদি সে ভালোবাসা সইতে না পারে, তাতে যদি এমন চীৎকার তোলেন, আমায় মাপ করবেন জামাইবাবু, তাহলে আপনার ও-ভালোবাসা আমি চাই না। কোনো দিন যদি দেখতুম, দিদিকে ডেকে আপনি বললেন—এসো না গো, দু'জনে বসে একটু গল্প করি, কিংবা আদর করে একটি ফুল এনে দিদিকে দিতেন···সংসারের কাজে দিদিকে একটু সাহায্য করতেন, কিংবা দিদি কি খেলে না খেলে···দিদি কি চায়, তার খোঁজ করচেন, তাহলে দিদির অপরাধ হলে দিদিকে যদি আপনি দু'-এক ঘা মারতেন, তাতেও নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করে দিদি বর্তে যেতো!

কৃপানাথ নিঃশব্দে সব কথা শুনিলেন···

নিরুপমা বলিল—এই যে ছেলেমেয়েদের জন্য আপনি ব্যস্ত হলেন, দিদি তখনি ছুটলো···আপনার মনের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য! কৈ ছেলেমেয়েদের পিছনে আপনি তো গেলেন না! অত মেজাজ না করে' আপনি দিদিকে বলতে পারতেন যে, ওগো, তুমি এই সব করছো—একটু বেড়াও গে যাও, আমি না হয় ছেলেদের দেখছি!···একসঙ্গে সকলে এসেছি···আপনি বসে আরাম করছেন···আর দিদির খাটুনি-দুশ্চিন্তার অন্ত নেই! বলুন তো, আপনার আর ছেলে-মেয়ের যখন যেটি চাই, নিজের আরাম-বিরাম না দেখে নিজেকে হত্যা করে দিদি আপনাদের সে-আরাম জোগাচ্ছে! এর নাম সংসার? এ-সংসারে কি সুখের আশায় আমার লোভ হবে, বলতে পারেন?

কৃপানাথের মনে চিন্তার তরঙ্গ···

তার পর বলিলেন—ঠিক বলেছো···বেশ, আজ থেকে মেজাজকে আমি কনট্রোল করবো নিরুপমা···তুমি আমাকে শিক্ষা দেছ।

বলিয়াই তিনি চলিলেন সারদাসুন্দরীর সন্ধানে বলিলেন—তোমার দিদি চান করবেন তো?

—হ্যাঁ।

—তাঁর শাড়ী-সেমিজ দাও···আজ থেকেই আমি পার্টনার।

বিস্ময়ে সারদাসুন্দরী স্তম্ভিত! কৃপানাথ আসিয়া উপস্থিত সারদাসুন্দরীকে সাহায্য করিতে! ছেলেমেয়েদের তুলিয়া দিয়াছেন···দর্শন তাদের সঙ্গে গেছে। স্নান সারিয়া সারদাসুন্দরী ছেলেমেয়েদের কাপড়-জামা কাচিতে উদ্যত হইলেন।

কৃপানাথ বলিলেন - আমাকে দাও, কাচি···তুমি যাও।

সারদাসুন্দরী বলিলেন—পাগল হয়েছো! তুমি পুরুষ-মানুষ···কাপড় কাচবে কি?

—তুমি কাচতে পারো, আর আমি পারবো না? সংসারের কাজ···এ-সংসার শুধু তোমার একার নয়··· আমাদের দু'জনের সংসার।

সারদাসুন্দরী ভাবিতেছিলেন, হইল কি? পাহাড়ের গায়ে ঐ মন্দির···মন্দিরের দেবতা সহসা আজ কৌতুক সুরু করিলেন না কি?

কৃপানাথ ছাড়িলেন না···কাপড় না কাচিতে পাইলেও কাচা-কাপড় বহিয়া আনিলেন।

আকাশে সূর্য্য প্রখর হইয়া উঠিল। সে-রৌদ্রে বসিয়া সারদাসুন্দরী রান্না-মাংস ভাগ করিতেছিলেন···

গায়ের আলোয়ান খুলিয়া কৃপানাথ স্বহস্তে চাঁদোয়া খাটাইতে উঠিলেন···রৌদ্রতাপে সারদাসুন্দরীর মাথা তাতিবে না! নিরুপমা বসিয়া নিঃশব্দে দেখিল।

সারদান্দসুরী বলিলেন—হঠাৎ এত যত্ন করবার কারণ কি, নিরু?

নিরুপমা কথা কহিল না···তার চোখে মৃদু ইঙ্গিত!

সারদাসুন্দরী সে-ইঙ্গিত বুঝিলেন না···কণ্ঠ মৃদু করিয়া বলিলেন—কিছু বলেছিস্ না কি রে?

—সেবা দেখে জিজ্ঞাসা করচো? হ্যাঁ। আমি বুঝিয়েছিলুম। বুঝলেন। বললেন, আজ থেকে মেজাজ ঠাণ্ডা করবেন···সুখে-দুঃখে পার্টনার হবেন!

সারদাসুন্দরী হাসিলেন। বলিলেন—ছেলেবেলায় কবিতা পড়েছিলুম···কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে?

দিনটা এখানে ভালোই কাটিল। সেই প্রোফেশর কৃপানাথ এমন শান্ত-শিষ্ট···নিরুপমা ম্যাজিক জানে!

সারদাসুন্দরী বলিলেন,—সইলে হয়, নিরু…

নিরুপমা বলিল—আমি লোকটি কে, ভাবো! একে শ্যালিকা…তায় তরুণী…রূপসী…বিদুষী…

সন্ধ্যার আগে পুনর্যাত্রা বা প্রত্যাগমন।

ছোট মেয়ে সুধা ঢুলিতেছে…সহস্র ঠ্যালায় হাঁটিবে না…দর্শনের কোলে চড়িবে, বায়না! সেজো ছেলে বুনো পাথরে চড়িতে গিয়া পা পিছ্‌লাইল…সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ ক্রন্দন…

কৃপানাথের মনের মধ্যে আবার সেই প্রোফেশর-মানুষটি জাগিয়া বসিল!

কৃপানাথ হাঁকিলেন — লক্ষ্মীছাড়া … বাঁদর … হাঙ্গাম করছে, ছাখো! সাধে বলি, ডিস্‌ওবিডিয়েন্ট এ্যাণ্ড ডিসর্ডালি। পাঁচশো-বার বললুম, লাফালাফি নয়… লাফালাফি নয়, তা গ্রাহ্য নেই…

সঙ্গে সঙ্গে চোখের দৃষ্টি ফিরিয়া নিবদ্ধ হইল সারদাসুন্দরীর উপর। তিনি তখন ছোট ছেলে কান্তির পায়ের জুতা খুলিতেছেন…কান্তি শুইয়া পড়িয়া চীৎকার করিতেছে,—জুতো খুলে—এ-এ…

কৃপানাথ বলিলেন—তোমার আদরে-আদরেই ওরা গেল…নিজের জুতো নিজে খুলতে পারে না? হুঁ:!

ও-দিকে ঘুমন্ত সুধাকে নিরুপমা জাগাইয়া তুলিয়া কোনো মতে খাড়া করিয়াছে! সুধা বলিল—আমার কিন্তু সে-বেরাল চাই মাসিমা…

কথাটা কৃপানাথের কাণে গেল। যে-আগুন মনে জ্বলিতেছে…তার উপর যেন ঘৃতের আহুতি! কৃপানাথ বলিলেন—চাই! বটেই তো! বাড়ীতে সে-বেরাল যদি ফের দেখি, তাহলে দেবো তাকে শাণে আছাড়…সঙ্গে সঙ্গে তোমাকেও বাদ দেবো না…a lot of disobedient and unruly imps!…হুঁ:!

সারদাসুন্দরী চাহিলেন নিরুপমার দিকে। নিরুপমা দিদির পানে চাহিয়াছিল…দুই বোনের চোখে-চোখে কৌতুকের যে-আভাস ফুটিল, তার মর্ম্ম,—ও-মেজাজ এ-জন্মে আর নয় গো…এ-জন্মে আর সারবার নয়!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

জ্যোতিষী

জ্যোতিষ জানি। দেখি তোমার হাতের রেখা—
কি হবে, না হবে—হাতে কেমন লেখা!
এই যে রেখা—এটি আয়ু দীর্ঘ সরল;
স্বাস্থ্য খাশা; মনটি ভালো, নাইকো গরল!

রেখায়-রেখায় এই যে এত কাটাকাটি—
অনেক পাণি-প্রার্থী করবে হাঁটাহাঁটি!
কিন্তু তারা অভদ্র সব,—রূপের পরীর
দাম জানে না, ফর্দ্দ দেবে হাজার ভরির
সোনা-দানা; চাইবে নগদ, কৌচ-সোফা,
আংটি-ঘড়ি, টেবিল-চেয়ার, মোটর তোফা!
মানুষ তো নয়, কাজেই বিদায় নেবে তারা—
নেহাৎ মেকি, লক্ষ্মীছাড়া, দৃষ্টিহারা!

তার পরেতে এই যে রেখা সবার পরে—
তোমার দ্বারে আনবে সে এক ভাগ্যধরে।
তোমায় পেয়ে ধন্য হবে ভাগ্য মানি,
সুজন সে-জন, করবে তোমায় হৃদয়-রাণী!
অর্থ-ভাগ্য দেখছি যে তার তেমন তো নয়!
তোমায় পেয়ে করবে কিন্তু ভাগ্য-বিজয়।
দুঃখ-তাপের একটুও আঁচ নাহি লাগে,
এমনি করে রাখবে তোমায় অনুরাগে!
গরীব স্বামী, রূপেও সে নয় কার্ত্তিকেয়!
তবে সে, হ্যাঁ, মানুষ! নহে ইতর হেয়!
কোথায় এখন আছে সে-জন? উদ্দেশ চাই?
দেখি, দেখি, হাতের রেখায় হদিশ কি পাই!
খোলো তো হাত! দূরেতে নয়, কাছেই—এ কি!

সামনে তোমার আছে সে-জন দেখি, দেখি,—
তোমার দু'হাত রয়েছে তার হাতের 'পরে!
তুমি যে তার সারা ভুবন আছো ভরে'!
তার হাতে যে দেখছো রেখা,—শাস্ত্র বলে,
রাজ্য পাবে রাণী, তোমার কৃপা হলে!

শ্রীবৈকুণ্ঠ শর্ম্মা
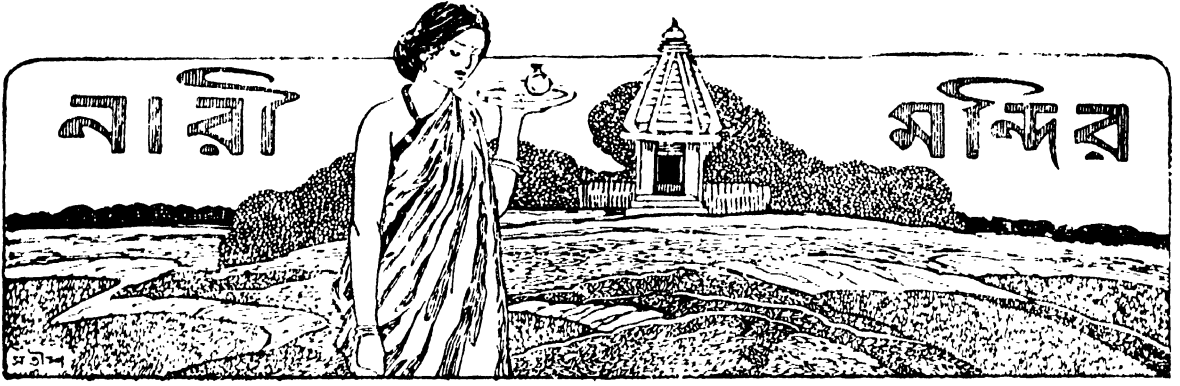
কার্ডিগান্ জ্যাকেট

এবারে একটি কার্ডিগান্ জ্যাকেটের কথা বল্‌ছি। কেপ-কলারের এ জ্যাকেটের প্যাটার্ণটি মার্কিণ-মহিলা-সমাজে খুব আদর পেয়েছে। আমাদের দেশের মেয়েরা কোমরে বেল্টটি না লাগালেই চলবে। বেল্ট না লাগালে কোনো ক্ষতি হবে না!

এ জ্যাকেটের জন্য চাই উল ১৩ আউন্স—৫ প্লাই-উল। আর চাই এক জোড়া ৯ নম্বরের এবং এক জোড়া ১১ নম্বরের কাঠি। তা ছাড়া লাগবে আটটি বোতাম। বোতামের সাইজ হবে আধুলির মাপে।

নির্দ্দেশ-অনুযায়ী বুন্‌লে কাঁধ থেকে এর ঝুল হবে সাড়ে ১৯ ইঞ্চি; বোতাম আঁটলে ছাতির ঘের হবে সাড়ে ৩৫ ইঞ্চি; এবং পুট-হাতা সমেত হাতের ঝুল হবে সাড়ে ১৮ ইঞ্চি।

সংক্ষেপোক্তি :—সো:=সোজা; উ:=উল্টো; ঘ: ক:=ঘর কমানো; ঘ: বা:=ঘর বাড়ানো; রি:=রিপিট।

পিঠের দিক

পিঠ থেকে বোনা সুরু করুন। তলার দিক থেকে বুনবেন। ১১ নং কাঠিতে ৯৬টি ঘর তুলুন—এক লাইন সোজা বুনে যান। তার পর প্যাটার্ণ সুরু করুন।

১ম লাইন—* ৬টা সো:, ৬টা উ:; তার পর * থেকে শেষ পর্য্যন্ত আগাগোড়া রিপিট করুন। ২য় লাইন—১টা উ:, * ৬টা সো:, ৬টা উ:। তার পর * থেকে রি: করে যান; ৫টা উ:তে শেষ করবেন।

৩য় লাইন—৪টে সো:, * ৬টা উ:, ৬টা সো:, তার পর * থেকে রি:, শেষ করবেন ২ সো:-এ। ৪র্থ লাইন—৩টে উ:, * ৬টা সো:, ৬টা উ:; তার পর * থেকে রিপিট্ করে লাইন শেষ করবেন ৬টা উ:-এ।

৫ম লাইন—২টা সো:, * ৬টা উ:, ৬টা সো:; * থেকে রি: করে লাইন শেষ করবেন ৪ সো:তে। ৬ষ্ঠ লাইন—৫টা উ:, * ৬টা সো:, ৬টা উ:,—তার পর * থেকে রি: করে ১ সো:তে শেষ। ৭ম লাইন—* ৬টা উল্টো, ৬টা সো:; তার পর * থেকে রি: করবেন শেষ পর্য্যন্ত।

৮ম লাইন— * ৬টা সো:, ৬টা উ:, তার পর * থেকে রি: শেষ পর্য্যন্ত। ৯ম লাইন—৫টা সো:, * ৬টা উ:,

কার্ডিগান্ জ্যাকেট

সো:; এবার * থেকে রি: করে লাইন শেষ করবেন ১ উ:তে। ১০ম লাইন—২টা উ:, * ৬টা সো:, ৬টা উ:; এবার * থেকে রি: করে ৪ উ:তে শেষ। ১১শ লাইন—৩টে সো:, * ৬টা উ:, ৬টা সো:; এবার * থেকে রি: করে ৩ সো:-এ শেষ। ১২শ লাইন—৪টা উ:; * ৬টা সো:, ৬টা উ:; এবার * থেকে রি: করে ২টা উ:তে শেষ। ১৩শ লাইন—১টা সো:, * ৬টা উ:, ৬টা সো:; তার পর * থেকে রি: করে ৫টা সো:তে শেষ।

১৪শ লাইন—* ৬টা উঃ, ৬টা সোঃ ; তার পর * থেকে রিঃ করে যাবেন শেষ পর্য্যন্ত।

এই ১৪ লাইনে প্যাটার্নটি সম্পূর্ণ হলো। এর পর আগাগোড়া এই ১৪ লাইনের প্যাটার্ন রিঃ করে যান। তার পর ৯ নম্বরের কাঠিতে এই বোনাটুকু তুলে রাখুন। তুলে আবার ঐ একই নিয়মে বুনে যান যতক্ষণ না ১৭টি ব্লক সম্পূর্ণ হবে। ৭ লাইনে ১টি ব্লক—তাহলেই আর কি ঐ প্যাটার্নে বুনে যাবেন যতক্ষণ না সবশুদ্ধ ১১৯টি লাইন সম্পূর্ণ হয়।

এর পর হাত দু'টির জন্য ঘর কমাতে হবে ১ ঘর করে—তার ফলে ৪ লাইন বোনার পর যখন দেখবেন ৮৪ ঘর বাকী আছে, তখন আর ঘর না কমিয়ে বুনে যাবেন—যতক্ষণ পর্য্যন্ত না গোড়া থেকে ৮টি ব্লক সম্পূর্ণ হয়।

সামনের ডান দিক

তলার দিক থেকে বুনবেন। ১১নং কাঠিতে ৬৮টি ঘর তুলুন। তার পর ১টা সোঃ, ১টা উঃ, ১টা ঘঃ তুঃ নিঃ। তার পর শেষ পর্য্যন্ত ১৪টা সোঃ।

এবারে প্যাটার্ন শুরু।

১ম লাইন—* ৬টা সোঃ, ৬টা উঃ, ১৪ রিব্। তার পর * থেকে রিঃ করে ৬টা সোঃ-তে শেষ। ২য় লাইন—১৪ রিব্, ৫টা উঃ, * ৬টা সোঃ, ৬টা উঃ ; তার পর * থেকে রিঃ করে ৬টা উঃ, ১টা সোঃ-তে শেষ। ৩য় লাইন—২টা উঃ, *৬টা সোঃ, ৬টা উঃ ; তার পর * থেকে রিঃ করে ৬ উঃ, ৪টা সোঃ-তে শেষ। ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ লাইন—ঠিক ঐ ১ম, ২য় ও ৩য় লাইনের অনুরূপ। ৭ম লাইন—* ৬ উঃ, ৬টা সোঃ,—তার পর * থেকে রিঃ করে ৬ উঃতে শেষ। ৮ম লাইন—২য় লাইনের অনুরূপ। ৯ম লাইন—১টা উঃ, * ৬টা সোঃ, ৬টা উঃ—তার পর * থেকে রিঃ করে ৫ সোঃ-তে শেষ। ১০ম লাইন—২য় লাইনের অনুরূপ। ১১শ লাইন—৩টে উঃ, * ৬টা সোঃ, ৬টা উঃ। তার পর * থেকে রিঃ করে ৩ সোঃ-তে শেষ। ১২শ লাইন—২য় লাইনের অনুরূপ। ১৩শ লাইন—৫টা উঃ, * ৬টা সোঃ, ৬টা উঃ—তার পর * থেকে রিঃ করে যান। ১৪শ লাইন—২য় লাইনের অনুরূপ।

এই ১৪ লাইনে প্যাটার্ন সম্পূর্ণ হলো। এর পর আগাগোড়া ঐ ১৪ লাইনের প্যাটার্ন রিঃ করে যান্। তার পর ৯নং কাঠিতে বোনা তুলে রাখুন—তুলে রেখে যথানিয়মে বুনে যান যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ১৭টি ব্লক সম্পূর্ণ হয়।

হাতের ঘেরের জন্য আগেকার মতো ১ ঘর করে কমিয়ে বুনে যাবেন—যতক্ষণ না ৪ লাইনে ৮৪ ঘর বাকী থাকে। এবার ঘর আর না কমিয়ে বুনে যাবেন যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ৮টি ব্লক সম্পূর্ণ হয়।

সামনের বাঁ দিক

ডান দিককার মতো বুনে যাবেন। তবে আরম্ভগুলো উল্টো দিক থেকে ধরতে হবে। যেমন যেখানে ৬টা সোঃ-তে আরম্ভ ৬টা উঃ-তে শেষ, সেখানে ৬টা উঃ-তে আরম্ভ করে ৬টা সোঃ-তে শেষ করবেন।

তার পর দু'দিককার ঘরগুলি একসঙ্গে বুনে ফেলুন।

হাত

হাতের তলার দিক থেকে বুনতে হবে। ১১নং কাঠিতে ৫৪টি ঘর তুলুন এবং তিন ইঞ্চি বুনে যান ১টা সোঃ, ১টা উঃ, ১টা রিব্। তার পর ৯নং কাঠি নিয়ে সেই কাঠিতে ঐ নিয়মে বুনে যাবেন, শুধু ৮০ ঘর তোলা না হওয়া পর্য্যন্ত ৪র্থ লাইন থেকে বরাবর শেষের দিকে ১ ঘঃ বাঃ হবে। তার পর আর ঘর না বাড়িয়ে সমান বুনে যাবেন যতক্ষণ পর্য্যন্ত না হাতের লম্বা ১৮ ইঞ্চি সম্পূর্ণ হবে। তার পর কাঁধের কাছটায় ১ ঘঃ কঃ বুনে যাবেন যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ৬৫টি ঘর বাকী থাকে।

কলার

১১ নং কাঠিতে ৭৫টি ঘর তুলে নিন দু' লাইনে। এ দু' লাইন বুনবেন ১টা সোঃ, ১টা উঃ ১টা রিব্। তার পর ৯নং কাঠিতে তুলে রেখে আবার বুনে যান যতক্ষণ পর্য্যন্ত না গোড়া থেকে ৩ ইঞ্চি বোনা সম্পূর্ণ হয়। তার পরের লাইন থেকে ১ ঘর করে বাড়িয়ে যাবেন যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ১২টি ঘর বোনা সম্পূর্ণ হয়। এমনি ভাবে ঘঃ নাঃ বাঃ ৮॥ ইঞ্চি বুনবেন। তার পর তিন লাইন বুনবেন ২টা সোঃ। এই নিয়মে তিন ইঞ্চি বুনে যান ; তার পর ঘর বন্ধ করে কলারের দু' দিকে জুড়ে নিন। কলারটা জামার সঙ্গে সেলাই করে নিন।

এবার গোটা জ্যাকেট তৈরী হলো। উল্টো ভাঁজ করে পুরো জামার উপর অল্প-ভিজে কাপড় চাপা দিয়ে গরম ইস্ত্রী চালিয়ে নিন। তার পর ডান দিকে বোতাম-পটী এবং বাঁ দিকে বোতাম-ঘর বসিয়ে নিন। মাপ বুঝে বোতাম-ঘর বসাবেন। তার পর আর-একবার গরম-ইস্ত্রী চালান। এবারে জ্যাকেট গায়ে দিন।
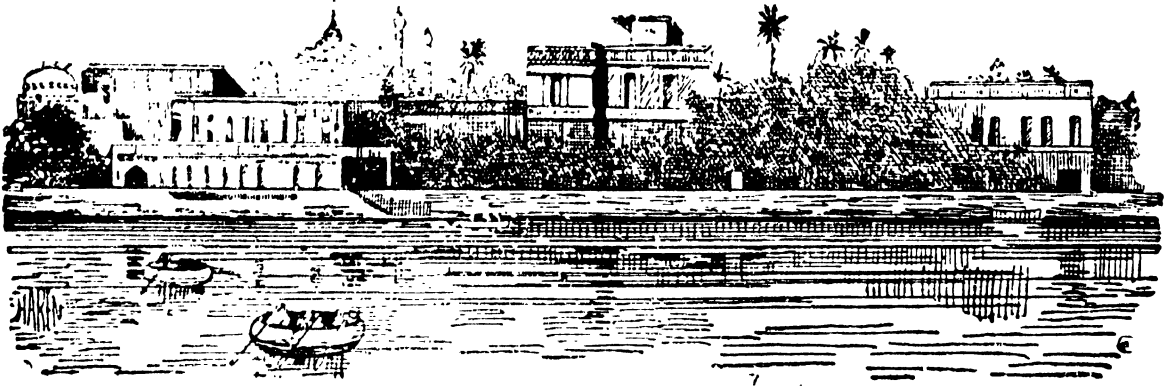
হাওয়াই-দ্বীপপুঞ্জ

হাওয়াই দ্বীপের সঙ্গে ভূগোলের পাতায় ছেলেবেলায় কি পরিচয় হইয়াছিল মনে পড়ে না! পরে আমেরিকান-

হাওয়াই

ফিল্মের কৃপায় হাওয়াইয়ের পরিচয় পাইয়াছি এই যে, ও-দ্বীপের মেয়ে-পুরুষ নাচে এবং গান-বাজনায় ওস্তাদ। 'হাওয়াইয়ান্-মিউজিক্'—আমাদের কানে-প্রাণে খুব মিঠা লাগিয়াছে। ঐ নাচে-গানে ও বাজনায় হাওয়াই-দ্বীপের নর-নারী যেন আমাদের একান্ত আত্মীয় হইয়া উঠিয়াছে!

জাপানের এই আসুরিক অভিযানের প্রথম পর্ব্বে সেই হাওয়াই দ্বীপে হানা পড়িলে আমাদের মনে আশঙ্কার সীমা ছিল না! এ দুর্দ্দিনে তাই হাওয়াইয়ের পরিচয় ভালো করিয়া জানিবার বাসনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।
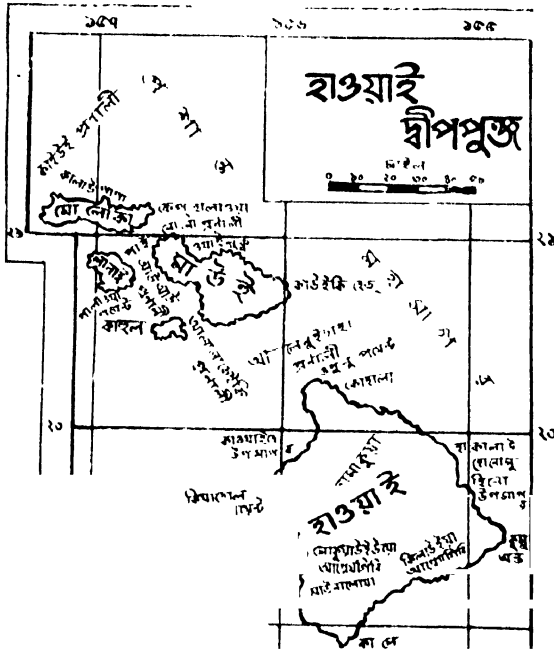
ম্যাপে প্রশান্ত-মহাসাগরের বিরাট্ বুকের উপরে ছোট তৃণাঙ্কুরের মতো হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ! দেখিলে চমক লাগে! বিরাট্ অথৈ সাগরের বুকে ছোট দ্বীপগুলির সন্ধান পাইয়া মানুষ কবে গিয়া ওখানে প্রথম বাসা বাঁধিল, জানি না! হাওয়াই হইতে সব-চেয়ে নিকটতম যে দেশ—সান্‌ফ্রান্‌সিশকো—তা'ও ২৪০০ মাইল দূরে অবস্থিত!

ইতিহাসের গবেষণায় আমরা জানিতে পারি, ৬০০ খৃষ্টাব্দে তাহিতি এবং সামোয়া দ্বীপ হইতে মানুষ-জন আসিয়া সর্ব্বপ্রথম এই হাওয়াইয়ে আস্তানা বাঁধে। কেন তারা আসিল, কি করিয়া আসিল এবং কার অধি-নায়কতায় আসিল, সে সম্বন্ধে বহু প্রয়াসেও কোনো কথা জানা যায় না। হয়তো কোনো বুনো জাতির

পশ্চিম-দিককার দ্বীপগুলি

ঢেউয়ের মাথায় নাচন

৬০০ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রায় বারো শত বৎসর পর্য্যন্ত সভ্য-জগতের জন-প্রাণী হাওয়াইয়ের নাম পর্য্যন্ত জানিত না। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন কুক প্রথমে আসিয়া এ দ্বীপালির সর্ব্ব-পশ্চিমে অবস্থিত কাউয়াইয়ে নামেন। দ্বীপের লোক-জন গাঁয়ে এক পরমাশ্চর্য্য জীব আসিয়াছে বলিয়া দিক্-দিগন্তে সে সংবাদ দিতে ছুটিয়াছিল। ক্যাপ্টেন

আক্রমণে বিপর্য্যস্ত হইয়াই তারা এখানে আসিয়াছিল নিরাপদ অবস্থানের জন্য!

আসিবার সময় স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের সঙ্গে আনিয়াছিল। আর সেই সঙ্গে আনিয়াছিল গৃহপালিত শূকরদল এবং

জাল ফেলার কৌশল—২৫ ফুট ব্যাপিয়া জাল পড়ে

তৃণ-শস্য ও গাছ-পালার বীজ। এখনো বহু কালের পুরাতন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এবং শুষ্ক জীর্ণ পুষ্করিণীর বহু চিহ্ন হাওয়াইয়ের বুকে বিরাজিত দেখা যায়।

কুক তার পর দেশে ফিরিয়া আসিলেন। এবং ফিরিয়া কয়েক মাস পরেই আবার জাহাজ ও লোক-জন লইয়া আসিলেন এই হাওয়াই দ্বীপে—সেখানকার লোক-জনের সঙ্গে বাণিজ্য করিবার বাসনায়। কিছু কাল ব্যবসা-

এই তরী নিয়ে জলখেলা
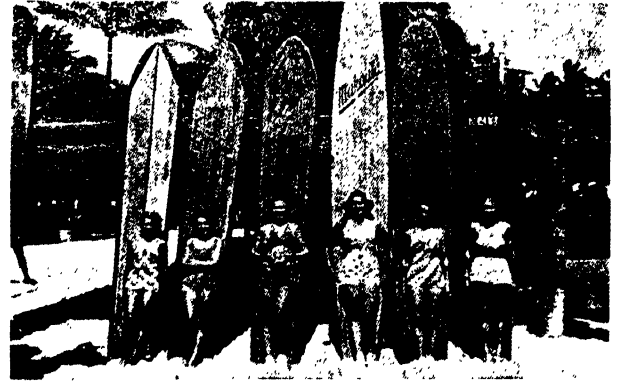
বাণিজ্য বেশ চলিয়াছিল; তার পর এক জন দেশী লোক কুকের একখানি নৌকা চুরি করে, সে চুরির ফলে কুকের লোক-জনের সঙ্গে দ্বীপের অধিবাসীদের ছোট-খাটো একটা লড়াই হয় এবং সে লড়াইয়ে কুক নিহত হন। হাওয়াই দ্বীপে কুকের দেহ মহা সমারোহে সমাহিত

টি-য়ের পাতায় বসিয়া পাহাড়ের ঢালু গা বহিয়া নামা

হয়। তার পর সভ্য দেশের আর কোনো মানুষ-জন কিছু কাল আর এখানে পদার্পণ করে নাই!

১৮২০ খৃষ্টাব্দে হাওয়াইয়ে আসিয়া দেখা দিলেন ক'জন মার্কিণ পাদরী। হাওয়াইয়ে তখন রাজা কামেহামেহার মৃত্যু হইয়াছে এবং সিংহাসনে বসিয়াছেন নূতন রাজা। নূতন রাজা পাদরীদের সমাদরে এ-দ্বীপে স্থান দিলেন। পাদরীদের মনে ধর্ম্ম-প্রচার বা বাণিজ্য-সম্পর্কিত কোনোরূপ সঙ্কীর্ণ বাসনা তখন ছিল না। তাঁরা বিদেশীদের লুণ্ঠন ও পীড়ন হইতে এ-দ্বীপের অধিবাসীদের প্রাণপণে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এ-দ্বীপের লোক জন তখন কাপড়-চোপড় পরিত না—কৌপীনে কোনো মতে লজ্জা নিবারণ করিত। পাদরীরা বসন দিয়া তাদের লজ্জা নিবারণ করিলেন; সেই সঙ্গে দিলেন তাদের রোগে ঔষধ-পথ্য। তারা বিবিধ রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইল। তখন তাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত রহিল না; পাদরীদের বশীভূত হইল। পাদরীরা তখন ধর্ম্মপ্রচারে মনোযোগী হইলেন। সারা দ্বীপে অচিরে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইল। পাদরীরা ক্রমে আইন-কানুন রচিয়া দিলেন; তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। সে-শিক্ষায় তারা বুঝিল, হাওয়াই তাদের দেশ; এবং এ-দেশকে বিদেশীয়ের আক্রমণ ও লুণ্ঠন হইতে রক্ষা করিতে না পারিলে তাদের ধ্বংস অনিবার্য্য! এ-শিক্ষা না পাইলে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় হাওয়াইয়ানরা দ্বীপটিকে ইংরেজ অথবা ফরাসী

পাহাড়ী রজনীগন্ধা—হাওয়াই

সওয়ারের পাশে "রূপার অসি" ফুল। এ ফুল জন্মায় আগ্নেয়গিরির বুকে

জাতির হাতে তুলিয়া দিত! পাদরীদের পরামর্শেই মার্কিণ-যুক্তরাজ্য হাওয়াইয়ের স্বাধীনতা লোপ করিয়া দ্বীপটিকে অধিকারভুক্ত করিবার সঙ্কল্প করে নাই। মার্কিণ রাজনীতিকগণ বুঝিলেন, স্বাধীন ভাবে হাওয়াইকে রক্ষা করিলে এ দ্বীপটিকে মার্কিণ-মুল্লুকের আত্মরক্ষার পক্ষে প্রভূত শক্তিমান্ করা চলিবে!

রাজা কামেহামেহার পর তাঁর বংশের আর চার জন রাজা হাওয়াইয়ের সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। তার পর এ-বংশে পুত্র-সন্তান না থাকার জন্য সর্দ্দার লুনালিলোকে রাজা বলিয়া অভিষিক্ত করা হয়। লুনালিলো অচিরে

পার্ব্বণে হুলা-হুলা নৃত্যলীলা

সিংহাসনচ্যুত করিয়া এ-দ্বীপে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে।

এই সময়ে দ্বীপটিকে মার্কিণ-যুক্তরাজ্য-ভুক্ত করিয়া লইবার জন্য ওয়াশিংটনে গুরুতর প্রয়াস চলিয়াছিল—স্পানিয়ার্ডরাও এই সময়ে হাওয়াই দ্বীপে হানা দিবে বলিয়া উদ্যোগ করিতেছিল। এজন্য হাওয়াইয়ে জল্পনা-কল্পনার সীমা ছিল না। স্পেনের সঙ্গে

পরলোকগত হন। তখন ভিভিড কালাকাউয়া নামে আর-এক জন সর্দ্দারকে রাজপদে অভিষিক্ত করা হয়।

কালাকাউয়া ইংরেজী ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন। রাজা হইয়া তিনি পৃথিবী পর্য্যটন করেন। তিনি ছিলেন

হুলা-হুলা নাচ

বুদ্ধিমান্ এবং প্রজারঞ্জক। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসিলেন কালাকাউয়ার ভগ্নী লিলিয়ুয়োকালানি। রাণী লিলিয়ুয়োকালানি স্ব-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করেন; তার ফলে হাওয়াইয়ে হয় প্রজাবিদ্রোহ; এবং ক্ষিপ্ত প্রজার দল রাণীকে

আমেরিকার যুদ্ধ বাধিল। এ্যাডমিরাল ডিউই মানিলা অধিকার করিলেন। হাওয়াইয়ে ঘোর বিভীষিকা! তখন হাওয়াইকে মার্কিণ-যুক্তরাজ্য স্বাধিকার-ভুক্ত করিল! মার্কিণ বুঝিল, হাওয়াই যদি হাত-ছাড়া হয়, তাহা হইলে বিরাট্ প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে মার্কিণ নেভি এতটুকু আশ্রয় পাইবে না—হাওয়াই দ্বীপ হাতে থাকিলে প্রশান্ত-মহাসাগরে ছাউনি ফেলিবার একটা ঠাঁই থাকিবে! এই উদ্দেশ্যেই হাওয়াইকে মার্কিণ স্বাধিকার-ভুক্ত করে। অধিকারভুক্ত করিলেও হাওয়াইকে আমেরিকা দাস-রাজ্য করে নাই—হাওয়াইকে দিল ঔপনিবেশিক অধিকার।

মার্কিণ শিক্ষা-সভ্যতার হাওয়া হাওয়াইয়ে আগে হইতেই বহিতেছিল,—আমেরিকার আশ্রয়-লাভের সঙ্গে সঙ্গে স্কুল-কলেজ, কাছারি, হাসপাতাল প্রভৃতি গড়িয়া উঠিতে লাগিল; এবং হাওয়াই দ্বীপ অচিরে হইয়া উঠিল মার্কিণ-যুক্তরাজ্যের একটি সংক্ষিপ্ত সজীব সংস্করণ! আজিকার হাওয়াইয়ানরা নিজেদের আমেরিকান বলিয়া পরিচয় দেয়। তারা নিজেদের আদি-ভাষা ভুলিয়া গিয়াছে; তাদের নিজেদের ইতিহাস নাই, পুরাণ নাই—প্রাচীন যুগের ধর্ম্ম-সংস্কারের বিষ-বাষ্পও আজ হাওয়াইয়ে নাই! হাওয়াই আজ মনে-প্রাণে মার্কিণ!

নিজেদের জাতীয় ক্রীড়া-কৌতুককে কিন্তু তারা বিসর্জ্জন দেয় নাই। তাদের সেই চিরকালের "হুলা-হুলা" নাচ—সে-নাচ তারা ভোলে নাই! সে-নাচে তাদের বৈশিষ্ট্য আজ সারা পৃথিবীকে বিমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে! তা ছাড়া খেলা। সমুদ্রের উত্তুঙ্গ তরঙ্গ-মালায় কাঠ ভাসাইয়া নির্ভীক্ চিত্তে সেই

হাওয়াইয়ের কূলে মার্কিণ রণতরী

কাঠে বসিয়া-দাঁড়াইয়া সাগরের বুকে মাতন—সভ্য যুবক-যুবতীরা আজও এ-মাতন ত্যাগ করে নাই। টি-গাছের পাতা ছিঁড়িয়া সেই পাতার গুচ্ছ বাঁধিয়া পত্র-গুচ্ছাসনে বসিয়া-শুইয়া পাহাড়ের ঢালু গা বহিয়া নামা—শিক্ষিত হাওয়াইয়ান্ তরুণ-তরুণী এ-খেলাকে আজও সাদরে শিরোধার্য্য করিয়া আছে! হাওয়াইয়ে এক-জাতের বেতগাছ জন্মায়—সে-গাছ হয় আমাদের দেশের বাঁশের মতো সরল ও দীর্ঘ। এই বেতের ঝাড় সাজাইয়া তার উপর মাচা বাঁধিয়া সেই মাচায় ওঠা—আদি যুগে ছিল জোয়ান বন্য হাওয়াই-য়ান্দের সখের খেলা! আজিকার সৌখীন হাওয়াই-য়ান্রাও এ-খেলাকে সভ্যতার আওতায় ত্যাগ করে নাই। এ মাচা ২০০।৩০০ ফুট উঁচু হয়। বেতের ভারা বহিয়া সে মাচায় ওঠা—ভারা দেখিলে চমক লাগে! কিন্তু নির্ভীক্-চিত্ত হাওয়াইয়ান্দের এ-খেলায় তিলমাত্র ভয় নাই! তাছাড়া দুর্গম স্থান হইতে রকমারি ঝিনুক-সংগ্রহ—হাওয়াইয়ান্দের দারুণ বাতিক!

হাওয়াইয়ান্ স্ত্রী-পুরুষের দেহের গঠন যেন ছন্দে বাঁধা! মোটা ভুঁড়ি দেখা যায় না। পুরুষদের ছিপ্ছিপে দেহের গড়নে বেশ আঁটসাঁট আছে! মেয়েরা যেন চির-যৌবনা। দেহের এই রূপ-ছাঁদের প্রধান কারণ, হাওয়াই দ্বীপে ধনী-গৃহস্থ-গরীব—কোনো পরিবারেই কেহ আলস্য জানে না—চুপচাপ বসিয়া গল্পগাছা করিবার প্রবৃত্তি কাহারো নাই! কাজকর্ম্ম, দৌড়-ঝাঁপ, ঘোরাফেরা, ঘোড়ায় চড়া, সাগরের বুকে সাঁতার—বিবিধ জলক্রীড়া—

ফার্ণে-ছাওয়া পথ—কিলৌয়া

এ-সব যেন সকলে রুটিন মানিয়া নিত্যকৃত্যের মতো করিতেছে। তাছাড়া এ জাতের মৃগয়ানুরাগ প্রবল। ফুটবল খেলার মতোই বরাহ-শীকারের সখ পুরুষদের একেবারে মজ্জাগত! এ-সব ক্রীড়ায় পটুতার সঙ্গে

আধুনিক মার্কিণের খেলাধূলাকেও হাওয়াইয়ানুরা আত্মগত করিয়া লইয়াছে। ফুটবল, টেনিশ, পোলো—এ-সব খেলার সমারোহ বারো মাস লাগিয়া আছে।

আনারসের ক্ষেতে কাগজ ঢাকা

কিছু দিন আগে উইলিয়াম কাস্‌ল্‌ নামে এক জন মার্কিণ ভদ্রলোক হাওয়াইয়ে গিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল সেখানে থাকিয়া সকলের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলা-মেশা করিয়াছিলেন। হাওয়াই এবং হাওয়াইয়ানদের সম্বন্ধে তিনি যে-কথা লিখিয়াছেন, তার মর্ম্ম সঙ্কলন করিয়া আমরা এ সন্দর্ভ শেষ করিব।

আগ্নেয়গিরির নীচে পথ—মাউই দ্বীপ

কাস্‌ল্‌ সাহেব লিখিতেছেন,—হাওয়াইয়ে ছোট-বড় অনেক পাহাড় আছে। আগ্নেয়গিরিও আছে অনেক। পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রান্তে আছে কিলোইয়া আগ্নেয়গিরি। মান্ধাতার যুগ হইতে এ-গিরির মাথায় আগুন জ্বলিতেছে! এই আ.গ্নেয়গিরিটি প্রায় পাঁচশো ফুট উঁচু। চারিধার ঘিরিয়া পাহাড়ের গা এমন ঢালুভাবে নামিয়া গিয়াছে, দেখিলে মনে হয়, পাহাড় যেন হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া আছে! মাথায় জ্বলিতেছে অগ্নিকুণ্ড! এই ঢালু গায়ে থাক্‌ কাটিয়া খেলার জমি ও বেড়াইবার পথ তৈয়ারী হইয়াছে! পথে বা খেলার জমিতে আগুন কিংবা গলিত-লাভার বিন্দুও গড়াইয়া বা ঝরিয়া পড়ে না! খেলার জমির আয়তন ২৬৫০ একর। এখানে লোক-জন নিত্য খেলাধূলা করিতে ও বেড়াইতে আসে। খেলিতে-খেলিতে, বেড়াইতে-বেড়াইতে সবিস্ময়ে তারা চাহিয়া দেখে—অগ্নির লহর-লীলা! কাহারো গায়ে কিন্তু এতটুকু আগুনের আঁচ লাগে না! রাত্রির অন্ধকারে যখন দিগন্ত ভরিয়া যায়, তখন আগ্নেয়গিরির মাথার ঐ অগ্নি-শিখায় সারা আকাশ রাঙা হইয়া ওঠে—সে দৃশ্য অপূর্ব্ব মধুর! তবে পথে এবং খোলা জায়গায় গণ্ডী নির্দ্দেশ করা আছে—যেন লক্ষ্মণের গণ্ডী! সে গণ্ডীর বাহিরে গেলেই আঁচ লাগিয়া গায়ে ফোস্কা দেখা দিবে! পাহাড়ের যে থাক-গড়ার কথা বলিয়াছি, সেই থাকের গায়ে ও নীচে বহু টানেল আছে—এ-সব টানেল

মানুষের হাতে গড়া নয়—আগ্নেয়গিরির বুক বিদীর্ণ করিয়া কবে এ-সব টানেলের সৃষ্টি, সে-কথা কোনো ইতিহাসে লেখা নাই! তবে এ-সব টানেলের গায়ে গলিত লাভা শুকাইয়া জমাট বাঁধিয়া মোটা আবরণ রচিয়া রাখিয়াছে। সে আবরণ এমন মজবুত যে, কামানের গোলায় তাহা মচকায় না! এমনি বহু টানেলে হাওয়াই ও হনলুলুর বহু স্থান যেন দুর্ভেদ্য দুর্গ-প্রাচীরের আড়াল রচিয়া রাখিয়াছে!

বহু কাল পূর্ব্বে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে একবার কিলৌইয়া ক্ষেপিয়া দারুণ অগ্নিবৃষ্টি করিয়াছিল! সে সময় পাহাড়ের মাথায় ৭০০ ফুট বিস্তৃত প্রচণ্ড ফাট ধরিয়া অগ্নি-নির্ঝর উৎসারিত হইয়া চারিদিক্ পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিয়াছিল। তার পূর্ব্বে অগ্নি-স্রাব ঘটিয়াছিল ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে। তখন রাজা কামেহামেহার রাজ্য-অপহরণের বাসনায় এক দল শত্রু-সৈন্য আসিয়া হাওয়াইয়ে হানা দিয়াছে! আগ্নেয়গিরির সে-অগ্নিবৃষ্টিতে শত্রুসৈন্য নিমেষে পুড়িয়া অঙ্গার-স্তূপে পরিণত হয়।

কাশ্‌লু লিখিতেছেন—ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া সমগ্র হাওয়াই আমি যেন চষিয়া বেড়াইতাম। ক্ষুধা বা পিপাসার জন্য দুশ্চিন্তা ছিল না। যত্র তত্র কদলীকুঞ্জ; তাছাড়া ওহিয়া নামে এক-রকম সুস্বাদু ফল পাওয়া যায়; তার উপর আছে বাদাম; নীল জাম; রাশপবেরি প্রভৃতি নানা জাতের সরস মিষ্ট ফল। এ-সব ফল খাইলে একসঙ্গে ক্ষুধা-পিপাসার নিরাকরণ হয়। আর একটি বড় আগ্নেয়গিরি আছে মোকুয়াউইয়োউইয়ো। প্রতি চার বৎসর অন্তর এটির অগ্নিস্রাব দেখা যায়। এ আগ্নেয়গিরির মাথার গহ্বরটি ৫০০|৬০০ ফুট গভীর। অগ্নিস্রাব দেখা দিবার সময় ভূমিকম্প হয় এবং বাতাসও সুযোগ পাইয়া ঝড়ের মত্ত-তাণ্ডবে নাচিয়া ওঠে! এই ত্র্যহস্পর্শ যোগ ঘটিলে জীব-জন্তু ও তৃণ-শস্যাদির রক্ষার কোনো উপায় থাকে না। বহু দূর সমুদ্র-বক্ষে জাহাজে বসিয়া বহু যাত্রী এ-গিরির সে অগ্নি-লীলা দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়াছেন! হাওয়াইয়ানরা বলে, এ-সব আগ্নেয়গিরি হইল পেলি দেবীর অনুচরী। খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও এখানকার সাধারণ ইতর-ভদ্র নর-নারী বছরে এই দেবীর উদ্দেশে পূজা-নিবেদন করে—দেবীর সন্তোষ-বিধানের জন্য ফলের ডালি উপহার দেয়, শূকর বলি দেয়। পূজা-পার্ব্বণে নাচ-গান-বাজনার সমারোহ ঘটে!

এখানকার সবচেয়ে বড় আগ্নেয়গিরি—মাউই দ্বীপের
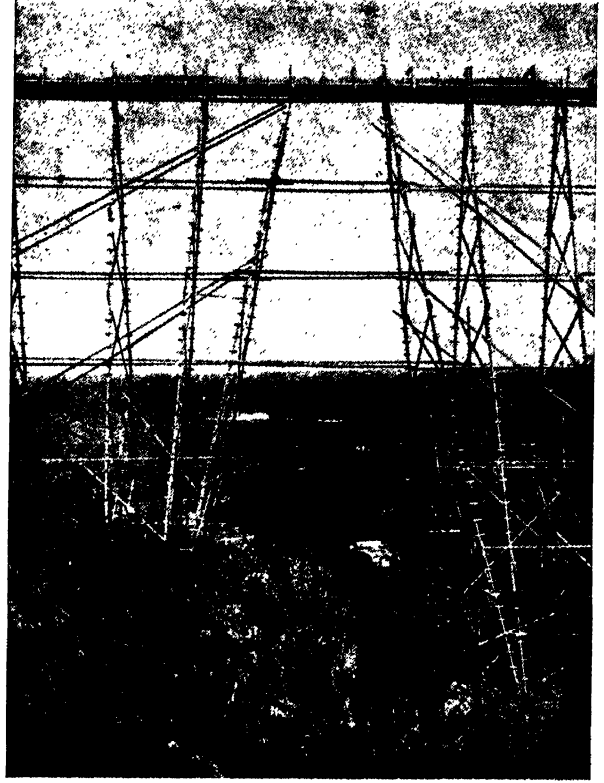
বেতের ভারা

হালিয়াকালা। পাহাড়টি সমুদ্র-বক্ষ হইতে ২০০৩২ ফুট উঁচু। পাহাড়টির ঘের প্রায় ২১ মাইল এবং এ-পাহাড়ের মাথায় যে গহ্বর বা crater, সেটির গভীরতা ১০০০ ফুটের চেয়ে বেশী। পাহাড়ের গায়ে বল্মীক-স্তূপের মতো অসংখ্য শিখর—শিখরগুলির সৃষ্টি হইয়াছে গলিত লাভার স্তূপে জমাট বাঁধিয়া!

এখানকার বনে-পর্ব্বতে হাজার রকমের ফুল ফোটে। সে-সব ফুলে এবং নানা-জাতের লতায়-পাতায় মনোমোহন বৈচিত্র্য দেখিলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। এক-জাতের মনসা-গাছে ফুল হয়—এক-একটি ফুল যেন এক-একটি চন্দ্রমণ্ডল! সে-ফুল রাত্রে ফোটে—হাওয়াইয়ান

রজনীগন্ধা! এ-ফুলের পাপ্‌ড়ি দুগ্ধ-ধবল। পদ্মও বুঝি এ-ফুলের সৌন্দর্য্য দেখিয়া লজ্জায় ম্লান হয়! আগ্নেয়গিরির বুকে আর এক-জাতের ফুল হয়—দেখিতে আনারসের মতো। সে-ফুলের নাম "রূপার অসি" (Silver Sword)। একটি গাছে একটি করিয়া ফুল ফোটে। এ-ফুল মানুষের চেয়ে দীর্ঘ হয়। উত্তরে পার্ব্বত্য অঞ্চলে এখনো আদি হাওয়াইয়ান্‌দের বাস আছে। ধর্ম্মে খৃষ্টান হইলেও আচারে-ব্যবহারে তারা সাবেক-কালের হাওয়াইয়ান্‌

মার্কিণ মোটর-ফৌজ—হাওয়াই

বালু-চরে—এ-বালুকা গান গায়!

রহিয়া গিয়াছে। কোহালা পাহাড়ের ধারে ওয়াইপিয়ো এবং ওয়াইমানোর সমতল ভূমেও আদিম হাওয়াইয়ানের বাস। আজো ইহারা পৃথিবীর সঙ্গে সব সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন রাখিয়া প্রাচীন যুগের আবহাওয়ার মধ্যে সেই প্রাচীন রীতিতে বাস করিতেছে!

কাশ্‌লু লিখিতেছেন,—ছোট-বড় অসংখ্য দ্বীপ লইয়া হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ সংগঠিত। হাওয়াইয়ের উপর মাওই দ্বীপ। তার পশ্চিমে লানাই; লানাইয়ের উত্তরে মোলোকা; মোলোকার পশ্চিমে ওয়াহু দ্বীপ এই ওয়াহুর প্রধান সহর হনলুলু। ওয়াহুর উত্তর-পশ্চিমে কাউয়াই
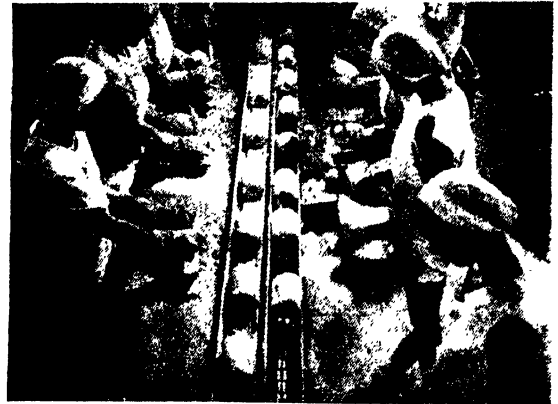
আনারসের রসধারা

চ্যানেল। চ্যানেলের পশ্চিমে কাউয়াই দ্বীপ। এই কাউয়াইয়ে আসিয়াছিলেন ক্যাপ্টেন কুক্‌। কাউয়াইয়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে নিহাউ; নিহাউয়ের পশ্চিমে ওয়েক দ্বীপ।

হনলুলু ও কাউয়াই দ্বীপের মধ্যে যে চ্যানেল, সেটি ৭৪ মাইল চওড়া। কিন্তু এ-চ্যানেল এমন তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ যে, ষ্টীমারে চড়িয়া চ্যানেল পার হওয়া দারুণ বিপদসঙ্কুল ব্যাপার ছিল। এখন এরোপ্লেনের কল্যাণে হনলুলু-যাত্রা

সহজ ও নিরাপদ হইয়াছে। হনলুলু আজ প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষে প্লেন-যাত্রীর পক্ষে অপরিহার্য্য হল্‌টিং-ষ্টেশন হইয়াছে। আমেরিকা হইতে হংকং-সিঙ্গাপুর যাত্রার পথে হনলুলুতে নামিতেই হইবে। তাছাড়া অষ্ট্রেলিয়ার পথেও হনলুলু মধ্যবর্ত্তী হল্‌টিং-গ্রাউণ্ড। হনলুলু হইতে মাউই এবং হিলো প্রভৃতি দ্বীপগুলিতে প্রত্যহ আজ প্লেন চলিতেছে।

হাওয়াই আজ আমেরিকার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হইয়াছে, এ-কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অসংখ্য পার্ক ও হোটেল—বাড়ী-ঘর সব আধুনিক ছাঁদের। বাড়ীর গঠনে কিন্তু মার্কিণ রীতি অবলম্বিত হয় নাই ; শ্রীছাঁদের দিকে নজর রাখিয়া বাড়ী তৈয়ারী হয়। সমুদ্রের লোনা জল-বাতাসে দেওয়াল না নষ্ট হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রাচীন প্রথা মানিতে হয়। প্রত্যেক বাড়ীর সঙ্গে বাগান আছে—লন আছে। বাগানে ও লনে নানা জাতের ক্রোটন, অজস্র লাল হিবিশাসের ঝাড়,—মাঝে মাঝে ছায়া-ঘন বিরাট্ বট। সমুদ্র-বক্ষগামী জাহাজ হইতে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জকে যেন ছবির মতো দেখায়।

হাওয়াইয়ের মাটী খুব উর্ব্বর। চিনির চাষেই এখানকার বিশেষ সমৃদ্ধি। এত ভালো আখ পৃথিবীর আর কোথাও জন্মায় না। আনারসেরও তেমনি ফলন! চাষ-আবাদের কাজে সর্ব্বত্র আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসৃত হইতেছে—এজন্য এক-একর-পরিমিত জমিতে যে আখ ফলে, সে আখ হইতে চিনি মেলে বছরে প্রায় বাইশ টন! আনারস এত বেশী জন্মায় যে, একটি টাকায় হাওয়াইয়ে প্রায় দেড়শো উৎকৃষ্ট আনারস পাওয়া যায়। এখান হইতে সপ্তাহে লক্ষ লক্ষ আনারস আমেরিকায় চালান যায়। রৌদ্র-তাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য আনারসের মাথায় সাদা কাগজ ঢাকিয়া দেওয়া হয়।

মাউই অতি-ক্ষুদ্র দ্বীপ। সে দ্বীপে আনারসের চাষ খুব বেশী পরিমাণে হয়। মাঠে আনারস-চারার গায়ে কাগজের আচ্ছাদন থাকে বলিয়া দ্বীপটিকে দেখায় যেন গায়ে অসংখ্য সাদা পটী আঁটিয়া পড়িয়া আছে!

তার পর এখানে আছে র‍্যাঞ্চ। এ-সব র‍্যাঞ্চে উৎকৃষ্ট গো-মেষ-মহিষ এবং শূকর প্রতিপালিত হয়—ব্যবসায়ের জন্য।

এখানকার কফিও বিশ্ববিখ্যাত। সব কফি আমেরিকায় চালান যায়।

হাওয়াইয়ের শ্যাম-পত্র-পল্লব—(এক-একটি পাতা ছাতার মতো)

ধানের চাষ আছে ; তবে চিনি, আনারস ও কফির তুলনায় অল্প। এখানে সব জাতের ফল ফলে। নারিকেল প্রচুর।

হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ মার্কিণের তোরণ-স্বরূপ। এজন্য এখানে ফৌজ ও দুর্গাদির প্রাচুর্য্য। বড় বড় রণতরী যেমন সাগর-বক্ষে সর্ব্বদা পাহারাদারী করিতেছে, তেমনি এখানে অসংখ্য দুর্গ ও ফৌজ-ব্যারাক। হাওয়াই হইতে শত্রুর আক্রমণ-প্রতিরোধ যাহাতে সফল হয়, সেজন্য বৈজ্ঞানিক মার্কিণ-জাতি এখানে কোনো অনুষ্ঠানে এতটুকু ত্রুটি রাখে নাই।

অল্প দিন পূর্ব্বে আমার বিবাহ হইয়াছে। আমার স্ত্রী খুবই সুন্দরী। অবশ্য, নিজের স্ত্রী সকলের নিকটেই অপরূপ সুন্দরী! বিশেষতঃ, সে যদি বাস্তবিকই রূপবতী হয়। আমার কোন প্রবাসী বন্ধু আমাদের congratulation করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, এবং আমাকে স্বতন্ত্র একখানি পত্র লিখিয়া খুব বিস্মিত হইয়া জানিতে চাহিয়াছেন, আমার ন্যায় ব্রহ্মচারীর কি করিয়া বিবাহ হইল, অর্থাৎ সত্যই কি আমি বিবাহ করিয়াছি? আমার ন্যায় ব্রহ্মচারীর মন টলাইতে পারিয়াছে, এমন কে সেই অনন্যসাধারণ রূপবতী, গুণবতী, ভাগ্যবতী যুবতী?··· এমনি আরও কত কি প্রশ্ন।

আমার বন্ধুবান্ধব সকলেই আমাকে ব্রহ্মচারী বলিত; কিন্তু কেন বলিত, তাহা আমার অজ্ঞাত। অবশ্য, তাহার নিশ্চয়ই কোন কারণ ছিল। বোধ হয়, কোন তরুণী আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া-যাইলে, তাহার দিকে ক্ষুধিত নেত্রে একবারও দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে, এবং যতক্ষণ তাহার শাড়ীর অঞ্চলটুকুও দেখা যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পথে যাইতে যাইতে সে-দিকে তাকাইয়া থাকিতে পারিতাম না, অথবা কোন তরুণী যদি দৈবাৎ আমার সহিত চোখা-চোখি হইবার পরও কৃপা করিয়া ঠোঁটের কোণ ঈষৎ আকুঞ্চিত করিতেন—তাহা হইলে সেই মধুর আকুঞ্চনের স্মৃতি মনে রাখিয়া নানা অসম্ভব কল্পনায় আত্মহারা হইতেও পারিতাম না। যাহা ক্ষণিক, তাহার মোহে অনর্থক বিড়ম্বনা ভোগ করিতে কোন কালেই আমি অভ্যস্ত নহি। সেই মৃদু হাসি, চঞ্চল পদক্ষেপ, সাময়িক প্রেম, কোমল করস্পর্শ—যাহার মোহ ক্ষণিক হইতেও ক্ষণিকতর—তাহার পশ্চাতে ঘুরিবার মত ধৈর্য্য, ও সময় নষ্ট করিবার প্রবৃত্তি কোন দিনও আমার ছিল না। এই জন্যই আমার বন্ধুরা আমাকে ব্রহ্মচারী বলিয়া অভিহিত করিত, এবং আমি যে বিংশ শতাব্দীর অযোগ্য নাগরিক, এ কথা বেশ উচ্চকণ্ঠেই ঘোষণা করিত। আমার বয়স এখন ছাব্বিশ বৎসর। তথাপি আরও অল্প বয়সে আমি এমন অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছি—যাহা কোন পাঠকই 'লেখকের' বয়সের কথা শুনিলে আমার লেখা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু কোন কালেই আমার গল্প লিখিবার অভ্যাস নাই; তাহা পারিও না। তবে গল্প মধ্যে মধ্যে পড়ি বটে। এখন আমার গল্প পড়িবার যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে; কারণ, আমার সহধর্ম্মিণী সাহিত্যিক বলিয়া তাঁহার কৃপায় আমার গৃহে বহু পত্রিকার আবির্ভাব হয়।

সে দিন রবিবার। আমার স্ত্রী তাঁহার সদ্যরচিত একটি গল্প আমায় পড়িতে দিলেন। সেই গল্পটি এই,—

"আমার পিতা-মাতা জানিয়া-শুনিয়া ও ভাবিয়া-চিন্তিয়া এক জন ঘোর নারীবিদ্বেষ্টার সহিত আমার বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর ফুলশয্যার মধুময় নিশীথে অন্তরের অনাবিল পুলকোচ্ছ্বাসে দিশাহারা হইয়া, আমি ব্রীড়াবনতবদনে জীবনে প্রথম স্বামি-সম্ভাষণের জন্য শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতেই তিনি তাঁহার অধিকৃত আসনের অদূরে সংরক্ষিত একখানি স্বতন্ত্র আসনে আমাকে উপবেশনের জন্য আদেশ করিয়া ধীর-শান্ত কণ্ঠে কহিলেন, 'তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে। তুমি বোধ হয় শুনে থাকবে, শুধু মায়ের কাজ-কর্ম্মে সাহায্যের জন্যই আমি তোমায় বিয়ে করেছি; নইলে নারী-জাতির প্রতি আমার একবিন্দুও শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি নেই। নাটক-নভেলে লেখা ঐ যে স্বামি-স্ত্রীর ছিচ্‌কাঁদুনে ভালবাসা, প্রেম-ট্রেম—ও-সব তুমি আমার কাছে প্রত্যাশা করো না; করলে বড়ই নিরাশ হবে। আমার কাছে ঐ কাব্যি কোন দিনই পাবে না; আর আমি ও-সব অভিনয়ও করতে পারব না।'

"বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রী-বিদ্বেষের অনেক কাহিনীই শুনিয়া মনে মনে হাসিয়াছিলাম; কিন্তু সেই সকল কাহিনী যে কোন দিন কঠোর সত্যে পরিণত হইতে পারে, তাহা তখন কল্পনাও করিতে পারি নাই। আজ রজনীর প্রগাঢ়তার মধ্যে উন্মেষিত-যৌবনা নববধূর অপরিমিত প্রেমোচ্ছ্বাস, সুখ-স্বপ্ন, নববিবাহিত স্বামীর এই কঠোর বাক্যবাণে চূর্ণ হইয়া গেল। আমার ন্যায়

আর কোনো নববধূকে প্রথম মিলন-রজনীতে স্বামীর নিকট এইরূপ নিদারুণ সম্ভাষণ শুনিতে হইয়াছে কি না—তাহা আমার জানা ছিল না। আমার সদ্যোজাগ্রত, প্রেমারুণ-কিরণ-সম্পাতে উৎফুল্ল তরুণ-হৃদয়ে একটি অজ্ঞাত বেদনার সুগভীর বিদারণ-রেখা অঙ্কিত হইয়া গেল। আমি নির্ব্বাক্ হইয়া অধোবদনে বসিয়া রহিলাম।

"অল্পকাল পরে তিনি আমার মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'চুপ করে বসে রইলে কেন? রাত অনেক হ'য়েছে; যাও, শুয়ে পড়গে। আমিও এখন শুয়ে পড়বো।'

"হায়, কি নিদারুণ আমার ভাগ্য! ফুলশয্যার রাত্রিতে এই কি স্বামীর প্রথম সম্ভাষণ? কিন্তু এখন কি করিব? এই মধুময় মিলন-নিশায় কোথায় আমায় শয়ন করিতে হইবে, তাহা বুঝিতে না পারায় আমি স্তব্ধভাবে জড়ের মত বসিয়া রহিলাম। আমি নববধূ হইলেও তখন বালিকা নহি। এ বয়সে অনেক উপন্যাসের রস উপভোগ করিতে পারিয়াছিলাম।

"জীবনে মোহময় সরস বসন্তে প্রথম প্রণয়-অভিসারে প্রিয়তম স্বামী কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় আমার প্রীতি-প্রফুল্ল মুগ্ধ হৃদয়টি ফিরিয়া যাইবার জন্য এই বজ্র-কঠোর আদেশে লজ্জায় সঙ্কোচে ম্রিয়মাণ ও হতাশ হইয়া উঠিতেছিল। মুখ-ফুটিয়া তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস হইতেছিল না। আমার নববধূ-সুলভ সঙ্কোচের বোঝা তাঁহার হতাদরে আরও পুঞ্জীভূত ও দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল; সুতরাং আমি উঠিতেও পারিলাম না, কথা বলিতেও পারিলাম না। অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া বসিয়া রহিলাম। আমার ব্যাকুল মনের দ্বিধা—সংশয়টুকু তাঁহার নিকট প্রকাশ হইল কি না, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

"'মাকে জিজ্ঞাসা করে আসি, তিনি কোথায় তোমার শোবার ব্যবস্থা করেছেন।'—বলিয়া তিনি হঠাৎ উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। সমগ্র গৃহে তখন নিঝুম নীরবতা বিরাজিত। মেঘবিরহিত নির্ম্মল আকাশ রজত-শুভ্র শারদ-কৌমুদী-সম্পাতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। নিবিড়পত্র তরুশাখায়, তৃণদলসমাচ্ছন্ন শ্যামায়মান প্রান্তর-বক্ষে খদ্যোৎপুঞ্জ ক্ষণে ক্ষণে জ্বলিয়া উঠিতেছে, আবার নিবিয়া যাইতেছে। তাহারই আশে-পাশে ঝিল্লীদল ঐক্যতান ধ্বনিতে শান্ত-মৌন রজনী মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। ধীরে—অতি ধীরে প্রবাহিত মৃদুমধুর নৈশ সমীরণ তরুপল্লব ও ব্রততীর শাখা-পত্র আন্দোলিত করিয়া অস্ফুট মর্ম্মর-ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিতেছে। সেই অসীম নীরবতার মধ্যে আমার হৃদয়দেবতার প্রত্যাগমনের আশায় কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া-থাকিয়া আমি খাটের উপর তাঁহারই জন্য প্রসারিত সুকোমল শুভ্র শয্যায় নিদ্রালস নেত্রে শয়ন করিলাম।

২

"তখনও তরুণ উষার সমাগমে পূর্ব্বাকাশে হিরণ্ময় আভার বিকাশ হয় নাই, আকাশের পূর্ব্বপ্রান্তে তাহার রাঙ্গা শাড়ীর অঞ্চলের ঈষৎ আভাসমাত্র লক্ষিত হইতেছে; গৃহমধ্যস্থ উজ্জ্বল দীপশিখা কিঞ্চিৎ নিষ্প্রভ হইয়া আসন্ন উষার মৃদু সমীরণ-স্পর্শে ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে। সেই প্রদীপের দিকে মুখ-ফিরাইয়া মাদুরের উপর তিনি শয়ন করিয়া আছেন। উষার সুলোহিত আলোকচ্ছটা ও নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের ম্লান রশ্মি তাঁহার মুদিত নেত্রে প্রতিফলিত হওয়ায় এক অপরূপ সৌন্দর্য্যের বিকাশ করিয়াছে। আমার মুগ্ধ নয়নযুগল তাঁহার হাস্যমধুর প্রশান্ত মুখমণ্ডলে নিবদ্ধ হইয়া রহিল। হিন্দু-কুলবধূর সুপবিত্র কোমল হৃদয়ে স্বামিপ্রেম স্বতঃই অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। তাহা বিধিদত্ত ধন। তাহা বিবাহ-রজনীর প্রথম শুভদৃষ্টিপাতেই অন্তরের অন্তস্তলে বিকশিত হইয়া উঠে।—আমার সম্বন্ধেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। তিনি নারীদ্বেষী, ইহা জানিয়াও এবং তিনি আমার জীবন-কুসুম তাঁহার পূজার অর্ঘ্যস্বরূপ গ্রহণ করিবেন কি না, তাহা জানিতে না পারিলেও, তাঁহাকে আমার একমাত্র আপনার ভাবিয়া বিবাহের চন্দ্রালোক-পুলকিত মধুর সন্ধ্যায় আমার মন-প্রাণ সর্ব্বস্ব তাঁহার চরণে অর্পণ করিয়াছিলাম। সেই দিন এক নিমেষেই তাঁহার দেবোপম মূর্ত্তি আমার হৃদয়-ফলকে পাষাণে রেখাবৎ অঙ্কিত হইয়াছিল—জীবনে ত তাহা মুছিবার নহে।

"আমি উঠিয়া-বসিয়া নির্নিমেষ নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। আরও কতক্ষণ যে জগৎ ভুলিয়া, আপনা ভুলিয়া, আমার নিদ্রিত দয়িতের চিরবাঞ্ছিত মুখের দিকে তৃষ্ণাতুর নয়নে চাহিয়া থাকিতাম, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু আমার দর্শনসুখে বাধা পড়িল। তিনি নিমীলিত নয়নযুগল উন্মীলিত করিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। 'মাকে তোমার কাছে শোবার জন্যে ডাকতে গিয়ে দেখি, মা ঘুমিয়ে পড়েছেন। ফিরে এসে দেখি—তুমিও ওখানে শুয়ে ঘুমিয়েছ। বোধ হয় শুনেছ, আমি কালই বাড়ী থেকে চলে যাব। তুমি মায়ের খুব অনুগত হয়ে থাকবে; মা তোমার ব্যবহারে সুখী হলে আমারও আনন্দ হবে। আমার মায়ের কাজে লাগবে বলেই ত তোমায় আনা; নইলে তোমাকে আমার কোনই দরকার ছিল না।'

"এক রাত্রির ভিতর দুই বার শুনিলাম, আমাকে তাঁহার দরকার নাই! শুধু মায়ের দরকারের জন্যই আমাকে আনা হইয়াছে শুনিয়া আমার মন প্রসন্ন ত হইলই না, অধিকন্তু বিষাদের অশ্রুভারে আমার চক্ষু দু'টি ভরিয়া উঠিল। আমি

বুঝিলাম, প্রভাতেই তিনি প্রবাস-যাত্রা করিবেন। তাঁহার সহিত আবার কত কাল পরে আমার দেখা হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? তাই মনের সমস্ত দ্বিধা-সঙ্কোচ, পরিত্যাগ করিয়া বলিলাম, 'মাকে সুখী করলেই যদি তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হও, তাহলে আমি প্রাণপণে তাঁকে সুখী করবারই চেষ্টা করব।'

"আমার কথায় তাঁহার মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, 'এইবার আমি নিশ্চিন্ত হয়ে কাজকর্ম্ম করতে পারব। মাকে দেখা-শুনা করবার কেউ নেই বলে অনেক সময় আমার বড় চিন্তা হ'ত। তুমি মার কাছে থেকে মার মত হতে চেষ্টা করবে। এক আমার মা ছাড়া সমস্ত স্ত্রীজাতিটাই বড় স্বার্থপর, বড়ই ইতর, - তাই তারা আমার চক্ষুর বিষ।'

"স্ত্রীজাতি কি কারণে তাঁহার চক্ষুর বিষ হইল, তাহা শুনিবার জন্য আমার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল; কিন্তু এই কৌতূহল বাধ্য হইয়াই আমাকে দমন করিতে হইল।

৩

"মায়ের ব্যাকুল আগ্রহেও সে-দিন তিনি কর্ম্মস্থলে যাওয়া কিছুতেই বন্ধ করিলেন না। মায়ের অনুযোগ অভিযোগ শুনিয়া উত্তর দিলেন, 'বাড়ীতে একা থাকতে হয় বলে তুমি সব সময় কত কাঁদতে, সেই দুঃখেই তো বিয়ে করলাম; আর তুমি আমায় বাড়ী আসতে বোলো না মা! তুমি বেশী উড়োতাড়া করলে আমি সত্যিই বেলুড়-মঠে চলে যাব, সেখানে ত্যাগী সন্ন্যাসীদের দলে যোগ দেব।'

"মা অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলিলেন, 'কথায় কথায় তুই বাবা বেলুড়মঠে গিয়ে সন্ন্যাসী হতে চাস্! কিন্তু এখন একটি পরের মেয়ের সুখ-দুঃখ তোর হাতে এসে পড়েছে; তার সব ভাবনাও তো তোকে ভাব্‌তে হবে।'

"'তার ভাবনা ভাবতে আমার তো ভারী দায় পড়ে গেছে! গয়না দিও, ভাল ভাল শাড়ী-জামা দিও, টাকাকড়িও দিও, তা হলেই পরের মেয়ে তোমার ঘরে সুখী হবে।'—বলিয়া তিনি মঠের একখানি ভক্তি-গ্রন্থ লইয়া পড়িতে বসিলেন। মা অগত্যা বিনা-বাক্যব্যয়ে পুত্রের প্রবাস-যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

"সেই দিন অপরাহ্ণেই তিনি মাকে প্রণাম করিয়া, আমার হাত হইতে পাণের খিলি গ্রহণ করিয়া, কেবল মার জন্যই যে আমাকে আনা হইয়াছে—সে কথাটা আবার আমাকে স্মরণ করাইয়া সুদূর প্রবাসের কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেলেন। আমার তরুণ-জীবনের প্রারম্ভে মুকুলিত আশালতা সহসা যেন শুকাইয়া গেল! প্রাণের সকল মাধুর্য্য, সকল সঙ্গীত যেন শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। এই স্বামী,—ইঁহাকে লইয়া কি প্রকারে আমার উপেক্ষিত দীর্ঘজীবন অতিবাহিত হইবে? ইঁহার সম্বন্ধে কোন অভিযোগেরও উপলক্ষ নাই; কারণ, ইনি তো অন্য কোথাও হৃদয় বাঁধা রাখিয়া আমাকে উপেক্ষা করিতেছেন না। অন্তর আমার গভীর বেদনায় টন্‌-টন্ করিতে লাগিল। বাহিরে সন্ধ্যার স্নিগ্ধতা ধীরে ধীরে প্রসারিত হইতেছিল! কুলায়-প্রত্যাবৃত্ত বিহঙ্গ-কুলের সুমিষ্ট কলকাকলীর সহিত শেফালী-কুঞ্জের পল্লব-মর্ম্মরে অন্ধকারাচ্ছন্ন পল্লী মুখরিত হইয়া উঠিল। আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া আমাকে একাকী চিন্তাম্লান দেখিয়া স্নেহবিগলিত কণ্ঠে বলিলেন, 'এখানে তুমি চুপ করে বসে রয়েছ কেন মা! অজিতের ব্যবহারে তোমার মন খারাপ হ'য়েছে বুঝি? ছিঃ মা! আমার কাছে লজ্জা করো না, আমিও যে তোমার মা। অজিতের সব কথাই তোমার শোনা উচিত। ওর প্রপিতামহ, পিতামহ—সকলেই কৌলিন্যের দোহাই দিয়ে নারীর প্রতি একটু বেশী মাত্রায় তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেছিলেন। তোমার শ্বশুর অবিশ্যি তা করবার সুযোগ পাননি; চব্বিশ বছর মাত্র বয়সেই তাঁকে পৃথিবী ত্যাগ করতে হয়েছিল।' —মৃত স্বামীর প্রসঙ্গে মায়ের প্রসন্ন মুখখানি মলিন হইয়া গেল। একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া মা বলিলেন, 'অনাদৃতা, উপেক্ষিতা একাধিক নারীর মর্ম্মোচ্ছ্বাসে আমার শ্বশুরকুলের একমাত্র বংশধর অজিত এ মতি পেয়েছে মা! কিন্তু এ মতি ওর চিরদিন থাকবে না। সংসার-ভোলা আমার কোমলমতি শিবের এ ধ্যান ভঙ্গ হবেই এক দিন। তুমি মা সেই সুদিনের প্রতীক্ষায় থাকবে! এখনকার সকল অনাদর অবহেলা তোমাকে মাথা পেতে নিতে হবে মা!'

"মায়ের সরল স্নেহভরা কথাগুলিতে আমার হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া বলিতে সাধ হইল, 'তুমি সেই আশীর্ব্বাদই কর জননি! তোমার আশীর্ব্বাদে ভবিষ্যৎ সুখের আশায় বর্ত্তমানের সকল দীনতা, সমস্ত বেদনা আমি যেন হাসিমুখে বরণ করতে পারি।'—কিন্তু মুখে কিছুই প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

"আমি নবীন আশায় হৃদয় বাঁধিয়া মায়ের সেবা-যত্ন করিবার জন্য আমার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়োজিত করিলাম। মাকে সুখী করিতে পারিলেই তিনি সুখী হইবেন, ইহাই যে আমার মূলমন্ত্র। মা কিন্তু আমার সেবা, যত্ন, শ্রদ্ধা, ভক্তি লাভ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার অতুল্য স্নেহবাৎসল্যের স্রোত আমারই অভিমুখে প্রবাহিত করিয়া দিলেন। মায়ের ব্যবহারে দুই দিনেই বুঝিতে পারিলাম, নারীদ্বেষী পুত্রের ভাবপ্রবণ হৃদয়টি কেন এ মহিমময়ী রমণীর চরণতলে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দিতে সর্ব্বদাই উন্মুখ?

৪

"তিনটি মাস পর পর কাটিয়া গিয়াছে। মাত্র দুইটি দিনের জন্য তিনি আজ বাড়ী আসিয়াছেন। অন্তরাল

হইতে তাঁহাকে দেখিয়া আমার হৃদয়, মন পুলকোচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। আমার হৃদয়-উদ্যানের অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত কুসুমগুলি তাঁহারই চরণতলে প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি দিতে উতলা হইয়া উঠিয়াছে। আজও সেই অতীত দিনের মত নীরব নিভৃত নিশীথে, আশা-নিরাশায় স্পন্দিত বক্ষে তাঁহার শয়ন-কক্ষের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইলাম। আমার পদশব্দে সচকিত হইয়া তিনি পুস্তক হইতে চক্ষু দুইটি তুলিয়া আমারই মুখের উপর রাখিয়া বলিলেন, 'দাঁড়িয়ে রৈলে কেন ? ভিতরে এস।'

"তাঁহার সেই সংক্ষিপ্ত 'দাঁড়িয়ে রৈলে কেন ? ভিতরে এস।'—কথাটিতে আমার মনোবীণায় দিব্য সঙ্গীত ধ্বনিত হইল। আমার পিপাসিত হৃদয় অমৃতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। আমার সমস্ত চিন্তা, কল্পনা এক মুহূর্ত্তে নূতন শাখা-প্রশাখা প্রসারিত করিয়া পুষ্পিতা লতার ন্যায় তাঁহার হৃদয়ের সহিত আমার হৃদয় যেন বিজড়িত করিয়া ফেলিল। আমি স্বপ্নবিভোরা মুগ্ধার ন্যায় তাঁহার পদতলে প্রীতিপ্রফুল্ল হৃদয়ে বসিয়া পড়িলাম। তিনি শান্ত-কোমল কণ্ঠে অপার করুণা ঢালিয়া বলিলেন, 'মাকে তুমি সুখী করেছ, মা বল্লেন। এ কথা শুনে আমিও বড় সুখী হলেম। বল, তুমি আমার কাছে কি চাও ?' আমার ভয় হইতেছিল, তাঁহার কথায় সুখাবেশে আমি বুঝি মূর্চ্ছিত হইব! আনন্দে আমার হৃদয়ের রক্তস্রোত যেন জমাট বাঁধিবার উপক্রম হইতেছিল। ভগবান্ আমার অদৃষ্টে এত সুখ যে, এত শীঘ্র—এত সহজে প্রদান করিবেন, তাহা আমার কল্পনার অতীত ছিল, —ধারণার বহির্ভূত ছিল। কিন্তু এ-জগতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ কিছুতেই নাই—তাই আমার স্বপ্নরাজ্যের অনির্ব্বচনীয় আনন্দোচ্ছ্বাস অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। আমাকে নীরব দেখিয়া তিনি হাসিমুখে বলিলেন, 'বল তুমি আমার কাছে কি চাও ? কোন্ গয়না পেলে তোমার সব চাইতে বেশী আনন্দ হবে ?'

"গহনার উল্লেখেই আমার মনের ভিতর হইতে সমস্ত উচ্ছলতা, ভাববিহ্বলতা কোথায় যেন উড়িয়া গেল! আমার অন্তর আর্দ্র সকরুণ স্বরে হাহাকার করিতে লাগিল। আমি কোনরূপে চক্ষের জল সংবরণ করিয়া বলিলাম, 'আমি তোমার কাছে গয়না চাই না ; গয়নায় আমার দরকার নেই। আমি তোমাকেই চাই, ওগো, তোমাকেই !'

"'আমাকে চাও—সর্ব্বনাশ ! অত কবিতা তো আমার মধ্যে নেই ! বল, কি গয়না চাও ? না, টাকা চাও ? না, ভাল কাপড় চাও ?'

"আমি তাঁহার শেষ কথা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। দুঃখের অনলে আমার মন দগ্ধ হইতেছিল ; প্রলয়ের মেঘ আমার হৃদয়-গগন সমাচ্ছন্ন করিতেছিল। 'তোমার কাছে আমি কিছুই চাই না গো ! তোমাকে কিছুই দিতে হবে না'—বলিয়া আমি সেই স্থান ত্যাগ করিয়া, একটি অন্ধকার-কক্ষে প্রবেশ করিয়া মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িলাম। পরদিন মাকে লুকাইয়া স্বামীর শয়ন-কক্ষের পরিবর্ত্তে সেই অন্ধকারময় শূন্য-কক্ষেই আমার সারারাত্রি অতিবাহিত হইল। প্রভাতেই আমার স্বামী কর্ম্মস্থলে প্রস্থান করিলেন। আমি ইচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার সহিত দেখা করিলাম না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, উনি সাধিয়া আমার সহিত কথা না কহিলে কথা কহিব না, দেখাও দিব না ; দেখি, আমাকে উঁহার দরকার হয় কি না।

"মানুষ ভাবে এক, ভগবান্ করেন অন্যরূপ ! যাহাকে দুঃখভোগ করিতে হইবে, তাহার অদৃষ্টে সুখ-শান্তি আসিবে কোথা হইতে ? মায়ের স্নেহাঞ্চলে বিমলানন্দে নিজের দৈন্য লুকাইয়া রাখিবার সৌভাগ্য আমার অদৃষ্টে বেশী দিন রহিল না। শরৎ-প্রারম্ভে মা হঠাৎ রোগশয্যায় শয়ন করিলেন। শরৎ অবসানে মা একমাত্র সন্তানের মায়াজাল ছিন্ন করিয়া, পদতলে লুণ্ঠিতা তাঁহার বড় আদরের পুত্রবধূর ক্রন্দনোচ্ছ্বাসের মধ্যে, কোন্ অজানিত রাজ্যে চিরদিনের জন্য প্রস্থান করিলেন।...

"মায়ের শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটাইয়া, ঘর-বাড়ীর ব্যবস্থা করিয়া স্বামী আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে, না বাপের বাড়ী যেতে চাও ?'

"বলিলাম, 'তোমার যা ইচ্ছা।'

"দুই দিন পর বুঝিলাম, আমাকে সঙ্গে লইয়া যাওয়াই তাঁহার ইচ্ছা।

৫

"স্বামী আমাকে তাঁহার কর্ম্মস্থলে আনিয়াছেন। আমরা সহরে আসিয়াছি। ছায়াশীতল, চিরনবীন প্রকৃতি-বেষ্টিত পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া, মানুষ কি এরূপ কোমলতা-বর্জ্জিত, ইষ্টকময়, স্নেহহীন সহরে বাস করিতে পারে? কেমন করিয়া যে পারে, আমি তাই শুধু ভাবি। এখানে শ্যামল বৃক্ষলতার পরিবর্ত্তে পথের দুই ধারে অগণিত সৌধমালা। কোথায় বা সেই সরিষাক্ষেতের কোমল সুমিষ্ট গন্ধ, কোথায় বা শিশিরসিক্ত শেফালী-বনে প্রভাত-সমীরণের মধুর হিল্লোল! এখানে কিছুই নাই গো, কিছুই নাই।

"কয়েক মাস ধরিয়া একত্র বাস করিবার ফলেও আমার স্বামীর বিদ্রোহী মন যে কিছুতেই আমার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে না, ইহা উপলব্ধি করিয়াই তাঁহার সমস্ত সেবার ভার নিজের হস্তে তুলিয়া লইয়াছি। তাঁহার হৃদয় না পাইলেও, সেবা করিবার সুখ হইতে নিজেকে বঞ্চিত রাখিব কেন? তিনি আমার প্রতি বিমুখ

হইলেও তিনি যে আমারই—আর কাহারও নহেন, এ কথা কি ভুলিবার?

"কার্য্যোপলক্ষে স্বামী স্থানান্তরে কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুর বাড়ী গিয়াছেন। এই বন্ধুরত্নটি আমার নিকট অপরিচিত নহেন। আমার বিবাহের পূর্ব্বে ইনি একবার আমাদের গ্রামের জমিদার-তনয়ার ছবি প্রস্তুত করিতে গিয়াছিলেন। চিত্রবিদ্যায় শ্রীযুত বীরেন্দ্রকুমার গুহ ইতিমধ্যেই খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। দ্বিপ্রহর বেলা। শূন্য গৃহে কিছুই আমার ভাল লাগিতেছিল না। আমি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁহার বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া, অন্যমনস্ক ভাবে তাঁহার কাগজপত্রের টেবিলটি গুছাইতে লাগিলাম। এখানে মন খারাপ হইলে কোন প্রতিবেশীর সহিত কথা বলিবার উপায় নাই। খিড়্কির ঘাটে রমণীদের আলোচনার বৈঠক নাই। কেবল কাযের মধ্যে ডুবিয়া নিজের দুঃখ-ব্যথা ভুলিয়া থাকিতে হয়।

"কাগজগুলি সাজাইয়া-গুছাইয়া রাখিতে গিয়া আমার হাত হইতে কতকগুলি কাগজ মেঝের উপর পড়িয়া গেল। সেগুলি তুলিয়া লইতেই তাহার ভিতর হইতে একখানি চিঠি বাহির হইয়া পড়িল। কৌতূহলের আতিশয্যে চিঠি পড়িয়া আমি চিন্তিত হইলাম। আমার বক্ষের মধ্যে কালবৈশাখীর প্রচণ্ড তুফান তুমুল বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। আমি কম্পিত-হৃদয়ে পত্রখানি পুনরায় পাঠ করিলাম। তাহাতে লেখা ছিল,—

'প্রিয় অজিত, বড় যে চুপচাপ! ব্যাপারখানা কি? চিত্রলেখাকে কি সত্যই ভুলিয়া গেলে? তোমার আগ্রহ ও ব্যাকুলতা দেখিয়া গৃহিণী ২রা আষাঢ় চিত্রলেখাকে তোমার হস্তে সম্প্রদান করিবার দিন-পর্য্যন্ত স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। তুমি ইহার মধ্যে অবশ্য অবশ্য একবার আসিও। চিত্রলেখাও তোমার আশাপথ চাহিয়া উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে! ২রা আষাঢ়ের শুভদিনের এখনও বিলম্ব আছে; এরূপ মাঝে একবার আসিয়া চিত্রলেখাকে দর্শন দিতেই হইবে। ওগো স্ত্রীবিদ্বেষি! আমি দিব্য নেত্রে তোমার 'পরাজয়' দেখিতে পাইতেছি। ধরা তো পড়িয়াছ, আর কেন মিথ্যা ভাণ করা? গৃহিণীর চিন্তা হইয়াছে, প্রতিমা চিত্রলেখার ন্যায় কি সতীন সহিতে পারিবে? আমি কিন্তু উত্তর দিতে ত্রুটি করি না; চিত্রলেখার ন্যায় সতীনও যদি প্রতিমা সহিতে না পারে তবে তার জীবনে শত ধিক্! থাক্, ওর বাজে কথা লিখিতে চাই না। ভালবাসা গ্রহণ করিও। ইতি।—তোমার বীরেন।'

"আমার হাত হইতে চিঠিখানা পড়িয়া গেল। আমি বজ্রাহতের ন্যায় সেইখানেই বসিয়া পড়িলাম। চিত্রলেখা যেই হউক না কেন, কিন্তু আমার স্বামী যে তাহারই নিকটে তাঁহার রুদ্ধ হৃদয়দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন—এটুকু বুঝিতে আমার আর বিলম্ব হইল না। লজ্জায়, ঘৃণায় আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল। এমন বিশ্বাসঘাতক, এমন হৃদয়হীন পাষাণ; ইহাকেই আমি ভালবাসিয়াছি! ইহার মুখের দিকে চাহিয়া আমি শত ব্যথা, অপমান বরণ করিয়া লইয়াছি! তিনি আমারই—বলিয়া যে স্পর্দ্ধা করিয়াছিলাম, তাহা আজ কোথায় রহিল? আমি সেইখানে লুটাইয়া পড়িয়া ভগবানের উদ্দেশে নিদারুণ মর্ম্মোচ্ছ্বাস নিবেদন করিতে লাগিলাম।

৬

"স্বামী ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার নিকট চিত্রলেখার সব কথাই শুনিয়া লইয়াছি। চিত্রলেখা বীরেন বাবুর স্ত্রীর অনূঢ়া ভগিনী। তাহার অনিন্দনীয় রূপের প্রভাবে আমার নারীবিদ্বেষী স্বামীর কঠোর হৃদয় বিগলিত হইয়া প্রেম-পারাবারের সৃষ্টি করিয়াছে। গুণেও না কি চিত্রলেখা অতুলনীয়া। স্বামী তাহাকেই বিবাহ করিবেন স্থির করিয়াছেন। তাহাকে না পাইলে উঁহার কোন প্রকারেই চলিবে না। হায় চিত্রলেখা, আমি তোমার শতাংশের একাংশ হইলেও আমার জীবন সার্থক হইত।

"জ্যৈষ্ঠের শেষ। এক দিন অপরাহ্ণে নিজের নিভৃত কক্ষে বসিয়া বিষাদের অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতেছিলাম।

"'প্রতিমা!'

"স্বামীর মুখে জীবনে এই প্রথম 'প্রতিমা' সম্ভাষণ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। আমি নিজের চিন্তায় তখন এতই বিভোর যে, তাঁহার সেখানে আগমনও বুঝিতে পারি নাই। হয় তো বহুক্ষণ পূর্ব্বেই তিনি সেখানে আসিয়াছেন এবং আমার অশ্রুবর্ষণও দেখিয়াছেন ভাবিয়া লজ্জায় আমি অধোমুখ হইলাম।

"স্বামী আমার পাশে উপবেশন করিয়া প্রেমার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন, 'প্রতিমা, যদি এত কষ্টই পাও, তা'হলে চিত্রলেখাকে বিয়ে করে আমি সুখী হতে চাইনে। তোমার মনে কষ্ট দিতে পারব না।'

আজ আমার স্বামীর মুখের প্রেমপূর্ণ কথাগুলি তীক্ষ্ণাগ্র তীরের ন্যায় আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। চিত্রলেখাকে ভালবাসিয়াই স্বামীর কণ্ঠস্বর পর্য্যন্ত কোমল হইয়াছে! পূর্ব্বে তাঁহার কণ্ঠস্বরে তো এরূপ প্রীতি-প্রফুল্লতা প্রকাশ হইত না; আর এখন তাঁহার কণ্ঠস্বরে, চক্ষুর স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে হৃদয়নিহিত প্রেম যেন উছলিয়া উঠিতেছে! কিন্তু ইহা তো আমার জন্য নহে; এ সেই সৌভাগ্যবতী চিত্রলেখার প্রতি অসীম অজস্র প্রণয়-নিবেদনের ক্ষীণ মূর্চ্ছনা মাত্র।

"আমি হৃদয়ের উদ্দীপ্ত ভাবরাশি সংযত করিয়া বলিলাম, 'চিত্রলেখার বিরহে তোমায় শুকিয়ে যেতে হবে না; তুমি তাকে বিয়ে কর। আমরা হিন্দুর মেয়ে, স্বামীর সুখেই আমাদের সুখ। আমাদের স্বতন্ত্র সুখ কিছুই নেই।'

"তিনি গভীর স্নেহে আমার কম্পিত হাতখানি হাতের মধ্যে রাখিয়া আমাকে বলিলেন, 'প্রতিমা, আমার সুখেই তোমার সুখ, এমন কথাও তোমরা বলতে পার! এত

দিন তোমাদের বড় ঘৃণা করেছি, বড়ই অবজ্ঞা করেছি; এবার তার প্রতিশোধ দিতে চাই। কিন্তু ২রা আষাঢ়ের তো আর বেশী দেরী নেই; এখনও তুমি ভেবে ছাখো।'

৭

"আষাঢ় মাস। রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, কিন্তু এখনও বর্ষণ-ক্লান্ত মেঘের অন্তরাল হইতে প্রভাতের মধুর রৌদ্র পরিস্ফুট হয় নাই। নিশাশেষের তরল অন্ধকারের যবনিকা বর্ষাম্লান প্রকৃতির বক্ষে এখনও সম্প্রসারিত। দুই-একটি বিহঙ্গ কলকণ্ঠে নবাগত উষার আবাহন-রাগিণী গাহিতেছে। গৃহস্থ-ভবনের প্রাঙ্গণে বেল, যূঁথিকার কোরকগুলি লজ্জাবতী বধূর ন্যায় শ্যামল পত্রান্তরাল হইতে ধীরে ধীরে মুখকান্তি বিকাশ করিতেছে। সেই পরিপূর্ণ স্নিগ্ধ শান্তির মধ্যে স্বামী আমার শয়ন-কক্ষের দ্বার ঠেলিয়া ডাকিয়া বলিলেন, 'প্রতিমা, আমি এসেছি, দোর খুলে দাও।'

"তিনি চিত্রলেখাকে বিবাহ করিতে গিয়াছিলেন; আজ তাঁহার ফিরিবার কথা—তাহা পূর্ব্বেই জানিতাম। তবুও স্বামীর আগমন-সংবাদে আমার বুক দুরু-দুরু করিতে লাগিল; কণ্ঠ-তালু শুষ্ক হইয়া আসিয়াছিল। রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া চিত্রলেখাকে সম্মুখে দেখিয়া আমি কেমন করিয়া তাহাকে সম্ভাষণ করিব? এই চিন্তায় আমার হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিল। তাঁহার পুনঃ পুনঃ আহ্বানে শঙ্কাবিহ্বল হৃদয়ে আমি রুদ্ধ দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া ঘরের এক কোণে সরিয়া দাঁড়াইলাম। তাঁহার দিকে মাথা তুলিয়া চাহিতেও আমার সাহস হইল না। তিনি আমার দিকে অগ্রসর হইয়া হাসিমাখা মুখে বলিলেন, 'চিত্রলেখা এসেছে। তাকে দেখবে চল প্রতিমা! আমার বসবার ঘরে তাকে রেখে এসেছি।'

"বক্ষ সবেগে স্পন্দিত হইলেও, আমি সহজ স্বরেই বলিলাম, 'চল, তাকে দেখিগে, তার অপরাধ কি?'

"'তার অপরাধ—আমি জীবনে প্রথম তোমাকে উপেক্ষা করে তাকে ভালবেসেছি।'—বলিয়া সাদরে, সস্নেহে তিনি আমার বাহু ধারণ করিয়া, তাঁহার বসিবার ঘরে আমাকে লইয়া চলিলেন। সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া আমি বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে দেখিলাম, সজীব চিত্র-লেখার পরিবর্ত্তে একটি অনিন্দনীয় কিশোরীর নিখুঁত তৈলচিত্র দেয়ালের গায়ে রক্ষিত হইয়াছে। আলেখ্য এতই সুন্দর যে, সজীব মূর্ত্তি বলিয়া ভ্রম হয়। একখানি সুনীল বসনে তরুণীর সুকুমার তনু আবৃত। ভ্রমর-কৃষ্ণ আলুলায়িত কেশদাম গুচ্ছে গুচ্ছে বক্ষস্থল ও বদনমণ্ডলের কিয়দংশ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। একটি কুসুমিত পুষ্পতরুর নিকটে দাঁড়াইয়া পুষ্পচয়নে উদ্যতা তরুণী তাহার বঙ্কিম গ্রীবা ঈষৎ হেলাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। তাহার মাথার উপর প্রভাতের নির্ম্মল আকাশে প্রথম অরুণোদয়ের সুবর্ণ-রেখা শাখাপত্রনিবদ্ধ তরুশ্রেণীর ব্যবধান-পথে ফুটিয়া উঠিয়াছে। চিত্রকরের অদ্ভুত কলা-নৈপুণ্যে আমার হৃদয় মুগ্ধ হইল। স্বামী উভয় হস্তে আমার নত মুখখানি তুলিয়া-ধরিয়া গাঢ় স্বরে বলিলেন, 'চিত্রলেখাকে চিন্‌তে পেরেছ, প্রতিমা?'

"আমি ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, 'না।'

"'এ যে তোমারই ছবি! তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা ঠিক হবার পর, বীরেন তোমাদের গাঁয়ে গিয়েছিল, সেই সময় কোন সুযোগে গোপনে তোমার এ ছবি তুলে নিয়েছিল। তা থেকে বড় যত্নে, কঠোর পরিশ্রমে এখানা সে এঁকেছে। ছবি শেষ করে, তোমার গালে একটি তিল আছে শুনে, সেই তিলটা ঠিক কোন্ জায়গায় আছে, তাই দেখিয়ে দেবার জন্যই সে আমায় ডেকেছিল।'

"তাঁহার সকৌতুক হাসিতে কক্ষখানি মুখরিত হইয়া উঠিল। হঠাৎ বহু দিনের বিস্মৃতপ্রায় একটি কথার আভাস আমার হৃদয়কোণে জাগিয়া উঠিল। বিবাহের অল্প দিন পূর্ব্বে এক দিন স্নানান্তে সখীদের সঙ্গে নদীর ধারে শিবপূজার জন্য ফুল তুলিতে গিয়াছিলাম। আমার বিবাহের কথা লইয়া সখীরা আমায় উপহাস করিতেছিল। তাহাদের পরিহাসে লজ্জায় দৌড়িয়া পলাইতে গিয়া বাগানের অল্প দূরে "ক্যামেরা"-ধারী বীরেন বাবুকে দেখিয়াছিলাম। তখন কে জানিত, তিনিই এই গল্পের সৃষ্টি করিবেন? পুলকোচ্ছ্বাসে প্রাণ আমার অধীর হইয়া উঠিল। আমি বলিলাম, 'বীরেন বাবুর স্ত্রী সম্প্রদানের কথা কি বলেছিলেন?'

"'হ্যাঁ, আমাদের বিয়ের সময় বীরেন সস্ত্রীক আনন্দোৎসবে যোগ দিতে পারেনি বলেই, ২রা আষাঢ় ছবিখানা আমাকে উপহার দেওয়ার উপলক্ষে তারা উৎসবের আয়োজন পুরোপুরিই করেছিল। প্রতিমা, তুমিই আমায় পরাজয় করেছ।'"

শ্রীদেবব্রত গুহ।
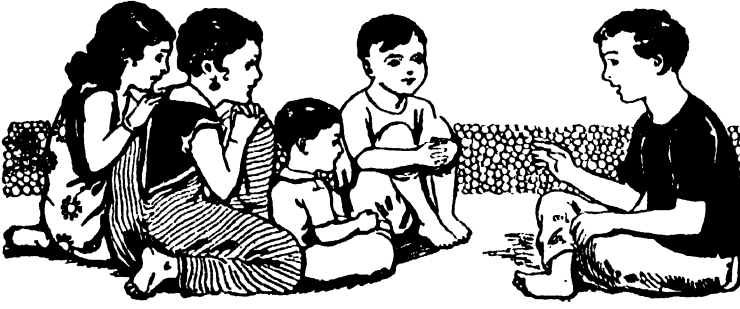
গল্পের প্লট

বড় বড় লেখকদের লেখা যে-সব গল্প-উপন্যাস পড়ে আমরা মুগ্ধ হই, সে সব বই পড়ে অনেক সময় সবিস্ময়ে আমরা ভাবি, কি করে ওঁরা এ-সব বিচিত্র ঘটনা নিয়ে কল্পনায় এমন সুন্দর গল্প গড়ে তোলেন! আমরাও তো চোখের সামনে নিত্য কত ঘটনা দেখি, সত্যকার কত কাহিনী কাণে শুনি, কিন্তু সে সব ঘটনা নিয়ে আমরা পারি না তো চারিদিকে সামঞ্জস্য আর সঙ্গতি বজায় রেখে অমনভাবে গল্প রচনা করতে! রবীন্দ্রনাথের "কাবলীওয়ালা" গল্প পড়ে অনেক সময় মনে হয়েছে, পথে আমরাও তো কাবলীওয়ালা দেখি, কিন্তু ও-কাবলীওয়ালাকে নিয়ে গল্প কি রচনা করবো, ভেবে তার কোনো হদিশ পাই না!

রবীন্দ্রনাথের আর-একটি গল্প মনে পড়ছে। পাশাপাশি দু'টি পরিবারের বাস। দু' পরিবারে দু'টি সমবয়সী ছেলে। দু'জনে খুব ভাব। এক জন আর-এক জনকে না দেখলে থাকতে পারে না! শেষে এক দিন কি-একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে দু' পরিবারে কর্ত্তায়-কর্ত্তায় বিরোধ-মকর্দ্দমা বাধলো। ছেলেদের উপর হুকুম হলো—খবর্দ্দার, ও-বাড়ীর সঙ্গে আর মেলামেশা করবে না!

সে গল্পটির নাম এখন মনে নেই—কাজেই ছেলেদু'টির নামও মনে পড়ছে না! তবে মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, অভিভাবকদের শাসনে দু' পরিবারের ছেলে দু'টির মনে অশান্তির সীমা ছিল না! একটি ছেলে খেলা ধূলো ছেড়ে দিলে; স্কুল থেকে বাড়ী ফিরে ছাদে এসে উঠতো—পাশের বাড়ীর ছাদের দিকে, জানলার দিকে চেয়ে থাকতো, বন্ধুকে একটিবার যদি চোখে দেখতে পায়! প্রত্যহ নৈরাশ্য সার হতো, বন্ধুর দেখা পেতো না! এক দিন দেখে, বন্ধু ও-বাড়ীর জানলার সামনে দাঁড়িয়ে আছে! দেখে এ-বাড়ীর ছেলেটি ছাদে ছুটলো—ছাদে গিয়ে যেমন বন্ধুর পানে চাইলো, বন্ধু অমনি জানলা বন্ধ করে দিয়ে সরে গেল! তখন এ-বাড়ীর ছেলের মন দুঃখে ভরে দু'চোখ সজল হয়ে উঠলো! অভিভাবকদের বিরোধ-হেতু ছেলে দু'টির সরল মনের দুঃখ-বেদনা—রবীন্দ্রনাথ এমন জীবন্ত করে এঁকে গেছেন যে, যত বার ও-গল্পটি পড়বে, বেদনায় ভরে মন ভারী হয়ে উঠবে!

এ-গল্পটি পড়ে অনেক বার মনে হয়েছে, সংসারে এমন তো ঘটে। আমাদের অনেকের জীবনে ঠিক এমনটি না ঘটুক, পারিবারিক বিবাদ-বিসম্বাদে বাপ-কাকা এক-সংসার ছেড়ে বাড়ীর উঠানে পাঁচিল তুলে পৃথক হয়ে গেছেন—বিরোধের অভিশাপ-অনলে কত ছেলের মন নিরাশায় দগ্ধ হয়েছে! নিজেদের প্রত্যক্ষ-করা এমন শোচনীয় ঘটনা—তবু সে ঘটনা থেকে ক'জন এমন গল্প লিখতে পারে—যে-গল্প একটি বিশেষ পরিবারের ইতিহাসে গণ্ডীবদ্ধ না থেকে সকলের মনে করুণ রেশ জাগিয়ে তুলবে?

লেখার এই শক্তি বা প্রতিভা সকলের থাকে না। সংসার বা বিশ্ব-চরাচরকে দেখবার শক্তি এবং সে-দেখাকে লেখায় ফুটিয়ে তোলা শক্তি-সাপেক্ষ, স্বীকার করি। তবু এ-কথাও অস্বীকার করা চলে না যে, দেখার শক্তি এবং দেখে তা লেখার শক্তি—সে শক্তিকে অনুশীলনে তৈরী বা বাড়িয়ে সবল করা যায় না। লেখার শক্তি কি করে আয়ত্ত হয়, সে সম্বন্ধে আর এক দিন আলোচনা করবো। আজ শুধু বলতে চাই, বড় বড় লেখকরা তাঁদের গল্প-উপন্যাসের উপকরণ কোথা থেকে সংগ্রহ করেন—প্রত্যক্ষ কি ঘটনা থেকে তাঁরা লেখার প্রেরণা পান!

আমাদের বাঙলা দেশের ৺তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মশায় একখানি উপন্যাস লিখে গেছেন—স্বর্ণলতা। এ বইয়ের গল্প হলো—শশিভূষণ আর বিধুভূষণ দুই ভাই। দুই ভাই এক সঙ্গে থাকেন। শশিভূষণ চাকরি করে' অনেক টাকা রোজগার করেন; ছোট ভাই বিধুভূষণ ভাইয়ের রোজগারের পয়সায় খান-দান-থাকেন! শশিভূষণের স্ত্রী প্রমদার সেটা অসহ্য ঠেকে! প্রমদা নানা কৌশলে ধমকে-চমকে স্বামীকে বুঝিয়ে বিধুভূষণকে পৃথক করে দিলে। তার পর প্রমদার এই হিংসা-দ্বেষের ফলে শশিভূষণের নানা বিপদ ঘটলো ইত্যাদি। শুনেছি, আমাদের এই বাঙলা দেশেরই কোন্ একান্নবর্ত্তী সংসার কি করে রোজগেরে কর্ত্তার স্ত্রীর প্ররোচনায় ভেঙ্গে তছনছ হয়ে গিয়েছিল, সেই পরিবারের কথাকে ভিত্তি করেই তারকনাথ এ উপন্যাসখানি লিখেছিলেন।

আমাদের দেশের পাঠক-পাঠিকারা সাধারণতঃ বড় লাজুক। ভালো গল্প-উপন্যাস পড়ে সে সব গল্প-উপন্যাসের লেখকের সঙ্গে মনে-মনে কোনো সংযোগ বা সম্পর্ক রাখার জন্য তাঁরা কৌতূহল প্রকাশ করেন না। গল্প-উপন্যাসের সঙ্গেই আমাদের পাঠক-পাঠিকার সব সম্পর্ক শেষ হয়—লেখকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবার জন্য তিলমাত্র ব্যগ্র হয় না।

বিলেতে কিন্তু এমন হয় না! সেখানে লেখক ও পাঠক—দু' পক্ষে মানসিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

কি করে, জানো? মাসিক-পত্রাদির মারফৎ পাঠকের দল প্রশ্ন পাঠায় লেখকদের কাছে—আপনার গল্পের প্লটের ভিত্তি কি থেকে গড়ে তুলেছেন? এ কাজে মাসিক-পত্রাদির সম্পাদকরাও সহযোগিতা করেন। এমনি প্রশ্নে বহু পত্রাদির সুলেখক পত্রিকাদির মারফৎ পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ করছেন! তারি দু'-চারটি পরিচয় আজ সঙ্কলিত করছি।

আর্ণল্ড বেনেট এক জন খ্যাতিমান্ কথা-শিল্পী এবং তাঁর Ol Wives' Tales একখানি বিখ্যাত উপন্যাস। এ উপন্যাসের প্লট তাঁর মাথায় কি করে উদয় হলো, সে সম্বন্ধে তিনি নিজে লিখছেন—১৯০৩ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে গিয়েছিলুম। ক্লিশি রেস্তঁরায় প্রত্যহ রাত্রে আমি গিয়ে ডিনার খেতুম। এক দিন রাত্রে এক বৃদ্ধা মহিলা এলেন সে হোটেলে ডিনার খেতে। মহিলাটি যেমন মোটা, দেখতে তেমনি কুৎসিত! গলার স্বর কর্কশ এবং তাঁর হাত-পায়ের ভঙ্গীও কদর্য্য! মহিলার সঙ্গে একরাশ পার্শেল। এক-ধারে একা তিনি খেতে বসলেন। ভাব দেখে বুঝলুম, মহিলাটি একা থাকেন! দুনিয়ার কাকেও সুনজরে দেখেন না! মুখে-চোখে দেখলুম বিরক্তির রেখা! তাঁকে দেখে আমার মনে হতে লাগলো, এক দিন যখন ওঁর বয়স ছিল কম, তখন হয়তো উনি সুশ্রী ছিলেন এবং আচার-ব্যবহারও হয়তো তখন ভালো ছিল! বুড়ীকে দেখে তাঁর অতীত সম্বন্ধে রঙীন কল্পনা আমার মনকে যেন মাতিয়ে তুললো! বার্দ্ধক্যের মস্ত ট্রাজেডির জীবন্ত ছবি ঐ স্থুলাঙ্গীকে দেখে আমার যা মনে হলো, তাই থেকেই আমি উপন্যাস লিখতে বসলুম!

"কুইনি" উপন্যাস লিখে এচ্, ভাশেল প্রচুর খ্যাতি লাভ করেছেন। এ উপন্যাসের কল্পনা কি করে মনে জাগলো, সে সম্বন্ধে ভাশেল লিখেছেন—সাউদাম্পটনের টমাস রোহানের দোকান থেকে প্রায় আমি রকমারি ফার্ণিচার এবং পোর্শিলেনের জিনিষপত্র কিনতুম। এক দিন গালার কাজ-করা চমৎকার একটি ক্যাবিনেট দেখিয়ে রোহান আমায় বললে,—এটি কিনুন। ক্যাবিনেটটির দাম খুব বেশী ছিল। অত পয়সা কোথায় পাবো? অথচ ক্যাবিনেটটি কেনবার জন্য মন একেবারে আকুল! কি করি? তখন একটি গল্প লিখলুম। তার নাম দিলুম গালার ক্যাবিনেট। গল্পটি লিখে তার দাম পেলুম ৭৫ পাউণ্ড। ক্যাবিনেটটির দামও রোহান্ বলেছিল ৭৫ পাউণ্ড। সেই ৭৫ পাউণ্ড দিয়ে ক্যাবিনেটটি কিনলুম! রোহান বললে,—একখানি নভেল লিখুন—তার নায়ককে করুন কিউরিয়ো-ওয়ালা! রোহানের কথায় তখন কুইনি লেখার কল্পনা জাগলো এবং কুইনি উপন্যাস লিখলুম।

আর-এক জন জনপ্রিয় কথা-শিল্পী জে,ডি, বেরেসফোর্ড। তাঁর A World of Women উপন্যাসের পরিকল্পনা সম্বন্ধে লিখেছেন—এক দিন আমার স্ত্রীর সঙ্গে পথে বেড়াতে বেরিয়েছি। এক জায়গায় মস্ত এক দোকানে 'শেল' (sale) হচ্ছে। আমার স্ত্রী বললেন, তুমি বাইরে একটু দাঁড়াও, আমি একবার দোকানে গিয়ে দেখি কম-দামে কোনো দরকারী ভালো জিনিষ পাই কি না! এই কথা বলে স্ত্রী ঢুকলেন দোকানের মধ্যে; আমি বাইরে দাঁড়িয়ে রইলুম। দোকানে বড় বড় কাঁচের দরজা। সে সব দরজা ছিল বন্ধ। কাঁচের মধ্য দিয়ে দেখছিলুম, ভিতরে মেয়েদের প্রকাণ্ড ভিড়। আগে কে কোন্ ভালো জিনিষ কিনবে, মেয়েদের মধ্যে সেজন্য একেবারে রেশারেশি চলেছে! ভালোটি যাঁর হাতছাড়া হচ্ছে, তাঁর চোখে ফুটছে বিরক্তি, প্রাণে হিংসা। যাঁরা কিনছেন, তাঁদের চোখে ফুটছে বিজয়-গৌরবের শিখা এবং নিরাশ ক্রেতাদের উপর অবজ্ঞা-বিদ্রূপ! এক-মনে আমি মেয়েদের মুখে-চোখে নির্ব্বাক্ ভঙ্গীতে এই বিচিত্র ভাবের লীলার উদয়াস্ত দেখতে লাগলুম। এক ঘণ্টা পরে আমার স্ত্রী ফিরে এলেন। অত্যন্ত কুণ্ঠিত স্বরে বললেন, বড় দেরী হয়ে গেছে। রাগ করেছো? হেসে আমি বললুম, না! কাঁচের মধ্য দিয়ে দেখছিলুম ভিতরে ঐ মেয়ে-রাজ্যে হিংসা-দ্বেষ-আনন্দের বিচিত্র রঙ্গ! দোকানে-দেখা মেয়েদের সেই ভাব-ভঙ্গীকে ভিত্তি করেই আমার A World of Women উপন্যাস লিখেছি।

আজ এই পর্য্যন্ত। বিলিতি পাঠক-পাঠিকার মতো অনেক-সময় আমাদের মনে হয়, আপত্তি না থাকলে আমাদের দেশের বড় বড় কথা-শিল্পীদের একবার প্রশ্ন করি, এত প্লট আপনাদের মাথায় কি করে জাগে?

বিশ্বে কেহ তুচ্ছ নয়!

পৃথিবীতে বড় বড় জ্ঞানী-গুণী মহাজনের জীবন যেমন বরণীয়, সে জীবনের যেমন দাম আছে,—তেমনি মাটীর কেঁচো; বা 'শরট-করট'—তাদের জীবনেরও দাম আছে! অর্থাৎ জগতে কাহারো জীবন তুচ্ছ নয়!

সকলের জীবন এই পৃথিবীর জীবনকে লালন করিতেছে, পুষ্ট করিতেছে।

ত্রেতা যুগে লঙ্কায় যে মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, সে মহাযুদ্ধে তুচ্ছ কাঠবিড়ালীটাও শ্রীরামচন্দ্রের সহায়তা করিয়াছিল —সেতু-বন্ধনের কাজে। এ কথাকে পুরাণ-কথা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাও? বেশ, আজ এ বৈজ্ঞানিক যুগের কথা তবে বলি,—সে-কথাকে কি করিয়া উড়াইবে, দেখি!

পায়রার কথা বলি। মানুষে-মানুষে যুগে-যুগে যে-সব মহাযুদ্ধ হইয়াছে, সে সব মহাযুদ্ধে পায়রা করিয়াছে দূত বা বার্ত্তাবহের কাজ। আজিকার এ বোমা-সাবমেরিণের দিনেও পায়রার এ-চাকরি বজায় আছে। সকল-জাতির রণ-বিভাগ পায়রাকে অপরিহার্য্য-সহায় বলিয়া আজো সার্টিফিকেট দিতেছে। প্লেন বিপন্ন হইলে সেখান হইতে পায়রা উড়াইয়া বিপদের বার্ত্তা পাঠানো—আজিকার এ যুগে প্রায় নিত্যকার ব্যাপার।

পায়রার পর দূতের কাজে কুকুরের পটুতাও অসাধারণ। শুধু কুকুর কেন? বিড়াল, গো-মহিষ, কীট-পতঙ্গকে পর্য্যন্ত এ বৈজ্ঞানিক যুগে যুদ্ধের সময় মানুষ সহায়-স্বরূপ বরণ করিয়া লইতেছে।

হাতী ছিল প্রাচীন যুগে রণ-মত্ত মানবের প্রধান

কুকুরের পিঠে বাক্সে ভরিয়া পায়রা পাঠানো

সী-প্লেন হইতে ডাকবাহী পায়রা ওড়ানো

শক্তি। রণাঙ্গনে আমাদের দেশের হাতীর শক্তির বহু পরিচয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লেখা আছে। হাতী ছিল বীর যোদ্ধা হানিবলের 'ট্যাঙ্ক'!

কুকুরের ঘ্রাণ এবং শ্রুতিশক্তি অসাধারণ। তার ক্ষিপ্রকারিতা, তার গতিভঙ্গী, গাছপালার গায়ে গা মিলাইয়া নিজেকে নিস্পন্দ ভাবে রাখিয়া পাহারাদারী—বিপদের সময় কুকুরের আশ্চর্য্য ধৈর্য্যশীলতা—এ সব গুণে আজিকার দিনের রণক্ষেত্রে কুকুর মানুষের মস্ত সহায় এবং বন্ধু। আজিকার এ যুদ্ধে পাহারাদারীর কাজে কুকুরকে শিক্ষা দিয়া এমন পটু করা হইয়াছে যে, আহত বা নিহত স্বপক্ষীয়দের সন্ধানের কাজে কুকুর আশ্চর্য্য শক্তি দেখাইতেছে। তা ছাড়া কুকুরকে এ যুদ্ধে ষ্ট্রেচার-বাহকের গাইড-স্বরূপ এবং বারুদ ও সরঞ্জামাদি বহিবার কাজে নিযুক্ত করা হইতেছে। ঘ্রাণে বিপক্ষদের অবস্থানের সন্ধান করিতে কুকুর অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাইতেছে।

বিগত মহাযুদ্ধের সময় ফরাসী সেনা-বিভাগে শিক্ষিত কুকুর ছিল দেড় হাজার এবং জার্ম্মাণীর পক্ষে কুকুর ছিল এগারো শ'। এখন এ সংখ্যা বাড়াইয়া চতুর্গুণ করা হইয়াছে। আল্‌সাটিনা এবং শ্নুজার জাতের কুকুরকেই এ বিভাগে লওয়া হইতেছে।

মানুষ-ফৌজের মতো কুকুর-ফৌজদলেও বিভিন্ন কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট আছে। এক-দল কুকুর করে ফার্ষ্ট-এডের কাজ; এক-দল আছে বার্ত্তাবহ; এক-দল করে পাহারাদারী। শেল ফাটিতেছে—তাহাতে এ-সব কুকুরের ভয় নাই, ভ্রূক্ষেপ নাই! তারা ঠিক তাদের কাজ করিয়া চলিয়াছে। এ-সব কুকুরের মুখে গ্যাস-মাস্ক আঁটা থাকে। ফার্ষ্ট-এড দলের কুকুরের পিঠে চামড়ার ব্যাগ বাঁধা থাকে। সে ব্যাগে রেড-ক্রশ চিহ্ন অঙ্কিত। ব্যাগের মধ্যে থাকে ঔষধ-পথ্য, ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতি।

আহত হইয়া কাহারো আরোগ্যের আশা যদি সম্ভাবনার অতীত হয়—প্রকৃতি-বশে এ-সব কুকুর তাহা বুঝিতে পারে। আঘাতের বেদনায় কেহ যদি মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে, তাদের ঘ্রাণ লইয়া এ-সব কুকুর সেবায়-পরিচর্য্যায় সচেতন করিতে পারে। হতাহতের সন্ধান পাইলে এ-সব কুকুর শিবিরে ফিরিয়া আসিয়া চাহনি-সঙ্কেতে সে-সংবাদ বিজ্ঞাপিত করে—সঙ্গে সঙ্গে সেবাব্রতীদের লইয়া কুকুর তখনি আবার ছোটে হতাহতকে আনিবার জন্য! এ কাজ তারা নিঃশব্দে করে। শিক্ষার গুণে এমন হইয়াছে যে, কার্য্যক্ষেত্রে একটিবার কুকুরের কণ্ঠে এতটুকু রব ফোটে না!

হতাহতের সন্ধানে কুকুর

প্যারাশুটিষ্টরা হয়তো নির্জ্জন বনে বা মরু-প্রান্তরে গিয়া পড়িল—সন্ধান করিয়া এই সব প্যারাশুটিষ্টদের উদ্ধার চলিতেছে আজ শুধু এই সব ফৌজ-কুকুরের প্রসাদে!

বিড়ালকেও ফরাসীরা দৌত্য-কার্য্যে লাগাইয়া এ যুদ্ধে সুফল লাভ করিয়াছিল। সাদা রঙের বিড়ালকেই বার্ত্তাবহের কাজে লওয়া হয়। বরফের গায়ে গা মিলাইয়া সাদা বিড়াল নিরাপদে কর্ত্তব্য করিয়া যায়। কালো বিড়াল করে রাত্রে বার্ত্তাবহের কাজ; এবং পাঁশুটে-রঙের বিড়াল কাদা-পাঁক ঘাঁটিয়া বার্ত্তাবহের কাজ করিতেছে। নিঃশব্দে যাতায়াত করে বলিয়া বার্ত্তাবহের কাজে বিড়ালের এতটুকু ত্রুটি থাকে না।

মাকড়শার বোনা সুতা যুদ্ধে কতখানি সহায়, জানো? মাকড়শার ঐ বোনা সুতায় রেঞ্জ-ফাইণ্ডার তৈয়ারী হয়।

মৌমাছিরাই কি যুদ্ধ-জয়ে কম সাহায্য করিয়াছে?

আফ্রিকায় সে-বারে জার্ম্মাণদের সঙ্গে ইংরেজের যে যুদ্ধ হইয়াছিল, সে যুদ্ধে এক-দল জার্ম্মাণ সেনা পলায়ন করিয়া আসিবার সময় বনমধ্যে প্রকাণ্ড মৌচাকের সঙ্গে বৈদ্যুতিক তার সংলগ্ন করিয়া যায়। পিছনে ব্রিটিশ ফৌজ জার্ম্মাণদের তাড়া করিয়া সে-জায়গায় আসিয়া পৌঁছিবামাত্র জার্ম্মাণ সেনাধ্যক্ষ সেই তারে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চালিত করেন। যেমন শক্ লাগা, অমনি হাজার হাজার মৌচাক হইতে লক্ষ লক্ষ মৌমাছি বাহির হইয়া ব্রিটিশ সেনাদলকে প্রচণ্ড আক্রমণে এমন জর্জ্জরিত করিল যে, ছত্র-ভঙ্গ হইয়া কে কোথায় পলাইবে, ঠিক পায় না! জার্ম্মাণ ফৌজ সে-যাত্রা প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়া বাঁচিয়াছিল।

গ্যাস্-মুখোশ-আঁটা কুকুর রণক্ষেত্রে চলিয়াছে

যাত্রী

আমি যাত্রী শুভরাত্রি হলো শেষ।
করি সজ্জা ত্যজি লজ্জা ভুলি ক্লেশ।
পূবে সূর্য্য বাজে তূর্য্য নিশা নাই!
পেয়ে আশ্বাস ফেলি নিশ্বাস—আমি যাই।

পথ দুর্গম চলি দুর্দ্দম নাহি শেষ—
নাহি অন্ত, আমি পান্থ—কোথা দেশ?
পথি-পার্শ্বে অতি হর্ষে ফোটে ফুল
আমি ভ্রান্ত হয়ে ক্লান্ত করি ভুল।

এ কি দুঃখ আমি মূর্খ ব্যথা পাই—
খুঁজি বিশ্ব আমি নিঃস্ব, তবু যাই।
আমি অন্ধ মম ভাগ্য করে শ্লেষ।
দেহ নশ্বর ভুলি ঈশ্বর খুঁজি দেশ।

শ্রীমতী সুনীতি দেবী

যুদ্ধ আজ ভারতের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষিতই হউক আর অনাকাঙ্ক্ষিতই হউক, যুদ্ধান্তে ভারতবাসীর ভাগ্যোন্নতির কোন নিশ্চয়তা থাকুক আর নাই থাকুক, ভারতের দ্বারদেশে সমুত্থিত রণকোলাহল ভারতবাসীর জীবনযাত্রায় আলোড়ন আনিয়াছে; অদূর ভবিষ্যতে আধুনিক যুদ্ধের ভীষণতা তাহার জীবনযাত্রায় বিরাট্ বিপর্য্যয় ঘটাইবে বলিয়াও আশঙ্কা হইতেছে। সার্দ্ধশতাব্দী কাল "নখদন্তভাঙ্গা" ভারতবাসী বৃটিশ-শাসনের বর্ম্মে আবৃত হইয়া নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করিয়াছে; সুখে না হইলেও বহু দিন নির্ঝঞ্ঝাটেই তাহার জীবন কাটিয়াছে। এত দিন ভারতবাসী নিশ্চিন্ত মনে ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া নিজের ঘরে "কোঁদল" করিয়াছে; গৃহের বাহিরে সাগ্রহ দৃষ্টিপাতের সময় ও স্পৃহা তাহার ছিল না; বিশ্বের উত্তাল ঘটনাস্রোতের প্রতি জড়তা-মিশ্রিত ঔদাসীন্যই তাহার বৈশিষ্ট্য। আজ বৃটিশ-শাসনের লৌহবর্ম্ম ভেদ করিয়া আধুনিক যুদ্ধের ভীষণতা ভারত-বাসীর সেই জড়ত্বে ও ঔদাসীন্যে সজোর আঘাত করিতে উদ্যত। এই আঘাত যদি সত্যই পতিত হয়, তবে তাহার ফল কি হইবে, তাহা কেহ জানে না; ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে ইহার প্রতিক্রিয়া কত গভীর ও ব্যাপক, তাহা অনুমান করা অসাধ্য। আজ শুধু এইটুকুই ধ্রুব সত্য যে, ভারত আর নিরাপদ নহে; ভারতবাসীর শতাব্দী কালের গঠিত শান্তির নীড় আজ বিশ্বব্যাপী বাড়বানলের অতি সন্নিকট।

জাপানের ব্যাপক সাফল্য—

প্রাচ্য সাম্রাজ্যবাদী জাপান তাহার প্রতীচ্য প্রতি-দ্বন্দ্বীকে অতর্কিতে আঘাত করিয়া বিশেষভাবেই বিব্রত করিয়াছে; তাহার সামরিক সাফল্য দ্রুত ও ব্যাপক। বস্তুতঃ, ভারতবর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী সীমান্ত সে অতিক্রম করিয়াছে; শাসনতান্ত্রিক কারণে ভারতের সঙ্কুচিত সীমান্ত পর্য্যন্ত উপনীত না হইলেও সে এখন উহার অদূরেই উপস্থিত।

মাত্র দেড় মাস পূর্ব্বে জাপান অতর্কিতে যুদ্ধ-ঘোষণা করে। ইহার মধ্যে দক্ষিণ-চীনসাগর বস্তুতঃ "জাপানী হ্রদে" পরিণত হইয়াছে। হংকং, ফিলিপাইন, সারওয়াক এবং প্রায় সমগ্র মালয় অধিকার করিয়া দক্ষিণ-চীন-সাগরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে জাপান একরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এদিকে ব্রহ্মদেশের টেনাসেরিম্ প্রদেশের কতকাংশ জাপানের করতলগত; পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জের প্রতি এখন জাপানের প্রবল আক্রমণ নিবদ্ধ; নিউগিনিতে জাপানের প্রবল বিমান আক্রমণ চলিতেছে।

গত ১১ই জানুয়ারী জাপ-বাহিনীর ওলন্দাজ পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে অবতরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জাপানের সমর-প্রচেষ্টাকে উদ্যোগপর্ব্ব বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। প্রশান্ত মহাসাগরের মার্কিনী ঘাঁটীগুলিতে অতর্কিতে প্রবল আঘাত করিয়া প্রথমে জাপান সুদূর প্রাচীর সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে। তাহার পর সে হংকং অধিকার করিয়া মালয়ের সহিত জাপানী দ্বীপপুঞ্জের সংযোগ নিষ্কণ্টক করিয়াছে। ফিলি-পাইন অধিকারের ফলে ওলন্দাজ পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটী তাহার করায়ত্ত হইয়াছে; বস্তুতঃ, ফিলিপাইনের ডাভাও বন্দর হইতেই বোর্ণিওর পূর্ব্ববর্ত্তী তৈল-প্রধান টারাকান্ দ্বীপে এবং সেলিবীসের মিনাহাসায় জাপানী সেনা প্রথম অবতরণ করে। সারওয়াকের তৈল ব্যতীত সমগ্র বোর্ণিওর আক্রমণ পরিচালনের পক্ষে ঐ অঞ্চলের সামরিক গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। মালয়ের রবারই জাপানের প্রধান লক্ষ্য নহে—প্রাচীর একমাত্র বৃটিশ-ঘাঁটী সিঙ্গাপুরকে শক্তিহীন করিতে হইলে মালয়ে অধিকার বিস্তৃত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত, মালয় হইতে মালাক্কা প্রণালী অবরুদ্ধ হইতে পারে: সুমাত্রায় প্রত্যক্ষ আক্রমণ-পরিচালনও সম্ভব। জাপান যখন পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আক্রমণ আরম্ভ করে, তখন এই সকল প্রাথমিক আয়োজনের মধ্যে কেবল

সমগ্র মালয় অধিকারই তাহার বাকী ছিল; তবে, তখন সে এই অঞ্চলে তাহার সামরিক প্রাধান্য উপলব্ধি করিয়া স্বীয় সাফল্য সম্বন্ধে হয় ত নিশ্চিন্ত হইয়াছিল।

মালয়ে জাপ-বাহিনী অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইতেছে। মালয়ের সর্ব্বদক্ষিণে জোহোর প্রদেশে তাহারা প্রবেশ করিয়াছে। মালাক্কা প্রণালীতে এখন জাপানী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত; ইহার ফলে মালয়ে যুদ্ধরত বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাহিনীর পার্শ্বদেশ আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ সম্ভাবনা এখন সুস্পষ্ট যে, সুমাত্রায় সৈন্য অবতরণ করাইয়া জাপান সিঙ্গাপুর পরিবেষ্টন করিতে সচেষ্ট হইবে। সম্প্রতি বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল ওয়াশিংটনে এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, মিত্রশক্তির পক্ষ হইতে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সিঙ্গাপুরের পতন হইবে না বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস। সম্ভবাতীত অল্পকালে সুরক্ষিত হংকংএর পতনে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর এই আশ্বাসবাণীতে পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন করা দুষ্কর। তাহার পর, শত্রুহস্তে সিঙ্গাপুরের পতনই বড় কথা নহে—সিঙ্গাপুর যদি পরিবেষ্টিত হয়, তাহার নিকটতম ঘাঁটীগুলি যদি শত্রুর অধিকারভুক্ত হয়, তাহা হইলে "ডাইভ বমারের" অবিরাম আক্রমণে বৃটেনের এই একমাত্র ঘাঁটী শক্তিহীন হইয়া পড়িবে। পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর ভ্যান্ মুক্ এইরূপ আশঙ্কাই প্রকাশ করিয়াছেন—He expressed confidence in Singapore's ability to hold out, but admitted the possibility of Singapore's becoming less important if by-passed and isolated. সিঙ্গাপুর যদি এই ভাবে শক্তিহীন হইয়া পড়ে, তাহা হইলে উহার প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হইবে। সিঙ্গাপুর শক্তিহীন হইলে জাপানী রণপোতের ভারত মহাসাগরে প্রবেশ সম্ভব হইতে পারে; ভারতের সুবিস্তীর্ণ উপকূলের নিকটে জাপানী রণপোতের উপস্থিতির সম্ভাবনা কত দূর ভয়াবহ, তাহা সহজেই অনুমেয়।

সুদূর প্রাচীর প্রসারিত রণাঙ্গন

মালয়ের যুদ্ধে সাম্রাজ্য-বাহিনীর প্রধান অসুবিধা—শত্রু-সৈন্যের সংখ্যাধিক্য এবং তাহাদিগের সমরোপকরণের প্রাচুর্য্য; বিশেষতঃ, সাম্রাজ্য-বাহিনী বিমানের স্বল্পতায় বিশেষ অসুবিধাও ভোগ করিতেছে। বর্ত্তমান যুগের যুদ্ধে বিমান-বাহিনী দ্বারা সুরক্ষিত না হইয়া কোন পদাতিক-বাহিনী অগ্রসর হইতে পারে না। সাম্রাজ্য-বাহিনী এই অতি-প্রয়োজনীয় বিমানেই বঞ্চিত রহিয়াছে। বিমানের স্বল্পতা সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দেওয়া হইয়াছে—মধ্য-প্রাচীর প্রয়োজনেই মালয়ে প্রচুর বিমান প্রেরণ সম্ভব হইতেছে না। সহকারী প্রধান মন্ত্রী মিঃ এট্‌লী এইরূপ উক্তিও করিয়াছেন যে, তাঁহাদিগের পক্ষে সর্ব্বত্র শক্তিশালী হওয়া সম্ভব নহে।

এই নির্লজ্জ উক্তির উত্তরে কেবল ইহাই বলা যাইতে পারে—সর্ব্বত্র রক্ষা-ব্যবস্থার দায়িত্ব লইতে বৃটেনকে কেহ আমন্ত্রণ করে নাই; প্রাচীতে বৃটিশ-অধিকৃত অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে স্বদেশরক্ষার পবিত্র অধিকারে বঞ্চিত করিয়া বৃটেন্ কেন সে দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে লইয়াছিল? ভারতে জাহাজ ও বিমান নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপন-সম্পর্কিত অপ্রীতিকর আলোচনার পুনরাবৃত্তির আর প্রয়োজন নাই। প্রথমে পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে মালয়ে কিছু বিমান প্রেরিত হইয়াছিল, এখন ঐ দ্বীপপুঞ্জ নিজেই বিপন্ন। অষ্ট্রেলিয়া হইতে বিমান প্রেরণের কথা শুনা যাইতেছে। কিন্তু নিউগিনিতে শত্রুর মনোযোগ পতিত হওয়ায় অষ্ট্রেলিয়াও আর নিরাপদ নহে; তাহার পক্ষেও প্রচুর বিমান প্রেরণ সম্ভব হইবে কি না, বলা যায় না। মোটের উপর, মালয়ে যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তিত হইবার লক্ষণ আদৌ স্পষ্ট নহে।
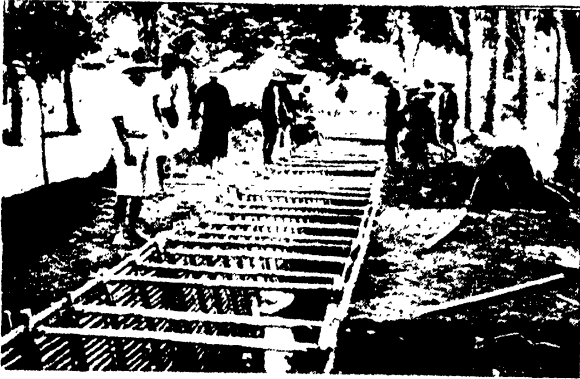
পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বিমান আক্রমণের আশ্রয়স্থল নির্ম্মিত হইতেছে

বর্ত্তমানে জাপানের প্রধান লক্ষ্য—ব্রহ্মদেশ ও ওলন্দাজ পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ। এই দুইটি অঞ্চলের প্রচুর কৃষিজ ও খনিজ সম্পদ্ জাপানকে বহু দিন হইতেই প্রলুব্ধ করিয়াছে। তাহার পর এই যুদ্ধ যে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে—ইহা জাপান জানে। সুদীর্ঘকাল সংগ্রাম পরিচালনের জন্য এই দুইটি অঞ্চলের সম্পদ্ তাহার বিশেষ সহায় হইবে। কাজেই যুদ্ধের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় প্রাথমিক আয়োজন শেষ হইবার পরই সে ব্রহ্মদেশ ও ওলন্দাজ পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের প্রতি অবহিত হইয়াছে। মালাক্কা প্রণালীতে জাপানী-প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় স্বভাবতঃ অনুমান করা যাইতে পারে—অতি সত্বর সুমাত্রা আক্রমণ করিয়া জাপান দুই দিক্ হইতে ওলন্দাজ পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের প্রতি "চাপ" দিবে। এদিকে থাইল্যাণ্ড হইতে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া জাপান ট্যাভয় অধিকার করিয়াছে; ইহার ফলে টেনাসেরিম প্রদেশের দক্ষিণ অঞ্চল ব্রহ্মদেশের সহিত বিচ্ছিন্ন-সংযোগ হইয়া জাপানের করতলগত হইয়াছে। এই অঞ্চলের টিন্ ও উল্‌ফ্রামের খনি এখন জাপানের অধিকারভুক্ত। বিশেষতঃ, ট্যাভয়ের বিমানঘাঁটী অধিকৃত হওয়ায় জাপানী বিমান এখন ব্যাঙ্কক হইতে ৭ শত মাইল পশ্চিম হইতে আক্রমণাত্মক কার্য্যে লিপ্ত হইবার সুযোগ পাইল। ট্যাভয় হইতে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ এবং সেখান হইতে দক্ষিণ-ভারতে জাপানের আক্রমণাত্মক প্রচেষ্টা প্রসারিত হওয়া অসম্ভব নহে। তার পর, সিঙ্গাপুর শক্তিহীন হওয়ায় জাপানী রণপোত যদি ভারত মহাসাগরে প্রবেশ-পথ পায়, তাহা হইলে নৌবাহিনীর সহযোগিতায় ব্রহ্মদেশে জাপানের আক্রমণ চালিত হইবে; সমগ্র ভারতও বিপন্ন হইবে। সিঙ্গাপুর অক্ষুণ্ণ-শক্তি থাকা সত্ত্বেও ব্রহ্মদেশে জাপানের প্রবেশে পূর্ব্ব-ভারতে বিমান আক্রমণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতবর্ষের সমর-প্রচেষ্টায় বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে প্রয়াসী হওয়া জাপানের পক্ষে স্বাভাবিক, ভারতবর্ষ হইতে সমরোপকরণ যাহাতে বাহিরে যাইতে না পারে, সেজন্য সচেষ্ট হওয়া তাহার সামরিক প্রয়োজন। দূরবর্ত্তী ঘাঁটী হইতে বিমান আক্রমণ করিয়া এই সকল প্রয়োজন পূর্ণ করিতে সে প্রয়াসী হয় নাই; কারণ, তাহার সঞ্চিত পেট্রোল অপরিমিত নহে। ঘাঁটী যতই নিকটবর্ত্তী হইবে, ততই তাহার অধিক পেট্রোল-ব্যয়ের সম্ভাবনা হ্রাস পাইবে। সম্প্রতি চীনা-বাহিনী চ্যাংশা অঞ্চলে জাপানীদিগকে বিশেষ ভাবে পরাজিত করিয়াছে। জাপানের উৎকৃষ্ট সৈন্য এবং সমরোপকরণ অন্যত্র স্থানান্তরিত হইবার ফলেই হয় ত চীনাদিগের এই বিরাট্ সাফল্য। কিন্তু জাপান হয় ত মনে করে—ব্রহ্মদেশে সমর-প্রচেষ্টা প্রসারিত করিয়া সে চীনের যুদ্ধোদ্যমে সজোর আঘাত করিতে সমর্থ হইবে। ব্রহ্ম-চীন পথ

চীনা-জাতির জীবনরক্ষার একমাত্র সূত্র। ব্রহ্মদেশে যদি জাপানের প্রভুত্ব-বিস্তার সম্ভব হয়, তাহা হইলে স্বভাবতঃ চীনা জাতির সমর-প্রচেষ্টায় উহার দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট হইবে। বর্ত্তমানে জাপান ব্রহ্মদেশে যে বোমাবর্ষণ করিতেছে, উহা কেবল তাহার স্থলপথে আক্রমণ পরিচালনের প্রাথমিক আয়োজনই নহে; ব্রহ্ম-চীন সরবরাহ-সূত্র ছিন্ন করাও তাহার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

মিত্র-শক্তির নূতন প্রয়াস—

মিত্রশক্তির সমর-প্রচেষ্টা সংহত ও সুব্যবস্থিত করিবার উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট রাজনীতিকগণের স্থানান্তরে গমনাগমন
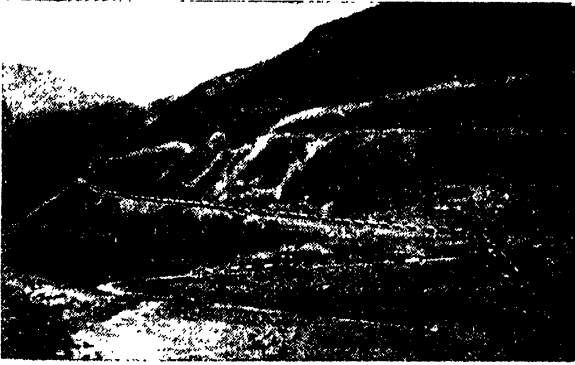
ব্রহ্ম-চীন পথের একটি দৃশ্য

একটি উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক ঘটনা। এই উদ্দেশ্যে ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে মিঃ চার্চ্চিল অকস্মাৎ সদলবলে ওয়াশিংটনে গমন করেন। এই সময় বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ ইডেন যান মস্কোএ; আর ভারতের তৎকালীন প্রধান সেনাপতি জেনারল ওয়াভেল চুংকিংএ গমন করেন। বিভিন্ন রাজনীতিক ও সমর-নায়কের এই সাক্ষাৎকার ও আলোচনার ফলে ভবিষ্যৎ সমর-প্রচেষ্টায় অধিকতর ঐক্য ও সংহতি রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহার আশু ফল-স্বরূপ মার্শাল চিয়াং-কাই-সেক্ চীন ও ব্রহ্মদেশে স্থলযুদ্ধের অধিনায়কত্ব লাভ করিয়াছেন; জেনারল ওয়াভেলের উপর ওলন্দাজ পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ রক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছে। ইতোমধ্যে ব্রহ্মদেশে চীনা সৈন্য পৌছিয়াছে, জেনারল ওয়াভেল যাভায় যাইয়া কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়াছেন। মিত্রশক্তির এই ব্যবস্থা লক্ষ্য করিয়া মনে হয়—তাঁহারা ব্রহ্মদেশ ও চীনের রণক্ষেত্র সংযুক্ত করিয়া এই অঞ্চলে চীনের সহিত একযোগে যুদ্ধ-পরিচালনা করিতে চাহেন। এই সম্পর্কে একটি রাজনীতিক সুবিধার কথাও হয় ত বিবেচিত হইয়াছে। মালয়, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে জাপানীরা এই মর্ম্মে প্রচারকার্য্য চালাইতেছে যে, তাহারা ঐ সকল অঞ্চলের অধিবাসীদিগের স্বজাতীয় ও স্বধর্ম্মী; জাপানীদিগের প্রকৃত শত্রু শ্বেতজাতি—স্বজাতি ও স্বধর্ম্মীদিগের সহিত তাহাদিগের কোন বিরোধ নাই। বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী মঙ্গোলিয়ান জাতি চীনারাও যে বৃটিশের সহযোগী এবং জাপানীদিগের সহিত কঠোর সংগ্রামে রত, ইহা কার্য্যক্ষেত্রে প্রতিপন্ন হইলে জাপানীদিগের এই প্রচারের উদ্দেশ্য বিফল হইতে পারে। বস্তুতঃ, জাপানীদিগের প্রচার ব্যর্থ করিবার জন্য বৃটিশের পক্ষ হইতে যাহাই বলা হউক না কেন, উহা অপেক্ষা চীনাদিগের সহিত দেশীয় সৈন্যের পাশাপাশি যুদ্ধের ফল অধিকতর কার্য্যকরী হইবে।

এই সম্পর্কে একটি কথা বলা যাইতে পারে—চীনারা তাহাদিগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতেছে; স্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রত্যেক চীনা নর-নারী ও শিশু-বৃদ্ধ আজ সঙ্ঘবদ্ধ। সমগ্র চীনা জাতির এই সঙ্ঘবদ্ধতা ও দৃঢ়তার জন্যই জাপান তাহার উন্নত প্রণালীর আধুনিক সমরোপকরণ লইয়াও সাড়ে চারি বৎসর চীনের পর্ব্বতে ও গিরিকন্দরে "ঘুরপাক খাইতেছে।" এই স্বাধীনতাকামী চীনাদিগের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যাহারা যুদ্ধ করিবে, তাহাদিগের মনে এই বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন যে, তাহারাও প্রকৃত স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রবৃত্ত—এই সংগ্রামের অবসানে তাহারাও প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিবে। এই বিষয়ে বৃটিশ রাজনীতিকদিগের অদূর-দর্শিতার ফলে সমর-প্রচেষ্টার বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট হওয়া সম্ভব।

রুশ-যুদ্ধের বিপরীত-গতি—

নববর্ষোপলক্ষে বক্তৃতায় হিটলার বলিয়াছিলেন—পূর্ব্ব-য়ুরোপে এখনও যুদ্ধ চলিতেছে; কিন্তু ক্রমেই উহার গতি মন্দীভূত হইয়া আসিবে; পরে উহা সম্পূর্ণ ভাবে থামিয়া যাইবে। একনায়ক হিটলার তাঁহার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতার গর্ব্বে হয় ত আশা করিয়াছিলেন—তাঁহার আদেশে পূর্ব্ব-য়ুরোপের যুদ্ধ থামিয়া

যাইতে বাধ্য। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে একনায়কত্বের গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে; পূর্ব্ব-য়ুরোপের যুদ্ধ রুদ্ধগতি হয় নাই—বিপরীত-গতি হইয়াছে।

জার্ম্মাণী শীতকালে পূর্ব্ব-য়ুরোপের যুদ্ধ স্থিতিশীল করিতে চাহিয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট অঞ্চল পর্য্যন্ত পশ্চাদপসরণ করিয়া পরিখার অভ্যন্তরে শীতকাল অতিবাহিত করিবার পরিকল্পনাই জার্ম্মাণ সেনানায়কগণ স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু নূতন সোভিয়েট সৈন্যের অবিরাম প্রতি-আক্রমণে এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়াছে। ইতোমধ্যে জার্ম্মাণরা বিভিন্ন অঞ্চলে যে সকল স্থান ত্যাগে বাধ্য হইয়াছে,

গত নভেম্বর মাসে নাৎসীবাহিনী যখন প্রথম খারকভে প্রবেশ করে, সেই সময়ের একটি দৃশ্য

তাহার সামরিক গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। এই প্রবন্ধ লিখিবার সময়—মস্কো অঞ্চলে মজায়েস্ক রুশ সেনার প্রচণ্ড আক্রমণে পতনোন্মুখ। মধ্য-রণক্ষেত্রে এই মজায়েস্কেই জার্ম্মাণরা শীতকাল অতিবাহিত করিতে চাহিয়াছিল। দক্ষিণে শ্রমশিল্প-প্রধান খারখভ্ অতি সত্বরই রুশ সেনা কর্ত্তৃক পুনরধিকৃত হইবার সম্ভাবনা। রষ্টভ অঞ্চল হইতে বিতাড়িত জার্ম্মাণ-বাহিনী এখন ট্যাগানরগে মার্শাল টিমোসেঙ্কোর সেনাদলের প্রচণ্ড আক্রমণে বিপন্ন। জার্ম্মাণীর আধিপত্য বিলুপ্তপ্রায়।

যে সকল সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান সোভিয়েট সেনার অধিকারভুক্ত হইতেছে, উহাতে তাহারা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে হিটলারের বসন্তকালে রুশ-বিজয়ের সুখস্বপ্ন বিফল হইতে বাধ্য। পূর্ব্ব-য়ুরোপে সোভিয়েট বাহিনীর এই প্রতি-আক্রমণ ও ক্রমবর্দ্ধমান সাফল্যের প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী। অক্ষশক্তিত্রয়ের (Axis-Powers) মধ্যে জার্ম্মাণীই প্রবলতম; শক্তিতে ও আয়োজনে সে-ই সর্ব্বাগ্রগণ্য। ইটালী জার্ম্মাণীর হতভাগ্য পদলেহী মাত্র। ইতঃপূর্ব্বে জাপানের শক্তি সম্বন্ধে যদি ভ্রান্তিবশতঃ লঘুত্ব আরোপ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলেও ইহা সত্য যে, জার্ম্মাণীর বিস্ময়কর প্রাথমিক সাফল্যেই জাপান আক্রমণাত্মক প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইয়াছে।

জার্ম্মাণী হয় ত শীতকালে পূর্ব্ব-য়ুরোপে কিছু সৈন্য নিযুক্ত রাখিয়া ভিসি-কর্ত্তৃপক্ষ ও স্পেনের সহযোগে উত্তর ও পশ্চিম-আফ্রিকা এবং ভূমধ্যসাগরে তৎপর হইবার অভিসন্ধি পোষণ করিতেছিল। রুশ সেনার প্রতি-আক্রমণ ও ক্রমবর্দ্ধমান সাফল্যের ফলে তাহার এই অভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিতে বিলম্ব ঘটিতেছে। অবশ্য, ইহার সম্ভাবনা এখনও বিদূরিত হয় নাই। পূর্ব্ব-য়ুরোপের সমর-প্রচেষ্টায় কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি না করিয়াও জার্ম্মাণী এই অঞ্চলে স্পেন ও ভিসি-কর্ত্তৃপক্ষের সহযোগিতায় তৎপর হইতে পারে। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল সম্প্রতি ওয়াসিংটনে এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—জার্ম্মাণীর আঘাত করিবার শক্তি বিনষ্ট হইয়াছে মনে করিলে ভুল হইবে। সম্প্রতি বার্লিনে অক্ষ-শক্তিত্রয়ের এক সম্মিলনে সমর-প্রচেষ্টা সংহত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কাজেই, নূতন ক্ষেত্রে জার্ম্মাণীর তৎপরতা হয় ত অদূরবর্ত্তী। তবে ইহা সত্য, পূর্ব্ব-য়ুরোপের যুদ্ধে জার্ম্মাণী এখন যে ভাবে বিব্রত, তাহাতে অন্যত্র তাহার সমর-প্রচেষ্টায় পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট হওয়া অবশ্যম্ভাবী। জার্ম্মাণী এত দিন প্রত্যেকটি রণক্ষেত্রে অখণ্ড মনোযোগ প্রদান করিয়াছে—একই সময় একাধিক রণক্ষেত্রে তাহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করান সম্ভব হয় নাই। বর্ত্তমানে একটি রণক্ষেত্রে অবস্থা তাহার প্রতিকূল। এই অবস্থায় অন্যত্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া তাহার পক্ষে আনন্দের কথা নহে; উহার ফল সম্বন্ধেও সে স্বভাবতঃ নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে না।

সুদূর প্রাচী সম্বন্ধে বলা যায়—জাপানও জার্ম্মাণীর পরোক্ষ সহযোগের আশা করে। তাহার প্রাথমিক সাফল্যের গুরুত্ব যতই অধিক হউক না কেন, তাহার পক্ষে একক চারি-পাঁচটি প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে অনির্দ্দিষ্ট

কাল যুদ্ধে রত থাকা কদাচ সম্ভব নহে। জাপান আশা করে—ভিসি-কর্ত্তৃপক্ষ ও স্পেনের সহযোগিতায় বৃটিশ ও মার্কিনী নৌবহরকে ভূমধ্যসাগর ও আট্‌লান্টিকে বিব্রত রাখিয়া জার্ম্মাণী তাহাকে পরোক্ষে সাহায্য করিবে। ইহা ব্যতীত, জাপান হয় ত স্থলভাগেও জার্ম্মাণীর পরোক্ষ সহযোগ আশা করে। তুরস্কের মধ্য দিয়া জার্ম্মাণীর সম্ভাবিত অভিযান সম্পর্কে যে আশঙ্কা একাধিকবার প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া উচিত নহে। আনাটোলিয়ার শীত চলিয়া যাইবার পর এই দিকে জার্ম্মাণীর মনোযোগ পতিত হইবার সম্ভাবনা আছে। পশ্চিম-এশিয়ায় যদি জার্ম্মাণীর প্রচণ্ড আক্রমণ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে প্রাচ্য অঞ্চলে বৃটেনের সমর-প্রচেষ্টায় তাহার বিশেষ প্রতিক্রিয়া
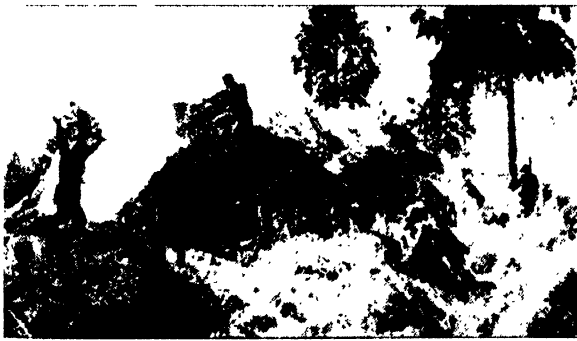
মরণোন্মুখ সোভিয়েট সৈন্য তাহার শেষ গুলীটি শত্রুর উদ্দেশে নিক্ষেপ করিতেছে

সৃষ্ট হইবে। হয় ত জাপান এইরূপ আশাও পোষণ করে—আগামী বসন্তকালের মধ্যেই সে দক্ষিণ-প্রশান্ত মহাসাগরে স্বীয় প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইবে, সুদীর্ঘ সংগ্রামে রত থাকিবার উপযোগী সম্পদও তাহার আয়ত্তে আসিবে। তাহার পর, বসন্তকালে জার্ম্মাণী যখন আনাটোলিয়ার মধ্য দিয়া পশ্চিম-এশিয়ায় বৃটিশ-স্বার্থে আঘাত করিতে উদ্যত হইবে, তখন জাপানও ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে আক্রমণ আরম্ভ করিবে।

জাপানের সমর-প্রচেষ্টার সহিত জার্ম্মাণীর এইরূপ পরোক্ষ সহযোগের কোন পরিকল্পনা যদি রচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সোভিয়েট বাহিনীর প্রতি-আক্রমণের সাফল্যে তাহা ব্যর্থ হইবে। জার্ম্মাণ সেনাদল যদি পূর্ব্ব-য়ুরোপ হইতে ক্রমাগত পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়, সোভিয়েট বাহিনীর অবিশ্রান্ত আক্রমণ যদি তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে, তাহা হইলে জার্ম্মাণী পূর্ব্ব-য়ুরোপের রণ-ক্ষেত্রের আর বিস্তার-সাধনে সাহসী হইবে না। তুরস্কের মধ্য দিয়া জার্ম্মাণীর অভিযান আরম্ভ হইলে এই অঞ্চলে বৃটিশ ও সোভিয়েট বাহিনীর সামরিক সহযোগ আরম্ভ হইবে। জার্ম্মাণ বাহিনীর পক্ষে যদি কৃষ্ণসাগরের উত্তর-তীরে প্রতিষ্ঠিত থাকা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে এই সহযোগে জার্ম্মাণীর পক্ষে নূতন ও বৃহত্তর অসুবিধার সৃষ্টি হইবে।

জার্ম্মাণীর সহিত যুদ্ধে রুশ বাহিনীর সাফল্যের এই সুদূর-প্রসারী প্রতিক্রিয়ার কথা বিবেচনা করিলেই জাপানের সহিত রুশিয়ার নিরপেক্ষতা চুক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবার কারণ উপলব্ধ হইবে। জাপান যেমন সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত শত্রু সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত সাময়িক সৌহৃদ্য রক্ষা করিয়া দক্ষিণ অঞ্চলে শক্তি সঞ্চয় করিতে চাহিতেছে, তেমনই সোভিয়েট রুশিয়াও প্রাচ্য সাম্রাজ্যবাদীর সহিত সাময়িক মিত্রতা রক্ষা করিয়া তাহার প্রধান অরির শক্তি ক্ষয় করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। বৃটেন্ ও আমেরিকাও হয় ত সাইবেরিয়া হইতে জাপানী দ্বীপপুঞ্জে আক্রমণ পরিচালনের সুবিধা অপেক্ষা পূর্ব্ব-য়ুরোপে সোভিয়েট বাহিনীর সাফল্যেই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিতেছে। জাপান যদি দক্ষিণ অঞ্চলে ক্রমাগত সাফল্য অর্জ্জন করে এবং ঐ অঞ্চলের সম্পদ শোষণ করিয়া শক্তিশালী হইয়া উঠে, তাহা হইলে সোভিয়েট রুশিয়ার পক্ষে উহা আশঙ্কার কারণ হইয়া উঠিবে। তখন কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের সহিত জাপান সৌহৃদ্য রক্ষা করিতে চাহিলেও উহা আর রক্ষিত হইবে না।

লিবিয়ার যুদ্ধ—

লিবিয়ায় বৃটিশ সৈন্য সম্প্রতি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে। প্রায় সমগ্র পূর্ব্ব-লিবিয়া হইতে ফ্যাসিষ্ট সৈন্য এখন বিতাড়িত; অদূর ভবিষ্যতে ত্রিপলি অভিমুখে বৃটিশের অভিযান আরম্ভ হইতে পারে। লিবিয়ার বিশেষ অর্থনৈতিক গুরুত্ব না থাকিলেও সামরিক গুরুত্ব অল্প নহে। দুইবার লিবিয়া হইতেই ফ্যাসিষ্ট বাহিনী য়্যালেক্‌জেন্দ্রিয়া ও সুয়েজের দিকে অগ্রসর হইতে প্রয়াস করিয়াছে। বৃটিশ সৈন্যের সাম্প্রতিক বিজয়ে এই দিক্ হইতে য়্যালেকজেন্দ্রিয়া ও সুয়েজের বিপদ দূরীভূত হইল। তাহার পর, বেন্‌ঘাজী, ডার্ণা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ঘাঁটী; এই সকল স্থান হইতে ভূমধ্যসাগরের উত্তর উপকূলে জার্ম্মাণ-অধিকৃত অঞ্চলে বিমান আক্রমণ-পরিচালন সম্ভব। তাহার পর, জার্ম্মাণী যদি অদূর ভবিষ্যতে ভিসি-কর্ত্তৃপক্ষের সহযোগে ভূমধ্য সাগরে তৎপর হয়, তাহা হইলে লিরিয়ার ঘাঁটীগুলি বৃটিশের বিশেষ উপকারে আসিবে।

শ্রীঅতুল দত্ত।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ১৮ বৎসর পূর্ব্বে যে পুণ্যতীর্থে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের উদ্বোধন করিয়া তাহার জয়যাত্রার পথনির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, এবার ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্র সেই বারাণসীধামে "বড় দিনের" অবকাশে আবার সেই সম্মেলনের ১৯শ অধিবেশন হইবে জানিয়া আমরা বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছিলাম এবং সাগ্রহে তাহার সাফল্য কামনা করিয়াছিলাম; কিন্তু সে আশা পূর্ণ হয় নাই জানিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। কার্য্যকরী সমিতির কয় জন উদ্যোগী সভ্যের পদত্যাগ যে এই অসাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

সম্মেলনের অধিবেশনের আয়োজনকারীরা প্রথমে শ্রীযুত চিন্তামণি মুখোপাধ্যায়ের জীবনব্যাপী সাধনায় সুপ্রতিষ্ঠিত—কেবল বারাণসীতেই নহে, সমগ্র উত্তর-ভারতে প্রবাসী বাঙ্গালীর গৌরবস্বরূপ শিক্ষায়তন অ্যাংলো-বেঙ্গলী কলেজে উপযুক্ত সমারোহ সহকারে অধিবেশনের আয়োজন ও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু মতভেদের ফলে হিন্দু স্কুলের প্রাঙ্গণে সাধারণ ভাবে সভানুষ্ঠান হইয়াছিল।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা-পূর্ণ সুচিন্তিত অভিভাষণ এবং রবীন্দ্র-স্মৃতি-বাসরের সভাপতি ডক্টর সার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের শ্রদ্ধা-নিবেদনের বক্তৃতা এবার সম্মেলনের বৈশিষ্ট্য ও গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছে।

মূল-সভার মনোনীত সভাপতি প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রবীন্দ্র-স্মৃতি-বাসরের সভাপতি শ্রীযুত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী সম্মেলনে যোগদান জন্য বারাণসীতে সমাগত হন নাই। কেদার-বাবু তাঁহার সংক্ষিপ্ত অভিভাষণে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন:—

> "আমি বয়োজীর্ণ, সামর্থ্যহীন ও রুগ্ন। শয্যা লোকের আরামের ও বিলাসের বস্তু, দুর্ভাগ্য সেই আমার লজ্জার ও সাজার বস্তু হইয়াছে।"

কিন্তু সম্মেলনের কর্ম্মকর্ত্তারা কি তাঁহার শারীরিক অবস্থার কথা পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই? তাঁহারা কি কেদার বাবুর সম্মতি না লইয়াই তাঁহাকে সভাপতিরূপে বরণ করিয়াছিলেন?

সম্মেলনে পঠিত কেদার বাবুর অভিভাষণ পাঠ করিয়াও আমরা হতাশ হইয়াছি। তাহা কোন শোক-সভায় পাঠের যোগ্য হইলেও সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণের উপযুক্ত নহে। কেদার বাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুপ্রবীণ সাহিত্যিক; কেবল প্রবাসী বাঙ্গালীরাই নহেন,—বাঙ্গালী মাত্রেই তাঁহার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার হইতে মূল্যবান্ ও অভিনব উপাদান লাভের আশা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সে আশা নিরাশায় ও উৎসাহ বিষাদে পরিণতিলাভ করিয়াছে। যে সম্মেলনে সাহিত্য-সাধনার বিকাশ দেখিবার আশায় বাঙ্গালার সাহিত্যামোদীরা সারাবর্ষ সাগ্রহে প্রতীক্ষা করেন—প্রবাসী বাঙ্গালীরা বহু ব্যয় করিয়া বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমবেত হইয়া ভাব ও অভাবের আলোচনা—প্রীতি-বিনিময় করেন, সেই সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণে ভাষার ঝঙ্কারের, ভাবমাধুর্য্যের, চিন্তাসম্পদের এমন দৈন্য আর কখনও পরিস্ফুট হইয়াছে বলিয়া স্মরণ হয় না। কেদার বাবু যখন বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তিনি কোন নূতন চিন্তার

শ্রীযুত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দানে সাহিত্য সমৃদ্ধ—সমবেত সদস্যগণকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিবেন না, তখন তিনি রোগশয্যা হইতে সম্মেলনের কল্যাণ ও সাফল্য কামনা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেই ত' যথেষ্ট হইত। অন্য কোন প্রতিভাবান্ মনীষী সাহিত্যিক সম্মেলনের সভাপতি হইয়া তাঁহার চিন্তাধারা প্রচারের সুযোগ পাইতেন। কোন স্নেহভাজন ভক্তের অনুরোধে বা প্ররোচনায় শরীরের এই অচল অবস্থায়—এইরূপ ব্যয়সাধ্য ও বহুজন-আকাঙ্ক্ষিত সম্মেলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ না করাই কি শোভন ও সঙ্গত হইত না ?

রবীন্দ্র-স্মৃতি-বাসরে নৃত্যগীতের আয়োজনও অকিঞ্চিৎকর—আদৌ চিত্তাকর্ষক হয় নাই। যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত—সুর-বৈচিত্র্য—তাঁহার কল্পিত নৃত্যের ভঙ্গী—নাট্যকলার বিকাশ অফুরন্ত—অতুলনীয়—রস-উচ্ছল—সর্ব্বব্যাপী অভিনয়েও যাহার মাধুর্য্য নিঃশেষিত হয় না; কিন্তু সুনির্ব্বাচনের অভাবে তাহার বিকৃতি লক্ষিত হইয়াছে।

অভ্যর্থনা সমিতি এই সম্মেলন দেখিবার প্রবেশপত্রের মূল্য দৈনিক ১ টাকা ও তিন দিনে ২ টাকা লইয়াছেন জানিয়া আমরা অতিমাত্র বিস্মিত হইয়াছি।

আমরা আশা করি, আলোচ্য অধিবেশনের অভিজ্ঞতা পরবর্ত্তী অধিবেশনে সাফল্যপথ প্রস্তুত করিবে। বাঙ্গালী কার্য্যব্যপদেশে সমগ্র ভারতে রহিয়াছেন—অনেক বাঙ্গালী-পরিবার বাঙ্গালার বাহিরে স্থায়িভাবে বাস করেন—বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যই সকলের যোগসূত্র। নানা প্রদেশ হইতে বাঙ্গালী সাহিত্যিকরা বাঙ্গালা সাহিত্য সমৃদ্ধ করিয়াছেন। বর্ষে বর্ষে প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের সাহিত্য-সম্মেলন যে বাঙ্গালা সাহিত্যের অশেষ কল্যাণজনক ইহা স্মরণ রাখিয়া, মতভেদে বিভ্রান্ত না হইয়া তাঁহারা ঐক্যের—লক্ষ্যের পথে জয়যাত্রায় অগ্রসর হইবেন।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের বিভিন্ন শাখার সভাপতিগণের অভিভাষণের সংক্ষিপ্তসার উদ্ধৃত করিবার স্থানাভাব। এজন্য কেবল অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ ও সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণের সারাংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"• • বারাণসী আর্য্য-সংস্কৃতির মাতৃপুরী। ভারতের সকল প্রান্তের সহিত ইহার অচ্ছেদ্য যোগ। অগণিত প্রণালী দিয়া যুগে যুগে ইহার সহিত ভারতের ভাবধারার বিনিময় হইয়া আসিতেছে। হিন্দুসভ্যতার মুখ্যপীঠরূপে অতি প্রাচীন সময় হইতে কাশীধাম প্রসিদ্ধ। সুদূর অতীতে বৈদিক সময়ে ইহার প্রতিষ্ঠার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর্য্যসভ্যতার যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষগণের পাদস্পর্শে ইহা গৌরবিত। ভগবদবতার গৌতমবুদ্ধের ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের স্মৃতি ইহার উপকণ্ঠে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে। সাক্ষাৎ শঙ্করাবতার আচার্য্য শঙ্কর ভারতীয় দর্শনের চরম তত্ত্ব অদ্বয়ব্রহ্মবাদের প্রতিষ্ঠাতারূপে এই শিবপুরীর মর্ম্মস্থলে অধিষ্ঠিত। এই স্থানেই বাঙ্গলার নিজস্ব অধ্যাত্ম-দৃষ্টির প্রতীক শ্রীগৌরাঙ্গদেব বৈদান্তিককেশরী প্রকাশানন্দ বা প্রবোধানন্দকে অভিভূত করিয়া প্রেম-ভক্তি ধর্ম্মের বৈজয়ন্তী উড্ডীন করেন। ভক্তকবি তুলসীদাস এইখানেই দ্বিতীয় বাল্মীকিরূপে রামনাম মহিমা প্রচারে অপূর্ব্ব সাধুজীবনের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার অগণিত মঠ, আখড়া, দেবমন্দির প্রভৃতির মধ্যে ভারতের অধ্যাত্ম জীবনের

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুত প্রমথনাথ তর্কভূষণ

বিচিত্র কাহিনী নিহিত আছে। সুদূর অতীতের কথা ছাড়িয়া দিলেও বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বদিক্ হইতে সেতুর উপর দিয়া রেলপথে ইহার সমীপবর্ত্তী হইলে রাজঘাট হইতে অসি পর্য্যন্ত বিস্তৃত পৃথিবীতে অতুলনীয় যে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি তীর্থরাজির ছবি চক্ষুর সমক্ষে উদ্ভাসিত হয়—মনে হয় যেন শ্বেতরক্ত-হরিদ্বর্ণের মহার্ঘরত্নে-খচিত পুরলক্ষ্মীর মুকুট উত্তরবাহিনীর প্রবাহ হইতে উত্থিত হইয়াছে—এই ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত আধুনিক বারাণসী গত চারি শত বৎসরের নির্ম্মাণ। রাজা মানসিংহের সময় হইতে ইহা স্তরে স্তরে গড়িয়া উঠিয়াছে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্র-শক্তির উত্থানের সহিত ইহার সমৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট। পরে হিন্দু সামন্তরাজগণ ও বিভিন্ন প্রদেশের ভূম্যধিকারিগণ এই তীর্থসোপানের ঐশ্বর্য্য বর্দ্ধিত করেন। রাণামহল, রাজা জয়সিংহ-নির্ম্মিত মানমন্দিরের ঘাট, সিন্ধিয়া ঘাট, মহীশূর ঘাট, পেশোয়া

ঘাট, অহল্যাবাঈয়ের ঘাট প্রভৃতি এই ইতিহাসের প্রস্তরময় সাক্ষ্য।

"কিন্তু এই শিলাময় তীর্থসোপান ও প্রাসাদের ঐশ্বর্য্য বারাণসীর বাহ্যরূপ মাত্র। প্রকৃত পরিচয় বারাণসী বিদ্যা ও তপস্যার ক্ষেত্র-স্বরূপ। * * আধুনিক বারাণসীর ইতিকথায় যে সকল পণ্ডিত-ধুরন্ধর প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন, এবং যে সকল বংশ পুরুষানুক্রমে সংস্কৃত বাঙ্‌ময়ের চর্চ্চায় নিরত ছিলেন—তাঁহাদের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ এক মনোরম ও শিক্ষাপ্রদ কাহিনী। নানাশাস্ত্রবিৎ দাক্ষিণাত্য-গ্রন্থকার অপ্যয়দীক্ষিত সপ্তদশ শতকে এখানে বাস করেন। দিল্লী-বল্লভ-পাণি-পল্লব-তলে তরুণ বয়স অতিবাহিত করিয়া পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ তাঁহার বিচিত্র শেষজীবন এখানে যাপন করেন। প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ভট্টোজি দীক্ষিত এখানকার অধিবাসী ছিলেন। ভট্টবংশ এই নগরে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। ছত্রপতি শিবাজীর সমকালীন গাগাভট্ট, নারায়ণভট্ট, স্মার্ত্ত কমলাকরভট্ট, নৈয়ায়িক দিনকরভট্ট, প্রভৃতি এই পুরীর অলঙ্কার। বহু দিন ধরিয়া গৌড়, সারস্বত, কান্যকুব্জ, সরযু-পারীয় ব্রাহ্মণগণের সহিত দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের বিদ্যা ও সন্ন্যাসাধিকার লইয়া বিরোধ চলে। এই দুই সম্প্রদায়ের প্রতি-যোগিতা, পরস্পর ব্যবহার, স্ব স্ব প্রাধান্য স্থাপনের কৌশল, সংস্কৃত পাণ্ডিত্যের ইতিহাসে এক পরম কৌতূহলোদ্দীপক পর্ব্ব—আজ জাতির স্মৃতি হইতে প্রায় মুছিয়া যাইতেছে। বিগত কিঞ্চিদধিক শত বৎসরের কাশীধামস্থ পণ্ডিতসমাজের বৃত্তান্ত সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ-ভাবে যাহা অবগত হইয়াছি, তাহাতে সংস্কৃত বিদ্যার পীঠস্বরূপ ইহার অতীত গৌরবের কিছু আভাস পাওয়া যায়। সহিষ্ণুতা ও তিতিক্ষার মূর্ত্তি কাকারাম পণ্ডিত যিনি তপ্তমুদ্রাসম্পর্কিত আন্দোলনে নানা ভাবে লাঞ্ছিত হন অথচ নির্ব্বিকারে অম্লানবদনে সকল সহ্য করেন, অতোবল পণ্ডিত—যিনি শুধু পুঁথির পাণ্ডিত্যে নয়, পরন্তু ভাস্কর্য্য, পাকপ্রণালী প্রভৃতি সকল বিষয়ে নিপুণ ছিলেন,—এ যুগের প্রারম্ভে উল্লেখযোগ্য। শতাব্দী পূর্ব্বেও বেদপাঠ ও শাস্ত্রবিচারে বারাণসী নিত্যমুখর ছিল—পাণ্ডিত্যের সে সমৃদ্ধি স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়! পরম পূজ্যপাদ জ্ঞান-বৈরাগ্যের অপূর্ব্ব সমন্বয়মূর্ত্তি মদীয় আচার্য্য বিশুদ্ধানন্দ স্বামীজি বলিতেন—বাল্যে সন্ন্যাসগ্রহণের পর মীমাংসাশাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়া তিনি যখন এখানে উপনীত হন, তখন এক শত জন এমন মীমাংসক ছিলেন, ভাষ্যবার্ত্তিক শুদ্ধ আদ্যো-পান্ত জৈমিনিসূত্রের সকল অধিকরণ—যাঁহাদের নখাগ্রে ছিল। কালক্রমে তাঁহার জীবদ্দশাতেই এরূপ অবস্থা দাঁড়ায় যে, এই মীমাংসা-পারদর্শী পাণ্ডিত্যের প্রতিনিধিরূপে তিনি একাকীই রহিয়া গিয়া-ছিলেন। প্রথম জীবনে আমি যে সকল পণ্ডিত-শিরোমণির সংস্পর্শ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম, তাঁহারা এক এক শাস্ত্রে পারদর্শী, অথচ সর্ব্বশাস্ত্রে গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহাদের স্মরণ করিলে সম্ভ্রমে মাথা নত হয়। জ্যোতিষ-ভাস্কর বাপুদেব শাস্ত্রী ও সুধাকর দ্বিবেদী, সীতারাম শাস্ত্রী, গঙ্গাধর শাস্ত্রী, শাম শাস্ত্রী, বৈয়াকরণকেশরী দামোদর শাস্ত্রী, তাতিয়া শাস্ত্রী এবং শিবকুমার শাস্ত্রী প্রভৃতি যখন কোনও শাস্ত্রবিচার-সভায় একত্রে সমবেত হইতেন, তখন তাহা বৃহস্পতিসভার শোভা ধারণ করিত। অতি প্রগলভ পণ্ডিতেরও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে হৃৎকম্প হইত। শুধু সংস্কৃত বিদ্যার কেন্দ্ররূপে বারাণসীর গৌরব নহে। অধ্যাত্মবিদ্যা, তপস্যা ও বৈরাগ্যের যে সব পুণ্যবিগ্রহ গত বর্ষশতকের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং যোগবলে অন্তে তনুত্যাগ করিয়া সাধনার পরাকাষ্ঠা দেখান—ভাবানন্দ স্বামী, ব্যাসজী, তৈলঙ্গ স্বামী, বিশুদ্ধানন্দ স্বামী—তাঁহাদের কাহিনী চিরতরে উত্তর-পুরুষগণের জ্ঞানপরিধির বাহিরে যাইয়া পড়িতেছে।

"বারাণসী নিখিল-ভারতের বিদ্যাতপঃকেন্দ্র হইলেও বিশেষ ভাবে ইহাকে বঙ্গভূমির প্রত্যন্তদেশ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কারণ, এই মহানগরীর জীবন-নাট্যের মধ্যে অনেকখানি ভূমিকা বাঙ্গালীই গ্রহণ করিয়াছে। চৈতন্যদেবের সময় হইতে বঙ্গদেশের সহিত ইহার যোগাযোগ আনুপূর্ব্বিক ভাবে অনুসরণ করা যায়। কিন্তু তাহারও পূর্ব্বে গৌড়ের নন্দনবাসী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণবংশে জাত সুপ্রসিদ্ধ কুল্লুকভট্ট এখানে মন্বর্থমুক্তাবলী রচনা করিয়াছিলেন। হুসেন সাহের সচিবপদ উপেক্ষা করিয়া শ্রীরূপ এখানে আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের চরণে শরণ লন। তাঁহার প্রেরণায় সপ্তগোস্বামী যখন বৃন্দাবনের তীর্থরাজির আবিষ্কারে উদ্‌যুক্ত হন, তখন বঙ্গ হইতে যাতায়াতের প্রশস্ত রাজপথের মধ্যবর্ত্তিরূপে বারাণসীর সহিত বাঙ্গালার ঘনিষ্ঠতা উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে। প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক মধুসূদন সরস্বতীর সহিত এখানে শ্রীজীবগোস্বামী বেদান্তশাস্ত্রের চর্চ্চা করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বারাণসীধামের যে অখিল ভারতীয় পাণ্ডিত্যের গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যেও বাঙ্গালার মনীষা যে সম্মান পাইয়াছিল, আজ তাহা অল্প লোকেরই নিকট পরিজ্ঞাত। এখানকার কুইন্স কলেজসংলগ্ন সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক চন্দ্রনারায়ণ তর্কপঞ্চানন উহার অন্যতম প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন, এবং তদীয় বংশধর চারি পুরুষ ঐ পদেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সুবিখ্যাত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন এখানে বঙ্গদেশীয় পাণ্ডিত্যের গৌরব বিশেষ ভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন; আজও তাঁহার স্মৃতি সমুজ্জ্বল রহিয়াছে। বাচস্পত্যের সম্পাদক তারানাথ তর্ক-বাচস্পতি এবং আলঙ্কারিক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ এই মোক্ষপুরীতে জীবনের শেষভাগ শাস্ত্রচর্চ্চা ও অধ্যাত্মচিন্তায় যাপন করেন। পরম পূজনীয় মদীয় অধ্যাপক কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি এবং ন্যায়দর্শনে সাক্ষাৎ গৌতমাবতার বলিয়া পরিগণিত পূজ্যপাদ রাখালদাস ন্যায়-রত্ন—ইঁহাদের নিকট কিরূপ শ্রদ্ধা সম্ভ্রম পাইতেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী যখন সাকার উপাসনার বিরুদ্ধে নিজমতস্থাপনার্থ পূর্ব্বদিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হন, তখন কাশীরাজসভাপণ্ডিত পরমারাধ্য তারাচরণ তর্করত্ন মহাশয় তাৎকালীন পণ্ডিতসমাজের মুখপাত্র হইয়াছিলেন। ইংরেজ-আমলের প্রথমাবস্থা হইতে বিশেষতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর বাস ও কৃতিত্বে কাশীধাম সমৃদ্ধ হয়। পুণ্যশ্লোক রাণী-ভবানীর অতুলনীয় কীর্ত্তি এতৎসম্পর্কে স্মরণীয়। তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালার জমিদারগণও এখানে বসতি—দেবমন্দির—অন্নসত্র স্থাপন করেন। ধর্ম্মার্থ দানের জন্য পুঁটিয়া, কুচবিহার, নদীয়া, আন্দোরিয়া, শীতলী বিদ্যাময়ী প্রভৃতির নাম আজও কীর্ত্তিত হইতেছে। বঙ্গের বাহিরে বারাণসীতেই বাঙ্গালীর প্রবাস নিজ-বাসভূমিতে পরিণত হয়। এখনও দশাশ্বমেধ হইতে কেদারঘাট পর্য্যন্ত তীর্থশ্রেণী সায়ংপ্রাতঃ বাঙ্গালী-নরনারীর সমাগমে সজীব এবং মুখর হইয়া সেই কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়, পূজা-পার্ব্বণে বাঙ্গালী-জীবনের সহিত ইহার নিবিড় সংযোগের সাক্ষী দেয়। পূর্ব্বে

এ সকল দৃশ্য আরও বহুল পরিমাণে লক্ষিত হইত। এই নগরের তান্ত্রিক মঠগুলি, যথা—কামাখ্যা মঠ, রাজগুরু মঠ প্রভৃতি বাঙ্গালার অধ্যাত্মজীবনের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ-সংযোগ প্রমাণ করে। বারাণসী সংস্কৃত বিদ্যার মর্ম্মস্থল, ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনা-পীঠ, আর্য্যভাব-সম্পদের আকর—ইহা অতীতের যেমন সত্য ছিল, বর্ত্তমানেও তেমনই। কালধর্ম্মে এই বৈশিষ্ট্যের হয় ত কিছু হানি হইয়াছে—তথাপি সমগ্র দেশের অবস্থার তুলনায় ইহার প্রাধান্য অদ্যাপি অবিসংবাদিত। এ কারণ ইহার সহিত আত্মীয়তা বাঙ্গালী হিন্দুর আস্তিক্যের অন্যতম রক্ষা-কবচ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমান সময়ে কাশী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন ও আধুনিক রীতিতে এই ইতিহাস-বিশ্রুত ধামের বিদ্যাগৌরব রক্ষা করিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সকল কারণে ইহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালার সংস্কৃতির পক্ষে সমূহ কল্যাণের নিদান বলিয়া মনে করি, এবং উহার রক্ষা ও বিস্তারকল্পে ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত উভয়বিধ প্রযত্ন আবশ্যক।"

পরিসমাপ্তিতে তর্কভূষণ মহাশয় বঙ্গসাহিত্যের কল্যাণ-কামনায় যে সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—তাহা সাদরে গ্রহণযোগ্য।

"* * এই ইতিবৃত্তে বাঙ্গালীর বিশিষ্ট স্থান আছে, ইহা তাহার একমাত্র হেতু নহে। প্রধান কারণ ইহাই যে, সংস্কৃত বাঙ্ময় ও ভারতের চিরাগত ভাবসম্পদ্ আমাদের প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টি ও প্রসারকল্পে মাতৃস্তন্যের মত সুদূর ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত কার্য্য করিবে। শব্দসম্পদ্ বৃদ্ধির জন্য শ্রুতি-পুরাণ-সাহিত্য-দর্শনে ও শিল্পশাস্ত্রে সমৃদ্ধ এই আদি-জননীর বক্ষোলগ্ন হইয়া আমাদিগকে বহু দিন যাবৎ থাকিতে হইবে। বাঙ্গালা ভাষার প্রকাশ-ক্ষমতা অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার তুলনায় সমৃদ্ধ, ইহা সত্য। য়ুরোপীয় বিশ্বজনীন ভাষাগুলির পার্শ্বেও ইহার লজ্জায় নত—সঙ্কুচিত হইয়া অন্তঃপুরে পলায়নের কারণ নাই। তবুও দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যথেষ্ট অপূর্ণতা আছে। দেবভাষার ভাণ্ডারে গ্রহণ করিবার মত যাহা কিছু আছে, তাহা আত্মসাৎ করা প্রয়োজন। বঙ্গবাণীকে তাহার চরম সম্ভাব্যতায় পৌঁছিতে হইলে সুনির্ণীত পরিকল্পনা অনুসারে এই বিপুল-ভাব-ভাষাজননীর কুক্ষিস্থ সম্পদ্ নিঃশেষে আহরণ করিতে হইবে। * *

"ইংরেজ-অধিকারের পূর্ব্বে এবং অদ্যাবধিও ভারতীয় ঐক্য ও অখণ্ডতাবোধের একটি মূল হইয়াছে সংস্কৃত ভাষা। সংস্কৃতবিদ্যার প্রবাহই এই মহাদেশের দিকে দিকে কৃষ্টি বহন ও বিতরণ করিয়াছে। এই খাতে যত দিন স্রোত ছিল—জোয়ার-ভাটা খেলিত—তত দিন ভারতের নিজস্ব বাণী উৎসারিত হইত নানা মৌলিকরচনায়, নব নব চিন্তাধারায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত তাই সংস্কৃতভাষা ছিল বহুপ্রসূতি, কিন্তু তদবধি সে প্রাণস্রোত ক্ষীণ হইতে চলিয়াছে—সৈকতের অভ্যন্তরে ফল্গুর মত হইতেছে অদৃশ্য। ভারতের বাণী বলিয়া বিশ্বের দরবারে যাহা উপস্থত হয়, তাহা সেই পুরাতনী বাণীর তর্জ্জমা মাত্র। জাতি এখনও তাহার নিজের আত্মাকে ফিরাইয়া পায় নাই। গত দেড় শত বৎসরে ভারতীয় সংস্কৃতির দূতরূপে যাঁহারা পাশ্চাত্ত্যে সম্মান পাইয়াছেন এবং বিশ্বসভায় এ দেশকে পরিচিত করিয়াছেন—তাঁহাদের কৃতিত্ব এই অনুবাদের কার্য্যে—বৈদেশিক ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া, তাহাতেই রূপান্তরিত করিয়া বৈদেশিকের মনোরঞ্জনে এবং তাহারই উদ্দেশ্যের অনুকূলতা সম্পাদনে। যে নদী পথহারা হইয়াছে, সেই মরা-গাঙ্গে আবার বান ডাকিবে কি না কে জানে? কিন্তু জাতি যদি জীবন্ত থাকে, তাহা হইলে সে তাহার উদ্ভাবিনী শক্তি, মৌলিকপ্রতিভা নিশ্চয়ই এক দিন ফিরাইয়া পাইবে। সেই সুদিনে জাতির মর্ম্মকথা ও তথ্য-প্রকাশের প্রকৃষ্ট বাহন হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করা বঙ্গবাণীর পক্ষে সম্ভব বলিয়া মনে করি। * *

"ফরাসী-বিপ্লবের পুরোগামী মনীষিগণের বিশ্বকোষসংকলন হইতে বঙ্গবাসীকে সকল সম্পদে, সকল ঐশ্বর্য্যে সজ্জিত করা কোনও অংশে ন্যূন নহে—বরং বর্ত্তমান জ্ঞানবিজ্ঞান-প্রসারের এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমের ভাববিনিময়ের যুগে আরও দুরূহ, আরও মহনীয় অনুষ্ঠান। বঙ্গভাষাকে যদি নিজগুণে ও শক্তিতে ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার মধ্যে উপস্থিত মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে এই বিপুল প্রচেষ্টায় উদ্‌যুক্ত হইতে হইবে। কোন্ ভাষা ভারতের রাষ্ট্রভাষা, হাটবাজারের ভাষা হইবে—ইহা লইয়া রাজনৈতিকগণ বিবাদ করিতে থাকুন। অনুরোধ, কেবল এই ভাষার-কোন্দলে শতধা-বিভক্ত দেশবাসীকে যেন আরও বিভক্ত, আরও পরস্পর-বিদ্বেষী করা না হয়। ইতিমধ্যে যে ভাষা ও ভাবের সম্পদ্ বঙ্গবাসীর ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়াছে—তাহার সমুচিত প্রয়োগ করিয়া আমাদের মাতৃভাষার সজ্জাকে আরও সমৃদ্ধ করা আমাদের কর্ত্তব্য। যাঁহাদের লেখনীতে বাগ্‌দেবী স্ফূর্ত্তি, সরসতা ও প্রবাহ দিয়াছেন, তাঁহারা যদি কবি-প্রতিভায় হীন হন—তাহা হইলে শুষ্ক অপ্রসিদ্ধিদুষ্ট শব্দজালে বিড়ম্বিত চূর্ণককাব্যরচনা হইতে বিরত হইয়া কৃষ্টির প্রকৃত প্রসার-কল্পে আত্মনিয়োগ করুন। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শেষজীবনে সহজ সাধারণপাঠ্য বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ-রচনায় তাঁহার অসাধারণ শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। বাগ্‌দেবীর প্রসাদে তিনি যে পরশ-পাথর পাইয়াছিলেন, তাহার স্পর্শে সকল বিষয়ই কাঞ্চনের শোভা ধারণ করিত, তাঁহার লেখনীমুখে সকল বস্তু উপাদেয়, মনোরম হইয়া উঠিত। শুধু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নয়, পরন্তু পুরাণ ও ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব ও সমালোচনায়, শিশু-সাহিত্য, শিল্পকলা ও দর্শনে—সংক্ষেপে চতুঃষষ্টি বিদ্যার প্রত্যেকটিতে বঙ্গভাষায় যদি শ্রেষ্ঠ পুস্তক রচিত হয়, তাহা হইলে লোক-হৃদয়ের উপর ইহার অধিকার ও প্রভাবে কে সীমারেখা টানিয়া দিতে পারিবে? বাঙ্গালা ভাষায় যদি শ্রেষ্ঠ অভিধান Classical ও Biblical Dictionary-র অনুরূপ শ্রেষ্ঠ পুরাণকোষ, বিশ্বকোষ রচিত হয়—বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার শ্রেষ্ঠ সম্পদ, যথা—সুরদাসের কবিতা, দাক্ষিণাত্যের ভক্তগণের ভজনসংগীতমালা, রাজস্থানের চারণকবিগণের গাথা সংগৃহীত হয়। শুধু বঙ্গ-পরিচয় নহে, ভারত-পরিচয়, পৃথিবী-পরিচয় পাইতে হইলে বাঙ্গালা ভাষাই আশ্রয়ণীয়, এরূপ ধারণা যদি ভারতের সর্ব্বত্র শিক্ষিত সমাজে প্রসার লাভ করে—এক কথায় ইংরেজীর আদর্শে সর্ব্বদেশের বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য অনুবাদের দ্বারা মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বনে যদি একত্রিত করা হয়, তাহা হইলে ইহার বিজয়াভিযানে কোন বাধাই দাঁড়াইতে পারিবে না।"

আমরা আশা করি, প্রতিভাবান্ সাহিত্য-সাধকগণ তর্কভূষণ মহাশয়ের এই পরিকল্পনা—অন্তিম কামনা পূর্ণ করিতে যত্নবান্ হইবেন।

সাহিত্য-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত আধুনিক সাহিত্যের পরিচয়-প্রসঙ্গে তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণে বলিয়াছেন—

"আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের যে গৌরব, তার প্রধান উপাদান আমাদের লিরিক কাব্যের ঐশ্বর্য্য। আধুনিক বাঙ্গালী কবি এ ঐশ্বর্য্যে প্রাচীন বৈষ্ণব-কবিদের উত্তরাধিকারী এবং রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভাও ঐ কাব্যের আশ্চর্য্য বৈচিত্র্য ও পরম উৎকর্ষে বাঙ্গালা লিরিক কাব্যকে পৃথিবীর যে কোন ভাষার লিরিক কাব্যের সমতুল্য করেছে। তার মহা প্রতিভার সৃষ্টি যদি ছেড়ে দেওয়া যায় তবে আজকের দিনে বিদেশের কবিরা এ কাব্য রচনা করেছেন তার তুলনায় আমাদের স্ব স্ব প্রতিভাশালী আধুনিক কবিদের কাব্য কিছু লজ্জা পায় না। ছোট গণ্ডী-ঘেরা আমাদের জীবনের স্বল্প পরিসরের মধ্যেও যে এটা সম্ভব হয়েছে, তার কারণ আছে লিরিক কাব্যের প্রকৃতির মধ্যে। লিরিক মনের অনুভূতিকে কাব্যের রূপে গড়ে তোলে। এবং সে রূপের প্রকাশ যতই বিচিত্র হোক, এবং অনুভূতি প্রধানতঃ মানুষের স্থায়ী ও চিরন্তন অনুভূতি। সেই জন্য আমাদের জীবনের অপ্রাশস্ত্য আমাদের কবিদের লিরিক প্রতিভা-বিকাশের বিশেষ প্রতিবন্ধক হতে পারেনি। অনুভূতির সূক্ষ্মতা ও গভীরতায় জীবনের প্রসার-হীনতাকে তাঁহাদের প্রতিভা অতিক্রম করেছে। কিন্তু যে কাব্য ও সাহিত্য মানুষ ও তার জীবনকে সৃষ্টি করে, আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বৈচিত্র্যহীন ক্ষুদ্রতা সেই সৃষ্টি প্রতিভা-বিকাশের প্রবল অন্তরায়। নরনারীর জীবনের কবির অভিজ্ঞতা তাঁর সৃষ্টির মূল উপাদান। কবির কল্পনার রসায়নে তারা অলৌকিক রূপ পায় সত্য, কিন্তু উপাদানের লাঘবে রসায়ন হয় ব্যর্থ। বাঙ্গালী কবি ও সাহিত্যিক যে বাঙ্গালী নর-নারীকে সাহিত্য সৃষ্টি করবে কি তাদের জীবনের পরিধি, কি ভাব ও ঘটনা তাদের জীবনে সম্ভব যা বড় সৃষ্টির উপাদান হতে পারে? সেই জন্য আমাদের নাটক, উপন্যাস, ছোট গল্প, লিরিক ছাড়া অন্য কবিতা সাহিত্যের সে স্তরে পৌঁছেনি, যে স্তরে আমাদের লিরিক কাব্য পৌঁছেচে। বিদেশী শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুলির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যের এ সব অংশ এক পংক্তিতে দাঁড় করান চলে না। আমাদের জীবনের দৈন্য ও খর্ব্বতা আমাদের এ সাহিত্যকে খাটো করে রেখেছে। রাষ্ট্র ও সমাজে আমাদের মুক্তি না ঘটলে আমাদের সাহিত্যিক সৃষ্টি-প্রতিভাও মুক্তি পাবে না। রাষ্ট্র ও সামাজিক জীবন বড় ও বিচিত্র হলেই যে বড় সৃষ্টি হয় তা নয়। বড় প্রতি-ভার জন্ম না হলে সে জীবন-সাহিত্যে নিষ্ফল থেকে যায়। কিন্তু সে জীবনের অভাবে বড় প্রতিভাও সৃষ্টির উপযুক্ত উপাদান না পেয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ সফল করতে পারে না। আজ যদি কোনও বাঙ্গালী টলষ্টয়ের প্রতিভা নিয়ে জন্মে War and Peaceএর মত উপন্যাস তাঁর লেখা সম্ভব হবে না।"

সাহিত্য-সৃষ্টির পরিকল্পনা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন :—

"এ সব মেনে নিয়েও মনে হয়, বাঙ্গালা সাহিত্যে সৃষ্টির পটভূমি আরও একটু বিস্তৃত হয়, যদি আমাদের সাহিত্যে বাঙ্গালার বাহিরের ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীকে আত্মসাৎ করতে থাকে। বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর সঙ্গে এ ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর যতটা গরমিল তাতে কোনও অস্বাভাবিকতায় সাহিত্যের ছন্দ ভঙ্গ না করে প্রতিভাবান্ বাঙ্গালী সাহিত্যিক এঁদের বাঙ্গালা সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন এবং তাতে বাঙ্গালা সাহিত্যে সৃষ্টির বৈচিত্র্য আসে। সে বৈচিত্র্যের অভাব আমাদের সাহিত্যের বড় অভাব, অবাঙ্গালী ভারতবাসীর জীবন যে বাঙ্গালীর জীবনের চেয়ে প্রশস্ততর তা বলছিনে, কিন্তু সমগ্র ভারতবাসীর জীবন কেবলমাত্র বাঙ্গালীর জীবনের চেয়ে বিচিত্রতর এবং সে বৈচিত্র্য মূলগত ঐক্যের বৈচিত্র্য।

"কিন্তু সাহিত্য ত ফরমাসী বস্তু নয়। কর্ত্তব্যবোধে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না, অখণ্ড ভারতের প্রতি কর্ত্তব্যবোধেও নয়। বাঙ্গালী সাহিত্যিক অ-বাঙ্গালী ভারতীয় নরনারী তার সাহিত্য সৃষ্টি করচে। তাহাতে যদি তাদের জীবন তার অনুভূতিকে স্পর্শ করে সৃষ্টির প্রেরণা জাগায়। সেজন্য প্রয়োজন, সে জীবনের সঙ্গে পরিচয়। এই পরিচয়-সাধনের কাজে প্রবাসী বাঙ্গালী ও 'প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন' সহায় হতে পারেন।

"একদা বাঙ্গালা ভাষায় অ-বাঙ্গালী ভারতবাসীর জীবনের উপাদানে সাহিত্য-সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছিল—প্রধানতঃ রাজপুত বীরত্বের প্রকৃত ও কল্পিত কাহিনী অবলম্বনে। সে সৃষ্টির মূলে পরিচয়ের কোনও নিবিড়তা ছিল না এবং তার প্রয়োজন বোধও ছিল না। তৎকালে প্রচলিত "রোমান্টিক" মনোভাবের সঙ্গে স্বদেশপ্রেমের মিলনে এ সাহিত্যের উদ্ভব। বাঙ্গালার ইতিহাসে "রোমান্টিক" বীরত্বের কল্পনার উপাদান তখন অজ্ঞাত থাকায় বাঙ্গালী লেখক কর্ণেল টডের গ্রন্থ আশ্রয় করেছিলেন এবং তাকেই যথেষ্ট মনে করেছিলেন। কারণ, প্রকৃত নরনারীর সৃষ্টি এই সাহিত্যের লক্ষ্য ছিল না। বীরত্বশূন্য বাঙ্গালা দেশে দুর্দ্দাম ভারতীয় বীরত্বের কাহিনী প্রচারই যথেষ্ট রসসৃষ্টি মনে হয়েছিল। সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য জীবনের সঙ্গে কোন পরিচয়ের প্রয়োজন, পরিচয়নিরপেক্ষ এই সাহিত্য-চেষ্টা বাঙ্গালা সাহিত্যে একটা তর্জ্জনী-সঙ্কেত।

"ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে যে সব সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে, তার সঙ্গে পরিচয় সে সব প্রদেশের নরনারীর জীবনের সঙ্গে পরিচয়ের প্রধান উপায়। কিন্তু এ সব সাহিত্যের কোন পরিচয় আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যে রাখি না। এ সাহিত্যের প্রধান সৃষ্টিগুলির বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ বিশেষ কঠিন কাজ নয় এবং প্রবাসী বাঙ্গালী এ কাজে প্রথমে উদ্যোগী হবেন আশা করা অন্যায় নয়। আমি জানি, আমাদের মনে গর্ব্ব আছে যে, এ সাহিত্যে বাঙ্গালার অনুবাদযোগ্য কিছু রচনা হয় না। এ সব রচনা প্রধানতঃ বাঙ্গালা সাহিত্যেরই অনুবাদ বা অনুকরণ। এ কথা আংশিক সত্য, কিন্তু পুরো সত্য নয়। বাঙ্গালা সাহিত্য যেন প্রসন্ন উদারতায় ভারত-বর্ষের অন্য ভাষার সাহিত্যকে গ্রহণ করে, অন্য কারও হিতের জন্য নয়, বাঙ্গালা সাহিত্যের নিজের হিতে।"

রাষ্ট্রীয় ভাষা প্রচলন-সমস্যা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন :—

"হিন্দী বা হিন্দুস্থানীকে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা করার যে আন্দোলন ও চেষ্টা চলেছে, তার প্রতিবাদে অনেক বাঙ্গালী বলছেন যে, বাঙ্গালা ভাষাকেই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা করা উচিত।

তার একটি যুক্তি আমরা এই দেখাচ্ছি যে, বাঙ্গালা ভাষা আধুনিক সাহিত্যের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। 'টাইমস্‌' কাগজের সাহিত্যিক ক্রোড়পত্রের প্রশংসাপত্রও আমরা দলিল করেছি যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যে দু'টি মাত্র বড় সাহিত্য আছে—ইংরেজী সাহিত্য ও বাঙ্গালা সাহিত্য। নিরপেক্ষ আদালতে আমাদের ভাষার এই সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবী সম্ভব ডিক্রি হবে। কিন্তু ভারতবর্ষের জনসাধারণের এতটা সাহিত্যপ্রীতি আমরা কিসে অনুমান করছি যে, সাহিত্যের উৎকর্ষের জোরেই তারা ভাষাকে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা বলে স্বীকার করে নেবে? যে দিন সময় আসবে ইংরেজীর জায়গায় কোনও ভারতীয় ভাষাকে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা করার, সে দিন সমস্যার মীমাংসা হবে—ভাষার সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে নয়, ভাষাভাষীদের সংখ্যা ও রাষ্ট্রীয় বল দিয়ে। বাঙ্গালী সে সংখ্যা ও বলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে কি না, সে তর্ক নিষ্প্রয়োজন।"

অভিভাষণ সমাপ্তিতে তিনি বলিয়াছেন,—

"আজ পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতি মরণ-উৎসবে মেতে উঠেছে, মারণযজ্ঞের আগুন ভারতবর্ষের সীমায় এসে পৌঁছেচে।—এখন কি সাহিত্য-সৃষ্টি ও সাহিত্য-আলোচনা মারাত্মক বিলাস নয়? অনন্তকর্মা হয়ে বলের চর্চা কি এখন একমাত্র কাজ নয়? প্লেটো তাঁর কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্র থেকে কবিদের নির্ব্বাসন দিতে চেয়েছিলেন, পাছে তাদের কাব্য রাষ্ট্রের জনগণের মনে মোহ ও দুর্ব্বলতা আনে। তাঁর সময়ের বাস্তব ও কল্পনার দুই-ই আজ ইতিহাসের স্মৃতি। গ্রীসের কবিদের কাব্য বেঁচে রয়েছে—মানুষের সভ্যতায় অমর হ'য়ে। যুধ্যমান সকল জাতিই প্রচার করেছেন যে, সভ্যতা রক্ষার জন্যই তাঁদের অস্ত্রধারণ; কারণ, তাঁদের শত্রুপক্ষ মানুষের সভ্যতার শত্রু। যুদ্ধক্ষেত্রে সভ্যতার সৃষ্টিও রক্ষা হয় নাই, সে যুদ্ধক্ষেত্র যতই দূরপ্রসারী হোক, তাতে বীরত্ব ও কৌশলের যতই পরিচয় থাকুক। মানুষের সভ্যতার সৃষ্টি ও রক্ষা হয়েছে কবির কাব্যে, দার্শনিকের চিন্তায়, ধর্ম্মনেতার উপলব্ধিতে, বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাশালায়। প্রচণ্ডতাকেই জীবনের চরম বিকাশ বলে স্বীকার করব না। আকস্মিককে চিরন্তনের পূজা দিয়ে তার পায়ে মাথা নোয়াব না।"

ফিরে এস পল্লীতে

সহর ত্যজিয়া আবার তোমরা ফিরে এস পল্লীতে,
আজো প্রেম-প্রীতি মাখা আছে হেথা, প্রতি তরু-বল্লীতে।
অশথের কালো ছায়া,
হয়ে জননীর মায়া—
সবুজ স্নেহের আঁচল বিছায়ে ডাকিছে আদর করি—
ফিরে এস বুকে পল্লীমায়ের যে যেথায় আছ পড়ি।

ঐ দেখ দূরে শিয়াল-কাঁটার বনে ছেয়ে গেছে যেথা,
বাপ্‌-পিতাম'র ভিটে যে তোমার আজো জাগিতেছে সেথা।
তুলসী-তলার 'পরে
সাঁঝের প্রদীপ ধ'রে—
দাঁড়ায়ে থাকিত যেথায় জননী, ঠাক্‌'মা তোমার নিতি,
সে ঠাঁই আজিকে তোমাদের তরে পাঠায় আশিস্‌-প্রীতি।

ঝিকিমিকি রোদ্‌, সহসা যখন পড়িয়া-আসিত বেলা,
উঠানে পড়িত কালো-ছায়া—গাছে বসিত কাকের মেলা।
ফুটিত ঝিঙের ফুল,
বধূ যারা বাঁধি চুল—
কলস লইয়া জলকে চলিত, কোথা গেল আজ তারা?
হাতের শাঁখার ধ্বনিতে যাদের—ঢেউগুলি দিত সাড়া।

সেই অতীতের পল্লী-সুষমা আবার আসিবে ফিরে,
সহর ত্যজিয়া তোমরা যখন আসিছ গ্রামের নীড়ে।
'গাঙুর' নদীর তীরে,
ভিড়াইয়া ভেলাটিরে,
তোমরা আসিলে, বেহুলার সনে ফিরিবে লখিন্দর,
শত-শবরীর মালা-গাঁথা হবে সার্থক সুন্দর।

কোথা বন্ধুরা পল্লীর পানে ফিরে চাও, ফিরে চাও,
কাঁদে অহল্যা পাষাণী-প্রতিমা তারে পদধূলি দাও।
গ্রাম তোমাদিকে ডাকে,
মহুয়া-বনের ফাঁকে—
আজো চেয়ে আছে সাঁঝের প্রদীপ ক্ষীণ আশা ল'য়ে চিতে,
ফিরে এস আজ তোমরা বন্ধু! ফিরে এস পল্লীতে।

কাদের নওয়াজ।

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু ও ভারত সরকার

বাঙ্গালার সর্ব্বজনমান্য নেতা শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুকে প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে ভারত সরকারের আদেশে গ্রেপ্তার করিয়া বিনা-বিচারে বন্দী করা হইয়াছে। তাঁহাকে এখন বাঙ্গালা হইতে বহু দূরবর্ত্তী ত্রিচিনপল্লী-জেলে বিনা-বিচারেই আটক করিয়া রাখা হইয়াছে। এই স্থানের জল-বায়ু তাঁহার স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে, এবং জেলে যে খাদ্য-দ্রব্য প্রদান করা হয়, তাহা আহার করাও তাঁহার পক্ষে কষ্টকর; কিন্তু জীবন-ধারণের জন্য তাহাই তাঁহাকে গলাধঃকরণ করিতে হয়। জাপানের সহিত যোগের অভিযোগে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে; কিন্তু ভারত সরকার বাঙ্গালা সরকারের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়াই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। ভারত সরকার না কি বাঙ্গালার লাটের সহিতও এ সম্বন্ধে কোন পরামর্শ করেন নাই। বাঙ্গালার মন্ত্রীরা তাঁহাকে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নাই। দেশের লোক একবাক্যে দাবী করিয়াছেন, হয় কোন বিশেষ ভাবে সংগঠিত আদালতে তাঁহার বিরুদ্ধে আরোপিত অপরাধ প্রতিপন্ন করা হউক, তাঁহাকে আত্ম-সমর্থনের সুযোগ দান করা হউক, অথবা তাঁহাকে মুক্তি-দান করা হউক। কিন্তু ভারত সরকার দেশের লোকের এই সঙ্গত দাবীতে এ পর্য্যন্ত কর্ণপাত করিলেন না! এরূপ একটি দায়িত্বপূর্ণ ব্যাপারে লোকমতে ভারত সরকারের অবিচল উপেক্ষা দেশের লোকের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষোভ ও বিস্ময়ের বিষয়। ভারত সরকার তাঁহাদিগের গুপ্তচরের বা কোন পদস্থ কর্ম্মচারীর নিকট শরৎ বাবুর প্রতিকূলে যে সকল কথা শুনিয়া তাঁহাকে আটক করিয়াছেন, তাহা একদেশদর্শিতা ও ভ্রমের ফল হইতে পারে, এই যুক্তিতেও কি শরৎ বাবুকে আত্মসমর্থনের সুযোগ দেওয়া উচিত নহে? তাঁহাদিগের লব্ধ সংবাদ অভ্রান্ত, এরূপ মনে করিবার কারণ কি? শরৎ বাবু স্বদেশের স্বাধীনতাপ্রার্থী। এ অবস্থায় তিনি জাপানের আনুগত্য স্বীকার করিয়া স্বদেশের মুক্তির ব্যবস্থা কিরূপে করিতে পারেন, সুস্থ লোকের কল্পনায় তাহা নির্দ্ধারণের উপায় নাই।

বড়লাট যখন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন বাঙ্গালার সচিবগণের নিকট এবং সার মন্মথনাথ মুখো-পাধ্যায়ের নিকটও শরৎ বাবুকে মুক্তিদানের প্রসঙ্গে অনেক কথাই শুনিয়াছেন এবং ইহাও প্রকাশ যে, কলিকাতায় বড়লাটের শাসন-পরিষদের যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতেও শরৎ বাবুর মুক্তিপ্রসঙ্গের আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু সমস্তই নিষ্ফল হইয়াছে; শরৎ বাবুর মুক্তিদান সম্বন্ধে ভারত সরকার এখনও সম্পূর্ণ নির্ব্বাক্! সরকার এ দেশে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের পক্ষপাতী শরৎ বাবুর সেই প্রশংসনীয় চেষ্টা যখন সাফল্যের পথে অগ্রসর, ঠিক সেই সময় তাঁহাকে গ্রেপ্তার এবং বিনা-বিচারে আটক করিয়া কি তাঁহার কার্য্যের পুরস্কার প্রদান করিলেন? যুদ্ধের এই সঙ্কটজনক অবস্থায় সরকার এ দেশের লোকের সহানুভূতি ও সমর্থন লাভের জন্য আগ্রহবান্; কিন্তু দেশের সর্ব্বজনমান্য নেতাকে বিনা-বিচারে এই ভাবে অনির্দ্দিষ্ট কাল আটক রাখিলেই কি সরকারের সেই আশা পূর্ণ হইবে? বাঙ্গালা প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করিয়াছে, কিন্তু সেই প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের কি ইহাই প্রকৃত রূপ? শরৎ বাবুকে উপযুক্ত বিচারালয়ে আত্মসমর্থনের সুযোগ দান করিয়া ভারত সরকার এ দেশবাসীর সঙ্গত অনুরোধে কর্ণপাত করিবেন—নিখিল বঙ্গের অধিবাসীরা এখনও এইরূপ দাবী করিতেছেন। ভ্রম-সংশোধনের সুযোগ উপেক্ষা করিয়া তাহা অসঙ্গত জিদে পরিণত করিলে তাহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় হয়। তাহার ফলও ভাল হয় না।

বাঙ্গালার অর্থ-সচিব ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দিল্লীতে গমন করিয়া বাঙ্গালার সচিবসঙ্ঘের পক্ষ হইতে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র-সদস্যের সহিত শরৎচন্দ্রের মুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি এক বিবৃতিতে প্রকাশ করিয়াছেন, "শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর ব্যাপার সম্বন্ধে

স্বরাষ্ট্র-সদস্যের সহিত আমার খোলাখুলি ভাবে আলোচনা হয়। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুকে শীঘ্রই মুক্তিদানের সম্ভাবনা আছে—আমি এই ধারণা লইয়া আসিয়াছি বলিলে প্রকৃত কথা বলা হইবে না।" তাঁহার উক্তি নিরাশাব্যঞ্জক।

বাঙ্গালায় শান্তি ও শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্ব যে সচিব-সঙ্ঘের, সেই সচিবসঙ্ঘ শরৎ বাবুর মুক্তি চাহিতেছেন; যে হিন্দু-মহাসভা সরকারের সমর-প্রচেষ্টায় সহযোগ করিতে সম্মত, সেই হিন্দু-মহাসভা তাঁহার মুক্তি চাহিতেছেন; যে বাঙ্গালায় নূতন সচিবসঙ্ঘ গঠনে তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সংস্থাপনে অসাধ্য-সাধন করিয়াছেন, সেই বাঙ্গালা তাঁহার মুক্তি চাহিতেছে। অথচ সমগ্র শাসন-পরিষদের সহিত পরামর্শ না করিয়া কেবল স্বরাষ্ট্র-সদস্যের সহিত একযোগে বড়লাট তাঁহাকে বিনাবিচারে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন! এ দেশের শাসন-পদ্ধতির স্বরূপ কি ইহাতেই সুস্পষ্ট নহে?

বাঙ্গালার বাজেট সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য

বাঙ্গালা সরকারের অর্থসচিব ডক্টর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দিল্লীতে গমন করিয়াছিলেন। তথায় বিভিন্ন প্রদেশের অর্থসচিব ও গবর্ণরের পরামর্শদাতৃগণ উপস্থিত হইলে সেই বৈঠকে যোগদান করিবার জন্যই বাঙ্গালার অর্থসচিবের দিল্লী গমন। বাজেট করিবার সময় তাঁহাকে দুইটি বিষয়ে অবহিত হইবার জন্য দেশের লোকের পক্ষ হইতে আমরা অনুরোধ করা প্রয়োজন মনে করি—

(১) যুদ্ধের জন্য বাঙ্গালাকে অনেক টাকা ব্যয় করিতে হইতেছে, বিশেষতঃ বাঙ্গালা সঙ্কট-মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। রেঙ্গুণে যাহা ঘটিতেছে, তাহাতে বাঙ্গালার বিপদের আশঙ্কা অল্প নহে, বরং প্রবল। যুদ্ধের জন্য বাঙ্গালার ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষতি হইতেছে, বহু লোক কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছে, অনেক দোকানপাট বন্ধ। এই সকল কারণে বাঙ্গালা সরকারের রাজস্ব-হ্রাস হওয়া অনিবার্য্য।

(২) বাঙ্গালা সরকারের এই ভাবে আয়হ্রাসের উপর দেশরক্ষার জন্য বিপুল পরিমাণে ব্যয়-বৃদ্ধি হইবে।

আমরা আশা করি, বাঙ্গালা সরকার বর্ত্তমান সঙ্কটসময়ে কোন নূতন কর ধার্য্য করিবেন না। যদি অসম্ভব না হয়, তবে দেশের সর্ব্বজননিন্দিত বিক্রয়কর বন্ধ রাখিয়া সচিব-সঙ্ঘ দেশবাসীর ধন্যবাদভাজন হইবেন—ইহাই আমরা আশা করি। যদি বাজেটে আয়-ব্যয়ে সামঞ্জস্য রক্ষিত না হয়, তাহা হইলে এই দুঃসময়ে কোন নূতন ট্যাক্স বসাইয়া দেশের লোককে বিপন্ন না করিয়া আয়ের অতিরিক্ত ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য তাঁহারা ঋণ গ্রহণ করিয়া ব্যয়ভার বহনের ব্যবস্থা করিলে নূতন সচিবসঙ্ঘের নিকট দেশবাসী কৃতজ্ঞ থাকিবে। প্রকাশ, সঙ্কটকালের অতিরিক্ত বে-সামরিক ব্যয় বাবদ বাঙ্গালা সরকার বাজেটে এক কোটি টাকা অধিক ধরিয়াছেন। বাঙ্গালা সরকার নানা ভাবে ব্যয়-সঙ্কোচ করিতেও পারেন।

ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী ইউ-স

গত ১৮ই জানুয়ারী তারিখে লণ্ডনে সরকারী দপ্তরখানা হইতে যে বিবৃতি প্রকাশিত হয়, তাহাতে জ্ঞাপন করা হইয়াছে, ব্রহ্মের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ইউ-স বৃটেন ভ্রমণে আসিবার পর তাঁহার গতিবিধি সম্বন্ধে যে সকল সংবাদ পাওয়া যায়, তাহা হইতে বৃটিশ সরকার অবগত হইয়াছেন, জাপানের সহিত যুদ্ধারম্ভের পর হইতে জাপানী কর্ত্তৃপক্ষের সহিত তাঁহার যোগ আছে। তাঁহার স্বীকারোক্তিতে সে কথা সমর্থিত হইয়াছে। সে জন্য বৃটিশ সরকার তাঁহাকে আটক রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহাকে ব্রহ্মে ফিরিতে দেওয়া সম্ভব হইবে না।

এই বিবৃতিতে ইউ-স কোথায় আছেন, তাহার কোন আভাস দেওয়া হয় নাই।

কিন্তু ব্রহ্মরক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে সরকারের যখন আলোচনা হয়, তখন তিনি অপাপবিদ্ধ ছিলেন, সরকারের কি এইরূপই ধারণা ছিল? তিনি জাপানের সহিত যোগ কি ভাবে ও কোন্ সুযোগে করিয়াছিলেন, তাহা বিবৃতিতে প্রকাশ নাই; কিন্তু তাঁহার যে উক্তি পূর্ব্বে নানা প্রসঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া মনে হয়, তিনি বৃটিশ সরকারেরই পক্ষপাতী। তাঁহার উক্তিতে অপরাধ-স্বীকারের কোন কথা পাওয়া যায় নাই। সুতরাং তাঁহার স্বীকারোক্তিতে কিরূপে অভিযোগ সমর্থিত হইয়াছে—তাহা সাধারণের বুঝিবার উপায় নাই।

ইউ-স এখন কোথায়? এ সম্বন্ধে সানফ্রান্সিস্কোর এক সংবাদে প্রকাশ, তিনি হনলুলু হইতে পৃথক্ ভাবে সানফ্রান্সিস্কোয় ফিরিয়া যান; তাহার পর আর তাঁহার দেখা পাওয়া যায় না।

জাপানীরা যখন হনলুলু আক্রমণ করে, তখন ইউ-স তথায় ছিলেন। ইউ-স গত নভেম্বর মাসে মার্কিণের প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ব্রহ্মদেশ যাহাতে স্বায়ত্ত-শাসন পাইতে পারে, সে জন্য তিনি ওয়াসিংটনে মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রের অনেক সরকারী কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগের সমর্থন লাভের চেষ্টা করেন। মার্কিণ বৈদেশিক-সচিব তাঁহার প্রতি বিশেষ সৌজন্য প্রকাশ করেন নাই। ব্রহ্মদেশকে স্বায়ত্ত-শাসন দানের জন্য তাঁহার কোন অসরল বা গোপনীয় উদ্দেশ্য থাকিলে কি তিনি এই ভাবে চেষ্টা করিতেন? ইংলণ্ড হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় জাপানের

সহিত যোগ স্থাপনের অভিযোগে তাঁহাকে আটক করা হইয়াছে, এই সংবাদে রেঙ্গুনের সকল সম্প্রদায় স্তম্ভিত হইয়াছে। নব-নিযুক্ত প্রধান মন্ত্রী সার প-টুন বলেন, "যাঁহারা আমার সহিত ইউ-স'র সচিব-সঙ্ঘে কাজ করিয়াছিলেন, আমি তাঁহাদিগকে সচিব রাখিতে চাহি। মিঃ ইউ-স যে নীতি ও কার্য্যপন্থা স্থির করেন, আমি তদনুসারে কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতেছি।"—ব্যাপারটি জটিল এবং রহস্যাচ্ছন্ন।

ডক্টর কালিদাস নাগের গ্রেপ্তার ও মুক্তি

গত ২৪শে অগ্রহায়ণ বুধবার কলিকাতা পুলিসের স্পেশাল ব্রাঞ্চ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর কালিদাস নাগকে ভারতরক্ষা বিধি অনুসারে গ্রেপ্তার করে। এই সংবাদে বাঙ্গালার শিক্ষিত-সম্প্রদায় স্তম্ভিত হইয়াছিলেন; কারণ, ডক্টর শ্রীযুত কালিদাস নাগের ন্যায় শিক্ষাব্রতী যে ভারতরক্ষা বিধির আমলে আসিবার মত কোন অপরাধ করিতে পারেন, ইহা সকলেরই ধারণার অতীত। কিন্তু ভারতরক্ষা-বিধির বিশাল বিস্তীর্ণ হুদ্দার কথা ভাবিলে "সর্ব্বসিদ্ধি" মন্ত্রের কথা মনে পড়ে—কারণ, গৃহস্থের গরু হারাইলে এই মন্ত্রবলে তাহাও বিনা-চেষ্টায় পাওয়া যায়।

যাহাই হউক, কিছু দিন পরে ডক্টর নাগকে বিনা-সর্ত্তে মুক্তিদান করায় বুঝিতে পারা গেল, হয় তাঁহাকে ভ্রম-ক্রমে আটক করা হইয়াছিল, না হয় তাঁহার বিরুদ্ধে আরোপিত অপরাধের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু দীর্ঘকাল হইতেই ভারতরক্ষা বিধির অপপ্রয়োগ হইয়া আসিতেছে। এই বিধি বহাল হইবার বহু দিন পূর্ব্বেও বঙ্গের কৃতী সন্তান নিরপরাধ অশ্বিনীকুমার দত্ত ও কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতিকে সরকার আটক করিয়া অবশেষে মুক্তিদান করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, দীর্ঘকাল হইতে একই প্রকার ভ্রমের পুনরাবৃত্তি হইতেছে। এ অবস্থায় গোয়েন্দা বিভাগের যে সকল কর্ম্মচারীর প্রতি গোয়েন্দাগিরি করিয়া দেশের সুশিক্ষিত ও সম্মানিত ভদ্রলোকদিগকে গ্রেপ্তার করিবার ভার প্রদান করা হয়, তাহাদের ভ্রম আবিষ্কৃত হইলে তাহাদিগের কর্ত্তব্যে অবহেলা ও বিবেচনার ত্রুটির জন্য দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা করা উচিত। ঐরূপ করিলে ভুল সংবাদে নির্ভর করিয়া তাহারা ঐরূপ ব্যবহারে বিরত হইতে পারে। বস্তুতঃ, যাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া বিনা-বিচারে আটক করা হয়, তাঁহারা যে নিরপরাধ ও অকারণ দণ্ড ভোগ করিতে পারেন, ডক্টর নাগ তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। আমরা আশা করি, নিরপরাধ ব্যক্তিগণকে যাহাতে এ ভাবে অনর্থক কষ্ট দান করা না হয়, কর্ত্তৃপক্ষ তাহার এবং যাঁহারা অভিযুক্ত হইবেন, প্রকাশ্য আদালতে তাঁহাদের বিরুদ্ধে আরোপিত অপরাধ প্রতিপন্ন করিবার ব্যবস্থা করিবেন। সরকার আপনার ভুল বুঝিলে তাঁহাদিগের পক্ষে নিঃসঙ্কোচে ত্রুটি স্বীকার করায় অগৌরব হয় না।

বিপদাশঙ্কায় কলিকাতা

বোমার ভয়ে কলিকাতাবাসী ও কলিকাতা-প্রবাসী নর-নারীবর্গ কি ভাবে কলিকাতা হইতে পলায়ন করিয়া নানা স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিল, গত পৌষ মাসের 'মাসিক বসুমতী'তে আমরা তাহার আলোচনা করিয়াছি। তাহার মাসাধিককাল পরেও কলিকাতা হইতে লোক চলিয়া যাইতেছে। অনেকে এরূপ আতঙ্কিত হইয়াছে যে, তাহারা স্ত্রীপুত্র-কন্যাদি লইয়া যে কোন গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে এবং কেহ কেহ নানা ভাবে বিপন্নও হইতেছে। অনেকে সহসা অপরিচিত স্থানে আশ্রয় লইয়া নানারূপে বিপন্ন হইয়া হাহাকার করিতে করিতে পুনর্ব্বার কলিকাতায় ফিরিতেছে, ইহাও আমরা শুনিতে পাইতেছি।

বিপদ আরও হইয়াছে দাস-দাসী, পাচক, পিয়ন, দ্বারবান প্রভৃতি লইয়া। ইহারা অমূলক জনরব বিশ্বাস করিয়া কলিকাতা হইতে পলায়ন করায় কলিকাতার অধিবাসিগণের অসুবিধার সীমা নাই। নূতন চাকর, চাকরাণী, পাচক প্রভৃতি সন্ধানে পাওয়া যাইলেও ভৃত্য কর্ত্তৃক চুরি ও প্রতারণা প্রভৃতি এতই বাড়িয়া উঠিতেছে যে, কলিকাতার পুলিস কমিশনার বুলেটিনযোগে ঘোষণা করিয়াছেন, "গৃহস্থদিগকে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করা হইলেও তাঁহারা এখনও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই বলিয়া মনে হয়। অথচ ভৃত্যরা হাতের কাছে যে সকল মূল্যবান্ দ্রব্য পাইতেছে, লইয়া কলিকাতা ত্যাগ করিতেছে।"

বিমান-আক্রমণে সতর্কতা সম্বন্ধে ২৪শে জানুয়ারী সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, "বিমান আক্রমণের সতর্কতাজ্ঞাপক ধ্বনি করিবার পরই আক্রমণ হইতে পারে; তদনুসারে সকলকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।' এই ইস্তাহার পাঠে জনসাধারণ আশ্বস্ত হইতে পারে নাই।

কলিকাতা, বর্দ্ধমান এবং অন্য যে সকল অঞ্চল বিপজ্জনক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, সেই সকল অঞ্চলের ডাক ও তারবিভাগের কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদিগের স্ত্রী-পরিবার স্থানান্তরিত করিতে পারিবেন, এই উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে এক মাসের বেতন অগ্রিম দেওয়া হইতেছে। এই টাকা

৩০ কিস্তীতে পরিশোধ করিতে হইবে এবং তাহার সুদ দিতে হইবে। সুতরাং অর্থাভাব না হইলে এই সুযোগ কেহ গ্রহণ করিবেন বলিয়া মনে হয় না।

কলিকাতায় নানা বিশৃঙ্খলার মধ্যে গুণ্ডার অত্যাচার প্রবল হইতে পারে, এই জনরব শুনিয়া কলিকাতার পুলিস কমিশনার এক প্রেস-নোটে কলিকাতার জনসাধারণকে জানাইয়াছেন, "কলিকাতার লোকদিগের আদৌ এরূপ আশঙ্কার কারণ নাই যে, বদমায়েস দল তাঁহাদিগের বিন্দুমাত্র ভয় বা অসুবিধার সৃষ্টি করিতে পারিবে। কলিকাতার প্রায় ১২ শত গুণ্ডা বর্ত্তমানে কারারুদ্ধ আছে; যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা মুক্তি পাইবে না। সহরে বিন্দুমাত্র বিশৃঙ্খলা লক্ষিত হইলেই সে সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।" পুলিস কমিশনার কলিকাতায় যত অধিক সংখ্যক সম্ভব—পরিখা খনন করিতে অনুরোধ করিয়া জানাইয়াছেন—বিমান আক্রমণে ইহাতে আশ্রয় লওয়াই আত্মরক্ষার প্রধান উপায়। কলিকাতায় বহু পরিখা খনন করা হইতেছে। অনেক বড় বড় দোকানের দ্বারের সম্মুখে প্রাচীর গাঁথিয়া বালির বস্তা সাজাইয়া রাখা হইতেছে। সরকার জানাইয়াছেন, বালির বস্তার দরও পূর্ব্বাপেক্ষা সুলভ করা হইয়াছে।

কলিকাতা হইতে লক্ষ লক্ষ লোক মফঃস্বলে চলিয়া যাইলেও কলিকাতায় নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মূল্য হ্রাস হয় নাই, অথচ মফঃস্বলে প্রত্যেক দ্রব্যই অগ্নিমূল্যে বিক্রয় হইতেছে। এ জন্য কোন কোন জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট নিত্যব্যবহার্য্য বহু দ্রব্যের মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

সঙ্কটকালে কলিকাতায় পানীয় জলের অভাব হইতে পারে ভাবিয়া দুইটি ভূগর্ভস্থ জলাধার ব্যবহারযোগ্য করিবার বিষয় পৌর-কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করিতেছেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে এই দুইটি জলাধার নির্ম্মিত হয়; দশ বৎসর ব্যবহারের পর টালার জলাধার নির্ম্মিত হইলে দুইটিই বন্ধ করা হয়। এই দুইটি জলাধারে এক কোটি গ্যালন জল সঞ্চিত হইতে পারে। এই দুইটি জলাধারে বৈদ্যুতিক 'পাম্প' সংযোজিত করিতে প্রায় ৪ লক্ষ টাকা ও উহা ব্যবহারোপযোগী করিতে ৮৮ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। এতদ্ভিন্ন, প্রচার বিভাগের এক ইস্তাহার হইতে জানিতে পারা গিয়াছে, কলিকাতায় বিমানাক্রমণের সতর্কতামূলক ব্যবস্থার জন্য যে ২৪৯৬টি নলকূপ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ২০৩২টি নলকূপ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, এবং ৬৬৮টি নলকূপের জল পরীক্ষা করা হইয়াছে। পাইপের অভাবে পরিকল্পনানুযায়ী কার্য্য সম্পন্ন করিতে বিলম্ব হইলেও ১৫ই মার্চ্চের মধ্যে এই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ নলকূপের জল এখনও পরীক্ষা করা হয় নাই। এই কার্য্যে অধিক বিলম্ব হওয়া উচিত নহে। নলকূপ-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তাহার জল পরীক্ষা করা কি অসম্ভব? অপরীক্ষিত নলকূপের জল পানের অযোগ্য হইলে যদি তাহা পান করিয়া বিপদ ঘটে, তাহার প্রতিরোধের ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার তারিখও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; স্থির হইয়াছে, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা, ১৬ই মার্চ্চ আই, এ. ও আই, এস-সি পরীক্ষা, এবং ১লা মে বি, এ, ও বি, এস-সি পরীক্ষা আরম্ভ হইবে; কিন্তু যে কারণে সময়ের এই পরিবর্ত্তন, ঐ সময়ের মধ্যে কি সেই কারণ দূর হইবে? এ অবস্থায় পরীক্ষার তারিখ আরও পরে নির্দ্দিষ্ট করিলেই সঙ্গত হইত। বলা হইয়াছে, যে সকল পরীক্ষার্থী কলিকাতা-কেন্দ্রে পরীক্ষা দিবে, তাহারা নিজ দায়িত্বে সে কায করিবে। কিন্তু অন্যত্র যাইয়া পরীক্ষা প্রদানের অসুবিধা ও ব্যয় বিবেচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এই সঙ্কটকালে পরীক্ষার্থীদিগের অধ্যয়নে মনোনিবেশও কষ্টসাধ্য। সেই জন্য প্রস্তাব হইয়াছিল, যাহারা টেষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহাদিগকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলিয়া ঘোষণা করা হউক; কিন্তু সে প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই।

ছাত্রীদিগের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হ্রাস করা হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশ হইতে ক্রমাগত বহু লোক কলিকাতায় আসিতেছে, অনেকে বাঙ্গালী। তাহাদিগকে ঘর-জিলায় প্রেরণ করা হইতেছে। জাপানী বোমায় আহত হইয়া যে সকল ব্যক্তি ব্রহ্মদেশ হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিল, তাহাদিগকে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বহরমপুর প্রভৃতি নগরের হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

সরকারের আদেশে নিশীথে কলিকাতার পথের গ্যাস ও বিদ্যুতের আলোক নির্ব্বাপিত হইতেছে; সন্ধ্যার পর পথে যে আলোক জ্বলিতেছে, তাহাও অত্যন্ত মৃদু। এই মৃদু আলোকে নানা দুর্ঘটনা ঘটিবার আশঙ্কা প্রবল।

ভাগলপুরে হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃন্দের মুক্তিলাভ

নিখিল-ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্রীযুত বিনায়ক দামোদর সাভারকরকে গত ২১শে পৌষ সোমবার প্রভাতে গয়া জেল হইতে মুক্তিদান করা হইলে তিনি তাহার পরদিন গয়া হইতেই বোম্বাই যাত্রা করেন। এতদ্ভিন্ন ডঃ বি, এস, মুঞ্জে, মিঃ নাইডু, শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অন্য যে সকল প্রতিনিধি ভাগলপুরে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও ২১শে পৌষ প্রাতে মুক্তিদান করা হয়। শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বাঙ্গালার ৮০ জন প্রতিনিধি ২৩শে পৌষ মঙ্গলবার

কলিকাতায় পৌঁছেন। দিল্লী, পঞ্জাব, বোম্বাই ও পুণার নেতৃবর্গও উহার পূর্ব্ব-রাত্রিতে ভাগলপুর ত্যাগ করেন। কলিকাতার মেয়র ও বহু হিন্দু নাগরিক হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া প্রত্যাগত প্রতিনিধিবর্গকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন।

হিন্দু মহাসভার ন্যায় নিখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীন ভাবে অধিবেশনের অধিকারে বঞ্চিত করিয়া এবং হিন্দু নেতা ও কর্ম্মিগণকে দলে দলে নির্ব্বিচারে গ্রেপ্তার করিয়া বিহার সরকার যে মনোবৃত্তির—স্বৈরাচারের পরিচয় দিয়াছেন, এ কালে ভারতেও তাহার তুলনা বিরল। বিহার সরকার এই বিচার-মূঢ়তার সমর্থন করিবার আশায় যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা কেবল অসার নহে, হাস্যোদ্দীপক। বিহার সরকার কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য ছিল বলিয়াই তাঁহারা এই ন্যায়বিগর্হিত নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেন। কিন্তু বিহার সরকার স্বীকার না করিলেও সকলেই জানেন, ভাগলপুরের বা সমগ্র বিহারের কোন মুসলমান নেতা কিম্বা মুসলমান প্রতিষ্ঠান এই নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করিতে অনুরোধ করেন নাই, এবং উহার সমর্থনও করেন নাই।

সাভারকর মহাশয়ের সহিত বিহার সরকারের কর্ত্তার যে পত্র-বিনিময় হইয়াছিল, তাহাতে অনেক কথাই জানিতে পারা গিয়াছে। বিহার সরকার যাহাতে ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখের প্রচারিত আদেশ সংশোধন করিতে সমর্থ হন, সে জন্য হিন্দু মহাসভার নেতৃপক্ষ যে সুবিধা প্রদানের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, তাহা সকলেই জানিতে পারিয়াছেন। বকর-ঈদ পর্ব্বের জন্য অসুবিধা ঘটিয়া থাকিলে আপোষ-আলোচনার ফলে তারিখ পরিবর্ত্তনেরও ব্যবস্থা হইতে পারে—এই কথা বলিয়া সাভারকর মহাশয় বিহার সরকারকে যে সুযোগদান করিয়াছিলেন, যে কোন ধীরবুদ্ধি ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সরকার তাহা কখন উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। কিন্তু বিহারের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদিগের বুদ্ধির প্রাখর্য্যে নির্ভর করিয়া তাঁহাদিগের বিশেষ ক্ষমতার যথেচ্ছা-প্রয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাহার ফলে জনসাধারণের মনে অধিকতর চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

বিহার সরকার বলিয়াছেন, যুদ্ধপ্রচেষ্টায় বিশেষ ভাবে সাহায্য করা হইয়াছে এই হেতুবাদে হিন্দু মহাসভা কর্ত্তৃক পক্ষপাতমূলক ব্যবহারের দাবী করা হইয়াছে। কিন্তু বিহার গবর্ণরের এ কথা তাঁহার কল্পনাপ্রসূত; হিন্দু মহাসভা ঐ হেতুবাদে পক্ষপাতমূলক ব্যবহারের দাবী করেন নাই। বিহার-লাটের এই যুক্তির মূলে সত্য নাই। বস্তুতঃ, তাঁহার সরকারের নিষেধাজ্ঞায় যে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল, হিন্দু মহাসভার পক্ষে তাহার সম্মুখীন না হইয়া কোন উপায় ছিল না।

যুক্ত-প্রদেশ প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সভাপতি সার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব তাঁহার প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, "অপদার্থ আমলাতন্ত্র যেরূপ জটিল ভাবে সমগ্র বিষয়টি পরিচালিত করিয়াছেন, তাহাতে সরকারের বন্ধুরা এতদূর ক্ষুব্ধ হইয়াছেন যে, যুদ্ধ-প্রচেষ্টার গতি পর্য্যন্ত শিথিল হইবার আশঙ্কা আছে। বিহার সরকারের আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া হিন্দু মহাসভার একদল কর্ম্মী ইতোমধ্যে যুদ্ধ-প্রচেষ্টা সম্পর্কে সমর্থন প্রত্যাহারের বিষয় চিন্তা করিতেছেন। এই দুরূহ সঙ্কটসময়ে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ যাহাতে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার নামে সহযোগিতাকামীদিগকে বিরুদ্ধভাবাপন্ন করিয়া না তুলেন, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য আমি বড় লাটকে পুনর্ব্বার অনুরোধ করিতেছি।"

সার জওলাপ্রসাদের ন্যায় সরকারের পরম হিতৈষী ব্যক্তির এই পরামর্শ কি বড়লাট গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করিবেন? তিনি কি এ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে তাঁহার কোন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন? ভাগলপুরের নিষিদ্ধ অধিবেশনের পর হিন্দু মহাসভা যে পূর্ব্বাপেক্ষ শক্তিশালী হইয়াছে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। সমগ্র ভারতের নিখিল হিন্দু সমাজের মিলন-বন্ধন যদি এই ঘটনার পর সুদৃঢ় হয়, এবং মহাসভা উত্তরোত্তর শক্তিশালী হইতে থাকে, তাহা হইলে হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃন্দের এই নির্য্যাতনভোগ সফল হইবে। হিন্দু মহাসভা বিপন্ন হইয়াও আত্ম-প্রতিষ্ঠার যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার গৌরব ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে।

যুদ্ধ ও ট্রেণ

এত দিন সরকার যাহাতে ট্রেণে যাত্রীর আধিক্য হয়, সেই চেষ্টাই করিয়া আসিয়াছেন। সেই জন্য তাঁহারা নানা চিত্তাকর্ষক পুস্তিকা ও প্রাচীর-পত্র প্রকাশেও বিরত হয়েন নাই। মধ্যে যখন মোটর-বাসের সহিত ট্রেণের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়, তখন যাত্রীদিগকে আকৃষ্ট করিবার জন্য লোক্যাল ট্রেণের সংখ্যা বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পর সরকারকে সেই প্রথার পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। সর্ব্বাগ্রে—কুম্ভমেলায় যাহাতে যাত্রীর সংখ্যা-হ্রাস হয়, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে অগ্রণী হইয়া সেই বিষয়ে প্রচার-কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহার পর যুদ্ধের প্রয়োজনে সরকার "এ", "বি", "সি", "ডি", ও "ই" এই পাঁচ প্রকার সঙ্কোচ-ব্যবস্থা স্থির করিয়াছেন। প্রথম ব্যবস্থায় দ্বিবিধ ট্রেণ-চলাচল বন্ধ করা হইয়াছে :—

(১) যে সকল ট্রেণ অধিক যাত্রী আকৃষ্ট করিবার জন্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল;

(২) মোটর-বাসের প্রতিযোগিতা প্রহত করা যে সকল ট্রেণের উদ্দেশ্য।

গত ১লা নভেম্বর হইতে এই দুই শ্রেণীর প্যাসেঞ্জার ট্রেণ-চলাচল বন্ধ করায় দৈনিক ৭২৮ মাইল ট্রেণ-চলাচল কমিয়াছে।

এইবার "বি" বা দ্বিতীয় ব্যবস্থা ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে প্রবর্ত্তিত হইল। এই ব্যবস্থায় মোট ২৯খানি ট্রেণ বন্ধ করা হইবে এবং ফলে ২৫খানি এঞ্জিনের ব্যবহার বন্ধ হইবে এবং দৈনিক ৪০২৫ মাইল ট্রেণ-চলাচল কম হইবে। বলা বাহুল্য, যাত্রীদিগের অসুবিধা যথাসম্ভব কম করিবার জন্য কোন কোন দ্রুতগামী ট্রেণ পূর্ব্বে যে সব ষ্টেশনে দাঁড়াইত না, সে সকল ষ্টেশনে দাঁড়াইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং লোকের অসুবিধার বিষয় বিবেচিত হইবে, এইরূপ প্রতিশ্রুতিও প্রদান করা হইয়াছে।

জাপানের সহিত যুদ্ধের ফলে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে; যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তন না হইলে পরবর্ত্তী ব্যবস্থাও অবলম্বিত হইবার সম্ভাবনা। তবে বর্ত্তমানে সে সকলের আলোচনার কোন প্রয়োজন নাই। যে কারণে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে এই ব্যবস্থা করিতে হইল, তাহার জন্য তাঁহারা দায়ী নহেন বটে, কিন্তু ভারত সরকার দায়ী। দেশের লোক প্রায় ৩০ বৎসর-কাল এ দেশে এঞ্জিন ও এঞ্জিনের অংশ প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিতে বলিয়া আসিতেছেন—কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদে এ বিষয় বহু বার আলোচিত হইয়াছে এবং আলোচনাপ্রসঙ্গে সরকার ভারতবর্ষকে পরমুখাপেক্ষী রাখার যে কৈফিয়ৎ দিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে ভারত-বাসী সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই—পরন্তু তাহারা মনে করি-য়াছে, বিদেশী ব্যবসায়ীদিগের স্বার্থরক্ষাই সরকারী নীতির অভিপ্রেত। যদি সরকার এ বিষয়ে দেশবাসীর অভি-প্রায়ানুরূপ কাজ করিতেন, তাহা হইলে আজ আর এঞ্জিনের অভাব অনুভূত হইত না। কেবল তাহাই নহে, যে সকল কারখানায় এঞ্জিন প্রভৃতি প্রস্তুত হইত, সেই কার-খানায় যুদ্ধের সময় সমর-সরঞ্জাম প্রস্তুত করাও সম্ভব হইত। গত যুদ্ধের সময় গ্লাসগো সহরে ট্রামগাড়ীর কারখানায় বিমান নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছিল—এ বারও নানা কারখানায় যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুত করা হইতেছে। যে সকল দেশে ভারতের তুলনায় রেলপথ অনেক অল্প, সে সকল দেশেও দেশে ব্যবহার জন্য এঞ্জিন প্রস্তুত করা হয়; আর এ দেশেই হয় না। গত যুদ্ধের সময় এ দেশে সরকারের প্ররোচনায় মাল-গাড়ী প্রস্তুত করিবার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সরকার বিদেশ হইতে মাল-গাড়ী আমদানী করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানে দিল্লী (অর্থাৎ ভারত সরকারের প্রচার বিভাগ) হইতেও লোককে বিনা-প্রয়োজনে রেলে গতায়াতে বিরত থাকিতে বলা হইতেছে। অবশ্য যুদ্ধের প্রয়োজনে—অস্বাভাবিক অবস্থায় লোককে ত্যাগস্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু যে স্থলে ত্যাগস্বীকার না করিলেও চলে, সে স্থলে যদি ত্যাগস্বীকার করিতে হয়, তবে তাহা নিশ্চয়ই দুঃখের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়।

কংগ্রেস ও গান্ধীজী

গত ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাই পরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে অর্থাৎ কংগ্রেস কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। ঐ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, যদিও কংগ্রেসের প্রস্তাব সম্বন্ধে বৃটিশ সরকারের মতের পরিবর্ত্তন হয় নাই, তথাপি কংগ্রেস বর্ত্তমান আন্ত-র্জ্জাতিক অবস্থার ও যুদ্ধ ভারতের নিকটবর্ত্তী হওয়ার বিষয় বিবেচনা না করিয়া পারেন না। যে সকল দেশ আক্রান্ত হইয়াছে, কংগ্রেস যে সেই সকল দেশের সহিত সহানুভূতি-সম্পন্ন, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু যে সাম্রাজ্যবাদ—এক-নায়কত্ব হইতে অভিন্ন বলিলেও বলা যায়, ভারতবর্ষ তাহার সমর্থন করিতে ও তাহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতে পারে না। এই অবস্থায় ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেসের কমিটী বোম্বাই সহরে যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া-ছিলেন, তাহাই বহাল রাখিতেছেন।

বড়লাট পুণায় যে প্রস্তাব করিয়া কংগ্রেসকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, বোম্বাই সহরে গৃহীত প্রস্তাবে কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি সেই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। কংগ্রেসের ঐ প্রস্তাবের মূল কথা—

কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতা-লাভের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে বৃটেনের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় যোগ দিতে সম্মত।

এ কথা কংগ্রেস হইতে অন্যান্য সময়েও বলা হইয়াছে। বৃটেন গণতন্ত্রের পক্ষ হইতে একনায়কত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়াছে এবং জার্ম্মাণী ও ইটালী একনায়কত্বের প্রসার-জন্য যুদ্ধ করিতেছে। এই অবস্থায় কংগ্রেসের পক্ষে বৃটেনের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া যেমন স্বাভাবিক, তাহার পক্ষে আপনি গণতন্ত্রশাসিত হইবার আকাঙ্ক্ষা তেমনই সঙ্গত। অথচ ভারতবর্ষ স্বয়ং স্বায়ত্ত-শাসনশীল না হইলে তাহার পক্ষে গণতন্ত্রের পক্ষে যুদ্ধে সাগ্রহে সাহায্যদানের কোন কারণ বা সার্থকতা থাকিতে পারে না।

এই প্রস্তাব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী কংগ্রেসের নেতৃত্ব ত্যাগ করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার পক্ষে কংগ্রেসের নেতৃত্বত্যাগ-ঘোষণা নূতন নহে। কারণ, তিনি সেরূপ ঘোষণা করিবার পরও কংগ্রেসকে প্রভাবিত করিয়া

আসিয়াছেন। তবে এবার তিনি নেতৃত্বত্যাগের যে কারণ দেখাইয়াছেন, তাহা বিস্ময়কর। তিনি বলিয়াছেন—"আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কেবল অহিংসাই ভারতবর্ষকে ও পৃথিবীকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে পারে।" অর্থাৎ যুদ্ধ যখন হিংসা-বর্জ্জিত হইতে পারে না, তখন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা প্রদানের প্রতিশ্রুতির বিনিময়েও তিনি যুদ্ধের সমর্থন করিতে পারেন না। তিনি বলিয়াছেন, তিনি কংগ্রেসের প্রস্তাবের অর্থ বুঝিতে ভুল করিয়াছিলেন। দীর্ঘ চতুর্দ্দশ মাস ঐ প্রস্তাবের বনিয়াদে কংগ্রেসের নেতৃত্ব করিবার পর যে তিনি বুঝিলেন, তিনি ভুল বুঝিয়াছেন, ইহা বিস্ময়কর ব্যতীত আর কি বলা যায়? অথচ এই চতুর্দ্দশ মাসে তাঁহার নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলন-হেতু সহস্র সহস্র লোক নানারূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন—নানারূপ লাঞ্ছনা সানন্দে ভোগ করিয়াছেন।

সে যাহাই হউক, অতঃপর কংগ্রেসকে গৃহীত প্রস্তাবানুসারেই আন্দোলন পরিচালিত করিতে হইবে।

সংবাদপত্রের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ

ভারত সরকার ভারতরক্ষা আইনের বলে প্রদত্ত ক্ষমতায়, সংবাদপত্রের মূল্য নিম্নলিখিতরূপে নিয়ন্ত্রিত করিয়া এই ব্যবস্থা ২রা ফেব্রুয়ারী হইতে বলবৎ করিয়াছেন :—

এই আদেশে সংবাদপত্রগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে :—যথা, 'এ' শ্রেণী (পৃষ্ঠায়তন ৩৩৬ বর্গ-ইঞ্চের কম হইবে না) 'বি' শ্রেণী (পৃষ্ঠায়তন ৩৩৬ বর্গ-ইঞ্চের কম হইবে, কিন্তু ২০০ বর্গ-ইঞ্চের কম হইবে না) এবং 'সি' শ্রেণী (পৃষ্ঠায়তন ২০০ বর্গ-ইঞ্চের কম হইবে)। মূল্য এইরূপ ধার্য্য হইয়াছে :—'এ' শ্রেণীর দুই পৃষ্ঠা, 'বি' শ্রেণীর দুই পৃষ্ঠা এবং 'সি' শ্রেণীর চারি পৃষ্ঠার মূল্য অর্দ্ধ আনার কম হইবে। 'এ' শ্রেণীর চারি পৃষ্ঠা, 'বি' শ্রেণীর ছয় পৃষ্ঠা এবং 'সি' শ্রেণীর আট পৃষ্ঠার মূল্য তিন পয়সার কম হইবে; কিন্তু অর্দ্ধ আনার কম হইবে না। 'এ' শ্রেণীর ছয়, 'বি' শ্রেণীর আট এবং 'সি' শ্রেণীর বার পৃষ্ঠার মূল্য এক আনার কম হইবে, তবে তিন পয়সার কম হইবে না। 'এ' শ্রেণীর আট, 'বি' শ্রেণীর বার এবং 'সি' শ্রেণীর যোল পৃষ্ঠার মূল্য দেড় আনার কম হইবে, তবে এক আনার কম হইবে না এবং 'এ' শ্রেণীর বার, 'বি' শ্রেণীর আঠার এবং 'সি' শ্রেণীর চব্বিশ পৃষ্ঠার মূল্য দুই আনার কম হইবে, তবে দেড় আনার কম হইবে না।

এ শ্রেণীর ২ × এন্ পৃষ্ঠা, বি শ্রেণীর ৩ × এন্ পৃষ্ঠা এবং সি শ্রেণীর ৪ × এন্ পৃষ্ঠার মূল্য "এন্" আনা এক পয়সার কম হইবে, কিন্তু "এন্" আনার এক-চতুর্থাংশের কম হইবে না।

(এস্থলে "এন্" বলিতে ৭এর অধিক কোন পূর্ণ সংখ্যা ধরিতে হইবে)।

মডারেটদিগের আবেদন

সার তেজবাহাদুর সপ্রু প্রমুখ ভারতের মডারেট রাজনীতিকরা ভারত সম্বন্ধে বৃটিশ সরকারের নীতির পুনর্ব্বিবেচনার জন্য বার বার আবেদনেও ভগ্নমনোরথ না হইয়া শেষে বিলাতের প্রধান মন্ত্রীকে এক তার করিয়াছিলেন। পার্লামেণ্টে সে সম্বন্ধে প্রশ্ন হইলে উত্তরে মিষ্টার চার্চ্চিল বলিয়াছেন—তিনি যখন মার্কিণের রাষ্ট্রপতির দরবারে যাইতেছিলেন, ঠিক সেই সময় তিনি ঐ তার পাইয়াছিলেন—সেই জন্য তাহার বিস্তৃত উত্তর দিতে পারেন নাই; তবে পরে উত্তর দিবেন। যুদ্ধের সময় শাসন-পদ্ধতি-সম্পর্কিত বিষয়ের আলোচনা সঙ্গত কি না, সে বিষয়ে তিনি সন্দেহ প্রকাশও করিয়াছেন। ঐ সন্দেহ প্রকাশেই তাঁহার প্রকৃত মনোভাব অনুমান করিতে পারা যায়। তবে আমরা তাঁহাকে বলিতে পারি, গত যুদ্ধের সময় যখন ভারতে শাসন-পদ্ধতি পরিবর্ত্তনের বিষয় আলোচিত হয়, তখন পার্লামেণ্টে ঐরূপ সন্দেহ প্রকাশ করা হইলে সরকারের পক্ষে বলা হইয়াছিল, যাহাতে ভারতে রাজনীতিক অবস্থার আরও অবনতি না হয়, সেই জন্য যুদ্ধের সময় হইলেও ঐ বিষয়ের আলোচনায় সরকার প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অবশ্য তাহার পর আরও প্রায় ২৫ বৎসর ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত-শাসনে বঞ্চিত অবস্থায় রাখা হইয়াছে।

'বিমান বোটের বোম্বেটে'

সুপ্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় দীর্ঘ-জীবনে যে চারি শতাধিক ইংরেজী পুস্তকের অনুবাদ করিয়াছেন তাহার প্রায় তিন শতখানিই ডিটেকটিভ-উপন্যাস। বিলাতের অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক 'য়ুনিয়ান জ্যাক' পত্রে বহুকাল পূর্ব্বে 'বিমান-বোটের বোম্বেটে' অন্য নামে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল।

দীনেন্দ্র বাবু ১২ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার সম্পাদিত "রহস্যলহরী-সিরিজে" ইহার অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। 'য়ুনিয়ান জ্যাক' পত্র বহু দিন পূর্ব্বে বন্ধ হওয়ায় য়ুরোপে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ-সূচনার পূর্ব্বে লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ 'সাপ্তাহিক ডিটেক্‌টিভ' পত্রে 'বিমান-বোটের বোম্বেটে' চিত্রযুক্ত ও ভাষান্তরিত হইয়া ধারাবাহিক ভাবে পুনরায় প্রকাশিত হইয়াছিল। দীনেন্দ্র বাবুই যে ১২ বৎসর পূর্ব্বে এই উপন্যাসের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা স্মরণ থাকা সম্ভবপর না হওয়ায় 'সাপ্তাহিক ডিটেক্‌টিভ' পত্র হইতে ইহা 'মাসিক বসুমতীর' জন্য অনুবাদ করিয়াছেন। আশা করি, তাঁহার

সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী সাহিত্যসেবার ফল স্মরণ করিয়া সাহিত্যানুরাগি-সম্প্রদায় তাঁহার বার্দ্ধক্যের অপরিহার্য্য বিস্মৃতি উপেক্ষা করিতে পারিবেন।

আমার কর্ম্মব্যস্ত জীবনে দীনেন্দ্র বাবুর অনূদিত তিন শতাধিক ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের সকলগুলি পড়িবার অবকাশের নিতান্ত অভাব,—ঘটনাপ্রবাহ স্মরণ রাখাও সম্ভবপর হয় নাই। ইহা অবশ্যই অক্ষমতার ত্রুটি। এই উপন্যাসে বিমানে ডাকাতি—প্যারাশুট অভিযান—মোটর সাইকেল-বিপর্য্যয় প্রভৃতি বর্ত্তমান যুগোপযোগী ঘটনা-সমাবেশ দেখিয়া ইহা উপন্যাসপ্রিয়-সমাজের চিত্তাকর্ষক হইবে বলিয়া 'মাসিক বসুমতীর' জন্য মনোনীত করিয়াছিলাম।

"রহস্যলহরী-সিরিজে" অল্পসংখ্যক পাঠক এই উপন্যাসখানি দীর্ঘকাল পূর্ব্বে পাঠ করিয়াছেন। সে সকল উপন্যাস বহু দিন পূর্ব্বে নিঃশেষিত হইয়াছে বলিয়া 'মাসিক বসুমতীর' বহু সহস্র পাঠককে এই কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী-পাঠে বঞ্চিত করা সমীচীন বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। এজন্য উপন্যাসখানি সম্ভবমত সংক্ষেপে সমাপ্ত করিবার প্রয়াস পাইব।

দুই জন শ্রদ্ধাভাজন সাহিত্যিক ও 'মাসিক বসুমতীর' পাঠক, এবং 'শনিবারের চিঠির' সুযোগ্য সম্পাদক এ বিষয়ে আমাদের ভ্রান্তিনির্দ্দেশ করিয়াছেন—সেজন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ

গত ১১ই মাঘ মঙ্গলবার ভৈমী একাদশী তিথিতে বঙ্গের বিদ্বজ্জন-সমাজের গৌরব মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় কাশীধামে বিশ্বজননীর ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৬ বৎসর হইয়াছিল।

তর্কবাগীশ মহাশয় ১২৮২ সালের মাঘ মাসে যশোহরের তালখড়ীর প্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য্য-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বগ্রামে কাব্যালঙ্কারের পাঠ সমাপন করিয়া নবদ্বীপের মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট প্রথম ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন; পরে ন্যায়-বেদান্তাদি নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিবিধ দর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি দুরূহ ন্যায়-দর্শনের অতিশয় জটিল বাৎস্যায়ন-ভাষ্যের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত করেন। অতঃপর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি সুবৃহৎ পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ সমগ্র বাৎস্যায়ন-ভাষ্যের বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন।

১৩২৪ সালে তিনি কাশীধামে বাস করিতে থাকেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে "মহামহোপাধ্যায়" উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। তিনি 'ন্যায়-পরিচয়' নামক ন্যায়দর্শনের একখানি সরল প্রবেশিকা রচনা করেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন।

তর্কবাগীশ মহাশয় ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের বীরভূম-অধিবেশনে দর্শন-শাখার সভাপতি

পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ

মনোনীত হন। সনাতন ধর্ম্মে তাঁহার অবিচলিত নিষ্ঠা, তাঁহার ব্যাপক ও বহুমুখী পাণ্ডিত্য, এবং তাঁহার নিরভিমান অমায়িক ব্যবহার তাঁহাকে সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধাভাজন করিয়াছিল। তিনি দীর্ঘকাল 'মাসিক বসুমতী'র লেখকরূপে অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রদান করিয়াছিলেন।

তর্কবাগীশ মহাশয় দুই পুত্র, এক কন্যা, জামাতা, পৌত্র-পৌত্রী ইত্যাদি রাখিয়া গিয়াছেন।

স্যার আকবর হায়দারী পরলোকে

গত ২৪শে পৌষ অপরাহ্নে ভারত সরকারের প্রচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার আকবর হায়দারী ৭২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। গত ২৩শে ডিসেম্বর কলিকাতা হইতে দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি পীড়িত হইলে তাঁহাকে 'নার্সিং হোমে' প্রেরণ করা হয়। তথায় যে ১৭ দিন তাঁহার চিকিৎসা হয়, তাহার অধিকাংশ সময় তিনি অচৈতন্য ছিলেন।

সার আকবরের মৃত্যুর পর তাঁহার মৃতদেহ হায়দরাবাদে প্রেরিত হয়। তিনি এই অন্তিম কামনা প্রকাশ করিয়াছিলেন—যেন তাঁহার স্ত্রীর সমাধির পার্শ্বে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।

সার আকবরের পিতা প্রতিষ্ঠাপন্ন বণিক্ ছিলেন। তিনি ১৯ বৎসর বয়সে ভারত সরকারের চাকরী গ্রহণ করিয়া পরে ভারত সরকারের অর্থবিভাগে নিযুক্ত হয়েন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজাম সরকারের ফাইনান্স সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করিয়া হায়দরাবাদে গমন করেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তিনি বোম্বাই সরকারের একাউণ্টেণ্ট-জেনারল পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর

সার আকবর হায়দারী

পরে তিনি পুনর্ব্বার হায়দরাবাদে গমন করিয়া নিজাম সরকারের অর্থ ও রেলওয়ে বিভাগের ভার-প্রাপ্ত সচিব হন। তাহার পর সমবায়, ঋণ ও খনি বিভাগের ভারও তিনি গ্রহণ করেন। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য তিনি ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত ছিলেন, এবং অরবিন্দ-আশ্রমের উন্নতির জন্য নিজাম সরকার হইতে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। গত ১৮ই ডিসেম্বর তিনি সংবাদপত্র-সম্পাদকগণের সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য কলিকাতায় আগমন করেন।

ভারতের সংস্কৃতি সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "কমলা লেকচারার"-রূপে বক্তৃতা প্রদানের জন্য আমন্ত্রিত হইলে সেই আমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি বক্তৃতা প্রদানের পূর্ব্বেই অসুস্থ হইয়া ইহলীলা সংবরণ করিলেন।

ডিউক অফ কনটের মৃত্যু

গত ২রা মাঘ শুক্রবার মহারাণী ভিক্টোরিয়ার তৃতীয় পুত্র ডিউক অফ কনট ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়; সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৯২ বৎসর হইয়াছিল।

ডিউক ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে মিশর অভিযানে সেনানায়কের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তিনি ফীল্ড-মার্সালের পদ লাভ করেন। ১৯০৭ হইতে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন। অতঃপর ১৯১১ হইতে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি কানাডার গবর্ণর-জেনারল ছিলেন।

তিনি ভারতেও (বোম্বাই বিভাগে) সমর বিভাগে চাকরী করিয়াছিলেন। তিনি ভারতের লাট লর্ড কার্জ্জনের দিল্লী-দরবারে যোগদান করিয়াছিলেন। ভারতে যখন মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হয়, তখন তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা পঞ্চম জর্জ্জের বাণী লইয়া ভারতে আসিয়া রাষ্ট্রীয় পরিষদের ও ব্যবস্থা পরিষদের উদ্বোধন করেন। সেই সময় তিনি দেশের লোকের সহিত ইংরেজের বিরোধের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, সমগ্র ভারতে অমৃতসরের (জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডের) নিবিড় ছায়া পতিত হইয়াছে। এজন্য তিনি উভয় সম্প্রদায়কে ক্ষমা করিতে ও (এই অপ্রীতিকর ব্যাপার) ভুলিয়া যাইতে লোককে অনুরোধ করেন।

পরলোকে সার পি, রাঘবেন্দ্র রাও

ভারত সরকারের অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সেক্রেটারী সার পি, রাঘবেন্দ্র রাও গত ৯ই মাঘ শুক্রবার প্রভাতে ৫৩ বৎসর বয়সে দিল্লীতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। দুই এক দিন পূর্ব্বে তিনি হঠাৎ অচৈতন্য হইয়া পড়েন, আর চেতনা লাভ করেন নাই।

রাঘবেন্দ্র রাও বাল্যে প্রতিভাবান্ ছাত্র ছিলেন; তাঁহার কর্ম্মজীবনও গৌরবপূর্ণ। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে চাকরীতে যোগদান করিয়া তিনি পর পর বিভিন্ন উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি রেলওয়ে বোর্ডের ডেপুটী-ডিরেক্টর, অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি-ডিরেক্টর, অর্থ-বিভাগের কমিশনার, এবং শেষে বঙ্গের একাউণ্টেণ্ট-জেনারলের পদে নিযুক্ত হয়েন। অতঃপর তিনি ভারত সরকারের অর্থ-বিভাগের অতিরিক্ত সেক্রেটারী হইয়াছিলেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

২০শ বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩৪৮ [৫ম সংখ্যা

রস

২

অষ্টরস-বাদীর মতে মূল রস চারিটি। এই চারিটি মূল রসই অবশিষ্ট চারিটি অবান্তর রসের উৎপত্তি হেতু ; অর্থাৎ—এই চারিটি রস হইতে অপর চারিটি রস সূক্ষ্ম ভাবে সূচিত হইয়া থাকে (১)।

এই মূলীভূত রসচতুষ্টয়—শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর ও বীভৎস। এই চারিটি রস হইতে যথাক্রমে হাস্য, করুণ, অদ্ভুত ও ভয়ানক রসের উৎপত্তি হইয়া থাকে ; অর্থাৎ—শৃঙ্গার রস হইতে জন্মে হাস্যরস, রৌদ্র হইতে করুণ, বীর হইতে অদ্ভুত ও বীভৎস হইতে ভয়ানক রসের উৎপত্তি হয়—ইহাই মহর্ষি ভরতের অভিমত (২)।

মহর্ষি ইহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—শৃঙ্গারের অনুকরণই হাস্য। রৌদ্রের যাহা কর্ম্ম, তাহাই করুণ। বীরের যাহা কর্ম্ম, তাহাই অদ্ভুত। আর যথায় বীভৎস দৃষ্ট হয়, তথায় ভয়ানকও বর্ত্তমান (৩)।

কথাগুলি একটু বিশদ ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। শৃঙ্গারের অনুকরণই হাস্য। ইহার অর্থ এই যে, বিকৃত বেশ-বপু প্রভৃতি দ্বারা শৃঙ্গার রসের অনুকরণ করিলে হাস্যরসের উদ্রেক হয় ; অর্থাৎ—শৃঙ্গারাভাস হাস্যরসের জনক। যদি দেখা যায়—কোন বৃদ্ধ যুবজনোচিত বেশভূষা ধারণ করিয়া কোন তরুণীর নিকট প্রেম-নিবেদন করিতেছে, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে আদিরসের পরিবর্ত্তে হাস্যরসেরই উদ্রেক হওয়াই স্বাভাবিক। অতএব, আভাস-দ্বারা(৪) রসান্তরের আক্ষেপক (সূচক) হইতেছে শৃঙ্গার ; কারণ, শৃঙ্গারাভাস (pseudo-erotic) হাস্যরসের অবতারণা করে।

এস্থলে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে—নিদ্রাভাস-দ্বারা

(১) অবশ্য স্থায়িভাবই আস্বাদ্যমান হইয়া রসে পরিণত হয়। সে হিসাবে বিভাবই রসের হেতু অথবা বিভাবানুভাব-সঞ্চারিভাব-সংযোগ রসনিষ্পত্তির হেতু—এই কথাই বলা উচিত। এ স্থলে চারিটি রস অপর চারিটি রসের উৎপাদক নহে—সূচক মাত্র। প্রথমোক্ত চারিটি রস হইতে অপর চারিটি রসের উপক্ষেপ খুব সহজে হইয়া থাকে—ইহাই মাত্র এ স্থলে বক্তব্য ; যথা—শৃঙ্গারের হাস্যে পরিণতি অতি স্বাভাবিক ; কিন্তু শৃঙ্গারের রৌদ্রে পরিণাম এরূপ অনায়াসসাধ্য নহে।

(২) মৎসম্পাদিত 'অভিনয়দর্পণ'—পৃঃ ২৩ দ্রষ্টব্য।

(৩) "শৃঙ্গারানুকৃতির্যা তু স হাস্যস্তু প্রকীর্ত্তিতঃ।
রৌদ্রস্যৈব চ যৎ কর্ম্ম স জ্ঞেয়ঃ করুণো রসঃ ॥ ৪৫ ॥
বীরস্যাপি চ যৎ কর্ম্ম সোঽদ্ভুতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বীভৎসদর্শনং যত্র জ্ঞেয়ঃ (যচ্চ ভবেৎ) স তু
ভয়ানকঃ" ॥ ৪৬ ॥ (নাঃ শাঃ—বরোদা সং, ৬ অঃ)

(৪) আভাস—নকল, আসল নহে ; অর্থাৎ—অনুকরণ।

হাস্যরসের অবতারণা ত শৃঙ্গার ছাড়া অন্য রসও করিতে সমর্থ। যে ব্যক্তি বন্ধু নহে, তাহার মৃত্যুতে কাহাকেও স্বাভাবিকের অতিরিক্ত শোকপ্রকাশ করিতে দেখা যাইলে করুণরসের পরিবর্ত্তে হাস্যেরই উদ্রেক হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা। বাঙ্গালায় একটি চলতি প্রবাদ আছে—"মাছ মরেছে, বকের চোখে সাঁতার-পানি শোকে"। ইংরেজীতেও ইহাকেই বলে—'Crocodile tears.' কিন্তু এ ত যথার্থ করুণরস নহে—বরং ইহা হাস্যোৎপাদক। এরূপ অবস্থায় কেবল শৃঙ্গারের আভাসকেই হাস্যের সূচক বলা চলে কিরূপে?

ইহার উত্তর অভিনবগুপ্ত দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে—'হাঁ, ইহা সত্য বটে, যে কোন রসের অনুকরণই হাস্যজনক, তথাপি এ বিষয়ে শৃঙ্গারেরই প্রাধান্য। শৃঙ্গারের অনুকরণে যত সহজে হাস্যোদ্রেক হয়, এত আর কিছুতেই হয় না। তথাপি তিনি ভরতের পঙ্‌ক্তিটি একটি নূতন প্রণালীতে যোজনা করিয়াছেন—যাহা অনুকরণাত্মক, তাহাই যখন হাস্যরসের উৎপাদক, তখন আদিরস শৃঙ্গারের অনুকৃতিও হাস্যোদ্রেককর। অথবা একটু ঘুরাইয়া বলা যায়—অনুকৃতিই যে হাস্যকর, তাহার প্রথম দৃষ্টান্ত শৃঙ্গাররসের ক্ষেত্রে অনুভূত হয় (৫)।

এইবার দ্বিতীয় বাক্যটি লওয়া যাউক—রৌদ্রের যাহা কর্ম্ম, তাহাই করুণরস বলিয়া বুঝিতে হইবে। এস্থলে 'কর্ম্ম'-শব্দের অর্থ 'ফল'। রৌদ্ররসের কর্ম্ম অর্থাৎ ফল—বধ-বন্ধন প্রভৃতি। আর এই বধ-বন্ধনাদির ফল করুণ রস। কারণ, বধাদি দর্শন করিলে করুণের উৎপত্তি হওয়া স্বাভাবিক। অতএব অভিনবগুপ্তের ভাষায় বলা যাইতে পারে যে—যে রসের ফল-দর্শনের পর দ্বিতীয় কোন রসের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী, সেরূপ রসের দৃষ্টান্ত দিতে হইলে রৌদ্রের নাম করিতে হয়। রৌদ্ররসের ফলভূত বধ-বন্ধনাদি দর্শন করিলে পর চিত্তে করুণরসের উদয় না হইয়াই পারে না। সংক্ষেপে বলা চলে—নিজফলের ফলস্বরূপে রসান্তরের সূচক রৌদ্র; কারণ, রৌদ্রের ফল বধবন্ধনাদির ফলস্বরূপই করুণ রস (৬)।

এবার তৃতীয় বাক্যটি আলোচ্য—বীরের যাহা কর্ম্ম তাহাই অদ্ভুত রস। এস্থলেও 'কর্ম্ম'-শব্দের অর্থ 'ফল'। তাহা হইলে অর্থ দাঁড়াইতেছে—বীররসের ফলভূত অদ্ভুত রস। শ্রীরামচন্দ্রাদি লোকোত্তর-পুরুষের উৎসাহ জগতের বিস্ময়জনক হইয়া থাকে—ইহাতে সন্দেহ নাই। উৎসাহ বীররসের স্থায়িভাব। উৎসাহ উদ্ভূতভাব প্রাপ্ত হইলেই বীররসে রূপান্তরিত হয়। ঐরূপ বিস্ময় স্থায়িভাব অভিব্যক্ত-দশায় অদ্ভুতরসে পরিণত হইয়া থাকে। অতএব, কোন লোকোত্তর-পুরুষগত উৎসাহ স্থায়িভাব অভিনয়কালে ব্যক্তাবস্থায় বীররসে পরিণত হইয়া জগদ্বাসীর বিস্ময়কর হয়। আর ঐ বিস্ময় স্থায়িভাবও তৎকালে হর্ষাদিসূচক ধ্বনি প্রভৃতি দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া অদ্ভুতরসে পরিণত হইয়া থাকে।

এস্থলে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে। দ্বিতীয় বাক্যটিতে বলা হইয়াছে—রৌদ্রের যাহা কর্ম্ম তাহাই করুণ রস; আবার তৃতীয় বাক্যে বলা হইল—বীরের যাহা কর্ম্ম তাহাই অদ্ভুত রস। উভয় বাক্যেরই গঠনপ্রণালী একরূপ। এ কারণে ধরিয়া লওয়া যায় যে, উভয় বাক্যের তাৎপর্য্যও একইরূপ। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে দুই বার দুইটি বাক্যের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উল্লেখ না করিয়া একই বাক্যে দুইটি দৃষ্টান্তকে গ্রথিত করিলে লাঘব হইতে পারিত। কিন্তু মহর্ষি তাহা করিলেন না কেন?

উত্তরে বলা চলে যে, দুইটি বাক্যের গঠনভঙ্গী উপর-উপর দেখিতে প্রায় একই প্রকার হইলেও উহাদিগের যোজনা-প্রণালী একরূপ নহে, অতএব, উহাদিগের তাৎপর্য্যও একরূপ নহে। দ্বিতীয় বাক্যে বুঝাইতেছে যে, একটি রস (অর্থাৎ করুণ) অন্য একটি রসের

(৫) "এবং তদাভাসতদ্দ্বারেণ রসান্তরাক্ষেপকত্বে শৃঙ্গার উদাহরণম্। তেন শৃঙ্গারানুকৃতিরিত্যত্র তু-শব্দো বীপ্সায়াম্, দ্বিতীয়ো হেতৌ। তেনৈবং যোজনা—যা অনুকৃতিঃ স হাস্যো যতঃ প্রকীর্ত্তিতঃ, এবংবিভাবকো হাস্য ইতি শেষঃ। তদ্ যথা শৃঙ্গার আদ্যঃ শৃঙ্গারবতানুকৃতিরিত্যর্থঃ"।—অভিনবভারতী, প্রথম খণ্ড, বরোদা সংস্করণ, পৃঃ ২৯৮—৯৯।

(৬) "যদীয় ফলানন্তরং দ্বিতীয়রসোহবশ্যম্ভাবী তস্যোদাহরণং রৌদ্রঃ। রৌদ্রস্য হি ফলং বধবন্ধনাদি, তদ্বিভাবকেনাবশ্যং করুণেন ভাব্যম্"।—অভিনবভারতী, পৃঃ ২৯৭। "পরম্পরফলত্বেন রসান্তরাক্ষেপে রৌদ্র উদাহরণম্। রৌদ্রস্য যৎ কর্ম্ম ফলাত্মকং বধাদি, চকারাৎ তস্য যৎ কর্ম্ম ফলরূপং স এব করুণঃ। এবকারেণাত্যন্তব্যবহিতাং পরম্পরাং পরাকরোতি"।—অঃ ভাঃ, পৃঃ ২৯৯।

(রৌদ্রের) সাক্ষাৎ ফল নহে—পরম্পরা-ক্রমে ফলস্বরূপ ; অর্থাৎ—একটি রসের (রৌদ্রের) যাহা ফল (বধাদি), তাহার ফল অপর একটি রস (করুণ)। এস্থলে একটি রস (রৌদ্র) অন্য রসের (করুণের) সাক্ষাৎ কারণ নহে—পরম্পরা-কারণ মাত্র। পক্ষান্তরে, তৃতীয় বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, একটি রস (অদ্ভুত) অপর একটি রসের (বীরের) সাক্ষাৎ ফলভূত। একটি রস অপর রসের অব্যবহিত পরভাবী অতি নিকট ফল—ইহাই তৃতীয় বাক্যে বলা হইয়াছে ; অর্থাৎ—নিজের অব্যবহিত ফলস্বরূপে রসান্তরের সূচক হইতেছে বীররস। ইহার বিশ্লেষণ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে যে, মহাপুরুষের উৎসাহ জগদ্বাসীর বিস্ময়জনক। কিন্তু রৌদ্ররসের ফল করুণ নহে—পরবিনাশ প্রভৃতিই রৌদ্রের ফল ; আর পরবিনাশের ফল করুণ। যে স্থলে একটি রস রসান্তরের ফলস্বরূপ, তাহার দৃষ্টান্ত—বীর হইতে অদ্ভুতের উৎপত্তি। উহাই তৃতীয় বাক্যের তাৎপর্য্য। আর যে স্থলে একটি রস অন্য রসের ফলের ফলভূত, তাহার উদাহরণ—রৌদ্র হইতে বধাদি ও তাহা হইতে করুণের জন্ম। দ্বিতীয় বাক্যের ইহাই অভিপ্রায় (৭)।

চতুর্থ বাক্যটি এইবার আলোচ্য—যথায় বীভৎস রস দৃষ্ট হয়, তথায় ভয়ানক রসও বিদ্যমান। সরল ভাষায় ইহার তাৎপর্য্য এই যে—বীভৎস ও ভয়ানক রসের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য অতি অল্প। কারণ, বীভৎস রসের যে সকল ভাব (অর্থাৎ বিভাবাদি)—রুধির প্রভৃতি, তাহারা যে অবশ্যই ভয়জনক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইলে বলা যায় যে, বীভৎস ও ভয়ানকের বিভাবাদি একই রূপ। অতএব, বীভৎস হইতে ভয়ানকের উৎপত্তি——এই বাক্যটির স্বারসিক তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—যে প্রকার বিভাবাদি হইতে বীভৎসের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ বিভাবাদি হইতে ভয়ানকেরও উৎপত্তির সম্ভাবনা আছে। এ কারণে সহভাবে রসান্তরের সূচক হইতেছে বীভৎস (৮)।

এই প্রসঙ্গে 'ভাবপ্রকাশন'-কার শারদাতনয় (খ্রীঃ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী) অনেক নূতন কথার অবতারণা করিয়াছেন। কথাগুলিতে পৌরাণিক আখ্যানাংশ কিছু থাকিলেও উহাদিগের সারবত্তা যথেষ্ট আছে ও উহা হইতে ভরতের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত বুঝিবার কিছু সাহায্য হয়। শারদাতনয় বলিয়াছেন—সামবেদ হইতে শৃঙ্গারের উৎপত্তি, ঋগ্বেদ হইতে বীরের, অথর্ব্ববেদ হইতে রৌদ্রের ও যজুর্ব্বেদ হইতে বীভৎসের জন্ম। পরমাত্মা জগৎসৃষ্টির ইচ্ছায় যখন ব্রহ্মার রূপ ধারণপূর্ব্বক প্রকাশমান হইয়াছিলেন, তখন সামবেদমন্ত্র স্মরণ করিতে করিতে জগৎ-সিসৃক্ষার মধ্য দিয়া তাঁহার যে স্বরূপের অভিব্যক্তির ইচ্ছা প্রকটিত হইয়াছিল, তাহার মূল তাঁহার বিষয়াভিলাষরূপা রতি—ঐ ইচ্ছারই নাম শৃঙ্গাররস। আবার ঋগ্বেদমন্ত্র স্মরণকালে তাঁহার যে ইচ্ছা বিচিত্র ক্রিয়াতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, তাহার মূলে ছিল তাঁহার উৎসাহাত্মক জ্ঞান—ঐ ইচ্ছাই বীররস নামে কথিত। পুনরায় অথর্ব্ববেদমন্ত্র স্মরণ-দশায় তাঁহার যে মতি (ইচ্ছা) হিংসাত্মিকা ক্রিয়ার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার ক্রোধমূলক—উহাই রৌদ্ররস বলিয়া কীর্ত্তিত। ইহা ছাড়া যজুর্ব্বেদমন্ত্র স্মরণকালে তাঁহার যে ফলাবসানিকী ক্রিয়ারূপা প্রবৃত্তি দেখা গিয়াছিল, তাহাই বীভৎসরস নামে খ্যাত। শৃঙ্গারের অনুকরণ হাস্যরস। বীরের যাহা ধীরতাপূর্ণ কর্ম্ম তাহাই অদ্ভুত। রৌদ্রের যাহা ক্রূরক্রিয়া তাহার নাম করুণ। আর বীভৎসের যাহা কর্ম্ম তাহাই ভয়ানক। শৃঙ্গার-বীর-রৌদ্র-বীভৎস—এই চারিটি যথাক্রমে হাস্য-অদ্ভুত-করুণ-ভয়ানকের 'জনক' বলিয়া প্রধান রসরূপে খ্যাত। আর শেষোক্ত চারিটি 'জন্য' বলিয়া অপ্রধান রস-রূপে গণ্য হয়। শারদাতনয় বলেন, ইহাই ব্যাসের সিদ্ধান্ত।

(৭) "সমনন্তরফলত্বেন রসান্তরাক্ষেপে উদাহরণং···বীরস্য সম্যক্ নিকটং যৎ ফলং সোঽদ্ভুতঃ" ।—অঃ ভাঃ, পৃঃ ২৯৯। "যস্য রসো রসান্তরং ফলত্বেনাভিসন্ধায় প্রবর্ত্ততে তস্যোদাহরণং বীরঃ। মহাপুরুষোৎসাহো হি জগদ্বিস্ময়ফলাভিসন্ধানেনৈব।···রৌদ্রস্য পরবিনাশনং ফলত্বেনাভিসন্ধায় প্রবর্ত্ততে, ন করুণমিতি শেষঃ"।
—অঃ, ভাঃ, পৃঃ ২৯৮।

(৮) 'যস্য রসস্তুল্যবিভাবত্বানিয়মেন রসান্তরং হি পরমাক্ষিপতি তস্যোদাহরণং বীভৎসঃ, তস্য হি যে (বি) ভাবা রুধিরপ্রভৃতয়স্তেঽবশ্যং ভয়হেতবঃ।·········"—অঃ ভাঃ, পৃ ২৯৮। "সহভাবেন রসান্তরাক্ষেপে বীভৎস উদাহরণম্। যদেব বীভৎসস্য দর্শনং বিভাবাদিরূপং স এব ভয়ানকস্যাপি বিভাবত্বাৎ, উপচারস্তু সহভাবপ্রতীতিঃ ফলম্"।—অঃ ভাঃ, পৃঃ ২৯৯।

অতঃপর শারদাতনয় নারদের মত উদ্ধৃত করিয়া চারিটি প্রধান রসের উৎপত্তি ও প্রধান রসচতুষ্টয় হইতে অপ্রধান রসচতুষ্টয়ের আবির্ভাবের কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। কল্পান্তকালে সমগ্র সৃষ্টি দগ্ধ করিবার পর স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ভগবান্ শ্রীমহেশ্বর আনন্দ-মন্থর নৃত্য করিতে, করিতে নিজ মনোদ্বারা বিষ্ণু ও ব্রহ্মার সৃষ্টি করেন। তখন তাঁহার বামভাগে মায়াময়ী সর্ব্বমঙ্গলা বৈষ্ণবী শক্তি অম্বিকারূপে অবস্থিতা ছিলেন। দেবদেবের নির্দ্দেশে ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্যে উদ্যুক্ত হইয়া ইতিকর্ত্তব্যতা-বিষয়ে চিন্তাকুল হইলে ভগবান্ নন্দিকেশ্বর চতুর্ম্মুখকে প্রয়োগ-বিজ্ঞানসহ সমগ্র নাট্যবেদের অধ্যাপনা করিয়া বলেন—'পিতামহ! এই নাট্যবেদোক্ত রূপকসমূহের মধ্যে একখানি লক্ষণান্বিত রূপক রচনা করিয়া আপনি নটগণকে উহার প্রয়োগ শিক্ষা দিন। উহার প্রয়োগ দর্শন করিলে প্রাক্তন সৃষ্টিপ্রক্রিয়া আপনার নিকট প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত হইবে'। ইহা শুনিয়া ব্রহ্মা দেবগণের সাহায্যে 'ত্রিপুরদাহ' নামক একখানি ডিম (নাট্যরচনা-বিশেষ) রচনাপূর্ব্বক নিজ সভামধ্যে নটগণের দ্বারা অভিনয় করাইয়াছিলেন। তখন তাহা দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মার মুখচতুষ্টয় হইতে কৈশিকী-সাত্ত্বতী-আরভটী-ভারতী বৃত্তিসহ শৃঙ্গার-বীর-রৌদ্র-বীভৎস রসচতুষ্টয় নিঃসৃত হইয়াছিল (৯)। যখন নটগণ শিব-শিবার মিলনের অভিনয় করিতেছিল, তখন ব্রহ্মার পূর্ব্বদিকের মুখ হইতে কৈশিকী-বৃত্তি-জাত শৃঙ্গার-রসের নিঃসরণ হয়। আবার নটগণ-কর্ত্তৃক ত্রিপুরমর্দ্দন অভিনয় দর্শনকালে ব্রহ্মার দক্ষিণ মুখ হইতে সাত্ত্বতী-বৃত্তি-সঞ্জাত বীররসের আবির্ভাব ঘটে। যখন নটগণ দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংস অভিনয় করিতেছিল, তখন ব্রহ্মার পশ্চিম মুখ হইতে আরভটী-বৃত্তি-সম্ভূত রৌদ্ররসের উৎপত্তি হয়। আর যখন হরের কল্পান্তকালীন সংহারক্রিয়ার অনুকরণাত্মক অভিনয় নটগণ সম্পাদন করে, তখন তাহা দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মার উত্তর মুখ হইতে ভারতী-বৃত্তি-সঞ্জাত বীভৎসের উদ্ভব ঘটিয়াছিল। তাহার পর যখন জটাজিন-ধারী, ফণিভূষণ, অগ্নিনয়ন, ভস্মাঙ্গরাগকারী শিব দেবী পার্ব্বতীর প্রতি অনুরাগী হইয়াছিলেন, তখন তদ্দর্শনে দেবীর ও তাঁহার সখীগণের হাস্যোদ্রেক হয়। এই কারণে বলা হয়—শৃঙ্গার হইতে হাস্যের উৎপত্তি। স্বর্ণ-রৌপ্য-লৌহময় পুরত্রয়ের রক্ষার্থে বহু শত-কোটী মহাবীর অসুরবৃন্দ সশস্ত্রে সজ্জিত থাকিলেও অপাঙ্গে অম্বিকা-বদন নিরীক্ষণ করিতে করিতে স্মরহর উক্ত অসুরগণসহ ত্রিপুর একটি বাণক্ষেপে নিঃশেষে যখন দগ্ধ করেন, তখন ত্রিলোকবাসী সকলেই পরম বিস্ময় অনুভব করিয়াছিল। এই নিমিত্ত বলা হয়—বীর হইতে অদ্ভুতের নিষ্পত্তি। বীরভদ্র-কর্ত্তৃক দক্ষের যজ্ঞধ্বংস ও দেবগণ নানা ভাবে লাঞ্ছিত হইলে সেই সকল দীনভাবাপন্ন ছিন্ন-কর্ণ-নেত্র-নাসিকাযুক্ত বিলাপ-কারী দেবগণকে দেখিয়া দেবীর সখীগণের চিত্তে কারুণ্যের উদ্রেক হইয়াছিল। এই হেতু বলা হয়—রৌদ্র হইতে করুণের জন্ম। আবার দগ্ধ অসুরগণের অস্থিসমূহ অলঙ্কাররূপে ধারণপূর্ব্বক ও তাহাদিগের দেহভস্ম নিজ দেহে বিলেপন করিয়া মহাভৈরব শ্মশানমধ্যে নৃত্যারম্ভ করিলে সেই বীভৎস দৃশ্যদর্শনে ভয়ার্ত্ত প্রমথ-ভূত-সঙ্ঘ বিমূঢ়চিত্তে সেই ভৈরবেরই শরণাপন্ন হন। এ কারণে বলা হইয়াছে—বীভৎস হইতে ভয়ানকের উদ্ভব। দেবর্ষি নারদ মহর্ষি ভরতকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন ও তাহা শুনিয়া রসসমূহের জন্য-জনক-ভাব মহর্ষি ভরত নিজ নাট্যশাস্ত্রে উপনিবদ্ধ করিয়াছেন (১০)।

---

(৯) এই 'ত্রিপুরদাহ' ডিমের অভিনয়-কথা ভরত-নাট্য-শাস্ত্রের চতুর্থাধ্যায়ে (১০ম শ্লোকে, বরোদা সং) বিবৃত হইয়াছে। নাট্যশাস্ত্রের উপাখ্যান মৎকর্ত্তৃক বহু বৎসর পূর্ব্বে ধারাবাহিক ভাবে অধুনালুপ্ত 'উদয়ন' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। (উদয়ন, আশ্বিন ১৩৪১—'ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের গোড়ার কথা' নামক মদীয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। এতদ্ব্যতীত 'মাসিক বসুমতী' (শ্রাবণ, ১৩৪৪) পত্রিকায় প্রকাশিত 'নাট্যমাতৃকা' প্রবন্ধে কৈশিকী প্রভৃতি বৃত্তিচতুষ্টয়ের বিশদ বিবরণ ও বৃত্তি হইতে রসের উৎপত্তি সম্বন্ধে শারদাতনয়ের বিবৃত উপাখ্যান প্রদত্ত হইয়াছে। বৃত্তি-সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ নাট্যশাস্ত্রের (কাশী সং) দ্বাবিংশ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। কৈশিকী—কোমলা, স্ত্রীবহুলা, বেশাদি-পারিপাট্য-যুক্তা। সাত্ত্বতী—উৎসাহবহুলা, ভাবপ্রবণা বৃত্তি। আরভটী—মায়া ইন্দ্রজাল প্রভৃতিতে পরিপূর্ণা উগ্রা বৃত্তি। ভারতী—স্ত্রী-বর্জ্জিতা, বাক্‌প্রধানা, পুরুষ-প্রযোজ্যা বৃত্তি। ইহাই বৃত্তি-চতুষ্টয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। বৃত্তি—ব্যবহার, প্রয়োগক্রম। রাজশেখর 'কাব্যমীমাংসা'য় বলিয়াছেন—বৃত্তি বিলাসবিন্যাসের ক্রম—dramatic mode of representation.

(১০) কিন্তু নাট্যশাস্ত্রে এ উপাখ্যানের কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। ইহা শারদাতনয়ের স্বকল্পিত বলাও দুঃসাহসের কর্ম।

এইবার রসের বর্ণ ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নিরূপণের প্রকরণ। রসের বর্ণ-নিরূপণের প্রয়োজন কি?—ইহার উত্তরে অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন—পূজা ও ধ্যানেই রসের বর্ণনির্ণয়ের প্রয়োজন আছে। কাহারও মতে মুখ ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গোপাঙ্গাদি রঞ্জিত (paint) করিবার সময়ও রসগুলির বর্ণজ্ঞান থাকা আবশ্যক (১১)।

শৃঙ্গারের বর্ণ শ্যাম। ইহা একটি অতি নিগূঢ় তত্ত্ব-কথা। বস্তুতঃ, ঈষৎ শ্যামবর্ণের নায়ক বা নায়িকা আলম্বন না হইলে যথার্থ আদিরসের উদ্ভব হয় না। এই কারণেই মূর্তিমান্ প্রেমঘন-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ শ্যামলতনু। পাশ্চাত্ত্যের যৌন-মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ পর্য্যন্ত গবেষণা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অধিকাংশ নর-নারীই উজ্জ্বল গৌরবর্ণ অপেক্ষা ঈষৎ শ্যামবর্ণাভ সঙ্গী বা সঙ্গিনীর প্রতি অধিকতর অনুরাগ পোষণ করিয়া থাকেন।

হাস্যরসের বর্ণ সিত বা শ্বেত। ইহার মধ্যে যে মনোবৃত্তির ক্রীড়া প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায়। হাসিলেই 'দন্তরুচিকৌমুদী' প্রথমে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অথবা অন্যভাবে বলা যায় যে, দন্তপ্রভার প্রকাশেই হাস্যের অভিব্যক্তি। এই দন্তপ্রভা স্বভাবতঃ শ্বেতবর্ণ। কাজেই হাস্যরসের বর্ণ শ্বেত বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে।

করুণরসের বর্ণ কপোতের বর্ণের ন্যায় ধূসর। কপোত বলিতে পায়রা বা ঘুঘু এই দুই প্রকার পাখীকেই বুঝায়। এ স্থলে কপোতবর্ণ বলিতে ঘুঘুর গায়ের মত রঙ্ বুঝিতে হইবে। বামন শিবরাম আপ্তে মহোদয় তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ অভিধানে কপোত-বর্ণ বলিতে বুঝিয়াছেন—"The grey colour of a pigeon, pale or dirty white colour." করুণের বর্ণ কেন ধূসর হইল—ইহা অতি সহজেই বুঝা যায়। করুণ রসের অভিব্যঞ্জক অশ্রুসিক্ত মুখ সাধারণতঃ বিবর্ণ বা পাণ্ডুবর্ণ দেখায়। কপোতের বর্ণের সহিত তাহার একটা বিশেষ সাদৃশ্য আছে। তাহা ছাড়া ঘুঘুর ডাক অতিশয় করুণ। এই পাখীটিকে দেখিলেই সাধারণতঃ চিত্তে একটা করুণ ভাবের উদ্রেক হইয়া থাকে। হয় ত বা এই কারণেও কপোতের বর্ণ অনুসারে করুণের বর্ণ কল্পনা করা হইয়াছে।

রৌদ্ররসের বর্ণ রক্ত। ক্রুদ্ধ ব্যক্তির মুখমণ্ডল, চক্ষুর্দ্বয়, এমন কি সর্ব্বশরীর পর্য্যন্ত স্বভাবতঃ আরক্তিম হইয়া উঠে। এ কারণে ক্রোধ স্থায়িভাব হইতে অভিব্যক্ত রৌদ্ররসের বর্ণ রক্ত বলা হইয়াছে।

গৌরবর্ণ বীররসের। ইহা নাট্যশাস্ত্রের মত। সাহিত্য-দর্পণকার বলিয়াছেন, বীররস হেমবর্ণ অর্থাৎ সোণার মত রঙ্ (১২)। ডক্টর সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মূল পাঠে বীররস গৌরবর্ণ বলিলেও মূলের ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন—"The heroic sentiment is known to be golden" (১৩)। 'গৌর' শব্দের অর্থ হইতেছে—অরুণ, পীত বা শ্বেত—"গৌরোঽরুণে সিতে পীতে" (অমরকোষ, তৃতীয়কাণ্ড, নানার্থবর্গ, শ্লোক ১৮৯)। গৌরবর্ণ বলিলে বুঝায় অনেকটা গরদ কাপড়ের রঙ্। ডক্টর মুখোপাধ্যায় ইহার 'স্বর্ণবর্ণ' অর্থ কোথায় পাইলেন—বুঝা গেল না। বোধ হয়, তিনি দর্পণকারের প্রস্তাবিত পাঠ গ্রহণ করা সমীচীন বোধ করিয়াছেন। বীররসের স্থায়িভাব উৎসাহ। এ কারণে উজ্জ্বল গৌরবর্ণের দ্বারা বীররস সূচিত হওয়া উচিত।

ভয়ানক রস কৃষ্ণবর্ণ। যে কোনরূপ বিভীষিকা দর্শনের সঙ্গে কৃষ্ণবর্ণের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। গাঢ় অন্ধকারের মধ্যেই যেন ভয়ের রাজ্য। অতএব, ভয়ানকের কৃষ্ণবর্ণ হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর নাই।

বীভৎসের বর্ণ নীল। বমনকালে উত্থিত পিত্তরসের রঙ্ও নীল। বমন বীভৎসরসের প্রধান উদ্বোধক। এই কারণেই বোধ হয় বীভৎসকে নীলবর্ণরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

অদ্ভুত রস পীতবর্ণ। অলৌকিক-দর্শন-জনিত বিস্ময়ের আতিশয্যে চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইলে চক্ষুর সম্মুখে পীতবর্ণের আবির্ভাব হয়—ইহা লৌকিক প্রত্যক্ষসিদ্ধ। চলিত ভাষায় ইহাকেই 'চোখে সরষের ফুল দেখা' বলে। এই কারণেই অদ্ভুতের বর্ণ পীত।

হয়ত নাট্যশাস্ত্রের যে সংস্করণ দেখিয়া শারদাতনয় এই কথা বলিয়াছেন, বর্ত্তমানে উপলভ্যমান সংস্করণে সে অংশটুকু লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

(১১) "বর্ণাভিধানং পূজাদৌ ধ্যান উপযোগি। মুখরাগেঽপ্যন্যে।"—অভিনবভারতী, পৃঃ ২৯৯।

(১২) "মহেন্দ্রদৈবতো হেমবর্ণোঽয়ং সমুদাহৃতঃ"। সাঃ দঃ ৩য় পরিচ্ছেদ।

(১৩) The Nāṭyas'āstra of Bharata, Chapter Six, English Translation portion, p. 10.

যাঁহারা শান্তকে রস বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের মতে শান্ত রস স্বচ্ছবর্ণ। মূলে এই পাঠ ধৃত না হইলেও অভিনবগুপ্ত 'অভিনবভারতী'তে নিম্নোক্ত মর্ম্মে পাঠান্তর উদ্ধৃত করিয়াছেন—'শান্তরস-বাদিগণের পাঠ—শম (শান্ত) ও অদ্ভুতের বর্ণ যথাক্রমে স্বচ্ছ ও পীত' (১৪)। দর্পণকার বলিয়াছেন, শান্তের বর্ণ—'কুন্দ-পুষ্প ও চন্দ্রের কান্তির ন্যায় সুন্দর' (১৫)।

শান্তের বর্ণ যে মালিন্যলেশ-হীন স্বচ্ছ হইবে, তাহা ত একান্ত স্বাভাবিক।

আর বাৎসল্যরসের বর্ণ দর্পণকারের মতে পদ্মগর্ভের ন্যায় আভাবিশিষ্ট (১৬)। ইহা অবশ্য নাট্যশাস্ত্রের কুত্রাপি পাওয়া যায় না। তথাপি দর্পণকার ইহাকে "মুনীন্দ্রসম্মত বৎসল" বলিয়াছেন। সম্ভবতঃ, মুনিবর ভরত ইহাকে রস বলিয়াছেন—ইহার সূচনা নাট্য-শাস্ত্রের কোন এক স্থানে পাওয়া গিয়াছে বলিয়াই ইহাকে 'মুনীন্দ্রসম্মত' বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহার কোন বিবরণ নাট্যশাস্ত্রের উপলভ্যমান কোন সংস্করণেই পাওয়া যায় না। পদ্ম-পুষ্পের গর্ভদেশ বাৎসল্যের আলম্বনীভূত শিশুর শরীরের ন্যায় অত্যন্ত কোমলভাবাপন্ন ও পীত-শ্বেত-মিশ্রিত ঈষৎ রক্তাভ থাকে। এ কারণে বাৎসল্যরসের বর্ণ পদ্মগর্ভের ন্যায়—ইহা বলা অসঙ্গত হইতে পারে না (১৭)।

এইবার বিবিধ রসের বিভিন্ন অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। রসস্ফুরণের উদ্দেশ্যে এই সকল দেবতার পূজা কর্ত্তব্য—এই উদ্দেশ্যে রসসমূহের দেবতা-নিরূপণ করা হইয়াছে।

শৃঙ্গারের অধিপতি দেব বিষ্ণু। অভিনবগুপ্ত ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'বিষ্ণু'-শব্দের অর্থ এস্থলে 'কামদেব'। কিন্তু এ গৌণ অর্থ এ ক্ষেত্রে না করিলেও চলিত। যিনি মোহিনীবেশে কামজেতা স্বয়ং মহেশ্বরকে পর্য্যন্ত রাগযুক্ত করিয়াছিলেন, যিনি রুদ্ররোষ-বহ্নিতে দগ্ধ অনঙ্গতা-প্রাপ্ত কামদেবকে পুত্ররূপে জন্মদানপূর্ব্বক পুনরায় নব অঙ্গ-বিশিষ্ট করিয়াছিলেন, সেই সাক্ষাৎ 'মন্মথ-মন্মথ' মদনমোহন শ্রীবিষ্ণুই শৃঙ্গারের অধিদেবতা হইবার উপযুক্ত পাত্র। এ বিষয়ে তাঁহার তুলনায় কামদেব নিতান্তই নগণ্য। অতএব, অভিনবের এ অভিনব অর্থ এস্থলে রসিকগণের তৃপ্তিদায়ক নহে। দর্পণকার প্রভৃতিও শৃঙ্গারের দেবতা স্বয়ং বিষ্ণু বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।

হাস্যরসের অধিদেবতা প্রমথগণ। প্রমথগণ রুদ্রানুচর—সর্ব্বদাই অট্টহাস্যপরায়ণ। এ কারণে তাঁহাদিগকে হাস্যের দেবতা বলা সম্পূর্ণ সঙ্গত।

রৌদ্ররসের দেবতা রুদ্র। ইহাও অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। কারণ, 'রৌদ্র'-শব্দটিই 'রুদ্র'-শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন। রুদ্র সংহারদেবতা ত্রৈলোক্যনাশকর্ত্তা। তাঁহার লীলাতেই রৌদ্ররসের অভিব্যক্তি।

করুণের দেব যম। যেখানে যমের আবির্ভাব, সেখানেই মৃত্যুর করাল ছায়াপাত—সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়জন-বিয়োগ বিধুর পরিজনের বিলাপে করুণ রসের প্রকাশ হইয়া থাকে।

বীভৎসের দেবতা মহাকাল। মহাকালের গলদেশে লম্বমান হাড়মাল ও তাঁহার অলঙ্কারভূত কঙ্কালাদি অন্য শ্মশানদ্রব্য বীভৎসরসের জনক।

ভয়ানকের দেবতা কাল। কাল সকল প্রাণীরই অন্তকর বলিয়া ভয়জনক। এই প্রসঙ্গে একটি কথার উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। নাট্যশাস্ত্রে ভয়ানকের অধিদেবতা-নিরূপণ-প্রসঙ্গে একটি পাঠ পাওয়া যায়—'ভয়ানকের দেবতা কামদেব'। ইহা যে ভ্রমপূর্ণ পাঠ—তাহা সহজেই বুঝা যায়। 'কামদেবে'র 'ম'কার স্থানে 'ল'কার বসাইলে 'কালদেব' হয়। 'কালদেব' পাঠ ধরিলেই অর্থ সুসংলগ্ন হয়। সাহিত্যদর্পণাদিতেও ভয়ানকের দেবতা কাল—ইহা বলা হইয়াছে। অথচ ডক্টর মুখোপাধ্যায় যে মূলের পাঠ ধরিয়াছেন, তাহাতে 'কামদেব' আছে। তাঁহার ফুটনোটে 'কালদেব' পাঠান্তর ধরা থাকিলেও উহা তিনি প্রশস্ত বলিয়া গ্রহণ করেন

---

(১৪) "স্বচ্ছপীতৌ শমাদ্ভুতাবিতি শান্তবাদিনাং পাঠঃ"
—অঃ ভাঃ, পৃঃ ২৯৯।

(১৫) "কুন্দেন্দুসুন্দরচ্ছায়ঃ শ্রীনারায়ণদৈবতঃ"
—সাঃ দঃ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(১৬) "পদ্মগর্ভচ্ছবির্বর্ণো দৈবতং লোকমাতরঃ"
—সাঃ দঃ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(১৭) "শ্যামো ভবতি শৃঙ্গারঃ সিতো হাস্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
কপোতঃ করুণশ্চৈব রক্তো রৌদ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪৭ ॥
গৌরো বীরস্তু বিজ্ঞেয়ঃ কৃষ্ণশ্চৈব ভয়ানকঃ।
নীলবর্ণস্তু বীভৎসঃ পীতশ্চৈবাদ্ভুতঃ স্মৃতঃ" ॥ ৪৮ ॥
—নাট্যশাস্ত্র, বরোদা সং, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০০।

নাই। ইহার কারণ বুঝা গেল না। আশ্চর্য্যের বিষয় —এই অংশের ইংরেজী অনুবাদ তিনি করেন নাই (১৮)।

বীররসের দেবতা মহেন্দ্র। ইহাও খুব স্বাভাবিক। কারণ, দেবরাজ যিনি, তিনি ত বীরাগ্রগণ্য বটেনই। তিনি যে বীররসের দেবতা বলিয়া স্বীকৃত হইবেন—ইহাতে অযৌক্তিক কিছু নাই। ডক্টর মুখোপাধ্যায় এই অংশেরও ইংরেজী অনুবাদ করেন নাই।

অদ্ভুতের দেবতা ব্রহ্মা। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা—বহু অচিন্ত্য ও অদ্ভুত পদার্থের তিনি স্রষ্টা—জগদ্বৈচিত্র্য তাঁহারই নির্ম্মাণ-কৌশলের পরিচায়ক। এই জগতের রচনা-পারিপাট্য দর্শনে জগদ্বাসী সকলেই বিস্ময় অনুভব করিয়া থাকেন। অতএব, অদ্ভুতরসের দেবতা ব্রহ্মা—ইহা সুসঙ্গত।

শান্তরস-বাদীর মতে শান্তের দেবতা বুদ্ধ। নাট্য-শাস্ত্রের কোন প্রচলিত সংস্করণের পাঠে ইহা পাওয়া যায় না। কিন্তু অভিনবগুপ্ত একটি পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন—'শান্তরসবাদী কেহ কেহ পাঠ করেন—বুদ্ধ শান্ত-রসের দেবতা ও পদ্মযোনি অদ্ভুতের'। ইহার ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন—'বুদ্ধ বলিতে বুঝায় জিনকে—যিনি কেবল পরোপকার-পরায়ণ; অথবা তত্ত্বজ্ঞানী প্রবুদ্ধ ব্যক্তিকেও বুঝাইতে পারে' (১৯)। অবশ্য ধ্যানী বুদ্ধের প্রতিকৃতি দর্শন করিলে তাঁহাকে শান্তরসের প্রতীক বলিতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। বিশেষতঃ, হিন্দুসম্প্রদায়ে বুদ্ধও বিষ্ণুর দশাবতারের অন্যতম অবতার-রূপে স্বীকৃত হইয়াছেন। বুদ্ধের অবতারত্ব প্রাচীন হিন্দুমত-সিদ্ধ ও সর্ব্ববাদিসম্মত না হইলেও অন্ততঃ অভিনবগুপ্তের সময়ে (খ্রীঃ ১০ম—১১শ শতাব্দী) যে তিনি কোন কোন হিন্দু-সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবার দাবী অর্জ্জন করিয়াছিলেন—ইহা অভিনব-ভারতীর এই পঙ্‌ক্তিটি হইতেই বুঝা যায়। অতএব বুদ্ধকে শান্তরসের দেবতা বলিতে বিশেষ আপত্তি না-ও হইতে পারে। কিন্তু মনে হয়, ইহাতে শান্তরসবাদী সকলের সম্মতি ছিল না। কারণ, অভিনব বলিতেছেন—'শান্তরসবাদী কেহ কেহ (সকলে নহেন) এই পাঠ করিয়া থাকেন'। এই কারণে অভিনবগুপ্ত 'বুদ্ধ'-শব্দটির দুইটি অর্থ করিলেন—(১) জিন অর্থাৎ সৌগত-সম্প্রদায়ের (অথবা আর্হত-সম্প্রদায়ের) সিদ্ধ পুরুষ, ও (২) (যাঁহারা এ অর্থ গ্রহণে অসম্মত, তাঁহাদিগের মতে) প্রবুদ্ধ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ (শুকদেবাদির ন্যায়)—যাঁহারা নির্ব্বিকল্প সমাধিদশায় শান্তরসের অবতাররূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন।

পক্ষান্তরে, সাহিত্যদর্পণে বলা হইয়াছে—শান্তরসের অধিদেবতা শ্রীনারায়ণ। ইহাও অতি সঙ্গত। যিনি সর্ব্বশান্তিকর ও সাক্ষান্মোক্ষদ, সেই শ্রীমন্নারায়ণকে শান্ত-রসাধিপতি বলাই বিশেষ শোভন সন্দেহ নাই।

অবশিষ্ট রহিল কেবল বাৎসল্য রস। দর্পণকারের মতে—ইহার দেবতা লোকমাতৃগণ। লোকমাতৃগণ বলিতে অষ্ট মাতৃশক্তিকে বুঝায়; যথা—ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী ও শিবদূতী। ইহা শ্রীশ্রী৺সপ্তশতী চণ্ডীর মত। কোন কোন তন্ত্রমতে—শিবদূতী-স্থলে অপরাজিতা অথবা চামুণ্ডা গ্রহণ করিলে অষ্টমাতৃগণের নাম সম্পূর্ণ হয়। আবার মতান্তরে —ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, চণ্ডী, বারাহী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, চামুণ্ডা ও চর্চ্চিকা—এই অষ্ট মাতৃ-শক্তি। আবার অন্য মতে—ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, মাহেন্দ্রী, বারাহী ও চামুণ্ডা—এই সপ্ত মাতৃশক্তি মাত্র। দেবীকবচ-মতে—চামুণ্ডা, বারাহী, ঐন্দ্রী, বৈষ্ণবী, নারসিংহী, শিব-দূতী, মাহেশ্বরী, কৌমারী লক্ষ্মী, ঈশ্বরী ও ব্রাহ্মী—এই একাদশ মাতৃকা। আবার গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকার নামও লোকপ্রসিদ্ধ; যথা—গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, আত্মদেবতা ও কুলদেবতা। ইঁহারা যখন লোক-মাতৃকা, তখন ইঁহাদিগের পক্ষে বাৎসল্যরসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক। অবশ্য ইহা বলা বাহুল্য যে, নাট্যশাস্ত্রের কোন স্থানে এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না (২০)।

(১৮) ডক্টর মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত—"The Nātyas'āstra of Bharata, Chapter Six", মূলাংশ, পৃঃ ১৪, অনুবাদাংশ, পৃঃ ১০।

(১৯) "বুদ্ধঃ শান্তোঽব্জযোঽদ্ভুতঃ" ইতি শান্তবাদিনঃ কেচিৎ পঠন্তি। বুদ্ধো জিনঃ পরোপকারৈকপরঃ প্রবুদ্ধো বা"।—অঃ ভাঃ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩০০।

(২০) "শৃঙ্গারো বিষ্ণুদেবত্যো (দৈবত্যো-দেবস্ত) শান্তঃ প্রমথদৈবতঃ"।

শারদাতনয় এই বর্ণ ও দেবতা সম্বন্ধে যে কয়টি কথা বলিয়াছেন, তাহা সংক্ষিপ্ত হইলেও সুচিন্তিত। তিনি বলেন—আভিরূপ্য (সৌন্দর্য্য—চারুতা) শৃঙ্গারের অধিষ্ঠান (আশ্রয়)। আর বিষ্ণু ত্রিলোকের মধ্যে অভিরূপোত্তম (সুন্দরতম)। এ কারণে বিষ্ণু শৃঙ্গারের অধিদেবতা। বিকটাভিনয় হাস্যের অধিষ্ঠান। প্রমথগণ বিকটাভিনয়-পরায়ণ। এ নিমিত্ত প্রমথগণ হাস্যের দেবতা। বীরের অধিষ্ঠান ধৈর্য্য। মহেন্দ্র অতি ধীর-প্রকৃতি, অতএব তিনি বীরের দেবতা। অদ্ভুতের অধিষ্ঠান নানা শিল্পরচনার অনুকূল-বুদ্ধি। উহা ব্রহ্মার আছে। তাই তিনি অদ্ভুতের অধিদেবতা। রৌদ্রের অধিষ্ঠান রোগশোকাত্মক কর্ম্ম। তাহা রুদ্রে বর্ত্তমান। এ হেতু তিনি রৌদ্রের অধিপতি। করুণের অধিষ্ঠান দয়া। এই দয়া দ্বারা পাপসংযম করেন যম। তাই যম করুণ-দেবতা। বীভৎসের অধিষ্ঠান রক্তাদি দর্শন। প্রলয়-কালীন তাণ্ডবে মহাকালে ঐ সকলের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। তাই মহাকাল বীভৎসাধিপতি। ভয়ানকের অধিষ্ঠান বিকৃতরূপাদি। সংহারকালে কাল ঐরূপ বিকৃতাকারে আবির্ভূত হন। এ কারণ তিনি ভয়ানকের অধিপতি। শারদাতনয় শান্তের অধিপতির উল্লেখ না করিলেও মনে হয়, তাঁহার মতে যোগিগণই শান্তরসের যথার্থ অভিব্যঞ্জক (২১)। শারদাতনয় আরও বলিয়াছেন যে, শৃঙ্গার-হাস্য-বীর-অদ্ভুত-রৌদ্র-করুণ-বীভৎস-ভয়ানক যথাক্রমে শ্যাম-শ্বেত-গৌর-পীত-রক্ত-কপোত-নীল-কৃষ্ণ বর্ণ। এই বর্ণগুলি তাহাদিগের অধিপতি দেবতার দেহবর্ণ অনুসারে পূর্ব্বাচার্য্যগণ-কর্ত্তৃক কল্পিত। অর্থাৎ—বিষ্ণু শ্যামতনু, তাই শৃঙ্গার শ্যামবর্ণ। প্রমথগণ শিবাকৃতি শ্বেতবর্ণ—তাই হাস্য শ্বেত। ইন্দ্র গৌর-বর্ণ, অতএব বীর গৌর। কিন্তু ব্রহ্মা পীতবর্ণ—ইহা পুরাণ-প্রসিদ্ধ নহে ; পুরাণে পাওয়া যায় তিনি রক্তবর্ণ। এস্থলে একটি ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে। রুদ্রও রক্তবর্ণ নহেন বরং নীললোহিত বলা চলে ; ইহাও আর একটি ব্যতিক্রম। ঐরূপ যমও কপোতবর্ণ নহেন—নীল বা কৃষ্ণবর্ণ ; ইহা তৃতীয় ব্যতিক্রম। মহাকালকে তন্ত্রে বলা হইয়াছে, ধূম্র-বর্ণ—নীলবর্ণ নহেন ; ইহাও চতুর্থ ব্যতিক্রম। কাল অবশ্য কৃষ্ণবর্ণ, তাই ভয়ানক কৃষ্ণ। শারদাতনয় বলিতেছেন, তিনি যোগমালাসংহিতা-বাসুকি-ব্যাস-নারদ প্রভৃতি প্রাচীন সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণের মত সংগ্রহপূর্ব্বক রসের স্বরূপ-জন্ম-নাম-ভেদ-বর্ণ-দেবতা প্রভৃতি বিষয়ক সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (২২)।

ইহার পর নাট্যশাস্ত্রে প্রত্যেকটি রসের স্থায়ী ভাব, বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারী ভাব প্রভৃতি যথাক্রমে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার উপক্রমে মহর্ষি বলিয়াছেন যে, যেমন মনুষ্যগণের মধ্যে আপ্ত (শাস্ত্রকার) পুরুষগণের উপদেশানুসারে নিয়মবশতঃ পিতৃগোত্র-মাতৃকুল-আচার-ব্যবহারানুরূপ নামকরণের প্রথা প্রচলিত আছে, ঠিক সেইরূপ ব্রহ্মাদি প্রাচীন আপ্তপুরুষগণ-কর্ত্তৃক ভাব—রস, এমন কি, নাট্যাশ্রিত সকল বিষয়েরই নাম তত্তৎ পদার্থের আচরণানুসারে প্রথম স্থিরীকৃত হইয়াছে। আর প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রবিদ্‌গণের সাম্প্রদায়িক ব্যবহারবশে ঐ সকল আপ্তোপদেশ-সিদ্ধ নাম পরবর্ত্তী লৌকিক ব্যবহারে নিরূঢ় হইয়াছে, অর্থাৎ লোকসমাজে প্রসিদ্ধি ও প্রচলন লাভ করিয়াছে।

এ প্রসঙ্গে প্রত্যেক রসের বিস্তৃত বিবরণ ধারাবাহিক-রূপে আগামী কয়েক সংখ্যায় দিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

" রৌদ্রো রুদ্রাধিদৈবত্যঃ করুণো যমদৈবতঃ। ৪৯।
বীভৎসশ্চ মহাকালঃ কাল (ম) দেবো ভয়ানকঃ।
বীরো মহেন্দ্রদেবঃ স্যাদদ্ভুতো ব্রহ্মদৈবতঃ" । ৫০।
—নাট্যশাস্ত্র, বরোদা সং প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩০০।

(২১) ভাবপ্রকাশন, শারদাতনয়-কৃত, বরোদা সং, পৃঃ ১৩১।

(২২) ভাবপ্রকাশন, পৃঃ ৬৮—৬৯।

দাবি

প্রত্যহ হাজার কাজে আমারে সংসার-মাঝে
হয় প্রয়োজন,
কাজ করি আর ভাবি, কে মিটাবে এত দাবি
মুদিলে নয়ন ?

শ্রীকালিদাস রায়।

২০

বাড়ী হইতে বাহির হইয়া কল্লোল পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইল। কোনো-কিছুতে লক্ষ্য নাই···মনের উপরে কে যেন ভারী একখানা পাথর আনিয়া চাপিয়া ধরিয়াছে! যেটুকু আলো-বাতাস ছিল, পাথরের চাপে সে-সব কোথায় ঢাকিয়া গেছে! অস্বস্তির সীমা নাই!

এবং এমনি অস্বস্তির ঝোঁকে হঠাৎ অনাদির সঙ্গে দেখা। অনাদি ডাকিল—কল্লোল···

কল্লোল বলিল—কখন ফিরলে?

অনাদি বলিল—ভোরে এসেছি।

—হঠাৎ?

অনাদি বলিল—হঠাৎ নয়। চৌধুরী সাহেব এখানে এসেছেন নানা ফন্দী নিয়ে। শুধু গরীব অভাগা আর সুন্দরী নারী বধ করা ওঁর কাজ নয়; যে-লোক পূর্ণ বিশ্বাসে ওঁর হাতে কারবারের ভার ছেড়ে দেছে, তাঁকেও উনি বধ করতে চান!

কল্লোল বলিল—কিন্তু এ-সব কথা আমার কাছে সম্পূর্ণ অর্থহীন!

অনাদি বলিল—যে দু'টো লোক মোসাহেব সেজে সঙ্গে এসেছে, ওরা দাগী। ওদেরই এক জনের জ্ঞাতি-ভাই গুণেন রায়···কারবারে চৌধুরীর হাফ-পার্টনার। বহুৎ টাকা সে দেছে এ-কারবারে। সে-ভদ্রলোক বাতে পঙ্গু। তাঁর স্ত্রী আছেন আর আছে দুই নাবালক ছেলে··· তাদের ফাঁকি দেবার জন্য এখানকার অফিসের খাতাপত্রে শুধু লোকসানের অঙ্ক আঁচড়াতে এসেছেন।···জেনে-শুনে এ-কাজে সহায় হতে পারি না,—তাই বাড়ীতে খুব অসুখ বলে পালিয়ে এসেছি।

কথাটা শুনিয়া কল্লোল ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া রহিল। মনে হইল, শিপ্রার তাহা হইলে সৌভাগ্যের সীমা নাই!

অনাদি বলিল—এসো···

কল্লোল বলিল—তুমি যাও···আমার কাজ আছে।

অনাদি বলিল,—কাজ? বেশ···

বলিয়া অনাদি চলিয়া গেল। পথে দাঁড়াইয়া কল্লোল দেখিল, অনাদি বাড়ী গেল না···মোড়ের মাথায় মদের দোকান। অনাদি সেই দোকানে ঢুকিল।

কল্লোল আরো কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর কি খেয়াল হইল, সেও আসিয়া ঢুকিল সেই দোকানে।

অনাদি বোতল কিনিয়াছে, কল্লোল আসিয়া পাশে বসিল। বলিল—আমাকে দিয়ো অনাদি···

অনাদির বিস্ময়ের সীমা নাই! বলিল—তুমি না ছেড়ে দেছো···

হাসিয়া কল্লোল বলিল—ও-জিনিস ছেড়ে থাকা গেল না···ছাড়া সম্ভব হলো না, ভাই!

কল্লোল মদ খাইল,···অনাদির চেয়ে বেশী করিয়াই খাইল।

তার পানে তাকাইয়া অনাদি বলিল—সাধে তোমাকে কলেজে থাকতে 'গুরুদেব' বলতুম!

কল্লোল কথা কহিল না···আর-একটা বোতল চাহিয়া লইল।

তার পর অনাদি যখন নেশার ঘোরে ঢুলিয়া পড়িয়াছে, কল্লোল উঠিল; দাম দিয়া বাহিরে আসিল। এবং···

পথে বাহির হইয়া যে-দিকে দু'চোখ যায়, আবার চলিতে শুরু করিল। চলার বিরাম নাই!

এমনি বিরামহীন চলার মাঝখানে কে তার হাত চাপিয়া ধরিল। একটা বাধা···শুধু অনুভূতি! কল্লোল দাঁড়াইল।

দাঁড়াইয়া ভালো করিয়া চোখ চাহিয়া দেখে, মা-শী।

কল্লোল বলিল—ধরলে যে!

— এসো আমার সঙ্গে।

কল্লোল বলিল—কেন যাবো?

মা-শীর বুকের মধ্যে যেন অশ্রুর সিন্ধু উথলিয়া উঠিল! কল্লোলের এ কী মূর্ত্তি···এ-মূর্ত্তি মা-শী কখনো চক্ষে দেখে নাই!

মা-শী বলিল—তুমি মদ খেয়েছো। আমার সঙ্গে এসো। না হলে পথে থাকলে পুলিশে ধরবে···

কল্লোল হাসিল··বলিল,—মাতালকে পুলিশ ধরে। আইন।

মা-শী বলিল—আইনের কথা বাড়ীতে বসে শুনবো ···পথে নয়। এসো···

কল্লোল বলিল—মমতা হচ্ছে?···বেশ, চলো···

একখানা খালি ফিটন যাইতেছিল। সেই ফিটন ভাড়া করিয়া কল্লোলকে তাহাতে তুলিয়া মা-শী তাকে লইয়া বাড়ী আসিল।

দেখিয়া মা বলিল—এ যে বদ্ধ মাতাল! কোথা থেকে ধরে আনলি মা-শী?

মা-শী বলিল—পথ থেকে।

মা-শী দাঁড়াইল না···কল্লোলকে ধরিয়া দোতলায় নিজের ঘরে আনিল। ঘরে খাটের উপরে বিছানা পাতা···কল্লোলকে সেই বিছানায় শোয়াইয়া দিল। বলিল—দোর-জান্‌লা বন্ধ করে দি। শুয়ে ঘুমোও···

কল্লোল বলিল—আমায় বন্দী রাখবে মা-শী?

মা-শী বলিল—না। ঘুমোলে সেরে উঠবে···সেরে যেখানে খুশী যেয়ো। ভয় নেই, তোমায় আমি ধরে রাখবো না।

জলে ওডিকলোন ঢালিয়া সে-জলে রুমাল ভিজাইয়া কল্লোলের মাথায় মা-শী পটীর মতো সে-রুমাল চাপিয়া দিল। তার পর এক-রকম জোর করিয়াই তাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া ঘরের দ্বার-জান্‌লা বন্ধ করিল। দ্বার-জান্‌লা বন্ধ করিয়া কল্লোলের মাথার কাছে বেতের চেয়ারে বসিয়া মা-শী হাত-পাখার বাতাস করিতে লাগিল; মাঝে মাঝে মাথায় ওডিকলোন-মিশানো জল ছিটাইয়া মাথায় হাত বুলায়, আবার পাখার বাতাস করে। আরাম পাইয়া কল্লোল চোখ বুজিল।

যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। মা-শী কপালে হাত বুলাইয়া দিতেছিল। কল্লোলের সব কথা মনে পড়িল। নেশা করিলেও বিস্মৃতির তরঙ্গে মনকে কল্লোল ভাসাইয়া দেয় নাই···কোনো দিন দেয় না!

কল্লোল ডাকিল,—মা-শী···

মা-শী বলিল—কেন?

মা-শী কথা কহিল যেন কোন্ সুদূর ধ্যানলোক হইতে!

কল্লোল বলিল—কি মতলব?

মা-শী জবাব দিল না।

কল্লোল উঠিয়া বসিল। বলিল,—জান্‌লা খুলে দাও···

উঠিয়া মা-শী গিয়া জান্‌লা খুলিয়া দিল। পূর্ণিমার সন্ধ্যা। দূর-আকাশের গায়ে প্রকাণ্ড চাঁদ আসিয়া আসন পাতিয়া বসিয়াছে। চাঁদের সে-আলো খোলা জান্‌লা দিয়া ঘরে আসিয়া ঢুকিল।

কল্লোল বলিল,—বলো···কেন আমায় নিয়ে এসেছো?

মা-শী বলিল—বলেছি তো। মদ খেয়েছিলে· পথে সে অবস্থায় দেখলে পুলিশে তোমায় ধরতো।

কল্লোল বলিল—এখন আর সে অবস্থা নেই···কাজেই পুলিশের হাতে ধরা পড়বার ভয়ও নেই। এখন তা হলে যেতে পারি?

কথাগুলা মা-শীর বুকে যেন একরাশ তীক্ষ্ণ তীরের মতো বিঁধিল।

মা-শী বলিল—কিন্তু আমি কি অপরাধ করেছি···

বাষ্প-ভারে মা-শীর কণ্ঠ বিজড়িত হইল; কথা শেষ হইল না।

কল্লোল বলিল—Always a woman's complaint! (মেয়েদের সব সময়েই ঐ নালিশ)! অপরাধ তুমি করোনি মা-শী। আমিই নিরুপায়…

মা-শী কথা বলিল না…অবিচল নেত্রে চাহিয়া রহিল কল্লোলের পানে। তার বুকের মধ্যে যেন দেব-দানবের যুদ্ধ চলিয়াছে! অঙ্গে-অঙ্গে বিপুল ঝঞ্চনা! মা-শী নীরবে চাহিয়া আছে…

কল্লোলেরও মুখে কথা নাই!

অনেকক্ষণ পরে বড় একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মা-শী মেঝেয় কল্লোলের পায়ের কাছে বসিল…তার পায়ে দু' হাত রাখিয়া বলিল,—আমার দুঃখ কতখানি, তা বুঝবে না?

কল্লোল কোনো কথা বলিল না। কি বলিবে?… পায়ের কাছে অনুগতের মতো পড়িয়া আছে মা-শী… ছলনা জানে না…কপটতা জানে না…শিক্ষা-সভ্যতার ধার ধারে না! মনে যে-কথা জাগে, সে-কথা রাখিয়া-ঢাকিয়া বলিতে জানে না! নিরীহ জীব! জানে ভালোবাসা, আর সে ভালোবাসার মানে এই দাসীর মতো সেবা-পরিচর্য্যা। কি কথা বলিয়া মা-শীকে কল্লোল নিজের নিরুপায়তা কতখানি, তাহা বুঝাইবে? মা-শীর চেয়ে পণ্ডিত…বি-এ এম-এ-পড়া এ যুগের বুদ্ধিমতী মেয়েদেরও যে সে তাহা বুঝাইতে পারে পারে নাই! কল্লোলের মনে হইল, সে-প্রয়াসে কাজ নাই! তাই শুধু বলিল,—তুমি ভালো…খুব ভালো… তোমার কোনো অপরাধ নেই!

মা-শীর মুখে কথা নাই…দু'চোখের দৃষ্টিতে শুধু রাজ্যের মিনতি!

কল্লোলের মমতা হইল। মনে হইল, দু'হাতে মা-শীকে বুকের উপরে টানিয়া তুলিয়া বলে, কোথা হইতে কি করিয়া এ নিরুপায়তার সমুদ্রে সে আসিয়া পড়িয়াছে…

কিন্তু না! মা-শীর চোখের ও-দৃষ্টিতে বিগলিত হইলে চলিবে না! বিগলিত হইয়া মা-শীকে বুকে তুলিলে বুকের মধ্যে যে দুরন্ত পশু আছে…তখনি জাগিয়া সে তার ক্ষুধা-পিপাসার চরিতার্থতা চাহিবে! মা-শীর যাতনার কথা ভুলিয়া আরো অপমানের বিষে তাকে জর্জ্জরিত করিবে না!…কি করিয়া মা-শীকে বলিবে, তোমার সঙ্গে দেহ লইয়াই আমার কারবার ছিল…তোমার ঐ পেলব দেহ…তোমার যৌবনের সুবিচিত্র মোহ শুধু? দেহের মোহে, যৌবনের মোহে মানুষ বেশী দিন তন্ময় থাকে না! ও-মোহ বড় ক্ষণিক! কাজেই…

কিন্তু এ কথা বলিলে বেচারীকে একেবারে চরম দুর্দ্দশার পাতালে নিক্ষেপ করিতে হয়! কাজ কি?

কল্লোলকে নিরুত্তর দেখিয়া মা-শী কথা কহিল। বলিল—তুমি যা বলবে, আমি তাই করবো…যাতে তোমার আনন্দ হয়…যাতে তুমি খুশী থাকো! তাতে যদি আমার সব যায়…

এ কথায় কতখানি গ্লানি, কত লজ্জা, কল্লোল বোঝে। ভাবিল, হায় রে, এক দিন নিজে বড়-গলায় সে বলিয়া বেড়াইয়াছে, নিজের স্বার্থ বুঝিয়া, নিজের সুখ খুঁজিয়া অপরের কাছ হইতে দাবী-দাওয়া নয়, চাওয়া-পাওয়া নয়…তবেই তো সত্যকার মানুষ হইবে! কিন্তু মুখে এ-কথা বলিলেও সারা জীবন কি করিয়াছে সে? শুধু নিজের স্বার্থ চাহিয়া, অপরের দেহ-মনের উপর মত্ত নৃত্য করিয়া লুণ্ঠনে তাদের দেহ-মন ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া দিয়াছে! কল্লোলের জন্য কত জন নিঃস্বতার বেদনায় নিশ্বাস ফেলিতেছে! এই মা-শী…ও-দিকে ঐ গঙ্গা…তার পর কলিকাতায় থাকিতে…

মাথার মধ্যে কে যেন আগুন জ্বালিয়া দিল! অসহ্য জ্বালা! এ জ্বালা কল্লোল আর সহিতে পারে না! তাই সে বলিল—আমার জন্য করবার কিছু নেই মা-শী। কি তুমি করবে?…আমি যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি, মানুষের স্নেহ-ভালোবাসা মমতা-করুণার বাইরে সে-স্থান! মানে, নিজের জীবনকে এমন করে ছেঁচে-পিষে ফেলেছি যে, তোমার এ মায়া-মমতা-ভালো-বাসাতেও তাকে আর খাড়া করা যাবে না! আমার মন আজ পাথর!

সত্যই তো, মা-শী কি করিবে? কি করিতে পারে? এই ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে মা-শীর বাস…দিবার তার কি আছে? নেবার মতো বস্তু পৃথিবীতে কি, ও তা জানে না।

কল্লোলের মন কি চায়…কি না পাইয়া দিনে-দিনে

এমন পাথর হইয়া গেছে, মা-শীর সাধ্য নাই, বুঝিবে। ···মা-শী বলে, ভালোবাসা!···সে ভালোবাসার অর্থ তো ঐ দেহের সেবা! দেহ দিয়া সেবা! ইহাকে ভালোবাসা বলে না! এ যদি ভালোবাসা হয়, এ ভালোবাসায় কল্লোলের মন তৃপ্তি পায় না···তার মনের কোনোখানটা এ ভালোবাসা স্পর্শ করিতে পারে না!

মা-শী বলিল,—সত্যি থাকবে না?

কল্লোল বলিল,—আমার আশা ছেড়ে দাও।··· আমি তোমায় মুক্তি দিলুম···তোমার এই বয়স···মানুষের মতো মানুষ দেখে বিবাহ করো। তোমার এ-ভালোবাসার দাম সে বুঝবে···বুঝে তোমার দামও তোমায় দেবে!

মা-শীর মুখ পাংশু, মলিন···সে কল্লোলের পা ছাড়িয়া দিল···দিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

কল্লোলও উঠিল; এবং নিঃশব্দে নীচে নামিয়া বাড়ী ছাড়িয়া বাহিরে পথে আসিল।

এখন···?

অনাদির আস্তানা! সেখানে ঐ গঙ্গা! তাছাড়া শিপ্রা সে-বাড়ী জানে।···

হঠাৎ মনে হইল, অনাদির মুখে শরৎ চৌধুরীর নূতন শয়তানীর যে-পরিচয় শুনিল···

মাথা ঝন্-ঝন্ করিয়া উঠিল! এই সব ইতর লোক··· পয়সার জোরে কি না করিয়া বেড়াইতেছে! পয়সার লালসা ইহাদের কি দুর্ব্বার! পয়সাতেই যত সুখ? বেচারী শিপ্রা!

২১

রাত্রি প্রায় ন'টা।

মুক্তি আসিয়া ডাকিল,—বৌদি···

ঘরে আলো জ্বলে নাই। চাঁদের জ্যোৎস্না আসিয়া ঘরে আলোর বন্যা বহাইয়া দিয়াছে! বিছানায় দেহ-ভার এলাইয়া শিপ্রা পড়িয়া আছে। মুক্তি আলো জ্বালিল। শিপ্রা বলিল—আলো নিবিয়ে দে, মুক্তি···

মুক্তি বলিল—ঘুমোওনি? জেগে আছো বৌদি!

—হ্যাঁ।

—খাবে না? ন'টা বেজে গেছে।

শিপ্রা বলিল—না, আমি খাবো না।

মুক্তি কোনো কথা বলিল না। তার মনের মধ্যে মেঘ নিবিড় হইয়া আছে! ভাবিল, সাহেবের এমন অসুখ· বৌদি যত লেখাপড়াই শিখুক, মেয়ে-মানুষ! স্বামী ছাড়া মেয়ে-মানুষের কে আর আছে! বিদেশে সেই স্বামীর এত বড় অসুখ! বৌদির দুর্ভাবনার কি সীমা আছে!···বলিল,—হোটেলের ম্যানেজারকে বলো বৌদি ···এক জন ভালো ডাক্তার আনিয়ে দিক।

শিপ্রার মনে পড়িল, স্বামীর অসুখ! ঠিক! নিজের চিন্তায় শরতের অসুখের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল।

নিশ্বাস ফেলিয়া শিপ্রা বলিল—হুঁ···

হঠাৎ মনে পড়িল কল্লোলের কথা। একটু আগে এত অভিমান! এত রাগ! তবু মনের উপরে কল্লোলের আসা-যাওয়ার বিরাম নাই! মনে পড়িল, কাল রাত্রে স্বামীর মুখের উপর স্পষ্ট ভাষায় শিপ্রা বলিয়াছে—শরৎ তার কেহ নয়! তার সঙ্গে শিপ্রার স্বামি-স্ত্রীর সম্পর্কও ঠিক নয়!

সে-কথা মনে পড়িবামাত্র নিজের উপর ধিক্কারে মন ভরিয়া গেল! মনে এত বিরাগ···তবু ঐ শরৎকে লইয়া তার সঙ্গে ক'বছর ঘর করিয়াছে! শরতের-দেওয়া অন্ন-বস্ত্র···শরতের দাস-দাসী, গাড়ী, আসবাবপত্র··· শরতের ঐশ্বর্য্য···সব সে ভোগ করিয়াছে! সে-ভোগে গৌরব-গর্ব্ব বোধ করিয়াছে! আর এ সুখ-উপভোগের বিনিময়ে ঐ শরৎকে সে দিয়াছে নিজের দেহ! ঐ ইতর, হীন লোকটার আলিঙ্গন নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছে!···এ কি ভদ্র নারী পারে?···স্ত্রী বলিতে যে-পুরুষ স্ত্রীর দেহটাকেই বোঝে, সেই পুরুষের সঙ্গে এক-শয্যায় শুইয়া কি করিয়া শিপ্রা এত কাল বাস করিয়াছে? আশ্চর্য্য!

শিপ্রাকে কে যেন কশাঘাত করিয়াছে···তার সর্ব্বাঙ্গে তেমনি জ্বালা!···শিপ্রা ভাবিল, রেঙ্গুন-নদীর জলে ঝাঁপ দিলে এ-জ্বালার উপশম হয় না?

শম্ভু আসিল। বলিল, সাহেবের জ্বর ১০৫। ভয়ঙ্কর বকাবকি করিতেছেন। বলিতেছেন, কলিকাতার ডাক্তার-বাবুকে তার করিয়া দাও···টাকা পাঠাও···প্লেনে করিয়া তাঁকে আসিতে বলো···

শিপ্রা নিঃশব্দে এ-কথা শুনিল।

মুক্তি বলিল—একবার দেখবে না বৌদি?

দেখা উচিত! স্বামী!

শিপ্রা বলিল—চ'।

শিপ্রা আসিয়া দাঁড়াইল শরতের শিয়রে। শরতের মাথায় আইস্‌ব্যাগ চাপানো। নার্শ আছে, ডাক্তার আছে। বার্ম্মীজ নার্শ, বার্ম্মীজ ডাক্তার। শম্ভু, বিষ্ণু,— দু'জনে দাঁড়াইয়া আছে ··পাথরের মতো নিস্পন্দ মূর্ত্তি।

শিপ্রা চাহিল ডাক্তারের পানে, বলিল,—কি অসুখ মনে হচ্ছে? এক-দিনে এত-বেশী টেম্পারেচার!

ডাক্তার বলিল—রক্তটা কাল সকালে এগজামিন করতে চাই।

শিপ্রা বলিল—রক্ত আজ এগজামিন না করার কারণ?

ডাক্তার বলিল—দু'দিন না গেলে সঠিক জানা যাবে না।

শিপ্রা জবাব দিল না। দু'চোখে ভ্রুকুটি-ভরা দৃষ্টি

নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া আসিল…বিষ্ণু এবং মুক্তি আসিল শিপ্রার সঙ্গে।

শিপ্রা বলিল—আমার সঙ্গে এসো বিষ্ণু। এখানে আমার এক জন বন্ধু আছেন। অনেক দিন এখানে বাস করছেন। তাঁকে আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি…সেই চিঠি নিয়ে তুমি এখনি তাঁর কাছে যাও। তিনি ভালো ডাক্তার নিয়ে আসবেন।

কথাটা বলিয়া শিপ্রা আসিল নিজের ঘরে…মুক্তি, বিষ্ণু সঙ্গে আসিল।

শিপ্রা বলিল—তুমি বাইরে দাঁড়াও, বিষ্ণু! চিঠি লেখা হলে ডাকবো।

বিষ্ণু চলিয়া গেল। মুক্তি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শিপ্রা চিঠি লিখিতে বসিল। লিখিল—

কল্লোলবাবু,

ভয় নেই। মনের কথা বলবো বলে' এ চিঠি লিখছি না,—রোমান্স নয়! বিপদে পড়েছি,—বিদেশে আপনি ছাড়া এমন বন্ধু কেউ নেই, এ বিপদে যার শরণ নিতে পারি! কাল আপনার আশায় পথ চেয়ে কি অধীর ভাবেই না ছিলুম! এলেন না! কেন, বুঝতে পারছি না! যদি ভেবে থাকেন, পুরোনো দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আপনাকে জ্বালাতন করবো, তাহলে ভুল বুঝেছেন। তা নয়।

কিন্তু এ সব কথা থাক্। আপনার কথা মনে হলে এত কথা মনে জাগে! কেন এমন হয়, বুঝি না!

আবার যা-তা বকছি! মাপ করবেন।

সত্যি, নিজের জন্য আপনার দ্বারস্থ হচ্ছি না। বিপদে পড়েছি। আমার স্বামী মিষ্টার চৌধুরীর খুব অসুখ। এখানকার ডাক্তার দেখছেন,—কিন্তু তাঁদের উপর নির্ভর করতে পারছি না। বাঙালীর ধাত্। তাছাড়া আমি স্ত্রী—আমার একটা কর্ত্তব্য আছে তো। তাই লিখ্‌ছি, এ চিঠি পাবামাত্র দয়া করে একবার আসবেন। এসে চিকিৎসার সম্বন্ধে ভালো একটা ব্যবস্থা করবেন। আমি যেন অকূলে পড়েছি! হাসবেন না,—সত্যই বিপন্ন! ভাবছেন, যে স্বামীকে ভালোবাসি না, তার উপর এত মায়া, এত দরদ। কিন্তু এত দিন একত্র বাস করছি—স্বামীর দৌলতে এমন আরাম, এত স্বাচ্ছন্দ্য…সেজন্য আমার মনে একটু কৃতজ্ঞতাও কি থাকবে না?

আশা করি, চিঠি পেয়ে একবার আসবেন। দয়া …এ দয়াটুকু পাবার প্রত্যাশা করতে পারি না?

শিপ্রা।

লিখিয়া দু'-বার তিন-বার চিঠিখানা পড়িল। ভালো লাগিল না। মনে হইল, যেন নভেলী-চিঠি! চিঠির ছত্রে ছত্রে যেন মনের করুণ আকুতি মিশিয়া আছে! পড়িয়া কল্লোল ভাবিবে, এক দিন বড় দর্প করিয়া সরিয়া গিয়াছিলে…আজ যাচিয়া আবার আমার করুণার প্রার্থী!

চিঠি ছিঁড়িয়া ফেলিল। ছিঁড়িয়া নূতন করিয়া আর একখানা চিঠি লিখিল। সে চিঠিও পড়িল বার-বার। মনে হইল, এ চিঠিতেও সেই নভেলী ছাপ! এ-চিঠি ছিঁড়িল! ছিঁড়িয়া আবার লিখিল…সে-চিঠিতেও ঐ এক সুর…

পাঁচ-ছ'খানা চিঠি লিখিয়া সে সব চিঠি ছিঁড়িয়া নিশ্বাস ফেলিয়া শিপ্রা চাহিল মুক্তির পানে।

দু'চোখে জমাট বিস্ময়…মুক্তি তার পানে চাহিয়া আছে। শিপ্রা বলিল—চিঠিতে হবে না, মুক্তি!…ভাবছি, আমি নিজে যাই! বাড়ী তো চিনি। একখানা ট্যাক্সি নিয়ে যাই। তাঁকে নিয়ে আসি…আমার অনেক দিনের বন্ধু। নাহলে একা…সাম্‌নে এত-বড় রাত…রাত্রে যদি বাড়াবাড়ি কিছু হয়…আমার ভারী ভয় করছে মুক্তি।

মুক্তি শুনিল বৌদির কথা। ভয়ে তারো দেহ-মন ছম্‌ছম্ করিতেছিল। স্বামী…স্বামীর অসুখে স্ত্রীর মনে কি হয়, সে জানে! সাত-আট মাস আগে মুক্তির স্বামীর সে-বারে যখন সেই খুব অসুখ হয়…উঃ, সে কথা মনে হইলে এখনো তার গায়ে কাঁটা দেয়! মুক্তির সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ-রেখা…মুক্তি কোনো কথা বলিতে পারিল না।

শিপ্রা উঠিয়া আয়নার সাম্‌নে গিয়া কেশে-বেশে একটু পারিপাট্য সাধন করিল। তার পর হাত-ব্যাগ লইয়া বলিল—আমি তাহলে আসি, মুক্তি…

মুক্তি শিহরিয়া উঠিল! বলিল—একা যাবে বৌদি?

—হ্যাঁ…

মুক্তি ভয়ে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তার দু'-চোখে আতঙ্ক।

শিপ্রা তাহা লক্ষ্য করিল। বলিল—কিসের ভয়? বর্ম্মা-মুল্লুক হলেও সহর! পথে আলো আছে…লোক-জন রয়েছে…পুলিশ-পাহারা আছে!

মুক্তি বলিল—আমি যাবো তোমার সঙ্গে?

—তুই!…কথার সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে আতঙ্কের আভাস…হয়তো কল্লোল বলিবে, না…হয়তো সে আসিতে চাহিবে না! শিপ্রা তখন বলিবে; আমার জন্য আসিতে হইবে…ভয়ে-ভাবনায় কার মুখ চাহিব আমি? কল্লোল বলিবে, তুমি আমার কে যে তোমার কথায় সেখানে গিয়া তোমার পাহারাদারী করিব? এ কথা বলিলে শিপ্রা ভাঙ্গিয়া গলিয়া কি যে করিবে…মুক্তি সঙ্গে থাকিলে দেখিবে!…বৌদিকে মুক্তি জানে, শক্তির গর্ব্বে মাথা নত করিতে জানে না! কল্লোলের সামনে সে-বৌদির মাথা যদি নুইয়া পড়ে…ভিক্ষা চাহিয়া সে-ভিক্ষা যদি না পায়…প্রত্যাখ্যানের সে গ্লানি মুক্তি দেখিবে?…

শিপ্রা বলিল—না মুক্তি, তুই এখানে থাক্। সাহেবকে ফেলে যাচ্ছি। শম্ভু, বিষ্ণু—ওরা কি মানুষ? না, মমতা জানে? তুই থাকলে আমি তবু নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারবো!…

ঘড়িতে ঢং-ঢং করিয়া দশটা বাজিল। শিপ্রা আর দাঁড়াইল না। ঘরের বাহিরে বিষ্ণু…শিপ্রার পানে চাহিয়া সে বলিল—চিঠি ?

শিপ্রা বলিল—চিঠি নয়, বিষ্ণু। আমি নিজে যাচ্ছি ; ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে একেবারে ফিরবো। সাহেবকে তোরা দেখবি। আমি ডাক্তারের জন্ম বেরুচ্ছি, সে. কথা খবর্দার, যেন প্রকাশ না পায় !

—না।

শিপ্রা চলিয়া গেল।

বাহিরে ট্যাক্সি। ট্যাক্সিতে বসিয়া শিপ্রা বলিল—অক্‌শুট্‌ রোড…

২২

কল্লোল বাড়ী ফিরিয়াছে। মনে সেই অস্বস্তি…খেয়ালের ভরে মদ খাইয়া এ-অস্বস্তি আরো বাড়িয়াছে! মনে হইতেছে, এখানকার বাতাসে কি যেন আছে…এ বাতাসের স্পর্শ কাটিয়া সরিয়া না গেলে অস্বস্তির জ্বালায় বুঝি পাগল হইয়া যাইবে!

তাই নিজের জিনিষপত্র বাঁধা-ছাঁদা করিতেছে। রাত্রি তিনটায় একখানা ট্রেণ আছে। সেই ট্রেণে চড়িয়া…

কোথায় যাইবে, জানে না। তবে এখানে আর নয়। ঐ মা-শী…এখানে গঙ্গা…তার উপর শিপ্রা!…নাগ-পাশের বন্ধন! এ বন্ধন কাটিতে হইবে!

মলিন-মুখে গঙ্গা দাঁড়াইয়া আছে…কল্লোল বলিল—তবু দাঁড়িয়ে রইলে! তোমার সঙ্গে আমার গাঁট-ছড়ার বাঁধন নয় যে, সে-বাঁধন কাটতে পাবো না! যতক্ষণ আমার ভালো লাগবে…মানে,…

গঙ্গার চোখের পিছনে অশ্রুর নির্ঝর স্তম্ভিত ছিল…এ কথার আঘাতে সে-নির্ঝর ফাটিয়া তার দু'চোখে ধারা বহিল!

কল্লোল কহিল,—শুধু কাঁদতে শিখেছো! চোখের জল আমার ভালো লাগে না। যাও এখান থেকে!

গঙ্গা বলিল,—আমি কি করেছি…

সেই এক কথা! মা-শী বলে, কি অপরাধ আমার? গঙ্গাও বলে, তাই! রাগে কল্লোল জ্বলিয়া উঠিল। অপরাধ…অপরাধ…অপরাধ!

কল্লোল বলিল—অপরাধ তোমার নয়, আমারো নয়। দু'দিন একসঙ্গে ছিলুম…আবার এখন আলাদা হচ্ছি। 'কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রঃ।' তার উপর আমার বিয়ে-করা স্ত্রী তুমি নও। মানুষের জীবনে কত মানুষ আসা-যাওয়া করে…তোমার-আমার জীবনে বহু লোক এসেছে…আবার তারা চলে গেছে! আবার আসবে নতুন লোক…এই হলো জগতের নিয়ম!

গঙ্গা বলিল—আর যা ইচ্ছা হয়, বলো…শুধু এই কথা বলো না। তোমার পায়ে পড়ি…

কল্লোলের পা দু'খানা গঙ্গা বুকে চাপিয়া ধরিল। বিরক্ত হইয়া কল্লোল বসিল খাটের বিছানায়।

পাশের ঘরে অনাদির নেশা তখনো কাটে নাই…নেশার ঝোঁকে বাদশা বনিয়া চোখ রাঙাইয়া দুনিয়াকে সে ভর্ৎসনা করিতেছে—চুপ্…চুপ্…চুপ্ রও…

কল্লোল ডাকিল,—গঙ্গা…

গঙ্গা চাহিল কল্লোলের পানে।

কল্লোল বলিল—তোমার অপরাধ নেই। কেঁদো না। এখানে আমার আর ভালো লাগছে না…তাই চলে যাচ্ছি।…ভেবেছিলুম, হয়তো তোমাকে নিয়ে বাকী দিনগুলো এক-রকমে কাটিয়ে দেবো। কিন্তু তা হবার নয়…

এই পর্য্যন্ত বলিয়া কল্লোল চুপ করিল। গঙ্গার মুখে কথা নাই…সজল চোখে অবিচল দৃষ্টি লইয়া কল্লোলের পানে চাহিয়া আছে!

কল্লোল ভাবিল, দেহের ক্ষুধা মিটাইয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না! মনে যে পিপাসা…সে পিপাসার তৃপ্তি…মা-শী পারিল না সে তৃপ্তি দিতে…গঙ্গাও পারিল না। ভাবিয়াছিল, দেহকে তুচ্ছ করিয়া মনের পানে যদি এরা চাহিতে জানিত…কল্লোলের মনকে যদি চিনিতে পারিত এবং এ-মনের নাগাল পাইত যদি ?

অসম্ভব! মন দিয়া মনের পিপাসা তৃপ্ত করিতে হয়। সে-মন ইহাদের নাই! মা-শী, গঙ্গা…ইহাদের সঙ্গে কথা কহিয়া কল্লোল কোনো দিন আনন্দ পায় নাই। ইহাদের যা কিছু মোহ, যা কিছু আকর্ষণ, তা ঐ দেহে! দেহের মোহ কতক্ষণ?…কাজেই মা-শী, গঙ্গা…কেহই তার মনকে পূর্ণ করিতে পারিল না। দেহের ক্ষুধা মিটিলেও মন তার শূন্য রহিয়া গিয়াছে!

এই মনের পিপাসা মিটে নাই বলিয়া সারা জীবন ছুটিয়া বেড়াইতেছে…কোথাও শান্তি নাই!…

গঙ্গা বলিল—কোথায় যাবে ?

—জানি না।

—কবে আসবে ?

—জানি না।

—আর আসবে না ?

—বোধ হয়, না।…তবে অভদ্রতা করবো না গঙ্গা। আমার কাছে টাকা আছে। তোমাকে একশো টাকা দিয়ে যাচ্ছি…এ-টাকা নিয়ে তুমি কলকাতায় যাও। সেখানে থিয়েটার আছে, সিনেমা আছে, তাতে যোগ দাও গে…ঐশ্বর্য্য পাবে। ভালোবাসার আশাও হয়তো দুরাশা হবে না।

কথাটা শেষ করিয়া সে গঙ্গার পানে চাহিল।

গঙ্গা কাঠ হইয়া বসিয়া আছে!

কল্লোল বলিল—দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছো! মানুষ তোমাদের বিশ্বাস করতে পারে না···আমি কিন্তু তোমায় অবিশ্বাস করিনি। মানুষের মতো মানুষ···এমন-কেউ যদি তোমার পরিচয় পায়, তাহলে সে তোমায় ভালো-বাসবে···তোমার ভালবাসায় সে সুখী হবে···তোমাকেও সে সুখী করবে···এ আশ্বাস আমি দিতে পারি।

এ-কথা গঙ্গার ভালো লাগিল না। গঙ্গা মুখ ফিরাইল।

কল্লোল বলিল,—অভিমান হলো না কি?···বলিয়া গঙ্গার চিবুক ধরিয়া গঙ্গার মুখখানাকে ফিরাইয়া ধরিল··· বলিল—তামাসা নয় গঙ্গা, আমি সত্য কথা বলছি···

এই কথার ঠিক মাঝখানে দ্বার ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিল শিপ্রা।

ঢুকিয়া সে ডাকিল,—কল্লোল বাবু···

কল্লোল চমকিয়া উঠিল! গঙ্গার চিবুক হইতে হাত সরাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কল্লোল বলিল—শিপ্রা···

কুণ্ঠিত স্বরে শিপ্রা বলিল—আমায় মাপ করবেন! সাড়া দিয়ে আমার আসা উচিত ছিল। আমি জানতুম না···

হাসিয়া কল্লোল বলিল—সেজন্য কোনো অপরাধ করোনি। এ হলো গঙ্গা···আমার স্ত্রী!

গঙ্গা শিহরিয়া উঠিল! তার মাথা ঝিম্-ঝিম্ করিতে লাগিল! খাটের বাজুতে মাথা রাখিয়া সে চোখ বুজিল।

শিপ্রা নিমেষে যেন পাথর বনিয়া গেছে! নিস্পন্দ-নির্ব্বাক্···এই গঙ্গাই তাকে বলিয়াছিল, কল্লোল তার কেহ নয়!···তার মানে?

এই স্তম্ভিত ভাব কাটাইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া শিপ্রা বলিল—বিবাহ করেছেন, সে-কথা আমায় বলেননি তো!

কল্লোল বলিল—অত্যন্ত ঘরোয়া কথা! আমার একান্ত ব্যক্তিগত···তাই বলবার প্রয়োজন ভাবিনি!

—শুনে খুব খুশী হলুম। বিয়ে করে আপনি সংসারী হবেন, এ আমাদের কতখানি···

বাধা দিয়া কল্লোল বলিল—কিন্তু এত রাত্রে তুমি এখানে···গরীবের কুঁড়েয়?

মনে যে-আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, বহু-প্রয়াসেও শিপ্রা সে আগুন নিবাইতে পারিল না। আগুনের সে-জ্বালা তার কণ্ঠের ভাষায় বাহির হইয়া পড়িল।

শিপ্রা বলিল—অভিসারে বেরিয়েছি, ভাববেন না!

কল্লোলের বুকে যেন বিদ্যুতের শিখা বিঁধিল! মৃদু হাস্তে কল্লোল বলিল,—তোমার সে অধোগতি হতে পারে না, জানি।

শিপ্রার মনে আরো তীব্র জ্বালা! শিপ্রা বলিল—কেন হতে পারে না, শুনি?

কল্লোল বলিল,—তার কারণ, তোমার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ···কোনো-কিছুর অভাব নেই! যে দুঃখী কাঙাল, যার অভাব আছে···সেই বাইরে বেরোয় অভাব-মোচনের জন্য···দেহ-মনের শূন্যতা পূরণের জন্য!

শিপ্রা এ কথার জবাব দিল না। দু'চোখে আগুনের শিখা···কল্লোলের পানে চাহিয়া রহিল।

কল্লোল তার দৃষ্টির সে তীব্রতা লক্ষ্য করিল। বলিল, —দেখা হলেই তর্ক আর কলহ···ভালো নয়, শিপ্রা! এতে বন্ধুত্ব বজায় থাকে না! যাক্···নিশ্চয় খুব দরকার আছে, না হলে এত রাত্রে লক্ষপতি চৌধুরী-সাহেবের স্ত্রী মিসেস্ চৌধুরী এখানে আসতেন না···এই পচা বস্তীর দুর্গন্ধ সইতে!

গঙ্গা তখনো খাটের বাজুতে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া আছে···গঙ্গার সাম্‌নে নিজের দৈন্য প্রকাশ করিতে শিপ্রার লজ্জা হইল। তাই চকিতে সুর ফিরাইয়া শিপ্রা বলিল,—সত্যি, খুব দরকার। বিপদ!

—বিপদ!

—তাই। মিষ্টার চৌধুরীর খুব অসুখ। আমার ভয় আর ভাবনার সীমা নেই। অজানা বিদেশ! তাই নিরুপায়ে আপনার কাছে আসতে হলো। একজন ভালো ডাক্তারের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।···মিষ্টার চৌধুরীর টেম্পারেচার এখন ১০৫।

—১০৫!···কল্লোলের দুই চোখ বিস্ময়ে-ভাবনায় যেন ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইয়া পড়িবে! কল্লোল বলিল,—কিন্তু ডাক্তার? ভালো ডাক্তার? কল্লোলের মনে চিন্তা···

—হ্যাঁ। আপনি ছাড়া এ বিপদে কে দেখবে? আমি বড্ড নিরুপায়···

কল্লোল ভাবিতে লাগিল। সহসা মনে পড়িল!··· বলিল—হ্যাঁ, আছেন···আমার জানা খুব ভালো লোক আছেন। স্ত্রীলোক···ইউরেশিয়ান ডাক্তার এবং নার্স··· মমতাময়ী! আমায় বাঁচিয়েছিলেন! তাঁর নাম মার্থা···

শিপ্রা বলিল—এখনি তাঁকে চাই। ট্যাক্সি আছে সঙ্গে। আপনি তাহলে···

কল্লোল বলিল—কিন্তু আমি যে রেঙ্গুন ছেড়ে চলে যাচ্ছি আজ রাত্রে। তিনটেয় আমার ট্রেণ।

শিপ্রা বলিল—ডাক্তারের ব্যবস্থা না করে আপনি যেতে পাবেন না।···দয়া করুন।

শিপ্রা দুই করপুট অঞ্জলিবদ্ধ করিল।

কল্লোল বলিল—বেশ, চলো তাহলে। মার্থাকে বলে-কয়ে সুব্যবস্থা করে দি! কতক্ষণ বা সময় লাগবে?

—আসুন! বলিয়া শিপ্রা চাহিল গঙ্গার দিকে; বলিল,—আপনার স্বামীকে নিয়ে যাচ্ছি···আজ রাত্রে যদি ফেরত না পাঠাই, রাগ করবেন না। আমার বড্ড বিপদ চলেছে। এ বিপদে আপনার স্বামীকে আজকের মতো ধার চাইছি···পারবেন না ধার দিতে?

গঙ্গা চাহিল শিপ্রার পানে। ক'মুহূর্ত্তে যে-সব কাণ্ড হইয়া গেল···তাহাতে গঙ্গার সব গোলমাল হইয়া গেছে। গঙ্গা জবাব দিল না।

স্তম্ভিত গঙ্গাকে ঘরে রাখিয়া শিপ্রার সঙ্গে কল্লোল চলিয়া আসিল।

মার্থাকে পাওয়া গেল।

এবং মার্থা আসিয়া যখন রোগীর সামনে দাঁড়াইল, রোগী তখন প্রলাপ বকিতেছে,—কল্লোল রায়···কল্লোল··· আমি জানি, তোমার লাভার! আমার স্ত্রী হয়ে···

প্রলাপ শুনিয়া কল্লোল স্তম্ভিত! শিপ্রা বলিল—Don't be upset. He is meanly jealous of my friends···(বিচলিত হবেন না। আমার বন্ধু-বান্ধবের নামে হিংসায় জ্বলে আছে)!

রাত্রি প্রায় তিনটা···কল্লোল আসিল শিপ্রার ঘরে। বলিল—রাত তিনটে বেজে গেছে। আমি আসি শিপ্রা।

—না···

কল্লোল বলিল—না! তার মানে?

কল্লোলের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া শিপ্রা বলিল—একটু মমতা হয় না? ঐ ভীষণ রোগী···তোমার স্নেহ নেই? মায়া নেই? আমি একা···যখন-তখন এমনি চীৎকার। দাসী-চাকর···সকলের সামনে এমন লাঞ্ছনা-অপমান! চাকর-বাকরের সাম্‌নে মাথা আমার মাটীতে মিশিয়ে যাচ্ছে!···আমাকে আত্মহত্যা করতে বলো?

কল্লোল বলিল—কিন্তু···

শিপ্রা বলিল—কিসের কিন্তু! আর কিন্তু নয়! ইতর স্বামী···নির্লজ্জের মতো যে-কথা বলে আমাকে অপমান করেছে, ঐ অপমানের শোধ নিতে ওকে অমনি অপমান করতে পারি, তবেই আমার মনের এ-জ্বালা যায়!

শিপ্রার দু'চোখে আগুন জ্বলিল!

কল্লোল বলিল—মাথা খারাপ করো না শিপ্রা··· জীবনে আমাদের বহু দুঃখ, বহু অপমান সইতে হয়।

শিপ্রা গর্জ্জন করিয়া উঠিল, বলিল—আমি অনেক সয়েছি। আপনি জানেন না! কোনো মানুষ এত অপমান সইতে পারে না। আমার নিজের অপরাধ স্মরণ করেই আমি সয়েছি। কিন্তু সহ্য করবার একটা সীমা আছে, কল্লোলবাবু···সে-সীমা আজ পার হয়েছে। আর আমি সইবো না। এত বছর ধরে যত আঘাত পেয়েছি···আজ থেকে প্রত্যেকটি আঘাতের আমি শোধ দেবো।···বিয়ে করেছেন! স্বামী। মন্ত্র-পড়া বিয়ে! এ-বিয়ে আমি স্বীকার করি না! ঐ ইতরের স্বামিত্ব চূড়ান্ত স্বীকার করে এসেছি···আর করবো না। করলে সমস্ত মেয়ে-জাতের আমি অপমান করবো!

কল্লোল নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া দেখিল, শিপ্রার যেন করালিনী মূর্ত্তি!

শিপ্রা বলিল—আপনাকে আজ আমি ছাড়বো না। যেতে দেবো না আমি। আপনাদের ঐ মিষ্টার চৌধুরী যদি না বাঁচে, তাতে আমার দুঃখ নেই! He has had enough of life. কিন্তু আমার বাঁচা হয়নি···আমি বাঁচতে চাই। আর সে-জন্য আপনাকে আমি চাই আজ আমার পাশে! নাহলে আমার ভয় হয়, এ-সব অপমানের ভারে পাছে আমি আত্মহত্যা করে বসি!

শিপ্রা কাঁপিতেছিল। কল্লোল ধরিয়া তাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিল।

টেবিলের উপর ছিল ওডিকলোনের শিশি। শিপ্রার মাথায় ওডিকলোন্ ঢালিয়া তার মাথায় হাত চাপড়াইতে চাপড়াইতে কল্লোল বলিল—তুমি ঘুমোও শিপ্রা। আমি এইখানেই থাকবো···বাড়ী যাবো না···তোমাকে কথা দিচ্ছি। [ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

সাবধানতা

ভুলবে ভুলো, এখন ত' নয়, মরণ যে দিন আমার হবে!
এখন তোমায় ভুলতে আমায় কেউ না কবে, কেউ না কবে।
সুখের-দুখের এ দিনগুলো
এখন ত' নয়, তখন ভুলো
এখন থেকে তোমার সাথে বুঝে-সুঝে চলতে হবে!
···কেই যারে আপন ···—কোথায় তুমি আপন তবে?

নিজেই তুমি এলে কাছে, ডাকতে তোমায় যাইনি আমি,—
আঁধার ঘরের বন্ধ দুয়ার রাখলে খুলে দিবা-যামি।
জ্বালিয়ে প্রদীপ নিজের হাতে
রইলে যে বেশ দিনে-রাতে
সেই থেকে যে তোমায় বলি প্রিয়তম, হৃদয়-স্বামী;
ভুললে আমায়, তোমায় ছেড়ে কেমন ক'রে থাকবো আমি?

শ্রীমৃণালকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

শঙ্করাচার্য্যরচিত গ্রন্থ-নির্ণয়

প্রায় সার্দ্ধ-সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতে এমন এক দিন আসিয়াছিল, যখন ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত চিন্তা-ধারায় ভারতের বৈদিক-সমাজ চিন্তা করিতেন, তাঁহার প্রদর্শিত পথে সকলে চলিতেন, তাঁহার উপদেশ সকলে শিরোধার্য্য করিতেন; অধিক কি, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকে ভগবান্ শিবের অবতার বলিয়া অনেকে জ্ঞান করিতেন। তাঁহারই আবির্ভাবে ভারতের বৈদিক-সমাজ আজও জীবিত রহিয়াছে। তাঁহারই রচিত গ্রন্থরাজি আজ ভারতের বৈদিক-সমাজের অবলম্বন। কারণ, বৈদিক-ধর্ম্মের সারতত্ত্ব যেমন উপনিষৎ—বেদান্তমধ্যে নিহিত, তদ্রূপ সেই উপনিষৎ বা বেদান্তের সারতত্ত্ব শঙ্করাচার্য্য-গ্রন্থমালার মধ্যে সংগৃহীত। জন্ম-মৃত্যুজরাব্যাধিপূর্ণ এই সংসার হইতে মুক্তিকামী জ্ঞানী ভক্তের পক্ষে নিভৃতে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীশঙ্করা-চার্য্যবিরচিত গ্রন্থাদি যেরূপ উপযোগী, এরূপ আর কোন গ্রন্থই নহে। কারণ, শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায়, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি অগণিত শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে যে কয়খানি মাত্র গ্রন্থের সাহায্যে মানব-জীবন সার্থক এবং পূর্ণ হয়, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সেই সকল শাস্ত্র-গ্রন্থকে নির্ব্বাচন করিয়া তাহাদিগকে শ্রুতিপ্রস্থান, স্মৃতিপ্রস্থান এবং ন্যায়প্রস্থান-রূপে বিভক্ত করিয়া—তাহাদের উপর ভাষ্য রচনা করিয়া বিদ্বৎসমাজে সুপ্রচারিত করিয়াছেন, এবং স্বতন্ত্র ভাবে কতকগুলি তত্ত্বোপদেশপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়া তৎপরে প্রায় যাবতীয় দেব-দেবীর স্তবস্তুতি রচনা করিয়া সেই প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্যগুলির সার সংগ্রহ করিয়া মুক্তির পথ সুগম করিয়াছেন। এই জন্য মুক্তিকামী জ্ঞানী ভক্তের পক্ষে নিভৃতে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিবার জন্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যবিরচিত গ্রন্থগুলি যেমন উপযোগী, এরূপ আর কোন গ্রন্থই নহে।

কেবল তাহাই নহে, বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য পদব্রজে একাধিক বার স্বয়ং সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিয়া, লুপ্ততীর্থাদির পুনরুদ্ধার করিয়া, বাদী ও প্রতিবাদীদিগকে বিচারে নিরস্ত করিয়া, দুষ্টমতবাদের নিরাকরণ করিয়া, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনঃপ্রচার করিয়া গিয়াছেন। ভগবান্ গৌতম বুদ্ধের পর, সহস্রবৎসরব্যাপী বৈদিক ধর্ম্মবিপ্লব, মহামতি কুমারিল ভট্টের পর যে ভাবে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বিদূরিত করেন, এমন আর কোন আচার্য্যই করেন নাই। এজন্য যাঁহারা আমাদের অনন্ত শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া সনাতনধর্ম্মতত্ত্বামৃত আহরণ করিতে স্বয়ং অসমর্থ, তাঁহারা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থাবলীর অনুশীলনে তাহা অনায়াসে করিতে পারিবেন—ইহাতে কোনও সন্দেহ হয় না।

কিন্তু এই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের রচিত গ্রন্থরাজি কোন্-গুলি, তাহা লইয়া এক মহা সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। এ বিষয়ে নানা লোকে নানা মত প্রকাশ করিতেছেন। অনেকেই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচলিত অনেক গ্রন্থকেই তাঁহার রচিত নহে বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং তজ্জন্য তাঁহারা বিবিধ প্রকার যুক্তিতর্কও প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ যাঁহার কীর্ত্তিকলাপের প্রভাবে আজও আমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম, বিদ্যা-বুদ্ধি পরিচালিত হইতেছে, তাঁহার সেই কীর্ত্তি সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ থাকা উচিত নহে। সে সম্বন্ধে নিশ্চয় জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে আমাদের প্রথমে দেখা উচিত, তাঁহার নামে প্রচলিত কত গ্রন্থ পাওয়া যায়। এজন্য নিম্নে তাঁহার রচিত বলিয়া প্রচলিত গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা প্রদত্ত হইল। তাঁহার গ্রন্থগুলির শ্রেণীবিভাগ এইরূপ—

১। স্বতন্ত্র রচিত গ্রন্থ এবং ২। ভাষ্যগ্রন্থ।

তন্মধ্যে ১। স্বতন্ত্র রচিত গ্রন্থ আবার দ্বিবিধ, (ক) স্তবস্তুতি, এবং (খ) উপদেশ-গ্রন্থ; এবং ২। ভাষ্যগ্রন্থ ত্রিবিধ—(গ) শ্রুতিপ্রস্থানের ভাষ্য (ঘ) স্মৃতিপ্রস্থানের ভাষ্য (ঙ) ন্যায়প্রস্থানের ভাষ্য। তন্মধ্যে স্তবস্তুতি গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত যত দূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহা ৯৩ খানি, যথা—

(ক) স্তবস্তুতি—৯৩

১। শিবভুজঙ্গপ্রয়াতস্তোত্র ২। শিবাষ্টক ৩। দ্বাদশজ্যোতির্লিঙ্গ ৪। দক্ষিণামূর্ত্ত্যষ্টক ৫। শিবপঞ্চাক্ষর ৬। মৃত্যুঞ্জয়-মানসপূজা ৭। কালভৈরবাষ্টক ৮। শিবপাদাদিকেশান্ত ৯। শিবকেশাদিপাদান্ত ১০। দক্ষিণামূর্ত্তিবর্ণমালা ১১। বেদ-সারশিবস্তোত্র ১২। শিবজ্ঞানদকারিকা ১৩। অম্বাষ্টক ১৪। ত্রিপুরসুন্দর্য্যষ্টক ১৫। ললিতপঞ্চরত্ন ১৬। রাজরাজে-শ্বরীস্তোত্র ১৭। মীনাক্ষীস্তোত্র ১৮। মীনাক্ষীপঞ্চরত্ন ১৯। বালাপঞ্চরত্ন ২০। ত্রিপুরসুন্দরীমানসপূজা ২১। ত্রিপুর-সুন্দরীবেদপাদ ২২। অন্নপূর্ণাস্তোত্র ২৩। মাতঙ্গীস্তোত্র ২৪। দেবীভুজঙ্গপ্রয়াত ২৫। দেবীপঞ্চরত্ন ২৬। দেবীস্তুতি ২৭। গৌরীদশক ২৮। ভবান্যষ্টক ২৯। ভবানীভুজঙ্গ-প্রয়াত ৩০। দুর্গাপরাধভঞ্জনস্তোত্র ৩১। তারাপজ্ঝটিকা ৩২। গিরিজাদশক ৩৩। কালিকাস্তোত্র ৩৪। কাল্যা-পরাধভঞ্জনস্তোত্র ৩৫। দেবীচতুঃষষ্ট্যুপচারপূজাস্তোত্র ৩৬। শারদাভুজঙ্গপ্রয়াত ৩৭। কামাক্ষীস্তোত্র ৩৮। শ্যামা-মানসার্চ্চন ৩৯। ভ্রমরাম্বাষ্টক ৪০। কৃষ্ণাষ্টক ৪১। ঐ অন্তবিধ

৪২। বালকৃষ্ণাষ্টক ৪৩। কৃষ্ণদিব্যস্তোত্র ৪৪। অচ্যুতাষ্টক ৪৫। চক্রপাণিস্তোত্র ৪৬। বিষ্ণুষট্পদী ৪৭। নারায়ণস্তোত্র ৪৮। গোবিন্দাষ্টক ৪৯। আর্ত্তনারায়ণাষ্টাদশ ৫০। বিষ্ণু-পাদাদিকেশান্ত ৫১। বিষ্ণুকেশাদিপাদান্ত ৫২। হরিমীড়-স্তোত্র ৫৩। জগন্নাথাষ্টক ৫৪। জগন্নাথস্তোত্র ৫৫। ভগব-ন্মানসপূজা ৫৬। পাণ্ডুরঙ্গাষ্টক ৫৭। মুকুন্দচতুর্দ্দশ ৫৮। হরি-নামাবলীস্তোত্র ৫৯। সংকটহরণস্তোত্র ৬০। রামাষ্টক ৬১। রাঘবাষ্টক ৬২। রামভুজঙ্গপ্রয়াত ৬৩। রামতত্ত্ব-রত্ন ৬৪। গণেশভুজঙ্গপ্রয়াত ৬৫। বরদাগণেশস্তোত্র ৬৬। গণেশাষ্টক ৬৭। গণেশপঞ্চরত্ন ৬৮। অর্দ্ধনারীশ্বর ৬৯। উমামহেশ্বর ৭০। লক্ষ্মীনৃসিংহপঞ্চরত্ন ৭১। হরিহরস্তোত্র ৭২। হরগৌর্য্যষ্টক ৭৩। সংকটনাশক লক্ষ্মীনৃসিংহস্তোত্র ৭৪। গঙ্গাষ্টক ৭৫। গঙ্গাস্তোত্র ৭৬। যমুনাষ্টক ৭৭। ঐ অন্যবিধ ৭৮। নর্ম্মদাষ্টক ৭৯। কাশীস্তোত্র ৮০। কাশীপঞ্চক ৮১। পুষ্করাষ্টক ৮২। ত্রিবেণীস্তোত্র ৮৩। মণিকর্ণিকাস্তোত্র ৮৪। সুব্রহ্মণ্যভুজঙ্গপ্রয়াত ৮৫। দত্তভুজঙ্গপ্রয়াত ৮৬। দত্ত-মহিম্নস্তোত্র ৮৭। কনকধারাস্তোত্র ৮৮। কল্যাণবৃষ্টিস্তোত্র ৮৯। স্বর্ণমালাস্তোত্র ৯০। মহাপুরুষস্তোত্র ৯১। ব্রহ্মানন্দ-স্তোত্র ৯২। হনুমৎপঞ্চক ৯৩। অঙ্গলীস্তোত্র।

উপদেশগ্রন্থ যতগুলি পাওয়া যাইতেছে তাহারা—

(খ) উপদেশ-গ্রন্থ—৭৭

১। অদ্বৈতপঞ্চরত্ন ২। অদ্বৈতরসানুভূতি ৩। অদ্বৈতানু-ভূতি ৪। অপরোক্ষানুভূতি ৫। অনাত্মশ্রীবিগর্হণ ৬। আত্ম-বোধ ৭। আর্য্যাপঞ্চক ৮। অষ্টশ্লোকী ৯। অজ্ঞানবোধিনী ১০। অবধূতাষ্টক ১১। আত্মানাত্মবিবেক ১২। একশ্লোক ১৩। কেবলোহহম্ ১৪। কৌপীনপঞ্চক ১৫। কেরলাচার-সংগ্রহ ১৬। গুর্ব্বষ্টক ১৭। চর্পটপঞ্জরিকা ১৮। জ্ঞানসন্ন্যাস ১৯। গায়ত্রীপদ্ধতি ২০। জীবব্রহ্মৈক্যস্তোত্র ২১। জ্ঞান-গঙ্গাশতক ২২। জ্ঞানগীতা ২৩। চিদানন্দাত্মকস্তোত্র ২৪। তত্ত্বোপদেশ ২৫। তত্ত্ববোধ ২৬। দশশ্লোকী বা নির্ব্বাণদশক ২৭। দ্বাদশমহাবাক্যবিবরণ ২৮। দক্ষিণামূর্ত্তি-স্তোত্র ২৯। ত্রিপুটী-প্রকরণ ৩০। দশনামাভিধান ৩১। ধন্যাষ্টক ৩২। নির্ব্বাণষট্ক ৩৩। নিরঞ্জনাষ্টক ৩৪। নির্গুণমানসপূজা ৩৫। নির্ব্বাণমঞ্জরী ৩৬। নবরত্নমালা ৩৭। পঞ্চরত্ন ৩৮। পরাপূজা ৩৯। প্রৌঢ়ানুভূতি ৪০। প্রশ্নোত্তরমালিকা ৪১। পঞ্চীকরণ ৪২। প্রাতঃস্মরণস্তোত্র ৪৩। প্রবোধসুধাকর ৪৪। পরমহংসসন্ধ্যোপাসন ৪৫। ব্রহ্মানুচিন্তন বা আত্মানু-চিন্তন ৪৬। বালবোধিনী ৪৭। ব্রহ্মনামাবলী বা ব্রহ্ম-জ্ঞানাবলী ৪৮। মণিরত্নমালা ৪৯। মঠাম্নায় ৫০। মনীষাপঞ্চক ৫১। মহাবাক্যমন্ত্র ৫২। মহাবাক্যবিবরণ বা ৫৩। মহাবাক্য-দর্পণ মহাবাক্য-বিবেক ৫৪। মায়াপঞ্চক ৫৫। মন্ত্রার্ণস্তুতি ৫৬। মন্ত্রমাতৃকাপুষ্পমালা ৫৭। যোগতারাবলী ৫৮। লঘু-বাক্যবৃত্তি ৫৯। বাক্যবৃত্তি ৬০। বিজ্ঞাননৌকা বা স্বরূপানুসন্ধান ৬১। বেদবেদান্ততত্ত্বসার ৬২। বাক্যসুধা ৬৩ বজ্রসূচ্যুপনিষৎসার ৬৪। স্বাত্মপ্রকাশিকা ৬৫। সদাচার ৬৬ সহজাষ্টক ৬৭। স্বাত্মনিরূপণ ৬৮। সারতত্ত্বোপদেশ ৬৯ সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহ ৭০। সামবেদমন্ত্রভাষ্য ৭১ শতশ্লোকী ৭২। সন্ন্যাসপদ্ধতি ৭৩। সর্ব্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ ৭৪ সর্ব্বপ্রত্যয়মালা ৭৫। সিদ্ধান্তপঞ্জর ৭৬। জীবন্মুক্তানন্দ-লহরী ৭৭। হরিতত্ত্বমুক্তাবলী।

এই তালিকাদ্বয়, কাশীর সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় কর্ত্তৃক হিন্দি ভাষায় লিখিত বেদান্তদর্শনের ভূমিকা হইতে এবং শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ-সম্পাদিত শঙ্কর-গ্রন্থাবলী প্রথম খণ্ডের ভূমিকা হইতে, বসুমতীর শঙ্কর-গ্রন্থমালা হইতে, এবং পুণা ও শ্রীরঙ্গমের শাঙ্কর-গ্রন্থাবলী হইতে সংগৃহীত হইল।

(ক) শঙ্করাচার্য্য-বিরচিত ভাষ্যগ্রন্থ বলিতে (১) শ্রুতি প্রস্থানভাষ্য (২) স্মৃতিপ্রস্থানভাষ্য এবং (৩) ন্যায় প্রস্থানভাষ্য বুঝায়। তন্মধ্যে শ্রুতিপ্রস্থানের ভাষ্য বলিতে ১২ খানি ভাষ্য বুঝায়, যথা—১। ঈশোপনিষদ্-ভাষ্য ২। কেনোপনিষদ্ভাষ্য ৩। কঠোপনিষদ্ভাষ্য ৪। প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্য ৫। মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্য ৬। মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ভাষ্য ৭। তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ভাষ্য ৮। ঐতরেয়োপনিষদ্ভাষ্য ৯। ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্য ১০। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্য ১১। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ-ভাষ্য ১২। নৃসিংহতাপনীয়োপনিষদ্ভাষ্য।

(খ) স্মৃতিপ্রস্থানের ভাষ্যমধ্যে যাহারা শঙ্করাচার্য্য রচিত, তাহারা এই—১। গীতাভাষ্য ২। বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্য ৩। সনৎসুজাতীয়ভাষ্য ৪। হস্তামলকভাষ্য ৫। গায়ত্রী-ভাষ্য ৬। ললিতাত্রিশতীভাষ্য ৭। আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রভাষ্য ৮। সাংখ্যকারিকাভাষ্য ৯। যোগদর্শনব্যাসভাষ্যটীকা ১০। গৌড়পাদকৃত সুভগোদয় গ্রন্থের "বাসনা" ভাষ্য।

(গ) ন্যায়প্রস্থানের শাঙ্করভাষ্য বলিতে একমাত্র ১। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকেই বুঝায়।

এইরূপে দেখা যাইতেছে, ভাষ্যগ্রন্থ সর্ব্বশুদ্ধ ২৩খানি পাওয়া যাইতেছে। যথা—শ্রুতিপ্রস্থান ১২; স্মৃতি-প্রস্থান—১০; ন্যায়প্রস্থান ১;—মোট ২৩ খানি।

আর তাহা হইলে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রণীত বলিয়া যে সব গ্রন্থ পাওয়া যাইতেছে, তাহারা সর্ব্বশুদ্ধ—স্তবস্তুতি গ্রন্থ ৯৩খানি, উপদেশ-গ্রন্থ ৭৭খানি, ভাষ্যগ্রন্থ ২৩খানি মোট ১৯৩খানি গ্রন্থ হইতেছে। কিন্তু শুনা যাইতেছে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের রচিত অনেক তন্ত্রগ্রন্থও বর্ত্তমান। সেগুলি এখনও মুদ্রিত হয় নাই। কাশীধামে তাঁহার বিরচিত তন্ত্রগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সংবাদ-মাত্রস্বরূপে উল্লেখ করা গেল। আর্য্যকীর্ত্তিরক্ষার্থ অনু-সন্ধিৎসু মহাত্মগণ ভবিষ্যতে ইহাদের উদ্ধারসাধন করিবেন, আশা করা যায়।

যাঁহারা মনে করেন, শঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচলিত গ্রন্থগুলির মধ্যে বহু গ্রন্থই শঙ্করাচার্য্য-বিরচিত নহে এবং তজ্জন্য যুক্তিও প্রদর্শন করেন, আমরা তাঁহাদের যুক্তিগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি। কারণ, অন্যরচিত গ্রন্থ শঙ্করাচার্য্যরচিত গ্রন্থমালার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া কোন সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। তাঁহাদের যুক্তিগুলির মধ্যে প্রথম যুক্তি এই—

(১) ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, গীতা-ভাষ্য এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্য এবং উপদেশসাহস্রী প্রভৃতি শঙ্করাচার্য্য-রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থের ভাষা ভাব ও ভঙ্গীর সহিত যে সকল গ্রন্থের ভাষা ভাব ও ভঙ্গী মিলিবে না, তাহাদিগকে শঙ্করাচার্য্যরচিত বলা উচিত নহে। যেমন শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ভাষ্য, বিষ্ণুসহস্রনামের ভাষ্য, ললিতাত্রিশতীর ভাষ্য প্রভৃতি ভাষ্যগ্রন্থ, এবং অজ্ঞানবোধিনী, আত্মানাত্মবিবেক প্রভৃতি উপদেশ-গ্রন্থগুলি এবং নানা দেবদেবীর স্তবস্তুতি প্রভৃতি শ্লোকবদ্ধ গ্রন্থগুলির ভাষা ভাব ও ভঙ্গী পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়, এজন্য এই জাতীয় গ্রন্থগুলিকে শঙ্করাচার্য্য-রচিত বলা তাঁহাদের মতে সঙ্গত নহে।

কিন্তু তাঁহাদের এই যুক্তি উপরি-উক্ত অনুমানের নিঃসন্দিগ্ধ হেতু বলা যায় না। কারণ, ইহাতে সংশয় দূর হয় না। আর সন্দিগ্ধ হেতুর দ্বারা কোনও গ্রন্থকে শঙ্করাচার্য্যরচিত নহে বলিয়া নিশ্চয় করা সঙ্গত হয় না। কারণ, আবশ্যক হইলে একই ব্যক্তি বিভিন্ন ভাষা ভাব ও ভঙ্গীতে বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকেন—ইহা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। আর শঙ্করাচার্য্যের পক্ষে এরূপ কার্য্য করা যে অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছিল, তাহা অনেকেই বিদিত আছেন এবং প্রায় সকলেই বুঝিতে পারেন। কারণ, শঙ্করাচার্য্য যে বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক-সমাজের সংস্কারের জন্য জীবনপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন। আর এই কারণে যে তাঁহাকে বিভিন্ন অধিকারীকে লক্ষ্য করিয়াই বিবিধ গ্রন্থাদি রচনা করিতে হইয়াছিল, তাহাও সহজেই অনুমান করা যায়। আমাদের বৈদিক-সমাজে কর্ম্মী জ্ঞানী ভক্ত উপাসক তান্ত্রিক ও যোগী প্রভৃতি উচ্চনীচ শ্রেণীর বহু লোকই আছেন। ইঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া যে সব গ্রন্থরচনা আবশ্যক, তাহাতে ভাষা ভাব ও ভঙ্গীর ঐক্য কখনই সম্ভবপর হয় না; অধিক কি, সেরূপ একতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করাও কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির পক্ষে সঙ্গত নহে। এজন্য ভাষা ভাব ও ভঙ্গীর ভেদ দেখিয়া কতকগুলি গ্রন্থকে শঙ্করাচার্য্য-রচিত নহে বলিলে তাহাতে নিশ্চয়বুদ্ধির উদয় হইতে পারে না। এজন্য শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্-ভাষ্যাদি গ্রন্থ প্রভৃতি, অজ্ঞানবোধিনী প্রভৃতি বহু উপদেশ-গ্রন্থ এবং বহু দেবদেবীর স্তবস্তুতিগুলিকে শঙ্করাচার্য্যরচিত নহে বলিলে সঙ্গত হইবে না—বলিতে পারা যায়।

(২) তাঁহাদের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, শঙ্করাচার্য্য-রচিত বলিয়া যে সব গ্রন্থ প্রচলিত, তাহাদের মধ্যে কোন গ্রন্থে যদি শঙ্করাচার্য্যের সূত্রভাষ্যাদিতে প্রচারিত অদ্বৈত-সিদ্ধান্তের প্রতিকূল কোন কথা থাকে, তাহা হইলে তাহা শঙ্করাচার্য্যরচিত বলা সঙ্গত নহে। যেমন শঙ্করাচার্য্য-রচিত সাংখ্যকারিকাভাষ্য, পাতঞ্জলদর্শনের ব্যাসভাষ্য-টীকা, সর্ব্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ প্রভৃতি প্রতিকূল মতেরই গ্রন্থ বলিয়া তাহাদিগকে শঙ্করাচার্য্যরচিত বলিয়া বিবেচনা করা উচিত নহে। তদ্রূপ ললিতাত্রিশতীভাষ্য, বিষ্ণু-সহস্রনামভাষ্য প্রপঞ্চসারতন্ত্র প্রভৃতি এবং দেব-দেবীর স্তবস্তুতিগুলিকে শঙ্করাচার্য্যরচিত বলা উচিত নহে। কারণ, ইহাতে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার কথাই বিশেষ-ভাবে কথিত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য—নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, অদ্বৈতবাদী, তাঁহার পক্ষে সগুণ ব্রহ্মোপাসনাপর গ্রন্থ-রচনা সঙ্গত হয় না। যেমন একটি স্তবে আছে—

"সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তরঙ্গঃ॥
(ষট্‌পদী স্তোত্র)

অন্যত্র দুর্গাপরাধভঞ্জনস্তোত্রে আছে—

"মৎসম পাতকী নাস্তি, পাপঘ্নী ত্বৎসমা ন হি।"

ইহাদের মধ্যে প্রথমটিতে জীবব্রহ্মের অংশাংশিসম্বন্ধ স্বীকার করায় জীবব্রহ্মের অভেদ অস্বীকার করা হইল। শাঙ্করমতে জীবব্রহ্মে অভেদই স্বীকার করা হয়। এ কারণে এই স্তোত্রটি শঙ্করাচার্য্যের রচিত নহে বলাই উচিত। তদ্রূপ দ্বিতীয়টিতে নিজেকে পাতকী বলায় তাঁহার নিজ ব্রহ্মস্বরূপতার বিরুদ্ধ কথাই বলা হইল, অতএব এই স্তবটিও শঙ্করাচার্য্যরচিত নহে বলা উচিত। এইরূপ এই দ্বিতীয় স্তবেই আছে—

"ময়া পঞ্চাশীতেরধিকমুপনীতে তু বয়সি।
ইদানীং মে মাতস্তব যদি কৃপা ন ভবতি॥"

অর্থাৎ আমার ৮৫ বৎসর বয়স হইল, এখনও যদি আপনার কৃপা না হইবে—ইত্যাদি। ইহাও শঙ্করাচার্য্যের উক্তি হইতে পারে না। কারণ, তিনি ৩২ বৎসর বয়সে দেহ-রক্ষা করেন। সুতরাং এই স্তবটি কখনই তাঁহার রচিত হওয়া উচিত নহে। এইরূপ বিচার করিয়া দেখিলে শঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচলিত বহু গ্রন্থাদিই শঙ্করাচার্য্যের নহে বলিতে হয়, ইত্যাদি।

কিন্তু এই যুক্তিটিও নিশ্চায়ক নহে, ইহাতেও সংশয় দূর হয় না। কারণ, অদ্বৈতমতে অধিকারিভেদে কর্ম্ম ভক্তি উপাসনা ও যোগ প্রভৃতি সাধনপথ স্বীকার করা হয়, এবং সগুণ ব্রহ্মেরও উপাস্যত্ব বিহিত হয়। অন্যমতবাদী যেমন অদ্বৈতবাদকে ভ্রান্তমত এবং অভীষ্টলাভের অনুপযোগী বা নরকগমনের হেতু বলেন, অদ্বৈতবাদী সেরূপ অন্যমতবাদকে বলেন না। কর্ম্ম উপাসনা ও যোগাদি—এই শাঙ্করমতে

চিত্তশুদ্ধি একাগ্রতা ও ঈশ্বরানুগ্রহের কারণ বলা হয়। সুতরাং অদ্বৈতবাদে অন্যমতবাদের স্থান আছে। অতএব শঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচলিত যে গ্রন্থে অদ্বৈতবাদের মূল সিদ্ধান্ত—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা, জীবব্রহ্মের অভেদ এবং জ্ঞান ও কর্ম্মের ক্রমসমুচ্চয়বাদ প্রভৃতি যদি খণ্ডনের উদ্দেশ্যে খণ্ডিত না হয়—তাহা হইলে সেই গ্রন্থকে শঙ্করাচার্য্যরচিত বলিতে কোন বাধা হইতে পারে না। এজন্য বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্য, ললিতাত্রিশতীভাষ্য, প্রপঞ্চসার-তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থকে শঙ্করাচার্য্যরচিত নহে, ইহা বলা অভ্রান্ত হইতে পারে না। ইহাতে সগুণব্রহ্মভাবের কথা থাকিলেও ইহারা নিগু'ণব্রহ্মজ্ঞানের উপায়বিশেষ বলিয়া অদ্বৈতবাদে বিবেচিত হয়। কারণ, সগুণ অর্থাৎ "গুণযুক্ত" এই শব্দ দ্বারাই নিগু'ণ অর্থাৎ গুণশূন্য-ভাবের সিদ্ধি হইয়া যায়। যেহেতু, যাহা কোন কিছুর সহিত যুক্ত বলা হয়, তাহা তদ্‌ভিন্নই হয়। অতএব এই সব গ্রন্থ শঙ্করাচার্য্যরচিত নহে বলিলে তাহাতে সংশয় দূর হয় না। তাহার পর জীবব্রহ্মের অংশাংশিসম্বন্ধ স্বীকার করায় ষট্‌পদী স্তবটিকে শঙ্করাচার্য্যরচিত নহে বলা যায় না। কারণ, উপাসকের পক্ষে এইরূপ সম্বন্ধ স্বীকার আবশ্যকই হয়। নচেৎ উপাসনাই সম্ভবপর হয় না, আর উপাস্য-উপাসকভাবে মিথ্যাত্ববোধ থাকিলেও অদ্বৈতমতে উপাসনা অসম্ভব হয় না। কারণ, মিথ্যাত্ব দ্বিবিধ, যথা, ব্যাবহারিক মিথ্যাত্ব এবং পারমার্থিক মিথ্যাত্ব। উপাস্য-উপাসকভাবকে পারমার্থিক মিথ্যা বলা হয়, ব্যাবহারিক মিথ্যা বলা হয় না। এজন্য উপাস্য-উপাসক সম্ভবপর হয়।

বস্তুতঃ মহামতি মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় গীতার ১৮শ অধ্যায়ের টীকায় ভক্তির তিনটি স্তর দেখাইয়াছেন। প্রথমটিতে "আমি তোমার", দ্বিতীয়টিতে "তুমি আমার" এবং তৃতীয়টিতে "তুমি আমি অভিন্ন" ইত্যাদি। অতএব উপাসনাকালে সাগরতরঙ্গের ন্যায় জীবব্রহ্মের অংশাংশি-সম্বন্ধ স্বীকার করায় অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধাচরণ করা হয় না। এই ভাবেই, যে স্তবটিতে বলা হইয়াছে "মা। আমার সমান পাতকী নাই, আর তোমার সমান পাপ-নাশিনী নাই" ইত্যাদি, তাহাকেও শঙ্করাচার্য্যরচিত নহে বলা সঙ্গত হয় না। কারণ, এই ভাবটি সাধারণ ভক্তের ভক্তির আদর্শবিশেষ। তদ্রূপ যে স্তবে বলা হইয়াছে "মা! আমার ৮৫ বৎসর বয়স হইল, এখনও তোমার কৃপা হইল না", তাহাও কোনও এক বৃদ্ধ ভক্তের কথা বলিলে কোনও অসঙ্গতি হয় না। তাহার পর এ বিষয়ে একটা কথা, এই যে স্তবস্তুতিগুলি ইহারা ভক্তি-সাধনার জন্য অপরকে লক্ষ্য করিয়া রচিত বলা হয়। কারণ, বহু স্তবেই দেখা যায়, তাহাদের শেষে বলা হইতেছে—ইহা যিনি পড়িবেন তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হইবেন ইত্যাদি, যথা—

"শ্লোকত্রয়মিদং পুণ্যং লোকত্রয়বিভূষণম্।
প্রাতঃকালে পঠেদ্ যস্তু স গচ্ছেৎ পরমং পদম্॥"
(প্রাতঃস্মরণস্তোত্র)

গঙ্গাস্তবে কথিত হইয়াছে—বিষয়ী ইহা পাঠ করিলে আর সংসারতাপে তপ্ত হইবেন না। যথা—

"পঠতি তু বিষয়ী ন ভবতি তপ্তঃ।"

শিবপঞ্চাক্ষরস্তোত্রে কথিত হইয়াছে—শিবসন্নিধানে ইহা পাঠ করিলে শিবলোকপ্রাপ্তি হয়, ইত্যাদি, যথা—

"পঞ্চাক্ষরমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ শিবসন্নিধৌ।
শিবলোকমবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে॥"

এইরূপ প্রায় সমুদায় স্তবস্তুতি মধ্যেই দেখা যায়।

ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, এই সব স্তবস্তুতিতে শঙ্করাচার্য্যের নিজের কথা বলা হইতেছে না। ইহা সর্ব্বসাধারণ অধিকারীর জন্য রচিত। বস্তুতঃ আর্ত্ত অর্থার্থী জিজ্ঞাসু প্রভৃতি ভক্তদিগের জন্য সাধু মহাত্মারা পৃথক্ স্তবস্তুতি অনেক সময় তাহাদের উপযোগী করিয়াই রচনা করিয়া দেন—এই প্রথা এখনও বর্ত্তমান। আর এই-রূপই কোন ৮৫ বৎসরের বৃদ্ধের জন্য দুর্গাপরাধভঞ্জন-স্তোত্রটি রচিত হইয়াছিল—যদি বলা যায়, তাহা হইলে তাহা অসম্ভব কল্পনা হইতে পারে না। অতএব এই সব স্তবস্তুতিগুলি নিশ্চিতই শঙ্করাচার্য্যরচিত নহে—ইহা বলা সঙ্গত হইবে না। বিদ্বান্‌গণ অজ্ঞের হিতের জন্য স্বয়ং অজ্ঞের ন্যায় আচরণ করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। ইহা গীতায় ভগবানই বলিয়াছেন—

"সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্ বিদ্বাংস্তথাঽসক্তঃ চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥"
(গীতা ৩।২৫)

এজন্য শঙ্করাচার্য্যের পক্ষে স্তবস্তুতি রচনা অসম্ভব ব্যাপার হইতে পারে না। আর সাংখ্যকারিকাভাষ্য, যোগদর্শনের ব্যাসভাষ্যটীকা, সর্ব্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থগুলিতে প্রতিকূল মতের কথা আছে বলিয়া তাহা-দিগকে শঙ্করাচার্য্যরচিত নহে বলা সঙ্গত হইবে না। কারণ, বেদান্তের পূর্ব্বপক্ষমতের কথা ভাল করিয়া জানিতে পারিলে সিদ্ধান্তপক্ষের কথা দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়, এজন্য পূর্ব্ব-পক্ষের পরিচয়ের জন্য শঙ্করাচার্য্য যদি অন্য মতের গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা হইলে তাহা অসম্ভব কল্পনা হইতে পারে না। বস্তুতঃ, শঙ্করাচার্য্যের পরমগুরু গৌড়পাদা-চার্য্যের কৃত সাংখ্যকারিকাভাষ্যই অদ্যাবধি বিদ্যমান। অতএব এই দ্বিতীয় যুক্তিবলে কতকগুলি গ্রন্থকে শঙ্করা-চার্য্যরচিত নহে বলিলে তাহা যে অভ্রান্ত কথা হইবে—ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

(৩) তাঁহাদের তৃতীয় যুক্তি এই—যে সব শঙ্করাচার্য্য-রচিত বলিয়া প্রচলিত গ্রন্থের উপর আনন্দগিরির টীকা নাই, সে সকল গ্রন্থ শঙ্করাচার্য্যের রচিত নহে—বলাই উচিত। এজন্য শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্‌ভাষ্য, বিষ্ণুসহস্র-নামভাষ্য, নৃসিংহতাপনীয়োপনিষদ্‌ভাষ্য, হস্তামলকভাষ্য, ললিতাত্রিশতীভাষ্য, গায়ত্রীভাষ্য এবং বহু উপদেশগ্রন্থ এবং বহু স্তবস্তুতি, যাহাদের উপর আনন্দগিরির টীকা নাই, তাহারা শঙ্করাচার্য্যরচিত বলা উচিত নহে। কারণ, আনন্দগিরি প্রায় সমুদায় শঙ্করাচার্য্যরচিত গ্রন্থের টীকাকার।

কিন্তু এই যুক্তিটিও নিশ্চয়-জ্ঞানোৎপাদন করিতে পারে না। কারণ, আনন্দগিরি যে সমুদায় শঙ্করাচার্য্য-রচিত গ্রন্থেরই উপর টীকা করিয়াছেন, এরূপ কথা তিনি কোথাও বলেন নাই। আর এখনও অনেক গ্রন্থের আনন্দগিরি-কৃত টীকা আবিষ্কৃত হইতেছে। উপদেশ-সাহস্রীর উপর আনন্দগিরি-কৃত টীকা এখনও মুদ্রিত হয় নাই। এইরূপ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ প্রভৃতির ভাষ্যের উপর আনন্দগিরির টীকা যে পাওয়া যাইবে না, তাহা বলা যায় না। আমাদের যাবতীয় গ্রন্থের সন্ধান এখনও নিঃশেষে পাওয়া যায় নাই, ইহা অনেকেই জানেন। অতএব এই তৃতীয় যুক্তিবলে কোন গ্রন্থকে শঙ্করাচার্য্যরচিত নহে বলিয়া নিশ্চয় করা সঙ্গত হইবে না।

(৪) তাঁহাদের চতুর্থ যুক্তি এই যে,—শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যাদির মধ্যে শ্রুতিপ্রমাণই অধিক গৃহীত হইতে দেখা যায়। ইতিহাস-পুরাণাদির প্রমাণ সে ভাবে গৃহীত হয় না। এজন্য শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ প্রভৃতি গ্রন্থের ভাষ্য শঙ্করাচার্য্যকৃত নহে—বলাই উচিত।

কিন্তু এই কল্পনাও নিঃসন্দিগ্ধ-জ্ঞান জন্মাইতে পারে না। কারণ, শঙ্করাচার্য্য শ্রুতিপ্রামাণ্যের অনুরাগী হইলেও যে, তিনি ইতিহাস-পুরাণাদিরূপ স্মৃতিপ্রমাণ স্বীকার করিতেন না, তাহা নহে। কারণ, গীতা প্রভৃতির উপর ভাষ্যই তিনি রচনা করিয়াছেন। স্মৃতির প্রামাণ্য শ্রুতিপ্রামাণ্যের অধীন বলিয়া তিনি শ্রুতিপ্রামাণ্য অধিক গ্রহণ করিতেন—এই মাত্র। আর কালবশে স্মৃতিগ্রন্থ যত বিকৃত হইয়াছে, শ্রুতি তত বিকৃত হয় নাই। এই জন্যও তিনি শ্রুতিপ্রামাণ্যের অধিক পক্ষপাতী। কিন্তু ইহা দেখিয়া যদি কেহ ভ্রম করিয়া ভাবেন যে, ইতিহাস-পুরাণাদি তবে অপ্রমাণ, আর সেই ভ্রম-নিবারণের জন্য যদি শঙ্করাচার্য্য কোন কোন গ্রন্থে ইতিহাস-পুরাণাদির প্রমাণ বহুল ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা শঙ্করাচার্য্যের পক্ষে অসম্ভব কথা হইতে পারে না। কে বলিতে পারে, এইরূপ ভ্রম শঙ্করাচার্য্যের জীবিতাবস্থায় শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যবর্গের মধ্যেই হয় নাই? আর সেই কারণেই তিনি অপেক্ষাকৃত সরল ভাষায় শ্বেতাশ্বতরাদি কতিপয় ভাষ্যে ইতিহাস-পুরাণাদির প্রমাণই বহুল ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ, এত দিন পরেও এখন অনেকে বলিতেছেন, যে সব গ্রন্থের বাক্যাদি শঙ্করাচার্য্য উদ্ধৃত করেন নাই, তাহারা শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী কালে রচিত। যেমন তাঁহারা ১০৮ উপনিষদের ১২।১৪খানি উপনিষদ্ বাদে সকলই শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী বলিয়া থাকেন। যোগবাশিষ্ঠ এবং ভাগবতের বাক্যাদি শাঙ্করভাষ্যমধ্যে উদ্ধৃত না হওয়ায় ঐ গ্রন্থদ্বয়কে অনেকে আধুনিক বলিয়া থাকেন। এজন্য ভবিষ্যতের এইরূপ ভ্রমের নিবারণ-মানসে যদি শঙ্করাচার্য্য শ্বেতাশ্বতরোপনিষদাদির ভাষ্যে পুরাণাদির বাক্যই মুখ্যভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা অসম্ভব কার্য্য হইতে পারে না। এই কারণে এই চতুর্থ যুক্তিটিও নিশ্চায়ক হেতু বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

(৫) তাঁহাদের পঞ্চম যুক্তি এই যে, এক ব্যক্তির পক্ষে এক জাতীয় বহু গ্রন্থ রচনা করিবার প্রবৃত্তি সম্ভবপর হয় না। আত্মবোধ, তত্ত্ববোধ, অজ্ঞানবোধিনী, তত্ত্বোপদেশ এইরূপ বহু একশ্রেণীর গ্রন্থ শঙ্করাচার্য্যের রচিত বলিয়া দেখা যায়। তদ্রূপ একই দেবদেবীর একাধিক স্তবস্তুতিও দেখা যায়। যেমন দ্বিবিধ গঙ্গাস্তব, দ্বিবিধ কৃষ্ণস্তব, দ্বিবিধ যমুনাস্তব ইত্যাদি। আবার শিব, শক্তি, বিষ্ণু, গণেশ প্রভৃতি উপাস্য দেবদেবীর নানা রূপের নানা স্তবস্তুতিও দেখা যায়। কেনোপনিষদের পদভাষ্য ও বাক্যভাষ্যরূপ দুইখানি ভাষ্যই দেখা যায়। এইরূপ এক-জাতীয় গ্রন্থ একই ব্যক্তির পক্ষে রচনা সম্ভবপর হয় না। অতএব এই সব গ্রন্থের বহু গ্রন্থই শঙ্করাচার্য্যরচিত নহে বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু এই যুক্তিও সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, বিভিন্ন অধিকারীর জন্যই একই কথা বিবিধ প্রকারে বলা আবশ্যক হইতে দেখা যায়। যাঁহাকে সমগ্র ভারতের বৈদিক-সমাজের সংস্কার সাধন করিবার জন্য সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল, তাঁহার পক্ষে একই কথার পুনরাবৃত্তি করিবার নিশ্চিতই আবশ্যকতা থাকে। তদ্রূপ পঞ্চ উপাস্য দেবতার বিবিধ রূপের উপাসক-সম্প্রদায়ও আমাদের মধ্যে বহু দেখা যায়। যিনি ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারের জন্য প্রবৃত্ত, তিনি এই সকল সম্প্রদায়ের জন্য একই দেবতার বিভিন্ন অধিকারীর জন্য বিভিন্ন স্তব-স্তুতি যে রচনা করিবেন, তাহাই ত স্বাভাবিক। অতএব উক্ত যুক্তির দ্বারা কোন্ গ্রন্থ শঙ্করাচার্য্যরচিত এবং কোন্ গ্রন্থ নহে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কেনোপনিষদের দুইখানি ভাষ্যের কি প্রয়োজনীয়তা হইয়াছিল, তাহা পরে বিবৃত হইতেছে।

(৬) তাঁহাদের ষষ্ঠ যুক্তিটি এই যে, এক জন ব্যক্তি যতই বুদ্ধিমান্ হউন না কেন, ৩২ বৎসর বয়সের মধ্যে

সমগ্র ভারত পদব্রজে ভ্রমণ করিতে করিতে এত অধিক এবং এত গভীর চিন্তাপূর্ণ দার্শনিক-গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন না। ইহা এক জন অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির পক্ষেও অসম্ভব। এত কাল পরে বিখ্যাত পাশ্চাত্ত্য মনীষী মোক্ষমূলর শঙ্করাচার্য্যের জীবিতকাল অন্ততঃ পক্ষে ৮৫ বৎসর ছিল বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। আর তাঁহার এই কল্পনার অনুকূলে পূর্ব্বোক্ত দুর্গাপরাধভঞ্জনস্তোত্রের "ময়া পঞ্চাশীতেরধিকমুপনীতে" এই বাক্যটির প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। অন্যথা শঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচলিত বহু গ্রন্থই শঙ্করাচার্য্যরচিত নহে, ইহাই বলিতে হয়, ইত্যাদি।

কিন্তু এই যুক্তিও সঙ্গত নহে। কারণ, অবতারকল্প অনন্যসাধারণ ব্যক্তি জগতে অতি অল্পই জন্মপরিগ্রহ করেন। আর জন্মগ্রহণ করিলেও বহুশত বৎসর অন্তর এক একজন জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদিগের ক্রিয়াকলাপ একজন অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সহিত তুলনা করাও সঙ্গত হয় না। শঙ্করাচার্য্য-জীবনে যে সব অলৌকিক কথা আছে, তাহার কিছুও যদি বিশ্বাস করা যায়, তাহা হইলে তাঁহাকে এক জন অনন্যসাধারণ প্রতিভাবান্ ব্যক্তি হইতেও অনেক অধিক বলিতে হয়। আর প্রবাদ বলিয়া তাঁহার অসাধারণত্ব একেবারে অস্বীকার করাও যায় না। কারণ, তাহা হইলে লোকব্যবহারই অচল হইয়া উঠিবে। সকলেই নিজ নিজ বংশ-কথা প্রবাদরূপেই অবগত হইয়া থাকেন। তাহা কি কেহ অবিশ্বাস করেন? অতএব প্রবাদ বলিয়া শঙ্করাচার্য্য-জীবনের অলৌকিক ঘটনাগুলি অবিচারিত ভাবে অবিশ্বাস করা চলে না। এই কারণে, এত অল্প জীবিতকালে এত অধিক দুরূহ দার্শনিক গ্রন্থরচনা শঙ্করাচার্য্যের পক্ষে অসম্ভব বলা সঙ্গত হয় না। বুদ্ধ, খৃষ্ট, রামকৃষ্ণ কয়জন জন্মিয়াছেন? শঙ্করাচার্য্য-জীবনের অন্য সকল কথা ত্যাগ করিয়া যদি কেবল তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যখানি উত্তমরূপে আলোচনা করা যায়, তাহা হইলেই তাঁহার অতিমানুষিকতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এই একখানি গ্রন্থের উপর এতই টীকা টিপ্পনী প্রভৃতি রচিত হইয়াছে, এত মহামনীষিগণ ইহার জন্য এত পরিশ্রম করিয়াছেন যে, সেরূপ সাধনা আর কোন গ্রন্থের জন্যই হয় নাই—মনে হয়। অতএব এই ষষ্ঠ যুক্তিও বিশেষ মূল্যবান্ বলিয়া বোধ হয় না।

(৭) তাঁহাদের সপ্তম যুক্তি এই যে, একই ব্যক্তি একই শ্রুতি প্রভৃতি প্রমাণের বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন—দেখা যাইলে সেই সকল গ্রন্থই সেই একই ব্যক্তির রচিত হইতে পারে না। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে যে শ্রুতিবাক্যের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই শ্রুতির ব্যাখ্যাকালে সেই বাক্যের সেরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির পরস্পরবিরুদ্ধ কথা বলা সম্ভব হইতে পারে না। এই কারণে বলিতে হয়—তাঁহার নামে প্রচলিত অনেক শ্রুতিভাষ্য তাঁহার রচিত নহে। যেমন কেনোপনিষদের দুইখানি ভাষ্যমধ্যেই অনেক স্থলে ব্যাখ্যাভেদ দেখা যায়। এজন্য ইহার দুইখানি ভাষ্যই তাঁহার রচিত নহে বলিতে হয়।

কিন্তু এরূপ কল্পনাও নিশ্চায়ক হয় না। ইহাতেও সংশয়ের অবসর থাকে। কারণ, ব্যাখ্যা যদি বিভিন্ন হইয়াও মূল সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে তাহা এক ব্যক্তির কৃত হইতে বাধা হয় না। এক শ্রুতির যদি পরস্পর অবিরুদ্ধ একাধিক প্রকার অর্থ হয়, তাহা হইলে তাহা শ্রুতিরই গুণ বলিতে হইবে। পৌরুষেয় বাক্যস্থলে বক্তার অভিপ্রায় অনুসারে ব্যাখ্যা না করিলে দোষ হয়। শ্রুতি কিন্তু অপৌরুষেয়, সুতরাং শ্রুতিব্যাখ্যাস্থলে ইহা দোষ হইতে পারে না। আর তজ্জন্য শঙ্করাচার্য্যরচিত বলিয়া প্রচলিত শ্রুতিভাষ্যগুলি সবই শঙ্করাচার্য্যরচিত নহে—এরূপ নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। আর সেই কারণে কেনোপনিষদের উভয় ভাষ্যই শঙ্করাচার্য্যরচিত বলিতে কোনও বাধা দেখা যায় না।

(৮) তাঁহাদের অষ্টম যুক্তি এই যে, শঙ্করাচার্য্যরচিত বলিয়া প্রচলিত গ্রন্থমধ্যে মঙ্গলাচরণ বিভিন্ন দেখা যায় অর্থাৎ গুরু ও ইষ্টদেবতার ভেদ দেখা যায়। এরূপ হইলে ঐ সকল গ্রন্থকে শঙ্করাচার্য্যরচিত বলা সঙ্গত হইবে না। শঙ্করাচার্য্যের গুরু গোবিন্দপাদ, এবং ইষ্টদেবতা নারায়ণ বা কৃষ্ণ। যেমন গীতাভাষ্যের মঙ্গলাচরণে তিনি তাঁহার ইষ্টদেবতা নারায়ণের স্মরণ করিয়াছেন, যথা—

"ওঁ নারায়ণপরোঽব্যক্তঃ অণ্ডমব্যক্তসম্ভবম্।
অণ্ডস্যান্তস্ত্বিমে লোকা সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী॥"

কিন্তু অদ্বৈতানুভূতি গ্রন্থে তিনি বিশ্বেশ্বর শ্রীবল্লভকে নমস্কার করিতেছেন, যথা—

"বিশ্বেশ্বরং বিদিতবিশ্বমনন্তমূর্ত্তিম্।
শ্রীবল্লভং বিমলবোধঘনং নমামি॥"

ইহাই আবার বাক্যবৃত্তি গ্রন্থেও দেখা যায়। অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থে দেখা যায়—

"শ্রীহরিং পরমানন্দমুপদেষ্টারমীশ্বরম্।
ব্যাপকং সর্ব্বলোকানাং কারণং তং নমাম্যহম্॥"

বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থে দেখা যায়—

"সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তগোচরং তমগোচরম্।
গোবিন্দং পরমানন্দং সদ্‌গুরুং প্রণতোঽস্ম্যহম্॥"

এইরূপ বিবিধ গ্রন্থে মঙ্গলাচরণ পৃথক্ পৃথক্ দেখা যায়। আর সূত্রভাষ্য প্রভৃতি কতকগুলি গ্রন্থে একেবারেই মঙ্গলাচরণ নাই। এইরূপ স্থলে তাঁহার নামে প্রচলিত সকল গ্রন্থ তাঁহার রচিত হওয়া সম্ভবপর নহে।

কিন্তু এরূপ কল্পনা করা সঙ্গত হয় না। কারণ, গোবিন্দ এবং নারায়ণ শব্দের পর্য্যায় শব্দ দ্বারা যেখানে মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে, সেখানে গুরু এবং ইষ্টদেবতার নমস্কার-ভেদ-কল্পনা করা সঙ্গত হইবে না। কারণ, স্পষ্টভাবে গুরু ও ইষ্টদেবতার নাম গ্রহণ করিতে শাস্ত্রে নিষেধও আছে। অনেকেই ইহা প্রতিপালিতও করেন দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মবাদী শঙ্করাচার্য্যের পক্ষে সকল দেবতাকেই ব্রহ্মদৃষ্টিতে নমস্কার করাই সম্ভব। সুতরাং বিভিন্ন দেবতার নমস্কার দেখিয়া অথবা গুরুনামের অনৈক্য দেখিয়াই কোন গ্রন্থ-বিশেষকে শঙ্করাচার্য্যরচিত নহে বলা যায় না। প্রবাদরূপে যাহা শিষ্টগণমধ্যে প্রচলিত, অথবা পুঁথির শেষে রচনাকর্ত্তার নাম যাহা লিখিত থাকে, তাহাকে বিশেষ প্রবল প্রমাণ না পাইলে অন্যথা করা সঙ্গত হইবে না। এই কারণে এই অষ্টম যুক্তিও নিঃসন্দিগ্ধ হেতু হইতে পারে না।

(৯) তাঁহাদের নবম যুক্তি এই যে, শঙ্করাচার্য্য আকুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন। তাঁহার যে গ্রন্থে আদিরসঘটিত বিষয়ের উল্লেখ দেখা যাইবে, তাহাকে শঙ্করাচার্য্যরচিত বলা উচিত নহে। যেমন অমরুশতক এবং বেদান্তকেশরী প্রভৃতি গ্রন্থকে এই কারণ শঙ্করাচার্য্যরচিত বলা সঙ্গত হইবে না। ইহাতে ব্রহ্মচারীর অযোগ্য কথাই দেখা যায়। অতএব এ জাতীয় গ্রন্থ শঙ্করাচার্য্য-কৃত হইতেই পারে না।

কিন্তু একথাও যুক্তিসহ নহে। কারণ, ব্রহ্মজ্ঞান দৃঢ় হইলে জ্ঞানপ্রতিবন্ধক কামাদিদোষ, তাঁহার জ্ঞানের কোনরূপ বাধা উৎপাদন করিতে পারে না। তিনি দৃশ্যমাত্রকে মিথ্যা জানিয়া অর্থাৎ "দেখা যায় কিন্তু সত্তা নাই"—এইরূপ জানিয়া লোকদৃষ্টিতে লোকহিতের জন্য আদিরসের দৃষ্টান্তাদি দিলে তাঁহার পক্ষে কোনও দোষ হয় না। যেমন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে রাসলীলা-জন্য কামদোষ স্পর্শ করে নাই, এ স্থলেও তদ্রূপ বলা যায়। এই কথাটি শঙ্করবিজয়গ্রন্থে বিদ্যারণ্যস্বামী. শঙ্করাচার্য্যের অমরু রাজদেহে প্রবেশকালে শঙ্করাচার্য্য পদ্মপাদকে বুঝাইবার জন্য বলিয়াছিলেন—এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এজন্য অমরুশতক গ্রন্থে মণ্ডনপত্নীর প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ যে সব কামশাস্ত্রের কথা আছে, তাহা সন্ন্যাসীর উচ্চার্য্য নহে বলিয়া, লোকহিতের জন্য পরদেহে প্রবেশ করিয়া শঙ্করাচার্য্য তাহা রচনা করিয়াছিলেন। যাঁহারা শঙ্করাচার্য্যের এই পরকায়-প্রবেশ বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বলেন, শঙ্করাচার্য্য নিজ প্রতিভাবলে বা যোগবলে মণ্ডনপত্নীর কামশাস্ত্রীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেন, কিন্তু সন্ন্যাসের আদর্শরক্ষার জন্য তিনি তাহা করেন নাই। নচেৎ কামশাস্ত্রীয় কথায় তাঁহাতে কোন দোষ স্পর্শ করিত না। কারণ, জ্ঞানোৎপত্তির পর জ্ঞান-প্রতিবন্ধক আর জ্ঞানের বিনাশক হয় না। অতএব অমরুশতক বা বেদান্তকেশরী গ্রন্থ শঙ্করাচার্য্যরচিত নহে—বলিবার কোন হেতু দেখা যায় না। বস্তুতঃ, উপনিষদের মধ্যে যে কামশাস্ত্রীয় কথা আছে, তাহার ব্যাখ্যা শঙ্করাচার্য্য করিয়াছেন। শ্রুতিব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে এ স্থলে কামকথা কথিত বলিয়া সন্ন্যাসীর আচার-বিরুদ্ধ কথা হইল না। কারণ, সন্ন্যাসীর পক্ষে বেদপাঠ বিহিত। আর বেদান্তকেশরী গ্রন্থকে যদি কোনও কারণে শঙ্করাচার্য্যরচিত নহে বলিতে হয়, তাহা হইলে উপনিষদের উক্ত ব্যাখ্যাও শঙ্করাচার্য্যরচিত নহে বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা কেহই বলেন না। যাঁহারা উপনিষদের এতাদৃশ অংশকে আপত্তিকর ভাবিয়া তাঁহাদের প্রকাশিত উপনিষদের অনুবাদে এই অংশের অনুবাদ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাও কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের এই অংশের ব্যাখ্যাকে শঙ্করাচার্য্যকৃত নহে বলেন নাই। অতএব এই নবম যুক্তির দ্বারা শঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচলিত কতকগুলি গ্রন্থকে শঙ্করাচার্য্যরচিত নহে বলা সঙ্গত হইতে পারে না।

(১০) তাঁহাদের দশম যুক্তি এই যে, শঙ্করাচার্য্যরচিত বলিয়া প্রচলিত কোন কোন গ্রন্থের টীকাকারগণমধ্যে শঙ্করাচার্য্যরচিত বিষয়ে মতভেদ যখন দেখা যায়, তখন এতাদৃশ গ্রন্থকে শঙ্করাচার্য্যরচিত বলা যুক্তিসঙ্গত হয় না। যেমন বাক্যসুধা গ্রন্থের টীকায় আনন্দগিরি তাহাকে শঙ্করাচার্য্যরচিত বলিয়াছেন এবং ব্রহ্মানন্দ তাহাকে বিদ্যারণ্যরচিত বলিয়াছেন। অতএব এ ক্ষেত্রে ব্রহ্মানন্দের কথাই গ্রাহ্য। কারণ, বিদ্যারণ্য, ব্রহ্মানন্দের গুরু, সুতরাং তাঁহাদের ব্যবধান অল্প, আর আনন্দগিরি ও শঙ্করাচার্য্যের ব্যবধান তিন চারি শত বৎসর। আর শঙ্করাচার্য্যের বহু গ্রন্থরচনাই একটি আপত্তির বিষয়, কিন্তু ব্রহ্মানন্দ সম্বন্ধে সেরূপ বহুগ্রন্থ-রচয়িতৃত্বজন্য কোন আপত্তি নাই।

কিন্তু একথাও নিঃসন্দিগ্ধ নহে। ইহাতেও সন্দেহের অবসর আছে। কারণ, প্রাচীন বিষয়ে প্রাচীনের কথা যত প্রমাণ, ততটা অর্ব্বাচীনের কথা প্রমাণ হয় না, তদ্রূপ বহুজ্ঞের কথা যত প্রমাণ, তত অজ্ঞের কথা প্রমাণ নহে—ইহা একটি সাধারণ নিয়ম। এক্ষেত্রে আনন্দগিরি ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা প্রাচীন, এবং আনন্দগিরি যত শাঙ্কর-গ্রন্থের টীকাকার, ব্রহ্মানন্দ এত গ্রন্থের টীকাকার নহেন। আনন্দগিরির কীর্ত্তি যত, ব্রহ্মানন্দের কীর্ত্তি তত নহে, এজন্য তাঁহার কথার প্রামাণ্য অধিক। কিন্তু তাহা হইলেও ব্রহ্মানন্দের গুরু বিদ্যারণ্য বলিয়া ব্রহ্মানন্দের কথাও একেবারে উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। এজন্য এক্ষেত্রে সংশয়ের অবসর থাকিয়া যাইতেছে। আর এই সংশয় যদি দূর করিতে হয়, তাহা হইলে অন্য নিশ্চায়ক প্রমাণ আবশ্যক। সুতরাং এক্ষেত্রে বাক্যসুধা গ্রন্থ শঙ্করাচার্য্যের রচিত নহে বলিয়া নিশ্চয় করা যায় না।

(১১) তাঁহাদের একাদশ যুক্তি এই যে, শঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচলিত গ্রন্থমধ্যে যদি কোন গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্যের বাক্যই তাঁহার নাম করিয়া প্রমাণস্বরূপে উদ্ধৃত দেখা যায়, তাহা হইলে সেই গ্রন্থ শঙ্করাচার্য্যের রচিত হইতে পারে না। কারণ, নিজ বাক্যের নিজ গ্রন্থে নিজ নাম দিয়া প্রমাণস্বরূপে উদ্ধৃত হইবার সম্ভাবনাই হয় না। এই কারণে "মহাবাক্যবিবরণ" গ্রন্থে গ্রন্থকারের নামের উল্লেখকালে শঙ্করাচার্য্যের নাম থাকিলেও গ্রন্থমধ্যে শঙ্করাচার্য্যের নাম করিয়া শঙ্করাচার্য্যের বাক্য প্রমাণস্বরূপে উদ্ধৃত থাকায় "মহাবাক্যবিবরণ" গ্রন্থখানিকে শঙ্করাচার্য্যের রচিত বলা সঙ্গত হয় না। তদ্রূপ নৃসিংহতাপনীয়োপনিষদ্‌ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্যরচিত প্রপঞ্চসারতন্ত্র গ্রন্থের বাক্য উদ্ধৃত থাকায় ইহাদের মধ্যে নৃসিংহতাপনীয়োপনিষদ্‌ভাষ্যখানি শঙ্করাচার্য্য-রচিত হইতে পারে না।

কিন্তু এ কথাও সঙ্গত নহে। কারণ, "মহাবাক্যবিবরণ" মধ্যে যে ভাবে শঙ্করাচার্য্যের বাক্য প্রমাণরূপে উদ্ধৃত, সে ভাবে নৃসিংহতাপনীয়ভাষ্যমধ্যে প্রপঞ্চসারতন্ত্রের বাক্য উদ্ধৃত নহে। এজন্য "মহাবাক্যবিবরণ" গ্রন্থ শঙ্করাচার্য্যকৃত নহে বলাই সঙ্গত, কিন্তু নৃসিংহতাপনীয়োপনিষদ্‌ভাষ্যকে শঙ্করাচার্য্যরচিত নহে—বলা সঙ্গত হইবে না। কারণ, এই ভাষ্যমধ্যে প্রপঞ্চসারতন্ত্রের মন্ত্রোদ্ধার বিষয়টি দেখিবার জন্য বলা হইয়াছে মাত্র; অতএব নৃসিংহতাপনীয়ভাষ্য শঙ্করাচার্য্যরচিত নহে বলা সঙ্গত নহে।

[আগামীবারে সমাপ্য।

স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ।

সে-দিনের মায়া

তুমি কি আমার গত জনমের প্রিয়া?
কি জানি, কেন এ প্রশ্ন জাগায় হিয়া!
সে-দিনের সেই চাঁদ
আজো কি পাতিয়া ফাঁদ
মায়া-কাননের হরিণী ধরিয়া আনে?
সে-দিনের কথা আজো কি কহিছ গানে?

নদীর ও-পারে আলো-আঁধারির মাঝে
সে-দিনের মায়া আজো কি তেমনি রাজে?
সে-দিনের মুসাফির
আজো কি ধরিয়া তীর
পিছনে রাখিয়া যায় শুধু পদরেখা?
চকোর পায় কি সেই সে চাঁদের দেখা?

সে-দিনের সাঁঝে যে-গান গেয়েছে পাখী;
মদির-আবেশে যে প্রেম দিয়েছে সাকী—
মলয় আজিকে প্রাণে
সে স্মৃতি কিছু কি আনে?
সাগরের বুকে সে-দিনের আকুলতা
আজো কি তোমার বুকে জাগাইছে ব্যথা?

মধু-যামিনীতে সে-দিনের বীথিকায়
হাতে হাত রাখা, চেয়ে থাকা মূক-প্রায়—
সেই লুকোচুরি খেলা
প্রভাত-সন্ধ্যা বেলা,
আজিকার দিনে ফেলেছে কি তার ছায়া!
সে-দিনের কায়া আজো কি রচিছে মায়া?

কিসের জোয়ারে আজি সে-দিনের দেশে
আমারে টানিছে যেন—চলিয়াছি ভেসে!
শেষ কি হয়েছে আজ
এগিয়ে চলার কাজ?
তাই মহাকাল আজ কি পিছনে ছোটে?
সে স্বপন আজ তাই কি আঁধারে ফোটে?

সে-দিনে-আজিকে একাকার দেখি যেন!
সে-দিনের হাসা আজিকার কাঁদা কেন?
আজিকার ব্যথা গান
অলস-বিবশ প্রাণ
সে-দিনের রাতে আপনা' বিলাতে চায়!
এ কি অঘটন আজিকে ঘটিল হায়!

শ্রীঅনিলকুমার গুপ্ত

বিংশ তরঙ্গ

আলোচনা

গভীর নিশীথে সার রড্‌নে ড্রমণ্ড ওয়াইল্ডের ডাকাডাকিতে হঠাৎ জাগিয়া-উঠিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে সবিস্ময়ে ব্লেক ও স্মিথের মুখের দিকে চাহিলেন; কিন্তু ব্যাপার কি, তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

ব্লেক ও স্মিথ সার রড্‌নের লাইব্রেরীতে নীত হইলে সার রড্‌নের খানসামা জার্ভিস নৈশপরিচ্ছদে দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইল। সার রড্‌নে তাঁহার অরণ্য-নিবাসে একাকী বাস করিতেন, একমাত্র ভৃত্য জার্ভিসই তাঁহার সকল আদেশ পালন করিত।

সার রড্‌নে ওয়াইল্ডকে বলিলেন, "আমাকে তুমি চমকাইয়া দিয়াছ! এ কাজ তুমি কেন করিলে ওয়াইল্ড, তুমি এই দুই জন ভদ্রলোককে এ ভাবে আমার আশ্রমে কেন লইয়া আসিয়াছ?"

ওয়াইল্ড সার রড্‌নের প্রশ্নে কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "ইহার কারণ আমি উঁহাদিগকে খুলিয়া বলিয়াছি। মিঃ ব্লেকের সহিত আপনার বোধ হয় পরিচয় আছে; কিন্তু আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, আমি উঁহাকে আপনার অপেক্ষা অনেক ভালই জানি। উঁহাকে আমি যথেষ্ট সম্মান করি; সুতরাং আমি উঁহার সহিত অসৎ ব্যবহার করিব, ইহা কদাচ সম্ভব নহে। কিন্তু উনি অত্যন্ত চতুর; এই জন্য আমার ইচ্ছা, আপনি অন্ততঃ একটা মাস উঁহাকে এখানে রাখিয়া অতিথি-সৎকার করুন। আপনার এই দুর্গ অত্যুচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত, এবং শৃগালের দল দিবারাত্রি এখানে পাহারায় নিযুক্ত আছে। আপনার অজ্ঞাতসারে উঁহারা চলিয়া যাইতে পারিবেন না।"

সার রড্‌নে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "শৃগালের পাহারা শেষ হইয়াছে। তুমি নিজেই ত দু'টিকে সাবাড় করিয়াছ, আর একটি রহস্যজনক ভাবে মারা গিয়াছে।"

এবার স্মিথ কথা বলিল। সে বলিল, "আর একটি চতুষ্পদ প্রহরী আমাদের টাইগারের সহিত যুদ্ধে পরলোকে প্রস্থান করিয়াছে।"

সার রড্‌নে বলিলেন, "সে সংবাদ আমার জানা ছিল না। যাহা হউক, এখনও আর দুইটি অবশিষ্ট আছে; কিন্তু তাহারা অত্যন্ত ভীরু-স্বভাব। তাহারা থাকা না থাকা সমান।"

ওয়াইল্ড বলিল, "কিন্তু আমার আর এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই। ব্লেক যদি অঙ্গীকার করেন, উনি এখানে নিষ্ক্রিয় ভাবে অবস্থিতি করিবেন, তাহা হইলে আপনি অনায়াসেই উঁহার কথায় নির্ভর করিতে পারেন। আমি এখন আমার কাজে চলিলাম সার রড্‌নে! বিদায় মিঃ ব্লেক! স্মিথ, তুমি এখানে কিছুকাল ফূর্তি কর!"

ওয়াইল্ড তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিল। সার রড্‌নে অত্যন্ত বিপন্ন ভাবে ব্লেক ও স্মিথের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি কুণ্ঠিত ভাবে ব্লেককে বলিলেন, "আমি আপনাকে জানাইতে চাই যে, এই ব্যাপার আমার অজ্ঞাতসারে সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবেই ঘটিয়াছে। আমার আশঙ্কা হইতেছে, আমি যথাযোগ্যরূপে অতিথি-সৎকার করিতে পারিব না; তবে আমি সাধ্যানুসারে তাহার ত্রুটি করিব না।"

ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ধন্যবাদ, সার রড্‌নে! ওয়াইল্ড আমাকে জানাইয়াছিল, সে আমাকে আটক করিবে। আমি তাহার এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলাম, ইহার প্রধান কারণ—আপনার সহিত গোপনে কোন কোন বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছিল। আমার মনে হইয়াছিল, আপনি বোধ হয় ভাবিয়া দেখেন নাই যে, ওয়াইল্ডকে এই কার্য্যের ভার দিয়া আপনি ফৌজদারী অপরাধের সমর্থন করিয়াছেন।"

ব্লেকের কথা শুনিয়া সার রড্‌নে অত্যন্ত বিব্রত হইয়া উঠিলেন; তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমার ঐরূপই আশঙ্কা হইয়াছিল মিঃ ব্লেক! সত্য কথা বলিতে কি, ও-কথা আমি জানিতাম। কিন্তু সে কোন্ পথে অগ্রসর হইবে, তাহা আমি পূর্ব্বে ধারণা করিতে পারি নাই। ওয়াইল্ড বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমাকে এই ভাবে বিপন্ন করিয়াছে; এজন্য আমাকে এরূপ হতাশ হইতে হইয়াছে যে—"

ব্লেক তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "কিন্তু আপনি এ ভাবে ওয়াইল্ডের প্রতি অবিচার করিবেন না। লোকের সম্পত্তি সম্বন্ধে ওয়াইল্ডের কিরূপ ধারণা—সে কথা আমি বলিতেছি না; কিন্তু আমি জানি, তাহার কথার কখন অন্যথা হয় না, এবং বিশ্বাসঘাতকতা তাহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। তথাপি আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আপনি ওয়াইল্ডের সহিত সহযোগিতা করিয়া ফৌজদারী অপরাধে বিজড়িত হইলেন।"

সার রডনে দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "হয় ত তাহা সত্য; বুঝিতেছি—এই অপরাধে আমি ফৌজদারী-সোপর্দ্দ হইতে পারি। কিন্তু ওয়াইল্ডকে আমি বিশ্বাস করি। যে তিনটি নর-পিশাচকে আমি বিষধর সর্প অপেক্ষাও ভীষণ মনে করি, তাহাদিগকে সায়েস্তা করিবার ভার আমি ওয়াইল্ডের হস্তেই অর্পণ করিয়াছি। এই কার্য্যে ওয়াইল্ড কোন বাধাই গ্রাহ্য করিবে না। আমার সকল কথা দয়া করিয়া শুনুন মিঃ ব্লেক! প্রথমেই আমি বলিয়া রাখি, আমরা যেন পরস্পরকে ভুল না বুঝি। আমার অবস্থা কিরূপ, আপনিই তাহা বিচার করিয়া দেখুন। দশ বৎসর ধরিয়া এই তিনটি লোক—কার্ণ, রোর্কি ও মেটল্যাণ্ড ভয় দেখাইয়া আমাকে শোষণ করিয়া আসিয়াছে। আমার কষ্টোপার্জ্জিত বিপুল সম্পত্তির অর্দ্ধাংশই তাহারা তিন জনে গ্রাস করিয়াছে!"

ব্লেক বলিলেন, "এ সংবাদ আমার জানা আছে।"

সার রডনে বলিতে লাগিলেন, "সুদীর্ঘ দশ বৎসর কাল তাহারা আমার জীবন দুর্ব্বহ করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারা নানা হীন কৌশলে এবং জঘন্য উপায়ে ক্রমাগত আমার বিপুল অর্থরাশি শোষণ করিয়াছে। তাহাদের অত্যাচারে আমার জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলে আমি পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করি। আদালতে তাহাদের অপরাধ সপ্রমাণ হওয়ায় তাহাদের প্রত্যেকের প্রতি তিন বৎসরের কারাদণ্ডের আদেশ হয়। তখন তাহারা প্রতিজ্ঞা করে, মুক্তিলাভের পর আমাকে হত্যা করিবে।

"আমি প্রাণভয়ে আমার এই অরণ্যাবাসে সন্ন্যাসীর মত—বন্দীর মত বাস করিতেছি; কিন্তু এই ভাবে জীবনযাপন আমার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আমি স্বাধীনতা চাই। অন্যান্য ভদ্রলোক যে ভাবে সমাজে বাস করেন, আমিও সেই ভাবে বাস করিতে চাই। যে বিভীষিকা দিবারাত্রি আমার জীবন দুর্ব্বহ করিয়া তুলিয়াছে, তাহা হইতে যদি পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা করি, তাহা হইলে আপনি আমাকে কি দোষী করিতে পারেন? ওয়াইল্ড এই তিনটা রক্তশোষী পিশাচের কবল হইতে আমার উদ্ধারের ভার গ্রহণ করিয়াছে। সে আমার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছে, উহাদের কবল হইতে আমার নিষ্কৃতি দানের জন্য সে তাহাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহারই করুক, তাহাদের প্রাণহানি করিবে না। তাহার এই অঙ্গীকারে নির্ভর করিয়া আমি তাহার সহিত চুক্তি করিয়াছি যে, সে ইহাতে কৃতকার্য্য হইলে আমি তাহাকে ত্রিশ হাজার পাউণ্ড পারিশ্রমিক প্রদান করিব। আমি স্বাধীনতা লাভের জন্য ইহার চতুর্গুণ অর্থও প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। এই কার্য্যের জন্য ত্রিশ হাজার পাউণ্ড ব্যয় আমি তুচ্ছ মনে করি।"

ব্লেক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আপনার অবস্থা যে অত্যন্ত সঙ্কটজনক, ইহা আমি অস্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু একটা ফেরারী দস্যু অন্যায়ের প্রতিবিধানের জন্য আপনার সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে—ইহা অদ্ভুত বটে! তবে আপনার অভিযোগ যে সম্পূর্ণ সত্য, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই; কারণ, কার্ণ, রোর্কি ও মেটল্যাণ্ড কিরূপ নরপিশাচ, তাহা আমার সুবিদিত। তথাপি সার রডনে, আমি আপনাকে এ কথা বলিতে বাধ্য যে, আপনি এক জন ফৌজদারীর আসামীকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া সত্যই ভুল করিয়াছেন।"

সার রডনে ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিলেন, "আমি ভুল করিয়াছি? উহাকে ভিন্ন আর কিরূপ প্রকৃতির লোকের উপর আমি এই কার্য্যের ভার দিতে পারিতাম?"

ব্লেক বলিলেন, "এই ভাবে নির্ব্বাসন-দণ্ড ভোগ না করিয়া আপনি পুলিশের হস্তে আপনার রক্ষার ভার অর্পণ করিতে পারিতেন।"

সার রডনে ঈষৎ বিচলিত স্বরে বলিলেন, "খুব পাকা কথাই আমাকে বলিলেন বটে মিঃ ব্লেক! কিন্তু ইহা কি আপনার আন্তরিক কথা? আপনি বুদ্ধিমান্ ও বিবেচক লোক, তথাপি এ কথা বলিতে আপনার মুখে বাধিল না? আমার সকল কথা শুনিয়াও আপনার ধারণা হইল, পুলিশের সহায়তা গ্রহণ করিলেই আমি তাহাদের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতাম? এ দেশের পুলিশের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আমার কোন অভিযোগ নাই। আমি জানি, আমাদের দেশের পুলিশের কার্য্যধারা অতি উৎকৃষ্ট; কিন্তু আমার মত আপনিও জানেন, সকলেই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ডিটেক্‌টিভ-দলে পরিবেষ্টিত থাকা অত্যন্ত বিড়ম্বনার বিষয় বলিয়াই মনে করে। ঐ সকল নরপ্রেতের অপরাধের যথাযোগ্য শাস্তি হওয়াই উচিত।"

ব্লেক বলিলেন, "তাহা হইলে আপনি তাহাদের মুখোস উন্মোচন করিয়া তাহাদিগকে দীর্ঘকালের জন্য কারাগারে প্রেরণের ব্যবস্থা করিতেছেন না কেন? তাহা করিলে আপনি তাহাদের কবল হইতে সহজেই মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন। ওয়াইল্ড মেট্‌ল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে একটা মিথ্যা মামলা উপস্থিত করিয়াছে; কিন্তু যদি মেট্‌ল্যাণ্ডের

প্রকৃত অপরাধ সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলেই তাহার ফল আপনার পক্ষে কল্যাণপ্রদ হইতে পারে।"

সার রড্‌নে বলিলেন, "ওয়াইল্ড তাহাকে জেলে পুরিবারই চেষ্টা করিতেছে। আপনি বলিলেন—সে মেট্‌-ল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে একটা মিথ্যা মামলা জুড়িয়া দিয়াছে। সত্য হোক, মিথ্যা হোক, বদমায়েসটাকে শায়েস্তা করিবার জন্য সে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছে, তাহাই আমি সমর্থনযোগ্য মনে করি। ওয়াইল্ড অসাধারণ চতুর লোক ; আমি তাহার চাতুর্য্যের প্রশংসা করি। চমৎকার! আমি এই ভাবে আনন্দ প্রকাশ করায়, আশা করি, কারাগারে প্রবেশের পথ মুক্ত করিতেছি না।"

ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "দেখুন সার রড্‌নে, আপনার সঙ্কটের জন্য আমি আপনার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিতে পারি ; কিন্তু আমি বলিতেছিলাম, প্রকৃত অপরাধ প্রতিপন্ন করিয়া এই নরপিশাচদের মুখোস উন্মোচন করাই কি অধিকতর প্রার্থনীয় নহে ? তদ্ভিন্ন—"

সার রড্‌নে তাঁহার কথায় বাধা দিয়া অধীর স্বরে বলিলেন, "আপনি ত বেশ ভাল কথাই বলিলেন ; কিন্তু উহাদের প্রকৃত অপরাধ আবিষ্কারের উপায় কি ? আমি বহু দিন হইতেই আপনার ন্যায় বহুদর্শী সুযোগ্য ডিটেক্‌টিভকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম ; কিন্তু আমি কার্ণ ও তাহার সহযোগিদ্বয়ের চাতুরীর কথা জানি ত। তাহাদিগকে ফাঁদে-ফেলিবার উৎকৃষ্টতর সুযোগ পাওয়া যাইবে—আমার এরূপ বিশ্বাস নাই। আপনি বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিলেও তাহাদের বিরুদ্ধে প্রকৃত অপরাধ সপ্রমাণ করিতে পারিবেন না। তাহারা অত্যন্ত সতর্ক। এই জন্যই ত আমি হতাশ হইয়া অবশেষে ওয়াইল্ডকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছি।"

ব্লেক উঠিয়া-দাঁড়াইয়া বলিলেন, "সার রড্‌নে, আমি দেখিতেছি, আপনি কর্ত্তব্য স্থির করিয়া বসিয়াছেন। আপনি এই পথেই চলিবেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু পরে আপনি এ কথা না বলেন যে, আমি আপনাকে সময় থাকিতে সতর্ক করি নাই ; তবে স্মরণ রাখিবেন, আপনি আগুন লইয়া খেলা করিতেছেন! আপনি এ খেলা বন্ধ করিলেই বুদ্ধিমানের কাজ হইত। অবশ্য, আপনার বিরুদ্ধে কোন কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইবে না, আমার এ কথায় আপনি নির্ভর করিতে পারেন ; কিন্তু মন্দ কাজ ঢাকা থাকে না, এবং তাহার ফলভোগ করিতে হয়।—এস স্মিথ, আমাদের আর এখানে কোন প্রয়োজন নাই।"

সার রড্‌নে সবিস্ময়ে বলিলেন,"আপনি আমার এখানে আটক থাকিবেন, এরূপ অঙ্গীকারে কি আবদ্ধ হন নাই ?"

ব্লেক বলিলেন, "আমি এরূপ কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছি বলিয়া যদি আপনার ধারণা হইয়া থাকে সার রড্‌নে, তাহা হইলে কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলাই ভাল। আমি ওয়াইল্ডের নিকট প্রতিশ্রুত ছিলাম যে, আমি তাহার হাত-ছাড়াইয়া পলায়নের চেষ্টা করিব না ; কিন্তু আমি কত দিন আপনার আশ্রয়ে থাকিব—এ সম্বন্ধে কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হই নাই। আমি আপনার অতিথি, এখন আপনার আশ্রয় ত্যাগ করি—ইহাই আমার ইচ্ছা।"

সার রড্‌নে ব্যাকুল ভাবে বলিলেন, "এ অবস্থায় আমি যে কি করিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না!"—তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন।

ব্লেক বলিলেন, "আপনার গুপ্ত কথা আমি কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না, এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। কিন্তু সার রড্‌নে, আপনি জানিয়া রাখুন—যদি আপনি আমাকে আমার অনিচ্ছায় আপনার এই অরণ্যভবনে আটক করিয়া রাখিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আমি আপনার কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য বল প্রয়োগ করিতে পারি ; কিন্তু আশা করি, আমাকে আপনি এই অপ্রীতিকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য করিবেন না।"

সার রড্‌নে ব্যগ্র ভাবে বলিলেন, "না না, আমার আদৌ সেরূপ ইচ্ছা নাই ; বলপ্রয়োগে আপনাকে এখানে আটক রাখিবার চেষ্টা করিব—এ কি কথার মত কথা ? কিন্তু আপনি যে সকল কথা বলিলেন,—তাহা আমাকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। সত্য কথা বলিতে কি, যে মুহূর্ত্তে ওয়াইল্ডের সহিত পুনর্ব্বার আমার সাক্ষাৎ হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই আমি তাহাকে জানাইব—আমি আমার আদেশ প্রত্যাহার করিলাম। আপনি আমাকে যে উপদেশ দান করিলেন, তাহা যে সম্পূর্ণ সঙ্গত, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছি। আপনার কথাগুলি কিরূপ মূল্যবান ও আমার অনুকূল, তাহাও বুঝিতে পারিয়াছি। তবে ওয়াইল্ড যে ভাবে আমার শত্রুগণকে আক্রমণ করিতেছিল, অন্য কেহ যদি সেই ভার গ্রহণ করিতে রাজী থাকেন, তাহা হইলে আমি তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করিব, মিঃ ব্লেক! আমি আপনার উপদেশে আমার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছি।"

সার রড্‌নে ব্লেক ও স্মিথের সঙ্গে তাঁহার দেউড়ির দ্বার-দেশে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সকলেই নির্ব্বাক্‌। যখন তাঁহারা তিন জন দেউড়ির দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন পূর্ব্বাকাশ উষালোকে সুরঞ্জিত হইয়াছিল।

ব্লেক স্মিথসহ দ্বারের বাহিরে আসিলে স্মিথ তাঁহাকে বলিল, "কর্ত্তা, আমরা ত বড়ই বিপদে পড়িলাম! এখন এই দশ মাইল পথ কি আমাদিগকে হাঁটিয়াই পাড়ি দিতে হইবে ?"

ব্লেক বলিলেন, "প্রাতর্ভ্রমণ স্বাস্থ্যের অনুকূল স্মিথ! সার রডনে এত সহজে আমার প্রস্তাবের সমর্থন করিবেন, এরূপ আশা ছিল না; তাঁহাকে আমার মতানুবর্ত্তী করিতে পারিয়াছি, এজন্য আমাদের সকল শ্রম সফল মনে হইতেছে। ওয়াইল্ডের মতলব আমি প্রথম হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম।"

স্মিথ বলিল, "আপনি ত বুঝিয়াছিলেন—এখানে আমাদিগকে অনির্দ্দিষ্ট কাল আটক থাকিতে হইবে না; এ অবস্থায় গ্রে-প্যান্থার ছাড়িয়া আমাদের এখানে আসা ভুল হইয়াছে কর্ত্তা!"

ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি হয় নাই; যদি প্রাতর্ভ্রমণে তোমার আপত্তি থাকে—তাহা হইলে ওয়াইল্ডই তাহার গাড়ীতে আমাদিগকে বেকার ষ্ট্রীটে রাখিয়া আসিতে পারিবে।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু সেই রাস্কেলটা ত আগেই সরিয়া পড়িয়াছে; কোথায় তাহার দেখা পাইবেন?"

ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "তোমার কি ধারণা, সে সত্যই চলিয়া গিয়াছে? আমার কিন্তু বিশ্বাস, আমাদের এই সরলহৃদয় বন্ধুটি নিকটেই কোথাও লুকাইয়া আছে। সে পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিল, সার রডনে আমাদিগকে আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন না।"

স্মিথ সভয়ে বলিল, "তাহা হইলে ত সেই নাছোড়-বান্দাটা আবার আমাদিগকে মুঠায় পুরিবার চেষ্টা করিবে।"

ব্লেক কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া পথের মোড় ঘুরিতেই ওয়াইল্ডের ট্যাক্সি অদূরে দণ্ডায়মান দেখিলেন! তাঁহাদিগকে সেই দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া ওয়াইল্ডের মুখে বিস্ময় ও বিরক্তি পরিস্ফুট হইল।

ওয়াইল্ড তাঁহাদের নিকটে আসিয়া দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া ব্লেককে বলিল, "যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই হইল! এই জন্যই ত এখানে আপনাদের প্রতীক্ষা করিতেছি।"

ব্লেক বলিলেন, "যদি বুঝিয়াছিলে—তোমার সকল মতলব ফাঁসিয়া যাইবে, তাহা হইলে কষ্ট করিয়া এখানে আমাদের আনিবার কি প্রয়োজন ছিল?"

ওয়াইল্ড নীরস স্বরে বলিল, "ভুল, ভুল! আমার ভুল হইয়াছিল মিঃ ব্লেক! ভুল না হয় কার? আপনি আপনার অদ্ভুত শক্তি দ্বারা কি ভাবে বুদ্ধিমান্ ও চতুর লোককেও সহজেই বশীভূত করিতে পারেন, সে কথা আমার স্মরণ থাকা উচিত ছিল।"

এ কথা শুনিয়া ব্লেক বলিলেন, "তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ ওয়াইল্ড! সার রডনে আমার যুক্তি এতই সঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছেন যে, তিনি তোমার উপর যে কাজের ভার দিয়াছেন, সেই ভার হইতে তোমাকে মুক্তি দান করিতেই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তোমার মত ফেরারী আসামীর সাহায্যগ্রহণে তাঁহার বিপদের আশঙ্কা অল্প নহে, ইহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন।"

এ কথা শুনিয়া ওয়াইল্ড গম্ভীর ভাবে ভ্রূ কুঞ্চিত করিল; তাহার পর বলিল, "মিঃ ব্লেক, আপনি কি ভাবে আমার সকল ব্যবস্থা নষ্ট করিয়া আসিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম; কিন্তু আমার সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত হইবার নহে। না, আমি তাহা ত্যাগ করিব না। সার রডনের সঙ্গে যতক্ষণ পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার আমার দেখা না হইতেছে, এবং তাঁহার নূতন আদেশ আমার কর্ণগোচর না হইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার পূর্ব্ব-আদেশ বলবৎ থাকিবে। যত দিন আমি কার্য্যসিদ্ধি করিতে না পারিতেছি, তত দিন আর তাঁহার সঙ্গে দেখা করিব না।"

ব্লেক বলিলেন, "সার রডনের শত্রুদের বিরুদ্ধে তুমি যে ভাবে আক্রমণ চালাইতেছিলে, তাহা সেই ভাবেই চালাইতে থাকিবে—এই কথা তুমি বলিতে চাও ওয়াইল্ড!"

ওয়াইল্ড মুখভঙ্গি করিয়া বলিল, "আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। আমি অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি, আমার আর ফিরিবার উপায় নাই। আপনি স্থির জানিবেন, ওয়াইল্ড যে কাজ আরম্ভ করে, সহস্র বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও সে সেই কাজ শেষ না করিয়া ছাড়ে না। আপনার কথা শুনিয়া কিন্তু হতাশ হইলাম মিঃ ব্লেক! আমার ধারণা ছিল, আপনি এই সকল নোংরা ব্যাপারের অনেক ঊর্দ্ধে। আপনি কি আমার কার্য্যে নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারেন না? আপনি আমার কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিলেই সঙ্গত হইবে; কারণ, আপনি জানেন, এই তিনটা নরপিশাচ সমাজের কলঙ্কস্বরূপ। পৃথিবী আর তাহাদের ভার সহ্য করিতে পারিতেছে না। আমি তাহাদিগকে চূর্ণ করিবার চেষ্টা করিয়া সমাজের কল্যাণই করিতেছি।"

ব্লেক বলিলেন, "তোমার কথা অসঙ্গত নহে; কিন্তু যে ব্যক্তি যে অপরাধ করে নাই, সেই অপরাধে সে দণ্ডভোগ করে—ইহা আমার অসহ্য; আমি কোন কারণেই সেই অন্যায়ের সমর্থন করিতে পারিব না। তোমার সহিত এই স্থানেই আমার মতের পার্থক্য; সুতরাং তোমার সহিত এ সম্বন্ধে তর্ক করিয়া কোন লাভ নাই।"

ওয়াইল্ড বলিল, "আপনার ও-কথা আমি অস্বীকার করি না; আর ও-কথা লইয়া আলোচনা করিয়াই বা ফল কি?—এখন আপনারা আমার গাড়ীতে উঠিয়া পড়ুন। আমি লণ্ডনেই ফিরিয়া যাইতেছি; আপনাদিগকে যেখান হইতে লইয়া আসিয়াছি—সেইখানেই নামাইয়া দিয়া যাইব। কেন আপনারা এতখানি পথ অনর্থক হাঁটিয়া যাইবেন? গাড়ীতে উঠুন।"

* * * * * *

ব্লেক স্মিথ সহ ওয়াইল্ডের ভাড়াটে ট্যাক্সিতে যখন বাড়ী ফিরিলেন, তখন পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যোদয় হইতেছিল; কিন্তু তখনও লণ্ডনের পথে জনসমাগম হয় নাই। তাঁহারা বাড়ী ফিরিয়া ঘণ্টা-দুই ঘুমাইয়া লইয়াছিলেন। ব্লেক তাহার অধিক কাল শয্যায় পড়িয়া থাকিতে পারেন নাই।

আহার শেষ করিয়া ব্লেক ধূমপান করিতে করিতে স্মিথকে বলিলেন, "এখন আমাদিগকে নাইট্‌সব্রীজে যাইতে হইবে স্মিথ! আমার বিশ্বাস, ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড সেখানে গিয়া মেট্‌ল্যাণ্ডের কাগজ-পত্র পরীক্ষা করিতেছে। আমি বৈধভাবে কাজ করিবার জন্যই মেট্‌ল্যাণ্ডের ঘর পরীক্ষা করিতে চাই। দেখ স্মিথ, ওয়াইল্ড যে পথে চলিতেছে, তাহাকে আমরা সেই পথে চলিতে দিতে পারি না; কারণ, তাহার চেষ্টা অবৈধ, অসঙ্গত। সে বে-আইনি ভাবে কাহাকেও উৎপীড়ন করিলে বুঝিতে হইবে—সে আমাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়াই সে কাজ করিতেছে। তাহার এই স্পর্দ্ধা আমরা সহ্য করিব না। মেটল্যাণ্ড লর্ড ব্ল্যাকউডের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার ঘর হইতে সেই স্বর্ণমঞ্জুষা চুরি করে নাই; এ অবস্থায় তাহাকে চুরির দায়ে ধরা পড়িয়া দণ্ডভোগ করিতে হইলে তাহাকে বিনা-অপরাধে উৎপীড়ন করা হইবে। আমি জানিয়া শুনিয়া এই অন্যায়ের সমর্থন করিতে পারি না; আমি সাধ্যানুসারে তাহাতে বাধা দান করিব। যদি সে অপরাধ করিয়া সেই অপরাধে দণ্ড-ভোগ করে, তাহাতে আমার কোন আপত্তি থাকিতে পারে না।"

অতঃপর ব্লেক স্মিথ সহ নাইটস্‌ব্রীজে যাত্রা করিয়া বেলা এগারটার পূর্ব্বেই সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা মেটল্যাণ্ডের গৃহে প্রবেশ করিয়া ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডকে দুই জন সহকারীর সহিত সেখানে উপস্থিত দেখিলেন।

লেনার্ড উৎসাহভরে ব্লেক ও স্মিথের অভ্যর্থনা করিলেন; তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, "কাহার কথা সত্য হইল ব্লেক! আমরা আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়াছি। আজই তাহাকে যথাসময়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে; কিন্তু আজ কোন কাজ হইবে না, আমরা এখন পর্য্যন্ত প্রমাণ উপস্থিত করি নাই। আমার বিশ্বাস, মেটল্যাণ্ডকে আগামী সপ্তাহ পর্য্যন্ত হাজতে বাস করিতে হইবে।"

ব্লেক বলিলেন, "তুমি কি মনে কর, মেটল্যাণ্ডের অপরাধ সপ্রমাণ করিতে পারিবে?"

লেনার্ড বলিলেন, "এ বিষয়ে তোমার কি কোন সন্দেহ আছে ব্লেক?"

ব্লেক বলিলেন, "সন্দেহ? আমি বলিতেছি, মেটল্যাণ্ড গত রাত্রে লর্ড ব্ল্যাকউডের ঘর হইতে তাঁহার স্বর্ণমঞ্জুষা চুরি করে নাই।"

লেনার্ড মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে সবিস্ময়ে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "কি বলিলে? সে লর্ড ব্ল্যাকউডের ঘর হইতে তাঁহার স্বর্ণমঞ্জুষা চুরি করে নাই? তুমি প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিলে কেন বলিতে পার? আমি কাল রাত্রে যখন লর্ড ব্ল্যাকউডের ঘর হইতে ঐ সকল অঙ্গুলি-চিহ্ন সংগ্রহ করি, তখন কি তুমি সেখানে ছিলে না?"

ব্লেক বলিলেন, "হাঁ ছিলাম বটে, কিন্তু এক টুকরা ফাঁস কাগজ লর্ড ব্ল্যাকউডের গৃহে আবিষ্কৃত হইলে তাহা হইতে আদৌ প্রতিপন্ন হয় না যে, মেটল্যাণ্ড সেই গৃহে উপস্থিত ছিল। যে কোন ব্যক্তি মেটল্যাণ্ডের অঙ্গুলি-চিহ্নিত সেই কাগজ-টুক্‌রা সেই কক্ষে লইয়া যাইতে পারিত, এ কথা তোমার বুঝিতে পারা উচিত লেনার্ড!"

লেনার্ড বলিলেন, "তোমার এই যুক্তি সত্য হইতে পারে। কিন্তু আমরা যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা সমস্তই যদি তুমি জানিতে পারিতে, তাহা হইলে ঐ অসার যুক্তির সাহায্যে মেট্‌ল্যাণ্ডের নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে না। আমি লর্ড ব্ল্যাকউডের গৃহ হইতে সোজা এখানে আসিয়া মেট্‌ল্যাণ্ডকে গ্রেপ্তার করি, তাহার পর তাহার এই ঘর খানাতল্লাস করিয়া ঐ সিন্দুকের ভিতর হইতে লর্ড ব্ল্যাকউডের বর্জ্জিয়া-স্বর্ণমঞ্জুষা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই।"

ব্লেক তাচ্ছিল্যভরে বলিলেন, "চোরা মাল হাতে হাতে বাহির করিয়াই ভাবিলে তোমার সকল শ্রম সফল হইয়াছে, কাজটা অত্যন্ত সহজ হইয়া গেল!"

লেনার্ড বলিলেন, "তাহা না ভাবিবার কোন কারণ ছিল কি?"

ব্লেক বলিলেন, "প্রমাণটা অকাট্য বলিয়াই তোমার মনে হইয়াছিল; তোমার মত বুদ্ধিমান্ যে কোন ডিটেক্‌টিভের সেইরূপই মনে হইতে পারিত।"

লেনার্ড বলিলেন, "চোরা মাল তাহার ঘর হইতে বাহির হইল, তাহার দুই জন বন্ধুর সম্মুখেই তাহা তাহার সিন্দুক হইতে বাহির করা হইল; কিন্তু তাহাতে তুমি সন্তুষ্ট নহ, তোমার বোধ হয় সন্দেহ হইয়াছে—অন্য কোন লোক—মেটল্যাণ্ডের কোন শত্রু তাহার অজ্ঞাত-সারে স্বর্ণমঞ্জুষা তাহার সিন্দুকের ভিতর রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু সিন্দুকের চাবি তাহার পকেটেই ছিল, অন্য কোন লোক কি মন্ত্রবলে সিন্দুক খুলিয়া তাহার অজ্ঞাতসারে উহা সিন্দুকের ভিতর রাখিয়া গিয়াছিল? তাহার পর আরও কথা আছে। মেটল্যাণ্ডের জুতায় গোড়ালীতে সুরকীর গুঁড়া লাগিয়া আছে। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, লর্ড ব্ল্যাকউডের বাড়ীর সন্নিহিত পথ টাট্‌কা সুরকী দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে; সেই সুরকী মেটল্যাণ্ডের

জুতায় লাগিল কিরূপে? তুমি কি বলিতে চাও, মেট্‌ল্যাণ্ডের অজ্ঞাতসারে তাহার পায়ের জুতা সেই স্থানে বায়ু সেবন করিতে গিয়াছিল? তুমি কি গায়ের জোরে এই সকল প্রমাণ মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিবে?"

ব্লেক বলিলেন, "তুমি যত প্রমাণই উপস্থিত কর, তথাপি আমি বলিব, মেটল্যাণ্ড লর্ড ব্ল্যাকউডের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার স্বর্ণমঞ্জুষা অপহরণ করে নাই। এমন কি, মেটল্যাণ্ড তাঁহার বাড়ীর নিকটেও গমন করে নাই। প্রকৃত পক্ষে তুমি তাহার এই গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত সে জানিত না যে, লর্ড ব্ল্যাকউডের স্বর্ণমঞ্জুষা অপহৃত হইয়াছে। স্বর্ণমঞ্জুষা চুরি-সংক্রান্ত সকল ব্যাপারই তাহাকে বিপন্ন করিবার জন্য অন্য লোকের চেষ্টার ফল।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তুমি যে সকল কথা বলিতেছ, তাহার সমর্থনে কি প্রমাণ উপস্থিত করিতে পার?"

ব্লেক বলিলেন, "প্রমাণ তুমি অবশ্যই পাইবে; কিন্তু সে জন্য তোমাকে কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হইবে। যাহা হউক, তুমি যখন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট মামলা মুলতুবি রাখিবার প্রার্থনা করিবে, সেই অবসরে আমি প্রয়োজনীয় সকল প্রমাণই সংগ্রহ করিতে পারিব।"

লেনার্ড নীরস স্বরে বলিলেন, "দেখ ব্লেক, তুমি যে চোরের পক্ষ-সমর্থনের জন্য এরূপ ব্যাকুল হইবে, ইহা আমি কোন দিন ধারণা করিতে পারি নাই। তুমি কি জান না, এই হতভাগা একটা স্থলচর হাঙ্গর? আমরা তাহার গতিবিধির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলাম বলিয়াই ইদানী চুরি-ডাকাতি করিতে তাহার সাহস হয় নাই। তাহাকে বিপন্ন করিবার জন্য কোন লোক কৌশলে তাহাকে চোর সাজাইয়াছে—এ কথা বলিয়া তুমি আমাকে ভুলাইতে পারিবে না ব্লেক! মেট্‌ল্যাণ্ড স্বয়ং লর্ড ব্ল্যাকউডের স্বর্ণমঞ্জুষা চুরি করিয়াছে; কিন্তু তুমি এ কথা অবিশ্বাস করিয়া আমাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছ, ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি।"

ব্লেক বলিলেন, "তুমি কচু বুঝিতে পারিয়াছ! তোমাকে অপদস্থ হইতে না হয়, এই জন্যই আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি। তোমার ভ্রম দূর করি, ইহাই আমার ইচ্ছা।"

লেনার্ড বলিলেন, "কিন্তু ভ্রম আমার নহে, তুমিই প্রথম হইতে ভুল-পথে চলিতেছ ব্লেক! বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তুমি ভ্রম স্বীকার করিতে চাহিতেছ না! আমরা দীর্ঘকাল হইতে পরস্পরের বন্ধু; এই তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া আমাদের বন্ধুত্ববন্ধন ছিন্ন হইলে তাহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় হইবে।"

ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "পরের ফ্যাসাদ ঘাড়ে লইয়া আমাদের বন্ধুত্ব ক্ষুণ্ণ হইবে, এরূপ মনে করিবার কারণ কি? তুমি পাগলের মত কথা বলিতেছ লেনার্ড! যাহা হউক, আমি মেটল্যাণ্ডের এই ঘরের জিনিস্-পত্রগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই—তাহাতে তোমার আপত্তি আছে কি?"

লেনার্ড মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, "আপত্তি করিয়া কোন লাভ আছে বলিয়া মনে হয় না; তবে যদি তুমি আমার বিরুদ্ধাচরণের জন্য কোন রকম চেষ্টা কর, তাহা হইলে আমি তোমার সমর্থন করিব—তুমি এরূপ আশা করিতে পার না।"

ব্লেক বলিলেন, "আমি তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিব না, আমার এ কথায় তুমি নির্ভর করিতে পার। মেটল্যাণ্ড নানা প্রকার গুরুতর অপকর্ম্ম করিয়াছে; যদি তাহার কোন অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি, সেই জন্যই আমি চেষ্টা করিব।"

লেনার্ড বলিলেন, "আমিও এখানে আসিয়া সেই চেষ্টাই আরম্ভ করিয়াছি; সুতরাং তোমার কার্য্যে আমারই সাহায্য হইবে। বেশ, তুমি আরম্ভ কর। যদি তুমি এখানে এরূপ কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পার, যে অপরাধ সপ্রমাণ হইলে তাহার ফাঁসি হয়, তাহা হইলে আমাদের সকল শ্রম সফল মনে হইবে। মেটল্যাণ্ডের ন্যায় নরপিশাচের অভাবে পৃথিবীর ভার লাঘব হইবে।"

ব্লেক বলিলেন, "এ বিষয়ে তোমার সহিত আমার মত-ভেদ নাই, লেনার্ড!"—তাহার পর তিনি মেটল্যাণ্ডের সংগ্রহাগারে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ইঙ্গিতে স্মিথও তাঁহার অনুসরণ করিল।

সেই কক্ষে বহুবিধ প্রাচীন, মহামূল্য দুর্লভ শিল্পদ্রব্য সঞ্চিত ছিল। ব্লেক এই সকল দ্রব্যের মূল্য জানিতেন, এবং তাহাদের গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি কৌতূহলভরে সেই সকল দ্রব্য দেখিতে লাগিলেন। এই ভাবে তিনি সময় নষ্ট করিতেছেন দেখিয়া স্মিথ অধীর হইয়া উঠিল।

স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা, আমরা কি এখানে মেটল্যাণ্ডের সঞ্চিত শিল্পদ্রব্যগুলি দেখিয়া চক্ষু সফল করিতে আসিয়াছি, না, চোরা-মাল খুঁজিয়া বাহির করাই আমাদের উদ্দেশ্য?"

ব্লেক বলিলেন, "দুই কাজই আমাদিগকে করিতে হইবে।"

স্মিথ বলিল," কিন্তু কি ভাবে আমি আপনাকে সাহায্য করিব? আমাকে কি করিতে হইবে বলুন।"

ব্লেক কোন কথাই বলিলেন না; সুতরাং স্মিথ কি ভাবে তাঁহাকে সাহায্য করিবে, তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

কয়েট মিনিট পরে স্মিথ দেখিল, ব্লেক একখানি ক্ষুদ্র চীনা টেবিল পরীক্ষা করিতেছেন। তাহার উপর লাক্ষার

কারুকার্য্য ছিল ; তাহা এরূপ সুন্দর যে, সে দিকে চাহিয়া চক্ষু ফিরাইতে পারা যায় না !

ব্লেক স্মিথকে ডাকিয়া বলিলেন, "স্মিথ, এই টেবিলের ডালার ঐ মুড়া চাপিয়া ধর, ডালাখানার ঐ ধার টানিয়া তুলিতে পার কি না দেখ।"

স্মিথ টেবিলের সেই মুড়া ধরিয়া ডালাখানা খুলিবার জন্য টানাটানি করিতে লাগিল।

ব্লেক বলিলেন, "অত বেশী জোর দিও না। ডালাখানা আল্‌গা কি না পরীক্ষা কর।"

ব্লেক দেখিলেন, লেনার্ড ও তাঁহার সহকারিদ্বয় মেটল্যাণ্ডের জমা-খরচের খাতা ও দলিলপত্রাদি পরীক্ষা করিতেছিলেন ; অন্য দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল না।

স্মিথ হঠাৎ বলিল, "কর্ত্তা, টেবিলের ডালা যে আল্‌গা ! দেখিয়া মনে হইতেছিল, ডালার নীচে কাঠ ভিন্ন কিছুই নাই, কিন্তু একটা ফুকর দেখা যাইতেছে যে !"

ব্লেক বলিলেন, "আমি ঐ রকমই আশা করিয়াছিলাম। ডালার মাথার আধখানা সতর্কভাবে তুলিয়া ধর। আমি উহার নীচের গুপ্ত প্রকোষ্ঠ পরীক্ষা করিতেছি।"

স্মিথ তাঁহার আদেশ পালন করিয়া বলিল, "এ ত বড় মজার টেবিল ! উপর হইতে দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই যে, নীচে গুপ্ত আধার আছে। মেটল্যাণ্ড তাহার দুই বন্ধু কার্ণ ও রোর্কির সহযোগে বিভিন্ন ধনাঢ্য পরিবারের নানা-প্রকার মূল্যবান্ দ্রব্য অপহরণ করে। এই প্রকার গুপ্ত প্রকোষ্ঠ মূল্যবান্ চোরামাল রাখিবার উপযুক্ত স্থান বটে।"

ব্লেক ফুকরের ভিতর হাত দিয়া চারি দিক্ হাতড়াইতেছিলেন, হঠাৎ একটা নরম জিনিসে তাঁহার হাত পড়িল। তিনি তাহা টানিয়া বাহির করিয়া দেখিলেন—তাহা কোমল চর্ম্মনির্ম্মিত একটি বাটুয়া ! সেই বাটুয়ার ভিতর কোন দ্রব্য আছে বুঝিতে পারায়, উহা কি দ্রব্য, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি বাটুয়া উল্টাইয়া তাহার মধ্যস্থিত দ্রব্য করতলে ঢালিয়া ফেলিলেন।

সেই দ্রব্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া স্মিথ সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "এ কি ? কি সর্ব্বনাশ !"

ব্লেকের করতলে যে দ্রব্য দেখিতে পাওয়া গেল, তাহা সুলোহিত ; আলোকসম্পাতে তাহা জল্-জল্ করিতে লাগিল। ব্লেক বুঝিতে পারিলেন, তাহা মহামূল্য চুণীর নেকলেস ! এরূপ মহার্ঘ্য অলঙ্কার সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

ব্লেক কয়েক মিনিট নিস্তব্ধ ভাবে নির্নিমেষ নেত্রে সেই নেকলেস পরীক্ষা করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল হইল। স্মিথও নির্ব্বাক্ ভাবে বিস্ফারিত নেত্রে সেই মহার্ঘ অলঙ্কার নিরীক্ষণ করিতেছিল।

কয়েক মিনিট পরে স্মিথ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কর্ত্তা, আমি জীবনে কখন এরূপ সুদৃশ্য, এমন উজ্জ্বল মনোহর রত্নালঙ্কার দেখি নাই ! ইহা যে-কোন সাম্রাজ্ঞীর কণ্ঠে শোভা পাইবার যোগ্য ! এরূপ মহামূল্য নেকলেস পৃথিবীতে বোধ হয় অধিক নাই।"

লেনার্ড দূরে থাকিয়া সেই দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন ; ব্লেককে বলিলেন, "তোমার হাতে ও কি জিনিস ব্লেক ! তোমরা দু'জনে মুগ্ধ দৃষ্টিতে ও কি দেখিতেছ ?"

ব্লেক বলিলেন, "অস্কার মেটল্যাণ্ডের অপরাধের অকাট্য প্রমাণ। যে অপরাধে তুমি তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছ, তাহা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ।"

লেনার্ড দ্রুতবেগে ব্লেকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ব্লেক বলিলেন, "এ নেকলেস তুমি চিনিতে পারিতেছ লেনার্ড ?"

লেনার্ড নেকলেস পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "ইহা যে রাগোজিন রুবি নেকলেস বলিয়া মনে হইতেছে !"

ব্লেক বলিলেন, "তুমি ঠিক ধরিয়াছ। ইহা কাউণ্টেস ডি রাগোজিনের বিখ্যাত নেকলেসই বটে ! দেড় বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার কোষাগার হইতে ইহা অপহৃত হওয়ায় ক্ষোভে-দুঃখে তিনি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিলেন। এত দিন পরে তাহা মেটল্যাণ্ডের ঘরে তাহার টেবিলের গুপ্ত প্রকোষ্ঠে পাওয়া গেল ! মেটল্যাণ্ডের অপরাধের অকাট্য প্রমাণ। লর্ড ব্ল্যাকউডের স্বর্ণমঞ্জুষা ইহার তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর দ্রব্য !"

লেনার্ড উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "হা পরমেশ্বর ! তোমার বিধান অপূর্ব্ব রহস্যময় ! এবার আর মেটল্যাণ্ডের পরিত্রাণ নাই। ব্লেক, বন্ধু ! আমার সকল কথাই আমি প্রত্যাহার করিলাম। তোমারই জিত।"

একবিংশ তরঙ্গ

বিচার

পশ্চিম-লণ্ডনের পুলিশকোর্টের একটি কক্ষে অস্কার মেটল্যাণ্ড দণ্ডায়মান ; মুখ মলিন, পরিচ্ছদ অসংযত, কেশ-রাশি বিশৃঙ্খল। সায়মন কার্ণ ও হুবার্ট রোর্কি এই উভয় বন্ধু তাহার নিকটেই ছিল।

কার্ণ মেটল্যাণ্ডকে বলিল, "এখন আমাদের যাওয়াই ভাল।"

মেটল্যাণ্ড বলিল, "যাইবে ? হাঁ, আমারও মনে হয়, যাওয়াই ভাল। যাহা হউক, ধন্যবাদ কার্ণ, ধন্যবাদ রোর্কি ! তোমরা আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলে আমি কি করিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না !"

কার্ণ মুখভঙ্গি করিয়া বলিল; "কি বাজে কথা বলিতেছ ? আমরা ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—সুখে-দুঃখে আমরা পরস্পরকে ছাড়িয়া থাকিব না।"

যখন তাহাদের এই সকল কথা হইতেছিল, তাহার

প্রায় পনের মিনিট পূর্ব্বে মেটল্যাণ্ডকে ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে আসামীর কাঠরায় দাঁড়াইতে হইয়াছিল। তাহার মামলা মুলতুবি রাখিবার আদেশ হইয়াছিল। মেটল্যাণ্ডের বন্ধুদ্বয় পাঁচ হাজার পাউণ্ডের জামিন হওয়ায় মেটল্যাণ্ডকে মুক্তিদান করা হইয়াছিল।

কর্তৃপক্ষ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, মেটল্যাণ্ড জামিনে মুক্তিলাভ করিয়া পলায়ন করিবে না; তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগের গুরুত্ব তেমন অধিক ছিল না। মেটল্যাণ্ডও আশা করিয়াছিল, তাহাকে জামিনে মুক্তিদান করা হইবে। কার্ণ ও রোর্কি তাহার জামিনের টাকা দাখিল করিয়া তাহাকে আশা-ভরসা দিয়া প্রস্থান করিল।

কার্ণ ও রোর্কি মেটল্যাণ্ডের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিবার অল্পকাল পরেই চীফ্ ইন্স্পেক্টর লেনার্ড-সহ ব্লেক ও স্মিথ আদালতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা মেটল্যাণ্ডকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য নূতন ওয়ারেণ্ট আনিয়াছিলেন। তাঁহারা অনুমান করিয়াছিলেন, মেটল্যাণ্ড হয় ত জামিনে মুক্তিলাভ করিয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অপরাধে তাহাকে পুনর্ব্বার গ্রেপ্তার করিবার জন্য লেনার্ডের যথেষ্ট আগ্রহ হইয়াছিল।

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড আদালতে আসিয়া শুনিতে পাইলেন, মেটল্যাণ্ড জামিনে মুক্তিলাভ করিয়া অল্পক্ষণ পূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছে। তাহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "চলিয়া গিয়াছে? তা যাউক, আমার বিশ্বাস, সে সোজা বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছে। ব্লেক, মেটল্যাণ্ড নাইটস্‌ব্রীজেই গিয়াছে; তোমার কি মনে হয়?"

ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেটল্যাণ্ড কি একাকী গিয়াছে?"

লেনার্ড বলিলেন, "বোধ হয়, সে কার্ণ ও রোর্কির অনুসরণ করিয়াছে। শুনিলাম, তাহার বন্ধুদ্বয়ও আদালতে তাহার জামিন হইতে আসিয়াছিল।"

ব্লেক বলিলেন, "তাহা হইলে আমাদের খুব তাড়া-তাড়ি সেখানে যাওয়া দরকার বলিয়াই মনে হইতেছে!"

ব্লেক কি উদ্দেশ্যে এই কথা বলিলেন, ইন্স্পেক্টর লেনার্ড তাহা বুঝিতে না পারিলেও বিলম্ব করিলেন না। ব্লেক আশা করিলেন, সার রডনে শীঘ্রই এক শত্রুর কবল হইতে স্থায়িভাবে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবেন, অথচ ওয়াইল্ডের অন্যায় কার্য্য নিষ্ফল হইবে।

ব্লেক মেটল্যাণ্ডের ঘরে যে চোরা-নেকলেস্ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার মূল্য বহু সহস্র পাউণ্ড; কিন্তু উহা অপহৃত হইবার পর ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের পুলিশের শ্রেষ্ঠ কর্ম্মচারীরাও উহার কোন সন্ধান করিতে পারেন নাই; অথচ তাহা দীর্ঘকাল হইতেই অস্কার মেটল্যাণ্ডের গৃহে সঞ্চিত ছিল! মেটল্যাণ্ডের ইচ্ছা ছিল, লোক যখন চোরা-নেকলেসের কথা লইয়া আর আন্দোলন করিবে না, চুরির কথা ভুলিয়া যাইবে, সেই সময় সে উহা বিদেশে পাঠাইয়া বিক্রয় করিবে। উহা কিরূপে তাহার হস্তগত হইয়াছিল, তাহা জানিবার জন্য পুলিশ ব্যস্ত হইল না; উহা তাহার গৃহে পাওয়াই তাহারা যথেষ্ট বলিয়া মনে করিল।

কিন্তু মেটল্যাণ্ড ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত হইতে বাড়ীতে না ফিরিয়া তাহার নাইটস্‌ব্রীজের দোকানের অদূরবর্ত্তী ক্লাবে উপস্থিত হইয়াছিল। এই ক্লাবেই সে আহার করিত। ক্লাবটি বহু পুরাতন ও অত্যন্ত ক্ষুদ্র।

কার্ণ ও রোর্কি সেই ক্লাবে আসিয়া মেটল্যাণ্ডকে অত্যন্ত চিন্তাকুল দেখিয়া বলিল, "মনে হইতেছে, তুমি বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছ; এ অবস্থায় তোমার কিছু আহার করা উচিত মেটল্যাণ্ড!"

মেটল্যাণ্ড বলিল, "না কার্ণ, আহারে আমার রুচি নাই, আমি কিছুই খাইতে পারিব না।"

কার্ণ বলিল, "আর কিছু খাইতে ইচ্ছা না হয়—কোন উত্তেজক তরল পানীয় দ্রব্য পান কর। খানিক নির্জ্জলা কড়া ব্র্যাণ্ডি পান করিলে তোমার দেহ সবল ও মন চাঙ্গা হইবে।"

মেটল্যাণ্ড এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বলিল, "এ মন্দ কথা নয়; খানিক ব্র্যাণ্ডি পান করিতে আমার আপত্তি নাই।"

কিন্তু তাহার বিহ্বলতা ও হতাশ ভাব দূর হইল না; তাহার ধারণা হইল, কোন অজ্ঞাত শত্রু নানা কৌশলে তাহাকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। সে ক্লাবে বসিয়া ভাবিতে লাগিল, বর্জ্জিয়া-স্বর্ণমঞ্জুষা অপহরণ করিবে ইহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই; তথাপি তাহার সিন্দুক হইতে উহা বাহির হইয়া পড়িল! তাহার সিন্দুকে কে তাহা রাখিয়া-ছিল? তাহার বিরুদ্ধে কিরূপ ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, তাহা ধারণা করা তাহার অসাধ্য হইল। বিপদের কথা চিন্তা করিতে করিতে তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, তাহার চিন্তাশক্তি অসাড় হইল।

মেটল্যাণ্ড তাহার বন্ধুদ্বয়সহ ক্লাবের ভোজন-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ না করিয়া ধূমপানের জন্য নির্দ্দিষ্ট কক্ষের একটি নিভৃত কোণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

কার্ণ একটা ফ্লাস্ক বাহির করিয়া মেটল্যাণ্ডকে বলিল, "আপাততঃ ইহাই চালাও।"

মেটল্যাণ্ড উহা দেখিয়াই মাথা নাড়িয়া বলিল, "ও যে জিন, উহা আমি স্পর্শ করিব না কার্ণ! জানি, তুমি জিনের পক্ষপাতী; কিন্তু ও-জিনিসটা আমি দু'চক্ষে দেখিতে পারি না।"

কার্ণ বলিল, "বেশ, যা তোমার পছন্দ, তারই ফরমাস কর। তুমি এখানে একটু অপেক্ষা কর, আমি রোর্কির সঙ্গে খাবারের ঘরে গিয়া আমাদের খাবার দিতে বলিয়া

আসি। কোন খানসামাকে ত এদিকে দেখিতে পাইতেছি না, সুতরাং আমাদিগকেই যাইতে হইবে।"

মেটল্যাণ্ড বলিল, "তা যাও; কিন্তু আমার খাবার দিতে বলিও না। আমি ত বলিয়াছি, আমি কিছুই খাইব না।"

কার্ণ বলিল, "না, আমাদেরই দু'জনের খাবার দিতে বলিব। তুমি কোন খানসামার দেখা পাইলে তোমার জন্য ব্র্যাণ্ডির বরাত দিবে। উহা শীঘ্রই তোমার পান করা চাই।"

কার্ণ ও রোর্কি প্রস্থান করিল, কিন্তু পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেও তাহার নিকট ফিরিল না। পরে তাহারা ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, মেটল্যাণ্ড আধ গ্লাস ব্র্যাণ্ডি সম্মুখে রাখিয়া নিমীলিত নেত্রে কি ভাবিতেছিল।

কার্ণ মেটল্যাণ্ডকে সেই ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, "এখন কি কিছু ভাল বোধ করিতেছ না?"

মেটল্যাণ্ড চক্ষু উন্মীলন করিয়া বিহ্বল স্বরে বলিল, "ভাই! ওটা সবটুকু গিলিতে পারিলাম না কার্ণ! আমার যে কি হইল—"

রোর্কি তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "তোমার এত ভাবনা-চিন্তা চলিবে না। এরূপ দুশ্চিন্তার কারণ কি? তুমি গ্লাসের ব্র্যাণ্ডিটা ও-ভাবে ফেলিয়া রাখিয়াছ কেন? ব্র্যাণ্ডিতে ত তোমার অরুচি নাই। কার্ণ, গ্লাসটা উহার হাতে তুলিয়া দাও। মেটল্যাণ্ড উহা শেষ না করিলে আমরা ছাড়িব না।"

সাইমন কার্ণ গ্লাসটা লইয়া মেটল্যাণ্ডের হাতে দিয়া বলিল, "সবটুকু এক নিশ্বাসে সাবাড় কর বন্ধু!"

মেটল্যাণ্ড তাহার আদেশ পালন করিল। মুহূর্ত্তের জন্য সে চমকিয়া উঠিল; তাহার বিস্ফারিত নেত্রে আতঙ্কের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল, এবং পরমুহূর্ত্তেই তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অসাড় হইল। সে ধীরে ধীরে চেয়ারে ঢলিয়া পড়িল; কিন্তু কোন শব্দ করিল না, বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্যও প্রকাশ করিল না।

কার্ণ তাহার পকেটে কি রাখিয়া রোর্কিকে মৃদুস্বরে বলিল, "শীঘ্র বাহিরে চল রোর্কি, এই মুহূর্ত্তেই।"

তাহারা উভয়েই ধূমপানের কক্ষ ত্যাগ করিয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল মৃদুস্বরে কি আলাপ করিল; তাহার পর উভয়েই সেই ক্লাবের বাহিরে আসিল। হুবার্ট রোর্কির ললাটের স্থূল ঘর্ম্মবিন্দুরাশি তখন ধারাকারে তাহার উভয় গণ্ড প্লাবিত করিতেছিল।

রোর্কি ভগ্নস্বরে বলিল, "অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ব্যাপার,—কি যে হইবে! আমার বড়ই দুশ্চিন্তা হইয়াছে কার্ণ!"

কার্ণ দৃঢ়মুষ্টিতে রোর্কির হাত ধরিয়া বলিল, "মেয়ে-মানুষের মত ভয়েই মরিলে যে! এ কাজ না করিলে চলিত না, তাহা কি তুমি এখনও বুঝিতে পার নাই?"

রোর্কি কপালের ঘাম মুছিয়া আতঙ্ক-বিহ্বল স্বরে বলিল, "কিন্তু কত বড় ঝুঁকির কাজ—তাহা কি—"

কার্ণ তাহার কথায় বাধা দিয়া ব্যগ্রভাবে বলিল, "না রোর্কি, ভাবিয়াছ, আমরা ধরা পড়িব; কিন্তু সে ভয় নাই। এ জন্য কেহই আমাদিগকে দায়ী করিতে পারিবে না। এখানে সকলেই স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করে, এটা সাধারণের ক্লাব; কেবল কি আমরাই আসিয়াছি? কোন খানসামা পর্য্যন্ত আমাদিগকে দেখিতে পায় নাই। লোকে কি সিদ্ধান্ত করিবে, তাহা কি বুঝিতে পারিতেছ না? মেটল্যাণ্ড চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া জামিনে খালাস আছে। আমরা উহার মামলার শেষ-ফলের প্রতীক্ষা করিতে পারি না। এ মামলায় আমাদিগকে সাক্ষ্য দিতে হইত; সেই সময় জেরায় আমাদের মুখ দিয়া কি বাহির হইয়া পড়িত কে জানে? তা ছাড়া, আত্মরক্ষার জন্য মেটল্যাণ্ড আমাদিগকে জড়াইত না—ইহাও মনে হয় না। মানুষ বিপদে পড়িলে আত্মরক্ষার জন্য সকলই করিতে পারে। আমাদিগকে সাক্ষীর কাঠরায় উঠিতে হইলে অত্যন্ত বিপন্ন হইতে হইত। সেই পথ বন্ধ করিবার একটি ভিন্ন দ্বিতীয় উপায় ছিল না; আমি সেই উপায়ই অবলম্বন করিয়াছি রোর্কি! আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি, ঐরূপ অমোঘ উপায় আর কিছুই ছিল না।"

সেই সময় রবার্ট ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডের সঙ্গে মেটল্যাণ্ডের দোকানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, লেনার্ডের দুই জন সহকারী দোকানের খাতাপত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি পরীক্ষা করিতেছিল। মেটল্যাণ্ডের দোকানের এক জন কর্ম্মচারী আতঙ্কে অভিভূত হইয়া তাহাদের আদেশ পালন করিতেছিল।

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড সেই কর্ম্মচারীটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিঃ মেটল্যাণ্ড কি বাড়ী ফিরিয়াছেন?"

কর্ম্মচারী বিস্মিত ভাবে বলিল, "বাড়ী ফিরিবেন কিরূপে? আপনিই ত তাঁহাকে মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন; তবে আর ও-কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কি উদ্দেশ্যে?"

লেনার্ড বলিলেন, "হাঁ, তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহাকে ত খানিক আগে জামিনে মুক্তিদান করা হইয়াছে। মামলা আপাততঃ মুলতুবি আছে। এই জন্যই আমি ভাবিয়াছিলাম, তিনি মুক্তিলাভ করিয়াই আদালত হইতে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।"

লেনার্ডের এক জন সহকারী বলিল, "আমরা এখানে আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই।"

এই সময়ে মেটল্যাণ্ডের টেলিফোনের ঝন্‌-ঝনি শুনিয়া মেটল্যাণ্ডের কর্ম্মচারীটি রিসিভার তুলিয়া-লইয়া সাড়া দিল; কিন্তু উত্তর শুনিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে সে ব্যাকুল স্বরে বলিয়া উঠিল, "কি! আপনি এ কি বলিতেছেন?"

ব্লেক তাহার ভয়-বিহ্বল কণ্ঠস্বর শুনিয়া, তাহার সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি? কোন দুঃসংবাদ শুনিতে পাইলে কি?"

কর্ম্মচারী স্খলিত স্বরে বলিল, "মিঃ মেটল্যাণ্ডের কি হইয়াছে, ঠিক বুঝিতে পারিলাম না! তিনি তাঁহার ক্লাবে হঠাৎ না কি অসুস্থ হইয়া—"

ব্লেক তাহার কথায় বাধা দিয়া অধীর স্বরে বলিলেন, "তাঁহার ক্লাব? কোথায় সেই ক্লাব?"

কর্ম্মচারীটি অস্ফুট স্বরে ব্লেককে মেটল্যাণ্ডের ক্লাবের ঠিকানা বলিল।

ব্লেক উত্তেজিত স্বরে লেনার্ডকে বলিলেন, "লেনার্ড, আমার বিশ্বাস, আমরা অত্যন্ত বিলম্ব করিয়া ফেলিয়াছি!"

লেনার্ড বিস্ফারিত নেত্রে ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "অত্যন্ত বিলম্ব করিয়া ফেলিয়াছি! তোমার এ কথার অর্থ কি ব্লেক!"

কিন্তু ব্লেক তাঁহার এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়াই মেটল্যাণ্ডের ক্লাবের অভিমুখে দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেন। ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডও তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

কিছুকাল পরে তাঁহারা ক্লাবে উপস্থিত হইয়া তাহার দ্বারদেশে কয়েক জন পুলিশ কর্ম্মচারীকে নিম্নস্বরে পরামর্শ করিতে দেখিলেন। ধূমপানের কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ক্লাবের এক জন কর্ম্মচারী সেই দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল।

সেই কর্ম্মচারীটি ব্লেককে ও ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডকে রুদ্ধ কক্ষের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া বলিল, "আপনারা মিঃ মেটল্যাণ্ডকে দেখিতে চান? তিনি ধূমপানের কক্ষেই আছেন বটে, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে!"

সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা ক্লাবের ম্যানেজার সহ এক জন ডাক্তারকে দেখিতে পাইলেন। ক্লাবের দুই জন ভৃত্যও সেই কক্ষের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিল; তাহারা আতঙ্কবিহ্বল চক্ষুতে তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মেটল্যাণ্ড তখনও চেয়ারেই বসিয়া ছিল; কিন্তু তাহার মাথা এক পাশে ঢলিয়া পড়িয়াছিল।

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড ব্যগ্রভাবে ডাক্তারের পাশে গিয়া দাঁড়াইলে ডাক্তার ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, "আপনারা অনেক বিলম্বে আসিয়াছেন! মিঃ মেটল্যাণ্ডের দেহে প্রাণ নাই।"

ব্লেক বলিলেন, "আমি এইরূপই আশঙ্কা করিয়াছিলাম।"

লেনার্ড ক্লাবের ম্যানেজারকে বলিলেন, "আপনি কি আত্মহত্যা বলিয়া সন্দেহ করেন?"

ম্যানেজার বলিলেন, "তাহা ভিন্ন অন্য কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নাই। ডাক্তার মিঃ মেটল্যাণ্ডের ব্র্যাণ্ডির গ্লাসটি পরীক্ষা করিয়া গ্লাসের নীচে যে বিষ দেখিতে পাইয়াছেন, তাহা অত্যন্ত উগ্র। উঁহার পকেটে একটি খালি-শিশি পাওয়া গিয়াছে। এই জন্য আমাদের ধারণা হইয়াছে, এই হতভাগ্য ভদ্রলোক ক্লাবে আসিয়া এক গ্লাস ব্র্যাণ্ডি লইয়া তাহা পান করিবার পূর্ব্বে শিশির ঐ বিষ তাহাতে মিশাইয়া লইয়াছিলেন।"

ব্লেক সন্দিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উনি কি এখানে একা আসিয়াছিলেন?"

এক জন পরিচারক বলিল, "হাঁ মহাশয়, উনি একাই এখানে আসিয়াছিলেন। উনি ব্র্যাণ্ডি চাহিলে আমিই তাহা পরিবেশন করিয়াছিলাম। মিঃ মেটল্যাণ্ড আমাদের ক্লাবের মেম্বার, এবং দীর্ঘকাল হইতে আমাদের সকলেরই সুপরিচিত। উনি এখানে আসিলে উঁহার মুখের দিকে চাহিয়া অত্যন্ত অসুস্থ মনে হইয়াছিল; এবং উঁহাকে অত্যন্ত বিচলিত ও উৎকণ্ঠাকুল দেখিয়াছিলাম। তখন আমি কল্পনাও করিতে পারি নাই যে, উনি—"

তাহার কথায় বাধা দিয়া ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "কে উঁহাকে প্রথমে এই অবস্থায় দেখিতে পাইয়াছিল?"

দ্বিতীয় পরিচারক বলিল, "আমিই প্রথমে দেখিয়াছিলাম—মহাশয়! প্রথমে আমার মনে হইয়াছিল, উনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া উঁহার মাথা বুকের উপর ঝুঁকিয়া-পড়িয়াছিল। এই জন্য উঁহাকে জাগাইবার অভিপ্রায়ে আমি উঁহার কাঁধ ধরিয়া অল্প ঝাঁকানি দিতেই উনি চেয়ারের এক পাশে ঢলিয়া পড়িলেন! তখন বুঝিতে পারিলাম, উঁহার দেহে প্রাণ নাই।"

ম্যানেজার বলিলেন, "আমি এই দুঃসংবাদ শুনিবামাত্র নাইটস্‌ব্রীজে উঁহার বাড়ীতে টেলিফোন করি। এখন আমরা কি করিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না; আমার ক্লাবে এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। যদি উঁহার আত্মহত্যা করিবারই ইচ্ছা ছিল—তাহা হইলে উনি ত নিজের বাড়ীতেই ঐ কার্য্য করিতে পারিতেন; আমার ক্লাবের সুনাম এ ভাবে নষ্ট করিলেন কেন?"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বিরক্তিভরে ভ্রু-কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "এই সকল অব্যবস্থিতচিত্ত রাস্‌কেলকে জামিনে মুক্তিদান করা অত্যন্ত অবিবেচনার কাজ! কিন্তু এখন আর আক্ষেপ করিয়া ফল কি? হতভাগাটা বিচারে শাস্তি পাইবার ভয়ে আত্মহত্যা করিয়াছে, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া পলাইয়া গেল! কি আফ্‌শোসের কথা!"

ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী ফিরিলেন। ব্লেকের মুখ অত্যন্ত গম্ভীর। স্মিথ কিছু কাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "কর্ত্তা, আপনার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল না। কে জানিত, বেচারা এ ভাবে আত্মহত্যা করিবে? মেটল্যাণ্ড পূর্ব্বে

জেল খাটিয়াছিল ; পুনর্ব্বার কারাদণ্ডের ভয়ে আত্মহত্যা করিয়াছে, এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন।"

ব্লেক স্থিরদৃষ্টিতে স্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার কি বিশ্বাস, মেটল্যাণ্ড আত্মহত্যাই করিয়াছে ?"

স্মিথ তাঁহার কথা শুনিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ ! তবে কি আপনার ধারণা—"

ব্লেক বলিলেন, "মেটল্যাণ্ড জামিনে মুক্তিলাভ করিয়া যে সময় আদালত ত্যাগ করে—সে সময় তাহার বন্ধু কার্ণ ও রোর্কি তাহার সঙ্গে ছিল। আদালতে মেটল্যাণ্ডের বিচার আরম্ভ হইলে তাহাদের ভাগ্যে কি ঘটিত, তাহা তাহাদের বিলক্ষণ জানা ছিল। দেখ স্মিথ, আমি কিছু সপ্রমাণ করিব, সে সুযোগ আমার নাই ; কিন্তু প্রকৃত ঘটনা কি, তাহা আমি সহজেই অনুমান করিতে পারি। এখন যদি আমি ওয়াইল্ডের উপর এক চক্ষু রাখি, তাহা হইলে কার্ণ ও রোর্কির উপর অন্য চক্ষু রাখিতে হইবে।"

সেই দিনই ওয়াইল্ড সংবাদপত্রে মেটল্যাণ্ডের আত্মহত্যার বিবরণ পাঠ করিল। সে কাগজখানি ফেলিয়া রাখিয়া আবেগভরে বলিল, "আমার একটা আশা পূর্ণ হইল ; এ জন্য আর আমাকে কোন নোংরা কাজে হাত দিতে হইল না, অথচ আশার অতিরিক্ত ফললাভ হইল। কিন্তু এখনও আর দুই শত্রু বর্ত্তমান। এবার কার্ণ ও রোর্কিকে দেখিব ; তাহাদের শায়েস্তা করিবার পূর্ব্বে স্যার রড্নের সঙ্গে দেখা করিব না। তাঁহার মনের কথা ত ব্লেকের কাছে শুনিয়াছি। দেখি, কি উপায়ে উহাদের হাতে পাই।"

[ক্রমশঃ।

দীনেন্দ্রকুমার রায়।

রাধা ও ম্যাডোনা

বসুধার বুকে নিদ্রা-বিভোল রাতি
রূপালি আলোর ঝরণা ঝরিয়া পড়ে।
শয়ন-শিথানে কখন নিবেছে বাতি
উতলা পবনে অশথের শাখা নড়ে।

পাশে শুয়ে প্রিয়া কণ্ঠে জড়ায়ে বাহু
অর্দ্ধ-বসন স্খলিত স্বপ্নাবেশে।
নয়নে কিসের মদিরেক্ষণ-মায়া
কল্পলোকের মাধুরী জড়ানো কেশে।

চাঁদ ডুবে গেল অশথ-তরুর ফাঁকে
সহসা জাগিল বিহগের কল-গীতি।
উদয়-অচলে অরুণের রথ-চূড়া
পূব-দিগন্তে জাগায় আলোর প্রীতি।

বাহু-বন্ধন শিথিল হইয়া এলো
মৃদু জৃম্ভনে জাগিয়া উঠিল প্রিয়া।
ওষ্ঠে আমার শেষ-চুম্বন দিল
স্খলিত বসন ত্রস্তে সম্বরিয়া।

অপর পার্শ্বে শয্যায় শুয়ে শিশু
মুখরি তুলিছে কণ্ঠের কল ভাষে।
কভু বুকে মোর কচি হাতখানি রাখে
খল-খল করি আপনার মনে হাসে।

দু' বাহু বাড়ায় মাতার কণ্ঠ শুনি
অভিমানে উঠে কচি ঠোঁট দু'টি ফুলে।
মৃদু সমীরণ দোল দিয়ে যায় এসে
রেশমের মত চাঁচর চিকুর চুলে।

জননী শুধায় কেন কাঁদো খোকামণি !
আবেগ ভরিয়া তুলে লয় তারে বুকে।
শত চুম্বনে গণ্ড তাহার ভরি
বক্ষ-পীযূষ ঢালি দেয় তার মুখে।

উষার আলোর ঝলকানি লাগে চোখে
গলিত স্বর্ণে ভরি গেল চারিধার।
প্রিয়ার মাঝারে জননীর স্নেহ জাগে
রাধা ও ম্যাডোনা হয়ে গেছে একাকার।

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায় (এম-এ, বি-টি)।

উপনিষদের ব্রহ্মবাদ

ব্রহ্মসূত্র-পরিচয়

অদ্বৈত বেদান্তের চিন্তাধারা বেদ, উপনিষদ্ প্রভৃতির ভিতর দিয়া কি ভাবে সাবলীল গতিতে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। দার্শনিক আচার্য্যগণের প্রতিভার অবদানে সেই ভাবধারা যে নবীন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। বেদ, উপনিষদ্ প্রভৃতি আকর-গ্রন্থে বেদান্তচিন্তা পরিপুষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ লাভ করিলেও তখনও উহা প্রকৃত দর্শনাকারে গড়িয়া উঠে নাই। আচার্য্য বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রেই প্রথমতঃ আমরা বেদান্তের দার্শনিক রূপের পরিচয় পাই। তর্কই দর্শনের প্রাণ, তর্কের সূত্রে বেদান্তের বিক্ষিপ্ত চিন্তা-কুসুমকে গ্রথিত করিয়া বাদরায়ণাচার্য্য ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছেন। ঐ ব্রহ্মসূত্রের অপর নাম বেদান্তদর্শন। পরবর্ত্তী যুগে বৈদান্তিক মহাচার্য্যগণ উক্ত ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শনের উপর ভাষ্য, বার্ত্তিক, টীকা, বিবৃতি প্রভৃতি রাশি রাশি গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। খণ্ডনমণ্ডনে বাণীর পাদপীঠ ভরিয়া উঠিল। মনীষার উজ্জ্বল আলোকে বেদান্তচিন্তা-রাজ্যের দিক্-চক্রবাল উদ্ভাসিত হইল। বেদান্তচিন্তার ইতিহাসে নবযুগের সূচনা দেখা দিল। এই যুগের পরিচয় দিতে হইলেই প্রথমতঃ যে ব্রহ্মসূত্রকে ভিত্তি করিয়া বেদান্ত-চিন্তার অভ্রভেদী সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার পরিচয় প্রদান করিতে হয়। অমরকীর্ত্তি বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতা। তিনি কোন্ সুদূর অতীতে ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন; কারণ, বেদব্যাসের কাল, ব্যক্তিত্ব লইয়া সুধী-সমাজে নানা বিরুদ্ধমত দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের রচয়িতা বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতা কি না, এ বিষয়েও কেহ কেহ সন্দেহ পোষণ করেন; কিন্তু মহাভারতের সময় যে ব্রহ্মসূত্র রচিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আমরা মহাভারতের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ই দেখিতে পাই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় "ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ" (গীঃ ১৩।৪ শ্লোক) বলিয়া যে ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ আছে, তাহা যে বেদান্তদর্শনকেই বুঝাইয়া থাকে, সে বিষয়ে সুধীগণের কোন সন্দেহ নাই। মহাভারতের অন্যান্য স্থলেও বেদান্তদর্শনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং মহাভারতের সময়ে যে বেদান্তদর্শন প্রচলিত ছিল, তাহা নিঃসন্দেহ। মহাভারতের রচনাকাল জ্যোতিষিক প্রমাণের সাহায্যে যত দূর জানা যায়, তাহাতে খৃষ্টপূর্ব্ব ২৫০০ বৎসর বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। সুতরাং ব্রহ্মসূত্র এরূপ সময়েই বিরচিত হইয়াছিল। একই বেদব্যাস উভয় গ্রন্থের প্রণেতা এবং সমকালেই গ্রন্থদ্বয় বিরচিত হইয়া থাকিবে। এইরূপ মনে করিবার আরও একটি কারণ এই যে, মহাভারতে যেমন ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ আছে, সেইরূপ ব্রহ্মসূত্রেও 'স্মৃতি' বলিয়া বহু সূত্রেই (১) মহাভারতকে কিংবা মহাভারতান্তর্গত গীতাকে গ্রহণ করা হইয়াছে; অন্ততঃ শঙ্কর, রামানুজ, মাধ্ব প্রভৃতি বৈদান্তিক আচার্য্যগণের ব্যাখ্যায় এইরূপ অর্থই পরিস্ফুট হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের প্রাচীনতার আরও একটি নিদর্শন এই যে, পাণিনি তাঁহার অষ্টাধ্যায়ী সূত্রে পারাশর্য্য ভিক্ষুসূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন (২)। পারাশর্য্যের অর্থ পরাশরের পুত্র অর্থাৎ বেদব্যাস। বেদব্যাস-প্রণীত ভিক্ষু বা সন্ন্যাসি-গণের পাঠ্য বেদান্তসূত্র ব্যতীত অপর কোন সূত্রের পরিচয় আমরা কোথায়ও পাই না; সুতরাং পাণিনি পারাশর্য্য ভিক্ষুসূত্র বলিতে যে বেদান্তের ব্রহ্মসূত্রকেই বুঝিয়াছিলেন, এরূপ মনে করা অস্বাভাবিক নহে। প্রসিদ্ধ দার্শনিক টীকাকার সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্রও ভিক্ষুসূত্র বলিয়া বেদান্ত-সূত্রকেই গ্রহণ করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনে আশ্মরথ্য, কাশকৃৎস্ন প্রভৃতি যে সকল প্রাচীন দার্শনিক আচার্য্যের নাম শুনা যায়, পাণিনি-সূত্রেও তাঁহাদের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় (৩); সুতরাং পাণিনির পারাশর্য্য ভিক্ষু-সূত্র ও ব্রহ্মসূত্র যে অভিন্ন, এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার সঙ্গত কারণ আছে। পাণিনি-সূত্রে যেমন ব্রহ্মসূত্র ও ব্রহ্মসূত্রোক্ত প্রাচীন আচার্য্যগণের পরিচয় আছে, সেইরূপ মহাভারতোক্ত শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ যোদ্ধপুরুষগণেরও নাম উল্লেখ আছে (৪); ইহা হইতেও ব্রহ্মসূত্র ও মহাভারত

১। স্মৃতেশ্চ ১।২।৬; অপিচ স্মর্য্যতে ২।৩।৪৫; স্মর্য্যতেঽপি চ লোকে ৩।১।১৯; স্মর্য্যতে চ ৪।২।১৪ (ব্রহ্মসূত্র)।

২। পারাশর্য্য শিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ। ৪।৩।১১০ (পাণিনি সূত্র)।

পাণিনির উল্লিখিত নটসূত্র এখন পাওয়া যায় না। নামদৃষ্টে যত দূর বোধ হয়, তাহাতে নাটকের বিধানাদি উক্ত পুস্তকে নিবদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

৩। পাণিনির গণসূত্র ৪।১।৭৩, ৪।১।১০৫ দ্রষ্টব্য।

৪। পাণিনিসূত্র ৮।৩।৯৫, ৪।১।১০৩, ৪।১।৯৬, ৫।২।১১০, ৪।৩।৯৮, ৩।৪।৭৪ দ্রষ্টব্য।

যে সমসাময়িক, এরূপ মনে করা অসঙ্গত হইবে না। পাণিনি বুদ্ধদেবের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। ঐতিহাসিকদিগের মতে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণকাল খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকের শেষভাগ (খৃঃ পূঃ ৫৮৩ অব্দ), সুতরাং পাণিনি যে খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতকেরও পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহা নিঃসন্দেহ। ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ পাণিনির আবির্ভাব-কাল খৃষ্ট-পূর্ব্ব নবম বা দশম শতক বলিয়া মনে করেন। পাণিনির আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বেই মহাভারত ও বেদান্ত-দর্শন রচিত এবং সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। দার্শনিক সূত্রগুলি সকলই সমসাময়িক। ষড়্‌দর্শনের সূত্রাবলীর মধ্যে পরস্পর পরস্পরের মতখণ্ডনের যে প্রচেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতেই তাহাদের সমসাময়িকতা প্রমাণিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মসূত্র মহাভারতের সমকালে বিরচিত হইয়াছে, ইহা মানিয়া লইলে অন্যান্য দার্শনিক সূত্রগুলিও মহাভারতের রচনার সমকালেই বিরচিত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। ব্রহ্মসূত্রে সর্ব্বমোট ৫৫৫ সূত্র আছে। ঐ সূত্রগুলি চার অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেকটি অধ্যায় আবার চারটি পাদে বিভক্ত, সুতরাং ব্রহ্মসূত্রে ষোলটি পাদ বা পরিচ্ছেদ আছে। প্রত্যেক পাদে কতকগুলি অধিকরণ আছে। এক একটি অধিকরণ কয়েকটি সূত্রের সমবায়ে গঠিত। বিভিন্ন বিচার্য্য বিষয় ভিন্ন ভিন্ন এক একটি অধিকরণে আলোচিত এবং মীমাংসিত হইয়াছে। অধিকরণের আলোচনার পদ্ধতি বিচার করিলে দেখা যায় যে, অধিকরণগুলি পঞ্চাঙ্গ অর্থাৎ প্রত্যেক অধিকরণেরই পাঁচটি অঙ্গ বা অংশ আছে; (১) প্রথম অঙ্গে বিচার্য্য বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে; (২) দ্বিতীয় অঙ্গে বিচার্য্য বিষয়ে সংশয়ের অবতারণা করা হইয়াছে; (৩) তৃতীয় অঙ্গে সংশয়ের পোষক যুক্তির উপন্যাস করা হইয়াছে; (৪) চতুর্থ অঙ্গে সেই সকল যুক্তি খণ্ডন করা হইয়াছে; (৫) পঞ্চম অঙ্গে বিচারের ফল বা সিদ্ধান্ত বিবৃত করা হইয়াছে (১)। এইরূপে প্রত্যেক অধিকরণকেই একটি পূর্ণাঙ্গ বিচার বলা যায়। এইরূপ বিচারপদ্ধতি অনুসরণ করিয়াই সূত্রোক্ত দার্শনিক রহস্য আলোচনা করা হইয়াছে।

বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রের ভিত্তিতে বেদান্তচিন্তার ইতিহাসে অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ভেদাভেদবাদ, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ প্রভৃতি নানা পরস্পর-বিরোধী মতবাদের সৃষ্টি ও পুষ্টি হইয়াছে। ঐ বিভিন্ন মতাবলম্বী আচার্য্যগণের তর্ককোলাহলের মধ্যে সূত্রকারের প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তাহা আমরা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এরূপ ক্ষেত্রে বাদরায়ণের বেদান্তমত-বাদ বুঝিতে হইলে আমাদিগকে ভাষ্যকারগণের ব্যাখ্যা, বিবৃতি প্রভৃতিকে দূরে রাখিয়া কেবলমাত্র সূত্রের ভিত্তিতে ব্রহ্মসূত্রের দার্শনিক তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। সূত্রগুলি এতই সংক্ষিপ্ত যে, অনেক স্থলেই ঐ সূত্র পড়িয়া সূত্রকারের রহস্য উপলব্ধি করা সহজসাধ্য নহে, তবুও ধীরতার সহিত পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করিলে ক্রমশঃ সূত্রগুলি সহজবোধ্য হইয়া আসিবে এবং সূত্রের অব্যক্ত তাৎপর্য্য সম্পূর্ণ না হউক, আংশিক ভাবেও আমাদিগের নিকট প্রতিভাত হইবে।

ব্রহ্মই বেদান্তের চরম ও পরম তত্ত্ব, অতএব ব্রহ্ম-নিরূপণই বেদান্তদর্শনের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। ব্রহ্ম-সূত্রকার বাদরায়ণও এই জন্য সূত্রের প্রারম্ভেই বেদান্তের একমাত্র নিত্য জিজ্ঞাস্য ব্রহ্মবস্তুর উপন্যাস করিয়াছেন এবং পর পর বহু সূত্রে তাহার প্রকৃত স্বরূপ ও স্বভাব বর্ণনার চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি যে, উপনিষদ্‌ই বেদান্ত। উপনিষদের রহস্যই তর্কের আলোকচ্ছটায় উজ্জ্বল ও প্রাণস্পর্শী করিয়া ব্রহ্মসূত্রে বা বেদান্তদর্শনে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই জন্যই বেদান্তদর্শনকে বেদান্তের তর্কপ্রস্থান বলা হইয়া থাকে। উপনিষদে ব্রহ্ম বা বিরাট্ পুরুষকে একমাত্র তত্ত্ব বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য সমস্তই আর্ত্ত বা বিনাশশীল। এই নিত্য-সত্য ব্রহ্মবস্তুকে উপনিষদে কোথাও বলা হইয়াছে "সেতু", সমস্ত চরাচর জগতের বিধায়ক। কোথায়ও বা সেই ভূমা ব্রহ্মকে মানের গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া বলা হইয়াছে, অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ, চতুষ্পাৎ, 'ষোড়শকল' বা ষোলকলায় পরিপূর্ণ। সুষুপ্তি অবস্থায় জীব ও ব্রহ্মের মিলনের কথা শ্রুতি স্পষ্টতঃ স্বীকার করিয়াছেন (সতা সম্পন্নো ভবতি)। জীব-ব্রহ্মের ঐরূপ মিলন স্বীকার করিতে গেলে জীবেরও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় কি না? ইহা বিশেষ বিচার্য্য; কারণ, মিলন তো একে হয় না। আর ঐরূপ মিলনের ফলে অসঙ্গ ব্রহ্মের জীব-সঙ্গ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে না কি? ব্রহ্মকে যে 'সেতু'রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং ছান্দোগ্য উপনিষদে 'সেতুং তীর্ত্ত্বা' বলিয়া যে সেতুর পরপারে যাইবার ইঙ্গিত করা হইয়াছে, সেই পরপার আবার কোথায়? ব্রহ্মের পরেও কোন তত্ত্ব আছে কি? বিশ্বের চরম তত্ত্ব কি? সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মকে মানের গণ্ডীতে বিচার করা যায় কি? এইরূপ নানা প্রশ্ন সূত্রকারের মনে উদিত হইয়াছিল এবং সূত্রকার ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের সপ্তম অধিকরণে এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া ব্রহ্মই যে বিশ্বের চরম তত্ত্ব, তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। সূত্রকারের মীমাংসা এই যে, উপনিষদে ব্রহ্ম সেতুরূপে বর্ণিত হইলেও এবং "সেতুং তীর্ত্ত্বা"

১। বিষয়ঃ সংশয়শ্চৈব পূর্ব্বপক্ষস্তথোত্তরম্।
নির্ণয়শ্চেতি পঞ্চাঙ্গং শাস্ত্রেঽধিকরণং স্মৃতম্।
ভাট্টচিন্তামণি ৫ পৃষ্ঠা, চৌখাম্বা সংস্কৃত গ্রন্থমালা।

বলিয়া সেতুর পরপারে যাইবার কথা উল্লিখিত হইলেও ব্রহ্ম সেতুর তুল্য নহেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, তাঁহাতে সমস্ত বিশ্ব অনুস্যূত রহিয়াছে, তিনিই বিশ্বের আশ্রয়, এই জন্যই উপনিষদে রূপক ভাবে তাঁহাকে (সেতুরিব সেতুঃ) সেতু বলা হইয়াছে। এই সেতুই পরমাত্মা পরব্রহ্ম। ইহার পারাপার নাই। জড়জগৎকে বাদ দিয়া জগতের অন্তরবিহারী কারণাত্মাকে প্রত্যক্ষ করাই সেতুর তরণ। ছান্দোগ্যোপনিষদে "সেতুং তীর্ত্বা" বলিয়া এই কথাই ব্যক্ত করা হইয়াছে।

'চতুষ্পাৎ', 'ষোড়শকল' বলিয়া সর্ব্বব্যাপী আত্মার যে সসীম-ভাবের কথা উপনিষদে প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা শুধু সেই বিরাট্ পুরুষের উপাসনার সুবিধার জন্যই করা হইয়াছে। মনের সাহায্যে চিন্তা করার নাম উপাসনা। আমাদের সসীম মন অসীমকে ধারণা করিতে পারে না, সেই জন্য আমরা অসীমকেও সীমার গণ্ডীতে আনিয়া আমাদের ভাবনা-বৃত্তিকে চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করি। সসীমের অন্তরালেও অসীমের স্ফুরণ আছে, সসীমকে অবলম্বন করিয়া অসীমের সন্ধানই প্রকৃত পরমতত্ত্বের সন্ধান; ব্রহ্ম নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়; মনের সাহায্যে তাঁহাকে জানা যায় না, মনোবৃত্তি বিলীন হইলেই ব্রহ্মজ্যোতির বিকাশ হয়। মনের সাহায্যে যতটুকু জানা যায়, তাহা জানিবার জন্যই অসীমের এই কল্পিত সসীম-ভাবের স্মৃতি ও বিকাশ। ব্রহ্মবস্তু চির-অসঙ্গ, তাঁহার কোনরূপ সঙ্গতি বা সম্বন্ধ নিছক কল্পনা মাত্র। যাহা কল্পিত বা ঔপাধিক, তাহাই মায়িক ও মিথ্যা, তাহা দ্বারা সত্য বস্তুর কোনও রূপান্তর ঘটে না। যেমন চন্দ্র বা সূর্য্যকিরণ গবাক্ষপথে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে উহা আঁকাবাঁকা বলিয়া মনে হয়, বস্তুতঃ কিরণ কিন্তু আঁকাবাঁকা হয় না, কিরণমালা যেই পথে গৃহমধ্যে প্রবেশ করে, সেই গবাক্ষপথের বক্রতা গৃহ-ভিত্তিতে পতিত কিরণমালাকে আঁকাবাঁকা করিয়া তোলে। সেইরূপ স্বপ্রকাশ, নিরাকার পরব্রহ্ম অন্তঃকরণাদি নানা উপাধি-পথে প্রকাশিত হইয়া ছোট, বড় বিবিধ আকার ধারণ করেন; অসঙ্গ-ব্রহ্মও সসঙ্গ বলিয়া প্রতিভাত হন। উহা উপাধিরই দোষ, ঐ দোষ ব্রহ্মে কল্পিত হইয়া থাকে মাত্র। ঐ উপাধি যখন বিলীন হইয়া যায়, তখন ঘটাকাশ যেমন মহাকাশে লীন হয়, সেইরূপ উপাধি কল্পিত বিবিধ আকারও ব্রহ্মে বিলীন হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়। এইরূপ ব্রহ্মতাদাত্ম্যের কথাই শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে। এখানে অসঙ্গ-ব্রহ্মের সসঙ্গতার বা অসীমের সসীম ভাবের কোন আপত্তিই উঠিতে পারে না (১)। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বই উপনিষদে ও বেদান্তদর্শনে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রহ্মই যে পরমতত্ত্ব, তাহা প্রতিপাদন করিয়া সূত্রকার নানা ভাবে আমাদিগকে ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সূত্রকার শ্রুতিরত্নাকর মন্থন করিয়া এবং ব্রহ্মামৃত উদ্ধার করিয়াছেন। শাস্ত্রই একমাত্র তাঁহাকে জানিবার উপায়। যদিও শাস্ত্রে নানা প্রকার পরস্পর-বিরোধী উক্তি-প্রত্যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি ব্রহ্মতত্ত্বে সমস্ত দ্বন্দ্বের চির-অবসান সূচিত হওয়ায় সেখানে এক মহা সমন্বয় সাধিত হইয়াছে (১)। ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে সূত্রকার বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম দ্যুলোক, ভূলোকের আশ্রয়, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমান্। তিনি অক্ষর, তিনি নিত্য, সৎস্বরূপ, প্রজ্ঞানঘন ও আনন্দময়। নিখিল বিশ্বের তিনি শাস্তা, অন্তর্য্যামী এবং জীবের কর্ম্মফলদাতা। তিনি জগদ্‌যোনি, বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-নিদান, এই জগতের নিমিত্তও তিনি, উপাদানও তিনি। এই জন্যই স্বতন্ত্র ভাবে (অন্য-নিরপেক্ষ হইয়াই) তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন (২)। এই জগৎসৃষ্টি একটা অন্ধ প্রচেষ্টা নহে। কাননকুন্তলা, সমুদ্রমেখলা বিচিত্র ধরণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রতি-মুহূর্ত্তেই বিশ্বস্রষ্টার অদ্ভুত শিল্পচাতুর্য্য, অপূর্ব্ব শক্তি ও অসামান্য নৈপুণ্যের কথা মনের মধ্যে উদিত হয়। বিশ্বস্রষ্টার সৃজনী-বৃত্তির মূলে তাঁহার ঈক্ষণ বা কামলীলা চলিতেছে, সেই লীলাবশেই প্রজ্ঞানঘন আনন্দময় পুরুষ বহু নামে এবং বহু রূপে প্রতিভাত হন। এই সিসৃক্ষা-বৃত্তি বা বহু হইবার প্রবৃত্তি তাঁহার লীলামাত্র। কামের এই লীলা দ্বারা কামাতীত লীলাময় পুরুষ অণুমাত্রও বিচলিত হন

১। পরমতঃ সেতুন্মানসম্বন্ধভেদব্যপদেশেভ্যঃ। ব্রঃ সূঃ ৩।২।৩১ উক্ত সূত্রটি পূর্ব্বপক্ষ সূত্র। ব্রহ্মসূত্রকার "সামান্যাত্তু" ৩।২।৩২, "বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ" ৩।২।৩৩, "স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ" ৩।২।৩৪, "উপপত্তেশ্চ" ৩।২।৩৫ এই চার সূত্রে পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত যুক্তির পরীক্ষাপূর্ব্বক খণ্ডন করিয়া অসঙ্গ-অসীম ব্রহ্মের সসীমভাবের যে কোন আপত্তিই উঠিতে পারে না, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। অনেন সর্ব্বগতত্বমায়ামশব্দাদিভ্যঃ, ৩।২।৩৭, এই সূত্রে আত্মার সর্ব্বব্যাপিত্ব সূত্রকার স্থাপন করিয়াছেন এবং "তথান্য প্রতিষেধাৎ" ৩।২।৩৬ সূত্রে ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অন্য সমস্ত বস্তুর নিষেধ করিয়া ব্রহ্মই যে একমাত্র তত্ত্ব, ইহার উপরে আর কোন তত্ত্ব নাই, ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

১। শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ব্রঃ সূঃ ১।১।৩; তত্তু সমন্বয়াৎ ব্রঃ সূঃ ১।১।৪; জন্মাদ্যস্য যতঃ ব্রঃ সূঃ ১।১।২; যোনিশ্চ হি গীয়তে ব্রঃ সূঃ ১।৪।২৭।

২। দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ। ব্রঃ সূঃ ১।৩।১; ভূমাসম্প্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ। ব্রঃ সূঃ ১।৩।৮; সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ। ব্রঃ সূঃ ২।১।৩০; সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ। ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৭; অসম্ভবস্তু সতোঽনুপপত্তেঃ। ব্রঃ সূঃ ২।৩।৯; বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ। ব্রঃ সূঃ ১।২।২; অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ। ব্রঃ সূঃ ১।৩।১০; আহ চ তন্মাত্রম্। ব্রঃ সূঃ ৩।২।১৬; আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ। ব্রঃ সূঃ ১।১।১২; সা চ প্রশাসনাৎ। ব্রঃ সূঃ ১।৩।১১; অন্তর্য্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ। ব্রঃ সূঃ ১।২।১৮; ফলমত উপপত্তেঃ। ব্রঃ সূঃ ৩।২।৩৮; প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ। ব্রঃ সূঃ ১।৪।২৩।

না। তিনি আপ্তকাম, তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই, তবে যুগে যুগে জীবের কর্ম্মফল-ভোগসিদ্ধির জন্য সুখ-দুঃখময় এই বিশ্বনাটকের অভিনয় করেন। জীবের সুকৃত বা দুষ্কৃত তাঁহাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন; সুকৃতকারী সুখভোগ করেন, দুষ্কৃত-কারী দুঃখের আগুনে জ্বলিয়া মরে। পরমেশ্বরের কোন পক্ষপাত নাই। তিনি কাহারও প্রতি অধিক দয়াপ্রবণও নহেন, কাহারও প্রতি অত্যন্ত নিষ্করুণও নহেন। ভগবানের লীলাচক্র সমভাবে চলিতেছে। জীব তাহার কর্ম্মানুরূপ ফলভোগ করিতেছে (১)। পরমেশ্বর আনন্দময়। তিনি একক সেই আনন্দ পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করিতে পারিতেছিলেন না, সেই জন্যই তাঁহার লীলাময়ী মায়া বা অবিদ্যাকে সহচরী করিয়া বিশ্বলীলায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই মায়ার খেলা যখন ভাঙ্গিয়া গেল, তখন নিখিল বিশ্বই তাঁহার কুক্ষিতে প্রলয়ের অন্ধকারে বিলীন হইয়া গেল। লীলাময়ের ধ্বংসের রুদ্রলীলা চলিতে লাগিল। চরাচর সমস্ত বিশ্বই তিনি গ্রাস করিলেন। সমস্তই তাঁহার অন্ন বা ভক্ষ্য, আর তিনিই একমাত্র ভোক্তা (২)। এক দিকে তিনি যেমন বিশ্বপতি, বিশ্বপ্রাণ ও বিশ্বযোনি, অপর দিকে তেমনই তিনি বিশ্বভুক্‌, বিশ্ব-কাননের তিনি দাবানল, তিনি উদ্যত মহাভয় বজ্র। এই-রূপে কোমলে-কঠোরে তিনি বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে নটবর সাজিয়া কত বিভিন্ন অভিনয় করিতেছেন। একাই তিনি অন্তরে, বাহিরে অব্যক্ত-ব্যক্তরূপে বিরাজ করিতেছেন। জগৎ সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টির যবনিকার অন্তরালে নিজকে আবৃত করিয়া একই তিনি বহু হইয়াছেন, নানা রূপে নানা নামে প্রকাশিত হইয়াছেন। ভোক্তাও তিনি, ভোগ্যও তিনি; দ্রষ্টাও তিনি, দৃশ্যও তিনি; স্রষ্টাও তিনি, সৃষ্টও তিনি। ইহাই যদি বেদান্তের সৃষ্টিরহস্য, তবে ব্রহ্মের সহিত জগতের সম্বন্ধ কি? চেতন ব্রহ্ম কেমন করিয়া অচেতন জগতের উপাদান হইলেন? তিনি কেমন করিয়া অচেতন জগৎ সৃষ্টি করিলেন? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে সূত্রকার বলিলেন, জগৎ যে ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ বা বিসদৃশ, তাহা তো কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। শ্রুতি স্পষ্ট ভাষায়ই জড়জগৎ ও চেতন-ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য প্রতিপাদন করিয়াছেন (৩)। তবে প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, কার্য্য ও কারণ বিসদৃশ বা বিলক্ষণ হইলে, ঐরূপ কারণ হইতে কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে কি না? চেতন হইতে অচেতনের উৎপত্তি সম্ভব কি না? ইহাই বিচার্য্য। সূত্রকার বলেন যে, চেতন হইতে অচেতনের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। চেতন জীবশরীরে অচেতন কেশ-নখরাদি উৎপত্তি ও বৃদ্ধি সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে (১)। পক্ষান্তরে জড়-জগৎকে ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ বিসদৃশই বা বলি কিরূপে? জড়প্রপঞ্চে ব্রহ্মসত্তা সর্ব্বত্র অনুস্যূত রহিয়াছে। তিনি অন্তর্য্যামি-রূপে নিখিল বিশ্বে বিরাজ করিতেছেন, জগতের প্রকাশের মূলেও রহিয়াছে তাঁহারই প্রকাশ, আনন্দের মূলে রহিয়াছে তাঁহারই আনন্দঘন রূপ; সুতরাং জড়প্রপঞ্চকে তো চেতনব্রহ্মের একান্তই বিসদৃশ বলা যায় না। তবে নাম-রূপাত্মক জগতের সহিত অরূপ ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য অবশ্যই অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু ("আরম্ভণ") শ্রুতির তাৎপর্য্য বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, নাম ও রূপের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, তাহাদের অস্তিত্ব তাহাদের কারণ-বস্তুরই অস্তিত্বের অধীন। মাটী হইতে ঘট, শরা, কলস প্রভৃতি বিবিধ মৃন্ময় বস্তুর উৎপত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু বস্তুতঃ ঐ সকল মৃন্ময় বস্তু মাটীরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি নহে কি? এক মাটীই কোন রূপে সে ঘট, কোনও রূপে সে শরা, কোনও রূপে সে কলস। মাটীকে বাদ দিলে ঐ সকল মৃন্ময় বস্তুর কোনও অস্তিত্ব থাকে কি? ঐ সকল বস্তু মাটীরই বিভিন্ন বিকাশ, পরিণামেও উহা মাটীতেই বিলীন হইবে। কার্য্যমাত্রেরই কোন স্বাধীন সত্তা নাই, উহা মিথ্যা, তাহা তাহাদের উপাদানের বিভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র; উপাদান কারণই একমাত্র সত্য। ব্রহ্মকার্য্য জগৎ ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি, উহা পরিণামে ব্রহ্মস্বরূপই হইয়া দাঁড়াইবে, নাম ও রূপের সীমার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে সমস্ত বস্তুই সেই সর্ব্বকারণ-কারণ ব্রহ্মে বিলীন হইবে। তখন বস্তুর কোন নিজ রূপ থাকিবে না, সকলই তখন ব্রহ্মরূপ হইয়া যাইবে; এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকিবে। এই তত্ত্বই সূত্রকার কার্য্য-কারণ হইতে অন্য বা ভিন্ন নহে, এই "অনন্যত্ব" বর্ণনায় প্রকাশ করিয়াছেন, ফলে সূত্রকারের মতে কার্য্যের মিথ্যাত্বই আসিয়া পড়িয়াছে (২)। জীব, জড়, ভোক্তা, ভোগ্য, দ্রষ্টা, দৃশ্য, চেতন, অচেতন, কার্য্য, কারণ প্রভৃতি যত প্রকার ভেদের কল্পনা আমাদের মনে আসিতে পারে, তাহা সমস্তই সেই লীলাময় পরমপুরুষের বিভিন্ন বিলাস। তাঁহার সৃজনী-বৃত্তিবশে তিনিই নানা রূপে অভিব্যক্ত হইতেছেন। মহাবারিধির ফেনা, বীচি,

---

১। ঈক্ষতের্নাশব্দম্। ব্রঃ সূঃ ১।১।৫; ঈক্ষতি কর্ম্মব্যপদেশাৎ সঃ। ব্রঃ সূঃ ১।৩।১৩; কামাচ্চনানুমানাপেক্ষা। ব্রঃ সূঃ ১।১।১৮; লোকবত্তু লীলা-কৈবল্যম্। ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৩; বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি। ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৪।

২। বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোঽত উপপদ্যতে চ। ব্রঃ সূঃ ২।৩।১৪; অত্তাচরাচরগ্রহণাৎ ব্রঃ সূঃ ১।২।৯।

৩। ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ। ব্রঃ সূঃ ২।১।৪।

১। দৃশ্যতে তু। ব্রঃ সূঃ ২।১।৬

২। তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ। ব্রঃ সূঃ ২।১।১৪

তরঙ্গ যেমন পরস্পর ভিন্ন হইলেও উহা জলেরই বিকার, জলময় বারিধি হইতে বস্তুতঃ উহা ভিন্ন নহে, কিন্তু তবুও ফেনা, বীচি, তরঙ্গ ও বুদ্‌বুদের ভেদ যেমন আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, সেইরূপ অসীম অনন্ত ব্রহ্মপারাবারে অগণিত জড়প্রপঞ্চের যে লীলালহরী ভাসিতেছে, উঠিতেছে, পড়িতেছে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মাত্মক হইলেও জড়-প্রপঞ্চরূপে তাহাদের মায়িক ভেদও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি ; সুতরাং ভোক্তা ভোগ্য, দ্রষ্টা দৃশ্য, স্রষ্টা সৃষ্ট প্রভৃতি ভেদ বাহ্যিক দৃষ্টিতে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে (১)। মূলে সকলই ব্রহ্মময়—'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ', ইহাই বেদান্তের সৃষ্টিরহস্য।

ডাঃ শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী, (এম-এ, পি, আর এস, পি, এইস্, ডি)।

১। ভোক্তাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ। ব্রঃ সূঃ ২।১।১৩।

রঙিন ঘুড়ি

সাম্‌নে সবুজ মাঠে,
রঙিন ঘুড়ি উড়ছে দেখি
আনন্দে দিন কাটে।
লম্বা সুতো লতায়, লাটাই ঘোরে,
রঙিন ঘুড়ি নাচ্‌ছে ডুরিব জোরে,
রাঙিয়ে আকাশ অস্তাচলের রবি
বস্‌ছে ধীরে পাটে।

নীল আকাশে উড়ছে ঘুড়ি
এতেই কত সুখ,
নয় এটা ডান্‌কার্ক কি ক্রীট্
ওডেসা তবরুক্।
নাই কামানের ধড়-ফড়ানি ডাক,
ঘড়-ঘড়ানে বিমান-পোতের ঝাঁক,
বোমার ধোঁয়ায় দেয়নি আঁধার ক'রে
উজ্জ্বল সাঁজের মুখ।

আলো আলো করেই যাদের
ভাঙ্‌লো গলা সব,
ডেকে তা'রাই আন্‌ছে আঁধার—
বীভৎস-উৎসব।
ধুকছে মানুষ নিম্নে মাটির তলে,
ফিরচে নেচে অঘোরপন্থী দলে,
অন্তরীক্ষ স্থল জলের শোভা
হচ্ছে যে দুর্লভ।

আকাশেতে ছোট্ট ঘুড়ি
উড়ছে রে পত্‌পৎ
সারঙ্গে কে বাজায় যেন
আনন্দেরি গৎ।
বল্‌ছে হেসে এই আকাশের কোলে,
নাইক অসুর—দোল্‌না দেবের দোলে,
বালক সেজে খেলায় ইহার তলে
স্নিগ্ধ ভবিষ্যৎ।

বায়ুর মহল আলোর বেদী
দেব দেবতীর ঘর,
এ মহা ব্যোম বোমায় ঢাকে
সত্য সে বর্ব্বর।
নির্ম্মলতার বিশাল এ রাজধানী,
পুণ্য এ ঠাঁই রটায় অভয় বাণী,
ঘুড়ি হ'য়ে উড়ছে শিশুর সোহাগ—
আবীর ও অভ্র।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

সেকালের সিভিলিয়ানের কথা

স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান্। তিনি ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে সিভিল-সার্ভিসে প্রবেশ করিয়া বোম্বাই প্রদেশে চাকরী গ্রহণের সাত বৎসর পরে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহারীলাল গুপ্ত এই তিন জন বাঙ্গালী সিভিল-সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ঐ বৎসরই শ্রীপদ বাবাজি ঠাকুর নামক বোম্বাইবাসীও সিভিল-সার্ভিসে চাকরী পাইয়াছিলেন। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত সিভিল-সার্ভিস পরীক্ষায় ইংরেজী ভাষায় প্রথম, এবং প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া বাঙ্গালীর গৌরব বর্দ্ধন করেন। স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সিভিল-সার্ভিস পরীক্ষা প্রদান করেন, কিন্তু প্রতিযোগিতায় অকৃতকার্য্য হওয়ায় ব্যারিষ্টার হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। মনোমোহন ও লালমোহন ঘোষ ঢাকার অধিবাসী হইলেও তাঁহাদের পিতা স্বর্গীয় রামলোচন ঘোষ নদীয়ার সদরালা ছিলেন, এ জন্য তাঁহারা কৃষ্ণনগরেই বাস করিতে আরম্ভ করেন। মনোমোহন ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করিয়া ফৌজদারী মামলা পরিচালনে অসাধারণ প্রতিষ্ঠালাভ করিলেও তিনি সিভিলিয়ান্ হইতে না পারায় তাঁহার মনে যে ক্ষোভ ছিল, তাঁহার পুত্র মহিমোহন (মাষ্টার লিং) দীর্ঘকাল পরে সিভিল-সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাঁহার সেই ক্ষোভ দূর হইয়াছিল। মান্দ্রাজে চাকরী লইয়া মহিমোহন অকালে প্রাণত্যাগ করেন।

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি সিভিল-সার্ভিসে প্রবেশ করিবার কয়েক বৎসর পরে কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি-লাভ করায় সিভিল-সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন। তিনি তাঁহার স্মৃতিকথায় বাল্যকাল হইতে কর্ম্মজীবনের অধিকাংশ কাল পর্য্যন্ত দেশের, সমাজের ও আমলাতন্ত্রের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; তাহা কৌতূহলোদ্দীপক ও একালের পাঠকগণের অজ্ঞাত অনেক ঘটনায় পূর্ণ বলিয়া পাঠকসমাজের প্রীতিকর হইতে পারে। এ জন্য তাঁহার বর্ণিত ঘটনাসমূহের উল্লেখযোগ্য অংশগুলি বর্ত্তমান প্রবন্ধে সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু লিখিয়াছেন, ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ২৮এ ফেব্রুয়ারী মধ্য-রাত্রিতে তাঁহার জন্ম হয়। সে দিন শিবরাত্রি; এই শুভদিনে তাঁহার জন্ম হওয়ায় তাঁহার আত্মীয় প্রতিবেশিগণের ধারণা হইয়াছিল—তিনি অসাধারণ সৌভাগ্যের অধিকারী হইবেন। তাঁহাদের এই ধারণা যে মিথ্যা হয় নাই, ইহা পরে প্রতিপন্ন হইয়াছিল। তাঁহার জন্মের এক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর কয়েক মাস মাত্র জীবিত থাকিয়া প্রাণত্যাগ করায় কৃষ্ণগোবিন্দের পিতামহী অপদেবতার কুদৃষ্টি হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য কয়েক কড়া কড়ির বিনিময়ে কোন হাড়িনীর নিকট তাঁহাকে বিক্রয় করেন। কিন্তু তিনি পিতৃগৃহেই প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। যে বৎসর তাঁহার বিবাহ হয়—সেই বৎসর তাঁহার 'হাড়িনী মা'কে তাঁহার মূল্যের কয়েক কড়া কড়ি ফেরত দিয়া, ও সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ মূল্যবান্ দ্রব্য উপহার দান করিয়া তাঁহার পিতামহী তাঁহাকে 'হাড়িনী'র নিকট হইতে পুনগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণগোবিন্দের পিতামহ মহেন্দ্রনারায়ণ ময়মনসিংহের জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের আফিসে কিছু দিন আমলাগিরি করিয়া প্রচুর অর্থ-উপার্জ্জন করেন, কিন্তু অল্প বয়সেই (৩২) তিনি প্রাণত্যাগ করেন। আদালতের আমলাগিরি চাকরীতে বত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যে প্রচুর অর্থ অর্জ্জন করিয়া সেই অর্থে জমিদারী ক্রয় করা সেকালেই সম্ভব ছিল। একালে মুন্সেফ, ডেপুটীরা দীর্ঘকাল চাকরী করিয়াও ঐরূপ ভূসম্পত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন না। মহেন্দ্রনারায়ণ অপুত্রক ছিলেন; এ জন্য তাঁহার বিধবা পত্নী কৃষ্ণগোবিন্দের পিতাকে দত্তক গ্রহণ করিয়া কালীনারায়ণ নামে অভিহিত করেন। সেই সময় কালীনারায়ণের বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র। ঢাকা হইতে প্রায় ত্রিশ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত ভাটপাড়া নামক ক্ষুদ্র গ্রামে কৃষ্ণগোবিন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ মহেন্দ্রনারায়ণ স্বয়ং যে সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা একাকী ভোগ না করিয়া তাঁহার জ্ঞাতি-ভ্রাতৃগণকে তাহার অর্দ্ধাংশ প্রদান করিয়াছিলেন। একালে আমাদের হিন্দুসমাজ হইতে এইরূপ জ্ঞাতি-বাৎসল্য বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়াই এ কথার উল্লেখ করিলাম।

রমেশচন্দ্র দত্ত

এই সময় পল্লীগ্রামবাসী ভদ্রলোকদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার আদর ছিল না। বাঙ্গালা ভাষায় অল্প জ্ঞানলাভ করিয়া অঙ্ক শিখিতে পারিলেই সাধারণ চাকরী মিলিত; ইহার উপর যাহাদের হস্তাক্ষর পরিচ্ছন্ন হইত, চাকরীর বাজারে তাহারাই অধিক আদর লাভ করিত। আদালতে ফার্সি ভাষা ব্যবহৃত হইত, এবং যাহারা উক্ত ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিত, সমাজে তাহারাই অধিক সমাদৃত হইত। পল্লীবাসিগণের মধ্যে প্রায় কেহই ইংরেজী ভাষা জানিতেন না। পাঁচ বৎসর বয়সেই হিন্দু বালকদের হাতে খড়ি দিয়া বিদ্যারম্ভ হইত।

সেই সময় ধনবান্ হিন্দু-গৃহে বার মাসে তের পার্ব্বণ হইত। পূজা-পার্ব্বণ ও ব্রতের প্রতি হিন্দু-সাধারণের অনুরাগ লক্ষিত হইত। ভদ্রমহিলা মাত্রেই বিভিন্ন ব্রতের অনুরাগিণী ছিলেন। ব্রত শেষ হইলে তাঁহারা পল্লীর জনসাধারণ, বিশেষতঃ, বালক-বালিকাগণকে মিষ্টান্ন বিতরণ করিতেন। অতি অল্প ভদ্রলোক চাকরী উপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিতেন। গ্রাম হইতেই গ্রামের অভাব পূরণ হইত; গ্রামবাসিগণকে সাধারণতঃ সহরাঞ্চলের মুখাপেক্ষী হইতে হইত না। কোন গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইবার জন্য জলপথে নৌকা ও স্থলপথে ডুলী ব্যবহৃত হইত। ঢাকার পল্লী অঞ্চলে গো-শকটের প্রচলন ছিল না, এবং কদাচিৎ কেহ অশ্বে আরোহণ করিত। বর্ষাকালে জলপ্লাবিত গ্রাম্যপথে চলিতে হইলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জোঁক পদদ্বয় আক্রমণ করিত। গ্রামস্থ ভদ্রলোকরা তাঁহাদের চাষের জমির উপর নির্ভর করিতেন, তাঁহারা চাষীদিগের সহিত জমি ভাগে বন্দোবস্ত করিতেন; চাষীরা যে ফসল উৎপন্ন করিত, জমির মালিক সেই উৎপন্ন শস্যের অর্দ্ধাংশ পাইতেন। পল্লীবাসীরা বিলাসী ছিলেন না; বিদেশী বিলাস দ্রব্য তাঁহাদিগকে মুগ্ধ করিতে পারিত না। প্রতি বৎসর সময়ে সময়ে বিভিন্ন গ্রামে মেলা বসিত। সেই সকল মেলায় যাত্রা, কবির গান, কথকতা প্রভৃতির অনুষ্ঠান হইত। রেলপথের অভাবেও গ্রামের লোক পদব্রজে তীর্থদর্শনে যাত্রা করিত। অনেকে নৌকায় যাইত। পল্লী-গ্রামের মহিলাগণেরই তীর্থযাত্রায় অধিক আগ্রহ ও উৎসাহ লক্ষিত হইত।

সেকালে অল্প লোকেই চিঠিপত্র লিখিত, এবং চিঠি খোয়া যাইবার ভয়ে অনেকেই ডাকে 'বেয়ারিং' চিঠি পাঠাইত। জমিদারদের চিঠিপত্র বহনের জন্য 'জমিদারী ডাক' ছিল। জমিদাররা ইহার ব্যয়-ভার বহন করিতেন। অনেক দিন পূর্ব্বে এই প্রথা রহিত হইয়াছে। জমিদারী ডাকের চিঠি-পত্রে টিকিট দিতে হইত না; লেফাপার উপর 'জমিদারী ডাক' লিখিয়া দিতে হইত। ডাকঘরের সংখ্যা অল্প ছিল; প্রধান প্রধান গ্রামের ডাকঘরে যে সকল চিঠি আসিত, ভিন্ন গ্রামের লোকরা ডাকঘর হইতে সেই সকল পত্র সংগ্রহ করিয়া আনিত। এ জন্য দূর-গ্রামের পত্র অনেক বিলম্বে লোকের হস্তগত হইত। গ্রামস্থ লোকের বিরোধ গ্রামের প্রধান ব্যক্তিরাই আপোষে মিটাইয়া দিতেন। একালের মত সে সময় গ্রামবাসীরা মিথ্যা মকদ্দমার আশ্রয় গ্রহণ করিত না, এবং তাহার তেমন সুযোগও ছিল না। গ্রামবাসিগণের ধর্ম্মভয় প্রবল ছিল, এবং সমাজবন্ধন দৃঢ় থাকায় সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করিতে কেহই সাহস করিত না। সমাজের উচ্চ স্তরের লোকরা নিম্ন স্তরের লোকদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিত, এবং আমোদ-উৎসবে তাহাদের সহিত মিশিতে কুণ্ঠিত হইত না। জাতিভেদের কঠোরতা সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমানের মনের মিল ছিল, এবং বিপদে-সম্পদে তাহারা পরস্পরের সহযোগিতা করিত। বড় বড় গ্রামেও একালের মত হোটেল বা পান্থনিবাস প্রভৃতি না থাকায় বিদেশী লোক গ্রামবাসীদের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিত, এবং অতিথিসেবা করিয়া সকলেই আনন্দ লাভ করিত। কোন সময় গৃহে ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণের অতিথি আসিলে তাহার রন্ধনের জন্য জ্বালানী কাঠ হইতে চাল, ডাল, তেল, লুণ ও তরিতরকারী-পূর্ণ সিধা দেওয়া হইত। অসময়ে গৃহে অতিথি আসিলেও কোন গৃহস্থ তাহার প্রতি বিমুখ হইত না। 'ঘরে চাল বাড়ন্ত' বলিয়া ভিক্ষুককে প্রত্যাখ্যান করা সকলেই লজ্জার বিষয় বলিয়া মনে করিত।

কৃষ্ণগোবিন্দ ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ইংরেজী শিক্ষার জন্য প্রথমে ময়মনসিংহ যাত্রা করেন; এই পথ তাঁহাকে নৌকাযোগে অতিক্রম করিতে হয়। তখনও এই অঞ্চলে রেলপথ নির্ম্মিত হয় নাই, এবং ষ্টীমারও চলিতে আরম্ভ করে নাই। তখন কুষ্টিয়াতেই পূর্ব্ববঙ্গ-রেলপথ শেষ হইয়াছিল। কুষ্টিয়া হইতে ঢাকা পর্য্যন্ত সপ্তাহে একবার মাত্র ষ্টীমার চলিত। বাড়ী হইতে যাত্রা করিয়া কৃষ্ণগোবিন্দ ষষ্ঠ দিনে ময়মনসিংহে পৌঁছিতে পারিয়াছিলেন; অথচ তাঁহাদের গ্রাম হইতে ময়মনসিংহের দূরত্ব আশী মাইলের অধিক নহে!

কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত

কৃষ্ণগোবিন্দ ময়মনসিংহে তাঁহার মাতুলের বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহ তখন অতি ক্ষুদ্র নগর। তিনি সন্ধ্যার পর মাদুরে বসিয়া মৃৎপ্রদীপের মৃদু আলোকে লেখাপড়া করিতেন। একটা বেতের ঝাঁপিতে তাঁহার জিনিসপত্র থাকিত। একখানি মৃৎকুটীরে তাঁহাকে বাস করিতে হইত। তিনি ময়মনসিংহ জিলাস্কুলের নিম্নতম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। তাঁহার মামার বাসায় কোন স্ত্রীলোক ছিল না। ঠাকুর যাহা রাঁধিয়া দিত, তাহাই তাঁহাকে অতি কষ্টে গলাধঃকরণ করিতে হইত। এইরূপ অখাদ্য খাইয়া সেই শৈশবকালে তাঁহার যে 'অম্বলের ব্যারাম' হইয়াছিল, সেই ব্যাধি হইতে তিনি জীবনে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই।

এই সময় ময়মনসিংহ জিলা-স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন সুবিখ্যাত

বৈজ্ঞানিক সার জগদীশচন্দ্র বসুর পিতা ভগবানচন্দ্র বসু। যে সকল ছাত্র তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই কর্ম্মজীবনে প্রসিদ্ধিলাভ করেন ; তন্মধ্যে স্বর্গীয় ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসু সর্ব্বপ্রধান। আনন্দমোহন ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এই স্কুল হইতেই এণ্ট্রান্স পাশ করেন। কৃষ্ণগোবিন্দ তখন খুব নীচের ক্লাশের ছাত্র হইলেও আনন্দমোহন তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। আনন্দমোহন বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রগণকে লইয়া একটি সমিতি স্থাপন করেন, তাহার নাম ছিল "মনোরঞ্জিকা সভা।" প্রতি রবিবার অপরাহ্নে এই সভার অধিবেশন হইত। জিলার য়ুরোপীয় কর্ম্ম-

শ্রীরামকৃষ্ণ দেব

চারীরা স্কুলের ছেলেদের শিক্ষায় উৎসাহ দিতেন, তাহাদের পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন, এবং তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া খেলাধূলাও করিতেন। এরূপ সহযোগিতা একালে অত্যন্ত দুর্লভ হইয়াছে। কৃষ্ণগোবিন্দ লিখিয়াছেন, একদিন স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর মিঃ রবিনসন তাঁহাদের স্কুলে ম্যাজিক-লণ্ঠনে অনেক ছবি দেখাইতেছিলেন ; কৃষ্ণগোবিন্দ তখন ক্ষুদ্র বালক, তিনি অনেক দর্শকের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া-থাকায় কিছুই দেখিতে পাইতেছিলেন না। সেই সময় ক্যালেক্টর মিঃ বিভারিজ তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন। কৃষ্ণগোবিন্দ কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না শুনিয়া মিঃ বিভারিজ তাঁহাকে কোলে লইয়া ছবি দেখাইয়াছিলেন। কোন ইংরেজ সিভিলিয়ান্ বাঙ্গালীর ছেলেকে কোলে লইয়া তাহাকে খেলা দেখাইতেছেন, একালে ইহা কল্পনাতীত!

কৃষ্ণগোবিন্দ ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে ময়মনসিংহ ত্যাগ করিয়া ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ঢাকার পগোজ স্কুলে প্রবেশ করেন। এন্, পগোজ নামক আরমানি জমিদার তাঁহার ঢাকার বাসভবনে এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই সময় বহু আর্মেনিয়ান বণিক্ ব্যবসায় উপলক্ষে ঢাকায় বাস করিত। এই সময় বঙ্গচন্দ্র রায় পগোজ স্কুলের শিক্ষক ছিলেন ; পরে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক হইয়াছিলেন। তিনিই কৃষ্ণগোবিন্দের হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ বপন করেন ; তবে কৃষ্ণগোবিন্দের পিতাও ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরাগী ছিলেন। সে সময় ঢাকায় ছাত্রগণের বাসের জন্য হষ্টেল, বা বোর্ডিং-হাউস প্রভৃতি স্থাপিত না হওয়ায় ছাত্ররা বিভিন্ন দলে ভিন্ন ভিন্ন মেসে বাস করিত। এই সময় যে ভৃত্য কৃষ্ণগোবিন্দের পরিচর্য্যা করিত, তাহার মাতাকে কৃষ্ণগোবিন্দের পিতামহ ক্রয় করিয়া দাসীত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে, কৃষ্ণগোবিন্দের পিতামহের সময়েও এ দেশে দাস বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত ছিল ; তবে আইন অনুসারে এই প্রথা বিলুপ্ত হইয়াছিল। ক্রীতদাসীর পুত্র হইলেও এই ভৃত্যকে কৃষ্ণগোবিন্দ 'দাদা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন ; তাঁহাদের পরিবারে এই ভৃত্য ক্রীতদাসীর পুত্র বলিয়া অবজ্ঞাত হইত না। হিন্দু সমাজের এই বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য।

কৃষ্ণগোবিন্দের পিতা বঙ্গভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন, অল্প ফারসীও জানিতেন, কিন্তু ইংরেজী জানিতেন না। তিনি পৈতৃক বিষয়সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। পিতামাতার প্রতি কৃষ্ণগোবিন্দের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তাঁহার পিতামহীর পিতা তাঁহার জন্মের পরও জীবিত ছিলেন, এবং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৯৬ বৎসর হইলেও তাঁহার দুই পাটি দন্তই কর্ম্মক্ষম ছিল। একালে এ দেশে দন্তের এরূপ সৌভাগ্য একান্ত বিরল—যদিও দন্তের পরিচর্য্যার জন্য দেশী, বিলাতী বহুবিধ মাজন ও বুরুষ নিত্য বাজার ছাইয়া ফেলিতেছে!

ঢাকার পগোজ স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া কৃষ্ণগোবিন্দ একটি সহাধ্যায়ী লাভ করিয়াছিলেন, তিনি প্রসন্নকুমার রায় (পি, কে, রায়)। প্রসন্নকুমার ইংলণ্ডে শিক্ষা লাভ করিয়া এ দেশে আসিয়া শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। প্রসন্নকুমারের সহিত কৃষ্ণগোবিন্দ চিরজীবন বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। প্রায় এই সময়েই ভক্তপ্রবর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার-কার্য্যে ঢাকায় গমন করেন। তাঁহার বাগ্মিতা, তর্কশক্তি, এবং অনন্যসাধারণ ধর্ম্মনিষ্ঠায় মুগ্ধ হইয়া পূর্ব্ববঙ্গের অনেক শিক্ষিত যুবক উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু গোস্বামী মহাশয় পরিণত বয়সে বহু অভিজ্ঞতা লাভের ফলে ও ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের উপদেশ-প্রভাবে হিন্দুধর্ম্মের ক্রোড়ে আসিয়া শান্তিলাভ করিয়াছিলেন ; গোস্বামী মহাশয়ের আধ্যাত্মিক জীবনের এই পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কৃষ্ণগোবিন্দ কোন কথাই বলেন নাই ; এবং পরমহংস দেব সেই সময় এ দেশের সুশিক্ষিত ও চিন্তাশীল যুবকগণের হৃদয় কি ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, অথবা

স্বনামধন্য স্বামী বিবেকানন্দ য়ুরোপ ও আমেরিকায় হিন্দুধর্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া স্বদেশেও কিরূপ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন—তৎসম্বন্ধে তিনি কোন অভিমত প্রকাশ করেন নাই। পরমহংস দেবের উপদেশে শিক্ষিত হিন্দু যুবকগণের ধর্ম্ম-জীবনের এই পরিবর্ত্তন তিনি উল্লেখযোগ্য মনে না করিলেও কেশবচন্দ্র সেনের ধর্ম্মভাব, নিষ্ঠা ও প্রতিভার প্রশংসা-কীর্ত্তনে তিনি কার্পণ্য করেন নাই। কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর ন্যায় উচ্চশিক্ষিত, দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিরপেক্ষতার এইরূপ অভাব-দর্শনে ব্যথিত হইতে হয়। তাঁহার সময়ে দেশের রাজনৈতিক জাগরণ, এবং স্বদেশবাসীর স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপনাও তিনি আমলাতন্ত্রের অনুদার, সহানুভূতিহীন দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ না করিলেই শোভন হইত; তবে শ্রীঅরবিন্দের নিঃস্বার্থ স্বদেশপ্রেম ও মাতৃভূমির নিষ্কাম সেবাব্রত তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি ভুলিতে পারেন নাই যে, শ্রীঅরবিন্দ ব্রাহ্মের পুত্র ও দৌহিত্র হইয়াও সনাতন ধর্ম্মের পক্ষপাতী।

কৃষ্ণগোবিন্দ ব্রাহ্মধর্ম্মে আকৃষ্ট হইলেও পনের বৎসর বয়সে বিবাহ করেন; তাঁহার পিতা হিন্দুশাস্ত্রানুসারেই তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন, এবং এই বিবাহে তাঁহার দাম্পত্য-জীবন সুখময় হইয়াছিল। কৃষ্ণগোবিন্দ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াও দশ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। সেই বৎসর প্রায় ষোলশত পরীক্ষার্থী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। তিনি ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিভাগে এফ, এ পাশ করিয়াও সৌভাগ্যক্রমে ৩২ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। এরূপ দৃষ্টান্ত সেকালেও অত্যন্ত বিরল ছিল।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন ঢাকায় গমন করেন। তাঁহার প্রভাবে ঢাকার অনেক শিক্ষিত যুবক ব্রাহ্মধর্ম্ম আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, এবং কৃষ্ণগোবিন্দের পিতামাতাও ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হইলে কৃষ্ণগোবিন্দের জ্যেষ্ঠা ভগিনী ঢাকায় ব্রাহ্মবিধানে বিবাহিতা হইয়াছিলেন; ইহাই ঢাকায় সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্ম-বিবাহ। এই বিবাহে পৌরোহিত্য করিবার জন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা হইতে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ও রামচন্দ্র বিদ্যাভূষণকে ঢাকায় প্রেরণ করেন। লক্ষ্য করিবার বিষয়, ব্রাহ্ম-প্রচারক হইলেও ইঁহারা উভয়েই উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। কেবল ব্রাহ্মরা নহেন, খৃষ্টান হইয়াও ব্রাহ্মণরা সেকালে জাতির গৌরব ত্যাগ করিতেন না। বাল্যকালে শুনিয়াছিলাম, একবার জ্ঞানেন্দ্র-মোহন ঠাকুর রেভারেণ্ড লালবিহারী দের সহিত ট্রেণে ভ্রমণকালে লালবিহারী জ্ঞানেন্দ্রমোহনের ফরসীতে ধূমপান করিলে জ্ঞানেন্দ্র-মোহন বলেন, "তুই সোনারবেণে খৃষ্টান, আর আমি ব্রাহ্মণ খৃষ্টান, তুই আমার হুঁকোর জাত মারলি যে!"

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে গিল্‌ক্রাইষ্ট ফণ্ডের ট্রাষ্টিগণ ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রদের ইংলণ্ডে অধ্যয়নের জন্য দুইটি বৃত্তি স্থাপন করেন। কৃষ্ণগোবিন্দ এই বৃত্তিলাভ করিয়া মনোমোহন ঘোষের পরামর্শে তাঁহার মধ্যম সহোদর লাল-মোহন ঘোষের সহিত ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। লালমোহন সিভিল-সার্ভিস পরীক্ষায় প্রস্তুত হইবার জন্যই এই সময় ইংলণ্ডে গমন করেন। এ সময় একমাত্র পি, এণ্ড ও কোম্পানীই ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে জাহাজ চালাইতেন। এই জাহাজে ভারত হইতে ইংলণ্ডে গমনের প্রথম শ্রেণীর ভাড়া প্রায় এক হাজার টাকা ছিল; কিন্তু সুয়েজ হইতে আলেকজান্দ্রিয়া পর্য্যন্ত রেল-ট্রেণে যাইতে হইত। ইহা 'পি, এণ্ড ও ওভারল্যাণ্ড সার্ভিস' নামে পরিচিত ছিল। তখন পর্য্যন্ত সুয়েজ-যোজক খালে পরিণত হয় নাই। অন্য ষ্টীমার ডাক ও যাত্রী লইয়া আলেক-জান্দ্রিয়া হইতে মার্সেলে ও সাউদামটন বন্দরে গমন করিত। সে

স্বামী বিবেকানন্দ

সময় সওদাগরী জাহাজগুলি আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ইংলণ্ড হইতে ভারতে যাতায়াত করিত। কৃষ্ণগোবিন্দ ও লাল-মোহন ১২ই সেপ্টেম্বর প্রভাতে কলিকাতার মেটিয়াবুরুজ হইতে 'মঙ্গোলিয়া' জাহাজে আরোহণ করেন। এই জাহাজখানি আড়াই হাজার টনের বৃহৎ জাহাজ। ইহাতে ত্রিশ জন প্রথম শ্রেণীর যাত্রী ছিলেন। তাঁহারা আলেকজান্দ্রিয়া হইতে 'ট্যাঙ্গুজ' জাহাজে সাউদামটনে যাত্রা করেন। এখানি আঠার শত টনের ক্ষুদ্র জাহাজ। ইহা ২৪শে অক্টোবর সাউদামটনে উপস্থিত হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে ইংলণ্ডে পৌঁছিতে তাঁহাদের এক মাস বার দিন লাগিয়াছিল; অথচ কিছুদিন পূর্ব্বে বিমান-ডাক সপ্তাহে দুই বার যাতায়াত করিত।

এই সময় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংলণ্ডে ছিলেন, তাঁহার বয়স অধিক হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে সিভিল-সার্ভিস হইতে বর্জ্জন করা হইয়াছিল। এই সময় ১৭ বৎসর হইতে ২১ বৎসর পর্য্যন্ত

সিভিল-সার্ভিসে প্রবেশের বয়স নির্দ্দিষ্ট ছিল। সুরেন্দ্রনাথের পিতা ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সে সময় কলিকাতার সম্ভ্রান্ত সমাজে প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন। তিনি তাঁহার পুত্রের অনুকূলে সিভিল-সার্ভিস সার্ভিসে প্রবেশ করিয়াও অশ্বারোহণে অকৃতকার্য্য হওয়ায় সিভিল সার্ভিসে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র বারীন্দ্র স্বদেশী যুগে সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণধনের কনিষ্ঠ পুত্র সমুদ্র-বক্ষে

কেশবচন্দ্র সেন

লালমোহন ঘোষ

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কমিশনরগণের নিকট যে আবেদন করেন, যুক্তিপূর্ণ বলিয়া তাহা গ্রাহ্য হওয়ায় সুরেন্দ্রনাথকে পরবৎসর সিভিল সার্ভিসে পুনর্গ্রহণ করা হয়; কিন্তু তাঁহাকে পুনর্ব্বার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল।

ইংরেজী ভাষায় লালমোহনের অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল। কৃষ্ণগোবিন্দ লিখিয়াছেন, তিনি লালমোহনের সহিত গাওয়ার ষ্ট্রীটের য়ুনিভারসিটি কলেজে যোগদান করিলে ইংরেজী সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক মরলে তাঁহাদিগকে একটি 'থিসিস্' লিখিতে দিয়াছিলেন। লালমোহনের রচনা এতই উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে, অধ্যাপক তাহা পাঠ করিয়া ক্লাশের সকল ছাত্রকে শুনাইয়াছিলেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে কেশবচন্দ্র সেন যে পাঁচ জন বন্ধুর সহিত লণ্ডনে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু ও ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। আনন্দমোহন ক্যাম্ব্রিজের ক্রাইষ্ট কলেজে যোগদান করেন। কৃষ্ণধন আই, এম, এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সিভিল সার্জ্জন হইয়াছিলেন, এবং রাজনারায়ণ বসুর এক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় মনোমোহন কবি, তিনি শিক্ষা বিভাগে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন; এবং শ্রীঅরবিন্দ সিভিল

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ

ইংলণ্ডগামী জাহাজের উপর জন্মগ্রহণ করায় 'বারীন্দ্র' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কৃষ্ণগোবিন্দ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা প্রদান করেন; মে মাসে পরীক্ষা-ফল প্রকাশিত হইলে তিনি জানিতে পারেন, প্রতিযোগিতায় ১১০ম স্থানে তাঁহার নাম বাহির হইয়াছে; কিন্তু ইহাতে তিনি ভগ্নোদ্যম না হইয়া পুনর্ব্বার পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। লালমোহন ঘোষও সেই বৎসর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা প্রদান করেন, কিন্তু তিনিও অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন; তাঁহার আর দ্বিতীয় বার চেষ্টা করিবার সময় ছিল না। সেই বৎসর এক জন মাত্র ভারতবাসী সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। তাঁহার নাম আনন্দরাম বড়ুয়া। তিনি আসামের অধিবাসী। বার্ষিক দুই হাজার পাউণ্ডের সরকারী বৃত্তি পাইয়া তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন। এই বৎসরের শেষ ভাগে প্রসন্নকুমার রায়ও গিল্‌ক্রাইষ্ট বৃত্তি লইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। তিনি য়ুনিভারসিটি কলেজে যোগদান করেন।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে (প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে)

কৃষ্ণগোবিন্দ দ্বিতীয় বার সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা প্রদান করেন। সেই বৎসর অন্য কোনও ভারতবাসী সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই; কিন্তু কৃষ্ণগোবিন্দ প্রতিযোগিতায় সপ্তম স্থান অধিকার করেন। এই জন্য তিনি বঙ্গদেশে চাকরী প্রার্থনা করিলে তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করা হইয়াছিল।

কৃষ্ণগোবিন্দ সুবিখ্যাত সংস্কৃত-অধ্যাপক ডক্টর গোল্ডষ্টুকারের নিকট সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ডক্টর গোল্ডষ্টুকার পাণিনি ব্যাকরণে সুপণ্ডিত ছিলেন। কৃষ্ণগোবিন্দ লিখিয়াছেন, তিনি স্বদেশে তিন বৎসরে সংস্কৃতে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন,' ডক্টর গোল্ডষ্টুকারের অধ্যাপনায় ছয় মাসেই সংস্কৃতে তদপেক্ষা অধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ডক্টর গোল্ডষ্টুকার ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে নিউমোনিয়া রোগে প্রাণত্যাগ করেন; তখন তাঁহার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর মাত্র।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণগোবিন্দ সিভিল সার্ভিসের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তিনি সংস্কৃতে পারদর্শিতার জন্য ১৫ পাউণ্ডের পুরস্কার লাভ করেন; কিন্তু যে পাদরী বঙ্গভাষার পরীক্ষক ছিলেন, তিনি এই ভাষার ৫০ পাউণ্ডের পুরস্কারটি কৃষ্ণগোবিন্দকে প্রদান করেন নাই। কৃষ্ণগোবিন্দ লিখিয়াছেন—সেই পাদরী অপেক্ষা তিনি ভাল বাঙ্গালা জানিতেন।

কৃষ্ণগোবিন্দ ও লালমোহন একই দিনে মিডল-টেম্পলে আইন শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেকালে 'বারে' যোগদান করা একাল অপেক্ষা অনেক সহজ ছিল।

চারি বৎসর ইংলণ্ডবাসের পর কৃষ্ণগোবিন্দ স্বদেশযাত্রা করেন। তিনি সুয়েজে আসিয়া 'গোলকুণ্ডা' জাহাজে আরোহণ করেন; এই জাহাজ সুয়েজ হইতে কলিকাতায় আসিতেছিল; কিন্তু পথিমধ্যে একটি মগ্ন-শৈলে ধাক্কা লাগায় জাহাজ জখম হয়। অগত্যা 'গোলকুণ্ডা' জাহাজের আরোহীরা 'ভিনিসিয়া' জাহাজে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বোম্বাই নগরে অবতরণ করেন। বোম্বাই হইতে রেল-ট্রেণে হাওড়ায় আসিয়া তাঁহাদিগকে ফেরী-ষ্টীমারে গঙ্গা পার হইতে হইয়াছিল; কারণ, তখনও হাওড়ার পুল নির্ম্মিত হয় নাই।

কৃষ্ণগোবিন্দকে সর্ব্বপ্রথমে রাজসাহীতে কার্য্যভার প্রদান করা হয়। এই সময় সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল বাঙ্গালার ছোটলাট, এবং সার চার্লস বার্ণার্ড তাঁহার চীফ্-সেক্রেটারী ছিলেন। কৃষ্ণগোবিন্দ রাজসাহীর পরিবর্ত্তে বরিশালে চাকরীর প্রার্থনা করেন; কারণ, তাঁহার শৈশবের মুরুব্বি মিঃ বিভারিজ তখন বরিশালের কালেক্টর। কৃষ্ণগোবিন্দ কার্য্যে যোগদানের জন্য এক মাস সময় পাওয়ায় প্রথমে ঢাকায় গমন করেন। পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথম সিভিলিয়ান্ বলিয়া ঢাকার জনসাধারণ তাঁহাকে যে সভায় অভিনন্দিত করেন, মিঃ পগোজ সানন্দে সেই সভায় সভাপতিত্ব করিতে সম্মত হইয়াছিলেন; কারণ, কৃষ্ণগোবিন্দ তাঁহারই স্কুল হইতে এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া গৌরবপূর্ণ কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করেন। কৃষ্ণগোবিন্দ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে উঠিয়া ভাবাবেশে এরূপ বিহ্বল হইয়াছিলেন যে, তিনি কোন কথা বলিতে না পারিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়েন। তাহার পর তিনি তাঁহার সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবনে কোন সভায় বক্তৃতা করিবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি ঢাকা হইতে হস্তী আরোহণে স্বগ্রামে যাত্রা করেন; কিন্তু পথিমধ্যে সন্ধ্যা হওয়ায় এবং রাত্রিকালে হাতী না চলায় সুদীর্ঘ চারি বৎসর প্রবাস-যাপনের পর দশ মাইল হাঁটিয়া গভীর রাত্রিতে তাঁহাকে বাড়ী পৌছিতে হয়! গৃহবাসিগণ তখন নিদ্রাচ্ছন্ন; এজন্য স্বগ্রামে তাঁহার অভ্যর্থনার সকল আয়োজন ব্যর্থ হইয়াছিল। এই সময় বরিশালে জজ, অতিরিক্ত জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি সকলেই ইংরেজ সিভিলিয়ান্ ছিলেন। এ দেশে তখন বাঙ্গালী সিভিলিয়ান্ একান্ত বিরল।

কৃষ্ণগোবিন্দ বরিশাল হইতে দিনাজপুরে বদলী হইয়াছিলেন। দিনাজপুর হইতে তাঁহাকে সুন্দরবনের ভিতর দিয়া প্রথমে কলিকাতায় আসিতে হয়; তাহার পর ই, আই, রেলের লুপ লাইন দিয়া রাজমহল, রাজমহলে গঙ্গা পার হইয়া ১৪ ক্রোশ পাল্কীতে মালদহ, এবং মালদহ হইতে পুনর্ব্বার পাল্কীতে দিনাজপুর পৌছিতে হইয়াছিল। কিন্তু এখন এক দিনেই কলিকাতা হইতে দিনাজপুর যাওয়া যায়। এই সময় দিনাজপুর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী বগুড়া জিলায় দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছিল। কৃষ্ণগোবিন্দকে এই দুর্ভিক্ষ দমনের ভার প্রদান করা হয়। ভারতের বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক সেই সময় আদেশ করেন, দুর্ভিক্ষে যেন একটি লোকেরও প্রাণ নষ্ট না হয়। তাঁহার এই আদেশ পালনের জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল। এই সময় মিঃ ও' ডুরেল নামক সিভিলিয়ান 'ব্ল্যাক-প্যাম্ফ্লেট' নামক এক 'প্যাম্ফ্লেট' প্রকাশ করিয়া তাহাতে বাঙ্গালা সরকার কর্ত্তৃক বিপুল অর্থের অপব্যয়ের নিন্দা করায় ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল—সেই দুর্ভিক্ষে সরকার অর্থব্যয়ে এরূপ কৃপণতা করেন যে, সাহায্যাভাবে মাদ্রাজে অসংখ্য লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। তখন লর্ড লিটন ভারতের বড়লাট; তিনি সার রিচার্ড টেম্পলকে বাঙ্গালা হইতে মাদ্রাজে প্রেরণ করেন। তিনি দুর্ভিক্ষ দমনের জন্য যথোচিত চেষ্টা করেন নাই; উক্ত 'ব্ল্যাক-প্যাম্ফ্লেটের' প্রচারই তাহার কারণ। বাঙ্গালার অভিজ্ঞতায় মাদ্রাজ সরকার দুর্ভিক্ষ দমনের জন্য অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করিয়াছিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে বরিশালের কালেক্টর মিঃ বিভারিজ বাঙ্গালা সরকারের অসন্তোষভাজন হওয়ায় শাসন বিভাগ হইতে অপসারিত হইয়া বিচার বিভাগে নিযুক্ত হইয়াছিলেন; বরিশাল হইতে তাঁহাকে অন্য জিলায় বদলী করা হয়। মিঃ বিভারিজের ন্যায় যোগ্য কর্ম্মচারীর প্রতি অসন্তোষের কারণ সম্বন্ধে কৃষ্ণগোবিন্দ কোন কথার উল্লেখ করেন নাই। বরিশালের জিলা-জজ মিঃ টটেন্‌হাম এই সময় হাইকোর্টের জজিয়তি লাভ করায় মিঃ এইচ সদারল্যাণ্ড বরিশালের জজ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি যে সময় শ্রীহট্টের কালেক্টর ছিলেন, সেই সময় তাঁহারই চেষ্টায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিভিল সার্ভিস হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করেন নাই।

কৃষ্ণগোবিন্দ লিখিয়াছেন, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর ভীষণ ঝটিকায় ও বঙ্গোপসাগরের জলোচ্ছ্বাসে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ও বাখরগঞ্জ জিলা প্রায় বিধ্বস্ত হইয়াছিল। বরিশালের পটুয়াখালি মহকুমার কোন কোন স্থানেও বানের জল কুড়ি ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়াছিল! ঝটিকাবেগে খড়ের ঘর সমস্তই সমভূমি হইয়াছিল। নদীতে যে সকল নৌকা ছিল—সমস্তই ডুবিয়া গিয়াছিল। পটুয়াখালি মহকুমার সদরে এক কালীমন্দির ভিন্ন অন্য কোন আশ্রয়

ছিল না। জেলখানার কয়েদী হইতে মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত সকলকে সেই স্থানেই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

পুলিশের ভ্রমে সময়ে সময়ে কিরূপ বিচার-বিভ্রাট ঘটে, মিঃ গুপ্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে তাহার যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, এখানে তাহা উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন, তিনি যখন বাখরগঞ্জ জেলার পিরোজপুর মহকুমার ভার-প্রাপ্ত কর্ম্মচারী, সেই সময় মহকুমার এলাকায় উপর্য্যুপরি কয়েক স্থানে ডাকাতি হইয়াছিল। কোন থানার দারোগা কয়েক জন আসামীকে একটি ডাকাতিতে লিপ্ত ছিল বলিয়া চালান দিয়াছিল; সেই ডাকাতদের নিকট পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া দারোগা কিছু অলঙ্কারও আদালতে দাখিল করিয়াছিল। এক জন আসামী স্বীকার করায় তাহাকে 'এপ্রুভার' (রাজসাক্ষী) করিয়া তিনি (মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট) সকল আসামীকেই দায়রা-সোপরদ্দ করেন; কিন্তু দায়রা-আদালতে সেই মামলা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টর আর এক দল আসামীকে বিস্তর মালসহ ফৌজদারী সোপরদ্দ করিলেন। প্রথম ডাকাতি মামলায় যিনি ফরিয়াদী ছিলেন, এই মালগুলি যে তাঁহারই, ইহা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইলে, এবং এই দ্বিতীয় দলই যে ফরিয়াদীর বাড়ীতে ডাকাতি করিয়াছিল—ইহার অন্যান্য প্রমাণও সংগৃহীত হইলে, কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু প্রথম দলের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ প্রত্যাহার করিবার জন্য জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেটকে অনুরোধ করেন; অথচ প্রথম দলের আসামীরা অপরাধ স্বীকার করে, এবং চোরা-মালও কিছু কিছু তাহাদের নিকট পাওয়া যায়—একালেও এই প্রকার 'কল্পতরু' দারোগার অভাব আছে কি?

যাহা হউক, তদন্ত-ফলে পরে জানিতে পারা যায়, প্রথম ডাকাতের দলও ঘটনার রাত্রিতে ডাকাতি করিতে বাহির হইয়াছিল; কিন্তু দ্বিতীয় দলই ফরিয়াদীর বাড়ীতে ডাকাতি করিয়াছিল।

কৃষ্ণগোবিন্দ যে সময় উড়িষ্যার কেন্দ্রাপাড়া মহকুমায় বদলী হন, সেই সময় মিঃ এ, স্মিথ নামক এক জন স্কচ্‌ম্যান উড়িষ্যা বিভাগের কমিশনর ছিলেন; তিনি সুবিচারক ও এ দেশের লোকের পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু তিনি য়ুরোপীয় সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। মিঃ স্মিথ যে নিরপেক্ষ ও সাহসী বিচারক ছিলেন, কৃষ্ণগোবিন্দ তাহার একটি দৃষ্টান্তেরও উল্লেখ করিয়াছেন। মিঃ স্মিথ যখন যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, সেই সময় তিনি মরেল নামক দুর্দ্দান্ত ইংরেজ জমিদারকে প্রজার প্রতি উৎপীড়নের জন্য কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণগোবিন্দ লিখিয়াছেন, এই জন্যই তিনি য়ুরোপীয়গণের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। মিঃ স্মিথের ন্যায় নিরপেক্ষতা ও সৎসাহসের দৃষ্টান্ত একালে এ দেশে একান্ত বিরল। মরেল যশোহর জিলার প্রবল-প্রতাপ জমিদার ছিলেন। উৎপীড়িত প্রজারা তাঁহার অত্যাচারের প্রতিবাদ করিতে সাহস করিত না। শ্বেতাঙ্গ-সমাজ মরেলের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

কৃষ্ণগোবিন্দ জগন্নাথ দেবকে দর্শনের জন্য পুরী গমন করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী হইলেও গোঁড়া হিন্দু ছিলেন না বলিয়া তাঁহাকে জগন্নাথ দেবের মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ভারতে দ্বিতীয় বার আদমসুমার হইয়াছিল। সেই সময় উড়িষ্যার সুমার-সংক্রান্ত প্রাথমিক হিসাব তালপত্রে লৌহ-লেখনী দ্বারা লিখিত হইয়াছিল। উড়িষ্যার অনেক প্রাচীন দলিল-পত্র সেকালে ঐ ভাবে তালপত্রেই লিখিত হইত। কীট-পতঙ্গ এই সকল দলিল নষ্ট করিতে পারিত না, এবং কাল-প্রভাবেও তাহা জীর্ণ ও সেই সকল অক্ষর ক্ষয়প্রাপ্ত হইত না। কৃষ্ণগোবিন্দ লিখিয়াছেন, যাহাদের উপর লোক-গণনার ভার ছিল—তাহারা গ্রাম্য বিগ্রহের মন্দিরগুলিতে প্রবেশ করিয়া বিগ্রহগুলিকেও গৃহবাসীর তালিকাভুক্ত করিয়াছিল, এবং তাঁহাদের উপজীবিকার ঘরে লিখিয়াছিল পেশা—"ভোগ খাওয়া!" এই সময় ভারতের শিক্ষিত সমাজে পানদোষের প্রাবল্য লক্ষিত হইত; উড়িষ্যাতেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে কৃষ্ণগোবিন্দ তিন মাসের ছুটি লইয়া যাদবচন্দ্র গোস্বামী নামক স্থানীয় যে ডেপুটীর হস্তে কার্য্যভার অর্পণ করেন, তিনি সুদক্ষ কর্ম্মচারী হইলেও অতিরিক্ত মদ্যপানে রোগাক্রান্ত হইয়া অকালে পরলোকগমন করেন। সে কালে এ দেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি এই ভাবে অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে কৃষ্ণগোবিন্দ কেন্দ্রাপাড়া হইতে বদলী হইয়া মুরশিদাবাদের জয়েণ্ট-ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি এই সময় কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃতে 'অনার' পরীক্ষা প্রদান করেন, এবং তাহাতে উত্তীর্ণ হওয়ায় বড়লাটের নিকট হইতে প্রশংসা-পত্র সহ পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার লাভ করেন। সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পরীক্ষক

ছিলেন। একালের তরুণ সমাজে বহুভাষাজ্ঞ পাদরী কৃষ্ণমোহনের নাম সুপরিচিত নহে। পাদরী ডক্টর ডফ কলিকাতায় আসিয়া যে সকল সম্ভ্রান্ত যুবককে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, কৃষ্ণমোহন তাঁহাদের অন্যতম। কৃষ্ণমোহন পাদরী হইয়াছিলেন। তাঁহার তিন কন্যার এক কন্যাকে স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন বিবাহ করেন; এ জন্য প্রসন্নকুমার জ্ঞানেন্দ্রমোহনকে ত্যজ্যপুত্র করায় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বাবু (পরে মহারাজা, সার) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহার পরিত্যক্ত বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। কৃষ্ণমোহনের অপর দুই কন্যা হুইলার ও ষ্টুয়ার্ট নামক দুই জন ইংরেজ পাদরীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রাচীন পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে—মনোমোহিনী হুইলার সেকালে শিক্ষা বিভাগে ইন্সপেক্টরের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইংরেজী ভাষার সুবিখ্যাত অধ্যাপক হুইলার তাঁহারই পুত্র। ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনায় তিনি প্রচুর খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণগোবিন্দ যে সময় মুরশিদাবাদের জয়েণ্ট-ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই সময় ডাক্তার সার্কোর নামক আর্মেনিয়ান চিকিৎসক বহরমপুরের সিভিল সার্জ্জন ছিলেন। কৃষ্ণগোবিন্দ লিখিয়াছেন—ডাক্তার সার্কোর বড় মজার লোক ছিলেন; তিনি নানা প্রকার কৌতূহলোদ্দীপক গল্প বলিয়া বন্ধুবর্গকে হাসাইতেন। এই সময় মুরশিদাবাদের নিজামত-প্রাসাদের মহিলাগণকে পুরুষগণের দৃষ্টিপথ হইতে দূরে রাখা হইত; ডাক্তার সার্কোর তাহার একটি গল্প বলিয়াছিলেন। এক দিন নবাব-প্রাসাদের একটি জেনানা-মহিলার চিকিৎসার জন্য ডাক্তার সার্কোর আহূত হইয়াছিলেন। মহিলাটি আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত হইয়া তাঁহার ধমনীর বেগ পরীক্ষার জন্য ডাক্তারকে হাতখানি স্পর্শ করিতে দিয়াছিলেন, এবং পাছে অন্য কোন মহিলা হঠাৎ সে দিকে আসিয়া পড়েন, এই আশঙ্কায় এক জন খোজা ডাক্তারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চিৎকার করিতেছিল, "মর্দ্দানা আয়া হায়।" যেন তিনি ব্যাঘ্রাদির ন্যায় কোন হিংস্র জন্তু!

এই সময় সুবিখ্যাত গঙ্গাধর কবিরাজ বহরমপুরে কবিরাজী করিতেন। তিনি বৈদ্য ছিলেন বলিয়া কৃষ্ণগোবিন্দকে যথেষ্ট আদর করিতেন। কৃষ্ণগোবিন্দ লিখিয়াছেন— তিনি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন বলিয়া যে সকল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য গভীর ছিল না—তাঁহাদিগকে অত্যন্ত অবজ্ঞা করিতেন। সেই সময় তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর পার হইলেও তাঁহার দৃষ্টিশক্তি এরূপ প্রখর ছিল যে, অতি ক্ষুদ্র অক্ষরও তিনি পাঠ করিতে পারিতেন। এরূপ সুস্থ ও সবলদেহ প্রাচীন ব্যক্তির সংখ্যা একালে একান্ত বিরল। গঙ্গাধর কবিরাজের সুচিকিৎসার প্রশংসা স্থানীয় লোকের মুখে এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। এই সময় যিনি মুরশিদাবাদের নবাব ছিলেন, তিনি নবাব মীরজাফরের বংশধর। তাঁহার পিতার খেতাব ছিল—(বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার) নবাব-নাজিম। এতদ্ভিন্ন, তাঁহার বংশগত রাজনীতিক অধিকারও যথেষ্ট ছিল; কিন্তু তিনি সরকারের নিকট কিছু টাকা লইয়া তাঁহার সেই সম্মানিত খেতাব ও অধিকারগুলি বর্জ্জন করেন। অতঃপর তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ 'নবাব বাহাদুর' খেতাবে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন, এবং সাধারণ জমিদারশ্রেণীতে পরিণত হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু একটি বড় দুঃখজনক কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন।

তিনি লিখিয়াছেন, তাঁহার মুরশিদাবাদে অবস্থানকালে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মুরশিদাবাদের নূতন নবাব বাঙ্গালার ছোটলাটের নিকট 'নবাব বাহাদুর' খেতাব ও সনদ লাভ করেন। ছোটলাট সার রিভার্স টমসন্ মুরশিদাবাদ-প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সনদ প্রদান করেন। প্রাসাদের যে দরবার-কক্ষে নবাব বাহাদুরকে এই সনদ প্রদান করা হয়, সেই কক্ষেই তখন একখানি বৃহৎ চিত্র সংরক্ষিত ছিল; সেই চিত্রে দেখা যাইতেছিল—ক্লাইভ নবাব-নাজিমের সিংহাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান, এবং নবাব-নাজিম সিংহাসনে উপবেশন করিয়া কৃপাপ্রার্থী ক্লাইভকে সনদ প্রদান করিতেছেন!

কৃষ্ণগোবিন্দ একথাও লিখিয়াছেন যে, ক্লাইভ যথাকালে যদি মীরজাফরের সাহায্য না পাইতেন, তাহা হইলে তিনি নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হইতেন না। তথাপি বৃটিশ সরকার তাঁহার বংশধরগণের প্রতি যে নিন্দনীয় ব্যবহার করিয়াছিলেন, সে জন্য যদি কেহ সরকারের নিন্দা করে, তাহা হইলে তাহা ক্ষমার্হ বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু ভাগ্যচক্রের এই পরিবর্ত্তনে কাহার হৃদয় ক্ষোভে পূর্ণ না হয়?

এ সময় কাশিমবাজারের দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ী অত্যন্ত বৃদ্ধা। তিনি পর্দ্দার আড়ালে থাকিয়া কৃষ্ণগোবিন্দের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। তাঁহার দানের সীমা ছিল না। তাঁহার স্বামী মহারাজ কৃষ্ণনাথের সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল না। মহারাজ কৃষ্ণনাথ শিক্ষা-বিস্তারের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বন্দুকের গুলীতে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন; কিন্তু আত্মহত্যা করিবার পূর্ব্বে তাঁহার বিশাল সম্পত্তি একটি উচ্চ শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ও তাহার ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য উইল করিয়া দান করেন। এই উদ্দেশ্যে বহরমপুরে অট্টালিকা-শ্রেণীরও বনিয়াদ স্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু মহারাণী স্বর্ণময়ীর পক্ষে রাজীবলোচন রায় তাঁহার স্বামীর এই উইল বাতিল করিবার জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই চেষ্টা সফল হইলে মহারাণী স্বর্ণময়ী পুরস্কারস্বরূপ রাজীবলোচনকে তাঁহার দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করেন।

অতঃপর কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু ইলবার্ট-বিলের আলোচনা করিয়াছেন; পরে আমরা এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিব। উহা নানা জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

চম্পট-চম্পূ

[নক্সা]
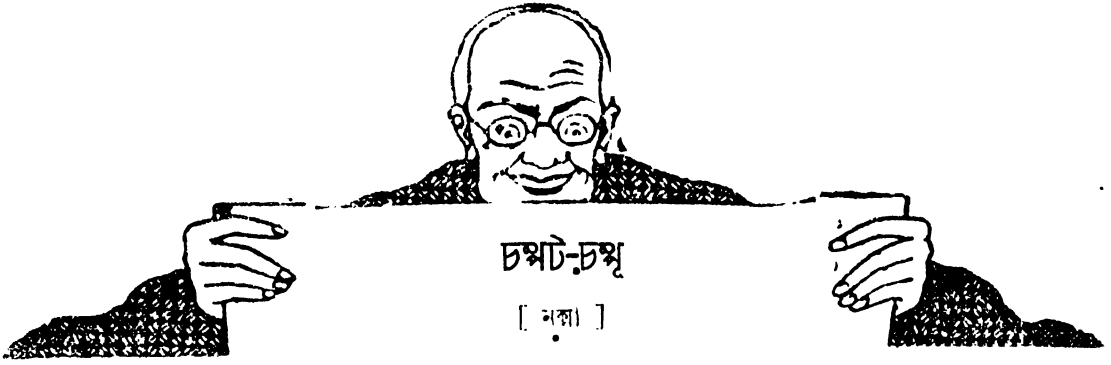
"আপনি কোথায় ঠিক করলেন ?"

"আমি ?—কাটোয়া ।"

"মহেন্দ্র বাবু, আপনি ?

"আমি ত এখনো কিছুই ঠিক্ করতে পারিনি । কাল আমতায় গিয়ে চারি দিক ঘুরে-ফিরে দেখে-শুনে এলুম । আমার আমতাই হোক, কি বর্দ্ধমানই হোক—এই ছু'য়ের কোন এক জায়গা ।"

"মতি বাবু 'ফ্যামিলী' কি জয়নগরেই পাঠালেন ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ ।"

শ্রীযুত রসময় দত্তর বৈঠকখানা-ঘরে বসিয়া পাড়ার পাঁচ জনের মধ্যে বোমার আতঙ্ক সংক্রান্ত আন্দোলন-আলোচনা চলিতেছিল ।

শশধর বাবু কহিলেন—"আমি ত বনগাঁ যাওয়াই ঠিক করেছি ; কিন্তু এই সব বিরাট্ 'ফার্ণিচার'—এগুলার কি উপায় করি ? বড্ড সখ কোরেই ও-সব কেনা । এমন কতকগুলো জিনিস আছে আমার, যা আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়—বুঝলে হীরুদা ?"

হীরুদা কহিল—"তা হোলে আর বনগাঁ গিয়ে কাজ নেই ; ঐগুলো বুকে আঁকড়ে ধরে এইখানেই পড়ে থাকো—যদি বোমা পড়ে, তোমার পিঠের উপরেই পড়বে, বুকের নীচে, তোমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় ঐ যে 'ফার্ণিচার'গুলো, ওগুলো তা হোলে রক্ষে পেয়ে যাবে ।"—বলিয়া হীরালাল হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল ।

গৃহকর্ত্তা রসময় বাবুর মুখের উপর একটা মহা-দুশ্চিন্তার ছাপ পড়িয়াছিল । এক পাশে নীরবে বসিয়া এই নিতান্ত অসময়ে, রসময় বিনা-বাক্যব্যয়ে অন্যমনস্ক ভাবে গড়গড়ার নল মুখে দিয়া ভুড়ুক্-ভুড়ুক্ শব্দে তামাক টানিয়া যাইতেছিলেন । হঠাৎ ইঁহাদেরই কাহার প্রশ্নে সচকিত হইয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন—"কি যে করি, কোথায় যে যাই, তার কিছুই ত ঠিক করতে পারচিনে । একটা সাজানো-গোছানো পাতা-সংসার ছেড়ে কোথায় যে···উঃ ! মাথা খারাপ হোয়ে ওঠ্‌বার যোগাড় হল !"

"আপনার ভাড়াটে-বাবুটি বুঝি কাল পিঠ-টান্ দিয়েছেন রসময় বাবু ?"

রসময় বাবুর বুকের ভিতর হইতে আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল ; কহিলেন—"সাত মাসের ভাড়া বাকী—সাড়ে তিনশো-খানি মুদ্রা ! দিব্বি বোমা'র সুবিধে পেয়ে প'য়ে আকার দিলেন,···বলে গেলেন—'কি করবো বলুন ; ব্যাপার ত দেখচেন ! দেশে পৌছেই আপনার সব টাকা পাঠিয়ে দেবো ; জিনিষপত্তর সবই থাকলো এখানে ।'—উঃ ! ধনে-প্রাণে এবার মরতে হবে আর কি !"

"তা, জিনিষ-পত্তর তা হোলে সব তিনি রেখে গেছেন ?"

একটু দুঃখের হাসি হাসিয়া রসময় কহিলেন—"তা রেখে গেছেন বটে, ভাড়াটা আমার প্রায় উঠে আসবে আর কি !—খান-পাঁচ-ছয় ভাঙ্গা চেয়ার, দু'টো দেবদারু কাঠের র‍্যাক, বিস্কুট-বালীর কতকগুলো খালি টিন, ডজনখানেক মাটীর হাঁড়ি, আর এক-রাশ ক্যালেণ্ডারের ছবি !"

মতিবাবু দেয়ালের ঘড়িটার দিকে চাহিয়া উঠিবার উপক্রম করিলেন ; কহিলেন—"আপনাদের আর কি বলুন ? যিনি যেখানে পারেন—চলে যান । আমার ত আর পালাবার উপায় নেই । বোমার হাত থেকে যদিই বা এড়াতে পারি, কিন্তু আফিসের হাত থেকে আর এড়াবার জো নেই । যাই, এদিকে ন'টা বাজে !"

ক্রমে সকলেই উঠিয়া গেলেন । রসময় একা বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন—

কি করা যায় ? এক-বাড়ী জিনিস-পত্তর শুদ্ধু এই পাতা-সংসার ফেলে কোথায়ই বা যাই ? আর না গিয়েই বা এখানে এ অবস্থায় থাকি কি করে ? উঃ—ভীষণ সমস্যা ! ভাড়াটে-বেটা সাড়ে-তিনশো টাকায় ঘা দিয়ে বে-মালুম সরে পড়লো ! ব্যাঙ্কের টাকাগুলো তুলে নিতে হবে । রাখিই বা কোথা ? এত সব আসবাব-পত্তর, বাসন-কোসন, বই-টই—এ সবেরই বা কি ব্যবস্থা করি ? দেড়শো টাকা দিয়ে 'ওক' কাঠের 'সেক্শানাল্ বুক-কেসটা' এই সে-দিন কিনে নিয়ে এলুম ! অমন সুন্দর ড্রেসিং টেবিলটা ! আড়াইশো টাকা দাম । অমন বড় আয়না-ওলা আলমারীর মত আলমারী—ক'টা বাড়ীতে দেখতে পাওয়া যায় ? অমন সুন্দর 'আমেরিক্যান্ রকিং

চেয়ার' দু'খানা! কত ভাল ভাল সখের জিনিষ—সবই ফেলে যেতে হবে আর কি! উঃ!—নাঃ, কোথাও যাব না; যদি মরতে হয়—এইখানেই মরবো। বরাতে যা থাকে, হোক।

ভিতর দিকের দরজাটা একটু ফাঁক হইল। সেই ফাঁকে মুখ বাড়াইয়া স্ত্রী জ্ঞানদা কহিল—"যাবে না? আমার ত রান্না হোয়ে গেল। চান্ কোরে খেয়ে নাও এসে।"

এগারোটা সতরর ট্রেণে রসময়ের রাণাঘাটে বাড়ী দেখিতে যাইবার কথা। সুতরাং রসময় স্নানাহারের জন্য উঠিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন। জ্ঞানদাকে কহিলেন—"নেপাটা কোথায়? সে আমার সঙ্গে গেলে ত ভাল হোত।"

জ্ঞানদা কহিল—"সে সেই ঘুম থেকে উঠেই বেরিয়েছে, বেলা বারটায় হয় ত ফিরবে! ২৫।২৬ বছরের ধেড়ে ছেলে, একটু হুঁস্-পবনও নেই! এই ডামা-ডোলের সময়—তা একটা কুটো নেড়েও ওর দ্বারা সংসারের কোন উপ্গার নেই! কথাতেই আছে—'জন-জামাই-ভাগনা, তিন নয় আপনা'।"

নৃপেন রসময়ের ভাগিনেয়। বাল্যে মা-বাপ হারা হইয়া এতাবৎ কাল সে রসময়েরই পোষ্য। তাহার বিরুদ্ধে মামী যখন ঘরে তিক্ত মন্তব্য করিল, সে সময়ে সে 'পার্ক-সাইড কেবিনে' বসিয়া পর পর দুই কাপ চা পানান্তে, তথায় উপবিষ্ট দুই-চারি জন বন্ধুর সহিত বোমা সম্বন্ধে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত। বোমা পড়িবে, কি পড়িবে না—এই লইয়াই তর্ক। তর্ক ক্রমে কলহ, এবং কলহ পরিশেষে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরিণত হইল। যুদ্ধ শেষ করিয়া যখন গৃহে ফিরিল, তখন দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। জ্ঞানদা কহিল—"হ্যাঁ রে, বিনা-কাজে এই রকম টো-টো কোরে ঘুরে বেড়াবি! এই সময়টা ওঁকে একটু সাহায্য করলেও ত অনেক উপ্গার হয়!"

মাতুলানীর কথার কোন উত্তর না দিয়া নৃপেন গামচা-খানা কাঁধে ফেলিয়া বাথরুমের দিকে অগ্রসর হইল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার অনেক পরে রসময় রাণাঘাট হইতে ফিরিয়া আসিলেন। জ্ঞানদা আসিয়া সাম্নে দাঁড়াইল; জিজ্ঞাসা করিল—"কি হোল?"

"নাঃ, রাণাঘাটে হ'বে না। প্রায় বাড়ীই আর খালি নেই। দু'-একখানা যা আছে, তা বাসের অযোগ্য; তা'রই ভাড়া চায় ৪০।৪৫ টাকা। চুর্ণির ধারে একখানা আছে, সেটা এক রকম চলতে পারে, ভাড়াও সুবিধে ছিল,—২৫ টাকা, কিন্তু···"

"তা, সেই ত সুবিধে ছিল। সেইখানাই ঠিক কোরে এলে না কেন?"

"ঠিক ত করতুম, কিন্তু শুনলুম, বাড়ীটায় না কি ভুতের ভয়!"

"তা হোলে ওখানে ত আর হবে না; কিন্তু আর দেরী করাও ত চলবে না। পেছনের বাড়ীর গাঙ্গুলীরা আজ সব চলে গেল। মোড়ের মাথার ঐ বড় বাড়ীর ওরাও চলে গেল!" একটা দুর্ভাবনা ও আতঙ্কের ছায়া জ্ঞানদার মুখখানাকে ছাইয়া ফেলিল।—"পিসিমা বুড়ো মানুষ, ভয়ে একেবারে সারা হোয়ে যাচ্ছে! যেখানে হোক শীগ্‌গীর একটা ব্যবস্থা করে ফেল।"

রসময় কহিলেন—"খুঁজতে কি আর কসুর করচি? সবই ত দেখ্‌তে পাচ্চ। টাকা-পয়সাও জলের মত খরচ হচ্চে, কিন্তু···"

"আচ্ছা, টেঁপীর মা'রা ত মধুপুর গেল; আমাদেরও ওখানে গেলে হয় না?"

"মধুপুর? সব্বোনাশ! সেখানকার খবর শোননি বুঝি? এত লোক গিয়ে সেখানে জমেচে যে, দুধ হোয়েছে টাকায় দু'সের, আলু ছ'আনা ক'রে সের; বাঁধা-কপির ওপরকার মোটা পাতাগুলো—যা লোকে অখাদ্য ব'লে ফেলে দেয়, তা-ই বিক্রী হোচ্চে চার আনা সের!"

"আচ্ছা—নবদ্বীপ?"

"নবদ্বীপে আর তিল-ধারণেরও স্থান নেই। তবে সহরের বাইরে মাঠে তাঁবু খাটিয়ে থাকা যেতে পারে।"

দালানের টেবিলের ধারে নেপু চেয়ারের উপর পা তুলিয়া বসিয়া নভেল পড়িতেছিল। টপ্ করিয়া সে মন্তব্য প্রকাশ করিল—"অবশ্য—আমাদের তাঁবুও নেই, আর তা খাটিয়ে বাস করা আমাদের অভ্যাসের বাইরে; কিন্তু কেউ যদি তাই থাকে, তা হোলে সেইখানেই আগে বোমা পড়বে। আর তা ছাড়া, নবদ্বীপ ত চলবেই না; বিস্তর লোকের ভীড় জমে ওখানে যে 'এপিডেমিক' লেগে গেছে!"

রসময় কহিলেন—"দেখ, আমার মাথা ঘুরচে। মিছরির সরবৎ একটু থাকে ত দাও, খেয়ে শুয়ে পড়ি।"

জ্ঞানদার মাথা না ঘুরিলেও, বুকের ভিতরটা সর্ব্বক্ষণই তাহার ধড়াস্-ধড়াস্ করিতেছিল। বুকখানা হাত দিয়া চাপিয়া-ধরিয়া সে রসময়ের জন্য সরবৎ আনিতে চলিয়া গেল।

২

পরের কয় দিন ধরিয়া কলিকাতার বাহিরে নানা স্থানে খোঁজা-খুঁজির আর অন্ত রহিল না! কালনা, কাটোয়া, উলুবেড়ে, আমতা, যশোর—কোন স্থান বাদ গেল না; কিন্তু সুবিধামত বাড়ী কোথাও মিলিল না। নেপু পরামর্শ দিল—"খুলনা সব চেয়ে সুবিধের জায়গা; সম্ভবতঃ ভাল বাড়ীও সুবিধেমত ভাড়ায় পাওয়া যাবে। জিনিস-পত্তরও বেশ সস্তা, অথচ কোলকাতা থেকে পঞ্চাশ মাইলের······"

বাধা দিয়া রসময় কহিলেন—"চলবে না রে, চলবে না; ওখানে কিছুতেই চলবে না। ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক স্থান ঐ খুলনা—সুন্দরবন 'এরিয়া'র ভেতর; 'বে-অব-বেঙ্গল'এর একেবারে মুখে!"

জ্ঞানদা অতিমাত্রায় চঞ্চল হইয়া কহিল—"তা হোলে বোসে বোসে ওই রকম ভাবনা-চিন্তেই কর, আর এদিকে বোমা পড়ুক মাথায়! পাড়ার লোক একে একে যে যেখানে পারলে চলে গেল, তোমার আর······

সেই দিনই রসময় জয়নগর যাত্রা করিলেন, এবং জয়নগর, মজিলপুর, ফুটিগোদা প্রভৃতি গ্রাম ঘুরিয়া, অবশেষে মজিলপুরে একখানি বাড়ী পছন্দ করিয়া আসিলেন। ৩২ টাকা, ভাড়া। এক মাসের ভাড়া অগ্রিম বায়না দিতে হইবে।

পরদিন বত্রিশটা টাকা লইয়া রসময় অগ্রিম দিবার জন্য জয়নগর ছুটিলেন; কিন্তু যাওয়া বৃথা হইল। তাঁহার সেখানে পৌছিবার পূর্ব্বেই এক মাদ্রাজী উহার ৪০ টাকা ভাড়া ঠিক করিয়া দুই মাসের ভাড়া অগ্রিম দিয়া রসিদ লইয়া গিয়াছে। বাড়ীওলা উপদেশ দিল—"এখানে আর বাড়ী পাবেন না; তবে এখান থেকে আর গোটা-দু'তিন ষ্টেশনের পর লক্ষ্মীকান্তপুরে যদি যান, সেখানে বাড়ী পেতে পারেন। খুব বড় একটা বাড়ী আছে, সেটা না কি 'পার্ট-পার্ট' ভাড়া দিচ্ছে। সে হোলে আপনার খুব সুবিধে হবে। এই একটা-পাঁচের গাড়ীতে গিয়ে একবার ঘুরে আসুন না।"

অগত্যা একটা-পাঁচের গাড়ীতে রসময় লক্ষ্মীকান্তপুর যাত্রা করিলেন।

সেখানে গিয়া দেখিলেন, হ্যাঁ—খুব প্রকাণ্ড বাড়ীই বটে, কিন্তু তাহাতে আর স্থান নাই। সমস্ত দোতালাটা এক মাড়োয়ারী ভাড়া লইয়া আছে। নীচের তলাটাকে ছয়টি ভাগে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক ভাগে দুইখানা করিয়া শয়ন-ঘর, একখানা দরমা-ঘেরা গোলপাতার রান্নাঘর, আর পাইখানার জন্য সঙ্কীর্ণ উঠানের একধার দরমা দিয়া ঘেরা। যাঁর বাড়ী, তিনি বলিলেন—"পশ্চিম দিকের কোণের 'ফ্ল্যাট্'টা খালি ছিল, আজই সকালে এক পাঞ্জাবী বাস্-ওলা ওখানে এসেচে।"

রসময় জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওর পাশেরটা?"

"ওটায় একটা চীনে মিস্ত্রী থাকে। তার স্ত্রী এখন ঘরে আছে, সে সন্ধ্যার ট্রেণে কল্‌কাতা থেকে ফিরবে। ভারি ভদ্র লোক···"

"তা হোলে আর খালি নেই কি?"

"আজ্ঞে না। এদিক্‌কার তিনটে পার্টে, এক জন নেপালী, এক জন উড়িয়া, আর এক জন আপনাদের কায়স্থ ভদ্রলোক আছেন। তবে ঐ গোয়াল-ঘরখানা এখনও খালি আছে। ওটা এক-আধটু মেরামত কোরে দিলে, ছোট্ট-খাট্টো একটা ফ্যামিলীর চলতে পারে; ঘরটাও খুব বড়। তা ওতে কি আপনারা থাকতে পারবেন? ভাড়া না-হয় সুবিধে কোরে দিতুম।"

"রান্নাঘর?"

"রান্নার জন্য একটা চালা পাশেই তুলে দেবো। সেটাও চাই বই কি!"

"পাইখানা?"

"ওটার অভাব—সনাতন প্রথা অবলম্বনে পূর্ণ করতে হবে" বলিয়া বাড়ী-ওলা বাবুটি হো-হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

হতাশ ভাবে রসময় একবার মুক্ত আকাশের দিকে চাহিলেন। এই চাহনি ভগবানের স্মরণে কিম্বা শ্রীবোমার সন্ধানে, তাহা ঠিক বোঝা গেল না। ঊর্দ্ধাকাশ হইতে দৃষ্টি নামাইয়া রসময় ধীর-মন্থর গতিতে ষ্টেশনের পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

তখনো অনেকটা বেলা ছিল। রসময় বারুইপুর ষ্টেশনে ট্রেণ হইতে নামিয়া পড়িলেন।

সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিতেই জ্ঞানদা কহিল—"কি হোল?"

"হয়েচে—অনেক খোঁজা-খুঁজি কোরে বেশ ভাল জায়গায় বাড়ী পেয়েছি। তবে জয়নগরে হোল না, সে বাড়ী পাওয়া যাবে না।"

"এ তবে কোথায় হোল?"

"বারুইপুর; চমৎকার হবে। এখন তড়ি-ঘড়ি এখান থেকে সরে পড়তে পারলেই হয়। ৩৫ টাকা কোরে ভাড়া। তিন মাসের ভাড়া আগাম দিতে হবে; দিয়ে এলুম।"

"তুমি ত ৩২ টাকা নিয়ে গেছলে, অত টাকা দিলে কোত্থেকে?"

"৩২ টাকা নগদ দিলুম আর ঘড়ি-আংটি রেখে এলুম। সেখানে গিয়ে বাকী ৭৩ টাকা দিয়ে ওগুলো সব ফিরিয়ে নিতে হবে।"

সারা-দিন ধরিয়া রসময়ের বেজায় পরিশ্রম হইয়াছে; তবে আজ অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছেন। এক কাপ চা-পানের পর ধূমপান করিতে করিতে রসময় বারুইপুর যাওয়ার ব্যবস্থা সম্বন্ধে নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—

"খান-দু'তিন 'লরি' লাগবে। ভাল ভাল ফার্ণিচার-গুলো সবই নিয়ে যেতে হবে। কালই ব্যাঙ্ক থেকে টাকাগুলো তুলবো। কতক টাকা সঙ্গে নোব, কিছু সোণা কিনবো, সোণার যে দাম হয়েছে—আগে যদি কিনতুম। আর বাকী টাকা বাহিরের দশটা ব্যাঙ্কে ছড়িয়ে রাখবো। সব সঙ্গে রাখা যুক্তিযুক্ত নয়; সেখানে চুরি

হওয়াও অসম্ভব নয়। উঃ! ভগবান্! শান্ত পুকুরের জলে এমনি ভাবে সমুদ্রের তুফান তুলে দিলে? আজকের কাগজখানাও পড়া হ'ল না। রেঙ্গুণের অবস্থাটা যে কি হোল, তা···শুক্রবারের মধ্যেই পালাবো; এই তিনটে দিন বাঁচিয়ে রেখো নারায়ণ!—কে?"

"আমি নেপু। আপনি বারুইপুরে না কি বাড়ী ঠিক কোরে এলেন?"

"হাঁ।"

"কিন্তু খুবই বিপদের জায়গা ওটা।"

"কেন—কেন?"

"ওটা যে ডায়মণ্ডহারবারের একেবারে খুবই কাছে। এক দম্—ওর নাম কি—ইয়ের মুখে! বুঝলেন না?"

রসময়ের মাথা ঘুরিয়া গেল, হাত হইতে গড়গড়ার নলটা খসিয়া পড়িল এবং চোখের সাম্‌নে অন্ধকার জমিয়া উঠিল।

নেপু আশ্বাস দিয়া কহিল—"বসিরহাটের ঐ দিকে শানপুকুরে চলুন না, বেশ চমৎকার জায়গা।"

একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া রসময় কহিলেন—"সেখানে সন্ধানে তোর বাড়ী-টাড়ী আছে না কি?"

"বাড়ী পাবার আশা নেই; তবে একটা ছাদ ভাড়া পাওয়া যেতে পারে।"

"কি পাওয়া যেতে পারে?"

"ছাদ; বাড়ীর ছাদ। তার ওপর আপনাকে নিজের খরচে টেম্পোরারী ঘর তুলে নিতে হবে—টালির ছাওনি কোরে। অনেকেই এ রকম কোরে নিচ্ছেন।"

নলটা তুলিয়া লইয়া পুনরায় রসময় ভড়ক ভড়ক করিয়া তামাক টানিয়া যাইতে লাগিলেন। মনে মনে স্থির করিলেন—বারুইপুর কিছুতেই চলিবে না। উঃ! আংটী, ঘড়ি, টাকা বত্রিশটা! ওঃ!

৩

ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস রসময়ের বুক ভেদ করিয়া বাহির হইল।

বোমার ধূম্রজাল-জড়িত ঘোর অকূলে রসময় কূল পাইলেন না। বারুইপুরের কথা রসময় আর মুখে আনেন নাই। তাঁহার শরীর খুবই অসুস্থ। সারা রাত ঘুম হয় না। যদি কিছুক্ষণের জন্য কখনো একটু তন্দ্রার ভাব আসে, সে তন্দ্রা স্বপ্নাচ্ছন্ন। সে সময় তিনি ভাবেন, দোতলার ঘর ত্যাগ করিয়া একতলার ঘরে উপরি উপরি ডবল তক্তাপোষের নীচে বিছানা পাতিয়া শুইয়া আছেন। বাহিরে 'ব্ল্যাক-আউটে'র বিকট অন্ধকার! সহসা সাইরণ বাজিয়া উঠিল। আকাশ-প্রান্তে এরোপ্লেনের যেন ক্ষীণ একটা শব্দ পাওয়া গেল; ক্ষীণ—খুবই ক্ষীণ। ক্রমে সেই শব্দ মহাকালের ভেরীর মত ভীষণ রবে মাথার উপরকার আকাশ কাঁপাইয়া তুলিল এবং পরক্ষণেই শ-শত বাজ যেন একসঙ্গে তাহার বাটীর ছাদে পড়িল। মহাতঙ্কে রসময়ের মাথা তক্তাপোষের তক্তায় ঠকাস্ করিয়া ধাক্কা লাগিল, এবং যেন সেই আঘাতের ফলেই তাঁহার সেই তন্দ্রা ছুটিয়া গেল।

নিদ্রার ন্যায়, তাঁহার আহারও নাই। আহার নাই, আহারে রুচিও নাই। কোন সময়েই ক্ষুধার উদ্রেক হয় না। সামান্য কিছু আহার করিলেই পেট ভুট-ভাট করে, পেটে 'সামরিক' বায়ু জমে, উদরমধ্যে কাঁপ ধরে। দৈনিক সংবাদপত্র, 'টেলিগ্রাফ'—আদি দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়া সর্ব্বক্ষণই ঊর্দ্ধপথে তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ। কয় দিনেই তাঁহার মুখের হাড় ঠেলিয়া—তাহারাও যেন ঊর্দ্ধপথে তাকাইতে ব্যগ্র। দুই চোখেয় কোলে কালিমা জমিয়াছে। দেহ ক্ষীণ ও শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছে। মাথা সর্ব্বদাই ঘোরে।

জ্ঞানদা নেপুকে পাঠাইয়া সত্যেন ডাক্তারকে 'কল্' দিয়াছিল। সত্যেন আসিল, এবং রোগী দেখিয়া কহিল—"অতিরিক্ত আতঙ্ক—'নারভাস্ ব্রেক্-ডাউন'! আপনি আকাশের দিকে বারে-বারে তাকান্ কেন?"

রসময় কহিলেন—"না তাকিয়ে পারা যায় না যে!"

"কোন ভয় পাবেন না; অবশ্য ভরসার যদিও কিছুই নেই। এক কাজ করুন না। আপনার ত বেশ উঠোন র'য়েচে দেখ্‌চি। উঠোনের ওদিকে ওগুলো কিসের বস্তা?"

"বালির। পঞ্চাশ টাকার বালি কিনে ছাদের ওপর··

"হাঁ; ওগুলো দিন না ছাদের ওপর, এখানে-সেখানে গোছ-গাছ কোরে। আর উঠোনে আপনার বেশ জায়গা রয়েচে, একটা 'ট্রেঞ্চ' কেটে ফেলুন। আর—"

"আর?"

"আর, একটা 'প্রেস্‌ক্রপশুন্' লিখে দিয়ে যাচ্ছি, ওষুধটা আনিয়ে তিন বার কোরে খেয়ে যান। বোধ হয়, গোটা-দু'-চার 'ইনজেক্‌সনের'ও দরকার হোতে পারে।"

কিন্তু হইল না কিছুই। না হইল, বালির বস্তা ছাদে সাজানো; না হইল 'ট্রেঞ্চ' কাটা; না হইল—ঔষধ সেবন। তবে ঔষধটা আনা হইয়াছিল বটে। তাহা খাইতে যাইবেন, এহেন সময়ে 'হকার'এর ডাক কাণে আসিল—'টে-লী-গ্রাফ—ভীষোণ খবর···রাঙ্গুণমে বোমা!'

সুতরাং আর রসময়ের ঔষধ খাওয়া হইল না। ঘন-ঘন তাঁহার দৃষ্টি আকাশপথে ঘুরিতে লাগিল। পল্লীটি নিস্তব্ধ। কোন বাড়ীতেই সাড়া নাই। দু'-একখানি বাড়ী ছাড়া আর সকল বাড়ীরই লোক-জন চলিয়া গিয়াছে। রসময়ের বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল।

নাঃ! কিছুতেই এখানে থাকা চলবে না। পাড়ার লোক আর কে-উ-ই থাকলো না। এখানে থাকলে,

শেষ পর্য্যন্ত হয় ত ধনে-প্রাণে মরতে হবে। এ অবস্থায় গুণ্ডার দল যদি··· নাঃ, যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।

রসময় বাড়ীর খোঁজে এগারটার ট্রেণে বর্দ্ধমানে যাইবেন ঠিক করিলেন। নেপু কহিল—"সাংঘাতিক ভীড়! যা'বেন কি কোরে? লোকে দু'দিন ধরে ষ্টেশনে 'হত্যে' দিয়ে তবে কোন-রকমে টিকিট কিনে গাড়ীতে উঠ্তে পাচ্চে, দেখ্‌লে মনে হয়, গাড়ীর ভেতর পাল-পাল বাদুড় ঝুলচে!"

প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া রসময় কহিলেন—"তা হোলে কি হবে নেপু! কোন উপায় নেই যাবার?"

"ইণ্টার ক্লাসে হবে না, সেকেণ্ড ক্লাসে যাওয়া যেতে পারে। এক কাজ না-হয় করুন। আমাকেই খরচ-খরচ দিন, আমি যাই। বাড়ী একেবারে ঠিক কোরেই ফিরবো।"

"ফিরবি? তাই কর বাবা! আমাকে বাঁচা। তুই আমার ছেলের বাড়া, নেপু! সেকেণ্ড ক্লাস হয়, ফার্ষ্ট ক্লাস হয়,—তুই চলে যা। বাড়ী একটা যেমন-কোরেই হোক ঠিক কোরে আয়। কত টাকা তোকে দোবো?"

"শ'খানেক দিন। যাতায়াতের রেলভাড়া, বাড়ীর অ্যাডভান্স হয় ত দু'-তিন মাসের দিতে হবে। দেড়শো দিলেই ভাল হয়। তবে বাড়ী আমি বর্দ্ধমানে ঠিক কোরে আসবোই।"

এই সময়ে আকাশে বিকট শব্দ করিয়া একখানা এরোপ্লেন উড়িয়া গেল; সঙ্গে-সঙ্গে রসময়ের বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। নেপুর কথায় আর দ্বিরুক্তি না করিয়া রসময় তাহার হাতে দেড়শো টাকার নোট দিয়া তাহাকে বর্দ্ধমান পাঠাইয়া দিলেন।

রাত প্রায় বারটার সময় নেপু বর্দ্ধমান হইতে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, বাড়ী ঠিক হইয়াছে। রসময় একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"তা হোলে আর দেরী কোরে কাজ নেই, কালই চলে যাওয়া যা'ক, কি বলিস্?"

জ্ঞানদা কহিল—"কাল হবে না। আবার কত দিনে ফিরে আসবো! কাল একবার তা হোলে দক্ষিণেশ্বর দর্শন করে আসতে হবে।"

অতঃপর সেই ব্যবস্থাই স্থির হইল।

৪

পরদিন প্রাতঃকালে চা খাইয়া অপেক্ষাকৃত হাল্কা-মনে রসময় ধূমপান করিতেছিলেন। একটি আধা-বয়সী ভদ্রলোক আসিয়া নমস্কার জানাইয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। রসময় প্রতি-নমস্কার করিয়া তাহার মুখের পানে চাহিতেই সে কহিল—"আপনার ওদিক্‌কার 'পার্ট'টা কি ভাড়া দেবেন?"

ভদ্রলোকটির গায়ের রং মিশ্ কালো, বেঁটে সাইজ, গোল-গাল চেহারা, নাকে চন্দনের তিলক, গলায় কণ্ঠী।

রসময় কহিলেন—"হাঁ, ভাড়া দোবো; কিন্তু এ সময় আপনারা ভাড়া নিয়ে এখানে থাকবেন?"

"বোমার হিড়িক বলছেন? সবই গোবিন্দের ইচ্ছা! তাঁর মনের যা ইচ্ছা, তাই হ'বে। জানেন ত, 'রাখে হরি ত মারে কে, আর মারে হরি ত রাখে কে'?"

"মশায়ে'র নাম?"

"শ্রীহরিদাস দাস।"

"তা বেশ। ও-পার্টটার ভাড়া হচ্চে পঞ্চাশ।"

"দেখুন, এ সময়টা একটু বিবেচনা করতে হবে। একশো টাকার বাড়ীর ভাড়া এখন বড় জোর চল্লিশ। দেখ্‌চেন ত সবই। তবে 'পেমেণ্ট' সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন; মাসটি কাবার হোলে সঙ্গে-সঙ্গেই আপনাকে ···নীচে-ওপরে ক'খানা ঘর আছে?"

"পাঁচখানা বেড্-রুম, রান্নাঘর, ওপর-নীচে পাইখানা, বাথ-রুম।"

"একবার দেখ্‌তে পারি কি?"

"দেখুন, আজ আমরা একটু ব্যস্ত আছি; এখনি আমরা বাড়ীশুদ্ধ সব দক্ষিণেশ্বর যাচ্চি। ফিরতে সেই সন্ধ্যা; আপনি কাল বেলা ৮টার মধ্যে যদি দয়া কোরে আসতে পারেন, তা হোলে ভাল হয়।"

"আজ্ঞে, তা'ই হবে।"

"ঐ সময়ের মধ্যে না এলে কিন্তু··· আমরা হয় ত কালই চলে যেতে পারি।"

"ওঃ! আপনারাও যাচ্চেন।—কোথায় যাবেন?"

"আমরা যাচ্চি বর্দ্ধমান। "আপনি তা হোলে কাল ঐ ৮টার ভেতরেই আসবেন।"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া হরিদাস পকেট হইতে একটা বিড়ি বাহির করিয়া কহিল—"আপনার চাকরকে এক-বার ডাকুন না, দয়া কোরে দেশলাইটা একবার···।"

'মাগুনিয়া—মাগুনিয়া' বলিয়া ডাকিতেই উড়িয়া-ভৃত্য ভিতর হইতে আসিল। রসময় তাহাকে দিয়াশলাই আনিতে কহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

হরিদাস কহিল—"মশায়ে'র নামটি কি?"

"রসময় দত্ত।"

অতঃপর বিড়ি ধরাইয়া নমস্কারান্তে হরিদাস চলিয়া গেল।

সম্মুখের রাস্তা দিয়া ও-পাড়ার বিহারী বাবু বাজার করিয়া ফিরিতেছিলেন। রসময়কে দেখিয়া তিনি দাঁড়াইলেন, কহিলেন—"হিন্দুস্থানী গোয়ালাগুলো সব গরু বিক্রী কোরে-দিয়ে দেশে পালাচ্চে! ছেলেটা ত মশায় 'এ, আর, পি'তে নাম লিখিয়েছে। সাংঘাতিক সময় এলো রসময় বাবু!"

ভীত-কণ্ঠে রসময় কহিলেন—"তা আর বোল্‌তে! আপনি বেহারী বাবু, কি ব্যবস্থা কোরলেন?"

"আমার ত আর চাকরী ছেড়ে যাবার উপায় নেই। মেয়েদের সব কেষ্টনগরে পাঠিয়ে দিয়েছি। ঐ ছেলেটি আর আমি আছি। ঠাকুরটার যে রকম ভাব-গতিক দেখছি, কখন 'প'য়ে আকার' দেয় তার ঠিক কি? তা হোলেই কিন্তু চিত্তির, বিপদের ওপর বিপদ!"

"নতুন খবর আর কি বলুন।"

"সবই নতুন। 'এ, আর, পি'র হুকুম শুনেছেন ত? 'সাইরণ' বাজলেই—তা দিনেই হোক আর রাতেই হোক,—সদর দরজা খোলা রাখতে হবে পথের লোকদের আশ্রয় দেবার জন্যে!" দুঃখের হাসি হাসিতে হাসিতে বিহারী বাবু চলিয়া গেলেন। বৈঠকখানা-ঘরের খিল লাগাইয়া রসময়ও স্নানাহারের জন্য ভিতরে চলিয়া গেলেন।

সমস্ত দিন সপরিবারে দক্ষিণেশ্বরে কাটাইয়া রসময় বাবুর ভাড়াটে গাড়ী যখন বাড়ীর সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সন্ধ্যা উৎরাইয়া গিয়াছে। দরজার কড়া নাড়িতেই মাগুনিয়া আলো জ্বালিয়া বৈঠকখানার দরজা খুলিয়া দিল। সঙ্গে-সঙ্গেই রসময় উন্মত্তবৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"এ কি! সব জিনিস-পত্তর—ফার্নিচার!"

মাগুনিয়া অতি সহজকণ্ঠে কহিল—"সবি তো লরি বোঝাই কিরি অপ্‌নেরো ভায়রাভাই নি গেলো পারা।"

"লরি বোঝাই কোরে? আমার ভায়রাভাই?"

"হঃ; হোরিদাসো বাবু,—সকালে যিনি আইথিলা। মতে কহিলা—'বাবু ত দাখিনেশ্বর যাউছন্তি, খুব সাবধানে রবু, মাগুনিয়া; এ সব জিনিষো বন্দোমানো নিব।' সবি ত নি গেল পারা।"

রসময়ের আর বাঙ্‌নিস্পত্তি হইল না। দেখিলেন—নীচের যাবতীয় কাঠ-কাঠ্‌রার ভাল-ভাল জিনিস, বাসন-কোসন, বই-পত্তর মায় ফুলগাছের টব কয়টা ও খাঁচা-সমেত ময়না পাখীটি পর্য্যন্ত উধাও হইয়া গিয়াছে। ময়নাটা কি চমৎকার বুলি আওড়াইত!

রসময় যেন মাথায় আকাশ-পড়ার চাপে সেইখানে বসিয়া পড়িলেন। সেই ধাক্কা সামলাইবার জন্য পরের দিন আর তাঁহার বর্দ্ধমান যাওয়া হইল না। তাহার পরদিন মোট-ঘাট লইয়া—বাড়ীতে চাবি দিয়া তিনি সপরিবারে বর্দ্ধমান যাত্রা করিলেন।

৩

হাওড়া ষ্টেশন।

লোকে লোকারণ্য। রথযাত্রার ভীড়ও ইহার—কাছে হার মানিয়া যায়! তা ছাড়া, শুধুই যে ভীড় তাহাও নহে। ভীড়, আতঙ্ক, কোলাহল, ঠেলা-ঠেলি, ছুটা-ছুটি, চীৎকার, মারা-মারি, ধস্তা-ধস্তি,—সবে মিলিয়া সে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব বিরাট্ দৃশ্য!

৫৫ নং আপ্ কিউল প্যাসেঞ্জার গমনোদ্যত হইয়া ৪ নং প্লাট্‌ফরমে দাঁড়াইয়া আছে।

ঢং—ঢং—ঢং

প্রথম ঘণ্টা যেমন বাজিয়া উঠিল, অমনি সেই বিশাল জনসমুদ্র উদ্বেলিত তরঙ্গাভিঘাতে আরও চঞ্চল, আরও মুখর, আরও কোলাহলময় হইয়া উঠিল। সেই কোলাহল ক্রমে চরমে উঠিল; ছুটা-ছুটি দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। ধাক্কা-ধাক্কি, ঠেলা-ঠেলির আর অন্ত রহিল না! তাহারি মধ্যে সপরিবারে রসময় জনতার চাপে চ্যাপ্টা হইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিতেছেন! সঙ্গে জ্ঞানদা, বৃদ্ধা পিসিমা ও নেপু। ৫।৭ জন কুলি তাঁহার মোট্-ঘাট্ লইয়া, কোন রকমে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে। রসময় পিছনের ঠেলায় একবার দুই হাত আগাইয়া যাইতেছেন, আবার সামনের চাপে তিন হাত পিছাইয়া আসিতেছেন। এই দারুণ শীতেও তাঁহার দেহ গলদ্‌ঘর্ম্ম। তিনি দৃঢ়ভাবে জ্ঞানদার হাত ধরিয়া আছেন; কিন্তু তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি সম্মুখস্থ কুলির মস্তকোপরি বিশেষ ভাবে নিবদ্ধ। ঐ কুলির মাথায় তাঁর তেঁতুলের কলসীটা ছিল। রসময় ব্যস্ত ও সন্ত্রস্ত হইয়া সেই কুলিটির অনুসরণ করিতেছিলেন। নেপু কহিল—"মামাবাবু, মামীমার হাত ছাড়বেন না। আমি, ঠাকুমা আর কুলিদের ঠিক দেখছি। আপনি শুধু মামীমাকে দেখুন।" রসময়ের দৃষ্টি কিন্তু পূর্ব্ববৎ; একান্ত ভাবে তেঁতুলের কলসীতেই সন্নিবিষ্ট।

"এই কুলি, সবুর্—সবুর্! আগাও মৎ!"

নেপু কহিল—"আপনি মামীমাকে দেখুন, মামাবাবু!"

ঢং—ঢঢং—ঢং—ঢঢং ঢং।

সঙ্গে-সঙ্গেই ভীষণ ব্যাপার। সে ঠেলা-ঠেলি, ধাক্কা-ধাক্কি অবর্ণনীয়। নেপু চীৎকার করিল—"মামাবাবু! মামীমাকে দেখবেন!"

অনুরূপ চীৎকারে রসময় হাঁকিলেন—"তেঁতুলের কলসীটা, নেপু, তেঁতুলের কলসীটা!—নেপু! নেপু!—এই কুলি! এই উল্লুক! কি ধার্ গিয়া?"

জ্ঞানদা সচকিতে কহিল—"ওগো, পিশিমা কই?"

সে-কথায় কর্ণপাত না করিয়া রসময় সমভাবে চীৎকার করিতে লাগিলেন—"এই কুলি! তেঁতুলকা কলসী কাঁহা! নেপু! নেপু!" কাহারা পিছন হইতে প্রবল এক ধাক্কা দিল। রসময় ছিট্‌কাইয়া গিয়া পাঁচ হাত তফাতে পড়িলেন, এবং চক্ষুর সম্মুখে সবই অন্ধকার দেখিলেন! কয়েক মুহূর্ত্ত পরে, সে অন্ধকার কাটিয়া গেলে রসময় দেখিলেন, '৫৫ আপ্' বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে প্ল্যাটফরম ছাড়িয়া ছুটিতেছে! জ্ঞানদা নাই; তেঁতুলের কলসী নাই; পিসিমা নাই; নেপু নাই! অন্য কুলি কয়টা বিছানা-তোরঙ্গ বোঁচ্‌কা-বুঁচ্‌কি মাথায় লইয়া অদূরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

বহুক্ষণ ধরিয়া রসময় প্ল্যাটফরমের একান্তে নির্জ্জীবের

মত বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। উঃ! এত দুর্ভোগও ভাগ্যে ছিল! বুড়ো পিসিমা কোথায় ছিট্‌কে গেলেন! জ্ঞানদাই বা কোথায়? নেপাটা বোধ হয় ইচ্ছে কোরেই সরে পড়েচে, আর তেঁতুলের কলসীটাও সে বেমালুম পাচার কোরেচে! সে ঠিক বুঝতে পেরেছিল যে, ওপরে তেঁতুল দিয়ে, ভেতরে আমি সোণা রেখেছিলুম। উঃ! করতে গেলুম এক, হোল—আর এক! এই বাজারে কন্‌-কনে সাত-চল্লিশ' শ' টাকা দিয়ে কেনা একশ' ভরী সোণা! সঙ্গে-সঙ্গে জ্ঞানদাও উধাও! কি করি? এই ভীড়ে আর কুলির সন্ধান পেয়েছি!

খানিকক্ষণ ধরিয়া এইরূপ ভাবিবার পর রসময় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তার পর আর একবার তন্ন-তন্ন করিয়া সারা ষ্টেশন খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; কিন্তু কোথাও কাহারো সন্ধান পাইলেন না। দশটা প্ল্যাটফরম, টিকিট বিক্রয়ের জায়গাগুলি, 'হুইলার'-এর ষ্টল, 'ওয়েটিং-রুম'গুলি, 'এন্‌কোয়ারী আফিস', কুলিদের বৈঠক প্রভৃতি 'প্ল্যাটফরম'স্থিত বিভিন্ন আফিস-ঘর—কোথাও খুঁজিতে বাকী রহিল না; কিন্তু সকলই বৃথা হইল।

অবশেষে সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, পাগলের মত জ্ঞানশূন্য হইয়া, এক কাপ চা খাইবার জন্য হিন্দু-'রেস্তোঁরা'র দিকে যখন টলিতে টলিতে আসিতেছিলেন, তখন জনৈক রেল-কর্ম্মচারী তাঁহার কাছে আসিয়া কহিলেন—"আপনার স্ত্রীর নাম কি জ্ঞানদাবালা?"

স-চকিত আশা-উৎফুল্লতায় রসময় কহিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ। তাঁকে পাওয়া গেছে কি?"

"পাওয়া গেছে।"

"কোথায় পাওয়া গেল মশায়?"

"'লেফ্‌ট্‌-লগেজ'-আফিসে।"

চায়ের তৃষ্ণা রসময়ের দূরে পিছাইয়া গেল। তাড়াতাড়ি সেই বাবুটির সহিত রসময় 'লেফ্‌ট্‌-লগেজ' আফিসে আসিলেন; আসিয়া দেখিলেন, একহাত ঘোমটা টানিয়া জ্ঞানদা একটি কোণে জড়-সড় হইয়া বসিয়া আছে।

তখন মাঘের বেলাশেষে ষ্টেশনের চারি দিকে অন্ধকার ধীরে ধীরে জমাট বাঁধিতেছিল। রসময়ের মনের ভিতরও অন্ধকার। সেই অন্ধকারের রাজত্বে পুনরায় গৃহে ফিরিবার উদ্দেশে রসময় জ্ঞানদার হাত ধরিয়া টলিতে টলিতে ভাড়াটে গাড়ীতে আসিয়া চাপিলেন। তেঁতুলের কলসীর শোকে তিনি আত্মহারা—স্তম্ভিত।

* * * *

পাঁচ দিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে।

চিন্তাকুলচিত্তে রসময় একখানি পত্র হাতে করিয়া শূন্য বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। পত্রখানি পূর্ব্বদিন সীতারামপুর হইতে এক অপরিচিত ভদ্রলোক লিখিয়াছেন। তাহাতে লেখা—'মহাশয়, আপনার বৃদ্ধা পিসিমা দৈবদুর্ব্বিপাকে আমাদের এখানে আছেন। কোন চিন্তা করিবেন না। তিনি আপনাদের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সত্বর আসিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইবেন। ইতি।'

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া যখন রসময় পিসিমার কথা, নেপু ও তেঁতুলের কলসীর কথা, ঘরের যাবতীয় আসবাবপত্রের কথা, বর্ত্তমান বিপদ ও দুর্ভোগের কথায় একান্ত চিন্তামগ্ন, তখন রাস্তার দিকের দরজা ঠেলিয়া তাঁহার শিবপুরের জ্ঞাতি-ভাই হিমাংশু ভিতরে প্রবেশ করিয়া কহিল—"দাদা তা হোলে কোথাও এখনো পালাননি, এইখানেই আছেন?"

অতিশয় গম্ভীর ভাবে রসময় কহিলেন—"হুঁ।"

"এ কি! জিনিস-পত্তর কোথায় পাঠালেন?"

"ভায়রাভাই হরিদাসের বাড়ী।"

"হরিদাস?"

"হ্যাঁ; নতুন ভায়রাভাই।"

"পিসিমা ভাল আছেন?"

"আছেন,—সীতারামপুরে।"

"বৌদি কোথায়?"

"লেফ্‌ট্‌-লগেজ আফিসে ছিলেন; এখন এখানেই।"

হিমাংশু কিছু বুঝিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, "নেপু?"

দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া অধিকতর উত্তেজিত কণ্ঠে রসময় কহিলেন—"জানি না।"

—হিমাংশু অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

হিংসা ও শিক্ষা

হিংসাই করিবে যদি কর' তারে যেই জন
লটারিতে টাকা জিতিয়াছে।
যে জন সাধনা-বলে উঠেছে এ ধরাতলে
নতশিরে শেখ তার কাছে।

শ্রীকালিদাস রায়

বৈষ্ণবমত-বিবেক

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

ভেদাভেদবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদ

বেদান্তের অন্যান্য ভাষ্যকারগণের মধ্যে আচার্য্য ভাস্করের ভেদাভেদবাদ ও আচার্য্য নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদের অনুরূপ বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে এই দুই সম্প্রদায়ের মতবাদের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের প্রতিপাদিত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

ভাস্করাচার্য্য ভেদাভেদবাদ স্বীকার করিলেও তাঁহার মতে ভেদ ঔপাধিক বা অনিত্য। অবশ্য ভাস্করাচার্য্যের পূর্ব্বেও ভেদাভেদবাদ বর্ত্তমান ছিল। ব্রহ্মসূত্রে আচার্য্য ঔড়ুলোমীকে ভেদাভেদবাদী বলা হইয়াছে। কিন্তু ভাস্করাচার্য্যের পূর্ব্বে ভেদাভেদবাদকে কেহই প্রণালীবদ্ধ করেন নাই। এই জন্য ঔপাধিক বা ঔপচারিক ভেদ স্বীকার করিলেও তাঁহাকে ভেদাভেদবাদী নামে আখ্যাত করা হয়। ইঁহার মতে ব্রহ্ম কার্য্যরূপে ভিন্ন এবং কারণরূপে অভিন্ন এবং শ্রুতি ভেদ ও অভেদ এই উভয়াত্মিকা। যুক্তিবলে ভেদাভেদ নিরূপিত হইতে পারে না, এ বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। অনুভবই জ্ঞান—এবং উপাসনার ফলে ব্রহ্মাত্মকতারূপ মুক্তিলাভ হয়। ইহার মধ্যে ভেদ অনিত্য—মুক্ত ব্যক্তি পরমাত্মার সহিত অভিন্ন ভাবে অবস্থান করেন। সুতরাং ভেদ যদি অনিত্য হয়, তবে অভেদই সত্য দাঁড়ায়। সুতরাং ঔপচারিক ভেদাভেদবাদী ভাস্করাচার্য্য আচার্য্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদ বিশেষতঃ নির্ব্বিশেষবাদ খণ্ডন করিয়া মায়াবাদিগণকে বৌদ্ধমতাবলম্বী বলিলেও * তিনি যে প্রচ্ছন্ন অদ্বৈতবাদী; তাহাতে সন্দেহ থাকে না। ভাস্কর কারণরূপী ব্রহ্মকে নিরাকার স্বীকার করিলেও নির্ব্বিশেষ স্বীকার করেন না। তিনি পাঞ্চরাত্র মত স্বীকার করিয়াছেন এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশেষতঃ শ্রীসম্প্রদায় ও বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ের অঙ্গীকৃত ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস স্বীকার করিয়াছেন। যাহা হউক, ভাস্করের ভেদাভেদবাদ সম্প্রদায়সিদ্ধ হইলেও, ও তদ্দ্বারা শ্রুতিসামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা হইলেও সে চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে সার্থক হয় নাই। সকল বৈষ্ণব-দর্শনের মতই তাঁহার মত হইতে স্বতন্ত্র। অনেকে নিম্বার্কমতের সহিত ভাস্কর মতের সাদৃশ্য অনুমান করিলে দুই একটি স্থল ভিন্ন অন্য সর্ব্বত্রই নিম্বার্কমতের সহিত ইহার পার্থক্য সুস্পষ্ট। বলা বাহুল্য যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ তাঁহার মত হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

আচার্য্য নিম্বার্ক স্পষ্ট বা বাস্তব ভেদাভেদবাদী। শ্রীমন্নিম্বার্কের ও তৎসম্প্রদায়ের ব্যাখ্যায় শ্রুতির সামঞ্জস্য রক্ষার যে চেষ্টা দেখা যায়, তাহা অনেকাংশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অভিধা-বৃত্তিলব্ধ শ্রুতির মুখ্যার্থের অনুরূপ হইলেও তাঁহারা শক্তির ও শক্তিমানের বাস্তব ভেদাভেদ স্বীকার করিয়াছেন—এই ভেদাভেদের অচিন্ত্যত্ব তাঁহারা অঙ্গীকার করেন নাই, অবশ্য 'অবিকৃত পরিণামবাদ' ও জগৎ ও জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বহুলাংশে ঐক্য আছে; তথাপি নিম্বার্কমতের "বাস্তব ভেদাভেদ" ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের "অচিন্ত্যভেদাভেদ" এক নহে। অবিচিন্ত্য পরিণামবাদই অধিকতর দার্শনিক বিচারসহ এবং তাহাতেই শ্রুতিসাবস্থ্য সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত হয়। এই অবিচিন্ত্য পরিণামবাদই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অন্য একটি বৈশিষ্ট্য। চিন্তামণির যে দৃষ্টান্তটি শ্রীজীব উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে। প্রাকৃত বস্তুর এই অবিচিন্ত্য শক্তির দৃষ্টান্তে অবিচিন্ত্য পরিণামবাদটি যে অবিকৃত পরিণামবাদের অপেক্ষাও দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এ কথা নিরপেক্ষ বিচারশীল কোনও ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্রন্থাবলীতে নিম্বার্কের নামের বিশেষ উল্লেখ পরিলক্ষিত হয় না এবং তাঁহার মতও বিশেষরূপে বিবৃত দেখা যায় না; ইহাতে মনে হয়, নিম্বার্কমত বিশেষরূপে প্রচারিত হয় নাই এবং উহা স্বসম্প্রদায়ের অতি অল্পসংখ্যক বৈষ্ণবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকায় এই মতটির বৈশিষ্ট্য অনেকেরই অবিজ্ঞাত ছিল। ফলতঃ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভেদাভেদবাদকে বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদকে যতদূর সুসংস্কৃত ও সুপ্রণালীবদ্ধ করিতে পারা যায়, শাস্ত্রসঙ্গতির দ্বারা তাহা করিয়াছেন এবং দার্শনিক-চূড়ামণি শ্রীজীব ষট্‌সন্দর্ভে ও সর্ব্বসংবাদিনীতে সুনিপুণ ভাবে শ্রৌতসিদ্ধান্তানুকূল যুক্তি ও তর্কের দ্বারা তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের সহিত অন্যান্য বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সম্বন্ধ

প্রাচীন বৈষ্ণবগণের মধ্যে পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায় সুপ্রসিদ্ধ. এই সম্প্রদায়ের সহিত চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্যগণেরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থূলতঃ রামানুজসম্প্রদায়, নিম্বার্ক-সম্প্রদায়, প্রাচীন বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের স্থলাভিষিক্ত বল্লভসম্প্রদায়,—এই চারি সম্প্রদায়ের মধ্যে মাধ্বসম্প্রদায় চতুর্ব্ব্যূহবাদ ও পরিণামবাদ অস্বীকার করিয়াছেন. কিন্তু উপাসনাতত্ত্বে তাঁহারাও পাঞ্চরাত্র ও ভাগবতমত প্রায় সর্ব্বাংশেই গ্রহণ করিয়াছেন। প্রাচীন ভাগবত-মত ও পাঞ্চরাত্র-মতের অপূর্ব্ব সমন্বয় শ্রীমদ্ভাগবতে হইয়াছে। রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ ও নিম্বার্ক সকলেই ভাগবতকে মানিয়া স্থূলতঃ প্রাচীন ভাগবত সম্প্রদায়ের ও পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের মতবাদ অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছেন. কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় যেরূপ জোরে দার্শনিক

---

* "তথা চ বাক্যং পরিণামস্তু স্যাদ্ দধ্যাদিবদিতি বিগীতং বিচ্ছিন্নমূলং মহাযানিক বৌদ্ধগাথায়িতং মায়াবাদং ব্যবর্ণয়ন্তো লোকান্ ব্যামোহয়ন্তি" চৌখাম্বা ভাস্কর ভাষ্য (৮৫ পৃষ্ঠা), অন্যত্র "যে তু বৌদ্ধমতাবলম্বিনো মায়াবাদিনস্তেঽপি" (ঐ ভাষ্য ১২৪ পৃষ্ঠা)

সিদ্ধান্ত ও লীলাতত্ত্ববিষয়ে পাঞ্চরাত্র ও ভাগবত-মতের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, এরূপ আর কোনও সম্প্রদায়ই করিতে পারেন নাই। শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা পাঞ্চরাত্র-সম্প্রদায়ে প্রাচীন কাল হইতেই প্রবর্ত্তিত আছে। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের একাংশেও তাহা প্রাচীন কাল হইতেই গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু ইঁহারা উভয়েই শ্রীরাধার স্বকীয়াত্ব-বাদী। কিন্তু গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের ন্যায় তাঁহাদের শ্রীরাধিকায় অচিন্ত্য স্বকীয়াত্ব ও পরকীয়াত্ব নিত্য বর্ত্তমান। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য অন্তরঙ্গা শক্তি হইলেও শ্রীবৃন্দাবনের প্রকটলীলায় যোগমায়া দ্বারা তাঁহাতে পরকীয়াত্ব আরোপিত হওয়ায় শ্রীবৃন্দাবনলীলায় পরমমাধুর্য্যময় ভাবের অপূর্ব্বতা উপলব্ধি হইয়া থাকে। শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার 'বিদগ্ধমাধবে' ও 'ললিতমাধবে' স্বকীয়ায় পরকীয়াত্ব ও পরকীয়ায় স্বকীয়াত্বের যে চমৎকারিত্বময় সমাবেশ দেখাইয়াছেন, তাহা অচিন্ত্য-ভেদাভেদের ন্যায়ই চমৎকারিতায় অনুপম। রসতত্ত্বসম্রাট্ শ্রীরূপের এই বৈশিষ্ট্যই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য। লীলামাধুর্য্যের এই গরীয়ান্ মহিমবিচারে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শুদ্ধ ও সুপবিত্র রসতত্ত্বের এরূপ অলৌকিক পরিপুষ্টি কোনও প্রাচীন বা নবীন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে আর কখনও হয় নাই।

শ্রীসম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্যগণ "আলোয়ার" নামে পরিচিত। এই সাধুগণের মধ্যে শঠকোপের তামিল বেদ সংগ্রহীতিতে এবং অণ্ডাল বা গোদার পাশুর নামক তামিল গীতি-কবিতায় পরমপুরুষ রসময় শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিপূর্ণ ভজনের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীসম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীবৎসাঙ্ক মিশ্র—ব্রজগোপীগণ রাসে সহসা শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে উন্মত্তার ন্যায় তাঁহার বিরহে অস্থির হইয়া শ্রীবৃন্দাবনের পুলিনের যে ধূলায় "অনঙ্গতপ্ত অঙ্গ নিক্ষেপ" করিয়া গড়াগড়ি দিয়াছিলেন—সেই ধূলায় জন্মগ্রহণ করিতে না পারিয়া যে বিপ্রলম্ভময় আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ব্রজগোপীভাবের পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হইলেও শ্রীরাধিকার মহিমা অনাবৃত ভাবে প্রকাশিত হয় নাই।* সেই মহিমা প্রকাশ করিবার জন্যই জগতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ের প্রয়োজন ছিল। ভাগবতমূর্ত্তি শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া তাহাই পরিপূর্ণ করিলেন। শ্রীরূপ-সনাতন-প্রমুখ সর্ব্বত্যাগী আদর্শচরিত্র গোস্বামিগণ সেই রসময় ভজনপ্রণালীর পরিচয় শাস্ত্রমুখে প্রদান করিয়া, এই সম্প্রদায়ের অতুলনীয় বৈভব প্রকাশে বাঙ্গালী জাতিকে ধন্যাতিধন্য করিয়া গিয়াছেন।

যাঁহারা রামানুজ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, শ্রীল যামুনাচার্য্য, শ্রীল রামানুজ ও পরবর্ত্তী শ্রীবেঙ্কটনাথ বেদান্তদেশিক শ্রীলোকাচার্য্য-প্রমুখ আচার্য্যগণ দার্শনিক-সিদ্ধান্তে লোকোত্তর প্রতিভার পরিচয় দিলেও আলোয়ারগণের সময়ে দক্ষিণদেশে যে ভক্তির ও প্রেমের বিলাস পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহার আর পুনরাবির্ভাব ঘটে নাই। এই জন্য সাধারণগ্রাহ্য দার্শনিক-বিচারে—রামানুজ-সম্প্রদায়ের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য থাকিলেও উপাসনাকাণ্ডে বৈশিষ্ট্যমূলক স্বাতন্ত্র্যের উদ্ভব হইয়াছে। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ শ্রৌত সিদ্ধান্তের সুসামঞ্জস্য বিধান করিবার জন্য জীব ও জগৎকে ব্রহ্মেরই শরীর—এই সিদ্ধান্ত করিয়া ব্রহ্মে স্বগতভেদ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু শরীর ও শরীরীর মধ্যে ঐকান্তিক ভেদ বা ঐকান্তিক অভেদ স্বীকৃত হইতে পারে না। বিশেষতঃ ব্রহ্মের শরীর যখন সচ্চিদানন্দময় ও শাশ্বত, তখন ব্রহ্ম ও তাঁহার শরীরের মধ্যে কি অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের সম্বন্ধই স্বীকৃত হইল না? সুতরাং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ কি অচিন্ত্যভেদাভেদবাদেরই নামান্তর নহে? পরন্তু অবিকৃত পরিণামবাদ জীবের অণুত্ব প্রভৃতি সিদ্ধান্তের সহিত গৌড়ীয়-সিদ্ধান্তেরও সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। আচার্য্য রামানুজ যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে অস্বীকার করিতে চাহিতেছেন, সেই পরাৎপর ব্রহ্মকেই তাঁহার পরমগুরু শ্রীভগবানের বিভূতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।* শ্রীযামুনাচার্য্যপাদ তাঁহার সুবিখ্যাত চতুঃশ্লোকীর চতুর্থ শ্লোকেও শান্তানন্ত মহাবিভূতি পরম ব্রহ্মরূপকেও শ্রীহরির রূপ বলিয়া স্পষ্টভাবেই বর্ণন করিয়াছেন।†

উপাসনাকাণ্ডে দাস্যভাবের উপাসনা হইতেই যখন সখ্য, বাৎসল্য, ও মধুর ভাবের উপাসনার আরম্ভ, তখন উপাসনাকাণ্ডে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের রসতত্ত্বাদি সম্বন্ধে প্রচুর বৈশিষ্ট্য থাকিলেও শ্রীসম্প্রদায়ের সহিত তাহার বিরোধ নাই। প্রকৃতপক্ষে সুপ্রাচীন আচার্য্য শ্রীবৎসাঙ্ক মিশ্র ও শঠকোপ গোদাম্বাদি আলোয়ারগণ মধুর রসের উপাসনার সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিলেন। শ্রীল যমুনাচার্য্য তাঁহার সিদ্ধিত্রয়ে পূর্ব্বাচার্য্য হিসাবেই শ্রীবৎসাঙ্ক মিশ্রের নামের উল্লেখ করিয়াছেন।‡ সেই শ্রীবৎসাঙ্ক মিশ্র তাঁহার "পঞ্চস্তবী" নামক পাঁচটি স্তবের সমষ্টিভূত গ্রন্থের 'অতিমানুষস্তবে' শ্রীকৃষ্ণের নানা লীলার উল্লেখ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের রাসস্থলীর মহিমাবর্ণনোপলক্ষে বলিতেছেন—

> "হা জন্ম তাসু সিকতাসু ময়া ন লব্ধং
> রাসে ত্বয়া বিরহিতা কিল গোপকন্যা।
> যাস্তাবকীন পদপংক্তিজুষো জুষন্তঃ
> নিক্ষিপ্য তত্র নিজমঙ্গমনঙ্গতপ্তম্।" ৫১।

অর্থাৎ হে ভগবন্ শ্রীকৃষ্ণ! তোমা কর্ত্তৃক রাসে পরিত্যক্তা হইয়া

---

* হা জন্ম তাসু সিকতাসু ময়া ন লব্ধং,
রাসে ত্বয়া বিরহিতা কিল গোপকন্যা।
যাস্তাবকীন পদপংক্তিজুষো জুষন্তঃ
নিক্ষিপ্য তত্র নিজমঙ্গমনঙ্গতপ্তম্। ৫১।
অতিমানুষস্তবঃ। শ্রীবৎসাঙ্ক মিশ্রের পঞ্চস্তবী।

* যদণ্ডমণ্ডান্তরগোচরং চ যৎ, দশোত্তরাণ্যাবরণানি যানি চ।
গুণাঃ প্রধানং পুরুষঃ পরং পদং, পরাৎপরং ব্রহ্ম চ তে বিভূতয়ঃ।
—শ্রীল যামুনাচার্য্যের "স্তোত্ররত্ন"। ১৭।

† শান্তানন্ত মহাবিভূতিপরমং যদ্ব্রহ্মরূপং হরের্মূর্ত্তং
ব্রহ্মতোঽপি তৎপ্রিয়তরং রূপং যদত্যদ্ভুতম্।
যান্যন্যানি যথাসুখং বিহরতো রূপাণি সর্ব্বাণি-
তান্যাহুঃ স্বৈরনুরূপবিভবৈঃ গাঢ়োপগূঢ়ানি তে।

‡ "যদ্যপি ভগবতা বাদরায়ণেন ইদমর্থান্যেব সূত্রাণি প্রণীতানি, বিবৃতানি চ, তানি পরিমিত-গম্ভীরভাষিণা ভাষ্যকৃতা, বিবৃতানি চ তানি গম্ভীরন্যায়সাগরভাষিণা ভগবতা শ্রীবৎসাঙ্ক মিশ্রেণাপি তথাপি আচার্য্যটঙ্ক-ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চ-ভর্ত্তৃমিত্র-ভর্ত্তৃহরি-ব্রহ্মদত্ত-শ্রীবৎসাঙ্ক-ভাস্করাদি-বিরচিত-সিতাসিত নিবন্ধনশ্রদ্ধা বিপ্রলব্ধবুদ্ধয়ো ন যথাবদন্যথা চ প্রতিপদ্যন্ত।"—(সিদ্ধিত্রয়, চৌখাম্বাসিরিজ ৫—৬ পৃঃ)

তোমার পদপংক্তির সেবাপরায়ণা যে সকল গোপকন্যা নিজ নিজ অনঙ্গতপ্ত অঙ্গ সেই স্থানের ধূলায় নিক্ষেপ করিয়া সেই ধূলিকণার সেবা করিয়াছিলেন, আমি যে সেই ধূলায় জন্মগ্রহণ করিতে পারি নাই, ইহা আমার বড়ই দুর্ভাগ্য।

এই শ্লোকটি হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, মাধুর্য্য ভাবে শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনার রসবৈচিত্র্য সম্বন্ধে ইহারা আলোচনা না করিলেও ঐ ভাবের উপাসনার উৎকর্ষ তাঁহাদের অগোচর ছিল না। শ্রীমতী গোদাম্বার রচিত তামিল ভাষায় ত্রিশটি গান আছে। এই গানগুলি "পাণ্ডর" নামে বিখ্যাত। দক্ষিণাপথের প্রত্যেক বিষ্ণুমন্দিরেই সর্ব্বপ্রথমে এই পাণ্ডরগুলি গীত হইবার পরে অন্য স্তবস্তুতি, গান বা গ্রন্থাদি অধ্যয়নের প্রথা প্রচলিত আছে। গোদাম্বা বা অণ্ডাল শ্রীসম্প্রদায়ের মাধুর্য্য-ভক্তির আদর্শস্থানীয়া। ইনি নিজে শ্রীল রঙ্গনাথকে স্বামিত্বে বরণ করিয়া তাঁহার অঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন। গোদাম্বা-বিরচিত এই পাণ্ডরগুলির প্রথম পাঁচটি পাণ্ডরে শ্রীকৃষ্ণলাভার্থ শ্রীবৃন্দাবনের কাত্যায়নী-ব্রতের উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের বন্দনা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের যে সুগভীর প্রেম ছিল—তাহা তাঁহাদের নিকট ভিক্ষা করা হইয়াছে।

এই সকল দেখিয়া শ্রীসম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্য ও আলোয়ারগণ যে মাধুর্য্য-উপাসনার মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহাতে বিভোর হইয়া গিয়াছিলেন, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। পরবর্ত্তীকালে শ্রীল রামানুজ আচার্য্য হইতে শ্রীসম্প্রদায়ে দার্শনিকতার পরিপুষ্টি হইলে এই মাধুর্য্য ভাবের সঙ্কোচ সাধিত হইয়াছে। শ্রীরামানুজ ও তৎপরবর্ত্তী আচার্য্যগণে প্রধানতঃ দাস্যভাবের চরমোৎকর্ষই সুপরিস্ফুট। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে ইহাদের উপাসনাতত্ত্ব সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, শ্রীসম্প্রদায়ে যাহার অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে তাহাই বিকসিত বিকচশতদলে পরিণত হইয়া অলৌকিক সৌরভে আত্মারামাদি মুনিগণের ও শ্রীনিবাসের বক্ষঃস্থিতা কান্তারও মনোহরণ করিয়াছে।

পক্ষান্তরে আধুনিক * গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ যে মধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া স্বয়ং-ভগবৎ-প্রবর্ত্তিত স্বীয় সম্প্রদায়ের পরিচয় প্রখ্যাপন করিয়া গৌরববোধ করিয়া থাকেন, সেই মাধ্ব সম্প্রদায়ের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের দার্শনিক সিদ্ধান্তের ও উপাসনাতত্ত্ব-পদ্ধতির বিলক্ষণ প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। ইহাদের মতে শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ নিত্য—জগৎ ও জীবের ত কথাই নাই। ব্রহ্মের নিরাকার বা নির্ব্বিশেষ ভাব ইহারা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছেন। অভেদমূলক শ্রুতিবাক্যগুলিকে অভিধাবৃত্তি বলে ব্যাখ্যা করিতে যাইয়াও ইহারা সেই শ্রুতিগুলির অর্থ অপ্রাকৃতভাবে পর্য্যবসিত করিয়া পরোক্ষভাবে একরূপ লক্ষণাবৃত্তিরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। মাধ্বসম্প্রদায় প্রায় সকল বিষয়েই ন্যায়-মতের অনুসারী—ইহারা সৃষ্টি বিষয়ে ন্যায়েরই আরম্ভবাদ অঙ্গীকার করিয়াছেন—কিন্তু অন্য সকল বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ই সৃষ্টিবিষয়ে পরিণামবাদ স্বীকার করিয়াছেন এবং ঐ জন্যই ঐ পরিণামবাদে যাহাতে ব্রহ্মবিকারী না হন, তজ্জন্য শক্তিবাদ অঙ্গীকার পুরঃসর শক্তির অচিন্ত্যত্ব প্রখ্যাপন করিয়াছেন। মধ্বাচার্য্য মুক্তিলাভের জন্যই ভক্তির প্রয়োজন; অথবা নিজের বিমলা সুখানুভূতিরূপা ভক্তির দ্বারা লাভ হয়, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ মুক্তিবাঞ্ছা বা মোক্ষবাঞ্ছাকে ভক্তির বিরোধী বলিয়াছেন; * তাঁহারা ভক্তিকেই পঞ্চমপুরুষার্থ বা সর্ব্বপুরুষার্থের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং ভক্তিরই পরিপাকদশায় প্রেমরূপ মহাপুরুষার্থ লাভ হয়, বলিয়াছেন। মধ্বমতের সংক্ষিপ্তসার নিম্নের সুপ্রসিদ্ধ শ্লোকটিতে প্রকাশিত হইয়াছে। যথা—

"শ্রীমন্মধ্বমতে হরিঃ পরতরঃ সত্যং জগৎ তত্ত্বতো
ভেদো জীবগণা হরেরনুচরাঃ, নীচোচ্চভাবং গতাঃ।
মুক্তির্নৈজসুখানুভূতিরমলা, ভক্তিশ্চ তৎ সাধনং
হ্যক্ষাদি ত্রিতয়ং প্রমাণমখিলাম্নায়ৈকবেদ্যো হরিঃ॥

অর্থাৎ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের মতে শ্রীহরিই পরতত্ত্ব, জগৎ সত্য, ভেদও তত্ত্বতঃ সত্য, জীবগণ হরির অনুচর,তাহারা নীচ এবং উচ্চভাব প্রাপ্ত, অমলা নিজ সুখানুভূতিই মুক্তি, ভক্তি তাহার সাধন, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনটি প্রমাণ এবং নিখিল বেদশাস্ত্রের একমাত্র শ্রীহরিই প্রতিপাদ্য।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের এই মধ্বমত হইতে নানারূপ বৈশিষ্ট্য আছে। তাহার মধ্যে দার্শনিক বৈশিষ্ট্যের কথা কথঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু উপাসনাতত্ত্বেও ইহাদের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের যথেষ্ট প্রভেদ। সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের উপাসনার কোনও পদ্ধতি মাধ্বসম্প্রদায়ে নাই বলিলেও চলে। পরন্তু, শক্তির নিত্যভেদ সিদ্ধান্তে অন্তরঙ্গা শক্তির অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যের বাধা হইতেছে। ইহারা শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণ বলিয়া স্বীকার করিলেও শ্রীরাধাকে স্বীকার করেন নাই। শ্রীবৃন্দাবনধামের মহত্ত্বও ইহারা স্বীকার করেন নাই। শ্রীরাধাকে স্বীকার ত দূরের কথা, গোপীগণের কাহাকেও ইহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া শক্তি বলিয়াই স্বীকার করেন নাই। পাঞ্চরাত্র-মতকেও ইহারা সর্ব্বত্র গ্রহণ করিতে পারেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবতকেও ইহারা সর্ব্বাংশে মান্য করেন নাই; শ্রীভাগবতের বহু স্থল ইহাদের মতে প্রক্ষিপ্ত। এই সকল কারণে এবং অন্যান্য নানা ব্যাপারে ও উপাসনাতত্ত্বে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সহিত ইহাদের প্রচুর মতভেদ বিদ্যমান। শ্রীল কবি কর্ণপূরের পিতা শিবানন্দ সেন। তাঁহার গুরুর নাম শ্রীনাথ পণ্ডিত। ইহার "শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা" নামে ভাগবতের একটি সংক্ষিপ্ত টীকা আছে। এই টীকাটি মুদ্রিত না হইলেও ইহার প্রথম শ্লোকটি সর্ব্বত্র প্রচারিত এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের উপাসনাতত্ত্বের পরিচায়ক। পাঠকগণের অবগতির জন্য এই শ্লোকটি এখানে উদ্ধৃত হইল,—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শাস্ত্রমমলং ভাগবতং পুরাণং প্রেমাপুমর্থো মহান্
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

---

* আধুনিক বলিতে আমরা শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মতাবলম্বী, তাঁহার পরবর্ত্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকেই লক্ষ্য করিতেছি।

* ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥
শ্রীরূপ গোস্বামীকৃত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ববিভাগ

তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত; আদি ১

অর্থাৎ—নন্দনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই আরাধ্য, শ্রীবৃন্দাবনই তাঁহার ধাম, শ্রীবৃন্দাবনের গোপবধূগণ যে ভাবে সেই শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছিলেন, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা মনোহারিণী উপাসনা, শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ তদ্বিষয়ের বিশুদ্ধ প্রমাণ এবং প্রেমই ইহার মহান্ পুরুষার্থ। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ইহাই অভিমত, এবং এই অভিমতই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা আদরের বস্তু।

ইহা দ্বারাই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের উপাসনা-বৈশিষ্ট্য জানা যাইতেছে।

এক্ষণে বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের সহিত দার্শনিকতত্ত্বে এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের সম্বন্ধ-নিরূপণ করিলেই আমাদের আলোচনা শেষ হইবে। যত দূর জানা যাইতেছে, তাহাতে বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায় অতি প্রাচীন সম্প্রদায়। শ্রীভাগবত-পুরাণের ও শ্রীবিষ্ণুপুরাণের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীধর স্বামী—এই প্রাচীন বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়-ভুক্ত। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থের গ্রন্থকার শ্রীল বিল্বমঙ্গল বা লীলাশুকও এই প্রাচীন বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া শ্রীবল্লভাচার্য্য সম্প্রদায় দাবী করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান কালে বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায় একরূপ লুপ্ত বলিলেই হয়, কিন্তু বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায় শ্রীবল্লভাচার্য্যকেই দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামী শ্রীল রাজগোপাল বিষ্ণুস্বামীর প্রশিষ্য শ্রীল বিল্বমঙ্গলের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন এবং এই হিসাবে শ্রীমদ্ বল্লভাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায় নামে পরিচিত হইয়া থাকেন। কিন্তু ইঁহারা বিষ্ণুস্বামিমতানুসারী বলিয়া স্বীয় সম্প্রদায়ের পরিচয় দিলেও প্রাচীন বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের সহিত বল্লভাচার্য্যের প্রচারিত মতের কিঞ্চিৎ পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

প্রথম বিষ্ণুস্বামী বা আদি বিষ্ণুস্বামী খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে পাণ্ড্যদেশের রাজপুরোহিত দেবেশ্বরের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার নাম দেবতনু, ইনিই কালক্রমে ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাস বা বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুস্বামী নামে বিখ্যাত হন। এই সম্প্রদায়ে সাত শত ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী ছিলেন। কালক্রমে এই ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীরা লোপ পাইলে আনুমানিক খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে 'রাজগোপাল বিষ্ণুস্বামী' নামে বিখ্যাত দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামীর বা আন্ত বিষ্ণুস্বামীর প্রাদুর্ভাব হয়। ইঁহার শিষ্য সোমগিরি এবং সোমগিরির শিষ্য বিল্বমঙ্গল। ইঁহার পরে তৃতীয় বিষ্ণুস্বামীর আবির্ভাব। তাঁহার সম্প্রদায় অদ্বৈতবাদিগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অদ্বৈতবাদী শিবস্বামী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। তাহার পর এই তৃতীয় বিষ্ণুস্বামীরই গৃহস্থ শিষ্যানুশিষ্যক্রমে বল্লভভট্টের পিতা সোমযাজী লক্ষ্মণভট্ট জন্মগ্রহণ করেন। এই লক্ষ্মণভট্টেরই দ্বিতীয় পুত্রের নাম বল্লভভট্ট বা বল্লভাচার্য্য। ইঁহার প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ই আধুনিক ধর্ম্মজগতে বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায় নামে পরিচিত হইয়া থাকেন।

যাহা হউক, আমরা সর্ব্বপ্রথমে আদি বিষ্ণুস্বামীর প্রচারিত শুদ্ধাদ্বৈতমতের কথারই আলোচনা করিয়া তাহার সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের সাদৃশ্য আছে কি না, তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করিব। আদি বিষ্ণুস্বামী "সর্ব্বজ্ঞ সূক্ত" নামে ব্রহ্মসূত্রের এক ভাষ্য রচনা করিয়া তৎকালে প্রবর্ত্তিত বৌদ্ধমত খণ্ডন করেন। এই "সর্ব্বজ্ঞ সূক্ত" এখন আর পাওয়া যায় না;—তবে শ্রীধরস্বামীর শ্রীভাগবতের টীকায় ও বল্লভ-সম্প্রদায়ের কোনও কোনও গ্রন্থে সর্ব্বজ্ঞ সূক্তের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, আদি বিষ্ণুস্বামী বলিতেছেন—

"বস্তুনোঽংশো জীবঃ বস্তুনঃ শক্তির্ম্মায়া চ বস্তুনঃ কার্য্যং জগচ্চ তৎ সর্ব্বং বস্ত্বেব ন ততঃ পৃথগিতি।"

বিষ্ণুস্বামী ব্রহ্মকে বা শ্রীভগবান্‌কে বস্তু নামে অভিহিত করিয়া বলিতেছেন যে, এই বস্তুর অংশই জীব, বস্তুর শক্তি মায়া এবং বস্তুর কার্য্য জগৎ—এই সকলই সেই বস্তু, তাহা হইতে পৃথক্ নহে।

অতএব জীব, জগতের ও শক্তির সহিত বস্তু মূলতঃ অভেদ-সম্বন্ধ থাকিলেও তাহা জীব, জগৎ ও শক্তিরূপে পরিচিত। ইহা বস্তুতঃই যুগপৎ ভেদে ও অভেদে তাৎপর্য্যবিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ বা শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ। ইহার সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। আচার্য্য বিষ্ণুস্বামী এই সম্বন্ধকে "অচিন্ত্য" বলেন নাই—ইহাই মাত্র প্রভেদ। বস্তুর অংশ জীব বস্তুর শক্তি মায়া ও বস্তুর কার্য্য জগৎ—এই সর্ব্বসমষ্টি লইয়াই বস্তু, এই জন্য একমাত্র 'বস্তু'ই বিদ্যমান বলিয়া ধরিয়া-লওয়ায় এই মতবাদ অদ্বৈতবাদ হইলেও শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ বলিয়া পরিচিত; এই জন্য আচার্য্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদকে এই সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ পরবর্ত্তী কালে "বিশুদ্ধ-অদ্বৈতবাদ" সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন। 'সর্ব্বজ্ঞসূক্ত'কার জীবের সহিত অংশ হিসাবে বস্তুগত অভেদ থাকিলেও অগ্নির স্ফুলিঙ্গের ন্যায় জীবের অণুত্ব ধর্ম্মও শ্রীভগবানের নিয়ম্য তত্ত্বরূপে স্থাপিত করিয়াছেন। এইরূপে জীবের বিভুত্ব বা স্বাতন্ত্র্য নিরাকৃত হইয়াছে। সুতরাং দেখা গেল—জীবতত্ত্ব সম্বন্ধেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীবের সিদ্ধান্ত আদি বিষ্ণুস্বামীর সিদ্ধান্তের অনুরূপ। শ্রীল বিষ্ণুস্বামী সর্ব্বজ্ঞসূক্তের অন্যত্রও বলিয়াছেন—"স ঈশো যদ্বশে মায়া স জীবো যস্তয়ার্দ্দিতঃ।" (শ্রীধরস্বামীর উদ্ধৃত—সর্ব্বজ্ঞসূক্ত) ইহাতেও জীবকে মায়া কর্ত্তৃক অভিভূত বলায় জীবের সহিত ভগবানের ভেদ স্পষ্টতঃই প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীজীবের জীববিষয়ক সিদ্ধান্ত যে এই সিদ্ধান্তের তুল্য, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

জগৎ সম্বন্ধে শ্রীবিষ্ণুস্বামী বলিয়াছেন যে, এই জগৎ বস্তুর কার্য্য। সুতরাং শ্রীভগবান্‌ই এই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান—এই উভয়বিধ কারণ। অতএব জগৎ ব্রহ্ম-সমবায়ী এবং ব্রহ্মরূপ। সুতরাং সর্ব্বকারণ ব্রহ্ম যখন সত্য ও নিত্য, তখন কার্য্যরূপ এই জগৎও সত্য ও নিত্য। বিষ্ণুস্বামী পরিণামবাদী। তিনি জগৎকে ব্রহ্মের অবিকৃত পরিণাম বা কারণের কার্য্যরূপ পরিগ্রহ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ব্রহ্ম নিজের "একোঽহং বহু স্যাম্" এই বহু হইবার ইচ্ছা দ্বারা ও বহু হইবার সামর্থ্যের দ্বারা নিজে অবিকৃত থাকিয়াও জগদ্রূপে পরিণত হন। এইরূপে বস্তুর ইচ্ছাশক্তির ও সামর্থ্যের স্বীকার করায় বিষ্ণুস্বামী প্রত্যক্ষ ভাবে শ্রীভগবানের শক্তি ও তাঁহার অচিন্ত্যসামর্থ্যের কথা পরোক্ষভাবে স্বীকার করিলেন। আমাদের মনে হয়, এই পরিণামবাদই পরিণামে শ্রীরামানুজের অবিকৃত পরিণামবাদ ও শ্রীজীবের অচিন্ত্য পরিণামবাদেই পরিণতি লাভ করিয়াছে। "চিন্তামণি যেমন নিজে অবিকৃত থাকিয়া বহু সুবর্ণ প্রসব করে—সেইরূপ ব্রহ্মও নিজে অবিকৃত থাকিয়া অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হন"—শ্রীজীবের এই ব্যাখ্যাই যেন পরিণাম-বাদের সম্বন্ধে সর্ব্বশেষ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথা। বীজরূপে এই কথাই সর্ব্বপ্রথমে আমরা বিষ্ণুস্বামীর সর্ব্বজ্ঞসূক্তে দেখিতে পাইলাম।

শ্রীবিষ্ণুস্বামী ঈশ্বর সম্বন্ধে বলিতেছেন—"ঈশ্বরস্তোপাধি-বশ্যতাভাবেন নিত্যমুক্ততাম্। সগুণমেব গুণৈরনভিভূতং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বেশ্বরং সর্ব্বনিয়ন্তারং সর্ব্বোপাস্যং সর্ব্বকর্ম্মফল-প্রদাতারং সর্ব্বকল্যাণগুণনিলয়ং সচ্চিদানন্দং ভগবন্তং শ্রুতয়ঃ প্রতিপাদয়ন্তি। যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ। যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ। সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ। যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরঃ। সোঽকাময়ত বহু স্যাম্। স ঐক্ষত তত্তেজোঽসৃজত। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ইত্যাদ্যাঃ।"

অর্থাৎ—উপাধিবশ্যতার অভাব হেতু ঈশ্বর নিত্যমুক্ত। শ্রুতিগণ তাঁহাকে সগুণ হইলেও গুণের দ্বারা অনভিপ্রেত সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বোপাস্য, সর্ব্বকর্ম্মফল-প্রদাতা, সর্ব্বকল্যাণ-গুণনিলয়, সচ্চিদানন্দ ভগবান্ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। অনন্তর শ্রুতি হইতে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে—যথা;—"যিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ" "যাঁহার তপস্যা জ্ঞানময়" "সকলই যাঁহার বশবর্ত্তী, যিনি সকলের ঈশান" "যিনি পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবী হইতে পৃথক্" "তিনি কামনা করিলেন, আমি বহু হইব।" "তিনি দর্শন করিলেন, তিনি সেই সূর্য্যরূপী তেজকে সৃষ্টি করিলেন।" "সত্য-জ্ঞান অনন্তই ব্রহ্ম" ইত্যাদি।

বস্তু বা ভগবানের এই প্রতিপাদিত তত্ত্বের সহিত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ভিন্নমত নাই। তবে শ্রীজীব শক্তি ও শক্তিমৎ হিসাবে ব্রহ্ম, ভগবান্ ও পরমাত্মা এই ত্রিবিধ যে যুক্তিসঙ্গত ও শ্রুতিসঙ্গত বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন, অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণের কেহই এত দূর সূক্ষ্মবিচারে অগ্রসর হন নাই।

এখন উপাসনাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, আদি বিষ্ণুস্বামী ও তাঁহার অনুবর্ত্তী শিষ্যানুশিষ্যগণ শ্রীনৃসিংহদেবের উপাসক। এই জন্যই তাঁহারা শ্রুতির মধ্যে নৃসিংহতাপনী উপনিষদের প্রাধান্য বিশেষ ভাবে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। শ্রীমাধবাচার্য্যের সর্ব্বদর্শনসংগ্রহেও দেখা যায়—

"বিষ্ণুস্বামিমতানুসারিভিঃ নৃপঞ্চাস্যশরীরস্য নিত্যত্বোপপাদনাৎ তদুক্তং সাকারসিদ্ধৌ—

সচ্চিন্নিত্যনিজাচিন্ত্যপূর্ণানন্দৈকবিগ্রহম্।
নৃপঞ্চাস্যমহং বন্দে শ্রীবিষ্ণুস্বামিসম্মতম্।"

অর্থাৎ—শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মতানুসারিগণ কর্ত্তৃক শ্রীনৃপঞ্চাস্য বিগ্রহের শরীরের নিত্যত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। "সাকারসিদ্ধি"তে এই কারণে বলা হইয়াছে যে—"শ্রীবিষ্ণুস্বামিসম্মত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ নিজ অচিন্ত্য আনন্দে পরিপূর্ণ শ্রীনৃপঞ্চাস্যকে বন্দনা করি।" সুতরাং দেখা যাইতেছে, আচার্য্য বিষ্ণুস্বামী শ্রীবিগ্রহের নিত্যত্ব স্বীকার পূর্ব্বক শ্রীভগবানের অচিন্ত্য আনন্দ বিগ্রহত্ব স্থাপন পূর্ব্বক শ্রৌতবাদের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। এই স্থলে আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় বিদ্যমান। শ্রীনৃপঞ্চাস্য বিগ্রহের পঞ্চবদন শিবকেও বুঝাইয়া থাকে। এ জন্য নৃপঞ্চাস্য শব্দের বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক শ্রীরুদ্রের সহিত শ্রীনৃসিংহদেবের অভিন্নতাও বুঝাইতেছে। ফলতঃ শ্রীশিবের সহিত শ্রীবিষ্ণুর অভিন্নতা সর্ব্ব-প্রথমে বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায় কর্ত্তৃকই অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীধরস্বামীও শ্রীভাগবতের টীকার মঙ্গলাচরণে 'মাধব' ও 'উমাধব'কে পরস্পরের আত্মস্বরূপ বলিয়া প্রণাম বিশেষরূপে বিখ্যাত। শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীসদাশিবের সহিত বিষ্ণুর অভিন্নত্ব "শ্রীলঘুভাগবতামৃতে" প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শ্রীশিবে ও শ্রীবিষ্ণুতে ভেদজ্ঞান করিলে বৈষ্ণবের "নামাপরাধ"-রূপ মহা অপরাধ হইবে এবং তাহার ফলে তাঁহার কোনও প্রকার সাধনার দ্বারাই শ্রীভগবৎকৃপালাভ অসম্ভব—ইহা শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে' এবং শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী তাঁহাদের "শ্রীহরিভক্তিবিলাসে" বিবৃত করিয়াছেন।

দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামী বা রাজগোপাল বিষ্ণুস্বামীর অনুশিষ্য শ্রীবিল্বমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের রসময়ত্ব ও ব্রজবধূগণের শিরোমণিস্বরূপা শ্রীরাধার ভজনবৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদও তাঁহার শ্রীভাগবতের টীকার রাসপঞ্চাধ্যায়ে যে প্রকারে এই উপাসনার বৈশিষ্ট্য সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে যে বৈষ্ণবজগতের 'স্বামী' বলিয়া গিয়াছেন, ইহাতে কিছুমাত্র অত্যুক্তি নাই।

তৃতীয় বিষ্ণুস্বামী বা আন্ধ্র বিষ্ণুস্বামীর গৃহস্থ শিষ্যপরম্পরায় শ্রীল যজ্ঞনারায়ণ ভট্ট নামক এক যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীল গঙ্গাধর ভট্ট; এই গঙ্গাধরের পুত্র শ্রীগণপতি ভট্ট। তাঁহার পৌত্র লক্ষ্মণ ভট্ট। শ্রীমদাচার্য্য বল্লভ এই লক্ষ্মণ ভট্টের দ্বিতীয় পুত্র। ইঁহাদের সম্প্রদায়ের মতে বিজয়নগরের রাজসভায় বল্লভ ভট্ট অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত বিজ্ঞানানন্দ গিরিকে বিচারে পরাজিত করিলে শ্রীবিল্বমঙ্গল * ইঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া ইঁহাকে বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ে দীক্ষিত করেন। অনেকের মতে ইনি শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিয়া (কাহারও মতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া) শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর আবিষ্কৃত শ্রীল গোবর্দ্ধননাথ গোপালের সেবায় নিযুক্ত হন। ইনি নিজে শ্রীভাগবতের যে "সুবোধিনী" টীকা লিখিয়াছেন, তাহাতে তৃতীয় স্কন্ধের ৩।৩২।৩৭ শ্লোকের টীকায় নিজে যে বিষ্ণুস্বামি সম্প্রদায় হইতে পৃথক্, তাহা স্পষ্টতঃ লিখিয়া গিয়াছেন (মাসিক বসুমতী, আষাঢ় ১৩৪০, বৈষ্ণবমত-বিবেক)। কিন্তু তথাপি পরবর্ত্তী কালে ইঁহার প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ ইঁহাকে বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন। সম্ভবতঃ চতুঃসম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে রাখিবার আগ্রহে, অথচ ইনি যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের, এরূপ পরিচয়ে স্বতন্ত্র সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার বিশেষ ব্যাঘাত হয়—এই জন্য পরবর্ত্তী তদ্বংশীয় গুরুবর্গ ইঁহাকে বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করাইয়াছেন।

যাহা হউক, শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্যের শুদ্ধাদ্বৈতবাদের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের বিরোধ নাই। শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্য শক্তিস্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি শক্তির 'অচিন্ত্যত্বও' স্বীকার করিয়াছেন। ব্রহ্মে বিরুদ্ধ শক্তির সমাশ্রয়ও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। তিনিও অবিকৃত পরিণামবাদী। তিনি পূর্ব্বে যে মর্য্যাদামার্গ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহা ঐশ্বর্য্যময় শ্রীভগবানের উপাসনা। পরবর্ত্তীকালে তিনি যে পুষ্টিমার্গের উপাসনা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তিত

* ইঁহাদের সম্প্রদায়ের গ্রন্থে আছে যে, শ্রীল বিল্বমঙ্গল ৭ শত বৎসর ধরিয়া বায়ুভূতরূপে থাকিয়া শ্রীবল্লভাচার্য্যের জন্য অপেক্ষা

রাগানুগা ভজনপদ্ধতিরই নামান্তর—তাহা শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে দেখাইয়াছেন।

শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্যের দার্শনিক মতবাদ ও উপাসনা-পদ্ধতি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে যে বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার সপ্তম অধ্যায়ে পরিস্ফুটরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। যিনি কাহারও উপরোধে বা কাহারও সহিত বিরোধের জন্য সত্যের অপলাপ করেন নাই, সেই চরিতামৃতকারের অকাট্য ঐতিহাসিক প্রমাণ অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই। শ্রীবল্লভ ভট্ট পূর্ব্বে বিশেষ ভাবে মর্য্যাদামার্গের প্রচার করিয়াছেন; পরে গদাধর পণ্ডিতের নিকট কিশোরগোপাল মন্ত্র-গ্রহণ করিয়া পুষ্টি-মার্গের বা রাগানুগা ভজনের প্রচার করেন। চরিতামৃতের পূর্ব্বোক্ত অধ্যায়ে ঐ মন্ত্র গ্রহণের কথা স্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে। যথা—

বল্লভ ভট্টের হয় বাল্য-উপাসনা।
বালগোপাল মন্ত্রে তেঁহ করেন সেবনা॥
পণ্ডিতের সনে তাঁর মন ফিরি গেল।
কিশোর-গোপাল উপাসনায় মন হৈল॥
পণ্ডিতের ঠাঞি চাহে মন্ত্রাদি শিখিতে।

• • • •

দিনান্তরে পণ্ডিত কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ।
প্রভু তাঁহা ভিক্ষা কৈল লঞা নিজগণ॥
তাঁহাই বল্লভ ভট্ট প্রভুর আজ্ঞা লৈলা।
পণ্ডিত ঠাঞি পূর্ব্ব প্রার্থিত সর্ব্বসিদ্ধ কৈলা॥

—চৈ: চ:, অন্ত্য, ৭

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের সংস্পর্শে আসিয়া বল্লভ-সম্প্রদায়ের ও নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ উপাসনা-পদ্ধতিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের দ্বারা যে বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের হরিব্যাসজী 'মহাবাণী' গ্রন্থে সখীভাবে যে যুগল-ভজন-পদ্ধতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যে গৌড়ীয় আচার্য্যগণের সঙ্গ-প্রভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দেশ, কাল, পাত্রবিচারে প্রমাণিত হইয়াছে (মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ ১৩৪২, "বৈষ্ণব-মত-বিবেক" প্রবন্ধ)।

শ্রীবল্লবাচার্য্যের পুত্র বিট্‌ঠলেশ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক শ্রীমহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের বিগ্রহ শ্রীগোবর্দ্ধনের সন্নিকটস্থ গাঁঠুলি গ্রামে প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিতেন। যথা—

"বিট্‌ঠলের সেবা কৃষ্ণচৈতন্যবিগ্রহ।
তাহার দর্শনে হৈল পরম আগ্রহ॥"

—ভক্তিরত্নাকর, বহরমপুর সংস্করণ, ২১৩ পৃ:।

পরে ভক্তিরত্নাকরে আরও বর্ণিত আছে—

"শ্রীদাস গোস্বামী আদি পরামর্শ করি।
শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বরে কৈলা সেবা-অধিকারী॥"

—ভ: র:, বহরমপুর সংস্করণ, ২১৩ পৃ:।

যখন শ্রীমহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব বৈষ্ণব মাত্রেরই গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতে আরোহণ নিষিদ্ধ করিলেন, কারণ, শ্রীগোবর্দ্ধন শ্রীহরিরই শরীর, তখন শ্রীরূপ-সনাতনের অবর্ত্তমানে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী ও শ্রীজীব গোস্বামী অন্যান্য বৃদ্ধ বৈষ্ণবগণের সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় ভক্ত বিট্‌ঠলেশ্বরের উপরই শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরীর আবিষ্কৃত শ্রীল গোবর্দ্ধননাথ গোপালের সেবার ভার অর্পণ করেন।

ইহা দ্বারাও শ্রীবল্লভসম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্যগণের সহিত শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

উপাসনাতত্ত্ব ও অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ

শুদ্ধ নির্ব্বিশেষ ও নিরাকার বস্তুর উপাসনার বিষয়ে কল্পনা করা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব। এইরূপ বস্তুর শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন অদ্বৈতাচার্য্যগণের বিধান অনুসারে অবশ্য কর্ত্তব্য হইলেও সসীম ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট মনুষ্যগণের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। আবার ঐকান্তিক দ্বৈতবাদ অঙ্গীকার করিলেও বিগ্রহের অচিন্ত্যত্বের ও অপ্রাকৃতত্বের স্ফুরণ হওয়া সহজসাধ্য নহে। পরন্তু আত্মীয়তার প্রগাঢ়তা না জন্মিলে লীলা-অনুভবের যে অলৌকিক আনন্দ, তাহা উপভোগের অধিকার জন্মে না। এই জন্য সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ সাকার-নিরাকার এই উভয় তত্ত্বের অতিগ অবস্থায় থাকিয়া যে রসবস্তু জড় ও চিন্ময় উভয় জগতেই রসের লহরী প্রবাহিত করিতেছেন, তাঁহার সহিত লীলানন্দে যোগদান করিতে গেলে সাকার-নিরাকার, সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ জ্ঞান যে অবস্থায় ডুবিয়া যায়, সেই অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বে উপনীত হইতে হয়। এই অবস্থায় মানব-দৃষ্টিতে যে অতি সাধারণ প্রাকৃত দারু-প্রস্তরাদিনির্ম্মিত সাকার বিগ্রহ সসীম ও সবিশেষ বলিয়া অনুভূত হয়, অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বজ্ঞ সাধকের নিকট তখন সেই বিগ্রহই অপ্রাকৃত বিষয়রস-তত্ত্বরূপে উপলব্ধ হইয়া থাকেন। এই অবস্থায় সাধক ভগবানের অপ্রাকৃত চিন্ময় লীলার রসমাধুরীতে অধিকতররূপে নিমজ্জিত হইয়া থাকেন। সর্ব্ববিচারের অতীত এই উপলব্ধির অবস্থাতেই শ্রীরূপ-সনাতনাদি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীললিতমাধব, শ্রীবিদগ্ধমাধব ও শ্রীগোপালচম্পূ-প্রমুখ গ্রন্থের বর্ণিত লীলা সাক্ষাদ্‌ভাবে উপলব্ধি করিয়া এই সকল লীলাগ্রন্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং উপাসনা-তত্ত্বে এই অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বই শ্রুতির সারল্য রক্ষা করিয়া সেই অলৌকিক চিন্ময় পরতত্ত্বকে প্রকাশিত করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল)।

কয়লা-শিল্পে আত্মঘাতী অপচয় ও অপব্যবহার

ভারতের খনিজ শিল্পের মধ্যে পাথুরিয়া কয়লার স্থান সর্ব্বপ্রথমে না হইলেও প্রথম শ্রেণীর বিশিষ্ট পর্য্যায়ে। রন্ধনশালা হইতে সর্ব্বপ্রকার শিল্প-শালায় ইন্ধনরূপে প্রতি দিন প্রতি মুহূর্ত্তে ইহার প্রয়োজন অপরিহার্য্য। প্রধানতঃ ইহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। অঙ্গারোৎপাদক (Anthracite) এবং তৈলোৎপাদক (Bituminous)। উভয়বিধ কয়লাই শিল্প-প্রয়োজনে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইহার উপ-উপপত্তিও (Bye-products) অনেক। এক টন উৎকৃষ্ট কয়লা হইতে আমরা দশ হাজার কিউবিক (ঘন) ফুট গ্যাস, দশ গ্যালন আলকাতরা, ২৩ গ্যালন নিশাদলঘটিত দারু (Ammonical liquer), এবং ৩৬ বুশেল পোড়া কয়লা (Coke) পাই। সমগ্র জগতে প্রতি বৎসর ১২০ কোটি টন কয়লা উৎপন্ন হয়; ইহার মূল্য অন্যূন ছয় শত কোটি টাকা। ইহার দুই-তৃতীয়াংশ যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পদ্। ভারতের উৎপাদন দুই হইতে তিন কোটি টন, এবং তাহার মূল্য নয় হইতে দশ কোটি টাকা।

ভারতের কয়লা দুই প্রকার। প্রথম শ্রেণীতে ভস্ম এবং আর্দ্রতা (Ash and moisture) অধিক, কিন্তু গন্ধক (Sulphur) কম। দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়লায় উদ্বায়ী অংশ প্রচুর, ভস্ম কম এবং গন্ধক অধিক। দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়লা প্রধানতঃ আসাম ও পঞ্জাব প্রদেশে পাওয়া যায়। ইহার আকরিক সম্বল ২৩০ কোটি টনের অধিক নহে। প্রথম শ্রেণীর কয়লায় আকরিক সম্বল আনুমানিক ছয় হাজার কোটি টন। তন্মধ্যে দুই হাজার কোটি টন ব্যবহারার্থ প্রাপ্তব্য বলিয়া গণ্য। এই দুই হাজার টনের এক-চতুর্থাংশ উচ্চগুণবিশিষ্ট, এবং তন্মধ্যে ১৫০ কোটি টন মাত্র লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পোপযোগী ইন্ধনার্থ (Metallurgical coke) ব্যবহারোপযোগী।

উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য হিসাবে লৌহ ও ইস্পাত ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্প। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে উৎপন্ন ইস্পাতের মূল্য হইয়াছিল দশ কোটি টাকা। ভারতে প্রতি-বৎসর ত্রিশ লক্ষ টন খাদযুক্ত লৌহ (Iron ore) খনি হইতে উদ্ধৃত হয়। ইহার মূল্য সাড়ে চারি কোটি টাকা। এই লৌহ-মিশ্রকে পরিষ্কৃত করিয়া আমরা পাই সাড়ে সতের লক্ষ টন খাদ-মুক্ত লৌহ (Pig iron)। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ভারতে যে সাড়ে সাত লক্ষ টন ইস্পাত প্রস্তুত হইয়াছিল, সে জন্য নয় লক্ষ টন খাদ-মুক্ত লৌহ ব্যবহৃত হইয়াছিল। উদ্বৃত্ত ৮৭ লক্ষ টন খাদ-মুক্ত লৌহ হইতে সাড়ে-পাঁচ লক্ষ টন, প্রায় তিন কোটি টাকা মূল্যে, বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। বক্রী অংশ দেশাভ্যন্তরে বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। বিশেষজ্ঞগণের অনুমান, ভারতের উৎকৃষ্ট লৌহের আকর-নিহিত সম্বল তিন শত কোটি টন। এই সম্বল ভারতের লৌহ-শিল্পোপযোগী উৎকৃষ্ট কয়লা-সংস্থানের দ্বিগুণ। নূতন লৌহ-(ore)খনির আবিষ্কার অসম্ভব নহে। সুতরাং ভারতের লৌহ-(ore) সম্পদ্, লৌহ-শিল্পোপযোগী কয়লা অপেক্ষা দ্বিগুণেরও অধিক হইবে। এই নিমিত্ত ভারতের উৎকৃষ্ট কয়লাসম্পদের অপচয় ও অপব্যবহার অচিরে বন্ধ না করিলে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্প পঙ্গু হইয়া পড়িবে।

অতীব দুঃখের বিষয় যে, এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কয়লার অপচয় ও অপব্যবহার উভয়ই বর্ত্তমানে প্রচুর। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ভারতের মোট উৎপাদন হইয়াছিল ২·৮০ কোটি টন। তন্মধ্যে মাত্র ৩০ লক্ষ টন লৌহ-শিল্পোপযোগী ইন্ধনে পরিণত হইয়াছিল। অবশিষ্ট কয়লা কাঁচা পোড়ান হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ৯০ লক্ষ টন উৎকৃষ্ট কয়লা ছিল। এই লৌহশিল্পোপযোগী ইন্ধনের অপ-ব্যবহারই একমাত্র ক্ষতি নহে। ইহার এইরূপ শোচনীয় অপব্যবহারের ফলে, আমরা প্রচুর উপ-উপপত্তিতেও বঞ্চিত হইয়াছিলাম। অপচয় ও অপব্যবহার নিবারণ করিতে পারিলে, আমাদের উৎকৃষ্ট কয়লা-(caking coal) সম্পদ চতুর্গুণ পরিমাণ লৌহ-মিশ্রকে খাদমুক্ত ভাবে পরিশোধিত করিতে পারিত; অথবা চতুর্গুণ পরিমাণ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারিত। উত্তোলন-ক্রটি হেতু শতকরা এক টন অপচয় ধরিয়া কয়লার বর্ত্তমান ক্ষয়ের (consumption) হিসাবে, আমাদের উৎকৃষ্ট কয়লা-সম্পদ্ ৫০ বৎসর মাত্র স্থায়ী হইবে; আর যদি অপচয় ও অপব্যবহার নিবারণ করা যায়, তাহা হইলে দুই শত বৎসর আমরা তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিব। সুতরাং অযথা অপচয় ও অপব্যবহার নিবারণ করিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বতোভাবে আমাদের কয়লা-সম্পদের সংরক্ষণ অত্যাবশ্যক।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দের অবসানে ভারতের উৎকৃষ্ট কয়লার সংস্থান (reserve) ছিল নিম্নরূপ :—

কয়লা ক্ষেত্র	প্রথম শ্রেণীর সর্ব্বাধিক উৎকৃষ্ট কয়লা	উৎকৃষ্ট লৌহ-শিল্পোপযোগী কয়লা
গিরিধি ও জয়ন্তী	২ কোটি টন	১½ কোটি টন
রাণীগঞ্জ	১৭০½ " "	২২ " "
ঝরিয়া	১১৫ " "	৮০ " "
বোকারো	৭৮ " "	৩০ " "
উত্তর ও দক্ষিণ কারানপুরা	১৪½ " "	
হুটার, ঝোহিলা, বুরাঢ়	৪⅘ " "	
কুর্দাসিয়া, ঝিলমিলি ইত্যাদি	২½ " "	
তালচর হইতে কোত্রা	১৯⅖ " "	
মোপানি, কান্হান-বোঞ্চ	২½ " "	
বল্লারপুর, সিঙ্গারেনি	৪ " "	
একুন	৪৭৩⅕ " "	১৩৩½ " "

ভারতের এই কয়লা-সম্পদ্ অন্যান্য দেশের সংস্থানের তুলনায় কত অকিঞ্চিৎকর, তাহা নিম্নে প্রদত্ত অঙ্ক-তালিকা হইতে বিশদ হইবে :—

দেশ	কোটি টন
যুক্তরাষ্ট্র	২,৮৮,৯০০ " "
জার্ম্মাণী	২৮,৮৭২ " "
যুক্তরাজ্য	১৭,৬০০ " "
চীন	২৫,০০০ " "

চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে, ভারতীয় খনিতে উত্তোলন-কালে কয়লার অযথা অপচয়ের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে সরকার বিলাত হইতে ট্রেহার্ণ-রীজ নামক এক জন বিশেষজ্ঞকে এ দেশে আনিয়া, আমাদের এই অমূল্য সম্পদের অযথা অপচয় নিবারণের উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত করেন। এই অনুসন্ধানের ফলে, ১৯২০ খৃষ্টাব্দে, কয়লা-ক্ষেত্র সমিতি (Coal-fields Committee) নিযুক্ত হয়। সমিতি কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত পরিচালকের তত্ত্বাবধানে বাধ্যতামূলক ভাবে সজ্জীকরণ প্রথার (Stowing) প্রচলনের জন্য সুপারিশ করেন। কিন্তু তখনও আমাদের কয়লাসম্পদের পরিমাণ নির্ণীত হয় নাই। সুতরাং খনি-আইনের কিঞ্চিৎ কঠোরতা ব্যতীত, অন্য কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই; অপচয়ের মাত্রাও হ্রাস হয় নাই।

তাহার পর খনি ধ্বসিয়া পড়া, আকস্মিক বিস্ফোরণ, অগ্নিকাণ্ড ও জলপ্লাবন প্রভৃতি বহু দুর্ঘটনা-জনিত বিষম ধনজনক্ষয় সংঘটনে সর্ব্বসাধারণের ও সরকারের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হয়, এবং ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে কয়লা-খনি সমিতি (Coal-mining Committee) প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিমধ্যে ভূতত্ত্বানুসন্ধান বিভাগ (Geological Survey of India) ভারতের কয়লা-সম্পদ্ যে অতি-পরিমিত, তাহা নির্দ্ধারণ করেন। অবশেষে এই অতি-সাংঘাতিক অনিষ্ট সম্বন্ধে সরকারের চৈতন্য সমুদ্ধ হয় এবং আমাদের অতি-পরিমিত কয়লা-সম্পদের আশু সংরক্ষণ যে অত্যাবশ্যক, তদ্বিষয়ে কয়লাখনি সমিতি অবহিত হয়েন।

সংরক্ষণের দুইটি দিক্; অর্থাৎ দুই প্রকারে সংরক্ষণের উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। প্রথম, অপচয় নিবারণ, দ্বিতীয়, অপব্যয় নিবারণ পূর্ব্বক প্রতি খণ্ড কয়লার যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার।

কয়লা-শিল্পের প্রথম যুগে আমরা যেরূপ আনাড়ির মত খনি হইতে কয়লা সংগ্রহ করিতাম, এখনও তাহার বিশেষ উন্নতি হয় নাই। য়ুরোপীয় কর্ত্তৃত্বাধীন প্রথম শ্রেণীর কয়েকটি খনিতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বিত হইয়াছে বটে, এবং তাহাতে যেটুকু অপচয় রহিত হইতেছে, তাহা নিতান্তই অল্প। অধিকাংশ কয়লা-খনিতে এখনও আদিম প্রথায় উত্তোলন-কার্য্য চলিতেছে। অনেক ক্ষেত্রে অপকৃষ্ট কয়লা খনিগর্ভে ফেলিয়া-রাখিয়া উৎকৃষ্ট কয়লা সংগ্রহ করা হয়। ইহার ফলে যে আমরা প্রচুর অপকৃষ্ট কয়লা হইতে বঞ্চিত হই তাহাই নহে, উৎকৃষ্ট কয়লারও প্রচুর অপচয় ঘটে; কারণ, যে সকল ব্যাপারে অপকৃষ্ট কয়লা দ্বারা অনায়াসে কায চলিতে পারে, সে সকল ক্ষেত্রেও আমরা অহেতুক উৎকৃষ্ট কয়লা ব্যবহার করি। ইহাতে আর্থিক হিসাবে খরচ কিছু কম, এবং সহজেই কার্য্যসিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু উৎকৃষ্ট কয়লার অপব্যবহারে উত্তম কয়লার অযথা ব্যয় হেতু তদুপযুক্ত কার্য্যের নিমিত্ত তাহার সংস্থানের স্বল্পতা ঘটে। অথচ আমাদের প্রধানতম লৌহ-শিল্পের অতি প্রয়োজনীয় কয়লার সংস্থান অতি-পরিমিত। স্থূল স্তরে (thick seam) খণ্ডিত ভাবে আংশিক কর্ম্মপরিচালনা ক্ষেত্রে এইরূপ অপচয় হয় প্রচুর। পরিত্যক্ত কয়লার ক্ষতি ব্যতীত স্বতঃপ্রজ্বলিত অগ্নিকাণ্ড এবং গহ্বরাচ্ছাদনের আকস্মিক পতনের ফলে, বিধ্বস্ত খনি ও পার্শ্ববর্ত্তী সংলগ্ন-সম্পত্তির সমূহ অনিষ্ট ঘটে।

এই অপচয় ও অনিষ্ট নিবারণের জন্য কয়লা-খনি সমিতি বিশেষ প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত সুপারিশ করিয়াছিলেন যে, উদ্ধৃত কয়লার শূন্য স্থান বালি অথবা অন্য কোন প্রকার অদাহ্য বস্তু দ্বারা দৃঢ় ভাবে পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। বালি-ঠাসা প্রথাই (sand-stowing) অবশ্য সহজ ও সর্ব্বজনগ্রাহ্য। ইহা অবিসংবাদিত যে, এই প্রথা যথাযথ ভাবে প্রযুক্ত হইলে, আপৎ ও অপচয় উভয়ই যথেষ্ট পরিমাণে নিবারিত হয়।

সমিতির সুপারিশের ফলে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে কয়লা-খনি নিরাপত্তা-সজ্জা-বিধি (Coal Mines Safety Stowing Act) প্রবর্ত্তিত হয়। একটি সজ্জা-নিয়ন্ত্রণ-মণ্ডলী (Stowing Board) গঠিত হয় এবং তাহার

কার্য্য পরিচালনকল্পে সর্ব্বপ্রকার কয়লার উপর দুই আনা হিসাবে কর নির্দ্ধারিত হয়। সংগৃহীত অর্থ হইতে যে সকল খনিতে বালি-ঠাসা অথবা অন্য প্রকার সজ্জাবিধান অবশ্য প্রয়োজন, সেই সকল খনিকে অর্থ সাহায্য করিবার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয়। ফলে, কয়লা খনিগুলির আবেদনে প্রার্থিত অঙ্ক-সমষ্টি বহু গুণে সংগৃহীত-অর্থ-সমষ্টিকে অতিক্রম করে। সজ্জাবিধান-মণ্ডলী কেবলমাত্র সেই সকল খনিকে সাহায্য দানে সমর্থ হইয়াছিলেন, যাহাদের প্রয়োজন ও নিরাপত্তার তাগাদা অত্যধিক। এই সাহায্য ও ঠাসিবার উপযুক্ত বালি ইত্যাদি খনিখাৎ-মুখে পৌঁছাইয়া, অথবা তাহার মূল্য দেওয়া মাত্রে সীমাবদ্ধ ছিল।

এই সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ সাহায্য প্রদানের ফলে এক অসমঞ্জস পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। উচ্চমূল্যে বিক্রীত উৎকৃষ্ট কয়লার অধিকারী স্বচ্ছল-অবস্থা-সম্পন্ন খনি ব্যতীত অপকৃষ্ট কয়লার অধিকারী দুঃস্থ-খনিগুলি এই আংশিক সাহায্যের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে নাই। অথচ, এই দ্বিতীয় শ্রেণীর খনির সংখ্যাই অধিক, এবং তাহাদের সকলগুলিই ভারতবাসী-পরিচালিত। এইগুলিই অধিকতর বিপজ্জনক,—আকস্মিক স্বতঃ-প্রজ্বলিত অগ্নিকাণ্ডের আশঙ্কা এইগুলিতেই অধিক। সুতরাং বালিঠাসার প্রয়োজনও ইহাদেরই সমধিকতর। কিন্তু আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য ইহারা এই অত্যাবশ্যক আংশিক সাহায্য হইতে বঞ্চিত থাকিতে বাধ্য হয়। ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে, কয়লা-শিল্প, বিশেষতঃ ইহার দুর্ব্বল অংশ, অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর খনিগুলি চির-দারিদ্র্যগ্রস্ত। কয়লা বিক্রয়ের মূল্য দ্বারা ইহারা কদাচিৎ খনি হইতে কয়লা উদ্ধারের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারে। ফলে, এই সকল খনিতেই অপচয় অধিক। কিন্তু ইহাদিগকে আংশিক নহে, সম্পূর্ণরূপে বালিঠাসার ব্যয় না দিলে ইহারা নিরাপত্তার সুযোগ লাভ করিতে পারিবে না।

বর্ত্তমানে সজ্জাবিধানমণ্ডলীর অর্থ-সংস্থানে, সমস্ত খনিগুলিকে বালিঠাসার নিমিত্ত পূর্ণ সাহায্য প্রদান সম্ভবপর নহে। এই উদ্দেশ্যে নির্দ্ধারিত কর (Cess) বৃদ্ধি না করিলে, উপযুক্ত অর্থসাহায্য অসম্ভব। যখন নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ এই উভয় অপরিহার্য্য প্রয়োজনের নিমিত্ত এই কর, তখন স্বল্প কর প্রদান করিয়া সাহায্য হইতে বঞ্চিত হওয়া অপেক্ষা, কিঞ্চিৎ অধিক কর দিয়া উপযুক্ত সাহায্য লাভ করা শ্রেয়ঃ। আপাতদৃষ্টিতে এই করের আতিশয্য পীড়ন বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু ভবিষ্যৎ কল্যাণের প্রতি অবহিত হইয়া এই করভার স্বচ্ছন্দচিত্তে বহন করাই যুক্তিযুক্ত। এই করভার অবশ্য অবশেষে ক্রেতামাত্রকেই বহন করিতে হইবে। মালগাড়ীর ভাড়া হ্রাস করিলেও এই ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে।

বর্ত্তমান অপচয়শীল উত্তোলনের প্রশ্রয়ে যে কয়লা নষ্ট হইয়া ক্ষতির মাত্রা বৃদ্ধি করিতেছে, ভবিষ্যতে সেই কয়লার অভাবে ক্রেতাগণের বিশেষ অসুবিধা হইবে। চাহিদা অপেক্ষা যোগান কম হইলে, পণ্যের মূল্য অযথা বৃদ্ধি পায়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। বিশেষতঃ, বর্ত্তমান অসঙ্গত উত্তোলন প্রথার ফলে, অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি দুর্ঘটনার সম্ভাবনা;—সম্ভাবনা কেন, নিশ্চয়তা প্রচুর। অতীতের অভিজ্ঞতাই ইহার অকাট্য প্রমাণ। অগ্নিকাণ্ডের ফলে কয়লার সমূহ ক্ষতি ব্যতীত ভবিষ্যৎ উত্তোলনের পথ রুদ্ধ না হউক, বিঘ্নসঙ্কুল হয়। এই নিমিত্ত পরিহার্য্য অপচয় নিবারণার্থ বিধিবদ্ধ আইনের কঠোরতা আরও বৃদ্ধি করা অবশ্য প্রয়োজন।

বর্ত্তমানে প্রচুর পরিমাণে অপকৃষ্ট কয়লার অপচয় হেতু, যে সকল কার্য্যে অপকৃষ্ট কয়লা ব্যবহৃত হইতে পারে, সেখানেও উৎকৃষ্ট কয়লার অযথা অপব্যয় হইতেছে। অথচ ভারতের কয়েকটি স্থূল ও মূল শিল্পের নিমিত্ত উৎকৃষ্ট কয়লার প্রয়োজন যেমন অধিক ও অপরিহার্য্য, তাহার সংস্থানও তেমনি স্বল্প ও পরিমিত। অপচয় ও অপব্যয়ের ফলে, অভাব অপরিহার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী। লৌহশিল্পের আলোচনা আমরা পূর্ব্বেই করিয়াছি। ইহা অতীব দুঃখের বিষয় যে, যে লৌহশিল্পের প্রধান প্রয়োজন তদুপযোগী উৎকৃষ্ট কয়লা, সেই লৌহ-শিল্পও বাষ্প উৎপাদনের নিমিত্ত উৎকৃষ্ট কয়লার অপব্যবহার করিতেছেন। লৌহশিল্পের প্রসার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে এবং যুদ্ধের অবসানে ইহার ক্ষেত্র অধিকতর বিস্তৃতিলাভ করিবে। সুতরাং ভবিষ্যৎ সংস্থানের প্রতি সতর্কদৃষ্টি না রাখিলে দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দের অবসানে উৎকৃষ্ট কয়লার পরিমাণের যে তালিকা আমরা দিয়াছি, তাহাতে লৌহশিল্পোপযোগী উৎকৃষ্ট কয়লার সমষ্টি ১৩৪ কোটি টন মাত্র। কয়লা-ক্ষেত্রের দেড় শত মাইলের মধ্যে লৌহ-মিশ্রের পরিমাণ তিন শত কোটি টন অপেক্ষাও অধিক। এক টন লৌহ-মিশ্রকে ধাতুতে পরিণত করিতে এক টন উৎকৃষ্ট কয়লা (caking coal) প্রয়োজন হয়। সুতরাং যদি উৎকৃষ্ট কয়লার প্রতি-টুকরা খনি হইতে উদ্ধার করা যায়, তাহা হইলেও লৌহ-শিল্পের প্রয়োজনোপযোগী কয়লার একান্ত অভাব। বর্ত্তমান অপচয় ও অপব্যবহারের ফলে এই উৎকৃষ্ট কয়লা ৫০ হইতে ৬০ বৎসরের মধ্যেই নিঃশেষিত হইবে। উৎকৃষ্ট কয়লা যথা-সম্ভব সংরক্ষণ করিয়া যে যে কার্য্যে সম্ভব, উৎকৃষ্টের সহিত কিছু কিছু অপকৃষ্ট কয়লা মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করাই লৌহ-শিল্পের কর্ত্তব্য।

বিজ্ঞানের যাদুবলে, অথবা নূতন আবিষ্কারের ফলে, হয় ত ভবিষ্যতে খাদযুক্ত ধাতুকে (ore) প্রকৃত ধাতুতে (metal) পরিণত করিতে কাঁচা কয়লার ব্যবহার সম্ভবপর হইবে। অথবা অপকৃষ্ট কয়লা হইতে উৎপাদিত

তড়িৎশক্তি দ্বারা এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে। অপকৃষ্ট কয়লাকেও হয় ত উৎকৃষ্ট ইন্ধনে পরিবর্ত্তিত করা যাইবে। কিন্তু যত দিন সেই শুভ সম্ভাবনা বাস্তবে পরিণত না হইতেছে, তত দিন সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বতোভাবে আমাদের সম্বল ও সংস্থানকে শ্যেনদৃষ্টিতে সংরক্ষণ করিতে হইবে। নতুবা বিঘ্ন, বিপদ ও বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী। সরকারের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

অপচয় ও অপব্যয়ের আলোচনা শেষ করিয়া এই বার গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা যাহাতে আমরা সর্ব্ববিধ কয়লার প্রতি-টুক্‌রা হইতে বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন ব্যবহার লাভ করিতে পারি, তাহার আলোচনা করিব।

ভারতের নিজস্ব খনিজ তৈল-সম্পদ্‌ অত্যন্ত অল্প। এই নিমিত্ত পেট্রলিয়াম সরবরাহ, বিশেষতঃ পেট্রল ও পিচ্ছিল (Lubricating) তৈল সংগ্রহ ও সংস্থান-সমস্যা অতি জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। গত কয়েক বৎসর ভারতের সমগ্র খনিজ তৈলের উৎপাদন ৮·৪০ কোটি গ্যালন (Imperial) মাত্র। ইহার এক-চতুর্থাংশ পঞ্জাব হইতে পাওয়া যায়। অবশিষ্ট অংশ আসামের দান। ভারতের সমগ্র খনিজতৈল-পরিশ্রুতি কারখানায় উৎপন্ন মোটর-তৈলের (Petrol) পরিমাণ ২·১০ কোটি গ্যালন মাত্র। প্রতি-বৎসর ভারতে—প্রধানতঃ বর্ম্মা হইতে ৮ কোটি গ্যালন পেট্রল ও বেঞ্জল (Benzol) আমদানী হইত। সুতরাং প্রতি-বৎসর ভারতের প্রয়োজন ও ব্যয় দশ কোটি গ্যালন মোটর-স্পিরিট, পেট্রল, বেঞ্জল, গ্যাসোলিন (Gasolene) ইত্যাদি। গ্যালন-প্রতি বারো আনা শুল্ক হেতু (Petrol, benzol, alcohol, and related Motor-spirit) কয়লা হইতে বেঞ্জল উৎপাদন করিতে, পেট্রলিয়াম হইতে পেট্রল উৎপাদন অপেক্ষা ব্যয় চতুর্গুণ অধিক পড়ে। এই জন্যই ভারতে কয়লা হইতে বেঞ্জল উৎপাদন লাভজনক নহে।

যুক্তরাজ্যে কয়লা এবং আল্‌কাতরা হইতে দ্রবীকরণ প্রথায় (Hydrogenation of coal) এবং কয়লা হইতে উৎপন্ন গ্যাস হইতে সংযোগাত্মক প্রথায় (Synthetical processes) বেঞ্জল উৎপাদনার্থ গ্যালন-প্রতি ছয় পেনি সরকারী সাহায্য প্রদত্ত হইয়াছিল। ভারতে পেট্রল, বেঞ্জল, এল্‌কোহল এবং সংশ্লিষ্ট মোটর-তৈলের উপর নির্দ্ধারিত গ্যালন-প্রতি বারো আনা শুল্ক সরকার পরিহার করিলে ভারতে লাভজনক ভাবে কয়লা হইতে বেঞ্জল উৎপাদন করা সম্ভব হইবে; কিন্তু ইহাতে বাণিজ্য-বিষয়ক জটিলতার সৃষ্টি হইতে পারে। সম্প্রতি ভারতে ২৫ লক্ষ টন কয়লা পোড়াইয়া (in by-product ovens) লৌহশিল্পোপযোগী ইন্ধন (Metallurgical coke) প্রস্তুত করা হয়। সুতরাং কোন বিশেষ পারিভাষিক মুস্কিল (Technical difficulty) ব্যতীত আভ্যন্তরীণ সংস্থান (domestic sources) হইতে, পেট্রলিয়াম হইতে যে-পরিমাণে পেট্রল উৎপন্ন হয়, কয়লা হইতেও সেই পরিমাণে বেঞ্জল উৎপাদন করিতে পারা যায়। কয়লা হইতে বেঞ্জল প্রস্তুত করিতে পারিলে "টেট্রা ইথিল লেড" অর্থাৎ অঙ্গার ও জলযান (C_2H_5) সংযোগে সম্ভূত ইথিল-চতুষ্টয়বিশিষ্ট তরল সীসকের (Tetra-ethyl lead) সহিত মিশ্রিত করিয়া উৎকৃষ্ট মোটর-আরক তৈয়ারী করিতে পারা যায়। কিন্তু এই টেট্রা ইথিল লেড $PB(C_2H_5)_4$ (Tetra-ethyl lead) প্রস্তুত করা সহজসাধ্য নহে; কারণ, ভারতে সীসা, টিন, টাংষ্টেন (Tungsten) এবং দস্তা, খনিজের অভাব। সম্প্রতি যুদ্ধের প্রয়োজনে সরকারের ব্যয়ে এবং টাটার আনুকূল্যে জামসেদপুরে বেঞ্জল প্রস্তুত হইতেছে।

অধিকাংশ শিল্প-পরিচালনকল্পে স্বল্পব্যয়ে তড়িৎ-শক্তির (Electical energy) প্রয়োজন। অনেকের বিশ্বাস যে, একমাত্র খরস্রোত সলিল-সংঘাত ক্ষেত্র (Hydro-electric sites) হইতেই বিজলি-শক্তি প্রাপ্তব্য। সাধারণতঃ ইহাই সত্য বটে, কিন্তু সর্ব্বদেশের পক্ষে ইহা প্রযুজ্য নহে। ভারতে খরস্রোত সলিল-প্রবাহের শক্তির সদ্ব্যবহার দ্বারা বিজলি-শক্তির উৎপাদন ব্যয়-সাপেক্ষ; কারণ, অধিকাংশ স্থলেই এই সুবিধা গ্রহণার্থ ব্যয়সাধ্য বাঁধ বাঁধিতে হয়। পক্ষান্তরে, দামোদর-তটবর্ত্তী কয়লা-ক্ষেত্রে স্বল্পায়াসে ও স্বল্পব্যয়ে প্রচুর তড়িৎ-শক্তি উৎপাদিত হইতেছে। এরূপ অনুমান করা অন্যায় হইবে না যে, সহজ ও সুলভ-লভ্য কয়লা এবং উপযুক্ত সলিল-সাহায্যে এইরূপ একটি বৃহৎ তড়িৎ সরবরাহ-প্রতিষ্ঠান নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে অতি অল্পমূল্যে তড়িৎ-শক্তি সরবরাহ করিতে পারে। বিহারে এইরূপ প্রচেষ্টার সূত্রপাত হইয়াছে। লৌহশিল্প-প্রতিষ্ঠান উপলক্ষেও কয়লাক্ষেত্রে এইরূপ পরিকল্পনাকে রূপ দিবার নিমিত্ত উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে।

রাণীগঞ্জের কয়লাক্ষেত্রে ইস্পাত-প্রস্তুতের কারখানা খোলা হইয়াছে। ইহাতে অধিকতর লৌহশিল্পোপযোগী ইন্ধনের প্রয়োজন হইবে। এইরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যদি বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে তড়িৎ-সরবরাহ কর্ম্মশালায় (Power-stations) কাঁচা কয়লার পরিবর্ত্তে উদ্বৃত্ত গ্যাস ব্যবহার করিবার প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনোযোগ আকর্ষণ করিবে। কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যেই কয়লা হইতে গ্যাস প্রস্তুত করা অসঙ্গত হইবে না। দশ-পনের মাইল দূরবর্ত্তী স্থানেও এই গ্যাস সরবরাহ করা কঠিন সমস্যা নহে। সোভিয়েট রাশিয়ায় এক শত মাইল দূরবর্ত্তী টুলা সহর হইতে রাজধানী মস্কো নগরে গ্যাস সরবরাহ হইত। দামোদর-তটবর্ত্তী কয়লাক্ষেত্রের দুই শত মাইল

পরিধির মধ্যে রেলওয়ে বর্ত্মগুলিকে বিজলি-শক্তিতে পরিচালিত করা সম্ভব। এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে বহু পরিমাণ উৎকৃষ্ট কয়লার অপব্যবহার নিবারিত হইতে পারে।

খনি হইতে উত্তোলনের সময় প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কয়লা কুচা কয়লায় পরিণত হয়। অপকৃষ্ট কয়লার কুচার বিক্রয় অতি কম। ফলে, এইরূপ বিস্তর কয়লার অপচয় ঘটে। কিন্তু এই কয়লাকে গুঁড়া করিয়া (Pulverised coal) ব্যবহার করিবার রীতি বহু দেশে প্রচলিত। ইহাতে জাতীয় সম্পত্তির অপচয় নিবারিত ও তাহার সদ্ব্যবহার দ্বারা প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে ফোর্ড কারখানায় উৎকৃষ্ট কয়লার পরিবর্ত্তে পঁচিশ হইতে ত্রিশ ভাগ ছাই-মিশ্রিত কয়লা চূর্ণ করিয়া ব্যবহার করা হয়। ভারতবর্ষেও একটি কল এইরূপ চূর্ণীকৃত কয়লা ব্যবহার করিয়া, কোন প্রকার ক্ষতির পরিবর্ত্তে, আর্থিক সাশ্রয় লাভ করিয়াছে। কলিকাতার বিজলি-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান (Calcutta Electric Supply Company) বাষ্পসৃষ্টির (Generation of steam) নিমিত্ত প্রতি-বৎসর চারি হাজার টন চূর্ণ কয়লা ব্যবহার করেন। সুতরাং লৌহশিল্পের উপযোগী নয়, এমন অপকৃষ্ট কয়লাকে চূর্ণ করিয়া ব্যবহারে লাগাইলে কেবল যে অপচয় নিবারিত হইবে এরূপই নহে, পরন্তু বহু উৎকৃষ্ট কয়লার অপব্যবহার নিবারণহেতু জাতীয় স্বার্থের উন্নতি সংঘটিত হইবে।

কয়লা-শিল্পে আশু অপচয় ও অপব্যবহার নিবারণ পূর্ব্বক অপকৃষ্টের অধিকতর সদ্ব্যবহার দ্বারা উৎকৃষ্টের সংরক্ষণ হেতু গবেষণামূলক অনুসন্ধিৎসা ও পরীক্ষা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে ধানবাদে একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছে। সরকার এবং কয়লা-শিল্পে সংশ্লিষ্ট খনিসম্প্রদায় এ বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন, কিন্তু এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধের অভিঘাতে সত্বর এই উদ্দেশ্যসাধনের পথে বিষম অন্তরায় ঘটিয়াছে। তথাপি জাতীয় শিল্পের কল্যাণকল্পে এই স্থূল ও মূল উপাদানের অপচয় ও অপব্যবহার নিবারণপূর্ব্বক পরিমিত ও বিজ্ঞান-সম্মত ব্যবহার দ্বারা এই জাতীয় সম্পদের সর্ব্বতোভাবে সংরক্ষণ ও সদ্ব্যবহার অত্যাবশ্যক। বহু প্রকারে বহু প্রয়োজনে প্রতিদিন কয়লার আবশ্যক। কয়লা ভারতের অমূল্য জাতীয় সম্পদ্। পার্থিব সম্পদ্ মাত্রই বিনাশশীল, সম্যক্ সংরক্ষণ ব্যতীত ইহার স্থায়িত্ব অচিরস্থায়ী। এ ক্ষেত্রে যুদ্ধাবসানের প্রতীক্ষা অসম্ভব। শত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বর্ত্তমানেই সরকার ও খনিসমিতিকে সকল প্রকার কল্যাণকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে; বিলম্বে বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানুষ

শক্তি যেথায় ভক্তি হইয়া ঝরে,
মানুষ সেথায় মানুষ রহে না আর।
দেবতা নীরবে নেমে আসে ধরা'পরে,
মনের-দুয়ার খোলা রহে অনিবার।

স্বার্থ সেথায় নহে আপনার প্রাণ,
ব্যথিতের লাগি কেঁদে ওঠে সারা হিয়া,
প্রেমের ধর্ম্ম জনগণ-কল্যাণ,
আপনার প্রাণ দেয় সেথা নিঙাড়িয়া।

ক্ষুদ্র সেথায় ক্ষুদ্র রহে না আর,
ভিক্ষুক-বেশী নেমে আসে ভগবান্।
বিন্দু সলিলে কাঁপাইয়া বার বার,
কল্লোলি চলে সিন্ধুর অভিযান।

মানুষ আমরা ভুলি নাই আপনারে,
মানুষ আমরা কর্ণ শিবির জাতি;
আমরা আলোক আনিব অন্ধকারে,
আমরা মানুষ দেবতা মোদের সাথী।

শ্রীঅরুণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

[উপন্যাস]

১

দার্জ্জিলিং। বৃষ্টিতে নয়, মেঘে দশ দিক্ আচ্ছন্ন। জনপূর্ণ ক্যালকাটা রোডে আমার পিপাসিত নয়নের দৃষ্টি 'বদ্রাওনের রাজকুমারীকে' খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। নির্জ্জন গিরিগুহায়, শৈবালাচ্ছন্ন উপলখণ্ডে, নির্ঝরিণীর উপকূলে সেই চির-বিবশা বিরহিণীকে ধরি ধরি করিয়াও ধরিতে পারিতেছি না। সে আমার ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে লুকোচুরি-খেলা খেলিলেও তাহাকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে অনুভব করি।

মেঘের আবরণ ভেদ করিয়া পুষ্পরেণুর মত যে কুজ্ঝটিকা গলিয়া আমাদের মাথায় ঝরিয়া পড়ে, আমার কাছে তাহা তুচ্ছ বাষ্প নহে। এক অনাদৃতা, অভি-মানিনীর বিগলিত নয়নাশ্রু "শত রূপে শত বার ঝরি পড়ে অনিবার।"

মল্লিকা বলে, আমার না কি ভাবপ্রবণতা প্রচুর। এমন কবির কল্পনা-বিভোর হৃদয় লইয়া সংসারে বাস করা চলে না। মল্লিকা যাহাই বলুক, আমি কিন্তু আমার মধ্যে কাব্যের লেশও খুঁজিয়া পাই না।

দীর্ঘ দ্বিপ্রহর হইল রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ পড়িয়া আমার মনে 'বদ্রাওনের নবাবনন্দিনী' আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ পাইয়াছেন। নহিলে, কাদের খাঁর পুত্রী দৌলত-উন্নিসা বা জেব-উন্নিসার আমি ধার ধারি না।

হিমালয়কে অনেকে মায়াপুরী বলিয়া থাকেন। কাঞ্চন-জঙ্ঘার অপরূপ সৌন্দর্য্য, মেঘ-রৌদ্রের আলো-ছায়া, শ্যামল বনরাজি মনশ্চক্ষে অলকার দ্বার খুলিয়া দেয়। চেরীকুঞ্জের মর্ম্মর গানে, ঝাউয়ের হা-হা নিস্বনে, আমি যেন কাহার বিশ্বব্যাপী বিলাপ-গুঞ্জন শুনিতে পাই।

বাবা বলেন, মানুষের জীবনে আনন্দের উপাদান অতি অল্প। বাবা এ কথা বলিতে পারেন। অকালে আমার মাতৃবিয়োগের পর বাবা নিরানন্দের স্বাদ পাইয়া-ছেন। আমি তাহা পাই নাই; শৈশব হইতে বাবা আমার মায়ের অভাব পূর্ণ করিয়া আসিতেছেন। বাবার মধ্যে পিতা-মাতা উভয়ের স্নেহ লাভ করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি।

আমার বাবা চিরদরিদ্র, ইস্কুল-মাষ্টার। বিদ্যা-শিক্ষায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াও স্বেচ্ছায়, সানন্দে তিনি তাঁহার অখ্যাত জন্মভূমির সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন।

মর্ত্ত্যের এই স্বর্গপুরী পরিভ্রমণ করিবার সৌভাগ্য আর যাহার থাকে থাকুক, আমার বাবার নাই।

আমি আসিয়াছি আমার মাসীমার সঙ্গে। বাবা যেমন খ্যাতিহীন, বিত্তহীন দীনদরিদ্র, আমার মাসীমা তেমনি খ্যাতিসম্পন্না, এবং বিত্তশালিনী। আজ-কালকার সভ্য-সমাজে মাসীমাকে সকলেই চেনে, জানে। মাসীমা কলিকাতার মেয়ে-কলেজের অধ্যক্ষ।

মাসীমার একমাত্র আদরিণী কন্যা মল্লিকা। আমার দাদামহাশয় দু'দিনের ছোট-বড় দু'টি দৌহিত্রী-রত্ন লাভ করিয়া ফুলের নামে দু'জনের নাম রাখিয়াছিলেন। আমি শ্রীমতী করবী; সংক্ষেপে 'করু'। আমার দু'দিনের ছোট মল্লিকা। মল্লিনাথের টীকা করিয়া মাসীমা তাকে 'মিলি' বলিয়া ডাকেন।

মিলি মাসীমার মত মেধাবিনী। শিক্ষায় তার প্রবল অনুরাগ, বুদ্ধি শাণিত ছুরির মত তীক্ষ্ণ; মিলি হাবে-ভাবে বিলাসে লীলাময়ী। মিলির চেয়ে মিলির ছোট ভাই ভানুকেই আমি বেশী ভালবাসি। আমরা তিন ভাই-বোন মাসীমার সহযাত্রী।

হাঁ, যা বলিতেছিলাম। মেঘের রাজ্যে আসিয়া 'বহ্রাওনের রাজকুমারী'র কথা!—কোথায় সেই অকাল-বৃন্তচ্যুতা কোমল-পুষ্পমঞ্জরী?

স্বাস্থ্যকামী নর-নারী দলে দলে ভ্রমণে বাহির হইয়াছে, দূরে যা-কিছু অস্পষ্ট আব্‌ছা, ক্রমেই তাহা স্পষ্ট হইতেছে; রডোডেনড্রন গাছটি এতক্ষণ কুয়াসায় নিজেকে অর্দ্ধ-আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল, বাতাসের স্পর্শমাত্রই তাহার সূক্ষ্ম, ধূসর উত্তরীয়খানি সরিয়া গেল। কি সুন্দর ফুলগুলি! মেঘমালার দেশে অরুণোদয়! নিশীথের তিমির-জাল ভেদ করিয়া রাশি রাশি আলোক-গোলক যেন পৃথিবীর বুকে বিকশিত হইয়াছে।

উর্দ্ধে প্রভাত-সূর্য্যের মত রাঙ্গা টুকটুকে অসংখ্য ফুলের ফুলঝুরি; নীচে শ্যামল তরু-কাণ্ডের উপর ঈষৎ হেলিয়া মিলি দাঁড়াইয়া ছিল—জীবন্ত মনোরম ছবির মত!

সুন্দরী না হইলেও মিলি সাজিতে জানে। হিমালয়ের আলোর পাশে দাঁড়াইবে বলিয়াই বোধ হয় সে আজ গাঢ় লাল জর্জ্জেটের শাড়ী পরিয়াছিল। শাড়ীর নীচে পশম আঁটিয়া গায়ে দিয়াছিল চুম্‌কির কাজ-করা মক্‌মলের ব্লাউজ। ফুলের আভা লাগিয়াছিল তাহার রক্তিম কপোলে—যেখানে মিলির স্বহস্ত-রচিত একটি কৃষ্ণ তিল জল্‌-জল্‌ করিতেছে। মিলির ভ্রূযুগল বাঁকিয়া কাণের পাশের রেশমগুচ্ছের মত কালো কুচ্‌কুচে চুলের সঙ্গে একেবারে মিশিয়া গিয়াছে। আমি জানি, মিলির ভ্রূ অত বাঁকা নয়, তার গালেও বসোরা-গোলাপ ফোটে না। অধরের কৃষ্ণ তিল জলে ধুইলে মুছিয়া যায়, সমরখন্দ বিকাইবার সে অকৃত্রিম তিলও নয়। তাই বলিতে-ছিলাম, সুন্দরী না হইলেও মিলি সাজিতে জানে।

মিলির দৃষ্টির অনুসরণ করিলাম, তাহার অনিমেষ দৃষ্টি অনতিদূরে পাষাণ-শিলায় আবদ্ধ। সেখানে এক ইংরেজ-বেশধারী তরুণবয়স্ক ভদ্রলোকের সহিত ভানু দিব্য গল্প জমাইয়া তুলিয়াছে।

ভানু বেচারা নিতান্ত নিরুপায়। অঙ্কে কাঁচা, সে জন্য এবার 'ম্যাট্রিক' পরীক্ষায় ফেল করিয়াছে; তাই কাহারো কাছে আমোল পায় না। মাসীমা লজ্জায়, ঘৃণায় ছেলের সঙ্গে বাক্যালাপ একরূপ বন্ধই করিয়াছেন। মিলির অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্যের অন্ত নাই।

মাসীমার বাড়ীতে সবই সৃষ্টিছাড়া। পরীক্ষা, পাশ, ইহা ছাড়া জীবনের বিস্তৃতি নাই, পরিধি নাই। চৌদ্দ বছর বয়সের সরল বালকের প্রতি ইহাদের এই অকরুণ ব্যবহারে আমার কষ্ট হয়। ভানুর কিন্তু ইহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। গৃহের বন্ধন শিথিল হইলেও বাহিরের বন্ধনকে সে নিবিড় করিতে জানে।

আমি মিলির কাছে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলাম, "ভানু, সন্ধ্যে হলো যে!"

ভানু মাথা তুলিবার পূর্ব্বেই ভানুর সহচর চোখ তুলিলেন। তাঁহার চঞ্চল নেত্র বারেক আমার দিকে প্রসারিত হইয়া মিলির উপর নিবদ্ধ হইয়া রহিল। চোরাকটাক্ষে আমি তাঁহাকে দেখিয়া লইলাম। কি দেখিলাম? কেশরলালের 'গৌরবর্ণ প্রাণসার সুন্দর তনুদেহ' না হইলেও ভদ্রলোক সুদর্শন।

আমার সাড়া পাইয়া ভানু উৎসাহভরে বলিয়া উঠিল, "করুদি, ইনি মিষ্টার জ্যোতিভূষণ সেন, ক'মাস হলো কলকাতা হাইকোর্টে 'ব্যারিষ্টারী' কর্‌ছেন। এঁর কাছে আমি বিলেতের কত মজার-মজার গল্প শুন্‌ছিলাম! তোমরা এসো, আলাপ করিয়ে দেই।"

আলাপ করিবার জন্য আমাদের আর মিষ্টার সেনের নিকটে যাইতে হইল না। তিনিই অগ্রসর হইয়া টুপি খুলিয়া যুক্তকরে আমাদের নমস্কার করিলেন।

আমরা দুই বোনে প্রতি-নমস্কার করিলাম। সহাস্যে সেন কহিলেন,—"ভানু আপনাদের পরিচয় দিয়েছে। আপনি করবী দেবী—ফোর্থ-ইয়ার। আর আপনি মল্লিকা দেবী বি-এ,—এম-এ ক্লাশ চল্‌ছে।" আজ আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজেকে আমি ভাগ্যবান্ মনে করছি।"

মিহি সুরে মিলি উত্তর করিল—"আমরাও। ভানুর কথায় আপনি যে আমাদের সঙ্গে আলাপ করলেন, এর জন্য ধন্যবাদ।"

জ্যোতি বাবু বলিলেন, "দেখুন, আমার শরীরে বিদেশী

পোষাক থাকলেও আমি আমার নিজের দেশের সব কিছুই পছন্দ করি বেশি। বহু দিন বিদেশে থেকে, দেশের ওপর আমার টান অনেকখানি বেড়ে গেছে। সেই আগ্রহে ভানুর সঙ্গে বন্ধুত্ব হতে আমার সময় লাগেনি। আজ নিয়ে আমরা পাঁচ দিনের বন্ধু, কেমন ভানু?" বলিয়া সস্নেহে তিনি ভানুর পিঠ চাপড়াইয়া দিলেন।

"ভানু আমাদের নিয়েই বেড়াতে বেরোয়, কৈ, এর আগে কোথাও তো আপনাকে দেখবার সৌভাগ্য হয়নি! আপনাদের এত বন্ধুত্ব হলো কোন্ জায়গায়?"—বলিতে বলিতে মিলি জ্যোতি বাবুর দিকে তাকাইল।

জ্যোতি বাবু বলিলেন, "বন্ধুত্ব হয়েচে আমার স্বস্থানে, অর্থাৎ 'স্যানিটেরিয়ামে'। পথে-ঘাটে আলাপ তেমন জমে না বলে এত দিন আপনাদের সঙ্গে পরিচয়ের আনন্দ থেকে আমি বঞ্চিত ছিলাম। ভানুকে আমার বড্ড ভাল লাগে, বেশ ছেলে!"

মিলির ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। মিলি বলিল, "ওকে আপনাকে ভাল লাগে, আশ্চর্য্য? ও যে ভয়ঙ্কর বোকা!"

ভানুর উজ্জ্বল হাসি-মুখ সহসা মলিন হইল। ভানুকে আমি ভালবাসি; তাহার ব্যথায় ব্যথিত হইয়া আমি কহিলাম, "না না, বোকা কেন? ভানু খুব ভাল ছেলে। আপনার কাছাকাছিই আমরা থাকি। বারান্দায় দাঁড়ালে আপনার 'হোটেল' স্পষ্ট দেখা যায়।"

মিলি কহিল, "হাঁ, কাছেই। আমাদের বাসার নাম "কাননছায়া"। আপনি দেখেননি? রাস্তার ডাইনে নীল রংএর বাড়ী?"

"দেখেছি বই কি! কত দিন কাননছায়ার পাশ দিয়ে যাওয়া-আসা করেছি। বাড়ীখানা যেমন সুন্দর, নামটিও তেমনি। মুলুকের বাসা রেখে আপনারা যে ঐ বাসাটা ভাড়া নিয়েছেন, এতে আপনাদের রুচির প্রশংসা করতে হয়। কাননেই যে 'মল্লিকা' 'করবীর' বাস।"

আমার ঠোঁটের ডগায় আসিল—কাননে বাস হইলেও জ্যোতির স্পর্শে মল্লিকা-করবীকে ফুটিতে হয়। কিন্তু মনে উদয় হইলেই কি কেহ এমন কথা বলিতে পারে? আর বলিবে কে? মেয়ে-মহলে 'মুখচোরা' বলিয়া আমার অপবাদ আছে। কাজেই আমাকে নিস্তব্ধ থাকিতে হইল।

মিলি কাজল-কালো নয়নে কটাক্ষ হানিয়া আবদার করিতে লাগিল, "ভানুকে আপনি বন্ধু বলে স্বীকার করেছেন, আমাদের বাসার আসে-পাশে ঘুরেছেন, অথচ এক দিনও তাহলে দয়া ক'রে আসেননি কেন? আপনাকে পেলে মা কত খুসী হবেন।"

"খুসী হবেন, তা তো জানতাম না। না জেনে ঢুকতে সাহস হয়নি। সকলেরই গলাধাক্কার আশঙ্কা থাকে মল্লিকা দেবি!"

বলিয়া জ্যোতি বাবু হাসিতে লাগিলেন।

২

আমাদের আলাপ-আলোচনা বেশী দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই চারি দিক্ অন্ধকার করিয়া বৃষ্টি ঝরিতে লাগিল। ছাতি, বর্ষাতি যাহার যাহা সম্বল ছিল, তাহাতে মাথা ঢাকিয়া সকলেই গৃহাভিমুখে ছুটিল।

আমরাও ছুটিবার জন্য ব্যস্ত হইলাম, কিন্তু মুস্কিল হইল মিলিকে লইয়া। বৈকালে স্নিগ্ধ, নির্ম্মল রৌদ্রের নিশানা পাইয়া মিলি আজ ছাতা লইয়া বাহির হয় নাই। আমার ছোট ছাতায় কুলাইবে না। এক ছাতায় গায়ে-মাথায় ঠেলাঠেলি করিয়া পথ চলিবার প্রবৃত্তিও মিলির নাই। তবু আমি মিলির পাশে গিয়া ছাতা খুলিলাম।

ক'পা চলিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া মিলি বলিল, "না রুক্ন, এমন করে যাওয়া আমার পোষাবে না। দু'জনের ভিজে লাভ নেই। তুই বরং ছাতা মুড়ি দিয়ে যা। আমি মাটীর ঢেলা নই, বাদলায় কাদা হবারও ভয় নেই; এ ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে ভিজে যেতে আমি বেশ আরাম পাই।"

আমি ভানুর দিকে চাহিলাম। বৃষ্টির সম্ভাবনা হইবা-মাত্র ভানু তার ছাতা খুলিয়াছে। জানি, প্রাণান্তেও সে আমার ছাতায় আসিয়া তাহার ছাতা মিলিকে দিবে না। মিলি তাহার প্রতি বিমুখ, সে-ও দিদির উপর অপ্রসন্ন। দুই ভাই-ভগিনীর স্নেহের সম্বন্ধ বিদ্বেষে পরিণত হইয়াছে।

জ্যোতি বাবু ছিলেন আমাদের সঙ্গে। মিলির সামনে তিনি তাঁহার বর্ষাতিটা ধরিয়া মিনতি করিলেন, "যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে এটাকে স্বচ্ছন্দে আপনি কাজে লাগাতে পারেন, মল্লিকা দেবি! অনাবশ্যক বোঝা বইবার দায় থেকে আপাততঃ নিস্তার পেয়ে আমিও তাহলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। শীতের দেশে বৃষ্টিতে ভিজার

মানে, যমের দক্ষিণ দুয়ারে হানা দেওয়া—এ কথা মানেন তো ?”

কাণের মুক্তার ঝুমকা দুলাইয়া মিলি প্রতিবাদ করিল, “না, তা হয় না মিষ্টার সেন! যমের দক্ষিণ বলুন আর উত্তরই বলুন, আমার বেলা সব দুয়ার বন্ধ করে আপনার বেলায় তা খুলে দিতে পারবো না আমি! যথার্থ বল্‌ছি, বৃষ্টি-বাদলে ভিজলে আমার কখনো অসুখ করে না, আজো করবে না। শরীরের উপর আমার অত দরদ নেই।”

“শরীরের ওপরে না থাকলেও, শাড়ীর ওপরে আছে তো মল্লিকা দেবি! আমি জানি, শরীরের চেয়ে মেয়েদের শাড়ীর ওপরেই মায়া বেশি। আমার জন্যে ভাবনা নেই; রৌদ্র-বৃষ্টি সর্ব্বসহা শিরস্ত্রাণটিকে আমি শিরোভূষণ করে রেখেছি।”—বলিতে বলিতে জ্যোতি বাবু হাতের টুপিটা মাথায় তুলিলেন।

মিলি বিনা-বাক্যব্যয়ে বর্ষাতি গায়ে দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া জ্যোতি বাবুর কাছে সরিয়া গেল।

জ্যোতি বাবু ক্ষণেক ইতস্তত: করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে মিলিকে বর্ষাতি-কোটে আবৃত করিয়া দিলেন।

মিষ্ট হাসি হাসিয়া মিলি বলিল, “ধন্যবাদ মিষ্টার সেন! আমাকে কিন্তু দেখ্‌ছি ভালুক সাজিয়ে দিলেন!—আপনার মাপের এ-কোট আমার হবে কেন? আস্তিনের অর্দ্ধেকে হাত-দুটো আট্‌কা পড়ে গেছে। অনুগ্রহ করে বোতাম কটা—”

মিলিকে আর বলিতে হইল না। জ্যোতি বাবু সন্তর্পণে বর্ষাতির বুকের বোতাম কয়েকটা চট্‌পট্‌ আঁটিয়া দিলেন।

লজ্জায় সঙ্কোচে আমার চক্ষু নত হইল। জানি, মিলির মধ্যে লজ্জা-সরমের লেশ নাই; তবু প্রত্যেক মেয়েরই সম্ভ্রমের জ্ঞান আছে। এক স্বল্প-পরিচিত, অনাত্মীয় যুবকের সহিত এতখানি মাখামাখি আমার বড় দৃষ্টি-কটু মনে হয়।

কিন্তু মিলিকে সবই মানায়। তাহার আচার, ব্যবহার, বাক্যের অবারিত উচ্ছ্বাস, সমস্তই যেন প্রভাতের অনাবিল উচ্ছ্বসিত, মন্দ-মধুর সমীরণ-প্রবাহ! তাহার পদে পদে স্বাচ্ছন্দ্য, সাবলীল গতি। কোথাও বাধে না, মিলি যেন চঞ্চল জলাশয়ের প্রস্ফুটিত শতদল, মাধুরী ও সৌরভে সকলকে অহরহ আকর্ষণ করিতেছে! আমি সেই পদ্মের পাশে জলের ছোট ফুল—শৈবালা-বরণে আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছি! না পারি সুগন্ধ বিলাইতে, না জানি তীরবর্ত্তী পথিকের মন হরণ করিতে। তবু মিলির অনুরূপ আমারও নারী-প্রকৃতি জাগ্রত, বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। সে যে তার ‘মনের কামিনী-পাপড়ির উপর ভ্রমরের চরণ-ভর’ সহিতে চায়। কোথায় আমার সে মনোমধুপ! হৃদয়ের পাতে যাহাকে আঁকিয়া রাখিয়াছি! বাস্তব জগতে তাহার তো সন্ধান পাই না! আমার নিশীথ-স্বপ্ন নৈশ-সুষুপ্তিতেই বিলীন হইয়া যায়।

“করবী দেবী যে একেবারে চুপ! কোন্‌ দিকে যাওয়া যায় বলুন? বাসার দিকে, না অন্য কোথাও? বৃষ্টি এখনি থেমে যাবে। বেড়ানোর সময় এখনো উত্‌রে যায়নি।”

জ্যোতি বাবুর কথায় দিবাস্বপ্ন হইতে সহসা আমি সজাগ হইলাম। তখনো মৃদু বর্ষণ চলিতেছে, চাঁদের উপর হইতে মেঘ সরিয়া গিয়াছে। তিথিটা জানা ছিল না, ভাঙ্গা মেঘের ফাঁক দিয়া, ঝাউবনের ঘন পত্রাবরণ ভেদ করিয়া এক ঝলক করুণ জ্যোৎস্না-লেখা জ্যোতি বাবুর মুখে বিচ্ছুরিত হইয়াছিল। সেই মৃদু জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া কোন কথাই আমি কহিতে পারিলাম না। আমার ভীরু-কণ্ঠ ফুটি-ফুটি করিয়াও ফুটিল না।

মিলি কহিল,—“আর বেড়ানো নয়, আজকের মত বেড়ান বিরাম দিয়ে কাননছায়ায় বিশ্রাম। কেবল আমাদেরি নয়, আপনারো। চলুন, আপনাকে মার কাছে নিয়ে যাই, মা আপনাকে পেলে খুব খুশী হবেন!”

“আমিও তাঁর কাছে গেলে খুশী হবো, মল্লিকা দেবি! তবে আজ রাত্রে তাঁকে বিরক্ত না করে, কাল সকালে গেলে আপত্তি আছে?”

“আছে,—নিশ্চয় আছে। জানেন না কি, শুভ কাজ তাড়াতাড়ি সারতে হয়? এখুনি আপনাকে নিয়ে যাব। বর্ষাতি আটকেছি, এখন তার মালিককে আটকাতে পারলেই আমাদের জিত! কি বলিস্‌ করু?”

দেন নাই। তুমিই কথা বলো মিলি, আমি শুধু শুনিয়া লই। যে বলিতে পারে না, হাসিটুকুই যে তাহার সম্বল!

মিলির কথায় জবাব না দিয়া আমি হাসিলাম।

জ্যোতি বাবু বলিলেন, "পদে পদে যারা আপনাদের কাছে পরাজয় মেনে আসছে মল্লিকা দেবি, নতুন করে তাদের জিতে নিতে হয় না। তবু বাঁধতে জানা চাই। যাকে বিদেশের একটি বিদেশিনীও আটকাতে পারেনি, সে আপনাদের বন্ধন সানন্দে স্বীকার করে নিচ্ছে। বর্ষাতির লোভে নয়, বিশ্বাস করুন, ও-জিনিসের ওপরে আমার বিন্দুমাত্র স্পৃহা নেই। কাছে থাকলে নিজেকে ভারবাহী গর্দ্দভ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না। আমি যাচ্ছি আপনাদের সঙ্গসুখের প্রত্যাশায়।—চলুন।"

জ্যোতি বাবু অগ্রসর হইলেন। মিলি তাঁহার দক্ষিণ পাশ অধিকার করিয়া চলিল।

মিলির 'বোকা'—আখ্যায় দল-ছাড়া হইয়া ভানু আগাইয়া গিয়াছিল। আমি মিলির পিছনে চলিলাম।

বাহুতে বাহু ঠিক সংবদ্ধ না হইলেও, মিলি জ্যোতি বাবুর গা-ঘেঁষিয়া চলিতেছিল। চলিতে চলিতে কহিল, "বিদেশিনীরা বাঁধতে পারেনি বলে আপনার যে ভারী অহঙ্কার দেখছি? জানেন না, অহঙ্কারই পতনের মূল? বিলেতে কি আপনার এমন এক জনও মহিলা-বন্ধু জোটেনি, অনায়াসে আপনাকে যে বেঁধে রাখতে পারতো?"

"যে বাঁধন চায় না তাকে বাঁধা শক্ত, মল্লিকা দেবি! বন্ধু কেন জুটবে না? অনেক বন্ধু জুটেছিল; কিন্তু তারা ছিল বাইরের বন্ধু, অন্তরের নয়। তেলে-জলে মিশ খায় না জেনে আমি খুব সাবধানেই ছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল লেখাপড়া শেখা, মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা নয়। তা অহঙ্কার আছে বৈ কি, তবে অতি কিছু নেই। 'অতি' হলেই পতন—অল্পে সে ভয় নেই।"

"তাই না কি? অতি-অল্পের অত খবর জানি না। আপনার ভাল-থাকার ভেতরে নিশ্চয়ই 'মিসেস সেনের' অনুনয়-বিনয়, চোখের জলের শাসন ছিল। বাহাদুরি তাঁহারই প্রাপ্য, আপনার নয়।"

"না, মল্লিকা দেবি, এ বাহাদুরি আমারই প্রাপ্য। দুর্ভাগ্য বশতঃ মিসেস সেনের অস্তিত্বই নেই। না থাকলেও আমার মা আমার গলায় রক্ষাকবচ বেঁধে দিয়েছিলেন।"

"আপনার মা আছেন? আপনি বুঝি তাঁকে খুব ভালবাসেন? খুব মাতৃভক্ত ছেলে আপনি!"

"ভক্ত-টক্ত নই, তবে মাকে যে ভালবাসি, তা অস্বীকার করতে পারছি নে। মাকে কে না ভালবাসে? আপনারাও বাসেন নিশ্চয়, কি বলেন করবী দেবি?"

উত্তর দিলাম, "আমি ও-রসে বঞ্চিত জ্যোতি বাবু! আমার মা নেই।"

সহজ ভাবেই আমি কথাটা বলিতে গেলাম, কিন্তু কি জানি কেন, গলা কাঁপিয়া উঠিল। নিজের কথা আমার নিজের কাণেই করুণ, কোমল হইয়া বাজিল।

বিগলিত কণ্ঠে জ্যোতি বাবু বলিলেন, "বড় দুঃখের কথা। আমি জানতাম না করবী দেবি, আমায় মাফ্ করবেন।"

জ্যোতি বাবুর সহানুভূতিতে আমার হৃদয় আর্দ্র হইল, লজ্জার সীমা রহিল না। এতক্ষণ পরে আমি যদি কথা কহিলাম, তবে এমন কথা কেন কহিলাম—যাহাতে অপরের হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হয়? আমার বেদনা সে আমারি নিজস্ব, আমার বুকেই তাহা লুকানো থাকুক। আমি তাহা কাহাকেও জানাইতে চাহি না।

আমরা কাননছায়ার কাছে আসিতেই আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। আঁকা-বাঁকা পথ নির্ম্মল জ্যোৎস্না-ধারায় প্লাবিত হইতে লাগিল।

বাঁক ঘুরিয়া উপর হইতে নীচে নামিবার সময় অকস্মাৎ পা মচ্‌কাইয়া মিলি জ্যোতি বাবুর গায়ে ঢলিয়া পড়িল।

ক্ষিপ্রহস্তে মিলিকে ধরিয়া উদ্বেলিত কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হোল আপনার? পায়ে চোট লেগেছে? এই পাহাড়ে-রাস্তায় একটু অসাবধান হলে আর রক্ষা থাকে না।"

তখনি নিজেকে সামলাইয়া লইয়া মিলি সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উত্তর দিল, "না, বিশেষ লাগেনি—এই বাঁ পায়ে,—একটু টেনে দিলেই ঠিক হয়ে যাবে।"

জ্যোতি বাবু আমার দিকে তাকাইলেন।

আমি নত হইতেই মিলি বিরক্তির সহিত বলিল, "এ তোর কাজ নয় রুবু,—তোর গায়ে কি জোর আছে? জোরে টেনে না দিলে আমার পা বাড়াবার উপায় নেই।"

"আপনার আপত্তি না থাকলে এ কাজের ভারটুকু আমিই সানন্দে নিতে পারি মল্লিকা দেবি,—অনুমতি করুন।"

"ধন্যবাদ—উপায় নেই। দিন—আপনি জোরে টেনে দিন, বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছে।"

হেঁট হইয়া জ্যোতি বাবু মিলির জুতা-মোজা-বিমণ্ডিত পদপল্লবে হাত বুলাইয়া ধীরে ধীরে টানিয়া দিতে লাগিলেন, মিলি তাঁহার পিটের উপর দেহ-ভার এলাইয়া, বেদনাব্যঞ্জক অস্ফুট শব্দ করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে ক্লিষ্টস্বরে মিলি কহিল, "হয়েছে মিষ্টার সেন, আর আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। এখন আমি ঠিক যেতে পারবো—টন্-টনানি কমে গেছে। দয়া করে একবার আপনার এই বোঝাটা খুলে নিন তো! বৃষ্টি অনেকক্ষণ থেমে গেছে।"

জ্যোতি বাবু মিলির গাত্র হইতে বর্ষাতি খুলিতে লাগিলেন। আমি বিস্মিত হইয়া সেই আধ-আলো অন্ধকারে মিলির পানে চাহিয়া রহিলাম।

মিলি অভিনয়ে পটু। কিন্তু সে-অভিনয় এতখানি উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তা জানিতাম না। আমার সন্দেহ হইতেছিল, মিলির পদস্খলন ছলনা নয় তো? ইচ্ছাকৃত সুনিপুণ অভিনয় মাত্র? বেশী বকিতে না পারিলেও আমার অনুভূতির অভাব নাই। আমার মনে হয়, মিলি নিজেকে যতটা না জানে, আমি তাহাকে তার চেয়ে বেশীই জানি।

কিছুকাল পূর্ব্বে শুভ্র, সুন্দর প্রভাত-পদ্মের সহিত মিলির তুলনা করিয়াছিলাম। তাহার যৌবন-পুষ্পিত সুশোভিত দেহ পদ্মের মতই নয়নরঞ্জন; কিন্তু ভিতরে পঙ্ক-কর্দ্দম; লিলিকে পঙ্কজ বলা চলে না—পলাশ বলিলে শোভন হয়। মিলির কি না জানি আমি? কেন জানিব না? মিলি প্রদীপ, আমি ছায়া। মিলি বাণী, আমি প্রতিধ্বনি। আমাদের স্বভাব বিপরীত হইলেও আমরা পরস্পরের অনুগামিনী। আমাদের অন্তর পরস্পরের কাছে চির-উদ্ঘাটিত।

৩

মাসীমা আজ বেড়াইতে বাহির হন নাই। চিম্‌নীর সাম্‌নে সোফায় কাত-হইয়া পড়িয়া বিলাতী ম্যাগাজিন পড়িতেছিলেন। মাসীমার বয়স অল্প নয়,—কিন্তু শরীরটি দিব্যি আঁটো-সাঁটো, মজবুত। খুব চট্‌পটে কাজের লোক, চুল শুকান, খোঁপা বাঁধা, এ-সব কাজে সময় নষ্ট হয় বলিয়া চুল ছাঁটিয়া তিনি বাবরী রাখিয়াছেন। মাসীমার মেজাজ বরাবরই কিছু খিট্‌খিটে। মেশো মহাশয়ের মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল কলেজের মেয়েদের প্রতি শাসন-গর্জ্জন করিয়া মেজাজ আরও রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

দ্বারে জুতার শব্দে চকিত হইয়া মাসীমা কালো ফ্রেমের চশমার ভিতর দিয়া তাকাইলেন।

মিলি জ্যোতি বাবুর পরিচয় দিতে লাগিল।

জ্যোতি বাবুর আভূমিনত নমস্কারের প্রতি-নমস্কারচ্ছলে মাসীমা হাত তুলিয়া জ্যোতি বাবুর অভ্যর্থনা করিলেন, "বসুন—আপনাকে পেয়ে খুব আনন্দিত হলেম।"

সকলে উপবেশন করিলে প্রথমে দার্জ্জিলিংএর আব-হাওয়ার প্রসঙ্গ উঠিল। তাহার পরে হাইকোর্টের মামলা-মোকর্দ্দমা সংক্রান্ত আলোচনা ও দেশের বর্ত্তমান আর্থিক সমস্যার কথা। শেষে যুদ্ধের আলোচনা আরম্ভ হইতেই মাসীমা আমাকে চা আনিতে বলিলেন।

জ্যোতি বাবু আপত্তি করিলেন, "না না, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমার চা খাওয়ার অভ্যাস খুব কম। চা খেয়ে বেরিয়েছি কি না, এখন আর দরকার নেই।"

ভানুর মনের মেঘ কাটিয়া গিয়াছিল। সে কহিল, "বেড়িয়ে ফিরেই তো আপনি রোজ চা খান,—বাঃ! আমি বুঝি তা জানি নে, না, দেখিনি?"

"দেখবে না কেন ভানু, দেখেছ নিশ্চয়। কিন্তু এখনো যে বেড়িয়ে ফিরিনি!"

কৃত্রিম অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া মিলি বলিল, "বেশ, তো হোটেলেই খাবেন, আমাদের কাছে খাবার দরকার নেই। আমরা আপনার জন্য তো ব্যস্ত হইনি। আমাদেরো চা চাই কি না, নইলে জমে বরফ হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে।"

জ্যোতি বাবু কোন কথা না বলিয়া একটু হাসিলেন। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, হাসিলে জ্যোতি বাবুকে কি চমৎকার দেখায়! হাসে সকলেই, কিন্তু এমন সুমিষ্ট হাসি যে হাসিতে পারে, তাহারই হাসা মানায়।

আমি চা-এর ব্যবস্থা করিতে উঠিলাম। ইহা আমার দৈনিক কর্ত্তব্যের অঙ্গ। মিলি সংসারের কাজ করিতে ভালবাসে না, আমি বাসি। না বাসিলে চলিবে কেন? আমি যে গরীবের মেয়ে। বাবার কাছে তাঁহারই সংসারে আমার বাল্য এবং কৈশোর কাটিয়াছে ঘরকন্নার কাজেই।

ম্যাট্রিক পাশ করিয়া কলেজে পড়িবার জন্য আমাকে মাসীমার কাছে আসিতে হইয়াছিল। মাসীমা আমাকে আশ্রয় দিয়াছেন; তাঁহার সংসার আমি মাথায় তুলিয়া লইয়াছি। ঘরে খাদ্য-সামগ্রী যাহা ছিল, সাজাইয়া-গুছাইয়া বেহারার হাতে চাএর সরঞ্জাম দিয়া আমি বসিবার ঘরে আসিলাম।

প্রশংসমান নেত্রে আমার পানে চাহিয়া জ্যোতি বাবু কহিলেন, "করবী দেবি, দেখ্‌তে পাচ্ছি, আপনি মস্ত কাজের লোক! এরি মধ্যে ডিম ভাজা, নিম্‌কি পর্য্যন্ত করলেন কি করে? চিঁড়ে ভেজে আনতেও ভোলেননি! সত্যি কথা বলতে কি, আমি এই চিঁড়ে-ভাজারই পরম ভক্ত; তাই বিলেতে মা আমার জন্য চিঁড়ে-ভাজা পাঠাতেন।"

মাসীমা সাধারণ লোকের সঙ্গে মেলামেশা তেমন পছন্দ করিতেন না ; কিন্তু মিলি বি-এ পাশ করিবার পর হইতে—উপার্জ্জনক্ষম শিক্ষিত তরুণ-সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

গল্পচ্ছলে জ্যোতি বাবুর পরিচয় জানিয়া মাসীমার রুক্ষ, শুষ্ক মুখে একটি কোমল, মোলায়েম আভা ফুটিয়াছিল। জ্যোতি বাবুর প্রশংসায় তিনি প্রসন্ন মনেই যোগ দিলেন ; বলিলেন, "হ্যাঁ, করু বড় ভাল মেয়ে, কাজে-কর্ম্মে ওর জোড়া নেই। ও হলো লক্ষ্মী, আর মিলি সরস্বতী। ইংরেজী অনার্সে ফাষ্ট ক্লাশ ফাষ্ট হয়েছে। এত অল্প বয়সে এমন ফল সচরাচর দেখা যায় না। মিলি করুর চেয়ে ছোট, তবু লেখাপড়ায় এগিয়ে গেছে কত! শুধু কি লেখাপড়ায় ? ওর গান যদি শোনেন ! কি চমৎকারই ও গায় !"

মাসীমার এই বিজ্ঞাপনের উচ্ছ্বাসের মধ্যেই আমি জ্যোতি বাবুকে বলিলাম, "আপনি খান, খেতে খেতে কথা বলুন। সব জুড়িয়ে যাচ্ছে যে !"

"না, জুড়িয়ে যাবে না, ঠিক আছে।" বলিয়া জ্যোতি বাবু চিঁড়েভাজার ডিসখানা সম্মুখে টানিয়া লইলেন।

তৃপ্তিতে আমার হৃদয় ভরিয়া গেল। স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া কত খাবার জিনিস আরও কত লোককে খাইতে দিয়াছি ; অনেকেরই মুখে নিজের স্তুতি শুনিয়াছি, কিন্তু এমন অভূতপূর্ব্ব আনন্দে বায়ু-বিকম্পিত লতিকার মত আমার হৃদয় আর কখন তো কাঁপে নাই ! সর্ব্বাঙ্গ পুলকে এমন রোমাঞ্চিত হয় নাই। জ্যোতি বাবুকে খাওয়ানোর মধ্যে আমার এ কিসের পুলক, কিসের শিহরণ,—আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না !

সকলকে চা পরিবেশন করিয়া আমি চেয়ারে বসিলাম। নিজের চায়ের কথা ভুলিয়া গেলাম, কিন্তু তিনি ভুলিলেন না। চায়ের বাটিতে চুমুক দিতে দিতে কহিলেন, "অন্নপূর্ণার কি অনাহারের বিধি আছে করবী দেবি ! কৈ, আপনি তো চা নিলেন না ?"

আমার কপোল রাঙা হইল কি না, জানি না ; অন্তরে লালের ছোপ লাগিল। লজ্জায় আমি চোখ তুলিতে পারিলাম না। এত দিন এ-লজ্জা আমার কোথায় ছিল ? কেহ কোন দিন আমাকে লজ্জাশীলা বলে নাই, মুখচোরা বলিয়াছে। সরমে সঙ্কুচিত, সঙ্কোচে আনত হইবার বালিকা-বয়স অনেক দিন অতিক্রম করিয়াছি। আমাতে লাজনম্রা কিশোরীর অতর্কিত আবির্ভাবে আমি বিস্মিত হইয়া নিজের জন্ত চা ঢালিয়া লইলাম।

কিছুক্ষণ পর মাসীমা ডাকিলেন,—"করু, চা খেলি না ? তোর শরীরটা আজ ভাল নেই ?"

"ভালই আছি ; এই তো খাচ্ছি মাসীমা !" বলিয়া আমি চায়ের বাটি তুলিলাম। কিন্তু তখন তাহাতে বস্তু ছিল না। লজ্জা ঢাকিবার জন্য সেই দুধ-চিনি-মিশ্রিত শীতল পানীয় আমাকে পান করিতে হইল।

চা-খাওয়ার পরে জ্যোতি বাবু বিলাতের গল্প আরম্ভ করিলেন। মাসীমার বহু দিনের ইচ্ছা—বিদেশ ভ্রমণের ; নানা বাধা-বিঘ্নে সেই ইচ্ছা এত দিন কাজে পরিণত না হইলেও তাঁহার আগ্রহ কি প্রবল ! বিলাত-প্রত্যাগত কাহাকেও পাইলে মাসীমা খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিতেন।

আমাদের গল্পের আসর ভাঙ্গিতে রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। গির্জ্জার ঘড়ির ঢং-ঢং শব্দে সচকিত হইয়া জ্যোতি বাবু বিদায় চাহিলেন।

মাসীমা বলিলেন, "আপনার গল্প আমার চমৎকার লাগ্‌লো। এক দিনেই শেষ করবেন না কিন্তু,—আরো ঢের খবর আমার জান্‌তে হবে। কাল সকালে সাড়ে সাতটায় আপনি আস্‌বেন—এসে আমাদের সঙ্গে চা খেলে খুব খুশী হবো।"

ভানু কহিল,—"না এলে আমি গিয়ে ধরে আনবো, মনে রাখবেন !"

মিলি আবদার করিতে লাগিল—"আসবেন নিশ্চয়, ভুলে যাবেন না।"

"কেন ভুলে যাব ? আমার তেমন ভুলো-মন নয়। খেতে বল্লে কক্ষনো ভুলি না। করবী দেবী যে চিঁড়ে-ভাজার লোভ দেখিয়েছেন, সেই লোভে এখানে তো দূরের কথা, কল্‌কাতাতেও আপনাদের পিছু-পিছু আমাকে ধাওয়া করতে হবে। চিঁড়ে-ভাজা ছাড়া আরো একটা লোভ আছে। আজ আপনাদের গান শোনবার সৌভাগ্য হলো না ; কাল কিন্তু পেটের খোরাক ও কাণের খোরাক দু'টোই না আদায় করে আমি ছাড়ব না।"—বলিয়া সকলকে অভিবাদন করিয়া জ্যোতি বাবু প্রস্থান করিলেন।

আমার মনে হইল, ঘরের উজ্জ্বল-ইলেক্‌ট্রিক-আলো সহসা নিষ্প্রভ হইয়া গেল। কাচের জানালা দিয়া বাহিরের যতটুকু চোখে পড়িতেছিল, যেন তাহা গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেছে ! মুখর বাতাসের সন্-সন্ শব্দের মধ্যে আবার আমি বিরহিণী 'বত্রাওনের রাজকুমারীর' নূপুর-সিঞ্জিত পদধ্বনি শুনিতে লাগিলাম। সে যেন অনাদৃত ভক্তি-ভার লইয়া, অনাঘ্রাত হৃদয়-ভার লইয়া, নির্ঝরিণীর তীরে তীরে ঘন গুল্মে আচ্ছাদিত দুর্গম বন-রাজীর মধ্যে সে যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী গিরিবালা দেবী।

যেমনটি চান্!

আমরা যে ফাউন্টেন-পেন ব্যবহার করি, যে-গ্লাসে জল খাই, যে স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়া কাঠে রন্ধ্র রচনা করিয়া স্ক্রুপ আঁটি,—সে পেন্, গ্লাস বা স্ক্রু-ড্রাইভার হাতে ধরিয়া কাজ করিতে অসুবিধা-অস্বস্তির সীমা থাকে না। সম্প্রতি নিউ-ইয়র্কের এক জন বৈজ্ঞানিক-শিল্পী এঞ্জেলো কিশেডু সুবিধা-বাদের দিক দিয়া যে পেন, যে গ্লাস প্রভৃতি তৈয়ারী করিতেছেন, সে পেন হাতে ধরিয়া লিখিতে কোনো কষ্ট নাই, স্বচ্ছন্দে সে-পেন্ হাতে সরে; তেমনি হাতে ধরিতে সুবিধা, এমন ছাঁচে গড়া তাঁর এই গ্লাস ব্যবহারে এতটুকু অস্বস্তি ঘটে না! যে স্ক্রু-ড্রাইভার তিনি তৈয়ারী করিয়াছেন, আমাদের আঙুলের খাঁজে

স্ক্রু-ড্রাইভার নূতন রূপ

খাঁজে তাহা এমন স্বচ্ছন্দ ভাবে ধরা যায় যে, আঙুলের গাঁটে বা হাতে বেদনা হইবে না! এই ভাবে হাতের গড়ন বুঝিয়া তিনি পেন তৈয়ারী করিয়াছেন, গ্লাস তৈয়ারী করিয়াছেন,—আমাদের হাতের স্বাচ্ছন্দ্য-আরামের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া। উপরের ছবিগুলি দেখিলে শিল্পী-বিশেষজ্ঞের কলা-কৌশলের পরিচয় পাইবেন।

কৃত্রিম উপায়ে নিশ্বাস বহানো

নানা কারণে মানুষের সংজ্ঞা লোপ পায়; মানুষ অজ্ঞান অচেতন হয়। তার উপর এই দানবী-সমরের দিনে বিষ-বাষ্পের

পাম্পে নিশ্বাস বহানো

কল্যাণে মানুষ মূর্চ্ছিত হইতেছে! এ মূর্চ্ছা-অপনোদনের প্রধান উপায়,- কৃত্রিম উপায়ে অচেতন ব্যক্তির ফুশফুশ-যন্ত্রে নিশ্বাস-বায়ু সঞ্চালিত করা। সম্প্রতি এক জন সুইস্ বৈজ্ঞানিক হাতে-চালানো এক-রকম পাম্প তৈয়ারী করিয়াছেন—এ পাম্প দেখিতে ঠিক ফুটবলের পাম্পের মতো। এই পাম্প চালনা করিয়া মূর্চ্ছাতুরের মুখ দিয়া তার ফুশফুশ-যন্ত্রে বাতাস বা অক্সিজেন বাষ্প সঞ্চালিত করা যায়—সহজে! পাম্পের সঙ্গে একটি টিউব আছে,—মূর্চ্ছাতুরের মুখের উপর একটি মুখোশ পরাইয়া সেই টিউব-সংযোগে পাম্প হইতে বায়ু সঞ্চালিত করা হয়।

ব্যবহার করা হইতেছে। সাধারণ বেলে-পাথর এবং কয়লা হইতে তাঁরা মেলামাইন প্রস্তুত করিয়া সেই মেলামাইন দিয়া ঘর-কর্ণার নানা বস্তু সৃষ্ট করিতেছেন। মেলামাইন জলে ভেজে না—মেলামাইনে ঝোল, ভাত, তরকারী-ব্যঞ্জনের দাগ লাগে না; এজন্য
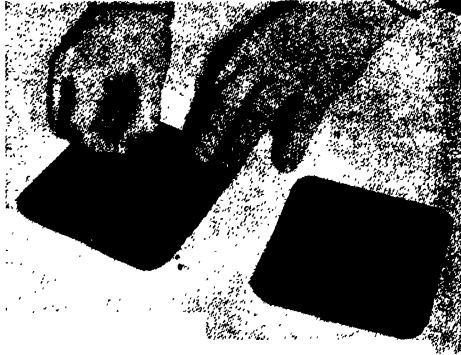
জমাট কঠিন মেলামাইন্

ইহা দিয়া প্লেট ডিশ পেয়ালা গ্লাস তৈরী হইতেছে। কাগজী-তোয়ালে, ব্লাউশ্ ও ফ্রকের কাপড়ও তৈয়ারী হইতেছে। অবশ্য কাপড় ও প্লেট প্রভৃতি তৈয়ারীর প্রণালীতে ঈষৎ তারতম্য আছে। বিবিধ রাসায়নিক উপাদান মিশাইলে মেলামাইনের

মেলামাইনের তৈরী কাপড়—এ-কাপড় কোঁচকায় না!

আকারে আবার বহু বৈলক্ষণ্য ঘটে। অর্থাৎ এই মেলামাইন তরল-ধারায় যেমন এনামেল-পালিশের কাজ করে, তেমনি কঠিন হইলে তাহা দিয়া প্লেট পেয়ালা প্রভৃতি তৈয়ারী হয়; আবার এই মেলামাইন অন্য রূপে জামার কাপড় বা আচ্ছাদনাদি রচিয়া তোলে। আমেরিকার সায়ানামিড (Cyanamid) কোম্পানি এই মেলামাইন লইয়া যেন ভেল্‌কি খেলিতেছেন!

—

কুকুরের গলায় বগলশ্

কুকুরের গলায় বগলশ্ আঁটিয়া জান আর কুকুর সে-বগলশ্ দাঁতে কাটিয়া নির্মূল করিয়া দেয়? একটির বদলে কুকুরের গলায় দু'টি
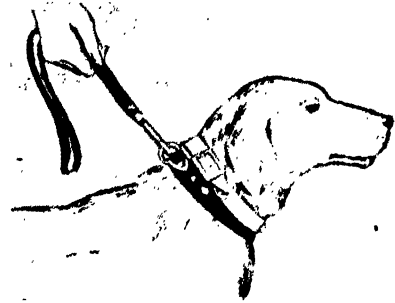
ডবল্ বগলশ

বগলশ আঁটুন—পিছনের বগলশের সঙ্গে চেন জুড়িয়া দিন এই পাশের ছবির ভঙ্গীতে। যত-বড় দুরন্ত কুকুর হোক, কিছুতে তার সাধ্য হইবে না পিছনের বগলশ কাটিয়া নিজেকে শৃঙ্খলমুক্ত করিবে!

—

অভিনব কুকার

এই নূতন কুকারটি গৃহস্থের কল্যাণকল্পে আমেরিকার অভিনব দান! এ কুকারের মধ্যে তরী তরকারী, মাংস ভরিয়া কুকারের
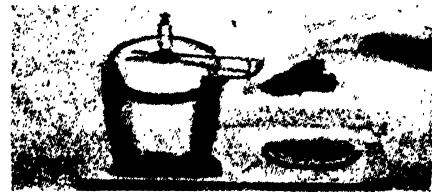
ডালা-বন্ধ কুকার

ঐ ডালায় যা-কিছু কৌশল

ডালা টাইটভাবে বন্ধ করিয়া দিন্। তরী-তরকারীতে বা মাংসে এক বিন্দু জল দিবেন না। ভাপে এ কুকারে দেড় হইতে তিন মিনিটের মধ্যে সব সিদ্ধ হইবে। মাংস সিদ্ধ হইতে সময় লাগে পনেরো মিনিট। তবে মাংসর টুকরা সমান ভাবে কাটিয়া কুকারে ভরিতে হইবে। শাক-সব্জী, ফল-মূল—এ কুকারে ভরিয়া যত দিন খুশী রাখিয়া দিন, সে শাক-সব্জী ও ফল-মূল শুকাইবে না বা সে-সবে যে ভাইটামিন থাকে, সে-ভাইটামিনের গুণ এক তিল ক্ষয় পাইবে না। কুকারের সঙ্গে সময়-নির্দ্দেশক ছোট একটি ঘড়িও সংলগ্ন আছে। এ কুকার ঘরে রাখিলে জ্বালানী কয়লা বা বৈদ্যুতিক প্রবাহের প্রয়োজন নাই; কাজেই প্রচুর ব্যয় লাঘব হইবে।
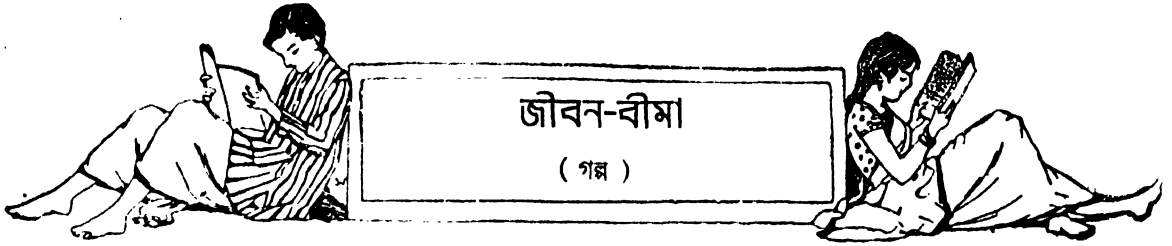
জীবন-বীমা

(গল্প)

সে মরতে চায়! শুধু মুখের কথা অথবা ভাব-বিলাসিতা নয়, সত্যই সে মরতে চায়। জীবনে তার কি সুখ আছে? শুধু ভাবনা আর চিন্তা, কেবলমাত্র যেটুকু সময় ঘুমোয়, তখনই যা একটু শান্তি পায়। তাও আবার অনেক সময় ঘুমের ঘোরে কাবলীওয়ালা পাওনাদারকে স্বপ্নে দেখে—বলছে "আসল ছোড় দেগা মগর সুদ নেহী ছোড়েগা"। তার জীবনে খাটুনী আছে, অর্থ নেই, ব্যর্থতা আছে, তৃপ্তি নেই। তাই প্রতিদিন রাত্রিতে যখন সে শুতে যায়, তখনই ভাবে আর যেন কালকের প্রভাত না আসে; কিন্তু প্রতিদিনই উঠে দেখে সে মরেনি! অদৃষ্টের এই তো সব চেয়ে নিষ্ঠুর পরিহাস! যে বাঁচবার জন্য লালায়িত, সে মরে;—অথচ যে মরবার জন্য ব্যগ্র, সে মার্কণ্ডেয়ের মত অখণ্ড পরমায়ু নিয়ে দিব্য বেঁচে থাকে।

সুধীরের মনে পড়ে, বিগত দিনের পুরাণো কথা। তখন সবেমাত্র সাহিত্যে এম-এ পাশ করে বেরিয়েছে। দু'-চারটে লেখা তার মাসিক-পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হয়েছে। মনে আশা আছে, কালে একটা রবীন্দ্রনাথ অথবা শরৎচন্দ্র অথবা—নাঃ, আর তেমন দেশজোড়া নাম তো মনে পড়ে না! সুতরাং তার পরেই নিজের নামটাই সুধীরের মনে জাগে। সেই সময় মৈত্রেয়ীর সঙ্গে তার আলাপ হয়। সে বি-এতে ইংরেজীতে অনার্স নিয়েছে। সুধীরের কাছে পড়া বুঝতে আসা-যাওয়া করে। সুধীরও তাকে মন-প্রাণ ঢেলে পড়ায়। যতটা পড়ায়, নিজের রচনার কথা তার চেয়ে বেশী শোনায়। ছাত্রী মুগ্ধ হয়ে তাই শোনে। ফলে তার বি-এ পাশ করা হ'ল না, কিন্তু শুভলগ্নে সুধীরের সঙ্গে বিয়েটা হয়ে গেল। সুধীর লেখে, মৈত্রেয়ী শোনে।

কিন্তু আজ? কোন আশাই তো সুধীরের পূর্ণ হয়নি! অত ভাল ভাবে পাশ করবার পরও কোথাও কোন ভাল চাকরী না পেয়ে শেষে একটা প্রাইভেট স্কুলের মাষ্টারী জোগাড় হয়েছে। মৈত্রেয়ীর সাধের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে। তার স্বামী রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র হয়নি, হয়েছে একটা স্কুল-মাষ্টার। সুতরাং সে মৈত্রেয়ী আর এখন সে নেই। কথায় কথায় হাসি, গান, আর ইংরেজী কবিতা আওড়ান বন্ধ হয়ে গেছে। তার ওপর আবার বিবাহের এক বৎসরের মধ্যে দুইটি দুর্ঘটনা সুধীরকে আরও দমিয়ে দিয়েছে। প্রথম তার পিতৃবিয়োগ। পিতার পেন্সন বন্ধ হয়ে গেল, অতএব অর্থকষ্ট। শোকটা পিতার জন্য কি পিতার পেন্সনের জন্য বলা শক্ত। দ্বিতীয়, একটি নব-অতিথির শুভাগমন। অতিরিক্ত এক জন পোষ্য, অতএব ব্যয়বৃদ্ধি। সুধীর বুঝলে যে, তার সব 'ক্যালকুলেশনই' একটু 'প্রীমেচিওর' হয়ে গেছে। রবীন্দ্র, শরৎ হবার বিশ্বাস প্রীমেচিওর, মৈত্রেয়ীকে বিবাহ করা প্রীমেচিওর, পিতার মৃত্যু প্রীমেচিওর, এবং সন্তানের আগমনটিও প্রীমেচিওর। অতএব সুধীর যে প্রীমেচিওরলি বৃদ্ধ হয়ে যাবে, এ আর বিচিত্র কি, এবং সে প্রীমেচিওর মৃত্যু কামনা করবে, এও সম্পূর্ণরূপে ন্যায়সঙ্গত। তাই সুধীর মরতে চায়। এত লোক মরে, কিন্তু সে মরে কই? সুধীর শুয়ে শুয়ে ভাবছে—মরতে হবেই। হঠাৎ পাশের বিছানায় ছেলেটা কেঁদে উঠ্‌ল। সুধীরের চিন্তাস্রোতের মোড় ফিরে গেল। ভাবলে, সত্যই সে মারা গেলে এদের কি হবে? মৈত্রেয়ী, তার ছেলে—তারা তো বলতে গেলে না খেতে পেয়েই মারা যাবে। কারণ, সুধীরের ব্যাঙ্কের খাতায় একটা কাণা-কড়িও জমা নেই। সত্য কথা বলতে গেলে সুধীরের ব্যাঙ্কের খাতাই নেই; কিন্তু পাওনাদার অনেক আছে। সুতরাং সে মরে গেলে—নাঃ! সুধীর আর ভাবতে পারছে না। মরা বুঝি তার আর হ'ল না; সব ফেঁসে গেল।

সুধীর একটার পর একটা বিড়ি খাচ্ছে আর ভাবছে। হঠাৎ সে "ইউরেকা" বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল। ধড়মড় করে মৈত্রেয়ী উঠে বসে সুধীরকে ঐ ভাবে চেঁচাতে দেখে রূঢ়স্বরে বললে—"সমস্ত দিন বাঁদীর মত খেটে রাত্তিরে যে একটু ঘুমোবো, তাও তোমার জ্বালায় হবে না! পাগলের মত চেঁচাতে হয় বাইরে গিয়ে চেঁচাও।" মৈত্রেয়ী আবার শুয়ে পড়ল। সুধীর ভাবতে লাগল, এই মৈত্রেয়ী আর সেই মৈত্রেয়ী। রাতের পর রাত জেগে গল্প করেছে, সুধীরের ঘুম পেলে সে অভিমান করে বলেছে, "তুমি আমায় ভালবাস না, তাই আমার সঙ্গে গল্প করতে বস্‌লে তোমার ঘুম পায়!" আর আজ—না! বেঁচে থেকে কোন সুখ নেই। সুধীরকে মরতে হবেই। যদি সে একটা মোটা রকমের, ধর, বিশ হাজার টাকার জীবন-বীমা করে একটা বার্ষিক প্রীমিয়াম দিয়ে মারা যায়, তাহলে এদেরও সংস্থান হয়, তারও কর্ত্তব্য পালন হয়। 'দ্যাট ইজ দি অনলি সলিউশন।' কিন্তু এই প্রীমিয়ামের টাকা সে দেবে কোত্থেকে? তার তো এক পয়সাও নেই। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী, সুতরাং কোন দিন জমবে বলে ভরসাও হয় না। যা স্কুল, মাইনে বাড়াবে না। ভগবান্ না করুন, যদি পুষ্যি

আরও বেড়ে যায়? এখনই সে একটা ইন্সিওরেন্স করতে পারছে না, আর তখন! সুধীর কেবল ভাবছে—কি উপায় করা যেতে পারে। প্ল্যানটা মন্দ নয়, কিন্তু প্রীমিয়ামের টাকাটা কোত্থেকে পাওয়া যায়?

হঠাৎ মনে পড়ল শ্যামাপদর কথা। তার সঙ্গে সুধীরের আর মৈত্রেয়ীর দু'জনেরই বেশ আলাপ হয়েছে। প্রায়ই আসে। তাছাড়া লোকটা বিবাহ করেনি। অতএব ব্যয়বৃদ্ধি হয়নি—বাপের টাকা আছে। আর সে নিজেও এটর্ণী; বেশ 'টু-পাইস' আসে। লোকটার বুদ্ধির তারিফ সুধীর কোন দিনই করেনি, সেই জন্যই তার বিশ্বাস, শ্যামাপদ 'ইজ দি রাইট ম্যান টু-বী অ্যাপ্রোচ্‌ড।'

পরদিন সকালেই সুধীর শ্যামাপদর বাড়ী গিয়ে হাজির। যথারীতি নমস্কার, কুশল-প্রশ্নাদির পর্ব্ব সাঙ্গ হলে, সুধীর আরম্ভ করলে—"ভাই, আমি তোমার কাছে বিশেষ একটি গোপনীয় এবং ডেলিকেট কাজে এসেছি।"

"বেশ, কি কাজ বল। ক্লায়েন্টের কথা গোপন রাখাই আমাদের পেশা।"—সযত্ন-চর্চ্চিত গুম্ফরাজীতে সাদরে হাত বুলোতে বুলোতে শ্যামাপদ বললে।

"ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, আমার সমস্ত 'প্ল্যানই' 'আপসেট' হয়ে গেছে। জীবনে শুধু নিরাশাই পেলুম। আমি ক্লান্ত। তাই এখন মনে করছি যে, আমি এ প্রাণ আর রাখব না।"

"মানে—মরবে?" বিস্মিত ভাবে শ্যামাপদ প্রশ্ন করলে। নিজের কাণকে যেন সে বিশ্বাস করতে পারছে না। মানুষ মরতে চায়—এ আবার কি রকম কথা!

"সত্যই ভাই আমি মরতে চাই। এ শুধু মুখের উক্তি নয়, একেবারে খাঁটী মনের কথা। আমি মরতে চাই, এবং আরও অনেক দিন আগেই মরতুম, শুধু আমার স্ত্রীর আর ছেলেটার কথা ভেবে মরতে পারিনি। এখন তবু তারা দু'মুটো খেতে পাচ্ছে, কিন্তু আমি চক্ষু বুজোলে তারা না খেয়ে মারা যাবে। একটা কাণা-কড়িও জমাতে পারিনি, এমন কি, আমার একটা 'লাইফ ইন্সিওরেন্স' পর্য্যন্ত নেই—"

"নেই, করে ফেল। সকলেরই করা উচিত। তবে আমি বলি কি সুধীর, এখনই নিরাশ না হয়ে আরও কিছু দিন দেখ। তোমার এমন আর কি বয়স হয়েছে—"

"আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই নে। কারণ, আমাকে তুমি নিরস্ত করতে পারবে না। আমি নিশ্চয়ই মরব। তুমি তো বললে—লাইফ যদি ইন্সিওর করা না থাকে তো করে ফেল; কিন্তু করি কি করে? প্রীমিয়াম যোগাব যে, সে টাকা কোথায়?"

"ও:! আচ্ছা, কত টাকার করতে চাও?"— শ্যামাপদ বললে।

"হাজার কুড়ি। তাহলে ওদের এক রকম চলে যাবে। এক বছরের প্রীমিয়াম পড়বে প্রায় সাতশো ত্রিশ টাকা। আমার তো এ টাকা দেবার ক্ষমতা নেই; তবে আমি ভাবছিলুম—"

"কি ভাবছিলে?" আগ্রহপূর্ণ কণ্ঠে শ্যামাপদ জিজ্ঞাসা করলে।

সুধীর থামতে লাগল। বলবে কি বলবে না। শেসে সাহসে ভর করে চোখ-কাণ বুজিয়ে বলেই ফেললে—"আমি ভাবছিলুম যে, যদি টাকাটা তুমি অ্যাডভান্স কর, তাহলে আমারও লাভ হয় আর তোমারও কিঞ্চিৎ আয় হয়।"

বিস্ফারিত নেত্রে শ্যামাপদ প্রশ্ন করলে—"ব্যাপারটা কি রকম শুনি?"

আম্‌তা আম্‌তা করে সুধীর বললে—"আমি বলছিলুম কি,—ধর, তুমি টাকাটা দিলে। সেই টাকায় আমি কুড়ি হাজার টাকার একটা লাইফ পলিসির প্রথম প্রীমিয়াম দিলুম। তার পর আমি মরে গেলুম। উইলে তুমি পাঁচ হাজার টাকা পেলে, আর বাকী পনেরো হাজার আমার স্ত্রী পেল'।—এ প্ল্যানটা তোমার কি রকম মনে হয়?"

"প্ল্যানটা তো শোনাচ্ছে ভালই। কিন্তু যদি তুমি না মর তখন? চোরের মা'র অবস্থা! এ নিয়ে তো কেস করাও চলবে না।"

"হ্যাঁ, আমি মরবই। একেবারে ঠিক করা রয়েছে। এতদিন মরতুমও। শুধু ওরা খেতে পাবে না তাই ভেবেই—তা তুমি যে দিন বলবে, সেই দিনই মরব।"

"আচ্ছা, আমি ভেবে দেখব। আজ ভাই আমি বড় ব্যস্ত। কিছু মনে কোরো না—"

"না, না। তুমি তোমার কাজ কর। আমি আজ আসি। হ্যাঁ, প্ল্যানটা ভাল করে ভেবে দেখ। অসময়ে বন্ধুরও উপকার করা হবে আর বিনা-মেহনতে তোমারও কিঞ্চিৎ ঘরে আসবে। আচ্ছা নমস্কার।"

শ্যামাপদ ভেবে দেখলে এবং রাজীও হয়ে গেল। শুভদিনে শুভক্ষণে শ্যামাপদ-দত্ত টাকায় সুধীর লাইফ ইন্সিওর করে ফেললে। সঙ্গে সঙ্গে একটা উইলও হয়ে গেল। সুধীরের অবর্ত্তমানে অর্থাৎ মৃত্যুতে শ্যামাপদ পাবে পাঁচ হাজার, আর সুধীরের বিধবা স্ত্রী মৈত্রেয়ী পাবে বাকী পনেরো হাজার। যাক্‌, এইবার সে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারবে।

"এইবার তবে ত্রাদার 'দুগ্‌গা' ব'লে ঝুলে পড়া যাক, কি বল?" সুধীর প্রশ্ন করলে।

"না না, এত তাড়াতাড়ি নয়," শ্যামাপদ উত্তর দিলে— "কেসটা যদি অ্যাক্‌সিডেন্ট বলে গণ্য না হয়—তাহলে 'সুইসাইড' বলে ব্যাটারা টাকা দেবে না। এক বছর এক মাস বাদে এ-সব কোন গণ্ডগোল থাকবে না।"

অগত্যা" সুধীর বল্‌লে—"যখন এত দিন গেছে না হয় আরও এক বছর এক মাস তোমার কথায় কষ্ট ভোগ

করি। তার পরেই তো চির-শান্তি। আঃ!" চোখ বুজিয়ে সুধীর একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেললে।

সুধীরের দিন যেন আর কাটতে চায় না। সেই এক-ঘেয়ে খাটুনী আর অশান্তি! হঠাৎ এক দিন মৈত্রেয়ীর কলেরা হ'ল। একেবারে—যার নাম এশিয়াটিক। সেই রাত্রের মধ্যেই সব শেষ।

স্ত্রী মারা যেতে ছেলেটার ওপর সুধীরের টান খুবই বেড়ে গেল। আহা, মা-মরা ছেলে! দিন গুলোও যেন হু-হু করে কেটে যেতে লাগল। এক মাস, দু'মাস, তিন মাস। যত দিন যায়, ততই সুধীর চঞ্চল হয়ে ওঠে। ছেলেটাকে ফেলে যদি সে মারা যায়—না! সুধীরের মরা হতে পারে না। কিন্তু না মরলে শ্যামাপদর ঋণ···

সুধীরের মরবার আর এক মাস মাত্র বাকী। এক দিন তাকে ডেকে শ্যামাপদ বললে—"কি হে, তোমার মরবার প্ল্যান ঠিক আছে তো?"

সুধীর চমকে উঠল। মৃদুস্বরে বললে—"হ্যাঁ, তা—তা আছে। তবে কি না, ছেলেটা নিতান্তই শিশু। আমি গেলে তার কি হবে? সেই জন্যই একটু—"

ভীত হয়ে শ্যামাপদ বললে—"সেই জন্য একটু কি? মরতে তুমি পেছ-পাও হচ্ছ। কন্‌ট্র্যাক্ট করে শেষে—এ ভেব না যে আমার দয়ামায়া নেই, কিন্তু 'বিজিনিস ইজ বিজিনেস।' তা ছাড়া তুমি তো বলেই ছিলে যে, তোমার এক বিধবা শালী ওকে মানুষ করতে রাজী আছে—"

"তা আছে; কিন্তু ছেলেটার ওপর আমার কি বলি, বড্ড মায়া পড়ে গেছে। তাকে ফেলে রেখে—"

"এখন তো এই রকম কত বাহানাই তুমি বার করবে। অথচ তখন আমাকে তুমি সাফ বুঝিয়ে দিলে যে তোমার প্ল্যানের নড়-চড় হবে না। তোমার উপকার করতে গিয়ে মাঝ থেকে আমি ডুবলুম। এ দিকে তোমার কথার ওপর নির্ভর করে, মাসখানেক পরে পাঁচ হাজার টাকা পাব—এই 'ক্যালকুলেশনে' বাড়ী করতে আরম্ভ করেছি—তুমিই দেখছি আমায় সব দিক্ দিয়ে মজালে!"

"আমি তোমার টাকা শোধ করে দেব।"

"যে টাকাটা দিয়েছি, তাই শোধ করতে পারবে কি না সন্দেহ, তা আবার পুরো পাঁচ হাজার টাকা! ভদ্দর লোকের কথার যে এমন—"

"আচ্ছা, আমি ভেবে দেখি। এখনও ত এক মাস সময় আছে।"

"আর ভেবে দেখি!" বিরক্ত ভাবে শ্যামাপদ বললে। মাথা হেঁট করে সুধীর তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চম্পট দিয়ে বাঁচল।

তার পর থেকে সে যতই এড়িয়ে চলতে চায়, ততই যেন বেশী করে শ্যামাপদর সামনে পড়ে যায়! দেখা হলেই সে সুধীরকে প্রশ্ন করে—"কি হে, ভাল আছ তো? শরীরটা তো ভালই আছে দেখছি, তার পর তোমার প্ল্যানের কি হ'ল?"—ইত্যাদি। সুধীর লজ্জায় মারা যায়। না মরলে তো আর চলে না; কিন্তু মরতেও ইচ্ছা নাই। এখন উপায়? শ্যামাপদকে ভয় দেখালে মন্দ হয় না যে, তোমার এই রকম লাভের চেষ্টা 'ক্রিমিন্যাল।' কোম্পানীকে বলে দিলে 'প্রসীকিউট' করবে। কিন্তু সেটা ভাল দেখায় না। বিপদের সময় শ্যামাপদ সাহায্য করেছে। মরাটা যত অসম্ভব, এটা তার চেয়েও বেশী অসম্ভব। একমাত্র উপায়—কাউকে না বলে এখান থেকে সরে পড়া।

জিনিস-পত্তর গোছগাছ করতে করতে তার মৃতা স্ত্রীর ট্রাঙ্কের ভিতর দু'-একটা চিঠি পাওয়া গেল। কৌতূহল বশতঃ সে পড়তে আরম্ভ করলে। শ্যামাপদ লিখেছে মৈত্রেয়ীকে। সম্বোধন করেছে, "প্রিয় বান্ধবী!" সুধীর পড়ছে। এক লাইনে এসে সে আটকে গেল। বার বার পড়তে লাগল। নিজের চোখকে যেন সে বিশ্বাস করতে পারছে না। তার বন্ধু শ্যামাপদ তার স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে লিখেছে—"তোমার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল একটা অপদার্থ স্বামীর হাতে পড়ে! তোমার রূপ, তোমার বিদ্যা, এ কেবল রাজাদের ঘরেই মানায়। আমি তোমায় ভালবাসি, তুমিও স্বীকার করেছ আমায় ভাল-বাস। তোমার স্বামীর জীবন বীমা ও উইলের কথা নিশ্চয়ই তুমি জান। আর ক'মাস ধৈর্য্য ধরে যদি আমরা কাটাতে পারি···আজকাল তো অনেকেই বিধবা-বিবাহ করছে।···তোমার অদ্ভুত ক্ষমতা! সুধীর মোটেই বুঝতে পারে না যে, আমরা পরস্পরকে ভালবাসি···"

সুধীর স্তম্ভিত হয়ে গেল। উন্মত্ত ভাবে ঘরময় পায়চারী করতে লাগল। তার পর কি ভেবে একটা কাগজ টেনে নিয়ে লিখতে আরম্ভ করলে,—

ডিয়ার শ্যামাপদবাবু,

আপনার লিখিত কয়েকটি পত্র আমি আপনাকে ফেরত পাঠাইতেছি। আমার স্ত্রীর অকাল মৃত্যুতে আপনার ভয়ানক ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। আমার মৃত্যু হইলে আপনি একটি স্ত্রী লাভ করিতে পারিতেন, এবং তার সঙ্গে নগদ কুড়ি হাজার টাকা ইন্সিওরেন্স কোম্পানী হইতে যৌতুকস্বরূপ আদায় হইত। আমি বড়ই দুঃখিত যে, আপনার বাড়া-ভাতে ছাই পড়িল। ভবিষ্যতে আমি আর এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে কোন আলোচনা করিতে প্রস্তুত নই। আমার জীবন-বীমার প্রথম প্রীমিয়াম এই চিঠিগুলি ফেরতের আক্কেল-সেলামী-স্বরূপ কাটিয়া লইলাম। আমার মরিবার আপাততঃ কোন ইচ্ছাই নাই। আমি শীঘ্রই নূতন উইল করিয়া আগেরটি নাচক করিয়া দিব মনস্থ করিয়াছি। ইতি—

ভবদীয়
শ্রীসুধীরচন্দ্র নাগ।

শ্রীযামিনীমোহন কর (এম-এ, অধ্যাপক)।

দেহের সুছাঁদ

নারীর স্তুতি-ছলে কোনো কবি বলিয়াছিলেন—নারীর দেহ যেন সুছন্দে বাঁধা কবিতা! এ কথা অত্যুক্তি নয়! রং-পাউডার মাখিয়া মুখে রঙ ফুটাইবার জন্য মেয়েদের যে কশরৎ দেখি, তাহাতে দুঃখ হয়! ভাবি, ও রঙ যে জাল, তাহা তো কাহারো অবিদিত থাকিবে না, তবে ও জাল, নকলিয়ানার জন্য এত পরিশ্রম কেন? তার চেয়ে
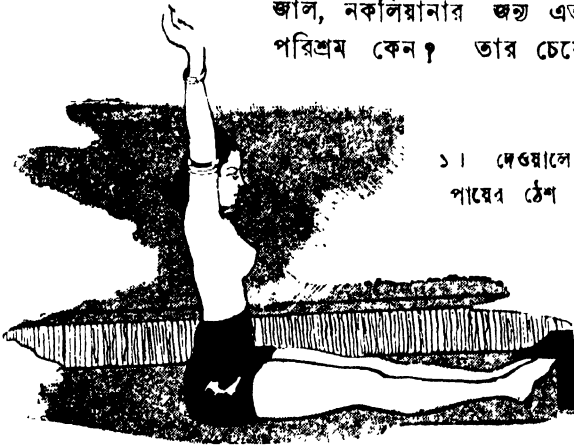
১। দেওয়ালে পায়ের ঠেশ

দেহের সুছন্দ রক্ষা বা দেহকে সুছন্দে বাঁধিবার জন্য যদি একটু কষ্ট করেন, তাহা হইলে দেহের লালিত্য-মাধুর্য্যের যে সীমা থাকিবে না! এ লালিত্য-সম্পাদনের জন্য সর্ব্বাঙ্গের ব্যায়াম প্রয়োজন। সে ব্যায়াম-সাধনে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুছাঁদে গড়িয়া উঠিবে! ঘাড়, গলা, বুক, হাত, পা, জঘনদেশ অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে ভরিবে। এ ব্যায়াম প্রথমে একটু কষ্টসাধ্য, সন্দেহ নাই; তবে অভ্যাসে অনায়াস ও সহজ হইবে।

অনেকের তলপেট যেন পিণ্ডের মতো ঠেলিয়া ওঠে, সেজন্য যে-কদর্য্যতা ঘটে, দামী শাড়ী-সেমিজে তাহা ঢাকা পড়ে না। এ-খুঁৎ যদি সম্পূর্ণ সারাইতে চান্, তাহা হইলে,—

১। মেঝেয় বসিয়া দুই পা প্রসারিত করিয়া দিন—এমন ভাবে দুই পা প্রসারিত করিবেন যেন অটল প্রাচীর বা দেওয়ালের ঠেশ্ পান! ১নং ছবি দেখুন। এই ছবির ভঙ্গীতে দেওয়ালে পায়ের ঠেশ্ দিয়া পিঠকে সিধা খাড়া করিয়া বসিতে হইবে। দুই হাত উর্দ্ধে তুলিয়া রাখিবেন। তার পর ধীরে ধীরে পিছন-দিকে দেহ হেলাইয়া দিবেন। যেন শুইতে চান্ এমনি ভাবে দেহ হেলাইতে হইবে। তাই বলিয়া সত্য যেন শুইয়া পড়িবেন না! না শুইয়া যতখানি পারেন দেহকে পিছন-দিকে হেলাইয়া তার পর ধীরে ধীরে আবার ঐ ছবির ভঙ্গীতে বসিবেন! এমনি করিয়া খাড়া-পিঠে উপবেশন, তার পর ধীরে ধীরে পিছন-দিকে দেহ হেলানো এবং পরক্ষণে আবার খাড়া-ভাবে বসা—এ ব্যায়াম করিবেন অন্ততঃপক্ষে দশ বার। এ ব্যায়ামে তলপেটের কোনো-খানটা কোনো কালে ঢিপি হইয়া উঠিবে না—তলপেটের গড়ন হইবে চমৎকার।

এ ব্যায়ামের পর ২নং ব্যায়াম। আবার চিৎ হইয়া
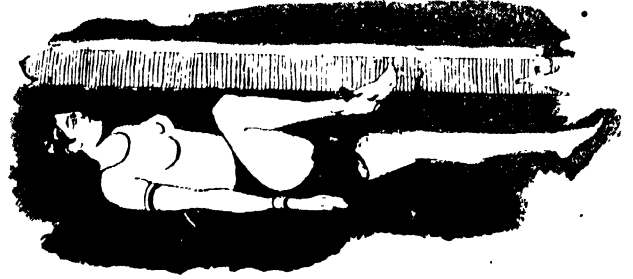
২। ডান পা গুটাইয়া

শুইয়া পড়ুন। দু'হাত দু'পাশে প্রসারিত থাকিবে। এবার ডান পা গুটাইয়া তুলুন। এমনি ভাবে তুলিয়া ডান হাঁটু আনুন বুকের উপরে—তার পর জঘনদেশের উপর দেহের ভর রাখিয়া এবং জঘনদেশকে স্থির অবিচল রাখিয়া বাঁ পাখানি চক্রাকারে ঘোরান্। ডান পা এ-সময় মেঝে ছুঁইয়া থাকিবে—নড়িবে না। এর পর বাঁ পা প্রলম্বিত রাখিয়া ডান পা ঘুরাইবেন।

তার পর ৩ নম্বরের কথা। মেঝেয় চিৎ হইয়া শুইতে হইবে। দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তলপেটের উপর রাখিবেন। এবার হাঁটু না মুড়িয়া ডান পা সরাসরি ভাবে তুলিয়া বাঁ কাঁধ লক্ষ্য করিয়া লাথি-মারার ভঙ্গীতে দ্রুততালে ডান পা ছুড়িবেন,—বাঁ পা মেঝে ছুঁইয়া থাকিবে। পাঁচ বার এমনি ভাবে ডান পা ছুড়িবার পর ডান পা মেঝেয় নামাইয়া বাঁ পা তুলিয়া ডান কাঁধ লক্ষ্য করিয়া ওমনি ভাবে লাথি-মারার ভঙ্গী। এবং

বাঁ পা ছুড়িবেন পাঁচ বার। লাথি ছুড়িবার সময় পা যতখানি উর্দ্ধে তুলিতে পারেন, চেষ্টা করিবেন। এ ব্যায়াম করা চাই অন্ততঃপক্ষে দশ বার।
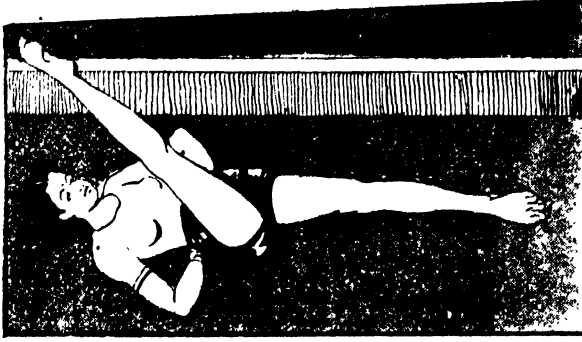
৩। দুই হাত তলপেটে

চারের পর্ব্বে ৩ নম্বরের প্রণালীর পুনরাবৃত্তি। তবে এ-পর্ব্বে ৩য় পর্ব্বের মতো দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তলপেটের উপরে হাত না রাখিয়া ৪ নম্বর ছবির মতো দু'দিকে প্রসারিত রাখিবেন। এ ব্যায়াম করা চাই বিশ হইতে পঁচিশ বার।
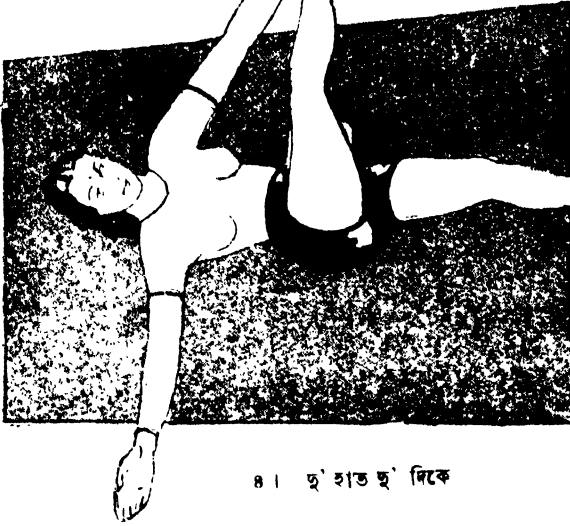
৪। দু'হাত দু'দিকে

পাঁচের পর্ব্বে চিৎ হইয়া শুইয়া কোমরের দুই দিকে দুই হাত প্রসারিত করিয়া ৫নং ছবির মতো বাইসিক্‌ল্-চালানোর ভঙ্গীতে দুই পা নাড়িতে হইবে। ক্ষিপ্র দ্রুত তালে পা নাড়িবেন। পাঁচ-সাত মিনিট এ ব্যায়াম করিবেন।

তার পর ছয়ের পর্ব্বে মাদুর বা সতরঞ্চ পাতিয়া ৬নং ছবির মতো নতজানু হইয়া ভূমিষ্ঠ-প্রণামের মতো অবস্থান, এমনি ভাবে থাকিয়া ডন্ ফেলিতে হইবে। ডন্ ফেলিবার সময় বুক ঠেকিবে হাতে এবং চিবুক ঠেকিবে মেঝেয়—এ দিকে লক্ষ্য রাখা চাই। এ ব্যায়াম করা চাই পাঁচ-ছয় মিনিট।

৫। বাইক্ চালানো

এবার সপ্তমাঙ্কে শেষের পর্ব্ব। মেঝেয় মাদুর পাতিয়া সেই মাদুরের উপর চিৎ হইয়া শয়ন,—দুই পদতল রাখিবেন দেওয়ালের গায়ে ঠেকাইয়া। পা দুখানিকে হাঁটুর কাছ হইতে ঈষৎ দুমড়াইয়া লইবেন ৭নং ছবির মতো। এবারে দুই

৬। ভূমিষ্ঠ প্রণাম

পা দিয়া যেন দেওয়াল বহিয়া উর্দ্ধে উঠিতেছেন, এমনি ভাবে দুই পদতল উপরে-নীচে চালনা করিতে হইবে। দুই পদতল যখন দেওয়াল বহিয়া উপরের দিকে উঠিবে

নয়—শক্ত জিনিষ। কাজেই কোণ-ফোঁড়া ঘরের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় শীটের কোণ চালিয়ে দিলে কোনো শীটই নষ্ট হবার বা ফেটে যাবার ভয় নেই! এই দ্বিতীয় অর্থাৎ ছোট মাপের শীটের গায়ের উপর দিয়ে একখানি ব্লটিং কাগজের চারটি কোণ ঐ তেকোণা ঘরের মধ্য দিয়ে চালিয়ে নিতে হবে। একটু সাবধানে কাজ করবেন,

৩। ব্লটার ও কাগজ-কাটা ছুরি

তাহলে তেকোণা ঘরের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় শীটের গা ছুঁয়ে ব্লটিং-কাগজ চালানো শক্ত হবে না। তার পর তৃতীয় যে শীটখানি রেখেছেন,—এ শীটখানির মাপ হবে প্রথম শীটের মাপের সমান। এই তৃতীয় শীটখানির চার ধারে পাৎলা টিন মুড়ে দিন। বাজারে টিনের প্লেট-মোড়া ছোট-ছোট যে আয়না পাওয়া যায়;—গঙ্গার ঘাটে উড়ে-বামুনদের পলিতে যেমন আয়না থাকে—সেই আয়নার টিন-বাঁধানো ফ্রেমের আদর্শে তৃতীয় শীটখানির চার-পাশ পাৎলা টিন দিয়ে মুড়ে শীটখানি বাঁধিয়ে নিন। এবার এই তৃতীয় শীটের গায়ে আঁটা আগে-কার ঐ ১ এবং ২নং শীট,—২নং শীটের গায়ে ব্লটিং-কাগজ আঁটা আছে, মনে রাখবেন—এই ৩নং শীটের টিনের ফ্রেমের মধ্য দিয়ে চালিয়ে এ দু'খানির ধারগুলি ৩নং শীটের ফ্রেমের সঙ্গে এঁটে নতে হবে। ছোট হাতুড়ির ঘা দিলেই টিনের ফ্রেমে আঁটা শক্ত হবে না। এই ভাবে বাঁধিয়ে নিলেই ৩নং ছবিতে টেবিলের উপর যে-ব্লটার দেখছেন, ঐ রকম ব্লটার তৈরী হবে।

কাণের দুল্

ব্লটারের গায়ে যদি নক্সার কাজ তুলতে চান তো সেলুলয়েডের গায়ে—ঐ যে আঠা-সিমেণ্ট রেখেছেন, সেই আঠা-সিমেণ্ট লাগিয়ে পছন্দসই ছবি কেটে ৩ নম্বরের শীটের পিঠে আঁটবেন—নক্সা তোলা হবে।

সেলুলয়েডকে যেমন-খুশী বাঁকানো যায়—তার উপায় বলি। সেলুলয়েডকে যদি গরম জলে পাঁচ-সাত মিনিট ভিজিয়ে রাখেন, তাহলেই সেলুলয়েড খুব নরম হবে এবং তাকে যেমন-খুশী বাঁকাতে-চোরাতে পারবেন। গরম থাকতে থাকতে সেলুলয়েডকে যে-ভাবে গড়ে নেবেন, ঠাণ্ডা হয়ে গেলেও তার সেই-রূপটুকু সঠিক বজায় থাকবে।

কাগজ-কাটা তৈরী করতে চান—যে-মাপের করবেন, সেই মাপে লম্বা করে সেলুলয়েড কেটে নিন,—হ্যাণ্ডেলের জন্য একটা দিকে পছন্দ মতো কাট-ছাঁট করুন। গরম জলে ভিজিয়ে নিয়ে সেলু-লয়েডকে বাঁকান, বাঁকিয়ে তার পর তাই নিয়ে ইচ্ছা-মতো প্যাটার্ণে কাগজ-কাটা ছুরি তৈরী করতে পারবেন। কাণের দুলও ঠিক এমনি রীতিতে তৈরী করতে হবে। ভিতরে ঐ যে নক্সাদার বিধ? গরম জলে ভিজোনোর পর ভিজে থাকতে থাকতে সেলুলয়েডের গায়ে ষ্টেন্‌সিল্ চালিয়ে যে-নক্সা তুলবেন, সেলুলয়েডের গায়ে পেন্সিল দিয়ে তার আদরা বা

ষ্টেন্‌সিল্-ছুরি চালানো

ডিজাইন্ ছকে নেবেন, আঁকার রেখা ধরে ছুরি চালাবেন। সেলুলয়েডের গায়ে ছুরি চালালে সেলুলয়েড সহজেই কাটা যাবে। সতর্ক হাতে চালনা করলেই রকমারি নক্সা তুলতে পারবেন। নিজে নক্সা তুলতে না পারেন, যাঁরা ছবি আঁকতে পারেন, তাঁদের দিয়ে সেলুলয়েডের গায়ে পেন্সিলে নক্সা আঁকিয়ে নেবেন।
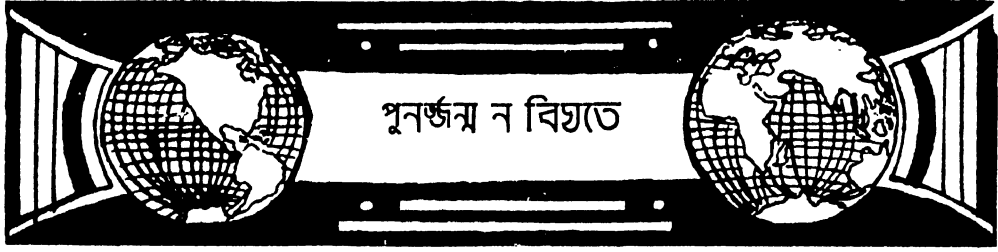
দোলযাত্রা

শিষ্য—গুরুদেব! আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থ কিছু কিছু করিয়া পড়িয়া দেখিতেছি; উহার অধিকাংশই "আষাঢ়ে গল্প" বলিয়া মনে হয়।

গুরু—বল কি হে বাপু! তোমার কথা শুনিয়া যে অবাক্ হইতেছি। তপঃসিদ্ধ ঋষিরা হইলেন শাস্ত্রকর্ত্তা। তাঁহারা নিয়ত ভগবচ্চিন্তাতেই নিরত এবং জগতের উপকারার্থ তৎপর। তাঁহারা আষাঢ়ে গল্প করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিয়াছেন, ইহা কি সম্ভব? তাঁহারা ছিলেন "আপ্ত।" আপ্তের লক্ষণ হইতেছে, "ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটবরহিতত্বম্।" যাঁহাদের ভ্রম নাই, প্রমাদ (অনবধানতা) নাই, বিপ্রলিপ্সা (কাহাকেও প্রতারণা করিবার ইচ্ছা) নাই এবং করণাপাটব (দেহের ও ইন্দ্রিয়ের অপটুতা) নাই, তাঁহাদিগকে আপ্ত বলে। যোগশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি।" (আপ্তবচনম্ আগমঃ) প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তবাক্য হইতে প্রমাণ। তাঁহাদের বাক্যকে আষাঢ়ে গল্প বলিয়া যে তাঁহাদের নিন্দা করে, সে ত পাপীই; "শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্" যে তাহার কাছে সে কথা শুনে, সেও পাপভাগী হইয়া থাকে। তাঁহাদের বাক্য আষাঢ়ে গল্প হইলে, যাঁহারা সমাজে যথেচ্ছ অনাচার প্রবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তাঁহারা তাঁহাদেরই বচন দেখাইয়া, তাহাদের অপব্যাখ্যা করিয়া স্বীয় মত সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন কেন? বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী পাশ্চাত্য মনীষিগণ তোমাদেরই ঘরের শাস্ত্রবচন শ্রদ্ধা-সহকারে আলোচনা করিয়া বহু গবেষণায় তাহাদের যাথার্থ্য অনুভব এবং মস্তিষ্ক-পরিচালনায় তাহাদিগকে কার্য্যে পরিণত করিয়া আপনারা মুগ্ধ হইতেছেন এবং জগৎকে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত করিতেছেন; আর তোমরা বলিতেছ, ও-সব আষাঢ়ে গল্প—উহাদের কিছুমাত্র সারবত্তা নাই, ইহা নিতান্ত লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়! যেগুলিকে তুমি অসার ও অশ্রদ্ধেয় মনে করিতেছ, তাহাদের দুই-একটা বল ত শুনি।

শিষ্য—গুরুদেব! আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। শাস্ত্রে এই যে আছে—

> দোলায়মানং গোবিন্দং মঞ্চস্থং মধুসূদনম্।
> রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

গোবিন্দকে দোলাধিরূঢ়, মধুসূদনকে স্নানমঞ্চস্থিত এবং বামনকে রথারূঢ় যে দর্শন করে, তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না অর্থাৎ সে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়।

মুক্তি কি এতই সহজ? তবে আবার শাস্ত্রান্তরে মুক্তির জন্য কত যোগ, কত তপস্যা, কত সাধনার উল্লেখ রহিয়াছে কেন?

গুরু—তুমি মূঢ়মতি বলিয়াই বুঝিতে পারিতেছ না যে, উহাতেই যোগ, তপস্যা, ও সাধনার সার কথাই রহিয়াছে। "দোলায়মানং গোবিন্দং" ইত্যাদি শ্লোকে যে গোবিন্দ, মধুসূদন ও বামন নাম রহিয়াছে এবং দোল-যাত্রা, স্নানযাত্রা ও রথযাত্রায় যে কৃষ্ণ, বিষ্ণু, জগন্নাথ, পুরুষোত্তম প্রভৃতি নামের উল্লেখও দেখা যায়, ঐ সবগুলিই ব্রহ্মবাচক। সমস্ত নামগুলির ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিবার আজ আমার অবসর নাই। আজ দোলযাত্রার সম্বন্ধেই কিছু বলিতেছি শ্রবণ কর।

> চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
> উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।
> রূপস্থানাং দেবতানাং পুংস্ত্র্যংশাদিককল্পনা॥

—জমদগ্নি।

ব্রহ্ম চৈতন্যময়, ইয়ত্তারহিত, পরিপূর্ণ ও নিরাকার; তিনি উপাসকদিগের উপাসনাকার্য্যের সহায়তার জন্য নানা রূপ ধারণ করিয়া থাকেন; সেই বিবিধ রূপের মধ্যে পুরুষ, স্ত্রী প্রভৃতিও আছেন।

> বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
> বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ তত্তোষকারণম্॥

—বিষ্ণুপুরাণ।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মাচারী পুরুষ পরম পুরুষ বিষ্ণুর আরাধনা করিবে; তাঁহার তুষ্টিবিধানের অন্য উপায় নাই।

বিষ + নু = বিষ্ণু—যিনি সর্ব্বব্যাপী।

> আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেদ্ ধনমিচ্ছেদ্ধুতাশনাৎ।
> জ্ঞানঞ্চ শঙ্করাদিচ্ছেন্মুক্তিমিচ্ছেজ্জনার্দ্দনাৎ॥

—মৎস্যপুরাণ।

সূর্য্যের নিকটে আরোগ্য কামনা করিবে, অগ্নির নিকটে ধন প্রার্থনা করিবে, শঙ্করের নিকটে জ্ঞান চাহিবে এবং জনার্দ্দনের নিকটে মুক্তি কামনা করিবে।

জনার্দ্দন—জন-অর্দ্দ+অন। অর্দ্দ ধাতুর অর্থ—গতি, পীড়ন, প্রার্থনা। সকল লোক যাঁহার নিকট সর্ব্বপুরুষার্থ প্রার্থনা করে। যিনি ভক্তগণের জন (জন্ম) নষ্ট করেন (ভক্তগণকে মুক্তি দেন)। সর্ব্বজনেই যিনি গমন করেন (সর্ব্বব্যাপী)।

বরং বৃণুধ্ব রাজর্ষে ঋতে কৈবল্যমস্য নঃ।
এক এবেশ্বরস্তস্য ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ॥

—ভাগবত।

(দেবগণ রাজর্ষি মুচুকুন্দকে বলিয়াছিলেন) তুমি মুক্তি ব্যতিরেকে যে বর ইচ্ছা, প্রার্থনা কর। আমরা মুক্তি ভিন্ন সকল বরই দিতে পারি। মুক্তিদানের কর্ত্তা ভগবান্ বিষ্ণু ভিন্ন আর কেহ নাই।

* * * *

তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

—শুক্লযজুর্ব্বেদ।

সেই মহাপুরুষকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারা যায়; মুক্তিপদে যাইবার অন্য পথ নাই।

বিশ্বরূপাধ্যায় এষ উক্তঃ সূক্তেঽপি পৌরুষে।
ধাত্রাদিস্তম্বপর্য্যন্তান্ এতস্যাবয়বান্ বিদুঃ॥
ঈশসূত্রবিরাড্‌বেধো-বিষ্ণুরুদ্রেন্দ্রবহ্নয়ঃ।
বিঘ্নভৈরবমৈরাল-মরিকাযক্ষরাক্ষসাঃ॥
বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রা গবাশ্বমৃগপক্ষিণঃ।
অশ্বত্থবটচূতাদ্যা যবব্রীহিতৃণাদয়ঃ॥
জলপাষাণমৃৎকাষ্ঠ বাস্যাকুদ্দালকাদয়ঃ।
ঈশ্বরাঃ সর্ব্ব এবৈতে পূজিতাঃ ফলদায়িনঃ॥
যথাযথোপাসতে তং ফলমিয়ুস্তথাতথা।
ফলোৎকর্ষাপকর্ষৌ তু পূজ্যপূজানুসারতঃ॥

—পঞ্চদশী।

বেদের পুরুষসূক্তে উক্ত হইয়াছে, আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত জগতের যাবতীয় পদার্থই তাঁহার (পরব্রহ্মের) মূর্ত্তি। সুতরাং পরমেশ্বর হইতে সূত্র, বিরাট্, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র, অগ্নি, বিঘ্ন, ভৈরবাদি, যক্ষ, রাক্ষস, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, গো, অশ্ব, পশু, পক্ষী, অশ্বত্থ, বট, আম্র, প্রভৃতি, যব, ধান্য, তৃণাদি, জল, পাষাণ, মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, বাসী, কুদ্দাল প্রভৃতি সমস্তই ঈশ্বর। অতএব যে-কোনও পদার্থকে ঈশ্বর-বুদ্ধিতে পূজা করিলে ফল পাওয়া যায়। তবে পূজ্য ও পূজা অনুসারে ফলের তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥
যেঽপ্যন্যদেবতা-ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥—গীতা।

(ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন) যে যে ভক্ত আমার যে কোনও মূর্ত্তিকে শ্রদ্ধাসহকারে পূজা করিতে ইচ্ছা করে, আমি তাহার তাদৃশী শ্রদ্ধা বিধান করি। সে সেই শ্রদ্ধার সহিত সেই মূর্ত্তির আরাধনা করিয়া থাকে এবং সেই মূর্ত্তির নিকট হইতে আমারই বিহিত কার্য্য বস্তু প্রাপ্ত হয়। যে যে ভক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অন্য দেবতা-দিগের পূজা করে, তাহাদেরও আমারই 'পূজা করা হইয়া থাকে; তবে তাহা বিধিপূর্ব্বক হয় না—(সাক্ষাৎ আমার পূজা করাই বিধিপূর্ব্বক হইয়া থাকে)।

এক্ষণে "দোলায়মানং গোবিন্দং" ইহার ব্যাখ্যা শুন। গো-বিদ্+শ (অ) -গোবিন্দ। গো শব্দের অর্থ পৃথিবী, বাণী, কিরণ ইত্যাদি; বিদ্ ধাতুর অর্থ লাভ।

মহাপ্রলয়ে সর্ব্ব পদার্থের সহিত পৃথিবীও নষ্ট হয়। পুনঃসৃষ্টি সময়ে যিনি তাহা লাভ করেন, তাঁহাকে গোবিন্দ বলে। যথা—

নষ্টাং বৈ ধরণীং পূর্ব্বমবিদং বৈ গুহাগতাম্।
গোবিন্দ ইতি তেনাহং দেবৈর্বাগ্‌ভিরুপস্তুতঃ॥

—মহাভারত।

অথবা যিনি বেদাদি সর্ব্ববিধ বাণী লাভ করেন, তিনি গোবিন্দ। যথা—

অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্, যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানি।

—বৃহদারণ্যক।

গৌরেষা ভবতো বাণী তাঞ্চ বিন্দয়তে ভবান্।
গোবিন্দস্ত ততো দেব-মুনিভিঃ কথ্যতে ভবান্॥

—হরিবংশ।

কিংবা যিনি কিরণ (জ্যোতিঃ বা তেজ) লাভ করেন অর্থাৎ যিনি স্বয়ংই জ্যোতিঃ বা তেজ, তিনি গোবিন্দ। যথা—

ব্রহ্মৈব তেজ এব —বৃহদারণ্যক।
জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ —ব্রহ্মসূত্র।
ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনু ভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

—কঠ, মুণ্ডক, শ্বেতাশ্বতর।

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥

—গীতা।

এক্ষণে দোলযাত্রার প্রকৃত অনুষ্ঠান বলিতেছি, প্রণিধান কর। শিরোদেশে যে অধোমুখ সহস্রদল কমল আছে, তাহা হইতে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিনটি নাড়ী রজ্জুরূপে গুহ্যদেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিত রহিয়াছে। ঐ তিনটি নাড়ীতে যথাক্রমে ষট্‌চক্র অর্থাৎ পদ্মাকৃতি ছয়টি চক্র যথাক্রমে গ্রথিত আছে। যথা—ভ্রূমধ্যে দ্বিদল আজ্ঞাচক্র, কণ্ঠে ষোড়শদল বিশুদ্ধচক্র, হৃদয়ে দ্বাদশদল অনাহতচক্র, নাভিতে দশদল মণিপুরচক্র, লিঙ্গমূলে ষড়দল স্বাধিষ্ঠানচক্র, এবং গুহ্যদেশে চতুর্দ্দল মূলাধারচক্র।

একস্তম্ভং নবদ্বারং গৃহং পঞ্চাধিদৈবতম্।
স্বদেহে যে ন জানন্তি কথং সিধ্যন্তি যোগিনঃ॥
—গোরক্ষসংহিতা।

এই দেহই গৃহ; ইহাতে মেরুদণ্ডরূপ একটিমাত্র স্তম্ভ আছে; নেত্রদ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসারন্ধ্রদ্বয়, মুখবিবর, লিঙ্গ ও পায়ু এই নয়টি দ্বার আছে; ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চতত্ত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব আছেন।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা ও ধ্যান করিয়া উক্ত দেহরূপ দোলমণ্ডপের মধ্যে হৃৎপদ্মরূপ দোলায় শ্রীগোবিন্দকে বসাইয়া তুলসীপত্ররূপ কৃষ্ণবর্ণ তমোগুণ তাঁহার শ্রীচরণে এবং ফল্গুরূপ রক্তবর্ণ রজোগুণ তাঁহার শ্রীঅঙ্গে অর্পণ করিয়া, শুদ্ধ সত্ত্বগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহাকে দোল দিলে—নিয়ত চঞ্চলস্বভাব মন যে দিকে ধাবিত হইবে, সেই দিকেই শ্রীগোবিন্দকে তাহার সহিত পরিচালিত করিলে—মুক্তি যে অবশ্যম্ভাবিনী, তদ্বিষয়ে কি সংশয় থাকিতে পারে?

আজ এই পর্য্যন্তই রহিল। আমি দোলযাত্রার আয়োজনে অত্যন্ত ব্যস্ত।

স্বর্গীয় পণ্ডিতপ্রবর শ্যামাচরণ কবিরত্ন।

মুক্তধারা

প্রথম সৃষ্টির স্বপ্ন চিত্রায়িত হোক্ শুভ্র মনে,
সেই ছবি: মহেশ্বর উপবিষ্ট মহাধ্যানাসনে
নিশ্চল প্রশান্তি-মাঝে।
বিসর্পিল ক্রূর জটাজাল
রুধিয়াছে পাকে পাকে জাহ্নবীর তরঙ্গ বিশাল
সফেন প্রবাহটিরে। অনন্ত আকাশ বাণীহীন—
অনন্ত জিজ্ঞাসাভরা। লুপ্তভেদ চির রাত্রি-দিন
একই মহাকালচক্রে চিরন্তন চলাচল-হারা
অসীম ইঙ্গিত বহি'।
জাগিল কি জাহ্নবীর ধারা
রুদ্ধ জটা-কারাগারে? আঘাতে টুটিল নীরবতা,
ধ্বনিল প্রথম গান—সৃষ্টির প্রথম ব্যাকুলতা—
মুক্তি যাচি' বন্দিনীর প্রথম বিদ্রোহ-আয়োজন;
ভাঙ্গিল যোগীর ধ্যান—মহেশ্বর খুলিলা নয়ন।
খোল আঁখি চেয়ে দেখ; উদাসীন স্তব্ধ মহাকাল
দিকে দিকে ছড়ায়েছে দীর্ঘতার রুদ্ধ জটাজাল
অচ্ছেদ্য বন্ধনভরা। সমস্যার—শোণিতের জট
জটিল সহস্র পাকে। মানুষের শাশ্বত-সঙ্কট
কাঁদিছে নীরবে তারি কারাগারে রুদ্ধ, অসহায়;
মৌনাচল মহাকাল—জীবনের চক্র ঘুরে যায়।

জাগো আজ নির্ঝরিণী জটার জটিল গতিপথে
মুক্তির উন্মাদ ছন্দে। খসে যাক্ জটার বন্ধন—
ভাঙ্গুক কালের ঘুম। নেমে এস সহস্র ধারায়
প্লাবনে ভাসিয়া যাক্ সুবিপুল ঐরাবতকায়
সুদূরের বহির্লোকে।
এত দিন ছিলে দিশেহারা,
আজি পথ দেখাইবে ভগীরথ; ঢাল মুক্তধারা।

শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত।

সোনার চাঁপা
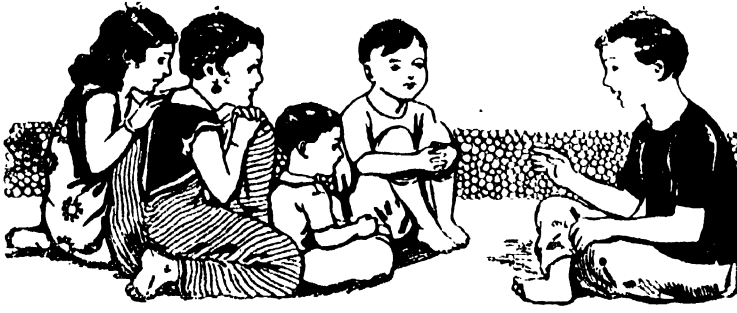
(রূপকথা)

সে অনেক দিনের কথা। এক রাজা ছিলেন, নামটি তাঁর বীরসিংহ। প্রজারা কিসে সুখে থাকবে তাই ছিল তাঁর চেষ্টা। এজন্য তিনি ছদ্মবেশে চার দিকে ঘুরে প্রজার অবস্থা দেখে বেড়াতেন। যদি কোথাও কারও দুঃখ কি কারও ওপর অত্যাচার উৎপীড়ন দেখতে পেতেন, তা'হলে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিকার করতেন। গুণের পুরস্কার ও দোষের দণ্ড দিতে কখন তিনি ভুলতেন না। রাজা যখন ভ্রমণে বার হতেন, তখন মন্ত্রীকে সঙ্গে নিতেন; রাজার মতো মন্ত্রীরও ছদ্মবেশ থাকত।

এক দিন রাত্রিকালে রাজা মন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ঐ রকম ঘুরে বেড়াচ্ছেন, ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা এসে পড়লেন একটা বাগানের ধারে। সেটা ছিল আঙুরের বাগান। সাধুভাষায় যার নাম দ্রাক্ষা-ক্ষেত্র। রাজা দেখতে পেলেন, একটা লোক যেন বাগানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রাত্রিটা ছিল অন্ধকার—কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী। তখনো চাঁদ ওঠেনি, ওঠো-ওঠো হয়েছে—পূর্ব্বদিক্ ফর্সা হ'য়ে এসেছে।

সেই আলোকে রাজা বাগানের দিকে চেয়ে বললেন, "দেখ মন্ত্রী, বাগানের ভেতর কে দাঁড়িয়ে রয়েছে বলে মনে হ'চ্ছে না?"

মন্ত্রী সেই দিকে তাকিয়ে বললেন, "তাই ত বটে মহারাজ!"

রাজা বললেন, "তুমি এইখানেই থাক, আমি বাগানে গিয়ে দেখে আসি ব্যাপারটা কি?"

মন্ত্রী বললেন, "তার দরকার কি, মহারাজ! এ অতি তুচ্ছ ব্যাপার।"

রাজা বললেন, "এটা তোমার ভুল মন্ত্রী!"

"ভুল?—এ কথার অর্থ?"

"দেখ, অনেক ছোট জিনিষের ভেতর বড় জিনিষও থাকতে পারে, তা কি তুমি জান না মন্ত্রী?"

মন্ত্রী স্বীকার করলেন—তা তিনি জানেন!

রাজা বললেন, "এ যদি জান, তবে আমাকে বারণ করছ কেন?"

"যদি যাওয়াই উচিত মনে করেন, তা হ'লে আমি ত সঙ্গে আছি—আমিই গিয়ে দেখে আসি।"

"না, তা হয় না, আমিই দেখে আসি; তুমি এখানেই থাক মন্ত্রী!

রাজার আদেশে মন্ত্রী সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। রাজ-আজ্ঞা।

রাজা যেখানে লোকটিকে দেখেছিলেন, সেইখানে গিয়ে দেখলেন, সে মানুষ নয়—বন্য জন্তু তাড়াবার জন্য কৃষক একটা বিচিলির বোঁদলায় ছেঁড়া জামা জড়িয়ে, তার মাথায় চোখ-মুখ-আঁকা একটা কালো হাঁড়ি বসিয়ে রেখেছে। দূর থেকে দেখলে হঠাৎ মানুষ বলেই ভুল হয়। তাই দেখে রাজা একটু হেসে বেরিয়ে আসতে লাগলেন।

এই বাগান থেকে রোজই আঙুর চুরি যেতো, চাষী অনেক চেষ্টা ক'রেও চুরি বন্ধ করতে পারেনি; তাই রাগ সামলাতে না পেরে—প্রতিজ্ঞা করেছে, সে নিজে রাতের বেলা বাগানে থাকবে, আর চোরটাকে দেখতে পেলে তাকে খুন করবে। সে দিন সে বাগানের এক কোণে লুকিয়ে থেকে পাহারা দিচ্ছিল। রাজাকে ফিরে যেতে দেখে সে তাঁকে চোর মনে করে চুপি চুপি তাঁর পেছনে এসে সজোরে মারলে তাঁর মাথায় মুগুরের এক ঘা! রাজার মুখ দিয়ে একটা আর্ত্তনাদ মাত্র বেরিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাটীতে পড়ে গেলেন, আর এক নিমেষেই তাঁর দেহ অসাড় হয়ে গেল।

তখন চাঁদ আকাশের খানিকটা ওপরে উঠেছে। রাজাকে পড়তে দেখে চাষী কাছে এসে বললে, "কেমন বেটা, আর চুরি করবি? বারে-বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান, এবার ঘুঘু তোমার বধেছি পরাণ। দেখি তোর মুখখানা—চেনা লোক কি না জানতে পারব।"

সে রাজার আরো কাছে এসে মাটীতে ঝুঁকে-পড়ে যা দেখলে, তাতে সে ভয়ে কেমন ভড়কে গেল! সে ভাবলে, তাই ত, লোকটাকে ত চোর বলে মনে হয় না। এত ঝকঝকে দামী পোষাকে যার শরীর ঢাকা, সে কি চোর? অ্যাঁ, কোঁৎকা দিয়ে এ কাকে ঠেঙিয়ে মেরে ফেললুম? তাই ত, কি হবে? ধরা পড়লে আমার যে ফাঁসী হবে! দেখি ত, লোকটা মরেছে কি এখনো বেঁচে আছে!"

চাষী রাজার মুখের কাছে হাঁটু-গেড়ে বসে তাঁকে ভাল ক'রে দেখ্তে লাগলো। দেখলে, প্রাণ অনেক আগেই বেরিয়ে গেছে। সেখানে রক্তের ঢেউ খেলুচে!

রাজার আর্ত্তনাদ মন্ত্রীর কাণে প্রবেশ ক'রেছিল। তিনি ভাবলেন, ব্যাপার কি, দেখতে হচ্ছে! তিনি তাড়াতাড়ি বাগানে প্রবেশ ক'রে, যে দিক্ থেকে শব্দটা শুনতে পেয়েছিলেন, সেই দিকে চ'ললেন। সেখানে গিয়ে দেখেন—সর্ব্বনাশ! রাজা মাটীতে অসাড় ভাবে পড়ে আছেন। আর একটা লোক গালে হাত দিয়ে তাঁর পাশে ব'সে কি ভাবুচে!

রাজার অবস্থা দেখে মন্ত্রী ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে কেঁদে উঠলেন।—তাঁকে দেখে চাষীটা প্রাণভয়ে পালাবার চেষ্টা করলে। তা দেখে মন্ত্রী এক লাফে তাকে ধরে ফেললেন; তার ঘাড় ধ'রে বললেন, "তুই পালাবি কোথায়? তোকে এখনি আমি খুন করবো।"

লোকটি দু' হাত যোড় করে বললে, "দোহাই—দোহাই হুজুর! আমার কোন কসুর হয়নি। আমি নিদ্দুষী।"

"তবে এ কাজ করলে কে? কে এঁকে খুন ক'রেছে?"

"আজ্ঞে ওঁর বরাত।"

"বরাত? বেটা, তুই বলুতে চাস কি?"

"আজ্ঞে ঠিকই বলেছি। ওঁর অদৃষ্টে আজ অপঘাত মৃত্যু লেখা ছিল কি না, আজ্ঞে তাই ওটা ঘটে গেল। আমি আজ্ঞে একটা উপলক্ষ মাত্র।"

"বেটা আমার কাছে এসেছিস্ চালাকি করতে? ও-সব চালাকী আমার কাছে খাটবে না। জানিস্, তুই কাকে খুন করেছিস্? ওঁকে চিনিস্?"

"কি ক'রে জানব আজ্ঞে? চিনিনে ত আজ্ঞে উনি কে?"

"যে রাজ্যে তুই বাস করচিস, ইনি সেই রাজ্যের রাজা। তুই রাজাকে খুন করেছিস্। তোকে মাটীতে পুঁতে ডালকুত্তো দিয়ে খাওয়াব। কুকুরে তোর শরীরের মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে।"

এ কথা শুনে লোকটা ভয়ানক ভয় পেয়ে বললে, "আমার দোষ নেই হুজুর! রোজ রাত্তিরে আমার এই ক্ষেত থেকে পাকা আঙুর চুরি যায়; তাই আমি চোর মনে করে ওঁর মাথায় মুগুর মেরেছিলাম। সেই কোঁৎকার এক ঘায়েই উনি শিঙে ফুকেছেন। আমি ত খুন ক'রবো ব'লে মারিনি ওঁকে।"

চাষাটা একটু ভেবে আরও বললে, "তা বেশ, আমাকে ধরে নিয়ে চল; কিন্তু আমি রাজসভায় গিয়ে সকলকে বলব, তুমিই মন্ত্রী রাজ্যলোভে রাজাকে খুন করেছ, আমাকে সেখানে দেখতে পেয়ে খুনের বদনাম আমারই ঘাড়ে চাপাচ্ছ। আমার এ কথা কে অবিশ্বাস করবে?—তার চেয়ে এক কাজ কর, তুমি তোমার পথ দেখ, আমিও এক দিকে সরে পড়ি।"

চাষার কথা শুনে মন্ত্রী ভাবলেন, "লোকটা বড় মন্দ কথা বলেনি। রাজার হত্যাকারী বলে আমাকেই সকলে সন্দেহ করবে। এখন উপায় কি? এ যে বড়ই কঠিন সমস্যায় পড়া গেল!"

চাষাটা মন্ত্রীর সঙ্কট বুঝতে পেরে বললে, "মন্ত্রী মশায়, আপনি এতো ভাবচো কেন? ভাবনা-চিন্তায় আর সময় নষ্ট করে লাভ কি?"

মন্ত্রী কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না,—ভাবতে লাগলেন, "এখন কি করা যায়? এখন আমার অবস্থা এই দাঁড়িয়েচে যে, হয় আমাকে রাজার মৃতদেহ নিয়ে রাজবাড়ীতে ফিরতে হবে, না হয়—স্ত্রী-পুত্রের মায়া ত্যাগ করে প্রাণভয়ে অন্য দেশে পালাতে হবে। কিন্তু আর এক কাজ ক'রলে কেমন হয়? এই লোকটাকেই যদি সঙ্গে নিয়ে গিয়ে আমাদের রাজা বলে চালাবার চেষ্টা করি, তাতে ক্ষতি কি?" এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি সেই চাষাটাকে বললেন, "তুমি সোজা হয়ে দাঁড়াও ত বাপু!"

চাষা সোজা হ'য়ে দাঁড়ালে, মন্ত্রী নিজের হাতে তার শরীরের মাপ নিলেন; তার পর রাজার মৃতদেহটারও আগাগোড়া মেপে দেখলেন। দেখলেন, চাষাটার দেহ রাজার দেহের চেয়ে আঙুল-দুই খাটো হ'ল। তার পর বেশ ক'রে তার দিকে চেয়ে দেখে ভাবলেন, লোকটা একটু খাটো বটে, কিন্তু একই রকম মোটা, আর খাসা চালাক-চতুর; এ বিপদে এ ছাড়া আর উপায় কি? রাজাকে সঙ্গে না নিয়ে আমার যখন ফিরে যাওয়ার কোন উপায়ই নেই, তখন একে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিই-বা করুতে পারি?"

এই রকম ভেবে মন্ত্রী বললেন, "ওহে বাপু,—ও চাষার ঘরের ঢেঁকি!"

"আজ্ঞে কি হুকুম—মশায় বলতে আজ্ঞে হোক?

"দেখ, তোমাকে রাজা হতে হবে; মানে—আমি তোমাকে রাজা বানাবো।"

"সে কি মশায়! চাষার ছেলে আমি—আমাকে রাজা বানাবেন—তার মানে?"

"হ্যাঁ, রাজাই হ'তে হবে তোমাকে। তা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।"

"আমাকে রাজা বলে চালাবেন না কি?"

"সেই ব্যবস্থাই ক'রতে হবে।"

"আমাকে কি ধরা পড়তে হবে না? আমি মুরুক্খু মানুষ, রাজাগিরির কি জানি আমি? রাজা হয়ে কি সোনার নাঙ্গল দিয়ে ক্ষ্যাত চোষবো?"

"ভয় নেই, আমি সব ঠিক করে নেব।"

"কি করে?"

"পরে তা দেখতে পাবে; তোমার বাগানে কি কোদাল আছে?"

"হাঁ আছে, কেন?"

"এখানে এনে, মাটী খুঁড়ে একটা বড় রকম গর্ত্ত খোঁড়।"

"ওঃ বুঝেছি!" ব'লে সে একখান কোদাল এনে মস্ত বড় একটা গর্ত্ত খুঁড়লো; তার পর দু'জনে ধরাধরি করে রাজার মৃতদেহ সেই গর্ত্তে ফেলে তার ওপর মাটী চাপা দিল।

রাজার সঙ্গে মন্ত্রী যখন ছদ্মবেশে বেরুতেন, তখন তিনি রাজার জন্য দু'-এক রকম পোষাক সঙ্গে রাখতেন; কারণ, রাজা নগর-ভ্রমণে বেরিয়ে কখন কখন পোষাক বদলাতেন। এইবার মন্ত্রী সেই বাড়তি পোষাকের এক প্রস্ত খুলে-নিয়ে চাষীটাকে তা দিয়ে সাজিয়ে দিলেন। তার পর তাকে সঙ্গে নিয়ে রাজবাড়ীর দিকে চললেন। যেতে যেতে চাষীটা তাঁকে বললে, "আমি ত আপনার সঙ্গে যাচ্চি, কিন্তু বাড়ীতে আমার পরিবার আছে, ছেলে আছে, তাদের কি উপায় হবে?"

মন্ত্রী বললেন, "সে জন্যে তোমাকে বাপু কিছু ভাবতে হবে না; তাদের চলবার উপায়ও আমি করব। তারা নিয়ম-মতো মাসোহারা পাবে, তাদের খাওয়া-পরার কোন কষ্ট হবে না।"

রাজবাড়ীর কাছে এসে মন্ত্রী চাষাটাকে ব'ললেন, "কেউ কোন কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করলে তুমি মুখ বুজে থাকবে, কোন উত্তর দেবে না। যার-তার সঙ্গে কথা কওয়া রাজার দস্তর নয়। আমি যা ব'লব, তাই শুনে যাবে। আমি সব ঠিক করে নেব।"

রাজা নগর-ভ্রমণ শেষ ক'রে গুপ্ত দ্বার দিয়ে রাজবাড়ীতে ফিরতেন। মন্ত্রী সেই গুপ্ত দ্বার দিয়ে চাষীকে নিয়ে রাজবাড়ীর পিছনের বাগান-বাড়ীতে প্রবেশ ক'রলেন। মন্ত্রী সেখানে গিয়েই আদেশ দিলেন, "এখানে কেউ যেন না আসে, যে ঢুকবে, তার কঠিন শাস্তি হবে। এটা রাজার হুকুম।"

তার পর মন্ত্রী চাষাকে বললেন, "দেখ, ভুলেও তুমি বাইরে যেও না। তোমার যা দরকার হবে, তা আমিই তোমাকে আনিয়ে দেব। এখন তুমি রাজা কি না, রাজা সেজেই এখানে থাকবে। কিন্তু সাবধান, বাইরে বেরিও না, বা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়েও বাইরে তাকিও না।"

চাষী ব'ললে, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনি যা যা ব'লবেন, আমি ঠিক তাই ক'রব।"

"বেশ, এখন রাত্তির হয়েছে। তুমি ঐ খাটের ওপর শুয়ে পড়।"

মন্ত্রীর কথায় যেমন সে সেই খাটে শুয়েছে, অমনি তার মনে হল, সে যেন পাতালে নেমে যাচ্ছে!

সে তখনই ঘরের মেঝেতে লাফিয়ে পড়লো।

মন্ত্রী বললেন, "কি হল হে? তুমি অমন করে লাফিয়ে নীচে নাম্‌লে যে?"

"মশায়, এ কেমন-ধারা বিছানা? আমাকে ঠেলে পাতালে নিয়ে যাচ্ছিল যে!"

মন্ত্রী হেসে বললেন, "ভয় নেই বাপু, তোমার কোন ভয় নেই। এ কি তোমার ঘরের চেটাইয়ের ওপর কাঁথা-বিছানো বিছানা? এ হচ্ছে রাজগদী। তুমি আরাম ক'রে শুয়ে থাক।"

মন্ত্রীর কথায় ভরসা পেয়ে চাষী আবার খাটে উঠে, বিছানায় শুয়ে পড়ল। এবার আর সে ভয় পেলে না।

পরের দিন সকাল বেলায় রাজার হুকুম বেরুল,—রাজা এখন এক বৎসর নির্জ্জন বাস করবেন। এই এক বৎসর তিনি জপ-তপ নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন। মন্ত্রী তাঁর হয়ে রাজকার্য্য চালাবেন। আর বিশেষ আবশুক হলে মন্ত্রী তাঁর কাছে এসে উপদেশ নিয়ে যাবেন।

তার পর নির্ব্বিঘ্নে রাজকার্য্য চলতে লাগল। রাজ্যের কেউই জান্‌তে পারলো না যে, রাজা বদল হয়ে গেছে। সবাই জানলে, রাজা নির্জ্জনে ব'সে জপ-তপ প্রভৃতি ধর্ম্ম-কর্ম্ম করচেন।

ও-দিকে মন্ত্রী চাষীকে রাজা গড়ে তোলবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছেন। লেখাপড়া শেখানো, রাজার আদব-কায়দা, তা ছাড়া তার চেহারার পরিবর্ত্তনের চেষ্টা; দুধ-ঘি, ছানা-মাখন, প্রভৃতি খাওয়ান, দুধের সর দিয়ে গা ডলা-মাজা, পায়ের ফাটাগুলো ঝামা দিয়ে রোজ ঘষে সমান করা,—এই সব ক্রমাগত চল্‌তে লাগল।

এই রকম করে এক বছর চালিয়ে মন্ত্রী দেখলেন, এখন রাজাকে রাজসভায় একবার হাজির করা দরকার। কিন্তু নকল রাজাকে কথা কওয়ানো হবে না। কি জানি, তাঁর ফন্দি-ফিকির যদি ধরা পড়ে যায়। আর ওকে দেখে কারও সন্দেহ হয় কি না, তাও দেখা দরকার।

এই সব ভেবে ঠিক এক বৎসর পরে মন্ত্রী ঘোষণা করলেন, "কাল রাজা রাজসভায় বসবেন; কিন্তু কোন কথা কবেন না। কেন না, তিনি এখনো মৌনী আছেন, —রাজসভায় ব'সে সকলকে দর্শন দান করবেন মাত্র। কবে তিনি সভায় বসে রাজকার্য্য আরম্ভ করবেন, তা পরে ঘোষণা করা হবে।"

পরের দিন নির্দ্দিষ্ট সময় পূর্ণ হয়েছে বুঝে প্রজাদের কি আনন্দ! এক বৎসর পরে তারা রাজাকে দেখতে পাবে। সাবেক রাজার যে ছবি ছিল, তা দেখে মন্ত্রী চাষীকে ঠিক সেই রকম পোষাকে সাজিয়ে দিলেন। এক বৎসরের চেষ্টায় তার চেহারা তখন ভদ্রলোকের চেহারার মতোই

হয়েছে। পায়ের ফাটাগুলো অদৃশ্য হয়েছে, গায়ের মাংসও আর খস্‌খসে ও কঠিন নেই, বেশ মসৃণ হয়েছে; হঠাৎ দেখে আর কারুর কোন রকম সন্দেহ হবার আশঙ্কা নেই। তাছাড়া এক বৎসর অদর্শনের পরে রাজাকে দেখা কি না!

রাজার সভায় আসবার সময় হল; বৈতালিকরা গান ধরল, নকীব ফুকরাতে লাগল, বন্দীরা স্তুতিবাদ আরম্ভ করল। সৈন্যরা চারিদিকে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করল। রাজা গম্ভীর ভাবে এসে সিংহাসনে বসলেন। রাজসভায় সকল লোক যথানিয়মে অভিবাদন করল, রাজাও প্রত্যভিবাদন করলেন। কি ভাবে কথা বলতে হবে, কি ভাবে সিংহাসনে বসতে হবে, সকলে প্রণাম করলে কি ভাবে তাদের তা ফিরিয়ে দিতে হবে—সে সবই মন্ত্রী তাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন; তাই কোন কিছুতেই কারুর সন্দেহ হ'ল না যে, এ-রাজা সে-রাজা নয়। তবে তাকে অন্দর-মহলে পাঠাতে মন্ত্রীর সাহস হল না, কি জানি, যদি সেখানে কোন রকম গোলমাল বেঁধে উঠে। মন্ত্রী ভাবলেন, আরও কিছু দিন যাক্, তখন যা হয় করা যাবে। রাজা কিছুক্ষণ সিংহাসনে বসে ধীরে ধীরে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে সকলেই উঠে দাঁড়াল। রাজা ধীর-গম্ভীর ভাবে আবার সেই বাগান-বাড়ীতে প্রবেশ করলেন।

মন্ত্রী সকলের সঙ্গে কিছুকাল রাজার সম্বন্ধে আলোচনা করলেন, কারুর মনে কোন রকম সন্দেহ হয়েছে কি না, তাই জানতে তাঁর আগ্রহ হয়েছিল। কিন্তু কারুর যে সন্দেহ হয়েছে, তা মন্ত্রীর মনে হল না। তখন প্রফুল্ল মনে মন্ত্রী বাগান-বাড়ীতে নকল রাজার কাছে গেলেন। সেখানে দু'জনে অনেক কথা হ'ল।

তার পরই ইস্তাহার বেরুল—আর ছ'মাস পরে রাজা সিংহাসনে বসে রাজকার্য্য করতে থাকবেন। সেই সময়ই তাঁর ব্রত শেষ হবে।

এ ছয় মাসও নকল রাজার শিক্ষা চলল—রীতিমত। রাজ্যের পুরাতন আইন-কানুন, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার—সবই শিক্ষা হ'ল। লোককে কি ভাবে আদেশ করতে হয়, তাও তাকে শেখান হল। মন্ত্রী দেখলেন, আর কোথাও কোন গোল নেই। কেবল অন্তঃপুরের ব্যাপারটাই শিখাতে বাকি!

রাজা বিয়ে করেননি—তাই তাঁর রাণী ছিল না। কিন্তু সেখানে কোথায় কি আছে, রাজা কোন্ ঘরে শয়ন করতেন, কোথায় বিশ্রাম করতেন, এই সব মোটামুটি বিবরণ চাষী-রাজাকে জানিয়ে দেওয়া হ'ল। অবশ্য, রাজার সঙ্গে দাসী থাকে, রাজার ইচ্ছামত স্থানে সে তাঁকে নিয়ে যায়। এজন্যে চাষী-রাজাকে বুদ্ধি খাটিয়ে চল্‌তে শিখিয়ে দেওয়া হ'ল।

অন্দর-মহলের সব বিবরণ বলবার পর মন্ত্রী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন হে, সব ঠিক করে নিতে পারবে ত?"

চাষী-রাজা হেসে বলল, "তা ঠিক পারবো বটে, কিন্তু মন্ত্রী, তুমি ভুলে যাচ্ছ যে, আমি এ রাজ্যের রাজা, আর তুমি আমার মন্ত্রী;—রাজার সঙ্গে এ ভাবে কথা বলা বেয়াদপি, এটা মন্ত্রীর মনে রাখা উচিত।"

মন্ত্রী হেসে বললেন, "ঠিক, মহারাজ! আমার ভুল হয়ে গেছে। কসুর মাফ করতে আজ্ঞা হয়।"

মন্ত্রী হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। চাষীও হাসতে লাগল। এমনি ক'রে দেখতে দেখতে ছ'মাস কেটে গেল। রাজা এবার রাজসভায় ব'সে রাজকার্য্য করতে লাগলেন। রাজার কাজকর্ম্ম দেখে মন্ত্রীর তাক্ লেগে গেল। তিনি ভাবলেন, এই কি সেই চাষী? ওর কাজকর্ম্ম আর বিচারে তা ত মনে হয় না; এ যেন ঠিক রাজা! এ বুঝি সিংহাসনেরই গুণ।

সভা ভাঙ্গল। রাজা আজ প্রথম অন্তঃপুরে যাবেন, তাই মন্ত্রীর আদেশমত দাসীরা সব উদ্যোগ আয়োজন ক'রে রাখলো।

রাজার কোন অসুবিধা না হয়, সে কথা জানানো হয়েছিল, আরও জানানো হয়েছিল যে, রাজা অনেক দিন অন্দরে যাননি, কোনও যায়গায় যেতে তিনি যেন বাধা না পান। সর্ব্বদাই কোন দাসী যেন তাঁর সঙ্গে থাকে।

রাজা অন্দরে প্রবেশ করলেন। দাসীরা মহাসমাদরে তাঁর অভ্যর্থনা করল। কেউ তাঁকে সুগন্ধ তেল মাখিয়ে দিল। কেউ কেউ তাঁর স্নানের জন্য বড় বড় রূপোর ঘড়া ভ'রে গোলাপ-জল নিয়ে এল। সকলে মিলে রাজাকে সিংহাসনে বসিয়ে স্নান করিয়ে দিলে। তার পর অন্দরের পোষাক পরে রাজা আহারাদির পর বিশ্রাম করতে লাগলেন। কোন বিষয়ে গোল হ'ল না।

এই ভাবে রাজা রোজই সভায় বসেন, আর রাজকার্য্য, প্রজাদের নালিশের বিচার করেন। বিচারের কোন ত্রুটি হয় না—সুবিচারে সবাই খুসী। মন্ত্রী দেখেন আর ভাবেন, এই কি সেই মূর্খ চাষী? নিজের হাতে তৈয়েরী-করা গাছে ফল ধরলে কার না আনন্দ হয়?

এক দিন রাজা রাজসভায় ব'সে আছেন, এমন সময় এক জন লোক একটা সোনার চাঁপা ফুল নিয়ে এসে বলল, "মহারাজ, এই ফুলটি নদীর জলে ভেসে যাচ্ছিল, আমি তুলে এনেছি। আপনি দয়া করে এটি নিলে আমি কৃতার্থ হব।"

সোনার চাঁপা ফুল দেখে রাজার বড়ই আনন্দ হ'ল। এমন চমৎকার ফুল তিনি ত কোন দিন দেখেননি! বার বার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে রাজা ফুলটি দেখতে লাগলেন। তার পর ডাকলেন, "মন্ত্রী!"

"আজ্ঞে মহারাজ!"—ব'লে মন্ত্রী এসে দুই হাত জোড় করে রাজার সামনে দাঁড়ালেন।

রাজা ব'ললেন, "এ রকম ফুল কোথায় পাওয়া যায়?"

"তা ত জানি নে মহারাজ!"—মন্ত্রী উত্তর দিলেন।

রাজার মুখে অসন্তোষের চিহ্ন দেখা গেল। তিনি বিরক্ত হ'য়ে বললেন, "এত বড় রাজ্যের মন্ত্রী তুমি, এ রাজ্যে কোথায় কি পাওয়া যায়, তা তোমার জানা নেই? এ বড় লজ্জার কথা! দেখ্ছি, তুমি মন্ত্রিত্ব করবার যোগ্য নও।"

মন্ত্রী মাথা হেঁট ক'রে ভাবলেন, "চাষীটার এত বড় দুঃসাহস! আমিই ওকে রাজা ক'র্লাম, আর সভায় বসে ও আমারই অপমান করে। ওঃ!"

রাজা আবার বললেন, "মন্ত্রী, সন্ধান কর, এই সুন্দর ফুল কোথায় পাওয়া যায়।"

মন্ত্রী বললেন, "এ যে অসম্ভব কথা! কোথায় এ ফুলের সন্ধান পাব?"

রাজার চোখ দিয়ে যেন আগুন বেরুতে লাগল; তিনি রেগে বল্লেন, "অসম্ভব! কিন্তু এই অসম্ভবই তোমাকে সম্ভব করতে হবে। যেখানে পাও, এক মাসের মধ্যে এই ফুল আর একটা আমাকে এনে দেবে।"

"আমি?"—মন্ত্রী এই প্রশ্ন করলেন।

"হ্যাঁ, তুমি। এক মাস—তোমাকে এক মাস মাত্র সময় দিলাম। না পাও, তোমাকে এই রাজ্য থেকে এক মাস পরেই নির্ব্বাসিত হতে হবে। এ রাজ্যে আর তোমার স্থান হবে না,—এটা মনে রেখ।"

রাজা সিংহাসন থেকে উঠে অন্তঃপুরে যেতে যেতে মন্ত্রীকে বললেন, "মনে রেখ মন্ত্রী, ফুল না নিয়ে ফিরে এলে, তোমাকে নিশ্চিতই মৃত্যুদণ্ড পেতে হবে।"

রাজা চলে গেলে সভা ভঙ্গ হল,—সভার সকল লোক প্রস্থান করল। মন্ত্রী কিন্তু স্তম্ভিত! "যে চাষীকে আমি নিজের হাতে শিখিয়ে-পড়িয়ে রাজা তৈয়েরী করেছি, সেই চাষী রাজা হয়ে আমার সঙ্গে এই ব্যবহার করচে! আমি তাকে রাজা না করলে সে আজ কোথায় লাঙ্গল ঠেলত, তার ঠিক নেই।"—মনে মনে একবার এই কথা ব'লে মন্ত্রী ভাবলেন,—"রাজার প্রকৃত পরিচয় সকলকে জানিয়ে দিই।"—কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মনে হল,—"এখন সে কথা বিশ্বাস করবে কে? সবাই ভাববে, রাগ ক'রে এই সব মিথ্যা কথা রটাচ্ছি। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ! যে কোন উপায়েই হোক, এর প্রতিশোধ নিতেই হবে। কিন্তু প্রতিশোধ নিতে হলে এ রাজ্যে থাকা চাই। সুতরাং আগে সোনার চাঁপা ফুলের সন্ধান করে রাজ্যে ফিরে আসি; তার পর দেখে নেব, আমার কূটবুদ্ধির কাছে ঐ চাষীর বুদ্ধি কোথায় লাগে?"

সেই দিনই মন্ত্রী সোনার চাঁপা ফুলের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। এ-দেশ, সে-দেশ—কত দেশ ঘুরলেন, কত লোককে জিজ্ঞাসা করলেন; কিন্তু কিছুতেই সোনার চাঁপা ফুলের সন্ধান পাওয়া গেল না।

এক দিন এক নদীর ধারে মন্ত্রী স্নান-শেষে আহ্নিক করতে বসেছেন, এমন সময় তিনি চেয়ে দেখলেন, নদীর জলে কি একটা জিনিষ ভেসে যাচ্ছে! মন্ত্রীর মনে হ'ল, সেটা যেন সোনার চাঁপা ফুল। তিনি অমনি সাঁতার দিয়ে সেটা ধরে দেখলেন, ঠিকই বটে; সোনার চাঁপা ফুলই ত! মনে তাঁর বড়ই আনন্দ হ'ল। সেটিকে বেশ করে কাপড়ে বেঁধে তিনি আবার আহ্নিকে বসলেন। কিছু কাল পরে আরও একটা সোনার চাঁপা ফুল ঐ ভাবে ভেসে যেতে দেখলেন। সেটাও তিনি ধরলেন। এই রকম যত বারই তিনি আহ্নিকে বসেন, তত বারই ঐ রকম দেখেন। আহ্নিক আর ভাল ক'রে করা হ'ল না। তিনি ভাবলেন, "এত সোনার চাঁপা ফুল কোথা থেকে আসছে দেখতে হবে।" মন্ত্রী তখন তাড়াতাড়ি আহ্নিক শেষ করে যে দিক্ থেকে সোনার চাঁপা ফুল ভেসে আসছিল, সেই দিকে চললেন।

ক্রমাগত যেতে যেতে তিনি একটা পাহাড় দেখে, তখনই তার ওপরে উঠলেন। উঠে দেখলেন, একটা লোক পাহাড়ের একটা ঝরণার ধারে ব'সে নিজের বুক থেকে রক্ত বের করে, সেই রক্ত দিয়ে মায়ের পূজা করছে; তার পর সেই রক্ত ঝরণাতে ফেলে দিচ্ছে, আর সেই রক্ত তখনই সোনার চাঁপা ফুল হয়ে ঝরণার জলে ভেসে যাচ্ছে। ভাস্তে ভাস্তে শেষে তা নদীতে পড়ছে।

মন্ত্রী সেই লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি বুকের রক্ত দিয়ে মায়ের পূজা করছ কেন? আর কত দিনই বা এ ভাবে পূজো করবে?"

"যত দিন দেহে প্রাণ আছে।"—লোকটি উত্তর দিল।

"এই ভাবে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলে পরজন্মে কি পাবে?"

"লোকটা বল্ল, পরজন্মে রাজা হব। রাজা হওয়া কি সোজা? যারা রাজা হয়, তারা পূর্ব্বজন্মে এই রকম তপস্যা করে।"

এ কথা শুনে মন্ত্রীর জ্ঞান হ'ল। সেই চাষী রাজার ওপর তাঁর যে রাগ হয়েছিল, মন থেকে তা দূর হল। তিনি ভাবলেন, "ওঃ, এত কষ্ট করলে তবে লোক জন্মান্তরে রাজা হতে পারে?—তবে সে-ও ত পূর্ব্বজন্মে এই রকম তপস্যা করেছিল, তাই এ জন্মে রাজা হয়েছে! আমি তাকে রাজা করেছি বলে আমার যে অহঙ্কার হয়েছিল, এখন দেখ্ছি, তা ভুল। সে তার ভাগ্যবলেই রাজা হয়েছে।"

তার পর মন্ত্রী সোনার চাঁপা ফুল নিয়ে রাজ্যে ফিরে এসে রাজাকে প্রণাম করে বললেন, "মহারাজ! এই নিন সোনার চাঁপা ফুল।"

মন্ত্রী এক আঁচলা সোনার চাঁপা ফুল রাজার পায়ের কাছে ঢেলে দিলেন। এতগুলি সোনার চাঁপা ফুল দেখে

রাজা ভারী খুসী। তিনি বললেন, "মন্ত্রী, তোমার মত লোক রাজ্যের গৌরব। তোমাকে আমি পুরস্কার দেবো। নদীর ও-পারে যে সকল গ্রাম আছে, তা আমি তোমাকে দিলুম, আর আজ থেকে ঐ গ্রামগুলো হল একটা পরগণা, আর ঐ পরগণার নাম হবে—'সোনার চাঁপা'।"

মন্ত্রী সিংহাসনের গোড়ায় মাথা ঠেকিয়ে বললেন, "আপনার দান আমি মাথা পেতে নিলুম, মহারাজ!"

৺সতীপতি বিদ্যাভূষণ।

রেড-ক্রশ সোসাইটি

যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় আহত-আতুরদের সেবা করিবার জন্য রেড-ক্রশ সোসাইটির যে-ব্যবস্থা আছে, তা নিখুঁৎ! এত নিখুঁৎ যে, সে-কথা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়! এ-সোসাইটিতে বহু রমণী যোগ দিয়াছেন; আহতের সেবা তাঁদের জীবনের ব্রত—রেড-ক্রশ সোসাইটির সম্বন্ধে ইহার চেয়ে বেশী খবর আমাদের মধ্যে অনেকেই রাখি না!

আঁরি ডুনা

আজ এই রেড-ক্রশ সোসাইটির পরিচয় দিতেছি। এ সোসাইটির প্রতিষ্ঠার মূলে দু'জনের নাম চির-স্মরণীয় হইয়া আছে। এক জনের নাম কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল; আর-এক জনের নাম আঁরি ডুনা। ডুনা ছিলেন সুইজার্ল্যাণ্ডের মস্ত ধনী ব্যাঙ্কার।

প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বেকার কথা—য়ুরোপে মহা-আক্রোশে তখন দু'টি মহাযুদ্ধ চলিয়াছে। ক্রিমীয়ার যুদ্ধ; এবং ইতালীর সহিত অষ্ট্রিয়ার যুদ্ধ। ক্রিমীয়ার যুদ্ধে সকল বাধা-নিষেধ ঠেলিয়া গৃহ-সংসারের আরাম-মায়া ভুলিয়া কুমারী নাইটিঙ্গেল স্বেচ্ছায় যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া আহতদের সেবার কাজে নিজেকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন। তাঁর সে পুণ্যব্রতের কাহিনী কাগজে-কাগজে প্রচারিত হইতেছিল এবং সুইজার্লাণ্ডে বসিয়া ধনী ব্যাঙ্কার আঁরি ডুনা সে পুণ্য-কাহিনী সাগ্রহে পাঠ করিতেছিলেন। সে কাহিনী পাঠ করিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না,—ইতালীর সহিত অষ্ট্রিয়ার যে-যুদ্ধ চলিয়াছিল, সেই যুদ্ধ-ক্ষেত্রে ছুটিলেন স্বচক্ষে যুদ্ধের হিংস্র-মূর্ত্তি দেখিতে। শলফেরেনোর মহাযুদ্ধে তিনি যে-দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে শিহরিয়া উঠিলেন!

জেনেভায় ফিরিয়া আসিয়া তিনি সে কাহিনীর বর্ণনা-সহ একখানি পুস্তক লিখিলেন। পুস্তকের নাম Un Souvenir de Solferino. গ্রন্থ লিখিয়া তিনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন না; সকল সাম্রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষের কাছে এক-কাপি করিয়া সে-বই পাঠাইলেন; সর্ব্ব দেশের

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল

সেনাধ্যক্ষ, মন্ত্রী, চিকিৎসকদের সঙ্গে গিয়া দেখা করিলেন। শাসন-পরিষদ্, বিচার-বিভাগ,—সকলকে জাগাইলেন, বলিলেন,—যুদ্ধ করো, নিষেধ করিব না। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে হতভাগ্য আহতদের সেবার ব্যবস্থা কেন সকলে করিবেন না?

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ডুনার গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে জেনেভায় আন্তর্জ্জাতিক সভার অধিবেশনে চব্বিশটি বিভিন্ন সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি-সমাগম হইলে তাঁদের কাছে ডুনা প্রস্তাব করিলেন, যুদ্ধে আহতদের সেবার দায়িত্ব সর্ব্বজাতির উপর ন্যস্ত; সে-সেবা সকলের কর্ত্তব্য। আহত বা আর্ত্তের সহিত কাহারো শত্রুতা থাকিতে পারে না,—কুকুর-বিড়ালের মতো উপেক্ষায়-অবহেলায় তারা কেন মরিবে? তাদের সেবার ব্যবস্থা করিতে হইবে—সে-সেবার ভার যদি সকলে না লন, তাহা হইলে মনুষ্যত্ব থাকিবে না!

এ কথায় সকলের অন্তরে সাড়া উঠিল ! সত্যই তো, কঠিন আদেশে ঘর-বাড়ী আত্মীয়-স্বজনের স্নেহপাশ হইতে উচ্ছিন্ন করিয়া যাদের ধরিয়া যুদ্ধে পাঠানো হয়, তারা আহত হইলে তাদের দেখিবে না? এ-প্রস্তাব ফলে ডুনার স্বপ্ন সত্যে পরিণত করিয়া রেড-ক্রশ সোসাইটির সৃষ্টি হইল। ডুনা তাঁর বিপুল ধন-সম্পত্তি দিয়া সোসাইটির বনিয়াদ্ গড়িলেন। এবং ক্রমে নানা জাতির সমবেত চেষ্টায় বিভিন্ন জাতীয় রেড-ক্রশ সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হইল।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ রেড-ক্রশ সোসাইটির জন্ম হয়। ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধে এ সোসাইটি উভয়-পক্ষের আহত-

বন্দীদের জন্ম রকমারি পার্শেল

আতুরের সেবায়-পরিচর্য্যায় প্রাণ-মন ঢালিয়া দিয়াছিল। সেই আন্তরিক সেবার সুফল দেখিয়া সকল জাতি মিলিয়া রেড-ক্রশ সোসাইটির কাজের সুবিধা-কল্পে বিধি-নিয়ম রচনা করেন। সকলে মিলিয়া স্থির করেন, যত শত্রুতাই চলুক, রণক্ষেত্রে সেবার সম্পর্কে যে সব আম্বুলান্স বা হাসপাতাল থাকিবে, সে সব আম্বুলান্স ও হাসপাতালকে অটুট, অক্ষত রাখিতে হইবে: এবং রেড-ক্রশের সদস্যদের সেবার কাজ যাহাতে অব্যাহত ও স্বচ্ছন্দ থাকে, সে জন্য তাঁদের যাতায়াত এবং অবস্থানাদির সম্বন্ধেও নিরাপদ ব্যবস্থা থাকা চাই।

সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত রেড-ক্রশ সোসাইটির কাজ অব্যাহত আছে। তার কাজের প্রসার বাড়িয়াছে; সদস্য-সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে; এবং রেড-ক্রশের উপর আজ পর্য্যন্ত কোনো পক্ষ বিদ্বেষ বা হিংসার স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করে নাই।

প্রথম যখন রেড-ক্রশ সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয়, তখন যেমন-তেমন লোক লইয়াই সেবা-পরিচর্য্যাদির কাজ চলিত। এখন সেবার কাজে সুব্যবস্থা হইয়াছে। শুধু আহতদের সেবা-পরিচর্য্যা বা রণক্ষেত্র হইতে আহতদের বহিয়া নিরাপদ-আশ্রয়ে রক্ষা -এই কাজেই রেড-ক্রশ সোসাইটি আপন কর্ত্তব্য সীমাবদ্ধ রাখে নাই। রণক্ষেত্রে যারা নিহত হয়, তাদের অভাগা পরিবারদের প্রতিপালন-ভার; বিপক্ষ-কারাগারে যারা বন্দী হইয়া আছে, তাদের পরিবারবর্গের সহিত বন্দীদের নিয়মিত সংবাদ আদান-প্রদান-ভার; যুদ্ধে আহত হইয়া যারা একান্ত নিরুপায়, তাদের লালন-পালন-ভার— এমনি বহু কর্ত্তব্য আজ রেড-ক্রশ সোসাইটি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছে; এবং সে-ভার সোসাইটি নিষ্ঠা-ভরে পালন করিয়া আসিতেছে। সে ব্রত-পালনে কোনো বিপক্ষ-পক্ষ আজ আর এতটুকু বাধা দেয় না; দিতে পারে না।

রেড-ক্রশ সোসাইটির অধীনে যে কার্য্য-বিভাগ আছে, সে-বিভাগে প্রায় দু'হাজার লোক কাজ করিতেছে। এ বিভাগে লক্ষ লক্ষ ফাইল আছে। সে সব ফাইলে আহত ও বন্দীদের এবং তাঁদের স্ত্রীপুত্রকন্যার নাম-ধাম লেখা থাকে। কাহারো সংবাদ চাহিলে সে-সংবাদ যথাসম্ভব শীঘ্র প্রদান করা হয়। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে এ তালিকায় পঞ্চাশ-লক্ষ নাম লিখিত ছিল। বন্দী বা নিরুদ্দিষ্ট আত্মীয়-বন্ধুর নাম-ধাম-পরিচয় প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এ সব তালিকায় লিপিবদ্ধ রাখা হয়।

কোনো ক্যাম্পে বিপক্ষ-বন্দীকে আনিবামাত্র তার নাম-ধাম, কোথায় কে আত্মীয়-বন্ধু আছে, সে-সব পরিচয় তখনি লিখিয়া লওয়া হয়। এ পরিচয়ের এক কাপি জেনেভায় সোসাইটির হেড অফিসে সদ্য-সদ্য পাঠানো হয়। টেলিগ্রামে এ সংবাদ যায়। বন্দীদের মধ্যে কেহ যদি মারা যায়, সে সংবাদও তখনি জেনেভায় পাঠানো হয়। জেনেভায় নামের খাতায় জাতি ও নাম-ধাম-সমেত সব পরিচয় লেখা থাকে। কাজেই কাহারো সম্বন্ধে সংবাদ চাহিবামাত্র সে-সংবাদ অবিলম্বে পাওয়া আজ অতিশয় সহজসাধ্য হইয়াছে।

সোসাইটির অফিসে নিত্য কত করুণ নাটকের অভিনয় হইতেছে, তার সংখ্যা নাই! নাম-ধাম, চেহারার সঠিক বর্ণনা—কোনো কথাই বন্দী বা নিরুদ্দিষ্ট ও আহতদের সম্বন্ধে অলিখিত থাকে না। একবার এক পোলিশ-রমণী যুদ্ধে-নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর সংবাদ চাহিয়া রেড-ক্রশ সোসাইটিকে আকুল ভাবে পত্র লিখিয়াছিলেন। সর্ব্বত্রই সোসাইটির বহু এজেন্ট আছে; তাদের কাজ যুদ্ধে আহত বা নিরুদ্দিষ্টদের সন্ধান লওয়া। পোলিশ-রমণীর পত্র পাইয়া তাঁর স্বামীর সংবাদ খুঁজিবামাত্র স্বামীকে পাওয়া গেল। তিনি আহত হইয়া কোথায় জঙ্গলে

পড়িয়াছিলেন। সোসাইটির এজেন্টের যত্নে নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর মুক্তি-সাধন; এবং তিনি দেশে ফিরিয়া প্রিয়-জনের সঙ্গে পুনর্মিলিত হইলেন। এমনি করিয়া হাঙ্গারী ও রুমানিয়ার বহু নিরুদ্দিষ্ট-জন সোসাইটির কৃপায় গৃহে ফিরিয়া নব-জীবন-লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন!

জেনেভায় সোসাইটির হেড অফিসে স্বতন্ত্র একটি পোষ্ট-অফিস আছে। সেটির নাম Prisoners' Post Office —বন্দীদের ডাক-ঘর। বিপক্ষ-কারাগারে যাঁরা বন্দী, এই ডাকঘরের মারফৎ আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে তাঁদের পত্রের আদান-প্রদান চলে। ইংলণ্ডে যে-জার্মান বন্দী হইয়া আছে, সে-ও আজ এই রেড-ক্রশ সোসাইটির ডাক-ঘরের কল্যাণে আত্মীয়-পরিজনের সহিত নিত্য-নিয়মিত পত্র-

বন্দীদের জন্ম অন্নবস্ত্রাদি পাঠানোর ব্যবস্থা

বিনিময় করিতেছে। এ সব চিঠি মারা পড়ে না—আন্তর্জাতিক বিধি-নিয়মে এ-চিঠি নষ্ট করিবার ক্ষমতা কাহারো নাই।

যুদ্ধে এই দানবী হিংসার অন্তরালে রেড-ক্রশ সোসাইটির এ-কাজ অন্ধকারে যেন আলোর বিমল রশ্মি! এবং এ রশ্মি জলিয়াছে আঁরি ডুনার কৃপায়। এ-কৃপার উৎস-মুখে কুমারী নাইটিঙ্গেলের বিরাট্ আদর্শ বিগুমান রহিয়াছে। এ যুগে তাই প্রাতঃস্মরণীয় বলিয়া জপের যোগ্য নাম যদি কাহারো থাকে তো সে এই দু'টি নাম—ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল এবং আঁরি ডুনা!

কল্পনা কি বিলাস-স্বপ্ন?

বহু কালের কথা। আমেরিকায় একটি ছেলে খাতায় অঙ্ক কষতো—অঙ্ক ভুল হতো,—সে ভুল শুধরে নিয়ে পেন্সিল দিয়ে কত কাটাকুটি করতো। ভিজে আঙুল ঘষে পেন্সিলের দাগ তুলতো—ফলে খাতার পাতা বিশ্রী কদাকার হয়ে উঠতো। সে জন্ম বেচারীর নিগ্রহের আর অন্ত থাকতো না! অথচ মা-বাপ তাকে আলাদা রবার কিনে দিতেন। বলতেন, আঙুল ঘষে পেন্সিলের দাগ তোলা যায় না, সে-চেষ্টা করে খাতার পাতা কদর্য্য করো না,—অঙ্ক ভুল হয়, এই রবার ঘষে পেন্সিলের লেখা মুছে আবার নতুন করে অঙ্ক কষো! কিন্তু এমন তার ভাগ্য, কোনো দিন রবার সে ঠিক রাখতে পারতো না! কোথায় ফেলতো, কি করে হারাতো, তার আর কোনো উদ্দেশ থাকতো না! বসে বসে অবসর-সময়ে সে-বেচারী কল্পনা করতো, আলাদা রবার না নিয়ে ঐ পেন্সিলের সঙ্গে যদি রবার আটকে রাখবার চিরস্থায়ী ব্যবস্থা থাকতো! তার এ কল্পনার কথা শুনে সকলে হাসতো। বলতো, তুই পাগল!

ছেলেটি কিন্তু শত-বিদ্রূপেও এ-কল্পনা ত্যাগ করেনি। বড় হয়ে এ-ছেলে ছেলেবেলাকার সে-কল্পনাকে সত্যে পরিণত করবার জন্ম সাধনা সুরু করে দিলে। এবং তার সাধনা এবং কল্পনা সত্য হলো যে দিন সে রবার-সংযুক্ত পেন্সিলের সৃষ্টি করলে! আজ তোমরা দোকান থেকে পাঁচ-ছ' পয়সা দামে মাথায় রবার-আটকানো যে-পেন্সিল কিনে এনে লেখায় অবাধ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করছো, সে পেন্সিল পেয়েছো সেই ছেলেটির কল্পনার ফলে! এ পেন্সিলের পেটেন্ট বেচে তিনি দাম পেয়েছিলেন প্রায় তিন লক্ষ টাকা।

আজ বাস্তব জগতে নানা জিনিষ তৈরী হয়ে আমাদের জীবনকে নানা দিক্ দিয়ে কি করে এমন সহজ করেছে, তার সন্ধান নিলে দেখবো, কল্পনাকে সফল করতে মানুষের বিপুল অধ্যবসায়ের কাহিনী এ-সব সৃষ্টির মূলে নিহিত আছে।

প্রথম যিনি ফটোগ্রাফির কৌশল আবিষ্কার করেন, তিনি ছিলেন ফৌজ-বিভাগের এক জন পদস্থ কর্ম্মচারী। যিনি প্রথম ইলেক্‌ট্রিক-মোটরের সৃষ্টি করেন, তিনি ছিলেন বই-বাঁধা দপ্তরী। যিনি টেলিগ্রাফ-প্রণালী আবিষ্কার করেন, তিনি ছিলেন এক জন চিত্র-শিল্পী। টাইপ্-রাইটারের সৃষ্টির মূলে ছিল এক জন কৃষি-ব্যবসায়ীর কল্পনা। সেলাইয়ের কল তৈরী হয়েছে এক জন কবির কল্পনার ফলে। শিক্ষা-সদনের এক জন শিক্ষকের কল্পনায় সৃষ্টি হয়েছে আজকের এই অপরিহার্য্য সহায় টেলিফোন! এবং এই যে চলচ্চিত্র,—এর সৃষ্টির মূলে ছিল এক জন সর্টহাণ্ড লেখকের আকাশ-চারী কল্পনা! অর্থাৎ প্রত্যেকটি আবির্ভাবের ইতিহাসের মূলে আছে আবিষ্কারকের কল্পনা এবং সে-কল্পনাকে সত্যে পরিণত করবার জন্ম অমানুষিক সাধনা!

যে-তোয়ালে আজ আমরা নিত্য-স্নানে ব্যবহার করি, এ তোয়ালের জন্ম-কথা বলি। আমেরিকার এক তাঁতের কলে কাপড় তৈরী হচ্ছিল। হঠাৎ কলের কোথায় কি

একটা গোলযোগ ঘট্‌লো—সুতোর তালে জোট্ পাকিয়ে বিপর্য্যয় ঘট্‌লো। সে-সুতোর জোট খোলা যায় না! অগত্যা তাঁতের মালিক কল চালাতে লাগলেন—সুতোর পাক নিঃশেষ করবার উদ্দেশ্যে! সে সুতোয় সুদীর্ঘ প্রসারে তৈরী হলো এই তোয়ালে! তোয়ালের চেহারা দেখে ভদ্রলোক মাথায় হাত দিয়ে বসলেন,—এ সুতোয় থান-থান কাপড় হতো—তা না হয়ে কল থেকে আঁশ-ওয়ালা এ কি উদ্ভট বস্তু বেরুলো? বিষণ্ণ মনে ভদ্রলোক আঁশ-ওয়ালা এই থান কারখানার এক কোণে জড়ো করে রাখলেন। তার পর এক দিন ভিজে-হাতের জল মোছবার জন্ত ঐ অব্যবহার্য্য কাপড়ের থানে দৈবাৎ হাত মুছলেন! হাত মুছতে গিয়ে দেখেন, বাঃ! এ তো চমৎকার মোছা গেল! আনন্দে তিনি মেতে উঠলেন! সেই অকেজো কাপড়ের তাল হাতে নিয়ে ভেবে-চিন্তে এমন কল শেষে তৈরী করলেন—যে-কলে সুতোর তাল শুধু জোট পাকিয়ে যায়। এবং এই কলে তোয়ালে তৈরী হতে লাগলো লক্ষ লক্ষ গাঁট!

তার পর এই টাকা-পয়সার সৃষ্টি! তোমরা জানো নিশ্চয়, পৃথিবীর নানা দেশে জিনিস-পত্র কেনা-বেচার জন্ত বিনিময়-প্রথার ব্যবস্থা চলে আসছে সেই মান্ধাতার আমোল থেকে! আমার চাই ধান-চাল, তোমার চাই কাপড়। আমি কাপড়-চোপড় তৈরী করি—তুমি এলে আমার কাছে। আমি তোমায় কাপড় দিলুম, তুমি আমাকে দিলে ধান-চাল। এমনি ভাবে কেনা-বেচার রীতিতে বহু বিঘ্ন ছিল। কার কাছে কোন্ জিনিষ পাবো, তার বেশ সন্ধান রাখতে হতো; তার উপরে আমি কাপড় তৈরী করি—ধান-চাল আনতে গিয়ে শুনলুম, তোমার কাপড়ের প্রয়োজন নেই! তখন কাপড়ের বদলে আমার পক্ষে ধান-চাল সংগ্রহ করা কঠিন হতো! কি করে এই বিনিময়-ব্যাপার সহজ হয়,—সে জন্ত আদিযুগে সভ্য-সমাজের কল্পনার সীমা ছিল না। এবং সে কল্পনাকে সত্য করে সৃষ্টি হয়েছে নির্দ্ধারিত দামে একই-ওজনের নানান্ মুদ্রা।

নদীর বুকে সেতু—জলের বুকে নৌকো-জাহাজ—এ সবের সৃষ্টিতত্ত্ব অনুশীলন করলে দেখবো—এ-সবের মূলেও ঐ মানুষের কল্পনা! নদীর তীরে বসে ও-পারে কি করে যাওয়া যায়, মানুষ তারি উপায় কল্পনা করতে গিয়ে সেতু-বন্ধনের কৌশল আবিষ্কার করেছে; এবং এমনি করেই জলের বুকে বড় কাঠ ভাসিয়ে নদী পার হবার উপায়-নির্দ্ধারণ। জলের বুক বয়ে ভেসে কি করে পার হবো আরামে—সেই কল্পনা খাটিয়েই মানুষ গড়েছে ঐ নৌকো-জাহাজ!

আকাশে পাখীর ওড়া দেখে মানুষ বহু কল্পনা করেছে, কি করে আকাশ-পথে সে-ও বিচরণ করবে! এ কল্পনা সফল করতে গিয়ে মানুষ ঐ পাখীর মতো পাখা গড়ে উড়তে চেষ্টা করেছে। সে-কল্পনাকে সত্যে পরিণত করতে কত মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, তার সংখ্যা নেই! সে-বিপত্তিতেও মানুষ কিন্তু কল্পনা ছাড়েনি! কল্পনায় নব-নব ছবি গড়ে-ভেঙ্গে ভেঙ্গে-গড়ে অবশেষে আকাশে ওড়ার সে-কল্পনাকে মানুষ সফল করেছে ঐ এরোপ্লেন রচনায়।

অতএব কল্পনাকে কখনো আকাশ-কুসুম-রচনা বা স্বপ্ন-বিলাস বলে উড়িয়ে দিয়ো না। মানুষের বহু কল্পনা তার সৃজনী-শক্তিতে সফল হয়েছে। মানুষের শক্তি সত্যই সীমাহীন। মানুষের অসাধ্য কিছু নেই,—'উদ্যোগিনং পুরুষসিংহম্ উপৈতি লক্ষ্মীঃ'—এ-কথা বড় সত্য। তাই তোমাদের বলি, কল্পনা নিয়ে যদি আন্তরিক সাধনা করো, তা হলে সে-কল্পনা সত্য হবেই, দেখবে। মানুষকে নীরোগ করার কল্পনা, মানুষকে অমর করার কল্পনা—এ-সব কল্পনার কথা হেসে উড়িয়ে দিয়ো না! এই কল্পনার ফলেই দুরারোগ্য কত ব্যাধির সুনিশ্চিত প্রতিকারের উপায় আজ নির্দ্ধারিত হয়েছে,—মনে রেখো! কাল যা সাধ্যাতীত মনে হতো, আজ বহু কল্পনায় সাধনার জোরে মানুষ তা অনায়াসে সফল এবং সত্য করেছে। সুতরাং কল্পনাকে অলস জল্পনা বা বিলাস-স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিলে মূঢ়তার পরিচয় দেওয়া হবে!

পরিচিতি

লেখা পড়ে যার হয়েছি মুগ্ধ, কেঁদেছি হেসেছি শত বার,
অন্তরে যার মূর্ত্তি আঁকিয়া পূজা করিয়াছি কত বার,—
রিতা সাথে যবে ভাগ্যের জোরে হলো চাক্ষুষ পরিচয়—
মন কেঁদে কয়—এ কোন্ মানুষ! এরে কি চেয়েছি? এ তো নয়!

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

সিঙ্গাপুর
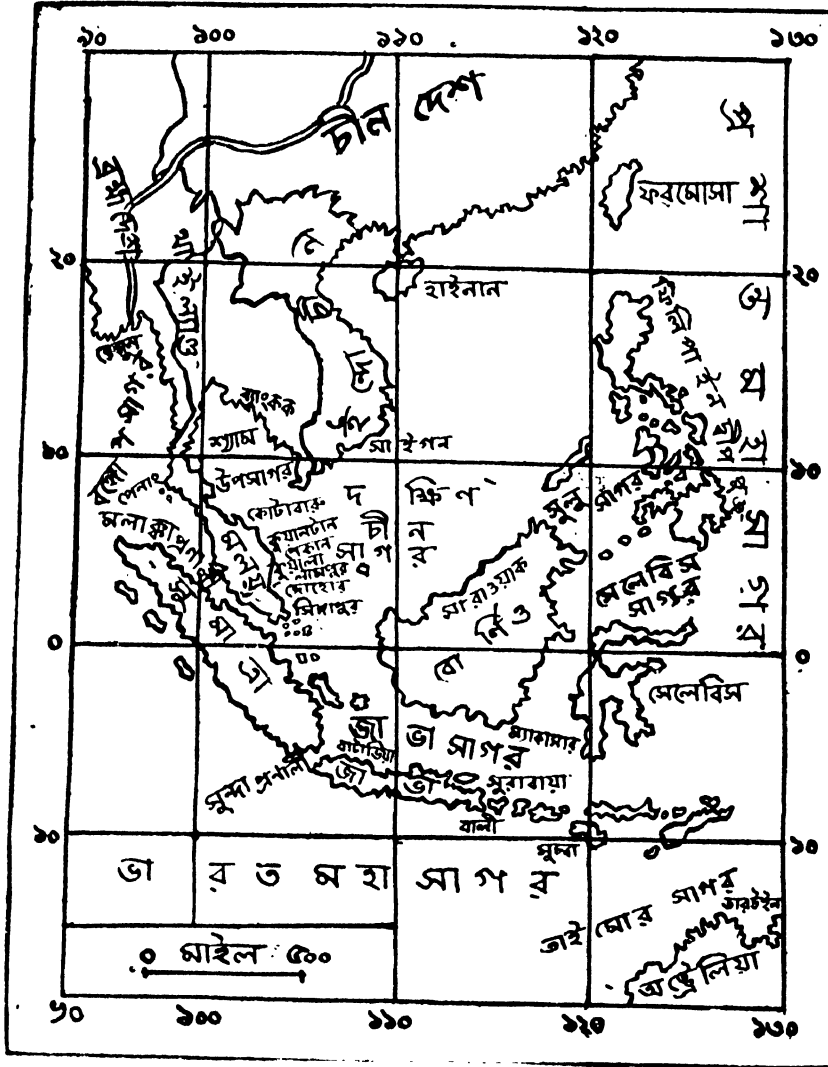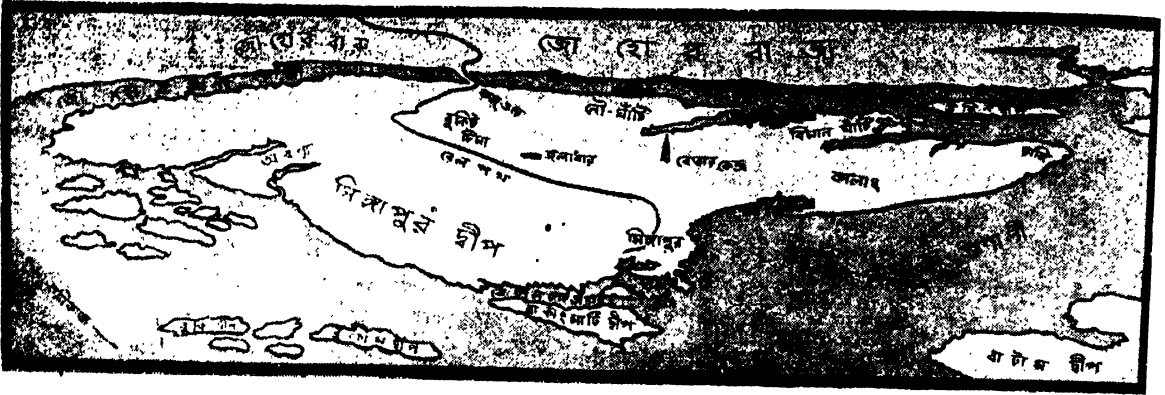
প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে দ্বীপ-পুঞ্জ

আমাদের ভারতবর্ষ এবং চীন—এ দুই মহাদেশের মাঝখানে যে দক্ষিণমুখো অন্তরীপ—তাহারি উত্তর-ভাগ ইন্দো-চীন এবং দক্ষিণ-ভাগ মলয়াঞ্চল নামে প্রখ্যাত। ব্রহ্ম দেশ এই অন্তরীপের অন্তর্ভুক্ত। শ্যামের দক্ষিণে এই মলয়াঞ্চল ভূগোলে মলয়-ষ্টেট্স ও ষ্ট্রেট্স সেট্‌ল্‌মেণ্ট নামে পরিচিত।

সিঙ্গাপুর, পেনাং এবং মলাক্কা—এই তিনের সমষ্টিতে ষ্ট্রেট্স সেট্‌ল্‌মেণ্টের সৃষ্টি। তিনটিই বেশ বিখ্যাত এবং সমৃদ্ধ বাণিজ্য-কেন্দ্র। তার মধ্যে সিঙ্গাপুর এবং পেনাং—দু'টি দ্বীপ। ষ্ট্রেট্স্ সেট্‌ল্‌মেণ্টের সঙ্গে এ দুই দ্বীপের সংযোগ শুধু সেতু এবং রেলওয়ে-সূত্রে। দুর্দ্ধর্ষ এবং দুরধিগম্য বলিয়া সিঙ্গাপুরের খ্যাতি সে দিন পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল—আজ নাই!

মলাক্কা হইতে বিবিধ মশলা রপ্তানি হয়। মশলার মাতৃ ও ধাত্রীভূমি হিসাবে মলাক্কার তুলনা নাই! এত রকমের মশলা পৃথিবীর আর কুত্রাপি হয় না এবং এই মশলার কারবারেই মলাক্কার সমৃদ্ধি ও সম্পদ্।

তার পর ঐ প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে দেখি অগণিত দ্বীপ—সুমাত্রা, যব, বোর্ণিয়ো, নিউ-গিনি, সিলেবিশ, ফিলিপাইন্‌স্ প্রভৃতি। আকারে কোনোটি বড়, আবার কোনোটি এত ছোট যে, মহাসিন্ধুর বুকে বিন্দুর মতো মনে হয়। মহাসিন্ধুর বুকের উপর দিয়া কত ঝড়

বহিয়া গিয়াছে, সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা লইয়া মহা-সিন্ধু কত তরঙ্গ তুলিয়াছে, কিন্তু একটি বিন্দু-দ্বীপকেও কোনো দিন গ্রাস করে নাই।

ছোট-বড় এ সব দ্বীপের নামের সঙ্গেই এত দিন আমাদের পরিচয় ছিল—আজ রণ-চামুণ্ডার ভীম ভৈরব নৃত্যরোলে এ সব দ্বীপ যেন আমাদের বুকে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে!

এ সব দ্বীপের ইতি-কথা আছে। সে কথায় কত গৌরব, কত লজ্জা বিজড়িত! পরমাণুর মতো অতি ক্ষুদ্র বিন্দু-দ্বীপ টার্ণেট, বন্দোনায়রার কথা খৃষ্ট-জন্মের ৩০০ বৎসর পূর্ব্বেকার বাণিজ্যের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। আজ এই যুদ্ধের কলরবে যে আম্বয়নার কথা আমাদের প্রাণে সাড়া দিয়াছে, সে-আমবয়না বহু প্রাচীন যুগে পোর্ত্তুগীজ জাতিকে সমৃদ্ধি-সম্পদে ভূষিত করিয়াছিল। এই সব ছোট-বড় দ্বীপের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক সংস্থাপিত করিতে ভেনিস ও লিশবন হইতে কত বণিক্ এখানে আসিয়াছিল, তার সংখ্যা নাই; ভেনিস লিশবনের সম্পদের অনেকখানি এই মলাক্কার মশলার দৌলতে গড়িয়া উঠিয়াছে, সে-কথাও ইতিহাসে লেখা আছে।

উপকূলে

রাজপথ—সিঙ্গাপুর

শ্যাম বা থাইল্যাণ্ডের দক্ষিণে মারগুই হইতে সোজা সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত মলয় প্রদেশ। মলয়ের আকার যেন বোতলের মতো! মলয়ের উত্তর-দিক্‌কে যদি বোতলের 'গলা' বলিয়া ধরি, তাহা হইলে এ গলার ঘের ৩০।৪০ মাইল মাত্র। উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত মলয়ের দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০০ মাইল। সারা প্রদেশটি পর্ব্বতময়। মলয়ে জলা-বিলের অন্ত নাই। পূর্ব্ব-দিকে শ্যাম-উপসাগরের দিকে ছোট-বড় অসংখ্য পাহাড় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সব চেয়ে উঁচু পাহাড়ের নাম ওফির। ওফির প্রায় ৪০০০ ফুট নীচু, এই পাহাড়ের কোলে মলাক্কা বা য়ুরোপীয় বণিক্‌দের মতে "সলোমনের সুবর্ণ-খনি।" এককালে এখানকার জলে অজস্র স্বর্ণরেণু মিলিত। এখন অজস্র ভাবে না মিলিলেও স্বর্ণরেণুর বিলয় ঘটে নাই। সুমাত্রায় জলে এখনো প্রচুর স্বর্ণরেণু মিলে। তার উপর এখন বাহির হইয়াছে টিনের খনি। সে টিনে সারা পৃথিবীর অভাব মোচন হইতে পারে। এ-সব খনির মালিক য়ুরোপীয়ান্ ও আমেরিকান বণিক-সম্প্রদায়। দেশের চীনা-অধিবাসীরা
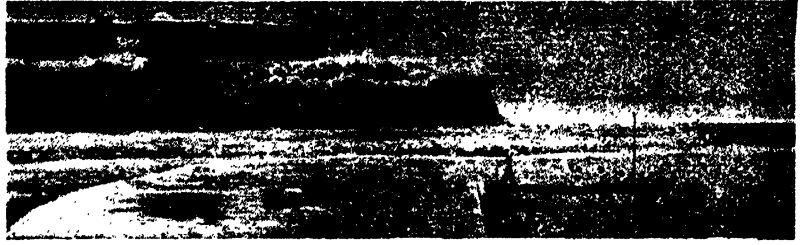
রবারের বন—সিঙ্গাপুর

এ সব খনিতে কুলি-মজুরের কাজ করিয়া দিন-যাপন করিতেছে। ঘরে এমন সম্পদ্ থাকিতেও এ-সম্পদ্-সন্ধানে তাদের ঔদাস্য ও মূঢ়তার সীমা ছিল না। যে আলস্য, ঔদাস্য এবং মূঢ়তার শাস্তি আজ ভোগ করিতেছে—
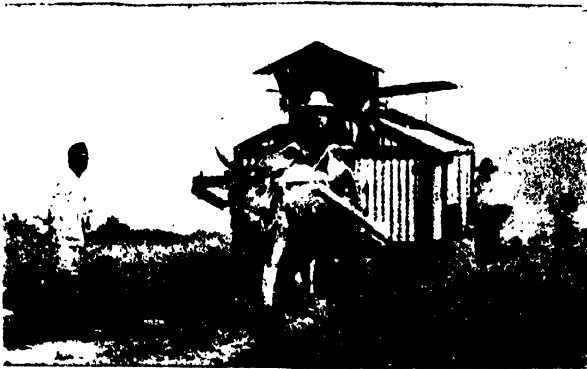
রশদবাহী গো-শকট—মলয়

নিজেরা গতর খাটাইয়া টিন বাহির করিয়া পরের হাতে তার দাম তুলিয়া দিয়া!

টিন ছাড়া মলয় প্রদেশের আর এক সম্পদ্ রবার। দক্ষিণ-আমেরিকা হইতে রবার-গাছ আনিয়া মলয়ে তার ফশল ফলানো হয়। এখানকার জমি রবারের পক্ষে এমন উপযোগী যে, রবার-গাছ পুঁতিবামাত্র মলয়ে যেন সে স্বর্ণছত্র খুলিয়া দিল! কুইনিনের পক্ষেও মলয় আজ কুইনিনের আদি-মাতা দক্ষিণ-আমেরিকাকে হারাইয়া দিয়াছে! তার উপর আছে চা ও কফির ফশল; এবং চিরযুগের লবঙ্গ, মরীচ, লঙ্কা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ মশলা। নারিকেলও এখানে প্রচুর জন্মায়।

মলয় প্রদেশে নানা জাতের লোকের বাস। উত্তরার্দ্ধ ভাগে বাস করে শ্যামশ্যামা জাতি। বর্ম্মীজ ও শ্যাম —এ দুই জাতির মিলনে এই শ্যামশ্যামা নামে বর্ণসঙ্কর জাতির আবির্ভাব। মুসলমানের সংখ্যা প্রচুর। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য লইয়া যা-কিছু প্রতিপত্তি, তা চীনা জাতির। সমুদ্রের উপকূল-প্রদেশে আছে মাদ্রাজী, আরব, মালাবারী, অষ্ট্রেলিয়ান্, ইউরেশিয়ান্, কাফ্রী এবং কয়েক সহস্র য়ুরোপীয়ান্।

মলয় নামে এ-প্রদেশের পরিচয় আধুনিক। আজো অনেকে মলয়-প্রদেশকে বলে মলাক্কা। মলাক্কার পত্তন হয় দ্বাদশ শতাব্দীর গোড়ায়। সুমাত্রা হইতে এক দল নর-নারী এখানে বাস করিতে আসে। তারা মালয়-জাতি নামে খ্যাত। তাদের নাম হইতেই অন্তরীপের নাম হইয়াছে মলয়।

ষোড়শ শতাব্দীতে পোর্ত্তুগীজরা এখানে আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করে। তার পর আসে ডাচ্ এবং ইংরেজ। এখনো মলয়ের বহু স্থানে প্রাচীন পোর্ত্তুগীজ, ডাচ্ এবং ব্রিটিশ ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। পোর্ত্তুগীজদের শেষ দুর্গ ইংরেজরা ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া দিয়াছে।

বেত-বনে মলয় শ্রমিক

মলয়ের পূর্ব্বদিকে চড়া পড়িয়া সাগরের বুক যেন খাঁ-খাঁ করিতেছে। মলয়ের জঙ্গলে নানা জাতের গাছ—সে সব গাছ কাটিয়া দেশদেশান্তরে কাঠ চালান যায়। তার উপর এখানে এক-জাতের পাম্ হয়। তার ডালে হয় মলাক্কা-কেন্ বা বেত। সে পামের তুলনা নাই! তাছাড়া মলাক্কার কাঠের আদর পৃথিবীর সর্ব্বত্র আজ সীমাহীন।

ডাচ্‌দের আসার সঙ্গে সঙ্গে মলয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ঢিলা হইয়া পড়ে। তার পর ব্রিটিশ জাতি আসিয়া পেনাঙে বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপিত করে। পেনাঙ সব-চেয়ে প্রাচীন ব্রিটিশ বন্দর।

তার পর সিঙ্গাপুরের অভ্যুত্থান; এবং এই অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে পেনাঙের প্রতিপত্তি কমিয়া যায়। এখন রবার এবং টিনের দৌলতে পেনাঙ-বন্দর খুব সমৃদ্ধ এবং বিশ্ব-বিখ্যাত হইয়াছে।

সিঙ্গাপুরকে প্রাচ্য জগতের তোরণ বলা হইত। সে-তোরণ আজ জাপানীর হাতে। য়ুরোপ-আমেরিকা হইতে যা-কিছু মাল, সব আসিয়া প্রথমে এই সিঙ্গাপুরে জমিত। তার পর এই সিঙ্গাপুর হইতেই সে সব মাল দিক্‌দিগন্তে পরিবেষিত হইত। সিঙ্গাপুরকে এ জন্য distributing centre for the whole of Malay Archipelago অর্থাৎ বাণিজ্য-ব্যাপারে মলয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যমণি বলা হয়! বছরের সব সময়েই সিঙ্গাপুরের বন্দরে নৌকা-জাহাজের অসম্ভব ভিড়। রকমারি তাদের আকার। আদিম মলয়-জাতি জেলে-নৌকায় চড়িয়া মাছ ধরিতেছে, মাছ বহিতেছে; চীনা জাঙ্ক ও শাম্‌পান্; জাপানী ষ্টীমার-জাহাজ; এবং বড় বড় য়ুরোপীয়ান্ ও আমেরিকান্ জাহাজ। টিন এবং রবার ছাড়া সিঙ্গাপুরের বেতের ব্যবসারও অসাধারণ প্রসার হইয়াছে!

ত্রি-চক্র ট্যাক্সি—সিঙ্গাপুর

সিঙ্গাপুর যেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন-ক্ষেত্র! পথে-ঘাটে সর্ব্ব-জাতির নর-নারীর বিচিত্র সমাবেশ। বাড়ী-ঘরের আকারে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ছাঁদ মিশিয়া আছে—এমন দৃশ্য পৃথিবীর আর কোনো নগরে বা গ্রামে নাই! এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে চীনার সংখ্যা খুব বেশী; তার পর সংখ্যা-হিসাবে মলয় জাতির উল্লেখ

করিতে হয়। য়ুরোপীয়ান্ ও আমেরিকানের সংখ্যাও অল্প নয়। এখানকার য়ুরোপীয়ান্ ও আমেরিকানরা মলয়-রীতি মানিয়া ঢিলা পায়জামা, জ্যাকেট এবং হাঁটু-ঝুল স্কার্ট পরে। মাথায় কেহ কেহ বাঁধে রুমাল, কেহ আঁটে ভেলভেটের ক্যাপ্।

শুধু সিঙ্গাপুরে কেন, সারা মলয় প্রদেশে এই যে নানা জাতির বাস—এ বাসের ব্যবস্থায় একটু বৈচিত্র্য আছে। প্রত্যেক জাতির স্বতন্ত্র পাড়া বা মহল্লা আছে।

সিঙ্গাপুরী পুলিশ

কলিকাতার চৌরঙ্গী যেমন ইংরেজ-পাড়া, বড়বাজার যেমন মাড়োয়ারী-পাড়া—মলয়ে তেমনি নানা পাড়া আছে। মহল্লা বা পাড়াকে মলয়েরা বলে কাম্পঙ্। আদিম মলয় জাতির মহল্লার নাম—কাম্পঙ্ মলাক্কা। ক্লিংদের মহল্লার নাম কাম্পঙ্ ক্লিঙ্; শ্যামবাসীর মহল্লা কাম্পঙ্ শ্যাম। এবং এই প্রথা-অনুযায়ী বাড়ী-ঘর পথ-ঘাটের সজ্জাও বিচিত্র রকমের।

প্রথমে সিঙ্গাপুরের কথা বলি। সিঙ্গাপুরে যে দুর্ভেদ্য নৌ-ঘাঁটীর (naval ba·e) প্রসিদ্ধি ছিল, সে নৌ-ঘাঁটী গঠনের প্রস্তাব করেন এ্যাডমিরাল স্যর জন্ জেলিকো ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে। তাঁর এ প্রস্তাব সম্বন্ধে পেনাঙে বহু ব্রিটিশ সেনাধ্যক্ষ মিলিয়া আলোচনা করেন। এবং সে আলোচনার ফলে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট সিঙ্গাপুরে নৌ-ঘাঁটী গঠনের সে-প্রস্তাব মঞ্জুর করেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে শক্তিপুঞ্জ মিলিয়া ওয়াশিংটন নেভাল্ লিমিটেশন্ সন্ধিপত্র সহি করেন; ও সেই সময় ইংরেজের সঙ্গে জাপানের মিত্র-সম্পর্ক সংস্থাপিত হয়।

কনশার্ভেটিভ-ক্যাবিনেট প্রস্তাব মঞ্জুর করিলেও ঘাঁটী-নির্ম্মাণের কাজ বন্ধ ছিল। তার কারণ, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে লেবর-গবর্ণমেণ্টের হাতে ক্যাবিনেট আসে। তখন প্রধান-

রবার সংগ্রহ

মন্ত্রী রাম্‌শে ম্যাকডোনাল্ড এ-প্রস্তাবকে "wild and wanton folly" (বিরাট্ বিমূঢ়তা) বলিয়া তাহা নামঞ্জুর করিলেন। কিন্তু পরের বৎসর কনশার্ভেটিভ-দল আবার কর্ত্তৃত্ব পাইলেন; তাঁরা আবার এ প্রস্তাব মঞ্জুর করিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘাঁটী-নির্ম্মাণের কাজ আরম্ভ হইল। এ কাজ সম্পূর্ণ হইতে চৌদ্দ বৎসর সময় লাগিয়াছে। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে মহা-সমারোহে ডকের উদ্বোটন-উৎসব সম্পাদিত হয়।

সিঙ্গাপুর একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ—দৈর্ঘ্যে ২৭ এবং প্রস্থে ১৪ মাইল মাত্র। জহোর ষ্ট্রেটসের উপর দিয়া সেতুর সূত্রে এশিয়ার সহিত সিঙ্গাপুরের সংযোগ-বন্ধ বিরচিত আছে।

সিঙ্গাপুর সহর হইতে বারো মাইল উত্তরে যেলেটায় ছিল নৌ-ঘাঁটীর স্থান। পূর্ব্বদিকে বিমান-ঘাঁটী।

সিঙ্গাপুরের আইন-কানুন খুব কড়া। দ্বীপটি ছিল সম্পূর্ণ

শন্-শন বায়ু নারিকেল-কুঞ্জে

মিলিটারী-কর্ত্তৃত্বাধীনে। সিঙ্গাপুরে যে-খুশী বেড়াইতে যাইতে পারিত, কিন্তু দু'-এক জায়গা ছাড়া আর কোথাও বিনানুমতিতে ফটো তুলিবার উপায় ছিল না! নৌ-ঘাঁটী তৈয়ারী করিবার সময় নদ-নদী বোজানো হইয়াছে—

ডক-খোলার উৎসব—সিঙ্গাপুর

বহু নদী ও পাহাড়কে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। এখানে যে পেট্রোল-ট্যাঙ্ক ছিল, তার মধ্যে পেট্রোল ধরিত দশ লক্ষ টন! এমন কৌশলে ট্যাঙ্কগুলি নির্ম্মিত যে, আগুন লাগিবার বিন্দুমাত্র আশঙ্কা নাই। কোথাও যদি আগুন লাগে, তাহা হইলেও সে-আগুন যাহাতে ছড়াইয়া লঙ্কাকাণ্ড না বাধায়, সে সম্বন্ধে পাকা রকমের ব্যবস্থা ছিল।

জমির নীচে গোলা-বারুদের ভাণ্ডার (dumps)। তাহা এত বেশী সঞ্চিত থাকিত যে, যে-কোনো মুহূর্ত্তে
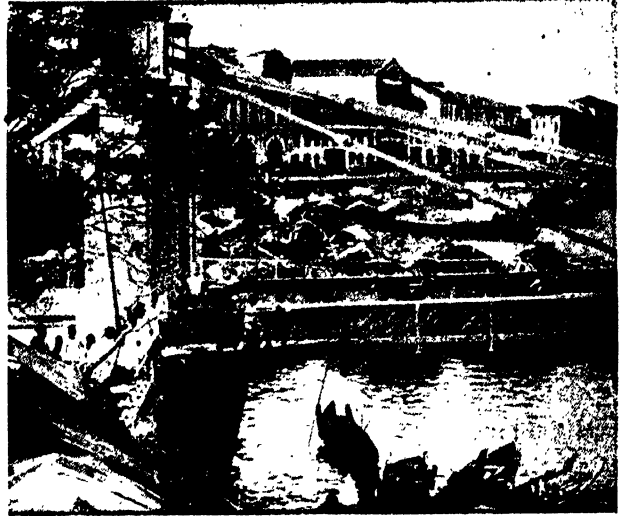
সিঙ্গাপুর নদীর বুকে কবনাগ-সেতু

একটি অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ পড়িলে সমগ্র সিঙ্গাপুর দ্বীপ চকিতে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়!

সিঙ্গাপুরে দু'টি ডক—একটি graving (মেরামতী); অপরটি floating (জাহাজ-রাখা)। এই দু'টিই নৌ-ঘাঁটীর প্রাণস্বরূপ ছিল। সিঙ্গাপুরের এই ডকে জাহাজ-ষ্টীমার

সিঙ্গাপুরের পথ

মেরামত হয়। এ ডক নির্ম্মাণের পূর্ব্বে মেরামতীর জন্য বহু দূরবর্ত্তী মালটায় জাহাজ পাঠাইতে হইত।

Graving ডকে ৬ কোটি ৮০ লক্ষ গ্যালন জল ধরিবার ব্যবস্থা। জাহাজ রাখিবার স্থানটুকু চার-হাজার কাঠখণ্ডে বিনির্ম্মিত। এ সব কাঠ মলয়ের বনের। নৌ-ঘাঁটীর মতো বিমান-ঘাঁটীকেও রীতিমত দুর্ভেদ্য করিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। এখানে তিনটি সামরিক এরোড্রোম ছিল;

তাছাড়া বে-সামরিক এরোড্রোম ছিল একটি। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে এই বে-সামরিক বিমান-ঘাঁটীর সৃষ্টি। এটি নির্ম্মাণ করিতে ব্যয় হইয়াছিল, দশ লক্ষ বাইশ হাজার পাউণ্ড! *

সিঙ্গাপুরের মাথার উপরে মলয়। মলয়ের একাংশ সন্ধি-মিত্র (federated) অপরাংশ করদ (non-federated)। কিন্তু এই স্ব-তন্ত্র বা মৈত্রী বলিয়া যে-বিভাগ, তা শুধু নামে! নহিলে উভয় অংশই বৃটিশ-শাসনাধীনে ছিল। এ সব প্রদেশে বহু রাজা ও সুলতানের ভূ-সম্পত্তি থাকিলেও কয়েকটি বিষয়ে মাত্র তাঁরা স্বাধীন মতানুসারে কাজ করিতে পারেন। এ সব ভূস্বামীদের মধ্যে বিশিষ্ট ভাবে উল্লেখযোগ্য জোহরের সুলতান। সিঙ্গাপুরের ঘাঁটী-নির্ম্মাণে তিনি পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড দান করিয়া ছিলেন। এ ঘাঁটীর রক্ষা-কার্য্যে বছরে খরচ পড়িত পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড।

গত বৎসর এক জন মার্কিণ ভদ্রলোক মলয় পর্য্যটনে গিয়াছিলেন। মলয়ের সম্বন্ধে তিনি যে-সব কথা লিখিয়াছেন, তাহারি মর্ম্ম সঙ্কলন করিয়া আমাদের আজিকার বক্তব্য শেষ করিব।

তিনি লিখিয়াছেন—মলয় বা মলাক্কার ইতিহাসের বেশ খানিকটা বৈশিষ্ট্য আছে। মলয় যেন বনদেবীর রাজ্য! ঘন বনে পত্র-পল্লবের যেমন শ্যামলিমা, তেমনি তরু-শাখায় ফুল-ফলের বিপুল সমারোহ! লবঙ্গর ক্ষেত প্রচুর; তার উপর মরিচ, লঙ্কা এত অজস্র পরিমাণে পাওয়া যায় যে, এই ক্ষুদ্র দ্বীপটি বিশ্ববাসীর লঙ্কা-মরিচ ও লবঙ্গর অভাব পূরণ করিতে পারে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তার উপর এখানকার জঙ্গল! পৌষের দিনে গাছ হইতে সোনালী পরাগ-রেণু বৃষ্টি-ধারার মতো ঝরিয়া পড়ে। মনে হয়, শীতের দিনেই বসন্ত তার আগমনীর সুর সুরু করিয়াছে! বর্ষায় এখানকার শোভা পরম-রমণীয়। মাথার উপর আকাশে কালো মেঘ, নীচে সমুদ্রের নীল জল, এবং তীরে বনানীর গভীর শ্যামল রূপ।

এখানকার পুরুষ জাত আলস্যে গা ঢালিয়া দিতে পারিলে কাজ করিতে চায় না! এক জন নিষ্কর্ম্মাকে ডাকিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—কাজ করো না কেন? তাহাতে সে জবাব দিয়াছিল—কি দুঃখে কাজ করিব? সংসারে কিছুর অভাব নাই। আমার স্ত্রীর ফুলের দোকান আছে। মলয়ীদের টেনিশ-খেলা শিখাইয়া তিনি মাহিনা পান। তাছাড়া বাড়ীর বহু কামরা ভাড়া দিয়াছি। আর কত টাকা চাই?

১৮১০ খৃষ্টাব্দে মলাক্কা বা মলয় প্রদেশ ব্রিটিশ-অধিকার-ভুক্ত হয়। তার পর সিঙ্গাপুর দ্বীপে সহরের প্রথম পত্তন করেন ষ্টামফোর্ড র‍্যাফ্‌লস্‌! র‍্যাফ্‌লসের বাগানের খুব সখ ছিল। মলয় যখন দেশীয় রাজার অধীনে ছিল, তখন এখানে বছরে ১৮০০ টন লবঙ্গ মিলিত! পোর্ত্তুগীজদের আমোলে তাদের পীড়ন এবং অব্যবস্থার ফলে ফশল কমিল; তখন বছরে লবঙ্গ মিলিত ১২০০ টন। র‍্যাফ্‌লসের যত্নে লবঙ্গর ক্ষেতে আবার কমলা আসিয়া আসন পাতিয়া বসিলেন! শুধু চালানী নয়—এখান হইতে লবঙ্গ লইয়া গিয়া জাঞ্জিবারে র‍্যাফ্‌লস্‌ তার চাষ সুরু করিয়া

পেরাক নদীর তীরে পথ—মলয়

দেলির তামাক-ক্ষেত—সুমাত্রা

* ১৩৩৩ সালের পৌষ সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী'তে "সিঙ্গাপুর" নামক সচিত্র প্রবন্ধে সিঙ্গাপুর সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

চীনা জেলেদের মাছের নৌকা
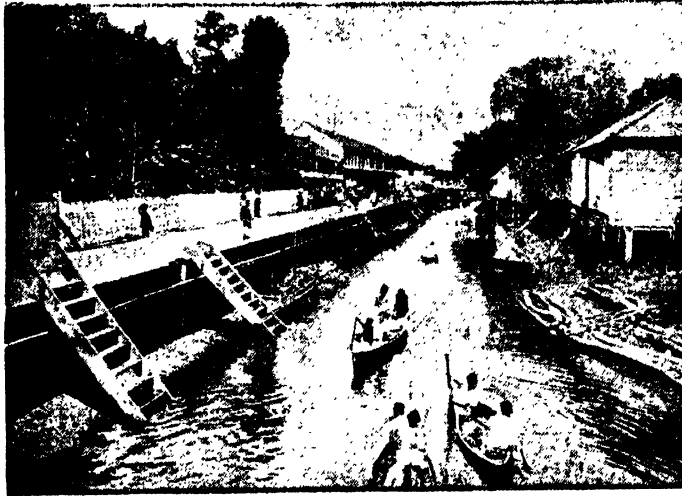
পালেম্‌বাঙ,—সুমাত্রা

দিলেন। মার্কো পোলোর আমোলে (১১৮৫ খৃষ্টাব্দে) য়ুরোপে লবঙ্গ বিক্রয় হইত—এক টাকায় এক আউন্স। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপে সেই লবঙ্গর দাম হয় সের-করা প্রায় সাড়ে চার টাকা!

মলয়ের আদিম-অধিবাসীদের মধ্যে ধর্ম্মাচারে বহু ভেদ আছে। কেহ মুসলমান, কেহ খৃষ্টান, কেহ বৌদ্ধ। আবার কেহ বা দেশের সনাতন সংস্কার লইয়া বাস করিতেছে।

এখানকার মুসলমান সমাজের মেয়েরা পর্দ্দা মানে না। বহু-বিবাহও নাই। তার কারণ, যত বিবাহ করিবে, খরচ তত বাড়িবে! যে সব মলয়বাসী এখনো শিক্ষার আলো-বাতাস পায় নাই, তাদের মধ্যে বিবাহ-প্রথা আশ্চর্য্য-ধরণের। যে-কোনো পুরুষ যে-কোনো অবিবাহিতা কন্যাকে বাসনা করিলে সবলে তাকে চুরি করিয়া আনিয়া তার সঙ্গে দু'-চার দিন বাস করে। তার পর অপহৃতা সে-কন্যাকে লইয়া কন্যার পিতার গৃহে আসিয়া সে যদি সেখানে কিছু কাল দাস্য করে, তাহা হইলেই তাকে জামাতৃপদে বরণ করিয়া লওয়া হয়; সে-পুরুষের লজ্জা বা শাস্তির আশঙ্কা নাই।

মলয়বাসীরা জুয়া খেলিতে যেমন ওস্তাদ, মুর্গীর লড়াইয়েও তাদের তেমনি নেশা! মুর্গীর লড়াইয়ে বাজি রাখিয়া সে-নেশায় এমন মাতিয়া ওঠে যে, পরাজয়ের ফলে অনেক সময় খুন-খারাপী ঘটিয়া যায়!

মলয় বা মলাক্কার নীচেই সুমাত্রা-দ্বীপ—যেন মা-কালীর পায়ের তলায় মহাদেবের মতো পড়িয়া আছে! সুমাত্রার দক্ষিণে যবদ্বীপ; এবং কোনো মতে যব-দ্বীপের ঘেঁষ বাঁচাইয়া তার পূর্ব্বে বলি-দ্বীপ। সুমাত্রা এবং যব-দ্বীপের উত্তরে বোর্ণিয়ো। বোর্ণিয়োর পূর্ব্বোত্তর-কোণে সুলু-সাগরের গায়ে ফিলিপাইন্‌সের দক্ষিণে এবং বোর্ণিয়োর পূর্ব্বে সিলেবিশ। সিলেবিশ এবং বোর্ণিয়োর মাঝখানে ম্যাকাশার ষ্ট্রেটের ব্যবধান। এবং এই সিলেবিশের পূর্ব্বে মলক্কাস্‌। মলক্কাশের পূর্ব্বে নিউগিনি। নিউগিনির দক্ষিণে আরফুরা উপসাগরের কূলে অষ্ট্রেলিয়া।

যবদ্বীপ আকারে ছোট হইলেও যেন মা-লক্ষ্মীর ভাণ্ডার! এখানকার মাটিতে ধান, চা, কফি, আখ, নীল, তামাক এবং মশলা ফলে অজস্র প্রচুর পরিমাণে। তার
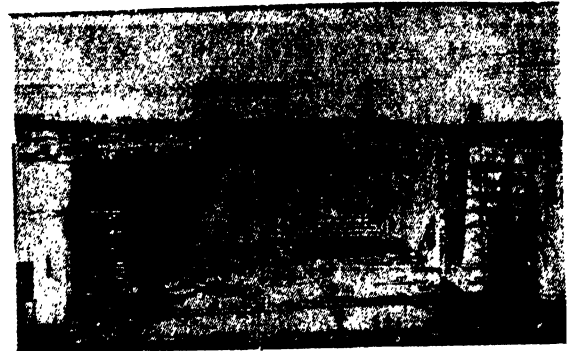
মেরামতী-ডক—সিঙ্গাপুর

উপর এখানকার বনে এত রকমের কাঠ মেলে যে, এই বন-বিভাগের দামে একটা রাজ্য কেনা যায়!

বিলাতী সাজে মলয়-রূপসী

সুমাত্রার উত্তরে সাবাঙ। এ-পথে যত ষ্টীমার চলে, সে-সব ষ্টীমার এই সাবাঙে কয়লা লয়। সাবাঙ এ অঞ্চলের প্রধান Coaling station. দক্ষিণে লামপঙ উপসাগরের কূলে তিলক-বেতঙ বন্দর।

সুমাত্রার রাজধানী বা প্রধান সহর পালেমবাঙ। সহরটির অবস্থান কতক-জলে কতক-স্থলে। অর্থাৎ

১৮১১ হইতে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যবদ্বীপ ছিল ইংরেজের অধিকারে—তার পর হইতে ডাচের অধীনে আছে।

যবদ্বীপের প্রধান সহর বা রাজধানী বাটাভিয়া। প্রাচীন কাল হইতে শিল্প ও সংস্কৃতির জন্য বাটাভিয়ার প্রসিদ্ধি। যবদ্বীপের এই শিল্প-সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ভারতীয়,—তার কারণ, যবদ্বীপ একদা ছিল হিন্দুর অধিকারে। * এখানকার বোরো-বোদরের প্রাচীন মন্দির নানা কারণে বিশ্ববিখ্যাত।

যবদ্বীপের পশ্চিমোত্তরে সুমাত্রা। এখানকার দ্বীপগুলির মধ্যে সুমাত্রাই সবচেয়ে আকারে বড়। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সুমাত্রার সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী কয়েকটি স্থান ছিল ইংরেজের অধিকারে। এখন এ দ্বীপের মালিক ডাচ-জাতি। এখানকার জমি উর্ব্বর হইলেও চাষবাসের ব্যবস্থা এখানে তেমন নাই। এখানকার তামাকের চাষ খুব বিখ্যাত। তাছাড়া বড় বড় পথের অভাব—যাতায়াত করিতে হইলে নদী-পথই সহায়। নদীর তীর ধরিয়া লোক-জনের বসতি। অধিবাসীরা মলয় জাতির বংশসম্ভূত। তাছাড়া এখানে বহু মুসলমান ও চীনার বাস।

ডাচ-গবর্ণর থাকেন পাডাঙে। পাডাঙ হইতে পাহাড়ের গায়ে ফোর্ট দ্য কক্ পর্য্যন্ত রেল-লাইন গিয়াছে। ফোর্টের কাছে প্রশস্ত সিং-কর লেক্। লেকের অদূরে বহু-বিস্তীর্ণ কয়লা-খনি। রেলোয়ে-লাইনের দু'ধারে শুধু তামাকের ক্ষেত। পূর্বদিকে রেল-লাইন গিয়াছে দেলি নদীর মোহনা পর্য্যন্ত। এই মোহনায় দেলি-বন্দর। এই বন্দরের দৌলতে পেনাং এবং সিঙ্গাপুরের সঙ্গে সুমাত্রা মালপত্রের চালানী-আমদানীর কারবার করে।

সিঙ্গাপুরের বুদ্ধ-মন্দির

সুপারি-বাগান—সিঙ্গাপুর

---

* ১৩৩৬ সালের মাঘ সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী'তে যবদ্বীপ সম্বন্ধে বিস্তারিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ১৩৪৭ সালের মাঘ সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত "বর্ম্মা রোড" প্রবন্ধও এই সঙ্গে দ্রষ্টব্য।

গলিত লাভার বুকে এখন প্রশস্ত রাজপথ

নৌকা ও কাঠের পাটাতন্ জলে বাঁধিয়া তাহাতে লোক বাস করে; আবার ডাঙ্গাতেও বহু ঘর-বাড়ী আছে। ডাঙ্গার ঘর-বাড়ীর মধ্যে সুলতানের প্রাসাদ এবং সেকন্দার সাহের বিজয়স্তম্ভ উল্লেখযোগ্য। সুমাত্রার ধরণও তেমনি মামুলি। পৃথিবীর চারিদিকে সভ্যতার এমন জৌলুশ, তার ক্ষীণ রশ্মিও সুমাত্রায় আসিয়া পড়ে নাই! এখন এখানে রবার, গাটাপার্চা, বাণিশের জন্য ডামার, রজন এবং নানা রকমের আঠার ফলন হইতেছে;

সিঙ্গাপুর বন্দরে নৌকা

য়ুরোপীয়ান ও চীনা মহল্লা নব-নির্ম্মিত। এ দুই মহল্লা এখন মস্ত বাণিজ্য-কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে।

ডাচের হাতে সুমাত্রা অযত্নে পড়িয়া আছে। পড়ো জমির যেমন প্রাচুর্য্য, এখানকার দেশী লোকের বাসের

এবং দেশ-বিদেশে সে-সব প্রচুর ভাবে চালান্ যাইতেছে। এখানকার কর্পূর গাছ যেন আকাশ-স্পর্শী। সে সব গাছ হইতে প্রচুর কর্পূর মেলে। ধান, ডাল, কফি ও নীলের চাষও এখন ভালো রকম হইতেছে।

পাখীর বাজার—যবদ্বীপ
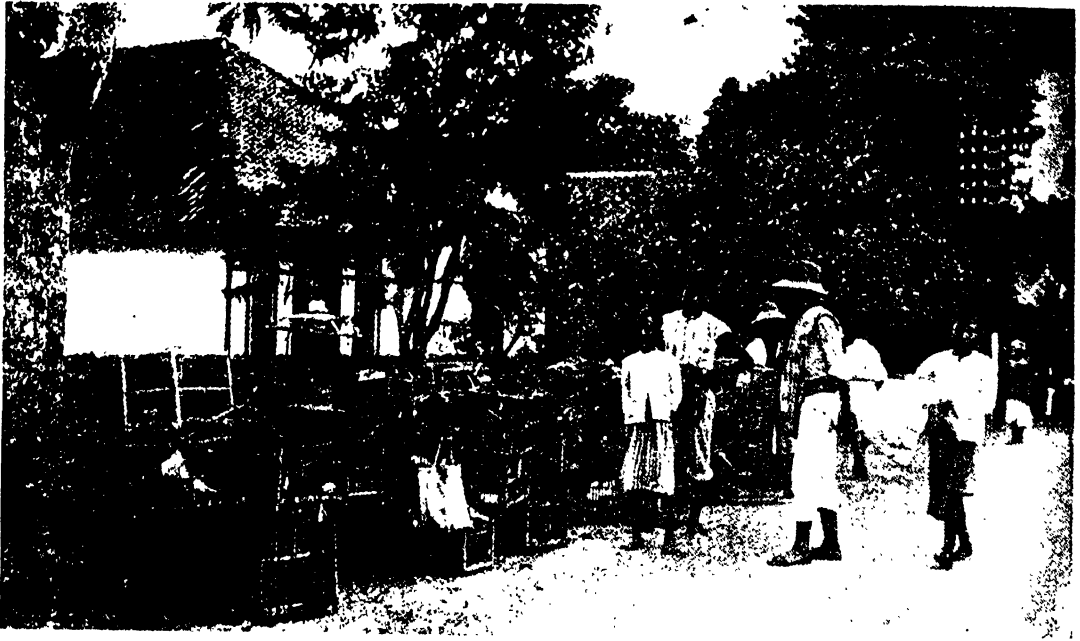
এখানকার নদী-নির্ঝরের জলে স্বর্ণরেণু মেলে তার ফলে এখানকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে অনেকেই সুবর্ণ-ধনে ধনী! কয়েক বৎসর পূর্ব্বে টিনের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাঙ্ক, বিলিটন এবং সিংকেপে টিনের খনি আছে প্রচুর। এখানকার টিন আজ দেশ-বিদেশে চালান যাইতেছে। এখানকার দেশী লোক এই টিন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। দেশী লোক, চীনা, এবং জেলের আসামীদের ধরিয়া টিনের খনির কাজ করানো হয় এবং সে টিন বেচিয়া লাভ যা হয়, তা যায় বিদেশী বণিক-দের পকেটে!

সুমাত্রা নিবিড় বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ। সে বনে হাতী আছে, নানা-জাতের বানর আছে, টাপির আছে, গণ্ডার আছে। তাছাড়া এত-রকমের পাখী আছে যে, সে-সব পাখীর গানে মন যেমন মুগ্ধ হয়, তাদের রকমারি রূপে নয়নও তেমনি বিমোহিত হয়।

আজ এ সময়-সঙ্কটে এ সব দ্বীপ শুধু আমাদের নিকট-প্রতিবেশীরূপে দেখা দেয় নাই! ইহাদের ইষ্টানিষ্টে আমাদের ইষ্টানিষ্ট। তাই এ-সব দ্বীপের অবস্থান এবং লোক-জনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়-লাভের বাসনা আমাদের মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। এ-সব দ্বীপের ভাগ্য লইয়া মহাকালের যে-খেলা চলিয়াছে, সে-খেলায় দিনে-দিনে কি বিপর্য্যয় ঘটিতেছে—দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া আছি! যখন সিঙ্গাপুরের কথা লিখিতে বসিয়াছিলাম, তখন সিঙ্গাপুরের বুকে ব্রিটিশ-পতাকা উড়িতেছিল,—লেখা

কফির ক্ষেত—ষ্ট্রেট্স্ সেটল্‌মেণ্টস্

শেষ করিবার সময় দেখিতেছি, সিঙ্গাপুরকে তার ভাগ্য-বিধাতা জাপানের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন! আজ সিঙ্গাপুর আর সিঙ্গাপুর নাই! তার নাম হইয়াছে, "শোনান"! জাপানী-ভাষায় শোনানের অর্থ,—"bright father of the south"—"দক্ষিণের জ্যোতির্ম্ময় পিতা"!

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

গত এক মাসে প্রাচীর যুদ্ধের কল্পনাতীত পরিণতি ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান সংগ্রাম বিশ্বব্যাপী রূপ পরিগ্রহ করিবার পূর্ব্বে য়ুরোপীয় রণক্ষেত্রে জার্ম্মাণীর দ্রুত সাফল্য যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছিল, গত এক মাসে জাপানের বিজয় তদপেক্ষাও অধিক বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়াছে। এই সময়ে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে—জাপানের অতর্কিত আক্রমণেই মিত্রশক্তি কেবল বিপন্ন হয় নাই, শত্রুর তুলনায় তাহাদের সমরায়োজনও নিতান্তই অপ্রচুর; শত্রুর সৈন্য ও সমরোপকরণের আধিক্য এবং উৎকর্ষতা, তাহাদের আক্রমণের ব্যাপকতা ও প্রচণ্ডতা মিত্রশক্তির পক্ষে অপ্রতিরোধ্য। জাপানের প্রকৃত মনোভাব সম্বন্ধে মিত্রশক্তি যেমন ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়াছিলেন, শত্রুর আক্রমণ-শক্তি সম্বন্ধেও তেমনই তাঁহাদের ধারণা অভ্রান্ত ছিল না, নিজেদের প্রতিরোধ-শক্তি সম্বন্ধেও তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণাই পোষণ করিয়াছিলেন; সুতরাং মিত্রশক্তির সাম্প্রতিক পরাজয়ে কেবল তাঁহাদের সামরিক আয়োজনের অপ্রতুলতাই প্রকাশ পায় নাই,—তাঁহাদের রাজনীতিক ও সামরিক অদূরদর্শিতাও শোচনীয় ভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

সিঙ্গাপুরের পতন ও তাহার প্রতিক্রিয়া—

আশঙ্কাতীত অল্পকালের মধ্যে মিত্রশক্তির সর্ব্বপ্রধান ভরসাস্থল সিঙ্গাপুরের পতনই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক ঘটনা। বৃটিশের লালিত প্রাচীর এই সর্ব্বপ্রধান প্রহরী, পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের সুবিস্তীর্ণ প্রাচ্য-স্বার্থের এই শক্তিমান্ রক্ষক, আধুনিক স্থাপত্য বিদ্যা ও সামরিক অভিজ্ঞতার এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন পীতাঙ্গ বামন জাপদিগের দুঃসাহসিক আক্রমণে সপ্তাহকালের মধ্যেই ধূলিসাৎ হইয়াছে! গত ৮ই ফেব্রুয়ারী বিশ্ববাসী সবিস্ময়ে শ্রবণ করে—জাপানী সেনা সিঙ্গাপুরে অবতরণ করিয়াছে। তাহার পর, প্রাচ্য অঞ্চলে মিত্রশক্তির এই প্রাণকেন্দ্রের ভাগ্য সম্বন্ধে শেষ সংবাদ জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় কোন প্রকারে একটি সপ্তাহ অতিবাহিত হয়। ১৫ই ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল ঘোষণা করেন—I speak to you all under the shadow of a heavy and far-reaching military defeat. It is a British and Imperial defeat. Singapore has fallen. All Malaya Peninsula has been overrun.

জানুয়ারী মাসের শেষে মিত্রশক্তির সেনাবাহিনী যখন মালয় ত্যাগে বাধ্য হয়, তখনই সিঙ্গাপুর বিশেষ ভাবে বিপন্ন হইয়াছিল; কিন্তু তখনও কেহ এরূপ আশঙ্কা করে নাই যে, এই সুরক্ষিত দুর্গ এত শীঘ্র শত্রুর হস্তে পতিত হইবে। মাল্টার ন্যায় অবিরাম শত্রুর বোমাবর্ষণের মধ্যেও সিঙ্গাপুরে, অন্ততঃ কিছুকালও, বৃটিশ-পতাকা উড্ডীন থাকিবে বলিয়া বিশিষ্ট সমর-নায়কগণও আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু সকল আশা, সকল অনুমানই বিফল হইয়াছে; বিজয়ী জাপান কেবল বৃটিশ-পতাকাই অবনমিত করে নাই—জাপানী রাষ্ট্রনায়কের আদেশে সিঙ্গাপুরকে আজ 'সেনান্' নামে পরিচিত করাইবারও ব্যবস্থা হইয়াছে।

প্রাচীতে জাপানের আক্রমণ আরম্ভ হইবার পর মিত্রশক্তির পক্ষ হইতে শস্ত্রশক্তির স্বল্পতা ও সৈন্য-সংখ্যার অনাধিক্য সম্বন্ধে যে বিলাপ শ্রুত হইতেছিল, সিঙ্গাপুরেও তাহারই পুনরুক্তি হইয়াছে। সিঙ্গাপুর-রক্ষী সেনাদল শেষ পর্য্যন্ত প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিল; কিন্তু প্রতিপক্ষের সৈন্য ও সমরোপকরণের আধিক্যে তাহারা তিষ্ঠিতে পারে নাই। সিঙ্গাপুরের যুদ্ধ-সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই—জাপান এইরূপ কৌশলে এই ঘাঁটী পরিবেষ্টিত করিয়াছিল যে, তথা হইতে মিত্রশক্তির সৈন্য ও সমরোপকরণ অপসারণ সম্ভব হয় নাই। সিঙ্গাপুর যখন পতনোন্মুখ, তখন বোর্ণিও হইতে প্যালেম্বাং পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করিয়া জাপান নির্গমন-পথ সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ করিয়াছিল। প্রাচীতে মিত্রশক্তির সৈন্য ও সমরোপকরণের পরিমাণ যেরূপ সীমাবদ্ধ, তাহাতে সিঙ্গাপুর পতনের তুলনায় তথায় সৈন্য ও সমরোপকরণ-হানির গুরুত্ব অল্প নহে। এই দিক্ হইতে সিঙ্গাপুরের পতন ডান্‌কার্ক, গ্রীস ও ক্রীটের পরাজয় অপেক্ষা অধিকতর শোচনীয়।

সিঙ্গাপুরের সামরিক গুরুত্ব অসাধারণ। সিঙ্গাপুরের অপরাজেয়তায় নির্ভর করিয়াই প্রাচ্য অঞ্চলে মিত্রশক্তির সমগ্র প্রতিরোধ-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল। সিঙ্গাপুরের পতন সম্বন্ধে বোধ হয় বলা যায়—প্রতীচ্য-স্বার্থের এই সর্ব্বপ্রধান দ্বাররক্ষীর পরাভবে সমগ্র প্রাচী হইতে পাশ্চাত্য-প্রাধান্য অবসানের সম্ভাবনা যেন নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। জাপানীদিগের মালয় অধিকারে মালাক্কা প্রণালীর আকাশে মিত্রশক্তির প্রাধান্য পূর্ব্বে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল; কিন্তু সিঙ্গাপুর-ঘাঁটী তখনও দুই মহাসমুদ্রের সংযোগ-স্থলে জলপথ রক্ষা করিতেছিল। সিঙ্গাপুরের পতনে

জাপানী রণপোতের ভারত মহাসাগরে প্রবেশ-পথ বিঘ্নমুক্ত হইয়াছে ; এখন পেনাং ও সুমাত্রা হইতে আফ্রিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্র-বক্ষে জাপানী রণপোতের বিধ্বংসি-প্রয়াস অবাধে চলিতে পারে।

ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে সিঙ্গাপুর-পতনের প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। অতঃপর ব্রহ্মদেশের উপকূলে সহজে জাপানী-সেনা অবতরণ করিতে পারিবে ; জাপানের বিমানবাহী পোতগুলি ব্রহ্মদেশের আকাশে প্রাধান্য-স্থাপনের সহায় হইবে।

তাহার পর, সিঙ্গাপুরই সুমাত্রা হইতে টিমর পর্য্যন্ত বিস্তৃত দ্বীপশ্রেণীর রক্ষক। সিঙ্গাপুরের পতনে কেবল সুমাত্রা ও যাভাই বিপন্ন হয় নাই—নিউগিনি ও অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত মিত্রশক্তির প্রতিরোধ-ব্যবস্থা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। বস্তুতঃ, সিঙ্গাপুরের পর সুমাত্রায় ব্যাপক আক্রমণ পরিচালনে আর বিলম্ব হয় নাই। এখন যাভার প্রতি জাপানের আক্রমণ নিবদ্ধ। বোর্ণিও, সেলিবীস, এবং সুমাত্রায় প্রভুত্ব-বিস্তার করিয়া জাপান পূর্ব্বেই যাভাকে তিন দিক্ হইতে পরিবেষ্টিত করিয়াছিল। যাভায় আক্রমণ আরম্ভ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বালিতে সৈন্য অবতরণ করাইয়া সে যাভা পরিবেষ্টন সমাপ্ত করে। অতঃপর ২১শে ফেব্রুয়ারী পশ্চিমে সুমাত্রা হইতে, উত্তরে বোর্ণিও ও সেলিবীস হইতে, এবং পূর্ব্বে বালি হইতে যাভার প্রতি প্রবল আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে।

যাভাই পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের প্রধান কেন্দ্র ; এই দ্বীপপুঞ্জের সমগ্র সমরায়োজন এখন যাভাতেই কেন্দ্রীভূত। সিঙ্গাপুর হইতে সৈন্য ও সমরোপকরণ যেমন অন্যত্র স্থানান্তরিত হইতে পারে নাই, সেইরূপ যাভা হইতেও মিত্রশক্তির রণ-সম্ভার যাহাতে অপসারিত হইতে না পারে, সে জন্য জাপান পূর্ব্ব হইতেই ব্যবস্থা করিয়াছে। যাভা আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্বে টিমর অধিকার, এবং অষ্ট্রেলিয়ার ডারুইন বন্দরে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ জাপানের এই উদ্দেশ্যের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-যুক্ত।

যাভায় মিত্রশক্তি যথাসাধ্য সমরায়োজন করিয়াছে ; সম্প্রতি তথায় নূতন সাহায্যও আসিয়াছে। খ্যাতনামা সেনাপতি জেনারল ওয়াভেলের উপর যাভা-রক্ষার ভার অর্পিত ; তথাপি যাভার প্রতিরোধ-শক্তিতে সন্দেহ হয়। মালয় ও সিঙ্গাপুরের পর, এত অল্প সময়ের মধ্যে, যাভার সমরায়োজন এত দূর বর্দ্ধিত হওয়া সম্ভব নহে যে, এই দ্বীপ হইতেই যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তিত হইবে।

ব্রহ্মদেশে যুদ্ধ—

মালয় ও ব্রহ্মদেশের প্রতি জাপান একই সময়ে অবহিত হইয়াছিল ; তবে, মালয় ও সিঙ্গাপুরের প্রতি তাহার মনোযোগ অধিকতর নিবদ্ধ হওয়ায় ব্রহ্মদেশে তাহার আক্রমণের বেগ এত দিন তত প্রবল ছিল না। কিন্তু জাপানী সৈন্য মৌলমেন অধিকারের পর স্যালুইন নদী অতিক্রম করিয়াছে ; অপ্রশস্ত বিলিন নদীর পশ্চিম উপকূলে তাহাদিগকে বাধাদানের যে প্রয়াস হইয়াছিল, তাহাও ব্যর্থ হইয়াছে। বিলিন নদী অতিক্রম করিয়া জাপ-বাহিনী এখন বিখ্যাত রেল-সংযোগ পেগুর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে সিটাং নদীর উপকূলে মিত্রশক্তির সেনাবাহিনী আর একবার প্রবল ভাবে শত্রুকে বাধাদানের চেষ্টা করিতে পারে। অবশ্য, জাপান ইতোমধ্যেই পেগু অধিকারের দাবী জানাইয়াছে। পেগু শত্রু-হস্তে পতিত হইলে উত্তর ও দক্ষিণ-ব্রহ্মের প্রধান রেল-সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইবে। এই রেলপথেই রেঙ্গুণ হইতে চীনে বৈদেশিক সাহায্য প্রেরিত হইত।

এখনও ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে সিঙ্গাপুর-পতনের বিশেষ প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয় নাই ; তবে, অতি সত্বরই এই প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। ঐ সময়ে দক্ষিণ-ব্রহ্মে স্থলপথে জাপানের আক্রমণের প্রচণ্ডতা যেরূপ বর্দ্ধিত হইবে, তেমনই ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন স্থানেও সৈন্য-অবতরণের প্রয়াস হইবে। সম্প্রতি বেসিনে বোমাবর্ষণ, সম্ভবতঃ সমুদ্রপথে সৈন্য-অবতারণেরই পূর্ব্ব-সূচনা। মান্দালয় এবং মেমিওতেও বোমা বর্ষিত হইয়াছে। দক্ষিণ-ব্রহ্মে যুদ্ধের প্রয়োজনে মান্দালয় অঞ্চলের কোন ঘাঁটী যদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আশু সামরিক প্রয়োজনে জাপানের পক্ষে ঐ অঞ্চলেও বোমা-বর্ষণ সম্ভব। আর, তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে মান্দালয়ে ও মেমিওয় এই বোমাবর্ষণ মধ্য-ব্রহ্মে প্যারাসুট-সৈন্য অবতরণের পূর্ব্বাভাস। এই অঞ্চলে বহু চীনা সৈন্য সমবেত হইয়াছে। কাজেই, দক্ষিণ-ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরও জাপ-বাহিনীকে যে উত্তরাঞ্চলে প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হইতে হইবে—ইহা জাপানী সমর-নায়কদিগের অজ্ঞাত নাই। কাজেই, একই সময়ে জাপানী সৈন্যের পক্ষে উত্তর ও দক্ষিণ-ব্রহ্মে অবহিত হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

জাপানের ভবিষ্যৎ আক্রমণ-প্রচেষ্টা ও ভারতবর্ষ—

বর্ত্তমানে জাপানের আক্রমণ-প্রচেষ্টা প্রধানতঃ ব্রহ্মদেশ এবং পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে নিবদ্ধ। সিঙ্গাপুরের পতনে পূর্ব্ব ও পশ্চিম—উভয় দিকেই জাপানের তৎপরতার ক্ষেত্র প্রসারিত হইবার পথ এখন সমভাবেই উন্মুক্ত ; তথাপি মনে হয় যে, পূর্ব্বাঞ্চলে অর্থাৎ প্রশান্ত মহাসাগরে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে জাপান হয় ত পশ্চিম দিকে মনোনিবেশ করিবে না। অবশ্য, ব্রহ্মদেশের তৈল ও চাউল অপেক্ষাও সামরিক দৃষ্টিতে যে ব্রহ্ম-চীন পথের গুরুত্ব অসাধারণ, তদ্বিষয়ে জাপানের ঔদাসীন্য সম্ভব নহে। প্রশান্ত মহাসাগরে জাপান যে সকল অঞ্চল অধিকার করিয়াছে, তাহাদের রক্ষার জন্য, এবং মিত্রশক্তিকে প্রতি-আক্রমণের সুযোগে বঞ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে জাপানের

প্রাচীব রণক্ষেত্র

পক্ষে অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ড পর্য্যন্ত অধিকার-বিস্তার একান্ত প্রয়োজন। আমেরিকার সহিত প্রশান্ত মহাসাগরের বর্তমান রণক্ষেত্রের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইলেও অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীলাণ্ডের সহিত এখনও আমেরিকার সহজ সংযোগ আছে। এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা জাপানের পক্ষে দুষ্কর। এই জন্য, সমগ্র পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং ফিলিপাইন অধিকারের পরও অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ড হইতে আরব্ধ প্রতি-আক্রমণের আশঙ্কায় জাপানকে সন্ত্রস্ত থাকিতে হইবে; আমেরিকা হইতে আগত সাহায্যে এই অঞ্চলের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা জাপানের সাধ্যাতীত। এই জন্য মনে হয়—প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের যে তৎপরতা চলিতেছে, ইহা স্বাভাবিক গতিতেই নিউজীল্যাণ্ড পর্য্যন্ত প্রসারিত হইবে। যাভার পরই সমগ্র নিউগিনির (বৃটিশ ও ওলন্দাজ) প্রতি জাপানের অবহিত হওয়া সম্ভব। এম্বয়না, নিউ বৃটেন, এবং নিউ আয়র্ল্যাণ্ডে জাপানের তৎপরতা নিউগিনি আক্রমণের প্রাথমিক আয়োজন। অবশ্য, এম্বয়নার নৌ ও বিমানঘাঁটীর সহিত সমগ্র

পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের রক্ষা-ব্যবস্থার সম্বন্ধ ছিল। নিউ-গিনির পর অষ্ট্রেলিয়া, এবং তাহার পর নিউজীল্যাণ্ড আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

সিঙ্গাপুরের পশ্চিমে ব্রহ্মদেশে জাপানের যে অভিযান পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা ব্রহ্ম-চীন পথ অবরোধের সামরিক প্রয়োজনেই আরব্ধ। এই অঞ্চল ব্যতীত ভারত মহাসাগরের উপকূলবর্ত্তী অন্যান্য অঞ্চলে আপাততঃ স্থলপথে প্রত্যক্ষ আক্রমণ (invasion) হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া মনে হয়। অদূর ভবিষ্যতে জাপান যখন প্রশান্ত মহাসাগর ও ব্রহ্মদেশে নিযুক্ত থাকিবে, সেই সময়ে তাহার পক্ষে ভারত মহাসাগরের বিশাল বক্ষে প্রভুত্ব-বিস্তারে প্রয়াসী হওয়াই সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে সে ভারত মহাসাগরে আন্দামান, নিকোবর, সিংহল, সকোট্রা, এমন কি, ম্যাডাগাস্কার পর্য্যন্ত অধিকার-বিস্তারে প্রয়াসী হইতে পারে। ভারত মহাসাগরে জাপানী নৌ-বহরের প্রভুত্ব বিস্তৃত হইলে ভারতবর্ষ কার্য্যতঃ অবরুদ্ধ হইবে,—ভারতবর্ষ হইতে সৈন্য ও সমরোপকরণ প্রাচী বা প্রতীচীর রণক্ষেত্রে প্রেরণের সম্ভাবনা থাকিবে না; ভারতবর্ষেও সমরায়োজন বর্দ্ধিত করা দুষ্কর হইবে। সিঙ্গাপুরের পতনে জাপান ভারতবর্ষের সামুদ্রিক সংযোগ এই ভাবে বিচ্ছিন্ন করিবার সুযোগ পাইয়াছে। আপাততঃ সে হয় ত ভারতবর্ষকে এই ভাবে অবরুদ্ধ রাখিয়াই সন্তুষ্ট থাকিবে। বিশেষতঃ, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাহার দুশ্চিন্তার কারণ নাই; কারণ, মধ্য-প্রাচীর যুদ্ধের প্রয়োজনে এবং বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে আক্রমণ-বিভীষিকার ফলে ভারতবর্ষের সামরিক শক্তি দ্রুত বর্দ্ধিত হওয়া অসম্ভব। এই বিষয়েই অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ডের অবস্থায় এবং ভারতবর্ষের অবস্থায় প্রকৃত পার্থক্য। ভারতবর্ষ সমুদ্র-পথে অবরুদ্ধ হইতে পারে; তাহার প্রতিরোধ-ব্যবস্থা দ্রুত বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা নাই। পক্ষান্তরে, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ডের সংযোগ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করা দুষ্কর; আমেরিকার সাহায্যে তাহার প্রতিরোধ-ব্যবস্থা শীঘ্র বিশেষ ভাবে বর্দ্ধিত হওয়া সম্ভব। এই জন্য মনে হয়, জাপান প্রশান্ত মহাসাগরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে স্থলপথে প্রত্যক্ষ আক্রমণ-পরিচালনার প্রয়োজন উপলব্ধি করিবে না; সমুদ্রপথ অবরুদ্ধ হইলেই আপাততঃ সে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে।

তবে, এই সময়ে ভারতবর্ষের সমর-প্রচেষ্টায় বিঘ্ন উৎপাদনের জন্য সে নানারূপ উপদ্রব করিতে পারে। এই সময়ে উপকূলবর্ত্তী নগরগুলিতে জাহাজ হইতে গোলাবর্ষণ সম্ভব; বিভিন্ন কারখানা, সেতু, ডক, রেলষ্টেশন প্রভৃতিতে বিমান হইতে বোমাবর্ষণ চলিতে পারে; বেসামরিক অধিবাসিগণের মধ্যে আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য অগ্ন্যুৎপাদক বোমা নিক্ষিপ্ত হওয়াও অসম্ভব নহে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ভারত মহাসাগরে জাপানী-নৌবহর প্রবেশ-পথ পাওয়ায় ভারতের উপকূলবর্ত্তী নগরগুলিতে যেমন অনায়াসে জাহাজ হইতে গোলাবর্ষণের সুযোগ হইয়াছে, তেমনই বিমানবাহী জাহাজের সাহায্যে উপকূল হইতে বহু দূরবর্ত্তী অঞ্চলেও অল্প পেট্রোল-ব্যয়ে বিমান-আক্রমণ পরিচালন সম্ভব হইতে পারে। ইহা ব্যতীত, ব্রহ্মদেশে অধিকার-বিস্তৃতির ফলে জাপান পূর্ব্ব-ভারতের নিকটবর্ত্তী ঘাঁটী লাভ করিবে। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন—ব্রহ্মদেশে যুদ্ধের প্রয়োজনে যদি পূর্ব্ব-ভারতের কোন বিমান ঘাঁটী ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে আশু সামরিক প্রয়োজনে জাপান ঐ ঘাঁটীতে বিমান আক্রমণ করিতে পারে।

অবশ্য, বিমান ও নৌবহরের সহযোগে ভারতবর্ষে সাধারণ ভাবে উপদ্রব-সৃষ্টির সম্ভাবনা নিশ্চিত কি না, তাহা বলা যায় না। এত দিন বিভিন্ন রণক্ষেত্রে জাপান স্থলপথে প্রত্যক্ষ আক্রমণের (invasion) প্রাথমিক আয়োজনরূপেই বোমাবর্ষণ করিয়াছে; বৃটিশের "আর-এ-এফের" ন্যায় জাপানী বিমানবহর স্বাধীন ভাবে শত্রুরাজ্যে আক্রমণ পরিচালিত করে নাই। জাপানের স্থলবাহিনী ও বিমান-বহরের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা লক্ষ্য করিয়া এইরূপ অনুমানও করা যাইতে পারে যে, ভারত-বর্ষে স্থলপথে প্রত্যক্ষ আক্রমণের প্রাথমিক আয়োজন ব্যতীত জাপানী বিমান-বহর হয় ত ভারতবর্ষে তৎপরতা প্রদর্শন করিবে না।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—ভারতবর্ষে প্রত্যক্ষ আক্রমণের সময় কেবল পূর্ব্ব-ভারতই বিপন্ন হইবে না; ভারতবর্ষের সমগ্র উপকূল একই সময়ে সমান ভাবে বিপন্ন হইবে। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে—আসাম হইতে পেশাওয়ার পর্য্যন্ত সৈন্য "মার্চ্চ" করাইবার দুঃস্বপ্ন জাপান দেখে না। সে যদি ভারতবর্ষে অধিকার-বিস্তার করিতে চাহে, তাহা হইলে যে দিন জাপানী সৈন্য ব্রহ্মদেশ হইতে বাঙ্গালা ও আসামের দিকে অগ্রসর হইবে, সেই দিনই চট্টগ্রাম হইতে করাচী পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্থানে জাপানী সৈন্য অবতরণ করিতে প্রয়াসী হইবে। ভারত মহাসাগরে প্রভুত্ব বিস্তৃতি এবং ভারতবর্ষে প্রত্যক্ষ আক্রমণ—এতদুভয়ের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

জাপানের সাফল্য ও সোভিয়েট রুশিয়া—

জাপানের ক্রমবর্দ্ধমান সাফল্যে সোভিয়েট রুশিয়া যেন উদাসীন। জার্ম্মাণী যেরূপ ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ব-সীমান্ত সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া য়ুরোপ-জয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, জাপানও যেন তেমনই তাহার কম্যুনিষ্ট প্রতিবেশী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়াই এশিয়া-জয়ে বহির্গত হইয়াছে। অথচ, জাপানের এই সাফল্যে বৃটেন ও আমেরিকার পক্ষে রুশিয়াকে সাহায্য প্রদানের ক্ষমতা

হ্রাস পাইতেছে ; ইতিমধ্যে রবার, টিন্, উলফ্রাম্ প্রভৃতির উৎপাদন-ক্ষেত্র জাপানের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। রুশিয়ায় বৈদেশিক সাহায্য প্রবেশের দুইটি পথ—ভ্লাডিভোষ্টক এবং ইরাণ বিপ্নাস্তীর্ণ হইতেছে। সর্ব্বোপরি, জাপান এশিয়ায় অধিকার-বিস্তার করিয়া স্বীয় আক্রমণ-শক্তি বর্দ্ধিত করিতেছে ; জার্ম্মাণীর শক্তিও ঠিক এই ভাবেই বর্দ্ধিত হইয়াছিল। প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের অধিকার অধিকতর বিস্তৃত হইলে, জাপানী বিমানের মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি অবহিত হইবার সম্ভাবনা। ঐ সময়ে জার্ম্মাণীও জল ও আকাশ হইতে মার্কিণ-ভূমিতে আক্রমণে প্রয়াসী হইতে পারে। আমেরিকা এখন মিত্রশক্তির বিশাল অস্ত্রাগারে পরিণত হইয়াছে। এই অস্ত্রাগারে প্রাচী ও প্রতীচীর ফ্যাসিষ্ট-নিধনের খড়্গ শাণিত হইতেছে। কাজেই, ফ্যাসিষ্ট-শক্তি মার্কিণভূমি সম্বন্ধে নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে না ; অদূর ভবিষ্যতে তাহারা মার্কিণভূমির কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলে বোমাবর্ষণ করিয়া মিত্রশক্তির অস্ত্রাগার চূর্ণ করিবার জন্য সচেষ্ট হইবেই। ইহাও সোভিয়েট রুশিয়ার পক্ষের স্বস্তির কথা নহে; সে-ও জার্ম্মাণীর সহিত যুদ্ধের প্রয়োজনে আমেরিকা হইতে সমরোপকরণ প্রাপ্তির আশা করে।

সোভিয়েট রুশিয়ার বর্ত্তমান নিষ্ক্রিয়তা সম্বন্ধে কেবল এইরূপ আশায় সান্ত্বনা লাভ সম্ভব যে, সে উপযুক্ত সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছে। সে হয় ত মনে করে—জাপানের দ্রুত প্রসারতার ফলে অস্ত্রবলে বিশাল অঞ্চল রক্ষার দায়িত্বও তাহার বাড়িতেছে। দক্ষিণ-প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন অঞ্চল অধিকারের জন্য বর্ত্তমানে জাপানের যে ক্ষতি হইতেছে, ঐ সকল অঞ্চলের সম্পদে পুষ্ট হইয়া সেই ক্ষতির পূরণ এবং অন্যত্র আক্রমণের উপযুক্ত শক্তিসঞ্চয়ে তাহার কিছু বিলম্ব হইবে। ইতিমধ্যে প্রশান্ত মহাসাগর, হয় ত ভারত মহাসাগরও রক্ষার দায়িত্ব জাপানী নৌবহরের উপর পতিত হইবে। জাপান যখন এই ভাবে তাহার "পরিপাক-শক্তির" অতিরিক্ত গলাধঃকরণ করিয়া সাময়িক অসুবিধায় পড়িবে, জাপানকে আঘাতের জন্য সোভিয়েট রুশিয়া হয় ত সেই সময়টিই নির্ব্বাচন করিবে। বৃটেন ও আমেরিকাও হয় ত আশা করে—সাইবেরিয়ার ঘাঁটী হইতে জাপানী দ্বীপপুঞ্জের উপর প্রবল আঘাত করিতে পারিলে জাপানী-হাঙ্গরের মুখগহ্বর হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের "স্বর্ণফলগুলি" আপনা হইতেই উদ্গীরিত হইবে। ইহা ব্যতীত, জাপান সম্পর্কে সোভিয়েট রুশিয়ার অন্য কি পরিকল্পনা থাকিতে পারে, তাহা বুঝা দুষ্কর। রুশ ও জাপানী রাষ্ট্রনায়কগণ নিশ্চিত জানেন—পশ্চিম দিক্ হইতে সূর্য্যোদয় সম্ভব হইলেও আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ ও মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের সংমিশ্রণে যে বর্ত্তমান জাপানের সৃষ্টি, তাহার সহিত কম্যুনিষ্ট রুশিয়ার কখনও স্থায়ী মিলন সম্ভব নহে ; আজ হউক, কাল হউক, এই দুই পক্ষে শক্তি-পরীক্ষা অপরিহার্য্য।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখযোগ্য—সোভিয়েট রুশিয়া ফ্যাসিষ্ট-শক্তির পরাজয় আকাঙ্ক্ষা করিলেও বৃটেন ও আমেরিকার শক্তিক্ষয়ও তাহার কাম্য। বর্ত্তমান যুদ্ধে এই দুইটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হীনবল হইলে ভবিষ্যতে ইহাদিগের নিকট হইতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রুশিয়ার কোন আশঙ্কার কারণ থাকিবে না ; বর্ত্তমান সমর-প্রচেষ্টায়ও ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী দলে রুশিয়ার নেতৃত্ব লাভের সম্ভাবনা ঘটিবে ; যুদ্ধের পরও এই নেতৃত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে।

সে যাহাই হউক, বৃটেন ও আমেরিকাও হয় ত সাইবেরিয়া হইতে জাপানী হাঙ্গরের পুচ্ছে আঘাত করিবার আশাই পোষণ করিতেছে। ফ্যাসিষ্ট-নিধনের জন্য বর্ত্তমানে যে অস্ত্র শাণিত হইতেছে এবং যে অস্ত্রের অমোঘতায় নির্ভর করিয়াই মিত্রশক্তি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন—ultimate victory is ours, সেই অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইবার ক্ষেত্রগুলিও এখন ক্রমে ক্রমে জাপানের অধিকারভুক্ত হইতেছে। ভবিষ্যতে হয় ত সাইবেরিয়া—একমাত্র সাইবেরিয়া হইতেই জাপানের প্রতি মিত্রশক্তির আক্রমণ-পরিচালন সম্ভব হইবে।

রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধ—

রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধের গতি এখনও সোভিয়েট রুশিয়ার অনুকূল। লেনিনগ্রাড, স্মলেন্স্ক, খারকভ এবং ক্রিমিয়া অঞ্চলে এখনও সোভিয়েট-বাহিনীর প্রচণ্ড প্রতি-আক্রমণ চলিতেছে এবং তাহারা ঐ সকল অঞ্চলে সম্প্রতি বিশেষ সাফল্যও লাভ করিয়াছে। অবশ্য, রুশ কর্ত্তৃপক্ষের সংবাদ-নিয়ন্ত্রণের কঠোরতার ফলে রুশ-বাহিনীর সাফল্যের পরিমাণ এবং যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা জানিবার সুবিধা নাই। বর্ত্তমানে জার্ম্মাণীর প্রতিরোধ-প্রচেষ্টা প্রবলতর হইয়াছে। জার্ম্মাণী না কি বসন্তকালীন অভিযানের জন্য সংরক্ষিত সৈন্যদল শীতকালেই নিয়োগ করিতে বাধ্য হইতেছে।

পূর্ব্ব-য়ুরোপে যুদ্ধের গতির পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে হিট্লারের উক্তিতে বিশ্বাস করিয়া অনেকে মনে করিয়া থাকেন—একমাত্র রুশিয়ার প্রচণ্ড শীতই জার্ম্মাণ-বাহিনীর গতি প্রহত করিয়াছে। শীতকালে রুশিয়ায় যুদ্ধ-পরিচালন যে কষ্টসাধ্য, তাহা সত্য ; কিন্তু সে অসুবিধা উভয়পক্ষেরই সমান। রুশিয়ার যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তনের সর্ব্বপ্রধান কারণ—সোভিয়েট সমর-নায়কগণ শত্রুকে প্রতি-আক্রমণের জন্য ঠিক এই সময়টিই নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ ইডেন রুশ সমরাঙ্গন পরিদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন—গ্রীষ্ম ও শরৎকালে যে সোভিয়েট বাহিনী যুদ্ধরত ছিল, শীতকালে তাহারা আর

যুদ্ধ করিতেছে না—সোভিয়েট বাহিনীর বিজয়ের কারণ উপলব্ধি করিতে হইলে এই কথাটি স্মরণ রাখিতে হইবে। সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ সম্প্রতি রুশিয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত অবস্থার প্রতি অধিকতর আলোক-সম্পাত করিবে। তিনি বলেন—Russian strategy was to withdraw until they had worn out the German attack and at the right time to throw in their reserves. It was a telephone-call from M. Stalin himself on the night of December 6 that caused seventy thousand cavalry to be put into the Moscow battle—the attack which started to German retreat on the Western front

তবে ইহা সত্য যে, শীতকালে যুদ্ধের অবস্থা যেরূপই হউক না কেন, বসন্তকালে জার্ম্মাণী সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া সোভিয়েট বাহিনীকে বিধ্বস্ত করিতে প্রয়াসী হইবে। বস্তুতঃ, সোভিয়েট বাহিনীর অগ্নি-পরীক্ষা আসন্ন। এই পরীক্ষায় সোভিয়েট সমরনায়কগণ যদি সাফল্যের সহিত উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তাহা হইলেই পূর্ব্ব-য়ুরোপে ফ্যাসিষ্ট-পরাজয় সুনিশ্চিত। বসন্তকালে অন্যান্য রণক্ষেত্র অপেক্ষা দক্ষিণাঞ্চলেই জার্ম্মাণীর বিশেষ অবহিত হওয়া সম্ভব। ঐ সময় ককেসাসের তৈল হস্তগত করিবার জন্য জার্ম্মাণী বিশেষ ভাবে সচেষ্ট হইতে পারে; এই উদ্দেশ্যে তুরস্কের মধ্য দিয়াও জার্ম্মাণীর সাঁড়াশী-আক্রমণ পরিচালিত হওয়া অসম্ভব নহে। একই সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব্ব-য়ুরোপ এবং পশ্চিম-এশিয়ায় জার্ম্মাণীর আক্রমণ এবং ভারতবর্ষ অভিমুখে জাপানের আক্রমণ পরিচালিত হইতেও পারে।

সম্প্রতি সোভিয়েট রুশিয়ার পক্ষে এক নূতন আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে। কয়েক দিন পূর্ব্বে তিনখানি জার্ম্মাণ রণতরী ব্রেষ্ট বন্দর হইতে বহির্গত হইয়া উত্তর দিকে প্রস্থান করায় মিঃ চার্চ্চিল স্বস্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। রণতরী তিনখানিকে ডোভার প্রণালীতে আটকের জন্য বৃটিশ সামরিক বিভাগ যে প্রবল চেষ্টা করেন, তাহার ব্যর্থতা-জনিত গ্লানি বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া অপনোদন করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু এই রণতরীগুলির নির্গমনে রুশিয়ায় বৈদেশিক সাহায্য প্রবেশের অন্যতম প্রধান পথ আর্চ্চেঞ্জেল অবরুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে; বাল্টিক সাগরেও রুশ-নৌবহরের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। এদিকে ভারত মহাসাগরে জাপান হয় ত অনায়াসে ভিসি কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে ম্যাডাগাস্কার ব্যবহারের অধিকার লাভ করিবে এবং তাহার ফলে আরব-সাগর তথা ইরাণের পথ অবরুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা ঘটিবে। ভ্লাডিভোষ্টকের পথ ইতিমধ্যেই বিপ্লাস্তীর্ণ হইয়াছে। এই ভাবে, অদূর ভবিষ্যতে রুশিয়ার সহিত পৃথিবীর অবশিষ্ট অংশের সামুদ্রিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইবার আশঙ্কা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

লিবিয়ায় যুদ্ধ—

লিবিয়ায় যুদ্ধের গতি পুনরায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। জেনারল অচিন্‌লেক্ পুনরায় বেন্‌ঘাজী, ডার্ণা প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া পশ্চাদপসরণে বাধ্য হইয়াছেন। বসন্তকালীন অভিযানের সময় রোমেলের আক্রমণ-শক্তি পুষ্ট করিয়া মিশর অভিমুখে ফ্যাসিষ্ট অভিযান চলিবে কি না, তাহা নিশ্চিত বলা দুষ্কর। বৃটিশ বাহিনীকে লিবিয়ার পূর্ব্ব-সীমান্ত পর্য্যন্ত বিতাড়িত করিয়া হিট্‌লার আফ্রিকা সম্বন্ধে সাময়িক নিশ্চিন্ত হইয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব-য়ুরোপ ও পশ্চিম-এশিয়ার প্রতি অবহিত হইতে পারেন। অথবা ঐ সময়ে মিশরের মধ্য দিয়া আলেকজেন্দ্রিয়া ও সুয়েজের দিকেও অভিযান চলিতে পারে।
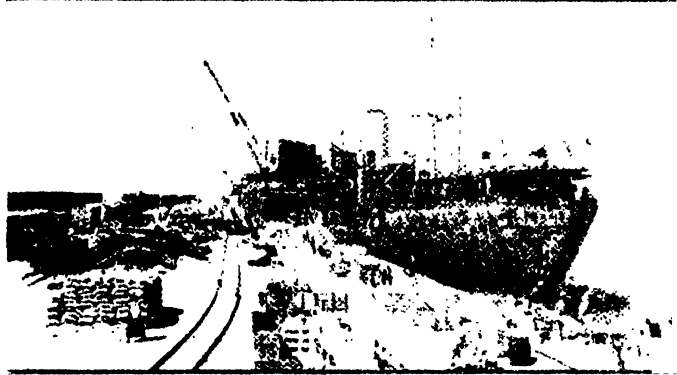
রুশিয়ার সাহায্যার্থে প্রেরিত মার্কিণী পণ্য ইরাণের একটি বন্দরে নামান হইতেছে

ফ্রান্স ও স্পেনের সহযোগিতায় ভূমধ্য সাগর এবং দক্ষিণ-আট্‌লান্টিকে ফ্যাসিষ্ট শক্তির প্রবল তৎপরতার আশঙ্কা আমরা ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। ফ্যাসিষ্ট শক্তির প্রয়োজনে ফরাসী নৌবহর এবং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার ফরাসী-অধিকৃত অঞ্চল এবং স্পেন ব্যবহৃত হইবার সম্ভাবনা এখনও আছে। বরং সম্প্রতি ভিসি কর্ত্তৃপক্ষের সহিত ফ্যাসিষ্ট শক্তির ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে; লিবিয়ার যুদ্ধে সমরোপকরণ প্রেরণের জন্য ভিসি কর্ত্তৃপক্ষ ফ্যাসিষ্ট শক্তিকে তাঁহাদিগের উত্তর-আফ্রিকার অধিকৃত অঞ্চল ব্যবহারের সুবিধা প্রদান করিয়াছিলেন।

২২।২।৪২ শ্রীঅতুল দত্ত।

প্রাচীন ভারতে কি গো-বধ হইত ?

অতি প্রাচীন কালের হিন্দু জাতির আহার্য্য লইয়া ইদানীং অনেক গবেষণা চলিয়াছে। প্রাচীন হিন্দুরা মাংসাশী ছিলেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না। যজ্ঞে সেকালেও পশুবলি হইত। চন্দ্রবংশীয় নৃপতি রন্তিদেবের যজ্ঞে সহস্রাধিক পশু নিহত হইয়াছিল। কথিত আছে, ঐ নিহত পশুর চর্ম্ম হইতে নিঃসৃত চর্ম্মের জলে চর্ম্মণ্বতী (চম্বল) নদীর সৃষ্টি হইয়াছিল। (১) ঋগ্বেদেও একথা আছে যে, পুরাকালে আর্য্য সমাজে কসাইয়ের দোকান ছিল, পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ ইহা বলিতেছেন। (২) সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন যে, ঋগ্বেদের ঐ ঋকে যে 'গোর্ন' শব্দ আছে, তাহার অর্থ কসাই। সুতরাং সেজন্য য়ুরোপীয়দিগকে দোষ দেওয়া যায় না। এখানে দুইটি কথা আছে—মাংসভোজন এবং গবাশন। আর্য্যগণ মাংস ভোজন করিতেন কিন্তু গোমাংস ভোজন করিতেন কি না, তাহাই বিবেচ্য। গো বা গরু হিন্দু সমাজে চিরকালই পূজ্য। দেবল বলিয়াছেন :—

লোকেঽস্মিন্ মঙ্গলান্যষ্টৌ ব্রাহ্মণো গোর্হুতাশনঃ।
হিরণ্যং সর্পিরাদিত্য আপো রাজা তথাষ্টমঃ॥ ইত্যাদি

ইহাদিগকে হিংসা করিতে নাই, পূজা করিতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে প্রাচীন কালে গো হত্যা ছিল বলা যায় কি করিয়া? পক্ষান্তরে সায়ণাচার্য্য এবং রঘুনন্দন উভয়েই এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিঃ কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥

ইহাতে বলা হইয়াছে যে, কলিযুগে এই পাঁচটি নিষিদ্ধ। যথা—অশ্বমেধ যজ্ঞ, গো হত্যা, সন্ন্যাসগ্রহণ, পৈতৃক শ্রাদ্ধাদিতে মাংসভোজন আর দেবর দ্বারা সুতোৎপত্তি। ইহা হইতে বুঝা যায়, কলির পূর্ব্বে ইহা প্রচলিত ছিল, পরে নিষিদ্ধ হইয়াছে। কারণ, যাহার বিধি ছিল না, তাহার নিষেধ হইতে পারে না। কলিতে অশ্বমেধ যজ্ঞ হইয়াছিল, রাজা পুষ্পমিত্র করিয়াছিলেন—কিন্তু গোমেধ যজ্ঞ যে হইয়াছে, তাহার প্রমাণাভাব। অন্যত্র মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে দেখা যায় যে, রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম কোন্ মাংসে কত দিন পিতৃগণের তৃপ্তি হয়, তাহা বলিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধে খরগোশ হইতে বরাহ, মহিষ ও গবয় প্রভৃতি দানের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু গো-মাংসদানের কথা বলেন নাই। যাহা বলা আছে তাহা অত্যন্ত অস্পষ্ট। মনু সত্যযুগের ধর্ম্মবক্তা হইলেও যজ্ঞে গো-মাংস ভোজনের বিধি দেন নাই। বরং নিষেধই করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে বৃহদারণ্যক উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণের ১৮ মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—

অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে পণ্ডিতো বিগীতঃ সমিতিঙ্গমঃ শুশ্রূষিতাং বাচং ভাষিতা জায়েত সর্ব্বান্ বেদান অনুব্রুবীত সর্ব্বমায়ুরিয়াদিতি মাংসৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িত বা ঔক্ষেণ বার্ষভেণ বা।

অথবা যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করেন যে, আমার বিগীত অর্থাৎ নানা দিকে খ্যাতিসম্পন্ন, সভায় কুশল, সর্ব্ববেদাধ্যায়ী পুত্র হউক, তাহার মাংসযুক্ত এবং ঘৃতপক্ব অন্ন (পোলাও) ভোজন করা উচিত। ঐ মাংস রেতঃসেকক্ষম ভেড়ার অথবা বৃষভের হওয়া আবশ্যক। এখানে 'ঔক্ষেণ' এবং 'বার্ষভেণ' শব্দের অর্থ লইয়াই গোল। উক্ষ অর্থ ভেড়া বা মেড়া হইতে পারে। বৃষভ শব্দের চলিত অর্থ ষণ্ড, বৃষভ এবং উক্ষা শব্দে রেতঃসেকক্ষম পশুও বুঝায়। বেদাদিতে অনেক শব্দ মৌলিক অর্থেই প্রযুক্ত হইত।

যুধিষ্ঠির যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহাতে যে যে পশুবলি হইয়াছিল, স্বয়ং বেদব্যাস তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। উহা এইরূপ,—

তং তং দেবং সমুদ্দিশ্য পক্ষিণঃ পশবশ্চ যে।
ঋষভাঃ শাস্ত্রপঠিতাস্তথা জলচরাশ্চ যে।
সর্ব্বাংস্তানভ্যযুঞ্জংস্তে তত্রাগ্নিচয়কর্ম্মণি। (১)

এখানে শাস্ত্রসম্মত ঋষভ উৎসর্গের কথা বলা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন পক্ষী ও জলচর জীবও বলি প্রদত্ত হইয়াছিল। ঐ সকল প্রাণীর কথা সাধারণ ভাবে বলা হইয়াছে—কেবল ঋষভ শব্দের সহিত 'শাস্ত্রপঠিতাঃ' এই বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে। সেই যজ্ঞে ঐ সকল পশ্বাদি হইতে বিবিধ খাদ্য প্রস্তুত হইয়াছিল। (২) মদ্যও যথেষ্ট দেওয়া হইয়াছিল। তাহা ইহার পূর্ব্ব শ্লোকে 'সুরা মৈরেয় সাগর' হইতেই প্রকাশ। উহা সাধারণের জন্য, ব্রাহ্মণাদির জন্য নহে।

ইহার পর অধ্যায়ে দেখা যায়, সুবর্ণমুণ্ডধারী এক নকুল (বেজী) আসিয়া যুধিষ্ঠিরের হিংসাপূর্ণ যজ্ঞের যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছিল। সে স্পষ্টই বলিয়াছিল যে, এই প্রকার জীবহিংসাকর যজ্ঞ অপেক্ষা দুর্ভিক্ষের সময় ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিদিগকে এক মুষ্টি শক্তু (ছাতু) দেওয়াও ভাল। তাহাতে অধিক পুণ্য আছে। এইখানেই এক বিষম গোল উপস্থিত হইয়াছিল। যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে বহু পশুহিংসা হইয়াছিল বলিয়া সেই নকুল যজ্ঞের নিন্দা করিয়াছিল। একটা নেউল মানুষের মত কথা বলিতেছে দেখিয়া সভাস্থ সকলে বিস্মিত হইয়াছিলেন। নকুল তখন শক্তুপ্রস্থদান যজ্ঞের কথা বলিয়াছিল। ইহাতে মনে হয় যে, পশুহিংসা হয় বলিয়া কেহ কেহ ঐ যজ্ঞের নিন্দা করিয়াছিল। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, স্বয়ং ব্যাসদেব যে যে যজ্ঞের বিধান দিয়াছিলেন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে যজ্ঞের বরাবর

---

(১) সংকৃতে রন্তিদেবস্য যঃ রাত্রিমতিথির্বসেৎ।
আলভ্যন্ত তদা গাবঃ সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ।
তত্র স্ম সূদাঃ ক্রোশন্তি সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ।
সূপং ভূয়িষ্ঠমশ্নীধ্বং নাদ্য মাংসং যথা পুরা।
(মহাভারত দ্রোণ ৬৫-১৬-১৭)

(২) ঋগ্বেদ ১ম অষ্টক ৪ অধ্যায় ১১ বর্গ।

(১) মহাভারত।

(২) ঋগ্বেদ ১ম অষ্টক। ১১ বর্গ।

অমুমোদন করিয়া আসিয়াছিলেন, একটা নেউল কোন্ সাহসে সেই যজ্ঞের নিন্দা করিতে সাহস করিল? এই প্রশ্ন স্বতঃই লোকের মনে উদিত হয়। বৈশম্পায়ন এই সংশয় ভঞ্জন করিবার জন্য একটি গল্প বলিয়াছিলেন। মহাভারতে ইহার পরই সে কথা বলা হইয়াছে। কথাটা এই:—এক সময়ে ইন্দ্র এক যজ্ঞ করিতে ব্রতী হইয়াছিলেন। যখন বলিদানের সময় আসিয়াছিল, তখন বলির জন্য আনীত পশুদিগের করুণা-উদ্দীপক মূর্ত্তি দেখিয়া তপোধনগণ ইন্দ্রকে বলিলেন যে, 'এ যজ্ঞ ঠিক হইতেছে না।' তাঁহারা ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন যে "এই যজ্ঞের সমারম্ভ ধর্ম্ম-হানিকর হইতেছে। ইহা ধর্ম্মানুযায়ী যজ্ঞ হইতেছে না, হিংসা কখনই ধর্ম্ম কার্য্য হইতে পারে না। যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে শাস্ত্রবিধি অনুসারে যজ্ঞ করিতে পারেন।" (১) ইন্দ্র সে কথায় কাণ দিলেন না। এ কথা লইয়া একটু তর্ক-বিতর্কও হইয়াছিল; ইহাও বেশ বুঝা যায়। দুই মতই প্রবল ছিল। তখন তাঁহারা সেই বিষয়ের মীমাংসার ভার চেদিরাজ বসুর উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। চেদিরাজ সকল দিক্ বিচার না করিয়া দুই দিক্ রক্ষা করিয়া রায় দিয়াছিলেন বলিয়া রসাতলে গিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, যে যাহা সংগ্রহ করিতে পারিবে সে তদ্দারাই যজ্ঞ করিবে। (২) এ স্থানে এ ব্যাপারটার মীমাংসা হইল না। কেবল সামিষ যজ্ঞের অপকর্ষই সূচিত হইল। তাহার পর মহাভারতে অশ্বমেধ পর্ব্বের শেষভাগে মহর্ষি অগস্ত্য কর্ত্তৃক দ্বাদশবার্ষিক শক্তু-প্রস্থ যজ্ঞের কথা আছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, পুরাকালে মহর্ষি অগস্ত্য দ্বাদশবর্ষব্যাপী অহিংস যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সে যজ্ঞে পশুহিংসা করা হয় নাই। ইন্দ্র সেজন্য ক্রুদ্ধ হইয়া বারিবর্ষণে বিমুখ হইবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন। অগস্ত্য কহিলেন যে, তিনি চিন্তা-যজ্ঞ এবং স্পর্শ-যজ্ঞ করিবেন, তথাপি হিংসা-যজ্ঞ করিবেন না। তিনি প্রয়োজন হইলে উত্তর কুরু হইতে আবশ্যক দ্রব্য লইয়া আসিবেন। শেষে মহর্ষি অগস্ত্যেরই জয় হইল। দেবরাজ ভূরিবর্ষণ করিলেন। কোন কোন মহাভারতে আছে যে, অগস্ত্য শেষটা ঋষিদিগের অনুরোধে যজ্ঞে পশুবধ হিংসা বলিয়া গণ্য হইবে না, এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। একথা সত্য বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। কারণ, সত্য যুগের ধর্ম্মবক্তা মনুই মাংস ভক্ষণের বিধি এবং নিষেধ উভয়ই কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বথা পশুহিংসা নিষেধ করিয়াছেন। আবার মাংস ভক্ষণে দোষ নাই ইহাও বলিয়াছেন। মনু বলিয়াছেন যে, মাংস ভক্ষণে দোষ নাই; তবে মাংস-মদ্যাদি ভোজন হইতে নিবৃত্তি লাভ করিলেই মহৎ পুণ্য হয়, (১) সেই স্থানেই বলিয়াছেন, প্রাণি-হিংসা না করিলে কখনই মাংস উৎপন্ন হয় না, প্রাণিবধ কিছুতেই স্বর্গজনক নহে; অতএব মাংস ভোজন পরিবর্জ্জন করিবে। মাংসের উৎপত্তি দেহিগণের বধ-বন্ধন-যন্ত্রণা—এই সমুদয় বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া কি বৈধ কি অবৈধ সকল প্রকার মাংস ভোজন বর্জ্জন করিতে হইবে। (২) মহাভারতে যেমন পাশাপাশি মাংস ভোজনের বিধি এবং নিন্দাসূচক কাহিনী দেখা যায়, মনুসংহিতায় তেমনই পাশাপাশি মাংস ভোজনের বিধি এবং নিষেধ দেখা যায়। য়ুরোপীয়রা ইহা দেখিয়া বড়ই ফাঁপরে পড়িয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন যে, বৈদিক যুগের পর যজ্ঞে পশুহননের আধিক্য দেখিয়া লোকের মনে হিংসাপূর্ণ যাগযজ্ঞের উপর একটা বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল। এই কাহিনী এবং বিধানগুলি হইতে তাহারই প্রকাশ। আবার তা ছাড়া এ কথাও বলেন যে, ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অনেকেই পশুহননের বিরোধী এবং ক্ষত্রিয়গণ অনেকেই উহার পক্ষপাতী ছিলেন। মিষ্টার সি ভি বৈদ্যও সেই কথা বলিয়াছেন। সকলেই জানেন, মনু ক্ষত্রিয়। তাঁহার প্রণীত বিধি-পুস্তকে মাংস ভোজনের বিশেষ নিন্দা দেখা যায়। ইন্দ্র অহিংস যজ্ঞের বিরোধী, ইহা দেখিয়া ক্ষত্রিয়গণ মাংস ভোজনের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। কারণ, ইন্দ্র শব্দ আধিপত্যসূচক। ইন্দ্ ধাতুর অর্থ আধিপত্য করা; অতএব যে আধিপত্য করে, সে ইন্দ্র-শব্দ বাচ্য। সুতরাং ইন্দ্র সাধারণতঃ রাজ্যশাসক ক্ষত্রিয়কেও বুঝায়। আবার ইন্দ্ ধাতুর অর্থ ঐশ্বর্য্যযুক্ত হওয়া। সে দিক্ দিয়াও ইহা ঐশ্বর্য্যশালী ক্ষত্রিয়দিগকেও বুঝায়। কিন্তু এই সাহেব-পণ্ডিতরাই আবার বলেন,—ব্রাহ্মণরা যজ্ঞরক্ষক ছিলেন, ক্ষত্রিয়রা যজ্ঞবিরোধী সুতরাং হিংসাবিরোধী ছিলেন না। আসল কথা—বুদ্ধি ভ্রান্ত পথে চালিত হইলেই সিদ্ধান্তগুলি এইরূপ পরস্পর-বিরোধী হইয়া উঠে।

আসল কথা—শাস্ত্রকারদিগের কথা এই যে, সাধারণ মানুষ মাংস-প্রিয় হয়। সেই জন্য সমাজের নিম্নস্তরের ব্যক্তিরা—বিশেষতঃ যাহাদের প্রবৃত্তি দমনের শক্তি তাদৃশ নাই, তাহারা মাংসপ্রিয় হইয়া থাকে। "প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি।" পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীই নিজ নিজ প্রকৃতিরই অনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। তখন ইন্দ্রিয়নিগ্রহ বা ধর্ম্মের শাসন কি করিবে? অর্থাৎ কিছুই করিতে পারে না। যজ্ঞকারীরা তাহা জানেন, সেই জন্য তাঁহারা আপামর সাধারণের জন্য সর্ব্ববিধ ভোগ্য বস্তু প্রস্তুত করিতেন। নতুবা সকলেই যে মাংস ভোজন করিতেন,—বিশেষতঃ গো-মাংস ভোজন করিতেন, এ সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত। এক মাত্র বৃহদারণ্যক উপ-নিষদ্ হইতে উপরে উদ্ধৃত বচন অনুসারে অনাপদ কালে উচ্চবর্ণের কেহ গোমাংস খাইতেন, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না। বৃহদারণ্যক

---

(১) অপরিজ্ঞানমেতত্তে মহান্তং ধর্ম্মমিচ্ছতঃ।
ন হি যজ্ঞে পশুগণা বিধিদৃষ্টাঃ পুরন্দর॥
ধর্ম্মোপঘাতকস্ত্বেষ সমারম্ভস্তব প্রভো।
নায়ং ধর্ম্মকৃতো যজ্ঞো ন হিংসা ধর্ম্ম উচ্যতে।
আগমেনৈব তে যজ্ঞং কুর্ব্বন্তু যদি চেচ্ছসি॥
মহাভারত। অশ্ব ৯১।১৩-১৫

(২) তচ্ছ্রুত্বা তু বসুস্তেষামবিচার্য্য বলাবলম্।
যথোপনীতৈর্যষ্টব্যমিতি প্রোবাচ পার্থিবঃ।
এবমুক্ত্বা স নৃপতিঃ প্রবিবেশ রসাতলম্।
মহা, অশ্ব ৯১।২২-২৩

---

(১) মনু—৫ম অধ্যায় ৫৬ শ্লোক।

(২) নাকৃত্বা প্রাণিনাং হিংসাং মাংসমুৎপদ্যতে ক্বচিৎ।
ন চ প্রাণিবধঃ স্বর্গ্যস্তস্মান্মাংসং বিবর্জ্জয়েৎ।
সমুৎপত্তিঞ্চ মাংসস্য বধবন্ধৌ চ দেহিনাম্
প্রসমীক্ষ্য নিবর্ত্তেত সর্ব্বমাংসস্য ভক্ষণাৎ॥ মনু ৫।৪৮—৪৯

এখানে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ মনুর নিষেধবাক্য স্পষ্ট। অতএব ক্ষত্রিয়রা মাংস ভক্ষণের পক্ষপাতী ছিলেন,—এ কথা বলা চলে না।

অতি প্রাচীন। কোন দেশের অরণ্যে উহা প্রথম উক্ত হয়। তখন শব্দগুলি প্রায় মৌলিক অর্থেই ব্যবহৃত হইত। বৃষ ধাতুর অর্থ সেক করা। সুতরাং উহার অর্থ হয় রেতঃসেচনক্ষম পুরুষ-পশু। উক্ষা শব্দেরও ঐ অর্থ। উক্ষা শব্দের অর্থ মেষ বা মেড়া হয়, ইহা মিষ্টার বৈল্ড লিখিয়াছেন। তিনি কোথাও এই অর্থ নিশ্চিতই পাইয়াছেন। সুতরাং এখানে মেষমাংসের পলান্নই ব্রাহ্মণাদির পক্ষে ব্যবস্থিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কারণ, কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে গোবধের বা গবাশনের বিধান দেখা যায় না। বরং মনু বলিয়াছেন যে, এক-পাটি দাঁতওয়ালা যত জীব আছে তাহার মধ্যে কেবলমাত্র উষ্ট্রের মাংসই যজ্ঞকালে ভোজন করা যায়। (১) ধেনুরও একপাটি দাঁত। সুতরাং মনু গোবধ বা গোমাংস ভোজন নিষেধই করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে যে, যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে "ঋষভাঃ শাস্ত্রপঠিতাঃ"; লিখিত হইয়াছে। তাহাতে শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে। শাস্ত্রে অবশ্য গোমেধ যজ্ঞের কথা আছে। ঐ যজ্ঞে গোরুর প্রয়োগ অনেকটা ছাগেরই ন্যায়। কিন্তু গোমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত বড় একটা পাওয়া যায় না। আপস্তম্ব প্রভৃতি কল্পসূত্রে ইহা কলিতে একেবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে। কোন ধর্মশাস্ত্রেই গোবধের বিধি আছে বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ঋষভঃ অর্থে অনড়ান্ নহে। বিশেষ গোমাংস ভোজন যে অতিশয় পাতিত্যজনক, তাহা মহাভারতেরই অনেক স্থানে উক্ত হইয়াছে। অভিমন্যুর মৃত্যুর পর অর্জ্জুন যখন জয়দ্রথকে পরদিন সংহার করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তখন অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন, যদি আমি জয়দ্রথকে সংহার না করি, তাহা হইলে যাহারা ব্রহ্মহত্যা এবং গো-হত্যা করে, তাহাদের পাতক যেন আমাতে অর্শে। (২) এখানে গোঘাতীর অতিপাতকই সূচিত হইতেছে। ঐ মহাভারতের অন্যত্র আছে যে, যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মহত্যা-কারী এবং গো-হত্যাকারীর অন্ন ভোজন করে সে পরজন্মে রাক্ষস হইয়া জন্মে, ইহা যুধিষ্ঠিরকে স্বয়ং ভীষ্ম বলিয়াছিলেন। (৩) হিংসা-মাত্রই পাপজনক, ইহাও ভীষ্মবাক্য। মনুও সে কথা বলিয়াছেন। সুতরাং সাধারণ পাতক হিসাবে একথা বলা হয় নাই, গুরুপাতক হিসাবে ব্রাহ্মণহত্যা ও গোহত্যার কথা বলা হইয়াছে, ইহা বেশ বুঝা যায়। তাহা হইলে ভাল পুত্র প্রজননের জন্য গোমাংসের পলান্ন ভোজন করা আবশ্যক; এই বিধানের সহিত ঐ নিষেধের সামঞ্জস্য থাকে না। যুধিষ্ঠিরের সময়ে যে মনুর বিধানই সম্মানিত হইত, তাহা মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উপদেশের সহিত মনুস্মৃতির পঞ্চম অধ্যায়প্রদত্ত বিধানগুলির হুবহু মিল দেখিলেই বুঝা যায়। কিন্তু শ্রাদ্ধে পিতৃগণের কোন্ কোন্ দ্রব্যে কত দিন তৃপ্তি হয়, তাহা কথন কালে ভীষ্ম বলিয়াছেন যে—

মাংসেনেকাদশ প্রীতিঃ পিতৃণাং মাহিষেণ তু।
গব্যেন দত্তে শ্রাদ্ধে তু সংবৎসরমিহোচ্যতে। মহা। অনু।৮৮।৮

ইহার সহজ অর্থ—মহিষের মাংসে পিতৃগণ এগার মাস এবং গব্য দ্বারা পিতৃগণ বার মাস পরিতৃপ্ত থাকেন। তাহার পরই বলা হইয়াছে—

যথা গব্যং তথা যুক্তং পায়সং সর্পিষা সহ।

অর্থাৎ যথা (যেমন) গব্য মাংস ঠিক সেইরূপই ঘৃতসংযুক্ত পায়স। অর্থাৎ ঘৃতপরমান্ন দিয়াই তাহার সমান ফল হয়। এখানে মাংসের কথা বলিতে যাইয়া হঠাৎ কেন ভীষ্ম পায়সের কথা বলিলেন, এজন্য কেহ কেহ মনে করেন যে, তিনি কেন পায়সের কথা বলিলেন? সেই জন্য গোমাংস-ভোজনপক্ষপাতীরা উহা গব্য মাংস বুঝেন। কিন্তু মনু বলিয়াছেন যে—

সংবৎসরন্তু গব্যেন পয়সা পায়সেন চ।

এবং গব্য দুগ্ধের পায়স দ্বারাই সংবৎসর পিতৃগণ পরিতৃপ্ত থাকেন। কারণ, 'গব্যেন পয়সা' বলিতে অন্যরূপ অর্থ করা সঙ্গত নহে। এখন ভীষ্মবাক্যের সহিত সামঞ্জস্য করিতে হইলে ভীষ্মও পায়সের কথা বলিয়াছেন স্বীকার করিতে হয়। অধিকন্তু গব্য বলিতে মুখ্যতঃ দুগ্ধ, দধি, ঘৃতাদি বুঝায়। সুতরাং এক্ষেত্রে গোমাংস অর্থ করা দুঃসাহসের কাজ। যাজ্ঞবল্ক্য বিধান দিয়াছেন যে, হবিষ্যান্নের দ্বারা এক মাস এবং পায়স দ্বারা এক বৎসর পিতৃগণের তৃপ্তি হইয়া থাকে। (১) উশনা বলিয়াছেন, পায়স দ্বারাই এক বৎসর পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হন। (২) সুতরাং শ্রাদ্ধে গোমাংস উৎসর্গের কথায় কোন ভিত্তি নাই। গোমাংস ভোজন অর্থাৎ অনড়ানের মাংস ভোজন কোথায়ও শাস্ত্রবিহিত ছিল বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং 'ঋষভাঃ শাস্ত্রপঠিতাঃ' অর্থে শাস্ত্রবিহিত ও রেতঃসেকক্ষম উষ্ট্রাদি পশুই বুঝিতে হইবে। বৃহদারণ্যকের ঐ বচনে 'ঔক্ষেণ ঋষভেণ' অর্থেও ঐরূপ মনে করা যাইতে পারে। অতি প্রাচীন কালে গোবধ হয় ত প্রচলিত ছিল। ব্রহ্মবর্ষে বা উত্তরকুরু বর্ষে আর্য্যগণ যখন আসেন নাই, তখনকার কথা না তোলাই ভাল। কারণ, অন্যদেশের ব্যবস্থা ভারতে চলিতে পারে না। মনু বলিয়াছেন যে, সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই নদী দুইটির মধ্যবর্ত্তী দেশ ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ নামে অভিহিত। এই দেশের যে আচার-ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। তাহাই সদাচার নামে অভিহিত। কারণ, সেই দেশেই প্রথম সজ্জনগণের আবির্ভাব হইয়াছিল। বৃহদারণ্যকের উদ্ধৃত বচনের অর্থ যদি বৃষমাংসের পলান্নই হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, উহা ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশের শিষ্টাচারসম্মত ব্যবস্থা নহে। তৎ পূর্ব্ববর্ত্তী অন্য কোন দেশের ব্যবস্থা। কারণ, ভারতের কুত্রাপি গোমেদ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। অন্য যুগে উহার বিধান ছিল, কিন্তু অনুষ্ঠান যে ছিল, তাহার প্রমাণ নাই। সেই জন্য বোধ হয় ভারতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে অথবা যে সকল আর্য্যগণ মধ্য-এসিয়ার পামীরে বা ককেসস অঞ্চলে বাস করিতেন,—তাহারাই গোমেধ যজ্ঞ করিতেন। ভবিতে

(১) শ্বাবিধং শল্যকং গোধাং খড়্গকূর্ম্মশশাংস্তথা।
ভক্ষ্যান্ পঞ্চনখেষ্বাহুরনুষ্ট্রাংশ্চৈকতোদতঃ। মনু ৫।১৮

(২) ব্রহ্মঘ্নানাঞ্চ যে লোকাঃ যে চ গোঘাতিনামপি।
• • • •
তানহৈবাধিগচ্ছেয়ং ন চেদ্ধন্যাদ্ জয়দ্রথম্। মহা। দ্রোণ ৪৫।২০-২৮

(৩) গোঘ্নে চ ব্রাহ্মণঘ্নে চ সুরাপে গুরুতল্পগে।
ভুক্ত্বান্নং জায়তে বিপ্রো রক্ষসাং কুলবর্দ্ধনঃ।

(১) হবিষ্যান্নেন বৈ মাসং পায়সেন তু বৎসরম্। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা ১।২৫৮

(২) সংবৎসরন্তু গব্যেন পয়সা পায়সেন চ। উশনস্ সংহিতা ৩।১৪০

গোমেধ যজ্ঞ কেহ করেন না। অন্ততঃ তাহার প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় নাই। অধিকন্তু যাঁহারা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেন, তাঁহারাও যে অশ্বমাংস খাইতেন এমন কোন কথা নাই। সগর, রামচন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র এমন কি রন্তিদেব পর্য্যন্ত মাংস খাইতেন না। (১) অধিকন্তু রন্তিদেব মুনিদিগকে ফলমূল খাইতে দিতেন। (২) সুতরাং যজ্ঞে পশুবলি হইলেও সকলেই যে মাংস খাইতেন তাহা নহে। দ্বিজাতিরা কেবলমাত্র যজ্ঞে বৈধ মাংস ভোজন করিতেন। বৃথা মাংস খাইতেন না; তবে পীড়িত হইলে শাস্ত্রের বিধি অনুসারে পথ্য হিসাবে মাংস খাইতেন। শ্রাদ্ধাদিতে যে সকল পশুর মাংসে পিতৃগণের তৃপ্তি হইত তাহাই দ্বিজাতিরা ভোজন করিতেন। তবে দেশে সকল কালেই গোমাংসভোজী লোক ছিল—এখনও আছে। মুচি প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতিরা গোমাংস এখনও খায়। যজ্ঞে উহাদের জন্ম গোবধ হইত, ইহা কেহ কেহ বলেন। আমার কিন্তু তাহা মনে হয় না।

আর একটা কথা বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। যে শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, "আচারমেব মন্যন্তে গরীয়ো ধর্ম্মলক্ষণম্।" (৩) অর্থাৎ এক মাত্র সদাচারই ধর্ম্মের বা ধার্ম্মিকতার প্রবল লক্ষণ,—সেই ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ বেদব্যাস পশুমাংসভক্ষণ এত সদাচারসম্মত হইলেও যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে কেবল শাস্ত্রানুজ্ঞাত ঋষভ বলি দিবার কথা কেন বলিলেন? গণ্ডার, উষ্ট্র, মহিষ, গবয় (নীল গাই) মেষ, বরাহ প্রভৃতি ভক্ষ্য বলিয়া শাস্ত্রবিধি অনুমোদিত হইলেও কেবল ঋষভের বা বৃষের কথা বলিলেন কেন? তাহার কারণ, ঋষভ, বৃষ, উক্ষণ শব্দে একই অর্থ অর্থাৎ রেতঃসেচনক্ষম পশু বুঝায়। নপুংসক পশুর মাংস বলিদান-কর্ম্মে, যজ্ঞে এবং শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে কখনই কাজে লাগে না। অনড্বান্ প্রভৃতি গোজাতি-বাচক অন্য শব্দ কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই। কেবল গো শব্দ এবং রেতঃসেচনক্ষমার্থক শব্দগুলি বাছিয়া বাছিয়া ব্যবহার করা হইয়াছে। গো শব্দে পশু মাত্রকেই বুঝাইতে পারে। বৃষ শব্দের অর্থ বার বার বলিয়াছি। সেই জন্য আমাদের বিশ্বাস, ঐ স্থানে প্রযুক্ত গো, বৃষ, উক্ষন্ ঋষভ শব্দে শাস্ত্রপঠিত পশুকে বুঝায়, বলীবর্দ্দ বা অনড্বান্ শব্দে তাহা বুঝায় না। মনু গৌতম, শঙ্খ লিখিত পরাশর প্রভৃতি সংহিতায় গো মাংস ভক্ষণের ব্যবস্থা নাই। ভারতে কুত্রাপি গোমেধ যজ্ঞ হয় নাই। সুতরাং প্রাচীন ভারতের হিন্দুরা গোখাদক ছিলেন, এমন কথা সাহস করিয়া বলা যায় না। যেখানে অর্জ্জুন জয়দ্রথকে বধ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিলেন, যদি আমি জয়দ্রথকে বধ করিতে না পারি, তাহা হইলে আমায় যেন গো-ঘাতীয় পাপ হয়, সেখানে গোঘাতীর পাপ যে ভীষণ, ইহা স্বীকার করিতে হয়। যে মহাভারতে গো-ঘাতকের অন্ন-জল পর্য্যন্ত গ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছে, —সেখানে ধর্ম্ম কার্য্যে লোক গোমাংস খাইত, ইহা মনে হয় না। সাহেবরা শাস্ত্রে গো শব্দ দেখিয়াই উহা গোরু বুঝিয়াছেন। হিন্দু সন্তানেরা যে তাহা বুঝেন, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়।

কৈহ বলেন, ভারতে গোবধ যে কেন রহিত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। আমাদের মতে ভারতে উহা প্রচলিত ছিল না। মৎস্য ভোজন, উষ্ট্র ভোজন, বন্যবরাহ ভোজন ত নিষিদ্ধ হয় নাই। মাংস ভোজনের যথেষ্ট নিন্দা থাকিলেও ত মেষ, উষ্ট্র, ভেড়া প্রভৃতি ভোজনও নিষিদ্ধ হয় নাই। কেবল গো-মাংস ভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, গো-মাংস ভোজন ভারতীয় আর্য্যগণের মধ্যে কখনই চলিত ছিল না। বৃহদারণ্যকের ঐ বচনে ভেড়া বা মেড়ার মাংসের কথাই বলা হইয়াছে।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, (বিদ্যারত্ন)।

(১) মহাভারত। অনুশাসন ১১৬।৬৮—৭৫
(২) মহাভারত। শান্তি। ২৯২।৭
(৩) মহাভারত। শান্তি 'আপৎ'

মূক-বধূ

মিথ্যা এ অভিসার-সাজ!
কজ্জল-টানা চোখে মিছে আনা লাজ!
মেখলাতে মিছা দেওয়া নব-নীপ-মালা—
দু'-হাতে মিছাই নেওয়া চন্দন-থালা!
মিছা কুরুবক মাথে,
কনক-কেয়ূর হাতে
লোধফুলের রেণু মুখে মিছা বালা—
চরণে চলনে মিছা ছন্দ-ঢালা।
অপরিচয়ের অবগুণ্ঠন তুলি'
মিছাই চেয়েছ বধূ-নয়ন মেলি'
শুভক্ষণে নয়নেতে নয়নের দৃষ্টি
নব-জীবনের নব পরিচয়-সৃষ্টি।

আবেগবিহীন বাহু-বন্ধন
মদিরাবিহীন তব চুম্বন—
ভাষাহীন ও-অধর যখন পড়িবে ধরা
যুগল-নয়নে রবে কেমনে যৌবন-সুরা?
বাসনা-কুসুম ফুটি তখনি যাইবে ঝরি'
আঁধার নামিবে তব সকল ভুবন ঘেরি।'
বধূ-জীবনের তব শতেক স্বপন
শত আশা বাসনা গো মধু-আলাপন
যূথিকার সম যাবে মুকুলে মরি'।
অভিসার-নিশি তব মিথ্যা কাটিবে আজ!
ভাষাহীন ও অধর, খুলে ফেল বধূ-সাজ!

শ্রীগৌরীরাণী ভট্টাচার্য্য।

শিবচতুর্দ্দশী

স্বরূপাকে দেখিলে মনে হয়, যেন নিকষপাষাণ-নির্ম্মিত প্রতিমা। তাহার মুখ, চোখ, এবং সুঠাম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন সুনিপুণ ভাস্কর-ক্ষোদিত; সেমূর্ত্তি অনুপম! তাহার নামে অত্যুক্তি ছিল না।

তবু ভবতারণ তাহাকে লইয়া বড়ই সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। স্বরূপা তাঁহার পঞ্চম কন্যা। তাঁহার বড় চারিটি কন্যাকে তিনি সঞ্চিত পৈতৃক অর্থে ও পিতৃপুরুষের আশীর্ব্বাদে কোন প্রকারে পাত্রস্থা করিয়াছিলেন; বিশেষতঃ তাহাদের রঙ ও ফরসা ছিল। কাজেই বিবাহের বাজারে তাহাদের ক্রেতা জুটাইতে তাঁহাকে এতখানি বেগ পাইতে হয় নাই; কিন্তু তাঁহার এই কনিষ্ঠা কন্যার না ছিল ধার, না ছিল ভার!

তবে তখনও একটা উপায় ছিল, তাহা ভগবানের করুণা। ভবতারণ জানিতেন, অসহায়ের তিনিই সহায়, অকূলের তিনিই কাণ্ডারী। জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহের সময় ভবতারণ ভাগ্যগুণে একটা লটারীতে মোটা রকম টাকা পাইয়াছিলেন। তার পর এই পনের বছর ধরিয়া তিনি কত লটারী ও রেসের টিকিট কিনিয়া আসিতেছেন; কিন্তু হিসাব করিলে দেখা যায়—লটারীতে সেই এক বার যে টাকা তাহার ঘরে আসিয়াছিল দৈব-অর্থ পুনঃ-প্রাপ্তির আশায় তাহার দ্বিগুণ টাকা তাঁহার ঘর হইতে বাহির হইয়া জলে পড়িয়াছে।

পত্নী সুনীতি যখন-তখন বলিয়া থাকেন, 'প্রাণদণ্ডের হুকুম একবারই মকুব হয়,—সিন্ধুর বুক শুকিয়ে সাহারার আবির্ভাব হয়েছে।'

ভবতারণ সভয়ে নির্ব্বাক্।

বন্ধু পরামর্শ দিল,—'ভবতারণদা, মেয়ে ম্যাটিকে প্রথম হয়েছে বলে আহ্লাদে আটখানা হয়ো না? সামনে তোমার দারুণ বিপদ! এ সঙ্কটে সদ্গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ কর।'

ক্ষীণ কণ্ঠে ভবতারণ কহিলেন,—'আমাদের কুলগুরু—'

তাঁহার কথা শেষ না হইতেই রাখাল ধমকাইয়া উঠিল—'থাম হে থাম। তোমাদের কুলগুরু ত? তার আশীর্ব্বাদের বহর থার্ডক্লাস ছক্কড় গাড়ীর ঘোড়ার মত, কখন না হোলো চেহারা, না ঘুচলো দুর্ভাবনা!'

'সেটার কারণ ভাই জন্ম-নক্ষত্র!' ভবতারণ সংক্ষেপে এই কৈফিয়ৎ দিলেন।

—'না হে, না! ও-সকলের কারণ নক্ষত্র টক্ষত্র নয়;—এর ভেতরে অনেক কিছুই আছে। আমরা ধর্ম্ম-কর্ম্ম করি কি না, ও-সব জানি। বুঝলে ভায়া! বশিষ্ঠদেবের কামধেনুটাই হলো আমাদের কাম্য।'

'কিন্তু তাঁরা যে বনবাসী মুনি-ঋষি ছিলেন।'

'থাক দাদা! তুমি ও-সব বুঝবে না। তোমাকে সৎ-পরামর্শ দিতে ইচ্ছে হয়; তুমি ছোট বেলার বন্ধু কি না, তাই মনটা তোমার জন্যে মাঝে মাঝে কেঁদে ওঠে।'

এতখানি সহানুভূতি লাভের পর প্রকাশ্য প্রতিবাদ চলে না; তাই নিতান্ত নিরীহের মত ভবতারণ কহিলেন, 'তা কেঁদে উঠলে আর কোরচো কি?'

রাখাল চারি দিকে সতর্ক ভাবে একবার চাহিয়া গুপ্তকথা বলিবার ভঙ্গিতে মৃদু স্বরে কহিল, 'বোসেদের বাড়ী মস্ত এক সাধু না দণ্ডী-বাবা এসেছেন—অনেক ভেল্কী-টেল্কী জানেন; তুমি যাও, তাঁর শরণ নাও। যদি তিনি কৃপা করেন,—আহা, সাধুপুরুষ, তাঁর কৃপা অমূল্য!'

ভবতারণ কাতর কণ্ঠে কহিলেন, 'তিনি কি গেলেই কৃপা করবেন? সাধু-সন্ন্যাসীরাও আজকাল বড়লোকেরই পক্ষপাতী কি না।'

মাথা নাড়িয়া বিজ্ঞের ন্যায় গম্ভীর স্বরে রাখাল কহিল, 'তা কথাটা নিতান্ত মিথ্যে বলনি; তবে কি জান? মঠ বা আশ্রম এখনও কিছু হয়নি, কাজেই কোন শিষ্যই এখন তাঁর উপেক্ষার পাত্র নয়। বোসেরা যে ওঁর এত সেবা-টেবা করছেন, ভেতরে ভেতরে মতলব একটা কিছু আছে বৈ কি!'

'আচ্ছা দেখি'—বলিয়া ভবতারণ আফিসে বাহির হইলেন।

রাত্রিতে আহারে বসিয়া ভবতারণ পত্নীর নিকট কথাটা পাড়িলেন। সাধু-সন্ন্যাসীর উপর স্ত্রীলোকেরই ভক্তি-বিশ্বাস বেশী; আলাউদ্দীনের আশ্চর্য্য প্রদীপ সাধু-সন্ন্যাসীর ঝুলির মধ্যেই সংরক্ষিত রমণীরাই অসংশয়ে ইহা মানিয়া থাকে।

সুনীতি শ্রদ্ধাভরে জোড়হাতে কপাল স্পর্শ করিয়া কহিল,—'তাই যাও না, মানুষটা অমন করে যেতে বলে গেল! একেই বলে দৈব; দৈবের কি আর ল্যাজ থাকে? হঠাৎ তার সন্ধান মেলে, আর সঙ্গে সঙ্গে ফললাভ! তা তুমি গিয়ে একেবারে সন্ন্যাসী ঠাকুরের দুটো পা জড়িয়ে ধরো না।'

'তুমি ও-সব বিশ্বাস কর?'

সুনীতি 'হ্যাঁ হ্যাঁ' করিয়া বলিয়া উঠিল,—'অমন কথা বোল না গো! ওঁরা হচ্ছেন অন্তর্যামী, ধ্যানসিদ্ধ! ওতে অবিশ্বাসের কিছু নেই।'

এ কথার পরে আর তর্ক চলে না। ভবতারণ অগত্যা মৌন রহিলেন, অর্থাৎ সম্মতি লক্ষণ।

সকালে নিদ্রাভঙ্গের পর সুনীতির তাগিদে ভবতারণ তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুইয়া, স্নান সারিয়া বোসেদের বাড়ীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

সুনীতি জোড়হাতে ঘরের সব কয়খানা দেব-দেবীর পটকে নমস্কার করিয়া অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য প্রার্থনা করিল।

কয়েকখানা বাড়ীর পরেই বোসেদের লালরঙের বড় বাড়ী। ভবতারণকে সে বাড়ীর সকলেই চিনিত। বিনা-প্রশ্নেই দারোয়ান তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিল। তিনি দারোয়ানকে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলেন, দ্বিতলের বড় বৈঠকখানাতে সাধুজী অবস্থান করিতেছেন; কোন ভক্তেরই সেখানে যাইতে নিষেধ নাই।

দ্বিতলের বারান্দাতে আসিয়াই ভবতারণ থমকিয়া দাঁড়াইলেন। সে দিন রবিবার, অনেকগুলি আফিসের চাকুরে ও অন্যান্য ভদ্রলোকে ঘরের ভিতরে ভীড় জমিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের কোন রকম সোর-গোল নাই। ভবতারণকে দেখিয়া শ্রীনাথ নমস্কার করিয়া কহিলেন, —'ভবতারণ বাবু যে! ওখানে দাঁড়ালেন কেন? আসুন, ভেতরে আসুন।'

এতখানি সাদর অভ্যর্থনা ভবতারণ আশা করেন নাই; এক নিমেষে অন্তরের সমস্ত জড়তা কাটিয়া মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। শ্রীনাথকে প্রতি-নমস্কার করিয়া তিনি সসঙ্কোচে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

ঘরজোড়া কার্পেট-পাতা, অদূরে সাটিনের আস্তরণে আবৃত গদীর উপর এক টি-বি-মার্কা মূর্ত্তি আসীন। অঙ্গে তাঁহার গৈরিক বসন। ললাটে সিন্দূরবিন্দু; পাংশু ত্রিবলী-অঙ্কিত! কণ্ঠে অক্ষ-মালা, গোলাপের হার! উভয় পার্শ্বে সুবৃহৎ ফুলদানীতে বৃহদাকার দুইটি গোলাপের তোড়া, পুষ্পের সাজি! রূপার ধূপদানীতে কয়েকটা মহীশূরের ধূপ গন্ধ দান করিতেছে। পুষ্পবাসে, ধূপের সৌরভে স্থানটি আমোদিত। একটা অহেতুক সম্ভ্রম ও সন্ত্রস্ততা শীতের দিনের কুয়াসার মত ভবতারণকে সহসা যেন আচ্ছন্ন করিল! ভক্তির আতিশয্যে তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে গিয়া সাধু-বাবার সম্মুখে একেবারে উপুড় হইয়া পড়িলেন।

সাধুজী কহিলেন,—'ভবতারণ, তোমার সব ভাবনা দূর হবে।'

ভবতারণ তখনও ধরাতল হইতে গাত্রোত্থান করেন নাই; কিন্তু অন্তরে ভীষণ চমকাইয়া উঠিলেন,'বাবা কি সত্যই অন্তর্যামী?'

সাধুজী পুনরায় কহিলেন, 'বিপদে যে শরণাগত, তাকে রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য—"মামেকং শরণং ব্রজ"।'

এত বড় আশ্বাসের বাণী শুনিয়া ভবতারণের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। তিনি চাঁদ হাতে পাইবার আনন্দ লাভ করিলেন।— ভবতারণ সাশ্রুনয়নে উঠিয়া বসিলেন।

কক্ষের সকলেই ভবতারণের আচরণে প্রীত হইয়াছিলেন। এই গুরু দেবতাবিদ্বেষী মানুষটির হঠাৎ আগমন—এবং মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় বাবার সম্মুখে লুটাইয়া পড়া—কেবল যে বাবার অলৌকিক শক্তিতেই সম্ভব—ইহাই সকলের সুদৃঢ় ধারণা হইল।

এইবার কথা আরম্ভ হইল। সকলের মুখেই কিছু না কিছু প্রার্থনা। বাবা যেন কল্পতরু! মাটী, বিভূতি, নির্ম্মাল্য, সিন্দুর, কজ্জল প্রভৃতি সকলেই কিছু কিছু লাভ করিয়া কৃতার্থ হইল। কেহ কজ্জল-টিপে হিংস্র জাতিকে মেষে পরিণত করিবে! কেহ সিন্দূর বিন্দু পরিয়া মামলা জিতিবে! কেহ বা নির্ম্মাল্য দ্বারা দুরারোগ্য রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিবে! বিভূতি লেপিয়া কেহ দারিদ্র্য-দুঃখ পরিহার করিবে!—ভবতারণ মনোযোগ সহকারে সব সংবাদই শ্রবণ করিলেন। আশ্বস্ত চিত্তে অভয় চরণে নিজের দুঃখ নিবেদন করিলেন।

বাবা স্নিগ্ধ হাস্য সহকারে কহিলেন,—'চিন্তা কি বৎস?'

ভবতারণের সৌভাগ্যে সকলেই বিস্মিত হইল;—প্রার্থনা মাত্র বাবার দেবদুর্লভ কৃপা আর কেহই লাভ করিতে পারে নাই!

কথায় কথায় বেলা বাড়িল। স্নানের কথা স্মরণ করাইবার জন্য শ্রীনাথ ঘড়ির পানে চাহিয়া হাতজোড় করিলেন। এই ইঙ্গিতে বাবা গাত্রোত্থান করিলেন; অগত্যা ভক্তবৃন্দকেও একে একে উঠিতে হইল। সভা ভঙ্গ হইল।

* * * * *

যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়া ভবতারণ গৃহে ফিরিলেন; সঙ্গে সঙ্গেই আহ্বান, 'ওগো শুনচো!'

'ওগো' তখন রান্নাঘরে ঝোল সাঁতলাইতে ব্যস্ত; সে কহিল,— 'বল না, কি বলবে; কানের মাথা তো খাইনি।'

—"আরে না, না, সে সব কিছু নয়! জরুরী খবর—চট্‌-করে উঠে এসো। রূপো ততক্ষণ ও-সব করুক না।'

—হ্যাঁ গা, কি কথা বলো! রূপোর যে এগজামিন এসে পড়েছে! হাঁড়ি ঠেলবে সে কি করে?"

—'কেন তোমরাই তো বল, যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না? এখন একবার এ দিকে এসো দিকি।'

স্বামীর তাগিদে অগত্যা ঝোলের কড়া নামাইয়া-রাখিয়া পত্নীকে উঠিয়া আসিতে হইল; কহিল,—'নাও, কি বলবে বল শীগ্‌গির।'

'দেখ, ভগবান্ কৃপাসিন্ধু!'

দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া সুনীতি কহিল, 'তাই বলতেই কি আমায় ওপরে ডাকলে?'

'না গো না; এই নাও ধর'—বলিয়া ভবতারণ জামার পকেট হইতে একটা মোড়ক বাহির করিয়া পত্নীর হস্তে অর্পণ করিলেন।

সুনীতি প্রশ্ন করিল—'এটা কি বস্তু?'

'অমন তাচ্ছিল্যভরে জিজ্ঞেসা করলে কেন বল তো? জান, এ কত বড় দুষ্প্রাপ্য বস্তু? কাশীতে 'দশমহাবিদ্যার' যজ্ঞ হয়েছিল, এ সেই হোমের ভস্ম!'

'তা আমি এ নিয়ে কি করব?'

'আঃ, সযত্নে তুলে রাখ; এতে মঙ্গল হবে। বুঝলে না, মেয়েটার জন্যে গেছলুম? ও ম্যাট্রিকে ফার্ষ্ট হোক আর যাই হোক, বিয়ের বাজারে সেটা কি কিছু কাযে আসছে? তাই যদি বাবা—'

সুনীতির মুখে এক ঝলক আলো আসিয়া পড়িল; জানালার সামনে দাঁড়াইয়া সে কথা কহিতেছিল; বাধা দিয়া সোৎসাহে কহিল, 'পেলে কিছু সন্ধান? কোন ভাল ছেলে টেলের? আঃ, তা হলে তো বাঁচি।'

ভবতারণ মাথা চুলকাইয়া কহিলেন, 'ছেলে? না পাত্তর তেমন দেখলুম না; সবাই-ই তো বিবাহিত, একেবারে ছাপোষা! বাবা অন্তর্যামী—ধরে ফেললেন টপ করে! ভরসা তো দিলেন; আমারও আশা হচ্ছে।'

সূর্য্যের উপর এক খণ্ড মেঘ আসিয়া পড়িল। সুনীতির উজ্জ্বল মুখখানা ঈষৎ ম্লান দেখাইল; তবু সে প্রশ্ন করিল, 'কি?'

চারি পাশে একবার চাহিয়া গলা খাট করিয়া ভবতারণ কহিলেন, 'বাবার ঝারা—বুঝেছ ?'

ইঙ্গিতেই পত্নী স্বামীর কথার সবখানি বুঝিয়া লইল ; তাই কহিল, 'বুঝেছি, তা কত খরচ পড়বে ?'

একটা ঢোঁক গিলিয়া ভবতারণ কহিলেন,—'খরচ ?—রামচন্দ্র ! স্বামীজি মুখে কোন আভাসই দেন না ! তবে টের পেলুম,—শ্রীনাথ বাবু, অলক বাবু কি একটা মস্ত ক্রিয়া করাচ্ছেন। আমিও ওই সঙ্গে,—বুঝছ কি না,—"রাজেন্দ্রসঙ্গমে দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে" ওদের কৌশল করে সেটা বলতেই, ভগবানের দয়াতে কেমন খপ্ করে রাজি হয়ে গেল ! তবে কিছু না হোক, গোটা তিরিশ—'

শুনিয়াই সুনীতি আঁতকাইয়া উঠিল ; মুখ-ভার করিয়া বলিল, 'তিরিশ ! বল কি ? এক মাসে মুদীর দোকানে—'

ভবতারণ বাধা দিয়া কহিল, 'দেখ, এ সব কাজে অত দর কষাকষি করতে গেলে চলে ? তারা যে রাজি হয়েছে—এই-ই ভাগ্য বলতে হবে ! এখন জয় মা দুর্গা বলে ঝুলে পড়া যাক।'

* * *

মানুষের ভাগ্যে যখন শুভগ্রহ উদিত হইবার সম্ভাবনা হয়, তখন পাঁজির পৃষ্ঠাতেও তেমনই দিন-ক্ষণ, গ্রহ-নক্ষত্র, বার-তিথিরও অদ্ভুত সমাবেশ হইয়া থাকে। ইহাই দৈব-সংঘটন !

পঞ্জিকা উল্টাইতেই দেখা গেল, এক দুষ্প্রাপ্য যোগাযোগ ঘটিয়াছে ! পৌষ মাসের সংক্রান্তি, অমাবস্যা তিথি, মঙ্গলবার, পুষ্যা নক্ষত্র—ইহারা যেন চতুর্ব্বর্গ ফল দিতেই একযোগে আসিয়া জুটিয়াছে।

অলকচাঁদের মুখে আর হাসি ধরে না, শ্রীনাথের বদন হর্ষ-প্রদীপ্ত ! ঘন ঘন পরামর্শ-বৈঠক বসিতেছে ; ভবতারণও হাঁটাহাটি করিতেছেন। এক অচিন্তনীয় মহা বস্তু করায়ত্ত করিবার অপূর্ব্ব সুযোগ ; আশাতীত সৌভাগ্যলাভের সুনিশ্চিত সম্ভাবনায় সকলেই ব্যগ্র ! বিপুল আনন্দে সকলেই অধীর।

অলকের পত্নী করবী 'গ্র্যাজুয়েট'-মহিলা, কিন্তু হিন্দুঘরের মেয়ে, সংস্কারবশতঃ সে-ও বিশ্বাস করে—ক্রিয়া-কর্ম্ম হোম-যাগের ফলে ভাগ্যকে কিরূপ প্রসন্ন করা যায়। শ্রীনাথের পত্নী জ্যোতি বন্ধ্যা, একটি পুত্র-কামনায় সে আকুল। সে কালে রাজমহিষীরা মুনি-ঋষিদের সহায়তায় হোম-যাগের পর চরু ভক্ষণ করিয়া পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়াছেন ; এ কালে কেনই বা তাহা না হইবে ?

ভবতারণের মহা লোভ,—২৩ নম্বরের বাড়ীর গিরীন সেনের উপর ! কন্দর্পতুল্য মূর্ত্তি ! পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাশের ছাত্র ; পিতা খ্যাতনামা এটর্ণী। সুতরাং কামনার যোগ্য পাত্র।

অনেকগুলা দিন অতিবাহিত হইলে অবশেষে প্রার্থিত দিনটি আসিয়া দেখা দিল। ভবতারণ প্রাতঃকালেই গঙ্গাস্নানের পর স্বামীজি-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—তিনি একা নহেন ; আরও অনেকগুলি কৃপাপ্রার্থী আসিয়া জুটিয়াছে।

সারা দিন ধরিয়া পূজার আয়োজন চলিল। মকর-সংক্রান্তির দুরন্ত শীতে গঙ্গাস্নান সারিয়া আচম্বিতে ভবতারণের মনে পড়িল, কালীঘাটের 'বলির জন্ত' প্রদত্ত সদ্যঃস্নাত অজাযূথের কথা—অগত্যা অন্তরকে চোখ রাঙাইয়া শাসন করিয়া, তিনি হাতের কাজে মনঃসংযোগ করিলেন। বেদী নির্ম্মিত হইল। মঙ্গলঘটে আম্রপল্লব স্থাপিত হইল ; পুষ্পমাল্যে, নারিকেল-পত্রে বেদী সুশোভিত হইল। সকলের মন আনন্দে, উৎসাহে পূর্ণ। দণ্ডী স্বামী ব্যাঘ্র-চর্ম্মাসনে উপবেশন করিলেন। উভয় পার্শ্বে ঋত্বিকদলের মত শ্রীনাথ, অলক, ভবতারণের দল তৃণাসনে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে উপবিষ্ট হইলেন। মস্তকোপরি বিস্তৃত চন্দ্রাতপ, চারি পার্শ্বে ঝালরের মত শোভিত ময়ূরপুচ্ছ। সম্মুখে সারি সারি শান্তিকুম্ভ, মঙ্গলঘটে ব্রহ্মবারি ইত্যাদি বিবিধ উপচার, পূজার বহুবিধ উপকরণ স্তূপে স্তূপে সংরক্ষিত হইতে লাগিল। ক্রিয়া-দর্শনের নিমিত্ত আহূত বহু ব্যক্তির সমাগম হইল। দণ্ডীস্বামীর অলৌকিক শক্তি, বিভূতির কথা শ্রবণে প্রত্যেকেই বিস্ময়ে স্তম্ভিত ! যাত্রার মহলা দেওয়ার মত কয় দিন ধরিয়া আবৃত্তি-করা স্বস্তিবাচন সুললিত স্বরগ্রামে দণ্ডী স্বামী শিষ্য কয় জনকে লইয়া উদাত্ত স্বরে আবৃত্তি করিয়া যজ্ঞক্রিয়ার মঙ্গলাচরণ করিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে একখানা বৃহৎ রূপার থালে, ঠং ঠাং শব্দে সিকি, আধুলী, টাকা বর্ষিত হইতে আরম্ভ হইল।

দণ্ডী স্বামী সে দিকে একবারও দৃষ্টিপাত করিলেন না ; রজত-কাঞ্চন ত তাঁহার নিকট মাটীর মত তুচ্ছ !

এইবার অগ্নি প্রজ্বলিত হইল, বাবা কহিলেন,—"এক পক্ষকাল এই পূত আহুত অগ্নি অনির্ব্বাপিত হইয়া প্রজ্বলিত রহিবে ! নিত্য মহানিশায় পূজা অন্তে আমার শিষ্যদলমাত্র মনোভীষ্ট পূর্ণ করিবে, আমি তাহাতে আহুতি প্রদান করিব।'

অলক, শ্রীনাথ, ভবতারণের দল যেন পদব্রজে স্বর্গে আরোহণ করিলেন ; তাঁহাদের মুখে উল্লাসের হাসি ফুটিয়া উঠিল।

বাবা জানাইলেন, মহানিশাতে তিনি চক্রেশ্বর হইয়া বসিবেন ; অলক ও শ্রীনাথের পানে চাহিয়া কহিলেন, 'সশক্তি তোমাদের জপে বসতে হবে। কেমন পারবে ? মন্ত্র সিদ্ধ করতে চাও তো ?'

সোল্লাসে অলক ও শ্রীনাথ কহিল,—'নিশ্চয় ! নিশ্চয় ! তারাও তো পূজোয় বসতে ব্যাকুল,—কিন্তু দিনের বেলায় যে বড্ড ভীড় !'

'হ্যাঁ, নিশাকালে বাহিরের লোকের প্রবেশ নিষেধ'—বলিয়া সাধুবাবা ভবতারণের পানে একবার কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

ভবতারণ কিঞ্চিৎ বিচলিত স্বরে কহিলেন, 'কিন্তু আমারও সহধর্ম্মিণী তো—কোমরের বাতের জন্ত—'

সহাস্যে বাবা কহিলেন,—'জানি, তোমার শক্তি পঙ্গু ; সুতরাং তুমি এ ক্ষেত্রে অচল।'

ভবতারণ অপরাধীর ন্যায় মুখখানা কাঁচুমাচু করিলেন।

বাবা কহিলেন,—'থাক্ সে কথা, মেয়েকে তো তোমার চাই ; হ্যাঁ, কুমারী-পূজা তাকেই করব।'—বলিয়া অদূরে উপবিষ্টা অন্য কয়েকটি কুমারীর পানে চাহিয়া কহিলেন,—'এদের ছাড়া আমার উপায় আছে কি ? জানই তো, কুমারী-ভোজনে প্রীতা, কুমারী-পূজনে তো—'

অবিবাহিতা কিশোরী-দলের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ; তাহারা কহিল, 'বাবা আমরা থাকব,—তা হলে, আপনার রহস্য পূজার সময়—"

'নিশ্চয় ! নিশ্চয় ! তা ভবতারণ, তোমার মেয়ে ?'

ভবতারণ মনে মনে প্রমাদ গণিতেছিলেন,—আমৃতা আমৃতা করিয়া কহিলেন,—'আমার মেয়ে ! সে কি আসবে ?'

এ কথায় দণ্ডী স্বামীর মুখ অকালে জলদোদয়বৎ গম্ভীর হইল।

শ্রীনাথ কহিল,—'কেন? আসবে না কি জন্য?'

অলক কহিল,—'আসতেই হবে যে।'

তথাপি ভবতারণ নীরব।

দণ্ডী স্বামী কহিলেন,—'আপত্তি কি তোমার?'

অলক কহিল,—'আপত্তির কিছু থাকতে পারে না তো! আমাদের গৃহিণীরা যে পূজায় উপস্থিত থাকছেন,—আপনি স্বয়ং যেখানে হোতা,—'

শ্রীনাথ কহিল,—'সে তো ঠিকই; তা মেয়েকে আপনার বুঝিয়ে বলুন।'

এতখানি উত্তর-প্রত্যুত্তরেও ভবতারণের আর বাঙনিষ্পত্তি হইল না!

দণ্ডী স্বামী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহা লক্ষ্য করিয়া পরক্ষণেই সহাস্যে কহিলেন, 'মেয়ে বুঝি তোমার অবাধ্য!—কলেজে পড়ে, না?'

আজ্ঞে ম্যাট্রিকে ফার্ষ্ট হয়েছিল।

'হুঃ! তাই বুঝি বাপ বলে তেমন গ্রাহ্য করে না, কি বল?' বলিয়া দণ্ডী স্বামী দক্ষিণে ও বামে উপবিষ্ট শ্রীনাথ ও অলকের মুখের দিকে চাহিলেন।

সকলেরই মুখে ঈষৎ হাসি ফুটিল।

ভবতারণ মনে অত্যন্ত আঘাত পাইলেন, তথাপি হঠাৎ প্রতিবাদের ভাষা খুঁজিয়া পাইলেন না; শেষে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিলেন,—'অবাধ্য ঠিক বলা যায় না; তবে কথাটা—মানে, চট্ ক'রে নেয় না—এই আর কি!'

দণ্ডী স্বামীর মুখমণ্ডল উত্তরোত্তর গম্ভীর হইয়া উঠিতেছিল; একটা শামুকের খোলায় রক্ষিত সিন্দূর-গোলা তিনি মধ্যমা অঙ্গুলাগ্রে তুলিয়া-লইয়া তদ্বারা ভবতারণের ললাটে একটা বৃহৎ ফোঁটা দিয়া কহিলেন, 'আমার শক্তির কিছু পরিচয় পাবে। যাও, গিয়ে মেয়েকে বলবে, আজ হোমে আহুতি-প্রদানের সময় তার উপস্থিত থাকা চাই। হোমে যখন তারও নাম দিয়েছি, তখন তাকে উপস্থিত থাকতেই হবে। কলেজে যাওয়া চলে, আর পূজা-তপস্যাতে আসা চলে না? হ্যাঁ, আজই আমি তাকে দীক্ষা দেব! খৃষ্টান ইস্কুলে মেয়েকে পড়তে দিয়ে ভাল করনি ভবতারণ! ওটা অধর্ম্মের কাথা।'

ভবতারণ কুণ্ঠিত স্বরে কহিলেন, 'বিনা-মাইনেতে পড়তো কি না; সেখানকার 'সিষ্টার'ই তো ওর লেখাপড়া শিখবার ব্যবস্থা করে দিলে।'

অলক ব্যঙ্গভরে কহিল, 'অমনি মস্তকটিও ভক্ষণের—'

শ্রীনাথ কহিল, 'ছেড়ে দাও! উনি তখন অতটা বোঝেননি; এখন মেয়ের উপর কড়া হবেন। বাপ তো—ধর্ম্মে মতি আন্‌বার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবেন।'

• • • •

পিতার নিকট একটি একটি করিয়া সুরূপা সবই জানিয়া লইল। তাহার পর তাঁহার সবিনয় অনুরোধ শুনিয়া হাসিয়া কহিল, 'ও তো পাগলা-গারদ, ওখা'নে কে যাচ্ছে বাবা?'

আহত স্বরে ভবতারণ কহিলেন, 'পাগলা-গারদ?'

'আজ না হোক, দু'দিন পরে তো হবে নিশ্চয়।'

মা রাগিয়া বলিলেন, 'দেখ রূপো, অত দেমাক ভাল নয়। খৃষ্টান-ইস্কুলে পড়ে তোর ধর্ম্মজ্ঞান দেখ্‌চি একেবারে লোপ পেয়েছে! হিন্দুশাস্ত্রের মহিমা তুই কি জানিস বল্ তো! সাধু-সন্ন্যাসীর ক্ষমতা কত—তা তুই জানিস্ কি?'

পত্নীকে স্বপক্ষে পাইয়া ভবতারণের সাহস বাড়িয়া গেল। তিনি কহিলেন, 'তুমিই বল তো, কত কাণ্ড করে এই যোগাযোগটা ঘটিয়েছি! মেয়েকে সেটাও বুঝিয়ে দাও। আর ছাখ্, তুই যাচ্ছিস তোর বাপের সঙ্গে, তোর অত ভয় কিসের শুনি?'

সুরূপা বিরক্তিভরে কহিল,—'ভয় আমি কাউকে করিনে। কিন্তু ঐ রকম কতকগুলা বুজরুকী, আমি সহ্য করতে পারিনে! মুখফোড় মানুষ আমি, স্পষ্ট কথা ব'লে ফেলি,—তা রাগই কর আর যা-ই বল।'

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সুনীতি কহিল,—'আজ বুঝলুম, তোর মাথায় কেউটে সাপে দংশিয়েছে! তা না হোলে এমন সুযোগ—যা বহু তপস্যাতেও মেলে না—তা হেলায় হারাবি কেন? জানিস্, বাবা তোর জন্যে কি করছেন?—কি কামনা করে ক্রিয়া করাচ্ছি? ঐ তেইশ নম্বর বাড়ীর গিরীন সেনের নাম দিয়েছি,—সোজা সুযোগ?'

পিতা কহিলেন,—'আহা, আর তো কিছু নয়, হোমে পূর্ণাহুতি দানের সময় তুই গিয়ে কেবল সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবি।'

সবিস্ময়ে কন্যা কহিল,—'গিরীন সেন?'

ভবতারণ হাসিয়া কহিলেন,—পাগল মেয়ে, এ কথা কে বোঝায় তোকে বল্‌তো? হ্যাঁ রে, সৎপাত্রে মেয়েকে কে না দিতে চায়?'

সুরূপা ভ্রূভঙ্গি করিয়া কহিল, 'এ তোমরা করছ কি?'

'কি আবার? কামনাসিদ্ধির চেষ্টা! কামাখ্যাতে সাধনা করে সিদ্ধ হয়েছেন। মানুষের সব কামনাই উনি পূরণ কত্তে পাবেন।'

'বেশ, আমি তো কোন কামনা কত্তে চাচ্ছিনে! আমার যাবারও দরকার নেই।'

'তুমি না যাও, তোমার বাপ দু'বেলা যাচ্ছেন। অহর্নিশি তাঁর কাছে কামনা কচ্ছেন। এই যে বালা বাঁধা দিয়ে ষাট টাকা হোমের খরচা দিলুম, সে কি অকারণ?'—ক্রোধে, ক্ষোভে সুনীতির কণ্ঠরোধ হইল।

তড়িৎ-স্পর্শের ন্যায় সুরূপা চমকিয়া উঠিল। ব্যথিত স্বরে কহিল, 'ষাট টাকা দিলে? মা, বাবার মত তোমারও কি মাথা খারাপ হয়েছে? দেখ, ও-লোকটার ত্রিসীমানাও আর তোমরা মাড়িও না। ও তোমাদের নিশ্চয়ই পাগল ক'রে তুলবে।'

'হ্যাঁ রে পাগলী! মন্ত্র-তন্ত্রের জোরে সহজ মানুষকে যে পাগল করে দিতে পারে, সে শক্তি যার আছে, সে মানুষকে রাজাও করতে পারে! এ তো শক্তিরই খেলা।'—ভবতারণের ওষ্ঠে আত্মপ্রসাদের হাসি ফুটিয়া উঠিল।

কন্যা কিন্তু দমিল না; সে সতেজে কহিল,—'মন্ত্র-তন্ত্র আমি বিশ্বাস করিনে! কিন্তু দ্রব্যগুণ মানি। শেকড়-টেকড় কি যে তোমাদের কিসের সঙ্গে খাওয়াবে, কে জানে? তা না হোলে যা কেউ করে না, তা তোমরা করবে কেন?'

পিতা কহিলেন,—'কি রকম! তুই বলতে চাস্ কি?'

সুরূপা অসঙ্কুচিত স্বরে কহিল,—'কি আবার বলবো? লেখাপড়া শিখে শ্রীনাথ বাবু শুনছি সাধুর বাসের ঘর ধুচ্ছেন, মুচ্ছেন; অলক বাবুর পিছনে সর্ব্বদা দু'-দু'টো চাকর ঘোরে; তিনি না কি সাধুর উচ্ছিষ্ট বাসন পরিষ্কার করছেন! তুমিও গিয়ে তাকে তেল

মাখাও ; আর ওদের বাড়ীর মেয়েরা, বৌরা তাকে চন্দন মাখায়, গন্ধদ্রব্য মাখায় ! বাড়ীর কুমারী মেয়েরা ফুল দিয়ে সাজায়, গলায় ফুলের মালা পরায় ! কিন্তু তিনি পাথরের বিগ্রহ বা অষ্টধাতুর মূর্ত্তি নন তো। একে কি ধর্ম্ম করা বলা চলে ? না, একে পাগলামী ছাড়া আর কিছু বলতে পারা যায় ?'

'তুমি সাধুসেবার মর্ম্ম কি বোঝ ? তুমি জান, এতে ওদের কত উন্নতির আশা আছে ? সে আশা নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে। সাধুর কৃপা !'

সুরূপা এতটুকু টলিল না ; কহিল,—'যখন তা দেখব, তখন নিশ্চয়ই বিশ্বাস করব। এখন তো সুস্পষ্ট অধোগতিই দেখতে পাচ্ছি !—হ্যাঁ, বুদ্ধির দিক্ দিয়ে, কর্ত্তব্যের দিক্ দিয়ে, নীতির দিক্ দিয়ে, সব দিক্ দিয়েই।'

—'তাহলে তুমি যাবে না ?' পিতার কণ্ঠস্বরে সুদৃঢ় প্রশ্ন।

সুরূপা কহিল,—'না, কোন মতেই যেতে পারব না। সেই ভণ্ডটিকে আমার পক্ষ থেকে বলো—আমি তাকে সমস্ত মন দিয়ে অশ্রদ্ধা করি,—ঘৃণা শব্দটা ব্যবহার নাই করলে—আর সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি—মানুষের সব রকম অনিষ্ট ঐ শ্রেণীর ভণ্ডগুলোর দ্বারা ঘটতে পারে ! হ্যাঁ, জগতে যত রকম অপরাধ আছে, সবই ওদের দ্বারা সম্ভব।'

ভবতারণ এবার ক্রোধে, ক্ষোভে প্রায় হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন। কহিলেন,—'রূপো, এত আস্পর্দ্ধা তোর। তুই এমন করে তাঁর অপমান কচ্ছিস্—যে পরম পূজ্য সাধুবাবাকে আমি ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি—ওঃ !'—উত্তেজনায় তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল।

অবিচলিত কণ্ঠে কন্যা প্রত্যুত্তর করিল, 'কিন্তু যখন তোমার মাথা ঠাণ্ডা থাকবে, তখন বুঝতে পারবে, কত বড় অপাত্রে শ্রদ্ধা-ভক্তি ন্যস্ত করেছ ! বাবা, এখনও তুমি বুঝতে পাচ্ছ না—ও কেন আমাকে তার কাছে নিয়ে যেতে বলেছে ? ও বুঝেছে, একমাত্র আমিই ওকে চিনতে পেরেছি—চিনেছি ; ও প্রতারক, শয়তান ! সরল প্রকৃতির মানুষগুলিকে ধর্ম্মের ধাপ্পা দিয়ে ঠকিয়ে স্বার্থসিদ্ধি করে। ও বুঝতে পেরেছে, আমাকে কাবু করতে না পারলে ওর জোচ্চুরি ব্যবসা বেশী দিন চলবে না। কলেজে যেতে যেতে কত দিন আমি দেখেছি—পথের ধারে বারান্দায় দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ভণ্ডটা আমাকে লক্ষ্য করছে !'

'হ্যাঁ, সে কথা বাবা আমায় বলেছেন। তিনি নিজেই বল্লেন, মহাকালীর কুমারী-মূর্ত্তি উনি নিরীক্ষণ করেন। আচ্ছা সুরূপা, আমার মান রেখেও কি তুমি—'

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সুরূপা দৃঢ় স্বরে কহিল, 'না বাবা, আমি যাব না। তোমার হাজার অনুরোধেও আমি যেতে পারবো না। আমার যাওয়ার অর্থই—দুর্নীতির নিকট, ভণ্ডামীর নিকট পরাজয় স্বীকার ! তা আমার অসাধ্য। আমি ওকে সাধু বলে মানি নে। সাধুগিরি ওর ভণ্ডামীর মুখোস।'

ভবতারণ কন্যার কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন।

সুনীতি তিরস্কারের সুরে গর্জ্জন করিয়া কহিল,—'খৃষ্টান-ইস্কুলে দু'পাতা লেখা-পড়া শিখে একেবারে অধঃপাতে গেছিস্। দেবতা, ব্রাহ্মণ, সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি না আছে ভক্তি, না আছে বিশ্বাস !'

—'খৃষ্টানের ধর্ম্মও ধর্ম্ম। আর জগতে কোন ধর্ম্মই মন্দ নয়। মন্দ তার বিকৃত উপসর্গগুলো।'—বলিয়া সুরূপা দুম্-দাম্ করিয়া তাহার ঘরে চলিয়া গেল। পিতামাতার আর কোন কথা শুনিবার জন্য সেখানে অপেক্ষা করিতে তাহার ইচ্ছা ছিল না।

* * * *

মহাযজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইল। সকলেই শান্তিজল গ্রহণ করিলেন।

সে দিন কথা-প্রসঙ্গে বাবা অলককে কহিলেন, 'নারী শক্তি,—তবে উহা দুই প্রকার, বিদ্যা-শক্তি, আর অবিদ্যা-শক্তি,—তোমরা বিদ্যা-শক্তি পেয়েছ।'

ভবতারণই এই মন্তব্যের লক্ষ্য—তাহা বুঝিতে পারিয়া তিনি অধোবদনে রহিলেন।

কিন্তু কথা এইখানে থামিল না ; দণ্ডী স্বামী আবার প্রসঙ্গক্রমে কহিলেন,—'ম্যাট্রিকে ফার্ষ্ট হওয়াটা কিছুই নয় ; আর তারও শেষ এইখানে, তামসী প্রকৃতি !'

ভবতারণ কাতর স্বরে কহিলেন, 'বাবা, অজ্ঞানের অপরাধ'—কথাটা তিনি শেষ করিতে পারিলেন না ; থামিয়া কহিলেন, 'বড্ড খেটে-খুটে পড়ে কি না।'

বাবা ঈষৎ হাস্য করিয়া অলকের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন,

'মা কুরু ধনজন-যৌবন-গর্ব্বং
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা।'

ইহার এক সপ্তাহ পরে গিরীন সেনের শুভ বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র প্রতিবেশীরা সকলেই পাইলেন।

সক্ষোভে নিশ্বাস ফেলিয়া ভবতারণ কহিলেন, "অদৃষ্ট ! কিন্তু বাবা তো জোর দিয়ে একশোবার করে বলেছিলেন,—ওই ছেলেই জামাই করে দেবেন, কিন্তু মেয়ের অহঙ্কারের জন্যেই'—

গৃহিণী রুষ্টস্বরে কহিলেন, 'মরুক, চুলোয় যাক্ ! বালা বাঁধা দিয়ে টাকা দিলুম ! মুঠো মুঠো টাকা, সবই জলে পড়লো ! ওকে খৃষ্টান-ইস্কুলে দেওয়াই তোমার ভুল হয়েছিল।'

'কিন্তু বিনা-মাইনেতে সুবিধেটা পাওয়া গেল ! তখন ভাবতুম, ও-মেয়ের তো বিয়ে হবে না, লেখাপড়াটাই শিখুক কিছু দূর।'

এই নিমন্ত্রণ-পত্র লইয়া বোসেদের বাড়ীতে আলোচনা চলিতেছিল।

করবী পত্রখানা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে স্বামীর পানে চাহিয়া কহিল, 'কার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে গিরীন সেনের—জান ?'

অলক কহিল, 'এক জন জজের মেয়ের সঙ্গে নয় ?'

'হ্যাঁ, তিনি যে বাবার বন্ধু ! আর হেনার সঙ্গে আমারও ভারী ভাব। ওরা সিমলেতে আমাদের বাসার কাছেই ছিল কি না। আমার কিন্তু বড্ডই লজ্জা করছে, ছিঃ !'

বিস্মিত ভাবে অলক কহিল, 'লজ্জা ! কিসের জন্য লজ্জা ?'

উত্তর হইল, গিরীন সেন তো আমাদের সবই জানে, নিশ্চয়ই হেনার কাছে গল্প করবে—তোমার বন্ধু করবী একটা তান্ত্রিক সাধুকে নিয়ে কি কাণ্ডই না কচ্ছে !—তখন এই আলোচনায় সারা সিমলে পাহাড়টাই গুলজার হয়ে উঠবে না ?'

'কিন্তু বাবার সম্বন্ধে ও-রকম করে বলছ যে, তুমি জান, বাবা শক্তি ?'

'হ্যাঁ, জানি গো, জানি সব! কিন্তু দিনের পর দিন হরদম্ সেবা করে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। ভাল লাগছে না। এই যে তোমাকে সিদ্ধাসন দিয়ে বললেন, এতে বসে লক্ষ বার জপ করলেই সিদ্ধ হবে। আজ দু'মাস ধরে তোমার এই কৃচ্ছ্র-সাধনা চলছে, মস্ত জাপক হয়ে উঠেছ! এই আসনে বসেই রেলের কনট্রাক্ট সই করলে, কিন্তু পেলে কি কচু? বাবাও আশীর্ব্বাদ করলেন; তা শুনে আমার বুকখানা দশ হাত ফুলে উঠেছিল! কিন্তু অর্ডারটা শেষে' পেয়ে গেল, ঐ পি, এন, ব্যানার্জ্জি কোম্পানী!'

পড়ন্ত বেলার ম্লান রৌদ্রের মত পাণ্ডুর হাসিতে মুখের অদ্ভুত ভঙ্গি করিয়া অলক কহিল, 'আঃ, সেই দু'লাখ টাকার কনট্রাক্টটা যদি পেয়ে যেতুম রুবি, তা হ'লে আমার ডোবা অদৃষ্ট ভেসে উঠতো; কিন্তু কি করি বল? খরচ যত দূর সাধ্য করেছি ওঁকে পরিতুষ্ট করতে! কিন্তু শ্রীনাথই যেন ওঁর বেশী প্রিয়জন! আমার মনে হয়, শ্রীনাথের মালাটাই আসল সিদ্ধমালা।'

'তুমি কেন সেই মালা-ছড়াটা ওঁর কাছ থেকে চেয়ে নিলে না?'

সক্ষোভে অলক কহিল, 'পাগল হয়েছ! এই আসন করাতে, —এতে বসে বাবা তিন দিন ধ্যান, ত্রিরাত্রি হোম করেছেন,—এতেই পড়লো গিয়ে দু'শো টাকা; আর ঐ মালা নিতে গেলে পড়তো পাঁচশো টাকা! ও আবার সাত দিনের ব্যাপার কি না—আমার জিভ্ বেরিয়ে পড়তো! আসলে যাদের বেশী টাকা আছে, সাধু-সন্ন্যাসী, ঠাকুর-দেবতা তাদেরই কথা কানে তোলে!'

'আমি না হয় পাঁচশো টাকা যেমন করে পারি জোগাড় করে দিতুম।'

ক্ষুব্ধ স্বরে অলক কহিল, 'তা জানি! কিন্তু তোমায় তো বললুম রুবা, যাদের টাকা আছে—ঠাকুর, দেবতা, সাধু, সন্ন্যাসী তাদেরই বশ। আমরা সংসারী মানুষ, টাকার খাতির আগে করি, ঠাকুর-দেবতারাও তা করেন; তা না হলে আসনখানা পেয়ে শ্রীনাথের কাছে আমি গল্প করতেই শ্রীনাথ বাবাকে ধরে বললে, অলকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বস্তু আমাকে একটা দিন। বাবা দিলেন অমনি মালা। খালি-সিন্দুকে আমি যতই প্রাণপণে সেবা করি, ভরা-সিন্দুক শ্রীনাথের প্রতিই বাবার প্রীতি বেশী! আহা, ভবতারণ বেচারার জন্তেও আমার বড় দুঃখ হচ্ছে। আমাদের নৈরাশ্য আমরা হয় তো সহ্য করতে পারব; কিন্তু সে বেচারা চুনোপুঁটি—পরিবারের বালা বন্ধক দিয়ে টাকা সংগ্রহ করেছিল। গিরীনের বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্রখানা যখন আমায় দেখালে—দেখলুম, মুখখানা তার একেবারে শুকিয়ে চুণ হয়ে গেছে!'

দৃপ্ত স্বরে করবী কহিল,—'আমার কিন্তু এতটুকুও সহানুভূতি নেই। ঐ রক্ষাকালীর মূর্ত্তি মেয়ে, সে হতো কি না গিরীন সেনের স্ত্রী! আমার বাবা তেরশো টাকা মাইনে পান, তবু আমাকে তার হাতে দিতে পারলেন না; আর সেই বটু সেনের পুত্রবধূ হবে ষাট টাকা মাইনের কেরাণী ভবতারণ মিত্রের মেয়ে? যা নয় তাই!'

আক্রোশে করবী যেন ফুলিতে লাগিল।

'কিন্তু ভবতারণ বাবুর ওই মেয়ে ম্যাট্রিকে ফার্ষ্ট হয়েছে জান?'

ঝাঁঝাল কণ্ঠে করবী কহিল, হোক ফার্ষ্ট! আমিও গ্র্যাজুয়েট হিন্দু—কিন্তু রূপের জোরই মেয়েমানুষের আসল জোর,—তা না হোলে আমি'—করবী হঠাৎ থামিয়া গেল। নিদারুণ ব্যথা মর্ম্মের কথা টানিয়া বাহির করে; কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আত্মসম্মান তাহাকে লজ্জায় এতটুকু করিয়া দেয়।

মর্ম্মাহত করবী সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

* * * *

ফাল্গুনের ঈষৎ-উষ্ণ দিবস। জ্যোতি বিছানায় শুইয়া শূন্য দৃষ্টিতে রবিকর-দীপ্ত আকাশের পানে চাহিয়া ছিল।

শ্রীনাথ শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া পত্নীকে শয্যায় শায়িত দেখিয়া কহিল, এমন অসময়ে শুয়ে?'

'শরীরটা ভাল নেই।'

শ্রীনাথের মুখ হর্ষপ্রদীপ্ত হইল; সে কহিল, 'কি রকম বোধ হচ্ছে? মাথা ঘুরছে?'

'না, এমনি; বিকেলের দিকে কেমন দুর্ব্বল ঠেকে! রগ দু'টো টিপ-টিপ্ করে।'

শ্রীনাথ পত্নীর পার্শ্বে বসিয়া প্রীতিপূর্ণ স্বরে কহিল, 'বুঝলে তো আমার মালাজপার গুণ? বাবার পায়ে পাঁচটি হাজার টাকা শ্রীনাথ বোস শুধু শুধুই ঢালেনি! হুঁ! কাশীতে মঠও করে দেব বলেছি—অবিশ্যি, সন্তানের মুখদর্শন করলে,—শাস্ত্রেই তো আছে—পুত্রপিণ্ডঃ প্রয়োজনং।'

ম্লান হাস্তে জ্যোতি কহিল,—'কি যে বল?'

আনন্দের মাঝেও দুঃখ জাগে! একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শ্রীনাথ কহিল, 'মার বড্ড সাধ ছিল নাতির মুখ দেখবার।'

পাশ ফিরিয়া শুইয়া জ্যোতি কহিল, 'তোমার কেবল পাগলামী!

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আমি তো পাগল! পাড়াশুদ্ধ সবাই বলেছে, তান্ত্রিকটা ওদের মাথা বিগড়ে দিয়েছে! কিন্তু কেউ তো জানে না—কেন শ্রীনাথ মন-প্রাণ ঢেলে সাধুসেবা কচ্ছে? হ্যাঁ, ভাল কথা, গিরীনের বিয়ের নিমন্ত্রণ করে গেল।'

জ্যোতি চমকিয়া উঠিয়া কহিল, 'ভবতারণ বাবু?'

আহা, সে বেচারার কথা আর বোল না। 'মুখ কালি, চোখ ছল্ ছল্ করছে! আমায় বললে—বাসা বাঁধা দিয়েছিলুম ক্রিয়া করাতে।

'সাধুবাবা কি বললে?'

গভীর শ্রদ্ধায় জোড়হাতে ললাট স্পর্শ করিয়া শ্রীনাথ কহিল, 'বাবা কি করবেন? অহঙ্কারী মেয়ে বাবাকে এক দিন একটা নমস্কারও করতে আসেনি!'

'না, সে কথা বলিনি। বলছিলুম কি, আমাদের ইভার বড্ডই ইচ্ছে ছিল গিরীনকে বিয়ে করে। তাই ও অত করে বাবার সেবা কোরত। আহা, পুরো তিন দিন উপোস করে আমাদের সঙ্গে বসে সারা রাত সমানে মালা জপ করেছে! বললে বৌদি, বাবা বলেন, কঠোর তপস্যা না করলে শঙ্করকে পাওয়া যায় না।'

শ্রীনাথ উপেক্ষাভরে কহিল,—'হয় তো ওর চিত্তশুদ্ধি ছিল না! সে যাক্, বাবাকে আমি শুভ সংবাদ দিয়েছি। বাবা বললেন—জানি রে ব্যাটা, শঙ্কর তোর ছেলে হয়ে আসছে—কাশীতে আমার মঠ বানিয়ে দে। এ কথা শুনে অলক আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল; বললে,—'শ্রীনাথ, ভাই, তুমিই সার্থক বাবার সেবা করলে!'

জ্যোতি অত্যন্ত সন্তর্পণে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল—আঃ, বাবার ভবিষ্যদ্বাণী যেন সফল হয়।—কি তৃপ্তি! কি আনন্দ! উঃ, বন্ধ্যাজীবনের মত নারীর দুর্ভাগ্য আর কি আছে?

জ্যোতির দাদা বিলাতে পাশ-করা নামজাদা ডাক্তার। দিল্লীতে তিনি প্র্যাকটিস করেন। বৈষয়িক প্রয়োজনে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ছোট ভগিনীটির সহিত দেখা করিবার জন্য শ্রীনাথের বাড়ীতে উপস্থিত। তিনি ভগিনীপতির মুখের দিকে চাহিয়া প্রফুল্ল স্বরে কহিলেন, 'কি হে শ্রীনাথ! আমায় দেখে হঠাৎ অমন চমকে উঠলে যে?'—সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভগিনীর দিকে চাহিয়া স্বয়ং যেন অধিকতর চমকিত হইলেন, মুখেও তাহা প্রকাশ করিলেন; কহিলেন, 'কি রে বুড়ি, হঠাৎ এতখানি রোগা আর এতটা কাল হলি কি করে? ঘরকন্না তো তোর সুখেরই রে!'—তাহার পর শ্রীনাথের পানে চাহিয়া কহিলেন, 'বুড়ীকে কি খেতে দাও না?'

শ্রীনাথের দৃষ্টি লজ্জায় ঈষৎ অবনত হইল; সে কহিল, 'এ সময়টা শরীর তো খারাপই হবে; তার উপর এত বয়েসে—'

অবাক্ হইয়া ডাক্তার কহিলেন, 'কেন, কি হয়েছে এ বয়েসে? জ্বর-টর হয় না তো? চোখ দু'টো অমন জ্বল্-জ্বল্ কচ্ছে!'

শ্রীনাথ বুঝিল, বিচক্ষণ চিকিৎসক হইলেও শ্যালকটি ধাত্রী-বিদ্যায় নিরেট! সে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিল, 'এই সে রকম খাওয়া-দাওয়াগুলো—মানে, যাকে বলে অরুচি আর কি! এই—এই!'

'আচ্ছা, আচ্ছা, আমি দেখ্‌ছি। দেখি বুড়ি হাতখানা!'—বলিয়া হিমাংশু জ্যোতির হাতখানা তুলিয়া-লইয়া মণিবন্ধটা কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য চাপিয়া-ধরিয়া ছাড়িয়া দিলেন; গম্ভীর স্বরে কহিলেন, 'বিকেলে এসে আমি এগ্‌জামিন কোরব; এখন ভারি ব্যস্ত! হ্যাঁ রে, চোখ জ্বালা কি রগ টিপ্‌-টিপ্‌—এ সব কিছু করে?'

অবনত চোখে জ্যোতি কহিল, 'বিকেলের দিকে—'

ডাক্তার কি ভাবিতেছিলেন হঠাৎ প্রশ্ন হইল, 'হ্যাঁ রে বুড়ি! তোদের বৈঠকখানাতে এক মূর্ত্তি বসে আছে—ও কে? আমাকে মোটর হতে নামতে দেখে উঁকি দিচ্ছিল? সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌ছি—দেখেই সরে গেল! মুখখানা দেখ্‌তে পেলুম না; কিন্তু গেরুয়া কাপড়টা দেখেছি।'

সসম্ভ্রমে জ্যোতি কহিলেন, 'বাবাকে দেখেছ? ওঁর অমনি শিশু-ভাব! নতুন মানুষ দেখলেই সরে যান।'

হিমাংশু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, 'মানুষ দেখলেই সরে যান? শিশু ভাব! কি সব বক্‌ছিস রে?'

শ্রীনাথ কহিল, 'ও-সব তত্ত্ব আপনি বুঝতে পারবেন না দাদা!'

'কি রকম তত্ত্ব—শুনি!'—হিমাংশুর স্বরে অবিশ্বাস।

জ্যোতি ব্যগ্র স্বরে কহিল, 'দাদা, আমারও অমনি প্রথমে মনে হোত; কিন্তু উনি—যাকে বলে সাক্ষাৎ ভগবান্। অন্তর্যামী! দাদা, তুমি বেলুড় মঠ, বিবেকানন্দ, আর সেই সব সাধু-সন্ন্যাসীদের কথা বল; ওঁকে যদি—'

'থাম, থাম বুড়ি! ও-সকলের সঙ্গে যার-তার তুলনা করা চলে না। চল হে, তোমাদের অন্তর্যামীকে দর্শন করে আসি।'

একান্ত অনিচ্ছাতেও জ্যেষ্ঠ শ্যালকের ইচ্ছা বা আদেশের চাপে শ্রীনাথ তাঁহাকে দণ্ডী স্বামীর নিকট উপস্থিত করিলেন। করবী তখন সাধুবাবার পার্শ্বে রক্ষিত রূপার ধূপাধারে মহীশূরের সুগন্ধি ধূপগুলা একে একে জ্বালাইতেছিল।

হিমাংশুকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে যেন ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

হিমাংশুর সহিত করবীর বহু দিনের আলাপ-পরিচয়।

হিমাংশু সহাস্যে কহিলেন, 'করবি, ওটা কি হচ্ছে?'

হাতে-হাতে অপরাধ ধরা পড়িলে নিরুপায় অপরাধীর চোখে-মুখে যে লজ্জা ফুটিয়া উঠে, করবীর মুখখানা তেমনি লজ্জায় কাঁচু-মাচু হইয়া গেল! জড়িত স্বরে সে কহিল, "এই ধূপটা—"

হিমাংশু কহিলেন,—

"ধূপ আপনারে চাহে মিশাইতে গন্ধে,
গন্ধ চাহিছে ধূপেরে ধরিতে;
সুর আপনারে চাহে মিশাইতে ছন্দে,
ছন্দ চাহিতেছে সুরেতে রহিতে।"

করবীর মুখখানা পলকে লাল করবী ফুলের মতই রাঙা হইয়া উঠিল। নিমেষের মধ্যে চক্ষুর সম্মুখে আনন্দভরা কৈশোর-যৌবন খেলিয়া গেল; কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য। ত্বরিতে সে মনের রাশ টানিয়া মৃদু হাস্যে কহিল, 'আপনি এখনও ঠিক আগেকার মতই!'

কথাটা সমাপ্ত হইতে না দিয়াই ডাক্তার কহিলেন, 'মনটাকে তাজা রেখেছি; কারণ, মনে ঘুণ ধরবার অবকাশ দিইনি তো! আর ওটাকে চালের বস্তায় পূরে কাঁচা ফল পাকানোর মত কাঁচা অবস্থাতেই জোর করে পাকাইনি'—বলিয়াই তিনি সাধুবাবার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন।

শ্রীনাথ হাতজোড় করিয়া বিনীত কণ্ঠে কহিল,—'বাবা, ইনি ডাক্তার, আমার জ্যেষ্ঠ শ্যালক—জ্যোতির সহোদর দাদা, দিল্লীতে প্র্যাকটিস্ করেন।'

বাবা হাসিয়া কহিলেন,—'স্বাগতম্, উপবিষ্ট!' অনন্তর শ্রীনাথের মুখপানে চাহিয়া কহিলেন,—

'শর্ব্বরীদীপকশ্চন্দ্রঃ প্রভাতদীপকো রবি।
ত্রৈলোক্যদীপকো ধর্ম্ম, সৎপুত্রঃ কুল-দীপকঃ।'

শ্রীনাথ অবাক্! বাবা তাহার শ্যালক সম্বন্ধে এত খবর জানিলেন কিরূপে? সে তো কোনও দিন তাহার শ্যালকের বিদ্যাবুদ্ধি প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কোন কথাই দণ্ডীবাবার নিকট প্রকাশ করে নাই!

জ্যোতিও বিস্মিত হইল। বাবা কি অন্তর্যামী? কিন্তু চমকিত হইলেন না তাহার দাদা—সেই বিখ্যাত ডাক্তারটি!

হিমাংশু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দণ্ডী স্বামীর মুখের দিকে মুহূর্ত্তকাল চাহিয়া রহিলেন। শিষ্টাচারবশতঃ তাঁহার যুক্ত-করপল্লব ললাট স্পর্শ করিলেও তৎক্ষণাৎ কোটের পকেটে আশ্রয় গ্রহণ করিল! 'শুভমস্তু' বলিয়াই দণ্ডী স্বামী অকস্মাৎ ধ্যানস্থ হইলেন। দেহ অসাড়, কাঠ! নিশ্বাস বহিতেছে কি না ভাল বুঝা গেল না! ইহাকেই বুঝি 'সমাধি' বলে!

জ্যোতি, করবী উভয়েই বাবার মুখের দিকে চাহিয়া ভক্তিতে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। শ্রীনাথ করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিল। ধূপ-সুরভিত কক্ষে গভীর স্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল।

হিমাংশু দণ্ডী স্বামীর মুখের উপর হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া একবার অন্য সকলের মুখের দিকে চাহিলেন। নিদারুণ বিরক্তিতে তাঁহার মুখকান্তি প্রাবৃটের মেঘমণ্ডিত আকাশের ন্যায় অন্ধকারাবৃত হইল!

হিমাংশু কহিলেন,—'ল্যাংড়টার অপারেশনের পর তুমি তবে সেরে উঠেছ, কি বল সর্ব্বেশ্বর? কিন্তু 'জেনারেল হেলথ' তোমার তো একটুও 'ইম্‌প্রুভ' করেনি দেখ্‌ছি! পাহাড়ে তোমার আরও কিছু দিন থাকাই উচিত ছিল, নয় কি?'

হঠাৎ যদি বন্য জন্তুর মুখে মানুষের ভাষা ফুটিত, কিম্বা চেয়ার-টেবিলগুলা অকস্মাৎ চলৎ-শক্তি পাইয়া ঘরময় লাফালাফি করিয়া বেড়াইত, তাহা হইলেও বোধ করি কক্ষস্থিত প্রাণীগুলি এতখানি বিস্মিত হইত না,—ভাবিত, তাহা ইচ্ছাময় বাবার বিভূতিরই নিদর্শন মাত্র! কিন্তু সেই এত বড় ভক্তির পাত্র,বিশ্বাসের অবলম্বনটিকে কোন ব্যক্তি কদাচ তাচ্ছিল্যপূর্ণ সম্ভাষণ করিতে পারে, এ যেন স্বকর্ণে শুনিয়াও সেবক-সেবিকাদের কেহই বিশ্বাস করিতে পারিল না!

সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া ব্যাকুল দৃষ্টিতে বাবার সমাধিমগ্ন অসাড় মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল।

হিমাংশু আর সেখানে দাঁড়াইলেন না। ভগিনীর দিকে চাহিয়া কেবল কহিলেন,—'কাল সকালে আবার তোমায় দেখ্‌তে আসবো। এখন বড্ডই ব্যস্ত কি না'—বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

হিমাংশুর জুতার শব্দ মিলাইয়া যাইতেই, ননদ রেবা কহিল,—'বৌদি, তোমার দাদা কি নাস্তিক?'

ভাগিনেয়ী প্রভা কহিল, 'কথাগুলা যেন কাটখোট্টার মত মাসীমা! হ'লই বা বিলেত-ফেরত ডাক্তার; বিলেতে তো দেশের হাজার হাজার লোক যাচ্ছে! বড় মামাও তো বিলেত-ফেরত, নাই বা হোলেন তিনি ডাক্তার!'

দণ্ডী স্বামীর মন তখন ধীরে ধীরে নিম্নভূমিতে অবতরণ করিতে-ছিল। আত্মগত ভাবেই তিনি কহিলেন, 'সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ। মা ঠিক বলেছিস্‌, অতিথি দেবতার স্বরূপ।'

করবী কোন সাড়া দিল না। সে কেমন-যেন অন্যমনস্ক; জ্যোতির মুখেও চিন্তার ছায়াপাত হইল!

* * * *

ভগিনীকে পুনর্ব্বার পরীক্ষা করিয়া হিমাংশু শ্রীনাথকে অন্তরালে ডাকিয়া কহিলেন,—'পাগলামী রাখ! বুড়ীকে নিয়ে এই সপ্তাহেই বেরিয়ে পড়।'

শ্রীনাথ হাত কচলাইতে-কচলাইতে সন্দিগ্ধ স্বরে কহিল, 'এমন অবস্থায়—'

কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই হিমাংশু ধমক দিয়া উঠিলেন, 'কি সব গাঁজাখুরী স্বপ্ন দেখ্‌ছ? আরব্য উপন্যাস ভাবছ! এখন ঠিক বুঝে দেখ, বুকের ও-সামান্য 'প্যাচ'টা চেঞ্জে-গেলেই সেরে যাবে। হঠাৎ যখন বুড়ী রোগা হতে আরম্ভ করলো, তখনই তোমার খেয়াল করা উচিত ছিল; তা না করে উনি আমাকে বুঝোতে এলেন—অরুচি, ক্ষুধামান্দ্য—ননসেন্স!'

অকস্মাৎ চপেটাঘাতে অভিভূতের মত শ্রীনাথের মুখ নিমেষে বিবর্ণ হইয়া গেল। সে স্খলিত স্বরে কহিল, 'এ্যাঁ—তা—তাহলে ও কি কিছু নয়?'

—'না, নয়; যেমন 'ইডিয়ট' তুমি! ছি! ছি! তুমি না গ্র্যাজুয়েট! কি একটা অন্ধবিশ্বাসে বুড়ীকে তাহা মেরে-ফেলবার জোগাড় করে তুলেছ!'

এই তীব্র তিরস্কারে শ্রীনাথের চক্ষুতে জল দেখা দিল। সে কুণ্ঠিত ভাবে কহিল, 'কিন্তু বাবা—অর্থাৎ স্বামীজী—'

হিমাংশু ক্রুদ্ধ স্বরে কহিলেন,—'কের বাবা! ও তো একটা টি,বি, পেসেণ্ট! বাস্‌ এইটুকুই যথেষ্ট; ঐ রাস্কেলটার সম্বন্ধে আর কোন কথা জানতে চেয়ো না। কিন্তু সতর্ক করে দিচ্ছি—এঁটো-কাঁটা কেউ যেন ওর না খায়। জান তো, কি ভয়ঙ্কর ছোঁয়াচে রোগ!

আতঙ্ক-বিস্ফারিত নেত্রে শ্রীনাথ শ্যালকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ডাক্তার কহিলেন, 'সেই যে সে-বার ছ্যাঁকা-পোড়া নিলে অমনি কোথাকার একটা ভণ্ড ধরে! তাতেও কি শিক্ষা হয়নি? আর ওরাও ঠিক মানুষ চেনে; নৈলে বেছে বেছে তোমাদের মত অকালকুষ্মাণ্ডের ঘাড়ে চাপে?'

শ্রীনাথ অপরাধীর মত নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

হিমাংশু কহিলেন, 'দার্জ্জিলিং চলে যাও। আমাদের মঠের ফ্ল্যাট আছে—আমি টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি, তোমার কোন অসুবিধা হবে না। তাছাড়া, রাঁচিতেও আমার এক বন্ধুর বাড়ী আছে।'

'কিন্তু পরশু যে শিবচতুর্দ্দশী, চণ্ডীপাঠ—'

হিমাংশু এবার রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিলেন। ভগিনীপতির হাত ধরিয়া একটা ঝাঁকানি দিয়া কহিলেন, 'তোমার মতলবখানা কি বল তো; আমি শুনতে চাই—যা বলছি, তা করবে কি না?'

শ্রীনাথ মুখ কাঁচু-মাচু করিয়া কহিল, 'তা হয়ে—হাঁ,—যাব।'

হিমাংশু প্রস্থান করিলেন; আর তিনি তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না।

* * * *

'নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে?' কথাটা নিদারুণ সত্য। শৈলাবাসে যাত্রার জন্য বাঁধা-ছাঁদা প্রভৃতি বন্দোবস্ত সমস্তই শেষ; অকস্মাৎ জ্যোতি বাঁকিয়া বসিল! নিদারুণ পণ করিল, শিবচতুর্দ্দশী কাটাইয়া সে প্রবাসে যাত্রা করিবে। হঠাৎ জরুরী তার পাইয়া হিমাংশুকে তাড়াতাড়ি দিল্লী যাইতে হইয়াছিল, কাজেই বিশেষ কোন গোলমাল হইল না।

দণ্ডী স্বামীর চরণে প্রণিপাত করিয়া শ্রীনাথ কহিল, 'বাবা, শুধু আপনার অসীম কৃপা!'

কৃপার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া বাবা কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন।

শিবরাত্রির পর্ব্ব মহা-সমারোহে আরম্ভ হইল। দণ্ডী স্বামী কহিলেন, 'প্রহরে প্রহরে শিবপূজার প্রয়োজন নেই, সে ভার আমার। তোমরা কেবল একাসনে বসে ধ্যান-জপ করবে।'

বাবার কৃপার বহর দেখিয়া সাগ্রহে সকলেই সম্মত হইল।

ধ্যানে বসিবার আয়োজন চলিল। কিছু দিন হইতে দণ্ডী স্বামী ভক্তবৃন্দের নিকট চিত্ত স্থির করিবার এক অভিনব উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন; কক্ষ অন্ধকারাবৃত করিয়া সকলকে তাঁহার সম্মুখে নিমীলিত নেত্রে বসিয়া ধ্যান অভ্যাস করিতে হইবে। সে দিন বলিয়া দিলেন, 'সমস্ত বাড়ীই অন্ধকারাচ্ছন্ন কর। সেই রজতগিরি-সন্নিভ-কান্তি মহাদেবের রূপজ্যোতিতেই আলোক-বন্যায় দশ দিক্‌ প্লাবিত হইবে। আমার শক্তি, আমার মহিমা সকলেই আজ দেখ্‌তে পাবে। এত দিন সকলে কেবল সেবাই করে এসেছ,—বলিয়া দণ্ডীস্বামী উদাত্ত স্বরে গৃহকক্ষ প্রতিধ্বনিত করিয়া কহিলেন, 'হর হর ব্যোম্‌ ব্যোম্‌ মহাদেব!'

সকলে প্রতিধ্বনি করিল, 'হর হর ব্যোম্‌ ব্যোম্‌ মহাদেব!'

বাবা কহিলেন, 'ভবতারণ বুঝি এলো না?'

শ্রীনাথ কহিল, 'আপনার আদেশে আমি স্বয়ং গেছলুম; কিন্তু ওর সেই পাশকরা মেয়ে আমার বললে, বাবার শরীর খারাপ, তাঁকে আপনাদের ওখানে যেতে দেওয়া যায় না। বললুম, ভবতারণ

বাবুকে ডেকে দাও। সে বল্‌লে,—আপনার সঙ্গে দেখা হলেই তিনি যাবার জন্তে ব্যস্ত হবেন; তাই তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা করতে দেওয়াও সঙ্গত হবে না।'

অলক কহিল, 'রক্ষেকালীর বাচ্চাটা তো ভারী ছোট লোক!'

বাবা কহিলেন, 'থাক্‌ ও-কথা। আমার কল্পতরু-মূর্ত্তি দর্শন বরা অনেক ভাগ্যে ঘটে! আজ পূজা অন্তে তোমাদের প্রত্যেকের কামনা পূর্ণ করে আমি আসন ত্যাগ করব।'

সকলে বিপুল পুলকে রোমাঞ্চিত-কলেবর!

দণ্ডী স্বামী বদ্ধ-পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়াই ধ্যানস্থ হইলেন।

করবী আলোর সুইচটা টিপিয়া দিল, আর নিমেষমধ্যে সমগ্র বাড়ীখানা যেন অন্ধকার-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইল। নিবিড় নিস্তব্ধতা সেই কক্ষে বিরাজ করিতে লাগিল; কিন্তু শ্রীনাথের বুকের ভিতর হঠাৎ কেমন যেন কম্পন আরম্ভ হইল। অস্থির মন দুরন্ত শিশুর মত অবাধ্য হইয়া উঠিল; শাসনে সে মন বশীভূত করা দুঃসাধ্য!

শ্রীনাথের মনে হইল, সকলের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দই তাহার ধ্যানের ব্যাঘাত করিতেছে! কানে সে আঙুল গুঁজিল, তথাপি বক্ষের দ্রুত স্পন্দন কিছুতেই থামে না! হিমাংশুর সেই হাত ধরিয়া ঝাঁকানী, সেই কঠোর তিরস্কার, তাহার মনের মধ্যে ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

শ্রীনাথ চোখ-মেলিয়া চাহিল, কিন্তু কি বিদ্‌ঘুটে অন্ধকার! নিজের হাতখানাও দেখা যায় না! মসীসমুদ্রে সমস্তই যেন তলাইয়া গিয়াছে! হঠাৎ শ্রীনাথের মনে হইল, প্রলয়ের সূচীভেদ্য তমিস্রায় বিশ্বের জ্ঞান-জ্যোতি বুঝি এমনি ভাবেই বিলুপ্ত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ধ্বংসকে আহ্বান করে; অন্ধকার কেবল নাশেরই ইঙ্গিত করে; উঃ, এ অসহ্য!

নিঃশব্দে শ্রীনাথ আসন ত্যাগ করিল; ভাবিল, চুপে চুপে একবার শয়ন-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া আলো জ্বালিয়া দু'দণ্ড বিছানায় গড়াইয়া লইবে; কেহই জানিতে পারিবে না। বাল্য-কালে শোনা একটা ছড়া তাহার মনে পড়িয়া গেল,—

'ডুব দিয়া যদি কেহ করে জলপান,
শিবের বাবাও তার না পান সন্ধান।'

নিঃশব্দ-পদবিক্ষেপে শ্রীনাথ সেই কক্ষ হইতে বারান্দায় বাহির হইল। আকাশে চন্দ্র না থাকিলেও নক্ষত্রপুঞ্জের মৃদুরশ্মিতে নৈশ অন্ধকার যেন তরল হইয়াছে। শ্রীনাথ শয়ন-কক্ষাভিমুখে অগ্রসর হইল। একটা বাঁক ঘুরিয়া গৃহের সম্মুখের বারান্দায় আসিয়া সে চমকিয়া উঠিল। রুদ্ধ বাতায়নের খড়খড়ির ফাঁক দিয়া এক ঝলক আলোক শাণিত ছুরীর ফলার মত গাঢ় অন্ধকারকে যেন চিরিয়া ফেলিয়াছে। শ্রীনাথ ভাবিল, 'আঁধার ঘরে আলো জ্বালিল কে?'

শ্রীনাথ তাড়াতাড়ি শয়ন-কক্ষের দিকে অগ্রসর হইল। গৃহে প্রবেশ করিয়াই সে ব্যাকুল ভাবে আলোর সুইচটা টিপিয়া দিল; পলকে উজ্জ্বল আলোক-প্রভায় চক্ষু ঝলসাইয়া গেল! সঙ্গে সঙ্গে তাহার কণ্ঠ বিদীর্ণ করিয়া একটা আর্ত্তনাদ বাহির হইল,—'এঁ্যা, সর্ব্বনাশ! এ কি?'

আলমারীর কপাট উদ্ঘাটিত,—খাটের পার্শ্বে সংরক্ষিত লোহার আলমারীর কপাট-জোড়াটা খোলা পড়িয়া আছে!

শ্রীনাথ দ্রুতপদে 'আয়রণ-চেষ্টের' নিকট উপস্থিত হইল। কিন্তু লোহার আলমারী যেন নীরব ভাষায় গৃহস্বামীকে সুস্পষ্ট ভাবে জানাইয়া দিল,—সে এখন নিঃসম্বল, সম্পূর্ণ রিক্ত!

যুদ্ধের হাঙ্গামায় বাজারে দারুণ অশান্তি। অত্যন্ত সংগোপনে শ্রীনাথ কিছু দিন হইতে নোটের বিনিময়ে সুবর্ণরাশি সঞ্চয় করিতে-ছিল। অন্যূন এক লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণ সে সেই সিন্দুকে সঞ্চিত রাখিয়াছিল। এই গুপ্ত সংবাদ শ্রীনাথ কোন দিন কাহারও নিকট প্রকাশ করে নাই; কেবল এক দিন কথাপ্রসঙ্গে সে দণ্ডী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—'বোমার উৎপাতের যেরূপ আশঙ্কা করা যাইতেছে, তাহাতে ধনরত্ন মাটীর নীচে পুতিয়া রাখা নিরাপদ, না, সিন্দুকে রাখাই সঙ্গত?'—এইটুকু মাত্র প্রশ্নচ্ছলে তাহার মুখ হইতে প্রকাশ পাইয়াছিল।

দণ্ডী স্বামী তাচ্ছিল্য সহকারে কহিয়াছিলেন,—'শ্রীনাথ, আমরা বৈদান্তিক; জগৎ আমাদের নিকট অনিত্য—মিথ্যা মায়া মাত্র। আমি, বাবা, এ সকল বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করিতে অসমর্থ।'

শ্রীনাথ দণ্ডী স্বামীর পদধূলি জিহ্বাগ্রে গ্রহণ করিয়া কহিয়াছিল, 'বাবা, আপনার এই মহাজ্ঞানের কিঞ্চিৎ অংশ আমায় দান করুন।'

সেই শ্রীনাথ আজ সোনার শোকে ক্ষিপ্তের মত চেঁচামেচি ও গোলমাল করিয়া এমন কাণ্ড বাধাইয়া বসিল যে, বৈঠকখানায় ধ্যানাসীন ভক্তগুলির সুগভীর তন্ময়তা নিমেষে শূন্যে বিলীন হইয়া গেল! হঠাৎ ঘরের ভিতর অজগর সাপ ফণা তুলিয়া ফোঁস্-ফোঁস্ শব্দে গর্জ্জন করিলে মানুষ যে ভাবে ছুটাছুটি করে, তেমনি হুড়-মুড় শব্দে সকলেই শ্রীনাথের আর্ত্তনাদ শুনিয়া সেই স্থানে ছুটিয়া আসিল।

শ্রীনাথ তখন গাল মাথা চাপড়াইয়া বলিতেছে, 'আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে; সর্ব্বস্ব গেছে, আমার সর্ব্বস্ব গেছে! হায় হায়, আমার লাখো টাকার সোনা, এই আলমারী থেকে সমস্তই—'

খোলা-সিন্দুক ও স্বামীর উন্মত্তপ্রায় মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া জ্যোতি আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার মুখ দিয়া আচম্বিতে বাহির হইল, 'বাবা!'

হৈ-চৈ হাঙ্গামার ভিতর সকলেই তড়িৎ-স্পর্শের ন্যায় চমকিয়া উঠিল।

কিন্তু বেদান্তের মায়া! জগৎ মিথ্যা! দণ্ডীবাবা সেই মহা-জ্ঞানের প্রকৃত অধিকারী। যোগপ্রভাবে মানুষ অদৃশ্য হইতে পারে, যেন এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়াই নিবিড় অন্ধকারের সুযোগে দণ্ডী স্বামী অদৃশ্য হইয়াছিলেন!

সুরূপা তাহার পিতার মুখে সকল সংবাদই অবগত হইল। সুনীতি বালা-জোড়ার জন্য পুনঃ পুনঃ খেদ করিয়া কহিতে লাগিল, 'মিন্সে পাকা চোর গো! এমন ভণ্ডও দুনিয়ায় আছে?'

ঈষৎ হাস্যে সুরূপা কহিল, 'কি বল মা? উনি যে পরম সাধু, কাঞ্চন-ত্যাগী নির্লোভ সন্ন্যাসী!'

'থাম্, থাম্, পোড়ারমুখী! তোর জন্তেই তো শাশুড়ীর হাতের ছ'ভরি ওজনের গিনি-সোনার বালা আমার—' ক্ষোভে-দুঃখে সুনীতি মুখের কথা শেষ করিতে পারিল না।

ভবতারণ কহিলেন, 'শুধুই কি বালা? দু'চোখে যাকে সামনে দেখ্‌তে পেয়েছি—মায় আফিসের পিয়ন, চাপরাশি, দারোয়ান সকলের কাছ থেকেই দু'-পাঁচ টাকা নিয়ে হাতীর পেট ভরিয়েছি!'—বলিতে বলিতে ভবতারণ ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। 'ব্যাটাকে

হাতে পাই তো ফাঁসির ভয় না করেই তার মুণ্ডুটা—' ক্রোধের উচ্ছ্বাসে বাকি কথা অসমাপ্ত রহিয়া গেল।

• • • •

মানুষের চিন্তাধারার সহিত অদৃষ্টের ব্যবস্থা কখন খাপ খায় না; প্রমাণ—জ্যোতির অকাল-মৃত্যু।

পত্নী-শোকে ও অর্থের শোকে শ্রীনাথ মর্ম্মাহত, উন্মত্তপ্রায়!

প্রতিবেশীর দল বলিতে লাগিল, 'অমন মানুষ, একটা ভণ্ড সাধুর পাল্লায় পড়ে নষ্ট হয়ে গেল!'

ধর্ম্মের নামে এখন ভবতারণের মহা আতঙ্ক।

সে দিন সুনীতি আসিয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার মেয়ে কি সন্ন্যাসিনী হবে?'

চমকিয়া ভীত স্বরে ভবতারণ কহিলেন, 'কেন, কি হয়েছে? ও-কথার মানে?'

মুখখানা বাঁকাইয়া সুনীতি কহিল, 'দেখগে কেন!'

ভবতারণ তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে কন্যার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সুরূপা রামকৃষ্ণ-মিশন হইতে প্রকাশিত সুমধুর 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ করিতেছিল।

ভবতারণ কহিলেন,—"ও-সব কি হচ্ছে রূপো? আবার ও-সব নিয়ে আলোচনা কেন?'—কণ্ঠে তাঁহার তিরস্কারের ঝঙ্কার।

সুরূপা হাসিয়া বলিল, 'না বাবা, ভয় নেই। এ সত্য-দ্রষ্টা ঋষির লেখনীতে মহাজীবনের ভাষ্য রচনা হয়েছে।'

ক্রোধ-কম্পিত স্বরে ভবতারণ কহিলেন,—'না না, ও-সবে কিছু দরকার নেই। ও-ব্যাধি বড়ই সংক্রামক, ভয়ঙ্কর ছোঁয়াচে! খবরদার, ও-পথে পা দিও না, একেবারে গোল্লায় যাবে।'—ভীষণ ক্রোধে সারা দিন তিনি বকাবকি করিয়া কাটাইলেন।

দিন-কয়েকের মধ্যে ভবতারণ স্বয়ং সুরূপার সম্বন্ধ আনিয়া হাজির করিলেন। ম্যাট্রিক-ফেল পাত্র, দ্বিতীয় পক্ষ, তবে করপোরেশনে ভাল চাকরী করে, এবং নিজস্ব ভিটা-মাটীও আছে।

সুনীতি কহিল,—এমন পাত্রে যদি মেয়ে উচ্ছুগ্গু করবে, এত দিন তবে ওকে এত খরচপত্তর করে পড়ালে কেন?'

ভবতারণ ক্রোধে চীৎকার করিয়া কহিলেন,—'ভুল হয়েছে, অন্যায় হয়েছে, ঘাট মানছি। তা অসিতবরণা কালী পেটে না ধরে চম্পকবরণা গৌরী প্রসব করতে পারনি কেন? দোষ তো তোমারই।'

সুনীতি নির্ব্বাক্ হইল।

কনে দেখাইবার পর্ব্ব চুকিয়া গিয়াছে; শেষে পাত্র স্বয়ং দেখিতে আসিয়াছিল। দোজবরে প্রৌঢ় পাত্র দেখিয়া সুনীতির মনে ধরিল না।

স্বামীকে অন্তরালে ডাকিয়া কহিল,—'প্রতিবেশী, ভাব-সাব হয়েছে, চেষ্টা দেখ না।'

ভবতারণ কহিলেন,—'কার কথা বলছ? কে এ বাজারে টাকা ধার দেবে বল তো?'

সুনীতি জ্বলিয়া উঠিল।—'আমি কি টাকা ধারের কথা বলছি? বলি, চোখের সামনে মানুষটা উদাসী হয়ে যাবে, বিবাগীর মত থাকবে?'

ভবতারণ চমকিয়া কহিলেন, 'কাকে আবার শনিতে পেয়েছে?'

এত ক্রোধেও সুনীতি হাসিল; বলিল, 'তোমার মাথা খারাপ হয়নি? চেষ্টা দেখ না—যদি শ্রীনাথের সঙ্গে রূপোর—'

'ওরা বড়লোক, তার ওপর ঐ রকম ধর্ম্মের বাতিক, ক্ষেপেচো?'—বলিয়া ভবতারণ গট্-গট্ করিয়া সরিয়া পড়িল।

• • • •

স্ত্রীচরিত্র দেবতারও অজ্ঞাত—কথাটা জ্বলন্ত সত্য! যে সুরূপা মনে-প্রাণে শ্রীনাথকে অবজ্ঞা করিত, ঘৃণা করিত, সেই সুরূপাই এখন শ্রীনাথের প্রতি সর্ব্বান্তঃকরণে সহানুভূতি পোষণ করে!

মনে মনে হাসিয়া তৎক্ষণাৎ সে চিত্তবৃত্তিকে শাসন করে, এবং তাহার মন শ্রীনাথ সম্বন্ধে সকল আলোচনা বন্ধ করিয়া দেয়; কিন্তু জ্যোতির বাসি-বিবাহের দিনের সেই চন্দন-লেখা অঙ্কিত মুখখানা মানসে ভাসিয়া উঠে। এগ্‌জামিনের পড়া ফেলিয়া সে দিন সুরূপা সকাল হইতেই জানালা-ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—বর-বধূ দেখিবে বলিয়া! সেই বধূটির মহাপ্রস্থানের দৃশ্যও সুরূপা দেখিয়াছে। চোখে তাহার জল আসে।

সে দিন ভবতারণ আফিসে যাইবার সময় পত্নীকে বলিলেন, 'তাহলে দেনা-পাওনার গোল তো মিটে গেল। আশীর্ব্বাদের দিন স্থির করে আসব তো?'

বিরস মুখে সুনীতি কহিল,—'এসো,—যে যার হাঁড়িতে চাল দিয়েছে, সে তারই ঘরে যাবে।"

ভবতারণ থমকিয়া দাঁড়াইলেন; তার পর কহিলেন,—'ভাবচ কেন? দেখ, টাকা তো নয়, আমাদের গায়ের রক্ত! মায়া করিনি, ওর জন্যেই তো খরচ করেছিলুম। তুমি বলতে, নারায়ণ না পূজলে কি সিংহাসন মেলে? কিন্তু কই, কি হল? শাস্ত্র মিথ্যা, দেবতা পাষাণ! স্বীকার করি, আমি ভণ্ডের পাল্লায় পড়েছিলুম! জোচ্চোরকে সাধু ভেবেছিলুম, কিন্তু অন্তর্যামী তো আমার মনের খবর জানতেন! আমার উদ্দেশ্যও জানতেন। পিতার প্রাণের জ্বালা কি তিনি দেখ্‌তে পেতেন না? তাই কাউকে আর ভগবানের নাম করতে দিই নে! ও ভুয়ো! সব মিথ্যে!'—ভবতারণ নিস্তব্ধ হইলেন।

সুনীতি কহিল, 'তোমার আফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে।'

—'যাই! তাহলে ওই কথাই রইল?'

—'তা বেশ, আশীর্ব্বাদের দিন স্থির করে এসো।'

ভবতারণ প্রস্থান করিলেন। বাড়ী হইতে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছেন—সম্মুখে আসিয়া পড়িল শ্রীনাথ! হাত তুলিয়া ভবতারণকে নমস্কার করিয়া কহিল, 'আমি আপনার ওখানেই যাচ্ছিলুম।'

'আমার ওখানে?' ভবতারণের স্বরে বিস্ময়! হঠাৎ ভবতারণের মনে পড়িয়া গেল,—এক দিন শ্রীনাথ তাঁহার গৃহে গিয়াছিল, কিন্তু সে দিন শিবচতুর্দ্দশী! সুরূপা শ্রীনাথকে ভবতারণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেয় নাই বলিয়া শ্রীনাথ নিজেকে ভয়ানক অপমানিত মনে করিয়াছিল। সৌহার্দ্যের শিথিলতা সেই দিন হইতেই আরম্ভ হয়, প্রীতিবন্ধন ছিন্ন হয়; কিন্তু তা লইয়া ভবতারণ এখন আর অনুতাপ করেন না। তবু শ্রীনাথের সম্ভাষণে আজ তাঁহার মুখ ঈষৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

শ্রীনাথ কহিল, 'ক'দিন থেকেই ভাবচি আপনার ওখানে যাব, তা ঘটে উঠ্‌ছে না! কিন্তু আর অপেক্ষা করা চলে না বলেই যাচ্ছি।'

প্রচ্ছন্ন বিস্ময় এবার ভাবনার পথ ধরিল। ভবতারণ কহিলেন, 'কোন বিশেষ জরুরী কথার জন্যে বোধ হয়?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

এতবড় সম্ভ্রমসূচক সম্ভাষণ ভবতারণকে আনন্দিত না করিয়া বিচলিতই করিল। কুসুমস্তবকের তলায় না জানি কি কালসর্প লুকাইয়া আছে!

সবিস্ময়ে ভবতারণ কহিলেন, 'কিন্তু কি দরকার? মানে, আমার আপিসের বেলা হয়েছে কি না।'

শ্রীনাথ হাসিয়া কহিল, "ভবতারণ বাবু, আজ যে ব্যাঙ্কের ছুটি!'

'এঃ—তাই তো! আজই যে সোমবার! উঃ, কি ভুলটাই হয়েছে! তা চল, তোমার ওখানে—"

শ্রীনাথ কহিল, 'না, আপনার বাড়ীতেই চলুন; সেইখানেই কথা হবে।'

ভবতারণ কুণ্ঠিত ভাবে সম্ভ্রান্ত প্রতিবেশীকে নিজের ক্ষুদ্র বাসভবনে লইয়া আসিলেন। বাহিরের ঘর খুলিয়া সতরঞ্চি-বিছান তক্তাপোষে উভয়ে উপবেশন করিলেন।

ভবতারণের বুক দুরু-দুরু করিতেছে! না জানি, শ্রীনাথ তাঁহাকে কি কথা বলিবে।

কয়েক মুহূর্ত্ত অবনত-মুখে বসিয়া থাকিয়া শ্রীনাথ মুখ তুলিল। একটা দুর্নিবার সঙ্কোচকে কাটাইয়া ঈষৎ হাস্যে কহিল, 'ভবতারণ বাবু, স্ত্রী-চরিত্র দুর্জ্ঞেয়, দেবতারাও তার মর্ম্ম জানেন না! জ্যোতি মৃত্যুকালে আমার কাছে কি প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে জানেন? আমাকে বিয়ে কত্তে হবে, এবং সে যাকে নির্দ্দেশ করে যাবে—তাকেই। সে বলতো—তুমি বিয়ে না করলে স্বর্গে গিয়েও আমার আত্মা তৃপ্তি পাবে না, শান্তি পাবে না। বিয়ে তুমি কোর; কিন্তু আমি যাকে বলে যাব—তাকেই করতে হবে। আমি এমন মেয়ের হাতে তোমায় দিয়ে যেতে চাই, যেমন শক্ত কাছিগুলো বড় বড় নৌকাগুলোকে আটকে রাখে—হাজার টানের মুখেও তারা দূরে ভেসে যেতে পারে না!—তেমনি একটি শক্ত মেয়ের হাতে তোমায় দেব। সে খালি সুরূপাতেই সম্ভব। তোমাদের রাগ তার উপর। আমি কিন্তু মনে মনে তাকে ভালোবাসি। আর তার সম্বন্ধে মনে একটু ব্যথাও আছে।—অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেসা করলুম, 'ব্যথা!' মাথা নেড়ে সে বললে—'হ্যাঁ! আহা, গিরীন সেনের বিয়ের নেমন্তন্ন-পত্রখানা দেখার পর আমি ভবতারণ বাবুর মুখখানা দেখেছিলুম! উঃ, কি মুষড়েই তিনি পড়েছিলেন! কি জানি কেন, তখন আমার মনে হয়েছিল—যদি আমার কোন শক্তি, কিছু সামর্থ্য থাকত, তাহলে ভবতারণ বাবুর ক্ষোভ দূর করতুম।—দেখ, অন্তর্যামী বোধ হয় সেই পরীক্ষা নিতেই আমার দিকে চেয়ে আছেন।'

শ্রীনাথ থামিল।

ভবতারণ স্তম্ভিত! শ্রীনাথের মুখের দিকে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

শ্রীনাথ আবার বলিতে আরম্ভ করিল; কহিল, 'দজ্জী স্বামীকে তোমরা সবাই অশ্রদ্ধা কর, কিন্তু আমি করি না। বিশ্বাসের ভিতর দিয়েই ভগবানকে পাওয়া যায়। বিল্বমঙ্গল নাটক দেখেছিলুম; সে কাহিনীর সত্যতা আমি অনুক্ষণ উপলব্ধি করচি। জ্যোতিকে অনেক বার বোঝাবার চেষ্টা করেছিলুম; কিন্তু কিছুই সে কানে তোলেনি, শুধু বলেছিল, সুরূপাকে বিয়ে করলেই আমি জানব, আমাকে তুমি সত্যি সত্যিই ভালবাসতে। এ যেন একটা খেয়ালের মত চেপে ধরেছিল! কিন্তু ভবতারণ বাবু, এ কথা তো ব্যক্ত করা চলে না। তাই আমি নীরব, যেখান থেকে যত সম্বন্ধের পীড়াপীড়ি হচ্ছে, আমি শুধু 'না' শব্দই উচ্চারণ কচ্ছি। কিন্তু আজ সকালেই হঠাৎ জানতে পারলুম, আমার ড্রাইভারের দাদার সঙ্গে সুরূপার বিবাহের সম্বন্ধ আপনারা পাকাপাকি করছেন; এই ফাল্গুনেই না কি বিবাহ হবে,—তাই ছুটে এলুম আপনার কাছে।'

স্বামীকে অকস্মাৎ আফিসের পথ হইতে শ্রীনাথকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী ফিরিতে দেখিয়া সুনীতি দ্বারের পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। সে আর থাকিতে পারিল না,—নির্বুদ্ধি স্বামীর কি বেফাঁস কথায় এই আশাতীত লোভনীয় সম্বন্ধটা পাছে কাঁচিয়া যায়, এই আশঙ্কায় লজ্জা-সঙ্কোচ পরিহার করিয়া সে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াই কহিল,—বাবা শ্রীনাথ, সাক্ষাৎ মহাদেবের মত তুমি এসেছ, এ শুধু রূপোর জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যা-ফলে! এই শিবচতুর্দ্দশীতেই তুমি আর এক দিন এসেছিলে,—আজ সেই তিথি।'

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী।

গল্প চুরি

শ্রীমতী গিরিবালা দেবী জানাইয়াছেন—১৩২৮ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'সাহিত্যে' প্রকাশিত—তাঁহার লিখিত 'চিত্রলেখা' গল্পটি "শ্রীযুক্ত দেবব্রত গুহ হুবহু অনুলেখন করিয়াছেন—গল্পের অঙ্গহানি বা নামটি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করেন নাই।" এ জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইয়া তিনি লিখিয়াছেন—"কেবল প্রথম কয়েক ছত্র নিজে লিখিবার কষ্ট স্বীকার করিয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণীর লেখনীপ্রসূত বলিয়া গল্পটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার রসিকতাবোধ অমার্জ্জনীয়।"

সাহিত্যে এই চৌর্য্যবৃত্তি নিশ্চয়ই নিন্দনীয়।

ভারত সরকারের আয়-ব্যয়

ভারত সরকারের আগামী বর্ষের বাজেট সামরিক বাজেট। কারণ, ইতোমধ্যেই সামরিক ব্যয় দৈনিক ৪০ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে এবং অবস্থা যেরূপ তাহাতে উহা বিবর্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনাই প্রবল।

এ বার বাজেটে আয়-ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব এইরূপ :—

আয়—

সাধারণ হিসাবে···১৪০ কোটি টাকা

ব্যয়—

সিভিল এষ্টিমেট···৫৪ কোটি ৭ লক্ষ টাকা

সামরিক ব্যয়···১৩৩ কোটি টাকা

মোট ··১৮৭ কোটি ৭ লক্ষ টাকা

সুতরাং এ বার ঘাটতীর পরিমাণ—৪৭ কোটি ৭ লক্ষ টাকা। এই ঘাটতীর পূরণোপায় কি ?—

(১) আয়কর বর্দ্ধিত করা হইতেছে। কিন্তু যে ভাবে ইহা বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাতে মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন-দিগকেও অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। যে সময় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যয় বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং কোন কোন স্থানে লোককে অপসারিত করাও হইতেছে, সে সময় এই অবস্থার লোকের পক্ষে আয়কর বৃদ্ধির ফল কিরূপ তাহা সহজেই অনুমেয়।

(২) পেট্রলের উপর কর প্রতি গ্যালনে ১২ আনার স্থানে ১৫ আনা করা হইল। পেট্রলের উপর কর ইতঃপূর্ব্বে যে ভাবে বর্দ্ধিত করা হইয়াছে, তাহা আমরা সমর্থনযোগ্য মনে করি না। কিন্তু এ বার—শেরিডেন যাহাকে "That imperi l tyrant State necessity" বলিয়াছেন তাহাই। ব্রহ্মই এ দেশে অধিক পেট্রল যোগাইত, সেই ব্রহ্ম আজ হস্তচ্যুত হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে—কেবল যে তথা হইতেই পেট্রল আমদানীর আশা দুরাশা তাহা নহে, অন্যান্য দেশ হইতেও তাহা আমদানী করা দুষ্কর। অথচ সামরিক কার্য্যে পেট্রলের প্রয়োজন এত অধিক যে, বর্ত্তমান কালে যুদ্ধকে "পেট্রলের যুদ্ধ" বলা হয়। কিন্তু যে সময় সামরিক প্রয়োজনে ট্রেণের সংখ্যাও এত হ্রাস করা হইয়াছে যে, কলিকাতায়—রাণীগঞ্জের অদূরবর্ত্তী স্থানে—কয়লার মণ প্রায় ২ টাকা হইতেছে, সেই সময় পেট্রলের অভাবে লোকের যাতায়াতে অসুবিধার অন্ত থাকিবে না।

(৩) পোষ্ট কার্ডের মূল্য আর বর্দ্ধিত করা হয় নাই বটে, কিন্তু পত্রের জন্য ডাক টিকিটের মূল্য ৫ পয়সার স্থানে ৬ পয়সা করা হইল। এক পয়সার পোষ্ট কার্ডে হিমাচল হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত পত্র লিখা যাইত—ইহা এ দেশে ইংরেজ শাসনের গর্ব্বের বিষয় ছিল। তখন খাম ও চিঠি লিখিবার কাগজ এক সঙ্গে ২ পয়সায় পাওয়া যাইত। টিকিটের দাম ৬ পয়সা করা হইল।

তারের মূল্যও বাড়িল।

আবার—এই সকল নূতন ব্যবস্থায় আয় ১২ কোটি টাকা বাড়িবে ; কিন্তু তাহা হইলেও ঘাটতীর পরিমাণ ৩৫ কোটি টাকা থাকিবে এবং সে টাকা ঋণরূপে গ্রহণ করা হইবে।

ভারত সরকারের অর্থ-সচিব বলিয়াছেন, সাধারণ সময়ে এই ঋণ-বৃদ্ধিতে চিন্তার কারণ আছে বটে, কিন্তু অসাধারণ সময়ে তাহাতে তিনি ভবিষ্যতের জন্য উৎসাহ অনুভব করিতে পারেন। অবশ্য তিনি যে ভবিষ্যতের কথা বলিয়াছেন, সে ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন—যুদ্ধের ধূম যখন সরিয়া যাইবে এবং আবার স্বস্তির আলোক দেখা দিবে, তখন কি হইবে তাহা আজ অনুমান করিবারও উপায় নাই।

আয়করের সুপার টেক্স প্রভৃতি যে ভাবে বাড়িল, তাহাতে ধনীরও ধন রাখা দায় হইয়া উঠিবে। ভারত সরকার যখন ঋণ গ্রহণ না করিয়া কিছুতেই ঘাটতী মিটাইতে পারিবেন না, তখন ঋণের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিয়া এই সকল কর হইতে লোককে এই সঙ্কটকালে অব্যাহতি দিলে, পরে সেই ঋণ কিরূপে শোধ করিলে লোকের ক্লেশ সর্ব্বাপেক্ষা অল্প হইবে, তাহা বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবার অবসর পাওয়া যাইত।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে দেশরক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ঋণ গ্রহণ আরম্ভ হয়। তাহাতে গত জানুয়ারী মাসের শেষ পর্য্যন্ত মোট ১১০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় দেশরক্ষার ঋণ ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে গৃহীত হয়। তাহার পর্ব্ব শেষ হইয়াছে। যে সকল "বণ্ডে" সুদ দিতে হইবে না, সে সকলেও উল্লেখ-যোগ্য টাকা পাওয়া দিয়াছে। সমর সার্টিফিকেট ও ষ্ট্যাম্প বিক্রয় করিয়া সরকার ৪ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা পাইয়াছেন।

মার্কিণ যে "ইজারা ও ঋণ" ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহার সুবিধা ভারতবর্ষকেও দেওয়া হইয়াছে। ইতোমধ্যেই

যে সকল মালের জন্য "অর্ডার" মার্কিণে দেওয়া হইয়াছে, সে সকলের মূল্য প্রায় ৪৭ কোটি টাকা হইবে। বলা বাহুল্য, যুদ্ধের জন্য উপকরণের প্রয়োজন আরও হইবে। তবে এই সকল উপকরণের মূল্য হিসাবে যে ঋণ হইবে, তাহা পরিশোধের কি ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা জানিবার উপায় আমাদিগের নাই।

—

বাঙ্গালা সরকারের বাজেট

বাঙ্গালার অর্থ-সচিব ডক্টর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার প্রথম বাজেট পেশ করিয়াছেন। তাঁহাকে বাজেটের জন্য কেহই অভিনন্দিত করিতে পারিবেন না; কিন্তু তিনি তাঁহার প্রদেশবাসীর সহানুভূতি লাভের অধিকারী। মাত্র দুই মাস পূর্ব্বে নূতন সচিবসঙ্ঘ কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার পর তিন সপ্তাহকাল মধ্যেই তাঁহাদিগকে বাজেট রচনা করিতে হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় স্বভাবতঃই অর্থ-সচিবের পক্ষে তাঁহার মনোমত বাজেট রচনা করা সম্ভব নহে। তথাপি তিনি যে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সচিবসঙ্ঘের মত প্রথম বার দপ্তর-খানার কর্ম্মচারীদিগের রচিত বাজেটই অবিচারিত-চিত্তে গ্রহণ করেন নাই, ইহা তাঁহার পক্ষে প্রশংসার কথা। সর্ব্বোপরি মনে রাখিতে হইবে—যুদ্ধের সময় যখন দেশরক্ষার কার্য্য জাতিগঠনের প্রয়োজনকেও নিষ্প্রভ করিয়াছে, সেই সময় দেশরক্ষার প্রয়োজন স্মরণ রাখিয়া বাজেট রচনা করিতে হইয়াছে। তথাপি যে, এ বার কোন নূতন কর ধার্য্য করা হয় নাই, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যদিও এ বার বাজেটে বেসামরিক রক্ষা-ব্যবস্থার জন্য প্রভূত অর্থ বরাদ্দ করিতে হইয়াছে, তথাপি হয়ত আরও অর্থব্যয় প্রয়োজন হইবে। দেশরক্ষা ব্যবস্থার ব্যয়ভার ভারত সরকারের বহন করিবার কথা হইলেও বেসামরিক রক্ষা-ব্যবস্থার ব্যয় তাঁহারা কতকটা প্রাদেশিক সরকারের উপরে ন্যস্ত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, জাপানী সেনাবাহিনী ব্রহ্মে প্রবেশ করিয়া রেঙ্গুণে বোমাবর্ষণ ও রেঙ্গুণাভিমুখে অগ্রসর হওয়ায় বাঙ্গালায় বেসামরিক রক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজন বিশেষ বর্দ্ধিত হইয়াছে। বিশেষ কলিকাতা ও চট্টগ্রামের বন্দরদ্বয় হইতে চীনের জন্য সমর-সরঞ্জাম প্রভৃতি প্রেরিত হওয়ায় বাঙ্গালা আক্রমণের আশঙ্কা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে জলপথে রেঙ্গুণে সাহায্য প্রেরণ বন্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে স্থলপথে তাহা প্রেরণের ব্যবস্থা হইতেছে। আর সিঙ্গাপুরের পতনে ভারত মহাসাগরে জাপানী সামরিক নৌবহরের প্রবেশ ও যথেচ্ছা বিচরণ সহজসাধ্য হইয়াছে। ইতোমধ্যেই জাপানী জাহাজের বঙ্গোপসাগরে বিচরণের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে এবং বৃটিশের পক্ষে মাইন স্থাপন করাও হইয়াছে।

গত বৎসর তিনটি উল্লেখযোগ্য নূতন কর স্থাপিত করা হইয়াছিল—(১) বিক্রয় কর, (২) পেট্রল কর, (৩) কাঁচা পাট বিক্রয় কর। বর্ত্তমান অবস্থায় আশা করা যায়, প্রথমটিতে ২৫ লক্ষ, দ্বিতীয়টিতে ২ লক্ষ ও তৃতীয়টিতে ৮ লক্ষ—মোট ৩৫ লক্ষ টাকা আয় হইবে। কিন্তু ব্যবসা যেরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, পেট্রল যে-ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হইতেছে এবং কাঁচা পাট বিদেশে পাঠান যেরূপ দুঃসাধ্য হইয়াছে, তাহাতে এই আনুমানিক আয়ও থাকিবে কি না, বলা যায় না।

গত যুদ্ধের সময় যেমন নিতান্ত প্রয়োজনীয় কায ব্যতীত কোন নূতন ব্যয়সাধ্য কায আরম্ভ করা হয় নাই, এ বার—নূতন সচিব-সঙ্ঘ তেমনই কোন নূতন উল্লেখযোগ্য জাতিগঠন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। তথাপি যে তাঁহারা—জিলাগুলিতে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য অতিরিক্ত ৫ লক্ষ টাকা এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগকে শিক্ষাদান জন্য ৯২ হাজার টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন, তাহা যেমন উল্লেখযোগ্য; তেমনই স্বাস্থ্য বিভাগে নূতন বরাদ্দ ব্যয় যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে ৩৫ হাজার টাকা ও সদর হাসপাতালসমূহের উন্নতি-সাধন জন্য ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দান উল্লেখযোগ্য—সন্দেহ নাই। আমরা বাজেটে আর দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করিব—(১) বীরভূম, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ ও মালদহ এই ৫টি জিলায় পুষ্করিণীসমূহের সংস্কার জন্য ঋণ বা অগ্রিম দান হিসাবে প্রায় লক্ষ টাকা প্রদান করা হইবে। (২) বাঙ্গালায় যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ অভিশাপের মত অনুভূত হইয়াছে এবং বাঙ্গালার সর্ব্ববিধ উন্নতির পথ বিঘ্নকঙ্কর-কণ্টকিত করিতেছে, তাহা দূর করিয়া সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সংস্থাপনের জন্য লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। অবশ্য দ্বিতীয় দফার ব্যয় কি ভাবে করা হইবে, সাফল্য বিশেষভাবে তাহার উপর নির্ভর করিবে।

যত দিন যুদ্ধের অবসান না হইবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের অনিশ্চয়তা দেশের লোকের করদান-শক্তি ক্ষুণ্ণ করিতে থাকিবে, তত দিন যে বাঙ্গালার লোককে বিশেষ বাঞ্ছিত ও একান্ত প্রয়োজনীয় নানা কার্য্যে বঞ্চিত থাকিতে হইবে, তাহা যত দুঃখের বিষয়ই কেন হউক না—তাহা অনিবার্য্য জানিয়া সহ্য করিতেই হইবে। আমরা আশা করি, যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে যুযুধান দেশসমূহ যখন আর্থিক ক্ষতি পূরণের জন্য ভারতের সহিত ব্যবসাবৃদ্ধির চেষ্টা করিবে এবং ভারতবর্ষও পাট, লৌহ প্রভৃতি বিদেশে পাঠাইয়া লাভবান্ হইতে পারিবে—সেই সময় বাঙ্গালার পক্ষে লাভজনক ব্যবস্থা কিরূপ করা সম্ভব হইবে, সচিবসঙ্ঘ পূর্ব্বাহ্ণে সে বিষয় বিবেচনা করিবার ভার

বিশেষজ্ঞদিগকে প্রদান করিয়া সুদিনের প্রতীক্ষায় থাকিবেন এবং সুদিনের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, সেচ—নানা দিকে উন্নতির ব্যবস্থা করিবার আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া রাখিবেন।

আপাততঃ আমরা দুর্দ্দিনের দুঃখ ও দুর্দ্দশা সাহস ও ধৈর্য্যসহকারে আশা লইয়া সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকিব। কারণ, তাহা অনিবার্য্য।

রেল বাজেট

ভারত সরকারের রেল বাজেটে যে লাভ দেখা যাইতেছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে আশাতিরিক্ত। কারণ—

বর্ত্তমান বর্ষের হিসাব—

আয়···১২৯ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা
ব্যয়···১০৩ " ৩৭ " "

উদ্বৃত্ত···২৬ কোটি ২০ লক্ষ টাকা

আগামী বর্ষের বাজেট—

আয়···১২৮ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা
ব্যয়···১০০ " ৫২ " "

উদ্বৃত্ত ২৭ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা

ভারতে রেলপথে যে সরকারের লাভই হইয়াছে, এমন নহে। ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দেও রেলের আয় হইতে সাধারণ রাজস্ব-ভাণ্ডারে দেয় টাকা প্রদান করা সম্ভব হয় নাই এবং রেল বিভাগের ঋণ—সাধারণ রাজস্ব ভাণ্ডারে ৩৫ কোটি টাকা এবং ব্যবহার-জনিত ক্ষতি-পূরণের ভাণ্ডারে ৩০ কোটি টাকা ছিল।

কিন্তু এই লাভের কারণ—যুদ্ধ। যুদ্ধের প্রয়োজনে যে অধিক লোক ও মাল বাহিত হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। তদ্ভিন্ন কলিকাতা ও উপকণ্ঠ হইতে যেমন বহু লোক রেলপথে নানা স্থানে চলিয়া গিয়াছে—মাদ্রাজ আক্রান্ত হইতে পারে এবং নগরে যাঁহাদিগের থাকিবার প্রয়োজন নাই তাঁহারা নগর ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন—মাদ্রাজ সরকারের এই ঘোষণায় তেমনই বহু লোক মাদ্রাজ ত্যাগ করিয়া যাইবার সম্ভাবনা। কেবল মাদ্রাজই নহে—ভারত মহাসাগরের ও বঙ্গোপসাগরের উপকূলস্থিত বহু স্থানের লোক বিপদের আশঙ্কায় স্থানান্তরে যাইবে, মনে করা যায়।

লোক সহর-ত্যাগের পূর্ব্বেই সামরিক প্রয়োজনে এবং বিদেশ হইতে এঞ্জিন প্রভৃতি আমদানী বন্ধ হওয়ায় রেল বিভাগ যাত্রী গাড়ীর সংখ্যা-হ্রাসে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদিগের সেই ব্যবস্থা ৫ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম ভাগ—মোটরযানের সহিত প্রতিযোগিতা হেতু যে সকল অতিরিক্ত ট্রেণ-চলাচলের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, সে সকল বন্ধ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় দফায়—আরও কতকগুলি ট্রেণের চলাচল বন্ধ করা হইয়াছে। প্রয়োজনানুসারে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম দফা কার্য্যে পরিণত করা হইবে।

বলা বাহুল্য, ইহাতে এ দেশে রেলের এঞ্জিন প্রভৃতির জন্য পরমুখাপেক্ষিতার শোচনীয় ফল সপ্রকাশ হইয়াছে। এ দেশের লোক বহু দিন হইতে এ বিষয়ে সরকারকে অবহিত হইতে বলিয়া আসিলেও তাহাদিগের অনেক কথার মত এ কথাও সরকার কর্ত্তৃক কর্ণপাতযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। গত যুদ্ধের অভিজ্ঞতায়ও যখন ভারত সরকারের এ বিষয়ে চৈতন্যোদয় হয় নাই, তখন এ বার যুদ্ধের পর ভারত সরকার, বর্ত্তমান ব্যবস্থায় থাকিলে, তাহা হইবে কি না, বলা যায় না।

যদিও রেলে লাভ আশাতীত হইয়াছে, তথাপি প্রস্তাব হইয়াছে :—

(১) যাত্রীর ভাড়া বাড়ান হইবে। আপাততঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ও নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ রেলপথদ্বয়েই এই ব্যবস্থা করা হইবে। তাহার কারণ, এই দুই রেলপথে যাত্রীর ভাড়া অন্যান্য রেলপথের ভাড়ার তুলনায় অল্প আছে।

(২) মালের—এমন কি, খাদ্য-শস্যেরও ভাড়া বাড়ান হইবে। সার এণ্ড্রু ক্লো এই ব্যবস্থার সমর্থনে বলিয়াছেন :—

"যুদ্ধারম্ভাবধি আমরা খাদ্য-শস্যের ভাড়ায় কোনরূপ পরিবর্ত্তন করি নাই। লোকের জীবিকানির্ব্বাহের ব্যয় বর্দ্ধিত হইয়াছে ; তাহা আর বর্দ্ধিত করা আমরা অভিপ্রেত বিবেচনা করি নাই। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে, অন্যান্য কারণে খাদ্য-শস্যের মূল্য যেরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাতে রেলে খাদ্য-শস্যের ভাড়া কিছু বাড়াইলে মন্দ হইত না। কারণ—গমের মূল্য দ্বিগুণ হইয়াছে। তবুও আমরা খাদ্য-শস্যের ভাড়ার হার অন্যান্য দ্রব্যের ভাড়ার হারের সমান করিতে চাহি না। আমরা কেবল—পূর্ণ এক মাল-গাড়ীতে যে মাল যায়, তদপেক্ষা অল্প খাদ্য-শস্যের ভাড়া টাকায় ২ আনা বাড়াইব।"

যে সময় খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধিতে লোকের পক্ষে অত্যাবশ্যক খাদ্য-সংগ্রহ করাও দুষ্কর হইয়াছে, সেই সময়—সকলই যখন সহিতেছে তখন ইহাই বা সহিবে না কেন, এই অসাধারণ যুক্তিতে খাদ্য-শস্যের ভাড়া টাকায় ২ আনা বাড়াইলে যে লোকের বর্ত্তমান দুর্দ্দশায় তাহাদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ না পাইয়া—তাহাতে নিষ্ঠুর অবজ্ঞাই প্রকাশ পায়, তাহাও কি সার এণ্ড্রু ক্লো বুঝিতে পারেন না ? আমরা জিজ্ঞাসা করি, যুদ্ধের প্রয়োজনে বড়লাটের পরিষদের সদস্যদিগের বেতনের হার শতকরা ৫০ টাকা কমাইলেও কি তাহা অসঙ্গত হইত ? দেশের লোকের স্বার্থ বিবেচনা করিয়াই কি রেলপথ রচিত ও পরিচালিত হয় ?

ভারতে চীনের রাষ্ট্রনায়ক

চীনের রাষ্ট্রনায়ক চিয়াং কাইসেক সপরিবারে ভারতে আসিয়াছেন, এই অপ্রত্যাশিত সংবাদ অতর্কিতে এ দেশে গত ৯ই ফেব্রুয়ারী দিল্লী হইতে প্রকাশিত হয়। চিয়াং-দম্পতি যে এ দেশে বড়লাটের সম্মানিত অতিথি হইয়াছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য। লর্ড লিন্‌লিথগো সপার্ষদ সমবেত হইয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করেন এবং বক্তৃতায় চীনের সহিত বৃটেনের যুদ্ধে সহযোগ, চীনাদিগের বীরত্ব প্রভৃতির নানা কথা বলিয়া—আপনাকে ভারতীয়ের শুভাভিষিক্ত করিয়া চীনের সহিত ভারতের দীর্ঘকালের সম্বন্ধেরও উল্লেখ করেন। চীনের রাষ্ট্রনায়ক ভারতবর্ষের —চীনের দীক্ষাতীর্থ ভারতের সহিত চীনের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়া বলেন—ভারতবর্ষ চীনের যাহা

মার্শাল চিয়াং কাই-শেক

করিয়াছে, তাহার প্রতিদান করা চীনের কর্ত্তব্য। সেই সময়েই তিনি বলেন, জাপান যদি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, তবে তাহাকে ব্রহ্মের মধ্য দিয়া আসিতে হইবে এবং ব্রহ্মে জাপানীদিগকে বাধা প্রদানে চীন সাহায্য করিবে।

চীনের রাষ্ট্রনায়ক ভারতের রাজনীতিক সমস্যা সম্পর্কে ভারতে আসেন নাই এবং সে সমস্যা সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করাও সঙ্গত বলিয়া মনে করেন নাই। তিনি তাঁহার বিদায়-বাণীতে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন—বৃটেনের সহিত একযোগে উভয়ের শত্রু জাপানের সহিত যুদ্ধ করিবার বিষয় আলোচনা করিবার জন্যই তিনি এ দেশে আসিয়াছিলেন। তথাপি তিনি এ দেশে অবস্থান-কালে একাধিক ভারতীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করায় সরকার সে ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। দিল্লীতে ও তাঁহার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন-পথে কলিকাতায় তিনি কয় জন ভারতীয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের সহিত তাঁহার নানা বিষয়ে যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহাতে যে ভারতের কথা বর্জ্জিত হয় নাই, তাহা অনায়াসে বলা যায়।

তিনি তাঁহার বিদায়-বাণীতে বলিয়াছেন :—

"আমি দৃঢ়ভাবে আশা করি এবং আমার বিশ্বাস এই যে, ভারতবাসীর পক্ষ হইতে দাবীর অপেক্ষা না রাখিয়া বৃটেন তাহাদিগকে যথাসম্ভব শীঘ্র প্রকৃত রাজনীতিক ক্ষমতা প্রদান করিবে যে, ভারতবাসীরা তাহাদিগের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব শক্তি আরও বর্দ্ধিত করিতে পারিবে এবং তাহারা বুঝিবে যে, তাহাদিগের এই যুদ্ধে যোগদান কেবল পরস্বাপহরণলোলুপদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য নহে, পরন্তু ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামে নূতন অবস্থার আরম্ভ। আমার বিবেচনায়, এই নীতিই বৃটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধির পরিচায়ক ও গৌরবজনক হইবে।"

চীনের রাষ্ট্রনায়কের এই আশার ও বিশ্বাসের ভিত্তি কি, তাহা আমরা জানি না। তবে স্বায়ত্ত-শাসনে বঞ্চিত —জন্মগত অধিকার চাহিয়া প্রত্যাখ্যাত ভারতবাসী আশা করে, বৃটিশ রাজনীতির আবিল আবর্ত্তমধ্যে এই সঙ্কট-কালে তিনি সে ভিত্তির সন্ধান পাইয়াছেন। কারণ, আমরা জানি, ভারতবাসীর আধ্যাত্মিক ও পার্থিব শক্তি বৃদ্ধির জন্য ভারতবাসী চাহিবার পূর্ব্বেই বৃটেনের তাহাকে প্রকৃত রাজনীতিক অধিকার প্রদান করা ত পরের কথা —ভারতবাসী দীর্ঘকাল তাহা চাহিয়াও পায় নাই এবং সেই কারণে নবভারতের ইতিহাসের বহু পৃষ্ঠা অশ্রুতে ও রক্তে কলুষিত হইয়াছে। আমরা আশা করি, চীনের সাহায্য যখন বৃটেনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন, তখন চীনের রাষ্ট্রনায়কের পরামর্শ বৃটেন অগ্রাহ্য করিবে না।

চিয়াং বলিয়াছেন :—

"আমি মনে করি, আমার ভারতীয় ভ্রাতৃবৃন্দ পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে এই সঙ্কটকালে চীনাদিগেরই মত সমগ্র মানবজাতির স্বাধীনতা-সংরক্ষণের কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিবেন। কারণ, কেবল স্বাধীন পৃথিবীতেই চীনের ও ভারতের জনগণ স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে। আর যদি চীনকে ও ভারতবর্ষকে স্বাধীনতায় বঞ্চিত করা হয়, তবে পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না।"

এ বিষয়ে চীনের রাষ্ট্রনায়কের মত ও ভারতবাসীর মত অভিন্ন এবং ভারতীয়রা তাঁহারই মত মনে করে, সমগ্র পৃথিবীর স্বাধীনতার সংরক্ষণ প্রয়োজন। কিন্তু তাহাদিগের অভিজ্ঞতা অতি তিক্ত। কারণ, গত যুদ্ধের পরও দুর্ব্বল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারলাভ হয় নাই—সবল দুর্ব্বলকে পদানত করিয়া রাখিয়াছে এবং পৃথিবী গণতন্ত্রের জন্য নিরাপদ হয় নাই।

এ বারও কি হইবে, তাহা বলা দুষ্কর; কারণ, বিলাতের প্রধান-মন্ত্রী এখনও বলিতেছেন, হৃত-স্বাতন্ত্র্য জাতিসমূহকে তাহাদিগের নষ্ট-স্বাধীনতা প্রদান বর্ত্তমান যুদ্ধে বৃটেন ও মার্কিণের উদ্দেশ্য হইলেও সে উদ্দেশ্য ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে!

চীনের রাষ্ট্রনায়ক বলিয়াছেন :—

"বর্ত্তমান সংগ্রাম স্বাধীনতায় ও দাসত্বে, আলোকে ও অন্ধকারে, ভালয় ও মন্দে সংগ্রাম।"

ভারতবাসী যদি বৃটেনের কার্য্যে ও ব্যবহারে এই উক্তি সত্য বলিয়া বুঝিতে পারে, তবে যে জগতের স্বাধীনতার সংগ্রামে তাহার আগ্রহ শতগুণ বৃদ্ধি পাইবে, তাহা বলা বাহুল্য। বাস্তবিক ইতোমধ্যেও ভারতবাসীরা গণতান্ত্রিক দেশসমূহের সাহায্যে অগ্রসর হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু সে যে যুদ্ধের পরে আপনি গণতান্ত্রিক শাসন লাভ করিবে, সে কেবল সেই প্রতিশ্রুতি চাহিয়াছে।

চিয়াং আরও বলিয়াছেন :—

"ন্যায়ের জন্য আত্মত্যাগের বাসনা ভারতীয় ও চীনাদিগের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য হেতুই আজ উভয়ের এই কায করা কর্ত্তব্য।"

ভারতবর্ষের যে শিক্ষা ও দীক্ষা চীন লাভ করিয়াছে এবং লাভ করিয়া তাহার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছে, চিয়াং সেই শিক্ষা ও দীক্ষার কথাই বলিয়াছেন। ভারতবর্ষ সেই শিক্ষা ও দীক্ষা বিস্মৃত হয় নাই এবং বিস্মৃত হয় নাই বলিয়াই সে বিশ্বাস করে—অন্যায় ও অধর্ম্ম কখন স্থায়ী হইতে পারে না।

ভারতবর্ষ পরস্বাপহরণকারীর সমর্থক নহে—তাহার বিরোধী। যদি ভারতের ও বর্ত্তমানে চীনের ভাব প্রতীচীর সাম্রাজ্যবাদের পতনের কারণ হয়, যদি প্রতীচীর মনোভাবের পরিবর্ত্তন সাধনে সমর্থ হয়, তবে তাহা জগতের পক্ষে পরম কল্যাণের কারণই হইবে এবং তাহা হইলেই পৃথিবী প্রকৃত শান্তিতে স্নিগ্ধ হইবে।

পৃথিবীর পরিবর্ত্তনের সন্ধিক্ষণে চীনের রাষ্ট্রনায়ক যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে যদি চীনের মিত্র বৃটেন, মার্কিণ ও রুশিয়ার সম্মতি থাকে, তবে ভারতের ও চীনের সহযোগে ও সাহায্যে ঐ সকল দেশ পৃথিবীতে আধ্যাত্মিকতার নবীন যুগের প্রবর্ত্তনে সাহায্য করিয়া ধন্য হইতে পারিবে।

চিয়াং বলিয়াছেন, ভারতবর্ষে আসিয়া তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন এবং লক্ষ্য করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছেন যে, ভারতবাসীরা পরস্বাপহরণে বাধাদান করিতে কৃতসঙ্কল্প।

ভারতবর্ষের লোক যদি এই যুদ্ধকে আপনাদিগের যুদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করিবার সুযোগ লাভ করে, তবে ভারতের ও চীনের লোকবল ও উপকরণ স্বৈরশাসনবিলাসী জাতিসমূহের পতনের কারণ হইবে, সন্দেহ নাই।

লর্ড লিন্‌লিথগোর বক্তৃতার উত্তরে চীনের রাষ্ট্রনায়ক কবি রবীন্দ্রনাথের কথা বলিয়াছিলেন। স্বদেশে যাত্রার পূর্ব্বে তিনি "বিশ্বভারতী" দেখিতে গিয়াছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধানিদর্শনরূপে "শান্তি-নিকেতনের" চীনা-ভবনের জন্য ৩০ হাজার টাকা ও "শান্তি-নিকেতনে" রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার কাযের জন্য ব্যবহারার্থ ৫০ হাজার টাকা দিয়াছেন।

—

অধিকার!

প্রাচীতে যুদ্ধ অপেক্ষা প্রতীচীতে যুদ্ধে অধিক মনোযোগ দিবার বিষয় যখন বৃটেন ও মার্কিণ আলোচনা করে, তখন অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান-মন্ত্রী তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন :—

(১) জাপানের যুদ্ধ জার্ম্মাণী ও ইটালীর যুদ্ধের অংশমাত্র নহে।

(২) অষ্ট্রেলিয়াকে যুদ্ধরত হইবার মত ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ইহার পর অষ্ট্রেলিয়া যখন বৃটেনের মধ্যস্থতার অপেক্ষা না রাখিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধ সম্বন্ধে মার্কিণের সহিত আলোচনা করিবার অধিকার দাবী করে, তখন বৃটেন—বাধ্য হইয়া—সেই প্রস্তাব শাসন-পদ্ধতির অননুমোদিত হইলেও—তাহাতে সম্মতি দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বলা হয়—(১) নিউজিল্যাণ্ড, কানাডা ও দক্ষিণ আফ্রিকা যদি সেইরূপ অধিকার চাহে, তবে তাহাদিগকেও তাহা দেওয়া হইবে, (২) অষ্ট্রেলিয়া যদি স্বদেশরক্ষার জন্য বিদেশে সাম্রাজ্যের জন্য যুদ্ধরত অষ্ট্রেলিয়ানদিগকে স্বদেশে আনিতে চাহে, তবে তাহাতেও সম্মতি দিতে হইবে। ইহার পর প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধের জন্য এক স্বতন্ত্র পরামর্শ-পরিষদ গঠিত করা হইয়াছে এবং গত ১২ই ফেব্রুয়ারী দিল্লী হইতে ভারত সরকার নিম্নলিখিত মর্ম্মে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন :—

"ডোমিনিয়ন-সমূহ সমর-পরিষদে ও প্রশান্ত মহাসাগরের সমর-পরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণের যে অধিকার লাভ করিয়াছে, বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষকেও সেই অধিকার প্রদান করিতে আগ্রহশীল। ঐ সকল পরিষদে সমর-পরিচালনের নীতি স্থির করা হইবে। সেই জন্য বৃটিশ সরকার ভারত সরকারকে অভিপ্রায়ানুরূপ প্রতিনিধি প্রেরণ-ব্যবস্থা করিতে আহ্বান করিয়াছেন।"

বিলাতের প্রধান-মন্ত্রী মিষ্টার চার্চ্চিল সার তেজবাহাদুর সপরু-প্রমুখ ব্যক্তিদিগের দীর্ঘ দিন পূর্ব্বে প্রেরিত তারের যে সংক্ষিপ্ত আংশিক উত্তর দিয়াছেন, তাহাতেও তিনি ভারতবর্ষকে ঐ অধিকার প্রদানের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা "ক্যামুফ্লাজ" ব্যতীত আর কি বলা যায়? ভারত সরকার বিদেশী শাসকদিগের

সরকার—ভারতবাসীর প্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠান নহে। কাযেই ভারত সরকারকে কোন প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার প্রদান ভারতবাসীকে অধিকার প্রদান নহে—তাহা কেবল বৃটেনেরই স্বীয় প্রতিষ্ঠানকে অধিকার প্রদান। এই হিসাবেই বৃটেন জাতিসঙ্ঘে ভারতের প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছিল এবং গত যুদ্ধেও এই হিসাবে লর্ড সিংহকে প্রথমে যুদ্ধ-পরিষদে ও তাহার পর শান্তি-পরিষদে ভারতের প্রতিনিধি বলা হইয়াছিল। ভারতবাসীর ইহাতে ইষ্টাপত্তি কিছুই নাই।

ট্রেণ-দুর্ঘটনা

কিছুদিন হইতে ভারতের রেলপথে দুর্ঘটনার বাহুল্য লক্ষিত হইতেছে। গত ২২শে মাঘ রাত্রি ৮টায় কলিকাতার উপকণ্ঠে কাঁকুড়গাছির নিকটে "বেঙ্গল এণ্ড আসাম রেলের" দুইখানি যাত্রী ট্রেণে সঙ্ঘর্ষ হইয়াছে। বিস্ময়ের বিষয়, দুইখানিই কলিকাতাগামী ট্রেণ—এক অপরের অনুসরণ করিতেছিল। তাহার পর "ইষ্ট ইণ্ডিয়ান" রেলপথের এলাহাবাদ-ফতেপুর শাখায় খাগা ষ্টেশনের নিকটে একখানি আপ পার্শেল ট্রেণের সহিত একখানি মালগাড়ীর সঙ্ঘর্ষ হইয়াছে। এই সঙ্ঘর্ষে ১৫ জন যাত্রী নিহত ও ৫২ জন আহত হইয়াছেন। এ দিকে যদি ভারতবর্ষে বিমান হইতে আক্রমণ হয়, সেই জন্য বৈদ্যুতিক "সিগন্যাল" ব্যবহার পরিবর্তন করা হইতেছে। যখন মোটর-যানের স্থান আবার অশ্ববাহিত যান ও গোযান অধিকার করিতেছে, তখন পুরাতন ব্যবস্থার পুনরাবর্ত্তনে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না। তবে তাহাতে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বৃদ্ধি হইবে না ত ?

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট "বেঙ্গল এণ্ড আসাম রেলের চুয়াডাঙ্গা ও জয়রামপুর ষ্টেশনদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে কলিকাতাগামী ঢাকা ডাকগাড়ী লাইনভ্রষ্ট হওয়ায় যে ৪২ জন যাত্রী হত ও ৮২ জন আহত হইয়াছিলেন, তাহার জন্য কতকগুলি লোককে অপরাধী বলিয়া তাহাদিগকে মামলাসোপর্দ্দ করা হইয়াছে। আসামীদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ—তাহারা ট্রেণ নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে রেল-লাইনের বোল্ট প্রভৃতি খুলিয়া দুর্ঘটনা ঘটাইয়াছিল। মামলা বিচারাধীন।

দল-নিরপেক্ষ সম্মিলন

কিছু দিন হইতে ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় কতিপয় ব্যক্তি সার তেজবাহাদুর সপরুর নেতৃত্বে বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতকে বিস্তৃত রাজনীতিক অধিকার প্রদানের জন্য বৃটেনকে প্ররোচিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। অল্প দিন পূর্ব্বে তাঁহারা সে সম্বন্ধে বিলাতের প্রধান-মন্ত্রীকে তার করিয়াছিলেন। কলিকাতায় সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের সভাপতিত্বে এক সভায় সেই দলের প্রস্তাব সমর্থিত হইবার পর দিল্লীতে তাঁহাদিগের সম্মিলন হয়। তাহাতে সার তেজবাহাদুর বলেন—বর্ত্তমান অবস্থায় বৃটেনের পক্ষে সাহস ও বিশ্বাস প্রয়োজন। ভারতবাসীকেও তিনি ঐ প্রয়োজনে অবহিত হইতে বলেন।

অধিবেশনে মিষ্টার জয়াকর দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন—এখনও ভারত সরকারের প্রকৃত ক্ষমতা ইংরেজদিগের হস্তগত ও তথায় কেন্দ্রীভূত।

অধিবেশনে সরকারকে অবিলম্বে নিম্নলিখিত কয়টি কায করিতে বলা হয়—

(১) ভারতবর্ষ যে আর বিলাত হইতে শাসিত অধীন দেশ বলিয়া বিবেচিত হইবে না, সেই প্রতিশ্রুতি প্রদান

(২) যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বড়লাটের শাসন-পরিষদ প্রকৃত জাতীয় সরকাররূপে গঠিত করা

(৩) বৃটিশ সরকার কর্ত্তৃক ঐ জাতীয় সরকার কর্ত্তৃক যুদ্ধ ও শান্তি-বৈঠকে ভারতের প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার-স্বীকার

(৪) বৃটিশ সরকার কর্ত্তৃক যে ভাবে ডোমিনিয়ন-সমূহের পরামর্শ গৃহীত হয়, সেই ভাবে ভারতের ঐ জাতীয় সরকারের পরামর্শ গ্রহণ।

সার তেজবাহাদুর সপরু বলেন—এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এখনও এ দেশের লোকের বিশ্বাস, বৃটেন ভারতীয়দিগকে বিশ্বাস করে না এবং বৃটেন কেবল প্রতিশ্রুতি দিলেই লোক তাহাতে নির্ভর করিতে পারিবে না। বৃটেনকে ভারত সম্বন্ধে তাহার নীতির পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

পূর্ব্বে মিষ্টার চার্চ্চিলকে যে তার প্রেরণের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা তিনি আমেরিকা যাত্রাকালে পাইয়াছিলেন বলিয়া যথাকালে তাহার উত্তর দিতে পারেন নাই, জানাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু দীর্ঘকাল পরে তিনি যে উত্তর দিয়াছেন, তাহাতে ভারতবাসীর রাজনীতিক আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। বৃটিশ সরকার যে ভারত সরকারকে (ভারতবাসীকে নহে) বৃটেনে সমর-পরিষদে ও প্রশান্ত মহাসাগরের সমর-পরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার দিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, পরে আর যে সকল প্রস্তাব করা হইয়াছে, সে সকল শাসন-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন সম্বন্ধীয় এবং সে সকলের ফল বহুদূর ব্যাপ্ত। অর্থাৎ যে ভারত সরকার ভারতের জাতীয় সরকার নহে, তিনি সেই সরকারকে সমর-পরিষদদ্বয়ে প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য আমন্ত্রিত করিয়া প্রকৃত অধিকার সম্বন্ধে কোনরূপ মত প্রকাশ করিতে বিরত থাকিয়াছেন। বলা বাহুল্য—তাঁহার এই কায যেমন রাজনীতিকোচিত নহে—তেমনই ভারতবাসীকে সন্তুষ্ট করিবার পক্ষে সহায় হইতে পারে না।

মাসিকপত্র ও বিক্রয় কর

বর্ত্তমান অবস্থায় বিক্রয় কর বর্জ্জন করা বাঙ্গালা সরকারের পক্ষে অসম্ভব বলিয়াও অর্থ-সচিব আশ্বাস দিয়াছেন, যে সকল দ্রব্যে ঐ কর বিশেষ অসঙ্গত ও পীড়াদায়ক, তিনি সে সকল দ্রব্য ঐ কর হইতে অব্যাহতি দিবার বিষয় বিবেচনা করিবেন। সেই জন্য আমরা তাঁহাকে মাসিকপত্র ঐ কর হইতে অব্যাহতিদানের জন্য অনুরোধ করিতেছি। পুস্তক ও সংবাদপত্রের উপর ঐ কর জ্ঞানের উপর কর ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। সংবাদপত্র অব্যাহতি পাইলেও সংবাদপত্র বলিয়া ডাকঘরের নিয়মে বিবেচিত মাসিকপত্র কেন যে অব্যাহতি লাভ করে নাই, তাহা বুঝা যায় না। মাসিকপত্রিকাগুলির উপর এই কর ধার্য্য হওয়ায় যে অসুবিধা ও ক্ষতি হইতেছে, তাহা বিবেচনা করিয়া অর্থ-সচিব এই কর বর্জ্জন করিবেন, আমরা কি এই আশা প্রকাশ করিতে পারি না?

শরৎচন্দ্রের প্রতি ব্যবহার

ভারত সরকার শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুকে গ্রেপ্তার করিয়া বিনা-বিচারে তাঁহাকে ত্রিচিনপল্লী জেলে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এই বিষয়ে বাঙ্গালা সরকারের কথায় ভারত সরকার কর্ণপাতও করেন নাই। সম্প্রতি বাঙ্গালার সচিব শ্রীযুত সন্তোষ-কুমার বসু ও নবাব খাজা হবিবুল্লা বাহাদুর ত্রিচিনপল্লী জেলে শরৎ-বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিবার পর যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা আমরা সভ্য সরকারের পক্ষে লজ্জাজনক বিবেচনা করি। শরৎবাবুকে আহার্য্যের জন্য দৈনিক মাত্র ৯ আনা দেওয়া হয় এবং তিনি স্বয়ং ঐ বাবদে আরও ১০ টাকা—নিজ তহবিল হইতে—ব্যয় করিতে পারেন। যে দেশে সিভিল সার্ভিসে চাকরীয়া-দিগের বেতন অন্যান্য দেশে ঐরূপ চাকরীয়াদিগের বেতন-তুলনায় অকারণ অধিক, সেই দেশে মাসিক ১২ হইতে ১৫ হাজার টাকা উপার্জ্জনকারী দেশনায়ককে আহার্য্যের জন্য দৈনিক মাত্র ৯ আনা প্রদান করায় লোকের মনে কিরূপ সন্দেহের উদ্ভব হইতে পারে, তাহা, বোধ হয়, বলিয়া দিতে হইবে না। প্রত্যেক ইটালীয়ান্ বন্দীর খোরাকীর জন্য ভারত সরকার দৈনিক কত ব্যয় করিতেন? আহার্য্য এত কদর্য্য যে, শরৎবাবু স্বয়ং স্বীয় আহার্য্য প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেশবাসীরা কখন এই ব্যবহার বিস্মৃত হইবে না। বাঙ্গালার সচিবদিগের আবেদনে ভারত সরকার অসীম উদারতার পরিচয় দিয়া স্থির করিয়াছেন—শরৎবাবু আহার্য্যের জন্য দৈনিক ৯ আনা পাইলেও নিজ ভাণ্ডার হইতে ৪০ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করিতে পারিবেন এবং তাঁহার পরিজনগণের জন্য মাসিক এক হাজার টাকা প্রদান করা হইবে। শরৎ-বাবুর সম্বন্ধে বাঙ্গালার সচিবসঙ্ঘের বিবৃতি লইয়া বাঙ্গালার অন্যতম সচিব শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পুনরায় দিল্লীতে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র-সদস্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা শরৎ বাবুকে মুক্তি দিতে—অভাবে তাঁহাকে বাঙ্গালার কোন স্থানে—অন্ততঃ বাঙ্গালার বাহিরে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে স্থানান্তরিত করিতে ও তাঁহার পরিজনগণকে মাসিক ৩ হাজার টাকা দিতে বলিয়াছেন।

যমুনলাল বাজাজ

পরলোকে শেঠ যমুনালাল বাজাজ

গান্ধীজীর অনুরক্ত ভক্ত শেঠ যমুনালাল বাজাজ অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন। খদ্দর-প্রচারে ও অসহযোগ আন্দোলনে তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। জয়পুর রাজ্যে সত্যাগ্রহ করিবার সময় তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়; এবং তাহাই তাঁহার অকাল-মৃত্যুর কারণ।

সরোজবাসিনী সেন

পরলোকে সরোজবাসিনী সেন

গত ১৪ই ডিসেম্বর মধ্যপ্রদেশস্থ রায়পুরের দায়রা জজ শ্রীযুত হেমচন্দ্র সেনের পত্নী সরোজবাসিনী পরলোকগতা হইয়াছেন। ইঁহার সাহিত্যানুরাগের পরিচয় বহু রচনায় পাওয়া গিয়াছিল। তিনি স্বামীর কর্ম্মস্থান নাগপুরে ভারতীয় সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

২০শ বর্ষ] চৈত্র, ১৩৪৮ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

রস

৩

সকল রসের আদিভূত শৃঙ্গাররস। তাই 'আদিরস' ইহার অপর নাম। সাধারণ ভাবে ইহার নিম্নোক্তরূপ লক্ষণ প্রদত্ত হইয়া থাকে—'পুরুষের নারীর প্রতি ও নারীর পুরুষের প্রতি যে সম্ভোগ-স্পৃহা, তাহাই 'শৃঙ্গার' নামে খ্যাত—উহা ক্রীড়া-রতি প্রভৃতির জনক' (১)। সাহিত্য-দর্পণকার 'শৃঙ্গার'-শব্দের ব্যুৎপত্তি-প্রদর্শন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'শৃঙ্গ'-শব্দের অর্থ মন্মথের (অর্থাৎ সম্ভোগেচ্ছার) উদ্ভেদ (অর্থাৎ উদ্বোধ)। এইরূপ কামোদ্বোধ শৃঙ্গার-রসের হেতুভূত। শৃঙ্গার 'প্রায়শঃ উত্তম-প্রকৃতির নায়ক-নায়িকাশ্রিত হইয়া থাকে' (২)। অধম-প্রকৃতির নায়ক-নায়িকা যথার্থ শৃঙ্গারের আশ্রয় হয় না। পক্ষান্তরে, উহারা শৃঙ্গারাভাসেরই কারণ (৩)। পরকীয়া নায়িকার অন্তরভেদ পরোঢ়া নায়িকা আর অননুরাগিণী সাধারণী নায়িকাও শৃঙ্গারভাসের হেতু—শৃঙ্গারের নহে। স্বকীয়া নায়িকা, পরকীয়ার মধ্যে কন্যকা ও অনুরাগিণী সামান্যা নায়িকা (অর্থাৎ বেশ্যা) ও দক্ষিণ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর নায়কবর্গ শৃঙ্গারের অনুকূল আলম্বন (৪)। যাঁহারা রস-সাহিত্যসেবী, এই তথ্যগুলি তাঁহাদিগের সাবধানে সর্ব্বদাই স্মরণে রাখা উচিত। অন্যথা যথার্থ রসসৃষ্টির পরিবর্ত্তে রসাভাসের সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা আছে। দর্পণকারের উক্তি হইতে বুঝা যায় যে—শৃঙ্গ (মন্মথোদ্ভেদ) যাহার কারণরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে, তাহাই শৃঙ্গার; অথবা, শৃঙ্গের দ্বারা সহৃদয় সামাজিকগণ যাহাকে অনুভূতির বিষয়রূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহাই শৃঙ্গার (৫)। একমাত্র সহৃদয় (অর্থাৎ রসগ্রাহী) সামাজিকবর্গই শৃঙ্গার-রসাস্বাদনে সমর্থ; কারণ, যাঁহারা বীতরাগ উদাসীন

(১) "পুংসঃ স্ত্রিয়াং স্ত্রিয়াঃ পুংসি সম্ভোগং প্রতি যা স্পৃহা।
স শৃঙ্গার ইতি খ্যাতঃ ক্রীড়ারত্যাদিকারকঃ"।

(২) "শৃঙ্গং হি মন্মথোদ্ভেদস্তদাগমনহেতুকঃ।
উত্তমপ্রকৃতিপ্রায়ো রসঃ শৃঙ্গার ইষ্যতে"।
—সাহিত্যদর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ।

(৩) "উত্তমঃ প্রকৃতিনায়কো যত্র স প্রায় ইত্যনেন শৃঙ্গারাভাসাদাবধমপ্রকৃতিত্বং সূচিতম্"—রামতর্কবাগীশ-টীকা।

(৪) "পরোঢ়াং বর্জ্জয়িত্বা তু বেশ্যাঞ্চানুরাগিণীম্।
আলম্বনং নায়িকাঃ স্যুর্দক্ষিণাদ্যাশ্চ নায়কাঃ"।
—সাঃ দঃ, ৩ পরিঃ।

"অত্র শৃঙ্গারে পরোঢ়ানুরাগিবেশ্যাবর্জ্জনং তদ্বিষয়রসস্য শৃঙ্গারাভাসত্বাৎ"—রামতর্কবাগীশ-টীকা।

(৫) "মন্মথস্য সম্ভোগেচ্ছায়া উদ্ভেদ উদ্বোধঃ, তদাগমনহেতুকঃ মন্মথোদ্ভেদপ্রাপ্তিজন্য...এবঞ্চ শৃঙ্গমৃচ্ছতি কারণত্বেন প্রাপ্নোতীতি

র্তি বা রসবর্জ্জিত (যথা, রঙ্গস্পৃহের অভ্যন্তরস্থ কাষ্ঠ-লোষ্ট্র-পাষাণের তুল্য নীরস বেদাভ্যাসী বা জরন্মীমাংসক), তাঁহাদিগের নিকট রসোৎপত্তিরই সম্ভাবনা নাই (৬)।

পূর্ব্বোক্ত বিচার হইতে বেশ বুঝা যায়, সাধারণতঃ আমাদিগের মনে ধারণা আছে যে—শৃঙ্গার বা আদিরস অত্যন্ত অশ্লীল, অতএব সুরুচিপূর্ণ শিক্ষিত সমাজে উহার সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা করাও নিষিদ্ধ—ইহা নিতান্তই ভ্রান্ত ধারণা। শৃঙ্গারাভাসই (অর্থাৎ যাহা আসল শৃঙ্গার নহে—নকল মাত্র—pseudo-erotic) অশ্লীল। যথার্থ শৃঙ্গার অশ্লীল হইতেই পারে না। যেহেতু, উহা রস। রস-বস্তু আস্বাদ্য আনন্দস্বরূপ। এই আনন্দ কেবল ইন্দ্রিয়-ভোগ্য সুখ নহে—উহা লোকোত্তর সুখ-দুঃখাতীত বস্তু—অজ্ঞানাবরণ-বিহীন চিন্মাত্র-স্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। এই পরমানন্দ-স্বরূপ রস যখন শৃঙ্গারের বিশিষ্ট-রূপ ধারণ করিয়া আস্বাদ্যমান হয়, তখনও উহার আনন্দ-রূপতার কোন হানি হয় না। বিশেষতঃ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু যখন উহার অধিপতি-দেবতারূপে বিরাজমান। অতএব যথার্থ শৃঙ্গাররস উপযুক্ত কবির কাব্যে পূর্ণ অভি-ব্যক্ত হইলে কোনক্রমেই অশুদ্ধ বা অশ্লীলরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। ইহা সর্ব্বদাই শুচি ও উজ্জ্বল। আর এই কারণেই ইহাকে বলা হয় সকল রসের আদিরস।

মহর্ষি ভরত শৃঙ্গাররসের বিবরণ দিতে যাইয়া বলিয়াছেন—শৃঙ্গাররস রতি স্থায়িভাব হইতে উদ্ভূত ও উহা উজ্জ্বলবেশাত্মক। লৌকিক জগতে যাহা কিছু শুচি মেধ্য (পবিত্র, যজ্ঞে প্রদানার্হ), উজ্জ্বল ও দর্শনীয় (রমণীয় শ্লাঘ্য)—তাহাই শৃঙ্গারের সহিত উপমিত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি কথার উল্লেখ করা যায়—কোন নর বা নারী উজ্জ্বল বেশ পরিধান করিলে বলা হয়, তিনি যেন শৃঙ্গার-বেশ ধারণ করিয়াছেন। উৎকলে, কাশীধামে বা অন্যান্য তীর্থক্ষেত্রে যে সকল প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ দেবমন্দির আছে, সেই সকল মন্দিরমধ্যে রাজিত দেববিগ্রহ-গুলির প্রাত্যহিক উজ্জ্বল-বেশের নামই 'শৃঙ্গারবেশ'। শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের মন্দিরে যে সকল পাণ্ডা প্রভুর এই দৈনন্দিন উজ্জ্বল শৃঙ্গারবেশ রচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা বংশ-পরম্পরায় 'শৃঙ্গারী' আখ্যা লাভ করিয়াছেন।

কি নিমিত্ত উজ্জ্বলবেশের নাম হইল শৃঙ্গারবেশ, তাহার বিবরণ-দান-প্রসঙ্গে মহর্ষি বলিয়াছেন—যেমন আপ্ত-পুরুষের উপদেশে বিহিত নিয়ম অনুসারে পিতৃগোত্র-মাতৃকুল-আচার প্রভৃতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষাপূর্ব্বক নবজাতের নামকরণ-প্রথা সম্প্রদায়সিদ্ধ, ঠিক সেইরূপ রস-ভাব প্রভৃতি নাট্যাশ্রিত বিবিধ বিষয়ের নামকরণও নাট্যশাস্ত্রের সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক ব্রহ্মাদি আপ্ত-পুরুষের উপদেশমত নাট্যোক্ত বিষয়সমূহের আচরণানুযায়ী করা হইয়াছে। অর্থাৎ—এক কথায় রসাদি বস্তুর নামকরণ তত্তদ্বস্তুর স্বাভাবিকধর্ম্মের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ও নাট্যশাস্ত্রের অনাদি-সম্প্রদায়-সিদ্ধ (৭)। এই কারণে, হৃদ্য উজ্জ্বলবেশাত্মক শৃঙ্গাররস—এই কল্পনাও অনাদি বৃদ্ধ-ব্যবহার-পরম্পরা অবলম্বনে প্রচলিত (অর্থাৎ এ কল্পনার মূল যে কত প্রাচীন—তাহা নির্ণয় করাই কঠিন)।

এই শৃঙ্গাররস স্ত্রী-পুরুষ উভয়হেতুক ও উত্তম যুব-প্রকৃতি ; অর্থাৎ শৃঙ্গারের আলম্বনীভূত নায়ক ও নায়িকা যথাক্রমে যুবা ও যুবতী হওয়া প্রয়োজন, আর উভয়েরই প্রকৃতি হওয়া উচিত—উত্তম।

শৃঙ্গারের অধিষ্ঠান (অর্থাৎ অবস্থা) মূলতঃ দুইটি —(১) সম্ভোগ ও (২) বিপ্রলম্ভ (৭)।

বসন্ত প্রভৃতি অনুকূল ঋতু, শোভন সুগন্ধি পুষ্পমাল্যাদি স্নিগ্ধ সুশীতল চন্দনাদি অনুলেপন, সমুজ্জ্বল স্বর্ণরত্নালঙ্কার, বিদূষক-পীঠমর্দ্দাদি নর্ম্মসহায় প্রিয়জনের সঙ্গ, গীত-বাদ্য-পান-ভোজনাদি কাম্য বিষয়, সুরম্য হর্ম্ম্য, প্রমোদোদ্যানে ভ্রমণ ইত্যাদি যত কিছু কামোদ্দীপক ব্যাপারের সাক্ষাৎ অনুভূতি, পরোক্ষ ভাবে দর্শন বা শ্রবণ ও জলাবগাহনাদি ক্রীড়া, প্রাচীন-কাব্যোপবর্ণিত নায়কাদির অনুকরণাত্মিকা লীলা, হংসমিথুনাদির চিত্রদর্শন প্রভৃতি বিভাব হইতে সম্ভোগ-শৃঙ্গারের উৎপত্তি। ইহারা অবশ্য উদ্দীপন বিভাব। আর উত্তম-প্রকৃতি নায়ক-নায়িকা আলম্বন।

শৃঙ্গারপদব্যুৎপত্তিরবধেয়া, অথবা শৃঙ্গেণার্দ্যতে সামাজিকৈঃ প্রাপ্য-তেঽসাবিতি···"—রামতর্কবাগীশ-টীকা।

(৬) "বীতরাগাণাং রসানুৎপত্তেঃ"—রাঃ-তঃ টীকা।

(৭) "অধিষ্ঠানে অবস্থে"—অভিনবভারতী, প্রথম খণ্ড, বরোদা সং, পৃঃ ৩০৪।

নয়নচাতুরী-ভ্রূবিক্ষেপ-কটাক্ষ (৮) প্রভৃতির আবেশ-পূর্ণ ও নয়নাভিরাম সঞ্চার, ধীর-মন্থর অথচ সুকুমার ভঙ্গীতে নানাবিধ অঙ্গহার-প্রদর্শন (৯) ও ললিত-মধুর বাগ্‌বিন্যাস প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা সম্ভোগ-শৃঙ্গারের অভিনয় প্রদর্শনীয়।

অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন, এই প্রসঙ্গে মুখরাগ-পুলক প্রভৃতি সাত্ত্বিকভাবেরও গ্রহণ কর্ত্তব্য (১০)।

এইবার শৃঙ্গারের ব্যভিচারি-ভাব নিরূপণ। মহর্ষি বলিয়াছেন—আলস্য, উগ্রতা ও জুগুপ্সা ব্যতীত আর সকল ব্যভিচারি-ভাবই শৃঙ্গারের অনুকূল।

এই প্রসঙ্গে দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথমতঃ, জুগুপ্সাকে ব্যভিচারি-ভাব বলা হইল কোন্ প্রমাণে? ইহা ত স্থায়িভাব-সমূহের অন্তর্ভুক্ত—বীভৎস রসের স্থায়িভাবই জুগুপ্সা। ইহার উত্তর অভিনবগুপ্ত দিয়াছেন। জুগুপ্সা স্থায়িভাবের অন্তর্গত হইলেও এখানে যখন শৃঙ্গারে নিষিদ্ধ ব্যভিচারিভাব-রূপে বর্ণিত হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে—এই ন্যায়ানুসারে স্থায়িভাবগুলিও অনুকূল কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যভিচারিভাব-রূপে গণ্য হইতে পারে—অন্ততঃ, মহর্ষির ইহা অনুমোদিত (১১)। দ্বিতীয়তঃ, মহর্ষি ত বলিলেন যে—আলস্য, (১২) উগ্রতা ও জুগুপ্সা ব্যতীত অন্য সকল ভাবই শৃঙ্গারে ব্যভিচারী; তবে কি

---

(৮) নয়নচাতুরী, ভ্রূবিক্ষেপ, কটাক্ষ প্রভৃতি কান্তা দৃষ্টির লক্ষণ। কান্তা, হাস্যা, করুণা, রৌদ্রী, বীরা, ভয়ানকা, বীভৎসা ও অদ্ভুতা—এই অষ্ট রসদৃষ্টি যথাক্রমে অষ্টরসে ব্যবহার্য্য। আর স্নিগ্ধা, হৃষ্টা, দীনা, ক্রুদ্ধা, দীপ্তা, ভয়ান্বিতা, জুগুপ্সিতা ও বিস্মিতা—এই অষ্ট স্থায়িভাব-দৃষ্টি অষ্ট স্থায়িভাবে যথাক্রমে প্রযোজ্য (নাঃ শাঃ, ২য় খণ্ড, ৮ম অঃ, ৪১-৪২ শ্লোক, বরোদা সং, পৃঃ ৭; কাশী সং ৮।৩৮ ৪৯ পৃঃ ১০১) নয়নচাতুরী—ভ্রূকর্ম্ম-বিশেষ; ইহার পারিভাষিক নাম 'চতুর'। ইহাতে ভ্রূর কিঞ্চিন্মাত্র উচ্ছ্বাস ও মধুরভাবে বিস্তার করা হয়—"চতুরং কিঞ্চিদুচ্ছ্বাসান্মধুরায়ততা ভ্রুবোঃ" (নাঃ শাঃ, ৮।১২১, পৃঃ ১৭; "মধুরায়তয়োর্ভ্রুবোঃ"—কাশী সং ৮।১১৭, পৃঃ ১০৭)। ভ্রূক্ষেপ বা ভ্রুকুটী—ইহাও ভ্রূকর্ম্ম-বিশেষ—ভ্রূদ্বয়ের মূলদেশ উৎক্ষিপ্ত করিলে 'ভ্রুকুটী' হয়—"ভ্রুবোর্ম্মূলসমুৎক্ষেপাদ্ ভ্রুকুটী পরিকীর্ত্তিতা" (নাঃ শাঃ, ৮।১২১; কাশী সং ৮।১১৬, পৃঃ ১০৭) কটাক্ষ—ইহা তারাকর্ম্ম-বিশেষ। ইহার পারিভাষিক সংজ্ঞা 'বিবর্ত্তন'—"বিবর্ত্তনং কটাক্ষস্তু" (নাঃ শাঃ, ৮।১০০, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৪, কাশী সং ৮।৯৬, পৃঃ ১০৬)।

(৯) অঙ্গহার—অঙ্গবিক্ষেপ। নাট্যশাস্ত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে—মহাদেবের আদেশে তণ্ডু (নন্দিকেশ্বর) মহামুনি ভরতকে অষ্টোত্তরশত করণ, দ্বাত্রিংশৎ অঙ্গহার, ও বিবিধ রেচক, পিণ্ডীবন্ধ প্রভৃতির উপদেশ দিয়াছিলেন (নাঃ শাঃ, প্রথম খণ্ড, ৪।১৩-১৯, পৃঃ ৮৯-৯১)। হর-কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বলিয়া এই অঙ্গহার-প্রয়োগের নাম 'হার' (অর্থাৎ হর-সম্বন্ধীয়)। অঙ্গ দ্বারা নির্ব্বর্ত্তনীয় হার—অঙ্গহার। বিভিন্ন অঙ্গের যথাবিধি অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিতে প্রাপণই অঙ্গহার—"অঙ্গানাং দেশান্তরে সমুচিতে প্রাপণপ্রকারোঽঙ্গহারঃ, হরস্যায়ং হারঃ প্রয়োগঃ, অঙ্গনির্ব্বর্ত্ত্যো হারোঽঙ্গহারঃ"—অভিনবভারতী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৯১)। করণ ক্রিয়া। কাহার ক্রিয়া?—উত্তরে বলিতে হয়, নৃত্যের ক্রিয়া; তাই ইহার অপর নাম 'নৃত্তকরণ'। হস্ত প্রভৃতি শরীরের পূর্ব্বার্দ্ধের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-উপাঙ্গের ও কটি-উরু-জঙ্ঘা-চরণ প্রভৃতি শরীরের নিম্নার্দ্ধের বিভিন্ন অঙ্গোপাঙ্গাদির দেহের একদেশের সহিত সংযোগ ত্যাগপূর্ব্বক অপর দেশে অত্রুটিত ও মিলিত ভাবে আবর্ত্তন-সহকারে যোজনার নাম একটি নৃত্তের ক্রিয়া বা করণ। আমরা চলিতে ফিরিতে বা কোন দ্রব্য লইতে বা রাখিতে যে ভাবে হস্ত-পাদ চালনা করি, তাহাতেও হস্তপাদাদির দেহের একদেশ হইতে দেশান্তরে সংযোগ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু নৃত্তক্রিয়া এই সকল স্বাভাবিক অঙ্গচালনা হইতে ভিন্ন। কারণ, নৃত্তে কর-চরণাদির বিলাসক্ষেপ প্রয়োজন; সাধারণ অঙ্গচালনায় তাহা নিষ্প্রয়োজন।—"হস্তপাদসমাযোগো নৃত্তস্য করণং ভবেৎ" (নাঃ শাঃ, প্রথম খণ্ড, ৪।৩০, পৃঃ ৯২)—"ক্রিয়া করণম্। কস্য ক্রিয়া? নৃত্তস্য—গাত্রানাং হস্তপাদসমাযোগঃ; হস্তোপলক্ষিতস্য বিলাসক্ষেপস্য হেয়োপাদেয়বিষয়ক্রিয়াদিভ্যো ব্যতিরিক্তায়াস্তৎক্রিয়ায়াঃ করণমিত্যর্থঃ। তস্যাঃ ক্রিয়ায়াঃ স্বরূপমাহ—হস্তপাদসমাযোগঃ। হস্তোপলক্ষিতস্য পূর্ব্বকায়বর্ত্তিশাখাঙ্গোপাঙ্গাদেঃ পাদোপলক্ষিতস্য চাপর-কায়গতপার্শ্বকট্যূরুজঙ্ঘাচরণাদেঃ সঙ্গততয়াত্রুটিতত্বেনাবৃত্তি-যোজনে পূর্ব্বক্ষেত্রসংযোগত্যাগেন সমুচিতক্ষেত্রান্তরপ্রাপ্তিপর্য্যন্ততয়া একা ক্রিয়া, তৎকরণমিত্যর্থঃ" (অভিনবভারতী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৯২)। এই করণ সংখ্যায় অষ্টোত্তরশত। বরোদা-সংস্করণের নাট্যশাস্ত্রের চতুর্থাধ্যায়ে উহাদিগের লক্ষণ ও ৯৩টি করণের প্রাচীন চিত্র (চিদম্বরমের নটরাজমন্দিরের গোপুরে ক্ষোদিত প্রস্তরমূর্ত্তির অনুলিপি) প্রদত্ত হইয়াছে। "সর্ব্বেষামঙ্গহারাণাং নিষ্পত্তিঃ করণৈর্যতঃ" (নাঃ শাঃ ৪।২৯)। দুইটি নৃত্তকরণের সম্মিলিত অবস্থার নাম 'নৃত্তমাতৃকা'; কারণ, অঙ্গহার-রূপ নৃত্তের ইহারা জননী বা উৎপত্তি-কারণ।—"দ্বে নৃত্তকরণে চৈব ভবতো নৃত্তমাতৃকা" (নাঃ শাঃ ৪।৩১)। "নৃত্তস্যাঙ্গহারাত্মনো মাতৃকা উৎপত্তিকারণম্।...করণদ্বয়-প্রয়োগেণ চ বিনিবৃত্তাভিমানো নাস্তি, ততঃ পরং তু নৃত্যতীত্যভি-মানাৎ করণদ্বয়ং নৃত্তমাতৃকেত্যুক্তম্" (অভিনবভারতী, পৃঃ ৯৩)। এক একটি অঙ্গহারে তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়টি পর্য্যন্ত করণের সংমিশ্রণ থাকে (নাঃ শাঃ ৪।৩১-৩৩)। অঙ্গহার অনন্ত হইলেও মহর্ষি বত্রিশটি অঙ্গহারের নাম করিয়াছেন (নাঃ শাঃ ৪।১৯-২৭)।

(১০) "আদিগ্রহণাৎ সাত্ত্বিকো মুখরাগপুলকাদির্গৃহ্যতে" (অভিনবভারতী, পৃঃ ৩০৭)।

(১১) "জুগুপ্সা স্থায়িরূপাপি নিষিদ্ধা ন্যায়সিদ্ধাৎ (?) স্থায়িনামপি ব্যভিচারিত্বমনুজ্ঞাপয়তি"—অঃ ভাঃ, বরোদা সং, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩০৭।

(১২) এ আলস্য বলিতে বুঝাইতেছে—আলম্বনবিভাব-স্বরূপ নায়িকাদিবিষয়ক আলস্য অর্থাৎ নায়িকাদির প্রতি আকর্ষণের তীব্রতার অভাব। নতুবা শৃঙ্গারে অলস শরীরের বর্ণনা খুবই

নির্ব্বেদ প্রভৃতি ভাবও শৃঙ্গারের ব্যভিচারী হইতে পারিবে? কিন্তু তাহাও ত সম্ভব নহে। কারণ, নির্ব্বেদাদি ত শৃঙ্গারের পরিপোষক নহেই—পক্ষান্তরে পরিপন্থী। ইহার উত্তর মহর্ষি স্বয়ং দিয়াছেন। ১ নির্ব্বেদ, ২ গ্লানি, ৩ শঙ্কা, ৪ অসূয়া, ৫ শ্রম, ৬ চিন্তা, ৭ ঔৎসুক্য, ৮ নিদ্রা, ৯ সুপ্ত, ১০ স্বপ্ন (১৩), ১১ বিবোধ, ১২ ব্যাধি, ১৩ উন্মাদ, ১৪ অপস্মার, ১৫ জড়তা, ১৬ মোহ, ১৭ মরণ (১৪) প্রভৃতি অনুভাবের (১৫) দ্বারা বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারের অভিনয় প্রদর্শনীয়। এই কারণেই অভিনবগুপ্তও বলিয়াছেন—আলস্য-উগ্রতা-জুগুপ্সা-বর্জ্জিত ভাবগুলি সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভ এই উভয় দশা-বিশিষ্ট শৃঙ্গারের ব্যভিচারি-রূপে গণ্য হয় (১৬)। তন্মধ্যে নির্ব্বেদ-গ্লানি প্রভৃতি দুঃখবহুল ভাবগুলি কেবল বিপ্রলম্ভে ব্যভিচারী; আর যেগুলি সুখকর ভাব (যথা—ধৃতি-ব্রীড়া-হর্ষ-আবেগ প্রভৃতি) তাহারা কেবল সম্ভোগ-শৃঙ্গারে সঞ্চারী (১৭)।

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠিতে পারে—শৃঙ্গার যখন রতি স্থায়িভাব হইতে উৎপন্ন, তখন করুণাশ্রয়ী ভাবগুলি উহার

স্বাভাবিক—"আলস্যাদি চ স্বাবিভাবপ্রমদাদিবিষয়মেব নিষিদ্ধম্"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩০৭।

(১৩) স্বপ্ন—ইহা পৃথক্ সঞ্চারিভাব নহে—সুপ্তেরই অন্তর্ভূত; তথাপি প্রাধান্যবশতঃ এস্থলে ইহার পৃথক্ গ্রহণ করা হইয়াছে। সম্ভোগশৃঙ্গারে আলম্বন-বিভাব নিকটে থাকে বলিয়া নিদ্রার অভাব ঘটা স্বাভাবিক। এ কারণে 'বিবোধ' (নিদ্রাভঙ্গ বা জাগরণ) সম্ভোগেও ব্যভিচারি-রূপে গণ্য হয়। আবার সম্ভোগে রতিশ্রমকৃত নিদ্রাদির সম্ভাবনা থাকিলেও উহাদিগের বিশেষ বৈচিত্র্য নাই—এ কারণে ঐগুলিকে ব্যভিচারি-রূপে গণনা করা হয় নাই। পক্ষান্তরে, বিপ্রলম্ভে নিদ্রাদির বাহুল্য দৃষ্ট হয়—এ হেতু ঐগুলিকে বিপ্রলম্ভেরই ব্যভিচারী বলা হইয়াছে।—"সুপ্তান্তর্ভূতোঽপি স্বপ্নঃ প্রাধান্যাদুপাত্তঃ।…সম্ভোগদশায়াম্ভ বিভাবসান্নিধ্যে নিদ্রাভাবাদ্ বিবোধোঽপি ব্যভিচারী। সম্ভোগেঽপি রতিশ্রমকৃতনিদ্রাদি যদ্যপ্যস্তি, তথাপি ন রতৌ তচ্চিত্রতামভিধত্তে। বিপ্রলম্ভে তু…নিদ্রাদিবাহুল্যাপেক্ষং চেপ্যমভিধানম্"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩০৮।

(১৪) উন্মাদ, অপস্মার, ব্যাধি প্রভৃতির অত্যন্ত কুৎসিত অবস্থা কাব্যে বর্ণনীয় নহে—প্রয়োগেও উহার প্রদর্শন নিষিদ্ধ। আর মরণের বর্ণনা এরূপভাবে করিতে হইবে—যাহাতে অচিরে পুনর্মিলন সূচিত হয় ও শোক স্থায়িরূপে অবস্থান করিতে না পারে। কেহ কেহ বলেন—এস্থলে 'মরণ'-শব্দের অর্থ প্রাণবিয়োগ নহে—কিন্তু জীবিত অবস্থায় থাকিয়া প্রাণত্যাগের প্রয়াস-মাত্র। 'মোহ'—সকল সংস্করণে (যথা—কাশী সং, উক্টর মুখোঃ সং) 'মোহ'কে ব্যভিচারি-রূপে ধরা হয় নাই। 'প্রভৃতি' বলিতে 'দৈন্য' 'মোহ' ইত্যাদি বুঝাইতেছে—ইহা অভিনবগুপ্তের অভিমত। অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩০৮ দ্রষ্টব্য।

(১৫) মহর্ষি এস্থলে 'অনুভাব' শব্দটির প্রয়োগ করিয়াছেন। অথচ যথার্থতঃ ইহারা ব্যভিচারিভাব। তবে মহর্ষি 'অনুভাব' শব্দের প্রয়োগ করিলেন কেন? ইহার উত্তরে অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন—ইহারা ব্যভিচারি-ভাব হইলেও নিজ নিজ অনুভাবের (অর্থাৎ কার্য্যের) দ্বারা অনুভাবিত (অর্থাৎ বহিঃপ্রকাশিত) হইয়া বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারকেও অনুভাবিত (অর্থাৎ পশ্চাৎ অভিব্যক্ত) করে, তাই ইহাদিগকে অনুভাব বলা হইয়াছে। সরল ভাষায়—উন্মাদের কার্য্য অসম্বদ্ধ-প্রলাপাদি হইতে উন্মাদ-ভাবটির বহিঃপ্রকাশ হইয়া থাকে; পরে ঐ উন্মাদ-ভাবই বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারকে হিসাবে বিপ্রলম্ভের অনুভাব। আবার কেহ কেহ বলেন, এস্থলে নির্ব্বেদ হইতে মরণ পর্য্যন্ত ভাবগুলি ব্যভিচারী। ঐগুলি করণ কারকের অর্থ প্রকাশ করিতেছে। উহাদিগের দ্বারা পরিপুষ্ট যথোপযুক্ত অনুভাবসমূহের দ্বারা বিপ্রলম্ভের অভিনয় প্রদর্শনীয়। তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে এই যে—নির্ব্বেদ-মরণাদি অপ্রধান সহকারিভাব করণ-স্থানীয়, আর তদনুকূল অনুভাবসমূহ প্রধান ভাব। "এতে ব্যভিচারিণোঽপি স্বানুভাবৈরনুভাবিতা বিপ্রলম্ভমনুভাবয়ন্তি তস্মাদনুভাবৈরিত্যুক্তম্। অন্যে ত্বাদিশব্দং করণবাচিনমাশ্রিত্য তদীয়ানুভাবান্ প্রাধান্যেন দর্শয়ন্তি"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩০৮—৯। এই সকল ভাব যে ব্যভিচারী, তাহা অভিনবগুপ্ত আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। এই সকল ব্যভিচারি-ভাব বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় স্থায়িভাব-সূত্রমধ্যে একবার আবির্ভূত ও পরক্ষণেই তিরোভূত হইয়া স্থায়িভাবের বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়া থাকে মাত্র। উহারা কদাপি স্থিরভাবে থাকে না—সতত চঞ্চল। অবশ্য ইহাও ঠিক যে, স্থায়িভাবও স্থির নহে। তথাপি সংস্কাররূপে ধারাবাহিক সমানজাতীয় প্রবাহের আকারে বর্ত্তমান থাকে বলিয়াই উহাকে 'স্থায়ী' বা স্থির বলা হয়। ব্যভিচারী ক্ষণকালের নিমিত্ত এভাবেও স্থির থাকে না। উহার সংস্কারও স্থায়িভাবের সংস্কারেরই পুষ্টি সম্পাদন করে মাত্র। "এতে চ ব্যভিচারিণো বিদ্যুদুন্মেষনিমেষযুক্ত্যেব স্থায়িসূত্রমধ্যে প্রকটয়ন্তস্তিরোদধতশ্চ তদ্বৈচিত্র্যমাবহন্তি, ন তু স্থিরাঃ। যদ্যপি স্থায্যপি ন স্থিরঃ, তথাপি সংস্কাররূপতয়া ধারাবাহিসজাতীয়প্রবাহরূপতয়া চ স্থির এব। ব্যভিচারিণস্তু নৈবং ক্ষণমপি ভবন্তি। সংস্কারমপি স্বকং স্থায়িসংস্কার এব প্রৌঢয়ন্তি"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩০৯।

(১৬) "ব্যভিচারিণশ্চালস্যৌগ্র্যজুগুপ্সাবর্জ্জাঃ" (নাঃ শাঃ ৬ অঃ, পৃঃ ৩০৭, বরোদা সং)।" অন্যেতি দশাদ্বয়মনুসন্তেত্যর্থঃ"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩০৭।

(১৭) "ননু নির্ব্বেদাদয়ঃ সম্ভোগে ন ব্যভিচারিণ ইত্যাশঙ্ক্যাহ বিপ্রলম্ভকৃতস্থিতি।…দুঃখপ্রায়নির্ব্বেদাদিমুক্ত্। আলস্যাদিব্যতিরিক্তাশ্চ সুখময়া ধৃত্যাদয়োঽত্র ব্যভিচারিত্বেন সম্ভোগ উপক্ষত্বা ইতি প্রকটয়তি"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩০৭। অবশ্য এই প্রসঙ্গে ইহাও বলিয়া রাখা উচিত যে, সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভে স্থায়িভাব ও আলম্বন-উদ্দীপনবিভাব ভিন্নরূপ নহে—একই। "ন হি বিপ্রলম্ভে বিভাবঃ স্থায়ী চ সম্ভোগাদ্ভিদ্যতে। এক এবাসাবিতি হি বহুশ উক্তম্"—

ব্যভিচারী হয় কিরূপে? কথাটা আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। বিপ্রলম্ভ-দশাপন্ন শৃঙ্গারও ত শৃঙ্গারই বটে—করুণ ত আর নহে; তাহা যদি হয়, তাহা হইলে করুণ বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট নির্ব্বেদ-মরণাদি ভাব উহার ব্যভিচারি-রূপে গণ্য হইতে পারে কোন্ যুক্তিতে? উহারা করুণের ব্যভিচারী হইলে অবশ্য আর কোন আপত্তিই উঠে না। কিন্তু শৃঙ্গারের ব্যভিচারী হওয়া উহাদিগের পক্ষে অসঙ্গত। ইহার উত্তরে মহর্ষি বলিয়াছেন—শৃঙ্গারের দুইটি অবস্থা—সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ (১৮)। নায়ক-নায়িকার মিলনে সম্ভোগ-শৃঙ্গারের অভিব্যক্তি। আর উহাদিগের পরস্পর বিরহে বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারের প্রকাশ। বক্তব্য এই—ইষ্টজনের বিচ্ছেদ যে কেবল করুণ-রসেরই উদ্ভবহেতু তাহা নহে, ঐ বিচ্ছেদ হইতে শৃঙ্গার-রসের উদ্রেক হওয়াও অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু শুধু এইটুকু বলিলেই বিষয়টি স্পষ্ট বুঝা যায় না। কিরূপ বিচ্ছেদ করুণের উৎপত্তি-কারণ, আর কি প্রকার বিচ্ছেদই বা বিপ্রলম্ভের হেতু—তাহাও বলা প্রয়োজন। তাই মহর্ষি বলিয়াছেন—শাপ-ক্লেশাদিতে পতিত ইষ্টজনের বিভবনাশ-বধ-বন্ধনাদি হইতে সম্ভূত নিরপেক্ষ শোকভাব-মূলক করুণ রস। অর্থাৎ—সাধারণতঃ রতিভাবের বিচ্ছেদে একটা অপেক্ষা (আলম্বন অথবা আশার বন্ধন) থাকে—যে পুনরায় মিলন ঘটিবে। মহাকবি কালিদাস 'মেঘদূতে' ইহারই বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"অঙ্গনাগণের স্বভাবতঃ প্রেমপ্রবণ কুসুমসদৃশ সুকুমার ও বিরহের স্পর্শমাত্রেই বিনাশোন্মুখ হৃদয়কে আশাবন্ধই রক্ষা করিয়া থাকে' (১৯)। এই কারণে রতি-ভাব-সংশ্লিষ্ট বিচ্ছেদকে বলা হয় 'সাপেক্ষ'। পক্ষান্তরে, শোক-সম্পর্কিত বিচ্ছেদে এই অপেক্ষা বা আশাবন্ধ থাকে না। অভিনবগুপ্তের ভাষায় শোকভাব উক্ত 'অপেক্ষা' (আশাবন্ধ) হইতে বিশ্লিষ্ট। তাই শোকভাবের সহিত যে বিচ্ছেদের সম্বন্ধ, তাহাকে বলা যায় 'নিরপেক্ষ'। শাপপ্রভাবে (২০) কিংবা তাপ-ক্লেশ-বশে ইষ্টজনের অর্থ-সম্পত্তির নাশ হইলে অথবা বধ-বন্ধনাদি সংঘটিত হইলে

---

(১৮) এই প্রসঙ্গে কেহ কেহ হয় ত এই বলিয়া আপত্তি করিতে পারেন যে, শৃঙ্গারের কেবল দুইটি অবস্থা কেন—আরও অনেক অবস্থা আছে। উত্তরে মহর্ষি বলিয়াছেন যে—হাঁ, বৈশিক-শাস্ত্র-কারগণ শৃঙ্গারের দশটি অবস্থা বলিয়াছেন; উহা নাট্যশাস্ত্রের সামান্যাভিনয়-প্রকরণে (কাশী সং, অঃ ২৪, শ্লোক ১৬০-৬২, পৃঃ ২৮১) বর্ণিত হইয়াছে। [বৈশিকশাস্ত্র—অভিনবগুপ্ত ইহার অর্থ করিয়াছেন—"কামসূত্র'। বস্তুতঃ, 'বৈশিক' কামসূত্রের একটি অধিকরণ মাত্র। প্রজাপতি ব্রহ্মা ধর্ম্মার্থকামশাস্ত্র লক্ষ অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া প্রথম উপদেশ দিয়াছিলেন। অনন্তর মহাদেবানুচর নন্দী ঐ মিলিত ত্রিবর্গ-শাস্ত্র হইতে পৃথক্ করিয়া সহস্রাধ্যায়-বিশিষ্ট কামসূত্রের প্রচার করেন। উদ্দালক-পুত্র শ্বেতকেতু পাঁচশত অধ্যায়ে উহার সংক্ষেপ করেন। তাহার পর বাভ্রব্য দেড়শত অধ্যায়ে ও সাতটি অধিকরণে উক্ত কামশাস্ত্রের পুনরায় সংক্ষেপ করেন। ঐ বাভ্রবীয় কামশাস্ত্র হইতে চারায়ণ-ঘোটকমুখ-গোনর্দ্দীয়-দত্তক-গোণিকাপুত্র-সুবর্ণনাভ ও কুচ(চু)মার এই সপ্ত আচার্য্য যথাক্রমে সাধারণ-কন্যাসম্প্রযুক্তক-ভার্য্যাধিকারিক-বৈশিক-পারদারিক-সাম্প্রযোগিক ও ঔপনিষদিক—এই সপ্ত অধিকরণ পৃথক্ পৃথগ্-ভাবে বিবৃত করিয়াছিলেন। অতএব, দত্তকই বৈশিক অধিকরণের প্রথম আচার্য্য। তিনি পাটলিপুত্রনিবাসিনী গণিকাগণের নিয়োগে বৈশিকাধিকরণ রচনা করেন—ইহা বাৎস্যায়নের 'কামসূত্রে'র প্রথমেই স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। বৈশিক—বেশ্যাসম্বন্ধীয়।] ঐ দশ অবস্থার নাম—১ অভিলাষ, ২ চিন্তন, ৩ অনুস্মৃতি, ৪ গুণ-কীর্ত্তন, ৫ উদ্বেগ, ৬ বিলাপ, ৭ উন্মাদ, ৮ ব্যাধি, ৯ জড়তা ও ১০ মরণ। ইহারা শৃঙ্গারের দশ অবস্থা বলিয়া সাধারণতঃ বর্ণিত হইলেও ("দশাবস্থাগতং কামং নানাভাবৈঃ প্রকাশয়েৎ"—নাঃ শাঃ ২৪।১৫৯, কাশী সং) যথার্থতঃ ইহারা বিপ্রলম্ভেরই দশাবস্থা (অবস্থা-গ্রহণেন চ তাবন্তো বহবো বিপ্রলম্ভা ইত্যাশঙ্কাং নিরাকরোতি। ...পরস্পরাস্থাবন্ধাত্মকত্বে রতিরূপে স্থিতে সতি তদঙ্গভূতা দশাবস্থা বিপ্রলম্ভাত্মম্"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩১০)। যাহাই হউক, এই বৈশিক-শাস্ত্রকারগণের সিদ্ধান্তও মহর্ষির সিদ্ধান্তের অনুকূল। কারণ, উক্ত সিদ্ধান্তেও চিন্তা প্রভৃতি (আপাতদৃষ্টিতে করুণরসের পোষক) ভাবগুলি রতির ব্যভিচারিভাব-রূপে কথিত হইয়াছে। অতএব, নির্ব্বেদ-চিন্তা-মরণাদির পক্ষে শৃঙ্গারের ব্যভিচারী হইতে কোন বাধা নাই—"তেন চিন্তাদয়োঽপি ব্যভিচারিত্বেন রতেস্তৈরনুজ্ঞাতা ইতি তাৎপর্য্যম্"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩১০।

(১৯) "আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়শো হ্যঙ্গনানাং সদ্যঃ পাতি প্রণয়িহৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি" (মেঘদূত—পূর্ব্বমেঘ, দশম শ্লোক)। নারীহৃদয় স্বভাবতঃ প্রণয়প্রবণ, আর কুসুমের ন্যায় অত্যন্ত সুকুমার। কুসুম যেমন প্রতিকূল স্পর্শমাত্রেই ঝরিয়া পড়িতে চায়, নারীহৃদয়ও তেমনই বিরহের প্রথম আঘাতেই তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইবার উপক্রম করে। তখন কুসুমকে বৃন্ত যেরূপ পড়িতে দেয় না, সেইরূপ আশাও বিরহগ্রস্ত রমণীহৃদয়কে নাশ হইতে রক্ষা করে। তাই মহাকবি আশাকে বৃন্তের সহিত তুলনা করিয়া 'আশাবন্ধ' শব্দটির প্রয়োগ করিয়াছেন। বন্ধ=বন্ধন =পুষ্পবৃন্ত।

(২০) শাপ—করুণরসে যে শোকের উদ্ভব হইয়া থাকে, তাহা অপ্রতিবিধেয় হওয়া প্রয়োজন। সাধারণ লৌকিক দুর্ঘটনা হইতে যে বিচ্ছেদের উদ্ভব হয়, উত্তম-প্রকৃতিক নায়কের পক্ষে তাহার প্রতিবিধান করা সম্ভব হইয়া থাকে। এ কারণে ঐরূপ

তাহার ফলে যে বিচ্ছেদাত্মক শোকভাবের সঞ্চার হয়, তাহাতে উক্তরূপ নিরপেক্ষতা বর্ত্তমান। যেহেতু, ঐ সকল দুর্ঘটনার প্রতিকারের কোন আশাই থাকিতে পারে না। অতএব, উক্ত স্থলে করুণরসের উদ্রেকই অবশ্যম্ভাবী (২১)। কিন্তু বিপ্রলম্ভের ক্ষেত্রে অন্যরূপ। ঔৎসুক্যভাব-প্রধান চিন্তাদি হইতে যে বিরহাত্মক রতিভাবের সঞ্চার হয়, তাহা সাপেক্ষ; অর্থাৎ—উক্ত রতিভাব বিরহভাবানুরঞ্জিত হইলেও উহাতে পুনর্মিলনের আশা থাকে। এই কারণেই মূলে 'ঔৎসুক্য'-শব্দটির প্রয়োগ করা হইয়াছে। 'ঔৎসুক্য'-শব্দের অর্থ কোন বিষয়ের প্রতি উন্মুখভাব। (এ স্থলে বিষয় বলিতে বুঝাইতেছে নায়ক বা নায়িকা।) উক্ত বিষয়টি একেবারে যদি নষ্ট হইয়াই যায়, তবে আর ঔৎসুক্য থাকিবে কিরূপে? অতএব, বিপ্রলম্ভে নায়ক-নায়িকার সাময়িক বিচ্ছেদ হইলেও উহাদিগের কাহারও একান্তভাবে নাশ ঘটে না—পুনরায় উভয়ের মিলনের সম্ভাবনা নিপুণ কবি-কর্ত্তৃক সুকৌশলে সূচিত হইয়া থাকে (২২)। অন্যথা বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারের পরিবর্ত্তে করুণরসেরই উদ্রেক হওয়ার সম্ভাবনা। অতএব, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, করুণরস ও বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গার সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে—মহাকবি কালিদাস-কৃত কুমারসম্ভব মহাকাব্যের চতুর্থসর্গে রতিবিলাপ বিপ্রলম্ভের নিদর্শন। এ স্থলে আকাশবাণী দ্বারা কামের পুনর্জ্জীবন-লাভের সম্ভাবনা সূচিত হওয়ায় করুণের পরিবর্ত্তে বিপ্রলম্ভ অভিব্যক্ত। পক্ষান্তরে, রঘুবংশের অষ্টমসর্গে ইন্দুমতীর পুনরুজ্জীবন-সম্ভাবনা সূচিত না হওয়ায় অজবিলাপ করুণরসের উদ্রেককর।

সাহিত্যদর্পণ-কার এই ভেদটি অতি সংক্ষেপে অথচ সুস্পষ্ট ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন—করুণরস বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গার হইতে পৃথক্; যেহেতু, করুণরসে শোক স্থায়িভাব, আর বিপ্রলম্ভে রতি স্থায়ী—উহা পুনরায় মিলনের সূচনা করিয়া থাকে (২৩)।

আচার্য্য অভিনবগুপ্তও সংক্ষেপে উক্ত সিদ্ধান্তের পূর্ব্বাভাস দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন—'রতির বিপরীত শোক করুণে স্থায়ী'—ইহাই করুণের ভেদ (২৪)।

শিঙ্গভূপাল (খ্রীঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দী) 'রসার্ণবসুধাকরে' 'করুণ-বিপ্রলম্ভ' ও করুণের ভেদ দেখাইতে গিয়া উক্ত মতেরই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন—'যে স্থলে নায়ক-নায়িকার অন্যতরের মৃত্যুর পর পুনর্জ্জীবনের সম্ভাবনা থাকে না, তথায় পুনরায় মিলনের অভাববশতঃ সত্যই শোকভাবোৎপন্ন করুণরসের উদ্রেক হইয়া থাকে। আর যথায় পুনর্জ্জীবনের দ্বারা ভাবী পুনর্ম্মিলনের সম্ভাবনা বর্ত্তমান, তথায় বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারের সমুৎপত্তি' (২৫)।

শারদাতনয়ের গ্রন্থে সর্ব্ববিষয়েই কিছু না কিছু নূতনত্ব

বিচ্ছেদে তাঁহার শোকের পরিবর্ত্তে উৎসাহ বা ক্রোধ জন্মাইতে দেখা যায়। ফলে করুণরসের পরিবর্ত্তে বীর বা রৌদ্ররসের উৎপত্তি ঘটে। কিন্তু শাপ অসাধারণ ও অলৌকিক ঘটনা। উহা অপ্রতিবিধেয়। এ কারণে উহা উত্তম-প্রকৃতির নায়কাদির পক্ষেও শোকোদ্রেককর হইয়া থাকে। অবশ্য যে স্থলে প্রত্যক্ষ ভাবে এই শাপ প্রদত্ত হয়, তথায় করুণরসের উৎপত্তি। আর যে ক্ষেত্রে নায়ক-নায়িকার অজ্ঞাতে অলক্ষিত ভাবে শাপ প্রদত্ত হয়—সে শাপ গৌণ (যেমন, 'বিক্রমোর্ব্বশী' বা 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে')—সে শাপ করুণের পরিবর্ত্তে বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারেরই জনক হইয়া থাকে—উহা সাময়িকভাবে প্রতিবন্ধকতা করে মাত্র—পুনর্ম্মিলনের আশাবন্ধকে বিচ্ছিন্ন করে না। "শাপগ্রহণেনা-প্রতিকার্য্যত্বে সত্যুত্তমপ্রকৃতেঃ শোকোদয়স্থানমেতদিতি দর্শয়তি। অন্যথোৎসাহক্রোধাদিবিভাবত্বং স্যাৎ। শোকত্বমেব চ পরাকর্ত্তুং কবিকুলচক্রবর্ত্তিনা পুরূরবস উর্ব্বশীশাপ প্রাপ্তিরনুপলক্ষিতত্বেন নিবদ্ধা" (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩১১)।

(২১) "করুণস্য শাপক্লেশবিনিপতিতেষ্টজনবিভবনাশবধবন্ধ-সমুত্থো নিরপেক্ষভাবঃ" (নাঃ শাঃ, ৬ অঃ, পৃঃ ৩১০)। "নিরপেক্ষো বন্ধুজনাদিবিষয়ে যা অপেক্ষা রতেরিবালম্বনং, যথোক্তম্ 'আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়শো হ্যঙ্গনানাম্' ইতি (মেঘ ১।১০), ততো নিষ্ক্রান্তো ভাবঃ শোকাখ্যো যস্মিন্ শাপক্লেশে বিনিপাতিতস্যেষ্টজনস্য যো বিভবনাশো বধঃ বন্ধো বা ততঃ সমুত্থানং যস্য" (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩১১)।

(২২) "ঔৎসুক্যচিন্তাসমুত্থঃ সাপেক্ষভাবো বিপ্রলম্ভকৃতঃ" (নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩১০)। "এবং প্রসঙ্গাৎ করুণস্য স্বরূপমভিধায় প্রকৃতে যোজয়ত্যৌৎসুক্যচিন্তেতি। চিন্তাশব্দোঽশেষনির্ব্বেদাদ্যুপলক্ষণম্। ঔৎসুক্যপ্রধানা যে চিন্তাদয়স্তেভ্যঃ সমুত্থানং বিজৃম্ভো যস্য। অতএব সাপেক্ষো যত্র রত্যাখ্যো ভাবস্তে চ সাপেক্ষা রত্যাখ্যাদ্ ভবন্তি।......এতদুক্তং ভবতি—ঔৎসুক্যং বিষয়োন্মুখ্যম্ তচ্চ নষ্টে বিষয়ে ন সম্ভবতি" (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩১১)।

(২৩) "শোকস্থায়িতয়া ভিন্নো বিপ্রলম্ভাদয়ং রসঃ। বিপ্রলম্ভে রতিঃ স্থায়ী পুনঃ সম্ভোগহেতুকঃ"।—সাহিত্যদর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ।

(২৪) "উত্তমপ্রকৃতাবপি রতিবিপরীতঃ শোকঃ করুণে স্থায়ী"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩১১।

(২৫) "যত্র পুনরনুজ্জীবনেন সম্ভোগাভাবস্তত্র সত্যং শোক এব। যত্র সোঽস্তি তত্র বিপ্রলম্ভ এব"।—রসার্ণবসুধাকর, ত্রিবান্দ্রম সংস্কৃতসিরিজ দ্বিতীয় বিলাস পৃঃ ১৮৯।

পরিলক্ষিত হয়। তিনি 'ভাবপ্রকাশনে' শৃঙ্গারকে ভরতাদির সিদ্ধান্তানুসারে দুই ভাগে বিভক্ত না করিয়া তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) সম্ভোগ, (২) অযোগ ও (৩) বিয়োগ। যে স্থলে নায়ক ও নায়িকার পরস্পরের প্রতি অনুরাগ উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও উভয়ের একবারও মিলনের সুযোগ ঘটে না, তাহাই 'অযোগ-শৃঙ্গারে'র ক্ষেত্র। এ স্থলে নায়ক ও নায়িকা উভয়েরই দশবিধ কামদশা ঘটিয়া থাকে। অবশ্য অনুরাগ উদ্রিক্ত হইবার পূর্ব্বে পরস্পরের পরিচিত হওয়া প্রয়োজন—তাহা উভয়ের সাক্ষাৎকার দ্বারাও হইতে পারে, অথবা প্রতিকৃতি-স্বপ্ন-ছায়া-মায়া প্রভৃতি দ্বারা, অথবা কেবল গুণাবলী শ্রবণের দ্বারাও ঘটিতে পারে। বিয়োগ হইতে অযোগের ভেদ কোথায়, তাহার সমাধান-কল্পে শারদাতনয় বলিয়াছেন—পূর্ব্বে সম্মিলিত নায়ক-নায়িকার পশ্চাৎ বিচ্ছেদ বিয়োগ বা বিপ্রলম্ভ, আর পূর্ব্বে অমিলিত অথচ পরস্পর অনুরাগবদ্ধ নায়ক-নায়িকার মিলনাভাবই অযোগ (২৬)। যাহা হউক, এই অযোগ-বিয়োগাত্মক দ্বিবিধ শৃঙ্গার কিয়দংশে করুণের তুল্য হইলেও সম্ভোগ-শৃঙ্গারের সহিত বহুলাংশে একরূপ। কারণ, ত্রিবিধ শৃঙ্গারেরই বিভাবাদি এক প্রকার। আর অযোগ ও বিয়োগ দশায় রতি স্থায়িভাব অনুবৃত্ত হয় বলিয়াই সৎকবিগণ উহাদিগকে 'শৃঙ্গার'-সংজ্ঞা দিয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গে শারদাতনয় আরও বলিয়াছেন যে, যদি প্রত্যুজ্জীবনের আকাঙ্ক্ষা রাখিয়া কাব্যে মরণের বর্ণনা করা যায়, তাহা হইলে তাহা বিয়োগ-সঞ্জাত দুঃখের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে—অর্থাৎ তাহা করুণরসের উদ্রেককর না হইয়া বিপ্রলম্ভেরই অভিব্যক্তি করে (২৭)।

বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা অধমপ্রকৃতির নায়ক-নায়িকাতে পরিস্ফুট হইতে পারে না। কারণ, অধমপ্রকৃতির নায়ক-নায়িকার নিকট সম্ভোগ-শৃঙ্গারই শৃঙ্গারের একমাত্র রূপ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সম্ভোগের অবসান হইলেই তাহাদিগের চিত্ত হইতে রতি স্থায়িভাব বিলুপ্ত হইয়া যায়। অতএব তাহাদিগের বিরহদশায় রতি স্থায়িভাব অনুবৃত্ত হয় না বলিয়া তাহারা বিরহাবস্থায় বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গার অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। অর্থাৎ এক কথায়—বিরহের মধ্যেও যে প্রেম বর্ত্তমান থাকিতে পারে—ইহা তাহাদিগের ধারণার অতীত (২৮)।

শৃঙ্গার-রস-প্রকরণ সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে মহর্ষি একটি অতি সুন্দর সংগ্রহ-শ্লোকে বলিয়াছেন—'শৃঙ্গার সুখবহুল অভীষ্টবস্তু-বিশিষ্ট, অভিমত ঋতু ও সুগন্ধি মাল্যাদি ভোগকারী প্রমদা-বিলাসী পুরুষস্বরূপ' (২৯)। ইহা নিছক রূপক নহে। অভিনবগুপ্ত ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, শৃঙ্গারকে যে 'পুরুষ' বলা হইয়াছে—ইহা অতিশয় যুক্তিযুক্ত। কারণ, পুরুষই ভোক্তা চিৎস্বরূপ। (চিৎ, চেতন চৈতন্য, সংবিৎ, সংবেদন প্রভৃতি শব্দ পর্য্যায়রূপে ব্যবহৃত

---

(২৬) "বিয়োগাযোগসম্ভোগৈঃ শৃঙ্গারো ভিদ্যতে ত্রিধা।
পরস্পরং বিভাবাদ্যৈর্যেনোৎকৃতরাগয়োঃ।
অসঙ্গতিরযোগোঽস্মিন্ দশাবস্থা দ্বয়োরপি।
সাক্ষাৎপ্রতিকৃতিস্বপ্নচ্ছায়ামায়াগুণাদিভিঃ।
নায়িকায়া নায়কস্য দর্শনং স্যাৎ পরস্পরম্।
... ...
বিয়োগো বিপ্রকর্ষঃ স্যাদ্‌যূনোঃ সম্ভোগমগ্নয়োঃ"।
—ভাবপ্রকাশন, বরোদা সং, ৪র্থ অধিকার, পৃঃ ৮৫।

(২৭) "সাধারণ্যাদ্বিভাবাদেরত্রাযোগবিয়োগয়োঃ।
করুণস্যানুরূপ্যেঽপি রতিস্থায্যনুবৃত্তিতঃ।
এতৌ শৃঙ্গারভেদৌ স্ত ইতি সংকবিনির্ণয়ঃ।
... ...
মরণং যদি সাপেক্ষং প্রত্যুজ্জীবনকাঙ্ক্ষয়া।
তদ্বর্ণ্যতে বিয়োগোত্থদুঃখসাধারণাত্মকম্।
—ভাঃ প্রঃ, পৃঃ ৮৭।

মরণ বিপ্রলম্ভে প্রদর্শিত হইবে কি না, সে সম্বন্ধে অভিনবগুপ্তের মতবাদ পূর্ব্বেই উদ্‌ধৃত করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে দর্পণকারের মত এই যে—রসবিচ্ছেদহেতু মরণের বর্ণনা শৃঙ্গারে অনুচিত। উন্মুখভাবের (অর্থাৎ প্রায় মরণ ঘটিল—এইরূপ অবস্থার) কিংবা চিত্তে মরণের আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে—এই ভাবেরই বর্ণনা করা উচিত। তবে যদি অদূর ভবিষ্যতে প্রত্যুজ্জীবন-সম্ভাবনা থাকে—তবে মরণের বর্ণনা বিপ্রলম্ভে করা চলে। যথা—কাদম্বরীর মহাশ্বেতা ও পুণ্ডরীকের উপাখ্যান। পুণ্ডরীকের মৃত্যু হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার পুনর্জ্জীবনের আশায় মহাশ্বেতার তাপসীরূপে জীবনধারণের কাহিনী করুণরসের পরিবর্তে বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারের সূচক। "রসবিচ্ছেদহেতুত্বান্মরণং নৈব বর্ণ্যতে। জাতপ্রায়ন্তু তদ্বাচ্যং চেতসাকাঙ্ক্ষিতং তথা। বর্ণ্যতেঽপি যদি প্রত্যুজ্জীবনং স্যাদদূরতঃ"।—সাঃ দঃ, ৩য় পরিচ্ছেদ।

(২৮) "অধমপ্রকৃতেস্তাবন্ন বিপ্রলম্ভঃ স্থায্যভাবাৎ"—অঃ ভাঃ পৃঃ ৩১১।

(২৯) সুখপ্রায়েষ্টসম্পন্ন ঋতুমাল্যাদিসেবকঃ। পুরুষঃ প্রমদাযুক্তঃ শৃঙ্গার ইতি সংজ্ঞিতঃ"। ৫২। (নাঃ শাঃ, ৬ অঃ, পৃঃ ৩১১)।

থাকে।) ভোক্তার অন্তঃকরণে স্থায়িভাব সংস্কার-রূপে বর্ত্তমান থাকে। সেই সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া বিভাবানুভাব-সঞ্চারি-সংযোগে যখন ভোক্তৃ-কর্ত্তৃক স্বাভিন্নরূপে আস্বাদ্যমান হয়, তখনই উহা রসরূপে অভিব্যক্তি লাভ করে। রস অনাবৃত চৈতন্যস্বরূপ। আবার ভোক্তাও চিদ্রূপ। অতএব, রসই ভোক্তার স্বরূপ। আর এ কারণে ভোক্তা স্বাভিন্নরূপে রসাস্বাদন করেন—ইহা অতি স্বাভাবিক। এই রস আস্বাদ্যমান অবস্থাতেই রসরূপ ধারণ করে। তৎপূর্ব্বে ইহা স্থায়িভাব বা তাহার সংস্কার-রূপে ভোক্তার অন্তঃকরণে বর্ত্তমান থাকে। অতএব স্থায়িভাবও বস্তুতঃ চিদ্রূপ। কেবল উহা আস্বাদ্যমান না হওয়ায় অনাবৃত চিদ্রূপে স্ফূর্ত্তি পায় না—আবৃতভাবে ভোক্তৃ-চিত্তে অবস্থিত থাকে। আবৃত থাকে বলিয়াই উহা সংস্কাররূপে প্রতীয়মান হয়, নতুবা স্বরূপে উহাও চিদ্রূপ। এই প্রকার সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায় স্থায়িভাবও সংবিদ্রূপ ও উহা ভোক্তার স্বরূপ হইতে অভিন্ন। এ কারণে রতি স্থায়িভাবকেই এ স্থলে ভোক্তা পুরুষরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে (৩০)। প্রমদা এ ক্ষেত্রে আলম্বন-বিভাব—ভোগ্যবিষয়-স্থানীয়—ভোক্তার অধীন। ভোক্তা পুরুষ কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—ভোগ্য প্রমদার অধীন নহেন। স্বাধীন নায়ক এক নায়িকা ছাড়িয়া অন্য নায়িকার সহিত মিলিত হইলেও তাঁহার স্বাতন্ত্র্যহানি ঘটে না বলিয়া শৃঙ্গার-রস-ভঙ্গ হয় না। পক্ষান্তরে, নায়িকা ভোগ্যবিষয়-রূপিণী বলিয়া অন্য নায়কের সহিত মিলনে স্বাতন্ত্র্যের অভাববশতঃ রসভঙ্গের কারণ হইয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে ঋতু-মাল্যাদি উদ্দীপন-বিভাব। সুখবহুল অভীষ্ট বস্তুসমূহ বলিতে বিভাব-অনুভাব-সঞ্চারিভাব প্রভৃতি সকলই বুঝাইতেছে। প্রমদা আলম্বন-বিভাব। ইহারা সকলেই ভোগ্য। কেবল এক ভোক্তা পুরুষ-স্থানীয় রতি স্থায়ি-ভাব। অতএব, অনুকূল বিভাবানুভাব-সঞ্চারিভাব-সংযোগে রতি স্থায়িভাব শৃঙ্গাররস-রূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে—ইহাই শ্লোকটির নিগূঢ় তাৎপর্য্য।

অনুকূল ঋতু-মাল্য-অলঙ্কার প্রভৃতি দ্বারা, বিদূষকাদি প্রিয়জনের সাহচর্য্য—গীতাদি হৃদ্য বিষয়ভোগ ও কাব্যসেবা দ্বারা, উপবন-গমন ও নানাবিধ বিহার দ্বারা শৃঙ্গাররস প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। (এইগুলি সবই বিভাব।)

নয়ন ও বদনের প্রসন্নভাব, স্মিত, মধুর বাক্য, ধৃতি, প্রমোদ, ও ললিত অঙ্গহার প্রভৃতি দ্বারা এবংবিধ শৃঙ্গার-রসের অভিনয়-প্রয়োগ কর্ত্তব্য। (ইহাদিগের মধ্যে ধৃতি ও প্রমোদ ব্যভিচারি-ভাব। অন্যগুলি অনুভাব মাত্র—ইহাই অভিনবগুপ্তের অভিমত।) (৩১)।

অভিনবগুপ্ত এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, সুখজনক বলিয়া কাব্যার্থই রস—এই মত যাঁহারা পোষণ করেন, তাঁহাদিগের মতবাদ এই শ্লোকগুলির দ্বারা মহর্ষি নিরাকৃত করিয়াছেন। কারণ, ভোগ্য বিষয়ের সমষ্টি যে রস নহে—বিভাবমাত্র—ইহা মহর্ষি স্বয়ং পূর্ব্বে প্রতিপাদিত করিয়াছেন (৩২)।

নাট্যশাস্ত্রের শৃঙ্গার-রস-প্রকরণ এই স্থানেই সমাপ্ত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে নবীন আলঙ্কারিকগণের অনেকে অনেক নূতন কথা বলিয়াছেন। সেই সকল উক্তির সারাংশ কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

(৩০) পুরুষ ইতি ভোক্তা সংবেদনাখ্যকোঽভিপ্রেতঃ। ভোক্তৈব চ স্থায়িসংবিদ্রূপো ব্যভিচারিণস্তু ভোগস্বভাবাস্তেন রতিরেব পুরুষঃ।......তত্র ভোক্তৃত্বে পুরুষস্য প্রাধান্যম্। প্রমদায়াস্তু ভোগ্যত্বম্। প্রাধান্যাদেব চ তস্য ভোগ্যোনাপরতন্ত্রীকরণমিতি নায়িকান্তরযোগেঽপি ন শৃঙ্গারহানিঃ, ভোগ্যস্য তু পারতন্ত্র্যাদেবান্য-সম্মীলনে শৃঙ্গারভঙ্গ ইতি দর্শিতম্"—(অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩১২)।

(৩১) "ধৃতি-প্রমোদশব্দেন ব্যভিচারিণো লক্ষয়তি"—অঃ ভাঃ পৃঃ ৩১৩।

(৩২) "কাব্যসেবাশব্দেন বিষয়সকলং বিষয়ত্বেন লক্ষয়তি। যত্বাহু—কাব্যার্থীভূতাদ্রসাৎ কাব্যার্থবিদো ভাবান্তরং প্রাদুর্ভবতি. অতঃ সুখজনকত্বাৎ কাব্যার্থো রস ইতি, স প্রত্যুক্তঃ, ন হি বিষয় সামগ্রী রস ইতি পূর্ব্বং লক্ষিতম্"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩১৩।

ব্ল্যাক-আউট

রাত্রি নটা। অমাবস্যা; তার উপর আকাশে মেঘের ঘন-ঘটা; এবং ব্ল্যাক-আউট! যাকে বলে, ত্র্যহস্পর্শ-যোগ!

বালিগঞ্জের এ্যারিষ্টোক্রাট্-পল্লীর পথে মোড়ের মাথায় নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে মহিম। তার মনের মধ্যেও ঠিক এমনি ব্ল্যাক-আউট। আলোর ক্ষীণ রশ্মিও সেখানে নাই!

পৃথিবীর বুকে যুদ্ধ আরম্ভ। ওদিকে আটলান্টিক, এদিকে প্যাসিফিক মহা-সাগর—দুই মহা-সাগরের জল যুদ্ধের কল-মাতনে তোলপাড় হইতেছে! মহিমের বুকেও এমনি যুদ্ধ চলিয়াছে—দেব-দৈত্যের যুদ্ধ!

রিট্রেঞ্চমেন্টের কল্যাণে সাত মাস পূর্ব্বে মহিমের চাকরি গিয়াছে। মাসে আশী-টাকা করিয়া মাহিনা পাইত, এক-কথায় সে চাকরি চলিয়া গেল! তার পর পাঁচ-ছটা বাড়ীতে টুইশনি করিয়া কোনো মতে গোটা পঞ্চাশেক টাকা রোজগার করিতেছিল, কিন্তু এমন বরাত, জাপানীর বোমা ফুটিবামাত্র ছাত্রদের লইয়া অভিভাবকের দল সহর ছাড়িয়া যে যেখানে পারে, পলায়ন করিয়াছে! ইভাকুয়েশনের স্রোতে টুইশনিগুলি ভাসিয়া গিয়াছে!

চাকরি গেলেও দুর্ভাগ্য তবু যাইতে চায় না! বাড়ীতে বুড়ী মা—তাঁর অসুখ। স্ত্রী সুশীলা সদ্য একটি পুত্র প্রসব করিয়া সূতিকা-রোগে শয্যাশায়িনী। হাতে পয়সা নাই! না হয় চিকিৎসা, না পায় কেহ পথ্য! চাকরির প্রত্যাশায় কোথায় কার দ্বারে না মহিম গিয়াছে! মুখ ভারী করিয়া সকলেই বলেন,—কি-রকম সময় যাচ্ছে! রাষ্ট্র-সঙ্কট!

মহিম আজ গিয়াছিল কলিকাতার যত খপরের কাগজের অফিসে—কাগজ বেচিয়া যদি দু'পয়সা পায়! কিন্তু সেখানেও নিরাশ হইয়াছে! কাগজওয়ালারা তাকে চেনে না, বলে—যে-সময় পড়িয়াছে, সিকিউরিটি-স্বরূপ পঞ্চাশটি টাকা জমা রাখিতে হইবে। তাছাড়া হকারের দল আছে···তাদের সংখ্যা কম নয়; তদুপরি কাগজের উপর রেসট্রিক্‌সন্···কাগজ মিলিবে, কি মিলিবে না···তার উপর নানা আইনের নাগপাশে কাগজওয়ালাদের গতি এমন আবদ্ধ ইত্যাদি···

সন্ধ্যার পূর্ব্বে মহিম বাড়ী ফিরিয়া দেখে, সুশীলার জ্বর বেশ বাড়িয়াছে। পাড়ার হোমিওপ্যাথিক-ডাক্তার গোপাল বাবু বিনা-পয়সায় বহু ঔষধ জোগাইয়াছেন, তিনি বলিলেন,—যে-রকম সময় পড়েছে, ওষুধের দামটা দিয়ে দিয়ো, মহিম! বেশী তো নয়···ডোজ-পিছু চার-আনা পয়সা!

নিশ্বাস ফেলিয়া মহিম চলিয়া আসিয়াছে! দু'-চারিটা পয়সার জোগাড় নাই, তা দু'-চার আনা!···চাল-ডাল নুণ-তেল কিনিতে সুশীলা তার গহনাগুলি খুলিয়া দিয়াছে! তার গায়ে আর গহনা নাই যে বেচিয়া ঘরে একটি পয়সা আনিবে!

ঐ শরীর লইয়া মা কোনো মতে দু'টি ভাত রাঁধিয়া দেন। মা বলিয়াছেন, কাল বৈকালে চাল চাই। সে চাল কি করিয়া জোগাড় করিবে···

অথচ সে দু'-দু'টা পাশ করিয়াছে। এত লোক পয়সা রোজগার করিতেছে, আর তার বেলায় সে-পয়সা এমন দুর্লভ! তার জোটে না হোমিওপ্যাথিক ঔষধের দাম, আর সিনেমা-হাউসগুলায় মানুষ ঢুকিতেছে হৈ-হৈ শব্দে! কোথা হইতে এত পয়সা উহারা পায়?

ভাবিতেছিল, এক দিন কি স্বপ্নই না দেখিতাম! ঘর-সংসার, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, লোক-জন! যে-মার কাছে কোনো দিন কোনো কারণে দাঁড়াইতে লজ্জা পায় নাই, সেই মার সামনে দাঁড়াইতে আজ লজ্জায় মাথা নুইয়া পড়ে! স্ত্রী সুশীলা···তাকে কোথায় ভালো কাপড় দিবে, গহনা দিবে, তা নয়, তার গা হইতে সব গহনা কাড়িয়া তাকে নিরাভরণা করিয়াছে!

শুধু এই রাত্রিটুকুর ব্যবধান! কাল সকালে সংসার তার দাবী লইয়া যখন ফুঁশিয়া উঠিবে···

এক-একবার মনে হয়, ব্যর্থ এ জীবনকে টানিয়া-টুনিয়া আর কত চালাইবে? চালানো যায় না! জীবন্ একেবারে অচল হইয়া উঠিয়াছে! তার চেয়ে ঐ লেকের জলে···

বুকখানা অমনি ছাঁৎ করিয়া ওঠে! কাহারো ভার বহিবার সামর্থ্য নাই, নিজেকে মানুষ বলিয়া পরিচয় দাও? সকলে তারি মুখের পানে চাহিয়া আশায় বুক বাঁধিয়া দিন কাটাইতেছে···লেকের জলে ডুব দিয়া তুমি চাও নিষ্কৃতি! উহাদের সব আশা নির্মূল করিয়া তুমি দিবে ফাঁকি! তার পর উহারা···?

না···মরা চলে না।

মনে মনে আবার কত কি গড়িতে থাকে! মনকে বলে, কাজ চাই, কাজ···life is struggle···জীবন সংগ্রামের ক্ষেত্র! বুঝিতে পারিলে এক দিন নিশ্চয়···

তাসের ঘর নিমেষে ভাঙ্গিয়া যায়! সঙ্গে সঙ্গে সাধ, আশা, মনের বল···সব ভাঙ্গিয়া ধূলায় ঝরিয়া পড়ে!

সাম্‌নের কোন্ বাড়ীতে রেডিয়োয় গান হইতেছিল,—

এ কি হরষ হেরি কাননে,!
পরাণ আকুল স্বপন-বিকসিত
মোহ মদিরাময় নয়নে!

মহিমের বুকের অস্থি-পঞ্জর চূর্ণ করিয়া একটা নিশ্বাস বাহির হইয়া বাতাসে মিলাইয়া গেল। যখন কলেজে পড়িত, ও-গান শুনিয়াছে···ও-গানে মনের সামনে সোনায়-গড়া কি রাজ্যই না তখন ভাসিয়া উঠিত! আর আজ ও-গানে···

মনে পড়িল, সুশীলার অসুখ বাড়িয়াছে! ডাক্তার-গোপাল বাবু চাহিয়াছেন ঔষধের দাম···সামান্য চার আনা পয়সা···

ভিক্ষা চাহিলে এ পয়সা মেলে না?···সুশীলার প্রাণ···তার জন্য ভিক্ষাই যদি চাহিতে হয়···মান খোয়াইয়া সুশীলার প্রাণ রক্ষা করিবে না? সুশীলার প্রাণের চেয়ে তার মানের দাম এত বড়?

না, ভিক্ষাই সে চাহিবে!

সামনে যে-বাড়ীর দ্বার খোলা দেখিল, মহিম দ্বার-পথে সেই বাড়ীতে ঢুকিল।

সামনে বারান্দা। মার্বেল-পাথরে বাঁধানো। বারান্দার কোলে মস্ত ঘর। ঘরের দ্বারে ভারী পর্দ্দা। পর্দ্দা ঠেলিয়া মহিম ঢুকিল ঘরের মধ্যে।

মোটা কালো কাগজের শেডে ঢাকা বিজলী-বাতি। স্তিমিত আলো···ক্ষীণ আলোয় অন্ধকার যেন ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে!

ঘরে কেহ নাই! এ-ঘরের ওদিকে দু'টো ঘর···খোলা দ্বার। সে দু'ঘরের দ্বারের সামনেও এমনি মোটা পর্দ্দা···

মহিম দাঁড়াইল···ওদিকে যাইবে?···যদি মেয়েরা থাকেন?

সাড়া দিবে?

বাড়ীর লোক হয়তো বিশ্রাম করিতেছে! ভিক্ষা চাহিবে তাঁদের সে বিরাম-সুখ ভাঙ্গিয়া দিয়া?

যদি বিরক্ত হন? যদি বলেন, ভিক্ষা চাহিবার আর সময় পাও নাই?

তার চেয়ে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকি! ঘরে আলো জ্বলিতেছে···নিশ্চয় কেহ-না-কেহ আসিবে!

এখনি না আসেন, একটু দেরীতে! ঘরে যখন আলো জ্বলিতেছে···ঘুমান নাই, নিশ্চয়!

মহিম ভাবিল, হোক দেরী! ভিক্ষার জন্যই যখন হাত পাতিতে আসিয়াছি, তখন ভিক্ষা না লইয়া যাইব না! ভিক্ষার জন্য রাত্রির এই অন্ধকারই ভালো। দিনের আলোয় ভিক্ষা হয়তো চাহিতে পারিত না। অথচ হাত না পাতিলে নয়! সুশীলার প্রাণ···সে-প্রাণের জন্য ভিক্ষা ছাড়া অন্য উপায় যখন নাই···

ওদিকে রেডিয়োয় গান চলিয়াছে···

কখন বসন্ত গেল,
এবার হলো না গান!
কখন বকুল-মূল
ছেয়েছিল ঝরা ফুল
কখন যে ফুল ফোটা
হয়ে গেল অবসান!

মহিম কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাণে আসিয়া লাগিতেছে ঐ গান! আর মনের মধ্যে···

যেন ঝড় বহিতেছে! গল্পে-উপন্যাসে পড়িয়াছে, মানুষের জীবনে এমন ক্ষণ আসিয়া উদয় হয়, যখন মনখানাকে দু'ভাগে ভাঙ্গিয়া কোথা হইতে দুটো দল আসিয়া তর্ক জুড়িয়া দেয়···বিরোধ তোলে! তার মনেও ঠিক তেমনি বিরোধ! এক-দল বলিতেছে, ছি, ভিক্ষা! তার চেয়ে বাজারে গিয়া মোট বহিতে পারো না? আর এক-দল বলিতেছে, এ পরামর্শ দিনের বেলায় দাও নাই কেন? মোট বহিতে গেলে যার-নাম-সেই বেলা ন'টা দশটা! তার আগে সুশীলার ঔষধ চাই! নহিলে যে-জ্বর দেখিয়া আসিয়াছে··· কে জানে, হয়তো রাত্রি শেষ হইবার পূর্ব্বেই···

পাশের ঘরে পায়ের শব্দ···

মহিমের বুকখানা ছাঁৎ করিয়া উঠিল।

একবার মনে হইল, চলিয়া যাই! ভিখারী সাজিয়া ভিক্ষা চাওয়া? না! তার চেয়ে···

মন তখনি পা দু'খানাকে আঁটিয়া চাপিয়া ধরিল, বলিল, —না, না···যখন আসিয়াছ···এই অন্ধকার! কে চিনিবে?

ওদিক্‌কার পর্দ্দা ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে আসিল মানুষ··· ভদ্রলোক···গায়ে কোট···

যে-লোক ঘরে ঢুকিল, সে চাহিল মহিমের পানে, বলিল,—কি চাই?

মহিমের বুকের মধ্যে কি একটা কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিল! সঙ্গে সঙ্গে কথা সে ভুলিয়া গেল! কি কথা বলিবে?

সে-লোক বলিল—কি চাই?

একটা নিশ্বাস···বড় নিশ্বাস! নিশ্বাস ফেলিয়া মহিম বলিল—বড্ড কষ্ট যাচ্ছে···

ভদ্রলোক বলিল,—কষ্ট কার এখন নয়, বাপু? অন্ন-সমস্যা তো! কোন্ বাঙালীর ঘরে ও-সমস্যা নেই? তার উপর এই যুদ্ধ!

মহিম বলিল—আজ সাত-আট মাস চাকরি নেই। যা কিছু সঞ্চয় ছিল, সব গেছে। স্ত্রীর গহনাগুলি পর্য্যন্ত। বাড়ীতে স্ত্রীর খুব অসুখ···একফোঁটা ওষুধ দেবো, সে সামর্থ্য নেই। কখনো ভিক্ষা করিনি···নিরুপায় হয়ে ভিক্ষার জন্য এসেছিলুম। দিনের বেলা হলে হয়তো আসতে পারতুম না। একে রাত্রি, তার উপর এই অন্ধকার···

ঘর-বাড়ী কাঁপাইয়া বাহিরে হু-হু শব্দে বাতাস গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

ভদ্রলোক বলিল,—ঝড় উঠলো!

দড়াদ্দম্-শব্দে এ-বাড়ীর···ও-বাড়ীর···পাঁচ-সাতখানা বাড়ীর দ্বার-জানলা গায়ে-গায়ে ধাক্কা দিয়া চীৎকার তুলিল।

ভদ্রলোক বলিল,—ইঃ, দোর-জানলাগুলো···

বলিয়া সদরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিল···সেই সঙ্গে দু'-চারিটা খড়খড়ি-সার্শি! তার পর আবার সে আসিল মহিমের সাম্‌নে।

মহিম বলিল—তাহলে···

সে-লোক বলিল,—বসো। এ ঝড়ে কোথায় যাবে?

মহিমের বুকের অন্ধকার কাটিয়া একটু যেন আলোর রশ্মি! দয়া হইয়াছে, বুঝি!

লোকটি বলিল,—বাড়ীতে কেউ নেই। আমি একা আছি। মানে, সব বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছি। বর্ম্মায় যা হচ্ছে···কে জানে, কোন্ দিন কলকাতায় যদি··· সাবধান হওয়া ভালো। গুণ্ডারা যদি ক্ষেপে ওঠে? এই ব্ল্যাক-আউটে চোর-বদমায়েসদের ভারী সুবিধা হয়েছে। তাছাড়া যদি কোনো দিন বোমার ভয় বেশী হয়, কে জানে, মেয়েদের রাখা তখন নিরাপদ হবে না! আবার সে হট্টগোলে তাদের নিয়ে সরে পড়াও দায় হবে!··· তাই!···তা হ্যাঁ, এবার বলো তোমার কথা, শুনি।

মহিম সবিস্তারে খুলিয়া বলিল তার জীবনের দারুণ ট্রাজেডির কথা! ভিক্ষা করিতে আসিয়া চিরদিনের মান-ইজ্জৎ যখন খোয়াইয়াছে, তখন আর কিসের লজ্জা?···দুঃখের কাহিনী সকল বাধা-বিমুক্ত হইয়া অবিরাম ধারায় বুকের গোপন-গহন হইতে উৎসারিত হইল! বাহিরে ঝম্-ঝম্ শব্দে বৃষ্টি পড়িতেছে···মাঝে মাঝে আকাশ-পৃথিবী কাঁপাইয়া কক্কড় শব্দে অশনি-হুঙ্কার···

একান্ত মনোযোগে ভদ্রলোক সব কথা শুনিল। শুনিয়া বলিল,—হুঁ, শুনলুম। বড় বাড়ীতে আরামে বসে আছি···দারিদ্র্য-দুঃখে মানুষ আজো কত কষ্ট পাচ্ছে···তার কিছু বুঝি না!···ভদ্র-ঘরের এ-দুর্দ্দশা! এ দুঃখ আমিও এক দিন পেয়েছি। তাই তোমার দুঃখ আমি বুঝতে পারছি!···বড়লোকের বাড়ীতে রেডিয়ো চলেছে··· এ রেডিয়ো-শেট কিনতে কত পয়সা লেগেছে! রেডিয়ো-শেট না হলেও মানুষের দিন চলে। কিন্তু এ-সব তত্ত্ব-কথার সময় এখন নয়।··· মানে, এই দারিদ্র্য, অর্থকষ্ট আমি কি-রকম সহ্য করেছি! চোখের সামনে দু'-দু'টো ছেলে রোগে ভুগে মারা গেছে। তাদের চিকিৎসা করাবার সামর্থ্য ছিল না, হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলুম। সেখানে সুপারিশ ধরবার কেউ ছিল না···তাই হাসপাতালেও ছেলেদের জায়গা হয়নি। শেষে টেনে হিঁচড়ে আবার তাদের ঘরে ফিরিয়ে আনি। আনবার পরেই···

ভদ্রলোক নিশ্বাস ফেলিল। তার পর বলিল—কিন্তু যাক সে কথা! চোখের সামনে ছেলেদু'টোর সেই অকাল-মৃত্যু···তার পর নতুন করে ব্যবসা সুরু করলুম। শুধু টাকার ধ্যান করেছি! মা-লক্ষ্মী মুখ ফিরিয়ে ছিলেন··· আমার সে-ধ্যানে খুশী হয়ে তিনি ফিরে চাইলেন! অনেক টাকা রোজগার হতে লাগলো। আজ ব্যবসা মেশিনে চলছে! দিব্যি আছি!···এই টাকা···এর নেশা এমন··· টাকার উপর যখন টাকা এসে জমে, মন তখন আর মন থাকে না—পাথর হয়ে যায়! একটি পয়সাকে তখন মনে হয় লাখ টাকার ভগ্নাংশ! তার উপরে কি মায়া···

মহিম নির্ব্বাক্···

ভদ্রলোক বলিল,—এখন ব্যস্ত আছি। আর এক সময় সুবিধা-মতো তুমি এসো। যে-ভাবে আমি টাকার সাধনা করেছি···সে-প্রণালী তোমায় শিখিয়ে দেবো। এখন নয়। এখন তোমার কিছু চাই···বললে না? ভদ্রলোক··· লেখাপড়া শিখেছো···দেখি, তোমার নশীবে কি মেলে!···

ভদ্রলোক উঠিয়া পাশের ঘরে গেল···মহিমের যেন চেতনা নাই! এক-একবার মনে হইতেছিল, স্বপ্ন দেখিতেছে না কি? চাহিবামাত্র মানুষ পয়সা দেয়, এই দুর্য্যোগের রাত্রে? এমন করিয়া আর এক জনের দুঃখের কাহিনী শোনে?

ভদ্রলোক ফিরিল···হাতে এক-তাড়া নোট!

নোটের তাড়া মহিমের হাতে দিয়া ভদ্রলোক বলিল —বোধ হয় শ' দেড়েক টাকা আছে, নিয়ে যাও। নিয়ে এখনি সরে পড়ো। আমার কাজ আছে···তোমার সঙ্গে এক-মিনিট আর নয়···বুঝলে!

এ সত্য? না···

কি করিয়া হাত বাড়াইয়া মহিম নোটের তাড়া লইল···

তখনি চেতনা ফিরিল। বুঝিল, হাতে এ নোটের তাড়া···স্বপ্ন নয়! দু' চোখের দৃষ্টিতে বিস্ময়···সে চাহিল ভদ্রলোকের পানে।

ভদ্রলোক বলিল—ঝামেলা নয়, সরে পড়ো। হ্যাঁ, ভালো কথা, তোমার নাম?

—আমার নাম মহিম।

—কোথায় থাকো?

মহিম্ বলিল।

ভদ্রলোক বলিল—যদি সুবিধা হয়, এক দিন গিয়ে দেখে আসবো! এখন যাও···

কৃতজ্ঞতা-ভরে মহিম লুটাইয়া পড়িল ভদ্রলোকের পায়ে! ভদ্রলোক বলিল—আঃ! ঐ তো দোষ! টাকা চাই···টাকা পেলে! সরে পড়ো, সরে পড়ো···

মহিম বলিল—আপনার নাম?

মহিমের চোখ বাষ্প-ভারে আর্দ্র।

ভদ্রলোক হাসিল, হাসিয়া বলিল,—আমার নাম রাঘব রায়। শুনলে তো···your great benefactor··· এবার যাও। যাও···

মহিমকে তাড়াইতে পারিলে ভদ্রলোক যেন বাঁচে! আশ্চর্য্য! এ কথার পর মহিম আর দাঁড়াইল না···চলিয়া গেল।

বাহিরে ঐ জল-ঝড়···সে জল-ঝড় গ্রাহ্য করিল না।

এত টাকা! এ টাকায় সুশীলার ঔষধ···পথ্য··· ডাক্তারের ফী···চাল-ডাল-নুণ-তেল···ওঃ!

ভিজিয়া একশা হইয়া মহিম বাড়ী ফিরিল। বাড়ীতে ছোট একটা টাইম-পীশ্ ঘড়ি ছিল···সে-ঘড়িতে তখন এগারোটা বাজিয়াছে।

মহিম ডাকিল—সুশীলা···

সুশীলা বলিল—কেন?

মহিম বলিল—কেমন আছো?

—ভালো।

মহিম বলিল—টাকা পেয়েছি···এক জন দয়াল-দাতা ···রাঘব রায়···তিনিও এক দিন এমনি দুঃখ পেয়েছিলেন! আমাদের কষ্টের কথা শুনে তাঁর দয়া হলো···এক-কথায় এত টাকা দিয়ে দিলেন!

মহিম সব কথা খুলিয়া বলিল।

শুনিয়া সুশীলা বলিল—কি বলছো তুমি!

—সত্য কথা বলছি, সুশীলা!

সুশীলা বলিল,—এ-কালে এমন মানুষ জন্মায়? গল্পের সেই হারুণ-উল্-রসীদ!

—তাই!···

পরের দিন ডাক্তার গোপাল বাবুকে ফী দিয়া মহিম বাড়ীতে আনিতে চাহিল।

মা বলিলেন,—টাকা পেয়েছিস্! এক জন ভালো ডাক্তার আন্, মহিম!

ভালো ডাক্তার আসিলেন। নীরদ বাবু এম-বি। রোগী দেখিয়া এম-বি ডাক্তার ভালো ঔষধ দিলেন। বলিলেন—ভয় নেই! এ রোগের ভালো ওষুধ বেরিয়েছে···ওষুধের সঙ্গে দু'-তিনটে ইনজেক্শন্···

দু'দিন পরের কথা···

এম্-বি ডাক্তারের বাড়ীতে মহিম বসিয়া আছে··· এখনি তিনি আসিবেন···ইনজেক্শন্ দিবেন।

টেবিলের উপরে ক'খানা খবরের কাগজ···একখানা খবরের কাগজ টানিয়া মহিম তার পাতায় মনঃসংযোগ করিল।

যুদ্ধের টেলিগ্রাম···একটার পর একটা দেশ কি করিয়া চূর্ণ হইতেছে···কত যুগের যত্নে-গড়া সভ্যতা-সমৃদ্ধি···কত কীর্ত্তি পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিতেছে! বোমার বিষে মানুষ মারিতেছে···হেলায়! মানুষ যেন মানুষ নয়···কীট-পতঙ্গ!

এ্যাসেম্বলির রিপোর্ট···তর্ক আর বাদানুবাদে ধোঁয়ার পর ধোঁয়া জমানো! সম্পাদকীয় মন্তব্য···তত্ত্ব···সর্ব্বজ্ঞতার এক বিরাট্ এগ্‌জিবিশন! সংবাদ···আইন-আদালত···

হঠাৎ চোখে পড়িল একটা সংবাদ। বড় হেড-লাইন—

দাগী চোর গ্রেফ্‌তার

লেক-ভিউ রোডে গয়ার বিখ্যাত জমিদার গজপতি সিংয়ের গৃহে সে-দিন ঐ দুর্য্যোগের রাত্রে ভীষণ চুরি হইয়া গিয়াছে। গজপতি সিং মহাশয়ের বাড়ীর মহিলা ও ছেলেমেয়েরা গয়ায়। সন্ধ্যার পর বাড়ীতে ছিল এক জন মাত্র দ্বারবান্। এক জন লোক আসিয়া দ্বারবানকে বলে, বড়বাজারের ফার্ম্মে গজপতি বাবু একটা বাণ্ডিল রাখিয়া গয়ায় গিয়াছেন। দ্বারবান্ যেন এখনি ফার্ম্মে গিয়া সে-বাণ্ডিলটা বাড়ীতে আনে।

বড়বাজারে গজপতি বাবুর কাপড়ের মস্ত ফার্ম্ম।

তার কথা শুনিয়া দ্বারবান্ তখনি বড়বাজারে চলিয়া যায়। সে-লোকটা তখন দোতলায় উঠিয়া আলমারির চাবি ভাঙ্গিয়া জিনিষ-পত্র সরাইয়াছে। ওদিকে ঝড়ে-জলে ভিজিয়া দ্বারবান্ বড়বাজারে গিয়া দেখে, গজপতি বাবু দোকানে আছেন। দ্বারবান্ তাঁকে বড়বাজারে আসিবার কারণ খুলিয়া বলিলে গজপতি বাবু কাল-বিলম্ব না করিয়া দ্বারবান্‌কে লইয়া তখনি মোটরে করিয়া বাড়ীতে ফেরেন।

বাড়ী ফিরিয়া তিনি দেখেন, একখানা রিক্স-গাড়ী বাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়াইয়া আছে; এবং তাঁর বাড়ী হইতে এক জন লোক মোট আনিয়া রিক্সয় চাপাইতেছে। দেখিবামাত্র তখনি তিনি লোকটিকে ধরিয়া ফেলেন। এ-আর-পি ওয়ার্ডেন তাঁর লোকজন-সমেত কাছে ছিলেন; গজপতি বাবুর চীৎকারে সকলে আসিয়া পড়েন। কাজেই চোর পলাইতে পারে নাই।

চোরের নাম জানা গিয়াছে রাঘব রায়। সাত-বারের দাগী। লোকটা থাকে বড়বাজারে। ভিতরকার কথা সে জানিত এবং জানিত বলিয়া দুঃসাহসে ভর করিয়া এ-কাজ করিতে গজপতি বাবুর গৃহে আসিয়াছিল।

কাপড়-চোপড় ও টাকা-কড়ি সবই পাওয়া গিয়াছে; শুধু দেড়শো টাকা কোথায় সরাইয়াছে। সে-টাকা আর মেলে নাই!"

খবর পড়িয়া মহিম চমকাইয়া উঠিল! সে-টাকা চুরির! দয়াল রাঘব রায়···সাত-বারের দাগী! তার বদান্যতা···

মনের মধ্যে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল! এ টাকা···

এম্-বি ডাক্তার আসিয়া বলিলেন—আমি রেডি, চলুন! এ ইনজেক্শন্ জানবেন, অব্যর্থ! আপনার স্ত্রীকে অচিরে সারিয়ে তুলবো!

মহিমের মাথার মধ্যে ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছিল···একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মহিম উঠিল; বলিল—আসুন···

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

প্রাচীন ভারতে উচ্চশিক্ষা-প্রণালী

সকল সভ্যদেশেই শিক্ষার তিনটি স্তর বা পর্য্যায় থাকে। তাহা প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ। প্রাচীন ভারতেও বিদ্যাশিক্ষায় যে এইরূপ তিনটি স্তর ছিল— ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তখন সকলেই প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিত। আমাদের দেশে সম্প্রতি একটা ধারণা জন্মিয়াছে যে, প্রাচীন ভারতে উচ্চ বর্ণের লোক ভিন্ন অন্য কেহ শিক্ষা পাইত না; কিন্তু ইহা প্রকাণ্ড ভুল ধারণা। সাধারণ বিদ্যা অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যা সকলেই শিখিতে পাইত। এই শিক্ষালাভে কোন বাধা ছিল না। প্রাচীন ভারতে সুপণ্ডিত শূদ্র এবং অন্ত্যজ ও আন্তরালিক অনেক ছিল। সূতপুত্র বলিয়া পরিজ্ঞাত কর্ণ সুপণ্ডিত ছিলেন। শূদ্রেরা রাজমন্ত্রীও হইতেন। রাজার রাজ্যাভিষেক কালে শূদ্রমন্ত্রী মৃন্ময় কলস হইতে রাজমস্তকে জল দিতেন। বিদুর শূদ্র বলিয়া গণ্য হইলেও ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী ছিলেন। "ন হি বিদ্যা কুলং জাতিরূপং পৌরুষপাত্রতাম্।" বিদ্যা-শিক্ষায় পাত্রাপাত্রের বিচার নাই। ছেলেকে লিখিতে পড়িতে না শিখাইলে ছেলের জননী তাহার বৈরী এবং জনক শত্রু বলিয়া গণ্য হইতেন। সূতজাতীয় রোম-হর্ষণকে স্বয়ং বেদব্যাস শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া পুরাণ এবং ইতিহাস শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই রোমহর্ষণ নৈমিষারণ্যে বহু সহস্র মুনি-ঋষির সমক্ষে পুরাণ-কথা প্রচার করেন (১)। রোমহর্ষণেরও আবার ছয় জন শিষ্য ছিল। এই ছয় জনের নাম সুমতি, অগ্নিবর্চ্চা, মিত্রয়ু, শাংসপায়ন, অকৃতব্রণ এবং সাবর্ণি। ইঁহারা কোন্ জাতীয় ছিলেন, বিষ্ণুপুরাণে (২) তাহার উল্লেখ নাই। তবে ইঁহারা সকলেই যে শূদ্র ছিলেন, এরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে। সুতরাং প্রাচীনকালে শূদ্র-গণ যে লেখাপড়া শিখিতেন না বা ব্রাহ্মণগণ শূদ্রদিগকে লেখাপড়া শিখিতে দিতেন না, এ ধারণা অতিশয় ভ্রান্তিপূর্ণ। প্রকৃত কথা এই যে, শূদ্রদিগকে কেবল ব্রহ্মবিদ্যাই শিক্ষা দেওয়া হইত না; তাহার অন্য সঙ্গত কারণ ছিল, তাহা পরে আলোচিত হইবে। প্রকৃত পক্ষে শূদ্র প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিতেন। পুত্র পঞ্চম বর্ষে উপনীত হইলেই তাহার হাতে-খড়ি দিয়া তাহাকে পাঠশালায় লেখাপড়া শিখান হইত। অন্ততঃ তিন বৎসর কাল প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিতেই হইত। প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর অন্ততঃ অষ্টম বর্ষ বয়সে ব্রাহ্মণ-বালক গুরুগৃহে উপবীত হইতেন। সকলে তিন বৎসরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিতে পারিতেন না। সেই জন্য ব্রাহ্মণের পক্ষে উপনয়নের কাল আট হইতে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ১২ হইতে ২২ বৎসর পর্য্যন্ত, এবং বৈশ্যের পক্ষে ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য-বালকদিগের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা অভ্যাস করিতে বিলম্ব ঘটিত। কারণ, সাংসারিক ব্যাপার সম্বন্ধে তাহাদিগকে অনেক-কিছু শিক্ষা করিতে হইত। ব্রাহ্মণবটুগণকে তাহা শিখিতে হইত না। কারণ, ব্রাহ্মণগণের পরাবিদ্যা শিখিবার দিকে ঝোঁক বেশী থাকিত। শূদ্রেরা স্বভাবতঃ ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইত না। তাহারা পার্থিব ব্যাপারে বা সাংসারিক ব্যাপারেই জড়িত হইয়া থাকিত। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্।" শূদ্রের চাকুরীর দিকেই ঝোঁক বেশী, ইহাই ভগবানের উক্তির মর্ম্মার্থ। কাজেই তৎকালে শূদ্রেরা পাঠ-শালায় প্রাথমিক শিক্ষা মাত্র করিত। পাঠশালায় শিক্ষার বিষয় বা বিস্তার অধিক ছিল না। লিখিতে পড়িতে ও সামান্য গণিতাদি শিখিলেই পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত হইত। শূদ্রেরা যে মোটামুটি লিখিতে পড়িতে পারিত, তাহা প্রাচীন কালের দলিলাদি লিখন ব্যবস্থা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীন কালে শূদ্রকে দলিলাদি লিখিতে ও তাহাতে নাম স্বাক্ষর করিতে হইত; সুতরাং শূদ্রেরা প্রাচীন ভারতে একেবারে 'আকাট মূর্খ' ছিল—এই ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন; তবে তাহাদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল না।

সে কালে অপরা বিদ্যা শিক্ষায় কাহারও বিশেষ বাধা ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তখন শূদ্রেরা প্রধানতঃ শিল্প-বিদ্যাই শিখিত। তাহাদের তাহা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। পুরা-বস্তু অনুসন্ধানকারীদিগের গবেষণা-ফলে যে সকল সুন্দর এবং সুচারু শিল্পজ বস্তু আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহা দেখিলেই মনে হয়, প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্যে উহা শিক্ষাদানের সুব্যবস্থাই ছিল; কিন্তু সেই ব্যবস্থা কিরূপ ছিল, একালে তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। শিক্ষা কল্প, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিদ্যার অষ্টাদশ অঙ্গমধ্যে যে কয়টি

---

(১) রোমহর্ষণনামানং মহাবুদ্ধিং মহামুনিম্
সূতং জগ্রাহ শিষ্যং স ইতিহাস-পুরাণয়োঃ।
—বিষ্ণুপুরাণ ৩।৪।১০ম শ্লোক।

(২) বিষ্ণুপুরাণ ৩।৬।১৮

যাহার শিক্ষার প্রয়োজন হইত, সে কয়টিতেই সে শিক্ষা-লাভ করিত। গন্ধর্ব্ববিদ্যা প্রভৃতির চর্চ্চা শূদ্রেরাও করিত। তাহারা শিল্পবিদ্যাও শিখিত। কারণ, উহা সেবাকার্য্যের অন্তর্ভূত বিদ্যা। দ্বিজাতিমাত্রই অষ্টাদশ বিদ্যার যেগুলি ইচ্ছা সেইগুলিই অধ্যয়ন করিত। কেবল যে সকল দ্বিজ পতিত, এবং শ্রদ্ধাহীন, তাহারা বেদ শিক্ষা করিতে পাইত না। চপলমতি শিক্ষার্থীদিগকে গভীর বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইত না। কারণ, তাহাদিগের সেই শিক্ষা নিষ্ফল হইত। এমন কি, শূদ্রাদি সেই কালে সংস্কৃত ভাষাও শিক্ষা করিত কি না, বলা কঠিন ; সাধারণ লোক প্রাকৃত ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত বলিয়াই মনে হয়। দ্বিজাতির বহির্ভূত অতি অল্প লোকই সংস্কৃত শিক্ষা করিত। হনুমান দ্বিজ না হইলেও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, ইহা রামায়ণ পাঠেই জানা যায়। ক্ষত্রিয়গণ গুরুগৃহে গমন করিয়া ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতেন। রাজপুত্রগণ এক-স্থানে গুরুর আশ্রম স্থাপন করিয়া তথায় গুরুসকাশে ধনুর্ব্বেদাদি শিখিতেন। বৈশ্যগণ প্রাথমিক শিক্ষা সাধারণ ভাবে শেষ করিয়া অর্থশাস্ত্রাদি শিক্ষা করিতেন। এ সম্বন্ধে যে গ্রন্থাদি ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে মাধ্যমিক শিক্ষালাভের এবং দানের পদ্ধতি কিরূপ ছিল, তাহা নিখুঁতভাবে জানা যায় না। পৌরাণিক উপা-খ্যানাদি হইতে কতকটা অনুমান করিয়া লইতে হয়। বৌদ্ধজাতক এবং জৈনদিগের পুরাণ হইতেও কিছু কিছু সন্ধান মিলিতে পারে, তবে তাহা পর্য্যাপ্ত নহে।

তাহার পর উচ্চশিক্ষা বা পরাবিদ্যা শিক্ষা। কর্ম্ম-কাণ্ডের পর যেমন জ্ঞানকাণ্ড, কর্ম্মযোগের পর যেমন ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ, সেইরূপ অপরা বিদ্যার পর পরা-বিদ্যা শিখিতে হইত। এই শিক্ষার স্থান ছিল প্রধানতঃ ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির আশ্রম। সকলেই কিন্তু আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার জন্য যাইত না। ব্রহ্মতত্ত্ব আয়ত্ত করিবার জন্য যাহার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিত, সেই কেবল ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার জন্য ব্রহ্মিষ্ঠ গুরুর শরণাগত হইত। সাধারণ ব্রাহ্মণগণ বেদ-বেদাঙ্গ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র ঋষির আশ্রমেই শিক্ষা করিত বটে, কিন্তু সেখানে সাধারণ টোলের শিক্ষার ন্যায় শিক্ষাই প্রদত্ত হইত। গুরু বা আচার্য্য সাবিত্রী-মন্ত্র দানে শিষ্যকে বেদপাঠ করাইয়া বেদে 'পণ্ডিত' করিয়া তুলিতেন। এ শিক্ষায় বাদ-বিতণ্ডা ছিল, জল্পনা-কল্পনা ছিল, পূর্ব্বপক্ষ এবং উত্তরপক্ষ থাকিত। শিষ্যের বিষয়গত বা পুঁথিগত সংশয় আচার্য্য ভাষার দ্বারা, দৃষ্টান্ত দ্বারা নিরসন করিতেন। ফলে এ সকল গুরু-গৃহে 'পণ্ডিত' তৈয়ারী হইত, জ্ঞানী অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্ তৈয়ারী হইত না। এ শিক্ষা ছিল লৌকিক শিক্ষা। উচ্চ-শিক্ষালাভের প্রথম সোপান। ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিগণের গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিত। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহ রাজার মন্ত্রী, কেহ বিচারক প্রভৃতির কাজও লইতেন। অনেকেই যজন, যাজন, অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা করিতেন। ইঁহারা 'গ্র্যাজুয়েট' হইলেও গৃহী হইতেন।

ইহার পরও যাঁহাদের ব্রহ্মবিদ্যা শিখিবার প্রবল বাসনা হইত, তাঁহারাই ব্রহ্মবিৎ গুরুর নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শিখিতে যাইতেন। ইঁহাদের সংখ্যা অতি অল্পই হইত। বলা বাহুল্য, ঔৎসুক্য না জাগিলে কাহাকেও ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইত না। অনধিকারীকে ব্রহ্মবিদ্যা শিখাইতে নাই। শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া যাঁহাদের মনে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা জন্মে, এবং সেই জিজ্ঞাসা প্রবল হয়, তাঁহারাই ব্রহ্মবিদ্যা-লাভের অধিকারী। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে স্বভাবতঃ কিঞ্চিৎ ধর্ম্মভাব থাকেই। কাহারও কাহারও মনে সেই ভাব প্রবল আকারে প্রকাশ পায়। তাহারাই সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া ব্রহ্মসাধনে রত হয়। ব্রহ্মবিদ্যা অত্যন্ত কঠিন। উহা বুঝিতে হইলে আধ্যাত্মিক বুদ্ধি বিশেষ ভাবে জাগ্রত হওয়ার আবশ্যক। আর ব্রহ্মকে বুঝাও সহজ নহে। ব্রহ্ম যে বাক্য-মনের অতীত। শ্রুতি বলিতেছেন—

যদ্ বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।

ইহার অর্থ, যিনি বাক্য দ্বারা প্রকাশিত হন না, (অর্থাৎ বাক্য দ্বারা যাঁহার কথা প্রকাশ করা যায় না), কিন্তু যাঁহার দ্বারা বাক্য প্রকাশিত হয় (অর্থাৎ মানুষের মধ্যে বাক্য দ্বারা ভাব প্রকাশ করিবার যে শক্তি আছে, তাহার মূলে যিনি আছেন,) তাঁহাকে তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিও, আর যাহার বা যে সগুণ দেবতার পূজা করা হয়, তাহা ব্রহ্ম নহে। এইরূপ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অগোচর যে ব্রহ্ম, গুরু তাঁহার কথা শিষ্যকে বুঝাইবেন কিরূপে? সমস্যা ত ঐখানেই। সেই জন্য এই ব্রহ্মবিদ্যাশিক্ষার প্রণালী স্বতন্ত্র। এখানে—

গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানম্
শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ

অর্থাৎ গুরু বাক্য দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দেন না। কিন্তু যে পদ্ধতি বলিয়া দেন, তাহাতে শিষ্যদিগের মনে কোন সংশয় থাকে না। এ পদ্ধতি আধুনিক শিক্ষায় নাই। সুতরাং আধুনিক শিক্ষিত সমাজে সকলে উহার উপকারিতা ঠিক বুঝেন না। কি ভাবে গুরু মৌন-ব্যাখ্যান করিতেন এবং কি ভাবে শিষ্য প্রকৃত সমস্যার সমাধান করিতেন, তাহা শ্রুতিতেই বর্ণিত আছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগুবল্লীতে উহার একটি চিত্র দেওয়া হইয়াছে। সেই চিত্র হইতে পাঠক এই শিক্ষার আভাস পাইবেন। এখানে এই কাহিনীটি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ

বরুণ ঋষির সাধনা-ক্ষেত্র—তপোবন বনভূমি-সন্নিকটে অবস্থিত। ঋষি তথায় সশিষ্য জ্ঞানসাধনায় রত থাকেন। এক দিন বরুণ ঋষির পুত্র ভৃগু পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি।' অর্থাৎ ভগবন্! আমাকে ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যাপন করুন। পুত্রকে ব্রহ্মজিজ্ঞাসু দেখিয়া ব্রহ্মিষ্ঠ পিতা কহিলেন,—'ব্রহ্ম উপদেশের বিষয় নহে, উহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভূতির বিষয়। মানুষের দেহ এবং শরীরের অন্তর্ভূত প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, মন, এবং বাগিন্দ্রিয়,—এগুলি সমস্তই ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বারস্বরূপ।' অতঃপর মহর্ষি বরুণ পুত্র ভৃগুকে ব্রহ্ম বলিতে কি বুঝায় তাহা বলিয়া দিলেন। ব্রহ্ম কি? "—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়্যাভিসং বিশন্তি। তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্মেতি।" অর্থাৎ "যাঁহা হইতে আব্রহ্মস্তম্ব জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, যাঁহার দ্বারা সমুৎপন্ন জীবসমূহ প্রাণধারণ করিতেছে, এবং বিনাশকালে এই বিশ্ব যাঁহাতে প্রবেশ করে বা বিলীন হয়, তাঁহাকে বিশেষ ভাবে জানিতে চেষ্টা কর, তিনিই ব্রহ্ম।" পিতা পুত্রকে পুনর্ব্বার বলিলেন, "তুমি তপস্যা কর। সমস্তই তোমার অধিগত হইবে।" উপদেশ আর দিলেন না। উপলব্ধিতব্য বিষয় উপলব্ধি করিবার পন্থাটি মাত্র নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। প্রকৃত ব্যাপার পুত্রের—শিষ্যের হাতে ছাড়িয়া দিলেন। ভৃগু তপস্যা আরম্ভ করিলেন; অর্থাৎ আহার-নিদ্রা ভুলিয়া অনন্যকর্ম্মা হইয়া ঐ বিষয়টি উপলব্ধি করিবার জন্য একমনে ধ্যানস্থ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ দিন, দিনের পর মাস অতীত হইতে লাগিল। ভৃগুর চিন্তার আর অবধি নাই। সত্য যেন উপলব্ধি হয় না। শেষে বৎসরও পূর্ণ হইল। ভৃগুর সাধনার বিরাম নাই, তপস্যার বিরতি নাই। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, অন্নই ব্রহ্ম। কারণ, অন্ন হইতেই ভূতগণ জন্মে। কথাটা সত্য বটে, কিন্তু ভৃগু বুঝিলেন, তাঁহার সমগ্র জ্ঞান জন্মে নাই। কোথায় যেন বুঝিবার কি ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। তিনি নিঃসংশয় হইতে পারেন নাই। যাহা হউক, যতটুকু পাইয়াছেন, ততটুকু লইয়াই তিনি গুরুর সকাশে, পিতৃ-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে বলিলেন, "অন্ন হইতেই ভূতগণের উৎপত্তি। জাত জীবগণ অন্ন দ্বারাই জীবিত থাকে। বিনাশকালে জীবগণ অন্নেই যায়। এই বিশ্ব অন্নময়। ইহা আমি জানিয়াছি। কিন্তু ইহাতে আমার সংশয় ঘুচিতেছে না। অতএব "অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি।" পিতা উত্তর করিলেন, "তপসা ব্রহ্ম জিজ্ঞাসস্ব, তপো ব্রহ্মেতি।" তপস্যা কর। তপস্যাই ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। ভৃগু স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিয়া তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

আবার মাস, বৎসর চলিয়া গেল। ভৃগু ভাবিলেন, অন্ন ত ব্রহ্মের পূর্ণরূপ হইতে পারে না। অন্নের আদ্যন্ত রহিয়াছে। অন্নের পরিবর্ত্তন ঘটে। তবে ব্রহ্ম আরও কিছু। ভৃগু তপস্যায় তন্মনা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার মনে প্রতিভাত হইল,—ব্রহ্ম অন্নময় ত বটেনই, পরন্তু তিনি প্রাণময়। অন্ন ত শরীরকে,—সমস্ত জড় বস্তুকে রক্ষা করে। কিন্তু জীবের ভিতর যে প্রক্রমণ শক্তি রহিয়াছে, তাহা ত অন্ন নহে। এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে যাহা শাশ্বত রহিয়াছে, তাহাও ত ব্রহ্ম। এই বিশ্বে যে একটি শাশ্বত—বা অবিনশ্বর ভাব রহিয়াছে,—যাহা প্রাণীকে প্রাণবন্ত করিতেছে, তাহাও ব্রহ্ম বটে। উহা ব্রহ্মের আর একটি পাদ। "প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ।" তিনি প্রাণকেই—চৈতন্য শক্তিকেই—ব্রহ্মের আর এক পাদ বলিয়া জানিলেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার মন প্রসন্ন, পরিতৃপ্ত হইল না। তিনি ভাবিলেন,—তাঁহার সিদ্ধান্তে তখনও কিছু ত্রুটি রহিয়াছে। তিনি আবার পিতৃসান্নিধ্যে—গুরুর নিকট গমন করিলেন। পিতা কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি তপস্যার দ্বারা,—মনন এবং নিদিধ্যাসন দ্বারা—যতটুকু বুঝিয়াছেন, তাহা বিবৃত করিয়া বলিলেন, "আমাকে ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ করুন।" কিন্তু গুরুর মুখে সেই একই কথা—"তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্ম।" "তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে চেষ্টা কর। তপস্যার দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।" ভৃগু আর বাক্যব্যয় না করিয়া পুনর্ব্বার তপস্যা করিতে চলিলেন। আবার দিন, পক্ষ, মাস গত হইল। ভৃগু বুঝিলেন যে, মনই ব্রহ্মের আর একটি পাদ। কারণ, মনই ত সব। মন দ্বারাই মনন ও নিদিধ্যাসন হয়,—অতএব মনও ব্রহ্ম। কিন্তু এই ত সব নহে। এ জ্ঞানে ত্রুটি রহিয়াছে। ভৃগু আবার তাঁহার পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইলেন। আবার সেই নিবেদন। কিন্তু পুনর্ব্বার গুরুর সেই একই উত্তর। সুতরাং ভৃগুর আবার স্বস্থানে গমন। আবার সেই কঠোর তপস্যা। এই প্রকারে ভৃগু বিজ্ঞানকে এবং পরে আনন্দকে ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করিলেন; এবং এইবার ভৃগু তাঁহার জ্ঞাতব্য তথ্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলেন।

এখন প্রশ্ন হইতেছে,—এই তপস্যা কিরূপ তপস্যা? মনু বলিয়াছেন—মানুষ নির্জ্জন স্থানে বসিয়া একান্ত মনে নিজ হিতবিষয় চিন্তা করিবেন। একাকী বসিয়া চিন্তা করিলেই সর্ব্বপ্রধান শ্রেয়ঃ লাভ হয় (৩)। সকল সমস্যা সমাধানের প্রকৃষ্ট উপায় হইতেছে নির্জ্জনে আত্ম-চিন্তা। ইহাই তপস্যা। এই তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। ইহা মুণ্ডকোপনিষদেও বলা হইয়াছে।

(৩) তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতম।—মুণ্ডক ১।৮

প্রশ্নোপনিষদে ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও আছে (৪)। সেই জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রকার বলিয়াছেন যে,—

> যদ্দুস্তরং যদ্দুরাপং যদ্দুর্গং যশ্চ দুষ্করম্।
> সর্ব্বন্তু তপসা সাধ্যং তপো হি দুরতিক্রমম্।

অর্থাৎ সংসারে যাহা দুষ্কর, দুষ্প্রাপ্য, দুর্গম এবং দুস্তর, তাহা সমস্তই তপস্যার দ্বারা লাভ হইয়া থাকে। তপস্যাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। একান্ত মনে চিন্তা করিলে মন হইতে আপনা-আপনিই সেই সমস্যার সমাধান হইয়া থাকে। তবে সেই বিষয়ে মনকে এমন ভাবে নিয়োজিত করিতে হইবে যে, মন মুহূর্ত্তের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়। মানুষের সকল জ্ঞানই ভিতর হইতে বিকাশ লাভ করে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা এ বিষয়টি স্বীকার করেন।

বিখ্যাত মার্কিণ পণ্ডিত ইমার্সন বলিয়াছেন,—**Man is endogenous and education is his unfolding** মানুষ ভিতর হইতে বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ মানুষের যাহা কিছু বিকশিত হয়, তাহা ভিতর হইতেই বিকাশলাভ করে, শিক্ষা দ্বারা সেইটি কেবল প্রকাশ পায় মাত্র। অর্থাৎ তালগাছ নারিকেলগাছ প্রভৃতি উদ্ভিদ্ যেমন ভিতর হইতে বর্দ্ধিত হয়, তাহাদের শাখা-প্রশাখা বিস্তারলাভ করিয়া তাহারা বড় হয় না। ভিতর হইতে কাণ্ড বাড়িলেই তাহাদের শাখা—বাগুলাগুলি খসিয়া যায়, এবং তাহারা যে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়—মানুষও সেইরূপ। তাহার সকলই ভিতর হইতেই গজাইয়া উঠে। শিক্ষা কেবল তাহার বাগুলাগুলি অর্থাৎ ভ্রান্ত সংস্কারগুলি খসাইয়া দিয়া তাহাকে স্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রাচীন কালে উচ্চতম বিদ্যা বা পরাবিদ্যা শিক্ষাদানের সময় আচার্য্যগণ বাহির হইতে কতকগুলি সিদ্ধান্তের বোঝা শিষ্যের মস্তিষ্কে চাপাইয়া দিতেন না। অল্প একটু উপদেশ দিয়া—শিষ্য তপস্যার দ্বারা যাহাতে স্বকীয় আভ্যন্তরীণ শক্তিবলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সমাধান করিতে পারেন, তাহাই করিতেন। ঐ ব্যাপার কেবল উপনিষদের 'বরুণভৃগু-সংবাদ' হইতেই জানা যায় না,—উপনিষদের অন্যত্রও উহার দৃষ্টান্ত আছে। ব্রাহ্মণ-বালক সত্যকাম যখন গৌতমবংশীয় হারিদ্রুমত আচার্য্যের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিবার জন্য উপনীত হইয়াছিলেন, তখন দীক্ষান্তে হারিদ্রুমত ব্রহ্মজিজ্ঞাসু সত্যকামকে চারি শত ধেনু প্রদান করিয়া বলেন, 'তুমি ইহাদের অনুসরণ কর। যত দিন ইহারা স্বচ্ছন্দ বনজাত তৃণাদি ভোজন করিয়া পরিপুষ্ট, এবং সংখ্যায় এক সহস্র না হইবে, তত দিন তুমি বনে বনে ইহাদিগের অনুসরণ করিবে। ইহাই হইল তোমার তপস্যা। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে তোমার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে।' সত্যকাম বিনা-বাক্য-ব্যয়ে তাহাই করিলেন। তাঁহার মনে যে জিজ্ঞাসা দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি কেবল তাহারই কথা ভাবিতেছিলেন।

বনভূমির যে যে স্থানে সরস তৃণ ছিল, ধেনুগুলি সেই স্থানেই গমন করিতেছিল। সত্যকাম গাভীগুলির সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। উন্মুক্ত প্রান্তরের বিশুদ্ধ বায়ু এবং সন্নিহিত বনভূমির স্বচ্ছন্দ বনজাত ফল সত্যকামের দেহের পুষ্টিসাধন করিতে লাগিল। ছয় ঋতু একে একে আসিল, এবং অতিবাহিত হইল। গোদলের সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অবশেষে সত্যকাম এক দিন দেখিলেন, তাহাদের সংখ্যা এক সহস্র পূর্ণ হইয়াছে। তিনি সহর্ষ চিত্তে গোসমূহ লইয়া গুরুকুল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে এক স্থানে সন্ধ্যা হইলে তিনি অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া গোকুলসহ বিশ্রাম করিতেছিলেন। তখন বায়ুদেবতা এক বৃষভের উপর ভর করিয়া সত্যকামকে ব্রহ্মের এক পাদ কীর্ত্তন করিলেন। ইহা সত্যকামের মনেই উদ্ভূত হইয়াছিল, বৃষভ উপলক্ষমাত্র। তিনি বলিলেন, পূর্ব্বদিক ব্রহ্মের এক পাদ। উহা প্রকাশবান্ নামে অভিহিত। তাহার পর অগ্নি, আদিত্য এবং মদ্গু তাঁহাকে ক্রমশঃ অনন্তবান্, জ্যোতিষ্মান্ এবং আয়তনবান্ আর তিন পাদের কথা বলিলেন। এইরূপে সত্যকাম ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। শেষকালে আচার্য্য হারিদ্রুমত, সত্যকাম যাহা বুঝিয়াছিলেন—তাহাই আবার ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। যাহা অপূর্ণ ছিল তাহাই আবার পূর্ণ করিয়া দিলেন। তখন সত্যকাম সফলকাম হইলেন।

অতঃপর সত্যকাম জাবাল যখন আচার্য্য হইয়াছিলেন, তখন উপকোশল নামক জনৈক ব্রহ্মবিদ্যা-শিক্ষার্থী ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য সত্যকামের শিষ্য হইয়াছিলেন। সত্যকাম তাঁহাকে অগ্নির পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ছয় ঋতু একে একে আসিল এবং চলিয়া গেল। তাহার পর বৎসরের পর বৎসর অতীত হইল। উপকোশল কেবল অগ্নিরই পরিচর্য্যা করিয়া যান। গুরু তাঁহাকে আর ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করেন না। একে একে এইরূপে এক যুগ কাটিয়া গেল। কত ছাত্র আসিল, কত ছাত্র চলিয়া গেল। তাহারা সমাবর্ত্তন করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিল; কিন্তু আচার্য্য আর উপকোশলকে ব্রহ্মবিদ্যায় উপদেশ দিলেন না। শিষ্য অধীর হইলেন। তিনি অন্ন-জল ত্যাগ করিলেন। তখন অগ্নি তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিলেন। এই সময়ে আচার্য্য সত্যকাম গৃহে ছিলেন না। তিনি গৃহে ফিরিয়া শিষ্য উপকোশলকে বলিলেন, "সৌম্য! তুমি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মতত্ত্ব কিছু উপলব্ধি করিয়াছ দেখিতেছি।"

[illegible] নাই।

তখন আচার্য্য সত্যকাম তাঁহার শিষ্যকে ব্রহ্মবিদ্যার সকল ব্যাপার বুঝাইয়া বলিলেন।

এই সকল উপাখ্যান হইতে প্রাচীন ভারতের গুরুদিগের মৌন-ব্যাখ্যান কিরূপ ছিল, তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। প্রত্যেক ক্ষেত্রে দেখা যায়,—শিষ্যের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার বাসনা অতিশয় বলবতী হইয়াছে,—অথচ গুরু যেন তাহাকে উপদেশ দিতে কার্পণ্য করিতেছেন। কেবল বরুণ তাঁহার পুত্রকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, "তপস্যা কর জানিতে পারিবে। এই বিশ্বই ব্রহ্মের মূর্ত্তি।" পুত্র একটু-একটু করিয়া যেমন অগ্রসর হইয়াছিলেন অমনই পিতার নিকট নিজ চিন্তালব্ধ ফলের কথা বলিয়াছিলেন। স্নেহময় পিতা একটু দোষ-ত্রুটি সংশোধন করিয়া পুনরায় পুত্রকে নির্জ্জনে তপস্যা করিতে বলিয়াছিলেন। পুত্রের আপ্রাণ চেষ্টায় তাঁহার হৃদয়মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান পূর্ণ-জ্যোতিতে ফুটিয়া উঠুক, ইহাই আচার্য্যের—পিতার একান্ত কামনা। তাই তিনি জন-কোলাহলবর্জ্জিত নির্জ্জন স্থানে আশ্রম করিয়া শিষ্য এবং পুত্রকে ব্রহ্মজ্ঞান সাধনে পাঠাইয়াছিলেন। 'অরণ্যগুহা-পুলিনেষু যোগাভ্যাসোপদেশঃ' ইহা শাস্ত্রেরই কথা। যেখানে চিত্তের কিছুমাত্র বিক্ষেপ না হয়, মন অহরহ সাধ্য বিষয়ের সমাধানে রত থাকিতে পারে, সেই স্থানে বসিয়াই চিন্তা করিতে হয়। নতুবা কতকগুলি পদের সিদ্ধান্ত মুখস্থ করিয়া তাহারই উদ্গার করিলে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না।

উপনিষদের এই কয়টি আখ্যান পড়িলেই বুঝা যাইবে যে, ভৃগু, সত্যকাম এবং উপকোশল—ইঁহারা লৌকিক বিদ্যায় বা অপরা বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইয়াই ব্রহ্মবিদ্যা শিখিতে আসিয়াছিলেন, একেবারে বর্ণজ্ঞানহীন অবস্থায় ব্রহ্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যা শিখিতে আসেন নাই। তপস্যা, দম, বেদ ও বেদের ছয় অঙ্গ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায়, আর সত্যই ইহার আশ্রয়। কেনোপনিষদ্ এবং শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া ইঁহারা অপরা বিদ্যার সমস্তই অবগত হইয়া তবে ব্রহ্ম কি, তাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন। নতুবা বরুণ, হারিদ্রুমত বা সত্যকাম প্রভৃতি বর্ণজ্ঞানবিহীন বা শাস্ত্রজ্ঞান-শূন্য শিষ্যকে এই দুরূহ বিষয় চিন্তা করিবার জন্য নির্জ্জন স্থানে পাঠাইতেন,—ইহা কখনই মনে করা যাইতে পারে না। কর্ম্মকাণ্ড সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিয়া তাহার পর জ্ঞানকাণ্ড শিখিতে হইত। কারণ, ভগবানের মহিমা উপলব্ধি করা জ্ঞানহীনের পক্ষে সম্ভব নহে। বিশিষ্ট জ্ঞান না হইলে তাহা হওয়া সম্ভব নহে।

সেই বিশিষ্ট জ্ঞান কি? জাগতিক ব্যাপারের সম্বন্ধে যত দূর সম্ভব জ্ঞানলাভ করা যায়, তাহার সম্বন্ধে যথাসম্ভব ভ্রম এবং প্রমাদ-পরিশূন্য জ্ঞান। সংস্কৃত ভাষায় যাহাকে প্রমা বলে, সেই জ্ঞান। সেই জন্য প্রথমতঃ ভাষাতত্ত্ব, অর্থশাস্ত্র, ভূতবিজ্ঞান প্রভৃতি এবং পুরুষ-পরম্পরাগত সিদ্ধান্ত ও আপ্তবাক্য, দর্শন, বেদ ইত্যাদি শিক্ষা করা আবশ্যক। নতুবা ব্রহ্মজ্ঞান বা উচ্চজ্ঞান হইতেই পারে না। এইগুলি টোলে শিক্ষা করিয়া পরে পরাবিদ্যা বা উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে হয়। ভৃগু, সত্যকাম প্রভৃতি তাহাই করিয়াছিলেন। পার্থিব বিষয়ে জ্ঞানলাভের চেষ্টা মানুষ মাত্রেরই স্বাভাবিক। অতি শৈশবেই মানুষের মনে ঐ জ্ঞানলাভের স্পৃহা জন্মে। প্রসুপ্ত জ্ঞান-পিপাসা পার্থিব বিষয় অবলম্বন করিয়া জাগরিত হইলে পরে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানলাভের পিপাসা জন্মে। সেই জন্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভের বাসনা জাগিবার পূর্ব্বে অপরাবিদ্যা শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন।

সত্য-সন্ধানই শিক্ষার উদ্দেশ্য। সত্য কি? এই বিষয়ে পাশ্চাত্ত্যখণ্ডের সিদ্ধান্তের সহিত প্রাচ্যখণ্ডের—বিশেষতঃ, ভারতের সিদ্ধান্তের বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান। পাশ্চাত্ত্যখণ্ডের পণ্ডিতগণ এই পরিদৃশ্যমান্ বিশ্ব সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা করাই সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে বিখ্যাত দার্শনিক এবং দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস-লেখক অধ্যাপক জি, এইচ, লিউইসের মত পাদটীকায় উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পরিদৃশ্যমান্ জগতের বিভিন্ন বস্তুর যে ক্রম আছে, ঠিক সেই ক্রম অনুযায়ী ধারণাকে সত্য বলে,—অর্থাৎ বাহ্যপ্রকৃতির বিন্যাস ঠিক ভাবে—প্রকৃত ক্রম অনুযায়ী ভাবে মানুষের মনে হুবহু প্রতিফলিত হইলেই মানুষের মনে সত্য অনুভূত হয় (৫)। ভারতীয় পণ্ডিতরা কিন্তু তাহা মনে করেন না। তাঁহারা বলেন, এই পরিদৃশ্যমান্ বিশ্বের যাবতীয় বস্তুই ভ্রমের ফলে সত্য বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। উহা অসৎ। কিন্তু উহার অন্তরালে যে সদ্বস্তু আছে, তৎসম্বন্ধে জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। এই বিচিত্র নিয়ত-পরিবর্ত্তনশীল বিশ্ববস্তুর প্রকৃত রূপ আমাদের চিত্তমুকুরে প্রতিবিম্বিত হইতেছে না। কিন্তু উহার পশ্চাতে যে সদ্বস্তু বা পরিবর্ত্তনবিহীন বস্তু আছে, তাহাই পরাবিদ্যার দ্বারা জ্ঞাতব্য বিষয়। মানুষের অন্তর্নিহিত ধিষণাশক্তির দ্বারা উহা উপলব্ধ হয়। ইহাই ভারতীয় মত। ভারতীয় শিক্ষায় এবং প্রতীচ্য শিক্ষায় প্রভেদ এইখানেই। পাশ্চাত্ত্যখণ্ডে এখন এই সূক্ষ্ম জ্ঞান-গম্য বিদ্যা (Metaphysical knowledge) উপেক্ষিত এবং উপহসিত। কিন্তু এই জ্ঞানপিপাসা মানুষের মনে জাগিবেই। সেই জন্য অধ্যাপক লিউইস বলিয়াছেন—Metaphysical ghosts can not be killed because

(৫) Truth is the correspondence between the order of ideas and the order of phenomena—so that the one is a reflection of the other—the movement of thought following the movement of Things—Lewis.

they can not be touched, অর্থাৎ এই আধ্যাত্মিক ভূতকে বিনষ্ট করা সম্ভবে না। কেন না, তাহাকে স্পর্শ করা যায় না। আসল কথা, উহা মানুষের প্রকৃতিদত্ত জ্ঞানপিপাসা-সম্ভূত,—তাই উহাকে উন্মূলিত করা যায় না। মানুষের অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় ইহার সার্থকতা আছে। অনুশীলন দ্বারা ইহাও মানুষের অন্যান্য মানসিক বৃত্তির ন্যায় পরিপুষ্ট হইয়া থাকে।

তৈত্তিরীয়োপনিষদের প্রথমেই শিক্ষাবল্লী কথিত হইয়াছে। বল্লী শব্দের অর্থ লতা। উহার মৌলিক অর্থ 'যাহা আচ্ছাদন করে।' এখানে বল্লী অর্থে অধ্যায় বলিয়া মনে হয়। এই উপনিষদের 'শিক্ষাবল্লী' মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, শিক্ষা সম্পূর্ণ না করিয়া পরাবিদ্যা লাভের প্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্র। ইহার ভাষা এবং বচনভঙ্গী বুঝা কঠিন। অনেক কথা সঙ্কেতে বলা হইয়াছে। তাহা হইলেও মেধাহীন ব্যক্তি যে পরাবিদ্যা-লাভ করিতে পারে না, এ কথা শিক্ষাবল্লীর চতুর্থ অনুবাকের প্রথমেই বলা হইয়াছে। সুতরাং "অপরা-বিদ্যার দ্বারা লৌকিক জ্ঞান বর্দ্ধিত করিয়া পরে যদি ব্রহ্মজ্ঞানের পিপাসা প্রবল হয়, তাহা হইলে উচ্চশিক্ষার জন্য তপস্যা করিতে হইবে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে শিক্ষা সমাপনের প্রয়োজন, এ কথা অনেক য়ুরোপীয় পণ্ডিত উপনিষদ্ আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন। ফলে যাঁহারাই উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে যাইতেন, তাঁহারাই মাধ্যমিক শিক্ষালাভ করিতেন।

প্রথমে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ আমাদিগকে ইহাই বুঝাইয়াছিলেন যে, প্রাচীন কালে ভারতে লৌকিক বিদ্যা বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হইত না,—কেবল ব্যাকরণ আর ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতির অধ্যাপনা হইত। ইহা যে বিশেষ ভুল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। য়ুরোপে যখন অর্থবিদ্যার বিষয় লোকে ভাবেও নাই,—তখন এই ভারতে অর্থশাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছিল। রসায়নশাস্ত্রেরও অনেক কথা এ দেশের লোক জানিত,—তাহা ঔষধাদি প্রস্তুতের কার্য্য হইতেই দেখা যায়। স্থাপত্য-শিল্পের কত দূর উন্নতি হইয়াছিল, তাহা দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলি, এবং নবাবিষ্কৃত মহেন্দো-জোড়োর স্থাপত্য-শিল্প আলোচনা করিলেই সুস্পষ্ট প্রতীতি হয়। জগন্নাথদেবের মন্দিরের শীর্ষশোভি বিরাট-প্রস্তরখণ্ড এবং কনারকের মন্দিরের শীর্ষস্থ নব-গ্রহের বিগ্রহ কি প্রকারে তথায় উত্তোলিত হইয়াছিল, তাহা বর্ত্তমান যুগেও রহস্যান্ধকারে সমাচ্ছন্ন! ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও দিল্লীর লৌহ-স্তম্ভের ন্যায় লৌহস্তম্ভ মার্কিণের শ্রেষ্ঠতম লৌহ-কারখানাতেও প্রস্তুত হইত না। সারনাথের অশোকস্তম্ভ-শীর্ষমণ্ডল যে চারিটি সিংহ-মূর্ত্তি ছয় শত বৎসর মাটীর ভিতর রাবিশে আবৃত ছিল, তাহার এখনও যে ঔজ্জ্বল্য আছে,—তাহা দেখিয়া প্রাচীন ভারতের পালিস-বিদ্যা কত দূর উন্নত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। তবে নানা যুগ-বিপ্লবে ঐ সকল শাস্ত্র লোপ পাইয়াছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ত সে দিন পাওয়া গিয়াছে। পুরাবস্তুই উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে প্রতিপন্ন করিতেছে যে, প্রাচীন ভারতে ভূতবিজ্ঞান বা প্রাকৃত বিজ্ঞানেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। তবে তখন সকল বিদ্যা এক জনকে কিছু কিছু করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইত না; এক এক জন এক একটি লৌকিক বিষয়ে সম্পূর্ণ শিক্ষালাভ করিত। প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপ্রণালী স্বতন্ত্র ছিল, কিন্তু তাহা কোন মতেই হীন ছিল না। য়ুরোপীয়রা বলেন—প্রাচীন ভারত আধ্যাত্মিক আলেয়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াই ঐহিক মঙ্গলকে হারাইয়াছে,—ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা, অথবা উপেক্ষা-জনিত ভ্রম মাত্র।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

বাঁশী

মানুষের আদি সঙ্গীত বহি' গাহি' নব আগমনী
এসেছিল যবে বন-পথ দিয়ে প্রথম বাঁশীর ধ্বনি,—

মেতে উঠেছিল হয়তো তখন কল-গুঞ্জনে অলি,
ফুটে উঠেছিল শ্যাম বনানীতে বন-কুসুমের কলি,
বনের দুলালী শুনিয়া সে সুর তরু হতে তুলি' ফুল
ফুলের মালায় জড়ায়ে কবরী বেঁধেছিল এলো চুল।
তার পর—যবে ব্রজের গোপাল বাজায়ে গিয়েছে বাঁশী,—
উজান বয়েছে প্রেমের যমুনা গোপীরা গিয়াছে ভাসি'।

এত কাল পরে ভুলেছে বাতাস শুনেছিল তাহা কবে
বাজিছে যখন যন্ত্রের বাঁশী শঙ্কা বহিয়া ভবে,
বিকট শব্দে বাজাইয়া বাঁশী 'এঞ্জিন' টানে 'রেল',
কারখানা হতে ভেসে আসে কাণে একঘেয়ে 'হুইশেল'—
শঙ্কিত বায়ু ভয়ে কেঁপে ওঠে, কাঁপে ভয়ার্ত্ত প্রাণ
'সাইরেণ' যবে বাজাইয়া যায় মহা-মরণের গান।

শ্রীবিমলাশঙ্কর দাশ।

অস্বীকার

২৩

পরের দিন। সকালে চায়ের টেবিলে ক'জনে কথা হইতেছিল। কল্লোল, শিপ্রা আর মার্থা।

মার্থা বলিল,—আমার মনে হচ্ছে, ম্যালেরিয়া। চিকিৎসাও যা চলছিল, তা ঐ ম্যালেরিয়ার।

শিপ্রা বলিল,—আপনার অসীম দয়া! ডাকবামাত্র এসেছেন, সারা রাত রোগীকে নিয়ে আছেন!···আমরা আপনার লোক···ভয়েই অস্থির! সেবা করবার সামর্থ্য নেই!

মৃদু হাস্যে মার্থা বলিল,—রোগীর সেবা করতে হলে মনকে শক্ত করা দরকার। আপনি স্ত্রী···স্বামীর অসুখে স্ত্রীরা ভয়ে ভেঙ্গে পড়েন! বিশেষ আপনাদের বাঙালীর ঘরে। স্বামীকে নিয়েই বাঙালী মেয়ের পৃথিবী, শুনেছি!

কথাটা শেষ করিয়া মার্থা আবার হাসিল। কল্লোল বলিল,—ভুল, মার্থা! স্বামীর অসুখে বাঙালী স্ত্রী যে-সেবা করে, দেখলে তুমি আশ্চর্য্য হয়ে যাবে! সে-সেবার কাজে আহার-নিদ্রার সম্বন্ধে স্ত্রীর চেতনা থাকে না!

মার্থা বলিল,—চেতনা না থাকা স্বাভাবিক!···আমি তো বলেছি, বাঙালী স্ত্রীর অস্তিত্বই তার স্বামীকে নিয়ে।

কল্লোল বলিল,—তার তারিফ নাই বা করলে, মার্থা! স্বামীকে সর্ব্বস্ব করার ফলে বাঙালী স্ত্রীকে যে-পীড়ন যে-অপমান সহ্য করতে হয়, তার তুমি কিছুই জানো না! বাঙালী স্বামীর দল স্ত্রীর এই অস্তিত্ব-বিলোপের সুযোগ পেয়ে কতখানি বর্ব্বর হয়ে ওঠে···

মার্থা বলিল,—স্বামীদের ওটা nature···স্বভাব! সব দেশে সব জাতের স্বামীই নিজেকে ভাবে, নারীর ভাগ্য-বিধাতা! মানব-জাতির ইতিহাসের পাতা খুললে এই কথাই প্রতি-পাতায় লেখা দেখবো!

হাসিয়া কল্লোল বলিল,—Beauty and the beast!

প্রাতরাশ শেষ হইলে মার্থা বলিল,—আমায় একবার যেতে হবে। অনুমতি চাইছি···

শিপ্রা একান্ত মনে কি ভাবিতেছিল। মার্থার কথায় চমকিয়া উঠিল! বলিল,—আপনি চলে যাবেন?

মার্থা বলিল,—উপায় নেই মিসেস্ চৌধুরী! তিন্-চার ঘণ্টার জন্য যাচ্ছি! তার পর···

শিপ্রা বলিল,—টাকায় যদি আপনার পরিশ্রমের হিসাব কষা যায়···

বাধা দিয়া মার্থা বলিল,—টাকাকে তেমন শিরো-ধার্য্য করতে পারিনি আমি···আপনার বন্ধু কল্লোল রায় জানেন! টাকা-পয়সার কথা নয়। আমার একটি নার্শিং হোম আছে···তার কাজ-কর্ম্ম আমি নিজে না দেখলে চলে না! সেখানে দু'-চারটি এমন রোগী আছেন, যাঁদের দেখা দরকার।···এখানে ভয় নেই! তবু কর্ণেল গাঙ্গুলি আছেন রেঙ্গুনে···সিভিল সার্জ্জন ছিলেন। রিটায়ার করে এই-খানেই প্রাকটিশ করছেন। বলেন যদি, তাহলে আজ একবার কনশাল্‌টেশনের জন্য তাঁকে আনি!

শিপ্রা বলিল,—আপনি যদি মনে করেন, আনবেন।

মার্থা উঠিল, বলিল,—He is ill more in the spirit. আচ্ছা, এখন তাহলে আসি···

মার্থা চলিয়া গেল।

টেবিলের সামনে কল্লোল আর শিপ্রা। কাহারো মুখে কথা নাই!

বাহিরে সারা সহর আবার কর্ম্ম-উদ্দীপনায় মাতিয়া উঠিতেছে···

রোগীর কাছে ছিল মার্থা···কল্লোল শিপ্রার কাছে··· শিপ্রার মনের উপর হইতে ভারী পাথরখানা সরিয়া গিয়াছিল!

মার্থা চলিয়া গেলে সে পাথরখানা কে যেন আবার বুকের উপরে ধীরে ধীরে চাপিয়া ধরিতেছে···

কল্লোল বলিল—আমিও এবার আসি, শিপ্রা···

শিপ্রা চাহিল কল্লোলের পানে···মুখে কথা ফুটিল না।

কল্লোল হাসিল, কহিল—শুনলে তো, ম্যালেরিয়া। কোনো ভয় নেই। মার্থা খুব ভালো···honest and capable···কাজেই আশা করি, সুস্থ স্বামীকে নিয়ে অচিরে তুমি তোমাদের প্যারাডাইসে ফিরে যাবে!

কথাগুলা শিপ্রার মনকে যেন তীক্ষ্ণ অস্ত্রের মতো বিঁধিল!

কল্লোল বলিল—চুপ করে মুখের পানে চেয়ে আছো যে?···কথা কও!

শিপ্রা বলিল—কি কথা কবো?

কল্লোল বলিল—বিদায়-বাণী···

শিপ্রা বলিল,—কোথায় যাবেন?

—জানি না। বলেছি তো, আমি একটা অভিশাপ ···দুর্গ্রহ! নিজের জীবনকেই বিষাক্ত করি, তা নয়! আমার কাছে যারা এসেছে, যারা আসে···

কথাটা শেষ না করিয়াই কল্লোল চাহিল শিপ্রার পানে···শিপ্রা তার পানেই চাহিয়াছিল···শিপ্রা যেন কল্লোলের মনের ভিতরটা দেখিতে চায়, এমন প্রখর দৃষ্টি তার চোখে!

কল্লোল বলিল—নয়?

শিপ্রা বলিল—আপনি যান্।···আপনাকে ধরে রাখবো, এমন দাবী আমার নেই!···কর্ম্মফল বলে একটা কথা শুনে আসছি! আগে মানতুম না। এখন মানি।

এ-কথা বলিয়া শিপ্রা উঠিয়া নিজের ঘরে গেল।

কল্লোল উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া রহিল···প্রায় পাঁচ মিনিট। তার পর নিঃশব্দে সে-ও বাহির হইয়া পথে আসিল।

পথে আসিয়া মনে হইল, এখানে আর নয়! ডেরা তুলিয়া টু ফ্রেশ্ ফীল্ডস্ এ্যাণ্ড প্যাশ্চার্স নিউ!

লগেজ পড়িয়া আছে অনাদির ওখানে। কল্লোল সোজা অনাদির গৃহে আসিল।

সামনে অনাদির সঙ্গে দেখা। অনাদি বলিল,—ব্যাপার কি, কল্লোল?

—ব্যাপার? কল্লোলের কথায় অনেকখানি বিস্ময়!

অনাদি বলিল—তুমি লগেজ বাঁধছো, গঙ্গা লগেজ বাঁধছে,—দু'জনে কোথায় যাবে, ঠিক করেছো?

গঙ্গা লগেজ বাঁধিতেছে? কল্লোলের বিস্ময় হইল!

কল্লোল বলিল—কিন্তু গঙ্গাকে নিয়ে কোথাও যাবার সঙ্কল্প করিনি তো!

অনাদি বলিল—তার মানে?

মৃদু হাস্যে কল্লোল বলিল—কারণ, পথের বিধি সম্বন্ধে দয়াময়ী কাছেই কোথায় ছিল; বলিল—গঙ্গা যে বললে, উনি এখানে থাকবেন না!

কল্লোল বলিল—আমি থাকবো না, সে কথা সত্য! কিন্তু আমি ভগীরথের মতো পুণ্য করিনি যে, গঙ্গাকেও ল্যাংবোট করে সঙ্গে নিয়ে যাবো!

দয়াময়ী বলিল—কিন্তু এখানে না থাকবার কারণ? কষ্ট হচ্ছে?

কল্লোল চাহিল দয়াময়ীর পানে; বলিল—কষ্ট নয়। এ আমার ব্যাধি! এক-জায়গায় বেশী দিন কেমন থাকতে পারি না।

—কোথায় যাবেন?

—জানি না।···বেরুবার সময় কোনো দিন আমার ঠিক থাকে না, কোথায় যাবো!

দয়াময়ী ভ্রূকুটি করিল, বলিল—যদি যাবেন, তাহলে একলাই বা যাবেন কেন? গঙ্গাকে তো জানেন, ও-বেচারী আপনার উপর ···

কথা শেষ হইল না। গঙ্গা আসিয়া দেখা দিল ঠিক নাট্যমঞ্চের পার্ট-মুখস্থ-করা অভিনেত্রীর মতো; আসিয়া দয়াময়ীর কথার মাঝখানেই সে বলিল—গঙ্গার জন্য কারো দুশ্চিন্তার দরকার নেই, দিদি! যেখানে খুশী উনি যদি যেতে পারেন, গঙ্গাই বা কেন পারবে না?

দয়াময়ীর চোখদু'টো যেন ঠিকরিয়া বাহির হইবে! দয়াময়ীর বিস্ময়ের সীমা নাই! এরা পাগল হইয়াছে? না, জীবনটাকে পাইয়াছে থিয়েটারের ষ্টেজ—লক্ষ্মীছাড়া নাটকের পাত্র-পাত্রীর মতো যেমন-খুশী কথা বলিয়া চমক লাগাইয়া দিবে?

গঙ্গার পানে চাহিয়া দয়াময়ী বলিল—তুমিও তো কোথায় চলেছো, বললে!···কোথায় তুমি যাচ্ছো, শুনি?

গঙ্গা বলিল—এত-বড় পৃথিবীতে যাবার জায়গার কোনো অভাব আছে?

—কিন্তু কল্লোল বাবুর সঙ্গে তো তুমি যাচ্ছো না?

—না···

এ-কথায় অবাক্ হইয়া দয়াময়ী খানিকক্ষণ গঙ্গার পানে চাহিয়া রহিল, তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—দাঁড়িয়ে তোমাদের নাটক বোঝবার সময় আমার নেই। উনুন জ্বলেছে। ছেলেদু'টোর আবার এগ্জামিন আছে। যা ভালো বোঝো, করো!

দয়াময়ী চলিয়া যাইতেছিল—যাইতে যাইতে চকিতের জন্য চমকিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া বলিয়া গেল—যদি থাকবে না, কেন মিথ্যে মায়ায় জড়িয়ে ছিলে, বুঝি না।

কথার সঙ্গে সঙ্গে যেন ষ্টেজ ছাড়িয়া উইংসের আড়ালে দয়াময়ী অদৃশ্য হইয়া গেল!

অনাদি ডাকিল,—গঙ্গা···

অনাদি বলিল—কল্লোল আবার আগেকার মতো রাস্কেল হয়ে উঠেছে! ও কি ভেবেছে, বুঝি না! তা বলে…

কল্লোল বলিল—তা বলে কি? বলো …

কল্লোলের পানে চাহিয়া অনাদি বলিল—নিজেকে এত বড় ভাবো যে দুনিয়ায় কারো পানে চাইবে কখনো! আমি শুকদেব গোস্বামী নই বা বশিষ্ঠদেব নই, তবু সারা জীবন এমন লক্ষ্মীছাড়া হয়ে চারিধারে তুমি আগুন জ্বেলে বেড়াবে, এ দেখে আমার মনে হয়…

অনাদি চোখের দৃষ্টিতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ…দেখিয়া কল্লোল বলিল—You kill me!

অনাদি রাগ করিল, বলিল—তা যদি করি, তাহলে তোমার এবং অনেকের উপকার হবে, বোধ হয়! কিন্তু তোমার সঙ্গে এ-বাদানুবাদে লাভ নেই!…শুধু পাশ করবার জন্য কতকগুলো বই পড়েছিলে…যা পড়েছো, তা থেকে নিজেকে চালাবার মতো বুদ্ধি বা শক্তির কণাও তুমি পাওনি!

কল্লোল বলিল—Incorrigible…অথবা বলতে পারো, পাথর! ঘা মারলে ভেঙ্গে যাবে, তবু নরম হবে না!

কথাটা বলিয়া কল্লোল চলিয়া গেল নিজের ঘরে। অনাদি চাহিল গঙ্গার পানে, বলিল—জিনিস-পত্র সব নিয়ে যাচ্ছে?

গঙ্গা বলিল—জানি না।

অনাদি বলিল—এ বাড়ীতে এলো…সখ্ করে জিনিষ-পত্র কিনলে…ভাবলুম, তোমার মতো পরশমণির কৃপায় হয়তো থিতু হয়ে বাস করবে! তা নয়!…কি ভেবেছে?

এ সব কথায় ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া গঙ্গা বলিল—দিদির সঙ্গে একটু দরকার আছে…

গঙ্গা চলিয়া যাইতেছিল, অনাদি আবার ডাকিল—গঙ্গা…

গঙ্গা চাহিল অনাদির পানে। অনাদি লক্ষ্য করিল, গঙ্গার মুখ মলিন! মমতা হইল।

অনাদি বলিল—কোথায় ও যাবে? তোমার কাছে আবার ওকে আসতে হবে, দেখে নিয়ো।

মুখে মলিন হাসি…গঙ্গা বলিল—আপনি পাগল হয়েছেন! জীবনকে বঙ্কিমবাবুর 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ভাবেন? ভ্রমর বলেছিল গোবিন্দলালকে, তুমি আবার আসবে! …সত্যিকার জীবনে কিন্তু…যে যায়, সে আর আসে না!

কথাটা বলিয়া গঙ্গা চলিয়া গেল।

অনাদি গুম্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল! মাথার মধ্যে একরাশ চিন্তা সরীসৃপের মতো কিলবিল করিতে লাগিল…মানুষ লক্ষ্মীছাড়া হয়, বওয়াটে হয়, সত্য! তা বলিয়া এমন…

দয়াময়ী ছাড়িল না, কল্লোলকে বলিল—যাবেন যদি, না খেয়ে যাওয়া হবে না। গেরস্ত-ঘর…ছেলেপিলে নিয়ে বাস করি, অকল্যাণ হবে!

অগত্যা…

খাওয়া-দাওয়া সারিতে বেলা বারোটা বাজিয়া গেল। গঙ্গাকে দয়াময়ী অনেক বার উপদেশ দিল, বলিল—নরম নয়…বেশ একটু দজ্জাল-মূর্ত্তিতে দাঁড়া… দাঁড়িয়ে ওকে দু' কথা শুনিয়ে দে গঙ্গা…

গঙ্গা নিঃশব্দে এ কথা শুনিল…কোনো জবাব দিল না বা কল্লোলের ত্রিসীমা মাড়াইল না।

কল্লোল ওদিকে কুলি ডাকিয়া তার মাথায় একটা সুটকেশ ও বিছানার বাণ্ডিল চাপাইয়া বাহির হইল। বাহির হইবার সময় দয়াময়ীকে বলিল—রাগ করবেন না…আপনি হলেন দয়াময়ী! আমার মনের পরিচয় তো জানেন না! হয়তো আবার আসবো… সে-দিন যেন এই রাগ মনে রেখে আমায় তাড়িয়ে দেবেন না…

দয়াময়ী দাঁড়াইল না…কল্লোলের পানে চাহিয়া দৃষ্টির আগুন খানিকটা বর্ষণ করিয়া চলিয়া গেল।

তার পর ডাকিল—গঙ্গা…গঙ্গা…

গঙ্গার সাড়া মিলিল না। সে-ডাকে আবার আসিল দয়াময়ী। বলিল—গঙ্গা চলে গেছে।

অনাদি ও কল্লোল সমস্বরে সবিস্ময়ে বলিল—চলে গেছে?

—হ্যাঁ…মেয়ে-মানুষকে তোমরা এত অধম ভেবেছো যে, খেয়ালমতো তাকে মাথায় তুলবে, খেয়ালমতো পায়ে মাড়াবে!…তোমরা অত্যন্ত পাপিষ্ঠ। আমরা মমত্ব করি, তোমরা সে মমত্ব পাবার যোগ্য নও!

কথাটা বলিয়া রোষ-ভরে দয়াময়ী একগাদা কাপড়-চোপড় ও ছোট বালতি লইয়া নদীর দিকে গেল।

অনাদি হতভম্ব! কল্লোলও তাই! তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কল্লোল বলিল—কাব্যে পড়েছিলুম, কেন্দ্রচ্যুত উল্কা…আমার জীবন ঠিক তাই!…আসি…

অনাদির মুখে কথা নাই! সে নিশ্চেতন, নিস্পন্দ… তার পলকহীন দৃষ্টি-পথ হইতে কল্লোল ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া গেল!

২৪

বাহির হইয়া কল্লোল আসিল রেলোয়ে-ষ্টেশনে। টিকিট কিনিবে বলিয়া থার্ড-ক্লাশ বুকিংয়ের সামনে গিয়া দাঁড়াইল। মন বলিতেছিল, শিপ্রা সেখানে বিপন্ন… মনকে তখনি ভর্ৎসনা করিল, করিয়া বলিল,—তোমার এত মাথাব্যথা কেন? সেখানে মার্থা আছে! শরৎ চৌধুরীর ম্যালেরিয়া… মার্থা বলিয়াছে, ভয় নাই!

কিন্তু কোথাকার টিকিট কিনিবে? দ্বিধা! এমন সময় পিছন হইতে পরিচিত কণ্ঠে কে ডাকিল—কল্লোলবাবু···

কল্লোল ফিরিয়া চাহিল। দেখে, হৃষি! সেই মার্থার বাড়ীর এক-তলার ভাড়াটিয়া।···

কল্লোল বলিল—কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

হৃষি বলিল—আমার মেয়ে গৌরী···তার বিয়ের ঠিক হয়েছে। পাত্রটি থাকে পিয়াপনে। ভালো চাকরি করে। পয়সা-কড়ি চায়নি···মেয়ে দেখেই পছন্দ করেছে। তবে মেয়েকে নিয়ে যেতে হচ্ছে পিয়াপনে···বিয়ের জন্ত বরের ছুটী মিললো না। তাই গুষ্টিবর্গ নিয়ে সেখানে চলেছি মেয়ের বিয়ে দিতে।···আপনি?

কল্লোল বলিল—আমি যাচ্ছি প্রোমে। সেখানে ভালো চাকরি পেয়েছি···

হৃষি বলিল—বটে!···তার পর একদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল,—ঐ যে সকলে দাঁড়িয়ে আছে!··· বলিয়া হৃষি হাসিয়া কল্লোলের পানে চাহিল।

কল্লোল দেখিল, হৃষির স্ত্রী নীরদা, ছেলেমেয়ে··· তাদের মাঝখানে গৌরী···যেন একরাশ পদ্মপত্রের মাঝখানে একটি পদ্ম!

হৃষি ডাকিল—গৌরী···

গৌরী চাহিল বাপের পানে।

হৃষি বলিল—এদিকে আয়···

গৌরী আসিল।

হৃষি বলিল—কল্লোল বাবু···প্রণাম করো! হুঁঃ, ভেবেছিলুম্ তোকে এই বাবুর হাতে দেবো! হলো না! ভাগ্য!

লজ্জায় রক্ত হইয়া কল্লোলের পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হইয়া গৌরী প্রণাম করিল। কল্লোল তার হাত ধরিয়া তাকে তুলিল, তার মাথায় হাত রাখিয়া বলিল—সুখী হও।···সেকালের সেই ছোট্ট গণ্ডীটুকু মেনে চলো গৌরী। তাতে হাজার অসুবিধা হলেও একটা লাভ হবে এই যে, অশান্তি ভোগ করবে না!···

কথাটা বলিয়া ভিড়ের মধ্যে কল্লোল নিমেষে কোথায় মিশিয়া গেল!

প্রোমের টিকিট কিন্তু কেনা হইল না। মনের মধ্যে যেন দেওয়ালির বাজি পুড়িতে লাগিল!

একটা বেঞ্চে বসিয়া রহিল। চোখের সামনে কত জাতের যাত্রীর ভিড়···রকমারি ফেরিওয়ালা···বিরাট্ কলরব। এ-সবের সঙ্গে কল্লোলের যেন কোনো যোগ নাই; সে যেন ও-জগতের জীব নয়!···ও-নাট্যমঞ্চে তার অভিনয়ের পার্ট নাই···সে শুধু দর্শক! এবং তার চিত্র-করা চোখের সামনে দিয়া ট্রেণখানা দীর্ঘদেহ সরীসৃপের মতো সশব্দে প্ল্যাটফর্ম্ম ছাড়িয়া চলিয়া গেল!

কল্লোল নিঃশব্দে বসিয়া রহিল···

হোটেলের ঘরে শরৎ চৌধুরীর জ্বর একটু নরম পড়িয়াছে। শরৎ চোখ চাহিল।

সামনে ছিল মার্থা। মার্থাকে দেখিয়া শরৎ বলিল, —তুমি কে?

মার্থা বলিল,—আমি ডাক্তার। আমার নাম মার্থা।

শরৎ বলিল,—আমার ডাক্তার? কলকাতা থেকে আনতে বলেছিলুম···

শরতের স্বর ক্ষীণ···তবু সে-স্বরে বিরক্তির আভাস!

মার্থা বলিল,—এখনো তিনি এসে পৌছোননি।

—এরোপ্লেনের অভাব হয়েছে? না, এরোপ্লেনের ভাড়া তিনি পাবেন না?

মার্থা কোনো জবাব দিল না।

মাথা তুলিয়া শরৎ চারিদিকে চাহিল, বলিল,—সে-লোকটা কোথায়? কল্লোল রায়?

মার্থা বলিল,—তিনি এখানে নেই।

—ও···শিপ্রার ঘরে? শিপ্রার সঙ্গে গল্প হচ্ছে?

—না। তিনি সকালেই চলে গেছেন; আর আসেননি।

শরৎ চৌধুরী চুপ করিয়া রহিল···খানিক পরে বলিল, —শিপ্রা তাঁর ওখানেই গেছেন, বোধ হয়? তাঁর সঙ্গে?

কথায় অনেকখানি শ্লেষ!

মার্থা মেয়ে-মানুষ···এ-কথার অর্থ বুঝিল। বলিল,— না। মিসেস চৌধুরী বারান্দায় বসে আছেন।

শরৎ চৌধুরী বলিল,—হুঁ···এখনো তিনি যাননি তাঁর বন্ধুর কাছে?

মার্থা বলিল,—তিনি যাবেন, এমন কথা আমি শুনিনি।

শরৎ চৌধুরী বলিল,—শিপ্রাকে একবার ডেকে দেবে?

উঠিয়া মার্থা গেল শিপ্রাকে ডাকিতে···শিপ্রার দেখা মিলিল না।

মুক্তি বলিল,—খানিক আগে বৌদি বেরিয়েছেন। বললেন, একটু ঘুরে আসি।

মার্থা ফিরিল শরতের ঘরে। শরৎ পাশ ফিরিয়া শুইয়াছে···দু'চোখ মুদ্রিত!

মার্থা আর ডাকিল না; মাথার শিয়রে চেয়ার ছিল, সেই চেয়ারে বসিল।

শিপ্রা ফিরিল, বেলা তখন পাঁচটা। ফিরিয়া সে আসিল শরতের ঘরে।

শরৎ তখনো ঘুমাইতেছে। শিপ্রা নিঃশব্দে মার্থার কাছে আসিল, মৃদু স্বরে বলিল,—কেমন আছেন?

—ভালো। ঘুমোচ্ছেন। জ্বর একটু কম। ডেকে-ছিলেন···আমার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা কইলেন···

—আমায় খুঁজেছিলেন?

—হ্যাঁ···তার পরই ঘুমিয়ে পড়েছেন।

শিপ্রা নিঃশব্দে বাহিরের বারান্দায় আসিল। বারান্দায় ছিল বেতের চেয়ার। সেই চেয়ারে বসিল।

মার্থাও আসিল।

শিপ্রা বলিল,—আমার কথা কি বলেছেন?

—কল্লোলের নাম করেছিলেন। বলছিলেন, আপনি তাঁর কাছে গেছেন!

শিপ্রা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিল মার্থার পানে···মার্থা তবে জানে? কল্লোলের নাম লইয়া শিপ্রাকে শরৎ যে-সব কথা বলে? আভাসে-ইঙ্গিতে মার্থাকেও বলিয়াছে?

শিপ্রার মনের মধ্যে যেন কুরুক্ষেত্র-পর্ব্ব! সে কোনো কথা কহিল না···মার্থাও নির্ব্বাক্!

অনেকক্ষণ পরে মার্থা ডাকিল—মিসেস চৌধুরী···

শিপ্রা চাহিল মার্থার পানে।

মার্থা বলিল,—আপনি সুখী নন্, বুঝছি। আমায় ক্ষমা করবেন, এ-কথা বলা আমার অনধিকার-চর্চ্চা···

শিপ্রা বলিল—না, না, আপনি ঠিক কথা বলেছেন! ঐশ্বর্য্যে পুরুষ-মানুষ সুখী হয়, মেয়েমানুষ হয় না।

মার্থা বলিল—কল্লোলের সঙ্গে আপনার অনেক দিনের বন্ধুত্ব?

—হ্যাঁ···

—তিনি কেমন লোক?

শিপ্রা বলিল—ভালো নয়! তবে আমার সঙ্গে তার একটু তফাৎ আছে—like me he never meant to be bad.

এ কথায় মার্থার বিস্ময়ের সীমা নাই! মার্থা চাহিল শিপ্রার পানে···বলিল,—কিন্তু শুনেছি, উনি বিবাহ করেছেন এই বর্ম্মায়···বর্ম্মীজ স্ত্রী···

শিপ্রা বলিল,—জানি। কল্লোলবাবু ভেবেছিলেন, বিয়ে করে জীবনে নূতন অধ্যায় সুরু করবেন, এইখানেই থাকবেন! ভেবেছিলেন, আমার সঙ্গে জীবনে আর কখনো দেখা হবে না!

মার্থা বলিল—He was a very old friend?

শিপ্রা চাহিল আকাশের পানে···একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—My only friend and very old··· ···অদৃষ্ট, ভগবান্···এ-সব আমি কোনো দিন মানিনি, মার্থা! এখন দেখছি, দু'জনে হঠাৎ আবার এখানে দেখা হলো! ইচ্ছা করলে মানুষ তার ভাগ্যকে বদলাতে পারে না, দেখছি! যে-পথে মন চলেছে, সে-পথ ত্যাগ করে অন্য পথে চলবে···এ-কথা যাঁরা বলেন, তাঁরা নির্ব্বোধ!

মার্থা বলিল—কিন্তু যত বই পড়ি···

বাধা দিয়া মার্থা বলিল—বইয়ে সত্য কথা লেখা থাকে না। নিজেদের জ্ঞানী, পণ্ডিত, ফিলজফার বলে প্রচার করবে বলে লেখকের দল মানুষের পরিবর্ত্তনের কথা লিখে নভেল-নাটক শেষ করে। ও-সব রূপকথা বিশ্বাস করো না···ও কথাগুলো ধাপ্পা ···idle talks!

মার্থা বলিল—কিন্তু···

শিপ্রা বলিল—মনকে তবু মানুষ ফেরাবার চেষ্টা করে···এ-কথা আমি মানি। কিন্তু এত রকম জটিল ব্যাপার পৃথিবীতে আছে!···তোমায় আমি বোঝাতে পারবো না, মার্থা···নিজেকে আমি কোনো মতে ঠিক করে নেবো বলে প্রাণপণে চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমার এই স্বামী···তুমি বুঝবে না, চিরদিন আমাকে উনি আঘাত করেছেন, চিরদিন অপমান করেছেন! মনকে ফেরাতে গেছি, উনি ফিরতে দেননি! ওঁর দিকে মনকে উন্মুখ করেছি···নিজেকে অসহায় নিরুপায় ভেবে—কিন্তু সে-মনকে চিরদিন উনি বিরূপ করে ফিরিয়ে দেছেন!··· স্বামী বলে উনি···

শিপ্রার কণ্ঠ উত্তেজনায় ভরিয়া উঠিয়াছে, মার্থা লক্ষ্য করিল··· লক্ষ্য করিয়া মার্থা বলিল—আমি জানি, মিসেস চৌধুরী, আমি বুঝি! আমিও এক দিন খুব বেশী আঘাত পেয়েছি···ভালোবাসার উপর কি শ্রদ্ধা, কি বিশ্বাস না ছিল! কিন্তু আঘাত পেয়ে বুঝেছি, মেয়ে-মানুষের ভালোবাসা কোনো দিন সার্থক হবার নয়! পুরুষ-মানুষ তার স্বার্থ নিয়ে এত বেশী মেতে থাকে যে, আমাদের মানুষ বলে ওরা স্বীকার করে না! যখন দায়ে ঠেকে, তখন এসে পায়ের কাছে দাঁড়ায়···কৃতাঞ্জলি-পুটে! না হলে···

কথা শেষ হইল না, মুক্তি আসিল। বলিল—বিষ্ণু এসেছে, বৌদি···

শিপ্রার চমক ভাঙ্গিল। শিপ্রা বলিল—কোথায় বিষ্ণু?

—তোমার ঘরের সামনে ···

শিপ্রা বলিল—যাচ্ছি ···

শিপ্রা আসিল, প্রশ্ন করিল—কি কথা, বিষ্ণু?

বিষ্ণু বলিল—কলকাতা থেকে এক জন বাঙালী সাহেব এসেছেন। কার্ড দেছেন। বললেন, জরুরি দরকার।

—বল্যেছো, বাবুর অসুখ?

—বলেছি। তাতে বললেন, তোমাদের মেম-সাহেবের সঙ্গে দেখা করবো।

কার্ডখানা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া শিপ্রা দেখিল। কার্ডে ইংরেজীতে নাম লেখা,—

পী, ব্যানার্জ্জী বার-এ্যাট্-ল

শিপ্রা ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, বলিল—কোথায় সে সাহেব?

—ড্রয়িং-রুমে।

শিপ্রা আসিল ড্রয়িং-রুমে। মধ্য-বয়সী এক জন বাঙালী সাহেব বসিয়া আছেন। মুখে মোটা সিগার।

শিপ্রাকে দেখিবামাত্র বাঙালী-সাহেব উঠিয়া

অভিবাদন জানাইলেন, বলিলেন—গুড্ আফটারনুন্ মিসেস চৌধুরী ···

প্রত্যভিবাদন সারিয়া শিপ্রা বলিল—আপনি মিষ্টার চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে চান?

—হ্যাঁ। কিন্তু শুনলুম, মিষ্টার চৌধুরীর খুব অসুখ, অথচ আমার কাজও খুব জরুরি···তাই আপনাকে বিরক্ত করতে হলো। ক্ষমা করবেন।

শিপ্রা বলিল—কি প্রয়োজন, বলুন!

বাঙালী সাহেব বলিলেন—আমার নাম পী, ব্যানার্জী···অর্থাৎ প্রসন্ন ব্যানার্জী। মানে, গুণেন রায় আছেন মিষ্টার চৌধুরীর পার্টনার। তাঁর তরফ থেকে ফার্ম্ম সম্বন্ধে কলকাতার হাইকোর্টে নালিশ হয়েছে··· মিষ্টার চৌধুরী ডিফেন্‌ডাণ্ট। তাঁরা বলছেন, মিষ্টার চৌধুরী না কি ফার্ম্মের বহু টাকা নষ্ট করেছেন। তাঁরা না পাচ্ছেন টাকা, না খাতাপত্র দেখতে। কোর্ট থেকে আমি রিসিভার এ্যাপয়েণ্ট হয়েছি!···আমি এখানে এসেছি, যদি আপোষে একটা মীমাংসা হয়! নাহলে ওঁরা ক্রিমিনাল কেশও করতে পারেন। বর্ম্মার অফিস থেকে কাগজ-পত্র সব আমি পেয়েছি।

শিপ্রা বলিল—আমাকে এ-সব কথা বলা মিথ্যা! কারবার সম্বন্ধে কোনো কথা আমি জানি না। এবং মিষ্টার চৌধুরীর এত বেশী অসুখ যে, এ-সময়ে এ-সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে কোনো কথা হতে পারে না!···আপনি ইচ্ছা করলে স্বচক্ষে তাঁকে দেখতে পারেন···তাঁর এ্যাটেনডিং ফিজিশিয়ানও এখানে আছেন।

ব্যারিষ্টার ব্যানার্জী একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, ফেলিয়া বলিলেন—এক্সকিউজ মী মিসেস চৌধুরী···কোর্টের কাজ করতে এসেছি বলে আমি মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিইনি! মিষ্টার চৌধুরীর এমন অসুখ, জানা ছিল না। আই প্রে, উনি শীঘ্র সুস্থ হোন, আমি এখানে ওয়েট করবো তাঁর জন্য। আমি চাই, কোর্টে জম-জমাট্ কিছু হবার আগে আপোষে সব মিটে যাক!

শিপ্রা বলিল—আপনাকে ধন্যবাদ!

ব্যানার্জী সাহেব বলিলেন—তাহলে আপনাকে আর বিরক্ত করবো না। আমি উঠি। গুড্ বাই···

ব্যানার্জী বসিলেন না।

ব্যানার্জী চলিয়া গেলে শিপ্রা আবার আসিল বারান্দায় মার্থার কাছে···

মার্থা বলিল—ক্যালকাটা ফ্রেণ্ড?

শিপ্রা বলিল—না, ব্যারিষ্টার। এঁদের কারবার নিয়ে সেখানে হাইকোর্টে কি মকর্দ্দমা হয়েছে। সেই মামলার ব্যাপারে এসেছেন মিষ্টার চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে।

মার্থার দুই চোখ যেন কপালে উঠিল! মার্থা বলিল—বাট বাই নো মীন্স হী শুড্ বী উয়োরিড!

শিপ্রা বলিল—ভদ্র আছেন! উনিও বললেন, এখন এ কথা হতে পারে না। হী উইল্ ওয়েট···

মার্থা বলিল—এবার একটু ঘুরে আসি। আমার সেই হোম্ ডিউটি! আবার আসবো।

মার্থার মুখে স্নিগ্ধ হাসি···ও-হাসির মধ্যে শিপ্রা কি দেখিল···আবেগে সে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। বলিল—একটা কথা ছিল···

মার্থা বলিল—রাত্রে এখানে আসবো। মিষ্টার চৌধুরী ভালোই থাকবেন···রাত্রে সে-কথা শুনবো··· ইউ আর সো সুইট্···

শিপ্রা বলিল—এ্যাণ্ড ইউ আর ওয়ান্‌ডারফুল! কিন্তু সে কথা নয়। মানে···

কথার সঙ্গে সঙ্গে শিপ্রা হাত হইতে ব্রেশলেট খুলিল। খুলিয়া বলিল—তোমার নার্সিং হোমে আমার খুব সিম্প্যাথি···তারি সামান্য নিদর্শন এই ব্রেশলেট তোমায় নিতে হবে।

মার্থা চমকিয়া উঠিল···দু' পা সরিয়া গিয়া বলিল—Oh my···নো, নো, নো···মিসেস্ চৌধুরী!

মার্থার হাত ধরিয়া শিপ্রা বলিল—না নিলে আমার দুঃখের সীমা থাকবে না। প্লীজ মার্থা···এর দামে তোমার এক জন রোগীও যদি সামান্য কমফর্টস্ পায়, আমার আনন্দ হবে!

শিপ্রার দু' চোখের দৃষ্টিতে কি আকুতি!

এ দান মার্থা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। বলিল,—দাও তবে···

ব্রেশলেট আবেগ-ভরে বুকে চাপিয়া মার্থা চক্ষু মুদিল। এই হীরা-পান্নার বদলে পাইবে নূতন এক্সরে যন্ত্র···অপারেশন্ টেবল্···মেশিন···

মার্থার দু'চোখে উজ্জ্বল দীপ্তি!

শিপ্রা নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া···একাগ্র দৃষ্টি মার্থার মুখে নিবদ্ধ। তার মন বলিতেছিল, নৈরাশ্য ভোগ করিয়াও মার্থা আজ কি-সুখে সুখী! ভাগ্যবতী মার্থা!

[ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

১

একই বাড়ীর দু'জন ভাড়াটে; দু'ই অংশের মাঝে 'পার্টিশন' আছে। তথাপি মনে হয়, দু'টি যেন একই সংসার। দুই বাড়ীর কর্ত্তায় কর্ত্তায়, গৃহিণীতে গৃহিণীতে, ছেলে-মেয়েদের মধ্যেও খুব সদ্ভাব। দুই বাড়ীর কর্ত্তাই কেরাণী—এক জন ব্যাঙ্কের এক জন পোষ্ট আপিসের, দু'জনেই প্রায় এক সময়ে বাড়ী ফেরেন। যিনি একটু আগে আসেন, তিনি বেশী টিকে-তামাক দিয়ে এক-ছিলিম তামাক সাজেন; দ্বিতীয় ব্যক্তি পরে আসিয়া হাত-মুখ ধুইয়া তাহাতে দুই-চারিটা টান দিয়া নাক-মুখ দিয়া ধূম উদ্‌গিরণ করেন। তার পর গল্প চলে, সেই আপিসের চর্ব্বিত-চর্ব্বণ! ভোরে উঠিয়া সনাতনের স্ত্রী সরমা ছড়া-ঝাঁট দিতে দিতে বলিলেন, দিদি উঠেছ?—বিমল বাবুর স্ত্রী নন্দরাণী পার্টি-শনের ও-পাশ হইতে বলিলেন, উঠেছি বোন! কিন্তু ঝি বেটীর আক্কেল দেখ, ছ'টা বাজে, এখনও তার দেখা নেই! সাড়ে-আট্‌টায় ভাত দিই কি করে বল ত ভাই?

সরমা সম্মার্জ্জনীর কার্য্য স্থগিত রাখিয়া বলিলেন, ঐ জন্যেই আমি রাত্তিরে রান্নাঘর ধুয়ে রাখি; ও-মাগীদের ত বিশ্বাস নেই। তা তুমি ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করতে যেও না, আমি রেখাকে ডেকে দিচ্ছি।—বলিয়া দালানে উঠিয়া ডাকিলেন, রেখা, ওঠ্ রে! তোর মাসীর ঝি আসেনি এখনো, একা হিমসিম্ খাচ্ছে।

রেখা উঠিয়া বসিল। সে সরমার প্রথমা কন্যা, বছর-পনের বয়স; টিকল নাক, ভাসা-ভাসা চোখ, রংটিও বেশ ফর্সা। স্কুলে সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে। গরীবের মেয়ে পরিশ্রমে ভয় পায় না। সে গায়ে কাপড়টা জড়াইয়া উঠানে নামিল, দাঁত-মাজিয়া কুলকুচা করিতে করিতে বলিল, মাসিমা আমি যাচ্ছি।—তাহার পর দুই হাতে চুল সমান করিতে করিতে দালানের পার্টিশনের দরজাটা খুলিল। ও-পাশটা ছোট অংশ; একখানি ছোট ঘর, সেই ঘরে থাকে বিমল বাবুর বড় ছেলে অমল। বছর কুড়ি-একুশ বয়স, বি-এ পড়িতেছে; বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, কৃশ কটি, কবাট-বক্ষ, সুশ্রী যুবা। ঘুম ভাঙ্গিয়া সবে বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছে। দু'জনে চোখো-চোখি হইতেই ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল; অমলের প্রাণে কবিত্বের তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল; সে চাপা-গলায় সুর করিয়া বলিল, "প্রভাতে উঠিয়া ও-মুখ দেখিনু, দিন যাবে আজ ভালো!"

রেখা হাসিমুখে ঠোঁটে আঙুল দিয়া ফিস্-ফিস্ করিয়া বলিল, চুপ, অসভ্য!

অমল বিছানা ছাড়িয়া মাটীতে দাঁড়াইয়া বলিল, এত সকালে যে?

রেখা বলিল, তোমাদের ঝি আসেনি, মাসিমা একা কি সব পারেন? এখুনি বুকের যন্ত্রণা আরম্ভ হবে না? যাঃ দুষ্টু!—বলিয়া অমলের প্রসারিত বাহুতে একটা ধাক্কা মারিয়া পলাইয়া গেল।

সে গেলে তাহার ভিজা পায়ের ছাপখানির দিকে অমল বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিল। কি সুগঠন পায়ের ছাপখানি, যেন লক্ষ্মীর চরণচিহ্ন! নন্দরাণী রেখাকে দেখিয়া অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, তোর মা তোকে ঠেলে তুল্‌লে ত? যা যা, তোকে আর হাত দিতে হবে না; আমিই সব গুছিয়ে নিচ্ছি। সরোর যেমন অনাছিষ্টি কাণ্ড!

বাসনের গোছা উঠানে নামাইতে নামাইতে রেখা বলিল, বাড়ীতে কি এ সব করতে হয় না মাসিমা! আপনার এখানে করলেই দোষ?

নন্দরাণী সস্নেহ কণ্ঠে বলিলেন, তা' তুই করিস্ জানি মা! এই দেখ্ না, আমার ধিঙ্গিটাকে। ডেকে এলুম, তা পাশমোড়া দিয়ে ফিরে শুলো। মা মরুক, বাঁচুক, তার সাড়ে-আট্‌টায় ভাত চাই-ই! অত-বড় ধেড়ে মেয়ের কাছে এক ফোঁটা জলেরও প্রত্যাশা নেই!

জোরে জোরে সাণ্ডেলের শব্দ করিতে করিতে অমল আসিয়া উঠানে নামিল, রান্নাঘরের দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া চাপা হাসির সহিত মাকে বলিল, নতুন ঝি রাখলে না কি মা?

নন্দরাণী উত্তর দিবার পূর্ব্বেই উঠানের কলের নিকট

হইতে রেখা তীব্র স্বরে বলিল, শুনলেন মাসিমা, কথার কি ছিরী!

নন্দরাণী হাসিমুখে বলিলেন, বলুকগে না; ওর মুরোদে কুলোবে কোন দিন তোর মত একটা ঝি রাখতে?

রেখা আড়চোখে অমলের দিকে চাহিল,—অর্থাৎ মুখের মত জবাব!

অমল সরিয়া গিয়া কলের পাশের ঢিপিটার উপর বসিল; নিমকাটির দাঁতনটা চিবাইতে চিবাইতে বলিল, আজ পড়া নেই? এ কাজ সেরে আবার ও-বাড়ীতেও কাজ আছে ত—পড়বে কখন?

রেখা ক্ষিপ্রহস্তে কাজ করিতে করিতে বলিল, হয়ে যাবে। এ আর কতক্ষণই বা লাগবে? আর ও-বাড়ীর এমন কি কাজ? খোকাকে দুধ খাইয়ে মাকে একটু কুটনো কুটে দিলেই ত হয়ে যাবে। আমার দেরী হয়, রেবাই সব গুছিয়ে দেবে। বিকেলে কিন্তু তুমি আমায় অঙ্কটা একটু বুঝিয়ে দিও।

অমল হাত বাড়াইয়া কল হইতে জল লইয়া কুলকুচা করিতে করিতে বলিল, ঈস্! আমার বয়ে গেছে!

রেখা অভিমানভরে বলিল, তা বেশ, দিও না; আমি যা পারি নিজেই করব। ভেবেছ, তোমার স্তবস্তুতি করবো?

অমল তাহার খোঁপাটা সজোরে নাড়িয়া দিয়া বলিল, তুমি নিজে যা করবে তা আমার জানাই আছে! কচু করবে!

রেখা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল, বেশ! সে গম্ভীর হইয়া বাসন ধুইতে লাগিল।

অমল ক্ষেপাইবার অভিপ্রায়ে বলিল, বেশ, বেরুবে যখন নাড়ুগোপাল হতে হবে।

রেখা তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, কি? নাড়ুগোপাল হবো? এ কি তোমাদের বেটাছেলের স্কুল, যে বেত মেরে পিঠের ছাল তুলবে?

অমল বলিল, তা জানি সবই। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া ত আর করতে পারবে না জানে, তাই সব দোষই মাফ!

নন্দরাণীকে দেখিতে পাইয়া রেখা রুষ্ট কণ্ঠে বলিল, শুনছেন মাসিমা! বলেছি বিকেলে একটু অঙ্ক বুঝিয়ে দিতে, তাই এই সকাল-বেলাই আমাকে গাধা, ঘোড়া, নাড়ুগোপাল, কত কি-ই না বলছে!

নন্দরাণী পুত্রের দুষ্টুমীভরা মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, দেবে, দেবে, দেখিয়ে দেবে। তুই ক্ষেপিস্ কেন? দেখছিস্ না নষ্টামী করে বলছে।—ছেলেকে একটা ধমক দিয়া বলিলেন, কেন ওকে ক্ষেপাস্ বল ত?

অমল হাসিতে হাসিতে সরিয়া পড়িল।

নন্দরাণীর চোখে ভবিষ্যতের একখানি রঙিন চিত্র ভাসিয়া উঠিল; তিনি বিস্মিত দৃষ্টিতে রেখার দিকে চাহিয়া

২

বৈকালের পর, সন্ধ্যার প্রায় কাছাকাছি অমল দুয়ার খুলিয়া এ-ধারে আসিল। সরমা কোলের ছেলেটিকে দুধ খাওয়াইতেছিলেন; বলিলেন, বেড়াতে যাওনি বাবা?

অমল তাঁহার পাশে বসিয়া কোলের ছেলেটির হাত-পা টানিয়া খুনশুটি করিতে করিতে বলিল, যাব কি মাসিমা! তোমার বিদুষী মেয়েটিকে পড়াতে হবে না? সকালে বলে রেখেছেন, এ-বেলা অঙ্ক দেখিয়ে দিতে হবে, তাই—

সরমা হাসিয়া উঠিলেন। রেখা ঘরের ভিতর হইতে রুক্ষ স্বরে বলিল, আমাকে দেখিয়ে দিতে হবে না; আমি নিজে যা পারি করব। ওঃ, ভারী ইয়ে।

অমল বলিল, ইস্. বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই কুলোপানা চক্কোর! শুনছ মাসিমা, তোমার মেয়ের কথা।

সরমা হাসিতে লাগিলেন। প্রাণখোলা সরল হাসি।

অমল প্রশ্ন করিল, মেসমশায় এখনও আসেননি?

সরমা বলিলেন, না বাবা! আফিস থেকে বেরিয়ে একবার কসবায় যাবেন।

অমল বলিল, কসবায়! কেন?

সরমা চাপা-গলায় বলিলেন, ওঁর আফিসের কোন্ বন্ধু নিয়ে যাবেন,—তাঁর এক আত্মীয়ের ছেলে আছে। ভাল ছেলে, তাদের অবস্থাও ভাল। শুনেছি, এম-এ পাশ করেছে। সব খবর ত জানি নে বাবা! উনি এলে জানতে পারব।

অমল এক মিনিট নীরব থাকিয়া প্রশ্ন করিল, ছেলে কি করে?

সরমা বলিলেন, তাও জানি নে বাবা! উনি এলে সব খবর পাব।

অমল ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া নির্ব্বাক্ রহিল। তাহার পর সরমা গেলেন রান্নাঘরে, অমল উঠিয়া গেল ভিতরে।

সনাতন যে ছোট কুঠুরীটিতে শয়ন করেন, তাহারই এক পাশে এক ফালি খালি জায়গায় স্থাপিত ছোট একটি ডেস্কের উপর রেখার বইগুলি গোছান থাকে। ঐখানে মাদুর পাতিয়া বসিয়া সে পড়ে। আলো জ্বালিয়া সে বই লইয়া বসিয়াছিল বটে, কিন্তু এক অক্ষরও পড়ে নাই; একটি মৃদু পদশব্দ শুনিবার আশায় কাণ পাতিয়া ছিল।

অমল আসিয়া তাহার পাশের সঙ্কীর্ণ স্থানটুকুতে বসিয়া পড়িল।

রেখার মুখ ভার, সে পার্শ্বোপবিষ্ট ব্যক্তির দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল না।

অমল তাহার খোঁপাটা খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া হাসিমুখে বলিল, ওরে বাবা, কি রাগ!

রেখা ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল, চক্ষে কি? মাকে বলে

দেব ? কেন, আমি নাড়ুগোপাল, গাধা, ঘোড়া আরও কত কি ! তোমার ত আমার কাছে দরকার নেই।

অমল হাসিমুখে বলিল, ইস্, খই ফুটছে, না তুবড়ী ছুটছে !—তাহার পর এদিক্-ওদিক্ চাহিয়া সে রেখার মাথাটা টপ্ করিয়া বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া তাহার অভিমানস্ফুরিত ওষ্ঠাধরে মৃদু চুম্বন করিল।

ইহার পর রেখার আর রাগ রহিল না ; সে হাসিয়া বলিল, কি অসভ্য ! মা যদি হঠাৎ এসে পড়েন ?

অমল বলিল, তাহলে ত ভালই হয়।

রেখা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, এঃ—কি বেহায়া ! তাহলে ভাল হয় ?

অমল বলিল, মেসমশায় কোথায় গেছেন জানো ?

রেখা সবেগে শিরশ্চালনা করিল।

অমল বলিল, কোথায় এক বড়লোকের এম-এ পাশ ছেলে পেয়েছেন,—সেখানে তোমার সম্বন্ধ করতে।

রেখা ঈষৎ ভীত ভাবে তাহার গা ঘেঁসিয়া বসিয়া বলিল, সত্যি ?

অমল গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়িল।

রেখা মৃদুকণ্ঠে বলিল, কি হবে ?

অমল বাঁ হাতে তাহাকে বেষ্টন করিয়া কাছে টানিয়া আনিয়া আশ্বাসের সুরে বলিল, ভয় কি ? আমি না দিলে ত কেউ কেড়ে নিতে পারবে না ? আমি বলব, রেখা আমার,—আমি দেব না ওকে।

এবার রেখার মুখে হাসি ফুটিল ; বলিল, বলতে পারবে ও-কথা ?

অমল দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, নিশ্চয়ই ! এক দিন একটু নির্লজ্জ হওয়া ঢের ভাল—যদি তাতে দু'জনেরই চির জীবনের অশান্তি কেটে যায়।

রেখা সংশয়-জড়িত স্বরে বলিল, মাসিমা, মেসো মশায় কি রাজী হবেন ?

অমল দীপ্ত মুখে বলিল, কেন, তুমি কি অবহেলার পাত্রী ?

রেখা অমলের বুকের একাংশে মাথা রাখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

* * *

রাত্রে একান্তে বিমল বাবু নন্দরাণীকে বলিলেন, জানো গা ! সনাতন আজ মা যশোদার সম্বন্ধ করতে এক বড়লোকের বাড়ী গেছল—

নন্দরাণী উৎকণ্ঠিত চিত্তে বলিলেন, কি হ'ল ? কথা কিছু এগুলো ?

বিমল বাবু বলিলেন, রাম রাম ! বল্লে, একটা ভিখিরীর চেয়েও আমি যেন হীন ! কেরাণী হওয়া এমনই পাপ ! একেবারে কথাই বললে না, শুধু বললে, ছেলে বিলেত যাবে।

নন্দরাণী কাছে সরিয়া-আসিয়া চাপা-গলায় বলিলেন, অমলের সঙ্গে বললে কি ওরা রাজী হবে না ?···ও মেয়ে বাপু, আমার হাত-ছাড়া করতে একটুও ইচ্ছে নেই। মেয়েটাকে জন্মাবধি দেখ্‌ছি, যেমন রূপ, তেমনি গুণ ! যত বড় হচ্ছে, আক্কেল-বিবেচনা সব দিকে যেন চৌকশ হয়ে উঠছে।

বিমল বাবু বলিলেন, সে ত আমারও ইচ্ছে। অমল বি-এটা পাশ করুক, বড় সাহেবকে বলে আফিসে ঢুকিয়ে দিই, তার পর কথাটা তুলতে পারি। দিন-কাল যা পড়েছে, ও যে এম-এ কি আইন পাশ করে কিছু করতে পারবে, সে ভরসা কম। বাঙ্গালীর ছেলের শেষ পর্য্যন্ত কেরাণীগিরি ছাড়া আর গতি নেই।

নন্দরাণী বলিলেন, তাহলে ওদের বলব ? কেন মিছে পাঁচ জায়গায় ঘুরে বেড়াবে ?

বিমল বাবু একটু ভাবিয়া বলিলেন, না, আগে থেকে বোল না। ওর মেয়েটি সুন্দরী ; মানুষের মনে একটা বড় আশা থাকেই,—কেরাণীর ছেলে কেরাণীর হাতে যদি মেয়ে দিতে ইচ্ছে নাই থাকে।

নন্দরাণী নিরুৎসাহ ভাবে বলিলেন, তবে আর আশা কি ?

বিমল বাবু হাসিয়া বলিলেন, ভবিতব্য মান না ? ও যদি ওরই বর হয় ত যে কোরে হোক বিয়ে হবেই, কেউ আটকাতে পারবে না। ওই মোটামুটি যেমন ওরাও জানে,—আমরা ওদের মেয়েটিকেই চাই, আমরাও জানি, অমলকে ওরা চায়। তাই থাক, আগে থেকে বেশি পাকা-পাকি করা ঠিক হবে না।

নন্দরাণী মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, তা যাই বলো, ওদের দু'টিতে যদি বিয়ে দিতে না পারি ত দু'জনেরই মনে বড় কষ্ট হবে।

৩

সে দিন কি একটা ছুটীর বার। রেখা এ বাড়ী আসিয়া বিমল বাবুকে বলিল, মেসো মশায় ! আজ আমার কাছে আপনি খাবেন।

বিমল বাবু হাত ধরিয়া তাহাকে কাছে বসাইয়া সস্নেহে বলিলেন, কেন রে ! কি রাঁধবি ?

রেখা হাসিয়া বলিল, স্কুলে আমাদের রান্না শিখিয়েছে কি না, আজ তার থেকে দু'-একটা রাঁধব।

বিমল বাবু প্রীত কণ্ঠে বলিলেন, রন্ধনবিদ্যার এগ্‌জামিন দিবি ? তবু শুনি, কি রান্না করবি ?

রেখা ঈষৎ লজ্জিত ভাবে বলিল, মাংসের ভুনি-খিচুড়ী, ভেট্‌কী মাছের পাতুরী, আর ডিমের হালুয়া !

নন্দরাণী রেখার কণ্ঠস্বর শুনিয়া দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইলে বিমল বাবু হাসিমুখে বলিলেন, দেখ্‌লি ত মা ! তোর মাসীর জিভে জল এসেছে !

রেখা হাসিয়া বলিল, আমার মা-মাসীরা ও-সব খান না, মেসো মশায় !

নন্দরাণী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন, যা বল্লি, ও-সব তোর মেসো-বাবারাই খায় !

রেখা আর বসিল না, হাসিতে হাসিতে উঠিয়া গেল।

অমল তখন সবেমাত্র পড়িতে বসিয়াছে ; রেখা তার পাশ দিয়া ও-বাড়ী যাইবে,—অমল হঠাৎ তাহার আলুলায়িত কুন্তলের একগোছা ধরিয়া টান দিল।

'উঃ' বলিয়া চকিত দৃষ্টিতে উঠানের দিকে একবার চাহিয়া সে অমলের সমীপবর্ত্তী হইয়া হাসিল ;—বল্লি, তুমি যেন দিন দিন কি হচ্ছ ! কেউ যদি দেখে ?

অমল মুখ বাঁকাইয়া বলিল, দেখুক্‌গে !—তাহার পর হাসিয়া বলিল, বাবার নেমন্তন্ন হ'ল, আর আমি বুঝি এক-ঘরে ?

রেখা বলিল, কেবল তোমায় কি করে বলি ? তাহলে ত ছুলু, অনিল, পুঁটু সকলকেই বলতে হয়। তাহার পর অমলের হাতের উপর একটা ছোট্ট চিমটি কাটিয়া বলিল, আহা, উনি যেন নেমন্তন্নের অপেক্ষাতেই থাকেন ? গিয়ে হুড়মুড় করে পোড়ে কেড়েকুড়ে খেয়ে এসো—লক্ষ্মীটি !···আর মা হয় ত তোমায় এখুনি ডাকবেন। ছাড়ো যাই, রাঁধতে সময় লাগবে না ?— বলিয়া অমলের সুবিন্যস্ত কেশে অঙ্গুলি চালাইয়া তাহা উস্কো করিয়া দিয়া পলাইয়া গেল। অমল অঙ্গুলি তুলিয়া শাসাইল,—আচ্ছা ! শোধ নেব আর এক সময় !

ও-দিকের দালান হইতে যুক্ত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া সে বলিল, এইটি করবে !

* * * *

খাইতে বসিয়া পূর্ব্বদিনের সেই বড়লোকের বাড়ীর অপমানের কাহিনী পুনরায় উঠিল। সনাতনের তাহা মর্ম্মান্তিক হইয়াছিল ; খাইতে খাইতে সেই দুঃখই তিনি করিতে লাগিলেন, বলিলেন, বড়লোক শুনে আমার যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না দাদা ! নারাণ বাবু নিতান্ত টানাটানি করে নিয়ে গেল, তাই,—কিন্তু ঘেন্না ধরে গেল ; নিজের ভুল খুব বুঝেছি, বড়লোকের কাছে যাচ্ছিনে। গরীবের মেয়ে, গরীবের ঘরেই পড়বে ; ওর মা-ঠাকুরমা হাঁড়ি ঠেলেই জীবন কাটিয়েছেন, ওকেও তাই করতে হবে। তেলে-জলে মিশ খায় না, এখন তা বেশ বুঝেছি।

বিমল বাবু গৃহিণীকে নিষেধ করিলেও নিজেই বলিয়া ফেলিলেন, তাই যদি হয়, তবে আর মিছে ঘোরাঘুরি করবে কেন ? তোমারও মেয়ে আছে, আমারও ছেলে আছে ; অমলকে একটা কাজকর্ম্মে ঢুকিয়ে দিতে পারি,—

সনাতনের মুখের গ্রাস মুখেই রহিয়া গেল, অব্যক্ত স্বরে বলিলেন, দাদা, সত্যি বলেছেন ? তাহলে ত উদ্ধার হয়ে যাই—অমলের মত ছেলে—

সরমা রান্নাঘরে বসিয়া মনে মনে তেত্রিশ কোটি দেবতার পায়ে প্রণাম করিতে লাগিলেন। রেখা পরিবেশন করিতেছিল, হাতের পাত্রখানা ফেলিয়া দ্রুতপদে ভিতরে পলাইয়া গেল।

দুই বৎসরের ছোট বোন রেবা সেখানে বসিয়া পাণ সাজিতেছিল ; হাসি-মুখে চুপি চুপি বলিল, বেঁচে গেলি দিদি ! কিন্তু খবরদার, অমলদাকে আমিই আগে বলব, তুমি এখনি বলতে পাবে না।

রেখা তাহার গালে ঠোনা মারিয়া আরক্ত মুখে বলিল, চুপ কর পাগ্‌লী !

৪

ইহার পর যে ঘটনা ঘটিল, সেটা যেমন অসম্ভব, তেমনি অতর্কিত। বিমল বাবু বিলাতে একটা লটারীর টিকিট কিনিয়াছিলেন, একেবারে ৬ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা !

প্রথম দুই-তিন দিন দুই বাড়ীর মধ্যে আনন্দের জোয়ার বহিল, সকলেই যেন নেশায় আচ্ছন্ন ! কিন্তু দুই-তিন দিন পরে রেখারা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল, মনে জাগিল একটা পার্থক্য।

অমলের মামারা অবস্থাপন্ন, থাকেন বালিগঞ্জে ; তাঁহাদের বাড়ীর স্ত্রী-পুরুষ সব সময়েই ও-বাড়ীতে আসা-যাওয়া করিতে লাগিলেন, আত্মীয়-স্বজনের আনন্দ-কোলাহলে বাড়ী মুখরিত হইয়া রহিল। কাজেই সরমাদের যাতায়াত কমিয়া গেল।

অমলের মামারা ভগিনীপতিকে বলিলেন, তা হচ্ছে না বিমল বাবু, আর এ এঁদো গলিতে থাকতে দিচ্ছিনে। চলুন বালিগঞ্জে, ভাল দেখে বাড়ী ভাড়া করে এখন থাকুন, তার পর দেখে-শুনে মনের মতন বাড়ী তৈয়েরী করবেন।

বিমল বাবুর সহিত সনাতনের সান্ধ্য মজলিস আর তেমন ভাবে জমে না, সে সময় শালারা, দালাল, এবং নূতন অনেক হিতৈষী বন্ধু তাঁহার স্বল্প-পরিসর বাটীখানি সরগরম করিয়া রাখেন।

নন্দরাণীর প্রথমা কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে ; দ্বিতীয়া কন্যা ছুলু বরাবর রেখাকে হিংসার চোখে দেখে, এখন সে গর্ব্বিত ভাবে তাহার নূতন ডিজাইনের গহনা ও কাপড় আনিয়া তাহাদের দুই বোনকে দেখাইয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতে লাগিল।

অমলও বন্ধু-বান্ধব লইয়া খুব মাতিয়া গিয়াছে ; মনে হয়, তাহাদের অতীত ও বর্ত্তমান-জীবনের ব্যবধানে একেবারে পূর্ণচ্ছেদ পড়িয়া গিয়াছে।

সনাতন এক দিন স্ত্রীকে বলিলেন, কি গো, তোমরা কি ও-বাড়ী যাওয়া বন্ধ করলে না কি ? চব্বিশ ঘণ্টাই দোর যে বন্ধই দেখি।

সরমা ম্লান হাসিয়া বলিলেন, এক রকম তা ছাড়া আর কি? সর্ব্বদাই ওদের বাড়ী লোকজনে গম্‌গম্ কচ্ছে,—তারা আপনার লোক, তার মধ্যে গিয়ে বসে থাকতে গল লাগে না। তারা সব বড়লোক, লাখ-বেলাখের গল্প চলে; আমরা গরীব মানুষ যেন তাতে থই পাই না!

সনাতন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, তাই হয় গো, তাই হয়। আজ যদি আমিও সাত লাখ টাকা পাই, দেখ্‌বে, তোমরাও বদলে যাবে।

সরমা চারি দিক্ চাহিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন, সব চেয়ে দুঃখ হয় মেয়েটার জন্যে। দেখেছ, কি রকম মনমরা হয়ে থাকে? অমল ওকে কি ভালই বাসত। তার পর কথাটাও উঠ্‌ল; সে-ও ত ক'মাস হল। এখন যেন ছেঁটে ফেলে দিয়েছে। বাড়ীতে চব্বিশ ঘণ্টাই দোল-দুর্গোৎসব লেগে রয়েছে, তাই নিয়েই উন্মত্ত!

সনাতন একটা ক্ষুব্ধ নিশ্বাস ফেলিলেন; একটু মৌন থাকিয়া বলিলেন, ওরা না আসুক, তবু তোমরা আগের মতই যাওয়া-আসা কোর, না হলে ভাববে, হিংসা হয়েছে, তাই আর যাও না।

সরমা বলিলেন, যাই বই কি, কিন্তু আগের মত আর তেমন আনন্দ পাই না। চোরের মত এক পাশে চুপটি করে বসে থাকতেও ভাল লাগে না।

মাসখানেক দেখা-শোনার পর বালিগঞ্জে বাড়ী ঠিক হইল। শুভদিন দেখিয়া যাওয়া হইবে। সংবাদ পাইয়া সরমা, রেবা ও রেখা চোখ মুছিয়া মুছিয়া চোখ ফুলাইয়া ফেলিলেন। নন্দরাণীরা যে দিন যাইবেন, ভোরে উঠিয়া সরমা চোখের জল মুছিতে মুছিতে পিঠা গড়িতে বসিলেন; অমল তাঁর হাতের পিঠা খাইতে বড় ভালবাসে। রেখা জলভারাকুল নয়নে মাকে জোগাড় দিতে লাগিল।

রেবা বলিল, মায়ের যেমন! অমলদা যেন ঐ পিঠে খাবার জন্যে বসে আছে! ওরা এখনও যেন সেই রকমই আছে? পুঁটুর সঙ্গে আমার অত ভাব ছিল, এখন কথা বলতে যেন তার বাধে,—দেখেছো? বড়লোক হয়েছে!

সরমা চোখ মুছিয়া বলিলেন, ছি, ও-কথা বলতে নেই। ভগবান্ ওঁদের আরও উন্নতি করুন।

পিঠা করিয়া পাত্রে গুছাইয়া সরমা ও-বাড়ী গেলেন, অবরুদ্ধ কণ্ঠে শব্দ ফোটে না, অতি কষ্টে বলিলেন, অমল ভালবাসে দিদি—

দুলু ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, মাসিমা যেন কি? ভোর-বেলা উঠে, এত খেটে-খুটে ও করবার কি দরকার ছিল? দাদা হয় ত খাবেই না।

নন্দরাণী ধমক দিয়া বলিলেন, তুই থাম দুলী! খাবে না কেন শুনি? সব তাতেই মেয়ের কথা বলা চাই!

দুলু বলিল, আজ ওর বন্ধু নয়ন চৌধুরীর বাড়ী পার্টি আছে না? সে আসুচে তোমার ঐ দু'খানা পিঠে খেতে!

সরমা চোখ মুছিয়া বলিলেন, সে না খায়, তোমরা খেয়ো মা, গরীব মাসী, কিছু ত দেবার ক্ষমতা নেই!

যাত্রার মিনিট দশেক পূর্ব্বে অমল বাড়ী ফিরিল; সরমার কাছে আসিয়া পদধূলি লইয়া বলিল, চল্লুম মাসিমা! অত কাঁদছ কেন? বাবা শীগ্‌গীরই গাড়ী কিনবেন, মধ্যে মধ্যে এদের সকলকে নিয়ে যেও।

রেখা ও রেবার পানে চাহিয়া বলিল, আরে, পাগলের মত কাঁদছে দেখো! চুপ কর, আমি এসে এক দিন সবাইকে নিয়ে যাব।

তাহার পর দুইখানি ট্যাক্সিতে সবাই উঠিলেন, অবশ্য বিদায়াশ্রু সকলের চোখেই ঝরিল; কিন্তু নন্দরাণী ও তাঁর ছেলেমেয়েদের চোখের জল গলির মোড় পার হইবার পূর্ব্বেই শুকাইয়া গেল।—সরমা ও তাঁহার কন্যাদের অশ্রুবন্যা সহজে শুকাইল না!

* * * *

সরমা সনাতনকে বলিলেন, আজ অমল এসেছিল।

সনাতন বলিলেন, বটে! কি মনে করে? সব ভাল আছে ত?

সরমা বলিলেন, হাঁ, পাশ করেছে, তাই বলতে এসেছিল।—একটু মৌন থাকিয়া বলিলেন, সে অমল আর নেই, একেবারে বদলে গেছে! আধ ঘণ্টাটাক্ বসেছিল, বিলেত যাবে বল্‌লে, এখনও পাসপোর্ট পায়নি। রেখার সঙ্গেও খানিকটা কথা বল্‌লে, তবে সে কেমন যেন ভাসা-ভাসা, আগেকার মত তেমন প্রাণখোলা সরল ভাব আর যেন নেই!

সনাতন নতমুখে চুপ করিয়া রহিলেন।

৫

ইহার পর চার বৎসর অতীত হইয়াছে। রেখার বিবাহ হয় নাই; সে এখন বি-এ পড়িতেছে। সনাতন ও সরমা তাহার বিবাহের জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়াছেন। যে অংশে পূর্ব্বে অমলরা থাকিত, সেখানে এখন যিনি বাসা লইয়াছেন, তাঁর একটি ছেলে আছে। বি-কম পাশ করিয়া হাইকোর্টে চাকুরীতে ঢুকিয়াছে। ছেলেটির একান্ত ইচ্ছা, রেখাকে বিবাহ করে, পাত্রপক্ষ সকলেই উৎসুক; কিন্তু অনিচ্ছুক পাত্রীপক্ষ। ছেলেটির হাব-ভাব ও ব্যবহার সনাতন, সরমা, রেখা—কাহারও প্রীতিপ্রদ নয়। রেখা ত অপূর্ব্বর নামে জ্বলিয়া যায়। অপূর্ব্ব কিন্তু আশা ছাড়ে না; রেখাকে একান্তে পাইলেই স্তুতিবাদ করিতে আরম্ভ করে। রেখাকে এক্ দিন সে বলিল, তোমার বাবা তোমার জন্যে কি রকম ব্যস্ত হয়ে বেড়াচ্ছেন, দেখেছ ত রেখা? কেন তুমি এত নিষ্ঠুর! আমার এত ভালবাসা কি তোমায় একটুও নরম করতে পারে না?

রেখা রুষ্ট হইলেও স্বাভাবিক স্বরে বলিল, কি একঘেয়ে কথা যখন তখন বলেন আপনি! কত দিন ত আমি আপনাকে ও-সব কথার আলোচনা করতে বারণ করেছি।

অপূর্ব্ব ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল; তথাপি সহজ স্বরে বলিল, তোমায় ভালবাসি বলেই তোমার আশা ছাড়তে পারি নে,—তোমার এত উপেক্ষাও সহ্য করি। কিন্তু এ কি এতই একঘেয়ে কথা?

রেখা বলিল, আমি ত বলেছি, বাবা আমাকে অনেক স্বার্থত্যাগ করে মানুষ করেছেন; আমার ইচ্ছে, আমিও উপার্জ্জন করে ভাই দুটিকে মানুষ করি।

অপূর্ব্ব বলিল, ওটা যে সর্ব্বৈব বাজে কথা, তা আমিও যেমন জানি, তুমিও তেমনি জানো। তোমার বাবা তোমার বিয়ের জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছেন, আমি জানি। তবে আমি কেরাণী, তুমি বি-এ পড়ছ, এই হিসেবে হয় ত আমায় তুমি অযোগ্য ভাবতে পারো—

রেখা এ গায়ে-পড়া অভিযোগের প্রতিবাদ করিল না; এই ধারণার বশে যদি অপূর্ব্ব নিরস্ত হয়, তবে ভালই।

কিন্তু সে দংশনোদ্যত ভুজঙ্গকে চিনিত না; অপূর্ব্ব তাহার দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, শিক্ষা সত্যিই তোমার আছে, কিন্তু তোমার মর্য্যাদা নেই রেখা! সুতরাং কোন ভদ্রসন্তান কি সহজে তোমাকে বিয়ে করতে রাজী হবেন?

রেখা চকিত দৃষ্টি তাহার মুখে নিবদ্ধ করিয়া শঙ্কিত ভাবে চাহিয়া রহিল।

অপূর্ব্ব এ কি বলিতেছে?

অপূর্ব্ব কুটিল নেত্রে তাহাকে লক্ষ্য করিতে করিতে বলিল, অমলকে নিয়ে ত খুব মাখামাখি গেছে,—তা ত আমার জানতে বাকি নেই! এক বাড়ীতেই না হয় থাকতুম না, কিন্তু এক পাড়ায় ত চিরকালই আছি।

রেখার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, বুঝিল, শয়তানের সহিত তাহার পাল্লা চলিয়াছে। একটুখানি অপূর্ব্বর দিকে চাহিয়া থাকিবার পর সে শক্ত ভাবে বলিল, মাথা খাটিয়ে আপনি আমাকে ভয় দেখাবার জন্তে চমৎকার চাতুর্য্য-জাল বিস্তার করেছেন দেখ্‌ছি! কিন্তু ও-জালে টিয়া ধরা চলে, ঈগল ধরা যায় না। যাকগে,—ধন্যবাদ!

অপূর্ব্ব মুখ কালো করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সেই রাত্রেই রেবা সংবাদ দিল, সনাতন অন্ত রেখার বিবাহের স্থির করিয়া আসিয়াছেন, দিন স্থির হইয়াছে ৭ই মাঘ। ইহাদের বাড়ীর সকলে রেখাকে দেখিয়া গিয়াছিলেন। পাত্রটি ভালো, মফঃস্বল কলেজের প্রোফেসর।

রেখা শুনিয়া মৌন হইয়া রহিল। মনে পড়িল একদিনের কথা, যে দিন অমল বলিয়াছিল,—আমি না দিলে ত কেউ কেড়ে নিতে পারবে না; আমি বলব, রেখা আমার, আমি দেব না।—রেখার বুক ফাটিয়া একটা জ্বালাময় শ্বাস শূন্যে মিলাইয়া গেল। এখন সে বিলাত হইতে আসিয়া সরকারী কলেজে মোটা বেতনে অধ্যাপক হইয়াছে,—সে সংবাদ তাহারা জানে; কিন্তু আর কোন যোগসূত্র নাই বলিয়া চোখের দেখা হয় নাই। সেই পুরাতন স্মৃতি খুব সম্ভব আর তাহার মনেই নাই। মাকে এক সময় রেখা বলিল, তুমি আমায় বাদ দিয়ে রেবার বিয়ে দাও মা!—সরমা তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, বড়কে বাদ দিয়ে ছোটোর বিয়ে?

রেখা বলিল, তাতে দোষ কি? আমাকে এই অবস্থার মধ্যে থেকেও অজস্র খরচ করে ছেলের মতই মানুষ করেছ। আমাকেও ছেলের কাজ করতে দাও। বাবার ত আর বছর পাঁচ-ছয় পরেই পেনসান্ হবে। পল্টু, খোকাকে মানুষ করতে হবে ত! আমি বি-এটা পাশ করে কোন একটা কাজে-কর্ম্মে ঢুকি, বাবা নিশ্চিন্ত হোন।

সরমা হাসিয়া বলিলেন, পাগল মেয়ে! মেয়ে ভবিষ্যতে উপার্জ্জন করে খাওয়াবে—এ আশা ক'রে কেউ মানুষ করে না। তোমার দরকার সে দিন, যে দিন রোগশয্যায় পড়ে থাকব।

রেখা বলিল, কেন মা, সুস্থ বাপ-মায়ের কোন উপকারে মেয়ে আসবে না? সে এমনই অপদার্থ?

মা বলিলেন, বালাই, অপদার্থ হবে কেন? মেয়ে যে মা পরের জন্যেই সৃষ্টি; তোমায় ত মা কাছে রেখে শান্তি পাচ্ছি না—যতক্ষণ না সেই পরের ছেলেটির হাতে তুলে দিতে পাচ্ছি। তুমি তোমার ঘরে রাজরাণী হয়ে থাক, তাই দেখেই আমরা নিশ্চিন্ত হব।

রেখা ম্লান মুখে বলিল, তবে এ ডবল খরচ আমার জন্যে করলে কেন মা!

সরমা হাসিয়া বলিলেন, তুই ত আমার পর ন'স্ যে, তোর জন্যে খরচটা আমার লোকসান গেছে। ও-সব ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না। তুই সুখে থাকলেই আমার সব সার্থক।

৬

বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। নিমন্ত্রণের ফর্দ্দ হইতে লাগিল। সরমা জিজ্ঞাসা করিলেন, বিমল বাবুদের বলবে?

সনাতন বলিলেন, তুমি কি বলো?...আমি ত বলি, করি। আমাদের ত কোন মনোমালিন্য হয়নি। যখন তিনি আমার মেয়ে নিতে চেয়েছিলেন, তখন আমরা সমান অবস্থার ছিলুম। আজ ঈশ্বরের অনুগ্রহে তিনি লক্ষপতি; গরীব কেরাণীর মেয়ে তিনি নিতে পারেন না। তাতে ত আমার অভিমান নেই। আর অপাত্রে ত আমিও মেয়ে দিচ্ছি না, আমার যেমন ক্ষমতা তেমনি ঘরে মেয়ে পড়বে!

সরমা নিরুত্তরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

সনাতন বলিলেন, ও-দুঃখ আজও ভুলতে পারলে না? কেন? যেমন অবস্থা তেমনিই ব্যবস্থা। আমার ত মনে কোন আক্ষেপ নেই।

তাহাঁর পর এক দিন দুই জনে নিমন্ত্রণ করিতে গেলেন। তিন বৎসর পরে দেখা। বিমল বাবু সাদরে সনাতনকে সুসজ্জিত বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন; সরমা নন্দরাণীর কাছে গেলেন। দুই বন্ধুতে বহু দিন পরে দেখা, গল্প যেন আর ফুরাইতে চায় না! নন্দরাণী খুব আনন্দ করিতে লাগিলেন, খুঁটিয়া খুঁটিয়া সব সংবাদ লইলেন; হৃদ্‌রোগে ভুগিতেছেন, এ জন্য যাইতে পারিবেন না বলিয়া দুঃখ করিলেন।

সরমা বলিলেন, তোমার শরীর ত একেবারে ভেঙ্গে গেছে দিদি! এবার অমলের বউ এনে নিশ্চিন্ত হও। কোথাও কথা-টথা হচ্ছে?

নন্দরাণী বলিলেন, সম্বন্ধ নিয়ে ত বোধ হয় পঞ্চাশ জন আনাগোনা করছে। সে সব মনের মত হচ্ছে কৈ? তাছাড়া দুলীর বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়েছি; রেখা আর দুলী ত প্রায় এক-বয়সী।

সরমা বলিলেন, আজ আসি দিদি! এত দিন পরে এলুম, অমলের সঙ্গে দেখা হল না, মনে বড় কষ্ট হল। অমল এলে বোলো, রেখার বিয়ে, যেন যায়। তুমিও চেষ্টা কোর দিদি! তবে রোগের ওপর কিছু বলতে পারিনি তো, একান্ত না যেতে পার—ছেলে-মেয়েদের সবাইকে পাঠিয়ে দিও।

তাঁহারা বিদায় হইলে বিমল বাবু ভিতরে আসিলেন, পত্নীকে বলিলেন, কি গো, কি বললে তোমার বন্ধু?

নন্দরাণী বলিলেন, কি আবার বলবে, যাবার জন্যে অনেক করে বলে গেল।

বিমল বাবু ঈষৎ কুণ্ঠার সহিত বলিলেন, অমলের সঙ্গে দিলুম না বলে কিছু বললে না?

নন্দরাণী জিহ্বা দংশন করিয়া বলিলেন, সরো কি সেই মেয়ে? পুরোনো কথাই তোলেনি। অমলের সঙ্গে দেখা হল না বলে দুঃখ করলে, তাকে যেতে বললে। তাছাড়া তার বিয়ের কথাবার্ত্তা জিজ্ঞেস করলে।

বিমল বাবু বলিলেন, সনাতনও তাই। কিছুই বললে না; তবু যতক্ষণ বসেছিল, আমার যেন লজ্জা-লজ্জা করছিল। কথাটা নিজেই বলেছিলুম কি না।

নন্দরাণী রুদ্ধ-নিশ্বাস ফেলিলেন। অমলের জন্য পাত্রী দেখার বিরাম নাই, অনেক পাত্রীই দেখিয়াছেন, কিন্তু যেন কোনটিই মনে ধরে নাই। কোথায় যেন একটা আদর্শ আছে, তাহার সহিত খাপ খায় না। কাহারও কথায় খুঁত পান, কাহারও চলনে, কাহারও গঠনে, কাহারও রূপে, —চোখে যেন একটা খুঁত ঠেকেই! কর্ত্তা-গৃহিণী দুই জনেই বিমনা হইয়া রহিলেন।

অমল কলেজ হইতে ফিরিলে নন্দরাণী বলিলেন, আজ তোর মাসিমা এসেছিল!

এখানেও মাসিমা পিসিমা অনেক জুটিয়াছেন; অমল বুঝিতে না পারিয়া বলিল, কোন্ মাসিমা?

নন্দরাণী বলিলেন, সরমা—রেখার মা।

অমলের মুখ হর্ষপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, বলিল, বটে! কি মনে করে হঠাৎ?

নন্দরাণী বলিলেন, রেখার বিয়ে, নেমন্তন্ন করতে এসেছিল।

পূর্ব্ব-স্মৃতি যেন সহসা কামান-গর্জ্জনে অমলের বুকের ভিতর গর্জ্জিয়া উঠিল, মায়ের মুখপানে চাহিয়া 'কোথায়' এ কথাটা আর উচ্চারণ করিতে পারিল না। মৌন নতমুখে রহিল।

নন্দরাণী নিজেই বলিতে লাগিলেন, ছেলেটি রাজসাহী কলেজের প্রোফেসর, ১২০ টাকা মাইনে পায়, গেরস্তর সংসার বটে, কিন্তু ছেলেটি খুব ভালো।

অমল রুদ্ধনিশ্বাসে সব কথা শুনিতে লাগিল। নন্দরাণী বলিতে লাগিলেন, তোর মাসী অনেক জোরে তোকে যেতে বলে গেল। তোর সঙ্গে দেখা হল না বলে দুঃখ কর'লো। হাঁ রে, বিলেত থেকে এসে এক দিনও দেখা করতে যাসনি? তোরা যেন বাপু কি!

অমলের রুদ্ধ কর্ণকুহরে সে কথা পৌঁছিল না; তাহার মনশ্চক্ষে ফুটিয়া উঠিয়াছিল বালিকা রেখার সেই সভয় দৃষ্টি—যে দিন সে বলিয়াছিল, 'তাহলে কি হবে?' আর তার নিজের সেই সময়ের আশ্বাসবাণী পর্য্যন্ত যেন কানে বাজিল, 'তুমি আমার, আমি কারুকে দেব না!'

অমল ভাবিল, রেখা কি সে কথা ভুলিতে পারিয়াছে?

৭

আজ গাত্র-হরিদ্রা, কল্য বিবাহ। সেই ছোট বাড়ী ছাড়িয়া একখানি বড় বাড়ী বিবাহের জন্য ভাড়া করা হইয়াছে। নীচে উঠানে কন্যা-সম্প্রদান করা হইবে। সনাতনের ভগিনীপতি কয়েক জন ছেলের সাহায্যে সেই স্থানটি সাজাইতেছেন।

সনাতন সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভগিনীপতি বলিলেন, বড় বেশী খরচ করে ফেললে ভায়া! খাট, আলমারী, চেয়ার-টেবিল, এত কি দেবার মত অবস্থা তোমার? তাছাড়া একটি ত নয়, রেবাও যে তৈয়েরী হয়ে উঠেছে!

সনাতন শুষ্ক স্বরে বলিলেন, কে কাকে দেয় ভাই! যে যার ভাগ্যে নেয়। ওর যতটুকু পাওনা ছিল দিলুম; আবার রেবাও তার বরাত-মত নেবে। প্রথম বার যেটুকু পারলুম, দ্বিতীয় বার তাও হয় ত দিতে পারবো না।

ভগিনীপতি বলিলেন, ডবল খরচ করলে। একবার মেয়েকে পড়াতে জলের মত খরচ করলে, দ্বিতীয় দফায়

বিয়েতেও বাড়াবাড়ি করে ফেল্‌লে; ছেলে দুটোর দিকে চাইলে না।

সনাতন ঈষৎ হাসিয়া সরিয়া গেলেন।

বারান্দার একটি পাশে রেখা দাঁড়াইয়া ছিল; দৃষ্টি তাহার মেঘমেদুর আকাশের মতই ম্লান ও করুণ। রেবা আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল, বলিল, ও মা! দিদি তুমি এখানে? আমি সারা-বাড়ী তোমায় খুঁজে মরছি।— সহসা তাহার শুষ্ক মুখের পানে চাহিয়া কলকণ্ঠ থামাইয়া, তাহার পিঠে একখানি হাত রাখিয়া রেবা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রেখা চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, কি রে?

রেবা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে ডাকিল, দিদি!

রেখা তাহার দিকে মুখ না ফিরাইয়া সাড়া দিল—উঁ।

রেবা বলিল, কেন এখনও সেই আগেকার কথা মনে রেখেছ দিদি! তিনি ত তোমায় ভুলেই গেছেন।

রেখা শুধু গভীর নিশ্বাস ফেলিল, সাড়া দিল না।

ছোট হইলেও রেবা বেশ গুছাইয়া কথা বলে। সে বলিল, তিনি যখন তোমায় ভুলেই গেছেন, তখন তুমিই বা কেন তাঁকে মনে করে ব্যথা পাও? মনে করো না কেন—ও-একটা ছেলেখেলা হয়েছিল।

রেখার চোখে জল টল-টল করিতে লাগিল; তথাপি ম্লান হাসিয়া বলিল, থাম ফাজিল মেয়ে! যেন দিদি হয়ে এসেছেন আমায় উপদেশ দিতে!

রেবার চক্ষুও সজল হইয়া আসিল; বলিল, না দিয়ে কি করি? কাল বিয়ে, আজ তুমি মুখ শুকিয়ে একাটি দাঁড়িয়ে কাঁদছ! বরের কাছে কি কৈফিয়ৎ দেবে? বুড়ো মেয়ে যে, বাপ-মার জন্যে মন কেমন কচ্ছে বলে রেহাই পাবে, তা ত নয়।

বারান্দার ও-পাশে সম্পর্কিতা এক ভ্রাতৃজায়াকে দেখিয়া রেবা থামিয়া গেল। একটু আগাইয়া আসিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, কি, মাণিক-জোড় ভেঙ্গে গেল বলে কান্না হচ্ছে? কিন্তু বরকে পেলেই সব ভুলে যাবে, ও-এমনই জিনিস! এস, মাসিমা ডাকছেন, স্যাকরা গয়না এনেছে, পরবে চলো।

নীচে আসিয়া দেখিল, দালানের আধখানা জুড়িয়া তত্ত্ব সাজান রহিয়াছে। রেবা বলিল, গায়ে-হলুদ এলো না কি মা?

সরমা বলিলেন, না; তোর মাসিমা আইবুড়ো-ভাত দিয়েছে। এই চিঠিখানা পড়তো রেবা! চশমাটা কাছে নেই, পড়তে পাচ্ছি নে।

রেবা পত্রখানা লইয়া পড়িতে লাগিল,—'স্নেহের বোন সরো, আমার মা-জননীর জন্য জিনিষগুলি পাঠালুম, তার পছন্দ হয়েছে কি না জানিও। লাল বেনারসীখানি পরে যেন বিয়ে হয়। তোমরা যদি কিনে থাক, তবে সেখানা জোড়ের তত্ত্বে দিও। আজ বুকের যন্ত্রণা বেড়েছে, কাল যদি একটু ভালো থাকি, নিশ্চয়ই যাব। তোমার দিদি— অমলের মা।'

সরমা বলিলেন, আমার জবানী একখানা চিঠি লিখে দে; লিখিস্, যা বলেছেন, তাই করব। আর যদি ভালো থাকেন, কাল যেন একটিবার এসে বর-কনেকে আশীর্ব্বাদ করে যান।

রেবা পত্র লিখিতে চলিয়া গেল। অন্য সকলে এটা-ওটা নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে দেখিতে দাতার রুচির প্রশংসা করিতে লাগিল।

রেখা একবার সে দিকে চাহিয়া ম্লান মুখে গভীর নিশ্বাস ফেলিল।

৮

বিবাহ-সভা, বর আসিয়াছে।

সকল নিমন্ত্রিতদের মধ্যে অপূর্ব্বও আসিয়াছে। চা, পান, সিগারেট ইত্যাদি লইয়া বরযাত্রীদের খুব খাতির করিতেছে।

বরের মামা বলিলেন, আশীর্ব্বাদের দিনও আপনাকে দেখেছি। পাত্রীর সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক?'

অপূর্ব্ব যেন শিটাইয়া গেল, বলিল, কনের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই, মশায়! আমি প্রতিবেশী মাত্র। আমরা গরীব কেরাণী, ও-সব অতি-আধুনিকা প্রগতি-শীলা মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবার আমরা কি উপযুক্ত?

কথাটা সে এমন ভাবে বলিল যে, মামার কাণে বিসদৃশ ঠেকিল। মামা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, পাত্রী ভয়ানক প্রগতিশীলা না কি?

ঠোঁটের কোণে একটা বক্র হাসি টানিয়া অপূর্ব্ব বলিল, আমাকে আর কেন জিজ্ঞেস কচ্ছেন, বলুন? আপনারা ত নিয়েই যাচ্ছেন, দু'দিনেই জানতে পারবেন।

মামা-শ্বশুর একটু সন্দিগ্ধপ্রকৃতির মানুষ; বলিলেন, আপনার কথা শুনে মনে কেমন খট্‌কা লাগছে! যা দিনকাল পড়েছে,—কিছু গোলমাল নেই ত?

অপূর্ব্ব বলিল, পুরানো কথা ঘেঁটে কি হবে বলুন? বিয়ে দিতে এসেছেন, দিয়ে যান; ও-সব কথা আর কেন তুলছেন, মশায়!

মামা-শ্বশুর চাপিয়া ধরিলেন; বলিলেন, বিয়ে দিতে এসেছি, কিন্তু এখনও দিইনি। মশায় যদি কিছু জানেন, দয়া করে বলুন। একটা সংসারকে রক্ষা করুন।

অপূর্ব্ব যেন মহা-মুস্কিলে পড়িয়াছে, এমনই মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, এ ত দেখ্‌ছি আমায় আচ্ছা বিপদে ফেললেন! বলতে গেলে ত অনেক কথাই বলতে হয়। ভদ্রলোকের মেয়ের বিয়েটাকে পণ্ড করা কি আমার উচিত?

মামা-শ্বশুর মিনতি করিয়া বলিলেন, মশায়, আমার ভাগ্নে আপনার কাছে এমন কোন অপরাধ করেনি, যে জন্যে যাতে আপনি জেনে-শুনেও তার জীবনটা অভিশপ্ত করে দেবেন।

অপূর্ব্ব তখন ঢোক গিলিয়া গিলিয়া বলিল, এখন আমরা বাড়ীর যে অংশে থাকি, সেই অংশে আগে বিমল বসু নামক একটি ভদ্রলোক থাকতেন। তাঁর ছেলে অমল বোসের সঙ্গে পাত্রীর খুবই ইয়ে—মাখামাখি ছিল।

মামা-শ্বশুরের চোখ দুটো যেন ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইয়া আসিল ; বলিলেন, এ্যাঁ, তার পর ?

অপূর্ব্ব বলিল, বাপ-মায়েরও ইচ্ছে ছিল, ওদের বিয়ে দেন, কিন্তু শেষে উল্টে গেল !

মামা অস্ফুট স্বরে বলিলেন, কেন ?

অপূর্ব্ব বলিল, বিমল বাবু লটারীতে প্রায় সাত লাখ টাকা পেয়ে একেবারে বড়লোক হয়ে উঠ্‌লেন। ছেলে অমল বোস বিলেত-ফেরত, প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রোফেসর হয়েছে। বালিগঞ্জে মস্ত বাড়ী, গাড়ী—তাঁরা আর এঁদের পাত্তা দিলেন না।

মামা-শ্বশুর রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিলেন, বাপ-মা এ ঘনিষ্ঠতার কথা জানতো ?

অপূর্ব্ব অবজ্ঞার সহিত বলিল, নাঃ, জানতো কি আর ? আমরা প্রতিবেশী—আমরা জানি, আর মা-বাপ জানতো না ? মা-বাপই ত প্রশ্রয় দিয়ে এটি ঘটিয়েছিল,—ভাবেনি ত যে, সব এমন উল্টে-পাল্টে যাবে !—তাহার পর সবিনয়ে বলিল, দেখবেন মশায় ! আমরা এক বাড়ীতে থাকি, আমার নামটা যেন জানতে না পারেন। শেষ মুহূর্ত্তে এ নিয়ে আর গোল করবেন না।

মামার কাণে তাহার কথা গেল কি না বোঝা গেল না ! তিনি সোজা গিয়া ভগিনীপতিকে এক পাশে ডাকিয়া সবিস্তারে চুপি চুপি নিবেদন করিলেন।

বরের পিতা শ্যাম বাবু বলিলেন, বল কি হে ! সত্যি ?

মামা বলিলেন, বললে ত। আর দেখ, মিছে কথা বলে তার লাভ ?

শ্যাম বাবু বলিলেন, মিথ্যে ভাঙ্গচিও ত হতে পারে। হয় ত শত্রুতা আছে।

মামা বলিলেন, বেশ ত, ডেকে একটু কৌশল করে জেনে নেও না। এ ত উড়িয়ে দেবার মত কথা নয় ; সর্ব্বনেশে ব্যাপার !

শ্যাম বাবু সনাতনকে এক পাশে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বিমল বাবু কে মশায় ?

সনাতন বলিলেন, চেনেন না কি ? যে বাড়ীতে আমি থাকি, ওরই অর্দ্ধেকটায় তিনি থাকতেন।

শ্যাম বাবু বলিলেন, তাঁর বড় ছেলের সঙ্গে পাত্রীর [illegible]

কথাটা কেমন সনাতনের ভাল লাগিল না ; তথাপি বলিলেন, তখন এক বাড়ীতে থাকতুম ; তাঁরা স্বামি-স্ত্রী রেখাকে খুব ভালোবাসতেন, তাই তাঁদের ইচ্ছে ছিল,—

শ্যাম বাবু বলিলেন, হুঁ ! হল না কেন ?

প্রশ্নের ধরণ শুনিয়া সনাতন শঙ্কিত হইলেন ; বলিলেন, তখন আমরা সমানাবস্থার লোক ছিলুম—কথা হয়েছিল। এখন তিনি লক্ষপতি লোক, ছেলে বিলেত-ফেরত ; এখন তাঁর সঙ্গে আমার আকাশ-পাতাল তফাৎ। ও-কথা আর ওঠেই না।

মামা বলিলেন, দেখলেন ত শ্যাম বাবু, ও সবই সত্যি।

শ্যাম বাবুর মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল ; বলিলেন, তাই ত দেখছি !

সনাতন আশঙ্কার সহিত বলিলেন, কেন মশায়, কি হল ? ছেলে-মেয়ে থাকলেই বিয়ের কথা হয় ; তাতে কি হয়েছে ?

শ্যাম বাবু রুদ্ধ রোষের সহিত বলিলেন, তা হয় ; কিন্তু ভদ্রলোকের সর্ব্বনাশ করার মতলবটা কি রকম ?

সনাতন শুষ্ক স্বরে বলিলেন, তার মানে ? কি বলছেন আপনারা ?

মামা কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন, আর ন্যাকা সাজবেন না মশায় ! মেয়েটিকে ত অমল বোসের কাছে ছেড়ে দিয়ে ছিলেন ! তারা বড় লোক, এখন নাগাল না পেয়ে আমাদের গরীবের ছেলের মাথা মুড়োবার চেষ্টায় ছিলেন ? ও-মেয়ে কোন্ ভদ্রলোকে নেবে ?

মামার কণ্ঠস্বর অনেকেরই কানে গেল। বর উৎকর্ণ হইয়া চাহিয়া রহিল, এবং বর ও কন্যা-যাত্রীরা ভীড় করিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইল।

সনাতন থর-থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন ; আর্ত্তকণ্ঠে বলিলেন, এ সর্ব্বনাশ আমার কে করলে ? আমি ত কারুর ক্ষতি কখনো করিনি !

তখন একটা যৌথ গণ্ডগোল আরম্ভ হইল ! কন্যা-পক্ষীয়েরা প্রতিবাদ করিতে লাগিল ; বরপক্ষীয়েরা বর তুলিয়া লইয়া যাইতে বদ্ধপরিকর হইল। কন্যাপক্ষীয় কর্ত্তা-ব্যক্তিরা বর-পক্ষীয়দের অনুনয় করিতে লাগিলেন, বিবাহ-মণ্ডপ যেন নির্ব্বাচন-কেন্দ্রের মত হট্টগোলে ভরিয়া গেল। নিস্তব্ধ ছিল শুধু বর, কিন্তু তাহার কুঞ্চিত ভ্রূও অন্ধকারাচ্ছন্ন মুখের পানে চাহিলেই বুঝা যাইতেছিল, তাহার মনে নিদারুণ ঝড় বহিতেছিল।

৯

এই সময় বাহিরে একখানি বৃহৎ মোটর আসিয়া থামিল ; এবং মূল্যবান শাল-বিমণ্ডিত বিমল বাবু নামিয়া আসিলেন ; ভিতরের দৃশ্য দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত। কেহ আস্ফালন করিতেছে। কেহ বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে। ভীষণ হট্টগোল।

সম্মুখে যাহাকে পাইলেন, তাহাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হয়েছে বলুন ত? এ যেন খুব একটা রাগারাগি-কাণ্ড দেখছি!

যাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি নিজেও সবিশেষ কিছু শোনেন নাই; বলিলেন, ঐ যে সনাতন বাবু, মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন। ওঁরা না কি কনের নামে কি বদ্‌নাম শুনে বর তুলে নিয়ে যাচ্ছেন।

এঁ্যা, সে কি!—বলিয়া বিমল বাবু হন্-হন্ করিয়া আগাইয়া গিয়া সনাতনকে একটা ঠেলা মারিয়া বলিলেন, কি হয়েছে সনাতন?

সনাতন জানুর ভিতর হইতে মুখ তুলিয়া বিমল বাবুকে দেখিয়া একেবারে ভেউ-ভেউ শব্দে কাঁদিয়া-উঠিয়া বলিলেন, দাদা এসেছেন! দেখুন, আমার কি সর্ব্বনাশ হল!

বিমল বাবু বলিলেন, তুমি ঠাণ্ডা হও। আমি দেখি, কি হয়েছে।

ভীড় সরাইয়া তিনি—যেখানে সশ্যালক শ্যাম বাবু সক্রোধে গর্জ্জন করিতেছিলেন, সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, বর-কর্ত্তা বোধ হয় আপনি?

পাশের কে এক জন সম্মতি জানাইল।

বিমল বাবু যোড় হাত করিয়া বলিলেন, সনাতন আমার ছোট ভাই, আমিই কন্যা-কর্ত্তা। আমার আসতে দেরী হয়ে গেছে, সে জন্যে আমি সকলের কাছে মার্জ্জনা চাইছি। কি হয়েছে, আমায় খুলে বলুন, আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে!

মামা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিলেন, বুঝবেন কেন মশায়? যাদের ঘরে এমন ব্যাপার—তারা ন্যাকা সেজেই থাকে!

বিমল বাবু শান্ত ভাবে বলিলেন, আমি ত এই আসছি, কাজেই কিছুই জানি নে। দয়া করে ঘটনাটা না বললে বুঝব কি করে?

শ্যাম বাবু বলিলেন, মাথা-মুণ্ড কি বলব মশায়? বলতে নিজেরই লজ্জা করছে। ওঁদের সঙ্গে এক বাড়ীতে কে বিমল বোস থাকতেন; তাঁর ছেলে অমল বোসের সঙ্গে পাত্রীর খুবই ঘনিষ্ঠতা ঘটেছিল। তার পর তাঁরা হঠাৎ খুব বড়লোক হয়েছেন, এঁরা আর সেখানে কল্কে পান না, তাই ঐ মেয়ে আমার ঘরে চালান দিতে যাচ্ছিলেন।

বিমল বাবুর ক্ষণকাল বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না, তাহার পর সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, এ সব আজগুবি কথা কে তুললে?

মামা তীব্র কণ্ঠে বলিলেন, তা আপনারা বলবেন বৈ কি! গায়ের কাদা ঢাকতেই হবে ত!

বিমল বাবু মিনিট-দুই মৌন থাকিয়া বলিলেন, বেশ, তখন আর তা অবিশ্বাস করতে পারবেন না। আচ্ছা, ছোটটির সম্বন্ধে ত কিছু শোনেননি, সেটিকে নিন না কেন? যে এ কথা বলেছে, ছোটটির সম্বন্ধে কিছু জানলে তা অবশ্যই বোল্‌তো। বড়টি থাক, ছোটটির সঙ্গেই বিয়ে দিন।

আসে-পাশে যাঁহারা দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহারা বলিলেন, সে কি! বড়কে বাদ দিয়ে ছোট?

সনাতন বলিলেন, সে কি দাদা, কি বলছেন আপনি?

বিমল বাবু ধমক দিয়া বলিলেন, আঃ, থাম না সনাতন! আমি কথা বলছি, আমাকেই দয়া করে বলতে দাও না! সারা দিন উপোস করে আছ, একটু জল খাও দেখি।

সকলে নিস্তব্ধ হইল।

বিমল বাবু শ্যাম বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, কি বলেন? তাতে কি আপত্তি আছে? ছোটটিকে আপনি দেখেছেন?

শ্যাম বাবু বলিলেন, হ্যাঁ, আশীর্ব্বাদের দিন একবার দেখেছিলুম বটে।

বিমল বাবু বলিলেন, ভালই। রূপে-গুণে সেটিও বড়র চেয়ে নিরেশ নয়, সে-ও এ বছর আই-এ দিচ্ছে। সেটির সঙ্গেই দিন না।

শ্যাম বাবু বলিলেন, সে কি হয়? এক জনের সঙ্গে কথা হল, আর এক জনের সঙ্গে দেব বিয়ে!

বিমল বাবু বলিলেন, তাতে দোস কি? যা দেনা-পাওনার কথা ছিল, টু দি পাই—সবই এই মেয়েকে দেওয়া হবে, শুধু কনেই বদল হয়ে গেল—পাত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কি বলো বাবাজী! এতে কি তোমার আপত্তি আছে?

পাত্র বলিল, বাবা রয়েছেন, যা বলতে হয় ওঁকেই বলুন।

বিমল বাবু বলিলেন, বেশ ত মশায়, তাহলে আপনারা একটা মত স্থির করুন। আরও দেখুন, লজ্জাটা ত এক পক্ষেরই নয়, আপনি বিয়ে দিতে এসে যদি শুধু বর নিয়ে ফিরে যান, পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজন সকলের কাছেই একটা 'কিন্তু' বোধ করবেন; আর ছেলেও বন্ধু-বান্ধবের কাছে লজ্জা পাবে। এটির সঙ্গে বিয়ে দিলে সব দিকই বজায় থাকে। আর সনাতনও ছাপোষা মানুষ, খামোখা এতগুলো খরচ-পত্র নষ্ট হবে।

বর-পক্ষীয়েরা পরামর্শ করিতে লাগিলেন। বিমল বাবু বাহিরে গিয়া সোফেয়ারকে ডাকিয়া কি বলিয়া আসিলেন।

শ্যাম বাবু বলিলেন, বেশ, ছোটটিকে একবার দেখান।

পাশে সনাতনের ভাগ্নে দাঁড়াইয়া ছিল, বিমল বাবু

ভেতরে গিয়ে এ সব কথা এখন কিছু ভেঙ্গ না, শুধু বোলো, তোমার মামা তাকে ডাকছেন।

মিনিট পাঁচেক পরেই রেবা আসিল—চারি দিকেই পুরুষ,—লজ্জিত, সঙ্কুচিত ভঙ্গীতে। পিতার নিকট আসিয়া বলিল, আমায় ডাকছেন বাবা?

সনাতন শুষ্ক স্বরে বলিলেন, আমি ডাকিনি মা! তোমার মেসো মশায় ডাকছেন।

মেসো মশায় এসেছেন?—বলিয়া চোখ তুলিতেই রেবার চোখোচোখী হইয়া গেল—বরের সহিত। সে সস্মিত মুখে রেবার পানে চাহিয়া আছে। রেবার বুকের মধ্যে একটা রুদ্ধ ক্ষোভ গুমরিয়া উঠিল, আহা:, দিদির এমন দীপ্ত সুন্দর, এমন চমৎকার বর হইতেছিল, আর কি যে গণ্ডগোল হইয়া গেল!

বিমল বাবু ডাকিলেন, মাসী, শোন!

রেবা কুণ্ঠিত ভাবে তাঁহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বিমল বাবু বাঁ-হাতে তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, মা যশোদা কি করছে?

রেবার চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, মৃদু কণ্ঠে বলিল, দিদি শুয়ে আছে।

বিমল বাবু বলিলেন, তোর মাসীকে আনতে গাড়ী পাঠালুম।

রেবা আশ্বস্ত ভাবে বলিল, মাসিমা আস্‌তে পারবেন? তাঁর যে অসুখ।

বিমল বাবু বলিলেন, থাক অসুখ। এখানে এই গণ্ডগোল, না এলে চলে কি? তোর মা কি কচ্ছে?

রেবার গলা কাঁপিতে লাগিল; নিম্নস্বরে বলিল, মা বড়ই কাতর হয়ে পড়েছেন।

বিমল বাবু বলিলেন, যা, তোর মায়ের কাছে বোস গে, আমি যাচ্ছি।

রেবা চলিয়া গেলে তিনি বলিলেন, মেয়ে দেখলেন ত? কি বলেন? বাবাজী কি বলো?

'বাবাজী' রেখাকে দেখে নাই. রেবাকে দেখিল, তাহার যে খুব পছন্দ হইয়াছে, তাহা তাহার আনত স্মিত মুখ দেখিয়াই বুঝা গেল।

পিতা ও মাতুল তথাপি একবার বলিলেন, তাহলে ওঁরা যা বলছেন, তাতে রাজী হব বীরেন?

পাত্র সলজ্জ ভাবে ঘাড় হেলাইয়া সম্মতি জানাইল।

শ্যাম বাবু বলিলেন, তাহলে মশায়, আপনার কথাই রইল।

বিমল বাবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, বাঁচালেন মশায়!

পাশের কে এক জন প্রশ্ন করিল, কিন্তু বড়টি?

বিমল বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, আমিই সেই আঙুল ফুলে কলাগাছ বিমল বোস। অমল আমারই ছেলে বড়টিকে আমিই নেব।

সনাতনের রুদ্ধ কণ্ঠ বিদীর্ণ করিয়া অতি করুণ আর্ত্তস্বর বাহির হইল,—দাদা!

বিমল বাবু বলিলেন, গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছি—অমল আর তার মাকে আনতে। তুমি এক কাজ করো সনাতন! এখনও রাত বেশী হয়নি, আর লগনসার বাজার, ঝাঁ করে ফুল, জোড়, টোপর, আর কাঁসা-পেতলের দান,—যা না-হলে কন্যা সম্প্রদান হয় না, তাই কারুকে আনতে দাও। আমি ভেতরে যাচ্ছি।—বলিতে বলিতে তিনি অগ্রসর হইলেন।

সনাতন শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন, অমল কি রাজী হবে দাদা?

বিমল বাবু ফিরিয়া-দাঁড়াইয়া বলিলেন, কেন রাজী হবে না, শুনি? তিনি এমন কি নবাব-পুত্তুর? চিম্‌ড়ে ক্যারাণীর ছেলে,—আজই না হয়,—হুঁ!—নাও নাও, তুমি আর দেরী কোর না, এখুনই আনতে দাও।—বলিয়া একটি ছোট মেয়েকে সঙ্গে লইয়া তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন।

বধূবেশিনী রেখা খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল, মেঝেয় কয়েকটি মহিলা বসিয়া ছিলেন, বিমল বাবুকে দেখিয়া অবগুণ্ঠন টানিয়া উঠিয়া গেলেন।

বিমল বাবু রেখার কাছে বসিয়া, তাহার পিঠে হাত রাখিয়া সস্নেহ কণ্ঠে ডাকিলেন, মা যশোদা!

রেখা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল; তাহার পর উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের সহিত "মেসো মশায়" বলিয়া তাঁহার কোলে মুখ গুঁজিল।

বিমল বাবুর চক্ষুও শুষ্ক রহিল না; তথাপি হাসিয়া বলিলেন, মেসো মশায় কি রে? বল—"বাবা!" ঘরের মেঝেয় সরমা পড়িয়া ছিলেন, রেবা মাথার কাছে বসিয়া ছিল, সে দিকে চাহিয়া বলিলেন, মাসী, তোর মাকে খানিকটা মিছরীর জল এনে খেতে দে। উপোস করে অমন এলিয়ে পড়লে ত চলবে না, দুই জামাই বরণ করে তুলতে হবে যে!

১০

বাহিরে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইতেই জোড়া শাঁখ বাজিয়া উঠিল। নন্দরাণী, অমল, অনিল, দুলু, পুঁটু নামিল। ভিতরে প্রবেশ করিতেই বিমল বাবু অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা নন্দরাণীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, ওগো, শোন শোন, একটু দাঁড়াও। মনে পড়ে, এক দিন সনাতনের কাছ থেকে মা যশোদাকে চেয়েছিলুম? তাই ভাবলুম, আমার মা, আমি অন্যকে দেব কেন? তাই ওদের অনেক বলে মাসীকে নিতে রাজী করিয়েছি। যাও, মা যশোদার গায়ের সব গয়না মাসীকে পরিয়ে, তোমার গয়না তাকে পরিয়ে দাও। শেষ মুহূর্ত্তেও যা হোক আমার কথাটা রইল।

নন্দরাণীর পা যেন চলে না! আনন্দে, বিস্ময়ে, ক্ষোভে থতমত খাইয়া ধীরে ধীরে ভিতরে অগ্রসর

হইলেন। ছি ছি, কর্ত্তা কি যেন! পূর্ব্বে কি একটু আভাস দিতে নেই? প্রথম ছেলের বিবাহ, না হইল কোন নিয়ম-লক্ষণ, না পাইলেন সাধ-আহ্লাদ করিতে!

অমল বিমূঢ় ভাবে পিতার দিকে চাহিয়া ছিল। কাণে শুনিলেও ব্যাপারটা যেন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছিল না।

বিমল বাবু তাহাকে বিস্ময়ের অবকাশ দিলেন না; বলিলেন, অমল, তোমার মাকে যা বলেছি শুনেছ ত?

অমল ঘাড় হেলাইয়া স্বীকার করিল।

বিমল বাবু বলিলেন, ওঁকে যা বললুম, তাই সবটা নয়, আরও কথা আছে। এসে দেখি হুলুস্থূল! আমরা যখন এক বাড়ীতে ছিলুম, তখনকার কথা কদর্য্য ভাবে ওঁদের কাণে উঠেছে!—যাকগে সে কথা; মোট কথা, দায়িত্বটা তোমার ঘাড়েই পড়েছে।···নাও, আর দেরী করো না, লগ্ন বয়ে যায়—জোড়টা পরে ফেল! স্ত্রী-আচারেই যাবে আবার এক ঘণ্টা,—মেয়েদের কাণ্ড ত!···

সভাশুদ্ধ লোক স্থিরদৃষ্টিতে অমলের মুখপানে চাহিয়া ছিল,—দেখা গেল, সে স্মিত-প্রসন্ন মুখে হেঁট হইয়া জোড়টা তুলিয়া লইল।

* * * *

রেবার স্ত্রী-আচারের সময় বাসর খালি করিয়া হুড়-মুড় করিয়া মেয়েরা নীচে নামিয়া গেল। নির্জ্জন পাইয়া অমল রেখার চিবুক ধরিয়া মুখ তুলিয়া ধরিল, হাসিমুখে প্রশ্ন করিল, ব্যাপারটা কি রেখা?' ওরা কি শুনেছে?

রেখা তাহার মুখের উপর আয়ত নেত্রের প্রশান্ত দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিল, যা সত্যি কথা, তাই শুনেছে।

অমল তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া প্রীত কণ্ঠে বলিল, এমন হিতৈষী আমাদের কে?

রেখা বলিল, কি করে জানব? কিন্তু হিতৈষীর আর দোষ কি? তুমি ত আমায় ভুলেই গেছ, মেসো মহাশয়ের আগ্রহেই ত এ ধরে-ভদ্রা ঘটল।

সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সারা জীবন ধরে করব, তাহলে হবে ত?—অমল রেখার মুখখানি উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিল।

রেখার অভিমান-স্ফুরিত ওষ্ঠে হাসি দেখা দিল; বারেক অমলের চন্দন-চর্চ্চিত মুখের পানে পূর্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া সে তাহার বক্ষে মুখ লুকাইল।

শ্রীমতী মায়াদেবী বসু।

কুঠীবাড়ী

কোন নীলকর কুঠেল সাহেব পেতেছিল কবে ডেরা
কুমার নদীর তীরে "কুঠীবাড়ী"—সেই স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।
পূব-পশ্চিম-উত্তর দিকে পঙ্কিল নালা কাটা,
দক্ষিণে তার আজও বয়ে যায় কুমারে জোয়ার ভাঁটা।

তিন্তিড়ী তাল আম জামরুল বিবিধ বিটপিরাজি,
বেতসকুঞ্জে রয়েছে ঘিরিয়া শ্যামল শোভায় সাজি'।
দোয়েল পাপিয়া বহু বিহঙ্গ উচ্চে বাঁধিয়া নীড়
বহু দিন হ'তে সুখে বাস করে শাখায় করিয়া ভীড়।

পুকুরের সাথে সুড়ঙ্গ-পথে কুমারের ছিল যোগ,
গোধিকারা সুখে রৌদ্র পোহায় তীরে রাখি নির্ম্মোক।
নাই সেই জল নীল টলমল, নাই সে বিদেশী পায়,
দিবসে শৃগাল করে বিচরণ—জনকোলাহল ক্ষান্ত।

ঈশান কোণেতে "আঁধার কুঠীর" দেহে রোমাঞ্চ আনে,
জ্যান্ত-কবর দিবার বিধান ছিল না কি সেইখানে!—
সত্য মিথ্যা কেমনে কহিব? লিখি যা শুনেছি যত
জননী-নয়নে যত জল ঝরে ফসল ফলিত তত।

কত বিধবার নয়নের মণি আর ফেরে নাই ঘরে,
কত জননীর নয়ন-অশ্রু বিগলিত চিরতরে।
আমরা সভয়ে আঁধার কুঠীর দূর হতে হেরিতাম,
সমুখে পড়িলে সহসা সঘন বাহিরিত রাম-নাম!

জ্যৈষ্ঠ-রজনী হয় নাই শেষ, বিহগও ঘুমের ঘোরে,
অতি ভোরে উঠে কুঠীবাড়ী গেছি আম কুড়াবার তরে।
গত রজনীতে ঝড় হয়ে গেছে ভাঙ্গিয়াছে ডালপালা
ছুটাছুটি করি মহা-আনন্দে আমে ভরিয়াছি ডালা।

সহসা কাহার ক্রন্দন-রোল পশিল মোদের কাণে—
কে যেন কাঁদিয়া বুক ভাসাইছে নিকটেই কোন'খানে।
সাহসী ক'জনে হেরিনু অদূরে থুথুরে এক বুড়ী
আঁধার কুঠীর নিকটে পড়িয়া বুকে দেয় হামাগুড়ি।

"কে তুমি বুড়ীমা?" সুধাইনু তারে, কাঁদিয়া সে হল সারা,
বক্ষে আঁকড়ি প্রকাণ্ড শিলা নয়নে অশ্রুধারা।
আকুল আবেগে কাঁদিয়া কহিল, "আমি রহিমের নানী,
আঁধার কুঠীরে আমার রহিম, কে দেবে রে দানাপানী?"

কোথাকার কোন্ কুঠেল সাহেব নীলের করিত চাষ,
বিষে তার নীল হয়েছিল যত তরু-লতা-তৃণ-ঘাস।
আজো কেঁদে ফেরে রহিমের নানী কত কুঠীবাড়ী-মাঝে,
প্রেতিনীর মত ক্ষুধিত আত্মা ঘুরিছে প্রভাতে-সাঁঝে।

উপনিষদের ব্রহ্মবাদ

৪

আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে গুণময়, লীলাময় পরমপুরুষের সৃষ্টিলীলা আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু ব্রহ্মের যে প্রপঞ্চাতীত নির্গুণ, নির্লেপ, নিরঞ্জন, নির্ব্বিশেষ রূপ বেদ, উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে সূত্রকারের অভিপ্রায় কি, তাহা আলোচনা করা যাইতেছে। সূত্রকার বলিলেন, ব্রহ্ম অরূপ, অদৃশ্য, অজ্ঞেয়, অব্যক্ত, অগোত্র, অবর্ণ, শব্দহীন, স্পর্শহীন, রসহীন ইত্যাদি (১)। এইরূপে সূত্রকার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার মতে সগুণ ও নির্গুণ, সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ উভয় বিভাবের কথা শ্রুতিতে উক্ত হইলেও একের এই পরস্পরবিরুদ্ধ উভয় রূপ ত কোনমতেই সত্য হইতে পারে না। ইহার একটিকে ত মিথ্যা বলিতেই হইবে। বহু সংখ্যক শ্রুতিতে তাঁহার নির্ব্বিশেষ রূপ বিবৃত হইয়াছে। ব্রহ্ম সবিশেষ হইলে ঐ সকল শ্রুতিবাক্যগুলি অর্থহীন ও অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে সগুণ, সবিশেষ ভাবকে মায়িক বলিলে শ্রুতির উভয়বিধ নির্দ্দেশেরই সার্থকতা প্রমাণিত হয়। অতএব সূত্রকারের সিদ্ধান্ত এই যে, নির্ব্বিশেষ রূপটিই ব্রহ্মের যথার্থ রূপ। নির্গুণ, নিরঞ্জন ব্রহ্ম মায়াশরীর অবলম্বন করিয়া সবিশেষ হন, বহু রূপে বিরাজ করেন। একত্ব ও নানাত্ব ভেদ ও অভেদ উভয়ই সত্য, কেবল দৃষ্টির প্রভেদমাত্র। সর্পকে সর্পরূপে দেখিলে তাহা অভিন্ন, আবার ঐ সর্পেরই কুণ্ডলী, উচ্চতা, দৈর্ঘ্য প্রভৃতি লক্ষ্য করিলে তাহা বিভিন্ন। এইরূপ ব্রহ্মও তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে অভিন্ন, আর মায়িক দৃষ্টিতে তাহাই নানারূপ ও বিভিন্ন (২)। এই দৃষ্টিতেই সূত্রকার তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে আকাশাদি ভূতপ্রপঞ্চের সৃষ্টি বর্ণনা করিয়াছেন। কেবল ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ব্যোম প্রভৃতি মৌলিক ভূত-প্রপঞ্চেরই তিনি এই ভাবে উৎপত্তি-বর্ণনা করিয়াছেন এমন নহে, জড়জস্তুর লৌকিক দৃষ্টিতে যত প্রকার বিভাগ অনুভূত হয়, সেই সমস্ত বিভিন্ন ভৌতিক বিকারের উৎপত্তি সূত্রকার বিবৃত করিয়াছেন (১)। এই অসংখ্য বিভিন্ন ভৌতিক বস্তু মূলভূতের বিকার হইলেও উহা জড়ভূতের স্বাধীন অভিব্যক্তি নহে। সমস্ত ভূত ও ভৌতিক সৃষ্টির অন্তরালেই সেই বিশ্বানুগ আত্মা অবস্থিত আছেন। সৃষ্টির প্রতি স্তরে স্তরেই তিনি অনুস্যূত আছেন। বিশ্বের প্রতি রেণু-পরমাণুতে ওতপ্রোত ভাবে বিরাজ করিতেছেন, অথচ তিনি নির্লেপ, নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন ও প্রপঞ্চাতীত। ব্রহ্ম সমস্ত বিকারে অনুগত হইয়াও যেই ব্রহ্ম সেই ব্রহ্মই থাকেন, অথচ তিনি জগৎ বলিয়াও প্রতিভাত হন, জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া থাকেন। তাঁহার স্বরূপের প্রচ্যুতি না হইয়া অন্যরূপে তাঁহার যে অভিব্যক্তি বা প্রকাশ, তাহাই তাঁহার বিবর্ত্তরূপ। ইহাই বেদান্তের অধ্যাস, মায়া বা অবিদ্যা। ইহা মিথ্যা, একমাত্র তাঁহার বিশ্বাতীত রূপই সত্য।

জড়প্রপঞ্চের সৃষ্টিরহস্য ব্যাখ্যা করিয়া সূত্রকার চেতনের উৎপত্তি-রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমেই সূত্রকারের মনে আসিল, আকাশাদি ভূতপ্রপঞ্চের যেমন উৎপত্তি হয়, জীবও সেইরূপ উৎপন্ন হয় কি না? জীবের প্রকৃত স্বরূপ কি? পরমাত্মাকেই জীব বলা যায় কি না? জীবের যে জন্ম-মৃত্যুর কথা এবং ইহলোক ও পরলোক-প্রাপ্তির কথা শাস্ত্রে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার তাৎপর্য্য কি? জীব এক, না বহু, অণু, না বিভু, জীবতত্ত্ব সত্য কি মিথ্যা? এইরূপ নানা প্রশ্ন সূত্রকারের মনে উদিত হইতে লাগিল এবং তিনি স্বীয় সূত্রে তাহার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহার নিম্নোক্ত শ্রুতি-বাক্যটি মনে পড়িয়া গেল—"জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়তে" (ছান্দোগ্য ৬।১১।৩) জীবশূন্য হইলেই সমস্ত চেতন, অচেতন জগৎ মৃত্যু-কবলিত হয়,

---

১। অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ। ব্রঃ সূঃ ১।২।২১; অরূপবদেবহি তৎ প্রধানত্বাৎ। ব্রঃ সূঃ ৩।২।১৪; তদব্যক্তমাহ হি। ব্রঃ সূঃ ৩।২।২৩

২। ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি ব্রঃ সূঃ ৩।২।১১; ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ। ব্রঃ সূঃ ৩।২।১২; অরূপবদেব তৎ প্রধানত্বাৎ। ব্রঃ সূঃ ৩।২।১৪; প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ ব্রঃ সূঃ ৩।২।১৫; দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্য্যতে। ব্রঃ সূঃ ৩।২।১৭; বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়-সামঞ্জস্যাদেবম্ ব্রঃ সূঃ ৩।২।২০। দর্শনাচ্চ ব্রঃ সূঃ ৩।২।২১; উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ। ব্রঃ সূঃ ৩।২।২৭, ৩।২।২৮—৩০

১। যাবদ্বিকারন্তু বিভাগো লোকবৎ। ব্রঃ সূঃ ২।৩।৭; তদভিধ্যানাদেব তু তল্লিঙ্গাৎ সঃ। ব্রঃ সূঃ ২।৩।১৩

ন বিয়দ শ্রুতেঃ। ব্রঃ সূঃ ২।৩।১; প্রতিজ্ঞাঽহানিরব্যতিরেকাচ্ছব্দেভ্যঃ। ব্রঃ সূঃ ২।৩।৬। এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ ব্রঃ সূঃ ২।৩।৮; তেজোঽতস্তথাহ্যাহ। ব্রঃ সূঃ ২।৩।১০ আপঃ। ব্রঃ সূঃ ২।৩।১১ ইত্যাদি সূত্র দ্রষ্টব্য।

জীব বস্তুতঃ মরে না। এই শ্রুতিকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া আমরা যদি জীবকে স্বতন্ত্র তত্ত্ব বলিয়া মানিয়া লই, তবে বেদান্তের মতে দ্বৈতসত্যতা অনিবার্য্য হয়, অদ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদের সাধক শ্রুতিবাক্য সকল অর্থহীন ও অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। একই ব্রহ্মকে জানিলে নিখিল বস্তু জানা যায় বলিয়া (এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা) বেদান্তে যে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, তাহা নিরর্থক হয়। এই সকল সমস্যা-সমাধানের জন্য সূত্রকার বলিলেন যে, জন্মমৃত্যু বলিয়া যে কথা আছে, তাহা কি প্রকৃত পক্ষে জীবেরই জন্মমৃত্যু সূচনা করে, না, জীব যে শরীরকে অবলম্বন করে, সেই শরীরেরই উৎপত্তি ও ধ্বংস সূচনা করে, ইহা বিচার্য্য। কি স্থাবর, কি জঙ্গম সমস্ত জাগতিক পদার্থেরই এক একটি শরীর আছে এবং সেই শরীরে জীবন-প্রবাহও স্পন্দিত হইতেছে, ইহাই সেই বিশ্বপ্রাণ পরমাত্মা। শরীরের উৎপত্তিই জন্ম এবং শরীরের ধ্বংসই মৃত্যু বলিয়া আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি। রাম জন্মিল, রাম মরিল বলিয়া লোকে যে ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাও ঠিক ঐরূপ। রামের শরীরের উৎপত্তিই তাঁহার জন্ম এবং ঐ শরীরের ধ্বংসই মৃত্যু বলিয়া লোকে মনে করে। এইরূপ জন্মমৃত্যুর অন্তরালে যে অনন্ত জীবন স্পন্দিত হইতেছে, তাহাই জীবাত্মা, সত্য সনাতন পরব্রহ্ম, জীবাত্মা কর্ম্মস্রোতে অবিরাম ছুটিয়া চলিয়াছে, জন্মমৃত্যু নাই, কেবল তাহার এই গতিপথে চরাচর শরীরের সহিত সম্বন্ধই জন্ম, আর ঐ সম্বন্ধের বিয়োগই মৃত্যু। শরীরের সহিত তাঁহার ঐ সম্বন্ধ হইবার ফলে শরীরের ধর্ম্ম জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি তাহাতে আরোপিত হইয়া থাকে। ফলে, অজ্ঞ লোকেরা জীবাত্মারই জন্ম-মৃত্যু কল্পনা করিয়া থাকে। এই কথাই ছান্দোগ্য শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। সূত্রকারও এইরূপ সিদ্ধান্তই তাঁহার সূত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন (১)। সূত্রকারের মতে জীবাত্মা বাস্তবিক নিত্য চৈতন্যস্বরূপ, তবে তাঁহার শরীর-সম্বন্ধ স্বীকৃত হওয়ায় যতক্ষণ শরীর ও অন্তঃকরণাদির সহিত সম্বন্ধ আছে, ততক্ষণ জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঘটাকাশ, মহাকাশের মত ঔপাধিক ভেদও স্বীকার করিতে হইবে। এই জন্যই সূত্রকার জীবাত্মাকে বলিয়াছেন, পরমাত্মার আভাস। দেহভেদে পরমাত্মার এই আভাস ভিন্ন ভিন্ন, অতএব বস্তুতঃ জীব এক হইলেও শরীরভেদে তাঁহার ভেদ স্বীকৃত হওয়ায় জীবের কর্ম্মফল ভোগের কোনরূপ ("ব্যতিকর") করিবার প্রশ্ন উঠে, গোলযোগ উপস্থিত হয় না অর্থাৎ একের কৃত কর্ম্ম অপরে ভোগ করিবার প্রশ্ন উঠে না (২)।

জীব অণু নহে, তাহা বিভু। প্রশ্ন হইতে পারে, জীবাত্মা যদি বিভু বা সর্ব্বব্যাপী হন, তবে তাঁহার ইহলোক, পরলোক গমনাগমন কিরূপে সম্ভব হয়? আর শাস্ত্রে কখনও কখনও তাঁহাকে যে অণু ও পরমাত্মার অংশ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে, তাহার অর্থ কি? এই আশঙ্কার উত্তরে সূত্রকার বলেন যে, পরমাত্মা বুদ্ধিকে যখন স্বীয় উপাধিরূপে আশ্রয় করেন, তখন বুদ্ধির ধর্ম্ম সুখদুঃখ প্রভৃতি আত্মাতে আরোপিত হয়, ফলে অসংসারী আত্মা সংসারারণ্যে প্রবেশ করিয়া সুখ-দুঃখের কণ্টকাঘাতে জর্জ্জরিত হন। স্বীয় শুদ্ধাবস্থা বিস্মৃত হইয়া, তিনি হন সংসারী, কর্ত্তা এবং ভোক্তা। এই অবস্থায় তাঁহাকে তাঁহার স্বকৃত কর্ম্মফল ভোগের জন্য ইহলোক, পরলোক যাতায়াত করিতে হয়। পরে যখন বিশুদ্ধ কর্ম্ম, শাস্ত্র, সেবা ও গুরূপদেশের ফলে তাঁহার জ্ঞান-চক্ষু ফুটিয়া উঠে, তখন জীব নিজ ব্রহ্ম-স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া চরিতার্থ হয়। তখন তাঁহাকে সংসারের আবিলতার মধ্যে প্রবেশ করিতে হয় না। এই সত্যই সূত্রকার সর্ব্বশেষ সূত্রে (অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ) জীবের অনাবৃত্তি ব্যাখ্যায় বিবৃত করিয়াছেন। বুদ্ধি অণু; সেই জন্য বুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত জীবকে কল্পিত ভাবে অণু বলা হইয়া থাকে। জীব ব্রহ্মের সোপাধিক রূপ, অতএব তাঁহাকে ব্রহ্মের এক পাদ বা অংশরূপে শাস্ত্রের যে বর্ণনা আছে, তাহাও অর্থহীন নহে (১)।

আমরা উক্ত প্রবন্ধে সগুণ ব্রহ্মবাদ ও ভেদবাদ, মায়িক এবং নির্গুণ ব্রহ্মবাদ ও নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদই ব্রহ্মসূত্রে বেদান্তসিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। এই ব্রহ্মসূত্রের ভিত্তিতে দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি নানা পরস্পর-বিরোধী বেদান্তমতের অভ্যুদয় ভারতের দার্শনিক-চিন্তার ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই এবং প্রত্যেক বেদান্ত-সম্প্রদায়ই তাঁহাদের ব্যাখ্যাকে ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন,

১। চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু স্যাৎ তদ্ব্যপদেশো ভাক্তস্তদ্ভাবভাবিত্বাৎ। ব্রঃ সূঃ ২।৩।১৬; নাত্মাশ্রুতেনিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ। ব্রঃ সূঃ ২।৩।১৭

২।৩।৫০, অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ ২।৩।৪৯ ব্রঃ সূঃ, বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিনিমিত্তং তু অস্য প্রবিভাগ প্রতিভানমাকাশস্যেব ঘটাদিসম্বন্ধনিমিত্তাদ্। ব্রঃ সূঃ শঙ্করভাষ্য ২।৩।১৭; আভাস এব চৈষ জীবঃ পরস্যাত্মনো জলসূর্য্যকাদিবৎ প্রতিপত্তব্যঃ। ব্রঃ সূঃ শঙ্করভাষ্য ২।৩।৫০

নহি কর্ত্তৃভোক্তৃশ্চাত্মনঃ সন্ততিঃ সর্ব্বৈঃ শরীরৈঃ সম্বন্ধোঽস্তি। উপাধিতন্ত্রোহি জীব ইত্যুক্তম্। উপাধ্যসন্তানাচ্চ নাস্তি জীবসন্তানঃ। ততশ্চ কর্ম্মব্যতিকরঃ ফলব্যতিকরো ন ভবিষ্যতি। ব্রঃ সূঃ শঙ্করভাষ্য ২।৩।৪৯

১। নিম্নলিখিত সূত্রগুলিতে সূত্রকার জীবাণুত্ববাদকে পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন।

উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাং। ব্রঃ সূঃ ২।৩।১৯, তদ্গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ। ব্রঃ সূঃ ২।৩।২৯, কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ ২।৩।৩৩, বিহারোপদেশাৎ ২।৩।৩৪, ব্রহ্মসূত্র ২।৩।৩০, ২।৩।৩৫, ২।৩।৩৬,

ফলে ব্রহ্মসূত্রের রহস্য ক্রমেই জিজ্ঞাসুর নিকট দুর্জ্ঞেয় হইয়া পড়িতেছে। আমরা আমাদের গৃহীত সিদ্ধান্তের অনুকূলে দুই-একটি কথা বলিয়াই এই প্রবন্ধ শেষ করিব। আমরা অদ্বৈতবাদকেই যে সূত্রকারের বেদান্তমত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তাহার কারণ এই যে, ব্রহ্মসূত্র সকল উপনিষদেরই সার সঙ্কলন, এ বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ নাই। আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে দার্শনিকতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে অদ্বৈতবাদই যে উপনিষদের দার্শনিক রহস্য, তাহা যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং দ্বৈতবাদের অনুকূলে যে সকল শ্রুতিবাক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও যে প্রকারান্তরে অদ্বৈতবাদেরই পোষকতা সম্পাদন করে, তাহা আমরা বিচার করিয়া দেখাইয়াছি। অদ্বৈতবাদ উপনিষদের প্রতিপাদ্য বলিয়া প্রমাণিত হইলে ব্রহ্মসূত্রেরও যে তাহাই লক্ষ্য হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। দ্বিতীয়তঃ ষড়্দর্শনের প্রাচীন সূত্রকারগণের মধ্যে পরস্পর মতখণ্ডনের যে প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়, তাহাতে দেখা যায় যে, সূত্রকার আচার্য্যগণ ব্রহ্মসূত্রোক্ত বেদান্তমত বলিয়া অদ্বৈতবাদকেই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা হইতেও অদ্বৈতবাদই যে ব্রহ্মসূত্রের প্রতিপাদ্য, তাহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। আচার্য্য বাদরায়ণ তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে যে সকল প্রতিপক্ষ-মত খণ্ডন করিয়াছেন, তাহাতে ন্যায়, সাংখ্য, বৈশেষিক, জৈন ও বৌদ্ধদর্শনের সহিত পঞ্চরাত্র মতবাদকেও তিনি খণ্ডন করিয়াছেন। পঞ্চরাত্র মতবাদ ভাগবত মত। ঐ ভাগবত মতবাদের ভিত্তিতেই দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন বৈষ্ণব-দর্শন-চিন্তা গড়িয়া উঠিয়াছে, এ কথা সত্য-জিজ্ঞাসু অস্বীকার করিতে পারেন না। আচার্য্য বাদরায়ণ পঞ্চরাত্র মতবাদকে প্রতিপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার সূত্রে খণ্ডন করায় প্রকারান্তরে সমস্ত বৈষ্ণবদর্শনের মতবাদই খণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ফলে দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ প্রভৃতি কোন বেদান্তমতই যে সূত্রকারের অনুমোদিত নহে, ইহাই সিদ্ধ হয়।

আমরা জগৎ ও ব্রহ্মের কার্য্য-কারণ-ভাব বিচার-প্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে, জড়, অচেতন ও অবিশুদ্ধ জগৎ, বিশুদ্ধ চৈতন্যময় পরমাত্মা হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ বা বিসদৃশ। কার্য্য জগৎ ও কারণ-ব্রহ্মের এই বৈলক্ষণ্য সূত্রকার স্পষ্টাক্ষরেই ঘোষণা করিয়াছেন (১)। শ্রুতিও উভয়ের বৈলক্ষণ্য প্রতিপাদন করিয়াছেন (২)। কার্য্য-কারণের বৈলক্ষণ্য সূত্রের অভিপ্রেত বলিয়া প্রমাণিত হইলে রামানুজোক্ত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদকে সূত্রকারের বেদান্ত মত বলিয়া কোনমতেই গ্রহণ করা যায় না। কারণ, আচার্য্য রামানুজ পরিণামবাদী, তাঁহার মতে কার্য্যকারণ বিলক্ষণ বা বিসদৃশ নহে—উহা সদৃশ বা সলক্ষণ ("সূক্ষ্মচিদচিদ্‌বিশিষ্ট ব্রহ্ম" তাঁহার মতে কারণ, আর "স্থূলচিদচিদ্‌বিশিষ্ট ব্রহ্ম" কার্য্য) এই জগৎ ব্রহ্মেরই শরীর, ব্রহ্মই জগৎরূপে পরিণত হন। কারণ-ব্রহ্ম অব্যক্ত ও সূক্ষ্ম, কার্য্য-ব্রহ্ম স্থূল ও ব্যক্ত। কারণরূপে যাহা অব্যক্ত ও অপ্রকাশিত থাকে, কার্য্যরূপে তাহা ব্যক্ত ও প্রকাশিত হয়। কার্য্য ও কারণ অবস্থার বিভেদ মাত্র। কার্য্য ও কারণের মধ্যে মৌলিক কোন ভেদ নাই। ব্রহ্মসূত্রে স্পষ্টতঃ কার্য্য ও কারণের বৈসাদৃশ্য (বৈলক্ষণ্য) উক্ত হওয়ায় রামানুজোক্ত পরিণামবাদ সূত্রকারের অনুমোদিত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। রামানুজ মত যে সূত্রানুমোদিত নহে, তাহা মনে করিবার আরও একটি কারণ এই যে, রামানুজাচার্য্য জ্ঞান-কর্ম্ম-সমুচ্চয়-বাদী। তিনি তদীয় শ্রীভাষ্যে ব্রহ্মবিজ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী পূর্ব্বাঙ্গরূপে কর্ম্মমীমাংসা-শাস্ত্রোক্ত যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে যাঁহারা কর্ম্মমীমাংসোক্ত যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন, তাঁহারাই ব্রহ্মবিজ্ঞানের অধিকারী বলিয়া গণ্য হইবেন। যাঁহাদের মীমাংসোক্ত যজ্ঞাদি কর্ম্মে অধিকার নাই, তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞানেও অধিকার নাই। রামানুজোক্ত এই অধিকারবাদ অঙ্গীকার করিলে দেবতাদিগকে ব্রহ্মবিজ্ঞানের অধিকারী বলিয়া সাব্যস্ত করা চলে না। কেন না, দেবতাদিগের পূর্ব্ব-মীমাংসোক্ত যজ্ঞাদি কর্ম্মের অধিকার নাই। বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদিতে ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশ্যেই আহুতি প্রদান করা হইয়া থাকে। ইন্দ্র আবার কোন্ ইন্দ্রকে উপাসনা করিবেন? কাহার উদ্দেশ্যে আহুতি অর্পণ করিবেন? ফলে অসম্ভব বিধায়ই দেবতাদিগের যাগ-যজ্ঞে অধিকার নাই, ইহাই বুঝা গেল। স্থূল বৈদিক যজ্ঞে কেন? মধু-বিদ্যা প্রভৃতি প্রতীক বিদ্যার উপাসনায়ও দেবতাদিগের অধিকার নাই, ইহা মীমাংসক-শিরোমণি জৈমিনির মত বলিয়া ব্রহ্মসূত্রে উক্ত হইয়াছে (মধ্বাদিষ্বসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ ব্রঃ সূঃ ১।৩।৩১) ব্রহ্মসূত্রকার বাদরায়ণও জৈমিনির ঐ মত গ্রহণ করিয়াছেন। দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদিকর্ম্মে দেবতাদিগের অধিকার না থাকিলেও ব্রহ্মবিদ্যায় যে তাঁহাদের অধিকার আছে; ইহা বাদরায়ণ তদীয় সূত্রে স্পষ্ট বাক্যেই স্বীকার করিয়াছেন—ভাবন্তু বাদরায়ণোঽস্তি হি। ব্রঃ সূঃ ১।৩।৩৩। সূত্রকারের এই সিদ্ধান্ত রামানুজ স্বীকার করিবেন কিরূপে? তাঁহার মতে যজ্ঞে অনধিকারী দেবতারা ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকারী হইতে পারেন না। অতএব সূত্রকারের সিদ্ধান্তে রামানুজের সম্মতি দেওয়া চলে না; রামানুজের জ্ঞানকর্ম্ম-সমুচ্চয়বাদ ব্রহ্ম-সূত্রকারের অঙ্গীকৃত সিদ্ধান্তের বিরোধী বলিয়াই মনে হয়।

ডাঃ আশুতোষ শাস্ত্রী (এম এ, পি আর এস, পি এইচ ডি)।

১। ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ। ব্রঃ সূঃ ২।১।৪

বিংশ তরঙ্গ

বিপন্না তরুণী

এখানে যে তরুণীর প্রসঙ্গ আলোচিত হইল, সে যখন হুবার্ট রোর্কির খাস-কামরা হইতে বাহিরের আফিসে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার মুখ অত্যন্ত মলিন; বিষণ্ণ-নয়নে এরূপ হতাশা পরিস্ফুট হইল যে, বাহিরের আফিসে উপবিষ্ট ওয়াইল্ড তাহার পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত ও বিচলিত হইল; এমন কি, মানসিক উত্তেজনা দমন করা যেন তাহার অসাধ্য হইয়া উঠিল।

ওয়াইল্ড বুঝিতে পারিল—এই তরুণী হুবার্ট রোর্কি কর্ত্তৃক কোন কারণে নিগৃহীত ও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।

তরুণী বাহিরের আফিসে আসিয়া ওয়াইল্ডের মুখের দিকে একবার কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; কিন্তু ওয়াইল্ড জানিত, সেই যুবতী পূর্ব্বে কোন দিন তাহাকে দেখে নাই। সে ওয়াইল্ডের মুখের দিকে হতাশ ভাবে চাহিয়া, মানসিক উত্তেজনা বশতঃ অধরে দন্তস্থাপন করিয়া বহির্দ্বার অভিমুখে অগ্রসর হইল।

রোপার ওয়াইল্ড কৌতূহলপূর্ণ নেত্রে তখনও যুবতীর দিকে চাহিয়া রহিল। তরুণী অসামান্যা রূপবতী না হইলেও তাহাকে সুন্দরী বলা যাইতে পারে। তাহার সুদৃশ্য পরিচ্ছদ মূল্যবান্ না হইলেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুরুচিসম্পন্ন; কিন্তু তরুণীর রূপের প্রতি ওয়াইল্ডের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। সে তাহার ক্ষুব্ধ, বিচলিত ভাবই লক্ষ্য করিতেছিল।

তরুণী যখন অর্থলোলুপ মহাজন হুবার্ট রোর্কির আফিসের অভ্যন্তরস্থ খাস-কামরা হইতে বাহির হইয়া আসে, সেই সময় ওয়াইল্ড তাহার চক্ষুতে ক্ষোভ ও দুশ্চিন্তা প্রতিফলিত দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল—তাহার একটি মাত্র কারণ থাকিতে পারে; সে যে আশায় রোর্কির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল, তাহার সেই আশা সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছিল; রোর্কির কঠোর প্রস্তাব শুনিয়া তাহার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইয়াছিল। ওয়াইল্ড পূর্ব্বে কোন দিন কোন নারীর চক্ষুতে সেরূপ হতাশ ভাব

ওয়াইল্ড জার্মিন ষ্ট্রীটের এই প্রাসাদোপম বিশাল ভবনে যে কোন বিশেষ প্রয়োজনে সেই অট্টালিকার মালিক হুবার্ট রোর্কির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল, ইহা বলা যায় না। সে দিন তাহার হাতে তেমন কোন জরুরি কাজ না থাকায়, রোর্কির মনের গতি কিরূপ ছিল, মেট্‌ল্যাণ্ডের মৃত্যুর পর ইহা বুঝিবার উদ্দেশ্যেই সে তাহার সহিত আলাপ করিতে আসিয়াছিল। মেট্‌ল্যাণ্ডের মৃত্যুর পর সে সার রডনের এই দ্বিতীয় শত্রুকে আক্রমণ করিয়া তাহার বিষদাঁত চূর্ণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। এই জন্য তাহার মনে হইয়াছিল—এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে রোর্কির ভাবভঙ্গী সাবধানে লক্ষ্য করা উচিত। সুতরাং রোর্কির সহিত গোপনে আলাপ করিবার জন্য তাহার আগ্রহ হইয়াছিল। কিন্তু রোর্কির কোন সাধারণ শত্রু ইহা হয় ত সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বলিয়াই মনে করিত।

বলা বাহুল্য, ওয়াইল্ড রোর্কির সহিত সাক্ষাতের জন্য পূর্ব্বেই তাহার অনুমতি গ্রহণ করিয়াছিল। রোর্কি মনে করিত, তাহার সময় অত্যন্ত মূল্যবান্, এই জন্য বিনা-প্রয়োজনে সে কাহারও সহিত দেখা করিত না, এবং কেহ তাহার সঙ্গে দেখা করিতে চাহিলে, কি প্রয়োজন—তাহা জানাইয়া তাহার সম্মতি গ্রহণ করিতে হইত। ওয়াইল্ড তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নিজের নামের পরিবর্ত্তে কর্ণেল হ্যাম্পসন এই ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়াছিল। সে রোর্কির নিকট এই নামেরই কার্ড পাঠাইয়াছিল।

ছদ্মনাম ধারণ করিলেও ওয়াইল্ড ছদ্মবেশ-ধারণে তেমন নৈপুণ্য প্রকাশ করে নাই। সে তাহার দুই কাণের পাশের চুলগুলির বর্ণ শুভ্র করিয়াছিল; কিন্তু মুখাকৃতির বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন করে নাই। তাহার মুখভঙ্গি এবং চলিবার 'মিলিটারী' কায়দা দেখিলে সহজেই মনে হইত, সে উচ্চপদস্থ সৈনিক পুরুষ।

ওয়াইল্ড স্বীকার করিত—সে প্রসিদ্ধ তস্কর; এবং এই বৃত্তিতে অধিক লোক তাহার সমকক্ষ ছিল না—ইহাও সে জানিত। কিন্তু হুবার্ট রোর্কির স্বভাবের সহিত নিজের স্বভাব-চরিত্রের তুলনা করিয়া সে আপনাকে 'সাধু পুরুষ'

আইনের বিধান ভঙ্গ করিয়া পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত, আর রোর্কি পুলিশের চক্ষুতে ধূলা দিয়া অবৈধ কার্য্য সম্পন্ন করিত; এ জন্য ভদ্রসমাজে সে সাধু বলিয়াই পরিগণিত হইত। তথাপি সার রড্‌নের অভিযোগে তাহাকে তাহার সহকর্ম্মী বন্ধুদ্বয়—মেট্‌ল্যাণ্ড ও কার্ণের সহিত তিন বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল, এ সংবাদ পাঠকগণ পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন। সার রড্‌নে ড্রুমণ্ডের শত্রুত্রয়ের অন্যতম মেট্‌ল্যাণ্ডের রহস্য-জনক মৃত্যুর পর ওয়াইল্ডের ধারণা হইয়াছিল, সে আত্ম-হত্যা করে নাই, তাহাকে কৌশলে হত্যা করা হইয়াছিল; এবং হত্যাকাণ্ডের প্রমাণ না থাকিলেও ওয়াইল্ডের প্রতীতি হইয়াছিল, তাহার মৃত্যুর জন্য তাহার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধুদ্বয়ই দায়ী। এই হত্যাকাণ্ডে ওয়াইল্ডের হাত ছিল না—ইহা সকলেই বিশ্বাস করিয়াছিলেন।

ওয়াইল্ড সঙ্কল্প করিয়াছিল, কার্ণের সর্ব্বনাশের ফন্দী সে পরে স্থির করিবে। মেট্‌ল্যাণ্ড সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইবার পর অর্থলোলুপ কুসীদজীবী রোর্কিকে চূর্ণ করাই প্রয়োজন বলিয়া তাহার ধারণা হইয়াছিল; কারণ, সমাজের বহু নরনারী রোর্কি দ্বারা নিত্য উৎপীড়িত হইতেছিল; তাহার অত্যাচারের সীমা ছিল না। ইহার প্রতিবিধানের জন্য ওয়াইল্ড ব্যাকুল হইয়াছিল। সে সার রড্‌নের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া তাঁহার সহিত তাহার চুক্তি কার্য্যে পরিণত করিবারই সঙ্কল্প করিয়াছিল। সে যে কার্য্য আরম্ভ করিত, তাহা শেষ না করিয়া নিরস্ত হইত না। ওয়াইল্ড জানিত, যে কার্য্যের জন্য সার রড্‌নে ড্রুমণ্ড তাহাকে ত্রিশ হাজার পাউণ্ড পারিশ্রমিক প্রদানে সম্মত হইয়াছিলেন, কার্য্য শেষ হইলে তাহাকে তিনি সেই প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদানে অসম্মতি প্রকাশ করিবেন না। তিনি চুক্তি বাতিল করিয়াছেন, ব্লেকের নিকট এ কথা শুনিয়া সে তাহাতে কর্ণপাত করে নাই। সে জানিত, উভয় পক্ষের সম্মতি ব্যতীত কোন চুক্তি বাতিল হইতে পারে না; কিন্তু ওয়াইল্ড আর সে দিকে ঘেঁসিল না!

রোর্কিকে কি ভাবে চূর্ণ করিবে—এ সম্বন্ধে তখন পর্য্যন্ত ওয়াইল্ড কোন উপায় স্থির করে নাই। ওয়াইল্ড জানিত, রোর্কির স্বভাবচরিত্র হাঙ্গরের ন্যায় ভীষণ; তাহাকে স্থলচর হাঙ্গর বলিলে অত্যুক্তি হইত না। কিন্তু সাইমন কার্ণ তিন জনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুর্জ্জন, অধিক সমাজদ্রোহী ও পরপীড়ক; তাহাকে মুঠায় পুরিতে যোগাড়-যন্ত্রের প্রয়োজন। এই জন্য ওয়াইল্ড স্থির করিয়াছিল, সকলের শেষে তাহাকে আক্রমণ করিয়া চূর্ণ করিবে; এবার রোর্কিই তাহার লক্ষ্য।

এই জন্য ওয়াইল্ড নিশ্চিন্ত চিত্তে রোর্কির বাহিরের আফিসে বসিয়া রহিল। সে স্থির করিয়াছিল—কিছু টাকা ধার করিবার ফন্দীতে ছদ্মনামে রোর্কির সঙ্গে দেখা করিয়া তাহার ভাবভঙ্গি পরীক্ষা করিবে।

যে সময় রোর্কির সহিত তাহার সাক্ষাতের কথা ছিল, তাহার পর পাঁচ মিনিট অতীত হইল। তখনও অনেক লোক রোর্কির খাস-কামরায় বসিয়া নানা কথার আলোচনা করিতেছিল; ওয়াইল্ড বাহিরের আফিসে বসিয়া সেই সকল কথা শুনিতেছিল। আরও কয়েকটি স্ত্রীলোক দেনা-পাওনা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য তাহার খাস-কামরায় প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু রোর্কি তাহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেছিল, ওয়াইল্ড বাহিরে বসিয়া তাহা বুঝিতে পারিল না।

তাহার কিছু কাল পরেই পূর্ব্বোক্তা তরুণী রোর্কির খাস-কামরা হইতে ম্লান মুখে বাহিরে আসিয়াছিল।

তরুণী অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বিরস বদনে রোর্কির আফিস ত্যাগ করিয়া পথে নামিলে ওয়াইল্ড মুহূর্ত্তমধ্যে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া তৎক্ষণাৎ তরুণীর অনুসরণ করিল।

তরুণীর ভাবভঙ্গি দেখিয়া ওয়াইল্ড ব্যথিত হইয়াছিল; তাহার মনে হইয়াছিল, মেয়েটির কোন রকম সাহায্যের প্রয়োজন হইতে পারে; কিন্তু ওয়াইল্ড ভাবিল, তরুণীর ব্যক্তিগত অভিযোগ সম্বন্ধে কোন কথা জানিবার চেষ্টা করিবে না; কারণ, তাহা ভদ্রলোকের কার্য্য নহে। ওয়াইল্ড তস্কর হইলেও আপনাকে ভদ্রলোক বলিয়াই মনে করিত। সাধারণ ভদ্রলোকের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যেও সে বঞ্চিত হয় নাই। এই অদ্ভুতচরিত্র তস্করের হৃদয়ে পরোপকার-বৃত্তির অভাব ছিল না; বিশেষতঃ, বিপন্না নারীকে সাহায্য করিবার জন্য তাহার প্রবল আগ্রহ হইত। এই কার্য্যে সে যথেষ্ট আনন্দলাভ করিত।

ওয়াইল্ড যেরূপ অসাধারণ শক্তি এবং দুর্লভ গুণের অধিকারী ছিল, কোন থিয়েটার বা সার্কাসের দলে প্রবেশ করিয়া যদি সে তাহাদের সদ্ব্যবহার করিত, তাহা হইলে প্রচুর অর্থ ও সুযশ অর্জ্জন করিতে পারিত, তাহার জীবনের দিনগুলি পরম শান্তিতেই অতিবাহিত হইত; কিন্তু ওয়াইল্ড এই ভাবে জীবন যাপন বিড়ম্বনার বিষয় বলিয়া মনে করিত; এরূপ নিরীহের ন্যায় দিনপাত করা সময়ের অপব্যবহার বলিয়াই তাহার ধারণা হইয়াছিল।

এই সময় দুইটি বিভিন্ন ভাব ওয়াইল্ডের হৃদয়ে প্রভাব-বিস্তার করিয়াছিল; রোর্কির অত্যাচারে যাহারা দুঃখ-যন্ত্রণায় কাতর হইয়াছিল, তাহাদের প্রতি সহানুভূতি, এবং রোর্কির অপকর্ম্মের জন্য তাহার প্রতি আন্তরিক ঘৃণা।

ওয়াইল্ড তাহার দুঃখময় ও সঙ্কট-সঙ্কুল কর্ম্মজীবনে নর-নারীর দুঃখ-কষ্ট সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল।

সে বহু নর-নারীর চক্ষুতে দারুণ হতাশা ও ভগ্ন-হৃদয়ের বিষাদ-বেদনা প্রতিফলিত দেখিয়াছিল; কিন্তু যে তরুণী অল্পকাল পূর্ব্বে রোর্কির আফিস ত্যাগ করিল, তাহার চক্ষুতে সে যে বিষাদ ও অন্তর্ব্বেদনা প্রতিফলিত দেখিল—এরূপ আর কখনও তাহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। যদি কোন প্রকারে তাহাকে সাহায্য করিতে পারে—এই আশায় ওয়াইল্ড তাহার অনুসরণ করিল। এ সময় সে হুবার্ট রোর্কির কথা ভুলিয়া গেল। সে যে উদ্দেশ্যে রোর্কির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল, সে কথা আর তাহার স্মরণ হইল না!

ওয়াইল্ড তরুণীর অনুসরণ করিল বটে, কিন্তু সে কি ভাবে তাহাকে সাহায্য করিবে, এই উদ্দেশ্যে তাহাকে কত দূর যাইতে হইবে, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করাও সে সঙ্গত মনে করিল না, এবং তাহার অনুসরণ করাও যে শিষ্টাচার-সঙ্গত নহে, ইহা সে বুঝিতে পারিল। কিন্তু সে তরুণীর চক্ষুতে যে হতাশ ভাব লক্ষ্য করিয়াছিল, ইহার কারণ জানিবার জন্য তাহার আগ্রহ এরূপ প্রবল হইয়াছিল যে, সে তাহার অনুসরণে নিবৃত্ত হইতে পারিল না।

তরুণী জার্ম্মিন ষ্ট্রীট হইতে বাহির হইয়া প্রথমে পিকা-ডেলীতে প্রবেশ করিল; তাহার পর ঘুরিতে ঘুরিতে লোয়ার রিজেণ্ট ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইল। ওয়াইল্ডের মনে হইল, তরুণী যেন বাহ্যজ্ঞানরহিত হইয়া স্বপ্নঘোরে পথে পথে বিচরণ করিতেছে! এই জন্য তাহার গমনে বাধা দিয়া তখন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে ওয়াইল্ডের সাহস হইল না। ওয়াইল্ডের ধারণা হইল—বন্ধুভাবে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেও যুবতী অসন্তুষ্ট হইবে, হয় ত তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া অবজ্ঞাভরে চলিয়া যাইবে।

অতঃপর তরুণী ঘুরিতে ঘুরিতে যখন টেম্‌স নদীর বাঁধের দিকে চলিল, তখন ওয়াইল্ডের মনে একটি নূতন সন্দেহের উদয় হইল। তরুণী নরদামবারল্যাণ্ড-এভেনিউ দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলে ওয়াইল্ড পূর্ব্বাপেক্ষা দূরে থাকিয়া তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, যুবতী কোন সঙ্কল্প স্থির করিয়াই ও-পথে অগ্রসর হইয়াছে।

যুবতী বাঁধের উপর দাঁড়াইয়া উদাস দৃষ্টিতে রবিকরোজ্জ্বল নদীবক্ষে চাহিয়া রহিল। সেই সময় লণ্ডনের পথ-গুলি জনসমাগমে পূর্ণ। আকাশ পরিষ্কার, মৃদুমন্দ সমীরণ প্রবাহিত হইতেছিল; সেই বায়ুহিল্লোলে নদীবক্ষে উর্ম্মিমালা আন্দোলিত হইতেছিল; তাহার উপর উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হওয়ায় জলরাশি সুশুভ্র রজত-প্লাবনের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। ওয়াইল্ডের মনে হইল, সেই সময় হুবার্ট রোর্কিকে সেখানে দেখিতে পাইলে সে তাহাকে সহজে ছাড়িত না।

সেই সময় নদীতীরের মুক্ত সমীরণ-প্রবাহে যেন বিশ্বব্যাপী আনন্দরাশি হিল্লোলিত হইতেছিল; কিন্তু তাহা যুবতীর মনে আনন্দ-সঞ্চার করিতে পারিল না। ওয়াইল্ডের মনে হইল—নদীর শীতল জলে হৃদয়-জ্বালা, মনের দুঃখ-কষ্ট বিসর্জ্জন করিবার জন্যই সে নদীর দিকে ঐরূপ হতাশ ভাবে চাহিয়া ছিল। যুবতী যদি ঐরূপ সঙ্কল্প করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা হইতে উহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে না পারিলে অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় হইবে বলিয়াই ওয়াইল্ডের ধারণা হইল। একটা নিষ্ঠুর উত্তমর্ণের অত্যাচারে বিপন্ন হইয়া যুবতী এরূপ অন্যায় কার্য্য করিবে? তাহাকে রক্ষা করিবার কি কোন উপায় নাই? ওয়াইল্ড দূরে দাঁড়াইয়া এইরূপ নানা কথা চিন্তা করিতে লাগিল!

যুবতী নদীর দিকে চাহিয়া পাঁচ মিনিট সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। সেই স্থান হইতে প্রায় কুড়ি গজ দূরে একখানি বেঞ্চি ছিল; ওয়াইল্ড সরিয়া গিয়া সেই বেঞ্চির উপর বসিয়া পড়িল। ওয়াইল্ডের মনে হইল, যুবতী যদি নদীতে ডুবিয়া মরিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ সেই বেঞ্চি হইতে উঠিয়া, দ্রুতবেগে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে। তাহার মনে হইল, শীঘ্রই তাহাকে হয় ত এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। যুবতীর মনের ভাব যেন সে সুস্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারিয়াছিল।

যুবতী বাঁধের উপর সংস্থাপিত একখানি বেঞ্চিতে আরও পনের মিনিট বসিয়া রহিল। সেই সময়ে তাহাকে কতকটা নিশ্চিন্ত দেখিয়া ওয়াইল্ডের আশা হইল, তাহার মনের ভাব সম্ভবতঃ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু ওয়াইল্ডের ইহা ভ্রম মাত্র; কারণ, কিছু কাল পরেই যুবতীর মাথা বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল, এবং তাহার চক্ষু নিরাশায় অন্ধকার হইয়া আসিল,—আর যেন তাহার আত্মসংবরণের শক্তি রহিল না।

যুবতীর ভাবভঙ্গি দেখিয়া ওয়াইল্ড রোর্কিকে দণ্ডদানের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাহার ইচ্ছা হইল, ঘোড়া চাবকাইবার একটি চাবুক ক্রয় করিয়া সে জার্ম্মিন ষ্ট্রীটে ফিরিয়া যায়, এবং সেই চাবুকের আঘাতে রোর্কির পিঠ ক্ষত-বিক্ষত করে; তাহার পর তাহার ঘাড় মোচড়াইয়া ভাঙ্গিয়া দিলে তাহার মন স্থির হইবে। এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাহার হাত নিস্‌পিস্ করিতে লাগিল।

কিন্তু তাহার এই চিন্তাস্রোতে সহসা বাধা পড়িল। কারণ, যুবতী সেই সময় উঠিয়া-দাঁড়াইয়া চঞ্চল দৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিতে লাগিল, যেন অতঃপর সে কোন্ দিকে যাইবে বা কি করিবে, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। কয়েক মিনিট চিন্তার পর সে যখন চলিতে আরম্ভ

করিল—তখন তাহার পদদ্বয় থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

ওয়াইল্ড দেখিল—যুবতী নদীতীর হইতে ফিরিয়া চলিল। তখন ওয়াইল্ডের আশা হইল—যুবতী আর যাহাই করুক—জলে ডুবিয়া-মরিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছে। অতঃপর যুবতী ট্রাম-লাইন পার হইয়া ওয়েষ্টমিনিষ্টার অভিমুখে চলিতে লাগিল। যুবতী তখন এরূপ অন্যমনস্ক ভাবে চলিতেছিল যে, চলিতে চলিতে সে গাড়ী-চাপা পড়িতে পারে বা অন্য কোনরূপে বিপন্ন হইতে পারে—এ বিষয়ে তাহার বিন্দুমাত্র লক্ষ্য ছিল না।

যুবতী এই ভাবে চলিতে চলিতে একখানি চলন্ত ট্রামগাড়ীর সম্মুখে আসিয়া পড়িল। তাহাকে গাড়ীর সম্মুখে দেখিয়া ট্রামগাড়ীর চালক যথাসাধ্য চেষ্টায় গাড়ীর গতিরোধ করিল। তাহার এই চেষ্টা বিফল হইলে সেই মুহূর্ত্তেই যুবতীকে গাড়ী-চাপা পড়িতে হইত; তথাপি সে দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না।

কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই পথিকগণের অনেকে "গেল গেল" শব্দে চিৎকার করিয়া উঠিল, এবং একখানি দ্রুতগামী ফায়ার-ব্রিগেডের ইঞ্জিন হইতে ঝন্-ঝন্ শব্দ উত্থিত হইল। ওয়াইল্ড সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পাইল, ওয়াটারলুর দিক্ হইতে সবেগে একখানি ফায়ার-এঞ্জিন আসিতেছিল, যুবতী তাহার নীচে চাপা পড়িতে উদ্যত হইয়াছে; তাহার আর রক্ষা পাইবার উপায় নাই! যুবতী কি করিবে, তাহা চিন্তা না করিয়া চলিতে লাগিল। তাহার বিপদ বুঝিতে পারিয়া বহু লোক দূরে দাঁড়াইয়া চিৎকার করিতে লাগিল। তাহাদের মনে হইল—যুবতী স্বপ্নঘোরে অগ্রসর হইয়াছে; সে যে কিরূপ বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে—তাহা যেন তাহার বুঝিবার শক্তি নাই!

কিন্তু পথিকদের বহু কণ্ঠের আর্ত্তনাদ শুনিয়া যুবতী হঠাৎ সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়াই মুহূর্ত্তমধ্যে নিজের বিপদ বুঝিতে পারিল। কিন্তু সে এতই হতবুদ্ধি হইয়াছিল যে, কি করিবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া সেই বিপজ্জনক স্থানে স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। অবশেষে ভয় পাইয়া সেই স্থানেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল!

ফায়ার-এঞ্জিনের চালক যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও গাড়ী বাঁধিতে পারিল না। গাড়ী মুহূর্ত্তমধ্যে যুবতীর দেহের উপর আসিয়া পড়িবে বুঝিয়া ওয়াইল্ড যে অসমসাহসের কার্য্য করিল - তাহা কেবল তাহার পক্ষেই সম্ভব! সে ফায়ার-এঞ্জিনের সম্মুখে লাফাইয়া পড়িল, এবং এঞ্জিন দ্বারা পিষ্ট হইবার মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বেই যুবতীকে দুই হাতে তুলিয়া কাঁধে ফেলিয়া বিদ্যুদ্বেগে এক পাশে সরিয়া গেল।

ওয়াইল্ড চক্ষুর নিমেষে এই কার্য্য সম্পন্ন করিল। এরূপ তৎপরতার সহিত নিজের ও যুবতীর প্রাণরক্ষা করা অন্যের অসাধ্য হইত। এই ভাবে যুবতীকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিয়া ওয়াইল্ডকে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে দেখিয়া স্ত্রীলোকেরা আনন্দধ্বনি করিল; পুরুষগণ মুক্তকণ্ঠে ওয়াইল্ডের ক্ষিপ্রতা, সাহস ও বীরত্বের প্রশংসা করিতে লাগিল। সকলেরই মুখে এই প্রশ্ন—যে যুবক এইরূপ অসমসাহসের কার্য্য করিল—সে কে? তাহার পরিচয় কি? বস্তুতঃ, ওয়াইল্ড যদি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া আর এক সেকেণ্ডও ইতস্ততঃ করিত, তাহা হইলে যুবতীর প্রাণ-রক্ষা হইত না, এবং ওয়াইল্ডও আত্মরক্ষা করিতে পারিত না। এক মুহূর্ত্তের জন্য উভয়ে সেই সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইল।

ওয়াইল্ড যুবতীকে বহন করিয়া নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইতে না হইতেই ফায়ার-এঞ্জিন্ ঝন্-ঝন্ শব্দ করিতে করিতে সেই স্থান অতিক্রম করিল।

একবিংশ তরঙ্গ

যুবতীর পরিচয়

তরুণী সংজ্ঞালাভ করিয়া ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিল। তখন তাহার চক্ষুতে আতঙ্ক ও বিস্ময় পরিস্ফুট।

ওয়াইল্ড তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "আপনাকে ধরিয়া টানাটানি করিতে হইল বলিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত; কিন্তু সম্পূর্ণ নিরুপায় হইয়াই এই ভাবে আমাকে অনধিকার চর্চ্চা করিতে হইয়াছে। আপনি যে ভাবে সেই ফায়ার-এঞ্জিনের—"

ওয়াইল্ডের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই একটি বৃদ্ধ ব্যগ্র ভাবে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "অদ্ভুত, মহাশয়, অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার! এরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা আমি জীবনে আর কখনও প্রত্যক্ষ করি নাই। আপনার সাহস ও শক্তির পরিচয় পাইয়া আমি আপনার অভিনন্দনের জন্য—"

ওয়াইল্ড বৃদ্ধের কথায় বাধা দিয়া বলিল, "মহাশয়, আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, আমার প্রতি আপনার সহানুভূতি অতুলনীয়। কিন্তু আপনি আমার কার্য্যের প্রশংসায় অনর্থক সময় নষ্ট না করিয়া যদি তাড়াতাড়ি একখানা ট্যাক্সি ডাকিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আমি অত্যন্ত উপকৃত হইব। আমার অনুষ্ঠিত কার্য্যের আলোচনায় আপনি আর বৃথা সময়ক্ষেপ করিবেন না। আমি ইঁহার অদূরে থাকায় একটু উপকার করিতে সমর্থ হইয়াছি, এবং আমার বিশ্বাস, প্রত্যেক পথিকই সুযোগ পাইলে ঐ কার্য্য করিত। ইহার অধিক আমার কিছুই বলিবার নাই।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "আপনার কথা সত্য বটে, কিন্তু—"

ওয়াইল্ড বৃদ্ধের কথায় কর্ণপাত না করিয়া একখানি ট্যাক্সিকে সেই পথ দিয়া যাইতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, "ওহে ট্যাক্সিওয়ালা, থামো থামো ; শীঘ্র এখানে এসো বাপু!"

ট্যাক্সি তৎক্ষণাৎ ওয়াইল্ডের পাশে আসিয়া থামিল ; তাহা দেখিয়া ওয়াইল্ড স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। সে চারি দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইল—ব্যাপার কি, জানিবার জন্য পথিকের দল ব্যগ্র ভাবে তাহার নিকট আসিয়া জুটিতেছে। ওয়াইল্ড বুঝিতে পারিল, যদি সে তরুণীকে ট্যাক্সিতে তুলিয়া-লইয়া অবিলম্বে সেই স্থান ত্যাগ না করে—তাহা হইলে ভীড় ঠেলিয়া তাহার বাহির হইতে বিলম্ব হইবে, এবং তাহার পর পুলিশ আসিয়া পড়িলে তাহাকে বাধ্য হইয়া থানায় যাইতে হইবে।

ওয়াইল্ড তরুণীকে কাঁধে তুলিয়া তাড়াতাড়ি ট্যাক্সির ভিতর নিক্ষেপ করিল, তাহার পর স্বয়ং তাহার ভিতর প্রবেশ করিল।

ট্যাক্সিচালক পাশে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া ওয়াইল্ডকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইতে হইবে মহাশয়!'

ওয়াইল্ড জানালা দিয়া মাথা-বাড়াইয়া বলিল, "যেখানে খুশী চল। এখন ত এই ভীড়ের বাহিরে যাও, তাহার পর তোমাকে ঠিকানা বলিয়া দিব।"

ট্যাক্সিওয়ালা আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া সম্মুখের পথে ধাবিত হইল। যে সকল পথিক মজা দেখিবার আশায় সেখানে সমবেত হইয়াছিল, তাহারা নিরাশ হইয়া তাহাদের গন্তব্য পথে প্রস্থান করিল।

ট্যাক্সি ওয়েষ্টমিনিষ্টার-সন্নিকটে উপস্থিত হইলে ওয়াইল্ড ব্যাকুল দৃষ্টিতে তরুণীর মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিল, সে ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হইতেছে।

এবার তরুণী বিহ্বল দৃষ্টিতে ওয়াইল্ডের মুখের দিকে চাহিয়া বিচলিত স্বরে বলিল, "ব্যাপার কি মহাশয়! কি হইয়াছিল? আ—আমার ত কোন কথাই স্মরণ হইতেছে না।"

ওয়াইল্ড মৃদু স্বরে বলিল, "তাহাতে কোন ক্ষতি হয় নাই। তোমাকে একটু অবসন্ন দেখিয়া পথ হইতে এই ট্যাক্সিতে তুলিয়া আনিয়াছি। তোমাকে কোথায় লইয়া যাইতে হইবে—এ কথা তখন জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ হয় নাই।"

ওয়াইল্ডের কথা শুনিয়া তরুণীর গণ্ডদ্বয় লোহিতাভ হইল, এবং চক্ষুর দৃষ্টির স্বাভাবিক ভাব ফিরিয়া আসিল। সে প্রশংসমান নেত্রে দুই-এক বার তাহার হিতৈষীর মুখের দিকে চাহিল। তাহার পর মৃদু স্বরে বলিল, "আ—আমার ত মূর্চ্ছা হয় নাই ; তবে আমি একটু দুর্ব্বলতা বোধ করিয়াছিলাম বটে। কিন্তু তাহার কারণ আমি বলিতে পারি নাই। পথ দিয়া সেই ফায়ার-এঞ্জিনটা সবেগে আসিতে দেখিয়া আমার এতই ভয় হইয়াছিল যে, এক পা সরিয়া যাওয়া আমার অসাধ্য হইয়াছিল। আপনি আমার জীবন-রক্ষা করিয়াছেন।"

ওয়াইল্ড কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "তুমি ও-সব কি বাজে কথা বলিতেছ? ও-সব কথা থাক।"

তরুণী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আমি বাজে কথা বলিলাম? সেই সঙ্কটের কথা মনে হওয়ায় এখনও আমার হৃৎকম্প হইতেছে! এঞ্জিনখানার নীচে আমি প্রায় চাপা পড়িয়াছিলাম ; কিন্তু আপনি অদ্ভুত কৌশলে চক্ষুর নিমেষে আমাকে মৃত্যুকবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। আপনি যাহা করিয়াছিলেন, সে জন্য যথাযোগ্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, সে শক্তি আমার নাই। কি বলিয়া আপনাকে ধন্যবাদ জানাইব—তাহাও আমার অজ্ঞাত।"

ওয়াইল্ড তরুণীর কথায় লজ্জিত হইয়া বলিল, "সে খুব ভাল কথা ; যদি তোমার জানা না থাকে, তাহা হইলে তাহা বলিবার চেষ্টা করিও না। আমি তোমাকে বলিয়া রাখিতেছি—তোমার জন্য যাহা করিয়াছি, সে কিছুই নয় ; সে সব কথা আর তুমি মুখে আনিও না। আমি ব্যস্ততাবশতঃ তোমাকে ধরিয়া টানাটানি করায় যদি দেহে আঘাত পাইয়া থাক, তাহা হইলে সেই ত্রুটির জন্য আমিই মার্জ্জনা প্রার্থনা করিতেছি। তুমি কোথায় যাইবে, সেই ঠিকানা আমাকে জানাইলে আমি ট্যাক্সি-চালককে সেখানে তোমাকে লইয়া যাইতে বলিব।"

তরুণী মুহূর্ত্তকাল ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আমি? আমি ক্যাটারহ্যামে বাস করি। কিন্তু ট্যাক্সিতে আমরা তত দূর ত যাইতে পারিব না ; তবে এখন আমরা ষ্ট্রেথামে যাইতে পারি। আ—আমার বিহ্বলতা এখনও সম্পূর্ণ দূর হয় নাই ; আমার এই দুর্ব্বলতা দয়া করিয়া মার্জ্জনা করুন। আমার এখন ষ্ট্রেথামের ৫ নং গস্‌ফীল্ড এভেনিউতে যাইলেই চলিবে। আমার দাদা সেই স্থানে বাস করেন।"

ওয়াইল্ড ট্যাক্সি-চালককে সেই ঠিকানা বলিয়া দিল ; তাহার পর তরুণীকে বলিল, "তুমি আমার একটা উপদেশ শুনিবে? আমরা যতক্ষণ পর্য্যন্ত ষ্ট্রেথামে পৌঁছিতে না পারি—ততক্ষণ তুমি একটু ঘুমাইবার চেষ্টা কর। আর যদি তুমি বেশ সুস্থ হইয়া থাক, তাহা হইলে আমি তোমাকে এই পথে নামাইয়া দিয়া ট্যাক্সিওয়ালার ভাড়া মিটাইয়া দিতে পারি। ইহাতে আমি আপনাকে সম্মানিত মনে করিব।"

তরুণী ব্যগ্র ভাবে বলিল, "না না, তাহা করিবেন না ; আমি এখনও সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইতে পারি নাই। আপনি আমাকে বাড়ী পর্য্যন্ত লইয়া চলুন।"

ওয়াইল্ড এই প্রস্তাবে আনন্দিত হইল।

ওয়াইল্ড ও তরুণীকে লইয়া ট্যাক্সি চলিতে লাগিল।

যুবতী চক্ষু বুজিয়া গাড়ীর ভিতর বসিয়া রহিল। ওয়াইল্ড তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মনের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করিল। ওয়াইল্ড এবার বুঝিতে পারিল, তরুণী অসাধারণ সুন্দরী, এবং তাহার বয়স উনিশ বা কুড়ি বৎসরের অধিক নহে। ওয়াইল্ড তাহাকে রক্ষা না করিলে সে দ্রুতগামী ফায়ার-এঞ্জিনের তলায় পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিত—এ বিষয়ে ওয়াইল্ডের সন্দেহ রহিল না। এ জন্য সে রোর্কিকেই দায়ী করিল; কারণ, তাহার দুর্ব্যবহারেই তরুণী মর্ম্মাহত হইয়া কোন দিকে না চাহিয়া পথে চলিতেছিল। দৈবক্রমেই তাহার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। তাহার আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা ছিল না, এ বিষয়ে ওয়াইল্ড নিঃসন্দেহ হইল।

গাড়ী ষ্টেথামে উপস্থিত হইলে তরুণী চক্ষু উন্মীলন করিল। সে ওয়াইল্ডের মুখের দিকে চাহিয়া কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "আমার সম্বন্ধে আপনি কি ভাবিয়াছেন, তাহা জানি না। আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন—সে জন্য আপনার নিকট আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশই যথেষ্ট নহে; আমি—"

ওয়াইল্ড তাহার কথায় বাধা দিয়া হাসিয়া বলিল, "তবে আর ও-কথা বলিবার কি প্রয়োজন? আমি তোমার সম্পূর্ণ অপরিচিত, সুতরাং আমার নাম জানিবার জন্য তোমার আগ্রহ হইতে পারে। আমার নাম ক-কর্ণেল হ্যাম্পসন। আমাকে তোমার হিতৈষী বলিয়াই জানিয়া রাখ।"

তরুণী লজ্জারক্তিম মুখে বলিল, "আপনার বড়ই দয়া! আমার নামও বলি শুনুন। আমার নাম ডোরিস হ্যামিল্‌টন। আমার দাদা মিঃ জর্জ্জ হ্যামিল্‌টন এক জন কৌন্সিলী। তাঁহার নাম সম্ভবতঃ আপনার অজ্ঞাত নহে।"

কিন্তু জর্জ্জ হ্যামিল্‌টনের নাম ওয়াইল্ডের সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাহা হইলেও সে ভাবিল, যুবতীর দাদা যখন কৌন্সিলী, তখন নিশ্চিতই ধনাঢ্য ব্যক্তি; তথাপি এই যুবতীকে কি কারণে সেই সুদখোর মহাজনটার সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল?

ওয়াইল্ড অন্য লোকের ঘরের কথা লইয়া আলোচনা করিতে ভালবাসিত না; কিন্তু তাহার মনে হইল, এই যুবতী সম্বন্ধে কোন কোন কথা জানিতে পারিলে তাহার কাজের সুবিধা হইতে পারে। সে এবার হুবার্ট রোর্কিকে চূর্ণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। সে যদি মিস্ ডোরিস হ্যামিল্‌টনের প্রতি রোর্কির দুর্ব্যবহারের বিবরণ জানিতে পারে—তাহা হইলে এই যুবতীর পক্ষাবলম্বন করিয়া তাহাকে জব্দ করিবার সুযোগ পাইবে। সেই সুযোগ ত্যাগ করিতে তাহার ইচ্ছা হইল না। সে বুঝিল—ইহাতে মিস্ হ্যামিল্‌টনের উপকার হইবে, সঙ্গে সঙ্গে সার রড়নের শত্রুনিপাতও হইবে।

মিঃ জর্জ্জ হ্যামিল্‌টনের গৃহের সম্মুখে আসিয়া ট্যাক্সি থামিলে ওয়াইল্ড দেখিতে পাইল, উহা বৃহৎ অট্টালিকা, একটি সুপ্রশস্ত আঙ্গিনায় তাহা নির্ম্মিত। ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়ী বটে। মিস্ হ্যামিল্‌টন বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী হইতে নামিয়া ট্যাক্সি-ভাড়া প্রদান করিবার পূর্ব্বেই ওয়াইল্ড তাড়াতাড়ি ট্যাক্সিওয়ালাকে তাহার প্রাপ্য ভাড়া প্রদান করিল। অতঃপর ওয়াইল্ড কি করিবে, তাহাই ভাবিতেছে দেখিয়া মিস্ হ্যামিল্‌টন তাহাকে তাহার সঙ্গে ভিতরে যাইবার জন্য অনুরোধ করিল।

একটি পরিচারিকা সেই অট্টালিকার দ্বার খুলিয়া বিস্মিত ভাবে ওয়াইল্ডের মুখের দিকে চাহিল। ওয়াইল্ড কোন কথা না বলিয়া একটি সুসজ্জিত বৃহৎ উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিল। মিসেস্ হ্যামিল্‌টন তখন বাহিরে গিয়াছিলেন। এ সংবাদে ওয়াইল্ড অসন্তুষ্ট হইল না। কিন্তু মিস্ হ্যামিল্‌টন যেন একটু বিব্রত হইয়া ওয়াইল্ডকে বলিল, "আমি আশা করিয়াছিলাম—বাড়ী আসিয়া ইথেলকে দেখিতে পাইব; কিন্তু শুনিতেছি, সে বাহিরে গিয়াছে! তা কর্ণেল হ্যাম্পসন, আপনি যদি দয়া করিয়া এখানে একটু অপেক্ষা করেন—"

মিস্ হ্যামিল্‌টন কি ভাবে কথাটা শেষ করিবে, তাহা বুঝিতে না পারায় ইতস্ততঃ করিতে লাগিল; তাহা দেখিয়া ওয়াইল্ড বলিল, "সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই মিস্ হ্যামিল্‌টন! সত্য কথা বলিতে কি, এখানে কয়েক মিনিট নিরিবিলিতে তোমার সঙ্গে কথা কহিতে পাইব ভাবিয়া আমার আনন্দ হইয়াছে।"

মিস্ হ্যামিল্‌টন প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে ওয়াইল্ডের মুখের দিকে চাহিয়া কি ভাবিল; তাহার পর মৃদু স্বরে বলিল, "আপনি আমাকে কি কথা বলিবেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

ওয়াইল্ড বলিল, "আমি জানিতে চাই, তুমি বিপন্ন ভাবে কি জন্য নদীর বাঁধের উপর গিয়াছিলে। আমার মনে হয়, তাহা জানিতে পারিলে আমি হয় ত তোমার কোন উপকার করিতে পারিব। যদি তাহা পারি—"

মিস্ হ্যামিল্‌টন তাহার কথায় বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "না, না। দেখুন কর্ণেল হ্যাম্পসন, আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, সে জন্য আমি আপনার নিকট চির-কৃতজ্ঞ। আপনার এই ঋণ আমি জীবনে পরিশোধ করিতে পারিব না; ইহার উপর আপনি যদি আমার আর কোন—"

ওয়াইল্ড তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বলিল, "আমার কথাটাই আগে তুমি শোন। তুমি হুবার্ট রোর্কির সঙ্গে কথা শেষ করিয়া যখন তাহার খাস-কামরার বাহিরে আসিয়াছিলে—সেই সময় আমি রোর্কির বাহিরের আফিসে বসিয়া ছিলাম; তাহার পর কি ঘটিয়াছিল, তাহা তোমার শুনা উচিত বলিয়াই আমার মনে হইতেছে।"

মিস্ হ্যামিল্‌টন নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সভয়ে তাহার মুখের দিকে চাহিল; তাহার পর কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "তাই না কি? যদি তাহাই হয়, তবে আপনি—আপনি—"

ওয়াইল্ড তাড়াতাড়ি বলিল, "হাঁ, সেই কথাই ত বলিতেছি। তুমি রোর্কির আফিস হইতে বাহির হইয়া পথে আসিলে আমি নদীর বাঁধের উপর তোমার অনুসরণ করিয়াছিলাম। তুমি রোর্কির আফিসের বাহিরে আসিবার সময় তোমার মুখের দিকে চাহিয়া তোমাকে এতই ম্রিয়মান ও হতাশ দেখিয়াছিলাম যে, তোমার বিপদের আশঙ্কা করিয়া তোমার অনুসরণ করাই কর্ত্তব্য মনে করিয়াছিলাম; পরে বুঝিতে পারি—আমি ভালই করিয়াছিলাম, এ জন্য আমি আনন্দিত!"

ওয়াইল্ডের কথা শুনিয়া মিস্ হ্যামিল্‌টন দুই-এক মিনিট কি চিন্তা করিল; তাহার পর বলিল, "কিরূপে নদীর বাঁধের উপর আসিয়াছিলাম, তাহা আমি স্মরণ করিতে পারিতেছি না! আমি বোধ হয় অন্যমনস্ক ভাবে সেখানে গিয়া পড়িয়াছিলাম। আপনি আমার অনুসরণ করিয়া আমার উপকারই করিয়াছিলেন।"

ওয়াইল্ড গম্ভীর ভাবে বলিল, "আমার একটা কথা শোন মিস্ হ্যামিল্‌টন! মনের কথা আমি সরল ভাবে প্রকাশ করিতেই ভালবাসি। রোর্কি তোমার প্রতি কিরূপ দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছিল, তাহা আমাকে খুলিয়া বলিবে? তাহার স্বভাব-চরিত্র, তাহার ব্যবহার এরূপ ঘৃণিত যে, ভাষায় তাহা বর্ণনা করা যায় না। কিন্তু সেই নরপশুকে চূর্ণ করিবার ভার আমার হস্তেই প্রদত্ত হইয়াছে।"

ওয়াইল্ডের কথা শুনিয়া মিস্ হ্যামিল্‌টনের উভয় চক্ষু হঠাৎ যেন জ্বলিয়া উঠিল! কিন্তু সে মুহূর্ত্তমধ্যে চক্ষু অবনত করিয়া বলিল, "হাঁ, সত্যই সে নরপশু।"

ওয়াইল্ড অচঞ্চল স্বরে বলিল, "তাহা হইলে তুমিও তাহাকে আমার মতই ঠিক চিনিয়া ফেলিয়াছ! কিন্তু তাহার দুর্ব্ব্যবহার সম্বন্ধে কোন কথা কি তুমি আমার নিকট প্রকাশ করিতে পারিবে না? আমার ধারণা, তোমাকেই হউক, বা তোমার পরিবারস্থ আর কাহাকেও হউক, কোন কারণে এই নরপিশাচের মুঠার ভিতর আসিয়া পড়িতে হইয়াছে; এবং সে কোনরূপ সুযোগ পাইয়া তোমাদের শোষণ করিতেছে। এই জন্যই আমার ইচ্ছা—তোমরা কি ভাবে তাহার কবলে পড়িয়াছ, তাহা সরল ভাবে আমার নিকট প্রকাশ কর। কেবল অনুমানে নির্ভর করিয়া অন্ধ ভাবে আমি আমার সঙ্কল্পিত কার্য্য আরম্ভ করি—এরূপ আমার ইচ্ছা নয়।"

মিস ডোরিস হ্যামিল্‌টন মুখ তুলিয়া ওয়াইল্ডের মুখের দিকে চাহিল, মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; যেন এ কথা শুনিয়া সে অত্যন্ত খুশী হইল।

ওয়াইল্ড মিস্ ডোরিস হ্যামিল্‌টনকে বলিল, "আমার ধারণা হইয়াছে, রোর্কি তোমাদের উপর ছোঁ-মারিবার সুযোগ খুঁজিতেছে।"

মিস্ হ্যামিল্‌টন ব্যথিত স্বরে বলিল, "সে কথা সত্য। এই জন্যই আমি এরূপ হতাশ, এই প্রকার বিব্রত হইয়াছি। ভয়ে, দুশ্চিন্তায় আমি ছট্‌-ফট্‌ করিতেছি। আমার মনে বিন্দুমাত্র সুখ নাই। জীবন আমার দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে। আমি একটু অনুগ্রহ-প্রার্থনায় রোর্কির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম।"—কথা বলিতে বলিতে তরুণীর চক্ষু ছল-ছল করিতে লাগিল। সে অতি কষ্টে অন্তর্ব্বেদনা দমন করিতে সমর্থ হইল।

ওয়াইল্ড উত্তেজিত স্বরে বলিল, "কি বলিলে? অনুগ্রহ-প্রার্থনা করিতে গিয়াছিলে—রোর্কির কাছে? পাষাণে জলের আশা! হা পরমেশ্বর! গণ্ডারের চামড়া ভেদ করা সহজ, কিন্তু রোর্কির চর্ম্ম দুর্ভেদ্য। এই হৃদয়হীন পিশাচের কাছে অনুগ্রহ-প্রার্থনা!"

মিস্ হ্যামিল্‌টন বলিল, "আপনার কথা এখন সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে। এই নর-পিশাচের মুখের দিকে চাহিলে ভয় হয়। কি ভীষণ, কর্কশ কণ্ঠস্বর! হৃদয়হীন বর্ব্বর পশু! কর্ণেল হ্যাম্পসন, সে কি ভাবে আমার অপমান করিয়াছে, আমার নারীত্বকে উপহাস করিয়াছে; সেই লজ্জার কথা আপনার নিকট প্রকাশ করিতে পারিব না। আমার পিতার অর্থাভাবের উল্লেখ করিয়া সেই নরাধম তীব্র স্বরে আমাকে বিদ্রূপ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই! সে আমাকে এ কথাও বলিয়া ভয় দেখাইল যে, সে আমাদের টাউয়ার্স অবিলম্বে নিলাম করিয়া লইবে,—আমাদিগকে পথে বসাইবে।"

ওয়াইল্ড বিস্মিত ভাবে বলিল, "টাউয়ার্স? কোন্ টাউয়ার্সের কথা বলিতেছ?"

মিস্ হ্যামিল্‌টন বলিল, "আমার পৈতৃক বাসভবন হ্যামিল্‌টন-টাউয়ার্স। রোর্কির ইচ্ছা, সে আমার পিতাকে আমাদের বহু-পুরুষের বাস্তুভিটা হইতে বিতাড়িত করিয়া তাঁহাকে নিরাশ্রয় করিবে। আমাদের সকলকেই আজন্মের সুখময় গৃহ ত্যাগ করিয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে! আমার মনে হয়, তাহাকে তাহার এই সঙ্কল্প হইতে বিচলিত করিবার উপায় নাই। আমি তাহাকে এই সঙ্কল্প ত্যাগ করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছি; আমাদের প্রতি দয়া-প্রকাশের জন্য কাতর ভাবে প্রার্থনা করিয়াছি; কিন্তু আমার সকল চেষ্টাই বিফল হইয়াছে। আমি অপমানিত হইয়া বিতাড়িত হইয়াছি।"

ওয়াইল্ড বলিল, "তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করি; হয় ত আমার চেষ্টা সফল হইবে।" [ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বৈষ্ণবমত-বিবেক

শ্রীজীবের গ্রন্থাবলী

১

শ্রীজীবগোস্বামীর ন্যায় পণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান ভক্ত জগতে দুর্লভ। তিনি বাল্যকাল হইতে একই উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া যে ভাবে সমস্ত জীবন যাপন করিয়াছেন—মানব-সমাজের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত অতিশয় অল্পই লক্ষিত হইয়া থাকে। সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী সাধনার ফলে শ্রীজীব যে গ্রন্থাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার শিষ্য শ্রীল কৃষ্ণদাস অধিকারী তাহার একটি তালিকা দিয়াছেন। ভক্তি-রত্নাকরের প্রথম তরঙ্গে (বহরম-সংস্করণের ৬০ পৃষ্ঠায়) এই বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। যথা—

শ্রীমদ্বল্লভপুত্র শ্রীজীবস্য কৃতিবৃন্দতে।
শব্দানুশাসনং নাম্না হরিনামামৃতং তথা॥
তৎসূত্রমালিকা তত্র প্রযুক্তো ধাতুসংগ্রহঃ।
কৃষ্ণার্চ্চাদীপিকা সূক্ষ্মা গোপালবিরুদাবলী॥
রসামৃতশ্চ শেষশ্চ শ্রীমাধবমহোৎসবঃ।
সঙ্কল্প-কল্পবৃক্ষো যশ্চম্পূভাবার্থসূচকঃ॥
টীকা গোপালতাপন্যাঃ সংহিতায়াশ্চ ব্রহ্মণঃ।
রসামৃতস্যোজ্জ্বলস্য যোগসারস্তবস্য চ॥
তথাচাগ্নি পুরাণস্থ গায়ত্রী বিবৃতিরপি।
শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্নানাং পাদ্মোক্তানামথাপি চ॥
লক্ষ্মীবিশেষরূপা যা শ্রীমদ্বৃন্দাবনেশ্বরী।
তস্যাঃকরপদাস্থানাং চিহ্নানাঞ্চ সমাহৃতিঃ॥
পূর্ব্বোত্তরতয়া চম্পূদ্বয়ী যা চ ত্রয়ী ত্রয়ী
সন্দর্ভাঃ সপ্তবিখ্যাতাঃ শ্রীমদ্ভাগবতস্য বৈ॥
তত্ত্বাখ্যো ভগবৎসংজ্ঞঃ পরমাত্মাখ্য এব চ।
কৃষ্ণভক্তিপ্রীতিসংজ্ঞাঃ ক্রমাখ্যঃ সপ্তমঃ স্মৃতঃ॥
সম্বন্ধশ্চ বিধেয়শ্চ প্রয়োজনমিতি ত্রয়ং।
হস্তামলকবদ্যেষু সদ্ভিরাদ্যৈঃ প্রকাশিতম্॥ ইত্যাদয়ঃ।

ভক্তিরত্নাকর-কার ইহার অনুবাদ করিয়াছেন—

শ্রীজীবের গ্রন্থ পঞ্চবিংশতি বিদিত।
হরিনামামৃত-ব্যাকরণ দিব্যরীত॥
সূত্রমালিকা ধাতুসংগ্রহ সুপ্রকার।
কৃষ্ণার্চ্চাদীপিকা গ্রন্থ অতি চমৎকার॥
গোপালবিরুদাবলী রসামৃতশেষ।
শ্রীমাধবমহোৎসব সর্ব্বাংশে বিশেষ॥
শ্রীসঙ্কল্প কল্পবৃক্ষ গ্রন্থ এ প্রচার।
ভাবার্থসূচক চম্পূ অতি চমৎকার॥
গোপালতাপনী টীকা ব্রহ্মসংহিতার।
রসামৃতটীকা শ্রীউজ্জ্বলটীকা আর॥
যোগসারস্তবের টীকাতে সুসঙ্গতি।
অগ্নিপুরাণস্থ শ্রীগায়ত্রী ভাষ্য তথি॥
পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন।
শ্রীরাধিকাকরপদস্থিত চিহ্ন ভিন্ন॥
গোপালচম্পূ পূর্ব্ব উত্তর বিভাগেতে।
বর্ণিলেন কি অদ্ভুত বিদিত জগতে॥
সপ্ত সন্দর্ভ বিখ্যাত ভাগবতরীতি।
তত্ত্ব ভগবৎ পরমাত্ম-কৃষ্ণভক্তি-প্রীতি॥
এই ছয় ক্রমসন্দর্ভ সপ্ত হয়।
প্রয়োজনাভিধেয় সম্বন্ধ ইথে ত্রয়॥

এখন এই তালিকা বিচার করিলে শ্রীজীবের পঞ্চবিংশতিগানি গ্রন্থ দেখা যায়। যথা—১। শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ ২। সূত্রমালিকা ৩। ধাতু-সংগ্রহ।

(মন্তব্য—কিন্তু শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ হইতে সূত্রমালিকা বা ধাতুসংগ্রহ স্বতন্ত্ররূপে পাওয়া যায় না। ইহাতে অনুমান হয়, 'সূত্রমালিকা' ও 'ধাতুসংগ্রহ' পরবর্ত্তীকালে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন—'ধাতুসংগ্রহ' স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে বিদ্যমান ছিল—কিন্তু এখনও স্বতন্ত্রভাবে ঐ গ্রন্থখানি পাওয়া যায় নাই।)

৪. শ্রীকৃষ্ণার্চ্চন দীপিকা ৫। গোপালবিরুদাবলী ৬। রসামৃতশেষ ৭। শ্রীসঙ্কল্পকল্পবৃক্ষ ৮। ভাবার্থসূচক চম্পূ ৯। গোপালতাপনী উপনিষদের টীকা, ১০। শ্রীব্রহ্ম-সংহিতার টীকা ১১। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকা (এই টীকা "দুর্গম-সঙ্গমনী" নামে বিখ্যাত) ১২। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণির টীকা (এই টীকা "লোচন-রোচনী" নামে প্রসিদ্ধ) ১৩। শ্রীমাধব-মহোৎসব কাব্য ১৪। শ্রীযোগসারস্তবের টীকা ১৫। অগ্নি-পুরাণাবলম্বনে শ্রীগায়ত্রীভাষ্য। ১৬। পদ্মপুরাণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নের বিবরণ-সংগ্রহ। ১৭। শ্রীরাধিকার কর-চিহ্নের ও পদচিহ্নের বিবরণ-সংগ্রহ ১৮। শ্রীগোপালচম্পূ (পূর্ব্ব ও উত্তর এই দুই খণ্ডে বিভক্ত) ১৯। শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভ ২০। শ্রীভগবৎসন্দর্ভ ২১। শ্রীপরমাত্ম-সন্দর্ভ ২২। শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ ২৩। শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ ২৪। শ্রীপ্রীতি-সন্দর্ভ ২৫। শ্রীক্রম-সন্দর্ভ নামে বিখ্যাত শ্রীভাগবতের টীকা।

এই গ্রন্থ-তালিকার মধ্যে "সর্ব্বসম্বাদিনী" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। বোধ হয় ইহা শ্রীতত্ত্ব ভগবৎ-পরমাত্ম ও শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ নামক চারিখানি সন্দর্ভগ্রন্থের প্রপূর্ত্তি-টীকাস্বরূপ বলিয়া ইহার স্বতন্ত্র ভাবে উল্লেখ করা হয় নাই। প্রেমবিলাসের ত্রয়োবিংশ বিলাসে "সর্ব্বসম্বাদিনীর" নাম উল্লিখিত হইয়াছে এবং ঐ গ্রন্থ যে শ্রীজীবগোস্বামীর রচিত, তাহাও বলা হইয়াছে। শ্রীজীব নিজেও শ্রীল সনাতন গোস্বামিকৃত দশমস্কন্ধের টীকা বৈষ্ণবতোষণী সংক্ষেপ করিয়া যে লঘুতোষণী রচনা করেন, তাহাতেও দশমস্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ের টীকায় তিনি নিজকৃত শ্রীভগবৎ-সন্দর্ভের টীকার উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ সময়ে শ্রীভগবৎ-সন্দর্ভের অন্য কোনও টীকা রচিত হয় নাই। এই জন্য অনুমান হয়, তিনি

—"শ্রীভাগবতসন্দর্ভ তট্টিকাদৌ" বলিয়া এখানে সর্ব্বসম্বাদিনীরই ইঙ্গিত করিয়াছেন। সুতরাং সর্ব্বসম্বাদিনী যে শ্রীজীবকৃত সন্দর্ভের টীকা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। সর্ব্বসম্বাদিনীকে স্বতন্ত্র গ্রন্থ ধরিলে শ্রীজীবের কৃত ২৬খানি গ্রন্থের সংবাদ পাওয়া গেল। অতঃপর আমরা শ্রীজীবের গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিবার চেষ্টা করিতেছি।

১। শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণ *

এই গ্রন্থখানির রচনা কোন্ সময়ে আরম্ভ হয় বা কোন্ সময়ে শেষ হয়, তাহা নির্দ্দিষ্টভাবে জানা যায় না, তবে শ্রীজীবের জীবনী ও কার্য্যাবলীর আলোচনা করিলে মনে হয় যে, এই গ্রন্থ ও গোপালচম্পূ গ্রন্থ বহু দিন আলোচনার ফলে অল্পে অল্পে রচিত হইয়াছিল এবং শ্রীজীবের শেষ বয়সে গ্রন্থ দুইখানি বিশেষরূপে সংশোধিত হইয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য শ্রীবৃন্দাবন হইতে গৌড়দেশে প্রেরিত হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীজীবের গ্রন্থাবলীর মধ্যে মাত্র গোপালচম্পূ ও শ্রীভাগবতসন্দর্ভ নামে খ্যাত ষট্‌সন্দর্ভের উল্লেখ আছে। কিন্তু শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থ রচনার সমকালেই শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণ লিখিত হইতেছিল বলিয়া বিশ্বাস হয়। কারণ, শ্রীজীবের এই দুই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য বিবেচনা করিলে মনে হয়, ভক্তজনগণ সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ ও সাহিত্য শিখিবার সময়ে যাহাতে শ্রীভগবন্-নামের ও লীলার আলোচনায় নিযুক্ত থাকিতে পারেন, তজ্জন্যই সর্ব্বপ্রকার সাহিত্যিক রচনার নিদর্শনরূপ শ্রীগোপালচম্পূ ও ব্যাকরণশাস্ত্রের সমস্ত নিয়মাবলী শ্রীহরিনামের দ্বারা বিভূষিত করিয়া শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণ রচনা করেন। শ্রীজীব শ্রীনিবাস আচার্য্যের সহিত যে গ্রন্থাবলী গৌড়দেশে প্রেরণ করেন ও যাহা বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বির কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছিল—শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণ তাহার মধ্যে ছিল না। কারণ, পরবর্ত্তীকালে শ্রীজীব শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট শ্রীবৃন্দাবন হইতে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীহরিনামামৃতের সংশোধন তখনও যে শেষ হয় নাই, ইহা স্পষ্টতঃ লিখিত আছে। যথা—

"অপরঞ্চ। শ্রীরসামৃতসিন্ধু শ্রীমাধবমহোৎসবোত্তরচম্পূ হরিনামামৃতানাং শোধনানি কিঞ্চিদবশিষ্টানি বর্ত্তন্তে ইতি বর্ষাশ্চেতি সম্প্রতি ন প্রস্থাপিতানি পশ্চাত্তু দৈবানুকূল্যেন প্রস্থাপ্যানি।" অনুবাদ—"শ্রীরসামৃতসিন্ধু, শ্রীমাধবমহোৎসবোত্তরচম্পূ ও হরিনামামৃত ব্যাকরণাদির সংশোধন কিয়ৎপরিমাণে বাকি আছে, এখন বর্ষাকাল, এই জন্য তাহা প্রেরণ করা হইল না—পরে দৈবানুকূল্যে প্রেরণ করা যাইবে।" এই পত্রে দেখা যায়, শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামিপাদের শ্রীবৃন্দাবন-প্রাপ্তি হইয়াছে, কিন্তু শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী তখনও বর্ত্তমান আছেন। ইহার পরবর্ত্তী পত্রে দেখা যায় যে, ঐ সময়ে শোধিত হইয়া শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণ গৌড়ে প্রেরিত হইয়াছে, এবং ঐ পত্রে দেখা যায় যে, শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর ঐ সময়ে তিরোভাব ঘটিয়াছে। সুতরাং শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামিপাদের তিরোভাবের পরে ও শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদের তিরোভাবের পূর্ব্বেই শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ শ্রীবৃন্দাবন হইতে গৌড়দেশে প্রেরিত হয়। শ্রীরাধারমণের গোস্বামিগণের গৃহে রক্ষিত "সেবাপ্রাকট্য ও ইষ্টলাভ" পুঁথির নির্দ্দেশ অনুসারে জানা যায় যে, ১৬৪২ সম্বতে অর্থাৎ ১৫০৭ শকের শ্রাবণী শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর তিরোভাব ঘটে। অতএব ১৫০৭ শকের বৈশাখ মাসে শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণ গৌড়দেশে প্রেরিত হইয়াছিল—এ অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। কিন্তু এই গ্রন্থের রচনা যে বহু পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা একরূপ নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

শ্রীহরেকৃষ্ণ আচার্য্য শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার, ইনি টীকার প্রারম্ভেই বলিতেছেন—

"শ্রীনামগ্রহণ পূর্ব্বক বিশিষ্ট ব্যুৎপত্তি বাঞ্ছয়া শ্রীকৃষ্ণদেব-প্রসাদমধিগম্য শ্রীমচ্ছ্রীল সনাতন গোস্বামিনাং সূত্রানুসারেণ শ্রীজীব গোস্বামীনামা গ্রন্থকারঃ পরমমঙ্গলরূপমনোহরমধুর হরিনামাবলিভিঃ সঙ্কেতীকুর্ব্বন্ শ্রীহরিনামামৃতাখ্য বৈষ্ণবব্যাকরণমারভমানঃ স্বপ্রয়োজনোদ্ঘাটন পূর্ব্বক বস্তুনির্দ্দেশাশীর্ব্বাদরূপমঙ্গলমাচরতি।" অর্থাৎ—"শ্রীনামগ্রহণ পুরঃসর বিশিষ্টরূপে সংস্কৃতভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভের অভিলাষে শ্রীকৃষ্ণদেবের অনুগ্রহ লাভ পূর্ব্বক শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের সূত্রানুসারে পরমমঙ্গলরূপ মনোহর ও মধুর হরিনামাবলী দ্বারা সঙ্কেত নির্দ্দেশ করিয়া শ্রীজীব গোস্বামী নামক গ্রন্থকার শ্রীহরিনামামৃত নামক ব্যাকরণারম্ভে নিজপ্রয়োজন প্রকাশপূর্ব্বক বস্তুনির্দ্দেশ ও আশীর্ব্বাদরূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন।"

টীকাকারের এই কথা হইতে বুঝিতে পারা গেল যে, শ্রীল সনাতন গোস্বামীই এইরূপ একখানি ব্যাকরণ প্রণয়নের জন্য সূত্র রচনা করেন, কিন্তু তিনি এ কার্য্য—হয় শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই, অথবা উপযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র সুপণ্ডিত শ্রীজীবের উপর এই কার্য্যের ভার প্রদান করিয়া যান। শ্রীজীব জ্যেষ্ঠতাতের সেই সূত্রগুলিকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার আন্তরিক অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য এই গ্রন্থ-প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন।

গ্রন্থের প্রারম্ভে চারিটি শ্লোকে ও গ্রন্থের শেষে সাতটি শ্লোকে গ্রন্থকার এই গ্রন্থরচনার কারণ ও উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়াছেন। গ্রন্থারম্ভের চারিটি শ্লোকে গ্রন্থ-রচনার হেতু নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন—

"কৃষ্ণমুপাসিতুমস্য স্রজমিব নামাবলিং তনবৈ।
ত্বরিতং বিতরেদেষা তং সাহিত্যাদি কামোদং॥ ১
আহত জল্পিত জটিতং দৃষ্ট্বা শব্দানুশাসন স্তোমং।
হরিনামাবলি বলিতং ব্যাকরণং বৈষ্ণবার্থাচিম্মঃ॥ ২
ব্যাকরণমকরন্দবৃত্তিজীবনলুব্ধা সদাষ্মৎবিদ্বাঃ।
হরিনামামৃতমেতৎ পিবন্তু শতধাবগাহন্তাং॥ ৩
সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥ ৪ ইতি শ্রীভাগবতে।

অর্থাৎ—

শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার জন্য তাঁহারই গলে বিরাজিত মালার ন্যায় তাঁহার নামাবলির বিস্তার সাধন করিতেছি। এই নামাবলি শীঘ্রই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে সাহিত্যাদি অনুশীলনের আমোদ বিতরণ করুন। ১

অন্যান্য ব্যাকরণশাস্ত্রকে নিরর্থক জল্পনাযুক্ত ও জটিল দেখিয়া বৈষ্ণবদিগের জন্য এই হরিনামাবলি-সম্বলিত ব্যাকরণ রচনা করিতেছি। ২

* "সটীক শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণ" বহরমপুর হইতে রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ব্যাকরণরূপ মরুভূমিতে সতত অধ্যয়নারূপ দুঃখে উদ্বিগ্ন হইয়া তৃষ্ণায় যখন প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন পানীয়লুব্ধ বৈষ্ণবগণ এই হরিনামরূপ অমৃত পান করুন, এবং ইহাতে নানাপ্রকারে অবগাহন করুন। ৩

কারণ, শ্রীভাগবতে বিবৃত হইয়াছে, যে সঙ্কেতেই হউক, পরিহাসেই হউক বা গীতালাপ পূরণার্থেই হউক অথবা অবহেলাতেই হউক, শ্রীকৃষ্ণের যে নামোচ্চারণ তাহা অশেষ পাপহরণ করে—মুনিগণ ইহা বলিয়াছেন। ৪

এইরূপ ব্যাকরণ রচনা করিতে গেলেই শ্রীভগবন্নামের দ্বারা সংজ্ঞা-গঠন অনিবার্য্য এবং এই বিষয়েই হরিনামামৃতের বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব।

অন্য ব্যাকরণে যাহাকে স্বরবর্ণ বা অচ্ সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে—এই ব্যাকরণে তাহার সংজ্ঞা "সর্ব্বেশ্বর"। গ্রন্থকার বলিয়াছেন—"এ স্থানে আমরা মাত্রালাঘবহেতু 'স্বর' বা অচ্ এই নাম না করিয়া বরং তাহাকে অনাদর করিয়া হরিনামরূপ সংজ্ঞা প্রদান করিবারই চেষ্টা করিব।

এইরূপে সমান স্বর দশটিকে "দশাবতার" সংজ্ঞায়, হ্রস্বস্বর পাঁচটিকে "বামন" সংজ্ঞায় এবং দীর্ঘস্বর পাঁচটিকে "ত্রিবিক্রম" সংজ্ঞায় আখ্যাত করা হইয়াছে। ত্রিমাত্রাযুক্ত স্বরকে "মহাপুরুষ", অ-আ-বর্জ্জিত অন্য দ্বাদশটি স্বরকে "ঈশ্বর" সংজ্ঞায় এবং অ-আ-বর্জ্জিত প্রথম আটটি স্বরকে "ঈশ" সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে। অ-আ-ই-ঈ-উ-ঊ—এই কয়টি স্বরকে "অনন্ত", ই-ঈ-উ-ঊ-কে "চতুঃসন", উ-ঊ-ঋ-ঌ এই চারিটিকে "চতুর্ভুজ", এ-ঐ-ও-ঔ—এই চারিটিকে "চতুর্ব্যূহ", অনুস্বারকে "বিষ্ণুচক্র", চন্দ্রবিন্দুকে "বিষ্ণুচাপ", বিসর্গকে "বিষ্ণুসর্গ" এবং ব্যঞ্জনকে 'বিষ্ণুজন" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। বর্গের বিষ্ণুবর্গ, বর্গের প্রথম বর্ণগুলির হরিকমল, দ্বিতীয় বর্ণ পাঁচটির হরিখড়্গ, তৃতীয় বর্ণগুলির হরিগদা, চতুর্থগুলির হরিঘোষ এবং পঞ্চম পাঁচটির হরিবেণু সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে। অনন্তর বর্ণস্বরূপে "রাম" যথা অরাম, আরাম, ইরাম ইত্যাদি, আদেশে বিরিঞ্চি, আগমে বিষ্ণু ও লোপে হরসংজ্ঞার বিধান করা হইয়াছে। পুংলিঙ্গের নাম পুরুষোত্তম লিঙ্গ, ঈকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গের নাম লক্ষ্মীলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গের নাম ব্রহ্মলিঙ্গ; দ্বন্দ্বসমাসের সঙ্কেত 'রামকৃষ্ণৌ'; কর্ম্মধারয়ের সঙ্কেত 'শ্যামরাম'; দ্বিগুর সঙ্কেত 'ত্রিরামী'; তৎপুরুষের সঙ্কেত 'কৃষ্ণপুরুষ' এবং বহুব্রীহির সঙ্কেত 'পীতাম্বর' নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ধাতুর বর্ত্তমানের প্রত্যয় অচ্যুত, বিধিলিঙের প্রত্যয় বিধি, লোটের প্রত্যয় বিধাতৃ, লঙের ভূতেশ্বর, লুঙের ভূতেশ, লিটের অধোক্ষজ, আশীর্লিঙের কামপাল, লৃঙের বালকল্কি, লৃটের অজিত ও লুটের প্রত্যয় কল্কি নামে বিহিত হইয়াছে।

ভক্তগণের পক্ষে শ্রীভগবন্নামমালাবিভূষিত এই ব্যাকরণের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা যে পরম সুখকর ব্যাপার, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই! সর্ব্বশাস্ত্রের সার্থকতা যে শ্রীভগবানে—তাহা বুঝিবার ও শিখিবার পক্ষে এই ব্যাকরণখানি অতুলনীয়। শব্দানুশাসন-রূপেও এই ব্যাকরণখানিকে ব্যাকরণশাস্ত্রের সর্ব্বশেষ সংগ্রহ-গ্রন্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাতে সর্ব্ব-ব্যাকরণের সারভাগ গ্রহণ পূর্ব্বক অতি সহজ প্রণালীতে ব্যাকরণ সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ই প্রকাশ করা হইয়াছে। তবে শ্রীজীব এই ব্যাকরণে বৈদিক শব্দানুশাসন সম্বন্ধে কিছুই লিপিবদ্ধ করেন নাই। তিনি বলিয়া-ছেন—কালবশে তাহার প্রচার নাই, এই জন্যই এই ব্যাকরণে আমি তাহা লিখিলাম না। যদি কাহারও তদ্বিষয়ে জানিবার ইচ্ছা হয়, তবে এই বিষয়ে অন্য কোনও শাস্ত্রসংগ্রহ গ্রন্থে তাহা দেখিয়া লইবেন।*

ফলতঃ এক বৈদিক-প্রকরণ ব্যতীত হরিনামামৃত-ব্যাকরণে যে লৌকিক ব্যাকরণের জ্ঞাতব্য তাবৎ ব্যাপারই অত্যন্ত সুকৌশলে সহজ ভাবে সুবিন্যস্ত হইয়াছে, তাহা অভিজ্ঞ বৈয়াকরণিক পণ্ডিত-গণের অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন। শ্রীজীবের অলৌকিক প্রতিভা এই ব্যাকরণখানিতেও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। কোনও বিষয়ে যে স্থানে এক ব্যাকরণের সহিত অন্য ব্যাকরণের মতবিরোধ আছে, সে স্থানে শ্রীজীব ঐ মতভেদের বিচার করিয়া সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছেন এবং যাহাতে ভাষার আলো-চনার অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য যথাসম্ভব ব্যাপক ভাবে সূত্র রচনা করিয়াছেন। এই সকল কারণে ব্যাকরণখানি সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তির অভিলাষীদিগের পক্ষে অতিশয় উপযোগী হইয়াছে।

ভাষার গতি যে শ্রীভগবানের দিকে, ব্যাকরণের সর্ব্বাংশের অর্থবোধের ইঙ্গিতের দ্বারা তাহা তিনি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। ধাতু-প্রকরণে বা আখ্যাত প্রকরণে 'ক্রিয়া' শব্দের একটি ব্যাপক অর্থ করা হইয়াছে। সমস্ত ক্রিয়াই যে শ্রীহরিরূপ পুরাণপুরুষ হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়া নিখিল অর্ব্বাচীন বস্তুমাত্রেই ধাবিত হয়—ইহা বিচার করিলে সৃষ্টজগতের সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, এই হিসাবে ভক্তচূড়ামণি সম্যগ্‌দৃষ্টিশালী শ্রীজীব সমস্ত ক্রিয়াকেই শ্রীহরির লীলারূপে দর্শন করিয়া যথামতি তাহার নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছেন।† প্রত্যুত এমন ভাবে শ্রীগোবিন্দ-চরণে নিষ্ণাত হইয়া অখিল ব্যাপারে শ্রীগোবিন্দের অভিব্যক্তির অনুভব না হইলে শ্রীহরিণামামৃত-ব্যাকরণের সার্থকতা কোথায়?

কারকপ্রকরণেও শ্রীজীবের এই অধ্যাত্ম-দৃষ্টি-ভঙ্গি অতি মনোরম ও ভক্তজনমাত্রেরই বিশেষ ভাবে উপভোগ্য। কারক-প্রবৃত্তি দেখাইবার জন্য শ্রীজীব বলিয়াছেন—

"যঃ কর্ত্তা কর্ম্মকরণং সম্প্রদানমশেষতঃ।
অপাদানাধিকরণে তৎসম্বন্ধো ভবেদিহ।"

অনুবাদ—যিনি অশেষ লীলা দ্বারা—কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণরূপে বর্ত্তমান—সেই শ্রীকৃষ্ণেরই সম্বন্ধ এই জগতে ষট্‌কারকরূপে অম্বিত হইয়াছে। শ্রীল হরিনামামৃত-ব্যাকরণের সুযোগ্য টীকাকার শ্রীল হরেকৃষ্ণ আচার্য্য এই শ্লোকের টীকার ব্যাখ্যামাধুর্য্যে মূল শ্লোকের ভাব-কমল আরও সুন্দররূপে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যিনি অপরিচ্ছিন্ন লীলাযোগে (অপরিচ্ছিন্ন লীলাভাবাৎ) অর্থাৎ দেশকাল-পাত্রের দ্বারা ছিন্ন না করিয়া যুগপৎ সকল লীলা প্রকাশ করিয়া অচিন্ত্যশক্তির দ্বারা যে শ্রীকৃষ্ণ মহাবিষ্ণুরূপে কর্ত্তা, বিরাট্‌রূপে কর্ম্ম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই তিন গুণাবতাররূপে করণ, যজ্ঞ-পুরুষরূপে (অর্থাৎ যজ্ঞপুরুষরূপে সম্যক্‌রূপে সমস্ত প্রদান করিয়া) সম্প্রদান, গর্ভোদশায়ীরূপে (যাহা হইতে নিখিল সৃষ্টি প্রসূত হইতেছে) অপাদান এবং শেষরূপে (যাঁহাতে নিখিল বিশ্ব বিধৃত

* ছান্দসাপ্রচরদ্রূপকারণশব্দান্ বিনা ময়া।
অত্রালেখি তদিচ্ছা চেদ্‌দৃশ্যোক্তঃ শাস্ত্রসংগ্রহঃ।

† প্রবর্ত্তন্তে ক্রিয়া সর্ব্বা যতোঽর্ব্বাচীন বস্তুষু।
হরেস্তস্যৈব লীলাস্তা নিরূপ্যন্তে যথামতি।

রহিয়াছে) অধিকরণস্বরূপে বিদ্যমান আছেন—সেই শ্রীকৃষ্ণেরই সম্বন্ধ ছয় কারকরূপে এই সংসারে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

সমাস-প্রকরণের প্রারম্ভেও শ্রীজীব গোস্বামী এইরূপ অধ্যাত্ম-দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা সমাসের উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়াছেন। যথা—

কৃষ্ণস্য বিগ্রহে ভাতি সমাসেনাখিলং পদং।
ইতীব স্মারকং বক্ষ্যে সমাসপদবিগ্রহম্ ॥

অর্থাৎ—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহে সংক্ষেপে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের অখিল পদ (বস্তু) শোভা পাইতেছে। অতএব স্মারকরূপে (সকলকে উদ্বোধিত করিবার জন্য) সেই সমাসপদবিগ্রহ অর্থাৎ তত্ত্বতঃ সর্ব্ববস্তুর আধারভূত বিগ্রহের কথা বলা যাইতেছে।

এইরূপে শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণের সর্ব্বত্রই শ্রীভগবদ্ভক্তির অব্যাহতস্রোত ব্যাকরণপথে পরিচালিত হইয়াছে। আমরা বাহুল্য-ভয়ে আর দৃষ্টান্তবৃদ্ধি করিতে বিরত হইলাম। যাঁহাদের কৌতূহল হইবে, তাঁহারা এই ব্যাকরণ আলোচনা করিয়া বা করাইয়া ইহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া শ্রীজীবের কৃতিত্ব আস্বাদন করিতে পারেন।

গ্রন্থশেষে শ্রীজীব সর্ব্বপ্রকার বাক্যেরই শ্রীগোবিন্দপ্রাপ্তির উপায়-স্বরূপে সার্থকতা দেখাইয়াছেন এবং শ্রীগোবিন্দে বাণীর গতি না হইলে তাহা যে অসার্থক হয়, ইহা ব্যক্ত করিবার জন্য বলিতেছেন :—

পানীয়ং পাণিনীয়ং রসবদরসবং কাকলাপঃ কলাপঃ
সারপ্রত্যাগি সারস্বতমপহতগীর্বিস্তরো বিস্তরোঽপি।
চান্দ্রং দুঃখেন সান্দ্রং সকলমবিকলং শাস্ত্রমপ্রস্তুতঞ্চ
গোবিন্দং বিন্দমানাং ভগবতি ভগবতীং বাণি নো চেদ্ব্রবাণি ॥

অর্থাৎ—হে ভগবতি বাণি! যদি তুমি গোবিন্দপ্রাপয়িত্রীরূপে ব্যক্ত না হও, তবে পাণিনিকৃত রসবৎ ব্যাকরণ ও অরসবৎ ও হয়নাই, কলাপ ও কাকের আলাপে, সারস্বত ও সাররহিতে বিস্তর ও বিস্তৃত হইলেও বৃথাবাক্যে কলাযুক্ত চান্দ্র ব্যাকরণও দুঃখপরিপূর্ণ কলাহীনে, অন্যান্য শব্দশাস্ত্রও অধন্য ব্যাপারে পরিণত হয়।

কিন্তু—

পানীয়ং পাণিনীয়ং রসযুক্ রসবমুংকলাপঃ কলাপঃ
সারশ্রীসারি সারস্বতমধিমধুগীর্বিস্তরো বিস্তরোঽপি।
চান্দ্রং সৌখ্যেন সান্দ্রং সকলমবিকলং শাস্ত্রমন্যৎ প্রশস্তং
গোবিন্দং বিন্দতীং ত্বাং যদি ভগবতি গীর্ব্বাণি বাণিব্রবাণি ॥

অর্থাৎ—

কিন্তু হে ভগবতি গির্ব্বাণি বাগ্‌দেবি! আর পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রাদি যদি তোমাকে গোবিন্দপ্রাপয়িত্রীরূপে ব্যক্ত করে, তবে পাণিনীয় ব্যাকরণ কোমল রসযুক্ত পানীয়ে কলাপ উৎকণ্ঠাপূর্ণ রসময় আলাপে, সারস্বত স্থিরসম্পদদাত্রীরূপে, বিস্তর ব্যাকরণ সুবিস্তৃত হইলেও মধুবাক্যশালীরূপে, সর্ব্বকলাযুক্ত অবিকল চান্দ্র ব্যাকরণ নিবিড় সুখাধারে, অন্যান্য শব্দশাস্ত্র ও প্রশস্ত শাস্ত্ররূপে পরিণত হয়।

অনন্তর শ্রীজীব বলিতেছেন যে—

"ভগবন্নামবলিতা ভগবদ্ভক্তিতৎপরৈঃ।
বৃন্দাবনস্থজীবস্য কৃতিরেষা তু গৃহ্যতাম্ ॥"

অর্থাৎ—হে ভগবদ্ভক্তিতৎপর সাধুগণ! আপনারা ভগবন্নামযুক্ত শ্রীবৃন্দাবনস্থ জীবের এই কৃতি গ্রহণ করুন।

শেষ শ্লোকে শ্রীজীব বলিতেছেন—

হরিনামামৃতং সংজ্ঞং যদর্থং প্রকাশয়ামাসে।
উভয়ত্র চ মম মিত্রং স ভবতু গোপালদাসাখ্যঃ ॥

অর্থাৎ—যাঁহার জন্য হরিনামামৃত-ব্যাকরণ আমি প্রকাশ করিলাম, সেই গোপালদাস নামক ব্যক্তি ইহলোকে ও পরলোকে আমার মিত্ররূপে পরিণত হউন। আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণের সুবিখ্যাত টীকাকার হরেকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয় এই গ্রন্থের টীকা সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই—পরবর্ত্তীকালের টীকাকার এই গোপালদাস যে কে, তাহার কোনও সন্ধান লইতে পারেন নাই।

শ্রীমৎ শ্রীজীব শ্রীবৃন্দাবন হইতে যে পত্রগুলি শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্যকে লিখিয়াছিলেন, তাহাতেই এই গোপালদাসের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীভক্তিরত্নাকরও বলিতেছেন—

"বীর হাম্বিরের পুত্র শ্রীগোপালদাস
শ্রীজীব গোস্বামিদত্ত এ নাম প্রকাশ ॥
শ্রীধাড়ি হাম্বীর নাম সর্ব্বত্র প্রচার।"

—ভক্তিরত্নাকর (১৪শ তরঙ্গ)

বিষ্ণুপুররাজ বীর হাম্বীরের পুত্রের নাম শ্রীগোপালদাস। শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীজীব গোস্বামীই এই পুত্রের শ্রীগোপালদাস এই নামকরণ করেন—রাজ্যের সর্ব্বসাধারণ ইহাঁকে 'ধাড়ী হাম্বির' বলিয়া ডাকিত, এবং ইনি এই নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। এই গোপালদাসকে আদর্শ বৈষ্ণবভাবে শিক্ষিত করিবার জন্য বৈষ্ণব-রাজা বীর হাম্বির বিশেষরূপে চেষ্টা করেন এবং তজ্জন্য শ্রীজীব শ্রীবৃন্দাবন হইতে শীঘ্র শোধন করিয়া এই ব্যাকরণখানি প্রেরণ করেন।

আমরা পূর্ব্বেই সূত্রমালিকা ও ধাতুসংগ্রহ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছি। যদি সূত্রমালিকা নামে কোনও স্বতন্ত্র গ্রন্থের অস্তিত্ব থাকে, তবে তাহা লোপ পাইয়াছে—অন্ততঃ এখন তাহার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। হরিনামামৃত-ব্যাকরণের প্রারম্ভেই টীকাকার বলিয়াছেন যে, শ্রীল সনাতন গোস্বামী এইরূপ একখানি ব্যাকরণ রচনা করিবার অভিপ্রায়ে অনেকগুলি সূত্র রচনা করেন, শ্রীজীব গোস্বামী সেই সূত্রগুলি বিস্তারিত করিয়া এই ব্যাকরণখানি রচনা করেন। কেহ কেহ মনে করেন যে, শ্রীরূপ গোস্বামীও এইরূপ একখানি ব্যাকরণ রচনা আরম্ভ করেন, কিন্তু তাহাও শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। যাহা হউক, শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীরূপ গোস্বামী ঐরূপ কোনও গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকিলেও শ্রীজীব গোস্বামীর এই গ্রন্থে তাহার সার সুরক্ষিত হওয়ায় ঐ সকল গ্রন্থ আর প্রচারিত হইতে পারে নাই, এবং তাহার সন্ধানও এখন আর পাওয়া যায় না। অতঃপর আমরা শ্রীজীব গোস্বামিপাদের অন্যান্য গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া শ্রীজীবের জীবন-কথা শেষ করিব।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল)।

[উপন্যাস]

৪

মিলি ও আমি এক-ঘরে শয়ন করিতাম। পাশাপাশি দু'খানি খাটে। খাটের নীচে জলন্ত চুল্লি রাখিয়া নীল আলো জ্বালাইয়া দিয়া "নানী" চলিয়া গেলে মিলি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"করু, আজ যে এরি মধ্যে লেপ মুড়ি দিয়ে জুজু-বুড়ি হলি? ঘুম পেয়েছে?"

মিথ্যা বলিতে প্রবৃত্তি হইল না। কহিলাম, "না মিলি, ঘুম পায়নি।"

মিলি বলিল, "আমারো না। মুখের লেপ খোল্ না ভাই, একটু গল্প করি।"

"এত রাতে কিসের গল্প, মিলি?"

"কিসের আবার! যাকে নিয়ে এতক্ষণ কাট্‌লো, তারি কথা। আচ্ছা, লোকটাকে তোর কেমন লাগ্‌লো?"

"কি করে বলি? চোখে তো দেখিনি!"

মিলি খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "কি কথাই বল্‌লি করু! মানুষ মানুষকে চোখে দেখে তার পর না কি ভাল-মন্দের সমালোচনা করে? এ কথা কোথাও শুনিনি। এ-দিকে কারুর সামনে সাত-চড়ে তোর মুখে রা' সরে না! অথচ কথার বাঁধুনি কত! সত্যি, বল্ না রে, সেনকে তোর কেমন লাগ্‌লো?"

"তুই আগে বল মিলি, পরে আমি বলবো।"

ক্ষণকাল ভাবিয়া মিলি উত্তর করিল, "হয় গবুচন্দ্র, নয় ন্যাকা! সাগর-পারের পালিশেও চকচকে হয়নি!"

আমি প্রতিবাদ করিলাম, "তা নয়। চরিত্রের মাধুর্য্য, আর চিত্তের সরলতা যে হারায়নি, তাকে তোরা 'গবুচন্দ্র' ছাড়া আর কি বল্‌বি, বল্? ভেতর-বার এক না হলে তাকে আবার মানুষ বলে কে? আমার কিন্তু ওঁকে বেশ লাগলো, দিব্যি মিষ্টি সরল স্বভাব।"

মিলি পরিহাস করিতে লাগিল, "পছন্দ হয়েছে? ও! তোর কাছে যত বোকার স্বভাব হয় মিষ্টি সরল! তুই মিছে দর্শন ঘেঁটে মরছিস করু, লোক চিন্‌তে পারিসনে! এক হিসাবে নির্ব্বোধ লোকগুলো মন্দ নয়! ওদের নিয়ে বেশ খেলা করা চলে। ভোঁতা ছুরিতে হাত কাটে না, ধারালোতে কাটাকুটির ভয়!"

"ছুরি নিয়ে কোন দিন খেলা করিনি। কোন্‌টা ভোঁতা, কোন্‌টা ধারালো, জানি না। জানতে চাই না, মিলি। তুই জিজ্ঞাসা করলি বলেই বলতে হলো! নাহলে আমার পছন্দ-অপছন্দর বালাই নেই, জানিস তো!"

"সত্যি করু, তুই যেন কেমন! এতখানি বয়স হলো তবু কচি-খুকী! নিরেট নির্ব্বিকার! না আছে কৌতুক, না আছে কৌতূহল! আমার মনে হয়, তোর মনের কোনো বালাই নেই, দিব্যি আছিস!"

"না থেকে কি করবো বল? যিনি ভাঙ্গা-গড়ার মালিক, তিনি মন গড়তে ভুল করেছেন!"

গায়ে লেপ টানিয়া মিলি বলিল, "আজ আর নয়, এইবার ঘুমো, করু। সকালে আবার তাণ্ডব আছে। বেশী রাত জাগলে শরীর বিশ্রী লাগে। তোকে আজ আমি বুঝতে পারছি না, হেঁয়ালির মত লাগ্‌ছে।"

আমি জবাব না দিয়া মনে-মনে বলিলাম, আমাকে বুঝিয়া তোমার প্রয়োজন নাই, মিলি। করবী ক্ষুদ্র, তার জীবনের পরিধিও বিস্তৃত নহে। তার কথা তাহারই থাকুক, তা তোমার কি দরকার জানিবার? কিন্তু তোমাকে আমি চিনি। তুমি অল্প-জলের শফরী, গভীর জলের মকর নও। তোমার লীলা-চাতুরী দিবালোকের মত স্বচ্ছ, আকাশের মত পরিষ্কার। তোমাকে জানিতে আমার বাকী নাই!

মিলির উদ্দেশে যাহাই বলি না কেন, আমার নিদ্রাহারা চোখের সামনে জ্যোতি বাবুর সুন্দর সুগঠিত মূর্ত্তি ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল! কেন যে এমন হইল, আমি তা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। কত বসন্ত-সন্ধ্যায়, শরৎ-মধ্যাহ্নে আমার উন্মেষিত জীবন-পথে কত পথিক আসিয়াছে, গিয়াছে! কিন্তু কাহারো চঞ্চল পদধ্বনি আমার হৃদয়ের কুঞ্জ-তোরণে প্রবেশ

করিতে পারে নাই! আজ যেন অলক্ষিতে দক্ষিণ বাতাসের আবির্ভাব হইল। কুঞ্জ-দ্বার আপনা-আপনি খুলিয়া গেল।

যে-দিন যায়, তাহাই শান্তির। যাহা আগত, তাহা যবনিকার অন্তরালে রহস্যে প্রচ্ছন্ন। আমার ভবিষ্যৎ আমার জন্য কি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে, জানি না। না জানিলেও আমি তাহারই পরিবেষ্টনের মধ্যে আত্ম-সমর্পণ করিতে চলিয়াছি।

পৃথিবীতে এত লোক থাকিতে দেখিবামাত্র জ্যোতি-বাবুকে আমার ভাল লাগিল কেন? মনের কাছে এ কেনর উত্তর না পাইয়া আমি জোর করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলাম।

ঘুম কি আসে? যে নব ভাবোচ্ছ্বাস এত দিন আমার অন্তরে অজ্ঞাতে রহিয়া গিয়াছে, আজ আমি সেই ভাব-ধারার কল-তান শুনিতেছি! সুপ্ত যৌবন-নদী সহসা তরঙ্গিত হইয়া হৃদয়-তটে কেবলই আঘাত করিতেছে। আমার চিরন্তনী নারী-প্রকৃতি কাহাকে চায়? যাহার কাম্য ছিল না, কামনা ছিল না, তাহারই ক্ষুধিত দীনতায় আমি ক্ষুব্ধ হইলাম, ভীত হইলাম!

•

সারা রজনী জাগিয়া ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। জাগিয়া দেখি, বেলা হইয়াছে। মিলি উঠিয়া স্নান সারিয়া প্রসাধন-টেবিলের সম্মুখে প্রসাধন করিতেছে।

আমি মিলিকে অনুযোগ করিলাম, "আমায় ডাকিসনি কেন মিলি? বেলা ঢের হয়েছে। কখন স্নান সারবো, কখন বা চা-এর যোগাড় করবো?"

মিলি সাবধানে ঠোঁটে রং-এর তুলি বুলাইতে বুলাইতে কহিল, "বেলা বেশী হয়নি। আজকের দিনটা বড় সুন্দর। মেঘের বালাই নেই, চন-চনে রোদ উঠেছে। তুই ব্যস্ত হোস্‌নে করু, সাড়ে সাতটার দেরী আছে। ঠাকুরকে মা খাবার তৈরির কথা বলে দিয়েছেন। রাত্রে তোর ঘুম হয়নি, তাই ভেবে আমি তোকে ডাকিনি।"

মনে যত কৃত্রিমতা থাকুক, তবু মিলি আমাকে ভাল-বাসে। বিছানায় শুইয়া তাহার ভালবাসা উপভোগ করিবার সময় ছিল না। তখনই আমাকে স্নানের ঘরে ঢুকিতে হইল।

স্নানান্তে ফিরিয়া আসিবামাত্র মিলির আদেশ হইল, "আমার লট্‌কান রং-এর শাড়ী ব্লাউশ বার করে রেখেছি, পরে নে, করু। তোর সাদা শাড়ী লম্বা-হাতা জামা আমার দু' চোখের বিষ! যে বয়সের যা, তা না হলে কি মানায়?"

বলিলাম, "এত কাল যা মানিয়ে এসেছে, আজও তা কেন মানাবে না মিলি? ছেলেবেলায় মিস্‌নারী স্কুলে পড়ে এটা আমার অভ্যাস হয়েছে, এখন বেশ বদ্‌লাতে ভাল লাগে না। আজ এমন বিশেষ দিন বা তিথি নয় যে, আমাকে ভোল্ বদ্‌লাতে হবে। আমি সাদা করবী, সাদাই আমার ভালো।"

মিলি রাগ করিল। বলিল, "যেমন সংএর মত সাজ, তেমনি ঢংএর কথা! রঙ্গীন শাড়ী পরতে পাঁজি-পুথির তিথি খুঁজতে হয়, জানতাম না। করবী ফুল সাদাই চোখে পড়েচে, রাঙ্গা যেন দেখেননি! এক-বাড়ীতে দুই বোন রয়েছি, এক জন সাদার বিশেষত্ব নিয়ে থাক্‌লে আর এক জনকে লোকে বলবে কি? ভানুর জন্মদিনে মিসেস সরকার এসে কি বলেছিলেন?"

"কবে কোন্ দিন কে এসে কি বলেছিল, তা আমার মনে রাখ্‌বার নয়, মনেও নেই!"

"তা থাক্‌বে কেন? বলেছিল, মাসীর আশ্রয়ে মা-মরা মেয়েটা বড় দুঃখে থাকে। না আছে বেশভূষা, না আছে হাসি-আহ্লাদ।"

"তুই শুনিয়ে দিলেই পারতিস্, করুর মা না থাক্‌লেও মাসিমা আছেন। মাসীর বাড়ী করুর দুঃখের আশ্রয় নয়। আমাদের করবী লাল নয়, সাদা!"

বিরক্তি-ভরে মিলি আমাকে ভ্যাংচাইল; বলিল, "আমাদের করবী লাল নয়, সাদা! সব-তাতে মেয়ের পাকোমো!"

৫

বেলা সাড়ে সাতটা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতি বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি আড়াল হইতে এক-ঝলক তাঁহাকে দেখিয়া লইলাম।

আজ জ্যোতি বাবুর অঙ্গে উঠিয়াছে ধুতি পাঞ্জাবী। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের উপর শেওলা-রংএর শালখানাতে তাঁহাকে চমৎকার মানাইয়াছিল। বাঙ্গালীর ছেলেকে বাঙ্গালী বেশে যেমন মানায়, বিদেশী পোষাকে তেমন নয়। আমি লক্ষ্য করিলাম, সত্যই জ্যোতি বাবুর চোখ দু'টি বড় সুন্দর! গত সন্ধ্যায় তীব্র দীপালোকে যাহা নক্ষত্রের মত দীপ্ত মনে হইয়াছিল, আজ ভোরের আলোয় তাহা ফুটন্ত ফুলের মত স্নিগ্ধ, মনোহর লাগিল।

একান্তে বেশীক্ষণ আমার দেখা হইল না। মাসিমা ব্যস্তসমস্ত ভাবে তাড়া দিতে আসিলেন, "করু, তোমার কত দূর হলো? সেন এসেছে। ওঃ, সব হয়ে গেছে? এবার তুমি শাড়ী বদ্‌লে পরিষ্কার হয়ে এসো।"

তখন মিলিকে বিমুখ করিলেও আমার যে বেশ ও বাস-পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা একটুও ছিল না, তা নয়। তবু বলিলাম, "আমি তো স্নান করে পরিষ্কার হয়েই রয়েছি মাসিমা, আবার কাপড়-জামা ছাড়তে গেলে দেরী হয়ে যাবে।"

"কিসের দেরী? চট করে একখানা ভাল শাড়ী

পরে নাও। এত সাদা-সিধে! মিলির পাশে বেমানান লাগে।"—মাসিমা চলিয়া গেলেন।

মিলির সাজের ঘটা আমার জানা আছে। আমি ইহাদের পরিবারভুক্ত—আমার সজ্জা-হীনতা মাসিমাকে লজ্জা দিবে মনে করিয়াই আমি সাজিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

লালপেড়ে গরদের শাড়ী পরিয়া, আয়নার দিকে চাহিতেই আমার মনে হইল, অনাত্মীয় ভদ্রলোকের সামনে বাহির হইতে যতটুকু প্রসাধনের প্রয়োজন, তাহার চেয়েও আমি বেশী সাজিয়াছি। আমার ভিতরে দেহ-শোভনের এ স্পৃহা এত দিন কোথায় ছিল? আর কখনো তো এমন করিয়া সাজিতে পারি নাই!

পুলক-মিশ্রিত লজ্জায় ঈষৎ সঙ্কুচিত পদে আমি বসিবার ঘরে আসিলাম।

জ্যোতি বাবু অভ্যর্থনা করিলেন, "এই যে করবী দেবী! আসুন! সুপ্রভাত!"

আমি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া পরিবেশনে লাগিলাম। আজ আমার আড়ষ্ট-ভাব কাটিয়া গিয়াছিল, স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্যে এ মজলিসে যোগ দিতে বাধিল না। হাস্য-কৌতুকে সকলের চা-পান চলিতে লাগিল।

মিলির সাজসজ্জা আজ অপূর্ব্ব অভিনব হইয়াছিল। গায়ের রং অনুজ্জ্বল গৌর বলিয়া সে গাঢ় রংএর শাড়ী ব্যবহার করিত। জ্যোতি বাবুর চঞ্চল নয়ন লুব্ধ ভ্রমরের মত মিলির মুখে নিবদ্ধ হইয়া রহিল।

মিলির আকর্ষণের শক্তি অসাধারণ! তরুণ হৃদয়কে পতঙ্গের মত আহত করিতে—দগ্ধ করিতে তাহার ক্ষমতা অসামান্য। আমি মিলিকে ভালবাসিলেও তাহার এ হীন প্রবৃত্তিকে কোন দিন শ্রদ্ধা করিতে পারি নাই। সেই অশ্রদ্ধার ভিতর কি এক অজ্ঞাত জ্বালার আস্বাদ আজ আমি অনুভব করিতে লাগিলাম।

হঠাৎ দাঁড়াইয়া জ্যোতি বাবু কহিলেন, "আপনারা আমাকে মাপ করবেন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি আসছি।"

কাল জ্যোতি বাবুকে সিগারেট খাইতে দেখি নাই, এখন জানিলাম, তাঁহার সে-অভ্যাস আছে।

দৈনিক কাগজওয়ালা হিসাব লইয়া আসিয়াছিল; মাসিমা হিসাব মিটাইতে উঠিলেন। ভানু জ্যোতি বাবুর সঙ্গী হইয়াছিল।

আমাকে একা পাইয়া মিলি পরিহাস করিতে লাগিল, "মরা-গাঙ্গে চাঁদের আলো কেন, করু? ব্যাপার কি? রং ধরলো না কি? রোজ টেনে-টুনে ঝুঁটি বাঁধা হয়, আজ দেখছি কাণের ওপর চুলের থর নেমেছে! গালে দোল খাচ্ছে কাণ-বালা! কুমকুমের কি ভাগ্যি, তিনি উঠেছেন দুই ভ্রূর মাঝখানে!"

লজ্জিত হইয়া উত্তর দিলাম, "ভিজে চুলে খোঁপা হয় না, তাই আঁচড়ে রাখতে হয়েছে মিলি। ঘুম থেকে না উঠতেই মিসেস সরকারের কথা নিয়ে তুই একবার শাসন করলি, তার পর মাসিমা তাড়না করলেন। আমি বেচারী নিরুপায়! কিছু করলেও দোষ, না করলেও দোষ! নাহলে রং-চং আমার আসে না ভাই, ও-জিনিস তোরি একচেটে!"

মিলি হাসিল, "ঠিক বল্‌তে পারলি নে করু! আমি রঙের মহাজন। অন্যকে রাঙাতে পারি, নিজে রাঙি না। জীবন আনন্দের, খেলার—যতটুকু হেসে-খেলে নিতে পারি, তাই লাভ। তুচ্ছ খেলা-ধূলো নিয়ে মানুষ যে কেঁদে মরে কেন, আমি ভেবে পাই না।"

বলিলাম, "ভেবে পাবি কি করে? তুই তো কখনো কাউকে ভালবাসিস না। যারা ভালবাসতে শেখে, তারাই কাঁদে, মিলি। শান্ত, সরল জীবন সুখের! কে তাকে সাধ করে জট পাকিয়ে তুলতে চায়? কোনো দিন বলিনি, আজ বল্‌ছি, ছেলেদের সম্বন্ধে তোকে যেন আমার কেমন লাগে! এত লেখাপড়া শিখে ভদ্র-ঘরের মেয়ের এ সব ভাল নয়।"

মিলি গর্জ্জিয়া উঠিল, "কি ভাল নয়? যারা বোকা মেয়েগুলোকে নাচিয়ে কাঁদিয়ে খেলার পুতুল বানিয়ে তুলতে পারে, তাদের জব্দ করা ভাল নয়? ওরা কি লেখাপড়া শেখে না, না, ভদ্রবংশের ছেলে নয়? সব তাতেই ওদের সাত খুন মাপ, যত মহাপাতক মেয়েদের বেলায়! অন্ধ সংস্কারের আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে মেয়েদের ওপর পুরুষ-জাত চিরকাল জুলুম করে আসবে, এর প্রতিকার নেই?"

"জুলুম কেউ কাউকে করে না মিলি, স্ত্রী-পুরুষ দুই জাত মিশিয়ে ভাল-মন্দ। একের অন্যায়ে আর এক জনের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া চলে না। নিজে না নাচলে কে কাকে নাচাতে পারে? তুই কবে থেকে এত পুরুষ-বিদ্বেষী হলি? ও-জাতের ভেতরেই বাবা, ভাই, স্বামী, পুত্র আছেন, তা ভুলে যাচ্ছিস কেন?"

"মেয়েদের ভেতরেও কি মা, বোন, স্ত্রী, কন্যা থাকে না? ক'জন পুরুষ তা মনে রাখে, বল্‌তে পারিস্? তুই বই নিয়ে কোণে বসে থাকিস, ও-জাতকে চিনিস না! আমি সম্পূর্ণ না চিনলেও কতক চিনি। ওরা ভাল নয়, ওদের কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। আমি তো কোন অন্যায় করিনি। বল্‌তে পারিস, ভাণ করি! কেন করবো না? ওরা কি আমাদের সঙ্গে ছলনা করে না? আসলে পৃথিবীর জীবমাত্রেই শিকারী। বনে-জঙ্গলে ঘরে-বাইরে দিন-রাত শিকার চল্‌ছে। এত শিকারের সমারোহের মধ্যে তুই ছাড়া আর কে চুপ করে আছে?"

কি উত্তর দিব? মিলির স্পষ্ট অভিব্যক্তিতে সঙ্কোচে আমি যেন এতটুকু হইয়া গেলাম! কি এক অব্যক্ত, গোপন ব্যথায় আমার হৃদয় খচ্‌-খচ্‌ করিতে লাগিল।

আমার মৌনতায় মিলি অধীর হইয়া উঠিল। কহিল, "রাগ হলো? তুই যে মস্ত বড় নীতিবাগীশ, তা আমার মনে ছিল না করু। কি বল্‌তে কি বলেচি, ভুলে যা। মুখ গোমড়া করে থাকিস্‌নে। ওই ছাখ্, ওরা ফিরে আস্‌ছে।"

জ্যোতি বাবু ভানুর সহিত যথাস্থানে আসিয়া উপবেশন করিলেন। মাসিমাও ফিরিলেন।

দুই-চারিটা অবান্তর কথার পরে জ্যোতি বাবু মিলিকে গান গাহিতে অনুরোধ করিলেন। গাহিবার জন্য মিলিকে বিশেষ অনুরোধ করিতে হয় না। এ ক্ষেত্রে তাহাকে ভাল বলিতে হইবে!

মিলি নীরবে অর্গানের টুলে গিয়া বসিল। তাহার পর সঙ্গীতের সুধাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। মিলির যেমন গলা, তেমনি শিক্ষা—জ্যোতি বাবু মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

কয়েকটি গানের পর মিলি আসন ত্যাগ করিলে জ্যোতি বাবু আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এবার আপনার পালা করবী দেবী। আমি গানের ভক্ত। কিন্তু নিজে অপারক। তবে শ্রোতা-হিসাবে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারি। একটু কষ্ট করে আপনি এবার উঠুন, গান শুনিয়ে দিন।"

বলিলাম, "মিলির গানের পর আমার গান ভাল লাগবে না। আমি ভাল গাইতে জানি না। ছেলেবেলায় যা একটু শিখেছিলাম, তাও পচা পুরোনো হয়ে গেছে, শোনার যোগ্য নয়।"

মাসিমা সায় দিলেন; বলিলেন, "করু মিছে বলেনি। গানে ওর মন নেই। ইচ্ছে থাক্‌লে শিখে নিতে পারে। সপ্তাহে দু'দিন মিলির ওস্তাদ আসে। আমি কত বলি, ও গা করে না। গলা ভাল ছিল, তার চর্চ্চা করলে না! হোক পুরোনো, যা জানিস গা করু, উনি শুনতে চাইছেন।"

জ্যোতি বাবু সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, "গান কখনো পুরোনো, পচা হয় না, করবী দেবী। দেখছেন না, কীর্ত্তনের যুগ আবার ফিরে এসেছে, লোকের রুচি বদলে গেছে। আরম্ভ করুন, আর দেরী করবেন না।"

না, আর দেরী করিব না! ফুটন্ত গোলাপ উদ্যানের অলঙ্কার-স্বরূপ হইলেও নগণ্য বনফুলের স্থানও যে তাহারই পাশে! মিলির ভাণ্ডার পরিপূর্ণ বলিয়া আমার যাহা আছে, তাহাই বা দিব না কেন? আমি সঙ্গীতের মধ্যে আমার সমস্ত হৃদয় ঢালিয়া দিয়া গাহিলাম—

"তোমারেই করিয়াছি, জীবনের ধ্রুবতারা
এ সমুদ্রে কভু আর হবো নাকো পথ-হারা।"

গান শেষ হইবামাত্র জ্যোতি বাবু উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কোকিলকণ্ঠী! আপনি বুলবুল! বুলবুলের মতই করুণ, মিষ্টি সুর!"

জ্যোতি বাবুর কথায় আমার ললাটের শিরা দপ-দপ করিতে লাগিল। আঁখি-পল্লব আনত হইল। আমি সঙ্গীতে পারদর্শিনী বা অনুরাগিণী নহি। কখনো কদাচিৎ দুই-একটা গাহিয়াছি মাত্র, শ্রোতারা ভাল বলিয়াছে, কিন্তু সে-প্রশংসা আমার হৃদয়ের তারে ঝঙ্কার তুলিতে পারে নাই। আজ এক দিব্য বিভায় আমার অন্তর-বাহির অনুরঞ্জিত হইল।

মিলি বলিল, "করু ওস্তাদী না জানলেও যা জানে তা খাঁটি। শিখ্‌লে হতো ভাল। ওর গলায় কি সুন্দর 'গিটকিরি'! সচরাচর অমন দেখা যায় না।"

মাসিমা বলিলেন, "কাজ-কর্ম্মে যেমন মন, অন্য কিছুতে তেমন নয় বলে আমার দুঃখ হয়।"

ভানু এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল, হঠাৎ তাহার মাথায় দুষ্ট-বুদ্ধি জাগিল। নির্ব্বোধ ছেলেটা বলিয়া বসিল,—"করুদি একটা গান যা গায়, তেমন কোথাও শুনিনি! জ্যোতিদা সেইটে শুনুন, খুব ভাল।"

মিলি জিজ্ঞাসা করিল, "কি গান ভানু?"

"কি গান আবার! তুমি হাজার বার শুনেছ তো। সেই যে, এখানে আস্‌বার আগের দিন সন্ধ্যা বেলা গেয়েছিল।"

আমি ইসারায় ভানুকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সে আমার দিকে না তাকাইয়া আপনার মনে আবোল-তাবোল বকিতে লাগিল।

মিলি বিরক্ত ভাবে বলিল, "এখানে আস্‌বার আগের দিন বল্‌লে কেউ মনে রাখ্‌তে পারে না। কথাগুলো কি, তাই বল্ না বাপু?"

"তা কি আমার মনে আছে যে বলবো? আমি তোমাদের মতন গায়ক নই, গানের খাতায় গান টুকে রাখি না। ভাল লাগ্‌লে শুনি, তার পর ভুলে যাই।"

মাসিমা গম্ভীর হইয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, "এমন স্মরণ-শক্তি না হলে এ দুর্গতি হয়!"

জ্যোতি বাবু মিনতি করিতে লাগিলেন, "ভানুর ভাল গানটা নিশ্চয় আপনার মনে আছে করবী দেবী। শুনিয়ে দিন। না শোনা পর্য্যন্ত আমি কিন্তু ছাড়বো না।"

মনে ছিল। কাজেই শুনাইয়া দিতে হইল—

সে যে পরম প্রেম সুন্দর, জ্ঞান নয়ন-রঞ্জন,
পুণ্য মধুর নিরমল জ্যোতি, জগৎ-বন্দন।

৬

ঘাতে-প্রতিঘাতে সংশয়ে-সন্দেহে কোথা দিয়া যেন দিনগুলি অতীতের গর্ভে বিলীন হইতেছিল!

দিনে দিনে আমাদের সহিত জ্যোতি বাবুর ঘনিষ্ঠতা

সঙ্গী, হাসি-গল্পের সহচর। তাঁহাকে না হইলে আমাদের আসর জমিতে চায় না, বেড়াইবার উৎসাহ থাকে না। পক্ষকাল বিলাতের বিবরণ শুনিয়াও মাসিমার শ্রবণের পিপাসা নিবৃত্ত হয় নাই। জ্যোতি বাবু পাকা খেলোয়াড়, ভানু এবং মিলি মহা-আড়ম্বরে তাঁহার নিকটে টেনিস খেলা শিখিতেছে। আমি নিতান্ত অপদার্থ, খেলা-ধূলা আমার আসে না। তবু উহাদের সহিত যোগ না দিয়া পারি না। কারণ, জ্যোতি বাবুর সাহচর্য্য পাইতে হইলে গণ্ডীর বাহিরে থাকা চলে না। তাঁহাকে পাইবার আশা না করিলেও তাঁহার সঙ্গ যে আমার পরম-প্রিয়, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই! আমার অন্তর্য্যামীকে ফাঁকি দিব কি করিয়া? জ্যোতি বাবু এখন আমার আলোক-শিখা, আমি মুগ্ধ ভ্রান্ত পতঙ্গ! এত দিন ছিলাম শাখা-পল্লবে লুক্কায়িত অরণ্যের ক্ষুদ্র একটি ফুল। অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় পুষ্প-পরাগে কীটের আবাস হইল! কালে সেই কীটের পরিণতি পতঙ্গে।

জানি, পতঙ্গ-জন্ম সুখের নয়! নিজেকে দগ্ধ করা তাহার বিধি-লিপি! সান্ত্বনা, পতঙ্গ দগ্ধ হয়, কিন্তু তাহার প্রাণস্বরূপ, উজ্জ্বল প্রদীপ-শিখাকে আঘাত করে না, আহত করে না।

আমি স্পষ্ট অনুভব করিতেছি, মিলির প্রতি জ্যোতি বাবু অনুরক্ত। সময়ে ভ্রম হয়। মিলির নির্ম্মম হৃদয়ে তিনিও বোধ হয় রেখাপাত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কেনই বা হইবেন না? রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি কোনটারই তো অভাব নাই। কুমারীর কামনার বস্তু তাঁহাতে প্রচুর। সর্ব্বোপরি জ্যোতি বাবুর সরল কোমল স্বভাব, এ যুগে দুর্লভ সম্পদ।

মিলির দুর্লভ-সুলভের বিচার আমি করিব না। অপরের হৃদয়ের গোপন-কাহিনী অপরে জানিতে পারিলে জগতে কিছুই অজানা থাকিত না। আমি কেবল জানি আমাকে। আমার মনের গোপন গহনে যাহা জাগিয়াছে, তাহাতে আবেগ নাই, উচ্ছ্বাস নাই। পাষাণ-শিলায় আবদ্ধ গিরি-নদীর মত একটু শুধু জল-কল্লোল! কেহ তাহা জানে না, জানিবার সম্ভাবনা নাই।

সে-দিন অপরাহ্ণে সম্মুখের 'লনে' বল র‍্যাকেট লইয়া মিলি জ্যোতি বাবুর প্রতীক্ষা করিতেছিল, মাসিমা নিবিষ্ট মনে 'সোয়েটার' বুনিতেছিলেন, ভানু একটা বল লইয়া লোফালুফি করিতেছিল।

গেটের দুই দিক মরশুমী ফুলে আলোকিত, মাঝে একটি হরিদ্রা বর্ণের গোলাপ ফুটি-ফুটি করিয়াও ফুটিতে পারিতেছে না। কুঁড়িটা যেন আমারি মত হিমে জর্জ্জরিত, সরমে সঙ্কুচিত! খুলি-খুলি করিয়াও হৃদয়-দ্বার খুলিতে পারে না!

আমি আগাইয়া গিয়া কলিটির গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলাম। সাধ হইতেছিল, একটি স্নেহ-চুম্বনে কোরকটিকে অভিষিক্ত করি।

"কি করবী দেবী, হাত বুলিয়ে গোলাপ ফোটাচ্ছেন না কি? বৃথা চেষ্টা! রোদ না উঠ্‌লে ও ফুটবে না!" বলিতে বলিতে জ্যোতি বাবু আসিয়া সামনে দাঁড়াইলেন।

আমি অপ্রতিভ হইলাম। আমার পুষ্পপ্রীতি কাহাকেও জানাইতে চাহি না। সব-তাতে আমার সঙ্কোচ হয়। বলিলাম, "যে ফোটে না, তাকে কি জোর করে ফোটানো যায়? আমি দেখ্‌ছিলাম, ফোট্‌বার কত দেরী! আপনার কিন্তু আজ দেরী হয়ে গেছে। ওই দেখুন, মিলি রাগ করে দেবদারু-তলায় বসে রয়েছে।"

মিলি রাগ করিয়াছে শুনিয়া জ্যোতি বাবু অন্বেষণের ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকাইয়া উত্তর দিলেন, "মল্লিকা দেবী রাগ করেছেন? আপনাদের রাগকে আমার বড্ড ভয়। আমি রাগ করতেও জানি না, রাগ ভাঙ্গাতেও জানি না। হাটে যেতে হয়েছিল বলে আস্‌তে দেরী হয়ে গেল!"

"হাটে কেন? কিছু কেনবার ছিল বুঝি?"

"হাঁ। অনেক কিছু কিন্‌তে হলো। যাবার তাগিদ এসেছে। দিদির ফরমাশ—কুঁড়ি গাছ, কাঁচের মালা, দশ-খানা 'লাসা' শাড়ী। সেগুলো আপনাদের দিয়ে পছন্দ করিয়ে কিনবো। দিদির মনের মত না হলে আমার সঙ্গে কুরুক্ষেত্র বাধবে। সাধে বলি, আপনাদের রাগকে আমার বড় ভয়!"—বলিয়া জ্যোতি বাবু হাসিতে লাগিলেন।

আমি তাঁহার হাসিতে যোগ দিতে পারিলাম না। শীঘ্র তাঁহাকে যাইতে হইবে শুনিয়া বর্ষার নদীর মত আমার হৃদয় চঞ্চল হইল। কেনই বা চঞ্চল হয়? জ্যোতি বাবুর সহিত আমার কিসের সম্বন্ধ, কিসের যোগা-যোগ? তাঁহার যাওয়া-আসায় আমার আনন্দ-বিষাদ হইবে কেন? এ বিপুল বিশ্বে কে কাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে? এখন যাহাকে একান্ত নিকটতম ভাবিয়া আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখিতে চাই, পরক্ষণে সে সুদূরের যাত্রী হইয়া নয়নের অন্তরালে সরিয়া যায়। মানুষের বিচ্ছেদ-বেদনা পায়ে-পায়ে।

আগে আমার অহঙ্কার ছিল, হৃদয়ের ধরা-বাঁধার কারবারে আমি নির্লিপ্ত, উদাসীন। পদ্মপত্রের মত জলে বাস করিয়াও আমাতে জল লাগে না! সে অহঙ্কার আমার কোথায় গেল? কিসের এ দুর্ব্বলতা? স্বপ্ন-বিহ্বলতা, আকাশ-কুসুম-রচনা আমার সাজে না।

আমি চিত্ত-চাঞ্চল্য দমন করিয়া সহজ ভাবে জবাব দিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুই বলা হইল না।

জ্যোতি বাবুর সাড়া পাইয়া ভানু আসিয়া তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চলিল। আমি তাহাদের অনুসরণ করিলাম।

মিলি যেমন বসিয়াছিল তেমনি রহিল। অভিমানিনী মিলির স্ফুরিত অধর, ছল-ছল চক্ষু, অপরূপ ভঙ্গিমা! দেখিবার জিনিস! মান-অভিমান সকলেরই আছে, কিন্তু এমন করিয়া ক'জন তাহা ব্যক্ত করিতে পারে?

জ্যোতি বাবু মিলির পাশে উপনীত হইয়া সহাস্যে বলিলেন, "আসুন মল্লিকা দেবী, আরম্ভ করা যাক। কাজে বেরিয়ে দেরী করে ফেলেছি।"

মিলি কহিল, "থাক, এখন আর খেলার সময় নেই। অনর্থক আরম্ভ করে কি হবে? আপনার কাজ থাকলে যেতে পারেন। আপনার মূল্যবান্ সময় অকারণ নষ্ট করতে চাইনে।"

মেয়ের বাঁকা-কথায় মাসিমা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "জ্যোতি কাজ-কর্ম্ম সেরে খেলতে এসেছেন। এইটেই তো খেলার সময়। রোদে পুড়ে খেলাধুলো আমি ভালবাসি না। শীতের দেশ হলেও রোদের তাতে গায়ের রং পুড়ে যায়। বিকেলের পড়ন্ত রোদ আমি একেবারে সইতে পারি না। মাথায় লাগলে মাথা টন্‌টনিয়ে ওঠে।"

মাসিমার রৌদ্র-বিভীষিকায় জ্যোতি বাবু বিচলিত না হইয়া মিলির অভিযোগের সূত্র ধরিয়া বলিলেন, "সময় আমার মূল্যবান্ নয় মিলি দেবী। যতক্ষণ আপনাদের কাছে থাকি, তখনি তাকে মূল্যবান্ মনে করি। আমি ইচ্ছা করে সময়ের অপব্যবহার করিনি। আজ চিঠি পেয়েছি, আমাকে শীগ্‌গির যেতে হবে। দিদি রাশীকৃত ফরমাশ পাঠিয়েছেন। লাসা-শাড়ী, মালা, ভুটানী চাদর, নেপালি বাটী, গেলাস, টাট্‌কা চা, মৃগনাভি, বাঘের নখ, কপি, কলাইশুঁটী, পেঁপে, কাঁটা,—সে এক বিরাট্ ফর্দ্দ! গোটা দার্জ্জিলিং সহরটাকে নিয়ে যাবার বিলি-ব্যবস্থা! চিঠি পেয়ে হাটে গিয়ে কতক সংগ্রহ করে রাখলাম। আর-এক হাট পর্য্যন্ত থাকা হবে কি না, সন্দেহ।"

অকস্মাৎ মিলির কাজল-কালো দুই চোখে মেঘের আমেজ লাগিল। মিলি ভালবাসিয়াছে! নিশ্চয় বাসিয়াছে! তাই উহার অভিমান-বিক্ষুব্ধ-হৃদয়ে বিচ্ছেদ-বেদনা উদ্বেলিত হইল।

নিশ্বাস ফেলিয়া মিলি তাহার স্বপ্ন-ভারাতুর বিহ্বল নেত্র জ্যোতি বাবুর মুখের উপরে মেলিয়া দিল।

মুহূর্ত্তে জ্যোতি বাবু বিশ্ব ভুলিয়া সেই চোখের সহিত চক্ষু মিলিত করিয়া অনিমেষে চাহিয়া রহিলেন। আমি আঁখির ভাষা জানি না, জানিলে পিপাসিত প্রাণের অব্যক্ত ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে পারিতাম!

ভানু নিষ্প্রভ হইয়া, মাথা দুলাইয়া বলিয়া উঠিল, "না জ্যোতিদা, এত শীগ্‌গির তোমাকে আমি যেতে দেব না। আমরা যে ক'দিন আছি, তোমাকেও থাকতে হবে। দিদিকে আজ আমি চিঠি লিখবো। আমার চিঠি পেলে দিদি তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে বলবেন।"

জ্যোতি বাবুর সহিত ভানু নিজেকে জড়িত করিয়া ফেলিয়াছে। ভদ্রতার মুখোস 'আপনি' খসিয়া গিয়া আত্মীয়তার 'তুমি' 'জ্যোতিদায়' পরিণত হইয়াছে। জ্যোতি বাবু কেবল আমার মধ্যে আলোড়ন-বিপ্লবের সৃষ্টি করেন নাই, আমাদের পরিবারে তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া একটা সম্ভাবনার আকার গঠিত হইতেছে! বৃক্ষের মূলের মত তিনি আমাদের হৃদয়-মৃত্তিকার অনেকখানি স্থান ব্যাপিয়া তাঁহার আসন পাতিয়া রাখিয়াছেন। বিরহের ঝটিকা শুধু বৃক্ষকেই নাড়া দিবে না, তাহার কম্পন-বেগ মাটিকেও আঘাত করিবে!

ক্ষুব্ধ স্বরে মাসিমা কহিলেন, "তাই তো, এত তাড়াতাড়ি তোমার যাওয়া হতে পারে না। সবে এখানকার পরিবর্ত্তন সুরু হয়েচে, স্বাস্থ্যের পক্ষে এ আবহাওয়া ভারী উপকারী।"

"থাক্‌তে পারলে উপকার হতো। কিন্তু থাক্‌তে আর পারছি কৈ! আমাকে যেতেই হবে। ব্যাঙ্কের একটা কাজের জন্য দরখাস্ত করেছিলাম, তাঁরা ডেকেছেন। হয়তো কাজটা পেয়ে যাব।"—বলিয়া জ্যোতি বাবু পাথরের উপর বসিলেন।

মাসিমা ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, কহিলেন, "হাইকোর্ট ছেড়ে দিয়ে শেষকালে তুমি ব্যাঙ্কের কাজ নেওয়া ঠিক করলে! নতুন বেরোচ্ছ, কিছু দিন তোমার দেখা উচিত ছিল। স্বাধীন ব্যবসা, মান-প্রতিপত্তি যথেষ্ট। সি, আর, দাশ যে এত-বড় হয়েছিলেন, তার মূলে ছিল এই স্বাধীন ব্যবসা।"

"মূলে শুধু স্বাধীন ব্যবসা ছিল না; ছিল দেশপ্রীতি—আত্মত্যাগ। ত্যাগ না করলে কেউ প্রাতঃস্মরণীয় হতে পারে না। আমি হাইকোর্ট ছাড়ছিনে, ব্যাঙ্কের কাজ পেলে একটা বাঁধা আয় থাক্‌বে। মামলা করে যা পাবো, সেটা হবে উপরি পাওনা। আপনাকে তো সব বলেছি, আমার বাবা নেই, মার পুঁজি ভেঙ্গে বিলাতের খরচ চালিয়েছি। আমার প্রতিজ্ঞা, বছর দুইয়ের মধ্যে সে টাকাটা রোজগার করতে হবে। একটা আঁকড়ে ধরে 'ভ্যারেণ্ডা-ভাজার' যুগ আর নেই। প্রত্যেককে চেষ্টা করতে হবে, রীতিমত যুদ্ধ করে আয়ের উপরে দাঁড়াবার।"

মাসিমা ধারালো ছেলে পছন্দ করিতেন। ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া, নিশ্চেষ্টতা ভালবাসিতেন না। কথাচ্ছলে বহু বার তাঁহার মুখে শোনা গিয়াছে, যার ভেতরে তেজ নাই, বড় হবার স্পৃহা নাই, সে আবার কিসের মানুষ? তেজের আগুনে উজ্জ্বল যে জীবন, সেই তো সত্য।

জ্যোতি বাবুর ভবিষ্যতের জল্পনা-কল্পনায় মাসিমার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইল। তিনি কহিলেন, "হাঁ,

উন্নতির চেষ্টা করবে বৈ কি। এ হলো পুরুষের কথা, মানুষের কাজ। তোমার মত উদ্যমশীল ছেলে আমি ভালবাসি, জ্যোতি। যারা অলস, 'মিন্‌মিনে', তারা কি মানুষ? তারা হলো অসার ছাইয়ের গাদা। তাদের দিয়ে কোন কাজের আশা নেই!"

মাসিমার বাক্যস্রোতে বাধা দিয়া অসহিষ্ণু ভানু সহসা প্রস্তাব করিয়া বসিল, "জ্যোতিদা, খেলতে চলো। সন্ধ্যে হয়ে গেল যে! আজ একটুও খেলা হলো না।"

মাসিমা ছেলেকে প্রচণ্ড ধমক দিলেন, "হুজুগ্ না হলে থাকতে পারো না! কীর্ত্তিমান্ হয়েছ! যাও, অঙ্ক নিয়ে বসোগে। পাঁচটা অঙ্ক কষে পরে অন্য কথা বলো।"

মাসিমার আদেশ বেদবাক্যতুল্য! এক মিলি ভিন্ন এ পরিবারে আর কাহারো সাধ্য নাই তাহা লঙ্ঘন করে!

মলিন মুখে হাতের র‍্যাকেটখানা ঘুরাইতে ঘুরাইতে ভানু চলিয়া গেল।

মাসিমা জ্যোতি বাবুকে কহিলেন, "তোমরা বসো, আমি ভানুকে গোটাকতক অঙ্ক দিয়ে আসি। ছেলেটা ফাঁকিবাজ হয়েছে, চোখের আড়াল হলে কিছু করতে চায় না। কল্প, আমার বোনার কাঠি থেকে ক'টা 'ঘর' সরে গেছে, ঠিক করে দেবে, চল।"

মাসিমা উঠিলেন। জানি, বোনার ওস্তাদ মাসিমার ভুল হইতে পারে না! মিলিকে নিভৃত আলাপের সুযোগ দিবার জন্য কৌশলে আমাকে সরাইতে চান। মিলি একা শুধু জ্যোতি-বিহঙ্গকে লুব্ধ করিতে জাল বিস্তার করিতেছে না, মাসিমারও চেষ্টার ত্রুটি নাই সে-দিকে! ব্যাধবৃত্তি কেবল বনচারী অনার্য্যের পেশা নয়, সভ্য সমাজেও ইহার প্রভাব কতখানি বিস্তৃত হইয়াছে, কে তাহার সন্ধান রাখে!

[ক্রমশঃ

শ্রীমতী গিরিবালা দেবী।

ফিরে চল

নগরে-সৌধে প্রাসাদে-দেউলে সান্ত্বনা নাহি পাই!
ঝিল্লী-মুখর পল্লীর বুকে চল পুনঃ ফিরে যাই।
যেথা নাহি পথে জন-কোলাহল,
ঘর্ঘর রথ চলে না কেবল,
আকাশ উদার, বায়ু চঞ্চল, চল সেথা ফিরে যাই!
নগরে-সৌধে প্রাসাদে-দেউলে সান্ত্বনা নাহি পাই!

যেথা ডাকে পিক্ ফিঙে বুলবুলি, শ্যামা দেয় ডালে শিস্,
সালিখেরা বসে মাঠে দল বেঁধে করে যেথা মজলিস্,
তড়াগে যেথায় সাঁপলা-শালুক—
হেরি আনন্দে ভরে ওঠে বুক,
বন-মর্ম্মরে জাগে কৌতুক,—চল সেথা ফিরে যাই।
নগরে-সৌধে প্রাসাদে-দেউলে সান্ত্বনা নাহি পাই।

জন-অরণ্য মিথ্যা অসার—দানিয়াছে পরিচয়,
ধূলি পাণ্ডুর রুক্ষ মুরতি, দেয়া-নেয়া বিনিময়!
আছ হেথা শুধু দিতে বলিদান,
প্রতি-নিশ্বাসে হারাইতে প্রাণ;
কৃত্রিম তার হোক্ অবসান,—চল গ্রামে ফিরে যাই।
নগরে-সৌধে প্রাসাদে-দেউলে সান্ত্বনা নাহি পাই।

আজি নগরের অন্তর-তলে গুমরিয়া ওঠে ত্রাস!
ফিরে চল সবে পল্লীর গেহে, তারে ফিরে ভালোবাস!
সৃষ্টির আদি যুগ হতে যার
ফুলে ও ফশলে রূপ অবিকার—
পলি-মাটী, জল, বন-কান্তার, চল সেথা ফিরে যাই।
নগরে-সৌধে প্রাসাদে-দেউলে সান্ত্বনা নাহি পাই।

শ্রীকমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (এম্-এ, বি-কম্)

ঘুমের বিধি

রূপ-যৌবনকে অটুট রাখতে হলে বিচার করে খাদ্য-পানীয় গ্রহণ, নিয়মানুবর্ত্তিতা, এবং ব্যায়ামের যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন দেহ-যন্ত্রটিকে নিয়মিত বিশ্রাম দেওয়া। বিশ্রামের এ ব্যবস্থা বিধি-দত্ত—না হলে দিন ও রাত্রিকে কৃত্রিম উপায়ে মানুষ আজ যতই একাকার করে তোলবার প্রয়াস পাক, আমোদ-উল্লাসে আমাদের দেহ-মন অবসাদে ভরে ওঠে, এবং দু'চোখ নিদ্রাঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে আমোদ-উল্লাস-উপভোগে অপটু করে তোলে।

নিদ্রা-সুখটুকু পরম যত্নে যিনি উপভোগ করতে জানেন, জরা বা বার্দ্ধক্য-ভারে তাঁর দেহ কোনো কালে পীড়িত হবে না—এ কথা বৈজ্ঞানিকেরা বেশ জোর-গলায় বলেন। নিদ্রা-সুখ উপভোগ করতে হলে তাঁরা বলেন, কয়েকটি বিধি-নিষেধ মানা প্রয়োজন। সকলের আর্থিক অবস্থা এক-রকমের নয়,—তার উপর কাজ-কর্ম্মের নানা পার্থক্য-বশতঃ নিদ্রার সময়-সম্বন্ধেও হয়তো সকলে একই বিধি পালন করতে পারবেন না! এ জন্য যে সব ত্রুটি অপরিহার্য্য, সে সব ত্রুটি সত্ত্বেও কয়েকটি সাধারণ বিধি মেনে চলা সকলের পক্ষে সম্ভব। আমরা আজ কতকগুলি সাধারণ বিধি-নিষেধের কথা বলছি।

গায়ে একরাশ জামা বা ভারী লেপ-কাঁথা-কম্বল চাপিয়ে কখনো শোবেন না। যদি শীত করে, তবু হালকা একখানি মাত্র লেপ বা কম্বল, কিম্বা মোটা চাদর মুড়ি দেবেন। বিছানা বেশী গরম হলে অনিদ্রা রোগ হবার ভয় আছে, মনে রাখবেন। হাল্কা লেপ-কাঁথা খানিকক্ষণ গায়ে রাখবার পরেই দেখবেন, শীতের কনকনানি ঘুচে গেছে!

ঘরের সব দ্বার-জানলা বন্ধ করেও কদাচ শোবেন না। বাইরে যদি জলো বা ঝড়ো বাতাস বয়, তাহলে এবং শীত-কালেও জানলা খুলে শোবেন। শুধু দেখবেন, ঠাণ্ডা বাতাস সরাসরি গায়ে না লাগে! ঘরের জানলা কদাচ আগাগোড়া বন্ধ রাখবেন না।

শুতে যাবার ঠিক পূর্ব্বক্ষণে ব্যায়াম করবেন না। শোবার সময় কাপড়ের গ্রন্থি যেন খুব আঁট না থাকে, কষা জামা ব্লাউশ বডিস কদাচ যেন গায়ে না থাকে! ঢিলা-ঢালা আলুগা বেশে শোয়া উচিত।

যে-ঘরে শোবেন, সে-ঘরে পোষা কুকুর-বেরাল-পাখী রাখবেন না—কদাচ না! ভোরের আলো ফুটলে সে আলো তীব্র ভাবে চোখে লেগে ঘুম ভাঙ্গে—এমন ব্যবস্থা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব প্রতিকূল। কাজেই এমন ভাবে ঘরে বিছানা পাতবেন, যেন ভোরের আলো তীব্র ছটায় এসে চোখে না লাগে! স্নিগ্ধ আলোয় ঘুম ভাঙ্গা—এইটেই হলো সুব্যবস্থা।

ঢিপি-ঢাপা তোষকে বা ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে ঘুমোবেন না। কারণ, গায়ে যদি ব্যথা-বেদনা বোধ হয় বা অস্বস্তি ধরে, তাহলে ঘুম স্বচ্ছন্দ হবে না। ঘুমের সময় দেহকে স্বচ্ছন্দ রাখতে হবে।

ঘুম ভাঙ্গাবার জন্য ঘড়িতে অনেকে এ্যালার্ম দিয়ে সেই ঘড়ি মাথার কাছে রাখেন। এ্যালার্মের তীব্র রবে ঘুম ভাঙ্গা—স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রতিকূল। এ্যালার্ম দিয়ে ঘড়ি রাখতে চান্, রাখুন—কিন্তু শোবার ঘরের বাইরে সেটি রাখবেন। তীব্র আলো চোখে লেগে ঘুম ভাঙ্গা যেমন দোষের, তীব্র শব্দে বা কারো উচ্চ আহ্বানে ঘুম ভাঙ্গাও তেমনি দোষের।

ঘুম যদি না হয়, তবু ঘুমের জন্য কদাচ ঘুমের ওষুধ খাবেন না। ওষুধের ঘুমে শুধু সহজ ঘুম নয়—অকালে কাল-ঘুম আসতে পারে!

যদি সম্ভব হয়, ঘুমোতে যাবার সময় বিছানায় বই খুলে পড়বার প্রয়াস কদাচ করবেন না। কবিতা বা হাল্কা গল্প বলুন, আর ডিটেক্‌টিভ নভেল কিম্বা দার্শনিক বা গুরুগম্ভীর সাহিত্য বলুন, কোনো-রকম বই এ সময়ে পড়া ঠিক নয়। বই পড়তে পড়তে ঘুম আসতে পারে—কিন্তু বই পড়ার ফলে সে-ঘুমে আমাদের মন স্বচ্ছন্দ সুস্থ থাকতে পারে না—বইয়ের বিষয়-বস্তু আমাদের অজ্ঞাতে মনকে জর্জ্জরিত করে তোলে।

মাঝ-রাত্রে যদি ঘুম ভেঙ্গে যায়, তাহলে আবার সে-ঘুমের দেখা পাওয়া অনেক সময় কষ্টকর হয়ে ওঠে। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, যদি এমন ঘটে, তাহলে একটু গরম দুধ খাবেন,—ও-অবস্থায় ঘুমের পক্ষে এমন অমোঘ ঔষধ আর নেই। ঠাণ্ডা জল খেলেও ফল পাবেন, কিন্তু গরম দুধ একেবারে অমোঘ! গরম দুধ খেয়ে বিছানায় শোবামাত্র অচিরে ঘুম এসে দু' চোখে মায়ার পরশ বুলিয়ে দেবে।

ঘুমকে ফিরিয়ে আনবার আর একটি উপায়ের কথা বলি।

ঘুম ভেঙ্গে গেছে, ঘুম আসছে না? এক কাজ করুন —মনে এতটুকু দুশ্চিন্তা না জাগিয়ে মাথার বালিশের উপর আর একটা বালিশ চাপান—বেশ উঁচু হলো তো! এবার এই উঁচু বালিশে কাঁধ আর মাথার ঠেশ রেখে একটু উঠে শোবেন—এমনি ভাবে কিছুক্ষণ থাকতে থাকতে দিব্যি ঘুমিয়ে পড়বেন।

দুশ্চিন্তা ও ব্যাধি—প্রধানতঃ এই দু'টি কারণ থেকেই অনিদ্রার উৎপত্তি। দুশ্চিন্তায় সমস্যা-প্রতিকারের উপায় যখন মিলবে না, তখন ঘুমোবার সময় দুশ্চিন্তাকে নাই বা মনে স্থান দিলেন! বলবেন, কথাটা বলা সহজ, কিন্তু— এ কথা মানি, কিন্তু মনের উপর একটু জোর করুন, মনে দুশ্চিন্তা জাগবার উপক্রম হবামাত্র মনকে শাসন করুন! বলুন, না, যা হবার হবে,—ঘুমের সময় দুশ্চিন্তা নয়! দেখবেন তাতে সুফল মিলবে।

সুগভীর মস্তিষ্ক-চালনার অব্যবহিত পর-ক্ষণে ভারী মন নিয়ে বিছানায় এসে শোবেন না। পাঁচ-দশ মিনিট বাতাসে একটু বেড়াবেন। দেখবেন, মাথা হালকা হবে, ঠাণ্ডা হবে, এবং দু' চোখ অচিরে ঘুমে আচ্ছন্ন হবে।

ঘুমের কথা বলছি এই জন্য যে, ঘুম আমাদের দেহ-মনে আরাম বহে আনে। সে বিরাম-আরামে দেহ-মনের স্বাস্থ্য থাকে ভালো—দেহ-মনের যৌবন থাকে অক্ষত। বার্দ্ধক্য বা জরার আক্রমণকে প্রতিরোধ করতে ঘুমের শক্তি অসাধারণ!

—

পায়ের দাম

পায়ের উপরেই আমাদের দেহের ভর! দাঁড়ানো এবং চলার ভঙ্গী যদি বিকৃত হয়, তাহা হইলে দেহের বাঁধনের বিকৃতি ঘটে। শুধু বিকৃতিই নয়,—দেহের স্বাস্থ্য হয় ক্ষুণ্ণ, মেজাজ হয় রুক্ষ। কাজেই পায়ের দাম সামান্য নয়!

পা দু'খানিকে তাই সুস্থ রাখা দরকার, মজবুত করা প্রয়োজন। দু' পা হাঁটিলে যাঁদের পা টনটন করে, ঐ পা-টনটনানির জন্য অস্বস্তিতে তাঁদের ভ্রূ হয় কুঞ্চিত, ললাটে পড়ে চিন্তার রেখা। এবং এ চিন্তার রেখা জমাট বাঁধিয়া মুখের কমনীয়তা নাশ করিয়া মুখকে একেবারে 'পাকা' কদর্য্য করিয়া তোলে।

মুখে-হাতে সাবান মাখিয়া মুখ-হাতের পরিচর্য্যা করিতে আমরা অনেকখানি সময় ব্যয় করি; কিন্তু পায়ের পরিচর্য্যার দিকে আমাদের আলস্য ও ঔদাস্যের সীমা নাই!

পায়ের পরিচর্য্যার জন্য চাই—বাহিরে ঘুরিয়া বাড়ী ফিরিবামাত্র দুই পা ভালো করিয়া জলে ধোওয়া—তার পর শুকনো গামছা বা তোয়ালে ঘষিয়া দুই পায়ের জল মোছা। এই ঘর্ষণ-মর্দ্দনে পায়ের স্বাস্থ্য ভালো থাকিবে—পা পরিষ্কার থাকিবে। প্রত্যহ একবার করিয়া পায়ে সাবান দিয়া (পায়ের তলাও বাদ পড়িবে না) ঈষদুষ্ণ জলে পা ধুইবেন। তার পর গামছা বা নরম তোয়ালে চাপড়াইয়া—ঘষিয়া নয়—পায়ের জল মুছিবেন। আঙুলের গলিও যেন এ-পরিচর্য্যায় বঞ্চিত না হয়। পায়ের জল মুছিয়া পায়ে পাউডার দিবেন। হাঁটিয়া দুই পা যদি শ্রান্ত হয়, তাহা হইলে বাড়ী ফিরিয়া ঈষদুষ্ণ জলে পাঁচ হইতে পনেরো মিনিট কাল দুই পায়ের তলা ভিজাইয়া রাখিবেন। ভিজাইয়া রাখিবার পর তোয়ালে বা গামছা অতি মৃদুভাবে ঘষিয়া পায়ের জল মুছিবেন।

অনেকের রোগ আছে, যা-তা ছুরি চালাইয়া পায়ের কড়া বা নখের কোণ কাটেন। কড়া বা নখ কাটিবার পূর্ব্বে জলে খানিকক্ষণ কড়া ও নখ ভিজাইয়া তার পর ধারালো ছুরি বা ক্ষুরের ব্লেড দিয়া সাবধানে কাটিবেন। কাটিবার পর একটু আয়োডিনের প্রলেপ দিবেন। তাহা হইলে ব্যথা-বেদনা বা 'সেপটিক' হইবার আশঙ্কা থাকিবে না!

এক-জোড়া মোজা না কাচিয়া পর-পর পায়ে আঁটিবেন না। একবার পায়ে দিবার পর মোজা কাচিবেন; কাচিয়া তবে সে-মোজা আবার ব্যবহার করিবেন।

যে-জুতা পায়ে দিলে পায়ের কোথাও চাপ ধরে বা কষা বোধ হয়, কিম্বা এতটুকু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, সে-জুতা কদাচ ব্যবহার করিবেন না। সে জুতা পায়ে দিলে 'পায়ের মাথা' খাইয়া বসিবেন—এ কথা যেন মনে থাকে!

সরু-ছুঁচোলো-মুখ জুতা কদাচ পায়ে দিবেন না। যে-জুতা পায়ে দিলে আঙুল চাপিয়া থাকে, সে-জুতা জানিবেন পায়ের যম!

তার পর পায়ের পরিচর্য্যার জন্য চাই প্রত্যহ খানিকটা করিয়া হাঁটা। সপ্তাহে এক দিন করিয়া খুব খানিকটা হাঁটা-পাড়ি দিলে পায়ের স্বাস্থ্য ভালো থাকিবে!

যখনই সুবিধা পাইবেন, ঘষিয়া ঘষিয়া পায়ের দলন-মলন করিবেন। সে-কালে বিলাসী বাবুর দল চাকর দিয়া পা টিপাইতেন। এ পরিচর্য্যা অনেকে এখন পছন্দ করেন না! তাছাড়া মেয়েরা কোনো কালে এমন করিয়া পা টিপাইতে পারিবেন না!

উপরে পা টেপার কথা বলিলাম, সে টেপার সঙ্গে চাই পায়ের স্বাস্থ্যের জন্য নিত্য নিয়মিত ব্যায়াম। সেই ব্যায়াম-প্রণালীর কথা বলিতেছি—

এ ব্যায়ামের জন্য চাই ভারী একখানি চেয়ার। চেয়ার এমন ভারী হইবে যেন তাহাতে দেহের ভর সয়!

১। দু'হাতে চেয়ার ধরিয়া ১ নং ছবির ভঙ্গীতে দাঁড়ান। দুই পায়ের গোড়ালি থাকিবে ঐ ছবির মতো। তার পর পা দুখানিকে সুদৃঢ় করিয়া কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত দেহের উর্দ্ধ-ভাগ সামনে-পিছনে জোরে জোরে হেলাইতে-

১। দুই গোড়ালির ভর

২। প্রথমে ডান পায়ের গোড়ালি

৩। নাচের ভঙ্গীতে

দুলাইতে থাকুন। দুই গোড়ালির উপর দেহের ভর থাকিবে,—পা আদৌ নড়িবে না। এ ব্যায়াম করিবেন অন্ততঃ পাঁচ মিনিট।

২। এবার ২ নং ছবির ভঙ্গীতে দাঁড়ান। চেয়ার ধরিয়া দাঁড়াইবেন। প্রথমে ডান পায়ের গোড়ালির উপরে সারা দেহের ভর রাখিবেন,—এ-সময় ডান পা ঈষৎ নুইয়া থাকিবে। বাঁ পা তুলিবেন; পায়ের গোড়ালি হইতে আঙুলের ডগা পর্য্যন্ত সমান-প্লেনে মেঝে ছুঁইয়া থাকিবে (২ নং ছবিতে যেমন দেখিতেছেন এমনি ভাবে)। সমস্ত দেহ তুলিয়া ত্বরিতে মৃদু তালে লাফ দিবেন। লাফ দিবার সময় প্রথম-দফায় ডান পায়ের গোড়ালির উপর সারা দেহের ভর থাকিবে এবং বাঁ পা মেঝে ছুঁইয়া থাকিবে; এবং পরক্ষণে বাঁ পায়ের গোড়ালি তুলিবেন ও ডান পা মেঝে ছুঁইয়া থাকিবে। এই ভাবে বেশ দ্রুত-তালে পর্য্যায়ক্রমে দুই পায়ের গোড়ালি তোলা-নামা [illegible] থাকিবে। এ ব্যায়াম করিবেন পাঁচ মিনিট।

৩। এবার চেয়ার ধরিয়া তার উপরে দেহের ব্যালান্স রাখিয়া ডান পা মেঝে ছুঁইয়া মেঝের উপর ফ্ল্যাট ভাবে রাখুন; বাঁ পা হাঁটুর কাছে ঈষৎ দুমড়াইয়া বাঁ পায়ের আঙুলগুলিকে ৩ নং ছবির ভঙ্গীতে উর্দ্ধ-মুখী রাখিবেন; তার পর গোড়ালি দিয়া মেঝে ছুঁইয়া নাচের তাল-ঠোকার ভঙ্গীতে ঠুকিতে হইবে দশ-বারো বার। বাঁ পায়ের এমনি ব্যায়াম চলিবে দু' মিনিট। তার পর ডান পা দিয়া তাল ঠোকা এবং সে সময় বাঁ পা রাখিতে হইবে মেঝের উপর ফ্ল্যাট ভাবে।

৪। এবার চেয়ার ছাড়িয়া ৪ নং ছবির ভঙ্গীতে দু'পা এমনি ফাঁক করিয়া দাঁড়ান, হাত রাখিবেন অমনি ভঙ্গীতে। তার পর দু'টি পায়ের চেটোর উপর দেহের ভর রাখিয়া দু' পায়ের গোড়ালি তুলিয়া চক্রাকারে দু' মিনিট কাল পায়চারি করুন। প্রথমে দু' মিনিট পায়চারি অভ্যাস করিবেন; তার পর রপ্ত হইলে দশ মিনিট পায়চারি।

৫। পাঁচের পর্ব্বে এ ব্যায়াম প্রথম পর্ব্বের অনুরূপ। তফাৎ শুধু এই যে, পাঁচের পর্ব্বে ৫ নং ছবির ভঙ্গীতে দুই পায়ের গোড়ালি একটু ফাঁক-ফাঁক রাখিয়া শুধু আঙুলগুলিকে পরস্পরের সম্মুখীন রাখুন। এবার

ছেলে-বহা দ্বিচক্রযান

বাইসিক্‌লে চড়িয়া বাহির হইবার সময় যদি ছোট ছেলে মেয়েদের সঙ্গে লইতে চান—বসাইতে অত ভয়-সঙ্কোচের কারণ

ছেলে-বহা বাইসিক্‌ল

নাই। সুইজারল্যাণ্ডের শিল্পীরা বাইসিক্‌লের সঙ্গে ছেলে-মেয়েদের গাড়ী আঁটিবার চমৎকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ছেলে-মেয়েদের সীট বাইসিক্‌লের হ্যাণ্ডেল বারের সঙ্গে শক্ত করিয়া আঁটিয়া তাহাতে ছেলেমেয়েদের বসাইয়া গাড়ী চালাইলে যাত্রা হইবে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

বিমান-ক্যামেরা

বিমান-পোতে উঠিয়া শত্রুর অবস্থানাদির ফটো লইবার জন্য মার্কিন-শিল্পী রবার্ট ফেরার নূতন এক-রকম ক্যামেরা-যন্ত্র নির্ম্মাণ

বিমান-ক্যামেরা

করিয়াছেন। যে-বিমানপোত ২০ হাজার ফুট ঊর্দ্ধে শূন্য-মার্গে আকাশের গা বহিয়া ঘণ্টায় ৪০০ মাইল বেগে চলিয়াছে, সে-পোত হইতে এ ক্যামেরায় সুস্পষ্ট ফটো তোলা চলে। ফটো অবশ্য রোল-ফিল্মের সাহায্যে তোলা হয়। ফোকাশ করিবার জন্য কোনো রকম কশরতির প্রয়োজন নাই। এক সেকেণ্ডে প্রায় দু'শো ফুট দীর্ঘ ছবি তোলা যায়।

রাজপথ

বেলা পড়ে এলো পৃথিবীর কালো বুকে
সন্ধ্যা-বধূরা পরিল নীলাম্বরী,
উঠিল শ্রাবণ আপন মনের দুঃসহ কৌতুকে
বন-বেতসের বুকে বুকে মর্ম্মরি!
দূরে দূরে ঐ যত দূর যায় দেখা
হে আকাশ, আজি তুমি আর আমি একা—

তোমার বিরাট্ শূন্যতা ওঠে অন্তর-তপ ভরি,
আমার সকল সঙ্কোচ-ভয় শঙ্কিত-চিত হরি
তব রাজপথ দূর-দিগন্তে হারালো আপন কায়া!
দুই ধারে পড়ে গোধূলি-বেলার স্বর্ণ-শ্যামল ছায়া,
রক্তপতাকা ওড়ে গোধূলির ধূম্র ললাট'পরে
সুদূর দিগন্তরে!

হে আকাশ, আজি তোমার প্রবেশ-পথে
দাঁড়াইনু একা আমার বিজয়ী রথে—
দেখিনু সে পথ দূরে মিশে গেছে
নাহি কোথা আঁকাবাঁকা!
তোমার পথের বক্ষ সে শুধু ক্ষমার ধূলিতে ঢাকা!

শ্রীসৌম্যেন্দ্রকুমার সান্যাল

সে-কালের সিভিলিয়ানের কথা

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু বাল্যকাল হইতেই উচ্চাভিলাষী ও স্বাবলম্বী ছিলেন বলিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অসাধারণ উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে অবস্থান কালে ছাত্র-জীবনেও তাঁহার সাহস ও উচ্চাভিলাষের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তিনি তাঁহার স্মৃতি-কথায় লিখিয়াছেন, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে প্রিন্স অফ ওয়েলস্ (পরে রাজা সপ্তম এডোয়ার্ড) জটিল আন্ত্রিক জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহার জীবন বিপন্ন হইয়াছিল; এ জন্য তাঁহার সংবাদ জানিবার আশায় ইংলণ্ডের সকল লোক প্রত্যহ আগ্রহভরে তাঁহার স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত বুলেটিনের প্রতীক্ষা করিত। দীর্ঘকাল পরে সকলে জানিতে পারিল, আর তাঁহার জীবনের আশঙ্কা নাই, কিছু দিন শয্যাগত থাকিয়া তিনি আরোগ্য লাভ করিবেন। অবশেষে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে স্থির হইল যে, তিনি আরোগ্যলাভ করায় জনসাধারণ কর্ত্তৃক সেণ্টপলের গীর্জ্জায় বিশেষ উপাসনার ব্যবস্থা করা হইবে। ইহা সেই সময়ের একটি স্মরণীয় ঘটনা। কৃষ্ণগোবিন্দ সেই সময়ে লণ্ডনে ছিলেন; তাঁহার আগ্রহ হইল, এই উপাসনার সময় তিনি সেণ্টপলের গীর্জ্জায় উপস্থিত থাকিয়া সকল অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করিবেন। আমাদের দেশের অনেক লোক নানা উপলক্ষে সে সময় লণ্ডনে ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কেহই সেই সভা-সন্দর্শনের প্রার্থনা করিতে সাহস করেন নাই; কারণ, তাঁহাদের সেই চেষ্টা সফল হইবে তাঁহারা এরূপ আশা করিতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য, কোন সাধারণ লোকের সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না। কৃষ্ণগোবিন্দ তখন সাধারণ ছাত্র মাত্র, তাঁহার কোনরূপ প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল না, এবং সেই সভায় যোগদানের কোন অধিকারও ছিল না; কৃষ্ণগোবিন্দের নিজের কথায়—I was only a student without position or influence and had no right to hope for admission—কিন্তু তথাপি তাঁহার সঙ্কল্প শিথিল হইল না। তিনি সভায় প্রবেশের জন্য অনুমতি পত্র প্রার্থনায় ইণ্ডিয়া-আফিসে আবেদন করিলেন। সেই আবেদন-পত্রে তিনি লিখিলেন—তিনি মহারাণীর এক জন নগণ্য প্রজা, সুদূর ভারত হইতে ইংলণ্ডে আসিয়াছেন; এই জাতীয় উৎসবে যোগদানের নিমিত্ত তাঁহার প্রবল আগ্রহ হইয়াছে, এ জন্য তিনি অনুমতিপ্রার্থী।

কৃষ্ণগোবিন্দ লিখিয়াছেন, তিনি এই মর্ম্মে আবেদন-পত্র পাঠাইলেন বটে, কিন্তু তিনি যে কোন অনুকূল উত্তর পাইবেন, মুহূর্ত্তের জন্যও এরূপ আশা করিতে পারিলেন না; তথাপি যথাসময়ে তাঁহার নামে একখানি বৃহৎ সরকারী লেফাপা আসিয়া পড়িল। তিনি আনন্দে ও বিস্ময়ে তাহা খুলিয়া দেখিলেন—তাহার ভিতর একখানি কার্ড; সেই ভজনালয়ের যে অংশে প্রসিদ্ধ বৈদেশিকগণের উপবেশনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সেই অংশেই তাঁহার উপবেশনের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

অতঃপর নির্দ্দিষ্ট দিন প্রভাতে কৃষ্ণগোবিন্দ একখানি সাধারণ ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া গীর্জ্জার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন—শত শত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নানাপ্রকার ঘরের গাড়ীতে গীর্জ্জার সম্মুখস্থ পথ আচ্ছন্ন হইয়াছে। সেই সকল গাড়ীর নিকট তাঁহার 'পুষ্পক-রথ'কে অগ্রসর হইতে দেখিয়া পুলিশের দল 'মার মূর্ত্তি' হইয়া উঠিল, এবং তাহাদের মন নানা সন্দেহে পূর্ণ হইল। তাহারা তাঁহার গাড়ী সেই স্থান হইতে বিতাড়িত করিতে উদ্যত হইলে তিনি তাঁহার কার্ড বাহির করিয়া তাহাদের সম্মুখে ধরিলেন। যখন তাহারা বুঝিতে পারিল—কার্ডে কোনরূপ কৃত্রিমতা নাই, তখন তাঁহাকে অগ্রসর হইবার অনুমতি প্রদান করিল। তিনি গীর্জ্জার ভিতর তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট আসন সহজেই খুঁজিয়া পাইলেন; কিন্তু তাঁহার চারি দিকেই অভিজাত সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের সমাগম দেখিয়া তিনি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন।

সেই সময় তিনি গীর্জ্জার ভিতর যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহা বিপুল সমারোহপূর্ণ; কিন্তু অতঃপর যে সকল অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল, তাহা সকলই তিনি সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন। গীর্জ্জার কেন্দ্রস্থলে বেদীর উপর রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া, প্রিন্স অফ ওয়েলস এবং রাজপরিবারস্থ সকলে উপবিষ্ট ছিলেন; তাঁহাদের সম্মুখে নিম্নস্থিত মেঝের উপর পার্লামেণ্টের লর্ড ও কমন্স সভার সদস্যগণ আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অস্থায়ী গেলারীগুলি নানা শ্রেণীর বিখ্যাত দর্শকবৃন্দে পূর্ণ। অনুষ্ঠান শেষ হইলে তিনি প্রফুল্ল হৃদয়ে বাসায় ফিরিলেন; কিন্তু তাঁহার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইল যে, বিনাচেষ্টায় কোন কার্য্যই সফল হয় না, এবং যাহা প্রথমে অসম্ভব মনে হয়, প্রাণপণ চেষ্টায় তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়।

কৃষ্ণগোবিন্দ লিখিয়াছেন, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে কর্ণেল অলকট বহরমপুর পরিদর্শন করেন। মাদাম ব্লাভাটাস্কি থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাত্রী হইলেও কর্ণেল অলকটই প্রথমে ইহা ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রচারিত করিয়াছিলেন; কিন্তু এই ধর্ম্ম এ দেশের শিক্ষিত সমাজেই সীমাবদ্ধ ছিল, এবং ব্রাহ্ম সমাজের অনেকে এই ধর্ম্ম আলিঙ্গন করায় ব্রাহ্মসমাজ যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। বহরমপুরের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিও এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কর্ণেল অলকটের সহিত একাধিকবার কৃষ্ণগোবিন্দের আলোচনা হইয়াছিল; তিনি কৃষ্ণগোবিন্দকে ভজাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। (tried to initiate) কৃষ্ণগোবিন্দ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, ধর্ম্মের মূলনীতি-সংক্রান্ত সকল কথা না জানিয়া তিনি দীক্ষাগ্রহণে অসমর্থ। কিন্তু কর্ণেল অলকট বলেন, 'আগে দীক্ষা গ্রহণ কর, পরে ও সব জানিতে পারিবে।' সুতরাং তাঁহার প্রস্তাবটি অবশেষে 'মাঠে মারা' যায়! যাঁহারা থিয়সফিষ্ট হইতেন, তাঁহাদিগকে জাতি অথবা সমাজ ত্যাগ করিতে হইত না; আচার-ব্যবহারও পরিবর্ত্তন করিতে হইত

না। এই জন্ত যে সকল শিক্ষিত হিন্দু যুবক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিতে সাহস করিতেন না, তাঁহারা অসঙ্কোচে খিয়সম্বিষ্ট হইয়া আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেন।

অতঃপর ইলবার্ট বিল সম্বন্ধে কৃষ্ণগোবিন্দ যাহা লিখিয়াছেন—আমরা তাহারই আলোচনা করিতেছি। এই সময় ইলবার্ট বিল লইয়া এ দেশে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। মিঃ ইলবার্ট ভারত সরকারের আইন-সদস্ত ছিলেন; এ জন্ত তিনি বড়লাটের কাউন্সিলে একটি ক্ষুদ্র বিল পেশ করেন। সে-কালে এ দেশে য়ুরোপীয় ও এ দেশী সিভিলিয়ানগণের ভিতর এই পার্থক্য ছিল যে, এ দেশের কোন য়ুরোপীয় বৃটিশ প্রজা (Europian British Subject) ফৌজদারী আদালতে অভিযুক্ত হইলে, কোন ভারতীয় সিভিলিয়ানেরই তাহার বিচার করিবার অধিকার ছিল না। এই পার্থক্য দূর করিবার জন্তই মিঃ ইলবার্টের এই বিল। এই বিলের কথা শুনিয়া এ দেশপ্রবাসী শ্বেতাঙ্গদল ক্রুদ্ধ যণ্ডের ন্তায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইল; এমন কি, আর্ম্মাণী ও ইহুদীরাও (শ্বেতচর্ম্ম বলিয়া?) এই দলে ভিড়িয়া পড়িল! দেশের যেখানে দুই-চারি জন শ্বেতাঙ্গ ছিল, তাহারাই সভা করিয়া এই মর্ম্মে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল যে, এই বিল আইনে পরিণত হইলে আর রক্ষা নাই; যত গো-বেচারা য়ুরোপীয় পুরুষ ও নারী কঠোরপ্রকৃতি এদেশী ম্যাজিষ্ট্রেটগুলার বিচারে পালে পালে জেলে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইবে! এই আন্দোলনের ফলে শ্বেতাঙ্গে ও কৃষ্ণাঙ্গে দীর্ঘকালের সম্প্রীতিও বিলুপ্ত হইল। ইংরেজ-পরিচালিত সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাগুলি দেশীয়-বিদ্বেষের হলাহলে পূর্ণ হইতে লাগিল। বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রভৃতি মনীষিবর্গের লেখনীও শ্লেষবর্ষণে উদাসীন রহিল না। কলিকাতার ইংরেজ সদাগর কেস্উইক ইংরেজের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহাদের মুকুটহীন রাজা হইয়া বসিল! ব্রান্সন নামক ফিরিঙ্গী ব্যারিষ্টার আক্রোশ প্রকাশ করিয়া চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিল। বাগ্মীশ্রেষ্ঠ লালমোহন ঘোষ প্রকাশ্য সভায় সরস ভাষায় তাহাদের মুখের মত উত্তর দিয়া দেশের শিক্ষিত সমাজকে আনন্দদান করিলেন। যাহা হউক, অবশেষে এক রকমে আপোষ হইয়া গেল! কিন্তু এই আন্দোলনের পর হইতেই আমাদের ভারতবাসীর হৃদয়ে স্বদেশপ্রেমের বীজ উপ্ত হয়, এবং তাহাই কালে মহা মহীরুহে পরিণত হয়। কৃষ্ণগোবিন্দ বলেন, "the spirit of nationalism has, in less than four decades, grown into an outspreading tree." এই স্বদেশ-প্রেমের নিদর্শন ভারতীয় মহাসমিতি; ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বে নগরে ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। ভারতের রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপন তাঁহার স্বদেশবাসী কর্ত্তৃক প্রকাশ্য ভাবে অবজ্ঞাত হইলেও সর্ব্বত্রই ভারতবাসী কর্ত্তৃক সম্মান সহকারে অভিনন্দিত হইয়াছিলেন। তিনিই ভারতে সর্ব্বপ্রথম স্বায়ত্ত-শাসনের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁহার পূর্ব্বে লর্ড ক্যানিং ভিন্ন অন্ত কোন রাজপ্রতিনিধি তাঁহার ন্তায় ভারতবাসীর হৃদয় অধিকার করিতে পারেন নাই।

কৃষ্ণগোবিন্দ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার চাকরীর দশম বর্ষে কালেক্টরের কার্য্যভার পাইয়া বহরমপুর হইতে বদলী হইয়াছিলেন! এই সময়ে সিভিলিয়ানদিগের 'প্রমোসন' হইতে অনেক সময় লাগিত। কৃষ্ণগোবিন্দ পুরীর কালেক্টর হইয়া প্রথমেই লবণের কারখানাগুলি যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহা এ-কালের জনসাধারণের অজ্ঞাত, এবং তাহা আলোচনা-যোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন, এপ্রিল ও মে মাসই লবণ-প্রস্তুতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময়, এবং এই সময়েই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লবণ প্রস্তুত হইত। চিল্কা হ্রদের পূর্ব্ব-তট হইতে সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ পলিতে পূর্ণ, সেই সকল স্থানেই লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী অত্যন্ত সহজ। বর্ষারম্ভের পূর্ব্বে গ্রীষ্মের যে কয় মাস সূর্য্য-কিরণ অত্যন্ত প্রখর থাকে, সেই সময় লবণাক্ত জলরাশি সঙ্কীর্ণ খালের সাহায্যে সেই সকল স্থানে সঞ্চিত হয়, এবং সেই জল সূর্য্যের উত্তাপে শুষ্ক করিয়া লবণ প্রস্তুত করা হয়। আট-দশ দিন পরে তাহার উপর সঞ্চিত লবণ-স্তর তুলিয়া-লইয়া গাড়ীর সাহায্যে গুদামজাত করা হয়; তাহার পর সেই সকল স্থানে পুনর্ব্বার লবণাক্ত জল সঞ্চয় করা হয়। এই উপায়ে সংগৃহীত লবণ 'করকচ' লবণ নামে অভিহিত। এতদ্ভিন্ন, লবণাক্ত জল জ্বাল দিয়া যে লবণ প্রস্তুত করা হয়, তাহার নাম 'পাঙ্গা' লবণ। এক সময় কটক হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ সমুদ্র-উপকূলে প্রচুর পরিমাণে পাঙ্গা লবণ প্রস্তুত হইত; কিন্তু তাহার প্রস্তুত-প্রণালী করকচ লবণ অপেক্ষা অধিক ব্যয়সাধ্য বলিয়া চে-সায়ার হইতে আমদানী লবণের সহিত প্রতিযোগিতায় তাহা সুবিধা লাভ করিতে পারে নাই। চে-সায়ার হইতে যে সকল লবণ আমদানী হয়, তাহাও পাঙ্গা লবণেরই প্রকার-ভেদ; কিন্তু তাহা অধিকতর বিশুদ্ধ এবং সুলভ। এই জন্ত বাঙ্গালা দেশ এখন এই লবণের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।

বোম্বে ও মান্দ্রাজে করকচ লবণ প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে। এই দুই প্রদেশে রপ্তানী লবণ অতি অল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। পুরীর উত্তরাংশে করকচ লবণ কোন সময়েই প্রস্তুত হইত না; প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাই ইহার কারণ। কিন্তু চে-সায়ারের লবণ এ দেশের বাজার আচ্ছন্ন করিবার পূর্ব্বে করকচ লবণই বাঙ্গালায় প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইত, এবং চিল্কার নিকট হইতে লক্ষ লক্ষ মণ করকচ লবণ কলিকাতায় আমদানী করা হইত। কিন্তু পরে কলিকাতায় তাহার রপ্তানী বন্ধ হয়, এবং যে অল্প পরিমাণ লবণ প্রস্তুত হইত, তাহা কেবল উড়িষ্যাতেই ব্যবহৃত হইত। উড়িষ্যায় যে সময় লবণ প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইত, সেই সময় পুরীর কালেক্টর তাঁহার বেতন ব্যতীত লবণ-শুল্ক হইতে অনেক টাকা অতিরিক্ত পারিশ্রমিক পাইতেন।

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু যে সময় পুরীর কালেক্টর, সেই সময় খুর্দ্দা মহকুমায় যিনি সেট্‌লমেণ্ট অফিসার ছিলেন, তাঁহার নাম মিঃ ডবলু. সি. টেলার; মিঃ টেলার বংশমর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ হইলেও প্রথমে এক সাঁওতাল যুবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই স্ত্রীর গর্ভে তাঁহার কয়েকটি সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; মিঃ টেলার তাহাদিগকে উচ্চশিক্ষা দান করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পুত্রগুলি ভাল সরকারী চাকরী পাইয়াছিল। সরকারের কোন য়ুরোপীয় কর্ম্মচারী এ দেশের নিম্নশ্রেণীর রমণীকে বিবাহ করিয়া, তাহার গর্ভজাত সন্তানগুলিকে উচ্চ শিক্ষাদান করিয়া সরকারী চাকরীতে নিযুক্ত করিয়াছেন, এ দেশে এরূপ দৃষ্টান্ত একান্ত বিরল!

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কৃষ্ণগোবিন্দ পুরীর কালেক্টরের

হইয়াছিলেন। কটকের কালেক্টর মিঃ জোন্‌স অত্যন্ত অলস কর্ম্মচারী ছিলেন বলিয়া তাঁহার বিস্তর কাজ মুলতুবি পড়িয়াছিল; কৃষ্ণগোবিন্দকে তাঁহার 'ফাইল'—পরিষ্কার করিবার জন্ম কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। কয়েক মাস পরে মিঃ জোন্‌স পুরীর কালেক্টর মিঃ কুরীর সহিত আপোষে চাকরী বদল করেন, কারণ পুরী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জিলা, এবং সেখানে কাজও অল্প। কিন্তু কয়েক মাস পরে মিঃ জোন্‌স হঠাৎ প্রাণত্যাগ করেন, এবং কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুকে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে পুনর্ব্বার পুরীর অস্থায়ী কালেক্টর নিযুক্ত করা হয়।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কৃষ্ণগোবিন্দকে কটকের জয়েণ্ট-ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করা হয়। এই বৎসর বসন্ত কালে তিনি আট মাসের ফার্লো গ্রহণ করিয়া কটক ত্যাগ করেন, এবং ১৫ই মে তারিখে বোম্বে হইতে পি এণ্ড ও কোম্পানীর 'আসাম' নামক জাহাজে ইংলণ্ডে যাত্রা করেন; কারণ এগার বৎসরের কঠোর পরিশ্রমের পর স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হওয়ায় তাঁহার বিশ্রামের প্রয়োজন হইয়াছিল। কেন্দ্রাপাড়ার অধিবাসী গোবিন্দচন্দ্র দাসের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছিল; কৃষ্ণগোবিন্দ তাঁহার পুত্র শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া বিলাতে গমন করেন। সৈয়দ বন্দরে তাঁহারা এই জাহাজ ত্যাগ করিয়া 'থেদিউন' জাহাজে আরোহণ করেন। তাঁহারা উভয়ে ৯ই জুন তারিখে প্লিমাউথ বন্দরে অবতরণ করেন। সেই দিনই অপরাহ্নে তাঁহারা লণ্ডনে উপস্থিত হইলে লালমোহন ঘোষ রেল-ষ্টেশনে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করেন। লালমোহনই রসেল-স্কোয়ারের নিকট তাঁহাদের জন্ম বাসা ঠিক করিয়াছিলেন। কয়েক দিন পরে তাঁহারা লালমোহন ঘোষের বাসার সন্নিহিত একটি সুসজ্জিত বাসায় উঠিয়া যান। লালমোহন সেখানে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা সুকুমারীর সহিত বাস করিতেছিলেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতে লালমোহন ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের কার্য্যে দুই-তিন বার ইংলণ্ডে গমন করেন; সেখানেও প্রতিষ্ঠাপন্ন বাগ্মী বলিয়া তাঁহার সুনাম প্রচারিত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ বক্তা জন ব্রাইটের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল। মিঃ জন ব্রাইট মুক্তকণ্ঠে লালমোহনের প্রশংসা করিতেন।

এইবার কৃষ্ণগোবিন্দ ইংলণ্ডে আসিয়া কয়েক জন বাঙ্গালীর বন্ধুত্ব লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে এস, পি, সিংহ (পরে লর্ড সিন্‌হা) ও সত্যরঞ্জন দাশ আইন, এবং এন, পি, সিংহ (পরে আই, এম, এস-এর কর্ণেল) ও ইউ, ডি, ব্যানার্জ্জি চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন। এই সময় আশুতোষ চৌধুরী (পরে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ও স্যর) এবং ডাক্তার এম, এন, ব্যানার্জ্জিও লণ্ডনে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। তাঁহারা লণ্ডনে কৃষ্ণগোবিন্দের প্রতিবেশী ছিলেন। এই সময় মিসেস টি, পালিত (ব্যারিষ্টার স্যর তারকনাথ পালিতের পত্নী) প্রায় প্রতি রবিবারে তাঁহার লণ্ডনস্থ ভবনে বাঙ্গালী বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিতেন। এই সময় ইংলণ্ডের রাজনীতিক্ষেত্রে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্ম ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন্‌স হইতে তিন জন 'ডেলিগেট' প্রেরিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা হইতে মনোমোহন ঘোষ, মান্দ্রাজ হইতে রামস্বামী মুদালিয়ার, এবং বোম্বাই হইতে নারায়ণ চন্দবারকার ইংলণ্ডে গমন করিয়া এই ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু অল্প দিন পরেই চন্দবারকারের মৃত্যু হয়। মিঃ চন্দ-হইয়া বোম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শিক্ষাব্রতী ও সমাজ-সংস্কারক বলিয়াও তিনি খ্যাতিলাভ করেন; কিন্তু স্বদেশপ্রেমিক বলিয়াই তিনি অধিকতর প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছিলেন। জীবনের কার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়াই তিনি ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। মনোমোহনও প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন না।

এই স্থানে কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু বিখ্যাত বাগ্মী মিঃ জন ব্রাইট সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এ-কালের বঙ্গীয় পাঠকগণের প্রীতিকর হইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন—তিনি অক্টোবর মাসে ভারতীয় ডেলিগেটগণের সহিত বার্মিংহামে মিঃ জন ব্রাইটের নিকট গমন করেন। মিঃ ব্রাইট তখন একটি বন্ধুর সহিত বার্মিংহামেই বাস করিতেছিলেন। সেখানে উদারনীতিক দলের সদস্যগণ পরম সমাদরে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করেন। এক দিন সায়ংকালে মিঃ জন ব্রাইট বার্মিংহামের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হলে বহু শ্রোতার সমক্ষে যে সভায় বক্তৃতা করেন, কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু সদলে সেই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। বক্তৃতা-মঞ্চে বক্তার পার্শ্বেই তাঁহাদের উপবেশনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সেই সন্ধ্যার স্মৃতি কৃষ্ণগোবিন্দের হৃদয়ে দীর্ঘকাল উজ্জ্বল ভাবে বিরাজিত ছিল। মিঃ জন ব্রাইট মিঃ গ্ল্যাডষ্টোনের ন্যায় দীর্ঘকায় ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার মুখের দিকে চাহিলে শ্রদ্ধায় হৃদয় পূর্ণ হইত; করুণা যেন তাঁহার মুখে ফুটিয়া বাহির হইত। তাঁহার কেশরাশি সম্পূর্ণ শুভ্র, এবং তাহা দীর্ঘ থাকায় তাঁহার মুখের ভাব মহিমাপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি বক্তৃতা করিবার জন্ম দণ্ডায়মান হইবামাত্র সেই বিশাল জনসমুদ্র যেন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, শ্রোতৃমণ্ডলী মহা উৎসাহে ও বিপুল কলরবে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিল; কিন্তু তাঁহার মুখ হইতে বাণী নিঃসারিত হইবামাত্র সভাস্থল মন্ত্রমুগ্ধবৎ সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হইল। রজতঘণ্টা-নিনাদের ন্যায় তাঁহার সুগম্ভীর ও মধুর কণ্ঠস্বর সেই সভার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, এবং তাঁহার কণ্ঠোচ্চারিত প্রাঞ্জল বাক্যলহরীতে এরূপ তেজ ও দৃঢ়তা ছিল যে, তাহা অত্যুৎসাহী শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত আলোড়িত করিয়া তুলিল। তিনি যে 'নোট' লইয়া গিয়াছিলেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া, এক ঘণ্টারও অধিক কাল ধরিয়া বর্ত্তমান রাজনীতি-প্রসঙ্গে বক্তৃতা করিলেন। তাহার পর প্রায় পনের মিনিটকাল উচ্ছ্বসিত ভাষায় ভারত সম্বন্ধে অনর্গল বক্তৃতা করিলেন। ভারতের প্রতি তাঁহার করুণা, সহানুভূতি, এবং ভারতীয় রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁহার অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া শ্রোতৃবর্গ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বসিয়া রহিলেন। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণগোবিন্দ লিখিয়াছেন, "তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া আমি এরূপ মুগ্ধ হইলাম যে, আমার মনে হইল, তাঁহার এইরূপ গৌরবমণ্ডিত বক্তৃতা শুনিবার জন্যই যদি কেহ ভারত হইতে এই দূরদেশে আগমন করেন, তাহা হইলে তাঁহার সকল শ্রম ও অর্থব্যয় সফল হয়। মিঃ ব্রাইটই যে তাঁহার সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বক্তা, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।"

অতঃপর তাঁহারা জোসেফ চেম্বারলেনের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন; কিন্তু তাঁহার ব্যবহারে সরলতা বা আন্তরিকতার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। তিনি যতক্ষণ আলাপ করিয়াছিলেন, ততক্ষণ কোন কথায় ধরা-ছোঁয়া দেন নাই; তবে বার্মিংহামে তাঁহাদের

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু য়ুরোপের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া ১৬ই ফেব্রুয়ারী জাহাজ হইতে বোম্বে নগরে অবতরণ করেন। সুয়েজ যোজক খালে পরিণত হইলে যদিও ১৮৭০ খৃষ্টাব্দেই খালের পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল, তথাপি পি এণ্ড ও কোম্পানীর জাহাজ তখন পর্য্যন্ত সুয়েজ ও আলেকজান্দ্রিয়া হইয়া 'ওভারল্যাণ্ড রুটে'ই যাতায়াত করিত; এই জন্য কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুকে এই পথেই দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে হইয়াছিল। ১৯শে ফেব্রুয়ারী তিনি বোম্বে হইতে কলিকাতায় পদার্পণ করেন। কলিকাতা হইতে তিনি ঢাকায় গমন করিয়াছিলেন। ঢাকায় আসিয়া জ্বর ও আমাশয়ে আক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে কয়েক দিন শয্যাগত থাকিতে হইয়াছিল। তাঁহার বাল্যবন্ধু প্রসন্নকুমার রায় সে সময় ঢাকা কলেজের অধ্যাপক; তাঁহাকে রোগাক্রান্ত দেখিয়া প্রসন্নকুমারের স্ত্রী সরলা রায় পরম যত্নে তাঁহার শুশ্রূষা করেন। কৃষ্ণগোবিন্দ লিখিয়াছেন—এই বন্ধু-পত্নীর পরিচর্য্যাতেই তিনি কঠোর ব্যাধির কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

দেশে প্রত্যাগমন করিয়া কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুকে কৃষ্ণনগরে জয়েন্ট-ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে যোগদান করিতে হয়। মিঃ হপকিন্স তখন নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট; কিন্তু অল্পকাল পরেই বীরভূমের ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া তিনি সিউড়ি গমন করেন। মিঃ এফ, ডবলিউ, ডিউক (পরে সার ডবলিউ, ডিউক) তখন বীরভূমের এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট। কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুকে অতঃপর কিছু দিন ফরিদপুরের কালেক্টরের কার্য্য পরিচালন করিয়া দিনাজপুরে বদলী হইতে হয়; কারণ, দিনাজপুরের কালেক্টর মিঃ এইচ, এস, বীডন আসামের কমিশনারের কার্য্যে অস্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

অতঃপর মিঃ বীডন দিনাজপুরে প্রত্যাগমন করিলে কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া পুনর্ব্বার কৃষ্ণনগর গমন করেন। কৃষ্ণনগর হইতে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে তিনি যশোহর গমন করেন। তাঁহাকে যশোহরের কালেক্টর নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু লিখিয়াছেন, দিনাজপুর ও যশোহর এই উভয় জিলা বৃহৎ হইলেও কাজ-কর্ম্ম অত্যন্ত অল্প; কারণ, ম্যালেরিয়া এই উভয় জিলার অধিবাসিগণের দেহ হইতে জীবনী-শক্তি ও উৎসাহ-উদ্যম এ ভাবে শোষণ করিয়াছিল যে, তাহারা পরস্পরের সহিত বিবাদ-বিসম্বাদে—তা দাঙ্গা-হাঙ্গামাই হউক, আর দেওয়ানী মামলাই হউক—প্রবৃত্ত হইবার সামর্থ্যে বঞ্চিত হইয়াছিল; অথচ পূর্ব্ববঙ্গের অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর ও সমৃদ্ধ জিলা সমূহের চাষী অধিবাসিগণের (peasantry) পক্ষে ইহা (মামলা মকর্দ্দমা) ব্যয়সাধ্য হইলেও চিত্তবিনোদনের উপায়! কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু স্বয়ং পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী হইয়াও স্বদেশবাসীদের প্রকৃতি সম্বন্ধে যে অভিযোগ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা সত্য বলিয়া স্বীকার করিবেন কি না জানি না; কিন্তু কোন ইংরেজ সিভিলিয়ান এই ভাবে এক ক্ষুরে তাঁহাদের মস্তক মুণ্ডন করিলে তাঁহারা সম্ভবতঃ তাহা অপমানজনক বলিয়াই মনে করিতেন। পূর্ব্ববঙ্গের যে সকল জিলার স্বাস্থ্য ভাল, এবং যাহারা সচ্ছল অবস্থাপন্ন—তাহারা মিথ্যা মামলায় মত্ত থাকিতে ভালবাসে—এরূপ দুর্নাম কখনই সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না। দেশের অনেক ভাল কাজে পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণের উদ্যম ও উৎসাহ সত্যই তস্কর, বাটপাড়, জালিয়াৎ প্রভৃতির স্বভাব-চরিত্র ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হয়, জনসাধারণের সদ্‌গুণরাশি সাধারণতঃ তাঁহাদের দৃষ্টি অতিক্রম করে।

এ-কালে যশোহর জিলার স্বাস্থ্যের অবস্থা যেরূপই হউক, অর্দ্ধ-শতাব্দীরও অধিক কাল পূর্ব্বে—কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু যে সময় যশোহরের কালেক্টর—সেই সময় তিনি যশোহর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "ইহা ভয়ঙ্কর অস্বাস্থ্যকর জিলা, ইহার সর্ব্বস্থান ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। এই জিলার নদীগুলি এক সময় স্রোতস্বিনী ছিল (flowing streams), এবং অনেক বৃহৎ ও সমৃদ্ধ গ্রাম তাহাদের তীরে প্রতিষ্ঠিত ছিল; কিন্তু এখন সেই সকল নদী শুষ্ক হইয়া রাশি রাশি জঙ্গলে আচ্ছন্ন হইয়াছে। ম্যালেরিয়ার উপদ্রব প্রত্যেক স্থানেই সুপরিস্ফুট, এবং স্ত্রী পুরুষ ও বালক-বালিকা প্রায় সকলেরই দেহে ইহার আক্রমণ-চিহ্ন সুস্পষ্ট বিদ্যমান। প্রাচীন লোক প্রায়ই দেখা যায় না, এমন কি, অধিবাসিগণের অধিকাংশই যৌবন-সীমাও অতিক্রম করিতে পারে নাই। অবস্থাপন্ন অধিবাসীরা, এবং মধ্যাবস্থার লোকও কলিকাতায় পলায়ন করিয়াছে; সাঁওতাল পরগণায় ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের প্রত্যেক ষ্টেশন স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া জনপূর্ণ হইয়াছে।"

যশোহরের কোটচাঁদপুরে তালের রস হইতে চিনি প্রস্তুত হয়। য়ুরোপীয়দিগের পরিচালিত কারখানায় এই চিনি পরিষ্কৃত হয়। নদীয়ায় এবং ফরিদপুরের সন্নিহিত স্থানসমূহেও তালের চিনি প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে; কিন্তু এই প্রদেশের অন্যান্য অংশে চিনি-প্রস্তুতের এই সুযোগ উপেক্ষিত হইতেছে—ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়। এই সকল অঞ্চলে তালের রস কেবল তাড়িরূপেই ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালার পশ্চিমাংশে অবস্থিত বর্দ্ধমান বীরভূম প্রভৃতি জিলার সর্ব্বত্র তালজাতীয় বৃক্ষ অজস্র উৎপন্ন হয়, কিন্তু দক্ষিণ-ভারতে ইহার রস হইতে প্রচুর চিনি উৎপন্ন হইলেও এই সকল স্থানে এই রসের অপব্যবহার হইতেছে; তবে প্রচুর পরিমাণে তালবৃক্ষ-রোপনে উৎসাহ প্রদান করিলে তাহাদের রস হইতে এই প্রয়োজনীয় শিল্পের উন্নতিসাধন সম্ভব।

যাহা হউক, বর্ষারম্ভের পূর্ব্বেই কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু যশোহর ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; কারণ, সেই সময় সার ষ্টুয়ার্ট বেলী সার রিভার্স টমসনের পরিবর্ত্তে বাঙ্গালার ছোটলাট হইয়া তাঁহাকে ছয় মাসের জন্য কলিকাতায় রেভিনিউ বোর্ডের জুনিয়র সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত করেন। এই পদে তাঁহার বেতন বৃদ্ধি না হওয়ায়, এবং কলিকাতায় বাস ব্যয়সাধ্য বলিয়া তিনি প্রথমে এই চাকরী গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইলেও তৎপূর্ব্বে কোন ভারতীয় সিভিলিয়ান লাটদপ্তরের এইরূপ পদে নিযুক্ত না হওয়ায়, এবং লাটদপ্তরে চাকরী গ্রহণ করিলে ভবিষ্যতে সুবিধা হইতে পারে মনে করিয়া, আর্থিক ক্ষতিসত্ত্বেও কর্ত্তৃপক্ষের সংস্রবে থাকিবার সুযোগ তিনি ত্যাগ করিলেন না। সেই সময় রেভিনিউ বোর্ডে দুই জন মেম্বর ছিলেন; প্রত্যেক্যের হস্তে কতকগুলি বিভাগের ভার ন্যস্ত ছিল, এবং প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র সেক্রেটারী ছিলেন। রেভিনিউ বোর্ডের জুনিয়ার মেম্বরের হস্তে অহিফেন, আবগারী, এবং শুল্ক বিভাগের ভার ছিল; তদতিরিক্ত তাঁহাকে আরও কোন কোন বিভাগের কার্য্য পরি-

সি, ই, বাক্ল্যাণ্ডের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সময় মিঃ এইচ, টি, এস, কটন কলিকাতা-কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হওয়ায় মিঃ বাক্ল্যাণ্ডকে তাঁহার পদে নিযুক্ত করা হয়। এক জন ভারতীয় সিভিলিয়ানকে রেভিনিউ বোর্ডে নিযুক্ত করায় সে সময় কিঞ্চিৎ আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল; কিন্তু পরে যখন সরকারের শাসন ও বিচার বিভাগের উচ্চতম পদসমূহেও ভারতবাসিগণকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল, তখন এইরূপ আন্দোলনের কি কারণ ছিল—তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

এই সময় মিঃ জন বীম্‌স রেভিনিউ বোর্ডের জুনিয়ার মেম্বর নিযুক্ত হইলে কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুকে তাঁহার সেক্রেটারীর পদ প্রদান করা হয়। মিঃ বীম্‌স সুদক্ষ কর্ম্মচারী ছিলেন; বিভিন্ন ভাষায় তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল, পারসী ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং তাঁহার লেখনীর শক্তিও অসাধারণ ছিল; কিন্তু অত্যন্ত দাম্ভিক ও দুর্দ্দান্ত মেজাজের লোক বলিয়া তাঁহার দুর্নাম ছিল। বিশেষতঃ, তিনি ভারতীয়দিগের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন। তিনি কৃষ্ণগোবিন্দের কর্ম্ম-জীবনের ক্ষতি করিবেন এরূপ আশঙ্কারও কারণ ছিল। ইহার দৃষ্টান্তও ছিল; ঐ প্রকৃতির আর এক জন—হেনরী সদারল্যাণ্ড সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু ভীত বা নিরুৎসাহ না হইয়া সাধ্যানুসারে তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। মিঃ বাক্ল্যাণ্ড এ বিষয়ে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। যাহা হউক, তিনি কিছু দিন পরেই বুঝিতে পারিলেন, মিঃ বীম্‌স তাঁহার অনুকূলই ছিলেন।

এই সময় আবগারি বিভাগের কমিশনারের পদ (excice commissionership) সৃষ্টি হয় নাই; কিন্তু ই, ভি, ওয়েষ্টমেকট আবগারি বিভাগ-সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কেবল ভারতীয় কর্ম্মচারীরা নহেন, য়ুরোপীয়েরাও মিঃ ওয়েষ্টমেকটকে সমভাবেই ঘৃণা করিতেন; কিন্তু রেভিনিউ বোর্ডের কার্য্যে আবগারি বিভাগের সহিত কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর সংস্রব থাকায় তাঁহাকে কার্য্যানুরোধে মধ্যে মধ্যে মিঃ ওয়েষ্টমেকটের সহিত দেখা করিতে হইত। তাঁহার ব্যবহার কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর অসহ্য হওয়ায় মিঃ বীম্‌স তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়া ওয়েষ্টমেকটকে সায়েস্তা করিয়াছিলেন। কিন্তু মিঃ বীমস দীর্ঘকাল বোর্ডে চাকরী করিতে পারেন নাই; কয়েক মাস পরেই তিনি কমিশনারের পদে পুনঃস্থাপিত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু লিখিয়াছেন—মিঃ বীমস্ সরকারের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া কোন কোন বে-সরকারী লোকের নিকট ঋণ করিয়াছিলেন, এই জন্যই তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। তিনি বোর্ড ত্যাগ করিবার সময় কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর অনুকূলে অনেক কথা লিখিয়াছিলেন; তাঁহার সাহায্যে তিনি যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিলেন, এ কথাও স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি বোর্ড হইতে অপসারিত হইলে বাঙ্গালার প্রথম ছোটলাট সার ফ্রেডারিক হ্যালিডের পুত্র মিঃ এইচ, এম, হ্যালিডে তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।* সেই সময় পর্য্যন্ত বড়লাটের অধীনে এক জন ডেপুটি গভর্ণরের হস্তে এই প্রদেশের শাসনভার ন্যস্ত ছিল।

মিঃ হ্যালিডে খাঁটি মানুষ ছিলেন, তাঁহার ব্যবহারও মধুর ছিল, কিন্তু তাঁহার যোগ্যতার অভাব ছিল; বিশেষতঃ, তিনি কালি-কলম একত্র করিতে ডরাইতেন, এ জন্য তাঁহার অধিকাংশ কার্য্য কৃষ্ণগোবিন্দ কাজের জন্য তাঁহাকে অসাধারণ পরিশ্রম করিতে হইত; কিন্তু মি হ্যালিডে তাঁহাকে এতই বিশ্বাস করিতেন যে, তিনি চিঠিপত্রাদির যে সকল মুসাবিদা করিতেন, ও বিভিন্ন কার্য্যের ব্যবস্থা সম্বন্ধে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিতেন, মিঃ হ্যালিডে চক্ষু মুদিত করিয়া তাহাই স্বাক্ষরিত করিতেন। তিনি দুই ঘণ্টার অধিক কাল কোন দিন আফিসে থাকিতেন না; কিন্তু কৃষ্ণগোবিন্দ তাঁহার অনুকূলে যে সকল কার্য্য করিতেন, তিনি অসঙ্কোচে তাহার সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন, এবং সকল কার্য্যেই কৃষ্ণগোবিন্দের সমর্থন করিতেন।

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু ছয় মাসের জন্য কলিকাতায় আসিয়া চারি বৎসরেরও অধিক কাল বোর্ডের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইহার মধ্যে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ছয় সপ্তাহের জন্য তাঁহাকে কালেক্টরের কার্য্য পরিচালনের জন্য মুর্শিদাবাদে গমন করিতে হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন, দুইবার তাঁহাকে বোর্ডের সিনিয়র সেক্রেটারীর কার্য্যও পরিচালন করিতে হইয়াছিল। মিঃ এ, স্মিথ, মিঃ এফ, বি, পিকক, এবং সার হেনরী হ্যারিসন পর পর বোর্ডের জুনিয়র মেম্বারের পদে স্থাপিত হইয়াছিলেন। সার হেনরী মিঃ এইচ, জে, এস, কটনের পরম বন্ধু ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই ভারতবাসীর পক্ষপাতী ছিলেন। সার হেনরীর আকস্মিক মৃত্যু অত্যন্ত শোচনীয়। তিনি দুই কন্যা সহ চট্টগ্রাম দর্শনে গমন করিয়া চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার মিঃ ডবলিউ, বি, ওল্ডহ্যামের আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেই অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহারা তিন জনেই অকস্মাৎ ভীষণ কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন; এবং সেই রোগেই তিনি ও তাঁহার একটি কন্যা প্রাণত্যাগ করেন। সকলেই সার হেনরীর বাগ্মিতার প্রশংসা করিতেন।

মিঃ পিকক কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার বার্ণেস পিককের পুত্র। কথিত আছে, সে-কালে সার বার্ণেস পিককের ন্যায় আইনজ্ঞ, নিরপেক্ষ ও নির্ভীক বিচারপতি কলিকাতা হাইকোর্টে আর এক জনও আসেন নাই। তাঁহার নিরপেক্ষতার জন্য একাধিকবার তাঁহাকে ভারত সরকারের প্রতিকূলাচরণে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। আদর্শ বিচারপতি বলিয়া এত কাল পরেও এ দেশে তাঁহার প্রশংসা ঘোষিত হইতেছে। মিঃ পিকক তাঁহার পিতার বহু গুণের উত্তরাধিকারী হইতে না পারিলেও সুদক্ষ কর্ম্মচারী বলিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর হস্তে যে সকল বিভাগের ভার অর্পিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে অহিফেন বিভাগের গুরুত্বই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। কেবল এই বিভাগ হইতেই সরকারের বার্ষিক তিন হইতে পাঁচ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হইত। বিহার ও যুক্তপ্রদেশের নানা স্থানে অহিফেনের চাষ হইত, এবং বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণের হস্তে এই বিভাগের কার্য্য-পরিদর্শনের ভার ন্যস্ত ছিল। চাষীরা অহিফেনের চাষ করিয়া যে অহিফেন উৎপন্ন করিত, সরকার হইতে তাহা কিনিয়া লওয়া হইত; উহার দর নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই ভাবে সংগৃহীত অহিফেন দুইটি বৃহৎ কারখানায় সঞ্চিত হইত; পাটনার গুলজারবাগে একটি, এবং গাজীপুরে দ্বিতীয় কারখানা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ দেশে দুই প্রকার অহিফেন প্রস্তুত হইত; এক প্রকার অহিফেন অত্যন্ত পুরু করা হইত, তাহা চৌকা ভাবে কাটিয়া ভারতের সর্ব্বত্র ব্যবহারের জন্য বিক্রয় করা হইত। অহিফেনের সেই সকল চাক্তি 'আবগারি অহিফেন' (excise opium) নামে অভিহিত

বিদেশে রপ্তানী করা হইত। এগুলি প্রধানতঃ চীনদেশে প্রেরিত হইত। এই শেষোক্ত প্রকার অহিফেন হইতেই অধিক রাজস্ব সংগৃহীত হইত। কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু লিখিয়াছেন, যে সময় তাঁহার হস্তে এই বিভাগের ভার ন্যস্ত ছিল—সেই সময় চীনদেশে ও অন্যান্য প্রাচ্যদেশের বাজারে ভারতীয় অহিফেনের চাহিদা অত্যন্ত অধিক ছিল। বৎসরে পঞ্চাশ হইতে ষাট হাজার মণ অহিফেন প্রাচ্য দেশসমূহে রপ্তানী হইত। অহিফেনের যে সকল 'বল' বাক্সবন্দী করা হইত, তাহা প্রতিমাসের নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিলাম করা হইত। বোর্ডের সুপারিন্টেন্‌ডেণ্ট কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর পর্য্যবেক্ষণে তাহা নিলাম করিতেন। বাক্সের সংখ্যা এবং প্রত্যেক বাক্সে কি পরিমাণ অহিফেন সঞ্চিত থাকিত, তাহা পূর্ব্বেই ঘোষণা করা হইত।

ইহুদী ও মাড়োয়ারীরাই অহিফেনের ব্যবসায় মুষ্টিগত করিয়াছিল। প্রত্যেক নিলামে তাহারাই দল-বাঁধিয়া নিলাম ডাকিতে আসিত। বিস্ময়ের বিষয়, যত দিন তাঁহার তত্ত্বাবধানে অহিফেন বিক্রয় হইয়াছিল, তত দিনের মধ্যে তিনি একবার ভিন্ন আর কখন বাঙ্গালীকে নিলাম ডাকিতে দেখেন নাই! ইহুদী ক্রেতাদের মধ্যে জোসেফ এজরা, এলিয়াস মেয়ার, হাওয়ার্ড (ডেভিড সাসুন এণ্ড কোং) মেনেসা এবং গব্বয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহারা সকলেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন যে সকল মাড়োয়ারী নিলাম ডাকিতে আসিত, তাহারা কোন না কোন ব্যবসায়ী দলের কর্ম্মচারী। তাহারা নিলামে অহিফেন ক্রয় করিয়া স্থানান্তরে রপ্তানী করিত না, ইহুদীদেরই নিকট বিক্রয় করিত। আপকার-লাইন ষ্টীমারেই অহিফেন রপ্তানী করা হইত। ইংলণ্ডে অহিফেন-বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ হইলে চীনদেশে অহিফেনের রপ্তানী নিয়ন্ত্রিত হয়; এবং কয়েক বৎসর পরেই রপ্তানী সম্পূর্ণরূপে রহিত হয়। অতঃপর পাটনার কারখানা বন্ধ হইয়া যায়, এবং অন্য কারখানার কার্য্যও ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। সরকার ন্যায়ের অনুরোধেই তাঁহাদের এই অসাধারণ লাভের ব্যবসায় বন্ধ করেন; ইহাতে তাঁহাদের রাজস্বের যে ক্ষতি হয়—সেই ক্ষতির তুলনা নাই! কিন্তু চীনদেশে অহিফেন রপ্তানি রহিত করিয়াও বিশেষ কোন ফল হয় নাই; কারণ, চীনদেশে অহিফেনের চাষ ক্রমশঃই ব্যাপকতা লাভ করিতেছিল। কিন্তু চীনদেশ-জাত অহিফেন ভারতীয় অহিফেনের তুলনায় অপকৃষ্ট, গন্ধেও নিকৃষ্ট; এ জন্য যে সকল ভারতীয়-অহিফেন অবৈধ ভাবে চীনদেশে রপ্তানী হইতেছে, তাহার মূল্য অত্যন্ত অধিক। আবগারির অন্যান্য বিভাগের আয় অহিফেনের আয়ের সমান না হইলেও অল্প নহে।

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু অতঃপর এ দেশের মদের ভাটি সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ; কিন্তু মাসিকের বর্ত্তমান সংখ্যায় তাহার আলোচনার স্থানাভাব।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বসন্তে

এ কি মন উন্মন উদ্দাম চঞ্চল
বক্ষের পিঞ্জরে উন্মুখ কি আশা।
ভেসে আসে ফুল-বাস, বিহগের কল-কল
দিগন্তে মিলনের দুর্দ্দম তিয়াসা।

এলো বুঝি অলিকুল—পিক-বধূ-বান্ধব
এলো বুঝি নিখিলের সুন্দর মনোরাজ।
অশোকে পলাশে তাই পুলকের শিহরণ
মল্লিকা-বল্লরী অঙ্গেতে নব-সাজ।

গুঞ্জরি কহে অলি প্রণয়ের কত কথা
বকুল, মাধবী, চূত-মঞ্জরী কর্ণে।
গোলাপ-কুঞ্জে নাচে উতরোল বুলবুল
দিকে দিকে সমারোহ গন্ধে ও বর্ণে।

যৌবনে যৌবন হ'ল আজি উচ্ছল
প্রান্তরে শ্যামলিমা, বন-বীথিকায় জাগে হর্ষ।
নির্ম্মল নদী-জল রূপে করে টল-মল
মুঞ্জরে নীপ-শাখা, বেণুবনে এলো নব বর্ষ।

রক্তকমল নব অনুরাগ-উৎসুক
তড়াগে উঠিল ফুটি নয়নেতে লজ্জা।
নাগকেশরের মন প্রলোভনে মোহিতে
অভিসারী কনক-চাঁপার কিবা সজ্জা।

বিশ্ব-বীণায় আজি কোন সুর ধ্বনিত
ফাগুনের ফাগে কার মধুমাখা প্রীতিটি।
নয়ন-সমুখে ভাসে অতীতের কত ছবি
মনে পড়ে বিরহের মিলনের স্মৃতিটি।

বেণু গঙ্গোপাধ্যায় (এম-এ, বি-টি)।

শিল্প ও শুল্ক

ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি কি সংখ্যায় কি গুরুত্বে, কোন অংশেই অন্যান্য দেশ হইতে বিভিন্ন নহে। আপাত-দৃষ্টিতে যতটুকু পার্থক্য লক্ষিত হয়, তাহা জন-সাধারণের হীনাবস্থা হেতু। এই বৈষম্য দূর করিতে হইলে আমাদের ধন এবং জন উভয়বিধ সংস্থানকেই অধিকতর শক্তিসম্পন্ন ও কার্য্যকরী করিতে হইবে। চিরাচরিত সহজ, সরল, সঙ্কীর্ণ প্রথা এবং শিথিল প্রচেষ্টা পরিহার পূর্ব্বক আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে উন্নততর ও উৎকৃষ্টতর উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। ভারতের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সংগঠন সাধনার্থ মনীষী সার মৎস্যগান্ধী বিশ্বেশ্বরায়ার "শিল্পোন্নতি সাধন কর, অথবা ধ্বংস হও" (Industrialise or perish) এই মহাবাণীকে বর্ণে বর্ণে সার্থক করিতে হইবে। এই মহাবাণীর অর্থ এমন নহে যে, কৃষিপ্রধান ভারতের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন কৃষিকে উপেক্ষা অথবা অবহেলা করিয়া শিল্পের অকুণ্ঠিত সেবা করিতে হইবে। কৃষি ব্যতীত শিল্পপ্রচেষ্টা, এক-চক্ষু হরিণের একদেশদর্শী সতর্কতার ন্যায় বিফল। জাতীয় সমুত্থান-প্রচেষ্টায় উভয়েই বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। একটিকে বর্জ্জন করিয়া অন্যটিকে অর্জ্জন করা সম্ভব নহে। শিল্প-প্রচেষ্টার সহিত কৃষি-সমৃদ্ধির কোন বিরোধ নাই। একটি অপরটির অনুপূরক ও পরিপূরক। কৃষি অধিকাংশ শিল্পের কাঁচা মাল সরবরাহ করে। শিল্পের প্রসারের সহিত কৃষির বিস্তার এবং কৃষির উন্নতির সহিত শিল্পের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমানে আমাদের দেশের উৎপাদন-প্রণালী অতি প্রাচীন পদ্ধতির অনুবর্ত্তী। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রচলন দ্বারা এই পদ্ধতির দ্রুত উন্নতিসাধন প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য সফল করিবার নিমিত্ত আবশ্যক—একটি ব্যাপক জাতীয় পরিকল্পনা। যে পরিকল্পনার প্রয়োগ দ্বারা আমাদের দেশের লোকের দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, এবং শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতা দূরীভূত হইবে। যুগপৎ এই চারিটি বিষয়ে উন্নতি সাধিত না হইলে, শ্রমজাত উৎপাদনশক্তি বর্দ্ধিত হইতে পারে না। আবার এই বর্দ্ধিত শক্তিকে অধিকতর কার্য্যকর ও কর্ম্মকুশল করিবার নিমিত্ত প্রয়োজন—আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক উপায় উপকরণের সম্যক্ সদ্ব্যবহার।

সুনিয়ন্ত্রিত রক্ষণনীতি ব্যতীত কোন ব্যাপক জাতীয় পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা সম্ভব নহে। আততায়ীর আক্রমণ ও অত্যাচার হইতে সীমান্ত রক্ষা না করিলে যেমন দেশরক্ষা অসম্ভব, তদ্রূপ বৈদেশিক শিল্পী ও বণিকের কবল হইতে স্বদেশী কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য রক্ষা করিতে না পারিলে দেশের সমৃদ্ধি-বৃদ্ধি ও দেশবাসীর আর্থিক উন্নতি সম্ভব নহে। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত চরম আত্ম-নির্ভরতা কিংবা একায়ত্ত শাসন ভারতের পক্ষে প্রযুজ্য নহে। ভারতের কাঁচামাল-সম্পদ অতুলনীয় ও অপরিসীম সন্দেহ নাই; তথাপি বহু শিল্পোপকরণের নিমিত্ত ভারত পরমুখাপেক্ষী; সুতরাং আদান-প্রদান এবং বিনিময় ব্যতীত কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের সর্ব্বতোমুখী অগ্রগতি সম্ভব নহে। ঘটনাচক্রে যুদ্ধের অপরিহার্য্য কার্য্য-কারণ পরম্পরার ঘাত-প্রতিঘাতে, ভারতের পক্ষেও যথাসম্ভব আত্ম-নির্ভরশীল হইতে প্রযত্নশীল প্রচেষ্টা অতি প্রয়োজনীয় হইয়াছে। য়ুরোপে রপ্তানী বন্ধ হওয়ায় তুলা, পাট, তৈল-বীজ, চীনা বাদাম প্রভৃতি কয়েকটি পণ্য প্রচুর পরিমাণে স্তূপীকৃত হইতেছে। প্রয়োজনাতিরিক্ত ধ্বংসশীল পণ্যের বিক্রয় বন্ধ হইলে অত্যধিকতাবশতঃ মূল্য হ্রাস ঘটে এবং দারিদ্র্য-পীড়িত প্রথম উৎপাদকগণের অর্থাভাব হেতু বিষম দুর্গতি উপস্থিত হয়। ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করিয়া এই সকল পণ্যের দ্রুত সদ্ব্যবহার আশু প্রয়োজন; সুতরাং চলতি শিল্পের প্রসার ও নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক। কেবল যে যুদ্ধ-বিপর্য্যয়-হেতু এই প্রয়োজনের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা নহে, দেশের কল্যাণ এবং ভবিষ্যতের নিরাপত্তার নিমিত্তও শিল্প-সমুন্নয়ন ও সম্প্রসারণ অবশ্য-কর্ত্তব্য ও অপরিহার্য্য হইয়াছে। কেহ কেহ আশা করিতেছেন যে, যুদ্ধান্তে এমন একটি নববিধানের আবির্ভাব হইবে, যাহার ফলে কোন শ্রেণীর লোকেরই কোন অভাব-অনটন কিংবা দুঃখ-দুর্গতি থাকিবে না। এ আশা দুরাশা! আমাদের কৃষিজাত ও খনিজ সম্পদের আভ্যন্তরীণ চাহিদা ও ব্যবহার এরূপ বৃদ্ধি করিতে হইবে, যাহাতে বিগত এবং বর্ত্তমান যুদ্ধ-সম্ভূত জটিল ও কুটিল পরিস্থিতির পুনরুপপত্তি সম্ভব না হয়। শিল্প-সম্প্রসারণের ফলে, সর্ব্বপ্রকার কাঁচা মালের প্রভূততর সদ্ব্যবহার ঘটিবে, এবং তাহার ফলে, জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি-হেতু উৎপন্ন দ্রব্যের কাটতি

বৃদ্ধি পাইবে। একমাত্র শিল্প-সম্প্রসারণ দ্বারাই আমরা কৃষি ও শ্রমশিল্পের উন্নতি সাধন করিতে পারি।

ভারতের দারিদ্র্য এবং তাহার কুট কারণাবলি বিদূরিত করিতে হইলে, দেশাভ্যন্তরেই আমাদের সকল সম্পদের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত আমাদের বর্ত্তমান অনুন্নত পদ্ধতি পরিহার করিয়া, কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য-সম্ভারের যুক্তি-সিদ্ধ ও বিজ্ঞানসম্মত উৎপাদন-প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে; কিন্তু সরকারী সাহায্য ব্যতীত এই উদ্দেশ্য-সাধন দুঃসাধ্য। শিল্প-শিক্ষা, শিল্পোন্নতি-গবেষণা, চলতি এবং নূতন শিল্পে সক্রিয় সাহায্য, স্বল্প সুদে ঋণদান-ব্যবস্থা, যাতায়াত ও মাল চলন-চালনের সুব্যবস্থা, উৎপন্ন পণ্য বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত প্রভৃতি বিষয়ে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রচুর,—অপরিসীম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতের শাসন-তন্ত্রে এখনও ভিক্টোরিয়া-যুগের "যা হবার হউক" (Laissez-faire) নীতির বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ফলে বিগত যুদ্ধের ন্যায় বর্ত্তমান যুদ্ধেও শিল্প-বাণিজ্য ও সংরক্ষণক্ষেত্রে নিতান্ত অসহায় ও অপ্রস্তুত অবস্থায় আমাদিগকে অবস্থিতি করিতে হইতেছে। সুখের বিষয়, সরকারী শৈথিল্য সত্ত্বেও বিগত যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় অর্জ্জিত চৈতন্যের ফলে আমাদের শিল্পনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের সঙ্কীর্ণ প্রচেষ্টা কোন কোন ক্ষেত্রে কথঞ্চিৎ ফলপ্রসূ হইয়াছে; তাই আজ আমরা বহু বিভাগে, বহু বিষয়ে সরকারকে যুদ্ধোপযোগী সাহায্য দানে সমর্থ হইতেছি।

যুদ্ধের তাগিদে সরকারকেও বাধ্য হইয়া শিল্প-সম্প্রসারণ বিষয়ে অবহিত হইতে হইয়াছে। সম্প্রতি যে বৈজ্ঞানিক ও শিল্প-সংক্রান্ত গবেষণামণ্ডলী (The Board of Scientific and Industrial Research) স্থাপিত হইয়াছে, আশা করি, কালে তাহাই শিল্পজ্ঞান অর্জ্জন ও বিতরণার্থ জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। যুদ্ধের প্রয়োজনে অনুষ্ঠিত প্রাচ্য-গুচ্ছের (Eastern Group Conference) অধিবেশন এবং বিলাতের যোগান-মন্ত্রিত্ব (Supply Ministry) কর্ত্তৃক প্রেরিত রোজার দৌত্যের (Roger Mission) ভারতের শিল্প-সম্পদের সূক্ষ্মানুসন্ধানের ফলে আমরা প্রচুর তথ্য সংগ্রহ এবং অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। প্রাচ্য-গুচ্ছের অধিবেশন-প্রসূত প্রাচ্য-গুচ্ছ-সমিতির (Eastern Group Council) প্রচেষ্টার ফলেও আমরা বিশেষ লাভবান্ না হই, উপকৃত হইব। যুদ্ধান্তে ভারত সরকার শিল্প এবং শুল্ক-সংক্রান্ত সমস্যা সম্বন্ধে সূক্ষ্মানুসন্ধানের নিমিত্ত একটি রাজস্ব-তদন্ত-সমিতি (Fiscal Commission) নিয়োগের ঘোষণা করিয়াছেন। বাণিজ্য-সচিব সার রামস্বামী মুদেলিয়ারও একাধিকবার আশ্বাস দিয়াছেন যে, যুদ্ধকালে প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলি সুনিয়ন্ত্রিত হইলে যুদ্ধান্তে সরকারী সাহায্যের অধিকারী হইবে। বর্ত্তমানে যে সকল শিল্প যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত করিতেছে, প্রয়োজনানুযায়ী তাহাদের অনেকেই, দ্রুত অনুসন্ধানানন্তর, সরকারী সাহায্য লাভ করিতেছে। কোন স্থায়ী রক্ষণ-শুল্ক-তদন্ত-সমিতির অভাব হেতু এইরূপ ত্বরিত বিভাগীয় অনুসন্ধান বিশেষ কার্য্যকরী হইতেছে। কিন্তু—যুদ্ধের প্রয়োজনের আশ্রয়ে যে-সকল শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে—সমস্যা তাহাদেরই লইয়া। এই সকল নব-প্রতিষ্ঠিত শিল্পকে যুদ্ধান্তে ঘোরতর বৈদেশিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইবে। বিগত যুদ্ধাবসানের পরে যেরূপ ঘটিয়াছিল, বর্ত্তমান যুদ্ধাবসানের পরেও, আত্মরক্ষার্থ বেগে পশ্চাদপসরণের তেমনি একটি পালা আসিবে। এইরূপ ভীরু দুর্ব্বল শিল্প-গুলির সংরক্ষণার্থ সরকার কি নীতি অবলম্বন করিবেন, তাহাই সমস্যা।

দ্বিতীয় রাজকীয় রাজস্ব-তদন্ত-সমিতি যথাকালে অবশ্যই এই প্রশ্নেরও সমাধান করিবেন। কিন্তু যুদ্ধাব-সানের অব্যবহিত পরেই যে আমরা উক্ত সমিতির অভিমত লাভ করিতে পারিব, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। যুদ্ধাবসানের পূর্ব্বে এরূপ সমিতির নিয়োগ ও অনুসন্ধান-কার্য্য সম্ভব নহে। সুতরাং যুদ্ধাবসানের অব্যবহিত পরবর্ত্তী পরিস্থিতির নিমিত্ত আমাদিগকে এখন হইতেই প্রস্তুত হইতে হইবে। রাজকীয় রাজস্ব-তদন্তসমিতির অনুসন্ধানের ফল এবং নূতন রক্ষণ-শুল্ক-মণ্ডলী নিয়োগের পূর্ব্বেই যুদ্ধান্তে অবশ্যসম্ভব্য মন্দার প্রকোপ হইতে যুদ্ধকালে-সংগঠিত নূতন শিল্পের রক্ষা-কল্পে আমাদিগকে এখন হইতেই বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। যত দিন তদন্ত-সমিতির অনুমোদন এবং রক্ষণশুল্কমণ্ডলীর নির্দ্দেশ না পাওয়া যায়, তত দিন সাময়িক সাহায্য দ্বারা এই সকল নবজাত শিল্পকে জীবিত রাখিতে হইবে। যুদ্ধের তাগিদে যে-সকল শিল্পের দ্রুত প্রতিষ্ঠান ও প্রসার ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে, যুদ্ধান্তে তাহাদের প্রয়োজন অকস্মাৎ ফুরাইয়া যাইবে। কেবল যে উৎপাদনই রুদ্ধ হইবে এরূপ নহে, উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদার অভাব ঘটিবে, এবং কাটতি বন্ধ হইয়া যাইবে। যে সকল শ্রমিক এই সকল শিল্পে নিযুক্ত আছে, তাহাদের কর্ম্মের অবসান ঘটিবে এবং আয়ের পথও রুদ্ধ হইয়া যাইবে; সুতরাং একটি জটিল ও কুটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে। সুখের বিষয়, এই সমস্যার প্রতি সরকারের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে, এবং এই সমস্যার সমাধান-হেতু একটি সমিতিও গঠিত হইয়াছে। যুদ্ধাবসান কখন্ ঘটিবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। যুদ্ধাবসানের পূর্ব্বেই যে নবনিযুক্ত সমিতি তাঁহাদের অনুসন্ধান ও আলোচনা শেষ করিয়া চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন, তাহারও কোন স্থিরতা নাই।

সুতরাং যদি কোন কারণে অকস্মাৎ যুদ্ধের বিরতি ঘটে, তাহা হইলে অতর্কিতে উপস্থিত সঙ্কটের প্রতিকারকল্পে, একটি জরুরি আইন দ্বারা, অধিকাংশ আমদানী পণ্যের উপর রক্ষা-শুল্ক নির্দ্ধারিত করিয়া যুদ্ধজাত-শিশু-শিল্পগুলিকে রক্ষা করিতে হইবে। এই আইন তিন হইতে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

যুদ্ধান্তে রক্ষণ-শুল্কনীতির আমূল পরিবর্ত্তনেরই প্রয়োজন হইবে। প্রথমতঃ, প্রভেদ-পার্থক্যমূলক রক্ষণ-নীতির (Discriminating Protection) যুক্তিসিদ্ধ সংস্কার প্রয়োজন। এই স্থলে রক্ষণ-নীতির সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত আলোচনাযোগ্য। এই ইতিহাস স্বার্থ-সংঘর্ষের কালিমালিপ্ত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রারম্ভকালে পরিচালকবর্গ ভারতের রপ্তানী-পণ্য উৎপাদক শিল্পগুলির প্রতি মনোযোগী হইয়াছিলেন। ফলতঃ, শীঘ্রই কোম্পানীর সহিত বিলাতের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। কোম্পানীর বাণিজ্য এবং এমন কি, রাজনৈতিক অধ্যবসায় বহুলাংশে খর্ব্ব করা হইল। উনবিংশ শতাব্দীতে বিলাতের শক্তিশালী স্বার্থনিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নির্দ্দেশানুযায়ী শুল্ক নিয়ন্ত্রণ দ্বারা তাঁহাদের ইষ্টসাধন ও ভারতের কুটীর-শিল্পের অনিষ্টসাধন সংঘটিত হইয়াছিল। প্রধানতঃ, বিলাতের শ্রমশিল্পের পুষ্টি-সাধনার্থ কোম্পানীকে ভারত হইতে কাঁচা-মাল সরবরাহ করিতে হইত। উপনিবেশগুলির পক্ষেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ফলে, প্রথমে আমেরিকা, এবং তৎপরে স্বায়ত্তশাসনশীল রাষ্ট্রগুলি (Dominions) এই নীতির বিরুদ্ধাচরণ করে। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে শিল্পনিষ্ঠ সম্প্রদায় কর্ত্তৃক ভূস্বামী সম্প্রদায়ের প্রাধান্য খর্ব্বীকৃত এবং শস্য-আইন (Corn Laws) রহিত-হেতু অবাধ বাণিজ্যনীতির অভ্যুদয় ঘটে। ১৮৪৭ হইতে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিরোধের ফলে ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড প্রভৃতি শেষোক্ত বর্ষে পূর্ণ শুল্ক-স্বাধীনতা লাভ করে।

বিলাতের শিল্পী সম্প্রদায় যে বিশেষ করিয়া ভারতে অবাধ-বাণিজ্যনীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহা নহে; তখন তাঁহাদের দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছিল যে, অবাধ-বাণিজ্যই, যেমন বিলাত, তেমনি ভারতের পক্ষেও প্রযুজ্য। অবশ্য ইহা সত্য যে, অধীন ও অনুগত দেশসমূহে অবাধ-বাণিজ্যনীতি-প্রচলন তাঁহাদের স্বার্থের অনুকূল ছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী-যুদ্ধের ফলে ভারতের অর্থকৃচ্ছ্রতা ঘটে। আমদানী ও রপ্তানী উভয়বিধ শুল্কেরই শুল্ক-বৃদ্ধি প্রয়োজন হয়। তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ক্যানিং শুল্ক সম্বন্ধে কয়েকটি নূতন নীতির প্রবর্ত্তন করেন। বিলাতের এবং ভারতের বণিকগোষ্ঠী এই নব-নীতির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আপত্তি উত্থাপন করেন। তখন তাঁহারা স্বাধীন বাণিজ্যের উপাসক। ভারতের ক্রেতা ও কৃষককুলের অনুকূলে তাঁহারা অশ্রু-বিসর্জ্জনে কার্পণ্য করেন নাই। প্রভুত্বসম্পন্ন বিলাতী বণিক সম্প্রদায়ের আপত্তি ও আন্দোলনের ফলে ১৮৫৯ হইতে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতে রাজস্ব-শুল্কের, বিশেষতঃ, সূতী কাপড়ের উপর প্রযুক্ত শুল্কের হ্রাস সংঘটিত হয়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ম্যানচেষ্টার-চেম্বারের আবেদনের ফলে একটি তদন্ত-সমিতি গঠিত হয়; কিন্তু এই সমিতি শুল্কহ্রাসের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেন। তদানীন্তন ভারত-সচিব লর্ড সল্সবারী বিলাতের শিল্পিগণের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় এবং এমন কি, বিলাতের ইণ্ডিয়া-কাউন্সিলের সভ্যবৃন্দের অভিমতেও উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া ভারতের শুল্ক-স্বাধীনতা খর্ব্ব করেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে অবাধ-বাণিজ্যের একনিষ্ঠ উপাসক সার জন ষ্ট্রাচী অর্থ-সচিব নিযুক্ত হইলে ভারতবর্ষকে অবাধ-বাণিজ্যনীতির অনুসরণ করিতে বাধ্য করা হয়। সংক্ষেপে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই নীতিরই প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল; তন্মধ্যে ১৮৮২ হইতে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অবাধ-বাণিজ্য পূর্ণ-প্রতিষ্ঠিত ছিল।

বিগত মহাযুদ্ধের তাগিদে এবং যুদ্ধাবসানে সরকারের অর্থকৃচ্ছ্রতা হেতু, এবং ১৯২১ খৃষ্টাব্দে শিল্প-বাণিজ্যে মন্দা বশতঃ অর্থ-নৈতিক সঙ্কটের ফলে সরকারকে ঘাটতি-পূরণের নিমিত্ত শুল্ক বর্দ্ধিত করিতে হয়। তথাপি ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অবাধ-বাণিজ্যের প্রভাব বিলুপ্ত হয় নাই। এতাবৎকাল দেশের অর্থ-বৃদ্ধি অপেক্ষা রাজস্ব-বৃদ্ধির প্রতিই সরকারের শ্যেন-দৃষ্টি ছিল। যুদ্ধের অভিজ্ঞতার ফলে রক্ষণ-নীতির দিকে ক্রমে সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই ১৯১৬—১৮ খৃষ্টাব্দের শিল্প-তদন্ত-সমিতির সুপারিশগুলির প্রতি সরকারের মনোযোগ শিথিল হইয়াছিল। কিন্তু ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে পার্লামেন্টের রাজনৈতিক ঘোষণার ফলে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের শাসন-সংস্কার আইনে রাজনৈতিক অগ্রগতির সহিত শুল্কনির্দ্ধারণ-স্বাধীনতার অভিন্ন সম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়াছিল। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় রাষ্ট্রসভায় এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে তীব্র আন্দোলনের ফলে শুল্ক-রাজস্ব-তদন্ত-সমিতির (Indian Fiscal Commission) আবির্ভাব ঘটে। এই সমিতিতে রক্ষণ-নীতি (Protection) সম্বন্ধে প্রবল মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়। দুই জন ভক্ত-চূড়ামণি ভারতবাসীর সহযোগে শ্বেতাঙ্গ সভ্যগণ সংখ্যাধিক লাভ করেন, এবং সভাপতির সহিত জাতীয়তাবাদী ভারতীয় সভ্যগণকে সংখ্যালঘিষ্ঠ পর্য্যায়ভুক্ত হইতে হয়। শেষোক্ত সভ্য পূর্ণ শুল্ক-স্বাধীনতার সমর্থন করেন; কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ দল প্রভেদ-পার্থক্যমূলক রক্ষণ-নীতির (Discriminating Protection) সুপারিশ করেন।

এই নীতিই পরিণামে অবলম্বিত হয়, রাজনীতিক্ষেত্রে দ্বৈত শাসনবৎ শিল্প-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে অনর্থ সৃষ্টি করে।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন-সংস্কার আইনের প্রভাবে যে শুল্ক-স্বায়ত্তশাসন-নীতির (Fiscal Autonomy Convention) প্রতিষ্ঠা হয়, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের আইনের অভিঘাতে তাহার অবসান ঘটে। যে পঞ্চদশ বৎসর ঐ রীতি আদর্শ মাত্র ছিল, তাহার মধ্যেও দুই-এক বার ইহার (ভারতের পক্ষে অনিষ্টজনক) পরিবর্ত্তন ঘটে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে লর্ডন কার্জ্জন যে 'রাজকীয় ছুট' (Imperial Preference) নীতির তীব্র প্রতিবাদ করেন, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে বিলাতে রক্ষণনীতি অবলম্বন, এবং রক্ষণশীল দলের সাম্রাজ্যঘটিত অবাধ-বাণিজ্যের (Empire Free Trade) ভাষ্যপ্রচার পর্য্যন্ত, ভারত সরকার তাহার প্রতি বিরূপ ছিলেন। কিন্তু গত কয়েক বৎসরে নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে, 'রাজকীয় ছুট' এবং 'দু'-তরফ চুক্তি' (Bilateralism) প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। রাজকীয় ছুট প্রচলন, প্রভেদ-পার্থক্যমূলক রক্ষণ-নীতির বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে। সাম্রাজ্য-বহির্ভূত দেশসমূহের সহিতও দু'-তরফ চুক্তির অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ, দু'-তরফ বাণিজ্য-চুক্তির অনুকূলে একটি প্রস্তাব অঙ্গীকার করেন, এবং অটোয়া-চুক্তির অবসান অনুমোদিত হয়। অটোয়া-চুক্তির অহিতকর পরিণামে বিক্ষুব্ধ হইয়াই তাঁহারা একতরফা-চুক্তি-স্বাধীনতার বিনিময়ে এই নব-বিধানের পক্ষপাতী হয়েন। অটোয়া-চুক্তির অবসানে, ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে কয়েকটি ইঙ্গ-ভারত চুক্তি লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত শাসন-সংস্কার আইনের বাণিজ্য-বিধানরীতির ফলে অনুষ্ঠিত নূতন নীতিকে "রক্ষণাভ্যন্তরীণ ছুট" (Preference within Protection) আখ্যা দেওয়া যায়।

যাহা হউক, বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসানে ভারতের শুল্ক-শাসন নীতির প্রভূত পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইবে। প্রভেদ-পার্থক্যমূলক রক্ষণ-নীতির প্রভূত সংস্কার আবশ্যক। ইহার পরিবর্ত্তে একটি সরল যুক্তিসিদ্ধ এবং পক্ষপাত-মুক্ত নিয়ম-নির্দ্ধারণ বাঞ্ছনীয়। এই নিয়ম-তন্ত্র বৃটিশ শিল্প-সংরক্ষণী আইনের (British safe-guarding of Industries Act) অনুবর্ত্তী হইবে। শুল্ক-রাজস্ব-তদন্ত-সমিতি রক্ষণ-সাহায্য প্রদান-হেতু যে তিনটি নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কাঁচা মাল-সংক্রান্ত বিধানের বিশেষ প্রশমন প্রয়োজন। কোন শিল্পের স্বাভাবিক সুবিধা (Natural Advantages) বিবেচনা করিতে হইলে, কাঁচা মাল ও শ্রমিকের প্রাচুর্য্যাপেক্ষা, তাহার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ উৎপাদন-ব্যয়ের প্রতি অধিকতর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ভবিষ্যতে স্বাবলম্বী হইতে পারিবে কি না, এই তৃতীয় নিয়মটি দৈবজ্ঞ-মনোবৃত্তি-সূচক, সুতরাং ইহার পরিহার করাই সঙ্গত। শুল্ক-নির্দ্ধারণমণ্ডলীর (Tariff-Board) গঠন ও কার্য্য-প্রণালীর পরিবর্ত্তনের সহিত অযথা বাধা-বিঘ্নবিহীন ত্বরিতানুসন্ধানের ব্যবস্থা প্রয়োজন। স্বেচ্ছা-প্রণোদিত অনুসন্ধানের ক্ষমতাও মণ্ডলীকে দেওয়া আবশ্যক। সরকারী সদস্যের সংখ্যা কমাইয়া বে-সরকারী অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ সদস্যের সংখ্যাবৃদ্ধি করিতে হইবে। উন্নতি-বিধায়ক, নিরাপত্তামূলক এবং রাজস্ববর্দ্ধক রক্ষণ-শুল্কের পার্থক্য পরিস্ফুট হওয়া প্রয়োজন। যেখানে রাজস্ববর্দ্ধক শুল্ক শিল্পোন্নতির অন্তরায় ঘটাইতে পারে, সেখানে শুল্ক-নির্দ্ধারণ-মণ্ডলীর অনুসন্ধানের অধিকার থাকিবে। সরকার জরুরি নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠায় পরীক্ষামূলক রক্ষণ-সাহায্য দিতে পারিবেন, এবং সাহায্য সত্ত্বেও সেই শিল্প প্রতিষ্ঠিত না হইলে, ঐ সাহায্য প্রত্যাহার এবং বিদেশাগত মালের উপরও শুল্ক রহিত করিবেন।

গত কুড়ি বৎসরের শুল্ক-নিয়ন্ত্রণরীতির পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখনই সরকার কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, অথবা নিয়ন্ত্রণ-মণ্ডলীর কোন ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করিয়াছেন, ক্ষুদ্র বর্দ্ধনোন্মুখ শিল্পের প্রয়োজনের দিকে কদাচিৎ উপযুক্ত লক্ষ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। রাজস্বের দিকে অতিরিক্ত লক্ষ্যহেতু, বহু জননোন্মুখ শিল্পের বিলয় ঘটিয়াছে। প্রতিযোগী বাণিজ্য স্বার্থের দিকে সভয় দৃষ্টিহেতু উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে নাই। শিল্প-সমুন্নয়ন উদ্দিষ্ট হইলে রাজস্বের নিমিত্ত চিন্তা অনাবশ্যক; কারণ, জাতীয় সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইলেই রাজস্ব বৃদ্ধি পাইবে। করনির্দ্ধারণ-পদ্ধতি ও পরিকল্পনার অনুকূল পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। রাজস্ব-হেতু নির্দ্ধারিত শুল্ক-প্রভাবে যখনই কোন শিল্প বর্দ্ধনোন্মুখ হইয়াছে, রাজস্ব নিম্নগামী হইলে, আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় সরকার তখনই সেই শুল্ক হ্রাস করিয়াছেন; ফলে ঐ রক্ষণ-শুল্ক-প্রভাবে বর্দ্ধিষ্ণু শিল্পও সমর্থনাভাবে অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। কারবার সম্ভাবনা এবং কারবারী লোক কর্ত্তৃক পরীক্ষা-মূলক মূলধন নিয়োজনের প্রতি এরূপ অসঙ্গত ব্যবহার শিল্প-সম্প্রসারণ নীতির সম্যক পরিপন্থী।

শিল্প সঙ্কোচন নহে,—অধিকতর শিল্প-সম্প্রসারণ; স্বল্প নহে,—প্রভূত এবং অধিকতর অর্থ-নৈতিক উন্নতি-প্রচেষ্টা; লঘু নহে,—গুরু এবং অধিকতর উৎপাদন-কুশলতা, একমাত্র মুখ্য সমাধান। যত দিন সরকার তাঁহাদের অর্থ-নৈতিক নীতিকে স্বার্থ-সংঘর্ষের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইতে দিবেন, এবং শিল্প-সমুন্নয়ে মন না দিবেন, তত দিন তাঁহাদের অর্থকৃচ্ছ্রতা, অর্থানটন প্রভৃতি অর্থনৈতিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান অসম্ভব।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঋণ-পরিশোধ

১

"দিদি, মা ডাকছেন।"

যে ঘরে বসিয়া চারুলতা ভাবিতেছিল, তাহার পিতৃব্য-পুত্রী কনকলতা সেই ঘরে আসিয়া তাহাকে ডাকিল। সেই ডাকে চারুলতার যেন চমক ভাঙ্গিল। সে একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "আমি যাচ্ছি।"

চারুলতা যাহা ভাবিতেছিল, তাহা সে কাহাকে বলিবে?

আজ এক যুবক বিবাহের জন্য তাহাকে "দেখিতে" আসিবে। যে বয়সে সাধারণতঃ হিন্দুকন্যার বিবাহ হয়, তাহার সে বয়স বহু দিন অতিক্রান্ত হইয়াছিল—এখন তাহার বয়স চব্বিশ বৎসর। তাহার পিতা বসন্তরঞ্জন রায় মফঃস্বল সহরে কয় জন জমিদারের আমমোক্তার। এক সময় আয় ভালই ছিল—এখন আর নাই; কারণ, কোন কোন জমিদারের সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে নূতন আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়াছে; কোন কোন জমিদারের উত্তরাধিকারীরা সে কালের—বাঙ্গালা-নবিশ আমমোক্তারের স্থানে এ কালের "জুনিয়ার" উকীল নিযুক্ত করিয়াছেন। আয় যখন ভাল ছিল, তখন বসন্ত বাবু সঞ্চয়ে অবহিত হয়েন নাই। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সেই মতাবলম্বী ছিলেন :—

> "লক্ষ্মীছাড়া হও যদি, খেয়ে আর দিয়ে।
> কিছুমাত্র সুখ নাই হেন লক্ষ্মী নিয়ে॥
> যতক্ষণ আছে ধন, তোমার আগারে।
> নিজে খাও, খেতে দাও, সাধ্য অনুসারে।
> ইথে যদি কমলার মন নাহি সরে।
> প্যাঁচা লয়ে যান মাতা কৃপণের ঘরে॥"

তিনি গ্রামে চালাঘরের স্থানে কয়টি পাকাঘর নির্ম্মাণ করাইয়াছেন—পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; সহরেও তাঁহার রান্নাঘর ও ভাঁড়ার ঘর ব্যতীত আর কয়খানি ঘরই ইষ্টক-নির্ম্মিত; একমাত্র ভ্রাতা তারককে পড়াইয়া উকীল করিয়া আনিয়াছেন—এখন সে তাঁহার বাড়ীর বিবাহে ও মাতার শ্রাদ্ধে তিনি ব্যয়কুণ্ঠ না হইয়া ব্যয়-বাহুল্যই করিয়াছিলেন। যে ব্যাধিতে স্নেহলতার মৃত্যু হয়, তাহা হইতে তাহাকে মুক্ত করিবার ব্যর্থ-চেষ্টায়ও তিনি অল্প ব্যয় করেন নাই; পুত্রদ্বয়ের শিক্ষার জন্যও তিনি আবশ্যক ব্যয় করিয়াছেন—তাহারা যে সে ব্যয় সার্থক করিতে পারে নাই, তাহা তিনি ও তাঁহার গৃহিণী অদৃষ্ট বলিয়া আপনাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া আসিয়াছেন—জ্যেষ্ঠ পুত্রটি আদালতে একটি ছোট চাকরী করে। গৃহিণী তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত দেবর তারকের বিবাহ দিয়াছিলেন। তারক দাদার অবস্থা দেখিয়া সঞ্চয়ী হইলেও তাহার স্ত্রী নির্ম্মলাকে সে সেই শিক্ষায় পারদর্শিনী করিতে পারে নাই। এই বিবাহে এই পরিবারে সম্বন্ধ বড় গোলমালের হইয়াছে। নির্ম্মলা রায়-গৃহিণীকে পিসীমাই বলে, রায় মহাশয়কে কি বলিবে স্থির করিতে না পারিয়া কিছুই বলে না এবং তাহার একমাত্র সন্তান কন্যা কনকলতা রায় মহাশয়কে "জেঠামশাই," ও রায়-গৃহিণীকে "জেঠাইমা"ই বলে। মা ও মেয়ে রায় মহাশয়ের গৃহেই অনেক সময় থাকে। চারুলতার বিবাহের চেষ্টা যে হয় নাই, এমন নহে। বিবাহ না হইবার কারণ—পিতার অর্থাভাব। গত চারি বৎসরে পাঁচ ছয় স্থান হইতে তাহাকে "দেখা" হইয়াছে—সকলেই বলিয়াছেন, "মেয়ে ভাল"—কিন্তু বিবাহ হয় নাই। তাঁহারা যে টাকা চাহিয়াছেন, তাহা প্রদান করা সম্ভব হয় নাই—সেই জন্য তাঁহারা "মেয়ে বড়—ছেলের সঙ্গে মানাইবে না' বলিয়া পাত্রী ও অর্থের সন্ধানে অন্যত্র গিয়াছেন।

চারুতলার সমবয়সী সকলেরই বিবাহ হইয়া গিয়াছে—তাহারা পুত্রকন্যার জননী। রঙ্গীন রেশমী শাড়ী পরিয়া—পায় আলতা দিয়া "কনে দেখার" কনে সাজা এখন সে লজ্জাজনক মনে করে। রায় মহাশয় ও তাঁহার গৃহিণী অজাতশত্রু—সকলেই তাঁহাদিগের কন্যাদায়ে সহানুভূতি প্রকাশ করে। সেই সহানুভূতির বিকাশ চারুলতাকে বিদ্ধ করিত—পিতা-মাতার জন্য সে দুঃখিত ও চিন্তিত হইত।

কিন্তু তাঁহার প্রয়োজনে তিনি সাহায্য চাহিতে যেমন কুণ্ঠিত হইয়াছেন, তেমনই যাঁহাদিগের নিকট হইতে তিনি সাহায্য লাভের আশা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সাহায্য প্রদানে একান্ত কুণ্ঠিত হইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে কন্যার যে বিবাহ-সম্বন্ধ আসিয়াছিল, তখন তিনি কুণ্ঠা অতিক্রম করিয়া কলিকাতায় যাঁহাদিগের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার বহু দিনের মক্কেল। তিনি যখন তাঁহাদিগের আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা তিন সহোদর একান্নে ছিলেন—এখন তিন ভাগে বিভক্ত; দুই ভাই পরলোকগত, তাঁহাদিগের উত্তরাধিকারীদিগের সহিত তাঁহার পরিচয় প্রায় পত্রে। ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে যিনি জীবিত ছিলেন, তিনি বলেন—বহু দিনের আমমোক্তার হিসাবে বসন্ত বাবু সাহায্য লাভের অধিকারী; কিন্তু শেষে তিন অংশে তিন শত টাকা মাত্র মঞ্জুর হয়। তাহাতে প্রয়োজন মিটিবে না বলিয়া তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে যিনি জীবিত ছিলেন, তাঁহার পুত্রদ্বয় দুই বার জমিদারী পরিদর্শনে যাইয়া রায় মহাশয়ের আতিথ্য সম্ভোগ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি কনিষ্ঠ তিনি কেবল বলিয়াছিলেন, তাঁহার অধিক সাহায্য করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সকলে যে ব্যবস্থা করিবেন, তাঁহাকে তাহাতেই সম্মত হইতে হইবে।

এ সব কথাও রায় মহাশয় গোপন করেন নাই। চারুলতাও তাহা শুনিয়াছিল।

এ বার যে পাত্র নিজে পাত্রী দেখিতে আসিয়াছিল, সে কলিকাতায় চাকরী করে—যে সহর রায় মহাশয়ের কর্ম্মস্থল, তথায় আদালতের সেরেস্তাদার তাহার মাতুল। পাত্রটির বিবাহ হইয়াছিল—সে স্ত্রী নিঃসন্তান অবস্থায় দুই বৎসর পূর্ব্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে—এই জিলার অন্য মহকুমায় তাহাদিগের বাস। মাতুল আশ্বাস দিয়াছিলেন, পাত্রী মনোনীত হইলে টাকার কথা উঠিবে না। সেই আশ্বাসেই রায় মহাশয় কাযে কতকটা অগ্রসর হইয়াছিলেন।

পাত্র আসিবে—তাহাকে সাজাইবার জন্য নির্ম্মলা চারুলতাকে ডাকিতেছিল। তাহার গমনে বিলম্ব দেখিয়া সে আপনি আসিয়া ডাকিল, "চারু! চল, চুলটা বেঁধে দিব।"

চারুলতা যাহা বলিবে কি না ভাবিতেছিল, কাকীমা'কে তাহা বলিয়া ফেলিল—তাহার পিতার অর্থ নাই; বার বার "কনে দেখায়" সে কেবল লজ্জানুভব করে। যদি বিনা অর্থে তাহার বিবাহ হয়, তবেই সে আপনাকে দেখাইতে সম্মত হইবে, নহিলে নহে। সে না হয় বিবাহ না-ই করিল।

নির্ম্মলা বলিয়া বিনা অর্থে বিবাহ হইবে এই আশ্বাস পাইয়াই রায় মহাশয় কাযে অগ্রসর হইয়াছেন—নহিলে হইতেন না।

পাত্র আসিলে তারক তাহাকে বলিল, তাহারা কিছু দিতে পারিবে না। যদি পাত্র তাহাতে সম্মত থাকে, তবেই কনে দেখান হইবে—নহিলে নহে।

পাত্র সেই কথায় সম্মতি দিল। পার্শ্বের কক্ষ হইতে চারুলতা তাহা শুনিয়া তবে বাহির হইল।

পাত্র পাত্রী দেখিয়া বিবাহে সম্মতি দিয়া গেল।

রায় মহাশয় ও তাঁহার গৃহিণী স্বস্তির শ্বাস ফেলিলেন। বাস্তবিক কলিকাতা হইতে হতাশ হইয়া আসিবার পর হইতেই রায় মহাশয়ের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল।

২

পাত্রী দেখিয়া বিবাহে সম্মতি দেওয়া পর্য্যন্ত পাত্র সুবিনয়ের কায ছিল—আর সব তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কান্তিচন্দ্র স্থির করিবেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে সুবিনয়ই আর একটু অগ্রসর হইয়াছিল—বিবাহে দেনা-পাওনার কথা থাকিবে না—বলিয়া গিয়াছিল।

বিবাহের দিন প্রভৃতি স্থির করিবার জন্য কান্তিচন্দ্র মাতুলালয়ে আসিয়া যখন সে কথা শুনিল, তখন সে বিরক্ত হইল—বলিল, "সে-ও কি কখন হয়?"

মাতুল বলিলেন, রায় মহাশয়ের অর্থব্যয় করিবার সামর্থ্য নাই। শুনিয়া জমিদারী সেরেস্তার কর্ম্মচারী কান্তিচন্দ্র বলিল, "মামা, সোজা আঙ্গুলে ঘী উঠে না।" মাতুল তখন তাহাকে বলিলেন, সুবিনয় ছোট্ট ছেলেটি মাত্র নাই—বড় হইয়াছে, ভাল চাকরী করিতেছে, সে যখন কথা দিয়াছে, তখন সে কথা রক্ষা না করিলে সে বিরক্ত হইতে পারে। শুনিয়া কান্তিচন্দ্র বলিল, "সে যে চাকরী করতে বিদেশে গিয়াছে, সে-ও টাকার জন্য। বিনাশ্রমে টাকা পেলে তা' ছেড়ে দেবে—এমন বোকা সে কখনই হ'বে না।" সে মাতুলকে বলিয়া গেল, তিনি দেখিবেন, সে ঐ রায় মহাশয়ের নিকট হইতেই টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করিবে। তাহার কথা শুনিয়া মাতুল আর তাহার সহিত রায় মহাশয়ের গৃহে যাইলেন না। সে মনে করিল, ভালই হইল—সে "একাই এক শ"।

কান্তিচন্দ্র যখন রায় মহাশয়ের বৈঠকখানা বা কাছারী-ঘরে আসিল, তখন তিনি তিন চারি জন উকীলের মুহুরী-পরিবেষ্টিত অবস্থায় তাহার আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি তখনও যে ক'য় জন জমিদারের আমমোক্তার ছিলেন, তাঁহাদিগের মামলাসংক্রান্ত কার্য্যে ঐ মুহুরীরা আসিয়াছিলেন। মলিন, কালীর চিহ্নপূর্ণ দপ্তরের আবরণ-বস্ত্র খুলিয়া তিনি পুরাতন কাগজপত্র বাহির করিতেছিলেন। কান্তিচন্দ্র সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলে তিনি

"এস, বাবা, এস," বলিয়া সাদরে তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। জোড়া তক্তপোষের উপর জাজিম ঢাকা সতরঞ্চের উপর বসিয়াই কান্তিচন্দ্র বলিল, "সুবিনয় এক মাসের ছুটী নিয়ে এসেছে—তা'র দশ দিন কেটে গেল, কাযেই আর দিন-দশেকের মধ্যে বিয়ের দিন স্থির করতে হ'বে।"

মুহুরীদিগের মধ্যে যাহাদিগের কায শেষ হইয়া গিয়াছিল, তাহারাও রায় মহাশয়ের পারিবারিক কাযের আলোচনা হইবে বুঝিয়াও—উঠিয়া গেল না; কথা শুনিতে লাগিল। ইহা আমাদিগের অনেকের অশিষ্ট দৌর্ব্বল্য।

রায় মহাশয় বলিলেন, "তা'ই হ'বে। দিন ক'বে হ'লে তোমাদের সুবিধা হয়?"

"সেটা মামার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে পরে জানাব। এখন দেনা-পাওনাটা স্থির করে ফেলুন।"

রায় মহাশয় বিস্মিত হইলেন—দেনা-পাওনার কোন কথা হইবে না জানিয়া তিনি কাযে অগ্রসর হইয়াছিলেন; আর তাহা জানিয়াই চারুলতা আপনাকে দেখাইতে সম্মত হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, "তোমার ভাই ত বলে গেছেন, দেনা-পাওনার কোন কথা নাই।"

কান্তিচন্দ্র "কাষ্ঠহাসি" হাসিয়া বলিল, "সে বর, সে কি আর সে কথা বলতে পারে?"

"কিন্তু—সে ত স্পষ্টই ব'লে গেছে—"

বাধা দিয়া কান্তিচন্দ্র বলিল, "ওরা আজ-কালকার ছেলে, বুঝে না—'কত ধানে কত চাল'। বিদেশে চাকরী করে—ভাবে সবই আপনি আসে।"

রায় মহাশয় নির্ব্বাক্ রহিলেন।

কান্তিচন্দ্র বলিল, "তা'র পর দেখুন, আমি ওর দাদা —আমিই ত বরকর্ত্তা—কথা আমাকেই বল্‌তে হ'বে।"

রায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের অভিপ্রায় কিরূপ?"

"আমাদের গতায়াতের ব্যয় আছে।"

"সে আমি দিব।"

"আমাদের ত মানসম্ভ্রম আছে; গ্রামের দশ জন লোক যদি দেখে মেয়ের কেবল শাঁখা আর সাড়ী আছে, তা'তে ত আমাদের মাথাই হেঁট হ'বে।"

"তা' হ'লে?"

"অন্ততঃ গলায় সোনার হার, আর হাতে তিন গাছা ক'রে সোনার চুড়ী, আর কাণের একটা গহনা—এ নহিলে কি কখন হ'তে পারে? আপনিই বলুন।"

মোট কত ভরী সোনা, মনে মনে রায় মহাশয় সেই হিসাব করিয়া দেখিতেছিলেন—অসম্ভব।

সেই সময় অঘটন ঘটিল।

তারকের পত্নী কন্যাকে লইয়া পার্শ্বের কক্ষে দাঁড়াইয়া সব শুনিয়াছিল। সে প্রথমে ভাবিল, যাইয়া বলিবে—"তোমাদের মত ছোট লোকের ঘরে আমরা কায করব না।" কিন্তু তাহার পরই তাহার মনে হইল, উপায় কি? সে কন্যাকে একখানি রেকাবী আনিতে বলিয়া আপনার গলা হইতে হার আর দুই হাত হইতে তিন গাছা করিয়া চুড়ী খুলিল; কন্যা রেকাবী লইয়া আসিলে সেইগুলি ও কন্যার কাণ হইতে ইয়ার-রিং খুলিয়া তাহাতে রাখিল এবং অবগুণ্ঠন একটু টানিয়া দিয়া দুই কক্ষের মধ্যবর্ত্তী দ্বার মুক্ত করিয়া কাছারী-ঘরে প্রবেশ করিল। সকলে বিস্মিত হইল—রায় মহাশয় স্তম্ভিত হইলেন। নির্ম্মলা কান্তিচন্দ্রের সম্মুখে রেকাবী রাখিয়া বলিল, "আপনি যা' চেয়েছেন, তা' এই। হ'বে ত?"

কান্তিচন্দ্র একটু হক-চকাইয়া গেল; কিন্তু তাহার পরই আপনার পাটোয়ারী বুদ্ধির প্রশংসা আপনি করিয়া ভাবিল—এই ত! না বলিলে কি কেহ স্বেচ্ছায় টাকা দেয়? সে বলিল, "আর নগদ অল্প দিলেই হ'বে।"

রায় মহাশয় মনে করিতেছিলেন, তিনি যেন স্বপ্ন দেখিতেছেন।

নির্ম্মলা ব্যঙ্গতিক্ত কণ্ঠে বলিল, "অল্পটা কত ব'লে ফেলুন।"

কান্তিচন্দ্র বলিল, "তা' মনে করুন—দেড় হাজার টাকা।"

"আপনারা দিন স্থির করুন। আমরা তা-ই দিব"—ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে এই কথা বলিয়া নির্ম্মলা রেকাবীখানা তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

৩

নির্ম্মলা যখন কাছারী-ঘর হইতে আসিয়া তাহার পিসীমা'র নিকট সব ঘটনা বিবৃত করিল, তখন রায়-গৃহিণী কিছুক্ষণ কোন কথা বলিতে পারিলেন না; তাহার পর বলিলেন, "নির্ম্মলা, তুই কি করলি? এখন কি হ'বে?

নির্ম্মলা বলিল, "আপনি ভাবছেন কেন, পিসীমা? ভগবান্‌কে ডাকুন। আপনি সকলের উপকার ব্যতীত অনিষ্ট কখন করেন নাই। আপনার বাসনা তিনি অপূর্ণ রাখবেন না।"

রায়-গৃহিণী স্বভাবতঃই মনে করিলেন, তারকের ইচ্ছানুসারেই নির্ম্মলা এই কায করিল; কিন্তু তবুও —। তিনি বলিলেন, "ঠাকুরপো এত টাকা দিবে?"

নির্ম্মলা দৃঢ়ভাবে বলিল, "দিতেই হবে। দাদাই ত' 'মানুষ' করেছেন। আর আজ পর্য্যন্ত কুটাটি ভেঙ্গে দাদার কোন উপকার করতে হয় নাই—কন্যাদায় কি তাঁ'রও নহে, পিসীমা?"

নির্ম্মলার কথায় রায়-গৃহিণীর চক্ষুতে জল আসিল।

নির্ম্মলা এক বার রৌদ্রের দিকে চাহিল; তাহার পর বলিল, "যাই, পিসীমা, বেলা হ'ল। আজ আমি সকালেই রান্না শেষ ক'রেছিলাম—যাই, ভাত দিবার আয়োজন করি গে।"

সে যখন যাইতেছিল, তখন চারুলতা তাহাকে ডাকিল—তাহাকে একান্তে লইয়া যাইয়া কাতর ভাবে বলিল, "কাকীমা, আপনি কেন এমন করলেন?"

নির্ম্মলা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল, "বেশ করেছি। তুই বিয়ের কনে, তোর অত কথায় কায কি রে? বাবা, কাকা থাক্‌তে তোর ভাবনা কেন?"

তাহার পর চারুলতার চক্ষুতে অশ্রু দেখিয়া সে স্নেহার্দ্র ভাবে বলিল, "শুভ দিনে কান্দতে নাই, চারু। আমি দুপুর বেলা আবার আসব।"

সে চলিয়া গেল।

চারুলতা ভাবিতে লাগিল—তাহার চক্ষু কেবলই অশ্রুপূর্ণ হইতে লাগিল।

নির্ম্মলা নিজগৃহে ফিরিবার পূর্ব্বেই কন্যা কনকলতা যাইয়া সোৎসাহে পিতাকে সকল কথা জানাইয়া দিয়াছিল—তাহার মুখে হাসি যেন আর ধরে না। সে বলিয়াছিল—"বাবা, কি মজাই হয়েছে!"

তারক কিন্তু ব্যাপারটিতে মজা অনুভব করিতে পারে নাই—সে ভাবিতেছিল, নির্ম্মলা যে কাণ্ড করিল, তাহার দায় তাহাকেই পোহাইতে হইবে। কিন্তু সে জানিত, নির্ম্মলার সহিত মতভেদে সে কখন জয়ী হইতে পারে নাই। লোক কথায় বলে—

"লোহা জব্দ কামার-বাড়ী।
মেয়ে জব্দ শ্বশুর-বাড়ী॥"

নির্ম্মলা পিতৃগৃহে সাত ভ্রাতার এক ভগিনী—বড় আদরের। তাহার মাতা আদর করিয়া বলিতেন—

"সাত ভাই চম্পা জাগ রে।
কেন বোন পারুলী ডাক রে?"

কিন্তু তাহার পিতা যখন তাহার পারুল নাম রাখিতে চাহিয়াছিলেন, তখন মা তাহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন—উহাতে সাত ছেলের প্রতি লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে। তাহার পর শ্বশুরবাড়ী, শ্বশুরবাড়ীতে সে স্বভাবতঃ স্নেহশীলা পিসীমা'র যে আদর পাইয়াছে, তাহা বুঝি সে পিত্রালয়েও পায় নাই। সেই জন্য সে কোন সকারণ জিদ করিলে তারক তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিত না।

তারককে অন্নব্যঞ্জন দিয়া নির্ম্মলা তাহাকে ডাকিতে পাঠাইল এবং তাহার আহারের সময় বলিল, "চারুর বিয়ের কথা শুনেছ?"

তারক বিরক্তির ভাবে বলিল, "শুনেছি। তুমি ত গহনা দিয়ে এলে—এখন আমি কোথা থেকে করাই বল ত।"

তারকের রোগের ঔষধ নির্ম্মলা জানিত। সে বলিল, "আমি কি বলেছি, তোমাকে গড়িয়ে দিতে হ'বে? গহনা তুমি দেওনি—যিনি দিয়াছিলেন, তাঁ'র এখন অভাব—কন্যাদায়—দিয়ে ত ধন্য হ'লাম। আমি কখন তোমাকে গহনা গড়িয়ে দিতে বলব না। শাঁখা আর সিঁদুর নিয়ে যেতে পারলেই আপনাকে ভাগ্যবতী বিবেচনা করব। তা'ও ত সিঁদুর মুছে নেবে।"

তারক প্রমাদ গণিল।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে—লৌহ তপ্ত থাকিতে থাকিতে তাহাতে আঘাত করিতে হয়। নির্ম্মলা তাহাই করিল; বলিল—"গহনার জন্য আমি কারও কাছে হাত পাতি নাই; কিন্তু টাকাটার জন্য তোমার কাছে হাত পাতছি।"

"কত টাকা দিতে হ'বে?"

"দেড় হাজার।"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তারক বলিল, "দে—ড়—হা—জা—র! ও ছোট লোকের ঘরে কায না করাই ভাল।"

"এত দিনে ক'টা ভদ্রলোকের ঘরের সন্ধান করেছ? —ক'টা ভদ্রঘরের সন্ধান পেয়েছ? বল্‌তে লজ্জা করে না"

"টাকা আমি কোথায় পা'ব?"

"কেন—বাড়ীতে বিশ্বাস করে দশটা টাকাও না রেখে যে আফিসে রাখ সেখানে।"

"লোন আফিসে টাকা এখন পাওয়া যা'বে না।"

"কেন? সে কি ইন্দুরের জাঁতিকল যে, পড়লে আর বা'র হ'তে পারে না?"

"তা' নয়। ক' বৎসর ব্যবসা-মন্দায় টাকা আটকে গেছে—পাওনা টাকা আদায় হচ্ছে না—দেনা দেওয়া যাচ্ছে না।"

"তাই বুঝি রোজ রোজ সন্ধ্যায় মিটিং হয়?"

"হাঁ। তা' ছাড়া কনকেরও ত বিয়ে দিতে হ'বে।"

"টাকার শোকে কি তোমার মাথা খারাপ হয়েছে? চারুর বিয়ে না হ'লে কনকের বিয়ে! তুমি কেমন ক'রে সে কথা মনে করতে পারলে?"

খেলায় যখন হার হয়, তখন যেমন দাবার সব চালই ভুল হয়—তারকের তেমনই হইতেছিল।

সে ভাবিতে লাগিল।

নির্ম্মলা বলিল, "ও সব আমি বুঝি না। ক' দিন মাত্র সময়—এর মধ্যে আমার দেড় হাজার টাকা চাই-ই। তুমি যদি দিতে না পার বল আমি দাদাদের লিখে টাকা আনাব—পিসীমা'র মেয়ের বিয়ে—তাঁ'রা দিতে কার্পণ্য করবেন না।"

তারক দেখিল—মহা বিপদ। তাহার শ্যালকরা জানিলে কি মনে করিবে? সে বলিল, "চেষ্টা ক'রে দেখি।"

"রাঙা দাদা থাকেন ব্রহ্মে। তাঁ'কে তা' হ'লে টেলিগ্রাম ক'রতে হ'বে।"

"অত ব্যস্ত কেন?"

"সুস্থ হ'বার সময় নাই ব'লে। তুমি বল না—টাকা দিবে—আমি ব্যস্ত না হয়ে, গিয়ে একেবারে শুয়ে ঘুমা'ব।"

৪

তারক যত ভাবিতেছিল, ততই তাহার মনে হইতেছিল, নির্ম্মলা যাহা বলিয়াছে, তাহাই সত্য—সে সকল বিষয়ে তাহার অগ্রজের নিকট ঋণী। সে ভাবিল, কেন সে ইতঃপূর্ব্বে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া চারুলতার বিবাহের ব্যবস্থা করে নাই?

সে স্থানীয় লোন-আফিসে তাহার জমা টাকার মধ্য হইতে দেড় হাজার টাকা তুলিবার চেষ্টা করিল। ঐ প্রতিষ্ঠান তখন আমানতকারীদিগের টাকা দেওয়া বন্ধ করিয়াছিল এবং তারক তাহার ডিরেকটারদিগের এক জন। দুই এক জন লোক উহার "চেক" লইয়া টাকা দিতেছিলেন বটে, কিন্তু কবে টাকা পাইবেন তাহা অনিশ্চিত বলিয়া এক শত টাকার "চেক" লইয়া পঞ্চাশ টাকামাত্র দিতেছিলেন। সুতরাং দেড় হাজার টাকা পাইতে আর দেড় হাজার টাকা ত্যাগ করিতে হয়।

টাকা সংগ্রহের চেষ্টায় তারকের গৃহে ফিরিতে বিলম্ব হইল। তাহার ফিরিতে যত বিলম্ব হইতেছিল, নির্ম্মলা তত উৎকণ্ঠিতা হইতেছিল; একখানি পত্র হাতে লইয়া সে পুনঃ পুনঃ কক্ষের বাতায়নপথে রাজপথে চাহিতেছিল—তারক আসিতেছে কি না দেখিতেছিল।

শেষে তারক আসিল।

রায়-গৃহিণী নির্ম্মলাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, কেহ পরিশ্রান্ত হইয়া গৃহে ফিরিলে তখনই তাহাকে কোন দুঃসংবাদ বা অভিযোগ বা অপ্রীতিকর ব্যাপার জানাইতে নাই। আজ নির্ম্মলা সে উপদেশও বিস্মৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "টাকা পেলে?"

তারক বলিল, "না।"

নির্ম্মলা হতাশ ভাবে বলিল, "কিন্তু আর ত বিলম্ব করা যায় না! ভগবানের মনে কি আছে কে জানে?"

তারক বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

নির্ম্মলা তাহাকে তাহার হস্তস্থিত পত্রখানি দিল।

রায় মহাশয়ের গৃহের এক পার্শ্বে তারকের গৃহ—ঐ গৃহেরই একাংশ বলা যায়; আর এক পার্শ্বের গৃহস্বামী রায় মহাশয়ের বিশেষ বন্ধু ছিলেন—তিনি এখন মৃত. পত্নী চারুলতার সমবয়সী—উভয়ে ঘনিষ্ঠতা ছিল—তাহার পুত্র-কন্যারা চারুলতাকে বড় ভালবাসিত। মধ্যাহ্নে সে চারুলতার কাছে আসিয়াছিল এবং বিবাহের কি স্থির হইল জানিতে চাহিয়াছিল। চারুলতা প্রথমে তাহাকে ব্যঙ্গের ভাবেই বলিয়াছিল, "ভারী ত বিয়ে—তার চা'র পায় আলতা।" কিন্তু তাহার পর কথায় কথায় সে তাহার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিল—পিতার অর্থ নাই; তাহার বিবাহের চিন্তায় পিতামাতা জর্জ্জরিত—এ দিকে পাত্রের দাদা অসম্ভব দাবী করিয়াছেন—কাকীমা বলিয়াছেন বটে, সেই দাবীই মিটাইবেন, কিন্তু কাকার হস্তেও টাকা নাই; এই অবস্থায় সে মরিলেই সব আপদ দূর হয়।

বধূটি গৃহে ফিরিয়াই নির্ম্মলাকে একখানি পত্র লিখিয়া তাহা গোপনে পাঠাইয়া দিয়াছিল—

কাকীমা,

আমি চারুর কাছে গিয়াছিলাম। তাহার নিকট আমি সব কথা শুনিয়াছি। আপনি মা'র মত কায করিয়াছেন। কিন্তু শুনিলাম, টাকা এখনও কাকাবাবু সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। চারুর সঙ্গে কথা বলিয়া আমি বুঝিলাম, তাহার মনের গতি ভাল নহে; সে মরিলেই সব আপদ যায়। আপনারা তাহাকে চোখে চোখে রাখিবেন।

আপনাদের
স্নেহের বৌ

তারকের পত্র-পাঠ শেষ হইলে নির্ম্মলা বলিল, "পত্র পেয়ে অবধি আমি ছটফট্ করছি—কখন তুমি আসবে। আমি কনককে পাঠিয়ে দিয়েছি, বলে দিয়েছি, সে যেন তার দিদির কাছে থাকে। রাত্রিতে আমি চারুকে কাছে রাখব।"

পত্র পাঠ করিয়া তারকও যে চিন্তিত হইল না, তাহা নহে। আদালতের বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আসিয়া তারক নির্ম্মলাকে বলিল, সে সেই দিনই কলিকাতায় যাইবে—এক ঘণ্টার মধ্যেই তাহাকে বাহির হইতে হইবে।

রায় মহাশয় কলিকাতা হইতে আসিয়া যে বলিয়াছিলেন, জমিদারদিগের মধ্যে এক জনের কনিষ্ঠ পুত্র রমেন্দ্র বলিয়াছিলেন, তাঁহার অধিক সাহায্য করিবার ইচ্ছা ছিল, তাঁহার কথা তারকের মনে পড়িয়াছিল। তারক যখন পড়িবার জন্য কলিকাতায় গিয়াছিল, তখন বসন্তরঞ্জনের নিকট হইতে পত্র পাইয়া সংবাদ দিতে সে বহু বার তাঁহার নিকটেও গিয়াছে।

সে তখনই যাইবে শুনিয়া নির্ম্মলা বলিল, "আমি তবে দু'খানা রুটী ক'রে দিই।" সে চলিয়া গেল।

তারক আহার করিতে বসিলে নির্ম্মলা বলিল "পারব

পাও, কলিকাতা হ'তেই রাঙা দাদাকে আমার নাম ক'রে টেলিগ্রাফ করে দিও—আবার তোমার কাছে সংবাদ পেলেই আমি আর সকলকে পত্র লিখে দিব।"

তারক সঙ্কল্প স্থির করিয়াছিল, যদি কলিকাতায় টাকা না পায়—ফিরিয়া আসিয়া ক্ষতিস্বীকার করিয়াই টাকা সংগ্রহ করিবে। সে বলিল, "আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, দেড় হাজার-টাকা তোমাকে দিব।"

হর্ষদীপ্ত চক্ষু তুলিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া নির্ম্মলা বলিল, "আমার ধড়ে প্রাণ এল। তোমার এই কাযের পুণ্যে কনকের ভাল বিবাহ হ'বে।"

তারক চলিয়া গেল।

নির্ম্মলা যাইয়া রায়-গৃহিণীকে বলিল, "পিসীমা, চারুর কাকা কি কাযে বাহিরে গেলেন; চারু আজ আমার কাছে শোবে।"

রায়-গৃহিণী বলিলেন, "কোথায় গেল ?"

"তা' ঠিক বল্‌তে পারি না।"

চিন্তিত ভাবে রায়-গৃহিণী বলিলেন, "সে কি রে ?"

নির্ম্মলা চুপ করিয়া রহিল।

রায়-গৃহিণী বলিলেন, "তা'র দাদাকে নিশ্চয় ব'লে গেছে।"

৩

প্রভাতে শিয়ালদহে উপনীত হইয়া তারক নিকটবর্ত্তী একটা হোটেলে আপনার ব্যাগটি রাখিয়া হাত-মুখ ধুইয়া জমিদারের গৃহের উদ্দেশে যাত্রা করিল। গৃহের সম্মুখে উপনীত হইয়া সে দেখিল, গৃহের পরিবর্ত্তন হইয়াছে—দুই ভ্রাতার দুইটি দ্বার হইয়াছে। কোন্‌টি রমেন্দ্র বাবুর তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়া সে গৃহে প্রবেশ করিল। প্রথম ঘরটি কাছারী-ঘর বা আফিস-ঘর। তথায় যাইয়া সে গৃহস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় জানাইলে, এক জন কর্ম্মচারী বলিলেন, তিনি প্রাতেই বাগানে যাইয়া থাকেন—তথায় গিয়াছেন, আরও এক ঘণ্টা পরে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন।

তিনি প্রতিদিনই প্রাতে বাগানে গমন করেন কি না জিজ্ঞাসা করিয়া তারক জানিল, তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যাটি কয় মাস পূর্ব্বে প্রসবের সময় প্রাণ হারাইয়াছে। সন্তান-সমূহের মধ্যে এই কন্যাটিই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। তাহাকে হারাইয়া তিনি ও তাঁহার পত্নী অত্যন্ত দুঃখিত ও শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন। মৃত কন্যার শিশুটি পালনের কার্য্যে পত্নী আপনাকে ব্যাপৃতা রাখেন; কিন্তু তাহার পিতা কাযের অবসরকাল বাগানে একা কাটাইয়া থাকেন।

শুনিয়া তারকের মনে হইল, এ সময় চাহিলেও সে টাকা পাইবে না। তথাপি যখন আসিয়াছে, তখন সাক্ষাৎ না করিয়া সে ফিরিবে না, স্থির করিয়া বসিয়া রহিল।

এক ঘণ্টার কিছু পরে রমেন্দ্র ফিরিয়া আসিলেন—আফিস-ঘরের পশ্চাতে বারান্দায় যাইয়া সংবাদপত্র পাঠ করিবেন।

তারক তথায় যাইয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। তিনি মুখ তুলিয়া তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "আপনাকে যেন কোথাও দেখেছি—কিন্তু ঠিক মনে করতে পারছি না।"

তারক বলিল, "আমি আপনাদের কর্ম্মচারী বসন্তরঞ্জন রায় মশায়ের ভাই।"

"তা'-ই বল, তুমি তারক।"

"আজ্ঞা হাঁ।"

"বসন্ত বাবু ভাল আছেন ?"

"হাঁ।"

"তাঁ'র একটি মেয়ের বিয়ের জন্য তিনি ক' বছর আগে এক বার এসেছিলেন। তা'র বিয়ে কোথায় হয়েছে ?"

"হয়নি।"

"হয়নি ?"

"আজ্ঞা—সেই জন্যই আমি এসেছি।"

সুযোগ পাইয়া তারক অর্থাভাবে বসন্ত বাবুর কন্যার বিবাহ দিতে অক্ষমতা, শেষ সম্বন্ধের কথা, পাত্রের দাদার ব্যবহার, তাহার স্ত্রীর কার্য্য, লোন অফিসের অবস্থা-বিপর্য্যয়হেতু তাহার অর্থসংগ্রহে অক্ষমতা, বসন্ত বাবুর পূর্ব্ববারের অভিজ্ঞতা স্মরণ করিয়া তাহার তাঁহার নিকট আগমন—সকল কথা ব্যক্ত করিল।

রমেন্দ্র ধৈর্য্য সহকারে সকল কথা শুনিলেন। তারকের মনে হইল, তাঁহার চক্ষু অশ্রুসজল হইয়াছিল। সে লক্ষ্য করিল, তিনি বার বার সম্মুখের প্রাচীরে বিলম্বিত এক তরুণীর চিত্র দেখিতেছিলেন।

সে চিত্র তাঁহার অকাল-নির্ব্বাপিতজীবনদীপ দুহিতার। তিনি স্মরণ করিতেছিলেন, মৃত্যুর কয় মাস পূর্ব্বে কোন জ্ঞাতির কন্যাদায়ে সে তাঁহার নিকট হইতে টাকা লইয়া দিয়াছিল। তাঁহার মনে হইল, সে বাঁচিয়া থাকিলে এবং তারকের কথা শুনিলে তাঁহাকে বসন্ত বাবুর দায় উদ্ধারের উপায় করিতে বলিত। তিনি সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত টাকার প্রয়োজন ?"

তারক বলিল, "দেড় হাজার টাকা।"

"আচ্ছা"—বলিয়া তিনি খাজাঞ্চীকে ডাকিয়া দেড় হাজার টাকা আনিতে বলিলেন।

খাজাঞ্চী যাইয়া টাকা আনিলে তিনি তাহা তারককে দিলেন।

খাজাঞ্চী জিজ্ঞাসা করিল, "কি খরচ লিখব ?"

তিনি বলিলেন, "পরে বলব।"

খাজাঞ্চী চলিয়া গেল।

তারক পকেট হইতে লোন আফিসের আমানতের খাতা বাহির করিয়া বলিল, "আমি এখানা আর হ্যাণ্ডনোট দিয়ে যাই।"

রমেন্দ্র দৃঢ়ভাবে বলিলেন, "না।"

তাহার পর—তারক কিছু বলিবার পূর্ব্বেই তিনি বলিলেন, "আমি এ টাকা ঋণ হিসাবে দিচ্ছি না। যদি পার—আর ইচ্ছা হয়, শোধ ক'র।"

তিনি উঠিয়া চলিয়া যাইলেন।

৬

তারক টাকা লইয়া আসিলে নির্ম্মলার কি আনন্দ! সে পল্লীর কালীবাড়ীতে পূজা পাঠাইয়া দিয়াই যাইয়া তাহার পিসীমা'কে সব কথা বলিল।

বসন্তরঞ্জন ও তাঁহায় পত্নী তারকের নিকট হইতে সকল কথা শুনিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ও ভগবানের কাছে রমেন্দ্র বাবুর মঙ্গলপ্রার্থনা করিলেন। বিবাহের সব আয়োজন সোৎসাহে করা হইতে লাগিল।

সুবিনয়ের মাতুল সেরেস্তাদার মহাশয় প্রতিদিন বেড়াইয়া ফিরিবার পথে রায় মহাশয়ের গৃহে আসিয়া ধূমপান করিয়া যাইতেন। কান্তিচন্দ্রের ব্যবহারের পর লজ্জায় আর তিনি সে পথে গমন করেন নাই। কিন্তু বিবাহের নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্বদিন তাঁহাকে রায় মহাশয়ের গৃহে আসিতে হইল—তিনি সংবাদ দিয়া যাইলেন, বর ও তাহার দাদা প্রভৃতি সেই দিন সন্ধ্যায় আসিয়া উপনীত হইবে।

সন্ধ্যায় আসিয়া রাত্রিতেই কান্তিচন্দ্র মাতুলকে বলিল, "কাল সকালে আপনাতে আর আমাতে গিয়ে টাকাটা আনব।"

মাতুল বলিলেন, "বাবা, তুমিই যেও—আমি যেতে পারব না।"

ভাগিনেয় বলিল, "আচ্ছা।"

মাতুল-ভাগিনেয়ে যে কথা হইল, তাহা সুবিনয় শুনিতে পাইল। সে মাতুলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মামা, টাকার কথা দাদা কি বলছিলেন?"

"আর বল কেন, বাবা!"—বলিয়া মাতুল কান্তিচন্দ্রের ব্যবহারের বিবরণ বিবৃত করিলেন; বলিলেন, "সেই দিন হ'তে আমার রায় মহাশয়ের কাছে মুখ দেখা'তে লজ্জা করে।"

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সুবিনয় বলিল, "এ কি অন্যায়! আমি এখনই চ'লে যা'ব—বিয়ে করব না!"

শুনিয়া মাতুল বলিলেন, "কান্তির কাযটা অন্যায়ই হয়েছে বটে, কিন্তু এখন তুমি যদি বিবাহ না কর, তবে একের পাপে অন্যকে দণ্ড দেওয়া হ'বে। রায় মহাশয়ের অবস্থা যেমনই কেন হ'ক না—তিনি মানী লোক। মেয়ের বিয়ের এমন কেলেঙ্কারী হ'লে কি আর বাঁচবেন? মেয়েই বা কি করবে তা' কে জানে?"

সুবিনয় ভাবিতে লাগিল। সে মাতুলকে বলিল, "দাদা টাকার কথা কাউকে বলেন নি বটে, কিন্তু গহনার কথা, বোধ হয়, বলেছেন। কারণ, বৌদিদি আমাকে বললেন, 'ঠাকুরপো, ছোট বৌয়ের গহনা ত রয়েছে, সেগুলো সে অঙ্গে দিতে পারে কি—সে সব নতুন বৌকে দিও; তুমি তোমার দাদার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে যাও।' এ কি ব্যবহার বলুন ত?"

সে রাত্রিতে সুবিনয় ঘুমাইতে পারিল না। তাহার প্রথমা পত্নীর কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাহার মনে দাদার ব্যবহারে বিরক্তি সব ভাবনা ডুবাইয়া দিতে লাগিল। সে স্থির করিল, সে ইহার প্রতীকার করিবে।

এ দিকে প্রাতেই কান্তিচন্দ্র রায় মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়া বলিল, টাকাটা বিবাহ-সভায় না দিয়া এখন তাহাকে দিলেই ভাল হয়। সে কথায় নির্ম্মলার নির্দ্দেশে তারক নোটগুলি আনিয়া—কান্তিচন্দ্রকে দেখাইয়া বলিল, "টাকা মজুদ আছে—গণে দেখ্‌তে পারেন—এক হাজার পাঁচশ টাকা। কিন্তু আপনি যখন আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন না, তখন আমরাই বা আপনাকে বিশ্বাস ক'রে আগে টাকা দিব কোন্ ভরসায়? টাকা আর গহনা আমরা সম্প্রদানের সময় দিব।"

আশাভঙ্গে বিরক্ত হইয়া কান্তিচন্দ্র ফিরিয়া গেল। ভাবিল—এত বড় স্পর্দ্ধা! ভাল, দেখা যাইবে।

পূর্ব্বরাত্রি হইতে নির্ম্মলা কাযের অবসরে কেবলই আসিয়া চারুলতাকে কি উপদেশ দিতেছিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া পার্শ্বের বাড়ীর বধূটি চারুলতাকে বলিল, "কাকীমা কি মন্ত্র দিচ্ছেন?

চারু কোন উত্তর দিল না।

তখন সে বলিল, "কাকীমার মন্ত্র যদি শিখতে পার, তবে ভালই হ'বে। কাকীমা'র কথা ছাড়া কাকাবাবু কায করেন না—সকলেই বল্‌ছে।"

ক্রমে দিন শেষ হইল। সন্ধ্যার পরেই বিবাহের লগ্ন।

সম্প্রদানের সময় নির্ম্মলা একখানি থালায় গহনাগুলি ও দেড় হাজার টাকার নোট লইয়া আসিয়া আসনে উপবিষ্টা চারুলতাকে বলিল, "মা, এই গহনা আর টাকা।"

কান্তিচন্দ্র তথায় দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল, "টাকাটা সুবিনয়কে দি'ন।"

"তা'ই হ'বে" বলিয়া নির্ম্মলা নোটগুলি লইয়া সুবিনয়কে বলিল, "এই লও বাবা।'"

সুবিনয় নোটগুলি লইয়া দোবজায় বাঁধিল। সে-ও কি করিবে, তাহা স্থির করিয়াছিল।

বিবাহ হইয়া গেল।

৭

বাসর-ঘরের কাছে যে কেহ থাকিবে না, তাহা নির্ম্মলা চারুতলাকে বলিয়া দিয়াছিল!

তখন বিবাহ-গৃহ নিস্তব্ধ হইয়াছে। শ্রান্ত গৃহস্থগণের মধ্যে কেবল নির্ম্মলা জাগিয়া আছে—ভগবান্‌কে ডাকিতেছে। সুবিনয় ভাবিতেছে, চারুলতাকে কি বলিবে? তাহার মনে হইতেছে, কয় বৎসর পূর্ব্বে আর এক দিন সে তাহার পার্শ্বে লজ্জাসঙ্কুচিতা বধূকে দেখিয়া এই কথাই ভাবিয়াছিল। সে একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। স্মৃতি কি কখন সুখের হয়?

সহসা চারুলতা উঠিয়া বসিল।

সুবিনয় জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যা'বে?"

চারুলতা বলিল, "যা'বার স্থান আর আমার কোথায়? আমি তোমাকে একটা কথা বলব—একটা অনুরোধ করব।"

সুবিনয় শঙ্কিত হইল।

চারুলতা বলিল, "তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার স্ত্রী। বয়স আমারও অল্প নহে—তোমারও নহে। আমরা সব বুঝতে পারি। আমি তোমাকে যে অনুরোধ করব, তা' শুনে তোমার যদি আমাকে ত্যাগ করতে ইচ্ছা হয়—তা'-ই ক'র—তা'তে আমি তোমাকে দোষ দিব না; মনে করব—দোষ আমারই। আর যদি তুমি আমাকে ত্যাগ না কর, তবে—বিশ্বাস কর—আমি জীবনে আর কখন তোমাকে কোন অনুরোধ করব না।"

সুবিনয় লক্ষ্য করিল, চারুলতার চক্ষু ছাপাইয়া দুই গণ্ডের উপর দিয়া অশ্রু ঝরিতেছে। অতি কষ্টে আপনার উচ্ছ্বসিত রোদন সংযত করিবার চেষ্টায় তাহার মুখ রক্তাভা ধারণ করিয়াছে। সে বলিল, "কি বল্‌বে—বল।"

"আজ কাকীমা তোমাকে যে দেড় হাজার টাকা দিয়াছেন, তা' অতি কষ্টে সংগ্রহ করা হয়েছে। যদি ইচ্ছা হয়, পরে সে কথা শুনতে পারবে। ঐ টাকাটা তোমার—তোমার দাদাকে দিও না।"

রোদনোচ্ছ্বাসে চারুলতা আর কিছু বলিতে পারিল না। তাহার বলিবারও আর কিছু ছিল না।

সুবিনয় বিরক্ত হইল না। চারুলতার কথা তাহার অন্তরের ভাবের বিকাশ বলিয়াই তাহার বোধ হইল। সে মনে করিল, এই তরুণী গৃহিণী, সচিব ও সখী হইবার মতই বটে। সে বলিল, "তুমি আমার স্ত্রী। তোমাকে আমার অনুরোধ, দাদার ব্যবহারে আমাকে বিচার ক'র না—তা' হ'লে আমাদের দু'জনেরই জীবন কেবল যন্ত্রণার হ'বে। এ টাকা তুমিই রাখ।"

সে দোবজা হইতে গ্রন্থি খুলিয়া নোটগুলি লইয়া চারুলতাকে দিল।

চারুলতার মনে হইল—তাহার দুঃখের রজনীর অবসান হইল—সে অন্ধকারে অরুণ-কিরণ-বিকাশ দেখিতে পাইতেছে। সে আপনাকে ভাগ্যবতী মনে করিল।

চারুলতা ভাবিতে লাগিল, কতক্ষণে রাত্রি শেষ হইবে—সে তাহার কাকীমা'কে সব কথা বলিবে।

৮

পরদিন প্রভাতে কান্তিচন্দ্র আসিয়া যখন সুবিনয়কে বলিল, "টাকাটা কোথায়?" তখন সুবিনয় দৃঢ়ভাবে উত্তর দিল, "আমার স্ত্রীর কাছে।"

কান্তিচন্দ্র বলিল, "কেন?"

"তা'কেই রাখতে দিয়েছি।"

"নিয়ে এস।"

"ও টাকা আমার স্ত্রীর কাছেই থাকবে।"

"আর বিয়ের ব্যয় যা' হ'ল আর হ'বে?"

"ব্যয়, বোধ হয়, এক শ' টাকার অধিক হয় নাই—হয়ত আর একশ' টাকা হ'তেও পারে। কিন্তু তা'র অনেক অধিক টাকা কি আমি উপার্জ্জন ক'রে পাঠাইনি?"

"বটে! বিয়ে হ'তে না হ'তেই এত। একেই বলে দ্বিতীয় পক্ষ।"

পূর্ব্বপত্নীর অলঙ্কারের কথা বলিবার প্রলোভন সম্বরণ করিয়া সুবিনয় সরিয়া গেল।

কান্তিচন্দ্র মাতুলকে বলিল, "দেখলেন, মামা?"

সেরেস্তাদার মহাশয় বলিলেন, "ও ত বলেই গিয়েছিল, দেনা-পাওনার কোন কথা নাই। তুমি তা শুন্‌লে না।"

"বড় অন্যায় কায করেছি! বুঝেছি, আমাকে অপমান করার জন্য একটা ষড়যন্ত্র হয়েছে। ভাল, আমি এ কামে থাকব না।"

কান্তিচন্দ্র রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে চলিয়া গেল—মাতুলের গৃহে যাইয়া যে কয় জন বরযাত্রী আনিয়াছিল, তাঁহাদিগকে ফেলিয়া আপনি গৃহে চলিয়া গেল।

সব কথা শুনিয়া রায়-গৃহিণী বলিলেন, "কি হ'বে?

রায় মহাশয় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইলেন।

নির্ম্মলাও যেন দমিয়া গেল।

সেরেস্তাদার মহাশয় অভয় দিয়া বলিলেন, "আমার ভাগনে। যা' করবার আমিই করব। ভগবান্ যা' করেন, ভালর জন্যই করেন, আমরা বুঝতে পারি না।"

তিনি বর-বধূকে স্বগৃহে লইয়া যাইলেন এবং বহু লোক নিমন্ত্রণ করিয়া পাকস্পর্শ সম্পন্ন করিলেন।

সুবিনয়ের মাতুলানীই মা'র কায করিলেন। তিনি বলিলেন, "ঠাকুরঝি বেঁচে থাকলে কি এত ছরকট হয়!"

বিবাহের কায মিটিলে সুবিনয় স্ত্রীকে লইয়া কার্য্যস্থল কলিকাতায় চলিয়া গেল। যাইবার পূর্ব্বেই সে তাহার এক বন্ধুকে বাসা ঠিক করিয়া রাখিতে বলিয়াছিল—যাইয়া সেই বাসায় উঠিল। চারুলতাকে যাইয়াই সংসার পাতাইয়া বসিতে হইল।

সে ছুটী লইয়া যাইবার পূর্ব্বে ভারত সরকারে একটা অধিক বেতনের চাকরীর জন্য আবেদন করিয়া গিয়াছিল —তাহার উপরস্থিত কর্ম্মচারী তাহার জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন। সে কলিকাতায় আসিবার পক্ষকাল মধ্যেই সে সেই চাকরীতে নিয়োগপত্র পাইল।

সে সেই সংবাদ মাতুল ও অগ্রজকে জানাইল। মাতুল বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া লিখিলেন—রায় মহাশয়ের মত লোকের কন্যার ভাগ্যে যে তাহার উন্নতি হইল, তাহা যেন সে মনে রাখে।

কান্তিচন্দ্র কোন পত্র লিখিল না; তাহার স্ত্রী গোপনে চারুলতাকে পত্র লিখিলেন—সুবিনয় যেন অকারণে গালি খাইবার জন্য আর তাহার দাদাকে পত্র না লিখে। তিনি আশীর্ব্বাদ করিতেছেন—তাহাদিগের মঙ্গল হউক।

দিল্লীতে যাইয়া—কাযে স্থিত হইয়া সুবিনয় দাদাকে আর একখানি পত্র লিখিল—সে তাহার পূর্ব্বপত্নীর অলঙ্কারগুলি চাহিল।

চারুলতার পক্ষে দিল্লীযাত্রার পূর্ব্বে আর পিতা-মাতাকে দেখিতে যাওয়া ঘটিল না।

৯

কলিকাতায় আসিয়াই চারুলতা স্বামীকে তাহার নিকট যে দেড় হাজার টাকা ছিল, তাহার বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। সুবিনয় বলিয়াছিল, "এখন রাখ—পরে যা' হয় করব।" দিল্লীতে যাইয়া সে বলিয়াছিল, "বিদেশ—অতগুলা টাকা রাখতে ভয় হয়।" "সে কথা সত্য" বলিয়া সুবিনয় উহা লইয়া ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিয়াছিল।

দিল্লীতে তিন মাস থাকিবার পর সুবিনয় এক দিন স্ত্রীকে সাহজাহানের দুর্গ দেখাইতে লইয়া গেল। সেই দিন সে তাহাকে বলিল, "মামার চেষ্টায় আজ একটা জিনিষ পেয়েছি।"

চারুলতা জিজ্ঞাসা করিল, "কি ?"

"দাদার কাছে আমার যে গহনা ছিল। কাকীমা যে গহনা তোমাকে দিয়াছেন তা' তাঁ'কে আর দেড় হাজার টাকা যিনি দিয়াছিলেন, তাঁ'কে দিতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত হই—দাদার পাপের চিহ্ন মুছে ফেলতে পারি। টাকা ত মজুদই আছে, আর তুমি যে ভাবে কষ্ট করে গুছিয়ে 'সংসার কর'ছ' তাতে তোমার গহনাও আর ছ' মাসে গড়াতে দিতে পারতাম ; এগুলা এসে গেল—আর অপেক্ষা করতে হ'বে না।"

স্বামীর কথায় চারুর মন তাহার প্রতি শ্রদ্ধায় পূর্ণ হইয়া গেল। সে বলিল, "আশীর্ব্বাদ ক'র, যেন তোমার উপযুক্ত হ'তে পারি—গহনায় আমার কি প্রয়োজন ?"

সুবিনয় সাদরে চারুলতার মুখ চুম্বন করিল।

তাহার পর দেড় হাজার টাকাটা প্রত্যর্পণের কথা উভয়ে অনেক সময় আলোচনা করিত—তাহার সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক উপায় কি, তাহা তাহারা বিচার করিত।

বিবাহের পর এক বৎসর অতীত হইয়া দ্বিতীয় বৎসর আরম্ভ হইল। চারুলতার সন্তান-সম্ভাবনায় তাহারা যখন কর্ত্তব্যের বিষয় বিবেচনা করিল, তখন সুবিনয় বলিল, চারুলতার হয়ত সে সময় পিত্রালয়ে যাইতে ইচ্ছা হইতেছে, কিন্তু সে, সে ব্যবস্থার বিরোধী; কারণ, অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে যাহাদিগের প্রথম সন্তান হয়, তাহারা প্রায়ই প্রসবের সময় কষ্ট পায়—দিল্লীতে ভাল ডাক্তার ও ধাত্রী সুলভ, বাঙ্গালার মফঃস্বল সহরে তাহা নহে; চারুকে সে দিল্লীতে তাহার কাছেই রাখিতে চাহে। চারুলতা তাহাতে বলিয়াছিল,—"তুমি যা' করবে তা-ই হ'বে।"

সংবাদ পাইয়া তারক সুবিনয়কে যে পত্র লিখিয়াছিল, তাহার উত্তরে সে সুবিনয়ের পত্র পাইলে নির্ম্মলা চারু-লতাকে লিখিয়াছিল—"তোমার কাকা জামাইয়ের পত্র পাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, দিল্লীতে ভাল ধাত্রী ও ডাক্তার আছেন এবং প্রসূতি হাসপাতালও খুব ভাল—অনেকেই প্রসবের জন্য হাসপাতালে যায়। তাহা হইলেও এ সময় আমরা এক জন তোমার কাছে থাকিব। তুমি জান, গত শীতকাল হইতেই তোমার বাবার শরীর ভাল নাই। সেই জন্য পিসীমা'কে এখানে রাখিয়া আমিই তোমার কাছে যাইব। তোমার কাকা আমাকে রাখিয়া আসিবেন।"

উত্তরে চারুলতা লিখিয়াছিল—"আপনি আসিবেন, সে ত আমাদিগের পরম ভাগ্য। কিন্তু কনককে সঙ্গে লইয়া আসিবেন।"

যথাকালে স্ত্রীকে ও কন্যাকে লইয়া তারক দিল্লীতে উপনীত হইল। তারক পরদিনই ফিরিয়া যাইতে চাহিলে সুবিনয় বলিল, সে যখন আসিয়াছে তখন নির্ম্মলাকে আগ্রা, মথুরা ও বৃন্দাবন দেখাইয়া দিল্লীতে রাখিয়া যাইবার ব্যবস্থা করুক।

নির্ম্মলা তাহাতে সম্মত হইল না। সে বলিল, "যে জন্য এসেছি, তা' শেষ না হ'লে আমি কোথাও যা'ব না। পিসীমাকে ব'লে এসেছি—মেয়ে আর নাতী নিয়ে যা'ব। সে-ই আমার প্রথম কায।"

দিল্লীর দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়া তারক ফিরিয়া গেল।

* * * *

চারুলতার পুত্রটি এক মাসের হইলেই নির্ম্মলা তাহা-দিগকে লইয়া ফিরিবার প্রস্তাব করিল। সুবিনয় দুই দিনের ছুটী লইয়া তাহাকে আগ্রা, মথুরা ও বৃন্দাবন দেখাইয়া আনিল।

যাত্রার পূর্ব্বদিন চারুলতা নির্ম্মলাকে একগাছি হার,

আটগাছি চুড়ী ও ছুইটি দুল দিয়া বলিল, "কাকীমা, আপনি জানেন, আমার বিয়ের টাকা আর গহনা নিয়ে আপনাদের জামাইয়ের সঙ্গে তাঁ'র দাদার ঝগড়া হয়ে গেছে। বিয়ের পর হ'তেই তিনি বলছেন—গহনা আপনাকে আর টাকা যিনি দিয়াছিলেন তাঁ'কে ফিরিয়ে দিতে হ'বে। শেষে তিনি বল্লেন—গহনা আপনার আশীর্ব্বাদ—আশীর্ব্বাদ ফিরিয়ে দিতে নাই—দেওয়া যায়ও না। তাই তিনি আপনি তাঁ'র বাড়ীতে এসে তাঁ'কে কৃতার্থ করেছেন বলে এই হার দিয়ে আপনাকে প্রণাম করছেন—আপনি প্রত্যাখ্যান করবেন না। বিদেশে থাকি, কনকের বিয়েতে আমি যা'বই; কিন্তু কি জানি, পাকা-দেখায় যদি গিয়ে উঠতে না পারি, তাই সেই সময়ের জন্য তা'র এই চুড়ী আর দুল আপনার হাতে দিয়ে দিলাম।"

নির্ম্মলা চারুলতাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, "মা আমার, আমি কি ফিরিয়ে পা'বার জন্য গহনা দিয়েছিলাম যে, তুমি আজ এ সব দিচ্ছ?"

চারুলতা বলিল, "সে আমরা খুবই জানি, কাকীমা। এ দেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া নয়। আপনার ঋণ কখন শোধ করতে পারব না, শোধ করবার চেষ্টাও করব না।"

নির্ম্মলা তখন বলিল, "আমার অনুরোধ, কনকের বর জামাইকে দেখে—বেছে দিতে হ'বে। তা' হলে আমি নিশ্চিন্ত হ'ব।"

"তোমাদের জামাই রমেন্দ্র বাবুর টাকাটা নিয়ে যেতে—তাঁ'কে দিয়ে যেতে বলেছিলেন; কিন্তু কাকা বলেছেন, 'তুমি এবার যখন কলিকাতায় যা'বে, তখন সে হ'বে।' কিন্তু কাকা টাকাটা নিয়ে গেলেই ভাল হ'ত।"

১০

যাত্রার পূর্ব্বদিন আফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া সুবিনয় সংবাদ দিল, তাহার পদোন্নতি হইয়াছে—পরদিনই তাহাকে নূতন কাযে যোগ দিতে হইবে—সে কলিকাতা পর্য্যন্ত যাইতে পারিবে না। কিন্তু তাহার আফিসের এক জন বাঙ্গালী কর্ম্মচারী পরদিন তাঁহার মাতা স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাকে কলিকাতায় রাখিতে যাইবেন—নির্ম্মলা প্রভৃতি তাঁহার সঙ্গেই যাইবেন।

শুনিয়া নির্ম্মলা চারুলতার পুত্রটির মুখচুম্বন করিয়া বলিল, "আমাদের মেয়ের 'পয়ে' যেমন—এই ছেলের 'পয়ে' তেমনই চাকরীতে উন্নতি হয়েছে।"

সুবিনয় বলিল, "কাকীমা, সবই আপনাদের আশীর্ব্বাদ।"

* * * *

চারুলতার এক মাস পরে দিল্লীতে ফিরিয়া আসিবার কথা ছিল; কিন্তু তাহা সম্ভব হইল না। রায় মহাশয় ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়াছিলেন—তাহার উপর বিষম জ্বরে পীড়িত হইলেন। সেই জ্বরেই তাঁহার জীবনান্ত হইল।

চারুলতা সেরেস্তাদার মহাশয়ের ব্যবস্থামত "চতুর্থী" করিল এবং তাহাকে পিতার শ্রাদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত মাতার নিকটেই থাকিতে হইল।

তাহার পর চারুলতার যাত্রার ব্যবস্থা হইল। স্থির হইল, তাহার অগ্রজ তাহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবে এবং সুবিনয় কলিকাতায় আসিয়া তথা হইতে তাহাকে লইয়া যাইবে।

তারকও বলিল, কলিকাতায় তাহার কায আছে, সে-ও যাইবে।

সকলে কলিকাতায় উপনীত হইলে—পরদিন প্রাতে "আমার একটু কায আছে" বলিয়া তারক বাহির হইয়া রমেন্দ্র বাবুর গৃহে গেল। সে তথায় যাইয়া দেখিল, বসন্ত বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র তাহার পূর্ব্বেই তথায় যাইয়া রমেন্দ্র বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। এ দিকে দিল্লী হইতে আসিয়া সুবিনয়ও তথায় গেল। কেহ কাহারও উদ্দেশ্য জানিতে পারিল না।

রমেন্দ্র বাবু বাগান হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহাদিগকে দেখিয়া তারককে বলিল, "এই যে, তারক—রায় মহাশয়ের কায সুসম্পন্ন হয়েছে ত'?"

"আপনাদের শুভেচ্ছায় হয়েছে"—বলিয়া তারক সুবিনয়কে জামাতা বলিয়া পরিচিত করাইয়া, ভ্রাতুষ্পুত্রের পরিচয় দিল।"

রমেন্দ্র বাবু তাহাদিগকে বসিতে বলিয়া প্রথমে সুবিনয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ত সরকারী দপ্তরে চাকরী কর।"

সুবিনয় বলিল, "আমি এখন দিল্লীতে। কলিকাতায় থাকলে অবশ্যই এর আগে এসে দেখা করতাম। আমি আজই দিল্লী হ'তে এসেছি—সব নিয়ে যা'ব।" বলিতে বলিতে সে পকেট হইতে এক হাজার টাকার একখানি ও পাঁচ শত টাকার একখানি নোট বাহির করিয়া টেবলের উপর রাখিয়া বলিল, "আমার বিয়ের সময় আমার দাদা আমার মতের বিরুদ্ধে টাকা নিয়েছিলেন। আমি সে টাকা খরচ করি নাই; আজ আপনাকে দিতে এসেছি।"

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে তারক বলিল, "সে কি কথা! টাকা আমি নিয়ে গেছি—আমি আজ দিতে এসেছি। তোমাকে এ টাকা দিতে দিব না।"

রমেন্দ্র বাবু বলিলেন, "এখন তোমরা শ্বশুর-জামাই ঝগড়া কর।"

বসন্ত বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র বলিল, "আমার এক নিবেদন আছে। বাবা যে অনেক দিন আগে জীবন-বীমা

করেছিলেন, তা' আমরা জানতাম না—তিনিও যেন ভুলে গিয়েছিলেন। রোগ-শয্যায় কাগজপত্র দেখ্তে দেখ্তে তিনি বীমার কাগজ আমাকে দিয়ে বলেন, হাজার টাকার বীমায় বোধ হয় পনের যোলশ টাকা হয়েছে—আমি যেন ঐ টাকা তুলে সিন্দুকে তুলবার আগেই এসে আপনাকে দিয়ে যাই। আপনি ঐ টাকা না নেওয়া অবধি তাঁ'র আত্মার শান্তি হ'বে না।"

তারক কি বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু রমেন্দ্র বাবুই প্রথমে কথা বলিলেন—"একেই বলে—ভগবান্ যখন দেন, তখন চাল ফুঁড়েও দেন। তারক, টাকাটা দিবার সময়ই আমি বলেছিলাম, আমি ঋণ হিসাবে দিই নি। ও টাকা আমি কা'রও কাছ থেকে নেব না।"

বসন্ত বাবুর পুত্র কাতর ভাবে বলিল, "কিন্তু আমার এ যে পিতৃঋণ! বাবা বলে গেছেন, এ টাকা যদি আমি শোধ না করি, তবে আমাদের মহা পাপ হ'বে। আর তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে গেছেন, আমি যত দিন বেঁচে থাকব আপনার আমমোক্তারের কায করব—সে জন্য টাকা নিতে পারব না।"

এ বার রমেন্দ্র বাবুর গলাটা "ধরিয়া" আসিল। তিনি এক জন কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া বসন্ত বাবু বৎসরে কত টাকা তাঁহার নিকট হইতে বেতন পাইতেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। কর্ম্মচারী উত্তর দিল—পাঁচ শত টাকা।

রমেন্দ্র বাবু বলিলেন "বসন্ত বাবু আমার বাবার সময়ের কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁর ইচ্ছা আমি অপূর্ণ রাখতে পারি না।"

তাহার পর বসন্ত বাবুর পুত্রকে তিনি বলিলেন, "আমি তোমার কাছ থেকেই টাকা নিলাম। তা'র মধ্যে পাঁচ শ টাকা বসন্ত বাবুর শ্রাদ্ধে আমার দেওয়া থাকল। অবশিষ্ট হাজার টাকা। তুমি বেতন নিবে না বটে, কিন্তু তোমার মা যত দিন জীবিত থাকবেন, তত দিন তিনি বসন্ত বাবু যে বেতন পেতেন, তা'ই বৃত্তি হিসাবে পা'বেন। দু' বছরের বৃত্তি ঐ হাজার টাকা তুমি তাঁ'কে দিও। কালাশৌচের বৎসরটা কাটলে তাঁ'কে তীর্থ ভ্রমণ করিয়ে এন—জামাই যেখানে আছেন, সেখানে থেকে অনেক তীর্থই কাছে।"

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

গরীবের হিতোপদেশ

শুনহ গরীব ভাই—

সবার উপরে কাগজ সত্য তাহার উপরে নাই।
বিধাতার গড়া সোনাদানা-ভরা সুফলা বসুন্ধরা
কাগজের পাতে কি লেখা রহিল তাহাতে পড়িল ধরা।
কে বলে ধরণী মাতা সবাকার? আইনে সে কথা নাই,
কোডে লিখিয়াছে ধনী গরীবের বৈমাত্রেয় ভাই।
যত সোনা-দানা বড়লোকে পাবে গরীবে চষিবে ক্ষেত
কোডের এ ধারা না মানিলে খাবে পঁচিশ পঁচিশ বেত।
মাটী খুঁড়ে যাও কুড়ুল চালাও দু'বেলা সেলাম ঠোকো
বুকের বেদনা মুখে বলিও না বাসনা রসনা রোকো।
ক্ষুধা বা তৃষ্ণা যাহাই পাক না গোল করিও না তবু,
সভ্যযুগের ডিসিপ্লিন আগে—ভুলেও ভুলো না কভু।
ক্ষুধার জ্বালায় হাহাকার করা অপরাধ তাহা নহে—
এ কথা ভেবো না, উহারেই খাঁটি শান্তিভঙ্গ কহে।

আইন একটু শেখো—

কোডের কয়টা মোটামুটি ধারা অন্ততঃ মনে রেখো।
ওয়ারিশ যারা টানা-পাখা খায় অনোয়ারিশরা টানে
বোকা বড়লোক হুকুম চালায় গরীব ধীমান্ মানে।
মহাজন করে খাতকে ফকির সুদের সুদের সুদে
ঘি পড়ে কাহারো তপ্ত অন্নে নুণ নাই কারো ক্ষুদে।
ধনী লম্পট লুটে ল'য়ে যায় কুটীরের সতী রাণী
ব্যাধি ও দৈন্য ঋণ-জর্জ্জর স্বামীর ফুটে না বাণী।
মণি-মুক্তার ঝলকে মিলায় রাজা-রাজড়ার পাপ,
দাগী যত সব কুলী খানসামা এ-পিঠে ও-পিঠে ছাপ।
পাল্কী যাহারা চড়ি আসে লোকে তাহাদেরি পাখা করে
পাল্কী যাহারা বহি আনে আহা! গলদঘর্ম্ম ঝরে!
দলিলদস্তে ধরি' দু'হস্তে জন্ম লভেনি যারা
মানব-জীবন লভিয়াছে হেন ভুল করে কেন তারা?

শ্রীঅনাথবন্ধু সেনগুপ্ত (বি-এল)।

শঙ্করাচার্য্যরচিত গ্রন্থনির্ণয়

[শেষার্দ্ধ]

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ গ্রন্থের তালিকা পূর্ব্ব প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে, এবং তাঁহার রচিত গ্রন্থের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া যে সব আপত্তি করা হয়, তাহারও আলোচনা করা হইয়াছে। এখন দেখা যাউক, শঙ্করাচার্য্যের নামে এত অধিক গ্রন্থ প্রচলিত হইবার কারণনির্দ্দেশ করিবার জন্য বিরুদ্ধবাদিগণ কিরূপ যুক্তি প্রদর্শন করেন? তাঁহাদের প্রথম যুক্তিটি এই যে,—

(১) শঙ্করাচার্য্যের আসনে উপবিষ্ট শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যপরম্পরা শঙ্করাচার্য্য নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। তাঁহারাও পণ্ডিত, মহাত্মা, এবং তাঁহারা অনেকেই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহারা যে সব গ্রন্থ লিখিয়াছেন, কালক্রমে তাহা আদ্য শঙ্করাচার্য্যের নামে চলিয়া গিয়াছে। এই জন্য শঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচলিত বহু গ্রন্থ, আদ্য শঙ্করাচার্য্যরচিত না হইলেও তাহা তাঁহার রচিত বলা হইয়া থাকে। যেমন, কেনোপনিষদের পদভাষ্য ও বাক্যভাষ্য-মধ্যে বাক্যভাষ্যটি আদ্য শঙ্করাচার্য্যের নহে, কিন্তু খুব সম্ভব বিদ্যাশঙ্কর বা শঙ্করানন্দেরই হইবে। কারণ, তাহাতে একই বাক্যের পদভাষ্যে যেরূপ ব্যাখ্যা দেখা যায়, বাক্যভাষ্যে সেরূপ ব্যাখ্যা নাই। এইরূপ অন্য অনেক উপনিষদ্ভাষ্যও শঙ্কররচিত নহে বলিতে হইবে; কারণ, তাহাতে অনেক শ্রুতির ব্যাখ্যা, ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে উদ্ধৃত শ্রুতির ব্যাখ্যার সঙ্গে ঐক্য হয় না। কিন্তু এগুলি শঙ্করাচার্য্যের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি থাকায় শঙ্করাচার্য্যের আসনে উপবিষ্ট শঙ্করাচার্য্য-নামধারী কোন আচার্য্যের রচিত বলা হয়। ইহাই হইল বিরুদ্ধবাদিগণের প্রথম যুক্তি।

কিন্তু অন্যরচিত গ্রন্থ শঙ্করাচার্য্যরচিত বলিয়া প্রচলিত হইবার পক্ষে ইহা সঙ্গত কারণ বলা যাইতে পারে না। কারণ, শঙ্করাচার্য্যের আসনে উপবিষ্ট আচার্য্যগণের "শঙ্করাচার্য্য" নাম হয় না—উপাধিমাত্রই হয়, আর তাঁহাদের এক একটি বিশেষ বিশেষ নাম থাকে। যেমন বিদ্যাশঙ্কর শঙ্করাচার্য্য, বিদ্যারণ্য শঙ্করাচার্য্য, অভিনবনৃসিংহভারতী শঙ্করাচার্য্য, চন্দ্রমৌলীশ্বর শঙ্করাচার্য্য, ইত্যাদি। এই সকল আচার্য্যের কোন গ্রন্থই কেবল শঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচলিত হয় নাই। এইরূপ অন্যান্য শঙ্করাচার্য্যোপাধিধারীর সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ, ইঁহারা যদি স্বরচিত গ্রন্থ আদ্য শঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচার করিয়া থাকেন বা প্রচলিত হইবার কোনরূপ সুযোগ প্রদান বা অনুমোদনও করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কি মিথ্যাচরণ করাই হয় না? তাঁহাদের মত পণ্ডিত সাধু মহাত্মগণ—যাঁহারা জগদ্‌গুরু বলিয়া সম্মানিত হন, তাঁহারা কি এরূপ কার্য্য করিতে পারেন? ইহা ত আমরা কল্পনাই করিতে পারি না। আর তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে অপরেই বা এরূপ কার্য্য কি করিয়া করিতে পারেন? ইহাতে অপরেরও ত' কোনও ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে না? অতএব এরূপ কল্পনা করিয়া যাঁহারা শঙ্করাচার্য্যরচিত গ্রন্থের "বাহুল্যের হেতু" ব্যাখ্যা করেন, তাঁহাদের সে কল্পনা নিতান্ত অমূলক বলিয়াই বোধ হয়।

কেনোপনিষদের পদভাষ্য এবং বাক্যভাষ্য উভয়ই আদ্য শঙ্করাচার্য্যের রচিত হইতেও কোন বাধা দেখা যায় না। কারণ, ব্যাসদেব শ্রুতিমীমাংসার জন্য যে ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের রচনা করেন, তাহাতে তিনি অধিকরণের বিষয়-বাক্যরূপে গ্রহণ করিয়া বহু উপনিষদের সন্দিগ্ধবাক্যের মীমাংসা করিলেও কেনোপনিষদের কোন বাক্যের মীমাংসা তিনি করেন নাই। বর্ত্তমানে লভ্য সর্ব্বপ্রাচীন ভাষ্যের রচয়িতা শঙ্করাচার্য্য সম্প্রদায়ক্রমে ব্রহ্মসূত্রের সেরূপ কোনও ব্যাখ্যা লাভ করেন নাই; আর তজ্জন্যই তিনি তাঁহার ভাষ্যে সেরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। বস্তুতঃ ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করব্যাখ্যা সম্প্রদায়ক্রমে লব্ধ না হইলে, অন্যথায় শঙ্করাচার্য্যের স্বোদ্ভাবিত হইলে, তিনি ব্রহ্মসূত্রের কোন অধিকরণের বিষয়রূপে কেনোপনিষদের কোন কোন বাক্য গ্রহণ করিয়া তজ্জনিত সংশয়ের মীমাংসা করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। তাঁহার সূত্রব্যাখ্যা ব্যাস, শুক, গৌড়পাদ ও গোবিন্দ-পাদক্রমে লব্ধ বলিয়া তিনি নিজে কেনোপনিষদের কোনও বাক্যকে ব্রহ্মসূত্রের কোনও অধিকরণে বিচার্য্যবিষয়বাক্য-রূপে গ্রহণ করিয়া নিজ ভাষ্যমধ্যে উল্লেখ করেন নাই। এই বিষয়টি বস্তুতঃ ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করব্যাখ্যার ব্যাসমূলকত্বের একটি উত্তম নিদর্শন বলা যাইতে পারে। অথচ এই উপনিষৎখানি অত্যন্ত প্রামাণিক গ্রন্থ, ইহার বহু বাক্য তিনি ভাষ্যমধ্যে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন; ইহার শাখাও তখন কেন, অদ্যাপিও বিদ্যমান। সুতরাং পাঠের বিকৃতির সম্ভাবনাও ছিল না। বলা বাহুল্য, শ্রুতির পাঠ-বিকৃতি হইলে তাহা আর শ্রুতিমধ্যে গণ্য হয় না। তাহা তখন ইতিহাস ও পুরাণমধ্যেই পরিগণিত হয়। তাহার

প্রামাণ্য তখন হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কেনোপনিষদের ভাগ্যে সেরূপ কিছু পাঠবিকৃতি ঘটে নাই। খুব সম্ভব, ব্রহ্মসূত্র-মধ্যে কেনোপনিষদের সন্দিগ্ধবাক্যের মীমাংসা না থাকায় শঙ্করাচার্য্য ইহার অভাব অনুভব করেন, অথবা ব্যাসদেবের মনে কেনোপনিষদের কোন বাক্যে কোন সন্দেহ উদিত না হইলেও শঙ্করাচার্য্যের মনে কোন কোন বাক্যে কিঞ্চিৎ সন্দেহ উদিত হইয়াছিল, সেজন্য তিনি তাহার মীমাংসার আবশ্যকতা অনুভব করেন।

এইরূপে শঙ্করাচার্য্য কেনোপনিষদের অত্যন্ত উপ-যোগিতা অনুভব করিয়া তাহার যে সব বাক্যে কোন-রূপ সংশয় উদিত হইতে পারে, তাহার মীমাংসার জন্য তিনি কেনোপনিষদের বাক্যভাষ্যমধ্যে ব্রহ্মসূত্রের সূত্রের ন্যায় কতিপয় সূত্র রচনা করিয়া উহার আবার ভাষ্য করিয়া দিয়াছেন। এই জন্যই কেনোপনিষদের পদভাষ্য করিবার পর বাক্যভাষ্য করিবার আবশ্যক হইয়াছিল।

প্রবাদ এই যে, শঙ্করাচার্য্য উপনিষদাদির ভাষ্য বদরিকাশ্রমে রচনা করেন। সেই সময়ে কেনোপনিষদের পদভাষ্য রচিত হয়। পরে যখন তিনি শৃঙ্গেরীতে মঠ-স্থাপন করিয়া বহু শিষ্যমধ্যে পঠন-পাঠন প্রবর্ত্তিত করেন, সেই সময় এই বাক্যভাষ্যের অভাব অনুভূত হয়, আর তাহার ফলে ইহা পরে রচিত হয়।

এই স্থলেই এই সময় তিনি বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একজাতীয় উপদেশ-গ্রন্থ সাংখ্যকারিকাভাষ্যাদি বিবিধ গ্রন্থ রচনা করেন। স্তবস্তুতিগুলির অধিকাংশ তীর্থভ্রমণকালে দেব-দর্শনসময়েই হৃদয়ের আবেগে সদ্যঃ সদ্যঃ রচিত হয়। তিনি শ্রুতিধর ছিলেন বলিয়া পরে তাহা লিপিবদ্ধ হয়, এবং কতকগুলি স্তবস্তুতি ব্যক্তিবিশেষের জন্য রচিত হয়। এই প্রবাদ বিশ্বাস করিলে একই ব্যক্তি একই গ্রন্থের দুই-খানি ভাষ্য রচনা করিতে পারেন না—বা একই দেবতার একাধিক স্তবস্তুতি রচনা করিতে পারেন না—এই যুক্তিটি সঙ্গত হয় না।

তাহার পর আরও একটি কথা এই যে, বাক্যভাষ্য যদি আদ্য শঙ্করাচার্য্যের রচিত না হইত, তাহা হইলে আনন্দগিরি তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকিতেন না। আনন্দগিরি বিদ্যাশঙ্করের সমসাময়িক, কেনোপ-নিষদের বাক্যভাষ্য বিদ্যাশঙ্করের হইলে তাঁহার পক্ষে ইহা অজ্ঞাত থাকিত না। এ জন্য ইহা আদ্য শঙ্করাচার্য্যের রচিত বলিয়া বোধ হয়। বিদ্যাশঙ্করের অন্য নাম শঙ্করানন্দ, ইহাও মনে করিবার অনেক কারণ আছে। বস্তুতঃ শঙ্করানন্দের কেনোপনিষদের উপর পৃথক্ টীকাই রহিয়াছে। তিনিই বা কেন আবার বেনামি করিয়া বাক্যভাষ্য রচনা করিতে যাইবেন? সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের আসনে উপবিষ্ট আচার্য্যগণের রচিত গ্রন্থ শঙ্করাচার্য্যের শৃঙ্গেরীতে শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যপরম্পরার দ্বারা অদ্যাবধি অবিচ্ছিন্ন প্রভাবে প্রচলিত। কাশী, কাঞ্চী প্রভৃতি স্থলেও শঙ্করসম্প্রদায় যথেষ্ট প্রভাবশালী। সুতরাং এরূপ ভ্রম কেহ কোথাও কখনও করিলে তাহা অচিরে সংশোধিত হইবার কথা।

আর অন্য কোন অভিসন্ধিতে কাহারও নিজ রচিত গ্রন্থ শঙ্করাচার্য্যের নামে চালাইয়া দিবার চেষ্টা হইলে তাহা বাধাপ্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিত; কারণ, শঙ্করসম্প্রদায় এখনও জীবিত, এখনও প্রবল প্রতাপে প্রচলিত। এরূপ কল্পনা লুপ্ত প্রাচীন সম্প্রদায়ের পক্ষেই সম্ভব হয়। অতএব এই প্রথম যুক্তিটি নিতান্ত অনাস্থেয়, ইহা হইতে কোন নিশ্চয়জ্ঞান উৎপন্ন হয় না।

(২) শাঙ্করগ্রন্থবাহুল্যের কারণ নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে কেহ কেহ মনে করেন—স্বরচিত গ্রন্থ শঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচার করিলে তাহার আদর হইবে, লোকমধ্যে তাহার পঠন-পাঠন হইবে, তাঁহার মতও চলিয়া যাইবে—এই ভাবিয়া অনেকে স্বরচিত গ্রন্থকে শঙ্করের নামে চালাইয়া দিয়াছেন; শঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচলিত গ্রন্থের সংখ্যাধিক্যের ইহা দ্বিতীয় কারণ।

কিন্তু এ কথাও যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, যিনি শঙ্করাচার্য্যের নামে চলিয়া যাইবার মত গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন, তিনি যে এরূপ মিথ্যাচরণ করিবেন, বা করিবার সুযোগ প্রদান করিবেন, ইহা কল্পনা করিতে পারা যায় না। তাহার পর ইহাতে বাধা ঘটিবারই কথা, কারণ, তাঁহার সম্প্রদায় জীবিত—ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব এই দ্বিতীয় কারণটিও গ্রাহ্য হইবার যোগ্য নহে। ইহাও কোনরূপ নিশ্চয়জ্ঞান জন্মাইতে পারে না।

(৩) শঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচলিত গ্রন্থের বাহুল্যের তৃতীয় কারণ, যাহা নির্দ্দেশ করা হয়, তাহা এই—যে সব বেদান্ততত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থের শেষে বা গ্রন্থের কোথাও গ্রন্থকর্ত্তার নাম কোনও কারণে উল্লিখিত থাকে না, সেই সকল গ্রন্থ নকল করিবার কালে লিপিকারই অনেক সময়ে বিষয়ের সাদৃশ্য দেখিয়া শঙ্করাচার্য্যের নামে চালাইয়া দিয়াছেন। এই কারণে শঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচলিত গ্রন্থের এত সংখ্যাধিক্য দেখা যায়।

কিন্তু এ কল্পনাও যুক্তিসহ নহে। কারণ, এরূপ ঘটনা যদি ঘটিয়াই থাকে, তবে দুই একখানি পুঁথির নকল স্থলেই তাহা হইতে পারে। আর তাহাও অন্যত্র লব্ধ সেই পুঁথির দ্বারা সংশোধিত হইবারই কথা। অতএব এই কথাও যুক্তিসঙ্গত নহে। আর লিপিকারই বা কেন, যে গ্রন্থে গ্রন্থকর্ত্তার নাম নাই, তাহাতে অন্যের নাম সংযুক্ত করিয়া দিবেন? তাহাও বুঝা যায় না। অতএব এই তৃতীয় যুক্তিটিও সঙ্গত নহে। এজন্য ইহা হইতে কোন

(৪) শাঙ্করগ্রন্থবাহুল্যের কারণ-নির্দ্দেশ-প্রসঙ্গে চতুর্থ কারণ যাহা নির্দ্দেশ করা হয়, তাহা এই যে, অনেক সময় নিত্যপাঠ্য গ্রন্থের মধ্যে বিভিন্ন গ্রন্থের নির্ব্বাচিত অংশ পাঠের সুবিধার জন্য একত্র রক্ষিত হইতে দেখা যায়। সেই সকল অংশবিশেষে গ্রন্থকারের নাম অনেক সময় থাকে না। এই ভাবে অপরের রচিত গ্রন্থাংশ শঙ্করাচার্য্য-রচিত গ্রন্থমধ্যে স্থান পাইতে পারে। আর তাহার ফলে বহু দিন পরে পুঁথিসংগ্রহকারীর হস্তে সেইরূপ গ্রন্থ আসিলে সেই অপরিচিত গ্রন্থাংশও শঙ্করাচার্য্যরচিত বলিয়া চলিয়া যায়। এইরূপে সদাচার, জ্ঞানগঙ্গাশতক এবং বোধসার-নামক গ্রন্থ শঙ্করাচার্য্যরচিত গ্রন্থমধ্যে স্থান পাইয়াছে—বলিতে হইবে। এই গ্রন্থগুলি নরহরিরচিত বৃহৎ বোধসার গ্রন্থের অংশরূপে দেখা যাইতেছে।

কিন্তু এই কল্পনাও যুক্তিসহ হয় না। কারণ, এরূপ ঘটনা কদাচিৎ অতি অল্প স্থলেই ঘটিতে পারে। আর বিভিন্ন পুঁথির পত্র অন্য পুঁথিমধ্যে রক্ষিত হইলে, লেখা ও পত্রের আকার দেখিয়া তাহা পৃথক গ্রন্থ বলিয়া বুঝিতে বিলম্ব থাকে না। এই কারণে এই চতুর্থ যুক্তিটিও তৃতীয় যুক্তির ন্যায় অনিশ্চায়ক। নরহরির সদাচার প্রভৃতি গ্রন্থগুলি শঙ্করগ্রন্থাবলীর মধ্যে স্থান পাইয়াছে, কি নরহরিই শঙ্করের গ্রন্থ নিজ গ্রন্থমধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার নিশ্চয় হয় না। অতএব এই কল্পনাও অকিঞ্চিৎকর।

(৫) শাঙ্করগ্রন্থ-বাহুল্যের পঞ্চম কারণ-নির্দ্দেশ-প্রসঙ্গে কেহ কেহ বলেন—বিনয়ের অনুরোধে অথবা আত্মপ্রচার-পরাঙ্মুখতার প্রভাবে অনেকে অনেক সময় স্বরচিত গ্রন্থ গুরুর নামে প্রচার করিয়া থাকেন, আত্মনাম গোপন করেন, এইরূপে শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যরচিত বহু গ্রন্থ শঙ্করাচার্য্যের নামে চলিয়া গিয়াছে। যেমন একখানি ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি কোন শঙ্করশিষ্যরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে দেখা যায়। বস্তুতঃ এই কারণেই সকল শাঙ্করগ্রন্থাবলীর ভাষা, ভাব ও ভঙ্গী একরূপ নহে। ইত্যাদি।

কিন্তু এই যুক্তিটিও সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, যে শঙ্করশিষ্য এরূপ গ্রন্থের রচনা করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই পণ্ডিত এবং নিরভিমান সাধক-বিশেষ হইবেন। তিনি কি জানিবেন না যে, এরূপ করিলে মিথ্যাচরণই হইবে। অতএব এইরূপ কল্পনা নিতান্ত অযৌক্তিক। বাস্তবিক পক্ষে দেখা যায় যে, এমনও গ্রন্থ রহিয়াছে, যাহা "কোন শঙ্করশিষ্যরচিত" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাতে গ্রন্থকারের নামের উল্লেখ নাই। যেমন একখানি ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি-নামক গ্রন্থে গ্রন্থকর্ত্তার নাম প্রকাশ করা হয় নাই। কিন্তু ইহাতে ত "কোন শঙ্করশিষ্যরচিত" বলিয়া উল্লিখিত হইতে দেখাই যায়। এজন্য কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি ওরূপ কার্য্য করিতে পারেন না। অতএব এই পঞ্চম যুক্তিটিও কোন নিশ্চয়জ্ঞানের জনক হইতে পারে না। ইহাই হইল শঙ্করাচার্য্যের নামে এত অধিক গ্রন্থ প্রচলিত হইবার কারণ-নির্দ্দেশ করিবার জন্য বিরুদ্ধবাদিগণের পাঁচটি প্রধান যুক্তি।

এইরূপ বহু কল্পনা বহু লোককে করিতে দেখা যায়। কিন্তু ইহারা কেহই নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য নহে। ইহাতে সংশয়ের অবসর যথেষ্টই থাকিয়া যায়। এজন্য শঙ্করাচার্য্যরচিত গ্রন্থনির্ব্বাচনের জন্য অন্য কোন নিঃসন্দিগ্ধ পন্থা অবলম্বন করা আবশ্যক। আমাদের মনে হয়, এজন্য ঐতিহাসিক প্রমাণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ যে সব গ্রন্থ শঙ্করাচার্য্যরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, অথচ সেই প্রসিদ্ধির বিরোধী নিম্নলিখিত কোন বাধক প্রমাণ যদি না থাকে, তাহা হইলেই তাহা শঙ্করাচার্য্যরচিত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। সেই বাধক প্রমাণসমূহ এইরূপ হইলেই বোধ হয় ভাল হয়, যথা—

(১) যদি শঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচলিত কোন গ্রন্থের শুদ্ধভাবে লিখিত কোন প্রাচীন পুঁথিতে অন্য গ্রন্থকর্ত্তার নাম দেখা যায়, তাহা হইলে তাহা শঙ্করাচার্য্যরচিত নহে বলা সঙ্গত। বস্তুতঃ নরহরির সদাচার প্রভৃতি গ্রন্থ ব্যতীত এরূপ কোন পুঁথি এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। অতএব এ কারণে শঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচলিত কোন গ্রন্থকে শঙ্করাচার্য্যরচিত নহে বলিবার আবশ্যকতা হইতেছে না। নরহরির সদাচার প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ আপাততঃ বাদ দেওয়া যাইতে পারে। যদিও কে কাহার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার নিশ্চয়তা নাই। তথাপি ইহাকে গ্রহণ না করাই ভাল। এজন্য ইহাকে প্রথম বাধক প্রমাণ বলা হয়।

(২) শঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচলিত কোন গ্রন্থ বা কোন গ্রন্থের কোন বাক্য যদি অন্যের রচিত কোন প্রাচীন গ্রন্থে উক্ত বা উদ্ধৃত হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে সেই গ্রন্থ শঙ্করাচার্য্যরচিত নহে বলা সঙ্গত। যেমন "অপরোক্ষানুভূতি"র বহু শ্লোক ১০৮ উপনিষদের "নাদোপনিষৎ" প্রভৃতিতে দেখা যায়। এস্থলে সে শ্লোকগুলি শঙ্করাচার্য্যের নহে বলা সঙ্গত। শঙ্করাচার্য্য তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন—এইমাত্র। কারণ, উপনিষৎ অপৌরুষেয়। অনেকে অনেক উপনিষদ্‌কে অপৌরুষেয় বলেন না, এজন্য তাঁহারা বলেন—শঙ্করাচার্য্যের অপরোক্ষানুভূতি দেখিয়াই উক্ত উপনিষৎ রচিত হইয়াছে। কিন্তু এরূপ কথা বলা বৈদিকসংস্কারবিরুদ্ধ। কেহ বলেন, ইহাতে শঙ্করাচার্য্যের গৌরবহানি হইবে। কিন্তু তাহাও নহে, কারণ, শঙ্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত তাঁহার নিজের সিদ্ধান্ত নহে, তাহা শ্রৌত, ইহাই শঙ্করাচার্য্যের গৌরব বা শঙ্করত্ব। পৌরুষেয় মত কখনও অভ্রান্ত হইতে পারে না। এজন্য শঙ্করাচার্য্য নিজ মত প্রচারে প্রবৃত্ত হন নাই;

অতএব ইহা শঙ্করাচার্য্যের গৌরবহানিকর নহে। সুতরাং তাদৃশ অংশ শঙ্করাচার্য্যের রচিত নহে বলিতে হইবে।

যদি বলা যায়, অপরের বাক্য গ্রহণ করিলে তাহা স্বীকার করা হয় নাই কেন? ইহা ত সঙ্গত আচরণ নহে। কিন্তু এ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, যখন মহামান্য কোন অপর ব্যক্তির মত ও নিজমত-মধ্যে কোন বিশেষ প্রভেদ থাকে না, অথচ তাহা উত্তমরূপে উক্ত হয় বা বর্ণিত হয় এবং যেখানে অপরের বাক্যকে নিজমত পুষ্টির জন্য প্রমাণরূপে প্রদর্শন করা হয় না, সেস্থলে অপরের বাক্যকে নিজবাক্যরূপে গ্রহণ করিতে দেখা যায়। এই রীতি আমাদের বিদ্বৎসমাজে প্রচলিত আছে। যেমন গীতাভাষ্যমধ্যে মহামতি মধুসূদন সরস্বতী পাতঞ্জল-দর্শনের ব্যাসভাষ্যের বহু অংশ, গ্রন্থকর্ত্তার নাম না করিয়া, স্ববাক্যরূপে প্রচার করিয়াছেন। এইরূপ বহু স্থল আছে। অতএব ইহা সর্ব্বক্ষেত্রে অসঙ্গত আচরণ বলা যায় না। আমাদের সমাজে ইহাতে কোন দোষদৃষ্টি করা হয় না। ইহাই এস্থলে দ্বিতীয় বাধক প্রমাণ।

(৩) শঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচলিত কোনও গ্রন্থে যদি শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী গ্রন্থকারের নাম ও বাক্য উদ্ধৃত থাকে, তাহা হইলে তাহা শঙ্করাচার্য্যরচিত নহে বলাই সঙ্গত। বস্তুতঃ এরূপ কোনও স্থল এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। অতএব প্রচলিত শাঙ্করগ্রন্থাবলীর বহু গ্রন্থ শঙ্করাচার্য্যরচিত নহে বলা অনাবশ্যক। ইহাই এস্থলে তৃতীয় বাধক প্রমাণ।

(৪) শঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচলিত কোন গ্রন্থমধ্যে শঙ্করাচার্য্যের নাম করিয়া শঙ্করাচার্য্যের বাক্যই যদি উদ্ধৃত থাকে, তাহা হইলে সেই গ্রন্থ শঙ্করাচার্য্যরচিত নহে বলাই সঙ্গত। যেমন "মহাবাক্যবিবরণগ্রন্থ" নামক গ্রন্থের শেষে শঙ্করাচার্য্যরচিত উক্ত হইয়াছে বলিয়া তাহা শঙ্করাচার্য্যরচিত বলিয়া অনেকের নিকট গৃহীত হইলেও তাহার মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের নাম করিয়া শঙ্করাচার্য্যের বাক্য উদ্ধৃত থাকায় তাহা শঙ্করাচার্য্যরচিত নহে বলিয়া বুঝা যায়। ইহাই এস্থলে চতুর্থ বাধক প্রমাণ।

(৫) শঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচলিত কোন গ্রন্থে সেই গ্রন্থরচনার উপলক্ষ্যাদি বর্ণনামধ্যে যদি তাহার অন্য-কর্তৃকত্ব বুঝা যায়, তাহা হইলে তাহাও শঙ্করাচার্য্যরচিত বলা হইবে না। যেমন "আত্মজ্ঞানকথন" গ্রন্থে "আত্মজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি শৃণু নারদ তত্ত্বতঃ।" এইরূপ কথা থাকায় অথবা "হরিনামমালা" স্তোত্রে "বলিরাজেন চোক্তা কণ্ঠে ধার্য্যা প্রযত্নতঃ" এইরূপ কথিত হওয়ায় তাহাকে শঙ্করাচার্য্য-রচিত বলা যাইতে পারে না। ইহাই এস্থলে পঞ্চম বাধক প্রমাণ।

(৬) শঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচলিত কোন গ্রন্থমধ্যে যদি শঙ্করাচার্য্যের প্রকাশিত অদ্বৈতবাদের মূল সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ কথা, বা প্রতিবাদ, বা খণ্ডন, তদুদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে তাহা শঙ্করাচার্য্যরচিত নহে বলাই সঙ্গত। শঙ্করাচার্য্যমতের মূল সিদ্ধান্ত বলিতে "নির্ব্বিশেষ নির্গুণ ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্ম ভিন্ন নহে, এবং জ্ঞান ও কর্ম্ম বা জ্ঞান উপাসনার ক্রমসমুচ্চয়" ইত্যাদি বুঝিতে হইবে। নচেৎ কোন গ্রন্থে বা স্তবস্তুতিতে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা, কর্ম্মের প্রশংসা, তীর্থসেবার উপযোগিতা, পূজাপাঠ প্রভৃতির কর্ত্তব্যতা, ভগবন্মহিমা বা লীলাদির কীর্ত্তন অথবা বর্ণাশ্রমাচারের আবশ্যকতা প্রভৃতির কথা থাকিলে তাহাকে শঙ্করাচার্য্যরচিত নহে বলা সঙ্গত হইবে না। কারণ, অদ্বৈতবাদে এই সকলেরই স্থান আছে। অন্য মতবাদে যেমন অদ্বৈতবাদের উপযোগিতা অস্বীকার করা হয়, অদ্বৈতবাদে তদ্রূপ অন্য মতবাদের উপযোগিতা অস্বীকার করা হয় না। এজন্য প্রপঞ্চসার তন্ত্র, বহু স্তবস্তুতি, বিবিধ উপদেশ-গ্রন্থ শঙ্করাচার্য্যরচিত কি না, বলিয়া সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। গ্রন্থবিশেষে গ্রন্থান্তরের কোন কথা বা ব্যাখ্যা প্রভৃতি পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইলে তাহা বুঝিবার চেষ্টা করাই উচিত, তাহাকে ভ্রম বলিয়া সহসা সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে। কারণ, এস্থলে গ্রন্থকার এক জন নিতান্ত অসাধারণ ব্যক্তি। এইরূপ পরস্পরবিরোধ দেখিয়া গ্রন্থবিশেষকে শঙ্করাচার্য্যরচিত নহে বলা উচিত নহে। মহামতি বাচস্পতি মিশ্রের মত সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র আচার্য্য শঙ্করভাষ্যকে প্রসন্ন-গম্ভীর ভাষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ কারণে সহসা কোন গ্রন্থবিশেষ শঙ্করাচার্য্যরচিত নহে বলিতে আমাদের সাহস করা উচিত মনে হয় না। ইহাই এস্থলে ষষ্ঠ বাধক প্রমাণ। শঙ্করাচার্য্য-রচিত বলিয়া প্রচলিত গ্রন্থে এই ছয়টি বাধক প্রমাণের কোনটি না থাকিলে, সেই সব গ্রন্থকে শঙ্করাচার্য্য-রচিত বলিতে বাধা হইতে পারে না।

ইহাই হইল শঙ্করাচার্য্যরচিত গ্রন্থনির্ণয়ের বোধ হয় অবিসম্বাদী উপায়। ইহাই বস্তুতঃ ঐতিহাসিক প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। বস্তুতঃ অন্য কোনও পক্ষে শঙ্করাচার্য্য-বিরচিত গ্রন্থনির্ণয়ের পথ অভ্রান্ত হইবে বলিয়া বোধ হয় না। বলিতে কি, অতীত বিষয়ে একেবারে নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ প্রদর্শন অসম্ভব। ইচ্ছা করিলেই সকলে সকল প্রকার সন্দেহ উত্থাপিত করিতে পারেন; তথাপি যতটা সম্ভব নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণের জন্য আমাদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে।

বর্ত্তমান শিক্ষার প্রভাবে আমাদের অতীত জাতীয় গৌরব ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য একটা চেষ্টা কিছু দিন হইতে প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে। এজন্য সত্যান্বেষণের ছলে আমাদের মধ্যে অনেকেই অন্যান্য অনেক বিষয়ের

ন্যায় আমাদের বেদান্তমতই আজ বৌদ্ধমতের ছায়া বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের শিল্পনৈপুণ্য, কলাবিদ্যা এবং জ্যোতিষ, চিকিৎসা প্রভৃতি বহু বিষয়েই সত্যান্বেষণের উদ্দেশ্যে আমাদের দেশে বিদেশের প্রভাব বা অনুকরণ বলিতে আজকাল আমাদের মধ্যে অনেকেরই যথেষ্ট উৎসাহ দেখা যায়। অধিক কি, আমাদের জাতিটাই মিশ্রজাতি বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা আমাদেরই শিক্ষিত সমাজে চলিতেছে। কেবল তাহাই নহে, এজন্য সাম্প্রদায়িক বিরোধবুদ্ধিকে প্রশ্রয় দিবারও কৌশল যে অবলম্বিত হয় না, তাহাও নহে। হিন্দু-অহিন্দুর মধ্যে বিরোধসৃষ্টির মূলে যে অভিসন্ধি, এই চেষ্টার মূলেও মনে হয়, সেই অভিসন্ধি সত্যান্বেষণের আবরণে স্বকার্য্য সাধন করিতেছে। কিন্তু তাহার প্রতীকারমানসে আমাদের চেষ্টা যেন সত্যপথ অতিক্রম না করে, এজন্য আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে সাবধান হইতে হইবে। এজন্য যে সব গ্রন্থ শঙ্করাচার্য্য-রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, সেই সকল গ্রন্থের রচনা বিষয়ে যদি উক্ত ছয়টি বাধক প্রমাণ না থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে শঙ্করাচার্য্য-রচিত গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, ইহাই বোধ হয় শঙ্করাচার্য্য-রচিত গ্রন্থনির্ণয়ের অবিসম্বাদী উপায়।

চিদ্‌ঘনানন্দপুরী।

চিরন্তন

হাজার শতাব্দী ধরি পৃথিবীর গাঢ় অন্ধকারে
জীবন-বর্ত্তিকা হাতে খুঁজিতেছে আজো যেন কারে :
চির রিক্ত যাযাবর—দেখা তার পায় নাই কভু
তবুও চলিতে হবে বুকে-আঁকা ক্ষুধার মরুভূ।

শববাহী মানবের আর্ত্তস্বর 'বল হরি বোল'
গভীর নীরব রাত্রে মাঝে মাঝে রক্তে দেয় দোল,
বাতায়ন খুলে দেখি অন্ধকার আকাশের তলে
অগণ্য জ্যোতিষ্ক-শিশু নিদ্রাহীন মূর্ত্ত হয়ে জ্বলে ;—

মনে পড়ে ইতিহাস মধ্যপথে আজো থামে নাই
জীবন-মৃত্যুর খেলা প্রতিদিন চলিয়াছে তাই ;
শেষ তার হয় নাই হবে কি না কে বলিতে পারে ?
যৌবন-ক্ষুধার বহ্নি জ্বালাইয়া জীবনের দ্বারে
মানুষ রাখিয়া যাবে অনাগত ভবিষ্যের মাঝে
নব জন্ম ইতিহাস মৃত্যুহীন নবীনের সাজে।

সহসা কাঁদিয়া উঠে দূর বনে বুভুক্ষু শৃগাল
চূর্ণিত স্বপ্নের মাঝে দেখা দেয় সেই মহাকাল !

জীবনের যাত্রাপথে দেখিয়াছি অন্য রূপ তার
বহু পরিচিত মোর ভুল তবু হয় বার বার,
প্রশান্ত গোধূলি-বেলা মানুষের জীর্ণ কুঁড়ে ঘরে
কত শিশু জন্ম লয় অভিশপ্ত চির অনাদরে ;—

জৈব ইতিহাস তার ভুল নয়, নয় অর্ব্বাচীন
অনাদি কালের আত্মা কোন দিন হয়নি বিলীন,
নূতন সৃষ্টির মোহ ক্ষুধা তার করেছে আড়াল—
পিছনে দাঁড়ায়ে হাসে পরিতৃপ্ত সেই মহাকাল !

মহাকাল জেগে আছে ভবিষ্যের গাঢ় অন্ধকারে,
মুক্তির আবর্ত্ত-মাঝে যুগে যুগে দেখিয়াছি তারে,
মরণ-ভৃঙ্গার ভরি জীবনের অমৃত-নির্য্যাসে
পৃথিবীর দিকে চেয়ে বিদ্রূপের তীব্র হাসি হাসে।

আমরা মুছিয়া যাই, লুপ্ত হয় আমাদের নাম—
ইতিহাসে সীমাবদ্ধ মানুষের জীবন-সংগ্রাম।

শ্রীঅমর ভট্ট
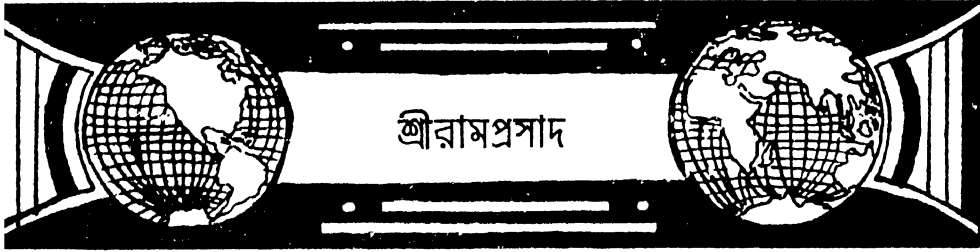
আজ জীবন-সন্ধ্যায় উপনীত হইয়াছি। সংসারের সঙ্গে দারুণ যুদ্ধে পরাভূত ও হৃতসর্ব্বস্ব। রোগ, শোক, চিন্তা, নৈরাশ্য, অভাব, বিড়ম্বনা জীবনের উপর এক করাল আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। কেবল দেবতার "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" রূপ দেখিতেছি। বিশ্বাসের ভিত্তিমূল প্রকম্পিত করিয়া দুর্দ্দিনের দারুণ ঝঞ্ঝা বহিয়া যাইতেছে! মন উদাসীন, শান্তি বিপর্য্যস্ত। এমন সময় পথে কে গাহিয়া গেল—

"মন কেন রে ভাবিস্ এত
যেমন মাতৃহীন বালকের মত?

* * * *

ওরে তুই কি করিস্ কালের ভয়,
হয়ে ব্রহ্মময়ীর সুত,!
এ কি ভ্রান্ত নিতান্ত রে তুই
হলি রে পাগলের মত!
ও মন, মা আছেন যার ব্রহ্মময়ী
কার ভয়ে সে হয় রে ভীত?

গান জীবনে অনেক শুনিয়াছি। সুন্দর কথার বাঁধুনী ও সুরের মূর্চ্ছনাপূর্ণ সুললিত কণ্ঠে গীত কত গান জীবনে শুনিয়াছি। কত সুরের ঝঙ্কারে ভুবন-মাতান সঙ্গীত স্বর্গের আবেশে মনকে এক অজানার রাজ্যে লইয়া গিয়াছে। কত সুরের মৃদুল স্পর্শ হৃদয়-তন্ত্রীকে আঘাত করিয়াছে। কিন্তু এমন সকরুণ মর্ম্মস্পর্শী গান কখনো শুনি নাই! এই সহজ সুরের সহজ কথার গান আমার হৃদয়ের পরতে পরতে এক অভূতপূর্ব্ব ঝঙ্কার জাগাইয়া দিল। দূরে গেল অবসাদ, দূরে গেল নৈরাশ্যের জড়তা। এ গান ব্রহ্মময়ীর সুত ভক্ত শ্রীরামপ্রসাদের গান। এ যে মায়ের ভক্তের মন প্রাণ ঢালা সাধনার অভিব্যক্তি। তাই এ গানে এত মধুরত্ব, এমন সঞ্জীবনী শক্তি! এ কি আশ্বাসের বাণী! ওরে তোর ভয় কি? তুই যে ব্রহ্মময়ীর সন্তান! এ যে সেই ভগবৎদর্শনলাভে পূর্ণমনোরথ বিপুল আনন্দে বিভোর উপনিষদের ঋষির উদাত্ত কণ্ঠ-নিঃসৃত বিশ্ববাসীকে অমৃতের সন্তান বলিয়া সম্ভাষণ—আশ্বাস-প্রদান আর সেই সবল কণ্ঠের বাণী "অভীঃ"—ভয়শূন্য হও। এ যে বিশ্বপ্রেম-অনুভূতির আবেগময়ী অনুপ্রেরণা। সরল প্রাণের সঙ্গীত-উচ্ছ্বাস অভিনব আলোকে ঝলমল। আবার এ ভক্তের তেজোদীপ্ত মরণ-উপেক্ষী আদেশ—

দূর হয়ে যা যমের ভটা
ওরে আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা।
বলগে যা তোর যম-রাজারে
আমার মত নেছে কটা।
আমি যমের যম হইতে পারি
ভাবলে ব্রহ্মময়ীর ছটা।

এ আদেশে বুঝি মৃত্যু-দেবতাও কম্পিত হয়। এ ব্রহ্মময়ীর সন্তানের আদেশ। এ যেন সেই ব্রহ্মের শাসন-বাক্য। যাহার ভয়ে সূর্য্য ও অগ্নি তাপ দিতেছে। যাহার ভয়ে চন্দ্র, বায়ু ও যম নিজ কার্য্য-সাধনে ব্যস্ত।

এই সাধকপ্রবরের জীবন-কথা জানিবার আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার সম্পূর্ণ জীবন-কাহিনী দুষ্প্রাপ্য। ১১২৫—৩০ সালের মধ্যে তিনি হালিসহরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সে বেশী দিনের কথা নয়। কিন্তু বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার জীবন-সাধনার ইতিহাস সংগৃহীত হয় নাই। সাধক গঙ্গারামের একটি গান আছে—

"খালেরে পেঁকে উঠ্লে
যখন লাও।
পিছের দিকে যে চিন্ থাকে
তাতেই মেলে ভাও।
(যখন) গহিন জলে পাল তুলিলা
লাও যায়,
পথের সে চিন, কই বা মিলায়,
কেমনে বা ভাও পায়?"

নৌকা পঙ্কে ঠেলিয়া লইয়া গেলে পিছন দিকে যে দাগ পড়ে, তাহা দেখিয়া বুঝা যায়, নৌকা কোন্ পথে আসিয়াছে। কিন্তু গভীর জলে নৌকা যখন পাল তুলিয়া যায়, তখন ত' এমন চিহ্ন থাকে না, যাহা দেখিয়া অনুমান করা যায় নৌকা কোন্ পথে আসিয়াছে! যাঁহাদের জীবন সংসারের পঙ্কিল প্রবাহে চলিয়াছে, তাঁহাদের জীবন-কাহিনী সহজে সঙ্কলন করা যায়। কিন্তু যাঁহাদের সাধনা-তরণী অনন্ত পথে চলিয়াছে, তাঁহাদের জীবন-সাধনার ক্রম-বিকাশের অনুসরণ অনুশীলন করা দুষ্কর। লোকচক্ষুর অন্তরালে কোন্ শান্ত নিকুঞ্জে নিভৃত ধ্যানে এই মায়ের ভক্ত জগজ্জননীর আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলেন, কোন্ ভয়াবহ অমানিশায় বীরাসনে বসিয়া এই মহাসাধক মায়ের চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া জগদম্বার কোটালের ভ্রূকুটি-বিভীষিকা উপেক্ষা করিয়াছিলেন, কোন্ সাধনায় "সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তাঁর দাসী" এই সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহার ইতিবৃত্ত কুজ্ঝটিকাবৃত। কিন্তু এই সাধনা-সিদ্ধির অমোঘ বাণী সঙ্গীতাকারে ফুটিয়া আছে! ইহাতে না আছে সাম্প্রদায়িকতা, না আছে দ্বেষাদ্বেষি। এ যে বিশ্বজনীন, নীল আকাশের মত অনন্ত ও উদার। ইহাতে আছে কেবল সত্যের বিমল জ্যোতি।

"মন করো না দ্বেষাদ্বেষি
যদি হবি রে বৈকুণ্ঠবাসী।

* * * *

ঐ যে কালী কৃষ্ণ শিব রাম
সকল আমার এলোকেশী।"

* * * *

"কালীঘাটের কালী তুমি মা গো, কৈলাসে ভবানী।
বৃন্দাবনে রাধা প্যারী, গোকুলে গোপিনী।"

• • •

"নটবর বেশে বৃন্দাবনে এসে
কালী হলি মা রাসবিহারী।
পৃথক প্রণব, নানা লীলা তব
কে বুঝে এ কথা বিষম ভারী।"

ইহাই সার্ব্বজনীন সাধনা। অন্তরের উপলব্ধি। সত্যের উপলব্ধি।

নৈষা তর্কেন মতিরপনেয়া

কালী যার হৃদে জাগে, তর্ক তার কোথা লাগে।
এ কেবল পদার্থ মাত্র, খুঁজিতেছ ঘট, পট রে।

এই আত্মনিবেদিত সাধনায়—এই তন্ময় হইয়া "মা" "মা" ডাকে বিশ্বজননী কি সাড়া না দিয়া থাকিতে পারেন? তাই মা সন্তানকে কন্যারূপে দেখা দিয়া তাঁহার ঘরের বেড়া বাঁধিতে সাহায্য করিয়াছিলেন।

"থাকতে নয়ন, দেখ্‌লে না মন
কেমন তোমার কপাল পোড়া।
(মা) ভক্তেরে ছলিতে, তনয়া রূপেতে
বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া।"

কৃপালাভ, সত্য-উপলব্ধি, সর্ব্বোপরি ইষ্টদেবতার দর্শন-লাভ ভক্তজীবনের কাম্য। যিনি জীবনে এই অমৃতের স্বাদ পাইয়াছেন, তাঁহার অন্তর-বাহিরের সর্ব্বকার্য্যে মায়ের কোমল স্পর্শ অনুভূত হয়।

"শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান,
ওরে নগর ফির মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে।
যত শুন কর্ণপুটে, সকলি মায়ের মন্ত্র বটে,
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে বিরাজ করে।
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে
ওরে আহার কর, মনে কর
আহুতি দেই শ্যামা মাকে।"

এই পুলক-স্পর্শ অন্তরে আনন্দ-প্রবাহ বহাইয়া দেয়।

"হৃদ্‌কমলে ধ্যান-কালে আনন্দ-সাগরে ভাসি
ওরে কালীর পদ-কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি।"

• • • •

"যেখানে আনন্দহাট, গুরু-শিষ্য নাস্তি পাঠ।
ওরে যার নেটো, তার নাট, তত্ত্বে তত্ত্ব কে পাইবা।
যে রসিক ভক্ত শূর, সে প্রবেশে সেই পুর,
রামপ্রসাদ বলে ভাঙ্গলো ভুর
আগুন বেঁধে কে রাখিবা?"

আনন্দময়ীর সন্তানের আনন্দের সীমা নাই। এ আনন্দ কেবল অন্তরের মণিকোটায় আবদ্ধ থাকে না, বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়ে। পাপী-তাপী সকলে এসো, ইহার অংশ গ্রহণ কর।

"কালী নামে পাপ কোথা
মাথা নাই তার মাথা-ব্যথা!
ওরে অনলে দহন যথা হয় রে তুলারাশি।"

সত্যসন্ধ সাধক সাধনার সরল পথ দেখাইতেছেন,

"মন তোর এত ভাবনা কেনে,
একবার কালী বলে বস্‌ রে ধ্যানে।
জাঁক-জমকে করলে পূজা
অহঙ্কার হয় মনে মনে।
তুমি লুকিয়ে তাঁরে কর পূজা
জানবে না রে জগজ্জনে।
ধাতু পাষাণ মাটীর মূর্ত্তি
কাজ কি রে তোর সে গঠনে।
তুমি মনোময় প্রতিমা করি
বসাও হৃদি-পদ্মাসনে।"

• • • •

"মেষ মহিষ ছাগল আদি
কাজ কি রে তোর বলিদানে?
তুমি জয় কালী জয় কালী বলে
বলি দেও ষড়রিপুগণে।"

এ পূজায় প্রতিমা-প্রতিষ্ঠা নাই, অন্নভোগের বিপুল আয়োজন নাই, পশুর করুণ আর্ত্তনাদে অন্তর ক্লিষ্ট হয় না, দীপমালার আড়ম্বর নাই। আছে কেবল মনোময়ী প্রতিমা, শুদ্ধা ভক্তি, ষড়রিপু বলি আর অন্তর-জ্যোতিপ্রবাহ। পূজার মন্ত্র,—জয় কালী জয় কালী।

মহাশক্তি পূজার মহাসাধক এই পূজায় "ভুজঙ্গরূপা লোহিতা স্বয়ম্ভুতে সুনিদ্রিতা 'কুলকুণ্ডলিনী' শক্তিকে জাগরিত করিয়া বিমল আনন্দ বিভোর চিত্তে গাহিতেছেন,

আমার মনের বাসনা জননী
ভাবি ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে হংসরূপ ব্রহ্মরূপিণী।"

যোগীর যোগসাধনা ভাষায় মূর্ত্ত! প্রত্যক্ষদর্শন না হইলে প্রকৃত অনুভূতি না জাগিলে ভাব-মাধুর্য্যে এরূপ সরল ভাবের উচ্ছ্বাসে কি প্রাণে ভগবৎ-প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ করিতে পারে? না, সে প্রেরণা এরূপ মর্ম্মস্পর্শী হয়?

আবার এ উগ্র সাধক যেন শিশুর মত সরল!

"কটু বলবি সাজাই পাবি
মাকে দিব কয়ে
সে যে কৃতান্তদলনী শ্যামা, বড় ক্ষ্যাপা মেয়ে।

মায়ের আবদারে ছেলের মায়ের কাছে সরল অভিযোগ—

"আমি ঐ খেদে খেদ করি
ঐ যে তুমি মা থাকতে আমার
জাগা ঘরে হয় চুরি।"

তিনি মায়ের প্রিয় সন্তান, মা ছাড়া আর কিছুই জানেন না। মায়ের চরণ তলে—মায়ের স্নেহের আঁচল ধরিয়া থাকিবেন—তাঁর কামনা! তীর্থবাস, অন্য কিছু বা বিভূতি-লাভের আকাঙ্ক্ষা নাই। এমন কি, মোক্ষও তিনি চাহেন নাই।

"মায়ের চরণতলে স্থান লব।
মায়ের নাম ভরসা করে, উপবাসী হয়ে পড়ে রব।"

• • • •

"নানা তীর্থ পর্য্যটনে, শ্রম মাত্র পথ হেঁটে,
পাবে ঘরে বসে চারি ফল, বুঝ না রে দুঃখচেটে।"

• • • •

"আর কাজ কি আমার কাশী
মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী।"

• • • •

কাশীতে মরিলে শিব দেন তত্ত্বমসি
ওরে তত্ত্বমসির উপর সেই মহেশ-মহিষী।"

কি অসীম শ্রদ্ধা! কি অটল নির্ভরতা! এ সেই উপনিষদের ঋষির নিকট—

ইহ চেদবেদীঃ, অথ সত্যমস্তি, ইহ কেন্নাবেদীঃ মহতী বিনষ্টিঃ
যদি সম্যক্ উপলব্ধি দ্বারা সত্য লাভ হয়, তবে এই স্থানেই সত্য দর্শন সম্ভব হইবে। যদি অশক্ত হই, তবে সাদরে মহামরণ বরণ করিব।

"কালীর বেটা রামপ্রসাদ
ভাল মতে তাই জানাব।
তাতে মন্ত্রের সাধন, শরীর পতন
যা হবার তাই ঘটাব।"

পিতৃবিয়োগের পর শ্রীরামপ্রসাদ ১৭।১৮ বৎসর বয়সে কলিকাতায় এক ধনি-গৃহে সামান্য মুহুরিগিরি চাকরি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু জগদম্বার সন্তান ভক্তির আবেগে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা না করিয়া হিসাবের খাতায় "আমায় দে মা তবিলদারী" লিখিয়াছিলেন। উর্দ্ধতন কর্মচারী ইহা দেখিয়া বিরক্ত হইয়া খাতাখানি মনিবকে দেখাইলে তিনি এই গান পাঠ করিয়া এবং পরে রামপ্রসাদের সুললিত কণ্ঠে এই সঙ্গীত-ঝঙ্কার শুনিয়া এমন মোহিত হন যে, তিরস্কারের পরিবর্তে তাঁহাকে পুরস্কার প্রদান করেন। রামপ্রসাদ চাকুরী ছাড়িয়া বৃত্তি লাভ করিয়া ইষ্টদেবীর আরাধনায় আত্মনিবেদন করেন।

কৃষ্ণনগরাধিপ সাহিত্যানুরাগী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরামপ্রসাদকে সভাসদ পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। গুণগ্রাহী মহারাজের সভায় সে সময় কবিবর ভারতচন্দ্র সভাসদ্রূপে বিরাজ করিতেন। কিন্তু জগজ্জননীর প্রিয় সন্তান সে সম্মান-গ্রহণে সম্মত হন নাই।

ন বিত্তেন তর্পনীয়ো মনুষ্যঃ।

ব্রহ্মময়ীর সন্তান কি বিত্তে বা লৌকিক সম্মানে সন্তুষ্ট হইতে পারেন?

"সামান্য ধন দিবে তারা,
পড়ে রবে ঘরের কোণে
যদি দেও মা আমায় অভয় চরণ
রাখি হৃদি-পদ্মাসনে।"

• • •

"চাকি কেবল ফাঁকি মাত্র
শ্যামা মা মোর হেমের ঘড়া"

—মায়ের রূপ-জ্যোতিতে ভক্তের হৃদয় ভরপুর। সেখানে অন্য কিছুর বাসনা বা কামনা নাই।

"রূপে কালী নামে কালী
কাল হ'তে অধিক কালো।
ও রূপ যে দেখেছে, সেই মজেছে
অন্য রূপ লাগে না ভালো।

সর্ব্বরস-ভাবময়ী মায়ের দুলাল ভক্তির ব্যাকুলতায় মায়ের উপর কত অভিমানই না করিয়াছেন।—

মা মা বলে আর ডাকব না
তারা দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা।

• • •

ডাকি বারে বারে মা মা বলিয়ে
মা কি রয়েছ চক্ষুকর্ণ খেয়ে
মা বিদ্যমানে, এ দুঃখ সন্তানে
মা মলে কি আর ছেলে বাঁচে না।

এই "মা" "মা" ডাক অন্তর্মুখী। এই ডাকে কতখানি প্রাণ সঞ্চারিণী শক্তি!

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরামপ্রসাদকে সঙ্গে লইয়া নৌকায় মুরশিদাবাদ যাইতেছিলেন। গঙ্গার শোভা সে রাত্রে বড়ই মনোরম ছিল। মায়ের ভক্ত প্রাণ ভরিয়া মায়ের নাম করিতে ছিলেন। সুললিত কণ্ঠে সেই অমিয় সঙ্গীত যেন উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছিল! বঙ্গের নবাব সিরাজদ্দৌলা সে সময় গঙ্গাবক্ষে নৌকায় বিহার করিতেছিলেন। এই অমৃতবর্ষী সুর-তরঙ্গ নবাবকে আকৃষ্ট করিল। নবাব এই সুর শিল্পীকে তাঁহার নৌকায় আহ্বান করিলেন। নবাবের নির্দ্দেশে ভাবপ্রসঙ্গে কয়েকটি হিন্দী ও পারসী গান গাহিলেন। নবাব তাহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া তাঁহাকে সেই মা মা করিয়া যে-গান গাহিতেছিলেন, তাহা গাহিতে বলিলেন। ভক্তের সুমধুর কণ্ঠে সেই আবেগময়ী গান—যে গানে পাষাণেও প্রাণের স্পন্দন হয়, সেই আত্মহারা গানে নবাব বিগলিত হইলেন।

এক দিন এই মাতৃপদে আত্মনিবেদিত ভক্ত প্রাণের আকুলতায় জীবন বৃথা বলিয়া জগদম্বার নিকট অভিযোগ করিয়াছিলেন।

"কেবল আশার আশা ভবে আসা, আসা মাত্র হলো।
যেমন চিত্রের পদ্মতে পড়ে ভ্রমর ভুলে রলো।
ও মা, নিম খাওয়ালে চিনি বলে, কথায় করে ছল।
ও মা, মিঠার লোভে, তিত মুখে সারা দিনটা গেল।"

পরে জগজ্জননীর কৃপায় মায়ের সন্ধান পাইয়া ভক্তি বিগলিত কণ্ঠে গাহিয়াছিলেন,

"ষড়দর্শনে দর্শন পেলে না
আগম নিগম তন্ত্রসারে,
সে যে ভক্তিরসের রসিক
সদানন্দে বিরাজ করে পুরে।
যে ভাব লোভে পরম যোগী
যোগ করে যুগ-যুগান্তরে।
হলে ভাবের উদয়, লয় সে যেমন,
লোহাতে চুম্বক ধরে।
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে, আমি তত্ত্ব করি যাবে
সেটা চাতারে কি ভাঙ্গবো হাঁড়ি
বুঝ রে মন ঠারে ঠোরে।"

সৌভাগ্যক্রমে বাঙ্গালীর কাছে এখন গজল, ভাটিয়ালী, সারি-গানের সমাদর বাড়িয়াছে। বর্ত্তমানে বেতার-যন্ত্রে সাধারণতঃ এই শ্রেণীর সঙ্গীতই পরিবেশিত হয়। কিন্তু শ্যামলা পল্লীমায়ের সন্তানগণ আজও সেই সহজ সুরের রামপ্রসাদী গানে মাতিয়া ওঠে। পল্লীমায়ের সন্তান চিরদিনই শ্যাম সৌন্দর্য্যের উপাসক। আজও বঙ্গের কৃষক জমি কর্ষণ করিতে করিতে ভক্তিপূত কণ্ঠে "এমন মানব-জনম রইলো

পতিত, আবাদ করলে ফলত সোণা" বা "এই যে তারার জমি, আমার দেহ যাতে দেবের দেব মহামন্ত্র বীজ বুনেছে" গান গাহিয়া কর্ষণ-জনিত কঠোর শ্রম লাঘব করে। আজও ঐ পল্লীবাসীর মন নদীতে অবগাহন-কালে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া "ডুব দে মন কালী বলে" গাহিয়া ওঠে। কলকণ্ঠে এই সুরের প্রতিধ্বনি তুলিয়া নাবিক নদী-বক্ষে গান গায়,

> সামাল সামাল ডুবলো তরী;
> আমার মন রে ভোলা গেল বেলা
> ভজলে না হরসুন্দরী।

ঐ যে সর্ব্বহারার মর্ম্মস্পর্শী করুণ সঙ্গীত "আগে পাছে দুঃখ চলে মা, যদি কোনখানেতে যাই" কত সমব্যথিতের হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করে? আবার যখন পূত শারদশ্রী ধরার বক্ষে অমৃতধারা ঢালিয়া দেয়, যখন বিশ্বজননীর আগমনের পূর্ব্বাভাস সন্তানের প্রাণে এক আনন্দ-শিহরণ জাগ্রত করে, তখন ঐ বৈরাগীর খঞ্জনি-সহযোগে করুণ কণ্ঠে মধুর গান "গিরি এবার আমার উমা এলে মাকে আর পাঠাব না"—কত কন্যা বিচ্ছেদবিধুরা মাতার চক্ষে স্নেহের ধারা না বহাইয়া দেয়? আবার যখন স্থলপদ্ম-শাখে শেফালি অঞ্চলে সরোবর-বক্ষে মায়ের হাসি ফুটিয়া ওঠে, তখন ঐ ভিখারীর একতারা-ঝঙ্কার বিয়োগবিধুরা জননীকে জানাইয়া দেয় তাঁহার স্নেহের পুতলির আগমনের কথা!

> "আজ শুভদিন পোহাল তোমার
> ঐ যে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া আন ঘরে।
> মুখশশী দেখ আসি, দূরে যাবে দুঃখরাশি,
> ও চাঁদ-মুখের হাসি, সুধারাশি ক্ষরে।

মরি মরি মায়ের কি রূপবর্ণনা!

> কাঞ্চন তরুবরে চন্দ্র কি মাল, বিলম্বিত ঝলমল,
> কো বিধি দেওল আনি।
> হিমকর-বদন, রদনমুকুতাবলি
> করতল কিশলয়, কোমল পাণি।
> রাজিত তহি, কনক-মণিভূষণ
> দিনকরধাম, চরণতলখানি।"

ধন্য ভক্ত, ধন্য সাধক! যিনি "মায়ের রাতুল চরণ অনুসরণ করিয়াছেন!

"বৎস পাছে গাভী যেমন, তেমনি পাছে পাছে ধাবা।"

ধন্য বঙ্গদেশ, ধন্য পল্লী হালিসহর, যেখানে এই সাধনার সুর প্রথম অনুরণিত হইয়া বাঙ্গালার আকাশ-বাতাস মুখরিত রাখিয়া আজও বাঙ্গালীর প্রাণে-মনে প্রতিধ্বনিত হইতেছে!

শ্রীভুবনমোহন মিত্র।

বৃদ্ধ পূজারি

শিশুকাল হতে পূজা করিতেছি তোমার—রাজাধিরাজ,
অবশ হতেছে সকল অঙ্গ দৃষ্টি শিথিল আজ।
বাড়িয়া উঠিছে পূজিবার সাধ,
যত আকাঙ্ক্ষা তত অপরাধ,
পঙ্গু হস্তে পঞ্চ-প্রদীপ ঘুরাইতে পাই লাজ।

তেমন করিয়া বাহিরিতে নারি, নূতন ফুলের খোঁজে।
তোমার সেবার কত গৌরব সেবক সে কথা বোঝে।
হয় না'ক ঘন তত চন্দন,
তেমন নিখুঁত তব বন্দন,
কুসুমের সাথে কত কণ্টকই দিতেছি অসঙ্কোচে।

চূড়াটি তেমন হয় না বাঁকানো কত কথা বলে লোকে,
কেয়ূরে বলয়ে ভুল করে ফেলি' দেখিতে পাই না চোখে।
কোঁচার বলনী হয় না'ক ভাল,
দিন লাগে ক্ষীণ প্রদীপের আলো,
নয়নের জল করে দেয় ফিঁকে চরণ-অলক্তকে।

বুড়া হইয়াছি—প্রাণের দেবতা তুমি ত হয়েছ বড়,
নিষ্প্রভ চোখে—উজ্জ্বল তুমি হও উজ্জ্বলতর।
বুকেতে ধরেছি আজ ধর বুকে,
সুখেতে আসনি এসো হে অসুখে
ঝিনুকের কাছে এসো হে সাগর ডুবায়ে আপন কর।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।
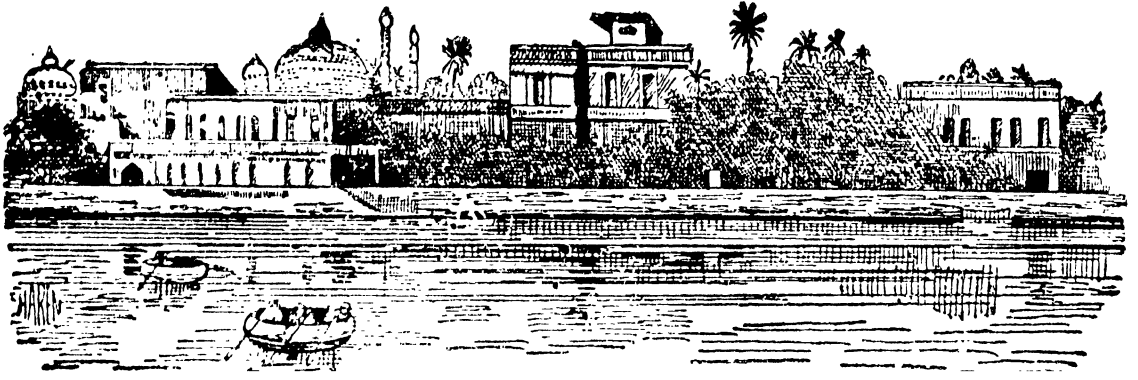
ফিলিপাইন্‌স্‌

ফরমোশার দক্ষিণে এবং বোর্ণিয়োর পূর্বোত্তর-কোণে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ। এ দ্বীপগুলিতে ছোট-বড় দ্বীপের সংখ্যা চারি শতের অধিক। এই চারি শতাধিক দ্বীপের মধ্যে বারোটি দ্বীপ আকারে বড়; আবার সেগুলির মধ্যে বৃহত্তম দ্বীপ লুজন্। এই লুজনের রাজধানী বা প্রধান সহর মানিলা।

ওয়েল্‌শ্‌কে বাদ দিলে ইংলণ্ডের যে-পরিমাপ হয়, লুজনের পরিমাপ সেই ওয়েল্‌শ্‌-বিহীন ইংলণ্ডের সমান। লুজনের পরেই আকার-হিসাবে উল্লেখযোগ্য মিণ্ডানাও দ্বীপ।

লুজনে ত্রিশ-চল্লিশ লক্ষ লোকের বাস। লুজনে প্রচুর পাহাড় ও নদী আছে। পাহাড়গুলি সবই প্রায় আগ্নেয়গিরি। আগ্নেয়গিরির দ্বীপ হইলেও লুজনের ভূমি বেশ উর্ব্বর।

পোর্ত্তুগীজ-পর্য্যটক ফার্দিনান্দ মাগেলান বহু অধ্যবসায়ে এ দ্বীপটি আবিষ্কার করেন। তিনি তখন স্পেনের অধীনে চাকরি করিতেন। সাণ্ট লাজারাশের নামে মাগেলান এ-দ্বীপের নামকরণ করেন—লুজন দ্বীপ। তার পর এ দ্বীপের মালিকানা লইয়া স্পেনের সঙ্গে পর্তুগালের বহু বিতর্ক, বহু বিরোধ চলে। শেষে পোপের বিচারে স্পেন হয় এ-দ্বীপের মালিক।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে এক দল ব্রিটিশ-ফৌজ গিয়া মানিলা আক্রমণ করে। তার ফলে ছোটখাট একটা যুদ্ধ হয়! সে যুদ্ধের অবসানে পারিসে যে সন্ধি হয়, সেই সন্ধি-সর্তে ব্রিটিশ আর্মিকে মানিলা ত্যাগ করিতে হয়। মানিলায় এক স্মৃতি-ফলকে এই সন্ধির প্রসঙ্গে 'মানিলা হইতে ব্রিটিশের বহিষ্করণ' কথাটি বিশেষ ভাবে লিখিত আছে।

তার পর স্পেনের অধীনে লুজনের দিন কাটিতেছিল। মাঝে-মাঝে ছোট-খাট বিদ্রোহ-বিপ্লব সঞ্চারিত হইতেছিল

স্পানিশ-আমেরিকান যুদ্ধ-অভিযান (১৮৯৯ খৃঃ অঃ)

—কিন্তু সে বিদ্রোহ-দমনে স্পেনকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই।

কিন্তু স্পানিয়ার্ডদের অমানুষিক নৃশংসতা ক্রমে তীব্র হইয়া উঠিল। তখন অতিষ্ঠ হইয়া উনবিংশ শতাব্দীর শেষে তরুণ ফিলিপিনো আস্তু ইনলেভোর অধিনায়কতায় ফিলিপিনোর দল বিদ্রোহে মত্ত হইল। স্পানিয়ার্ডরা তখন প্রায় আশী জন তরুণ অধিনায়ককে সন্দেহ-বশে

বন্দী করিয়া গ্রীষ্মের রাতে ছোট একটি কামরার মধ্যে আবদ্ধ রাখে; তার ফলে প্রায় ত্রিশ জনের মৃত্যু ঘটে!

দেশী পল্লী

এ ব্যাপারে বিদ্রোহের বহ্নি আরো তীব্র তেজে জ্বলিয়া ওঠে। এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ফিলিপিনোদের সহায়তাকল্পে শেষে আমেরিকা আসিয়া স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধে নামিল। কাভিতে বন্দরে স্পেনের বিরাট নৌ-শক্তি বিধ্বস্ত হয়; এবং এ যুদ্ধে আমেরিকা শেষে বিজয় লাভ করে।

যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও আমেরিকা লুজনে বিজয়ীর আসন প্রতিষ্ঠা করিতে পারিল না। ফিলিপিনোরা বলিল—দেশের শাসন-পালনের ভার আমাদের হাতে থাকিবে। তোমরা মনিব হইয়া হুকুম চালাইবে, তা হইবে না! তার ফলে ফিলিপিনোদের সঙ্গে আবার যুদ্ধ হইল। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে আগু ইনলেভো হইল বন্দী, তখন লুজনে আমেরিকা নিজের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিল।

পার্কে স্কেটিং চলে

দ্বীপের বুকে বিদ্বেষের বহ্নি কিন্তু তবু নিবিল না। দস্যুর উৎপাতে মার্কিণ-শাসন বহু কাল কণ্টকিত রহিল। এ উৎপাতের অবসান ঘটে বহু বৎসর পরে।

এখানকার অতি-প্রাচীন অধিবাসীরা মলয়ের সহিত চীনা-জাতির বিবাহ সম্পর্কে সঞ্জাত হইয়াছিল। তাদের নাম নেগ্রিতোশ্‌। আদিম-ফিলিপিনো বলিতে এই জাতিকে বুঝায়।

এখানকার পাহাড়ী অঞ্চলে বাস করে ইগরোত্‌ জাতি। এ জাত্‌ যেমন সাহসী, তেমনি জোয়ান্‌। কৃষি-কাজ করিলেও ডাকাতিতে এ-জাতের পটুতা অসাধারণ। এ-জাত এমন মাংসাশী যে, কুকুরের মাংসেও ইহাদের অসাধারণ রুচি!

এ দ্বীপে আর এক জাতির বাস আছে; তাদের নাম মোরো। মোরো বা মুসলমান; জাতে ইহারা মলয়। ইহাদের বাস মিন্ডানাওয়ে। এ কয়টি জাতি ছাড়া সারা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে বাস করে ইণ্ডোনেশিয়ান; মলয় জাতির বংশ-সম্ভূত বিশাইয়ান্‌; তাগালোগ; এবং স্পানিশ।

মার্কিন-জাতির চেষ্টায় খৃষ্ট-ধর্ম্মের প্রচার হইলেও এখানকার অধিবাসীরা আজো তাদের পুরোহিতের অনুশাসন মানিয়া চলে।

ফিলিপিনোরা সাধারণতঃ অলস। লেখাপড়ায় তেমন অনুরাগ পূর্ব্বে ছিল না; এখন অনুরাগ হইয়াছে।

জোশ্‌ রিজাল্‌ নামে এক জন ফিলিপিনো য়ুরোপে চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিখিয়া আসিয়াছেন। কবি ঔপন্যাসিক ও ভাষা-তত্ত্ববিদ্‌ হিসাবেও তাঁর খ্যাতি প্রচুর।

লেখাপড়ায় তেমন অনুরাগ না থাকিলেও গান-বাজনায় ফিলিপিনো জাতির অসাধারণ পটুতা। এখানকার পুরুষ-সমাজে এখন য়ুরোপীয় বেশভূষার প্রবল প্রচলন দেখা যায়; তবে সার্টটাকে ইহারা পেণ্টুলেনের নীচে গুঁজিয়া দেয় না—পেণ্টুলেনের উপরে সার্ট ঝুলায়। গ্রীষ্মের জন্যই এ ব্যবস্থা করিয়াছে। শিল্প-কাজে ফিলিপিনোদের খুব ঝোঁক আছে। এখানকার তৈয়ারী খড়ের টুপি, মাদুর, চ্যাটাই, বেতের টুকরি-চেয়ার, কাঠের খেলনা-পুতুল; সিগারেট-কেশ—কারুকারিতায় বিশ্বপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

এখানকার প্রধান সহর মানিলা। এখানে য়ুরোপীয়ান ও আমেরিকানের বাস প্রায় পঁচিশ হাজার।

মানিলা সহরটি পাশিগ নদীর তীরে অবস্থিত। নদীটি চক্রাকারে ২০০ মাইল পথ ঘুরিয়া মানিলা উপসাগরে গিয়া মিশিয়াছে। নদীর মোহনা হইতে দশ মাইল দূরে কাভিতে বন্দর। রাজ্যের মাল-বাহী জাহাজ আসিয়া এই বন্দরে দাঁড়ায়।

পাশিগা নদীর ডান দিকে প্রাচীন নগর ইন্‌ত্রামুরস——প্রাচীন যুগের বড় বড় বাড়ী-ঘর ভূমিকম্পের উপর্য্যুপরি আঘাতে আজ জীর্ণ স্তূপে পরিণত হইয়া আছে।

এই প্রাচীন সহরের ওপারে এস্কেলেটা সহর, এটি এখানকার প্রধানতম বাণিজ্য-কেন্দ্র। এই সহরেই যত য়ুরোপীয়ানের বাস। ভূমিকম্পের অবিরাম উৎপাতে পাকা বাড়ী-ঘরের দাঁড়াইবার উপায় এখানে নাই। এজন্য কাঠের বাড়ী-ঘরই বেশী এবং সে বাড়ী-ঘরগুলি দেখিতে নয়নাভিরাম।

মানিলায় তামাকের যে ফশল, তার আর তুলনা নাই! সে তামাকে যে সিগার হয়—মানিলা সিগার—এমন সিগার না কি পৃথিবীর আর কুত্রাপি মেলে না। তামাকের ফশল ছাড়া এখানে শণ, ও পাট প্রচুর জন্মায়। তাছাড়া জন্মায় চিনি, কফি, নীল, ধান ও রাঙা আলু। এখানকার চিনি, কফি ও নীল নানা দেশে চালান যায়।

তরুণ ফিলিপিনোদের সমর-শিক্ষা
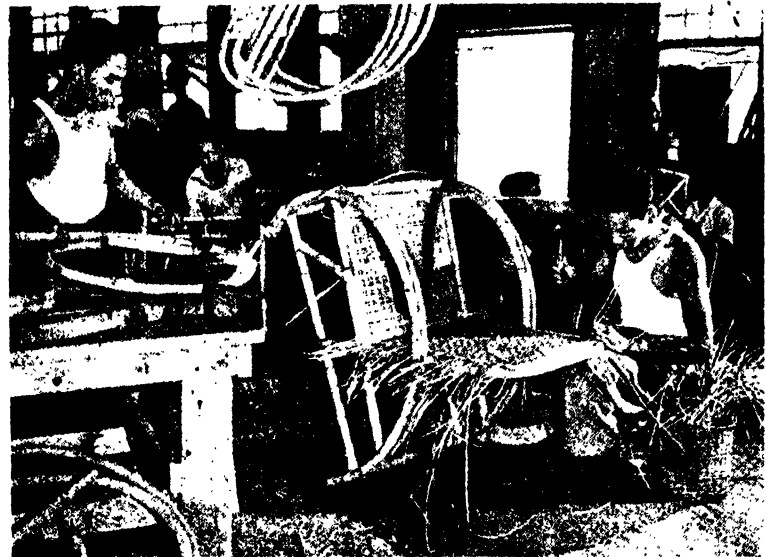
বেতের চেয়ার তৈরী

মানিলা ছাড়া ফিলিপাইন্‌সে আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বন্দর আছে—ইলইলো (পনয় দ্বীপে); জেবু (মধ্যবর্ত্তী দ্বীপে); জামবোয়ানগাও (মিন্ডানাওয়ে)।

ফিলিপাইন্‌সের দ্বীপগুলি যেন প্রকৃতির লীলাভূমি—

আগ্নেয়গিরির ধূম-বহ্নিতেও প্রকৃতির শ্যামলিমায় এতটুকু দাগ পড়ে নাই!

লেখাপড়ায় সাধারণ লোকজনের তেমন অনুরাগ না থাকিলেও দ্বীপের বহু পুরুষ-অধিবাসী এখন লেখা-

নারিকেল-গাছে তাড়ির ভাঁড়
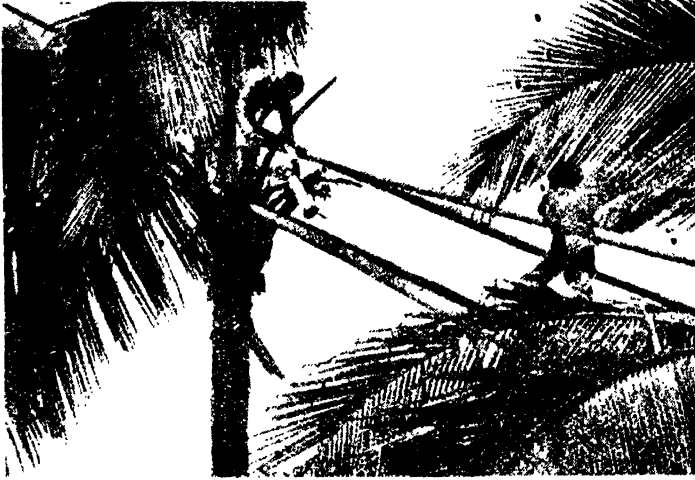
মেয়েরা হাতে গড়ে কাঠের খেলনা-পুতুল

পড়া শিখিয়া কৃতী হইয়াছেন। চিকিৎসা, অধ্যাপনা, ঞ্জীয়তী, আইন-ব্যবসায়—কোন বিভাগেই আজ শিক্ষিত ফিলিপিনোর অভাব নাই! স্ত্রীশিক্ষাও সুপ্রচলিত। তার ফলে ফিলিপাইন্‌সে মেয়ে-কর্ম্মীর অভাব নাই!

আমেরিকানরা ফিলিপাইন্‌সের বহু উন্নতি সাধন করিয়াছে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর টাফটের অধিনায়কতায় একটি কমিশন বসিয়াছিল। সে কমিশনের রিপোর্ট-অনুযায়ী ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ফিলিপাইন্‌সে 'হোম-রুল' প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। নির্ব্বাচিত সদস্যগণ-গঠিত সেনেট-সভা কর্ত্তৃক আভ্যন্তরীণ রাজকার্য্য সম্পাদিত হয়। কিন্তু গবর্ণর ও পদস্থ কর্ম্মচারীদের নিয়োগকর্ত্তা মার্কিণ-যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট। সামরিক ব্যবস্থাদির ভার মার্কিণ ফৌজের হাতে।

কিছুকাল পূর্ব্বে এক জন ইংরেজ সুধী ফিলিপাইন্‌সে গিয়াছিলেন। আধুনিক ফিলিপাইন্‌স্‌ সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তার মর্ম্ম সঙ্কলিত করিয়া দিলাম।

তিনি লিখিতেছেন, প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে আবার আসিয়া জাহাজ হইতে মানিলায় নামিলাম। পূর্ব্বে মানিলায় গিয়াছিলাম ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে। তখন স্পানিশ নৌ-শক্তি সদ্য বিধ্বস্ত হইয়াছে। উত্তেজনার ঘোরে মার্কিণ সেনা তখন সংহার-লীলায় মাতিয়াছে! তার পর সমগ্র ফিলিপাইন্‌-দ্বীপপুঞ্জে আবিষ্কারের মহা সমারোহ চলিল। ভলাণ্টিয়ারদের দল দিকে-দিকে চলিয়াছে অনাবিষ্কৃত দ্বীপগুলির পরিচয়-লাভের উদ্দেশ্যে। চারি দিকে অধীর চাঞ্চল্য দেখিয়াছিলাম।

এবারে আসিয়া দেখি, দিকে-দিকে শান্তি-স্বাচ্ছন্দ্য, সম্পদ-সমৃদ্ধি। পাকা রাস্তা, পাকা ইমারত। পাকা রাস্তায় আজ মোটর-ট্রাম চলিয়াছে। মোটর-লরি ও ট্যাক্সির বিরাম নাই। মাটীর কুটীরের জায়গায় আজ উঠিয়াছে রম্য হর্ম্ম্য-ভবন। লোকজন আজ সিনেমার নামে উন্মত্ত।

পাশিগ নদীর বুকে আজ বড় বড় জাহাজ ষ্টীমার—নদীর জল আজ স্বচ্ছ নির্ম্মল; তার সে পঙ্কিল ঘোলাটে বর্ণ আর নাই! রাত্রে আজ জাহাজে-জাহাজে বৈদ্যুতিক আলো, বাড়ীর জানলা ভেদ করিয়া বৈদ্যুতিক আলো আসিয়া নদীর জলে মাণিকের মালা দুলাইতেছে! চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এ নদীর বুক রাত্রে অন্ধকারে ঢাকিয়া থাকিত, জেলেডিঙ্গির প্রদীপের ক্ষীণ আলোর বিন্দু সে-অন্ধকারের মাঝে চুম্‌কির মতো ঝিকঝিক করিত!

মানিলার প্রাচীন ছবি আজো আঁকা আছে শুধু প্রাচীন সান্তিয়াগো দুর্গের গায়ে। এ দুর্গটি মধ্য-যুগে নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রাচীন অট্টালিকার মধ্যে সাণ্টো টমাস বিশ্ববিদ্যালয় (এ বিশ্ববিদ্যালয়টি হার্ভার্ড

চীনা-পাড়া বাজার

পাগ্‌শান্‌জান্‌ জল-প্রপাত

শণের দড়ি-কাছি

মেয়ে-ডাক্তার

ধানের ক্ষেত—(ইগরোত্‌-জাতের)

বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়েও প্রাচীন) উল্লেখযোগ্য। শুধু মানিলাতেই আজ ছ'লক্ষ বিশ হাজার লোকের বাস, সহর আজ কর্ম্ম-উদ্দীপনায় যেন ফুঁশিতেছে! পথে-ঘাটে কর্ম্মব্যস্ত লোকজন —কি বিপুল উত্তাল জনস্রোত! সে স্রোতে পৃথিবীর সর্ব্ব-জাতির লোক গা ভাসাইয়া চলিয়াছে!

মানিলার এ সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতি আমেরিকানেরা গড়িয়া তোলে নাই! ১৫২১ খৃষ্টাব্দে এ দ্বীপের যে-পরিচয় ভাষায় গ্রথিত দেখা যায়, তাহা হইতে জানিতে পারি, ফিলিপিনোরা বর্ব্বর বা মূর্খ ছিল না। তারা রাজ্য-চালনা করিত; শিক্ষা-সদন প্রতিষ্ঠা করিত; যুদ্ধ করিত; বাণিজ্য করিত।

এক জন ফিলিপিনোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার। সকলেই ইংরেজী শিখিতেছে—তবে তাদের উচ্চারণ ফরাসীদের মতো।

আমেরিকান্ সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রাদির এখানে খুব আদর। প্রতি মাসে মার্কিন যুক্তরাজ্য হইতে ফিলিপাইন্সে মাসিক-পত্র আসে প্রায় পাঁচ লক্ষ কপি। মেয়েদের কাছে ফ্যাশন-পত্রিকাদির অপরিসীম আদর।

ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি ফিলিপিনোদের তেমন অনুরাগ নাই। ইংরেজী সংবাদপত্রগুলিই তারা বেশী পড়ে। ফিলিপাইন্সে দু'শো খানি ইংরেজী সংবাদ-পত্র প্রকাশিত হয়। তাদের প্রচার প্রায় পনেরো লক্ষ। তাছাড়া শুধু মানিলাতেই ইংরেজী ভাষায় ৯৫ খানি মাসিক, ২০ খানি সাপ্তাহিক, ১৫ খানি দৈনিক এবং
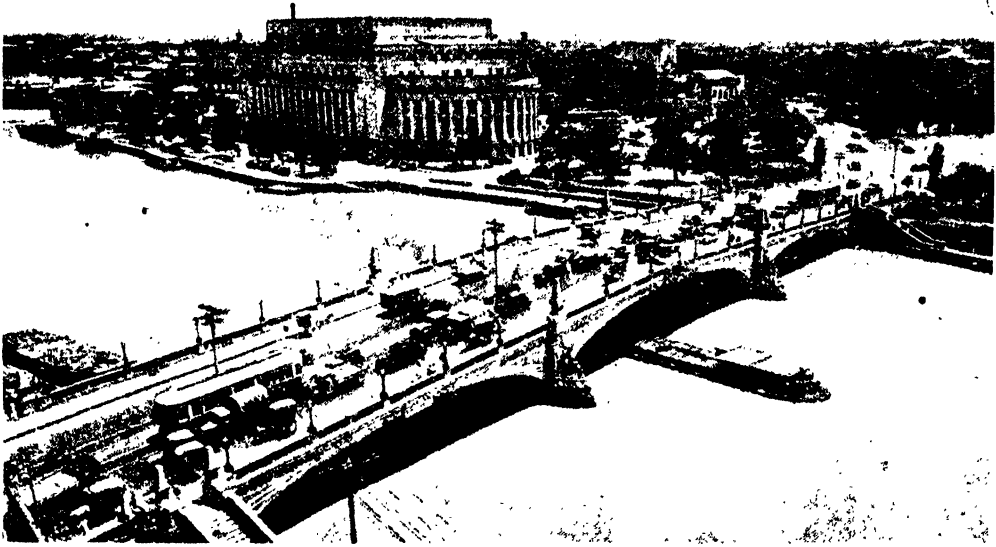
পাশিগের বুকে ঐতিহাসিক পুল (১৮৯৮ খৃঃ অঃ)

আমেরিকার কাছ হইতে সব চেয়ে দামী কি-বস্তু তোমরা লাভ করিয়াছ? উত্তরে ভদ্রলোক বলিলেন,—ইংরেজী ভাষা! কেহ বলেন, মার্কিনের দৌলতে দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি বিধান হইয়াছে! কেহ বলেন, মার্কিন আমাদের দিয়াছে ডিমোক্রেশি। তরুণের দল বলে—মার্কিনের কাছ হইতে আমরা পাইয়াছি খেলাধুলা—বিশেষ করিয়া বেশ-বল্ আর বক্সিং! মেয়েরা বলেন—মার্কিনের কাছ হইতে বেশভূষার আদর্শ; সিনেমা, নাচ-গানের নব রীতি, স্কেটিং আর টেনিস পাইয়াছি! যাঁরা শিক্ষিত, তাঁরা বলেন, মার্কিনের সংস্পর্শে আসিয়া আমরা পাইয়াছি সামাজিক মুক্তি এবং সাম্য! সাদায়-কালোয় ফিলিপাইন্সে এতটুকু পার্থক্য নাই!

২০ খানি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সে-সব পত্র-পত্রিকাদিতে প্রচুর ছবিও ছাপা হয়।

ইংরেজী ভাষার প্রচলন এখানে এমন যে, এখানকার অধ্যাপক ডক্টর চিয়েনভেনিডো মারিয়া গনজালেশ্ পি-এইচ-ডি, বলেন—ইংরেজী ভাষার দৌলতে ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে প্রচুর সুবিধা বলিয়া ইংরেজী শিখিবার ঝোঁক এখানকার অধিবাসীদের অত্যধিক।

লেখক লিখিতেছেন, দোকানে, কারখানায়, অফিসে, ডাক্তারখানায়, উকিলের সেরেস্তায়—সর্ব্বত্র ইংরেজী ভাষার প্রচলন।

লেখক লিখিতেছেন, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মানিলায় ফিলিপিনোর সংখ্যা ছিল ষাট লক্ষ; এখন তাদের সংখ্যা

লেখক লিখিতেছেন—ফিলিপাইন্‌সে শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রচলন বহু প্রাচীন যুগ হইতে। ফিলিপাইন্‌সের অতি প্রাচীন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এখানকার যে-সব লিপি সংরক্ষিত আছে, তাঁহাতে যে অক্ষর, সে অক্ষর দেখিতে ভারতের অশোক-স্তম্ভের শিলা-লিপির মতো। তালপাতায় এ-সব অক্ষর লিখিত। কালি এমন যে, বহু শত বৎসরেও তার আঁচড় এতটুকু অস্পষ্ট হয় নাই। এ-সব তালপত্রের পুথিতে এখানকার রূপ-কথা লেখা আছে। ধর্ম্ম-বিধি, অনুশাসন, এবং বংশ-তালিকা লেখা আছে। বাঁশের পাতায় বিষয়-সম্পত্তির দানপত্র-লেখা দলিল সংরক্ষিত আছে—সে লেখা এখনো অক্ষত আছে। একখানি প্রণয়-পত্রিকা আছে—তার উত্তর-সমেত। তরুণ প্রণয় জানাইয়া তরুণীর হৃদয় প্রার্থনা করিয়াছে; উত্তরে তরুণী লিখিয়াছে—না!

পাতায় টুপি বোনা

র‍্যাগ্-সতরঞ্চ বোনে

ফিলিপাইন্‌সের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর ওটলি বেয়ার বলেন—সেঞ্চুরি অভিধানে ফিলিপিনো এবং মলয়-ভাষা-সম্ভূত প্রায় ২০০০ বাক্য সংগৃহীত আছে—এ-সব কথার মধ্যে অনেক কথা ইংরেজী-ভাষাবিদের সুপরিজ্ঞাত। ইংরাজীতে যে humbug কথা আছে, সেটির উৎপত্তি হইয়াছে ফিলিপিনো 'হামবুগ্' হইতে।

স্পানিশ ও মার্কিণ জাতির আগমনের পূর্ব্বে ফিলিপাইন্‌স্ দ্বীপপুঞ্জে যে শিক্ষা-সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিদ্যমান ছিল, তাহা প্রাচীন-ভারত ও শ্যামের শিক্ষা-সংস্কৃতি হইতে উদ্ভূত। মাগেলান্ কর্ত্তৃক এ দ্বীপ-আবিষ্কারের পরেই য়ুরোপীয়ান ঐতিহাসিকের দল এ কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

প্রাচীন যুগে এখানকার অধিবাসীরা খনির কাজ করিত। স্বর্ণরেণু-সংগ্রহ, তাঁত, পশু-পালন, মুক্তা-সংগ্রহ, অস্ত্র-নির্ম্মাণ—এ সব কাজে তারা অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছে। তাদের সে কাজের বহু নিদর্শন ফিলিপাইন্‌স্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। সোনা-রূপায় রকমারি নক্সা তোলার কাজে প্রাচীন যুগের ফিলিপিনো জাতির পটুতা ছিল অসামান্য। এখানে বহু শত বৎসর পূর্ব্বে কাচ তৈয়ারী হইত। সে কাচে রকমারি চুড়ি-ব্রেশলেট-ভূষণ বিরচিত হইত। এ সব শিল্প-কাজ করিত ফিলিপাইন্‌সের মেয়েরা! এখনো এখানকার ইগরোত্-জাতি কাঠের যে-সব খেলনা ও

মূর্ত্তি তৈরী করে, তার তুলনা মেলে শুধু জয়পুরের হাতীর দাঁতের খেলনার সহিত।

চল্লিশ বৎসরে এখানকার নারী-সমাজে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তার সঙ্গে তুর্কির নারী-সমাজের তুলনা করিলে অত্যুক্তি হইবে না। এখানকার মেয়েরা অবরোধ জানে না এবং মানে না। শিক্ষা-দীক্ষায় তারা পুরুষের সমতুল্য। মেয়েদের যেমন ভোট দিবার অধিকার মিলিয়াছে, তেমনি ভোটের জোরে শাসন-পরিষদে প্রবেশের অধিকারও মিলিয়াছে। তাছাড়া কর্ম্মক্ষেত্রের সকল বিভাগে এখানকার মেয়েরা এখন পুরুষদের সঙ্গে সমান আসন অধিকার করিয়াছে। এরোপ্লেন-চালনাতেও ফিলিপিনো রমণী যেমন দক্ষ, তেমনি আবার স্বামীর সঙ্গে সহযোগিতা-

নাই! এ পরিচ্ছন্নতা রক্ষা-কল্পে এখানকার সামান্য কুলি-মজুরেরও চেতনার সীমা নাই। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে দ্বীপগুলি ছিল কদর্য্য পঙ্কিল, নানা রোগের লীলাক্ষেত্র! কুষ্ঠ-রোগীর সংখ্যা ছিল তখন প্রায় দশ হাজার! তার উপর প্লেগ আর কলেরা মার-মূর্ত্তিতে সমগ্র ফিলিপাইন্‌সে যেন শীকার করিয়া বেড়াইত! তখন নদীর জলে ইঁদুরের বাহিনী সাঁতার দিয়া বেড়াইত, বিছানায় মানুষের পাশে আসিয়া বসিত! চল্লিশ বৎসরে সে সব জঞ্জাল সাফ হইয়া গিয়াছে। রোগ এখনো হয়, তবে তার প্রতিরোধ এবং প্রতিক্রিয়া-কল্পে দীনতম অধিবাসী পর্য্যন্ত আজ সজাগ! ম্যালেরিয়া এখনো আছে, তবে ম্যালেরিয়ায় মরে আজ অল্প লোক।

পাশিগ নদী

সূত্রে ফিলিপিনো রমণী টকি-ফিল্ম রচনা করিতেছেন— সেই সঙ্গে সংসারে বিন্দুমাত্র ঔদাস্য নাই! ফিলিপাইন্‌সের শাসন-সভার প্রেসিডেণ্ট গঞ্জালেশ লিখিয়াছেন— Our women take to education like ducks to water. বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-শিক্ষালাভে পুরুষের চেয়ে ফিলিপিনো মেয়েদের অনুরাগ এবং পটুতা অনেক বেশী! ফিলিপাইন্‌সে পুরুষের চেয়ে মেয়ে-ডাক্তারের সংখ্যা বেশী। রাজনীতির ব্যাপারেও মেয়েদের সহযোগিতা এবং চেতনা সীমাহীন।

লেখক লিখিতেছেন—প্রাচ্য জগতে মানিলার মতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহর আর কোথাও দেখি

ফিলিপাইন্‌সে বহু ফিল্ম-কোম্পানি আছে। একমাত্র মানিলার ষ্টুডিয়োগুলিতেই ফিল্ম তৈয়ারী হয় বছরে পঞ্চাশখানি করিয়া। প্রণয়-লীলার ছবিই ফিলিপিনোরা ভালোবাসে; এ্যাডভেঞ্চার বা চুরি-ডাকাতির গল্প তারা পছন্দ করে না। ট্রাজেডি তাদের দু'চোখের বিষ!

দেশী উপন্যাস হইতেই অধিকাংশ ফিল্মের গল্প লওয়া হয়। তাছাড়া মার্কিন ফিল্মের গল্প-সংলাপাদি-সমেত নিজেদের ভাষায় হুবহু নকল করিতে ছাড়ে না। নূতন গল্পের জন্য এখানকার ষ্টুডিয়োগুলি চারি দিকে আকুল ভাবে সন্ধান করিতেছে। মানিলার বহু চিত্রাভিনেতা ও অভিনেত্রী 'ষ্টার'রূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এ

খ্যাতি আমেরিকাও মানিয়া লইয়াছে। এই সব ষ্টারদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রোগেলিয়ো রোজা; কোরাজন নোবল্; জোশি পাতিলা; এল্‌শা ওরিয়া; রোশিটা রিভেরা; ইয়োশাস্তা মার্কোয়েজ। ইঁহারা প্রচুর টাকা উপার্জ্জন করেন। ইঁহাদের বড় বাড়ী ও দামী মোটর-গাড়ীর অভাব নাই!

পূর্ব্বে বড় বড় চীনা নৌকায় মালপত্র চালান যাইত, মালপত্রের আমদানী হইত—এখন মাল যাতায়াত করিতেছে শীপ্লেনে! আমেরিকা হইতে মানিলায় শীপ্লেন আসিয়া পৌঁছায় মাত্র ছ' দিনে।

পূর্ব্বে জল-পথে দস্যুর ভয় ছিল। এখন সে পথ সম্পূর্ণ নিরাপদ। বহু শত বৎসর পূর্ব্বে মেক্সিকোর সঙ্গে মানিলার ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত। বছরে একবার করিয়া নৌকা আসিত—আসিতে সময় লাগিত দুই শত দিন।

এখান হইতে মেক্সিকো লইয়া যাইত মশলা, হস্তিদন্ত, মৃগনাভি-সার; ফিরিবার মুখে চীন হইতে লইয়া যাইত চীনামাটী বা পোর্শিলেন এবং সিল্ক। ডাকাতের হাতে এবং ঝড়ে বহু জাহাজ মারা যাইত। মেক্সিকোর সঙ্গে ফিলিপাইন্‌সের এ বাণিজ্য-সম্পর্ক ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রায় দুই শত বৎসর অটুট ছিল।

এখন সে বাণিজ্য-সম্পর্ক নিবিড় হইয়াছে মার্কিণ যুক্ত-রাজ্যের সহিত। এখান হইতে আমেরিকায় যায় শণ, কাঠ, চিনি, তামাক এবং নারিকেল তৈল। ফিলিপাইন্‌সের এই নারিকেল তৈলে আমেরিকায় যে সাবান তৈরী হয়, তার তুলনা নাই!

লেখক লিখিতেছেন—There is hardly a person in the whole United States who does not wash his hands with a soap containing Philipine cocoanut-oil.

এখানে স্বর্ণখনির স্বর্ণ এখনো নিঃশেষিত হয় নাই—কামারাইন্‌স্ নর্ট প্রদেশের মামবুলাও সহরে কিছু কাল পূর্ব্বে একটি স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখনো ফিলিপাইন্‌স্ দ্বীপপুঞ্জের স্বর্ণ-খনি হইতে বছরে যে স্বর্ণ পাওয়া যাইতেছে, তার দাম হইবে প্রায় এক কোটি টাকা।

স্পানিশ-আমলের গির্জ্জা

ফিলিপাইন্‌সের তরুণ-সম্প্রদায়ের খনিজ বিদ্যা শিখিয়া খনির কাজে সাফল্য-লাভের বাসনা সীমাহীন। শিক্ষিত হইলেও মাটী কাটিতে বা মজুরী করিতে তারা এতটুকু লজ্জাবোধ করে না।

ফিলিপাইন্‌সে ময়না পাখী প্রচুর। পূর্ব্বে ছিল না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক-ঝাঁক ময়না কোন্ জাহাজ হইতে উড়িয়া পথ হারাইয়া মানিলার বনে কি করিয়া আসিয়া উপস্থিত হয়, তার পর হইতে এখানে ময়নার কলোনি গড়িয়া উঠিয়াছে।

লেখাপড়া শিখিলেও প্রাচীন কয়েকটি সংস্কার ফিলিপিনোরা এখনো মানিয়া চলে। রাত্রে কোনো জানলা দিয়া বাহিরে কোনো জিনিষ ফেলিতে নাই—একান্ত যদি ফেলিতে হয়, তাহা হইলে 'মাপ করবেন' বলিয়া ফেলিবে—নহিলে ভূতের গায়ে লাগিলে রক্ষা থাকিবে না!

মোটরে যদি শূকর চাপা পড়ে, তাহা হইলে অনর্থ ঘটিবে, বুঝিবে!

সাপ মরিলে তার ডান দিক্ দিয়া চলিয়া যাইবে।

যাত্রাকালে বানর-দর্শন—তার অর্থ, অযাত্রা!

কেহ যদি পথে বাহির হইয়া সামনে টিক্‌টিকি ডাকে, তাহা হইলে যাত্রা বদলাইয়া বাহির হইবে।

ছেলেদের বানর লইয়া খেলিতে দিবে না।

বাড়ীতে যদি কালো প্রজাপতি আসে, তাহা হইলে এক জনের মরণ নিশ্চিত!

নিদ্রাকালে মানুষের আত্মা তার দেহ ছাড়িয়া বাহিরে যায়—তাই চীৎকার বা হাঁক-ডাক করিয়া ঘুমন্ত মানুষের ঘুম ভাঙ্গাইলে তার সে-ঘুম আর ভাঙ্গিবে না!

এ দ্বীপ কি করিয়া গড়িয়া ওঠে, সে সম্বন্ধেও আশ্চর্য্য গল্প প্রচলিত আছে। ফিলিপিনোরা বলে, অতি পুরা কালে একটা দৈত্য পৃথিবীকে পিঠে বহিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। এক দিন হঠাৎ তার মেজাজ গেল বিগড়াইয়া! ভাবিল, কেন মিছা এ ভার বহিয়া বেড়াই! রাগে পৃথিবীকে পিঠ হইতে সে ফেলিয়া দিল! ফেলিয়া দিবামাত্র পৃথিবী ভাঙ্গিয়া ৭০৮৩ টুকরা হইয়া জলে পড়িল। সেই কয় টুকরা হইতে ফিলিপাইন্‌স্ দ্বীপপুঞ্জের সৃষ্টি!

এখানকার গরীব চাষা-মজুরেরা বাড়ীতে সাপ পোষে। সাপে ইঁদুর মারে; ইঁদুর মারিলে ফশল রক্ষা পাইবে, তাই।

একবার বন্যায় এক প্রকাণ্ড ময়াল সাপ ভাসিয়া তীরে আসিয়া ওঠে। এ সংবাদ গ্রামে রাষ্ট্র হইবামাত্র দলে দলে সকলে আসিল সাপ ধরিতে। এক দুই তিন—বলিয়া বিশ জন লোক সাপের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল; এবং চাপিয়া সাপকে কায়দা করিয়া ধরিল! এমন করিয়া জাপ্টাইয়া ধরিল যে, ময়াল তার দেহকে কুণ্ডলীকৃত করিতে পারিল না! তার পর বাঁশে বাঁধিয়া সাপকে লইয়া সকলে গ্রামে ফিরিল। সে-সাপটাকে আমেরিকার চিড়িয়াখানায় তারা বেচিয়া দেয়।

ফিলিপিনো জাতি আজ নব প্রাণ-হিল্লোলে জীবন্ত। সর্ব্ব দিকে তার কর্ম্মোদ্দীপনার সীমা নাই।

এই ফিলিপাইন্‌সের উপর বিধাতা হঠাৎ আজ বিরূপ, তাই দানবী মূর্ত্তি লইয়া জাপান আজ সেখানে হানা দিয়াছে! ফিলিপিনো জাত ভয়ে হটিবার পাত্র নয়! জাপানীর এ বর্ব্বর আক্রমণকে সবলে তারা প্রতিরোধ

আলুর ফশল

করিতেছে! যে বিক্রমে এ প্রতিরোধ চলিয়াছে—তাহা অপূর্ব্ব! ফিলিপিনোদের এই সাহস, এই শক্তি এবং সর্ব্বোপরি তাদের দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তা—তার জয় অনিবার্য্য বলিয়া মনে হয়!

চৈত্ররাতে

তুমি কি আসিবে ফিরে? বিফলে যামিনী যায়,—
আছ কোন্‌খানে?
মিলন-মল্লিকা-মালা ছিন্ন করে' কত দিন কত কাল আগে—
গেছ চলে,—আনন্দের মধুপাত্র রিক্ত রহে ক্ষুধিত পাষাণে,
পাটলা হরিণী কাঁদে উদাস অন্তরে সদা বনপ্রান্ত ভাগে।

অরণ্যকুটীরে মম বসন্তের বিভাবরী দীর্ঘশ্বাসে রহে,
নিস্তব্ধ নিকুঞ্জপথে বিরহবেদনাভরা নয়নপল্লব—
চেয়ে আছে চৈত্ররাতে, স্মৃতির সৌরভ এবে বহে গন্ধবহে
জীবনের নদীতটে,—দোলে ছায়া চারি ভিতে পরাণবল্লভ!

হৃদয়ের হিন্দোলায় উড়াইয়া উত্তরীয় এ কুটীরদ্বারে
তুমি কি করুণাভরে চাহিবে আমারি পানে নিশীথে নির্জ্জনে!
অতৃপ্ত কামনা মম চিত্ত করে ব্যাকুলিত অনিত্য সংসারে
সান্ত্বনার সঙ্গীতেরে শুনাবে কি প্রিয়তম প্রাণের স্পন্দনে!

অশোক পলাশবনে অন্ধকারে পথহারা কাঁদে চৈত্ররাত
ক্ষীণ প্রদীপের সম গগনে জ্বলিছে তারা, অস্তে গেছে চাঁদ!

শ্রীঅপর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।
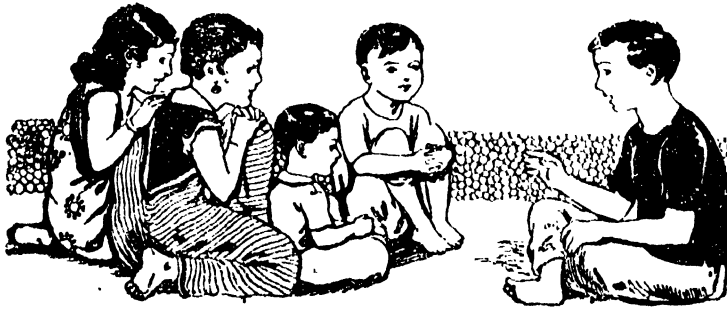
নির্ব্বাসিতা রাজকন্যা

[রূপ-কথা]

১৩

মনে আছে ত—অনেক কষ্টের পর লীনা জয়ন্তী দেবীর সিদ্ধপীঠে মাথাটি ঠেকিয়ে তাঁকে জাগাবার আর প্রসন্ন করবার কি মন্ত্রটি পড়েছিল? অন্য কোন সাধারণ মেয়ে হলে এই বলেই দেবীর কাছে ধর্ণা দিত—"মা গো, বড় বিপদে পড়েই এসেছি—রক্ষা কর তুমি; মানে মানে যাতে ঠিক জায়গাটিতে নিরাপদে পৌঁছুতে পারি—আমার বাবার সিংহাসনটির উপরে বাঙ্গালার রাণী হয়ে বসি—তারি উপায় করে দাও; তোমার প্রসাদে আমার গায়ে যেন বিপদের আঁচটুকু আর না লাগে!"

কিন্তু এই ধরণের প্রার্থনা জানাবার মেয়েই নয় আমাদের লীনা। পিছনে কত বড় বিপদ! সামনে এখনো কত দুর্গম পথ, কত বিঘ্ন, কত বাধা অতিক্রম করতে হবে তাকে,—এ সব জেনেও সে দেবীর কাছে বিপদ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে ভিক্ষা চাইল না। লীনার বিশ্বাস, আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস যার থাকে, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের মহাশক্তি সে-ই লাভ করতে পারে। কিন্তু এই শক্তি পেতে হলে নিষ্ঠা চাই, ভক্তি চাই, বিশ্বাস চাই, আর চাই—লব্ধশক্তি সঞ্চয় করবার মত শক্ত আধার, ব্যবহার করবার যোগ্যতা। লীনা জানে—ভগবান্ সামনে এসে ভক্তকে এই দুর্লভ শক্তি দেন না, তিনি ভাগ্যবান্ ভক্তের অন্তরেই আবির্ভূত হয়ে তাকে ধন্য করেন। গভীর রাতে ধূলোপায়ে জয়ন্তী দেবীর পীঠে এসে ধর্ণা দিয়ে পড়লে, দেবী তার মনস্কামনা সিদ্ধ করেন জেনেও—লীনা নিজের জন্যে কোন প্রার্থনাই জানাল না, দেশের নারীজাতির দুর্দ্দশার ছবিগুলো তার মানসপটে সর্ব্বক্ষণই জল্-জল্ করে—তাই সে দুর্গতিনাশিনী দুর্গার কাছে জোর-গলায় তার প্রাণের কথা জানাল—"অসুরদলনী মূর্ত্তিতে তোমাকে জাগাতে এসেছি মা, তুমি জাগো।"

এমন মর্ম্মস্পর্শী ডাক শুনে পাষাণীও কি আর স্থির থাকতে পারেন?

মনের ভিতরে দেবীর অসুরদলনী মূর্ত্তির রূপ কল্পনা করেই লীনা ধ্যানে বসেছিল। তার মনোরাজ্যে তখন দেবীর বোধন বসেছে, মনের মণি-কোঠাটির উপর আসন পেতে বসেছেন দুর্গতিনাশিনী দুর্গা অসুরদলনী মূর্ত্তি ধরে। সহসা তার কানে বাজল বীণার ঝঙ্কারের মত মুক্ত কণ্ঠের সুমধুর স্বর—"রাণী, আমাদের রাণী; জয় মা জয়ন্তী!"

চকিতে হরিণের মত কালো কালো দু'টি চোখ মেলে বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টিতে লীনা পিছনে তাকিয়ে দেখ্‌ল—ধনুকের আকারে সারি দিয়ে গুহার দরজাটি আড়াল করে আটটি মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তার পানে একদৃষ্টে চেয়ে। পরনে তাঁদের গেরুয়া রঙ্গের সাড়ী—পাড়গুলি লাল টুকটুকে; মাথার এলো চুল পিঠের কাপড়ের উপর দিয়ে কোমর পর্য্যন্ত ঝাঁপিয়ে পড়েছে। গলায় জবা-ফুলের টাটকা মালা, কপালে সিঁদুর-কোঁটা যেন অগ্নিশিখার মতই জ্বল্‌ছে। প্রত্যেকের হাতে এক-একটি ত্রিশূল—মৃদু আলোর আভায় তাদের ফলাগুলো চক্‌চক্ করছে। আটটি মেয়ের আকৃতি অনেকটা একই রকমের—দেহের বাঁধন শক্ত, জোরালো; বয়সের দিক্ দিয়ে যৌবনের সীমা তারা পেরিয়ে এলেও যৌবন-শ্রী তাদের স্বাস্থ্যপূর্ণ দেহে যেন টলমল করছে। প্রত্যেকেরই মুখে একটা পবিত্র শ্রী, আর চোখগুলিতে ভক্তির এক অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস। মেয়েগুলিকে এ ভাবে হঠাৎ দেখে লীনার ভারী ভাল লাগল, ভয় ও বিস্ময়ের স্থলে তার মুখে আনন্দের আভা ফুটে উঠ্‌ল; হাত দুইখানি জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে হাসিমুখে বল্‌ল—"দেখুন, দেবীর পীঠে আসতেই তাঁর অসুরদলনী মূর্ত্তিটির চিন্তাই আমার মনে উঠে চোখ দু'টো বুজিয়ে দেয়। আপনাদের মুখের কথায় চোখ খুলে যায়! চেয়ে দেখ্‌ছি—মা আর ঘুমিয়ে নেই—জেগেছেন।"

মেয়েদের ভিতর থেকে এক জন বল্‌লেন—মাকে আপনিই জাগিয়েছেন। এখন জাগ্রতা মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর রাজ্যের ভার নিন আপনি—আমাদের রাণী হয়ে।"

লীনা তখনই বুঝে নিল যে, এই আটটি মেয়ে নারীরাজ্যের পক্ষ থেকে তাকে, রাণীর পদে বরণ করবার জন্যেই জয়ন্তী দেবীর পীঠে এসেছেন। গুহার ভিতরে

প্রবেশ করবার মুখে বিজলীর মুখ দিয়ে একটা বিচিত্র শব্দ তীক্ষ্ণ ভাবে নির্গত হওয়ায় তার মনে যে সন্দেহ তখন জেগেছিল—সেটা মিথ্যা নয়; সেই শব্দেই এঁরা নতুন রাণীর আগমনের সাড়া পেয়ে গুপ্ত পথ দিয়ে গুহার মধ্যে এসেছেন। এখন সেই আটটি মেয়ের সঙ্গে তাকে বোঝাপড়া করতে হবে। মনের এই ভাবটুকু মনেই চেপে রেখে মুখে বিস্ময় আর কৌতূহলের আভা ফুটিয়ে লীনা জিজ্ঞাসা করল, "আপনাদের এ কথার মানে কি বলুন ত? আমি এসেছি দেবীর পীঠে দেবীকে দর্শন করতে। তাঁর রাজ্যের ভার আমি নিতে যাব কেন? আর আমার মত একটা অজানা মেয়েকে এ ভার দেবীই বা কেন দেবেন?"

লীনার প্রশ্নে আটটি মেয়ের মুখেই একই ধরণের হাসি ফুটে উঠ্‌ল। কিন্তু সারির এক ধারে লীনার কাছে যে মেয়েটি দাঁড়িয়েছিলেন, তিনিই প্রথমে কথা বলেছিলেন, এবারও তিনিই প্রশ্নটার উত্তর দিলেন। স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে লীনার পানে চেয়ে হাসিমুখে আস্তে আস্তে বল্‌লেন, "মায়ের ঘোড়ায় চড়ে মায়ের আস্তানায় এসেও আপনি যে ও-কথাটার মানে বুঝ্‌তে পারেননি, আপনার মুখ দেখে ত তা মনে হচ্ছে না। কেন না, অবুঝ বা বোকা মেয়েকে মায়ের ঘোড়া তার পিঠে কখনো তোলে না; রাজরক্তে যার জন্ম, রাজ্যের ভার নেবার সামর্থ্য যার আছে, আর মা যাকে চান,—বেছে বেছে সে ঠিক সেই মেয়েকেই পিঠে বসিয়ে মায়ের আস্তানায় আনে।"

স্তব্ধ হয়ে লীনা কথাগুলো শুনল, তার মনের ভিতরটা হঠাৎ যেন দুলে উঠ্‌ল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে আবার প্রশ্ন করল, "কিন্তু আমার যদি রাণী হবার ইচ্ছা না থাকে?"

তেমনি হেসে বর্ষীয়সী মহিলাটি উত্তর দিলেন, "রাণী হবার জন্যেই মা যাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি ছাড়া আর কেউ মার ঘোড়ায় চড়ে তাঁর আস্তানায় আসতে পারে না।"

মুখখানা শক্ত করে লীনা বল্‌ল, "মায়ের আস্তানায় এসেছি বলেই যে তাঁর রাজ্যের রাণী হতে হবে আমাকে, তার কি কোন মানে আছে?"

মহিলাটি হেসেই জানালেন, "মানে আর কিছু নয়—মায়ের ইচ্ছা। আপনাকে ভাবতে হবে—বাইরের সমস্ত দরজাগুলো বন্ধ হয়ে গেছে, মা'র এই পাহাড়-ঘেরা রাজ্যটিই আপনার ঘর-বাড়ী আস্তানা। এর বাইরে চেয়ে দেখবার মতন আপনার আর কিছু নেই।"

কথাগুলো লীনার মনের উপরে যেন জোরে একটু আঘাত দিল, কিন্তু মুখে তার ব্যথার চিহ্নটুকু প্রকাশ হতে না দিয়ে সে একটু গম্ভীর হয়েই বল্‌ল, "রাজ্যের ভিতরে রাণীকে যদি কয়েদ করে রাখাই এখানকার ব্যবস্থা হয়, তাহলে বাইরে থেকে নতুন কোন মেয়েকে ধ'রে না এনে আপনাদের ভিতর থেকেই ত কাউকে রাণীর আসনে বসাতে পারতেন। এত হাঙ্গামার কি দরকার ছিল?"

মহিলাটি একটু হেসে বললেন, "আমাদের ভিতরে এমন কেউ নেই—রাণীর আসনে বসবার মত যোগ্যতা যার আছে। আমরা আট জন মেয়ে মিলে রাজ্য চালনার বিধি-ব্যবস্থা তৈয়েরী করি, রাণীকে পরামর্শ দিতে পারি; কিন্তু রাণীর আসনে বসবার মতন ক্ষমতা আমাদের নেই।"

লীনা বল্‌ল, "রাণীর আসনে বসবার ক্ষমতা বা যোগ্যতা যে আমার আছে, তা আপনারা বুঝলেন কি করে?"

মহিলাটি উত্তর দিলেন, "আগেই ত এ কথা বলেছি। ক্ষমতা আপনার না থাকলে রাজ্যের সিদ্ধ ঘোড়া কখ‍ন আপনাকে পিঠে তুলে এখানে নিয়ে আসত না।"

মনে মনে কি ভেবে লীনা সহসা বলে উঠ্‌ল, "আচ্ছা, বলুন ত, এই ঘোড়া এর আগে বাইরের আর কোন মেয়েকে পিঠে তুলে এনেছে এখানে—যাঁকে আপনারা রাণীর আসনে বসিয়েছিলেন?"

মহিলাটি তাঁর কথায় জোর দিয়ে বল্‌লেন, "নিশ্চয়ই; ঠিক তিন বছর আগে রাণীর আসন খালি হ'তে এই ঘোড়াকেই ছেড়ে দেওয়া হয়। ঠিক তিন মাস পূর্ণ হবার মাথায় সে রাণীকে পিঠে তুলে এনেছিল। আমরা এখানে মায়ের সামনে তাঁর অভিষেক করে রাণীর আসনে বসাই।"

লীনা জিজ্ঞাসা করল, "তাঁর কি হল?"

মহিলাটি বল্‌লেন, "তাঁর বয়স হয়েছিল অনেক। যখন রাণীর মুকুট আমরা তাঁর মাথায় পরিয়ে দিই—চুলগুলো তাঁর সব পেকে গেছে, গায়ের মাংসগুলো ঢিলে হয়ে পড়েছে। ঘোড়া কিন্তু ঠিক লোককেই এনেছিল। তাঁর মায়ের ভারি সাধ ছিল, মেয়ে রাণী হবে। মরবার সময় মেয়েকে তিনি বলে যান—'রাজা বা রাজপুত্তুর ছাড়া আর কাউকে তুমি যেন বিয়ে ক'র না মা, তাহলে মনে ভারি ব্যথা পাব। স্বর্গ থেকে আমি চেয়ে থাকবো তোমার পানে।' মায়ের সাধ পূর্ণ করতে মেয়ে হল যৌবনে যোগিনী। সংসার ছেড়ে পাহাড়ে এসে রাণী হবার জন্য তপস্যা সুরু করে দেন। তপস্যার ফলেই শেষ বয়সে তিনি রাণী হয়েছিলেন এই নারীরাজ্যের। তাঁর মৃত্যুর পরই ঘোড়া ছেড়ে দেওয়া হয় নতুন রাণীকে খুঁজে আনতে। সে যে ঠিক মেয়েকেই এনেছে, আপনাকে দেখেই তা বুঝতে পেরেছি আমরা।"

লীনা গম্ভীর হয়ে বল্‌ল এবার "বোঝা-পড়াটা ত দু'পক্ষেরই হওয়া উচিত। আমি কিন্তু অন্ধকারেই রয়েছি যে।"

মহিলাটি হেসে বল্‌লেন, "অন্ধকারের পাহাড় ভেদ করে মায়ের আস্তানায় যখন এসে পৌঁছেছেন, তখন ত আর অন্ধকারে থাকবার কথা নয়!"

লীনা বল্‌ল, "মা'র নাম করেই আপনারা আমার মনের অন্ধকারটি আরো গাঢ় করে দিয়েছেন যে!"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লীনার মুখের দিকে চেয়ে মহিলাটি একটু শ্লেষের সুরে বল্‌লেন, "কিসে বলুন ত?"

একটু আগে যে কথাগুলো আঘাতের মতনই লীনার মনে ব্যথা দিয়েছিল, সুযোগ বুঝে এবার সেই প্রসঙ্গটাই সে তুলল। সহজ কণ্ঠে আস্তে আস্তে মন্দিরের আটটি মেয়ের মর্ম্মে যেন বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বলতে লাগল—"আপনারা পাহাড়-ঘেরা এই ছোট অঞ্চলটিকেই আপনাদের পৃথিবী সাব্যস্ত করে নিয়েছেন ব'লে রাণীর চোখেও ঠুলি বেঁধে দেন; কাজেই আপনাদের চিন্তার সঙ্গে চিত্ত মিশিয়ে রাণীকে স্থির করে নিতে হবে—এই রাজ্যের বাইরের সমস্ত দরজাগুলো তার সাম্‌নে বন্ধ হয়ে গেছে, আর কোন দিন খুলবে না। এরই ভিতরে সমস্ত জীবনটাই তার নিঃশেষ হবে—বাইরের কোন সন্ধানই সে পাবে না।—কেমন, রাণীকে আপনারা এই কথাগুলোই ত আগে মন্ত্রের মতন পড়াবেন?"

মহিলাটি বল্‌লেন, "এই ব্যবস্থাই যে এখানে বরাবর চলে আসছে। রাণী রাজ্যের বাইরে কোন দিন যাবেন না—কোন পুরুষের মুখদর্শন তাঁর পক্ষে নিষিদ্ধ। রাজ্যের ভিতরেও বাইরের কারুর প্রবেশ করবার উপায় নেই।"

মুখখানা এবার শক্ত করে লীনা জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু রাজ্যের বাইরে যে সব অনাচার হচ্ছে, রাণী তাদের সম্বন্ধে কি করে নিশ্চিন্ত থাকবেন? এ রাজ্যের পাশেই রয়েছে দুরন্ত লালুংদের রাজ্য। তাদের মত নৃশংস আর নিষ্ঠুর জাত এ তল্লাটে দু'টি নেই। তাদের খবর আপনারা রাখেন? কি করে রাণী তাদের ঠেকাবেন?"

মহিলাটি বল্‌লেন, "মায়ের কৃপায় আমাদের কোন ভয় নেই। লালুংরা খুব নৃশংস আর অত্যাচারী সত্য, কিন্তু তারা আমাদের রাজ্যের পানে কোন দিন ফিরেও চায়নি। তারা জানে, এ দিকে এগুলেই মায়ের কোপে পড়ে পাষাণ হ'য়ে যাবে। এই ভয়ে তারা মায়ের এই আসল মন্দিরেও কস্মিন্ কালে আসেনি। আমাদের রাজ্যের বাইরে পাহাড়ের ও-পিঠে তাদের দেবীস্থান পর্য্যন্ত আলাদা।"

প্রতিবাদের ভঙ্গীতে লীনা বল্‌ল, "চিরদিন কিন্তু সমান যায় না; মানুষের মতি-গতিও এক রকম থাকে না। নকল দেবীস্থান ছেড়ে লালুংরা যে দিন আসল দেবীস্থানের দিকে ঝুঁকবে, জীয়ন্ত দেবীরা তখন কি করবেন? ধরুন, লালুংদের ভেতর থেকে কোন দুঃসাহসী যদি দেবীরাজ্যে ঢুকে দেখে যে, দেবীর কোপে সে পাথর বনে যায়নি—যে কথা তারা বরাবর শুনে আসছে, সেটা ধাপ্পাবাজী—তখন নিশ্চয়ই তারা বিধি-নিষেধ আর মানবে না; বন্যার জলের মতন এগিয়ে আসবে, একাকার করবে। কি করে তাদের বাধা দেবেন বলুন ত?"

মহিলাটি জোর-গলায় উত্তর দিলেন "দেবীই তার ব্যবস্থা করবেন। তিনি তখন নিশ্চয়ই পাষাণ হয়ে থাকবেন না, চোখ মেলে চাইবেন, তাঁর চোখের আগুনে পাষণ্ডরা পুড়ে ভস্ম হবে।"

কথাটা বলতে বলতে মহিলাটির মুখে উত্তেজনার আভা পড়লেও লীনার মুখে তার কোন চিহ্ন কিন্তু দেখা গেল না, বরং তার ঠোঁটের কোণে হাসির একটু ক্ষীণ রেখা ফুটে উঠল। সেই সঙ্গে তার মুখ দিয়ে যে কথাগুলি বেরুল, আট জন মহিলার মুখেই তা এক সঙ্গে বিস্ময়ের রেখা ফুটিয়ে দিল। লীনা বলল, "মিছে কথা! লালুংরা এখানে এসে যদি আপনাদের চুলের মুঠি ধরে জোর করে টেনে নিয়ে যায়, তাতেও দেবী চোখ মেলে চাইবেন না—তাঁর চোখ দিয়ে আগুন বেরুনো ত দূরের কথা। এ কথা আপনাদের ভাল লাগছে না—মুখের ভাব দেখেই তা বুঝতে পারছি। কিন্তু আমি সত্য কথা বলতে ভালবাসি। এ কথা এই ভেবে বলছি যে, লালুংরা যখন এই রাজ্যের পাশ দিয়ে দেশের শত শত অভাগিনী মেয়েকে ধরে নিয়ে যায়—তাদের বুক-ফাটা হাহাকার শুনেও দেবীর চোখ খোলে না। উদ্ধার করতে হাত উঠে না। তার কারণ, আপনাদের প্রাণে বাইরের মেয়েদের লাঞ্ছনা, যাতনার আঁচটুকুও সাড়া দেয় না, তাদের চোখের জলের সঙ্গে আপনাদের চোখের জল মেশে না; ঐ পাষাণময়ী দেবীকে যে মন্ত্রে জাগাতে হয়, সে মন্ত্র আপনারা জানেন না।"

মহিলাদের চোখে-চোখে এই সময় একটা ইঙ্গিত বিদ্যুতের মত খেলে গেল, সঙ্গে-সঙ্গে আবদার করা হ'ল, "বেশ ত, আপনি যখন এসেছেন, আমাদের ভুলগুলো শুধরে দিন; আর যে মন্ত্রে দেবীকে জাগাতে হয়, সেই মন্ত্র বলুন—আমরাও শিখে নিই।"

লীনা বল্‌লে, "মন্ত্র আমি দিতে পারি, কিন্তু এই সর্ত্তে যে—আপনারা আমাকে আটক করে রাখবেন না এখানে। পাহাড়ের পাঁচীল-ঘেরা এতটুকু একটা জায়গার মধ্যে চিরজীবন বন্দিনী হয়ে থাকবার জন্যে আমি এখানে আসিনি। আমার কর্ম্ম-জীবনের পরিধি দিগ্‌দিগন্ত-ব্যাপী—নারীরাজ্যের কতকগুলি নারীর মঙ্গলের দিকে আমার লক্ষ্য শুধু নিবদ্ধ নয়, দেশের লক্ষ লক্ষ নারীর মূর্ত্তি আমার চোখের উপরে ভাসছে। দিকে দিকে যে নির্য্যাতন চলেছে, নিষ্ঠুর দস্যুরা পণ্যের মতন যাদের লুণ্ঠন করে আসছে, তাদের পাঁজর-ভাঙ্গা কান্না আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে! তারই প্রতিকার করতে আমি বেরিয়েছি। সঙ্কল্প আমার জেনেই অন্তর্য্যামিনী মহাদেবী তাঁর সিন্ধু-ঘোড়া

পাঠিয়ে আমাকে এখানে এনেছেন। আমি তাঁর করুণা পেয়েছি, দুর্লভ দৈবীশক্তি তিনি আমার অন্তরে ঢেলে দিয়ে আশীর্ব্বাদ করেছেন। এখানে আমার উদ্দেশ্য আমার সিদ্ধ হয়েছে; ধূলোপায়ে যেমন এখানে এসেছি, ধূলোপায়েই তেমনি বিদায় নেব আমি। এতে আমাকে আপনারা বাধা দেবেন না।"

লীনার শেষের কথাগুলি শুনতে শুনতে ত্রিশূলধারিণী আটটি মহিলার মুখগুলি একসঙ্গে কঠিন হয়ে উঠল; মুখপাত্রীটি দৃঢ় স্বরে জানালেন, "তা হয় না রাণি, দেবীর ইচ্ছায় আপনি এসেছেন—তাঁরই সেবা করতে। তিনি আপনাকে শক্তি দিয়ে আশীর্ব্বাদ করেছেন—এই রাজ্য পালন করতে, রক্ষা করতে। বিদায় নেবার নামও আপনি করবেন না; আমরা আপনাকে যেতে দেব না,—দিতে পারিনে।"

কথার সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁরা সকলে হাতের ত্রিশূলগুলি শক্ত করে বাগিয়ে ধরলেন। লীনা মনে মনে হেসে মুখখানা গম্ভীর করে বল্‌লে, "কিন্তু আমাকে যখন রাণী বলেই আপনারা মেনে নিয়েছেন, তখন রাণীর ইচ্ছায় বাধা দিতে চান কোন্ সাহসে?"

এ কথার উত্তরে কি বলবার জন্যে প্রধানা মহিলাটির ঠোঁট দু'খানি সবেমাত্র নড়ে উঠেছে, এমন সময় মন্দিরের দেওয়ালের দিক থেকে একখানা পাথর ঝাঁ করে সরে গেল, আর তার ভিতর দিয়ে একটি মেয়ে ঝড়ের মত বেগে বেরিয়ে এসে আর্ত্তকণ্ঠে বললে, "ভারি বিপদ! যা কখন ভুলেও ভাবিনি আমরা—চোখের উপর তাই দেখছি অবাক হয়ে। কালো কালো মুস্কো-চেহারার এক পাল পাহাড়ে ডাকাত ঘোড়ায় চড়ে আমাদের রাজ্যে সেঁধিয়েছে, দেবীর মন্দিরেই তারা আসছে। এখন কি করব আমরা, তাই বলুন।"

মেয়েটির মুখের কথাগুলি শুনতে-শুনতেই ত্রিশূল-ধারিণী আটটি মেয়ের মুখগুলি একসঙ্গে যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেল! সকলেই জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে প্রধানা মহিলাটির মুখের দিকে চাইলেন—যিনি এতক্ষণ একলাই লীনার সঙ্গে কথা বলছিলেন; তাঁরও মুখখানা বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল। এখন যেন জোর করে বুকে সাহস এনে মুখখানা শক্ত করে তিনি বলে উঠলেন, "তাহলে নিশ্চয় ওরা লালুং; মরবার পালক উঠেছে ওদের পিঁপড়ের মতন, মরবার জন্যই আসছে ওরা মায়ের মন্দিরে—মায়ের রাজ্যে!"

মহিলাদের মধ্য থেকে আর এক জন এই সময় জোর-গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু কোন্ ভরসায় ওরা এ রাজ্যে সেঁধিয়েছে? এত সাহস ওদের কোথা থেকে এলো?"—বলেই তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লীনার দিকে চাইলেন। সঙ্গে-সঙ্গে [illegible]

একসঙ্গে জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, "তাই ত, কেন এমন হ'ল?"

লীনা এতক্ষণ মুখখানি বুজিয়ে এঁদের কথাগুলি শুনছিল, তার মুখে-চোখে ভয় বা ভাবনার কোন চিহ্নই ছিল না। এই সময় সে মুখখানা উঁচু করে গলায় জোর দিয়ে বলে উঠল, "আমি জানি, তারা কে, আর কেনই বা এখানে আসছে?"

লীনার মুখের কথাগুলি চকিতে নয়টি মেয়েকেই বুঝি বিস্ময়ে অবাক্ করে দিল, কারুর মুখ দিয়ে কথা বেরুল না।—তাঁদের চোখের প্রশ্নভরা দৃষ্টি লীনার মুখেই নিবদ্ধ হ'ল। মুখখানি শক্ত করে লীনা এবার বলে উঠল "সত্যিই ওরা লালুং। আসবার সময় পথেই আমি ওদের দেখেছি। আমাকে ধরবার জন্যেই পিছু নিয়েছিল কিন্তু আমি ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে চলে আসি। আমার সন্ধানেই এখানে ওরা এসেছে। এখন আমার যুক্তি শুনুন। যেমন আমি ধূলোপায়ে দেবীর পীঠের সাম্‌নে এসেছি, তেমনি ধূলোপায়েই বেরিয়ে যাচ্ছি। বাইরে গেলেই ওদের লক্ষ্য পড়বে আমার উপরে; আমি তখন ওদের সকলকে ভুলিয়ে অন্য দিকে নিয়ে যাবো—এ রাজ্যের বাইরে।"

লীনার এই প্রস্তাব কিন্তু প্রধানা মহিলাটির মনঃপূত হ'ল না। তিনি বললেন, "রাজ্য রক্ষা করতে আপনি নিজেই ত তাহলে বিপদে পড়বেন। তা হয় না। ভুলে যাচ্ছেন কেন—আপনিই এখন এ রাজ্যের রাণী?"

লীনা বললে, "রাণী বলেই ত আমি রাজ্যটি বাঁচাতে চাইছি। আমার জন্যে আপনারা একটুও ভাববেন না। আমি দেবীর পীঠে এসেই তাঁর আশীর্ব্বাদ পেয়েছি। তাঁর ইচ্ছাই আমার মনে জেগে উঠেছে—আমি তাই জানাচ্ছি। লালুংরা আমার কোন অনিষ্টই করতে পারবে না। আপনারা নিশ্চিন্ত মনে আমাকে বিদায় দিন। রাতারাতি আমি ঐ পাষণ্ডগুলোকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাই।"

কথাগুলি শেষ করেই লীনা দেবীর পীঠের উদ্দেশে নত হয়ে প্রণাম করলে, তার পর মুখখানা উঁচু করে বল্‌লে, "পথ ছাড়ুন, আমি গুহার বাহিরে যাব—যেখানে ঘোড়া আছে।"

নয়টি মেয়েই বিহ্বল দৃষ্টিতে লীনার দীপ্ত চোখদু'টির পানে চেয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের মুখ দিয়ে আর একটি কথাও বেরুল না, কলের পুতুলের মতন মাথা নীচু করে গুহার দ্বারটির পথ ছেড়ে দু'-পাশে তাঁরা সরে দাঁড়ালেন। আর লীনা হাতখানি তুলে তাঁদের অভয় দিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।

গল্প-দাদু

বমার-প্লেন

এ যুগে যুদ্ধ চলিয়াছে আকাশ-পথে। আকাশ-পথকে যে-জাতি স্বচ্ছন্দ-নিরাপদ করিতে পারিয়াছে, সেই জাতিরই আজ জয়-জয়কার!

এজন্য সকল শক্তিধর জাতির দেশেই ফৌজকে আকাশ-পথে যুদ্ধ করিবার উপযোগী করিয়া তুলিবার প্রয়াস চলিয়াছে।

স্থল-পথে যুদ্ধের জন্য সেনাদের প্যারেড করাইয়া শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা আছে, সে-ব্যবস্থায় একসঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া পরস্পরের সহযোগিতায় যুদ্ধ-কৌশল শিখানো হয়; সেই সঙ্গে বাধ্যতার অভ্যাসও চরমে গিয়া ওঠে। এ প্যারেডে যাহাকে বলে Team-work অর্থাৎ সম্মিলিত সহযোগিতা—সে সম্বন্ধে শিক্ষা হয় চমৎকার।

দলে দলে চলে মৃত্যু বহিয়া

অসংখ্য বিমানপোতে চড়িয়া যে-সব সেনাকে শূন্যপথে তোলা হয়, তাহাদিগকেও শিক্ষা দিয়া এই সম্মিলিত সহযোগিতায় পটু করিয়া তুলিবার সুব্যবস্থা সম্পাদিত হইতেছে। বিচ্ছিন্ন ভাবে শত্রুকে আক্রমণ করার দিন এযুগে আর নাই! পৌরাণিক বা প্রাগৈতিহাসিক যুগের সে দ্বৈরথ-সমর এখন আজিকার দিনে সম্পূর্ণ অচল, বাতিল!

আকাশে বমার-প্লেন তুলিয়া শত্রু-নিপাতের যে-ব্যবস্থা আজ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সে-ব্যবস্থায় প্রথম বিধি—খাপছাড়া বিচ্ছিন্ন ভাবে বমার-প্লেন বাহির হইবে না! একসঙ্গে অনেকগুলি বমার-প্লেন শূন্যে ওঠে পরস্পরের সহযোগিতা-কল্পে; এবং পরস্পরকে রক্ষা করাও বমার-প্লেন-চারী ফৌজের প্রধান কর্ত্তব্য! বমার-ফৌজের উপর নির্দ্দেশ থাকে, অমুক জায়গায় গিয়া এতখানি ভূ-ভাগের উপর বোমা বর্ষণ করিতে হইবে। এ আক্রমণ-ব্যাপারে পশ্চাদপসরণ বা দীর্ঘসূত্রিতা চলিবে না। কারণ, পশ্চাদপসরণে বা দীর্ঘসূত্রিতায় বমার-ফৌজের পরাজয় কোনমতে নিবারণ করা যাইবে না।

এই বমার-প্লেনকে যদি বিপক্ষ-প্লেন তাড়া করে, তাহা হইলে সেই অনুসরণকারী বিপক্ষ-প্লেনকে ধ্বংস করিবার জন্য আর-এক দল বমার-ফৌজ আক্রমণোদ্যত প্রথম-বমার-দলের পিছনে-পিছনে সতর্ক-ভাবে আসিতে থাকে।

বমার-প্লেনে যে সব মেশিন-গান্ আছে, সে সব মেশিন-গান হইতে মিনিটে ৬০০ হইতে ১২০০ গুলী বর্ষণ হয়। কোন্ বেল্টে কত কার্টরিজ থাকিবে, তার সংখ্যা নির্দ্ধারিত আছে। শূন্য-পথে উড়িতে উড়িতে কিম্বা যুদ্ধ করিতে করিতে পাইলটের পক্ষে বন্দুকে কার্টরিজ ভরা সম্ভব নয়—এজন্য বোমা-বর্ষণের সময় কার্টরিজের সংখ্যা সম্বন্ধে খুব হুঁশিয়ার থাকা প্রয়োজন!

এ-সব বমার-প্লেন চলে নক্ষত্রের মতো ক্ষিপ্রগতিতে, সেজন্য যে-কোনো দিক হইতে আক্রমণ করিতে পারে। বোমা-বর্ষণের পূর্ব্বে লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিয়া ঠিক সেই লক্ষ্যের উপরে বমারকে আনা চাই। এ ব্যাপারে একটু ভুল হইলেই লক্ষ্য-ভ্রষ্ট সুনিশ্চিত। যেখান-সেখান হইতে বোমা ফেলিলে সে-বর্ষণ নিষ্ফল হইবে। এজন্য আক্রমণকারী বমার-প্লেনের রক্ষা-কল্পে যে-সব বমার তার পিছনে আসে, বোমা-বর্ষণকালে পিছনকার সেই প্লেন বমারের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে—বমারকে সে সাহায্য করিবে অথবা বমার যদি আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে সে-আক্রমণ হইতে তাকে রক্ষা করিবে।

বোমা-বর্ষণের পূর্ব্বে বমার-প্লেনকে বিলক্ষণ হুঁশিয়ার থাকিতে হয়। একখানি বমার সহসা দল-ভ্রষ্ট হইয়া যদি বোমা ফেলিতে আসে, তাহা হইলে তার সে বোমা-বর্ষণ আংশিক ভাবে সফল হইলেও বিপক্ষ-প্লেনের আক্রমণ
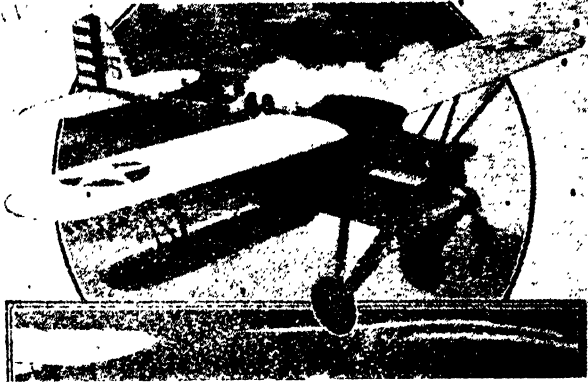
মৃত্যুর দূত

বাঁচাইয়া পলায়ন করিয়া তার পক্ষে আত্মরক্ষার আশা প্রায় নিরাশায় পরিণত হয়।

আবার বোমা-বর্ষণের সময় বমার-প্লেনের সংখ্যা যদি বেশী হয়, তাহা হইলেও কাজে ব্যাঘাত ঘটে। ব্যাঘাতের কারণ, লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিয়া আক্রমণের কেন্দ্রকে যথা-সম্ভব সঙ্কীর্ণ করা উচিত, নচেৎ বিপক্ষ-আক্রমণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

আক্রমণের পূর্ব্বে বমার-প্লেনগুলিকে লাইন করিয়া থাকিতে হয়—তবে কাছাকাছি কেহ যেন না থাকে! কাছাকাছি থাকিলে পরস্পরে কোলি-শন বা সংঘর্ষ বাধিবে!

যে-সব জায়গায় বিপক্ষ আত্ম-রক্ষার জন্য anti-air-craft কামান সাজাইয়া সতর্ক আছে, সে সব জায়গায় আট ন'খানিমাত্র বমার চক্র-কারে আসিয়া আক্রমণের উদ্যোগ করে। এ আট-ন'খানি বমার পরস্পরকে রাখে মাথার উপরে—এ্যান্টি-এয়ারক্রাফ্‌ট কামানের গোলা লাগিলে সব-নীচেকার বমারখানি আহত হইলেও উপরকার বমারগুলির এতটুকু অনিষ্ট ঘটিবে না; এবং আক্রমণ বা প্রতিরোধ ঘটিলে এ বমারগুলি সহজে বিচ্ছিন্ন ভাবে পলায়ন করিতে পারে।

অনেক সময় টু-শীটার রণ-বিমান-পোত এ-সব বমার-প্লেনকে আক্রমণ করে। বমারের পিছনে এ-সব টু-শীটার সমান্তরাল-রেখায় আসিয়া (on parallel lines) সামনে ও পিছন দিক্ হইতে কামান ছোড়ে। সেজন্য এখন বমার-প্লেনে সময়-নির্দ্দেশক (time-fixed) বোমা রাখা হয়। সে বোমা বর্ষণ করিয়া বমার-প্লেন সহজে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে।

আমাদের ধারণা, বমার-প্লেন হইতে যে-লোক বোমা ফেলে, সে তার নিজের খুশী ও খেয়ালমতো ফেলে! আসলে তা নয়। দলের প্রথমে যে বমার-প্লেন থাকে, সেই প্লেনে থাকে দলের অধ্যক্ষ। অধ্যক্ষ যেমনি বোমা নিক্ষেপ করে, অমনি পিছনের প্লেন হইতে সঙ্গে সঙ্গে বোমা বর্ষিত হয়। বহু-উর্দ্ধ হইতে বোমা যখন বর্ষিত হয়, তখন সব ক'টি বোমাই যে লক্ষ্যে গিয়া পড়িবে, তা নয়! তবে এতগুলি বোমা বর্ষিত হইলে সে-সব বোমার মধ্য হইতে দুই-চারিটা যে লক্ষ্যভেদ করিবেই, সে সম্বন্ধে এ-যাবৎ ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই।

লক্ষ্য বিদ্ধ করিবার জন্য যখন বোমা বর্ষিত হয়, তখন সব বমারগুলি উচ্চ-নীচ অবস্থান ছাড়িয়া এক-লাইনে সমবেত হয় এবং এক-লাইনে সমবেত হইয়া তবে বোমা নিক্ষেপ করে।

চন্দ্রালোকিত রাত্রি ছাড়া অন্ধকার রাত্রে বমার-প্লেন-গুলি সদলে কখনো আক্রমণে বাহির হয় না। অন্ধকারে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেই হইবে! তার উপর নিজেদের গায়ে-গায়ে সংঘর্ষ ঘটিয়া আত্মঘাতী হইবার আশঙ্কা তাহাতে খুব বেশী থাকে। অন্ধকার রাত্রে যে-সব বোমা বর্ষিত হয়, সে অভিযানে এক-একটি স্বতন্ত্র বমার সম্পূর্ণ
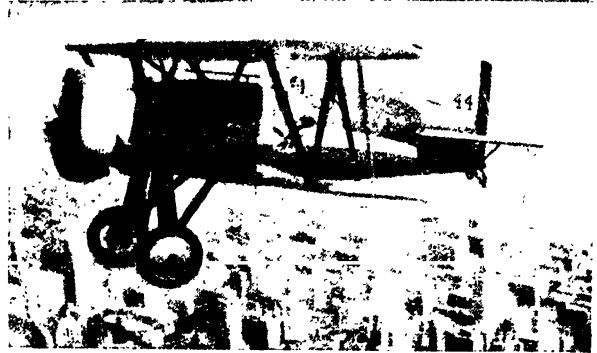
রক্ষক বমার

নিঃশব্দ ভাবে বাহির হয়। কম্পাশ দেখিয়া ম্যাপ দেখিয়া এ বমার লক্ষ্যপথে বাহির হয়। এই সব নিঃশব্দ নিশাচর বমারকে প্রতিরোধ বা আক্রমণ করা কঠিন। কারণ, সার্চ্চ-লাইট না ফেলিলে কি করিয়া বমারের অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হইবে? তবে অন্ধকার রাত্রে উপর্য্যুপরি বহু বমার যদি হানা দিতে বাহির হয়, তাহা হইলে আক্রমণে তাদের কয়েকটিকে বিধ্বস্ত করা অসম্ভব নয়। বহু বমারকে প্রতিরোধ বা আক্রমণ করিবার জন্য যে-সব

প্লেন তার পিছনে তাড়া করে, তার মস্ত অসুবিধা এই যে, সামনের দিক্ হইতে ছাড়া তাড়া-করা-বমারের পক্ষে কামান ছোড়ার অন্য উপায় নাই। কাজেই এমন কৌশল করিতে হয়, যাহাতে আক্রমণকারী বমার-প্লেনের পক্ষে পলায়নের আশা না নির্ম্মূলিত হয়।

বমার-প্লেন যখন সদলে আক্রমণে বাহির হয়, প্রতিরোধ-আক্রমণ হইবামাত্র সে-দল চক্রাকারে বিপক্ষ-প্লেনকে আক্রমণ করে। তখন
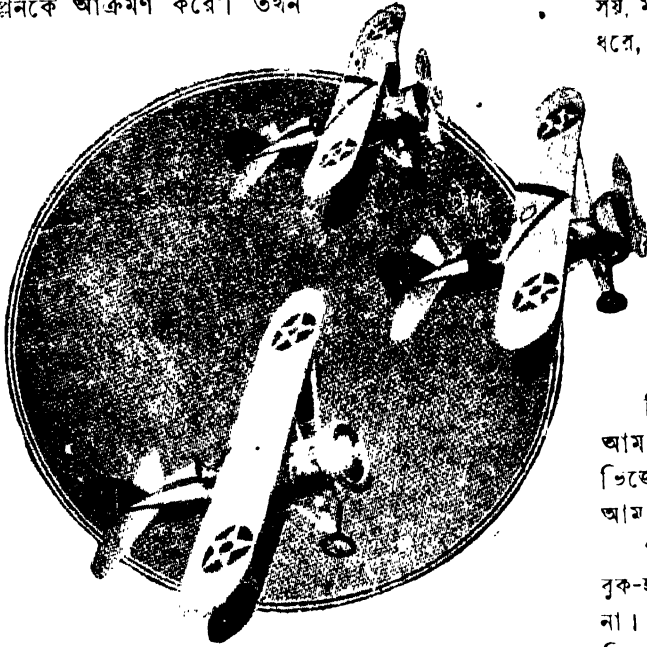
V-এর ভঙ্গীতে তিন বমার চলিয়াছে

প্রতিরোধকারী প্লেনের অবস্থা হয় চক্রব্যূহে অভিমন্যুর মতো! এমনি চক্র করিলে আক্রমণকারী বমারের পক্ষে আত্মরক্ষাও সহজ-সাধ্য হয়।

আক্রমণ এবং প্রতিরোধ ব্যাপারে আক্রমণকারীর সুবিধা এই যে, তারা আট-ঘাট বাঁধিয়া দেখিয়া-শুনিয়া আক্রমণ করিতে আসে। এ জন্য আত্মরক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ তাদের পক্ষে যত সহজ, প্রতিরোধকারী প্লেনের পক্ষে প্রতিরোধ-প্রয়াস সফল করার মাত্রা ঠিক ততখানি কঠিন। অনেক সময় ধূম-বর্ষণে আকাশ ঘোলাইয়া আক্রমণ ব্যর্থ করা হয়। এ-কৌশল প্রায় অব্যর্থ হয়।

পৃষ্ঠদেশ

আমাদের পিঠ! সারা দেহের মধ্যে এমন জোরালো অঙ্গ আর নেই! আমরা কথায় বলি back-bone! যখন বলি অমুকের back-bone নেই বা back-bone ভেঙ্গে গেছে, তখন সে কথার অর্থ বুঝি এই যে, অমুক লোকটা একেবারে নির্জীব, বা অমুক লোকের মধ্যে যা-কিছু পদার্থ ছিল, তা নিঃশেষ হয়েছে।

পিঠে শিরা এবং রক্ত-কোষের (blood-vessels) সংখ্যা খুব কম; এবং পিঠে আমরা যতখানি ভার বহিতে ও সহিতে পারি, এমন আর কোথাও নয়! ভয়ে আমাদের বুক ধুক্‌পুক্ করে, চোখ বুজে আসে, পিঠ কিন্তু থাকে অবিচল। খট্‌খটে রোদ—পিঠে যেমন সয়, মাথায় তেমন নয়! বেশীক্ষণ রোদে থাকলে মাথা ধরে, পিঠ কিন্তু ঠিক থাকে! পিঠের মতো এতখানি প্লেন বা সমতল স্থান আমাদের সকল দেহের মধ্যে আর কোথাও নেই।

শীত বলো, গরম বলো, পিঠে তার আঁচ লাগে কম! শীতে পাঁজরা ঝন্‌ঝনিয়ে ওঠে, হাত-পা কালিয়ে যায়,—পিঠ কিন্তু তখনো সতেজে অবিচল থাকে।

পিঠে শিরা-উপশিরা নেই। কাজেই ওখানে রক্ত-চলাচলের হাঙ্গামা নেই। পিঠ যেন নদীহীন মরু-প্রান্তর!

পিঠে গ্রন্থির সংখ্যা খুব কম! শারীরিক শ্রমে আমাদের ঘাম হয়। সে ঘামে প্রথমে আমাদের হাত-পা ভিজে ওঠে—তার পর সকল অঙ্গ হয় ক্লেদসিক্ত—তখনো আমাদের কষ্ট তত হয় না, যত কষ্ট হয় পিঠ ঘামলে!

গায়ে জামা আছে, খুব ঘামছি! জামা গায়ে থাকলে বুক-হাত-পা যদি ঘামে, সে-ঘামে তত অস্বস্তি বোধ হয় না। কিন্তু পিঠ ঘেমে জামার পিঠ যদি সে-ঘামে ভিজে শপ্‌শপ্ করে, তাহলে তখন সে-জামা গায়ে রাখা অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে। তার কারণ, পিঠের ঘাম পিঠেই থাকে—ধারা-বর্ষণে নামে না। পিঠের ঘাম পিঠে নেপ্‌টে থাকতে চায়—সেজন্য আমাদের অমন অস্বস্তি ধরে!

পিঠের জোর মানুষের মস্ত জোর। আমাদের দেহের প্রধান রক্ষী হলো এই পিঠ! সেই জন্যই বুঝি বিপদে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় বলে কীর্ত্তিত হয়েছে!

তামাসা নয়! আমাদের পিঠের পেশী খুবই সুদৃঢ়—তাতে অসাধারণ শক্তি! সেজন্য খুব-ভারী বোঝা বইবার সময় আমরা পিঠের আশ্রয় নিই। পিঠ যতখানি ভার বইতে পারে, হাত-পা বা মাথার ভার বইবার সামর্থ্য ততখানি নেই।

পিঠের কথা কেন বলছি, খুলে বলি। পিঠ দুম্‌ড়ে, পিঠ ঝুঁকিয়ে কুঁচকে বসা-দাঁড়ানোর বদভ্যাস সর্ব্বদা সযত্নে পরিহার করে চলো। ছেলেবেলা থেকে পিঠ যদি ঝুঁকিয়ে রাখো, তাহলে পিঠের বাঁধন জোরালো হবে না; পিঠ হবে দুর্ব্বল। মানুষ হয়ে জীবনে অনেক পরিশ্রম করতে হবে, বহু যুদ্ধ লড়তে হবে—সেজন্য back-bone বেশ জোরালো রাখা চাই!
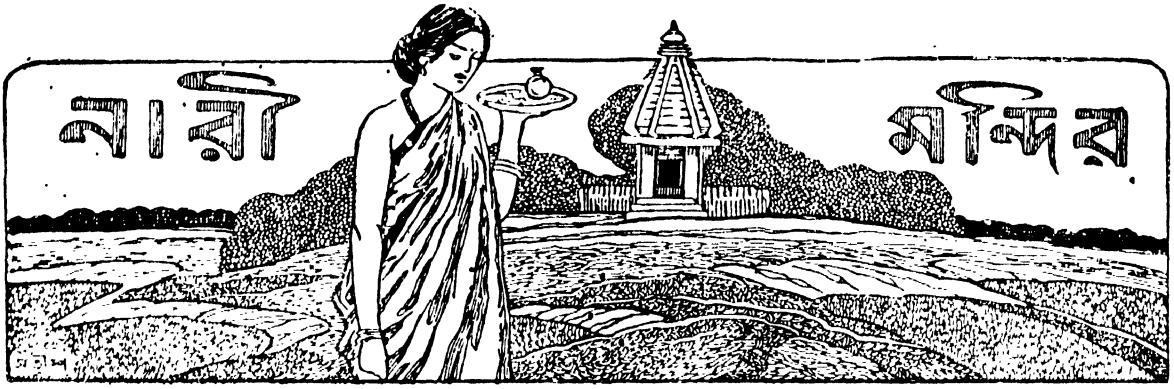
সাজি ও টুকরি বোনা

বেতের সাজি এবং টুকরি বোনার কাজে এদেশের অন্তঃ-পুরিকারা এক দিন খুবই পারদর্শিতা দেখিয়ে গেছেন! এখন ফ্যাশন-শিল্পের অত্যধিক আদর হওয়ার ফলে সাজি-টুকরির রেওয়াজ বাঙলার অন্তঃপুর থেকে এক-রকম অন্তর্হিত হয়েছে বললে কথাটা অত্যুক্তি হবে না!

অথচ এ কাজে কোনো-রকম ফ্যাশাদ্ নেই! এর জন্য বিশেষ যন্ত্রপাতি কিনতে কিম্বা আয়োজনে সমারোহ করতে হবে না! বেত কিম্বা চ্যাঁচারি নিয়ে কাজে নামা; সেই সঙ্গে চাই বেত বা চ্যাঁচারি ছোলবার বা চেরবার জন্য ধারালো একখানি শক্ত ছুরি। ভালো বেত দিয়ে যিনি সাজি-টুকরি তৈরী করতে চান, তাঁর পক্ষে বাজার থেকে বেত কেনা মোটেই শক্ত নয়।
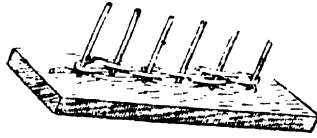
(১)

(২)

বেত বা চ্যাঁচারি নিয়ে কাজ করবার আগে সে-বেত ও চ্যাঁচারি গরম জলে খানিকক্ষণ ভিজিয়ে নেবেন। ভিজিয়ে নিলে বেত ও চ্যাঁচারি নরম হবে এবং নরম হলে কাটতে বা চাঁচতে-ছুলতে এতটুকু বেগ পেতে হবে না! আট-দশ মিনিট ভিজিয়ে রাখবেন। তার বেশী ভিজিয়ে রাখলে বেতের রঙ খারাপ হয়ে যাবে।

বেত দিয়ে টুকরি, সাজি বা চেয়ার—যা খুশী তৈরী করতে পারেন। তবে প্রথম মুখে বেতের পাক কি করে দেবেন, তা ঐ ১, ২ আর ৩ নম্বর ছবি দেখলে বুঝতে পারবেন। ১নং ছবিতে এক-পাকের, ২নং ছবিতে দু'পাকের এবং ৩নং ছবিতে তিন-পাকের বেতের বন্ধনী আছে। টুকরি বা সাজি বুনতে হলে ১নং ছবির ভঙ্গীতে বেতের এক-পাক বাঁধুনি দেবেন। একটা কাঠের ফ্রেম চাই—ছবি দেখে ওমনি করে প্রথম গ্রন্থি বেঁধে নেবেন। দু'-পাকের বন্ধনীর জন্য কাঠে সাতটি গোঁজ এঁটে নিতে হবে; তিন-পাকের জন্য ৩নং ছবির মতো অনেকগুলি গোঁজ আঁটা দরকার।
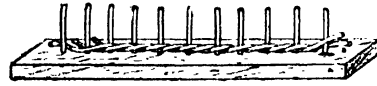
(৩)

এবারে ৪নং আর ৫নং ছবি দেখুন। ৪নং ছবিতে দেখানো হয়েছে—বেতকে চিরে তার মধ্য দিয়ে কি করে আর এক-হালি বেত চালাতে হবে। ৫নং ছবিতে দেখানো হয়েছে, বুননের জের টেনে বেতকে কি করে গোল বা চক্রাকারে টেনে নিয়ে যাবেন। এ দু'টি ছবি ভালো করে দেখে রাখুন—এই ধরণে বেতের বা চ্যাঁচারির বুনন চলবে

(৪)

(৫)
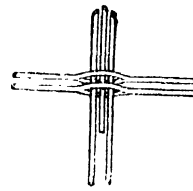
এবার ৬নং ছবি দেখুন। গ্রন্থি রচনা করবার আগে বেতের হালি-গুলি কি করে সাজিয়ে নেবেন, ৬নং ছবি দেখলে তার ধরণ বুঝতে পারবেন। পাঁচ-হালি বেত নেওয়া হয়েছে,—ছবিতে দেখছেন তো! দু'হালি বেত প্রথমে আড়াআড়ি-ভাবে রাখুন; তার পর এ দু'হালির উপর লম্বালম্বি ভাবে আর দু'হালি বেত সাজান্—এ চার হালি মাপে সমান হবে। এবার আর এক-হালি বেত নিন—এ হালির উপর-দিকটা—লম্বালম্বি যে দু'হালি বেত সাজিয়েছেন, তাদের সঙ্গে মাথায়-মাথায় সমান থাকবে; তলার দিকটা হবে খাটো; এবং ৬নং ছবির ভঙ্গীতে এই পঞ্চম হালিটি লম্বালম্বি-ভাবে-রাখা দু'হালি বেতের মাঝখানে রাখুন। এবার আর এক-হালি বেত নিন—

হবে। ষষ্ঠ হালিটি ৭নং ছবির ভঙ্গীতে উপরের আড়-ভাবে-রাখা বেতের উপর দিয়ে বাঁয়ে টেনে নিয়ে যাবেন —৫নং ছবি দেখে বুননের হালিকে চক্রাকারে পাক দিয়ে পাক দিয়ে বরাবর টানতে হবে। বেশ কষে টেনে নিয়ে যাবেন। এ-পাকে গ্রন্থি রচিত হবে—এবং সে-গ্রন্থি মজবুত হবে। কষে গ্রন্থি না দিলে আলগা থেকে যাবে—বাঁধন মজবুত হবে না। এমনি করে বেতের এই ষষ্ঠ হালিকে তিন-পাক ঘুরিয়ে বোনবার পর ৮নং ছবি দেখুন।

তিন-পাক ঘুরোবার পর ৮নং ছবি দেখে এই হালিকে উল্টো-পাকে বুনতে হবে। এই উল্টো-পাকে আরো তিন পাক বোনা শেষ করুন। তার পর সোজা পাকে আবার তিন পাক-চার পাক; এবং সোজা পাকের পর এ দফায় যত পাক দেছেন, উল্টো করে আবার ঠিক তত পাক দিতে হবে। টুকরি বা সাজি যে-মাপের করতে চান, সে মাপ বুঝে বেতের হালি লম্বা বা খাটো করে নেবেন, এ কথা বলা অবশ্য বাহুল্য মাত্র। এমনি ভাবে পর্য্যায়ক্রমে সোজা এবং উল্টো পাক তুলে বরাবর বুনে যান।

(৬)

(৭)

বেতের হালি ফুরোবে, নিশ্চয়। যেখানে এক হালি শেষ হবে, সেখান থেকে আবার নতুন হালি নিয়ে কাজ শুরু করবেন। ঠাশ-বুননের জন্য হালির জোড়ে এতটুকু ক্ষতি হবে না। হালির শেষে যে-খোঁচ (প্রান্তভাগ) বেরিয়ে থাকবে, সমস্তটা বোনা হয়ে গেলে সে-সব খোঁচ কেটে নিতে পারেন—কিম্বা গুঁজে নেওয়াও শক্ত হবে না।

সমস্তটা বোনা হয়ে গেলে—বেত নরম বলে সাজি বা টুকরির দেহ-সমেত সুগোল 'শেপ্' বা আকার গড়ে তুলতে পারবেন।

যে-প্রণালীর কথা বললুম, এটি হলো সবচেয়ে সহজ এবং সরল। এবারে আর একটি সহজ প্রণালীর কথা বলি।

৬নং এবং ৭নং ছবির ভঙ্গীতে ক' গাছি মাত্র হালি নিয়ে কাজ করেছেন! এবার হালির সংখ্যা বাড়িয়ে দিন—দিয়ে আগে যে বোনার কথা বলা হয়েছে, অমনি ভাবেই বুনে যান; এবারে বোনবার সময় শুধু দীর্ঘ হালিগুলির প্রান্তভাগ খাড়া করে পর্য্যায়ক্রমে এই খাড়া-করা বেতের গা ঘুরিয়ে বুনন করে যাবেন—৯নং ছবিতে যেমন দেখছেন, এমনি ভাবে!
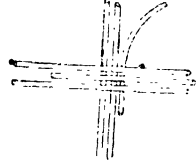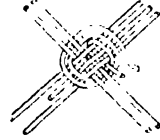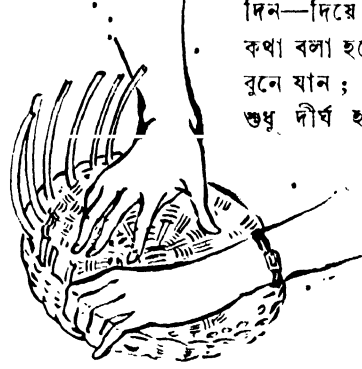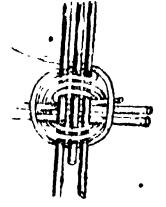
(৮)　　(৯)

এ দুই প্রণালীতে বোনার কাজ আরম্ভ করুন। প্রথমটা মনে হবে, বুনন বুঝি খুব জটিল, কিন্তু হাতে কাজ করলে সে ধারণা যে ভুল, তা বুঝতে পারবেন। তবে টুকরি বোনার কাজে ধৈর্য্য চাই—রেশম-পশমের কাজের চেয়ে এতে একটু বেশী ধৈর্য্য এবং মনোযোগিতা দরকার।
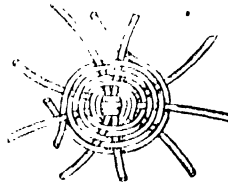
(১০)

এ কাজ আগে অভ্যাস হোক—তার পরে নানা ডিজাইনের সাজি-টুকরি বোনার কথা বলবো। সে কাজ একটু জটিল—হাত না পাক্‌লে সে-কাজে ধৈর্য্যচ্যুতি হতে পারে।

অব্যয়

পুষ্পে তৃণে লতায় পাতায় তুচ্ছ মাটি সাজে
বুকে তাহার নানান সুরে জীবন-বীণা বাজে।
ঋতুর পরে ঋতু নবীন রূপ করে তায় দান,
বৈশাখে রয় মরার মত আষাঢ়ে পায় প্রাণ।

পাথর আছে উঁচু হ'য়ে সমান চিরদিন,
নাইক বিকার সম্বল তার গরিমা প্রাণহীন।
হয় না শ্যামল হয় না সরস শ্রাবণ-বরিষণে,
শিহরে না অঙ্গ তাহার লতার আলিঙ্গনে।

কেউ বিশেষ্য, কেউ বিশেষণ, কেউ বা ক্রিয়াময়,
চারি পাশে, পাথর আছেন অক্ষয় অব্যয়।

শ্রীকালিদাস রায়।

বাঙ্গালায় খাদ্য-সঙ্কট

বাঙ্গালা দেশের সম্মুখে সম্প্রতি এক বিরাট্ সমস্যা উপস্থিত! গত দশ বৎসরে বাঙ্গালার লোকসংখ্যা প্রায় এক কোটি বৃদ্ধি পাইয়াছে। কুচবিহার এবং ত্রিপুরা রাজ্য লইয়া বাঙ্গালার লোকসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৬ কোটি ১৪ লক্ষ ৬০ হাজার। তন্মধ্যে বৃটিশ অধিকারের মধ্যস্থিত দেশের লোকসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩ কোটি ৩ লক্ষ। দশ বৎসরে প্রায় ১ কোটির অধিক লোক বাড়িয়া গিয়াছে। গণনা সত্য হইলে ইহাতে চিন্তার কারণ আছে। এত লোকের অন্নসংস্থান কি এই অবস্থায় বাঙ্গালার লোক করিতে পারে? বাঙ্গালার প্রায় সকল লোকের আহার্য্যের প্রধান দ্রব্যই চাউল। জলখাবার মুড়ি মুড়কি, চিঁড়া, তণ্ডুল ও গুড় দিয়া প্রস্তুত নানাপ্রকার মিষ্টান্ন! এই তণ্ডুল বাঙ্গালায় যে পরিমাণ উৎপন্ন হইতেছে, তাহাতে সমস্ত বাঙ্গালীর ক্ষুধা নিবারণ হইতেই পারে না। বাঙ্গালায় গোধূমভোজী লোক কিছু আছে সত্য, কিন্তু পল্লী অঞ্চলে তাহাদের সংখ্যা এত অল্প যে, তাহা গণনার মধ্যেই আসে না। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে গোধূম-ভোজী লোক বাঙ্গালায় আসিয়া কিছু দিন থাকিলেই তাহারা রুটির সহিত কিছু ভাত খাইতে আরম্ভ করে। কাজেই ধান্যই এই প্রদেশের অন্ন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। এই ধান্য বাঙ্গালায় যে পরিমাণে উৎপন্ন হয়, তাহার দ্বারা বঙ্গবাসীর ক্ষুধা নিবৃত্তি হইতে পারে কি না তাহাই বিচার্য্য। আজকাল বাঙ্গালা দেশে গড়ে ২ কোটি ১৯ লক্ষ ৮৮ একর জমিতে ধান্যের চাষ হইয়া থাকে। গত বৎসরের হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই; কিন্তু ইদানীং ধেনো জমির পরিমাণ বাড়িতেছে না—বরং কমিতেছে। এই জন্যই আমরা ঐ পরিমাণ জমিতে বাঙ্গালায় ধান জন্মে ইহা ধরিয়া লইলাম। বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, নিখিল ভারতের চাউল উৎপন্ন গড়ে প্রতি একরে ৮ শত পাউণ্ড বা পৌনে দশ মণ হইয়া থাকে। এক মণ ৮২ পাউণ্ড। বাঙ্গালায় স্থানে স্থানে কিছু অধিক চাউল হয়। সেই জন্য আমরা গড়ে প্রতি একরে দশ মণ চাউল জন্মে ধরিয়া লইলাম। আমাদের হিসাবে প্রতি একরে ১৪ হইতে ১৫ মণ ধান্য জন্মে। ১৫ মণ ধান্যে খুদ (ভাঙ্গা চাউল) বাদে দশ মণ চাউল হইতেও পারে। সুতরাং বঙ্গদেশে সর্ব্বসাকল্যে ২১ কোটি ৯৮ লক্ষ ৮০ হাজার মণ চাউল জন্মিতে পারে। গত পূর্ব্ববৎসর ঠিক ঐ পরিমাণ জমিতে ২০ কোটি ৬২ লক্ষ মণ ধান জন্মিয়াছিল, ইহা সরকারী হিসাব। এখন প্রশ্ন এই যে, এই চাউলে বাঙ্গালার সমস্ত অধিবাসীর অন্নসংস্থান হয় কি না? খুব অল্প করিয়া ধরিলেও বাঙ্গালায় সাড়ে পাঁচ কোটি লোক ভাত খায়—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সাড়ে পাঁচ কোটি লোকের সকলে সমান খায় না; কারণ ইহার মধ্যে শিশু আছে, বৃদ্ধ আছে, রোগী আছে, কর্ম্মী আছে, অলস আছে, স্ত্রী আছে, এবং পুরুষ আছে। প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে, মাটিকাটা মজুর, বেহারা, মুটে, দাঁড়টানা মাঝি, কাঠকাটা তবলদার প্রতিদিন দুই বার বা তিন বারে অন্ততঃ দেড় সের চাউলের ভাত খাইয়া থাকে। নিম্নশ্রেণীর নারীরাও প্রায় ঐরূপ ভাত খাইয়া থাকে। একাহারী বিধবারা এক বারেই আড়াই পোয়া চাউলের ভাত খায়। নিম্নশ্রেণীর বিধবারা দুই বেলাই খাইয়া থাকে। ছেলে-মেয়েরা ১২—১৩ বৎসর বয়স্ক হইলে তাহারাও প্রায় পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগের ন্যায় খাইতে থাকে। তাহারা দুই বারের অধিক ভোজন করে, এবং চিঁড়া মুড়কি মুড়ি প্রভৃতি একাধিক বার ভোজন করে। যাহারা খাইতে পায় না, তাহারা অন্নাভাবে জীর্ণ হইতে থাকে। অথচ ভদ্রলোকের আহার কম। সহরের কেরাণী, লেখক, গদীনশিন দোকানদারেরা গড়ে এক এক বেলায় বড় জোর এক পোয়া চাউল খাইয়া থাকেন। ইঁহারা অনেকেই চা, বিস্কুট প্রভৃতি জলখাবার খান। মফস্বলের ভদ্রলোকদিগের খোরাক কিছু অধিক। অবশ্য, 'মুনকে রঘু'র মত খোরাক মফস্বলে এখনও ভদ্রলোকদিগের মধ্যে একেবারে বিরল নহে। এখনও অনেক ভদ্রলোক দিনে দেড় সের চাউলের ভাত খাইতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে এই সাড়ে ৫ কোটি লোকের জন্য কত চাউল আবশ্যক তাহার হিসাব করা কঠিন। অল্প দিন পূর্ব্বে মফস্বলে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবার ফর্দ্দে নিয়ম ছিল এক শত লোকের জন্য এক মণ চাউল বরাদ্দ করিতে হইবে। এখন ঠিক অত চাউল লাগে না সত্য,—কিন্তু সাধারণ লোক খাওয়াইতে হইলে জন শতকরা ১ মণ চাউল লাগেই,—কাঙ্গালী ভোজনে আরও অধিক চাউল দিতে হয়। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে বালক, যুবক ও বৃদ্ধ সকল প্রকার লোকই থাকে। কাঙ্গালীদের মধ্যেও তাহাই।

এখন জিজ্ঞাস্য, এই সাড়ে পাঁচ কোটি লোকের জন্য ঠিক কি পরিমাণ চাউল প্রয়োজন? এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করিতে হইলে তাহার অনেকটা আনুমানিক হইবেই হইবে। লোকসংখ্যার মধ্যে সদ্যজাত শিশু হইতে ১৪ বৎসরের বালকের সংখ্যা অল্প নহে। তাহারা সমগ্র জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ হইবে। আর ১৫ হইতে ৬০।৭০ বর্ষীয় লোকের সংখ্যা সমস্ত জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ হইবে। ৭০ বৎসরের অধিক বয়স্ক বৃদ্ধের সংখ্যা অতি অল্প। সুতরাং আমাদের মনে হয়, বাঙ্গালার জন-প্রতি প্রতিদিন গড়ে তিন পোয়া চাউল ধরিলে কতকটা ঠিক হয়। এ সম্বন্ধে সকলের মধ্যে মতের ঐক্য নাই। কেহ কেহ বলেন, জন-প্রতি গড়ে দশ ছটাক বা আড়াই পোয়া চাউল হইলেই চলে। সুতরাং জন-প্রতি গড়ে প্রায় ৫ মণ চাউলের প্রয়োজন হইয়া থাকে। মিষ্টার ও বাইন (O, Bynne) কিছু দিন পূর্ব্বে হিসাব করিয়া বলিয়াছিলেন, এক জন পূর্ণবয়স্ক লোককে স্বাস্থ্যবান্ রাখিতে হইলে [illegible]হার পক্ষে বৎসরে ৫ হইতে ৬ মণ চাউলের প্রয়োজন হয় [illegible]ম হইলে চলে না। কেহ হয় ত বলিতে পারেন যে, উহা [illegible] ব্যক্তির পক্ষে গড় হিসাব হইলেও শিশু প্রভৃতিকে বাদ দিয়া হিসাব করিতে হয়। তাহা ঠিক নহে। দুর্ভিক্ষ-কোডে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক শ্রমিকই আধ সেরের অধিক চাউল খায়।

মাটিকাটা মজুরেরা গড়ে ১৮ ছটাক, বেহারা ও মুটে প্রভৃতি প্রত্যেকে গড়ে তিন পোয়া, এবং শ্রমিক বালকরা গড়ে আধ সের করিয়া চাউল খাইয়া থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক যে সকল পুরুষ কঠিন পরিশ্রম করে না, তাহাদের জন্ম গড়ে তিন পোয়া চাউল প্রয়োজন হয়। ১০ হইতে ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্ক বালক-বালিকারা গড়ে আধ সের, এবং ৭ হইতে ১০ বৎসরের বালক-বালিকারা দেড় পোয়া চাউল প্রতিদিন খায়। দুর্ভিক্ষ-কোডের এই হিসাব খুব টানাটানি করিয়া ধার্য্য করা হইয়াছে। জেলের বরাদ্দ আরও অল্প। কিন্তু তাহা হইলেও তাহারা পূর্ণবয়স্ক শ্রমিকের জন্ম দৈনিক তের ছটাক, অশ্রমিক লোকের জন্ম প্রত্যহ ৯ ছটাক চাউল বরাদ্দ করিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত কম। সুতরাং গড়ে প্রত্যেক লোকের পক্ষে বার্ষিক সাড়ে ৫ মণের স্থলে ৫ মণ চাউল আবশ্যক—ইহা ধরা উচিত। উহা তাহাদের জন্ম প্রয়োজন। অবশ্য লোক অভাবের জন্ম হয় ত এত খাইতে পায় না,—কিন্তু প্রয়োজনের হিসাবে তাহা ধর্ত্তব্য নহে। সুতরাং বাঙ্গালায় প্রকৃত প্রয়োজন সাড়ে পাঁচ কোটি লোকের জন্ম সাড়ে সাতাশ কোটি মণ চাউলের। কিন্তু বাঙ্গালায় এত চাউল জন্মে না। উড়িষ্যার লোক বলিতেছে যে, তাহাদের প্রদেশে যে পরিমাণ চাউল জন্মে, তাহাতে তাহাদের চাউলের অভাব ঘটে না। সে দিন পণ্ডিত জওহরলাল বলিয়াছেন যে, যুক্তপ্রদেশে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য জন্মে, তাহাতে তথাকার লোকের খাদ্যাভাব ঘটিতে পারে না; কিন্তু বাঙ্গালার লোক সে কথা বলিতে পারে না। বাঙ্গালার মাঠে বড় জোর ২২ কোটি মণ চাউলের উপযোগী ধান্য জন্মে; অথচ তাহার জনগণের ভোজনের জন্ম সাড়ে সাতাইশ কোটি মণ চাউলের প্রয়োজন। বাঙ্গালায় যে ধান জন্মে, তাহা হইতে কিছু কম ২২ কোটি মণ চাউল গড়ে ফলিতে পারে। কিন্তু ঐ উৎপন্ন ধান্য হইতে পরবর্ত্তী বৎসরের ফসল বুনিবার জন্ম বীজধান রাখিতে হয়। প্রত্যেক একরে কাহারও কাহারও মতে প্রায় ১৫ সের ধানের প্রয়োজন। আমাদের ধারণা যে, প্রত্যেক একরে বার সের, সাড়ে বার সের ধান হইলেই বপন-কার্য্য চলিতে পারে। সুতরাং প্রায় ২ কোটি ২০ লক্ষ একর ধান্য-ক্ষেত্রে বপনের জন্ম প্রায় ৬৮ হইতে ৬৯ লক্ষ মণ বীজধানের প্রয়োজন হয়। উহা রাখিয়া দিতেই হইবে। সুতরাং অবশিষ্ট ধানে ২২ কোটি মণ চাউল ফলিতে পারে না। তাহার পর সকল বৎসর সর্ব্বত্র সমান ফসল ফলে না। বাঙ্গালার সর্ব্বত্র যদি জল-হাওয়া অনুকূল থাকে, তাহা হইলে হয় ত প্রতি একরে দশ মণের কিছু অধিক ধান গড়ে জন্মিতে পারে। কিন্তু তাহা প্রায় হয় না, প্রায়ই কোন না কোন অঞ্চলে শস্যহানি হয়। এরূপ অবস্থায় ২২ কোটি মণ চাউল যে বাঙ্গালায় জন্মে, ইহা মনে করা নিরাপদ নহে। আমাদের সাধারণ কৃষকদিগের চাষে প্রতি একরে গড়ে ১৫ মণ ধানও জন্মে না। সরকারী কৃষি-পরীক্ষাগারে সকল বৎসর একই জমিতে নানাবিধ সার দিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে ধান্য উৎপাদন করিলেও যখন দুধমার, ভাসামাণিক, জটাকলমা, নাগরা প্রভৃতি ধান কোন কোন বার প্রতি একরে ১৫ মণের অধিক জন্মে না, তখন সাধারণ দরিদ্র কৃষকের ক্ষেতে সামান্য কর্ষণে এবং বিনা-সারে গড়ে ১৫ মণ ধানও জন্মে না।

চিন্তার বিষয় বটে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাঙ্গালা প্রদেশে অধিক লোকের বসতি। এই প্রদেশে প্রতি বর্গমাইল স্থানে বার বৎসর পূর্ব্বে গড়ে ৬ শত ৪৬ জন লোক বাস করিত, এখন সেই সংখ্যা ৭ শত ৭৫ জনে দাঁড়াইয়াছে। ঢাকা জিলায়, বিশেষতঃ লৌহজঙ্গ থানায় লোকের ঘন-বসতি অধিক। মধ্যবঙ্গে লোকের তাদৃশ ঘন বসতি নাই। এখন এই ভাবে লোক বাড়িয়া যাইলে বাঙ্গালার দুর্গতির একশেষ হইবে। নিখিল ভারতে শতকরা ১৫ জন হারে লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালা প্রদেশে ২০ জনেরও অধিক হারে লোক বাড়িয়াছে। পঞ্জাবেও এইরূপ হারে লোক বাড়িয়াছে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ভারতের যে দুইটি প্রদেশে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বেশ জাগাইয়া তোলা হইয়াছে, সেই দুইটি প্রদেশেই জনসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে! মাদ্রাজে এবং বোম্বাই প্রদেশে এত অধিক হারে লোকবৃদ্ধি পায় নাই। মাদ্রাজ প্রদেশে শতকরা ১১ জন হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাই মনে হয়, আচম্বিতে বাঙ্গালায় ও পঞ্জাবে, ভারতের দুই প্রান্তস্থিত প্রদেশে মা ষষ্ঠীর এত কৃপা হইল কেন? আর এই উভয় প্রদেশেই জনসংখ্যা ঠিক সমান তালে বাড়িয়াছে! বাঙ্গালায় শতকরা ২০.৩ জন হারে, এবং পঞ্জাবে শতকরা ২০.৪ জন হারে।

বাঙ্গালা প্রদেশ হইতে অনেক ধান, চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। আজ আড়াই বৎসর হইল, বর্ত্তমান য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ চলিতেছে। এই আড়াই বৎসরের মধ্যে প্রায় দুই বৎসর কাল সাগর-পথ বিঘ্নসঙ্কুল হওয়ায় য়ুরোপে বাঙ্গালার চাউল রপ্তানীর কার্য্যে বিঘ্ন ঘটিয়াছে। তৎপূর্ব্বে প্রচুর চাউল বিদেশে চালান যাইত; এখন আর তাহা যাইতেছে না। এখন যুদ্ধের প্রয়োজনে কিছু কিছু চাউল বিদেশে যাইতেছে, তাহা যাওয়াই আবশ্যক। কিন্তু ইহার ফলে বাঙ্গালার জন্ম আবশ্যক তণ্ডুলের পরিমাণ হ্রাস পায়। তদ্ভিন্ন, বাঙ্গালায় চাউল কেবলমাত্র মানুষেরই খোরাক নহে,—উহা গৃহপালিত পশুরও আহার্য্য। গোরু, ভেড়া, মহিষ, উট, হাতী, হাঁস, কুকুর প্রভৃতি সকল গৃহপালিত পশুরই ভোজ্য চাউল। এই চাউলের পরিমাণ নির্ণয় করা কঠিন; তবে ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, বাঙ্গালার চাউলে বাঙ্গালীর কুলায় না। বাঙ্গালায় গমের চাষও হইয়া থাকে; প্রায় পৌনে-দুই লক্ষ একর জমিতে গোধুম উৎপন্ন হয়। কিন্তু এত গম সবই বিদেশে চালান যায় না; তবে পল্লীবাসী বাঙ্গালীরা আটা ময়দা খাইতে অভ্যস্ত না হইলেও প্রয়োজনের তুলনায় তাহা নিতান্তই অল্প।

বাঙ্গালার আরও বিপদ এই যে, বাঙ্গালা বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের ন্যায় শ্রমশিল্প-প্রধান নহে। বোম্বাই প্রদেশে প্রতি বর্গ-মাইলে গড়ে ১৭৭ জন লোকের বাস। ইহা ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের হিসাব। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারের হিসাবে দেখা যায় যে, বিগত দশ বৎসরে ঐ প্রদেশে শতকরা ১৬ জনের কিছু কম লোক বাড়িয়াছে; বাঙ্গালার মত এত অধিক হারে লোক বাড়ে নাই। বোম্বাইয়ের খাদ্যশস্য বোম্বাই প্রদেশেই উৎপন্ন হয়—বরং কিছু উদ্বৃত্তও থাকিতে পারে। মাদ্রাজ অঞ্চলে প্রতি বর্গমাইলে গড়ে ৩ শত ২৯ জন লোক বাস করিত; এখন তথায় লোকসংখ্যা শতকরা সাড়ে ১১ জন হিসাবে বাড়িয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালার তুলনায় তথায় প্রতি বর্গ-মাইলে অর্দ্ধেক লোকের বাস; কিন্তু তথাপি তথাকার লোক বাঙ্গালীর তুলনায় অধিক শিল্পসেবী। সুতরাং ঐ সকল প্রদেশ অপেক্ষা বাঙ্গালায় এখন দুর্ভিক্ষ হইবার আশঙ্কা অধিক। বাঙ্গালায় ইদানীং কয়েকটি কাপড়ের কল

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প। নিখিল ভারতে আজকাল প্রায় পৌনে-চারি শত কার্পাস-কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; তন্মধ্যে বাঙ্গালায় উহার সংখ্যা ৩১টি মাত্র। বস্ত্রশিল্পই পূর্ব্বে বাঙ্গালার বিশিষ্ট শিল্প ছিল। কিন্তু ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে বিলাতী তাঁতিরা ফোর্টগ্লষ্টার-মিল প্রতিষ্ঠিত করিবার পর তাহার সহিত অসম প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালার এই প্রধান শিল্প নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং বাঙ্গালা কৃষিপ্রধান প্রদেশে পরিণত হইয়াছে। যে প্রদেশে এত অধিক লোক কেবল কৃষির উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, তাহাদের আর দুর্গতির অবধি থাকে না। সত্য বটে, গত দশ-এগার বৎসরে বাঙ্গালায় কার্পাস-কল কিছু অধিক হইয়াছে, কিন্তু তাহাও এ প্রদেশের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। সুতরাং এই শ্রমশিল্প প্রসারের প্রতি বাঙ্গালী-মাত্রেরই বিশেষ ভাবে অবহিত হওয়া আবশ্যক। বাঙ্গালার কার্পাস-বস্ত্রের কলগুলিতে ৩১ হাজার মাত্র কর্ম্মী কাজ করে, সমগ্র জনসংখ্যার তুলনায় তাহাদের সংখ্যা নগণ্য। ঐ সকল কল দ্বারা বাঙ্গালার প্রয়োজনের সিকি পরিমাণ বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুতরাং এ বিষয়ে বাঙ্গালী যদি সচেতন না হয়, তাহা হইলে আমাদের দুর্দ্দশা আরও ভীষণ হইবে।

কেহ কেহ বলেন যে, কৃষির উন্নতি সাধন করিতে পারিলে এই সমস্যার সমাধান হয়। উহা স্থায়ী সমাধান না হইলেও সাময়িক ভাবে কিছু দিনের জন্য সমাধান হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ, কৃষির উন্নতি করিলে ফসলের ফলন বাড়ে। সরকারী কৃষি পরীক্ষাক্ষেত্রে (experimental farms) সযত্নে সার দিয়া দেখা গিয়াছে, এক এক একর জমিতে ঝিঙ্গাশাল নামক আমন ধান ৩৯ মণ পর্য্যন্ত ফলন হইয়াছে; কিন্তু সর্ব্বত্র এরূপ হয় না। বাঁকুড়ায় উচ্চাবচ ভূমিতে ইহার ফলন অধিক হয়। বর্দ্ধমান সরকারী কৃষিক্ষেত্রে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রতি একরে ২০ মণের অধিক ফলে নাই; কিন্তু বাঁকুড়ায় প্রায় এক একরে ৪০ মণ পর্য্যন্ত ফলিয়াছিল। তবে সকল জমিতে ইহা ভাল জন্মে না। নাগরা, দুধকলমা, ঝিঙ্গাশাল প্রভৃতি ধানের জমিতে সার দিয়াও প্রতি একরে ২১ মণের অধিক ধান জন্মে না। কটকতারা, ধৈরাল, সূর্য্যমুখী প্রভৃতি আউস ধান সার প্রভৃতি দিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করিলে প্রতি একরে ৩৬ মণ ধান বা প্রায় ২৪ মণ চাউল উৎপাদন করা সম্ভব বটে, কিন্তু এ দেশের কৃষকদিগের সেরূপ জমি পাইট করিবার সাধ্য নাই। হাড়ের সার দিলে দেশী গোরুতে প্রায়ই লাঙ্গল টানিতে চায় না। যাহা হউক, কৃষির উন্নতিসাধনে এই সমস্যার আংশিক সমাধান হয় সত্য,—কিন্তু যেখানে জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত, সেখানে এই ভাবে চাষ করাও অসম্ভব; অতি দরিদ্র কৃষকদিগের জন্য সার কিনিয়া তাহা জমিতে দেওয়াই কঠিন। কিন্তু এই উপায় না করিলেও নিস্তার নাই। ইদানীং দেখা যাইতেছে, চাষীরা খাদ্যশস্যের জমি সঙ্কুচিত করিয়া বাণিজ্য-ফশল অধিক উৎপন্ন করিতেছে। নিখিল ভারতের সর্ব্বত্রই এইরূপ হইতেছে। বাঙ্গালা প্রদেশেও তাহার ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় নাই।

কেহ কেহ বলেন যে, রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিলে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। প্রায় ১৮ বৎসর পূর্ব্বে মিষ্টার লতিফ এ কথা বলিয়াছিলেন; কিন্তু ইংরেজ সরকার সে কথা গ্রাহ্য করেন নাই। রপ্তানী বন্ধ করিলে যে সুফল ফলে, মিষ্টার লতিফ তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেও ত্রুটি করেন নাই। তিনি কৃষিপ্রধান ফ্রান্সের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ফ্রান্স বিদেশে খাদ্যবস্তু যত রপ্তানী করিত, তাহা অপেক্ষা ৪৫ কোটি ফ্রাঙ্ক মূল্যের খাদ্যবস্তু বিদেশ হইতে ফ্রান্সে আমদানী করিতে বাধ্য হইত। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে রক্ষাশুল্ক স্থাপিত হয়। তাহার ফলে ফ্রান্সে বাণিজ্যের যে প্রতিকূল পাল্লা ছিল, তাহা ঘুরিয়া যাইতে থাকিল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে দেখা গেল যে, ফ্রান্সে যত টাকার খাদ্যশস্য আমদানী করা হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা ২৮ কোটি ৭০ লক্ষ ফ্রাঙ্ক মূল্যের পণ্য সে বিদেশে অধিক রপ্তানী করিয়াছে। ফ্রান্সের লোক ৭ বৎসরে ৫৫ কোটি ১৬ লক্ষ ৩০ হাজার ফ্রাঙ্ক জমাইয়াছিল, তাই তাহারা তখন স্বদেশে এবং বিদেশে টাকা ধার দিয়াছিল। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ফিস্‌ক্যাল কমিশনও স্বীকার করিয়াছেন যে, অবস্থা বুঝিয়া খাদ্যশস্যের উপর রক্ষাশুল্ক স্থাপন করা কর্ত্তব্য। এ দেশে খাদ্যশস্য যাহা জন্মে, তাহার দ্বারা দেশের লোকের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না, এ কথা ডক্টর শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার প্রণীত Fiscal Policy of India নামক গ্রন্থে স্পষ্টই বলিয়াছেন; বলিয়াছেন যে, "সাধারণ সুজন্মার বৎসরেও এ দেশ হইতে খাদ্য রপ্তানী করিবার মত খাদ্যশস্য জন্মে কি না তাহাতে সন্দেহ আছে। যাঁহাদের মতের মূল্য আছে, এরূপ কতকগুলি লোক বলিয়া থাকেন যে, ভারতে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য জন্মে, তাহাতে ভারতবাসীর নিজ-খরচ কুলায় না, সুতরাং রপ্তানীকারক দেশ না হইয়া ভারতের আমদানীকারক দেশ হওয়াই উচিত।" কথাটা তিনি বহু দিন পূর্ব্বেই বলিয়াছেন। তাহার পর কুড়ি বৎসরেরও অধিক কাল অতীত হইয়া গিয়াছে। এই কুড়ি বৎসরে ভারতের জনসংখ্যা সাত কোটি বৃদ্ধি পাইয়াছে; অর্থাৎ ওয়েলস্ সহ ইংলণ্ডের যত লোক, তাহার প্রায় দেড় গুণেরও অধিক লোক এই ভারতে বাড়িয়া গিয়াছে। অথচ গত কুড়ি বৎসরে সমগ্র ভারতে খাদ্যশস্য উৎপাদনের কৃষিক্ষেত্র বাড়ে নাই। ১৯৩০-৩১ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রায় ২১ কোটি ৩৮ লক্ষ একর জমিতে খাদ্যশস্য উৎপাদন করা হইয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে ১৯ কোটি ৬৯ লক্ষ একর জমিতে খাদ্যশস্য বপন করা হয়। বাঙ্গালাতেও খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রের বিস্তার অনেক কমিয়াছে। ভারতে যে পাট জন্মে, তাহার শতকরা ৮০ ভাগ এই বাঙ্গালাতেই উৎপন্ন হয়। গত ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ভারতে ২৬ লক্ষ ৭০ হাজার একর জমিতে পাট জন্মিয়াছিল, আর ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ৩০ লক্ষ ৭৪ হাজার একর জমিতে পাট জন্মে। এই বৃদ্ধিটা প্রায় বাঙ্গালাতেই হইয়াছে। উৎকৃষ্ট ধানের জমিতে কৃষকরা পাটের আবাদ করে; সুতরাং ইহার ফলে ধানের ফলন অনেক কমে। কচুরীপানার আতিশয্যেও ধানের ফলন অনেক কমিয়া গিয়াছে; কাজেই বাঙ্গালায় খাদ্য-সমস্যা জটিল হইয়া উঠিতেছে। এত দিন ব্রহ্মদেশ হইতে বাঙ্গালায় চাউল আমদানী হইত বলিয়া কোন প্রকারে বাঙ্গালার লোকের খাদ্যসংস্থান হইতেছিল; কিন্তু এবার ব্রহ্মদেশ যুদ্ধে বিপর্য্যস্ত, সুতরাং তথা হইতে আর বঙ্গদেশে চাউল আসিবে না। তদ্ভিন্ন যুদ্ধে "পোড়া-মাটি" নীতি অবলম্বিত হওয়ায় ব্রহ্মদেশে অনেক মজুত শস্যও নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহারও পরোক্ষ ফল একটা আছে। অবশ্য, এবার য়ুরোপ প্রভৃতি সকল দেশে শ্বেতসার প্রস্তুত, এবং মদ-চোলাই করিবার জন্য চাউল রপ্তানী হইতেছে না; তবে রণক্ষেত্রের জন্য কিছু চাউল রপ্তানী হইতেছে বলিয়াই মনে হয়। গুর্খারা তণ্ডুলভোজী।

যাহা হউক, যাঁহারা রপ্তানী-বন্ধের বিরোধী, তাঁহারা বলেন যে, রপ্তানী বন্ধ করিলে চাউলের মূল্য হ্রাস পাইবে; ইহার ফলে বাঙ্গালার অধিকাংশ লোকের ক্ষতি হইবে। কারণ, এ প্রদেশের অধিকাংশ লোকই চাষী। যাঁহারা এ কথা বলেন, তাঁহারা নিতান্তই ভ্রান্ত। দেশের অপরিহার্য্যরূপে আবশ্যক দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলে কোন পক্ষেরই লাভ নাই! বার্ত্তিক সমিতির তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে পুণা কৃষি কলেজের অধ্যক্ষ মিষ্টার ম্যান্ যে নিবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিয়াছিলেন যে, প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলে পল্লী-অঞ্চলের লোকের ঋদ্ধি ক্ষুন্ন হয়। বেবিংটন স্মিথ কারেন্সি কমিশনের সমক্ষে ভারত সরকার যে মন্তব্য উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্টই বলা হইয়াছিল যে, পণ্য-মূল্য বৃদ্ধির ফলে কৃষিবলের কোন উপকার হয় নাই (১)। কারণ কৃষকদিগেরও সকল জিনিষ কিনিয়া খাইতে হয়। কাজেই তাহারা তাহাদের ক্ষেত্রজাত কৃষিজ পণ্য বেচিয়া অধিক পয়সা দিয়া সকল জিনিষ কিনিতে বাধ্য হয়। বাঙ্গালায় অধিকাংশ কৃষকের যোতে যে জমি আছে, তাহাতে তাহাদের সম্বৎসরের প্রয়োজনীয় ধান্য জন্মে না। ইহারা দুই-তিন বিঘা জমিতে বাণিজ্য-ফসল বুনিয়া বাকি জমিতে ধান বোনে, সে ধানে তাহাদের বড়-জোর ৬ মাস ৭ মাস চলে। অবশিষ্ট ৫-৬ মাস তাহাদিগকে ধান কিনিয়া বা মহাজনের নিকট ধার করিয়া, খাইতে হয়। তাহাদিগকে শেষকালে যে কেবল অধিক মূল্যে ঐ ধানই কিনিতে হয়, তাহাই নহে,—বেশী সুদ বা 'বাড়ি' দিয়া ধান লইতে হয়। ইহাতে তাহাদের বিশেষ কষ্ট হয়, মহাজনী আইন প্রবর্ত্তনের পর পল্লী-অঞ্চলের লোক এখন আর সহজে টাকা ধার পাইতেছে না। মহাজনরা আর পূর্ব্বের মত গোলায় অধিক ধান মজুদ রাখিতেছে না। যত দিন বাঙ্গালার কৃষকরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করিতে না শিখিতেছে, অথবা ধনবান্ শিক্ষিত লোকেরা চাষ-কার্য্যে আত্মনিয়োগ না করিতেছে,—তত দিন বাঙ্গালা হইতে বিদেশে ধান-চাউল রপ্তানী বন্ধ রাখিতে হইবে। অথবা যে পর্য্যন্ত বাঙ্গালী শিল্পপ্রধান জাতি না হইতেছে,—কৃষিপ্রধান থাকিবে—সে পর্য্যন্ত বাঙ্গালা হইতে খাদ্যশস্যের রপ্তানী কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতেই হইবে।

গ্রেট বৃটেনেই এইরূপ সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রমশিল্পের বিপ্লবকালে তথায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জনসংখ্যা এরূপ ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, ইংলণ্ডে উৎপন্ন খাদ্য-শস্যে ইংরেজ জাতির কুলাইত না। এদিকে জমিদারদিগের উৎসাহে ও আনুকূল্যে বিদেশ হইতে আমদানী শস্যের উপর কড়া-হারে শুল্ক ধার্য্য ছিল। কাজেই দুর্ম্মূল্যতার ফলে ইংরেজ জাতি নিষ্পিষ্ট হইতেছিল। অবস্থা এত দূর শোচনীয় হইয়াছিল যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বিলাতের জনসাধারণের মধ্যে সাত ভাগের এক ভাগ লোক আর্ত্তত্রাণ সমিতির সাহায্যের উপর নির্ভর করিত (২)। শিল্পসেবীরাও খাদ্যপণ্য সুলভ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল। কারণ, খাদ্য সুলভ না হইলে শিল্প বৃদ্ধি পায় না। বিলাতে অবাধ বাণিজ্য নীতির ফলে খাদ্যশস্যের মূল্য হ্রাস হইয়াছিল। আমাদের দেশে অবাধ আমদানীর ফলে তাহা হইবে; তবে দেশের জন্য খাদ্য দেশে উৎপন্ন করাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পন্থা।

খাদ্য-শস্যের উৎপাদন সম্বন্ধে জর্জ্জ সিডেনহাম ক্লার্ক যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরকালই সত্য বলিয়া সমাদৃত হইতে থাকিবে। তিনি বলিয়াছেন যে, মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হইলে খাদ্যশস্যের উৎপাদনই সর্ব্বপ্রধান কাজ। এ দেশে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং পাইতেছে; তাহার ফলে জমির উপর ক্রমশঃই অধিক টান পড়িতেছে। বর্ত্তমান সময়ে যে দুর্ম্মূল্যতা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহার কারণ উৎপন্ন শস্যের সহিত বর্দ্ধিত লোকের প্রবর্দ্ধমান পার্থক্য হউক, কিম্বা অন্য আর কিছু যাহাই হউক, ইহা সত্য যে, ভারতের ৩০ কোটি লোককে খাওয়াইতে হইবে, এবং যত বৎসর যাইবে ততই খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। পরে এমন একটা অবস্থা আসিতে পারে, যখন—যদি জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদন বর্দ্ধিত করা না যায়, তখন অন্য বাণিজ্য-পণ্যের উৎপাদন হ্রাস করিতে হইবে (৩)।

কথা সম্পূর্ণ সত্য। সমস্যাটি ভাবিবার যোগ্য। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে যখন ফরাসীবিপ্লবের এবং নেপোলিয়ানের সহিত যুদ্ধের ফলে গ্রেট বৃটেনে দুর্ম্মূল্যতা উপস্থিত হইয়াছিল,—তখন গ্রেট বৃটেনের অবস্থা ঠিক এখনকার ভারতের মত ছিল না। তখন গ্রেট বৃটেন শিল্পোন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল। বাষ্পচালিত যন্ত্রের সাহায্যে হস্ত-চালিত যন্ত্রজাত পণ্যকে পর্য্যুদস্ত করিয়া গ্রেট বৃটেনের ধনিকরা পৃথিবীর নানা দেশ হইতে ধনরত্ন আনিয়া নিজ কোষাগার পূর্ণ করিতেছিল, কিন্তু শ্রমিকদিগকেও তাহারা অর্থলোভে কম পীড়িত করিতেন না। তখন ধনিকরা ধন পাইত, দরিদ্ররা ধনীর স্বার্থসাধনের মর্ম্মন্তুদ পেষণী-যন্ত্রে নিষ্পিষ্ট হইত। যুদ্ধের উৎকট গর্জ্জনের বিভীষণ ধ্বনিতে মনুষ্যত্ব রক্ষা-প্রচেষ্টার কথা উঠিলেও তাহা লোক শুনিতে পাইত না। আমাদের দেশে কিন্তু শ্রমশিল্পের দিক দিয়া বিদেশ হইতে ধন আমদানী হইতেছে না; কিন্তু লোক বাড়িতেছে। যুদ্ধের ফলে দুর্ম্মূল্যতা বাড়িতেছে,—যুদ্ধের কোলাহলে গরীবের কষ্টের কথা

(১) Babington Smith's Report, para 46 & 47.

(২) This practice grew to such an extent that in the early years of the nineteenth century, a seventh of the population was in receipt of poor law relief. Thus despite the increase of population wealth and trade, there was much distress and discontent which was increased by the hardships and high prices that resulted from the great wars against the French revolution and Nepolean.

(৩) The provision for an adequate food supply is the primary condition of the existence of mankind and the great growth of population which has accompanied British rule, and which is still proceeding entails more and more demands on land, • • • The fact remains that the 300 millions of people in India must be fed, that the food supply will have to be increased as the years roll on and a point may be reached at which the growth of all other staples will have to be checked unless the production of the necessaries of life can be increased.

কেহ শুনিতেছে না। ভারতের সাধারণ লোক অত্যন্ত দরিদ্র। ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটী হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ভারতের পল্লীবাসী প্রত্যেক লোকের আয় গড়ে বার্ষিক ৩৫ টাকা। গড়ে অর্থাৎ ইহার ভিতর ধনী-দরিদ্র সকলেই আছেন। সুতরাং কতকগুলি লোকের আয় কত কম, তাহা সহজেই বুঝা যায়। বহু লোকের জন-প্রতি বার্ষিক আয় দশ টাকারও অধিক নহে। সুতরাং এ দারিদ্র্য কত গভীর, তাহা সকলে ভাবিয়া দেখুন। এখন মফস্বলে কয়লার অভাবে—কয়লা ২ টাকা ২।০ টাকা পর্য্যন্ত দরে মণ বিকাইতেছে।—কেরোসিনের শুল্ক বাড়িতেছে।—বস্ত্রের মূল্য বাড়িতেছে।—শুল্কবৃদ্ধির ফলে দেশলাইয়ের দর বাড়িতেছে; চিঠির মাশুল বাড়িতেছে; ইহার ফলে গরীবদিগের দুঃখ কত বাড়িবে, তাহা সকলে ভাবিয়া দেখুন। তাহার উপর ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানী বন্ধ হইল। এরূপ অবস্থায় এখন হইতে সাবধান না হইলে দেশে দুর্ভিক্ষ ও লুণ্ঠতরাজ আরম্ভ হইবে। কারণ, বাঙ্গালার চাউলে বাঙ্গালীর চলিতে পারে না। ইংরেজ সরকার যদি সময় থাকিতে এ দেশে শিল্প-বিস্তারের চেষ্টা করিতেন, যদি যথাসময়ে কতক সামরিক পণ্য এ দেশে উৎপাদন করিতেন, তাহা হইলে কতকটা সুবিধা হইত। যুদ্ধের সময় দেশবাসীর হাতে কিছু পয়সা আসিত। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধজয়ের দিকে বিশেষ দৃষ্টি না রাখিয়া ভবিষ্যতে এ দেশে তাঁহাদের বাণিজ্য কিসে বজায় থাকিবে, কেবল সেই দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া চলিতেছেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু জীববিশেষের ন্যায় বালুকার মধ্যে মাথা গুঁজিয়া থাকিলে আগন্তুক বিপদের হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া যায় না। গত পূর্ব্ববৎসর বাঙ্গালায় ২০ কোটি ৬২ লক্ষ মণ চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করি, ইহা বাঙ্গালায় সকল লোকের ক্ষুধা-শান্তি করিতে পারে কি? তাহার উপর যুদ্ধের জন্য সকল জিনিষই দুর্মূল্য। ঔষধাদিও অধিক মূল্যে বিকাইতেছে। ইহাতে লোকের কষ্টের সীমা নাই। মফস্বলে স্থানে স্থানে কতক কতক আবশ্যক জিনিষ দুষ্প্রাপ্য হইতেছে। চাউলের দর এখনও তত চড়ে নাই সত্য, কিন্তু ডাল, চিনি, আটা, ময়দা প্রভৃতির মূল্য বাড়িতেছে। এরূপ অবস্থায় কর্ত্তব্য কি, তাহাই সকলের বিচার্য্য বিষয়।

সম্প্রতি নয়া দিল্লীতে সম্মিলিত ভারতীয় বণিক সমিতির যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে এ দেশের বণিক সমাজের মনোভাব বিশেষ ভাবে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। প্রাচ্যপুঞ্জ সমিতির কার্য্যফলে ভারতবাসীর সকল আশা নিরাশার সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছে,—আবার মার্কিণ হইতে যে টেকনিক্যাল মিশন ভারতে আসিতেছে, তাহাদের সম্বন্ধেও ভারতবাসী সন্দেহদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। শ্রীযুত ঘনশ্যামদাস বিরলা বলিয়াছেন, যদি মার্কিণকে ভারতে শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠিত করিবার বেপরোয়া অধিকার দেওয়া হয়, তাহা হইলে ভারতবাসীকে সে জন্য উদ্বিগ্ন হইতে হইবে। যিনি সরকারের ফিসক্যাল কমিশনের সদস্য ছিলেন, জেনিভার আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক কমিশনের সদস্য ছিলেন, তাঁহার মনে এই সন্দেহ যে অকারণ উদিত হইয়াছে, তাহা মনে হয় না। ভারতে মোটরগাড়ী-নির্ম্মাণের কারখানা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সম্বন্ধে যাহা করা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহটা একবারে উপেক্ষা করা যায় না। ফলে এই দুর্য্যোগে বাঙ্গালীকে স্বকীয় স্বার্থে সচেতন হইতে হইবে। বাঙ্গালাকে শিল্পপ্রধান না করিলে বাঙ্গালায় জমির উপর চাপ কমিবে না। জমির উপর লোকের চাপ না কমিলেও কৃষির উন্নতি হইবে না। কৃষির এবং শিল্পের উন্নতি না হইলে ত এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হইবে না।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

একটি দুপুর

ক্রীং ক্রীং করে কে ডাকে ফোনেতে—জান্‌ না ছন্দা ভাই!
বলিস্ কি! তোর জামাইবাবুর পড়ে শুনে কাজ নাই?
কি হোলো তোমার? ডাকছ কেন গো? এত কি জরুরী কাজ?
মা তো নেই হেথা, মাসীমার বাড়ী গেছেন তিনি যে আজ।
ফিরতে হয়ত বেলা পড়ে যাবে। আমি কেন যাইনি কো?
এ কথা জানিয়ে হবে কিবা ফল—তোমার লাভটা কি গো?
ঈস্! তাই না কি! আমি যে যাইনি মাথাটা ধরেছে কি না।
অল্প একটু! ভাবতে হবে না, রয়েছে ছন্দা, বীণা।
না, না, না, চাই না অতটা দরদ—প্রশ্রয় দেব' না কো;
ষোলো দিন বাদে ফাইনাল, তবু—উঃ! কি দুষ্টু মা গো!
এম, এস্-সি'তে যে ফার্ষ্ট হতে হবে সে কথা ভুলেছ বুঝি?
আমি ভেবে মরি, আর উনি কি না বেড়ান সুযোগ খুঁজি!
বড্ড গরম পড়েছে ওখানে? এটা বুঝি মেরুদেশ!
ইন্‌স্পিরেশন পাবার জন্যে? দুষ্টু ফন্দী বেশ!
চল্‌বে না বাপু অত আব্দার—মা গো কি কাঙালপণা!
এই ক'টা দিন ভাল করে পড়ো, হয়ো না অন্যমনা।
বেশ, বেশ তাই! দিন দিন আমি হতেছি নিঠুরা ঘোর?
নাগাল আমার যায় না কো পাওয়া? স্বভাব মন্দ মোর!
কল্পলোকের মানসী-প্রতিমা? তাই না কি আমি? ঈস্!
স্বপনেতে ঘেরা দেহাতীত আমি দান্তের বিয়াত্রিস্?
হয়েছে, হয়েছে! বুঝেছি ভণিতা, তথাপি বারণ করি,
এসো না কো আজ, পাবো বড় লাজ, লক্ষ্মীটি পায়ে পড়ি!
মা এসে বলবে, জামাই এসেছে? সামনে পাশের পড়া!
সকলের কাছে অত ছোট করে' নিজেকে দিয়ো না ধরা।
একটা দুপুর, একটি ঘণ্টা, শুধু বারেকের দেখা?
না বাপু, পারি না, রোজ রোজ যদি মনে হয় একা একা।
তুমি কি ভেবেছ' তব আসা রবে অজ্ঞাত মা'র কাছে?
দুষ্টুমীভরা পোড়ারমুখী সে ছন্দা যে বাড়ী আছে।
কেমন বিনিয়ে বলবে সে মাকে—লজ্জাতে হবো সারা।
ছিঃ! কি যে বলো! বেহায়াপনায় হয়েছ' সবার বাড়া।
ঈস্। তাই বুঝি! তুমি না কি মোর লজ্জারো চেয়ে বড়ো?
এই শেষবার? আঃ! ও কি কথা? কি যে বলো আর করো!
বললে তুমি ত শুনবে না ছাই! কি আর করব' তবে?
একটি ঘণ্টা দিতে পারি শুধু—পরে ছুটি দিতে হবে।
আর কথা নয়, একটি ঘণ্টা, এই বেলা এসো চলে'।
লক্ষ্মী ছন্দা, তুই যেন ভাই দিস্‌নি কো মাকে বলে'!
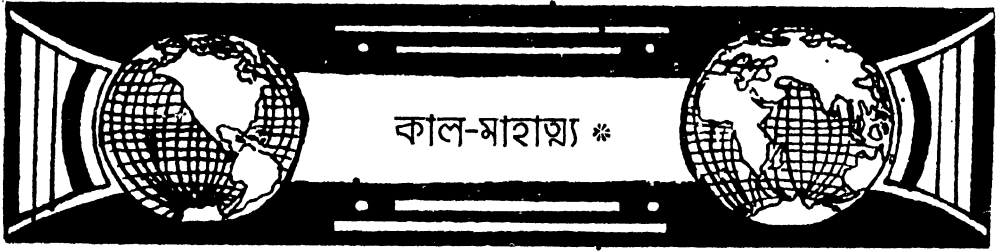
'কাল-মাহাত্ম্য' এই কথাটি এ দেশে চিরপ্রসিদ্ধ। সে কালের জ্ঞানী বৃদ্ধগণ অনেক সময়েই দৃঢ় বিশ্বাসে বলিতেন —'ইহা কালমাহাত্ম্য'। আমরাও কদাচিৎ ঐ কথা বলিয়া থাকি। কিন্তু কাল কি? কাল কি কোন মহাত্মা? তিনি মহাত্মা না হইলে তাঁহার মাহাত্ম্য বলিতে কি বুঝিব? বস্তুতঃ কালের প্রকৃত স্বরূপ না বুঝিলে তাঁহার মাহাত্ম্য কিছুই বুঝা যায় না।

মহাভারতে পড়িয়াছি—ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটে কোন সময়ে সরোবরস্থ বকরূপ ধর্ম্ম প্রথম প্রশ্ন করেন—'কা বার্ত্তা' অর্থাৎ বার্ত্তা কি? তদুত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—

"অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে
ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা॥"

অর্থাৎ এই সংসাররূপ মহামোহময় কটাহে কাল সর্ব্বভূতকে পাক করিতেছেন, ইহাই বার্ত্তা। কিন্তু সেই কাল কি? দিন, রাত্রি, মাস, ঋতু, বৎসর ও যুগাদিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া যে কাল কত কত বিচিত্র লীলা করিতেছেন, সেই কাল কি কোন জড় পদার্থ? বঙ্গে নব্য ন্যায়ের নবযুগের প্রবর্ত্তক প্রতিভার অবতার রঘুনাথ শিরোমণি বিচারপূর্ব্বক নিজমত বলিয়া গিয়াছেন যে, কাল কোন জড় পদার্থ নহে। কাল বস্তুতঃ সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মা; সুতরাং কালের মাহাত্ম্য বর্ণনাতীত।

বস্তুতঃ রুদ্ররূপ সেই কালের লীলারহস্য অতি দুর্জ্ঞেয়। সেই কালের মাহাত্ম্যেই ভারতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তাঁহার সেই মহা লীলা হইয়া গিয়াছে। তৎপূর্ব্বে মহাভাগ বীর-চূড়ামণি অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সেই 'সুদুর্দ্দর্শ' বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া নিতান্ত বিস্মিত ও ভীত হইয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "আখ্যাহি মে কো ভবান্ উগ্ররূপঃ" অর্থাৎ উগ্ররূপ আপনি কে? ইহা আমাকে বলুন। তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিয়াছিলেন—

"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥"—গীতা ১১।৩২

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তখন অর্জ্জুনকে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, আমি লোকক্ষয়কারী অত্যুগ্র কাল। তুমি যুদ্ধার্থ উপস্থিত এই ভীষ্মাদি বীরগণকে বধ না করিলেও ইঁহারা জীবিত থাকিবেন না। ইঁহারা সকলেই কাল কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইয়া অবশ্য নিহত হইবেন; আমিই সেই কাল।

পূর্ব্বোক্ত ভগবদ্বাক্য দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, কাল সেই সর্ব্বশক্তিমান্ রুদ্ররূপ পরমাত্মা হইতে তত্ত্বতঃ অভিন্ন। নানা উপাধিভেদে সেই মহাকালের কাল্পনিক অসংখ্য ভেদ থাকিলেও বস্তুতঃ তিনি অখণ্ড বা এক। সুতরাং তাঁহার মাহাত্ম্য অতি দুর্জ্ঞেয়।

অবশ্য কালের স্বরূপ বিষয়ে ভারতীয় পূর্ব্বাচার্য্যগণের বহু বিভিন্ন সিদ্ধান্ত আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সুবিখ্যাত অধ্যাপক নানা শাস্ত্রপারদর্শী শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় প্রাঞ্জল সংস্কৃত ভাষায় সুন্দর ভাবে "**কালসিদ্ধান্তদর্শিনী**" নামে অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করিয়া কাল সম্বন্ধে সমস্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্তই বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে এইরূপ গ্রন্থ যে কখনও কোন দেশে রচিত হইয়াছে, ইহা আমরা জানি না। শাস্ত্রী মহাশয়ের "কালসিদ্ধান্ত-দর্শিনী" সত্যই অপূর্ব্ব গ্রন্থ। তিনি কাল সম্বন্ধে নানা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে বহু গ্রন্থের বহু বাণী উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু আমি ভগবদ্গীতায় বুঝি যে, **'কালোঽস্মি'** এই ভগবদ্বাণীই বস্তুতঃ **কালসিদ্ধান্তদর্শিনী**।

বস্তুতঃ কাল যে সেই পরমাত্মারই স্বরূপ, ইহা বৈদিক বর্ণনার দ্বারাও বুঝা যায়। শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ও তাঁহার উক্ত গ্রন্থে "অথর্ব্বসংহিতামত" প্রকাশ করিতে লিখিয়াছেন যে, অথর্ব্ববেদসংহিতার ১৯শ কাণ্ডের ষষ্ঠ অনুবাকে অষ্টম ও নবম সূক্ত "কালসূক্ত" নামে কথিত। তন্মধ্যে অষ্টম সূক্তে দশটি এবং নবম সূক্তে পাঁচটি মন্ত্র আছে। উক্ত সূক্তদ্বয়ে কালের যেরূপ মহাস্তুতি পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা বুঝা যায়, অথর্ব্ব বেদ কালকে পরমাত্মস্বরূপই বলিয়াছেন। সেখানে ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্যও স্পষ্ট লিখিয়াছেন—

"অনেন সূক্তদ্বয়েন সর্ব্বজগৎ-কারণভূতঃ কালরূপঃ পরমাত্মা স্তূয়তে।"

মহাপুরাণ বিষ্ণুপুরাণেও (২য় অঃ) উক্ত বেদমূলক সিদ্ধান্তই কথিত হইয়াছে, যথা—

* পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র শাস্ত্রি-বিরচিত "কালসিদ্ধান্তদর্শিনী" নামক অভিনব সংস্কৃত গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত।

"কাল-স্বরূপং রূপং তদ্বিষ্ণোর্মৈত্রেয় ! বর্ত্ততে।"
অর্থাৎ কালের যাহা স্বরূপ, তাহা বিষ্ণুর অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরেরই স্বরূপ। বিষ্ণুপুরাণের পরিশিষ্ট—"বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরে" কালের সেই স্বরূপ বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তাঁহার "তিথিতত্ত্ব" নামক স্মৃতি নিবন্ধের প্রথম ভাগে কালের স্বরূপ বিষয়ে উক্ত মতের প্রমাণ প্রদর্শন করিতে বিষ্ণুপুরাণের পূর্ব্বোক্ত বচনার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়া পরেই লিখিয়াছেন—

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—"অনাদি-নিধনঃ কালো রুদ্রঃ সঙ্কর্ষণঃ স্মৃতঃ। কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং স কালঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥" "কলনাৎ"—লয়করণাৎ। তথাচ বিষ্ণুঃ—

"যে সমর্থা জগত্যস্মিন্ সৃষ্টি-সংহারকারিণঃ।
তেঽপি কালেন লীয়ন্তে কালো হি বলবত্তরঃ॥"

ভারতের শাব্দিকশিরোমণি ভগবান্ ভর্ত্তৃহরিও কালকে জগৎকারণ পরব্রহ্মের শক্তিবিশেষ বলিয়া—পরব্রহ্মস্বরূপই বলিয়াছেন। তিনি তাঁহার "বাক্যপদীয়" গ্রন্থের প্রারম্ভে পরব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন—"অব্যাহতাঃ কলা যস্য কালশক্তিমুপাশ্রিতাঃ।" উক্ত শ্লোকে "কলা" শব্দের অর্থ কলানাম্নী শক্তি। ভর্ত্তৃহরির মতে পরব্রহ্মের জগৎ-সৃষ্ট্যাদির কারণভূত অন্যান্য বহু শক্তির নাম "কলা"। সেই সমস্ত শক্তিই তাঁহার কালশক্তির আশ্রিত। পরব্রহ্মের ঐ "কাল" নামক শক্তিই প্রধান শক্তি। কারণ, উহাই তাঁহার স্বাতন্ত্র্য শক্তি। ঐ শক্তি-বশতঃই তিনি জগৎসৃষ্ট্যাদির কর্ত্তা। কারণ, স্বাতন্ত্র্য শক্তি ব্যতীত কেহ কর্ত্তা হইতে পারেন না। ভগবান্ পাণিনিও বলিয়াছেন—"স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা।" ১।৪।৫১

কিন্তু ভর্ত্তৃহরির মতে পরব্রহ্মের সেই যে স্বাতন্ত্র্য শক্তি যাহা "কালশক্তি" নামে কথিত হইয়াছে, তাহা সেই অক্ষরশব্দাত্মক পরব্রহ্ম হইতে বস্তুতঃ কোন ভিন্ন পদার্থ নহে। কারণ, তাঁহার মতে শক্তি ও শক্তিমান্ তত্ত্বতঃ অভিন্ন। সুতরাং পরব্রহ্ম হইতে তাঁহার শক্তিবিশেষ কালের বাস্তব পৃথক্ সত্তা নাই।

এখানে বলা আবশ্যক যে, ভর্ত্তৃহরির ব্যাখ্যাত দার্শনিক মত অতি দুর্ব্বোধ। প্রাচীন ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যেও ভর্ত্তৃহরির মত-ব্যাখ্যায় মতভেদ পাওয়া যায়। বিশেষতঃ ভর্ত্তৃহরির "বাক্যপদীয়" গ্রন্থের সম্প্রদায়বেত্তা অধ্যাপক এখন দুর্লভ হওয়ায় ভর্ত্তৃহরির দার্শনিক মত আরও দুর্ব্বোধ হইয়াছে। ভর্ত্তৃহরির প্রকৃত মত বুঝিতে হইলে এখন বহু প্রশ্ন উপস্থিত হয়। পরন্তু "সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে" ব্যাখ্যাত পাণিনীয় দর্শনের মূল কি এবং মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির মত হইতে "বাক্যপদীয়"কার ভর্ত্তৃহরির মতের কোন অংশে বৈশিষ্ট্য আছে কি না, ইহা বুঝা অত্যাবশ্যক। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সম্মত অদ্বৈত মত হইতে ভগবান্ ভর্ত্তৃহরির ব্যাখ্যাত অদ্বৈতমতের যে বিশেষ আছে এবং ভর্ত্তৃহরির মত কিরূপে শ্রুতিসম্মত হয়, ইহাও বুঝা আবশ্যক।

বড় সুখের কথা,—পতঞ্জলির মহাভাষ্য ও ভর্ত্তৃহরির "বাক্যপদীয়" প্রভৃতি মহাগ্রন্থের সম্প্রদায়-বেত্তা একমাত্র বাঙ্গালী অধ্যাপক ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীমান্ হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় কাশীর গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ হইতে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে আহূত হইয়া বঙ্গভাষায় মহাভাষ্যাদি গ্রন্থের অধ্যাপনাদি করিতেছেন। 'মাসিক বসুমতী'র পণ্ডিত পাঠকগণ শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত পতঞ্জলির মহাভাষ্য-ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া তাঁহার পাণ্ডিত্য বুঝিতেছেন। তন্ত্রশাস্ত্র এবং বৌদ্ধশাস্ত্র বিষয়েও শাস্ত্রী মহাশয়ের পাণ্ডিত্য তাঁহার নানা প্রবন্ধে প্রকটিত হইয়াছে। পরে শাস্ত্রী মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় কাল সম্বন্ধে কত মতের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং তাহাতে তিনি কত সংস্কৃত গ্রন্থের যে সংবাদ দিয়াছেন, তাহা একটি প্রবন্ধ লিখিয়া প্রকাশ করা অসম্ভব। তাঁহার সেই গ্রন্থ পাঠ করিলেই সে সমস্ত সম্যক্ বুঝা যাইবে। এত কাল পরে কালমাহাত্ম্যেই শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকটে আমরা **কালসিদ্ধান্তদর্শিনী** পাইয়াছি।*

পরন্তু এই গ্রন্থের প্রথমে কাশী গবর্ণমেণ্ট কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ নানা শাস্ত্রদর্শী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ এম-এ মহাশয়ের ইংরেজী ভাষায় সুলিখিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ যে ভূমিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে কাল সম্বন্ধে বহু সূক্ষ্মতত্ত্বের আলোচনা হইয়াছে। কাল সম্বন্ধে বহু মতের ব্যাখ্যা হইলেও আমার কিন্তু এখন সকল মতের মধ্যেই সেই ভগবদ্বাণী মনে আসে—"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ"।

স্বর্গীয় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ (মহামহোপাধ্যায়)।

---

* এই পুস্তকের মূল্য ২৲ টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—কলিকাতা, বাগবাজার ষ্ট্রীট ৬৫।৫বি গ্রন্থকারের বাসা।
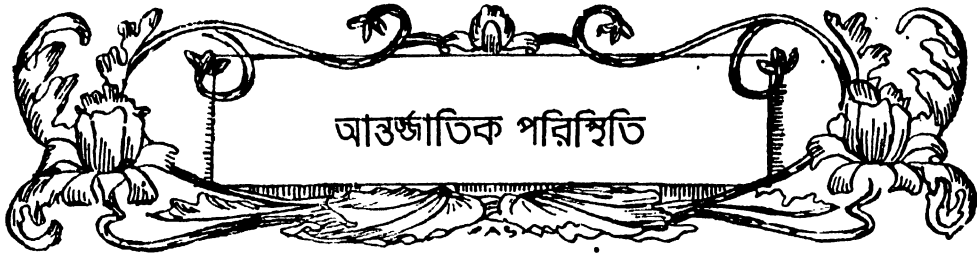
গত এক মাসে সমরানলের দহন-শিখা প্রাচীতে আরও ব্যাপ্ত হইয়াছে, আরও উজ্জ্বল ও ভয়ঙ্কর হইয়াছে। এই তীব্র শিখা আজ পশ্চিমে ভারতবর্ষকে স্পর্শ করিতেছে, দক্ষিণ-পূর্ব্বে ইহা দ্বৈপায়ন মহাদেশটিকে পরিবেষ্টিত করিতে উদ্যত। গত এক মাসে "এ-বি-সি-ডি" নামে পরিচিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের শেষ ব্যূহ ধূলিসাৎ হইয়াছে। এই রাষ্ট্র-চতুষ্টয়ের মধ্যে একটির প্রতিরোধ-প্রচেষ্টার সম্পূর্ণ অবসান ঘটিয়াছে, অবশিষ্ট তিনটি আবার নূতন ব্যূহ রচনা করিয়া শত্রুর বিরুদ্ধে নূতন ভাবে দাঁড়াইতে সচেষ্ট হইয়াছে।

অবশ্য, গত এক মাসের ঘটনাবলী সিঙ্গাপুর পতনের স্বাভাবিক পরিণতি—logical development. ওলন্দাজ পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের শেষ রক্ষাব্যূহ রচিত হইয়াছিল যাভায় ; কিন্তু সিঙ্গাপুরের বিশাল স্তম্ভ ব্যতীত এই ব্যূহের স্থৈর্য্য অসম্ভব। কাজেই, সিঙ্গাপুর-স্তম্ভ চূর্ণ হইবার পর যাভার ব্যূহ ধূলিসাৎ হইতে বিলম্ব হয় নাই। ব্রহ্মদেশে সিঙ্গাপুর পতনের দুর্নিবার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী ; তাই সিঙ্গাপুর পতনের পর দক্ষিণ-ব্রহ্ম অনায়াসে শত্রুর কবলিত হইয়াছে। সিঙ্গাপুর পতনে ভারত মহাসাগরে শত্রুর প্রবেশ-পথ এখন নির্ব্বিঘ্ন, সুতরাং এই মহাসাগরে কোন অরক্ষিত দ্বীপ অধিকার তাহার খেলার বিষয়।

যাভার যুদ্ধ—

গত ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে জাপানের যাভা পরিবেষ্টন-প্রয়াস সমাপ্ত হয়। তাহার পর, প্রচণ্ড বিমান আক্রমণের মধ্যে জাপানী সৈন্য এই দ্বীপে অবতরণ করিতে আরম্ভ করে। ওলন্দাজ সেনাপতিগণ জানিতেন—জাপান যদি যাভায় প্রচুর সৈন্য ও সমরোপকরণ অবতরণ করাইতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে বাধা দেওয়া দুঃসাধ্য হইবে ; সীমাবদ্ধ সমরায়োজন লইয়া প্রচণ্ডশক্তি শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবস্থিত যুদ্ধ (positional war) পরিচালন দুষ্কর। এই জন্য, যাভায় জাপানী সৈন্যের অবতরণ অসম্ভব করিয়া তুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই ; এই চেষ্টাতেই ওলন্দাজ নৌ-বহর সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়। পরে, অবতীর্ণ সেনাবাহিনীকে প্রতি-আক্রমণে প্রতিষ্ঠ করিয়া যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তনের যে চেষ্টা হয়, তাহাও বিফল হইয়াছিল।

যাভায় এক সপ্তাহের মধ্যে এক লক্ষ জাপানী সৈন্য অবতরণ করে ; সম্মিলিত পক্ষের সৈন্যের সহিত জাপানী সৈন্যের অনুপাত প্রতি এক জনে ৫ জন। জাপানের এই প্রাধান্য কেবল সৈন্য-সংখ্যায় নিবদ্ধ ছিল না—উভয় পক্ষের কামান, ট্যাঙ্ক প্রভৃতি সমরোপকরণের সংখ্যানুপাতও এইরূপ আশঙ্কাজনক ছিল। যাভার আকাশে জাপানী বিমান একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে।

ওলন্দাজ পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য দ্বীপগুলিতে জাপান যখন অধিকার-বিস্তার করিতেছিল, তখন জেনারল ওয়াভেলের নেতৃত্বে যাভায় শেষ রক্ষাব্যূহ রচনার প্রয়াস হয়। ফেব্রুয়ারী মাসে এই দ্বীপে নূতন সৈন্য ও সমরোপকরণ পৌঁছিবে বলিয়া আশা করা হইতেছিল। কিন্তু জাপান তাহার পূর্ব্বেই দ্বীপটি পরিবেষ্টিত করে এবং জাপানী বিমানের প্রচণ্ড আক্রমণে যাভার পোতাশ্রয়গুলি বিধ্বস্ত হয়। কাজেই, নূতন সৈন্য ও সমরোপকরণ প্রাপ্তির আশা মূলেই বিনষ্ট হইয়াছিল। কিছু মার্কিণী বোমাবর্ষী বিমান যাভায় পৌঁছিলেও প্রচুর জঙ্গী বিমানের অভাবে যাভার বিমানাশ্রয়গুলি রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই ; ফলে বোমাবর্ষী বিমানগুলির যথাযথ ব্যবহার অসম্ভব হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে কিছু ওলন্দাজ বিমান মালয়ে বিধ্বস্ত হয়। যাভার আকাশে একচ্ছত্র প্রভুত্ব লাভের পর ওলন্দাজ-দিগের অপেক্ষা ৫ গুণ অধিক জাপানী সৈন্য একরূপ বিনা বাধাতেই অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে ; মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই এ-বি-সি-ডি (আমেরিকা-বৃটিশ-চায়না-ডাচ্) রাষ্ট্রসঙ্ঘের শেষ "রক্ষাব্যূহ" চূর্ণ হয়।

যাভার পরে—

প্রশান্ত মহাসাগরে নিষ্কণ্টক হইবার জন্য অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড সম্বন্ধে জাপানের উৎকণ্ঠার অবসান হওয়া প্রয়োজন। মার্কিণী সাহায্যে পুষ্ট হইয়া এই অঞ্চল হইতে মিত্রশক্তি যদি অদূর ভবিষ্যতে প্রতি-আক্রমণে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে জাপানের প্রাথমিক সাফল্যের গুরুত্ব সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এই জন্য যাভার পরই জাপান এই অঞ্চলের প্রতি অবহিত হয়।

নিউ গিনিকে অষ্ট্রেলিয়ার "পাদভূমি" বলা যাইতে পারে। য়্যাম্বয়না, নিউ বৃটেন ও নিউ আয়ার্লণ্ডে অধিকার বিস্তার করিয়া জাপান পূর্ব্ব হইতে নিউ গিনি পরিবেষ্টিত করিয়াছিল। তাহার পর, গত ৮ই মার্চ্চ জাপানী সৈন্য নিউ গিনিতে অবতরণ করে। নিউ গিনিতে সম্মিলিত পক্ষের প্রতিরোধ এখনও সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই। জাপানীদিগের পোর্ট মোর্সবী অধিকারের দাবী

অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান-মন্ত্রী মিঃ কার্টিন অসত্য বলিয়াছেন। জাপানীরা ইতোমধ্যে নিউ গিনির পূর্ব্বদিকে সলোমন দ্বীপপুঞ্জ অধিকারের দাবীও জানাইয়াছে।

গত ফাল্গুন মাসের 'মাসিক বসুমতী'তে বলিয়াছিলাম—"যাভার পরই সমগ্র নিউ গিনির প্রান্তে জাপানের অবহিত হওয়া সম্ভব। * * * * * নিউগিনির পর অষ্ট্রেলিয়া এবং তাহার পর নিউজিল্যাণ্ড আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।" গত এক মাসের ঘটনাবলী লক্ষ্য করিয়া মনে হয়—জাপান হয়ত সত্বর অষ্ট্রেলিয়ায় সৈন্য অবতরণ করাইতে চাহে না। অষ্ট্রেলিয়ার লোক-সংখ্যা মাত্র ১ কোটি হইলেও ইহার আয়তন ৩০ লক্ষ বর্গ মাইল—অর্থাৎ ভারতবর্ষের আয়তন অপেক্ষা দেড়-গুণেরও অধিক। শক্রশক্তির স্বল্পতা সত্ত্বেও এই বিশাল দেশের বন্ধুর অঞ্চলে শত্রুকে বহু দিন ব্যাপৃত রাখা সম্ভব। এই জন্য মনে হয়—জাপান আপাততঃ অষ্ট্রেলিয়ায় প্রত্যক্ষ আক্রমণ (invasion) পরিচালনের বিপদ স্বীকার না করিয়া 'দ্বৈপায়ন' মহাদেশটি পরিবেষ্টনে উদ্যোগী হইতে পারে। বস্তুতঃ বর্ত্তমানে এই অঞ্চলে সে যেন এইরূপ অভিসন্ধি লইয়াই অগ্রসর হইতেছে। সলোমনের পর ফিজি, নিউ হীব্রাইড্স, নিউ ক্যালিডোনিয়া—এমন কি, নিউজিল্যাণ্ড অধিকার করিয়া জাপান অষ্ট্রেলিয়াকে পশ্চিম গোলার্দ্ধের সহিত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন-সংযোগ করিতে প্রয়াসী হইতে পারে। অবশ্য, নিউজিল্যাণ্ড আক্রমণের পূর্ব্বে, পূর্ব্ব-প্রশান্ত মহাসাগরে বৃটিশের অগণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপগুলি অধিকারের জন্য হয়ত জাপান সচেষ্ট হইবে। অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের পারস্পারিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিবার প্রয়াসও হইতে পারে। পূর্ব্ব-প্রশান্ত মহাসাগরে সর্ব্বপ্রধান মার্কিণী ঘাঁটী হাওই জাপানীর প্রাথমিক আক্রমণে দুর্ব্বল হইলেও উহার শক্তি পুনরায় বর্দ্ধিত হইয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরে সম্ভাবিত প্রতি-আক্রমণের শেষ ঘাঁটী বিনষ্ট করিবার উদ্দেশে জাপানের হাওইর প্রতি অবহিত হওয়াও অসম্ভব নহে। সংক্ষেপে, অষ্ট্রেলিয়ায় সৈন্য অবতরণ করাইয়া প্রত্যক্ষ আক্রমণে প্রবৃত্ত না হইয়া জাপান হয়ত বর্ত্তমানে পশ্চিম গোলার্দ্ধের সহিত অষ্ট্রেলিয়ার সংযোগ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিতে প্রয়াসী হইবে; সামরিক প্রয়োজনে এই প্রয়াসের গতি কিরূপ হইবে, তাহা নিশ্চিত অনুমান করা দুঃসাধ্য। সিঙ্গাপুরের পতনে জাপানী নৌবহর ভারত মহাসাগরে প্রবেশপথ পাইয়াছে। কাজেই, ঐ মহাসাগরে কতকগুলি ঘাঁটী অধিকার করিতে পারিলে জাপান পশ্চিম দিকে অষ্ট্রেলিয়ার সামুদ্রিক সংযোগ সহজেই বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে:

ব্রহ্মদেশের রণাঙ্গন

বস্তুতঃ পশ্চিম দিক সম্বন্ধে জাপানের দুশ্চিন্তা অল্প।

অষ্ট্রেলিয়া পরিবেষ্টন-প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ায় বিমান আক্রমণের প্রাবল্য বর্দ্ধিত হইয়াছে; অদূর ভবিষ্যতে এই প্রাবল্য আরও বর্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনা। জাপানী রাষ্ট্রনায়কগণ হয়ত আশা করেন—অষ্ট্রেলিয়াকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন-সংযোগ করিয়া প্রচণ্ড বোমা বর্ষণে ঐ দেশের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদিগের জীবনযাত্রা যদি বিঘ্ন-কণ্টকিত করিয়া তুলা যায়, তাহা হইলে তাহারা আত্ম-সমর্পণে বাধ্য হইবে।

ব্রহ্মদেশে জাপানী অভিযান—

গত ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যভাগে সিঙ্গাপুরের পতনের পর ব্রহ্মদেশে যুদ্ধের গতি সাময়িক মন্দীভূত হইয়াছিল। মার্চ্চ মাসের প্রথমে জাপানী সৈন্য সিটাং নদী অতিক্রম করিয়া পেগু অধিকার করিলে ৭ই মার্চ্চ সমুদ্রপথে জাপানী সেনা রেঙ্গুণে অবতরণ করিতে আরম্ভ করে। রেঙ্গুণে বৃটিশ সৈন্য পরিবেষ্টনের প্রয়াস সফল হয় নাই; জাপানীরা রেঙ্গুণ-প্রোম রেলপথের দিকে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই রেঙ্গুণ হইতে বৃটিশ সৈন্য অপসারণ সম্ভব হইয়াছিল। অপসারণের সময় বৃটিশ সৈন্য রেঙ্গুণ ধ্বংস করিয়া আসিয়াছে; সীরিয়ামের পেট্রল সংশোধনাগারও বিনষ্ট হইয়াছে। অতঃপর, জাপ-সৈন্য লেট্পেডান পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া বেসিনকে বিচ্ছিন্ন-সংযোগ করে; পরে, বেসিন্ (সম্ভবতঃ সমুদ্রপথে) অধিকৃত হইয়াছে।

উত্তর-ব্রহ্মের উদ্দেশে আরব্ধ যুদ্ধে জাপানের আক্রমণের বেগ পূর্ব্বাঞ্চলে অর্থাৎ সিটাং উপত্যকায় প্রবল। ইহার কারণ দ্বিবিধ; জাপান এই অঞ্চলে সন্নিবিষ্ট চীনা-বাহিনীকে সর্ব্বাগ্রে পর্য্যুদস্ত করিতে চাহে। উত্তর-পূর্ব্ব ব্রহ্মে চীনা সৈন্যের ক্রমিক দলপুষ্টি জাপানের পক্ষে উৎকণ্ঠার বিষয়; ইতোমধ্যে দুইটি শক্তিশালী চীনা বাহিনী না কি শান রাজ্যের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া থাইল্যাণ্ডে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। মিত্রশক্তির পক্ষ হইতে যদি প্রতি-আক্রমণ চালাইয়া যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তন করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে সমর-প্রচেষ্টা সম্পর্কে জাপানের পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হইবে। এই জন্য প্রথমে চীনাদিগকে দমনের চেষ্টা হইতেছে; হয়ত জাপানী সেনা সর্ব্বাগ্রে উত্তর-পূর্ব্ব ব্রহ্মে অধিকার বিস্তার করিয়া ব্রহ্ম-চীন সংযোগ বিনষ্ট করিতে প্রয়াসী হইবে এবং তাহার পর ব্রহ্মের অবশিষ্টাংশের প্রতি অবহিত হইবে।

ফিলিপাইনের প্রেসিডেণ্ট কোয়েজন

মার্কিনী সেনাপতি জেনারল ম্যাক্-আর্থার

ইরাবতী অঞ্চলে শত্রুর অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয়তায় উৎসাহিত হইবার কারণ নাই। বেসিন্ হইতে উত্তরাভিমুখে অগ্রগামী জাপ-বাহিনী এবং সিটাং অঞ্চলের জাপ-সৈন্যের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইবার আশঙ্কায় ইরাবতী উপত্যকায় বৃটিশ সৈন্য পশ্চাদপসরণে বাধ্য হইবেই। তাহার পর, সমুদ্রপথে আরাকান্ অঞ্চলে জাপানী সৈন্যের অবতরণ এখন সহজসাধ্য। বিমানবাহী জাহাজের সাহায্যে অথবা দক্ষিণ-ব্রহ্মের কোন বিমান-ঘাঁটী হইতে আরাকানের সর্ব্বপ্রধান বন্দর আকিয়াব অনায়াসে বোমা-বিধ্বস্ত হইতে পারে। প্রবল বোমা বর্ষণের পর সমুদ্রপথে সৈন্য অবতারণ জাপানীদিগের সমর-নীতি। উত্তর-আরাকানে এই নীতির অনুসরণ এখন শত্রুর পক্ষে অনায়াসসাধ্য। অকস্মাৎ আরাকানে সৈন্য অবতরণ করাইয়া জাপান ইরাবতী নদীর তৈল-কূপে অধিকার-বিস্তৃতির জন্য প্রয়াসী হইতে পারে। ইহাতে প্রোম অঞ্চলের বৃটিশ সৈন্যও বিশেষ ভাবে বিপন্ন হইতে পারে।

দক্ষিণ-ব্রহ্ম হইতে প্রধানতঃ ইরাবতী এবং সিটাং নদীর উপত্যকা ধরিয়াই উত্তরাভিমুখে যাইবার পথ। জাপানের আক্রমণও প্রধানতঃ এই দুইটি পথ ধরিয়া চলাই স্বাভাবিক। জাপান ইরাবতী অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় থাকিয়া সিটাং উপত্যকাতেই বিশেষ ভাবে মনোযোগ প্রদান করিয়াছে। তবে, শুনা গিয়াছে—একটি জাপানী সেনাদল বেসিন হইতে সমুদ্রপথে আকিয়াব অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। সিটাং উপত্যকায় জাপানী সৈন্য কৌশলে টঙ্গু আক্রমণ করে; প্রথমে টঙ্গুর বিমানঘাঁটি অধিকার করিয়া জাপ-বাহিনী টঙ্গুর চীনা সৈন্যদলকে পরিবেষ্টিত করিয়া ফেলে। ঐ সময় টঙ্গুর ২০ মাইল উত্তরে দুইটি স্থানে রেঙ্গুণ-মান্দালয় পথ বিচ্ছিন্ন করা হয়।

মোটের উপর, ব্রহ্মদেশে যুদ্ধের অবস্থা আশাপ্রদ নহে। রেঙ্গুণ অধিকারের পর জাপানীরা কিছু দিন নিষ্ক্রিয় ছিল। তাহার পর, জাপ-সেনার আক্রমণ প্রবল হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই মধ্যব্রহ্মে মিত্রশক্তির অবস্থান-ক্ষেত্র বিপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মদেশে চীনা সৈন্যের আগমনে মিত্রশক্তির সমর-নায়কদিগের হয়ত আর সৈন্য-সংখ্যার স্বল্পতার জন্য

অনুযোগের কারণ নাই। তবে, সমরোপকরণ—বিশেষতঃ বিমানের স্বল্পতার জন্য তাঁহারা এখনও অসুবিধা বোধ করিতেছেন। ব্রহ্মের চীনা-বাহিনীর মার্কিণী অধিনায়ক জেনারল্ ষ্টিল্‌ওয়েল্ সম্প্রতি বলিয়াছেন—"চীনারা বোমা বর্ষণে ভীত হয় না; তবে, টঙ্গুর চতুঃপার্শ্বে মধ্যব্রহ্মের উন্মুক্ত অঞ্চলে বিমানশক্তির প্রাধান্য গুরুত্বপূর্ণ। মিত্র-শক্তির বিমান-সংখ্যা যদি বর্দ্ধিত হইত, তাহা হইলে সৈন্যরা সম্ভবতঃ অত্যন্ত উৎসাহী হইয়া উঠিত।" আধুনিক যুদ্ধে সাফল্য লাভের জন্য অন্তরীক্ষে প্রাধান্য স্থাপন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। ব্রহ্মের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রাংশে জাপানী নৌবহর প্রভাব-বিস্তার করিয়াছে; তাহার-পর স্থলভাগেও যদি শত্রুর বিমানশক্তি অধিকতর প্রবল হয়, তাহা হইলে উহা আতঙ্কের কথা। ইহা ব্যতীত, শত্রুর সহিত বিদ্রোহী বর্ম্মীদিগের ঘনিষ্ঠ সহযোগ বৃটিশ বাহিনীর সমর-প্রচেষ্টায় বিশেষ বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে।

বক্ষে প্রথম পাদভূমি লাভ করিল। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অধিকারে তাহার বিলম্ব হইবে না। সিংহল তাহার পরবর্ত্তী লক্ষ্য। তথা হইতে কয়েকটি গুরুত্ব-হীন দ্বীপকে পাদভূমিরূপে ব্যবহার করিয়া জাপান ম্যাডাগাস্কারের উদ্দেশে লম্ফ প্রদান করিতে পারে। ম্যাডাগাস্কার অধিকৃত হইলেই সমগ্র ভারত মহাসাগরে জাপানের প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে; ভারতবর্ষ অবরোধও সম্পূর্ণ হইবে। পশ্চিম দিক্ হইতে অষ্ট্রেলিয়ায় আর পিপীলিকাটি পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারিবে না। ইরাণের পথে রুশিয়ায় মার্কিণী সাহায্যের প্রবেশ বন্ধ করাইবার উদ্দেশ্যে, ম্যাডাগাস্কার সম্পর্কে জার্ম্মাণী ভিসি কর্ত্তৃপক্ষকে জাপানের অনুকূলে প্রভাবান্বিত করিতে পারে। সিংহল হইতে জাপান লাক্ষা দ্বীপ ও মাল দ্বীপ অধিকার করিয়া সকোট্রা—এমন কি, এডেন অধিকারেরও প্রয়াস করিতে পারে।

গুয়াম—যুদ্ধ-ঘোষণার অব্যবহিত পরেই জাপান এই দ্বীপ অধিকার করিয়া ফিলিপাইনকে বিচ্ছিন্ন করে

জাপানী আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্বে ওয়েক্ দ্বীপ

জাপানের আন্দামান অধিকার—

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী পোর্ট ব্লেয়ারে বোমা বর্ষিত হয়। তাহার পর, গত ২৫শে মার্চ্চ জাপানীদিগের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ অধিকারের কথা ঘোষিত হইয়াছে। পরে বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ ইডেন জানাইয়াছেন যে, ১২ই মার্চ্চ আন্দামান হইতে বৃটিশ সৈন্য অপসারিত হইয়াছিল।

জাপানীদিগের আন্দামান অধিকারে সিংহল ও মাদ্রাজ হইতে তাহাদিগের নিকটতম বিমান-ঘাঁটীর দূরত্ব প্রায় ৫ মাইল হ্রাস পাইয়াছে। তবে, আন্দামান অধিকার করিয়া জাপান বাঙ্গালার অধিকতর নিকটবর্ত্তী হয় নাই; চট্টগ্রাম বা কলিকাতা হইতে দক্ষিণ-ব্রহ্মের দূরত্ব যত, তাহা অপেক্ষা আন্দামানের দূরত্ব অধিক। জাপানের ভারত মহাসাগরে প্রভুত্ব-বিস্তার-প্রয়াসের সম্ভাবনা সম্পর্কে ফাল্গুন মাসের 'মাসিক বসুমতী'তে বিশদ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। আন্দামান অধিকার করিয়া জাপান ভারত মহাসাগরের

জাপান-জার্ম্মাণী সহযোগ—

কেহ কেহ অনুমান করেন—আগামী গ্রীষ্মকালে প্রাচী ও প্রতীচীতে ফ্যাসিষ্ট শক্তির সমর-প্রচেষ্টায় পারস্পরিক সহযোগের ব্যবস্থা হইবে। কেহ কেহ বলেন—ঐ সময় জার্ম্মাণী পশ্চিম দিক্ হইতে এবং জাপান পূর্ব্ব দিক্ হইতে সোভিয়েট রুশিয়া আক্রমণ করিবে। কাহারও কাহারও ধারণা—জার্ম্মাণী পশ্চিম-এশিয়ায় অগ্রসর হইবে এবং জাপান ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবে।

এই দুই পক্ষের কাহারও যুক্তির সারবত্তা উপেক্ষা করা যায় না। পূর্ব্ব-সাইবেরিয়া জাপানের উদ্দেশে উদ্যত খড়্গের ন্যায়, এই খড়্গ উপেক্ষা করিয়া জাপান অন্য দিকে—বিশেষতঃ ভারতবর্ষের ন্যায়, "দ্বিতীয় চীনে" অভিযান পরিচালনে ইতস্ততঃ করিতে পারে। সমগ্র ব্রহ্মদেশ জাপানের অধিকৃত হওয়ায় প্রস্তাবিত চীন-ভারত পথ যদি বিচ্ছিন্ন হয়ও, তাহা হইলেও

চীনের প্রতিরোধ-বহ্নি নির্ব্বাপিত হইবে না। ভারত মহাসাগরে প্রভুত্ব-বিস্তৃতির ফলে ভারতবর্ষ যদি অবরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে ইহার সম্বন্ধে স্বভাবতঃ জাপানের দুশ্চিন্তার অবসান হইবে। অবরুদ্ধ ভারতের কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলে বিমান আক্রমণ চালিত হইলে ভারতবর্ষের সমরায়োজন অগ্রসর হইতে পারিবে না। কাজেই, নিষ্কণ্টক হইবার জন্য সাইবেরিয়া আক্রমণে জাপানের প্রয়াস অসম্ভব নহে।

আবার ইহাও সত্য যে, রুশিয়া এখন পশ্চিম অঞ্চলে বিশেষ ভাবে ব্যাপৃত। এই সময় জাপান যদি রুশিয়াকে উত্যক্ত না করে, তাহা হইলে সাইবেরিয়ার দিক্ হইতে তাহার আশঙ্কার অধিক কারণ নাই। তাহার পর, পূর্ব্ব-সীমান্তে সোভিয়েট রুশিয়ার সামরিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে গঠিত। পশ্চিম অঞ্চলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকা সত্ত্বেও সাইবেরিয়ায় সে জাপানকে প্রবল ভাবে প্রতিরোধ করিবে। ভ্লাডিভোষ্টক অঞ্চল হইতে বিমান আক্রমণ চালাইয়া অনায়াসে জাপানী দ্বীপপুঞ্জের কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহগুলি ভূমিসাৎ করা যায়; জাপানের শ্রমশিল্পকেন্দ্রে বিপর্য্যয় সৃষ্টি করাও সম্ভব। কাজেই, সাইবেরিয়া আক্রমণ করিয়া বিপদ ডাকিয়া আনিতে জাপান এখন দ্বিধানুভব করিতে পারে। বরং জার্ম্মাণীর সহযোগে ভারতবর্ষের প্রতি অবহিত হইতে প্রলুব্ধ হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব।

উভয় দিক্ চিন্তা করিয়া জাপানের ভবিষ্যৎ আক্রমণ-পরিকল্পনা সম্বন্ধে নিশ্চিত অনুমান করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। তবে, ইহা সত্য—জাপান যে দিকেই অগ্রসর হউক না কেন, ভারত মহাসাগরে সে প্রভুত্ব-বিস্তারে প্রয়াসী হইবেই। ভারতবর্ষে প্রত্যক্ষ আক্রমণ (invasion) চালিত না হইলেও ভারতের কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলে বিমান আক্রমণের সম্ভাবনা থাকিবে।

২৯।৩।৪২

রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধ—

রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধে সম্প্রতি কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। সোভিয়েট বাহিনী ক্রমাগত প্রতি-আক্রমণে প্রবৃত্ত থাকিয়া জার্ম্মাণীর গ্রীষ্মকালীন অভিযানের আয়োজনে বিশেষ বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে। তবে, সোভিয়েট বাহিনীর অগ্রগতি এবং পুনরধিকৃত অঞ্চলের আয়তন অধিক নহে।

সম্প্রতি বুল্‌গেরিয়ার রাষ্ট্রনায়কদিগের রহস্যজনক গতিবিধি, গ্রীসে জার্ম্মাণ সেনাপতি ফন্ ব্রাউকিট্‌সের উপস্থিতি, ঈজিয়ান সাগরে জার্ম্মাণীর আয়োজন প্রভৃতি হয়ত জার্ম্মাণীর গ্রীষ্মকালীন অভিযানের পূর্ব্বাভাস। জার্ম্মাণী ঐ সময়ে রুশিয়ার মধ্য ও উত্তর রণক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় থাকিয়া দক্ষিণ-রুশিয়া এবং পশ্চিম-এশিয়ায় প্রচণ্ড আঘাত করিতে প্রয়াসী হইতে পারে। সম্প্রতি লিবিয়ায় জেনারল রোমেলের সৈন্য ও শস্ত্রশক্তি বর্দ্ধিত হইয়াছে। হয়ত জার্ম্মাণী একই সময়ে কৃষ্ণসাগরের উত্তর তীর ধরিয়া ককেসাস্, দক্ষিণ তীর ধরিয়া ইরাণ-ইরাকের তৈলকেন্দ্র এবং মিশরের মধ্য দিয়া সুয়েজের দিকে অগ্রসর হইবার আয়োজন করিতেছে। তুরস্কের বিপদ হয়ত আসন্ন। জার্ম্মাণী যদি এইভাবে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে ঐ সময় জাপানও পূর্ব্ব দিক্ হইতে ভারতবর্ষের প্রতি অবহিত হইতে পারে। এই সময় জাপান সমুদ্রপথে অগ্রসর হইয়া পারস্যোপসাগরের তীরে প্রতীচীর মিত্রের সহিত সংযোগ-স্থাপনে প্রয়াসী হইবে। পরে, এই পথে জাপানের নব-লব্ধ অঞ্চলের "রস" জার্ম্মাণীতে বাহিত হইবে।

শ্রীঅতুল দত্ত।

অস্তাচলের আহ্বান

দিবসের ক্লান্ত দেহে বেলাশেষে রক্ত-রশ্মিজালে
বিদায়ের শেষ বাণী এঁকে দিল অস্তাচল-ভালে।
সুনীল গগন ছেয়ে ছড়াইল তারকার মালা;
আঁধারের বুকে যেন মণিময় দীপশিখা জ্বালা।
পথের সন্ধান দিতে কে ডাকিছে, 'ওরে পথচারি!
সন্ধ্যা যে ঘনায়ে এল, এইবার দিতে হবে পাড়ি।'
বিদায়ের শেষ-বাণী ডেকে যায় আজি পথে পথে;
সাগরের নীল জলে ডুবে-যাওয়া আলোকের রথে।
বালুকার বুকে আঁকা পথ-চলা পদচিহ্নগুলি
হারান সুরের মত স্মৃতিপথে উঠিছে চঞ্চলি।
আলোড়ি তুলিছে হিয়া, সুনিবিড় তিমিরের কোলে;
স্নেহ-আঁখি, জননীর ডাকে যেন মধুমাখা বোলে—
ডেকে যায় 'আয় আয় ব্যথাতুর ওরে!' বারে বারে;
জীবনের বেলা-শেষে মরণের মহাসিন্ধু-পারে।
কম্পিত বক্ষের দ্বারে ঘন ঘন করাঘাত করি,
মৃত্যুরে করিয়া তুচ্ছ—সুধামৃতে দেয় হিয়া ভরি।

শ্রীনকুলেশ্বর পাল (বি-এল)।

ব্রহ্মে ভারতবাসী

ব্রহ্মের একাংশ জাপান কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। যে সময় আমরা এই রচনা লিপিবদ্ধ করিতেছি, তখন জাপান ব্রহ্মের অবশিষ্ট অংশও অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে—তথায় ইংরেজের সেনাদল ও চীনা সৈনিকরা জাপানীদিগের আক্রমণে পশ্চাদপসরণ করিতেছে। কোন কোন স্থানে ব্রহ্মের লোক বিজয়ী জাপানীদিগের সহিত যোগ দিয়াছে—অনেক স্থলে তাহারাই আক্রমণকারীদিগকে পথের সন্ধান দিতেছে, ইংরেজরা কোথাও থাকিলে তাহার সন্ধান দিতেছে। স্থানত্যাগের পূর্ব্বে ইংরেজরা তথায় যে সকল প্রতিষ্ঠান শত্রুহস্তে পতিত হইলে তাহারা উপকৃত হইতে পারে, সে সকল ধ্বংস করিয়া দিয়াছে; ব্রহ্মের পেট্রল পরিষ্কার করিবার কারখানা ও সিমেণ্টের কারখানা সে সকলের মধ্যে উল্লেখ করা যায়। যাহা দীর্ঘকাল শ্রমে ও অধ্যবসায়ে এবং কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, কয় মিনিটের মধ্যে তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মানুষ—সভ্যতাভিমানী মানুষ এই ভাবেই বিজ্ঞানকে ধ্বংসের বাহন করিয়া ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। আর সেই শিক্ষার গর্ব্বে সে গর্ব্বিত !

ব্রহ্মের রাজধানী রেঙ্গুন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে—রেঙ্গুন যখন জ্বলিতেছিল, তখন তাহার অগ্নিশিখা ২০ মাইল দূর হইতেও ধূমমলিন আকাশে লক্ষিত হইয়াছিল। কি দৃশ্য !

সে যাহাই হউক, আমরা ব্রহ্ম-প্রবাসী ভারতীয় নরনারীশিশুদিগের জন্য আজ অধিক বিচলিত। ইংরেজ কর্তৃক ব্রহ্ম অধিকৃত হইবার সময় হইতেই দলে দলে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ভারতবাসী অর্থার্জ্জনের ও অন্নার্জ্জনের জন্য সে দেশে গিয়াছেন। এক দিকে যেমন ভারতীয় ব্যবহারাজীব, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী, বিচারক, সরকারী চাকরীয়া ব্রহ্মে দলে দলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন—তথায় গৃহ ও সম্পত্তি করিয়াছেন, অন্য দিকে তেমনই লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত ভারতীয় তথায় শ্রমিকের কায করিতে গিয়াছে। এক দিন যেমন প্লীনী দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষ তাহার পণ্যের বিনিময়ে রোমক সাম্রাজ্য হইতে বহু অর্থ শোষণ করে, তেমনই ইদানীং ব্রহ্মের লোকরা মনে করিতেছিল, ভারতীয়রা আসিয়া তাহাদিগের দেশের "সার শস্য" গ্রাস করিতেছে। ইহাতে—এই ভাব অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মধ্যে ব্যাপ্তির ফলে—মধ্যে মধ্যে হাঙ্গামা হইয়াছে এবং ব্রহ্ম ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর তথায় যে সকল আইন প্রণীত হইয়াছে, সে সকলে তথায় ভারতীয়দিগের অর্থ ও সম্পত্তি বিপন্ন হইয়াছে—ভারতীয়দিগের অধিকার-সঙ্কোচ হইয়াছে। শেষে ভারত সরকার—ভারতের ব্যবস্থা পরিষদের মতের অপেক্ষা পর্য্যন্ত না রাখিয়া—ব্রহ্ম সরকারের সহিত যে চুক্তি করেন, তাহাতে ভারতবাসীর অধিকার নষ্ট হওয়ায় ভারতবাসীর মনে অসন্তোষের উদ্ভব অনিবার্য্য হয়। অথচ সেই চুক্তির পরও ব্রহ্ম সরকারকে ভারতবর্ষ হইতে কয় সহস্র শ্রমিক পাঠাইবার জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ-জ্ঞাপন করিতে হইয়াছিল। সেই সকল ভারতীয় শ্রমিক না পাইলে ব্রহ্মের ধানের ফশল সংগ্রহ করা ব্রহ্মের লোকের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

যখন রেঙ্গুন পর্য্যন্ত জাপানীরা অধিকার করে—তখন বুঝা যায়, জলপথ বিপদসঙ্কুল এবং যে সকল ভারতবাসী সর্ব্বস্বান্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের জন্য জাহাজে আবশ্যক স্থান হইত না। তখন অনেকে বাধ্য হইয়া অব্যবহৃত স্থলপথেই ভারতযাত্রা করেন।

ভারত সরকার ব্রহ্মপ্রবাসী এই সকল লোককে ফিরাইয়া আনিবার কোন ব্যবস্থা করেন নাই। অথচ এক জন ভারতীয়—শ্রীযুত মাধব শ্রীহরি এনী বড়লাটের বিবর্দ্ধিত শাসন-পরিষদে সাগরপারস্থ ভারতীয়দিগের স্বার্থরক্ষার ভারপ্রাপ্ত সদস্য !

ব্রহ্মে জাপানীরা কি করিবে সে ভয় ও ব্রহ্মের অধিবাসীদিগের অত্যাচারের ভয়—ভারতীয় নরনারীদিগকে পদব্রজে বা কোনরূপ যান সংগ্রহ করিয়া দুর্গম— শ্বাপদসঙ্কুল পথে ভারতের দিকে যাত্রা করিতে প্রণোদিত করে—তাহাদিগের অন্য উপায় ছিল না। যে সকল মহিলা কখন পদব্রজে এক সঙ্গে দুই মাইল পথ অতিক্রম করেন নাই, তাঁহারাও শিশু ও বালকবালিকাদিগকে লইয়া—অনেক স্থলে অভিভাবকশূন্য অবস্থায় সেই দুর্গম পথ গ্রহণ করেন। পথে ভারত সরকার বা ব্রহ্মের বৃটিশ সরকার তাঁহাদিগের জন্য কোন ব্যবস্থা করেন নাই—আশ্রয় ছিল না, খাদ্যের এমন কি পানীয় জলেরও অভাব ছিল। সেই অবস্থায় যদি পথে লোক রোগে বা খাদ্য-পানীয়ের অভাবে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে, তবে তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

কিন্তু ব্যবস্থা না করা অপেক্ষাও ভীষণ অভিযোগ আমরা পাইয়াছি—তাহার প্রমাণও প্রচুর।

এই প্রমাণিত অভিযোগ—ব্যবহার-বৈষম্যের। এ দেশে আমরা বর্ণগত ব্যবহার-বৈষম্যের বহু দৃষ্টান্তে অভ্যস্ত। এ দেশের ধর্ম্মাধিকরণেও অভিযুক্ত য়ুরোপীয়দিগের বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা স্বীকৃত ছিল এবং একাধিক ইংরেজ স্বীকার করিয়াছেন—য়ুরোপীয়ের সহিত ভারতীয়ের মামলায় ভারতীয়দিগের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রে ন্যায্য বিচার লাভ ঘটে না। ব্রহ্ম হইতে সর্ব্বস্বান্তদিগের ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ও সেই ব্যবহার-বৈষম্য সপ্রকাশ হইয়াছে। যে পথের দুর্গমতার বিষয় আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, সেই পথের একাংশে ভারতীয়দিগকে আসিতে না দিয়া কেবল য়ুরোপীয়—এমন কি ফিরিঙ্গীদিগকেও আসিতে দেওয়া হইয়াছে।

'দৈনিক বসুমতী' সর্ব্বপ্রথম এই ব্যবহার-বৈষম্যের উল্লেখ করিবার পর ইহা অন্যান্য স্থানেও স্বীকৃত হয় এবং উড নামক এক জন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারী ইহার যে কারণ নির্দ্দেশ করেন, তাহা ঔদ্ধত্যে ভারতবাসীর ক্ষতে ক্ষারক্ষেপ করিয়াছে। তিনি বলেন :—

(১) যে পথে ভারতীয়াতিরিক্তদিগকেই আসিতে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বহু লোক আসিতে দিলে তথায় য়ুরোপীয়দিগের ব্যবহারযোগ্য যে খাদ্যদ্রব্য কোন কোন য়ুরোপীয় প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিল, তাহা ফুরাইয়া যাইত।

(২) ভারতীয়দিগের মধ্যে শতকরা ৯৫ জন শ্রমিক শ্রেণীর। তাহারা স্বাস্থ্যরক্ষার প্রাথমিক নিয়মও জানে না। ঐ পথে তাহাদিগকে আসিতে দিলে তথায় সংক্রামক ব্যাধির বিস্তারলাভ ঘটিত।

অর্থাৎ যে পথে খাদ্যপানীয়ের ব্যবস্থা ছিল, সে পথ ভারতীয়দিগের পক্ষে নিষিদ্ধ করা হয়। য়ুরোপীয়দিগের জন্য—পূর্ব্বাহ্লেই জানিয়া—কোন কোন য়ুরোপীয় প্রতিষ্ঠান আহার্য্যপ্রভৃতি পাঠাইয়াছিল—অথচ ভারতীয় সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতীয়দিগের জন্য সে ব্যবস্থা করিবার অনুমতি চাহিলে তাহাদিগকে সে অনুমতি দেওয়া হয় নাই। ঐ পথে দৈনিক মাত্র ৫০ জন বা ঐরূপ সংখ্যক য়ুরোপীয় ও ফিরিঙ্গী আসিয়াছে; আর দৈনিক প্রায় দেড় হাজার ভারতীয় অন্য ও নিকৃষ্ট পথে আসিতে বাধ্য হইয়াছে—যাহারা ইংরেজের শাসনকালে ব্রহ্মের সমৃদ্ধিসাধনের প্রধান কারণ হইয়াছিল, তাহারা সেই পথে খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে বা রোগে চিকিৎসা না পাইয়া অশেষ কষ্টভোগ করিয়াছে এবং কাহারও কাহারও মৃত্যু ঘটিয়াছে। য়ুরোপীয়—এমন কি ফিরিঙ্গীদিগেরও জীবন ভারতীয়ের জীবনের তুলনায় অধিক মূল্যবান্—এই বিশ্বাস যে ঐ আপত্তিকর ব্যবস্থার কারণ, তাহা বলা বাহুল্য। এই ব্যবহার-বৈষম্য যে লক্ষ লক্ষ ভারতীয়ের মনে বর্ত্তমান শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত করিবে, তাহা অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই।

ব্রহ্ম হইতে যে সকল ভারতীয়—ইংরেজ সে দেশ শত্রুর আক্রমণে রক্ষা করিতে না পারায় এবং ইংরেজ রেঙ্গুন নগর ধ্বংস করিয়া আসায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া আসিয়াছে, তাহাদিগের অনেকের ব্রহ্মে বহু সম্পত্তি ছিল। সে সকল সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে, তাহা তাহারা জানিতে চাহিয়াছে। হয়ত যুদ্ধ শেষ না হইলে তাহা জানা যাইবে না। ব্রহ্মে ডাকঘরে ও অন্য ব্যাঙ্কে তাহাদিগের যে টাকা ছিল, তাহা ভারতে তাহাদিগকে বা তাহাদিগের উত্তরাধিকারীদিগকে দেওয়া হইবে কি না, তথায় য়ুরোপীয়-পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলিতে যে সব টাকা জমা ছিল সে সব কোথায় পাওয়া যাইবে, সরকারী চাকরীয়াদিগের বেতন, পেন্সন বা প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে, সে দেশের পোর্ট ট্রাষ্টের ও মিউনিসিপ্যালিটীর ঋণে যে টাকা দেওয়া হইয়াছিল, কে তাহা পরিশোধ করিবে, ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে চাকরীয়াদিগের প্রাপ্য টাকা প্রদান করা হইবে কি না—এই সকল প্রশ্ন যত জটিলই কেন হউক না, এ সকলের উত্তর দিতে হইবে।

যে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় নিঃসম্বল অবস্থায় ভারতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে কোন কোন সেবা-প্রতিষ্ঠান কোনরূপে স্ব স্ব প্রদেশে গমনের সহায় হইয়া অশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন বটে, কিন্তু এই লক্ষ লক্ষ লোকের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা করা কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না। সামরিক প্রয়োজনে এ দেশের ইংরেজ সরকার যে বহু লোককে কায দিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে এই যে সকল ভারতীয়কে তাঁহারা ব্রহ্মে শত্রুর আক্রমণে রক্ষা করিতে অক্ষম হইয়াছেন—তাহাদিগের ধন-প্রাণ রক্ষা করিতে পারেন নাই—ইহাদিগকে প্রথমে গ্রহণ করিবার বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন কি?

ব্রহ্ম যত দিন ভারতের অংশ ছিল, তত দিন ভারতীয়গণ ভারত সরকারকে এ বিষয়ে ব্যবস্থা করিতে বলিতে পারিত। কিন্তু ব্রহ্ম বিচ্ছিন্ন হইলেও যখন বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশ এবং স্বায়ত্ত-শাসনশীল নহে, তখন কি ভারত সরকার সে দেশে সর্ব্বস্বান্ত ভারতীয়দিগের সম্বন্ধে আবশ্যক ব্যবস্থা করিতে বৃটিশ সরকারকে বলিবেন না?

মালয় প্রভৃতি স্থান হইতে লোকাপসারণেও যে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা বড় লাটের শাসন-পরিষদের সদস্য শ্রীযুত মাধব শ্রীহরি এনী স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—যে সব সরকার তাহার জন্য দায়ী, সে সব সরকারই ত আর নাই—সুতরাং কাহাকে সে কথা বলা যায়? অতএব—দোষ আমাদিগের অদৃষ্টের।

শাসন-পদ্ধতির আলোচনা

বর্ত্তমান ভারত শাসন-পদ্ধতি যে দেশের জাতীয় দলের প্রীতিপ্রদ নহে, তাহা বলা বাহুল্য। বিশেষ, ইহা সাম্প্রদায়িকতার প্রসার-বৃদ্ধির সহায়। এই শাসন-পদ্ধতি যখন প্রবর্ত্তিত হয়, তখন তথা-কথিত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলেও, কেন্দ্রী সরকারে গণতন্ত্রের ছায়াপাতও নিবারিত হইয়াছিল। প্রথমে কংগ্রেস প্রদেশসমূহে মন্ত্রিমণ্ডল গঠনে অসম্মত হওয়ায় অধিকাংশ প্রদেশেই ঐ স্বায়ত্ত-শাসনও অচল হওয়া অনিবার্য্য দেখিয়া বিলাতে ভারত-সচিব ও এ দেশে বড়লাট কংগ্রেসের সহিত মীমাংসার চেষ্টায় এক বিবৃতি প্রচার করিবার পর অধিকাংশ প্রদেশেই কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করা হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুদ্ধের সময় কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। তাহার প্রথম কারণ—এ দেশের লোকের মতের অপেক্ষা না রাখিয়াই ভারতবর্ষকে যুদ্ধে লিপ্ত ঘোষণা করা হইয়াছিল, দ্বিতীয় কারণ—ভারতবর্ষ যুদ্ধ শেষ হইবার পর নির্দ্দিষ্ট কাল-মধ্যে পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার লাভ করিবে, কংগ্রেসের এই দাবী স্বীকৃত হয় নাই।

তদবধি অধিকাংশ প্রদেশেই—যে সকল প্রদেশে সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থায় ব্যবস্থা পরিষদে মুসলমানদিগের সংখ্যা অধিক নহে, সে সকল প্রদেশে—গবর্ণররা আবার স্বৈর-শাসন পরিচালন করিতেছেন। সম্প্রতি উড়িষ্যায় সে নিয়মের যে ব্যতিক্রম হইয়াছে, তাহা উল্লেখেরও অযোগ্য।

এই দীর্ঘকাল বিলাতে প্রধান-মন্ত্রী ও ভারত-সচিব কেবলই এ দেশের রক্ষা ও সখ্যাল্প সম্প্রদায়ের স্বার্থ-সংরক্ষণ—তথা বৃটেনের বিজেতার দায়িত্ব প্রভৃতি কারণে ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত-শাসনে বঞ্চিত রাখিবার কথাই বলিয়া আসিয়াছেন; আর এ দেশে বড়লাট বিখ্যাত, অখ্যাত ও কুখ্যাত বহু লোকের সঙ্গে আলোচনায় সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীতে যুদ্ধের অবস্থার সহসা বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়। জাপান বহু দিন হইতেই এশিয়ায় "নব-বিধান" প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়া—আপনার প্রভাব প্রবল করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল; এবং গোপনে যে আয়োজন করিতেছিল তাহাতে সে বৃটিশ নরনারীকে লাঞ্ছিত করিতে দ্বিধানুভব করে নাই। সে যখন বৃটেনের ও মার্কিণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়াই প্রবল আক্রমণ পরিচালিত করিল, তখন অপ্রস্তুত বৃটেনের ও তাহার সঙ্গীদিগের পক্ষে সে আক্রমণ প্রতিরোধ করা দুঃসাধ্য হইল। জাপান মালয় কুক্ষিগত করিল এবং প্রথমে সিঙ্গাপুরের পতনে ও তাহার পর ব্রহ্মে রেঙ্গুন পর্য্যন্ত অংশ হইতে বৃটিশ বাহিনীর বাধ্য হইয়া অপসারণে প্রাচীতে বৃটেনের বহু কালের সামরিক সম্ভ্রম ধূলিলুণ্ঠিত হইল। তাহার পর ভারতবর্ষ আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা—সঙ্গে সঙ্গে—প্রবল হইয়া উঠিল।

সেই অবস্থাহেতু বৃটিশ রাজনীতিকদিগকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মতের পরিবর্ত্তন করিতে হইল; কারণ, ভারতবর্ষ "বৃটিশ মুকুটে সর্ব্বাপেক্ষা সমুজ্জ্বল মণি।" লর্ড রথার-মিয়ার বলিয়াছেন—বৃটেন যদি ভারতবর্ষ হারায়, তবে তাহার সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িবে। সেই জন্য গত ১১ই মার্চ্চ বৃটিশ সরকার যে বিবৃতি প্রচার করেন, তাহাতে বলা হয়:—

জাপানীরা (ভারতের দিকে) অগ্রসর হওয়ায় ভারতের অবস্থায় যে সঙ্কট সমুদ্ভূত হইয়াছে, তাহাতে শত্রুর আক্রমণ হইতে তাহাদিগের দেশরক্ষায় যাহাতে ভারতীয়দিগের সকল শক্তি সঙ্ঘবদ্ধ হয়, তাহাই বৃটেনের অভিপ্রেত। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ভারত সম্বন্ধে বৃটিশ সরকারের নীতি ও উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া এক বিবৃতি প্রচারিত হইয়াছিল। তাহাতে এইরূপ প্রতিশ্রুতিই প্রদত্ত হইয়াছিল যে, যুদ্ধের পর যথাসম্ভব শীঘ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন দল একযোগে যে শাসন-পদ্ধতি রচনার অধিকার লাভ করিবেন, তাহাতে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এবং বৃটেনের ও বৃটেনের ডোমিনিয়নসমূহের সহিত তুল্যাধিকার লাভ করিতে পারিবে।

সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলা হয়, এই কাযে বৃটেনের কতক-গুলি দায়িত্ব (?) রক্ষা করিয়া কায করা হইবে। যথা—(১) ভারতে সংখ্যাল্পসম্প্রদায়সমূহের (ইহার

মধ্যে হিন্দু তথা-কথিত অবজ্ঞাত বা অনুন্নত সম্প্রদায়ও ধরা হইবে) স্বার্থ রক্ষা ; (২) সামন্ত রাজ্যসমূহের সহিত বৃটেনের সন্ধির সর্ত্ত রক্ষা ; (৩) ভারতের সহিত বৃটেনের দীর্ঘকালের (শাসিত-শাসক-সম্বন্ধ) হইতে উদ্ভূত কতকগুলি ব্যাপার।

এই জন্য বৃটিশ সমর-পরিষদ ভারতবর্ষের শাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধে যে প্রস্তাব রচনা করেন, তাহা লইয়া সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে এ দেশে পাঠান হয়। তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য—বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদিগের সহিত আলোচনা করিয়া—ঐ প্রস্তাব গৃহীত হইবার সম্ভাবনা আছে কি না তাহা তিনি বুঝিবেন। অর্থাৎ বৃটিশ সমর-পরিষদ—ভারতবাসীর মতের অপেক্ষা না রাখিয়া—আপনারা অভিভাবকরূপে নাবালক ভারতবাসীর জন্য যে শাসন-পদ্ধতি রচনা করিয়াছেন, ভারতবাসীর যদি তাহাতে আপত্তি না থাকে, তবে তাহারা তাহা পাইতে পারে।

সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসও এ দেশে আসিয়া প্রথমে সেইরূপ কথাই বলিয়াছিলেন—বৃটেনে প্রস্তুত যে পদ্ধতির প্রস্তাব লইয়া তিনি আসিয়াছেন, তাহাতে কেবল সামান্য পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে—মূল প্রস্তাব যেমন তেমনই রাখিতে হইবে।

২২শে মার্চ্চ সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ বিমানে ভারতে আগমন করেন এবং তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই কংগ্রেস, মসলেম লীগ ও হিন্দু মহাসভা এই প্রধান প্রতিষ্ঠানত্রয়কে তাঁহার সহিত আলোচনার জন্য প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে বলা হইয়াছিল।

২৩শে মার্চ্চ দিল্লীতে উপনীত হইয়া সার ষ্ট্যাফোর্ড বলেন, তিনি দুই সপ্তাহকাল ভারতে অবস্থিতি করিবেন এবং প্রথমে বড়লাটের ও তাহার পরে জঙ্গী-লাটের ও প্রাদেশিক গভর্ণরদিগের সহিত আলোচনা করিবেন। কংগ্রেস, মসলেম লীগ ও হিন্দু মহাসভার মত সামন্ত রাজ্য-সমূহের প্রতিষ্ঠানকেও প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিতে বলা হয়। শ্রীযুত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে স্বতন্ত্রভাবে সাক্ষাতের জন্য আমন্ত্রণ করা হয়।

২৯শে মার্চ্চ সার ষ্ট্যাফোর্ড বিলাতের সমর-পরিষদের প্রস্তাব প্রকাশ করেন। তাহা এইরূপ :—

(১) যুদ্ধাবসানের অব্যবহিত পরেই ভারতের জন্য একটি নূতন শাসন-পদ্ধতি রচনা করিবার দায়িত্ব দিয়া ভারতে একটি নির্ব্বাচিত প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইবে। কি ভাবে ইহা গঠিত হইবে, তাহা পরে বিবৃত করা হইবে।

(২) শাসন-পদ্ধতি রচনাকারী প্রতিষ্ঠানে যোগদানের জন্য সামন্ত-রাজ্যগুলির সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা করা হইবে।

(৩) বৃটিশ সরকার এইরূপ ভাবে রচিত শাসন-পদ্ধতি নিম্নলিখিত সর্ত্তে অবিলম্বে গ্রহণ করিতে ও কার্য্যে প্রযুক্ত করিতে প্রস্তুত আছেন :—

(ক) বৃটিশ শাসনাধীন ভারতের কোন প্রদেশ নব-রচিত শাসন-পদ্ধতি গ্রহণ করিতে সম্মত না হইলে তাহাকে বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতি রাখিতে দেওয়া হইবে। ঐ প্রদেশ যদি পরে নূতন শাসন-পদ্ধতি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার ব্যবস্থাও থাকিবে।

যে সকল প্রদেশ যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতে সম্মত হইবে না, তাহারা ইচ্ছা করিলে, বৃটিশ সরকার তাহাদিগের জন্য "ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের" অনুরূপ পূর্ণমর্য্যাদাসম্পন্ন অন্য একটি শাসন-পদ্ধতি রচনা করিতে সম্মত থাকিবেন। উহাও নিম্নলিখিত ভাবে রচিত হইবে।

(খ) বৃটিশ সরকার ও শাসন-পদ্ধতি রচনাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আলোচনাফলে প্রস্তুত এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইবে। এই সন্ধিতে দায়িত্ব বৃটিশ সরকারের নিকট হইতে ভারতীয়দিগের নিকট সম্পূর্ণ হস্তান্তরিত হওয়ায় উদ্ভূত সকল সমস্যার সমাধান করা হইবে। বৃটিশ সরকার জাতি ও ধর্ম্মবিষয়ে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহের স্বার্থরক্ষার জন্য যে সকল প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন, তদনুযায়ী বিধান সন্ধিতে থাকিবে। কিন্তু সন্ধি বৃটিশ রাষ্ট্রসঙ্ঘের অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত ভারতীয় রাষ্ট্রের সম্বন্ধ নির্দ্ধারণের ক্ষমতায় কোনরূপ বিধি-নিষেধ আরোপ করিবে না।

কোন সামন্ত রাজ্য এই সঙ্ঘে যোগ দিতে ইচ্ছা করুক না করুক, নূতন ব্যবস্থার প্রয়োজন বুঝিয়া তাহার সহিত বৃটিশের সন্ধি-সর্ত্তের পরিবর্ত্তনজন্য আবশ্যক আলোচনা করা হইবে।

(৪) প্রধান প্রধান ভারতীয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ যুদ্ধ-পরিসমাপ্তির পূর্ব্বে আপনারা কোন কোন ব্যবস্থায় সম্মত না হইলে, শাসন-পদ্ধতি রচনাকারী প্রতিষ্ঠান নিম্নলিখিতরূপে গঠিত হইবে :—

যুদ্ধ-পরিসমাপ্তির অব্যবহিত পরে প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদসমূহের নির্ব্বাচন-ফল প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদসমূহের সকল সদস্য একটি নির্ব্বাচক-মণ্ডলীতে পরিণত হইয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিবেন। নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর আনুমানিক এক-দশমাংশ সদস্য লইয়া এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে।

বৃটিশ-শাসিত ভারতের জনসংখ্যার যে অনুপাতে বৃটিশ-শাসিত ভারতের প্রতিনিধি থাকিবেন, সেই অনুপাতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে সামন্ত রাজ্যসমূহকেও আহ্বান করা হইবে এবং বৃটিশ-শাসিত ভারতের প্রতিনিধিগণের যে সকল অধিকার থাকিবে, সামন্ত রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিগণেরও সেই অধিকার থাকিবে।

(৫) বর্ত্তমানে ভারতের যে সঙ্কটকাল সমুপস্থিত, যত দিন তাহা দূর না হয় এবং যত দিন নূতন শাসন-পদ্ধতি রচনা করা সম্ভব না হয়, তত দিন বৃটিশ সরকার অবশ্যই ভারত রক্ষার দায়িত্ব বহন করিবেন এবং পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধের অংশরূপেই ভারতে তাহা পরিচালিত করিবেন। কিন্তু ভারতের সামরিক, নৈতিক ও উপকরণগত যে সকল সুযোগ রহিয়াছে ভারত সরকার সে সকলের সম্যক্ ব্যবহারের দায়িত্ব লইবেন এবং সেই কার্য্যে ভারতবাসীর সাহায্য গ্রহণ করিবেন।

গান্ধীজী এই প্রস্তাবকে—পরে দিবার প্রতিশ্রুতি মাত্র বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

এই প্রস্তাব যে পূর্ব্বে উল্লেখিত আগষ্ট মাসের প্রস্তাব অপেক্ষা অগ্রগামী নহে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। সার ষ্ট্যাফোর্ড এই প্রস্তাবের যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহাতে ইহার প্রকৃতিগত ত্রুটি দূর বা গোপন করা সম্ভব হয় নাই। সে সকল ত্রুটির মধ্যে কয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

(১) এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে মহাভারত রচনার চেষ্টা স্বপ্নমাত্রে পর্য্যবসিত করিয়া খণ্ড খণ্ড ভারত রচনা করাই হইবে। যদিও সার ষ্ট্যাফোর্ড বলিয়াছেন, প্রস্তাবে "পাকিস্থান" পরিকল্পনা সমর্থিত হয় নাই, তথাপি কার্য্যতঃ যে তাহাই হইবে, তাহা বর্ত্তমান অবস্থা লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

(২) বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট নির্ব্বাচন-প্রথায় ব্যবস্থা পরিষদের যে নির্ব্বাচন হইবে, তাহাতে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা শাসন-পদ্ধতি রচনা সমিতিতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিলে সেই সমিতিও সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট হওয়া অনিবার্য্য হইবার সম্ভাবনা।

(৩) সামন্ত রাজ্যসমূহকে বৃটিশ-শাসিত প্রদেশ-সমূহের সহিত তুল্যাধিকার প্রদান কখনই সমর্থিত হইতে পারে না। তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ, সে সকল রাজ্যে গণতন্ত্র সমাদৃত নহে।

(৪) বর্ত্তমানে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইতেছে, তাহা ভারতবাসীকে স্বায়ত্ত-শাসন প্রদানের আগ্রহে নহে—সামরিক প্রয়োজনে। অথচ দেশরক্ষার দায়িত্ব ও ভার বৃটিশ সরকারের থাকিবে। বৃটিশ সরকার যে একা সে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে ও সে ভার বহন করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন, তাহার কারণ আমরা জাপান কর্ত্তৃক অধিকৃত মালয়ে ও ব্রহ্মের অংশে, এমন কি আন্দামানেও দেখিতে পাইয়াছি।

কাযেই এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, এই প্রস্তাব ভারতবাসীর দেশাত্মবোধের পক্ষে সম্মানজনক নহে।

দেশরক্ষার ভার সম্বন্ধে সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস বিলাতে সমর-পরিষদের সহিত টেলিগ্রাম-বিনিময় করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন, তাহাতেও ভারতবাসীকে সে ভার প্রদান করা হয় না।

কংগ্রেস বার বার বিবেচনা ও বহু বার আলোচনা করিবার পর প্রস্তাব গত ১১ই এপ্রিল প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন এবং সুস্পষ্টরূপে বলিয়াছেন—দেশরক্ষার দায়িত্ব ভারতবর্ষকে না দিলে সে দায়িত্ব প্রহসনমাত্রে পরিণত করা হয় এবং তাহা অন্তঃসারশূন্য হয়। তাহাতে বুঝায়, যত দিন যুদ্ধ চলিবে, তত দিন ভারতবর্ষ পরাধীনই থাকিবে এবং ভারত সরকার স্বাধীন সরকার-রূপে কায করিতে পারিবেন না।

বলা বাহুল্য, এই যে "ভারত সরকারের" কথা বলা হইয়াছে, ইহা সার ষ্ট্যাফোর্ডের নিদানের বিধান অনুসারে গঠিত নানা দলের প্রতিনিধি লইয়া—এমন কি সামন্ত রাজ্যসমূহেরও প্রতিনিধি গ্রহণ করিয়া যে সরকার গঠনের কল্পনা করা হইয়াছিল, তাহাই। যদি সে সরকার গঠিত হইত, তবে তাহা যে বড়লাটের বিস্তারপ্রাপ্ত শাসন-পরিষদেরই অভিনব সংস্করণ হইত, তাহা বলা বাহুল্য। আর সেরূপ সরকার গঠিত হইলে তাহা সমবেত-ভাবে কার্য্য পরিচালনা করিতে পারিত কি না এবং তাহাতে যুদ্ধে অধিক সাহায্য লাভের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত কি না, সে বিষয়েও সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

কংগ্রেসের মত মসলেম লীগও প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

হিন্দু মহাসভা বলিয়াছেন, যত দিন ভারতবর্ষ খণ্ডিত হইবার সম্ভাবনা প্রস্তাব হইতে বর্জ্জন করা না হইবে, তত দিন তাঁহারা ইহা সমর্থন করিতে পারেন না।

সুতরাং কোন প্রধান প্রতিষ্ঠানের সমর্থন, সার ষ্ট্যাফোর্ড দুই সপ্তাহের স্থানে প্রায় চারি সপ্তাহ ভারতবর্ষে থাকিয়াও, লাভ করিতে পারিলেন না।

সম্ভবতঃ লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের আশা ছিল, কংগ্রেসকে বর্জ্জন করিয়াও বৃটিশ সরকার তাঁহাদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে পারিবেন এবং সেই জন্য তিনি আমেরিকায়—নিরাপদস্থানে থাকিয়া—আস্ফালন করিয়াছেন—কংগ্রেস সমগ্র ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিবার অধিকারী নহেন। তিনি মুসলমান সম্প্রদায়ের ও অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়ের সমর্থনের আশা মনে পোষণ করিয়াছিলেন, বলিয়াই মনে হয়!

কিন্তু সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস সেই কুম্ভকর্ণের নিদ্রাবসানের কথায় আস্থা স্থাপন করেন নাই। তিনি দীর্ঘ তিন সপ্তাহ কাল তাঁহার বিশেষ চেষ্টায় ভারতীয়দিগকে বৃটিশ সরকারের অস্পষ্ট প্রস্তাব দিয়া আকৃষ্ট করিতে পারিলেন না। তিনি যে প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহার ধাতুগত অসারতাই ভারতবাসী কর্ত্তৃক তাহা প্রত্যাখ্যানের কারণ।

গত ১১ই এপ্রিল, সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস সাংবাদিকদিগকে বলিয়াছেন :—

বৃটিশ সরকার ভারতবাসীর নিকট শাসন-পদ্ধতি সম্পর্কিত যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাহার করিলেন।

অর্থাৎ শাসনসম্বন্ধীয় ব্যবস্থা তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে যেমন ছিল, তাহার গমনের পরেও তেমনই থাকিবে—মধ্যে যাহা হইয়াছে তাহা আলোচনা মাত্র। তবে তাহা যে ভারতের রাজনীতিক জয়যাত্রার পথে স্মরণীয় স্মৃতিচিহ্নরূপে বিরাজ করিবে, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

হয়ত যুদ্ধের মধ্যে বৃটিশ সরকার আর কোন প্রস্তাব করিবেন না। পরে, তাঁহারা কোন প্রস্তাব করিবেন কি না, তাহা কে বলিতে পারে?

এ দিকে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ যদি আক্রান্ত হয়, তবে দেশরক্ষায় প্রচেষ্ট হওয়া তিনি কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন—নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না। তিনি যুদ্ধে ইংরেজের সহিত সহযোগের কোন প্রস্তাব করিবেন কি না এবং করিলে তাহা কিরূপ হইবে, তাহা এখন দেখিবার বিষয় রহিল।

আক্রান্ত ভারত

সিঙ্গাপুরের পতনের ও ব্রহ্মের কতকাংশ অধিকারের পর ভারতে জাপানীদিগের আক্রমণের আশঙ্কা যে অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। সিঙ্গাপুরের পতনের পর ভারত মহাসাগরে ও বঙ্গোপসাগরে জাপানী সর্ব্ববিধ রণতরীর বিচরণ-পথ মুক্ত হইয়াছে। গত ২৫শে মার্চ্চ প্রচারিত হয়—তাহার দুই দিন পূর্ব্বে জাপানীরা আন্দামান অধিকার করিয়াছে। তাহাদিগের আক্রমণ অনিবার্য্য এবং হয়ত প্রতিহত করা অসম্ভব জানিয়া তাহারও কয় দিন পূর্ব্বে ইংরেজ সরকার আন্দামান হইতে লোকাপসারণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইংরেজের আন্দামান ত্যাগ বৃটেনের জার্শি দ্বীপ ত্যাগের মত গুরুত্বশূন্য নহে। কারণ, আন্দামান অধিকার করিলে জাপান যে তথায় ঘাঁটী করিতে পারিবে, তাহা ইংরেজ অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াও তাহা রক্ষা করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন।

এ দিকে মাদ্রাজের উপকূল রক্ষার বিষয় ভারত সরকারের বিবেচনার বিষয় হয়, এবং মাদ্রাজের উপকূল হইতে স্থানে স্থানে লোকাপসারণের ব্যবস্থা হয়। মাদ্রাজের পর উড়িষ্যায়ও অনুরূপ চিন্তার কারণ ঘটে। কলিকাতা যে বিমান আক্রমণের লক্ষ্য হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বেই অনুমান করিয়া বাঙ্গালা সরকার সে জন্য যথাসম্ভব প্রস্তুত হইতেছিলেন। যে সকল লোকের কলিকাতায় অবস্থিতি অনিবার্য্য নহে, সে সকল লোককে—বাহিরে আশ্রয়স্থানের ব্যবস্থা করিতে পারিলে—কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাইতে পরামর্শ দেওয়া হয়। এখনও সেই পরামর্শ প্রদান করা হইতেছে। কলিকাতায় "বিমান আক্রমণ-বিরোধী" ব্যবস্থারও নানারূপ উন্নতি সাধন করা হইতেছে। কলিকাতাবাসীরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছে না। ইতোমধ্যে এক দিন নিশীথে কলিকাতায় বিমান আক্রমণের শঙ্কাসূচক "সাইরেন" ধ্বনি করা হইয়াছিল। কলিকাতার রাজপথে আলোক-নিয়ন্ত্রণ পূর্ব্বেই হইয়াছে—মধ্যরাত্রির পর সকল আলোক নির্ব্বাপিত হয়। পথের উপর প্রাচীর ও মধ্যে মধ্যে আশ্রয়-গৃহ। সমগ্র সহরে যে স্থানেই পতিত জমি আছে, তথায় পরিখা খনিত হইয়াছে। কলিকাতা হইতে প্রায় ৭ লক্ষ লোক ইতোমধ্যেই চলিয়া গিয়াছে।

এই সময় ৫ই এপ্রিল তারিখে সিংহলে—কলম্বো সহরে প্রথম বোমা-বর্ষণ হইয়াছে। সে বর্ষণে ক্ষতি আশঙ্কানুরূপ হয় নাই এবং কলম্বোর অধিবাসীরা ভীতিবিহ্বলও হয় নাই। ভারতবর্ষেও যে রক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহার প্রসঙ্গে বলা যায়, গত ৪ঠা এপ্রিল, ভারতবর্ষ হইতে কয়খানি আমেরিকান বিমান যাইয়া বঙ্গোপসাগরে পোর্টব্লেয়ারে রক্ষিত জাপানী যুদ্ধতরীগুলিকে আক্রমণ করিয়া অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছিল।

ইহার পর গত ৬ই এপ্রিল প্রাতে ও অপরাহ্ণে ভিজাগাপটম বন্দর এবং ঐ দিনই কোকনদা বিমান হইতে আক্রান্ত হয়। ভারতের ভূমিতে ইহাই প্রথম বিমান হইতে বোমাবর্ষণ। এখন যে কোন সময়ে যে ভারতের উপকূলস্থ যে কোন অংশে বোমা বর্ষিত হইতে পারে, তাহা মনে করিতেই হয়।

এই ঘটনার পর যে ঘটনার সংবাদ—বিস্তৃত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহা এইরূপ—

(১) বঙ্গোপসাগরে কয়খানি বাণিজ্যতরী জাপানের জাহাজ ও বিমান হইতে আক্রমণে জলমগ্ন হইয়াছে। প্রায় ৪।৫ শত লোকের উদ্ধার-সাধন সম্ভব হইয়াছে এবং তাহাদিগকে উড়িষ্যার উপকূলে নানা স্থানে আনা হইয়াছে।

(২) লণ্ডন হইতে সংবাদ প্রকাশিত হয় (৯ই এপ্রিল) বৃটিশের দুইখানি ক্রুজার রণতরী—"ডরশেট-সায়ার" ও "কর্ণওয়াল" জাপানীদিগের বিমান আক্রমণে ভারত মহাসাগরে জলমগ্ন হইয়াছে।

ইহা সোমবারের ঘটনা।

পরে কটক হইতে বঙ্গোপসাগরে জলমগ্ন বাণিজ্য তরীগুলির বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। তাহাতে প্রকাশ :—

সোমবার প্রাতে যে ছয়খানি জাহাজ জলমগ্ন হয়,

সেগুলি রক্ষী জাহাজ দ্বারা রক্ষিত অবস্থায় যাইতেছিল। সেই সময় সেগুলির প্রতি জাপানী বিমানের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বেলা ৮টার সময় এই ঘটনা ঘটে। তাহার পরই ২ খানি ভারী জাপানী ক্রুজার ও একখানি ডেষ্ট্রয়ার আসিয়া উপস্থিত হয় এবং জাহাজগুলির উপর গোলাবর্ষণ আরম্ভ করে। ঐ কয়খানি জাহাজে বৃটিশ, আমেরিকান, চীনা ও ভারতীয় ছিল। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টায় সব শেষ হয়। বেলা প্রায় ১১টার সময় কটকে সংবাদ পাওয়া যায়—প্রায় ৩০ মাইল দূরে কামানের শব্দ পাওয়া গিয়াছে। অতি কষ্টে লোক—যাত্রীদিগের মধ্যে যাহারা কূলে উপনীত হইয়াছিল—তাহাদিগের নিকট উপনীত হয়। রাত্রিতে ঝড় বহিতেছিল। বহু যাত্রী প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় ও অনাহারে রাত্রি কাটাইতে বাধ্য হয়। তাহার পর পদব্রজে প্রায় ১০ মাইল অতিক্রম করিয়া তাহারা যে স্থানে উপনীত হয়, তথা হইতে তাহাদিগকে মোটরে কটকে আনা হয়।

গ্রামের লোকরা আগন্তুকদিগকে যথাসম্ভব সাহায্য করিয়াছিল এবং হরিশপুরের জমিদারের ম্যানেজার পুলিসকে বিশেষ সাহায্য করেন। এই হরিশপুর (হরিশপুর গড়) এ দেশে—বিশেষ বাঙ্গালায় ইংরেজের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। কারণ, যে কয় জন ইংরেজ বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিবার অনুমতি লাভ করিবার চেষ্টায় মসুলীপটম হইতে নৌকায় আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিল এই হরিশপুরের ঘাটে নৌকার নোঙ্গর ফেলিয়াছিলেন। হরিশপুরে তখন মোগলদিগের শুল্কঘর ছিল। এই হরিশপুরেই ঐ বৎসর জুন মাসে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যায় ইংরেজের প্রথম কুঠী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বঙ্গোপসাগরে ইহাই বহু শতাব্দীর মধ্যে প্রথম নৌ-যুদ্ধ।

প্রকাশিত বিবরণে বুঝিতে পারা যায়, জাপানী সামরিক নৌবহর এখন বঙ্গোপসাগরে বিচরণ করিতেছে। গত যুদ্ধের সময় জার্ম্মাণ রণতরী "এমডেন" ভারত মহাসাগরে আসিয়া মাদ্রাজের উপকূলে কিছু ক্ষতি করিয়া গিয়াছিল। সে তখন বাধা পায় নাই।

এ বার জাপানী সামরিক নৌবহরের ভারত মহাসাগরে ও বঙ্গোপসাগরে প্রবেশে অনিষ্টের আশঙ্কা অনেক অধিক। কারণ, জাপানী নৌবহরে কতগুলি জাহাজ প্রভৃতি আছে, তাহা জানা যায় নাই। জাপান পৃথিবীর তৃতীয় নৌশক্তি বলিয়া অভিহিত। কিন্তু তাহার প্রকৃত শক্তি কিরূপ, তাহা ইংরেজ জানে না।

যদি বিমানের সাহায্য পাইয়া জাপানী নৌবহর শক্তিশালী হয়, তবে ভারতের দীর্ঘ সমুদ্রকূলে তাহার পক্ষে আক্রমণ পরিচালন—এমন কি সৈনিক অবতরণ করাও সম্ভব হইতে পারে। বাঙ্গালায় ও ভারতে সরকারের স্বতন্ত্র নৌবহর নাই—সিঙ্গাপুরের পতনের পর যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে অন্য স্থান হইতে নৌবহর আনিয়া জাপানী নৌবহরের সহিত যুদ্ধ করাও সহজসাধ্য নহে। তবে জাপান যে জলপথে ভারতবর্ষই আক্রমণ করিতে উদ্যত, তাহা না-ও হইতে পারে। কারণ, তাহাকে প্রশান্ত মহাসাগরে দৃষ্টি রাখিতেই হইবে। তথায় মার্কিণের নৌবহর তাহার বিপদ ঘটাইতে পারে। যত দিন একটি বড় জলযুদ্ধ না হইবে, তত দিন জাপানের দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়া ও ডাচ ইষ্ট-ইণ্ডিজ অধিকার ক্ষণভঙ্গুর ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

বঙ্গোপসাগরে জাপানী নৌবহরের অবস্থিতি যে কলিকাতা বন্দরের উপযোগিতা ক্ষুণ্ণ করিবে, কেবল তাহাই নহে—তাহার দ্বারা বাঙ্গালাও যে কোন সময়ে বিপন্ন হইতে পারে। কলিকাতা আর ভারতের রাজধানী নহে, সুতরাং রাজধানীতে—হৃদ্‌কেন্দ্রে—আঘাত করা যদি জাপানের অভিপ্রেত হয়, তবে সে দিল্লীতেই অধিক মনোযোগ দিবে, এমন মনে করিয়া স্বস্তিলাভের অবসর আমাদিগের নাই। কলিকাতার গুরুত্ব অল্প নহে—হয়ত দিল্লীর গুরুত্ব-তুলনায় অধিক। কলিকাতা রক্ষার স্বতন্ত্র ও বিশেষ ব্যবস্থা যে একান্ত প্রয়োজন, তাহা বলা বাহুল্য। বাঙ্গালার বন্দর—কলিকাতা ও চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামও কলিকাতারই মত আক্রান্ত হইতে পারে। নৌবলের সাহায্য পাইলে বিমানবলও প্রবল হইতে পারে এবং উভয়ের সহযোগে শত্রুর পক্ষে সৈন্য আনয়ন দুষ্কর হয় না।

বাঙ্গালার খাদ্য-সমস্যা

যুদ্ধের জন্য বাঙ্গালার খাদ্য-সমস্যা বর্ত্তমান যুদ্ধজনিত অবস্থায় অধিক জটিল হইয়া উঠিয়াছে—ভবিষ্যতে হয়ত আরও জটিল হইবে। গত বৎসর যখন বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্যদ্রব্য চাউলের মূল্য বর্দ্ধিত হয়, তখন তাহার কারণ-সমূহের মধ্যে বলা হয়, যুদ্ধের জন্য জাহাজে স্থানের স্বল্পতায় ব্রহ্ম হইতে যথেষ্ট পরিমাণ চাউল আমদানী করা সম্ভব হয় নাই। তাহার পর ব্রহ্ম সরকার দিন কয়েক আকিয়াব হইতে ভারতে চাউল রপ্তানী বন্ধও করিয়াছিলেন। সেই সময়েই জানা গিয়াছিল, জাপান ব্রহ্ম হইতে প্রচুর চাউল লইয়া যাইতেছিল। তাহা যে তাহার সমরায়োজনে করা হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। সে যাহাই হউক—এ বার ব্রহ্ম হইতে আর চাউল ভারতে আসিবে না। সুতরাং বাঙ্গালায় যে চাউল উৎপন্ন হয়, তাহাতেই বাঙ্গালীর ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায় করিতে হইবে। কেবল তাহাই নহে, বিহার, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতিতে গমের অভাবহেতু চাউলের চাহিদা যে বর্দ্ধিত

হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালায় যে সকল অবাঙ্গালী বাস করে, তাহারাও আটা ও ময়দার অভাবে মন্ডই গ্রহণ করিবে। অথচ বাঙ্গালায় যে চাউল হয়, তাহাতে বাঙ্গালীরই খাইতে কুলায় না। এই অবস্থা বৎসরের পর বৎসর অধিক জটিল হইয়া উঠিতেছিল।

বাস্তবিক ভারতবর্ষ বিরাট্ চাউল আমদানিকারী দেশে পরিণত হইয়াছে এবং অধিকাংশ আমদানী ব্রহ্ম হইতেই হইত। ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ ব্রহ্ম হইতে ১২ লক্ষ ৮১ হাজার টন চাউল আমদানী করিয়াছিল এবং এই আমদানী চাউলের মূল্য ১১ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা। বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে চাউলই লোকের খাদ্য নহে এবং যে সকল প্রদেশে চাউলই ব্যবহৃত হয়, সে সকলের মধ্যেও মাদ্রাজ প্রভৃতি কোন কোন প্রদেশকে চাউলের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় না। কিন্তু বাঙ্গালার অবস্থা অন্যরূপ। বাঙ্গালাকে বাহির হইতে চাউল আমদানী করিতেই হয় এবং কিছু দিন হইতে ব্রহ্মই তাহার চাউলের চাহিদা পূর্ণ করিত। কাযেই বর্ত্তমান অবস্থায় কি হইবে, তাহা বিশেষ চিন্তার বিষয় হইয়াছে।

বাঙ্গালার সরকার এত দিন বাঙ্গালাকে চাউল সম্বন্ধে স্বাবলম্বী করিবার আবশ্যক চেষ্টা করেন নাই। "কড়িতে বাঘের দুধ মিলে" এই বিশ্বাসে তাঁহারা পাটচাষেই অধিক উৎসাহ দিতেন এবং মধ্যে মধ্যে "ইন্দ্রশাইল" ও "কটকতারা" চাউলের কথা বলিয়াই মনে করিতেন—কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়াছেন। অথচ ধান্যের চাষে কত উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহা ইটালী প্রভৃতি দেশে দেখা গিয়াছে। এ বার বাঙ্গালা সরকার বাঙ্গালার কৃষককে অধিক পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপন্ন করিতে উপদেশ দিতেছেন। তাহা প্রয়োজন। কিন্তু খাদ্যশস্য উৎপন্ন করা সময়সাপেক্ষ—তাহা ঐন্দ্রজালিক দণ্ডের স্পর্শে হয় না। আগামী অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ব্বে ধান্যের নূতন ফশল সংগৃহীত হইবে না। অথচ তাহার বহু পূর্ব্বেই—শ্রাবণ মাস হইতেই—চাউলের অভাব অনুভূত হইবে। বাঙ্গালায় যে মজুদ চাউলের বা ধান্যের পরিমাণ অধিক তাহা নহে। কোন কোন অর্থনীতিক বলিয়াছেন, পূর্ব্বে যে লোক রপ্তানীর অসুবিধাহেতু ও অভ্যাসবশে ধান্য মজুদ রাখিত, সে অবস্থা রেল-গাড়ীর জন্য পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এখন লোক আর ধান মজুদ রাখে না—প্রয়োজন হইলে চাউল কিনিয়া খায়।

এই অবস্থায় কি হইবে?

যাহাতে বাঙ্গালা হইতে চাউল রপ্তানী বন্ধ হয়, সর্ব্বাগ্রে তাহাই করিতে হইবে। ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে ভারতে ২ কোটি ৩৫ লক্ষ ৭৭ হাজার টন চাউল উৎপন্ন হইলেও তাহাকে ব্রহ্ম হইতে যে চাউল আমদানী করিতে হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি। সেই বৎসরেও ভারতবর্ষ হইতে ২ লক্ষ ৮২ হাজার টন চাউল রপ্তানী হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন দেশে রপ্তানীর হিসাব এইরূপ—

বৃটেন	...	৬ হাজার টন
য়ুরোপের অন্যান্য দেশ	...	৪ " "
সিংহল	...	১ লক্ষ ৫ হাজার টন
এসিয়ার অন্যান্য স্থান	...	৮১ " "
দক্ষিণ-আফ্রিকা	...	২৫ " "
পূর্ব্ব-আফ্রিকা	...	৬ " "
অন্যান্য দেশ	...	৫৫ " "

বলা বাহুল্য, এ বার বাঙ্গালা হইতে চাউল রপ্তানীর অসুবিধা হইবে। তাহা যেন "দোষ হৈয়া গুণ হইল"—দাঁড়াইবে। কিন্তু তাহাতেই হইবে না।

তাহার পর—বাঙ্গালা হইতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও চাউল রপ্তানী বন্ধ করিতে হইবে এবং বাঙ্গালা হইতে অন্য প্রদেশের অনাবশ্যক লোক অপসারণও প্রয়োজন হইতে পারে।

যাহাতে এ বার আশুধান্যের ও পরে হৈমন্তিক-ধান্যের চাষ অধিক হয়, সে বিষয়ে সরকারকে অবহিত হইতে হইবে। তাহা হইলে অগ্রহায়ণ মাসের শেষ হইতে অভাব হ্রাস পাইতে পারে।

সে সম্বন্ধে এবং প্রয়োজন হইলে ফেন-সহ ভাত ব্যবহার সম্বন্ধে লোককে উপদেশ দিতে হইবে। বাঙ্গালা সরকার খাদ্যশস্যের ফশলবৃদ্ধির জন্য এক সমিতি গঠিত করিতেছেন। সেই সমিতি কি ভাবে কায করেন, তাহার উপর ফল বহু পরিমাণে নির্ভর করিবে। সে জন্য প্রচার-কার্য্য প্রয়োজন। বাঙ্গালা সরকারের কৃষি বিভাগ যে ভাবে প্রচার-কার্য্য পরিচালিত করেন, তাহাতে আমাদিগের আস্থা নাই; পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে প্রচার-কার্য্যে তাঁহারা যে টাকা ব্যয় করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই অপব্যয় হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বিভাগের কায ও প্রচারের কায স্বতন্ত্র এবং প্রচার-কার্য্য ফলপ্রদ না হইলে তাহার জন্য যে অর্থ ব্যয়িত হয়, তাহা অপব্যয়ই হয়।

বাঙ্গালায় নানা প্রকার ধান্য জন্মে—সে সকলের মধ্যে যেগুলি অগ্রে ফশল দেয় ও যেগুলিতে ফশলের ফলন অধিক হয়, সেইগুলির চাষে কৃষকদিগকে অধিক অবহিত করিতে হইবে এবং সে জন্য জমি বুঝিয়া আবশ্যক বীজধান দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এ বিষয়ে আর বিলম্ব করা সঙ্গত নহে—কারণ চাউলের অভাবে বাঙ্গালীর জীবন বিপন্ন হইবে।

সামরিক ব্যবস্থা

বাঙ্গালা সরকার সামরিক প্রয়োজনে স্থানে স্থানে সব বাই-সাইকল ও দেশী নৌকা রেজেষ্টারী করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন শেষ করিবার সময় বাঙ্গালার গভর্ণর সার জন হার্ব্বার্ট এ বিষয়ে সরকারের মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। যদি আক্রমণকারীরা কোনরূপে প্রদেশের কোথাও কিছু সৈনিক আনিতে পারে, তবে তাহারা যাহাতে যান না পায়, সে বিষয়ে অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনেই এই কায করা হইতেছে। যদি কোথাও বিপদের সম্ভাবনা লক্ষিত হয়, তবে যথাসম্ভব শীঘ্র সেই অঞ্চল হইতে যানগুলি অপসারিত করিয়া অন্যত্র লইতে হইবে। ইহা সামরিক ব্যবস্থা।

এই সামরিক ব্যবস্থাহেতুই কলিকাতা হইতে অনাবশ্যক লোক অপসারণের উপদেশ দান ও চট্টগ্রামের কোন কোন স্থান হইতে লোক অপসারিত করা হইয়াছে। হয়ত আরও কোন কোন স্থানে এই ব্যবস্থা করা হইতেছে বা হইবে। তবে সে সকল বিষয়ে সংবাদ গোপন রাখাই প্রয়োজন। কারণ, সেরূপ সংবাদে আক্রমণপ্রয়াসীদিগের সুবিধা হইতে পারে।

এই সঙ্কট অবস্থায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকগণ এক দিকে যেমন পরীক্ষার দিন পিছাইয়া দিয়া বিপদ যখন ঘনীভূত সেই সময় পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, অপর দিকে তেমনই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন কার্য্যালয় স্থানান্তরিত করিয়া ও সঙ্কটকালীন কর্ম্মচারীর পদ সৃষ্টি করিয়া অনেক টাকা ব্যয়ের পথ পরিষ্কৃত করিয়াছেন। সঙ্কটকালীন কর্ম্মচারীর কায কি, তাহাও বুঝা যায় না। আবার তাঁহারা যে সকল অধ্যাপকের কার্য্যকাল শেষ হইতেছে, তাঁহাদিগকে নির্ব্বিচারে আরও এক বৎসরকাল চাকরীর মেয়াদ বৃদ্ধি করিয়া দিয়া পোষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অথচ তাঁহারা কি কায করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ যে নাই, তাহা নহে।

কলিকাতায় বিদ্যালয়গুলিও বন্ধ করা হয় নাই—বালিকা বিদ্যালয়গুলি সঙ্ঘবদ্ধ মাত্র করা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকগণ সঙ্কটে স্থিরভাবে কায করিতে পারেন নাই। ইহার ফল ছাত্রদিগকে ও তাহাদিগের অভিভাবকদিগকেই ভোগ করিতে হইতেছে ও হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস-চান্সেলার সার মহম্মদ আজিজুল হক বিলাতে হাই কমিশনারের পদ পাইয়া বিলাতযাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার স্থানে ডাক্তার শ্রীযুত বিধানচন্দ্র রায় ভাইস-চান্সেলার মনোনীত হইয়াছেন। আমরা আশা করি, ভাইস-চান্সেলারকে সঙ্কটকালীন কর্ম্মচারীর নির্দ্দেশে বহরমপুরে যাইতে হইবে না।

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুকে ত্রিচিনপল্লী কারাগার হইতে স্থানান্তরিত করিয়া মারকারায় (কুর্গ) লইয়া যাওয়া হইয়াছে। তথায় তাঁহাকে কারাগারে বদ্ধ না রাখিয়া একখানি স্বতন্ত্র বাঙ্গলোয় রাখা হইয়াছে। এই স্থানের জলবায়ু যে ত্রিচিনপল্লীর জলবায়ুর তুলনায় ভাল, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু যে গৃহে তাঁহাকে রাখা হইয়াছে, তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নহে। যাঁহারা আশা করিয়াছিলেন, সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ তাঁহার সহিতও শাসন-পদ্ধতিসম্পর্কিত প্রস্তাবের আলোচনা করিবেন, তাঁহাদিগের আশা পূর্ণ হয় নাই। সার ষ্ট্যাফোর্ড "ফরওয়ার্ড ব্লক" দলের প্রতিনিধির বা প্রতিনিধিদিগের সহিতও আলোচনা করিতে সম্মত হন নাই। তিনি তাহার কারণ দেখাইয়া বলিয়াছেন—ঐ দলের সভাপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু এখন বৃটেনের শত্রুপক্ষের সহিত সহযোগ করিতেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি—বেতারে সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা ব্যতীত কোন প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই। সার ষ্ট্যাফোর্ড কি সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠস্বরের সহিত পরিচিত?

সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু-সংবাদ

একটি অসমর্থিত সংবাদে প্রচারিত হইয়াছিল, জাপানের নিকট বিমান-দুর্ঘটনায় শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু হইয়াছে। পরে সে সংবাদ সমর্থিত হয় নাই এবং প্রমাণিত হইয়াছে, তাহা নির্ভরযোগ্য—সুতরাং বিশ্বাস-যোগ্য নহে। তবে সুভাষচন্দ্র এখন কোথায় এবং তিনি কি করিতেছেন, তাহাও জানা যায় নাই।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত